আজ দেশব্যাপী **বেঙ্গল শটীফুডের** সুখ্যাতি কেন? **বেঙ্গল শটীফুডের** সুযশ এই জন্য ইহা যেমন **উপকারী** তেমনি **বিশুদ্ধ** এবং সম্পূর্ণ **ভারতীয় উপাদানে** ভারতবাসীর দ্বারা প্রস্তুত। **আজকাল** বাজারে এমন কোন শিশু-**পথ্য** বা **খাদ্য** নাই যাহা **বেঙ্গল শটীফুডের** সমকক্ষ হইতে পারে। **এমন কি** বিলাতি বার্লি বা এরারুট অপেক্ষা ইহা **শ্রেষ্ঠ** এবং **উপকারী**। আজকাল **বেঙ্গল শটীফুড** একমাত্র শিশু ও রোগীদের আহার্য্য ও পথ্য।

বেঙ্গল শটীফুড মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং মহামান্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তক **অনুমোদিত**।

বেঙ্গল শটীফুড সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅমূল্যধন পাল

প্রসিদ্ধ মশলা-বিক্রেতা

ম্যানুফ্যাকচারার, কমিশন এজেন্ট ও অর্ডার সাপ্লায়ার—**১১৩।১১৪, খোংরাপটী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

যদি আপনি **খাঁটি** বা **নিখুঁত, মজবুত** ও **মধুর আওয়াজ**-বিশিষ্ট **যন্ত্র** পাওয়া **সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চান**—আপনার উচিত কোন এক **খ্যাতনামা বড় দোকান হইতে জিনিস লওয়া। ছোট বাজে দোকানের চেয়ে** হয়ত দাম দু'চার **টাকা বেশী** লাগিতে পারে কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিলে **বড় দোকান হইতে ক্রয় করাই বিধেয়।**

ছোট দোকানেই প্রতারণার ভয় বেশী। শুনিতে **কম দাম হইলে কি হয়?**

ডোয়ার্কিনের দোকান ৬০ বৎসর **সুপ্রতিষ্ঠিত** ও যে-কোন দোকান অপেক্ষা ইহার **খ্যাতি** অনেক **বেশী।** আরও বিশেষ কথা এই যে, বৎসরের পর বৎসর এই দোকানের **উন্নতি হইতেছে;** কারণ, ইহার পরিচালকগণ সেই **খ্যাতির মর্য্যাদা** অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যগ্র।

সোনরা হারমোনিয়াম, ডবল রীড—মূল্য ৩৬৲

ফ্লুটিনা বা গ্রামোলা হারমোনিয়াম, ডবল রীড—মূল্য—**৪৫৲** হইতে **৬০৲**

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন—ফেরৎ ডাকে পাঠাইয়া দিব।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স, ১১, এস্‌প্লেনেড, কলিকাতা।

আপনি কি ভোজনে তৃপ্তি পান ?

তীব্র ক্ষুধা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ কিন্তু অজীর্ণতা রোগগ্রস্তের পক্ষে ইহা পরিহাস মাত্র।

অগ্নিমান্দ্য হইলেই বুঝিতে হইবে যে আপনার শরীরে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং তাহারই জন্য আপনি জীবনের এক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনার **পুষ্টিকারক ঔষধ** সেবন করা আবশ্যক।

উত্তমরূপে আহার করিয়া যদি পরে **অজীর্ণতায় কষ্ট পান**, অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়।

সন্তোষজনক বা অল্প আহারের পর **কোষ্ঠকাঠিন্য অনুভব করিলে**, মৃদুবিরেচক ঔষধ সেবনীয়।

ষ্টার্ণসের পরিপাচক ও পুষ্টি-কারক বটিকা এই তিনটি অভাবই পূরণ করে। **রক্ত, স্নায়ু, পরিপাক শক্তি** এবং অন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করিয়া পুরুষ ও নারী উভয়েরই **দৈহিক ক্ষমতা** ও প্রজননশক্তি আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি করে।

সকল কাজেই হ'বে সুখভোগ।
প্রমোদেও হ'বে পূর্ণ উপভোগ॥

STEARNS'

DIGESTIVE & TONIC TABLETS

Remedial, Restorative, Rejuvenating

উচ্চ দরের সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

শিশুদের জন্য
ডোঙ্গরের
বালামৃত

চিত্রসূচী

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৪০

বিষয়-সূচী

সামান্য ব্যয়ে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে হইলে

—আপনাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

দি ক্যাশ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ

(ম্যানেজমেণ্ট—বেন ভেন্নটো এণ্ড কোং)

খোঁজ করুন

(কোম্পানীর আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত)

মূলধন—৫,০০,০০০৲ টাকা।

এক—মাসিক ১৷০, ১৶০, ২৷৷০, ৩৶০ ও ৬৷০ কিস্তিতে যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০, ১৫ ও ১০ বৎসরে ১০০০ টাকা পাওয়া যাইবে। যে কোন বয়সের নরনারী এই বণ্ড খরিদ করিতে পারিবেন।

দুই—বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় ১৮ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক নরনারী মাসিক মাত্র এক টাকা কিস্তিতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জীবন-বীমা করিতে পারেবেন।

তিন—১০ ও ১০০ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট এককালীন মাত্র ৫৷৷০ ও ৫৫৲ টাকা দিলে পাওয়া যায়।

সমস্ত বিবরণের জন্য সেক্রেটারীকে আবেদন করুন।

প্রধান অফিস
৯নং ড্যালহাউসী স্কয়ার
কলিকাতা।

শাখা
৩২৭, মুর ষ্ট্রীট জি, টি,
মাদ্রাজ

উচ্চ কমিশনে বা বেতনে সর্ব্বত্র পুরুষ ও মহিলা এজেণ্ট আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগের অদ্ভুত আবিষ্কার!

"ওমী"
লোমনাশক পাউডার

এই পাউডার অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছনীয় লোম মাত্র ২ মিনিটে নষ্ট করে। মোটে জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ও প্রশংসিত।

প্রতি শিশি মূল্য—
মাত্র ১৲ টাকা।

"হেয়ার কিল্ লোশন।"

আর ক্ষুর দ্বারা চিরজীবন কামাই-বার জন্য বিরক্ত হইতে হইবে না। প্রত্যেকবার কামাইবার পর এই লোশন নিয়মিত ১৬ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে, মুখখানি ঠিক বালকের মত মসৃণ হইবে। আর লোম বা দাড়ীর চুল উঠিবে না।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ও প্রশংসিত।

প্রতি শিশি মূল্য ২৷৷০

ইহা ব্যতিরেকে "ওমী" মার্কা নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দামে সস্তা অথচ অতি উত্তম দ্রব্য। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

বেন্ ভেন্নটো এণ্ড কোং

৯নং ড্যালহাউসী স্কয়ার, কলিকাতা। মুর ষ্ট্রীট, জর্জ টাউন, মাদ্রাজ।

উচ্চ কমিশনে মহিলা ও পুরুষ এজেণ্ট আবশ্যক।

টেলিগ্রাম—'কারনবিশ' কলিকাতা

'কারনবিশের' ফুটবল

—সুবিখ্যাত—
—সুপরীক্ষিত—
—সুপরিচিত—
—সুবিদিত—

খেলার সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জাম—স্যাণ্ডোর ডাম্বেল ও ডেভলপার ডিস্ক লোডিং বারবেল ক্যারম: বোর্ড—রূপার কাপ ও মেডেলের সচিত্র ক্যাটালগের

২৯ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ক্লাবে কারনবিশের ফুটবলে খেলা হই-তেছে ইহাই আমাদের বলের উৎকৃষ্টতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৮০৲ হইতে ৮৫০৲ টাকা মূল্যের
গ্রামোফন ও নানাবিধ রেকর্ড—

মাসিক কিস্তিতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে।

হিজ্ মাষ্টার ভয়েস 'পোরটেবল্'
নং ১০২ মূল্য—১২০৲

আজই পত্র লিখুন ৩ নং [illegible]

ষাণ্মাসিক সূচী

২য় বর্ষ—২য় খণ্ড] [শ্রাবণ—পৌষ ১৩৪০

চিত্র-সূচী

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

নিত্য ও সাহিত্য

— শ্রীসত্যসুন্দর দাস

সাহিত্যের সম্পর্কে 'নিত্য' কথাটি প্রয়োগ করিতে চাই—কেন, ও কি অর্থে, তাহাই বলিব।

প্রথমেই বলিতে হয় সাহিত্য অর্থে আমি কি বুঝি ও বুঝাইতে চাই। মানুষের যে সাধনা ভাষার সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে, তাহার সব খানিকেই সাহিত্য বলিতেছি না; সেই কীর্ত্তির যে অংশে সে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহার নিজেরই অন্তরঙ্গ কাহিনীরূপে যে আর এক জগৎ সে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকেই সাহিত্য নামে অভিহিত করিয়া আমি বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। গদ্য ও পদ্য, উভয় ছন্দে সেই যে বাঙ্ময়ী সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে তাহা একাধিক অর্থে নিত্য হইতে পারে, তাহার মূলে যে ভাব-সত্য আছে তাহা চিরন্তন, অথবা এ সৃষ্টি মানুষের সাধনায় চিরদিন অব্যাহত আছে বলিয়া এক অর্থে ইহা নিত্য। এই রূপে নিত্য শব্দটির নানা অর্থ হইতে পারে। কিন্তু এহ বাহ্য; যে অর্থে জগৎ নিত্য নয়, সৃষ্টি চিরচঞ্চলা; স্থির, ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া কোনও লক্ষণ কালের শাসনে কুত্রাপি নাই,—সেই অর্থে সাহিত্যসৃষ্টিতে নিত্য কিছু আছে কিনা তাহারই কিঞ্চিৎ বিচারণা এ প্রসঙ্গের অভিপ্রায়। তথাপি, আমি যে কোনও সুগভীর দার্শনিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি এমন আশঙ্কা কেহ করিবেন না। সাহিত্যের স্বরূপ এই যে তাহার গূঢ় মর্ম্ম, হয়, অপরোক্ষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, নতুবা আদৌ বোধগম্য হয় না। সাহিত্যের আলোচনা সাহিত্যিক না হইয়া তত্ত্ব-বিচারের মত হইলে তাহা সার্থক হয় না। আমার এই আলোচনায় সেই রূপ বিশুদ্ধ তর্কসিদ্ধান্তের আশা কেহ করিবেন না, আমার কথাটি কোনও রূপে ভাবুকের ভাবনায় ধরাইয়া দিতে পারিলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, মনে করি।

নিত্যের কথাই বলি। তত্ত্বজ্ঞানীরা নিত্যের যে ধারণা করেন, এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাহার বিপরীত, অর্থাৎ ইহা অনিত্য। জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা খাটে, সাহিত্য সম্বন্ধেও তাহা খাটিবে না কেন—জগৎ-অতিরিক্ত এমন কি বস্তু সাহিত্যে আছে যাহাকে নিত্য বলা যায়? জ্ঞানী তাহা স্বীকার করিবেন না; অধ্যাত্মবাদী বা জড়বাদী কেহই এমন ধারণার সমর্থন করিবেন না।

কিন্তু মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাসন হইতে মুক্তির অবকাশ পায়, সে যখন সর্ব্বসংস্কার মুক্ত হইয়া আপনাকে আপনি দেখিবার শক্তি লাভ করে, এবং সেই দেখার ফলে আর এক জগৎ সৃষ্টি করে, তখন সেই অপরা সৃষ্টির সাহিত্যের ভিতরে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যাহা বাহিরের জগতে নাই—অনিত্যই নিত্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে, যাহা চঞ্চল তাহাই যেন কোন্ এক স্থির মুহূর্ত্তে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই দুই সৃষ্টির মধ্যে যে বৈলক্ষণ্য তাহার মূল কোথায়? ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহার একটি জগৎ-দৃশ্য মাত্র, অপরটি মানব-কাব্য; একটি চৈতন্যহীন বস্তুপ্রবাহ, অপরটি মানুষের সত্তায় ওতপ্রোত। এই অপরা সৃষ্টিতে মানুষই কালের গতিকে ভাব ও অভাবের ছন্দে বাঁধিয়া, দেশকে আপন কেন্দ্রানুযায়ী বৃত্তাকারে পরিণত করিয়া, অনিত্যকেই নিত্যলীলার সহায় করিয়া লইয়াছে—সেই লীলাই সাহিত্যে প্রকট হয়। কবি যে বলিয়াছেন—'স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু ঘূর্ণীর মাঝখানে'—এ উপমা অমূল্য। ঘূর্ণীটি—জগৎ, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক বিন্দুই ঘুরিতেছে, কেহ স্থির নহে; কিন্তু কেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখ, একটি বিন্দু ঘুরিতেছে বটে—কিন্তু স্থান ত্যাগ করিতেছে না। বাহিরের সৃষ্টি এই স্থির কেন্দ্র-বিন্দুযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সাহিত্যে। সাহিত্য জগৎ-ছাড়া নয়, অনিত্য দেশকালের উপাদানেই তাহার সৃষ্টি। কিন্তু একটি লক্ষণে মূল সৃষ্টি হইতে ইহা বিলক্ষণ—এই কেন্দ্র-বিন্দুগত স্থিরতা। এই বিন্দুর নাম মানুষ, ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যিক সৃষ্টি অখণ্ড

মণ্ডলাকারে প্রতিভাত হয়। উপমাটিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, মনে রাখিতে হইবে—এই বিন্দু একই কালে স্থির ও চঞ্চল। একান্তভাবে মানুষকে অবলম্বন করিয়াই যে আর এক জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতরকার রহস্য বুঝিয়া লইলে, আমি যে নিত্যের কথা বলিতেছি, তাহার মূল কোথায়, স্বরূপই বা কি, এবং সেই স্বরূপভ্রষ্ট হইলে সাহিত্যের অবস্থা কি দাঁড়ায়, সে প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইবে।

জাগতিক সর্ব্ব ব্যাপারই অনিত্য, এধারণা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; দার্শনিক বিচার ব্যতিরেকেও ইহা স্থূল ভাবে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু নিত্যের ধারণা তেমন সহজ নয়, তাহাকে দেশকালাতীত রূপে কল্পনা করিতে না পারিলে তাহার যেন কোন অর্থই হয় না। তথাপি মানুষের চিত্তে এই নিত্যের ধারণা যেন সহজাত; একটা ধ্রুব শাশ্বত কিছুর আশ্বাস তাহার চাই-ই; ইহা বড়ই রহস্যময়। বাহিরের জগৎ-যাত্রায় কালের ঘূর্ণাবর্ত্তে, যাহার কোনও ইঙ্গিত নাই, তাহার চেতনা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইল কেমন করিয়া? সম্ভব হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু নিজ নাভিগন্ধে কস্তুরীমৃগের মত মানুষ এই নিত্যের সন্ধানে দিশাহারা হইয়াছে। নিত্য স্থির যদি কিছু থাকে তবে তাহা এই ঘূর্ণীর কেন্দ্রস্থিত তাহারই আপন সত্তা। কিন্তু মানুষ তাহার সন্ধান করে আপনার বাহিরে, কালের বাহিরে, জীবন ও জগৎ হইতে অতি দূর কোন আত্মার আলয়ে। তাই, নিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত কোনও ব্যাপার নয়; সে ধারণা পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হয়। এইরূপ দিশাহারা হওয়ার কারণ—সৃষ্টির অনিত্য-রূপের প্রবল তাড়নায় মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়, মৃত্যু-বিভীষিকায় বিচলিত হইয়া নিজের নিত্যসত্তায় সন্দিহান হয়—জন্ম-মৃত্যুর শাসন-মুক্ত একটা নির্ব্বিকল্প অবস্থার স্বপ্ন দেখে। এই দেহ-জীবনেই, সৃষ্টির অতি চঞ্চল পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই, যে নিত্য-স্বরূপ সত্তায় সে বিরাজ করিতেছে, তাহাতে আস্থাহীন হইয়া সে সৃষ্টির বাহিরে নিত্য সত্তার সন্ধানে আকুল হয়। এই জীবনেই, এই দেহাধীন অবস্থাতেই যে ধারণার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে পাইতে হইবে জীবনের বাহিরে। ইহার তুল্য রহস্য আর নাই।

মানুষের ভিতরকার স্বরূপের কথা ছাড়িয়া বাহিরের দিক দিয়া একটু স্থূলভাবে এই নিত্যের ধারণার কথা বলিব। ইহা কি সত্য নয় যে, যুগযুগান্ত ধরিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনার ফলে, অথবা কালধারার অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনমুখে, জীবনের বহিরঙ্গ যতই রূপান্তরিত হোক, ভিতরে মানুষ চিরদিন সেই একই মানুষ? সেই জীবন-পিপাসা ও মৃত্যুভয়, প্রেমের মোহ ও কামের লালসা, সুখ-দুঃখ, ভোগ-ত্যাগ, বন্ধন ও মুক্তির সেই সমান আগ্রহ আজও তাহার প্রকৃতির এতটুকু পরিবর্ত্তন হইতে দেয় নাই। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষের আত্মজ্ঞান যে পর্য্যন্ত পৌছিয়া স্থগিত হইয়াছে, আজও তাহার অধিক অগ্রসর হয় নাই; জন্ম-জরা-মৃত্যুর ত্রিগুণিত নিয়তিসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া এখনও সেই একই দেহচক্রে একই ভাবে ঘুরিতেছে—নিত্য নূতন পাত্রে ঢালিয়া সেই একই বিষামৃত পান করিতেছে। মনুষ্যত্বের সেই ভিত্তি-তল এতটুকুও টলে নাই—বরং সেই ভিত্তির গভীরতম তল হইতে অঙ্কুরিত ও উদ্গত হয় বলিয়াই আজিও সাধারণ মানুষের মধ্যে মহামানবের আবির্ভাব হয়; এবং সে মানব যে সকল কালের প্রতিনিধি, সর্ব্ব মানবের প্রতীক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। নিত্য আর কাহাকে বলে? এই নিত্যকে আমরা মানি; না মানিলে অন্তরে আশ্রয়হীন হইতাম, জগৎ-বিধানের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজিয়া পাইতাম না, কিছুরই সহিত কোনও সম্বন্ধ বুঝিতাম না। সর্ব্বকালের সকল মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা-বোধে এই নিত্য শাশ্বত সর্ব্ব মানবের পরিচয় পাই; এই পরিচয় পাই বলিয়াই সৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—উদয় ও বিলয়, জন্ম ও মৃত্যু, জীর্ণ ও নূতন সকলের মধ্যে একটা সঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে। তাহা না হইলে, মানুষ আমরা, উন্মাদ জড়বৎ অবস্থায়, জীবলীলা সমাপ্ত করিতাম। ইহাই অনিত্যের অন্তরালে নিত্যের ইঙ্গিত, মৃত্যুর ভ্রূভঙ্গে অমৃতের আশ্বাস। মানুষের মনে নিত্যের ধারণা, তাহারই নিজ সত্তার সহজ উপলব্ধি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; স্থায়িত্বের এই সংস্কার, ফলের মধ্যে বীজের মত, সংসারবৃক্ষেই জন্মিয়াছে। ইহা জগৎ ও জীবনের বহির্ভূত কোনও ধারণা নহে—এ অমরত্ব জন্ম-মৃত্যুকে বাদ দিয়া নহে, দেহকে অস্বীকার করিয়া নহে। মনে রাখিতে হইবে, ইহা ঘূর্ণীর মধ্যবর্ত্তী সেই স্থির বিন্দু—মানুষের এই যে চিরস্থির সত্তা ইহাই যেন নিত্য ও অনিত্যের লুকাচুরী-চাতুরীর লীলাস্থল; ধ্রুব ও অধ্রুব যেন এখানে

অন্যোন্যসাপেক্ষ হইয়া বিরাজ করিতেছে; এই মানুষের কাহিনীতে সৃষ্টি যেন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, অচঞ্চল পুরুষ ও চঞ্চলা প্রকৃতি নিত্যসংযুক্ত একাঙ্গীভূত হইয়া আছে।

সাহিত্যের প্রধান আখ্যা এই যে তাহা মানুষেরই আত্ম-কাহিনী; জগতের উপরে আপনাকে প্রসারিত করিয়া আপনাকেই আপনি দেখার যে অপূর্ব্ব ভঙ্গী তাহাই সাহিত্য-সৃষ্টির সর্ব্বস্ব। সাহিত্য কোনও বিদ্যা নয়, বহিঃসৃষ্টির পরিচয়াত্মক কোনও জ্ঞান-গবেষণা নয়। ইহাই একমাত্র অপরা সৃষ্টি—এ সৃষ্টিতে স্রষ্টা মানুষ স্বপ্রবিষ্ট হইয়া আপন সত্তায় ইহাকে সত্তাবান করিয়াছে। এই সৃষ্টির একটি লক্ষণ এই যে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কোনও সজ্ঞান ভাবনা বা উদ্দেশ্য ইহাতে নাই, যম-নিয়মের শাসন হইতে ইহা মুক্ত। এই অর্থেই ইহা নিয়তিকৃতনিয়মরহিত। সাহিত্যের এই স্বরূপ হইতেই মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। নিয়তিকৃতনিয়মরহিত অর্থে ইহাই বুঝি যে সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে প্রবৃত্তি আছে তাহা স্বাধীন, কালের শাসন অগ্রাহ্য করিতে পারে বলিয়াই মানুষ এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মসৃষ্টিমূলক ব্যাপারে এমন একটি নিত্য-সত্তায় দীপ্যমান হইয়া আছে। আমি পূর্ব্বে স্থূলভাবে এই নিত্য সত্তার যে আলোচনা করিয়াছি তাহা বাহিরের নিয়তি-নিয়মের দিক দিয়া—জগতের দিক দিয়া। নিত্য-পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশের মুখেও মানুষের মনুষ্যত্ব যে একটি স্থির ধারণার বিষয় হইয়া আছে—মানুষ বলিতে সর্ব্বকালেই যে এক মানুষের পরিচয় আমরা বুঝিয়া থাকি, কালস্রোতে ক্রমাগত আবর্ত্তিত হইয়াও তাহার যে মূল-স্বভাব অটুট আছে, তাহারই স্থূল প্রমাণ লক্ষ্য করিয়াছি। এই পরিচয় সাহিত্যে আর এক দিক দিয়া গভীরতর ভাবে প্রকাশিত হয়। কারণ সাহিত্য-সৃষ্টির আর এক লক্ষণ এই যে, তাহা যেন কালপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত একটা ভাবস্থির জগৎ। প্রকৃতির অস্থির কটাক্ষ-ঈক্ষণ সত্ত্বেও তাহার নয়নপুত্তলিতে মানুষ যেন আপনার স্থির প্রতিবিম্ব দেখিতেছে—নিজ প্রজ্ঞা বা স্থির-গভীর রসচৈতন্যের বলে, সেই নটিনী-লীলার মধ্যেই, মানুষ যেন প্রকৃতির বধূরূপ নিরীক্ষণ করে। এই জন্যই যাহা কিছু বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন, তাহাই সাহিত্যে সমগ্রতায় মণ্ডিত হইয়া একটি পরম পরিসমাপ্তির ব্যঞ্জনা করে। এমন কেন হয়, তাহার একমাত্র উত্তর—সাহিত্য অপরা সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিতে স্রষ্টা মানুষ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে; এবং মানুষের সত্তা জড়প্রকৃতি হইতে অতিশয় বিলক্ষণ।

সাহিত্যের যাহা নিত্য, তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় কেমন করিয়া এইবার তাহাই বলিব। এতক্ষণ সাহিত্যের স্বরূপ লক্ষণের আলোচনায় বার বার মানুষের কথা বলিয়াছি, এই বার মুখ্যতঃ সেই নিত্য মানুষের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব। নিত্য-মানুষ বলিলে অমর-মানুষই বুঝিতে হয়; এই অমরত্বই সব কথার বড় কথা—কাব্যামৃতরসাস্বাদ আর কিছুই নয়, এই অমরত্বের আস্বাদ।

মানুষ যে অমর, একথা আমরা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি। কথাটা বিশ্বাস কিম্বা অনুমানসাপেক্ষ; বিশ্বাসের মূলে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, অনুমানের কারণ কল্পনা ও তর্কবুদ্ধি; কোনও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি নাই। এই অমরত্বও মানুষের ব্যক্তি-দেহের নয়; দেহাভ্যন্তরবাসী অনুমানগ্রাহ্য যে আত্মা তাহাই অমর; অতএব এই অমৃতপদ অনিত্য ইহলোকের সীমানার বাহিরে—জন্ম-মৃত্যুর পরপারে। ভাবিয়া দেখিলে ইহাকে মানুষের অমরত্ব বলা যায় না। আবার অতিসূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে এই অমৃতত্ব বা নিত্য সত্তা নামরূপ অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দে সমর্পিত হয়—ব্যক্তি সম্বন্ধে ইহা প্রযুজ্য নহে। তবেই বুঝা যায়, এ অমরত্বের সঙ্গে জীবন ও জগতের দূরতম সম্বন্ধও নাই। কিন্তু অমৃতত্বের আর এক ধারণা বা সংস্কার মানুষের জীবন-সংস্কারের সঙ্গেই জড়িত হইয়া আছে। পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি এই সংস্কারই বোধ হয় সর্ব্ববিধ অমৃতকল্পনার নিদান। আমি পূর্ব্বে ছিলাম, আজ আছি, এবং পরেও থাকিব, ইহা খাঁটি আধ্যাত্মিক সংস্কার নহে, দেহ-চৈতন্যের মধ্যেই ইহা নিহিত আছে! জন্ম-মৃত্যুর নিরন্তর স্রোতে দেহ-তরণী আশ্রয় করিয়াই এক অমর পুরুষ নিত্য গতায়তি করিতেছে—প্রবহমান সৃষ্টির উপরে তাহার সেই ছায়া স্থির, দীর্ঘায়ত, জন্ম ও মৃত্যুর তরঙ্গভঙ্গে বহু খণ্ডে বিক্ষিপ্ত, এই ধারণাই সহজ ও স্বাভাবিক। এই পুরুষ ব্যক্তিও বটে, বিরাটও বটে। যত ব্যক্তিরূপী 'আমি' ব্যক্তি-জীবনের বিশিষ্ট সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া, একদিকে যেমন অনিত্যকালের বশ্যতা স্বীকার করে, তেমনই আর একদিকে একই কালে চেতনার গভীর গহনে সেই

বিরাট সত্তার বিপুলানন্দ ভোগ করে। একই কালে সে মর ও অমর। নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের এই লুকাচুরী খেলা ইহাই মানুষের জীবন; এই জীবনই অমর—মানুষের অমরত্বের আর কোনও অর্থ হয় না, আর কোনও অমৃতের প্রমাণ কোথায়ও নাই। এই যে অমরত্ব, ইহা 'আত্মা' নামক কোনও বিদেহ-সত্তার সম্পত্তি নহে; এই সৃষ্টির অনিত্য-সনাতনী ধারায় নিত্য বিগ্রহরূপী যে পুরুষ দেহে দেহে জন্ম মৃত্যু বরণ করিয়া, একের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, এ অমৃতপদ তাহারই; নাম রূপ ত্যাগ করিয়া নহে—নাম-রূপের বিশিষ্ট আধারেই এই অমৃত-রস নিত্য উচ্ছল হইয়া উঠে।

এই মানুষের পরিচয় পাই সাহিত্যে। ব্যক্তি ও বিরাটের, মৃত্যু ও অমৃতের, নিত্য ও অনিত্যের এই লীলা-চাতুরীর অপূর্ব্ব রস—এই অমৃত—সাহিত্যেই সঞ্চিত হয়। যে অমৃত-পুরুষের কথা বলিয়াছি, যিনি দেহ-পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ হইয়াও সর্ব্বদেহে এক, ব্যক্তির মৃত্যুতে যাঁহার দেহের বিনাশ নাই—যাঁহার নাম, আত্মা নয়, মানুষ—অনিত্য-বিহারী সেই নিত্যস্বরূপের দেখা পাই সাহিত্যে। এই স্বরূপ যে আমারই স্বরূপ, এই উপলব্ধিই সেই অমৃত যার আস্বাদন সাহিত্যেই সম্ভব। এই অমৃতকে 'রস' নামে অভিহিত করা ঠিক হইবে না, কারণ উহার একটি বিশেষ আলঙ্কারিক অর্থ আছে। এ অমৃত লোকোত্তরচমৎকার বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ভাবাবস্থা নয়, ইহা এই ইহলোক-সাক্ষী 'আমি'র অমরত্ব-বোধের আনন্দ। দেশে ও কালে যত 'আমি'র যত লীলা চলিয়াছে ও চলিতেছে—সে সকলই আমার লীলা, তাই পরিচয়ে বাধে না; হাসি-অশ্রুর যত রূপ যত ভঙ্গি, সকলই আমার নয়নে, আমারই অধরে ফুটিয়া উঠে; এ যেন অযুত দর্পণে আমারই মুখ অযুত প্রকারে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জীবনের যত কিছু বিপুল বিচিত্র জটিল ও গভীর অভিজ্ঞতা সকলই এক হৃদয়পাত্রে সমাহৃত ও মিলিত হইয়া, অতলস্পর্শ অনির্ব্বচনীয় অসীম অনুভূতি-সমুদ্রে উদ্বেল হইয়া উঠে। সেই নিত্য শাশ্বত পুরুষের সেই সর্ব্ব-মানুষের সংস্পর্শে আমার অঙ্গে মৃত্যুচিহ্ন মুছিয়া যায়, কালে ও দেশে আমার এই 'আমি'টা এক অদ্ভুত উপায়ে প্রসারিত হয় বলিয়া পরমানন্দে বিভোর হই। এই পুরুষই সাহিত্যের নিত্য-বস্তু, ইহার সহিত একাত্মীয়তার যে অপূর্ব্ব অনুভূতি তাহাই কাব্যামৃত-রসাস্বাদ।

আজিকার দিনে সাহিত্য হইতে এই মানুষ নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সেই নিত্য পুরুষের সম্পর্কশূন্য এক অতিশয় ক্ষণজীবী 'আমি'র প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ সাহিত্য মানুষের অন্তরঙ্গ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মকাহিনী নয়। ইহা নিয়তি-নিয়মাধীন সৃষ্টির অঙ্গীভূত মানুষের যে জীব জীবন, তাহারই অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আজিকার এই বিজ্ঞান-বাদের যুগে আমরা সর্ব্ববিদ্যাবার্ত্তাবিধিকে ক্রমবিকাশের বা প্রগতিবাদের আদর্শে সংশোধিত করিয়া অনিত্যের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছি। আধুনিক মানুষের চিন্তায় চিৎ ও জড়ের দ্বন্দ্ব আর নাই—জড় চিৎ হইয়া উঠে নাই, চিৎ-ই জড়-রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। গতিই ব্রহ্ম, তাহা জড়-পরিণামী; জড় ও গতির মধ্যে যে ভেদ তাহা স্থূল-সূক্ষ্মের ভেদ মাত্র। যে সাহিত্যকে আমি অপরা-সৃষ্টি বলিয়াছি, তাহাও এই জড়তত্ত্বঘটিত ক্রম-বিকাশের বহির্ভূত নয়—সাহিত্যে কোনও নিত্যবস্তুর প্রকাশ থাকিতে পারে না। কাল যে 'আমি' ছিল, আজ সে 'আমি' নাই; চিরচঞ্চল কালপ্রবাহের প্রতি তরঙ্গ উত্থানমাত্রে বিলীন হইতেছে—ধরিবার বা ধরিয়া থাকিবার কিছুই নাই। ঐতিহাসিক তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোনও কিছুর দেশকালনিরপেক্ষ স্বাধীন মূল্য নাই। সাহিত্যেও এই গতিবাদ বা অনিত্য-তত্ত্বের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় সংক্রমিত হইয়াছে—তাই সাহিত্য আজ যে মানুষের কাহিনী, সে মানুষ নিত্য বা অমর নহে, অমরত্বের স্পৃহাও যেন পরাজিত হইয়াছে। কোন্ নার খেয়ালে কবি একদিন যাহা লিখিয়াছিলেন—

> শুধু অকারণ পুলকে
> ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
> ক্ষণিক দিনের আলোকে।
> যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
> পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়;
> নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়
> ফুটে আর টুটে পলকে
> তাহাদেরি গান গা'রে আজি প্রাণ
> ক্ষণিক দিনের আলোকে।

তাহাই আজ সাহিত্যের আদর্শ। এ মানুষের জীবন যেমন তাহার গানও তেমনই—'ফুটে আর টুটে পলকে।' প্রভাতে যাহার জন্ম, দিন শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু; তজ্জন্য

ক্ষোভ নাই—অচিরজীবী ক্ষণবিধ্বংসী আমি, অনিত্যই আমার সত্তা, নিত্যের উপাসনা কেন করিব? কাল যেমন ক্ষণ-পরিচ্ছিন্ন, চৈতন্য তেমনই ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন; জন্ম-মৃত্যুর গণ্ডীর মধ্যে প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র। তাই এ সাহিত্যে সেই রস নাই যাহাকে আমি অমৃত বলিয়াছি। এ সাহিত্যের আকৃতি, প্রকৃতি বা ভঙ্গিমায় সেই সৌন্দর্য্য নাই যাহা অমৃতত্বের দ্যোতক, সেই মহিমা নাই যাহা সর্ব্ব-মানুষ বা শাশ্বত পুরুষের মুখ-শ্রী। এ কালে যে মহা নাস্তিক্যনীতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে মানুষ সর্ব্ববিষয়ে শ্রদ্ধাহারা হইয়াছে, অমৃতের পরিবর্ত্তে মৃত্যুর আরাধনা করিতেছে। মনে হয়, মানুষ যেন অন্তরে শক্তি হারাইয়াছে—প্রকৃতি-পরাজিত হইয়া নিজের নিত্যসত্তা প্রকৃতির হাতে বিলাইয়া দিয়াছে। একদিন যে কবি লিখিয়াছিলেন--

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণীর মাঝখানে।

আজ তিনিই এই 'চঞ্চলা' প্রকৃতির মোহ এড়াইতে পারেন না; জন্মমৃত্যুর নিরন্তর ধারাকেই আত্মার একমাত্র গতি বলিয়া বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—সেই আদিঅন্তহীন অতি-অস্থির নিরুদ্দেশ গতি প্রকৃতিকেই নিজ প্রকৃতি রূপে উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতে চান। তাই এই 'চঞ্চলা'র উদ্দেশে কবিকে আজ বলিতে শুনি—

যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি'
তখনি চমকি'
উচ্ছ্রি য়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে।
*　　　*　　　*
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি'
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

এ বিশ্ব বস্তু-বিশ্ব—গতি-ব্রহ্মের ক্রমবিকাশ; অনিত্যই ইহাকে শুচি করিয়া রাখে বটে, কিন্তু পুরুষ-সত্তা বা মানব-চৈতন্য হইতে ইহা স্বতন্ত্র; ইহার স্বরূপ-উপলব্ধিতে মানুষ চরিতার্থ হইতে পারে না। তাই যখন শুনি—

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কার-মুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রণরণি'।

অথবা—

ওরে দেখ, সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থর থর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে' থাক্ তীরে,
তাকাসনে ফিরে!
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে- অকূল আলোতে।

—তখন ভিতরের মানুষটি আশ্বস্ত হয় না। এইরূপ নিরুদ্দেশ নিত্যগতিপ্রবাহে ভাসিয়া যাওয়ার যে অবস্থা, তাহা জড় প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হওয়ার যে শিবত্ব তাহারই বিপরীত মাত্র, ইহার কোনটাই অমৃতপদ নহে। উভয়ের মধ্যেই বিরাট শূন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে

এই যে অনিত্যের আদর্শ আজ সাহিত্যকেও গ্রাস করিয়াছে—"পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়"—এই যে মন্ত্র আজ সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া উঠিয়াছে, ইহা মানুষেরই পরাজয় সূচনা করে। এককালে সংসার অনিত্য বলিয়া নিত্যের স্বতন্ত্র সাধনা ছিল; এবং সাহিত্যেই অনিত্যের নিত্যরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আজ নিত্যই মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংসারের অনিত্যরূপকেই বরণ করিয়া, মানুষ নিজ সত্তাকে অস্বীকার করিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছে। তাই মানুষের অন্তরঙ্গ কাহিনী যে সাহিত্য তাহাতে অমৃতের স্বাদ আর নাই, এ সাহিত্য বড় নহে, অমর নহে। একবার বিখ্যাত রুশ লেখক Anton Tchehov-এর একটি গল্পে একটি চমৎকার উক্তি পড়িয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। উক্তিটি এই—

Butyga loved his fellow-creatures, and would not admit the thought that they might die and be annihilated, and so when he made his furniture, he had the immortal man in his mind. The Engineer Asorin did not love life or his fellow-creatures; even in the happy moments of creation, thoughts of death, of finiteness and dissolution, were not alien to him, and we see how insignificant and finite, how timid and poor are these lines of his.

আধুনিক কবি সাহিত্যিক কি জীবনকে ভালবাসে—মানুষকে ভালবাসে? সে কোন্ জীবন? কোন্ মানুষ?

প্রদর্শনী

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছবি

কালিম্পং—১৯২৬ কি ২৭ সাল। শুনিলাম, স্থানীয় বাজারের ভিতরে দ্বিতলের একটি কুঠরিতে একজন তরুণ বাঙালী যুবক রাজবন্দীরূপে অবস্থান করিতেছেন। বাঙালীর সংখ্যা তখনও কালিম্পংএ খুব বেশী ছিল না; অল্প যে

শিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়।

কয়েক জন ছিলেন সরকারী চাকুরী বা ব্যবসায় সম্পর্কে তাঁহাদের অধিষ্ঠান; স্বাস্থ্যকামী দুই একটি পরিবারেরও আসা যাওয়া আছে। সুতরাং কালিম্পং-এ পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্ব অবগত হইলাম। একথাও আমাকে বলিয়া দিতে বিলম্ব হইল না, যে, এই যুবকের সহিত স্থানীয় বাঙালীরা কেহ কথাবার্ত্তা বলিতে ভরসা করেন না, পুলিসের ভয় আছে। তিনি খাস পাহাড়ীদের মধ্যে প্রায় নির্জ্জন কারাবন্দীর মত দুঃসহ জীবন যাপন করেন; একজন এ সংবাদও দিলেন, যে, একলা থাকিতে থাকিতে ছোকরাটির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, উদ্‌ভ্রান্তের মত তাঁহাকে পাহাড়ে পাহাড়ে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

খাই-দাই-শুই-জাতীয় সাধারণ বাঙালী হইলে মাথা খারাপ হইবারই কথা। প্রান্তরবিলাসী বাঙালী আকাশের ও পৃথিবীর উন্মুক্ত বিস্তার দেখিতে অভ্যস্ত কিন্তু এখানে সকলই বিপরীত। ছোট ছোট পাহাড় মাথা খাড়া করিয়া আকাশের অবাধ অবকাশকে খণ্ডিত করিয়াছে; কয়েক ঘণ্টার বিস্ময়ের পরই এই বাধা বুকের উপর চাপিয়া বসে, মনকে পীড়া দেয়। তাহার পর বলা নাই, কহা নাই, আকাশে ঘনঘটা করিয়া মেঘ জমিল, কুয়াশায় পাহাড় গেল তলাইয়া, তীক্ষ্ণ সূচের মত বৃষ্টিধারা—বিরামহীন; কথা-বিলাসী বাঙালীর মন এই অবস্থায় কথা বলিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে।

তথাপি, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের বন্দীশালায় একদিন দর্শন দিলাম এবং তাঁহার স্বপ্নাতুর চোখ দুটির দিকে চাহিয়াই বুঝিলাম, মস্তিষ্ক-বিকৃতির কথাটা মিথ্যা। এই জাতীয় প্রাণীর মাথা খারাপ হওয়ার আশঙ্কা নাই; ইহারা ধরার অধিবাসী হইয়াও ধরার ঊর্দ্ধে বিচরণ করেন; নিজেদের সহিত নিজেরাই কথা বলিবার কৌশল ইহাদের আয়ত্ত। রঙ, তুলি আর ছবিতে ছোট্ট কুঠুরিটি ভর্ত্তি—কবিতার খাতা আর টুকরা টুকরা কাগজে ঘরখানি যেন কথা বলিয়া উঠিল।

পাঁচ মিনিট পরিচয়—আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করিতে বসিলাম। তার পর কবিতা শুনিলাম, ছবি দেখিলাম এবং কবিতা ও ছবির অন্তরালে যে অদম্য কবিপ্রাণ বিরাজ করিতেছে তাহার স্পর্শও লাভ করিলাম। এই আশা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম যে একদিন চৈতন্যদেবকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিব। আমার আশা যে বিফল হয় নাই তাহা বাঙলার আধুনিক চিত্রশিল্পের ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই স্বীকার করিবেন।

পাহাড়ের চূড়ায় ভুট্টাক্ষেতের ধারে বসিয়া চৈতন্যদেবের স্বপ্ন-লোকের বারতা শুনিতাম—এক, দুই, তিন, চার, সে কত স্বপ্ন—অদ্ভুত, বিচিত্র। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, নীচে বহু দূরে গিরিনির্ঝরিণীর বুকের উপর সাদা কুয়াশা ঘন হইয়া চাপিয়া বসিত, ঝর ঝর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাইত, তবু উঠিতে পারিতাম না। বিচিত্রবেশা পাহাড়ী মেয়েরা কৌতুকোজ্জ্বল চোখে আমাদের দেখিতে দেখিতে পথ চলিত—গাছপালা, ঘরবাড়ী পাহাড়-ঘেরা অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া যাইত; শুধু দূরে দূরে উপরে নীচে আলোর শ্রেণী কালো কাপড়ে চুমকির কাজের মত অপরূপ দেখাইত। সন্ধ্যার পরে চৈতন্যদেবের বাসার বাহিরে থাকিবার হুকুম ছিল না, ফিরিয়া আসিতাম।

দ্বিপ্রহরে একদিন এক প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরে (গোম্ফা) চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা। মন্দিরের মেঝেতে উবু হইয়া বসিয়া তিনি তুলি কাগজ লইয়া প্রাচীন তিব্বতী শিল্প-কৌশল আয়ত্ত করিবার সাধনা করিতেছেন। কথায় ভুলাইয়া মন্দিররক্ষীদের কাছ হইতে সুপ্রাচীন পট সংগ্রহ করিয়াছেন, মেঝেতে তাঁহার সামনে সেগুলি খোলা। সবুজ, লাল আর সোনালী রঙে আমার চোখ ঝলসাইয়া গেল।

চৈতন্যদেব বলিলেন, এই টেকনিক যদি আয়ত্ত করতে পারি তাহ'লে কিছু দিতে পারব।

আমি হাসিলাম, পাগল হওয়ার অবকাশ এই ব্যক্তির কোথায়? চৈতন্যদেব যে তাঁহার বাসনাকে কাজে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিখ্যাত 'অৰ্দ্ধনারীশ্বর' ও 'সৃষ্টিতত্ত্ব' চিত্র দুইটিই তাহার প্রমাণ। তিব্বতী পদ্ধতিতে বুদ্ধ ও যীশুখৃষ্টের কয়েকটি চিত্রও তিনি এই সময় আঁকিয়াছিলেন।

কালিম্পং হইতে ফিরিবার দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। টেবিলের নীচে অনাদৃত অবস্থায় একটি ছবি পড়িয়া ছিল, সেখানিকে টানিয়া তুলিয়াই অবাক হইয়া গেলাম। পাহাড়ের ধারে একজন ভুটিয়া ভিখারী একাগ্র চিত্তে একটি পাহাড়ী একতারা বাজাইতেছে—একটি সাধারণ ওয়াটার-কলার চিত্র কিন্তু ভিখারীটিকে স্পষ্ট চিনিতে পারিলাম, কালিম্পং-এর বাজারে একজন ভুটিয়া ভিখারী ঐভাবে ভিক্ষা করিত—হুবহু সেই। ওয়াটার-কলারের সাহায্যে পোর্ট্রেটের এই ছাঁদ অনন্যসাধারণ, নূতন। চিত্রটি আমি সঙ্গে লইয়া আসিলাম। ওই সালের প্রবাসীতে এই চিত্রটি তিন রঙে বাহির হইল। সম্ভবতঃ ইহাই চৈতন্যদেবের প্রথম আত্মপ্রকাশ।
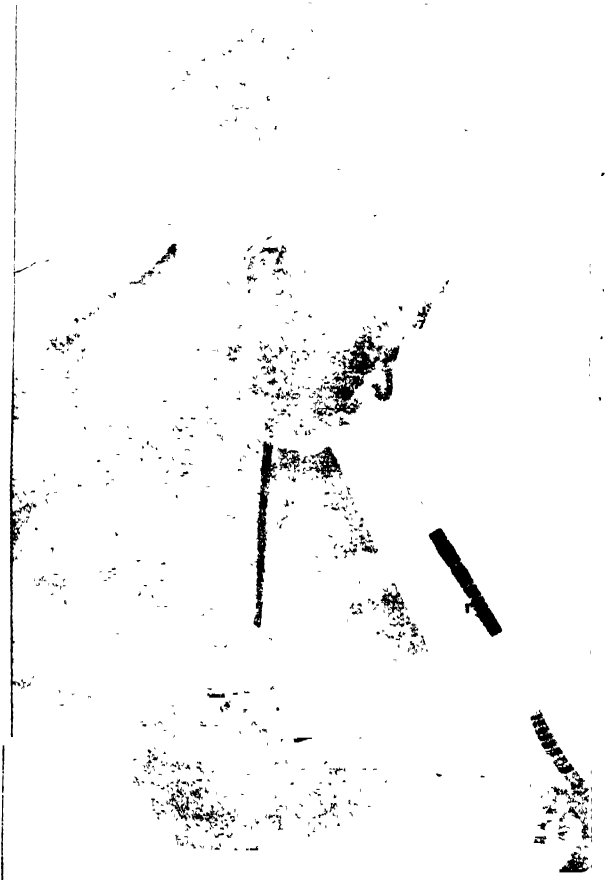
একখানি পোর্ট্রেট।

তারপর তাঁহার অনেক ছবিই দেখিয়াছি ও দেখিতেছি তিনি মরেন নাই। উত্তরোত্তর বাঁচিয়াই চলিয়াছেন; নব নব পদ্ধতিতে বিচিত্র রকমের পরীক্ষা তিনি করিতেছেন এবং ওয়াটার-কলারে পোর্ট্রেট আঁকাটা তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই ভুটিয়া ভিখারীর ছবিতে যাহার আভাস দেখা গিয়াছিল সম্প্রতি অনেক চিত্রে তাহার পরিণতি দেখিতেছি। সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে পোর্ট্রেট আঁকিয়া

এবং এই কার্য্যে সফল হইয়া চৈতন্যদেব জাতীয় শিল্পকলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন

আর একখানি পোর্ট্রেট

চৈতন্যদেব এখনও তরুণ, তাঁহার বয়স মাত্র আটাশ। অবনীন্দ্রনাথ ইহার গুরু এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ইঁহার শিক্ষক। চৈতন্যদেব গুরুর অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য। তিনি যে এক জোড়া চোখ অথবা একটি গাছ আঁকড়াইয়াই পড়িয়া থাকেন নাই ইহাতেই তাঁহার অদম্য প্রাণশক্তির পরিচয় পাই। তিনি মৃতও নন, মৃতকল্পও নন; মহাভারতবিষয়ক কয়েকটি চিত্রে তাঁহার মানসিক বীরত্বের প্রকাশ দেখিতে পাই। 'রূপম'-সম্পাদক বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, বাঙলার আধুনিক পোর্ট্রেট-শিল্পীদের মধ্যে চৈতন্যদেবের স্থান অতি উচ্চে। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে এই জাতীয় শিল্পী যেরূপ সমাদর লাভ করেন আংশিক ভাবেও এদেশের শিল্পীরা যদি সেই সমাদর পাইতেন তাহা হইলে চৈতন্যদেবের নাম মুখে মুখে শুনিতে পাইতাম। "Unfortunately we are ages behind our responsibility in civic patronage of Art."

আমরা এখানে শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের একখানি রঙীন (রাগ-ভৈরব) ও সাতখানি অন্য রঙীন চিত্রের একরঙা প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম। শিল্পীর কবিমনটি পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত করিবার জন্য তাঁহার একটি অপ্রকাশিত রচনারও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

মন্দাকিনীর ত্রিধারা

আদিম মানুষ জগতে জন্ম নিয়েই দেখলে এ বড় বিষম ঠাঁই। এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা বড় শক্ত ব্যাপার, চারিদিকে মৃত্যু ও বিভীষিকা ছড়ানো রয়েছে। জল, জমি দুইই নানা হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। মাথার উপরে এক বিরাট নীল ফাঁকা, যার শেষ নাই, সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে কত রকমই রূপ বদলাচ্ছে, প্রতি মুহূর্ত্তে,—কখনও তার নীল শান্ত মূর্ত্তি, কখনও উগ্র প্রচণ্ড লাল, আবার কখনও কুচ কুচে গাঢ় কালো অন্ধকার। তার পরেই সে দেখলে চারিদিকে বিপদ, মৃত্যু, বিভীষিকা।

চোখ দিয়ে দেখা যায়, মন দিয়ে ভাবা যায় এমন সব সমস্যা মানুষের বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করা চললো, কিন্তু এক যায়গায়

অসুর যুদ্ধে ইন্দ্র।

এসে চক্ষুষ্মান, বুদ্ধিমান মানুষকে হার মানতে হ'ল। সেটি হচ্ছে অদৃষ্ট সমস্যা।

এই রকম অদৃশ্য, শক্তিমান, খামখেয়ালী শত্রুর হাতে পদে পদে বিপর্য্যস্ত হয়ে যখন মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তখন একদিন হঠাৎ তার মনে হল এই অজানা শক্তি যে খুব অনেক দূরে মেঘের মধ্যে বা মাটির খুব নীচে একেবারে পাতালেই শুধু আছে তা নয়, তার খুব নিকটে এমন কি তার অন্তরের মধ্যেই সর্ব্বদা তার খেয়াল চালাচ্ছে। তা না হলে, সেই বা সেদিন হঠাৎ রেগে উঠে ছেলেটাকে অমন জোরে চাপড় মারবেই বা কেন? —আবার খানিক বাদেই ত' তাকে আদর ক'রেছিল। এই রকম একের পর এক, নিজের মনের খেয়ালের নানা কথা তার মনে পড়তে লাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ, অশান্তি অনেক কমে গেল, বহু দূরের অজানা শত্রুকে নিকটে পেয়ে। তাকে বশ মানাবার, শান্ত করবার উপায় উদ্ভাবন উদ্দেশে তার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে যে, তার অন্তর্বাসী তার সকল কর্ম্মের এই খেয়ালী ভগবান-দেবতা, কখনও অন্য কোন রকম ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে তার আরামে বেঁচে থাকার বিরুদ্ধাচরণ করছেন,—তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান, তিনি কেবল মাত্র স্তবের দ্বারাই

[illegible] ঈশ্বর
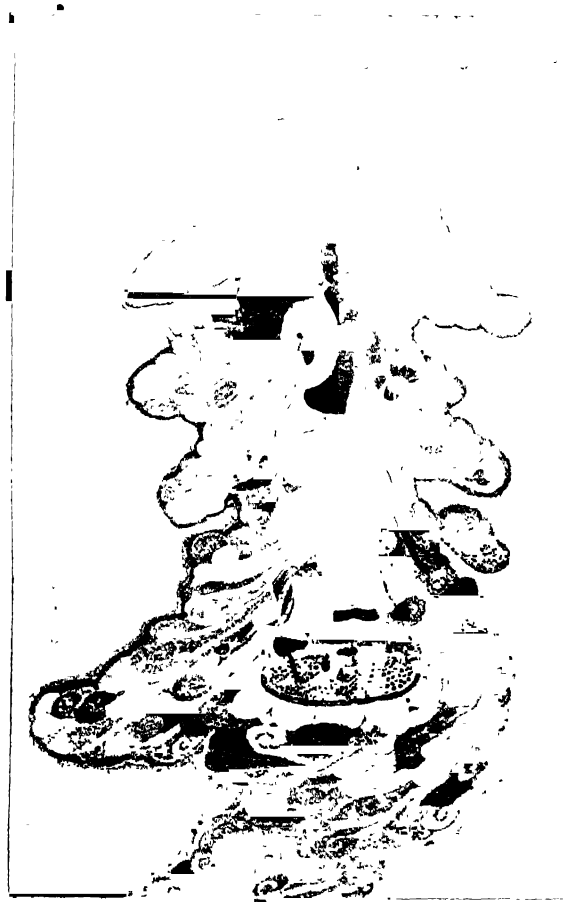
তুষ্ট হন। বহুদিন ধ'রে মানুষ তার নিজের অন্তরের এই খেয়ালী দুর্ণিবার ভাবভাব লক্ষ্য ক'রে কর্ম্মক্লিষ্ট ও যুদ্ধশ্রান্ত হয়ে তাকে স্তুতির দ্বারা তুষ্ট করে শান্তি ভিক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় মনে করলে। কিন্তু এখনও এক সমস্যা রয়ে গেল। এই অজানা শক্তিমানকে দেখা গেল না চোখ দিয়ে। কত লোকই এ চেষ্টা করে দেখলে। তাই তার নাম দেওয়া হ'ল "অদৃষ্ট" তার কথা বলতে গিয়ে বলা হ'ল "অব্যক্ত",—শুধু অনুভব করা গেল মনে মনে।

মানুষ সেই অদৃশ্য মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলে, বললে, যুদ্ধে আমি পরাস্ত হয়েছি, আমি শ্রান্ত, আমি ক্লান্ত, তোমার কাছে আমি করজোড়ে ভিক্ষা চাইছি—সুখ, শান্তি, জীবন, তৃপ্তি। তুমি সর্ব্বশক্তিমান, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,

দোল-লীলা

প্রতীক্ষমাণা।

মানুষের গীতা বলে উঠলো—আত্মসমর্পণ। কবি গেয়ে উঠলো, এখানে আর সমর সঙ্গীত নয়,—

> চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা
> বাঁচাও তাহারে মারিয়া,
> শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
> তোমার কাছেতে হারিয়া।

মানুষ শান্তি পেলে, মনে মনে অব্যক্ত ও অনন্তের বশ্যতা স্বীকার ক'রে, তাঁকে শান্ত, শিব, সুন্দরভাবে অনুভব ক'রে। মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্ম নেমে এলেন, মুমূর্ষুকে প্রাণ দিতে, ভীতকে অভয় দিতে, শ্রান্ত ও ক্লান্তকে অবসর দিতে,—ভাবরূপে জগতের বৃধ ও প্রতিভাদের অবলম্বন ক'রে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব ঘটনার পশ্চাতে, এই যে কারণটি এর সন্ধানে জ্ঞানে, অজ্ঞানে সকলেই আমরা ছুটে চলেছি,—বহুদিনের অতৃপ্তি ও অনবকাশের বোঝা বহন ক'রে সীমাহীন অনন্তের পথে। কিন্তু সব অনুসন্ধানই বিফল হয়েছে। চোখে তাঁকে দেখা যায়নি, হাতে তাঁকে ধরা যায়নি, বুদ্ধি দিয়ে ভাবাও চলেনি তাঁকে। শুধু কেউ কচিৎ কখনও মনে মনে তাঁর অস্তিত্বের কথা অনুভব করতে পেরেছে, মাত্র রসরূপে,—চকিতে অনুভূতিতে তিনি ধরা দিয়েছেন,—"আকেলিকা ইসারা"র মত।

তাই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই তাঁকে অনাদি, অনন্ত, অদৃষ্ট প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে মানুষের বুদ্ধিতে সীমা-রেখা টেনে দিয়েছে। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে, নত মস্তকে করজোড়ে স্তবের মধ্য দিয়ে এই অদৃষ্ট শক্তির কৃপা ভিক্ষা করেছে।

এই অনির্ব্বচনীয় রসানুভূতিই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করলে। সে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার ক'রে, বিচারকের আসন ত্যাগ ক'রে এই জগতেই বিবাদ দ্বন্দ্বহীন স্বর্গরাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করলে কেবলমাত্র সহানুভূতির উপকরণে। মানব হ'য়ে উঠ্‌লো দেবতা, এই অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রভাবে রসের পরশে। কবি ও শিল্পীর মানস-শতদলের উপর মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌লেন অমৃতের পুত্র।

ভাবের সার্থকতা প্রকাশে। তাই মানুষের যখনই কোন কর্ম্মের মধ্যে এই অনির্ব্বচনীয়ের প্রকাশ দৃষ্ট হ'ল তখনই সেই কর্ম্মটি হ'ল সার্থক এবং তাকে বলা হল সৃষ্টি। অসীমকে পাওয়া গেল সীমার মধ্যে!

এইরূপে রস বস্তুকে যখন প্রকাশ করা হ'ল কথায়, সুরে, ছন্দে; সত্য, শিব, সুন্দরকে দেখা গেল, বলা হ'ল 'কবিতা'। যখন তিনি রঙে, রেখায় প্রকাশ পেলেন কোন শিল্পীর কাজের মধ্যে তখন তাঁরই নাম হ'ল 'চিত্রশিল্প'। এইপ্রকার রূপ ভেদে একই রসবস্তু জগতে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হলেন মাত্র। সত্য, শিব সুন্দরকেই বলা হ'ল 'নটরাজ'। এই একই নটরাজের অভ্রভেদী জটানিঃসৃত সুন্দরী মন্দাকিনীর ত্রিধারা, ধর্ম্ম, কাব্য ও শিল্পের রসসুধা-স্রোতে জগৎ প্লাবিত করে দিচ্ছে কবে থেকে কে জানে!

মা।

হরগৌরী

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

হিমে ঢাকা হিমালয়-চূড়ে,
উমা দেখে জলের মুকুরে
নিজরূপ সঙ্গোপনে,
ভাবে আপনার মনে,
কোথায় কৈলাস কত দূরে !

একাকিনী পর্ব্বত-দুহিতা,
নাহি সঙ্গী নাহি তার মিতা—
জননীর কাছে যায়,
মেনকা ফিরিয়া চায়—
কিছু না শুধায় লাজভীতা।

বলে না, তপস্যা আমি করি,
কৈলাসে হইব মহেশ্বরী।
বলে না, মা, এ নিখিল
কেন দেখি নীলে নীল,
চিতাভস্মে ধরণী সুন্দরী।

চেয়ে চেয়ে দেখে গিরিবালা
ভেসে আসে ধুতুরার মালা ;
তৃতীয়ার ক্ষীণশশী
কাহার ললাটে পশি'
বক্ষে তার জ্বালে অগ্নি-জ্বালা।

নির্ঝরিণী বহি কলতানে
জটায় গঙ্গার স্মৃতি আনে ;
কেঁপে ওঠে চরাচর,
খসে পড়ে বাঘাম্বর,
উমা মনে লাজ নাহি মানে !

চাহিয়া রজত-গিরি-চূড়ে
কদম্বের মত দেহ স্ফুরে ;
তুষার সে নহে, হায়,
তুষার গলিয়া যায়—
বিহ্বল মদন মরে পুড়ে !

আকাশে বিষাণ শুধু বাজে,
সে বুঝি তাহারই বক্ষ মাঝে !
শোনে বৃষখুরধ্বনি,
ফুঁসিছে জটায় ফণী,
পথ পানে চায় উমা লাজে।

কৈলাসে মহেশ নত আঁখি,
গজাজিনে বসেন একাকী—
সহসা ভাঙিল ধ্যান,
একি কোনো অকল্যাণ—
মধুরে কে যেন গেল ডাকি।

এস, এস, এস মহেশ্বর,
যেনরে ডাকিল চরাচর—
কানে বলে গেল কে এ,
আমি আছি পথ চেয়ে
হে শিব, ললাটে রাখ কর।

নয়ন মেলিয়া ত্রিনয়ন,
দেখে অপরূপ আয়োজন—
কৈলাসে উৎসব-বেশ,
কাহার মাথার কেশ,
মেঘ নয়, মেঘের বরণ।

লজ্জা মানি উঠিল মহেশ,
যোগীবেশ তবু বরবেশ—
পার্ব্বতীর বাম আঁখি
কাঁপি উঠে থাকি থাকি,
কাঁপে বক্ষ, কাঁপে উরুদেশ।

* * *

মদন বাঁচিয়া রতি-কোলে
বিস্মিত বিহ্বল আঁখি খোলে—
বলে, মোর পরাজয়ে
শিব এল হিমালয়ে,
ভোলানাথ বুঝি সব ভোলে !

চৈতন্য-জীবনীর উপকরণ ঃ

(১) চৈতন্যভাগবত ও বৃন্দাবন দাস

—শ্রীসুশীলকুমার দে

চৈতন্যদেবের জীবনী ও ব্যক্তিগত প্রভাব সম্বন্ধে জানিতে হইলে উপকরণের অভাব নাই। তাঁহার তিরোধানের অনতিকালমধ্যে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি জীবনী রচিত হয়; এই গুলিতে শুধু যে তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার বিশদ বিবরণের উপাদানই আছে, তাহা নহে, তিনি যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, কি করিয়া তাহা প্রসার লাভ করিল তাহাও যথাযথ বর্ণিত আছে। কোন্ আবেষ্টনীর মধ্যে, কি প্রণালীতে এই ধর্ম্ম ধীরে ধীরে সংক্রমিত হইয়া দেশব্যাপী প্রভাব বিস্তার করিল, এই সকল জীবনীতে তাহারও পরিচয় আছে; যাঁহারা এই লীলানাট্যে প্রধান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারাও এইগুলিতে জীবন্ত হইয়া আছেন। এই গুলির মধ্যে দুই একটি প্রায় সমসাময়িক বিবরণ বলিয়া লেখকদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও জ্ঞানের দ্বারা রচনাগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছে; ফলে, এই জীবনীগুলি এক হিসাবে ইতিহাসের মতই মূল্যবান হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রায় সকলকটিতেই চৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং ভক্তিবাহুল্যে এগুলি অতিরঞ্জিত *। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই চরিতাখ্যায়িকা বিভাগ, বৈষ্ণব প্রভাবের ফলেই যে প্রবর্ত্তিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; এই দিক দিয়া বাঙলা সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিকট ঋণী। অনেক ক্ষেত্রে গোঁড়া ভক্তির আতিশয্যে যে সত্যকার চরিতাখ্যায়িকা বিকৃত ও বিরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই জীবনীর সকলগুলিই ছন্দে গ্রথিত। এই হেতু অসম্ভব কল্পনাও মধ্যে মধ্যে সত্যপ্রকাশে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। একজন মহাপুরুষের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও প্রভাব এই সকল লেখকদের এমনই আবিষ্ট করিয়াছিল যে তাঁহারা তাঁহাদের মানবীয় প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অতি অল্প বয়সেই চৈতন্যদেবে দেবত্ব আরোপিত হইয়াছিল বলিয়া সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যাগুলির আদর্শে তাঁহারা চৈতন্যের জীবনী রচনা না করিয়া পারেন নাই। চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই তাঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ও সম্পূর্ণ অসম্ভব কাহিনী প্রচলিত হয়; বিশ্বাসে অন্ধ এই সকল ভক্ত জীবনীকারের সেগুলি জীবনীর সহিত গাঁথিয়া দিতে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও এই অবিশ্বাস্য কাহিনীগুলির আবরণ সরাইয়া আমরা সত্যকার একজন মহামানবের চিত্র খুঁজিয়া পাই।

চৈতন্যদেবের প্রাচীনতম জীবনী যাহা আমরা পাই তাহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত; এই জীবনীটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত অথবা সংক্ষেপে চৈতন্যচরিতামৃত নামে পরিচিত। মুরারি গুপ্ত এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও বয়সে তাঁহার অপেক্ষা বড় ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন শিশু, মুরারি গুপ্ত তখনই পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের প্রায় সকল জীবনীতেই মুরারি গুপ্তের উল্লেখ আছে এবং লেখকেরা যে মুরারি গুপ্তের জীবনী অবলম্বন করিয়াই চৈতন্যচরিত লিখিয়াছেন তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে ইহার অধিক বিশেষ কিছু জানা যায় না। শ্রীহট্টে ইহার আদি নিবাস ছিল, পরে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ ইনি চৈতন্যদেবের পিতার প্রতিবেশী ছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং বোধ হয় কবিরাজী করিতেন। ইনি বৈদ্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদি আলোচনা করিতেন বলিয়া বালক চৈতন্য ইঁহাকে প্রায়ই উপহাস করিতেন। চৈতন্যদেবের পিতার মত ইনিও সম্ভবতঃ রামোপাসক ছিলেন। চৈতন্যদেবের নিকট তিনি যে রামাষ্টক আবৃত্তি করিতেন তাহা তল্লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতে (২, ৭, ১০-১৭) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কারণেই ইহাঁকে হনুমানের অবতার বলা হইত। তিনি দৈহিক বলে বলীয়ান ছিলেন। একবার শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া চৈতন্যদেবকে কাঁধে তুলিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মুরারি গুপ্ত, দামোদর

* অলৌকিক লীলা ইহা পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইবে তর্কে হয় বহু দূর॥

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮, ১৬৮

পণ্ডিত (স্বরূপ দামোদর নহেন, কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই এই গ্রন্থ রচনা করেন। দামোদর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের এক প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং অন্ত্যলীলায় পুরীতে ইনি বরাবর তাঁহার পার্ষদরূপে বিরাজ করিতেন। এই গ্রন্থ মুরারি গুপ্তের কড়চা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও আসলে ইহা কড়চা অর্থাৎ অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলির সমষ্টি মাত্র নহে, ইহা একখানি রীতিমত কাব্য। কাব্যটি চারিপ্রক্রমে ৭২ সর্গে বিভক্ত এবং চৈতন্য-দেবের সমগ্র জীবনই ইহার বিষয়। গ্রন্থশেষে * রচনার কাল ১৪৩৫ শক অর্থাৎ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু চৈতন্যদেব ১৪৩১ শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দ) সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খৃঃ) বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন সুতরাং এই গ্রন্থে চৈতন্যজীবনের এই অংশ পর্য্যন্তই থাকিবার কথা। অথচ দেখা যাইতেছে ইহাতে চৈতন্যের পরবর্ত্তী জীবনের কাহিনীও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হয় গ্রন্থশেষে তারিখে ভুল আছে, না হয়, শেষ অংশ প্রক্ষিপ্ত, এইরূপ বিবেচনা করা ছাড়া উপায় নাই। সমগ্র গ্রন্থের মূল্য যাহাই হউক মুরারি গুপ্ত বর্ণিত অনেক কাহিনীই যে চৈতন্য-জীবনের সত্যকার ঘটনা তাহাতে সংশয় নাই; মনে হয়, চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনই ইহার মূল বিষয়-বস্তু। বাঙলা ভাষায় লিখিত প্রথম চৈতন্যচরিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে এই গ্রন্থের উল্লেখ নাই, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলেও নাই। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধানের মাত্র দশ বৎসর পরে রচিত কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে লিখিত আছে (২০,৪২) যে মুরারি গুপ্তের কাব্য অবলম্বন করিয়াই কবিকর্ণপূর তাঁহার চরিতামৃত রচনা করিয়াছেন। তবে উহা যে শুধু আদিলীলারই উপকরণ জোগাইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। কবিকর্ণপূরের অন্য একখানি গ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতেও (১,৯৪) মুরারি গুপ্তের চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লেখ আছে। চৈতন্যদেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক জীবনী কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত সম্ভবতঃ চৈতন্যের তিরোধানের তিরাশী বৎসর পরে লিখিত হয়। তিনি যে মুরারি গুপ্তের কাব্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তাঁহাতে চৈতন্য-দেবের আদিলীলা সম্পূর্ণভাবে সূত্রাকারে বিবৃত হইয়াছে *।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন চরিতকার লোচন দাসও মুরারি গুপ্তের এই কাব্যে গ্রথিত জীবনীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহাতে প্রভুর 'জন্ম হইতে বালক চরিত্র' বিশদ ভাবে বিবৃত আছে। তিনি মুরারি গুপ্তের নিকট তাঁহার অসীম ঋণ স্বীকার করিয়াছেন †। লোচন দাসের জীবনী কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের চরিতামৃতের পূর্ব্বের রচনা, সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উহা লিখিত হয়। বর্ত্তমানে মুরারি গুপ্তের চরিতামৃত যে ভাবে পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় চারি প্রক্রমের মধ্যে তিন প্রক্রমই চৈতন্যদেবের রামকেলি গমন ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ লইয়া রচিত অর্থাৎ মোটামুটি ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা পর্য্যন্ত ইহাতে আছে; চতুর্থ প্রক্রমে সংক্ষেপে তাঁহার বৃন্দাবন পরিক্রমা ও শেষে পুরীতে বসবাসের কথা আছে। দ্বিতীয় প্রক্রম তাঁহার সন্ন্যাসের কথা লইয়াই সমাপ্ত হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত আদিলীলা। লোচন দাস ব্যতীত আর কোনও চরিতকার মুরারি গুপ্তের নামে প্রচলিত গ্রন্থের আদিলীলার পরবর্ত্তী অংশ ব্যবহার করেন নাই, সুতরাং মনে হইতেছে বর্ত্তমানে আমরা মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ যে আকারে পাইতেছি লোচন দাসও ঠিক সেই আকারেই উহা দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রক্রমের পরবর্ত্তী প্রক্রম দুইটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, মনে হয় দ্বিতীয় প্রক্রমেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল এবং গ্রন্থশেষে যে তারিখ আছে পরবর্ত্তী তৃতীয় ও চতুর্থ প্রক্রম যাঁহারা সংযোজিত করিয়াছেন তাঁহারা সেই তারিখই শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছেন। দামোদর পণ্ডিতের আগ্রহে মুরারি গুপ্ত চৈতন্য-চরিত লিখিয়াছেন এই উক্তির মধ্যেও একটা সম্ভাবনার কথা মনে

* অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

* আদিলীলার মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত্র।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥

চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৩, ১৫

† লোচনদাস মুরারি গুপ্তের লেখা স্থানে স্থানে হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন। লক্ষ্মী যে পূর্ব্বজন্মে অপ্সরা ছিলেন এইরূপ কতকগুলি বিষয় কেবল লোচনদাসই লিখিয়াছেন এবং এগুলি মুরারি গুপ্তের লেখা হইতে সংগৃহীত। এমন কি সন্দেহজনক শেষাংশ হইতেও লোচনদাস বিভীষণ কাহিনী তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

হয় এই যে, দামোদর স্বয়ং শেষ জীবনে পুরীতে চৈতন্যদেবের লীলা-সহচর থাকার দরুণ অন্ত্যলীলা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন সুতরাং তিনি কেবল মাত্র আদ্যলীলাই মুরারি গুপ্ত মারফৎ জানিতে চাহিয়া থাকিবেন। মুরারি গুপ্তেরও অন্ত্য-লীলা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ কোনও জ্ঞান ছিল না—লোকপরম্পরায় তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন সেইটুকুই মাত্র তাঁহার উপকরণ ছিল। চৈতন্যের জীবিতকালের রচনা হইলেও মুরারি গুপ্ত তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পনা করিয়াই গ্রন্থ সুরু করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে যতগুলি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল, সকল গুলিকেই তিনি স্থান দিয়াছেন। এই কারণেই ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রন্থের মূল্যহানি হইয়াছে। পরবর্ত্তী চরিতকারগণও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী মুরারি গুপ্তের উপাদান ব্যবহার করিয়া যে সকল জীবনী রচনা করিয়াছেন সে গুলিও মুরারি গুপ্তের জীবনীর মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছে।

ইহার পরই স্বরূপ দামোদরের চরিতকথা; কিন্তু এই পুথির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই পুথিটিকেই চৈতন্য-জীবনের মধ্য ও অন্ত্যলীলার মূল উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—ইহাও কড়চা বলিয়া খ্যাত ছিল। এ সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের দুই একটা পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

> দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে—চৈ, চ, মধ্য, ৭, ১১২
>
> প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
> সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
> দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
> মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিস্তারি॥ আদি, ১৩, ৪৬
>
> স্বরূপ গোস্বামী আর রঘুনাথ দাস।
> এই দুইর কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ। অন্ত্য, ১৪, ৭

এই শেষোক্ত পংক্তি হইতে বুঝা যায় রঘুনাথ দাসও একটি কড়চা লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছে। রঘুনাথ স্বাধীন ভাবে কোনও গ্রন্থ রচনা হয়তো করেন নাই—গুরু স্বরূপ দামোদরকে তিনি তাঁহার কড়চা রচনায় সাহায্য করিয়া থাকিবেন। স্বরূপ দামোদরের কড়চা নামে বটতলা হইতে যে সকল সস্তা ছাপা পুথি পাওয়া যায় সেগুলির সহিত এই চৈতন্য-জীবনীর কোনও সংশ্রব নাই। সহজিয়ারা এগুলি নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য প্রচার করিয়াছিল।

আসলে স্বরূপ দামোদরের গ্রন্থের নাম কড়চা হইতে পারে না কারণ ইহা সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। স্বরূপ দামোদর পূর্ব্বে নবদ্বীপের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য্য; প্রথমে বৈদান্তিক থাকিয়া তিনি পরে দণ্ডী সন্ন্যাসী হন ও স্বরূপ দামোদর নাম গ্রহণ করেন। পুরীতে ইনি চৈতন্যের একজন বিশেষ অনুগৃহীত ভক্ত শিষ্য ছিলেন এবং প্রভুর সমস্ত লীলায় যোগদান করিতেন। কবিকর্ণপূর তাঁহার চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে এবং অন্যান্য চরিতকারেরাও স্বরূপ দামোদরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন, যে কয়জন শিষ্য চৈতন্যদেবের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, স্বরূপ দামোদর তাঁহাদের অন্যতম, তিনি চৈতন্যদেবের মন জানিতেন (মধ্য ১৩, ১২২, ১৩৪-৫)। তরুণ রঘুনাথের নিকট চৈতন্যদেব স্বয়ং একবার স্বীকার করিয়াছিলেন যে শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান তাঁহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদরের অধিক। বৈষ্ণব তত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি চৈতন্যদেবের এরূপ অনুরক্ত ছিলেন যে তাঁহার তিরোধানের পরেও যে তিনি বাঁচিয়া ছিলেন এরূপ মনে হয় না. তবে মুক্তাচরিত্রে রঘুনাথ দাস উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি শেষ জীবনে বৃন্দাবনে থাকিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে চৈতন্য-চরিত রচনা করেন।

পরমানন্দ সেন বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যের স্থান ইহার পরেই। এই কাব্য ২০ সর্গে বিভক্ত এবং চৈতন্যদেবের তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যে রচিত হয়। পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর এই নামে সমধিক পরিচিত। চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক নামে চৈতন্য-জীবনী বিষয়ে তিনি দশ অঙ্কে একটি নাটক রচনা করেন। চৈতন্যের একজন বয়স্ক শিষ্য শিবানন্দ সেনের ইনি পুত্র। ইনি জাতিতে ছিলেন। পরমানন্দ তাঁহার নিবাস নৈহাটির নিকটবর্ত্তী কাঁচড়াপাড়াতে (কাঞ্চন-পল্লী) চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। শিবানন্দ কবি ছিলেন, পদকল্পতরু নামক বৈষ্ণবপদের সংগ্রহ গ্রন্থে তাঁহার কয়েকটি পদ আছে। পুত্র পিতার এই ক্ষমতা অতি শিশু বয়সেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে যখন তাঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর তখন তিনি পিতার সহিত পুরী গিয়া

চৈতন্যদেবকে সন্দর্শন করেন। প্রণামার্থ মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়া এই শিশু এমনই অভিভূত হইয়া পড়ে যে কঠিন আর্য্যাছন্দে নিম্নলিখিত শ্লোকটি সে সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিয়া উচ্চারণ করে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের কর্ণভূষণ বলা হইয়াছে বলিয়া চৈতন্যদেব স্বয়ং প্রীত হইয়া শিশু পরমানন্দকে কবিকর্ণপূর আখ্যা প্রদান করেন। শ্লোকটি এই—

শ্রবসোঃ কুবলয়ং অক্ষোরঞ্জনং উরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবন-রমণীণাং মণ্ডনং অখিলং হরির্জয়তি॥

এই গল্পের অন্য কোনও মূল্য না থাকিলেও অতি অল্প-বয়সেই যে পরমানন্দ সেন কাব্য রচনা সুরু করেন ইহাতে তাহার প্রমাণ হয়। সংস্কৃত চৈতন্য-চরিতামৃত কাব্যই তাঁহার প্রথম সম্পূর্ণ রচনা, ইহাতে কবি নিজেকে শিশু আখ্যা দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে তারিখ দেওয়া আছে—আষাঢ় ১৪৬৪ শক অর্থাৎ ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ। যদি ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে তাঁহার আঠারো বৎসর বয়সে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষীয় বালকের পক্ষে এরূপ একটি কাব্যরচনা বিস্ময়কর বটে। ইহা ২০ সর্গে ১৯০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ এবং ইহাতে আর্য্যা ছন্দ ভিন্ন অন্য অনেক ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের ৪৭ বৎসরের জীবনের ঘটনা ইহাতে কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে। কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি মুরারি গুপ্তের কাব্য অবলম্বনেই এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যে ইহা লিখিত, তখনও বাঙ্গলাভাষায় একটিও জীবনী রচিত হয় নাই। জীবনীর শেষাংশ তেমন বিশদভাবে ইহাতে বিবৃত হয় নাই—বরঞ্চ ভক্তিতত্ত্বের দিক দিয়া অনেক অসম্ভব কল্পনা ইহাতে করা হইয়াছে, চৈতন্যদেব ত্রাণকর্ত্তা ও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন চৈতন্য-চন্দ্রোদয় তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা এবং সম্ভবতঃ উহা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রের আদেশে রচিত হয়। বিখ্যাত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটককে আদর্শ করিয়া মৈত্রী, ভক্তি, অধর্ম্ম, বিরাগ প্রভৃতি গুণবাচক ও নারদ, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া ইহা রচিত। ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী হিসাবে এগুলিকে না মানিলেও তৎকালে চৈতন্যদেবের প্রভাবে দেশের আবহাওয়া কিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল এগুলি হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। অন্ততঃ কিছু কিছু সত্য ঘটনার আভাস যে কবিকর্ণপূর তাঁহার পিতার কাছ হইতে পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা শিবানন্দও এই নাটকের একটি চরিত্র।*

এই সকল সংস্কৃত জীবনচরিতকে কেন্দ্র করিয়া পর পর এমন অনেকগুলি জীবনচরিত বাঙলা ভাষায় রচিত হয় যেগুলি মূল সংস্কৃত জীবনীগুলিকে আত্মসাৎ করিয়াও বহু পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাচীনতার দিক দিয়া ও চৈতন্যদেবের আদ্যলীলার সঠিক বিবরণ হিসাবে বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা নিত্যানন্দ ও স্বরূপের আজ্ঞায় লিখিত হয়

নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥

চৈতন্য ভাগবত

ইহার রচনা তারিখ সম্বন্ধে সংশয় আছে তবে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহা লিখিত হইয়া থাকিবে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন যে ইহা ১৪৭০ শকে (১৫৪৮ খৃঃ) রচিত হইয়াছিল। গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় ১৪৫৭ শকের (১৫৩৫ খৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। এই তারিখ ঠিক হইলে কবি কর্ণপূরের সংস্কৃত চরিতামৃতে নিশ্চয়ই ইহার উল্লেখ থাকিত। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার নানা গ্রন্থে এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করেন, কেন করেন তাহার কারণ দেওয়ার আবশ্যকতা তিনি অনুভব করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসের অনুমতি লইয়া চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের ঋণ স্বীকার

* গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা কবিকর্ণপূরের অপর একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ কবে রচিত হইয়াছিল বলা কঠিন। বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন তারিখ পাওয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়া অফিস রক্ষিত পুথিতে ১৪৬৬ (১৫৪৪ খৃঃ) বলিয়া লিখিত আছে। এই গ্রন্থে শুধু চৈতন্যদেবের পূর্ব্বজন্মে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে বৃন্দাবন-লীলার কথাই নাই, তাঁহার পার্ষদরাও সে জন্মে কে কোন রূপে ছিলেন তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। তত্ত্বের দিক দিয়া এমন পাকা লেখা কবির এত অল্প বয়সের লেখা হইতে পারে না। কবিকর্ণপূরের অন্যান্য গ্রন্থ—১। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ২। অলঙ্কার-কৌস্তুভ ৩। চমৎকার চন্দ্রিকা।

করা হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্ব্বে যে চৈতন্য ভাগবতের রচনা শেষ হইয়াছিল ইহা নিশ্চয়। লোচনদাসও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং জয়ানন্দ পূর্ব্বচরিতকারদের তালিকা দিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রেই বৃন্দাবন দাসের নাম করিয়াছেন। লোচনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই ষোড়শ শতকের শেষভাগে তাঁহাদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন সুতরাং বৃন্দাবন দাস যে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চৈতন্য ভাগবত তিনখণ্ডে বিভক্ত। আদি খণ্ড, চৈতন্যদেবের গয়াগমন পর্য্যন্ত; মধ্যখণ্ড তাঁহার সন্ন্যাস পর্য্যন্ত এবং অন্ত্য খণ্ড পরবর্ত্তী জীবন হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত। সর্ব্বশুদ্ধ ইহাতে ৫২ পরিচ্ছেদ। চৈতন্যের অলৌকিক লীলাকাহিনী এই সময়ে অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে এবং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার তাহাতে তখন আর কাহারও সংশয় নাই। বৃন্দাবন দাস নিজে গোঁড়ামির মধ্যে মানুষ এবং তাঁহার নিজের জন্মও এক অলৌকিক রহস্যের দ্বারা আবৃত সুতরাং চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনীগুলি বিশ্বাস করিয়া সেগুলির সাহায্যে চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রমাণ করিতে বৃন্দাবন দাস চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বৃন্দাবন দাস শ্রীমদ্‌ভাগবৎ হইতে এই গ্রন্থরচনার অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন, সুতরাং চৈতন্যের বাল্যজীবন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের আদর্শে রচনা করিতে তাঁহাকে বিশেষ ভাবিতে হয় নাই এবং এই দিক দিয়া এই জীবনী এতটা সফল হইয়াছে যে এই গ্রন্থপ্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে বৃন্দাবনের গোস্বামীপ্রবরেরা ইহার গ্রন্থকার প্রদত্ত চৈতন্য মঙ্গল নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া চৈতন্য ভাগবত* নাম রাখেন। এই নামের মধ্যেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও মাহাত্ম্যের পরিচয় আছে। এই অনাবিল ভক্তির প্রাবল্য সত্ত্বেও নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের প্রথমজীবন সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং শ্রীবাসের ভ্রাতার দৌহিত্র ছিলেন এবং এই সুবিখ্যাত শ্রীবাসের আঙ্গিনাই চৈতন্যধর্ম্মের প্রথম কেন্দ্র ছিল বলিয়া বৃন্দাবন দাস এই সময়ের ইতিহাস রচনার সকল উপাদানই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ণনায় তিনি কুত্রাপি ভাষার আড়ম্বরের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, অত্যন্ত সহজ ভাষায় মানুষ ও ঘটনার যেন ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, এবং এই কারণেই তাঁহার লেখা জীবনী এত লোকপ্রিয়। তিনি তখনকার সেই আবেষ্টনীকে সমগ্রভাবে পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন; চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় যে সকল মহাপুরুষ ভাবোন্মাদনার দ্বারা ইহার প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন বৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থে তাঁহাদিগকে জীবন্ত করিয়া গিয়াছেন।

গোঁড়া বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন দাসকে শ্রীমদ্‌ভাগবৎকার ব্যাসের অবতার বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি অনেকে বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্যচরিতের ব্যাস আখ্যা দেওয়াতেই সম্ভবতঃ এইরূপ প্রচারিত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ৮২ শ্লোকে আছে—"চৈতন্যচরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।"

বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর বিধবা অবস্থার পুত্র; নারায়ণীর স্বামী কুমারহট্টের বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর আঠারো মাস পরে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রভৃতির বিবরণে ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থে এই উক্তির স্বপক্ষে কিছু পাওয়া যায় না। বৃন্দাবন দাস স্বয়ং কোথায়ও তাঁহার পিতার নামোল্লেখ করেন নাই। মুরারি গুপ্ত নারায়ণী দেবীর বর্ণনায় মধুব্রত্যাতি ও অভর্তৃক এই বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

> নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
> তার গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥ আদি, ৮, ৫১

নারায়ণীর সমসাময়িক প্রাচীন লেখকেরা এ বিষয় সম্পূর্ণ নীরব। শুধু কবিকর্ণপূর নারায়ণীর নাম যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত গৌরাঙ্গলীলার অন্যতম পরিকররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের জন্মবৃত্তান্তকে এরূপ রহস্য ও অলৌকিক কাহিনীর আচ্ছাদনে আবৃত করিবার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ থাকিবে। নারায়ণী যে সে সাধারণ রমণী নহেন—যে শ্রীবাসের আঙ্গিনা চৈতন্যদেবের আদিলীলার প্রারম্ভে বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তিনি সেই ঘরেরই মেয়ে। তিনি বালিকাবয়সেই চৈতন্যদেবের আশীর্ব্বাদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ ভক্ত বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাতেই নারায়ণী দেবীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই গল্পে যথেষ্ট সন্দেহের

* প্রেমবিলাস গ্রন্থে (২০) এই কাহিনী বর্ণিত আছে

অবকাশ আছে, কারণ বৃন্দাবন দাস স্বয়ং আক্ষেপ করিয়াছেন যে তাঁহার চৈতন্যলীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে হয় তো তিনি নবদ্বীপলীলার সময় অত্যন্ত শিশু ছিলেন অথবা তাঁহার জন্মই হয় নাই; চৈতন্যদেবের জীবিতকালে যদি বৃন্দাবন দাসের জন্মই না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নারায়ণীর চৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণের ফলে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইয়াছিল এরূপ সম্ভব নহে। এই কাহিনী বিশ্বাসের পথে আরও অন্তরায় আছে। বৃন্দাবন দাস স্বয়ং বলিয়াছেন যে নিত্যানন্দ ও স্বরূপ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই তিনি চৈতন্যজীবনী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিতপরে স্বরূপের মৃত্যু হয়, এইরূপ কথিত হয়। তিনিই যদি আদেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলে চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই নিশ্চয়ই এই আদেশ দিয়া থাকিবেন। আমরা ইহাও অবগত আছি যে নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের পর মাত্র ৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তিনি একজন আট বৎসরের শিশুকে এই আদেশ দিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহাও কথিত আছে যে পুত্রের মত নারায়ণী দেবীও নিত্যানন্দের অনুরক্ত শিষ্যা ছিলেন এবং নিত্যানন্দ শ্রীনিবাসের গৃহে অবস্থানকালে নারায়ণী যে বিধবা তাহা না জানিয়া তাঁহাকে পুত্রবতী হওয়ার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, নারায়ণী সম্বন্ধে যে কিছু কুৎসাবাদ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু দুর্ভোগও তাঁহাকে এই কারণে সহিতে হইয়াছিল (গৌরপদতরঙ্গিণী ভূমিকা ১২৮ পৃষ্ঠা)। নারায়ণী দেবীকে স্বীয় চরিত্র সম্বন্ধে জবাবদিহি করিবার জন্য নবদ্বীপের কাজীর নিকট হাজির হইতে হয়; এই অবস্থায় এমন একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাহাতে কাজীকে নারায়ণীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। এ কাহিনীও অবিশ্বাস্য এবং ইহার মূলে কোনও প্রমাণই নাই। ইহা সত্ত্বেও নারায়ণীকে শিশুপুত্রসহ পিতৃব্যের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। তিনি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মামগাছি গ্রামের বাসুদেব দত্তের গৃহে আশ্রয় নেন। পরবর্ত্তী জীবনে বৃন্দাবন দাস বর্দ্ধমান জেলার দেন্নুড় গ্রামে বসবাস করেন। বৃন্দাবন দাসের জন্মের ঠিক তারিখ জানা যায় না; তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলাকালে হয় তিনি শৈশব অতিক্রম করেন নাই অথবা জন্মগ্রহণ করেন নাই।

> হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, না হইল তখনে।
> হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে—আদি, ২০;
> হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল।
> হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল।—মধ্য ১

কেহ কেহ বলেন বৃন্দাবনদাস ১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৪১ শক অর্থাৎ ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জন্মের আরও একটি তারিখ পাওয়া যায় ১৫০৭ খৃষ্টাব্দ। এই সকল তারিখ সম্বন্ধে কোনই স্থিরতা নাই, প্রাচীন কোনও লেখকই কোনও তারিখ দেন নাই। বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হয় ১৫০৭ সালেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম হওয়া অধিকতর সম্ভব, কারণ যদি তাঁহার ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম হইত তাহা হইলে নিত্যানন্দ ও স্বরূপ কর্ত্তৃক জীবনী লিখিতে আদিষ্ট হওয়ার কথাটা মিথ্যা হইয়া যায়। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন এবং নিত্যানন্দের কথাই অনেক করিয়া বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

> নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
> চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ। আদি, ৮, ৪৮

নিত্যানন্দকে যাহারা কটূক্তি করে তাহাদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়াই বৃন্দাবন দাস উত্তেজিত হইয়া অসংযত ভাষা পর্য্যন্তও ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধবাদীর অভাব ছিল না।

চিত্রা

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

বয়সের তাপ এমন একটা মাত্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে হৃদয়টা টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, এবং বুদ্ধি বাষ্পে পরিণত হইয়াছে। সেদিন একটা পদদলিত পিঁপড়ের যন্ত্রণা দেখিয়া মনে হইতেছিল, রাজেন মুখুজ্জের যাবতীয় টাকা কাড়িয়া লইয়া পিঁপড়ের অসহায়তা ঘুচাইবার কাজে লাগি।

পৃথিবীতে বেকার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সমস্ত দায়িত্ব সেদিন আমারই উপর চাপিয়াছিল। বাংলা দেশের তরুণ আমি—নিশ্চিন্ত থাকি কি উপায়ে? যথেষ্ট টাকা চাই—কিন্তু ইচ্ছা যদি প্রবল হয় তাহা হইলে টাকার অভাব ঘুচাইতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। ইচ্ছাটা হওয়া চাই আগুনের মত—সেটা মন হইতে মনান্তরে ধরাইয়া দেওয়া দরকার।—স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, প্রথমতঃ এক কলিকাতা শহরে যদি কাজ আরম্ভ করি এবং ধনীদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারি তাহা হইলে দীন ভারতবর্ষের মুখে হাসি ফুটিবে।—ইচ্ছাটা করিয়াছিলাম তিন বৎসর আগে কিন্তু ভারতবর্ষ আজও কাঁদিতেছে। বলা বাহুল্য আমি কৃতকার্য্য হই নাই। না হইবার কারণ—বাড়ি বাড়ি ঘুরিবার জন্য ট্রামের একখানা মাসিক টিকিট করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল—কিন্তু দশটি টাকা আমার জুটিল না। সাত আনা আট আনা প্রতিদিন খরচ কবায় অসুবিধা অবশ্য ছিল না, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম ইহাতে খরচ অত্যন্ত বেশি পড়িয়া যায়।

এক একবার মনে হয় আমারি ভুল। বায়োস্কোপে ঢুকিয়া ছবির ভিতর দিয়া দেখি পৃথিবীতে ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি—যে দিন ঢুকিতে না পারি সে দিন টিকিট-ঘরের সামনে মারামারি এবং কাড়াকাড়ির মধ্যে দেখি বিপুল ঐশ্বর্য্য। সে ঐশ্বর্য্য যেমন প্রাণের তেমনি পকেটের। বুঝিতে পারি জগতে দুর্দ্দশা নাই।

মনের এবং ঘরের অবস্থা যখন দুই বিপরীত আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া পিঠে পিঠ লাগাইয়া বসিয়া আছে—তখন হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ডিগবাজি খাইলাম। টেলিগ্রাম আসিল লটারিতে আমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা াছে। টিকিটটা গোপনে কিনিয়াছিলাম, কিন্তু আর গোপন রহিল না। আমার পাওনা দেখিয়া আমাদের পাড়া হইতে এখন অনেক টাকা ছুটিতেছে লটারি মায়া-মৃগের পশ্চাতে।

তিনদিক হইতে তিনটি সদুপদেশ আমি পাইলাম। আমি কুল-গুরু মানি না কিন্তু শুনিলাম আমার পিতামহ মানিতেন। তাঁহার গুরুদেবের নাতি, বয়সে আমার সমান হইবেন—কখনো পরিচয় নাই—একগাল দাড়ি লইয়া আমার গৃহে আসিয়া বলিলেন, বাবাজি, পদ্মপত্রে জল।

আমি বলিলাম, সেটা কিছু না, জল যদি দেখতে চান বর্ষাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। শুধু পদ্মপত্রে নয় ঘাটে মাঠে বাটে সর্ব্বত্র দেখতে পাবেন।

একজন বন্ধু লিখিয়াছেন,—টাকাটা হাতে রেখো না ভাই, বীমা-কম্পানিতে কিছু চালিয়ে দাও।

আর একজন লিখিয়াছেন—যদি মাথা এবং টাকা উভয়ই ঠিক রাখতে চাও তবে পত্রপাঠ ব্যাঙ্কে স্থায়ী-আমানত ক'রে ফেল।

গুরুদেবের উপদেশে টাকার প্রতি মায়া কাটাইতে পারিলাম না। অন্য দুইটি উপদেশের মাঝামাঝি রফা করিয়া টাকাটার চারি আনা দিলাম বীমায় আর বারো আনা রাখিলাম ব্যাঙ্কে।

সারা পৃথিবীর বেকার সমস্যা ঘুচাইবার জন্যই হউক বা পিঁপড়ের দুর্দ্দশা ঘুচাইবার কাজেই হউক, লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন এতদিন দেখিয়াছি, কাজেই পঞ্চাশ হাজারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু বয়সটা ছিল বিধর্ম্মী—ফলে হৃদয়টা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া রহিল। কিন্তু সে ঐ পর্য্যন্তই।—যে উত্তাপ হৃদয়কে গলাইতে পারে—পঞ্চাশ হাজার টাকাকে গলাইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। সুতরাং হৃদয় বিগলিত হইলেও টাকা গলিল না। বল্পনাকে যেখানে খুশী চালনা করা যায়, হাত পা-ও নিরুদ্দেশের পথে চলিতে বাধা পায় না, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার মত এতখানি সুস্পষ্ট জিনিসকে কি অস্পষ্ট ছায়ার পিছনে সহজে ঠেলিয়া দেওয়া যায়? পঞ্চাশ হাজারের প্রভু হওয়ার যে একটা গৌরব আছে সেটাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা চলে না।

বন্ধুরা গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল—লোকটা বড় সেয়ানা। যথেষ্ট বাজে খরচ করা সত্ত্বেও এরূপ উপাধি কেন পাইলাম বুঝিতে পারি না। তাহাদের বায়োস্কোপে যাইবার খরচ ত আমিই বরাবর দিতেছি—তবে সেটা সুদ হইতে দিতেছি বটে।

সমালোচনা করিবার মত আত্মীয় আমার কেহ ছিল না—বন্ধুরাই এ ভার লইয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমার পোষাকের বর্ব্বরতা তাহাদের কাছে এমনি বিসদৃশ ঠেকিল যে তাহাদের লজ্জা নিবারণের জন্য আমার সজ্জা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। একদিন জামার দোকানে বেশ কিছু খরচ করিয়া বসিলাম—অন্য সময় হইলে ইহাতে আমার ছয় মাসের খাওয়া খরচ চলিত। জনৈক বন্ধু বলিলেন—এইবার ঠিক রাজপুত্রের মত দেখাইতেছে। আমি বলিলাম, পরের পুত্রের মত দেখাবার জন্যই কি এতটা খরচ করলাম? বন্ধু লজ্জিত হইয়া জবাব দিলেন,—না ঠিক তা নয়—তবু—ইহার চেয়ে বেশি আর তিনি বলিতে পারিলেন না। আমি নিজেও উহার চেয়ে বেশি কিছু বলিতে পারিতাম না। "তবু" কথাটা যে একটা অনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত করিল তাহাতে রীতি মত একটা মোহ আছে।

সেদিন নব-পোষাকে ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখি, শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড়-পরা এক বৃদ্ধা আমার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল, বাবা, একটা পয়সা। তাহার চোখ দুইটি কাতর মিনতিতে ভরা, দারিদ্র্যের স্বরূপ তাহার আকৃতিতে সুস্পষ্ট।

আমি নব-সজ্জার আত্মপ্রসাদে মগ্ন, তাহারই বেগে আমি পথে বাহির হইয়াছি—ভিক্ষার দাবী মিটাইবার অবস্থাটা হঠাৎ আমার মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। "একটা পয়সা বাবা" ইহার উত্তরে আমার হাত চকিতে পকেটে যাইতেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না, আমার পা তাহার চেয়ে বেশি বেগে চলিতেছিল। একটু পরেই পিছনে চাহিয়া দেখি, অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি, বৃদ্ধাকে আর দেখা যায় না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। একটা বীভৎসতার হাত হইতে বাঁচিয়া যাওয়া কম সুখের নহে।

পঞ্চাশ হাজারের চাপে মনটা ঠিক ছাড়া পাইতেছে না—বড় দুঃখ বোধ হইতে লাগিল। হাঁটিয়া যাওয়া আর চলিল না—একটা সিগারেট ধরাইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই সৌন্দর্য্যময় নরসমাজে একি কুৎসিত দৃশ্য! উল্লাসময় জনবহুল পথের ফাঁকে ফাঁকে বাঁকে বাঁকে কেন এই বীভৎসতার ছড়াছড়ি! ইহাতে চোখ পীড়িত হয়, মন দমিয়া যায়—হঠাৎ মনে আসে ঐ পঞ্চাশ হাজারের কথা।—মনে হয় এই সব ভিক্ষুকের ক্ষুধার গহ্বরে আমার ঐ সম্পদের সৌধটি ভাঙিয়া পড়ে বুঝি!

কিন্তু এ ত সামান্য ঘটনা। যে ঘটনাটি অসামান্য তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে তাহাই ভাবিতেছি। এক দিকে সৌরজগৎ, অন্যদিকে রাশি রাশি নক্ষত্র-জগৎ। অর্দ্ধেক আকাশ জুড়িয়া বৃশ্চিক রাশি দেখা যাইতেছে—সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—মঙ্গল ও বৃহস্পতি এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে যে বোধ হইতেছে যেন পরস্পর সংঘর্ষ লাগিবে। এই অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র অনন্ত কোটি বৎসর ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বহু হিসাব করিয়া যে প্রাণীটিকে সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে তাহার নামও গ্রহ-নক্ষত্র হইতেই প্রাপ্ত। চিত্রার বয়স বাইশ এবং বাড়ি রসারোডে। ইহারই সহিত আমার একদিন মোলাকাৎ হইবে বিবেচনা করিয়া দেবতারা আমার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন।

দৈবদুর্ব্বিপাকে বন্ধুহীন হইয়া একা গিয়াছিলাম সিনেমায়। বইটা ছিল আগাগোড়া একটা হাসির হর্‌রা। টিন-টাইপ ক্যামেরা ঘাড়ে লইয়া এক হতভাগ্য নায়কের করুণ কাহিনী। সংসারে যত হতভাগ্য আছে তাহাদের কাজই হইল হাস্যরসের যোগান দেওয়া। নায়কের দুঃখ সেখানে সব চেয়ে তীক্ষ্ণ, আমাদের হাসির বেগ সেখানে সব চেয়ে দুর্দ্দাম।

অন্ধকারের উৎস হইতে উৎসারিত বস্তু মাত্রেই আলো কিনা জানি না—কিন্তু আলো মাত্রেই অন্ধকার হইতে উৎসারিত হয়। ছবি দেখিতে দেখিতে আমি যে আলোটি লাভ করিলাম তাহার খোলসটা ছিল শব্দ দ্বারা তৈয়ারী। নিঃশব্দতা বিদীর্ণ করিয়া একটি কথা আমার কানে প্রবেশ করিল:—"এ যে জোর ক'রে হাসানো।" আমার কান হইতে শব্দটির উৎপত্তি-স্থল যে মাত্র পনেরো ইঞ্চি তফাৎ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। আমার প্রাণে সাড়া জাগিল—কিন্তু সাড়া জাগাইবার ক্ষমতা আমার কই? পুরুষ

নারী-কণ্ঠে অস্থির হইতে পারে, কিন্তু পুরুষের কণ্ঠ-স্বরে মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়ে না সেটা আমি বুঝিতাম। সুতরাং কণ্ঠ-স্বরকে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিলাম। কথাটি শুনিবামাত্র যাঁহার কথা তাঁহাকে শুনাইয়া বলিয়া উঠিলাম wonderful!

তাহার পর হাস্য-হিল্লোলের ভিতর দিয়া ছবি দেখা শেষ হইল। আলো জ্বলিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনের আসন হইতে দুইটি চোখও আমার চোখের দিকে জ্বলিয়া উঠিল। আমার সম্মুখের দুইটি আসন দখল করিয়া দুইটি তরুণী বসিয়াছিল—জ্বলন্ত চোখ দুইটি তাহাদেরই একজনের।

তাহার দৃষ্টিতে যে ভাষা ছিল তাহা আমার বোধ শক্তির কাছে ব্যর্থ হইল না—আমি সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে। আপনা হইতেই বলিলাম—শপথ ক'রে বলছি, আমি বিদ্রূপ করিনি।

আমরা ভীড়ের সঙ্গে পাশাপাশি চলিতেছিলাম, বাংলা ভাষা বোঝে নিকটে এমন কাহাকেও লক্ষ্য করিলাম না।

* * *

ইহার পর পাঁচদিন কাটিয়া গিয়াছে—আজ ষষ্ঠদিন, আজও আমি চিত্রার নিকট বাস্‌টার কীটনের অভিনয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতেছি। বাংলা দেশের পক্ষে নিশ্চিতই এই গল্পটায় মাত্রাধিক্য হইল, কিন্তু উপায় কি? মিথ্যাই মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য ব্যস্ত হয়, সত্যের সে সব ভয় নাই।

চিত্রা যে যায়গাটা বুঝিতে ভুল করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল জোর করিয়া হাসানো—বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখা গেল সেই জায়গাটাই সমগ্র নাটকটির মধ্যেকার একটি শ্রেষ্ঠ হাস্য-রসাত্মক অংশ। আমি শেষ পর্যন্ত বলিলাম, এই কমেডিটির মধ্যে যে কত বড় একটা ট্র্যাজেডি লুকাইয়া আছে তাহা বুঝিতে হইলে নায়কের সঙ্গে অন্তরের সহানুভূতি থাকা চাই।

চিত্রা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আপনার সহানুভূতি হয়?

চিত্রার এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র আমার মনে হইল সহানুভূতি এবং অনুকম্পা যে আমার হয় এইটাই আমার জীবনের চরম কথা। বলিলাম—হয় বৈ কি। বাহিরে যতই হাসি ঠাট্টা করি; ঐ দুঃখী নায়কের সঙ্গে আমার যেন কোথায় একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। জীবনে কত কামনা-পরিতৃপ্তির পিছনে ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, মনে হইয়াছে এই সংসারে একমাত্র *আমিই হতভাগ্য, কিন্তু আজ ঐ বাসটার কীটন্‌কে আমার* দলে পাইয়া একটা তৃপ্তি বোধ হইল।

সহানুভূতিতে ডুবিয়া গেলাম, আমার বিশ্বাস হইল আমি সত্যই হতভাগ্য, ক্রন্দন করাই আমার ব্যবসা—ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া উঠিলাম। এমন সময় চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাঁচিলাম। দুঃখ নাই অথচ যদি থাকিত এই চিন্তাটা যে কি আরামপ্রদ সেটা বুঝিতে পারিলাম। এখন প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয়। "রিক্ত যারা সর্ব্বহারা সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা" ইহার চেয়েও ভাল কবিতা লিখিবার প্রেরণা জাগে।

আমি যে সহানুভূতি দেখাইতে পারি এ গৌরব ত ঐ পঞ্চাশ হাজারের কৃপায় পাইয়াছি। এখন আমার মুখের সহানুভূতিতে লোকে ধন্য হয়, কিন্তু যখন আমি ট্রামের টিকিট কিনিতে পারি নাই তখন আমার এ অধিকার ছিল না।

কিন্তু আজ ছয়দিন ধরিয়া চিত্রার নিকট যে অধিকার বিস্তার করিতেছি তাহার শেষ দেখিতে পাইতেছি না। নাটকের চরিত্র সমালোচনা যতই আগ্রহের সঙ্গে করিতেছি ততই উহা হইতে নানারূপ ডালপালা গজাইয়া ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠিতেছে। চরিত্র-বিশ্লেষণ শিক্ষায় চিত্রার যে পরিমাণ আকুলতা দেখা যাইতেছে আমার শিক্ষা দিবার আগ্রহ তাহার চেয়ে দশগুণ বেশি হইয়া পড়িয়াছে—দেখিতেছি ইহার শেষ হইবে না। বক্তৃতা দিয়া সন্ধ্যা ৮টায় পথে বাহির হইতেই একটি ভিখারীর হাত আবার 'একটা পয়সা বাবা' বলিয়া আমার সম্মুখে প্রসারিত হইল, আমি চমকিয়া উঠিলাম

নাঃ, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ একই কান্না ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও! আমার পঞ্চাশ হাজারের গোড়া ধরিয়া বিশ্বসুদ্ধ লোক টানিতেছে। শুধু আমার কেন, যাহার যেখানে সঞ্চয় তাহারই চারিধারে হতভাগ্যেরা গর্ত্ত খুঁড়িতেছে, নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।

আরো তিনদিন কাটিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য আজও সম্মুখে চিত্রা বসিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়া বড় বাড়িটার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সেই আধ-আঁধারের আবেষ্টনে আমি যেন আজ নিজেকে খুঁজিয়া

পাইতেছিনা। রোগীর দেহের তাপ-জনন-কেন্দ্র [illegible] হীন হইয়া পড়ে তখন বরফের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও তাহার দৈহিক উত্তাপ স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, কিছুতেই কমানো যায় না। চিত্রাকে শিক্ষা দিবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতে আমার ভিতরকার সহানুভূতি-শাসনের কেন্দ্রটিও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে—সহানুভূতির থার্মোমিটারে ১১০ ডিগ্রী তাপ উঠিয়াছে, কিছুতেই নামিতেছে না। এই অবস্থায় আমার খেয়াল হইল অমি চিত্রার কাছে অনন্ত-অপরাধী। তাহার ঘরের দিকে চাহিলাম। দেখা গেল তাহার দেয়াল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে— তাহার পুরাতন চেয়ার-টেবিল-আলমারি একটা হীনতম দারিদ্র্যের ছাপ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রিয় বিড়ালটি দুধমাছের অভাবে ইঁদুর ধরিয়া খাইতেছে। তাহার বোনটি একটা করুণ ভাব মুখে ফুটাইয়া প্রাণহীন পুতুলের মত চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে। চিত্রা কলেজে পড়ে—তাহার বোনও এই বৎসর ম্যাট্রিকুলেশান পাস করিয়াছে— কিন্তু বয়সের তুলনায় চেহারা বেশি পাকিয়া গিয়াছে। মায়ের রান্না করায় সাহায্য করাতেই তাহার অৰ্দ্ধেক সময় কাটিয়া যায়। ভাইটি স্কুলে পড়ে - কিন্তু মনে হয় যেন তাহার বয়স পচিশ হইয়াছে।

আমি এই সব দেখিতে দেখিতে আবার আমার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া গেলাম। সে-ই পূর্ব্বাবস্থা, যখন আমার টাকা ছিল না অথচ পৃথিবীর দৈন্য ঘুচাইবার দুঃসাহসিক উৎসাহ ছিল। চিত্রার দুঃখ আর বিশ্বজগতের দুঃখ এক হইয়া দেখা দিল। মনের মধ্যে ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল—আমার বর্ত্তমান সে ঝড়ে উড়িয়া গেল। আমি নির্ব্বাক হইয়া কতক্ষণ ছিলাম মনে পড়ে না, যখন স্বপ্ন ভাঙিল তখন আমার হৃৎ-স্পন্দনের ধক্ ধক্ শব্দ আমি স্পষ্ট কানে শুনিতে পাইতেছি।

দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলাম—চাহিয়া দেখি আমার ব্যাঙ্ক চিত্রার পাশে দাঁড়াইয়া খুশীতে হাসিতেছে। যন্ত্রচালিতবৎ পকেট হইতে চেক্-বইখানা লইয়া একটা মোটারকম অঙ্কপাত করিয়া সই করিলাম। তার পর সেখানা চিত্রার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম—আপনাকে এটা নিতে হবে।

চিত্রা বিস্মিত হইয়া বলিল—এর অর্থ?

আমি বলিলাম—আমাকে ভাই, বন্ধু, যা হয় ভাবুন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন, এটা আমাদের পরিচয়ের স্মরণ-চিহ্ন।

চিত্রা আর কথা বলিতে পারিল না।

আমার কর্ত্তব্য আমি ঠিক করিয়া ফেলিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, এটাকে একটা শস্তা দাতা গ্রহীতার ব্যাপার করিয়া ভক্তি আর কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে জীবনে আর এ বাড়িতে আসিব না। ও বুঝুক দানে শুধু মহত্ত্ব আছে তাহা নহে, পৌরুষও আছে।

আমি সৈনিকের কায়দায় উঠিয়া পড়িলাম। চিত্রা হঠাৎ বলিল—ফিরিয়ে নিন আপনার চেক্, আমার কোনো অভাব নেই—সে ভাবে আমি কোনো কথা আজপর্য্যন্ত উচ্চারণ করি নি।

চাহিয়া দেখি তাহার চোখে জল।

আমার মন তখন উত্তেজনার চরমে উঠিয়াছে, বলিলাম, —আমাকে আঘাত দেবেন না, আপনার অভাব নেই বলেই আমাকে আজ অনেক দিয়েছেন, আমার এটা দান নয়, শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

—বলিয়াই দ্রুত বাহির হইয়া পড়িলাম; দেখিতে দেখিতে আমার পঞ্চাশ হাজার স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল, সে পঞ্চাশ হাজার হইতে পঞ্চাশ লক্ষ, পঞ্চাশ লক্ষ হইতে পঞ্চাশ কোটির পথে যাত্রা করিল। ভিতরকার পঁচিশ হাজারের বিয়োগে আমার উচ্ছ্বসিত আনন্দ হৃদয় ছাপাইয়া পড়িতে লাগিল। একটা যথার্থ ট্র্যাজেডির মূলোৎপাটন করিবার আনন্দ আজ আমি পাইলাম।

পথে পর পর তিনটি লোকের ধাক্কা খাইলাম। একটা মোটরের হাত হইতে দৈবাৎ রক্ষা পাওয়া গেল। ভাবিলাম পদাতিকের লাঞ্ছনা আর ভোগ করিব না, ট্রামে উঠি।

ষ্টপের কাছে একটু দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল একটা জীর্ণশীর্ণ স্থবির বৃদ্ধ ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনার ভিতর হইতে একটা একটা করিয়া ভাত খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহার অত্যন্ত নোংরা কাপড়ের একটা ধার বিছাইয়া তাহাতে জমা করিতেছে। দেখিয়া ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

এই দৃশ্যের ভিতর দিয়া আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম আমার গৌরবের ভিত্তি যে গর্ত্তটাকে এতদিন ভয় করিয়াছে, সেটা একটা প্রকাণ্ড গহ্বরে পরিণত হইয়াছে, তাহার

অন্ধকার মুখের ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতিকে রোধ করে এমন সাধ্য আর কাহারো নাই।

আমি তখনি উহাকে কিছু দান করিয়া এই হীনতম কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতাম। চারি আনার পয়সায় ইহা হইতে পারিত, আমার পক্ষে সেটা কষ্টকরও ছিল না—কিন্তু আমি তাহা করি নাই।

উহাকে একটা-পয়সাও দেওয়া মানে উহার কাছে হার স্বীকার করা। যে ভিখারীর হাতকে একদিন ভয় করিয়াছিলাম, তাহার চলিবার ক্ষমতা ছিল, তাহার সংসারের কাছে হাত বাড়াইয়া ধরিবার সামর্থ্য ছিল, কিন্তু এই আবর্জ্জনা-পঙ্ক হইতে যে ভাত বাছাই করিতেছে, তাহার কোনো ক্ষমতাই নাই, সে কুষ্ঠগ্রস্ত বৃদ্ধ, মাটির উপর বসিয়া বসিয়া কোনো রকমে নিজেকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলে, জীবন্ত জগতের কাছে সে কিছু আশা করিয়া হাত বাড়াইয়া ধরে না—সেখানে তাহার কিছু চাহিবার নাই। তাই সে এই সুখের জগতের উপর প্রতিশোধ লইতেছে। সে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের শত্রু, সকল শোভাকে সে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে, উহাকে পয়সা দিয়া উহার শক্তিকে আরো বাড়াইয়া দেওয়া একটা কৃতিত্ব নয়।

মনটা ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল, ট্রামের পর ট্রাম চলিয়া গেল উঠিবার প্রবৃত্তি রহিল না। বিকাল বেলায় যে মদির স্রোতটি আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, সে যেন এই কদর্য্য পাকের মধ্যে আসিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল। এতবড় বিস্ময়কর আনন্দের আবর্ত্ত যা আমার রক্তের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতেছিল, তাহার সমস্ত নৃত্য-হিল্লোল স্তব্ধ হইয়া গেল এই একটি মনুষ্য-কীটের দৃশ্যে। উহার ঐ গলিত কুষ্ঠের ক্লেদ দিয়া যেন আমার ব্যাঙ্কের বইখানা সিক্ত করিয়া দিল। আমার পক্ষে সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব হইল না। ট্যাক্সি ডাকিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

তাহার পর কোথায় গেল সেই ভিখারী, কোথায় গেল সেই কুষ্ঠ-গ্রস্ত জীর্ণ নরপশু! মনটা ছুটিয়া গেল চিত্রার কাছে—তাহার চোখের জল আমি দেখিয়াছি।

দেখিলাম, বাসনা থাকিলে পৃথিবীতে দুঃখমোচনের সুখ পূর্ণ রূপেই পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের জাতিভেদ মান্য করিয়া চলিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে হরণ-পূরণের রীতিটিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

একটা আনন্দের বেদনায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। ইহার পর আবার বন্ধুবান্ধব, আবার হাস্য-কৌতুক, আবার খেলা-ধূলা—বাস্।

তারপর একটি রাত্রির গভীর ঘুম।

সকালে উঠিয়াই মনে পড়িল আমার পঁচিশ হাজার টাকা নাই। মনের একটা ঘুমন্ত অংশ ছিল বোধ করি, সে জাগিয়া উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—মূর্খ, করেছিস্ কি?

আমি প্রাণপণ শক্তিতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম, সংসারে অঙ্কের হিসাবটাই ত সব সময়ে বড় নয়। অঙ্কের ক্ষতি অন্য দিক দিয়ে যে লাভের ইঙ্গিত করে সেটা কি কিছু না?

একটি মহীয়সী নারীর অন্তরে নিজেকে দেবতা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করায় যে গৌরব লাভ হয়, পঁচিশ হাজার টাকা কি তার তুলনায় তুচ্ছ নয়?

মনের বিষয়ী অংশ একথায় একটু হাসিল; অর্থাৎ সে রফা করিতে রাজি নয়। ইহাতে একটা খিটমিটি ভাব অনেক দিন ধরিয়াই থাকিয়া যাইবে এমন আশঙ্কা হইল, কাজেই মনটা খারাপ হইয়া রহিল।

মন খারাপ হইবার আরো একটা কারণ ছিল। সংবাদ আসিয়াছে উত্তর বঙ্গে ভয়ানক জলপ্লাবন, সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন—প্রতিদিন অনাহারে লোক মরিতেছে, ইহার উপর নাকি মহামারী দেখা দিয়াছে।

অতএব সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া নানাদিক হইতে চাপ পড়িতেছে। টাকা দিবার পথ অনেক কিন্তু ফাঁকি দিবার পথ একটিও নাই।

দুশ্চিন্তার হাত হইতে সাময়িক ভাবে রক্ষা পাওয়া গেল বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাইয়া। জন্মদিন উপলক্ষে সে এবারে বেশ বড় রকম উৎসব করিবে। সন্ধ্যায় ভোজন।

প্রচুর আয়োজন। আমরা গানের আসর শেষ করিয়া খাইতে বসিয়াছি। ছাব্বিশ রকমের তরকারী আর দশ রকম মিষ্টান্ন—একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার। ভোক্তা হইবে প্রায় পঞ্চাশজন। আমরা ছয় সাতজন অন্তরঙ্গ কাছে কাছে বসিয়াছি। হাসি গল্পে উৎসব সর-গরম হইয়া উঠিয়াছে।

এককোণ হইতে চীৎকার উঠিল—লং লিভ্ মিঃ চৌধুরী।

সমস্ত হল্-ঘরটা সম্মিলিত শব্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তারপর—

—আচ্ছা, এই ইংরেজি চীৎকার ছাড়া আমাদের আর গতি নেই ?

—না, নেই। দিশী কোন জিনিষটা ভাল বল দেখি ? দেখেছিস দিশী ফিল্ম্ ? যে-কোন একটা ছবির নাম করত।

—আচ্ছা এ সপ্তাহে ভাল ছবি কোন্‌টা ?

—ওরে শোন্ শোন্ আমাদের একটা স্বদেশী হর্ষধ্বনি আবিষ্কার করা গেছে।

—কি ?

—সরস্বতী মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেবার সময় চীৎকার শুনলাম—মহাত্মা গান্ধীকি জয়।

হো হো ধ্বনিতে ঘর ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

—ওরে শোন্ আমিও একটা আবিষ্কার করেছি। সেবারে কার্ত্তিক বিসর্জ্জন দেবার সময় দুইদলের একদল বল্‌ছে জে-এম সেন গুপ্ত কি জয়—অন্যদল বলছে সুভাষ বসু কি জয়!

—আপনাকে একটু মাংস ?

—রেখে যান।

—নর্থ-বেঙ্গল ফ্লাডের শেষ খবর জানিস্ ?

—জানি, কলেরা আরম্ভ হয়েছে।

—ওটা শেষ খবর না, তিনটে লোকে না খেতে পেয়ে আত্ম-হত্যা করেছে।

—আপনাকে আর একটু মাংস ?

—মাংস ?—আর কত খাব ?

—না না, আর না, এই পাতে দিন।

—কি আশ্চর্য্য, এত-দিলেন!

ইত্যাদি করিয়া ভোজন-পর্ব্ব শেষ হইল। সিগারেটটা ধরাইতে যাইতেছি এমন সময় বিষয়ী মন আমাকে দমাইয়া দিল। বলিল—হতভাগা গাধা, তোর পঁচিশ হাজার টাকা গেল কোথায় ?

আমি আবার সেই পুরানো কথাটি বলিতে যাইতে-ছিলাম—টাকাই মানুষের সব নয়। মানুষের তৃপ্তির গভীরতা কি টাকায় মাপা যায় ?

—কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল, একথা মানিলে প্লাবন-তহবিলে টাকা দিতে হইবে, কেননা অনাহারে যাহারা আত্মহত্যা করিতেছে তাহাদের অন্নদান করারও একটা মূল্য আছে।

বিষয়ী মনকে কিছু বলা হইল না। একটা বিমর্ষ ভাব লইয়া বাড়ি ফিরিলাম। আসিয়া দেখি একখানা চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আর কিছুই না—খামে পুরিয়া চিত্রা আমার সেই চেক্ খানা ফিরাইয়া দিয়াছে।

* * *

বুঝিলাম ভগবান আছেন, নইলে চিত্রা আমার কে!

আর একদিক

উইলিয়ম এস্ হ্যাড্‌লার এম-ডি, খ্যাতনামা চিকিৎসক লিখিতেছেন—আমার একটি রোগীর পক্ষাঘাত হইয়াছিল—কেহ সারাইতে পারে নাই। আমার ডিস্পেনসারিতে আসিলে আমি তাহার মুখে ক্লিনিক্যাল থার্মোমেটার দিয়া কি কাজ করিতে যেন বাহিরে গিয়াছিলাম। ফিরিতে আমার দেরী হইল। আসিয়া দেখি, যেমন অবস্থায় রোগীকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, তেমন অবস্থাতেই সে বসিয়া আছে। বুঝিলাম ভদ্রলোক ক্লিনিক্যাল থার্মোমেটার কি তাহা জানে না, ভাবিয়াছে আমার চিকিৎসার ইহা এক নূতন পন্থা। আমি তাহার বিশ্বাসে বাদ সাধি নাই। অতঃপর সে দিনের পর দিন আসিয়া আমার এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থার্মোমেটার মুখে দিয়া বসিয়া থাকিত। দিন পোনেরো পরে শুনিলাম,—তাহার পক্ষাঘাত সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে।

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একা ওই অতবড় বাড়ীতে রাত্রি বাস করা শ্রীহর্ষর পক্ষে এক রকম অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নটা দেখিয়া অবধি আজকাল সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিলেই তাহার গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে, খুট্ করিয়া কোথায় একটু শব্দ হইলেই তৎক্ষণাৎ শির্ শির্ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে, মনে হয় এখনই হয়ত তাহারা সশরীরে তাহার চোখের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইবে। যে মানুষ মরিয়া গেছে, যাহার শবদেহ সে তাহার নিজের হাতে চিতায় পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া আসিয়াছে, সেই মানুষ যদি আবার এতদিন পরে অকস্মাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়—তাহা হইলে ভয় পাইবার কথাই। মানুষ মরিলে ভূত হয় এবং সেই ভূত সম্বন্ধে নানান্ আজগুবি গল্প সে বাল্যবধি শুনিয়া আসিতেছে। তাহাদের চেহারা যে প্রিয়দর্শন সেকথা অদ্যাবধি কেহ অবশ্য বলে নাই। কেহ কোনোদিন তাহাদের সত্যই দেখিয়াছে কিনা তাহাও সে জানে না। তবে শুনিয়াছে তাহারা নাকি কিম্ভূতকিমাকার অদ্ভুত, লম্বা লম্বা হাত, লম্বা লম্বা পা, মুখখানা কদাকার কুৎসিত, এবং তাহাদের আনুনাসিক কণ্ঠস্বর শুনিয়াই নাকি অনেকে ভয়ে কাঠ হইয়া মরিয়া যায়।

দিনের বেলা চারিদিকে যখন আলো ছড়াইয়া পড়ে, অত বড় বাড়ীটার মধ্যে কোথাও একটুকু অন্ধকারের লেশমাত্র থাকে না, শ্রীহর্ষর তখন মনে হয়—তাহারই পরমাত্মীয় সেই নিতান্ত নিরীহ পত্নী উমা, তা সে হোক্-না কিম্ভূতকিমাকার কুৎসিত, তবু যদি সে আজ মৃত্যুর পর ভূত হইয়াও তাহার সহিত দেখা করিতে পারে ত' করুক, ভয় সে পাইবে না। এমন কি সঙ্গে যদি তাহার শিবপদ বাবু এবং রাণী থাকেন, তবুও না। তাঁহারা যদি আসেন ত' সেই স্বপ্নে দেখা ঘটনার মত তাহাকে তিরস্কার করিতেই আসিবেন, এবং উমা নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ রাণীর হাতে ধরিয়া তাঁহার ক্ষমা চাহিয়া লইবে। সুতরাং ভয় পাইবার কিছুই নাই।

অর্থাৎ শ্রীহর্ষ চায়—তাহার স্বপ্ন যদি সত্য হয় ত হোক। তবে শিবপদ বাবুকে সে সত্যই প্রতারণা করিয়াছে। তিনি না আসিলেই যেন ভাল হয়।

কিন্তু এ-সব তাহার মনে হয় শুধু দিনের বেলা। তাহার পর ধীরে ধীরে ওই ভাঙ্গা বাড়ীটা যখন আব্ছা অন্ধকারে ঢাকা পড়িতে থাকে, তখন সে বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছে বসায়, গল্প করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় বলিয়া বসে, 'আপনি ত' এইখানে—এই আমার কাছে রাত্রে শুতে পারেন ঘোষাল মশাই ?'

বৈকণ্ঠ ঘোষাল বলেন, 'কেন বাবা, রাত্রে কি তুমি ভয়-টয় পাও ? কোনোদিন দিন কিছু দেখেছ নাকি ?'

ঘাড় নাড়িয়া কথাটাকে ঢাকা দিবার জন্য শ্রীহর্ষ বলে, 'না, না, না, না, কিচ্ছু দেখিনি। ভূত-প্রেতের কথা বলছেন ? ও-সবে আমার বিশ্বাসই হয় না ত' দেখব কোত্থেকে !'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'তা দেখা কিছু আশ্চর্য্য নয় শ্রীহর্ষ ! তিন তিনটে মানুষের এখানে অপমৃত্যু ঘটেছে, এখানে ভূত প্রেত থাকলেও থাকতে পারে।'

শ্রীহর্ষ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বৈকণ্ঠ বলিল, 'তা বেশ, আজ থেকে তোমার কাছেই রাত্তিরটা কাটাব বাবাজি।' বলিয়াই কিয়ৎক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল।

দু'জনেই চুপ। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। ইলেকট্রিকের আলোটা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাঙ্গা দোতালার উপরে হঠাৎ কিসের যেন একটা বিকট চীৎকারে দু'জনেই আচম্কা চমকিয়া উঠিল। বৈকণ্ঠ একবার চমকিয়াই খাড়া হইয়া কান পাতিয়া বসিল, কিন্তু ভয়ে শ্রীহর্ষর তখন হইয়া গেছে, মুখখানি শুকনো, বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ আবার সেই শব্দ।

বৈকুণ্ঠ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুইটা বিড়ালে মারামারি আরম্ভ করিয়াছে।

শ্রীহর্ষ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তাই হোক্ !'

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া বলিল, 'না বাবাজি, এখানে একা থাকা তোমার উচিত নয়। আচ্ছা, এক কাজ করলেই ত' পার শ্রীহর্ষ, তোমার বয়স ত' এমন বেশি কিছু হয় নি, তুমি আবার একটি বিয়ে কর না! দেখবার শোনবার লোকও হবে আর—'

কথাটাকে শ্রীহর্ষ শেষ হইতে দিল না। হাত নাড়িয়া হাঁ হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'না, বিয়ে আমি আর করব না, ঘোষাল-মশাই, কোনও জালা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, খরচ নেই, একা-একা এ আমি বেশ আছি।'

বৈকুণ্ঠ আবার চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবছেন?'

মুখ তুলিয়া বৈকুণ্ঠ বলিল, 'বিয়ে যদি করতে ত' মেয়ে একটি ছিল শ্রীহর্ষ।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'নাঃ ও ঝঞ্ঝাট বাড়াবার ইচ্ছে আর আমার নেই

বৈকুণ্ঠ যেন আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, 'মেয়েটি ছোট, কিন্তু দেখতে শুনতে ভালই, গরীবের মেয়ে, ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম সবই জানে, রাঁধতে-বাড়তেও পারে।'

এই বলিয়া গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৈকুণ্ঠ কহিল, 'হলে বেশ নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম বাবাজি

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আপনি কার কথা বলছেন?'

বৈকুণ্ঠ ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'বলছি আমারই কথা বাবা! নিজের ত' ছেলেপুলে হয়নি, তা ধরতে গেলে একরকম বেঁচেছি। কিন্তু দাদা আমার মরবার সময় হাতে ধরে যাদের দিয়ে গেছেন তারাই বর্ত্তমানে আমার সন্তানের স্থান অধিকার করে' রয়েছে। তিনকড়ির বোন্—চাঁপাকে ত' তুমি রোজই দেখছ বাবাজি, ওই চাঁপার কথাই বলছি।'

বৈকুণ্ঠর ভাইঝি চাঁপা! নিতান্ত ছেলে মানুষ। তবে ছেলেমানুষ হইলে কি হয়, যেমন স্বাস্থ্যবতী তেমনি সুন্দরী। অতি শৈশবে মা বাপ দু'জনেই মরিয়াছে। বৈকুণ্ঠর কাছেই মানুষ

বৈকুণ্ঠ বলিতে লাগিল, 'এই এত টুকু টুকু,—তিনকড়ি আর চাঁপাকে আমার হাতে দিয়ে দাদা যখন মারা গেলেন, আমার ব্রাহ্মণীও তখন মরেছে। সবাই বললে, 'ঘোষাল বিয়ে কর। বিয়ে না করলে অই ছেলে মেয়ে দুটো মরে যাবে।' তাদের কি বলতাম জানো শ্রীহর্ষ? বলতাম, 'বিয়ে আমি আবার নিশ্চয়ই করতাম দাদা, ওই ছেলে মেয়ে দুটো যদি দাদা আমায় না গছিয়ে যেতো।' সবাই ভাবত, বুড়ো বলে কি! হাঁ করে' আমার মুখের পানে তারা তাকিয়ে থাকতো। বলতাম, 'ঠিকই বলছি দাদা, মা-বাপ-মরা ওই যে ছেলে মেয়ে দুটোর ভার আমি নিয়েছি তারা আমার ভাইপো ভাইঝি হ'তে পারে, কিন্তু বিয়ে করে' বাড়ীতে যাকে আমি নিয়ে আসব, তার কেউ নয়। সে ওদের ভালও বাসবে না, মানুষও করবে না, ভাববে—এরা আবার কে, এ-আপদ বিদেয় হ'লেই বাঁচি। কি বল শ্রীহর্ষ, সত্যি নয়? তাই আমি শুধু ওদের মানুষ করবার জন্যেই বিয়ে করতে পারিনি বাবাজি।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'ভাল করেছেন। খুব ভাল কাজ করেছেন।'

বৈকুণ্ঠ আবার একটুখানি হাসিল। বলিল, 'শোনো বাবাজি শোনো, ওদের মানুষ করার গল্প বলি শোনো। ওদের আমি ইচ্ছে করেই সুখে কখনও রাখিনি শ্রীহর্ষ, ছেলে-বেলা থেকেই কষ্ট দিয়েছি, ভাল কাপড়-জামা কখনও কিনে দিইনি। ওই চাঁপাকে এই এতটুকু বয়েস থেকে বলেছি—মা তুই অন্নপুন্নো হ', ভাতের হাঁড়ি ধর্। ঘরের কাজকম্ম শেখ্। তাই শিখেছে! তিনকড়িকে বলেছি—তুই বাবা পুরুষ ব্যাটাছেলে, শরীরটাকে ঠিক পাথরের মত শক্ত করে' ফ্যাল্। আমি মরে গেলে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোদের আর আপনার বলবার কেউ থাকবে না বাবা, ক্ষিদেয় যদি মরেও যাস্ ত' কেউ কোনোদিন ডেকে দু'মুঠো অন্ন দেবে না, মাটি কেটে পাথর কেটেও তোকে রোজগার করে' আনতে হবে।—হয়েছেও তাই! দেখেছ ত' তিনকড়ির শরীরখানা, শক্তি ত' দেখেছ?'

শ্রীহর্ষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, দেখেছি বই-কি!'

বৈকুণ্ঠ আবার বলিতে লাগিল, 'কিন্তু পাড়ার লোকজন ভাবতো অন্য রকম। ভাবতো, নিজের ছেলে ত' নয়,—ভাইপো, তাই বোধ হয় এত কষ্ট দিয়ে মানুষ করে। একদিন পাড়ার ওই গোপাল নন্দী আমায় কাছে ডেকে বললে, 'বৈকুণ্ঠ তিনকড়ি হাজার হ'লেও তোমার দাদারই ছেলে, ওকে অন্তত

ভাল একখানা জামা ভাল একখানা ধুতি তোমার কিনে দেওয়া উচিত। কখনও ওকে আমি জামা গায়ে দিতে দেখলাম না।' শুনে ভারি রাগ হ'লো। বললাম, 'ত্যাখো গোপাল, আমার দাদা মরবার সময় তোমায় কিছু বলে গিয়ছিলেন কি? বলে গিয়েছিলেন যে, আমার ছেলেটাকে বৈকণ্ঠ যদি যত্ন আত্তি না করে ত' তুমি বৈকুণ্ঠকে আচ্ছা করে' ধমকে দিয়ো।' গোপালের মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল, দেখলাম, বেচারী ভারি অপদস্থ হয়ে গেছে। তখন হেসে বললাম, 'তুমি বুঝতে পারছ না গোপাল, কেন আমি ওকে বাবু সাজিয়ে রাখি না। ভাল ভাল জামা জুতে ইচ্ছে করলে কিনে আমি ওকে দিতে পারি, কিন্তু তবু দিই না। কারণ জানি, আমি চোখ বুজলেই—এ দুনিয়া তার অন্ধকার। আপনার বলতে তখন ওর আর কেউ থাকবে না, সব অনাত্মীয়, সব পর। এই যে তুমি আজ ওর খবর নিচ্ছ, সেদিন তুমিও মুখ ফিরিয়ে সরে যাবে। তাই ওকে আমি এখন থেকে দুঃখের রিহার্শ্যাল্ দিইয়ে রাখছি গোপাল, ভবিষ্যতে যত বড় দুঃখই ও পাক্, দুঃখকে দুঃখ বলে' আর মনেই হবে না।' আমার কথা শুনে গোপাল তখন হাসতে লাগলো।'

খুব যেন বুঝিয়াছে এমনি ভাবে শ্রীহর্ষ তাহার ঘাড় নাড়িতে লাগিল। বলিল, 'ঠিক্ ঠিক্, আমিও ঠিক ওই রকমটি চাই, বুঝলেন? দুঃখু কষ্ট? আচ্ছা দুঃখু কষ্টই সই। থাক্ বাবা টাকাকড়ি—জোগানোই থাক্, অনেক সময় কাজে লাগবে।'

শ্রীহর্ষ তাহার মনের মত কথাটাই বলিয়াছিল, কিন্তু বৈকুণ্ঠ বুঝিল অন্যরকম। বলিল, 'না বাবা টাকাকড়ি আমার নেই। পুজোরী বামুন, টাকা পাবই বা কোথায়! থাকবার মধ্যে আছে মাত্র ওই বাড়ীখানি। তাও ভাবছি ওই বাড়ীখানি বন্ধক রেখে চাঁপার যদি বিয়ে দিই ত'হলে ভবিষ্যতে হয়ত ওদের দুই ভাই-বোনের মাথা গুঁজবার জায়গাটুকুও আর থাকবে না।'

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ী বন্ধক দেবেন?'

তাছাড়া আর উপায় কি বাবা! তিনকড়ি পুরুষ ব্যাটাছেলে, বিয়ে-থা ওর না দিলেও চলবে, কিন্তু চাঁপার বিয়েটা না দিয়ে গেলে ত' আমার মরেও সুখ হবে না।

বেশি দিনের কথা নয়, কাল রাত্রে সে ভাবিয়াছে, বুড়া যে-রকম উপকার তাহার করিয়াছে তাহার প্রতিদান সে যেমন করিয়াই হোক্ দিবে। শ্রীহর্ষ সে কথা তখনও ভুলে নাই। চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, 'আচ্ছা, চাঁপার একটি ভাল বরের সন্ধান আপনি করুন। যা খরচ হয় সবই আমি দেবো।'

শ্রীহর্ষের মুখ দিয়া একথা যে শুনিবে বৈকুণ্ঠ তাহা আশা করে নাই। বলিল, 'তুমি দেবে?'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শ্রীহর্ষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমিই দেবো।'

শ্রীহর্ষের সঙ্গে এত দিনের ঘনিষ্ঠতায় বৈকুণ্ঠ এইটুকু মাত্র বুঝিয়াছিল যে, শ্রীহর্ষের থাকিবার মধ্যে আছে শুধু এই প্রকাণ্ড বাড়ীখানি, নগদ টাকাকড়ি তাহার কিছুই নাই। যদিই-বা থাকে তাও এত যৎসামান্য যে একটা মেয়ের বিবাহ দিবার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবার মত নয়। তবে এত বড় এই বাড়ীখানার মালিক শ্রীহর্ষ যদি কাহারও কাছে গিয়া ঋণ চায় ত' তাহার টাকার অভাব কোনো দিনই হইবে না। সেই সাহসেই কথাটা সে উত্থাপন করিয়াছে কিনা তাই-বা কে জানে!

যাই হোক্, সে সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হইয়া থাকাই ভালো। বৈকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু—একটা মেয়ের বিয়ের খরচ শ্রীহর্ষ, সে ত' নেহাৎ কম হবে না। তা ছাড়া—'

কথার মাঝখানেই শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'তা'হলেও কত হবে?'

বৈকুণ্ঠ চোখ বুজিয়া একবার ভাবিয়া বলিল, 'তা হাজার দেড়েক হাজার দুই-এর কম নয়।'

শ্রীহর্ষর কাছে ইহা কিছুই নয়। বলিল, 'তা বেশ, আপনি একটি পাত্রের সন্ধান করুন।'

এত সাহস করিয়া যে-লোক টাকা দিবে বলিতেছে তাহাকে আর-কিছু জিজ্ঞাসা করা অশোভন, কিন্তু কয়েকটা দিনের কয়েকটা ছোট-খাটো ঘটনার কথা ক্রমাগত বৈকুণ্ঠর মনে হইতে লাগিল। উমার মৃত দেহ সৎকার করিবার সময় আড়াইটা টাকা শ্রীহর্ষর কম পড়িয়াছিল, সে টাকা বৈকুণ্ঠ নিজে দিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই আড়াইটা টাকা সে ফেরৎ দেয় নাই। তাহার বাড়ীতে একবেলা সে খাইতেছে

বলিয়া অতি কষ্টে কোথা হইতে পাঁচটা টাকা সেদিন সে ধার করিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়াছে। ভূমিকম্পে যে-বাড়ী পড়িয়া গেছে সে বাড়ীতে কাহাকেও বাস করিতে দিবে না বলিয়া কর্পোরেশন হইতে বাড়ীখানা একেবারেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য একখানা নোটিশ সেদিন আসিয়াছে। সেইটারই তদ্বির করিয়া ব্যাপারটাকে কৌশলে চাপিয়া ফেলিবার জন্য শ্রীহর্ষর কিছু টাকার দরকার হইয়াছিল, সেই টাকাটা সংগ্রহ করিতে শ্রীহর্ষকে যে কি রকম হায়রাণ হইতে হইয়াছে বৈকুণ্ঠর তাহা চোখে দেখা। শেষ পর্য্যন্ত কোথায় কোন্ পোদ্দারের দোকানে সোনার একটা ঘড়ির চেন কি ওই রকম একটা কিছু বিক্রি করিয়া টাকাটা সে সংগ্রহ করিয়া আনে।

বাড়ীখানা বিক্রি না করিয়া সেই লোক আজ দু' হাজার টাকা দিবে কোথা হইতে?

বৈকুণ্ঠ চুপ করিয়া একটুখানি ভাবিয়া বলিল, 'এই বাড়ীখানা তাহ'লে কেনবার একজন লোক দেখতে হয়, না কি বল শ্রীহর্ষ?'

শ্রীহর্ষ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'কেন?'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'তা না হ'লে নগদ দু'হাজার টাকা…… তোমার হাতে এখন ……আমি ত' জানি…'

কথাটা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে বৈকুণ্ঠর কোথায় যেন বাধিল।

শ্রীহর্ষ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, 'আপনি একটি পাত্র দেখুন, তারপর টাকা আমি দেবো যখন বলছি তখন যেখান থেকে হোক্ যেমন করে হোক্ দেবোই।'

এতক্ষণ পরে বৈকুণ্ঠ খানিকটা যেন আশ্বস্ত হইল।

কথায় কথায় রাত্রিও হইয়াছিল। ওদিকে চাঁপা ছেলেমানুষ। বেশি রাত্রি হইলে সে ঘুমাইয়া পড়ে। বৈকুণ্ঠ বলিল, 'এবার তাহ'লে চল—খাবে চল।'

শ্রীহর্ষ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আজ থেকে এইখানেই আপনার শোবার ব্যবস্থা করি, না কি বলেন ঘোষালমশাই? আমার ভয়-টয় কিছু পায় না, তবে কিনা একজন লোক কাছে থাকলে তবু যাহোক্ দুটো কথা কইতে কইতে ঘুমোনো যায়।'

সেইদিন হইতে তাহাই স্থির হইল। শ্রীহর্ষর রাত্রির আহার বৈকুণ্ঠর বাড়ীতেই হয়। সুতরাং আহারাদির পর আজ হইতে দু'জনে আবার একসঙ্গে এইখানেই ফিরিয়া আসিবে।

বৈকুণ্ঠর বাড়ীতে মেয়ে বলিতে একমাত্র চাঁপা। ঠিকা একটা ঝি আছে, দুবেলা শুধু বাসন মাজিয়া দিয়া যায়, তাহা ছাড়া সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম চাঁপা নিজেই করে।

শ্রীহর্ষ প্রত্যহ রাত্রে সেখানে খাইতে আসে। প্রত্যহই দেখে একটি ছোট মেয়ে তাহাদের খাবার ধরিয়া দিয়া যায়, প্রয়োজন হইলে আবার আসে, জানে মাত্র সে বৈকুণ্ঠর ভাইঝি, তিনকড়ির বোন। ইহার বেশি আর কিছু সে জানে না। জানিবার প্রয়োজনও কোনোদিন অনুভব করে নাই।

সেদিন সে খাবারের থালা লইয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র শ্রীহর্ষ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। কিন্তু সর্ব্বনাশ!—ওইটুকু মেয়ের এত রূপ! যাহা কোনোদিনই তাহার নজরে পড়ে নাই আজ সে তাহাই দেখিল। ঢলঢলে আয়ত দুইটি হরিণীর মত কালো কালো চোখ, কাঁচা সোনার মত গায়ের রং, নিরাভরণ নিটোল সুন্দর দুটি হাত,—মেয়েটি যেমন স্বাস্থ্যবতী তেমনি সুন্দরী।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'হু', ভাইঝিটি আপনার সুন্দরী তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।'

থালাটি নামাইয়া দিয়া চাঁপা চলিয়া গেল।

বৈকুণ্ঠ মুখ তুলিয়া একবার 'হুঁ' বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'কিন্তু ওই অতটুকু মেয়ে, এতগুলি লোকের রান্না…… আহা বেচারা!'

বৈকুণ্ঠ হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। বলিল, 'আহা উহু কোরো না শ্রীহর্ষ, মাথাটি তাহ'লে ওর বিগ্‌ড়ে যাবে। ভাববে বুঝি এই কাজের বোঝা অন্যায়ভাবে তার ঘাড়ের ওপর চড়ানো হয়েছে।'

এমন সময় খাবার-থালা হাতে লইয়া চাঁপাকে আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৈকুণ্ঠ বলিল, 'শুনেছিস্ মা, তোর বিয়ের জন্যে বাড়ীখানা আমাদের আর বন্ধক দিতে হ'লো না। শ্রীহর্ষ তোর বিয়ের সমস্ত খরচই দিয়ে দেবে।'

চাঁপা তাহার কাকাবাবুর দিকে একবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের সংবাদে ঈষৎ লজ্জিত হইয়াই বোধকরি আবার মাথা হেঁট করিল।

তিনকড়ি বলিল, 'চাঁপার বিয়ে দিলে আমাদের রাঁধবে কে ?'

এই বলিয়া সে চাঁপার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

শ্রীহর্ষ ছিল বলিয়াই তখন বোধ করি চাঁপা সে কথার জবাব দিতে পারিল না, ভাবিল, উহারা একবার উঠিলে হয় !

উঠিতে দেরি বিশেষ হইল না। বৈকুণ্ঠ বলিল, 'আজ থেকে রাত্রে আমি আর এখানে শোবো না চাঁপা, একা থাকে, তাই ওখানেই আমায় যেতে হবে।'

বলিয়া শ্রীহর্ষর সঙ্গে সেও বাহির হইয়া গেল।

চাঁপা বলিল, 'খেতে খেতে তখন কি বলছিলে দাদা, কই আর একবার বল দেখি শুনি!'

তিনকড়ি হাসিতে লাগিল। বলিল, 'রাঁধুনীটি আমাদের চলে গেলে কে রাঁধবে তাই ভাবছি।'

চাঁপা খাইতে বসিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বেশ, তাহ'লে কাকাবাবুকে কাল সেই কথা বলব আমি। বলব—দাদার আগে বিয়ে দাও, বৌদিদি আসুক, তারপর আমায় যেখানে পাঠাতে ইচ্ছে হয়—পাঠিয়ো।'

চাঁপাকে বিশ্বাস নাই। হয়ত সে বলিয়াও বসিতে পারে। তিনকড়ি বলিল, 'খবরদার বলিসনি বলছি চাঁপী, নইলে তোর মাথাটি ধরে' ঠাই করে' ওই দেয়ালের গায়ে দোবো ঠুকে।'

চাঁপা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

বেলুড় মঠ, ১৯০১ সাল, দেহরক্ষার নয় মাস পূর্ব্বে।

স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। সন্ধ্যা হইয়াছে। একজন শিষ্য ঘরের বাহিরে চাহিয়া বলিলেন, আজ অমাবস্যা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। আজ কালিপূজার দিন।

স্বামিজী শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া জানালা দিয়া পূর্ব্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, 'দেখ্‌ছিস্, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা।' বলিয়া সেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরঘরে ভক্তগণ পঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তব মাত্র কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামিজীর এই অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য এবং গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে বহিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থিরভাব দেখিয়া মন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামিজী আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিলেন, "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।"

গীত সাঙ্গ হইলে, স্বামিজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা' 'কালী' 'কালী' বলিতে লাগিলেন। স্বামিজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন কোন এক দূর দেশে অবস্থান করিতেছেন।

...গান ধরিলেন—"কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী"—গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন, এই কালীই লীলারূপিণী ব্রহ্ম।...এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজা করব। রঘুনন্দন বলেছেন, "নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দ্দমং"—এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্ন হন। মার ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহালয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।

বিবেকানন্দ চরিত্রের ইহাই মূলকথা এবং ইহাই বিবেকানন্দ। কিন্তু এই নির্জ্জীব, পরান্নভোজী, পরপ্রসাদ-জীবী হতভাগ্য জাতি এই মহাবীরের আদর্শকে উপেক্ষা তো করিয়াছেই, জ্বলন্ত আগুনের মত এই মানুষটাকে একবার চোখে দেখিয়াও দেখিল না। ভাল করিয়া চোখ চাহিয়া এই একটা মানুষকেও যদি এই জাতি দেখিত—জাতির একজনও যদি দেখিত! কিন্তু তাহা হইবার নহে, আমরা অন্ধ হইয়া গিয়াছি, সূর্য্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করিব কেমন করিয়া! শুধু অন্ধ নয়, আমরা সকল অনুভূতি হারাইয়াছি, চোখে না দেখিলেও সূর্য্যের উত্তাপ তো গায়ে লাগিবার কথা। সূর্য্য উদয় হইয়া অস্তে গেল, অনুভূতিহীন জড় মাংসপিণ্ড আমরা, যে অন্ধকারে ছিলাম, সেই অন্ধকারেই পড়িয়া রহিলাম। এই মহাদান আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া গেল।

স্বামী বিবেকানন্দ

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এমন হইল কেন, বিধাতার এই অপরিসীম পরিহাস কেন? এই দূষিত পঙ্কের উপর পঙ্কজ ফুটিল কেন? কাদার তো চোখ থাকে না। ভেড়ার পালে সিংহ আসিল কেমন করিয়া! শক্তি পৃথিবীতে বড় দুর্ল্লভ, এতখানি শক্তির অপচয় বিধাতা ঘটিতে দিলেন কেন? এই মড়ার দেশে মাত্র দশ বার বৎসরের জন্য প্রাণের এমন একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা অত্যন্ত বে-আইনী ভাবেই বহিয়া গেল।

অনেকে বলিবেন, বিবেকানন্দের প্রভাব এদেশের পক্ষে মোটেই কার্য্যকরী হয় নাই বা একজনও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই—ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ির কথা। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, বিবেকানন্দ মিশন প্রভৃতি তবে কি একেবারেই ব্যর্থ? এ সব গুলিই তো স্বামিজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত! ঠিক, কিন্তু এগুলিতে সে প্রাণশক্তি কোথায়? গতানুগতিকভাবে চলা ছাড়া প্রথম যেদিন এগুলির সূত্রপাত হয় সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কি উন্নতি এগুলি করিয়াছে? বিবেকানন্দ-রূপ স্ফুলিঙ্গ যে-কাঠে আগুন ধরাইয়া গিয়াছিলেন কবে তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাপিত, নূতন কাঠও হয়ত নাই।

আর স্বামী বিবেকানন্দকে যদি একজনও চিনিতে পারিত তাহা হইলে আমরাও তাঁহাকে চিনিতাম; বিবেকানন্দকে চিনিয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব, আগুন খাইয়া হজম করার কথা শুনি নাই। বিবেকানন্দকে যদি কেহ চিনিতে পারিত তাহা হইলে তাঁহার এমন জীবনী আমরা এদেশে রচিত হইতে দেখিতাম যাহা পড়িলে দেহে ও মনে আগুনের স্পর্শ অনুভব করিতাম। এমন একখানি জীবনীও—তিনি একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন—তাঁহার মাতৃভাষায় তো আজও রচিত হইল না; এদেশের মহাপুরুষের প্রথম সত্যকার জীবনী লিখিলেন একজন ফরাসী মনস্বী, মসিয়ে রঁম্যা রলাঁ ফরাসী ভাষায়; তাহার ইংরেজী তর্জ্জমা দেখিয়াই আমরা বিস্মিত হইতেছি।

মহামূল্যবান জীবন বলিয়াই জীবনীর কথা উঠিতেছে, বাঙালা ভাষায় কি একখানাও ভাল জীবনী রচিত হইতে পারিত না? তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যদের লিখিত ইংরেজী ভাষায় সুবৃহৎ জীবনীটিকে জীবনী লেখার উপাদান বলিতে পারি, মহামূল্য একখানি গ্রন্থ বলিতে পারি, কিন্তু ঠিক জীবনী ইহা নহে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯১২ সালের জুলাই মাসে (স্বামিজীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে!) ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়; ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২১ বৎসর পরে অদ্বৈত আশ্রম হইতে দ্বিতীয় সংস্করণ * বাহির হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী দেশের লোকের কাছে এমনই মূল্যবান যে একটা সংস্করণ হইতে ২১ বৎসর লাগিয়া গেল!

অথচ এমন মানুষ, এমন মহাপুরুষ সহস্র বৎসরে একবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। বিবেকানন্দের সহিত এই দেশবাসীর সত্যকার পরিচয় থাকিলে এ কথা নূতন করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে হইত না। দেখিতে পাইতাম, কাতারে কাতারে লোক উন্মাদ হইয়া তাঁহার আদর্শকে সফল করিবার জন্য ছুটিয়াছে—কোনও বাধা, কোনও বন্ধনই টিকিতেছে না। বিবেকানন্দকে ঠিকমত চিনিতে পারিলে এই বাংলা দেশের কলিকাতা সহর কপিলবাস্তু ও জেরুযালেমের মত সমস্ত পৃথিবীর তীর্থস্থল হইত।

বিবেকানন্দ সত্য, বিবেকানন্দ ধ্রুব—সত্য ও ধ্রুবের যখন আপাতপরাজয় ঘটিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে কোথায়ও কোনও গোল আছে। আমার মনে হয়, বিবেকানন্দ তাঁহার সময়ের অনেক পূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়াছেন; জাগতিক নিয়মে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই হইয়া গিয়া থাকিলেও আমাদের পক্ষে, আমাদের এই জাতির পক্ষে তিনি এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই—কখনও ভূমিষ্ঠ হইবেন কি না কে বলিতে পারে?

কৌতুকের কথা এই যে বিবেকানন্দের নামটা আমাদের মনে যথেষ্ট মোহ বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে—নামটাই শুধু। এই নামের পিছনে যে মহাপ্রাণ ব্যক্তি, তাঁহার পাগড়ি এবং আলখাল্লাই আমরা দেখিলাম, বহিরাবরণ মাত্রই প্রত্যক্ষ করিলাম, তাঁহার আলোকচিত্র শিয়রে টাঙাইয়া রাখিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কিছু জানিতে চাহিলাম না। বিবেকানন্দ বলিতেই

* Life of Swami Vivekananda in two Volumes by His Eastern & Western Disciples, published by the Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas; Price of each Vol. Rs. 4.

আমরা একবার মেরুদণ্ড ঋজু করিয়া বসিবার চেষ্টা করি, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত', অথবা 'চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না' ইত্যাদি বুকনি আওড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করি—শাঁস ফেলিয়া দিয়া খোসা খাইতে বসি। আসলে বিবেকানন্দ আমাদের মনে একটা আইডিয়া মাত্র হইয়া আছেন; একটা পরিচয়বিহীন মোহ আমরা তাঁহার সম্বন্ধে পোষণ করি।

ইহা মন্দের ভাল; মোহই একদিন সত্যকার প্রেমে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু তাহার জন্য আয়োজন করিতে হইবে; তাঁহার সত্যকার পরিচয় জানিতে হইবে; চোখে না দেখিলেও তাঁহার বাঁশী শুনিতে হইবে। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর হইতে তাঁহার অজ্ঞাতবাস ও পরিব্রাজকের ধর্ম্মগ্রহণ, দেশে ও বিদেশে তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ১৯০২ সালে তাঁহার দেহরক্ষা, সমস্ত মিলিয়া মাত্র ১৬ বৎসরের ব্যাপার। কিন্তু এই ষোলটি বৎসর যেন ষোলটা যুগ। প্রত্যেক যুগের সন্ধান জানিতে হইবে।

পৃথিবীতে ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরের অভাব নাই; ভক্তেরও অভাব নাই কিন্তু একাধারে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির একত্র সমাবেশ দুর্লভ: 'কোটিকে গোটিক' এইরূপ মহাপুরুষের উদয় হয়, যিনি শিশুর মত সরল হৃদয়ে গুরুকে ভক্তি করিয়াছেন, যন্ত্রের মত অক্লান্ত গতিতে কাজ করিয়া গিয়াছেন অথচ জ্ঞানবাপীতে ঘন ঘন ডুব দিতে যাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখা যায় নাই; বিবেকানন্দে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।

বিবেকানন্দ রাজসিকতা ভালবাসিতেন অথচ তাঁহার মত নির্লিপ্ত সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী কম জন্মিয়াছে। এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন জাতির মুক্তির জন্য রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। অশক্তদের জন্য তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে শক্তি কামনা করিতেন। বলিতেন—

আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি তোদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ, ওঠ লেগে পড়, কোমর বাঁধ। কি হবে দুদিনের ধন মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস—আমি মুক্তি মুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া, একটা মানুষ তৈরী করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

* * * *

আমি দুনিয়া ঘুরে দেখ্‌লুম—এদেশের মত এত অধিক তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভাণ, ভিতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মত জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্ম্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারচে না—সর্ব্বাঙ্গে প্যারালিসিস হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে। আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই—হৃদয়ে উৎসাহ নেই—মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা এই কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে, এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা, তোমরা অমিতবীর্য্য অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর—জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বল। আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন—উত্তম ভোগ—আগে করতে শিখুক তারপর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে তা বলে দে। আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে—বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির হয়ে থাকতে পারে? কান্না পায় না? মান্দ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, বাঙ্গালা—যে দিকে চাই, কোথাও যে জীবনী-শক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস—আমরা শিক্ষিত! ছ্যা! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরাণীগিরি, না হয় একটা উকিল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরাণীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরী—এই ত? এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকুরীগুখুরী করে নয়—নিজের চেষ্টায় নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশটা উৎসন্ন হয়ে গেছে—আর তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্রগ্রন্থ গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে, ধর্ম্মকথায় কেউ কাণ দেবে না। আগে আপনার ভিতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর, তারপর দেশের ইতর সাধারণ সকলের ভিতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথমে অন্ন-সংস্থান, পরে ধর্ম্মলাভ করতে তাদের শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই।

বসিয়া তিনি থাকেনও নাই। তাঁহার নিজের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাম্য ছিল ভাব-সমাধি—তাঁহার গুরু পরমহংস দেব বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার এই শিষ্য যদি ভাবসমাহিত হইয়া থাকে তবে দেশের কোনও কাজ হইবে না; তিনিই তাঁহাকে যোগ হইতে কর্ম্মে টানিয়া আনেন। এই কর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার অসাধারণ মানসিক যন্ত্রণা হইয়াছে, এক এক সময় প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন, তবু তিনি গুরুনির্দ্দিষ্ট কাজ হইতে বিরত হন নাই। তথাপি জীবনের প্রায় শেষ সীমানায় আসিয়া এই মহাকর্ম্মী এক-বার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়াছিলেন। তখন তিনি কালিফোর্ণিয়ায়। কাজের প্রবল তাড়নায় তাঁহার হৃদয় ক্লান্ত হয় নাই, তিনি যেন সম্মুখে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া জীবনের সঙ্গে একটা নিকাশ করিয়া লইতেছিলেন—

আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন চিরদিনের মত আমার কাজের সমাপ্তি ঘটে; আমার সমুদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলিয়া তন্ময় হইয়া যায়। তাঁহার কাজ তিনি বুঝিবেন। ··আমি ভাল আছি, মানসিক খুবই ভাল আছি, দেহ অপেক্ষা মনে বিশ্রামসুখ বেশী অনুভব করিতেছি। এই সংগ্রামে জয়-পরাজয় দুইই হইল—যাহা কিছু সম্পত্তি বাঁধিয়া ছাঁদিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, মহান মুক্তিদাতা-রূপে কবে তিনি আসিবেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। হে শিব, হে শিব, আমার তরী পরপারে লইয়া যাও।···আমি সেই বালকই আছি, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বাণী যে বালক বিভোর হইয়া শুনিত। এই বালকের স্বভাব এখনও আমার যায় নাই।···এই কাজকর্ম্ম, ছুটাছুটি, পরার্থে জীবনোৎসর্গ ইত্যাদি সব কিছুই আমার এই বালক-স্বভাবকে চাপা দিয়াছিল মাত্র···আমি আবার সেই বাণী শুনিতে পাইতেছি, সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা স্পন্দিত হইতেছে; শৃঙ্খল টুটিয়া খান্ খান্ হইতেছে; প্রেম মরিল, কর্ম্ম বিস্বাদ হইল, জীবনের সম্বন্ধে মোহ কাটিল,

স্বামী বিবেকানন্দ।

গুরুর আহ্বানবাণীই শুধু সত্য ও ধ্রুব হইয়া মনে জাগিতেছে ...যাই প্রভু, যাই! "শবেরা শবের সৎকার করুক; সংসারের ভালমন্দ সংসারবিলাসীরা দেখুক, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমায় অনুসরণ কর বৎস!" প্রভু, আমি আসিতেছি।

আমি আসিতেছি প্রভু, আমার সম্মুখে অনন্ত নির্ব্বাণ··· সেই সীমাহীন শান্তি-পারাবার—নিস্পন্দ, নিস্তরঙ্গ। এই ধরণীতে জন্ম লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি, এত দুঃখ ভোগ করিয়াছি বলিয়া ধন্য হইয়াছি, আমার সকল ভুলভ্রান্তির জন্য আমি ধন্য—আমি ধন্য যে শান্তি-সমুদ্রে অবগাহন করিব। নিজের ও সকলের সকল বন্ধন মুক্ত করিয়া আমি চলিলাম—বিবেকানন্দ মরিয়াছে। শিক্ষক, গুরু, নেতা বিবেকানন্দ আর বাঁচিয়া নাই·····

··ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছারূপ প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া আমি চলিতেছি—হাত পা ছুঁড়িয়া ঢেউ তুলিয়া এই প্রবাহের অপূর্ব্ব শান্তি ভঙ্গ করিতে আমার সাহস নাই – এ শান্তি এমনই প্রগাঢ় যে মায়া বলিয়া ভ্রম হয়। আমার কর্ম্মের পিছনে যশাকাঙ্ক্ষা ছিল, আমার প্রেমের মূলে ব্যক্তি ছিল, আমার পবিত্রতার অন্তরালে ভয় ছিল, আমার নেতৃত্বে প্রভুত্ব-স্পৃহা ছিল। এখন সব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল ..মা, আমি আসিতেছি। তোমার উত্তপ্ত স্নেহময় ক্রোড়ে আমাকে গ্রহণ কর। যেথানে খুসী আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাও ··

এই বিবেকানন্দকে বাঙ্গালী জাতি চিনিবে না? যিনি বঙ্গমাতার সন্তান হইয়া এক দিনের জন্যও নিজেকে বিরাট ভারতবর্ষের সন্তান ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নাই, ভারতবর্ষও কি কোনদিন তাহার সত্য পরিচয় জানিবে না? বিবেকানন্দের জীবনী লিখিতে বসিয়া মনস্বী রলাঁ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আলকোজ্জ্বল দেখিয়াছেন, বিবেকানন্দ-চরিতে অবগাহন করিলে আমাদের প্রাণেও হয় তো আশার সঞ্চার হইবে, আমরাও হয় তো ফরাসী মনীষীর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারিব—

জীবনকে তিনি যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নাই। · রামকৃষ্ণের তিরোধান ও বিবেকানন্দের তিরোধানের ব্যবধান মাত্র ষোলটি বৎসর— বহ্নিজ্বালায় প্রদীপ্ত এই ষোল বৎসর। জীবনের চল্লিশ বৎসরও তখন তাঁহার অতিক্রান্ত হয় নাই—এই মহাবীর চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন।

সেই চিতাবহ্নি আজিও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাঁহার দেহভস্ম হইতে ভারতের বিবেক নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছে —বৈদিক যুগ হইতে এই প্রাচীন জাতি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল ইহা সেই স্বপ্নবাণী। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে এই বাণী শোনানোর দায়িত্ব ভারতবর্ষেরই।

বিবেকানন্দকে আজ আমাদের প্রয়োজন আছে; তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী হইলেও তাঁহার আদর্শ আমাদের কল্যাণ করিবে। সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে নানা বিরুদ্ধভাবের সংগ্রামে আমরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের সমাজ-দেহে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। অগ্নিস্পর্শে আমাদিগকে পূত হইতে হইবে। বিবেকানন্দ-জীবনী এই পাবক।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মত আজ অনুভব করিতেছি—

"এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি। অমনি অবসাদ চলিয়া যায়।"

বিবেকানন্দ শুধু মহাবীর ছিলেন না, মহাপ্রেমিকও ছিলেন। সর্ব্বজীবে তাঁহার সমান প্রীতি ছিল এবং নরনারায়ণ তাঁহার উপাস্য ছিলেন। তাঁহার একটি ইংরেজী কবিতায় এই প্রেমের বন্দনা আছে, আমরা নিম্নে সেই কবিতাটির অনুবাদ দিয়া বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

শুনহ বন্ধু, তোমারে আমার বলি হৃদয়ের কথা,
আমার জীবনে খুঁজিয়া পেয়েছি সব সত্যের সার,
জীবনের স্রোতে তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়াছি যথা তথা,
একটি মাত্র খেয়াতরী এই জলধি করিতে পার।

পূজার মন্ত্র বহু আছে, আছে হঠযোগ-প্রাণায়াম,
বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে, প্রণালীর নাহি শেষ;
ত্যাগ কর আর অর্জ্জন কর, যাই দাও তার নাম··
মনের ভ্রান্তি সকলই বন্ধু, নাহি সন্দেহ লেশ—
একটি রত্ন ভাণ্ডারে তুমি রেখ রেখ অবশেষ—
ভালবাস আর ভালবাস আর ভালবাস অবিরাম।

* * *

একথা সত্য, সকলে তোমরা অসীমের সন্তান,
বুকে তোমাদের প্রেমের সাগর সদা টলমল করে,
যা আছে বিলাও, দান কর, শুধু চেয়োনাক' প্রতিদান—
ফিরিয়া সে চায় সাগর তাহার গোষ্পদরূপ ধরে।

উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ, ওই কীটেরা ক্ষুদ্রতম,
ধূলি হতে ধূলি অতীব সূক্ষ্ম অণুপরমাণু মাঝে,
বিরাজেন এক ভগবান সেই প্রেমময়ে নমোনমঃ—
কায়মন আর বচনে বন্ধু, নমঃ সেই রাজরাজে।

সমুখে তোমার দেখিছ তাঁহার সহস্র পরকাশ,
এসব ফেলিয়া দেবতারে তব কোথা কর সন্ধান,
ভালবাসে সবে যেজন না লয়ে বিচারের অবকাশ—
সত্য পূজায় তাহার বন্ধু, খুসী হন ভগবান।

।

বাংলা সামাজিক উপন্যাসের উপক্রমণিকা-
নক্সা ও ব্যঙ্গচিত্র

(প্রথম পর্য্যায়)

—শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী ও
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এই পুস্তকটি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদই বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। এই দুই বিপদের প্রথমটি, সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুকারী বাংলা ভাষার নিগড়, দ্বিতীয়টি, বাংলা সাহিত্যের উপর সংস্কৃত উপাখ্যান ও কাব্যের বিষয়-বস্তুর প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়, সে-যুগের "সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয় ততোধিক সঙ্কীর্ণপথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে, এবং বেতালপঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী ও অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তসম্প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন।" প্যারীচাঁদই প্রথমে বাংলা সাহিত্যের এই দৈন্য মোচন করেন; তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙালীর বোধগম্য ও বাঙালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনিই আবার প্রথমে বাঙালীর ঘরের কথা লইয়া বাঙালীর জন্য বাংলা উপন্যাস রচনা করেন। প্যারীচাঁদের এই দ্বিতীয় কীর্ত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার সবটুকু উদ্ধৃত করিবার মত। তিনি বলেন,—

> "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"

বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস এবং উহাই বাঙালী জীবনের সাধারণ ঘটনাকে উপন্যাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিবার প্রথম চেষ্টার ফল। প্যারীচাঁদের এই কৃতিত্বকে দুই-একজন সমালোচক অস্বীকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেজন্যই কথাটা আরও স্পষ্ট-ভাষায় ঘোষণা করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি কথাও ভুলিলে চলিবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান হয় নাই বলিয়া এ-বিষয়টির একটা দিকের উল্লেখমাত্রও তিনি করেন নাই। বাংলা উপন্যাসের, বিশেষ করিয়া 'আলালের ঘরে দুলালে'র জন্মকথা বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সে-বিষয়টির আলোচনা আবশ্যক।

'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সামাজিক উপন্যাসের প্রথম পূর্ণবিকশিত দৃষ্টান্ত হইলেও বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ইতিহাস 'আলাল' হইতেই আরম্ভ করা সঙ্গত হইবে না। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। উহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাংলা সাময়িক সাহিত্যে বিদ্রূপ বা হাস্যরসাত্মক সামাজিক চিত্রাঙ্কনের একটা ধারা চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল সামাজিক চিত্র অবশ্য

খুবই সংক্ষিপ্ত, এবং গল্প বা নক্সার ছাঁচে ঢালা হইলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত গল্প বা প্রকৃত উপন্যাস নয়। উহাদের সবগুলিতেই উপন্যাস অপেক্ষা satire-এর ধর্ম্মই বেশী বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল নৈতিক উপদেশ ও বিদ্রূপাত্মক রচনা এবং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত উপন্যাসের মধ্যে যে একটা সূত্র বর্ত্তমান তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে সামাজিক আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণের উপর satire প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উপন্যাসও সেই অনুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য সকল দেশ এবং সকল ভাষার সাহিত্যেই দেখিতে পাই, ব্যঙ্গ ও উপদেশমূলক রচনা হইতেই বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাসের উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই সুপরিচিত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস হইলেও উহার আবির্ভাব আকস্মিক নয়। যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও সাহিত্যিক প্রেরণা এতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রে স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল, বিদেশী দৃষ্টান্তে, বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী উপন্যাসের দৃষ্টান্তে, সেই শক্তি এবং সেই অনুভূতিই 'আলালের ঘরের দুলালে' রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিয়াছে। একদিক হইতে দেখিতে গেলে 'আলাল' বাংলা সাহিত্যে যেমন একটা সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্যিক genre-এর প্রথম প্রকাশ, আর একদিক হইতে দেখিলে উহা তেমনই একটা অতি-পুরাতন সাহিত্যিক ধারার পরিণতি মাত্র। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের সহিত 'আলালে'র যোগ আরও নিবিড়। প্যারীচাঁদই সর্ব্বপ্রথমে বাঙালীর ঘরের কথা লইয়া উপন্যাস রচনা করেন, একথা খুবই সত্য। কিন্তু বাঙালীর ঘরের যে উপাদান লইয়া তিনি উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের আবিষ্কার নয়। তাঁহার বহুপূর্ব্বেই বাংলা দেশের লৌকিক সাহিত্যে এই বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল। 'আলালের ঘরের দুলালে'র বিষয়-বস্তুর জন্য প্যারীচাঁদ যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট ঋণী সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। এই সকল লেখকের রচনাই বাংলা সামাজিক উপন্যাসের উপক্রমণিকা।

২

'আলালের ঘরের দুলালে'র নায়ক এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেকার যুগের অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী বাবু। এই বিচিত্র চরিত্রটি ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ইংরেজের শাসনতন্ত্র ও বাণিজ্যের ছায়ায় বর্দ্ধিত নূতন ধনী-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে দেখা দেয়। সুতরাং বাঙ্গসাহিত্যে উহার আবির্ভাবও প্রায় সমসাময়িক। শুধু অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীবাবুর চিত্রই নয়, অন্য ধরণের বিদ্রূপাত্মক বহু সামাজিক নক্‌সাও প্রথমযুগের বাংলা সাময়িক পত্রাদিতে পাওয়া যায়, এবং উহার কারণ নির্ণয়ও খুব কঠিন নয়। এদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেকার যুগের লৌকিক সাহিত্যের নিদর্শন আমাদের খুব বেশী নাই। কিন্তু যতটুকু আছে, তাহাতেও কতকগুলি বিশেষ চরিত্র, বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ আচার-ব্যবহার লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। স্ত্রীগণের পতিনিন্দা প্রাচীন বাংলা কাব্যের একটি অবর্জ্জনীয় অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে বাঙালী কবিরা বহু অপ্রিয় ব্যক্তি বা অপ্রিয় কর্ম্মের উপর ঝাল ঝাড়িয়া লইয়াছেন। সতীনের ঝগড়া প্রাচীন বাংলা কাব্যের আর একটি অতি মুখরোচক উপাদান। কিন্তু সে-যুগের ব্যঙ্গরচনার বিশেষত্ব এই যে, সেগুলি কতকগুলি বাঁধা-ধরা চরিত্র ও ঘটনার বিদ্রূপাত্মক বর্ণনাতেই আবদ্ধ। উহার মধ্যে খুব বেশী বৈচিত্র্য বা নূতনত্ব নাই। ইহার কারণ সেকালের সমাজের স্থিতিশীলতা। নূতন ধারণার প্রবর্ত্তন বা নূতন ধরণের চরিত্রের আবির্ভাব না হইলে বিদ্রূপ-ব্যবসায়ীর কৃতিত্ব দেখাইবার অবকাশ হয় না। পুরাতন সমাজ পুরুষানুক্রমে একই প্রথায় নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে উহার মধ্যে নূতনত্ব সহজে দেখা দিতে পারিত না, তাই উহাতে পরিহাসের ক্ষেত্রও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। এ-দেশে ইংরেজী শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সে অবস্থা একেবারে বদলাইয়া গেল। এ-দুইয়ের প্রভাবে বাংলা দেশে একদিকে যেমন নূতন ভাবধারা ও নূতন চরিত্রের বিকাশ হইতে লাগিল, পুরাতনপন্থীরাও আর একদিকে তেমনই প্রাচীন প্রথাকে রক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। ব্যঙ্গ রচনা এইরূপ দ্বন্দ্বের একটা খুব মারাত্মক অস্ত্র। তাই এই সংঘাতে নূতন ও পুরাতন উভয় দলই বিদ্রূপাত্মক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং উহার ফলে শুধু যে বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার প্রসার হইল তাহাই নহে, পূর্ব্বেকার যুগের সাহিত্যে যে বিদ্রূপ সহজ পরিহাস মাত্র ছিল, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় একটা বিবাদের মধ্যে পড়িয়া পরের

যুগে উহা সমাজসংস্কার ও সমাজরক্ষার অস্ত্র, উপদেশমূলক তীক্ষ্ণ satire-এ পরিণত হইল।

তাই দেখিতে পাই, লেখকের সহানুভূতি যে-দিকেই থাকুক না কেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সাময়িক পত্রাদিতে সামাজিক নক্সার অভাব নাই। এই সকল নক্সায় নূতন ধরণের বাবু, পুরাতন ধরণের পণ্ডিত, প্রাচীন ও নূতন আচার-ব্যবহার, গ্রামবাসী, নগরবাসী, বৈষ্ণব, কবিরাজ, সকলকেই নির্ব্বিচারে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। এই সকল বিদ্রূপাত্মক চিত্রের কতকগুলি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাদের সবগুলিই শ্রীরামপুরের বিখ্যাত 'সমাচার দর্পণ' হইতে গৃহীত।

প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল গান সম্বন্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক রচনার উদাহরণই দেখা যাক। নিম্নলিখিত রচনাটি ১৮২১ সনের ২৬ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক জানাইতেছেন যে "কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নরূপে পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা করা গেল।"

"চৈতন্যমঙ্গল গান শ্রবণের ফল

অতিসুমধুর কথা"

কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটা টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ক কর্ত্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর কহিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামীর নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদি ভাবিস তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না। যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পাঁচ পুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে২ কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই। পরে সুরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ রক্তপাত হইল যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীরদের মায়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে।

ইহাতে লেখক কহে উচিত নয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্ছা পুরাইতে পারে—দেখ

সমাচার দর্পণ কর্ত্তা মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব—শুনিয়া দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা করি। সোনায় মণ্ডিবে ভুজ পাবে সুখসিন্ধু তরি।

৩

ইহার কিছুদিন পরেই, ১৮২১ সনের ৩০ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' বৃদ্ধের বিবাহ শীর্ষক একটি রচনায় হাস্যরসের এই সুপরিচিত অবলম্বনটিকে কাজে লাগানো হয়। এক বৃদ্ধের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। তিনি ঘটকদের নিকটে গিয়া বলিলেন

"বৃদ্ধের বিবাহ"

আমার গৃহ শূন্য হইয়াছে যদি তোমরা আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ দুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব। ইহা কহিতে২ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া গেল তাহা দেখিয়া ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহণ করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চর্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম কত হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখি না ঠীক বলিতে পারি না ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই যে দেখিতেছ দন্ত গুলা পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর বেয়ে ধাতুপ্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অদ্যাপি ত্রিশ পচিশ দণ্ড রোজ২ করি। পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে২ গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর আমারদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু২ হইয়া কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ সকলি দিব একথা প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইসুন। ঘটকেরা কহিল যে শুন হে মজুমদার যদি তোমার ভাল করিলাম তবে আর ঢাক২ গুড়২ কি সে কুলীনের মেয়ে তাহার পিতা মাতা নাই তত্রাপি অন্য জ্ঞাতি আছে তাহারা হইতে দিবেক না অতএব রাহা খরচের টাকা দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়া আনি গিয়া।

ঘটকেরা ১০ দশ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। বালিকা কহিলেন যে কি সম্বাদ। ঘটকেরা সকল কথা কহিলেক। কন্যা সেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহণ করিয়া বর পাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা হইল। পাত্রটী সেইখানে গেলেন কন্যা দেখিয়া হুপ পাচ হাত হইল। পরে কোন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে কন্যাকে রাখিলেন পর দিবস বিবাহ হইবেক উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে সুতা বান্ধিয়া বরপাত্র আপনি নান্দীমুখ করিলেন।

বৈকালে সুশীলা কহিলেন বর কোথা। পরে ছেলেটী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাজার যদি শিশু কন্যা হয় তত্রাপি কালের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত কহিলেন যে আমি ওবুড়া বরকে বিবাহ করিব না।

এই সম্বাদ পাইয়া যত২ আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ২ গোঁপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া কেহ২ মাথায় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়ে ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ও গোঁপে কলফ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।

অনেক বুঝান সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে আমি বিবাহ করিব যদি গহনা ও টাকা আমার হাতে দেয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেন রাম মা দুর্গা দিন দিলেন সেই রাত্রিতে তিনি আপন পরিবারের নিকটে আসিয়া, কোন ছল করিয়া গহনা লইয়া গেলেন বাটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ্জ

করিয়া লইয়া দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অনুসার গেল না। সুশীলা কহিলেন যে আমার পীড়া আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলিকাতা আনিলেন ডাক্তরের ঔষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্যা আপন কুলে পলাইয়া গেলেন। মজুমদার পাগলের ন্যায় হইয়া বাপুরে মারে শব্দে কান্দিতে২ বৈষ্ণবাটীতে গিয়া দেখেন যে দশ পোনের জন নেড়া নেড়ী একত্র মহোৎসব করিতেছে। মজুমদার দেখিয়া শুভ যাত্রা করিলেন ওনামটা আর মুখে আনিলেন না।

অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়েরা সাবধান২।

বিবাহেচ্ছু বৃদ্ধের পর সে-যুগের একটি সৌখীনবাবুর পালা। তখনকার দিনেও মাহেশে স্নানযাত্রায় খুব ধুমধাম হইত। এই স্নানযাত্রায় একটি সৌখীন বাবুর অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল তাহাই নিম্নলিখিত উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। সম্পাদক বলিয়া দিতেছেন যে "অজ্ঞাত কুলশীল নামক এক ব্যক্তি পরোপদেশার্থ এই কথা পাঠাইয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ছাপান গেল।"

"শৌকীন বাবু"

নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীস কিংবা কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর এক জন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক,যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড় কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর২ বিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক কেনো।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর২ যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পাঁন কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণনিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকাহইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন। এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সঙ্কেতইবা ছিল কিছু বুঝা গেল না। কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্নানযাত্রায় শুভ যাত্রা করিয়াছেন মনে করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে২ মঙ্গল গাইয়া বেড়াইলেন এবং ঐ নগরের মধ্যে দ্বারে২ অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শৌক শুনিয়া বমি উঠে সাবধান২ এমত কর্ম্ম আর কেহ না করেন। ('সমাচার দর্পণ', ২৩ জুন ১৮২১)।

৫

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্বন্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বাংলা সাহিত্যে নূতন নয়; সুতরাং 'সমাচার দর্পণে' তাঁহারাও বাদ যান নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি

৭ই জুলাই ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় :—

"প্রেরিত পত্র"

কোন মহানগরে বহু দেশীয় বহুবিধ জাতি ভাগ্যবান লোক বাস করেন সেখানে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারদের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই সকল ধর্ম্মতো আছেই তদ্ব্যতিরিক্ত ভাগ্যবানেরদের ভাগ্যজন্য বিশেষ আর অনেক গুণও আছে তাহার কিছু আমি বর্ণনা করি। তাঁহারদের প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে প্রায় অবকাশ হয় না অথচ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে অনুগ্রহও করা আছে তাঁহারা সকালে গিয়া বাবুকে আশীর্ব্বাদ করেন ও নানাবিধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন অনেক২ প্রসঙ্গ হইয়া থাকে তাহার একটা লিখি।

গুণাকর বাবু এক ভট্টাচার্য্য স্থানে শুনিলেন যে অমুকের মাতাকে গঙ্গা যাত্রা করাইয়াছে ও চৈতন্য অতিসামান্যরূপ আছে তাহাতে বাবু কহিলেন যে হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না কিন্তু শ্রাদ্ধ চমৎকার করিবেক। পণ্ডিতেরা কহিলেন যে এ শ্রাদ্ধে আমারদের নিমন্ত্রণ করাইতে হইবেক। বাবু কহিলেন ভাল আগেতো তাঁহার কাল হউক তখন বোঝা যাইবেক। মহাশয় কি আজ্ঞা করেন তাঁহার কাল এই যাত্রায় অবশ্যই হইবেক আমরা এতগুলা ব্রাহ্মণ কি সন্ধ্যা পূজা করিয়া জল খাই না তাহার মরণ না হইলে আমারদের মরণ। এই প্রকার কথোপকথনের দ্বারা প্রায় বেলা দুই প্রহর হইল। বাবু স্নান করিয়া পূজায় বসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বাসায় গিয়া কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে ভাগীরথীতে গেলেন। তাহার পর বাসায় আসিয়া বৈদিক তান্ত্রিকাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন ওহে ভৃত্য অদ্য হবিষ্যের কি আনিয়াছ। অদ্য বাজারে ভাল মাচ নাই ইহাতে শাঙ্গিমাচ আনিয়াছি আর পুঁয়ের খাড়া। তাহাই চড়চড়ি করিলেন আর ঘৃত দুগ্ধ দধি অপূর্ব্ব সেলা তণ্ডুলের অন্ন পাক করিয়া আড়াই প্রহরের মধ্যেই ভোজন হইল। কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলে কোন মান্য লোক চৌবাড়ীতে আইলেন তাহার কোন জিজ্ঞাসা আছে। তাহাতে ভট্টাচার্য্য কহিলেন ওহে ছাত্রেরা অদ্য তোমারদের পাঠ চাহা হইয়াছে যদি কাহার কোন সন্দেহ থাকে তবে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর আমি চটোপাধ্যায় মহাশয়কে বিদায় করিয়া কহিয়া দিব। চটোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন মহাশয় আমার একটা সন্দেহ আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করি। মহাভারত ব্যাসদেব কৃত কিন্তু শুনা যায় কোন স্থানে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ সঞ্জয় উবাচ ইত্যাদি বহু জন উবাচ কিন্তু কোন স্থানে শুনিলাম না যে ব্যাস উবাচ তবে কি প্রকারে বলি এ ব্যাস কৃত। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া কহিলেন ও অনেক কথা আপনি কোন দিবস প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যার পর আসিবেন এইক্ষণে আমার ছাত্রেরা ব্যস্ত হইয়াছেন। যে আজ্ঞা তাহাই করিব। চটোপাধ্যায় গেলেন।

ভট্টাচার্য্য বাবুর কাছে গেলেন পথ মধ্যে ঐ গঙ্গাযাত্রীর সম্বাদ পাইলেন যে অদ্য দেখিয়া আসিয়াছি কিছু ভাল আছেন ভট্টাচার্য্য মহাভাবিত হইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন। কেমন বাবুজী মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী কেমন আছেন। মহাশয়েরদের আশীর্ব্বাদে বুঝি এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন কল্য বাক্‌রোধ হইয়াছিল অদ্য বিলক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মনে২ কহিতেছেন হে দেবতা কি করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আহার কিছু আছে। না ঐ বিষয়ে মহাশয় ভাবিত আছি। ভাল চিন্তা নাই দুর্গা মঙ্গল করিবেন। যে পক্ষে হউক। মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিবেন। এ কেমন কথা যে দিবসাবধি ইহার পীড়া শুনিয়াছি সেই অবধি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি।

এই কথা কহিয়া গুণাকর বাবুর নিকটে আইলেন তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড। কেমন ভট্টাচার্য্য অদ্য বৈকালে যে দেখি নাই। আর মহাশয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেমন২ বল দেখি। আর বলিব কি ছাই কথা হইয়াছে। সে কি। মহাশয় বুঝিলেন না কল্য বাক্‌রোধ ছিল অদ্য বাক্য কহিতেছে ইহা শুনিয়া

আমার বাক্‌রোধ হইল। তবে কি ওবিষয়টা বৃথা হইল। না মহাশয় ইহার মধ্যে একটা সুসম্বাদ আছে আহার নাই এইটা শুনিয়া আসিয়াছি তাহা না শুনিলে কি এপর্য্যন্ত আসিতে পারিতাম। আর২ মহাশয়েরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা তাহা শুনিয়া কহিলেন রাম বাঁচিলাম ওহে বিদ্যানিধি ভায়া ন দেবঃসৃষ্টি নাশকঃ। ইত্যাদি কথোপকথনের পর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বিদ্যানিধি মহাশয় আমারদের এখানে কত গুলি টোল আছে। বিদ্যানিধি কহিলেন যে বাবুজী টোল অনেক আছে কিন্তু সে টোল বোলমাত্র তাহার বিশেস কহাতে আত্মশ্লাঘা পরগ্লানি হয় তবে মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কহিবার বাধা কি।

শুন কোন লোক অনেক ক্লেশ পাইতেন বাবু তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া এক টোল করিয়া দিলেন তাঁহার বিদ্যা নাই ব্যবসায় কি প্রকারে করেন অনেক উপযুক্ত পড়ো রাখিলেন কখন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ পড়ো উত্তর করে এবং বাসাতে ভাইপো ভাগিনেয়কে রাখেন লোকতো জানান যে তাহারা আমার পড়ো তাঁহারা কখন২ একবার পুথি খুলিয়া বৈসেন এইমাত্র। কখন বাবু জিজ্ঞাসা করেন ভটাচার্য্য মহাশয় সুরা পানে কি পাপ হয়। উত্তর। ইহাতে পাপ হয় যে বলে তাহারি পাপ হয় ইহার প্রমাণ আগম ও তন্ত্রের দুইটা বচন অভ্যাস ছিল পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মদ্য ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না। বলরাম ঠাকুরও মদ পান করিয়াছিলেন ইত্যাদি মনোরমা কথাদ্বারা বাবু তুষ্ট হইয়া টোল করিয়া দিলেন।

এবং কোন ভটাচার্য্যের টোল কাহারো সঙ্গে ভাগে আছে। গুণাকর বাবু কহিলেন এ বড় নতন কথা কি প্রকার কহ দেখি। শুন বলি। এক জন বিষয়ী লোক আপন বাসার ব্রাহ্মণকে কহিলেন ওহে ঠাকুর এক পরামর্শ আছে পূর্ব্বকালে অধ্যাপক এত ছিলেন না ও বিদায়ও এত পাইতেন না এইক্ষণে দেখিলাম বিষয় কর্ম্মে কোন লাভ নাই যাহারা২ টোল করিয়াছেন একর নিমন্ত্রণ হইলে ২০০ টাকা প্রধান বিদায় তাহার বিভাগ মত মধ্যম কনিষ্ঠ ও পান আর রূপা ও সোনার ঘড়া গাড়ু পাওয়া যায় আইস আমি তোমার এক টোল করিয়া দি কিন্তু যত টাকা লভ্য হইবেক তাহা আমি সকল লইব তুমি ১০ টাকা হিসাবে মাহিআনা পাইবা আর বাসা খরচ ও ভোজোন্ন কাপড়। উত্তর। যে আজ্ঞা আমার এই যথেষ্ট। গুণাকর বাবু কহিলেন ভাল ভট্টাচার্য্য ইঁহারদের নিমন্ত্রণ কি প্রকারে লোকে করে। মহাশয় এ কি বড় আশ্চর্য্য কথা কাহারো বাবুর উপরোধ কাহারো বা যজমান কিম্বা শিষ্য কোন সাহেবের নিকটে চাকর আছে সেই সাহেবের উপরোধ এই নানা প্রকার উপরোধে উপায় হয়।

ভাল ভটাচার্য্য যদি সভায় বিচার করিতে হয় কিম্বা বিদায় কালীন যদি সেই বাটীর কর্ত্তা বিচার শুনিয়া বিদায় করে তবে কি হয়। মহাশয় কয় স্থানে দেখিয়াছেন যে সভায় কিম্বা বিদায় কালীন বিচার হইয়া থাকে অধ্যক্ষ সুপারিশ বুঝিয়া বিদায় দেয় কিন্তু এ সকল লেঠা পল্লীগ্রামে আছে সেখানে সভা হইলে বিচার হয় ও বিদ্যা বিবেচনা করিয়া বিদায় করে।

এই প্রকার কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইল। ভটাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন। ভটাচার্য্যের কিন্তু এই গুণ যে দুই প্রহর হউক কিম্বা আড়াই প্রহর হউক অবাধে প্রাতঃস্নানটী আছে এবং কালে সন্ধ্যাটী করা আছে মিথ্যা কথাটী কন না নিন্দাও কাহারো করেন না।

এই পত্রটি পড়িয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যে নিতান্ত প্রসন্ন হন নাই তাহার প্রমাণ আমরা ১৮২১, ২১এ জুলাই তারিখে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারি।—

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রেরিত পত্র"

প্রেরিত পত্রের প্রত্যুত্তর॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিল কিন্তু তাহা আমরা ছাপাইতে অপারক তাহার এই২ কারণ। প্রথম। আমরা অনৃত কথা ছাপাইতে পারি না এই প্রেরিত পত্রে অনেক অনৃত আছে অতএব ইহা ছাপাইলে অনেক মিথ্যা ছাপান হয়। দ্বিতীয়। আমারদের

পূর্ব্বোক্ত আছে যে কোন ব্যক্তির হিংসাসূচক কথা ছাপাইব না তাহাতে এ পত্রে কোন ব্যক্তির নাম নির্দ্দিষ্ট নাই বটে তথাপি যেরূপ বিশেষণ বিশিষ্ট ব্যক্তির বিষয় পত্রে লিখিত আছে তাহাতে মর্ম লোকেও সে ব্যক্তিকে জানিতে পাবে অতএব এ পত্র ছাপাইলে সে ব্যক্তির হিংসা করা হয়। তৃতীয়। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতোপহাস সূচক পত্র ছাপান গিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য মর্ম অথচ মিথ্যা পণ্ডিতম্মন্য-ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত প্রকৃত পণ্ডিতকে বিষয় করে না কিন্তু তাহাতে যাঁহার ক্রোধোদয় হয় তিনি সে পত্রের তাৎপর্য্যবিষয় সুতরাং হন ইহাও এই পত্র ছাপাইলে লোকতঃ প্রকাশ হইলে তাঁহার হাস্যাস্পদত্ব হইতে পারে। অতএব এই কারণত্রয়েতে এই পত্র ছাপান গেল না।

৬

ইহার পর সমাচার দর্পণের বিদ্রূপবাণ ক্রমে ক্রমে দেশীয় কবিরাজ ও বৈষ্ণবের উপর বর্ষিত হয়। বৈদ্য-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি "শতমারী ভবেদ্বৈদ্য" এই কথাটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ :—

"প্রেরিত পত্র বৈদ্যসম্বাদ"

...এখানে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রোগীর প্রাণ কেমন২ করিতেছে দেখিয়া কবিরাজেরদিগকে ডাকাইলেন। কবিরাজ মুক্তা জারা সুদ্ধা শীঘ্র আসিয়া কহিলেন ভয় কি কি বলিব ঔষধি তৈয়ার করিতে দিলেক না ভাল২ এই সোনা মুক্তা জারা উহার গাত্রে মাখাও দেখ ইহাতে যদি এ ভাব সারে দ্বিতীয় জন কহিলেন আপনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন তাহা করাইলে তবু ফিরে শেষে কহিলেন ও জানা আছে ও ব্যাধিহইতে মুক্ত কখন হয় না তুমি আমি কি করিব শিব সাক্ষাৎ হইলেও বাঁচে না আর দেখা শুনা কি গঙ্গা যাত্রা করাও ভাগ্যে আমরা আসিয়াছিলাম নতুবা গঙ্গা কদাচ পাইত না এই কথা কহিয়া বিদায় হইলেন।

গঙ্গাতীরে রোগীকে রাখিয়া এক জন জ্ঞানবান কবিরাজকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কবিরাজ আসিয়া দেখিতেছেন এমত সময়ে রোগী বিছানাতে হস্ত পদাদি ঘর্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ শয্যাকণ্টক হইয়াছে। তাহা দেখিয়া রোগীর মাতা কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেক বিছানায় হাত বুলাইতেছে কারণ কি। কবিরাজ কহিলেন এক দ্রব্য তত্ত্ব করিতেছে। রোগীর মাতা কহিলেন কি দ্রব্য। কবিরাজ কহিলেন শিঙ্গা। শিঙ্গা কি করিবেক। কবিরাজ কহেন ফুঁকিবেক আর কি করিবেক। পরে তাহাই হইল। (সমাচার দর্পণ, ১ সেপ্টেম্বর, ১৮২১)

বৈষ্ণব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটির কোন ভূমিকা আবশ্যক করে না।—

"বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত পত্র"

...এই কলিকাতা রম্য নগরে কোন মহাশয়ের বনিতা কর্ত্তার অজ্ঞাতে এই সকল ক্রিয়া [বৈষ্ণবের পূজা, প্রসাদগ্রহণ ইত্যাদি] প্রতিদিন করিতেন। এক দিবস ঐ কর্ত্তা এই কথা শ্রবণান্তে রাগান্বিত হইয়া এ বিষয় জ্ঞানার্থে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকিলেন। কিয়ৎ কালান্তরে ঐ অধিকারির প্রেরিত বৈষ্ণবহস্তস্থ বস্ত্রনির্ম্মিতান্নপাত্র তদুপরি নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন চর্ব্য চোষ্য লেহ্যপেয় পায়স পিষ্টক মিষ্টান্ন-সংযুক্ত; ভূরি২ অন্তঃপুরে গৃহিণীসমীপে উপস্থিত-মাত্রে ক্রোধাবিষ্ট তর্জন গর্জ্জনযুক্ত ঐ লুক্কায়িত কর্ত্তা বিষ্ণুপবারণ ঐ বাবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা সদৃশ কেশাকর্ষণপূর্ব্বক চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত পাদুকাঘাত চতুর্ব্বিধাঘাতে বাবাজী অঙ্গভঙ্গ গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত প্রায় হইলেন। এই সময়ে গৃহিণী দেখিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে কহিতেছেন আমারদিগের সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন। হে প্রভু কি করিলা বৈষ্ণব গোসাঞীর এত অপমান। যে হউক অত্যল্প কালেই প্রতিফল হইবেক। এই বাক্য বাবাজী শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন আমার অপরাধ কি অধিকারি মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে নিয়োগ

করিয়াছেন এবং গৃহিণীর মতে আগমন করি ইহাতে আমার স্বার্থ কিছু নাই। এ মানী বাবাজী মানচ্যুত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা অন্তঃপুরহইতে বহির্দ্বারে আসিয়া প্রধান দ্বারপালের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট কটু বাক্য কহিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যথোচিত প্রহার করিলেন। ঐ দ্বারপাল ব্রজবাসী বিশেষতঃ কনৌজ ব্রাহ্মণ ও ঈশ্বর পরায়ণ নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোমহইতে খড়্গা লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিল। পুরবাসীগণেরা নানাবিধ সান্ত্বনা করিলে পরে ঐ বৈষ্ণব ও দ্বারপাল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বিলাপ করিতেছেন।

পয়ার বিলাপ।

বৈষ্ণব কহিছে দ্বারি করি নিবেদন। এই কর্ম্মে প্রতি দিন মোর আগমন॥ এমন বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ কিছু জানি নাই॥ গোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি। সেই মত মোর ভাগ্যে ঘটাইলা বিধি॥ নাহি ছুল্যাম নাহি পাল্যোম সুখ উদ্দীপন। রাবণ আজ্ঞাতে মারীচ মজিল যেমন॥

রাবণ হরিল সীতা বদ্ধ মহোদধি। এই কর্ম্মে সেই মত ঘটাইল বিধি॥ না আইলে অধিকারী অধিক রুষ্ট হবে। এবার এখানে আইলে এবেটা মারিবে॥

রাম মারে রাবণে মারে অবশ্য মরণ। দুই মতে দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন॥
দ্বারপাল কহিতেছে।

শুনিয়া বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ান। এবার আমার হাতে হারাইবে প্রাণ॥ সুন্দর করিল সুখ বিস্তারে লইয়া। কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিয়া। বার২ মুরগীতে খায়ে যায় ধান। এইবার মুরগীর বধা যাবে প্রাণ॥ ভণ্ডগুরুর লণ্ডচেলা হইয়াছে মেলা। নিত্য২ এই রূপ কর লীলা খেলা॥ আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গোসাঁই। শিক্ষা পড়া এত পোড়া আগে জানি নাই॥

আমার চৌকিতে পাবি এড়াইতে নারে। জানিলে কি ভণ্ড বেটা ফাকি দিতে পারে॥
('সমাচার দর্পণ, ২ মার্চ্চ' ১৮২২)

৮

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজের শাসনতন্ত্র ও বাণিজ্যের ছায়ায় বর্দ্ধিত ধনী-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধশিক্ষিত নব্য বাঙালীবাবুও আমাদের সমাজে এবং ব্যঙ্গসাহিত্যে দেখা দেয়। ব্যঙ্গসাহিত্যে এই চরিত্রটির প্রথম অবতারণা আমরা দেখিতে পাই 'সমাচার দর্পণে'ই। ১৮২১ সনের ২৪এ ফেব্রুয়ারি ও ৯ই জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দুই খণ্ডে "বাবুর উপাখ্যান" নামে একটি বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিই যে 'নববাবু-বিলাস' ও 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত বিদ্রূপাত্মক সামাজিক চিত্রের মূল সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। নিম্নে ইহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল। গল্পটির আরম্ভ পুরাতন উপাখ্যানের মত।

"বাবুর উপাখ্যান"

অমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে এক জন অতিবড় ধনবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্ত্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমীদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড়২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জন করিয়াছিলেন।

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী বুদ্ধিমান আদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া প্রচর রূপে ব্যক্ত হইবাতে সুলতান অহম্মদ খলীফা ভারতবর্ষের ব্যাপক মনাজন তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় উপার্জনের সীমা নাই। অত্যল্প খরচে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেষ্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান সর্ব্বদা দুঃখী কহেন যে, আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্ব্বংশ হইলাম সন্তান নাই ধন কাহাকে দিয়া যাইব। ঃপ্রযুক্ত সর্ব্বদা যাগ দান করেন।

অমরাবতী নগর ও সুলতান খলীফার উল্লেখ সত্ত্বেও ঘটনাটি যে কোন্ কালের তাহা বুঝিতে আমাদের কোন কষ্টই হয় না। পরবর্ত্তী বর্ণনায় প্রাচীন আখ্যায়িকার এই ক্ষীণ আভাসটুকুও বজায় রাখিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

পরে এক চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ানজীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিক্‌টিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন। এমতে পুত্রের বয়স্ ছয় মাস হইল অন্নপ্রাশন কাল উপস্থিত নাম করণ হইবেক। চক্রবর্ত্তী সভাসৎ পণ্ডিত লোককে প্রশ্ন করিলেন যে ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার পুত্রের নাম কি হইবেক। প্রধান পণ্ডিত যিনি নিরত সভায় থাকেন এবং কুলাচার্য্য কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার পুত্রের অনেক সুলক্ষণ আছে যাহা কহিতে প্রায় সম্ভবে না যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ইনি বাঁচেন তবে প্রাকৃত মনুষ্য হইবেন না ইনি কুলীনের ঔরসে জা· আর কুলীনের নবগুণের লক্ষণ আছে সে কি কি।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।

ইহার তাবতেরি চিহ্ন আছে ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন অতএব ইহার নাম কুলীনচন্দ্র কিম্বা তিলকচন্দ্র রাখুন। দ্বিতীয় জন কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার যে পুত্র ইনি কত কাল তপস্যা করিয়াছেন সেই বরে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন ইহার আপন কর্ম্মানুযায়ি নাম আর দেখি না বরং মধুমক্ষিকার চাক-নাশক বাবু নাম রাখহ।

তৃতীয় কহিলেন যে দেওয়ানজী বিদ্যালঙ্কার উত্তম কহিয়াছেন আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে এ সন্তান হইয়াছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহোনাস্তি আর বাবুর চিহ্ন গণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ অনুভব হইয়াছে সে কি২।

ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ। অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র বাবু রাখুন। পরে অনেক বিবেচনাতে তিলকচন্দ্র বাবু নাম স্থির হইল। তিলকচন্দ্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না মহা আদর্গা কত২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীরে যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।

এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক্য শক্তি হইল তিলকচন্দ্র সকলকেই কটু বাক্য কহেন ও মারেন তাহাকে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু কোন অকর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে। দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না কহেন ব্রাহ্মণের ছেলা গায়িত্রী শিখিলেই হয় কপালে থাকে বিদ্যা হবে আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেই খানেই আদর্গা ও মান্য দেওয়ানজীর পুত্র অনেক অভরণ আছে। বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতক গুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।

এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয় বোধ ও জ্ঞান যথেষ্ট কেহ বাবুর স্থানে পরামর্শ লয়েন কেহবা কোন বিষয়ের বিবেচনা বাবুকে লইয়া করেন শাস্ত্রার্থ যাহা অন্য বিষয়ী ও পণ্ডিত লোক হইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ হয়। বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি বিস্তু শেষ করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত

ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই ধন্য শুভ ক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যেমত শিষ্টতা ও নম্রধারা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না। কেহ২ আপনাআপনি ও পরস্পর অথচ বাবুর সম্মুখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে তৎপর ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন ইহাতে চিঠী গুলান দেখিবা মাত্রেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চড়২ করিয়া লিখিয়া দেন বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার বাদার্থ করিতে পারেন যাহা হউক বাবু না পড়িয়া পণ্ডিত না হবেক কেন দেওয়ানজীর পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদ্বারা বাবু অন্তঃকরণে স্ফীত হইয়া মনেং করেন যে আশ্চর্য্য আমি আপ্ত বিস্মৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্য২ লোকের মত ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব আমি মুহুরি কিম্বা মুনসী অথবা কেরাণী গিরি করিব না আমার দানাদিদ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎ প্রযুক্ত অনুপার্জিত বিদ্যাও হইয়াছে অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগই সত্য কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য এই মতে পুর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ অথবা ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন।

অনন্তর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন কেহ কর্ত্তা বলে কেহ২ বাবু কহে কর্ত্তা বাবু বড় লোক কতক গুলি নির্ধন দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে। কাহাকে ধন দেন কাহাকেও চাকরি দেন তখন বাবুর পুর্ব্বোক্ত নামের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যেমত মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্প হইতে কণামাত্র মধু আহরণ করিয়া বহু কালে চাক বদ্ধ করিয়া অধিক মধু সংহগ্র করেন পরে কোন ব্যক্তি ঐ চাকে অগ্নি নুড়া দিয়া পোড়াইয়া মধু ভাঙ্গিয়া লয়ে বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে। সেই মত বাবুর পিতা বহুকালে বহু শ্রমে কিঞ্চিৎ২ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন বাবু সেই ধন হাজার২ টাকা নানা প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য চাকরি না করিলে লোকে মানে না ও দশ জন প্রতি পালন হয় না। ইহা সর্ব্বদা ব্যক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন স্থানে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু চাকরি করিবেন ইহাতে কতক গুলি বিদেশস্থ কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী ওমোদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল ইহারা কতক সোপারিশদ্বারা কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে। বাবুর পুর্ব্বোক্ত বিদ্যায় কোন অংশেই গুণ নাই কেবল কতক গুলি অর্থ আছে কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ সুতরাং বিষয় কর্ম্ম হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই ওমোদওয়ারের-দিগকে এমত আশ্বাসদ্বারা পরিতুষ্ট রাখেন যে বাবুর হস্তে নানা কর্ম্ম প্রস্তুত অত্যল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তম২ কর্ম্ম দিবেন। ইহারা বাবুর কথায় প্রত্যয় করিয়া আপন২ স্বজন ও পরিবারকেও ঐ মত লব্ধ আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে। বাবু মনে জানেন যে তাহারো কর্ম্ম হইবে না সুতরাং অন্যেরো কর্ম্ম দিতে পারিবেন না এই রূপ প্রতারণা না করিলে কোন লোক আসিবেক না অতএব সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক। ওমোদওয়ার সকল প্রাতে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন বাবু আসিবামাত্রেই তাবতে অতিসমাদরপূর্ব্বক যথেষ্ট শিষ্টাচার করত অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন যে অদ্যকার কি সমাচার। ওমোদওয়ার মহাশয়েরা ক্রমে২ যে যাহা তাবৎ দিবসের মধ্যে উত্তম২ অথবা অসম্ভব কথা শুনিয়া থাকেন

অনুসন্ধান করেন কেহ২ রচিয়া থাকেন তাহা কহেন পরে ভূত ডাকাইত সর্প দুষ্কর্ম্ম দাতৃত্ব কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাস্য পরিহাসে অধিক রাত্রি হয় পরে বাবু গাত্রোত্থান করেন। ওমোদওয়ারেরা স্ব২ বাসায় যান তাহারা কেহ২ কহেন যে এবার আমার কর্ম্ম হওনের বাধা নাই আমার শনির শেষ হইয়াছে আমার প্রতি বাবুর বড় অনুগ্রহ। কেহবা দৈবজ্ঞের স্থানে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দেখেন। কেহ বলেন যে বাবু গোলানগবের নবাব হইলেন কেহ কহেন যে বাবুর এবার বড় কর্ম্ম হইল সুন্দরবন তাবৎ ইজারা করিলেন কোন দিবস বাবু মজলিসে পদার্পণ করিবামাত্রেই চাকরকে হুকুম করেন যে আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোশাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব। ইহা শুনিতেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা মানে কেহ সত্য পীরের শীরণি দিতে চাহে কেহবা আপন২ ইষ্ট দেবতার স্থানে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে। সকলেই কর্ণে২ ফুসফুস করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে বাবু কল্য কোথা যাইবেন কেহ কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা কহিয়াছি সেই বটে বাবু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন দেখ মা জগদীশ্বরীর ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তাহার মধ্যে এক জন আস্পর্দ্ধাধারী সোপদা লোক অধিক প্রস্তুত ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবুজী কল্য কোথা যাইবেন। বাবু ঈষদ্ হাসিয়া কহিলেন। যে ঈশ্বর প্রতুল করুন পশ্চাৎ কহিব দেবতার নিকট প্রার্থনা করহ। বাবু পর দিনে দরবার যাইবেন অতএব মজলিস অল্লরাত্রে বরখাস্ত হইল। বিদায় কালে বাবু কহিলেন যে তোমরা কল্য প্রাতে আসিও না।

পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া এছকালে পরিধান করিয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারি জন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী ঘর২ শব্দে দুর্ব্বিধ বাজারে পঁহুছিল সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন হাদি সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অন্য বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ তোমার কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বাণিয়ারা ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব এদেশে আর এক জন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না লড়াইয়ের কি খবর এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীরদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে এক জন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছেন কি না আনতনি বদ্রিও সাহেব ঘরে হাজির থান কি না দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এল্লাণ্ড সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে আমি যাইব ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন বাটীর লোক সকলে স্তব্ধ বড় গরমি বাবু অভুক্ত কুঠী গিয়াছিলেন আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন।

এখানে ওমোদয়ার মহাশয়েরা পথ্য দেখিতেছেন কতক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবু উত্তম মছলন্দে আসিয়া বসিলেন ও প্রথমত আলাপ করিলেন যে অন্য বড় ক্লেশ হইয়াছে দরবার হইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীড়া হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। বিষয় কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না। ওমোদওয়ারেরা বাবুর মনঃসন্তোষজনক দিনফল যে যাহা২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে২ নিবেদন করিলেন। পরে কোন্ ইংরাজ কোন কর্ম্মে

নিযুক্ত হইল অনুমান সিদ্ধ ব্যক্ত করিলেন কোন সাহেবের কে চাকর হইল। এই প্রকার প্রায় প্রতিদিন মজলিস হয় অভাগা ওমোদওয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা খরচ করিলেন পরে কর্জ করিয়া বাসা খরচ চালাইলেন যখন কর্জ না পাইলেন তখন কুটুম্ব স্বজনের বাটীতে থাকিয়াও বাবুর উপাসনা করিলেন কিন্তু বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহারদের উপকার করিলেন না জবাবও দেন না বরং যাতায়াতের অল্পতা হইলে কহেন যে অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এক কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কএক দিন না আইসাতে সে কর্ম্ম অন্যের হইয়াছে। এই প্রকারে বাবু কাল ক্ষেপণ করেন। ইতি বাবুর উপখ্যান।

এই উপাখ্যান প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছিলেন অতএব ছাপান গেল।

ইহার প্রায় চার মাস পরে "বাবুর উপাখ্যান"-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে নব্য বাবুর লক্ষণ আরও সুস্পষ্ট।

বাবুর উপাখ্যান যাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছিল তাহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তিনি পুনর্ব্বার পাঠাইয়াছেন।

"বাবুর উপখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ"

বাবু লেখা পড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও সকল করা হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্ম্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল। বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের দ্বারা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠহইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক বাবু ছাইগাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতে ছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অর্থাৎ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোন২ লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না মানুষের একই কথা।

সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুশা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিস্টল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ

দীন দুঃখিরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনেং পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

সাহেব লোক রবিবারং গ্রিজায় গিয়া থাকেন অন্য বারে বিষয় কর্ম্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান কখন শকের যাত্রা খেউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন যদি কোন লোক আপদ্‌গ্রস্ত হয় তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছুদিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠক-খানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেত পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রী লোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

সাহেব লোকে অদালতহইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় অদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ। এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করিবেন।
('সমাচার দর্পণ', ৯ জুন ১৮২১)

জহরের দুঃখ

—শ্রীলালমোহন দে

ছোট্ট ছোট্ট ধবধবে পা দু'খানি,—যেন ননী ছানিয়া গড়া।

সবে মাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে। খুটখুট, খুটখুট,—হেলিয়া দুলিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। পাঁচ পা যাইতে না যাইতে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়ে। আবার ওঠে, আবার সেইরূপ টলিয়া টলিয়া হাঁটে, আবার টাল সামলাইতে না পারিয়া যেখানে সেখানে ধুপ্‌ধাপ্ বসিয়া পড়ে।

একখানা বড়ঘরের পাশে একখানি ছোটঘর। আয়তনে ছোটঘরটি বড়ঘরের অর্দ্ধেক। দুই ঘরের মাঝখানের দেওয়ালে পাশাপাশি দু'টি দরজা। দরজা বন্ধ থাকিলে ঘর দু'খানা সম্পূর্ণ পৃথক ; খোলা হইলে দু'টি ঘর প্রায় একই।

বর্ষণক্লান্ত এক শ্রাবণের প্রভাতে ছোট ঘরটিতে কিঞ্চিৎ জনসমাগম হইল। ডাক্তার, ধাত্রী, সহকারিণী ধাত্রী, একটি মুচিজাতীয়া স্ত্রীলোক, আরও দুই এক জন। তারপর কিছু-কাল 'গরম জল' 'গরম জল' রব, যন্ত্রপাতির ঝন্‌ঝনা, থাকিয়া থাকিয়া একটা প্রচ্ছন্ন কাতরানির শব্দ। ব্যস্ততায়, উদ্বেগে, অশ্রুজলে ঘরখানা একেবারে থমথমে হইয়া উঠিল।

ওয়া, ওয়া—

উদ্বেগ, অশ্রুজল কমিয়া আসিল ; কিন্তু ব্যস্ততা চলিল আরও কিছুকাল। অবশেষে, ধীরে ধীরে, শব্দমুখর ছোট ঘরটি নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। প্রয়োজনে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, প্রয়োজন ফুরাইতেই তাঁহারা একে একে প্রস্থান করিলেন। রহিল কেবল মুচি-স্ত্রীলোকটি এবং তাহার কর্ম্মকুশলতাজ্ঞাপক কোনও ধাতুময় কিম্বা মৃৎপাত্রের একটা

ঠক্‌ঠাক্ শব্দ। দেখিতে দেখিতে তাহাও থামিয়া গিয়া ছোট ঘরটি সম্পূর্ণ নীরব হইল।

উলু দাও না গো তোমরা।

ক'বার দেব?

ফুটফুটে খোকা হয়েচে যে,—পাঁচবার উলু দাও।

উলু উলু উলু
উলু উলু উলু
উলু উলু উলু

ক'বার হলো?

তিন বার; আরো দু'বার—

উলু উলু উলু
উলু উলু উলু

সোল্লাস উলুধ্বনিতে নবজাত শিশুর আগমন-বার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হইল। উলুধ্বনি থামিতে না থামিতে পোঁ ভোঁ করিয়া শাঁক বাজিয়া উঠিল। শঙ্খের নিঃস্বনে ও উলুধ্বনি গণনা করিয়া পাড়াপ্রতিবেশীরা বুঝিতে পারিল সহরের উপর পাঁচ খানা ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিক নটবর সিংহ মহাশয়ের আবার একটি দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করিল

কেহ কেহ সন্তুষ্ট হইলেও, অধিকাংশ প্রতিবেশীরা ইহাতে মনে মনে বিষম চটিয়া উঠিল—"দেখ কি অবিচার! মাস ফুরোতে না ফুরোতে যার ঘরে কড়কড়ে হাজারো টাকা উঠে আসচে তার ঘরেই একেবারে ছেলের বন্যা। আমাদের মাসান্তে একশোটি টাকার সংস্থান নেই; আর আমাদের এক এক জনার ঘরে দেখগে যাও খালি মেয়ে, মেয়ে, আর মেয়ে।" কেহ বলে,—"আরে ফর্সেপ ডেলিবারি; আগে বাঁচুক ত। টেঁশে যেতে কতক্ষণ?" সহৃদয় প্রতিবেশীরা নানাপ্রকার মুখরোচক কথা বলিয়া, ইঙ্গিত করিয়া, গাত্রদাহ নিবারণ করিতে বিধিমতে কিম্বা অবিধিমতে চেষ্টা করে।

ছোটঘর ও বড়ঘরের মধ্যকার দরজা দু'টি এতক্ষণ বন্ধ ছিল; এইবার খোলা হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের দিকের জানালা কপাট সব বন্ধ।

তক্তপোষের উপর প্রসূতি শায়িতা। মুখখানি তাঁর অতি মাত্রায় পাণ্ডুর। যেন ঝড়ে খসিয়া পড়া একটি চীনা গোলাপ। বিধ্বস্ত,—কাগজের মত সাদা, রক্তরাগের লেশমাত্রহীন। পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি মঞ্জরী। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। শুধুমাত্র মুখখানা দেখা যায়,—লাল টুকটুকে; বসোরাই গোলাপের কুঁড়িটির মত।

খুটখুট খুটখুট করিয়া কোথা হইতে জহর আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই হেলিয়া দুলিয়া রাজহংসের মত তাহার গতি; কিন্তু মুখের ভাবটি ভীষণ প্রশ্নবোধক।

দুটি ঘরের মধ্যকার দরজার নিকট আসিয়া জহর দাঁড়াইল। চৌকাঠের নীচে খানিকটা জায়গা বেদীর মত করিয়া বাঁধানো। সেই বেদীর উপর উঠিতে গিয়া হুড়মুড় করিয়া সে পড়িয়া গেল। একটু লাগিয়াছিল। কাঁদিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেই ছোটঘর হইতে জননী অবসন্ন ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"পড়ে নাই, পড়ে নাই, জহর পড়ে নাই ত;—লাফ দিয়েচে! যাট্, ওঠো।"

মস্ত বড় দেড় বছরের ছেলে, সে নাকি আবার দুই ইঞ্চি উঁচু জায়গায় উঠিতে গিয়া এমন করিয়া পড়িয়া যাইতে পারে? ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক ও অপমানকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে, হ্যাঁগা? সেই জন্যই বুঝি জহরের কাঁদিয়া ফেলিবার আয়োজন? কিন্তু স্বয়ং জননীই যখন বলিতেছেন জহর পড়িয়া যায় নাই, শুদ্ধ মাত্র ইচ্ছা করিয়াই একটা "হাই জাম্প" দিয়া ফেলিয়াছে, তখন ইজ্জৎ ত রক্ষাই হইল। আবার ক্রন্দন কেন?

জহর কাঁদিল না। দুই হাত উলটাইয়া চোখ দুটি একটু রগড়াইয়া লইল মাত্র। তাহার পর, দরজার পাল্লা এইবার বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া, চৌকাঠের নীচেকার বেদীর উপর সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বেদীর উপর চড়িয়া ছোটঘরের তক্তপোষের উপরকার সকল প্রাণীকেই জহর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। ঐ যে তাহার মা শুইয়া আছেন। কিন্তু তাহাদের উপরকার সুন্দর সাজানো-গোজানো বড় ঘরটিতে না শুইয়া, এই দরজা-কপাট বন্ধকরা চোরকুঠরির ভিতরেই বা কেন, আর এমন অসময়েই বা কেন? মায়ের পাশে ওটাই বা কি বস্তু? কত প্রশ্ন, কত সন্দেহ যে মনে জাগে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাহা ভাষায় যে প্রকাশ করিবে, সে পথও বন্ধ। সবে তার দুই চারিটি কথা ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে—অথচ রসনাগ্রে শত শত প্রশ্ন ভিড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত।

জহর তরলকণ্ঠে ডাকে—"মা।"

প্রসূতির মুখে কেমন একটা অপরাধিনীর ভাব ফুটিয়া উঠে। অপরাধিনীর ভাব? —হাঁ, অপরাধিনীর ভাবই বটে। এমন ছেলে,—ভাল করিয়া হাঁটিতেও শিখে নাই; মুখে কথাও ফুটে নাই,—আর কত কথাই ত মনের কোণে আসিয়া উঁকি মারে। জহরের মাতৃ-সম্ভাষণের কোন উত্তর দেওয়া হয় না। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া জননী অবোধ শিশুটির পানে চাহিয়া থাকেন।

"মা"—

ছোট ডাক। কিন্তু এমন টানিয়া টানিয়া, যেন কণ্ঠস্বরে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, জহর মা বলিয়া ডাকে যে, জননী চমকাইয়া উঠিয়া বলেন—"বাবা।"

"মা—"

"আমার জহর,—আমার জহরৎ!"

শুধু এই? ঐ এক মাইল দূরে শুইয়া শুধু মাত্র একটু মৌখিক সোহাগ—আমার জহরৎ? কেন, উঠিয়া নিকটে আসিলে কি পা দুইখানা তাঁর ক্ষয় হইয়া যাইবে?

রুদ্ধ অভিমানে জহরের চক্ষুদুটি ছল ছল্ করিয়া উঠে।

পূর্ব্বে, মা বলিয়া ডাকিলে, জননী যেখানেই থাকুন না, ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বক্ষে তুলিয়া চুমায় চুমায় অস্থির করিয়া তুলিতেন। সে তাহার চম্পককলির মত অঙ্গুলির সাহায্যে জননীর মুখ ঠেলিয়া সরাইয়া দিত। কিন্তু এমন সুখের দিন ছিল তখন যে জননীর মুখ সবলে ঠেলিয়া দিলেই কি আর তাঁহার মুখ বিমুখ হইত? অসম্ভব। মুখখানি তাঁর ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাহার অধরের নিকট আসিয়া পড়িত। আবার তাহার গণ্ডস্থল আক্রমণ করিতে চাহিত। সে সব দিনের কথা ভাবিতেও পুলকে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। আর আজ একি বৈষম্য! তিন তিন বার সে মা বলিয়া ডাকিয়াছে; কিন্তু একটু সাড়া ব্যতীত কিছুই সে আজ পাইল না কেন? চোখ যদি বেদনায় ছল ছল করিয়া উঠে, তাহা হইলে চোখের আর অপরাধ কোথায়?

একবার শেষ পরীক্ষা করিবার জন্য উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জহর ডাকে—

"মা—"

সেই পূর্ব্বেকার মত, একটানা স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বর।—যেন দোয়েল ডাকে, কিম্বা কোকিল ডাকে। এমন সুধামাখা কণ্ঠস্বর বুঝি আর হয় না।

পুত্রের মনোগত অভিপ্রায় জননী প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া, ব্যথায় বুকের ভিতরটা তাঁহার টন্ টন্ করিয়া উঠে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে। কিন্তু উপায় কি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন—"জহরৎ আমার, মাণিক আমার,—এই যে আমি রয়েচি।"

"ই-যে—"

"হাঁ এই যে তুমি বাবা; আমি দেখেচি তোমাকে ধন; কিন্তু তোমাকে যে এখন কোলে নেবার উপায় নেই।"

উপায় যে নাই তাহা জহরও কিছু কিছু বুঝিতে পারে। কেহ যেন তাহার মনের ভিতর থাকিয়া চুপি চুপি সে কথা তাহাকে বলিয়া দেয়।

তবু মন ত প্রবোধ মানে না। ছোট ছোট, ননী ছানিয়া গড়া, পা দু'খানি চৌকাঠ ডিঙাইয়া যাইতে চায়।

একটি পা উঠিয়াছে; এখনই হয় তো উহা ছোটঘরে আসিয়া পড়িবে, এমন সময় কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া জহরের মাসীমা খপ্ করিয়া জহরকে কোলে তুলিয়া লইলেন। জহরের আশা ত পূর্ণ হইল না। দু'টি ঘরের মধ্যে ব্যবধান একটি চৌকাঠ মাত্র—হিমালয় পর্ব্বতও নহে, গঙ্গা নদীও নহে;—শুধু একখণ্ড কাষ্ঠ। সেই সামান্য অন্তরায় লঙ্ঘন করিয়া সে মায়ের কাছে যাইবে,—মাকে স্পর্শ করিবে, মায়ের বুকে নিজেকে ঢালিয়া দিবে। শুধু মাত্র চোখের দেখাতেই কি প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়?—বল না তোমরা!

জহরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। প্রাণের যে বিপুল আকাঙ্ক্ষা, যে তীব্র ব্যাকুলতা লইয়া সে চৌকাঠ ডিঙাইয়া যাইতেছিল, তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই ব্যাকুলতা এইরূপে প্রতিহত হইয়া কোমল বক্ষটিকে তার একেবারে দলিয়া মুচড়াইয়া শেষ করিয়া দিয়া গেল। জহর কাঁদিল।

সূতিকাগৃহে প্রসূতির পাংশু মুখখানা যেন পাংশুতর হইয়া উঠে। একটি প্রবোধবাণী একটি সান্ত্বনার বাক্যও মুখে জুটে না। নীরব ব্যথায়, অপলকনেত্রে পুত্রের অশ্রুপ্লুত মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। হায়রে নাড়ীর টান!

ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া···

বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৪০

কাজেই, এটাকেও বুকে আঁকড়াইয়া সামলাইতে হয়।

দেখিয়া জহর কাঁদিয়া আকুল। মনে করে, এটা আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া এমন করিয়া তাহার মায়ের বুক জুড়িয়া বসিল। ভাবে, আর তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া বিগলিত অশ্রুধারা হু হু করিয়া নামিয়া আসে।

মাসীমা জহরকে নানা প্রকারে ভুলাইতে চেষ্টা করেন।—"বাবা আমার, কাঁদে না; এই ই যে তোমার মা রয়েচে। আর একে চেয়ে দেখ। ও কে হয় জান? ভাই হয়, ছোট্ট ভাই। দাদা, দাদা,—জহর আমার দাদামণি হয় যে;—কাঁদে না। চুপ কর,—আমার ধন।"

চুম্ চুম্ করিয়া বহু চুম্বন জহরের গণ্ডে আসিয়া পড়ে।

আদর পাইয়া জহর সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যায়। অশ্রুধারা শুষ্ক হইয়া উঠে। মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতে চাহে। হাসি নয় ঠিক, হাসির ছায়া; ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র। মেঘের কোলে পথভ্রান্ত রবিকরের চকিত বিকাশের মত।

সস্নেহে অঞ্চলে চোখ মুছাইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া মাসীমা জহরকে বড়ঘরের তক্তপোষের উপর বসাইয়া দেন। বলেন,—"এই খানটায় লক্ষ্মীটি হয়ে বসো। ওঘরে যেও না যেন দাদমণি, বুঝলে? ওঘরে এখন যেতে নেই; অশুদ্ধ ঘর ওটা। এইখানে বসে এই বিস্কুট দু'খানা খাও, কেমন? আমি কাজ সেরে এসে এবার তোমাকে কোলে নেব,—আরও একটিন ভর্ত্তি বিস্কুট দেব!" বলিয়া, মাসীমা কক্ষান্তরে চলিয়া যান।

জহর বসিয়া বসিয়া বিস্কুট খাইতে থাকে—কুটুর, কুটুর, কুটুর।

দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। বেলা শেষে, সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া, জহরের মাসীমা সবে আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছেন। জলের ঘটীটি বামহস্তে লইয়া তিনি আচমন করিতেছেন, এমন সময় সূতিকাগৃহ হইতে একটা আকুল আহ্বান শুনিতে পাইলেন—"দিদি, দিদি।"

এক নিমেষে হস্তমুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া, অঞ্চলে মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি বড়ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কি লা, কি হয়েচে?"

"আমার জহর কই?"

"ওঃ, এই? এমন করে ডেকেচিস যে পেটের পিলে অবধি চমকে উঠেছিল। না জানি আবার কি হ'ল ভেবে দৌড়ে এসেছি। কেন, জহর ত এই খানেই খেলা করছিল। তুই জানিসনে কখন এঘর থেকে বেরিয়ে গেল?"

"না আমিত কিছুই জানিনে। খেলা করছিল ত অনেক আগে। এখান থেকে ওঘরের সবটা কি আর দেখা যায়?—থেকে থেকে খুট্ খুট্ একটা শব্দ মাত্র শুনতে পাচ্ছিলাম। ভাবলুম জহরই বুঝি খেলা করছে। তারপর কখন যে আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, জানিনে। জেগে দেখি, ওঘরটা যেন খাঁ খাঁ করছে; বাড়িশুদ্ধ কারো সাড়াশব্দ নেই। আর এটা পেট থেকে পড়ে অবধি কী যে লম্বা ঘুম দিচ্ছে! ভাল লাগে না আমার।—এই, এই, ওঠ্ না।"

"উঠবে এখন; এমন করে ধাক্কাসনে। এ ঘুম খুব ভালো। সকাল সকাল ছেলেরা বেড়ে ওঠে যদি এমন করে ঘুমোয়।"

"ঘুমোক তবে। তুমি দেখ জহর কোথায়। জহর, জহর;—কোথায় গেল ছেলে?—ওর জন্যে বুকের ভিতরটা কেমন যে করে আমার। এটা হয়েচে বটে, কিন্তু জহরটার জন্যে মনে আমার একতিল সুখ নেই। কোথা থাকে, কোথা যায়,—যে আমাদের নেড়া ছাদ, সেখান থেকেই পড়ে, কি আরশোলাই চিবোয়!—দেখ তুমি দিদি জহর কোথা আছে।"

"ভাবিসনে অত; জহর ঠিক ওর ছোট মাসীমার কাছে আছে।"

"একবার দেখেই এস না।"

কিন্তু দেখিয়া আসিবার কোনই প্রয়োজন হইল না। খুটখুট খুটখুট করিয়া জহর আসিয়া উপস্থিত। একেবারে দিগম্বর অবস্থা। গলায় সোনার বিছেহার, প্রকোষ্ঠে বলয়, কোমরে গোট। মস্তকের রেশমনিন্দিত কেশরাশি সম্মুখের দিকে ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। ঝুটিতে আবার একটি সোনার ঝুমকো আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুস্থ, সবল শিশুটির বালকৃষ্ণ-বেশ মানাইয়াছে সুন্দর। দেখিয়া জননী ও মাসীমা সতৃষ্ণনয়নে জহরের দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন।

হাত বাড়াইয়া জহরকে কোলে টানিয়া লইয়া মাসীমা বলিলেন—

"বলি, ছিলে কোথা এতক্ষণ? মহাশয়ের কোথা থেকে আগমন হ'ল?"

জহর হাসিল। হাসিয়া, হাঁ করিয়া মুখের ভিতরটা দেখাইল। তাহার পর আবার মুখ বন্ধ।

ব্যস্ত হইয়া মাসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কি খেয়েচিস্, দেখি কি খেয়েচিস্?"—বলিয়া মুখের ভিতর অঙ্গুলি চালাইয়া একরাশি নানা আকারের চর্ব্বিত কয়লার টুকরা বাহির করিয়া ফেলিলেন।—"আ রামোঃ। পাথর কয়লা চিবিয়ে দন্তধাবন করা হয়েছে বুঝি?—এই তোমার বুদ্ধি? ফেল্, ফেল্,—যা আছে মুখে সব ফেল্।"

আর ফেল্! অৰ্দ্ধচর্ব্বিত পাথুরে কয়লা লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া ততক্ষণে জহরের পেটে চলিয়া গিয়াছে।

মাসীমা তর্জ্জন করিয়া বলেন—"রাজ্যের অখাদ্যের ওপর তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, কেমন?—আর খেও না কখনো।"

জননী কহিলেন—"কয়লা খেয়েচে, এই রক্ষে। কেন্নুই কি আরশোলা যে মুখে পুরে দেয়নি এটাই সুবুদ্ধি বলতে হবে।—কেন যে ওর এ সমস্ত অখাদ্য-কুখাদ্যের ওপর দৃষ্টি বুঝিনে।"

"হয়রে হয়, ওরকম ঢের ছেলেপুলের হয়। হবে না, পাঁচ ছয় মাসেরটি হতে না হতেই মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ওর বন্ধ হয়েছে যে।"

লজ্জায় জননীর মুখে রক্তের ছোপ লাগিতে চায়। কিন্তু রক্ত কোথায় শরীরে যে মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিবে?

রাঙা আর হয় না; ঐ কেমন একরকম হইয়া উঠে জহরের মা কথাটা উল্টাইয়া অন্য কথা পাড়েন—"দিদি!"

"কি লা?"

"হাটখোলায় খবর যায় নি?"

"ছেলে হবার সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাঠান হয়েছে।"

"কারো সঙ্গে দেখা নেই যে। এত কষ্ট পেলাম, যদি মরেই যেতাম? আজ বোধ হচ্চে আসবে না।"

"কি জানি; আসা ত উচিত ছিল এতক্ষণ। সন্ধ্যেবেলা হয়ত আসবে।"

জহর তাহার মাসীমার বক্ষের কাপড় ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই আর কাপড়টা স্থানচ্যুত করিতে না পারিয়া, তাঁহার কাঁধের কাছে কুট্ করিয়া কামড়াইয়া দিল। মাসীমা উহু উহু করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখেছ ছেলের নষ্টামি? কাপড় ধরে টানাটানি করছে আমিও শক্ত করে চেপে রয়েছি; না পেরে শেষে দিলে কামড়ে।"

প্রসূতির মুখখানা আবার অন্ধকার হইয়া আসে।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন—"দাও দিদি, ওকে একটু দাও। চাটুক একটু। জহরের দুধ খাবার সাধ ত মেটে নি।"

"দূর, আমার ওতে কিছু যেন আছে!"

"থাক্ বা নাই থাক্, দাও ওকে একটু চাটতে। কিছু না পেলে ও আপনি ছেড়ে দেবে।"

"আমি পারবো না বাবা। যে ধার ওর দাঁতে; কিছু না পেলে, শেষে দেবে তখন কামড়ে!"

জননীর মুখে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠে। বলেন—"কামড়াবে না, কামড়াবে না; আমার মাথার দিব্যি, তুমি দিয়েই দেখ। মা হয়ে আমি ওকে কিছুই দিতে পারলুম না। সুড্ আর গরুর দুধ খেয়েই ও বড় হ'ল।—এখনও ঘুমের ঘোরে ও মাইটানার স্বপ্ন দেখে।—চোঁ চোঁ চোঁ—কেমন যে করে ওর ঠোঁট দু'খানা, দেখো তুমি এক দিন রাত্রিবেলা।

সন্তানহীনা মাসীমার বক্ষে স্নেহরসের প্রস্রবণ উদ্দাম হইয়া উঠে। তক্তপোষে বসিয়া পড়িয়া, জহরকে অঙ্কে শোওয়াইয়া, তিনি বলেন—"জহর—"

"ই - যে"—

বক্ষের অঞ্চল ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। জহরের মস্তক ঈষৎ হেলিয়া পড়ে। শেষে তাহার গোটা মাথাটাই মাসীমার অঞ্চলের নীচে অদৃশ্য হয়।

প্রসূতির চোখ দু'টি শান্তিতে মুদিয়া আসে

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : দ্বিতীয় যুগ

—শ্রীসুকুমার সেন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১] এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যে যুগান্তর আনয়ন করে। বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধুভাষার পূর্ণাঙ্গরূপ ইহাতে প্রকটিত হইল। বাঙ্গালা গদ্য তাহার জড়তা ও দুর্ব্বোধ্যতা হইতে মুক্তি পাইয়া সাহিত্য-সংসারের প্রাত্যহিক কাজের উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধুভাষাকে যে রূপ দিলেন তাহা ইহার স্থায়ী রূপ। সাধুভাষার এই রূপ এখনও বদলায় নাই, এবং বদলাইতে যথেষ্ট দেরীও আছে। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটী দিগ্‌দর্শনী। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব বিচার করা যাউক।

আমি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম যুগের গদ্যের একটা প্রধান দোষ ছিল, এক ছেদের মধ্যে একাধিক বাক্যের প্রয়োগ। রামমোহন রায় এই দোষ অনেকটা কাটাইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের হস্তে পড়িয়া বাঙ্গালা গদ্যের এই দুর্ব্বোধ্যতাজনক দোষ একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল। বেতাল-পঞ্চবিংশতি-তে দেখি যে এক একটী বাক্যের পর ছেদ ব্যবহৃত হইয়াছে। আরও এক কথা, পূর্ব্বেকার গদ্যে বিভিন্ন ধাঁচের বাক্য সংযোজক অব্যয়-(conjunction)এর সাহায্যে গ্রথিত হইত, ইহাতে ভাবের বিরুদ্ধতার দরুণ গদ্যের লালিত্য একেবারেই থাকিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার মধ্যে এরূপ দোষ মোটেই পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়েব কানেই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গদ্যের ছন্দ ও তাল ধরা পড়ে। গদ্যেরও একটা তাল আছে। একাধিক শব্দ উচ্চারণ করিবার পর শ্বাসবায়ু স্বতঃই এক একবার রুদ্ধীভূত হইয়া যায়, ইহাতেই গদ্যের বাক্যে যতি পড়ে। এই যতি প্রত্যেক ভাষায়ই একটু না একটু পৃথক রকমের। বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যেরও এইরকম যতিমূলক ছন্দ বা তাল আছে [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত Origin and Development of the Bengali Language, পৃষ্ঠা ২৯৫ দ্রষ্টব্য]। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের ভাষায় (সাধুভাষায়) এই তাল অনুযায়ী বাক্যরচনা করিতে আরম্ভ করেন। আমি অবশ্য বলিতে চাহি না যে গদ্যের এই তাল পূর্ব্ববর্ত্তী গদ্যসাহিত্যে একেবারেই নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে ইহা ক্বচিৎ মিলে বটে, কিন্তু সেখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইহা রচয়িতার অজ্ঞাতসারেই হইয়াছে। আর গদ্য লিখিতে গেলে কথ্যভাষার প্রভাব তো আসিয়া যাইতেই পারে। আমার বক্তব্য এই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সাধু-ভাষায় গদ্যসাহিত্য এই তালমূলক কাঠামোয় দাঁড় করাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যের এই ছন্দোময়তা বা তালমূলকতার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

একদা, | রাজা বিক্রমাদিত্য | মনে মনে | এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ॥ জগদীশ্বর | আমায়, ॥ নানা জনপদের | অধীশ্বর করিয়া, ॥ অসংখ্য প্রজাগণের | হিতাহিত চিন্তার | ভার দিয়াছেন ॥ [বেতাল পঞ্চবিংশতি]।

তাঁহারা | প্রস্থান করিলে, ॥ শকুন্তলা, | সত্য সত্যই | সখীরা চলিয়া গেল, ॥ ইহা বলিয়া, | উৎকণ্ঠিতার ন্যায় | হইলেন ॥ [শকুন্তলা]।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, | কিঙ্করকে | জাহাজের অনুসন্ধানে | পাঠাইয়া, ॥ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত | উৎসুকচিত্তে, | তদীয় প্রত্যাগমনের | প্রতীক্ষা করিলেন ॥ [ভ্রান্তিবিলাস]।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় আপাতদৃষ্টিতে যে কমা (comma)-চিহ্নের প্রাচুর্য্য বা বাহুল্য দেখা যায়, তাহার হেতু এই ছন্দ বা তাল দেখান মাত্র। অবশ্য অনেক স্থলে যে বোধসৌকর্য্যের জন্যও এইরূপ বিরামচিহ্নের ব্যবহার হইয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ-নন্দিনী"-তেও এইরূপ কমা-চিহ্নের অসদ্ভাব নাই। পরে অবশ্য এই চিহ্ন এত অধিক ব্যবহার করা হয় নাই, তাহার

[১] ইহার কিছু পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া "বাসুদেব-বিজয়" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকখানি আমার দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। সুতরাং এই বইটীর বিষয় আলোচনা করিতে পারিলাম না।

কারণ তখন বাক্যরচনার এই স্বাভাবিক রীতি সাহিত্যিক-দিগের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

'-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার সাহায্যে একাধিক ক্রিয়াপদ একই সরল বাক্যে (simple sentence) প্রয়োগ করা বাঙ্গালা ভাষার একটী প্রধান বিশেষত্ব বলা চলে। কিন্তু পর পর বহু অসমাপিকার প্রয়োগ করিলে রচনার জোর কমিয়া যায়, এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈচিত্র্যের খাতিরে '-পূর্ব্বক', '-অনন্তর' ও '-পুরঃসর' শব্দের সহিত ভাববচন (verbal noun)-এর সমাস করিয়া অসমাপিকার অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন, "ফল লইয়া, পুরস্কার প্রদান-পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিয়া" ইত্যাদি।

সাধারণ লোকের একটা ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় বড় দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। একথা ঠিক সত্য নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুভাষায় যে প্রকার সংস্কৃত-রীতি ও ভরীবহ তৎসম শব্দ প্রযুক্ত হইত তাহার কিছুই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় পাওয়া যায় না। আর "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ব্যতীত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্য কোন রচনায় অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা অতিশয় অপরিচিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই। বেতালপঞ্চবিংশতি তে যাহা আছে তাহাও অল্প, যেমন—'কাদাচিৎক কুব্যবহার', 'মলিম্লুচের নিকট', 'নিকাম ব্যাকুল'। 'সমভিব্যাহার', 'অনুকূলতা' ইত্যাদি শব্দ এখন আমাদের নিকট অপরিচিত হইলেও, এককালে ইহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর খুবই পরিচিত শব্দ ছিল। এই সকল শব্দ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও যথেষ্টই পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যা ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি বহুল পরিমাণে তদ্ভব শব্দের ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাষার ওজস্বিতা ও কর্ম্ম-ক্ষমতা কমিয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কথ্যভাষার ছাঁচ তাঁহার ভাষার মধ্যে যথেষ্টই পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কুত্রাপি লঘুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। যেমন,—

সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি; কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া, কেমন করিয়া পিতামাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ, আজ আবার সেই সর্ব্বনাশিয়া আসিয়াছে; সেই বা, দেখিয়া শুনিয়া, কি মনে করিবে। সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি; তাহা হইলেই সকল আপদ্ ঘুচিয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্ব সমাপ্ত করিয়া (১২৬৭ সাল) তিনি এই কার্য্য কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে ছাড়িয়া দেন। মহাভারতে অবশ্য প্রচুর তৎসম শব্দের প্রয়োগ আছে। তাহা থাকিবারই কথা। মহাভারতের মত গ্রন্থের অনুবাদে ইহা অপরিহার্য্য।

স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদের বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় প্রয়োগ করা তখনকার রীতি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায়ও ইহার অন্যথা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যেও ইহা খুবই পাওয়া যায়। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে এই রীতি যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কোচ লাভ করিয়াছিল। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদের বিশেষণ বিধেয় (predicate) রূপে ব্যবহৃত হইলে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার করেন নাই।

নামধাতুর প্রয়োগ বিদ্যাসাগরের রচনায় নাই বলিলেই হয়, কেবল এইগুলি পাওয়া যায়—'জিজ্ঞাসিলেন', 'সম্বোধিয়া', 'প্রবেশিয়া', 'দংশিয়া', 'সম্ভবে'। 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ "বেতালপঞ্চবিংশতি"তে বেশী; "শকুন্তলা"-য় (১২৫৭ সাল) ও "সীতার বনবাস"-এ (১২৬৮ সাল) 'বল' ও 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ প্রায় সমান সমান; আর "ভ্রান্তিবিলাস"-এ 'বল' ধাতুরই প্রয়োগ আছে, 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়।

ভাববচনসংবলিত যুক্ত-ক্রিয়াপদের (compound verb with a verbal noun) প্রয়োগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় একটী বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। ইহা অবশ্য তৎকালিক প্রয়োগরীতি ছিল। এই রীতি অনুসারে যুক্ত-ক্রিয়াপদটীর কর্ম্ম কর্ম্মকারক রূপে ব্যবহৃত না হইয়া ভাববচনের সম্বন্ধপদ হিসাবে ষষ্ঠী বিভক্তিতে প্রযুক্ত হইত। যেমন, "তুই আমার নাম ও পদ উভয়েরই অপহরণ করিয়াছিস"; "আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলেন"; "আনন্দের অনুভব করিতেছি;" ইত্যাদি। এখন আমরা এই ষষ্ঠ্যন্তপদ গুলিকে যুক্ত-ক্রিয়া পদের কর্ম্ম হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি; তখনও 'অপহরণ করিয়াছিস' ইত্যাদি বাক্যাংশ ঠিক যুক্ত-ক্রিয়াপদ রূপে পরিণত হয় নাই, সুতরাং ভাববচনের স্বাতন্ত্র্য ছিল, এবং সেই জন্য উহার কর্ম্মপদ সম্বন্ধপদ রূপে ব্যবহৃত হইত।

অল্প কতিপয় স্থলে ক্রিয়াপদের ব্যবহার এখনকার হিসাবে প্রাচীন (archaic) বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তখন এইরূপ প্রয়োগ রীতিসিদ্ধ ছিল। যেমন 'করিলাম না (=করি

নাই)'; 'যাহাতে না হইতে পায়;' 'উচিত হয় না'[১] (=নহে);' 'চেষ্টা পাই ;' 'হইতেছে না (=হইবে না) ;' 'রহিতেছে (=থাকিয়া যাইতেছে);' 'বলেন, বলে'[২] (=বলিল)।'

দ্বিতীয়া-চতুর্থী বিভক্তির '-রে' ও '-কে' এই দুই প্রত্যয়ের প্রয়োগই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় পাওয়া যায়। শেষের দিকের রচনায় '-রে' প্রত্যয়ের অপেক্ষা '-কে' প্রত্যয়ের প্রয়োগই বেশী পাওয়া যায়। 'নিমিত্ত'-বাচক 'জন্য' শব্দের প্রয়োগও বহুলভাবে শেষের দিকের রচনায় দেখা যায়।

বাক্যমধ্যে শব্দ প্রয়োগের রীতির মধ্যে একটী উল্লেখ-যোগ্য প্রয়োগ দেখা যায়। বাক্যমধ্যে মুখ্য উক্তি (dierct speech) থাকিলে প্রথমে কর্তৃপদের প্রয়োগ, তাহার পরে মুখ্য উক্তির প্রয়োগ, এবং তাহার পরে ক্রিয়া বিশেষণ ইত্যাদি ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন "শকুন্তলা, আর ইহা শুনিয়া বিলম্ব করিতে পারি না, কিন্তু কি বলিয়াই যাই, –অথবা, এই মৃণালবলয়ের ছলেই যাই, এই বলিয়া পুনর্ব্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।" "রাজা, ভাল আমি চলিলাম, যেন পুনরায় দেখা হয়, এই বলিয়া" ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ওজস্বী রচনার সহিত সকলেই পরিচিত, সুতরাং ইহার উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। "শকুন্তলা" ও "সীতার বনবাস"-এর মধ্যে এই রচনা উৎকর্ষ্য ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। "ভ্রান্তিবিলাস"-এর রচনা বেশ লঘু ও দ্রুতগতি। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির অব্যবহিত পূর্ব্বগ। সাধুভাষার কর্মক্ষমতা ও তৎসহ অক্ষুণ্ণ লঘুত্বের পরিচয় এই গ্রন্থের মধ্যে যথেষ্টই পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকের মুখে কথ্য-ভাষার ছায়ানুসরণ করিয়াছেন। তথায় দেখা যায় যে প্রায়ই সাধুভাষার ও কথ্যভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। তখনকার সাহিত্যিকদিগের মধ্যে এই রীতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের তাবৎ উপন্যাসেও এরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। আরও এক কথা, তখন পর্য্যন্ত কথ্যভাষার ক্রিয়াপদের রূপের কোন standard বা আদর্শ রূপ দাঁড়ায় নাই, সুতরাং এইরূপ গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ লঘু রচনার উদাহরণ দিতেছি।

এই কথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি ভাই! তুই যথার্থই পাগল হয়েছ; নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে? ছি ছি! কি লজ্জার কথা; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন। [ভ্রান্তি বিলাস]।

অনেকের ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে খ্রীষ্টীয় ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হিন্দী "বৈতালপচ্চীসী" গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। ইহা সত্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দী পুস্তক হইতে গল্পের কাঠামো লইয়াছিলেন ইহা সত্য; কিন্তু ভাষায় তিনি একান্ত নিজস্ব পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিন্দী "বৈতাল-পচ্চীসী" ও বিদ্যাসাগরের "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" হইতে অনুরূপ অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি। দুইটী অংশের তুলনা করিলেই আমার উক্তির যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

মহারাজ! জহাঁ রঘুনাথজী নে সমুদ্র পর পুল বাধা হৈ, উস জা দেখতা ক্যা হুঁ কি সাগর মেঁ সে এক সোনে কা তরবর নিকলা; কি জমুররুদ কে পাত, পুখরাজ কে ফুল, মূঁগে কে ফলোঁ সে ঐসা খূব লদা হুআ থা, কি জিস কা বয়ান নহীঁ হো সকতা. ঔর উসপর মহা সুন্দরি স্ত্রী, বীন হাথ মেঁ লিয়ে, মীঠে মীঠে সুরোঁ সে গাতী থী. পর এক ঘড়ী কে বাদ, বহ পেড় সিন্ধু মেঁ ছিপ গয়া. [বৈতালপচ্চীসী[১]]

যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধানবাসনায়, মহাকায় মহাবল কপিবলসাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর লোকাতীতকীর্ত্তিহেতু সেতু-সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল; তদুপরি এক পরমসুন্দরী রমণী, বীণা-বাদনপূর্ব্বক মধুরস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই বৃক্ষ কন্যা সহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল। [বেতাল-পঞ্চ-বিংশতি, একাদশ উপাখ্যান]

১ 'উচিত নয়' এরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে।

২ আধুনিকতম সাহিত্যিকেরা সামান্য অতীতের স্থলে বর্ত্তমানের এইরূপ প্রয়োগের অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

১ Duncan Forbes সম্পাদিত ও লণ্ডন হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৩।

ইংরেজী বিরামচিহ্ন বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে গিলক্রীষ্টের পুস্তকে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল [বঙ্গশ্রী, বৈশাখ, পৃঃ ৪৬৬]। কিন্তু ঐ পুস্তক রোমান হরফে ছাপা হইয়াছিল। বাঙ্গালা হরফে ছাপা বাঙ্গালা পুস্তকে কমা (comma) প্রভৃতি ইংরেজী বিরামচিহ্নের প্রয়োগ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কতদুর শ্রীমণ্ডিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের রচনা আলোচনা না করিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যাইবে না। একা বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার প্রকৃত ক্ষমতা কেহই সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা আলোচনা করিবার সময় এই বিষয় বিস্তার করিয়া বিচার করিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরেই অক্ষয়কুমার দত্তের নাম করিতে হয়। ইঁহার প্রথম পুস্তক "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রথম ভাগ ১৭৭৩ শকাব্দে (=খ্রীষ্টীয় ১৮৫১ সালে) প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় ভাগ পরবর্ত্তী বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বইটী George Coombe প্রণীত Constitution of Man নামক ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত। খ্রীষ্টীয় ১৮৫২ হইতে ১৮৫৪ সালের মধ্যে তিন ভাগ "চারুপাঠ" রচিত ও প্রকাশিত হয়। ইঁহার শেষ পুস্তক "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রথম ভাগ ১৭৯২ শকে (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭০ সালে) ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮০৪ শকে (=খ্রীষ্টীয় ১৮৮২ সালে) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি Wilson সাহেবের Religious Sects of the Hindus নামক প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে বিরচিত।

অক্ষয়কুমারের কোন রচনাকে ঠিক 'সাহিত্যিক' বা 'রস'-রচনা বলা যায় না। তিনি প্রধানতঃ প্রবন্ধকার। তাঁহার রচনা হইতে দেখা যায় যে সাধুভাষা পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি নূতন আমদানী পাশ্চাত্য বিষয়ের আলোচনা কার্য্যে বিশেষ উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য ইঁহার রচনায় তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য অপরিহার্য্য হইয়াছিল। আর প্রধানতঃ এই কারণেই অক্ষয়কুমারের ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতবহুল। আরও একটী কারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাক্য-মধ্যে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেন তাঁহার অধিকাংশই বাঙ্গালা ধাতুর পদ। আর দত্ত মহাশয় ক্রিয়াপদ যথাসম্ভব কম ব্যবহার করিতেন, এবং তাঁহার প্রযুক্ত ক্রিয়াপদের বেশীর ভাগই তৎসম শব্দযুক্ত যুক্ত-ক্রিয়াপদ (compound verb)। ক্রিয়াপদের অপ্রাচুর্য্যের জন্য অক্ষয়কুমারের ভাষা 'খিচখিচে' (halting) বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ অক্ষয়কুমার খুবই ব্যবহার করিয়াছেন। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপেক্ষাও বেশী। অক্ষয়কুমার খুব বড় বড় সমাসযুক্ত পদ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু সমাস করার দরুণ স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, "এই প্রকার কুল সম্বন্ধ পশুদিগের পরস্পর সহযোগে শাবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে যে, বংশে বংশে তাহাদের হীনতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে প্রায় তাহা সকলেই স্বীকার করেন।" "পরস্পর-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে।"

কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, "তদীয় শিখরদেশ হইতে অগ্নিময়ী নদীস্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন।" এখনকারদিনে অপ্রচলিত বাক্য-প্রয়োগরীতি (idiom)ও যথেষ্ট আছে। যেমন, "পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাহারও অভ্যাস পাইতে পারে।" 'করিতে হয় (=করিতে হইবে)'; 'ধন্যবাদ করেন'; "ইহাই যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইল, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত ফলোৎপত্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই।" "রিপুপরতন্ত্র বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বিবাহ করা যে কর্ত্তব্য নয় এতাবন্মাত্র এই পুস্তকে নির্ণীত হইতেছে।" "তখনই তাহাদের তন্নিবন্ধন কতকগুলি অবশ্যপ্রতিপাদ্য পবিত্র ব্রতে ব্রতী হওয়া হইল।" ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমারের পরিণত বয়সের রচনা[১] হইতে কিছু উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আত্ম প্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্লানি ও পশ্চাত্তাপ-শোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যখন কোন দুষ্পাপ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ পিঞ্জরে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিলেও, আমরা তাহাতে প্রতিপাত করি না।

১ ধর্ম্মনীতি, ১৮১৬ শকাব্দের সংস্করণ হইতে।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "টেলিমেকস" তন্নামক ফরাসী কাব্যের প্রথম ছয় সর্গের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে নিখুঁত বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার প্রথম তিন সর্গ সন ১২৬৫ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৫৮) সালে রচিত। এই পুস্তকের রচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও হাত কিছু ছিল। গ্রন্থকার 'প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন'-এ বলিয়াছেন—"এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

রচনার নমুনা হিসাবে "টেলিমেকস" হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি[১]।

টেলিমেকস কহিলেন, মিশর দেশের অধীশ্বর সিসষ্ট্রিস স্বীয় বাহুবলে অশেষ দেশ জয় করিয়া ভূমণ্ডলের নানা খণ্ডে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফিনিশিয়ার অন্তর্গত টায়র নগর সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং বিপক্ষে সহসা তদ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ বহুবিস্তৃত বাণিজ্য দ্বারা তাহারা অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। সহসা কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না এই সাহসে ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না এবং সিসষ্ট্রিসকেও অগ্রাহ্য করিত। [দ্বিতীয় সর্গ]।

রামগতি ন্যায়রত্নের "রোমাবতী" সংবৎ ১৯১৮ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৬১) সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত হইলেও ভাষা যথেষ্ট সংস্কৃত ঘেঁষা। বইটি অনুবাদ কি মূলগ্রন্থ তাহা গ্রন্থকার বলেন নাই। আখ্যায়িকা-ভাগ যাহাই হউক রচনার অধিকাংশই যে সংস্কৃতের অনুবাদ অথবা সংস্কৃতের ছায়াবলম্বনে রচিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। গ্রন্থকার "দশকুমার-চরিত," "কাদম্বরী" প্রভৃতি সংস্কৃত আখ্যায়িকা গ্রন্থের আদর্শে ইহা রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় অব্যবহৃতপূর্ব্ব ও অপরিচিত অনেক তৎসম শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ ইহাতে আছে। যেমন, 'বণিগ্জন'; 'অশোক শাখী'; 'উদার-গুণ-পিশুন বদন-মণ্ডল'; 'সর্ব্বতঃ দত্ত-দৃষ্টি হইয়া'; 'ইভ-দলিত সর্জ্জতরু'; 'কৌবেরী দিক'; 'শিফা-সংঘাত;' ইত্যাদি। 'প্রতিবাসিগণেরা' প্রভৃতি প্রাচীন প্রয়োগও নিতান্ত বিরল নহে।

এ সকল দোষ সত্ত্বেও রোমাবতীর ভাষা নিন্দনীয় নহে। ভাষার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি আছে। রচনার নমুনার হিসাবে নীচে কিছু তুলিয়া দিতেছি।

যে কামিনীকে নয়নগোচর করিয়াছ বলিতেছ, বোধ হয়, তিনি অত্রত্য কোন বিভবশালী জনের দুহিতা হইবেন। এস্থলে তাদৃশ জনের প্রতি তোমার এই অকারণানুরাগ পরিণত বিষফলে বামনের চন্দ্রপুটাপাতের ন্যায় কি একান্ত উপহাসাস্পদ হইবে না? বন্ধো! তুমি নানা শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়াছ "অসঙ্গত আশা কেবল ক্লেশকারিণী ও হৃদয়শোষিণী" এই সামান্য নীতি-সূত্র তোমার নিকট আর কি আম্রেড়িত করিব? আহা! আধীক্ষিকী বিচক্ষণ পণ্ডিতপ্রবর মনকে যে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা উচিতই হইয়াছে, যে মনঃ অবলাদিগের কটাক্ষ মাত্র দর্শনে এতাদৃশ অসার হইয়া পড়ে তাহাকে সহস্র খণ্ড করিলেও রাগ যায় না।

এই-জাতীয় রচনার মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্নের "কাদম্বরী" একটী উল্লেখযোগ্য পুস্তক। তৎসম শব্দের ঘনঘটা ও সমাস-বাহুল্যের মধ্য দিয়া তারাশঙ্কর মূল কাদম্বরীর শব্দঝঙ্কার ও শব্দচিত্র যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তারাশঙ্করের অন্যতম আখ্যায়িকা "রাসেলাস।" ইহা জনসন সাহেব রচিত তন্নামক উপন্যাস অবলম্বনে রচিত। ইহার রচনা সংস্কৃত-ঘেঁষা ও বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত।

'টেকচাঁদ ঠাকুর' (প্যারীচাঁদ মিত্র)-প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" সন ১২৬৪ (খ্রীষ্টীয় ১৮৫৭) সালে প্রকাশিত হয়[১]। ইহা প্রকাশের কিছু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহা প্রায় সবই সংস্কৃত (অথবা ইংরেজীর) অনুবাদ বা ছায়া রচনা। সুতরাং "আলালের ঘরের দুলাল"-এর কথ্য-ভাষা মূলক ভাষা ও জনসাধারণের পরিচিত বিষয়-বস্তু সকলকেই কম বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। এ অনেকটা 'পিণ্ড-খর্জ্জুর খাইয়া বিরক্ত হইয়া তিন্তিড়ী ভক্ষণের' মত। (আমি অবশ্য "আলালের ঘরের দুলাল"কে সর্ব্বাংশে তিন্তিড়ী-শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহি না।) বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মূল কারণই এই বলিয়া আমার মনে হয়। নতুবা বিচার করিয়া

১ খ্রীষ্টীয় ১৯০৯ সালে প্রকাশিত ষোড়শ সংস্করণ অবলম্বনে। চতুর্দ্দশ (কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল) ও পঞ্চদশ সংস্করণে (চৈত্র ১৩১৪ সাল) গ্রন্থকার পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত করিয়াছিলেন। "পাঠকগণের অনায়াসে অর্থবোধের নিমিত্ত অনেক সমস্তপদ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, এবং কতকগুলি স্কুল বালকগণের পাঠের অনুপযুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।" [পঞ্চদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন]

১ ইঁহার "অভেদী" নামক ধর্ম্মমূলক উপন্যাস ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনা মিশ্র সাধুভাষা-মূলক।

দেখিতে গেলে "আলাল"-এর মধ্যে ভাষা ও রচনারীতির দোষ অনেক কিছুই পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ "আলাল"কে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না; ইহা একই গল্পসূত্রে রচিত কতকগুলি চিত্রসমষ্টি মাত্র। আর ইহার উদ্দেশ্য নীতিমূলক। ভাষার দিক হইতে—এবং অনেকটা ভাবের দিক হইতেও—বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে কেরির "কথোপকথন", প্রমথনাথ শর্ম্মার "নববাবু-বিলাস", টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল", এবং "হুতোম পেচার নক্সা" একই পর্য্যায়ের জিনিষ।

"আলাল"-এর ভাষার প্রধান গুণ, ইহা সকলের বোধগম্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গ্রন্থকার এই উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—যুক্ত ক্রিয়াপদের (compound verb) বর্জ্জন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে কথ্য বাঙ্গালা ধাতুর ব্যবহার; তদ্ভব ও দেশী প্রচলিত শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ; তৎসম শব্দের ন্যূনতম প্রয়োগ; সমাস-যুক্ত পদের পরিবর্জ্জন; এবং কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত আরবী পারসী শব্দের ব্যবহার। ইংরেজী শব্দও কতকগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন, 'ডবল', 'বোট', 'বাক্স', ইত্যাদি। পূর্ণচ্ছেদ অথবা কমা (comma) সেমিকোলন (semicolon)-এর পরিবর্ত্তে ড্যাশ (dash)-এর ব্যবহার খুবই করা হইয়াছে। পূর্ণচ্ছেদও অনেক সময় বাদ দেওয়া হইয়াছে।

"আলাল"-এর ভাষার প্রধান দোষ ইহাতে একই বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সাধুভাষা ও কথ্যভাষার রূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন: "মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে—গুরু মহাশয়ের নাক ডাকিতেছে—শিষ্য কি করিতেছে তাহা কিছুই জানেন না।" "ভাত খেতে বস্তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেছি—হেটেল পান্‌সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত;" 'চোক টিপ্তে লাগিলেন;' 'ধেয়ে আইল;' ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের কথ্য ভাষার রূপ প্রায়ই প্রকৃত নহে, সাধু ভাষা হইতে গঠিত বিকৃত রূপ। যেমন, 'চট্‌কাতেছেন', 'ভাবৃতেছেন', 'উঠ্‌তেছে', ইত্যাদি (এইগুলি অবশ্য ভাগীরথী-তীর হইতে পৃথক অঞ্চলের উপভাষা হইতে পারে); 'শুনিয়ে', ইত্যাদি। কথ্য ভাষা হইতে গঠিত বিকৃত সাধুভাষার ক্রিয়াপদও কতকগুলি পাওয়া যায়। যেমন, 'পালিয়া (=পালাইয়া) আসিতে হইয়াছিল;' 'পেছিয়া' (=পিছাইয়া); 'সকলেই ঘাড় বাড়িয়া (=বাড়াইয়া) কান পেতে রহিলেন;' ইত্যাদি।

আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য্যও একটা দোষ বলিয়া আমাদের মনে হইতে পারে। কিন্তু যখন বইটী রচিত হইয়াছিল তখনকার দিনে এই সকল আরবী ফারসী শব্দ জনসাধারণের খুবই সুপরিচিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 'সেখানে তাহাদিগকে বাজিঞ্জির মাটি কাটিতে হয়' ইত্যাদি প্রয়োগ এখন দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক সময় তৎসম ও বিদেশী শব্দ বিকৃত রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কতক ক্ষেত্রে ইহা ছাপার ভুল হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নহে। যেমন, 'সবি' (=ছবি); 'আমাদিগের কেবল বাঁশবোনে রোদন করা'; ইত্যাদি।

পূর্ব্বতন ভাষার ছাপও কিছু কিছু পাওয়া যায়। যেমন, '-দিগে' (=দিকে); 'করত' (=করিয়া), 'হওত' (=হইয়া; 'হওন'; 'উত্তরিলেন' (=পৌছিলেন); 'গুণ' (=গুণবান্) পুত্রেরা;' ইত্যাদি।

'বল' ও 'কহ' উভয় ধাতুরই প্রয়োগ আছে, তবে 'বল' ধাতুর প্রয়োগই খুব বেশী। 'আপনকার', হইবেক' ইত্যাদিরও অল্পস্বল্প প্রয়োগ আছে।

সামান্য বর্ত্তমান ও অসম্পন্ন বর্ত্তমান যথাক্রমে অসম্পন্ন বর্ত্তমান ও অতীতের স্থলে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, "তাঁহার নিকট দুই একজন আমলা ফয়লা আসিয়া ঠারে ঠোরে চুক্তির কথা কহিতেছে কিন্তু বরদা বাবু তাহাতে ঘাড় পাতেন না তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা বলিতেছে—"; "বাবুরাম চাকর ও পাইকের সহিত বোটের উপর উঠিলেন। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়া দুই দিগ দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন।"

"আলাল"-এর ভাষার মধ্যে সাধুভাষা ও মিশ্র সাধুভাষা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর উপভাষার নমুনা পাওয়া যায়। উপভাষাগুলি কথ্যভাষা-মূলক বটে, কিন্তু কিছু কিছু ভেজাল আছে। তাহা অবশ্য অপরিহার্য্য। উপভাষার রচনাগুলি থাকার দরুণ বইটী উপভোগ্য হইয়াছে। এই বিভিন্ন ধরণের রচনার কিছু কিছু উদাহরণ দিতেছি।

সাধু ভাষা—

১ খ্রীষ্টীয় ১৮৭০ সালে সুচারু যন্ত্র হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ অবলম্বন করিয়া এই আলোচনা করা হইয়াছে।

শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে ছাত্রদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে মনের শক্তির ও ভাব সকল সমানরূপে চালিত হইবেক। এক শক্তির অধিক চালনা করা কর্ত্তব্য হয় না। যেমন শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় তেমনি মনের সকল শক্তিকে সমানরূপে চালনা করিলে আসল বৃদ্ধি হয়। মনের সদ্ভাবাদিরও চালনা সমানরূপে করা আবশ্যক। একটি সদ্ভাবের চালনা করিলেই সকল সদ্ভাবের চালনা হয় না। [দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৮২]।

মিশ্র সাধুভাষা—

ছেলে একবার বিগ্‌ড়ে উঠ্‌লে আর সুযুত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমে ২ পেকে উঠ্‌তে পারে তখন কুকর্ম্মে মন না গিয়া সৎকর্ম্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়, কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা। অতএব যে পর্য্যন্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে সে পর্য্যন্ত নানা প্রকার সৎ অভ্যাস করান আবশ্যক। [পৃঃ ৫৭-৫৮]।

ভদ্রলোকের কথ্যভাষা (ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের) —

বাবুরাম বাবু! তুমি কাহার বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ? টাকার লোভেই গেলে যে! তোমাকে কি বল্‌ব? -- এ আমাদিগের জেতের দোষ। বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে—কেমন গো রূপর ঘড়া দেবে তো? মুক্তর মালা দেবে তো? আরে আবাগের বেটা কুটুম্ব ভদ্র কি অভদ্র তা আগে দেখ—মেয়ে ভাল কি মন্দ অন্বেষণ কর? [পৃঃ ৬৭]।

ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের কথ্য ভাষা—

(ঠকচাচা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে) মোদের নসিব বড় বুরা —মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে— মোকান বি গেল —বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না মোর বড় ডর তেনা বি পেণ্টে সাদি করে। (বাহুল্য বলিল—) দোস্ত! এ সব বাৎ দেল থেকে তফাৎ কর—দুনিয়াদারি মুসাফিরি— সেরেফ আনা যানা --কোই কিসিকা নেহি,—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে — সব জাহানমে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ। [পৃঃ ১৭৭-১৭৮]।

অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। বইটীর অধিকাংশই মিশ্র সাধুভাষায় রচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্রিয়াপদের সাধু ও কথ্য রূপ প্রায় এক সঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা অবশ্য ব্যাকরণ ও রচনারীতির হিসাবে দোষ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু এই প্রয়োগের জন্য ও আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারের জন্য রচনা সরস ও রোচক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ঝটিকাক্ষিপ্ত বালুরাশি ওয়েসিস্‌ সংলগ্ন পাহাড়ের রুক্ষ গাত্রদেশকে মসৃণ করিয়াছে। 'বিচিত্র জগৎ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পক্ষী

প্রবন্ধের নাম লইয়া হয় তো বিতর্ক উঠিতে পারে। কাহারো মতে অমুক পাখী সকলের চেয়ে মূল্যবান, কাহারো মতে বা অমুক পাখী। কিন্তু টাকা-পয়সার দিক হইতে যে দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানে পাখী খুবই মূল্যবান, এ বিষয়ে যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই।

গুয়ানে এক জাতীয় সামুদ্রিক পক্ষী। পেরুতে সাধারণত এই পক্ষী প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক ব্যবসায়িগণের হাতে এই পাখীর বংশ একরূপ নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছিল বলিয়া পেরুর গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা ইহার অবাধ শিকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের অনুর্ব্বর, বৃক্ষলতাহীন, পাষাণময় তীরভূমিতে পারীনা অন্তরীপ হইতে গুয়াকিল উপসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রায় এই পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দীর্ঘ উপকূল-রেখা বাহিয়া প্রায় সমান্তরাল ভাবে একটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা সামুদ্রিক স্রোত উত্তর দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে, তাহার নাম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Humboldt হুমবোল্ট এর নামানুসারে দেওয়া হইয়াছে Humboldt Current হুমবোল্ট কারেণ্ট। উপকূল রেখার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার উত্তাপ হইতেছে ৬০ ডিগ্রী ফারেণহাইট্—যেখানে অপেক্ষাকৃত দূরতর সমুদ্রজলের উত্তাপ ৭৮ হইতে ৮১ ডিগ্রি ফারেণহাইট। এই ঠাণ্ডা জলে একজাতীয় মাছ ও উদ্ভিদ জন্মায়, গুয়ানে পাখীদের তাহাই আবার প্রিয়খাদ্য। Humboldt Current যতদূর বিস্তৃত, গুয়ানে পাখীদের ঝাঁক ততদূর দেখিতে পাওয়া যায়; Humboldt Current যেখানে শেষ হইল গুয়ানে পাখীর বসতিও সেখানে শেষ হইল। এই উপকূলে বহু ছোট-খাটো প্রস্তরময় দ্বীপ আছে—প্রায়ই এই

গুয়ানে পক্ষীর ঝাঁক।

সব দ্বীপে জনমানব বাস করে না—এই দ্বীপগুলিও গুয়ানে পাখীর আড্ডা।
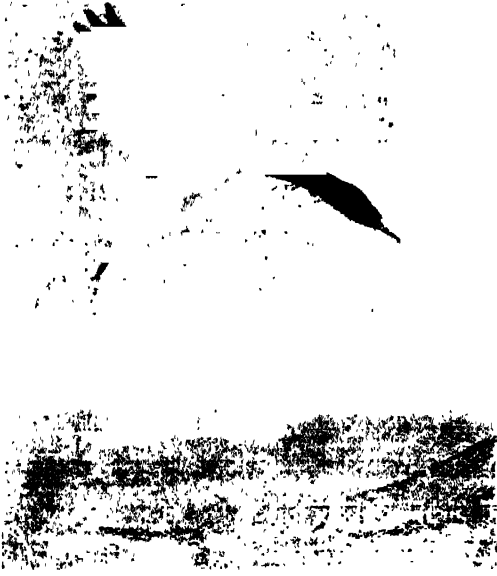
উড্ডীয়মান গুয়ানে।

গুয়ানে পাখীর বিষ্ঠাকে গুয়ানো বলে। গুয়ানো কৃষিক্ষেত্রের অতি উপাদেয় সার—এবং প্রাচীন কাল হইতেই পেরু ও বলিভিয়ার কৃষিক্ষেত্র সমূহে গুয়ানো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পেরু উপকূলের দ্বীপগুলি গুয়ানে পাখীর ঝাঁকে ভর্ত্তি—এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই সব অনুর্ব্বর দ্বীপের পাথুরে জমির উপর গুয়ানো জমিয়া স্তূপীকৃত হইয়া আছে—কিন্তু বাতাসে আদ্রতা না থাকায় উহা বিকৃত হয় নাই। এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনীই গুয়ানোকে এবং অধিকতর উপযোগী ও মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে ইহার যে বিশেষ কোনো উপযোগিতা আছে, তাহা পনেরো বৎসর পূর্ব্বেও ওখানকার লোকের পক্ষে সন্দেহের বিষয় ছিল।

যখন গুয়ানে পাখীর ঝাঁক সমুদ্রের জলে শিকার খুঁজিতে থাকে—তখন দূর হইতে ইহাদিগকে একটা কালো রংএর খুব বড় ভাসমান ভেলা বলিয়া মনে হয়। আবার যখন তাহারা কোনো দূরবর্ত্তী স্থানে শিকারের সন্ধানে যায় তখন আকাশে সুদীর্ঘ সরু সারি বাঁধিয়া উড়িতে থাকে—এত সুদীর্ঘ যে কোনো একটা বিশেষ স্থান পার হইতে গোটা সারিটার চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগিয়া যায়।

গুয়ানের সমজাতীয় অন্য কোনো পক্ষী দক্ষিণ আমেরিকার অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র মাগেলন প্রণালীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে ইহাদের নিকটতম জ্ঞাতি এক জাতীয় cormorant * পাখী বাস করে। এই জাতীয় cormorant দক্ষিণ মেরুর তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে বিস্তর আছে—কিন্তু Humboldt currentবাসী গুয়ানে পাখী হইতে হিমময় মেরুপ্রদেশীয় এই সকল পাখীর শরীরগত পার্থক্য বিস্তর।

গুয়ানে পাখী জলের উপর হইতে ছোঁ মারিয়া অনেক সময় শিকার ধরে। এই খানেও মাগেলন প্রণালীস্থ ও মেরুপ্রদেশীয় পাখীদের সহিত গুয়ানের শিকার-প্রণালীর পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পাখী অনেক সময় গভীর জলে ডুব দিয়া শিকার ধরে কিন্তু গুয়ানে ডুব দিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না বলিয়া অল্প জলে যে সকল মাছ সাঁতার দিয়া বেড়ায়—তাহাই ছোঁ মারিয়া ধরে।

সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় দশ বিশটা গুয়ানে উপকূল হইতে উড়িয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে—ইহারা নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এদিক ওদিক উড়িতে থাকে

গুয়ানে-মাতা ডিমে তা দিতেছে।

* লিপ্তপদ মৎস্যভুক্ সামুদ্রিক পক্ষী বিশেষ।

এবং যেমন জলের উপর মাছের ঝাঁক ভাসিতে দেখে, অমনি ছোঁ মারিতে সুরু করে—ইহাদের ছোঁ মারিতে দেখিয়া তীরবর্তী পাখীর ঝাঁক বুঝিতে পারে যে এইবার শিকারের সন্ধান মিলিয়াছে, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী নানাদিক হইতে উড়িয়া আসিতে থাকে।

গুয়ানে পাখী পেঙ্গুইনের মত সোজা হইয়া মানুষের মত হাঁটে। সাধারণতঃ ইহাদের উচ্চতা আঠারো ইঞ্চি হইতে কুড়ি ইঞ্চি ও ওজন দুই সের হইতে আড়াই সের। ইহাদের
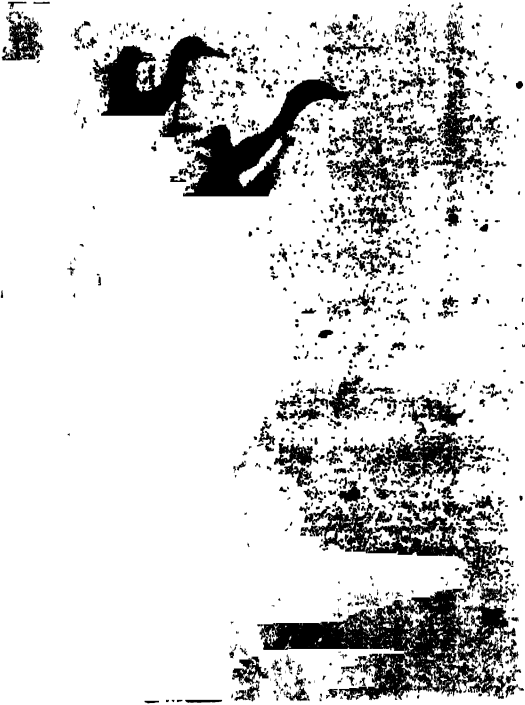
সমুদ্রতীরে পাহাড়ের শীর্ষে উৎসুক গুয়ানে-কুল!

গলা নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, বুক দুধের মত সাদা। এক একটা দ্বীপে বহুসংখ্যক পাখী একত্রে বাস করে—ডাঃ কোকার একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন দক্ষিণ চিন্‌কা দ্বীপে একটি মাত্র বাসস্থানে অন্ততঃ দশলক্ষ পাখী থাকে। কোনো কোনো স্থানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় এক কোটী।

মানুষ দেখিলে ইহারা সকলে একসঙ্গে উড়িয়া যায় না—প্রথমে মানুষকে খুব কাছে আসিতে দেয়—এমন কি অনেক সময় দুই হাত দূরে আসিলেও নড়ে না। মনে হয় বুঝি হাত বাড়াইলেই ধরা যাইবে। হঠাৎ খুব নিকটের দু' দশটা পাখী উড়িতে আরম্ভ করে—তাহাদের দেখাদেখি বিশটা পঞ্চাশটা ক্রমে দুশো পাঁচশো পাখী ডানার ভীষণ ঝটাপট্ শব্দ করিতে করিতে আকাশে উঠিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে কালো রংএর সচল ঝাঁকে আকাশ আবৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ আকাশে থাকে না, মানুষ সরিয়া ক্রমে দূরে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে ঝাঁকটা উড়িয়াছিল, সেটা মাটীতে নামে। এই রকমে একে একে আগের সব ঝাঁকগুলাই আবার মাটীতে আসিয়া বসে—তখন দূরতম প্রান্তের ঝাঁকগুলি উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, একদিকে যত ওড়ে, অন্যদিকে তত বসে। বেশী কুইনিন্ সেবনে যেমন কান ভোঁ ভোঁ করে, নিকটে গিয়া শুনিলে ইহাদের অসংখ্য ডানার অনবরত ঝটাপট্ ধ্বনিতে কানের মধ্যে তদ্রূপ অস্বস্তি অনুভূত হইতে থাকে।

গুয়ানে পাখীর ঝাঁক শিকার অন্বেষণে অনেক সময়ে বহুদূর সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িলেও সমুদ্রের মধ্যে তাহারা কখনো রাত্রি যাপন করে না—পেলিকান জাতীয় পাখীদের মত। ডাঃ কোকার লিখিয়াছেন, "আমি অনেক সময় গুয়ানে পাখীর ঝাঁক দূর সমুদ্র হইতে ফিরিতে দেখিয়াছি—বেলা দুইটার সময় ঝাঁকের প্রথম পাখী দেখা দিল এবং শেষের দলটি যখন তীরে আসিয়া পৌঁছিল তখন রাত্রি প্রায় সাতটা।" অনেক সময় তিন চারটি দীর্ঘ শ্রেণীতে বড় ঝাঁকটি বিভক্ত হইয়া যায়—প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন দলপতি আগে আগে পথপ্রদর্শক ভাবে থাকে—শ্রেণীগুলির মধ্যে ১০।১৫ গজ তফাৎ থাকে, কখনও বা বেশী।

গুয়ানের শত্রু অনেক। তীরবর্তী পাখীদের ছানা ও ডিম অধিকাংশ সময়ই জলসিংহ sea lionএর সুখাদ্য। গভীর রাত্রে চুপি চুপি জল হইতে উঠিয়া প্রায়ই ইহারা ছোট ছোট ছানাগুলিকে খাইয়া ফেলে—সুবিধা পাইলে ধাড়ী পাখীও বাদ দেয় না—ডিমগুলি কতক খাইয়া ফেলে, কতক শরীরের ভারে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। ছানাগুলির গায়ে অনেক সময় এক প্রকার উকুন জন্মায়, তাহাদের উৎপাতে ছানাগুলি বাড়িতে পারে না, রোগগ্রস্ত হইয়া মারাও পড়ে। সিন্ধুশকুন ও কণ্ডর্ নামে সুবৃহৎ শিকারী পক্ষীও ইহাদের ভয়ানক ভক্ত। অনেক সময় ইহাদের উৎপাতে ধাড়ীপাখীর ঝাঁক ছানা ও ডিম ফেলিয়া পলাইয়া যায়—বহুদূর পর্য্যন্ত তীরভূমি জুড়িয়া শুধু দেখা যায় ভাঙা ডিমের খোলা ও ছানার রক্তাক্ত

মৃতদেহ। এই অবস্থায় একটা কণ্ডর পাখীকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল—তার পাকস্থলী হইতে ষোলটা ডিমের শ্বেতসার ও হরিদ্রাংশ পাওয়া যায় কিন্তু একটুক্‌রাও ডিমের খোলা পাওয়া যায় নাই।
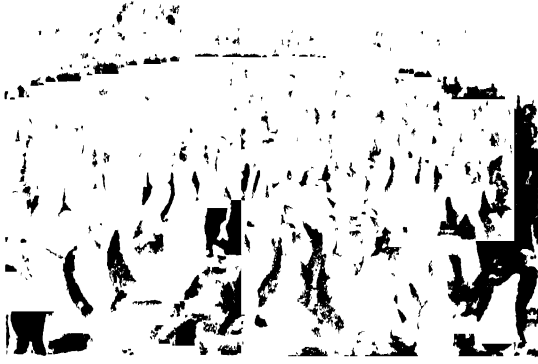
পেস্‌কাদোর দ্বীপপুঞ্জের গুয়ানে জনসভা।

ধাড়ী পাখীরা ছানাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য গলার মধ্যে পুরিয়া আনে এবং পিতামাতা ফিরিয়া আসিলে ছানারা তাহাদের গলার মধ্যে মুণ্ড পুরিয়া দিয়া খাবার বাহির করিয়া খায়। গুয়ানে পাখীর ছানা মানুষ দেখিয়া ভয় পায় না, বরং মানুষ দেখিলে কৌতূহলের দৃষ্টিতে কাছ ঘেঁসিয়া আসে আরও ভাল করিয়া দেখিবার জন্য।

পনেরো বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ অবস্থা ছিল, সেরূপ অবাধ শিকার ও ডিমসংগ্রহ এখনও চলিতে থাকিলে এতদিন গুয়ানে পাখীর বংশ নির্ম্মূল হইয়া যাইত। কিন্তু ১৯১৮ সালে পেরু গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা গুয়ানে পাখীর ডিমসংগ্রহ ও শিকার অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস ভিন্ন অন্য সময় গুয়ানের বাসস্থানে যাওয়াও আইনানুসারে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। পাখীদের পরিরক্ষণ ও গুয়ানো ব্যবসায় সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে ঐ সালে জাতীয় গুয়ানো পরিচালন National Guano Administration নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কর্ম্মীগণ সকলেই পেরু গবর্ণমেণ্টের বেতনভুক্ কর্ম্মচারী। পাখীদের মধ্যে সংক্রামক রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে বা রোগ দেখা দিলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা হয়—এজন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ পক্ষীতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সমিতির উদ্যমে গুয়ানো ব্যবসায়ের উন্নতিও সাধিত হইয়াছে—যেখানে ১৯১৪ সালে পেরু হইতে ২৫,০০০ টন গুয়ানো বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, সে স্থলে দশ বৎসর পরে ১৯২৪ সালে ৯০,০০০ টন গুয়ানো রপ্তানী হইয়াছিল। বর্ত্তমানে গুয়ানো ব্যবসায়ের আরও উন্নতি হইয়াছে।

লিবীয় মরুভূমির বেদুইন জাতি

ইজিপ্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ইজিপ্ট ও ত্রিপোলির মধ্যে লিবীয় মরুভূমি। এই মরুভূমির সর্ব্বত্রই বেদুইন আরব জাতি বাস করে। 'বেদুইন' আরবী শব্দ, ইহার অর্থ 'মরুবাসী'—কিন্তু আজকাল বেদুইন বলিতে যে কোনো ভ্রাম্যমান পশুপালক জাতি বোঝায়—তাহারা শ্বেতকায় হৌক্ বা কৃষ্ণকায় হৌক্, আরব হৌক্ বা নিগ্রো হৌক্।

আসল বেদুইন জাতি মধ্য আফ্রিকার নিগ্রো অপেক্ষা সুশ্রী—শ্বেতকায় বেদুইন প্রায়ই আরব; কৃষ্ণকায় বেদুইন (বিশেষতঃ যাহারা লিবীয় মরুর দক্ষিণে বাস করে) প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—টেবু, গোরান ও বিদিয়াৎ। অনেকে সেনুসি সম্প্রদায়কে বেদুইন আরবের একটি শ্রেণী বলিয়া ভুল করেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেনুসি কোনো একটি পৃথক জাতি নহে, ইহা একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়, মুসলমান ধর্ম্মেরই একটি ভিন্ন সম্প্রদায় মাত্র। উত্তর আফ্রিকার সর্ব্বত্রই এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত প্রবল।

মরুভূমির পথে।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে আলজিরিয়া হইতে সিদি মোহম্মদ ইবন্ আলি এল্ সেনুসি নামে জনৈক সাধুপুরুষ মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন ও সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার

পরে এই ধর্ম্মমত প্রচার করেন। ইহার অনেক শিষ্য অন্য অন্য দেশেও প্রচারকার্য্যে চলিয়া যায় - দেখিতে দেখিতে কুফ্রার উত্তরে সমগ্র স্থানে সেন্নুসি মত বিস্তৃতি লাভ করে। সেন্নুসি প্রসিদ্ধ জগ্‌বাহব্‌ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

জাঘবুবের মস্‌জিদের গুম্বজ : প্রধান সেন্নুসীর সমাধি ইহার নীচে অবস্থিত।

জগ্‌বাহব্‌ লিবীয় মরুভূমির প্রান্তবর্ত্তী একটি ওয়েসিস্‌ ও ক্ষুদ্র সহর। এই জগদ্বিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্রই ইহার সবটুকু, মস্‌জিদ ও বিদ্যালয়ের বাহিরে সহরের কোনো পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। মস্‌জিদে একসঙ্গে ৫০০।৬০০ শত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারে এবং ইহার সুবৃহৎ

জগ্‌বাহব ওয়েসিস্‌ ছাড়াইয়া একশত মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে সিউয়া ওয়েসিস্‌। এখানকার খেজুর প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখান হইতে খেজুর রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে খেজুরের বাজারে একটি অদ্ভুত ধরণের প্রথা প্রচলিত আছে। বাজারে যখন শুষ্ক বা সুপক্ক খেজুর স্তূপীকৃত করা থাকে, তখন যে কোনো ভিক্ষুক বা পথিক তাহা হইতে পেট ভরিয়া যত ইচ্ছা খেজুর খাইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সিউয়ায় কেহ উপবাসী থাকে না। সিউয়া লিবীয় মরুভূমির একটি প্রাচীনতম ওয়েসিস্‌—খেজুর ও জলপাইয়ের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানকার ব্যবসায়িগণ প্রায়ই শ্বেতকায় বেদুইন আরব।

সিউয়া হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে জাকো—আর একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার বাণিজ্যদ্রব্য হস্তীদন্ত, খেজুর ও অষ্ট্রিচের পালক। এখানকার ব্যবসায়ে বেদুইন আরবদের স্থান নাই—মাজাব্রা জাতিই এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী এবং সুবিস্তৃত লিবীয় মরুভূমির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। এক একজন সওদাগর এক হাজার দেড় হাজার উটের মালিক, উত্তর আফ্রিকায় সর্ব্বত্র ইহাদের উট যাতায়াত করে।

মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রতিদিন বহু বণিকদল যাতায়াত করে। গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীগণও সরকারী কাজে একস্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে। মরুভূমিতে কেহই একা ভ্রমণ করে না—সবাই দল বাঁধিয়া যায় এবং এক এক দলে অনেক উট ও লোকজন থাকে। লিবীয় মরুভূমিতে ভ্রমণ খুব নিরাপদ নয়—বেঘোরে পড়িলে মরুভূমির মধ্যে প্রাণ হারানোও বিচিত্র নয়। এই সকল মরুভূমিতে প্রায়ই ভীষণ ঝড় উঠিয়া চারিধারে বালি উড়াইতে থাকে—একটু আধটু বালি নয়, সে ভয়ানক ব্যাপার। মরুভূমির মধ্যেকার বালির পাহাড় তখন সচল হইয়া উঠে, উড়ন্ত বালিরাশি সূর্য্যদেবকে

জালোর ওয়েসিস্‌। ইহার খর্জ্জুর তালবীথির আশ্রয়ে প্রায় ২০০০ লোকের বসতি।

গম্বুজের নীচে সিদি মোহাম্মদ সেন্নুসির সমাধি অবস্থিত। সেন্নুসি সম্প্রদায়ের লোকের নিকট ইহা একটি পবিত্র তীর্থস্থান—বহুদূর হইতে লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে।

ঢাকিয়া ফেলে। এই অবস্থায় পথিক প্রায়ই বিপদে পড়ে—বালি উড়িয়া চোখে মুখে আসে বলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে তো হয়ই—কিন্তু মুস্কিল এই যে অত্যন্ত সতর্ক থাকিলেও এই সময় অনেকে পথ হারাইয়া ফেলে এবং এই

জনমানবহীন পদচিহ্নহীন মরুপ্রদেশে পথ হারানো মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

মরুভূমিতে ঝড় উঠিলে কখনো দাঁড়াইয়া থাকিতে নাই—অগ্রসর হওয়া যতই কষ্টকর হউক না কেন, অগ্রসর হওয়াই বিধেয়—নতুবা বালুরাশি দ্বারা প্রোথিত হইতে হইবে। অথচ সে সময় যদি সামনের দিক হইতে ঝড় বয়, তবে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে—ডান দিক বা বাম দিক হইতে ঝড় বহিলে ভ্রমণ তত কষ্টকর হয় না। কিন্তু অগ্রগমন কষ্টসাধ্য হইলেও অভিজ্ঞ পথিক ঝড়ের সময় কখনোই এক জায়গায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে না—এমন কি উটেরাও ইহা বুঝিতে পারিয়া যত ধীরে ধীরেই হৌক—অগ্রসর হইবেই।

মরুভূমিতে চলাফেরার কতকগুলি নিয়মকানুন আছে—ঝড়ের সময় কি করিতে হয়, পথ হারাইয়া গেলে কি করিতে হয়, জল কি ভাবে খুঁজিতে হয় ইত্যাদি। এগুলি না জানা থাকিলে প্রায়ই বেঘোরে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ভিন্ন কখনই মরুভূমির পথে যাইতে নাই—অনেক সময় অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীর দলও মারা পড়ে।

পথিকদের সঙ্গে খাদ্য থাকে প্রধানতঃ চাউল, ময়দা, খেজুর ও বেদুইনদের মাখন। এই মাখন অতি অদ্ভুত পদার্থ। ভেড়ার দুধ হইতে ইহা তৈয়ারী হয়, কিন্তু বেদুইনরা টাটকা মাখন ব্যবহার করিতে জানে না। চামড়ার থলির মধ্যে রাখিয়া যখন বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়ে—তখন বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরিত হয়। লিবীয় মরুভূমির সর্ব্বত্র এই ধরণের মাখন ছাড়া মেলে না।

বেদুইনরা চায়ে দুধ মিশাইয়া খায় না। সমান পরিমাণে চা ও চিনি জলে খুব কড়া করিয়া সিদ্ধ করে এবং বড় গ্লাসে করিয়া সেই ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের কড়া ও তিক্ত চা মহা আনন্দে পান করে। উহারা কফিতেও দুধ মেশায় না। দুধ পাওয়া যায় না বলিয়া নয়—এই রকম ভাবে চা ও কফি খাওয়াই উহাদের অভ্যাস।

মরুভূমির প্রধান খাদ্য কিন্তু ভাত। এখানকার চাউল মোটা হইলেও সাদা ও দেখিতে ভাল। বেদুইনরা গরম ভাত ছাড়া বাসি ভাত কখনও খায় না। ময়দা দিয়া আমাদের দেশের হাতে গড়া চাপাটি রুটীর মত মোটা মোটা রুটী প্রস্তুত করে—কিন্তু তাহা খাইতে আদৌ সুস্বাদু নয়। রুটী গড়িয়া চামড়ার থলির মধ্যে পুরিয়া লয় ও পথে খাইতে খাইতে যায়।

লিবীয় মরুভূমির দক্ষিণ দিক হইতে যাযাবর পাখীরা উড়িয়া ইউরোপের দিকে যায়—একটা একটা ছোট রবিন পাখী একবারও জল না খাইয়া ২৫০ শত মাইলেরও বেশী উড়িতে পারে। অনেক সময় সচল পক্ষী উটকে বৃক্ষ ভ্রম করিয়া তাহাদের উপর বসে। এই ক্ষুদ্রকায় পথিকদল কখনো দিক ভুল করে না। একা থাকিলেও ঠিক গন্তব্যস্থান অভিমুখে যাইতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে ট্রাজেডিও ঘটে,—তার 'নীরব' কাহিনী অনেক সময় লেখা থাকে বালির উপর ছড়ানো ছোট ছোট ডানার হাড় ও পালকে। হয় তো অবসাদ, ক্লান্তি, হয় তো জলাভাব, কিংবা অতিরিক্ত গরম কে জানে? শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষে নানা তোড়জোড় সঙ্গে লইয়া দল বাঁধিয়া যে দুস্তর মরুভূমি পার হইতে হিমসিম খাইয়া যায়—এই ক্ষুদ্র, অসহায় পক্ষীর দল অনেক সময় একটা পাখী—কি করিয়া তাহা পার হইয়া, সমুদ্র পার হইয়া, নানা দিগ্দেশ পার হইয়া, পূর্ব্ব বৎসরের অভ্যস্ত স্থানটিতে পৌছায়। এ রহস্যের কে মীমাংসা করিবে?

কুফ্রার লবণাক্ত হ্রদ। এই হ্রদ প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। ইহারই চারি পাশে ওয়েসিস। সম্মুখে বৃদ্ধ সর্দ্দার দাঁড়াইয়া।

এই ভীষণ মরুভূমিতে অভিজ্ঞ লোকও অনেক সময়ে বিপদে পড়ে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জিঘেন্ হইতে কিছু দূরে অনেক দিন পূর্ব্বে এল্ ফাডিল্ নামক অভিজ্ঞ ও নিপুণ পথ-প্রদর্শক দলবল সহ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাইয়াছিল। এল্ ফাডিল বহু বৎসর ধরিয়া জালো ও কুফ্রার মধ্যে পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছে। পথ তাহার নখদর্পণে। একবার সে একদল বণিক্‌কে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে ভয়ানক ঝড় উঠিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া দিল। এল্ ফাডিল্ পথ চিনিতে না পারিয়া জলের কূপ হইতে দূরে অন্য এক পথে সকলকে পরিচালিত করিয়া লইয়া গেল। অনেক দূর আসিয়া এল্ ফাডিল্ তাহার ভুল বুঝিতে পারিল বটে, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। ফলে এই দলের প্রত্যেক লোক ও উট তৃষ্ণায় প্রাণ হারাইল।

বহু চেষ্টার ফলে পনেরো বৎসর পরে বালুসমুদ্রের মধ্যে ইহাদের কঙ্কাল ও জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছিল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) —শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত তাঁহার কপিলবাস্তু হইতে রাজগৃহে ফিরিয়া দ্বিতীয় বর্ষা যাপন পর্য্যন্ত বলিয়া আমরা অন্য আলোচনার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, আবার তাহা আরম্ভ করি। আগে বলিয়াছি যে রাজা বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ, পর পর এই তিন বর্ষা রাজগৃহে "বেণুবন-আরামে" যাপন করিয়াছিলেন। বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুতে রাজগৃহের কাছাকাছি স্থানগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সময়ের কয়েকটি ঘটনার কথা বলিব।

অনাথপিণ্ডদের কথা

সুদত্ত নামক একজন মহা ধনবান শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তীতে বাস করিতেন। রাজগৃহের একজন শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে সুদত্তের ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। সুদত্তকে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে প্রায়ই রাজগৃহে আসিতে হইত এবং আসিলে তিনি ভগ্নীপতির বাড়ীতেই উঠিতেন। একবার সুদত্ত রাজগৃহে আসিয়া ভগ্নীপতির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বাড়ীতে কেমন যেন একটা ব্যস্ততার ভাব, ভগ্নীপতি আগে যেমন তিনি আসিলেই সব কাজ ছাড়িয়া তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিতেন এবার তাহা না করিয়া কি যেন কাজে ব্যস্ত হইয়া চাকর-বাকরদের ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। পরে ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা হইলে সুদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে কি বিবাহ আছে, না মগধরাজ বিম্বিসারকে আহারে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে! ভগ্নীপতি বলিলেন যে সেদিন তিনি সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সুদত্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কি বলিলে—বুদ্ধ? আসল বুদ্ধের দেখা পাওয়া বড় কঠিন।" বুদ্ধ সশিষ্য শ্রেষ্ঠীভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলে তাঁহার সঙ্গে সুদত্তের পরিচয় হইল। সুদত্তের বুদ্ধকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই ভাল লাগিয়াছিল কারণ পরদিন সুদত্ত প্রত্যূষে একাকী "বেণুবন-আরামে" বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। বুদ্ধ তখন পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ধ্যান করিতেছিলেন। সুদত্ত নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আশা করি ভগবানের সুনিদ্রা হইয়াছে?" বুদ্ধ বলিলেন, "যাহার কাম ক্রোধ পাপ দূর হইয়াছে, সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তৃষ্ণা দূর হইয়াছে ও মনে শান্তি আছে, তাহার সর্ব্বদাই সুনিদ্রা হয়।" সুদত্ত বুদ্ধের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করিলেন ও তাঁহার গৃহী শিষ্য হইলেন। সুদত্ত অনেক অনাথ ব্যক্তিকে অন্নদান করিতেন বলিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার নাম "অনাথপিণ্ডদ" (অনাথপিণ্ডিক)। আমরাও তাঁহাকে এখন হইতে এই নামে অভিহিত করিব। ইনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন; দানের জন্য ও বুদ্ধের প্রতি ভক্তির জন্য ইঁহার অসীম সুখ্যাতির কথা বৌদ্ধ-সাহিত্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্ঘের প্রয়োজনে যত অর্থই লাগুক ইনি তাহা ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প আমরা পরে বলিব।

অনাথপিণ্ডদ একবার বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে আসিয়া এক বর্ষা যাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, "হে গৃহপতি, তথাগতেরা নির্জ্জন স্থান ভাল বাসেন (সুঞ্ঞাগারে খো গহপতি, তথাগতা অভিরমন্তি)।" শ্রাবস্তী বহু জনাকীর্ণ, ব্যবসাবাণিজ্য-প্রধান কোলাহলময় নগর ছিল; অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের কথার অর্থ বুঝিলেন কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। একথা তাঁহার মনে রহিল।

রাজগৃহের কার্য্য শেষ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিবার সময় অনাথপিণ্ডদ পথে সব জায়গায় বলিয়া গেলেন যে বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে যাইবেন তখন যেন কোন সুবন্দোবস্তের ত্রুটী না হয়। বড় লোক ছিলেন বলিয়া অনাথপিণ্ডদের অনেক বন্ধু ও অনুগত লোক ছিল ও তাঁহার মুখের কথার দাম ছিল।

শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের বাসের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক খুঁজিবার পর জেত নামক রাজকুমারের একটি উদ্যান তাঁহার পছন্দ হইল। তিনি জেতের সঙ্গে দেখা করিয়া উদ্যান কিনিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন কিন্তু জেত বলিলেন যে একটির পাশে একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা সাজাইয়া সমস্ত উদ্যান ঢাকিয়া দিলেও তিনি উহা বিক্রয় করিবেন না। অনাথপিণ্ডদ ঐ দামই দিতে রাজি হইলেন কিন্তু জেত বলিলেন, ঐ দাম দিলেই যে তিনি উদ্যান বিক্রয় করিবেন এমন কোন সর্ত্ত হয় নাই। সর্ত্ত হইয়াছে

কি না ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হইল, শেষে তাঁহারা মহামাত্যদের কাছে বিচার প্রার্থনা করিলেন। মহামাত্যেরা সব শুনিয়া বলিলেন যে, সর্ত্ত হইয়াছে এবং অনাথপিণ্ড ঐ দাম দিলে জেত উদ্যান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। বর্ণিত আছে যে অনাথপিণ্ডদের হুকুমে তাঁহার লোক গাড়ী-বোঝাই স্বর্ণ-মুদ্রা আনিয়া পাশাপাশি বিছাইয়া উদ্যান ঢাকিয়া দিল। একটু জায়গা বাকি ছিল, অনাথপিণ্ডদ আরও গাড়ী বোঝাই করিয়া স্বর্ণমুদ্রা আনিতে বলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া জেত ভাবিলেন না জানি কি একটা বৃহৎ ব্যাপার হবে হইবে! তিনিই বা কেন বাদ যান? তাই জেত বলিলেন ও জমিটুকু আর স্বর্ণমুদ্রায় ঢাকিতে হইবে না, উহা তিনি নিজেই দান করিতেছেন। ঐ জমির উপর জেত নিজে একটি ঘর বানাইয়া দেন। অনাথপিণ্ডদ উদ্যানে সুবৃহৎ "আরাম" বানাইলেন, তাহাতে বাসঘর, শয়নঘর, ভাণ্ডারঘর, রন্ধনঘর, স্নানঘর, পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ আরামে বহুভিক্ষু বাস করিতে পারিত ও তাহাদের সকল প্রকার সুবিধা যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা ছিল। বুদ্ধের জন্য যে প্রকোষ্ঠটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা বোধ হয় চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত ছিল কারণ ইহাকে "গন্ধকুটি" বলা হইত এবং ইহা হইতে পরে অন্যত্র অন্য আরাম বা বিহারে বুদ্ধ যে ঘরে থাকিতেন তাহাকেই "গন্ধকুটি" বলা হইত। মুদ্রা সাজাইবার গল্পের অর্থ বোধ হয় যে অনাথপিণ্ডদ বহুব্যয়ে এই আরাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহাতে অনেকদিন লাগিয়াছিল এবং বুদ্ধের সঙ্গে অনাথপিণ্ডদের ঘনিষ্ঠতা হইতেও সময় লাগিয়াছিল। অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উহা দান করিলেন ও এই আরামের নাম "জেতবন" রাখা হইল।
(চুল্লবগ্‌গ, ৬।৪,৯)

বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে আসিলে "জেতবনে"ই বাস করিতেন। জীবনের শেষ পঁচিশ বর্ষা তিনি এখানেই যাপন করিয়াছিলেন। ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর বদান্যতায় এখানে ভিক্ষুদের কোন অভাবই হইত না। শ্রাবস্তীতে আরও অনেক ধনাঢ্য শিষ্য শিষ্যা বুদ্ধের হইয়াছিল শ্রাবস্তী কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল, কোশলের রাজা প্রসেনজিৎও (পসেনদি) বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। বহু উপদেশ দান, বহু লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক বুদ্ধ এই "জেতবনে" বসিয়া করিয়াছিলেন, তাঁহার ও সঙ্ঘের জীবনের কত ঘটনাই এখানে ঘটিয়াছিল। এই সব কারণে জেতবন বৌদ্ধশাস্ত্রে এত বিখ্যাত যে বুদ্ধের সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিতে হইলেই তাহার আরম্ভ প্রায়ই "তেন সময়েন (-অথবা, একং সময়ং-) বুদ্ধো ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্‌স আরামে" —সেই সময় (-অথবা এক সময়ে-) ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডদের আরাম জেতবনে বাস করিতেছিলেন" ইত্যাদি।

ফা-হিয়েন, হিউএন্থ-সিয়াং প্রভৃতি চৈনিক বৌদ্ধভক্তগণ ভারতের বুদ্ধস্মৃতিজড়িত স্থানগুলি পরিদর্শনের সময় জেতবনকে জীর্ণদশায় দেখিয়াছিলেন। রাজগৃহের আর একটি স্থানে বুদ্ধ প্রায়ই বাস করিতেন, ইহা "গৃধ্রকূট" (গিজ্‌ঝকূট) নামক পর্ব্বত। ভক্ত ফা-হিয়েন "জেতবন" আরাম ও গৃধ্রকূট পর্ব্বতে যেখানে বুদ্ধ বাস করিতেন তাহা দেখিয়া সেখানে বুদ্ধ যেসব উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই এই দুঃখে রোদন করিয়াছিলেন।

সুমন নামক মালী রাজা বিম্বিসারকে ফুল জোগাইত। একদিন সে রাজার জন্য ফুল লইয়া যাইতেছিল এমন সময় বুদ্ধকে পথে দেখিল। বুদ্ধ নগরে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। সুমন বুদ্ধকে দেখিয়া শ্রদ্ধালু হইয়া ফুলগুলি বিহারে গিয়া তাঁহাকে দিয়া আসিল। বুদ্ধ স্মিতহাস্যে তাহার এই ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিলেন। সুমন বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে এই কথা জানাইলে সেদিনকার ফুলের দাম মিলিল না বলিয়া স্ত্রী মালীকে গালাগালি করিতে লাগিল। ইহাতেও রাগ শান্ত না হওয়ায় সে দৌড়িয়া রাজার কাছে গিয়া বিবাহ-ভঙ্গের প্রার্থনা করিল। বিম্বিসার ব্যাপার শুনিয়া তাহাকে সভা হইতে তাড়াইয়া দিয়া মালীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহাকে অর্থ-পুরস্কার দিলেন (ধ-কথা, ২।৪০-৪৭)।

জীবকের কথা

রাজগৃহের আর একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন, ইঁহার নাম জীবক। জীবক চিকিৎসক ছিলেন; বড়লোকদের, রাজা বিম্বিসারের ও অন্যান্য রাজ্যের রাজাদেরও চিকিৎসা করিতেন। বুদ্ধ একবার অসুস্থ হইলে জীবক জোলাপ দিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের অনুরোধে জীবক বুদ্ধের চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবক প্রথমে বুদ্ধকে মালিশের ঔষধ দেন, তাহাতে ফল না হওয়ায় মৃদু জোলাপের জন্য নীলপদ্মের

পাপড়িতে ঔষধ লাগাইয়া জীবক বুদ্ধকে আঘ্রাণ করিতে দিলেন। কয়েকবার দাস্ত হইলে তিনি বুদ্ধকে গরম জলে স্নান করিতে বলিলেন। ইহাতে বুদ্ধের উদরশূল সারিয়া গেল। তারপর জীবক বুদ্ধকে কিছুদিন তরল খাদ্য খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। জীবকের মত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে জীবকের জীবন ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের অনেক গল্প লিখিত আছে। কয়েকটির কথা এখানে বলিব।

রাজগৃহের একজন শ্রেষ্ঠী ব্যবসা উপলক্ষে বৈশালী নগরে গিয়াছিলেন। বৈশালীর শোভা ও বৈভব দেখিয়া শ্রেষ্ঠী মুগ্ধ হইলেন কিন্তু বৈশালীর সব জিনিষের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠীপ্রবরের মনে লাগিল তাহা গণিকা আম্রপালী (অম্বপালী)। এখনকার নৈতিক রুচিতে গণিকা ঘৃণ্যা হইলেও সেকালে সমাজে ইহাদের স্থান ও মর্য্যাদা ছিল। গণিকা ও সাধারণ পণ্যস্ত্রীতে প্রভেদ আছে। পরমাসুন্দরী, নৃত্যগীতকুশলা কলানিপুণা সুচতুরা রমণীই গণিকাবৃত্তি করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত। যে সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক লোক লালায়িত হইত, যাহাকে লইয়া রাজায় রাজায় বিবাদ বাধিত তাহাকে একজনের হাতে না দিয়া সাধারণের সম্পত্তি করা হইত, "গণে"র অর্থাৎ সাধারণের ভোগ্যা বলিয়া ইহাদের "গণিকা" বলা হইত। পরে ইহাদের নানা কলাবিদ্যা শিখাইয়া ব্যবসা করিতে দেওয়া হইত। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এই শ্রেণীর রমণীদের অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়; প্রাচীন গ্রীসে এই শ্রেণীর রমণীদের "হেটাইরা" বলা হইত এবং সমাজে তাহাদের উচ্চ স্থান ছিল—সোক্রাটিস্ প্রভৃতি জ্ঞানী ও মান্য ব্যক্তিরাও ইহাদের গৃহে আলাপ-আলোচনা করিতেন; পণ্ডিত, রাজা, শাসক, ধনী প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও ইহাদের বন্ধুত্বলাভ করিতে পারিলে ধন্য বোধ করিতেন। যাহা হউক শ্রেষ্ঠীমহাশয় বৈশালী হইতে রাজগৃহে ফিরিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, আম্র-পালীর জন্যই বৈশালীর অত জাঁক, তাঁহারাও রাজগৃহে একজন গণিকা বসাইয়া বৈশালীর সঙ্গে পাল্লা দিবেন। রাজা সহজেই রাজি হইয়া উপযুক্ত একটি তরুণীর সন্ধান করিতে বলিলেন। শালবতী (সালবতী) নামে একটি অতি সুন্দরী বালিকাকে পাওয়া গেল। শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া শ্রেষ্ঠী শালবতীকে গণিকার পদে বসাইয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শালবতী কিছু দিনের মধ্যে সুদক্ষা হইয়া বৃত্তি আরম্ভ করিল; আম্রপালী একরাত্রির জন্য পঞ্চাশ কার্ষা পণ লইত, শালবতী একশত কার্ষা পণ লইতে লাগিল। কিছুদিন পরে শালবতীর গর্ভসঞ্চার হইল; গর্ভবতী গণিকার আদর নাই জানিয়া শালবতী দ্বারপালকে বলিয়া দিল যে লোক আসিলে "শালবতী অসুস্থ, কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না" বলিয়া বিদায় করিতে হইবে। যথাসময়ে শালবতী একটি পুত্র প্রসব করিল ও দাসীকে কুলায় করিয়া সদ্যোজাত শিশুকে পথপার্শ্বের আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া দিতে বলিল। দাসী তাহাই করিল। সেই সময় রাজা বিম্বিসারের পুত্র কুমার অভয় সেই পথে যাইতেছিলেন। তিনি কাক-বেষ্টিত শিশুটিকে দেখিয়া পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, শিশু জীবিত কি না। শিশু জীবিত আছে শুনিয়া তিনি স্বগৃহে লইয়া গিয়া শিশুকে পালন করিলেন। শাস্ত্রে আছে অভয়ের প্রশ্নের উত্তরে লোকে "জীবিত আছে" বলায় ও রাজকুমার তাহাকে পালন করায় শিশুর নাম পরে "জীবক কুমারভৃত্য" (জীবক কোমারভচ্চ) হইয়াছিল। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে কুমার অভয় শালবতীর কাছে খুব যাতায়াত করিতেন ও জীবক তাঁহারই সন্তান। এ অবস্থায় অভয়ের জীবকের লালনপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করা স্বাভাবিক।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, জীবক কৌমারতন্ত্রে বিশারদ ছিলেন বলিয়া তাঁহার "কুমার-ভৃত্য" নাম হইয়া থাকিবে। জীবকের চিকিৎসানৈপুণ্যের এত গল্প বৌদ্ধ-সাহিত্যে আছে, কিন্তু গর্ভিণী বা শিশুরোগের চিকিৎসার একটি গল্পও আমি পাই নাই। তিব্বতী গ্রন্থের মতে জীবক রাজা বিম্বিসারের পুত্র। বিম্বিসার নাকি স্থূলদেহ কামুক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নগরীর পথে বাহির হইয়া উভয় পার্শ্বের গৃহগুলির বাতায়নে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতেন—কোন সুন্দরী রমণীকে দেখা যায় কি না। একবার একজন প্রবাসগত শ্রেষ্ঠীর রূপবতী স্ত্রীকে বাতায়নে দেখিয়া বিম্বিসার গোপনে তাহার গৃহে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠী প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে বিম্বিসার কর্ম্মচ্ছলে তাহাকে আবার বিদেশে পাঠাইয়া দিলেন। বিম্বিসারের সহিত শ্রেষ্ঠীপত্নীর এই গোপন মিলনের ফলে নাকি জীবকের জন্ম হয়।

জীবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার মাতাপিতা কোথায়। মাতাপিতা নাই, অভয়ই তাঁহার পালক-পিতা একথা শুনিয়া জীবকের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শিক্ষা-লাভের ইচ্ছা হইল। তিনি অভয়কে না জানাইয়া পলাইয়া তক্ষশীলায় (তক্কসীলা) গিয়া একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের কাছে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সাত বৎসর শিক্ষালাভের পর জীবকের মনে হইল এ অপার শাস্ত্রে কবে তিনি দক্ষতা লাভ করিবেন! গুরুর কাছে একথা জানাইলে গুরু তাঁহাকে একখানি কোদালি দিয়া বলিলেন—"তক্ষশীলার বাহিরে এক যোজন পরিধির মধ্যে খুঁজিয়া দেখ, ঔষধিগুণহীন কোন গাছ-গাছড়া পাইলে আমার কাছে লইয়া আসিও।" জীবক কোদালি হাতে বহু ভ্রমণ করিয়াও গুণহীন উদ্ভিদ পাইলেন না (অর্থাৎ সব রকমের গাছগাছড়ারই গুণ তিনি জানিতেন)। গুরুকে একথা জানাইলে গুরু বলিলেন "জীবক, এবার তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে—ইহাতে তুমি জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে।" তারপর জীবককে পাথেয়স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া গুরু তাঁহাকে দেশে ফিরিতে বলিলেন

দেশে ফিরিবার সময় সাকেত নগরে আসিয়া গুরুর প্রদত্ত সামান্য অর্থ ফুরাইয়া গেল। এক শ্রেষ্ঠীপত্নীর অসুখের কথা শুনিয়া জীবক সেখানে গেলেন। তাঁহার অল্প বয়স দেখিয়া শ্রেষ্ঠীপত্নী তাঁহার বিদ্যায় সন্দিহান হইয়া প্রথমে চিকিৎসায় অসম্মত হইলেন। জীবক বলিলেন, তিনি প্রথমে কিছুই চান না, রোগ সারিলে শ্রেষ্ঠীপত্নী যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন। রোগিনী সম্মত হইলে জীবক রোগ পরীক্ষা করিয়া ঘৃত আনাইয়া তাহাতে ঔষধ মিশাইলেন ও সেই ঘৃত রোগিনীর নাসাপথে প্রবেশ করাইয়া মুখবিবর দ্বারা বাহির করাইলেন। রোগিনী মুখের ঘৃত একটি পাত্রে ফেলিয়া দাসীকে তাহা বস্ত্রখণ্ড দিয়া তুলিয়া লইতে বলিলেন। জীবক ভাবিলেন, "এ নারী দেখিতেছি বড় কৃপণ, যে ঘৃত ফেলিয়া দেওয়া উচিত তাহা তুলিয়া লইতে বলিতেছে; আমি মূল্যবান ঔষধ দিলাম এখন না জানি এ আমাকে কি দিবে!" জীবকের মনোগত ভাব বুঝিয়া শ্রেষ্ঠীপত্নী বলিলেন, "আমাদের মত গৃহস্থ সঞ্চয়ের অর্থ বুঝে; এ ঘৃত পরে দাসদাসীরা পায়ে লাগাইতে পারিবে বা প্রদীপে জালান যাইবে; ভয় নাই, বৈদ্য, তোমার প্রাপ্য তুমি পাইবে।" রোগমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নী জীবককে আশানুরূপ অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন।

রাজগৃহে ফিরিয়া জীবক তাঁহার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়া-ছিল তাহা কুমার অভয়কে ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন। অভয় অসম্মত হইয়া বলিলেন, "এ অর্থ তোমার কাছেই থাকুক, আমি শুধু এই চাই যে তুমি আমার বাড়ী ছাড়া অন্যত্র থাকিও না।" অভয়ের একথা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল: তিনি রাজার পুত্র, অর্থ ও প্রভাবশালী বহুলোকের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, তিনি জানিতেন তাঁহার বাড়ীতে থাকিলে তিনি এই সব লোকের বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য জীবককে নিযুক্ত করাইতে পারিবেন। শীঘ্রই সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজা বিম্বিসার ভগন্দর রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র রক্তাক্ত দেখিয়া রাণীরা পরিহাস করিয়া বলিতেন, "…এইবার রাজা সন্তান প্রসব করিবেন!" রাজা ইহাতে লজ্জিত হইলেন। অভয় জীবককে ডাকাইয়া পিতার চিকিৎসা করাইলেন। জীবকের চিকিৎসায় বিম্বিসার রোগ-মুক্ত হইলেন। রাজা তাঁহাকে রাজভবনের চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন, ইহাতেও বোধ হয় অভয়ের হাত ছিল। যে রাজবাড়ীর বৈদ্য তাহার ভাবনা কি? ক্রমে জীবকের খুব পসার বাড়িয়া গেল। বড় বড় লোকেরা চিকিৎসার জন্য জীবককে ডাকাইতে লাগিলেন। জীবক সুচিকিৎসক, বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন বটে কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধিও তাঁহার খুব ছিল। বড়লোকদের কাছে তিনি নির্দ্দয় ভাবে অর্থ আদায় করিতেন। বুদ্ধের প্রতি ভক্তিবশতঃ এবং বিম্বিসারের অনুরোধে তিনি সংঘের অন্য ভিক্ষুদেরও বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেন। একবার নগরে সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হইল, দলে দলে লোক জীবকের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া চিকিৎসা ভিক্ষা করিল। "আমি মগধরাজ বিম্বিসারের চিকিৎসা করি, বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসা করি, তোমাদের চিকিৎসা করিবার আমার সময় নাই" বলিয়া জীবক সব লোককে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। দয়ামায়া দেখাইলে ব্যবসা পোষায় না একথা জীবক ভালই জানিতেন।

একবার এক শ্রেষ্ঠীর চিকিৎসায় জীবকের মনে হইল রোগীকে সাত দিন বামপাশে ও সাত দিন ডানপাশে শুইয়া থাকিতে হইবে; কিন্তু সাত দিন বলিলে রোগী দুই তিন দিনের

বেশী এ কষ্ট সহ্য করিবে না বলিয়া জীবক তাহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে সে সাত মাস করিয়া একপাশে শুইয়া থাকিবে। রোগী সাত দিন পরেই বলিল সে আর পারিবে না। জীবক বলিলেন তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, রোগী এখন যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত বড় ক্রোধী লোক ছিলেন এজন্য তাঁহার নাম "চণ্ড-প্রদ্যোত" (চণ্ড পজ্জোত) ছিল। প্রদ্যোত একবার জীবকের চিকিৎসা প্রার্থনা করিয়া বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। জীবক উজ্জয়িনীতে গিয়া প্রদ্যোতকে দেখিয়া ঔষধমিশ্রিত ঘৃত ব্যবস্থা করিলেন। প্রদ্যোত বলিলেন ঘৃত খাইতে তাঁহার ভাল লাগে না, তিনি কোন মতেই ঘৃতময় ঔষধ খাইতে পারিবেন না। জীবক জানিতেন যে সেই ঔষধ না খাইলে কোন মতেই রোগ সারিবে না, তাই তিনি ঠিক করিলেন ঘৃতময় ঔষধ বর্ণ, আকৃতি, আস্বাদ ও গন্ধে পাচনের মত করিয়া তৈয়ার করিয়া পাচন বলিয়া প্রদ্যোতকে খাওয়াইবেন। কিন্তু ঔষধ উদরস্থ হইলেই বমন হইতে থাকিবে এবং তখন উহা ঘৃতময় জানিতে পারিয়া প্রদ্যোত হয়ত তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পারেন এই ভাবিয়া জীবক প্রদ্যোতকে বলিলেন, "আমরা বৈদ্য, আমাদের ঔষধের খোঁজে সর্ব্বদা বনজঙ্গলে যাইতে হয়, আপনি হুকুম দিন যে আমি যখন ইচ্ছা আপনার অশ্বশালা হইতে ঘোড়া লইয়া নগরের যে দ্বার দিয়া ইচ্ছা যখন তখন নগরের বাহিরে যাতায়াত করিতে পারিব।" সেকালের নগরগুলি প্রাকার বেষ্টিত থাকিত, নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন নগরদ্বার দিয়া যাতায়াত করা যাইত না, দ্বারে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরীরা থাকিত। নগর-দ্বার গুলি বন্ধ করিয়া দিলে বাহির হইতে ভিতরে বা ভিতর হইতে বাহিরে যাতায়াত অসম্ভব হইত। প্রদ্যোত জীবকের এ অনুরোধে সম্মত হইয়া সর্ব্বত্র তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন যে জীবকের ইচ্ছামত গতায়াতে কেহ যেন বাধা না দেয়। জীবক কয়েকদিন লোক দেখাইয়া সময়ে অসময়ে রাজার ঘোড়া হাতী লইয়া যাতায়াত করিলেন। শেষে তিনি একদিন প্রদ্যোতকে সেই পাচনরূপ ঘৃত খাওয়াইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বশালা হইতে তীব্রতম বেগশালী অশ্ব লইয়া তীরবেগে উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া ছুটিলেন। এদিকে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া প্রদ্যোতের বমন হইতে লাগিল। তাঁহাকে জীবক ভুলাইয়া ঘৃত খাওয়াইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া প্রদ্যোত চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবককে ধরিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত করিতে বলিলেন। জীবক পালাইয়াছেন শুনিয়া তিনি জীবককে ধরিতে অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইলেন। জীবক প্রদ্যোতের রাজ্য ছাড়াইয়া তবে থামিলেন, প্রদ্যোতের সেনারা তাঁহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাদের ভুলাইয়া আবার যাত্রা করিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া বিম্বিসারকে সব কথা জানাইলেন। রাজারা পরস্পরের প্রকৃতি ভাল রূপেই জানেন। বিম্বিসার বলিলেন যে জীবক পালাইয়া বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে প্রদ্যোত রোগমুক্ত হইয়া পুরস্কারের জন্য জীবককে আনিতে রাজগৃহে দূত পাঠাইলেন। জীবক কিছুতেই গেলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন যে প্রদ্যোত যেন তাঁহার আরোগ্যলাভের কথা না ভুলেন। প্রদ্যোত কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একখানি মহা-মূল্য বস্ত্র জীবককে উপহার পাঠাইলেন। সেই মহার্ঘবস্ত্র লইয়া জীবক বুদ্ধের কাছে গিয়া বলিলেন "ভদন্ত, আমি আপনার কাছে একটি বর প্রার্থনা করি।"

"জীবক, তথাগতেরা বরদানের অতীত (অতিক্কন্তবরা' খো জীবক, তথাগতা)।"

"ভদন্ত, আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে কোন দোষ নাই।"

"বল, জীবক।"

"ভদন্ত, আপনি ও ভিক্ষুসঙ্ঘ পথের বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করিয়া চীবর প্রস্তুত করেন। রাজা প্রদ্যোত আমাকে এই মহামূল্য বস্ত্র পাঠাইয়াছেন, ইহার সমতুল বস্ত্র আর হয় না। ভগবান আমার নিকট হইতে এবস্ত্র গ্রহণ করুন এবং ভিক্ষুসংঘকে গৃহস্থদের প্রদত্ত (নূতন বস্ত্রে প্রস্তুত) চীবর গ্রহণ করিতে অনুমতি দান করুন।"

বুদ্ধ জীবকের দান গ্রহণ করিলেন ও ভিক্ষুদের বলিলেন যে তাহাদের যাহার ইচ্ছা পূর্ব্বের মত পথ ও শ্মশান হইতে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ডে চীবর প্রস্তুত করিতে পারে, যাহার ইচ্ছা গৃহস্থদের প্রদত্ত নূতন বস্ত্রে প্রস্তুত চীবর ব্যবহার করিতে পারে। (মহাবগ্‌গ, ৮।১)

টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে এই দান গ্রহণ বোধিলাভের কুড়ি বৎসর পরে ঘটিয়াছিল, ইতিমধ্যে আর কেহ বুদ্ধকে বস্ত্রদান করে নাই।

রাজগৃহে থাকিবার সময় বুদ্ধ একবার বৈশালীতে গিয়াছিলেন। কথিত আছে বৈশালীতে মড়ক লাগিয়াছিল; বুদ্ধ আসিলে মড়ক থামিতে পারে ভাবিয়া নগরের লোকে তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। বিম্বিসার রাজগৃহ হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত পথ সুসজ্জিত করিয়া নিজে বুদ্ধের সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন। গঙ্গার অপর পারে লিচ্ছবিরা অভ্যর্থনা করিয়া বুদ্ধকে বৈশালীতে লইয়া গেলেন। লিচ্ছবিবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা বৈশালীতে রাজত্ব করিতেন। বুদ্ধ পৌছিবার আগেই নাকি খুব বৃষ্টি হইয়া নগর ধুইয়া গিয়া মড়ক থামিয়া গেল। লোকে ইহাকে বুদ্ধের আগমনের ফল ভাবিল। বুদ্ধ যখন রাজগৃহে আবার বর্ষাবাসের জন্য ফিরিলেন তখন লিচ্ছবিরা তাঁহাকে গঙ্গার উত্তর তীর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল, দক্ষিণ তীরে বিম্বিসার উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজগৃহে লইয়া গেলেন। (ধ-কথা, ৩।৪৩৭)। বৈশালীতে গিয়া বুদ্ধ "মহাবন" নামক একটি শালবনে থাকিতেন। রাজগৃহ ও বৈশালী কাছাকাছি নগর ছিল। বর্ষাবাস করা ছাড়া অন্য সময়েও অনেকবার বুদ্ধ বৈশালীতে গিয়াছিলেন।

রাজগৃহের একজন শ্রেষ্ঠীর উগ্রসেন (উগ্গসেন) নামে এক পুত্র ছিল, সে এক বাজিকরের খেলা দেখিতে গিয়াছিল। বাজিকরের দলের একটি তরুণী দড়ির উপর হাঁটার খেলা দেখাইত। উগ্রসেন এই তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ও মাতাপিতার নিষেধ না মানিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া বাজিকরের দলে যোগ দিল। প্রথম প্রথম নানারূপ কসরৎ অভ্যাস করিবার সময় উগ্রসেনের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া বাজিকরের দলের লোকেরা ও উগ্রসেনের স্ত্রী তাহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিত। কিছুদিনের মধ্যে উগ্রসেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়া নানারূপ খেলা দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন সে বহুলোক জড় করিয়া একটা বাঁশের মাথায় উঠিয়া খেলা দেখাইতেছিল। খেলা ভাঙ্গিবার সময় বুদ্ধ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি মৌদ্গল্যায়নকে প্রথমে গিয়া উগ্রসেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতে বলিলেন ও শেষে সদলে নিজে গিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেন। উগ্রসেন সস্ত্রীক তাঁহার কাছে দীক্ষা লইয়াছিল (ধ-কথা, ৪।৬০)।

পঞ্চম বর্ষা বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে যাপন করিয়াছিলেন। মহাবনের যে গৃহে বুদ্ধ ও ভিক্ষুরা থাকিতেন তাহার নাম "কূটাগার-শালা" ছিল।

একবার যখন বুদ্ধ "মহাবনে" বাস করিতেছিলেন তখন সংবাদ পাইলেন যে কপিলবাস্তু ও কোলিয়, রোহিণী নদীর উভয়তীরস্থ এই দুই রাজ্যে যুদ্ধ বাধিবার মত হইয়াছে। শস্যক্ষেত্রে সেচনের জন্য নদীর জল লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। নদীতে বাঁধ দিয়া দুই রাজ্যের লোকই নিজ নিজ ক্ষেত্রে জল দিত। সে বৎসর নদীতে জল অল্পই ছিল, দুই পক্ষই বলিল তাহারা নিজ নিজ প্রয়োজনের জন্য যত জল আবশ্যক সব লইবে, তাহাতে অপর পক্ষ কিছু পা'ক আর না পা'ক। বিবাদ বাড়িয়া এমন হইল দুই রাজ্যের লোক যুদ্ধ করিবার জন্য সশস্ত্র হইয়া নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধ উপস্থিত হইয়া তাহাদের বুঝাইলেন এবং মিটমাট করিয়া যুদ্ধে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, "জলের দাম কত?" উহারা বলিল জলের দাম সামান্যই। "মাটির দাম কত?" "মাটির দাম সামান্যই।" "যে যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে তাহাদের জীবনের মূল্য কত?" "যোদ্ধাদের জীবন অমূল্য।" বুদ্ধ তখন তাহাদের বুঝাইলেন যে সামান্য জলের জন্য এতগুলি যোদ্ধার অমূল্য জীবন যুদ্ধে নাশ করা কি ভাল হইবে? এইরূপে বুঝাইয়া বুদ্ধ তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন (কুণালজাতক ও ধ-কথা ৩।২৫৪)। সন্ন্যাসী বলিয়া যে বুদ্ধ সংসারের কোন বিষয়ের মধ্যে থাকিতেন না, তাহা নয়। যাহাতে বহুজনের মঙ্গল হয় তাহাই তিনি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বুদ্ধ নিজবংশের শাক্যদের যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টাও করিতেন। একাধিকবার তিনি রাজায় রাজায় যুদ্ধ থামাইয়াছিলেন। সাংসারিক ব্যাপারেও বুদ্ধ কিরূপ লোকের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট ছিলেন তাহা আমরা বহু ঘটনায় দেখিতে পাইব।

"মহাবনে" বর্ষাবাসের সময় শুদ্ধোদন অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়া বুদ্ধকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া বুদ্ধ মাত্র কয়েকজন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত কপিলবাস্তুতে পৌছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ান পিতাকে বুদ্ধ সংসারের

অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। মৃত্যুর পর শুদ্ধোদনের প্রাণহীন দেহ দেখাইয়া শিষ্যদিগকে সংসারের পরিবর্ত্তনশীলতা ও উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই বিনাশশীলতা বুঝাইলেন। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া বুদ্ধ তাঁহার শ্রাদ্ধকালে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। মহাপ্রজাবতী গৌতমী এই সময়ে গৃহ ছাড়িয়া ভিক্ষুণীরূপে সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে যে বুদ্ধ প্রথমে মহাপ্রজাবতীকে সংঘে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হন নাই। একথা ঠিক নহে। অন্য অনেক স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বুদ্ধের আপত্তি ছিল। কিন্তু মহাপ্রজাবতী এই সময়েই ভিক্ষুণীধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাবতী অন্য স্ত্রীলোকদিগকেও সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিতে অনুরোধ করায় বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "অলম্ গোতমি, মা তে রুচ্চি মাতুগামস্স তথাগতপ্পবেদিতে ধর্ম্মবিনয়ে অগারস্মা অনগারিয়ম্ পব্বজ্জা—না গৌতমি, স্ত্রীলোকেরা গৃহ ছাড়িয়া তথাগত-প্রবেদিত ধর্ম্মনিয়মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুক, এ ইচ্ছা তোমার যেন না হয়।" মহাপ্রজাবতী একাধিকবার অনুরোধ করিয়াও একই উত্তর পাইলেন। এখানে দেখি যে স্ত্রীলোক মাত্রেই সংঘে প্রবেশ করিতে পারিবে ইহাতে বুদ্ধের আপত্তি ছিল। বুদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণের পর শুদ্ধোদনকে "গৌতম" ও "মহাপ্রজাবতীকে "গৌতমী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। (ক্রমশঃ)

তারপাশা

পদ্মার জল মেটে পাড় ভেঙে ঢুকেছে গাঁয়ে,
আঙিনায় ঘরে থৈ থৈ করে নদীর জল,—
মাঠের বাটের নাহিক চিহ্ন, ভেলায় নায়ে
উৎসাহী যারা ঘোরে তারা খুঁজি কাজের ছল।
জল ছুটিয়াছে কাত করে দিয়ে ধানের শীষে,
গাঁয়ের ডোবায় কুনো মাছ যত হারায় দিশে;
পাশাপাশি বাড়ী দু'সখির আড়ি থাকিবে কিসে—
ছলাৎ ছল,
এ-দাওয়া ও-দাওয়া এক হয়ে মিশে, স্রোত প্রবল।

ষ্টীমার-ঘাটের কোঠাবাড়ীখানি আধেক ডুবে
মিনতি করিছে, থামো থামো, নদী কীর্ত্তিনাশা!
পশ্চিমে রবি ঘুম-জড়া চোখে চাহিছে পূবে;
তটেরে বেড়িয়া পাগল নদীর কী ভালবাসা!
বৃহৎ ষ্টীমার, ছোট ডিঙা যেন জলের তোড়ে,
কা কা করে কাক, মিছা ডাকে আর মিছাই ওড়ে;
মাটীর শিশুরা যতই শুনিছে স্বপনঘোরে
নদীর ভাষা,
চরের মতন ডোবে জাগে বুকে তাদের আশা।

নদী ছোটে আর ঢেউ ভাঙে তটে, অলস পায়ে
গ্রামের বধূরা কলসকক্ষে আসে না জলে,
লোভে লোভে জল এসেছে ছুটিয়া আঙন-ছায়ে,
বেড়া ভেঙে কোথা জুটেছে বধূর চরণ-তলে।
দূরে পরপার রেখার মায়ায় হয়েছে লীন,
বাতায়নপথে দেখে বধূ শেষ বরষা-দিন;
সোনার আলোয় ঝলে ঢেউ-তোলা ঘরের টিন—
স্তিমিত জলে
ঘাটে সারি আলো, জেলেদের ডিঙি ভাসিয়া চলে।

উঠে আগ্রহে, দুরু দুরু বুকে নামিল কেহ,
গাঢ় হয় ধোঁয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিল বাঁশী,
পরদার ফাঁকে মুখ একখানি; ঘরের স্নেহ,
কূল-ছাপা জল, কূলের বধূরে করে উদাসী।
ঘর জলতলে ইলিশ মাছেরা অন্ধকারে
জাল খুঁজে খুঁজে এ আসি পড়িছে উহার ঘাড়ে,
ভাঙা কোঠাখানি চকিতে মিলায় জলের আড়ে—
আঁধার আসি
তীরে নীরে এক করিল, ষ্টীমার চলিল ভাসি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথির বিবরণ ও সমালোচনা *

—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

ক-পুথি। সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ পুথি। বিক্রমপুর মূলচর গ্রামে এক বৈদ্য পরিবারে প্রাপ্ত। উৎকৃষ্ট তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা। আগা-গোড়া অতি সুস্পষ্ট সুন্দর গোটা গোটা এক হাতের লেখা। ৫৪৩ পাতায় অর্থাৎ ১০৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পাতার আকার ১৪¼″×৪¼ ইঞ্চি। মধ্যে ছিদ্রের জন্য চতুষ্কোণ শূন্য স্থান রাখিয়া লিখিত, কিন্তু ছিদ্র নাই। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০ পংক্তি করিয়া লিখিত, ক্বচিৎ ১১ পংক্তিও আছে।

আরম্ভ :—"৴৭ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ কাল রাত্রি স্ত্রীকে রাজা কৈল সম্ভাষণ। সুমিত্রা দুর্ভগা হৈল এই সে কারণ।" সুমিত্রা-বিবাহ-প্রসঙ্গে আরম্ভ হইতে বুঝা যায়, এই পুথির আদর্শ পুথিতে ইহার পূর্ব্বের পাতাগুলি ছিল না; কাজেই সেই পুথিখানা সুপ্রাচীন ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

পুথিখানা শেষের দিকে জীর্ণ। শেষ পাতার শেষাংশে কুশী-লবের রামায়ণ-গান-প্রসঙ্গের নিম্নরূপ পাঠোদ্ধার করা যায় :—

"রাক্ষস মারিয়া রাজা কৈলা বিভীষণ। পুষ্পরথে চড়ি আইলা আপনা ভুবন॥ অজোধ্যা আসীয়া হৈলা পৃথিবীর পতি। উত্তরা কাণ্ঠে গাহিল শ্রীরাম নৃপতি॥ বিনা দোশে সিতারে বর্জ্জিলা নৃপতি। সেই কথা শুনিয়া লজ্জিত রঘু পতি॥ জখনে গাহিল সিতা দেবির বনবাস। হস্তের বিণা খসি পড়ে গাত্রের খশে বাস। মহারণ্যে সিতা নিয়া থুইল লক্ষ্মণ। বাল্মীক এ পাইয়া নিল আপনা ভুবন॥ সীতা প্রসবিল দুই জমক কুমার। কুশ লব নাম মুনি থুইল তাহার॥ এই মতে গীত গাহে সিসু দুই জন। ভূমিতে পড়িয়া কান্দে শ্রীরাম লক্ষণ। ভাই কান্দএ কান্দএ রাজাগণ।"

ইহার পরে এই ছত্রে আর কয়েকটি অক্ষর লিখিত আছে কিন্তু নিতান্ত অস্পষ্ট। আভাসে যতদূর বুঝা যায়, সম্ভবতঃ "ইতি উত্তরা কাণ্ঠ", ভিন্ন ছত্রে "সম্পূর্ণ।"

এই সমাপ্তি হইতে বুঝা যাইবে যে আদর্শ পুথিতে ইহার পরে আর ছিল না।

এই সমাপ্তি ৫৪৩৷১ পৃষ্ঠায়। ৫৪৩৷২ পৃষ্ঠায় ভিন্ন কালিতে মোটা কলমে লিখিত আছে :—

"শ্রীমুক্তারাম শর্ম্মণা স্বাক্ষর মিদং শ্রীরামসন্তোষ দাসস্য পুস্ত (স্ত?) কেয়াং রামায়ণং ইতি শকাব্দা ১৫৭১ সৌর মাঘস্য চতুর্দ্দশ দিনে সমাপ্ত।" ইহার পরে এক ছত্রে একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে, অর্থ বোধ হইল না। যতদূর পড়িতে পারিতেছি, শ্লোকটি এই :—"একারনোশৌদ্বিফলস্ত্রিমূলঃ চতুরুণঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াংশে সপ্তাখে (?) অষ্ট বিটপো নবাক্ষ দশছদি দ্বিগগস্থাদি বৃক্ষঃ॥" মনে হয় যেন কোন বৃক্ষের বর্ণনা, এক দুই তিন চারি করিয়া দশ পর্য্যন্ত উহার কোন অঙ্গ কত সংখ্যক তাহার বর্ণনা।

এই সংস্কৃত শ্লোকের অনেকখানি পরে "শ্রীকৃষ্ণ সহায়" লিখিত আছে। দক্ষিণ দিকের পাতার অঙ্কের ৫৪ দুইটি অঙ্ক পড়া যায়। ৩টি মুছিয়া গিয়াছে। শকাব্দ ১৫৭১ বাঙ্গালা সন ১০৫৫ এর সমান। এই পুথিখানি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন। এত প্রাচীন পুথিতে অঙ্কের প্রাচীন রূপগুলি পাওয়া যাওয়ার কথা। অঙ্কের আধুনিক রূপই বেশী, ক্বচিৎ প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। ১৪ পত্রাঙ্কে ৪এর আধুনিক রূপ ৪ এবং প্রাচীন রূপ ৎ দুইই পাওয়া যায়। ৫ এর আধুনিক রূপ এবং প্রাচীন রূপ 5 ১৩৫ পত্রাঙ্কে পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের তারিখযুক্ত সপ্তকাণ্ডাত্মক এত প্রাচীন পুথি আর পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় রামায়ণের ১৫৯ খানি পুথি আছে, কিন্তু উহাদের দুইখানা (নং ১৫০, ১৫১) ছাড়া আর সমস্ত পুথিই আদি, অযোধ্যা ইত্যাদি কাণ্ডের খণ্ড খণ্ড পুথি। ১৫০নং পুথিতে অযোধ্যা হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত আছে। ১৫১নং পুথিতে অযোধ্যা হইতে উত্তরকাণ্ড পর্য্যন্ত আছে। সন ১২০৪ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১২০১ বাঙ্গালা সনে এই পুথিখানি লিখিত। ইহাতে আবার ষষ্ঠীবর ও ভবানী দাসের ভণিতা আছে। এই সকল পুথি হইতে আমাদের আলোচ্য 'ক' পুথি যে অনেক মূল্যবান, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ, প্রাচীনতর পুথি দেখিয়া নকল করা সুপ্রাচীন পুথি, আগাগোড়া একহস্তে লিখিত এবং সম্ভ্রান্ত বংশে পুরুষানুক্রমে সুরক্ষিত। কাণ্ডে কাণ্ডে বিভক্ত পুথিগুলিতে নানা কারণে

* "মূল কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে"—দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অবান্তর বিষয় আসিয়া প্রবেশ করে, গায়েনগণ অনেক সময় নিজেদের রচনা উহাদের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। আমাদের 'ক' পুথি ঐ রূপে দুষ্ট হইবার সুযোগ বেশী পায় নাই।* এই পুথি পাইয়াই কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা উদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া আমাদের ভরসা হয়। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে আর এক খানা সম্পূর্ণাঙ্গ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি আসিয়া আমাদের হাতে পড়ে।

খ-পুথি। ত্রিপুরা জেলার গজরা গ্রাম হইতে প্রাপ্ত। তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার ১৬½''×৫½ ইঞ্চি। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পংক্তি। সুস্পষ্ট সুন্দর অক্ষর। ক-পুথির অক্ষর একটু পেঁচাল—খ-পুথির অক্ষর অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন ও সুগঠিত। আরম্ভ :—

"শ্রীশ্রী গুরবে নমঃ শ্রীগণেসায় নমঃ। রামংলক্ষণ পুর্ব্বজং" ইত্যাদি। আদিকাণ্ডের একেবারে আদি হইতে আছে। মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন হস্তাক্ষর আছে। 'ক' পুথির ভাষা সর্ব্বদা প্রাকৃত-ঘেঁসা, 'খ' পুথি সর্ব্বদা সংস্কৃত-ঘেঁসা।

আদিকাণ্ড। ৭২ পাতায় সম্পূর্ণ। শেষ যথা :—

> "রাম বিনে সিতার যে অন্য নহী মনে।
> আদী কাণ্ঠে সমাপ্ত হইল এথাহনে॥
> কির্ত্তীবাস পণ্ডিতের সরস রচন।
> এথা হতে পুথা আদীকাণ্ঠ রামায়ণ॥
> পুস্তক সমাপ্ত হইল মিতি কিমধিক।
> সনেতে দ্বাদশশত অষ্টম অধিক॥
> মাঘে কৃষ্ণ শুক্র পক্ষে ত্রিবিংশতি দিনে।
> ভ্রগু দ্বিতীয়া উত্তর ভাদ্র উপক্ষণে॥
> ই পুথির কর্ত্তা শ্রী কালিশঙ্কর সেন।
> দক্ষীণ সাহাপুরে বাস স্বহস্তে লেখেন॥
> মধ্যে মধ্যে লেখে কিছু রাধাকৃষ্ণ দাস।
> মন্দ জ্ঞানহীন রাজনগরেতে বাস॥"

উল্লেখ করা আবশ্যক যে খ-পুথির আদিকাণ্ডের সহিত একখানা বিচ্ছিন্ন পত্র ছিল—উহার পাঠ গ-পুথির পাঠের অনুরূপ। যথাস্থানে উহার পাঠ আলোচিত হইল।

দক্ষিণ সাহাপুর মেঘনা নদীর পূর্ব্বতীরস্থিত এবং স্বনামখ্যাত চাঁদপুরের উত্তরস্থ পরগণা। মেঘনার পশ্চিমতীরে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা। ক-পুথির প্রাপ্তিস্থান মুলচর গ্রাম, খ-পুথির প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ সাহাপুর হইতে সোজা ১২।১৩ মাইল পশ্চিম দিকে, মধ্যে সুপ্রশস্ত মেঘনা নদীর ব্যবধান।

অযোধ্যা কাণ্ড। ৩৫ পাতায় সম্পূর্ণ। আদিকাণ্ডের পত্রসংখ্যা ধরিয়া ভিন্ন এবং ক্রমাগত পত্রাঙ্কও আছে এবং উহা ১০৭ অঙ্কে শেষ হইয়াছে। শেষ :—

"ইতি অজদ্ধা কাণ্ঠ সমাপ্ত॥ রামচন্দ্র বনে জাতি সিতা হরতি রাবন ভিবিসন ভবেত মন্ত্রি তেন লঙ্কানিপাতিত॥ সযক্ষরমেতং শ্রীকেবলকৃষ্ণ সেন শ্রীকালীশঙ্কর সেন গুপ্ত।

অরণ্য কাণ্ড। ৩৪ পাতায় (মোট ১৪১) সমাপ্ত। শেষ :—

> "রাম দরশনে কন্যা গেল স্বর্গবাস।
> অরণ্য কাণ্ঠ গাহিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥
> কার্ত্তিবাস কবি গাথা অমৃতের ভাণ্ড।
> যে না লয়ে শ্রীরাম নাম তাহার পাষণ্ড॥"

ইত্যাদি আরও লেখকের রচিত ৬ ছত্র। পরে :—"ইতি শ্রীরামায়ণে অরণ্য কাণ্ঠ সমাপ্ত। জন্ম দৃষ্টি তথা লীখীতং লেখকো নাস্তি দোষক। ইতি সন ১২১৪ সন তারিখ ২৭ পৌষ সমাপ্ত।"

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ২৫ পাতায় (মোট ১৬৬) সমাপ্ত। শেষ :—

> "পিতৃপুরে পক্ষী গেল আপনার ঘর।
> কটক লইয়া গেল দক্ষীণ সাগর॥
> কির্ত্তিবাস রচিলেক অমৃতের ভাণ্ড।
> শুনিলে এসব কথা পাপ হয় খণ্ড॥

ইতি শ্রী রামায়নে কির্ত্তিবাস রচিত কিস্কিন্ধা কাণ্ঠ সমাপ্ত। সয়ক্ষর মেতং শ্রীরামচন্দ্র সেন গুপ্ত। ইতি সন ১২১৪ বারসও চৌদ্দ তেরিখ অগ্রাহণ।"

দেখা যাইতেছে, এই কাণ্ডটির প্রতিলিপি পূর্ব্ববর্ত্তী কাণ্ডের ১ মাস ২১ দিন পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছিল।

সুন্দর কাণ্ড। ৬১ পাতায় (মোট ২২৭) সমাপ্ত। এই কাণ্ডের ১ম পাতার সাদা ১ম পৃষ্ঠে সমস্ত গুলি কাণ্ডের পত্রসংখ্যার জায় দেওয়া আছে, যথা :—

"আছ্যকাণ্ড ৭২, অজোধ্যাকাণ্ড ৩৫, অরণ্যকাণ্ড ৩৪; কিস্কীন্দাকাণ্ড ২৫। সুন্দরাকাণ্ড ৬১, লঙ্কা কাণ্ড ১৮৩, উত্তরা কাণ্ড ২২৪। মোট ৬৩৪।"

শেষ :—

* একেবারেই পায় নাই, এমন কথা বলা যায় না। হরধনুভঙ্গ প্রসঙ্গে দেখা যাইবে, ক-পুথির এই অংশ গুণরাজ খাঁ বিরচিত রামায়ণ হইতে গৃহীত বলিয়া সন্দেহ করিবার প্রবল কারণ বিদ্যমান।

"শয়ঙ্কর মেতৎ শ্রীরামচন্দ্র সেন (গুপ্ত ?) ইতি সন ১২১৪ বারসএ চৌর্দ্দি সন তেরিখ ১৯ অগ্রাহণ রোজ শুক্রবার।"

কাজেই পূর্ব্ববর্ত্তী কাণ্ডের ১৩ দিন পরে এই কাণ্ডটি সমাপ্ত হইয়াছিল।

লঙ্কা কাণ্ড। এই কাণ্ডটি পুথিতে ছিল, কিন্তু যিনি পুথিখানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি মধ্য হইতে এই কাণ্ডটি রাখিয়া দিয়াছেন। কাজেই ইহার কোন বিবরণ দেওয়া গেল না।

উত্তর কাণ্ড। জল লাগিয়া এই কাণ্ডের পাতাগুলির বাম অংশ অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছে এবং অনেকস্থানে জমাট বাধিয়া গিয়াছে। তবে অধিকাংশ স্থানের অধিকাংশ পংক্তিরই পাঠোদ্ধার করা যায়। ২২৪ পাতায় (মোট ৬৩৪) এই কাণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ ধারে কাণ্ডের পৃষ্ঠাঙ্ক, বামধারে পুথির মোট পৃষ্ঠাঙ্ক। প্রথম পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নীচে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে লিখিত আছে :—

"[শা] কে নববিংস অব্দ সপ্তদশ শত।
আরম্ভ পুস্ত তাথে জানিয সমস্ত॥
মনছবি বিসএ তাথে নরসিংহপুর থানা।
গুরু পদ সিরে করি করে আরম্ভনা॥"

শেষ :—

"রামাযন সমাপ্ত হইল এত দূরে।
জেবা গাহে জেবা শুণে জাএ স্বর্গপুরে॥
[শা] কে নববিংস যব্দ সত সপ্তদস।
মধু শুক্লা ত্রিওদসি উনত্রিংস দিবস॥
উত্তর ফাল্গুনি রিক্ষ শনিশ্চর দিনে।
পুস্তক সমাপ্ত ।

শকাব্দিকা ১৭২৯।১১।৮।১৩॥ ইতি সন ১২১৪ সন বাঙ্গালা তারিখ ২৫ সনজের (?)॥ সন ১৮০৮ ইংরেজী ৯ আফরেল মুনছবি বাজে ছিল।

আদিকাণ্ডটি ১২০৮ সনের নকল, অযোধ্যায় সনাঙ্ক নাই, কিন্তু আদির মালিক কালীশঙ্কর সেনের নাম দেখিয়া মনে হয়, অযোধ্যা ও আদি এক বৎসরেরই নকল। অরণ্য হইতে বাকী কাণ্ডগুলি ১২১৪ সনের অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সনেরই চৈত্রের মধ্যে সমাপ্ত। মাত্র সওয়াশত বৎসরের প্রাচীন হইলেও এই সম্পূর্ণাঙ্গ পুথিখানা মূল্যবান। উহার মালিক সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং মুনসেফি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অনেক স্থান তাঁহার স্বহস্ত লিখিত।

আদিকাণ্ড সম্পাদন করিবার কালে এই খ-পুথির আদিকাণ্ডের সহিত অন্যান্য পুথির আদিকাণ্ডের পাঠ মিলাইতে যাইয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহার রচনা ও পাঠ একেবারে স্বতন্ত্র,—কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন আদিকাণ্ডের পুথির সহিত ইহার কোন মিল নাই। সম্পাদন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের রঙ্গপুর-পরিষদ্-প্রকাশিত আদিকাণ্ডের পাঠের সহিত মিলাইয়া ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে খ-পুথির আদিকাণ্ড অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত। বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনীর মূল খুঁজিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ সমস্তগুলি পুথি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এই সংগ্রহের ৭৪৬নং পুথি অদ্ভুতাচার্য্যের আদিকাণ্ডের পুথি। পুথিখানি আগাগোড়া সম্পূর্ণ আছে। পুথিখানির প্রাপ্তিস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের কোন গ্রাম। বিক্রমপুর সোনারঙ্গ নিবাসী সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত মহাশয় পুথিখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। পুথির আকার ১৬½"×৫"। সুন্দর, সুস্পষ্ট, কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি অক্ষরে অত্যন্ত ঘন করিয়া লিখিত, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৯ ছত্র। পুষ্পিকায় পুস্তকের মালিকের নাম লিখিত আছে শ্রীদুর্গাচরণ সেন ওলদে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সেন। লেখক শ্রীজয় মানিক্য সেন। নকলের তারিখ ১২১২ সন, ৭ই অগ্রহায়ণ। ২১শে ভাদ্র নকল কার্য্য আরম্ভ হইয়া ৭ই অগ্রহায়ণ শেষ হয়। মালিক অথবা লেখকের সাকিন্ দেওয়া নাই। এই পুথিখানিতে আগাগোড়া অদ্ভুতাচার্য্যের ভণিতা এবং মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম যে খ-পুথির আদিকাণ্ডের সহিত একমাত্র ভণিতা ভিন্ন এই পুথির আর বিশেষ কোনই প্রভেদ নাই॥ খ-পুথিতে প্রথম দিকে অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয়াত্মক শ্লোকগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে, আর সারা পুথিতে অদ্ভুতের ভণিতা উঠাইয়া দিয়া কৃত্তিবাসের ভণিতা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই পুথির আদি অন্ত এবং বন্দনা পয়ারগুলি পর্য্যন্ত এক। খ-পুথির নকল কারক ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ সাহাপুর নিবাসী কালীশঙ্কর সেন সম্ভবতঃ অদ্ভুতাচার্য্যের অস্তিত্বের খবরই রাখিতেন না। তাই অদ্ভুতাচার্য্যের নামসম্বলিত অদ্ভুত ভণিতাগুলি দেখিয়া তিনি উহা বদলাইয়া ভণিতায় কৃত্তিবাসের নাম বসাইতে সঙ্কোচ করেন

নাই। এই অদ্ভুত ভণিতাবিপর্য্যয় এবং এক গ্রন্থকারের গোটা পুস্তক খানাই অন্যের নামে চালাইতে দেখিয়া অনেকগুলি রহস্যের মীমাংসার সন্ধান মিলিতেছে।

আমরা অনেকগুলি প্রাচীন এবং বিশ্বাসযোগ্য পুথি মিলাইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে পাঠ এবং বিষয়পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, বাজারসংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পাঠের এবং বিষয়পরম্পরার সহিত তাহার অনেক স্থানেই গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হইবে। যথা, বাজার সংস্করণের হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, রঘুর উপাখ্যান, ইত্যাদি আদি কাণ্ডের কোন বিশ্বাসযোগ্য পুথিতে আমরা পাই নাই, মূল রামায়ণেও এইগুলি নাই। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ যে পুথি অবলম্বন করিয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ ছাপিয়াছিলেন, তাহা যে ২২ কবির মনসামঙ্গলের মত পাঁচমিশালি পুথি ছিল, এই ব্যাপার হইতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। গায়েনগণ শ্রোতাগণের চিত্তরঞ্জনের জন্য নানা গ্রন্থকারের রচিত পালা হইতে নানা বিষয় সংগ্রহ করিয়া গাহিয়া আসর জমাইতেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা হইতে সংগৃহীত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের এমন পুথি বিরল যাহাতে প্রভূত পরিমাণে দ্বিজ বংশীদাসের, জানকীনাথের, রায়বিনোদের রচনার মিশ্রণ নাই। কিন্তু এই পুথিগুলিতে ভণিতা বদল নাই, কাহার রচনা কতটুক, ভণিতা দেখিলেই চেনা যায়। রামায়ণ রচয়িতা হিসাবে কৃত্তিবাসের অসাধারণ প্রতিপত্তি কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিপরীত কার্য্য করিয়াছিল। গায়েনগণ কৃত্তিবাসের সহিত অন্যের রচনা আনিয়া মিশাইয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য খ-পুথির মত ভণিতা বদলাইয়া মিশাইয়াছেন। তাই বাজার সংস্করণে কৃত্তিবাসের রচনাবিপর্য্যয় এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে, এত অবান্তর বিষয় আসিয়া ইহাতে ঢুকিয়াছে এবং কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা এত বাদ পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত এক পুথির সহিত তাই অন্য পুথির এত আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায়। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং করিতে শব্দান্তর হইতে পারে, ভাষান্তর হইতে পারে; রুচি অনুসারে বর্জ্জন-গ্রহণের ফলে কোন পুথিতে একটু বেশী রচনা থাকিতে পারে যাহা অন্য পুথি বাদ দিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক পুথির সহিত আর এক পুথি যে আদৌ মিলেনা, তাহার কারণ যে ভণিতা বদল করিয়া কৃত্তিবাসের নামে অন্যের রচনা চালাইয়া দেওয়া, এই খ-পুথি হইতে তাহাই ধরা পড়িল।

সম্প্রতি নোয়াখালি হইতে আদিকাণ্ডের একখানা খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। বিক্রমপুরের শ্রীপাট পঞ্চসার—বিনোদপুর নিবাসী, গদাধরের শিষ্য বল্লভচৈতন্য গোস্বামীর বংশধর, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী প্রভুপাদ নোয়াখালি জেলার চন্দ্রগঞ্জ নিবাসী তাঁহার এক শিষ্যের বাড়ী হইতে এই খণ্ডিত গ্রন্থখানি উদ্ধার করিয়াছেন। পুথিখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথি। পুথিতে ৬১, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭, ১২৭, ১৭৯ এই নয় খানি পত্র মাত্র আছে। ভাল তুলট কাগজে, সুন্দর অক্ষরে, মধ্যে চতুষ্কোণ স্থান খালি রাখিয়া লিখিত। মধ্যে দড়ির জন্য চতুষ্কোণাকৃতি স্থান খালি রাখা পুথি লেখার প্রাচীন পদ্ধতি, ১২০০ সনের এই দিকের বেশী বাঙ্গালা পুথিতে ইহা লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কাজেই পুথিখানা খ-পুথি অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই পুথি হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দেখাইতেছি।

রামচন্দ্র দেখিয়া অতেক নারিগণ।
বিফল মানিল সবে আপনা জীবন॥
যখনে আছিল আক্ষা বাপমাও ঘরে।
তখনে কথাতে ছিল এমত সুন্দরে॥
মদন মুরতি কি বা হইছে প্রকাশ।
নিশি পতি আইল কিবা ছাড়িয়া আকাশ॥ ৮০।২

ইহার সহিত তুলনা করুন রঙ্গপুর পরিষদের মুদ্রিত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের ২৫১ পৃঃ—

ক্ষণেক চৈতন্য পায়্যা বলে নারীগণ।
এমন সুন্দর বর না দেখি কখন॥
এত কাল এহি বর ছিল কোন খানে।
বাপ মায়ের ঘরে মোরা আছিনু যখনে॥
তখনে এমত বর না ছিল ভুবনে।
জন্ম জন্ম গতি হৌক ইহার চরণে॥

এই দুই রচনার সাদৃশ্য স্পষ্ট। অথচ প্রথম পুথির ভণিতা কৃত্তিবাসের। অদ্ভুতাচার্য্যের সহিত কৃত্তিবাসের রচনার গোলযোগ ও মিশ্রণ কত আগে হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা তাহারই উদাহরণ। অথচ এই চন্দ্রগঞ্জের খণ্ডিত পুথি

খানির রচনা অন্তত্র অদ্ভুতাচার্য্য বা কৃত্তিবাস কাহারও সহিতই মিলে না।

আদিকাণ্ডের আগেই সুন্দরকাণ্ডের সম্পাদন শেষ করায় জানিয়াছি যে খ-পুথির সুন্দরকাণ্ডের সহিত ক-পুথির সুন্দরকাণ্ডের চমৎকার মিল আছে। খ-পুথির উত্তরকাণ্ডের সহিত ক-পুথির উত্তরকাণ্ডের পাঠও বেশ মিলে। খ-পুথির অযোধ্যা, অরণ্য এবং কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের সমালোচনা যথাস্থানে করা যাইবে। খ-পুথির আদিকাণ্ড স্পষ্ট অদ্ভুতাচার্য্যের পুথি বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় আদিকাণ্ড সম্পাদনে উহা কোন কাজেই লাগিল না।

গ-পুথি। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পুথিশালার ৮ এবং ১০ নম্বরের পুথি। এই দুইখানা মূলতঃ আদিকাণ্ডের একই পুথির প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ, অনর্থক দুই নম্বর ভুক্ত হইয়াছে। পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ", তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যার সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১০ম সংখ্যক পুথির বর্ণনাকালে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন। তথাপি আদিকাণ্ডের এই দুই অর্দ্ধ দুই সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইল কেন, বুঝিলাম না। বসন্তবাবু লক্ষ্য করেন নাই, ১৫০ নম্বরের পুথিও এই আদিকাণ্ডেরই পরবর্ত্তী অযোধ্যা ইত্যাদি কাণ্ড, এবং ৮ ও ১০নং পুথিরই পরবর্ত্তী অংশ। অর্থাৎ একই পুথির বিভিন্ন অংশ ৮, ১০ এবং ১৫০ নম্বর ভুক্ত হইয়াছে।

পুথিখানি ভাল তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার ১৭"×৫½ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় দশ পংক্তি করিয়া লিখিত। প্রথম পাতা লুপ্ত। ৫৫ পাতায় আদিকাণ্ড শেষ হইয়া অযোধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ হইয়াছে।

বসন্ত বাবু এই পুথিখানির হরফ পূর্ব্বদেশীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অনুমানের ভিত্তি কি বুঝিলাম না। অক্ষর অত্যন্ত জড়ান। পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য। পুথির আভ্যন্তরীণ প্রমাণে পুথিখানিকে কিন্তু পশ্চিম বঙ্গীয় বলিয়া মনে হয়। ৩৭নং সীতাজন্ম প্রসঙ্গে ঢোল শব্দটির টীকা দ্রষ্টব্য। এই পুথিখানি কোথা হইতে সংগৃহীত পরিষদে তাহার কোন স্মারক-লিপি নাই।

আদিকাণ্ড সম্পাদনে এই পুথিখানি ভারী কাজে লাগিয়াছে। ইহার আরম্ভে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী। এই কাহিনীটি আদৌ কৃত্তিবাসে ছিল কিনা, খুবই সন্দেহ। কিন্তু ইহার পর হইতে এই পুথি কৃত্তিবাসী রামায়ণের খাঁটিরূপ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি এবং তদনুসারে পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

রামায়ণের প্রকৃত আরম্ভ এই পুথিতে নিম্নরূপ :—

> চেবণের পুত্র জে বাল্মিক মহামুনি।
> তপের প্রভাবে মুনি জ্বলন্ত আগুনি॥
> নারদ জে মহামুনি ত্রিলোক্য পুজিত।
> বাল্মিকের সনে দেখা হইল আচম্বিত॥
> দুহা দরশনে দুহার প্রসন্ন বদন।
> বিনয় ব্যবহার বড় করে দুই জন॥
> বাল্মিকে বলেন গোসাঞি তুমি অন্তরজামি।
> তোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি॥
> কোন মহাপুরুষ হএ সংসারের সার।
> সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার॥
> সংসারের সাধু হয় জগতের হিত।
> জার ক্রোধে দেবগণ সতেক বেষ্টিত॥
> সর্ব্বলক্ষণ লক্ষি জারে হএ অধিষ্ঠান।
> হিংসার ইসত্ত নাই চন্দ্র সুর্জ্জের সমান॥
> ইন্দ্র জম বাউ বরুণ সেই বলবান।
> ত্রিভুবন রাখে তারা সেহ বলবান॥
> তোমা অবিদিত মুনি সকল ভুবন।
> আমাকে কহিবা তুমি নারদ তপোধন॥ ইত্যাদি।

অবিকল অনুরূপ আরম্ভযুক্ত একখানা পুথি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ত্রিপুরা জেলায় পাইয়া তাহা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য খরিদ করিয়াছিলেন। এই পুথি হইতে আরম্ভটি তিনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ ; ১২০ পৃষ্ঠা।) এই পুথিখানি বর্ত্তমানে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হইবার কথা। কিন্তু এই পুথিখানি বর্ত্তমানে উক্ত সোসাইটিতে নাই। দীনেশ বাবুর নিকট পত্র লিখিয়া জানিয়াছি, এশিয়াটিক সোসাইটিতে না থাকিলে এই পুথিখানি কোথায় গেল, তিনিও বলিতে পারেন না। যাহা হউক অনুরূপ আরম্ভযুক্ত আরও কয়েকখানা পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যথাস্থানে বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

ঘ-পুথি। পরিষদের ২নং পুথি। দোভাঁজ তুলট কাগজের সংলগ্ন পৃষ্ঠে লেখা, অপর দুই পৃষ্ঠা সাদা। মধ্যে

ছিদ্র। ১৩½″×৩½ ইঞ্চি। প্রাচীনত্বনিবন্ধন মধ্যের ভাঁজ কাটিয়া গিয়া এক পাতারই দুই পৃষ্ঠা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। কোণগুলি ক্ষয় হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। ১ হইতে ৩৫।১ পাতায় আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিত।

শেষঃ—

"রামের মুখ দেখিতে রাজার বড় রষ।
আন্ত কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস॥
নারায়ণের জন্ম কথা শুনীল সব্বজনে।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণির জন্ম স্তনহ বিশেষ।

ইতি আদ্যকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণমস্তু। জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিখেকো নাস্তি দোশক – ভিমস্যা মি [পি] রণে ভঙ্গো মণিনাঞ্চ মতিভ্রম ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রীমর্নারাম দেব শর্ম্মণ সকলম সহি পুস্তক শ্রীআত্মারাম গন্ধ বণিকের সমাপ্ত লিখন হইল ১০ মাঘ বৃহস্পতিবার যুক্ত চতুর্থী শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শত ছয় শাল নীবাস রুকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজমল করোরি গুলার রায় শীকদার শ্রীবসন্ত রায়ঃ বৃহস্পতিবারের একপ্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি সমাচার হাতিসালার শ্রীমর্নারাম ঠাকুরতার সহি।"

শকাব্দ ১৬২২=১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে শাহজাদা আজিম্-উস্-সানের আমল, বদ্ধমানে থাকিয়া আজিম-উস্-সান তখন বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতেছিলেন। "রাজমল" যদি রাজমহল হয় তবে বাঙ্গালার পশ্চিমতম প্রান্তে এই পুথিখানি লিখিত। ক্রোড়ী ও শিকদার মোগল যুগের সরকারী রাজস্ব কর্ম্মচারী। "হাতিসালা" রাজমহলস্থিত সরকারী হাতীশালা হওয়াই সম্ভব। কিংবা কোনও গ্রামের নাম?

হাতীশালার মর্নিরাম ঠাকুরের হস্তাক্ষর বিশেষ ভাল ছিল না; মধ্যে মধ্যে, যথা সপ্তম পাতায়, নিতান্ত ছেলেমানুষী হস্তাক্ষরের নমুনা আছে। ৩৩ পাতার যে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠাঙ্ক তাহার বিপরীত সাদা পৃষ্ঠে "শ্রীকৃষ্ণগতি, সন ১১০৭ সন" এই কথা কয়টি লিখিত আছে।

পৃষ্ঠাঙ্কনির্দ্দেশে দুই প্রকার অঙ্কের বিন্যাস দেখা যায়। যথা ডাহিনে ১, বামে ১৮; ডাহিনে ২, বামে ১৯। এইরূপে ডাহিনে ১৩, বামে ৩০ পর্য্যন্ত যাইয়া বামের পৃষ্ঠাঙ্ক থামিয়াছে, ডাহিনের অঙ্কের ক্রমই শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই প্রাচীন পুথিখানির প্রামাণিকতার বিচার করিবার জন্য ইহার একটা বিষয়সূচী আবশ্যক। নিম্নে তাহাই সঙ্কলিত হইল।

১।১—দেবতা বন্দনা, কৃত্তিবাস বর্ণনা। রামের বংশাবলি বর্ণন।

১।২ বংশাবলি বর্ণনের জের—অজের পুত্র দশরথ।

২।১ দশরথের পুত্র রাম "জন্মিল্ল যত করিবেন কমল লোচন, সুণ প্রকারে কহি শুন বুধজন"। রামের জীবনের ঘটনা বর্ণনা শূর্পনখার রাবণের নিকটে গমন।

২।২ রাম চরিতের জের,—রাম বানর সৈন্য লইয়া সাগরকূলে গেলেন।

৩।১ রাম চরিতের জের,—অগস্ত্য রামের নিকট রাবণ কিরূপে লঙ্কার রাজা হইল তাহা কহিতেছেন।

৩।২ রামচরিত সম্পূর্ণ। "সাতকাণ্ড রামায়ণ কথা কহিল অল্প প্রমাণে। বিস্তারিয়া কহি কথা শুন সাবধানে। আদ্য কাণ্ডের কথা শুনিবা সভাতলে। যে কথা শুনিলে হয় অশ্বমেধের ফলে।" তাহার পরেই "পৃথিবীতে উপজিল রাবণ মহাবীর" বলিয়া রাবণের কাহিনীর আরম্ভ। রাবণের ভ্রাতা ভগিনীগণের জন্ম।

৪।১ কুবেরের লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ ও তাহাতে বাস। লঙ্কা প্রার্থনা করিয়া রাবণের দূত প্রেরণ। পিতার আজ্ঞায় কুবেরের কৈলাসে গমন এবং রাবণের লঙ্কা অধিকার।

৪।২ শূর্পনখার বিবাহ। রাবণের মন্দোদরী ও শক্তিশেল লাভ। স্বর্গপুরী আক্রমণ ও কুবেরের নিকট তাহার অদ্ধেক ধন প্রার্থনা।

৫।১ কুবেরের সহিত রাবণের যুদ্ধ। কুবেরের পুষ্পক রথ বলে কাড়িয়া লওয়া এবং রাবণকে লঙ্কা দিয়া কুবেরের কৈলাসে গমন। রাবণের সহিত যুদ্ধে সকল দেবগণের পরাভব।

৫।২ "কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন। আদ্যকাণ্ডে রচিয়া দিল রামায়ণ কথন।" অযোধ্যা বর্ণনা। অযোধ্যার রাজা দশরথের বর্ণনা।

৬।১ অন্তঃপুরে সাত শত মহাদেবী ও কৌশল্যা কৈকেয়ী সহ দশরথের রাজ্যপালন। অজ রাজার কথা। পুত্রের যৌবন দেখিয়া অজরাজার কোশল রাজকন্যার জন্য কোশল দেশে দূত প্রেরণ।

৬।২ দূতের অপমান ও তাহার রাজার বাধা। কোশলরাজের সপুত্র অজকে আহ্বান।

৭।১ দশরথ কৌশল্যার বিবাহ—অজের পাণ্ডবা প্রত্যাবর্ত্তন—পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক ও মৃত্যু। দশরথের অযোধ্যা পালন।

৭।২ কেকয় রাজার কন্যা কেকেয়ার স্বয়ংবরে দশরথের গমন।

৮।১ দশরথের কেকেয়ীকে স্বয়ংবরে প্রাপ্তি।

৮।২ দশরথকে নিজের কন্যা সুমিত্রা-দান উদ্দেশ্যে সিংহল দেশের রাজা সৌমিত্রের দশরথের নিকট দূতপ্রেরণ। দশরথের সিংহল গমন।

৯।১ সুমিত্রার বিবাহের আয়োজন।

৯।২ বিবাহ ও দেশে যাত্রা।

১০।১ দেশে প্রত্যাগমন। শত শত রাণী এবং প্রধানা তিন মহিষী লইয়া দশরথের সুখে রাজ্য।

১০।২ দশরথের সভায় নারদের আগমন। অনাবৃষ্টিতে রাজ্য নষ্ট হয় বলিয়া দশরথকে গঞ্জনা। রথে চড়িয়া দশরথের রাজ্য-পরিদর্শন।

পুথির বাকী অংশের বিশ্লেষণ না দিলেও ক্ষতি নাই। উপরের অংশ যিনিই মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে এমন উল্টাপাল্টা রচনা,—আদিকাণ্ড-উত্তরকাণ্ডের খিচুড়ী কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না। অন্ততঃ বিষয় বিন্যাসে যে বিষম গোলযোগ প্রবেশ করিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। এই পুথিতে কুবের-রাবণ-দ্বন্দের বিস্তৃতি বর্ণনা আছে, উহা স্পষ্টই উত্তরকাণ্ড হইতে স্থানচ্যুত করিয়া আদিকাণ্ডে আনা হইয়াছে। উহা অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের একটি বিশেষত্ব। কাজেই এই পুথিতে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়াও বোধ হয়। এই পুথিখানা কোন গায়েনের পুথি দেখিয়া নকল করা এবং গায়েনগণের স্মৃতিভ্রংশের ফলে অথবা খামখেয়ালীতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কৃত্তিবাসের রচনা এই রকম বিকৃত আকার ধারণ করিতেছিল।

১ম পাতায় বাম দিকে ১৮ অঙ্ক দেখিয়া সন্দেহ হয়, মূল পুথিতে হয়ত প্রথম ১৭ পাতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বাল্মীকির দস্যুবৃত্তি, নারদ কর্তৃক উদ্ধার, ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে শ্লোকের উৎপত্তি, ব্রহ্মাকর্তৃক রামায়ণ রচনার আদেশ ইত্যাদি একেবারেই বাদ পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাও লক্ষ্যের যোগ্য যে যদিও পুথিখানা আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণ পুথি কিন্তু ইহার শেষ বালির জন্মে। আদিকাণ্ডের বাকী অংশ ইহাতে

কৃত্তিবাস অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন ; ভাষা-রামায়ণ রচনা করিতে তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ, মহানাটক, সেতুবন্ধ কাব্য ইত্যাদি হইতে ভাব, ভাষা ও উপাখ্যান আহরণ করিয়া মূল রামায়ণের উপাখ্যানের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মূল রামায়ণের বিবৃতিপরম্পরা তিনি অনর্থক লঙ্ঘন করেন নাই, ইহা ধরাই স্বাভাবিক। ভাষারামায়ণের যে পুথির বিষয়পরম্পরা মূল রামায়ণের বিষয়পরম্পরার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, সেই পুথিই কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা রক্ষা করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই বিচারে এই পুথিখানির প্রথমাংশ নিতান্ত অসার, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। যে স্থানে অন্যান্য পুথির সহিত ইহার মিল আছে তাহা পাঠোদ্ধারের কালে প্রদর্শিত হইবে।

ঙ-পুথি। পরিষদের ১২নং পুথি। পাতলা নিকৃষ্ট তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। আকার ১৩¼ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২—১৫। আদিকাণ্ডের অসম্পূর্ণ পুথি। গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখিত। বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর হস্তাক্ষরের সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন তাঁহারা এই পুথির অক্ষরের প্রকৃতি সহজেই বুঝিবেন। এই পুথিখানি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের সংগৃহীত। ইহার বিবরণ পঞ্চম বর্ষের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ২৮১ পৃষ্ঠায় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত করেন। পুথিখানি কোথায় প্রাপ্ত এই বিবরণে তাহার উল্লেখ নাই। কুমার বাহাদুরের নিকট পত্র লিখিয়া অবগত হইয়াছি, পুথিখানি তাঁহার পৈত্রিক নিবাস দীঘাপাতিয়ার নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

পুথিখানা গায়েনের পুথি, আরম্ভ হইতেই তাহা বুঝা যায় :—

.. চারি অংস হইয়া।
প্রভু তিন গর্ভে জর্ম্ম লভিলা সুভক্ষণ পাইয়া॥
রামের অনুজ বন্দো ভরত সত্রুগ্ন।
রামের কুল পুরহিত বন্দো বসিষ্ট ব্রহ্মান॥
লক্ষ প্রণামে বন্দো পবন কুমার।
আসরে আসিয়া হনুমান করো ভর॥
জতোক্ষণ আমরা শ্রীরাম গুণ গাই।
আসর ছাড়হ প্রভু রামের দোহাই॥
প্রণামে বন্দিব সরস্বতির চরণ।
জগাতে আত্তয়ে গ্রহস্ত হউক স্মরণ।
. : : :

—ইত্যাদি।

কৃত্তিবাস বন্দনাটুকু বিশেষ প্রয়োজনীয় :—

পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জন্ম লভিলা কিত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কির্ত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কির্ত্তিবাস গুণমালি।
অনেক শাস্ত্র পড়া-রচে শ্রীরাম পাচালী
শুনিতে অমৃতধার লোকে ত প্রকাশ।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কিত্তীবাস॥

ইহার সহিত পরিষদের ১২৬নং উত্তরকাণ্ডের পুথির কৃত্তিবাস বন্দনা তুলনীয় :—

কির্ত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতি॥

মুখুটিবংসে জন্ম ওঝার জগতে বিদিত।
ফুলিয়া সমাজে কিত্তিবায যে পণ্ডিত॥
পিতা বনমালি মাতা মানিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা(?) পার
তথা তথা কর্যা বেড়ায বিদ্যার উদ্ধার॥
বাল্মিকি হইতে হৈল রামাযণ প্রকাস।
শ্লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ। সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য; ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪১-৪২।

অনুরূপ কয়েকটি ছত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭নং অযোধ্যাকাণ্ডের খণ্ডিত পুথিতে কিঞ্চিৎ বিকৃত আকারে পাওয়া যায়, যথাঃ—

রাড় দেস ফুলিয়া জার নাম।
মুখটি বংসেতে জন্ম অতি অনুপাম॥
বাপ বনমালি মা মানকির উদরে।
ছয় ভুড়া (ওঝা ?) জন্মিলেন ছয় সহোদরে॥
ছোটির বন্দো(গঙ্গা ?) বড়র বন্দো (গঙ্গা ?) বড় গঙ্গার পার।
তথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যা রে উদ্ধার॥
রাঢ়া মধ্যে বন্দানু আচার্য্য চূড়ামণি।
[illegible] কিত্তিবাস পড়িলা আপুনি॥

Descriptive Catalogue of Bengali Mss. in the Calcutta University by Messrs. Basanta Ranjan Roy, Vidvadvallabh and Basanta Kumar Chatterjee, M.A. Vol. I, Introduction, P. ix and page 231.

অনুরূপ বিবরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের K. 486 নম্বর পুথিতেও পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের পুথি, ময়মনসিংহ জেলায় সংগৃহীত। মুক্তাগাছার জমীদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় বহু পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপহার দিয়াছিলেন,—এই পুথিখানি তাহাদেরই অন্যতম। ১২২১ সনের নকল, ৩০৯ পাতায় সমাপ্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার অধ্যক্ষ শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুথি হইতে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান সম্পাদনকার্য্যে শ্রীমান সুবোধের আন্তরিক অনুরাগ ও যোগের ইহা অন্যতম নিদর্শন মাত্র।

চতুর্দ্দিগ ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
উত্তর দক্ষিণ চাপী বহে সুরেশ্বরী।
মুকুটী বংশে জ[illegible]শংশারে বিদীত।
তথা এ উ[illegible]জিল কিত্তিবাস পণ্ডীত॥
বাপ ব[illegible]মালী মাও মালীকা (১) উদরে।
জ[illegible] লভিল পণ্ডীত ছয় শহোদরে॥
মাও মালিকা জার বাপ বনমালী।
শহোদর ছয় জন শব্ব গুণে জানি॥
সরস কবিতা বাক্য লোকেত প্রকাশ।
ফুলিঞা নগরে বাশ হেন কীর্ত্তিবাশ॥
কিত্তিবাশ পণ্ডীতের কণ্ঠে শ্বরশ্বতী।
ধ্যান করি বশী দেখে শভার আরতি॥
গুরুর বচণ বন্দী ভাবে ভাবে একমতি।
সাস্ত্রের বিধানে বশী করেন যুগতি॥
জথা তথা বন্দো (?) মুঞী গোশাঞীর কাহিনি।
অদিষ্টান হৈয়া গোশাঞী শুন মোর বাণী॥
রামায়ণ ভারত পোথা বেদ পুরাণ।
অযোদ্ধার রঘুবংশের শুনহ বাখান॥
পূর্ব্ব দিগে গুরু বন্দো আচার্য্য বলভদ্র।
রাজ ভূষিত ব্রাহ্মণ অনেক শম্পদ॥
দক্ষিণের গুরু বন্দো কৃষ্ণ গোপাল।
কাব্য শাস্ত্র চণ্ডিপাঠ বাখানে বিশাল।
পশ্চিমের গুরু বন্দো কৃষ্ণ গোবিন্দ।
ভুবন ভুষিত ব্রাহ্মণ জ্ঞানের প্রবিন্দ॥
উত্তরেত বন্দো গুরুদেব বীজয় রাজা।
গুরুজন হয় সেই সম্বন্ধেত আজা॥ (২)
চারিদিগের গুরু বন্দো পণ্ডিত হেন মানি।
বলশাল জ্ঞান চারিজনের বাখানি॥

পূর্ব্বদিগের গুরু বন্দো মাথার শান্দুর।
তাহার উদয অন্ধকার গেল দূর। (৩)

পরিষদের ১২নং পুথিখানি দেখিয়া উহা বাঙ্গালা ১২০০ সনের নিকটবর্ত্তী পুথি, অর্থাৎ প্রায় সওয়াশত বৎসরের প্রাচীন পুথি বলিয়া ধারণা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭নং পুথিখানা সম্পাদকদ্বয় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। পরিষদের ১২৪নং পুথিও ইহাদের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গায়েনগণ কৃত্তিবাসের পিতার নাম, মাতার নাম

(১) মালীকা বলিয়াও পড়া যায়।
(২) মায়ের বাপ।
(৩) এই সকল দিগ্বিহারী গুরু সম্ভবতঃ গায়েনের।

(আত্মবিবরণে মালিনী. পরিষৎ ১২নং পুথিতে মেনকা, ১২৪নং এ মানিকি; কঃ-বিঃ র ১৭১৭৭ পুথিতে মানকি; ঢাঃ বিঃ K—488 এর মালীকা বা মানীকা। সম্ভবতঃ মালিনীই ঠিক, অন্যগুলি বিকৃতি) সহোদরগণের সংখ্যা ও নাম মনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল দেখিয়া ভরসা হয় যে কৃত্তিবাসের দীর্ঘ ও সুবিখ্যাত আত্মবিবরণাত্মক পয়ারগুলি সমেত আর একখানা পুথি হয়ত একদিন আবিষ্কৃত হইবে।

এই আত্মবিবরণসম্বলিত পুথিখানা হুগলি জেলার বদনগঞ্জে পাওয়া যায়। বদনগঞ্জ বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার মিলনস্থলে, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার পশ্চিমতম প্রান্তে। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর হইতে বদনগঞ্জ প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে। এই বদনগঞ্জে এক নিঃসন্তান বৃদ্ধ কথক ও গায়ক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বদনগঞ্জের ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে তাঁহার সমস্তগুলি পুথি দান করেন। ভক্তিনিধি মহাশয় আবার ঐ পুথিগুলি পরলোকগত ৺নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর নিকট বিক্রয় করেন। *

এই পুথিগুলির মধ্যে ১৪২৩ শকের একখানা রামায়ণের পুথি ছিল। ইহা কি কোন কাণ্ডের পুথি, না সমগ্র রামায়ণের পুথি, তাহার উল্লেখ কোথাও পাইলাম না। এই পুথিখানিতে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি ছিল। ভক্তিনিধি মহাশয় উহার একটি নকল ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহাই তদীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"এর দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেই হইতে এই আত্মবিবরণটি বিদ্বজ্জন সমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর ক্রীত পুথিখানা কোথায় গেল তাহার কোন খোঁজই আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ভক্তিনিধি মহাশয়ের বাড়ীতে উহার একটি নকল ছিল, তাহাও নাকি আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে এই অমূল্য পুথি ও তাহার নকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই আত্মবিবরণটি দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"এর ৫ম সংস্করণের ১২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত আছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাহা পরে মুদ্রিত হয়। চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জি-কোম্পানী প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্যান্য সংস্করণেও উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ যোগেশবাবু বিচার করিয়া বলিয়াছেন, আত্মবিবরণটি কৃত্রিম নহে। † পরিষদের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনখানি পুথিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পুথিতে উহার সমর্থন পাইয়া এখন ঐ কথা আরও জোর করিয়া বলা চলে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে যথা সময়ে (অর্থাৎ সেই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে) কেহ ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই অথবা পারিলেও এই অমূল্য পুথিখানা যাহাতে সুরক্ষিত হইতে পারে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করেন নাই। এই সুপ্রাচীন পুথিখানি পাইলে কৃত্তিবাসের আসল রচনা উদ্ধারে এত গলদঘর্ম্ম হইতে হইত না।

এখন আবার 'ঙ' পুথির বর্ণনায় ফিরিয়া আসা যাউক। ২ হইতে ১৫ পাতায় পুথিখানি সম্পূর্ণ। সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ না দিলে পুথির প্রকৃতি বুঝা যাইবে না।

২।১ বিবিধ বন্দনা, কৃত্তিবাসের পরিচয় ও বন্দনা।

২।২ বন্দনার জের। বিষ্ণুর অবতারসমূহ বর্ণন।

৩।১ সপ্তমে রাম অবতার। তৃতীয় ছত্রে "গোলক বৈকুণ্ঠপুর সভাকার পর" বলিয়া নারায়ণের চারি অংশে অবতার বর্ণনা আরম্ভ। নূতন অবতার দেখিয়া ব্রহ্মার মহা চিন্তা, নারদ আসিয়া বলিলেন রাম নামে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনি হইয়া রামায়ণ রচনা করিবেন।

৩।২ রত্নাকরের দস্যুবৃত্তি। ব্রহ্মার অনুরোধে বিষ্ণু সন্ন্যাসী বেশে তাহাকে উদ্ধার করিতে চলিলেন।

৪।১ রত্নাকরের উপাখ্যানের জের।

৪।২ রত্নাকরের উপাখ্যানের জের।

৫।১ রত্নাকরের উপাখ্যানের জের। 'ব্রহ্মা আদি দেব লইয়া' বিষ্ণু সিদ্ধমগ্ন রত্নাকরকে দেখিতে চলিলেন।

৫।২ বাল্মীকি নামকরণ। বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এবং সমস্ত দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ রামায়ণ রচনার বর দিলেন। বাল্মীকির পিতার নিকট প্রত্যাগমন এবং পিতা কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা। শিষ্য ভরদ্বাজ সহ সরোবর কূলে স্নানার্থ গমন।

৬।১ ব্যাধের ক্রৌঞ্চবধ। বাল্মীকির ব্যাধকে অভিসম্পাত। দেবগণের মন্ত্রণায় নারদের আগমন ও বাল্মীকিকে দীক্ষাপ্রদান। নারদ কর্ত্তৃক ক্ষীরোদ-মন্থনের বিবরণ।

৬।২ মন্থনে চন্দ্রের উত্থান। চন্দ্রবংশের বিবরণ—"সংক্ষেপে কহিল ইলার উপক্ষন। উত্তরাতে কহিব সকল বিবরণ।" চন্দ্রবংশে জনকের জন্ম।

* রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর লিখিত "কৃত্তিবাসের জন্ম শক" প্রবন্ধ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, ২৩ পৃষ্ঠা।

† সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০ সন, ৩১৬ পৃষ্ঠা।

"চন্দ্রবংশ মহামণি এই থানে থুইয়া। সূর্য্য বংস রচে মুনি স্থাপিত হইয়া'। সূর্য্য বংশ বর্ণন।

৭।১ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৭।২ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৮।১ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৮।২ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৯।১ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৯।২ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান এই উপাখ্যান পুথির শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে, শেষ হয় নাই।

এই নমুনারই কোন পুথি অবলম্বন করিয়াই যে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ পরিষদে রক্ষিত 'গ' পুথিতে অথবা ১৬২২ শকের 'ঘ' পুথিতেও নাই। উহা আমাদের চ-ছ-জ পুথিতেও নাই। উহা পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্য আধুনিক পুথিগুলিতেই দৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যানটি পশ্চিম-বঙ্গের কোন গায়েনের রচনা বলিয়াই মনে হয়। এই নমুনার পুথিগুলিতে সমুদ্রমন্থন এবং চন্দ্রবংশ-সূর্য্যবংশ-বর্ণনা স্থানচ্যুত হইয়া অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আগে আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের প্রকৃত স্থান রামচন্দ্রের বিবাহসভায় বরকন্যার বংশ-বর্ণনে। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান মূল সংস্কৃত রামায়ণে নাই। আমাদের আদর্শ পুথিগুলিতেও নাই। আলোচ্য নমুনার পুথিগুলিতে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানও আদিকাণ্ডের আদিতেই স্থান পাইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্রীরামপুরের মিশনারী-গণ কর্ত্তৃক প্রচারিত সংস্করণই সামান্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজিও বাজারে চলিতেছে। এমন কি উদ্ভটসাগর মহাশয় সম্পাদিত চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণের সুশোভন-সংস্করণও অবিকল বটতলা সংস্করণেরই পুনর্ম্মুদ্রণ, উদ্ভটসাগর মহাশয় শুধু দুই চারিখানা পুথি ঘাঁটিয়া কয়েকটি অতিরিক্ত উপাখ্যান সংযোজিত করিয়াছেন। এই শ্রীরামপুরী সংস্করণের অবলম্বিত পুথিগুলি তৎকাল প্রচলিত নিতান্ত আধুনিক পুথি ছিল। সুপ্রাচীন পুথির খোঁজ করিয়া কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা উদ্ধারের কোন চেষ্টা সাহেবেরা করেন নাই। ফলে এই সওয়াশত বছরের অধিককাল ধরিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া আমরা চারি পাঁচ পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে যাহা পড়িয়া আসিতেছি, তাহা নিতান্তই ভেজাল কৃত্তিবাস। *

কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনার উদ্ধার করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রথমাবধিই সচেষ্ট আছেন। ১৩১০ সনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের সম্পাদনে কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ড পরিষৎকর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। 'তিনখানা পুথি অবলম্বনে এই উত্তরকাণ্ড সম্পাদিত হয়। একখানা ১০০৯ সালের বাঁকুড়া পাত্রসায়রের পুথি, উহার মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়। দ্বিতীয় পুথিখানা পরিষদের সম্পত্তি, উহাতে "কোন সন তারিখ নাই, দেখিলেও প্রাচীন লিপি বলিয়া মনে হয় না।" এই দুই পুথির পাঠে মিল ছিল এবং এই দুইখানা মিলাইয়াই প্রেসকপি প্রস্তুত হয়। বই ছাপা আরম্ভ হইলে আর একখানা পুথি হস্তগত হয়, উহা সুপ্রাচীন এবং ১৫০২ শকের প্রতি-লিপি। "১৫০২ শকের পুথিখানি অতি প্রাচীন হইলেও ১০০৯ সনের পুথির সহিত অধিকাংশ স্থলেই পাঠের মিল নাই। বিষয়গত সাদৃশ্য সত্ত্বেও পাঠবৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে এই দুইখানি পুথি যেন দুইজন কবির রচনা বলিয়া মনে হইবে। ১০০৯ সালের পুথি ও সাহিত্য পরিষদের পুঁথির শেষাংশ নিতান্ত অস্পষ্ট, সেই জন্য আলোচ্য রামায়ণের শেষাংশ ১৫০২ শকের পুথির সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে।" (পরিষদের 'উত্তরকাণ্ড', ভূমিকা)

হীরেন্দ্র বাবু যখন 'উত্তরকাণ্ড' সম্পাদন করেন তখন যথেষ্ট সংখ্যক পুথি পাওয়া যায় নাই বলিয়া তুলনামূলক সমালোচনার সুযোগ ছিল না। এখন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচুর পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তুলনা-মূলক সমালোচনা করিবার সুযোগও আছে। হীরেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত ১০০৯ সনের পুথিখানার সন যে মল্ল সন এবং

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তাঁহার সম্পাদনে পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত অযোধ্যাকাণ্ডের ভূমিকায় অবিকল এই মন্তব্যই প্রকাশিত করিয়াছেন :—"পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে অধুনাপ্রচলিত বটতলার রামায়ণের আদর্শ স্থানীয় শ্রীরামপুরী রামায়ণ বিশ্বাসযোগ্য পুথি হইতে সংগৃহীত নহে। অতএব প্রচলিত সংস্করণের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে।"

বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৪৪

১০০৯ সন যে প্রকৃত পক্ষে বঙ্গাব্দ ১১১০, তাহা শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে (পৃঃ ১১৭, ৫মসং) বলিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রাচীনতর পুথি ১৫০২ শকের পুথিখানা, যাহার উপর উত্তরকাণ্ডের পাঠ-নির্দ্দেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, সেই পুথির যথোপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই। এই উভয় পুথিই এখন কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের পুথিশালায় আছে। নম্বর ২০৮ এবং ২০৯।

পরিষদের চেষ্টায় এবং হীরেন্দ্র বাবুর সম্পাদনে কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ড ১৩০৭ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ১০০৯ সনের একখানা পুথির পুনর্ম্মুদ্রণ মাত্র। এই পুথিখানা এখন কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের পুথিশালার ৩৩ নম্বর অযোধ্যা-কাণ্ডের পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ইংরেজি ভাষায় রচিত বাঙ্গালা পুথির বিবরণীতে নিম্নলিখিতরূপে এই পুস্তকের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। (পৃঃ ২৫)

Substance, countrymade paper; 14 × 5 inches. Folia 1—33 marked by two sets of figures. Lines 10 on a page leaving a blank space of about an inch in the middle of each page. Date 1008 B.S. (1691 A.D.). Date seems to be doubtful. This ms. cannot be more then 150 years old. Complete. Place of find, Bankura.

হীরেন্দ্র বাবু পুথিখানার তারিখ পড়িয়াছিলেন ১০০৯ বাঙ্গালা। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের পুথিবিবরণীতে সম্পাদকদ্বয় ঐ তারিখই ১০০৮ পড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে পুথিখানা অত প্রাচীন হইতে পারে না। ইহার ব্যাখ্যায় একটি গূঢ় রহস্য বাঙ্গালী পাঠকগণের জানা আবশ্যক। এইসমস্ত পুথি দীনেশ বাবুর ভৃত্য বাঁকুড়া পাত্রসায়রবাসী রামকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। এই ব্যক্তিকে দীনেশ বাবু পুথিসংগ্রহের জন্য নগেন্দ্র বাবুর হাতে সমর্পণ করেন। নগেন্দ্র বাবু এই ব্যক্তির দ্বারা বাঁকুড়া অঞ্চল হইতে পুথিসংগ্রহ করাইয়া নিজের পুথিশালা গড়িয়াছিলেন। ঐ পুথিশালার বাঙ্গালা পুথিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় কিনিয়া লইয়াছেন, সংস্কৃত পুথিগুলি দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় কিনিয়া লইয়াছেন। আমি দীনেশ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, এই রামকুমার দত্ত অত্যন্ত ধূর্ত্ত ছিল এবং পুথিসংগ্রহ কার্য্যে হাত পাকাইয়া অবশেষে সে সংগৃহীত পুথির জন্য নগেনবাবুর নিকট হইতে অধিক মূল্য আদায় করিবার আশায় পুথির পুষ্পিকায় লিখিত সনাঙ্ক কৌশলে বদলাইয়া প্রাচীনতর সনাঙ্ক বসাইতে আরম্ভ করে। অবশেষে এই দুষ্কার্য্যে ধরা পড়িয়া বিতাড়িত হয়।

অযোধ্যাকাণ্ডের পুথিখানার প্রাচীন সনাঙ্ক সম্ভবতঃ এইরূপ পরিবর্ত্তিত সনাঙ্ক, তাই কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের পুথি-বিবরণীর সম্পাদকদ্বয় পুথির পুষ্পিকায় সনাঙ্কের সহিত পুথির বয়সের মিল দেখিতে পা'ন নাই। উত্তরকাণ্ডের ১০০৯ সনের পুথিখানার সনও ঐরূপ কিনা কে বলিবে? নগেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে ক্রীত এবং রামকুমার দত্ত কর্ত্তৃক বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত পুথিগুলির সনাঙ্কগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষার পর গ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বজন নমস্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত পরিপক্ক প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে নিতান্ত ঢিলামি ও অসতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন। কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব্ব তাঁহার সম্পাদনে পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। যে পুথিখানা দেখিয়া উহা সম্পাদিত, তাহার পুষ্পিকায় সনাঙ্ক শাস্ত্রী মহাশয় পড়িলেন ৯৮৫ সাল। দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে (৪৪৫ পৃঃ, ৫মসং) কাশীদাসের সময় নির্ণয় আছে। উহাতে দেখা যায় কাশীদাস ১০১০ বাঙ্গালা সনে বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পরিষদের পুথিখানি কিন্তু তাহারও ২৫ বৎসর আগেকার হইয়া পড়িল। পরিষৎ প্রকাশিত আদিপর্ব্বের ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"সাহিত্য পরিষদে গিয়া একদিন হঠাৎ শুনিলাম যে সেখানে সন ৯৮৫ সালের একখানি পুথি আছে। সেখানি কাশী রামেরই আদিপর্ব্বের পুথি। সন ৯৮৫ সাল হইলে ইংরেজি ১৫৭৮ সাল হয়। মনে একটু খট্‌কা বাধিল। কাশীরাম আওরঙ্গজেবের সময়ের লোক শুনিয়াছিলাম, এ যে আকবরের সময়ে গিয়া পড়ে; প্রায় ১০০ বছরের তফাত। বেশ করিয়া হাতের লেখা মিলাইলাম, অঙ্ক কয়টাও দেখিলাম; সে বিষয়ে কোন ভুলভ্রান্তি মনে হইল না। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে কাশীরাম যত পুরাণ শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আরও পুরাণ। পুথিখানি কাশীরামের হাতের লেখা নয়। সুতরাং পুথিতে যে তারিখ আছে, তাহা নকলের

তারিখ, রচনার তারিখ নয়। তাহা হইলে কাশীরাম আবও পুরাণ হইলেন।" *

শাস্ত্রী মহাশয় আজীবন পুথি ঘাঁটিয়াছেন, তাঁহার এই কথার উপর আর কাহারও কথা চলে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুথিসংগ্রহ ব্যাপারে পুথি-সংগ্রহ-সমিতির সম্পাদকের কাজ করিয়া আমারও পুথিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে এবং ১১।১২ হাজার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পথি আমারও হাত দিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। একদিন কৌতূহল পরবশ হইয়া পরিষদে যাইয়া আদিপর্ব্বের পুথিখানা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ৯৮৫ সনের পুথি হইলে সাড়ে তিন শত বছরের পুরাণ পুথি। পুথিখানা দেখিয়াই মনে হইল উহা শ'দেড়েক বছরের বেশী পুরাতন নহে। সাড়ে তিন শত বছরের পুথির পৃষ্ঠাঙ্কে ৪ সংখ্যাটি ৎ এর মত হওয়া উচিত, ৩5 সংখ্যাটি ও এর মত হওয়া উচিত, ৭ সংখ্যাটির মাথায় ফাঁক থাকিয়া ভাঙ্গা ৭ এর চেহারা ধারণ করা আবশ্যক। ৮এর আকৃতি ৮ হওয়া আবশ্যক। পুথির প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশে এই-গুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই বিদিত পরথ। উহাদের একটিও এই পুথিতে নাই। পুষ্পিকায় সনের অঙ্কটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ৯৮৫ অঙ্কের রহস্য বুঝিলাম। প্রথমতঃ, পুথিখানা বিষ্ণুপুরের, কাজেই সনটি মল্লাব্দ হইবার সম্ভাবনা তো রহিয়াছেই। তাহার উপর আবার সনাঙ্কের ৮৫ অঙ্ক দুইটি মাত্র স্পষ্ট। পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ পোকায় কাটা। আটের পূর্ব্বের অঙ্কটি ১ ছিল বলিয়া বোধ হয়, উহার মাথা হইতে কতক অংশ গোলাকৃতিতে পোকায় কাটিয়াছে, কাজেই উহা ৯এর মত দেখা যায়। উহা ৯ নহে ইহা জোর করিয়াই বলা যায়। এই অঙ্কের পূর্ব্বেও কতক স্থান পোকায় কাটা। তথা হইতে ১ কাটা গিয়াছে বলিয়া অনুমান করি। কাজেই সনাঙ্কটি প্রকৃত পক্ষে সম্ভবতঃ ১১৮৫। অথচ এই অঙ্কটি ঠিক পড়া হইল কিনা তাহা ভাল মত বিচার না করিয়াই এই আধুনিক পুথিটি অবিকল মুদ্রিত করিতে শাস্ত্রী মহাশয় এবং পরিষদের পুথিরক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি প্রাণপাত পরিশ্রমই না করিয়াছেন এবং কতগুলি টাকাই না ব্যয় হইয়াছে! শাস্ত্রী মহাশয়ের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি এমন ভুল করিতে পারেন তবে অন্যে পরে কা কথা? পুথিখানা পরিষদের পুথিশালায়ই রক্ষিত আছে। কৌতূহলী অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই আমার কথা সত্য কিনা মিলাইয়া দেখিতে পারেন। আমি তারাপ্রসন্ন বাবু এবং পরিষদের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ রামকমল বাবুকে এই ব্যাপার দেখাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আদিপর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

* এই পুথিখানা ১৩০৬ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬৩।৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। তখন উহা নগেন বাবুর সম্পত্তি এবং বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে রক্ষিত ছিল। নগেন বাবু পুষ্পিকায় যে পাঠ দিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠের সহিত তাহার গরমিল আছে

আর একদিক

শ্রীযুক্ত এফ. এল. ওয়েলমান 'জেণ্টলমেন অব দি জুরি'তে স্যর আর্থার কনান ডয়েলের পরিহাস-রসিকতার একটি সুন্দর কাহিনী লিখিয়াছেন।

একবার সমাজের মান্যগণ্য প্রতিপত্তিশালী, সৎ-জীবনযাপী বারোজন বিশিষ্ট বন্ধুর প্রত্যেকের কাছে তিনি একটি করিয়া টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামে লেখা—'পালাও বন্ধু, পালাও, সব ধরা পড়েছে।' যাঁহাদের কাছে টেলিগ্রাম গেল, তাঁহাদের প্রত্যেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। কি জন্য জানাইতেছেন, তাহা কেহই বুঝিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলেন না। টেলিগ্রামের মর্ম্মোদ্ধারের চেষ্টাও কেহ করেন নাই।

স্যর আর্থার ইহার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন কিনা লেখক তাহা জানান নাই।

গ্লাসগোর এক কলেজে জনৈক প্রোফেসার সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির মূল্য বুঝাইতে নিজের ক্লাশে এক মজার কাণ্ড করেন। একটি পেয়ালায় কেরোসিন, সরিষার ও রেড়ীর তেল মিশাইয়া, ক্লাশের সকল ছাত্রদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিয়া ঐ কুৎসিত দ্রব্যে একটি আঙ্গুল ডুবাইয়া নিজের আঙ্গুল চুষিলেন। তারপর তিনি পেয়ালাটি ক্লাশের সব ছেলেদের হাতে দিলেন। সব ছেলেই তাঁহার দেখাদেখি পেয়ালায় আঙ্গুল ডুবাইয়া সেই আঙ্গুলটি চুষিয়া লইল। ফল যাহা হইল বলাই বাহুল্য। অতঃপর প্রোফেসার পেয়ালাটি ফিরাইয়া লইয়া ক্লাশের ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমাদের কাহারও দৃষ্টিশক্তির সূক্ষ্মতা নাই। কেন না ইহা তোমরা লক্ষ্য কর নাই যে, যে আঙ্গুলটি আমি পেয়ালাতে ডুবাইয়াছিলাম, সে-আঙ্গুলটি চুষি নাই। সুতরাং তোমাদের যে দুর্ভোগ হইয়াছে, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।—গ্রেনফেল—ফর্টি ইয়ার্স ফর ল্যাব্রাডর।

বিদ্যাসাগর-কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরসিক এবং মজলিসি লোক ছিলেন। অনেক সময় তাঁহার কথা শুনিয়া সমবেত লোকেরা হাস্য করিয়া উঠিতেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিতেন, যেন হাস্যোদ্দীপক কোন কথাই হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় এক বৎসর কাল চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন। সেই এক বৎসর আমি প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। আমার পিতা তখন বৰ্দ্ধমানে কাজ করিতেন, প্রতি শনিবার রাত্রিতে বাটী আসিতেন এবং সোমবার প্রাতে কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতেন, সুতরাং তিনি মাসে তিন চারি বারের অধিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিতেন না। আমি কলিকাতায় কার্য্য করিলেও প্রত্যহ বাটী হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতাম, সুতরাং আমার পক্ষে সর্ব্বদা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে যাইবার সুবিধা ছিল। এক বার, কি কার্য্যোপলক্ষে মনে নাই, উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ দিন আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারি নাই। চারি পাঁচ দিন পরে আমার অবসর হইবা মাত্র আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইলাম। পথিমধ্যে দেখি, তিনি আমাদের বাটীর দিকেই আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি দ্রুত পদে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিবা মাত্র তিনি বলিলেন— "তুই আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছিলি, চার পাঁচ দিন তোর দেখা নেই, আমি মনে কল্লেম হয়ত তোর অসুখ করেছে। ভাল আছিস ত? আমি তোর খবর জানবার জন্যে তোদের বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম।"

প্রায় এক বৎসর কাল ধরিয়া যে মহাপুরুষের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাঁহার সম্বন্ধে কয়টা কথা আমি বলিতে পারিব? বিশেষতঃ সে প্রায় তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এই বৃদ্ধ বয়সে ততদিন পূর্ব্বের কি সকল কথা মনে পড়ে?

মনে আছে, একদিন স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কথায় কথায়, আমরা ইংরেজের নিকট হইতে কি পাইয়াছি এবং ইংরেজের সংশ্রবে আসিয়া আমাদের কি ক্ষতি হইয়াছে তাহারই আলোচনা হইতেছিল। সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ বা লাভের অঙ্কে—রেলপথ, ডাক ও তার-বিভাগ প্রভৃতির উল্লেখ করিলেন; কেহ বা লোকসানের অঙ্কে আমাদের স্বাস্থ্য, শান্তি প্রভৃতির উল্লেখ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরবে তাঁহাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন, নিজে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। অবশেষে দুই একজন তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "লাভ লোকসান ত' কখনও খতিয়ে দেখিনে, তবে মোটের উপর আমার মনে হয়, আমরা ইংরেজের কাছ থেকে তিনটি ভাল জিনিষ পেয়েছি।" সেই তিনটি কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"প্রথম, ইংরেজী সাহিত্য। ওদের সেক্সপীয়র, মিল্টন, বেকন, সার ওয়াল্টার স্কট্ প্রভৃতি যে সাহিত্য আমরা পেয়েছি, তা বড় সামান্য লাভ বলে মনে ক'র না। তারপর দ্বিতীয় লাভ—বরফ। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে এক ঘটি জল এক টুক্‌রো বরফ দিয়ে খেলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আর তৃতীয়—পাঁউরুটি।" সাহিত্য, বরফ ও পাউরুটিকে এক তালিকাভুক্ত করাতে সকলে হাসিয়া উঠিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমরা আমার কথা শুনে হাসছ? কিন্তু বল দেখি পাঁউরুটির মত পথ্য আমাদের দেশে কিছু ছিল কি? এক বাটী দুধে এক খানা পাউরুটি ফেলে খেলে পেট ভরে যায়, কোন অসুখ করে না। আমার ত মনে হয়, ওরা আমাদিগকে যে সব নূতন খাবার খেতে শিখিয়েছে, তার মধ্যে পাউরুটি সকলের সেরা।" সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, চিকিৎসকের পরামর্শে রাত্রিতে দুধ ও পাঁউরুটি খাইতেন।

আর একদিন বাঙ্গালীর পোষাকের কথা হইতেছিল। সকলেই জানেন যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান বিদ্যাসাগর সকল সময়েই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপযোগী পরিধেয়ই ব্যবহার করিতেন। সাদা ধুতি, সাদা চাদর এবং চটিজুতা ইহাই ছিল তাঁহার পোষাক। বাঙ্গালীর পোষাকের কথায় তিনি বলিলেন—

'একবার বড় মজা হয়েছিল। সার এশ্‌লি ইডেন তখন ছোটলাট। জার্ম্মানি থেকে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি ছোটলাটের বাড়ীতেই অতিথি হ'য়ে বাস ক'রছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ সহজ করে লিখেছি, অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছি। তাই তিনি ছোটলাটকে একদিন বল্লেন—বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন। ছোটলাট তাঁর কথা শুনে বলেছিলেন—বিদ্যাসাগর আমার বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, কিন্তু আপনি গিয়ে দেখবেন, তিনি প্রায় উলঙ্গ (he is almost naked)। ছোটলাটের ঐ মন্তব্যটা আমি শুনেছিলাম। এর কয়েক মাস পরে, একদিন বৈশাখ মাসের দুপুর বেলা সার এশ্‌লি ইডেন কোন পরামর্শের জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন দার্জ্জিলিং শিমলাতে লাট সাহেবদের যাতায়াত ছিলনা। গ্রীষ্মকালে বড়লাট কল্‌কেতা ছেড়ে যেতেন বারাকপুরে আর ছোটলাটেরা কি শীত কি গ্রীষ্ম, আলিপুরে বেলভিডিয়ারে থাক্‌তেন। আমি ছোটলাটের বাড়ীতে গিয়ে দেখি তিনি একটা অন্ধকার ঘরে, লংক্লথের ঢিলে পাজামা পরে বসে আছেন। জানলায় খসখসের পর্দ্দা, টানাপাখা চলছে, সাহেব গরমে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। ঘরে ঢুকে আমার গা যেন জুড়িয়ে গেল। যাক্, প্রথমে আমাদের কাজের কথা হ'ল, তারপর কিছু কাল এটা-ওটা বাজে কথা হ'তে লাগল। দারুণ গ্রীষ্মের কথা তুলে সাহেব হঠাৎ বল্লেন—I envy your dress (অর্থাৎ তোমার পোষাক দেখে আমার ঈর্ষা হয়)। সাহেবের কথা শুনে আমি বল্লেম, সাহেব আপনার envyর ত' কোন কারণ নেই। আমার পোষাকের দাম তিন টাকাও নয়। এক টাকার কাপড়, বার আনার চাদর আর আট আনার জুতা। এতে আর envy করবার কি আছে? যেটা আমায় আয়ত্তের অতীত, সেইটার জন্যই আমার envy হতে পারে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করলেই যা সংগ্রহ কর্ত্তে পারি তার জন্য আর envy কেন? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে you envy the dress of a naked man! আমার কথা শুনে সাহেবের সেই মন্তব্য মনে পড়ে গেল,—তিনি লজ্জিত হয়ে ব'ল্লেন—আমাকে ক্ষমা কর, আর কখনও তোমার সম্বন্ধে ওরকম মন্তব্য ক'রব না। অবশ্য তোমার মত পোষাক আমিও ব্যবহার ক'রতে পারি কিন্তু তাতে আমার লজ্জা করে। সাহেবের কথা শুনে আমি বললাম—সাহেব, লজ্জা জিনিষটা আপনাদেরই একচেটে নয়, ও জিনিষটা আমাদেরও আছে। আপনি ইংরেজ হয়ে বাঙ্গালীর পোষাক পর্ত্তে যেমন লজ্জিত হন, আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে হয়ে, ইংরেজের পোষাক পর্ত্তে তার চেয়ে বেশী লজ্জিত হই।'

সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'এক সময় আমি বর্দ্ধমানে গিয়েছি শুনে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসেন। তাঁর আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন- বাবা, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এসেছি।' হঠাৎ আমার উপর তাঁর এই বাৎসল্যের কারণ কি বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেম। তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্লেন—বাবা তুমি সংস্কৃত ব্যাকরণের রেল-গাড়ী তৈরি করেছ, তাই তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এসেছি। আগে, যখন রেলগাড়ী ছিল না, তখন এই বর্দ্ধমান হ'তে কল্‌কাতা যেতে তিন দিন লাগত। আর এখন ইংরেজের কৃপায় সকালে বাড়ীতে ভাত খেয়ে রেলগাড়ীতে করে কল্‌কাতায় গিয়ে সন্ধ্যার আগেই বাড়ীতে ফিরে আসতে পারা যায়। তোমার ঐ 'উপক্রমণিকা' আর চার খানা 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ঠিক যেন ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রবেশ করবার রেলগাড়ী। আমরা চতুষ্পাঠীতে দশ বার বছর ধরে পরিশ্রম করে যা আয়ত্ত কর্ত্তে পারতুমনা, এখন দেখি তোমার ব্যাকরণ পড়ে এক বছরে তাই—বরং তার চেয়ে বেশী শেখা যায়। বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করে বলেছিলেন—'পরোপকৃতয়ে ময়া।' তার কথা তুমি সার্থক করেছ। এই বলেই বৃদ্ধ তাঁর পায়ের ধূলি নিয়ে আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন। কতরকমই যে মানুষ আছে!'

এক দিন এক জন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা আপনি এই যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছেন, তাতে অনেকে আপনাকে ভালও বলেছেন, আবার অনেকে মন্দও বলেছেন ত'? যারা মন্দ ব'লছেন, তাদের কথাও আপনার কানে গেছে ত'?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"তা' অনেক গালাগাল শুনেছি বৈ কি। একদিন এক মজার ঘটনা হয়েছিল। আমি তখন ইনস্পেক্টর। হুগলী জেলাতে একটা গ্রামে স্কুল দেখে কলকেতায় ফিরে আসব বলে তাড়াতাড়ি পাণ্ডুয়া ষ্টেসনে এলাম। আমি ষ্টেসনে উপস্থিত হলেম আর গাড়ীখানাও ছেড়ে চলে গেল। শুনলেম তিন চার ঘণ্টার মধ্যে আর গাড়ী নাই। (তখন এত ঘন ঘন গাড়ী ছিল না) সুতরাং ষ্টেসনের বাইরে একটা মুদির দোকানে গিয়ে আশ্রয় নিলেম। মুদী আমাকে বসবার জন্য একখানা টুল দিলে এবং তামাক খাই জেনে এক কলকে তামাক সেজে দিলে। আমি তামাক খেয়ে পাশের ময়রার দোকান থেকে কিছু সন্দেশ এনে জলযোগ সেরে নিলেম। আমি যখন জল খাচ্ছি, সেই সময় আর একজন গেরুয়া-পরা ব্রাহ্মণ সেই দোকানে এলেন। তাঁকে দেখে মুদী তাড়াতাড়ি দোকানের মাচা থেকে নেমে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে এবং খুব খাতির করে এক কলকে তামাক সেজে দিলে। সেই ব্রাহ্মণ নিজের জামার পকেট থেকে একটা ছোট হুঁকো বের করে গম্ভীরভাবে তামাক টানতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের কাপড়, জামা, চাদর সব গেরুয়া, পায়ে খড়ম, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কপালে একটা রক্তচন্দনের ফোঁটা, বুকে জামার উপর একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা। ব্রাহ্মণ তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় মুদী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা দাদা ঠাকুর, এই যে শুনেছি আজকাল রাঁড়ের বিয়ে হচ্ছে, এ ব্যাপারখানা কি? প্রশ্ন শুনেই দাদাঠাকুর একেবারে গরম হয়ে উঠলেন। বল্লেন—ওসব খিষ্টানী মত, হিঁদুর মেয়ের কি আর দুবার বিয়ে হয়? দেখনি, মোছলমানদের নিকে হয়, হিঁদুর ঘরেও দুলে বাগ্দীর ঘরে নিকে হয়? ও সেই রকমই, ভদ্দরলোকের মেয়ের কি আর দুবার বিয়ে হয়? মুদী বল্লে—শুনেছি, কলকেতার একজন মস্ত বড় পণ্ডিত নাকি শাস্তর দেখিয়ে রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা দিয়েছেন? দাদাঠাকুর গরম হয়ে বল্লেন—ও সেই বিদ্যাসাগরের কথা বলছ? সে বেটা আবার পণ্ডিত হল কবে? টাকা খাইয়ে গোটাকতক ফিরিঙ্গীকে আর কতকগুলো কালেজের ছেলেকে হাত করে, কোম্পানিকে বলে কয়ে বিধবা-বিবাহের আইন পাশ করেছে। সে বেটা যদি পণ্ডিত হয় তবে মূর্খ কে? মুদী নাছোড়বান্দা, সে ব'লল—আমি শুনেছি বিদ্যাসাগর নাকি বামুন পণ্ডিতের ছেলে, নিজেও বামুন পণ্ডিত? দাদাঠাকুর বল্লেন—বামুন পণ্ডিত? সে হোটেলে সাহেবদের সঙ্গে বসে খানা খায়, মাথায় টুপি, জামা ইজের বুটজুতো পরে চুরুট মুখে দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চলে, তাকে কি বামুন পণ্ডিত বলতে হবে নাকি? ব্রাহ্মণের মুখে আমার বর্ণনা শুনে আমি মনে মনে হেসে তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেম—আপনি বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন? দাদাঠাকুর বল্লেন—দেখিনি? দুবেলা আমার বাদুড়বাগানের বাসার সুমুখ দিয়ে যাতায়াত করে, আমি তাকে দেখিনি? কলকেতায় তাকে না দেখছে কে? ব্যাটা হিঁদু কি ফিরিঙ্গী তা বোঝা যায় না; ইয়া লম্বা গোঁফ, চোখে চসমা। দাদাঠাকুর তো আমার রূপ বর্ণনা করে বিধবা-বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় তাই প্রচার করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যা নয় তাই বলে গাল দিতে লাগলেন। খানিক পরে, দাদাঠাকুরের মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হলে আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেম। তিনি নিজের নাম ও পাণ্ডুয়ার কাছাকাছি কি একটা গ্রামে তাঁর আস্তানা বল্লেন। কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। পাঁচ কথার পর তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করাতে আমি আমার নাম বল্লেম। নাম শুনেই ব্রাহ্মণ একেবারে থ হয়ে গেলেন, চক্ষু ছানাবড়ার মত ঠেলে বেরিয়ে এল, বল্লেন, আপনার নিবাস? আমি বল্লেম—কলকেতা বাদুড়বাগান। শুনে ত' ব্রাহ্মণ একেবারে অবাক, মুখে আর কথা নেই। খানিক বাদে আমতা আমতা করে বল্লেন—আপনি আপনি কোন বিদ্যেসাগর? আমি হেসে বল্লেম- যে বিদ্যেসাগর রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা দেয়, আমি সেই বিদ্যেসাগর। তবে আপনি যে বিদ্যেসাগরের কথা বল্লেন, বুট জুতো পরে ইজের জামা টুপি পরে দিন রাত চুরুট খায়, লম্বা গোঁফ, আমি সে বিদ্যেসাগর নই, সে বোধ হয় আর কেউ হবে। আমি ত জীবনে কখন বুট জুতো পরিনে, চুরুট খাইনে, আর গোঁফও নেই, তাত দেখতেই পাচ্ছেন। আমার কথা শুনে ব্রাহ্মণ উঠে একেবারে লম্বা ভোঁ ভোঁ করে দৌড়। আমি দাদাঠাকুরকে কত ডাক দিলেম, কে শোনে? দাদাঠাকুর আর পিছনে চেয়ে দেখলেন না। মুদী আমার নাম শুনে আর দাদাঠাকুরের বাহাদুরী দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।"

আর এক দিনের ঘটনার কথায় বলিয়াছিলেন "আমি যখন মফস্বলে স্কুল দেখতে যেতাম, তখন গ্রামের ভিতরে কখনও পাল্কী চড়ে যেতাম না, কেমন লজ্জা করত। গ্রামের বাইরে পাল্কী থেকে নেমে চলে গ্রামে ঢুকতেম, আমার চাপরাসিকে ও বেহারাদিগকে হয় আগে পাঠিয়ে দিতেম, নয়ত আমার অনেক পরে আসতে বলতেম। সেকালে মফস্বলে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে ইনস্পেক্টরদের স্কুল দেখতে যাওয়াটা একটা সমারোহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। কোন দিন কোন স্কুল দেখতে যাব তা পূর্ব্বে খবর দিয়ে জানিয়ে রাখতে হ'ত। আমি একে ইনস্পেক্টর তার উপর বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থাদাতা বিদ্যাসাগর, তাই আমার অভ্যর্থনাটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের হ'ত। সে সময় দাশুরায়ের পাঁচালীতে বিধবা-বিবাহের ছড়া বেরিয়েছে, শান্তিপুরে 'বেচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে' পাড় কাপড় বেরিয়েছে, সুতরাং আমি তখন একটা কেষ্টবিষ্টু গোছ হয়ে উঠেছি। মফস্বলে স্কুল দেখতে গেলে এই অপরূপ জানোয়ারকে দেখবার জন্য গ্রামান্তর থেকে লোক আস্‌ত। সেই সময় আমি এক বার হুগলী জেলার থানাকুল * গ্রামে স্কুল দেখতে যাই। আমার যেদিন যাবার কথা ছিল, সেদিন গিয়ে পৌছতে পারি নি, তার পর দিন বৈকালে গিয়ে পৌছলাম। গ্রাম হ'তে প্রায় পোয়াটাক দূরে পাল্কী ছেড়ে দিলেম আর বেয়ারা-গুলোকে পাল্কী নিয়ে পরে আসতে বল্লেম। আমার চাপরাসিকে আগে গিয়ে স্কুলে খবর দিতে বল্লেম। দূর থেকে দেখি, গ্রামে ঢোকবার পথের উপর বাঁশ আর ডালপালা দিয়ে একটা ফটক বাধা হয়েছে, বুঝলেম আমারই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হয়েছে। চাপরাসা আগে আগে যাচ্ছে, আমি তার প্রায় পঞ্চাশ হাত পিছনে চলেছি, এমন সময় দেখি একপাল মেয়েছেলে—ছেলে, যুবা, বুড়ী সব কাপড় কেচে দল বেধে যাচ্ছে। আমার চাপরাসিকে দেখে একজন আধাবয়েসী মেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে, —তুমি কে গা? চাপরাসী ব'লল—আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাপরাসী। শুনে সেই স্ত্রীলোকটি ব'লল—তুমি এলে তা' বিদ্যাসাগর মশাই কোথায়? সে পশ্চাতে আমাকে নির্দ্দেশ করে ব'লল—ঐ যে পিছনে আসছেন। তার কথা শুনে সেই মেয়ের দল আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। একটু পরে একজন মুখরা গোছের বুড়ী বল্লে, ঐ বিদ্যাসাগর? ঐ পোড়ার মুখ দেখবার জন্য আমরা কাল থেকে ঘর বার করিছি? তার কথাগুলো আমি শুনতে পেলাম, কিন্তু সে তা বুঝতে পারেনি। আমি একটু জোরে চলে তার কাছে গিয়ে বল্লেম—হাঁ মা, এই পোড়ারমুখোই বিদ্যাসাগর। কি করব বল, কার্ত্তিকের মত চাঁদ মুখ নিয়ে ত জন্মাইনি যে রূপ দেখে তোমাদের আহ্লাদ হবে। আমার কথা শুনে মাগী একগলা ঘোমটা দিয়ে দে দৌড়!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় চন্দননগরে বাস করিতে-ছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে সহবাস-সম্মতি আইন উপলক্ষে হিন্দুসমাজে, বিশেষতঃ কলিকাতার হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন হইতেছিল। হিন্দুসমাজের সনাতনী দল ঐ আইনের বিরুদ্ধে এবং সমাজ-সংস্কারক ও ব্রাহ্মদল আইনের সমর্থনে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সভাতে বক্তৃতা করিয়া সহর সরগরম করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় পণ্ডিত ৺শশধর তর্কচূড়ামণি এবং পরিব্রাজক ৺কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী) প্রভৃতি সম্মতি-আইনের বিরুদ্ধে প্রত্যহ বক্তৃতা করিতেন, অন্য পক্ষে ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺নগেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ বক্তৃতা করিতেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইত। "বঙ্গবাসী" তখন সনাতনী দলের এবং "সঞ্জীবনী" সংস্কারপন্থীদিগের মুখপত্র রূপে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অভিমত প্রকাশ করিতেন। সামাজিক ব্যাপার লইয়া সেরূপ ঘোরতর আন্দোলন তাহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। যেদিন ঐ আইন পাশ হইল, তাহার পরদিন কলিকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের নিকটে এক বিরাট সভা হইল, সেই সভাতে বোধ হয় এক লক্ষ লোক হইয়াছিল। প্রধানতঃ "বঙ্গবাসী"র চেষ্টাতেই সেই বিরাট সভা হয়। সম্মতি আইন উপলক্ষে যখন কলিকাতা এইরূপ ভীষণ আন্দোলনে আন্দোলিত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন রুগ্ন দেহে চন্দননগরে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রত্যহ তাঁহার নিকটে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইত বটে কিন্তু তিনি নিজে কোন দিন ঐ আইন উপলক্ষে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে ঐ আইন সম্বন্ধে প্রশ্ন

* বিদ্যাসাগর মহাশয় থানাকুল বলিয়াছিলেন কি সেঁয়াখালা বলিয়াছিলেন আমার ঠিক মনে নাই।—লেখক।

করাতে তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"ও'দল বানরে দাঁত খিঁচুচ্ছে, ওতে বলবার কথা কি আছে? গোঁড়া হিন্দুর দল কচি কচি মেয়েগুলোর গলায় পা দিয়ে পরকালের পথ পরিষ্কার কচ্ছে আর কেউ যদি সেই মেয়েগুলোকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে, অমনি—'সর্ব্বনাশ হ'ল, ধর্ম্ম গেল' ব'লে চেঁচাতে থাকে। অন্য দিকে যারা এই আইন পাশ করাবার জন্য লাফালাফি কচ্ছে, তাদের বানরে বুদ্ধি ব'লব না ত কি বলব? তারা যেন আইন করে বার বছর পর্য্যন্ত মেয়েগুলোকে রক্ষা কর্‌লে। কিন্তু মেয়ের বয়স বার বছর এক দিন হবেই, তখন তাকে রক্ষা কর্‌বে কি করে? আইনের সাহায্যে এই সব ব্যাপার সমাজে চালাতে চেষ্টা করা বাঁদরামি নয়ত কি? আমি অবাক হই যে লোকে একটু চেয়ে দেখেনা। সমাজে শিক্ষার বিস্তার হলে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ আপনা হ'তেই সমাজ থেকে লোপ পাবে। আজকাল ত দেখছ যে ভদ্দর-লোকের বাড়ীতে বার বছরের আইবুড় মেয়ে থাকলে মেয়ের মা-বাপের আহার নিদ্রা ঘুচে যায়। যদি বেঁচে থাক ত' দেখবে, এর পরে বার বছর তের বছরের মেয়ের বিয়ের কথা বড় কেউ শুনতেই পাবেনা। পনের ষোল বছরের না হলে কেউ মেয়ের জন্য বর খুঁজতে বেরুবেনা। সমাজের গতি যে কোন্ দিকে তা কেউ চোখ চেয়ে দেখবেনা, কেবল চোখ বুজে 'গেল, গেল' ব'লে চেঁচাবে। সব বাঁদরের দল।"

পাঠকগণ দেখিবেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দূরদৃষ্টি কিরূপ প্রখর ছিল। তিনি হিন্দু ভদ্রলোকের কন্যাদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, আজ তাহা সর্ব্বত্র বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। মহাপুরুষদিগের লক্ষণ-ই এই যে, তাঁহারা সমাজের ভবিষ্যৎ অবস্থা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়া সমাজকে সেই অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু অদূরদর্শী লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চেষ্টা পণ্ড করিবার প্রয়াস পায়।

কোন সাংসারিক সমস্যা উপস্থিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সুন্দর রূপে সেই সমস্যার নিরাকরণ করিয়া দিতেন একদিন বৈকালে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে তাঁহার পরিচিত কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আগন্তুক তাহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকটে কত লোকের শারীরিক ও পারিবারিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে কথায় কথায় সেই ভদ্রলোক তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের অকৃতজ্ঞতা ও অন্যায় ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"আপনি ত' সবই জানেন, বাবা যখন মারা যান, তখন, কত কষ্ট ক'রে আমার ভাইকে মানুষ করেছিলাম। নিজে পেটে না খেয়ে তাকে খাইয়ে ছিলেন, স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে তাকে কলেজে পড়ালেম, তার বিব এখন সে বেশ দশটাকা উপার্জ্জন কচ্ছে, কিন্তু আমাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। বড় আশা করেছিলেম যে সে মানুষ হ'লে আমার সাংসারিক কষ্ট ঘুচবে, আমি শেষ বয়সে সুখের মুখ দেখতে পাব। কিন্তু এমনই আমার কপাল যে, এখন সে আমায় দশটা টাকা দিয়েও সাহায্য করে না, সাহায্য করা ত' দূরের কথা একখানা পত্র দিয়েও খবর নেয় না যে দাদা আছে কি মরেছে।" ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরবে সেই ভদ্রলোকের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া শেষে বলিলেন, "দুনিয়ার নিয়মই এই। ব্যবসা কর্ত্তে গেলে লাভও হয় লোকসানও হয়। তোমার ব্যবসাতে লাভ আর হ'ল না, লোকসানই হ'ল।"

তাঁহার কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যবসার কথা কি বলছেন, আমিত' বুঝতে পাল্লাম না কোন ব্যবসায়ে আমার লোকসান হ'ল?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"ব্যবসা নয়ত কি? তুমি ত' কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ভাইকে মানুষ কর নি, ভাই বড় হয়ে টাকা রোজগার করে তোমাকে মুঠো মুঠো টাকা দেবে, এই আশাতে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে মূলধন হিসাবে টাকা খরচ করেছিলে। এখন দেখছ সেই ব্যবসাতে লোকসান হ'ল। তুমি বড় ভাই, পিতৃহীন ছোটভাইকে মানুষ করা তোমার কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে যদি তুমি ভাইকে মানুষ কর্ত্তে, তা'হলে আজ আর তোমাকে হতাশ হয়ে আফশোস কর্ত্তে হত না। এই যে আমার কত আত্মীয়স্বজন আমার কাছ থেকে কত রকম সাহায্য পেয়ে, এখন আমাকে গ্রাহ্যই করে না, বরং অনেক সময় আমার অনিষ্ট চেষ্টাই করে, সেজন্য ত' আমার কোন দুঃখ হয় না। কারণ আমি যখন তাদিগকে সাহায্য করে-ছিলেম তখনও কোন প্রতিদান পাবার আশায় সাহায্য

করিনি, আমার কর্ত্তব্য ভেবেই আমি সাহায্য করেছি। তুমিত সে পথে যাওনি, তুমি যে লাভের আশায় মূলধন বের করেছিলে। তা সব ব্যবসাতে কি আর লাভ হয়?” ভদ্রলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শুনিয়া লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বেত খাওয়া”র গল্প বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। চন্দননগরের তদানীন্তন দানবীর ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের দাতব্য কবিরাজী চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক কবিরাজ ৺রামহরি পাল প্রায় প্রত্যহই বৈকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময় নিজের পীড়া সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয়ের অভিমত ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রেও কবিরাজ মহাশয়ের জ্ঞান ছিল। কিন্তু তাঁহার একটা রোগ ছিল, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাইলেই তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বভাব ছিল ঠিক তাহার বিপরীত। তিনি সহজে কাহারও সহিত কোন বিষয়ে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরিচিত হইবার কয়েক দিন পরে, একদিন কবিরাজ মহাশয় কথায় কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা মহাশয় এই যে সব শাস্ত্রেই মুক্তির কথা দেখতে পাই, সে মুক্তিটা কি রকম?” বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে কবিরাজ মহাশয় আবার সেই প্রশ্ন করিলেন, সেবারও বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। এইরূপে তিনি চারিবার জিজ্ঞাসিত হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—“কেন বাপু আর এই বুড়ো বামুনকে বেত খাওয়াবে?” ঐকথা শুনি কবিরাজ মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—“সে কি মহাশয়, আমি আপনাকে বেত খাওয়াব কিরূপে?” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—“তা নয়ত কি? ও মুক্তি, নির্ব্বাণ, পরলোক, স্বর্গ, নরক সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা আছে, তুমি তাই নিয়ে থাক—আমার যা ধারণা আছে, আমি তাই নিয়ে থাকি। মুক্তি সম্বন্ধে আমার যা বিশ্বাস আছে, সেটা হয়ত ভুল বিশ্বাস। এই ভুল বিশ্বাসের ফলে ম'লে পর যখন যমের বাড়ী যাব, তখন চিত্রগুপ্ত বলবে—‘বুড় বিট্‌লে, মুক্তি সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা? দাঁড়াও তোমার ধারণা ঘোচাচ্ছি।’ এই বলেই একটা যমদূতকে হুকুম কর্ব্বে ‘লাগাও বুড়োকে বিশ বেত।’ যমদূত এসে আমাকে শপাশপ বেত লাগাবে। এমন সময় হয়ত তুমি সেখানে গিয়ে হাজির হ'লে, চিত্রগুপ্ত যখন তোমাকে মুক্তির তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করবে তখন তুমি আমার মুখে যা শুনবে তাই বলবে। চিত্রগুপ্ত যখন জিজ্ঞাসা কর্ব্বে ‘এ তত্ত্ব কার কাছে শুনেছিলি?’ তখন তুমি আমাকে দেখিয়ে বলবে ‘উনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন।’ চিত্রগুপ্ত তাই শুনে আমাকে বলবে বটেরে বিট্‌লে বামুন, নিজেও মজেছ আবার পরকেও মজিয়েছ?’ এই বলেই যমদূতকে হুকুম কর্ব্বে ‘লাগাও বুড়োকে আর বিশ ঘা।’ তা বাপু, আমি একে নিজের বেতের ঘায়ে জ্বলে মরছি, তার উপর তুমি আবার কেন বেত খাওয়াবে? ও সব নিজে বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা ভাল বোঝ তাই কর, অন্য লোককে ওসব কথা জিজ্ঞাসা করে আর ফ্যাসাদে ফেল না।”

এইরূপ কতদিন কত কথা সেই মহাপুরুষের মুখে শুনিয়াছি এবং যুবজনসুলভ চপলতায় তাহার কেবল হাস্যরসটুকুই উপভোগ করিয়াছি, তাহার অন্তরালে যে কত বড় সত্য নিহিত আছে, তখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখনই কি পারি?

সন্ধানী

সমস্যা

ব্যাপকতর অর্থে দর্শন হইতেছে সেই দৃষ্টি বহির্ভূত বনিয়াদ যাহাকে ভিত্তি করিয়া সভ্যতার কোন ইমারৎ দাঁড়াইয়া থাকে। যেন আত্মার মত—নিজেরই প্রয়োজনে ইহা ধীরে ধীরে দেহকে গড়িয়া তুলিতেছে। কোন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সেই সম্প্রদায়ের সংগঠিত অভ্যাস ও প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে জীবনের মূল্যাবধারণ, জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য বুঝিয়া লয়। কোন সভ্যতার প্রশংসা বা নিন্দা করার সময় আমরা উহার মূল্য-নিরূপণের তুলাদণ্ডকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

প্রাচীন হিন্দুর জ্ঞানচর্চ্চায় এবং প্রাচীন গ্রীকের চিন্তাধারায় দেখি মানুষকে এই বিশ্বসৃষ্টির প্রতীক বলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহার দেহ আছে, ধাতুদ্রব্যের মত সে দেহের ওজন এবং পরিমাপ, উদ্ভিজ্জের মত গঠন, জীবজন্তুর ন্যায় অনুভূতি ও গতি এবং তদুপরি আছে যুক্তিশক্তি ও আধ্যাত্মিক সাধনা। মোটামুটি বলিতে গেলে মানুষের আত্মা হইতেছে দেহ, মন ও জীবনীশক্তি—এই ত্রয়ী। আমাদের দৈহিক সত্তা যে বানরের দৈহিক সত্তা হইতে বিশেষ কিছু বিভিন্ন নয়, তাহা হইতে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জৈব ও উদ্ভিজ্জ সত্তার প্রমাণ পাই। অধ্যাপক ইলিয়ট স্মিথ বলেন, মানুষের মস্তিষ্কের আকার শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্কের আকার হইতে ভিন্ন নয়। আমাদের স্বভাবগত আলস্য, স্রোতে গা ভাসাইবার প্রবৃত্তি, মাটির প্রতি আকর্ষণ এবং ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি রিপুর বশ্যতা—এই সব মানসিক বৃত্তি হইতেও আমরা যে প্রাণী-জগতের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ তাহা বুঝা যায়। অদৃশ্যের জন্য আমাদের আকুলতা, আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও তাহার দুঃসাহসিকতা এবং আত্ম-উন্নয়নের জন্য চেষ্টা আমাদের সত্তার বিশিষ্ট অঙ্গ—এবং তাহা হইতেই আমাদের পুরাণ, দর্শন, ধর্ম্ম ও শিল্পকলা আমরা পাইতেছি। ক্রমবিবর্ত্তনের পারম্পর্য্যের মধ্য দিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতাই—পুরাকালের সেই আদিম কুসংস্কার, প্রত্যেক প্রাণী ও জড়বস্তুতে আত্মা বর্ত্তমান বলিয়া ধারণা (animism), অলীক কাহিনী (myth) ইত্যাদি হইতে বর্ত্তমানের সূক্ষ্ম ও জটিল দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্পন্ন সংস্কৃতি পর্য্যন্ত - নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

যদিও আমাদের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহাকে প্রাক্তন পাশব উত্তরাধিকার বলা যায়, তথাপি মানুষ, মানুষ হিসাবে পশু হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের পাপ এবং পুণ্য বিশেষ করিয়া মনুষ্যসুলভ। ইন্দ্রিয়-সুখকে যখন আমরা জীবনের লক্ষ্য করিয়া তুলি তখন আমরা মানুষের চেয়ে বেশী পশুপ্রকৃতির বলিয়া কথিত হই, কিন্তু কোন পশুই রিপুপরবশ জীবনের একটি আদর্শ গঠন করিয়া মানুষের মত তাহা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার পশুরা মানুষের চেয়ে অধিকতর ভব্য। কতকগুলি জিনিস পশুর পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু মানুষকে সেগুলি সাধ্যমত চেষ্টা ও সংযমের দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। পশুরা তাহাদের রতিক্রিয়াকে প্রজননক্রিয়ার অধীন রাখিয়াছে। এবিষয়ে আদিম বর্ব্বর মানুষের সহিত পশুর সাদৃশ্য আছে। আমরা যে চিন্তা ও নির্ব্বাচনীশক্তি পাইয়াছি তাহার বিপুল সম্ভাবনা আছে—হয় তাহা আমাদিগকে পাশব প্রকৃতির ঊর্দ্ধে তুলিয়া বীরত্বের উচ্চ শিখরে পৌঁছাইয়া দেয়, নয় তো অধঃপতনের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং পশুত্বের ধাপে নামিয়া যাওয়ার কথা যখন আমরা বলি, তখন শুধু ঘুরাইয়া সেই সব প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাপারে আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ করিয়া থাকি, যেগুলি নাকি মানুষ এবং পশু উভয়েরই পক্ষে সাধারণ।

আমাদের ভিতরকার পশু সর্ব্বদাই বিকাশলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সকল প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ চরিতার্থতা হইলে আমাদের পশু-সত্তার পূর্ণ বিকাশ হয় - পশু-প্রকৃতির চরম সার্থকতা ঘটে। মানুষের আত্মাকে যদি দেহের সঙ্গে এবং জীবনের বৈশিষ্ট্যকে যদি আমরা দৈহিক বিকাশের সঙ্গে এক করিয়া দেখিতে চাই, তবে আমরা বর্ব্বর, পশুবলের ও সামর্থ্যের পূজারী এবং ইন্দ্রিয়-ভোগের আদর্শবাদী বলিয়া কথিত হই। এরূপ একান্ত দেহচর্চ্চার ফলে আত্মা স্থূল হইয়া পড়ে এবং তাহার অধিকার হারায়। দৈহিক বল-বিকাশের দ্বারা প্রাধান্যলাভ বর্ব্বরতার বিশিষ্ট লক্ষণ। এ রকম সমাজে পুরুষ স্ত্রীজাতিকে খাটো করিয়া দেখে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করে, কারণ স্ত্রীজাতি দেহের দিক দিয়া দুর্ব্বল; নারীরাও পক্ষান্তরে পশুবলকে শ্রদ্ধা জানায়, সহায়তা করে এবং যাহারা সাহস ও অস্ত্রচালনার জন্য খ্যাত তাহাদেরই আদর করিয়া থাকে।

প্রাণ বা দেহ অপেক্ষা মনকে যে সম্প্রদায় বড় বলিয়া ধরে সে সম্প্রদায় ঊর্দ্ধ স্তরের। কিন্তু মনকে প্রসারিত করিয়া তাহাতে যদি সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ ও নৈতিক পূর্ণতা দিতে না পারি অর্থাৎ মনকে যদি আত্মার সহিত অবিচ্ছিন্ন বলিয়া না ধরি তবে সভ্যতার আদর্শ লাভ হয় না। আমাদের জ্ঞান হয়তো বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু সে জ্ঞান আমরা উচ্চতর আধ্যাত্মিক বৃত্তি-সাধনে না খাটাইয়া দৈহিক তৃপ্তিসাধনে খাটাইতেছি। অভাব আমাদের ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, এই অভাবের পরিপূরণ ও সম্পদবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আমাদের জীবনকে চাপিয়া রাখিতেছে। মনের জগতে বর্ত্তমানে যে জীবনযাত্রা চলিয়াছে তাহা নিম্ন স্তরের। রোমাঞ্চকারী চিন্তাবেগ, বুদ্ধিগত উপভোগ, সৌন্দর্য্যের মোহ এবং মানসিক উত্তেজনা আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, উচ্চ সাহিত্য বা মহৎ কলার গভীর রাগানুভূতিতে আমরা আকৃষ্ট হই না। গতানুগতিক প্লট, ডিটেক্‌টিভ গল্প, কথার হেঁয়ালি- এই সবে আমরা মুগ্ধ হইয়া আনন্দ পাই। এই দ্বিতীয় স্তরের সম্প্রদায়ভুক্ত কোন লোক নিজের জন্য চিন্তা করে না, প্রচলিত বুদ্ধিহীনের পন্থা ধরিয়া কাজ করিয়া যায়—পছন্দ, অপছন্দ, কুসংস্কার এবং পক্ষপাতিত্বের পুঞ্জে পড়িয়া তাহার নৈতিক প্রকৃতি স্থূল ও খর্ব্ব হয়। কেবল প্রচলিত প্রথানুযায়ী জীবনযাপন, আরাম এবং ভব্যতা ছাড়া আর কোন মাপকাঠি

তাহার নাই। এই সম্প্রদায়ে অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় মানুষকে সাফল্যলাভের যোগ্য করে বলিয়াই শিক্ষার মূল্য দেওয়া হয়; প্রয়োজনীয় জ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান আদর পায়—ইহার দ্বারা আরাম ও সুবিধাভোগের সম্ভাবনা আছে, ইহার সংগঠনশক্তি আছে এবং প্রচুর পণ্য উৎপাদনের যন্ত্র ইহার দ্বারা আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ইহার আদর। বাহিরের এই সম্পদ কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য ফুটাইতে পারে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের এখনও হয়—তবে মানুষে মানুষে অস্ত্রযুদ্ধ আর নয়, এখন চলে যন্ত্রে যন্ত্রে যুদ্ধ। শিকারের পশু আমরা যতটা হইয়া পড়িয়াছি, ভাই-ভাই সম্পর্ক আমাদের ততটা লুপ্ত হইয়াছে এবং যতদিন না আমাদের স্বার্থপরতা সংযত হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা আরও ভয়ঙ্কর হইব, কেননা, অনিষ্ট করার ক্ষমতা আমাদের সহস্র গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রচলিত প্রথার দাস বলিয়া অন্তরেও আমরা দাস্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। স্বীয় সংস্কারের সার্ব্বভৌমত্ব বা কালচারের শ্রেষ্ঠত্বে সমষ্টির বিশ্বাস থাকিলে ব্যক্তিও তজ্জন্য লড়াই করিতে প্রস্তুত থাকে। বলপ্রয়োগে বিশ্বাসই হইল আমাদের প্রথম কথা, ধর্ম্মমতের জন্য অত্যাচারের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ দিতেছে। এরকম সমাজে যদি কয়েক জন সাধারণের উর্দ্ধ স্তরে উঠিয়া এই চিন্তা করে যে, মানুষের চরম উদ্দেশ্য হইল এক বিশ্ব গোষ্ঠির সৃষ্টি—যে গোষ্ঠি হইবে সার্ব্বভৌম প্রেমের ভগবানে বিশ্বাসী—সমষ্টির কল্যাণে কেহ কেহ যদি মানুষকে এই মতাবলম্বী করিতে চায় ও বলপ্রয়োগ বন্ধ করিবার প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিদ্রোহী ও বিধর্ম্মী বলিয়া ধরা হয়, সমাজ তাহাদিগকে শীঘ্র সরাইবার ব্যবস্থা করে। ভীরু যাহারা তাহারা ভয়ে বশীভূত হয় এবং যাহারা ভিন্ন মত পোষণ করিয়া চলে তাহারা বিনষ্ট হয়। সমাজের এই অবস্থা হইল অর্থনৈতিক অথবা বুদ্ধিগত বর্ব্বরতার অবস্থা, কেন না ইহাতে আরামের সহিত সভ্যতা, আচারের সহিত নীতি, রুটিনের সঙ্গে ধর্ম্ম এবং ত্যাগের, শোষণ ও পণ্যের বাজারের সঙ্গে রাজনীতি—সব মিশাইয়া গুলাইয়া দেয়।

সুখী হইতে কি কি লাগে!

'হেরাল্ড ট্রিবিউন ম্যাগাজিন'-এ কয়েক মাস আগে সার ফিলিপ গিব্স—'সুখের জন্য আমাদের কি কি দরকার' (What do we need for Happiness) নামে একটি ক্ষুদ্র হইলেও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধের শীর্ষে তিনি ডক্টর টমাস ডাবলিংটনের একটি লেখা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—প্রাচ্যের এক ভূপতি দারুণ অশান্তিতে পরামর্শের জন্য একজন দার্শনিককে ডাকিয়া পাঠান। দার্শনিক রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখীকে সন্ধান করিয়া তাঁহার পিরাণ ভূপতিকে পরিতে বলিলেন। বহু সন্ধানে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখীর পাত্তা মিলিল—কিন্তু তিনি পিরাণ পরেননা।

প্রবন্ধের সারাংশ—

আমি নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় যে সব লোক দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া পাতিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখীদের কথা মনে করি। ইহাদের অধিকাংশই দারিদ্র্যপীড়িত। হয়তো অখ্যাতনামা গ্রন্থকার, চিত্রকর, কবি কি ভবঘুরের দল। মাত্র কয়েক শিলিং সম্বল লইয়া কোনও কাফের টেবিলে কি রেস্তোঁরায় বসিয়াই জীবনের অনেকদিন ইহাদের কাটে। কিন্তু স্ফূর্ত্তির অভাব নাই। জীবনকে একটা মহা মজার ব্যাপার বলিয়া ইহারা ধরিয়া লইয়াছে। ঘরবাড়ীর ছাদের উপর দিয়া কিংবা কুসুমকীর্ণ পথের পাশ হইতে সূর্য্যাস্ত দেখিতে পয়সা লাগে না। ধোঁয়াটে আকাশের পটভূমিতে কোনও গাছের শাখাপ্রশাখার প্রসার দেখিতেও ট্যাক্স লাগে না। আলিসায় উপর আলস্যে ভর দিয়া নীচে প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী দেখিতেও খরচ নাই। ইহাদের প্রত্যেকেরই কল্পনার অদ্ভুত শক্তি আছে আর বাক্‌চাতুর্য্য আছে। নিজেদের সমান দরের সঙ্গীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে দিন গুজরাণ করিতে ইহাদের কয়েকটি সিগারেট কি একটি পুরাণো পাইপ হইলেই যথেষ্ট। শুধু ইহারই সাহায্যে তাহারা জীবনে এমন আনন্দের অধিকারী হইতে পারে, যে-আনন্দ হিসাবনিকাশ ও ভাবনা-চিন্তায় ভরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের আয়ত্তের বাহিরে।

একথা কেহ ভাবিয়া দেখিলে নিজের অভাব অভিযোগ সম্পূর্ণ কমাইয়া জীবন হইতে যথেষ্ট রস ভোগ করিতে পারে। শরীররক্ষার জন্য মানুষের এমন কিসেরই বা প্রয়োজন! আমরা সকলে অতিভোজন-বিলাসী। নিজের নগ্নতা ঢাকিতে মানুষের কয়খানি বস্ত্রের দরকার? একজোড়া পুরানো পাতলুন আর গলাখোলা শার্ট, যে-মানুষ হাসিতে জানে—তাহার পক্ষে এই পরিধানই যথেষ্ট।

আমার একজন বন্ধু—জি, কে, চেষ্টারটন একবার বলিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া নিপাত যদি যাই-ই, হাসিতে হাসিতে যাইব। এ কথা ফেলিবার নয়। এমন নর-মানুষ তো দেখিলাম না, যিনি নাকি বলিতে পারেন অর্থনীতিক জগতে কি ঘটিবে। লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর অঞ্চলের একটুখানি স্পর্শ পাইবার আগে আমাদিগকে আরও কত দারিদ্র্য সহিতে হইবে কে জানে। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে দারিদ্র্যকে সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্যে দেখিতে ও সহিতে পারিলে আমরা নিজেদের ও অপরের দারিদ্র্যের অনেক কালিমা দূর করিতে পরিব।

কাল্‌চার-বাদ

কয়েক সংখ্যা আগের 'বুকম্যান' পত্রিকায় উইন্‌থ্রপ প্যাংকহার্ষ্ট লিখিয়াছেন—

মানুষ মহৎ প্রাণী—কিন্তু কেমন যেন একটু সঙের মতও। যেখানে তাহাকে কাল্‌চারের প্রমাণ দিতে হয়, সেখানে সে এমনই সঙ্‌ যে, তার তুলনা হয় না। পাছে লোকে ভাবে তাহার কাল্‌চার নাই—সে একটি গাধা, ইহা অপ্রমাণ করিতে সে সময়ে সময়ে নিজেকে কি গর্দ্দভই না প্রমাণ করে!

উদাহরণ দিতেছি। বিদগ্ধজন হিসাবে আপনি পুশ্‌কিণের নাম নিশ্চয়ই জানেন। পুশ্‌কিণ রুশিয়ার সব চাইতে বড় কবি—নয়? অবশ্য। সুতরাং পুশ্‌কিণের নাম উচ্চারণ করিতে 'উশ্‌'কে একটু দীর্ঘ ও রসায়িত করিয়া বলিতেই হইবে। শ্রোতা যিনি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনিও টানিয়া বলিলেন—'ও, পুশ্‌কিণ্‌!' দুই জনের চোখের ভাষা দুই জনে শুনিলেন। আর কথা হইল না। যাদুবাক্যের মত একটি কথা শুধু আর কিছু নয়। আর কোন কথা বলিবার দরকার কি?—তাই বাঁচোয়া, নহিলে দুজনের ভাগ্যে কি যে ঘটিত। যদি দুজনের পুশ্‌কিণের বিদ্যার পরীক্ষা হয়—তবে? থাক্‌, সে দুঃস্বপ্নের কথা না ভাবাই ভালো!

* * * * না, এ কথা আমাদের অস্বীকার করিবার জো নাই যে কাল্‌চার নামক নিতান্ত এক অদ্ভুত দ্রব্যের আমরা অর্থহীন দাস হইয়া পড়িয়াছি। এই কাল্‌চারের পৃথিবীর পটভূমি হইতেছে কতকগুলি পাঁচমিশালি তুক্‌তাক্‌, চলতি কতকগুলি পাঁজিপুঁথির দিন-তারিখ, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার গা-ঘেঁসা দু'চার দশটা বুলি, এখানে একটি ইংলিশ রাজা, ওখানে একটি গ্রীক দার্শনিক—বিশেষ একটি কথার বিশেষ একরূপ উচ্চারণভঙ্গী—বিদগ্ধ জনের স্বর্গের এই নমুনা।

শ্রাবণ-শর্ব্বরী

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে শ্যামলের দেরী হ'য়ে গেল। ভোর থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে—সে বৃষ্টির আর বিরাম নেই; একই ভাবে সহরের অসীম প্রসারের উপর ঝ'রে পড়্‌ছে। শ্যামলের সীট্‌টা পূর্ব্বদিকের জানালার কাছেই। অন্যদিন সকালের প্রথম রৌদ্র তা'র মুখে এসে পড়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। বাইরের নির্ম্মল আকাশ এবং সদ্যজাগ্রত নগরীর ঈষৎ চাঞ্চল্যে তার যেন কেমন নেশার আমেজের মত মনে হয়—তাই এই মেসের সঙ্কীর্ণতা বা অপরিচ্ছন্নতা সে ভুলে যায়। চা, খবরের কাগজ বা এক-আধখানা বিদেশী উপন্যাসপাঠ, আলাপ-আলোচনা, স্নান, আহার এবং যথা-নিয়মিত আফিস্ যাওয়ার মধ্যে তাই সে সকালের প্রসন্নতাটুকুকে বারে বারে খুঁজ্‌তে চেষ্টা করে—হয়ত পায়ও কিন্তু আজ দেরীতে ঘুম থেকে উঠে আকাশ-বাতাস এবং মেসের অবস্থা দেখে তার আর বিরক্তির অন্ত নেই।

ঘরের মেঝেয় ঘোলাজলের ট্যাঙ্ক্ থেকে কে যেন পলিমাটি তুলে মাখিয়ে রেখে গেছে—তার উপর বিড়ি মুখে দিয়ে সহবাসী বন্ধুর দল এ-ঘর থেকে ও ঘর, সে-ঘর থেকে এ ঘর ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তা'দের চটির গতিতে মেঝের দুর্দ্দশা আরো বেড়ে যাচ্ছে। শ্যামল বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে বারান্দায় জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে, মেসের তেতলাবাসীরা হুড়মুড় ক'রে বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে, উপরের ছাদ ফুটো হয়ে এক মহা বিড়ম্বনা বাধিয়ে তুলেছে। কিন্তু এ-সব সত্বেও শ্যামল দেখ্‌লে, কাজ কোথাও থেমে নেই—ঝি, উড়ে বামুন, প্রাইভেট টিউটার, খবরের কাগজ-ওয়ালা সব ঠিক যথানিয়মিত ভাবে কাজে চলেছে। সেই বৃষ্টিপ্লাবিত বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্যামল ভাব্‌লে—তা'কেও যেতে হবে আপিসে, স্নান করতে হ'বে, খেতে হ'বে, অবহিত হ'য়ে পোষাক পরতে হ'বে এবং ট্রাম-বাস-ভর্ত্তি অসংখ্য সহযাত্রীর সঙ্গে দশটা-পাঁচটার কাজে বেরুতে হ'বে। ঘরের দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো ছিল টুথ্‌-ব্রাশ—সেটা হাতে ক'রে নিয়ে, কাঁধে একখানা গামছা ফেলে শ্যামল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

শ্যামল কলতলায় মাথা পেতে দিয়েছে। পাশেই রান্নাঘর। ঠাকুর সশব্দে হাতাখুন্তী নাড়্‌ছে। এমন সময় চৌবাচ্চার ও-ধার থেকে কে একজন তাঁ'র বিপুল কলেবর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কলের দিকে উঁকি মেরে দেখ্‌লেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌লেন, 'আরে কে ও? শ্যামল ভাই যে! তা' এত সকালে যে নাইতে এলে? তাড়া আছে'

কলের ধারাপতনটিকে শ্যামল বেশ উপভোগ বাইরে বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দ আর স্নান-ঘরের মধ্যে কলের জলের শব্দ—এ দুয়ের মাঝখানে হয়ত কোন মিল ছিল, শ্যামল তা'রই মধ্যে অন্তরকে নিবিষ্ট ক'রে দিয়ে নিঃশব্দ হ'য়ে ছিল; হঠাৎ ঐ কথা শুনে কল থেকে মাথা না তুলেই বল্‌লে, 'হরপ্রসাদ দা' নাকি? না, তাড়া আর কিসের,—এম্‌নি সকাল সকাল সেরে নিচ্ছি।'

'বেশ ভাই বেশ, সেরে নাও। সকালে স্নান করার অনেক সুবিধে। প্রথম ধরো, বেশী ভিড় থাকে না, তা'র ওপর সমস্ত দিনের পরিশ্রমটা বেশ সহজে নেওয়া যায়; আমার ত ঐ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, আহ্নিক পূজোর ব্যাপার আছে কি না!'

'কি ক'রে করেন দাদা, আহ্নিক-পূজো এই মেসে—কি নোংরা জঘন্য জায়গা!'—ব'লে শ্যামল গামছা কাচ্‌তে লাগ্‌ল।

'আর ভাই, তুমিও যেমন! ও-সব চিত্তশুদ্ধি রে ভাই চিত্তশুদ্ধি—এই ধরো এখন গিয়ে এক হাজার আট বার ইষ্টনাম জপ করব—আমি ঠিক থাক্‌লে আমায় বাধা দেয় কে? চৌকিটা একটু উঁচু দেখে করিয়েছি—তা'রই নীচে গিয়ে আশ্রয় নিই! ওপাশের সিটে চা হচ্ছে, কেক্ হচ্ছে, সকাল বেলা পেঁয়াজ আর আদা কুচিয়ে তোমাদের কি সব ওই অমলেট না মমলেট ছাইভস্ম হচ্ছে—সে-সব দিকে আমি লক্ষ্যই করি নে। একবার চৌকির নীচে গিয়ে আশ্রয় নিলেই হ'ল'—ব'লে হরপ্রসাদ বাবু স্নান শেষ ক'রে যা'বার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

শ্যামল-ও কল ছেড়ে যা'বার উপক্রম করছে, বল্‌ল, 'তা দাদা, বেশ আছেন। আপিসের আপনার ছুটি-ছাটাও

আছে বেশ। ও-সব জিনিষ অবসর না পেলে হয় না।'

চলতে চলতে হরপ্রসাদ বাবু বললেন, 'আর ভাই অবসর! তুমিও যেমন! অবসর কি আছে রে ভাই? পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে আমার শ্যামল, আমার কি অবসর নিলে চলে? সমস্ত ব্যাপারই বুঝলে ভাই, সমস্ত ব্যাপারই হ'ল গিয়ে মনের শক্তি—তোমরা যে-সময়টা খবরের কাগজ পড়বে, সে-সময়টা আমি একটু ঈশ্বরের নাম করলাম—এই যা তফাৎ। ছুটি-ছাটা ভাই, তোমাদেরও ত আছে—এই ধরো একটা ছুটি দিন দুয়েকের তোমরাও ত পাচ্ছ শীগ্‌গির!'

'কবে দাদা, কবে?'—শ্যামল ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেই দেখল, হরপ্রসাদ বাবু ত্বরিত গতিতে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আপিস্ থেকে ফিরে শ্যামল দেখলে রুম্-মেট অতীন বাবু দাড়ি কামাচ্ছেন; পূবদিকের খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আস্‌ছে। হাওয়াতে তাঁর লম্বা চুলগুলো বিশৃঙ্খল হ'য়ে যাচ্ছে—একহাতে চুলগুলো চেপে ধ'রে, আর একহাতে তাড়াতাড়ি সাবানের ফেনার উপর দিয়ে সেফ্‌টি রেজর টেনে যাচ্ছেন। এই দৃশ্যে শ্যামলের বড় হাসি পেল। কারণ, আজ তা'র মনটি হাল্কা সুখের সুরে ভরা। কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে দুদিন ছুটি পাচ্ছে তা'রা আপিস্ থেকে। অতীন বাবুকে লক্ষ্য ক'রে শ্যামল বললে, 'মাথায় একখানা গামছা বেঁধে ফেলুন অতীন বাবু, সুবিধে হ'বে তা' হ'লে।'

অতীন বাবু দাড়ি কামাতে কামাতে বিরক্তির সুরে বললেন, 'আর ভাই বলেন কেন? নাপিত,—তা-ও এই বৃষ্টি-বাদ্‌লার দিনে মিল্‌বার যো নেই। বেশী পয়সা খরচ ক'রে সেলুনে গিয়ে চুল-টুল ছাঁটায় আমি মোটেই পক্ষপাতী নই—দেশের যা দুর্দ্দিন! কি আর করি? বর্ষাটা শেষ না হ'লে চুল-ছাঁটাই বোধ হয় আর হয় না।'

'যা বলেছেন দাদা, ছোটখাট ট্রাজেডির আর অন্ত নেই জীবনে!'—ব'লে শ্যামল জামা-কাপড় বদ্‌লাতে লাগ্‌ল।

'হাঁ, ভালো কথা'—ব'লে অতীন বাবু দাড়ি-কামানো ব্যাপারে ফিনিশিং টাচ্ দিয়ে বললেন, 'শ্যামল বাবু, আপনার একখানা চিঠি আছে, এই নিন্!'—ব'লে তিনি চিঠিখানা তাঁর ড্রয়ার থেকে বা'র করে শ্যামলের হাতে দিলেন। হাতে দেবার সময় শ্যামলকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—'আপনার তবু মশায়, চিঠি-পত্র আসে। আমাদের মত দুর্ভাগাদের স্মরণ করবারও কেউ নেই।'

শ্যামল স্মিতহাস্যে অতীন বাবুর কথাটিকে স্বীকার করে নিল। স্বীকার না ক'রে তা'র আর উপায় ছিল না। কারণ চিঠিখানি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তা'র নববধূ করবী তা'কে লিখেছে—'আপনার আপিসের কি ছুটি হয় না? কাছেই ত আছি, একদিনের জন্যও ত আস্‌তে পারেন।'

এ চিঠি শ্যামল আশা করে নি। কারণ, কোথায় সুদূর কাশী আর কোথায় শিবপুর! কাশীতে শ্যামলের বিয়ে হ'য়েছে। করবী তা'র মামার বাড়ী শিবপুরে এসেছে অল্প কয়েকদিন হ'ল।

চিঠিখানা পেয়ে শ্যামল সব ভুলে গেল। কোথায় রইলেন অতীন বাবু তাঁর লম্বা চুল নিয়ে! কখন যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শ্যামল তা'ও বুঝ্‌তে পার্‌ল না। হরপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করার দরকার ছিল—আরও সব কত দরকার ছিল শ্যামলের—সে সব সে ভুলে গেল। ঠিক একবছর আগে এমনি এক শ্রাবণ-সন্ধ্যা তা'র মনে প'ড়ে গেল। কাশীর শ্রাবণের গঙ্গা—তা'র সেদিনের সেই দুর্লভ স্বপ্নের ইন্দ্রজালের মধ্যে বারবার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। বর্ষায় বিয়েতে কত অসুবিধে হ'য়েছে, কত বন্ধু বিরক্ত হয়েছে, কত মান-অভিমানের পালা অভিনীত হ'য়েছে, শ্যামল তা'তে ভ্রূক্ষেপ করে নি। তা'র নিজের পছন্দ-করা মেয়ে করবী—একদিন বৈশাখ-প্রভাতে সে করবীকে দেখে পছন্দ ক'রেছে; সেই মনোরম বৈশাখ-প্রভাত করবীর স্বভাব-মাধুর্য্যকে একটি অখণ্ডরূপে রূপায়িত করেছিল। সেই মুহূর্ত্তটুকু শ্যামলের কাছে তা'র নিজের মধুর পূর্ব্বরাগের স্মৃতি। সেই কাশীতে শ্যামল স্বপ্নে বিচরণ করতে লাগল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। শ্রাবণের ঘন বৃষ্টিধারা আবার সমস্ত সহরকে আচ্ছন্ন ক'রে নেমে এল।

ছুটির দিন সন্ধ্যার দিকে হাওড়া-গামী একখানা বাসে শ্যামল উঠে বস্‌ল। সত্যই একটি বছর করবীর কোনো খোঁজ নেওয়া তা'র পক্ষে সম্ভব হয় নি। কি ক'রে খোঁজ সে নেবে—শুধু মাঝে মাঝে দু' একখানা চিঠি দেওয়া

ছাড়া ? গরীবের জীবন—পিতার মৃত্যু হ'য়েছে অনেক দিন ; সংসারে শুধু মা, একটি বিধবা বোন্, তা'র দু'টি ছেলে মেয়ে, আর একটি ছোট ভাই। এদের জন্যে তা'র আর পরিশ্রমের অন্ত নেই। চাকরি করেছে, টিউশানী ক'রেছে সুদীর্ঘকাল, আরও অর্থোপার্জ্জনের নানা পন্থা আবিষ্কারের জন্যে মাথা ঘামিয়েছে—কাজেই তা'র জীবনের গত পাঁচবছরের ইতিহাস কর্ম্মের জালে বোনা—গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তা'র ক্লান্তি আর বিরক্তির চিহ্ন। এরই মধ্যে একদিন করবী এসেছে কিন্তু প্রথম প্রেমের বৃদ্ধি, গতি এবং পরিণতির জন্যে যে-টুকু অবকাশ মানুষের দরকার, সে-টুকু শ্যামল পায় নি। তাই আজ চল্‌তি বাসের গোলমাল হৈ-হৈ-হট্টগোলের মধ্যে শ্যামলের মন উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল—একটি দিন মাত্র ছুটি আর আছে, করবীকে সে কাছে পা'বে মাত্র একটি রাত্রি আর একটি দিন।

হাওড়া-ব্রিজের উপর দিয়ে বাস তখন ষ্টেশনের দিকে চলেছে। দিন শেষ হ'য়েছে কি না ঠিক বোঝা যায় না—একটা বিমর্ষ পাণ্ডুর আলো কলের চিম্‌নিগুলোর পাশ দিয়ে গঙ্গার উপরে, ব্রিজের উপরে এবং সম্মুখের দৃশ্যমান বাড়ীগুলোর উপর পড়েছে। বৃষ্টি আর নেই। সমস্ত আকাশ কিন্তু গম্ভীর হ'য়ে আছে—মুমূর্ষু আলোর পাণ্ডুরতা তা'কে আরও মলিন আরও গম্ভীর ক'রে তুলেছে।

বাস্-ওয়ালারা হাঁক্‌ছে—শিবপুর, বাবু শিবপুর !

হাওড়া ষ্টেশনে নেমে শ্যামল রেস্তোরাঁয় একটু চা খেয়ে নিলে এবং ছুটির অবসরটাকে লঘু করবার জন্যে দু'খানা মাসিক পত্র কিন্‌ল—বাসের আলোয় পাতা ওল্টা'তে ওল্টা'তে যা'বে এবং মামাশ্বশুরের বাড়ী গিয়ে যদি সময় পায় ত দু'একটা গল্প প'ড়ে ফেল্‌বে।

শিবপুরের বাসে উঠে শ্যামলের মনে হ'ল বাসখানা বড় আস্তে আস্তে চলেছে। বাড়ীটার নম্বর আছে কিন্তু খুঁজে নিতে হ'বে—তারপর মামাশ্বশুরকে সে কখনো দেখে নি—শুনেছে তিনি বৃদ্ধ হ'য়েছেন। তাঁ'র দু'টি ছেলে মার্চেন্ট আপিসে ভালো চাকরি করেন। তাঁ'দেরও সে কখনো দেখে নি। আসন্ন প্রথম পরিচয়ের একটা চক্ষুলজ্জা তা'র মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ল।

অবশেষে বাস থেকে শ্যামল যখন নাম্‌ল, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। শিবপুরের একটা অপরিসর রাস্তা দিয়ে শ্যামল চল্‌তে লাগ্‌ল। পথ জন-বিরল। মাঝে মাঝে দুই একজন কুলী-মজুর শ্রেণীর লোক হন্-হন্ ক'রে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আশে পাশের বাড়ীগুলির কোনো-কোনোটি থেকে ছেলেদের পড়া মুখস্ত করার শব্দ আস্‌ছে। শ্যামল ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌ল, যদি বাড়ী খুঁজে না পায় সে অন্ধকারে !

একটা বড় আমগাছ প্রাচীরের উপর দিয়ে রাস্তার দিকে অনেকখানি ছায়া ক'রে ঝুঁকে পড়েছে—টুপ্-টাপ্ ক'রে বৃষ্টির জল ঝ'রে পড়্‌ছে। তা'রই পাশে ঠিক রাস্তার উপরেই বাড়ীখানি। শ্যামলের নম্বর ঠিক মিলে গেল। দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল এবং একটি দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণ-কায় বৃদ্ধ শ্যামলের মুখের উপর কৌতুহলী দৃষ্টি ফেলে ব'লে উঠ্‌লেন, 'তুমি নিশ্চয়ই শ্যামল, এস বাবা এস !'

ছাতাটি বন্ধ ক'রে শ্যামল সে'টি বাইরে রাখ্‌বে না ভেতরে রাখ্‌বে এই রকম একটা দ্বিধা আর সঙ্কোচের মধ্যেই ভাব্‌লে, 'যাক্ বাঁচা গেল, পরিচয় দিতে হ'লেই পথের ক্লান্তি হ'ত দ্বিগুণ'—এমন সময় বৃদ্ধ বল্‌লেন, 'ওটা ভেতরে রাখো বাবা, বাইরে রাখাটা ঠিক হ'বে না', ব'লে নিজেই ছাতাটি একরকম শ্যামলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেলেন। যা'বার সময় শ্যামলের দিকে চেয়ে ব'লে গেলেন—'তুমি বসো ঐ চৌকীতে, আমি আস্‌ছি এক্ষুণি।'

এই সময়টায় শ্যামল ঘরের মধ্যে একবার তাকা'বার সুযোগ পেল। সুন্দর করে সাজানো ঘরটি সর্ব্বত্রই একটা সংযত পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমানে শ্যামল বুঝ্‌ল, এই ঘরটি তা'র মামাশ্বশুরের। কোথায় আছে করবী এই বাড়ীর মধ্যে কোন্ কোণে—আরও কতজন আছেন হয়ত ! সকলের সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে গেলে রাত্রির কোন্ নিভৃত নির্জ্জন ক্ষণে তা'দের দু'জনের দেখা শুনা হ'বে—এমনি একটি মধুর সম্ভাবনার মধ্যে শ্যামলের হৃদয় আন্দোলিত হ'তে লাগ্‌ল।

সার্শিতে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে—ঘরের আলোয় বাইরের বারিকণাগুলি কাচের উপর ছোট ছোট মণি-মুক্তার মত চিক্-চিক্ করছে। জানালার কাছে গিয়ে শ্যামল সার্শি

না খুলেই বাইরে তাকা'বার চেষ্টা করতে লাগল—বাগানের মত অনেকটা,—বাতাসে ছোট ছোট গাছের মাথাগুলি দুলছে—কিন্তু ঘন বর্ষায় ছোট্ট বাগানটির আনন্দের কলরব তা'র কানে পৌছল না। আজ যেন সবই তা'র ভালো লাগছে—বৃষ্টিতে বিরক্তি নেই, পথের ক্লান্তিতে বিরক্তি নেই, জীবনের অনিশ্চয়তায় বিরক্তি নেই—সবই যেন আজ একটি রসাকুলিত প্রতীক্ষার বিহ্বলতায় মধুর হ'য়ে উঠেছে—জীবনের ছোট ছোট তিক্ততা আজ সারা অন্তর খুঁজলেও পাওয়া যা'বে না।

জোরে বৃষ্টি নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের দরজা খুলে দুটি প্রিয়দর্শন যুবা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। এক জনের বয়স কিছু বেশী—অপর জন প্রায় শ্যামলের সমবয়স্ক। শ্যামল সলজ্জ বিস্ময়ে তাঁদের দিকে চেয়ে রইল।

'নমস্কার শ্যামলবাবু, বিয়ের দিন আপনাকে দেখেছিলাম, পরিচয় ত তখন হয় নি—' ছোটটি বললেন।

বড়টির যেমন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, তেমনি প্রবল কণ্ঠস্বর, বললেন, 'সেই ত হয়েছে মুস্কিল! পরিচয় নেই ব'লে উনি কতটা বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছেন দেখতে পাচ্ছ না? বসুন আপনি, জামাটামা খুলে ফেলুন—একটু সুস্থির হো'ন'—এই ব'লে চেয়ারটা শ্যামলের দিকে আগিয়ে দিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে পরিচয় হ'ল। চাকরির কথা, সংসারের কথা, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা। শ্যামলের মনে হ'ল এঁরা বেশ খুশী হ'য়েছেন ওর সঙ্গে আলাপ করে—তারপর এক সময়ে ছোটটি শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে অগ্রসর হ'লেন।

বাড়ীর মধ্যে গিয়ে শ্যামল দেখল, বৃদ্ধ রোয়াকে, দালানে, সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, 'এটা করো, ওটা করো, সেটা করো'—ব'লে ক্রমাগত তিনি কা'দের যেন উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর শ্যামলের মনে হ'ল কা'রা যেন সকৌতুক সাগ্রহ প্রতীক্ষা ক'রে আছে তা'কে দেখবার জন্য। চাপা নিঃশ্বাস, চাপা কথাবার্ত্তার অস্পষ্ট আভাস এবং দ্রুত সন্তর্পিত পদক্ষেপ যেন এ-ঘরে ও-ঘরে এবং আশে পাশে সর্ব্বত্রই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। যে ঘরে শ্যামল এসে বসল, সে ঘরে এর একটু আগেই যেন কা'রা বসেছিল—শ্যামল আসতেই কা'রা যেন নিঃশব্দে উঠে ভিতরের দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গিয়েছে।

ঘরের মধ্যে তা'কে বিশ্রাম করতে ব'লে ছোটটি চলে গেলেন। শ্যামলের এইবার মাসিক-পত্র দু'খানা কাজে লাগল। ক্রমাগত সে পাতা ওল্টা'তে লাগল—বিজ্ঞাপন, ছবি, গল্প, কবিতা, আলোচনা ইত্যাদি। পাশের ঘরে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'জামাই এ বাড়ীতে অনেক দিন পরে এসেছেন বৌমা—এক এসেছিলেন করবীর বাবা···সে আজ অনেক দিন হ'ল,—তারপরে এই এলেন শ্যামল!'

অপরিচিত নারী-কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বেশ জামাই হ'য়েছে বাবা, পিসেমশাই দেখে যেতে পেলেন না---' শেষ কথা কয়টি আর শুনতে পাওয়া গেল না। শ্যামলের মনে হ'ল আজ সে বড় শুভযাত্রা ক'রে বেরিয়েছে—এতটা অভ্যর্থনা হ'বে সে মোটেই আশা করে নি! বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে—অপরিচিত আত্মীয় গৃহে নূতন অতিথির সম্বর্দ্ধনার আয়োজন বৃষ্টিধারার মতই প্রচুর, প্রফুল্ল এবং অক্লান্তবর্ষী। আজকের রাত্রিটি শ্যামলের কাছে যেমন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তেমনি মধুর ব'লে মনে হ'ল।

রাত্রি ক্রমশ গভীর হ'য়ে এল। শ্যামল করবীর প্রতীক্ষা করছে। খাটের চমৎকার বিছানায় না ব'সে শ্যামল নীচে পাতা একখানি সতরঞ্চির উপর ব'সে আছে। মাসিক-পত্র দু'খানা এই নীরব প্রতীক্ষার আগ্রহে বড় সাহায্য করছে। পুরুষদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাচ্ছে না—এখন শুধু বিচিত্র অস্পষ্ট হাসির ধ্বনি কানে আসছে, সংসারের ছোট ছোট কাজগুলি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করবার একটা সচেষ্ট ভাবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শ্যামলের হৃৎস্পন্দন ক্রমশ দ্রুত হ'য়ে উঠল।

নানা দিক্ থেকে একটা লঘু হাওয়া এক সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে—কিন্তু হাওয়ায় উড়ে আসা পাতার শব্দ নয়;—সাড়ীর খস্-খস্ শব্দ, শ্যামল কান পেতে শুনল। তা'র মনে হ'ল এই সময়ে সে যদি ঘুমিয়ে পড়ত, তা'হলে বড় ভালো হ'ত। এক সঙ্গে অনেকগুলি চুড়ি ঝিন্-ঝিন্ ক'রে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ চাপা হাসির শব্দও শোনা গেল। হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত একটি তরুণী বধূ ঘরের মধ্যে এসে

শ্যামলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, 'নিন্ নিন্, রাখুন এখন বই কেতাব—খাটের উপর উঠে বসুন ত লক্ষ্মীছেলের মত!'

এ অনুরোধ নয়, এ যেন আদেশ।

শ্যামল নিঃশব্দে আদেশ পালন কর্‌ল।. বই-কেতাবের এখন কোন মূল্যই নেই, তা সে জানে। 'নাও, এসো এবার' —দরজার দিকে তাকিয়ে বধূটি বল্‌লেন।

খাটের একপাশে অতি সঙ্কোচে আর একটি তরুণী এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'তিনজন বধূ এবং ভাবী বধূ একটা মধুর স্বপ্ন-সুরভির তরঙ্গ তুলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। একজনের হাতে কয়েকটি পুষ্পিত রজনীগন্ধার শীর্ষ সদ্য-তুলে-আনা হেনার কয়েকটি মুঞ্জরিত সপত্র শাখার মধ্যে লুকানো ছিল। তিনি একটু আগিয়ে গিয়ে শ্যামলের একখানি হাত তুলে নিয়ে তা'র মধ্যে সেগুলি রেখে দিলেন, বল্‌লেন, 'বর্ষার দিনের সব চেয়ে বড় উপহার আপনাকে দেওয়া হ'ল শ্যামল বাবু, দেখ্‌বেন যেন ফুল শুকিয়ে না যায়।' —ব'লে সকৌতুক স্নেহে একবার খাটের পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

প্রথমা এইবার সঙ্গিনীদের দিকে চেয়ে বললেন্—'নাও চলো, আমরা যাই এবার!'

শ্যামল নিজেকে বড় অসহায় ব'লে মনে কর্‌ছে—একটা ধন্যবাদসূচক কোনো কথা এঁদের বলা তার খুবই উচিত ছিল। অনেকগুলি পদ-শব্দ মিলিয়ে গেল। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে; করবী দরজাটি বন্ধ ক'রে দিয়ে একটি জানালা খুলে দিল। আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। জানালা দিয়ে বারিসিক্ত বনের এবং মাটির একটি সজল স্নিগ্ধ গন্ধ ঘরের মধ্যে আস্‌ছে। ধারা-শ্রাবণের নিবিড় অন্ধকার দু'জনকে ক্রমশ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

'তুমি আমাকে আপনি না ব'লে তুমি বল্‌বে, কেমন?'

'কেন?'

'আপনি কথাটা বড় দূর-দূর মনে হয়—তুমি বল্‌লে অতটা মনে হয় না।'

'বল্‌তে পারি, কিন্তু চিঠিতে আপনি লিখ্‌ব।'

'চিঠিতে যা হয় লিখো, কাছে যখন আছি, তখন আর আপনি ব'লো না। কাছে ত একদিন থাক্‌তে হ'বে, চিরকালই চিঠি লেখালেখি চল্‌বে নাকি?'

'কবে আর হ'বে? তা'র চেয়ে চিঠি-ই ভালো। আচ্ছা ক'দিন ছুটি তোমার?'

'দু'দিন ত ছুটি, তা'র মধ্যে একদিন শেষ হ'ল—আর একটা দিন আছে।'

'কাল-ই তোমাকে চ'লে যেতে হ'বে কিন্তু!'

'কেন? ডেকে এনে বড় যে তাড়িয়ে দিচ্ছ!'

'না না—তা নয়; ঘর বেশী নেই কি না। এটা ছোট-দা'র ঘর—ওঁদের হয়ত অসুবিধে হচ্ছে!'

'অসুবিধে হচ্ছে না কি? তা হ'লে আজই চ'লে যাই, কি বলো?'

'ভারি দুষ্টু তুমি, না, আজ নয়—কাল সকালে খেয়ে দেয়ে যেয়ো। মামা হয়ত ছাড়বেন না, তবু তুমি যেয়ো।'

'আচ্ছা যা'ব, নিশ্চয়ই যা'ব, কিন্তু আজ কি চমৎকার রাত করবী! আজ শুধু শুধু যাওয়ার কথা তুলছ কেন?'

'আমি জানি তুমি রাগ করবে। রাগ করেছ ত?'

'না রাগ করি নি। রাতটা সুন্দর নয়—বলো বলো রাতটা সুন্দর কি না?'

'চুপচাপ শুয়ে থাক্‌লেই বর্ষার দিন আর রাত ভালো লাগে— কোনো কাজকর্ম্ম করতেই যত মুস্কিল। কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি, ভারি অসুবিধে হয়।'

ঢং ক'রে ঘড়িতে একটা বেজে গেল। বাইরে বৃষ্টির কত বিচিত্র শব্দ। গাছ-পালার উপর এক রকম, ছাদের উপর একরকম, ছোট ছোট ঘাসের উপর একরকম—এমনি কত বিভিন্ন সুরে শ্রাবণের বীণা একই সঙ্গে বেজে চলেছে। একটা বেজে গেল—শ্যামল ভাবল আজ রাতটুকু তা'দের মিলনের পরমায়ু, তারপরেই সীমাহীন বিচ্ছেদ। আবার সেই মানুষের আর সময়ের দাসত্ব। তা'র মনে একবার কল্‌কাতার সেই বিরক্তিকর জীবনের ছবি ভেসে উঠ্‌ল। সেই মেস, সেই হরপ্রসাদ বাবু চৌকীর নীচে বসে আহ্নিক করছেন, সেই অতীন বাবু তাঁর দীর্ঘ কেশদাম সম্বরণ করতে ব্যস্ত, সেই ঠাকুর হাতাখুন্তী নেড়ে প্রাত্যহিক অখাদ্য রন্ধনে

ব্যাপৃত—এমনি সব অজস্র টুক্‌রো টুক্‌রো জীবনের প্রতিদিনকার ছবি।

…করবীর মাথায় আর গুণ্ঠন নেই ; তা'র ঘনকুঞ্চিত কেশের সুগন্ধ রজনীগন্ধা আর হেনার গন্ধের সঙ্গে মিশে ঘরের আর্দ্র বায়ুতে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবনের রৌদ্র-খর কর্ম্মক্লান্তির মধ্যে এ গন্ধ কি থাক্‌বে—কতদিন থাক্‌বে এর স্মৃতি ? বিরাট বিশ্বব্যাপী কাউণ্টারে কেবল অনাদিকালের হিসেব-নিকেশ—এরই নাম মানুষের জীবন।

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামল বল্‌লে, 'আরও কাছে স'রে এস করবী—আজ রাত শেষ হ'য়ে গেলে তোমাকে আর কোথায় পা'ব ?'

'এখন এখানে আছি, আবার কিছুদিন পরে কাশীতে যা'ব।'

'চলো, তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই—প্রকাণ্ড নদী দেখ্‌বে, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না।'

'দেখেছি। সেখানে আমি যা'ব না।'

'কেন ?'

'যা'ব না—আমার খুশী। তুমি বারোমাস থাক্‌বে বিদেশে। আর আমি সেখানে প'ড়ে থাকি—এই তোমার ইচ্ছে ! কেন, একটা ছোট দেখে বাসা করো না কল্‌কাতায়।'

'বাসা এইবার করব। কতই বা আর খরচ হ'বে ? এই ধরো দেড়শো টাকা—তা' দেড়শো টাকা আমি পাব্‌ব আন্‌তে। বাসা তাহ'লে একটা করি, কেমন ?'

'হ্যাঁ বাসা করো। মা'দের নিয়ে এসো—দিদিকে, তাঁর ছেলেমেয়েকে, ঠাকুরপোকে। সব্বাইকে নিয়ে এসে তারপর আমাকে নিয়ে যা'বে—আমি ততদিন না হয় এখানেই থাকি।'

হায়রে, শ্যামল ভাব্‌ল, দেড়শো টাকা সে কোথায় পা'বে ? কোনো রকমে একশো টাকা উপার্জ্জন করতেই পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রায় নষ্ট হ'য়ে গেল ! কিন্তু সে কথা করবীকে ব'লেই বা কি হ'বে। বাসা সে একটা করবেই। যেমন ক'রে হোক্‌ বাসা সে চালাবে।

না হয় গরীব মানুষের মত থাক্‌বে—অল্প খরচে চালা'বে। করবীকে বল্‌লে, 'তা হ'লে বাসা একটা ক'রে ফেলি। চালা'তে পারবে ত সংসার অল্পের মধ্যে ?'

'খুব পার্‌ব, সবাই কি আর বড় লোক হয় ?'

'ঠিক কথাই ত, সবাই কি আর বড়লোক হয় ?'

'বড় নদীর কথা বল্‌ছিলে তুমি। আমি সেদিন এখানকার গঙ্গায় স্নান ক'রে এলাম। বৃষ্টি হচ্ছিল—চারিদিকে ঝাপ্‌সা হয়ে গেল, ওপার দেখতে পেলাম না। কাশীর গঙ্গা আরও সুন্দর, আরও পরিষ্কার।'

'হাঁ, কাশীর গঙ্গা আরও চমৎকার ; দেখো, তুমি এখানে না থেকে কাশীতে থাক্‌বে, কেমন ? বাসা করে তোমাকে কাশী থেকে নিয়ে আস্‌ব।'

'কি সুবিধে হ'বে তোমার তা'তে ? কাশী দেখে আস্‌বে বুঝি আবার ?'

'হ্যাঁ, শুধু কাশী দেখা নয়, কাশীতে আবার তোমাকে দেখ্‌ব। কাশীতে তোমাকে একরকম দেখেছিলাম, এখানে একরকম দেখ্‌ছি, আবার কলকাতার বাসায় তোমাকে আর একরকম দেখ্‌ব।'

'সে আবার কি ? আমিত সেই আমিই আছি—এখানে কি রকম দেখ্‌ছ আবার ?'

'বোঝাতে পারব না। এই বর্ষার রাতে তোমাকে যেখানে যেমনটি পেলাম, এমন কি আর অন্য কোনোখানে পা'ব ?'

'কেন, আমি কি হারিয়ে যা'ব ?'

'হ্যাঁ, তুমি হারিয়ে যা'বে করবী—এই হেনা আর রজনীগন্ধার মধ্যে তুমি একরকম, আর কল্‌কাতার একটা ছোট্ট গলির ছোট্ট বাসায় তুমি অন্য রকম হ'য়ে যা'বে করবী !'

'বুঝ্‌তে পেরেছি—তা' সে ত সবাই ও-রকম বদ্‌লায়। তা'তে আর এমন কি হ'য়েছে ?'

ঢং ঢং ক'রে ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। কি ক'রে বোঝা'বে শ্যামল করবীকে, মানুষকে এই না-পাওয়ার বেদনা ! সম্পূর্ণ ক'রে মানুষকে কে কবে কোথায় পায় ? দু'টি মানুষের মধ্যে এই অপার বিচ্ছেদ মিলনের বহুমুহূর্ত্তেও তা' দূর হয় না। আজ এই শ্রাবণের নিঃশব্দ গভীর রাত্রে বৃষ্টিধারা যখন মানুষের মিলনকে নিবিড়তর ক'রে তুলবার আয়োজন ক'রেছে, তখন শ্যামলের মনে হ'ল কোথায় করবী আর কোথায় সে ?

করবী তা'র কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে—তবু তা'র মনে হ'ল সে-শূন্য পূর্ণ হ'বার নয়। ধারা-যন্ত্রে উদাসীন শ্রাবণ শুধু একটি তার বাজিয়ে চলেছে—তা'তে মিলনের বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বিরহের বৈরাগ্যের সুর। যা'কে পাওয়া গেল, তা'কে চিরকাল ধ'রে পাওয়া যায় না। বিরহ-ব্যবধানের অপর পারে সে সম্পূর্ণ আর একজন। কি ক'রে এ-কথা সে করবীকে বোঝা'বে? একবার উস্‌খুস্‌ ক'রে করবী পাশ ফিরে শু'ল। বল্‌ল, 'দু'টো বেজে গেল, এইবার ঘুমোও

শ্যামলের চোখে আর ঘুম এল না। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ ক'রে সে জেগে রইল। জীবনের কোন্‌ অবস্থায় মানুষ না পায়, তা সম্পূর্ণ ক'রে পায়, তাই সে ভাব্‌তে লাগল। চমৎকার খাট, বালিশ, মশারি—সুন্দর ঘর পুষ্পগন্ধে ভারাক্রান্ত, বাইরে অপূর্ব্ব বর্ষাপ্রকৃতি গূঢ় আনন্দে আত্মহারা। মানুষের আনন্দ কোথায়? মিলনের সুখাবেশের মধ্যে চোখের পাতা যখন স্বভাবত মুদ্রিত হ'য়ে আস্‌ছে, তখন মনের কোন্‌ গোপন কোণে বিরহ তা'র করুণ আঁখি দু'টি তু'লে চেয়ে আছে, মানুষ তা নিজেও জানে না। এ কি অদ্ভুত অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে মানুষকে চল্‌তে হ'বে!

মেসের কতজনকে সে দেখেছে—শ্বশুরবাড়ীতে একটি রাত্রি কাটানোর বর্ণনা তা'দের যেন আর শেষ হ'তে চায় না। ব'লে, বর্ণনা ক'রে যেন তা'রা আনন্দ পায়। বেশ আছে তা'রা—বেশী চিন্তা করবার তা'দের অবকাশ কোথায়? পথের পাশে চলতে চল্‌তে তা'রা যা পায়, যেটুকু পায় সেটুকুই তা'রা উপভোগ করে—কোনো ক্ষোভ রাখে না মনে, কোনো অতৃপ্তি রাখে না। সে ভাব্‌ল, সে নিজেও যেন ঐরকম হ'তে পার্‌লে বেঁচে যেত।

ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ ক'রে কলের চিম্‌নিগুলি রাত্রির শেষ-প্রহর ঘোষণা করল। বিশ্রামের তরল সুখ-স্বপ্নে মানুষ যেন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত না হয়—এ বোধ হয় তা'রই সাবধান-সঙ্কেত-ধ্বনি। বাইরে বৃষ্টির তখনো বিরাম নেই। তেমনি অক্লান্ত গতিতে পৃথিবীর উপরে সে ঝ'রে পড়ছে—চিন্তাক্লিষ্ট মনে কখন যে শ্যামল ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেও জানে না।

ঘুম ভাঙ্‌ল যখন, তখন কেমন একটা অদ্ভুত চেতনার বশে করবীর গায়ে হাত দেবার জন্যে সে হাত বাড়িয়ে দিল। অর্দ্ধনিমীলিত চোখেই সে অনুভব করল যে করবী তা'র বিছানায় নেই। হাতে ঠেক্‌ল শুধু গতরাত্রের মিলনোৎসবের স্মৃতি—সেই হেনা আর রজনীগন্ধা! শ্যামলের মনে হ'ল, করবী হারিয়ে গেছে, বিশাল সংসারের কর্ত্তব্যের অসংখ্য গ্রন্থির মধ্যে সে আবার কোন্‌ এক কোণ আশ্রয় ক'রে বন্দিনী হ'য়ে আছে - শ্যামল উঠে বস্‌ল। আজই তা'কে আবার সেই পুরাতন জীবনের পথে ফিরে যেতে হ'বে। বারিসিক্ত শ্রাবণ-শর্ব্বরী শেষ হ'য়ে প্রভাতের উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠেছে।

কন্যা-প্রশস্তি

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আজিকে তোমার হাতে— কোমল কমল-পাতে—
দিব আনি' আরো কি কোমলতর ফুল?—
ভেবে নাহি পাই মনে কবিতার ফুলবনে
আছে কিবা মনোহর তার সমতুল!

শ্যাম-কান্তি দুর্ব্বা-শীষ রচিবে কি শুভাশিস্
শিরে তব—শুভতর ও'কেশ-কেশরে?—
দেবতা আপনি হোথা চিরশ্যাম নবীনতা
রচিয়াছে সুচিকণ রেশমের স্তরে!

তোমারে হেরিতে চোখে হেরি শুধু কল্পলোকে
যেন সেই মন্দাকিনী-বালুকা-বেলায়
কন্দুক-ক্রীড়ায় মতি গিরিবালা হৈমবতী
আত্মভোলা উমা আজও মাধুরী বিলায়!

নয়ন-পল্লবে তোর শৈশব স্বপন ঘোর—
গান-গেয়ে দোল-দেওয়া দোলনার ঘুম
আজও যে রে ঘুচে নাই, মুখে তোর মুছে নাই
মা-বাপের কোলে-পাওয়া শতস্নেহ-চুম!

জীবনের মধু-মাস বিষ-বায়ু তপ্ত শ্বাস
হানে নাই—ফাগুনেও ঝরিছে শিশির!
নয়নে যে আলো নাচে উষা ম্লান তার কাছে—
সে নহে মশাল-ভাতি তামসী নিশির।

এ যেন মাধবী দিনে, —কত ফুল কেবা চিনে!—
রঙে সে রঙীন হ'ল লতার বিতান;
তবু সে শরৎ-শশী আকাশে রয়েছে বসি;
অমল কমল ফুটে—সরসী-শিথান!

যে রূপের ভাব-ছবি বাঙালী সাধক-কবি
হেরিয়াছে যুগ-যুগ কুমারী-বদনে,
পূজিয়াছে বালিকারে সচন্দন পুষ্পভারে—
কন্যা-রূপা মহামায়া ভক্তের সদনে,

তোমার মাঝারে কন্যা, আরো যে হয়েছে ধন্যা
কুমারীর সেই তনু-মনের পূর্ণিমা,
সুকোমল শিশু-আস্যে খলহীন কলহাস্যে
একি হেরি অপরূপ তরুণী-মহিমা!

তাই কি ভাবের ঘোর লেগেছে নয়নে মোর?—
আশিস্ করিতে কর করে যে অঞ্জলি!
প্রাণে মোর দিলে আনি' যে পুণ্য পরশখানি
কোন্ ছন্দে রচি হায় তার পদাবলী!

জানি আমি, যে উদ্যানে যে আলো শিশির-পানে
বাড়িয়াছ বন-জ্যোৎস্না বালিকা-ব্রততী,
সংসার-কানন তলে সে ভাগ্য ক্বচিৎ ফলে—
শুক্তি যথা স্বাতী-জলে হয় মুক্তাবতী।

শ্রীমান্ শুচির গেহে কল্যাণ-সাধন স্নেহে
পালিয়াছে তুই পিতা তুই মাতা যারে—
জীবন-আনন্দ-খনি সেই সে নয়ন-মণি
যেচে দান করে আজ শত উপচারে!

একি যজ্ঞ-আয়োজন —এ যেন সর্ব্বস্ব-পণ
শোধিবারে দেব-ঋণ—বিশ্ব-জিৎ ব্রত!
মমতার মোম ছানি' পরাণ-পুতলিখানি
গড়ি' পুন ত্যাগ করে মর্ত্ত্য গৃহী যত!

হেন কন্যা-ধন-দান করে যেই ধনবান
তার মত দাতা আর আছে বা কোথায়?
আজ তার গৃহতল শততীর্থসম স্থল—
স্নান-পুণ্যে ধন্য যারা আহূত হেথায়!

দাঁড়াও সভার মাঝে হেরি তোমা কন্যা-সাজে—
সালঙ্কারা চেলাম্বরা সৌভাগ্য-রূপিণী,
চন্দন-চর্চ্চিত ভাল নত নেত্র-পক্ষ্মজাল—
শীতান্তে মুকুল-মুখী লতা পল্লবিনী।

কে সে চির ভাগ্যবান? —ও পাণি করিবে দান
তুমি যারে, অনুরাগে অকুণ্ঠিত মনে,
সার্থক যতন তার এমন রতন হার
লভে যেই, খুঁজে সারা সংসার-গহনে।

প্রজাপতি জয়ী আজ, দুষ্ট স্মর পায় লাজ—
ধীর বিধি মিলাইল হেন বধূ বর;
আজি এ মণ্ডপতলে মহাহর্ষ-কুতূহলে
মন্ত্রপাঠ করে যত ঋষিরা অমর।

তারি সাথে মৃদুস্বরে স্নেহসুখগর্ব্বভরে
রচিনু মঙ্গল-গীত দম্পতী-বন্দনা,
এ মিলন পুণ্য হোক, সর্ব্ববিঘ্ন শূন্য হোক,
চিরশান্তি পূর্ণ হোক—এ মোর প্রার্থনা। *

* ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুধীরার শুভপরিণয় উপলক্ষ্যে রচিত।

নারী-প্রতিভা

সম্প্রতি একটি ধুয়া উঠিয়াছে, এ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই নারীর প্রতিভা পুরুষের প্রতিভার সমকক্ষ হয় নাই—বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই। কথাটি অদ্ধ সত্য। সমস্ত জিনিসের মত প্রতিভারও জাতিভেদ আছে, একথা আমরা সর্ব্বত্র ভুলিয়া থাকি বলিয়াই এমন একটি অর্দ্ধসত্য সম্পূর্ণ সত্য হিসাবে চলিয়া যাইতেছে। আমরা যদি মহীরুহের মত আশ্রয়দানে সক্ষম নয় বলিয়া বিকশিত শতদল পদ্মকে তাচ্ছিল্য করিতে সুরু করি, তবে ভুল করিব। পুরুষ-প্রতিভার সহিত নারী-প্রতিভার পার্থক্য-রেখা আমরা কেন টানিব না? নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র—একথা যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইলেই আমরা দেখি, নারী-প্রতিভা ও পুরুষ-প্রতিভার তুলনা-মূলক প্রচলিত যে-ধারণা, তাহা মিথ্যা। পুরুষের মধ্যে আমরা ফ্লরেন্স নাইটিংগেল চাই না, মেয়েদের মধ্যেও লর্ড কিচ্‌নারকে চাইনা। অথচ বিশ্বসাহিত্যের দিকে চাহিয়া আমরা বলি, আনাতোল ফ্রাঁসের মত সাহিত্যিক নারী-প্রতিভা কই? নাই। কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁসের 'ইজিরিয়া' মাদাম কাইয়াভের কথা এ প্রসঙ্গে কেন মনে কবিব না? এই একটি স্ত্রীলোকের প্রভাব ফ্রাঁসের শুধু সাহিত্য-জীবনকে নয়, সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। এবং আজ যে-ফ্রাঁসকে আমরা তাঁহার বিবিধ রচনার মধ্য দিয়া পাইয়াছি, এই স্ত্রীলোকটি না থাকিলে হয়তো তাহাদের অর্দ্ধেকের দর্শন মিলিত না। অলস ফ্রাঁসকে কাজের প্রেরণা দিতেন এই মহিলাটি, এমন কি ফ্রাঁসের বহু রচনাতে ইঁহার লেখনীর স্পর্শও আছে।

মেয়েদের স্বকীয় প্রতিভা হইতেছে এই—পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণা দেওয়া। কেমন করিয়া আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, আমরা দুইটি মহিলার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এখানে তাহার নিদর্শন দিব।

সকলেই জানেন, ফরাসীরা মজ্‌লিসী জাত। চায়ের আড্ডায় ও কাফে-সালোঁতে ফরাসী সাহিত্য ও শিল্পের অধিকাংশের জন্ম। কল্পনা করুন একটি সুসজ্জিত লাইব্রেরি, পড়িবার জন্য সেখান হইতে বই পাওয়া যায় এবং সম্ভব অসম্ভব সকল পাঠ্য ও অপাঠ্য পুস্তক কিনিতেও পাওয়া যায়। এই দোকানের চারিপাশে পল ক্লদেল, আঁদ্রে ঝিদ্ ইত্যাদি ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পালগণের সহিত ছোট বড় মাঝারি সকল সাহিত্যিক ও শিল্পী নানা দলে ছড়াইয়া আছেন এখানে তর্ক বাধিয়াছে, ওখানে খোস-গল্প জমিয়াছে। আপনি এখানে শুধু বই কিনিতে ঢুকিয়াছেন—প্রফুল্ল হাস্যে ঘরের কর্ত্রী আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিয়া জানিতে চাহিলেন, কি বই দরকার এবং অল্প কালের মধ্যেই সাহিত্য-জগতের নূতনতম সংবাদ আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তিনি সাহিত্য সম্পর্কে উৎসুক করিয়া তুলিলেন। আপনি কিছুই না,
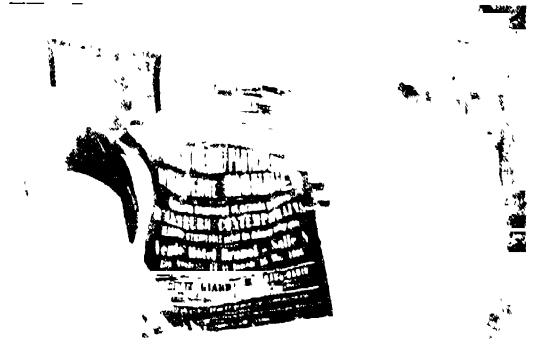
সাহিত্যব্রতচারিণী, Nun of Literature আদ্রিয়েন মনিয়ে।

নিতান্ত আটপৌরে লোক, খান্ দান্ ঘুরিয়া বেড়ান—কিন্তু এই মজ্‌লিসের নেশা আপনার লাগিয়া গেল। এবং বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে হয়তো আপনার রচনা ফরাসী ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এমনই একটি মজ্‌লিসের কর্ত্রী, এই আদ্রিয়েন মনিয়ে। ইঁহার মজ্‌লিসের নাম, পুস্তকানুরাগীদের মিলন-স্থল (La Maison des Livres)। ইঁহার দোকানেই প্রথম পাণ্ডুলিপি অবস্থায় জেম্‌স্ জয়স্ তাঁহার ইউলিসিস্ পাঠ করিয়া

শোনান। কিন্তু কেবল ইউলিসিসের মত একখানি বই নয়, হাজারে হাজারে বই—যে সব বই বিশ্ব-সাহিত্যে স্পর্দ্ধার সহিত সম্মানের আসন দাবী করিতেছে—এই মজ্‌লিসে মাসের পর মাস আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চারিদিকে সমঝদার শ্রোতা—মাঝখানে মাতৃরূপিণী গৃহকর্ত্রী। প্রতিভার আদর্শ জন্মস্থল। এই মজ্‌লিস হইতেই দাদাইজ্‌মের মত বহু মতবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। কি বিচিত্র জীবন এই নারীর! কঠিন দারিদ্র্যের সহিত সংঘর্ষে জীবনের দিবারাত্র কাটিয়াছে। কিন্তু অদম্য উৎসাহে তবুও আদর্শের জন্য শ্রম করিয়াছেন।
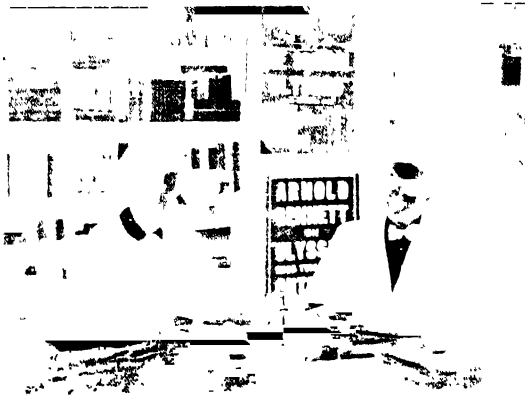
ইউলিসিসের প্রকাশক শ্রীমতী সিল্‌ভিয়া বিচ ও লেখক জেম্‌স্‌ জয়স্‌।

শ্রীমতী সিল্‌ভিয়া বিচ এই আদ্রিয়েনেরই বিশেষ বন্ধু ও শিষ্যা। আমেরিকায় ইহাঁর জন্ম কিন্তু ফরাসী দেশে আসিয়া প্যারীর সাহিত্য-স্রোতে গা ভাসাইয়াছেন। লাটিন কোয়ার্টারের মধ্যস্থলে ইহাঁর মজ্‌লিস, নাম শেক্‌স্‌পিয়ার এণ্ড কোম্পানী। হ্যাভলক এলিস্‌ এই মজ্‌লিসে নিয়মিত আড্ডা দিয়াছেন। শ্রীমতী সিল্‌ভিয়া বিচই জেম্‌স্‌ জয়সের ইউলিসিস্‌-প্রকাশের দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন। গ্রন্থকারের নিষেধ সত্ত্বেও এই কাজ তিনি করেন। জয়স্‌ তাঁহাকে টাকা নষ্ট হইবার ভয়ও দেখান। কিন্তু কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া—ইউলিসিসের মত পুস্তকের নিজে পাঁচবার প্রুফ পড়িয়া, জয়স্‌কে দিয়া সাতবার প্রুফ পড়াইয়া তাহা প্রকাশ করিয়া অসাধ্যসাধন করেন। এই সিল্‌ভিয়া বিচ না থাকিলে কে আজ জেম্‌স্‌ জয়স্‌কে জানিত?

তবুও বলিব নারীর প্রতিভা পুরুষের প্রতিভার সমকক্ষ নহে?

নীচে তাঁহার একটি কবিতার কয়েকটি কলির অনুবাদ দিলাম। ইহা হইতে তাঁহার জীবনের আদর্শের আভাস পাওয়া যাইবে—

আমি সেই পুরাকালের ব্রতচারিণী,

আমার আদর্শের সন্ধান মিলিয়াছে—সঙ্গীদের সাহায্যে আমি আমার এই গৃহস্থালীকে পূজামন্দির করিয়া গড়িয়া তুলিলাম।

আমার সাথীরা আমাকে শ্রদ্ধা করে, আমি তাহাদের কথায় সান্ত্বনা পাই—

তাই কাজ করিতে করিতে নিজের দুঃখ ভুলি এবং যে-পথিক পথ হারাইয়াছে তাহাকে আনিয়া এই গৃহে আশ্রয় দিই।

ফুলের দেশ জাপানের ফুল বাগিচার মালিনীদ্বয়।

জাপানের সৌন্দর্য্যের আদর্শ অপরাপর দেশ হইতে ভিন্ন। লম্বা ধরণের মুখমণ্ডল, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, কুঞ্চিত নয়, টানা ভ্রূ, আঁখি ও ভ্রূর মধ্যে খানিকটা পরিসর, টিকোলো নাক, ছোট মুখগহ্বর, ওষ্ঠাধর পূর্ণ হওয়া চাই। সুন্দর রঙেরই আদর বেশী, একটু লাল্‌চে হইলে আরও ভাল। তন্বী ও অপুষ্ট নিতম্ব। কনিসাদা, হিরোশিগে, উত্তাগাওয়া, হক্‌সাই, ইসাই ইত্যাদি চিত্রকরের আঁকা ছবিতে জাপানীদের নারী সৌন্দর্য্যের আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপানী সুন্দরী।

কিন্তু আসল জাপানী নারীর সত্যকার পরিচয় সৌন্দর্য্যে নয়, সে-পরিচয় তাহার পরিশ্রমের শক্তিতে। জাপানের স্ত্রীজাতি ঘর সাজাইবার বস্তু নয়, পুরুষের সহিত সমানে তাল রাখিয়া তাহারা জীবিকার জন্ম শ্রম করে। গাঁয়ে-গাঁয়ে কলকারখানায় নানারূপে এই সব শ্রমিকাদের দর্শন মেলে। পার্শ্বে ধানের ক্ষেতে কর্ম্মরতা বৃদ্ধা কৃষাণ রমণীর প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। অপর পৃষ্ঠায় পুষ্পকুঞ্জে দুইটি মালিনীর ছবি দেওয়া হইয়াছে।

ধানক্ষেতে জাপানী কৃষক-রমণী।

প্রাচীন ভারতে নারী

— শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান কালের বিবাহ

নিপুণ হস্তের আলিম্পনে চিত্রিত বিবাহের আসন এ যুগের বধূর মনে বিচিত্র কৌতুক জাগায়। রক্তপট্টবাস তাহার হৃদয় রাঙ্গাইয়া দেয়। স্বামী সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট অনুভূতি হয়ত তাহার চিত্তকে উতলা করে না, কিন্তু বহু আত্মীয়ের কোলাহলের সঙ্গে মিশিয়া উৎসবের বাঁশীর তান তাহার অসম্বদ্ধ কল্পনাকে সীমারেখার বাহিরে লইয়া যায়। বসনের বিলাস আর ভূষণের ভাতি একটি গূঢ় পুলকের আবেষ্টন রচনা করে। আর, সমস্ত উৎসবকে মঙ্গলময় করিয়া রাখে—বিবাহ-সভার দর্শকবৃন্দের সম্মিলিত শুভ কামনা। কিন্তু এত আনন্দ কোলাহল হাসি বাঁশীর মধ্যেও 'বুদ্ধিবিহীনা বালিকা বধূ' অশান্ত। তাহার এত দিনের পরিচিত জগৎ এক নিমেষে চোখের সাম্‌নে মিলাইয়া যাইবে এবং সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে আর একটি জগৎ—যাহার সুখ দুঃখের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র বালিকার কোন পরিচয় নেই। তাই সে অস্পষ্টের আনন্দে ও অজানিতের আশঙ্কায় বিহ্বল।

প্রাচীন কালের বিবাহ

কিন্তু বৈদিক যুগের চিত্র অন্য রকম। সূর্য্যাসূক্তের[১] নবম ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য বিবাহের কন্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'পতিং কাময়মানাং পর্য্যাপ্ত যৌবনামিত্যর্থঃ'—কন্যার যৌবন-সমাগম ও দাম্পত্যসুখের কামনা হইয়াছে। 'কন্যা' শব্দ[২] অনূঢ়া যুবতী এবং 'যুবতী' শব্দ[৩] অনূঢ়া কন্যা অর্থে বেদে বহু ব্যবহার দেখা যায়। বৈদিক যুগ হইতে বাৎস্যায়নের যুগ অবধি, 'কন্যা'র মত পুনর্ভূ বা বিধবাও * বিবাহ-যোগ্যা বলিয়া গৃহীতা হইতেন। কয়েক শতাব্দী হইল এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিধবার নারী-হৃদয়, যাহাতে এক পরপারের ছাড়া ইহসংসারের কোন আহ্বানে সাড়া না দেয় সেজন্য সর্ব্বাঙ্গীন রিক্ততার ব্রত-পালনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এই অনাসক্তির ব্রত-উদ্‌যাপন কোমল-প্রাণ পুরুষের দ্বারা অসম্ভব হইলেও বিধবা সহজেই পারেন, যেহেতু তিনি দেবী[৪]। তবুও যে ঐ ব্যবস্থার জরুরি প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার কারণ স্ত্রীলোক স্বভাবতই দুষ্ট প্রকৃতি[৫]। তর্কের জোরে এ দুইটিকে পরস্পর-বিরোধী যুক্তি বলা গেলেও ইহাও অতি খাঁটি কথা যে পরের ভাল[৬] যাঁহারা চান, পরের প্রতি তাঁহাদের নির্ম্মম হইতেই হইবে। আর, পরের ভাল করাটাই আগে বেশী দরকার যেহেতু ইহাতে নিজের ভাল না হইয়াই যায় না। এই সব নানা দিক্ সুবিবেচনা করিয়া আমাদের সেদিনকার বিধান-কর্ত্তাগণ বুঝিয়াছিলেন, সমাজের মঙ্গল-সাধন করিতে হইলে না আছে সহৃদয়তার আবশ্যক, না আছে ত্যাগের, আর না আছে শাস্ত্রের মর্ম্ম-অনুসরণের জাগ্রত বুদ্ধির। আবশ্যক আছে শুধু ব্যাকরণের সূত্রের—'সহর্নেঘঃ'। তাই সুপ্রাচীন বিধি-সম্মত বিধবা-বিবাহের চেষ্টায় বিদ্যাসাগর গেলেন রসাতলে, গান্ধী মহাত্মাও গেলেন তলাইয়া, ভাসিয়া রহিলেন কেবল সনাতন সমাজপতিগণ।

(১) ঋ, বে, ১০, ৮৫—বিবাহের প্রার্থনা মন্ত্র।

(২) ঋ, বে,—১, ১২৩, ১০ : ১, ১৬১, ৫ ; অ, বে,—১, ১৪, ২ : ১১, ৫, ১৮ . ১২, ১, ২৫। (৩) ঋ, বে,—১, ১১৮, ৫, ২, ৩৫, ৪ , ৩, ৫৪, ১৪ . ৭, ১৮, ৮। তৈঃ, ব্রাঃ— ৩, ১, ১, ৯, ৩, ১, ২, ৪। শ, প, ব্রাঃ—১৩, ১, ৯, ৬ . ১৩, ৪, ৩, ৮। অ, বে, ১৪, ২, ৬১।

* তদভাবে যে কুফল হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ সংবাদ লীগ অব নেশনস্ দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ সংশ্রবে তাঁহাদের এই মন্তব্য :—

…Young widows constituted a great part of the brothel inmates, 30 per cent of them, according to some witnesses…It was said that many young widows were sold to brothels by families of their dead husbands or thrown out without any means of livelihood and were able to find no place to give them shelter and food except a brothel. Some widows were said to prefer the brothel life to the seclusion and harsh treatment they had to undergo in the family of their dead husband.

—The Report of the commission of Enquiry into the Traffic of Women and Children in the East submitted to the Council of the League of Nations, 10th December 1932, Geneva.

(৪) কামসূত্র -১, ৫, ৩। (৫) মনু—২, ২১৩ ; ৯, ১৪-১৯।

(৬) Materlink বলিয়াছেন "We are too anxious that others should be good."

প্রাচীন যুগে মাত্র সেই সম্বন্ধই আদর্শ[১] বলা হইত যেখানে বর ও কন্যা পরস্পরে শ্রদ্ধাশীল ও সুখী। সৌভাগ্যের[২] বিষয় মনে করিয়া বর কন্যাকে গ্রহণ করিতেন। এই আদর্শ জীবনে অর্জ্জন করা সম্ভব হইত নানা কারণে। মন ও দেহ দুয়েরই উৎকর্ষের সুব্যবস্থা ছিল। সূর্য্যাসূক্তের একটি ঋক্-এ[৩] পাই, —সত্যের আধার ও সৎকর্ম্মের ক্ষেত্র এই বিবাহিত জীবনে, ওগো বধূ! তোমায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত করি। স্মৃতিও আদেশ করিতেছেন—কন্যাকে ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষিতা না করিয়া পিতা যেন তাঁহার বিবাহ না দেন—'নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম জ্ঞাত ধর্ম্মশাসনম্'। দেহের দিকেও অমনোযোগ দেখা যায় না। পূর্ব্ব রাগের অনুশীলনও যথেষ্ট[৪] দেখা যায়। কন্যা বেশ বড় হইয়াছেন ও বরলাভের কল্পনায় নিজেকে মোহন সাজে আকর্ষণীয়া করিয়া তুলিয়াছেন[৫]। এ বিষয়ে তাঁহার শিল্পকলাশিক্ষার সুযোগ ছিল। বাৎস্যায়ন[৬] বলেন— 'পিতৃগৃহে কন্যা কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং পরিণয়ান্তে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া অধ্যয়নের ধারা বজায় রাখিতে পারেন। চতুঃষষ্টি কলা কন্যা নিজে নিভৃতে অভ্যাস করিয়া যৌবনে প্রয়োগ করিবেন।' যথাবিহিত শিক্ষার গুণে, উভয়েই, কিছু আত্মকর্তৃত্ব দ্বারা নিজে বিবাহ স্থির করিতেন। প্রয়োজনমত প্রণয়-নিবেদনও চলিত। কামসূত্র[৭] হইতে তাহার সামান্য নমুনা দেওয়া যাইতে পারে :—

পূর্ব্ব-রাগ

নায়কের ব্যবহার—নায়িকার সহিত একত্রে খেলা, আমোদ প্রমোদের জন্য এটা ওটা দেখান, সামর্থ্য থাকিলে প্রচ্ছন্ন ভাবে উপহার দেওয়া কিন্তু প্রকাশ্যে দেওয়ার উপযুক্ত হইলে প্রকাশ্যে ভাল, কদাচিৎ গোপনে দেখা করার প্রার্থনা, বিবিধ কলায় অনুরাগিনী করার চেষ্টা, কৌতূহল থাকিলে, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি দেখাইয়া বিস্মিত করা; পর্ব্বদিনে অলঙ্কারাদি উপহার দেওয়া, সকল বিষয়ে পরিচারিকার সাহায্য লওয়া আবশ্যক।

নায়িকার ব্যবহার—দেখা হইলে লজ্জা দেখান, কথা জিজ্ঞাসা করিলে মুচ্‌কি হাসিয়া অধোমুখী হইয়া অস্ফুটভাবে অর্থহীনপ্রায় জবাব দেওয়া; যাহা কিছু একটা দেখিয়া অকারণ বিশেষ হাস্য করা; নায়ককে দেখাইয়া কোলের শিশুকে কোলে লইয়া অজস্র আদর করা; অপর রমণীর বেশভূষা রচনায় অকস্মাৎ প্রবল মনোযোগ দেওয়া; ইত্যাদি।

পূর্ব্বরাগের বিপদ-আপদ্ স্বীকার করিয়াই যাত্রা করা হইত। বৈদিক যুগে 'বরুণ-প্রঘাস' নামে যজ্ঞ ছিল। প্রতিপ্রস্থাতৃ যজমানের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি অপর কাহারও সহিত মিলিতা হইয়াছেন কিনা। জিজ্ঞাসার কারণ, স্বামীর সহিত যজ্ঞ-কালে তাঁহার অন্তরে গোপন প্রণয়-বেদনা থাকিলে মন্ত্রের আন্তরিকতা ব্যর্থ হইবে। পক্ষান্তরে প্রকাশ হইলে পাপ কমে এবং অপ্রকাশ হেতু তাঁহার আত্মীয়গণের অমঙ্গল হয়[৮]। শাস্ত্রান্তরে বলা হইয়াছে, তিনি প্রণয়ীগণের মোট সংখ্যা মাত্র বলিবেন, কিম্বা সেই কয়টি কুশ দেখাইবেন; আর যদি কোন প্রণয়ী না থাকে তবে কেহ নাই সে কথা ভাষায় বলিবেন। প্রকাশের ফলে তিনি পবিত্র হ'ন নতুবা তাঁহার কোন আত্মীয়ের গুরুতর ক্ষতি হয়; আর, অমুকে আমার প্রণয়ী ইহা বলায় সেই ব্যক্তি বরুণ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়[৯]। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও[১০] দেখা যায়, বিবাহের পূর্ব্বে যদি কুমারী কাহারও সহিত মিলিতা হইয়া থাকেন তবে সে কাহিনী ব্যক্ত করা আবশ্যক। নতুবা পরে প্রকাশ হইলে অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

পূর্ব্বরাগের ভুলভ্রান্তি

বিবাহের অনুষ্ঠান * আলোচনায় দেখা যায়, বর এই মন্ত্র[১১] আবৃত্তি করেন—'আমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী; আমি সাম গান, তুমি ঋক্ মন্ত্র; আমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী; আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সন্তান লাভ করিব।' শিলাখণ্ডের উপর পত্নীকে দাঁড় করাইয়া তিনি

বিবাহের অনুষ্ঠান

(১) কামসূত্র—২, ১, ২০,। (২) ঋ, বে—১০, ৮৫, ১—'গৃভ্‌ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং'। (৩) ঋ, বে, ১০, ৮৫, ২৪।
(৪) অ, বে,—২, ৩৬, ১; ৬, ১৩০, ৪; ১৪, ২, ৫৯ ইত্যাদি।
(৫) ঋ, বে,—১, ১২৩, ১১; ৭, ২, ৩,।
(৬) কামসূত্র—১ম অধিকরণ, ৩য় অধ্যায়।
(৭) কা, সূ,—২, ৩।

(৮) শ, প, ব্রাঃ—২, ৫, ২, ২০। (৯) কাত্যায়ন—৫, ৫৭—৯; তৈঃ ব্রিঃ ব্রাঃ—১, ৬, ৫, ২। (১০) কৌটিল্য—৩য় বিভাগ, ১৫, অধ্যায়—বিবাহচুক্তি।

* The bridegroom is led to the house of the bride by gay young women to whom he must behave with complaisance. The bridegroom, with the permission of the maidens, gives the bride a new garment and anoints her.

—Religion and Philosophy of the Veda—Keith, p. 374.

(১১) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র—১, ৭, ৩, পারস্কর গৃহ্য—১, ৬, ৩; কাঠক সংহিতা—৩৫, ১৮; অ, বে, ১৪, ২, ৭১, ঐতরেয় ব্রাঃ—৮, ২৭।

বলেন[১]—'শিলার ন্যায় তুমি পতিকুলে স্থির হইয়া থাক।' অস্থির হওয়ার ঘটনা দুর্লভ ছিল না বলিয়াই এই আকিঞ্চন। এই অস্থিরতার নিদর্শন কৌটিল্যশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। তবুও, মোটের উপর বৈদিক যুগের দাম্পত্য-আদর্শ কেবল মাত্র কাল্পনিকই ছিল না, প্রচুর পরিমাণে বাস্তবই[২] হইয়াছিল। সাত বার বিশেষ বিশেষ মনোভাবের সার্থকতা-বোধে স্বামী যে সকল মন্ত্রে স্ত্রীকে তাঁহার অনুগমনে আহ্বান করেন তাহার শেষ মন্ত্রটি[৩]—'পরস্পর সখ্য ভাব হওয়ার জন্য তুমি সপ্তম পদ নিক্ষেপ কর'। অগ্নি প্রদক্ষিণ[৪] এক বিশেষ অনুষ্ঠান যেহেতু অগ্নিই কন্যার দেবতা[৫]। পাণিগ্রহণ[৬] আর একটি প্রধান ক্রিয়া। ধ্রুবতারা দৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বধূ ঘরে বসিয়া থাকেন। পরে স্বামী তাঁহাকে বাহিরে আসিয়া ধ্রুবতারা[৬] দেখাইয়া চিরস্থির চিরস্নিগ্ধ প্রেম প্রার্থনা করেন। গৃহ্যসূত্রাদি বিবাহের প্রথম তিনরাত রীতিমত সংযম আদেশ করিয়াছেন। কামসূত্র[৭] কিন্তু বলেন, তিন রাত একেবারে কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া থাকিলে 'নায়ককে স্তম্ভের মত দেখিয়া কন্যা তাহাকে গ্রাম্য ভাবিতে পারে, সুতরাং কিছু রঙ্গরস সে সময় কর্ত্তব্য, তবে যেন ব্রহ্মচর্য্য[৮] ভঙ্গ না হয়। কন্যার গৃহ হইতে উভয়ে রথারোহণে[৯] শোভাযাত্রা করিয়া বরের বাড়ী আসেন। আসিয়াই গার্হপত্য অগ্নি[১০] প্রজ্জ্বলিত করা হয়। গৃহ্যসূত্র[১১] বলেন—এই অগ্নি গৃহের কল্যাণের জন্য, আর পত্নীই গৃহ, অতএব উভয়ে অগ্নি আবাহন করিতে পারেন।

বরের বাড়ীতে 'চতুর্থী হোমের' পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অনুমোদিত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন বলেন[১২]—'অত্যন্ত

দাম্পত্য পরিচয়

লজ্জাবশে কন্যাকে উপেক্ষা করিলে তিনি উদ্বেগ দূষিতা হন, আবার হঠাৎ উদ্ধত ভাব অবলম্বন করিলেও প্রীতিযোগ না হওয়ায় তিনি পুরুষ-দ্বেষিণী হন; সুতরাং সুকুমার উপায় অবলম্বন করিবে।' অপরপক্ষে কন্যার লজ্জাশীলতা দূর করিবার প্রয়াস হইতে[১৩] ক্রমে যৌন ভাবাবেশ সঞ্চারিত হয়। বিবাহের পর অযোধ্যায় আসিয়া যথাবিধি শাস্ত্রীয় ক্রিয়া ও গুরুজন-সম্ভাষণ প্রভৃতি সমাপ্ত হইলে দশরথ পুত্রবধূগণ[১৪] স্বামীসহ নিভৃতে ক্রীড়ায় মগ্ন হইলেন—'রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ'। সীতা দেবীর বয়স তখন কত সে সংবাদ দেবীর নিজ মুখেই প্রকাশ। ইন্দ্রজিতের মায়াযুদ্ধে রামলক্ষ্মণ নিপতিত হওয়ার সংবাদে অশোক-কাননে সীতাদেবী শোক করিতেছেন যে, বৈধব্য অসম্ভব বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল, যেহেতু 'কন্যালক্ষণজ্ঞগণ'[১৫] তাঁহাকে সুলক্ষণা বলার অনেক কারণ পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মগ্ন চুচুকৌ'—সংবাদটি, দেবীর বয়সের আভাস দেয়।

প্রাচীণ শাস্ত্রকারগণ স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক অনুরাগ রসবোধহীন কর্ত্তব্যপরায়ণতার মধ্যে রুদ্ধ করেন নাই, অথচ

সন্তান কামনা

অহেতুক কামলিপ্সাকে সংযত করিয়া দাম্পত্যসঙ্গমকে সামাজিক অথবা ধার্ম্মিক কোন মহত্তর কল্যাণসাধনের ভাবপ্রবাহে চালিত করিয়াছেন। চতুর্থ রাত্রে স্বামী এই মন্ত্রে[১৬] স্ত্রীকে সহবাসে অনুরাগিণী করেন—'আমাদের আত্মা মিলিত হৌক্, হৃদয় মিলিত হৌক্, নাভি মিলিত হৌক্, দেহ মিলিত হৌক্। আমাদের বন্ধন অবিচ্ছেদ্য হইবেই'; তারপর, মুখে মুখ মিলাইয়া তিনি বলেন

(১) পারস্কর—১, ৭, ১। (২) Macdonell & Keith Vedic Index. (৩) আশ্ব—১, ৭, ১৯। (৪) ঋ. বে, ১০, ৮৫, ৩৬—৩৮. অ, বে, ১৪, ১, ৪৭—৪৮। ঋ, বে, ৫, ৩, ২। (৫) ঋ, বে, ১০, ১৮, ৮—'হস্তগ্রাভ'। (৬) গোভিল—২, ৩। (৭) কা, সূ—২, ২। (৮) এ বিষয়ে বৈদিক ব্যবস্থার অনুরূপ। The History of Human Mariage গ্রন্থে Westermarck বলেন—'In the Vedic literature the blood of the bridal night is represented as a poison and a seat of danger." [Weber প্রণীত Indische Studien, V. 189, 190, 211 sqq. দ্রষ্টব্য।] The Sexual Life in Ancient India গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় Meyer এই "blood of innocence" বিষয়ে নানা জাতির প্রথা আলোচনা করিয়াছেন এবং আমাদের কৌটিল্যের প্রমাণও আহরণ করিয়াছেন। আজকাল শয্যা-তোলানি প্রথায় এই ব্যাপার রূপান্তরিত হইয়াছে। Vedic Index গ্রন্থে Macdonell & Keith বলেন—"The marriage ritual quite clearly presumes that the marriage is a real and not a nominal one." ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ৮৫ সূক্তের-২৮, ৩০, ৩৪ ঋকগুলিতে কন্যার বসনশুদ্ধির মন্ত্র এই সংশ্রবে দ্রষ্টব্য। (৯) ঋ, বে, ১০, ৮৫, ৭—১০—২৪।

(১০) হিরণ্যকেশী—১, ১৯, ৭। (১১) গোভিল—১, ৩, ১৫,। (১২) কা, সূ,—৩, ২। (১৩) Havellock Ellis—Psychology of Sex, Vol iii, Analysis of the Sexual Impulse, p 181. উক্ত প্রয়াসের বর্ণনা কামসূত্রে বেশ পাওয়া যায়। (১৪) বালকাণ্ড-৭৭, ১৪। (১৫) লঙ্কাকাণ্ড—৪৮, ১১—১৩। (১৬) হিরণ্যকেশী—১, ৭, ২৪, ৪—৬।

—'মধু, ওগো মধু, এই ত মধু; আমার জিহ্বায় মধুর বাণী, আমার মুখে মধুমক্ষিকার মধু।' দ্বাদশ শতাব্দীতেও[১] ঐ সুরই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—'বেদের মতে বিবাহ আলগা যোগ নয়, দেহে দেহে, অস্থি মজ্জায় মিলন'। গর্ভাধান, পুংসবন[২], সীমন্তোন্নয়ন[৩], সুপ্রসব[৪]—এ সমস্তেতেই মন্ত্রের বহুল ব্যবহার ও আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় উপভোগের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ না হইতে দিয়া বরং তাহাকে একটি ব্যাপকতর পরিণতির দিকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। পুত্রলাভের সার্থকতা বেদে অতিশয় প্রশংসিত[৫]। দশটি পুত্র ও স্বামীকে লইয়া একাদশটি পুরুষ সংখ্যা বৈদিক[৬] রমণীর আদর্শ সংসার। এক মন্ত্রে স্ত্রী স্বামীকে বুঝাইতেছেন[৭], প্রাচীন ঋষিগণও সন্তানের আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন, তাহাতে পারমার্থিক অনিষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, কাল্পনিক উৎসাহে শক্তি অপচয় করা ব্রাহ্মণগ্রন্থে[৮] ভ্রূণহত্যার মতই দোষের বলা হইয়াছে। তেজসম্পন্ন পুত্রকামনায় স্বামীকে পত্নীর সম্মুখে আহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।* কেবল কর্ম্ম-কাণ্ডের মন্ত্র ব্রাহ্মণেই নয়, জ্ঞান-কাণ্ডের আরণ্যক উপনিষদেও পুত্রলাভের বিশদ আলোচনা আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক[৯]—'তন্ত্রীমতী তে সপেয়' ইত্যাদি মন্ত্রে—এ বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আরণ্যক পুনশ্চ[১০] বলিয়াছেন,—'প্রজননে রমন্তে'; 'প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠা লোকে'[১১]। বৃহদারণ্যক[১২] বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট পুত্রকামনায় বিভিন্ন আহার-বিহারের সবিস্তার উপদেশ দিয়াছেন। আর, মাতৃত্বকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করা হইয়াছে। বনের মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নির প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার উপমা দিতে[১৩] মাতৃ-গর্ভ-লীন শিশুর কথা মনে হইয়াছে। জলদেবিগণের নিকট প্রার্থনা করিতে গিয়া অথর্ব্ব বেদের ঋষি[১৪] ভাবিয়াছেন, মা যেমন সন্তানকে স্তন্যদানে লালনপালন করেন, তিনিও তেমনি মানবকে সবল করেন। মহাভারত[১৫] বলিয়াছেন, মায়ের সুমধুর নাম লইয়া যে কেহ বাড়ী ফেরে, অতি দৈন্যের মধ্যেও তাহার আনন্দ অটুট থাকে। মহাভারত[১৬] আরও বলিয়াছেন—মাতার অপেক্ষা কোন ধর্ম্মই বড় নয়—'নাতি মাতরম্ আশ্রমঃ।'

ইন্দ্রদেবকে[১৭] মন্ত্রাচ্ছাদিত করার কল্পনায় বৈদিক ঋষির মনে স্ত্রী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত যুবা স্বামীর ছবি আসিয়াছে।

দাম্পত্য প্রণয়

জ্যা, বাণ আকর্ষণে যে ধ্বনি করে, যুদ্ধ-প্রিয় আর্য্য এ ভাবের বর্ণনায়ও, পতিকে আলিঙ্গন করিয়া জায়ার কল-ভাষের তুলনা[১৮] দিয়াছেন। প্রণয়ের একান্ত আকর্ষণ থাকায় বয়োধিকা বধূ স্বামীর ঘরে অশান্তি ঘটান না। নতুন সংসারের কর্ত্রী হইয়া আসিলেও তিনি গুরুজনের মান-মর্য্যাদা খুব রাখিয়াই চলেন। অথর্ব্ব বেদ[১৯] বলেন, বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর আনন্দদায়িনী হইবেন—'স্যোনা ভব শ্বশুরেভ্যঃ।' আবার, ভয়ও করিবেন[২০]। কিন্তু স্ত্রীর সংসারের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি[২১] অনুপ্রাণিত করিয়া স্বামী তাঁহার সঙ্গে হৃদয়ে ও মনে এক হইবেন। বাৎস্যায়নও[২২]

(১) জীমূতবাহন—দায়ভাগ—৪, ২, ১৪। (২) অ, বে, ৩, ২৩, সাংখ্যায়ন—১, ১৯, ২০। আশ্বলায়ন—১, ১৩। পারস্কর—১, ১৪। গোভিল—২, ৬। হিরণ্যকেশী—২, ২। আপস্তম্ব—৬, ১৪, ৯। (৩) অ, বে, ৭, ৩৫। গৃহ্যসূত্রাদি দ্রষ্টব্য। (৪) ঋ, বে, ৫, ৭, ৮, ৭—৮। অ বে, ১, ১১। শুক্রযজুঃ ৮, ২৮। শ, প, ব্রা—১৪, ৯, ৪, ২২। আপস্তম্ব মন্ত্রব্রাহ্মণ—২, ১১, ১৫। বৌধায়ন গৃহ্য পরিশিষ্ট—২, ২। (৫) ঋ, বে, ১, ৯১, ২০, ১, ৯২, ১৩ ; ৩, ১, ২৩, অ, বে, ৩, ২৩, ২ ; ৫, ২৫, ১১ ; ৬, ১১, ২। সূর্য্যাসূক্তও দ্রষ্টব্য। (৬) সূর্য্যাসূক্ত ৪৫ ঋক্ ; অ, বে, ৬, ২, ১৯—'দশাস্যাম্ পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশম্ কৃধি'। (৭) ঋ, বে, ১, ১৭৯, ২—লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে বলিতেছেন। (৮) তৈঃ, ব্রাঃ—২, ৮, ২। * শতপথ ব্রাহ্মণ—১০, ৫, ২, ৯। (৯) তৈঃ, আঃ, ৪, ৬, ৫। Psychopathia Sexualis গ্রন্থে Krafft Ebbing বলেন, দুএকটি ছেলে হওয়ার পর স্ত্রীর অপরোক্ষ আসক্তি কমিয়া আসে ও তাঁহাতে যে স্বামীর আনন্দ এখনও আছে এই চরিতার্থতাবোধেই স্বামীসঙ্গ তিনি প্রীতিপদ মনে করেন। (১০) তৈঃ, আঃ,—১০, ৬২, ৭ ; ১০, ৬৩, ৮। (১১) The History of Human Marriage, প্রথম খণ্ড Westermarck বলেন—বহুদেশে প্রথা আছে যে সাধারণতঃ গর্ভ বা ছেলে হওয়া দেখিয়া তবে পুরুষ সে রমণীকে বিবাহ করে। এ সম্বন্ধে ভারতে কয়েকদল আদিম অধিবাসীদের ব্যবহার উল্লেখ-যোগ্য Gait—Census of India, 1911, Vol. i (India) Report, P. 243 (Aboriginal Tribes); Hutchinson, Account of Chittagong Hills Tracts, P. 23 ইত্যাদি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১২) বৃঃ, উ, ৬, ৪। (১৩) সামবেদ—১, ১, ৮, ৭। (১৪) অ, বে, ১, ১, ৫, ২,। (১৫) মহাভারত—১২, ১৬৫। (১৬) মহাভারত—১২, ১৬১, ৯। (১৭) ঋ, বে, ২, ১৬, ৭। সোম দেবতা সম্বন্ধেও ঐ ভাবের মন্ত্র আছে—ঋ, বে, ৮, ১৭, ৭। (১৮) ঋ, বে, ৬, ৭৫, ৩। (১৯) অ, বে, ১৪, ২, ২৬,। (২০) অ, বে, ৮, ৬, ২৪। মৈত্রায়নি সংহিতা—২, ৪, ২ ; কাঠক সংহিতা—১১, ১২ ; তৈঃ ব্রাঃ—২, ৪, ৬. ১২ ; ঐ, ব্রাঃ—৩, ২২। (২১) অ, বে, ৩, ৩০। (২২) কা. সূ—১, ২।

বলেন—'সমান তৃপ্তির জন্য প্রেমই স্ত্রী-রক্ষার একমাত্র উপায়; তবে মনু যে, স্ত্রীলোককে কঠিন কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত করার বিষয় উপদেশ দিয়াছেন, সে উপায় উদ্বেগজনক ও অশোভন।' অপরপক্ষে, তিনি বলেন[১], স্বামী কোন অপরাধ করিলে স্ত্রী কিঞ্চিৎ রুষ্টা হইবেন কিন্তু তিরস্কার যেন না করেন। দাম্পত্য প্রণয় বৈদিক যুগে এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, 'স্ত্রী যেমন স্বামীর প্রেম কামনা করেন'[২] এই উপমার আশ্রয়ে দেবতার প্রীতি-প্রার্থনার মন্ত্র রচিত হইয়াছে। স্বর্গের লোভে, শাসনের ভয়ে বা নীতি উপদেশের প্রকোপে সে যুগে পাতিব্রত্যের সঞ্চার হয় নাই। আপনা হইতেই ও লজ্জায় আড়ষ্ট না হইয়া, নিজের দেহ-মনের সকল ঐশ্বর্য্য উজাড় করিয়া বৈদিক পত্নী[৩] পতি সেবা করিয়াছেন। ঈর্ষ্যা চঞ্চল হৃদয়ে তিনি স্বামীকে আলিঙ্গন ও বসনে আচ্ছাদিত করিয়া বলেন[৪]—'মনুজাত বসন দ্বারা, হে স্বামি! তোমায় আবৃত করিয়া আমি নিবেদন করি, তুমি একান্ত আমার হও, তোমার মুখে অন্য রমণীর নাম যেন শুনিতে না হয়।' ঊষার সম্বন্ধে এক উপমায়[৫] পতির প্রতি জায়ার একান্ত অনুরাগ অতি চমৎকার বর্ণিত হইয়াছে—'কত না দিন অনুরাগিণী ঊষা আকাশ রাঙা করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় থাকেন, যেমন প্রেমময়ী পত্নী বিক্ষিপ্ত-চিত্ত স্বামীকে ত্যাগ না করিয়া[৬] প্রতি দিনই সেবা করেন।' রমণী হৃদয়ের এই সর্ব্ব-হারা আত্ম-নিবেদন কাজরীর[৭] বর্ণনা মনে করাইয়া দেয়—

> "প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত।
> স্তম্ভিত মেঘের মতো,
> তৃষ্ণাতুরা
> আষাঢ়ের আত্মদান প্রত্যাশায় ভরা।"

রমণীর এই প্রেম পুরুষের চিত্তকে মুগ্ধ ও গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ইন্দ্রদেবকে যজ্ঞক্ষেত্রে দ্রুত আসিবার প্রার্থনায় বলা হইয়াছে[৮]—'হে দেব! যেমন প্রণয়িনীর বাহু-বন্ধনে ধরা দেওয়ার জন্য তাঁহার নায়ক অতি ব্যাকুল আবেগে আসেন তেমনি প্রবল আকর্ষণে তুমিও আসিয়ো। হে দেব! তোমার প্রেমময়ী জায়া আছেন, তিনি তোমার জীবনের আনন্দ ও সান্ত্বনা।' এক ঋষি[৯] অনুতাপ করিয়াছেন—'আমার প্রিয়া আমায় কখনো যাতনা দেয় নাই বা তুচ্ছও করে নাই কিন্তু পাশার নেশায় আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিলাম। অন্যের পত্নীর সৌভাগ্য দেখিয়া আমার প্রিয়ার জন্য বড় দুঃখ হয়। দুরন্ত পাশা যাহার অর্থ নাশ করিয়াছে, অন্য লোকে তাহার পত্নীর প্রণয়প্রার্থী হয়।'

ঋষিগণের রমণী প্রিয়তা

কামিনী-কাঞ্চনে বৈরাগ্য ঋষিগণের কদাচ ছিল না। ঋগ্বেদ[১০] স্ত্রীকে 'মধুর গৃহ ও আনন্দ' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, প্রজাপতি স্ত্রীলোককে সুন্দর অবয়ব দিয়াছেন সেজন্য রূপসী কুমারী পুরুষের প্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। যাজ্ঞবল্ক্য হেন মহর্ষি কেবল যে দুইটি বিবাহই করিয়াছিলেন তাহা নয়, দ্বিতীয় পক্ষটিই যে প্রিয়তরা ছিলেন, সে কথা বলিতে তাঁহার সঙ্কোচ হয় নাই। আর, বানপ্রস্থে যাওয়ার সময়, পত্নীদ্বয় মধ্যে তিনি যে সম্পত্তি ভাগ করিয়াছেন, সে এক রাজার ঐশ্বর্য্য। আবেগের সঙ্গে তিনিই বলিয়াছেন[১১]—স্ত্রী-হীন জীবনের অর্দ্ধেকই শূন্য, স্ত্রীর দ্বারাই

(১) কা, সূ—৪, ১, ১৯। (২) ঋ, বে, ৫, ৭৮, ৪। (৩) ঋ, বে, ১, ৬২, ১০। (৪) অ, বে, ৭, ৩৭। (৫) ঋ, বে, ৭, ৭৬, ৩। (৬) Sex Problem in Women গ্রন্থে Magian বলেন, মেয়েরা সাধারণতঃ স্বামীর সংসারে নিজেকে মিশাইয়া রাখিতেই চায়, বাহিরে যাওয়ার ঝোঁক সহজে হয় না। Intelligent Woman's Guide to Socialism গ্রন্থে G. B. S. বলেন, যৌন আকর্ষণ খামখেয়ালীর বিষয় নয় বরং নিশ্চিত অনুরাগ। The Sexual Life of Women গ্রন্থে Henrich Kisch বলেন, যুবকের পক্ষে যৌন পবিত্রতা যদিচ প্রেমবিলাসের স্বপ্ন মাত্র, যুবতীর প্রকৃতিতে সেটি একটি স্বভাবগত নিষ্ঠা...অবশ্য, পুরুষের প্রাকৃতিক গঠন বিবেচনায় তাহার যৌন বিষয়ে সততা বেশী কঠোর আদর্শে বিচার করা যায় না। Psychopathia Sexualis গ্রন্থে Krafft Ebbing আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, রমণী বোধ হয় একবারের বেশী সত্যকার প্রেমে পড়িতে পারে না। কিন্তু Dr. Magian বলেন, এক রমণী দেহের টানে এক পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আবার সেই সঙ্গে মানসিক আকর্ষণে অন্য পুরুষের দিকে ঝুঁকিতে পারে, এমন কি একই সময়ে দুজনেরই সেবা করিতে পারে। [শেষ প্রশ্নের—কমল] তবে, প্রকৃতির ব্যবস্থায়, স্ত্রীলোকের আসক্তি কম এবং সে জন্য The Evolution of Sex গ্রন্থে Dr. Giegerio Maranon বলেন, বাধ্যতামূলক যৌন নিবৃত্তি স্ত্রীলোকের পক্ষে "organic tragedy" (দৈহিক অনিষ্ট) ততটা নয় যতটা "social tragedy" (সামাজিক অপচয়)। (৭) রবীন্দ্রনাথ-মহুয়া—কাজরী। (৮) Muir—Original Sanskrit Text, Vol V. P. 127. (৯) ঋ, বে, ১০, ৩৪। (১০) ঋ, বে,—৩, ৫৩, ৪,। (১১) বৃহ, উপ—১, ৪।

জীবনের শূন্যতা পূর্ণ হয়। স্মৃতিশাস্ত্রও[১] স্বামী স্ত্রীকে একাত্মা বলিয়াছেন—'যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা'। বৈদিক সমাজে রমণী অফুরন্ত প্রেরণা জাগাইয়াছেন। তাঁহার রূপ-লাবণ্য ও অলোক-রহস্য ঋষিগণের কবিচিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। উজ্জ্বল ফেণিল সোমরসের দৃশ্য[২] দেবস্তুতিরত ঋষির চোখে অন্য কিছুর মত দেখাইতেছে না– দেখাইতেছে 'সন্দর্শনীয়া রমণীর ন্যায় রমণীয়া।' রমণী-রূপের কোন মাধুরীই ঋষির দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তরুণী যখন চলিয়াছেন, 'কলসী ল'য়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা', তখন তাঁহার বঙ্কিম ভঙ্গিমা ও মৃদু আন্দোলিত শোভন বাহুর কঙ্কণ-ঝনৎকার এমনই এক সংক্ষিপ্ত উপমায় ঋষির মনে[৩] গাঁথা রহিয়াছে—'উদকং কুম্ভিনীরিব'। ঋষির চিত্তে[৪] রূপলুব্ধ নাগরিকগণের দৃষ্টিবিদ্ধা সজলবসনা সুন্দরীর চিত্র তাহই আঁকা রহিয়াছে–'এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্দ্ধেব স্নাতী দৃশয়ে ন অস্থাৎ'। পথচারিণী রূপসীর অনুগমন করা এতই অনিবার্য্য সম্ভাবনার বিষয় যে দীপ্যমানা উষার পশ্চাৎ সূর্য্যোদয়ের বর্ণনায়[৫] ঋষি এই উপমাই অবলম্বন করিয়াছেন—'সূর্য্যো দেবীমুষষং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।' উষাকে অভিনন্দন করা হইয়াছে—'স্ত্রীনাং মধ্যে শশ্বত্তমা'[৬] এবং তিনি 'ভুবনস্য পত্নী'[৭]। নারীজাতির প্রতি আর্য্য সমাজের যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উষা-স্তুতির[৮] অন্তরালে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রভাবে কেহ বা জাগিল ভূমিলাভের জন্য, কেহ যশ অর্জ্জন করিতে, কেহ মহত্বের আশায়। তাঁহারই প্রভাবে জ্ঞান বিকশিত হয় এবং স্তুতিরত মানবের মনের কথা তিনি বোঝেন।

সংবাদ

[নীচের সংবাদগুলি বিভিন্ন তারিখের সংবাদপত্র হইতে নিতান্ত অসংলগ্ন ভাবে লওয়া হইয়াছে—এগুলির মধ্যে কোন পারম্পর্য্য কেহ যেন না খোঁজেন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট যদিও নিছক সত্য কখনই হয় না, তবু প্রকাশিত সংবাদ গুলির মধ্য হইতে আমাদের নারী-প্রগতির ধারার সন্ধান মিলিবে বলিয়াই মনে হয়।]

গত ২৪শে জুন (১০ই আষাঢ়) কলিকাতার ইয়ং উইমেনস খৃশ্চান এসোসিয়েসন হলে নিখিল ভারত নারী-সম্মেলন, কলিকাতা কেন্দ্রের এক সভা হইয়াছিল। সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন শ্রীযুক্তা কে, এন, রায়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল মেয়েদের ভোটাধিকার। শ্রীযুক্তা এস, সি, মুখুজ্যে মহাশয়া সভার আহ্বান-কারিণী হিসাবে প্রারম্ভে বক্তৃতা দিয়া বলেন, ভারতবর্ষের নূতন শাসননীতি গঠিত হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের ভোট সম্বন্ধে সমানাধিকারের দাবী স্বীকৃত হওয়া দরকার। অবশ্য গৃহ ও পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যই ভারতের নারীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

ঐ তারিখে বোম্বাই সহরে পুণার উইমেনস ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটদের সম্মুখে এক বক্তৃতায় শ্রীমতী সুব্বারোয়াণ বলিয়াছেন—ভারতের নারী যদি পুরুষের সহিত একযোগে বাহিরে কাজ করিতে চায় তবে তাহাকে মিথ্যা ভাববিলাস ছাড়িয়া আদর্শের জন্য কঠিন সাধনার্থে প্রস্তুত হইতে হইবে। পাশ্চাত্যের যাহা ভাল তাহা লইয়া প্রাচ্যের সমাজ-ব্যবস্থার দৃঢ় ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে গার্হস্থ্য কাজকর্ম্মের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

গত ২৭শে জুন (১৩ই আষাঢ়) আসাম মহিলাসমিতির কর্ম্মকর্ত্রী, শ্রীমতী রাজবালা দাস বর্ত্তমান নারীশিক্ষার রীতি সমালোচনা করিয়া গৌহাটিতে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, প্রচলিত শিক্ষার সহিত ছাত্রীজীবনের পর কাজে লাগে এমন সব বিষয়েও মেয়েদের শিক্ষার সমূহ প্রয়োজন—যেমন সেলাই, গান, চরকা কাটা, তাঁত বোনা প্রভৃতি কার্য্যকরী বিষয়।

লণ্ডনে ২০শে জুন তারিখে ফ্রেণ্ডস মিটিং হাউসে বক্তৃতা করিবার সময় শ্রীমতী রাজকুমারী অমৃত কাউর ভারতীয় মহিলাদের দাবীগুলি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে এরূপ বিধান আবশ্যক যাহাতে মহিলাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হয়। মহিলারা এখন পুরুষের সমানাধিকার এবং প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার দাবী করিতেছেন। তবে অবস্থান্তর-সময়ের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যাহাতে মহিলাগণকে পুরুষের সমান ভিত্তির উপর দাঁড় করান যায়। আমি সদস্যপদ নির্দ্দিষ্ট রাখার তীব্র প্রতিবাদ করি। কারণ আমি মনে করি যে, এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা আমদানী হইবে।

লণ্ডনের ২৮শে জুনের সংবাদ—মিস্ ইলিনোর র‍্যাথবোন, এম্ পি ভারতীয় নারীর দাবী বিষয়ে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে একটি দীর্ঘ সওয়াল দাখিল করিয়াছেন। তাঁহার মত হোয়াইট পেপারে নারীর সম্পর্কে অবিচার করা হইয়াছে।

(১) মনু—৯, ৪৫। (২) ঋ, বে–৯, ৭৭, ৩। (৩) ঋ, বে, ১, ১৯১, ১৪। (৪) ঋ, বে,—৫, ৮০, ৫। (৫) ঋ, বে—১, ১১৫, ২। তত্র সায়নঃ–যথা কশ্চিন্মনুষ্যঃ শোভনাবয়বাং গচ্ছন্তীং যুবতিং স্ত্রিয়ং সততমনুগচ্ছতি। (৬) ঋ, বে, ১, ১২৪, ৪। (৭) ঋ, বে, ৭, ৭৫, ৪। (৮) ঋ, বে, ১, ১১৩, ৬, ১, ৯২, ৯, ১, ১১৩, ৮।

তাঁহার স্বাক্ষ্যে তিনি ভারতীয় পর্দ্দানশীন নারীদের যাঁহারা প্রগতিকামিনী তাঁহাদের মত ব্যক্তিগত ভাবে সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি যাহা জানিয়া গিয়াছেন—তাহার বিবরণ দিয়াছেন। সামাজিক হিসাবে মেয়েদের মর্য্যাদার দাবী ক্রমেই ভারতবর্ষে স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতেছে—ইহাই তাঁহার মত।

গুরগাঁও শেকেন্দরপুর ২৮শে জুনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, একটি আহীর রমণী চিতাবাঘের কবল হইতে তাহার শিশু সন্তানের জীবন রক্ষা করিয়াছে।

প্রকাশ যে সে তাহার শিশু-সন্তানকে লইয়া গৃহের বাহিরে একটি তক্তপোষের উপর ঘুমাইতেছিল, মধ্যরাত্রে একটি চিতা বাঘ আসিয়া শিশুটিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চিতাবাঘের মুখ হইতে শিশুকে ছিনাইয়া লয় এবং তক্তপোষদ্বারা চিতাবাঘকে চাপিয়া ধরে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চিতাবাঘ স্ত্রীলোকটিকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে গুরুতর ভাবে জখম করে। শিশুর দেহে সামান্য আচড় লাগিয়াছিল, তদ্ভিন্ন সে সম্পূর্ণ অক্ষতদেহ আছে। স্ত্রীলোকটির চীৎকার শুনিয়া গ্রামবাসিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং চিতাবাঘকে বধ করে।

স্ত্রীলোকটি মুখে ও হস্তদ্বয়ে গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। তাহাকে গুরগাঁও হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলন

দেশের বর্ত্তমান প্রগতির ধারার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, এমন সকল লোকের কাছেই এতদিন নিখিল ভারত নারী-সম্মেলন সুপরিচিত। এই সভা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, এবং ইহার উদ্দেশ্য সামাজিক ও শিক্ষামূলক সমস্যা সম্বন্ধে ভারতনারীর মতামত প্রকাশ ও দাবী প্রচার করা। ভারতবর্ষময় এই সভার প্রায় শতাধিক শাখা বর্ত্তমান, তাহার মধ্যে কলিকাতা সহরে একটি।

এই সভা রাজনৈতিক দলাদলিতে যোগদান করে না, কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালকদের উন্নতিসংক্রান্ত সকল প্রশ্নেরই আলোচনা করে এবং লোকমত গঠন ও নানাপ্রকার লোকহিতকর অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের মঙ্গল সাধন করিবার চেষ্টা করে। প্রতি শাখার কাজ একটি স্থানীয় সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত। এইরূপে সকল শাখার পরস্পরের কাজের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়, এবং ভারতনারীর সম্মিলিত চেষ্টার ফলে অনেক উপকার সাধিত হয়।

এ পর্য্যন্ত পুণা, দিল্লী, পাটনা, বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ ও লক্ষ্ণৌ, এই সাতটি সহরে উক্ত সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। প্রত্যেক বারই কোন-না-কোন বিশিষ্ট ভারতরমণী সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন,—যথাক্রমে বরোদার মহারাণী, ভূপালের বেগম, মুণ্ডির রাণী, সরোজিনী নাইডু, ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি, শ্রীমতী সরলা রায় এবং লেডী নীলকণ্ঠ।

এই বৎসর আগামী বড়দিনের ছুটিতে আমরা সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছি। সেই উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে অনুমান ২০০ প্রতিনিধির শুভাগমন এখানে হইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইতিপূর্ব্বে যেখানে সেখানে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে, এমন প্রত্যেক সহরেই প্রতিনিধিদের মুক্ত হস্তে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে, এবং কোন প্রকারে আদর আপ্যায়ণের ত্রুটি হয় নাই।

আমরা এই আশায় এই আবেদন প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতাবাসিনী নারীবৃন্দ দলে দলে এই অভ্যর্থনা সমিতিতে যোগদান করতঃ আমাদের এই মহানগরীর উপযুক্ত অতিথিসৎকার সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।

বিস্তারিত তথ্য স্থানীয় সমিতির সম্পাদিকার নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, (সভানেত্রী), শ্রীচারুলতা মুখোপাধ্যায়, (স্থায়ী কমিটীর সভ্য) শ্রীমণিকা গুপ্তা, (কোষাধ্যক্ষ) শ্রীঊষা হালদার, শ্রীব্রহ্মকুমারী রায়, (যুগ্মসম্পাদিকা)

গত ৪ঠা জুলাই (২০শে আষাঢ) নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের কলিকাতা কেন্দ্রে লেডী মুখুয্যে মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে এক বৈঠক হইয়াছে। সভায় নানা সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা এস সি রায় সভার বিবিধ ভাগের প্রারব্ধ কর্ম্মের বিবরণ দিয়া উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা দেন।

কয়েক মাস আগে 'হার্পাস ম্যাগাজিন'-এ ডরথি ডানবার বোম্‌লে ফরাসী দেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে একটি জ্ঞাতব্য প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

আইনানুযায়ী ফরাসী-স্ত্রীর কোন শক্তিই নাই। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাঁহার দেশ ছাড়িবার উপায় নাই, তাঁহার হুকুম না থাকিলে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলিতে তিনি পারেন না এবং আইনানুযায়ী তিনি পতির অনুজ্ঞা না পাইলে বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা করিতেও পারেন না। স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রী-সম্পত্তি যদিচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে স্বামীর ব্যবস্থাই শেষ ব্যবস্থা।

কিন্তু আইনের এই সব বিধি উল্টাইবার জন্য ফরাসী নারীর খুব মাথা-ব্যথা নাই। গৃহস্থালীতে সে নিজেকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়াছে। ফরাসীতে একটি প্রবাদ আছে—"জীবনে উন্নতি করিবার একমাত্র উপায়, বুদ্ধিমতী পত্নী।" আমেরিকায় কি ইংলণ্ডে এমন কথা বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তুলনায় ফরাসী নারী ফরাসী পুরুষের চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে। একটি গল্প আছে, স্বামী কিছুতেই পুত্রকে ধর্ম্মশাস্ত্রের স্কুলে দিতে চান না। স্ত্রী তর্ক না করিয়া বলিলেন,—যদি শৈশবে তুমি ধর্ম্ম শিক্ষা না পাইতে, তবে এমন সৌভাগ্যের আমি অধিকারিণী হইতাম কিরূপে?—আমার জীবনের একমাত্র সাধ হইতেছে আমার পুত্রবধূ আমারই মত সৌভাগ্যবতী হৌক।" সুতরাং স্বামীর মত বদলাইল।—ফরাসী নারী তর্ক না করিয়াও নিজের কোট বজায় রাখিতে অদ্বিতীয়।—

চতুষ্পাঠী

-শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজী সাহিত্যের কাহিনী
ইংলণ্ডের গুরুমহাশয়

এর আগের সংখ্যায় তোমাদের ইংলণ্ডের প্রথম খৃষ্টান কবি ক্যাডমান সম্বন্ধে বলেছি। এখন যাঁর কথা লিখতে যাচ্ছি, তাঁকে ইংলণ্ডের প্রথম গুরু-মশাই বলা যেতে পারে।

আগেই তোমাদের বলেছি যে রোম থেকে Augustine বলে একজন সাধুপুরুষ ইংলণ্ডে এসে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রচারের ফলে ইংলণ্ডে অনেক সাধুপুরুষ দেখা দিলেন। তাঁদের মঙ্ক monk বলা হতো। লোককে ধার্ম্মিক এবং শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তাঁরা সাংসারিক জীবনের সব সুখ শান্তি ত্যাগ করে মঠে বাস করতেন।

ডারহাম্ প্রদেশে উয়েরমাউথ বলে একটা জায়গায় সেই রকম একটি মঠ ছিল। একদিন একটি সাত বছরের ছেলেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা সেই মঠে দিয়ে গেল। তার বাপ-মা কেউ ছিল না। ছেলেটির নাম বীড্। মঠের সাধুরা ছেলেটির লালন-পালনের ভার নিলেন। এই অনাথ ছেলেটিই ইংরেজী সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন।

দশ বছর পর্য্যন্ত সেই মঠে থাকার পর বীড্ জারো বলে অন্য আর একটা বায়গার মঠে গেলেন এবং সেইখানে থেকে তিনি লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। আজকালকার মত তখন লেখাপড়া শেখার এত সুবিধা ছিল না। এত রকমের বই ছিল না, এত বইও ছিল না। যে-সব বই ছিল সে গুলোও আবার দুরূহ ল্যাটিন ভাষায় লেখা। অল্প বয়সের ছেলের পড়বার মত বিশেষ কোনও বই ছিল না। গুরুর কাছে দিনের পর দিন ধৈর্য্য ধরে শিখে তবে সেই সব দুরূহ বই পড়তে হতো। মঠের নানারকমের কাজ-কর্ম্মের মধ্যে বীড্ অতি কঠোরভাবে আত্মনিয়োগ করে উনিশ বছর বয়সে সেই দুরূহ জ্ঞান অর্জ্জন করলেন। এই ছাত্রাবস্থায় তাঁর মনে একটা মস্ত বড় কথা জাগে—তিনি ভাবেন যে তাঁকে এত কষ্ট করে, এত সাধনা করে বিদ্যা-অর্জ্জন করতে হলো—কিন্তু সকল লোকই কি এইভাবে বিদ্যা-অর্জ্জন করতে পারবে? আর দেশের মধ্যে অসংখ্য লোক যারা অশিক্ষিত রয়েছে—তাদের যদি শিক্ষিত না করে তোলা যায়—তাহলে শিক্ষার প্রয়োজন কি?

তোমরা জানবে যে এই চিন্তা সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে একটা মস্ত বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ। এবং প্রত্যেক সাহিত্যের ইতিহাসে তোমরা বড় হয়ে দেখবে যে একদল পণ্ডিত লোকের মাথায় এই চিন্তা এসেছিল বলে, সেই সব জাতি শিক্ষায় তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পেরেছে। এই সব পণ্ডিত লোক বড় বড় কাব্য বা উপন্যাস লিখে হয়ত নিজের যশ বাড়াতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা পরম ত্যাগীর মত নিজেদের যশের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে তার চেয়েও একটা বড় কাজ করে যান—সেই সব বড় কাব্য বা উপন্যাস বোঝবার জন্যে যে প্রাথমিক শিক্ষার দরকার তার ব্যবস্থা করেন। একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিই। তোমরা সকলেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। নানা দেশের সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে তাঁর মত পণ্ডিত লোক আজও পর্য্যন্ত বাংলা দেশে খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। তোমরা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর ইংরেজী বইএর লাইব্রেরী যদি দেখে আসো তো স্তম্ভিত হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি লিখতে বসলেন বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ। আমরা যখন আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস লিখি—তখন নানারকমের কাব্য-উপন্যাসের কথার মধ্যে এই বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগের কথা ভুলে যাই কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? যেদিন বিদ্যাসাগর য়ুরোপের সমস্ত দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস পড়ে, অ-আ ক-খর বই লিখতে বসলেন, সেদিন আমাদের ভাষার এবং সাহিত্যের একটা স্মরণীয় দিন। এবং এই দিনটি যদি বাঙালী সাহিত্যিকেরা স্মরণে রাখেন, তাহলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি সব চেয়ে শ্রদ্ধা দেখান হবে এবং বাংলা সাহিত্যেরও অনেক কল্যাণ হবে। কিন্তু বাঙালী সেদিনটাকে ভুলে গিয়েছে এবং এই ভুলে যাওয়াতে আজ বাংলা সাহিত্যের কতখানি ক্ষতি হয়েছে জানো? আমাদের ভাষায় বঙ্কিম আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, শরৎচন্দ্র আছেন—কিন্তু বলতো তোমরা ক'জনে বাংলা বই পড়ে বিজ্ঞানের একটা কথা

শিখেছো, বাংলা বই পড়ে তোমরা কজন জগতের ইতিহাস জানতে পেরেছো? বাংলা বই পড়ে তোমরা ক'জন ভূগোল, দর্শন, আজকালকার যে কোনও জ্ঞানের কোন্‌টি জান্‌তে পেরেছো?

কিন্তু একজন ইংরেজ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করো, সে বলবে—তার দেশের সব চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিকের লেখা তারই ইংরেজী ভাষায় সে বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছে, তার দেশের সব চেয়ে বড় সাহিত্যিক তারই মাতৃভাষায় তার জন্যে জ্ঞানের পথ প্রথম খুলে ধরেছে—নানা বিষয়ে, নানাদিকে। এই জন্যে ইংরেজী সাহিত্য এত বিরাট! সাহিত্যের এই একটা দিক আছে—সেদিকটা বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়—তারপর আমরা সে দিকটার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

এ কথা এখানে তুললাম, কেন না ইংরেজী সাহিত্যের সেই প্রথম অবস্থায় বীড্‌ এই কথাটি ভালো করে বুঝেছিলেন। তাঁকে অতি কষ্ট করে বিদ্যা অর্জন করতে হয়েছিল—বিদ্যাসাগর মশাইকেও কি রকম কষ্ট করে বিদ্যা অর্জ্জন করতে হয়েছিল তা তোমরা জানো। তাই বীড্‌ সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি দিলেন সাধারণ লোকের জন্যে কি করে সাহিত্য গড়া যায়।

ইংরেজী সাহিত্যের গতিকে তিনি নিঃশব্দে অতি বিপুল মাত্রায় বাড়িয়ে দিলেন। নানারকমের বিষয় নিয়ে তিনি ৪৫ খানি স্কুল-পাঠ্য বই লিখলেন এবং এই বই লেখাতেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন নিযুক্ত করলেন। বীডের মৃত্যুর পর প্রায় চারশো বছর ধরে তাঁর এই বইগুলিই ইংরেজ-জাতির কিশোর-কিশোরীদের জ্ঞানের দুরূহ পথে আলো দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অবশ্য তোমাদের এখানে একটা কথা স্মরণে রাখা উচিত যে বীড্‌ এই সমস্ত বই ল্যাটিন ভাষায় লেখেন, তার কারণ তখন লোকে শিক্ষার জন্যে ল্যাটিন ভাষাই আয়ত্ত করতো।

এই সব বই ছাড়া বীড্‌ আর একখানি বহুমূল্য ইতিহাস লেখেন—তার নাম হলো History of the Church of England. এই বইখানি হলো ইংলণ্ডের প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। বৃটেনে পদার্পণ করার পর থেকে বীডের সময় পর্য্যন্ত ইংরেজ জাতির ইতিহাস এই বইতে আছে।

এই বই লেখা ছাড়া বীড্‌ তাঁর জীবন লোক-শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করেন। জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় সাধনা। এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি একান্ত মনে সেই মহৎ কাজই সাধন করে যান। তাঁর বিদ্যার খ্যাতি রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। স্বয়ং রোমের পোপ তাঁকে রোমে নিমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠালেন। এত বড় সম্মান সে সময় কারুরই ভাগ্যে বড় একটা ঘটে উঠতো না। কিন্তু বীড্‌ বলে পাঠালেন—জ্যারোর সেই মঠ ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। তাতে তাঁর লোক-শিক্ষার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। জ্যারোর লোকে তাঁকে মঠের অধ্যক্ষ করতে চাইলো। কিন্তু তিনি বললেন, অধ্যক্ষ হতে তিনি চান না—সামান্য শিক্ষক হয়েই তিনি মরতে চান। লোক-শিক্ষার ইতিহাসে সেইজন্য বীডের নাম চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এথেকে তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারো যে এমন গুরুকে ছাত্ররা কি রকম ভালবাসতো। তাঁর ছাত্ররা সর্ব্বদাই তাঁর কাছে কাছে থাকতো। যখন তিনি অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—সমস্ত কেশ শুভ্র হয়ে এসেছে, নিজের চোখে যখন আর ভালো করে দেখতে পান না—তখন তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে জানালেন যে, এবার ল্যাটিন ভাষায় নয়, তাঁরা প্রতিদিন যে ভাষায় কথা বলেন, সেই ভাষায় এবার তিনি একখানি বই লিখবেন—St. Johnএর gospel. তিনি বলে যেতে লাগলেন—তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র তাই লিখে নিতে লাগলো। এবারে তাঁর দিনও শেষ হয়ে আসছিল। তাঁর অবস্থা দেখে ছাত্ররা সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলো। কয়েকদিন অবিশ্রাম লেখার পর তারা বল্লো - থাক্‌ এখন লেখা। বীড্‌ অসুস্থ শরীরে শয্যায় উঠে বল্লেন তা হয় না। সেদিন তাঁর দেহে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো—কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি বলে যেতে লাগলেন। সহসা সমস্ত দেহ অবশ হয়ে উঠলো। ছাত্র বলে উঠলো—গুরুদেব, শেষ হতে আর কত বাকি? অবসন্ন দেহ একবার নড়ে উঠলো—তিনি বল্লেন—তবে শেষ কথাগুলো লিখে নাও! তাড়াতাড়ি ছাত্র লিখতে লাগলো। লেখা শেষ হয়ে গেলে সে বলে উঠলো—শেষ হলো? ঊর্দ্ধে একবার দুটি সুনীল চক্ষু তুলে বীড্‌ শান্ত স্বরে বললেন—হে প্রভু, আমারও শেষ হয়েছে!

বীডের অবসন্ন দেহ হিম-শীতল হয়ে গেল।

ইংলণ্ডের প্রথম লোক-গুরু, এই ভাবে ইহলীলা সংবরণ করলেন। আজও ইংলণ্ডের ইতিহাসে বীডের নাম Monk of Jarrow হিসাবে অতি শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়।

নব-কথামালা

নন্দন-কাননে গাধা

আমাদের কৈলাস পর্ব্বতের মত, প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করতেন Olympium, অলিম্পিয়াম বলে একটি পাহাড় আছে। সেখানে দেবতারা থাকেন। তারই একটা অংশের নাম তাঁরা দিয়েছিলেন Parnassus, পারনেসাস্। এখানে থাকতেন—ন'জন দেবী। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী ন'জন দেবী।

একবার অলিম্পিয়ামে একটা ভয়ানক গণ্ডগোল হয়। একদল লোক এসে স্বর্গ থেকে দেবতাদের দিল তাড়িয়ে। নিজেদের মধ্যে জমিজমা ভাগ করে তারা পরমানন্দে স্বর্গে বাস করতে লাগল।

বরাতক্রমে এক চাষার অংশে গিয়ে পড়লো পারনেসাস্। চাষা তার গাধার দল নিয়ে পারনেসাস্ অংশ দখল করে বসলো। যেখানে ঘুরে বেড়াতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা, সেখানে এখন ঘুরে বেড়াতে লাগলো গাধার দল।

একদিন ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গাধারা আপনাদের মধ্যে আলোচনা করছিল—একজন বল্লে, জানিস্, আমাদের এখানে কেন আনা হয়েছে? এখন বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ যে এখানে কটা দেবতা থাকতো—তাদের বিদ্যে বুদ্ধি সব ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের বদলে আমাদের এখানে আনা হয়েছে—আমরা নতুন করে গান রচনা করবো, আর গাইবো। লোকে অবাক হ'য়ে শুনবে—তবে একটা নিয়ম থাকবে, আমাদের এই গাধার দলের সঙ্গে যে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে না পারবে—তাকে এখানে গাইতে দেওয়া হবে না—

তথাস্তু।

তারপর একদিন পারনেসাসে সহসা গভীর রাত্রে গাধার দলের বিচিত্র সঙ্গীত জেগে উঠলো। চাষা জেগে উঠে অবাক হয়ে ভাবে, স্বর্গে এ কিসের শব্দ! কোথা দিয়ে যেন একটা বিরাট রেলগাড়ী চলেছে, তার হাজারটা চাকা—আর কোন চাকাতেই যেন কখনও তেল দেওয়া হয়নি—এমনি বিচিত্র অদ্ভুত সব সুর! এমনি শব্দ রোজ রাত্রেই হয়। অবশেষে শেষে চাষা একদিন দেখে যে তার গাধার দলই পরমানন্দে চেঁচাচ্ছে। অসহ্য রাগে চাষা লগুড়প্রহারে পারনেসাস্ থেকে গাধাদের দিলো তাড়িয়ে।

এই কাহিনীর শেষে নীতিকথা স্বরূপে গল্প-রচয়িতা ক্রিলভ্ লিখছেন—

> Once you have an empty skull
> No post you get will make it full—

এটার অনুবাদ তোমরা করে নিও।

আমেরিকা প্রথম কে আবিষ্কার করে?

আমরা সবাই জানি যে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক হতো কলম্বাসের নামে যদি আমেরিকার নাম করা হতো। কিন্তু তা যে হয়নি তা আমরা আমেরিকার নামেই বুঝতে পারি। কিন্তু কেন এরকম হলো?

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করবার ৭ বছর পরে Amerigo Vespucci, আমেরিগো ভেস্পুচ্চি বলে একজন ইতালীয়ান নাবিক আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলে আসেন এবং তিনি সেখান থেকে য়ুরোপে ফিরে এসে এই নতুন দেশের বর্ণনা করে একখানা বই লেখেন। সেই বইখানা সেই সময় খুব চলিত হয়। লোকে কথায় কথায় সেই জন্যে এই নতুন দেশকে Amerigo's Land, আমেরিগোর দেশ বলতে সুরু করলো। কিছু দিন পরে এই আমেরিগোর দেশই হয়ে গেল America, আমেরিকা। এখানে তোমাদের আর একটা কথা বলি—Columbusএর আগে একজন লোক আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

প্রায় ৯৪৯ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের একদল লোক আইসল্যাণ্ড আবিষ্কার করে এবং সেখানে বসবাস করে। এই নরওয়ের লোকেরা সমুদ্র বড় ভালবাসতো। জীবন-মরণ তুচ্ছ করে সে সময় তারা সমুদ্রপথে অনেক দূরদেশে যাতায়াত করতো।

যে সমস্ত নরওয়েবাসী আইস্‌ল্যাণ্ডে এসে বসবাস করলো, তার মধ্যে একজন বুড়ো নাবিক ছিল, তার নাম হারজুল্‌ফ্‌। বুড়ো বয়সে হারজুল্‌ফ্‌ গ্রীণল্যাণ্ড আবিষ্কার করবার জন্যে বেরুল। বাড়ীতে রেখে গেলো তার একমাত্র ছেলে বিয়ারণিকে। মাসের পর মাস চলে যায় হারজুল্‌ফ্‌ আর ফেরে না। তখন পিতাকে খুঁজে বার করবার জন্যে বিয়ারণি বেরুলো। বহু দিন সমুদ্রের তরঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঝড়ে পথ ভুলে বিয়ারণি আমেরিকার কূলে এসে পড়ে। কিন্তু বিয়ারণি তার বাবার মুখে Greenlandএর যে বর্ণনা শুনেছিল—আমেরিকায় নেমে দেখে—তার সঙ্গে কিছুই মিলছে না।

আমেরিকার উপকূল ত্যাগ করে বিয়ারণি আবার সমুদ্রপথে যাত্রা করলো। অবশেষে গ্রীণল্যাণ্ডে এসে বাপের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। বাপ বেটায় তারা আবার আইস্‌ল্যাণ্ডে ফিরে এলো।

আইস্‌ল্যাণ্ডে ফিরে এসে তারা আমেরিকার গল্প করলো। সমুদ্রের পারে আর একটা মস্ত বড় দেশ আছে। আর্ল এরিক যখন শুনলেন যে, সেই নতুন দেশ ভালো করে না দেখে বিয়ার্‌ণি ফিরে এসেছে তখন তিনি তাঁকে বিশেষ তিরস্কার করলেন এবং নিজের ছেলে লিইফ্‌কে পাঠালেন সেই নতুন দেশ ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করে আসতে।

লিইফ্‌ আমেরিকায় এসে নামলেন বটে, কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—তাঁর মনে হলো এখানে বাস করা চলবে না। আজ কাল আমরা যাকে ল্যাপল্যাণ্ড, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড বলি, সেই সব যায়গা ঘুরে লিইফ্‌ও ফিরে এলেন আইস্‌ল্যাণ্ডে।

১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস আইস্‌ল্যাণ্ডে যান। সেইখানে সম্ভবত প্রাচীন গাথায় তিনি বিয়ারণির এই আমেরিকা যাত্রার কথা শুনে থাকবেন।

রূপকথা

—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

মায়ের এক ছেলে, মৌনকান্তি—দশ বছর তার বয়েস। বনের ধারে তাদের ঘর—একখানি কুঁড়ে। সন্ধ্যে হতেই মনে হয় যেন কত রাত্তির হয়েচে, মৌনকান্তি ঘুমিয়ে পড়ে। পিদীমের শিখা কেঁপে কেঁপে তার মুখের ওপর আলো-ছায়ার আল্পনা আঁকে। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মা একবার তার চওড়া কপালখানিতে, একবার ফুলের কুঁড়ির মতন বোজা চোখদুটিতে, হাত বুলিয়ে দেন, একবার আমের কসির মতন চিবুকখানি ধরে খুব সন্তর্পণে আদর করেন। মাঝখানে ছোট্ট একটি টোল, তার ওপর কতবার ধীরে ধীরে আঙুলের চাপ দেন—যেন ছেলের ঘুম না ভেঙে যায়। হঠাৎ মৌনকান্তি 'মা-মা'-করে ডেকে বিছানার ওপর উঠে বসে। ছেলের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে মা তাকে বুকে টেনে নেন। মৌনকান্তি বলে—

মা ওই বনের মধ্যে গিয়েছিলুম—একটা গাছের গুঁড়ির পাশে শেয়াল-ভায়া চুপটি করে বসে ছিল—বোধ হয় তার খুব দুঃখু হয়েছে মা। আমি যেতেই একটুখানি হেসে বল্লে—এসো খোকা এসো-এসো ভাই এসো! আমি তার গায়ে হাত দিলুম, শেয়াল-ভায়া বল্লে—বেশ বেশ—তোমাদের ঘরে অনেক ছেলে মেয়ে আছে—নয় খোকা? বল্লুম—আমাদের ঘরে আর কেউ ছেলে নেই—সেই রাজাদের ঘরে আছে। তখন শেয়াল-ভায়া ঘাড় নেড়ে নেড়ে বল্লে—তাই-তাই। তারপর খুব যেন মুসড়ে পড়ে বল্লে—বাঘ সিংহী হাতী মো'ষ বাঁদর কুমীর এদের সব জব্দ করবার জন্যে কত নূতন নূতন মজার মজার ফন্দী এঁটে রেখেছি—সে সব খাটানো আর হচ্ছে না—ছেলেমেয়েরা আর বনের দিকে তাকিয়ে থাকে না—আমায় তারা ভুলে গেছে—বলে সে অনেকক্ষণ ধরে নিঃশ্বাস ছাড়লে। আমার কান্না পেতে লাগল মা—বল্লুম—শেয়াল-ভায়া, আমি তাকিয়ে থাকি—তখন সে খুব খুসী হয়ে কান দুটো আমার গায়ে বুলিয়ে বুলিয়ে বল্লে—শেয়াল-ভায়া, শেয়ালভায়া! কে তোমায় বলে দিলে খোকা? আমি ঠিক জানি—তোমার মা। বলেই দু'পা তুলে, আমি শেয়ালভায়া-শেয়ালভায়া—বলে নাচতে আরম্ভ করে দিলে। খানিক বাদে আমার ভয় হ'ল মা—বল্লুম—শেয়ালভায়া থামো থামো। সে তক্ষুণি থেমে কাছে এগিয়ে এসে আদর করে বল্লে—ভয় কি, ভয় কি, কি

হয়েচে, কি হয়েচে ?—তাকে দেখিয়ে দিলুম—ঐ দেখ, বড্ড শব্দ হচ্ছে, একটা হাতীর ছানা মস্ত বড় গাছটাকে কি রকম ঠেলা দিচ্ছে—এক্ষুণি আমাদের মাথায় পড়বে।

শেয়াল-ভায়া তক্ষুণি গম্ভীর হয়ে গেলো, বল্লে—ও-বেটা আমার ছেলে, বেটার কিছু বুদ্ধি নেই—বনভরা গাছ যদি অমনি করে সব ফেলে দেয়—সুয্যিঠাকুরের জ্বালায় বাঁচবো কেমন করে! দাঁড়াও বেটাকে জব্দ করে আসি। চলে যাবে ঠিক সেই সময় আমি বলে ফেলিচি—ধুত্তু্ শেয়াল। অমনি মা, সে তড়াক করে এক লাফ দিয়ে উঁচুতে উঠে গেলো।—তার পড়েই চিৎ হয়ে মাটীতে পড়লো চার পা তুলে, লেজ নেড়ে কান নেড়ে, এক গাল হেসে, ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগলো—

বাঃ বাঃ ধুত্তু্ শেয়াল ধুত্তু্ শেয়াল
মগজ ভরা আছে আমার অনেক খেয়াল
অনেক খেয়াল।—

তারপর শেয়াল-ভায়া গা ঝেড়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—ছেলে বেটাকে পরে দেখবো—চড়ো আমার পিঠে—তোমায় আগে ঘরে দিয়ে আসি। পিঠের উপর চড়ে বসলুম—দোরগোড়ায় ঘা দিয়ে ডাকলুম—মা-মা—অমনি ঘুম ভেঙে গেল মা, একবার দোরটা খোলো না, দেখি শেয়াল-ভায়া দাঁড়িয়ে আছে কি না। মা বল্লেন—আজ নয় বাবা—এখন ঘুমোও—বনের ওধারে তোমার মামার বাড়ী—কাল আমরা যাবো—তখন তাকে খুঁজবো—এখন তো সে দাঁড়িয়ে নেই—তোমায় দিয়ে গিয়ে সে বনে ফিরে গেছে।

মৌনকান্তি আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকাল থেকেই মৌনকান্তি মা'কে—কখন যাবে মা, কখন যাবে—বলে বিরক্ত করে তুল্‌লে। শেষকালে দুপুর নাগাদ দু'জনে যাত্রা করলে। সারা বনটা মার কোল থেকে নেমে মৌন ছুটে-ছুটে এখানে-ওখানে উঁকি দিয়ে দেখে-দেখে চল্লো—মা তার নাগাল পান না—পেছন থেকে ডাকেন। কিন্তু কোথায় শেয়াল-ভায়া, কোথায় কে! কেউ নেই। শেষকালে মায়ে-পোয়ে যখন পৌছুলেন তখন সন্ধ্যাবেলা। মৌনর দিদিমা দাওয়ায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছড়া বলতে বসেচেন। দিদিমা বলচেন :—

আঁচল পেতে মা'টি খানিক গড়িয়ে গেছেন ঘুমে,
একলা খোকার কচি হাতে কোলের কাছে ভূমে
ঝুমঝুমিতে বাজে ঝুমুর্ ঝুম্—
মাগো তোমার কত সুখের ঘুম,
সে ঘুম আসে কোন্ বেলা গো কোন্ বেলা····

চুপটি করে বসেছিল

অমনি নাতীনাতনীরা চারধার ঘিরে এক সঙ্গে গলা-মিলিয়ে বলে উঠ্‌চে—

ভরা দুপুর ভরা দুপুর ভরা দুপুরের বেলা।

দিদিমা বলচেন—

জলকন্যের লক্ষ সখী নরম নরম পা
ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঠেলছে জলে,
দোলে, নদীর গা
ধীর বাতাসে ঢেউ খেলে তাই
কোন্ বেলা গো কোন্ বেলা ·

সবাই মিলে বলচে—

ভরাদুপুর ভরাদুপুর ভরাদুপুরের বেলা

দিদিমা অনেকদূরে আঙুল দেখিয়ে বলচেন্—

সেই সেখানে ঝাঁপুর ঝুঁপুর গাছ দেখা যায় যে,
তার মধ্যে কালো কালো ওটি বটে কে ?
ওকি হবে ডালখানারে, নয়কি রাখাল ছেলে,
বাঁশী বাজায় কোন্ মাঠেতে গাই-বাছুরে ফেলে,
বাঁশী বাজায় বাঁশী বাজায় কোন্ বেলা গো কোন্ বেলা

নাচতে আরম্ভ করে দিলে।

সবাই মিলে বলচে—

ঠিক্ দুপ্পুর ঠিক্ দুপ্পুর ঠিক দুপুরের বেলা—

মৌনর মা তাঁর মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বসলেন। দেখাদেখি মৌন কচি কচি হাত দু'খানিতে পায়ে হাত দিতেই দিদিমা তাকে কোলে টেনে নিয়ে বল্লেন—

মৌন এলো মেয়ে এলো এলো সন্ধ্যে বেলা
এখন তোরা করবি নাকি সোণা ধুলোর খেলা !

বুড়ীর কথায় সুর মিলিয়ে কচ্ছিস্ গো কি
সবাই একসঙ্গে দুলে দুলে বলে উঠলে—
আধার ঘরে দীপ জ্বালচি-দীপ জ্বালচি-ই

'ঠিক দুপ্পুর বেলা' কথাটি মৌনর ঠিক মনে রইল। তারপর আদরযত্ন চুমো ভাতদুধ খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দুপুর বেলা যখন সবাই ঘুমিয়েচে, মৌন মায়ের বুকের কাছটি থেকে জেগে উঠে বসলে—জান্লা দিয়ে অনেক দূরে একটা গাছ দেখতে পেলে। সে মনে করলে, কাল দিদিমা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল ওই ত সেই ঝাঁপুর-ঝুঁপুর গাছ—ওইত রাখাল ছেলে একটা ডালে পিঠ দিয়ে আর একটা ডালে পা দিয়ে বসে আছে—নিশ্চয়ই বাঁশী বাজাচ্ছে। মৌন চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। রাস্তায় নেবে আর গাছ দেখা যায় না—সে কোন্ পথে যাবে ঠিক্ করতে পারলে না—তবু সে চল্লো। চারদিকে খুব

বাঁশী বাজায় কোন মাঠেতে –

আলো, মনে তার ভয় একবার উঁকিও মারলে না—যে দিকে দু'চক্ষু যায় চলে গেলো।

এমনি করে ঘুরে ঘুরে মৌন এক নদীর ধারে পৌছলো। কেমন একটু একটু হাওয়া বইচে, অশথপাতা শির্ শির্ করচে, ওই ওপারে রোদ-চিক্‌চিকে ছোট ছোট ঢেউ দুলচে। মৌন অশথগাছের ছায়ায় বসে রইলে। এমন সময় একছড়া আকন্দর মালা ঢেউয়ে ঢেউয়ে এপারের তীরে লাগলো—মৌন ছুটে গিয়ে' সেটাকে ধরলে। অমনি কে যেন তাকে জলের দিকে টানতে লাগলো। মালাটাকে সে কিছুতেই টেনে তুলতে পারলে না—মালাটাই তাকে টেনে টেনে একেবারে জলের তলায় টেনে নিলে। সেখানে জল ঢালু হয়ে নীচের দিকে কোথায় নেবে গেছে, মৌন তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এক জায়গায় হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়লো—আর পাশ থেকে একটি মেয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো। মস্ত লম্বা আকন্দর মালাটি বিশ পাক হয়ে সেই ছোট্ট মেয়েটির গলায় পরানো, তার বুক জুড়ে আকন্দ ফুলগুলি থাকে থাকে সাজানো, তার ওপরে জলভরা কচি তালশাঁসের মতন মেয়েটির মুখখানি। মৌন যেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো সে একটা বরফের বেদী, তলা থেকে তার ভেতর দিয়ে ধোঁয়া ধোঁয়া ছলছলে জ্যোৎস্না আসচে। মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হাসতেই মৌনও হেসে ফেল্লে—তারপর বল্লে—বরফের ভেতর চাঁদ লুকিয়ে আছে নয়?

মেয়েটি বল্লে—আমাদের পায়ের তলার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে—বরফের বেদীতে আলো হয়েচে—আকন্দর মালা পরে এইখানে আমি ঘুমিয়ে যাবো—আমার নাম আকন্দা।

মৌন বল্লে—আমার নাম মৌনকান্তি।

আমি ঘুমোই ঠাণ্ডা দাওয়ায়
মায়ের কোলে নিমের হাওয়ায়
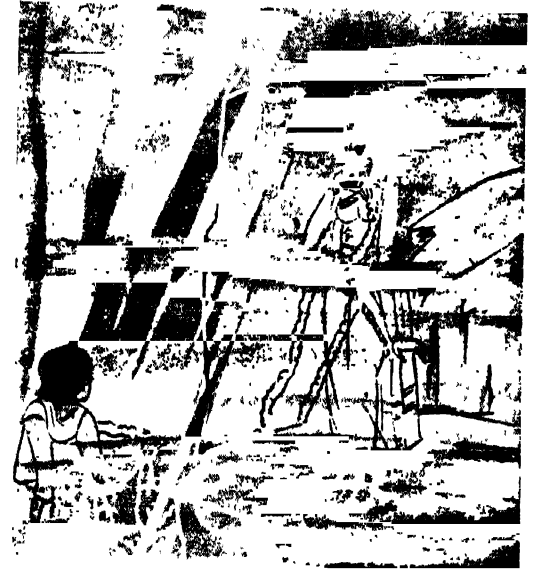
—নদীর এপারে বনের ওধারে কুঁড়েঘরে রোজ রোজ তুমি যাবে?

আকন্দা বল্লে—আজ যাবো না। রাণীকে জিগেস করে তোমায় বলবো—আর একদিন আসবে, তখন।

তারপর মালার একদিক ধরে মৌন ওপরে উঠে এলো, কূলে ঠেকলো, তীরে উঠ্‌লো—তারপর কোন দিকে যাবে জানে না, এক ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। দু' একজন লোক আসচে যাচ্ছে—কা'কে পথ জিগ্যেস করবে মৌন ঠিক করতে পারলে না। এদিকে তাকে খোঁজবার জন্যে মামা বেরিয়েছেন। সব খুঁজে খুঁজে শেষকালে এই দিকে এলেন। মৌনকে দেখতে পেয়ে একেবারে কোলে তুলে নিলেন তক্ষুনি। তারপর বাড়ীতে এনে আসনে বসিয়ে কত কি খাওয়ালেন।

আমার নাম আকন্দা

মৌনর আর আকন্দার কাছে যাওয়া হ'লো না কিন্তু পরদিনই মায়ের সঙ্গে সে আবার ঘরে ফিরে এলো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য; বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে অপাঠ্য। ইহার ভাষা-অংশের দুরূহতা ও কাব্যাংশের অশ্লীলতা পণ্ডিত ও রসিকের আপত্তির কারণ হইয়া আছে। পণ্ডিতে রসিকে দ্বন্দ্ব চিরন্তন; এই অনৈক্যে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব নূতন ভাবে দেখা দিয়াছে। কিন্তু বিপদ পণ্ডিত রসিক উভয়ের মাঝে সাধারণ পাঠকদলের। তাহারা ভীত হইয়া কলহ দেখিল, আর পরের মুখের ঝাল খাইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যেমন ছিল, আলমারীর উচ্চতম শেল্‌ফে প্রচুর ধূলিতে, তেমনি পড়িয়াই রহিল।

পুঁথিখানির ভাষা দুরূহ, অন্ততঃ আংশিক ভাবে দুরূহ—পণ্ডিতেও স্বীকার করিয়া থাকেন; কাব্যাংশও অল্পবিস্তর অশ্লীল রসিকেও অস্বীকার করেন না। এখন, এই উভয় বিপদ পাশ কাটাইয়া সাধারণ পাঠকের উপভোগ্য কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক্! আদিরসের দুস্তর সমুদ্র ও দুরূহ ভাষার প্রাকারের পারে একটি তরুণী এই কাব্যে অপেক্ষা করিতেছে। রসবোধের সোনার কাঠির স্পর্শে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অথবা, কবিই স্বয়ং সে কাজটুকু সারিয়া রাখিয়াছেন। কারণ ইহা রাধার বাল্য হইতে যৌবনোন্মেষের মধ্যে জাগরণের কাব্য।

পদাবলীতে যে রাধার সহিত আমরা পরিচিত, এ সে নহে। পদাবলীর রাধা যৌবনের প্রথম অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত; প্রেমের প্রথম বিস্ময় তাহার কাটিয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধা অবশ্য কিশোরী, কিন্তু এ কাব্যের রাধা একেবারে বালিকা। কবি তাহাকে অত্যন্ত কৌশলে বাল্যের এই জড়-প্রায় জীবন হইতে ধীরে ধীরে, একটির পর একটি অভিজ্ঞতার আঘাতে, ভাস্কর যেমন করিয়া পাথর হইতে মূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলে, কৈশোরের মধ্য দিয়া, যৌবনময়ী এই মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়া প্রেমের বিস্ময়-নিকেতনের সম্মুখে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ পদাবলীর তিল-তুলসীসমর্পিত-দেহ রাধা নহে—ভক্তিরস যাহার উপজীব্য। এ রাধা দুরন্ত বালিকা, অনভিজ্ঞা কিশোরী, গর্ব্বিতা যুবতী। কৃষ্ণের দেবত্বে এর বিশ্বাস নাই; পরকীয় প্রেমের মহত্বে এ সন্দিগ্ধ! এ হাসিয়া রাগিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, মারিয়া ধরিয়া, ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া, কথার মুখে মুখে তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত ক্ষণ পাঠকের মনকে টানিয়া রাখে; এবং কাব্যের শেষে বিরহ-ব্যথার নিভৃত খিলানপথে কখন অজ্ঞাতসারে একেবারে মনের মধ্যে আসিয়া আসন গ্রহণ করে। এ মূর্ত্তি এতই সজীব, প্রাণপ্রচুর যে মনে হয় কাঁটাটি বিঁধিলে রক্ত বাহির হইবে। এই রক্তের অধিকার-ই সাহিত্যের অধিকার; সেই স্বাভাবিক অধিকারে রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নায়িকা এবং রাধার অধিকারে কাব্যখানি, নানা দোষ সত্ত্বেও, অমূল্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার যেখানে শেষ, পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ও পদাবলীর রাধাকে যথাক্রমে বৈষ্ণব কাব্যের পূর্ব্ব-রাধা ও উত্তর-রাধা বলা চলিতে পারে। যে কালে আর দশ জন কবি গতানুগতিক পথে কাব্য রচনা করিতেছিলেন, তখন যে একজন কবি বাঁধা পথ ছাড়িয়া পুষ্প রীতিসম্মত একটা পুতুল না গড়িয়া মানুষ গড়িতে পারিলেন ইহাই বিস্ময়ের।

বর্ত্তমান রাধা চরিত্র যে কয়েকটি মানসিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পরিণামে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক্।

রাধা বড়াইর সাথে নিত্য দুধ দই বেচিতে যায়, একদিন সে পথে হারাইয়া গেল। বড়াই কৃষ্ণকে রাধার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। কৃষ্ণ চায় তাহার বর্ণনা শুনিতে। বর্ণনা তো জানা চাই নহিলে সন্ধান হয় কেমন করিয়া। কত লোকেই তো যায়। বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণ রাধার খোঁজ বলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন—রাধার প্রেমে। তারপরে বড়াইর সাথে মন্ত্রণা, তাহাকে দিয়া ফুল-পান প্রেরণ! কিন্তু এ বড় শক্ত স্থান। বড়াই মার খাইল; কৃষ্ণ বোধ করি, কাছে ছিলেন না বলিয়া বাঁচিয়া গেলেন। পণ্যের মাশুল আদায়কারী সাজিয়া কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে বসিলেন, আর রাধা সেখানে যাইতেই তাহাকে ধরিলেন, তোমার বার বছরের মাশুল বাকি, দাও। কিন্তু সে কি কথা! তাহার বয়স যে বারই নহে।

"সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোর কিসে॥"

তার পরে উভয়ে কত তর্ক-বিতর্ক! কৃষ্ণ বলেন, তিনি বিষ্ণু, দেবতা ইত্যাদি! কিন্তু যে-দময়ন্তী দেবতার মধ্যে মানুষকে চিনিতে পারিয়াছিল, রাধা তো সেই মেয়েরেই জাত! সে কৃষ্ণে কোনো দেবত্বের চিহ্ন দেখিতে পায় না। দেবতার পক্ষে ইহা আশঙ্কার, কিন্তু রাধা যে উত্তর দেয় তাহা প্রায় অপমানের মতই শোনায়—

"শঙ্খ, চক্র, গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।
দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ পথত বসিআঁ।"

নিরুত্তর হইয়া কৃষ্ণ পূর্ব্বজন্মের ও ভাবী বীরত্বের কথা তোলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাঁধা দিয়া এ মেয়েকে ভোলানো কঠিন, তবে হাঁ, সে তাঁহার বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছে বটে!

"তোহ্মার বিরত কাহ্নাঞিঁ তিরীর উপর।
এতেকেঁ পাইল তোহ্মে মহত্ব বিথর।"

কৃষ্ণ বলেন সে নাকি ত্রিদশের ঈশ্বর!

"আপনে বোল তোহ্মে ত্রিদশের পতী।
তবে কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী॥"

অবশেষে কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন! রাধার রূপবর্ণনা সুরু করিলেন; কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল কিনা জানি না, শ্লেষ তো থামে না!

"দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান।"

এবার এই অস্ত্রে কিছু অপ্রত্যাশিত ফল ফলিল। রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল বটে, তবে তাহাতে কৃষ্ণের ধৈর্য্য বেশি কি রাধার প্রেম বেশি বলা শক্ত!

ইহার পরে রাধার একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন সে স্বেচ্ছায় আনন্দে মথুরার পথে যাতায়াত করে।

শুধু তাই নহে, প্রেম ব্যাপারে সে বেশ দ্রুত উন্নতি করিতেছে। এখন সে কৃষ্ণকে মিলনের আশা দিয়া ছত্র ধারণ করায় ও দধির ভার গ্রহণ করায়। কিন্তু বৃন্দাবন খণ্ডে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া পাছে সে অন্য গোপীর সহিত মিলিত হইয়া থাকে ভাবিয়া ঈর্ষা প্রকাশ করে। ঈর্ষাই প্রেমের প্রমাণ।

এ সব দেখিয়া এই সেদিন যে তাহার বয়স এগার ছিল তাহা তো বিশ্বাস হয় না। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার রূপ-বর্ণনায় বিশ্বাস করিলে এগারকে কয়েক বছর উপরে ঠেলিয়া দিতে হয়। তবে রাধা এগার বলে বটে, কিন্তু তাহার আচার ব্যবহার যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে। কৃষ্ণভীতিই রাধার বয়স কুমাইবার কারণ; বিশেষত, কোনো কারণ না থাকিলেও মেয়েরা বয়স কমাইয়া বলে।

রাধা আর অনভিজ্ঞা বালিকা নহে। প্রেমের স্বাদ সে পাইয়াছে, কিন্তু পদাবলীর কোমলতা এখনো সে পায় নাই। কৃষ্ণকে কঠোর বচন শুনাইতে তাহার বাধে না।

বংশীখণ্ডে আসিয়া রাধার প্রেমের পরিণতি ঘটিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তাহার জীবনের অন্য উপাদান সব ছিল, এবার অশ্রুও আসিয়া মিশিয়াছে। কৃষ্ণ যখন কাছে ছিল, তখন সে উপেক্ষা করিয়াছে। আজ সে নাই, আছে তাহার বাঁশীর সুর। এই বাঁশীর সুর তাহার চিত্তকে উন্মনা করিয়া দিয়া, একদিন যে ভবিষ্যৎকে সে অবজ্ঞা করিয়াছিল, সেই ভবিষ্যতের দিকে, সেই অলক্ষ্যের দিকে, তাহার চিত্তকে অভিসারে বাহির করিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের দেহ তাহাকে তৃপ্তি দিয়াছে। কিন্তু এই গীতি-মূর্ত্তির আহ্বানে তাহার দেহের পালঙ্কের উপরে বিরহিণীর বিমুগ্ধ চিত্ত জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিয়া বিরহের শূন্য পটে স্মৃতির জ্বলন্ত চিত্র আঁকিয়া আঁকিয়া দেখিতে লাগিল। এবারে রাধার দেহ মাত্র নয়, মন ভুলিয়াছে; কৃষ্ণের রূপে নয়, কৃষ্ণের স্বরূপে। কে বলে চাঁদ চন্দন-সুশীতল। কে ইতঃপূর্ব্বে জানিত যে নব কিশলয়ে দগ্ধ করে! আজ কানু বিনা যে দশ দিক্ তাহার নিকট শূন্য! আজ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া একমাত্র বাঁশীর সঙ্গীত।

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এগোঠ গোকুলে!
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।"

কিন্তু বিরহের এত তাপ সত্ত্বেও সে ছলনাময়ী রাধা। কৃষ্ণকে বশ করিবার জন্য তাহার বাঁশী চুরি করিয়া বসিল। মন চুরি হইলেও লোকের দু' চারি দিন চলিয়া যায়, কিন্তু বাঁশী চুরি অচল। কৃষ্ণকে ধরা দিতে হইল।

বিরহখণ্ডের রাধা প্রায় পদাবলীর রাধা। সে হাসি নাই, সে রাগ নাই, সে ছলনা নাই, আর নাই সে কথায় কথায় তীব্র শ্লেষ। কৃষ্ণের চিন্তা জীবন ছাড়িয়া রাধার স্বপ্ন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। সে প্রহরে প্রহরে স্বপ্ন দেখিয়া

জাগিয়া উঠে। কৃষ্ণের সন্ধানে সে বৃন্দাবনে যাইবে—পথে বাঘ ভালুকে তাহাকে যেন খায়। একদিন সে 'শিশুমতী' ছিল, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে, আজ সে জন্য নিজেকে সহস্র বার ধিক্কার। একদিন যে দেবত্ব ব্যঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, কেমন করিয়া সে বুঝাইবে, তাহাতে আর তাহার অবিশ্বাস নাই। দেশে যে বসন্ত আসিয়া পড়িল, অথচ তাহার দেখা নাই। রাধার মনের দুঃখ কে আর বুঝিতে পারে।

"এবেঁ মোর মণের পোড়নী
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী।"

যে দুঃখ কাহাকেও দেখানো চলেনা সে যে শতগুণ দগ্ধ করে। আজ সে কখনো ঈর্ষায় আকুল, কখনো মূর্চ্ছায় বিকল!

সে আজ,

"খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে॥"

এ রাধা পদাবলীর; এর "বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।" এ রাধার হাসিঠাট্টায়, রাগ ক্ষোভে, মানে অভিমানে, প্রেমে ঈর্ষায়, ছলনা চাতুরীতে, অবশেষে ভক্তিমুখী প্রেমে আমরা ইহার সহিত একাত্মকতা (sympathy) অনুভব করি। পদাবলীর রাধাকে দেখিয়া আমাদের ভক্তির উদয় হয়, তাহা আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের একাংশ মাত্র। বর্ত্তমান রাধাকে দেখিয়া তাহার প্রতি মানবরসের সঞ্চার হয়—ইহা আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে একদিন কবির হৃদয় হইতে এই মানবী কাব্যখানিতে আসন গ্রহণ করিয়াছিল—আশা করি কাব্যের এই নির্জ্জনতা ত্যাগ করিয়া পুনরায় সে আমাদের রসলোকে অবতীর্ণ হইবে।

ক্যাশ ইন্‌সিয়োরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ

ইতিপূর্ব্বে আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি যে আমাদের দেশে আরও অনেকগুলি সুপরিচালিত বীমা কোম্পানীর দরকার আছে। বর্ত্তমানে আমাদের বীমার পরিমাণ প্রায় ১৬০ কোটি টাকা। দেশীয় কোম্পানীর সংখ্যা ১২৬টি, সুতরাং গড়ে প্রত্যেক কোম্পানীর কাজের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। ইহার মধ্যে একটি কোম্পানীর বীমার পরিমাণ ৪০ কোটি টাকার উপর। সুতরাং গড়ের হিসাব আরও কম ধরিতে হইবে।

এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও সৎপরিচালকবর্গের হাতে পড়িলে বীমা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ব্যাঙের ছাতার মতো দেশের এখানে-ওখানে যে সব বীমা-প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিতেছে, এবং রাত না হইতেই লালবাতি জ্বালাইতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সম্পূর্ণরূপে সতর্ক হইতে বলি। কিন্তু নূতন কোম্পানী মানেই জুয়াচুরির প্রতিষ্ঠান নয়—একথাও মনে রাখা দরকার। নীচে আমরা একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিতেছি।

কলিকাতা, ৯ ডালহৌসী স্কোয়ারে এই বীমা-প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি নূতন হইলেও ইহার পরিচালক বেন ভেঙ্কটো এণ্ড কোং বাংলার ব্যবসায়ক্ষেত্রে নানা সুগন্ধি দ্রব্যের প্রস্তুতকারী হিসাবে ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্যবসায়ে ইহাঁরা অনভিজ্ঞ নহেন। বাংলা দেশে প্রায় অপরিচিত বহুবিধ বীমার রকমফের ইহাঁরা এখানে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, যথা মাস্ ইন্‌সুরেন্স ইত্যাদি। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ইহাঁদের চাঁদার হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম মাসেই ইহাঁরা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কাজ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এবং অল্পকাল মধ্যেই মান্দ্রাজ, বর্ম্মা, সিংহল, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায়ের প্রসার করিয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালক-বর্গের পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা।

আশা করি, এই প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে।

কস্মৈ দেবায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

নকুড় দাসের সংসারের গ্লানি আর যেন তাহাকে তেমন পীড়িত করে না ইহাই বিনুর সম্বন্ধে সব চাইতে ভয়ের কথা। ইহাদের জীবনের প্রণালীতে সে যেন মিশিয়া যাইতেছে। এখানকার আবহাওয়া তাহাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করিয়া যে ফেলিতেছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

এই সংসারে জড়ত্বের একটা আরাম আছে, কিছু না করার, কিছু না ভাবার একটা পরিতৃপ্তি। সেই পরিতৃপ্তিই কি বিনুর কাম্য হইয়া পড়িতেছে ?

এক একদিন অবশ্য তার সুপ্ত মন গা ঝাড়া দিয়া উঠে। সে দিন হয়ত সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন কাজ না থাকায় সে ঘাটের পইঠার উপর আসিয়া বসিয়াছে। কালীর মত কালো নদীর জলে কয়েকটা শালতির আব্ছা চেহারা দেখা যায়। একটি শালতির মাঝে হোগলার ছাউনির তলায় মাঝিরা উনুনে ভাত চাপাইয়াছে। হোগলার ভিতর দিয়া উনুনের আগুনের আভা অন্ধকারে বড় সুন্দর দেখায়। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনুর মন উদাস হইয়া যায়। হঠাৎ তাহার যেন মনে পড়ে নকুড় দাসের এই সংসারের বাহিরে কত বড় পৃথিবী তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখানে কত রহস্য, কত উত্তেজনা! সে পৃথিবীর সহিত তাহার কি পরিচয় হইবে না ?

ছবি দিয়াই এখনও সে ভাবে। এখানকার জীবন ভাবিতেই নকুড় দাসের ভাপসা গন্ধে ভরা, অপরিষ্কার সঙ্কীর্ণ ঘরটা তাহার মনে পড়ে। এই ভাঙ্গা ঘরের শ্বাসরোধকারী সঙ্কীর্ণতাই যেন এখানকার জীবনের প্রতীক। শীতল অন্ধকারে শালতির অস্পষ্ট দীর্ঘ ছায়া-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সত্যই খানিকক্ষণের জন্য এই ঘরের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মায়। শালতিগুলা কোথা হইতে আসিয়াছে কে জানে! কাল ভোর হইবার আগেই লগি বাহিয়া মাঝিরা কোন দূর-গ্রামের উদ্দেশে হয়ত রওনা হইয়া পড়িবে। তাহার হঠাৎ ওই মাঝিদের সঙ্গে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। নীল জলের ভিতর দিয়া মসৃণ গতিতে শালতি চলিয়া যাইতেছে, দুইপাশে কত অপরিচিত ঘাট কত মাঠ বন গাছপালা। শালতির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে সমস্ত পার হইয়া যাওয়া—ইহার চেয়ে বড় সুখ আর কিছু নাই। তাহার শিশুমন এ জীবন হইতে মুক্তি এই ভাবেই কল্পনা করে। এ জীবনে কোথায় তাহার মনের মধ্যে একটু অতৃপ্তি আছে। সে অতৃপ্তি রূপ গ্রহণ করে শুধু দূরে চলিয়া যাওয়ার বাসনায়।

কিন্তু এরকম মনোভাব তাহার ক্রমশঃই বিরল হইয়া আসিতেছে। খানিক বাদেই হয়ত মাসি তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকে। নন্দ বুঝি কোথায় জেলেদের ছেলের সহিত মাছ ধরিতে গিয়াছিল। জেলেরা কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে কয়েকটা ছোট মাছ দিয়াছে। অন্য কোন জিনিষ হইলে নন্দর বাড়ি আনিতে মনে থাকিত না। মাছটা নেহাৎ রান্না না করিলে চলে না বলিয়াই সে বাড়ির প্রতি এইটুকু দয়া করিয়াছে।

এই ব্যাপার লইয়াই মাসির আদিখ্যেতার আর সীমা নাই। নন্দ বুঝি বলিয়াছে,—"বড় বড় গুলো কিন্তু আমি খাব, আগে থাকতে বলে রাখছি।"

মাসি সে কথায় গম্ভীর মুখে বলে, "তাই খাস্‌রে খাস্! আমার আর ও মাছে লোভ নেই। মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে আছে। তোরা আর কি দেখলি বল্—আমার বাপের বাড়ির দীঘির এক একটা মাছ যদি তোরা দেখতিস্!..."

মাছের সূত্রে মাসি তাহার বাপের বাড়ির গল্প বলিতে বসে। মাসির বাপ যে মস্ত বড় লোক ছিল, কোঠাবাড়ি ক্ষেতখামার, পুকুর বাগান কিছুরই যে তাহার অভাব ছিল না এ গল্প বিনু অনেকবার এ পর্য্যন্ত শুনিয়াছে। মাসির বাপের বাড়ির ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ অবশ্য বাড়িয়াই চলিতেছে। আজ শোনা যায় যে মাসির বাপের বাড়ির পুকুর বলিয়া যাহা মনে করা গিয়াছিল তাহা আসলে পুকুর নয়—সেটি দীঘি এবং সে দীঘির মাছ নাকি এত বড় ও এত বেশী যে জেলেরা জাল ছিঁড়িয়া যাইবার ভয়ে সেখানে জাল দিতে সাহস করিত না।

মাছের কাহিনী শেষ করিয়া মাসি বলে—"আমার বাপ ত আর একটা হেঁজিপেঁজি লোক ছিল না!"

নকুড় দাস এই মাত্র কোথা হইতে ফিরিয়াছে। বাপের বাড়ির গৌরবের পর কথাটা কোন পথে যাইবে অনুমান করিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি বলে—"চেহারাও ছিল কি রকম শশুর মশাইএর? ঠিক রাজরাজড়ার মত!"

স্বামীর দিকে চাহিয়া অত্যন্ত প্রসন্নমুখে মাসি বলে, "তুমি যখন দেখেছ তখন তবু রোগে ভুগে ভুগে অদ্ধেক হয়ে গেছেন।"

নকুড় দাস বিনা আপত্তিতে সে কথা স্বীকার করিয়া লয়। আজ বাড়ির আবহাওয়া ভাল। বাপের বাড়ির কথা হইতে অকর্ম্মণ্য স্বামীর হাতে পড়ার দুর্ভাগ্যের কথা অতি সহজেই যে আসিয়া পড়ে তাহা নকুড়ের জানিতে বাকী নাই। আজ খুব তৎপরতার সহিত সে কথাটার মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে।

স্বামীকে দলে পাইয়া মাসির আজ উৎসাহের আর সীমা নাই। এই কুৎসিত অভাবগ্রস্ত জীবনের একমাত্র বিলাস সে আজ ভাল করিয়াই ভোগ করিয়া লয়। বিনুকে উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই মাসি বলে—"গাঁয়ের লোক ত' বাবার নামে তটস্থ! বারোয়ারীতলায় ঝগড়া বেধেছে;—পূজোর পেসাদ নিয়ে লাঠালাঠি হয় আর কি;—বাবা গিয়ে যেই দাঁড়ান, অমনি কারুর মুখে আর কথাটি নেই!"

নকুড় দাস স্ত্রীর মেজাজ বুঝিয়া ভরসা করিয়া বলে, "অমনি ক্ষেমতা আমার বাবারও ছিল। একবার রুখে দাঁড়ালে সামনে এগোয় কার সাধ্যি!"

মাসির আজ মেজাজ সত্যই ভাল। স্বামীকে এইটুকু সুবিধা দিতে তাহার আজ কিছু মাত্র আপত্তি নাই। সে বরং সায় দিয়া বলে, "তা আর হবে না, কত বড় বংশের ছেলে!"

ইহাদের কথায় বিনুও উৎসাহ পায়। এমন মজার খেলা আর কিছু নাই। কেহ প্রতিবাদ করিবে না। নিজের কথা শুনাইবার আগ্রহে অপরের কল্পনায় অনায়াসে বিশ্বাস করিতে সকলেই প্রস্তুত। বিনা পরিশ্রমে এমন কল্পনার নেশা উপভোগ করিবার লোভ সামলান সহজ নয়।

কথাটা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেইখানেই ফিরাইয়া লইয়া গিয়া সে বলে, "মাসিমা আমাদের পুকুরেও খুব বড় বড় মাছ হয়! তার একটা আনলে তোমরা সবাই খেয়ে ফুরতে পারবে না!"

নন্দ গঙ্গায় হাত পা ধুইতে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া বিনুর কথাটা শুনিতে পাইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলে—"তোর বাবার পুকুর কোনটা রে? গোলদীঘি না লালদীঘি?"

বিনু অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। কিন্তু আজ মাসিই তাহার সাহায্যে আসিয়া ছেলেকে মুখ নাড়া দিয়া বলে—"সব কথায় ফড়ফড় করিস্ কেন বল্ত? তোর মত হাঘরে ত' ও নয়। ছেলেকেই না হয় দেখেনা, ওর বাপ একটা লোকের মত লোক

বিনু এ জীবন হইতে উদ্ধার পাইল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

কিছুদিন আগে নকুড়দাস ভিক্ষা করিবার একটা নূতন ফিকির আবিষ্কার করিয়াছিল। বিনুই তাহার প্রধান উপকরণ।

একদিন দেখা গেল নকুড় কাহাকে দিয়া ইংরেজি ও বাংলায় একটা আবেদন-পত্র লিখাইয়া আনিয়াছে। আবেদন পত্রটি বিনুর হাতে দিয়া নকুড় বিনুকে কি করিতে হইবে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। তাহার সহিত ইহাও বলিল যে চালাকচতুর হইয়া বিনু যদি চলে তাহা হইলে এবার তাহাদের অর্থের অভাব আর হইবে না।

বিনুর অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও এই ব্যাপারে তাহার প্রথমটা একটু আপত্তি দেখা গেল। এতখানি মিথ্যাচার করিতে এখনও তাহার বাধে। দরখাস্তের মর্ম্ম সে বুঝিয়াছে। এই আবেদন-পত্রটি লইয়া সদ্যপিতৃবিয়োগবিধুর অনাথ বালক সাজিয়া বাসে ও ট্রামে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইবে, ইহাই নকুড়ের অনুরোধ।

বিনু প্রথমটা কিছুতেই রাজি হইতে চাহিল না।

কিন্তু নকুড় দাসও নাছোড়বান্দা। কিছুতে বিনুকে রাজী করাইতে না পারিয়া অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে বিনুকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশী স্নেহ দিয়া সে পালন করিতেছে, বিনু যদি তাহার মুখ একটু না চাহে তাহা হইলে তাহার আর উপায় নাই। ছেলেপুলে লইয়া তাহাকে

অনাহারে মরিতে হইবে। আর কাজটাই বা এমন কি অন্যায়। জাল জুয়াচুরি করিয়া কাহারও ক্ষতি ত করা হইতেছে না। এ যুগের লোকের মায়ামমতা নাই। সত্যকথা বলিলে তাহাদের মন গলেনা। সেইজন্যই এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয় লইয়া ভিক্ষা করিতে হইতেছে। এক হিসাবে ইহা মিথ্যাও নয়। বিনুর বাবা যখন তাহার কোন খোঁজ লয়না তখন এক হিসাবে তাহার অস্তিত্বই ত নাই।

শেষ পর্য্যন্ত বিনুকে রাজী হইতে হইল। সেই হইতে আবেদন-পত্র হাতে লইয়া সত্যই সে ট্রামে ও বাসে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতেছে।

নকুড়দাসের অনুমান ভুল নয়। সত্যই এই ফিকিরে প্রচুর অর্থ প্রথম প্রথম উপায় হইতে লাগিল। নকুড়দাস বিনুকে সকালে বিকালে গলায়-কাছা-দেওয়া পিতৃহীন অনাথ বালক সাজাইয়া বাহির করিয়া দেয়। বিনু ফিরিবার সময় থলি ভর্ত্তি করিয়া পয়সা আনি সিকি কখন কখন গোটা টাকাও লইয়া আসে। বিনুর সুন্দর সরল মুখ দেখিয়া আবেদন-পত্রের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হয় না। অধিকাংশ লোকই যেমন সাধ্য কিছু দেয়।

অনাথ বালকের অভিনয়ে বিনুও ক্রমশঃ দক্ষ হইয়া উঠিতেছে। বিশেষ কিছু অবশ্য তাহাকে করিতে হয় না। মুখখানি ম্লান করিয়া ট্রামে বা বাসে উঠিয়া যাত্রীদের কাছে দাঁড়াইলেই হইল। অধিকাংশ লোক তাহার কাতর মুখের দিকে চাহিয়া আবেদন-পত্রের উপর একটু চোখ বুলাইয়াই পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দেয়। দু একজন একটু আধটু খবরও লয়। কেহ কেহ অবশ্য উদাসীনই থাকে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বেশী নয়। উপার্জ্জনের পরিমাণ দেখিয়া বিনুও ক্রমশঃ এ ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বের সঙ্কোচ আর তাহার নাই।

কিন্তু একদিন ভয়ঙ্কর একটা কেলেঙ্কারী হইয়া গেল। বিনুর জীবন-ধারা নূতন পথে প্রবাহিত হইলও সেই কেলেঙ্কারীর ফলেই।

নকুড় দাস চালাক লোক। ধরা যাহাতে না পড়ে সেজন্য সে বিনুকে প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিপদ ঘটিল

সকাল বেলা বিনু বেহালার দিকের একটি ট্রামে উঠিয়া আবেদন-পত্র বাহির করিয়া দেখাইতেছিল। অফিসের সময় ঠিক না হইলেও ট্রামে যাত্রীর অভাব নাই। কয়েকজনের কাছে কিছু কিছু আদায় হইয়াছে, এমন সময় এক ভদ্রলোক সামনের দিক হইতে বিনুকে ইসারা করিয়া ডাকিলেন।

বিনু কাছে যাইতেই ভদ্রলোক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখি তোমার কাগজখানা!"

বিনু আনন্দিত চিত্তেই আবেদন-পত্রটি তাঁহার হাতে দিল।

ভদ্রলোক আবেদন-পত্রের উপর একবার চোখ বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি জাত খোকা?"

বিনু একটু থতমত খাইয়া বলিল, "আমরা ব্রাহ্মণ।"

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বলিলেন—"বেশ! কতদিন ধরে এ জুচ্চুরী চালাচ্ছ?"

বিনুর আজকাল সাহস অনেক বাড়িয়াছে তবু একথায় সে কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িল। কাতর মুখে বলিল, "জুচ্চুরী কেন করব! আমার বাবা মারা গেছে!"

ভদ্রলোক গলা আরো চড়াইয়া ধমক দিলেন—"বাবা মারা গেছে! বামুনের ছেলে একমাস ধরে কাছা গলায় দিয়ে থাকে—না!"

বিনুর মুখ কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে সে সত্যই অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত লাজুক। এই মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়া উপরে তাহার একটু সাহস জন্মাইলেও সঙ্কোচ তাহার একেবারেই কাটে নাই। ভদ্রলোকের ধমকানিতে লজ্জায় গ্লানিতে সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল।

ট্রামের অন্যান্য যাত্রীরা তখন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। একজন জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি মশাই?"

ভদ্রলোক উষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"ব্যাপার আর কি মশাই! এই এক নতুন রকম জুচ্চুরি!"

"সেকি মশাই? ওইটুকু ছেলে জুচ্চুরী করবে! মুখ দেখলে মায়া হয় যে?"

"ওই ত পাকা জুয়াচোরের লক্ষণ। এখন থেকে তৈরী হচ্ছে, বড় হলে লোকের গলায় দেবে।" ভদ্রলোক আবার বিনুর দিকে ফিরিয়া ধমক দিয়া বলিলেন—"কি? বাবা মরার নাম করে আর এ রকম জুচ্চুরী করবে?"

বিনু দুর্ব্বল ভাবে বলিল—"আমি ত জুচ্চুরী করি নি!"

ভদ্রলোক হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া তাহার একটা হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তবু বলছ জুচ্চুরী করিনি? তোমায় আমি পুলিশে দোব জান!" তাহার পর অন্যান্য যাত্রীদের দিকে ফিরিয়া তিনি জানাইলেন—"এইটুকু ছেলের বদমায়েসী দেখুন মশাই! একমাস আগে আমি নিজে ওকে এই অবস্থায় দেখে পয়সা দিয়েছি। আজ ট্রামে উঠতেই তাই আমার সন্দেহ হয়েছিল। কাছে ডেকে দেখি যা ভেবেছি তাই। আমার কথা বিশ্বাস না হয় ওর কাগজটার তারিখ দেখুন না! দেড়মাস আগে ওর বাবা মরেছে, এখনো ওর গলা থেকে কাছা নামল না!"

নকুড় দাস ধূর্ত্ত হইলেও এইখানে সত্যই একটা ভুল করিয়াছিল। আবেদনের কাগজটা বদলাইবার কথা তাহার মনে পড়ে নাই।

ট্রামের যাত্রীরা বিনুর জুয়াচুরীর স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের যে সরলতা এতদিন সকলের মনকে কোমল করিয়াছে সেই সরলতাই এখন তাহার সব চেয়ে প্রতিকূল দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিনু বিমূঢ় হইয়া ভয়ে দুঃখে লজ্জায় তখন কাঁদিতেছে। সে কান্নায় যাত্রীদের মন গলা দূরের কথা, রাগ যেন বাড়িয়া গেল।

একজন তাহার হাত ধরিয়া একটা হেঁচ্‌কা দিয়া বলিল—"খুব ধড়িবাজ ছেলে ত বাবা! আবার মায়া কান্না সুরু করে দিয়েছে।"

আর একজন কে বলিল—"এই বয়সে বাপকে মেরে পয়সা আদায়ের ফিকির শিখেছে, বড় হলে করবে কি!"

একজন বুঝি তাহার পক্ষ লইয়া একটু কিছু বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা টি"কিল না।

"ওর দোষ নেই মশাই ওর পেছনে বদমায়েস লোক আছে। তা না হলে ও অত জানবে কেমন করে!"

যে ভদ্রলোক প্রথম বিনুকে ধরিয়াছিলেন তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন—"পেছনে না হয় লোক আছে বুঝলাম, কিন্তু আমাদের সামনে বাপ মরার ভাণ করে ত আর সে দাঁড়ায় নি। এসব ঢঙ ওইটুকু ছেলে শিখলে কোথায়!"

বিনু চারিদিক এইবার অন্ধকার দেখিতেছিল। এই এতগুলি লোকের ভিতর তাহার সহায় হইবার মত কেহ নাই। সবাই তাহার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই উত্তেজিত লোকগুলির বিরূপতার চাইতে তাহার নিজের ভয়ঙ্কর অপরাধের অনুভূতিই তখন তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ অভ্যাসের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া গিয়া তাহার নিজের মূর্ত্তি সে যেন দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ছি, ছি এতবড় জুয়াচুরী কেন সে এতদিন করিয়া আসিয়াছে! নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় লজ্জায় গ্লানিতে মাটিতে তাহার যেন মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল।

কে একজন তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"এসব ব্যাপার অমনি ক্ষমা করা উচিত নয় মশাই। আমি ওকে পুলিশে দেব।"

এতক্ষণ মুখ তুলিয়া বিনু চাহিতে পারে নাই। পুলিশের কথায় আতঙ্কে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কাতর ভাবে লোকটার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মিনতি করিয়া সে বলিল—"আমায় পুলিশে দেবেন না, আমি আঁর কখনও এমন করব না।"

কিন্তু এইটুকু একটা ছেলের সরলতার ভাণে ঠকিয়া গিয়া লোকগুলার রাগ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। যে ভদ্রলোক তাহাকে প্রথম ধরিয়াছিলেন বিনুর হাত হইতে আবেদন-পত্রটি লইয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"না, করবে না! কাল থেকে তুমি পকেট কাটবে। চল তোমায় পুলিশে দেবই।"

বিনু সকলের মুখের দিকে চাহিয়া হতাশ ভাবে কাঁদিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার আর কোন আশা ইহাদের কাছে নাই।

পুলিশে সত্যই তাহাকে দেওয়া হইত কিনা বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় একটি বেঞ্চি হইতে একজন উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইয়া শান্ত স্বরে বলিলেন—"পুলিশে দিলে কি ওর সত্যি উপকার হবে মনে করেন আপনারা?

একজন বুঝি বলিল—"আমাদের উপকার ত হবে! এর পর আর নতুন কেউ ঠকবে না!"

তেমনি শান্ত স্বরে লোকটি বলিলেন—"তাও বলা যায় না, জেল যদি ওর হয় তাহলে জেল থেকে ও পরম সাধু হয়ে নাও বেরোতে পারে। সাধারণতঃ তা বেরোয় না।"

সকলে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া লোকটি আবার বলিলেন, "আপনারা যদি আপত্তি না করেন তা হলে আমি ওকে এখানে নামিয়ে নিয়ে যাই।"

আপত্তি অবশ্য কাহারও বিশেষ কিছু দেখা গেল না। বিনুর উপর রাগ যত বেশীই হউক পুলিশে দিবার হাঙ্গাম পোহাইতে কেহ বড় রাজী নয়। তাছাড়া এতক্ষণ ধরিয়া আস্ফালন করিয়া গায়ের ঝাল তাঁহাদের অনেকটা মিটিয়াছে।

একজন শুধু বলিল—"কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না মশাই। ও মিটমিটে ডান ছেলেকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ভাল করতে পারবেন মনে করবেন না।"

লোকটি বিনুর কাঁধে সস্নেহে একটি হাত রাখিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। তাহার পর বলিলেন—"কিন্তু চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি?"

পুলিশের ভয়ে এতক্ষণ বিনু একেবারে আড়ষ্ট হইয়াছিল। সে বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনায় এতক্ষণ বাদে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে প্রথম তাহার উদ্ধার-কর্ত্তার দিকে ভাল

করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া তাহার শিশুমন সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেল। লোকটি সন্ন্যাসী ; সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি, ঋজু দীর্ঘ সবল দেহে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা মানাইয়াছে অপরূপ। এমন সন্ন্যাসী বিনু আগে কখনও দেখে নাই। সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাসিতে কি এমন একটি মাধুর্য্য ও মহিমা আছে যে মন আপনা হইতেই শ্রদ্ধানত হইয়া আসে।

সন্ন্যাসী বিনুর হাত ধরিয়া খানিক বাদেই এক জায়গায় নামিয়া পড়িলেন। বিনুর কান্না তখন থামিয়াছে, কিন্তু চোখের জল শুখায় নি। সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"চোখের জল মুছে ফেল ভাই—বড় ছেলেকে কি কাঁদতে আছে।"

বিনু লজ্জিত হইয়া কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছিল।

সন্ন্যাসী হঠাৎ বলিলেন—'চল ভাই তোমাদের বাড়ি যাব। কোন্ দিকে তোমাদের বাড়ি !"

বিনু মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী একটু থামিয়া বলিলেন—"বাড়িতে তোমার বাবা আছেন ?"

বিনু এবার শুধু একটু মাথা নাড়িল। আবার তাহার কান্না আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাড়িতে তাহলে তোমার কে আছে ? কে তোমায় এমন করে ভিক্ষে করতে পাঠায় বলত ?"

বিনুর চোখে অশ্রুর আভাষ দেখিয়া সন্ন্যাসী তখন আর উত্তরের জন্য জেদ করিলেন না।

তাহাকে লইয়া নির্জ্জন একটি জায়গায় গিয়া তিনি বসিলেন। খানিক বাদে দেখা গেল সন্ন্যাসীর স্নেহের স্পর্শে গলিয়া বিনু তাহার অনেক কথাই বলিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ন্যাসী শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আর সেখানে যেতে চাও বিনু ?"

বিনু হাঁ, না, কিছুই বলিল না। সত্যই সে এখন কি করিবে কিছুই জানে না।

বিনুকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে এক জায়গায় ? সেখানে তোমার মত অনেক ছেলে আছে। খেলার মাঠ, স্কুল, মন্দির আরো কত কি দেখবে সেখানে।"

বিনু সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে যাইবে। নকুড় দাসের সংসর্গের প্রতি বিতৃষ্ণাই তাহার এ উৎসাহের একমাত্র কারণ নয়। নূতন জীবনের সম্ভাবনাও তাহাকে লুব্ধ করিয়াছে। তাছাড়া সন্ন্যাসীর সৌম্যশান্ত মূর্ত্তির প্রভাব ইতি-মধ্যেই তাহার উপর কেমন করিয়া যেন পড়িয়াছে।

সন্ন্যাসী বিনুর উৎসাহ দেখিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কারুর জন্যে তোমার মন কেমন করবে না ত ?"

বিনু অম্লান বদনে বলিল—"না", তারপর উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করিল—"সে জায়গা এখান থেকে কত দূর ?"

"বেশী দূর নয়, রেলগাড়ি করে ঘণ্টা দু'এক যেতে হয়।"

"রেলগাড়ি করে যেতে হয় ?" বোঝা গেল সে জায়গা সম্বন্ধে যেটুকু আপত্তি হইতে পারিত রেলগাড়ি করিয়া যাইতে হয় বলিয়া তাহা খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। বিনু অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আজকেই যাব ত ?"

সন্ন্যাসী ঘাড় নাড়িলেন।

*　　*　　*

কিন্তু নূতন জায়গা সম্বন্ধে যত উৎসাহই থাক্ গাড়িতে উঠিয়া বিনুর মন কেমন করিতে লাগিল। মাঠ, বন, ষ্টেশন ফেলিয়া গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ ছুটিয়া চলার ভিতর একটা অপরূপ আনন্দও আছে। কিন্তু সেই আনন্দের ভিতরও বিনুর মন কেমন উদাস হইয়া যায়। স্পষ্ট করিয়া কাহারও জন্য যে তাহার মন কাঁদে তাহা নয় ; কিন্তু তবু তাহার যেন মনে হয় অনেক ভালবাসার অনেক স্মৃতির গত-জীবনকে এই গাড়ির সহিত সেও চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাই-তেছে। যেখান হইতে আজকে চলিয়া যাইতেছে সেখানে আর কখনও ফেরা যাইবে না এবং এই ফিরিতে না পাওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ বুঝি কিছুই নাই। তাহার মনের ভিতর তাহার মা, বাপ, তাহাদের পাড়ার বন্ধুরা, মাসি, এমন কি নকুড় ও নন্দও যেন একাকার হইয়া অতি প্রিয়জনের মত অশ্রুসজল নেত্রে তাহাকে অনিচ্ছায় বিদায় দিতে থাকে।

*　　*　　*

বিনুর জীবনে এইখান হইতে ছেদ পড়িয়াছে। ইহার পরের ইতিহাস অমৃতানন্দের।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ॥০+২২৩। সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৮৩। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা ১৩৪০ সাল। মূল্য পরিষৎসদস্য পক্ষে ১।০, সাধারণের পক্ষে ১॥০।

বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার জন্য এতাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব্ব ও একক। আধুনিক কালের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে বিস্ময়কর ও যুগান্তরকারী উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা নব নব সাহিত্য-প্রচেষ্টায় ও সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্য এই আধুনিক সাহিত্য উদ্যানের একটী বিশিষ্ট ও রমণীয় পুষ্প। শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাহিত্যের এই প্রধান অঙ্গটার বিশেষ অভাব ছিল। কেমন করিয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সহিত সংস্পর্শের ফলে বাঙ্গালায় অভিনব রঙ্গভূমির ও নাট্য সাহিত্যের উদ্ভব হইল, প্রাচীন নাটকের ধারার সহিত বিদেশ হইতে আগত নাট্যরীতি ধীরে ধীরে কিরূপে মিশিয়া একাঙ্গীভূত হইয়া গেল, — ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে এক অতি সার্থক আলোচনা। বাঙ্গালা নাটকের আভ্যন্তরীণ প্রাণবস্তু হইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাহার বহিরঙ্গস্বরূপ ইতিহাস ও ঘটনা-পরম্পরা সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। উপস্থিত পুস্তকে ব্রজেন্দ্রবাবু সেই ধারণা করিবার সাধন আমাদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছেন। যে পারিপার্শ্বিক ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালা নাটক তাহার নবীন জন্ম লাভ করিল এবং পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইল, ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার একটি যথার্থ দিগ্‌দর্শন আমাদের দিয়াছেন। সমসাময়িক সাহিত্য ও দলিলপত্র হইতে প্রমাণপঞ্জী আহরণ করিয়া দেওয়ায় তাঁহার পুস্তক বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস বিষয়ে অবশ্য গ্রহণীয় প্রমাণ ভাণ্ডার হইয়া থাকিবে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল ধরিয়া মুখ্য source-book অর্থাৎ আকর বা আধার-পুস্তক হইয়া থাকিবে। এই হিসাবেই ব্রজেন্দ্রবাবুর বইয়ের অপূর্ব্বত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

বইখানি ঐতিহাসিক প্রমাণের ভাণ্ডার স্বরূপ হইলেও, বিশেষজ্ঞ বা সাহিত্য-সমালোচক ভিন্ন সাধারণ পাঠকগণও ইহাতে যথেষ্ট রস পাইবেন — এমনই চিত্তাকর্ষক করিয়া নিপুণ ইতিহাস-শিল্পী ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রমাণগুলি ও তদবলম্বনে তাঁহার ইতিহাস কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। তিনি প্রাচীনদের মুখ হইতেই প্রাচীন কথা শুনাইয়াছেন, — প্রাচীনের সারল্য ও সরসতা ইহাতে অক্ষুণ্ণ থাকায় পাঠকালে যে আনন্দ আস্বাদন করা যায় তাহা নিছক অধুনাতন ঐতিহাসিকের যুক্তিতর্কময় প্রমাণ-কণ্টকিত লেখায় পাওয়া অসম্ভব। বস্তু-বিষয় বিন্যাসের কৌশলে বইখানি একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এইরূপ পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিত বা শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালীর আলোচ্য বা পাঠ্য হইবার যোগ্য।

এই পুস্তকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয় ধরণের থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ও আনুষঙ্গিক ভাবে বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। ইহাতে গালগল্পের প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই, কেবল প্রামাণিক ভাবে লব্ধ ঘটনার যথাযথ উল্লেখ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে সম্প্রতি যে কতকগুলি ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির বহু ত্রুটী-বিচ্যুতি ও ভ্রম-প্রমাদ এই প্রমাণ-ভাণ্ডার প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে সংশোধন করিয়া লইবার সুযোগ মিলিল।

পুস্তকে উদ্ধৃত বহু প্রাচীন কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের পাঠের জন্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার যোগ্য। এই ক্ষুদ্র সমালোচনায় তাহা করা সম্ভবপর হইল না।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের ভূমিকা ব্রজেন্দ্রবাবুর বইখানির উপযোগিতা বিষয় একটি সুন্দর পরিচয় পত্র। এই বইয়ে প্রদত্ত ঐতিহাসিক কাঠামোর উপর এখন সাহিত্য-রসিকগণ বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিয়া বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলুন, ইহা সুশীলবাবুর সহিত প্রত্যেক সাহিত্যামোদী কামনা করিবেন।

এই প্রকার পুস্তক প্রকাশ করা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অতি উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে — এবং এই সুন্দর পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দেওয়ায় আমরা গ্রন্থকার ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কর্তৃপক্ষ উভয়কেই অভিনন্দিত করিতেছি।

— শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত নাটকের গল্প। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্, এ প্রণীত — ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ, মূল্য আড়াই টাকা।

কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙালী সংস্কৃত পড়িত কিন্তু ক্রমেই ও পাঠ একেবারেই উঠিয়া যাইতেছে, দেবভাষা দেবতার মতই পরিত্যক্ত হইতেছেন। ইহা লইয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই, কি থাকিবে এবং কি যাইবে মহাকালই তাহা নিরূপণ করিতেছেন। শাস্ত্র-গ্রন্থের কথা ছাড়িয়া দেই — সংস্কৃত কাব্য নাটকও কি আমরা পড়িব না। একদিন ভারতবর্ষের রসিকসমাজ যে সকল গল্প-নাটকের মধ্যে জীবন যাত্রার পাথেয় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা সেগুলি কি ভোগ করিব না?

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত মহাশয় বাঙলা ভাষাতেই আমাদিগকে সংস্কৃত নাটকের গল্প শোনাইতেছেন। সুতরাং গল্পাংশ সম্বন্ধে আমাদের দুঃখ করিবার কারণ নাই। রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, মালতীমাধব, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রিয়দর্শিকা, নাগানন্দ, বিক্রমোর্ব্বশী, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, স্বপ্নবাসবদত্তা, উত্তররামচরিত, শকুন্তলার গল্প স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় আমরা শুনিতে পাইতেছি। আমাদের উত্তরাধিকারের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য দাসগুপ্ত মহাশয়কে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[বন্ধুসমাজে আগন্তুক]

সদ্য বারিধারায় স্নাত প্রভাত, মনোহর প্রাণচঞ্চল নবীনতায় ঝলমল করিয়া উঠিল। ভাসমান মেঘপুঞ্জকে পশ্চাতে ফেলিয়া তরুণ তপন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইতে লাগিলেন ; নীলোজ্জ্বল অনন্ত আকাশ-প্রান্তরে গতিশীল সূর্য্য ; গৃহচূড়া এবং বৃক্ষচূড়া—নারিকেল ও খর্জ্জুর শাখা, আম ও বাব্‌লা গাছগুলি যেন অপরূপ আলোক-বন্যায় স্নান করিয়া হাসিতে লাগিল। বৃক্ষ-লতার পাতায় পাতায় পতনোন্মুখ জলবিন্দু প্রভাতসূর্য্যের তির্য্যক রশ্মিস্পর্শে লক্ষ লক্ষ মুক্তা-বিন্দুর মত শোভা পাইতে লাগিল। বৃক্ষকুঞ্জের ঘনসন্নিবিষ্ট শাখার অবকাশপথ দিয়া মৃদু রশ্মি নিম্নের আর্দ্র তৃণভূমির উপর যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সদ্যোজাগ্রত ও আনন্দিত পক্ষীকুল তাহাদের সহস্র কণ্ঠের কোলাহলে বনভূমি মুখর করিয়া তুলিল; শুধু থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়ার সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি স্পন্দমান বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। লঘু পেজা তুলার মত সাদা মেঘ আকাশের সদ্য পরিশুদ্ধ নীলে নিঃসঙ্গভাবে বিচরণ করিতেছিল ; দোদুল্যমান ব্যাকুল শাখাগ্রবর্ত্তী জলবিন্দু ঝরাইবার জন্যই যেন একটা মৃদু বাতাস সহসা উত্থিত হইয়া আকাশের নিঃসঙ্গ মেঘমালাকে দোলাইতে লাগিল।

পাঠক, আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া গত রাত্রে মাতঙ্গিনী যে পুকুরের পাড়ে ক্ষণিকের জন্য বিপন্ন হইয়া আবার বিপদ্‌মুক্ত হইয়াছিল সেইখানে আসুন। সূর্য্যদেব আকাশমার্গে এক প্রহরের পথ অতিক্রম করিয়াছেন। একটি অনতিপ্রাচীন তেঁতুল গাছের নীচে লতাগুল্মের আচ্ছাদনে মাতঙ্গিনী ভিজা ঘাসের উপর বসিয়া ছিল। তাহার বস্ত্র সিক্ত, কর্দ্দমাক্ত, বৃষ্টিবিধৌত কুঞ্চিত কেশদাম আলুলায়িত হইয়া গুচ্ছে গুচ্ছে তাহার স্কন্ধদেশ ও বাহুদুইটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে মস্তক ঈষৎ আনত করিয়া ঘন মেঘের চাইতেও কালো কেশ সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া লইতেছিল। পাশেই যৌবন-পরিপুষ্ট পূর্ণাঙ্গী কনকের দেহ সদ্য তৈলমার্জ্জিত হইয়া মসৃণ দেখাইতেছিল। তাহার কাঁধে ময়লা একটা গামছা—সুবৃহৎ পিতলের কলসিটি পাশে খালি পড়িয়া ছিল ; মিশি-প্রয়োগে মলিন দাঁতগুলি ইহাই বলিয়া দিতেছিল যে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে কনক ঘরের বাহিরে আসিয়াছে বটে কিন্তু এখনও তাহা বাকী আছে। দুই বন্ধুতে গভীর কোনো বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল। পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে তাহাদের বার্ত্তালাপের বিষয় আমাদের অজ্ঞাত নহে। মাতঙ্গিনী তাহার একমাত্র বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমতী সখির নিকট বিগত রাত্রির ঘটনাপরম্পরা মৃদুস্বরে বিবৃত করিতেছিল। পাঠকের অনুমতি লইয়া এই কথোপকথনের শেষাংশ তাঁহার অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে এই বর্ণনা শুনিয়া কনক শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, মাগো, আমি হ'লে তো ভয়েই মরে যেতাম। ধন্যি সাহস তোর, দিদি। আচ্ছা, এখন তুই কি তোর বরের কাছে ফিরে যাবি ?

মাতঙ্গিনী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, আর কোথাই বা যাব !

কনক অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, আমার মাথা খাস্ দিদি, সেখানে আর ফিরিস্ না। তারা তোকে জ্যান্ত রাখবে না।

মাতঙ্গিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মরতে আমাকে হবেই ভাই, অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে ? আর কোথায় আমি আশ্রয় পেতে পারি, বল্।

বন্ধুর দুঃখে সহানুভূতিতে কনকের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সে বলিল, আমি বেশ বুঝছি দিদি, আমাদের বাড়ীতে থাকা তোমার চলবে না। কিন্তু বাড়ীতে তুমি কিছুতেই ফিরো না ! হ্যাঁ, তোমার বোনের কাছে যেতেই বা তোমার আপত্তি কি ?

এই কথায় মাতঙ্গিনীর দেহে এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর ঘটিল। উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া যে কঠিন সংযত ভাষায় সে মাধবের কাছ হইতে বিদায় লইয়াছিল, কথায় তেমনই জোর দিয়া সে বলিল, অসম্ভব, এ জীবনে আর সেখানে যেতে পারি না।

মাতঙ্গিনীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া কনক আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, আরে বেটীরা, এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কি পরামর্শ হচ্ছে শুনি! আহা, তোমরা কাঁদছ, কেন, কি হয়েছে, মা?

ভয়চকিত সখীদের পাশে আসিয়া যে দাঁড়াইল সে একজন শ্যামাঙ্গী প্রৌঢ়া রমণী। তাহার চুলে পাক ধরিয়াছে। দেহ বার্দ্ধক্যবশত কুঞ্চিত হইতে সুরু হইয়াছে। তাহার পরণে একটা মোটা পরিষ্কার ঠেটি, মুখ তৈলাক্ত, কাঁধে মলিন গামছা, এবং কোমরের খালি কলসি তাহার সেখানে আগমনের কারণ বলিয়া দিতেছিল।

কনক এক মুহূর্ত্তে চোখের জল ভুলিয়া গেল, হাস্যোজ্জ্বল-মুখে সে বলিয়া উঠিল, আরে, এ যে দেখ্ছি, সুকীর মা। হ্যাঁ সুকীর মা, ফুলপুকুরে আজ যে বড় হঠাৎ এলে?

সুকীর মা অত্যন্ত প্রসন্নভাবে উত্তর দিল, উঠ্তে আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল মা, ভাবলাম, যাই, ঘরের কাজে হাত দেবার আগে চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আসি। কিন্তু, বাছা তোদের কি হয়েছে বল্ তো? দুজনেই কাঁদছিস কেন?

কনকের চোখদুটি আবার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, সে বলিল, আর বোলো না, সুকীর মা! এ হতভাগীর দুঃখের কথা তোমাকে আর কি বলব!—মাতঙ্গিনী নীরব অর্থপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কনককে সাবধান করিয়া দিল—সেই দৃষ্টি যেন বলিল, আমার দুঃখের কথা যাকে তাকে বলিবার নয়, কিছু প্রকাশ করিও না। কনকও তেমনই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জবাব দিল, ভয় নাই, তোমার গুপ্তকথা ব্যক্ত হইবে না।

কনক আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওর দুঃখের কথা আর বোলো না! হতভাগিনীকে ওর স্বামী ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, এখন ও কোথায় যেয়ে আশ্রয় নেবে তাই ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না।

সুকীর মা বলিল, আরে ছ্যা, এতেই কান্না! স্বামীস্ত্রীতে সকালে ঝগড়া করে, সন্ধ্যেয় আবার তাদের মিল হয়—এ তো সবাই জানে। এখন তার রাগ আছে, রাগ পড়লেই সে সেধে তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবে। ছিঃ মা, এর জন্য কান্না কেন? জানিস্ কনক, আমার জামাই যখন শ্বশুর-ঘর করতে আসে, এমন একটা রাত যায় না যখন আমার মেয়ের সঙ্গে সে ঝগড়া করে না। কিন্তু তাতে কি, তাই বলে, আমার মেয়েকে সে কোনও স্বামীর চাইতে কম ভাল বাসে না। এই গেলো বুধবারের কথাই ধরো, জামাইতো এলো চমৎকার একটা সোনার নথ নিয়ে—এমন নথ, তোকে কি বলব কনক--

কনক কিন্তু সুকীর মায়ের জামায়ের মিষ্টি স্বভাবের পরিচয় সম্পূর্ণ করিতে দিল না, সে মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, যা বলেছ ঠিক সুকীর মা, কিন্তু এ আলাদা ব্যাপার। রাজুদা আর একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়—সেই যে জঙ্গলবেড়ে থেকে সম্বন্ধ এসেছিল সেই মেয়ে। এখন বুঝতেই পারছ, একে বারবার এমন ভাবে যন্ত্রণা সে দিচ্ছে কেন। এ আর স্বামীর ঘর করতে যাবে না সুকীর মা। আর এমন ভাবে কারু যাওয়া উচিতও নয়। সেখানে গেলে অপমান আর দুর্ব্বাক্য ছাড়া আর কিই বা জুটবে? এর জন্যে ফিরে যাবে ও! আবার এদিকে কোথায় যে যাবে তারও ঠিক নাই—হতভাগীর বাপের বাড়ী কাছে হলেও বা কথা ছিল, তারা তো আর ঠেলতে পারত না।

সহৃদয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, পোড়া কপালই বটে। তুই ঠিকই বলেছিস্ কনক, এমন হলে কিছুতেই আর ওর ফিরে যাওয়া উচিত নয়। আবার বিয়ে করবে? বলি, এমন সোনার চাঁদের মত বউ কোথায় পাবে সে? আর একটা কচি মেয়েকে ঘরে আনলেই সে কি ঘরগেরস্থালী সামলাতে পারবে? না মা, তুমি ঘরে ফিরো না, বরঞ্চ তোমার বোনের ঘরে গিয়ে দেখ ও কি করে।

কনক বলিল, তাই কি হবার জো আছে সুকীর মা, বোনের ঘরে যাওয়ার মুখও ওর নাই। মাতঙ্গিনী লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন হইয়া রহিল। কনক বলিতে লাগিল, মাধব-বাবু তাদের বাড়ীতে গেলো শ্রাদ্ধের সময় রাজুদাকে নেমন্তন্ন করেনি বলে ও ওর বোনের সঙ্গে কি কম ঝগড়াটাই করেছে! আমাদের বাড়ীতেই ওকে রাখতে পারতাম কিন্তু জানই তো সুকীর মা, আমরা কত গরীব। ওকে নিয়ে যাব আর ও উপোস্ করে মরবে। এটাই কি ভাল?

সুকীর মা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, মরণ! কি বোকা মেয়ে তুমি বাছা। অমন স্বামীর জন্যে বোনের সঙ্গে

ঝগড়া করা! হ'ত আমার জামাই—আমি কি শুধু তাকেই কথা শোনাতাম! তার বাপ মারও কি রক্ষে থাকত নাকি? মরুকগে, আয় মা তুই আমার সঙ্গে—বিপন্ন ও শুষ্ক মাতঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আমার সঙ্গে এসো, আমাদের গিন্নীর সঙ্গে যতদিন খুসী তুমি থাকবে। বড় ঠাকরুণ তোমাকে বড্ড ভালবাসেন, তোমাকে পেলে তিনি খুসীই হবেন। তারপর তোমার স্বামীর রাগ পড়লে, তা সে শীগ্‌গিরই পড়বে, তোমাকে বাড়ীতে যেতে সাধাসাধি করলে তবে তুমি যেয়ো। দেখো, যেন চট করে আবার তার কথায় ভুলে যেয়ো না; নাকের জলে চোখের জলে হয়ে দাঁতে খড় কেটে সে তোমাকে নিয়ে যাবে, তবে যাবে তুমি।

কনকের আনন্দ আর ধরে না, উল্লসিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছ সুকীর মা, ও তোমার সঙ্গেই এখন যাক। কি বলিস্ দিদি? সুকীর মায়ের সঙ্গে যাওয়াটাই কি সব চাইতে ভাল হবে না? আমি জানি, বড় ঠাকরুণ তোকে ভালবাসেন। তুই গেলে তিনি খুসীই হবেন। চুপ করে আছিস্ কেন দিদি, কথা বল্।

মাতঙ্গিনী যেন বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিল, কিন্তু মুখরা কনক সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিতে লাগিল। হাঁ, হাঁ ও যাবে। তুমি যাও সুকীর মা চানটা সেরে এস, তোমার সঙ্গে এখনই ও যাক। যাও, দেরী ক'রো না।

সুকীর মা আর বিলম্ব না করিয়া স্নান করিতে গেল। মাতঙ্গিনী বলিল, এতও আমার কপালে ছিল কনক।

কনক উত্তেজিত হইয়া জোরের সঙ্গে বলিল, না ব'লো না দিদি, এতে মত না দিলে তুমি আমার রক্ত খাবে। এখন যাও, সন্ধ্যে বেলায় আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। আর কথা ব'লো না।

কনক আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কলসী তুলিয়া লইল এবং দ্রুতপদে জলের ধারে গিয়া সুকীর মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে নামিল। (ক্রমশঃ)

পুরুষ-যজ্ঞ

ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহুসহস্রবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবন-যাত্রায় ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্ম্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্দ্ধ পৃথিবী প্রভাম্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্য্যন্ত, অর্দ্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিশ্বভূতের জন্ম আত্মোৎসর্গে মায়ের বাধা হয় নাই। তিনি কখনও ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত পরকে আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই; বরং, যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যপাসতে—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতার সমীপে উপস্থিত হয়,—সেইরূপ পৃথিবীর যে কেহ অন্নার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাকে কোলে লইয়া স্নেহের সহিত স্তন্যদান করিয়াছেন। চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন;—কেবল স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশবিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণার ধারায় দেশবিদেশকে ধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন। পৃথিবীতে ত্যাগের আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য, নিবৃত্তির পথ দেখাইবার জন্য, তিনি আপনার পায়ে সংযমের শিকল পরাইয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; পরপীড়নের আশঙ্কায় আপনার সন্তানদের পায়েও নিগড় পরাইয়া বিত্তালাভের বা লক্ষ্মীলাভের ব্যপদেশে পরদেশ আক্রমণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। মা আমার স্বয়ং ইড়াদেবী—মনুকন্যা মানবী রূপে তিনি স্বয়ং মনুকর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; সরস্বতী রূপে তিনি ব্রহ্মাবর্ত্তে বেদপন্থী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতীরূপে তিনি ভারতবর্ষের কুলদেবতা, বাগ্‌দেবীরূপে তিনি ব্রহ্মরূপিণী। তিনি গায়ত্রীরূপে মর্ত্তলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন, সাবিত্রীরূপে আমাদের ধীশক্তির অদ্যাপি প্রচোদনা করিতেছেন।

—যজ্ঞকথা, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সম্পাদকীয়

পুণা তিলক-মন্দিরে

পুণার তিলক-মন্দিরে ভারতের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

আজ আমাদের সকলের মনে দুটি প্রশ্ন বিশেষ করিয়া জাগিতেছে, একটি, আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে ; দ্বিতীয়, ভারত-সরকারের সঙ্গে কোনও সম্মান-জনক আপোষের উপায় সম্ভব কি না। এই দু'টি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পুণায় নেতারা সমবেত হইয়াছেন।

তিলকের মর্ম্মর-মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া তিন দিন ধরিয়া অধিবেশনের আলোচনা চলে। যে শুভ্র বেদীর উপর মহাত্মা গান্ধী বসিয়া এই অধিবেশনের আলোচনায় যোগদান করিতেছেন, তাহার ঠিক উপরে একটি তৈল-চিত্র রহিয়াছে, কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণে কপিধ্বজ রথে যুযুধান পার্থ!

এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী বলেন,—"আমি আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রস্তুত ; ইহা স্থগিত রাখা যায় না, তাহা জাতির আত্মসমর্পণের তুল্য হইবে। অবশ্য আমি জানি, নৈরাশ্য ও ব্যর্থ কুয়াশা সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আপনারা স্মরণ রাখিবেন, সাহস ও আত্মত্যাগের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি—লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মর্ম্মর-মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া আপনারা আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আপনারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের কল্পনাও মনে আনিবেন না, আপনারা আপনাদের মহান জন্মভূমির স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে জীবনদানের জন্য প্রস্তুত হউন।"

তিনদিন আলোচনার ফলে জানা যাইতেছে যে মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই ফিরাইয়া আনিতে হইবে, ইহাই নেতৃসম্মেলনের সিদ্ধান্তের মূল কথা। অবশ্য ইহাতে বুঝা যায় না যে, ৩১শে জুলাই মধ্যেই পুনরায় আইন অমান্য সুরু হইবে। কারণ অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি মিঃ এম, এস, আণের নির্দ্দেশ অনুসারে সাময়িকভাবে আগামী ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত আইন অমান্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। তবে এই অসময়ের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্মানজনক সর্ত্তে আপোষ মীমাংসা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তাহাতে যদি কোন ফল না হয়, তাহা হইলে ৩১শে জুলাই তারিখের পর আইন অমান্য স্থগিত রাখার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল বলিয়া অস্থায়ী সভাপতি মিঃ এম, এস্, আণে একটি ঘোষণা প্রচার করিবেন।

১৫ই জুলাই এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে তার করিয়াছেন—"শান্তি-স্থাপনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে বড়লাট আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দিবেন কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক তারযোগে জানান।"

যখন পর্য্যন্ত এই বিষয় লেখা হইতেছে, তখন পর্য্যন্ত আমরা এই তারের উত্তরের কোনও সংবাদ অবগত নই। এই উত্তরের উপর পুণা অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পদ্ধতির ধারা নির্ভর করিতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব-পরিচালিত কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিয়ম-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্মান-জনক আপোষের পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিয়াছে—পুণা অধিবেশনেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ব্যক্তির জীবনে যেমন রাষ্ট্রের জীবনেও তেমনি, সম্মান-জনক আপোষ করিবার একটা মনস্তত্ত্ব বা মনোভাব যে শুভ-লগ্নকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ঠিক সেই রকম সকল সুবিধা ও সুযোগ লইয়া বারে বারে দেখা দেয় না। ব্যক্তির জীবনে সেই লগ্নকে অবজ্ঞা করার মধ্যে যে দায়িত্ব থাকে, রাষ্ট্রের জীবনে সেই লগ্নকে অবজ্ঞা করার মধ্যে সহস্র গুণ অধিক দায়িত্ব থাকে এবং এই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি আত্মস্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদার দোহাই দিয়া যাহা করিতে পারে, রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা করা উচিত নয়, কারণ ব্যক্তি নিজের জীবন লইয়া নিজে পরীক্ষা করিতে পারে, বহু সহস্রের জীবন লইয়া অর্থনীতি বা রাজনীতির এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করিবার দায়িত্ব কাহারও নাই। জগতে বহুবার এই ভুল হইয়া গিয়াছে, বহু মানব এই ভুলের জন্য অজ্ঞাতসারে অকারণে প্রাণ দিয়াছে। এই ভুল সংশোধনের সময় কি আসে নাই?

ভারতে চিনির কলের ভবিষ্যৎ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রী, শিল্প-বিভাগের পরিচালক এবং কয়েকজন বেসরকারী লোক লইয়া সিমলাতে ভারতের চিনি-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক বৈঠক বসিয়াছে। ভারতীয় সরকারী এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কৌন্সিলের শর্করা-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত আর সি বাস্তব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে যত চিনির কারখানা চলিতেছে, তাহাতে ১৯৩৪-৩৫ নাগাদ ভারতবর্ষে এত চিনি উৎপন্ন হইবে যে, তাহারা ভারতের চাহিদা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত কিছু রপ্তানী করিতে বাধ্য হইবে এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যে প্রতিযোগিতা হইবে, তাহাতে এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। অতএব যাহাতে আর চিনির কল প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে তাহার জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হউক।

ভারতে আমদানী চিনির উপর রক্ষণশুল্ক বসানর দরুণ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পঞ্জাব এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে দ্রুতগতিতে চিনির কলের সংখ্যা ইদানীং বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে আজ পর্য্যন্ত একটিও বড় চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অথচ বাংলা দেশ প্রতিবৎসর বহু পরিমাণ চিনি অন্যান্য প্রদেশের নিকট ক্রয় করে। যে কয়দিন সিমলার অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে একটি প্রস্তাবকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে, ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের লাইসেন্স না লইয়া কেহ চিনিব কল স্থাপন করিতে পারিবে না। এই আইনের অজুহাতে যদি বাংলা দেশে এই শিল্পের পথ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীব শিল্প-জীবনে রীতিমত আঘাত করা হইবে। বাঙ্গালা যে পরিমাণ চিনি ক্রয় করে, তাহার অতি সামান্য অংশ সে উৎপন্ন করে। বাঙ্গলার পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্তের সমস্যাই উঠে না। অথচ তাহার জন্য যদি বাংলাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, অথবা চিরকাল এই নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হইবে।

বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলনের সার্থকতা

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের উদ্বোধনে লণ্ডনে বিশেষ ঘটা করিয়া বিশ্ব-অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন বসে। এই সম্মেলনে বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যা কতদূর সমাধান করা হইবে বা হইতে পারে তাহা আমরা বলিতে পারি না—কিন্তু আমাদের জর্জ্জ বার্ণার্ড শ তাঁহার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে এই বিরাট অধিবেশন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,

"এই সপ্তাহে বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলনের বৈঠক বসিয়াছে। অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁহাদের প্রাথমিক জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই এমন কতকগুলি ভদ্রলোক এই বৈঠকে সমবেত হইয়াছেন। ইহাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে; ইহাঁরা সকলেই স্বীয় দেশের জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক কার্য্য করিতে যাইয়া একটা গোল পাকাইয়াছেন। তাঁহারা নিজের দেশের সমস্যা নিজে সমাধান করিতে অপারগ হইয়াছেন, এখন অন্য দেশের সহায়তায় যদি তাহা সমাধান করিতে পারা যায়—এই আশায় প্রস্তরীভূত প্রাণী ও উদ্ভিদের পুঞ্জীভূত কঙ্কালরাশি সন্নিবিষ্ট এই যাদুঘরে (জিওলজিক্যাল মিউজিউয়মের বাড়ীতে সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে) ইহাঁরা অবশেষে সমবেত হইয়াছেন।

"তিন চার দিন আলোচনার পরই তাঁহাদের এই আশা প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে এবং সম্মেলনের উৎসাহী প্রতিনিধিগণ নিজদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থার হাত হইতে সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য ইহাঁদের উপর নির্ভর না করিয়া আমাদিগকেই এই সব গুরুতর সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

স্যর রাজেনের সম্বর্দ্ধনা

কর্ম্মবীর স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরজনের পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। স্যর রাজেনের কর্ম্ম-জীবন এই কর্ম্ম-বিমুখ জড় জাতির পরম গৌরবের বস্তু। স্বীয় ক্ষমতায় এবং অসামান্য কর্ম্ম-প্রতিভার বলে তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অনাগত বহুদিন ধরিয়া এই জাতির যুবকদের সম্মুখে কর্ম্মজীবনের বিরাট আদর্শরূপে বিরাজ করিবে। এই উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে জগদানন্দ রায়

শান্তিনিকেতনের গণিত এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় গত ১১ই আষাঢ় পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্প কয়েকদিন পরে তিনি শিক্ষক হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। একান্ত নিষ্ঠার সহিত বাংলা সাহিত্যের এই শোচনীয় অভাব দূর করিবার জন্য তিনি আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি বহুদিন যাবৎ তাঁহার এই মহৎ প্রচেষ্টার কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিবে।

দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক শিশুদের শিক্ষা নিকেতন

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক শিশুদের শিক্ষা দিবার জন্য একটি শিক্ষা-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বোধনা-নিকেতন। গত ১লা জুলাই উক্ত নিকেতনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রণালী অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া শ্রীযুক্তা প্রতিভা চৌধুরী উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন। দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক শিশুদের শিক্ষা-দানের এই সুমহান্ চেষ্টা জয় যুক্ত হউক, আমরা কায়মনোবাক্যে ইহা প্রার্থনা করিতেছি।

ভারতে বিমান-পোতে ডাক-ব্যবস্থা

সরকারী ডাক-বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে দিল্লী হইতে করাচীর মধ্যে যে বিমান-ডাক চলাচলের ব্যবস্থা ছিল তাহা ৪ঠা জুলাই হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে করাচী ও কলিকাতার মধ্যে বিমান ডাক চলিবে। যোধপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ এবং আসানসোল এই বিমান-পথের ষ্টেসন হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে বিমান ডাকে কোন চিঠি-পত্র পাঠাইতে হইলে চিঠি এবং প্যাকেটের প্রতি তোলার মূল্য ৵০ এবং প্রতি পোষ্টকার্ড ⁄০ হইবে।

আইন-অমান্যকারী বন্দীদের সংখ্যা

আইন-অমান্য-আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ আইন অনুসারে অথবা ১৯৩২ সালের ১০ নং অর্ডিন্যান্সের পরিবর্ত্তে যে সব লোক আটক হয়, তদনুসারে ১৯৩৩ সালের মে মাসের শেষভাগে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল, তাহার একটি সরকারী হিসাব বাহির হইয়াছে। ঐ হিসাবে দেখা যায় ঐ সময় ঐ রূপ বন্দীদের সংখ্যা ৯১৪৪ জন ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে বৃটিশ ভারতে এই শ্রেণীর বন্দীর সংখ্যা ১৮০৬ জন অধিক ছিল।

বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশে এবং বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্ববর্ত্তী সন অপেক্ষা ঐ শ্রেণীর বন্দীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮৭, ৪৪৫, ২৭৯ এবং ২০০ জন কম দেখা যায়।

প্রবাস-প্রত্যাগত ভারতবাসীর দুর্দ্দশা

ওয়েষ্ট ইণ্ডিস ও দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশসমূহ হইতে যে সব ভারতীয় সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে তাহাদের প্রায় ৪৫০ জন এখনও খিদিরপুরের আক্রা অঞ্চলে সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহারা এখন প্রায় নিরন্ন ও অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় আছে; বর্দ্ধমান পূর্ত্তবিভাগের কাজে এই সব লোককে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই। এই সমস্ত অসহায় লোকের প্রায় ১০০ জনকে গভর্ণমেণ্টের এমিগ্রেশন ডিপার্টমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে ৫৷১০ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট লোকদের অবস্থা নাকি হৃদয়বিদারক।

কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে এই সব লোককে কাজ দিয়া বা অন্য উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু গত এপ্রিল মাস হইতে তাহাদের জন্য প্রায় কিছুই করা হয় নাই।

অনাহার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাদের প্রায় ২০০ জন ইতিমধ্যেই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কেহ কেহ নাকি কাঁচা ফল ও পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

ওয়াই-এম-সি-এ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন এবং কলিকাতার কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তি এই সমস্ত হতভাগ্য কপর্দ্দকশূন্য

লোককে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের ও স্ত্রীপুত্রের জীবনরক্ষার জন্য এই সমস্ত অসহায় লোকের এখনও খাদ্য-বস্ত্র ও আশ্রয়ের আবশ্যক। সরকার ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের অবিলম্বে এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত

কামাল পাশার সম্পত্তি দান

তুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক গাজী মুস্তাফা কামাল স্থির করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার দলের ধনভাণ্ডারে দান করিবেন। এই দলের নাম 'পপুলার পার্টি' এবং মুস্তাফা কামাল ইহার স্থায়ী সভাপতি। তুরস্কের প্রচলিত আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণ ব্যতিরেকে অপরকে দান করিতে পারেন না। সুতরাং এই দান বে-আইনী হইয়া যায়। কাজেই একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হইয়াছে।

সম্পত্তি দান সম্পর্কে এই আইনে রাষ্ট্রনায়কের বিশেষ অধিকার স্বীকার করিয়া একটি নূতন ধারা সন্নিবিষ্ট হইবে। মুস্তাফা কামালের সংগ্রহের মধ্যে বহু চারুশিল্পের নিদর্শন আছে। তাহা ছাড়া মাতৃভূমিকে বিদেশীয় অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করায় তাঁহার বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে কয়েকখানি বাড়ী উপহার দিয়াছিলেন। এই সবই দলের ধনভাণ্ডারে দান করা হইবে।

কয়েদী এবং সাধারণ মানুষে প্রভেদ

শুনা যাইতেছে যে, সোভিয়েট সরকার ইতিমধ্যেই যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার ফলে প্রায় লক্ষ কয়েদী সাইবেরিয়া ও রুষিয়ার কারাগারে হইতে মুক্ত হইবে। শুধু যে রাজনৈতিক কয়েদীরাই মুক্ত হইবে তাহা নহে, সাধারণ কয়েদীকেও মুক্তিদান করা হইবে। যে সকল কয়েদী "হোয়াইট সি ক্যানাল" খনন করিয়াছে এবং উত্তরাঞ্চলের খনিসমূহে কাজ করিয়াছে, তাহারাই এই অনুগ্রহের প্রথম সুফল পাইয়াছে।

অভিজ্ঞ মহলের মত এই যে, রুষিয়ায় বাসন্তী শস্যের প্রচুর ফসলের দরুণ যে সুদিনের আভাষ দেখা যাইতেছে, তাহাই এই মুক্তির কারণ।

এই সাধারণ কারামুক্তির সংবাদে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। একজন বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা বলেন যে, সোভিয়েট সরকার কোন ব্যক্তিকেই স্থায়ীভাবে ভালো বা মন্দ বলিয়া বিবেচনা করেন না। এক প্রকার ঘটনাসমাবেশে হয়তো কোন ব্যক্তি সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, আবার যদি সেই পরিবেষ্টনীর পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই একজন পুরা ভাল মানুষ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বঙ্গীয় জার্ম্মান বিদ্যা-সংসদ

জার্ম্মানীর প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং জার্ম্মান কলা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের নিমিত্ত বঙ্গীয় জার্ম্মান-বিদ্যা-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এই সংসদের প্রেসিডেন্ট এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতের রৌপ্যে আমেরিকার ঋণ শোধ

সমর-ঋণের কিস্তি বাবদ গ্রেট বৃটেন ভারত-সরকারের নিকট হইতে ২ কোটী আউন্স রৌপ্য লইয়া আমেরিকাকে দিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতে রূপার দর প্রতি শত ভরি ৫৮৷৷০—এই হিসাবে ২ কোটী আউন্স রৌপ্যের মূল্য ৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। আমেরিকা এক কোটী ডলারের পরিবর্ত্তে এই রূপা লইতেছে। এই হিসাবে এই রূপার দাম হয় ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা। গ্রেট বৃটেন ভারত-সরকারকে এই রূপার বাবদে দিতেছেন ১৬ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের এই ব্যাপারে অন্ততঃ এক কোটী টাকা ক্ষতি হইতেছে। দেনা পাওনার অন্তরালে এই কোটী টাকার অপব্যয় করিবার শক্তি ভারতবর্ষের আছে কি ?

চর্য্যাগত মিলন

সম্প্রতি লণ্ডন, গ্রস্‌ভেনর হাউসে এক সাহিত্যিক ভোজে স্যর আকবর হায়দারী বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—'ভারতবর্ষ আজ বহু দ্বন্দ, বহুতর বাধাবিঘ্নের দ্বারা বিপর্য্যস্ত। এ বিপর্য্যয়ের কথা ভাবিলে মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু যখন ইহার মধ্যেও ভারতের শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও সঙ্গীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা মনে পড়ে, তখন এই কোলাহলের

মধ্যেও মন অপূর্ব্ব শান্তিতে ও বিশ্রাম-সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠে।' তাঁহার বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল ভারতীয় চর্য্যার একত্ব। তিনি বলেন, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষের শিল্প-প্রচেষ্টার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত বাংলার আধুনিকতম শিল্পেরও একটি মিলনসূত্র দেখি। বহুর মধ্যে একের যে সাধনা ভারতীয় চর্য্যার বৈশিষ্ট্য—তাহার শিল্পতেও তাহা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার মতে ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে যত কলহ-বিবাদই থাক্ শিল্পসূত্রে দুই জাতের মনপ্রাণ এক গ্রন্থিতে বাঁধা।

এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি। এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে যতদিন না ইস্‌লামের কৃষ্টিকে হিন্দু ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে ও পক্ষান্তরে হিন্দুর কৃষ্টিকে মুসলমান-ভারত বুঝিবার চেষ্টা করিবে, ততদিন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনও প্রকারের মিলন স্থায়ী হইতে পারে না। চর্য্যাগত মিলন ছাড়া আর কোনও মিলনে আমরা বিশ্বাসী নহি। দেশের নায়ক স্থানীয় যাঁহারা, তাঁহাদের বুদ্ধি এই দিক দিয়া কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

জন্ম-মৃত্যুর হিসাব

গত ৩১শে ডিসেম্বর যে চতুর্মাস্যা শেষ হইয়াছে, তাহার জন্মমৃত্যুর হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে ২৭ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত ৮০ জনের মৃত্যু ও ১৬ লক্ষ ১২ হাজার ২ শত ৮৭ জনের জন্ম হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের মোট জন-সংখ্যা ২৬ কোটি ৮লক্ষ ৩৯ হাজার ৮ শত ২৯—তন্মধ্যে সহর-বাসীর সংখ্যা ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৯, গ্রামবাসী ২৪ কোটি ১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭ শত ৫০। স্বাধীন রাজ্যের যাহাদের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মোট জনসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৩ শত ৫৭। এই সময়ের মধ্যে মৃত অবস্থায় শিশুজন্মের সংখ্যা ৬২ হাজার ৩২। গত চতুর্মাস্যায় ইহার সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার ১ শত। মৃত্যুর হিসাবে কলেরাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ৯ হাজার ২ শত ৬৯, তন্মধ্যে এক বাংলায় ৩ হাজার ৭ শত ৫৮ অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি। বসন্তজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ৮ হাজার ৭ শত ৬৫, বাংলায় ৯ শত ৪১। প্লেগে মৃত্যু ঘটিয়াছে ৮ হাজার ৮ শত ৯০ জনের। মৃত্যুর কারণ জ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৪ শত ১৮ জনের। আমাশা ও উদরাময় রোগে ৫৯ হাজার ৩ শত ২০ জনের এবং শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত ব্যাধির ফলে ১২ হাজার ১ শত ২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এই হিসাব হইতে উপলব্ধি হয়, প্রতিষেধ-সম্ভব ব্যাধিতেই এদেশে অধিক লোকের মৃত্যু হয়। বাংলা দেশে ওলাউঠার প্রকোপে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অথচ ওলাউঠার প্রতিষেধ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওলাউঠার টীকা একেবারে অমোঘ না হইলেও বহু পরিমাণে ব্যাধির প্রকোপ নিবৃত্ত করিতে সক্ষম। ওলাউঠার টীকা লওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু ঘটিয়াছে—ইহার সংখ্যা আমাদের জানা নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ঘটিলেও, বহু ক্ষেত্রেই যে ওলাউঠার টীকা প্রতি-ষেধকের কার্য্যে সফল হইয়াছে, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। এবং ইহাও সত্য যে কলিকাতায় ও বিভিন্ন জেলায়, কর্পোরেশন কিংবা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে টীকা দিবার ব্যবস্থা আছে। মহামারীর সময়ে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণও করা হইয়া থাকে। কিন্তু সে বিজ্ঞাপনে উচিতানুরূপ কাজ হয় না। ইহা হইতে মনে হয়, আমাদের দেশে আজও শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে অধিকাংশ লোক বিজ্ঞান-সম্মত স্বাস্থ্যনীতি উপেক্ষা করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

ভ্রম সংশোধন :

৩২ পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের যে ইংরাজী কবিতার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, সেই কবিতাটি মূলে বাংলায় লিখিত। ইংরাজী জীবনীতে কবিতাটি অনুবাদ ইহা উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া এই ভুল হইয়াছে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যক্ষ্মারোগের মহৌষধ

(টিউবারকুলো স্পেসিফিক)

"গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টরীকৃত"

"টিউবারকুলো স্পেসিফিক্" (সাধুর ঔষধ) যক্ষ্মা রোগীদের আরোগ্য কামনা করে। বহু মরণাপন্ন রোগী আরোগ্য হইয়া নিজ নিজ কাজ করিতেছেন। ঔষধ ব্যবহারে ৭ দিনেই উপকার দর্শিবে। ঔষধের মূল্য ৫৲ টাকা। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

টিউবারকুলো ফার্ম্মেসী,

৬৫।২, হ্যারিসন রোড, (ব) কলিকাতা।

অভাবনীয় সস্তা !! অপূর্ব্ব সুযোগ !!!

গ্যারাণ্টি ৪ বৎসর

নীরেস রিষ্টওয়াচ মূল্য ৪।০, নীরেস পকেট ওয়াচ মূল্য ৩।০

গোল্ড গিণ্ট রিষ্টওয়াচ মূল্য ৫৷৷০, টাইমপিস মূল্য ২।৵০

প্রত্যেক ঘড়ি সুন্দর ও জুয়েলযুক্ত মজবুদ ও ঠিক সময় রক্ষক।

প্রত্যেকটির মাশুল স্বতন্ত্র।

সোল এজেণ্ট—সেন এণ্ড কোং

৩১ (ব) বেথুন রো, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
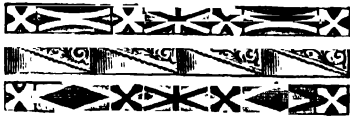
সমস্ত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়

বণিক

কৃষক, শিল্পী, বেকার, ব্যবসায়ী ও গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় **কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য** বিষয়ক বিবিধ উপাদেয় ও সারগর্ভ প্রবন্ধ, জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ বহুল প্রচারিত মাসিক পত্র। সপ্তম বর্ষ চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য বার আনা মাত্র। বিজ্ঞাপনের দর সুলভ। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা প্রেরিত হয়।

এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং,

১০নং, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

গিনি মেটাল গোল্ডের অলঙ্কার

কারুকার্য্য রং পালিশ চমৎকার।

আমাদের সর্ব্বজনপ্রশংসিত আদি ও অকৃত্রিম জগৎ বিখ্যাত গিনি মেটাল গোল্ডের গহনা প্রভৃতি আসল গিনি স্বর্ণের গহনার সমতুল্য, নিত্য ব্যবহার করিলেও গিনি সোনার **রং সমভাবে স্থায়ী থাকে,** তথাপি **দুই বৎসর গ্যারাণ্টি** দিয়া থাকি। উপরে অঙ্কিত ভাটীয়া ও টালি চুড়ি ৮ গাছায় ১ সেট বড় ৪৲, মাঝারি ৩৷৷০, ছোট ৩৲। মফচেন ৩ হাতি ১ ছড়া ৫৲, ঐ ২৷৷০ হাতি ৪৲, ঐ ১ হাতি ২৲। বিছেহার চওড়া ছেলা ১ ছড়া ৩৲, ঐ মধ্যম ২৲, ঐ সরু ১৲ (সচিত্র ক্যাটলগ ফ্রি)

কে, স্মিথ এণ্ড কোং

৩৪৪নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

অদ্বিতীয় বাণার গোল্ড মেটেল
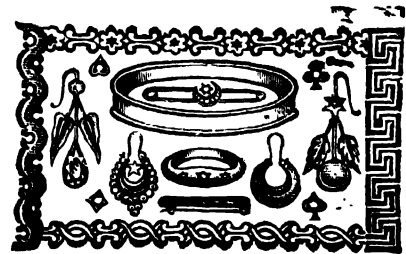
দেখিতে ও কারুকার্য্যে গিনি সোনার গহনার সহিত কোনও প্রভেদ নাই। রং ও পালিস দীর্ঘকাল স্থায়ী। মেটেলের গহনার উপঃ মিনার কার্য্য ও পাথর, চুনি, পান্না, মুক্তা বসান যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই মেটেলে গহনা ব্যবহারান্তে ক্যাস মেমো সহিত ফেরত আনিলে টাকা প্রতি ।০ আনা হিসাবে খরিদ করিয়া থাকি।

মফচেন্ বহু নমুনার ২৲—৩৷৷০ টাকা। ভাটীয়া চুড়ি ১২ গাছা সেট ৩৷৷ টাকা। ভাটীয়া চুড়ি ১০ গাছা সেট ৩৲ টাকা। ভাটীয়া চুড়ি ৮ গাছা সেট ২৲ টাকা। লেচপিন ১৷৷ টাকা, ঐ পাথর সেট ২৲ টাকা। কিলিব ৸০—১।০ পাঁচসিকা। লেডিস রিং ১৲—১।০ টাকা। আর্মলেট ৩৲—৮৲ টাকা।

প্রোঃ—এইচ, পি, ভৌমিক

৯৭।১এ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ষাণ্মাসিক সূচী

১ম বর্ষ—১ম খণ্ড] [মাঘ—১৩৩৯—আষাঢ় ১৩৪০

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

চিত্র-সূচী

BANGASREE—Regd. No. C. 2064.

বঙ্গশ্রী

ট্রেড্‌ল মেশিনের মধ্যে

ফিনিক্স সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

Phœnix is fitted with all the latest improvements and is the strongest and most reliable machine for printing at a profitable cost every kind of plain and art printing.

ছাপাখানার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহাদের সকলেই **রেকর্ড মেসিনের** কদর জানেন। মুদ্রণ-যন্ত্র-ক্ষেত্রে রেকর্ডই শেষ কথা। নূতন ও পুরাতন প্রেস-ব্যবসায়ীরা সকলেই রেকর্ড কিনিয়াছেন ও কিনিতেছেন। আমাদের শো-রুমে আসিলে ইহার কারণ আপনিও বুঝিবেন।

ইণ্ডো-সুইস্ ট্রেডিং কোং

২, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।

MULLICK FLUTE

উচ্চ শ্রেণীর

গায়ে মাখিবার সাবান
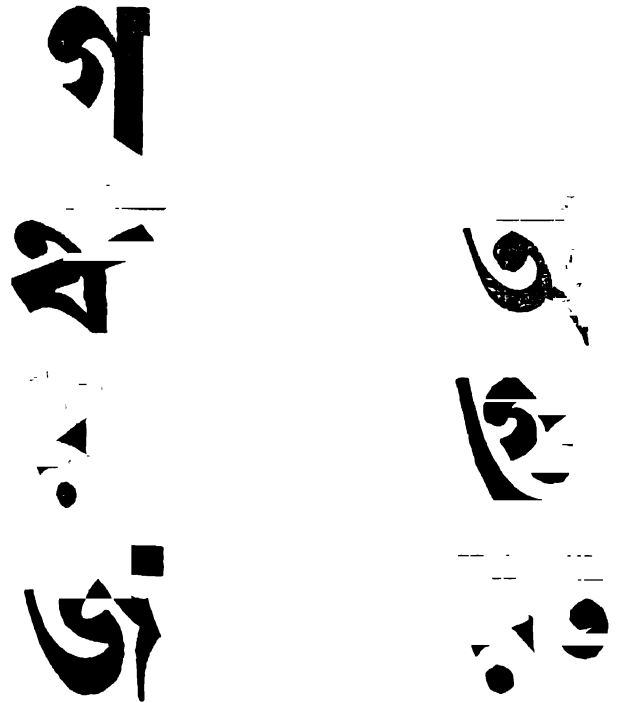
উপহারে ও ব্যবহারে

বাংলার ঘরে ঘরে

আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্

২৮, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীমার্কা গব্যঘৃত

বিশুদ্ধতায় ও পবিত্রতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

কিনিবার সময়

সূর্য্যাঙ্কিত ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন

চিত্রসূচী—ভাদ্র

জন্মাষ্টমী (ত্রিবর্ণ) শ্রীনন্দলাল বসু
প্রাসাদ ও কুটীর „ শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন (পূর্ণ পৃষ্ঠা)

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা ভাদ্র—১৩৪০

বিষয়-সূচী

নভস্যে বা—

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ১৭শ শ্লোক।

পীড়ন-অত্যাচারের মধ্যে, কারাগারের অন্ধকারে যে দেবতার জন্ম, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অবসাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে তিনিই বলিয়াছিলেন, সাধুদের পরিত্রাণের, দুষ্কৃতদের বিনাশের এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে তাঁহার অভ্যুদয়। শ্রীকৃষ্ণজন্মের পূর্ব্বে সমস্ত ভারতভূমি পিশাচের লীলাভূমি হইয়াছিল, অত্যাচারে অত্যাচারে সাধারণ মানুষও ন্যায় অন্যায়ের বোধ হারাইয়া প্রলয়ের আশঙ্কায় দিন গণিতেছিল, দুষ্টদের পাপে ধরণী পীড়িতা হইয়াছিলেন: ধন-জন পরিজন লইয়া কাহারও শান্তি ছিল না। প্রবলের পীড়নে দুর্ব্বলেরা অরণ্য ও পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া ঘৃণিত পশুর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সাধুরা দেশের ও জাতির মুক্তির জন্য দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়া অধীর আগ্রহে তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা বিফল হয় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দিনী দেবকীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়া গ্রাম্য গোপালকদের মধ্যে শৈশব অতিবাহিত করিয়া কংসবধ, জরাসন্ধবধ, শিশুপালবধ ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাজ শেষ হইতেই তিনি দেহরক্ষা করিলেন। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু টিকিল না। অন্যায় ও পাপ আবার মাথা তুলিয়া পীড়ন সুরু করিল। দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদে ও হাহাকারে আবার গগনমণ্ডল মুখর হইয়া উঠিল। সেই পুণ্য ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথি বহু সহস্রবার আসিল এবং চলিয়া গেল, বৎসরে বৎসরে আমরা উৎসব করিলাম, দেবতা কিন্তু প্রসন্ন হইলেন না। দুষ্টেরা বিনষ্ট ও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল না।

কারণ, সাধুরা আর তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে নাই। সেদিনকার পুণ্যাত্মাদের মত তাহারা বলিতে পারে নাই—

হে দেবতা জাগ্রত হও।

বিভীষিকাময়ী রজনী সমুপস্থিত। অবিশ্রান্ত বারিপাতে কর্দ্দম-পিচ্ছিল পথ, মুহুর্মুহু বিদ্যুতে ও মেঘগর্জ্জনে আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মনে হইতেছে যেন প্রিয় পরিজনের কাঁচা মাংস ও তপ্ত রক্তের উপর দিয়া চলিতেছি। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া আছে। সকলেরই নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইতেছে, যেন আর কেহ নাই। অন্ধকারে আমারই মত আর যাহারা চলিতেছে তাহাদের সহিত মুখামুখি হইলেই হিংস্র পশুর মত পরস্পর চাহিয়া দেখিতেছি, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার বাসনা, অথচ যেন পরস্পরকে আঘাত না করিয়া, হনন না করিয়া চলিবার উপায় নাই।

রাক্ষস কংসের অনুচরেরা অন্ধকারে পাগলের মত ঘুরিতেছে, তাহাদের চোখেও ঘুম নাই। আমরা তাহাদের বন্দী—আমাদের লাঞ্ছনার সীমা নাই। তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না। রুদ্ধনিশ্বাসে ভীত শঙ্কিত প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি- হে দেবতা, জাগ্রত হও।

পাপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, জননীর বক্ষে স্তন্য নাই—ক্ষুধিত শিশুরা ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতেছে। অসহায়া নারীদের আর্ত্তনাদে কর্ণ বধির হইয়া গেল। এত আঘাত সহ্য করিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি। তোমার প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে। শাসনে পীড়নে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়াছে। হে অন্ধকারের দেবতা, হে কৃষ্ণ, তুমি জাগ্রত হও।

আশা আছে, ভগবান আবার আবির্ভূত হইবেন। লাঞ্ছনাপূত সাধু অন্তঃকরণ লইয়া আমরা একদিন তাঁহাকে ডাকিব, সেদিন আমাদের আহ্বান বিফলে যাইবে না। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় বিমূঢ়া শবরীর মত আমরা বসিয়া আছি। হে দেবতা, হে কৃষ্ণ, তুমি জাগ্রত হও।

— জন্মাষ্টমী, ২৭শে শ্রাবণ।

জন্মাষ্টমী

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি, ভাদ্র মাস,
শশিহীনা নিশি নিরন্ধ্র কালো কৃষ্ণমেঘে—
কংস-কারায় বন্দীরা ফেলে তপ্তশ্বাস,
ঝলসে গগন, মাতাল পবন বহিছে বেগে।
আঁধার বসনে ঝলমল করে জরির পাড়,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

বনে বনে গাছে শাখায় পাতায় শ্বসিছে বায়ু,
পাষাণ-পুরীর রুদ্ধ দুয়ারে হানে আঘাত,
ঘুমায় কংস, মথুরা-পতির ফুরায় আয়ু,
গরজায় মেঘ ক্ষণে ক্ষণে হয় বজ্রপাত;
গগনে পবনে মেঘে বিদ্যুতে এক-আকার,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

প্রসব-ব্যথায় ধূলায় লুটায় দেবকী-মাতা,
পিতা বসুদেব, চরণে হস্তে বাজে শিকল;
তিমির-বিদারী দেবতা, কংস-ভয়ত্রাতা
হবে ভূমিষ্ঠ, মহাকাল-গতি ভয়ে বিকল।
শিকলে শিকলে শুধু ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

সহসা উঠিল আলো অপরূপ উদ্ভাসিয়া,
মৃতের নয়নে জ্বল জ্বল করে অমৃতভাতি,
দেবকী-মাতার দুই আঁখি জলে যায় ভাসিয়া,
পিতা বসুদেব ভাবেন প্রভাত তিমিররাতি।
আলো কোলে নিয়ে যেন তিমিরের এ অভিসার·
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

প্রাবৃটনিশার আকাশের শশী ভূতলে নামে,
পিতা বসুদেব ইষ্টের নাম জপেন ভয়ে,
দেবকী-মাতার কোলের কাছেতে সে আলো থামে,
আলেয়ার মত ভেসে ভেসে চলে নন্দালয়ে।
হাসে শিশুচাঁদ তবু কোল খালি যশোদা মা'র,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

কংসকারায় কৃষ্ণজননী মূর্চ্ছাতুরা,
স্বপ্নাবিষ্ট পিতা বসুদেব জাগিয়া বসে,
উঠিয়া দাঁড়ায় করে প্রমত্ত এ কোন্ সুরা,
এক নিমিষেই হাতের পায়ের শিকল খসে।
চকিতে খোলে যে অন্ধ কারার পাষাণ-দ্বার –
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

ভগবান-ক্রোড়ে ভয়ার্ত্ত পিতা বাহিরে আসে,
মূর্চ্ছাভঙ্গে ব্যাকুলা জননী দাঁড়ান দ্বারে।
অষ্টমী তিথি, মেঘে বিদ্যুতে ঝটিকাশ্বাসে
রজনী ভীষণা, বিরামবিহীন বৃষ্টিধারে।
নিজে ভগবান ব্যাকুল পিতারে করান পার—
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

প্রগাঢ় তিমিরে ঘুমান কৃষ্ণ পিতার কোলে,
মত্ত পবন মেঘ ও অশনি হাঁকিছে শিরে।
প্রসব-ব্যথায় যেন চরাচর ব্যাকুল দোলে,
স্খলিত নৃত্যে পৌঁছিবে শেষে আলোর তীরে।
যশোদার ক্রোড়ে নিয়ে যেতে হবে গোপালে তাঁর,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

নগরশোভা ভাস্কর্য্য ও কলিকাতার কতকগুলি ভাস্কর্য্য

ভাস্কর্য্য দ্বারা নগরের শোভাবর্দ্ধন অতি প্রাচীন রীতি। প্রাচীন গ্রীসেই ইহার সমধিক প্রচলন ছিল, এবং প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষে ও অন্য দেশে স্বাধীন ভাবে এই রীতি প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া মনে হয়। মিসর, বাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন দেশের মন্দির গাত্র নানা মনোহর ভাস্কর্য্য দ্বারা অলঙ্কৃত। দেব-মন্দির প্রস্তুত করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য্য বা খোদাই কাজ দিয়া তাহার অলঙ্করণ একটি অবশ্য কর্ত্তব্য আনুসঙ্গিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। গ্রীসেও বাস্তুশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুর অলঙ্করণস্বরূপ ভাস্কর্য্যেরও দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। মন্দিরগাত্রাবলম্বী এই সমস্ত ভাস্কর্য্য প্রথম প্রথম মুখ্যতঃ দেবতাদের লীলা অবলম্বন করিয়া হইত। মিসর এবং বাবিলন প্রভৃতি দেশের মন্দিরগাত্রে রাজাদের কীর্ত্তি-কলাপও স্থান পাইত। এতদ্ভিন্ন পৃথক্ ধাতু ও প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণের রীতিও প্রচলিত হয়—যেমন, মন্দিরে রক্ষিত দেব-মূর্ত্তি, বা নগরের কোনও প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত দেবতার বা রাজার মূর্ত্তি। রাজার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা যেন কতকটা ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান হিসাবেই হইত—রাজা ছিলেন দেবতার প্রতীক বা স্থলাভিষিক্ত, 'মহতী দেবতাহেষা নররূপেণ সংস্থিতা'। রাজমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা যেন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠারই সমশ্রেণিক ব্যাপার ছিল। আদিম অবস্থায় সকল জাতির মধ্যেই এইরূপ মূর্ত্তি স্থাপন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মমূলক ব্যাপার ছিল। দুইটি জিনিস আসিয়া ইহাকে ধর্ম্মবেদি হইতে বিচ্যুত করিয়া সাধারণ অলঙ্করণ-শিল্পের অথবা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক শিল্পের কক্ষায় আনয়ন করে. সেই দুইটি হইতেছে—প্রথম, দেবতার পরিবর্ত্তে রাজার মূর্ত্তি অথবা অন্য কোনও মানুষের মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার লীলাবিষয়ক চিত্র বা ভাস্কর্য্যের পরিবর্ত্তে ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিক-পৌরাণিক-মিশ্র অথবা মানবিক ব্যক্তি বা আখ্যানের চিত্র বা ভাস্কর্য্য দ্বারা মন্দিরের অলঙ্করণ, এবং দ্বিতীয়—রীতিমত পূজার উদ্দেশ্যে মন্দিরে যে ভাবে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়, সে ভাবে না করিয়া নগরের মধ্যে যাহাতে নিজ নিজ বিষয়কর্ম্ম-

সহমরণের দৃশ্য [১]
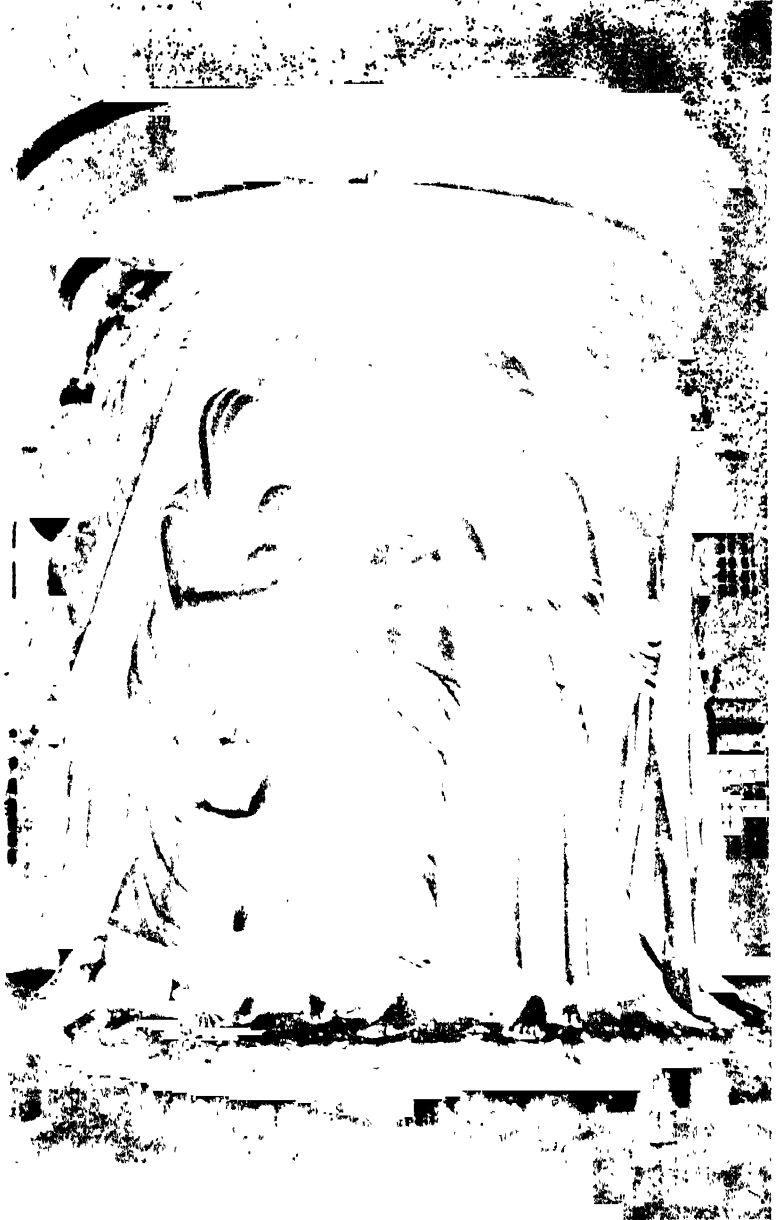
রত নাগরিকগণের নেত্রপথে সর্ব্বদা দেবমূর্ত্তি বা দেবোপম পুরুষের মূর্ত্তি থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্য লইয়া পথিপার্শ্বে অথবা নগরচত্বরে দেবমূর্ত্তি বা মহাপুরুষের মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। এইরূপ মূর্ত্তি ক্রমে ধর্ম্মভাব জাগরিত না করিয়া নাগরিকগণের সৌন্দর্য্যবোধের উদ্বোধক মাত্র হইয়া দাঁড়াইল, নগরশোভাবর্দ্ধক মাত্র হইয়া দাঁড়াইল—শিল্পের আদিম উদ্দেশ্য নূতন পথে ধাবিত হইল।
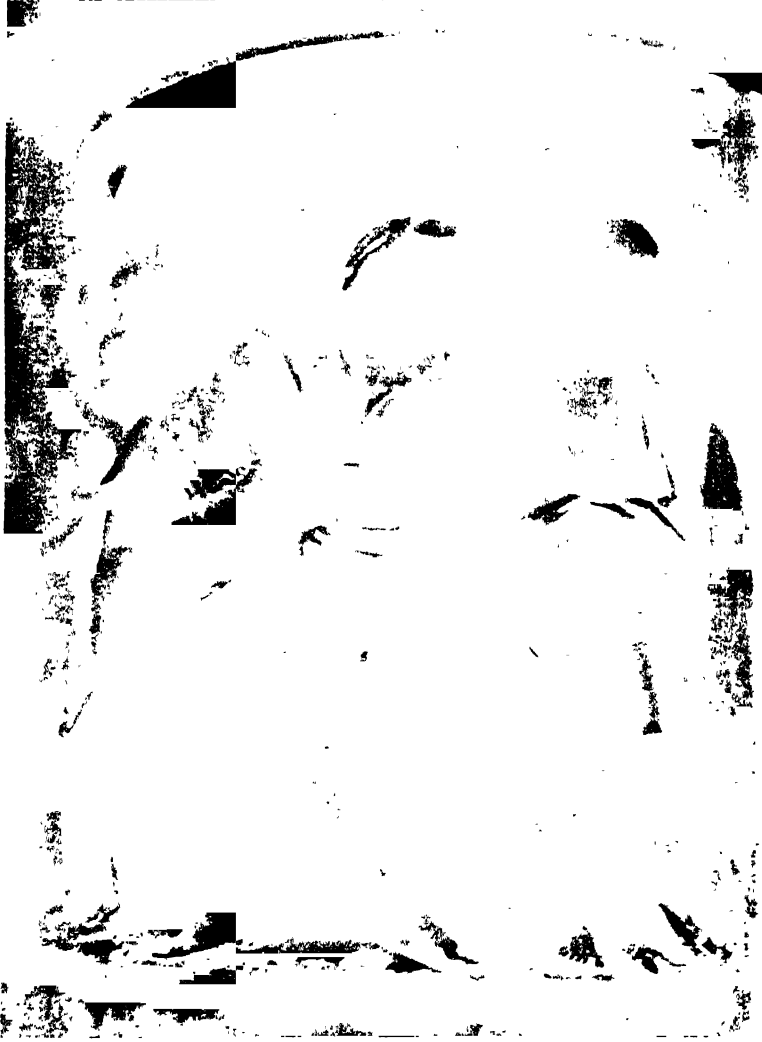
সহমরণ দৃশ্য [২]

রাস্তার ধারে বা নগরের চত্বরে দেবতাদের তথা বড়লোকের ও রাজা-রাজড়া প্রভৃতির মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, অর্ব্বাচীন যুগের গ্রীক এবং গ্রীকের অনুকারী রোমান সভ্যতার একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। নগর চত্বরে, পথের ধারে, সাধারণের জন্য নির্ম্মিত গৃহে গ্রীসে এক সময়ে কেবল Hermes হের্মেস দেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হইত—মানুষের আকারের একখণ্ড লম্বা পাথরকে চৌকা করিয়া কাটিয়া খাড়া করিয়া রাখা হইত, এবং এই পাথরের উপরিভাগটুকু কুঁদিয়া হের্মেস্ দেবতার আবক্ষ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইত। এইরূপ মূর্ত্তিকে Hermes দেবতার নাম হইতে ইংরেজীতে herm বলা হয়। এই herm-এর অনুকরণে দেশের মহাপুরুষদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। পরে চৌকা স্তম্ভাকারে পাথরের উপরের দিকে আবক্ষ মূর্ত্তি না করিয়া পূরা মূর্ত্তি গড়িয়া মহাপুরুষদের প্রতি সম্মাননা দেখাইবার রেওয়াজ আসিয়া যায়। কথিত আছে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে আথেন্স নগরীতে Harmodios হার্মোদিওস ও Aristogeiton আরিস্তোগেইতোন নামে দুই জন যুবকের সম্পূর্ণ প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়—এই দুই যুবক Hipparkhos হিপ্পারখোস নামক একজন অত্যাচারী শাসককে হত্যা করে এবং নিজেরাও এই কার্য্যে নিহত হয়। পরে আথেন্সনগরবাসীগণ এই ব্যাপারের স্মৃতি চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ইহাদের মূর্ত্তি স্থাপন করে। কোনও পৌর ঘটনার স্মারক হিসাবে মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রথম এইরূপে করা হইয়াছিল। গ্রীসের দেখাদেখি রোমের লোকেরা এই রীতি গ্রহণ করে এবং ইহার ধারা বরাবর গ্রীকো-রোমান ইউরোপে বিদ্যমান ছিল। পরে ষোড়শ শতকে গ্রীক সাহিত্য ও শিল্প আলোচনার ফলে ইউরোপে যে পুনর্জাগৃতি ঘটে, সেই পুনর্জাগৃতির ফলে ইউরোপে ভাস্কর্য্য দ্বারা নগরের শোভাবর্দ্ধনের খুব ঘটা পড়িয়া যায়। এই নবীন পুনরুজ্জীবিত ধারা এখন ইউরোপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এবং এই ধারা ইংরেজরা আমাদের দেশে আনিয়া, প্রতিকৃতিময় মূর্ত্তি ও নগর অলঙ্করণ স্বরূপ ভাস্কর্য্য দ্বারা আপনাদের সাম্রাজ্যের গৌরব-বর্দ্ধন করিতেছে।

ভারতবর্ষে আর্য্যদের মধ্যে দেবতার মূর্ত্তি গড়ার রীতি সুপ্রচলিত ছিল না, প্রধানতঃ আগুনে হোম করিয়া আর্য্যদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সাধিত হইত,—মূর্ত্তিপূজার রেওয়াজ ছিল না। এদেশের মূর্ত্তিশিল্প এবং অন্য সমস্ত শিল্প মুখ্যতঃ অনার্য্যের (সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতির) সৃষ্টি বলিয়া অনুমিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার কতকগুলি যক্ষ ও অন্য দেবতার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি মানবাকারের বা অতিকায়,—সেগুলি হইতে প্রাচীন ভারতে এই প্রকার প্রতিকৃতিময় ভাস্কর্য্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ভাসরচিত 'প্রতিমা' নাটকখানি যদি যথার্থই প্রাচীন হয়, তাহা হইলে মৃত রাজার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার স্মারক

হিসাবে রক্ষা করিবার নিয়ম ভারতে যে ছিল, সে সম্বন্ধে ভাল প্রমাণ আমরা পাই। মহারাজ কণিষ্কের এক বৃহৎ প্রস্তরময় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, মূর্ত্তিটি এখন মথুরার সংগ্রহশালায় রক্ষিত; মস্তকটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চাপকানের মত পোষাক পরা, পায়ে খুব বড় জুতা আঁটা রাজার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি, সমগ্র মূর্ত্তিটি ধরিয়া জানুদেশে ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজা কণিষ্কের নাম ও বিরুদাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি গ্রীক প্রভাব সম্ভূত হইতে পারে। নগর চত্বরে বুদ্ধমূর্ত্তি বা জিনমূর্ত্তির বা অন্য দেবতার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা নগরশোভাবর্দ্ধক স্বরূপ প্রাচীন ভারতে ছিল। মধ্যযুগের ভারতেও প্রতিকৃতিময় ভাস্কর্য্য নগরশোভাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইত। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

কলিকাতায় ইংরেজদের চেষ্টায় যে সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি যে ইংরেজদেরই হইবে, ইহা স্বাভাবিক। এই সকল মূর্ত্তির দেখাদেখি ভারতীয় বড়লোকদেরও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইউরোপের নানা দেশের নগরগুলিতে প্রতিকৃতি ভিন্ন অন্য নানা প্রকারের ভাস্কর্য্যদ্বারা অলঙ্করণ সাধিত হয় — কোথাও বা দেশের প্রাচীন অথবা অর্ব্বাচীন ইতিহাসের কোনও কথা লইয়া খোদিত চিত্র অথবা মূর্ত্তিসমূহ নির্ম্মিত হয়, কোথাও বা জাতির নৈতিক আদর্শ বা পৌর জীবনের নানা বিষয়ের প্রতীকস্বরূপ কল্পিত বহু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। জাপান, শ্যাম প্রভৃতি এশিয়ার স্বাধীন জাতি, যাহাদের মধ্যে মূর্ত্তি-শিল্পের বিশিষ্ট ধারা বিদ্যমান, তাহারাও জাতীয় ইতিহাস ও ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জাতীয় শিল্পের রীতি অনুসারে পরিকল্পিত মূর্ত্তি ও অন্য ভাস্কর্য্য দ্বারা নগরের শোভাবর্দ্ধন করে। আমাদের ভারতবর্ষে অধুনাতন কালে এ বিষয়ে আমরা তাদৃশ অবহিত হইবার সুযোগ পাই নাই।

সহমরণ দৃশ্য [৩]

ভারতবর্ষের কোনও নগরের অলঙ্করণ ভারতীয়দেরই হস্তে ন্যস্ত থাকিলে এবং সেই অলঙ্করণ কার্য্যের জন্য যথোচিত অর্থ পাওয়া গেলে, আমাদের দেশের দৈতিকথা ও ইতিহাস অবলম্বনে কত না সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্য-চিত্র আমাদের নগরগুলিকে শোভাযুক্ত করিতে পারিত। মহাভারত, রামায়ণের কথা, পৌরাণিক কথা, বুদ্ধ-চরিত, অশোক-চরিত, গুপ্ত রাজগণের ইতিহাস, রাজপুত রাজাদের ইতিহাস, দক্ষিণ ভারতের নানা ঐতিহাসিক চরিত্র ও উপাখ্যান, আকবর ও মোগল রাজাদের চরিত্র,—এইরূপ সব বিষয় অবলম্বন করিয়া ভারতের ভাস্কর ও শিল্পিগণ ভারতের শিল্প-সরস্বতীর কত না অভিনব প্রকাশ আমাদের লোকচক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিতেন! এইরূপে নিজ শিল্প-বৈশিষ্ট্যে ভারতীয় নগরগুলি জাতীয় মর্য্যাদাবোধে সহায়তা করিত, বিদেশী আগন্তুকগণেরও প্রীতি ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারিত। কিন্তু অবস্থা-বৈগুণ্যে পড়িয়া, শিক্ষা, সুরুচি ও অর্থবল তিনেরই অভাবে এসব কিছু হইল না। কলিকাতায় এখন বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মারক-স্তম্ভ ও মন্দির প্রস্তুত হইতেছে। ভারতীয় শিল্পীর হাতে বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কতকগুলি ভাস্কর্য্য-চিত্র দ্বারা অনায়াসে এই স্মৃতি-মন্দিরকে আরও সৌষ্ঠব-যুক্ত করা যাইত।

পিত্তলে ঢালাই কাজ আমাদের দেশে অতি সুন্দর হয়- বিশিষ্ট বাঙ্গালী বা ভারতীয় ঢঙ্ বজায় রাখিয়া দেশী কারিগরের দ্বারায় তৈয়ারী ধাতুমূর্ত্তি বা ঢালাই-করা খোদিত-চিত্র দ্বারা আমাদের দেশের মহাপুরুষদের স্মৃতি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে নবদ্বীপে রাধারমণ-কুঞ্জে ৺চরণদাস বাবাজীর যে বৃহদাকার পিত্তলময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

যুদ্ধ [১]

হইয়াছে, তাহার গঠন নৈপুণ্য ও বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পানুমোদিত ভাব বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য এ কথা ভাবিয়া ও বলিয়া আনন্দ ও গর্ব্ব হয় যে, এইরূপ সুন্দর মূর্ত্তি নবদ্বীপেই বাঙ্গালী কারিগরের পরিকল্পিত এবং বাঙ্গালী কাঁসারীর হাতে ঢালাই করা এইরূপ মূর্ত্তি কলিকাতার যে-কোন বাগান-বাগিচাকে যেন আলো করিয়া রাখিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জারমানি, ইটালী প্রভৃতি দেশে যেমন সাধারণের জন্য নির্ম্মিত উদ্যানাদিতে 'স্বাধীনতা', 'শক্তি', 'সত্য', 'জাগৃতি' প্রভৃতি গুণাবলীর প্রতীক-স্বরূপ মূর্ত্তির ছড়াছড়ি, ইউরোপীয় পুরাণ ও ইতিহাসের পাত্রপাত্রীগণের মনোহর প্রতিমা এবং পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দৃশ্যের সুন্দর সুন্দর খোদিত চিত্র যেমন অতি সহজেই শিল্পের সাহায্যে দেশের জনগণের সমক্ষে জাতির আদর্শ এবং অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান দেশাত্মবোধ ও দেশাভিমানকে প্রকাশ করিতেছে, তদ্রূপ আমাদের দেশেও হওয়া উচিত ছিল, রামচন্দ্রের, বেহুলা লখিন্দরের, প্রতাপাদিত্যের কথা, চৈতন্যদেবের জীবনী কথা, বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রার কথা, দীপঙ্করের তিব্বতযাত্রার কথা এবং বাঙ্গালীর ঘরোয়া জীবনের ব্যাপার প্রভৃতি বহু বহু বিষয় অবলম্বন করিয়া কত না মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্য আমাদের বাঙ্গালার (তথা ভারতের অন্য প্রদেশের) নগর-গুলির শোভা-বর্দ্ধন করিতে পারিত। হয়তো ভবিষ্যতে করিবে। শ্যামদেশের রাজধানী বাঙ্কক নগরে দেখিলাম—পুরাতন রাজপ্রসাদের সম্মুখে স্থিত বিরাট চত্বরের এক পার্শ্বে একটী মন্দির-চূড়ার মত আবরণের মধ্যে 'নাং থরনী' অর্থাৎ ধরণী পৃথিবী-দেবীর ধাতুময় মূর্ত্তি, —শ্যামদেশীয় শিল্পের অনুযায়ী অতি সুন্দর একটি প্রতিমা, শ্যামের জাতীয় আত্মা যেন মূর্ত্ত হইয়া ইহাতে প্রতিফলিত, রাজকীয় সংগ্রহ শালার সামনে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রামচন্দ্রের ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি; শিল্প ও কারিগরীর সরকারী বিদ্যালয়ের ফটকের মাথায় উপবিষ্ট বিশ্বকর্ম্মার ব্রঞ্জ মূর্ত্তি, ফিয়াথাই রাজবাটীর উদ্যানে ফোয়ারার মধ্যে শঙ্খহস্তে দণ্ডায়মান বরুণের ধাতু-মূর্ত্তি—যখন এগুলি দেখিলাম, তখন এই প্রকারের কোনও কিছু আমাদের ভারতীয় নগরগুলিতে নাই সে কথা স্মরণ করিয়া বাস্তবিকই লজ্জায় অধোবদন হইতে হইয়াছিল।

ইংরেজেরা আমাদের দেশে যে কতকগুলি মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছে, সেগুলি একাধারে তাহাদের জাতীয় গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য, ও তাহাদের প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের জন্য, এবং এই গৌরব এদেশের সম্পর্কে অর্জ্জিত বলিয়া, তাহাদের শুসঙ্গতি-বোধ এবং গ্রীক ও রোমান জাতি হইতে লব্ধ তাহাদের সৌন্দর্য্য-বোধের ফলে তাহারা এই সমস্ত মূর্ত্তির অলঙ্করণ ভারতের জীবনের ঘটনা (অবশ্য তাহাদের চোখে যেমন লাগিয়াছে) একেবারে বর্জ্জন করে নাই।

কলিকাতার সাধারণ স্থানে যে সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সে-গুলির মধ্যে কতকগুলি শিল্পকলা হিসাবে বাস্তবিকই সুন্দর – সেগুলি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের কৃতি। অনেক সময়ে এগুলি আমরা মোটেই লক্ষ্য করি না – বা চোখে দেখিলেও এগুলি আমাদের মনকে নাড়া দেয় না বা আকৃষ্ট করে না। পার্ক-ষ্ট্রীটের মোড়ে চৌরঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত আউট্‌রামের অশ্বারোহী প্রতিমূর্ত্তি এই জাতীয় মূর্ত্তির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত; এইরূপ মূর্ত্তির মনোহারিত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন। ইংরেজ ভাস্কর John Henry Foley R. A. কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল এবং, ১৮৭৪ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাস্কর ফোলি ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭৪ সালে মারা যান। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত লর্ডক্যানিং ও লর্ড হার্ডিঞ্জ এর অশ্বারোহী মূর্ত্তিদ্বয়ও ইঁহার প্রস্তুত। এতদ্ভিন্ন বিলাতে ইঁহার তৈয়ারী অনেক প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি আছে।

আর একজন ইংরেজ ভাস্করের কতকগুলি মূর্ত্তি কলিকাতার শিল্পসম্পদের মধ্যে অন্যতম—এই মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে ইঁহার একটি ভাস্কর্য্যের তিনখানি চিত্র প্রদর্শিত হইল। Sir Richard Westmacott ১৭৭৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১৮৫৬ সালে দেহত্যাগ করেন। ইনি বিখ্যাত ইটালীয় ভাস্কর Canova কানোভার ছাত্র ছিলেন। চিত্রণ-পদ্ধতি ও ভাস্কর্য্য-রীতি বিষয়ে ইনি নিজ গুরুর ন্যায় প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের অনুকারী ছিলেন। বহু পদস্থ ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি এবং নানা ঐতিহাসিক ও অন্যবিধ ঘটনার তথা কাল্পনিক দৃশ্যের ভাস্কর্য্য-চিত্র ইনি প্রস্তুত করেন। ইংলণ্ডে বহু স্থানে ইঁহার রচিত অনেক মূর্ত্তি আছে। কলিকাতায় ইঁহার প্রস্তুত দুইটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটী হইতেছে শ্বেতপাথরে প্রস্তুত ওয়ারেন্ হেস্টিংস্-এর মূর্ত্তি—মূর্ত্তির পাদপীঠের দুই ধারে দুইজন ভারতীয় বিদ্বানের মূর্ত্তি, মূর্ত্তির দক্ষিণে দণ্ডায়মান পুঁথি হাতে চিন্তা-নিমগ্ন ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি এবং মূর্ত্তির বামে উপবিষ্ট গ্রন্থপাঠনিরত মুসলমান মৌলবীর মূর্ত্তি। এই দুইটী মূর্ত্তিই অতি সুন্দর—বিশেষ সহানুভূতির ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত পরিকল্পিত, ও অতি নিপুণ হস্তে খোদিত। এই মূর্ত্তি-দ্বয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গৃহের পশ্চিম প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত আছে। আর একটী হইতেছে ব্রঞ্জে লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর মূর্ত্তি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাটীর উত্তরে, টাউন হলের দিকে মুখ করিয়া এই মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। বেন্টিঙ্ক-এর আমলে আইন করিয়া সতীদাহ-প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া এই মূর্ত্তির স্তম্ভাকার পাদপীঠে সতীদাহের বিষয় অবলম্বন করিয়া ব্রঞ্জে ঢালা চমৎকার একটী চিত্র আছে। এই চিত্রটী বাস্তবিকই অতি সুন্দর। পাদপীঠের আকার অনুসারে গোলাকারে গঠিত বলিয়া তিন দিক হইতে তিনখানি ছবি লইয়া ইহা প্রদর্শিত হইল। দৃশ্যটী উত্তর ভারতের। মধ্যে চিত্রটীর প্রধান পাত্রী—সহগমনের জন্য প্রস্তুত জনৈক তরুণী বিধবা দণ্ডায়মানা. বিধবার মস্তকের ঊর্দ্ধে সু-উচ্চ চিতার উপরে শায়িত তাহার মৃত পতির বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ দেখা যাইতেছে। বিধবার সমস্ত ভঙ্গীতে একটা অপার্থিব আত্ম-ভোলা ভাব সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিধবার বামপার্শ্বে গভীর বিষাদ ও সহানুভূতির ভাবে রাজপুতের বেশে একজন বর্ষীয়ান অস্ত্রধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া—সম্ভবতঃ বিধবার পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি যেন মেয়েটীকে সহগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মৃদু ভাষায় অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন। সম্মুখে একজন আত্মীয়া বিধবার দুইটী পুত্রকে লইয়া—কোলের শিশুটী মায়ের কাছে ঝাঁপাইয়া যাইতে চায়, কিন্তু মাতার সেদিকে লক্ষ্য নাই, আর একটী শিশু সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ও মায়ের স্তব্ধ উন্মাদিনীবৎ ভাব দেখিয়া সভয়ে পিসী বা মাসীর কাছে আশ্রয় লইতেছে—সন্তানের প্রতি মায়ের আর যেন স্নেহ-মমতা বা কোনও আকর্ষণ নাই। শিশু দুইটী একেবারে রেনেসান্স বা পুনর্জাগৃতির যুগের ইটালীয় শিল্পের ঢঙ্গে গঠিত হইয়াছে। চিত্রটির দক্ষিণ ভাগে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ পুঁথি-হাতে ব্রাহ্মণের কাঁধে হাত রাখিয়া তাঁহাকে যেন উৎকণ্ঠিত ও কাতর ভাবে কোনও প্রার্থনা জানাইতেছে। ব্রাহ্মণের মুখ বিষণ্ণ, ও চিন্তাযুক্ত, এই ভীষণ ব্যাপারে অবিচলিত ভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিয়া যাইবেন—অথচ যেন তাঁহার মন এই কার্য্যে সায় দিতে চাহে না। বামদিকে দুইজন ভৃত্য-শ্রেণীর পুরুষ কাঠ ও খড় আনিয়া উচ্চ চিতা আবৃত করিয়া দিতেছে—ইহারা যেন হুকুমের দাস, কোনও ভাবনা চিন্তা না করিয়া যেন যন্ত্রচালিতবৎ নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া যাইতেছে,--কিন্তু ইহাদের মুখেও একটা বিষণ্ণ ভাব পরিস্ফুট। আসন্ন নিষ্ঠুর ও হৃদয় বিদারক ঘটনার কৃষ্ণচ্ছায়া সমস্ত চিত্রখানিতে যেন পরিব্যাপ্ত। সাতটি মূর্ত্তির প্রত্যেকটি এক একটি বিশিষ্ট ভাবে অনুপ্রাণিত, এমন কি শিশু দুইটির মধ্যেও পৃথক্ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। মূর্ত্তিগুলির সুন্দর সুষম গঠন এবং অপূর্ব্ব ভঙ্গী-লাবণ্য লক্ষণীয়, এবং classic শিল্পের একটী বিশেষ গুণ—ইহার আত্ম-সমাহিত শুদ্ধ সংযত ভাব খোদিত চিত্রখানিতে পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত পাইয়াছে। শিল্পী ওয়েস্টম্যাকট্ বিশেষ দরদ দিয়া, এমন কি, যে-জাতির মধ্যে বিদ্যমান এই নিষ্ঠুর ব্যাপারটির চিত্র তিনি আঁকিতেছেন তাহার সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধাভাবও লইয়া, এবং পুরা গ্রীক ও রোমান দৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই ভাস্কর্যটি গঠিত করিয়াছেন। ইহাতে ভারতের সম্বন্ধে জুগুপ্সার ভাবের কোনও ইঙ্গিত নাই। এই রূপ ভাস্কর্য বাস্তবিকই নগরের শোভা-বর্দ্ধক।
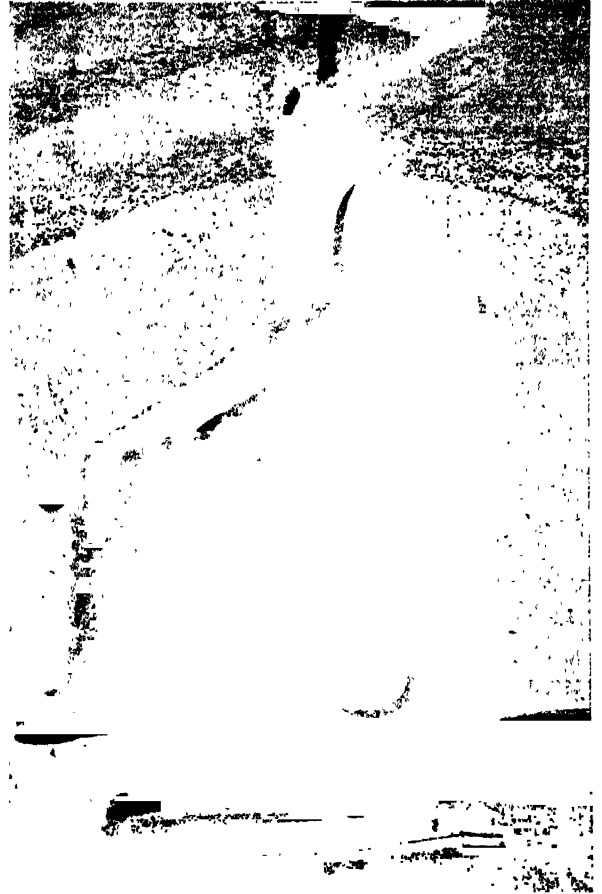
যুদ্ধ [২

বিজয়দেবী

কলিকাতা ময়দানে রেড-রোডের ধারে স্থাপিত লর্ড রবার্ট্‌স্‌-এর প্রতিমূর্ত্তি সকলজন বিদিত। এটিও একটি সুন্দর মূর্ত্তি। লর্ড রবার্ট্‌স্‌ বহু বৎসর ধরিয়া জঙ্গী লাটের কাজ করেন, আফগান সীমান্ত যুদ্ধে তিনি বিশেষ যশস্বী হন। এই মূর্ত্তিটি Harry Bates নামক ইংরেজ ভাস্করের প্রস্তুত (ইহাঁর জীবৎকাল ১৮৫০—১৮৯৯), এবং ১৮৯৮ সালে ইহা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অশ্বারোহী লর্ড রবার্ট্‌স্‌ আফগান 'পোস্তীন' বা ভেড়ার চামড়ার জামা পরিয়া আছেন। সমগ্র মূর্ত্তিটি ১৮টি কামানের ধাতু গলাইয়া একসঙ্গে ঢালাই হইয়াছিল,—সাধারণতঃ যেমন হয় ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ঢালাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া মূর্ত্তি নহে। পাদপীঠে চারিদিকে ভারতীয় দেশী ও ইংরেজ ফৌজের শ্বেত প্রস্তরে খোদিত চিত্র, এবং পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটি বিরাট মূর্ত্তি—ব্রঞ্জে ঢালা। এগুলিও শিল্পী বেট্‌স্‌-এর কীর্ত্তি। পশ্চিমের মূর্ত্তিটির বিষয়—War বা 'লড়াই', বিশালকায় এক পাঠান যোদ্ধা তরবারী হস্তে একটি পিত্তলের কামানের উপর সদর্পে উপবিষ্ট। যোদ্ধার বাম হস্তে বিরাট ঢাল, মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে সানা বা বর্ম্মস্বরূপ একখানি লোহার জিঞ্জিরের চাদর, এবং পায়ে পাঠানদের বিশিষ্ট চাপ্‌লি জুতা। সমস্তটা লইয়া একটা বীরত্ব গর্ব্ব-দৃপ্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রৌঢ় মানুষের আদর্শ 'লড়াই'-এর উপযুক্ত প্রতীক বটে। ইহার অপর দিকে Victory বা 'বিজয়-দেবী'র মূর্ত্তি। গ্রীক দেবীর আকারে একটি তেজস্বিনী রমণীর মূর্ত্তি, সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া গ্রীক রণপোতের অগ্রদেশে উপবিষ্টা, হস্তে বিজয়মাল্যজড়িত বৈজয়ন্তী পতাকা। 'যুদ্ধ'-মূর্ত্তির উপযুক্ত প্রতিচ্ছন্দ বটে। এই দুইটি মূর্ত্তি অলঙ্করণ-ভাস্কর্য্য হিসাবে খুবই সুন্দর।

কলিকাতায় অন্যান্য যে সমস্ত মূর্ত্তি আছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ভবিষ্যতে সেগুলির এবং ভারতের বাহিরের অন্য দুই এক স্থানের এইরূপ নগর-শোভা-বর্দ্ধক মূর্ত্তির সচিত্র পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

— শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সত্য-মিথ্যা

— বনফুল

শৈশবে রূপকথা চুপ ক'রে শুনতাম
মনে হ'ত ওর বুঝি সব কথা সত্যি,
বড় হয়ে দেখলাম ভাবলাম বুঝলাম
রঙ্‌ করা খালি শুধু মিথ্যেয় ভর্ত্তি।
কৈশোর যৌবনে কাব্য ও বিজ্ঞান
কত শত প'ড়লাম হয়ে উন্মত্ত,
মনে হ'ল বিজ্ঞানে পাওয়া গেল ঠিক জ্ঞান
কাব্যেতে পাওয়া গেল হৃদয়ের তত্ত্ব।
যৌবন ভেঙে গেল প্রৌঢ়ত্বের ঘায়
কাঁচা-পাকা গোঁফ নিয়ে কর্লাম চিন্তা,
অর্থই সার ধন স্বার্থের দুনিয়ায়
মিছিমিছি বুঝিনিকি হায় এতদিন তা'!
জীবনের শেষ ধাপে মরণের দরজায়
আজ বসে' ভাবি আমি জরজর বৃদ্ধ,
মায়াময় পৃথিবীতে কিছু নাই হায় হায়,
থাকে যদি পরপারে আছে তাহা স্নিগ্ধ।
ঈশ্বর দয়াময় করি তাঁর নামগান
তাঁরি কথা অহরহ জাগে মোর চিত্তে
মাঝে মাঝে ভয় হয়, দেখো যেন ভগবান,
তুমিও না শেষকালে হয়ে যাও মিথ্যে।

হরিমতি

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সকালে হস্পিটালে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে আমাকে আসিতে হইয়াছিল। একটা কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার আর একটা ইরিসিপেলাস কেস দেখিয়া হাত ধুইতেছি, কে যেন কাঁধের উপর হাত রাখিয়া একটা ঝাঁকানি দিল। একটু চমকাইয়া মুখ তুলিতেই দেখি, আমাদের শ্যামচরণ অর্থাৎ আমাদের কলেজ-জীবনের উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিক শ্যামচরণ হাজরা। ছেলেবেলা হইতে আই-এস-সি ক্লাস পর্য্যন্ত একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম; তারপর আমি ভর্ত্তি হইলাম মেডিক্যাল কলেজে, শ্যামচরণ বি-এস-সি ফেল করিয়া সসম্মানে পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কে লেজার-কীপারের কাজ করিতেছিল। এই পর্য্যন্ত জানিতাম, তারপর প্রায় আড়াই বৎসরের অসাক্ষাতের পর এই দেখা।

বলিলাম, আরে, শ্যামচরণ, খবর কি?

শ্যামচরণ আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে বারান্দায় আনিয়া বলিল, ভাই, বড় বিপদ!

বিপদ তো দেখিতেছিলাম আমার নিজের, ষ্টুডেন্ট আর পেশেণ্টরা ফ্যালফ্যাল করিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল! কি ভাবিল কে জানে! মনের বিরক্তি মনেই চাপিয়া বলিলাম, তাড়াতাড়ি বল, অনেকগুলো কেস এখনো—

শ্যামচরণ একটু থতমত খাইয়া বলিল, আমারও একটা কেস ছিল।

বলিলাম, বেশ তো নিয়ে এস।

শ্যামচরণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সামনের একটা ট্যাক্সি দেখাইল; একজন বলিষ্ঠ যুবকের কোলে কে একজন শুইয়া আছে। আমি ষ্ট্রেচার পাঠাইয়া রোগিণীকে অপারেশন টেবিলে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া প্রশ্ন করিলাম, কে?

শ্যামচরণ বলিল, আমার একটি আত্মীয়া; কাল রাত্রে হঠাৎ এপোপ্লেক্সীর একটা ষ্ট্রোক—

রোগিণী ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে মোটা-মুটি পরীক্ষা করিয়া হস্পিটালে মেয়েদের জেনারাল ওয়ার্ডে একটা বেডের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। শ্যামচরণকে বলিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাও, যা করবার আমি করছি। বিকেলে আবার এসো—

অনেকগুলি রোগী অপেক্ষা করিতেছিল। আমি তাহাদের লইয়া পড়িলাম।

সেদিন আর সুবিধা হইল না; আমার এসিষ্ট্যাণ্ট সুরেশ-বাবু পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি শ্যামচরণের রোগীকে নিজে দেখিতে পারিলাম না। বৈকালে শ্যামচরণের সঙ্গেও দেখা হইল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অবস্থা খারাপ। আরও নানা খট্‌কা মনে জাগিল। শ্যামচরণের আত্মীয়া? কেমন করিয়া সম্ভব!

বৈকালে অবসর ছিল, শ্যামচরণ আসিলে তাহার সহিত তাহার আত্মীয়াটিকে দেখিয়া বলিলাম, আমার বাসায় চল, এক কাপ চা খাবে, অন্য কথাও আছে।

একথা সেকথার পর প্রশ্ন করিলাম, তোমার আত্মীয়া?

শ্যামচরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, ঠিক নয়, কেন একথা জিজ্ঞেস করছ বল তো?

বলিলাম, কারণ আছে। চিকিৎসার সুবিধার জন্যে হিষ্ট্রীটা একটু শোনা দরকার।

শ্যামাচরণ কবি মানুষ, সরাসরি ইতিহাস বলা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, সে প্রায় একটা গল্প ফাঁদিয়া বসিল।

* * * *

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। চাকুরীতে সদ্য মাহিনা-বৃদ্ধি হইয়াছে, গৃহিণী এবং হিতৈষী বন্ধুজনেরা সৎ পরামর্শ দিলেন, নিজে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিতে। গৃহিণীর পিত্রালয়ে ঘরের সংখ্যা কম, তাঁহার অসুবিধা হইতেছিল। স্বাধীনতা এবং আহারের সুবিধা কোন্‌টার ওজন বেশী তখনও স্থির করিতে পারি নাই, তথাপি একটা বাসা ভাড়া করিলাম এবং একদিন শুভলগ্ন দেখিয়া বেলেঘাটাস্থিত পিত্রালয় হইতে গৃহিণীকে ট্যাক্সি যোগে নেবুতলাস্থ পতিগৃহে লইয়া আসিলাম। গৃহিণীর বড় মাসী নূতন সংসার পাতিবার সাহায্যার্থে সঙ্গে আসিলেন। আমার প্রথম পুত্র, আমার প্রিন্স অব ওয়েলসের (wails!) রথাগ্রচূড়া তখন সবেমাত্র দেখা গিয়াছে, স্বশরীরে আসিতে তখনও তাহার পাঁচ সাত মাস বিলম্ব।

মাহিনায় না কুলাইলেও এই অবস্থায় গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য রাঁধুনী বামুন হোক, বা দিনরাতের ঝি বা চাকর হোক, একজন লোক আবশ্যক। ঠিকা ঝি সারদা ঘর ঝাঁট দেওয়া বাসনকোসন মাজা ইত্যাদির জন্য পূর্ব্বেই বাহাল হইয়াছিল কিন্তু তাহার আরও তিন বাড়ীর কাজ এবং কোলে রুগ্ন শিশু। ঠিক দরকারটির সময় তাহাকে পাওয়া যাইত না। পাশের বাড়ীর ললিত আমার বন্ধু, সেই নূতন বাসা ঠিক করিয়া দিয়াছিল, কাকীমা অর্থাৎ ললিতের মা'র নিকট দরখাস্ত পেশ করিলাম। ফলে, পরদিন বৈকাল নাগাদ আমার বাড়ীতে দিনরাতের ঝিএর কাজ করিবার জন্য দুই মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল; একজন অপেক্ষাকৃত সমর্থ বয়সের, মেসবাড়ী হইলে তরুণী বলিয়াও চালানো যাইত, রঙ ময়লা দোহারা গড়ন; অন্য জন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত, বিধবা, রঙ ফর্সা, বাঁ চোখটা যে কারণেই হোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার মুখে এবং ভাবে-ভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল যাহাতে চট্ করিয়া ঝি বলিয়া মানিয়া লইতে বাধে, গিন্নীবান্নী গোছের কেহ বলিয়াই বোধ হয়।

অফিস হইতে সবে ফিরিয়াছি, দেখি, এই দুইটি জীবকে সামনে লইয়া মাসী বোনঝিতে পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। আড় চোখে চাহিয়া দাড়ি কামাইতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গিন্নী পাশে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া জানাইলেন যে মেয়েটি মাসিক ছয় টাকা বেতন চাহিতেছে, তাছাড়া দুবেলা আহার, দুবেলা জলখাবার, বৎসরে তিন জোড়া কাপড়, শীতে কম্বল। আমি জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া আর একবার আড় চোখে চাহিয়া দেখিলাম, অপেক্ষাকৃত তরুণীটি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ঘোমটাবৃত বৃদ্ধা বসিয়া আছে। মাহিনা এবং আনুষঙ্গিক প্রার্থনা এমন কিছু বেশী নহে, শান্তভাবে প্রশ্ন করিলাম, ও পারবে তো?

চটিবার কোনও কারণ ছিল না, তবু গৃহিণী চটিলেন। ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না পারলে বিদেয় করে দেব। ঝিয়ের তো আর মড়ক হয়নি।

ইহার উপর কথা চলে না। পরের দিন হইতেই নূতন ঝি কাজে বাহাল হইল।

তাহার নাম হরিমতি, প্রথমটা কিছুকাল তাহাকে মূক মনে হইলেও পরে বুঝিলাম হরিমতি মুখরা। ছয় টাকা মাহিনায় রাজি হইয়াছিলাম, দুই মাস যাইতে না যাইতেই হিসাব করিয়া দেখিলাম তাহাকে ৭৸৵০ করিয়া দিতে হইতেছে, ১৸৵০ এক ভরি আফিমের দাম, তাহার সমস্ত মাসের মৌতাত।

প্রথম প্রথম আমাকে হরিমতি ভারী লজ্জা করিত, আধ হাত ঘোমটা টানিয়া কাছে আসিত,' কথা বলিত না। নিতান্ত প্রয়োজনে ফিস্‌ফিস্ করিয়া যাহা বলিত তাহার অর্দ্ধেক বোঝা যাইত না। গৃহিণী খুসী। বলিতেন, নূতন ঝি মোটেই বেতরিবৎ নয়। অথচ এদিকে ঠিকা ঝি সারদার সহিত তাহার বচসার কথা প্রায়ই শুনিতে পাইতাম; তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে কাজ বুঝিয়া লইতে হরিমতি ভালবাসে, এক চুল এদিক ওদিক হইলেই কথা শুনাইতে বসে। ক্রমশঃ গিন্নীও কথা শুনিতে লাগিলেন এবং সংসারে খিটিমিটি সুরু হইল।

তিতিবিরক্ত হইয়া তাহাকে জবাব দিব স্থির করিলাম, গিন্নী বলিলেন, লোক না হইলেও তিনি চালাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু সামনে পৌষ মাস। পৌষমাসে জবাব দেওয়া যায় না। কার্ত্তিকে বাহাল হইয়াছিল, মাঘ পর্য্যন্ত হরিমতি রহিয়া গেল। ইহার মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম, সে এক মুহূর্ত্তের জন্য বাহিরে যাইত না। স্ত্রীপুরুষ কাহাকেও কখনও তাহার নিকট আসিতেও দেখি নাই। কৌতূহলী হইয়া গৃহিণীকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি অপ্রসন্ন মুখে বলিয়াছিলেন, তিন কুলে নেই কেউ তো আবার আস্‌বে কে? সবাইকে খেয়ে তবে ও এখানে এসেছে। পাপ বিদেয় হলে বাঁচি।

শেষের কথা যেন শুনিতেই পাই নাই, বলিলাম, তবু?

—তবু আবার কি? তারকেশ্বরের কাছে কোথায় ঘর, জাতে তেলী, ভাজের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তাহার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার অধিক পরিচয় হরিমতি সম্বন্ধে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অতীত জীবনের কোনও কথাই কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। বাড়ী ছাড়িয়া এগারো বারো বৎসর এখানে-ওখানে ঝিগিরি করিবার পর সে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল, এই বারো বৎসরের কোনও কথাও শুনি নাই, শুধু প্রত্যেক পূজার সময় একটি নির্দ্দিষ্ট বয়সের ছেলের জন্য

সে আমাকে দিয়া জামা-ইজের খরিদ করাইত এবং ঠিক সপ্তমীর দিন প্রাতঃকালে কাহাকে যেন দিয়া আসিত, সেই শিশুর বয়স প্রত্যেক বৎসরে এক বৎসর করিয়া বাড়িয়াছে এইটুকু মাত্র জানিতে পারিয়াছি।

মাঘের ২রা তারিখে হরিমতির বিদায় হইবার কথা, হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া আমার অর্দ্ধোন্মাদ পিসীমাকে সঙ্গে লইয়া পিসেমশাই, পিসতুতো দাদা-বৌদি, ইত্যাদি আজিমগঞ্জ হইতে একেবারে কলিকাতায় আমার ছোট বাসায় উপস্থিত। হরিমতি রহিয়া গেল কিন্তু স্থানাভাবে গৃহিণীকে পিত্রালয়ে সরিতে হইল, ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই তিনি থাকিবেন।

বাড়ীতে জায়গার অভাব, নীচে অন্য ভাড়াটে থাকে, আমার ভাগে মোট আড়াইখানি ঘর ও একটি রান্না ঘর। ঘর আড়াইখানি পিসীমা পিসেমশাই, দাদা বৌদি দখল করিলেন, আমি পাশে ললিতদের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। এখানেই হরিমতির সহিত পরিচয় সুরু হইল। রাঁধুনীবামুন রান্না করিয়া যায়। আমার দেরী হইলে হরিমতি আঁচলের তলায় ভাত লইয়া গিয়া আমাকে খাওয়াইয়া আসে তাহার আধহাত ঘোমটা কমিয়া আঙুল চারেকে দাঁড়াইল এবং বাবা সম্বোধনে এক আধটা কথাও সে বলিতে সুরু করিল। তাহার নিজের অসুবিধার অন্ত ছিল না, ভিজা রান্না ঘরেই শয়ন করিতে ও ঠাকুরের মুখ চাহিয়া চলিতে হইত।

হঠাৎ একদিন কাকীমার (ললিতের মা) মুখে খবর পাইলাম, হরিমতি কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার বাবাকে অর্থাৎ আমাকে দেখাশোনা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছে।—মাগী যেন কি, আমার চাইতে তার যেন দরদ বেশী!

দরদ বেশী কি কম ভগবানই তাহার পরীক্ষা লইলেন! চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ললিতদের বাড়ীতেই প্রবল জ্বরে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম এবং বিকারের ঘোরে অনুভব করিলাম আমার বসন্ত হইয়াছে। পিসীমার অসুখ তখন বাড়িয়াছে। দাদা-বৌদি ইত্যাদি তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত।

পরে শুনিয়াছি, হরিমতি যেন এই সময়টা পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। নীচের ভাড়াটেদের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের একটি ঘর খালি করাইয়া আমাকে সে সেখানে লইয়া আসে এবং বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া সেই যে আমার মাথাটি কোলে লইয়া বসে, যখনই চোখ মেলি দেখিতে পাই একটি কল্যাণ-হস্ত আমার ললাটে ন্যস্ত, অন্য হাতে সে মাছি তাড়াইতেছে। মা শীতলা তাহার একটি চক্ষু লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার পথে-পাওয়া বাবাকে লইয়াও টানাটানি সুরু করিয়াছেন, এটা সে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। মা শীতলার সহিত হরিমতি যেন ভক্তির আতিশয্যেই লড়াই করিল এবং একুশদিন পরে আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। পিসেমশাইরা পিসীমাকে সামলাইতে ব্যস্ত ছিলেন, অন্তঃস্বত্বা গৃহিণীরও বসন্ত-রোগীর কাছে আসিবার হুকুম ছিল না। আমাকে খাওয়ানো, ওষুধ মালিশ করা, বাতাস করা—বৃদ্ধার যেন ক্লান্তি ছিল না এবং এরই মধ্যে আমার ঘুমের অবসরে বেলেঘাটায় হাঁটিয়া গিয়া গৃহিণীকে খবর দেওয়া—কাজের ঝোঁকে হরিমতির চার আঙুল ঘোমটাও ঘুচিয়া গেল এবং আমাকে কোলের শিশুর মত মনে করিয়া সে বকিতে ঝকিতে সুরু করিল।

পিসীমাকে লইয়া সকলে খুলনা গেলেন, রাঁধুনীবামুনকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, হরিমতী ঝি-পদবী হইতে একেবারে রাঁধুনীত্বে প্রোমোশন পাইল। এবং সকলের অজ্ঞাতসারে কখন যে সে ঘরের গৃহিণী হইয়া বসিল জানিতেই পারিলাম না। শ্রাবণ মাসে সন্তান প্রসব করিয়া আশ্বিন মাসে নিজের বাসায় আসিয়া গৃহিণী দেখিলেন হরিমতির কর্ত্রীত্ব এড়াইয়া চলা তাঁহার পক্ষেও কঠিন! তাহাতেই গোল বাধিয়া হেস্তনেস্ত যাহোক একটা তখনই হইয়া যাইত, আজ হরিমতির কথা বলিবার জন্য তোমার কাছে উপস্থিত হইতে হইত না কিন্তু যিনি রহস্যচ্ছলে এই বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহার অন্য মতলব। কিছু দিন যাইতে না যাইতে গৃহিণী হঠাৎ নিদারুণ বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইলেন। চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় শিশুসন্তানের প্রতিপালনের জন্য এই বৃদ্ধারই মুখ চাহিয়া থাকা ছাড়া তাঁহার অন্য পথ ছিল না; তিনি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহাকে মানিয়া লইলেন। তিন মাসের শিশুকে মানুষ করিবার অধিকার পাইয়া বুড়ী বর্ত্তাইয়া গেল।

খোকনের ভাগ্যে মাতৃস্তন্য জুটিল না, পলিতায় দুধ খাইয়া ও হরিমতির শুষ্ক বুকে মুখ গুঁজিয়া সে বড় হইতে লাগিল। হরিমতি যে কি করিয়া এই মাতৃস্নেহবঞ্চিত

শিশুকে মানুষ করিয়াছে সে ইতিহাস ভাল করিয়া আমারই জানা নাই, গৃহিণী জানেন কিন্তু সকল সত্যের মত এ সত্যটাও স্বীকার করিতে তাঁহার অহঙ্কারে বাধে, এবং বাধে বলিয়াই মা হইয়া তাঁহার শিশুর এই উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা মাকে তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিলেন না। এখান হইতেই যে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত, আমার সম্পূর্ণনিঃসম্পর্কিত এই বৃদ্ধা শেক্সপীরীয় নাটকের নায়িকার মত সকল আঘাত সহ্য করিয়া আজ অসাড় চেতনাহীন অবস্থায় সেই নাটকের যবনিকা-পতনের অপেক্ষায় তোমাদের হাসপাতালে পড়িয়া আছে। আমি এখানে বসিয়া তোমাকে তাহার ছন্নছাড়া জীবনের ইতিবৃত্ত বলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি।

বিপদ হইল আমার, আমাকে হরিমতি 'বাবা' বলিলেও গৃহিণী ঠিক মায়ের পদবীতে উঠিতে পারিলেন না; একটা অকারণ রাগ, ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া একটা অর্থহীন হিংসা তাঁহাকে রোগের মধ্যেই আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, অথচ হরিমতিকে না হইলেও তাঁহার চলিত না। খোকাকে মানুষ করা ছাড়াও, গৃহিণীর সেবা ও সংসারের অন্যান্য কাজ সে একাই করিতে লাগিল! এখন বুঝিতে পারি খোকনের ভার না পাইলে সে অন্য কোনও কাজই করিতে পারিত না। খোকনও মাকে ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই এই নিঃসম্পর্কীয়া বৃদ্ধাকে বুঝিল এবং তাহাকে আঁকড়াইয়া শিশুমনের ক্ষুধা মিটাইতে লাগিল। আমি কথার উপর কথা দিয়া ভুলাইয়া রোগিণীকে ঠাণ্ডা রাখিতে লাগিলাম। গৃহিণী যখন সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিলেন তখন খোকন মায়ের কাছ হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, মাকে আর তাহার বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই। সে দিদিকে জানে, দিদিকে বুঝে।

পাঁচ মাসে পড়িতেই খোকনের অন্নপ্রাশনের একটা দিন স্থির হইল; ষষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, খুব যে ঘটা করিয়া হইবে তাহা নয়। সামান্য রকম একটা উৎসব। গৃহিণী সবে সারিয়া উঠিতেছেন, হৈ হৈ করিবে কে? হরিমতি কিন্তু অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে কারণ দেখাইল, প্রথম ছেলে; কিন্তু খোকন দ্বিতীয় ছেলে হইলেও কারণের অভাব হইত না। ইহা লইয়া একদিন মায়ে-ঝিয়ে তুমুল বচসা হইয়া গেল এবং আমি গরীবের ছেলে মাঝ হইতে মারা পড়িতে বসিলাম।

চাকুরীতে ঢোকার পর মাস তিনেক পর্য্যন্ত হরিমতি নিয়মিত মাহিনা লইয়াছে, তাহার পর প্রায় নয় দশ মাস সে একটিও পয়সা লয় নাই। শুধু আফিমের ১৮৶০; অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে। গৃহিণীর সহিত কলহের ফলে খোকাকে কোলে লইয়া হরিমতি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া আমার নিকট বিদায় ও বাকী বেতন প্রার্থনা করিল—এখানে থাকা আর পোষাইবে না। একটা পেট যেমন করিয়াই হোক চলিয়া যাইবে। কাঁটাটাকে একটু ভালবাসিয়াছিলাম, তা আমার মত হতভাগীর সেটা বাড়াবাড়ি হইয়াছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম, অত টাকা এই সময়ে একসঙ্গে জোগাড় করা অসম্ভব। গৃহিণীকে বুঝাইলাম, হরিমতিকে বুঝাইলাম এবং শেষে নিরুপায় হইয়া ধরাধরি করিয়া অফিস হইতে আগাম বেতন লইয়া তাহার মাহিনা চুকাইয়া দিলাম।

কিন্তু একদিন, দুই তিন, তিনদিন, হরিমতি যায় না। ললিতের ভাই অবনী হরিমতির কাছে যাতায়াত করিতেছে দেখিলাম। বোধ হইল তাহার চাকরী জুটাইয়া দিতেছে। এদিকে খোকনের অন্নপ্রাশনের দিনও প্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন সকালে অবনী একগাছা সোনার হার আনিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল, কেমন হয়েছে বলুন তো! অবনীর প্রতি চিত্ত অপ্রসন্ন ছিল। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, ভাল। অবনী বলিল, হরিমতি এটা খোকনের ভাতের সময় দেবে বলে গড়িয়ে আনিয়েছে।

আমি কথা বলিতে পারিলাম না। এই জন্যই মাহিনার তাগাদা! চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারটা তাহা হইলে কিছু নয়। বাঁচা গেল। গৃহিণীর মনও ভিজিল, তিনি কিছুদিন ঠাণ্ডা রহিলেন।

গৃহিণীর এই অসুখটার সময় আমার নিত্যসহচর বন্ধুরা হরিমতিকে ভাল মতেই চিনিয়াছিল। আড্ডায় পড়িয়া দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেওয়া আমার স্বভাবগত। গৃহিণী একা পড়িয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় কাৎরাইতেছেন, তাঁহার ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা নাই, আমি অফিস হইতে আড্ডা দিয়া গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিলাম, দেখি হরিমতি গজ গজ করিয়া আমার বন্ধুদের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে খোকাকে কোলে দোল দিতেছে। এই অবস্থায় তাহার কাছে যা-না-তাই শুনিয়া হজম করিতে হইত। দুই একজন বন্ধু

ক্বচিৎ কথনো বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া হরিমতির বাক্যবাণে আক্রান্ত ও আহত হইয়া ফিরিয়াছে, তাহার পর হইতে আমাদের বাড়ীমুখো হইতে তাহারা ভরসা করিত না। হরিমতি তাহাদের কাছে জুজুর মত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পরেই আমার দ্বিতীয় সন্তান মহামহিমান্বিতা শ্রীমতী গৌরীর আগমনী উদ্ঘোষিত হইয়াছে। বেদখল খোকনকে হরিমতির কবল হইতে উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই গৃহিণীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। তিনি মুখভার করিয়া শত্রুর হাতে প্রথম সন্তানকে সমর্পণ করিয়া নূতনের অভ্যর্থনার আয়োজন করিবার জন্য পিতৃগৃহে গমন করিলেন। খোকন ও খোকনের পিতা হরিমতির জিম্মায় রহিল।

প্রায় একবৎসর কাল এভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিল। খোকনের মা গৌরীকে লইয়া ব্যস্ত, খোকনের উপর হরিমতির একচ্ছত্র অধিকার। তাহার আনন্দ কত! জীবনে যে কাহাকেও পায় নাই, ভগবান তাহার প্রতি বোধ হয় কৃপা করিলেন, খোকন দিদি বলিতে অজ্ঞান! তাহাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া খাওয়াইয়া শোওয়াইয়াও হরিমতির তৃপ্তি নাই। আমি আমার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের জীবনে একুনে যে পরিমাণ প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার করি নাই, খোকন একবৎসরেই তাহার চাইতে বেশী হেজলিন, পাউডার, এসেন্স মাখিয়া ফেলিল। অমুক বাড়ীর অমুক ছেলের জামার ছিটটা কি চমৎকার, খোকনের জন্য ঐ ছিটের একটা জামা চাই; দুই দিন অন্তরই খোকার ইজের ছোট হইয়া যাইতে লাগিল, জামায় ঘামের গন্ধ থাকিলে খোকন পরিতে পারে না, তাহার অসুখ করে। আমি পদে পদে বিপন্ন হইতে লাগিলাম।

বহু কষ্টে নিজের শোবার ঘরে একটা সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, গরমে খোকা রাত্রে ঘুমাইতে পারে না, তাহারও একটা পাখা চাই।—তোমরা যদি না দাও, আমার মাহিনার টাকা হইতে একটা পাখা কিনিয়া আন।—অগত্যা ৩৫ টাকা ব্যয় করিয়া একটা টেবিল-ফ্যানের বন্দোবস্ত করিতে হইল।

গৃহিণী আসিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। বলিলেন, আর ওকে রাখা নয়। ছেলে খারাপ হইয়া যাইতেছে। আমি এত সহজে মামলা নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না, ছেলেকে যে বাঁচাইল, ছেলেকে বাঁচাইবার ওজুহাতে তাহাকে তাড়াই কি করিয়া? বাড়ীতে রোজই অশান্তি ঘটিতে লাগিল। আমি বাহিরে বাহিরে থাকি, বাড়ীতে ফিরিলেই ফোঁসফাঁস শুনি, একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম।

হরিমতি গৌরীকে দেখিতে পারে না, তাহার ধারণা, খোকনকে যথাযোগ্য সমাদর করিবার পূর্ব্বেই সে আসিয়া ভাগ বসাইয়াছে; তাছাড়া, আজ বাদে কাল যে পর হইয়া যাইবে, তাহার জন্যই বা এত কেন! খোকনের জামা-জুতা ছোট হইয়া গিয়াছে, গৌরীকে তাহা পরাইবার জো নাই। ছেলের ও মেয়ের জামার কাপড়ের ছিটে যে তফাৎ থাকিতে পারে, মেয়ের জামার ছিট একটু জমকালো স্বভাবতই হয়, হরিমতি তাহা স্বীকার করে না। গৌরীর কাঁথা কাচিতে কাচিতে প্রাণ গেল, এদিকে কাঁথার ব্যবহার খোকনই করে বেশী। হরিমতি এবং গৃহিণীতে খোলা আদালতে একটা মামলা হইতেই শুধু বাকী রহিল।

টানাটানির মধ্যে পড়িয়া গৌরীর অন্নপ্রাশনই হইল না। মেয়েছেলের আবার অন্নপ্রাশন! গৃহিণীও হরিমতিকে তাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া হরিমতির কথায় তিনি কাঁদিতেছেন এরূপ দৃশ্যও দুই একদিন দেখিলাম। ইতিমধ্যে হরিমতির বাকী মাহিনার অঙ্ক শ'য়ের কোঠায় এক দুই করিয়া উঠিতেছে। হঠ করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়াও যায় না।

বাহিরে শুনিয়া আসি, আমার ভাগ্য ভাল, এমন একজন লোক পাইয়াছি। ঘরে শুনি, আমিই তাহাকে নাই দিয়া মাথায় তুলিয়াছি নহিলে একটা সাধারণ ঝি, কোথাকার কে, ঘরের লোকের মত খায়দায় শোয় আবার চোখও রাঙায়। খোকা আর গৌরী যেন দুই সরিক, আমি যতটা পারি চোখ বুজিয়া চলিতে লাগিলাম

বাড়াবাড়ি যে হরিমতি না করিতেছিল তা নয়। ঝি-গিরি করিয়া যে জীবনের অর্দ্ধেক কাটাইল, ঠিকা ঝি সারদার সম্বন্ধে তাহার কি সুগভীর ঘৃণা! চার বৎসরের মধ্যেই সে এমন পোক্ত বড়লোক হইয়া গিয়াছে যে ছোটলোককে ছোট-লোক বলিতে তাহার এতটুকু বাধিত না। ধোপা ছোট লোক, নাপিত ছোটলোক, হিন্দুস্থানী চাকর রামলখন, সে ছোটলোক; গণেশ নামক এক ছোকরা কিছুদিন বাড়ীতে

কাজ করিল, সে শুধু ছোট লোক নয়, চোর,—আমার পয়সা বেশী হইয়াছে তাই সকলকে আস্কারা দিতেছি।

আমার উপরেই কি কম অত্যাচার চলিতে লাগিল! ট্যাক্সি করিয়া কোনও দিন বাড়ী আসিবার জো ছিল না,—নবাবের জামাইয়ের খুব পয়সা হয়েছে দেখছি। বন্ধু-বান্ধবদের ডাকিয়া খাওয়ানো তো এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম, মাঝে মাঝে দুই চার কাপ চা—তাহাও সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া দিবার উপায় ছিল না। এমন কি, একবার বাবা আসিয়া আমাদের বাসায় কিছুদিন থাকিয়া গেলেন। হরিমতির রাগ দেখে কে!—নিজের পেনসনের টাকা জমিয়ে ব্যাটার পয়সায় খেতে এসেছেন! থাকো দুদিন অসুখে পড়ে, কে তোমায় দেখে দেখি। কখনও শুনি, আগে দেনাগুলো শোধ কর। তার পর নবাবী করো।

আমি সহ্য করি, আমার সহ্য করিবার কারণ আছে। আমি জানি, পৃথিবীতে এই স্ত্রীলোকটির আর কোনো অবলম্বন নাই, আপনার বলিতে কেহ নাই। ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে একটি আশ্রয় তাহার জুটিয়াছিল, খোকনকে কেন্দ্র করিয়া এই শুষ্ক মৃতপ্রায় বৃক্ষটি পুষ্পিত হইবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছিল কিন্তু দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর স্নেহচ্ছায়াহীন কঠোরতা তাহার প্রতিবন্ধক। সে কিছুতেই এখানে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না।

কিন্তু গৃহিণী বোঝেন না, আর কেহ বোঝে না। নীচজাতীয়া এই স্ত্রীলোক কোন্ স্পর্দ্ধায় মনিবের সমান হইতে চায়, খোকনের সহিত স্নেহসম্পর্ক তাহাকে কেমন করিয়া খোকনের মায়ের মর্য্যাদা দিতে পারে, ইহা বোঝা শক্ত। তাহার স্বভাব হোঁচট খায়, ব্যবহারে নীচতা প্রকাশ পায়, অতীত জীবনের অভদ্রতা দুই একটি নীচ কথায় আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে কিন্তু আমি জানি, তাহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং এই পরিবর্ত্তনই তাহার দুর্দ্দশার কারণ হইল।

খোকন হরিমতির স্থাওটো, সেইখানেই তাহার জোর। খোকনকে দুধ খাওয়াইবার ক্ষমতা গৃহিণীর নাই। কাঁদিলে হরিমতি ছাড়া কেহ ভুলাইতে পারে না। কোনোদিন মাই না পাইয়াও সে এখন পর্য্যন্ত মাই-টানার সখটা বজায় রাখিয়াছে, রাঁধিতে রাঁধিতে হরিমতি তাহাকে মাই দিতে বসে। সমস্ত রাত্রি হরিমতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া না শুইলে তাহার ঘুম হয় না। মায়ের তাহা সহিবে কেন! পরিশ্রান্ত দেহে রাত্রির অবসর আমার বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী স্বয়ং ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি একটু একটু করিয়া খোকনকে তাহার দিদির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম, দেখিলাম, কিন্তু কি বলিব! গৌরীর ঝঞ্ঝাট অনেকটা কমিয়াছে। খোকনের ঝক্কিও তিনি সহিবেন। তা ছাড়া হরিমতির কাছে কাছে থাকিলে সংশ্রব-দোষ ঘটিতে পারে; এখন হইতে সাবধান হওয়া ভাল। বেশ বুঝিলাম, ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার হইতেছে।

একচক্ষু হরিণের মত একচক্ষু হরিমতি যে দিক হইতে আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়াছিল ঠিক সেইদিক হইতেই আঘাত আসিল। এই মূর্খ স্ত্রীলোক হঠাৎ একদিন অনুভব করিল, তাহার একমাত্র আশ্রয়, সীমাহীন সমুদ্রে তাহার নিজ হাতে রচনা করা একটি মাত্র ভেলা তাহার হাত হইতে সরিয়া যাইতেছে। খোকন আর শুধু হরিমতিগতপ্রাণ নয়। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, অকারণে খোকনের মায়ের সহিত ঝগড়া করিয়া কাঁদিল এবং আবার একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, সে থাকিবে না। আমি শুধু 'আচ্ছা' বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম।

তাহার পর হইতেই দেখিলাম, হরিমতির মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, মুখে আর কিছু আটকায় না, যাকে তাকে যা তা বলে। যে ভালবাসা তাহার জীবনে সংযম আনিয়াছিল সেই ভালবাসা হারাইবার ভয় তাহাকে অসংযত করিল। খোকনকেই সে কটুকাটব্য করিতে লাগিল। সারদা, রামলখন, আমাদের বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটে, গৃহিণী, এমন কি পাড়াপ্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত বিরক্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার চুলগুলি রুক্ষ হইল, কপালে নীল শিরা দেখা দিল।

ইতিমধ্যে হরিমতির ঘরের টেবিল-ফ্যানটি হঠাৎ বিকল হইয়া গেল। পাখার হাওয়ায় ঘুমাইতে অভ্যস্ত খোকন বিনা দ্বিধায় দিদিকে ভুলিয়া আমাদের শুইবার ঘরে সন্ধ্যা হইতে আশ্রয় লইল। একদিন, দুইদিন চলিয়া গেল। সকালে ঘুম ভাঙিতেই শুনি, উপরের কলের জল লইয়া হরিমতি তার স্বরে নীচের কাহাকে গালি-গালাজ করিতেছে। কয়লা-ভাঙা লইয়া ঝগড়া, বাসন-মাজা লইয়া ঝগড়া। তাহার এমন উগ্রমূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নাই। আবার এমন নরমও সে কোনদিন ছিল না, একেলা বসিয়া বসিয়া প্রায়ই কাঁদিত; গৃহিণী বলিতেন, বোধ হয় পাগল হইয়া যাইবে।

আমার লোভী ছেলে শৈশবের কথা ভুলিতেছে, তাহার বয়স চার হইয়াছে, এখন তাহার অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা; শুধু দিদি আর তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। বাহিরের জগৎ তাহাকে টানিতেছে, দিদি ভাসিয়া গেল, মাও একদিন ভাসিয়া যাইবে, গৃহিণী সে কথা এখন ভাবিতে পারেন না।

চিরআশ্রয়হীনা এই হতভাগিনী যে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে চলিয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া মরিতেছিল তাহা আমিও অনুভব করিয়া উঠিতে পারি নাই, একদিন বৈকালে সংবাদ পাইলাম, হরিমতি বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। পদ্মা ভিতরে ভিতরে ক্ষয় সমাপ্ত করিলে পাড় ধ্বসিয়া পড়ে। আমরা পাড় ধ্বসাটাই দেখি, চম্‌কাইয়া উঠি ; ভিতরের খবর কতটুকু জানিতে পারি !

বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, ডাক্তার আসিয়াছেন। এপোপ্লেক্সির ষ্ট্রোক্—জিহ্বায় জড়তা আসিয়াছে। কথা বলিতে পারে না, শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে সে চাহিল। কি বলিতে চেষ্টা করিল। আভাসে বুঝিলাম, খোকনকে খুঁজিতেছে।

দিনের পর দিন, সাতদিন চলিয়া গেল, হরিমতি তেমনই পড়িয়া রহিল। চোখ বন্ধ, বিকৃত বিশীর্ণ মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছে ; তাহার দক্ষিণাঙ্গ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। বহুকষ্টে নিশ্বাস লইয়া বহির্মুখ প্রাণটাকে সে দেহে রাখিতে চাহিতেছিল। অন্য চেতনার লক্ষণ নাই। কিন্তু যেই খোকন কাঁদিল, কি কাছে কোথায়ও কথা কহিল, অমনি ঘোলাটে চক্ষুটি মেলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া সে এদিক ওদিক তাহাকে খুঁজিত। হরিমতির ঘরে খোকন খাইতে বসিলে সে একদৃষ্টে তাহাকে দেখিত ; খোকন এক আধবার কাছে গিয়া 'দিদি' বলিয়া ডাকিলে হরিমতি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিত, পারিত না। অকৃতজ্ঞ শিশু এ দৃশ্য দেখিতেও চাহিত না। পলাইয়া যাইত। আমি জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতাম, সামনে বসিতে বলিতাম, তাহার খেলায় মন ; হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইত। হরিমতির নষ্ট চোখটি ছাপাইয়া জল ঝরিত।

গৃহিণী হরিমতিকে তাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, সে নিজেও চলিয়া যাইবে বলিয়াছিল, কিন্তু এভাবে যে সে যাইবে তাহা কে জানিত ! গৃহিণী শেষে কথা বলিতেন না, নিঃশব্দে এই অসহায়া বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। রাত্রে দেখিতাম, তিনি ঘন ঘন হরিমতির কাছে যাইতেছেন। আমাকে শুধু বলিতেন, বড় কষ্ট হচ্ছে ওর, না গো ? ছেলের অকৃতজ্ঞতায় তিনিও লজ্জিত। 'পাজি' ছেলেকে তাহার দিদির কাছে হাজির থাকিবার জন্য তিনি কাতর অনুরোধ করিতেন কিন্তু চার বৎসরের শিশুর মনস্তত্ত্ব কে বুঝিবে ?

হরিমতি যদি মরে তবে বুঝিব এই স্নেহই তাহার কাল হইল। জীবনের ৫৫ বৎসর সকল স্নেহ-বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা যেমন করিয়া এঁটোকাঁটা-সকরি লম্বা লম্বা পদক্ষেপে ডিঙাইয়া যায়, তেমনই করিয়া সকল আকর্ষণকে সে ডিঙাইয়া আসিয়াছিল, খোকনকে ভালবাসিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িল। যে ভালবাসা মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করে সেই ভালবাসাই মৃত্যুর মুখে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। ইহা কাহারও পরিহাস কিনা তোমরাই ভাল বলিতে পারিবে। নিরুপায় হইয়া উহাকে তোমাদের নিকট আনিয়াছি, দেখিও ও যেন শান্তিতে মরিতে পারে। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

শ্যামচরণ চুপ করিল, তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে, চোখের কোণে জলও যেন চক্ চক্ করিল। অস্বীকার করিব না, আমিও কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পেয়ালায় অর্দ্ধভুক্ত চা ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে। দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম, সবই তো বুঝলাম, শ্যামচরণ, তুমি তো বেশ নিঃশব্দে তোমার গৃহিণী আর সন্তানের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে মনে মনে বীরত্ব অনুভব করছ—আমরা ডাক্তার মানুষ, সব জিনিষ আমাদের রয়ে সয়ে নিতে হয়। সাইকলজিকাল গল্প হিসেবে তোমার গল্পটা ভাল কিন্তু নিছক গল্প ওটা।

শ্যামচরণ যেন আহত হইল। ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না। বলিলাম, বুঝতে ঠিকই পারছ, সত্যের খাতিরে এমন একটা কল্পনাকে মাঠে মারা যেতে দিতে চাও না।

শ্যামচরণ একটু অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল।

—অর্থাৎ, খোকনের সংশ্রবে না এলেও, আজ হোক, দুদিন বাদে হোক্ এ ষ্ট্রোক্ ওর আসতই। নিজের অপরাধে যে বিষ ওর শরীরে ঢুকেছে স্বয়ং ভগবানেরও ওকে বেকসুর খালাস দেবার ক্ষমতা ছিল না। ষ্ট্রোক্‌টা সিফিলিটিক।

শ্যামচরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ অত্যন্ত আবেগে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া ধরা গলায় বলিল, তা হোক, তবু—

আমি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, নিশ্চয়ই, আমার ডিউটি আমি করব বই কি ! এসো।

বৃদ্ধা তেমনই অসাড় ভাবে পড়িয়া ছিল। শ্যামচরণ কাছে যাইতেই একবার চোখ মেলিয়া দেখিল এবং আরও যেন কি খুঁজিতে লাগিল।

আমি সস্নেহে তাহার ব্যাকুল চোখের পাতার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্যামচরণকে বলিলাম, এবার যখন আসবে তোমার খোকনকে সঙ্গে এনো।

বাস্তব-বিমুখতা

—বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল

লোকে পড়ে কেন? অধিকাংশেরই পক্ষে এই প্রশ্নের জবাব এই যে, তাহারা পড়ে না। পৃথিবীর পনেরো আনা লোক কিছুই পড়ে না; বাকী এক আনা যাহারা, তাহাদের অধিকাংশই শুধু সচিত্র পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখে। সচিত্র পত্রিকার অনুরাগীদের একটু উপরের স্তরের যাহারা তাহাদেরও অধিকাংশের বিদ্যা পুস্তক পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। পুস্তকের পাঠক যাহারা—গম্ভীর ও তরল প্রকৃতির, গভীর ও পল্লবগ্রাহী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক অথবা বীভৎসতাপ্রিয়—সকল শ্রেণীর সকলকে একত্র করিলেও সমগ্র মানব জাতির তাহারা এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। তৎসত্ত্বেও তাহাদের রুচি ও প্রকৃতিতে আকাশপাতাল ভেদ। কেহ কেহ জ্ঞানলাভের জন্য পড়াশুনা করে—তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের। কেহ বা নিজেদের মজ্জাগত সংস্কার বা কুসংস্কারের সমর্থন খুঁজিবার জন্য বই পড়ে—ইহাদিগকে বয়সে পাকা বলা চলে। কিন্তু অধিকাংশ পড়ুয়া-সম্প্রদায় ইহাদের কোনও দলেই পড়ে না, ইহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করাও নয়, নিজেদের মতামতের সমর্থনও ইহারা খোঁজে না, ইহারা চায় ক্ষণকালের জন্য বাস্তবের রূঢ়তা ভুলিয়া কল্পলোকে বিচরণ করিতে। নানা উপায়ে এই বাস্তব-বিমুখতা পরিতৃপ্ত হয়। সব চাইতে মোটা উপায় চটি উপন্যাস অথবা চলচ্চিত্র—যে গুলিতে দেখা যায় দরিদ্র অখ্যাত কোনও যুবক বা যুবতী হঠাৎ জীবনে সাফল্যলাভ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিল অথবা বিবাহ করিয়া বড়লোক হইল। ইহারই উঁচু স্তরের যাহারা তাহারা ইতিহাসের সাহায্যে বাস্তবকে ভুলিয়া থাকে, অতীতের ঐশ্বর্য্য-কল্পনায় যাহারা বিভোর। ইহার উপরেও আর একটা স্তর আছে, সেখানে যাহারা থাকে তাহারা জ্যোতির্বিদ্যা অথবা ওই জাতীয় কিছুর চর্চ্চা করিয়া থাকে। জিনস্ অথবা এডিংটনের লেখা বই-গুলির সাফল্য এই কারণেই ঘটিয়াছে যে তাঁহারা যে-লোকের কথা লিখিয়াছেন সেখানকার অধিবাসী নক্ষত্রেরা বড় শান্তিতে চলাফেরা করে বলিয়া বোধ হয়; ট্যাক্সের ভারে তাহারা পীড়িত নয়। ছেলেপিলেদের অসুখ লইয়াও তাহাদিগকে বিপন্ন হইতে হয় না; ব্যবসায়ের মন্দা তাহাদিগকে কাহিল করে না। তুমি যদি একবার নিজে কোনও তারা বা নীহারিকার সহিত এক হইয়া গিয়াছ এরূপ কল্পনা করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তোমার সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে।

কিন্তু জ্বালা জুড়ানই মানুষের একমাত্র কাম্য নয়, তাহারা উত্তেজিত হইতেও চায়। আমার নিজের কথা বলিতে পারি, আমি যে পড়াশুনা করি, তাহার মূলে প্রায়ই এই উত্তেজিত হইবার বাসনা থাকে। আমি প্রায়শই বলিয়া থাকি যে আমি যে-ধরণের বই লিখি সে-ধরণের বই পড়িতেই পারি না। যে সব বই আমার পড়িতে ভাল লাগে সে সব বই নিজে লিখিতে পারিলে খুসী হইতাম; কিন্তু সে ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয় নাই। আমি ডিটেক্‌টিব গল্প পড়িতে ভালবাসি। আমার নিজের বিশ্বাস আমি যদি ডিটেক্‌টিব গল্প লিখিতে পারিতাম তাহা হইলে মানুষের সুখদায়ক কাজে সহায়ক হইতাম। অবশ্য আমার এ কথায় লোকে এখন সন্দেহ করিতে পারে।

ডিটেক্‌টিব গল্প, কবিতা, জ্যোতির্বিদ্যা সবগুলিই বাস্তব সত্য হইতে দূরে পলাইবার পৃথক্ পৃথক্ উপায়। মনস্তত্ত্ব-বাদীরা বলিয়া থাকেন যে এই বাস্তব-বিমুখতা ভাল নয়; কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহাদের এই কথা সাধারণ ভাবে সত্য নয়। বাস্তব হইতে পলাইবার ইচ্ছা তখনই খারাপ যখন তাহা সত্যকার মোহ সৃষ্টি করে অথবা কাহাকেও কর্ত্তব্যচ্যুত করে। একজন অতি দরিদ্র উত্তমর্ণের দ্বারা প্রপীড়িত লোক এই বিশ্বাস করিয়া সুখী হইতে পারে যে সে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। এই ধরণের বাস্তব-বিমুখতা ক্ষতিকর। কোনও তরুণী কল্পনামূলক প্রেমের কাহিনী পড়িয়া এমনই অভিভূত হইতে পারে যে কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়া চাকুরী হারাইতে পারে। ইহাও ভাল নয়। কিন্তু অন্য অনেক ধরণের বাস্তব-বিমুখতা আছে যাহা কাম্য, যাহা আমাদের ভাল করে। মোজার্ট বাস্তবজগতের দারিদ্র্য ও ঋণের কথা ভুলিয়া কল্পনাবিলাসে আত্মবিস্মৃত হইবার জন্য সঙ্গীত রচনা করিতেন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদদের কথা শুনিয়া যদি তিনি শুধু আয়-ব্যয়ের খসড়া প্রস্তুত করিয়া সেই মত হিসাব করিয়া চলিতে যত্নবান হইতেন তাহা হইলে তাঁহার আয় যে বিশেষ বাড়িত, তাহা মনে হয় না। মাঝ হইতে আমরা তাঁহার অপরূপ সঙ্গীত হারাইতাম। এইভাবে বাস্তব-সত্য হইতে দূরে যাওয়া অবাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এই বাস্তব-বিমুখতা আমাদিগকে এমন কল্পলোকে লইয়া যায় যেখান হইতে আমরা বাস্তবজগতকেও অধিকতর সহনীয় করিয়া তুলিতে পারি। আমার বিশ্বাস বাস্তবকে ফাঁকি দিবার এই উদ্দেশ্য মানুষের মনে জাগ্রত না হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ মনোহারী বস্তু অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইত। সুতরাং ইহাই আমার অভিমত যে যাহারা বাস্তব হইতে দূরে যাইবার জন্য পড়াশুনা করে, বাস্তব-বিমুখ বলিয়া তাহাদের নিন্দা করা চলে না। *

* অনূদিত।

প্রাক্তনী

—শ্রীসুশীলকুমার দে

ছায়ার কায়াটি ধরিয়া, মায়ার রথে
কতবার তুমি এসেছ গিয়েছ ফিরে,
মৌনী মনের আঁধার-আড়াল পথে
বেদনা-বাহিনী বাসনার তীরে-তীরে ;
চিনি চিনি করি' চকিতে চিনেছি যা'রে,
চিনিয়া আবার হারায়ে খুঁজেছি তা'রে,
স্বপ্নের সেই কনক-কণিকাটিরে।

হে মোর ক্ষণিকা অপরূপ অপ্সরা,
তবুও লুকাতে পার নি গোপন প্রাণে,
বারে বারে তাই জীবনে দিয়েছ ধরা
শত-জনমের জাঙালের মাঝখানে ;
মানস-মৃণালে কামনার মঞ্জরী,
তিলে তিলে তব তনুটি উঠেছে গড়ি',
ফুটেছে আবার আমার মুখের পানে।

বরমাল্যটি পরায়ে স্বয়ম্বরে
কতবার তুমি হয়েছ সুখের সাথী,
অশ্রুধারায় ঝরেছ আমার তরে
কত না একেলা দীর্ঘ দুখের রাতি ;
মধু-পরিহাসে কত-না সকালে সাঁঝে
চোখে জলভার দেখেছি হাসির মাঝে,
কত-না লীলায় লীলায়িত রূপ ভাতি।

দিয়েছ দীপ্ত চরণ-অলক্তকে
গৃহ-প্রাঙ্গণ সারা প্রাণ-মন ভরি' ;
তুচ্ছ করিল কল্পনা-স্বর্গকে
আমার ধরণী তোমারে বক্ষে ধরি' ;
নিষ্কলঙ্ক শঙ্খ তোমার হাতে
বাজিল আবার শুভ কঙ্কণ সাথে ;
জ্বলিল প্রদীপ স্নেহ-রসে থরথরি'।

কতবার এলে তপোভঙ্গের তরে
জিনিয়া লইতে মোরে জীবনের মাঝে ;
কত তপোবনে একান্ত অন্তরে
আমারি ধেয়ানে জাগিলে তাপসী-সাজে ;
কতবার শুধু এলে আর গেলে চলি'
ক্ষণতরে মোরে বাহু-বন্ধনে ছলি',
উন্মাদ-ব্যথা তাই ত বক্ষে বাজে।

পথহারা তাই যুগে যুগে বারে বারে
ফিরেছি ঘুরিয়া বেদনের নিবেদনে,
ঊষর ধূসর মর্ম্ম-মরুর পারে
কখনো গহন মনের বিজন বনে।
ধ্যানের নয়নে উঠিয়াছ কত জাগি' ;
বরেছি হাসিয়া মৃত্যুরে তোমা' লাগি' ;
কেঁদেছি বসিয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে।

জনমে জনমে, হে আমার প্রাক্তনী,
কত খেলা কর দেহে দেহে সঞ্চরি',
সব সুখ-দুখ স্মৃতি-আশা মন্থনি'
অতনু সুষমা তনুর পাত্রে ভরি' ;
সে কায়ার মায়া জড়াল আমারে বুকে,
যমেরে তাড়াল কতবার,—হাসি-মুখে
বসিল চিতায় আমার চরণ ধরি'।

কতবার সেই দেহটি বেঁধেছি বুকে ;
চোখের আড়ালে কেঁদেছে বিরহ-ছলে,
সুধাসুমধুর-বেদনা-বিধুর সুখে
তন্ময় হয়ে ফিরেছি এ ধরাতলে ;
প্রলয়-পাগল কখনো সে-দেহহারা
স্কন্ধে ধরিয়া ছুটেছি ভুবন সারা,—
কখনো ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে।

হারায়ে হারায়ে ফিরে ফিরে পাই তারে
মরণের স্রোতে জন্ম-বিবর্ত্তনে ;
চির-তৃষ্ণায় প্রেম তাই বারে বারে
অমৃতায়মান মরণের অমরণে ;
হাবা-মুখখানি তাই বুঝি অমলিন
লুকায়ে আবার দেখা দেয় চিরদিন,
দ্বিগুণ সরস হরষের চুম্বনে।

ওগো প্রাক্তনী, চিরকাল সাথে থাকি'
এসেছ আবার সব স্মৃতি অবগাহি'—
অনেক কালের ভুলেছ সে-যাত্রা কি ?
চির-পুরাতন মোরে আর মনে নাহি ?
তাই আজ আমি তব চির-অনুরাগী
এনেছি আবার এ জনমে তোমা' লাগি'
বিপুল পথের বিচিত্র কথা বাহি'।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : দ্বিতীয় যুগ

বঙ্কিমচন্দ্র

—শ্রীসুকুমার সেন

রচনা-রীতির ক্রমবিকাশের দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির এইভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা চলে।

১। সংস্কৃতঘেঁষা : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী। (খ্রীষ্টীয় ১৮৬২—১৮৭০ সাল)।

২। প্রাকৃতঘেঁষা[১] : বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়[২]। রাধারাণী[৩]। (১৮৭২—১৮৭৪)।

৩। নিজস্ব-রীতি : ইন্দিরা,[৪] রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম। (১৮৭৪-৭৫—১৮৮৮)। কমলাকান্তের দপ্তর ও মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতও এই পর্য্যায়ে পড়িবে।

এই শ্রেণীবিভাগের নামকরণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। 'সংস্কৃতঘেঁষা' অর্থে যে রীতিতে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য ও সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য লক্ষিত হয় তাহাকেই আমি লক্ষ্য করিয়াছি। যে রীতি বা রচনাপদ্ধতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম তৎসম শব্দ ও সমাসযুক্ত পদের প্রয়োগ হইয়াছে, 'প্রাকৃতঘেঁষা' অর্থে তাহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আর যে পদ্ধতিতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দ সমান সমান ব্যবহৃত হইয়াছে ও সমান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে সমাসযুক্ত পদের প্রয়োগ অত্যল্প এবং যাহার বাক্যরচনা-রীতি সম্পূর্ণভাবে কথ্যভাষার আদর্শানুযায়ী, এক কথায় যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রীতি তাহাকেই 'নিজস্ব-রীতি' বলিয়াছি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে, যে সকল উপন্যাস পূর্ব্ব দুই শ্রেণীতে পড়ে তাহা বুঝি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য-পরিবর্জ্জিত। ইহা অনুমান করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভঙ্গি তাঁহার প্রথম উপন্যাসেই প্রকট হইয়াছিল; তবে এই ভঙ্গি প্রথম সাতখানি উপন্যাসে (যাহা আমি প্রথম দুই শ্রেণীতে ফেলিয়াছি) ক্রমপরিবর্দ্ধমান ভাবে দেখা যায়, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে উল্লিখিত সাতখানি উপন্যাসে সেই রীতি সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়। এই শ্রেণীবিভাগ ঠিক রচনা-কালানুযায়ী। রচনা-কাল হিসাবে 'ইন্দিরা' দ্বিতীয় শ্রেণীতে যায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কাল পরে ইহাকে যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমি এই পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত 'ইন্দিরা'-র কথা বলিতেছি।

প্রথমে প্রথম শ্রেণীস্থ উপন্যাসগুলির ভাষা লইয়া আলোচনা করিব। এক একটী উপন্যাস লইয়া বিচার করিলে বঙ্কিমের রচনারীতির ক্রমবিকাশ স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইবে বলিয়া তাহাই করা যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' খ্রীষ্টীয় ১৮৬১ সালে রচিত হইয়া ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা মোটামুটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষাশ্রয়ী বলা যাইতে পারে। এমন কি দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা ভ্রান্তিবিলাসের ভাষা হইতেও অধিকতর সংস্কৃতঘেঁষা। হেতুশব্দের অর্থে '-প্রযুক্ত,' অসমাপিকার অর্থে '-পূর্ব্বক,' সঙ্গ, সঙ্গী অর্থে 'সমভিব্যাহার,' 'সমভিব্যাহারী;' '-প্রমুখাৎ' প্রভৃতি প্রয়োগ ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে। 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ সুপ্রচুর, 'বল' ধাতুর প্রয়োগ নামমাত্র। 'সম্ভব', 'জিজ্ঞাস' শব্দ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তিষ্ঠ' ধাতুর ও ছবি আঁকা অর্থে 'লিখ' ধাতুর ব্যবহার ও ভাষার প্রাচীনত্ব-দ্যোতক।

তৎসম শব্দ বা শব্দাংশ প্রয়োগের উদাহরণ: 'নদী কল কল রবে প্রবহণ করে;' 'দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই;' 'যখন যাহা প্রয়োজন তাহা ইচ্ছাব্যক্তির পূর্ব্বেই পাইতেছেন;' 'ভানূদয় হইবে;' 'আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া;' 'তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন;' ইত্যাদি।

---

১ এখানে 'প্রাকৃত' শব্দ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি নাই। বাঙ্গালা-ভাষার মূল-প্রকৃতি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি।

২ 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস নহে, বড় গল্প।

৩ 'রাধারাণী'ও বড় গল্প।

৪ অষ্টম সংস্করণ। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম সংস্করণে 'ইন্দিরা'কে যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা' ঠিক উপন্যাসও নহে বড় গল্পও নহে, উভয়ের মাঝামাঝি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয় আগাগোড়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের সকল রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাকে তাঁহার প্রথম যুগের রচনার বিশেষত্ব বলিয়া গণ্য করা চলে না। কিছু উদাহরণ দিতেছি। 'বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা,' 'গৃহিণী যাদৃশী মান্যা,' 'ধূলিধূসরা দেহলতিকা,' ইত্যাদি।

সমাসের অসদৃশ আড়ম্বরের উদাহরণ : 'রাজকুমার পুনর্ব্বার অনিবার্য্যতৃষ্ণাকাতরলোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ;' 'তবে তালগাছ কখনও তাদৃশ গুরুনাসিকাভারগ্রস্ত হয় না ;' 'শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাতবিক্রেতা ;' 'অগণিত রজত-দ্বিরদরদস্ফাটিক সামাদানের তীব্রোজ্জ্বল জ্বালা' ; ইত্যাদি।

বাক্য-প্রয়োগরীতির বিসদৃশতা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষাকে কণ্টকিত করিয়াছে। এই দোষ উত্তরোত্তর কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার উপন্যাসের ভাষা হইতে এই দোষ কখনই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। প্রবন্ধাদির ভাষায় এই দোষ একেবারেই নাই, ইহা বলা চলে। দুর্গেশনন্দিনীতে বাক্য-প্রয়োগরীতির দোষ যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

'বোধ করি পাঠান সর্ব্বাংশে আপনার সহিত অভদ্রতা না করিয়া থাকিবে ;' 'এ জীবন ত্যাগ করিতে ব্যতীত আর ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না ;' 'ওসমান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন ;' 'দিনে দিনে গ্রাম গ্রাম পরগণা পরগণা দিল্লীশ্বরের হস্তস্খলিত হইতেছে ;' 'সুতরাং পৌরজন প্রায় কতলুখাঁর যাদৃশ, ওসমানের তাদৃশ বাধ্য ছিল ;' 'আরোগ্য জন্মিতে লাগিল।' 'দেখিয়াছিলাম না,' ইত্যাদি প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে হয়ত চলিত, এখন এইরূপ প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

অনেক স্থলেই সংস্কৃত বাক্যপ্রয়োগরীতি দেখা যায়। যেমন, 'আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথশরজালে বিদ্ধ হয় ;' 'অপরাহ্ণে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন ;' 'বিমলা অপেক্ষা কোন নবীনা তোমার মনমোহিনী ?' 'আমি তাঁহার নিকট আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থিতা ;' 'এমত শ্রুত ছিলেন ;' 'তিনি আমাকে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন।'

দুর্গেশনন্দিনীতে ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগরীতিরও অসদ্ভাব *নাই বটে ; কিন্তু ইংরেজীর ছাঁচে ঢালা প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস* হিসাবে ইহার মধ্যে যে পরিমাণ ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগ রীতির প্রাচুর্য্য থাকা উচিত ছিল তাহার শতাংশের একাংশও নাই। উদাহরণ : 'তবে ক্ষমা করি, যদি পরিচয় দাও ;' 'আমি নিশ্চিত পাঠক মহাশয়কে বলিতেছি ;' 'সংবর্দ্ধিত ব্যাকুলতার সহিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ;' 'আমি আপনার কার্য্য করিতে পরম সুখী হইব ;' 'বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম-প্রবেশও উত্তম।'

দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় আর একটী মহৎ দোষ আছে। এই দোষ বঙ্কিমচন্দ্র শেষ অবধি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে শেষের দিকের রচনায় এই দোষের মাত্রার পর পর হ্রস্বতা হইয়াছিল। ইহা আর কিছুই নহে, কথোপকথনের ভাষায় মৌখিক ও লৈখিক[১] ক্রিয়াপদের একই বাক্যের মধ্যে বা একই ব্যক্তির উক্তির মধ্যে একত্র প্রয়োগ। এই শৈথিল্যের জন্য অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে দায়ী। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার মধ্যেও ইহা কিছু কিছু পাওয়া যায় [বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৪০, পৃ: ৫৩]। ইহার কারণও আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিয়াছি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের রচনায় ইহার মাত্রাধিক্য হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি আরও সাবধান হইতে পারিতেন।

এই প্রয়োগের কিছু উদাহরণ দিতেছি। 'আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি ?' 'অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ওত কিছুই বুঝিতে পারিবে না ; সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই। তবে বামুন যেতে চাবে না' ; 'সাধ করিয়া কি তোমায় খরাজ বলেছি ?' অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

দুর্গেশনন্দিনী ও প্রথম যুগের অপরাপর উপন্যাসের মধ্যে রচনাপদ্ধতির দুইটী স্তর পাশাপাশি দেখা যায়। একটী সংস্কৃতানুযায়ী বা 'বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি', অপরটী বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব বা 'বঙ্কিমী পদ্ধতি।' এই পদ্ধতির সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না, প্রবন্ধের শেষের দিকে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। দুর্গেশনন্দিনীর বেশীর ভাগই বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতে রচিত। বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব যাহাই থাকুক, তাঁহার নিজের রীতি এই বিদ্যাসাগরী

১ শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই উপযোগী শব্দটীর স্রষ্টা।

রীতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাস কয়খানি স্থূলতঃ বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতেই রচিত। দুর্গেশনন্দিনী হইতে এই পদ্ধতিতে রচিত কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

শ্যামোজ্জ্বল শাখাপল্লব সকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত, কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল, কাননতলে ঘোরান্ধকার, কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইতেছে, আমোদরের স্থিরাম্বুমধ্যে নীলাম্বর চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত, দূরে অপরপারস্থিত অট্টালিকা সকলের গগনস্পর্শী মূর্ত্তি, কোথাও বা তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা বিষণ্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, এমত সময়ে তাঁহার অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল। বিমলা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা চিত্রার্পিতপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইলেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় ১৮৬৭ সালে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়। এই পাঁচ বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-রীতি বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কপালকুণ্ডলার ভাষা ঠিক দুর্গেশ-নন্দিনীর ন্যায়। তবে ইহাতে ভাষার গতি দ্রুততর হইয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতরীতিকণ্টকিত হইলেও বাক্য-প্রয়োগের বিসদৃশতা একেবারে নাই বলিলেই হয়। আর বিষয়োপযোগী হওয়াতে রচনা-রীতির দুরূহত্ব এই আখ্যান-কাব্যটীর সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধিসাধনই করিয়াছে।

স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় হইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যপদের সম্বোধনে সংস্কৃত রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন 'কপালকুণ্ডলে।' দুর্গেশনন্দিনীতেও এই প্রয়োগ পাওয়া যায়। 'কহ' ধাতুর প্রয়োগও পূর্ব্বের মত বলবৎ রহিয়াছে। 'তিষ্ঠ' ধাতু ও 'বর্ণ,' 'ভ্রম,' 'জিজ্ঞাস,' 'সম্ভব,' প্রভৃতি নামধাতুর প্রয়োগও যথেষ্ট রহিয়াছে।

মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ যথেষ্টই রহিয়াছে, তবে দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। এই পুস্তকেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম 'এলেম', 'পড়লেম' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ কথ্যভাষায় ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপ পদগুলি বোধ হয় নাটকীয় ভাষার প্রভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল।

বাক্যপ্রয়োগরীতির বৈসাদৃশ্য কপালকুণ্ডলায় লক্ষিত হয় না বলিলেই হয়। একটীমাত্র উদাহরণ আমার চোখে পড়িয়াছে, 'কাপালিক কুটীরমধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে।'

সংস্কৃত বাক্যপ্রয়োগরীতিও ইহাতে যথেষ্ট লক্ষিত হয়। যেমন, 'একমাত্র উপায় হইতে পারে—সে আপনার ঔদার্য্য-গুণের অপেক্ষা করে;' 'পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই;' 'মদনরসে টলটলায়মান;' 'তথায় পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন;' ইত্যাদি।

তৎসম সমাসযুক্ত পদ অনেক সময় রচনার মধ্যে খাপ খায় নাই। উদাহরণ, 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল;' 'তদ্বর্ত্ম-সংবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই;' 'মেহের উন্নিসাকে আমি কিশোরবয়োবধি ভাল জানি;' 'সহসা লুৎফ-উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন;' 'কেবল কদাচিন্মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন শব্দ;' ইত্যাদি।

গ্রন্থমধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত অংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া অক্লেশে গৃহীত হইতে পারে।

ইহাঁর বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খৃষ্টীয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইহাঁর নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধি করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া, ইহাঁর চরিত্র পরমপবিত্র। ইহাঁকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' খ্রীষ্টীয় ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়। কপালকুণ্ডলা প্রকাশের তিন বৎসর পরে রচিত(?) ও প্রকাশিত হইলেও ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি কিছুমাত্র উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয় নাই। বরং ইহা কপালকুণ্ডলার তুলনায় যথেষ্ট অমার্জ্জিত রচনা বলিয়া বোধ হয়, যেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর শক্তি কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে পূর্ব্ব দুই উপন্যাসের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তদ্ভব পদ ও কথ্য বাক্যরীতি ব্যবহার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই উপন্যাসটীতে

তাঁহার রচনারীতি নিজস্ব পদ্ধতির দিকে বেশী পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে দেখা যায়।

প্রথম সংস্করণের মৃণালিনীর ভাষা যে আরও কতদূর অধিক অমার্জ্জিত ছিল তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। প্রথম সংস্করণের ত্যক্ত প্রথম দুই পরিচ্ছেদ অবলম্বনে এই আলোচনা করিতেছি।

অযথা সন্ধি ও সমাস অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে। যেমন, 'উৎসবের জন্য দিনাবধারিত করিলেন;' 'চক্ষু অধিক জ্যোতিঃস্ফুরৎ হইতে লাগিল;' 'সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্ন;' 'আরোহীরা কি বা তচ্চালনকৌশলী;' ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত বাক্যটিতে 'কানে কানে' এই তদ্ভব বাক্যাংশের তৎসম রূপ 'কর্ণে কর্ণে' ব্যবহার করাতে অর্থদোষ ঘটিয়াছে—'তাহার কর্ণে কর্ণে উপদেশ দিলেন।'

সংস্কৃত বাক্যপ্রয়োগরীতিরও অসদ্ভাব ছিল না। যেমন, 'তাঁহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল।'

এই সকল দোষ পরিমার্জ্জিত সংস্করণের মৃণালিনীতে পাওয়া যায় না। সে হিসাবে মৃণালিনীকে অনেকটা দ্বিতীয় যুগের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

'সম্ভব,' 'সাধ,' 'তিষ্ঠ,' প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ খুবই আছে। 'কহ,' 'বল' ও, ধাতু তুল্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর লৈখিক ও মৌখিক ভাষায় ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ যথেষ্টভাবে বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতঘেঁষা রীতিতে লিখিত কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধৃবেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন। অকালজলদোদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে।

'বিষবৃক্ষ' বাঙ্গালা ১২৭৯ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭২-৭৩) সালে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে 'ইন্দিরা'ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষবৃক্ষের বিষয়বস্তু অভিনব ও আধুনিক, এবং ইহার ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তদ্ভবমূলক বা প্রাকৃতঘেঁষা হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতরীতিকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজস্ব রীতি এখনও তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া উঠে নাই। সংস্কৃত বাক্যপ্রয়োগরীতি যথেষ্টই উঁকি দিতেছে। যেমন, 'আকাশে মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল,' 'গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল;' ইত্যাদি। তৎসম শব্দও সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার প্রায়ই রচনার সৌন্দর্য্য ব্যাহত করিয়াছে। যেমন, 'তোর. এই বালিকাবয়ঃ;' মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছে;' ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদের স্ত্রী-প্রত্যয়ের একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। যেমন, 'চাঁপা বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল;' 'বিচিত্রা মালা;' 'অস্ফুটবাচা বালিকা;' 'এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল;' 'প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা;' 'সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা;' 'বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায়;' ইত্যাদি। এই স্ত্রীপ্রত্যয়প্রিয়তা দুই এক স্থলে ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। যেমন, 'মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ।'

'করত' প্রভৃতি পদ ও '-পূর্ব্বক' শব্দের দ্বারা অসমাপিকার অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে। 'তিষ্ঠিতে,' 'সিঁয়াইতে,' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাক্যপ্রয়োগরীতির বৈসাদৃশ্য মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে। যেমন, 'তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয়দিন থাকিতে পারিব?' 'এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি;' 'আমা হ'তে পবিত্র নয়?' ইত্যাদি। শ্রুতিকটু ইংরেজী রীতির প্রয়োগ খুব কমই আছে। একটী উদাহরণ দিতেছি,—'চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল।'

লৈখিক ও মৌখিক ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ ত আছেই, উপরন্তু 'খেতেছে', 'করতেছে', 'হলেম', প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বিষবৃক্ষে কতকগুলি ফারসী ও ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিষয়বস্তু আধুনিক কালের (অর্থাৎ রচনা সময়ের হিসাবে আধুনিক কালের, আন্দাজ ১৮৬৫ সালের দিকের) বলিয়া ইহাতে তৎকালে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এইরূপ কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা শব্দের মত ব্যবহৃত

হইয়াছে। যেমন, 'সোপ-হস্তে;' 'প্রাচীন গীত কোট করিয়া;' 'টিকিট মারিয়া;' 'কমিটী করিয়া;' 'কমিটীতে বসিয়া গেল;' ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে এতাদৃশ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না।

বিষবৃক্ষে সংস্কৃতঘেঁষা রচনার অসদ্ভাব নাই, কিন্তু তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব পদ্ধতির প্রভাবে পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার ইহা একটী প্রধান বিশেষত্ব। বিষবৃক্ষ হইতে এই রচনার উদাহরণ হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

> রূপদর্শন-জনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। ইত্যাদি।

'চন্দ্রশেখর' বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা ১২৮০ (খ্রীষ্টীয় ১৮৭৩-৭৪) সালে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। আমি প্রথম সংস্করণের চন্দ্রশেখর পাই নাই, সুতরাং সংশোধিত সংস্করণ লইয়াই এই আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

চন্দ্রশেখরের মধ্যে বাক্যপ্রয়োগরীতির গলতি একেবারেই নাই। তবে মৌখিক ও লৈখিক ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ আছে বটে। এই পুস্তকেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম 'কল্লুম' ইত্যাদি ভাগীরথীতীরবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কথোপকথনের ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাবে মৌখিক ভাষার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যও যথেষ্ট, এমন কি তদ্ভব স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণেও স্ত্রী-প্রত্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, 'হৃষ্টপুষ্টা একটি গাই চরিতেছে।'

'সন্তবে,' 'মোহিয়াছে,' 'শোভিতে লাগিল,' ইত্যাদি কাব্যসুলভ নামধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। সমাসের জটিলতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি সমাসযুক্ত পদের অসদ্ভাব নাই। দুইটীর অধিক পদ লইয়া সমাস খুব বেশী নাই। যেমন, 'পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থিশাখা-রাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত।'

'রজনী' বাঙ্গালা ১২৮১ (খ্রীষ্টীয় ১৮৭৪—৭৫) সালে বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার শেষ চারিখণ্ড বহুল পরিমাণে পরিবর্জ্জিত ও পুনর্ল্লিখিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের অভাবে এই পরিমার্জ্জিত সংস্করণ লইয়াই আলোচনা করা হইতেছে।

রজনীর ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত রীতির সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই পুস্তকে দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব-রীতি সম্বন্ধে পুরামাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহাতে 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ নাই। পরবর্ত্তী উপন্যাস-গুলিতেও নাই। লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ কম হইয়া আসিতেছে। স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহারও যথেষ্ট কম।[1] 'বর্ষে,' 'উছলিত,' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। নিম্নে উদ্ধৃত স্থলে দ্বিতীয়া-চতুর্থীর '-কে' প্রত্যয়ের অভাব লক্ষণীয়—'আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব;' 'আমি শচীন্দ্র চাহিতাম।'

তদ্ভব শব্দকে তৎসমরূপে ব্যবহার করায় একস্থলে বিষম অর্থদোষ ঘটিয়াছে,—'তাহার কঙ্কাল (=কাঁকাল) হইতে দাখানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম।'

'সুতরাং' শব্দের সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ লক্ষণীয়—'যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।'

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাঙ্গালা ১২৮৪ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৭-৭৮) সালে বঙ্গদর্শনে বাহির হয়। ইহার রচনারীতি 'রজনী' হইতেও বেশী পরিমাণে প্রাকৃতঘেঁষা। স্ত্রী-প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ একস্থলে পাইয়াছি,—'হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ক-কলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ!' ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও কিছু কিছু আছে। 'তিনি হাপ-পর্দ্দানসীন'—এই ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী শব্দটীকে বাঙ্গালা শব্দে পরিণত করিয়াছেন। সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য মোটেই নাই, দৈবাৎ উপমাদির স্থলে

' সংস্কৃতঘেঁষা রচনার উদাহরণ—

শব্দসাগর মন্থন করিয়া কত শত মহার্ঘ শ্রবণমনোহর বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভাষিতা ছায়া বিস্তারিতা করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠনির্গত, উচ্চারণকৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্যসকল চন্দ্রশেখরের কণ্ঠে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ইত্যাদি।

[1] ইহা অবশ্য পুনর্লিখনের ফল হইতে পারে।

পাওয়া যায়। যেমন, 'নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায়।' মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে।

উক্তি-প্রত্যুক্তির বাহুল্য ও ঘটনার দ্রুতগতি কৃষ্ণকান্তের উইলের ভাষাকে লঘুগতি ও সাবলীল করিয়া তুলিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে সংস্কৃতঘেঁষা রচনাপদ্ধতি যে কতটা সরল ও লঘু হইয়া উঠিয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজলে সে ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন।

অথবা—

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল-দীর্ঘ-বিলম্বিত ঘোর-কৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জল বৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্তভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল।

'রাজসিংহ' বাঙ্গালা ১২৮৫ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৭৮-৭৯) সালে প্রকাশিত হয়। ইহাও প্রথম বঙ্গদর্শনে বাহির হয়। চতুর্থ সংস্করণে উপন্যাসটীর কলেবর যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের ভাষার সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য।

রাজসিংহের ভাষা বেশ সরল হইলেও পূর্ব্ব দুইটী উপন্যাসের ভাষার তুলনায় খুঁতযুক্ত (crude) ও অপরি-মার্জ্জিত (careless) বলিয়া বোধ হয়। ইহা নিম্নের আলোচনা হইতে স্পষ্টীকৃত হইবে।

অনুপযুক্ত স্থলে তৎসম পদ বা সমাস এবং তৎসমপ্রচুর বাক্যের মধ্যে তদ্ভব, দেশী, বা বিদেশী শব্দের প্রয়োগ স্থানে স্থানে রচনাকে তুচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। যেমন, 'কুতব-মিনারের বৃহচ্চূড়া,' 'নয়ননামা গিরিসঙ্কটে;' 'প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল;' ইত্যাদি।

সমাসযুক্ত তৎসম শব্দের প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে রচনার ভারসমতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যেমন, 'অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল;' 'বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায়;' 'পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া বিস্ময়করী মোগলবাহিনী;' ইত্যাদি।

'সম্ভবে,' 'উছলিতেছে,' 'ভ্রমিতেছিলেন,' 'শোভিতেছিল,' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ আরও কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই।

'আনন্দমঠ' বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা ১২৮৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৯ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৮০—৮৩) সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণে ইহা কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইয়াছিল। তথাপি ভাষার দোষ ইহাতে কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। যেমন, 'জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে;' 'এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না;' 'ভবানন্দের কাছে এসব কারণ অনুপস্থিত;' 'যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও; আমি যাইতেছি;' ইত্যাদি স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার অল্প।

সংস্কৃতঘেঁষা রচনার উদাহরণ—

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি। অন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পরিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

'দেবীচৌধুরাণী'-র কিয়দংশ মাত্র বঙ্গদর্শনে ১২৮৮ (=খ্রীষ্টীয় ১৮৮১-৮২) সালে প্রকাশিত হয়। আনন্দমঠ প্রকাশিত হইবার পর ইহা সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়।

'আনন্দমঠ' রচনার সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছিল। দেবীচৌধুরাণীতে তাহা স্ফুটতর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ উপন্যাস তিনটীর ভাষার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখেন নাই, ইহা নিম্নের আলোচনা হইতে বোধগম্য হইবে।

নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে ইংরেজী অনুকরণ ও বাঙ্গালা ব্যাকরণঘটিত দোষ পরিলক্ষিত হইবে।

'যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই!' 'পাঁচ বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে (=শাণাইতে)

হইবে ;' 'কাপড়ের ব্যাপারীরা কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল।'

স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য আবার দেখা দিয়াছে। যেমন, 'শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন ;' 'কান্তি স্ফূর্ত্তিময়ী ;' ইত্যাদি। মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ—যাহা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল—তাহা আবার বাড়িয়াছে।

'সীতারাম' খ্রীষ্টীয় ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। আনন্দমঠ ও দেবী-চৌধুরাণীর তুলনায় ভাষা বেশ সরল হইলেও রচনা অমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেমন, 'অশ্বা বড় তেজস্বিনী,' 'বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী ;' 'বজ্রের প্রহারে আহতা আসুরী সেনার ন্যায় ; 'আশা নিস্ফলা হইবে না ;' ইত্যাদি।

'না হইয়াছিলেন ;' 'না দেখিয়াছিলেন ;' 'বিধেয় হয় না (=নহে) ;' ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যাকরণদুষ্ট না হইলেও অপ-প্রয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে। 'জমিদারির খাজানা পূর্ব্বমত রাজকোষাগারে পৌছিয়া দিতে লাগিলেন ;'—এ স্থলে 'পৌছাইয়া'র পরিবর্ত্তে 'পৌছিয়া' লেখা ভুল। দেবী-চৌধুরাণীতেও 'শাণাইতে' স্থলে 'শাণিতে' পাওয়া গিয়াছে।

'নিস্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল ;'—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বাক্যপ্রয়োগরীতির হিসাবে এই বাক্যটী দুষ্ট। 'রমা বড় ছোট মেয়েটি ;' ইহাও শ্রুতিকটু। 'প্রেম যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশ কুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে ;'—ইহা ইংরেজি অনুবাদ-গন্ধী। 'কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপা-দৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম' ;—এস্থলে 'তিনি' এই পদটী 'তাঁহার' হওয়া উচিত ছিল।

উপন্যাসগুলির তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলির ভাষা মার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় যুগের প্রবন্ধগুলিতে স্ত্রী-প্রত্যয়ের আধিক্য দেখা যায়[১]। শেষযুগের প্রবন্ধের বিশেষ করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের ভাষাকে নিখুঁত বলা যাইতে পারে।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব-রীতির আলোচনা করিব। পূর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির মূলে বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস হইতে এমন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারা যায় যাহা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া বোধ হইবে। যেমন, 'পূর্ব্বকালে উত্তর বাঙ্গালায় নীলধ্বজবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন' [দেবীচৌধুরাণী]। এই উদাহরণটী আমি যদৃচ্ছাক্রমে তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়াই কেহ যেন মনে করিয়া না বসেন যে বঙ্কিমী-রীতি বলিয়া কিছু নাই, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য কিছুমাত্র উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা (সাহিত্যের) গদ্যের জনক, আর বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পোষ্টা। পোষ্টার কৃতিত্ব জনকের কৃতিত্ব হইতে কিছুমাত্র অল্প নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে পড়িয়া বাঙ্গালা গদ্য চরমরূপ প্রাপ্ত হইল। (ভাষায় চরমরূপ বলিয়া কিছু হইতে পারে না, কেন না ভাষা পরিবর্ত্তনশীল, আর সাহিত্যিকের প্রতিভাও অনন্ত দিকে প্রতিফলিত হইতে পারে। সুতরাং ভাষার বা রচনাভঙ্গির বিভিন্ন রূপ হইয়াই থাকে। এখানে চরম রূপ অর্থে বাক্যের গঠন ও কার্য্যোপযোগিতাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি। ভাষা অল্পবিস্তর বদলাইলেও সাহিত্যের ভাষায় বাক্যের কাঠামো অনেকদিন ধরিয়া অবিকৃত থাকে। বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যের গদ্যের কাঠামো বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক গঠিত ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হয়।)

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রচনা-পদ্ধতির বিশেষত্ব এইগুলি—

(১) বাক্যগুলি ছোট, এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই সরল (clipped, simple sentences).

(২) সংযোজক অসমাপিকার (conjunctive) অব্যবহার, ও তৎস্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার।

(৩) নিশ্চয়াত্মক (affirmative) বাক্যের স্থলে প্রশ্নাত্মক (interrogative) বাক্যের ব্যবহার।

(৪) মধ্যে মধ্যে পাঠককে অথবা প্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া অথবা চিন্তাকুলতার হেতু মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ। এই

১ দুই এক স্থলে এইরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। যেমন, 'নরোত্তম কৃষ্ণকে একটি বিশেষ ঐশী শক্তিতে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।' [বিবিধপ্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড]।

প্রয়োগটী রচনাকে সরস (interesting) ও বিশ্রদ্ধ (intimate) করিয়া তুলে।

(৫) পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের আখ্যায়িকার রচনায় লেখক কথকের স্থান অধিকার করিতেন, অর্থাৎ তিনি যেন কতকগুলি শ্রোতার নিকট কোন ব্যাপার বা কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। অথবা কোন ঘটনা নথীভুক্ত (record) করিতেছেন বা রিপোর্ট লিখিতেছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখক যেন কোন বন্ধুর সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন বা বিশ্রদ্ধভাবে কথোপকথন করিতেছেন। এখানে গল্প বা কাহিনীটা মুখ্য নহে, যাহাকে বলা হইতেছে তাঁহাকে পরিচর্য্যা (entertain) করাই যেন লেখক বা বক্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব পদ্ধতিতে কাহিনীটা মুখ্য, শ্রোতা গৌণ (in the background), এই পদ্ধতিতে পাঠকই মুখ্য। এইটীই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রধান বিশেষত্ব। মুখ্যতঃ ইহাই তাঁহার রচনাকে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের রচনা হইতে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

(৬) একই বাক্যের অথবা একই কর্তৃপদ কিংবা একই ক্রিয়াপদসংবলিত বাক্যের পুনরাবৃত্তি। ইহাও রচনায় আন্তরিকতা ও বিশ্রদ্ধভাব আনয়ন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে ইহা কিরূপভাবে দেখা দেয়, এবং পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে ইহা পরপর কিরূপভাবে ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্যলাভ করে তাহা দেখাইবার জন্য আমি ক্রমহিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

[দুর্গেশনন্দিনী] প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে? চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কিনা কে বলিবে?

রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। যদি আয়েষার নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আয়েষা কোন উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে?

[কপালকুণ্ডলা] কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গম্ভীর[১] চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফ-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

[মৃণালিনী] গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতি এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমত নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ

[বিষবৃক্ষ] নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশবাবু প্লাওর ফেয়ার্‌লির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারী, শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।[২]

[চন্দ্রশেখর] তুমি জড়-প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। তোমাকে নমস্কার।

[রজনী] আমার মর্ম্মের দুঃখ, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখপ্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না। সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুল বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুল বৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমার দুঃখে আর কয়জনের দুঃখ হইবে?

[কৃষ্ণকান্তের উইল] ভ্রমর আবার শ্বশুরালয় গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না, কোনও সংবাদ আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না।

[আনন্দ মঠ] রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য—কেন না, এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন, ফুল্লকমল তুল্য তাহার নব বয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই, বেশ নাই, আহার নাই—তবু সে প্রদীপ্ত অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত।

[সীতারাম] তা কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কা'ল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কা'ল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈ কি? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা, সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা।

---

১ গভীর?

২ এই অংশটী বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প-বলার পদ্ধতির (narrative style) সুন্দর উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভাষা ইতিপূর্ব্বেই খুঁটিয়া আলোচনা করিয়াছি। এইবার এই সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটা কথা বলিব।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় খুব প্রচুর পরিমাণে এবং সর্ব্ববিধ ও সর্ব্বসময়ের রচনায় দেখা যায়। এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিধেয়-বিশেষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও করিয়াছেন। উদাহরণ পূর্ব্বেই যথেষ্ট দিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাস গুলিতেই কবিতায় ভাষার ছাপ কিছু কিছু পাওয়া যায়—'আমা হইতে,' 'তোমা বিনা,' ইত্যাদি প্রয়োগে ও 'সন্তুষে,' 'উছলিত,' 'ভ্রমিয়া,' 'মোহিয়াছে,' 'বর্ণিতে,' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে।

'প্রহরেক,' 'বৎসরেক,' 'ক্রোশেক,' ইত্যাদি 'এক' শব্দের সহিত সমাসান্ত পদও সমস্ত রচনাতেই পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ সমাসযুক্ত পদের সহিত উপমাদ্যোতক '-বৎ' প্রত্যয়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন, 'অনাহ্লাদজনিতবৎ;' 'কুসুমমালাবৎ;' নিশীথফুল্লকুসুমযুগল-বৎ;' ইত্যাদি।

'নহে', 'নয়'—ইহার স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র 'না' এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব হেতুই হইয়াছে। যেমন, 'তামাসা না;' 'তা না;' ইত্যাদি।

'বল' ও 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ প্রথম দিককার লেখায় দেখা যায়। দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় 'কহ' ধাতুরই প্রাবল্য। শেষের দিককার রচনায় 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ একেবারেই দেখা যায় না।

'গাহিতে' এই ক্রিয়াপদ 'গায়িতে' এইরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কদাচিৎ 'গাইতে' এইরূপ পাওয়া যায়। 'চাহিতাম' 'চাইতাম' রূপেও দেখা যায়। 'লইয়া' স্থলে 'নিয়া' এই রূপই শেষের দিকের রচনায় কথোপকথনের ভাষা ছাড়াও অন্যত্র বেশী করিয়া দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ খুবই অল্প। আর তাহাও নেহাত আবশ্যক স্থল ছাড়া করা হয় নাই। ফারসী শব্দের সম্বন্ধেও তাহাই বলা চলে।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার দোষের কথা কিছু বলিব।

বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-প্রত্যয়ের খুব পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই স্ত্রী-প্রত্যয়-প্রিয়তা তাঁহাকে অনেক সময় ব্যাকরণদুষ্ট পদের প্রয়োগ করাইয়াছে। ইহার একাধিক উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি।

কথোপকথনের মধ্যে মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-পদ্ধতির একটী প্রধান দোষ। প্রথম যুগের রচনায় ইহা যতটা দেখা যায় ততটা পরবর্ত্তী যুগের রচনায় দেখা যায় না ইহা সত্য বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কোন রচনা ('কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি দুই একটী প্রবন্ধ ছাড়া) এই দোষ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহে।

অযথা সমাস করা আর একটী বড় দোষ। রচনার গুরুত্ব ইহার জন্য মধ্যে মধ্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেমন, 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল;' 'পরমাহ্লাদিত হইত;' 'তাহাতে কালাপহৃত হয়;' 'সপ্তমী প্রায়াগতা;' ইত্যাদি।

মোটামুটি এইগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রধান দোষ।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিস বাঙ্গালা দেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই, তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাঙ্গালাভাষাকে স্নান করাইয়া তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

—রামেন্দ্রসুন্দর

রাজমহলের আর একটি পাহাড়ী জাতি

—শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

১৩৩৯-এর ভাদ্রের 'উপসনা'য় রাজমহল পাহাড়ের সাউরিয়া নামক একটি বর্ব্বর পাহাড়িয়া জাতির কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। এই জাতিটির দক্ষিণে মালপাহাড়িয়া নামে একটি সমতলবাসী জাতি বাস করে। সাউরিয়া ও মালপাহাড়িয়ারা যে আকার, অবয়ব, কৃষ্টি প্রভৃতিতে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধে মালপাহাড়িয়াদের উৎপত্তি ও তাহাদের কৃষ্টির কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদানের (traits) আলোচনা করিব।

লোকসংখ্যা ও ভাষা

মালপাহাড়িয়াদের আজকাল দেখিলেই অনেকটা বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। সাঁওতাল পরগণার আশেপাশে বাউরি হাড়ী ডোম প্রভৃতি বাঙ্গালী জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়াই মালপাহাড়িয়া কৃষ্টির মধ্যে আজকাল বিবিধ হিন্দু প্রভাব দৃষ্ট হয়। মালপাহাড়িয়াদের ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে তাহাদের আদি দ্রাবিড় 'মালতো' ভাষার অনেক কথাবার্ত্তা শুনা যায়। এখন অনেক মালপাহাড়িয়ারা এই 'মালতো' ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। বিহার ও উড়িষ্যার আদমসুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় যে সাঁওতাল পরগণায় সমস্ত মালপাহাড়িয়ার সংখ্যা হইল ৩৭,৪৩৭ (১৮,৭২৯ পুরুষ, ১৮,৭০৮ স্ত্রী) এবং সাউরিয়া পাহাড়িয়ার সংখ্যা হইল ৫৯,৮৯১ (৩০,৫৫৫ পুরুষ, ২৯,৩৩৬ স্ত্রী) অথচ সাঁওতাল পরগণায় 'মালতো'-ভাষীর সংখ্যা হইল সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭,০৬২। 'মালতো'-ভাষীদের মধ্যে কেবলমাত্র সাউরিয়াদের গণনা করা হইয়াছে। অথচ সাউরিয়াদের মোট সংখ্যা হইতে 'মালতো'-ভাষীদের সংখ্যা ৭,১৭১ অধিক। বাঙ্গালীরা ত আর 'মালতো' ভাষায় কথা কহে না? বলিতে পারিলেও ত তাহাদের মাতৃভাষারূপে আদমসুমারীর রিপোর্টে প্রকাশিত হইতে পারে না? মালপাহাড়িয়াদের আদি মাতৃভাষা হইল এই 'মালতো' এবং এই ৭,১৭১ জন যে মালপাহাড়িয়া তাহা নিঃসন্দেহ।

উৎপত্তি

সাঁওতাল পরগণার যে অংশে আজকাল এই মালপাহাড়িয়ারা বাস করে তাহা অন্যূন একশত বৎসর পূর্ব্বে সাউরিয়াদের বাসভূমি ছিল। পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সাউরিয়া পাহাড়িয়াদের বাসভূমি উত্তরে গঙ্গার উপকূল হইতে
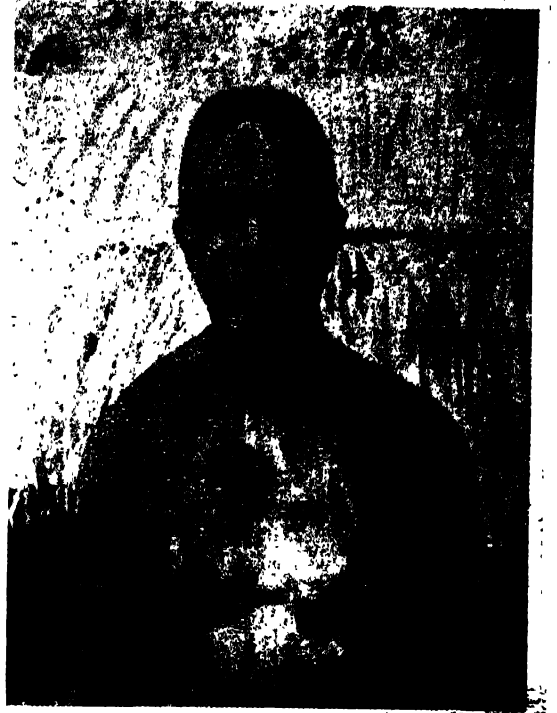
মালপাহাড়িয়া (সম্মুখ)

দক্ষিণে ব্রহ্মাণী নদীর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকারের সংরক্ষিত পুথি হইতে আমি কয়েকটি অপ্রকাশিত তথ্য আবিষ্কার করি এবং তাহা হইতে মনে হয় যে সাউরিয়াদের বাসভূমি আরও দক্ষিণে বীরভূমের উত্তর-পশ্চিমাংশে বেলপাত্তা প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পুথিগুলি ১৭০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগের— তৎকালীন গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ের। এই সময়ে মালপাহাড়িয়া জাতির কোন অস্তিত্ব ছিল বলিয়াই মনে হয় না। সাউরিয়া পাহাড়িয়ারা এই সময়ে সমতলবাসীদের অত্যন্ত ভয়ের কারণ ছিল; গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি কোনরূপ অস্থাবর সম্পত্তি ইহাদের উপদ্রবে রাখা যাইত না; কখন কখন দলবদ্ধ হইয়া গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিত এবং লুটতরাজ করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত। যাহারা সম্মুখে বাধা

দিতে আসিত তাহাদের মারিয়া ফেলিতে পশ্চাৎপদ হইত না। ইহাদের অস্ত্রের মধ্যে ছিল একমাত্র তীর ও ধনুক। বাঙ্গলার লাট বাহাদুর এই সময় এই পাহাড়িয়াদের দমন করিতে একদল সৈন্য পাঠান ; এইরূপ কত সৈন্যদল আসিয়া

মালপাহাড়িয়া (পার্শ্ব)

আপন আপন দলের অধিকাংশ সৈন্য হারাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সৈন্যদল অধিকাংশ স্থলেই পাহাড়ের উপরেই আসিতে পারিত না—সাউরিয়ারা বিষাক্ত তীর ও ধনুক লইয়া বৃক্ষপত্রের মধ্য হইতে অগ্রগামী সৈন্যদলের সম্মুখে সকলে মিলিয়া একত্রে কতকগুলি তীর ছুঁড়িত। সৈন্যেরা বুঝিতেই পারিত না কোথা হইতে তীর আসিতেছে, আর যাহার গাত্রে একটি বার ঐ বিষাক্ত তীরের কোন অংশ লাগিত তাহার আর মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি ছিল না। এখনও সাউরিয়ারা এই বিষাক্ত তীর ব্যাঘ্র মারিবার সময় ব্যবহার করিয়া থাকে। পর পর কয়েকবার বিফল হইয়া লাট বাহাদুর সৈন্যদলের নেতাকে রাত্রিকালে হঠাৎ আক্রমণ করিতে আদেশ দেন ও ইহার ফলে বহু সাউরিয়া হত ও আহত হইয়াছিল। বহু সাউরিয়া গ্রাম একেবারে পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। এই আক্রমণের দুই বৎসর পরে ক্লীভল্যাণ্ড, Cleaveland ভাগলপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও রাজস্ব-আদায়কারী হইয়া আসেন। ক্লীভল্যাণ্ড এই পদ গ্রহণ করিয়াই পাহাড়িয়া দমনে মনোনিয়োগ করিলেন। তবে তাঁহার উপায় হইল অন্য। তিনি বুঝিলেন যে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা এরূপ শত্রু করায়ত্ত করা যাইবে না। সাউরিয়াদের মধ্যে পূর্ব্বে যে সকল আহত বন্দীরা ছিল তিনি তাহাদের প্রত্যেককে কিছু জমি ও সরকার হইতে কিছু মাসিক বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া সমতল স্থানে বসবাস করাইয়া দিলেন এবং ক্রমশঃ ইহাদের দ্বারা অন্যান্য পাহাড়িয়াদের আনাইয়া একটি পাহাড়িয়া সৈন্যদল গঠন করিলেন ; এই সৈন্যদলের মধ্যে সকলেই ছিল, সাউরিয়া পাহাড়িয়া। এজন্য এই দলের নাম হইয়াছিল দি ভাগলপুর হিল রেঞ্জার্স্ The Bhagalpur Hill Rangers। এই সৈন্যদলেই পরে অন্যান্য পাহাড়িয়াদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া থাকে। ক্লীভ্ল্যাণ্ড এই সৈন্যদলের প্রত্যেককে সমতলবাসী হইবার আদেশ দেন ; পুরাতন পুস্তকাদিতে এরূপও পাওয়া যায় যে ইহারা যদি সমতলবাসী না হয় তাহা হইলে সমস্ত বেতন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, এই ভয় দেখান হয়। এইরূপে ক্লীভ্ল্যাণ্ড এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত পাহাড়িয়াদের করায়ত্ত করেন। ক্লীভ্ল্যাণ্ড-এর পদ গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা হয়। ভারত সরকারের অপ্রকাশিত জীর্ণ পুথিগুলির মধ্য হইতে আমি একখানি এই পাহাড়িয়াদের প্রশংসা-পত্র পাই। এই প্রশংসা-পত্রখানিতে ৪৭ জন পাহাড়িয়া 'মাম' (মোড়ল) ও সর্দ্দারের নাম আছে। প্রশংসা-পত্রখানি ওয়ারেন হেষ্টিংসের গুণকীর্ত্তন করিয়া লণ্ডনে বার্ক, শেরিডান প্রভৃতির হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ অমূলক ইহা সমর্থন করিতে প্রেরিত হইয়াছিল। কোন বিশিষ্ট কারণে এই স্থলে প্রশংসা-পত্রখানির অনুবাদ দেওয়া গেল না। এই প্রশংসা-পত্রখানির মধ্যে একটিও মালপাহাড়িয়া নামের উল্লেখ পাই না। এখন এই মালপাহাড়িয়ারা কোথা হইতে আসিল ? সাউরিয়াদের মধ্যে যাহারা সমতলবাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারাই কি এই মালপাহাড়িয়া নহে ? কিছুকাল সমতল স্থানে বসবাস করার ফলে পাহাড়ের উপরের সাউরিয়াদের সহিত সকলরূপ আদান প্রদান রহিত হইয়া গিয়াছিল। কেহ

কেহ বা একরূপ শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবে—কারণ পরে এই সৈন্যদলেই সাউরিয়াদের আক্রমণ প্রতিরোধ

সাউরিয়া পুরুষ।

করিয়াছিল। জাতিবিভাগের মূলে ছিল বিপরীত প্রবৃত্তি, আচার ও ব্যবহার; একে অন্যকে সর্ব্বদাই নীচ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। তথাপি এই সমতলবাসীদের সহিত সাউরিয়াদের যে সকম সম্পর্কই একেবারেই রহিত হইয়াছিল বা এখন হইয়াছে তাহা নহে। এখন এই দুই জাতির মধ্যে অন্তর্বিবাহও বিরল নহে। পুরাতন পুথিপত্রে মালপাহাড়িয়া নামের উল্লেখ ১৮১৯–১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পাওয়া যায় না।

এই জাতিবিভাগ হেষ্টিংসের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয় এবং আমার মনে হয় মালপাহাড়িয়ারা ১৭৭৭-১৭৭৮ হইতে ১৮১৯-১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকিবে।

সমাজ

হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া মালপাহাড়িয়াদের সমাজতন্ত্রের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ব্বর সমাজে যৌথ পরিবার নাই বলিলেই চলে, কিন্তু অধুনা মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে দুই একটি যৌথ পরিবার হিন্দু আদর্শে গড়িয়া উঠিতেছে। যৌথ পরিবার নামেই; দুই একটি সংসারে দেখিয়াছি পিতামহ তাহার পৌত্রের নামই বলিতে পারে না। পরিবারের মধ্যে সকলেই উপার্জ্জনক্ষম, আপন উপার্জ্জনমত যে যার গ্রাসাচ্ছাদন করিয়া থাকে। সাউরিয়া পাহাড়িয়াদের মধ্যে 'ঘরজামাইয়ের' প্রথা আছে কিন্তু জামাতা একেবারে হিন্দুগৃহের মত শ্বশুরের উপার্জ্জনের উপর নির্ভরশীল নহে। সাউরিয়াদের মধ্যে এই ভাবের জামাতা আনিয়া তাহাকে তাহার বাসোপযোগী গৃহ ও জমি দিয়া থাকে এবং জামাতা নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। মালপাহাড়িয়াদের দুই একটি সংসারে এই ভাবের গৃহপালিত জামাতা দেখিয়াছি। অধুনা জমির অংশ সকলেরই হ্রাস হইয়া গিয়াছে—সাউরিয়া পাহাড়িয়া বন্দোবস্তের (settlement)এর ফলে পাহাড়ের সন্নিকটস্থ বহু সুউচ্চ স্থানে সমতল ভূমির সামিল করা হইয়াছে। এই সকল স্থানে সমতল ভূমিরই মত কর দিতে হয়। মালপাহাড়িয়াদের জমির অংশও এইভাবে কমিয়া আসিয়াছে। স্বীয় জমির ফসলে আপনার সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন

সাউরিয়া স্ত্রী।

হয় না সেজন্য মালপাহাড়িয়ারা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি গ্রামের অধিকাংশ মালপাহাড়িয়ারা

আজকাল সর্ব্বদা পুলিশ কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানেই থাকে। পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিনা আদেশে তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া কোন দূরদেশে যাওয়া একেবারে নিষেধ। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সাউরিয়া পাহাড়িয়াদেরও আর সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নাই। মদ্যপান মালপাহাড়িয়া সমাজের একটি বিশিষ্ট দুর্নীতি। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে মদ্যপান করিয়া থাকে, ফলে কাহারও স্বাস্থ্য ভাল নহে; পুরুষের যকৃতের দোষ অত্যন্ত অধিক দেখা যায়, স্ত্রীলোকের পুত্রোৎপাদিকা শক্তিও অল্প। প্রায় প্রতি সংসারেই দুই একটি অপুত্রক নারী আছেই। উদ্বাহ-বন্ধন এত শিথিল যে তাহা বর্ণনাতীত; অতিরিক্ত মদ্য ও গ্রামের অন্যান্য জাতিগুলির সহিত মিশিয়া অপরাপর মাদক দ্রব্য সেবন, এবং নানা প্রকার চরিত্রহীনতা এই অত্যল্পকালের বিবাহ ও জন্মহারের স্বল্পতার জন্য আংশিক দায়ী। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুসমাজেও (বাউরি, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি) বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। এই জাতিগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন সম্প্রতি পরিলক্ষিত হইতেছে গোপন বেশ্যাবৃত্তিতে। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রাম্যহাটে নানারূপ লোকসমাগমের ফলে এই নীচ ব্যবসায়ের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, কারণ এইরূপ স্থানেই আমি এই বৃত্তির কথা শুনিয়াছি। সমতলবাসী বর্ব্বর সমাজ যে এই সকল সমাজের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয় তাহা নিঃসন্দেহ। মালপাহাড়িয়াদের ধর্ম্মে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মের বন্ধন দৃঢ় করিলে সমাজ-বন্ধনও দৃঢ় হয়, মালপাহাড়িয়ারা সেজন্য হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইবার উদ্দেশ্যেই ইহার মধ্যে হিন্দু দেবতাদের নিজ ধর্ম্মে টানিয়া লইয়াছে।

মালপাহাড়িয়া সমাজের গোত্র হইল একেবারে হিন্দু সমাজের নিছক অনুকরণ। অধিকাংশ গোত্রগুলি হিন্দুদের উপাধি হইতে গৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত মাত্র এগারটি গোত্র আছে :—(১) আর্‌হি (২) দের্‌হি (৩) গৃহী (৪) মাঝি (৫) পুঝর (৬) পাতর (৭) সিং (৮) দলই (৯) খুঁস (১০) রায় (১১) কুমার। এই গোত্র-নামগুলির মধ্যে কয়েকটি মাল্‌তো ভাষার; 'আর্‌হি' অর্থে শিকারী বুঝায়, ইহাদের বনজঙ্গলের পশুপক্ষী বধ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের কথা; 'দর্‌হি'ও মাল্‌তো শব্দ, 'দের্‌হি' ও 'পুঝর' উভয়েরই অর্থে পুরোহিত বুঝায় যদিও ইহাদের মধ্যে অল্প পার্থক্য আছে। 'দের্‌হি' সর্ব্বদা বর্ব্বর দেবতাদের পূজা করে আর 'পুঝর' হিন্দু দেবতাদের পূজা করে আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে একই লোক তিনটি গোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। একটি মাল-পাহাড়িয়ার জন্মগত গোত্র হইল সিং, তাহার কারণ হইল পিতা সিং; সে প্রথমে বর্ব্বর দেবতাদের পূজা করিত এবং এখন হিন্দু দেবতাদের পূজা করে, এজন্য সে নিজেকে 'দের্‌হি' ও 'পুঝর' উভয় গোত্রের বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। গোত্রের মূল কার্য্য হইল বিবাহ বিধিবদ্ধ করা; সাউরিয়াদের গোত্র নাই, তাহা সত্ত্বেও যতদূর পর্য্যন্ত আপন আত্মীয়কুটুম্বদের নির্দ্ধারণ করিতে পারে ততদূরের মধ্যে বিবাহ করে না। মালপাহাড়িয়াদের গোত্র থাকিলেও এখন ঠিক সাউরিয়াদের অনুরূপ প্রথায় বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। ইহার ফলে মাল-পাহাড়িয়াদের মধ্যে বহু সগোত্রে বিবাহ হইতে দেখিয়াছি অথচ ইহাদের মধ্যে কোনরূপ আত্মীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ব্বর সমাজের কুত্রাপি সগোত্রে বিবাহ হইতে শুনা যায় না। গোত্র নিয়ম এই নবীন বিভক্ত জাতিটির মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন—সামাজিক কোন নিয়ম ফলিত ভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে এইরূপ ব্যতিক্রম হইয়াই থাকে। আবার যখন মালপাহাড়িয়াদের বিভাগ সবেমাত্র সুরু হইয়াছিল তখন জাতিবিস্তারের ফলে যাহারা বাঙ্গালা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের চা বাগানে আসিয়া এখন বসবাস করিতেছে তাহাদের মধ্যেও কোন গোত্র নাই। দার্জ্জিলিং জেলার কয়েকটি চা বাগান হইতে আমি এই তথ্যটি সংগ্রহ করিয়াছি। জাতি-বিভাগের সহিত গোত্রবিভাগ হয় নাই—অপরাপর পরি-বর্ত্তনের পালা সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। সম্প্রতি ইহারা নানা প্রকারে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজনীতিরও কিছু কিছু আলোচনা করিতেছে।

সমাজের উচ্চস্তরে আসিয়া মালপাহাড়িয়া নারীর স্থান বরং কিছু নামিয়াই গিয়াছে। মালপাহাড়িয়া স্ত্রীরা অধুনা বাঙ্গালীদের অনুকরণে মাথায় ঘোমটা ব্যবহার করিতেছে; সাউরিয়াদের মধ্যে কুত্রাপি এই প্রথা নাই। নানা উৎসবে নৃত্যগীত প্রভৃতিতে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যেরূপ অবাধ গতি ছিল তাহাও অধুনা মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে তত অধিক প্রচলিত নাই। একমাত্র বিবাহের সময় কোথাও এই নিয়মের

ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অল্পবয়স্কা বালিকার বিবাহ মাল-পাহাড়িয়াদের একটি বিশিষ্ট রীতি হইয়া পড়িয়াছে অথচ সাউরিয়াদের মধ্যে এইরূপ বিবাহ কখনও হইতে দেখি নাই। নারীহৃদয়ের এই স্বাধীনতা ও পরাধীনতার দ্বন্দ্বই অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে হয়। পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপে অথবা দর্শনে কি সাউরিয়া, কি মালপাহাড়িয়া কোন নারীরই কোনরূপ সঙ্কোচ দেখি নাই—অথচ অনেক ক্ষেত্রে মালপাহাড়িয়া রমণীর এই ঘোমটা লজ্জা ও সঙ্কোচের সহায়ক হইয়া পড়ে। মালপাহাড়িয়া পুরুষের এই সকল ক্ষেত্রে কোন প্রকার আপত্তির কথা শুনি নাই কিন্তু বার বার বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি অসদাচরণের ফলে ইহারাও নারীজাতিকে একটু নীচ চক্ষে দেখিয়া থাকে। একদিকে কৃষ্টির দ্বন্দ্ব আর একদিকে সভ্যেতর জাতির উৎকর্ষ এই দুইটি অচিরে মাল-পাহাড়িয়া সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবে।

বিবাহ

মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে বিবাহের সময় এখন কন্যা-পণপ্রথা প্রচলিত আছে। ৮।৯ বৎসরের বালিকার সহিত ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক যুবকের বিবাহের সংখ্যাই অধিক হইয়া থাকে। সাউরিয়াদের মত বর এবং কন্যার মতামতের কোন প্রয়োজন হয় না। আপন আপন সাথী নির্ব্বাচনেও কাহারও অধিকার নাই। বিবাহের কথাবার্ত্তা চালাইবার সময় সাউরিয়াদের মত একজন পেশাদার ঘটকেরও (সিটুদার) প্রচলন আছে। কিন্তু বিবাহকালে এই সিটুদারের কোন প্রয়োজন হয় না। সাউরিয়াদের মধ্যে বরকন্যা উভয় পক্ষেরই সিটুদার সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে কিন্তু মাল-পাহাড়িয়াদের মধ্যে 'দেরহির' উপর সমস্ত কার্য্য ন্যস্ত করা হয়। বিবাহের অনুষ্ঠান অথবা আচার-কর্ম্মের মধ্যে কেবলমাত্র বর ও কন্যা উভয়ে উভয়ের মস্তকে তৈল ও সিন্দূর প্রদান করিয়া থাকে। এই সময় বর ও কন্যা পরস্পরে পূর্ব্ব ও পশ্চিমমুখী হইয়া বসে। কন্যা বরপক্ষীয়দের সম্মুখে আনিবার পূর্ব্বে যৌতুকস্বরূপ একটি বালা (সাধারণতঃ দস্তার), একটি মাথার পাগড়ী ও কন্যাপণ দিতে হয়। বালাটি কন্যার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ও পাগড়ীটি কন্যার কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য হইয়া থাকে। কন্যাপণ অবশ্য কন্যার পিতার প্রাপ্য হয়। বিবাহের পরদিন কন্যা স্বামীগৃহে গমন করে এবং আট দিন পরে পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে। আট দিনে ফিরিয়া আসে বলিয়া ইহারা হিন্দুদের অনুকরণে এই দিনের নাম 'আটমঙ্গলা' বলিয়া থাকে। ইহার পরদিনই কন্যা চিরতরে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীগৃহের লক্ষ্মী হইয়া আসে।

মালপাহাড়িয়া দম্পতী।—ইহারা এখনও সাউরিয়াদের মত বসবাস করে। ইহাদের বসবাস পাকুড় মহকুমায়।

হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও বিধবা-বিবাহ এখনও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সাউরিয়াদের মধ্যে বিধবা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে কনিষ্ঠ দেবরে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে ইহার একটিও নিদর্শন পাই নাই। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর স্ত্রী তাহার স্বামীপ্রদত্ত অলঙ্কার ও বিবাহের পণমূল্য ফিরাইয়া দেয়; পাঁচ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক বালিকাদের মাতার সহিত যাইতে দেওয়া হয় কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে তাহার উপর মাতার আর কোন অধিকার থাকে না। পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধ পুত্র কন্যাদের

পিতার নিকট রাখিয়া যাইতে হয়। গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সম্মুখে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও অপরাপর আনুষঙ্গিক ব্যাপারের মীমাংসা করিতে হয়।

সমাধি

মৃতদেহের সংকার সম্বন্ধে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রথা নাই; যাহার অর্থে কুলায় তাহাকে পোড়ান হয় নতুবা পুতিয়া রাখা হয়। যখন পোড়ান হয় তখন মৃতদেহের মস্তক উত্তর দিকে থাকে, পুতিবার সময় পশ্চিমে রাখা হয়। মৃত ব্যক্তির নিজস্ব আসবাবাদি মৃতদেহের সহিত দেওয়া হয়। মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা নয় দিন কাল কোন প্রকার মাংস, মৎস্য ও লবণ খায় না। নয় দিনের পর শ্রাদ্ধকর্ম্ম হইয়া থাকে। এই শ্রাদ্ধ দিনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কিছু খাদ্য প্রদান করে। এই খাদ্যবস্তুর মধ্যে ভুট্টার দানার প্রয়োজন হয়। পর্ব্বতবাসী সাউরিয়াদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য হইল ভুট্টা—সকল দেবতার পূজায়, উৎসবে এই ভুট্টার ছাতু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাউরিয়ারা মৃত দেহের সহিত কিছু করিয়া ভুট্টার ছাতু দিয়া থাকে এবং মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে ইহার অনুরূপ প্রথা হইতে বুঝা যায় যে এই প্রাচীন প্রথা পূর্ব্বপুরুষদের ক্রোধোৎপাদনের ভয়ে আজিও কিছু পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে। কৃষ্টির দ্বন্দ্বে বিজিত কৃষ্টির কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায় আবার কখনও বা পুরুষানুক্রমে কোন প্রথা চলিয়া আসিলে বিবাহ, সমাধি প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন অতি অল্পই হইয়া থাকে। কি বর্ব্বর, কি সভ্য সকল সমাজেই ইহার রক্ষণশীলতা দৃষ্ট হয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের বিষয়ে ডার্কহেইম, Durkheim বলেন:—

When some one asks a native why he observes his rites, he replies that his ancestors always have observed them and he ought to follow their example.[১]

অর্থাৎ কেহ কোন আদিম অধিবাসীকে তাহার অনুষ্ঠানগুলি কেন পালন করে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দেয় যে তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা সদাসর্ব্বদা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহারও তাহাদের আদর্শ অনুসারে চলা উচিত।

অবস্থাভেদে সকল প্রকার প্রথারই পরিবর্ত্তন হয়। দারিদ্র্যের কঠোর তাড়নায় শুভাকাঙ্ক্ষী দেব-দেবতার ঠাইও লোপ পায়। ইতিপূর্ব্বে ইহার আলোচনা করিয়াছি।[২]

সাউরিয়া ও মালপাহাড়িয়া এই দুই আধুনিক বিভিন্ন জাতির কৃষ্টিমধ্যে এই প্রকার বহু উপাদান[৩] লইয়া তুলনা করা যায়। ইহাতে মনে হয় অনতিকালপূর্ব্বে এই দুই জাতি একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দুইটি জাতির দৈহিক মাপজোক দ্বারাও এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এইরূপ কৃষ্টি সংঘর্ষ দেখা যায়, ফলে নানা জাতি-সংঘর্ষও উপস্থিত হয়। কত নূতন জাতি নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নূতন বল, বীর্য্য লইয়া আসিয়া সমাজের তথাকথিত উন্নত জাতির সহিত মিশিতেছে তাহা সংখ্যাতীত। তথাপি নিজ জাতির বৈশিষ্ট্যটুকুও বিজ্ঞ নৃতত্ত্ববিদের চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে না। ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, অনুন্নত সম্প্রদায়, হরিজন প্রভৃতি কত কি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভে প্রয়াস পাইতেছে কিন্তু সুদূর অতীতের গৌরবের সত্যাসত্য নৃতত্ত্ববিদের সমালোচনাসাপেক্ষ নহে কি?

১ E. Durkheim—The Elementary Forms of Religious Life, London, 1915. P. 190.

২ রাজমহলের পাহাড়িয়া ধর্ম্ম-বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০, পৃঃ—৬৯৯-৭০৪।

৩ Sarkar, S—The Malers and the Malpaharias of the Rajmahal Hills, Current Science, May, 1933, pp. 318.

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের
পুথির বিবরণ ও সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

চ-পুথি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার 62 F নম্বর পুথি। সাদা মোটা উৎকৃষ্ট তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা, শুধু আদিকাণ্ডের পুথি। ৩৩ পাতায় সমাপ্ত, তারিখ নাই। উজ্জল, ঘন, বাদামীর আভাযুক্ত গাঢ় কৃষ্ণ কালীতে, অতি সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে যত্ন করিয়া লিখিত। প্রথমে দেখিয়া মনে হয়, বয়স ১০০।১২৫ বছরের বেশী হইবে না। পুথি ব্যবহার করিতে করিতে বোধগম্য হইল, পুথিখানির বয়স ইহা অপেক্ষা বেশী—সম্ভবতঃ ইহা গ-পুথি অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুলিপি। কিঞ্চিৎ ভূমিকার পরে দশরথের বিবাহপ্রসঙ্গে পুথি আরব্ধ। রত্নাকরের কাহিনী, বাল্মীকির রামায়ণ-রচনা-প্রসঙ্গ এবং রাক্ষসগণের জন্মবিবরণ, এই গুলির একটাও নাই। গ এবং ছ পুথির সহিত পাঠের অধিকাংশ স্থানেই বেশ মিল আছে। পুথিখানি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিঙ্গলা নামক স্থানস্থ শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন চৌধুরী মহাশয় নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

ছ-পুথি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫৩৯ পুথি। পুথিখানির বয়স বেশী নহে। সম্পূর্ণ সাতটি কাণ্ডই আছে। প্রত্যেক কাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দেওয়া হইয়াছে। এইখানে শুধু আদিকাণ্ডের বিবরণ দিলাম। অন্য কাণ্ডগুলির পুথি-বিচারের কালে বাকী গুলির বিবরণ দেওয়া যাইবে। আদি-কাণ্ডের নম্বর ৩৫৩৯। আকার ১২$\frac{3}{8}''\times 8\frac{1}{8}''$। মিলের পাতলা কাগজে ছোট ছোট গোটা গোটা অক্ষরে লিখিত, প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ ছত্র। ৫০ পাতায় আদিকাণ্ড সমাপ্ত। পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

রামগণ কির্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল।
আন্ধকাণ্ড সমাপ্ত হৈল হরি হরি বোল॥

(লাল কালিতে) ইতি শ্রীবাল্মীক মুনি বিরচিত আন্ধ কাণ্ড রামায়ণ পুস্তক সম্পূর্ন্নং॥ (কাল কালী) শকাব্দা ১৭৭১ বাঙ্গালা ১২৫৬ কার্ত্তিক মাসস্য ১০ দশম দিবসে বৃহস্পতি বারে নবম্যাস্তিথৌ সমাপ্তমিতি পুস্তকেয়ং॥ সাক্ষর মন্দমতি দীনাতিদীন শ্রীগোকুলকিশোর দাসস্য তস্য নিবাস শ্রীহট্টদেশীয় সাদিপুর গ্রামেতি।

পুষ্পিকার ভাষা ও বানান দেখিয়া বোধ হয়, লেখক কতকটা সংস্কৃতজ্ঞ এবং ভাষাজ্ঞানবিশিষ্ট ছিলেন। পুথিখানি আধুনিক হইলেও কোন ভাল পুথি দেখিয়া নকল করা—পড়িয়া এই ধারণাই হয়। এই পুথিখানি ঢাকা সহরের পশ্চিমাংশস্থ বাড্ডানগর নামক স্থানের এক বৈষ্ণব মঠ হইতে প্রাপ্ত। এই মঠ এখনও শ্রীহট্ট দেশীয় এক জমীদারের অধীন।

পুথিখানির প্রথম পাতা নাই, কিন্তু উহাতে প্রারম্ভিক সংস্কৃত শ্লোকমাত্র ছিল; কারণ ঐ শ্লোকের জের ২।১ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ভাষায় আরম্ভটুকু উদ্ধারের যোগ্য :—

গণপতি শিবা শিব স্বরস্বতী মাতা।
লক্ষ্মী নারায়ণ বন্দো বিশ্বরূপ ধাতা॥
মহামুনি বাল্মীকের বন্দিঞা চরণ।
যাহার প্রসাদে সুখে শুনে সর্ব্বজন॥
অবধানে শুন সবে হঞা একমন।
সূর্য্যবংশ চরিত্র যাহা অপূর্ব্ব কথন॥
ঋষী শৈল হৈতে মহানদী রামায়ণ।
রাম সাগরেতে আসি হইল মিলন॥
অবিরত সে অমৃত পান করে সুধী।
সাধু জনে দরশন করে নিরবধি॥
এহাতে উপায় মনে হইল উদয়।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক রচিব ভাষায়॥
বামন হঞা হাতে চান্দ ধরিবারে মন।
ভেলা ধরি সমুদ্র পার হইব কেমন॥
সূর্য্য বংশ কীর্ত্তি হয় অসাধ্য বর্ণনা।
কেমতে আমার পুরে মনের বাসনা॥
কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে কহে মহামুনি আদি।
এক বার সে পদ স্মরণ করে যদি॥
পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি মূক কথা কয়।
বানরে সঙ্গীত গায় যাহার কৃপায়॥
হেন রামচন্দ্র পাদ হৃদে করি ধ্যান।
ভাষায় রচিব গ্রন্থ যেমত প্রমাণ॥

সসাগরা পৃথিবী মণ্ডল রাজা সার।
মনু আদি বংশ কীর্ত্তি হয়েত অপার॥
সগর নামেতে পূর্ব্ব পুরুষ বাখানি।
উদ্ধারিয়া সাগর কীর্ত্তি রাখিলেন জিনি॥
যদি হয় ফনিপতি সমান রসনা।
ঈক্ষাকু চরিত্র তভু না হয় বর্ণনা॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন।
যে তে মতে কহি শুন ভাষা রামায়ণ॥
সতকাণ্ড রামায়ণ প্রথমে আদিকাণ্ড।
শুনিতে অদ্ভুত কথা অমৃতের ভাণ্ড॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি বৃদ্ধি হয়।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি আর অমঙ্গল ক্ষয়॥
কোশল নামেতে দেশ জনপদে খ্যাত।
সরয়ূর তীরে সর্ব্ব শস্য সমন্বিত॥
তার মধ্যে বিরাজিত অযোদ্ধা নগর।
নয় ভাগ মধ্যে উচ্চ অতি শোভাকর॥
বিংশতি যোজন দীর্ঘে প্রস্থেতে অৰ্দ্ধেক।
মধ্যে মধ্যে রম্য স্থান আছয়ে অনেক॥
মানবেন্দ্র মনু পূর্ব্বে করিলা নির্ম্মাণ।
তুলনা নাহিক দিতে তাহার সমান॥
সুবিভুক্ত জলসিক্ত ধুলা রাজ পথে।
নানা বর্ণ পুষ্প শোভে রত্ন বিভূষিতে॥ (১)
গভীর তাহাতে গড় নানা অস্ত্র যুত।
রথ গজ অশ্ব সৈন্য আছে কত শত॥
সর্ব্বত্র সমান শোভা সুমঙ্গল ধ্বনি।
সে পুরি তুলনা নাহি হেন অনুমানি॥
তাহাকে পালেন নিত্য দশরথ রাজা।
সূর্য্য বংশ সমুদ্ভব সূর্য্যসম তেজা॥
ভূপাল যতেক আছে পৃথিবী ভিতর।
সূর্য্যবংশ রাজাগণের হয়েন ঈশ্বর॥
মহারাজা পালিত সে অযোধ্যা নগর।
দেবেন্দ্র পালিত যেন অমরা সহর॥
সে রাজার নাহি মাতা পিতা সহোদর।
কুলে শীলে ধর্ম্মে শাস্ত্রে বড়ই তৎপর॥
রাজা দশরথের গুণ কি বলিতে জানি।
যার গৃহে নারায়ণ জন্মিলা আপনি॥

(১) তুং—রামায়ণ, আদিকাণ্ড পঞ্চম সর্গ—৮ম শ্লোক :—
সুবিভক্তান্তরম্বাথা সুবিস্তীর্ণমহাপথা।
শোভিতা রাজমার্গেন জলসংসক্তরেণুনা॥
শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুরের সংস্করণ।

রাজ চক্রবর্ত্তী তিনি সবার উপরে।
তিন শত বর্ষ তভু বিহা নাহি করে॥
দৈবের কারণে যেবা আছয়ে নির্ব্বন্দ।
যেমতে রামের জন্ম শুন অনুবন্দ॥
কৌশল নগরে রাজা কৌশল নাম ধরে।
ইত্যাদি।

এইরূপে মুখবন্ধ করিয়া কৌশল্যা-বিবাহপ্রসঙ্গে পুথি আরব্ধ।

সৌভাগ্য ক্রমে অনুরূপ আরম্ভযুক্ত পুথি আরও পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯নং পুথি দ্রষ্টব্য। পুথির তালিকায় উহার আদি হইতে যতটুকু উদ্ধৃত আছে, তাহা প্রায় অবিকল এই ছ-পুথির আরম্ভের সহিত মিলিয়া যায়। পুথির তালিকায় পুথিখানি কোথায় প্রাপ্ত তাহার উল্লেখ নাই।

পরিষদের ৬নং পুথিও অবিকল এই রকমের আরম্ভ-যুক্ত পুথি। পুথিখানির ১—৫৭ পাতা আছে, পরে খণ্ডিত। অম্বরীষ যজ্ঞপ্রসঙ্গ (অর্থাৎ আমাদের গৃহীত পাঠের ৪৪নং প্রসঙ্গ) পর্য্যন্ত আসিয়া পুথি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। পুথিখানি কোথায় প্রাপ্ত, তালিকায় তাহার কোন উল্লেখ নাই।

'চ' পুথির মুখবন্ধ আরও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে অযোধ্যা বা কোশলের বর্ণনা নাই। মাত্র ৯টি শ্লোকে বাল্মীকি-বন্দনা ইত্যাদি শেষ করিয়া,—পরে আছে,—

সূর্য্য বংশে দশরথ সভে একেশ্বর।
বাপ মা নাঞি রাজার ভাই সহোদর॥
মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে।
তিন শত বচ্ছর রাজা বিভা নাহি করে॥
দৈবে কারণ রাজার আছিল নির্ব্বন্ধ।
যেনমতে রঘুনাথের জন্ম অনুবন্ধ॥

সহজেই লক্ষ্য হইবে যে 'ছ' পুথির "রাজচক্রবর্ত্তী তিনি সবার উপরে।" এবং 'চ' পুথির "মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে।" এই দুই ছত্রে মিল আছে। এই ছত্র হইতে মিল আরব্ধ হইয়াছে—এবং এই মিল মোটামুটি শেষ পর্য্যন্তই চলিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরের পুথি এবং ঢাকার পুথিতে এই মিল বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ডের কি ইহাই আদিরূপ ছিল? 'গ' পুথির পাঠ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, কতক দূর অগ্রসর হইয়া মূল সংস্কৃত রামায়ণের অনুযায়ী অনেকখানি রচনা রচিত হইলে

পর, চ-ছ-পুথির যেই স্থান হইতে পাঠের মিল আছে, 'গ' পুথিরও পাঠের সহিত সেই স্থান হইতেই মিল আছে। গ-চ-ছ পুথির যেই স্থান হইতে মিল আছে, গ-পুথির তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের পাঠ, দীনেশ বাবুর দৃষ্ট এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত (১২০ পৃঃ ৫ম সং) ত্রিপুরার পুথি দ্বারা, গ-পুথিতে প্রাপ্ত একখানা বিচ্ছিন্ন পত্র দ্বারা এবং আমাদের জ-ঝ-ঞ পুথি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে এবং এই পাঠক্রমের বিষয়-বস্তু মূল সংস্কৃত রামায়ণের সহিতও মিলিতেছে। কাজেই গ-জ-ঝ-ঞ পুথি মিলাইয়া উদ্ধৃত পাঠই যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের আরম্ভের খাঁটি পাঠ, সেই বিষয়ে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

জ-পুথি। আদিকাণ্ডের খণ্ডিত-পুথি, ১ হইতে ৫ পাতা মাত্র। ত্রিপুরা জেলার 'ঘনিয়ার পার' গ্রামে প্রাপ্ত। আদিকাণ্ডের পাঠোদ্ধার শেষ হইলে এই পুথি হস্তগত হয়। এই পুথি খানি গদাধর ঠাকুরের শিষ্য বল্লভচৈতন্য গোস্বামীর বংশধর ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে শ্রীপাট পঞ্চসার বিনোদপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ লাল গোস্বামী প্রভুপাদ ঘনিয়ার পার গ্রামস্থ তাঁহার এক শিষ্যের (উদয় সেন) বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া দেন। এই পঞ্চপাতাত্মক খণ্ডিত পুথিখানি পাইয়া ভাগী উপকৃত হইয়াছি। ইহার পাঠ দ্বারা গ-পুথির পাঠ সমর্থিত হইয়াছে। অধিকন্তু, ইহাতে আরম্ভ হইতে থাকায় বাল্মিকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী আদৌ কৃত্তিবাসী রামায়ণে ছিল কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসার উপকরণও হাতে আসিয়াছে। এই কাহিনীটি গ-পুথিতে আছে কিন্তু এই ঘনিয়ার পারে প্রাপ্ত জ-পুথিতে নাই। জ-পুথির আরম্ভ উদ্ধৃত করিতেছি। পুথির হাতের লেখা বেশ ভাল। প্রাচীন উৎকৃষ্ট তুলট কাগজে এক এক পৃষ্ঠায় ১০ ছত্র করিয়া লিখিত। পুথির আকার ১৬´´×৫´´। পুথি খানি ঢাকা মিউজিয়মে উপহৃত।

শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগনসায় নম ঃ॥

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চন্দ্রে চ মধ্যে চ হরি সর্ব্বত্র গিয়তে॥
রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুননিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যবন্তং দসরথ তনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবনারি॥

নারায়নং নমস্কৃত্বং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবিং সরেস্বতিঞ্চৈব ততো জয় মুদিরএৎ॥
প্রণমোহ নারায়ণ পরম কারণ।
ব্রহ্মা আদি দেবে জারে করয়ে স্তবন॥
রামপিতা বন্দী আর শুমিত্রা নন্দন।
ভরথ শত্রুঘ্যন বন্দী শানন্দিত মন॥
ব্যাস বাল্মিকী মুনি বন্দোম শদায়।
রামাঅন পুরান শুনী জাহার ক্রপায়॥
সরেস্বতি পদযুগে করি নমস্কার।
জনমে ২ মাত্তা সেবক তোমার॥
গনপতি প্রনমোহ গৌরির নন্দন।
হরগৌরী প্রনমোহ জত দেবগণ॥
দশরথ রাজা বন্দোম করিয়া জতন।
কৌশল্যা শুমিত্রা বন্দম রাজরাণীগণ॥
সচির সহিতে বন্দোম দেব শুরপতি।
মগর বাহনে বন্দম দেবী ভাগীরথী॥
চতুর্দ্দিগপাল বন্দোম করি ভাগ ভাগ।
পাতালেতে বন্দোম ছাপন্ন´কুটী নাগ॥
গুরুর চরণ বন্দী তুলি লৈলাম মাথে।
জে গুরু জিবন মুক্ত´করিছে ভারথে॥
শিক্ষ্যা গুরু বন্দোম জে দিক্ষ্যা গুরু পায়ো।
জে গুরু দেখাইয়া দিল তরনের ভায়ো॥
কির্ত্তীবাস রচএ জে মুররির নাতি।
জার কণ্ঠে কেলী করে দেবী শরেস্বতী॥
চাবনের পুত্র বাল্মিকী মহা মুনি।
তপস্যার কারণে সেই জ্বলন্ত আগুনী॥
ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে শেষ দুই ছত্রে রামায়ণ আরব্ধ এবং বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী শেষ করিয়া অবিকল এই দুই ছত্র দ্বারা গ-পুথিতেও রামায়ণ আরব্ধ হইয়াছে। (গ-পুথি, ৩।২ পাতার শেষ।) গ-পুথির পাঠের সহিত জ-পুথির পাঠের মিল ও গরমিল যথাস্থানে দেখান যাইবে।

সৌভাগ্যক্রমে আদিকাণ্ডের এই আরম্ভ আর একখানি খাঁটি কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন পুথি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। আদিকাণ্ডের পাঠ সংগঠন শেষ হইলে এই পুথিখানি আমার হস্তগত হয়। (৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৩) জ-পুথির মাত্র প্রথম পাঁচ পাতা রক্ষিত আছে বলিয়া উহা শুধু আদিকাণ্ডের আরম্ভনির্ণয়েই সহায়তা করিয়াছিল। এই

পুথিখানি আদ্যোপান্ত অখণ্ডিত থাকায় ইহার সাহায্যে আমার উদ্ধৃত পাঠ আগাগোড়াই পরখ করিবার সুযোগ হইয়াছে। আমার উদ্ধৃত পাঠের সহিত অধিকাংশ স্থানেই এই পুথির পাঠের বেশ মিল আছে। এই পুথি স্থানে স্থানে কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়া গিয়াছে,—আমার পাঠের সাহায্যে এই পুথির সেই চ্যুতিগুলি ধরা যায়। আবার এই পুথির সাহায্যে আমার পাঠেরও কতক ক্রটি সংশোধিত হইতে পারিয়াছে। এই পুথি খানিকে ঝ-পুথি বলিয়া ধরা গেল এবং নিম্নে উহার বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

ঝ-পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৫২ নং পুথি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পূর্ণ আদিকাণ্ডের পুথি। ৪৭ পাতায় সমাপ্ত। মলিন এবং বিবর্ণতাপ্রাপ্ত হলুদ রঙের তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে মধ্যে প্রায় ১ বর্গ ইঞ্চি স্থান ফাঁক রাখিয়া লিখিত। সুন্দর হস্তাক্ষর। আরম্ভের দিকের এবং শেষের দিকের কয়েক পাতায় লেখা অনেকটা মোছামোছা, মধ্যের লেখা বেশ তাজা আছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ ছত্র লেখা। পুথির আকার—১৪´´×৪¾´´। বাকুড়া জেলায় প্রাপ্ত, কিন্তু কোন গ্রামে, পুথির বর্ণনামূলক তালিকায় তাহার উল্লেখ নাই। র-এর আকৃতি অসমীয়া পেটকাটা র-এর মত। আরম্ভ :—

শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ। রামং লক্ষ্মণ পুর্ব্বজং ইত্যাদি।
আগুকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিভা।
অজোধ্যায় গেলা রাম রাযা হারাইয়া॥
অরণ্যকে সিতা হরিয়া লইল রাবণ।
তাহার শেষ কাণ্ডে হইল জটাউর মরণ॥
কাণ্ডে২ রঘুনাথ পাইল অপচয়।
কিস্কিন্দা কাণ্ডে মিত্রলাভ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরকাণ্ডে সেতুবন্ধ কটক করিলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজা সবংশে সহার॥
উত্তরাকাণ্ডে দিলা রাম সিতার বনবাস।
সাতকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাস॥
চিরন মুনির পুত্র বাল্মিক মহামুনি।
তপের ফলে মুনি জেন জলন্ত আগুনি॥
হেন কালে নারদ আইলা আচম্বিত।
দেখিয়া বাল্মিক মুনি হইলা হরসিত॥
দুহেঁ দুহা দেখিয়া হরিষ বদন।
বিনয় ভক্তি করেন বাল্মিক তপোধন॥
ত্রিভুবনের বৃত্তান্ত সকল জান তুমি।
তোমার ঠাঞি কিছু জিজ্ঞাসিব আমি॥
কোন জন হয় মুনি সংসারের সার।
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার॥
ইন্দ্র জম বাউ বরুণ পুজে কোন জন।
তোমার গোচর মুনি সকল ত্রিভুবন॥
আমার তরে কহ মুনি সকল বিবরণ।
এত শুনি হাসেন নারদ তপোধন॥
সুনহ বাল্মীক মুনি আমার বচন।
সাবধান হইয়া সুন ইহার কথন॥
তুমি ত কহিলা এত গুন আছে কাথে।
ত্রিভুবন দেখ এমত পুরুষ কথায় আছে॥
এত গুন নাহি দেখি দেবতা ভিতর।
হেন পুরুষ জন্মিতে আছে শাটী হাজার বৎসর॥
ইত্যাদি।

শেষ :—

দুই ভাই রহিল গিয়া মাতামহের দেশে।
মাতামহের বাড়ী দুই ভাই পড়েন হরিষে॥
অষ্ট প্রহর দশরথের আর নাঞি মন।
রামেরে রাযা দিতে রাজা চিন্তেন সর্ব্বক্ষণ॥
কিৰ্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল পোত্তা আগুকাণ্ড॥
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদিঃ। শ্রীরঘুনাথায় নমঃ।

শুভমস্তু শকাব্দা ১৬২৬ সন ১১১২ সাল তারিখ ১১ই ফাল্গুন রোজ বুধবারঃ লিখিতং শ্রীগোপাল দেবশর্ম্মা পুস্তক মিদং শ্রীরামচন্দ্রস্য। ('শ্রীরামচন্দ্রস্য অক্ষর কয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট)

আমাদের চ-পুথি মেদিনীপুরের এবং এই ঝ-পুথি বাকুড়ার। এই দুই পুথির পাঠে চমৎকার মিল আছে। গ-পুথির সহিতও ইহাদের মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। মনে হয়, এই তিন খানি পুথি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কৃত্তিবাসী পাঠধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

ঞ-পুথি। ঝ-পুথির সহিত আমার আদিকাণ্ডের উদ্ধৃত পাঠ মিলান সম্পূর্ণ হইলে আবার একখানি সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ হস্তগত হয় (২০শে মে-১৯৩৩)। ইহা পরিষদের ২৫৭৪ নং পুথি। ইহাকে ঞ-পুথি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা গেল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক পরলোকগত অনুকূলচন্দ্র রায় মহাশয় এই মহামূল্য সম্পূর্ণাঙ্গ পুথিখানি মূল পরিষদের পুথিশালায় উপহার দিয়াছেন।

পরিষদের পুথিশালায় কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড-সম্পূর্ণ পুথি এই-ই প্রথম। এই পুথি আমার ক-খ পুথির মত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদনে আগাগোড়াই সবিশেষ সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করি। খ-পুথির আদিকাণ্ড অদ্ভুতাচার্য্যের বলিয়া উহা বর্জ্জন করিতে হইয়াছে—এই বিষয়ে ঞ-পুথিখানি খ-পুথি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহার আদিকাণ্ড খাঁটি কৃত্তিবাসী রচনা এবং ঝ-পুথির মত আগাগোড়া আমাদের উদ্ধৃত পাঠ সমর্থন করিয়াছে।

পুথিখানি প্রকাণ্ডকায়,—১৮″×৭″, প্রত্যেক পাতায়, মধ্যে ১½″×১½″ পরিমিত স্থান ফাঁক রাখিয়া ১৩ হইতে ১৪ ছত্র করিয়া লিখিত। লেখকের নাম শ্রীকান্ত দে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের মুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়া অধ্যায় শেষে এক একটি পয়ার জুড়িয়া দিয়াছেন। পুথির আবিষ্কর্ত্তা অনুকূলচন্দ্র রায় মহাশয় প্রচলিত বাজার সংস্করণের কৃত্তিবাসের সহিত এই পুথির রচনার গরমিল দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই রামায়ণ খানি শ্রীকান্তেরই বিরচিত। সেই মর্ম্মে তিনি ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন পত্রিকার ১৩২২ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ৮৪ পৃষ্ঠায় "শ্রীকান্তের রামায়ণ,—নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ" নাম দিয়া এক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন।

পুথিখানি কুমিল্লা সহরের ১২ মাইল পশ্চিমস্থ বড়কামতা গ্রামে এক নাপিত বাড়ীতে প্রাপ্ত। অনুকূল বাবু লিখিয়াছেন, "নাপিত নিজে কবির দলের সরকার। বোধ হয় তাহার পূর্ব্ব পুরুষও এই ব্যবসায় করিত।" পুথিখানি যে কোন 'শীল' এর অধিকারে ছিল—পুথির প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় আছে। উহাতে নিম্নোদ্ধৃত কথাকয়টি লিখিত আছে।

শ্রীউমাকান্ত চৌধুরি বিক্রদার খড়িদ শ্রীগকুলচন্দ্র সিল। মুর্ং ৫ পাচ টাকা মাত্র। সাং বরকামতা গ্রামাৎ।

সপ্তকাণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ রামায়ণের মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা সেই কালের পক্ষেও বেশ শস্তা বলিতে হইবে।

এই পাতার প্রকৃত দক্ষিণোর্দ্ধ কোণে আরও কয়েকটি নাম লিখিত রহিয়াছে, যথা:—

শ্রীরাম শঙ্কর আঘা সং বরকামতা॥
শ্রীরাম রত্ন মুদি সং বরকামতা॥
শ্রীপরান দেয় সাউ॥

বিক্রেতা ও খরিদদারের নামের উপরে নিম্নলিখিত বিক্রয়বার্ত্তা লিখিয়া আবার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, কথাবার্ত্তা হইয়া পরে এই সঙ্কল্পিত বিক্রয়কার্য্য সামাধা হইতে পারে নাই।

শ্রীউমাকান্ত চৌধুরি বিক্রদার খরিদার শ্রীরামগোবিন্দ সিল। মং পাচ টাকা মাত্র।

পুথির আরম্ভ হইতে কতকটা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করিলাম:—

শ্রী নমো গনেসায়ঃ
বেদে রামাঅনকৌব পুরানে ভারত স্তুতা।
আদৌ চান্তে মৌর্দ্ধানে চ হরি সর্ব্বত্রে গিয়তে গিতা॥
আদি কাণ্ডে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিহা।
অজোধ্যাতে রামচন্দ্র রার্য্য হারাইয়া॥
অরণ্যাতে সিতা হরিলেক রাবন।
সিতা হারাইয়া ভ্রমে কমল লোচন॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্র পাইয়া অপচয়।
কিস্কিন্ধাতে মিত্র লব্য কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরাতে সেতুবন্ধ সাগর হইল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ রাজা সবংসে সংহার॥
উত্তরাতে শ্রীরামের দেষে আগমন।
হেন রামের করোম দুই চরন বন্দন॥
রাম নাম লইতে জমের নাহি দায়ে।
সেই জম বিনাশিল রাবন দুর্জ্জয়॥
দষ গোটা মুণ্ড ধরে লঙ্কার রাবণ।
দস(১) মুণ্ড কাটে তার নাহিক মরণ॥
অযোধ্যা নগরে রাজা ত্রিভুবনে সার।
তার অবতার ধন্য সকল সংসার॥
শ্রীরামের জর্ম্ম হইল পুরুস প্রধান।
বিষ্ণু অবতারে কৈলা লোক পরিত্রাণ॥
নররূপি রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার।
মনুস্য রূপে করিলেন দেব উপকার॥
ধনু বান ধরে প্রভু তপস্বির ভেষ।
মারিলা দেবের বৈরি দুরন্ত রাক্ষষ॥
নররূপে রঘুনাথ বিষ্ণু অবতারী।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গম ধারি॥
জার মুখে রাম নাম লঞ একবার।
এড়াএ সমন ভয় জর্ম্ম নাহি য়ার॥

(১) পূর্ব্বের ছত্রেই 'দষ' আছে।

জার হোতে রাম নাম হইল উতপন।
তাহার কথা কহি লোক সুন দিয়া মন॥
চ্যবনের পুত্র বাল্মিকি মোহা-মুনি।
তপের প্রভাবে বিপ্র জলন্ত আগুনি॥
নারদ জে মোহা মুনি ত্রিলোক্য পুজিত।
বাল্মিকির সনে দেখা হৈল আচম্বিত॥
মোহানে দেখিয়া দুইর প্রসন্ন বদন।
বিনয়ে ভক্তিএ দুই কৈল সম্ভাসন॥
বাল্মিকিয়ে বোলে নারদ তুহ্মি অন্তর্জামি।
তোহ্মা স্থানে এক কথা জিজ্ঞাসিব আহ্মি॥
কোন মোহা পুন্ন বন্ত ত্রিভুবনের সার।
বিষ্ণু জ্ঞান জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার॥
জগতের পূয় সর্ব্ব লোকের করে হিত।
জার ক্রোধ হইলে দেবতা পাএ ভিত॥
সর্ব্বদাএ জেইজন হতে হএ পুনা।
হিংসা পৌসন্ত নাহি সরিল কারন্ত॥
ইন্দ্র জম বাউ হতে কেবা বলবান।
ত্রিভুবন রৈক্ষা করে পুরুস প্রধান॥
তোহ্মার অবিদিত নাহি এতিন ভুবন।
আহ্মাতে সকল কহ মোহা তপোধন॥
ত্রিকালজ্ঞ মুনিবর কহন্তি বচন।
সুনহ বাল্মিকি মুনি দড় করি মন॥
জত কথা পুছিলা তুহ্মি কহিএ তোহ্মারে।
আন্ত পান্ত জানে হেন নাহিক সংসারে॥
এমত কেহো নাহি দেবের ভিতরে।
মোহা মোহা পুন্ত কথা কহিবার তরে॥
পাখিয়া পাখিনি দুই থাকে এহিস্থানে। ১।২
তাহা হোতে জানিবা জে অপূর্ব্ব বাখানে॥
নিসাদের ঘাএ পাখি তেজিল পরান।
তাহা হোতে হইল জে শ্লোক বিবরণ॥
পাখিনির বিলাপ শুনিয়া বাল্মিকি মোহামুনি।
নিসাদের ঘাএ পাখি হারাইল পরাণি॥
দেখিয়া বাল্মিকি মুনি পরম দুক্ষিত।
নিসাদের বোলে মুনি তোর অপচিত্ত॥
কালরূপি হইয়া পাখি বধিলী কি কারণ।
সর্ব্বথাএ প্রতিষ্ঠা না পাইবা কদাচন॥
সঙ্গেত বচনে তারে বলিলেক মুনি।
সিস্ত ভরদ্বাজেত বলিল আপনি॥
তোহ্মার মুখ হোতে বাহির হইল বেদ।
চারিপদ সহিতে উত্তম পরিচ্ছেদ॥

আহ্মার মুখ হতে বাহির হএ সুললিত বানি।
বিচিত্র গাথনি পদ সুললিত সুনি॥
জে কারনে আহ্মার মুখ হোতে বাক্য বাহির হৈল।
মা নিসাদ শ্লোক নাম তে কারণে থুইল॥
গুরুর বচন সুনি বোলে ভরদ্বাজে।
এহি মতে থাউক শ্লোক পৃথিবির মাঝে॥
এতেক বলিল মুনি সিস্তের বিদিত।
আপনা আশ্রমে মুনি চলিল তুরিত॥
সেই শ্লোক মোহা মুনি ভাবে সর্ব্বক্ষণ।
আচম্বিতে সেই খানে ব্রহ্মার আগমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া হরসিত মুনি বর।
ধ্যান এড়িয়া মুনি আইল সহচর॥
জোড় হস্তে নমস্কার করিল ব্রহ্মা আগে।
তোহ্মার চরণ দেখিলুম অতি পুন্ন ভাগে॥
স্তুতি করি বসিবারে দিলেক আসন।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনি বন্দিল চরণ॥
আপনে বসিল ব্রহ্মা পরম সন্তোসে।
বাল্মিকিএ বলিলেক ব্রহ্মারে অসেসে॥
ব্রহ্মার সমুখে মুনি বলিল আপনে।
সেই শ্লোক মুনি চিন্তে সর্ব্বক্ষণে॥
ব্রহ্মাএ বোলেন মুনি চিন্তো কেনে আন।
আহ্মার বচন মুনি কর অবধান॥
ব্রহ্মার বচন সুনি বোলেন বাল্মিকি।
বড় মোহা পাপ কৈল নিসাদ পাতকি॥
ক্রৌঞ্চ দুই পক্ষি তমসা নদির কুলে।
নানা রঙ্গে পক্ষি সঙ্গে আছে কুতুহলে॥
কামে মুহিত কেলি করে পক্ষি সনে।
হেন কালে পাপ ব্যাধ আইল সেইখানে॥
সন্ধান করিয়া বান মারিলেক রোসে।
নরকে পড়িল পাপি আপনার দোসে॥
ব্রহ্মাএ বোলেন চিন্তা না করিয় আর।
আহ্মার [বরে] তোহ্মার শ্লোক হউক বাহার॥
স্বরেস্বতি তোমার কণ্ঠে হউক প্রসন্ন।
শ্লোক ভাবিয়া মুনি করিয় রামায়ন॥
রামের জত গুন আছে নানা স্থান।
আহ্মার বরে স্বরেস্বতি হউক অদিষ্ঠান॥
সিতা লক্ষনের গুন লোকের বিদিত।
রামের গুন সুনহ হইয়া একচিত্ত॥
গোপ্তরূপে রামের কথা আছিল জতেক।
একে একে ব্রহ্মাএ জানাইল অনেক॥

রাক্ষস বানর জর্ম্ম অনেক প্রকার।
তোহ্মাতে প্রকাষ হউক বচন আহ্মার॥ ২।১
রাবনের বিক্রম জতঞ্জত নিসাচর।
জতেক বিক্রমসিল সকল বানর॥
জাবত আহ্মার নাম থাকে পৃথিবিত।
জাবত চন্দ্র সূর্য্য থাকে প্রকাসিত॥
তর্তকাল থাকিব জস এতিন ভুবন।
এত বর দিয়া ব্রহ্মা করিল গমন॥
এতেক কহিল জদি দেব প্রজাপতি।
মুনি হরসিত তবে সিবে (স্তে)র সংহতি॥
স্মনিয়া ব্রহ্মার মুখে এসব বচন।
রামায়ন করিবারে চিন্তে মনে মন॥
পবিত্র হইয়া কৈল ইষ্ট দেবাচ্চন।
ধ্যানে চিন্তিল রাম কমল লোচন॥
রামের জতেক গুন হইল স্মরন।
আকৃত্তি প্রধান নিত্য নিত্যনিরঞ্জন॥
আহ্মার চরিত্র হৈব রাম অবতারে।
সকল কহিব আহ্মি ব্রহ্মার গোচরে॥
রামায়ন রচিবারে ব্রহ্মার আদেশ।
প্রজারি (প্রচারি ?) করিব কিছু কৌতুক বিসেস॥
মুনিগন আনাইয়া তবে তপোধন।
তুহ্মি সবে স্তাপ (শুন ?) আহ্মি রচি রামায়ণ॥
প্রথমে আদি কাণ্ডে রচিলেক মুনি।
রামের জর্ম্ম বিবাহ অপুর্ব্ব কাহিনী॥
চৌসষ্টী স্বর্গ তাহার প্রধান হেন স্তান।
দুই সহস্র নব সত তাহার পরিমান॥
দ্বিতিয় অজোধ্যা কাণ্ড সুন সর্ব্বজণ।
কেকৈর দুরন্ত বাক্যে রাম গেল বন॥
আসি স্বর্গ সহস্র শ্লোক তাহাত জে লেখী।
সত্তরি সহস্রাধিক শ্লোক সুনি হইল সুখী॥
ত্রিত্তিয় অরণ্যা কাণ্ড সুন সর্ব্ব জন।
সত্তরি অধিক শ্লোক অরণ্যাএ তথন॥
চতুর্থে কিষ্কিন্দা কাণ্ড সুন সুললিত।
বালি বধি সুগ্রিবেরে পাইলেক মিত্র॥
চৌসষ্টী সর্গ হএ এহার পরিমান।
দুই সহস্র অষ্টসত শ্লোক যে প্রধান॥
পঞ্চম সুন্দরা কাণ্ড অদ্ভুত জে কথা।
সমুদ্র তরি হনু মন্তে দেখিলেক সিতা॥
পঞ্চধিক স্বর্গ শতেক পরিমানি।
তিন শত শ্লোক তাহে সুন সব মুনি॥
লঙ্কার পুরির কথা শুন মুনিগন।
রাবন রাজা পরিল জতেক রাক্ষগণ॥
তিন সত শ্লোক পঞ্চ বর্গাধিক জানি।
উত্তরা কণ্ডের কথা কহে অগস্ত মোহা মুনি॥
দুই সত সত্তরি জে সর্ব্ব লোকে জানি।
চারি সহস্র পঞ্চ সত শ্লোক পরিমানি॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ করিল বাখান।
জত শ্লোক জত বর্গ করিল পরিমান॥
মুনি সবে সুনিয়া জে হরসিত বাসে।
সাধু ২ করিয়া জে মুনিরে প্রসংসে॥
পঞ্চালির ছন্দে কৈল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
প্রথমে রচিল আদি কাণ্ডের প্রকাষ॥
চ্যবনের পুত্র বাল্মিকি মোহা মুনি।
আস্তকাণ্ড রচিল ত্রিভুবনে জানি॥
সষ্টি সহস্র বৎসর আছে হইতে পরিমান অবত্যর।
আঙ্গে´(অগ্রে ?) রচিল পুথি মুহিত সংসার॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের সরস হৃদএ।
পঞ্চালি করিতে পুনি তাতে মনে লএ॥
সর্ব্ব সাধারন লোকের লইয়া সর্ম্মত।
রামায়ন করিবারে হইল প্রবর্ত্ত॥

ইহার পরেই—"পৃথিবিতে জর্ম্মিলা রাবণ মহাবীর" আরদ্ধ। আদিকাণ্ড মাত্র ১৮ পাতায় সমাপ্ত দেখিয়া অনুমান করিলাম যে পুথিখানি নিশ্চয়ই উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়া গিয়াছে। পড়িয়া দেখি, প্রথম দিকে অযোধ্যা রাজ্যের বর্ণনা, শেষের দিকে বিশ্বামিত্রের তপস্যার উপাখ্যানগুলি, সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ বর্ণন, চন্দ্রবংশের ইলার উপাখ্যান,—এই সমস্তই বাদ পড়িয়াছে। অন্যথা পাঠ আমাদের উদ্ধৃত পাঠের সহিত সর্ব্বত্রই বেশ মিলে। কত পাতায় কোন কাণ্ড সমাপ্ত তাহার তালিকা এই :—আদিকাণ্ড—১—১৮পাতা। অযোধ্যা—১৯—৪০।১। অরণ্য—৪০।২—৫৭। কিষ্কিন্ধ্যা—৫৮—৭৫ সুন্দর—৭৬—১০৬। লঙ্কা—১০৭—২৪২। উত্তর—২৪৩—৩৪৩।

পুথির শেষ নিম্নরূপ :—

ইত্যু উত্তরাকাণ্ড আদি সপ্ত কাণ্ড সমাপ্ত।
সপ্তকাণ্ড রামায়ন থাকে জার ঘরে।
আগ্ন ভএ চৌর ভএ তথা না সঞ্চরে॥
রামনাম দুইটি অক্ষর চারিবেদে সার।
পঠিলে সুনিলে নাই জম অধিকার॥

কবি কিৰ্ত্তিবাসে কহে রাম পদে ভক্তি।
জে ঘরে পুস্তক থাকে সে ঘরে লক্ষি স্বরেস্বতি॥
শ্রী শ্রীকান্ত দেয় কহে জোড় করি কর।
পদভঙ্গ অপরাদ ক্ষেম গদাধর॥
জমেত তাড়না দেখি মনে লাগে ভয়।
এহি ভয়ে (রে) তরাইতে রাম দয়াময়ে॥
তোমার চরণে প্রভু এহি বর চাহম।
অন্তিম কালে মুখে মোর আইসক রামনাম॥

ইতিসন ১২১৮ সন বাঙ্গালা বিতারিথ ৮ ই—বৈশাখ রোজ সুত্র (ক্র) বার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল। (ইহার পরে তিনটি অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক—পরে) স্বোয়ক্ষর শ্রীশ্রীকান্ত দেয়স্ত পরগনে হোমনাবাদ সাকিন ধামইচা।

অনুকূলবাবু তদীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—ধামইচা গ্রাম বিখ্যাত রেলওয়ে ষ্টেশন লাকসাম গ্রামের নিকটবর্ত্তী। এই সুবৃহৎ পুথিখানি আগাগোড়াই এক হাতের, অর্থাৎ শ্রীকান্ত দের হাতের লেখা।

আদিকাণ্ডের পাঠসংগঠনে প্রথম দিক দিয়া বিশেষ বিচার প্রয়োগ করা আবশ্যক। "নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ" নামক উপাখ্যানের প্রাচীনত্বে ও প্রামাণিকত্বে পূর্ব্বেই সন্দেহ প্রকাশ করা গিয়াছে। আমাদের অবলম্বিত একখানা পুথিতেও উহা নাই। এই উপাখ্যান খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের ঙ-পুথিতে (পরিষদের ১২নং) আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত আধুনিক পুথিগুলিতেই ইহা বিস্তৃত আকারে পাওয়া যায়। উহা পরিত্যক্ত হইল।

বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনীটি সম্বন্ধেও বিশেষ বিচার আবশ্যক। ক-পুথি সুমিত্রা বিবাহে আরব্ধ, কাজেই উহাতে এই কাহিনী ছিল কি না, জানা অসম্ভব। খ-পুথিতে এই কাহিনী বেশ বিস্তৃত ভাবে আছে। গ-পুথিতেও এই কাহিনী আছে কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে। ঘ-পুথিতে এই কাহিনী নাই। ঙ-পুথিতেও এই কাহিনী আছে, কিন্তু গ-পুথির মতই সংক্ষিপ্ত ভাবে। দুই পুথিতে ভাষার কিন্তু কোন মিলই নাই। চ-ছ-জ-ঝ-ঞ পুথিতে এই কাহিনী নাই। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের যে আদিকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও এই কাহিনীটি আছে। কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইবে।

বাল্মীকির দস্যুবৃত্তি-কাহিনীর বিশ্লেষণ

(১)

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ। ব্রাহ্মণ-কুমার বাল্মীকি 'ডাকা চুরি' করিয়া পিতা মাতা সুত দারা পুষিতেন। ব্যাধরূপে কোটি কোটি প্রাণী হত্যা করায় তাহার নাম মদন আকাটি হইল। ভগবান নারদরূপ ধারণ করিয়া নানা অলঙ্কারে সাজিয়া দুর্ব্বল ব্রাহ্মণরূপে দস্যু বাল্মীকির নিকট নির্জ্জন বনে আগমন করিলেন।

গ-পুথি। (প্রথম ভাগ লুপ্ত।) ব্রহ্মবধ দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তিত হইলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং সন্ন্যাসী বেশে নানা ধনরত্ন লইয়া মুনি পুত্রের নিকট (নাম উল্লেখ নাই) বনে আগমন করিলেন।

ঙ-পুথি। ব্রহ্মার পুত্র অত্রিক। তাহার পুত্র চ্যেবন। চ্যেবনের পুত্র রত্নাকর পিতামাতার প্রতিপালন করিতে না পারিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া সংসার চালাইতে মনস্থ করিল। বহু মনুষ্য মারিয়া রত্নাকর পাপে জড়িত হইয়া পড়িল। ব্রহ্মার বচনে বিষ্ণু স্বয়ং নানা অলঙ্কার পরিয়া দণ্ড বনে রত্নাকরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

খ-পুথি। ঔবন পুত্র চ্যবনের যদু নামে এক পুত্র ছিল। চ্যবন যদুর উপর সংসার প্রতিপালনের ভার দিয়া বৃদ্ধ বয়সে তপস্যায় গমন করিলেন। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া যদু দস্যুবৃত্তি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে মনস্থ করিল এবং জয়ন্তক নামক বনে তিন পথের সঙ্গমস্থলে যাইয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিল। বহু মনুষ্য মারিয়া যদু সেই রম্য বন ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল। বিপ্রের অধোগতি দেখিয়া ব্রহ্মার উপদেশে নারদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে যাইয়া সেই বনে উপস্থিত হইলেন।

দ্রষ্টব্য, যে অদ্ভুতে ভগবান স্বয়ং নারদরূপে, গ-পুথিতে ব্রহ্মা স্বয়ং সন্ন্যাসী বেশে, ঙ-পুথিতে ব্রহ্মার কথায় বিষ্ণু, খ-পুথিতে ব্রহ্মার কথায় নারদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উদ্ধার-কর্ত্তা।

অদ্ভুতে দস্যুর নাম মদন আকাটি, গ-পুথিতে নাম নাই, ঙ-পুথিতে রত্নাকর, খ-পুথিতে যদু। যে ব্যাধ পাখী মারিয়া বাল্মীকির শোক এবং শ্লোকের কারণ হইয়াছিল, খ-পুথিতে তাহার নাম মদন আকাটি।

(২)

অদ্ভুতাচার্য্য। নারদকে পাইয়া মদন তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল এবং টানিয়া দণ্ডক বনে লইয়া গেল। বিষ্ণুর মায়ায় তথায় পিপীলিকাগণ দেখা দিল। নারদ বলিলেন, আমাকে এথায় মারিও না, মারিলে আমার মৃত দেহের ভারে বহুসংখ্যক পিপীলিকা মরিবে। এই বলিয়া, বিভাণ্ডক মুনি সুয়া পোকা মারিয়া সেই পাপে কিরূপে শূলদণ্ড লাভ করিয়াছিল সেই কাহিনী মদনকে নারদ শুনাইলেন। প্রাণী হিংসায় এত পাপ শুনিয়া অঙ্কুশের আঘাতে হাতীর মত মদনের মনের গতি ফিরিয়া গেল। নারদের পায়ে ধরিয়া মদন মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিল। কৃত পাপ পুণ্যের ফলভাগী পিতামাতা হইবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে নারদ মদনকে পিতা-মাতার নিকট পাঠাইলেন।

গ-পুথি। ব্রহ্মাকে দেখিয়া মুনিপুত্র তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন, আমাকে এথানে মারিও না, আমার চাপনে জীবসকল বিনষ্ট হইবে তাহাতে আমার পাপ হইবে। মুনি-পুত্র বলিল, তবে তোমাকে মারিলে কাহার পাপ হইবে? ব্রহ্মা বলিলেন—তোমার পাপ হইবে। মুনি-পুত্র বলিল, আমি স্ত্রীপুত্র, বৃদ্ধ পিতামাতা এই বৃত্তিতে প্রতিপালন করি, এত পুণ্যে পাপ আমাকে লাগিবে না। ব্রহ্মা বলিলেন, এ পাপের ভাগী স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা হইবে না, একা তাহাকেই এই পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে। পরিজনগণ তাহার পাপের ভাগী হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিতে ব্রহ্মা মুনিপুত্রকে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন।

ঙ-পুথি। সন্ন্যাসীরূপী বিষ্ণুকে রত্নাকর মারিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু বলিলেন,—সন্ন্যাসী মারিলে তোমার অনেক পাপ হইবে। এই বলিয়া মায়া করিয়া পথে পিপীলিকার সারি চালাইলেন। বলিলেন, যদি মারিতেই হয় আমাকে অন্য স্থানে লইয়া যার। আমার অঙ্গের চাপে পিপীলিকা মরিলে আমার অধোগতি হইবে। মুনিপুত্র বলিলেন, আমার উপার্জ্জন আমার পরিজনবর্গ খায়, সমস্তে মিলিয়া আমার পাপ বাটিয়া লইবে, আমার পিতামাতার পুণ্যে আমার পাপ কাটিয়া যাইবে। বিষ্ণু বলিলেন,—পাপের ভাগী কেহ নয়, বিশ্বাস না হয় পরিজনবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।

ধ-পুথি। অনুরূপ কাহিনী,—পিপীলিকা প্রসঙ্গ, পাপের ভাগী কেহ হইবে কিনা জানিতে দস্যুকে পরিজনবর্গের নিকট প্রেরণ।

কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ সকল পুথিতেই এক রকম। বাজার সংস্করণের রামায়ণে দেখা যায়, ব্রহ্মা ও নারদ একত্র হইয়া আসিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী অংশের বর্ণনা উপরের কাহিনী গুলির অনুরূপ।

বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনীর মূল অধ্যাত্ম রামায়ণ। বঙ্গবাসী সংস্করণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তথায় বাল্মীকি যে চ্যবনের পুত্র অথবা তাঁহার নাম পূর্ব্বে রত্নাকর ছিল, এমন কোন কথাই নাই। উদ্ধার-কর্ত্তাও ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা নারদ কেহই নহেন—সপ্তর্ষিগণ একত্রে। বাল্মীকি ভৃগু মুনির কুলে উৎপন্ন ভার্গব। চ্যবনও ঐ বংশের গোড়ার দিকের একজন বড় মুনি। কাজেই বাল্মীকিকে এই হিসাবে চ্যবন-পুত্র বলা যাইতে পারে বটে। কিন্তু বাল্মীকির পিতার প্রকৃত নাম প্রচেতস্। পার্জ্জিটার সাহেবের সঙ্কলিত ভার্গববংশাবলি ও তাহার বিবৃতি দ্রষ্টব্য। (Pargiter's Ancient Indian Historical Traditions. P. 192—202)

এখন প্রশ্ন এই যে, বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী কৃত্তিবাসরচিত কি না এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গ কি না। কাহিনীটি অদ্ভুতের সমস্ত পুথিতেই আছে, কিন্তু কৃত্তিবাসের মাত্র কোন কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর, কোন পুথির সহিত কোন পুথির এই প্রসঙ্গের পাঠ মিলে না। ঙ-পুথির সহিত এই প্রসঙ্গের গ-পুথির পাঠের মিল নাই। মুদ্রিত অদ্ভুতের পুথির এই প্রসঙ্গের পাঠের সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের K-489 নং এবং K-528 নং অদ্ভুতের রামায়ণের আদিকাণ্ডের এই প্রসঙ্গের পাঠের বেশ মিল আছে। খ-পুথির এবং ঢা-বি-র ৭৪৬ নং পুথির পাঠে মিল আছে কিন্তু সেই পাঠ আবার মুদ্রিত অদ্ভুতের পুথির পাঠের সহিত মিলে না। খ-পুথি এবং ঢা-বি ৭৪৬নং পুথি অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের যে পাঠধারা রক্ষা করিয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে মুদ্রিত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ এবং ঢা-বি K 489 নং ও K-528 নং পুথি দ্বারা রক্ষিত পাঠ ধারা হইতে ভিন্ন। এই ভিন্নতার রহস্যমীমাংসা সম্পূর্ণ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ যিনি ভবিষ্যতে সম্পাদন করিবেন

তাঁহারই সমস্যা, সমাধান তাঁহারই জন্য রহিল। আমাদের বর্ত্তমানে দ্রষ্টব্য এই যে অদ্ভুতের সমস্ত পুথিতেই বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের সমস্ত পুথিতে পাওয়া যায় না। যে গুলিতে পাওয়া যায়, সেগুলি স্পষ্টই অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত। এক মাত্র গ-পুথি ইহার ব্যতিক্রম। এইখানি খাঁটি কৃত্তিবাসী পুথি, অথচ ইহাতে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী আছে। কিন্তু রচনা পড়িয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা এই পুথির অঙ্গীয় নহে, বাহির হইতে আমদানী। দস্যুবৃত্তির কাহিনী সম্পূর্ণ শেষ করিয়া বাল্মীকির গোষ্ঠী-গোত্রের সমস্ত পরিচয় সারিয়া—

চ্যেবনের পুত্র জে বাল্মিক মহামুনি।
তপের প্রভাবে মুনি জ্বলন্ত আগুনি॥

বলিয়া—পিতৃনাম উচ্চারণপূর্ব্বক বাল্মীকির আবার পরিচয়প্রদানের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে কাহিনীটি বাহির হইতে আমদানী করা হইয়াছে। জ-পুথিতে এবং আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন পুথি ঝ-পুথিতে এই কাহিনী না থাকায় আদৌ ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রারম্ভে ছিল না, এই বিষয়ে একরকম নিশ্চিত হওয়া যায়। ঞ-পুথিতেও এই কাহিনী নাই। অদ্ভুতের রামায়ণের প্রসাদে এই মনোরম কাহিনীটি দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই গ-পুথির মত কৃত্তিবাসী রামায়ণের খাঁটি পুথিও আদিতে এই কাহিনী দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে নাই। খ-পুথিতে এই কাহিনীটি বেশ বিস্তৃত এবং অনেকখানি কাব্যরসসহকারে রচিত। নমুনা দেখাইবার জন্য আমরা পরিশিষ্টে উহা উদ্ধৃত করিলাম।

আদিকাণ্ডের প্রথমাংশের পাঠসংগঠন

ক-পুথি আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু উহা সুমিত্রা-বিবাহ-প্রসঙ্গে আরব্ধ। কাজেই আদিকাণ্ডের প্রথমাংশের জন্য আমাদিগকে গ-পুথির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে কৃত্তিবাস অসাধারণ পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনর্থক সংস্কৃত মূল রামায়ণের বিষয়বিন্যাস উল্লঙ্ঘন করিবেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। যে কৃত্তিবাসী পুথির বিষয়বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহা মূল রামায়ণের অনুগত, তাহাই কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণের খাঁটি পাঠ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই পরখে গ-পুথিই খাঁটি কৃত্তিবাসী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। গ-পুথির বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম পাতায় ২য় পৃষ্ঠা হইতে সম্ভবতঃ এই পুথিতে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির উপাখ্যান আরব্ধ হইয়াছিল। কারণ, পুথির ১ম পাতার ১ম পৃষ্ঠা বন্দনা কবিতাগুলিতেই প্রায় ভরিয়া যায়। এই পুথির ২।১ পৃষ্ঠা নিম্নলিখিতরূপে আরব্ধ :—

র নাই কারে পড়ে দৃষ্টি॥
ব্রহ্মবধ দেখি ব্রহ্মা চিন্তে মনে মন।
সন্ন্যাসির বেশে ব্রহ্মা কৈল আগমন॥

কাজেই এই পুথিতে 'নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ' উপাখ্যানটি ছিল না।

ব্রহ্মা স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে আগমন করিলেন।

• পাপের ভাগী কেহ হইবে না জানিয়া মুনিকুমারের চেতনা হইল। 'মরা' মন্ত্র দিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। বল্মীকে মুনিকুমারকে গ্রাস করিল। ৬০ হাজার বৎসর মুনিকুমার মরামন্ত্র জপ করিলেন। ব্রহ্মা আবার আসিলেন, তাঁহার স্পর্শে মৃত্তিকা গলিয়া পড়িল। মুনিকুমার বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হইলেন। সহসা একদিন নারদের সহিত তাহার দেখা হইল। বাল্মীকি নারদকে বহুবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তত গুণশালী আদর্শ মহাপুরুষ সংসারে কে আছেন? নারদ বলিলেন, অমন গুণশালী বর্ত্তমানে কেহ নাই, অযুত বৎসর পরে অমনি গুণশালী হইয়া নারায়ণ রঘুবংশে অবতীর্ণ হইবেন। এই বলিয়া তিনি রাম জন্মিয়া কি কি করিবেন, সংক্ষেপে তাহা বাল্মীকিকে কহিলেন। কাহিনী সমাপ্ত করিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে লইয়া তমসাতীরে তপস্যায় চলিলেন, তথায় পক্ষীর শোকে শ্লোকের উদ্ভব হইল। ব্রহ্মা আসিলেন, শ্লোকচ্ছন্দে রামায়ণ রচনা করিতে বলিয়া বিদায় লইলেন। বাল্মীকি আচমন করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে বসিলেন, মুনিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। বাল্মীকি সংক্ষেপে রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের বিবরণ দিলেন। পরে রাবণ ও রাক্ষসগণের জন্ম ও বিবাহাদির কাহিনী। রামের বংশের পরিচয়। অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা। অযোধ্যার রাজা দশরথের বর্ণনা। স্বীয় কন্যা কৌশল্যাকে বিবাহ করিতে আহ্বান করিয়া কোশল-

নৃপতির দশরথের নিকট দূত প্রেরণ। দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ। স্বয়ংবরে দশরথের সকুব্জা কৈকেয়ীকে লাভ। সিংহল রাজকন্যা সুমিত্রার সহিত দশরথের বিবাহ।

তুলনার সুবিধার জন্য মূল সংস্কৃত রামায়ণের আদি বা বালকাণ্ডের বিষয়সূচী এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১ম সর্গ। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্ত্তমান কালে সর্ব্বগুণশালী মহাপুরুষ কে বর্ত্তমান আছেন। নারদ উত্তর করিলেন, ঐরূপ মাত্র এক ব্যক্তি আছেন, তাঁহার নাম রাম। তিনি রামের বর্ণনা এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিলেন।

২য় সর্গ। বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজ সহ তমসা নদীতে অবগাহন করিতে গমন করিলেন। ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুনের পুংক্রৌঞ্চ নিহত হইল—ক্রৌঞ্চ শোকে বাল্মীকি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন এবং আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এমন সময় ব্রহ্মার আগমন। শোকজনিত মানসিক চাঞ্চল্যে বাল্মীকি ব্রহ্মার সমীপেও পূর্ব্বোচ্চারিত শ্লোক আবার উচ্চারণ করিলেন। ব্রহ্মা বাল্মীকিকে নারদের নিকট শ্রুত রামচরিত্র ঐ শ্লোকছন্দে বর্ণনা করিতে উপদেশ দিয়া বর দিলেন যে, যে সমস্ত বৃত্তান্ত বাল্মীকির অগোচর আছে, ধ্যান যোগে তাহার সমস্তই গোচর হইবে।

৩য় সর্গ। বাল্মীকি আচমন করিয়া কুশাসনে বসিয়া যোগমার্গে অন্বেষণ করতঃ রামের সম্যক ইতিহাসই করস্থ আমলকের মত দেখিতে পাইলেন এবং বর্ণনা করিলেন। এইখানে আবার বাল্মীকি কি কি বিষয় বর্ণনা করিলেন তাহার এক তালিকা আছে।

৪র্থ সর্গ। রামায়ণ রচনা করিয়া কাহার দ্বারা ইহার প্রয়োগ করাইবেন বাল্মীকি এই মত চিন্তা করিতেছেন এমন সময় মুনিবেশধারী কুশীলব আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। বাল্মীকি এই দুই ভাইকে রামায়ণ গান শিক্ষা দিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে একদিন কুশীলব মুনিগণের সভায় রামায়ণ গান করিলেন, খুসী হইয়া মুনিগণ যাহার যাহা সম্পত্তি ছিল কুশীলবকে দিয়া ফেলিলেন। পরে কুশীলব অযোধ্যানগরে এই গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের খ্যাতি রামের কানে যাইয়া পৌছিল। রাজাজ্ঞায় তাহারা একদিন রাজসভায় এই গান গাহিতে আরম্ভ করিল। এই গানই পরবর্ত্তী রামায়ণ কাব্য।

৫ম সর্গ। কোশল রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যার বর্ণনা।

৬ষ্ঠ সর্গ। অযোধ্যায় রাজা দশরথের বর্ণনা।

৭ম সর্গ। দশরথের অমাত্য বর্গের বর্ণনা।

৮ম সর্গ। দশরথের পুত্রজন্মের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের কামনা ও ব্রাহ্মণগণের সম্মতিলাভ।

৯ম সর্গ। সুমন্ত্র কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে রোমপাদ রাজার অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবৃত্তি বর্ণন।

১০ম সর্গ। রোমপাদের বারাঙ্গনা পাঠাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন।

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই সংক্ষিপ্তসারের সহিত আমাদের আলোচ্য পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত সার মিলাইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে পরিষদের ৮ নম্বর পুথি,—আমাদের 'গ' পুথিতে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ রক্ষিত রহিয়াছে, তাহাই আদি ও অকৃত্রিম পাঠ হওয়া সম্ভব।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিকৃতি।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের প্রক্ষেপ।

ক-পুথির সুমিত্রাবিবাহে আরম্ভ দেখিয়া এবং চ ও ছ পুথির আদিতে বাল্মীকির রামায়ণ রচনা কাহিনীর অভাব দেখিয়া মনে হয় যে ভাল কৃত্তিবাসী পুথি দূরদেশে যাইয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই উহার প্রথমাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গায়েনগণ বা পুথির মালিকগণ জোড়াতাড়া দিয়া ঐ অংশ গড়িয়া লইত। পরিষদের ২ নং পুথিখানা,—আমাদের 'ঘ' পুথি—বেশ প্রাচীন। তাহাতে, 'ঙ' পুথিতে (পরিষদের ১২ নং) এবং শ্রীরামপুরের মিশনরীগণের মুদ্রিত রামায়ণে এই অংশে অনুরূপ গোলযোগ দেখিয়া মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই অংশ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

এই বিকৃতির প্রধান এক কারণ যে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আক্রমণ, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বুকানন হামিল্টনের ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১২১৬ সন) সঙ্কলিত রঙ্গপুরের বিবরণীতে দেখা যায় (**Martin's Eastern India Vol. III, p. 503**) রঙ্গপুর জেলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ উভয়ই পঠিত হইত। * অদ্ভুতাচার্য্যের কাল সন্তোষজনকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে অদ্ভুতাচার্য্য অতি সামান্য স্থানই অধিকার করিয়াছেন। অথচ সমগ্র

* ১৩১৩ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৬৭ পৃষ্ঠায় ৺হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের একখানি পুথির পরিচয় দিয়াছেন। উহা মূলতঃ কৃত্তিবাসী পুথি। উহার শেষে লেখা আছে—"ইতি বাল্মীকি পুরাণে উত্তর কাণ্ড কৃত্তিবাসী অদ্ভুতি পুথি গড়ান লেখা সমাপ্ত।" সম্ভবতঃ অদ্ভুতাচার্য্যের প্রক্ষেপ আছে বলিয়াই পুথিখানিকে কৃত্তিবাসী অদ্ভুতি পুথি বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। পুথিখানি এখন রঙ্গপুর পরিষদের সম্পত্তি, আমি ব্যবহারার্থে আনাইয়াছি। রংপুর পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন যে 'কতক ছাড়িয়া কতক রাখিয়া' অর্থে রঙ্গপুরে গড়ান শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উত্তরবঙ্গে এবং ময়মনসিংহ ত্রিপুরাতেও অদ্ভুতাচার্য্যের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল,—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তাঁহারই রামায়ণ পঠিত ও গীত হইত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুতের রামায়ণে বিষয়বৈচিত্র্য অনেক বেশী—চরিত্রচিত্রণও নূতনতর। মোটামুটি বলিতে গেলে রামায়ণগানে গঙ্গার দক্ষিণ ভাগ কৃত্তিবাস স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন, গঙ্গার উত্তরভাগ অদ্ভুতাচার্য্য সরস করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচক হিসাবে অদ্ভুতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা বড় কম নহে। রঙ্গপুর পরিষদ কর্তৃক আরব্ধ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের প্রকাশ আদিকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াই স্থগিত রহিল, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। রঙ্গপুর পরিষদে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অদ্ভুতের বহুসংখ্যক পুথি জড় হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রচনায় অদ্ভুতাচার্য্যের প্রক্ষেপের অথবা বিপরীত ব্যাপারের কাল নির্ণয়ের জন্য অদ্ভুতাচার্য্যের কাল নির্ণয় একান্ত আবশ্যক। দীনেশ বাবু অদ্ভুতকে প্রায় ২০০ শত বৎসরের লোক বলিয়া অনুমান করেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ।) রঙ্গপুর পরিষদের ১১-১ নং পুথি অদ্ভুতের সুন্দর—উত্তরকাণ্ডের পুথি, তারিখ ১১৫১ সন। অর্থাৎ এই খণ্ডিত পুথিখানিই প্রায় ২০০ শত বৎসরের আমাদের খ-পুথি ১১০৬ সনের, অর্থাৎ প্রায় আড়াই শত বৎসরের পুরাতন। উহা স্পষ্ট অদ্ভুতাচার্য্য দ্বারা প্রভাবিত। আদিকাণ্ডের ২০—ক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। কাজেই অদ্ভুত ইহার অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে আছে, তাঁহার বাড়ী সোনাবাজু পরগণার অন্তর্গত অমৃতকুণ্ডা গ্রামে ছিল। এই পরগণা বর্ত্তমানে পাবনা জেলার মধ্যে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ—ঈশ্বরদি রেলওয়ে লাইন অমৃতকুণ্ড নামক একটি গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে এবং উক্ত লাইনের উপরের চাটমোহর ষ্টেশনটি এই গ্রামের অন্তর্গত। এই গ্রামের মৌজা নম্বর ১৪৬। অদ্ভুতাচার্য্য লিখিয়াছেন, অমৃত কুণ্ডা আত্রেয়ীর উত্তরকূলে এবং করতোয়ার পশ্চিমে ছিল। ত্রিস্রোতা নদীর জল পূর্ব্বে করতোয়া এবং আত্রেয়ী দিয়া নামিত, তাই এই নদী দুইটি তাজা ছিল। এখন ত্রিস্রোতা পূর্ব্বাভিমুখে বহিয়া সোজা ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে করতোয়া এবং আত্রেয়ী উভয় নদীই শুখাইয়া গিয়াছে এবং পাবনা জেলা মরা নদীর খাতে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অমৃতকুণ্ডা বর্ত্তমান চাটমোহর হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে। বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট ম্যাপে চাটমোহরের উত্তরে একটি শুষ্ক নদীর খাতের নাম করতোয়া দেখা যায়। এবং অমৃতকুণ্ডার দক্ষিণস্থ নদীটি রেণেলের ১৬ সংখ্যক মানচিত্রে আত্রেয়ী বলিয়াই লিখিত হইয়াছে। এই অমৃতকুণ্ডা সোনাবাজু পরগণারই অন্তর্গত। কাজেই এই অমৃতকুণ্ডায়ই অদ্ভুতাচার্য্যের বাস ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। স্থানীয় অনুসন্ধান করিবার সুবিধা হইলে আমার অনুমান সত্য কি না পরখ করা যাইত। অদ্ভুতাচার্য্যের কালনির্ণয় সমস্যারও একটা কিনারা করা যাইত।

বন্দনা পয়ারসমূহ

বাজার সংস্করণের কৃত্তিবাসে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়, উহাতে রামায়ণের আদিতে কোন বন্দনা কবিতা নাই। "গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর" বলিয়া দেবদেবীর নাম মাত্র না করিয়াই রামায়ণের আরম্ভ হইয়াছে। সহজেই বুঝা যায়, কোন প্রাচীন কাব্যেরই আরম্ভ এই প্রকারে হইতে পারে না। মিশনারীদের ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের আদি সংস্করণে নিম্নলিখিতরূপে রামায়ণের আরম্ভ হইয়াছিল।

রামায়ণ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

অথ আদ্যকাণ্ডমভিলিখ্যতে

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সভাকার পর।

লক্ষ্মীর সহিত তথা আছেন গদাধর ॥

ঙ-পুথিতে দেখা যায়, "গোলক বৈকুণ্ঠপুরি সভাকার পর" এই ছত্রের পূর্ব্বে গায়েনদের পদ্ধতিমত বহু দেবদেবী বন্দনা, দশ অবতারের বর্ণনা এবং রামনামের অশেষ মহিমাকীর্ত্তন আছে। মিশনারীদের প্রকাশিত রামায়ণের আদর্শ পুথিতেও হয় ত এই সমস্ত ছিল, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের পুথি প্রচার করিতে বসিয়া অতখানি পৌত্তলিকতা হয় ত মিশনারীগণের মনঃপূত হয় নাই। তবু তাঁহাদের সংস্করণে "শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ"টুকু ছিল—বাজার সংস্করণ হইতে তাহাও বাদ পড়িয়াছে, এবং বন্দনাহীন রামায়ণই সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে।

ঙ-পুথির বর্ণনাকালে ৺হারাধন দত্ত প্রচারিত কৃত্তিবাসের সুবিখ্যাত ও সুদীর্ঘ আত্মবিবরণাত্মক কবিতাটির আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন পুথির প্রচলিত পদ্ধতিমত এই আত্মবিবরণ সম্ভবতঃ আদিকাণ্ডের আদিতেই ছিল। এই আত্মবিবরণের প্রারম্ভে নিশ্চয়ই বন্দনা কবিতা ছিল, কিন্তু দীনেশ বাবুকে আত্মবিবরণটি দিবার কালে দত্ত মহাশয় ঐ বন্দনা কবিতা বাদ দিয়া আত্মবিবরণটি পাঠাইয়াছিলেন। ঐ বন্দনা কবিতা পাইলে আর কোন গোলযোগই ছিল না। আমাদের পুথিগুলির মধ্যে খ এবং ঙ-পুথির বন্দনা নিতান্তই গায়েনের বন্দনা। চ-পুথির বন্দনাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও কুরচিত। একমাত্র ছ-পুথির বন্দনাই গ্রহণযোগ্য এবং সম্ভবতঃ উহা কৃত্তিবাস রচিত।

শিক্ষায় হিন্দুর অবনতি

— শ্রীগৌরিশঙ্কর দত্ত

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ইংরাজি মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান ১৯৩১ সালের আদম-সুমারী সঠিক নহে। আমারও বিশ্বাস যে ১৯৩১ সালের আদম-সুমারী রাজনৈতিক কারণে ও কংগ্রেসী হিন্দুগণের অসহযোগের ফলে যথাযথ ও সঠিক হয় নাই। কিন্তু নিম্নের বিষয়টির আলোচনাকালে আমরা আদম-সুমারীর অঙ্ক সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। যদ্যপি ১৯৩১ সালের আদম-সুমারী সঠিক হয়, তাহা হইলে হিন্দুর ভাবিবার কথা অনেক আছে। সাধারণ ও শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে একটা আত্মপ্রসাদের ভাব আছে যে শিক্ষায় বাংলাদেশে তাঁহারা মুসলমানগণের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। তাঁহারা মুসলমানগণের অপেক্ষা শিক্ষায় অগ্রসর ছিলেন, এবং বর্ত্তমানেও আছেন বটে; কিন্তু অদূরভবিষ্যতে থাকিবেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের অবনতি—তুলনামূলক ও প্রকৃত আরম্ভ হইয়াছে। এই তথ্যটি তর্ক অপেক্ষা তথ্যের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ইং ১৯২১

সকল বয়সের হিন্দুর সংখ্যা	লিখন-পঠনক্ষম হিন্দুর সংখ্যা	শতকরা
১০,৮৫৮,৩২৩ (পুরুষ)	২,৫৯৯,৭৯৮	২৩·৯
৯,৯৫০,৮২৫ (স্ত্রীলোক)	৩১৭,১৯৮	৩·১
২০,৮০৯,১৪৮ মোট	২,৯১৬,৯৯৬	১৪·০
যাহারা ২০ বা ততোধিক বয়সের		
৫,৯৩৭,৫৯৯ (পুরুষ)	১,৮৫৫,৫৭৬	৩১·২
৫,২৯৩,৭১৫ (স্ত্রী)	১৮৫,৯৯৯	৩·৫
১১,২৩১,৩১৪ মোট	২,০৪১,৫৭৫	১৮·১

ইং ১৯৩১

সকল বয়সের		
১১,৬৩৯,২৮৫ (পুরুষ)	২,৬১০,২৯৩	২২·৪
১০,৫৭২,৭৮৪ (স্ত্রী)	৪৪১,০৯৮	৪·১
২২,২১২,০৬৯ মোট	৩,০৫১,৩৯১	১৩·৭
যাহারা ২০ বা ততোধিক বয়সের		
৬,৩১০,০৯১ (পুরুষ)	১,৮৪০,৩৩৩	২৯·১
৫,৫১৩,১৫৪ (স্ত্রী)	২৫৯,৬০১	৪·৭
১১,৮২৩,২৪৫ মোট	২,০৯৯,৯৩৪	১৭·৭

উদ্ধৃত অঙ্কগুলি হইতে বেশ বুঝা যায় যে হিন্দুদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা আনুপাতিক হিসাবে কমিয়াছে। ইং ১৯২১ সালে ছিল শতকরা ১৪·০ আর ইং ১৯৩১ সালে হইয়াছে শতকরা ১৩·৭। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে এই হ্রাস অল্প, কিন্তু তাহা নহে। এই গণনানুসারে শুধু যদি পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইং ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সালে এই দশ বৎসরের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম পুরুষের সংখ্যা শতকরা ২৩·৯ হইতে ২২·৪এ নামিয়াছে।

এই দশ বৎসরে হিন্দু সংখ্যায় ২০৮ লক্ষ হইতে ২২২ লক্ষে দাঁড়াইল, আর হিন্দুর মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িল মাত্র ১,৩৪,০০০। কেবল মাত্র হিন্দু পুরুষের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এই বৃদ্ধির স্বরূপ আরও পরিস্ফুট হইবে। হিন্দু পুরুষ ১০৮ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১১৬ লক্ষ হইয়াছে; কিন্তু হিন্দু পুরুষ লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ২,৫৯৯,৭৮৯ হইতে ২,৬১০,২৯৩এ দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ মাত্র ১০,৪৯৫ জন বেশী লিখিতে পড়িতে জানে।

যাহারা ২০ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক পুরুষ তাহাদিগকে "সাবালক" বলিয়া ধরা যাউক। এইরূপ "সাবালক"এর সংখ্যা হিন্দুর মধ্যে গত দশ বৎসরে ৫৯ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৬৩ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু এইরূপ "সাবালক" হিন্দু পুরুষদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ১,৮৫৫,৫৭৬ হইতে কমিয়া ১,৮৪০,৩৩৩এ দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ ১৫,২,৪৩ জন কমিয়াছে! শতকরা আনুপাতিক সংখ্যা ৩১·২ হইতে কমিয়া ২৯·১ হইয়াছে। "সাবালিকা" স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫৩লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৫৫ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে; আর তাঁহাদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ১৮৫,৯৯৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৯,৬০১ হইয়াছে। শতকরা আনুপাতিক সংখ্যা ৩·৫ হইতে বাড়িয়া ৪·৭ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু "সাবালক" পুরুষ ও "সাবালিকা" স্ত্রীলোকদের মধ্যে গত দশ বৎসরে লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ১৮·১ হইতে কমিয়া ১৭·৭এ নামিয়াছে।

অপর পক্ষে মুসলমানদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ও অনুপাত সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নের অনুরূপ অঙ্ক হইতে বুঝা যাইবে।

ইং ১৯২১

সকল বয়সের মুসলমানের সংখ্যা	লিখন পঠনক্ষম মুসলমানের সংখ্যা	শতকরা
১৩,১০৪,৩০৭ (পুরুষ)	১,২৪০,১৬৯	৯.৪
১২,৩৮১,৮১৭ (স্ত্রীলোক)	৫৩,৩৭৯	০.৪
২৫,৪৮৬,১২৪ মোট	১,২৯৯,৫৮৮	৫.১
যাহারা ২০ বা ততোধিক বয়সের		
৬,২৯৫,৭৪৩ (পুরুষ)	৯১৭,৬৩০	১৪.৫
৫,৭৮৩,১৯২ (স্ত্রী)	২৮,৬৭১	০.৮
১২,০৭৮,৯৩৫ মোট	৯৪৬,৩০১	৭.৮

ইং ১৯৩১

সকল বয়সের মুসলমানের সংখ্যা		
১৪,৩৬৬,৭৫৭ (পুরুষ)	১,৩৯৪,২৩১	৯.৭
১৩,৪৪৩,৩৪৩ (স্ত্রী)	১৮৯,৪৭৯	১.৪
২৭,৮১০,১০০ মোট	১,৫৮৩,৭১০	৫.৭
যাহারা ২০ বা ততোধিক বয়সের		
৬,৯০৭,৫৭৭ (পুরুষ)	১,০০৭,৪০১	১৪.৫
৬,০৯৫,০৮৪ (স্ত্রী)	৯৫,৬৮২	১.৭
১৩,০০২,৬৬১ মোট	১,১০৩,০৮৩	৮.৪

মুসলমানদের মধ্যে গত দশ বৎসরে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে লিখন-পঠন-ক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ও শতকরা আনুপাতিক হিসাব উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমান "সাবালক" পুরুষ ও "সাবালিকা" স্ত্রীলোকদের মধ্যেও লিখন-পঠন-ক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ও শতকরা আনুপাতিক হিসাব উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমান সমাজে স্ত্রীলোকের কঠোর পর্দ্দা থাকা সত্বেও "সাবালিকা" লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ২৮,৬৭১ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৯৫,৬৮২তে পরিণত হইয়াছে। ১৯২১ সালে মুসলমান সমাজে লিখন-পঠন-ক্ষম "সাবালিকা"র সংখ্যা ২৮,৬৭১ ছিল, এমতে "নাবালিকা" লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা ৫৩,৩৭৯—২৮,৬৭১=২৪,৭০৮ হইতেছে। ধরিয়া লওয়া যাউক যে ১৯২১ সালে এই ২৪,৭০৮ জন লিখন-পঠনক্ষম 'নাবালিকা'র বয়স ১০ হইতে ২০ বৎসর। তাহা হইলে ১৯৩১ সালে এই ২৪,৭০৮ জন সকলেই "সাবালিকা" হইবেন। আরও ধরিয়া লওয়া যাউক যে এই ২৪,৭০৮ জনের মধ্যে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন নাই; এবং যাঁহারা ১৯২১ সালেই "সাবালিকা" ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বয়স ১০ বৎসর করিয়া বাড়িলেও, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন নাই। সুতরাং ১৯৩১ সালে "সাবালিকা" লিখন-পঠনক্ষম স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫৩,৩৭৯এর অধিক হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা আরও কম হওয়া উচিত। কিন্তু ১৯৩১ সালের অঙ্ক হইতে দেখিতে পাই যে "সাবালিকা" লিখন পঠনক্ষম স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৫,৬৮২ জন। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে—প্রথম, আদম-সুমারীর অঙ্ক ভ্রমপূর্ণ; দ্বিতীয়, মুসলমান সমাজে গত দশ বৎসরে "সাবালিকা" স্ত্রীলোক যাঁহারা পূর্ব্বে নিরক্ষর ছিলেন, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে মুসলমানদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ও আনুপাতিক হিসাব সর্ব্ব-প্রকারে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-বয়সে বাড়িয়া যাওয়াতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বরং আনন্দের কথা।

কিন্তু হিন্দুর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। ১৯২১ সালে ৭,৪৪,০০০ হাজার হিন্দু "নাবালক" পুরুষ লিখন-পঠন-ক্ষম ছিল; ১৯৩১ সালে তদ্রূপ হিন্দুর সংখ্যা মাত্র ৭,৭০,০০০ হাজার। ১৯২১ সালে হিন্দু নাবালক পুরুষের সংখ্যা ৪৯ লক্ষ ছিল, ১৯৩১ সালে তদ্রূপ "নাবালক" হিন্দুর সংখ্যা ৫৩ লক্ষ; কিন্তু লিখন-পঠনক্ষমের সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র ২৬,০০০। ইহার কারণ পূর্ব্বের ন্যায় অধিক হিন্দু বালক আর শিক্ষা লাভ করিতেছে না। এইবারকার আদম-সুমারীতে হিন্দুর শিক্ষায় আনুপাতিক অবনতি প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু নিশ্চেষ্ট থাকিলে আগামী আদম-সুমারীতে হিন্দুর মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা বর্ত্তমান হইতেও কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমান আদম-সুমারীতেই দেখা যায় যে "সাবালক" হিন্দু পুরুষদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা বর্ত্তমানে (অর্থাৎ ১৯৩১ সালে) ১৯২১ হইতে কম। "নাবালক" হিন্দু পুরুষদের মধ্যে তদ্রূপ ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র ২৬ হাজার বেশী—বিশেষ চেষ্টা না করিলে আগামী আদম-সুমারীতে হিন্দুর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা (কেবল মাত্র স্বাভাবিক মৃত্যুর হার বাদ দিলেই) আরও কমিয়া যাইবে।

এ বিষয়ে, আদম-সুমারীর অঙ্ক সঠিক হইলে, হিন্দুর বিশেষ ভাবিবার কথা। মুসলমান শিক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে বা হইতেছে, তুলনায় হিন্দু পিছাইয়া পড়িতেছে, ইহাও ভাবনার আর এক কারণ। একেই ত' রাজনৈতিক কারণে প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞ এম্, এ, কে হিন্দু বলিয়া সরকারী চাকরী হইতে বিতাড়িত করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অনভিজ্ঞ মুসলমানকে বাহাল করা হইতেছে। তাহার উপর হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান গর্ব্ব করিবার বিষয়—শিক্ষায় উন্নতি ও কৃতিত্ব—তাহাও যদি যায়, তাহা হইলে হিন্দুর রহিল কি? হিন্দু নেতাগণকে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া চিন্তা করিতে করজোড়ে অনুরোধ জানাইতেছি।

পদ্মা

(উপন্যাস)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

চরচিলমারী

১

বড়দিনের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হইয়াছে। সকাল বেলার প্রচুর অবকাশে পড়িবার ঘরে বিনয় তাহার কয়েকজন বন্ধুর সহিত বসিয়া ছিল। প্রাত্যহিক প্রথম পেয়ালা চা নিঃশেষ হইয়া দ্বিতীয় পেয়ালাও সমাপ্ত—সময় তবু কাটে না। তাস-পাশার কেহ ভক্ত নহে—হইলেও এমন সকালটা ঘরে বসিয়া কাটাইতে তাহারা রাজি নহে। সংবাদ-পত্রের স্বাদেশিক খবরেও যখন মন উঠিল না—বিনয় বলিল—চল এক কাজ করা যাক্।

কোথায় চলিতে হইবে এবং কাজটা কি জানাইবার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া পড়িল, অন্য তিনজন তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিল।

বাড়ীর সম্মুখেই পদ্মা। বিনয়ের একখানা ডিঙি নৌকা আছে—সেখানা ঘাটেই বাঁধা থাকে। এই চারি বন্ধুতে শীত গ্রীষ্ম কি বর্ষা প্রায়ই এই ডিঙিখানিতে করিয়া নদীতে বেড়ায়। আজও বিনয় ঘাটে গিয়া নৌকায় উঠিল—অন্য তিনজন, লগি, বৈঠা লইয়া বাঁধন খুলিয়া দিল।

শীতের পদ্মা—মধ্যে প্রকাণ্ড চর যেন মাথা তুলিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল। জল অত্যন্ত কম—অনেক স্থানেই নামিয়া নৌকা ঠেলিতে হয়। বিনয় হাল ধরিয়া নৌকা ঘুরাইয়া দিল—সকলেই বুঝিল, ওপারের চরেই তাহারা যাইতেছে। আসন্ন মটরশুঁটির আশায় দীনেশের কণ্ঠ খুলিয়া গেল। সেটি পারস্য দেশের গোলাপ গাছ বিশেষ—ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলির বাসা।

রাজসাহীর পদ্মায় বৃহৎ এক চর পড়িয়াছে—বর্ষার জলেও তাহা ডোবে না—অনেক বসতি হইয়া গিয়াছে। এ দিকের তীর হইতে প্রায় এক ক্রোশ—চরটা চার ক্রোশ দীর্ঘ—এক ক্রোশ প্রস্থ—ইহার অপর দিকে পদ্মার বৃহত্তর শাখাটা বহু দূর প্রসারিত—তাহার পরেই মুর্শিদাবাদ জেলা।

এই চরে ডিঙি বাহিয়া বিনয় বন্ধুদের সাথে অনেকবার গিয়াছে—এবং শীতের সন্ধ্যায় মটরের শাক ও গ্রীষ্মের রাত্রে তরমুজ 'না-বলিয়া' লইয়া আসিয়াছে।

বিনয়ের অভ্যস্ত হাতের টানে নৌকা শীঘ্রই গিয়া চরে ভিড়িল। একখানা বড় নৌকা বাঁধা ছিল—তাহার নোঙরের সহিত ডিঙি বাঁধিয়া তাহারা রওনা হইল। প্রথমে খানিকটা শুকনা বালু—তারপরে মটর ও মশুরের ক্ষেত—মাঝ দিয়া সরু আল। দীনেশের সঙ্গীতের বুলবুলি আপাতত কচি মটর-শুঁটির স্বাদে নীরব হইল—কেবল উৎকণ্ঠা ছিল অদূরবর্ত্তী গ্রামের ক্ষেত্রপতির পরিপুষ্ট যষ্টিখানি স্মরণ করিয়া।

বিনয় বলিল—চল চর থেকে সস্তায় মুরগী নিয়ে যাওয়া যাক—কাল বনভোজন হবে।

মহীন্দ্র ঠাট্টা ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি সুরে জিজ্ঞাসা করিল—একেবারে নিষিদ্ধ পক্ষী!

বিনয়—না, সিদ্ধ করে খাওয়া যাবে।

মহীন্দ্রের ঠাট্টা পাছে টিকিয়া গিয়া উক্ত বিহঙ্গের আশা অকালে উড়িয়া যায়—তাই দীনেশ ও প্রবীর যুগপৎ বলিয়া উঠিল—অন্ততঃ কুসংস্কার দূর করবার জন্যেও খাওয়া দরকার। কুসংস্কার দূর করিবার জন্য চারিজনে এক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামী তখন বাখারি চাঁছিয়া বেড়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। গোটা দুই গরু কুলগাছটার সহিত আবদ্ধ হইয়া পরম আলস্যে রৌদ্র পোহাইতেছিল—একবার অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে আগন্তুকদের দিকে চাহিয়া জিহ্বা দিয়া পরস্পর গাত্রলেহন করিতে লাগিল।

উঠানে, আশেপাশে, গোবরের গাদায় একদল মুরগী চরিতেছিল।

বিনয়ের কথা শুনিয়া লোকটি হাতের দা মাটিতে রাখিয়া গলাটা কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া গৃহস্বামী-উচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—মুরগী বিক্রি করাই তাহার পেশা বটে কিন্তু বাবুরা সন্ধ্যাবেলায় আসিলেই ভাল হয়—এখন মুরগী ধরা সহজ নহে। দীনেশ বিরক্ত হইয়া বলিল—মুরগী তাহারা এখনি চায়, সে দিতে পারে ভাল—নতুবা তাহারা অন্য বাড়ী যাইবে। অগত্যা গৃহস্বামীকে উঠিয়া তাহার ছেলেদের মুরগী ধরিবার হুকুম দিতে হইল।

তখন এক মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। মুরগীপরিবার অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া, চীৎকার করিয়া, পাখা ঝাড়িয়া, পালক খসাইয়া, উড়িয়া পাড়া অস্থির করিয়া তুলিল। মুরগীও যে উড়িতে পারে ইহার পূর্ব্বে দীনেশের সে ধারণাটা ছিল না—সে কেবলি বলিতে লাগিল, কি অন্যায়, কি অন্যায়! অন্যায়টা কি জানি না—বোধ করি সে ভগবানের অবিচারের কথা ভাবিতেছিল—যাহাকে খাদ্য করিয়াই সৃষ্টি করা হইল, তাহার আবার অনর্থক এক'জোড়া পাখা কেন? মুরগীরা তাড়া খাইয়া গোটা দুই কুলগাছে, কয়েকটা চালের উপরে, গোটা চার পাঁচ দুর্ভেদ্য সিমগাছের মাচায় আশ্রয় লইল। আর গোটা কয়েক দুঃসাহসী ঘরের ভিতরে, জালার মধ্যে, শিকার উপরে, নানা অসম্ভব স্থানে আত্মগোপন করিল। এই মুরগী শিকারে বিনয়েরা এবং বাড়ীর মেয়েরা ছুটাছুটি করিয়া হাঁপাইয়া পড়িল। পাড়ার অন্য মেয়েরা বাবুদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। তাহারা মাঝে মাঝে সহরে গিয়া বাবুদের দেখে বটে কিন্তু একেবারে এত কাছে বিশেষত এমন দুর্দ্দশায় দেখে নাই। বিনয়েরা তিনজন বসিয়া পড়িল—দীনেশ তখনও উড্ডীয়মান একটা মুরগীকে তাড়া করিতেছিল। বিনয় বলিল—দীনেশ একটু বিশ্রাম কর। পাখীটার দোদুল্যমান পুচ্ছটা করায়ত্ত হইয়াছে ভাবিয়া দীনেশ গম্ভীরভাবে বলিল—শরীরপাতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন।

বিনয় বলিল—শরীরপাতন কার হে? মুরগীর নয় তো!

মহীন্দ্র বলিল—কিম্বা ও যে রকম উড়বার পাল্লা দিচ্ছে—ওর হলেও বেশি আশ্চর্য্য হ'ব না।

দীনেশ এসব তুচ্ছ ঠাট্টার উত্তর না দিয়া তাচ্ছীল্যভরে বন্ধুদের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। এমন নির্ব্বাক অনুনয় উপেক্ষা করা যায় না—সকলে উঠিয়া আবার আক্রমণ সুরু করিল। এইমাত্র যে দলপতি-মোরগটা এতক্ষণে তাহাদের জয়লাভ হইয়াছে মনে করিয়া গোময়স্তূপের শিখরে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড়ের ফুল দোলাইয়া, ইতস্তত সগর্ব্ব দৃষ্টিপাত করিয়া, অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত বৃক্ষচূড়াশ্রিত পলাতক মোরগটার দিকে তাকাইয়া—সানন্দে ডাকিতে যাইতেছিল—সহসা শত্রুদলের পুনরাক্রমণে সে অপ্রত্যাশিত দ্রুতপক্ষে পূর্ব্বোক্ত পলাতক স্বজাতিটার পাশে গিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিনয়ের দল নবোদ্যমে আক্রমণের জন্য যখন ব্যূহ রচনা করিতেছে এমন সময়ে মেয়েদের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—ছি ছি, তোমরা মুরগী খাও!

সকলে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, বছর পনেরো ষোলর একটি বালিকা—কথাটি বলিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কথাটা নূতন নহে—বিনয়েরা এই কথাটি স্বজন পরিজন ও গুরুজনদের নিকট হইতে অনেকবার শুনিয়াছে কিন্তু তাহা আজিকার মত মর্ম্মান্তিক মনে হয় নাই। একে তাহারা মুরগী ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় পরিশ্রান্ত,—তার উপরে এমন নিদারুণ শ্লেষ—সকলেরই উৎসাহে কেমন ভাটা পড়িয়া আসিল। প্রবীর বলিল—বেলা অনেক হয়েছে, চল বিনয়, ফেরা যাক্।

বিনয় উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দীনেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—শুধু হাতে, তাও আবার একটা মেয়ের কথায়!

মহীন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনেই যেন কহিল—মেয়ে কোথায় হে! তন্বী!

তখনো মাঠের মধ্যে একটা ছোট জাম গাছের আড়াল হইতে তাহার দোদুল্যমান কেশের প্রান্ত দেখা যাইতেছিল। বিনয় সমস্যার সমাধান করিল—চল মুরগী যখন পাওয়া গেল না—হাঁসের খোঁজ করা যাক্!

একেবারে এত বড় পরিবর্ত্তন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বয়স যখন পঁচিশের নীচে, সম্মুখে যখন প্রচুর অবকাশ—চারিদিকে যখন শীতের রৌদ্রে নিস্পন্দ কচি রবিশস্যের ক্ষেত—আকাশের নির্ম্মেঘ নীলিমায় যখন অদৃশ্য চিলের করুণ ক্রন্দন—আর সুদূর দিগন্তের বন-রেখা যখন নীলাভ বাষ্প-কুহেলিকায় কম্পমান, তখন তরুণীর কণ্ঠস্বর করিতে পারে না এমন অসাধ্য কার্য্য জগতে কয়টা আছে!

অতএব হাঁসের খোঁজেই চলিতে হইল। গৃহস্বামীর আদেশে তাহার পুত্র বিনয়দের ডাকমুন্সীর বাড়ীতে লইয়া চলিল। সে নাকি হিন্দু, বাড়ীতে হাঁস আছে, বিক্রয়ও করিয়া থাকে। সরু আলের পথ বাহিয়া, দুই দিকের কঞ্চির বেড়ার কাঁটা হইতে কাপড় বাঁচাইয়া খানকয়েক বাড়ী ও তিন চারখানা আখের ক্ষেত অতিক্রম করিয়া বিনয়েরা একটি পরিচ্ছন্ন বাড়ীতে আসিয়া থামিল।

উঠানে ছোট একখানি কাঠের টুল পাতিয়া অর্দ্ধনিমীলিত চোখে এক বৃদ্ধ রোদ পোহাইতেছিল। চাষার ছেলেটি

ডাকিল—ডাকমুন্সীজি! বৃদ্ধ না ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল —কোন্ বাড়ী?—করিম সেখের?—চিঠি নাই। চাষার ছেলেটি বুঝাইয়া বলিল চিঠি লইতে সে আসে নাই—এই কয়টি বাবু হাঁস কিনিতে আসিয়াছে—বিক্রয়ের মত আছে কিনা!

বৃদ্ধ এইবার ফিরিয়া বিনয়দের বসিতে বলিল। তাহারা ক্লান্ত হইয়াছিল—ঘরের বারান্দায় খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিল। বিনয় লক্ষ্য করিল—বৃদ্ধের মুখের চর্ম্ম লোল, দুই চক্ষুর নীচে খানিকটা করিয়া ফুলিয়া ওঠাতে চক্ষু দুইটি ছোট দেখায়—শাদা এক খোপা দাড়িও আছে। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা হাঁস চান! রাজহাঁস!

বিনয়—মন্দ কি।

বৃদ্ধ—রাজহাঁস একেবারে সেরা! কিন্তু দাম লাগবে যে।

মহীন্দ্র—দাম লাগবে বই কি!

বৃদ্ধ—কিন্তু হাঁস নিয়ে কি করবেন!

বিনয়—এই ধরুন খাওয়া, বিনয় বৃদ্ধের বয়সটা বিবেচনা করিয়া তাহাকে আপনি বলিয়াই সম্বোধন করিল।

বৃদ্ধ খুসী হইয়া বলিল—আজকালকার ছেলেরা মুরগী খায়।

দীনেশ গম্ভীর ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল—আমরা মুরগী খাই না।

বৃদ্ধের ডাকে আট দশ বছরের একটি রাখাল আসিল এবং প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে ঘরের পিছনের এক ডোবা হইতে একটি বড় রাজহাঁস ধরিয়া আনিল। বৃদ্ধ সেটিকে ভালো ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আড়াই টাকা। দামটা কিঞ্চিৎ বেশি—কিন্তু বেলাও ততোধিক হইয়াছে—এবং সকলের মনে আশা ছিল ফিরিবার পথে আর একবার হয় তো সেই দোদুল্যমান কেশরাজির মালিকের সঙ্গে দেখা হইলে হাঁসটা দেখাইয়া লইবে। দামটা মিটাইয়া দিয়া বিনয় হাঁসটি হাতে করিয়া ফিরিবার জোগাড় করিতেছে—এমন সময়ে কোথা হইতে ঝড়ের মত একটি বালিকা আসিয়া এক ঝাপটায় হাঁসটি কাড়িয়া লইয়া বলিল—বাঃ আমার হাঁস কাউকে দেব না, আমার হীরা, আমার মাণিক! বলিয়া ভীত হাঁসটির পাখায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল। সকলে পুনরায় চমকিয়া দেখিল—সেই দোদুল্যমান কেশরাজির মালিক স্বয়ং। বিনয়ের উত্তর দিবার মত অবস্থা ছিল না। মহীন্দ্র যেন আপন মনেই বলিল—এওতো বেশ মজা। একবার বারণ করে মুরগী খেতে, আবার হাঁস কিনলেও নেয় কেড়ে!

দীনেশ সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিল—তন্বী! বিনয় এ রকম দৃশ্য ইংরাজি ও সংস্কৃত কাব্যে পড়িয়াছে কিন্তু জীবনে যে কখনো দেখিবে—বিশেষতঃ এই নির্জ্জন চরচিলমারীতে, এমন কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

বিনয় দেখিল— পনেরো ষোল বছরের কিশোরীর বুকের আঁচল কোমরে শক্ত করিয়া জড়ানো, তাহাতে সুঠাম দেহখানি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—প্রত্যেক পদক্ষেপে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে দেহের ভঙ্গি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। চোখের দুই পাতায় গোটা দুই করিয়া রেখা—উপরের পাতা দুটি ভারি বলিয়া মনে হয়—কিন্তু চোখের ভিতরে কেমন একটি অত্যন্ত লঘু স্বচ্ছ ভাব। কণ্ঠে গোটা তিনেক রেখা—রংটি ফর্সা নহে—কিন্তু কালো বলিলেও ভুল হয়।

বৃদ্ধ বলিল—দে মা কঙ্কণ, তোর তো আরো আছে।

বালিকা বলিল—বাঃ, এযে আমার হীরা!

যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নাই। মণি, মাণিক, জহর যতই থাক্, হীরা গেলে হীরাই গেল। কন্যা ও পিতার অনেকক্ষণ মান অভিমান চলিল। অবশেষে বৃদ্ধ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িল—তবে থাক, বিক্রি করে কাজ নেই কিন্তু আমিও যে বিনা ওষুধে মরব।

ব্রহ্মাস্ত্রে প্রত্যাশিত ফল ফলিল। বালিকা তাড়াতাড়ি হাঁসটি ছাড়িয়া দিল এবং অত্যন্ত অকুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—ইহাতে এক বোতল 'ডি-গুপ্ত' হইবে কিনা?

বিনয়ের এ রকম ভাবে হাঁসটি লইতে ইচ্ছা করিতেছিল না—অথচ ঔষধের দামটা দেওয়া চাই! বালিকার চোখের পাতা দুইটি ভারি ভারি মনে করিয়া—ভাবিল, জিনিষ না লইয়াই দামটি দেয়—কিন্তু পরক্ষণেই চোখের মধ্যে এমন লঘু ভাব দেখিতে পাইল যাহাতে মনে হইল এমন অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিলেই তীক্ষ্ণ হাসির আঘাতে ভূমিশায়ী হইতে হইবে। অতএব দাম দিতে হইল এবং হাঁস লইতে হইল। বিনয়েরা বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে এমন সময় বৃদ্ধ চাষার

ছেলেটিকে বলিয়া দিল যে তাহাদের পাড়ায় আজ কাহারো চিঠিপত্র নাই।

সেই সরু আল বাহিয়া, ক্ষেত পার হইয়া, বিনয় হাসটি বুকে লইয়া ফিরিয়া চলিল। বেলা তখন দুইটা—পৌষের বাতাস শীতল হইয়া উঠিয়াছে—স্বর্ণাভ রৌদ্র ওপারের উগ্র শুভ্র অট্টালিকাগুলির উপরে কোমলতা সমর্পণ করিয়াছে—ঘাটে তাহাদের ডিঙিখানি নিশ্চল স্থির ভাবে পড়িয়া আছে

২

গ্রাম্য ডাকঘরে ধারে কারবার চলে—কিন্তু তাহারও একটা সম্ভাব্যতার সীমা আছে। যেমন, ভি-পি আসিলে 'দামটা কাল হাট-বেলায় দিয়া যাব' বলিয়া বহু তলব-তাগাদায় বিরক্ত হইয়া দুইমাস পরে পোষ্টমাষ্টারের বাপান্ত করিয়া টাকা দেওয়া কিম্বা বাজার করিতে আসিয়া হঠাৎ একখানা পোষ্ট-কার্ডের আবশ্যক হওয়াতে ধারে লওয়া—এসব প্রায় গ্রামেই চলিয়া থাকে।

কিন্তু পাবনা জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম এসব বিষয়ে সত্যযুগের অবতারণা করিয়াছিল। সেখানকার লোকেরা বহু সুকৃতির ফলে ব্রাহ্ম পোষ্টমাষ্টার রূপে প্রৌঢ় তারণ দাসকে পাইয়াছিল। বাংলাদেশের পল্লীবাসীদের অন্যান্য গুণের অসদ্ভাব থাকিলেও কাহার নিকট হইতে কি পরিমাণ টাকা পাওয়া যাইতে পারে এবং কতদিন পর্য্যন্ত তাহা বিনা সুদে আটকাইয়া রাখা যায়—এই জ্ঞানটি তাহাদের একেবারে কর্ণের অক্ষয়-কবচের মত সহজ বলিলেই চলে।

কিছুদিনের মধ্যেই তারণ দাসের ডাকঘর যুগপৎ বৈঠক-খানা ও মহাজনের গদিতে পরিণত হইল। বাকিতে মণি-অর্ডার করা সুরু হইল—গ্রামের লোকেও বিনা পয়সায় তামাক খাইয়া, বিনা ফিসে গভর্ণমেণ্টের টাকায় দূরস্থ আত্মীয় স্বজনের দেনা শোধ করিতে লাগিল। হাট-বাজারের পয়সার অবান্তর ভাবনাটা আর রহিল না—অবশেষে আসন্নপ্রায় মণি-অর্ডারের সম্ভাবনাপূর্ণ চিঠিখানা বাঁধা রাখিয়া টাকা গ্রহণও চলিতে থাকিল। সে মণি-অর্ডার বলা বাহুল্য প্রায়ই আসিত না—কাজেই হিসাবের সুবিধার জন্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারত-সম্রাটের নামে বিনা সুদের কর্জ্জা-খাতা খুলিতে হইল। গ্রাম্য ডাকঘরে ইন্‌স্পেকসন বড় একটা হয় না। গ্রামের লোককে একেবারে অবিবেচক বলা চলে না—যেদিন ইনস্‌পেক্টার আসিত, তহবিলের ঘাটতি অংশ, তাহারা কোন রকমে জোগাড় করিয়া দিত। হিসাব মিলিলে ইনস্‌পেক্টার চলিয়া গেলে—আবার যেখানকার টাকা সেখানে যাইত। সনাতন পল্লীবাসীরা জানে—ফল পাইতে হইলে বৃক্ষে জল-সেচন করিতে হয়।

কিন্তু একবার সত্য সত্যই গরুর পালে বাঘ পড়িল। ইনস্‌পেক্টার আসিল—টাকা জোগাড় হইল না—বিজ্ঞ পল্লীবাসী দলের দ্বারা পরিত্যক্ত শূন্য ডাকঘরের চারিচালায় একা তারণ দাস দাঁড়াইয়া চালের বাতা গুনিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টার পোষ্টমাষ্টারকে 'সস্‌পেণ্ড' করিয়া চালান দিল। সদরে আসিয়া গ্রামবাসীর তদ্বিরের ফলে তারণ দাসের জেলটা বাঁচিয়া গেল বটে কিন্তু নিঃস্বার্থপর গ্রামবাসীর আশা পূর্ণ হইল না—তারণ দাস আর গোবিন্দপুরের ডাকঘরে ফিরিল না—তাহার চাকুরী গেল।

চাকরি হারাইয়া তারণ দাস নিজের গাঁয়ে আর গেল না, চরচিলমারীতে তাহার কিছু জমি ছিল—সেখানেই আসিয়া বাসা বাঁধিল। সংসারে নিজে আর তার দুই বছরের এক মেয়ে; স্ত্রী ছিল, কন্যার বয়স যখন ছয় মাস—তখন সে গাঁয়ের নায়েব মহাশয়ের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিল—নিজের গাঁয়ে না ফিরিবার সে-ও এক কারণ বটে!

সংসারে খাটুনি কম নাই বলিলেই চলে—যে জমি ছিল তাহাই আধিতে চাষ হইয়া যে ধান ও কলাই পাইত তাহাতেই তারণের সংসার চলিত। কক্ষণ বড় হইয়া শোলার ফুল, টোপর গড়িতে শিখিয়াছিল—তাহার হাতের জিনিষ এত সুন্দর হইত যে রাজসাহী সহরে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় পদ্মার ধারের অনেক গাঁয়ে লোকে বিবাহ-আদিতে আদর করিয়া তাহার জিনিষ কিনিত।

উপর্য্যুপরি দুইটা আঘাতে তারণের মাথায় বিকৃতি ঘটিয়াছিল। সে সারাটা সকাল উঠানে বসিয়া ডাকঘরের কাজের অভিনয় করিত। একটা কাঠের বাক্সে অনেকগুলি ছোট ছোট খোপ তৈয়ারী করিয়া বিভিন্ন গাঁয়ের নাম আঁটিয়া দিয়াছিল। কতকগুলা পুরাতন চিঠি ঠিকানা অনুসারে সেই সব খোপে রাখিত এবং বিকাল বেলা তাহার বাড়ীর আখাল চিঠিগুলি পাড়ার বাড়ী বাড়ী বিলি করিয়া আসিত। এই

মুসলমান চাষী-পল্লীর সরল অধিবাসীরা তাহার এই খেলায় সকৌতুক আনন্দ পাইত। সকলে তরুণ দাসকে ডাকমুন্সী বলিয়া ডাকিত, ক্রমে এমন হইল-গাঁয়ের লোক তাহার আসল নামটি ভুলিয়া গেল। ছেলে মেয়েরা জন্মিয়াই তাহাকে ডাকমুন্সী বলিয়া জানিত। বাদল তাহার বাড়ীর রাখাল—সকাল বেলায় সে ডাকমুন্সীর এক নম্বর পিওন—বিকাল বেলা সে-ই পিওন নম্বর দুই।

নিত্যকার মত সেদিনও ডাকমুন্সী রৌদ্রে পিঠ দিয়া চিঠি সাজাইতেছিল। বারান্দায় মাদুরে বসিয়া কঙ্কণ শোলা ও রাংতা দিয়া বিবাহের টোপর গড়িতেছিল। বাদল একটা কঞ্চি দিয়া গাছ হইতে ফুল পাড়িতেছিল—পাড়ার তিন চারটি ছেলে মেয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সংযত হইয়া তাহাই দেখিতেছিল।

এমন সময়ে হাঁসটি হাতে করিয়া বিনয় আসিয়া সিম-গাছের মাচার নিকটে দাঁড়াইল। আজ উক্ত হাঁসটির সাহায্যে বনভোজন সমাধা হইবার কথা। কিন্তু কাল সারা রাত বিনয়ের ঘুম হয় নাই- ভোর বেলা বন্ধুরা আসিবার আগেই সে হাঁসটি লইয়া রওনা হইয়া পড়িল। আসিবার সময় টেবিলের উপরে একখণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল—

ন খলু ন খলু বাণঃসন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি হংসশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

বিনয় পিছনে দাঁড়াইয়া—কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে দেখিতে লাগিল কঙ্কণ সম্মুখে ঈষৎ ঝুঁকিয়া টোপর গড়িতেছে - পিছন হইতে ডান হাতের কিয়দংশ ও আঙুল-গুলির মৃদু সঞ্চালন দেখা যাইতেছিল। চুল খোঁপা করিয়া জড়ানো—এক খোপা ডান হাত ও পিঠের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িয়া ছিল—সেই চুলের স্নিগ্ধ অন্ধকার আঁচলের স্বচ্ছ অবকাশ দিয়া দক্ষিণ স্তনের পার্শ্বভাগ চোখে পড়িতেছিল। বিনয় বোকার মত কতক্ষণ এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত জানি না—হাঁসটা পরিচিত স্থান অনুভব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পিতা ও কন্যা উভয়েই চমকিয়া চাহিল;—বৃদ্ধ তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি নাম? ঠিকানা কি? কঙ্কণ কাছে আসিতেই হাঁসটা ডানা ঝটপট করিয়া তাহার কোলে ছুটিয়া গিয়া অত্যন্ত ডাকিতে লাগিল।

বিনয় বলিল—হাঁসটা ফিরিয়ে দিতে এলাম। হাঁসটা ফিরিয়া পাইয়া কঙ্কণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কিন্তু দাম ফিরাইয়া দিলে ওষুধ হইবে না ভাবিয়া পরক্ষণেই তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল।

বৃদ্ধ একটু উঠিয়া আসিয়া বলিল—হাঁস খাওয়া তো ভাল—এখন শীতকাল। বিনয়ের কোনো উত্তর মনে আসিল না—হাঁ এবং না-র মাঝামাঝি কোনো একটা শব্দ কেবল মুখ হইতে বাহির হইল।

কঙ্কণ বিনয়কে একখানা মাদুর বিছাইয়া বসিতে বলিয়া হাঁসটিকে খাইতে দিতে গেল। বিনয় বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ একজন শিক্ষিত শ্রোতা পাইয়া তাহার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল। বিনয়ের সেদিকে মোটেই দৃষ্টি ছিল না—সে দেখিতেছিল বাড়িতে তিন খানা ঘর।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পাবনা জেলায় গোবিন্দপুর দেখা আছে কি? প্রকাণ্ড গ্রাম, সোণামুখী নদীর ধারে—

বিনয় দেখিতেছিল, একখানা ঘর শোবার, এক খানা গোয়াল, একখানা পাকঘর।

বৃদ্ধ বলিতেছিল—সেই গ্রামের ডাকঘর—মস্ত টিনের আটচালা। কয়েক বৎসরের মধ্যে কল্পনার বলে খড়ের চার-চালা টিনের আটচালা হইয়াছে—ভবিষ্যতে কে বলিল অট্টালিকায় পরিণত হইবে না!

—শয়ন ও পাকঘরের কাঁচা বারান্দা সুন্দর ভাবে লেপা, লাল মাটির আলপনা দেওয়া। শয়ন ঘরের চালের বাতায় এক রাশ শোলা গোঁজা।

সেই ডাকঘরে দুইটা সিন্দুক, তিনটি আলমারি, চারিজন পিওন।

—দুইটি পরিপুষ্ট গাভী রৌদ্রে দাঁড়াইয়া পরস্পরের পিঠ লেহন করিতেছিল। তাহাদের গা গড়াইয়া যেন তেল চকচক করিতেছে।

ডাক-মাষ্টারের বেতন পঁয়ষট্টি টাকা দশ আনা।

—উঠানের চারিদিকে একসার গাঁদা ফুলের গাছ—বড় বড়, জলন্ত, ফুটিয়া মিষ্ট গন্ধ ছড়াইতেছে—পাচ সাতটা প্রজাপতি উড়িতেছে।

এমন সময় কঙ্কণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তাইতো আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

বিনয় সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে পারে—কিন্তু এসব স্থানে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে বলিল—

—বাঃ, তুমি বেশ টোপর গড়তে পার তো।

—কাল একটা বিয়ে আছে—দু'খানা টোপর গড়ে দিতে হবে।

—আমাকে একটা দাও না।

—আপনার বিয়ে নাকি!

বিনয় অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—দাম দেব।

—দামতো দেবেন! কিন্তু বিনা কাজে টোপর আবার কেনে কে।

—টেবিলের উপর রেখে দেব।

—কঙ্কণ আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। টেবিলের উপর আবার টোপর রাখে কে! বই রাখে, দোয়াত রাখে, কলম রাখে।

এই উচ্ছল হাসি বিনয়ের ভালো লাগিলেও তাহার কান মুখ লাল হইয়া উঠিল।

—আচ্ছা আপনাকে একটা টোপর তৈরি করে দেব।

— দাম নিতে হবে কিন্তু।

—দাম নেবো বইকি। আমরা গরীব মানুষ দাম না নিলে চলবে কি ক'রে?

—কিন্তু কবে পাবো?

—কথা দেব কেমন করে! আমি মরবার আগে নিশ্চয়ই পাবেন। বৃদ্ধ বলিল, তাহলে দামটা ফেরৎ দিতে হয়। বিনয় ব্যস্ত হইয়া বলিল, থাক থাক পরে নেব। সে সিম গাছের মাচার কাছে আসিয়া কঙ্কণকে জিজ্ঞাসা করিল—গোটা কয়েক সিমের ফুল নিতে পারি?

—সিমের ফুল আবার মানুষে নেয়! তার চেয়ে গাঁদা ফুল নিন্ না। দেখুন দেখি কত বড় বড় ফুল—এ আমি নিজে লাগিয়েছি—উঃ কত কষ্ট করেই না জল দিয়েছি।

বিনয়কে বাধ্য হইয়া গাঁদা ফুল লইতে হইল। ফুল লইয়া যখন উভয়ে ঘরের পিছনে সরু পথটার উপরে আসিয়া দাঁড়াইল, কঙ্কণ বলিল—একটু দাঁড়ান। বিনয় দাঁড়াইলে, সে আঁচল হইতে খুলিয়া আড়াই-টা টাকা তাহার হাতে দিল। বিনয় কি একটা আপত্তি করিতে যাইতেছিল—কিন্তু সেই চোখের দিকে চাহিয়া—এবং কিছুক্ষণ আগেকার সেই হাসি মনে করিয়া আপত্তি করিতে সাহস করিল না।

টাকা লইয়া চলিতে চলিতে এতক্ষণ যে সুরের আবেশ তাহার মনে জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল—কোথায় কি যেন একটা কাঁটার মত খচ্ খচ্ বিঁধিতে লাগিল। কিছু দূর আসিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল—কঙ্কণ তখনো সেখানে সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বিনয়কে তাকাইতে দেখিয়াই যেন অপ্রস্তুত ভাবে সরিয়া গেল। এই ঘটনাটি বিনয়ের এত ভাল লাগিল যে এই মাত্র যে-সুরের জাল ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল তাহা আবার দ্বিগুণ জমিয়া উঠিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখে সঙ্গীত ধ্বনিত ও পদক্ষেপে নৃত্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এই মাত্র টাকা ফেরৎ দিবার ঘটনাটি যে তাহাকে এমন কষ্ট দিতেছিল—তাহাই অন্যভাবে মনে উদয় হইতে লাগিল। টাকা ফেরৎ দিবার সময় সে এত কাছে আসিয়াছিল যে তাহার চুলের গন্ধ পর্যন্ত পাইয়াছিল—বোধ হয় উত্তরে বাতাসে এক গোছা চুল তাহার কাঁধেও উড়িয়া স্পর্শ করিয়াছিল। সেই চুলের গন্ধ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই গাঁদা ফুলের গন্ধে মিশ্রিত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত উন্মনা করিয়া তুলিল। নীলাকাশ-ব্যাপী শীতের স্বর্ণাভ রৌদ্রে এই বৃহৎ পৃথিবীকে স্বর্ণশলাকা বেষ্টিত একটি পিঞ্জরের মত মনে হইতে লাগিল। এই বিশাল পিঞ্জরে দুইটি মাত্র পাখী·· ......। (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা

—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালার নাট্যশালার ইতিহাসের এক অবজ্ঞাত অধ্যায়

বাঙ্গালার নাট্যশালার ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে "মৌলিক গবেষণা" করিয়া বিলাতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাধিলাভও সম্ভব হইতেছে। অথচ ইহার ইতিহাসের একটি অধ্যায় আজিও শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত রহিয়াছে। পুরানো কাগজ-পত্র হইতে যাহা বাহির হইতেছে, তাহা পশ্চিমের রঙ্গমঞ্চের অনুকরণের ইতিহাস। ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যিনি বা যাঁহারা এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের উদ্যম ও অনুরাগের প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু ইহার মূলে বাঙ্গালীর নিজস্ব সৃষ্টি কতখানি আছে, ভাবের দিক দিয়া পশ্চিমের অনুকরণ-স্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী আপন আমোদ-প্রমোদের বা লোক-শিক্ষার অন্য কোন্ অধুনা অবজ্ঞাত উৎস হইতে ইহার প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, কোনো উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু তাহার যথাযথ ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিলে আমরা উপকৃত হইব। ইহা সম্ভবপর হইলে আমাদের অতীত জীবনের রুচি ও প্রবৃত্তির একটি ধারা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তাহার বিবর্ত্তনের গতি ও ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আমরা কৃত কর্ম্মের শুভাশুভ চিন্তায় অগ্রসর হইতে পারিব।

আমরা যাত্রার কথা বলিতেছিলাম। আমাদের মনে হয় প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রার সঙ্গে বাঙ্গালার নাট্যশালার একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে। রঙ্গমঞ্চের গঠন-প্রণালী, দৃশ্যাবলী এবং প্রসাধন-পারিপাট্য আমরা পশ্চিম হইতে আমদানী করিয়াছি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এবং মন যদি যাত্রা দেখিয়া অভ্যস্ত না থাকিত, তাহা হইলে ঐ সমস্ত আমাদিগকে কতখানি মুগ্ধ করিতে পারিত অনুমান করা কঠিন নহে। যাত্রার আসরে আমাদিগকে বৃন্দাবন মথুরার দৃশ্যও কেহ দেখাইত না, ঘটনাক্ষেত্রের নামও কেহ বলিয়া দিত না। আমরা পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন এবং আখ্যান-বস্তুর সহিত পূর্ণ পরিচয় নিবন্ধন সে সমস্ত বুঝিয়া লইতাম। তজ্জন্য আমাদিগকে কোন অসুবিধা বা অসোয়াস্তি ভোগ করিতে হইত না। খোলা মাঠে একটা চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া যাত্রার আসর করা হইয়াছে, চারিদিকে লোকারণ্য, মাঝখানে খান কতক তাল বা খেজুর-চাটাই বা—কি বড় জোর কয়েক খান সতরঞ্চ বিছাইয়া অধিকারী মহাশয় যাত্রা গাহিতেছেন। নিজেই দূতী সাজিয়াছেন, কিম্বা দলের কেহ দূতী সাজিয়াছে, তিনি কাঁধের উপর একখানা নামাবলী ফেলিয়া আসরে নামিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন দোহার এবং অভিনেতা, একজোড়া তবলা বাঁয়া, জোড়া কয়েক মন্দিরা, দুই খানা খোল, খান কয়েক সেতার, তানপুরা, বেহালা, হাত ঢোল ইদানীং আসিয়া জুটিয়াছে, সর্ব্বনাশা হারমোনিয়মও খুব বেশী দিনের নহে। ইহাতেই লোক হাসিয়া কাঁদিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত। বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মাঝে মাঝে অধিকারী মহাশয় দুই চারি কথা বলিয়া সমস্ত বিষয়টির সংযোগ-শৃঙ্খল বজায় রাখিতেন। চণ্ডীর গানে, রামায়ণে, ধর্ম্মমঙ্গলে আবার এসব কিছুই থাকিত না। কয়েক জোড়া মন্দিরা হাতে লইয়া কয়েক জন দোহার, আর মাথায় ফেটা-বাঁধা চামর-হাতে নূপুর পায়ে মূল গায়ক, ইহাতেই আসর সরগরম থাকিত। মূল গায়ক কোন একজন দোহারকে অবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে কথোপকথন ছলে গল্পের সূত্র ধরাইয়া দিতেন, বাকীটা সব গানের মধ্য দিয়াই বুঝিয়া লইতে হইত। মনসা-মঙ্গলও পূর্ব্বে এই ধরণেই গাওয়া হইত, ইদানীং এই গানে খোলের ব্যবহার দেখিয়াছি। কীর্ত্তনে খোল করতালই প্রধান অবলম্বন। গানের মাঝে মাঝে মূল গায়কের বক্তৃতার পদ্ধতি কীর্ত্তনেও আছে, ইহাকে 'কথা' বলে। কীর্ত্তনের 'আখর' একটি অপূর্ব্ব জিনিষ, গানের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ইঙ্গিত মানুষকে কত কথাই না জানাইয়া দেয়! আখরের ব্যঞ্জনা কত গভীর, কত দূর-প্রসারী, এবং রহস্যময়,—না শুনিলে ধারণা হয় না। ঝুমুর এবং কবির মধ্যে দুই দলের উক্তি প্রত্যুক্তিতে সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার হইত। যাত্রায় এই সমস্ত উক্তি প্রত্যুক্তি, বিশ্লেষণ

এবং গান প্রভৃতিই অভিনেতাদের মধ্যে মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। থিয়েটারে যে একখানা পট দেখিয়া আমরা হস্তিনা, অযোধ্যা, নদী পর্ব্বত কল্পনা করিয়া আনন্দ পাই, তাহার মূলে নিসর্গপ্রীতি বা কথানুরাগ যাহাই থাকুক, ইহার মধ্যে পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাবও অস্বীকার করিতে পারি না। গিরিশচন্দ্র হইতে অপরেশচন্দ্র পর্য্যন্ত যে কয়জন নাট্যকারের নাটক বঙ্গ-রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হইয়াছে, তাঁহাদের পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা ও প্রচার দেখিয়াও আমাদের যাত্রানুরাগের ধারা অনুমান করা চলে। বহু পূর্ব্ব হইতেই এ দেশের ধর্ম্ম-মূলক উৎসবগুলি যাত্রা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই যাত্রা অর্থাৎ শোভাযাত্রা একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হইবার সময় পথের মাঝে স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া যে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইতেই 'যাত্রা-গান' নাম প্রচলিত হইয়াছে অনুমান করা চলে। আমরা ভালমন্দ বিচার করিতেছি না, অতীতে ফিরিয়া যাইতেও অনুরোধ জানাইতেছি না, মাত্র ইতিহাসের দিক্ হইতে কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রার একটা বিবরণ দিয়া ইহাই নিবেদন করিতেছি যে আমাদের সমাজ, সাহিত্য তথা বঙ্গ রঙ্গালয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কতখানি, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। সম্প্রতি ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাট্যশালার ইতিহাস নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদন করিয়াছেন। পুস্তকখানি তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমী, উদ্যমশীল, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের উপযুক্তই হইয়াছে। আমরা যাত্রার ইতিহাস সংগ্রহ কার্য্যে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বীরভূম জেলায় কেন্দুলী গ্রামে শিশুরাম অধিকারী নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুবিখ্যাত যাত্রাওয়ালা স্বর্গীয় নীলকণ্ঠের নিকট শুনিয়াছি, এই অধিকারী মহাশয়ই কালীয়-দমন যাত্রার প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীদাম এবং সুবল দুই যমজ ভ্রাতা ইঁহারই ছাত্র। পরমানন্দ অধিকারী শ্রীদাম সুবলের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরমানন্দের ছাত্রের নাম গোবিন্দ অধিকারী। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় গোবিন্দের ছাত্র। ইহাই কালীয়দমন যাত্রার গুরুপরম্পরা।

প্রায় দুইশত বৎসর গত হইতে চলিল কীর্ত্তনের স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিলে প্রাচীন ঝুমুর ও কীর্ত্তন মিলিয়া যাত্রার সৃষ্টি হয়। তাহার একটু পূর্ব্বেই দাঁড়া কবির সৃষ্টি হইয়াছিল। দাঁড়া কবি ঝুমুরেরই নূতন সংস্করণ, বোধ হয় উন্নত সংস্করণ। ঝুমুরে যেমন 'আগম' অর্থাৎ ভবানীবিষয় এবং সখী সংবাদ অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা দুইটি ভাগ ছিল, দাঁড়া কবিও প্রধানতঃ সেই দুই ভাগ লইয়াই গড়িয়া উঠে। কালীয়-দমন যাত্রা কিন্তু আগম বর্জ্জিত, কৃষ্ণলীলাই তাহার একমাত্র উপজীব্য। কৃষ্ণলীলারও অপরাপর অংশ বাদ দিয়া মাত্র 'যুগল-মিলন' 'কলঙ্কভঞ্জন', 'মান' এবং 'মাথুর' এই চারিটি পালাই 'কালীয়দমনে' গৃহীত হয়। কালীয়দমনের দেখাদেখি "রামযাত্রা" ও "গৌরাঙ্গ-যাত্রার"ও খুব চলন হইয়াছিল। পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী রামযাত্রা গাহিতেন, লোচন অধিকারী নিমাই-সন্ন্যাস যাত্রায় খুব নাম করিয়াছিলেন। ইনি আবার কালীয়দমনের মাথুর পালার একটা অংশ লইয়া অক্রুর সংবাদ গান করিতেন। গোবিন্দের যাত্রার দলের প্রতিপত্তি দেখিয়া কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী একটা স্বতন্ত্র কালীয়দমন যাত্রার দল করেন। ইহাঁদের জাতিগত উপাধি কি ছিল জানি না। যাত্রার দলের অধিকারী বলিয়া ইহাঁরা 'অধিকারী' উপাধিতেই পরিচিত হইয়াছিলেন। সেকালে কেহ "কালীযাত্রা"র দল করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। কালে রাম-যাত্রা ও নিমাই সন্ন্যাস উঠিয়া গেল। কিন্তু রামায়ণ ও চৈতন্য-মঙ্গল আজো টিকিয়া আছে। পরে "সখের যাত্রার" দল হইয়াছে। তাহার মধ্যে কৃষ্ণকালী, রামচন্দ্র, গৌরাঙ্গদেব প্রভৃতির লীলা এবং আরো কত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক পালা স্থান পাইয়াছে। মতি রায়ের দল সখের যাত্রার দল নামে পরিচিত; কলিকাতায় যেমন পেশাদারী ও সখের যাত্রার অর্থ ভিন্ন প্রকার পশ্চিম বঙ্গে সেরূপ নহে। কালীয়দমন হইতে পার্থক্যরক্ষার জন্যই মতি রায়ের যাত্রার নাম সখের যাত্রা হইয়াছিল।

"যুগলমিলনে" কালীয়দমন দিনে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের সূচনা ও রাধার সূর্য্যপূজার স্থলে মিলন হইলে পালা শেষ হইত। কংসবধ যেমন মাথুর পালারই একটা অংশ, "কৃষ্ণকালী" তেমনি "যুগল মিলন" পালারই একটা অংশ। অনেক সময় "যুগলমিলন" না বলিয়া লোকে গোটা পালাটাকেই "কৃষ্ণকালী" বলিত। এই যুগলমিলন বা কৃষ্ণ-

কালী যাত্রার প্রথম পালা এবং কালীয়দমন দিনের পূর্ব্বরাগে তাহার আরম্ভ বলিয়াই যাত্রার নাম হইয়াছিল 'কালীয়দমন'। কীর্ত্তনের পালা গানেও কালীয়দমন দিনের পূর্ব্বরাগের একটি পালা আছে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ। এই পদে পালা আরম্ভ হয়—কালীয় দমন দিন মাহ॥ কালিন্দী তীর কদম্ব ছাহ। কত শত ব্রজ নব বালা। পেখলুঁ জনু থির বিজুরিকি মালা॥ তঁহি ধনী মণি দুই চারি। তঁহি মনমোহিনী এক নারী॥ সো রহু মঝু মন পৈঠি। মনসিজ ধুমেহুঁ ঘুম নাহি দিঠী"॥ পদটি গোবিন্দদাসের। কেহ কেহ বলেন শিশুরাম অধিকারী যাত্রার কোন নামাকরণ করেন নাই। তাঁহার ছাত্র শ্রীদাম সুবল তাঁহাদের পুষ্করিণীতে বাঁশের বাখারীর প্রকাণ্ড একটা কালীয় সর্প প্রস্তুত করাইয়া সাপের মাথায় একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি বসাইয়া দেন। পুষ্করিণীটি হইল কালিদহ, কৃষ্ণ যেন সেখানে কালীয়কে দমন করিতেছেন। "শ্রীদাম সুবল এই উপাখ্যান লইয়াই সেই পুষ্করিণীর সম্মুখের আসরে প্রথম যাত্রাগানের সূত্রপাত করেন, তাই ইহার নাম হইয়াছে কালীয়দমন যাত্রা।" আমরা এ মত সমর্থন করি না, কারণ শ্রীদাম সুবল যে কালীয়দমনের প্রবর্ত্তক বা সৃষ্টিকর্ত্তা একথার কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে শিশুরাম অধিকারীই যে এ যাত্রার উদ্ভাবয়িতা, যাত্রার দলের অধিকারীপরম্পরাক্রমে তাহার গুরুপ্রণালীর একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই।

শিশুরাম অধিকারীর অথবা শ্রীদাম সুবলের কোন পরিচয় আমরা জানি না। মাত্র এইটুকু জানিতে পারি যে শিশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নিবাস ছিল কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলী। শিশুরামের জাতিগত উপাধিই ছিল অধিকারী। আমাদের মনে হয় এই জন্যই হয় তো যাত্রার দলের মূল গায়কগণ পরবর্ত্তী কালে সকলেই অধিকারী উপাধিতেই চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীদাম সুবলের আবার জাতি বা বাসভূমির পরিচয়ও জানা যায় না। শিশুরাম ও শ্রীদাম সুবলের রচিত কোন পালা বা গান আদিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পরমানন্দ অধিকারীর সঙ্গে শিশুরামের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। আমরা পুরানো কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি পরমানন্দের বাড়ী ছিল "রামটবাটী"। যে কাগজখানিতে আমরা এই গ্রামের নাম পাইয়াছি, তাহার উপরে ১১৭৫ সাল লেখা আছে। লেখা আছে—"শ্রীপরমানন্দ অধিকারীর বাটী রামটবাটী— শ্রীআনন্দচাঁদ গোস্বামী।" মনে হয় আনন্দচাঁদ ইঁহার ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সে সময় পরমানন্দের যাত্রার দলের খুব চল্‌তি ছিল। এই কাগজের সঙ্গে পরমানন্দের দুইখানি তুক গান পাওয়া গিয়াছে। আমরা কাগজখানি স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। "রামটবাটী" পাঠ তিনিও সমর্থন করিয়াছিলেন। অনেকের মতে পরমানন্দ অধিকারী বীরভূম জেলার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু বীরভূম জেলায় এখন রামটবাটী নামে কোন গ্রাম খুঁজিয়া পাইতেছি না। বীরভূমে কোথায় পরমানন্দের নিবাস ছিল কেহ বলিতে পারেন না। অন্য কোন জেলায় রামটবাটী নামে গ্রাম আছে কিনা কেহ জানাইলে বাধিত হইব। পরমানন্দ কালীয়দমন যাত্রার কাঠামো গড়িয়া তাহার একটা সুস্পষ্ট রূপ দান করেন। ঝুমুরের সঙ্গে কীর্ত্তন মিশাইয়া যাত্রার গড়নের কথা বলিয়াছি, কিন্তু বলিতে ভুলিয়াছি ইহার সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের ঢঙ্গেরও খানিকটা যোগ ছিল। নাটকের "নান্দ্যন্তে সূত্রধারের" মত পরমানন্দ যাত্রার দলে "বাসদেবে"র প্রবর্ত্তন করেন। তিনি কীর্ত্তনের মত যাত্রার পূর্ব্বে একটু গৌরচন্দ্রিকাও রাখিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্রিকায় কীর্ত্তনের মত কি পালা গান হইবে তাহার পূর্ব্বাভাস জানানো হইত না। মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বন্দনাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। মোটামুটি ইহাই ছিল যাত্রার দলের নান্দী বা মঙ্গলাচরণ। তাহার পর বাসদেব আসিয়া সেকেলে রসিকতায় একটু রং ঢঙ্গের চেষ্টা পাইত। অনেক সময় একটি বালক কৃষ্ণ সাজিয়া বাসদেবের সঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর করিত। তারপর আসিত ঝুমুরের দল। কতকগুলি বালক বালিকার পোষাকে আসরে আসিয়া এক সঙ্গে একটি গান গাহিত ও নাচিত। এই ঝুমুরই ছিল কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা। অর্থাৎ ঝুমুর হইতেই বুঝা যাইত আজ যাত্রায় কোন্ পালা গাওয়া হইবে। ঝুমুরের পর দোহারেরা কিছুক্ষণ গানের কসরত দেখাইতেন। তাহার পর বৃন্দা দূতী আসিতেন এবং কৃষ্ণ রাধা কিম্বা অপরাপর অভিনেতাগণ আসিতেন। ইঁহারা

জটীলা, কুটীলা, কংস, অক্রুর, নারদ, নন্দ, যশোদা ইত্যাদি সাজিয়া অভিনয় করিতেন।

পরমানন্দের হাতেই এই বিষয়গুলি বেশ সুসম্বদ্ধ হয়। পরমানন্দের পিতা মাতার নাম জানা যায় না। আজ পর্য্যন্ত পরমানন্দ রচিত কোন গান কোথায়ও ছাপা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা পরমানন্দের চারিটি গান পাইয়াছি। একটি ঝুমুর, ইহা মান গানের পূর্ব্বে গাওয়া হইত। একটি মাথুরের গান, ও দুইটি তুক বা তুক্ক। পরমানন্দের তুক্ক সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল। পরমানন্দ বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন, তিনি নিজে দূতী সাজিয়া আসরে নামিতেন। নিম্নে পরমানন্দের দুইটি গান (ঝুমুর ও মাথুরের গান) এবং একটি তুক্ক তুলিয়া দিলাম।

ঝুমুর ॥ যার অঙ্গ বাঁকা বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় নিদয় পাষাণময় যার শোন গো বিধুমুখী ॥
যে মন চুরী করে বাঁশীর স্বরে জানে জগত জনে।
তার সঙ্গে প্রেমপ্রসঙ্গ সে-কি প্রেমের মর্ম্ম জানে ॥
সদা চরায় গো-পাল গোঙার গোপাল ফেরে বনের মাঝ।
তারই জন্যে ও রাজকন্যে কেনে লোক সমাজে লাজ ॥
আজ দেবো সাজা দেখবো মজা ঘুচাবো বাড়াবাড়ি।
পথ চেয়ে তার আকুল হ'য়ে পরনা আছে পড়ি ॥
(৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত)

মাথুরের গানটি যাত্রাওয়ালা শ্রীরামের ভ্রাতা কাঙ্গাল দাস দিয়াছিলেন। ইনি বোধ হয় বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন, জাতিতে বৈরাগী। পরমানন্দের পর গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার অনেক উন্নতি করেন। নীলকণ্ঠের হাতে তাহা আরো উন্নত হয়, নীলকণ্ঠের কালীয়দমন যাত্রা যেন নূতন আকার লাভ করিয়াছিল। শ্রীরাম কিন্তু পুরানো ঢঙ্গের গায়ক ছিলেন। তিনিও গোবিন্দ অধিকারীর ছাত্র। গোবিন্দ পরমানন্দের নিকট হইতে যে পালাগুলি যে আকারে লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীরাম গুরুর নিকট হইতে সেই সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক অনেকটা অবিকল তাহাই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি গোবিন্দ অধিকারীর পদ গাহিতেন বটে, তবে কীর্ত্তনের পদই বেশী পছন্দ করিতেন। সেই জন্য নীলকণ্ঠের পাশে শ্রীবাসের যাত্রা আমাদের নিকট বেশ একটু নূতন মনে হইত। শ্রীবাসের যাত্রারও এক সময় খুব নাম ছিল। শ্রীবাসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কাঙ্গাল দাস কিছু দিন দল চালাইয়াছিলেন। দুই ভাই-ই খুব সজ্জন এবং অমায়িক লোক ছিলেন। আমরা জীবনে বহুবার শ্রীবাস ও কাঙ্গাল দাসের গান শুনিয়াছি। নীলকণ্ঠের গানে আমরা যেরূপ মাতিয়া উঠিতাম শ্রীবাসের গানও আমাদিগকে প্রায় তেমনই মাতাইয়া তুলিত। শ্রীবাস এবং কাঙ্গাল দাস নিজেরাও গান রচনা করিতে পারিতেন।

মাথুর ॥ ব্রজের হরি ব্রজে চল দিনেক দু'য়ের মত।
মন মানেত থাকবে না হয় হবে প্রত্যাগত ॥
যদি বল চল্‌তে চরণ ধূলায় ধূসর হবে।
ব্রজগোপীর নয়ন জলে চরণ পাখালিবে ॥
যখন এসেছিলে তখন হাঁটু খানেক জল।
এখন পশু পাখী তরুলতা কাঁদছে অবিরল ॥
ও তাই যমুনা অতল বল কেমনে পার হবে।
না হয় শ্রীযমুনার কূলে থেকে ব্রজ নিরখিবে ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম কাঁদছে অবিরত।
কানাই ভাই কি আসবে নারে এ জনমের মত ॥
তোমার প্রাণেশ্বরী বলে আসবে হরি কবে।
ক'দিন রবে এছার পরাণ কালায় কে আনিবে ॥
বাঁচে কি না বাঁচে প্যারী কখন হয় বা গত।
তাই এলো পরমানন্দ সখীর অনুগত ॥

শ্রীরামের মুখে এই গান শুনিয়া আবালবৃদ্ধ নরনারী কাঁদিয়া আকুল হইত। গানটির বিষয়-বস্তু চিরপরিচিত, এবং ইহার ভাবে ভাষার ছন্দে কেমন যেন একটু মাধুর্য্য আছে। এই বিখ্যাত গানটী আমরা কতদিন কত ভাবে কত গায়কের মুখে শুনিয়াছি, শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এখন নাকি গ্রামোফোন রেকর্ডেও এ গান স্থান পাইয়াছে। অথচ আমরা জানিতাম না এ গানের রচয়িতা কে। এ গান বাঙ্গলার পদাবলীর সাহিত্যের অনুপযুক্ত নহে। পদাবলী-রচয়িতাগণের মধ্যে পরমানন্দের নামও সমাদরে উল্লিখিত হইতে পারে। অনেকে গানটির প্রথম কয়েকটি ছত্র মাত্রই জানেন, সম্পূর্ণ পদ প্রায়ই লোকে জানেন না। "সখীর অনুগত" কথাটির দুই রকম মানে হয়। এক "শ্রীমতী রাধিকার অনুগত সখী", আর "সখীর অনুগত ভজননিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রজের রাগানুগা মার্গে ভজনাকারী।"

পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে পরমানন্দের তুক্ক পাওয়া গিয়াছে। একটি তুক্ক এইরূপ—

তুক॥ সই করি শ্যাম আনিলো।
শশি অস্তাচলে গেলো নিশি পোহাইলো॥
কে বাদী হ'লো সাধে॰বাদ সাধিলো।
আমার শ্যাম গুণধামকে ভাঙ্গাইলো॥
আমি মরি শ্যাম বিহনে গহন বনে।
শ্যাম রইলো কার কুঞ্জে সুখ শয়নে॥
কি আশে প্রাণ রাখবো বলো।
এ ছারো প্রাণ গেলেই ভালো॥
পরমানন্দের গেলো কুল শীলো।
শেষে সকলি বিফল হ'লো॥

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিতেন সন ১১৪০ সালে পরমানন্দের জন্ম হয়। ১২৩০ সালে তাঁহার পরলোক ঘটে। পূর্ব্বে বলিয়াছি পুরানো কাগজপত্র হইতে জানা যায় ১১৭৫ সালে পরমানন্দের যাত্রার বেশ চল্‌তি ছিল।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী জাঙ্গীপাড়া (হুগলী জেলায়) গ্রামে গোবিন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভাল কীর্ত্তনগায়ক ছিলেন। বাল্যে পিতৃহীন হইয়া গোবিন্দ পরমানন্দের দলে ভর্ত্তি হন এবং অল্প দিনের মধ্যেই অধিকারীর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। পরমানন্দের পরলোকের পূর্ব্বেই ইনি স্বাধীন ভাবে যাত্রার দল করিয়াছিলেন। গোবিন্দ জাতিতে বৈরাগী ছিলেন, লোকে বলিত গোবিন্দ অধিকারী। কণ্ঠ মহাশয় বলিতেন ১২০১ সালে গোবিন্দের জন্ম হয় এবং ১২৭৭ সালে তিনি লোকান্তরিত হন। পরমানন্দের মত গোবিন্দও নিজে দূতী সাজিয়া আসরে গান করিতেন। কিন্তু যাত্রাগানে গোবিন্দ পরমানন্দের অপেক্ষাও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গোবিন্দের যাত্রার কথা প্রাচীনগণ প্রবাদের মত গল্প করিতেন। গোবিন্দ দল লইয়া অনেক সময় হাবড়া শালিখায় থাকিতেন। গোবিন্দের কবিত্বশক্তি ছিল। পরমানন্দের তুকের ধরণে গোবিন্দের গানে অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। গোবিন্দের শুকসারীর দ্বন্দ্ব আজিও পুরাতন হয় নাই। এখনও যাত্রার শেষে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের পর প্রত্যেক কালীয়দমন যাত্রার দলেই শুকসারীর দ্বন্দ্ব গাওয়া হয়। গোবিন্দের একটি গান—

যার বরণ কাল স্বভাব কাল অন্তর কি ভাল তার।
কাল ভাল বেসে ভাল কোন্ কালে হয়েছে কার॥

না বুঝিয়ে ভজে কাল	দুঃখে মজে গেল কাল
কাল ভাল বেসে হ'ল	আসন্নকাল গোপিকার॥
এক কালর কথা বলি	ছিল বামন মহাছলী
তারে ভাল বেসে বলি	উপকারে অপকার॥
ভুঞ্জিয়া বলির বলি	ত্রিপাদ ভূমি ছলে ছলি
বলিরে লইয়া বলী	পাতালে দিল আগার॥
রামচন্দ্র ছিল কাল	শূর্পনখা বেসে ভাল
সঙ্গ আশে পাশে গেল	তারে কল্লে কদাকার
ছিল সীতা মহাসতী	নির্দ্দোষে ব'লে অসতী
পঞ্চ মাসের গর্ভবতী	কল্লে বনে পরিহার॥

গোবিন্দের বিখ্যাত শুকশারীর দ্বন্দ্বও নীচে তুলিয়া দিলাম।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের রাই আমাদের আমরা রাইএর রাই আমাদের॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ। নইলে শুধুই মদন॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল। নৈলে পারবে কেন॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
শারী বলে আমার রাধার নামটী তাতে লেখা। ঐ যে যায় গো দেখা॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে। চূড়া তাইত হেলে॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদাজীবন।
শারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন। নৈলে শূন্য জীবন॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতচিন্তামণি।
শারী বলে আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী। তোমার কৃষ্ণ জানে॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে সত্য বটে রটে রাধার নাম। নৈলে মিছে সে গান॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু। নৈলে কে কার গুরু॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে আমার রাধা প্রেমের লহরী। প্রেমের ঢেউ কিশোরী॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগোনা। নৈলে যেত জানা॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ রূপে চিকণ কালো।
শারী বলে আমার রাধা জগত করে আলো। নৈলে আঁধার কালো॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী। হত কাশীবাসী॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ।
শারী বলে আমার রাধা স্থগিত পবন। মেঘে স্থির যে রাখে॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে আমার রাধা প্রাণ করে দান। নৈলে কোথায় পে'ত।
শুক শারী দুজনারই দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধাকৃষ্ণের প্রীতে একবার হরিহরি বল।
ব'লে বৃন্দাবনে চল॥

স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোবিন্দের ছাত্র। নীলকণ্ঠের সময় কালীয়দমন যাত্রা উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল। কবিত্বে, লোকরঞ্জনে, প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারীগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তথাপি প্রতি যাত্রার আসরে গোবিন্দকে প্রণাম না করিয়া তিনি যাত্রা আরম্ভ করিতেন না। তুলনা করা উচিত হইবে না, কিন্তু যদি একথা বলা যায়, বঙ্গের প্রাচীন সঙ্গীতের ধারায় রামপ্রসাদ, দাশু রায় এবং নীলকণ্ঠের কবিত্ব-মাধুরী প্রায় পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান সহরে এবং পল্লীতে, বাঙ্গালার বাহিরে কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নীলকণ্ঠ যে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন তাহা যে কোন দেশের যে কোন কবির কাম্য বস্তু। কি ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়, কি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, কি অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত আপামর জনসাধারণ সকলেই নীলকণ্ঠের সমান অনুরাগী ছিলেন। কণ্ঠের কণ্ঠ ছিল যেমন সুমধুর, কি কীর্ত্তন গানে, কি ধ্রুপদ খেয়াল আদি বৈঠকী সঙ্গীতে, আর কি বাউলের গান আদি লোক-গীতে তেমনি তাঁহার পারদর্শিতাও ছিল প্রচুর। শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের সহিত তাঁহার সদালাপের ক্ষমতা, তাঁহার বিনয়-মধুর ব্যবহার, তাঁহার সৌজন্য, তাঁহার দেশ-প্রীতি ও গার্হস্থ্য জীবন মনে রাখিবার মত।

সন ১২৪৮ সালের ৬ই মাঘ তারিখে নীলকণ্ঠ ধবনি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধবনি নীলকণ্ঠের জন্মসময়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। প্রায় পঞ্চাশ ষাট বৎসর গত হইল বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের পিতার নাম বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম সরস্বতী দেবী। বামাচরণের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ, মধ্যম সিতিকণ্ঠ, কনিষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ। তিন ভাইয়েরই নামের শেষে কণ্ঠ ছিল, কিন্তু একা নীলকণ্ঠই 'কণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ দরিদ্রের সন্তান। বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায়ও লেখা-পড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। পিতার নিকট যৎসামান্য যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে পারিতেন। নীলকণ্ঠ বাল্য হইতেই সঙ্গীতানুরাগী, কণ্ঠও তাঁহার খুবই সুমিষ্ট ছিল। তিনি বাল্যেই কিছু কিছু পল্লীপ্রচলিত গান গাহিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ধবনি গ্রামের জমিদার ব্রজনাথ রায় বালক নীলকণ্ঠের নিকট রামায়ণ শুনিতেন এবং আদর করিয়া নিজ বাড়ীতে খাওয়াইতেন।

কণ্ঠের বয়স যখন তের বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতা পাগল হইয়া যান। অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়িয়া নীলকণ্ঠ তাঁহার খুড়ার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন এবং রামমোহন পাঁড়ের দোকানে খাতা লেখার কাজে নিযুক্ত হন। সেখানে রাম-মোহনের অনুগৃহীতা কোন স্ত্রীলোকের যত্নে তিনি কিছুদিন গান শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরে কণ্ঠ ধবনির নিকটস্থ জামবন গ্রামের গোপাল রায়ের যাত্রার দলে ভর্ত্তি হন এবং কিছুদিন শিক্ষানবিসীর পর তাঁহার মাহিনা হয় মাসে ছয় টাকা। মাহিনা ঠিক হওয়ার পূর্ব্বে আট দিন গান করিয়া তিনি চারি আনা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ গোপাল রায়ের দলে দুই বৎসর ছিলেন। সকলে নীলকণ্ঠের গান শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া, গোপাল রায় নিজের প্রতিপত্তিহানির ভয়ে কণ্ঠকে তাড়াইয়া দেন। গোপালের খুড়া গঙ্গানারায়ণও ঐ দলে গান করিতেন। তিনি নীলকণ্ঠকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র যাত্রার দল করেন। গঙ্গানারায়ণ নীলকণ্ঠকে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা মাত্র বেতন দিতেন। আর নীলকণ্ঠ গান করিয়া টাকাকড়ি, শাল দোশালা বাসনকোসন যে সব পেলা পাইতেন সে গুলি তাহাকে না দিয়া নিজে আত্মসাৎ করিতেন বলিয়া অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিতেন। একবার মানভূম পঞ্চকোটে বৈদ্য বংশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে গান করিয়া কণ্ঠ একটি ঘোড়া পেলা পাইয়াছিলেন। কণ্ঠ খঞ্জ ছিলেন বলিয়া ভদ্রলোক তাঁহাকে যাতায়াতের জন্যই ঘোড়াটি দিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া গঙ্গানারায়ণ সেটি কাড়িয়া লন এবং আগাম কিছু দেওয়া ছিল বলিয়া নীলকণ্ঠকে বসাইয়া রাখেন। গঙ্গানারায়ণ জামবনের অধিবাসী ছিলেন। জামবনের নিকট কাঁটাবেড়ে গ্রাম। ঐ গ্রামে নীলকণ্ঠের খুড়া যাদবেন্দুর শ্বশুর বাড়ী। যাদবেন্দুর শ্যালকের নামও গোপাল রায়, তিনি আসিয়া গঙ্গানারায়ণের প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিয়া নীলকণ্ঠকে

লইয়া যান। অতঃপর এই গোপাল রায়ের পরামর্শ মত কণ্ঠ গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে বর্দ্ধমানে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। কণ্ঠের গান শুনিয়া গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাকে দলে লইয়া মাসিক ষোল টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। বিশুদ্ধ তানলয়যোগে গান গাহিবার পদ্ধতি তিনি এখানেই সম্পূর্ণ-রূপে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। গানরচনার দীক্ষাও তাঁহাকে গোবিন্দই দিয়াছিলেন। গোবিন্দ স্বীয় গুরু পরমানন্দের কথা এবং নিজের শিক্ষা-জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কথা কণ্ঠের নিকট গল্প করিতেন, কণ্ঠও আগ্রহপূর্ব্বক শুনিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে কণ্ঠ এই সমস্ত কথা গল্প করিতে খুব ভাল বাসিতেন, গোবিন্দের কথা বলিতে গিয়া তিনি চোখের জল রোধ করিতে পারিতেন না। কণ্ঠের বয়স যখন উনিশ বৎসর তখন তিনি নিজে স্বাধীন ভাবে যাত্রার দল করেন। কণ্ঠ দল গড়িবার জন্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত লাউদহ গ্রাম নিবাসী রামেশ্বর ঘটকের নিকট ১০০৲ টাকা কর্জ্জ লইলেন, জামগড়া নিবাসী কণ্ঠের পুরোহিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ঐ টাকার জামিন রহিলেন। দশ টাকার কাপড়েই দলের পোষাক তৈরী হইল, বাকী টাকা আগাম দাদন দিয়া জন একুশ লোককে দলে পাওয়া গেল। নীলকণ্ঠ কখনো বা নিজ বাড়ীতে আনাইয়া কখনো বা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দল প্রস্তুত হইলে তিনি ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নে অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে গোঁসাইগ্রামে অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে প্রথম গান করেন। ঐ সালের শ্রীপঞ্চমীতে বীরভূম সুপুর গ্রামের রায়দের বাড়ীতে গানেও তিনি বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিলেন। তখন কণ্ঠের দলের দৈনিক দক্ষিণা ছিল দশ টাকা। পরে দক্ষিণা দৈনিক একশত টাকা উঠিয়াছিল। তিনি বৰ্দ্ধমান এবং হেতমপুর রাজবাটী হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ যাত্রার প্রত্যেকটী পুরাতন পালা নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। নিজে কয়েকটী নূতন পালাও রচনা করিয়াছিলেন। আসরে বেশীর ভাগ তিনি নিজের রচিত গানই গাহিতেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত আসরে দাঁড়াইয়াই গান রচনা করিতেন। সখের যাত্রাওয়ালা মতি-রায়ের সঙ্গে কণ্ঠের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। নবদ্বীপ হইতে কণ্ঠ 'গীতরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় কণ্ঠের যাত্রার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল মহারাজা স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কণ্ঠের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণ-পদক দানে পুরস্কৃত করেন। পদকে লিখিত আছে—

"প্রাচীনো রীতিসম্পন্নঃ কৃষ্ণযাত্রাধিকারিণঃ।
মুখঃ শ্রীনীলকণ্ঠায় প্রবীণায় লয়েশ্বরে॥"

জাষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে গান করিয়াও তিনি একটি স্বর্ণ-পদক পান। এইরূপ স্বর্ণ-পদকের সংখ্যা তাঁহার নিতান্ত কম ছিল না। নীলকণ্ঠ রামপ্রসাদ এবং দাশু রায়ের বাসগ্রামে গিয়া রামপ্রসাদের সিদ্ধাসনের সম্মুখে এবং রায়-পল্লীর নিকট যাত্রা গান শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। উভয় স্থানেই কোন বাবদে এক কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই। আজকাল আমরা সম্মেলন করি, সংঘ সংসদ চক্র গড়ি; কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের উপর আমাদের শ্রদ্ধা কতখানি তাহা দূরবীক্ষণ কষিয়া দেখিতে হয়। প্রাচীন সাহিত্যিকগণকে কত সম্মান করি, কি ভাবে সম্মান দেখাই তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। সমসাময়িক সাহিত্যিক বন্ধুর মধ্যে সম্প্রীতিও পাঁচজনকে দেখাইবার মত। তাহার পাশে প্রাচীন সমধর্ম্মার প্রতি কণ্ঠের এই শ্রদ্ধা-নিবেদনের ভঙ্গী ও মতি রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের কাহিনী স্মরণ করিতেও আনন্দ হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কণ্ঠের গান শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কণ্ঠ কয়েকবার বিনা দক্ষিণায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পরমহংসদেবকে গান শুনাইয়া গিয়াছিলেন। কয়েকবার রাণী রাসমণিও তাঁহার জামাতা দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

সন ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গান করিতে গিয়া কনিষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ পরলোকগত হইলে কণ্ঠ ভ্রাতৃ-শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। সেই যে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে, আর তিনি সাম্লাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সন ১৩১৮ সালের ২০এ শ্রাবণ বাঙ্গালার মুক্তবেণীর পুণ্য-ক্ষেত্রে সজ্ঞানে তাঁহার গঙ্গালাভ ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৯এ ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়া তিনি নীচের লিখিত গানটি রচনা করিয়া-ছিলেন। পুত্র কমলের মুখে স্বরচিত এই গান শুনিতে শুনিতে পশ্চিম বঙ্গের গৌরব নীলকণ্ঠ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন।

গানটি এই—

আজি যখন আমি নই মন আর মরণে ভয় কি আছে।
যাঁরই জীবন তাঁরই মরণ তাঁর ভাবনা তাঁরই কাছে॥
বারম্বার আমি সাজে ভুগলাম ভাল ভবের মাঝে
আর ভেবনা মিছে কাজে তোমার আসা যাওয়া ঘুচিয়াছে॥
কি সুকর্ম্ম কি কুকর্ম্ম কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম
তিনি ভিন্ন সকল কর্ম্মের কর্ম্মকর্ত্তা আর কে আছে॥
পাপ পুণ্য করে গণ্য ভাবিয়ে হয়োনা জীর্ণ
হয়ে যাওরে উভয় শূন্য তবে ধন্য হবে পাছে।
ছায়ার বাজি মায়ার বাঁধন একবারেতে খুলে দে মন
তবেরে দুরন্ত শমন আর আসবে না তোমার কাছে।
কণ্ঠ কহে হাসি হাসি পরম ভাবেতে ভাসি
শ্যামা মা আমার যে মুক্তকেশী আমি মুক্তি পাব তাঁরই কাছে॥

নীলকণ্ঠের প্রথম বিবাহ হয় বীরভূম ভবানীপুরে। প্রথমা পত্নী পরলোকগতা হইলে তিনি ভবানীপুরেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পত্নীর কোন সন্তান-আদি না হইলে ইহাঁরই অনুরোধে বীরভূম রাজহাটে কণ্ঠ তৃতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে নীলকণ্ঠের তিনকন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠপুত্র রামকমল পিতৃ-পরিচালিত দল বজায় রাখিয়াছেন। কালীয়দমন যাত্রায় রাম-কমলও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। লোকে রামকমলকে কমলাকান্ত বলে।

নীলকণ্ঠের ছাত্রগণের মধ্যে গদাধর দাস, হিতলাল গোস্বামী, পঞ্চানন ভট্ট প্রভৃতি দেশব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গদাধর দাস, যোগীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ বাগ প্রভৃতি ছাত্রগণ নিজেরা স্বাধীন ভাবে যাত্রার দল পরিচালনা করিতেন।

রামপ্রসাদ দাশুরায়ের মত কণ্ঠের গানও বাঙ্গালার সম্পদ। আজিও পশ্চিম বঙ্গে প্রতি প্রভাতে পল্লীবৃদ্ধের মুখে প্রথম ভাষা দেয় এই গান। জননী তাহার শিশুর দেয়ালার তালে তালে আবৃত্তি করেন এই গান। এই গানে পল্লীর যুবক হৃদয়ের চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, যুবতীরা প্রিয় সখীর কানে মনের গোপন কথার আভাষ জানায়। এ গান নিরালা পথের পথিকের সঙ্গী, ভিখারীর জীবিকার অবলম্বন, দুঃখীর সান্ত্বনা, পল্লী-বৈঠকের অনাবিল আমোদের উৎস। কণ্ঠের প্রথম গান—"শ্যাম আমারে করলে পাগলিনী"। কণ্ঠ যখন গাহিতেন "মুনি গো সুখ চেয়ে দুখ বড় ভাল" "কারে সুখে রেখেছ হে সুখময়", পল্লীর দুঃখদিগ্ধ প্রাণ যেন সে গানে একটা আশ্বাসের অবলম্বন লাভ করিত। তিনি গাহিতেন—"হরি দুখ দাও যে জনারে। তার কেউ দেখে না মুখ ব্রহ্মাণ্ডবিমুখ দুখের উপর দুখ সুখ নাই সংসারে"॥ আপনার জীবনব্যাপী দুঃখের সঙ্গে মিলাইয়া চিরদুঃখী সে গানে সকল দুঃখের রহস্য উপলব্ধি করিত। নিরুপায় জীবনে ভগবন্নির্ভরতার শান্তি খুঁজিয়া পাইত। কণ্ঠের "সব রূপে রূপ মিশাইয়া আপনি নিরাকার", "সংসারে পরমারাধ্য যেই সে একজনা", "শ্যামা মা আমার মাতা কি পিতা" প্রভৃতি গান তত্ত্বান্বেষীর

তাঁহার "কেমন ক'রে এমন ঘরে করি বাস", "আমি বলা সাজে না নরে", "কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার", "আমি শ্যামকে চাই না শ্যামের চরণ চাইগো" প্রভৃতি গানে সংসারবিরাগীর মনে অপার আনন্দের উদয় হইত। "আমায় লিখিতে শিখিতে দিলে কই", প্রভৃতি গানে ভগবানের ভক্তের কাছে ধরা দেওয়ার যে নিবিড় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'শুধাতে এসেছি নিতে আসি নাই' প্রভৃতি গানে রাধা সহচরীর অন্তরঙ্গতার অভিমানভরা যে দাবী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মহাজন পদাবলীর অনুসরণ হইলেও কবিত্ব বর্জ্জিত নহে। কণ্ঠের "শারদ চাঁদ ফাঁদবদন", "কলিত কলধৌত রুচি শচীতনয় তনুকর", "সজল জলদাঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে" প্রভৃতি গান পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার উদাহরণ। দুঃখ হয় বাঙ্গালার সাহিত্যিক মণ্ডলী বৎসরে অন্ততঃ একটা দিনের জন্যও রাম-প্রসাদ, দাশু রায়, নীলকণ্ঠের স্মৃতি-তর্পণের কোন ব্যবস্থা করেন না। দুঃখ হয় রামপ্রসাদ, দাশুরায়, নীলকণ্ঠের গানের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ নাই। দুঃখ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে ইহাঁদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। দেশের সাহিত্য পরিষদ, দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপরাপর সঙ্ঘ-সংসদ আদি এবিষয়ে সমান উদাসীন।

কণ্ঠের একটি গান উদ্ধৃত হইল।

শ্যামের বাঁশী আমি যদি পেতাম।
মোহন মুরলীর স্বরে সবার মন হ'রে
মনোহরের মন ভুলাইতাম।
উচ্চ বেণী বেঁধে দিতিস্ শিখিপাখা
বামে হেলাইয়ে ক'রে দিতিস্ বাঁকা
পীতাম্বর দিয়ে সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা
বাঁকা হ'য়ে না হয় দাঁড়াইতাম।

শ্যামের সাধা বাঁশী বাজে রাধা ব'লে
আমার করে বাঁশী বাজত কৃষ্ণ ব'লে,
বাঁশী বাজায়ে গোকুলে কালিন্দীর কূলে
কালাচাঁদের কুলে কালি দিতাম।

বনফুলের মালা গেঁথে দিতিস্ বনে,
বনমালী হ'য়ে থাকতাম নিধুবনে,
কণ্ঠ কহে রাই চিন্তা কর কেনে
আমি ঐ চরণে নূপুর হ'তাম॥

মধুসূদন কান্, গোপাল উড়ে প্রভৃতির কথা আমাদের আলোচ্য নহে। কণ্ঠের প্রায় সমসাময়িক ভরত, মধু দাস, বদন প্রভৃতিও পশ্চিম বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভরতের নাচের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। মাথায় কলসীর উপর কলসী বসাইয়া, কিম্বা পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া ভরত যখন (দূতী সাজিয়া) আসরে নাচিতেন, নরনারী উল্লাসে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিত। ভরত চানকের অধিবাসী ছিলেন।

যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, পাঁচালী পল্লীর লোক-শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান সহায় ছিল। ইহার সব কয়টিই লুপ্ত প্রায়। পুনঃ প্রচলনের চেষ্টার কথা বলিতেছি না, অন্ততঃ এগুলির ইতিহাসটুকুও তো জানা দরকার। কালীয়দমন যাত্রা বাঙ্গালার থিয়েটারের গড়নের কাজে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে, তাহার আলোচনা দরকার। যাত্রার ইতিহাস এবং তাহার ক্রমবিকাশের কথা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নাট্যশালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধও নিতান্ত অল্প নহে।

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

শাস্ত্রে নারীদের সংঘপ্রবেশের বৃত্তান্ত এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে একবার বুদ্ধ যখন বৈশালীতে মহাবনের কূঠাগার শালায় বাস করিতেছিলেন তখন চীবর-পরিহিতা ছিন্নকেশা মহাপ্রজাবতী একদিন অনেক শাক্য নারীদের সঙ্গে লইয়া হাঁটিয়া কপিলবাস্তু হইতে বৈশালীতে আসিয়া কূঠাগারশালার দ্বারকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া গৌতমী অশ্রুপূর্ণ নয়নে দুঃখিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধের পরম ভক্ত শিষ্য আনন্দ তাঁহাদের সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রজাবতী বলিলেন, তাঁহারা সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অনুমতির জন্য এত পথশ্রম স্বীকার করিয়া কপিলবাস্তু হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিকই তাঁহাদের পথশ্রমে বড় কষ্ট হইয়াছিল। মহাপ্রজাবতীর পা ফুলিয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত হইয়াছিল। অভিজাত-বংশীয় শাক্য নারীরা এই শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন না। আনন্দ এই সব দেখিয়া ও মহাপ্রজাবতীর কথা শুনিয়া দৌড়িয়া ভিতরে গিয়া বুদ্ধকে সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে মহাপ্রজাবতীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধ আনন্দকে এ কথা ছাড়িতে বলিলেন। তখন আনন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, সংসার ত্যাগ করিয়া তথাগতের ধর্ম্ম ও নিয়ম পালন করিলে স্ত্রীলোকেরা কি ধর্ম্মপালনের সমুদায় ফলভোগের, এমন কি অর্হত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিবার যোগ্য হয় না?"

সংঘে নারীর প্রবেশ

"হাঁ আনন্দ, হয়।"

"ভদন্ত, যদি তাহারা সম্পূর্ণ ফললাভের যোগ্য হয় তবে যিনি ভগবানের অনেক উপকার করিয়াছেন, যিনি মাতৃষ্বসা ও পালিকারূপে ভগবানকে লালন পালন ও দুগ্ধ পান করাইয়াছেন, যিনি জননীর মৃত্যুর পর ভগবানকে স্তন্যদান করিয়াছেন, সেই মহাপ্রজাবতী যখন বলিতেছেন তখন স্ত্রীলোকদের সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত।"

"আনন্দ, মহাপ্রজাবতী যদি এই আটটি 'প্রধান ধর্ম্ম' পালন করিতে পারেন তবে ইহা তাঁহার দীক্ষাতুল্য হইবে, যথা—

"(১) ভিক্ষুণীরা এমন কি শতবর্ষ ধর্ম্মপালন করিবার

পরও, ভিক্ষুদিগকে, যদি তাহারা সদ্যদীক্ষিতও হয়, তথাপি দেখিলে অভিবাদন করিবে, উঠিয়া দাঁড়াইবে, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া থাকিবে, ও সর্ব্বপ্রকার সম্মান দেখাইবে। এই নিয়ম পালন করিতে হইবে, মানিতে হইবে, পূজা করিতে হইবে, সম্ভ্রম করিতে হইবে ও জীবনে কখনও ব্যতিক্রম করা যাইতে পারিবে না।

"(২) যেখানে কোন ভিক্ষু নাই এমন স্থানে কোন ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করিতে পারিবে না। এই নিয়ম পালন করিতে হইবে, মানিতে হইবে,···ও জীবনে কখনও ব্যতিক্রম করা যাইতে পারিবে না।

"(৩) প্রতিপক্ষে ভিক্ষুণীদের ভিক্ষুসংঘের কাছে আসিয়া উপোসথ (এই দিনে সংঘ মিলিত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিত) কবে হইবে এবং ওবাদের (উপদেশ) জন্য ভিক্ষু কবে আসিবেন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। এই নিয়ম পালন করিতে হইবে···ও জীবনে কখনও ব্যতিক্রম করা যাইতে পারিবে না।

"(৪) বর্ষাবাসের পর ভিক্ষুণীদের ভিক্ষুণীসংঘ ও ভিক্ষু-সংঘ দুইএরই সম্মুখে যাহা দেখা গিয়াছে, শুনা গিয়াছে বা সন্দেহ করা গিয়াছে এ তিন বিষয়ে পবারণা (বর্ষাউদ্‌যাপন) পালন করিতে হইবে। এই নিয়ম ইত্যাদি।

"(৫) কোন ভিক্ষুণী গুরুদোষে অপরাধী হইলে দুই সংঘেরই কাছে মানত দণ্ড (নিয়মভঙ্গের শাস্তি) পাইবে। এই নিয়ম, ইত্যাদি।

"(৬) ষড়ধর্ম্মে দুই বৎসর শিক্ষা পাইবার পর ভিক্ষুণী-দের দুই সংঘেরই নিকট উপসম্পদার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। এই নিয়ম, ইত্যাদি।

"(৭) ভিক্ষুণীরা কোন কারণেই ভিক্ষুদের প্রতি আক্রোশ বা কটুভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই নিয়ম, ইত্যাদি।

"(৮) এখন হইতে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের শাসনবচন বলিতে পারিবে না ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের শাসন-বচন বলিতে পারিবে এই নিয়ম, ইত্যাদি।

আনন্দ, যদি মহাপ্রজাবতী এই নিয়মগুলি পালন করিতে পারেন তবে তাঁহাকে দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।"

আনন্দ বাহিরে গিয়া মহাপ্রজাবতীকে একথা জানাইলেন। মহাপ্রজাবতী বলিলেন, "আনন্দ, মণ্ডনপ্রিয় যুবক বা যুবতী যেমন স্নানের পর দুই হস্ত তুলিয়া পদ্ম বা অন্য ফুলের মালা মস্তকে ধারণ করে, সেইরূপ আমিও এই নিয়মগুলি শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম এবং জীবনে ইহার ব্যতিক্রম করিব না।"

আনন্দ মহোৎসাহে আসিয়া বুদ্ধকে জানাইলেন, "ভদন্ত, মহাপ্রজাবতী আটটি নিয়মই পালনে স্বীকৃত হইয়াছেন; ভগবানের মাতৃস্বসার উপসম্পদা হইয়াছে।"

বুদ্ধ আনন্দের এই কথায় হৃষ্ট না হইয়া অতি নিদারুণ কথা বলিলেন, "আনন্দ স্ত্রীলোকেরা যদি সংসারত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইয়া তথাগতের ধর্ম্ম ও নিয়মপালনের অনুমতি না পাইত তবে ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইত, এই সদ্ধর্ম্ম সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইত, চিরট্‌ঠিতিকম্ ব্রহ্মচরিয়ম্ অভবিস্‌স, বস্‌সসহস্‌সম্ সদ্ধম্মো তিট্‌ঠেয্য। কিন্তু আনন্দ, এখন তাহারা যখন এই অনুমতি পাইয়াছে তখন সদ্ধর্ম্ম ততদিন স্থায়ী হইবে না, মাত্র পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হইবে। আনন্দ, যে গৃহে বহু স্ত্রীলোক কিন্তু অল্প পুরুষ বাস করে সে গৃহ যেমন চোর ও দস্যুরা সহজেই ধ্বংস করিতে পারে সেইরূপ যে ধর্ম্মনিয়মে স্ত্রীলোককে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যেমন উত্তম ধান্যক্ষেত্রে ছাতাপড়া, সেতট্‌ঠিকা রোগ লাগিলে সে ক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না, যেমন উত্তম ইক্ষুক্ষেত্রে "সঞ্‌জেট্‌ঠিকা" নামক রোগ লাগিলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না সেইরূপ যে ধর্ম্মনিয়মে স্ত্রীলোকদের সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহাও চিরস্থায়ী হয় না। আনন্দ, আর যেমন লোকে পূর্ব্ব হইতে তড়াগে বাঁধ দেয় যাহাতে তাহার উপরে জল উঠিতে না পারে সেইরূপ আমিও পূর্ব্ব হইতে ভিক্ষুণীদের জন্য এই নিয়মগুলি বাঁধিয়া দিলাম যাহা চিরজীবনেও তাহারা যেন ব্যতিক্রম না করে (চুল্লবগ্‌গ, ১০।১)

শাস্ত্রে এইভাবে ব্যাপারটিকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে বুদ্ধ কপিলবাস্তুর "ন্যগ্রোধারামে" থাকার সময় মহাপ্রজাবতী স্ত্রীলোকদিগের সংঘপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু বুদ্ধ তাহাদিগকে এমন কি মহাপ্রজাবতীকেও সংঘে প্রবেশ করিতে দেন নাই। পরে মহাপ্রজাবতী শাক্য নারীদের লইয়া বৈশালীর "কূঠাগারশালার" দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবারও বুদ্ধ অনিচ্ছা দেখাইলেন। শেষে আনন্দের কথায়

তিনি মহাপ্রজাবতী ও অন্য নারীদের সংঘে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন, ইহার পূর্ব্বে সংঘে ভিক্ষুণী ছিল না।

এই শাস্ত্রবর্ণনার সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধের যুগে জৈন, আজীবিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি বারাণসীর ঋষিপত্তনে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের সময় বুদ্ধের শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন ভিক্ষুণীও ছিল। কাজেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের সংঘেই যে স্ত্রীলোকেরা প্রথমে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা নয়। তারপর বর্ণনায় দেখিতে পাই মহাপ্রজাবতী যখন শাক্যনারীদের লইয়া বৈশালীতে আসিলেন তখন তাঁহার কেশ ছিন্ন ও পরিধানে গৈরিক বাস ছিল। একথা শুধু তাঁহারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার অন্য সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে বলা হয় নাই। সঙ্ঘে পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়া না থাকিলে মহাপ্রজাবতী কেশচ্ছেদন ও গৈরিক বাস ধারণ করিলেন কিরূপে? এগুলি দীক্ষাদানের সময়ে করা হইত, পূর্ব্বে নয়। ইহাতে মনে হয় পণ্ডিতেরা যে অনুমান করিয়াছেন যে, মহাপ্রজাবতী পূর্ব্বেই ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন একথা ঠিক। আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্মপালনের শ্রেষ্ঠতম ফল লাভ করিতে পাবে; অতএব স্ত্রীলোকমাত্রেই সঙ্ঘে প্রবেশে অনধিকারী ইহা নিশ্চয় বুদ্ধের অভিমত ছিল না। যদি তাহাই হয় তবে যোগ্য স্ত্রীলোক কেহ কেহ যে পূর্ব্বেই সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইহা খুবই সম্ভব। আরও একটি কথা আছে; আনন্দ বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন যে মহাপ্রজাবতী যখন বলিতেছেন তখন স্ত্রীলোকদের সংঘে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে মনে হয় মহাপ্রজাবতীর নয়, অপর স্ত্রীলোকদের সংঘে প্রবেশ উচিত কি না ইহাই তখন বিবেচ্য ছিল। "ন্যগ্রোধারামে"ও মহাপ্রজাবতীর কথার উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন স্ত্রীলোকেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করুক এ ইচ্ছা যেন মহাপ্রজাবতীর না হয়। এখানেও দেখিতে পাইলাম, আপত্তিটা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে, মহাপ্রজাবতীর সম্বন্ধে নয়। আমার মনে হয় বুদ্ধ সংঘে স্ত্রীলোকদের অবাধ প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন না। পুরুষদের প্রথম প্রথম চাহিলেই সংঘে প্রবেশ করান হইত এবং আমরা পরে দেখিতে পাইব যে বাস্তব অভিজ্ঞতায় যখন দেখা গেল যে অনেক অযোগ্য ও অবাঞ্ছনীয় লোক সংঘে প্রবেশ করিতেছে তখন পুরুষদের সম্বন্ধেও সংঘপ্রবেশে অনেক নিষেধ-বিধির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। "মিলিন্দ-পঞ্‌হো"তে এ বিষয়ে একটা তর্কের সমাধান করা হইয়াছে। সেনাপতির জিজ্ঞাসা করিলেন যে বুদ্ধ যদি সর্ব্বজ্ঞ তথাগত ছিলেন তবে তিনি সংঘের সম্বন্ধে বিধিনিষেধগুলি প্রথম হইতেই প্রবর্ত্তন করেন নাই কেন? এগুলির প্রয়োজন যে হইবে একথা যদি তিনি প্রথমে না বুঝিয়া থাকেন তবে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইল না কি? উত্তরে নাগসেন বলিয়াছিলেন যে বুদ্ধ এগুলির কথা আগে হইতেই জানিতেন, তাঁহার মনে সবই ছিল, প্রয়োজন অনুসারে তিনি একটি একটি করিয়া বিধি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ উত্তরে তর্কের অবসান হইল বটে কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবের অপলাপ ঘটিল মনে হয়। পুরুষদের সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে প্রথম হইতে সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বুদ্ধের মনে হয় নাই কিন্তু স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে হইয়াছিল। বুদ্ধ সংসারানভিজ্ঞ ভবভোলা সরল লোক ছিলেন না; তিনি মধ্যযৌবন পর্য্যন্ত বিবাহিত জীবন ভোগ করিয়াছিলেন, সন্তানের পিতা হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে সংসারের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। স্ত্রীচরিত্রের দুর্ব্বলতা ও দুষ্টতা যাহা যাহা আছে তাহা তিনি ভালরূপেই জানিতেন, এগুলির সংস্পর্শের প্রভাবে কর্ম্মীপুরুষের লক্ষ্যসাধনায় যে বিপর্য্যয় ঘটে তাহাও তিনি জানিতেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জৈন ও আজীবিকদলের মধ্যে যে সব অনাচার ব্যভিচার ঘটিয়াছিল তাহারও খবর তিনি রাখিতেন। এই সব কারণে যে-সে স্ত্রীলোকের সংঘ-প্রবেশের তিনি বিরুদ্ধ ছিলেন। আরও একটি জিনিষ বুদ্ধের জীবনে দেখিতে পাই যে পুরুষদিগকে শিক্ষা দিবার সময় তিনি ধর্ম্ম-দর্শনের তত্ত্বালোচনা করিতেন, শ্রামণ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতেন এবং তাহাদের সংঘে টানিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু স্ত্রীলোককে উপদেশ দিবার সময় গার্হস্থ্যজীবন ও সংসার-ধর্ম্মের কর্ত্তব্য সুসম্পাদনে তাহাদিগকে প্রণোদিত করিতেন। ইহাতে মনে হয় যে তাঁহার মতে গৃহই অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পক্ষে উচিত এবং উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র। স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে স্ত্রীলোককে বঞ্চিত করিয়াছেন, নারীও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে ইহা মানেন নাই, ইত্যাদি কথা বলিয়া এবং

শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত বা অপর কাহিনীগুলিকে আক্ষরিক সত্য ভাবিয়া কেহ যদি বুদ্ধকে দোষ দেন তবে তাঁহাকে আবার আনন্দকে বুদ্ধ যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে বলি —ভদন্ত, "সংসার ত্যাগ করিয়া তথাগতের ধর্ম্ম ও নিয়ম পালন করিলে স্ত্রীলোকেরা কি ধর্ম্মপালনের সমুদায় ফল-ভোগের, এমন কি অর্হত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিবার যোগ্য হয় না ?"

"হাঁ আনন্দ, হয়।" পৃথিবীর কোন প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টা এমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় অধ্যাত্ম বিষয়ে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিবরণে ভিক্ষুণীসংঘের জন্য বুদ্ধ যে নিয়মগুলি বাঁধিয়া দিলেন বলা হইয়াছে তাহার সবগুলিই যে তিনি একবারে বা প্রথম হইতে বা অবিকল ঐ ভাবেই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন এরূপ মনে হয় না। আমরা পরে ভিক্ষুসংঘের জন্য প্রণীত নিয়মগুলি—ইহাকে বৌদ্ধেরা "বিনয়" বলেন—আলোচনার সময় দেখিতে পাইব যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা হইয়াছিল এবং পরে প্রয়োজনানুসারে বিশেষ নিয়মের প্রণয়ন ও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা দেওয়া হইত। সাধারণ নিয়মগুলি ভিক্ষুভিক্ষুণী উভয় সংঘকেই সমভাবে পালন করিতে হইত, তাহা ছাড়া ভিক্ষুণীদের জন্য বিশেষ নিয়মের সবগুলি না হউক কতকগুলি বুদ্ধ প্রথম হইতেই কঠোর ভাবে পালনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; জলের বাঁধের দৃষ্টান্তটি ভিক্ষুদের স্বকল্পিত মনে হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সন্দেহ হয় যে এই নিয়মগুলি এখন যে ভাষায় ও যে আকারে দেখি তাহাতে সন্ন্যাসীদের হাত ছিল।

বুদ্ধ ও আনন্দের কথায় বড় সুন্দর একটি স্বাভাবিক মানুষ-ভাবের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনন্দ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন না কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল। নিজের প্রাণ ছিল বলিয়া অপরের প্রাণে তিনি সহজেই প্রবেশ করিতে পারিতেন, নিজের কোমল হৃদয়ের দ্বারা অপরের হৃদয়ের কোথায় কোমলতা তাহা বুঝিতে পারিতেন। কূঠাগারশালার দ্বারকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রজাবতীরা যদি সুবিখ্যাত সারিপুত্রকে ঈপ্সিতলাভে সাহায্য করিতে বলিতেন তবে হয়ত সারিপুত্র মহা ভাবনায় পড়িতেন, পরম নির্লিপ্ত চিত্তে বহু আলোচনা তর্ক করিতেন; মৌদ্গল্যায়ন হইলে হয়ত শাক্য-নারীদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন। মহাপ্রজাবতীর তদবস্থা দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া বুদ্ধকে খবর দেওয়ার কথা আনন্দেরই মনে হইয়াছিল। বুদ্ধকে বুঝাইতে হইলে সারিপুত্র সেখানে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব, দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার আরম্ভ করিতেন এবং মৌদ্গল্যায়ন যেখানে "ইদ্ধি"বলে শাক্যনারীদের তৎক্ষণাৎ কপিলবাস্তুতে • রাখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিতেন, সেখানে সহজবুদ্ধি আনন্দ বুদ্ধের অতিগূঢ় হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া মহাপ্রজাবতীর লালন পালন স্তন্যদানের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বুদ্ধ ইহাতে যে বিচলিত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় তো স্পষ্টই রহিয়াছে—ধর্ম্মের আয়ু কমিয়া যাইবে, সংঘের শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে সবই বুঝিলেন কিন্তু মহাপ্রজাবতীর উপকারের কথায় আনন্দ যে মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন তাহা তিনি রোধ করিতে পারিলেন না। বুদ্ধের কোমলতা, সজীবতা, প্রাণবত্তা আমরা ইহাতে দেখিতে পাই। শাস্ত্র যাঁহাকে সকল প্রকার অমানুষিক ঐশ্বর্য্যবিভূতিতে পরিমণ্ডিত করিয়া লোকোত্তর মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি মধ্যে মধ্যে এইরূপ কয়েকটা নাড়াচাড়া দিয়া প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন যে লোকোত্তর হইলেও তিনি মানুষই ছিলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে বুদ্ধ নিজে যদি নারীবর্জ্জক না ছিলেন তবে শাস্ত্রলেখক বুদ্ধশিষ্যেরা কি উদ্দেশ্যে এ ঘটনাগুলির বিকৃত বিবরণ দিলেন। ধর্ম্ম-ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে পৃথিবীর ধর্ম্মগুরুরা প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনকে মিথ্যা মনে করিতেন। সব দেশেই ধর্ম্মান্বেষী ব্যক্তিরা সাধারণ জীবনের সংসার ছাড়িয়া থাকিতেন। সস্ত্রীক হইলেই সংসারে জড়াইয়া পড়িতে হয়, কামিনীরূপের মোহে পড়িলে নানা বিপত্তি ঘটিয়া উদ্দেশ্যসাধনে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে—কাজেই নারী-বর্জ্জন সন্ন্যাসপন্থীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক মনে করা হইত। ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম মাত্রেই ত্যাগমার্গ অনুসরণ করিয়াছেন, ভোগের বহু কুফল দেখাইয়াছেন। ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য যেখানে করিবার চেষ্টা হইয়াছে, "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" উপনিষৎ যখন এই উপদেশ দিয়াছেন, গীতা যখন "যুক্তাহার বিহার" হইতে বলিয়াছেন, সর্ব্বত্রই লক্ষ্য কিন্তু রহিয়াছে ত্যাগের উপর; লক্ষ্য যেখানে ভোগের উপর রাখিয়া ধর্ম্মকে

সরল করিবার চেষ্টা হইয়াছে সেখানে সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম "সহজিয়া"র পূতিগন্ধে বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ত্যাগপন্থীকে সেই জন্য কামিনী যাহাকে একজন খৃষ্টীয় সাধু চরম ও নিকৃষ্টতম ভোগের বিষয় লিখিয়াছেন—হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে। উপনিষদের 'ব্রহ্মচর্য্য' (বুদ্ধের 'ব্রহ্মচরিয়ং') শব্দটি পূর্ব্বের বৃহৎ অর্থ ছাড়িয়া পরবর্ত্তীকালের ভাষায় অধুনা-প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যেন ইহাই ধর্ম্মের সব। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাসেও এই সঙ্কীর্ণ অর্থের ব্রহ্মচর্য্য বড় স্থান অধিকার করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় শাস্ত্রে নারীর বহু নিন্দা আছে, জৈনশাস্ত্রে নারীর বহুদোষ কীর্ত্তন করিয়া উহা হইতে শতহস্ত দূরে থাকিতে বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে গল্পে ও দৃষ্টান্তে নারীচরিত্রের যাহা যাহা দুষ্টতা তাহা প্রায় নিঃশেষে বর্ণনা করা হইয়াছে। বুদ্ধ সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক উপরে ছিলেন; নারীর দোষ জানা থাকিলেও তিনি যে উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহা ভিক্ষু-সংঘের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সংঘের প্রধান ভিক্ষুরা নারীদ্বেষী ছিলেন এবং সংঘে নারীর প্রবেশের বিরুদ্ধে ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কালক্রমে, এমন কি বুদ্ধ জীবিত থাকিতেই সংঘের কাছে তিনি ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহার চেয়ে দলবদ্ধ সন্ন্যাস ধর্ম্মের রীতিনীতিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। নারীবর্জ্জন না করিলে সন্ন্যাসধর্ম্মের ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া যায়, এ জন্য নারীবিদ্বেষ প্রচার করা ভিক্ষুদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। এই জন্যই তাঁহারা বুদ্ধকে প্রথম হইতে নারীদ্বেষী, এমন কি মহাপ্রজাবতীকেও সংঘে লইতে অনিচ্ছুক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মনে হয়। নারী সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন, সংঘের স্থায়িত্বের জন্য নারীবর্জ্জনমূলক সন্ন্যাস-নিয়মগুলি কঠিন ভাবে বাঁধিয়া দিবার প্রয়োজন ইহারা এত গুরুতর মনে করিয়াছিলেন যে, অন্তিম শয্যায় শায়িত বুদ্ধের মুখ দিয়া অতি অপ্রাসঙ্গিকরূপে অপ্রয়োজনে এ সম্বন্ধে আদেশ বাহির করিয়া লইলেন—অন্ততঃ শাস্ত্রে এইরূপ আছে। বুদ্ধ যখন কুশীনগরের নিকটবর্ত্তী শালবনে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়া অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন তখন হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?"

"আনন্দ, স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাইও না।"
"যদি তাকাইতে হয়, তবে আমরা কি করিব?"
"আনন্দ, তাহা হইলে কথা বলিও না।"
"ভদন্ত, যদি কথা বলিতে হয়, তবে আমরা কি করিব?"
"কথা বলিতে হইলে সাবধানে সতর্ক থাকিবে।"

(দীঘনিকায়, মহাপরিনিব্বান সুত্ত)

বুদ্ধের আনন্দকে বা অন্য কাহাকেও কোন সময়ে এই কথা বলিয়া থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু তথাগতের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, একটু পরেই আনন্দ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে এ প্রশ্ন করিবার মত অবস্থা আনন্দের নিশ্চয় ছিল না। শাস্ত্রপ্রণেতাদের এ স্থলে এই কথাগুলি বসাইয়া দিবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—তথাগতের অন্তিমবচনের মধ্যে ইহা থাকিলে সংঘ কখন নারীবর্জ্জনের কথা বিস্মিত হইবে না। বুদ্ধের মৃত্যুর পর সম্মিলিত সংঘ আনন্দকে কয়েকটি দোষে অভিযুক্ত করেন; তাহার মধ্যে একটি অভিযোগ এই ছিল যে আনন্দ বুদ্ধের মৃত্যুর পর প্রথমে নারীদিগকে মৃতদেহ দর্শন করিতে দিয়াছিলেন এবং তিনিই বুদ্ধকে প্ররোচনা করিয়া সংঘে নারীর প্রবেশ ঘটাইয়াছিলেন। সংঘ-নায়কদের মনোভাব ইহাতে ভালই বুঝা যায়।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

Culture-এর প্রতিশব্দ কি ?

বাঙ্গালা ভাষাকে জগতের সভ্য ও শিক্ষিত লোকদের ভাষারূপে ব্যবহারের প্রচেষ্টা, অর্থাৎ বাঙ্গালাভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির অন্যতম স্থানদানের প্রচেষ্টার প্রথমেই আবশ্যক, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দগুলির উপযুক্ত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ স্থির করা। কিন্তু এ কাজটা ঠিক ইংরেজী শব্দ অনুবাদের চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কোনও ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বা পরিভাষা ভাষান্তরিত হইলে অনেক সময় তাহাদের স্থানে উপযুক্ত প্রতিশব্দ বা প্রতি-পরিভাষা ব্যবহার করা যায় না, কারণ প্রত্যেক ভাষায় উহার প্রত্যেক শব্দ বা পরিভাষার একটা বিশিষ্ট স্থানে আছে। উহাদের ঐ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ স্থান অপূরণীয়। প্রত্যেক ভাষার শব্দ বা পরিভাষা ঐ ভাষাভাষী জাতির প্রাণধারার সহিত যুক্ত, এবং সেই কারণে উহাদের ভাষান্তরের চেষ্টা অনেক সময় হাস্যকর হইয়া উঠে।

কিছুদিন হইতে শিক্ষিত সমাজে একটা নূতন কথার আবির্ভাব হইয়াছে। এ শব্দটা আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত ছিল না, এবং পূর্ব্বে বিদ্বৎসমাজেও ইহার ব্যবহার লক্ষিত হয় নাই। এই নূতন শব্দটি "কৃষ্টি", ইংরেজী culture শব্দকে বাঙ্গালায় বুঝাইতে এই শব্দটি আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে culture বুঝাইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৺শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার "বঙ্গবাণী"-তে "কর্ষণা" শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এবং ইহারও অনেক পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র culture-এর পরিবর্ত্তে "অনুশীলন" শব্দ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক culture বুঝাইতে চলিত বাঙ্গালায় উপযুক্ত কোনও শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা "কর্ষণা" বা "কৃষ্টি" ব্যবহার করেন, তাঁহারা culture-এর পরিজ্ঞাত অর্থ "চাষ" করার সংস্কৃত রূপ "কৃষি" শব্দকে যথোপযুক্ত বিবেচনা করেন, কিন্তু culture-এর স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নাই। Culture শব্দের ধাতুগত অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ল্যাটিন cultus বা colere হইতে cultivate, culture ও cult, এই তিনটি ইংরেজী শব্দ আবির্ভূত হইয়াছে—সুতরাং এই তিনটি শব্দেরই একটা মূলগত অর্থ-সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্য কর্ষণ শব্দের সহিত যুক্ত। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে যাঁহারা প্রথমতঃ এই শব্দত্রয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা মনে করিতেন যে cultivate (কর্ষণ) করিলে culture (কৃষ্টি ?) হয় এবং ইহাই cult (?)। মানব সভ্যতার প্রথম অবস্থায় কৃষিকর্ম্মকে ধর্ম্মকার্য্য বিবেচনা করা হইত, ইহা ভাবা অসঙ্গত নয়; এবং এই অর্থে এই শব্দত্রয়ের অর্থসঙ্গতি সুস্পষ্ট।

অভিধান-চিন্তামণি অনুসারে কর্ষণ শব্দের অর্থ কৃষিকর্ম্ম, লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূম্যাদি খনন (শব্দকল্পদ্রুম, ১৬৪ পৃঃ, হিতবাদী মুদ্রাযন্ত্র, ১৮৫০ শক)। নামলিঙ্গানুশাসন মতে কৃষ্টি শব্দের অর্থ পণ্ডিত (শব্দকল্পদ্রুম, ২১২ পৃঃ) এবং শব্দকল্পদ্রুম মতে কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ ও বিলেখন (২১২ পৃঃ)। অধ্যাপক Monier Williams-এর মতে কর্ষণ বা কর্ষণা শব্দের অর্থ pulling to and fro, dragging, attracting, overpowering, injuring ; tormenting ; harassed ; extending (in time) ; bending (a bow) ; ploughing, cultivating the ground ; cultivated land (A Sanskrit-English Dictionary, Oxford, 1872, p. 210,) এবং কৃষ্টি শব্দের অর্থ men, races of men, sometimes with the epithet 'manushis'···; originally the word may have meant cultivated ground, then an inhabited land, next its inhabitants, and lastly any race of men ; Indra and Agni have the name 'raja' or 'patih krishtinam' ; and 'panca krishtayas,' 'the five races' comprehends the whole human race (not only the Aryan tribes) ; according to native lexicographers the word means also ploughing, cultivating the soil ; attracting, drawing ; and (is), a teacher, a learned man or Pandit, 'krishti-pra-as, as, am,' pervading the human race. 'kristi-han, ha, ghni, ha,' subduing nations. 'krishty-ojas,' as, as, as, overpowering men (A Sanskrit-English Dictionary, p. 250) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের মতে কর্ষণ শব্দের অর্থ হলচালনা ; কৃষিকার্য্য ; লাঙ্গলাদিদ্বারা ভূমি খনন। আকর্ষণ, টানন (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ, ৩৪৬ পৃঃ) এবং কৃষ্টি শব্দের অর্থ ভূমি কর্ষণ, হাল চাষ। চাষ, কৃষিকর্ম্ম। বিধিজ্ঞ, পণ্ডিত, বিদ্বান (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ৪২৯ পৃঃ)। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের মতে কর্ষণ শব্দের অর্থ কৃষি, চাষ। আকর্ষণ। ঘর্ষণ (চলন্তিকা ৯৭ পৃঃ), এবং কৃষ্টি শব্দের অর্থ কর্ষণ, কৃষিকর্ম্ম। শিক্ষা বা চর্চ্চা দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ, সংস্কৃতি culture (চলন্তিকা ১১৮ পৃঃ)। চলন্তিকা লিখিত হওয়ার বহুপূর্ব্বে ৺শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের "বঙ্গবাণী" রচিত হইয়াছিল, সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবু ৺শশাঙ্কমোহনের "কর্ষণা" শব্দ culture অর্থে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে কৃষ্টি শব্দের অর্থ culture স্থির করিয়াছেন। চলন্তিকার পূর্ব্বে কৃষ্টি শব্দ culture অর্থে কোথায় ব্যবহৃত হয় তাহা আমার জানা নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের মতে, "প্রথমত culture শব্দের বাংলা একটি করতে হবে। আমি বলি মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বললে ভাবখানার একটা ইসারা পাওয়া যায়। Cultured লোককে বলা যেতে পারে প্রকৃষ্টচিত্ত বা প্রকৃষ্টমনা। যদি বলতে হয় অঙ্কশাস্ত্রে তিনি cultured, তাহ'লে বাংলায় বলবে অঙ্কশাস্ত্রে তিনি প্রকর্ষপ্রাপ্ত। অমুক পরিবারে culture-এর atmosphere আছে বলতে হলে বলা যেতে পারে অমুক পরিবারে মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষের আবহাওয়া আছে। কৃষ্টি কথাটা আমার কানে একটুও ভালো লাগেনা। বরঞ্চ উৎকৃষ্টি বললেও কোন মতে চলত। যাহোক্, আমার মতে cultural selfকে চিত্তপ্রকর্ষগত বা মনঃপ্রকর্ষগত সত্তা বা

ব্যক্তিত্ব বলা যায়। বলা বাহুল্য physical cultureকে বলতে হবে দেহপ্রকর্ষ চর্চ্চা" (উত্তরা, সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৯, ৮০ পৃঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের মতে culture শব্দের অর্থ কৃষ্টি নয় ; এবং culture-এর উপযুক্ত কোন প্রতিশব্দ নাই, তবে প্রকর্ষ কথাটাকে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। অধ্যাপক Monier Williams সাহেবের মতে প্রকর্ষ শব্দের অর্থ pre-eminence, excellence, eminence, distinction, superiority, intensity of good qualities or merit, high degree ; might, strength ; speciality ; universality ; absoluteness, definitiveness ; protractedness, length (A Sanskrit-English Dictionary, p. 603).

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে culture শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ হওয়া উচিত "সংস্কৃতি" এবং এই অর্থেই নাকি সংস্কৃতি শব্দের মারহাট্টি ভাষায় ব্যবহার আছে। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবু culture শব্দের একটা অর্থ সংস্কৃতি বলিয়াছেন (চলন্তিকা, ১১৭ পৃঃ)। অধ্যাপক Monier Williams সাহেবের মতে সংস্কৃতি শব্দ সংস্কার শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ এবং সংস্কার শব্দের অর্থ forming well or thoroughly, making perfect, perfecting, completing, finishing, polishing, refining, perfection, refinement, education, accomplishment ; forming in the mind, conception, idea, notion ; impression, form, mould ; impression on the mind or memory ; the power of memory, faculty of recollection, self-reproductive quality (one of the twenty-four qualities enumerated in the Vaiseshika branch of Nyaya phil.) ; any faculty, capacity, instinct ; operation, influence ; preparation, making ready, preparation of food, etc., cooking, dressing, compounding ; decoration, embellishment, ornament, elegance ; making sacred, hallowing, consecration, dedication ; consecration of a king, etc. ; making pure, purification, purity ; a sanctifying or purifactory rite or essential ceremony (enjoined on all first three or twice-born classes) (A Sanskit-English Dictionary, p. 1041)। Culture শব্দের অর্থ করিতে Monier Williams বলিয়াছেন "cultivation, culture (of land) কর্ষণং, কৃষিঃ কৃষিকর্ম্ম, কৃষ্টিঃ, কার্ষিঃ (labouring at, promoting) সেবনং, অনুসেবনং, পরিষ্কারঃ, অনুষ্ঠানং, অনুপালনং, প্রতিপালনং, সংবর্ধনং of learning বিদ্যানুসেবনং (Dictionary English and Sanskrit, London 1851, p. 150)

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত অনুশীলন শব্দ ও Monier Williams-এর ব্যবহৃত সেবন শব্দ বিচার করিলে দেখা যায়, ধাতুদীপিকাকার শীল্ ধাতুর অর্থ করিয়াছেন সমাধি, সেবা, অনুভাবন, প্রবৃত্তি (শব্দকল্পদ্রুম, ১৫৫৪ পৃঃ) এবং কবিকল্পদ্রুম সেব্ ধাতুর অর্থ সেবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (শব্দকল্পদ্রুম ১৭৮২ পৃঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে অনুশীলন বা অনুসেবন শব্দ দ্বারা কোন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া বুঝায় বটে, কিন্তু ঠিক culture বুঝায় না এবং cultivation of learning বুঝাইতে বিদ্যানুশীলন বা বিদ্যানুসেবন শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এস্থলে cultivation শব্দের "culture"-এর ন্যায় ব্যাপক অর্থ নাই।

পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি আলোচনা করিয়া দেখা গেল, কৃষ্টি শব্দ culture বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। culture-এর উপযুক্ত প্রতিশব্দ একমাত্র সংস্কৃতি, কিন্তু সংস্কৃতি শব্দ কৃ ধাতু নিষ্পন্ন এবং কৃ ধাতু নিশ্চয়ই cultus বা colere হইতে ভিন্ন। সুতরাং culture-এর উপযুক্ত প্রতিশব্দ সম্ভবতঃ সংস্কৃতি ভিন্ন অন্য কিছু।

Cultus এর মূলগত col ধাতুর সংস্কৃতরূপ চর্। চর্ ধাতুর সাধারণ অর্থ গমন (শব্দকল্পদ্রুম, ২৯৭ পৃঃ), কিন্তু এই গমন অর্থ হইতেই culture শব্দের ন্যায় ইহার ক্রমোন্নতি হইয়াছে। অধ্যাপক Monier Williams সাহেবের মতে চর্ ধাতুর অর্থ to move one's self, go, walk, move, stir, drive (in a carriage etc), roam about, walk about, wander ; to graze ; to spread, be diffused ; to be active ; move or travel through, pervade, go along, follow ; to behave, conduct one's self ; to live, be, remain in any position, act ; to be engaged in, occupied with, busy one's self with ; to undertake, set about' undergo, observe, practise, do or act in general ; to continue performing or being ; to exercise the body with penance ; to perform the act of copulation, to have sexual intercourse with, have to do with ; to make or render ; to act as a spy ; to consume, to eat (A Sanskrit-English Dictionary, p. 317).

ইংরেজি cult শব্দ সংস্কৃতে "আচার"-রূপে ব্যবহৃত আছে—দিব্যাচারী, বীরাচারী ও পশ্বাচারী তান্ত্রিক, বামাচারী, কামাচারী, প্রভৃতি শব্দও সুপ্রচলিত। ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত culture শব্দটি "আচার" শব্দের ন্যায় "চর্" ধাতু হইতে উৎপন্ন "চর্য্যা" রূপে ব্যবহার করিলে বোধ হয় দোষ হয় না। অধ্যাপক Monier Williams সাহেবের মতে চর্য্যা শব্দের অর্থ to be gone ; to be practised or performed etc., going about, wandering, walking about, driving or going in a carriage ; pervading, visiting, course ; proceeding, behaviour ; due and regular observance of all rites or customs, following the rules of studentship ; practising religious austerities, wandering about as a mendicant ; performing, practising, engaging in, practice, conduct ; behaviour, deportment, usage ; eating (A Sanskrit-English Dictionary, p. 318)। চর্য্যা শব্দ আচরণীয় অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহার আছে, যথা, তপশ্চর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, দিনচর্য্যা ইত্যাদি. কিন্তু আচরণীয় শব্দটি সংস্কৃতে দেহ মন, বাক্য এবং এমন কি সমস্ত সভ্যাচারা আচরণীয় এই অর্থেই বহুল ব্যবহার আছে, সুতরাং ইহাতে

culture বাদ যায় না এবং এই অর্থে চর্ধাতু নিষ্পন্ন চরিত্র শব্দের অর্থ কেবলমাত্র আচরণ বা ব্যবহার নহে। অধ্যাপক Monier Williams সাহেবের মতে ইহার অর্থ foot, leg ; going, acting, behaving, behaviour, habit, practice, acts, deeds, proceedings, exploits ; instituted and peculiar observance or conduct ; adventures, story, history or account of any deeds or exploits ; nature, disposition (A Sanskrit-English Dictionary, p. 318)। প্রসঙ্গচ্যুত করিয়া চরিত্র শব্দটিকে বিচার করিলে উহার একটা সামান্য অর্থ conduct হয় বটে, কিন্তু একটু বিচার করিলেই বুঝা যায় যে চরিত্র শব্দ মূলতঃ nature বা সত্তা, উহার স্বাভাবিক observance বা নিয়ম এবং উহার লোক-ব্যবহার কথা, সুতরাং চরিত্র শব্দ দ্বারা ইহার কোনও একটিকেই মাত্র বুঝায় না, সবগুলিকেই একসঙ্গে বুঝায়। এস্থলে মনে রাখা উচিত সংস্কৃতে আচরণকে পৃথকরূপে কল্পনা করা হয় নাই, সর্ব্বদাই দেহ, মন ও বাক্যের সংযমের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; সুতরাং অন্য সবটুক বাদ দিয়া চরিত্রের সেই লোকব্যবহার বা আচরণটুকুই মাত্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এবং এই কারণেই ব্রহ্মচর্য্যের জন্য প্রথম দেহসংযম, মনঃসংযম প্রভৃতির কথা কথিত হইয়াছে। আজকাল আমরা culture বলিতে ব্যাপক অর্থে যাহা বুঝি, পূর্ব্বেও ধর্ম্ম সম্প্রদায়গত গ্রন্থে চর্য্যা শব্দটি ঠিক সেইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। চর্য্যা শব্দের এইরূপ অর্থ করিলে চর্য্যাপদ শব্দে আমরা, সেই পদ যাহা cultured লোকদের জন্য অথবা যে পদ দ্বারা cultured হওয়া যায়, এই অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এবং চর্য্যাপদ শব্দের এই অর্থই সুসঙ্গত। সুতরাং culture শব্দের ব্যাপকতম অর্থে চর্য্যা শব্দটিকে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে চর্য্যা শব্দের সামান্য অর্থ যমনিয়মাদি দ্বারা সংস্কৃত দেহমনাদিসংযুক্ত কোন বিশিষ্ট সত্তার আপন রীতিতে অনুষ্ঠান ও ঐরূপ অনুষ্ঠানের ভাব এবং ব্যাপক অর্থ যমনিয়মাদিদ্বারা সংস্কৃত দেহমনাদি সংযুক্ত সত্ত্বের আপন রীতিতে অনুষ্ঠান ও ঐরূপ অনুষ্ঠানের ভাব। সুতরাং চর্য্যা ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক।

Culture শব্দের অর্থ চর্য্যা মানিয়া লইলে ইংরেজী culture-মূলক শব্দগুলির চর্য্যাযুক্ত প্রতিশব্দ বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। Cultural self চর্য্যাসত্তা, cultured লোককে চর্য্যাযুক্ত বা চর্য্যাসম্পন্ন, cultural atmosphere-কে চর্য্যাভাব, physical culture-কে দেহচর্য্যা, mental culture-কে চিত্তচর্য্যা বলা যাইতে পারে। দেহচর্চ্চা শব্দ সদর্থজ্ঞাপক নহে, ইহাতে ঠিক culture বুঝায় না, দেহের বা দেহসম্বন্ধীয় বিলাস বুঝায় মাত্র। Culture বুঝাইতে কেবল মাত্র সংস্কৃতি বলিলে সর্ব্বত্র সুসঙ্গত হয় না, যেমন কোন লোককে cultured বলিতে তিনি সংস্কৃত বা তাঁহার সংস্কৃতি আছে বলা যায় না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত culture শব্দের ধাতুগত আলোচনা করা গিয়াছে, এইবার অর্থগত আলোচনা করা আবশ্যক। Standard Dictionary অনুসারে culture শব্দের অর্থ 1. The working of the ground in order to raise crops ; cultivation ; tillage. 2. Attention and labor given to the growth or propagation of plants or animals, especially with a view to improvement of the stock or breed ; as, oyster-culture. 3. The training, development or strengthening of the powers, mental or physical, or the condition thus produced ; improvement or refinement of mind, morals, or tastes enlightenment or civilization. 4. Biol. (1) The process of securing the growth and multiplication of bacteria or other micro-organisms, collectively, resulting from such a process. In this sense the word is used in many compound names of apparatus, etc., as culture-club, culture-oven, culture-tube. (A Standard Dictionary of the English Language prepared by more than two hundred specialists and other scholars under the supervision of Isaac K. Funk, Editor-in-chief p. 451. Ward, Lock & Co., Ltd. London & New York 1893)। উক্ত অভিধান অনুসারে culture-এর পর্য্যায় শব্দ humanity ; refinement. (p. 451)

Humanity শব্দের অর্থ 1. Mankind collectively ; the human race. 2. The state or quality of being human ; human nature. 3. The state or quality of being humane ; humane or philanthropic disposition or behavior ; benevolence ; philanthropy ; also, a humane act. 4. Human or secular learning or literature. 5. Good breeding or manners ; politeness (A Standard Dictionary of the English Language, p 873).

Refinement শব্দের অর্থ 1. Fineness or chasteness of thought, taste, manner, or language ; freedom from coarseness or vulgarity ; personal cultivation ; as a man of refinement. 2. The act, process or effect of refining ; purification ; as the refinement of the precious metals 3. A nice or subtle distinction ; extreme elaboration ; fastidiousness ; as, the refinements of metaphysics. 4. Artful praise ; flattery. (A Standard Dictionary of the English Language, p. 1198).

Refinement-এর পর্য্যায়বাচক শব্দের আলোচনায় উক্ত অভিধান বলিতেছেন refinement-এর পর্য্যায়বাচক শব্দ civilization, cultivation, culture. Civilization applies to nations denoting the sum of those civil, social, economic, and political attainments by which a community is removed from barbarism ; a people may be civilized while still far from refinement or culture, but civilization is susceptible of various degrees and of continued progress. Refinement applies either to nations or individuals, denoting the removal of what is coarse and rude, and a corresponding attainment of what is

delicate, elegant, and beautiful. Cultivation denoting primarily the process of cultivating the soil or growing crops, then the improved condition of either which is the result, is applied in similar sense to the human mind and character, but in this usage is now largely superseded by the term culture, which denotes a high development of the best qualities of man's mental and spiritual nature, with especial reference to the esthetic faculties and to graces of speech and manner, regarded as the expression of a refined nature. Culture in the fullest sense denotes that degree of refinement and development which results from continued cultivation through successive generations ; a man's faculties may be brought to a high degree of cultivation in some speciality, while he himself remains uncultured even to the extent of coarseness and rudeness. (p. 1499) ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে culture শব্দের অর্থ বিভিন্ন, কিন্তু সুসঙ্গত না হইলেও বাঙ্গালায় culture-এর একটি মাত্র পরিজ্ঞাত প্রতিশব্দ চাষ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। মৎস্যের চাষ শীর্ষক প্রবন্ধ বাঙ্গালা মাসিকপত্র পাঠকদের অজ্ঞাত নহে। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবুও মাছের চাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (চলন্তিকা ১৭৫ পৃঃ)। শব্দ মাত্রেরই একাধিক অর্থ থাকে, এবং শব্দমাত্রেরই ভাষায় একটা বিশিষ্ট স্থান থাকে বলিয়া ঐ শব্দের প্রতিশব্দ কখনই এরূপ হইতে পারে না যে মূল শব্দের সমস্ত অর্থের সহিত একটিমাত্র সঙ্গতি থাকে। সুতরাং culture শব্দের উপরোক্ত বিভিন্ন অর্থের জন্য বাঙ্গালায়ও বিভিন্ন প্রতিশব্দ হওয়া উচিত। Cultivation or tillage বুঝাইতে culture-এর ধাতুগত প্রতিশব্দ হওয়া উচিত (হল) চালনা বা হল চালনা এবং অর্থগত প্রতিশব্দ চাষ ; attention and labor given to the growth or propagation of plants or animals অর্থে culture-এর ধাতুগত প্রতিশব্দ হওয়া উচিত সেই সেই পদার্থের পরিচর্য্যা, যথা গো পরিচর্য্যা, মৎস্য পরিচর্য্যা ইত্যাদি, এবং অর্থগত প্রতিশব্দ সেই সেই পদার্থ প্রজনন বা বৃদ্ধি, যথা গো প্রজনন বা গো বৃদ্ধি, মৎস্য প্রজনন বা মৎস্য বৃদ্ধি, the process of securing the growth and multiplication of bacteria in gelatin বুঝাইতে culture শব্দের ধাতুগত প্রতিশব্দ হওয়া উচিত সিরিষে জীবাণু পরিচালনোপায় ও অর্থগত প্রতিশব্দ সিরিষে জীবাণু প্রজননোপায় ; the bacteria collectively resulting from such process বুঝাইতে culture শব্দের ধাতুগত প্রতিশব্দ হওয়া উচিত প্রচলিত জীবাণু ও অর্থগত প্রতিশব্দ প্রজাত বা বর্দ্ধিত জীবাণু ; the training, development or strengthening of the powers, mental or physical বা civilization বুঝাইতে culture-এর ধাতুগত প্রতিশব্দ পূর্ব্বোক্ত চর্য্যাই সঙ্গত এবং অর্থগত প্রতিশব্দ শিষ্টতা বা শিষ্টাচার।

সংস্কৃত পণ্ডিতগণের নিকট culture-জ্ঞাপক কোন শব্দ ছিল কিনা ইহা আজ সন্দেহে পরিণত হইয়াছে, নচেৎ কৃষ্টি শব্দকে জোর করিয়া intellectual development অর্থে ব্যবহার করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। যাহা হউক, culture-এর উপযোগী অবস্থা অর্থাৎ যাহার ফলে culture জন্মে তাহা বুঝাইতে সংস্কৃতে শাস্ ধাতু ব্যবহৃত হয়। কবিকল্পদ্রুম মতে শাস্ ধাতুর অর্থ আশীষ, শাসন, দুর্গাদাসের মতে শাস্ ধাতুর অর্থ আশীষ ও ইষ্টসূচক বাক্য এবং মতান্তরে ইচ্ছা (শব্দকল্পদ্রুম ১৪১৮ পৃঃ)। Monier Williams-এর মতে শাস্ ধাতুর অর্থ to rule, govern, command, order, direct, control ; to enact, decree ; to train, instruct, inform, teach ; to report, proclaim ; to correct, punish, chide ; to implore, wish, desire. 2. One who recites, a reciter, repeater ; a worshipper (A Sanskirt-English Dictionary, p. 1003).

Culture শব্দের improvement by mental training বুঝাইতে শাসধাতুনিষ্পন্ন শিষ্ট শব্দ সংস্কৃতে প্রচলিত। মহাভারত অনুসারে শিষ্টের লক্ষণ—"ন পাণি পাদচপলো ন নেত্রচপলো মুনিঃ। ন চ বা অঙ্গচপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণম্॥" (অশ্বমেধপর্ব্ব)। কূর্ম্ম পুরাণ অনুসারে শিষ্টের লক্ষণ—"ধর্ম্মো নাভিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ। তে শিষ্টা ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা নিত্যমাত্মগুণান্বিতাঃ" (২৪ অধ্যায়)। মৎস্যপুরাণ অনুসারে শিষ্টের লক্ষণ—"বিশেষশব্দনিষ্ঠস্তু শেষঃ শিষ্টঃ প্রচক্ষতে। মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ॥ মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসন্তান কারণাৎ তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্ম্মার্থং তান্ শিষ্টান পরিচক্ষতে। তৈঃ শিষ্টৈঃ পালিতো ধর্ম্মঃ স্থাপ্যতে বৈ যুগে যুগে (১২০ অধ্যায়) (শব্দকল্পদ্রুম, ১৫৪৯ পৃঃ)। বোধায়নের মতানুসারে শিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ—"The sishtas are persons who are free from envy, free from pride, contented with a store of grain sufficient for ten days, free from covetousness, and free from hypocrisy, arrogance, greed, perplexity, and anger," "who, in accordance with the sacred law, have studied the veda together with its appendages, who know how to draw inferences from that, (and) who are able to adduce proofs perceptible by the senses from revealed texts [(বোধায়ন ১, ১, ১,৫-৬) (Public Administration in Ancient India, p. 135 by Pramathanath Banerjea, Macmillan & Co. Ltd., London 1916)] শিষ্টশব্দের অর্থে Monier Williams বলেন, "Ordered, commanded, disciplined, well-regulated, educated, trained ; tamed, obedient, docile, orderly, correct, learned, wise, good, select, eminent, excellent, superior, principal, chief, a chief ; a courtier, counsellor (A Sanskrit-English Dictionary, p. 19) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে culture-এর সমস্ত লক্ষণগুলি শিষ্ট শব্দে বর্ত্তমান, তথাপি শিষ্টশব্দ বিশেষণ এবং culture বিশেষ্য। সংস্কৃতে এই বিশেষণ শিষ্ট শব্দ এবং বিশেষ্য আচার শব্দের একত্রযোগে ইংরেজী culture শব্দের ব্যাপকতম অর্থ পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে শিষ্টাচারের লক্ষণে পাওয়া যায়—"ততঃ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। এবং বৈ দ্বিবিধো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে। ত্রয়ী বার্ত্তা

দণ্ডনীতিঃ প্রজা বর্ণাশ্রমেজ্যায়া। শিষ্টেরাচর্যতে যস্মাৎ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ॥ দানং সত্যং তপোঽলোভো বিদ্যেজ্যা পূজনং দমঃ অষ্টৌ তানি চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্॥ শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যেনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ যে। মন্বন্তরেষু সর্বেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ॥ শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ শিষ্টাচারবিরুদ্ধস্তু ধর্ম্মঃ স সাধুসম্মতঃ॥ (১২০ অধ্যায়) (শব্দকল্পদ্রুমঃ, ১৫৪৯ পৃঃ)। Monier Williams-এর মতে শিষ্টাচার শব্দের অর্থ—the practice or traditional usages of the virtuous; well behaved; the approved conduct of the wise and good, good manners, gentlemanly conduct, proper behaviour. (A Sanskrit-English Dictionary, p. 1009)।

শিষ্ট শব্দকে বিশেষ্যে পরিণত করিলেও culture এর অর্থ পাওয়া যায়। Monier Williams-এর মতে শিষ্টতা বা শিষ্টত্ব শব্দের অর্থ docility, good behaviour, urbanity, civility (A Sanskrit-English Dictionary, p. 1009)

শিষ্ট শব্দের যোগে অন্যান্য শব্দেও culture সূচিত হয়। শিষ্টসম্মত approved or loved by the learned. (Manu, III. 39). শিষ্টাচরণ—the conduct or procedure of the virtuous, practice of the good, gentlemanly behaviour (A Sanskrit-English Dictionary, p. 1009)

প্রসঙ্গানুরোধে শাস্ ধাতু নিষ্পন্ন অপর কয়েকটি শব্দের আলোচনা করা যাইতেছে। মেদিনীকোষ অনুসারে শাস্ ধাতু নিষ্পন্ন শাসন শব্দের অর্থ লেখা, শাস্ত্র, শাস্তি (শব্দকল্পদ্রুমঃ, ১৫১৯ পৃঃ)। Monier Williams-এর মতে শাসন শব্দের অর্থ one who instructs, instructing, directing, etc. (f) Ved. an instructress; act of governing, ruling, government; on order, edict, enactment, decree, command, direction; the act of instructing, discipline; a precept; a royal grant, charter; a writing, deed, written contract or agreement; any written book or work of authority, scripture; the control or goverment of the passions, self-control, devotion (A Sanskrit-English Dictionary, p. 1003)। অশোক অনুশাসনে পাওয়া যায় রাজা বা শাসক প্রজাদের পার্থিব উন্নতির জন্যই কেবল মাত্র দায়ী নহেন; কিন্তু নৈতিক উন্নতির (culture-এর) জন্যও দায়ী এবং তজ্জন্য তিনি (অশোক) অনুশাসন লিপিবদ্ধ করাইতেছেন। এই অর্থে শাসন শব্দের অর্থ যদ্দ্বারা cultured হওয়া যায় এবং শাসক শব্দের অর্থ যিনি প্রজাদের culture বিধান করেন।

শাস্ধাতু নিষ্পন্ন শাস্ত্র শব্দের অর্থ "an instrument of directing or teaching, an order, command, rule, precept, institute; religious or scientific treatise, any sacred book or composition of divine or standard anthority applicable even to the Veda, and said to be of fourteen or even eighteen kinds; the word sastra is often found at the end of a compound after the word denoting the subject of the book, or applied collectively to whole departments of knowledge (A Sanskrit-English Dictionary, p. 1003)। এক কথায় বলিতে গেলে তাৎকালিক ভারতীয়গণের পরিজ্ঞাত শিক্ষণীয় সমগ্র বিষয় শাস্ত্র, সুতরাং যাহা কিছু শিক্ষার ফলে cultured হওয়া যায়, অথবা যে শিক্ষা culture গঠন করে তাহা শাস্ত্র। শাস্ত্র শব্দের এরূপ ব্যাপক অর্থের সঙ্গে শাস্ধাতু নিষ্পন্ন শিষ্য শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা একথা বিশেষরূপেই জানিতেন যে কেবল মাত্র পুস্তক-অধ্যয়নে culture জন্মে না, এবং অধ্যয়ন অধীয়ানের সত্তার সহিত সংযুক্ত, এই জন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা শিষ্য কোন বিদ্যার অধিকারী কিনা, কিম্বা আদৌ অধিকারী হইবেন কিনা, বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া শিষ্য অর্থাৎ শাস্ত্র-গ্রহণ ও ধারণক্ষম পুত্র বা আত্মজ স্বরূপ ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতেন, সুতরাং এই অর্থে culture-এর উপযোগী ব্যক্তি শিষ্য। শিক্ষক বা আচার্যের চর্যা বা প্রবুদ্ধ সত্তা শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া শিষ্য ও পুত্র অভেদ। অন্য কথায় বলিতে গেলে পুত্র দেহজাত ও শিষ্য চর্যাজাত সুতরাং পুত্র অপেক্ষাও শিষ্য আচার্যের প্রিয়তর।

এইরূপে আচার্য কেবল মাত্র বেদাধ্যাপক (শব্দকল্পদ্রুম, ৮২ পৃঃ) বা 'one to whom one must have recourse' or 'one who is to be attended to or waited on' or 'one whose precepts are to be followed' or 'one who knows the achara or rules' a spiritual guide or teacher, especially one who invests the student with the sacrificial thread, and instructs him in the vedas, in the law of sacrifice and religious mysteries (মনু ২,১৪০,১৭১)। The title acarya affixed to names of learned men is rather like our Dr. (A Sanskrit-English Dictionary, p. 115) মাত্র নহে, যিনি যমনিয়মাদি দ্বারা দেহ, মন ও বাক্যে সুসংস্কৃত, সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী এবং এইরূপে যিনি বিশেষভাবে চর্যাসত্ত্ব তিনিই আচার্য ও দেবতাস্বরূপ, তিনি ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মদর্শী।

যাহা হউক, এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় culture, সুতরাং অন্যান্য শব্দের বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে ধাতুগতভাবে intellectual development বা civilization অর্থে culture-এর সংস্কৃত প্রয়োগ শিষ্টতা বা শিষ্টাচার, কিন্তু উক্ত অর্থে "চর্য্যা" শব্দও ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে culture-এর অপর প্রতিশব্দগুলিও যথাস্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অব্যবহারে শব্দ আপন শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং পরে সেই ভাষাভাষীদের নিকটও উহা অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়। কবির কথায় বলিতে গেলে "বহুল ব্যবহার ছাড়া এসব শব্দ ভাষায় প্রাণবান হয়ে ওঠেনা" (উত্তরা ৮০ পৃঃ শ্রাবণ ১৩৩৯), সুতরাং culture-এর বহুপ্রচলিত সংস্কৃতমূলক প্রতিশব্দও পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজন হইতেছে।*

—শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

* শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "চর্য্যা" শব্দের সঙ্গতি বিষয়ে তাঁহার মতবিরোধাভাব জানাইয়া লেখককে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

কামরূপশাসনাবলী

বিগত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্টনিবাসী খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ মহাশয় "কামরূপশাসনাবলী" প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজের) বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রচারকল্পে তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার এই মহামূল্য গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতীত ইতিহাসের অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা জানিতে পারিয়া আমরা অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি। কিন্তু, তিনি অনুবাদে এবং পাদ-টীকায় যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। তিনি জীবিত থাকা কালেই ঐ সকল কথার প্রকাশ্য আলোচনা করিয়া মীমাংসা করা আবশ্যক। সুতরাং এই প্রবন্ধে ২।১টি কথার অবতারণা করিতেছি—আশা করি ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাসনগুলি পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের নবম পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানীব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানসমর্থ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ভারতের এই পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে তখন যে ছিল না, রাঢ়ীয়বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় যে পঞ্চগোত্রের কথা আছে, ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণও যে এতদঞ্চলে ছিল, তাহা এই ভাস্করের শাসন হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে"।

এই টীকা দেখিয়া মনে হয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে করেন যে আদিশূর নামক কোন নৃপতি যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকিলেও ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্বামীদের সন্তানগণের মধ্য হইতেই কয়েকজনকে নেওয়াইয়া থাকিবেন, কান্যকুব্জ হইতে নহে।

ইহাতে প্রধানতঃ দুইটি কথা বিচার্য্য—(১) ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসম্পাদনযোগ্যতা ছিল কি না? (২) যজ্ঞসম্পাদনযোগ্যতা থাকিলেও রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহারা হইতে পারেন কি না?

প্রথমতঃ—আমরা ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করিয়াও ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহারও বেদজ্ঞতাসূচক বা যজ্ঞসম্পাদকতাসূচক কোন বিশেষণ খুঁজিয়া পাইলাম না। এমন কি ইঁহাদের কাহারও বিদ্যা বুদ্ধি বা ষট্‌কর্ম্মপরায়ণতাসূচকও কোন বিশেষণ দেখা যায় না। অন্যান্য শাসনগুলিতে সর্ব্বত্রই প্রাপক ব্রাহ্মণদের বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিশদ বর্ণনা আছে। এই অবস্থায় কিরূপে বুঝিব যে ঐ সকল স্বামীর যজ্ঞানুষ্ঠানসামর্থ্য ছিল।

দ্বিতীয়তঃ—যদি বা ইঁহাদের মধ্যে কাহারও যজ্ঞানুষ্ঠানসামর্থ্য ছিলই স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। কারণ, ইঁহাদের বেদ গোত্রাদি এবং তাহাদের গোত্র বেদাদিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কুলপঞ্জিকা তুলিয়া রাখিয়া কেবল তাম্রশাসন দ্বারা বিচার করিলেই এই ভেদ লক্ষিত হইবে। যথা—

কামরূপশাসনাবলীরই ধর্ম্মপাল নরপতির "শুভঙ্করপাটক" লিপিতে আছে—

> "গ্রামঃ ক্রোসঞ্জনামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং যত্র যজ্বনাম্।
> হোমধূমাঙ্ককারাঙ্কং নাবিশৎ কলিকল্মষম্॥
> তৎসম্ভবানাং প্রবরো দ্বিজানা-
> মুদারধীঃ কৌথুমশাখমুখ্যঃ।
> রামোপমঃ সামবিদামখণ্ডঃ
> শাণ্ডিল্যগোত্রোঽজনি রামদেবঃ॥" (কবিতা ১৬।১৭)

এই শ্লোকদ্বয়ে শাসনপ্রাপক হিমাঙ্গের পিতামহের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—তাহার সাদৃশ্য ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে নাই। তাহাতে যে ২।৩ জন শাণ্ডিল্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের কেহই 'কৌথুমশাখমুখ্য' 'সাম-বিদামখণ্ড' ছিলেন না; সকলেই 'বাজসনেয়ী'। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভাস্করবর্ম্মার সময়ে শ্রাবস্তি হইতে সমাগত ব্রাহ্মণসন্তান কেহ কামরূপ পর্য্যন্ত যান নাই।

এই শাসনের অতিরিক্ত আলোচনায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু ভুল করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"সম্প্রদানীভূত ব্রাহ্মণের নিবাস শ্রাবস্তির অন্তর্গত ক্রোসঞ্জ গ্রামে ছিল। এই শ্রাবস্তি নিঃসন্দেহ একটি জনপদ এবং কামরূপরাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী একটি স্থান ছিল।" (পৃঃ ১৬৪)। আমরা কিন্তু শাসনটি পড়িয়া বুঝিয়াছি—শাসনপ্রাপক রথিক হিমাঙ্গের পিতামহ রামদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা (যাহাদের যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন হইয়া কলিকল্মষ প্রবেশ করিতে পারিত না) শ্রাবস্তির ক্রোসঞ্জগ্রামে বাস করিতেন, এইমাত্র বলা হইয়াছে। রামদেব বা তাহার পৌত্র হিমাঙ্গ তখনও (শাসনপ্রদানকালে) শ্রাবস্তির ক্রোসঞ্জ গ্রামে বাস করিতেছিলেন এমন কথা উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে বুঝায় না। বরং এই অন্বয়পরিচয়ে ইহাই বুঝা যায় যে,—হিমাঙ্গ শাসনপ্রাপ্তিকালে ক্ষত্রিয়কর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে যাজ্ঞিক ষট্‌কর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনি যে কামরূপবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র, (শ্রাবস্তি হইতে সমাগত যাজ্ঞিক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সন্তান) তাহাই এই পরিচয়ের উদ্দেশ্য। এই শাসনোক্ত শ্রাবস্তি শব্দের সমর্থনের জন্য কামরূপে একটা শ্রাবস্তি কল্পনার কোন আবশ্যকতা নাই।

শিলিমপুর শিলালিপির শ্রাবস্তি নিয়া শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় গৌড়ে গোণ্ডে যে টানাটানি করিয়াছেন; তাহারও কোন আবশ্যক দেখি না। সেখানেও "বাভ্রাজস্ত" বলিয়া হোমধূমের অতীতকালই কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ লিপিতে প্রশংসিত ব্রাহ্মণ প্রহাসের পূর্ব্বপুরুষেরা পবিত্র হোমধূমযুক্ত শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি গ্রামে বাস করিতেন, পরে তাহারা পুণ্ড্রদেশে বালগ্রামে আসিয়াছিলেন। ইহার ব্যাখ্যার জন্য গৌড়ে বা কামরূপে আর একটা শ্রাবস্তির কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরং কনিংহাম

সাহেব উত্তর কোশলে যে শ্রাবস্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই শ্রাবস্তি যাজ্ঞিক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণদের আবাসভূমি ছিল। কোন এক সময়ে সেই শ্রাবস্তির ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া (আদিশূরের আমন্ত্রণে অথবা বৌদ্ধ বিপ্লবে) গৌড় (বঙ্গে) পুণ্ড্র এবং ক্রমশঃ কামরূপ পর্য্যন্ত গিয়া ব্রাহ্মণেরা ভূমিদানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সকল দিকে সুসঙ্গতি হয়।

শ্রাবস্তি হইতে ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন এই কথা শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন; তবে তাঁহার মতে এদেশে আসিয়া তাহারা তাহাদের বাসভূমির নাম জন্মভূমির নামানুসারে শ্রাবস্তি রাখিয়াছিলেন। (কামরূপশাসনাবলী ১৬৩ পৃঃ)

এখন দেখা গেল—শ্রাবস্তি হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের সন্তান। শুভঙ্কর পাটকলিপি এবং শিলিমপুর শিলালিপি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া কানৌজ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন কেন ইহা বিচার্য্য বিষয় বটে।

ইতিহাসে দেখা যায়—হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে কানৌজাধিপতি যশোবর্ম্মন্ উত্তর ভারতে সম্রাট্ হইয়াছিলেন। কাজেই তখন শ্রাবস্তি অবশ্য তাহার শাসনাধীন ছিল। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকামতে ব্রাহ্মণদের আগমনের তারিখ (বেদবাণাঙ্গ শক) ৭৩২ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ে শ্রাবস্তি হইতে যাহারা আসিয়াছিলেন, তাহারা কানৌজাধিপতির রাজ্য হইতে আসিয়াছিলেন এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ দূরদেশে গেলে বাসস্থানের পরিচয়ে নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানের নামই বলিতে হয়। আমরা ঢাকা বা কলিকাতা গেলে বাড়ী শ্রীহট্টেই বলিয়া থাকি, যদিও আমাদের বাড়ী শ্রীহট্ট সহর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। আবার জাপান বা চীনে গেলে বসতিস্থান কলিকাতাই বলিতে হইবে। সেখানে শ্রীহট্ট বলিলে কেহই চিনিবে না। অষ্টম শতাব্দীতে (রেল জাহাজ বিরহিত দিনে) শ্রাবস্তি এবং বঙ্গের দূরত্বস্থান চীন জাপানের মতনই ছিল। সুতরাং তখন জন্মভূমি শ্রাবস্তি হইলেও কানৌজ অধিপতির রাজ্য হইতে আসিয়া কানৌজ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়াই স্বাভাবিক হইয়াছিল। তাম্রশাসন শিলালিপির ন্যায় দলীলে অপরব্যাবর্ত্তক পরিচয় থাকা আবশ্যক বিবেচনায়ই শ্রাবস্তি, তর্কারি, ক্রোসঞ্জ ইত্যাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখানে আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। কামরূপশাসনাবলীর মধ্যে ভাস্করবর্ম্মার শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া বনমাল বলবর্ম্মা রত্নপাল পর্য্যন্ত কোন শাসনেই দানপ্রাপক ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিয়াছেন ইহার উল্লেখ নাই। ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসন হইতে শাসনপ্রাপক ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে ইন্দ্রপালের সময় একাদশ শতাব্দী। একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহারা সকলেই কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং পূর্ব্ব পরিচয়ের বড় একটা প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই মনে হয়। ইন্দ্রপাল এবং ধর্ম্মপালের সময়ে যখন শ্রাবস্তির ব্রাহ্মণসন্তান প্রাগ্জ্যোতিষে উপস্থিত হইলেন তখনই তাম্রপত্রে পূর্ব্ব পরিচয় লিখা আবশ্যক হইল।

এই সকল তাম্রশাসন দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে কানৌজ হইতে ব্রাহ্মণেরা যে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন এইকথা অস্বীকার করিবার যো নাই। একাদশ শতাব্দীতে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা কামরূপে গিয়াও তাম্রশাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতএব, কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণআনয়নব্যাপারটা কোন প্রকারেই অমূলক হইতে পারে না।

—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব

নিত্যানন্দ স্বরূপ

বর্ত্তমান শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্গশ্রীতে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় "চৈতন্য-জীবনীর উপকরণ" শীর্ষক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার এক স্থলে আছে "বৃন্দাবন দাস স্বয়ং বলিয়াছেন যে নিত্যানন্দ ও স্বরূপ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই তিনি চৈতন্যজীবনী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।" [পৃঃ ১৭]

সুশীলবাবুর এই উক্তি ভুল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে প্রায়ই নিত্যানন্দকে 'নিত্যানন্দস্বরূপ' (=নিত্যানন্দ হইয়াছে স্বরূপ যাহার) বলা হইয়াছে, (আর স্বরূপদামোদরও ঐ গ্রন্থের কুত্রাপি শুধু স্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হয়েন নাই)। যথা—

গৌড়দেশে নিত্যানন্দস্বরূপ পাঠাঞা। রহিলেন নীলাচলে কতজন লঞা॥ [১-১]॥ হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির। নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ শরীর॥ [১-৬]॥ নিত্যানন্দস্বরূপের এই বাক্য মন। চৈতন্য ঈশ্বর মুঞি তাঁর একজন॥ [২-৫]॥ নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ। নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন॥ [৩-৫]॥

সুশীলবাবুর উক্তির মূল বোধ হয় চৈতন্যভাগবতের এই অংশটী—

আর কত লীলা রস হইল যে স্থানে। নিত্যানন্দস্বরূপ সে সব তত্ত্ব জানে॥ তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে। কিছুমাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে॥ [২-২৭]॥

এখানে কাটোয়ার মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং স্বরূপ দামোদরের নাম আসিতেই পারে না।

বৃন্দাবন দাস যে কেবল নিত্যানন্দের আজ্ঞায় চৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি বহুবার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ [১-১]॥ অন্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান। আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥ [২]॥ ইত্যাদি।

অধিক উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র।—শ্রীসুকুমার সেন

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথির বিবরণ ও সমালোচনা

বর্তমান সংখ্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ - শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের 'কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথির বিবরণ ও সমালোচনা।" প্রবন্ধটীর প্রথম পৃষ্ঠায় (অর্থাৎ বঙ্গশ্রী, পৃঃ ৭১২) ভট্টশালী মহাশয় একটী রামায়ণের পুথিতে একটী অশুদ্ধ শ্লোক পাইয়া তাহা যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে শ্লোকটির অর্থবোধ হইল না। তিনি ইহাকে কোন এক বৃক্ষের বর্ণনা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। ইহা দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭ সংখ্যক শ্লোক। দেবগণ সহিত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবানের স্তবের মধ্যে আছে। শ্লোকটীর শুদ্ধ পাঠ এই—

একায়নোঽসৌ দ্বিফল স্ত্রিমূলশ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা। সপ্তত্বগ্ অষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগোহ্যাদিবৃক্ষঃ॥

ইহা কোন প্রাকৃত বৃক্ষের বর্ণনা নহে, এই শ্লোকে বিশ্বপ্রপঞ্চকে রূপকভাবে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।—শ্রীসুকুমার সেন

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাঙের চাষ

আমেরিকায় ব্যাঙ্‌পালন একটি লাভজনক ব্যবসায়। কোলাব্যাঙ্ জাতীয় এক প্রকারের বড় ব্যাঙ্ আমেরিকায় অতি সুখাদ্য বলিয়া গণ্য হয় এবং প্রায় চার পাঁচ কোটী সবুজ কোলাব্যাঙ্ বৎসরে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আমেরিকার অনেক স্থানে লোক কোলাব্যাঙ্ পালন করিয়া থাকে। কোলাব্যাঙের ঠ্যাং ছাড়া দেহের অন্য কোন অংশ খাদ্যরূপে পরিগণিত হয় না—একজোড়া ঠ্যাং বাজারে ৩০ সেণ্ট হইতে ৫০ সেণ্ট মূল্যে বিক্রীত হয়—সুতরাং অর্থের দিক হইতে দেখিতে গেলে ব্যাঙ্‌পালন, —গরুপালন, মুর্গীপালন প্রভৃতি ব্যবসায় হইতে মূল্যবান।

বড় বড় ফার্ম্মে ব্যাঙ্‌পালন তো করা হয়ই, তা ছাড়া মিসিসিপি, ফ্লোরিডা অঞ্চলে একদল লোক আছে, ব্যাঙ্-শিকারই তাদের উপজীবিকা। আমেরিকার এই অঞ্চলে জলাভূমি অত্যন্ত বেশী, বিশেষতঃ এভারগ্লেড্‌স্ অব ফ্লোরিডা, **Everglades of Florida** একটি অত্যন্ত সুবৃহৎ ও সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি। ফ্লোরিডাতে যে ব্যাঙ্ পাওয়া যায়, তা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু—ফার্ম্মে চাষ করিলেও অত বড় ব্যাঙ্ কিছুতেই জন্মাইতে পারা যায় না—বা অত সুস্বাদুও হয় না—এইজন্য বাজারে বন্য ব্যাঙের দাম বেশী। এক এক রাত্রিতে এই সব ব্যাঙ্‌শিকারীরা চার হইতে দশ ডলার রোজগার করে।

সবুজ কোলাব্যাঙই পালনের উপযুক্ত, শীঘ্র শীঘ্র ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং ইহারা সহজে রোগগ্রস্ত হয় না। মিসিসিপি অঞ্চলের বন্য ব্যাঙের আকার ইহার প্রায় দ্বিগুণ হইলেও বন্দী অবস্থায় তাহাদের বংশ আশানুরূপ বাড়ে না। শীঘ্র শীঘ্র মারাও পড়ে। এক বৎসর বয়সের ব্যাঙের মাংস অতীব নরম ও স্বাদু। ইহার বেশী বয়স হইলে মাংস সহজে সিদ্ধ হয় না ও রং আর শাদা থাকে না। মিসিসিপি অঞ্চলের ব্যাঙ্‌কে এই এক বৎসরই বাঁচাইয়া রাখা অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর সবুজ কোলাব্যাঙ্ অনায়াসেই পাঁচ ছয় বৎসর [illegible] এই জন্য ফার্ম্মে সবুজ কোলাব্যাঙ্ ছাড়া অন্য জাতীয় ব্যাঙের চাষ হইতে বড় একটা দেখা যায় না। কালিফোর্নিয়া অঞ্চলের ব্যাঙ্ সুস্বাদু বটে, পালনের সুবিধাও আছে কিন্তু আকারে ইহারা অত্যন্ত ছোট বলিয়া বাজারে অত্যন্ত কম দামে বিকায়।

বন্য কোলাব্যাঙ্ দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ বিশ বাইশ ইঞ্চি হয় এবং ছয় সাত বৎসরের মধ্যে ওজনে প্রায় দু'সের আড়াইসের হয়—কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর সবুজ কোলাব্যাঙ্ ডিম হইতে বাহির হইবার এক বৎসর পরে আধ সের ওজনের হইয়া থাকে—এবং সেই সময়ই ইহাদের মাংস বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ-মূল্যে বিক্রীত হয়—বয়স বাড়িলে ব্যাঙের দাম কমিয়া যায়।
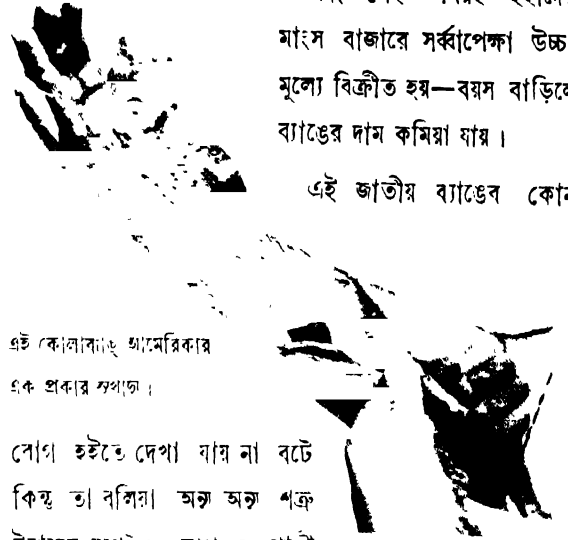
এই কোলাব্যাঙ্ আমেরিকার এক প্রকার সুখাদ্য।

এই জাতীয় ব্যাঙের কোন রোগ হইতে দেখা যায় না বটে কিন্তু তা বলিয়া অন্য অন্য শত্রু ইহাদের যথেষ্ট। সাপ ও পাখী এই দুটি ব্যাঙের ভীষণ শত্রু—ইহাদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য অনেক তোড়জোড় করিতে হয়—লোহার জাল্‌তির বেড়া দিয়া চারিপাশে ও উপরে ঘিরিয়া দিতে হয়—অনেক সময় তাহাতেও রক্ষা হয় না—র‍্যাট্‌ল্ সাপ ইহাদের একবার সন্ধান পাইলে যেরূপে হৌক আক্রমণ করিবেই—সেজন্য বেড়ার নীচে খানিকটা কংক্রিটের গাঁথুনি রাখিতে হয়। আমেরিকাতে ব্যাঙ্‌পালন-ব্যবসায় দিনে দিনে বাড়িতেছে—কারণ আজকাল শুধু আমেরিকায় নয়, ইউরোপের লোকেও ব্যাঙের আস্বাদ পাইয়া মজিয়াছে—ইউরোপের সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া ফ্রান্স ও ইটালিতে ব্যাঙের চাহিদা যথেষ্ট।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন উদ্যমশীল যুবক সম্প্রতি ব্যাঙ্‌পালন ব্যবসায়ে মন দিয়া নিজের অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছেন। মিসিগান ষ্টেটে ইঁহার পৈত্রিক ভিটা। সেখানে নিজেদের জমিজমা কিছুই ছিল না।

এই হাত জাল দিয়া ব্যাঙ্‌ ধরা বড় সহজ ব্যাপার নয়।

বাড়ির কাছে খানিকটা জলাজমি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া ছিল—চারিধার বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ভদ্রলোক এই জমিটুকু বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া এখানেই ব্যাঙের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন।

নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন:—জলাজমিটুকু বন্দোবস্ত করে নিয়েই লুইসিয়ানা থেকে পঞ্চাশ জোড়া পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় কোলাব্যাঙ এনে ছেড়ে দিলাম সেখানে। তাদের রং ছিল নানা রকম—কারুর ফিকে সবুজ, কারুর বা ঘন সবুজ—আবার কারুর সবুজের সঙ্গে একটু মেটে রং মেশানো। ছায়া না পেলে ব্যাঙ্‌ বাড়তে পায় না, এজন্য জলের ধারে বেশ ঘন করে বন্য উইলো পুঁতেছিলাম—কিন্তু উইলো গাছ বাড়তে তো সময় নেবে, ততদিন কি করবো? ভেবে ভেবে দেখলাম উইলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে রেড়ির গাছ পোতা সবচেয়ে প্রশস্ত, কারণ রেড়ির গাছ বাড়বে খুব তাড়াতাড়ি। রেড়ির গাছ পুঁতে দিতে মাস দুই তিনের মধ্যে দশ বারো ফিট লম্বা হয়ে পড়লো বটে কিন্তু একটু অসুবিধাও লক্ষ্য ক'রলাম। উইলো গাছে যেমন পোকা মাকড় এসে বসে—রেড়ির গাছে তা আসে না—অথচ পোকা মাকড় ব্যাঙের অতি প্রধান খাদ্য।

এদের খাবারের জন্যে ছোট ছোট কুচো মাছ অনেক ছেড়ে দিলাম ডোবাতে। আমি দেখেছি চিংড়ি মাছ ও কাঁকড়া ছাড়াই ভাল। ওদের দেহের শক্ত আবরণের জন্যে ব্যাঙেরা ওদের খেতে পারে না কিন্তু ওদের ডিম ও ছানা খেয়ে বাঁচে। এতে মূলধন নষ্ট হয় না, সুদেই কারবার চলে যায়।

ব্যাঙ ডিম ছাড়ে সাধারণতঃ মে মাসের প্রথমে—ডিম তখনি আলাদা করে রাখ্‌তে হয়। আমি কাছেই একটা চৌবাচ্চা গাঁথিয়ে সেখানে ডিম রেখে দিয়েছিলাম, ব্যাঙাচি না বেরুনো পর্য্যন্ত। আলাদা করে না রাখ্‌লে ব্যাঙেরাই নিজেদের ডিম খেয়ে ফেলে এ ছাড়া অন্যান্য শত্রুও যথেষ্ট। ব্যাঙাচি বার হয়ে গেলে তাদের ময়দার গুঁড়ো খেতে দিয়ে উপকার পেয়েছি—এতে খুব শীঘ্র বাড়ে। রাত্রে জলার ধারে আলো জ্বালিয়ে রাখ্‌লে অনেক পতঙ্গ এসে আলোর চারি পাশে উড়ে পড়ে—ব্যাঙের দল সারারাত ধরে ধরে খায়—এতে খাবার জোগাড় করবার পয়সা বেঁচে যায়।

মদ্দা ব্যাঙের চোখের পাশের বড় বড় কান দুইটা দেখিবার মত: মাদী ব্যাঙের কান এত বড় হয় না।

ডিম ফুটে বার হবার দু'বছর পরে সাধারণতঃ আমি ব্যাঙ্‌ বাজারে পাঠাই—তখন তিন পোয়া থেকে এক সের পর্য্যন্ত এদের ওজন হয়। এদের বংশ এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে, শুনলে অবাক হয়ে যেতে হবে। আমার এক বন্ধু মাত্র

একজোড়া কোলাব্যাঙ্‌ ও ছোট একটা ডোবা নিয়ে প্রথম ব্যবসা সুরু করে, এই যে মাসের শেষে ডোবাতে বিশ হাজার ব্যাঙ্‌ হয়েছে, ছোট ডোবাটাতে সে আর এদের স্থান সঙ্কুলান

অনেকেই ইহার মধ্য হইতে ব্যাঙটিকে খুঁজিয়া পাইবেন না ; একেবারে ঠিক মধ্যখানে সে লুকাইয়া আছে।

কর্ত্তে পারচে না—আবার আগামী বৎসরে যে মাসে যখন এরা ডিম ছাড়বে, তখন ভাবুন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে !

কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে গিরগিটি জাতীয় একপ্রকারের প্রাণী বাস করিত। এখন তারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পৃথিবীর সব দেশের যাদুঘরে রক্ষিত আছে, একথা আজকাল স্কুলের ছেলেরাও জানে। কিন্তু একটা জিনিষ হয়তো অনেকেরই জানা নাই—সেটা এই যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় গিরগিটিদের বংশধর আজও পৃথিবীতে আছে—এবং তারা নিতান্ত ছোট নয়।

বালিদ্বীপ হইতে অল্পদূরেই কোমোডো—ইহা সাণ্ডা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর এই অঞ্চলে মাটীর নীচে আগ্নেয় উৎপাৎ লাগিয়াই আছে, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি এ অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলিলেও চলে—পৃথিবীর দৈনন্দিন ভূকম্পের অধিকাংশের উৎপত্তি-স্থান এই অঞ্চলে। এখান হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ছোট বড় দ্বীপের উৎপত্তিও এই আগ্নেয় উপদ্রব প্রসূত। এই কোমোডো দ্বীপেই উপরোক্ত শ্রেণীর অদ্ভুত ধরণের গিরগিটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে একটা কথা আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সব অতিকায় সরীসৃপের কাহিনী মানুষের মনে এমন একটা বিস্ময় ও মোহের সৃষ্টি করিয়াছে যে, বহুকাল হইতেই এদের লইয়া নানা আজগুবি গল্প প্রচলিত আছে। অধিকাংশ গল্পের বক্তব্য এই যে, এইসব অতিকায় সরীসৃপ এখনও পৃথিবীতে আছে—মানুষে তাহাদের লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম বনভূমির মধ্যে, কখনও বা মধ্য আফ্রিকার, কখনও বা ভারতবর্ষের। আর্থার কোন্যান্‌ ডয়েলের লস্ট ওয়ার্ল্ড্‌, 'Lost World' নামক উপন্যাস ও এইচ, জি, ওয়েল্‌সের ইন দি অবজারভেটরি, 'In the

কোমোডো দ্বীপের তাল গাছ : যে লোকটি উঠিতেছে তাহার অবস্থা চিন্তনীয়।

Observatory' নামে ছোট গল্প এই বিষয় লইয়া লেখা। গত শতাব্দীর শেষভাগে, এমন কি বিংশশতাব্দীর প্রথমেও লোকে এই ধরণের কথা বিশ্বাস করিত। কিন্তু

আজকাল ভৌগোলিক তত্ত্বে আর রোমান্সের অবকাশ নাই। মেরুপ্রদেশের চারিধারে দেবলোকের ন্যায় অদ্ভুত দেশ যে নাই

কোমোডো দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

কম্যাণ্ডার বার্ড বা জেনারেল নোবিলের কৃপায় এখন সেকথা সকলেই জানে।

তাই কোমোডো দ্বীপের গিরগিটির কথা প্রথমে লোকে অবিশ্বাস করিত। কোমোডো দ্বীপে সভ্যমানুষের যাতায়াত ছিল না বলিলেই হয়—কচিৎ এক আধ-জন নাবিক বা ভবঘুরে কি করিয়া ঐ দ্বীপে গিয়া পড়িয়াছিল কে জানে—তাহারাই ফিরিয়া আসিয়া গল্পটা প্রচার করে। সবাই শোনে বটে কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। অবশেষে ১৯১২ সালে একজন ডাচ্ বৈজ্ঞানিকের কাছে খবর পাওয়া গেল যে কথাটা সত্য—এত বড় গিরগিটি সত্যই সেখানে আছে।

এর বছর কয়েক পরে যুক্তরাষ্ট্রের মিউজিয়াম অব ন্যাচুরাল হিষ্ট্রি, Museum of Natural History-র তরফ থেকে একটা দল কোমোডো দ্বীপে রওনা হয়, তারা যে শুধু কোমোডো দ্বীপের গিরগিটির বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্যই গিয়াছিল তাহা নয়—পৃথিবীর ওই দিকটা ছিল অনেকটা অজ্ঞাত, ওখানকার সমুদ্র, পাহাড় ও অরণ্যে কত অজ্ঞাত ধরণের প্রাণী আছে তাদের নমুনা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছাও ছিল ইঁহাদের।

ইঁহারা অনেকগুলি ফটো তুলিয়া আনেন ও অঞ্চলের, ফটোগুলি অতি মূল্যবান। এই ফটোগুলির সাহায্যে পৃথিবীর একটি অপরিচিত অন্ধকার কোণ আমাদের নিকট পরিচিত আলোকময় হইয়া উঠে—বিচিত্র পৃথিবী আমাদের চোখে আরও বিচিত্র ও লীলাময়ী হইয়া প্রতিভাত হন—সাগর পারের কোন্ সুদূর দেশের পাহাড়, নির্জ্জন সৈকতভূমি, তালীবন, ঘন অরণ্য আমাদের কোলাহলমুখর প্রাণকে ক্ষণকালের জন্য শান্ত ও উদাস করিয়া তুলে।

বালি ও কোমোডো একই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এদের মধ্যে প্রভেদ অনেক। শুধু এই দুই দ্বীপের বলিয়া নহে, এ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেকার কোন দ্বীপের সঙ্গে কোনটার মিল নাই—কি লোকজন, কি ধর্ম্ম, কি প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সংস্থান,—এক একটার এক একরকম।

বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত, অধিবাসীদের চেহারা সুশ্রী,

অতিকায় গিরগিটিদের মৃত শূকর ভক্ষণ।

শিল্প ও সভ্যতা উন্নত। বালিদ্বীপে ভাল চাষবাস হয়, বিশেষ করিয়া ধানের চাষ খুব বেশী। কিন্তু কোমোডো দ্বীপে লোকজন বেশী বাস করে না, দ্বীপটি আগ্নেয়-পর্ব্বতসঙ্কুল ও বনময়—চাষবাস তো দূরের কথা, কোমোডো দ্বীপে স্থায়ী বাসিন্দা লোক নাই বলিলেই চলে। এখানকার ঘন অরণ্যের

কোমোডো হইতে নিষ্কাসিত গিরগিটি।

মধ্যে হরিণ, বন্য বরাহ, মহিষ ও নানা জাতীয় বিচিত্র বর্ণের পাখী প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় না যে দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ এত দুর্গম। বেলাভূমি অতি সুন্দর ও তাল নারিকেল গাছের প্রাচুর্য্যে স্বপ্নময়, কিন্তু দ্বীপের ভিতরে কিছু দূর গেলেই কেবলই ছোটখাটো পাহাড়, কাঁটাবন ও বড় বড় ঘাসের জঙ্গল। অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে হয়, তা ছাড়া বিষধর সর্প তো যেখানে সেখানে—সাবধানে চলাফেরা না করিলে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসাই দুষ্কর।

সব দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দ্বীপটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীসৃপের বর্ত্তমান বংশধরদিগের উপযুক্ত বাসভূমি বলিয়া মনে হয় বটে।

ইঁহারা অবশ্য দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই এই গিরগিটির সন্ধান পান নাই। কারণ তাহারা মানুষকে দেখা দিবার অপেক্ষায় কাতারে কাতারে বসিয়া নাই। বহু কষ্টে, বহু টোপ্ ফেলিয়া, ফাঁদ পাতিয়া, বহুবার অকৃতকার্য্য হইবার পরে তবে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু শেষকালে এত বেশী ফাঁদে পড়িতে থাকে যে ইঁহারা বাছিয়া বাছিয়া মিউজিয়মের উপযুক্ত কতকগুলি রাখিয়া বাকীগুলি ছাড়িয়া দেন।

এই গিরগিটির বৈজ্ঞানিক নাম **Varanus Komodoensis**—সাধারণতঃ ইহাদের দৈর্ঘ্য দশ ফুট ও ওজন সাড়ে চার মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এক একটা এর বেশীও হয়। ডাচ বৈজ্ঞানিক Ouwens সাড়ে বারো ফুট লম্বা ও প্রায় পাঁচ মণ ওজনের একটি গিরগিটি দেখিয়াছিলেন।

গিরগিটি নাম শুনিয়া যেন কেহ ভুল না করেন যে বোধ হয় ইহারা আমাদের গৃহবাসী গিরগিটির একটু বড় সংস্করণ মাত্র। আসলে ইহারা অত্যন্ত হিংস্রস্বভাব, নির্দ্দয় ও ক্রূর প্রকৃতির। মানুষ দেখিলে অনেক সময় তাড়া করিয়া আসে—অনেক বন্য জন্তু ইহাদের দেখিলে ভয়ে পালায়। ইহাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্ব্বপুরুষদের মত ইহারা শিকার ধরিয়া করাতের মত ধারালো দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া এক এক গ্রাসে মাংসের বড় বড় টুকরা অধীর ও ব্যগ্রভাবে গিলিতে থাকে—তখন তাহাদের মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর দেখায়।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা **Eocene** যুগে, অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় দুই কোটী বৎসর পূর্ব্বে এই জাতীয় গিরগিটির সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু **Eocene** যুগের পূর্ব্বের শিলাস্তরে ইহাদের আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতেই মনে হয়

বন্দুকের গুলিতে হত গিরগিটি।

ঐ সময়ে উহারা প্রথমে আবির্ভূত হয়। সুতরাং কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি যে পৃথিবীর অতি বনিয়াদী বাসিন্দা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয়

এই জন্তুটিকে ধরিতে বহু মাল-মশলা খরচ করিতে হইয়াছে

দাঁড়াইয়াছে এই যে, কোমোডো দ্বীপ অপেক্ষাকৃত আধুনিক—পণ্ডিতেরা বলেন, মাত্র কয়েক লক্ষ বৎসর সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয় উপদ্রবের ফলে ইহার জন্ম—শুধু ইহারা নহে, তাবৎ সাণ্ডাদ্বীপ পুঞ্জটিরই উৎপত্তি এইভাবে ও প্রায় একই কালে ঘটে—এত প্রাচীন যুগের প্রাণী এই অপেক্ষাকৃত নবীন দ্বীপে কি করিয়া আসিল? এ সমস্যার মীমাংসা এখনও হয় নাই।

কোমোডো দ্বীপের নিকটে উইটার নামে আর একটা দ্বীপ আছে—সেটা আরও অরণ্যময়, আরও পাহাড় পর্ব্বতে ভরা। উইটার দ্বীপের অভ্যন্তরে সভ্য মানুষে এখনও যায় নাই, সেখানে কি আছে কেহ জানে না। তবে যতদূর জানা গিয়াছে এই জাতীয় অতিকায় ড্রাগন গিরগিটি ওখানে নাই। উইটার দ্বীপের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে অল্পসংখ্যক অসভ্য পাপুয়ান্ অধিবাসী নারিকেল পাতার কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করে ও প্রধানতঃ মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এই দুই দ্বীপ হইতে **Museum of Natural History**-র দলটি অনেক সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী সংগ্রহ করিয়া আনেন। চৌদ্দটি অতিকায় গিরগিটি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটিকে জীবন্ত অবস্থায় আনা হয়। অতিকায় গিরগিটি শিকার করা বড় শক্ত, ইহাদের গাত্রাবরণের নীচে কঠিন হাড়ের পাত সাজান আছে, বন্দুকের গুলি ছাড়া সহজে মারা যায় না।

আর এক দিক

লিটন ষ্ট্র্যাচি সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জীবনকথায় লিখিয়াছেন—ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের রাগ হইলে ঘর বন্ধ করিয়া থাকিতেন। একদিন ভিক্টোরিয়া আর আলবার্টে কথা কাটাকাটি হইয়াছে। আলবার্ট চিরাচরিত প্রথা মত গিয়া ঘরে খিল দিয়াছেন। রাগে গস গস্ করিতে করিতে ভিক্টোরিয়া আসিয়া দ্বারের কড়া নাড়িলেন। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—'কে?'—জবাব হইল—'ইংলণ্ডের রাণী?' ঘরের ভিতর হইতে আর কোন শব্দ হইল না। দোরও কেহ খুলিল না। আবার ভিক্টোরিয়া কড়া নাড়িলেন। ঘরের ভিতর হইতে পুনরায় প্রশ্ন আসিল। পুনর্ব্বার একই জবাব হইল। তার পর খানিক চুপ চাপ; কিছু পরে দোরের কড়া ঈষৎ নাড়িয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে আবার প্রশ্ন শোনা গেল—'কে?'—এবারে বাহির হইতে জবাব হইল অন্য প্রকার—'আমি আলবার্ট! তোমার স্ত্রী,—'

তৎক্ষণাৎ ঘরের দোর খুলিয়া আলবার্ট বাহিরে আসিলেন।

রাজরাজেশ্বরী

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এমনি দুর্ভাগা মেয়ে,—ছ'মাস পার হইতে না হইতেই মা মরিয়া গেল। মরিবার কথা মা তাহার নিশ্চয়ই জানিত না, তাই এই পড়ন্ত বয়সের মেয়েটির সে নাম রাখিয়া গিয়াছিল—রাজরাজেশ্বরী।

বাপের বয়স হইয়াছে। মায়েরও হইয়াছিল। কাজেই এই মেয়েটার শুভাগমন একপ্রকার অপ্রত্যাশিতই বলিতে হইবে। এবং অপ্রত্যাশিত বলিয়াই বোধকরি তাহার আদরের যেন আর সীমা নাই।

অথচ পরেশনাথের ওই অত বড় ছেলে বর্ত্তমান, ছেলের বৌ···। দেখিতে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে।

ছেলে কিছু বলে না। কিন্তু বৌ বলে। বলে:

'বুড়ো মিন্‌সের কাণ্ড ত্যাখো দেখি! মেয়ে মান্‌ষের মত পা ছড়িয়ে বসে' ঝিনুক্ দিয়ে মেয়েকে দুধ খাওয়াচ্ছে। লোকে দেখলে হয়ত আমাকেই দোষ দেবে। বলবে, বৌ হয়ত কিছু দেখে না।'

তা মেয়ে লইয়া যে-রকম তিনি করেন, খানিকটা দোষ বৌ-এর ঘাড়ে আসিয়া পড়াই স্বাভাবিক।

পরেশনাথ ঘরে বসিয়া হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করেন। তিন ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে সেদিন একটা 'ডাক্' আসিয়াছিল, ডাক্তারবাবু রুগী দেখিতে গেলেন—আদরিণী কন্যা রাজরাজেশ্বরীকে কাঁধে লইয়া।

দৃশ্য দেখিয়া লোকজনের চোখ দিয়া জল আসে। বলে, 'আহা বেচারার কষ্টের আর সীমে নেই।'

পরেশনাথ বলেন, 'কি আর করি বল, আমার কাছ ছাড়া মেয়েটা কোথাও আর থাকতে চায় না।'

কথাটা মিথ্যা নয়।

পরেশনাথ তাঁহার বাড়ী হইতে একটুখানি দূরে তাঁহার সেই ছোট ডিস্‌পেন্সারী-ঘরে বসিয়া হয়ত রোগী দেখিয়া ঔষধ দিতেছেন, মেয়েটা চুপ করিয়া চৌকাঠের কাছে বসিয়া আছে। ঔষধ আনিবার জন্য পরেশনাথকে শহরে যাইতে হইবে, মেয়েটা ঝোঁক ধরিয়া বসিল সেও যাইবে। বৌ হয়ত তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কোলে লইয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিল, 'ছি রাজু, আমার কাছে কি থাকতে নেই? আমি তোমায় কত ভালবাসি···চল, আজ আমরা দুই ননদ-ভাজে পুকুরের ঘাটে গিয়ে সাবান মেখে গা ধুয়ে আসি, কেমন? মাথায় সুগন্ধ তেল দিয়ে দেবো, ভালো ভালো গয়না পরিয়ে দেবো—আঃ, ছিঃ, কিছুতেই কোলে থাকবি না? যা তবে বাপু তোর যেখানে খুশী যা, আমি আর কি করব বল্।'

কাঁদিয়া কাটিয়া বৌ-এর চুল ধরিয়া টানিয়া শেষ পর্য্যন্ত রাজু তাহার কোল হইতে নামিয়া পড়িল। তখন সে বেশ হাঁটিতে শিখিয়াছে। মুখে কথা ফুটিয়াছে। ছুটিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরেশনাথের পিছন ধরিল।

পরেশনাথ তাহাকে কোলে করিয়া আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'পারলে না বৌমা একে আগ্‌লে রাখতে?'

বৌ বলিল, 'কিছুতেই থাকলো না।'

'যাই তাহ'লে ওকে নিয়েই শহরে যেতে হবে দেখছি! দাও তাহ'লে সেই ছোট বোতলটিতে একটুখানি দুধ পুরে দাও, পথে ক্ষিদে পেলে একবার খাবে।'

বৌ তৎক্ষণাৎ বোতলে দুধ ঢালিতে বসিল।

পরেশনাথ মেয়েকে তাঁহার বুকের উপর তুলিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ছোট ছেলে হ'লে কি হবে, কে ওকে ভাল বাসে না বাসে ও ঠিক বুঝতে পারে। রাজুকে তুমি একটুখানি ভাল যদি বাসতে বৌমা তাহ'লে ও ঠিক তোমার কাছেই থাকতো।'

ছলাৎ করিয়া বৌমার হাত হইতে একটুখানি দুধ মাটিতে পড়িয়া গেল। রাজুকে সে ভালবাসে না সে কথা তাহার পরম শত্রুও কোনদিন বলিতে পারিবে না। আহা, মা-মরা ওই কচি মেয়েটা··! তাহার নিজেরও যে মা নাই! রাজুর কথা ভাবিয়া এক-একদিন সে নির্জ্জনে চোখের জল ফেলিয়াছে। অথচ শ্বশুরের ধারণা—তাহাকে সে ভালবাসে না।

দুধ-ভর্ত্তি বোতলটি সে শ্বশুরের পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'ভাল আপনার রাজুকে সবাই বাসে, কিন্তু কারও ভালবাসা ও নেয় না। ও আপনার এক অদ্ভুত মেয়ে।'

পরেশনাথ একহাতে রাজুকে তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া, আর এক হাতে দুধের বোতলটি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'শুধু মুখের কথায় আমাকে তোমরা বোঝাতে পারবে না বৌমা, ওকে যে তোমরা কত ভালবাসো তা আমি জানি।' বলিয়া তিনি গজ্ গজ্ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দেখিয়া মনে হইল তিনি রাগিয়াছেন।

পরেশনাথের একমাত্র পুত্র সুবোধ তখন বাড়ী ছিল না। দুপুরে বাড়ী যখন ফিরিল, দেখিল—তাহার স্ত্রী তখন রান্নাবান্না শেষ করিয়া ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

সুবোধ বলিল, 'কি গো মালতীমালা, অমন করে' শুয়ে যে?'

মালতীমালা উঠিয়া বসিল। বলিল, 'তোমার ওই বাচ্চা বোনটিকে নিয়ে বাবা আজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করে' গেছেন।'

সুবোধ একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল। বলিল, 'কোথায় গেছেন তাঁরা?'

মালতী হাসিয়া বলিল, 'ওই কচি মেয়েটাকে নিয়ে শহরে গেছেন ওষুধ আনতে। আমার কাছে মেয়েটা থাকলো না কিছুতেই। বাবা বললেন—তোমরা ওকে ভালবাসো না, ভালবাসলে থাকতো।'

সুবোধ বলিল, 'বলুক্‌গে. তুমি চুপ করে' থেকো।'

মালতী চুপ করিয়াই ছিল।

দুপুর গড়াইয়া গেলে মেয়েটাকে লইয়া পরেশনাথ শহর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া সেই পড়ন্ত বেলায় স্নানাহার করিয়া রাজুর সঙ্গে শুইয়া শুইয়া তিনি গল্প করিতেছিলেন।

গল্প না ছাই! রাজরাজেশ্বরীর গল্প করিবার বয়স তখনও হয় নাই।

পরেশনাথ বলিতেছিলেন, 'রাজুর আমাদের বিয়ে দেবো এক রাজার বাড়ী, রাজু আমার রাজরাণী হবে, কত দাস দাসী, কত চাকর চাকরাণী থাটবে, আমাদের তখন রাজু আর চিনতে পারবে না,—কেমন?'

রাজু কি বুঝিল কে জানে, তাহার বাবার মুখের পানে তাকাইয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পরেশনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা রাজু, বল ত' মা কে তোমায় সবচেয়ে বেশী ভালবাসে?'

ইহার জবাব পরেশনাথ তাহাকে বহু পূর্ব্বেই শিখাইয়াছিলেন। যে ই জিজ্ঞাসা করুক্—রাজু বলে, 'বাবা।'

সেদিনও সে তাহাই বলিল।

পরেশনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর তোমার দাদা?'

রাজু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ!'

'আর বৌদি? বৌদিদি তোমাকে ভালবাসে না, না?'

রাজু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

পরেশনাথ আপন মনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'তা আমি জানি। বৌদিদি তোমায় মারে, না?'

রাজু তাহার মাথাটি ঈষৎ কাৎ করিয়া বলিল, 'হুঁ, বোডি মালে।'

ওদিকে কোঠাঘরের উপরে সুবোধকে একটা ঠেলা দিয়া মালতী বলিল, 'শুনছো?'

সুবোধ বলিল, 'হুঁ।'

মালতী বলিল, 'শোনো। মেয়েকে ওই সব উনি শেখাচ্ছেন বসে' বসে'।'

সুবোধ তাহার জবাব না দিয়া ঘুমাইবার ভাণ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

পুরুষ মানুষ,—বিরক্ত না হইয়া আর কতক্ষণ থাকে। মেয়েটাকে চব্বিশ ঘণ্টা কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেদিন না জানি কোথায় কেন কি ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল, পরেশনাথ বাড়ী ফিরিয়াই টিপ্ করিয়া মেয়েটাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বাবারে,

বাবারে, আর পারি না বাবা! তুইও ত' সেই সঙ্গে গেলেই পারতিস্ রাজু,—তোর মার সঙ্গে!'

এই বলিয়া তিনি তামাক সাজিতে বসিলেন।

বলিলেন, 'একটুখানি তেল দাও ত' বৌমা, স্নানটা সেরে' আসি।'

তেল মাখিয়া তিনি স্নান করিতে যাইবেন, রাজু তাহার পিছু-পিছু গুট্ গুট্ করিয়া চলিতে লাগিল।

মালতী খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল, 'আজ আমি তোকে জোর করে' ধরে' রাখব, দেখি তুই কেমন করে' যাস্।'

পরেশনাথ বলিলেন, 'হঁ্যা বৌমা, রাখো ত'—রাখো ত' ওকে ধরে'। আর পারি না বাপু।'

বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু মেয়েটাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া মালতী বড় বিপদে পড়িল। আদর সোহাগ ভালবাসা কিছুই সে চায় না,—সে শুধু ঝাঁপাইয়া ঝাঁপাইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার বাবার পিছু পিছু যাইতে চায়!

শেষে সে এমন চীৎকার সুরু করিয়া দিল, মনে হইল যেন দম বন্ধ হইয়া এখনই মারা পড়িবে।

সুবোধ বাড়ীতেই ছিল। বলিল, 'আর কেন ওকে কাঁদাচ্ছ বল ত'! দাও না ছেড়ে। যাক্ ও যেখানে যাবে চলে' যাক্।'

মালতীরও রাগ হইয়াছিল। রাজুকে সে সত্যই ছাড়িয়া দিল। বলিল, 'যা তবে মর্‌গে—কোথায় যাবি যা, আমার আর দোষ নেই।'

স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে মেয়েটাকে কোলে লইয়া পরেশনাথ একেবারে মারমূর্ত্তি হইয়া ঘরে ঢুকিলেন। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'বৌমা!'

মালতী ছিল রান্নাঘরে। চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

পরেশনাথ বলিতে লাগিলেন, 'বা বা বা বা বা বা, বলিহারী, বলিহারী! মেয়েটাকে ধরে রাখছি বলে' দিব্যি নিশ্চিন্ত আমাকে বিদেয় করে' দিয়ে—বাস্, দিয়েছ ছেড়ে! গুড়্ গুড়্ করে' গড়িয়ে যদি পুকুরে পড়ে' যেতো! যদি ডুবে মরতো! তা মরতো ত' মরতো—তোমাদের কি!'

মালতী কি একটা কথা বলিয়া যেন প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু পরেশনাথ আবার হাত নাড়িয়া এমন ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। বলিলেন,—'থামো থামো, খুব হয়েছে, আমাকে আর তোমায় বলে' বোঝাতে হবে না বৌমা, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি।'

সুবোধ বাড়ীতেই ছিল। রাজু যে বৌ-এর কাছ হইতে জোর করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা সে জানে, অথচ বাবা সেকথা অবিশ্বাস করিতেছেন। সুবোধ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, 'বৌ-এর দোষ নেই বাবা, রাজি নিজে কেঁদে কেঁদে—'

পরেশনাথ বলিয়া উঠিলেন, 'তুই ত' তা বল্‌বিই রে! রাজি একেবারে মস্ত মন্দ মেয়ে তাই বৌমা তাকে আট্‌কে রাখতে পারলে না। এই ত' কথার মত কথা! বাঃ বলিহারি!'

সেই দিন হইতে পরেশনাথের কি যে হইল, কথাটা কিছুতেই তিনি আর ভুলিতে পারিলেন না। মালতীর নামে দোষ দিয়া যেখানে সেখানে শুধু ওই এক কথাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৌমা যদি একটুখানি দেখতো আমার মেয়েটাকে তাহ'লে কি এ দুর্দ্দশা আমার হয় কখনও! স্নান করতে গিয়ে আমি যদি সেদিন তাড়াতাড়ি না ফিরে আসতাম তাহ'লে রাজুকে আমার আর খুঁজে পাওয়া যেতো না, রাস্তা থেকে পা হিড়্‌কে গুড়্ গুড়্ ক'রে পুকুরের জলে গিয়ে পড়তো, আর টুক্ ক'রে পড়লেই—বাস্, তৎক্ষণাৎ...'

এই কথা শুনিয়া কে যেন সেদিন পরামর্শ দিল,—'ও বৌ-টৌ পরের মেয়ে, ওরা কি আর কথা কখনও শোনে! তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর ডাক্তার, আবার একটি বিয়ে কর।'

পরেশনাথ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'না না, তা আর এই বুড়ো বয়সে হয় না শিবু! ছেলের বিয়ে দিয়েছি, দুদিন বাদে নাতি হবে, নাৎনী হবে, নাঃ, ও-সব বাজে কথা।'

শিবু বলিল, 'বাজে কথা নয় ডাক্তার, তোমার চেয়ে কত দাঁতভাঙ্গা চুলপাকা লোকের বিয়ে হয়। তা' ছাড়া তুমি ত'

আর সাধ করে' বিয়ে করছ না, তুমি করছ মেয়েটাকে মানুষ করবার জন্যে দায়ে পড়ে'।'

যাই হোক্, কথাটাকে পরেশনাথ সেদিন আর তত আমল দিলেন না।

মালতী সেই দিন হইতে রাজু সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন হইয়া গেছে। আগে যদিই বা তাহার খাওয়া-পরার খোঁজ লইত, বাড়ীতে থাকিলে এক এক সময় কাছে টানিয়া আনিয়া হাসিত, গল্প করিত, আজকাল সে তাহাও করে না, এমন কি তাহার জামা-জাঙিয়া ময়লা হইয়া গেলে পরেশনাথকে নিজের হাতে সাবান দিয়া পুকুরের ঘাটে গিয়া কাচিয়া আনিতে হয়।

জ্বর হইলে মেয়েকে আর কেমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইবেন! রাজুর সেদিন জ্বর হইয়াছিল। সারাটা দিনই প্রায় পরেশনাথ তাহার শিয়রের কাছটিতে বসিয়া রহিলেন, সন্ধ্যায় ওপাড়া হইতে একটা রুগী দেখিবার ডাক্ আসিল। পরেশনাথ এক পয়সার বার্লি আনিয়া রাখিয়াছিলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'রাজুর জন্যে বার্লিটা তুমি তৈরি করে' রেখো বৌমা, পার ত' খাইয়ে দিয়ো, নয় ত' আমি নিজে এসে খাওয়াব।'

মালতী বার্লি তৈরি করিতে যাইবে, এমন সময় সুবোধ আসিয়া খাবার চাহিল। সুবোধের সুমুখে খাবার ধরিয়া দিয়া কাছে বসিয়া গল্প করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে গিয়াই মালতীর দেরি হইয়া গেল। ভাবিল, স্বামীর খাওয়া শেষ হইলেই রাজুর জন্য বার্লিটা সে তৈরি করিয়া দিবে। বার্লি তৈরি করিতে আর কতক্ষণ!

সুবোধের খাওয়া শেষ হইতেই পরেশনাথ রুগী দেখিয়া বাড়ী ফিরিলেন। রাজুর কাছে গিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বার্লি তৈরি করেছ বৌমা?'

মালতী বলিল, 'এই যে, দিই।'

'এখনও দাওনি?' বলিয়া পরেশনাথ রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া গেলেন এবং গম্ভীর মুখে বৌমার হাত হইতে বার্লি তৈরির আসবাবপত্র একরকম কাড়িয়া লইয়া নিজেই উনানের কাছে বসিয়া বার্লি তৈরি করিতে বসিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'শেষ পর্য্যন্ত শিবুর কথাই আমাকে শুনতে হ'লো দেখছি। শিবু ঠিকই বলেছিল—পরের মেয়ের দ্বারা কিছু হয় না বৌমা, তোমার দোষ নেই।'

মালতী স্তম্ভিত হইয়া হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাংলা দেশে মেয়ের অভাব সত্যই হইল না। দু' তিন মাসের মধ্যেই নিতান্ত গরীবের ঘরের পনেরো-ষোলো বছরের বয়স্থা একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পরেশনাথের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহে কেহ আপত্তিও করিল না, দোষও দিল না, বলিল, 'ডাক্তার ভালই করেছে। আহা, মা-মরা মেয়েটা মানুষ হোক্।'

আপত্তি করিল শুধু তাহার পুত্র সুবোধ এবং পুত্রবধূ—মালতী। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে বাপের সঙ্গে সামান্য একটুখানি ঝগড়া করিয়া সুবোধ তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতেও বেশিদিন সে থাকিতে পারিল না। মাসখানেক পরে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়াই আবার তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—সৎ মা সত্যই গরীবের মেয়ে, দেখিতে সুন্দরী, বয়সও হইয়াছে, বিবাহের পর হইতে ছোট ভাইটিকে লইয়া সে এইখানেই জাঁকিয়া বসিয়াছে।

মালতীর সঙ্গে তাহার একদিনেই ভাব হইয়া গেল। সেই দিনই রাত্রে মালতী বলিল, 'আমরা যা ভেবেছিলাম তা নয়, গরীবের মেয়ে হলে কি হবে, বড় ভাল মেয়ে। আমার সঙ্গে বেশ ভাব হ'য়ে গেছে।'

সুবোধ চুপ করিয়া রহিল।

মালতী বলিল, 'চুপ করে রইলে যে?'

সুবোধ বলিল, 'বেশত' ভাল হ'লেই ভাল।'

মালতী আবার বলিল, 'কিন্তু বড় বোকা।'

'কি রকম?'

'আমায় কি বলে জানো?'

'কি?'

'বলে ভাই, তোমাকে আমি বৌমা বলে' ডাকতে পারব না। লোকজনের সাক্ষাতে বলব না হয় এক আধবার, কিন্তু এম্‌নি আমরা চুপি-চুপি দু'জনের নাম ধরেই ডাকব। কি নাম, জানো?'

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম ?'

মালতী বলিল, 'যমুনা।'

এই বলিয়া দু'জনে হাসাহাসি করিতে লাগিল।

পরেশনাথ এতদিন নীচে শুইতেন, এইবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। তাঁহাদের বিছানা হইল কোঠাঘরের উপরে আর সুবোধ ও মালতী নীচে নামিয়া আসিল।

রাত্রে সেদিন পরেশনাথ তাঁহার নব-বিবাহিতা পত্নী যমুনাকে অত্যন্ত আদর করিয়া সস্নেহে বলিলেন, 'আমার মত লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া উচিত নয় তা আমি জানি।'

এ দরদটুকুও তাঁহার আছে জানিয়া আনন্দে যমুনার চোখদুইটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

পরেশনাথ আবার বলিলেন, 'কেন তোমায় আমি বিয়ে করেছি জানো ?'

যমুনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ?'

পরেশনাথ বলিলেন, 'আমার ওই মেয়েটাকে মানুষ করবার জন্যে।'

যমুনা ভাবিয়াছিল, কি ভাল কথাই না সে বলিবে, কিন্তু যখন শুনিল তাহার নারী-জীবনের কর্ত্তব্য শুধু ওই মাতৃহীনা সতীনের কন্যাটাকে মানুষ করিয়াই সমাপ্ত হইবে, তখন তাহার চোখের জল ধীরে ধীরে শুকাইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না।

পরেশনাথ বলিলেন, 'শুনেছ ?'

যমুনা গলাটা একবার তাহার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, 'শুনেছি।'

'ভাল করে' মানুষ করবে ত ?'

'হ্যাঁ করব।'

'ঠিক নিজের মেয়ের মত ?'

যমুনা নীরবে শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

দিনকতক পরেই দেখা গেল, পরেশনাথ যমুনার বেশ অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন। যমুনার মুখেও বেশ কথা ফুটিয়াছে।

রাজু প্রথমে যমুনার কাছে কিছুতেই যাইতে চাহিত না, আজকাল তাহার বাবার তিরস্কারের ভয়ে যায়।

যমুনা বলে, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এই রকম করে' মেয়েকে এক আধবার ধমক্-টমক্ দিও, নইলে বড় হ'লে ভারি বেয়াড়া হ'য়ে যাবে।'

কিন্তু তিরস্কার করিয়াই পরেশনাথের মন কেমন করিতে থাকে। গোপনে চোখের জল মুছিয়া রাজুকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া বলেন, 'চল তোমায় একটু ঘুরিয়ে আনি।'

এই বলিয়া তিনি বাহির হইতে যান, যমুনা বলে, 'এত আদর বড় হ'লে ওর কোথায় থাকবে কে জানে।'

বলিয়াই সে নিজের কথা ভাবিতে বসে।

এমনি করিয়াই দিন যায়।

সেদিন অমনি পরেশনাথ দূরের গ্রামে ডাকে গিয়াছিলেন। বাবাকে অনেকক্ষণ দেখিতে না পাইয়া যমুনার কোলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাজু সারা হইতেছিল। পরেশনাথ বাড়ী ঢুকিতেই ঝাঁপাইয়া সে যমুনার কোল হইতে নামিতে চাহিল, কিন্তু যমুনা তাহাকে কিছুতেই নামিতে দিল না, কোলের উপর দু' হাত দিয়া বেশ করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। বলিল, 'চুপ কর্ বলছি, নইলে মেরে তোকে আমি খুন করে' ফেলব।'

পরেশনাথ বলিলেন, 'কাঁদচিস কেন রাজু, আয় আমার কাছে।'

বলিয়াই তাহাকে কোলে লইবার জন্য তিনি হাত বাড়াইলেন।

যমুনা বলিল, 'না। এমনি করেই মাথাটি ওর খাবে দেখছি। যাও তুমি তেল মেখে আগে স্নান করে' এসো। বেলা গড়িয়ে গেছে।'

বাধ্য হইয়া পরেশনাথ তেল মাখিতে বসিলেন। সকরুণ নয়নে বারকয়েক মেয়েটার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আহা অত কাঁদছে যখন—একবারটি না হয় .... '

ঘাড় নাড়িয়া যমুনা বলিল, 'না।'

বলিয়াই সে মেয়েটাকে তাঁহার চোখের সুমুখেই ঢিপ্ করিয়া মাটির উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, 'খবরদার তুমি ওকে কোলে নিতে পাবে না। কাঁদুক্ ও ওইখানে বসে' বসে'—দেখি ও কত কাঁদতে পারে।'

যমুনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সত্যই দেখিতে লাগিল, কিন্তু পরেশনাথ সেদৃশ্য আর দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি তেল মাখিয়া স্নান করিবার জন্য মেয়ের কান্নার শব্দ শুনিতে শুনিতে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে পুকুরে চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, মেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বলিলেন, 'ওইখানে—ওই মাটিতেই ঘুমোলো ?'

যমুনা বলিল, 'ঘুমোক্। মেয়েছেলে, ওর কিচ্ছু হবে না।'

কিন্তু মেয়েছেলের কিছু না হইলেও মেয়ের বাপের হইল।

খাইতে বসিয়া পরেশনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘুমিয়ে পড়্‌লো, ও খেয়েছে ত' ?'

যমুনা বলিল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, খেয়েছে। তুমি খাও।'

কিন্তু খাইয়াও পরেশনাথের তৃপ্তি হইল না। কোনও রকমে চারটি ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িয়া তিনি মেয়েটাকে মাটি হইতে তুলিতে গেলেন, যমুনা হাঁ হাঁ করিয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। বলিল, 'থাক্ থাক্ আমি তুলব। মেয়ে-মানুষের কাজ—পুরুষ মানুষ তুমি, করতে তোমার লজ্জাও করে না। মা গো মা, এমনি করে' করেই মেয়েটির মাথা খেয়েছ।'

পরেশনাথ বলিলেন, 'সেই কখন থেকে মাটিতে পড়ে' আছে……'

যমুনা বলিল, 'তা বেশ, তাহ'লে তোলো। ও যদি একবার জেগে উঠে দেখে যে তুমি তুলেছ তাহ'লে হয় ত আমাকে আর জীবনেও মানবে না।'

কথাটা যমুনা বোধকরি রাগ করিয়াই বলিয়াছে। ইহার পর আর রাজুকে তুলিতে যাওয়া বৃথা।

পরেশনাথ ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। যে মেয়েকে এতদিন তিনি একটি দণ্ডের জন্যও কোল হইতে নামান নাই, সেই মেয়েই আজ তাহার ধূলায় বালিতে মাখামাখি হইয়া পড়িয়া রহিল।

মালতীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিয়া খাওয়া শেষ করিতে যমুনার একটুখানি দেরি হইল।

তাহার পর ঘুমন্ত রাজুকে উঠান হইতে তুলিয়া লইয়া যমুনা ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামী তাহার তখনও চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

রাজুকে তাহারই এক পাশে শোয়াইয়া দিয়া যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, 'ঘুমোও নি এখনও ?'

পরেশনাথ বলিলেন, 'না।'

যমুনা তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া পাখাটা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেই বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজুকে আমি শাসন করি তার জন্যে তোমার কি খুব কষ্ট হয় ?'

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া পরেশনাথ কহিলেন, 'না - তা কেন হবে ! সে ত' তুমি ওর ভালর জন্যেই কর।'

যমুনা বলিল, 'কিন্তু তোমার মুখ দেখে আমার যেন তাই মনে হয়। কষ্ট যদি হয় ত' আমায় মুখ ফুটে বোলো,—শাসন তাহ'লে আর করব না।'

পরেশনাথ মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। চুপ করিয়া যেমন উপরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, তেমনি তাকাইয়া রহিলেন।

যমুনাও কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, 'আমাদের গাঁয়েও ঠিক অমনি একটা মা-মরা মেয়ে ছিল। তার দুর্গতি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাছাড়া এই আমারই কথা ধর না ! ছেলেবেলায় বাবা আমায় যথেষ্ট আদর করতেন।'

পরেশনাথ এক গ্লাস জল চাহিলেন। যমুনা জল আনিবার জন্য উঠিয়া গেল। কথাটা তাহার আর শেষ হইল না।

খালি জলের গ্লাসটা পরেশনাথের হাত হইতে লইয়া যমুনা সেইখানেই নামাইয়া রাখিল।

পরেশনাথ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বলিলেন, 'তুমি যা ভাল বোঝো তাই কোরো। মেয়েটার কষ্ট যাতে না হয়—বাস্, তাহ'লেই হ'লো।'

যমুনা বলিল, 'ছেলেবেলায় কষ্ট একটুখানি পাওয়া ভালো। বড় হ'য়ে যদি এতটুকু সুখ পায় তাহ'লেও ভাববে খুব সুখে আছি।'

যাই হোক্, এমনি করিয়াই যমুনার হাতে রাজু মানুষ হইতে লাগিল।

দিনকয়েক পরে পরেশনাথকে আবার সেদিন শহরে যাইতে হইয়াছিল। আজকাল মেয়েটাকে কোলে লইয়া আর ঘুরিতে হয় না, তাই দিবসরাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় তিনি শুধু তাহার কথাই ভাবেন, মন তাঁহার সেই মেয়েটার কাছেই পড়িয়া থাকে। গ্রাম হইতে শহরে যাইতে হইলে মাঠের পথ ধরিয়া হাঁটিয়া যাইতে হয়। আর একদিন এই

পথ ধরিয়াই তিনি রাজুকে কোলে লইয়া শহরে গিয়াছিলেন। যমুনা তখন আসে নাই। ছোট্ট টুম্‌নী নদীটা পার হইবার সময় রাজু বলিয়াছিল, 'বাবা, জল খাব।' নদীতে তখন এক হাঁটু মাত্র জল। আর নদীর ঠিক ওই জায়গাটাতেই আশপাশের গ্রামের লোক শবদাহ করে। এখানে ওখানে চিতা সাজানোর কালো দাগ, কালো কালো পোড়া কাঠে আর কয়লায় জায়গাটি ভর্ত্তি, তাহার উপর সদ্য শবদাহ করিতে আসিয়া কাহারা যেন একটা বালিশ ফেলিয়া গেছে, শেয়ালে কুকুরে বালিশটাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া চারিদিকে সাদা সাদা তুলা উড়াইয়া দিয়াছে। জলের উপর তুলা ভাসিতেছিল। তাই সে নদীর জল তাহাকে না খাওয়াইয়া, পরেশনাথের বেশ মনে পড়ে, ওপারের ওই কাঁঠাল গাছটার ছায়ায় বসিয়া রাজুকে তিনি বোতলের মুখে দুধ খাওয়াইয়াছিলেন। তাহার পর কাপাসতুলি গ্রামটা পার হইয়া প্রকাণ্ড একটা তেঁতুলগাছের উপর একদল মুখপোড়া হনুমান দেখিয়া রাজুর সে কি হাসি!... ...

তাহার সেই হাসি-হাসি কচি মুখখানি মনে পড়িতেই পরেশনাথ ভাবিলেন, যমুনা বলে বলুক, আজ তিনি বাড়ী ফিরিয়াই রাজুকে একবার বুকে তুলিয়া তাহাকে তিনি ঠিক তেমনি করিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিবেন। ওইটুকু কচি মেয়েকে এত কড়া শাসন করিয়া কোনও লাভ নাই। মুখের হাসি যেন তাহার শুকাইয়া গেছে।

শহরের কাজ সারিয়া পরেশনাথের বাড়ী ফিরিতে সেদিন একটুখানি দেরি হইল। বাড়ী যখন ফিরিলেন তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে।

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ যে এত দেরি হ'লো?'

গায়ের জামা খুলিয়া জুতা খুলিয়া পরেশনাথ বলিলেন, 'হ্যাঁ, হয়ে গেল দেরি।—রাজু কোথায়?'

যমুনা একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'গেছে হয়ত কোথাও খেলা করতে।—এটা কি?'

বলিয়া কাঁচা শালপাতার একটি ঠোঙা খুলিয়া যমুনা দেখিল, দুইটি সন্দেশ।

পরেশনাথ বলিলেন, 'রাজুর জন্যে এনেছি। ডাক ত' একবার!'

রাজুকে ডাকিবার জন্য যমুনা বাহির হইয়া গেল।

'রাজু! রাজু!'

একা কাহারও বাড়ী ত' সে কোন দিন যায় না! তবে সে গেল কোথায়?

পাড়ার কোনও ছেলের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে হয়ত তাহাদের বাড়ী গিয়া উঠিয়াছে।

যমুনা ফিরিয়া আসিল।—বলিল, 'ভাখো না গো কোথায় গেল। হয়ত কারও বাড়ী গিয়ে উঠেছে।'

শালপাতার সেই ঠোঙাটি হাতে লইয়া পরেশনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'একা একা ছেড়ে দিয়েছ?'

যমুনা বলিল, 'এই ত' ছিল এইখানে!'

পাড়ার প্রত্যেকটি বাড়ী তিনি খুঁজিয়া আসিলেন। রাজুকে কোথাও পাওয়া গেল না। দিনের আলো তখন কমিয়া আসিতেছে। সুবোধ খুঁজিতে বাহির হইল। পরেশনাথ হন্তদন্ত হইয়া আবার ছুটিয়া গেলেন।

মালতী ও যমুনা দু'জনেই অবাক্ হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল।

'তাই ত' মেয়েটা গেল কোথায়?'

বাড়ীর পাশেই পুকুরের জলের উপর ঝপাং করিয়া কিসের একটা শব্দ হইতেই যমুনা তাড়াতাড়ি খিড়কির দরজাটা খুলিয়া ঘাটের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পরেশনাথ জলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। যমুনা বলিল, 'ওকি, এই অবেলায় জলে নামলে কেন?'

কথাটার জবাবের আর কোনও প্রয়োজন হইল না। দিনের আলো তখনও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। দেখা গেল, পরেশনাথ দুই হাত দিয়া জল হইতে রাজুকে তুলিয়া আনিতেছেন। সবুজ রঙের সেই জামাটি গায়ে, কোঁকড়া কোঁকড়া এক মাথা কালো চুল, জল খাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া তখন ঢাক হইয়া গেছে, দেখিলে সহজে আর চিনিবার জো নাই, কখন যে ডুবিয়াছে কেহ জানে না, মৃতদেহ এতক্ষণ পরে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

বহুদিন পরে মেয়েকে তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া শালপাতায় মোড়া সন্দেশ দুইটি পা দিয়া মাড়াইয়াই পরেশনাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন।

স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্ যমুনা শুধু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

...ন্দ্র যেদিন পালামৌ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, সেদিন আর নাই। আজ কম পক্ষে পেরু কি প্যারাগুয়ে না গেলে ভ্রমণ কাহিনী লিখিবার কারণ ঘটে না। অবশ্য পেরু কিংবা প্যালামৌ যে-স্থলেই হোক্, ভ্রমণ যে করিতে জানে, তাহারই ভ্রমণ-কাহিনী লেখা সাজে—আমাদের নয়। হইয়াছি—হয়তো কাহিনীতে ইহার কোনোটিকেই রূপ দিতে পারিব না—কিন্তু দেখিয়াছি তো! সঞ্জীবচন্দ্রের মতো করিয়া বলিতে না পারিলেও—দেখিয়াছি অনেক-কিছু; যত দেখিয়াছি, তত ভাবিয়াছি এমন দেশের এ অবস্থা কেন হইল—কে করিল?—কিন্তু সে-কথা থাক্।

যাত্রীদল: প্রফুল্ল বসু, সুরেন দাস; অনিল নাগ; প্রফুল্ল দে: বীরেন মুখুয্যে।

তবু যে দার্জ্জিলিং অবধি গিয়াই এ কাহিনী লিখিতেছি ইহার কারণ আছে—রেলে চড়িয়া যাই নাই, গিয়াছি বাইসিক্‌লে; দুই চোখ দিয়া আমাদের এই বাংলা দেশকে দেখিতে দেখিতে গিয়াছি। যাইতে আসিতে গভীর রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া আকাশ-ভরা তারা দেখিয়াছি, পথের পাশে শিশিরসিক্ত ঘাস-ফুল দেখিয়াছি—আচম্বিতে দিন-মজুরকে মাঠের পথে চলিতে চলিতে প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে কঠিন চীৎকারে গান করিতে শুনিয়াছি, বাতায়নান্তরালে তরুণীর হাসিকেও লক্ষ্য করিতে বাধ্য

গত বৎসরে প্রায় এই সময়কার কথা।

স্থির করিয়াছিলাম, সাইকেলে সকলে মিলিয়া বোম্বাই বলিয়া পাড়ি দিব, কিন্তু মহাত্মাজী বাদ সাধিলেন—তিনি অনশন আরম্ভ করিলেন। মনটা দমিয়া গেল। সাইকেল হাতে করিয়া কলিকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে দল বাঁধিয়া মহাত্মাজীর অনশনের সহিত ভারতবর্ষের ভাগ্যের যোগসূত্রটিকে খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিতে দাঁড়াইয়া গেলাম। তর্কে-বিতর্কে এ সমস্যার একটি সমাধান প্রায় করিয়া ফেলিয়াছি—এমন সময় মহাত্মাজী ব্রতভঙ্গ করিলেন। আনন্দে আবার

পুরানো মতলব সাঙ্গ করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম; কিন্তু দেরী হইয়া গিয়াছিল, আসন্ন পূজা—পূজার সময় কাহারও বাড়ী ছাড়িবার উপায় নাই। •

—বোম্বাই যাওয়া হইল না। অন্ততঃ মধুপুর কি শিমুলতলা অবধি সাইকেল হাঁকাইব কিনা, ই-আই-আর-এর টাইম-টেবলের ম্যাপ খুলিয়া তাহাই ঠিক করিতেছিলাম। পাশে ই-বি-আর-এর টাইম-টেবল পড়িয়া ছিল, সুরেন সেইটি তুলিয়া বলিল,—'চল, ঘুমের দেশে যাওয়া যাক্।' গতবার কাশ্মীর যাওয়ার সময় সুরেন আমাদের সঙ্গে ছিল না। এবারে কাশ্মীর-যাত্রীদের সকলেই (এক মণি সান্যাল ছাড়া) ছিলাম—প্রফুল্ল বসু, ধীরেন মুখুয্যে, অনিল নাগ আর আমি। মণি সান্যালের পরিবর্ত্তে সুরেন দাসকে এবারে পাইয়াছিলাম সঙ্গী।—তাহার কথাই মানিয়া লওয়া হইল—দার্জ্জিলিং যাওয়াই ঠিক হইল।

অক্টোবরের উনিশে।—

প্রথম শরতের আমেজ কাটিয়া গিয়াছে। যে-আমেজে দিনে কলিকাতার রৌদ্রে নেশা লাগে, রাত্রে পীচঢালা রাস্তা জ্যোৎস্নার দৌত্যে চাঁদের স্বপ্ন দেখিতে সুরু করে—সে-আমেজ ছিল না। কিন্তু বাতাস গন্ধে তখনও ভরপুর, সে বাতাসে মনে আবেশ আসে। বাংলার এই শরৎ-শ্রী—ইহার কি তুলনা আছে? অপর দেশ দেখি নাই, কিন্তু কাব্যে পড়িয়াছি। ইংলণ্ডের কবি সে-দেশের শরৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

> Thee sitting careless on a granary floor,
> Thy hair soft-lifted by the winnowing wind,
> Or on a half-reap'd furrow sound asleep.

কিন্তু বাংলার শরৎকে এই সামান্য কয়টি কথায় কে বুঝাইবে?—প্রতিক্ষণে ইহা নূতন রূপ গ্রহণ করে—নব রূপ, নব বর্ণ, নব গন্ধ—সব নূতন।

উনিশে সন্ধ্যা ৬টার সময় আমরা বাড়ী হইতে বাহির হই। বর্দ্ধমান হইয়া অণ্ডাল, দুবরাজপুর, সিউড়ির পথ দিয়া যাইব স্থির হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দার্জ্জিলিং যাইবার আর রাস্তাও নাই। গড়পার-সার্কুলার রোডের মোড়ে বন্ধুরা অপেক্ষা করিতেছিলেন—হাবড়ার পুল পর্য্যন্ত অনেকে আসিয়াছিলেন, সুধাংশু, অশোক, ধীরেন, গণেশ, শ্যামা আর ব্রতীশ ·· ইহাঁরা বর্দ্ধমান অবধি সঙ্গে চলিলেন।

শ্রীরামপুরে পৌঁছাই রাত্রি নয়টায় সেখানে চা-পান করি চন্দননগরে গিয়া রাত্রির আহারের জন্য থামিয়াছিলাম।

বিদায়ের প্রাক্কালে বন্ধুদের অভিনন্দন।

রাত্রি ১২॥০ টায় চন্দননগর ছাড়িলাম। অন্ধকার রাত্রির বুক চিরিয়া আমাদের এগারো খানি বাইসিক্‌ল চলিয়াছে। পথে ব্যাণ্ডেলের পরিচিত গির্জ্জাটি মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, গির্জ্জার চূড়ায় সজ্জিত আলোকমালার মধ্যে মাদার মেরীকে দেখিলাম। মনে পড়িল, এমনই এক রাত্রির অন্ধকারে জোসেফকে একদিন ইহাঁকে এবং ইহাঁর শিশু-পুত্রকে লইয়া ইজিপ্ট পলাইতে হইয়াছিল। রাত্রির সহিত মাতৃত্বের কোথায় যেন মিল রহিয়াছে—ইহার গভীরতা, গাম্ভীর্য্য, সীমাহীনতা, অশেষ স্নিগ্ধতা—চিরকালের মায়ের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। সেই গভীর রাত্রে পথ চলিতে চলিতে একথা যেমন বুঝিয়াছিলাম, এমন আর কোন দিন বুঝি নাই।

মগরা ও পাণ্ডুয়া ছাড়িয়া সেলিমগড় ষ্টেশনে পৌছাইলাম রাত তিনটা সাড়ে-তিনটায়। ষ্টোভে চায়ের জল গরম হইল—চা-পান শেষ করিয়া আবার পথে নামিলাম।

অন্ধকার অল্পে অল্পে যাইতেছে—ভোর না হইতে যাহারা ভোরের খবর রাখে, সেই সব পাখীর দলের এক একবার সাড়া পাওয়া যাইতেছে। চারি পাশ স্তব্ধ, অদ্ভুত শান্ত। হুইটম্যানের সেই—'I inhale great draughts of space'-এর কথা মনে আসে—

I think heroic deeds were all conceived in the open air,
And all free poems also,
I think I could stop here and do miracles.

বুদ্‌বুদ্‌ ডাকবাংলা।

২০শে। মেমারী—।

...তখনও সূর্য্য ওঠে নাই। দোকানপাট সব বন্ধ। একটি দোকানীকে তুলিতে হইল। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর বর্দ্ধমান বলিয়া রওনা হইলাম। বেলা ৯॥০ টায় বর্দ্ধমান পৌছাইয়া আমাদের পরিচিত পানের দোকানে গিয়া উঠিলাম। একটি খাটিয়াতে ধীরেন আর আমি বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলাম, হঠাৎ সেটি ভাঙ্গিয়া দুইজনেই মাটিতে পড়িয়া গেলাম। ধুলা ছাড়িয়া উঠিতে মনে হইল, একি অশুভ যাত্রা! মানুষ বোধ করি জন্মগত সংস্কারের সীমা কোন দিনই অতিক্রম করিতে পারে না।

বেলা প্রায় ১২ টায় আমার এক আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় মিলিল—ডাক্তার নাথ। তিনি আমাদের যথেষ্ট আদর-যত্ন করিলেন। রাত্রে বর্দ্ধমানে ছয় জন সঙ্গীকে ছাড়িতে হইল। বর্দ্ধমান হইতে পানাগড়ের পথ ধরিলাম। এতক্ষণ আসিয়াছিলাম মন্দ না, দলে বেশী ছিলাম, নিতান্ত চুপ করিয়া পথ চলিতে হয় নাই। এধারে পাঁচ জন—সবাই কেমন দমিয়া গেলাম। দলের মধ্যে সুরেন গান জানিত। তাহাকে গাহিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু কণ্ঠে তাহার সুর আসিল না। সে দুই চারিবার চেষ্টা করিয়া থামিয়া গেল। সুতরাং—'we kept silent pace.'

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া চলিয়াছি। নূতন নূতন ছোট ছোট খাল কাটিয়া রাস্তার মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে—ইতিপূর্ব্বে পঞ্জাবে এবং যুক্তপ্রদেশের রাস্তায় এমন দেখিয়াছি। রাস্তার ধারে একটি চালের কলে সংকীর্ত্তন হইতেছিল, সেখানে ভিড়িয়া গেলাম। খোল-করতালের শব্দে আর বহু লোকের কণ্ঠস্বরে মনের জড়িমা কাটিয়া গেল। কিন্তু রাত্রি বেশী হইবার ভয়ে শীঘ্রই আবার পথে নামিয়া পড়িলাম।

রাত্রি এগারোটায় বুদ্‌বুদ্‌ ডাকবাংলাতে পৌছাই। ঘরে লোক ছিল, সুতরাং আমাদিগকে গ্যারেজে আশ্রয় লইতে হইল। কম্বলের শয়ন বিছাইয়া ডাক্তার নাথের দেওয়া আহার্য্য শেষ করিলাম। সাইকেলের আলোতে পাঁচজনে ময়দানে বসিয়া থাকিবার ছবিটি মনে পড়িতেছে। কে যেন বলিয়াছিল 'পঞ্চ-পাণ্ডবের কথা মনে পড়ে।'

সকালে ঘুম ভাঙ্গিল। বাংলার বারান্দায় দুইটি সাহেব চা পান করিতেছিল। রাত্রে ইহারাই ঘরে ছিল। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল—চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তিনি পি-ডব্লিউ-ডিতে কাজ করেন। চা-পানের পরে ইহাকে সঙ্গে লইয়া ডাকবাংলার একটি ফটো লইলাম।

লোকের পরামর্শে পানাগড় দিয়া না গিয়া মানকরের পথে নামিলাম—এইখানে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছাড়িতে হইল। প্রায় মাইলটাক গিয়া ছোট্ট একটি নদী। পুলের রাস্তা ছিল—পার হইতে বেগ পাইতে হইল না। অতঃপর মানকর বাজার। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তার ঝাঁকুনিতে আলো খুলিয়া মাটিতে পড়িল। বহু কষ্টে বেলা ১২টায় গুস্করায় আসা গেল। এতক্ষণে লাল মাটির দেশে যে পৌছাইয়াছি, জামাকাপড়ের দিকে চাহিয়া সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল

না। অনুপান হিসাবে চালের কলের ভূষাও ছিল। এখন মনে হইতেছে সে চেহারার একটা নমুনা রাখিলে হইত। পোষাকী সভ্যতার আওতায় বর্দ্ধিত মানুষ আর বর্ব্বর, নগ্ন মানুষ—দুই জনের কে বেশী সুন্দর প্রমাণ হইত।

গুস্করায় এক দোকানে আশ্রয় লইলাম। খাবারগুলি খোলা—যত রাজ্যের ধূলা উড়িয়া পড়িয়াছে। অসম্ভব রকমের ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, নহিলে সেগুলি ভোজন করিতে পারিতাম না। সেই প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় রাক্ষসের মত সম্মুখে যাহা পাইয়াছিলাম তাহাই গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম। তার উপর আবার নাগ মশাই ২ সের পুরী ভাজিতে বলিলেন। পুরীগুলি খাইতে পারিলাম না। সেগুলি সঙ্গে বাঁধিয়া লইলাম। এইখানে রাজবংশী নামক ঘরবাড়ীহীন এক জাতের লোক দেখিলাম।

দুই একজনকে রাস্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "ভাল রাস্তা!" বিশ্বাস করিয়া আগাইয়া চলিলাম। গুস্করা গ্রামটির মধ্যের রাস্তা খুবই খারাপ, এত খারাপ যে বর্ণনা করা যায় না। গ্রামটি ছাড়িয়া একটি পুল পাইলাম, সেই পুলে একটি গ্রাম্য লোক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে রাস্তার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, 'আপনারা বাবু রেলের লাইন ধরে গেলেন না কেন? এ রাস্তায় চলতে পারবেন না।'

বাস্! কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

কিছুদূর গিয়াই বুঝিতে পারিলাম রাস্তা কিরূপ। রাস্তাটি বালিতে পূর্ণ, দুই দিকে গাছপালা কিছুই নাই, এমন কি, একখানি গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। যতই চলি, ততই বালি বাড়িতে আরম্ভ করে। বালির উপর সাইকেল চালানো বা ঠেলা কি ব্যাপার এই রাস্তায় তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলাম। রাস্তায় জনপ্রাণী নাই, পথের ধারে অদূরে কোনও গ্রামের চিহ্ন অবধি নাই, জল নাই, কিছুই নাই, যেন মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিতেছি। কিছুদূর গাড়ী চড়িয়া, কিছু দূর হাতে করিয়া চলিতে লাগিলাম। কয়েক মাইল চলার পর রাস্তার ধারে একটি গাছের ছায়া পাইয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সকলে একে একে উঠিয়া গেল; সব শেষে আমি, যখন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, তখন নিতান্ত অনিচ্ছায় রথে আরোহণ করিতে হইল।

বালির উপর কিছুদূর গাড়ী চালাইয়া যখন উঁহাদের ধরিতে পারিলাম না তখন জোরে যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিয়দ্দুর যাইবার পর একটি বাঁকের মুখে নাগ মশাইকে ধরি। দুইজনে গল্প করিতে করিতে গাড়ী চালাইতেছিলাম, কখন যে সামনের চাকাটি বালির ভিতর একটি গর্ত্তের মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারি নাই—সঙ্গে সঙ্গে এক ভল্ট। চক্ষু খুলিয়া দেখি নাগ মশাই আইডিন লেপিতেছেন, হাত-মুখ কাটিয়া গিয়াছিল।...

গুস্করার দোকানটি।
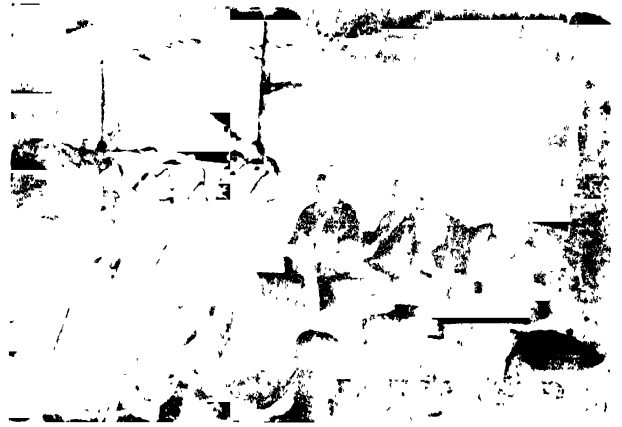
ভেদিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উঠিলাম। কি বালি! এত বালি বোধ হয় কোন নদী পার হইবার সময়ও পাই নাই। এখানে দুই জন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাস্তার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হওয়ায় তাঁহারা বলিলেন, 'আপনারা বর্দ্ধমান ছেড়ে মানকর দিয়ে এত ঘুরে এলেন কেন?' এ রাস্তা সোজা বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছে। আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা স্বীকার করিয়া ভেদিয়ার রাস্তা ছাড়িয়া রেলের লাইন ধরিলাম।

এখান হইতে বোলপুর ছয় মাইল। আরও ছয় মাইল বালির রাস্তায় না চলিয়া রেল লাইনের ধারে ধারে যাওয়াই এবারে শ্রেয় মনে করিলাম। রেলের লাইন দিয়া চলিতে চলিতে 'অজয় নদী' মিলিল; পুলের উপর গিয়া দুই একখানি ফটো তোলা গেল এবং কুলিদের দিয়া আনাইয়া নদীর জল-পান করা গেল। এটি রেলের পুল। কিছুদূর যাইতে
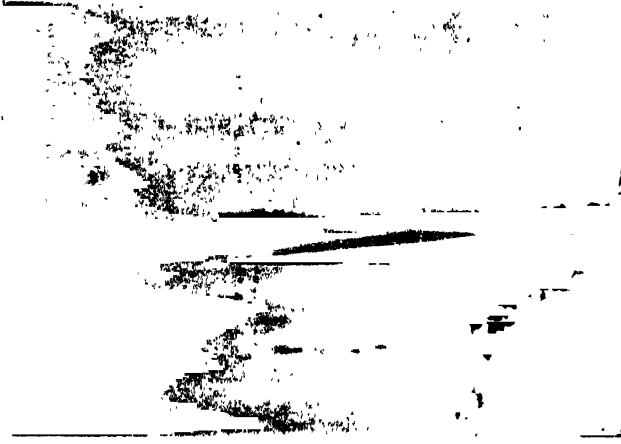
একটি ট্রেণ দেখিতে পাইয়া জঙ্গলে নামিয়া দাঁড়াইলাম, ট্রেণ চলিয়া গেলে আবার দ্বিচক্রে চড়িলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বোলপুরে উপস্থিত হই। ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, রাস্তায় এই প্রথম বৃষ্টি। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই শান্তিনিকেতনে যাইবার রাস্তায় একটি চায়ের দোকান পাইয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। দুই পেয়ালা চা ও সেই সঙ্গে শুকরার পুরীগুলি—বেশ আনন্দের সহিত জলযোগ করা গেল।

বৃষ্টি থামিলে শান্তিনিকেতনে যাই

(ক্রমশঃ)

তিমির-তীর্থ

—শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

হে উষা, আমারে কর ক্ষমা।
আলোকের পরপারে অন্ধকারে আমার বসতি,
সেথা গাঢ় গহনের মাঝে,
কায়াহীন ছায়া সব নৃত্য করে আমারে ঘিরিয়া,
ছিন্নমস্তা রুধির-পিপাসু,
কবন্ধ আকার কত রক্তমাংস জড়পিণ্ডপ্রায়
বাহু মেলি' বন্দী করিয়াছে।
পূতিগন্ধ অন্ধকারে তাহাদেরই মাঝে মোর
চরিতার্থ দূষিত বাসনা।
সে তিমির পার হয়ে বাহু মোর ধরিতে না পারে-
হে উষা, হে স্বয়ম্প্রকাশ,
বহ্নি-দীপ্ত ও কায়া তোমার।

এ আঁধারে বসি বসি শিহরিয়া করি অনুভব,
অরুণের জয়যাত্রা হে উষসী তোমার উদয়ে।
আধ-অবগুণ্ঠনের মাঝে
আলোরে আড়াল করি তিমিরের করিছ সাধনা;
সেই তব পরাজয়, বিজয় আমার,
তবু ইহা গর্ব্বের তো নহে!

বসি ক্লান্ত নিঃশব্দের তলে,
আতঙ্কিত কর্ণে মোর রহি রহি শুনিবারে পাই—
মত্ত গূঢ় বাসনার লক্ষ লক্ষ ফণার গর্জ্জন;
শুষ্কপত্র মর্ম্মরিয়া শ্বাপদের নির্ভয় বিলাস।
মোর উত্তেজনা
আমারে করেছে বন্দী, ভালবাসি তাই এ তিমিরে,
ভালবাসি এ পঙ্ক-কর্দ্দম।
তোমারে ধরিতে সাধ নাই,
হে উষসী মোরে কর ক্ষমা।

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চপলা-ঠাকরুণকে আমিষ রান্নার আলাদা ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রত্যহ শ্রীহর্ষ খাইতে গিয়া দেখে, তাহার আদর যত্নের আর সীমা নাই। এত যত্ন সে তাহার জীবনে কোনো দিন উমার হাতেও পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। শ্রীহর্ষ একটুখানি কুণ্ঠিত হইয়া বলে, 'আমার জন্য এত আয়োজন কিছু করবার ত' দরকার নেই মাসি। এত এত রান্না তুমি কেন কর বল ত?'

চপলা-ঠাকরুণ ঈষৎ হাসিয়া জবাব দেয়, 'বিধবা হয়েছি, মরবার আগে কিছু পুণ্যি ত' বাছা করতে হবে।'

শ্রীহর্ষও হাসে। বলে, 'তাই বুঝি আমায় খাইয়ে তুমি পুণ্যি করছ? বেশ, টাকাকড়ি আর নিয়ো না। পনেরো টাকা দিয়েছি, বাস্, তাহ'লে টাকাকড়ি আর দেবো না।'

চপলা-ঠাকরুণ আবার হাসিতে লাগিল। বলিল, 'তাহ'লেই হয়েছে। তাহ'লে বাছা আমারও আর পুণ্যি করা হবে না।'

'ও, তাহ'লে বুঝি তুমি যা-কিছু কর সব টাকার জন্যে?'

চপলা-ঠাকরুণ বলিল, 'হায় হায় এতদিনেও তুই আমাকে চিনলিনে শ্রীহর্ষ? টাকা ছাড়া চপল-ঠাকরুণ কখনও কিছু করেছে দেখেছিস?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আচ্ছা, টাকা যদি ধরো আমি আর না দিই, তাহ'লে আমার মেয়েটাকে তুমি কি আবার আমার কাছেই ফেলে দিয়ে আসবে মাসি?'

'তা বিশ্বাস কি বাছা, দিয়ে আসতেও পারি। কিন্তু শোন্ শ্রীহর্ষ, ভাল একটি মেয়ে দেখে দিই, তুই আবার বিয়ে কর্।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'না মাসি, বিয়ে করবার ইচ্ছে আর আমার নেই।

মাসি হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'তোর কথায় আমি আর বিশ্বাস করি না শ্রীহর্ষ, তুই হয়ত টাকা খরচ হবে বলে' বিয়ে করতে চাস্ না।'

শ্রীহর্ষও হাসিতে লাগিল। বলিল, 'না মাসি, তুমি ভুল বুঝছ। সেদিন আমার বাড়ীতে এক বুড়ো ভদ্রলোককে দেখেছ না, সেই বৈকুণ্ঠবাবুর একটি ভাইঝি আছে, তার বিয়ে আমি নিজে দু'হাজার টাকা খরচ করে' দিয়ে দিচ্ছি। টাকা খরচের ভাবনা আমি আর ভাবি না মাসি।'

মাসি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'চুপ করে' রইলে যে মাসি?'

ঘরের ভিতর হইতে মাসি জবাব দিল, 'কি আর বলব বল্। আমি শুধু সেই হতভাগী উমীর কথা ভাবছি। চিরদিন সে দুঃখু পেয়েই মলো।'

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'মালতী কি এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি?'

মাসি বলিল, 'হঁ্যা, ঘুমোচ্ছে। তুই আসবার খানিক আগেই ঘুমোলো।'

আঁচাইয়া আসিয়া ঘুমন্ত মেয়েটাকে বোধকরি একবার দেখিবার জন্যই শ্রীহর্ষ ঘরে গিয়া ঢুকিল। অন্যদিন মেয়েটা এ সময় ঘুমায় না। 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া শ্রীহর্ষর কোলে গিয়া ওঠে। শ্রীহর্ষ তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। উমার মুখের প্রতিচ্ছবি তাহার এই কন্যার মুখে দেখিতে পায়।

ওদিকে বৈকুণ্ঠ তখন তাহার ভাইঝি চাঁপার জন্য মনের মত একটি পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া, ইহার উহার কাছে সন্ধান জানিয়া, ভাইপো তিনকড়িকে সঙ্গে লইয়া গত কয়েক দিন হইতে বুড়া বৈকুণ্ঠ ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া চাঁপা তাহাদের জন্য রান্না চড়াইয়া দেয়।

তিনকড়ি বলে, 'তাড়াতাড়ি যেমন হোক্ চারটি দে চাঁপা! আজ একটা ভাল শ্বশুরবাড়ী তোর আমি খুঁজে দিচ্ছি দ্যাখ।'

চাঁপা হাসিয়া বলে, 'অমনি তোমরাও একটা খুঁজলে না কেন দাদা?'

তিনকড়ি রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে ভাল করিয়া চাপিয়া বসে। বলে, 'শোন্ তবে, আমার কি মতলবটা তোকে

বলি। তোর বিয়েটা আগে হয়ে যাক্ চাঁপী, বুঝলি? যার-তার সঙ্গে বিয়ে ত' হবে না, বিয়ে তোর বেশ ভাল ঘরেই দেবার চেষ্টা আমরা করছি। তারপর তোর বরকে বলে' আমার একটা রোজগারের ব্যবস্থা তোকে করে' দিতে হবে।—চুপ করে' রইলি যে?'

বলিয়া পিছন ফিরিয়া মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখে চাঁপার মুখখানি চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তিনকড়ি আবার বলিল, 'বা-রে! হাসি হচ্ছে বুঝি! ওই যে ওই লাল বাড়ীটার মণি ঘোষকে জানিস ত?— খুব, বড়লোক। ওর তিন-তিনটে শালা রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে' ঘুরে বেড়াতো। শেষে ওই মণি ঘোষ শালাদের জন্যে মস্ত বড় একটা ছাপাখানা কিনে দিয়েছে।—বাস্, এখন শালাদের অবস্থা খুব ভালো।'

চাঁপা তখনও চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনকড়ি বলিল, 'এতে আর লজ্জা কিসের! বা-রে? বলবি—আমাদের অবস্থা ভাল নয়। শ্রীহর্ষবাবু দয়া করে দু হাজার টাকা দিচ্ছেন তাই বিয়েটা কোনো রকমে হয়ে যাচ্ছে। নইলে এই বাড়ীখানা কাকাবাবুকে বন্ধক দিতে হতো।'

এতক্ষণ পরে চাঁপা কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'দুই হাজার টাকা তোমাদের ওই শ্রীহর্ষবাবু পেলেন কোথায় দাদা?'

তিনকড়ি তাহার চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, 'শ্রীহর্ষবাবু যে মস্ত বড়লোক রে! ওর বাড়ীটা ত' দেখছিস—কি রকম বাড়ী।'

চাঁপা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'ওই বাড়ীখানাই হয় ত' আছে, টাকাকড়ি কিছু নেই দাদা, আমি কাকাবাবুর মুখে শুনেছি। টাকা যদি থাকতো ত' আমার হাতের রান্না খেয়ে ওর দিন কাটাতো না।'

তিনকড়ি রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'তুই জানিস নি শুনিস নি, শুধু শুধু কেন চেঁচাস্ বল্ দেখি চাঁপী! টাকা নেই ত' কি তুই বলতে চাস্—তোর বিয়ে নিয়ে ও রহস্য করছে। অমনি শুধু শুধুই বলে দিলে—তোমরা পাত্র ভাখো! যাঃ!'

চাঁপা বলিল, 'কি জানি দাদা, শ্রীহর্ষবাবুর চেহারা দেখে ত টাকা আছে বলে' আমার মনে হয় না।'

এই বলিয়া দু' জনেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উনান হইতে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া চাঁপা ফেণ গালিতেছিল, তিনকড়ি বলিল, 'কিন্তু যা ব'ললাম তোর মনে থাকবে ত?'

চাঁপা অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'কি!'

তিনকড়ি মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'কি? এরই মধ্যে ভুলে' গেলি? আচ্ছা মেয়ে ত'! বিয়ে হ'লে তোর আর কিছু মনে থাকবে না দেখছি।'

দাদার রাগ দেখিয়া চাঁপা হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তোমার চাকরির কথা ত'? কিন্তু দাঁড়াও দাদা, আগে বড়লোকের বাড়ী যাই।—আর দাদা, সে ভাগ্য যদি আমার না হয়? গরীবের ঘরের বৌ হ'য়ে গেলে তোমার জন্যে আমি যে কিছুই করতে পারব না দাদা!'

বলিতে বলিতে চোখ দুইটা তাহার ছল্ ছল করিয়া আসিল।

তিনকড়ি বলিল, 'আরে দূর দূর, গরীবের বাড়ী দেবো কেন? দু হাজার টাকা ত' আর মুখের কথা নয়।'

চাঁপা নীরবে তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে দাদা, ও তোমরা নিজেরা কেউ কিছু করতে পারবে না দেখো, এই আমি বলে রাখলাম।'

সে দিন খবরের কাগজে দেখা গেল, এম-এ পাশ একটি ছেলে সুশিক্ষিতা সুন্দরী একটি পাত্রীর সন্ধান করিয়াছে।

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'চল্ তিনু দেখে আসি।'

তিনকড়ি প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ বলিল, 'চল।'

ঠিকানায় পৌছিতেই দেখিল, প্রকাণ্ড বাড়ী। দরজায় একখানি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। তিনকড়ি থমকিয়া দাঁড়াইল। বৈকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, 'দাঁড়ালি যে? আয়।'

আনন্দে তিনকড়ির মুখখানি ইহারই মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, 'নম্বরটা আমরা ঠিক দেখেছি ত' কাকাবাবু?'

দরজার নম্বরটার দিকে আর-একবার তাকাইয়া বৈকুণ্ঠ বলিল, 'এই ত' তিরিশ নম্বর। ঠিকই ত! এদিকে এই নামটা কি লেখা রয়েছে ছাখ্‌ ত' বাবা! উকিল বলে' মনে হচ্ছে।'

বৈকুণ্ঠের অনুমান মিথ্যা নয়। ওদিকের 'ডোর প্লেটে' ইংরেজিতে লেখা—এন্‌, ব্যানার্জ্জি, এম-এ বি-এল, এ্যাড্‌-ভোকেট, হাইকোর্ট।

তিনকড়ি মহা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল, 'এখানে হয় যদি ত' ভারি ভাল হয় কাকাবাবু। চাঁপী তাহ'লে সুখে থাকে।'

কিন্তু বৈকুণ্ঠ বুড়া মানুষ। এই দুনিয়ায় সে অনেক দেখিয়াছে, অনেক ঠকিয়াছে। তিনকড়ির মত এত সহজে উৎসাহিত হইতে সে পারিল না। বলিল, 'আয় বাবা আগে দেখি। তারপর যা হয় হবে।'

এই বলিয়া তিনকড়িকে সঙ্গে লইয়া বৈকুণ্ঠ সরাসর ঘরে গিয়া ঢুকিল। ফটক পার হইয়া গিয়া একটুখানি উঠান এবং উঠানের বাঁ দিকে দেখা গেল, একখানি ঘরের মধ্যে কয়েকজন সাহেবী পোষাকপরা ভদ্রলোক বসিয়া বসিয়া কথা বলিতেছেন।

বৈকুণ্ঠ দরজার সমুখে গিয়া দাঁড়াইতেই, সেই দিকে মুখ করিয়া গদি আঁটা চেয়ারে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চাই? কাকে চান?'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'প্রিয়ব্রত—'

'থাক আর বলতে হবে না, আসুন।' বলিয়া তিনি তাহাদের ভিতরে আহ্বান করিলেন।

বিলাতী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্বামীর সঙ্গে ইংরাজিতে কি যেন কথা হইল, তাহার পর তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন।

বৈকুণ্ঠ ও তিনকড়ি তখন দুখানি চেয়ারে ভাল করিয়া চাপিয়া বসিয়াছে। ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্র প্রচুর এবং প্রত্যেকটিই মূল্যবান। মাথার উপরে বন্‌ বন্‌ করিয়া পাখা ঘুরিতেছে। দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড একটি ঘড়ীর ভিতর হইতে ধীরে ধীরে জলতরঙ্গ বাজিতেছিল

আগন্তুকেরা বিদায় হইয়া গেলে গৃহস্বামী পুনরায় তাঁহার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। বৈকুণ্ঠর মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার মেয়েটি কত বড়?'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'আমি যে ওই জন্যই এসেছি তা তুমি জানলে কেমন করে বাবা?'

ভদ্রলোক ঈষৎ হাসিলেন। হাসিয়া তাঁহার বাঁপাশের ড্রয়ারটি টানিয়া টানিয়া কালো রঙের একখানি বই বাহির করিয়া কি যেন দেখিয়া লইয়া বলিলেন, 'কাল থেকে এই আপনাদের নিয়ে সতেরো জন এলেন।—হ্যাঁ, আপনাদের মেয়েটি কত বড়?'

বৈকুণ্ঠ বলিলেন, 'তা চোদ্দ পনেরো বছরের কম নয়।'

'দেখতে কেমন?'

বৈকুণ্ঠ এবার হাসিল। বলিল, 'নিজেদের মেয়ের সুখ্যাতি নিজেরা কেমন করে' করি বলুন! দয়া করে' একবার যদি পায়ের ধূলো দেন আমার বাড়ীতে, তাহলেই দেখতে পাবেন।'

'কত খরচ করতে পারবেন বলুন!'

বৈকুণ্ঠ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'কিছুই পারব না বাবা। তবে আপনার কি চাই শুনি!'

ভদ্রলোক আবার হাসিলেন। বলিলেন, 'আমার কিছুই চাই না। ছেলেটি আমার এক দূর সম্পর্কের কাকার ছেলে, অর্থাৎ খুড়তুতো ভাই। আমার এইখানে থেকেই এম-এ পাশ করেছে। এইবার ল' পড়বে আর হাজার দুই টাকা নিয়ে একটি ব্যবসা করবে। আমারই এক বড়লোক মক্কেলের সঙ্গে জুটিয়ে দেবো—ব্যাবসায় লোকসান তার হবে না।'

এই বলিয়াই তিনি 'প্রিয়' 'প্রিয়' বলিয়া হাঁকিতে লাগিলেন।

ভিতর হইতে জবাব আসিল, 'যাই।'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'ছেলেটাকে আপনারা স্বচক্ষে দেখেই যান। দু-হাজার টাকা নগদ যদি খরচ করতে পারেন ত' বলুন আমি নোটবুকে আপনার ঠিকানা লিখে রাখি, মেয়েটিকে একদিন দেখে আসব। আর যদি দুহাজার টাকা নগদ দেবার ক্ষমতা আপনার না থাকে ত' গুড্‌বাই।'

বলিয়াই হাতখানি তাঁহার সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে কপালে ঠেকাইয়া তিনি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'দুহাজার টাকা দিতে যাঁরা পারবেন, এই দেখুন তাঁদের নামের পেছনে লালকালির দাগ দিয়ে রেখেছি। আর যাঁরা পারবেন না তাদের এই কালো কালির 'ক্রশ্‌-মার্ক'। আপনার নামটি কি বললেন!'

বৈকুণ্ঠ বলিল,—'বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল।'

'অল্ রাইট্'‥—পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া তিনি লিখিলেন—'বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল।' বলিলেন,—'ঠিকানা?'

'পনেরো নম্বর রাধাচরণ মিত্তির লেন, বাগবাজার।'

'অল্ রাইট, পনেরো নম্বর রাধাচরণ মিত্তির লেন, বাগবাজার। এইবার বলুন, নামের সঙ্গে কি দেবো? কালো ক্রশ্ না লাল দাগ? লাল দাগ মানে টাকা দিতে পারবেন, মেয়ে দেখতে যাওয়া হবে। আর কালো মানে—'

কথাটি তাঁহার শেষ হইল না। লম্বা চওড়া প্রিয়দর্শন একটি ছোক্‌রা ঘরে ঢুকিল।

এই প্রিয়ব্রত।

চমৎকার চেহারা! তিনকড়ি তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

প্রিয়ব্রত একটি নমস্কার করিতেই তাহার দাদা বলিয়া দিলেন, 'এঁরা তোমায় দেখতে এসেছেন প্রিয়, মেয়েটির বয়স বেশি নয়, দেখতেও শুনছি সুন্দরী, তবে টাকাকড়ি দিতে পারবেন কিনা সেকথা এখনও—'

তিনকড়ি বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ, টাকা আমরা দেবো।'

প্রিয়ব্রতর দাদা টেবিল হইতে তৎক্ষণাৎ লাল কালির কলমটি তুলিয়া লইয়া দোয়াতে ডুবাইয়া বলিলেন, 'দিয়ে দিই তাহ'লে লাল দাগ?'

বৈকুণ্ঠ শুধু ঘাড় নাড়িল। আর তিনকড়ি বলিল, 'দিন।'

লাল দাগ কাটিয়া তিনি বলিলেন, 'তাহ'লে মেয়ে দেখতে যাবার দিন হচ্ছে আমাদের—'

বলিয়া চোখ বুজিয়া কি যেন হিসাব করিয়া বলিলে,—'টোয়েন্টি থার্ড, থার্ট মিন্স্ আগামী রবিবার। বাংলা তারিখ হলো গিয়ে বারোই।'

প্রিয়ব্রতের দিকে তাকাইয়া বৈকুণ্ঠ বলিল, 'বোসো বাবা বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

প্রিয়ব্রত বসিল।

বৈকুণ্ঠ এইবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—'তাহ'লে ছেলেটি আপনার…'

প্রিয়ব্রতর দাদা বলিলেন, 'খুড়তুতো ভাই।'

'মা বাবা জীবিত আছেন?'

'বাবা নেই, মা আছে।'

'বাড়ী ঘর দোর? বিষয় সম্পত্তি?'

'হ্যাঁ—তা, তবে আপনার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, আছে, বারোমাস খাবার মত বিষয়-সম্পত্তি আছে। বাড়ী একখানি আছে, দোতলা দালান বাড়ী। বেশ ভাল বাড়ী। তাছাড়া প্রিয় এম-এ পাশ করেছে, খুব বুদ্ধিমান। যে কারবারে ওকে আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি, দুবছর পরে দেখবেন, অবস্থা ও নিজেই ফিরিয়ে ফেলবে।'

বৈকুণ্ঠ মৃদু মৃদু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'ভাই বোন নেই বোধ হয়।'

'একটি বোন আছে। ছোট—এই বছর দশেকের হবে। নারে প্রিয়?'

প্রিয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ। বারো বছরের।'

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বাড়ীখানি আপনার নিজের, না?'

প্রিয়ব্রতর দাদা বলিলেন, 'আজ্ঞে না, ভাড়া বাড়ী। লেক্ রোডের কাছে জায়গা আমার কেনা আছে, বাড়ী এইবার আরম্ভ করব।'

এমন সময় ক্রিং ক্রিং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই রিসিভারটা তিনি তুলিয়া ধরিলেন। 'হ্যালো! ইয়েস্, ব্যানার্জ্জি।'

বৈকুণ্ঠ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আজ তা'হলে আসি।'

তাহার দেখাদেখি তিনকড়িও তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রিসিভারের মুখটা তিনি বাঁহাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আসুন! নমস্কার! আগামী রবিবার আমরা যাব—সন্ধ্যের পর। আমি, প্রিয়ব্রত এণ্ড সাম্ অব্ মাই ফ্রেণ্ড্স্। তিন চার জনের বেশী নয়। আচ্ছা, নমস্কার!'

ফটকের বাহিরে আসিয়াই বৈকুণ্ঠ বলিল, 'ফট্ করে' টাকার কথাটা বলা তোর উচিত হলো না তিনু।'

তিনকড়ি বলিল, 'বাঃ, এমন ছেলে তুমি পাবে কোথায় কাকা! চাঁপীর সঙ্গে কেমন মানাবে বল দেখি!'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'তা ত' মানাবে, কিন্তু ছেলেটি শুধু লেখা-পড়াই শিখেছে, অভিভাবকও নেই, বিষয়-সম্পত্তিও নেই।'

বাড়ী ফিরিয়া আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া তিনকড়ি বলিল, 'তোর একটি খাসা বর দেখে এলাম চাঁপা। ঠিক যে রকমটি চেয়েছিলাম, তেমনি।'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'খাসা বর ত' হলো তিনকড়ি, কিন্তু আমার যেন মন উঠছে না বাবা।'

তিনকড়ি বলিল, 'বিষয়-সম্পত্তি নেই, অভিভাবক নেই, —এইত! তা নাইবা থাকলো কাকা, এমন বিদ্বান এম-এ পাশ তুমি পাবে কোথায়?'

বৈকুণ্ঠ ম্লান এক খানি হাসিল। বলিল, 'এম-এ পাশ!'

এই বলিয়া আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঘর হইতে চাঁপা ডাকিল, 'দাদা!'

'কিরে, কি বলছিস?' বলিয়া তিনকড়ি উঠিয়া গেল।

লজ্জায় চাঁপার মুখ দিয়া কথা সহজে বাহির হইতে চাহিতেছিল না, তবু সে মাথা হেঁট করিয়া কোনো রকমে বলিল, 'কাকাবাবুকে বল—এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিক্।'

তিনকড়ি যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, 'সে কিরে! দাঁড়া, আগে ছাখ্,—এই ত' এই আসছে রবিবার স্বচক্ষে দেখতেই পাবি। যেমন গায়ের রং, তেমনি চেহারা, তেমনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান,—দেখলেই তোর পছন্দ হয়ে যাবে। মাইরি বলছি, দেখিস্ তুই।'

চাঁপা বলিল, 'কাল যে তবে বড়ফট্টাই করে' বলে গেলে—বড়লোকের বাড়ীতে তোর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ছাখ্।'

তিনকড়ি বলিল, 'আরে সে আমি বলেছিলাম—আমার একটা কাজকর্ম্মের জন্যে। তা না হোক্‌গে আমার চাকরি, এই খানেই তোকে মানাবে চমৎকার। এখানেই ঠিক করে ফেলি।'

চাঁপা এইবার জোর করিয়া বলিল, 'না দাদা. এখানে বিয়ে আমি করব না। তুমি বড়লোকের ছেলে ছাখো।'

কথাটা বোধ করি এ ঘর হইতে বৈকুণ্ঠ শুনিতে পাইয়াছিল। বলিল, 'সেই ভালো তিনকড়ি, চাঁপা ঠিকই বলেছে। এখানে সেই টাকাও খরচ হবে, অথচ চাঁপা হয়ত ছদিন পরে খেতে পরতেও পাবে না।'

কথাটা শ্রীহর্ষকে একবার জানান দরকার। বৈকুণ্ঠ বলিল, 'আসি আমি একবার শ্রীহর্ষর কাছ থেকে, তিনকড়ি, তোরা বোস্।'

বলিয়া সে শ্রীহর্ষর কাছে চলিয়া গেল।

রাত্রে শ্রীহর্ষর ভাল ঘুম হয় না, তাই সে দিনের বেলা এক ঘুম ঘুমাইয়া তখন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছে। বেলা প্রায় চারিটা। বৈকুণ্ঠকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, 'এই যে আসুন!'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'এলাম ত' বাবা, কিন্তু বড় চিন্তায় পড়েছি। পাত্র একটি আজ দেখে এলাম। ছেলেটি দেখতেও ভালো, এম-এ পাশও করেছে, খাঁকৃতিও অনেক। আড়াই হাজার টাকার কমে হবে না। দুহাজার টাকা নগদ চায়।'

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'টাকাটা কি আগেই দিতে হবে?'

'না, সে রকম কোন কথা হয়নি।' তবে টাকাটা হাতে আমাদের রাখা দরকার। কিন্তু—' বলিয়া কি যেন বলিতে গিয়াও বৈকুণ্ঠ চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীহর্ষ ভাবিল, বৈকুণ্ঠ তাহার কাছে টাকা চাহিতেই আসিয়াছে। বলিল, 'আচ্ছা, কাল আমি টাকার যোগাড় করে' দেবো।'

বৈকুণ্ঠও কথাটা আর তাহার কাছে ভাঙ্গিয়া বলিল না। ভাবিল, টাকা আগে। তারপর এসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া অন্য সম্বন্ধ দেখিতেই বা কতক্ষণ! শ্রীহর্ষ আগে টাকার জোগাড় করুক্।

কিন্তু তাহার পরের দিন টাকা জোগাড় করিতে গিয়া ভারি এক মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল। চেক্-বইখানি হাতে লইয়া শ্রীহর্ষ ব্যাঙ্কে গিয়াছিল টাকা আনিতে। বৈকুণ্ঠকে টাকা যখন সে দিবে বলিয়াছে তখন আর না দেওয়া হইবে না। চেক্-বইএ আড়াই হাজার টাকা লিখিয়া নাম সহি করিয়া সে টাকার জন্য 'কাউণ্টারে'র কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। যথা-সময়ে টাকাও সে পাইল কিন্তু নোটের তাড়াটা হাতে লইয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল—সর্ব্বনাশ! এত এত টাকা আর-একজনকে দান করিবে! তা হোক্, কথা যখন দিয়াছে তখন আর না দিলে উপায় কি!

এই ভাবিয়া নোটগুলি অতি সাবধানে পকেটে রাখিয়া সে ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইল। রাস্তায় আসিয়া একবার মনে হইল, গরীবের একটা মেয়ের বিয়ে, তাহার জন্য এক হাজার টাকাই যথেষ্ট, আড়াই হাজার টাকা কত বড় লোকের মেয়ের বিবাহে খরচ হয় না। সুতরাং বৈকুণ্ঠকে বলিলেই চলিবে—এক হাজারের বেশি পাওয়া গেল না।

এমনি সব নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ী ফিরিল। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়াও শ্রীহর্ষর চিন্তার আর অবধি নাই!

সারাদিন ভাবিয়া ভাবিয়া হায়রাণ হইয়া গিয়া সন্ধ্যায় যখন সে বৈকুণ্ঠের দেখা পাইল, বলিল, 'আসুন, আপনাকেই খুঁজছিলাম।'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'কেন বাবাজি, আমায় খুঁজছিলে কেন?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'চাঁপার বিয়ে আপনি প্রথমে আমার সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, না?'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'তাই ত' চেয়েছিলাম শ্রীহর্ষ, তা'হ'লে কি আর আমায় এত কষ্ট করতে হ'তো?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তাহলে শুনুন, শেষ পর্য্যন্ত ভেবে স্থির করলাম, চাঁপাকে আমিই বিয়ে করব।'

(ক্রমশঃ)

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

নারীর ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমানে, ও অতীতের বহুদিন ধরিয়া আমাদের দেশের নারী সামাজিক হিসাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে যে জীবন যাপন করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকে আদর্শ জীবন-যাপন, নিতান্ত সনাতন-পন্থীরাও বলিবেন না। অবশ্য এদেশের পুরুষের জীবন-যাপনকেও কোন দিক দিয়া আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইবার কারণ নাই। তবু পুরুষের সুযোগ আছে, সুবিধা আছে, জীবনকে প্রসার করিবার জন্য তাহার ক্ষেত্র বিস্তৃত। কিন্তু এদেশের নারীকে সংস্কার ও প্রচলিত প্রথা দ্বারা সীমাবদ্ধ স্থানে জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে এই সীমা ও প্রথার গণ্ডীকে অতিক্রম করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলন নারী-প্রগতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। একটি কথা ভুলিলে চলিবেনা যে এ আন্দোলনের মূল আমাদের দেশে নহে, ইহা সাগরপারের শিক্ষা ও দীক্ষার প্রেরণায় প্রাণ পাইয়াছে। সাগরপারের এ আন্দোলনের ইতিহাসও খুব প্রাচীন নয়। এই আন্দোলনকে বোধহয় প্রথম ভাষা দিয়াছিলেন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তাঁহার Subjection of Woman পুস্তক ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়—ইহাই তাঁহার শেষ প্রকাশিত রচনা। এই পুস্তকের অনুপ্রেরণা জোগান তাঁহার স্ত্রী। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার কিছু পূর্ব্বে এই মহিলা Enfranchisement of Women শীর্ষে এক রচনা প্রকাশ করেন। মিলের বই তাঁহার এই প্রবন্ধকে ভিত্তি করিয়া লিখিত মিলের বইকে আজও পর্য্যন্ত এ আন্দোলনের সমর্থকগণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। মিলের সময়ের প্রায় কোনও প্রথাই আজ ইংলণ্ডের সুদূরতম পল্লীতেও আচরিত হয় না—কিন্তু তৎসত্ত্বেও মিলের যুক্তিগুলিকে আজও একেবারে মরিচা-ধরা বলা চলে না। মিলের যুক্তির সারাংশ হইতেছে—স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা, এই পার্থক্যকে ভিত্তি করিয়া কখনও পুরুষের ও নারীর ক্ষমতার সীমারেখা টানা চলে না। তিনি বলিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত নারীকে পুরুষের সমস্ত কাজের ভার দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা না যাইবে যে, নারীরা পুরুষের কাজ করিতে সত্যই অক্ষম, ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষের মুখে নারীর অক্ষমতার কথা বেমানান হইবে। ইহা প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা। আজও নারী-প্রগতিমূলক আন্দোলনে মাঝে মাঝে এই যুক্তিরই অবতারণা দেখা যায়।

কিছু পরবর্ত্তী সময়ের লেখক, ফ্রেডারিক হ্যারিসন্ নারী-আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ১৯০৮ সালে তাঁহার প্রকাশিত Realities and Ideals পুস্তকে এ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে। ফ্রেডারিক হ্যারিসনের মতে, যদিও ইহা সত্য যে বহুকাল হইতে পুরুষ নারীর প্রতি অবিচার করিয়া আসিতেছে, এবং সে অবিচারের কোন মার্জ্জনা নাই, তবু স্ত্রী পুরুষে কোন ভেদ নাই এ মতকে তিনি হাস্যকর বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, বহু যুগের বিবেচনা, বিচার ও পরীক্ষার পর মানুষ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে—এই বিভেদ ভাঙিবার চেষ্টা করা মূঢ়তা মাত্র।

বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা একেবারে নারী-আন্দোলনের সহিত জড়িত নন্, তাঁহারা হ্যারিসন সাহেবের মত মানিয়া লইয়াছেন। নারী ও পুরুষের যে পার্থক্য আছে এবং নারী ও পুরুষের কর্ম্মশক্তির মানদণ্ড যে এক নহে—ইহা প্রায় স্বীকৃত সত্যে দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে নারী-আন্দোলনের নেত্রীবৃন্দের মধ্যেও এই মত খানিকটা গ্রাহ্য হইয়াছে (গত সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদগুলি দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৭)। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে স্বীকার করিয়া লইলেও কার্য্যতঃ এ বিষয়ে কিছু হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার একটি কারণ এই যে আমাদের দেশের নারী-শিক্ষায়তনগুলি পুরুষ-শিক্ষায়তনের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। ফলে নারী ও পুরুষ এক পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-শিক্ষার ভাল ও মন্দ লইয়া কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর কাল এদেশের পুরুষ হিমসিম্ খাইয়া মরিতেছে, নিরুপায় হইয়া সেই শিক্ষারই আওতায় পড়িয়া আধুনিক কালে এদেশের নারী—এদেশের পুরুষের একশত বৎসর পূর্ব্বের কৃত ভুলের অনুসরণ করিতেছে মাত্র। হয়তো

ইহা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু অবশ্যম্ভাবীত্বেরও প্রতীকারের কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশের নারীশিক্ষার কর্ণধারগণ যত শীঘ্র নারী-শিক্ষার একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ভাবিয়া-চিন্তিয়া বাহির করেন, ততই ভাল।

অবশ্য এ যুগেও যাঁহারা মনে করেন, মেয়েদেরকে একটু-আধটু লেখা-পড়া, টেলিগ্রাম পড়িবার মতো ইংরেজি ও ধোবার খাতা রাখিবার মতো অঙ্ক শিখাইলেই চলে—তাঁহাদের কথা উঠিতেই পারে না। নারীকে পুরুষের চাইতে কোনদিক দিয়া নিকৃষ্টতর শিক্ষা দিবার কথাও উঠিতে পারেনা। বরং পুরুষের শিক্ষার বহু বিষয়কে অতিক্রম করিয়া নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সে-ব্যবস্থা কি রকম, তাহার একটা খসড়া গত শতাব্দীতে রাস্কিন তাঁহার Sesame and Lilies পুস্তকের Queen's Garden অধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন। যে-দেশে বসিয়া তিনি এই বই লিখিয়া গিয়াছেন,—সে-দেশ কোন দিক দিয়াই তাঁহার দেওয়া নারীশিক্ষার আদর্শ মানিয়া চলে নাই—চলা সম্ভবও হয় নাই। সে-দেশের আবহাওয়ায় রাস্কিনের আদর্শ অচল। আমাদের মনে হয় এদেশের আবহাওয়ায় রাস্কিনের নারী-শিক্ষাকে কার্য্যকরী করা অসম্ভব নয়।—এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

আজ আমরা ফ্রেডারিক হ্যারিসন সাহেব নারীর ভবিষ্যৎ, The Future of Women বলিয়া যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। তিনি বলিতেছেন:—the root of the matter is that the social function of women is essentially and increasingly different from that of men, অর্থাৎ মোদ্দা কথা হইতেছে এই, যে, মেয়েদের সামাজিক কর্ত্তব্য পুরুষদের চাইতে মূলতঃ এবং রীতিমত পৃথক। তাঁহার মতে এ কর্ত্তব্য পারিবারিক, ব্যক্তিগত। এ কর্ত্তব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ—দরদ, ইহার মূলে চাই কল্পনা, শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নয়। শারীরতত্ত্বের দিক দিয়াও এ কথা অবিসম্বাদী ভাবে সত্য। এবং এ সত্যের পিছনে মনুষ্য-সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইতিহাস রহিয়াছে। প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক বাড়ীর প্রতিটি কাজে ইহার পরিচয় আমরা পাইতেছি। এবং পৃথিবীর আধুনিক ও প্রাচীন যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য গুলির উপজীব্য নারীত্বের এই পরিচয়।

তাঁহার মতে এই পার্থক্যের জন্যই আমরা এমন কিছু বলিতে পারি না যে নারী ও পুরুষ, এ ইহার অপেক্ষা বড়। তিনি বলিতেছেন—who can say, whether it is nobler to be husband or to be wife, to be mother or to be son? অর্থাৎ কে বলিবে স্বামী ও স্ত্রী, মা ও ছেলে, ইহার কোনটা হওয়া মহত্তর? The thing which concerns us is to hold fast by the organic difference implanted by nature between man and woman—অর্থাৎ আমাদের কাজ হইতেছে শুধু প্রকৃতি-স্বতঃসিদ্ধ ভাব নারীকে পুরুষ হইতে যে পৃথক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে মানিয়া লওয়া।

তাঁহার মতে মাতৃত্বই নারীত্বের এবং মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তিনি বলিতেছেন শুধু নিজের ছেলেকে নয়, নারী মাত্রেরই পুরুষকে শিক্ষা দিবার অধিকার আছে—the true function of women is to educate, not children only, but men, to train to a higher civization, not the rising generation, but the actual society.

ইহার পর হঠাৎ হ্যারিসন সাহেবের খেয়াল হইয়াছে যে এ সব কথা বহুদিন ধরিয়া বহুলোক বলিয়া আসিয়াছে, সুতরং তিনি একটু লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন—একথা সকলেই জানে, হোমার হইতে টেনিসন সকলেই এই কথাই লিখিয়া গিয়াছে। এবং তিনি ইহার বেশী আর কি বলিবেন?

হ্যারিসন সাহেব ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, একথা সত্য, কোনও স্ত্রীলোকই আর্কিমিডিস্, শেক্সপীয়ার, দেকার্ত্তে, রাফেল কি মোজার্টের সমকক্ষ প্রতিভা দেখাইতে পারে নাই; কিন্তু প্রতিভার কথা বাদ দিলে দেখা যাইবে মোটামুটি স্ত্রীজাতি পুরুষের চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে। একথার উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, যদিও একটি সীজারের কাছে এক লক্ষ সুনিপুণা গৃহিনী ম্লান হইয়া যায়, তবু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই গৃহিনীরাই যুগের যুগের মানুষের সুখ-শান্তির খোরাক জোগাইতেছে।

তারপর তিনি বলিতেছেন—নারীর কর্ম্মকেন্দ্র হইতেছে গৃহ ও পরিবার এবং গৃহ ও পরিবারের যে-আবহাওয়া, বহির্জ্জগতে সেই আবহাওয়ার সংরক্ষণ। তিনি মেয়েদের অন্দরে বসিয়া থাকিতে বলেন না, সদরেও তাহাদের প্রয়োজন

আছে—কিন্তু সেখানে পুরুষের যে-প্রয়োজন, নারীর সে-প্রয়োজন নয়—ইহাই তাঁহার মত। তিনি নারীকে পুরুষ হইতে দিবার পক্ষপাতী নন্। এরূপ চেষ্টা করিলে স্বভাবের বিরুদ্ধবাদ করা হইবে। তাঁহার মতে—women must choose to be either women or abortive men. They can not both be men and women—অর্থাৎ নারীকে হয় নারী হইতে হইবে, নয় ক্লীব-পুরুষ হইতে হইবে, পুরুষ ও নারী ভাগাভাগি করিয়া দুই-ই হইব এমন হইতে পারে না।

পাপ ব্যবসার বিরুদ্ধে সমাজের কর্ত্তব্য

আপনারা সকলেই জানেন পাপ-ব্যবসার বিরুদ্ধে কিছুদিন হইতে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে এবং আইন পাশ করিয়া যাহাতে এই অনাচার বন্ধ হয় তাহার জন্য দেশের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন ও কলিকাতার বিভিন্ন নারী-প্রতিষ্ঠান আইনটি যাহাতে সত্বর পাশ হয় তাহার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই শুভ প্রস্তাব যে সমাজের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই সমর্থন করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা নারীর দেহকে পণ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর দেশ-বিদেশ হইতে নূতন নূতন যুবতী ও বালিকার সন্ধান লইয়া, তাহাদের প্ররোচিত করিয়া ইহারা বাজারে ছাড়িয়া দেয়, রাতের পর রাত এই হতভাগিনীরা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মনুষ্যত্বকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া, নারীত্বকে পিষিয়া, বুকের রক্ত ঢালিয়া অর্থ সঞ্চয় করে ; কাহারও সে অর্থ ভোগে আসে কাহারও বা অপরের সিন্ধুকে গিয়া স্থান পায়। দিনের পর দিন এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বাড়িয়া চলিয়াছে, দেশের ভিতর এই জঘন্য অনাচার পরিব্যাপ্ত হইয়া জাতির মজ্জায় মজ্জায় যে দারুণ ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে সে সম্বন্ধে অবহিত না হইলে আমাদের যে এক মহা সর্ব্বনাশ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দুর্নীতি বন্ধ করিতে হইলে আইন পাশের আবশ্যকতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু আইনের সাহায্যে বাহিরের ক্ষতের উপর একটা প্রলেপ পড়িবে মাত্র, ভিতরের রক্তদুষ্টির প্রতীকার হইবে না।

পৃথিবীর স্মরণাতীত কাল হইতে বহু বিধির প্রচলন হইয়াছে কিন্তু মানুষের দুর্নীতিকে তাহা বন্ধ করিতে পারে নাই। তপ্ত কটাহের ভিতর ফেলিয়া, শিরশ্ছেদ করিয়াও অপরাধীর চৈতন্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহা প্রকাশ্যে চলে তাহা গোপনে চলিবে মাত্র এবং এই গোপনতা হয়তো বর্ত্তমান অবস্থার অপেক্ষা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে।

ইংলণ্ডে বারবনিতার বৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য কোন নারীকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং আইনানুসারে এই বৃত্তি-অবলম্বনকারিণীরা দণ্ডনীয়া হইতে পারে, তথাপি একথা কি সত্য সেখানে ষোল আনার পুরাপুরি 'সতীত্ব' আছে—ব্যাভিচার নাই, এই পাপবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে এমন কোন নারীই নাই?—তাহা হইতে পারে না, কখনও কোন দেশে হওয়া সম্ভব নয়!

তবে কি এই পাপ-ব্যবসায় অবাধে চলিতে দিবার পক্ষে মত আছে?···কখনই নয়, কিন্তু মাত্র একটি আইন পাশ করিয়াই যদি ইহার মূলোচ্ছেদ করিলাম বলিয়া আমাদের ধারণা হয় তাহা হইলে আমরা যে একটি প্রকাণ্ড গলদ করিয়া বসিব সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

আইন আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে শান্তি দিতে পারে না। যাহারা এতদিন এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিল আজ মধ্যপথে তাহাদের উপর নৈতিক বোঝা চাপাইয়া দিলেই যে তাহারা দেবী হইয়া উঠিবে এরূপ কোন ভরসা নাই। আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে চুপ করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্কোচন হইবে না।

মেয়েদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া যে সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত এই পাপ ব্যবসায় চালাইতেছে তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ড-বিধানের প্রয়োজন আছে এবং বর্ত্তমানে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু যে সমস্ত বালিকা ও যুবতী পাপ-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে বা লিপ্ত হইতে চলিয়াছে তাহাদের উপায় সম্বন্ধে যদি আমাদের সমাজপতিরা চিন্তা না করেন তাহা হইলে আইনের সাহায্যে এ ব্যবসায় বন্ধ হইতে পারে না।

যে দেশে নারীর একবার পদস্খলন হইলে সমাজে ফিরিবার ঠাঁই নাই, ভাল হইতে চাহিলেও যাহাদের ভাল করিবার উপায়

নাই সে দেশে এ সমস্ত নারী কি করিতে পারে? এ দেশে এমন কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে, যে-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ইহারা সৎভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে? এমন কয়টি আশ্রম আছে যাহাতে তাহারা আশ্রয় পাইতে পারে এবং যেখানে গিয়া তাহারা নিপীড়িত হইবার অপেক্ষা রাখে না? ইহাদের ঠাঁই দিবার জন্য যতগুলি প্রতিষ্ঠান হওয়া আবশ্যক আজও তাহা হয় নাই অথচ সকলের পুর্ব্বে তাহাই হওয়া উচিত।

ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, জীবনের যে মহতী বৃত্তি-গুলিকে ইহারা পিষিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের সেই সব নৈতিক সচেতনতা ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা, সমাজের ভিতর তাহাদের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি যে প্রাথমিক কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা না করিলে ইহাদের নিকট হইতে জাতির আশা করিবার কিছু থাকিতে পারে না।

তাহা ছাড়া যে সমস্ত নবাগত যুবতী বা বালিকা এখনও পাপকে পাপ বলিয়া ভাবে, বাধ্য হইয়া যাহাদের আত্মদান করিতে হইতেছে তাহাদের সহিত এ ব্যবসায়ে সংস্কারাভ্যস্ত নারীদের একত্রে রাখা চলিতে পারে না। দেহের প্রতি শোণিতে যাহাদের পাপ প্রবৃত্তি বাসা বাঁধিয়াছে, যাহারা অনুভূতিলেশহীন হইয়া গিয়াছে, পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে থাকিয়াও তাহার দুর্গন্ধ যাহারা আর পায় না তাহাদের মহিয়সী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে তাহা সাধারণতঃ ব্যর্থ হইবে একথা জোর করিয়া বলিতে পারি।

লোকের মুখে প্রায় শোনা যায়, 'যাহার ভাল ভাবে থাকিবার ইচ্ছা সে ভাল করিয়া থাকিতে পারে', কিন্তু অবস্থা গতিকে যে ভালভাবে থাকিতে চাহিলেও থাকা যায় না একথা অনেকে বুঝেন না। মানুষের প্রতি উপদেশবর্ষণ করিবার মত সহজ ও অনায়াসসাধ্য কার্য্য আর কিছুই নাই, তাই আমরা এই সমস্ত হতভাগিনীর প্রতি বহু সময়ে অন্যায় বিচার করিয়া থাকি, ইহাদের কাছ হইতে বড় বড় জিনিষ প্রত্যাশা করিয়া থাকি কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখি না।

নারীর সতীত্ব রক্ষা করা মানুষের কর্ত্তব্য এবং সমগ্র সমাজ তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ক্ষণিকের দৌর্ব্বল্যে বা পারিপার্শ্বিক ঘটনার চক্রে পড়িয়া কোন নারীর পদস্খলন যদি ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে চিরজীবনের মত হেয় জ্ঞান করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেওয়া যে কতখানি অবিচার তাহা ভাবিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। একটা মানুষ চির জীবনের মত অপবিত্র হইয়া যায় কোন্ শাস্ত্রের বিধানে তাহা জানিনা, কিন্তু মানুষের এই অবিচার পাপের কর্ম্মক্ষেত্রকে শুধু বিস্তৃত করিয়া দেয় মাত্র। পাপ-ব্যবসায় বিস্তার লাভ করিবার বহু কারণের মধ্যে ইহাও একটি প্রধান কারণ।

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলন

শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র রায়ের পত্নী গত ২৪শে শ্রাবণ রেডিওতে 'নিখিল ভারত নারী সম্মেলন' সম্বন্ধে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় নারী-সম্মেলনের কার্য্যাবলীর বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত হইল। গত সংখ্যায় ১০৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সম্মেলনের বিবরণীর সহিত নিম্নের মুদ্রিত অংশ পাঠ করা প্রয়োজন—

……ভারতবর্ষের কোন একটি প্রধান সহরে প্রতি বৎসর মূল সম্মেলনের একটি করে অধিবেশন হয়। প্রতি শাখা থেকে দশজন প্রতিনিধি সেই বার্ষিক অধিবেশনে প্রেরিত হয়। এই অধিবেশনে সকল প্রদেশ থেকে দেশের ভাবানুযায়ী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং তার মধ্যে যেগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয়, সেইগুলি প্রত্যেক স্থানীয় সমিতি কার্য্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেন।

কলিকাতার স্থানীয় সমিতির কাজের মধ্যে :—

[১ম] সারদা আইন যাতে ফলপ্রদ হয়, তার জন্য গত দুই বৎসর হতে মহিলাদের মত গঠন করবার বিস্তর চেষ্টা হয়েছে।

[২য়] All Bengal Women's Union বা নিখিল বঙ্গ নারী-সঙ্ঘ পাপ-ব্যবসা-দমন আইন পাশ করবার জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। আমাদের অনেক সভাও এ বিষয় তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। সকলের সম্মিলিত চেষ্টা ও যত্নে আইনটি পাশ হয়েছে এবং ৯০০০৲ টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক যাতে উদ্ধৃত বালিকাদের একটি আশ্রয় স্থাপন করা যেতে পারে তারও উদ্যোগ চলেছে।

[৩য়] তাছাড়া স্থানীয় সমিতি অস্পৃশ্যদের একটি বস্তির উন্নতিকল্পে নানা কাজের সূত্রপাত করেছেন। রাস্তাগুলি মেরামত করা, জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা, স্নানের জায়গা পরিষ্কার করা, ঘরগুলিতে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি অনেক উন্নতি সাধন করেছেন। সেখানে বয়স্কদের জন্য একটি নৈশবিদ্যালয়ও খোলা হয়েছে, তাতে এখন ছাত্র-ছাত্রীর

সংখ্যা প্রায় ১৫০ শত। ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় ও বর্ত্তমান সময়ের নানা ঘটনা সংবাদপত্র থেকে পড়ে শোনানো হয়।

[৪] তারপর স্থানীয় সমিতির উদ্যোগে প্রামিথক শিক্ষাবিভাগের শিক্ষয়িত্রীগণের উন্নতিকল্পে তাদের জন্য refresher courses বা শিক্ষা-সঞ্জীবনী শ্রেণী স্থাপিত হয়েছে। তাতে অঙ্ক ও বাঙ্গালা সাহিত্য কি রূপে সহজে সুন্দর ভাবে শেখাতে পারা যায়, তা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হয়েছে।

[৫] বয়স্কা মহিলাদের জন্য ভবানীপুরে একটি স্কুল খোলা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহে তিনদিন আমাদের কোন কোন সভা গিয়ে তাঁদের বাঙ্গালা ও ইংরাজি পড়ান এবং সেলাই ও তাঁত শেখান।

[৬] স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের জন্য স্থানীয় সমিতি কর্পোরেশনের কাছ থেকে কয়েকটি বাগান চেয়ে নিয়েছেন। সেখানে যাতে তাঁরা খোলা হাওয়ায় বেড়াতে পারেন ও নানারূপ স্থানে ব্যায়াম চর্চ্চা করতে পারেন, সমিতি তার ব্যবস্থা করেছেন।

মূল সম্মেলনের চেষ্টায় দিল্লীতে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করবার জন্য সম্প্রতি একটি home science college প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য বিশেষ করে মেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত গার্হস্থ্য শিক্ষা দেবার উপযোগী ব্যবস্থা করা ও ভারতীয় ধারা এবং প্রয়োজন বুঝে শিক্ষা দান করা। সেজন্য ৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গত বৎসর হ'তে এই কলেজ উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অধীনে নয়াদিল্লীতে ১১নং বরখম্বা রোডে ১১টি ছাত্রী নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছে। ঐ বাড়ীতে আপাততঃ কাজ চলবার মত যথেষ্ট ঘর আছে। তাছাড়া ব্যায়ামের উপযুক্ত সকল রকম ব্যবস্থাই আছে। সমস্ত প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলির কার্য্যবিবরণী ও প্রয়োজনীয়তা দেখে এবং যাতে আশুফলপ্রদ হয় সেই বুঝে, একটি কার্য্যপদ্ধতি ১৯৩১ সালে বিশেষ সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। আরো টাকা সংগ্রহ হ'লে পড়বার বিষয় এবং বিদ্যালয়গৃহ বাড়ানো যেতে পারে। শরীর চর্চ্চা, কারু ও চারুশিল্প এবং গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনেক বিষয় এখানে শেখানো হয়। এ দেশের শিশুদের জীবনের উন্নতি কি ভাবে করা যেতে পারে, তার গবেষণাও এখানে করা হবে। সেই সংক্রান্ত একটি research bureau বা গবেষণা-বিভাগ ও একটি child's guidance council বা শিশু-শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হবে। সমাজ-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ভারতীয় লোকসঙ্গতি (folk music, folk song, folk dancing) ও চারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া হবে। পল্লী-বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে পল্লীশিক্ষাও যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয়, তারও চেষ্টা করা হবে। শিক্ষয়িত্রীগণের পাঠ্য বিষয় অনেকগুলি। তার মধ্যে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়, যথা :—

সেলাই, পাক প্রণালী, কাপড় ধোলাই এবং গৃহস্থালী ছাড়াও ফলিত বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, জীবতত্ত্ব, প্রাথমিক অস্থিবিদ্যা, শরীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যনীতি, প্রাথমিক প্রতিকার, গৃহ-সেবাবিধি, মাতৃনীতি, সুজননবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, বাগান-তৈরী, পৌরবিজ্ঞান (civics) প্রভৃতি নানা বিষয় শেখান হয়। শিক্ষয়িত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা-প্রণালী দুই বৎসর ব্যাপী। কিন্তু যাঁরা সাধারণ ছাত্রী হিসাবে আসবেন, তাঁদের এক বৎসরের মধ্যেও সংক্ষিপ্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

* * * *

যদিও এই সম্মেলন রাজনৈতিক দলাদলিতে যোগদান করেন না, তবুও ভারতীয় নারীর ভোটপ্রাপ্তির অধিকার সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহী। কারণ আইন সংস্কারে অধিকার না থাকলে, শিক্ষা সংস্কার কিংবা সমাজ সংস্কার করা দুর্ঘট। যে মেয়েরা আজকাল বাংলা কাউন্সিলে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। কেননা, যাঁদের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের সম্পত্তি নেই তাঁরা পুরুষই হোন কিংবা মেয়েই হোন, ভোট দিতে পারেন না ; আর ও রকম সম্পত্তির মালিক, মেয়েদের মধ্যে এ দেশে কমই আছে। এই নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সুযোগে মেয়ে ভোটারদের সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া দরকার ; কেননা পুরুষদের মত মেয়েদেরও যে দেশের ওপর একটা দাবী আছে এবং দেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে সে কথা ভুললে চলবে না। প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই যাঁরা ভোটপ্রার্থী হন তাঁরা দেশের কি কাজ করেছেন আর কি কি সংস্কার করতে প্রস্তুত আছেন, তার একটা ঘোষণাপত্র তাঁরা প্রচার করেন। সেই কাজগুলি যদি তাঁরা কথামত না করেন, তাহলে পরের বারে নির্ব্বাচিত হবার আশা করতে পারেন না। কিন্তু মেয়ে ভোটারদের সংখ্যা আমাদের দেশে এত কম যে, ভোট-প্রার্থীরা তাঁদের ভোটের উপর মোটেই নির্ভর করেন না ; কাজেই তাঁরা মেয়েদের উন্নতির জন্য কাজ করবার কোনও বাধ্যবাধকতা অনুভব করেন না। মেয়ে ভোটারদের সংখ্যা বাড়ালে পর তবেই এ অবস্থার কতক প্রতিকার হওয়া সম্ভব। সেজন্য এই সম্মেলনের সঙ্গে সমধর্ম্মী অন্য দুইটি ভারতী

সম্মেলন যথা—Women's Indian Association বা নারী সভা এবং National Council of Women বা জাতীয় নারী সম্মেলন একত্রে ১৯৩১ সালের প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে স্ত্রীলোকের ভোটপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ঐক্য মত লিখে পাঠান। তাতে তাঁরা সংক্ষেপে এই প্রস্তাব করেছিলেন যে, পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সমান অধিকার স্বীকার করা হোক। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে ২১ বৎসর বয়স্ক সকলকেই ভোটের অধিকার দেওয়া হোক। তৃতীয়তঃ, পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে স্ত্রীলোকদের নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হোক—কোন সুযোগ সুবিধা তাঁরা চান না। চতুর্থতঃ, সম্প্রদায়ভেদের উপর নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার তাঁরা সম্পূর্ণ বিরোধী; কারণ তাতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট করা হয়।

এ প্রস্তাব কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়, এই অজুহাতে বিলাতের বৈঠক তা না-মঞ্জুর করেন। তাতে যদিও এই নারী সভ্যগুলি বিশেষ দুঃখিত হন, তবুও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে প্রথম দুইটি সম্মেলন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আর এক প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং তিনটি সভ্যের উপর তাঁদের পক্ষ সমর্থন করিবার ভার দিয়েছেন—যথা, ডাক্তার মুথুলক্ষী রেডি, রাজকুমারী অমৃত কাওর ও শ্রীমতী হামিদ আলি।

এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রথম প্রস্তাবের তিনটি অঙ্গ বজায় রেখে, কেবল একটি বিষয়ে, অর্থাৎ কিরূপে ভোটদাত্রী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে, সেই বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। যথা—(১) কেবলমাত্র লিখতে পড়তে জানলেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ভোট দেবার অধিকারী হবে (২) White paper-এ সম্পত্তিকে ভিত্তি ক'রে যে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ দুজনেরই পক্ষে সেই ভিত্তি বহাল থাকবে। (৩) ভোটদাত্রী স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য যে বিশেষ উপায় Franchise Committee প্রস্তাব করেছেন, অর্থাৎ যে সকল পুরুষ সম্পত্তির মালিক হিসেবে ভোটার, স্বামীর জীবিতকালে কিংবা মৃত্যুর পরে তাঁদের স্ত্রীদেরও ভোট দেওয়া—এই সম্মেলন দুইটি, সে প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাঁদের মতে বিবাহরূপ অনিশ্চিত ঘটনার উপর নাগরিক অধিকার নির্ভর করা উচিত নয়। সেই জন্য উক্ত সম্মেলনগুলির প্রস্তাব এই যে, শিক্ষিতা স্ত্রীলোক ও সম্পত্তির মালিক ভিন্নও ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নগরবাসী স্ত্রী-পুরুষকেই ভোটের অধিকার দেওয়া হোক।

অতঃপর আগামী বড় দিনের বন্ধে যে-সম্মেলন হবে, তার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন—

আমাদের এই বার্ষিক সম্মেলনের সঙ্গে এক প্রদর্শনী থাকবে। তাতে শিক্ষামূলক ও সমাজ-সংস্কারক প্রতিষ্ঠান সকলের নানাবিধ চার্ট নক্সা ও দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হবে।

এই প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত বিভাগ থাকবে—

(ক) সেলাই—(১) মোটামুটি ঘর সংসারের সেলাই।

(২) গৃহসজ্জা ও দেহসজ্জার্থে স্বদেশী ছাঁচের কারু সেলাই।

(খ) দেশজ শিল্পকলা ও কারুকার্য্য :—

(১) তাঁত বোনা, (২) মাটির বাসন তৈরি, (৩) ছবি আঁকা, (৪) বেতের কাজ, (৫) প্রথম তিনটিতে প্রচলিত ও মৌলিক নক্সা।

(গ) (১) ইতিহাস (২) ভূগোল (৩) প্রাকৃতিক জ্ঞান চর্চ্চা (৪) পড়া (৫) অঙ্ক সম্বন্ধে শিক্ষার সাহায্য ও ব্যাখ্যার সুবিধার্থে নানা প্রকার ছবি, মূর্ত্তি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি।

(ঘ) সামাজিক সংস্কার—ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব, (১) ব্যাখ্যা চিত্র দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় বোঝান :—

যেমন (ক) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, (খ) স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, (গ) শিশুমঙ্গল—(১) কাপড় (২) খাদ্য (৩) সাধারণ স্বাস্থ্য (৪) যথোচিত আহার (৫) ভাল ও বিশুদ্ধ দুধ সরবরাহের জন্য গৃহপালিত পশুর যত্ন।

ব্যাখ্যা-চিত্র বা মূর্ত্তি দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় বোঝান :—

যেমন, (১) আদর্শ গৃহ—(ক) সহরে, (খ) গ্রামের শেষোক্ত স্থলে উঁচু ভিট, বাড়ীর পত্তনভূমি, বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, গোয়াল ঘর, আবর্জ্জনা ফেলার যথাবিহিত ব্যবস্থা, জলনিকাশের পথ জল সরবরাহ এবং স্নানের বন্দোবস্ত প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(২) আদর্শ রান্নাঘর—কম খরচায় সন্তোষজনক উনান প্রস্তুত. অবর্জ্জনা ফেলার ব্যবস্থা ইত্যাদি আদর্শ, রোগ-গৃহ।

(৩) সহরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিত্রাদি প্রদর্শন :—

কর্পোরেশন ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্যকলাপ ইত্যাদি, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জলনিকাশ প্রণালী, খাদ্য দ্রব্যের শুচিতা রক্ষা, আলো বাতি, মাছি-মশার বিরুদ্ধে অভিযান, রাস্তা।

এই সকল বিভাগের প্রদর্শিত দ্রব্য স্কুল, কলেজ ও মহিলা সমিতি প্রভৃতির প্রেরিতব্য।

[স্থানীয় সমিতির বার্ষিক চাঁদা ২৲। অন্যান্য তথ্য সম্পাদিকাকে ৩৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে লিখলে জানতে পারা যাবে।]

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজী সাহিত্যের কাহিনী

বাইবেল

ইতিহাস বা কোন কিছু পড়তে গেলেই তোমরা প্রায়ই দুটি সংক্ষিপ্ত শব্দ দেখতে পাও—একটিকে বলো বি-সি, B. C. আর একটিকে বলে এ-ডি, A. D. বি-সি, মানে হলো Before Christ, খৃষ্টপূর্ব্ব, A. D. হলো, Anno Domini, the time after Christ, যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পর। যাকে আমরা সাধারণত বলি খৃষ্টাব্দ।

যেদিন থেকে প্রথম মানুষ সৃষ্ট হলো সেদিন থেকে আর আজ—এই যে আমি তোমাদের কাহিনী শোনাচ্ছি, এই বিরাট সময় জগতে যা কিছু ঘটেছে সমস্ত যদি একটা ছবির মত একজাগায় ভাবতে পারো—তা হলে দেখবে একদিকে নানা রকমের লোকজন, প্রাচীন সব দুর্গ, পিরামিড, বিরাট সব স্তূপ রয়েছে—প্রাচীন জগতের ছবি, তার পরে একটা একটু ফাঁকা জায়গা, সেখানে একটা কাঠের ক্রুশে একজন মানুষ লৌহবিদ্ধ হয়ে রয়েছে—তার পর আবার লোকজন, নতুন ধরণের বাড়ী, নতুন ধরণের গির্জ্জা, নতুন ধরণের সব মন্দির উঠেছে—আমাদের বর্ত্তমান জগৎ। সেই কাঠের ক্রুশের পিছন দিককার জগৎকে বলে B. C., তার সামনের জগৎকে বলে A. D. এই বিরাট কালকে একটি ছোট কাঠের ক্রুশ দু'ভাগ করে দিয়েছে।

এমনি ভাবে আজ সকল দেশে মানুষ সময়কে দুভাগ করে নিয়েছে। সকল দেশের ইতিহাসে প্রতিদিনের কাজকর্ম্মে, ব্যবসায়ে মানুষ সময়কে এই ভাবে দু'ভাগে ভাগ করেছে। তোমরা একটু ভেবে দেখো যে এই ব্যাপারে জাতিধর্ম্মদেশ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষ এক হয়েছে। অনন্ত কালস্রোতকে দ্বিখণ্ড করে তার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে—একটি অপূর্ব্ব মহামানব, তার কোনও দেশ নেই, কোনও জাতি নেই—যেখানে সব মানুষ এক—সেই বেদনার সে প্রতীক। তাই সব মানুষ তার কাছ থেকেই সময়কে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে—কারুর মনে কোন বাধা, কোনও সঙ্কোচ আসে নি।

সময়কে যেমন আমরা দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছি বাইবেলও তেমনি দু'ভাগে বিভক্ত। যে-অংশ যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে রচিত হয়েছিল, তাকে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট, Old Testament বলা হয়, যে-অংশ তাঁর জন্মাবার পর রচিত তাকে বলা হয় নিউ টেষ্টামেণ্ট, New Testament. ঈশ্বর মানুষের কল্যাণের জন্য যে শপথ করেন Old Testament-এ তা লিখিত হয়েছে, যীশুখৃষ্টের জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষের কল্যাণের জন্য যে নতুন সুসমাচার পাঠালেন তাকেই বলে New Testament. অন্যভাবে বলা যায় Old Testament-এ মানুষের কল্যাণের জন্যে যে সব ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছিল New Testament-এ যীশুখৃষ্টের জীবনের মধ্য দিয়ে তা সফল হলো, তাই দেখানো হয়েছে। এই দুইখানি বই নিয়েই হলো বাইবেল। এবং এই বাইবেলের প্রধান-পুরুষ হলেন যীশু।

Old Testament-এ আমরা একটি প্রাচীন জাতির ইতিহাস পাই। সে জাতিটির নাম হোলো হিব্রু; Hebrews, তাদেরকে কখনও জু, Jew এবং কখনও বা তাদের ইস্রেলাইট্‌স্ Israelites ও বলা হয়। এই Old Testament-এ তাদের দেশের যারা জ্ঞানী গুণী লোক তাঁরা নিজেরাই তাঁদের জাতির ইতিহাস লিখে গিয়েছেন হিব্রু ভাষায়। এই প্রাচীন য়িহুদীদের বিশ্বাস ছিল যে, জগতের লোককে জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে অথবা ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা দেবার ভার ঈশ্বর শুধু তাঁদেরই ওপর দিয়েছেন। তাঁরা সেই জন্যে বলতেন যে, তাঁরা হলেন ভগবানের নির্ব্বাচিত জাতি, ভগবান তাঁদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁদের দিয়েই জগতের কল্যাণ সাধন তিনি করাবেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে এই ভাবে তাঁরা যে সব বাণী পেয়েছিলেন, সেগুলি তাঁদের দেশের ধার্ম্মিক লোকেরা তাঁদের হিব্রু ভাষায় অনুপম করে লিখে রেখেছিলেন। এই হলো Old Testament.

এই প্রাচীন য়িহুদীরা ভারী সুন্দর জাতি ছিল। তাদের নিজের ঘরকে ঘিরে তারা এই পৃথিবীতে একটা চমৎকার শান্তিময় জীবন-যাপন করতো। সংসারকে, সাংসারিক জীবনকে, তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো—কৃপণ যেমন তার

সঞ্চিত অর্থকে ভালবাসে সে ভাবে নয়, সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে ভালবাসে তেমনি ভাবে তারা ভালবাসতো, উদার, সুন্দর, অকুণ্ঠভাবে। সবার ওপর তাদের সকলের একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের প্রত্যেকের কাজ লক্ষ্য করছেন। তাদের যে বিপদ-আপদ বা দুঃখ-দৈন্য ছিল না তা নয়। সেই সময়কার অন্য সব জাতি তাদের অত্যন্ত ঘৃণা করতো এবং সুবিধা পেলেই নির্য্যাতন করতে ছাড়তো না, কিন্তু এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-নির্য্যাতনের মধ্যে তাদের অন্তরের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, ভগবান তাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তিনি তাদের মধ্যে এমন একজনকে পাঠিয়ে দেবেন, যিনি তাঁর অনন্ত শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে তাদের শত্রুদের বিনাশ করে জগতে আবার তাদেরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করাবেন।

সেই জন্যে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রির মধ্যে দিয়ে তারা অপেক্ষায় ছিল, মা যেমন অপেক্ষায় থাকে প্রবাসী সন্তানের ফিরে-আসার পথের দিকে চেয়ে, পৃথিবী যেমন অপেক্ষায় থাকে দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রির মধ্যে দিয়ে প্রথম উষার আলোর আশায় তেমনি করে একটা সমগ্র জাতি অপেক্ষায় ছিল, কখন্ তিনি আসেন। সমগ্র Old Testament-এর মধ্যে এই অপূর্ব্ব চেয়ে-থাকা, এই অপূর্ব্ব আসার আশায় অপেক্ষা করে-থাকা প্রত্যেক অক্ষরের মধ্য দিয়ে এমন সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে যে, Old Testament কে আশার মহাকাব্য বলা যেতে পারে।

কিন্তু তিনি এলেন সংগোপনে এক অতি দরিদ্রের ঘরে। হাতে তাঁর জিহোবার বজ্র নেই—সঙ্গে তাঁর রণবাদ্য নেই—সামান্য এক দরিদ্র কৃষক—কমনীয়তায় ভরা বর-তনু, জেলেদের সঙ্গে ভাঙ্গা নৌকোয় ঘুরে বেড়ান। পথের ভিখিরীদের সঙ্গে ভিখিরীর সাজে ফেরেন—লোকদের ডেকে বলেন যারা তোমাদের শত্রু তাদেরই করো ক্ষমা! য়িহুদীরা গেল চটে। যার জন্যে দীর্ঘ রাত্রি তারা ছিল অপেক্ষায়, তিনি যখন এলেন, যখন বল্লেন, আমি এসেছি, তাঁর কাছ থেকে শুধু এই কথা-টুকু তোমাদের বলবার জন্যে, ভালবাসো, ক্ষমা করো! তারা গেল চটে, বল্লে, ভণ্ড! এসেছে আমাদের ঠকাতে। আমাদের আসবে রাজা, বিপুল তাঁর শক্তি, শত্রুদের তিনি দেবেন সাজা, নিজে হবেন এই পৃথিবীর রাজা, য়িহুদীরা হবে পৃথিবীর ত্রাতা—কিন্তু এ বলে কি? আছে এর লোকজন, আছে তার সে শক্তি? শুধু দুটি নীল চোখ, চোখের কোলে কোলে অশ্রু-জল, হাতের আঙ্গুলে শুধু মিনতি—একে দিয়ে কোন্ কাজ হবে পৃথিবীর! এ ভণ্ড, যাঁর আসবার কথা তিনি এখনও আসেন নি। য়িহুদীরা তাঁকে করলো প্রত্যাখ্যান। ভগবান এসে মানুষের কাছ থেকে শুধু লাঞ্ছনা নিয়ে ফিরে গেলেন। এই হলো New Testament. কিন্তু সেই লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে তিনি দিয়ে গেলেন, তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—য়িহুদীর বিশ্ব-সাম্রাজ্য নয়—সকল মানুষের মুক্তির রাজ্য—জানিয়ে গেলেন সেই শক্তির কথা—যে-শক্তি দিয়ে তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে—অস্ত্র দিয়ে নয়, আঘাত দিয়ে নয়, সকল আঘাত-সহা প্রেম দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে। এই হলো Bible-এর সার কথা।

এখন আমরা আলোচনা করবো এই বাইবেলের প্রভাবের কথা, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যে তার প্রভাবের কথা। কারণ আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ইংরেজী সাহিত্যে বাইবেলের প্রভাব। এখানে তোমাদের বলে রাখি, সাহিত্য হিসেবে ইংরেজী ভাষায় যত বই হয়েছে—এই বাইবেল হলো সকল দিক দিয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এর ভাষা, এর অপূর্ব্ব সঙ্গীতময় গদ্য, ইংরেজী সাহিত্যে তার তুলনা নেই। শুধু ইংলণ্ডের কেন, জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই ইংরেজী বাইবেল পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এর ভাব, এর ভাষা যে কোনও মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যখনই কোনও লোক খুব ভালো ইংরাজী লেখেন, তখনই আমরা বাইবেলের ইংরেজীর সঙ্গে তার তুলনা করি। ইংরেজী ভাষা যদি তোমরা শিখতে চাও, তা হলে বাইবেল তোমাদের পড়া একান্ত দরকার। এখন কি করে বাইবেলের প্রচার হলো তার অপূর্ব্ব কাহিনী এখানে তোমাদের সংক্ষেপে বলি।

প্রাচীন কালে মিশরীয়রা প্যাপিরাস্, papyrus বলে একরকম গাছের ছালে বই লিখতেন। মিশরীয়দের দেখাদেখি তখনকার অনেক জাতি কাগজ হিসেবে সেই প্যাপিরাস্ গাছের ছালই ব্যবহার করতেন। য়িহুদীরা যখন তাঁদের Old Testament লিখলেন তখন এই কাগজের ছালই কাগজ হিসেবে ব্যবহার করলেন। এই প্যাপিরাস্ গাছের ছালে হিব্রু ভাষায় প্রথম বাইবেল

লিখিত হয়। এখন বাইবেল কথাটা এলো কোত্থেকে? আর তার মানেই বা কি?

প্রাচীন গ্রীকরা খুব জ্ঞান-পিপাসু ছিল। অপর জাতের খবর, তাদের জ্ঞানী লোকেরা কি করেছে না করেছে এসব খবর রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে তারা মনে করতো। তারা গেলো য়িহুদীদের এই সব লেখা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে নেবার জন্যে। প্রাচীন গ্রীকেরা এই প্যাপিরাস্ গাছের ছালকে বলতো বিব্লস্, biblos : সেই জন্যে তাদের ভাষায় ক্রমশঃ বিব্লস্ কথাটার মানে দাঁড়ায় বই। হিব্রুদের এই সব লেখা বই-এর তারাই প্রথমে নাম দেয় বিব্লিয়া, biblia—বিব্লসের বহুবচন, ইংরেজীতে যাকে অনুবাদ করলে হয়—দি বুক্স্, The Books. তারপর ইতালী দেশের লোকেরা বাইবেলকে য়ুরোপে প্রথম চালান। তাঁরা গ্রীকদের কাছ থেকে এই কথাটা নিয়ে হিব্রুদের লেখা সে বই-এর নাম দিলেন বিব্লিয়া সাক্রা, Biblia Sacra অর্থাৎ দি হোলী বুক্স্, The Holy Books. অবশেষে ইংরেজী ভাষায় যখন সেই গ্রন্থের অনুবাদ হলো তখন বিব্লিয়া থেকে তাঁরা করলেন বাইবেল, Bible অর্থাৎ দি বুক।

তোমরা মনে করো না যে, বাইবেল একজনের লেখা একখানা বই। অনেক লোকের লেখা বই এক জায়গায় সংগ্রহ করে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বাইবেল।

ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের প্রবেশ লাভ খুব নিরাপদে হয় নি। পাঁচশো বছরেরও আগেকার কথা। তখন বাইবেল ল্যাটিন ভাষায় প্রচলিত ছিল। ইতালী দেশের যাঁরা ক্লার্জি, Clergy বা ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন—তাঁরা মনে করতেন যে বাইবেলের কথা প্রচার করা তাঁদেরই একমাত্র অধিকার। তাঁরা ছিলেন বাইবেলের পুরোহিত। তাঁরা যে ভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করে দেবেন—সেই ভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। সেই জন্যে সেই সময় য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের গির্জ্জেয় গির্জ্জেয় ইতালী দেশের এই সব পাদ্রীরা থাকতেন। এই সব পাদ্রীর রাজ-দরবারে ভীষণ প্রভাব ছিল। তাদের কথা অমান্য করা মানে তখন রাজার কথা অমান্য করা ছিল। ইংলণ্ডে সেই সময় অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচশো বছরের কিছু বেশী এই রকম ইতালীর পাদ্রীতে ভরে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে সেই সময়কার ইংলণ্ডের জনসাধারণের অন্তরের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তারা আবার ইংরেজী ভাষাই ভালো করে বুঝতো না। এই সব পাদ্রীদের কাছে এসে লোকে বাইবেল পড়া শুনতো। তাদের নিজেদের পড়া নিষিদ্ধ ছিল—আর সাধারণ লোক পড়বেই বা কি করে—তারা তো আর ল্যাটিন ভাষা জানতো না।

এ হেন সময়ে জন্ উইক্লিফ, John Wycliffe বলে ইংলণ্ডে একজন জ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দেখলেন যে এ ব্যবস্থা তো ঠিক নয়। যিনি এসেছিলেন জগতের নিম্নতম লোকদের মধ্যে, যিনি বাণী দিয়ে গেলেন জগতের আপামর সকলের জন্যে, তাঁর বাণীকে সেই জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে রাখা ঠিক নয়। তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে, সকল মানুষের বাইবেল পড়বার সমান অধিকার আছে এবং প্রত্যেকেরই অধিকার আছে তার নিজের মতন করে বাইবেলের অর্থ করতে এবং সেই মতো তার জীবনকে পরিচালনা করতে।

এই ঠিক করে জন্ উইক্লিফ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে তাদের ভাষায় যীশুর জীবন-মহিমা প্রচার করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় প্রচার করবার জন্যে নতুন প্রচারক গড়তে লাগলেন। কিন্তু সহসা জন উইক্লিফ্ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁর এ কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটলো। ইতালী দেশের পাদ্রীরা তাঁর ওপর এত রেগে গিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরে তাঁর কবর হ'তে হ'তে দেহাবশিষ্ট হাড় খুঁড়ে তারা নদীতে ফেলে দেয়।

উইক্লিফের মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পরে উইলিয়ম টিণ্ডেল বলে আর একজন লোক এলেন। তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন। আজকে তোমরা হয়ত মনে করতে পার এ আর এমন কি কঠিন কাজ। কিন্তু পেছনের ইতিহাসে এমন সব দিন গিয়েছে—যখনকার কথা আমরা ভাবতেই পারি না। পাদ্রীদের অমতে কোনও কাজ করবার তখন কোনও উপায় ছিল না। সত্য যদি এই সব পাদ্রীদের মতের সঙ্গে না মিশতো, তা হলেও তাকে সত্য বলবার উপায় ছিল না। প্রাণদণ্ড অথবা নির্য্যাতন তো লেগেই ছিল। তখন ইংরেজী ভাষায় বাইবেল লেখা মানে মৃত্যু। চারশো বছর আগে য়ুরোপে এরকম দিন ছিল একথা ভাবতেই আজ বিস্ময় লাগে।

টিণ্ডেল প্রতিজ্ঞা করলেন যে মৃত্যুকে বরণ করেও তিনি একাজ করে যাবেন। পোপ হলেন তখন খৃষ্টান জগতের সর্ব্বেসর্ব্বা, অনুবাদের জন্য তাঁর কাছে অনুমতি নিলেন। ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে জার্ম্মানীর হামবুর্গ শহরে গিয়ে গোপনে লাটিন ভাষা থেকে তিনি ইংরেজীতে বাইবেল অনুবাদ করলেন। সেখানে গোপনে তিনি একটি ছোট ছাপাখানা কিনলেন এবং একদল ভক্তদের নিয়ে তিনি ইংরেজী ভাষায় বাইবেল ছাপতে লাগলেন। টিণ্ডেল জানতেন যে তাঁর এই কাজের জন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। কিন্তু তিনি মৃত্যুকে স্বীকার করেই এই কাজে লেগেছিলেন। গোপনে সেই সব বই ইংলণ্ডে নিয়ে এসে টিণ্ডেল বড় লোকদের বাড়ীতে এক একখানা করে গোপনে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু বেশীদিন এই ব্যাপার চাপা রইলো না। পাদ্রীদের কাণে এই ব্যাপার গিয়ে উঠলো। গোপনে টিণ্ডেল তাঁর অনুচরদেব নিয়ে ইংলণ্ড ছেড়ে পালালেন। কাউকে কাউকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দেওয়া হোল। সমস্ত ইংরেজী বাইবেল সংগ্রহ করে সেণ্ট পল গির্জ্জার প্রাঙ্গণে পোড়ানো হোল। সেই আগুণে ক্রুশ আবার রক্তিম হয়ে উঠলো।

টিণ্ডেল কিন্তু যেখানে যেতে লাগলেন সেইখানেই ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে বাইবেল প্রচার করতে লাগলেন। এক দেশ থেকে আর এক দেশে নির্ব্বাসিতেব জীবন যাপন করতে করতে তিনি অবশেষে বেলজিয়ামের আণ্টোয়ার্প সহরে আসেন। সেখানে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং পরে গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেলে তাঁর মৃত-দেহকে পুড়িয়ে সেদিন পুরোহিতরা ক্রুশবিদ্ধ মানবের স্মৃতি তর্পণ করে। কিন্তু যেদিন যীশুকে রোমান সৈন্যেরা ক্রুশে উঠিয়েছিল সেই দিন জগতে খৃষ্ট-ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেছিল—যেদিন টিণ্ডেলকে এমনি শোচনীয়ভাবে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হোল—সেদিন জগতে বাইবেলের সত্যিকারের মহিমা বিঘোষিত হোল। এবং তার পর থেকে সমগ্র য়ুরোপে এক বিরাট ধর্ম্ম আন্দোলন হয়—সেই আন্দোলনের নাম প্রোটেষ্টাণ্ট মুভমেণ্ট। তার ফলে বাইবেলের প্রভাব, প্রেম ধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন বাণীর প্রভাব জগতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

কীর্ত্তি-কাহিনী
উড়িষ্যার বীর-বালক

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় একবার ভায়নক দুর্ভিক্ষ হয়। তিন বছর ধরে এই দুর্ভিক্ষ থাকে। মাঠে কোথাও একটি ঘাস পর্য্যন্ত ছিল না; সূর্য্যের তেজে সব শুকিয়ে গিয়েছিল। গাছে একটিও পাতা ছিল না। বৃষ্টি নেই—শুক্‌নো আকাশ থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। সূর্য্যের তেজে শুকিয়ে যাবার আগে যাও বা লতা-পাতা ছিল, ক্ষিদের তাড়নায় মানুষ তাও খেয়ে ফেলেছে। দিনের পর দিন যায়। কুকুর, বেড়াল গরু বাছুরের সঙ্গে দলে দলে মানুষ পথে ঘাটে মরে পড়ে থাকে। তবুও আকাশ থেকে এক ফোঁটা জল পড়লো না।

এই সময়ে এক দরিদ্র পরিবারে সনাতন বলে একটি ছেলে ছিল। সংসারে তারা ছিল চারজন প্রাণী। সে, তার বাবা, তার মা, আর তার এক ছোট ভাই। ঘরে খাবার যা ছিল তা কবে ফুরিয়ে গিয়েছে। এক জোড়া বলদ ছিল। অনেক ঘুরে চার মুঠো চালের বিনিময়ে তাও বিক্রী করলো। চার মুঠো চাল আর ক'দিন থাকে।

একমাস ধরে সনাতনের বাবা আর মা এক বেলা করে কোন রকমে লতা পাতা সেদ্ধ করে খেয়ে ছেলে দুটোর মুখে দুবেলা কিছু খাবার জোগাড় করে দিতো।

একদিন রাত্রিবেলায় সনাতন শুনলো তার বাবা তার মাকে বলছে—আর কিছু কোথাও মিলছে না—কালকে থেকে আমি আর কিছু খাবো না ভেবেছি—কিন্তু ছেলে দুটোকে কি দেবো?

ভোর না হতেই সনাতন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো। যেমন করে হ'ক, সে কিছু খাবার জোগাড় করে আনবে। কিন্তু যতদূর যায়, কোথাও সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। মাথার ওপরে আগুনের কড়া কে যেন উল্টে দিয়েছে, চোখের সামনে সারি সারি গাছের কঙ্কাল। পায়ের তলায় একটি ঘাস পর্য্যন্ত নেই। সারা দিন ঘুরে ক্ষিদেয় আর তেষ্টায় পরিশ্রান্ত হয়ে হতাশ মনে সনাতন বাড়ী ফিরে এলো।

তার মা ভিক্ষে করে এক বাটী ফ্যান্ তার জন্যে যোগাড় করে রেখেছিল। সনাতন এসে দেখে, তার ছোট ভাই-টি ক্ষিদেয় নড়তে পারছে না। সেই ফ্যানের বাটী নিয়ে সনাতন ছোট ভাইটিকে খাওয়ালো। মাকে বল্লে, মা, কাল তুমি

দেখো, আমি যেমন করে পারি, কিছু খাবার নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো!

প্রতিদিন সকাল বেলা সনাতন বাড়ী ছেড়ে চলে যেতো। রাত্রি বেলা কোনও দিন এক মুঠো ঘাস, কি কতকগুলো পাতা নিয়ে ফিরতো। কিন্তু এরকম করে আর কত দিন যায়?

সনাতনের বাবার দিন ঘনিয়ে আসছিল। সেও আর উঠে হেঁটে বেড়াতে পারতো না। চোখের সামনে ছেলেদের সেই কাতর মুখ না দেখতে পেরে, একদিন স্ত্রীকে ডেকে বল্লে, দেখো, আমার জন্যে ভেবো না—আমি চল্লুম—যদি খাবার পাই তো ফিরবো নইলে জেনো আর এলাম না।

সবাই মুমূর্ষু; কারুর শক্তি নেই কারুকে বাধা দেয়। কোন রকমে টলতে টলতে সনাতনের বাবা চলে গেল। কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। সনাতনের ওপর ভার পড়লো, সমস্ত সংসারের খাবার জোগাড় করবার।

কঙ্কালসার মূর্ত্তি নিয়ে সনাতন রোজ সকাল বেলা খাবারের সন্ধানে বেরুতো। কোন দিন দু' এক মুঠো ভাত জুটতো, কোন দিন জুটতো না। অবশেষে কোন রকমের খাদ্য পাওয়া একান্ত দুরূহ হয়ে পড়লো। কঙ্কালসার ভাইটিকে নিয়ে সনাতনের মা মাটী কামড়ে শুয়ে পড়লো।

সনাতন সেই কঙ্কালসার দেহ দিয়ে আবার বেরুলো। আজ তিন দিন সে নিজে দাঁতে কিছু কাটে নি। নিজের কথা তার মনে নেই—তার চোখের সামনে শুধু ছিল—তার মা আর তার ভাই-এর সেই চেহারা।

এক দূর গ্রামে গিয়ে সেদিন ভাগ্যক্রমে দেখলো যে, একটি বৃদ্ধা ভাত রাঁধছে। বহু কাকুতি-মিনতি করে তার কাছে কয়েক মুঠো ভাত ভিক্ষে করে পেলো। কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ঘরের দিকে ফিরলো!

ফেরবার পথে তার পা আর চলে না। ক্ষিদের তাড়নায় তার সমস্ত দেহ তখন আর্ত্তনাদ করে উঠছিল। ক্রমে তার চোখের সামনে সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো। কে যেন তার দেহের ভেতর থেকে বলতে লাগলো, সনাতন, তোমার আঁচলে ভাত বাঁধা রয়েছে, তুমি খেয়ে বাঁচ। দু'তিন বার সনাতন পথে বসে পড়লো—আঁচলের গেরো পর্য্যন্ত খুললো—কিন্তু একটাও দানা মুখে দিতে পারলো না। অন্ধকারে, একলা ঘরে তার মা আর তার ভাই এখনও হয়ত তার অপেক্ষায় বেঁচে আছে! সনাতন পুঁটলী বেঁধে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু পথে রাত নেমে এলো। মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশে একটা জলজলে তারা জ্বলে উঠলো। সনাতন আর চলতে পারলো না। পথের ধারে অবশ অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলো। বেশ শক্ত মুঠো করে বুকের মধ্যে সেই ভাতের পুঁটলীটা চেপে ধরে আকাশের সেই জলজলে তারাটার দিকে একবার চেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

কয়েক দিন পরে একদল লোক দুর্ভিক্ষ নিবারণ করতে বেরিয়ে দেখে, পথের ধারে একটি ছেলে না খেতে পেরে মরে পড়ে আছে, কিন্তু তার বুকে তখনও মুঠোতে ধরা ভাতের পুঁটলী!

শিশু-শিক্ষা

কয়েক মাস আগে 'দি পেরেণ্ট্‌স্ ম্যাগাজিন'-এ শিশুশিক্ষার অধ্যায়ে অনেকগুলি মজার গল্প বাহির হইয়াছে। নীচে তাহার একটি দেওয়া হইল।

ছেলের মা লিখিতেছেন—আমার খোকার বয়স যখন তিন, তখন সে ভয়-কাতুরে হইয়া পড়িয়াছিল। আঁধার দেখিলে আর কথা নাই, সে কাঁদিয়া-কাটিয়া চেঁচাইয়া অনর্থ বাধাইত। ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক উপায় ঠাওরাইলাম। ছেলেকে সঙ্গে লইয়া আমি আর খোকার বাবা লুকোচুরি খেলা সুরু করিলাম। আমি অন্ধকার কোণে লুকাইয়া থাকি, খোকার বাবা আমাকে খুঁজিয়া বাহির করেন, খোকার বাবা লুকাইলে আমি খুঁজিয়া বাহির করি। খোকা হাসিয়া খুন! পরে খোকাকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাবা লুকান, আমি খুঁজিয়া বাহির করি; আমি খোকাকে লইয়া লুকাই, খোকার বাবা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করেন। সুতরাং খোকা সাহস পাইয়া একা-একাই অন্ধকার কোণে লুকাইতে সুরু করিল। অন্ধকারে আর সে ভয় খাইলনা। তাহার ভয়-কাতুরে ভাব ক্রমেকাটিয়া গেল।

রূপকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

এখন বছরের পর বছর কেটে গিয়ে মৌন বড় হয়েচে। যে সব দিকে যেতে বারণ ছিল সেই সব দিকে ঘুরে আসে, এ গাঁ সে গাঁ, আজ নগরে, কাল সহরে নানা দরকারী সামগ্রী জোগাড় করে আনে—মায়েপোয়ে থাকে সুখে।

একদিন বিধবা স্বপ্নে দেখলে—পাঁচটি পাপড়ির ওপরে মন্দির গড়ে উঠেছে, মন্দিরের মাথায় একখণ্ড পান্না বসানো। জল্ জল্ করছে। সকালে উঠে দেখে পাঁশগাদায় গাছ জন্মেছে—এতদিন নজরেই পড়েনি—সেইটিতে আজ ফুল ফুটেচে—আকন্দ ফুল।

আজ শিবরাত্রি। দেবাদিদেবের দয়া হয়েচে—বিধবার বুক ভরে ভরে উঠলো, উপচে উপচে পড়লো। আজ বড় শুভ দিন। পূজোর ফুল স্বপ্নে ফুটলো। জাগরণে ফুটলো—দেবতা আপনি ফোটালেন আপনার পূজোর ফুল। এত আনন্দ বিধবার যেন আর সহ্য হয় না। বুক বুঝি ফেটে যায়। সে ফুল কটি গাছ থেকে তুলে পূজোয় বসলো। মৌন এধার-ওধার থেকে ঘুরে এসে মায়ের পূজো দেখ্‌লে চুপ করে পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আকন্দ ফুল দেখে তার আকন্দার কথা মনে পড়লো, জলভরা কচি তালশাঁসের মতন মুখখানি, বিশনলী ফুলের মালা বুকটি জুড়ে থাকে-থাকে পাথরকুচির মতন সাজানো। পূজো শেষ হলে বল্লে—মা মামার বাড়ী যাই।

মা বল্লেন—আজ নয় বাবা, কাল যেও।

রাত পোহালে ভোরবেলা মা'কে প্রণাম করে মৌন-কান্তি চলে গেলো। চলে গেলো একেবারে সেই নদীর পারে। বন পার হয়ে, মামার বাড়ী পাশে রেখে, সকাল কাটিয়ে, দুপুর কাটিয়ে, বিকাল বেলা রোদ পড়-পড়, তখন ক্লান্ত হয়ে ঘাটে পৌছলো। ধুপ্ করে বসে পড়ে সামনে তাকিয়ে রইল।

আকন্দর মালাগাছি ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে আসে,
কখন আসে কখন আসে।

আকন্দমালা আর এলোনা। চেয়ে চেয়ে জলভরা নদীটি তাও চোখে পড়লো না, শুধু শুক্‌নো বালির চর ধু-ধু করচে, তার বুকে একখানি ভাঙ্গা নৌকো—কতকাল ধরে' পড়ে আছে কেউ জানে না, পাল ছিঁড়ে গেছে, হাল হেলে পড়েছে, মাঝি নেই, কেউ নেই তাতে।

শুক্‌নো বালির চর ধু-ধু করছে, তার বুকে একখানি ভাঙ্গা নৌকা।

মৌন বসে বসে বল্লে—

হাল ভাই, হাল ভাই, বল ভাই বল,
ভরা নদী সরে সরে কন্দ্‌র গেলো ?

মৌন কাউকে দেখতে পেলে না, কোত্থেকে কে উত্তর দিলে—

যেমনটি মাঝি ওর ছেড়ে গেছে ও'কে
তেমনটি হেলে আছে মাঝিটির শোকে,
ওকে কেন মিছে আর জ্বালাতন করো,
ও'র দুখে বেলাখানি—তাও পড়োপড়ো।

তখন মৌন বল্লে—

পাল ভাই পাল ভাই বুকখানি মেলো,
ভরা নদী সরে সরে কদ্দূর গেলো ?

অমনি উত্তর হলো—

ফোলা ছাতি ফুটো করে চলে গেছে হাওয়া,
এলোমেলো ঝুলে আছে রোদে জলে নাওয়া,
পড়োপড়ো বেলা খানি খাঁজে খাঁজে নিয়ে
তুমি বাছা আন পথে এসো আজ গিয়ে।

মৌন বল্লে—

চরগো চরগো বালুচর ভাই
সরে যাওয়া ভরানদী কদ্দূরে পাই ?
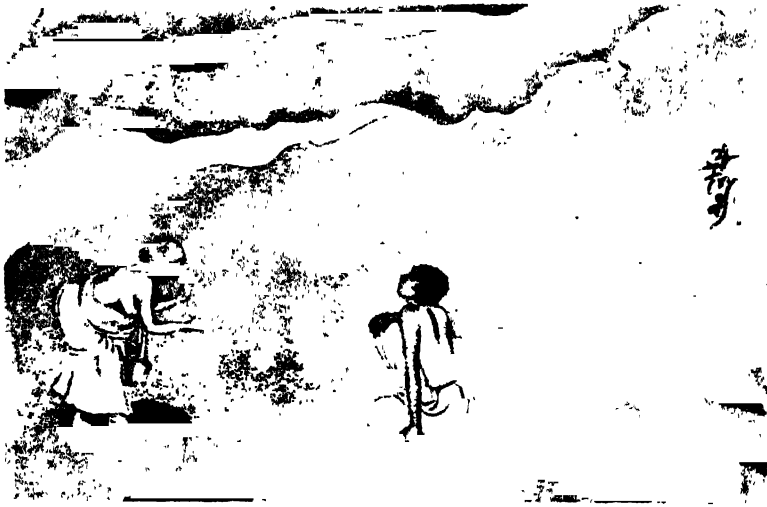
আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী তিন ভুবনের মা

হলো—

আহা ওর বুকখানি বিধবার মত,
ওর কথা ফুরিয়েচে জন্মের মত,
ওকে আর ডেকে ডেকে কেন কর গোল,
রাত্রির স্নেহটুকু ওর সম্বল।

মৌন তখন খুব কাতর হয়ে বল্লে—

কেগো তুমি এত জানো তুমি বল না ?

অমনি এক বুড়ী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে পথ দিয়ে চলতে চলতে বলে গেলো—

আমি আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী তিন ভুবনের মা –
আমার দেখা পাবে আবার শুকনো জলের দেশে
রূপো-রেখা রোগা নদী বইচে ওপার ঘেঁসে ·

এই বলে বুড়ী ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেলো। মৌন বালুচরের ওপর দিয়ে নেবে নেবে সোজা চলতে সুরু করলে। ওপারের কাছে এসে দেখলে সে-নদী আর চেনা যায় না—সরু রূপোলীজলের ধারাটি সির্ সির্ করে বয়ে যাচ্ছে—পড়-পড় বেলায় বড়ই মলিন। আর আকন্দমালার খানিকটা জলের কোলে চরার বুকে নেতিয়ে পড়ে রয়েচে। মৌন ছুটে গিয়ে মালাটি ধরলে। ঠিক আগের মতন টান পড়লো—মৌনকে জলের তলায় ডুবিয়ে নিলে। সে বরফের বেদীর ওপর দাঁড়ালো। তলা থেকে কেমন রাঙা আভা আসছিলো, সেই আভায় মৌনর গায়ে গায়ে রঙ ধরে গেলো। এবার কেউ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো না।

মৌনর চোখের মধ্যে; ভিজে-চোখের পাতায় বালি আটকে ছিল। আকন্দা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, লাল গামছা দিয়ে মৌনর চোখ দুটি মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিলে। মুখখানি তার ঠিক তেমনি আছে—রাঙা আভায় আভাময়ী—নাকে একটি নোলক, একমাথা চুল পিঠ ছেয়ে এলিয়ে গেছে, আকন্দা এখন বড় হয়েচে। তেমনি বুক ঢেকে আকন্দর মালা। একখানি সমুদ্রের ফেনার কাপড়, তাতে নীলজলের ছোপ লাগানো—শঙ্খ আঁকা, শালুক আঁকা—তাই পরে আকন্দা দাঁড়িয়েছিল, ফিক্ করে হেসে বল্লে—পায়ের তলার আকাশে ভোর হচ্ছে—বললো, শুনবে শুনবে— ?

মৌন তোমার পায়ের কাছে জল জমানো রাঙা
ওই পানেতে সাধের ঘুমের শেষ নিঝুমের ডাঙ্গা,
তোমার আদুল গায়ে করে আদর।
জড়িয়ে দেবো পাতলা চাদর,
তুলোর মতন তোমার দুটি নরম নরম হাতে,
মৌন তোমার গোঁফ জোড়াটি কচি নিমের পাতে,
ওর মাঝেতে ফলবে কেমন একটি ছোট ফল,
আমার নাকের নোলকটি কি দুলিয়ে দেবো বল্ ?

পিঠ থেকে নেবে গিয়ে বুক থেকে এসে,
কানের কাছে দুটি টান চোখের কোণে মেশে।
মৌন তোমার চক্ষুদুটি পাখীর ছাঁচে গড়া,
তারা দুটি কেমনতর জানেন না কি নড়া।
আঁতুর ঘরে মায়ের আদর ছোট্ট আমার বাপ্,
দাড়িটিতে ওই যে ছাপা মা'র আঙুলের চাপ।
মৌন তোমার দাড়িটিকে গড়েচে কোন ধাতা,
তাঁর কাছেতে আসবো শিখে গলার মালা গাঁথা।
আমি কেমন দাড়িতে দিই একটি খয়ের-টীপ,
তোমার পায়ে নমস্কার—ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্।

বলে ঢিপ্ করে নমস্কার করলে।

মৌন টপ্ করে মাথাটা তুলে দিলে। এইবার আকন্দা খুব হাসলে-হাসতে হাসতে বরফের বেদীর ওপর বসে পড়লো। মৌন মালাগাছি ধরে বল্লে চলো আকন্দা, এই বার তোমায় নিয়ে যাই। আকন্দা তখন হাসি থামিয়ে স্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালো, মৌনর হাতখানি ধরে বল্লে আগে আমার সঙ্গে একবার চলো, রাণী তোমায় ডেকেছে।

আকন্দা মৌনকে নীল-নীল কালো-কালো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, ছাই-ছাই সবুজ-সবুজ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, রাঙা-রাঙা বেগুনী-বেগুনী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলো। সে কতো অন্ধকার। কোথাও ছম্ ছম্ করচে, কোথাও জমাট ঘোর, কেউ গায়ে চেপে ধরেচে, কেউ দূরে দূরে ছড়িয়ে গেছে। শেষকালে তারা পৌছলো। শঙ্খদ্বীপে প্রবালরাণী গম্ভীর হয়ে মলিন মুখে বসে আছেন। চারদিকে, তলায়, অনেক রকমের অনেকরঙের ঝিনুক ছড়ানো। চারদিক থেকে ছোট ছোট ঢেউ কুল্কুল্ কুল্কুল্ কুল্কুল্ কুল্কুল্ করে কূলে কূলে এসে লাগছে,—আর ঝিনুকদের মধ্যে ঢুকে সর্সর সর্সর সর্সর সর্সর করে খেলা করচে। ছোট্ট দ্বীপের ছোট্টরাণী।

মৌন সটান রাণীর কাছে এসে বল্লে—প্রবাল-রাণী, প্রবাল রাণী—আকন্দাকে নিয়ে যাবো তাই বলতে এসিচি। প্রবাল-রাণী বল্লেন, 'বেশ মৌন বেশ—নিয়ে তুমি যেও কিন্তু আগে এক কাজ করতে হবে। মৌন বল্লে-কি কাজ, এক্ষুনি করবো। রাণী বল্লেন—আমার নদীর জল কোথায় গেল --রোজই কমে যাচ্ছে। যে ঢেউদের সাগরে পাঠাই একটিও আর ফিরে আসে না। সাগরের কি দশা হলো খোঁজ আনতে হবে। পারবেতো! মৌন তক্ষুণি আকন্দার মালা ধরে ভেসে উঠলো। ওপারের এক আঘাটায় গিয়ে ঠেকে মালা ছেড়ে দিলে। এপারে আর এলোনা—সাগর খুঁজতে বুক বেঁধে এগিয়ে গেলো। তখন রাত্তির হয়েচে ভালো করে পথঘাট দেখা যায় না—দু'ধারে ঘন ঘন গাছের সার— একটিও পাতা নড়ে না—তাদের মাঝে মাঝে জোনাকি জ্বলচে আর নিভচে। মৌনর খুব সাহস, সে সারা রাত ধরে চল্লো। ভোর বেলায় মৌনর ঘুম্ ঘুম্ পাচ্ছে-তবুও সে চলেচে, চোখ

প্রবাল রাণী গম্ভীর হয়ে মলিন মুখে বসে আছেন।

আধবোজা, পা টেনে টেনে আন্মনে চলেচেতো চলেইচে। হঠাৎ মৌনর কিসের সঙ্গে খুব জোরে ধাক্কা লাগলো। বড্ড তার ঘা লাগলো-সে একেবারে চমকে উঠলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখলে—সাম্নে এক মস্ত দরজা, তাইতে ধাক্কা লেগেচে। সেই দরজার গোড়ায় রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, আর যাবার পথ নেই—মৌন ভাবতে লাগলো কি করে। এমন সময় দরজা খুলে গেলো—খুব চওড়া একটা উঠোন পেরিয়ে একটি মেয়ে ছুটে ছুটে আসচে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলচে—মেঘমাদলে তুমি এলে? মৌন দরজার ভেতর ঢুকে বল্লে—না, না, আমি মৌনকান্তি।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লে—অঃ! মৌনকান্তি, যাবে কোথা?

—রূপোরেখা নদী রোগা হয়ে যাচ্ছে, তার ঢেউ যায় আর ঢেউ ফেরে না—তাই সাগরে চলিচি খোঁজ নিতে।

মেয়েটি তখন জিগ্যেস করলে—তাহলে ত' নীলানদীরও জল শুকুলো! গেলো বছর বর্ষাকালে মেঘমাদলে সেই-যে নদীতে নৌকো ভাসালে আজও ফিরলে না। বলে গেলো রূপোরেখা দিয়ে ফিরবে। যেদিন গেলো আকাশে মেঘ করেছে—মেঘমাদলে ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল। জানালা দিয়ে ঘর থেকে দেখে দেখে আশ মিটলো না—ঘোমটা খুলে ফেল্লুম, তবু ঠিক হলো না—ছাদে চলে গেলুম, সেখানে মাথার ওপর চারদিক ঘিরে ঘোর অন্ধকার, আর মধ্যে মধ্যে বিজলী ঝিলিক্ মারচে; আমি ঘোমটা খুলে ফেলিচি, তবু মনে হচ্ছিল যেন চোখের ওপর মুখের ওপর ঘোমটা নেবে নেবে পড়ছে—আমার দেখা হচ্ছিল না ভালো করে। মেঘমাদলে আমায় টেনে আনলে নীলায় নৌকো ভাসাবে বলে। দোতলায় ওই ছোট্ট ঘরটি —ওইখানে জানালায় বসে বসে দেখি—বর্ষা ফুরোলে ফিরবে কথা ছিল, শরৎ-কাল ভোর জানালায় বসে কাটালুম। রূপোরেখার বুক বেয়ে, মালীচরের বাঁকে বাঁকে কত নৌকো আসতো, তাদের পালগুলো শুধু দেখা যেত—কত রঙের পাল—প্রজাপতির মতন ডানা মেলা। রূপো-রেখার জল কমেচে তাত জানি না—মালীচরের বাঁকে তাই আর নৌকো দেখি না। মেঘমাদলে ফিরবে কি করে মৌনকান্তি?

—বাতাসে পালগুলি ফুলে উঠলো।

মৌন শুধোলে—সে তোমার কে?

মেয়েটি বল্লে—মেঘমাদলে আমার বর। আমি বঙ্গদীপা।

মৌন বল্লে—আমায় রাস্তা বলে দাও—নীলানদীতে খোঁজ নিয়ে যাবো। মৌনকান্তি সাগর যাবে, রূপরেখায় জল ভরবে, মেঘমাদল ঘর ফিরবে, সব হবে। সার সার অনেক ঘর পেরিয়ে মেয়েটি প্রথম দরজার মতন উঠোনের অন্য দিকে আর একটা দরজা দেখিয়ে দিলে-সেই দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলে নীলানদীতে যাওয়া যাবে। মৌন বল্লে—আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে—আমি ঘুমোবো। তারপর জেগে উঠে আমার খুব ক্ষিদে পাবে—আমায় খেতে দিও—তারপর আমি যাবো।

এই বলে মৌন উঠানের মাঝখানে শুয়ে পড়লো। তার

ঘুম ভাঙলো গভীর রাতে। বক্ষদীপা বনের ফল সাজিয়ে দিলে—মৌনকান্তি খেয়ে-দেয়ে রাস্তা ধরলে। ভোরবেলা নীলার তীরে পৌছলো। নীলায় জল একেবারে নেই বল্লেই হয়—মেঘমাদলে চুপ করে তার নৌকোয় বসে ছিল, মৌন নৌকোর ধারে এক গোছ জলে নেবে বল্লে—মেঘমাদলে মেঘমাদলে, বক্ষদীপা পথ চেয়ে আছে, ফিরবে কবে? মেঘমাদলে জিগ্যেস করলে—বক্ষদীপা? বক্ষদীপা? তাকে দেখলে কেমন? মৌন বল্লে—উঠোন পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো। তার—

নাকে ছিল নাকছাবি গলায় চন্দ্রহার,
ছটি হাতে বাঁকা কাঁকণ বাজলো বার বার,
আঁচলে বাজলো চাবি ছ' কানে ছুই ছল
তোমার জন্যে সেজেগুজে একেলা আকুল।

মেঘমাদলে বল্লে—নীলার জলে নৌকো অচল—রূপোরেখায় যাই কি করে—মালীচরের বাঁকে চরা পড়েছে—বক্ষদীপাকে ব'লো। মৌন বল্লে—ফিরে গিয়ে আর বলতে পারবো না—সে জানে। সাগরের কি দশা হলো দেখতে চলিচি—এখন ত ভাই সময় নেই।

মেঘমাদলে বল্লে—তুমি সাগরে যাচ্ছো—বেশ বেশ—খোঁজটা নিয়ো তো ভাই - নীলার এত জল গেলো কোথা। আমি এক বছর বসে আছি। তখন বর্ষা এলো—চারদিক ঘোর করে। সারা আকাশ ছেয়ে একখানি মেঘ উঠলো—আমার ইচ্ছে হলো ওর সঙ্গে পাল্লা দেবো। বক্ষদীপার মুখে চোখে বিজলী-ঝিলিকের ঘোমটা নেবে নেবে পড়ছিলো, আমায় ভালো দেখতে পাচ্ছিল না—তাকে সঙ্গে করে নীলার তীরে এলুম।

আমার খয়েরী নৌকো সাত সমুদ্দুর পাড়ি দেয়, তাইতে মস্ত বড় পাল তুলে দিলুম—ঘোর নীল রঙের—বাতাসে পালখানি ফুলে উঠলো—আমি তার কাছে এতটুকু হয়ে গেলুম—এইটুকু মানুষ। এক হাতে পালের দড়ি টেনে, সাদা ধবধবে এক টুকরো কানি এঁটে হালে বসলুম। বক্ষদীপা নীল শাড়ী বাতাসে উড়িয়ে দিলে, হলুদ শাড়ী নদীর কূলে বিছিয়ে দিলে, নিজে একখানি শ্বেত বসন পরে' নীলার জলে নেয়ে উঠলো। আমার নৌকো ধরে' বল্লে—মেঘমাদলে তোমার গায়ের কালো রঙটি চোখ জুড়ানো কালো। বলে' নৌকো আমার ঠেলে দিলে। তাকে বলে দিলুম বর্ষা পেরিয়ে রূপোরেখায় নৌকো ভেড়াবো। মেঘের পানে পালের পানে তাকিয়ে আমি নীলার জলে ভেসে চল্লুম—তীরে জামগাছে থলো থলো জাম ফলে আছে, তার তলায় আমার শ্বেতবসনা ভিজে-সোনা বক্ষদীপা দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর মেঘের দিকে চেয়ে পাল ফুলিয়ে আমি ছোট্ট মানুসটি সারা বর্ষা মাঝ নদীতে নোঙ্গর ফেলে বসে রইলুম। হঠাৎ একদিন নীলার জল কমতে সুরু হলো—নৌকো ছেড়ে দিলুম—কিন্তু রূপরেখায় পড়তে পারলুম না—এইখানেই বসে আছি। (ক্রমশঃ)

মুদ্রাকর-প্রমাদ

এই সংখ্যার 'কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা' প্রবন্ধের ১৮৮ পৃষ্ঠায় কয়েক স্থলে 'শ্রীরাম' স্থলে 'শ্রীবাস' মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের মাঝামাঝি স্থানে 'সেকালে কেহ কালীযাত্রার দল করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না'-র পরে এই কথাগুলি সংযুক্ত হইবে—'ফরাসডাঙ্গার গুরুদাস ভট্ট কালীযাত্রার দল করিয়াছিলেন, কিন্তু দল স্থায়ী হয় নাই। বর্দ্ধমান জেলার লাউসেন বড়াল যাত্রার দল বাঁধিয়া মনসার ভাসান গান করিতেন। দেশে সে-ধারাও চলে নাই। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল আজও চলিতেছে।'

১৯৮ পৃষ্ঠায় 'Culture-এর প্রতিশব্দ কি?'-র তৃতীয় কলিতে 'জ্ঞানে-বিজ্ঞানে' স্থলে 'মনোব্যাপারে' পড়িতে হইবে।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধারকল্পে অক্লান্তকর্ম্মা সুলেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র দ্বিতীয় খণ্ড পড়িলাম। এই পুস্তক প্রথম খণ্ডের গৌরব রক্ষা করিয়াছে এবং আমাদিগকে নূতন অনেক তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছে। প্রথমেই চিত্র-প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি মিস বেলনোসের অঙ্কিত কয়েকখানি ১০০ বৎসরের প্রাচীন ছবি। শুধু কালীর রেখায় আঁকা ছবিগুলি বাঙ্গালী জীবনকে মূর্ত্ত করিয়া দেখাইতেছে। ছবিগুলি দেখিলে কয়েকটি কথা স্বতঃই মনে পড়িবে। যে বাঙ্গালী এখন ভাতে মরা, কোটরগত চক্ষু, যকৃৎ ও হৃদপিণ্ডের পীড়ায় ম্রিয়মাণ, যৌবনে যাহারা স্ফূর্ত্তিহীন, বার্দ্ধক্যে যাহারা ন্যুব্জ দেহ, দৃষ্টিশক্তিহারা ও বধির, একশত বৎসর পূর্ব্বে সেই বাঙ্গালীর কি বীরমূর্ত্তি ছিল, তাহাদের কপাট-বক্ষ সবল স্নায়ুযুক্ত পুষ্টদেহ, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিলে সন্দেহ হয়—আমরা কি সেই জাতির লোক? মেয়েদের মূর্ত্তিতে অন্নপূর্ণার মহিমা ভাসিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের পিঙ্গল চক্ষে চশমা নাই, তাহারা পুরুষের স্বভাব নকল করিতে যাইয়া কাঠকঠোর হইয়া পড়ে নাই, "এলো চুলে কিবা শোভা, চোখে কাল তারা। দেখে নাই যারা এসে দেখে যাক তারা।" চিত্রগুলি দেখিলে কবির এই উক্তিই মনে পড়ে। অথচ চিত্রকরী বাঙ্গালীর ঘর ও বাহির প্রত্যক্ষ করিয়া ছবিগুলি আঁকিয়াছেন, তুলির রেখায় ঈষৎমাত্র অতিরঞ্জন নাই। স্বয়ং রাজা রামমোহন চিত্রগুলি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "মিস বেলনোস যাহা দেখিয়াছেন ঠিক তাহাই আঁকিয়াছেন।" এই ১০০ বৎসরে আমাদের জাতীয় জীবন যে কিরূপ বিকৃত হইয়াছে, ছবিগুলি তাহাই যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছে। যতগুলি অন্তঃপুরের ছবি ইনি আঁকিয়াছেন- প্রত্যেকটিতেই চরকা আছে। রান্নাঘর এখন উড়ে বামুনের দ্বারা কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছে, সেই দুর্গতির কথা না বলিলেই ভাল। রান্নার কথায় আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা ভয় পান, কিন্তু রন্ধনে-নিরতা মেয়ের ছবি, তাঁহার প্রসাধন প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যেন সুনীল সরসীর জলে কনকপদ্ম ভাসিতেছে। কালীঘাটে পাঁঠা কাটার ছবি ও চড়কের ছবিও বিশেষ দর্শনীয়। মানুষ তখন উৎসব উপভোগ করিত। বারমাসের তের উৎসবের এখন যতই নিন্দা কর, তখন দেশে যে প্রকৃত আনন্দ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন সে আনন্দের উৎস ফুরাইয়াছে। ষড় ঋতুর কোন ঋতুই এখন আর আমাদের মনে উৎসাহ বা আনন্দ আনে না।

একশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর জীবন এখন হইতে অনেকটা খাঁটি ছিল, তাহাদের বাদ-প্রতিবাদ, কলহ ও মৈত্রী সকল বিষয়েই একটা প্রকৃত জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। এখনকার আবেদন-নিবেদন, সংস্কারের চেষ্টায় পরান্ত বঙ্গ-যুবকের নিষ্ফল আক্রোশ, বিদেশীবর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি লইয়া ঘরে ঘরে প্রতারণা—এইরূপ একটা অসত্য রঙ্গমঞ্চের অভিনয় তখন ছিল না। তখনকার রুচি একটু অমার্জ্জিত ছিল, কিন্তু সেরূপ প্রাণ খোলা, মুখ-ভরা হাসি হাসিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সেই যুগে ইংরেজী শিক্ষার উপকার ও কুফল, বৈদ্যশাস্ত্রকে সংস্কৃত কলেজ হইতে বিদায় দান এবং মধুসূদন গুপ্তের অধ্যাপক হওয়ায় সাধারণের মনোভাব, কুলীনদের বহু-বিবাহ লইয়া বাকবিতণ্ডা, ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশীয় যুবকদের মধ্যে অনাচারের প্রাচুর্য্য ও তাহার প্রতিকার ইত্যাদি কত বিষয়ে যে সাময়িক আলোচনা আছে তাহার অবধি নাই। একজন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশটি উচ্ছন্ন যাইবার পথে যাইতেছে দেখিয়া প্রতিকার স্বরূপ এই সব নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন—"বালকগণ ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক, ঠাকুর প্রণাম করি, দশজনের সম্মুখে হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ, রামনারায়ণ, গোবিন্দ, কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলী ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবে। কেহ বা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসীমালা লইয়া সর্ব্বদা হরিবোল ২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম্ম রক্ষাকরণ পূর্ব্বক পুণ্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন।" (সমাচার চন্দ্রিকা, ১৭১ পৃঃ)।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার এই প্রাণান্ত চেষ্টায় নব শিক্ষিতদের মধ্যে যে সুপ্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ এই যে একটি শিক্ষিত যুবক তাহার পিতার সহিত কালীঘাটে যাইয়া কালীমাতাকে প্রণাম করিতে বলিলে, পিতার সম্মুখে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল, গুড্ মর্ণিং ম্যাডাম।

যে যুগ দূর আকাশগাত্রে সংলগ্ন পল্লীর সবুজ দৃশ্যের মত অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছিল, ব্রজেন্দ্র বাবু তাহা যেন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের চক্ষের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন; সেই সকল হারান দৃশ্য এত কাছে আসিয়াছে যে সেই অতীত যুগের জনকোলাহল, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি যেন একান্ত ভাবে আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে। *

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড), শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩॥০, পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲।

ভূদেব-প্রসঙ্গ

—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সান্নিধ্যলাভ করিবার সৌভাগ্য আমার যেরূপ হইয়াছিল, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্নিধ্যলাভের সেরূপ সৌভাগ্য আমার হয় নাই, অথচ ভূদেব বাবুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বৎসরাধিক কাল আমাদের প্রতিবেশীরূপে চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন এবং তখন আমি বালক ছিলাম না, তখন আমি কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতায় জীবিকা-অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভূদেব বাবুর যখন মৃত্যু হয় তখন আমি কলেজের ছাত্র; চুঁচুড়ায় ভূদেব বাবুর বাটী আমাদের কলেজ হইতে বিশেষ দূরে অবস্থিত না হইলেও তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাইবার সুবিধা পাইতাম না। ভূদেব বাবুও রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ সময় কাশীধামে বাস করিতেন, মধ্যে মধ্যে চুঁচুড়ায় আসিতেন, সুতরাং কখন তিনি চুঁচুড়ায় আসিতেন, তাহা সকল সময় আমি জানিতে পারিতাম না।

আমি বলিয়াছি যে, ভূদেব বাবুর সহিত আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; সেই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। ভূদেব বাবু হাওড়া জিলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ইয়ং ভূদেব বাবুকে চুঁচুড়ায় নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনের ভার প্রদান করিলে ভূদেব বাবু চুঁচুড়ায় আগমন করেন। আমার পিতার বয়স তখন উনিশ-কুড়ি বৎসর। চুঁচুড়াতে একটি নূতন স্কুল হইবে এবং সে স্কুলে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহারা মাসিক চারি পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে এবং পরে তাহাদের গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য পাইবার আশা আছে, লোকমুখে এই কথা শুনিয়া আমার পিতা চুঁচুড়াতে গিয়া ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পিতার মুখে, আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া ভূদেব বাবু তাঁহাকে বলেন যে, কয়েক দিন পরে বিদ্যার্থী ছাত্রদিগের একটা পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, যে সকল ছাত্র সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই বৃত্তি প্রদান করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে পিতৃদেব পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন এবং নর্ম্যাল স্কুলে ছাত্ররূপে গৃহীত হইলেন। পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, স্কুলের রেজিষ্ট্রি-বহিতে তাঁহার নাম লিখিবার সময় ভূদেব বাবু আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন—"নূতন স্কুলের প্রথম রেজিষ্ট্রি-পুস্তকে প্রথমে তোমার নাম লিখিয়া 'বউনি' করিলাম, দেখা যাক্ তোমার 'পয়' কেমন।" আমার পিতাই হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের প্রথম ছাত্র ছিলেন।

হুগলীতে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনের পূর্ব্বে মাত্র কলিকাতাতে একটি নর্ম্যাল স্কুল ছিল; পরে ঢাকা, হুগলী ও কটকে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। এই চারিটি নর্ম্যাল স্কুলের পরীক্ষা এক সঙ্গে হইত, অর্থাৎ একই দিনে একই রূপ প্রশ্ন-পত্র দ্বারা চারিটি স্কুলে ছাত্রদিগের পরীক্ষা করা হইত। নর্ম্যাল স্কুলে তিন বৎসর অধ্যয়নের পর শেষ পরীক্ষাটাই এক যোগে হইত, সেই পরীক্ষাকে সকলে "ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা" বলিত; এখনও নর্ম্যাল স্কুলে ঐ ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা প্রচলিত আছে। পিতৃদেব ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করাতে ভূদেব বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং পরীক্ষার পরই আমার পিতাকে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলেই শিক্ষকতা প্রদান করেন।

এইরূপে ভূদেব বাবুর সহিত আমার পিতার শিক্ষক ও ছাত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাহার পর যত দিন ভূদেব বাবু কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, আমার পিতা ততদিন তাঁহারই অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিলে ভূদেব বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ কি?" দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষা লইতে আদেশ করিলে বাবা বলেন, "যদি আপনি আমাকে দীক্ষা দেন তবেই দীক্ষা গ্রহণ করিব, অন্য কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিব না, কারণ আপনার প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি হয় অন্য কাহারও প্রতি সেরূপ হয় না।" পিতার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূদেব বাবু তাঁহাকে দীক্ষা-

প্রদানে সম্মত হইলেন এবং কয়েক দিন পরে দীক্ষা প্রদান করিলেন। এইরূপে ভূদেব বাবু আমার পিতার শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু হওয়াতে তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

আমার পিতা কি বৈষয়িক, কি সাংসারিক এবং কি পারলৌকিক সকল বিষয়েই ভূদেব বাবুর উপদেশ গ্রহণ করিতেন। পিতার মুখে শুনিয়াছি যে ভূদেব বাবুই আমাদের কয় সহোদরের নামকরণ করিয়াছিলেন। আমার পিতা ভূদেব বাবুর পত্নীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সেই মহিয়সী মহিলাও বাবাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি অনেক সময় আমার জননীকে তাঁহাদের চুঁচুড়ার বাটীতে লইয়া গিয়া একাদিক্রমে একমাস দেড়মাস রাখিতেন; সে সময় আমার মাতামহী যদি আমার জননীকে বাটীতে আনিবার প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে ভূদেব বাবুর পত্নী বলিতেন, "আমার বৌকে আমি এখন পাঠাইব না, যখন ইচ্ছা হইবে পাঠাইব, বেয়ান রাগ করেন, ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইবেন।"

আমি বাল্যাবস্থায় বহুবার আমার মাতার সঙ্গে ভূদেব বাবুর বাটীতে গিয়াছি, কিন্তু তখন আমি বালক মাত্র, সদর বাটীতে ভূদেব বাবুর কাছে বড় যাইতাম না, অন্দরে মাতার নিকটেই অধিকাংশ সময় থাকিতাম। ভূদেব বাবুর পত্নীকে আমি দেখি নাই, কারণ আমার জ্ঞানসঞ্চারের পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে ভূদেব বাবুও আহারের সময় এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্তঃপুরে গমন করিতেন না। সেই জন্য ভূদেব বাবুর সান্নিধ্য-লাভের সৌভাগ্য আমার বড় অধিক হয় নাই

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং ভূদেব বাবু উভয়ে আকৃতি ও প্রকৃতিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, সাদাসিধা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের লোক, আর ভূদেব বাবু ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি রাসভারী লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন মজলিসী—নানা প্রকার গল্প করিতেন, সকলকে হাসাইতেন; ভূদেব বাবু ছিলেন গম্ভীর-প্রকৃতি,অল্পভাষী; বিদ্যাসাগর মহাশয় মোটা থান ধুতি পরিধান করিতেন, ভূদেব বাবু বাটীতে সর্ব্বদা ফরাসডাঙ্গার চওড়া-পাড় সূক্ষ্ম ধুতি (তাহাকে ধুতি না বলিয়া শাড়ী বলাই সঙ্গত) ব্যবহার করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গোঁফ দাড়ি ও মাথার সম্মুখ ভাগ কামাইতেন, মাথার পশ্চাৎ দিকে একটি ক্ষুদ্র শিখাও ছিল, আর ভূদেব বাবুর তুষারধবল আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু অথচ মাথায় যুবজনোচিত কৃষ্ণ কেশ। উভয়েই ব্রাহ্মণ অধ্যাপক পণ্ডিতের সন্তান, উভয়েরই সনাতন হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় আস্থা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ভূদেব বাবুও সর্ব্বদা ধূমপান করিতেন, সর্ব্বদা ধূমপান হেতু ভূদেব বাবুর সুশুভ্র গুম্ফ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অল্প দামের একটা হুঁকাতে ধূম পান করিতেন আর ভূদেব বাবু সুদীর্ঘ-নল আলবোলাতে ধুম পান করিতেন। ভূদেব বাবু লাট-দরবারে বা ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতিতে যাইবার সময় চোগা চাপকান পাগড়ী ব্যবহার করিতেন; সে সময় তাঁহাকে দেখিলে একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ইহুদি বা মোগল বলিয়া মনে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভোজনকালে আমি কখনও উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং তাঁহার ভোজনের প্রক্রিয়া কিরূপ ছিল তাহা জানি না; ভূদেব বাবুকে অনেকদিন ভোজন করিতে দেখিয়াছি, তিনি ভোজনকালে চামচ ও কাঁটা ব্যবহার করিতেন, কখনও তাঁহাকে হাতে করিয়া খাইতে দেখি নাই। ভূদেব বাবু প্রত্যেক দিন মাংস খাইতেন।

ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমার মনে একটা আশঙ্কার উদয় হয়। আমার মনে হয় যে ভূদেব বাবুর নাম ছাড়া আর কিছু একালের অনেকে অবগত নহেন। কিন্তু সেকালে ভূদেব বাবু বঙ্গদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং শিক্ষা-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসীই স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন নাই। কিছুদিনের জন্য তিনি শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেকালের শিক্ষা-বিভাগে তাঁহার ন্যায় উচ্চ বেতনভোগী দেশীয় কর্ম্মচারী কেহই ছিলেন না।

কিন্তু ভূদেব বাবুর এই কর্ম্ম-জীবনের জন্য তাঁহার বিষয় আলোচ্য নহে, অন্য বিষয়ে তিনি সেকালে এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। আজকাল বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত সমগ্র ভারতবর্ষে কোটীকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, সেই সঙ্গীতের প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন ভূদেব বাবুর নিকট হইতে। ভূদেব বাবুর "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" পাঠ করিয়াই বঙ্কিম বাবুর হৃদয়ে জন্মভূমির প্রতি অনুরাগের সূত্রপাত হয়। বঙ্কিম বাবু ভূদেব বাবুর নিকটেই

স্বদেশানুরাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু বলিতেন যে ভূদেব বাবুর ঐ পুস্তক পাঠ না করিলে তিনি "আনন্দ-মঠ" লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালার যে যুবক সম্প্রদায় আজ জন্মভূমির দুঃখমোচনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সেই যুবকগণের মধ্যে কয়জন জানেন যে, ভূদেব বাবুই প্রথমে জন্মভূমির সেই দুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন এবং কি উপায়ে সেই দুঃখ দূর হইতে পারে "ভারতবর্ষের ইতিহাস" ও "পুষ্পাঞ্জলী"তে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেই ভূদেব বাবুর পুস্তক পাঠ তো দূরের কথা তাহাদের নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পারিবারিক ব্যাপারের সহিত আমি পরিচিত ছিলাম না, তাঁহার শুধু ব্যক্তিগত পরিচয়ই আমি পাইয়াছিলাম। কিন্তু ভূদেববাবুর বাটীতে অতি বাল্যকাল হইতে আমার যাতায়াত থাকাতে ব্যক্তিগত জীবনী অপেক্ষা তাঁহার পরিবারিক জীবনীর সহিতই আমি সমধিক পরিচিত ছিলাম। পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, যে অনুরূপা দেবীর "পোষ্য-পুত্র" "মন্ত্র-শক্তি" প্রভৃতি আজকাল কলিকাতার রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে, সেই অনুরূপা দেবী এবং তাঁহার স্বর্গীয়া অগ্রজা ইন্দিরা দেবী ভূদেব বাবুর পৌত্রী, ভূদেববাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ৺মুকুন্দবাবুর কন্যা। আমি যখন ভূদেববাবুর বাটীতে যাইতাম, তখন অনুরূপা, ইন্দিরা প্রভৃতির বয়স বোধ হয় সাত আট বৎসর হইবে।

ভূদেব বাবুর পত্নীর নাম ছিল কালী। ভূদেববাবু যেরূপ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার পত্নী সেরূপ ছিলেন না, তিনি শ্যামাঙ্গী ছিলেন। আমার জননীর মুখে শুনিয়াছি, ভূদেববাবু মধ্যে মধ্যে পত্নীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "আমি তোমাকে বিবাহ না করিলে তোমার গতি কি হইত? কে তোমার মত কালো মেয়েকে বিবাহ করিত?" তাঁহার পত্নী উত্তর করিতেন, "আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হইলে তোমার গতি কি হইত? ঠাকুরের (শ্বশুরকে সেকালের বধূরা 'ঠাকুর' বলিয়া উল্লেখ করিতেন) মুখে শুনিয়াছি—স্ত্রীভাগ্যে ধন। আমার ভাগ্যবলেই তোমার আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হইলে তোমাকে টোল খুলিয়া বসিতে হইত আর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শিষ্য যজমানের নিকট বৃত্তি আদায় করিতে হইত।"

ভূদেব বাবুর পিতা অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। ভূদেববাবু সেই সকল শিষ্য তাঁহার জ্ঞাতিদিগকে দিয়াছিলেন। আমার পিতাই তাঁহার একমাত্র মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। ভূদেব বাবুর সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামি একেবারে ছিল না। বরং কেহ তাঁহার নিকট ধর্ম্মের গোঁড়ামি করিলে তিনি প্রতিকূল যুক্তি-তর্ক দ্বারা উহার অসারতা প্রতিপাদন করিতেন। আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, নর্ম্ম্যাল স্কুলে যাঁহারা আমার পিতার সহিত অধ্যয়ন করিতেন, উত্তরকালে তাঁহাদের মধ্যে কেহ উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম, কেহ বা খৃষ্টান হইয়াছিলেন। ছাত্রগণের ধর্ম্মান্তরগ্রহণের কথায় একদিন ভূদেব বাবুর পত্নী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেহ ব্রাহ্ম, কেহ খৃষ্টান, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা শাক্ত এমন হইল কেন?" উত্তরে ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন, "আমার দোষেই হইয়াছে। উহারা যখন আমার কাছে পড়িত তখন উহাদের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইত। কেহ বা খৃষ্ট ধর্ম্মের নিন্দা করিত, কেহ বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিন্দা করিত, কেহ বা শাক্ত সম্প্রদায়ের নিন্দা করিত। উহাদের তর্কের কথা আমার কর্ণগোচর হইলে আমি উহাদের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্য হিন্দুর নিকট খৃষ্টধর্ম্মের, শাক্তের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মের, বৈষ্ণবের নিকট শাক্ত ধর্ম্মের গুণগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতাম। কোন ধর্ম্মই হেয় বা নিকৃষ্ট নহে, সকল ধর্ম্মই ভাল, কেবল ধর্ম্মের গোঁড়ামিই খারাপ, ইহা বুঝাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে আমার যুক্তি-তর্ক তাহাদের কোমল হৃদয়ে কিরূপ গভীর রেখাপাত করিবে। সুতরাং আমার কোন ছাত্র যদি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করে, তাহার জন্য আমিই দায়ী।"

ভূদেব বাবু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। প্রতি বৎসর পিতা মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিতেন। দেবপূজা বা অন্য যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে বস্ত্রদানের বিধান আছে, সেই সকল কার্য্যে তিনি কখনই বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। সেই জন্য মধ্যে

মধ্যে চন্দননগরের তাঁতের ধুতি বা সাড়ী ক্রয় করিবার জন্য আমার পিতার উপর ভার পড়িত। আমিও অনেকবার চন্দননগরের তাঁতীদের নিকট হইতে বস্ত্র ক্রয় করিয়া চুঁচুড়ায় ভূদেব বাবুর বাটীতে দিয়া আসিয়াছি।

আমার পিতা যেদিন দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেদিন আমি বাবার সঙ্গে ভূদেব বাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। দীক্ষাদানের সময় গুরুকে বস্ত্র, উত্তরীয়, পাদুকা ও ছত্র দান করিতে হয়। আমার পিতা তাঁহার গুরুদেবের জন্য গরদের জোড় লইয়া গিয়াছিলেন। দীক্ষাদানের পর ভূদেব বাবু সেই 'জোড়' পরিধান করিয়াই বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন যে, হালিসহর-নিবাসী বাবু বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। বিষ্ণু বাবু ভূদেব বাবুরই অধীনে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন, উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে রহস্যালাপও হইত। ভূদেব বাবু অধস্তন কর্ম্মচারীদের দোষ বা ত্রুটী দেখিলে কদাচ তাহা উপেক্ষা করিতেন না বা কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু আফিসের কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে যদি তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মচারী তাঁহার বাটীতে যাইতেন, তাহা হইলে ভূদেব বাবু তাঁহার সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ভূদেব বাবুকে গরদের জোড় পরিহিত দেখিয়া বিষ্ণু বাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি বেশ?" ভূদেব বাবু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আজ ইন্দ্রকুমারকে দীক্ষা দান করিলাম, ইন্দ্রকুমার গুরুকে এই বস্ত্র দান করিয়াছে।" বিষ্ণু বাবু বলিলেন, "আমি জানিতাম আপনি চিরকাল গুরুমহাশয়গিরিই করিয়া আসিতেছেন, গুরুগিরিও করেন, তাহা জানিতাম না।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "কেন? আমার মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্রের পক্ষে গুরুগিরি করা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? তুমি জান আমি প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক করি।" বিষ্ণু বাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন, "সন্ধ্যাহ্নিক তো করেন, কিন্তু ভোজনকালে গণ্ডূষ করেন কিরূপে? কাঁটা চামচেতে গণ্ডূষ হয় নাকি?" ভূদেব বাবু বিষ্ণু বাবুর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভূদেব বাবুর প্রথম পুত্রের বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দদেব এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেবকে রাখিয়া ভূদেব বাবু দেহত্যাগ করেন। গোবিন্দদেব মুন্সেফ এবং মুকুন্দদেব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। গোবিন্দ বাবু পিতার ন্যায় উজ্জ্বল গৌর বর্ণ ও মুকুন্দদেব জননীর ন্যায় শ্যাম বর্ণ ছিলেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণের মধ্যে কেহ বা গৌর-বর্ণ কেহ বা শ্যামবর্ণ। ভূদেব বাবু একদিন তাঁহার দুইটি পৌত্রীর বর্ণ-বৈষম্যের সাহায্যে একখানি পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। শান্তিপুরনিবাসী পণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সেই পুস্তকের এক এক খণ্ড ভূদেব বাবুকে, বঙ্কিম বাবুকে আমার পিতাকে এবং অন্যান্য অনেককে উপহার দিয়াছিলেন। একদিন আমার পিতা এবং বঙ্কিম বাবু ভূদেব বাবুর নিকট বসিয়া ছিলেন, এমন সময় বিদ্যানিধি মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ভূদেব বাবুর দুইটি পৌত্রী একখানা বড় আরসির নিকট খেলা করিতেছিল। পৌত্রী দুইটির মধ্যে একটি গৌরাঙ্গী, অন্যটি শ্যামাঙ্গী। গৌরাঙ্গীটি দর্পণের নিকটে দাঁড়াইয়া যত্নসহকারে দর্শনের কাচ মুছিতেছিল আর নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতেছিল। শ্যামাঙ্গীটি ভগিনীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে মুখভঙ্গী করিতেছিল, কিল দেখাইতেছিল। ভূদেব বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। এমন সময় বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্কিম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সম্বন্ধ-নির্ণয় পড়িয়াছেন কি? কেমন দেখিলেন?" বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "আপনি অনেক পরিশ্রম করিয়া পুস্তক খানা প্রণয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু মোটের উপর উহা ঘটকের কুলজী ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সমাজের বিবরণ মাত্র।" বিদ্যানিধি মহাশয় আমার পিতার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিলেন—"আমার তো বেশ ভাল লাগিয়াছে। আজকাল ঘটকের ব্যবসায় লোপ পাইতে বসিয়াছে, এ সময় আপনি এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা লুপ্তপ্রায় অধ্যায়কে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ সমূহের কৌলীন্য-মর্য্যাদা ও শ্রেণীবিভাগের ইতিহাস পাঠ করিলে, সেকালের আমাদের সমাজের একটা ধারণা করিতে পারা যায়।"

অবশেষে বিদ্যানিধি মহাশয় ভূদেব বাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার পৌত্রীরা তোমার কেতাবের

সমালোচনা করিতেছে। যেটি গৌরাঙ্গী, সে যত্ন করিয়া আর্‌সি মুছিতেছে, আর যে শ্যামাঙ্গী সে মুখভঙ্গী করিতেছে, কিল দেখাইতেছে। ইন্দ্রকুমার নিকষ কুলীন, তাই তোমার কেতাবের সুখ্যাতি করিল, আর বঙ্কিম ভঙ্গ কুলীন, তাই তোমার কেতাবে কৌলীন্য-মর্য্যাদার কথা তাহার ভাল লাগে নাই।" এই বলিয়া বঙ্কিম বাবুকে বলিলেন, "বঙ্কিম, কেবল রাজরাজড়ার কথা আর লড়াই-ঝগড়ার কথা লইয়াই একটা দেশের ইতিহাস নয়, সমাজ-গঠন, সামাজিক উন্নতি-অবনতির কারণ, শ্রেণীবিভাগও ইতিহাসের একটা প্রধান অঙ্গ। যে শ্রেণীবিভাগ পাঁচ সাত শত বছর ধরিয়া আমাদের দেশে রহিয়াছে, তাকে উপেক্ষা করিলে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

কোন ব্রাহ্মণ সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলে ভূদেব বাবু তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তিনি বলিতেন যে, উপবীত আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন, উপবীত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে এক কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিদ্যা বুদ্ধি, বিনয়, সৌজন্য, ত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্যই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, রাজার মুকুটও তাঁহাদের চরণতলে লুণ্ঠিত হইত। আমরা তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হীন, নীচ হইতে পারি না। উপবীত ত্যাগ করিলে সেই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ত্যাগ করা হয়, আত্ম-মর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিতে হয়। যে আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিতে পারে সে সকল প্রকার দুষ্কার্য্যই করিতে পারে! উপবীত-ত্যাগী-দিগকে তিনি কিরূপ ঘৃণা করিতেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। একদিন কলেজের ছুটীর পর আমি কোন প্রয়োজনে ভূদেব বাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে তিনি আমাদের বাটীর প্রত্যেকের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সহিত আর একজন অল্প-বয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া ভূদেব বাবুকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। ভূদেব বাবু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া সানন্দে বলিলেন, "কালীময় যে? কেমন আছ? কবে আসিলে? বাড়ীর খবর সব ভাল?" আগন্তুকের নাম কালীময় শুনিয়া আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, কারণ আমি পিতার মুখে অনেক বার তাঁহার সতীর্থ ও প্রিয় বন্ধু কালীময় ঘটকের নাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। কালীময় ঘটক প্রণীত "চরিতাষ্টক" প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ সেকালে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ছিল; তাঁহার রচিত "ছিন্নমস্তা" উপন্যাসও তখন বেশ ভাল উপন্যাস বলিয়া সমাদৃত ছিল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে ভূদেব বাবু বলিলেন, "এটি ইন্দ্রকুমারের ছেলে।" কালীময় বাবুর সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিলেন, কথায় কথায় প্রকাশ পাইল যে, তিনি উপবীত ত্যাগ করিয়া উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজ-ভুক্ত হইয়াছেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর ভূদেব বাবু কালীময় বাবুকে বলিলেন, "দেখ কালীময়, আমরা সেকেলে লোক, আমাদের এখনও অনেক কুসংস্কার আছে। সেগুলি কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। আমার ত কেমন মনে হয় যে, যাহার শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে, সে উপবীত ত্যাগ করিলেও উপবীত তাহাকে ছাড়ে না, প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আবার তাহার স্কন্ধে আশ্রয় লয়, আর যাহার শোণিত সম্বন্ধে গোলযোগ আছে, উপবীত তাহার স্কন্ধে থাকে না, তাহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।" বলা বাহুল্য যে ভূদেব বাবুর এই কুসংস্কারের কথা শুনিয়া সেই বাবুটি অধোবদন হইলেন। পরে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানি না। ভূদেব বাবুর ঐ মন্তব্য অনেকের নিকটে রূঢ় এবং অপ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা জানিয়াও, তিনি উপবীত-ত্যাগীদিগকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা দেখাইবার জন্যই আমি ঐ ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

ভূদেব বাবু কাহারও নিকটে সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তবে সত্য কথা, অপ্রিয় হইলে তিনি কৌশল সহকারে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতেন। সেকালে শিক্ষা-বিভাগের একজন কর্ম্মচারীর একখানা জ্যামিতি অনেক স্কুলে পড়ান হইত। সেই পুস্তকে এক স্থানে একটা ভুল ছিল। ভূদেব বাবু এক বার কোন বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সেই পুস্তক খানি লইয়া ছাত্রদের কতদূর পড়ান হইয়াছে, তাহা দেখিতেছিলেন, এমন সময় সেই ভুল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি স্বহস্তে সেই ভুল সংশোধন করিয়া ক্লাসের শিক্ষককে বলিলেন, "ছাত্রদিগকে এই ভুলটা সংশোধন করিয়া লইতে বলিবেন।" যিনি সেই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তিনি ভূদেব বাবুরই অধীনে একজন সব-ইন্‌স্পেক্টার এবং উক্ত

শিক্ষক মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। কিছুদিন পর সেই গ্রন্থকার ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া শিক্ষক মহাশয়ের মুখে শুনিলেন যে, ভূদেব বাবু তাঁহার পুস্তকে একটা ভুল দেখিয়া তাহা কাটিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল, তিনি বলিলেন, "ভূদেব বাবু আমার বই কলম দিয়া কাটিয়াছেন, আমি তাঁর বই কোদাল দিয়া কাটিব।" গ্রন্থকারের এই মন্তব্য কিছু দিন পরে কোনরূপে ভূদেব বাবুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সকলেই নিজ নিজ হাতের যন্ত্র ব্যবহার করে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?" সেই গ্রন্থকার জাতিতে উগ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, অধিকাংশ উগ্র ক্ষত্রিয়ই কৃষিজীবী।

ভূদেব বাবুর সহিত স্যর আশ্‌লি ইডেনের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। স্যর আশলি ছোটলাট হইবার কিছু পরেই ভূদেব বাবুর পদোন্নতি হয়। ভূদেব বাবু বুঝিতে পারিলেন যে প্রধানতঃ ছোটলাট বাহাদুরের চেষ্টাতেই কোন ইংরেজকে ঐ পদ না দিয়া তাঁহাকেই ঐ পদ প্রদান করা হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে এক দিন স্যর আশ্‌লি কথায় কথায় ভূদেব বাবুকে বলেন, "গভর্ণমেণ্ট যে আপনাকে শিক্ষাবিভাগে এই উন্নত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেজন্য বোধ হয় আপনি গভর্ণমেণ্টের উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন?"

ভূদেব বাবু বলিলেন, "আমার পদোন্নতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" ছোটলাট বলিলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা ছাড়িয়া দিন, গভর্ণমেণ্টের উদারতা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" ভূদেব বাবু বলিলেন "আমি ইংরেজের আমলে না জন্মাইয়া যদি মুসলমান বা হিন্দু রাজত্বকালে জন্মাইতাম, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিতাম।"

সেকালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতাপ পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অলোকসামান্য প্রতিভা, অদম্য উৎসাহ এবং সুতীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিপ্রভাবে সামান্য অবস্থা হইতে বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার হইয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর সহিত জয়কৃষ্ণ বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভূদেব বাবু বলিতেন যে জয়কৃষ্ণ বাবু যদি মুসলমান আমলে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রতাপাদিত্য বা সীতারাম রায়ের ন্যায় একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন।

ভূদেব বাবু আদর্শ পিতৃভক্ত ছিলেন। আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি একবার পিতার পীড়ার সময় ভূদেব বাবু তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় আমার পিতা তথায় উপস্থিত হইলে ভূদেব বাবু আমার পিতাকে রোগীর ঘরেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভূদেব বাবুর পিতা ভূদেব বাবুর সকল ছাত্রকেই পৌত্র সম্পর্ক ধরিয়া রহস্যালাপ করিতেন। আমার পিতা সেই কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক উভয়কে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূদেব বাবুর পিতা কাশিতে কাশিতে গয়ের ফেলিবার জন্য পিকদানী লইবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইলেন, কিন্তু পিকদানী সে স্থানে ছিল না, বোধ হয় উহা পরিষ্কার করিবার জন্য ভৃত্য বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। ভূদেব বাবু যখন দেখিলেন যে ঘরের মধ্যে পিকদানী নাই, অথচ পিতা গয়ের ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তিনি পিতার মুখের নিকট আপনার দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া দিলেন। পিতা পুত্রের হাত সরাইয়া দিয়া মেঝেতে গয়ের নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন "ভূদেব, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুই বড়লোক হবি।" ভূদেব বাবু তখন মাসিক দেড়শত টাকা বেতনভোগী শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হয় নাই, উত্তরকালে তিনি মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

ভূদেব বাবুর সুবিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং যদি কেহ ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই জীবনীপাঠে তাঁহার কৌতূহল নিরাকৃত হইবে। তাঁহার জীবনীতে যে সকল ঘটনার উল্লেখ নাই, অথচ যাহা আমি নিজে দেখিয়াছি বা আমার জনক-জননীর কাছে শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া আমার এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[আশ্রয়দাত্রী]

মথুর ঘোষের বাসভবন পল্লীগ্রামের সমৃদ্ধির সহিত পরিচ্ছন্নতার অভাবের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বহুদূরবিস্তৃত ধানের ক্ষেতের ওপার হইতে বৃক্ষশাখাপত্রের অবকাশ-পথ দিয়া বাড়ীটির ছাদের আলিসা ও কালো প্রাচীর নজড়ে পড়ে। কাছে আসিলে দেখা যায় যে স্থানে স্থানে প্রাচীন চুন-বালির সম্রান্ত বুনিয়াদ জরাজীর্ণ পুরাতন ইষ্টক-ভিত্তি ত্যাগ করিয়া খসিয়া পড়িবার মতলব করিতেছে; কোথায়ও বা একটা বিশ্রী রঙ্-ওঠা জানালার পাল্লা একটি কব্জা মাত্র আশ্রয় করিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে গত বৎসরে অন্তর্হিত সঙ্গী অপর পাল্লাটির বিরহে কাতরতা প্রকাশ করিতেছে; কোনো কোনো জানালায় কব্জা বা পাল্লার চিহ্ন-মাত্র নাই; নীচজাতীয় টাটের পরদা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সেই সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্ভাগের সামান্য স্থানেই চুনবালির প্রলেপ পড়িয়াছিল। চুনবালিশোভিত অপেক্ষাকৃত ভাগ্যসম্পন্ন অংশ, মথুর ঘোষ স্বয়ং না হউন্ তাঁহারই মত মহামহিমান্বিত কেহ যে অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; এখানে খুঁজিলে ভিনিসিয়ান খড়খড়ির দুই একটা টুকরা যে না মিলিবে তাহা নয়, কিন্তু দৈত্যের মত ওই বাড়ীটা ওরূপ সূক্ষ্ম অলঙ্কারে শোভিত হইতে প্রস্তুত ছিল না। এই অট্টালিকার বহির্ভাগের অধিক অংশেই চুনবালির ছোঁয়াচ লাগে নাই, অনাবৃত ইষ্টকস্তূপের উপর ধূলাকাদা ও কালিঝুলির প্রলেপ পড়িয়া একটা বীভৎস সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এখানে সেখানে ইঁটের দেওয়াল ফুঁড়িয়া এক আধটা তরুণ বট অথবা অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর কোনও গাছ মাথা খাড়া করিয়া যেন কোনও পারস্য-সম্রাট-কল্পিত শূন্যস্থিত উদ্যানের একটি ছোটখাট সংস্করণ গড়িয়া তুলিবার বাসনা করিতেছিল।

বাড়ীটি চারিটি সম্পূর্ণ পৃথক মহলে বিভক্ত। সম্মুখ দিয়া ঢুকিতে গেলেই এক জোড়া ভারী লোহার পাতমোড়া আলকাতরামাখানো কবাট পার হইতে হয়, তাহার পরেই প্রশস্ত উঠান। উঠানের তিন দিক দোতালা বারান্দা দিয়া ঘেরা—বারান্দা খুব উঁচু নয়। তোরণের ঠিক বিপরীত দিকেই পাঁচ খিলানের উপর দণ্ডায়মান সুপ্রশস্ত হল-ঘর। হল-ঘরের ভিতর-বাহির সর্ব্বত্রই চুনবালির কাজ করা কিন্তু বহু বর্ষার অত্যাচারে সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে কিঞ্চিৎ রঙের সমাবেশ হইয়াছে, বিশেষ করিয়া যে সকল স্থানে ছাদের জলনিকাশের জন্য পাইপ বসানো ছিল, সেই সেই স্থান একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। হল-ঘর হইতে অন্দর-মহলে যাইতে হইলে গোলকধাঁধার মত অন্ধকার ও সঁ্যাৎসেতে অনেকগুলি কামরা পার হইয়া যাইতে হয়। অন্দরমহলটা চকমিলান বাড়ী; মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের চারি পাশে পূর্ব্বের মতই বারান্দা। চুনবালির কাজ এখানেও আছে, কিন্তু অধিকাংশ থামের নগ্ন মূর্ত্তি কালের প্রকোপে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর শিশুরাও এই কার্য্যে কম সহায়তা করে নাই। উপরের এবং নীচের সকল ঘরের দেওয়ালেই অসংখ্য লাল সাদা কালো সবুজ চিহ্ন, এক কথায় রামধনুব সাতরঙে রঙীন। অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে রসস্থ মুখের ভার-লাঘবকারী পিচে, অথবা চিন্তালেশহীন কোনও দাসীর কদ্দম-আধারের ভার সহিতে না পারিয়া গোলা-হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলিবার ফলে অথবা পানসাজা রূপ সুখকর কাজের ভার যাহার উপর, দেওয়ালকে তোয়ালে ভাবে ব্যবহার করিয়া তাহার কাজের পরিচয় অঙ্গুলিচিহ্নরূপে ঘন ঘন দেওয়ালের গায়ে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই এরূপ হইয়াছে। কয়লার সাহায্যে অঙ্কিত বহু চিত্র, এঞ্জেলোর কল্পনা অথবা গুইডোর বর্ণগৌরব না থাকিলেও দুষ্ট বালকদের সময় নষ্ট করিবার অথবা বুদ্ধিমতী বালিকাদের ক্ষুধিত প্রহরযাপনের প্রচেষ্টার সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান ছিল। উঠানে ইট বা টালির বালাই ছিল না, জননী বসুন্ধরা সকল প্রকার উদ্ভিজ্জগৌরবে শোভমানা ছিলেন। গৌরবটা বেশী ছিল চারটি কোণে। উঠানের মাঝখানে এদিক ওদিক চারদিকে যাওয়ার পথ। সংসারে যত আবর্জ্জনা আর ময়লা জল মিলিয়া ঘন কালো হইয়া উঠানের এক দিকে

যেন যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্রাম করিতেছে—সে কালোর তুলনা নাই।

এখান হইতে একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথ দিয়া অপরিসর অথচ দৃঢ় একটি দরজা পার হইলেই বাড়ীর তৃতীয় মহল। এখানেই রান্নাঘর, দুইদিকে সারি সারি একতলা কতকগুলি কুঠরি, মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, উদ্ভিজ্জগৌরবে পূর্ব্বের প্রাঙ্গণ হইতেও সমৃদ্ধ। এখানে সর্ব্বদাই ধরিত্রীজাত শাকসব্জির উপর যে অকথিত অত্যাচার প্রত্যহই করা হইতেছে তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান; সলিলনিবাসী মীনজাতীয় জীবেদের উপর এই বিভাগের কর্ত্রীঠাকুরাণীরা যে অত্যাচার করেন তাহারও চিহ্ন রহিয়াছে। অপ্রতিহত গৌরবে যুগযুগসঞ্চিত ঝুল এখানে রাজত্ব করিতেছে।

চতুর্থ অর্থাৎ শেষ মহল রান্নাঘরের পিছনে অবস্থিত কিন্তু এদিক হইতে ও মহলে প্রবেশ করিবার সকল পথই অবরুদ্ধ। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে যাহারা কদাচিৎ এই মহলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা খুব কম।

পুরুষেরা এই মহলটিকে গুদাম-মহল বলিত, বাহির হইতে গুদাম-মহলে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র দরজা—অত্যন্ত স্থূল, প্রায় নিরেট। এই মহলের তিনদিকে খাড়া উঁচু প্রাচীর, বাহিরের কেহ যাহাতে বাড়ীর এই অংশে সহসা প্রবেশ করিতে না পারে সেই জন্য এই প্রাচীরের উপরিভাগ বোতলের ভাঙা কাচ দিয়া দুর্গম করা হইয়াছে। চতুর্থ অর্থাৎ বাকী দিকে সারি সারি একতলা কতকগুলি ঘর। প্রত্যেক ঘরের দেওয়াল অসম্ভব রকম পুরু, দরজাগুলি ছোট কিন্তু লোহার পাতমোড়া; জানালার বালাই কোনোটিতেই নাই। সম্ভব অসম্ভব সকলপ্রকার দ্রব্য সুরক্ষিত রাখিবার জন্য এই গুদাম-ঘরগুলি ব্যবহৃত হয় সকলে এইরূপ জানিত। বাড়ীটির একদিকে সুপ্রশস্ত সুপারিবাগান, মাঝে মাঝে বকুলগাছ। চতুর্দ্দিকে ইষ্টক-প্রাচীর দিয়া ঘেরা এবং ঠিক মধ্যস্থলে কানায় কানায় পরিপূর্ণ একটি পুকুর আছে, এই অংশটিকে বাড়ীর খিড়কি বলা হইত। রন্ধনশালার নিকট দিয়া এই অংশে আসিতে হয়, ইহার পরই আর একটি দরজা পার হইলেই গৃহসংলগ্ন উদ্যান।

পাঠক আসুন, আপনাকে সঙ্গে লইয়া আমরা, এতক্ষণ যে সুবৃহৎ অট্টালিকার পরিচয় দিতেছিলাম তাহারই দ্বিতীয় মহল অর্থাৎ অন্দর-মহলের দ্বিতলে গমন করি। সিঁড়ি অত্যন্ত অপ্রশস্ত এবং অন্ধকার; নিরেট ইঁটের স্তূপ ধাপে ধাপে উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে।' আমরা তাঁহাকে দুর্গম ও দুরতিক্রম্য আর এক রাজ্যে যাইতে আহ্বান করিতেছি—স্বয়ং মথুর ঘোষের শয়ন-কক্ষে তাঁহাকে যাইতে হইবে। এই কক্ষের প্রাচীরগাত্রের পালিসকরা চুনবালির আবরণ যথাসম্ভব পরিষ্কার আছে, দুই একস্থলে যে ইহার পবিত্রতা বিনষ্ট হয় নাই তাহা নহে; এখানে ওখানে দুই একটা কলঙ্কের দাগ, ক্বচিৎ দুই একটা আঁচড়ও দেখা যাইতেছে। এই কক্ষের এক দিকের একটা কোণ ঘেঁসিয়া অনাবৃত মেঝের উপরে সেগুন কাঠের একটা ভারী এবং উঁচু খাট দাঁড়াইয়া আছে। এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত ফ্রেমটির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন ভাবে একটা ডোরাকাটা জালি-পরদা চারিপাশে মাটির উপর পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে। কাঠের কয়েকখানা বিপুলকায় আলমারী এবং চেষ্ট-অব ড্রয়ার্সও ছিল; কালের প্রকোপ ও অযত্নব্যবহারে সেগুলির বার্নিশ বিশেষ ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এগুলি ঠিক পালঙ্কটির বিপরীত দিকে দেয়াল ঘেঁসিয়া বিরাজ করিতেছিল। একটা কি দুটি ড্রয়ার-সমন্বিত লিখিবার টেবিল, কয়েকটি অতি সাধারণ গ্রাম্য বাক্স ও সিন্দুক, তাহাদের ডালার চারিটা ধার মোটা মোটা পিতলের পাত দিয়া মোড়া এবং মধ্যে মধ্যে চন্দন কাঠের টুকরা বসানো—ইহাই হইল সেই কক্ষটির কাঠের আসবাবের সম্পূর্ণ পরিচয়। বিপরীত দুই দেওয়ালের মাথা হইতে পরস্পর মুখামুখি ভাবে দুইটি সুবৃহৎ চিত্র ঝুলিতেছিল—একটি মা কালীর কালো মূর্ত্তি এবং অন্যটি মা দুর্গার ছবি, দূর হইতে দেখিলে এটি কাঁকড়ার ছবির মত বোধ হয়।

অন্য দুই বিপরীত প্রাচীরগাত্রে ভীষণা কালী ও ঐশ্বর্য্যময়ী দুর্গার মত অত উঁচুতে নয়, দেয়ালের মাঝামাঝি সারি সারি ইয়োরোপীয় শিল্পকলার কয়েকটি নমুনা রক্ষিত ছিল। কুমারী মাতা মেরী ও তাঁহার শিশুসম্পর্কিত অপরূপ শিল্প যে-কক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল তাহার অধিবাসীরা শিল্পীর প্রতিভা অথবা খোদাইকরের কলা-কৌশল যথার্থ কি প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই কক্ষে একটি জানালার ঠিক পাশে একটি রমণী উপবেশন করিয়া ছিলেন—তাঁহার বয়স আটাশের কাছাকাছি হইবে।

J. M. Sen-Gupta

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

তাঁহার মুখ এবং গড়ন এখনও সুন্দর বলা যায়। তাঁহাকে শ্যামাঙ্গী বলা চলে; তাঁহার চক্ষুদ্বয় আয়ত ও ভ্রমরকৃষ্ণ, মৃদু অথচ হাস্যোজ্জ্বল, একটা জ্যোতি সে দুটিতে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। ইহা ছাড়া এই রমণীর আর কিছু বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত ছিলনা, কিন্তু মোটের উপর তাঁহার দেহে এমন একটা মাধুর্য্যের বিকাশ দেখা যাইতেছিল যাহা তাঁহার সহজাত, এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই মাধুর্য্য তাঁহার অঙ্গ ছাড়িয়া যায় নাই। তাঁহার সুডৌল দেহখানিকে বেষ্টন করিয়া একটি পরিষ্কার সাড়ী শোভা পাইতেছিল, কিন্তু মহিলাটির মস্তকে কোনও আবরণ ছিল না। সদ্যস্নানসিক্ত উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশদাম আলুলায়িত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, চিরুণীর সাহায্যে তাহা সংস্কৃত হয় নাই, বিশৃঙ্খল বলিয়াই যেন অধিকতর মনোহারী বোধ হইতেছিল; সচরাচর যে রকম ভারী ভারী গহনা আমাদের চোখে পড়ে তাহা অপেক্ষা হালকা সুবর্ণ অলঙ্কারে তাঁহার কান, গলা, বুক বাহু ও প্রকোষ্ঠ শোভিত ছিল। যে কারণেই হউক, তাঁহার নাসিকারন্ধ্র ও গণ্ডদেশে নথের সূক্ষ্ম এবং হালকা বৃন্তটি শোভা পাইতেছিল না, কিন্তু পায়ের যথাস্থানে থাকিয়া মলগুলি রুণ্‌ঝুণ্‌ করিতেছিল। জানালার চৌকাঠে মানুষের চুলের কয়েকটি গুচ্ছ ঝুলিতেছিল—রমণীর অঙ্গুলি-গুলি ইহাদের সাহায্যে কিশোরী বালিকাগণের কাম্য বিনুনীর গোছানির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিল। দশ বছরের একটি বালিকা তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিল। তাহার অপরূপ সুন্দর মুখশ্রীতে বয়স্কা রমণীর মুখের আদল খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নয়। বালিকা যেরূপ ব্যাকুলভাবে তাহার মায়ের শিল্পনির্ম্মাণ কার্য্য দেখিতেছিল তাহাতে বোধ হয় যে তাহারই উন্মত্ত কেশপাশকে বন্ধনদশায় দেখিবার জন্যই তাহার মাতার এই মধুর পরিশ্রম। ইহাদের নিকট হইতে একটু দূরে বিনম্রভাবে আর একটি স্ত্রীলোক উপবিষ্ট ছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়াছে, মনে কোনও গভীর দুঃখ বাসা করিয়াছে। এই রমণী কে সহৃদয় পাঠককে নিশ্চয়ই তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সুকোর মা, শাশুড়ী-জগতে তাহার স্থান যে কতখানি উচ্চে তাহার নিজের ভাষাতেই পাঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। সুকোর মা তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। সে দ্বিধাগ্রস্ত মাতঙ্গিনীকে তাহার কর্ত্রীঠাকুরাণী অর্থাৎ মথুর ঘোষের প্রথমা পত্নীর নিকটে হাজির করিয়া দিয়াছে। তিনিই তাঁহার কন্যার নিমিত্ত চুলের গুছি প্রস্তুত করিতেছিলেন।

মথুরের গৃহিণী ও মাতঙ্গিনীতে অত্যন্ত নিম্ন স্বরে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সুকোর মা অদূরে বসিয়া আপনার মনে বকর্ বকর্ করিয়া যাইতেছিল—উভয়ের কাহাকেও সে বাধা দিতে-ছিল না। এই কথোপকথন অথবা বকুনি বিস্তৃত ভাবে পাঠককে শুনাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া ধরিয়া লইতেছি যে তিনি অনুমানে ইহাদের কথাবার্ত্তা কি ধরণের হইবে তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন। কনকের মিথ্যা গল্প হইতে সুকোর মা হতভাগিনী পলাতকা মাতঙ্গিনী সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ আহরণ করিতে পারিয়াছিল তাহার উপর নিজের কল্পনার অনেক খানি রঙ চড়াইয়া, অনেকগুলি ভাল ভাল প্রক্ষিপ্ত বর্ণনা যোগ করিয়া দিয়া তাহার দুরবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্রীঠাকুরাণীকে ওয়াকিবহাল করিয়া দিয়াছে। পরিশেষে নিজের সুখী কন্যার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া বিবাহিত জীবনের সুখ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেও সে ছাড়ে নাই। সহৃদয়া বৃদ্ধা ঠিকই বিচার করিয়া দেখিয়াছিল যে এই সকল অতিরঞ্জন বা প্রক্ষিপ্ত বর্ণনায় তাহার মক্কেলের কোনই ক্ষতি হইবে না, অথচ তাহার নিজের বাক্‌চাতুর্য্য দেখাইবার যথেষ্ট অবকাশ সে পাইবে। এই বৃদ্ধার সম্মুখেই আসল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিবার সাহস মাতঙ্গিনীর হইল না। ভাল মানুষ সুকোর মা যতক্ষণ তাহার সম্বন্ধে গল্প বলিয়া গেল, সে নীরবে বসিয়া শুনিল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনা প্রতিবাদে সুকোর মার প্রায় সকল কথাই মানিয়া গেল। মনে মনে সে ইহা স্থির করিয়া লইল যে যদি প্রয়োজন হয়, যদি তাহাকে অধিক দিন ধরিয়া এই নব-পরিচিতার দয়ার আশ্রয়ে থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনও সময়ে তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেই চলিবে—অবশ্য তাহার স্বামী যে হীনতার মধ্যে ডুবিয়াছেন যতদূর সম্ভব সে সংবাদ গোপন করিয়াই চলিতে হইবে।

মথুরের স্ত্রী যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেন; তাঁহার হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উদারতা, শুদ্ধমাত্র শুষ্ক ভদ্রতা নয়, মাতঙ্গিনীর নিকট ইহা স্পষ্ট করিয়া দিল যে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতেছেন না, নিমন্ত্রণ করিয়া কাছে রাখিতে চাহিতেছেন। অবশ্য মাতঙ্গিনী এই বাড়ীর একজন হইয়া যাইবার পূর্ব্বে আর একটি কাজ করিতে হইবে। মথুর বাবুর অনুমতি এ বিষয়ে আবশ্যক। এই অনুমতি প্রার্থনা করিবার অভিলাষে স্বামীর নিকট একবার এক মিনিট ভিতরে আসিবার অনুরোধ জানাইবার জন্য সুকোর মাকে সদরে পাঠাইলেন। বৃদ্ধা তখনও তাহার কন্যার স্বামী-সৌভাগ্য সম্বন্ধে বক্তৃতায় ক্ষান্তি দেয় নাই। স্বামীকে কি জন্য ডাকিতেছেন তাহা তিনি মাতঙ্গিনীর নিকট ভাঙ্গিলেন না। কয়েক মিনিট পরে তাঁহার স্বামী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তিনি মাথার ঘোমটা টানিয়া দিলেন। মাতঙ্গিনীর আর সেখানে বসিয়া থাকা রীতিবিগর্হিত, সুতরাং সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই গৃহস্বামীর অপলক চোখে পরিচয় ও বিস্ময়ের একটা দৃষ্টি সে যেন দেখিতে পাইল।

[ক্রমশঃ]

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

কাব্য-পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত (দ্বিতীয় সংস্করণ)। প্রকাশক: শ্রীঅভীজিৎকুমার চক্রবর্ত্তী। ১৫৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১।০।

বোধ করি, পোনেরো কুড়ি বছর পূর্ব্বে অজিতকুমারের কাব্য-পরিক্রমার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়—এতদিনে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য ক্ষোভ করিয়া লাভ নাই। কেননা রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনা দূরে থাক রবীন্দ্র-সাহিত্যই, এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি পড়িয়াছেন, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া গদ্যে-পদ্যে, প্রবন্ধে, সমালোচনায়, গানে নাটকে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বন্যা বহাইয়াছেন—ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সমালোচনা কয়জন করিয়াছেন? বিদেশী লিখিত দুই একখানি ইংরেজী বই, এবং নিতান্ত অপটু হস্তে লিখিত খানকয়েক বাংলা বই ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে আর কেহ কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না।—রবীন্দ্র সাহিত্য লইয়া তবু কিছু আলোচনা হইয়াছে—বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মধুসূদনের তাহাও হয় নাই। প্রতিভামাত্রই যে-কোন দেশে আকস্মিক ঘটনা—কিন্তু কোন দেশেই জনসাধারণ ও প্রতিভার মধ্যে পরিচয়ের সূত্র জোগাইবার লোকের অভাব ঘটেনা। ইংলণ্ডে দেখি, শেক্সপিয়ার তো দূরের কথা, জেন অষ্টিন, জর্জ্জ এলিয়ট, এমন কি অ্যান্টনি ট্রোলোপের স্মরণেও একটা কিছু-না-কিছু আজ পর্য্যন্ত লাগিয়াই আছে। জীবিত কেহও বড় বাদ যান না। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিভা নিতান্ত একাকী, তাহার পরিচয় দিবার মত ব্যক্তিও এ দেশে নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত দেশের জনসাধারণের এই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন অজিতকুমার। এবং এ পরিচয় দিবার জন্য যে সকল গুণ প্রয়োজন, পাণ্ডিত্য, রসবোধ, পরিশ্রমের শক্তি—সমস্তই তাঁহার ছিল। অল্প বয়সে মারা না গেলে তিনি বাংলার সমালোচনা-সাহিত্যকে অনেক কিছু দিয়া যাইতে পারিতেন।

বর্ত্তমান পুস্তকে, রাজা, জীবনদেবতা, ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ধর্ম্মসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য—রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি পুস্তক লইয়া আলোচনা আছে। সকল প্রবন্ধের মতামতের সহিত আধুনিক বাঙালী পাঠক একমত না হইতে পারেন—কিন্তু প্রত্যেকেই এগুলি পড়িয়া লাভবান হইবেন, এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায়।

মাটির মেয়ে—উপন্যাস। শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীগৌরগোপাল মণ্ডল, ৪৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বইখানির প্রথমাংশ লেখকের সম্পর্কে যে আশার সৃষ্টি করে, শেষাংশ সে আশার গলা টিপিয়া মারিয়া ক্ষান্ত হয়। কাঁসারিপাড়ার বাড়ীতে অর্থাৎ লেখক যতক্ষণ স্বাভাবিক গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন ততক্ষণ দেবেন মুদী, তাহার স্ত্রী পটল, অনিল, মণি ও সরমা, সবাই প্রাণ পাইয়াছিল। এখানে-ওখানে মাঝে-মাঝে একটু-আধটু বাধিয়া গেলেও মোটামুটি ভাবে ও অংশটুকুতে লেখকের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই ছিল না। এমন কি সরমার চরিত্রের কুণ্ঠাজড়িত ভাবটি, নবজাত কন্যার সহিত অনুপস্থিত পিতার উদ্দেশ্যে তাহার রসালাপটুকু মনকে আবিষ্টও করিতে সক্ষম হয়। মনে হয় এই সরমাকে লেখক দেখিয়াছেন। এই দেখা চরিত্রের উপর না-দেখার প্রলেপ লাগাইয়া তাহাকে বিধুর সহিত শিমুলতলা পাঠাইয়া লেখক সরমার কেন যে সর্ব্বনাশ করিলেন তাহা বুঝিলাম না। ব'য়ের নায়িকা পটলের মধ্যেও রক্তমাংসের প্রথমটায় পরিচয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু কি কুক্ষণেই যে তাহাকে সিনেমার ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড় করানো হইল—অতঃপর তাহার ছায়া ছাড়া আমরা আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নায়ক অনিল ও উপনায়ক মণি—একেবারে ব্যঙ্গ-চরিত্র। লেখক পুরুষ-চরিত্র অঙ্কনে অপটু। মোটামুটি এ বই সম্বন্ধে হতাশ হইলেও এই বয়েরই স্থানে স্থানে লেখকের যে-পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে লেখক সম্বন্ধে আমরা একেবারে হতাশ হইলাম না।

পরবর্ত্তী কালে তাঁহার লেখা পড়িয়া আমরা খুশী হইতে পারিব, এ ভরসা রাখিতেছি।

সাঁঝের প্রদীপ } শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত।
মন্দিরের চাবি } —দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪-বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ১।০ ও ।০।

দুইটিই কবিতাপুস্তক। কবিকে চিনি না, নামও শুনি নাই, সুতরাং কিঞ্চিৎ অনুকম্পার সহিত পড়িতে সুরু করিলাম। গ্রন্থকারও স্বয়ং এই অনুকম্পার অবকাশ দিয়াছেন। 'সাঁঝের প্রদীপে'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"[কবিতাগুলি] মুকুলে-ফলে—কাঁচায় ডাঁসায় একত্রে বর্ত্তমান। পাকেনি একটীও, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ—সমবেদনার অশ্রুজলে—" ইত্যাদি, কিন্তু পড়িতে পড়িতে চমক লাগিল, চমক ভাঙিলও। লজ্জা অনুভব করিলাম। বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতেছি বলিয়া যে গর্ব্ব ছিল তাহাতে আঘাত লাগিল। কবিকে ইতিপূর্ব্বেই চেনা উচিত ছিল। বই দুটিই ১৩৩৮ সালে ছাপা।

ছন্দে ভাবে ভাষায় কবি শক্তিশালী, দোষ আছে কিন্তু দোষ আছে বলিয়াই ভরসা হয়, পানসে নির্দ্দোষিতার চাইতে তেজী দোষ ভাল। কষ্ট-কল্পনার বালাই কোথায়ও নাই। যাহা বলিতে চান ছিটাগুলির মত অন্তরে আঘাত করে। বুঝিলাম না বলিবার উপায় নাই। স্পষ্ট হইলেও স্বপ্নসৃজনে বাধার সৃষ্টি করে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, বৈষ্ণবসাহিত্যের দ্বারাও তিনি অভিভূত। 'সাঁঝের প্রদীপ' যদি সূত্রপাত হয়, ভরসা করি মোহ একদিন কাটিবে।

তাহার পরিচয় পাইতেছি 'মন্দিরের চাবি'তে। অন্তরের উদ্দাম আবেগে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন, কোনও কৌশলী সাঁতারুর অনুকরণে সন্তরণ কৌশল দেখাইবার অবকাশ এখানে পান নাই।

কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কবির পরিচয় দিতে পারিলে সুখী হইতাম, কিন্তু স্থানাভাব।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দুই খণ্ডে সমাপ্ত। মূল্য প্রতি খণ্ড ১৸৹। ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ইউ, এন, মুখার্জ্জির সহিত আমাদের পরিচয় আছে; হিন্দুসমাজের ইতিহাস স্বনামে ছাপাইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবারে পরিচিত হইলেন। ত্রিশ চল্লিশ বৎসরেরও বেশী হইবে ইনি 'ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি' সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ও এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। 'হিন্দুসমাজের ইতিহাস' প্রবীণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুবর্ষের সাধনার ফল। হিন্দুজাতি ও সমাজ সম্বন্ধে হিন্দু একজন ভাবিয়াছেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু ভাবিয়াছেন বলিলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে অন্যায় বলা হইবে, তিনি হিন্দুর অবনতি দেখিয়া কাঁদিয়াছেন, অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া আশান্বিত হইয়াছেন। এই ক্রন্দন ও আশার দোলায় দোল খাইতে খাইতে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সকল হিন্দুরই অনুধাবনযোগ্য। হিন্দুসমাজের ইতিহাস হিন্দু যেন পড়ে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কতকগুলি থিওরি আছে—সেগুলি সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। এই অল্প পরিসরের মধ্যে সে সম্বন্ধে আলোচনা চলে না। বিস্তৃত প্রবন্ধে ভবিষ্যতে এ সকল বিষয়ে আলোচিত হইবে। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া থিওরীর প্যাঁচে পড়িয়া তিনি সত্যকে বিকৃত করিয়াছেন কি না, ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার অকারণ বিদ্বেষ আছে কি না, এতখানি rational হইলে সমাজের ইতিহাসরচনায় সহানুভূতিহীন হইয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব এবং লোপ শুধু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উপর নির্ভর করে কি না—ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের যথাযথ বিচার করিলে তবেই এই গ্রন্থের সম্যক বিচার হয়।

সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে চিন্তাশীল, তিনি আমাদিগকে তাঁহার কথা শুনাইবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এই মুমূর্ষু জাতির মঙ্গলচিন্তায় তিনি যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে।

বইখানির ছাপাই বাঁধাই চমৎকার।

পল্লীর প্রাণ—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ২৷৹।

যে কারণেই হউক বাঙলাদেশের উপন্যাস-জগতে এমন একটা হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে যাহার প্রকোপে বাঙলাদেশেরই এখানে স্থান হইতেছে না। যে কোনও উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার নাম বদলাইয়া যে কোনও দেশের উপন্যাস বলিয়া চালানো যায়। এক হিসাবে হয়তো ইহা উন্নতি, আমরা বিশ্বজনীন হইয়া উঠিতেছি।

কিন্তু, ইহাতে মন ভরিতেছে কই? কোথায় যেন একটা অভাব, অতৃপ্তি থাকিয়া যাইতেছে, চটকদার ভাষায় লেখা উপন্যাসগুলি কয়েক ঘণ্টার জন্য মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিও—ব্যস, ওই পর্য্যন্ত, আর একখানি উপন্যাসে হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আগের গুলির কথা ভুলিয়া যাইতেছি।

ইহার কারণ দেশের মাটির সহিত আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে, আমরা ডাঁটাহীন পদ্মের মত বিশ্ব সাগরে দোল খাইয়া ফিরিতেছি। এটা সুস্থ অবস্থা নয়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত মহাশয়ের এই উপন্যাসখানি পড়িয়া অনেকদিন পরে মনে হইল, যেন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলাম। শূন্য হইতে মাটিতে পা ঠেকিল; অনেকদিন পরে আবার পল্লীপ্রাণ বাঙলা দেশকে ভাল বাসিলাম। আমারই চারিপাশে যাহারা প্রতিনিয়ত চলে ফেরে, হাসে কাঁদে তাহাদেরকেই কাছে পাইয়া হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। হয়তো এ যুগের উপন্যাসের মাপকাঠিতে ইহা দোষ। হইলেই বা ক্ষতি কি? ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বিচরণ করিতে আর ভাল লাগে না।

পাষাণ-পুরী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। আর্য্য পাব্লিশিং কোং, ২৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা।

পল্লীর সহিত দেশের সহিত, মানুষের সহিত ভাল পরিচয় আছে বলিয়া নূতন যুগের মানুষ হইয়াও তারাশঙ্কর বাবু ধোঁয়া হইতে পারেন নাই। পাষাণ-পুরীতে ইহার অবকাশ ছিল সুপ্রচুর। একটা জেলের কয়েদীদের কাহিনী। দেশকালপাত্রকে অতিক্রম করিয়া খাঁটি আধুনিক বিশ্ব-উপন্যাস রচনা করিতে লেখক পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। পাষাণ-পুরীর জীবেরা রক্তমাংসের জীব, অত্যন্ত চেনা-চেনা। লেখকের সহানুভূতি অসাধারণ, এই জন্য তিনি নির্লিপ্ত হইবার ভাণ করিতে পারিয়াছেন।

বই শেষ হইয়া গেলেও পাষাণপুরীর সুর খানিকক্ষণ মগজের মধ্যে ধোঁয়ার মত পাক খাইতে থাকে, মাথা রিমঝিম করে। পল্লীর একটানা তীব্র সুর—শুধু মনে হয়, কালীর ফাঁসী হইয়া গেল।

ময়ূরপঙ্খী রাজকন্যা—শ্রীহেমদা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। আট আনা।

ছেলেমেয়েদের গল্প, নূতন নয়, নতুন ছাঁচে ঢালা। শিল্পী-লেখক কলমের খোঁচায় ছবি আঁকিয়া গেছেন। গল্প বলার পিছনে তাঁহার একটা উদ্দেশ্য আছে—

'ঘুরে ঘুরে আনতে হবে জীয়ন কাঠিটি—'

এর চাইতে বড় উদ্দেশ্য শিশু-সাহিত্যের গল্প-লেখকের আর হইতে পারে না। আশা করি, লেখক তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় এই কাজই করিবেন। ছবিগুলি ভাল। ছেলেমেয়েদের হাতে বইখানি শোভা পাইবে।

[গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত সচিত্র আরব্য উপন্যাস একখণ্ড আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ছেলেদের সাহিত্য বলিয়া বইখানি বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। আগামী বারে এই আলোচনা প্রকাশিত হইবে।]

ফরিদপুর হিতৈষিণী, বারমাসী—ষাণ্মাসিক পত্রিকা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা। হুমায়ূন কবির সম্পাদিত। মূল্য ॥০।

জেলাগত সাহিত্যসেবার চেষ্টা সম্ভবত এই প্রথম. প্রত্যেক জেলায় এক একটি এইরূপ পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন আছে। ছড়াইয়া পড়া সাহিত্যিকেরা যদি এইভাবে অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে একবার কি দুইবার একই 'কভারের' নীচে আসিয়া আশ্রয় লন তাহা হইলে শুধু যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিবেন তাহাই নহে, অন্য বহুবিধ উপকার ইহার দ্বারা তাঁহারা পাইতে পারেন। যেমন, প্রচারের সুবিধা, কোন্ সাহিত্যিক কোন্ জেলার তাহা জানা আজকাল এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে যে ইচ্ছা থাকিলেও নিজের জেলার কবির কবিতাপুস্তক খরিদ করিয়া উঠিতে পারি না, গল্প-প্রতিযোগিতায় কাহাকে যে ভোট দিব তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হয়। এইরূপ পত্রিকাপ্রকাশের ফলে নিজের জেলার প্রতি তথা দেশের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এবং সহরমুখী মনকে গ্রামমুখী করিবার পথে ইহা সহায়ক হয়। জেলায় জেলায় স্বাস্থ্যকর রেশারেশির ফলে সাহিত্যের ষ্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চতর হয় ইত্যাদি।

এই সংখ্যা বারমাসী দেখিয়া অনেক সাহিত্যিক সম্বন্ধে নূতন খবর জানিতে পারিলাম। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঠাকুরদাদার নিবাস যে ফরিদপুরে ছিল অনেকেই তাহা অবগত নহেন। এই ধরণের আরো অনেক খবর আছে। আমরা এই বারমাসীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৪০

গোড়াতেই শ্রীচিন্তামণি করের একখানি রঙীন চিত্র, নাম দেওয়া হইয়াছে, 'সীতান্বেষণ'। 'রুক্মিণীহরণ' নাম দিলেও আমরা সমান আনন্দ পাইতাম।

প্রথম প্রবন্ধ, 'সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা'—লেখক শ্রীরাজশেখর বসু। তিনি বলিতেছেন, "মোট কথা, চলিত ভাষাই একমাত্র লৈখিক ভাষা হবার যোগ্য, যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধু ভাষার সঙ্গে রফা করা হয়।" "এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না—এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ শব্দ আর সমাসে সাধু ভাষার একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে ' হয়ে উঠল' লিখলে গুরু-চণ্ডাল দোষ হবে না।"

দৃষ্টান্ত দ্বারা মনে হইতেছে লেখক বলিতে চান, যে, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য শুধু ক্রিয়াপদের পার্থক্য। তাহা হইলে তো শুধু চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। ইহাতে লেখার জোর কমে না স্বীকার করিলাম, কিন্তু বাড়ে কি? আমাদের মনে হয়, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য শুধু ক্রিয়াপদেই নয়, অন্য অনেক তফাৎ আছে এবং এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে চলিত ভাষা যেমন উপযোগী, বহু ক্ষেত্রে সাধু ভাষার প্রয়োগও তেমনই অত্যাবশ্যক। দর্শন-বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কথা-সাহিত্যেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, পরশুরাম হইতে এমন সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায় যেখানে চলিত ভাষার প্রয়োগ ব্যর্থ হইত। সাধু ভাষায় যে মাদকতা আনে, সে সকল ক্ষেত্রে চলিত ভাষার সাধ্য নাই সেই নেশা জমাইয়া তুলিতে পারে। ভার বহন করিতে হইলে শক্ত জমির প্রয়োজন, একথাই বা অস্বীকার করা যায় কেমন করিয়া! এই প্রবন্ধে 'চলতি ভাষা' না লিখিয়া 'চলিত ভাষা'ই বা লেখা হইল কেন?

দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, এই সকল স্থলে চলতি ভাষা ব্যবহার করিলে লেখা যে কত দুর্ব্বল হইত ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তন সাধন করিবার চেষ্টা করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। ঠিক উল্টা তরফের সমর্থনেও একপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

১। বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্ত।

"মনে মনে আমি সেইদিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দ মাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া যবন সেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল. নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল. কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল. গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না।"

২। (ক) রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম্ম।

'হে মহা তিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনি, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ. তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড় ভাবে, নিগূঢ় ভাবে অনুভব করিতে চাহি। হে বিরাম বিভাবরীর ঈশ্বরি মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। ঐ দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু জ্যোতিরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে।· আকাশের ঐ যে নক্ষত্র সকল যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়,—··· তোমার অন্ধকার বসনাঞ্চলতলে, তোমার অবনত স্থিরদৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপাননিরত সুপ্ত শিশুর মত নিশ্চল নিস্তব্ধ।"

(খ) রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ।

"ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই গারিবল্‌ডিও হই নাই। আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।"

৩। পরশুরাম, গড্ডলিকা।

"ফাল্গুন মাসের শেষ বেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্য্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিমুল বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দ ঝোপে গোটা কতক পাকা ফল ফট্

করিয়া ফাটিয়া গেল, এক রাশ তুলার আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকশার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা কটকটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটি গুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল এবং শিবুর দিকে ডাব্‌ডেবে চোখ মেলিয়া টিট্‌কারী দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিঁ পোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যত্নে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সঙ্গৎ ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রি-রি-রি-রি করিয়া উঠিল।"

শ্রাবণের প্রবাসীতে একটি নূতন ধরণের স্থান পরিবর্ত্তনের বিজ্ঞাপন দেখিলাম। 'উত্তর ইউরোপের সুরলোক' প্রবন্ধের লেখক শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহের নামের শেষে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে [লেখক পুনরায় সুইডেন গিয়াছেন]--এখন হইতে কাহার বেতন কত তাহাও বোধ হয় লিখিত হইবে।

বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৪০।

বাতায়নে—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী (শিলং), রবীন্দ্রনাথের দ্বিসপ্ততিতম বৎসরটিও তাঁহার যে ক্ষতি করিতে পারে নাই একা শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী তাহাই করিলেন। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাৎনী, তরুণী হওয়াই সম্ভব, তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের সমস্ত তরুণ সম্প্রদায়কে ক্ষ্যাপাইয়া দিয়া ভাল করিলেন না। তরুণ হইলেও তাহারা পুরুষ তো! অপরাজিতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে বলিতেছেন—

জমা আছে কবি তোমার কাছে যে আমাদের মূলধন—
ভাণ্ডারে তব চির-সঞ্চিত নিখিলের যৌবন।

এ কথায় অন্য সকল পুরুষের ক্রুদ্ধ হইবার কারণ আছে। বাঙলার তরুণেরা কি তবে ধারে কারবার চালাইতেছেন?

রবীন্দ্রনাথের এই সাধের নাৎনীটি অন্যত্র যে সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের নাৎনীর উপযুক্ত বটে! এযুগের পক্ষেও এটা 'স্ক্যাণ্ডালাস'।

নিকোলাস রোরিকের ছবি বিচিত্রার এ সংখ্যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বহুকাল বাংলা মাসিক সাহিত্যে একসঙ্গে এতগুলি ভাল চিত্রের সমাবেশ হয় নাই।

সম্পাদকীয়

পরলোকে যতীন্দ্রমোহন

"২২শে জুলাই রাঁচীতে রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত পরলোক গমন করিয়াছেন"—

২৩শে জুলাই-এর সকাল বেলা যখন এই সংবাদ বাংলা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল—তখন সহসা বাঙালীর মনে আট বছর আগেকার ঠিক এমনিতর আর একদিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—হিম-শৈলে অকস্মাৎ দেশবন্ধুর তিরোধান! সেদিন মৃত্যু তাহার অকস্মাৎ আবির্ভাবে মন্থর-গতি, শতধাভিন্ন এই জাতিকে সহসা একদিনের জন্য প্রবুদ্ধ সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আজও চোখের সম্মুখে সেই মহাদৃশ্য জাগিতেছে। সংশয়ে, দ্বিধায়, ভয়ে যাহারা আজও মিলে না—একদিনের জন্য তাহাদের সকলের একত্র মিলন! বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন স্বার্থের লক্ষ লক্ষ লোক একদিনের জন্য এক পথে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইল। ভাঙ্গিয়া-যাওয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা জাতি মৃত্যুর রসায়নে সেদিন একবার সমগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সেদিনকার সেই বিরাট জনতার পুরোভাগে, সেই একত্রীভূত বাঙালীর স্বতঃনির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরূপে যতীন্দ্রমোহন দাঁড়াইয়াছিলেন—দীর্ঘকায়, ঋজু, আত্ম-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, কি নিঃসঙ্কোচ ভঙ্গী! জনতার ঊর্দ্ধে তাঁহার উন্নত শিরে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য তপ্ত-কিরণের ত্রিপুণ্ডক আঁকিয়া দিয়াছে!

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে সেদিন যে-জনতা একত্রীভূত হইয়াছিল, তাঁহার চিতা-ভস্ম হিম হইতে না হইতে সে-জনতা আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জাতির ঐক্য-বিধানের দায়িত্ব পরম উদারতার সহিত সমর্পণ করিয়া, প্রতিদিনের হিসাবনিকাশ-সুখ-সুবিধার মধ্যে শামুকের মত সেদিনকার জনতা আত্ম-গোপন করিল। কিন্তু সেদিন সেই জনতার সম্মুখে যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন—তিনি আর ফিরিলেন না। সকলের হইয়া একা দুঃসহ অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলিবার ভার তিনি গ্রহণ করিলেন এবং মৃত্যু আসিয়া সে-ভার হইতে তাঁহাকে এইভাবে সহসা মুক্ত না করা পর্য্যন্ত তিনি অবিচলিত ভাবে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সে দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধুর পরিত্যক্ত নায়কত্বের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্যতা বাঙালীর মধ্যে তাঁহারই ছিল

এবং কোনও দিন কোনও ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য তিনি সে দায়িত্বপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। আপনার চরিত্রমাধুর্য্যে এবং কর্ম্মনিষ্ঠার বলে যতীন্দ্রমোহন ধীরে ধীরে বাঙালীর অন্তরে কতখানি স্থান করিয়াছিলেন, বাঙালী তাহা জানিত না। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আট বৎসর আগে যাহা ঘটিয়াছিল, যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে সকলে আবার সেই দৃশ্য দেখিল—শামুকের খোল ত্যাগ করিয়া আবার একদিনের জন্য

বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তিনি বন্দী-জীবন যাপন করিতেছিলেন। যখন শেষ-বার তিনি কারারুদ্ধ হন তখন তাঁহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ ছিল।

সেই অবস্থায় বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্কন্ধে যে-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—হয়ত তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। শুধু যতীন্দ্রমোহনের এই অকাল মৃত্যুতে

অন্তিম শয়ানে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

সকলে একত্র আসিয়া দাঁড়াইল। এবং সেদিনকার জনতায় লক্ষ্য করিয়াছি—সেই আট বৎসর আগেকার এই পথে এমনি শোভাযাত্রার স্মৃতি সকলের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। একজনের অভাব সেদিন প্রত্যেক বাঙালীর বুকে দুইজনের অভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এবং সেই সঙ্গে আর একটি অভাব বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দেশবন্ধুর পরিত্যক্ত পতাকা যতীন্দ্রমোহন তুলিয়া ধরিয়াছিলেন—যতীন্দ্রমোহনের পরিত্যক্ত পতাকা বাঙালীর মধ্যে আজ কে তুলিয়া ধরিবে?

নয়, রাজবন্দীদের মধ্যে ভয়াবহ কালব্যাধির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে এই কথা লোকের মনে জাগরূক হওয়া অসম্ভব নয়।

মৃতের অমর্য্যাদা না আত্ম-অমর্য্যাদা?

যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তাঁহার স্মৃতির সম্মান উপলক্ষে প্রস্তাব করা হয়, তখন য়ুরোপীয় কাউন্সিলরগণ সেই সভা হইতে উঠিয়া যান। এই কার্য্যের দ্বারা সেই সব য়ুরোপীয় কাউন্সিলর

নিজেদের অসভ্য প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে-জাতির লোক সেই জাতিকেই অসম্মান করিয়াছেন।

প্রস্তিতের রাজনৈতিক মতামতের সহিত তাঁহাদের কোনও সহানুভূতি নাই ইহা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা অনায়াসে সেই সভায় থাকিতে পারিতেন। আর যাঁহার স্মৃতির সম্মান উপলক্ষ্যে এই প্রস্তাব আনা হয়— তিনি একবার নয়, দুইবার নয়, পাঁচবার সেই কাউন্সিলরমণ্ডলীর সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি

যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শবযাত্রা।

ছিলেন। মাত্র রাজনৈতিক কারণে জীবনে যাঁহাদের সহিত মিলিত না হইতে পারা যায়, তাঁহারা যদি এমন উচ্চ আদর্শের লোক হন যে, চরিত্রগুণে তাঁহারা জগতের যে কোনও দেশের শ্রদ্ধার পাত্র—তাঁহার শোক-সভায় উপস্থিত হইয়া উঠিয়া যাওয়ার মত বর্ব্বরতা কোনও সভ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের হইতে পারে না—ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

যতীন্দ্রমোহন কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন কিন্তু সেখানেও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য ইহাতে যে-মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন, তাঁহার কিছু যায় আসে না কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া যে মনস্তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, তাহা স্পষ্টই বুঝাইয়া দেয়, আমরা কোথায় আছি।

স্বর্গীয় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী

বিগত ১৪ই জুলাই তারিখে পাবনা সহরে নিজগৃহে ৭৭ বৎসর বয়সে রায় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। যে সকল পবিত্রচেতা, শুভ্র, তেজস্বী পুরুষদের দেখিয়া প্রাচীনকালের আশ্রমবাসী তপস্বীদের কথা মনে হয়, তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে, চৌধুরী মহাশয় ইহাঁদের অন্যতম ছিলেন।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, অত বয়সেও অমন সুন্দরকান্তি দীপ্তিময় মানুষ কম দেখিয়াছি। তিনি নিয়মিত প্রাণায়াম করিতেন এবং এই কারণেই বার্দ্ধক্য তাঁহাকে কাবু করিতে পারে নাই। জীবনের পথে তিনি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সূত্র মানিয়া চলিতেন, কখনও তাহার

একচুল ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি সোজা হইয়া চলিতে ভালবাসিতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সোজাই ছিলেন।
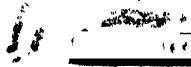
স্বর্গীয় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী।

তাঁহার মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গ একজন দিক্‌পাল হারাইল। তিনি ১৮৫৭ সালে পাবনা জেলায় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মলাভ করেন। ৪০ বৎসরের উর্দ্ধকাল প্রশংসার সহিত সরকারী উকীলের কার্য্য করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের একটি বাংলা অনুবাদসহ "গায়ত্রী" নামক একখানি পুস্তক এবং Evidence of Accomplices এবং Prosecution in False Cases নামক দুইখানি আইন পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্যর রাধাকান্ত দেব মেমোরিয়াল পদক প্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বি-এ পাশ করিবার পর কিছুকাল তিনি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী ছিলেন এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি আইনজীবী ছিলেন, কিন্তু সমস্ত মনঃ প্রাণ সাহিত্যসাধনায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সরস ব্যঙ্গ গল্পরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তাঁহারই ঐকান্তিক উৎসাহে পাবনার দুর্গাদাস টোল এখনও চলিতেছে, সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পাবনায় তাঁহার গৃহে বাংলা দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং জ্ঞানী গুণীদের প্রায়ই শুভাগমন হইত। নিজের গ্রামে তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে জ্ঞানী, মহানুভব এবং দাতা ছিলেন। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি যে সময়ে পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সেই সময়ে পাবনা শহরের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি হইল।

ভারতীয় শিল্পকলায়তন

ভারতীয় চিত্রকলা বলিয়া বর্ত্তমানে দেশে যে-শিল্প-পদ্ধতি পরিচিত হইয়াছে, বয়স তাহার বেশী নয়—বড় জোর চল্লিশ হইবে। এই শিল্প পদ্ধতির সহিত হ্যাভেল সাহেবের নাম চিরবিজড়িত, তাঁহারই অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। অবনীন্দ্রনাথই ইহার জন্মদাতা। মোটামুটিভাবে ইহা প্রাচীন ভারতের—হিন্দু, রাজপুত, মুঘল ও বৌদ্ধ যুগের রীতিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া পুনর্প্রতিষ্ঠা করিলেও ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয় নয়। পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতিও ইহার খোরাক জোগাইয়াছে। এক দিক দিয়া ইহা পুরাতনের উদ্ধারকর্ত্তা হইলেও নব্য-ভারতশিল্পের প্রথম রেখাপাতও ইহারই। এবং দেশে শিল্পবিষয়ে পুনর্জাগৃতির মূলে ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলনে অগ্রণী বাংলার মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী। বহু নিন্দার ভাগী হইয়াও মাত্র চল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে এই আন্দোলন যে-প্রগতি লাভ করিয়াছে তাহা যে কোন দেশের শিল্পেতিহাসে গৌরবময় হইয়া থাকিত। কিন্তু তবু অপরাপর সভ্য দেশের তুলনায় বর্ত্তমান ভারতের শিল্পকে বর্ব্বরযুগোচিত বলিলে অন্যায় হয় না। অশিক্ষিতদের কথা নাই তুলিলাম, এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণ আজও শিল্পকলা সম্পর্কে একেবারে নিরুৎসাহী। এ বিষয়ে ইহাদের অজ্ঞতা অসাধারণ। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে,

প্রকাশ্যভাবে, জনসাধারণের সামগ্রী করিয়া দেশের শিল্পচর্চ্চাকে কোনদিন দেখা হয় নাই—গুহাবাসীর মত কয়েকজন তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটতম সাঙ্গোপাঙ্গ ছাড়া সে-তপস্যার মূল্য কেহ বুঝে নাই। মাঝে মাঝে দু'একখানি পত্রিকা তাঁহাদের সেই তপস্যার পরিচয় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহা দেশকে নাড়া দেয় নাই।

ইউরোপ কি আমেরিকার জনসাধারণ এ বিষয়ে আমাদের মত এত উদাসীন নয়—সেখানে প্রত্যেক শহরে আর্ট গ্যালারি আছে। সেই সব গ্যালারিতে দেশী বিদেশী বহু শিল্প-কলার প্রখ্যাত অবাদানসমূহ সজ্জিত থাকে। অবসরযাপনের নিমিত্ত দেশবাসীরা সেগুলি দেখিতে গিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসে। আমাদের দেশে এই ধরণের আর্ট গ্যালারির প্রয়োজন বহুপূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল। গত ৩০শে শ্রাবণ কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে স্যর রাজেন্দ্রের সভাপতিত্বে এই প্রয়োজনসিদ্ধিকল্পে একটি সভা হয়। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এই সভার উদ্বোধনে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার সারগর্ভ। শিল্প-ছাত্রদের দিক হইতেই তিনি এ কাজের মূল্য বিচার করিয়াছেন। আমরা জনসাধারণের দিক দিয়া ইহার বিচার করিলাম। প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে Indian Academy of Fine Arts, ভারতীয় শিল্প-কলায়তন। ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যোগী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ইহার সভাপতি, শ্রীযুক্ত আবদুল আলি চেয়ারম্যান, মিঃ ভ্যান ম্যানেন ও শ্রীযুক্ত অতুল বসু যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিশিষ্ট ও কৃতী উদ্যোগীদের কর্ম্মশক্তি শীঘ্রই এ প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে আমরা ইহা বিশ্বাস করি।

আইন অমান্য আন্দোলন ও কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি না পাওয়ায়, ২২শে জুলাই কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ আনে ঘোষণা করেন,—

টেক্স-বন্ধ ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনসহ ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখা হইবে। তবে যাঁহারা ব্যক্তিগত দায়িত্বে সকল নির্য্যাতনকে বরণ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন চালাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে সেই ক্ষমতা দেওয়ার অধিকার থাকিবে। যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইতে চাহেন তাঁহারা কংগ্রেসের নিকট হইতে সাহায্যের আশা না করিয়া নিজ দায়িত্বে আন্দোলন করিতে পারিবেন।

মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্ম-পদ্ধতি

মিঃ আনের বিবৃতিপ্রকাশের পর মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেই বিবৃতিতে তিনি সবরমতী আশ্রম ভাঙ্গিয়া দিবার বাসনা জানান এবং স্বতন্ত্রভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন। উক্ত বিবৃতির কোন কোন অংশ আপত্তিজনক মনে করায়, তাহা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই বিবৃতির প্রকাশিত অংশে আইন-অমান্য-আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন,—

"আমার মতে বর্ত্তমান অবস্থায় যদি আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয় তবে উহা মারাত্মক হইবে।"

"যাহারা নৈরাশ্য এবং দুর্ব্বলতা হেতু আইন অমান্য বন্ধ করিয়াছে, যদি একজনও আইন অমান্য করে তবে আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।"

"ব্যাপক আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কারণ এই তথাকথিত ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদিত অর্ডিন্যান্স শাসনের আমলে যে নির্য্যাতন চলিতেছে, জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরিয়া এই নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারিতেছে না ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই জন্যই আইন অমান্য আন্দোলন ব্যষ্টির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে ও তাঁহাদিগকে নিজ দায়িত্বে কংগ্রেসের নামে কাজ করিতে হইবে। যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহারা কংগ্রেসের নিকট হইতে আর্থিক বা অন্য সাহায্যের আশা করিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় কারাবরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কারাভোগের কাল উত্তীর্ণ না হইলে বা দেশবাসী তাঁহাদিগকে বাহির করিতে সক্ষম না হইলে তাঁহারা জেল হইতে আসিতে পারিবেন না। কারাকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁহারা প্রথম সুযোগেই জেলে ফিরিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদিগকে দরিদ্রতা ও অন্যান্য সকল বিপদকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁহাদিগের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হারাইবার কারণ থাকিবে অথবা লাঠির আঘাত-জাতীয় অন্যান্য শারীরিক নির্য্যাতন ভোগ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

বোম্বাই সরকারের নিকট মহাত্মাজীর পত্র

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নবতম কর্ম্ম-পদ্ধতির প্রারম্ভে বোম্বাই সেক্রেটারীকে যে পত্র লিখেন, আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে তাহার সারাংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম,—

আমেদাবাদ, ২৬শে জুলাই

প্রিয় মহাশয়,—

১৯১৫ সালে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া আমার সর্ব্বপ্রথম গঠনমূলক কার্য্য হইল সত্যের সেবার জন্ম একটা সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। আশ্রমবাসীদিগকে সত্য, অহিংসা, কৌমার্য্য, রসনাসংযম, দারিদ্র্য, নির্ভীকতা, অস্পৃশ্যতা, খাদিকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশী ব্রতাবলম্বন. সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমশ্রদ্ধা-বুদ্ধি, শ্রমার্জ্জিত অন্নগ্রহণের শপথ গ্রহণ করিতে হয়। আশ্রমের বর্ত্তমান জমি ১৯১৬ সালে ক্রয় করা হয়। আশ্রমে বর্ত্তমানে ১০৭ জন অধিবাসী (৪২ জন পুরুষ, ৩১ জন নারী, ১২ জন বালক, ২২ জন বালিকা) আছেন। যাঁহারা কারাগারে আছেন কিংবা যাঁহারা অন্য কাজে আশ্রমের বাহিরে নিযুক্ত আছেন এই হিসাবে তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই আশ্রম হইতে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তিকে খাদি উৎপাদনের কার্য্যে শিক্ষিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, আমার যতদূর জানা আছে, প্রয়োজনীয় গঠনমূলক কার্য্য করিতেছেন এবং সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। আশ্রমটি একটি রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রাষ্ট এবং এই আশ্রম হইতে যে টাকা ব্যয়িত হয়, তাহার বরাদ্দ বাঁধিয়া দেওয়া আছে। আশ্রমের অনুমান ৩,৬০,০০০৲ অধিক টাকার স্থাবর সম্পত্তি এবং নগদ টাকা সমেত অনুমান ৩,০০,০০০ টাকার অধিক অস্থাবর সম্পত্তি আছে।

আশ্রমের পক্ষে এখন বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র কারাবরণে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি না। শান্তিপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে কংগ্রেস আমার মারফতে আন্তরিকভাবে যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক তাহা অগ্রাহ্য করায় ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট শান্তি চাহেন না অথবা উহা ইচ্ছা করেন না। আশ্রমের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি এবং আশ্রমের অন্যান্য অনেক সদস্য অষ্টাদশ বর্ষাকাল ব্যাপিয়া অপরিমিত ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিয়াছি। ইহা আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, আমার যেসব প্রিয় বস্তু ত্যাগ করিবার আছে তন্মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই আশ্রমের প্রত্যেকটি গো, মহিষ এবং প্রত্যেকটি বৃক্ষের ইতিহাস আছে এবং প্রত্যেকের সহিত পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। ইহারা সকলেই একটি বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।—

* * * *

[অতঃপর মহাত্মা গান্ধী আশ্রমের সম্পত্তি যাহাতে জনহিতকর কার্য্যে লাগে, তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন]

* * তারপর, বাকী থাকিল, জমি, বাড়ীঘর এবং শস্যাদি। আমার মত এই যে, গবর্ণমেণ্ট ঐগুলির ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের যেমন খুসী সেগুলির তদ্রূপ ব্যবস্থা করুন। বন্ধুদের হস্তেও আমি ঐগুলি সানন্দে প্রদান করিতাম, কিন্তু ঐগুলির জন্য প্রাপ্য খাজনা তাঁহারা দিবেন, আমি ইহার অংশভাগী হইতে পারি না।

যদি কোন কারণে গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত সম্পত্তি দখল করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলেও আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার মেয়াদ শেষ হইলে অর্থাৎ ৩১শে জুলায়ের পর আশ্রমের অধিবাসীরা উহা খালি করিয়া দিবেন।

ইতি—

ভবদীয় বিশ্বস্ত

এম. কে. গান্ধী

৩১শে জুলাই-এর রাত্রি-শেষে

৩১শে জুলাই আশ্রম ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী আমেদাবাদে শেঠ রণছোড়লালের বাংলোতে গমন করেন। রাত্রি-শেষে ৩২ জন অনুচরসহ রাসগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু রাত্রি ২॥০ ঘটিকার সময় ৩২জন অনুচর সহ অর্ডিন্যান্স আইনের ৩ ধারা অনুসারে গ্রেফ্‌তার হন। গ্রেফ্‌তারের পর তাঁহাদিগকে সবরমতী সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

৪ঠা আগষ্ট প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধী এবং মহাদেব দেশাইকে সহসা মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি-পত্রে তাঁহাদিগকে জেলের সীমানা ছাড়িয়া যাইতে এবং পুণা ত্যাগ না করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে নির্দ্দেশ না মানায় তাঁহারা পুনরায় গ্রেফ্‌তার হন। জেলের মধ্যে তাঁহাদের দুইজনের বিচার হয় এবং বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ১ বৎসর করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আপীলের রায়

সুদীর্ঘ ৪ বৎসর কাল পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে পুনর্ব্বিচারের ফলে এই ঐতিহাসিক মামলার যবনিকাপাত হইল। এত দীর্ঘকালব্যাপী বিরাট মামলা কোন সভ্য দেশের আদালতে হইয়াছে কি না সন্দেহ। অভিজ্ঞ লোকেরা অনুমান করেন যে এই মামলায় সরকার পক্ষের প্রায় ৫০।৬০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। ৪ বৎসর কাল ধরিয়া বন্দীরা কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। ৪ বৎসর কাল হাজৎ বাস করিবার পর এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারে ৯জন নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইয়াছেন। নিরপরাধ ব্যক্তির এই দীর্ঘ ৪ বৎসরের কারাযন্ত্রণার জন্য দায়ী কে? আপীলে নিম্ন আদালতের দণ্ডিত আসামীগণের প্রত্যেকের দণ্ড হ্রাস হইয়াছে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত মুজাফর

আহ্‌মদের দণ্ড ৩ বৎসরে হ্রাস হইয়াছে। বিলাতের শ্রমিক দলের মুখপত্র ডেলী হেরাল্ড এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বিচারকার্য্যঘটিত যত কলঙ্ক এ যাবৎ ঘটিয়াছে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আপীলের রায়ে তাহার মধ্যে বৃহত্তম কলঙ্ক অপনীত হইল। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে—এই কলঙ্ক নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।" প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিয়া অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টা হইতেছে। যে-সমস্ত আসামী এক বা দুই বৎসরের অনধিক কালের জন্য দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষ হইতে খেসারৎ আদায় করিবার জন্যও বিলাতের শ্রেষ্ঠতম ব্যবহার-জীবদের পরামর্শ লওয়া হইতেছে।

বেলডাঙ্গার বর্ব্বরতা সম্বন্ধে দায়ী কে?

বেলডাঙ্গা এবং তাহার আশেপাশের ৩৩ খানি গ্রামে, খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিনেরই ভাষায় যে "নৃশংস অত্যাচার" হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোনও সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া কোনও লাভ নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিনের মত শিক্ষিত এবং দায়িত্বসম্পন্ন লোক যে ভাবে এই ব্যাপারকে অতি নৃশংস জানিয়াও স্বীয় সম্প্রদায়ের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতীব শোচনীয় এবং হাস্যকর। তিনি স্বয়ং একদিকে বলিতেছেন, "ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মুসলমানেরা গৃহদাহ লুণ্ঠন প্রভৃতি অতি নৃশংস কাজ করিয়াছিল। যতই উত্তেজনার কারণ থাক, এরূপ অপরাধ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।" কিছুক্ষণ পরেই আবার তিনিই বলিতেছেন, "এই দাঙ্গার জন্য প্রকৃত পক্ষে তাহারাই দায়ী যাহারা নিরক্ষর মুসলমানদিগকে এই নৃশংসতায় উত্তেজিত করিয়াছিল।"

কিন্তু "এত দূর নৃশংসতায়" উত্তেজিত করিবার জন্য সেখানকার কয়েকজন হিন্দু এমন কি ভীষণ অন্যায় করিয়াছিলেন? খাঁ বাহাদুর তাঁহার বিবৃতিতেই বলিতেছেন,—

২৯শে জুন, ১৯৩৩ তারিখে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে চুক্তি হয় রথযাত্রা এবং উল্টারথের দিনে,—হিন্দুরা তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল বটে, কেননা, তাহারা মন্দির অতিক্রম করিয়া মিছিল নেয় নাই; কিন্তু কার্য্যতঃ চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণ তাহারা করিয়াছিল। কেননা, তাহারা মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া জোরে জোরে ও বিরক্তিকর ভাবে বাজনা বাজাইয়াছিল॥

এই রকম অকাট্য হাস্যকর যুক্তির সমাবেশ আর কি হইতে পারে? মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো ব্যাপার লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষেত্রে পুলিশ-নির্দ্দিষ্ট সীমারেখাও অতিক্রম করা হয় নাই, তবুও আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মুসলমান নেতাদের যেখানে উচিত ইসলামের গৌরবকে তাহাদের স্বজাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া এই সমস্ত নৃশংসতার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণ বর্দ্ধন করা—সেখানে তাঁহারা আজও কুণ্ঠিত ভাষায় স্বপক্ষ সমর্থনের ব্যর্থ চেষ্টাই করিতেছেন। কারণ যাহাই হউক—কোন ধর্ম্ম এই নৃশংসতা সমর্থন করিতে পারে না—ইহা ইসলাম ধর্ম্ম না জানিয়াও যে-কেহ বলিতে পারে। মহরমের সময় বাজে বলিয়া মুসলমানের কাড়ানাকাড়ায় কি হিন্দুর ঢাক হইতে কম আওয়াজ বাহির হয়? হিন্দুর ঢাকের কাঠিতে সংস্কৃত ভাষায় শব্দ উঠেনা—মুসলমানের ঢাকের কাঠিতেও আরবীতে শব্দ বাহির হয় না। এবং ভারতবর্ষেই শুধু মুসলমান নাই—জগতের বহু জায়গা—যেখানে মসজিদের সামনে সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি নানা অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে হোটেলের বাদ্যযন্ত্র বাজে—সেখানেও মুসলমান আছে—তাহাদেরও জন্য হজরৎ মোহাম্মদ ঐশী বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন।

মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল

কর্পোরেশনের সভায় কর্পোরেশন মিউনিশিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ঐ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শাসমল কর্ত্তৃক সংশোধিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রস্তাবটি ৩৮—২৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটিতে এই অভিমত জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন বিল 'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক'। প্রস্তাবটিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, "জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, রাজনীতিক কারণই সরকারকে এই বিল উত্থাপনে প্ররোচিত করিয়াছে, কাজেই এই বিলটি পরিত্যাগ করাই গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।" কর্পোরেশনের এই যুক্তির সারবত্তা সরকারকে বুঝাইয়া দিবার জন্য কর্পোরেশনের

প্রতিনিধিগণ ও সরকারের পক্ষের প্রতিনিধিগণের মধ্যে সরাসরি একটা আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থাও প্রস্তাবটিতে চাওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান আইনে কর্পোরেশনের উপর গভর্ণমেন্টের যে কর্তৃত্ব আছে তাহা কম নহে। কর্পোরেশনঘটিত অনাচার সেই আইনবলে রোধ করা গভর্ণমেন্টের দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা এবং বর্ত্তমান দুর্বল, অতি দুর্ব্বল ব্যবস্থাপক সভার সুবিধা লইয়া নাগরিক-জীবনের এই উপার্জ্জিত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিল উপস্থাপিত করা হইতেছে—এই কথা যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহাদের আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই।

দাস-প্রথা-উচ্ছেদের শত-বার্ষিকী

মহামতি উইল্‌বারফোর্সের চেষ্টায় ১৮৩৩ সালের ২৯শে জুলাই ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্টে দাস ব্যবসায় রহিত করিবার আইন পাশ হয় এবং ঐ দিনই উইল্‌বারফোর্স পরলোক গমন করেন। এই স্মরণীয় ঘটনাদ্বয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের হাল্ শহরে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত আয়োজনে মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বাণী পাঠাইয়াছেন,—

"যাঁহাদের চেষ্টায় দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে তাঁহাদের নিকট আমাদের যথেষ্ট শিক্ষার আছে। কারণ আমাদের দেশের দাসত্বপ্রথা তথাকথিত শাস্ত্রানুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহা পাশ্চাত্য দাসপ্রথা অপেক্ষা বিষময়।"

কিন্তু আমাদের মনে হয় উইল্‌বারফোর্সের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতদাস প্রথা জগতে এখনও উচ্ছিন্ন হয় নাই—রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া আজও দেশে দেশে তাহা রহিয়াছে। শুধু পণ্যশুল্কের এবং নির্য্যাতনের রূপ এবং ধারা বদলাইয়াছে।

ভারতীয় স্থাপত্য-পরিষদ স্থাপনে প্রয়াস

সমগ্র ভারতের জন্য একটি ভারতীয় স্থাপত্য-পরিষদ স্থাপনের নিমিত্ত প্রথিতযশ স্থপতি-শিল্পী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ মুঞ্জে, স্যর সি, ভি, রমণ, স্যর রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতেছেন। শ্রীশচন্দ্র বাঙ্গালী, ভারতীয় স্থাপত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়া বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন। স্থাপত্য সম্পর্কে প্রাচীন পরিকল্পনাসমূহে তাঁহার নিপুণতা অপূর্ব্ব। অদ্ভুত দক্ষতার সহিত তিনি তাঁহার মৌলিক বিশেষত্বের সংযোজনা করিয়াছেন। বহু বৎসর পরিশ্রমের পর, অসীম বাধা, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। এখন কেবল মাত্র স্বদেশ নয়, বাহিরেও তাঁহার গৌরবের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বুডাপেষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থপতি মিঃ ষ্টিফেন ডি, সেরেপি তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি কৃতী হইয়াও কর্ম্মী।

আমরা তাঁহার স্থাপত্য-পরিষদ স্থাপন-কার্য্যের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহক

১। বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৸০ টাকা। ষাণ্মাসিক ২।৵০ আনা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী c/o মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। মাঘ হইতে বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। প্রতি বাংলা মাসের পয়লা তারিখে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ৮ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

৪। জমা-চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ করা হয়। মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনি অর্ডার কুপনে অথবা আদেশপত্রে নূতন কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ চাঁদা পাঠাইবার সময় তাহাদের গ্রাহক সংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। না লিখিলে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পত্র লিখিবার সময়ও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ কথা মনে রাখিবেন।

প্রবন্ধ

৬। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৭। লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

বিজ্ঞাপন

৮। বাংলা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কাষ করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার। বিজ্ঞাপনের হার নীচে দেওয়া হইল।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫৲, ৮৲, ৪॥০।
বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনি কি ভোজনে তৃপ্তি পান ?

তীব্র ক্ষুধা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ কিন্তু অজীর্ণতা রোগগ্রস্তের পক্ষে ইহা পরিহাস মাত্র।

অগ্নিমান্দ্য হইলেই বুঝিতে হইবে যে আপনার শরীরে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং তাহারই জন্য আপনি জীবনের এক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনার **পুষ্টিকারক ঔষধ** সেবন করা আবশ্যক।

উত্তমরূপে আহার করিয়া যদি পরে **অজীর্ণতায় কষ্ট পান,** অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়।

সন্তোষজনক বা অল্প আহারের পর **কোষ্ঠকাঠিন্য অনুভব করিলে,** মৃদুবিরেচক ঔষধ সেবনীয়।

ষ্টার্ণসের পরিপাচক ও পুষ্টি-কারক বটিকা এই তিনটি অভাবই পূরণ করে। **রক্ত, স্নায়ু, পরিপাক শক্তি** এবং অন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করিয়া পুরুষ ও নারী উভয়েরই **দৈহিক ক্ষমতা** ও প্রজননশক্তি আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি করে।

সকল কাজেই হ'বে সুখভোগ।
প্রমোদেও হ'বে পূর্ণ উপভোগ॥

STEARNS'
DIGESTIVE & TONIC TABLETS
Remedial, Restorative, Rejuvenating

উচ্চ দরের সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

ওরিয়েণ্টাল

গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

১৮৭৪ সনে ভারতবর্ষে স্থাপিত।

হেড অফিস—বোম্বাই।

১৯৩২-এর কাজের হিসাব

নূতন কাজ ঃ ২৯,৯৮২ খানি পলিসিতে **৫** কোটি **৯৪** লক্ষ টাকার বীমা। আলোচ্য বৎসরে ৩৮১৬টী পলিসির জন্য **৮-৫** লক্ষ টাকার দাবী মিটান হইয়াছে।

মজুদ্ তহবিলে বাড়িয়া প্রায় **১২॥০** কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছে।

চলতি বীমার পরিমাণ : **২০,৭৫৩১** খানি পলিসিতে বোনাস্‌সহ প্রায় **৪৪** কোটি টাকা।

ব্যয়ের অনুপাত—চাঁদার আয়ের মাত্র শতকরা **২১** ভাগ।

আগামী লভ্যাংশ-বণ্টনের তারিখ ১৯৩৩এর ৩১ ডিসেম্বর।

যাঁহারা এই বৎসরের মধ্যে স-লাভ বীমা করিবেন, তাঁহাদের পলিসি যদি বর্ষশেষে চল্‌তি থাকে তবে তাঁহারা আগামী বিতরণের অংশ পাইবেন।

অপরাপর সংবাদের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন :—

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী,

ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কিম্বা কোম্পানীর নিম্নলিখিত যে-কোন শাখা-অফিসে—

আগ্রা	বেজওয়াদা	করাচী	মোম্বাসা	রেঙ্গুন
আজমীর	ভূপাল	কুয়ালালামপুর	নাগপুর	রাওয়ালপিণ্ডি
আমেদাবাদ	কলম্বো	লাহোর	পাটনা	সিঙ্গাপুর
এলাহাবাদ	ঢাকা	লক্ষ্ণৌ	পুণা	সুক্কুর
আম্বালা	দিল্লী	মাদ্রাজ	রায়পুর	ত্রিচিনপল্লী
বাঙ্গালোর	গৌহাটি	মান্দালয়	রাজসাহী	ত্রিবান্দ্রম্
বেরিলি	জলগাঁও	মার্কারা	রাঁচী	ভিজাগাপট্টম্

মদন মঞ্জরী

শক্তি ও সামর্থ্যের আধার—১৲

রমণ-বিলাসিণী

স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের খনি—১৲

অনঙ্গপ্রভা ইয়াকুতি

মৃত প্রায়কে পুনর্জ্জীবন দান করে। প্রথম দাগ ঔষধেই ফল পাওয়া যায়। ত্রিশ বটিকার মূল্য—১০৲ টাকা।

নপুংসকত্বারি ঘৃত

দুর্ব্বল স্নায়ুকে সবল করে। ১৬ বটিকার মূল্য—১৲ টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মদনমঞ্জরী ফার্ম্মেসী

১৭৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুষ্ঠ ও ধবল

রোগ নিশ্চিত আরোগ্য করিতে হইলে আমাদের চিকিৎসা-পুস্তক পাঠ করুন।

বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মাসী

মিহিজাম E. I. R.

ডায়েবেটিস্

প্রস্রাবের সুগার ১৪ দিনে কমে

ঔষধের মূল্য ৪৲, ভিপিতে ৪॥০

পি, ব্যানার্জ্জী

মিহিজাম E. I. R.

HOLLOW WALL BRICK

RANEEGUNGE
TILES

BUILDING BRICK

CRUSHED & UNSLAKED GHOTT

চিত্রসূচী—আশ্বিন

বিচার করিয়া দেখিবেন কি ?

আপনি জানেন—

১। 'বঙ্গলক্ষ্মী' অন্য কাপড়ের তুলনায় কমপক্ষেও তিন মাস বেশী টেঁকে।

২। 'বঙ্গলক্ষ্মী'র পাড় ও জমিনের রকম ও সৌন্দর্য্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩। 'বঙ্গলক্ষ্মী' আপনার বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্প।

আর জানুন—

'বঙ্গলক্ষ্মী'র মূল্য আশাতীত কমান হইয়াছে।

সুতরাং

এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে পূজার কাপড়
শুধু 'বঙ্গলক্ষ্মী'ই
কিনিলে আপনার মনস্তুষ্টি ও আর্থিক
উপকার দুই-ই হয় কি না ?

ইণ্ডিয়ান [illegible] হাউস

স্মৃতির পাতে অটুট থাকুক—

শিশুর হাসি, বুড়ার চোখের শান্তি, রমণীর লাবণ্য, প্রিয়জনের মুখচ্ছবি,
গৃহ, নদী, বন, পর্ব্বত—যাহা কিছুর সঙ্গে জীবন জড়িত—
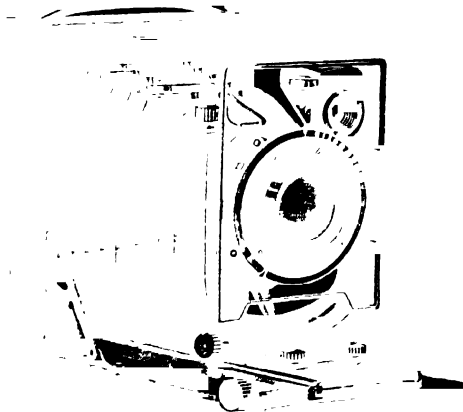
কিন্তু ক্যামেরা কিনতে হলে
জগতের সেরা জাইস-ইকনের ক্যামেরা
কেনাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত

সকল ফটোগ্রাফির দোকানেই
পাওয়া যায়।

জনপ্রিয় "ম্যাক্সিমার"

এডেয়ার, ডাট এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা—বম্বে—মান্দ্রাজ।

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[আশ্বিন—১৩৪০

সামান্য ব্যয়ে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে হইলে

—আপনাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

দি ক্যাশ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ

(ম্যানেজমেণ্ট—**বেন ভেনুটো এণ্ড কোং**)

খোঁজ করুন

(কোম্পানীর আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত)

মূলধন—৫,০০,০০০৲ টাকা।

এক—মাসিক ৷১০, ৷৵০, ২৷০, ৩৵০ ও ৬৷০ কিস্তিতে যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০, ১৫ ও ১০ বৎসরে ১০০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। যে কোন বয়সের নরনারী এই বণ্ড খরিদ করিতে পারিবেন।

দুই—বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় ১৮ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্থা নরনারী মাসিক মাত্র এক টাকা কিস্তিতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জীবন-বীমা করিতে পারিবেন।

তিন—১০৲ ও ১০০৲ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট এককালীন মাত্র ৫৷০ ও ৫৫৲ টাকা দিলে পাওয়া যায়।

সমস্ত বিবরণের জন্য সেক্রেটারীকে আবেদন করুন।

প্রধান অফিস	শাখা
৯নং ড্যালহাউসী স্কয়ার	৩-২৭, মূর ষ্ট্রীট জি, টি,
কলিকাতা।	মাদ্রাজ

উচ্চ কমিশনে বা বেতনে সর্ব্বত্র পুরুষ ও মহিলা এজেণ্ট আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগের অদ্ভুত আবিষ্কার!

"ওমী" লোমনাশক পাউডার

এই পাউডার অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছনীয় লোম মাত্র ২ মিনিটে নষ্ট করে। মোটে জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ও প্রশংসিত।

প্রতি ফাইল মূল্য—মাত্র ১৲ টাকা।

"হেয়ার কিল্ লোশন।"

আর ক্ষুর দ্বারা চিরজীবন কামাইবার জন্য বিরক্ত হইতে হইবে না। প্রত্যেকবার কামাইবার পর এই লোশন নিয়মিত ১৬ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে, মুখখানি ঠিক বালকের মত মসৃণ হইবে। আর লোম বা দাড়ীর চুল উঠিবে না।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ও প্রশংসিত।

প্রতি শিশি মূল্য ২৷০

ইহা ব্যতিরেকে "ওমী" মার্কা নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দামে সস্তা অথচ অতি উত্তম দ্রব্য। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

বেন্ ভেনুটো এণ্ড কোং

৯নং ড্যালহাউসী স্কয়ার, কলিকাতা। মূর ষ্ট্রীট, জর্জ্জ টাউন, মাদ্রাজ।

উচ্চ কমিশনে মহিলা ও পুরুষ এজেণ্ট আবশ্যক।

কার এণ্ড মহলানবিশ

টেলিগ্রাম—'কারনবিশ' কলিকাতা

'কারনবিশের' ফুটবল

—সুবিখ্যাত—

—সুপরীক্ষিত—

—সুপরিচিত—

—সুবিদিত—

২৯ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ক্লাবে কারনবিশের ফুটবলে খেলা হইতেছে ইহাই আমাদের বলের উৎকৃষ্টতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৮০৲ হইতে ৮৫০৲ টাকা মূল্যের

গ্রামোফন ও নানাবিধ রেকর্ড

মাসিক কিস্তিতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে।

খেলার সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জাম—স্যাণ্ডোর ডাম্বেল ও ডেভেলপার ডিস্ক লোডিং বারবেল **ক্যারম** বোর্ড—রূপার কাপ ও মেডেলের সচিত্র ক্যাটালগের **জন্য আজই পত্র লিখুন**

৩ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা

হিজ্ মাষ্টার ভয়েস 'পোরটেবল্' নং ১০২ মূল্য—১২০৲

দুর্গোৎসব

দেখিলাম— অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে - আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে- আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা- মাতৃহীন- 'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা ? কই আমার মা ? এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি ?

সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল – স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল— সেই তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম,—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে!
'দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি।'—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দুর্গোৎসবে বিশ্বময়ী ও আত্মময়ী এক হইয়াছেন। মা আমার দশভুজা—দশদিক প্রসারিণী, ব্রহ্মাণ্ডে ভাণ্ডোদরী। আবার মা আমার দেহ-ঘটমধ্যস্থা! [illegible] উমা - দক্ষিণা কালী। মায়ের দালান-জোড়া ঘর-আলো-করা প্রতিমার [illegible] তাকাইয়া দেখ দেখি! দেখিবে, মা আমার বিশ্বময়ী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বজননী। [illegible] পূর্ণ ঘটের দিকে তাকাইয়া দেখ দেখি! নারিকেলের মধ্যে যেমন জল [illegible], কি জানি কোথা হইতে সে জল আসে, কেমন করিয়া আসে কেহ [illegible] না, তেমনই দেহের মধ্যে রসময় আত্মা—রসময়ী ভাবময়ী আদ্যাশক্তি [illegible] রূপে বিরাজ করিতেছে। এই দুই জনকে দুই আত্মাকে এক [illegible] উপাসনাই দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসবের অন্তরালে যে বাঙ্গালার কত [illegible] লুকান আছে, কত সমাজতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা একমুখে বলা যায় [illegible] এক জীবনে শেষ করা যায় না। তন্ত্রের সাধনতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে [illegible] বুঝা কঠিন, দুর্গোৎসব না বুঝিতে পারিলে বাঙ্গালীকে চিনিতে [illegible] না।

—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] পূজা, শরতের এ দুর্গাপূজা,- বাঙলার নিজস্ব পূজা, এ উৎসব [illegible] নিজের- বাঙালীর নিজের। যেথায় বাঙালী সেথায় দুর্গাপূজা।

হায়রে সেকাল! সত্য, সেকালের সবই কিছু ভাল নয়, কিন্তু এই পূজার বেলায় সত্যি সত্যিই বলি, 'হায়রে সেকাল।' আঃ, সে কি আমোদই গিয়াছে! কি সে সব বড় বড় মহানৈবেদ্য সাজানো, ঘড়ি-ঘণ্টা কাঁসরের কি সে ভক্তিমাখা ঝন্ ঝনা! বাজাইতে বাজাইতে ঢাকঢুলিদের কি সে উন্মাদ নাচন! ধূপধূনার গন্ধে সুরভিত পল্লীতে পল্লীতে কি সে খাওয়া-দাওয়া, বাঁধা-ছাঁদা!

—অমৃতলাল বসু

এই দীর্ঘজীবনে নানা প্রকারের বহু আনন্দ উৎসব দেখিয়াছি ও ভোগ করিয়াছি—কিন্তু আমাদের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হইত তার মতন আনন্দ-উৎসব জীবনে কখনও দেখি নাই। এখনও তার আমেজ প্রাণে লাগিয়া আছে। শরতের প্রাতঃসূর্য্যের আলোকে এখনও প্রাণে সে আনন্দের সাড়া জাগে। দুর্গোৎসবের পূর্ব্বপক্ষকে পিতৃপক্ষ কহে। আজিকালিকার বালকেরা বোধ হয় পিতৃপক্ষের কোন পরিচয়ই পায় না। আমার বাল্যে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যূষে প্রায় সকল ভদ্র গৃহস্থই প্রাতঃস্নান করিয়া আবক্ষজলে দাঁড়াইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। সেই তর্পণের মন্ত্রে পল্লীর সমস্ত জলাশয়ের তীর মুখরিত হইয়া উঠিত। সে দৃশ্য ও সে-মন্ত্রের ধ্বনি এখনও যেন চোখে ভাসিতেছে ও কানে জাগিতেছে। আর পূজার আনন্দ! তার তুলনা দিতে পারি পর-জীবনে এমন কিছু পাই নাই।

—বিপিনচন্দ্র পাল

কাল দুর্গোৎসব, আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্চে তখন তাদের সঙ্গে আমার ধর্ম্ম-সংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পর্শু দিন স-র বাড়ি যাবার সময়ে দেখেছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড় বড় বাড়ির দালান মাত্রেই প্রতিমা তৈরি হচ্চে। দেখে আমার মনে হল, দেশের ছেলে বুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকয়েকের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে উঠে একটা বড় গোছের খেলায় লেগে গেছে। ভেবে দেখতে গেলে আনন্দের আয়োজন মাত্রই পুতুল খেলা—অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে মনে হয় সময় নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে একটা ভাবের আন্দোলন এনে দেয় তা কি কখনো নিষ্ফল হতে পারে? প্রতি বৎসর কিছুকালের জন্য মনে এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে : আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয় সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দ-কাব্য রচনা করে।

পুস্তক ও প্রতিভা

[বাংলাদেশে বর্ত্তমানে জীবিতদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাবলে যাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে শুধু এদেশে নয়, জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন বাল্যকালে এবং পরবর্ত্তী জীবনে কোন্ কোন্ বই তাঁহাদের মনে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে অথবা কি ধরণের বই পড়িতে তাঁহারা স্বভাবত ভালবাসেন তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার বশেই আমরা বাংলাদেশের পূজ্য মহাপুরুষদের কয়েকজনের নিকট স্বহস্তে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির জবাব লিখিয়া দিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। কয়েকজন কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা সেগুলি বাঙালী পাঠকসাধারণের গোচরে আনিতে পারিয়া ধন্য হইলাম।

পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে শ্রীঅরবিন্দের মত সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। ২৭শে ভাদ্র তারিখে তাঁহার টেলিগ্রাম পাই—Reserve two page space, he consents only must print as he says। ২০শে আশ্বিন বৈকালে টেলিগ্রাম পাই—Excuse delay, reserve six pages, সেই লেখা অদ্য ২রা আশ্বিন বৈকালে আমাদের হস্তগত হইল। বিভিন্ন লোকের নিকট লেখা পত্র হইতে শ্রীঅরবিন্দের মতামত লইয়া দিলীপবাবু একে পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, চিঠির প্রত্যেকটি কথা মায় ফুটনোট পর্য্যন্ত যেমন আছে তেমনটি ছাপিতে হইবে। সুতরাং তাহাই করিতে বাধ্য হইলাম। দিলীপবাবু আরও লিখিয়াছেন, "অনেক কষ্টে শ্রীঅরবিন্দকে দিয়ে এগুলি অনুমোদিত করিয়ে পাঠাচ্ছি।" সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মহামূল্য উক্তিগুলি তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের কাছেই থাকে। বহির্জগতের কাহারও সেগুলি শুনিবার সৌভাগ্য হয় না। সেই বাণীর কয়েকটি যে আমরা বঙ্গশ্রীর মারফত শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদনে পাঠকের গোচর করিতে পারিলাম এইজন্য দিলীপবাবুর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। শ্রীঅরবিন্দ প্রেসের জন্য কিছু লেখেন না। লেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং দিলীপবাবু একপ্রকার অঘটন ঘটাইয়াছেন। যদিও বাংলা কাগজে ইংরাজী লেখা (অনুবাদ বিনা) ছাপার আমরা বিরোধী তথাপি সময় ও স্থানাভাবে আমরা শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজি লেখার অনুবাদ দিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সময়াভাবে তাঁহার কথা বলিতে পারেন নাই, ভবিষ্যতে বলিবেন এরূপ ভরসা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় অসুস্থ ছিলেন বলিয়া আমরা আমাদের আবেদন তাঁহাদিগের গোচরে আনিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহার লেখাও সংগৃহীত হয় নাই। আশা করি, ইঁহাদের মতামতও ভবিষ্যতে আমরা প্রকাশ করিতে পারিব।]

শ্রীঅরবিন্দ ও সাহিত্যিকী

শ্রীসজনীকান্ত দাস
করকমলেষু

আপনার প্রশ্নটি ভালো লাগ্‌লো। তাই শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রেছিলাম তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন আমাকে যে প্রেসের জন্যে কিছু তিনি বিশেষ ক'রে লিখ্‌তে পারেন না। কেন—তা বলার দরকার দেখি না। তবে তাঁকে যখন একথা লিখি যে আমাদের কাছে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে যে-কয়টি অপূর্ব্ব গভীর উজ্জ্বল পত্র আছে সে কয়টির কয়েকটি থেকে অংশবিশেষ বেছে নিয়ে বঙ্গশ্রীতে পাঠালে সন্ধানী পাঠকপাঠিকা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ ক'রবেন তখন তিনি লেখেন : তাতে আপত্তি নেই। এটুকু ভূমিকা ক'রলাম—কেননা আপনি ঠিক যে-ধরণের লেখা শ্রীঅরবিন্দের কাছে চেয়েছেন (যথা, কোন্ কোন্ বই প'ড়ে উনি খুব মুগ্ধ হ'ন) সে ধরণের ফর্ম্মাসি লেখা সরবরাহ করা একেবারেই অসম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ কোনোমতেই প্রেসের জন্যে বিশেষ ক'রে কিছু লিখ্‌বেন না অন্ততঃ কিছুকাল, একথা আমাকে পূর্ব্ব পত্রে লিখেছিলেন। আমার "অনামী"তে তাঁর অনেকগুলি পত্র আমি ছাপিয়েছি এক রকম জোর ক'রেই। তাতে শ্রীঅরবিন্দ তত আপত্তি করেন নি এই জন্যে যে সে-পত্রগুলি যখন তিনি লিখেছিলেন তখন ভাবেন নি যে অদূরভবিষ্যতে আমরা—(the incorrigible propagandists alas !)—ছাপাব ধ'রে ক'রে। কিন্তু তা ব'লে কোনো মাসিক পত্রিকার জন্যেই কোনো কবিতা, প্রবন্ধ, আশীর্ব্বচন বা বাণী তিনি ছাপ্‌তে দিতে পারেন না। এতে আপনারা রাগ করবেন ? কিন্তু তা-ই বা কদিন ? যে মহান তপস্যায় তিনি ব্রতী তার প্রত্যক্ষ ফল যখন বাইরে ফল্‌বে তখন কে না কৃতজ্ঞ বোধ করবে যে এ-আত্মপর যুগে পরার্থে এমন আত্মনিয়োগ এমন ত্যাগ কোনো দেবকল্প মানুষ ক'রতে পারে ? আর ভুলবোঝা ? তার ভার কোন্ মহাপ্রাণকে না বইতে হ'য়েছে বলুন—বিশেষ ক'রে ভাগবত সাধনায়—এ নাস্তিক যুগে ? যাক্ একথা। কেবল ব'লে রাখা যে এ অনুক্রমণিকার দরকার ছিল, কী দরকার ছিল তা বুঝবেন আশা করি। কেননা আপনি ক্রোধন হ'লেও কল্পনাপ্রবণ তো। আর একটি কথা শুধু : আপনাকে ছাপ্‌তেই হবে এ সমস্ত ভূমিকাটুকু আদ্যন্ত একটি কথাও বাদ না দিয়ে। আপনাকে সেই সর্ত্তেই পাঠাচ্ছি এ চিঠি। কিন্তু কেন পাঠাচ্ছি আপনাকে—যে আপনি—ইত্যাদি ইত্যাদি ? এইজন্যে যে কোনো বিমুখতা পোষণ করা বা দলাদলি রাখায় আমি বিশ্বাস করি না। দুদিনের জীবন—যেটুকু প্রীতি মানুষের কাছে মেলে তাই লাভ এ স্বার্থসন্ধী যুগে। শ্রীঅরবিন্দকে তাই অনুরোধ ক'রেছিলাম যে আপনাকে কনভার্ট ক'রতে আপনার অনুরোধ রক্ষা করাচ্ছি না—কেননা আপনারা সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও সমান বক্রোক্তি ও কটূক্তিই করবেন। করলেনই বা। আমরা কিছু মনে রাখ্‌ব না এইটেই বড়কথা। তাতে কে কী ভাবে কী আসে যায় বলুন ?

এবার সুরু করি। অথ পয়লা নম্বর।

শ্রীঅরবিন্দকে হোরেস ক্যাটুলাস ও লুক্রেশিয়াস্ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করি একবার মাসকয়েক আগে। তাতে আমি গীতিকবি ক্যাটুলাসের সঙ্গে দার্শনিক কবি লুক্রেশিয়াসের গোল ক'রে ফেলি—এ দুটি কবির সম্বন্ধে কিছুই না প'ড়ে রাখার দরুণ। এতে শ্রীঅরবিন্দ নৈষ্ঠিক হাসি হেসে লেখেন :

DILIP,

About the Roman poets : You prefer Catullus because he was a philosopher ? You have certainly rolled Lucretius here into Catullus—Lucretius who wrote an epic about the "Nature of Things" and invested the Epicurean philo-

sophy with a rudely Roman and most unepicurean majesty and grandeur. Catullus had no more philosophy in him than a red ant. He was an exquisite lyrist, much more spontaneous in his lyricism than the more sophisticated and well-balanced Horace, a poet of passionate and irregular love and he got out of the Latin language a melody no man could persuade it to before him or after. But that was all. Horace on the other hand knew everything that was to be known about philosophy at that time and had, indeed, all the culture of the age at his fingers' ends and carefully put in its place—in his brain also—but he did not make the mistake of writing a philosophical treatise in verse. A man of great urbanity, a perfectly balanced mind, a vital man with a strong sociability, faithful and ardent in friendship, a *bon vivant* fond of good food and good wine, a lover of women, but not ardently passionate like Catullus, an Epicurean, who took life gladly but not superficial—this was his character. As a poet he was the second among the Augustan poets, a great master of phrase—the most quoted of all Roman writers, a dexterous metrist who fixed the chief lyric Greek metres in Latin in their definitive form with a style and rhythm in which strength and grace were singularly united, a writer also of satire and familiar epistolary verse as well as a master of the ode and the lyric—that sums up his work. SRI AUROBINDO

অথ দোসরা নম্বর।

পরম-মধুর কবি খ্যাতনামা পণ্ডিত জিজ্ঞাসু সাধক অমলকিরণ (এঁর নামছিল কেবু সেঠনা যোগ নেবার আগে—ইনি পার্সী—ইংরেজীতে এঁর কবিতা প'ড়ে স্বয়ং "এ ই" মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে পত্র লিখেছেন) শ্রীঅরবিন্দকে এই প্রশ্ন করেন :

"You spoke once of Goethe as not being one of the world's absolutely supreme singers. Who are these then? Homer, Dante, Shakespeare, Valmiki, Kalidas? And what about Aeschylus, Virgil and Milton?"

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে লেখেন :

I suppose all the names you mention (except Goethe) can be included ; or if you like you can put them all including Goethe in three rows—e. g.

1st row—Homer, Shakespeare, Valmiki.

2nd row—Dante, Kalidasa, Aeschylus, Virgil, Milton.

3rd row—Goethe.

And there you are. To speak less flippantly, the first three have at once supreme imaginative originality, supreme poetic gift, widest scope and supreme creative genius. Each is a sort of poetic Demiurge who has created a world of his own. Dante's triple world beyond is more constructed by the poetic seeing mind than by this kind of elemental demiurgic power—otherwise he would rank by their side ; the same with Kalidasa. Aeschylus is a seer and creator but on a much smaller scale. Virgil and Milton have a less spontaneous breath of creative genius ; one or two typal figures excepted, they live rather by what they have said than by what they have made.

অমলকিরণ নাছোড়বান্দা, ফের লেখেন :

Yes, I plead guilty. But that I hope, will be no reason why Vyasa and Sophocles should remain

unclassified by you. And the 'others'—they intrigue me even more. Who are these others? Saintsbury as good as declares that poetry is Shelley and Shelley poetry—Spenser alone, to his mind, can contest the right to that equation, (Shakspeare, of course, is admittedly *hors concours*). Aldous Huxley abominates Spenser : the fellow has got nothing to say and says it with consummately cloying melodiousness. Swinburne, as is well known, could never think of Victor Hugo without bursting into half a dozen alliterative superlatives, while Matthew Arnold it was, I believe, who pitied Hugo for imagining' that poetry consisted in using 'divinite', 'eternite', 'infinite', as lavishly as possible. And then there is Keats, whose *Hyperion* compelled even the sneering Byron to forget his usual condescending attitude towards 'Johnny' and confess that nothing grander had been seen since Aeschylus. Racine, too, cannot be left out—can he? Voltaire adored him, Voltaire who called Shakespeare a drunken barbarian. Finally, what of Wordsworth, whose Immortality Ode was hailed by Mark Pattison as the *ne plus ultra* of English poetry since the days of *Lycidas*.

Kindly shed the light of infallible *viveka* on this chaos of jostling opinions.

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে লেখেন :

I am not prepared to classify all the poets in the universe—it was the front bench or benches

you asked for. By 'others' I meant poets like Lucretius, Euripides, Calderon, Corneille, Hugo. Euripides (Medea, Bacchae and other plays) is a greater poet than Racine whom you want to put in the very first ranks. If you want only the very greatest, none of those can enter—only Vyasa and Sophocles. Vyasa could very well claim a place beside Valmiki, Sophocles beside Aeschylus. The rest, if you like including Racine, you can send to the third row with Goethe, but it is something of a promotion about which one can feel some qualms. Spenser too, if you like ; it is difficult to draw a line.

Shelley, Keats and Worsdworth come in the second zone, they cannot be included here. It is not that their very best work is not as fine poetry as any written, but their work as a whole is not considerable enough to be counted among that of the greater creators. If Keats had finished Hyperion (without spoiling it), if Shelley had lived, or if Wordsworth had not petered out like a motor car with insufficient petrol, it might be different, but we have to take things as they are. As it is, all began magnificently, but none of them finished, and what work they did except a few lyrics, sonnets, short pieces and narratives, is flawed and unequal. If they had to be admitted, what about at least fifty others in Europe and Asia ?

The critical opinions you quote are each more absurd and ineptly jaunty and flagrantly prejudiced and personal than the other. If "poetry is Shelley and Shelley is poetry," then "Saintsbury is criticism and criticism is Saintsbury" and "Chellu * is service and service is Chellu," all three apopthegms are of an equal truth and excellence. The only thing that results from Aldous Huxley's opinion is that Spenser's melodiousness cloyed upon Aldous Huxley, which is of no importance to anybody and makes not the slightest difference to the value of Spenser. Swinburne and Arnold are equally unbalanced on either side of their see-saw about Hugo. He was a great but imperfect genius, missing the front rank becuse his word exceeded his weight, because his height was at the best considerable, but his depth insufficient and especially because he was often oratorical and insincere. The remarks of Voltaire and Mark Pattison go into the same basket.

SRI AUROBINDO

অথ তেসরা নম্বর।

অধুনা আর্ট-সেকিষ্ট তরুণদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে হীন প্রতিপন্ন করার একটি অতিসাধু চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা ক'রে, বঙ্কিমের নৈতিকতাকে আর্ট ফর আর্টস্ সেকের ধুয়ো তুলে হসনীয় প্রতিপন্ন ক'রে (একথা ভুলে গিয়ে যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা এ পঞ্চাশ বৎসরে তেমনিই চির শ্যামল আছে এবং রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কেউ কালের দরবারে এখনো অবধি এ শিরোপা পান্ নি), বর্ত্তমান বাংলা গদ্যের যথেচ্ছাচারকে ষ্টাইল মনে ক'রে সব রকম মহৎ আদর্শকে সাহিত্য থেকে অবাস্তব ব'লে নির্ব্বাসিত ক'রে—আর কত কী হেয় ধুলিবিলাস ! ··এতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে লিখি শ্রীঅরবিন্দকে যে সম্ভবতঃ আমি তরুণ নই ব'লেই মহতের এ লাঞ্ছনায় ব্যথা পাই, আর্টিষ্ট নই ব'লেই (ভগবানকে ধন্যবাদ !) আনন্দমঠ প'ড়তে প'ড়তে রক্তস্রোতের দ্রুততর প্রবাহ অনুভব করি —(কেন না আনন্দমঠ নাকি আর্ট হয় নি—যেন না হ'লেই জাতীয় জীবনে আনন্দমঠের মহৎ অবদানের মূল্য এক তিলও কমে—তবে আর্ট-সর্ব্বস্বতার শোচনীয় অন্ধতা এমনিই হয় !) ভ্রমরের দুঃখে উচ্ছ্বসিত হই, বিষবৃক্ষের মাধুর্য্য চরিত্রচিত্রণে হৃদয় ওঠে দুলে—এবং সর্ব্বোপরি কমলাকান্ত যতবারই পড়ি ততবারই মনে হয় বাংলা গদ্যে এ অফুরন্ত রসাবেশ যে ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের আগে জান্ত কে ? আমি শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করি : আচ্ছা, বঙ্কিমকে এই যে অল্ট্রামডার্ণের দল গালিগালাজ করছেন ছোট প্রতিপন্ন করে গোঁফে চাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন তাতে কি আপনার সায় আছে ? তাতে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন আমাকে :

"Depreciation of Bankim is absurd ; he is and will always rank as one of the great creators and his prose stands among the ten or twelve best prose-styles in the world's literature." *

আর যাবে কোথায় ? আমি চেপে ধরলাম : বলুন বাকি দশ বার জনের নাম। প্লেটো ? মেরেডিথ ? আনাতোল ? ল্যাম্ব ? ভল্‌টেয়ার ? না কে ? বলতেই হবে। শ্রীঅরবিন্দ বিব্রত হয়ে লেখেন (করেন কি ?)

DILIP,

I stand rather aghast at your summons to stand and deliver the names of the ten or twelve best prose styles in the world's literature. I had no names in mind and I used the incautious phrase only to indicate the high place I thought Bankim held among the great masters of language. To rank the poets on different grades of the Hill of Poetry is a pastime which may be a little frivolous and unnecessary, but possible and permissible. I would not venture to try the same game with the prose-writers who are multitudinous and do not present the same marked and unmistakable differences of level and power. The prose field is a field, with eminences no doubt, much more than a mountain. But the tops, if there are any, are not so high, the drops not so low as in poetical literature.

Then again there are great writers in prose and great prose-writers and the two are by no

* আশ্রমের একটি পরিচারক।

* এইখানে একটু লিখে দিই আমার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দের মত : "A wonderful style and a great and perfect creative artist with a profound emotional power."

means the same thing. Dickens and Balzac are great novelists, but their style or absence of style had better not be described. Scott has a style I suppose but it is neither blameless nor has distinguishing merit. Other novelists have a style and a good one but their prose is not quoted as a model and they are remembered not for that but as creators. You speak of Meredith, and if Meredith had always written as he did in *Richard Feverel* he might have figured chiefly as a master of language, but the creator got the better of the stylist in the bulk of his work. I was writing of prose styles and what was in my mind was those achievements in which language reached its acme of perfection in one manner or other so that whatever the writer touched became a thing of beauty—no matter about its substance—or a perfect form and memorable. Bankim seemed to me to have achieved that in his own way as Plato in his or Cicero or Tacitus in theirs or in French: Voltaire, Flaubert or Anatole France. I could name others, especially in French which is the greatest store-house of good prose among the world's languages—there is no other to match it. Mathew Arnold once wrote a line something like this

"*France great in all great arts, in none supreme*" to which someone very aptly replied "And what then of the art of prose writing? Is it not a great art and who can approach France there? All prose of other languages seem beside its perfection, lucidity, measure almost clumsy."

There are many remarkable prose-writers in English, but that perfection is not so common. The great prose-writers in English seem to seize by the personality they express in their styles rather than by its perfection as an instrument—it is true at least of the earliest and I think too of the later ones. Lamb whom you mention is a signal example of a writer who erected his personality into a style and lives by that achievement—Pater and Wilde are other examples.

As for Bengali we have had Bankim, have still Tagore and Sarat Chatterjee. That is achievement enough for a single century.

I have not answered your question—but I have explained my phrase and I think that is all you can expect from me. SRI AUROBINDO.

অথ চৌঠা নম্বর ও শেষ।

বর্ত্তমান সময়ে কোন্ কোন্ এবং কী ধরণের কবির কাব্য শ্রীঅরবিন্দ খুব ভালবাসেন এ প্রশ্নের একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর না দিলে এ পত্রটি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। আমি শুধু যুবক কবি হারীন্দ্রনাথের কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব'লে বিদায় নেব। (শ্রীঅরবিন্দ A-E সম্বন্ধে আমাকে লিখেছিলেন:

"He is one of the two or three whose poetry comes nearest to spiritual knowledge and experience. He has, too, a very fine and subtle perception of things."

হারীন্দ্রনাথ সেদিন আমাকে ব'লছিলেন জীবিত কবিদের মধ্যে A-E-ই তাঁর মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। হারীন্দ্রনাথের কাব্যে এ-ইর প্রভাব আছে একথা অমলকিরণ আমাকে সেদিন ব'ল্ছিলেন তাই এ-কথার উল্লেখ ক'রলাম।)

হারীন্দ্রনাথের নাম আজ রুষ, ইংলণ্ড, য়ুরোপ ও আমেরিকায় জানিত। ইনি যে প্রথম শ্রেণীর কবি একথা আজ প্রায় অবিসংবাদিত। * কিন্তু প্রায় কুড়ি বৎসর আগে যখন উনিশ বৎসর বয়স্ক কিশোর হারীন্দ্রনাথ তাঁর **Feast of Youth** বইখানি প্রকাশ করেন তখন কে-ই বা তাঁকে জান্ত? কিন্তু তখনই শ্রীঅরবিন্দের তীক্ষ্ণ ভবিষ্যদৃষ্টি এঁর মধ্যে বিপুল প্রতিভা দেখতে পেয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন **Feast of Youth** এর সমালোচনাপ্রসঙ্গে:

"As to the abundance here of all the essential materials, the instruments, the elementary powers of the poetical gift, there cannot be a moment's doubt or hesitation. A rich and finely lavish command of language, a firm possession of his metrical instrument, an almost blinding gleam and glitter of the wealth of imagination and fancy and a high though as yet uncertain pitch of expression, are the powers with which the young poet starts...He is rather overburdened with the favours of the goddess, comes like some Vedic Marut with golden weapons, golden ornaments, car of gold, throwing in front of him continual lightnings of thought in the midst of a shining rain of fancies... .."

এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া আর শ্রীঅরবিন্দের মতন ধ্যানী সমজদারের কাছ থেকে! বলুন তো, এ কথা কি প্রচার না করে থাকতে পারা যায়!

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে শ্রীঅরবিন্দ সেই সময়েই এ কিশোর কবির মধ্যে যোগী কবির দেখা পেয়েছিলেন, লিখেছিলেন:

"We may well hope to find in him a supreme singer of the vision of God in Nature and Life, and the meeting of the divine and the human which must be at first the most vivifying and liberating part of India's message to a humanity that is now touched everywhere by a growing will for the spiritualising of the earth-existence."

এ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ফ'ল্ল বই কি। হারীন্দ্রনাথ এখন এখানে—ও শ্রীঅরবিন্দেরই প্রেরণায় লিখ্ছেন (যা তিনি নিজেই স্বীকার করেন তাঁর পক্ষে লেখা অসম্ভব ছিল) অনন্ত-

* Yeats, A E., Cousins, Binyons সকলেই হারীন্দ্রনাথের প্রতিভার মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি ক'রেছেন। Fowler Wright সেদিন এমন কথাও নিঃশঙ্কে লিখেছেন: "It may be high praise and yet not too high to say that what Conrad did for English Prose Chattopaddhyaya is doing for English poetry" সেদিন হারীনের এখনকার কয়েকটি কবিতা প'ড়ে রবীন্দ্রনাথও আমাকে লিখেছেন: "হারীনের কবিতাগুলি প'ড়ে বিস্মিত হ'তে হয় প্রতিভার সূর্য্যালোক বিচ্ছুরিত হ'য়ে দেখা দেয়"—ইত্যাদি।

পূর্ব্ব গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কবিতা। হারীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ও একটি ছোট কবিতা দিয়ে এ প্রবন্ধোপম ইনফর্মাল পত্রটি শেষ করি। হারীন্দ্রনাথ সেদিন লিখে-ছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে যে তাঁর অনেক পাশ্চাত্য বন্ধু বলেন যে তাঁর কবিতায় নাকি শেলি কীটস ও ব্লেকের আমেজ মেলে? আরও লেখেন: "আমি প্রত্যক্ষ দেখি আমাকে দিয়ে কে লেখাচ্ছে—স্পষ্ট দেখি—একথা কি সত্য? (ভাবটা তাঁর ছিল এই আর কি) তাতে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন:

HARIN,

I don't find the particular influence of any English poet ; the critics are always trying to make these rapprochements but I think there is very little truth in it. You resemble Shelley only in the spontaneous lyrical flow, and in the mystic tendency but your temperament is different from his and your mystic tendency is of a different kind, so too, in you the power of poetic vision has no resemblance to his. The only point of resemblance to Keats is the richness of colour, more orientally bold and vivid in your poetry than in his but here again there is no true similarity in the temperament or the vision. Blake you resemble only in the fact that you have the opening on occult planes and receive freely their images, that at once produces the fundamental likeness which the intellect feels so easily between all such poetry, but once again the worlds he was in touch with and the worlds from which you receive are not the same : these comparisons are critical pot-shots that go wide of the real mark and hit something else.

You are being made an unusually effective Instrument for the expression of spiritual truth and experience in poetry—which fulfils the prediction I made about you in reviewing your first book.

যে-কবিকে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ শেলি-প্রমুখ কবির সঙ্গে তুলনা করেন তাঁর সম্বন্ধে গর্ব্বিত বোধ করার কারণ আছে। বস্তুতঃ এ রকম প্রতিভার সাক্ষাৎকার একটা ভাগ্য। তাঁর একটি কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ-কৃত তার অনুবাদ নিয়ে দিয়ে আজ ইতি করি।

In jungles-woods in joyless sleep
Out of some far-sown seed
I rose, imprisoned to a spot,
A wretched bamboo-reed.
One silver morning suddenly
The Mother with Her knife
Cut me and took me to Her room
And breathed me into life.
And what was once a bamboo-reed
Music-unmated, mute,
In Mother's hands became a fine
Thrice gifted bamboo-flute.
She plays upon me now at noon,
At twilight and at dawn ;
The flute itself is silent, so
Her melodies go on.

কবি এর অনুবাদ ক'রেছেন অমিল ছন্দে। লিখেছেন আমাকে যে এর মিল "রাখতে গেলে যেটা ছাড়তে হয় সেটা মিলের চেয়ে বেশি দামী।"

কোন্ সে জটিল ঘন জঙ্গলে আনন্দহীন ঘুমে
সুদূরবাহিত অখ্যাত বীজ হ'তে
কবে উঠেছিনু সঙ্গীবিহীন বন্দী নিভৃত কোণে
আমি বিষণ্ণ বেণু॥
সহসা একদা কী শুভলগ্নে শুভ্র সুপ্রভাতে
ছুরি হাতে নিয়ে মা এলেন বনমাঝে,
কাটিয়া নিলেন মোরে নিজ ঘরে, শূন্য ধ্বনিল মম
প্রাণভরা নিঃশ্বাসে॥
একদিন ছিল সামান্য যাহা নগণ্য বেণুশাখা
গীতমাধুরীর বিরহে বোবার মতো
মায়ের করুণ অঙ্গুলিতলে কখন্ ধন্য হোলো,
হোলো সে পুণ্য বাঁশি॥
মা বাজান মোরে গভীর ছন্দে কখনো মধ্য দিনে
কভু সায়াহ্নে কভু নিশান্তকালে।
স্তব্ধ রয়েছে বাঁশির চিত্ত, তাহারি মৌন ভরি'
তাঁর সঙ্গীত বাজে॥

ইতি

ভবদীয়—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্ত্তমান কালেও জীবন্তভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন-উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাসনয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বার বার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।

৭-৯-৩৩　শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বাল্যকালে আমার পিতার পুস্তকাগারে প্রপিতামহের আমলের স্তূপীকৃত সমাচার-দর্পণ দেখিতাম। সময় সময় কৌতূহলবশতঃ তাহার পাতা উল্টাইতাম। একদিন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে কি প্রকারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ভিজা সূতার দ্বারা পৃথিবীতে আনয়ন করিলেন তাহা পড়িয়া অবাক হইলাম। অবশ্য সেই তরুণ বয়সে এই ঘটনার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সর্ব্বাপেক্ষা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং সোমপ্রকাশ (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত)-পত্রিকার নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণে জড়িত। এই সাময়িক পত্রিকাগুলি গোড়া হইতে আমার পিতা সযত্নে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি এগুলির পাতা তন্ন তন্ন করিয়া উল্টাইতাম ও যথাসাধ্য লেখাগুলির ভাব গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইতাম। ফলে, কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিবার বহু পূর্ব্বেই আমি ব্রাহ্মসমাজের দিকে অতর্কিত ভাবে আকৃষ্ট হই।

তত্ত্ববোধিনী ও বিবিধার্থ সংগ্রহে পদার্থ-বিদ্যা, জন্তু-বিদ্যা ও ভূ-বিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া বিজ্ঞানের বীজ আমার হৃদয়ে উপ্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে যখন বঙ্গদর্শন প্রচারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের অবতারণা করিল তখনও আমি পুস্তক-কীটের ন্যায় ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা, এমন কি, প্রতি ছত্র পড়িয়া হজম করিতে লাগিলাম। রামদাস সেনের কালিদাস ও বৈষ্ণবসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ (যাহা শেষে ঐতিহাসিক রহস্য নামে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—) পড়িয়া আমি প্রত্নতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হই। ভবিষ্যতে হিন্দু-রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিয়া এই অন্তর্নিহিত বলবতী তৃষ্ণা নিবারণের পথ মুক্ত হয়।

৮-৯-৩৩　শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সকল রকমের জ্ঞানই সাংবাদিকের কাজে লাগে। এই জন্য নানা বিষয়ের পুস্তক, টেক্নিকাল ধরণে লেখা না হইলে, আমি অল্পস্বল্প পড়ি। অনেক বৎসর হইতে আদ্যোপান্ত কোন বহি পড়িবার সৌভাগ্য আমার কচিৎ ঘটে। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের লেখা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বহিতে মিথ্যা কথা ও কুযুক্তি থাকিলে তাহার ভ্রম প্রদর্শনের নিমিত্ত আমাকে মধ্যে মধ্যে কোন কোন বহি আগাগোড়া পড়িতে হইয়াছে।

সেই সব ঐতিহাসিক বহি পড়িতে আমার ভাল লাগে যাহা হইতে জাতীয় অবনতির কারণ বুঝা যায় এবং দুর্দ্দশা-মোচন ও পুনরভ্যুদয়ের সঙ্কেত পাওয়া যায়। জগতের ইতিহাস জাতীয় নৈরাশ্যের অমোঘ ঔষধ।

কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক ভাল লাগে। গল্প, উপন্যাস ও নাটকে লম্বা বক্তৃতা বা দীর্ঘ বর্ণনা থাকিলে তাহা প্রায়ই বাদ দিয়া যাই।

আরব্য উপন্যাস আমার এখনও ভাল লাগে। বাল্যকালে যখন বাংলা ইস্কুলে পড়িতাম, তখন বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভিদ্-বিদ্যা আমাকে আকৃষ্ট করিত। বিদ্যালয়-পাঠ্য বহি ছাড়া অন্য বহির মধ্যে রামায়ণ বেশী পড়িতাম। ইংরেজী শিখিবার পর একটু বড় হইয়া ইংরেজী উপন্যাসের মধ্যে স্কটের আইভান্‌হো আগ্রহের সহিত পড়িয়াছিলাম মনে পড়ে। কেনিল্‌ওআর্থ্ এবং ব্রাইড্ অব্ ল্যামারমূর্ পড়িয়া বড় বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। কলেজে পড়িবার সময় টেনিসনের সব লেখা, মিল্টনের সব কাব্য (সমগ্র প্যারাডাইজ লষ্ট ও প্যারাডাইজ রিগেণ্ড পর্য্যন্ত !) এবং এমার্সনের গ্রন্থাবলী পড়িয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, সেক্সপিয়ারের নাটকের মোহিনী শক্তির অধীন বরাবরই ছিলাম ও আছি।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বাল্যকালে তারাশঙ্কর কৃত কাদম্বরীর বাংলা অনুবাদ, দুর্বোধ্য ভাষা সত্ত্বেও, খুব ভাল লাগিত।

১০-৯-৩৩ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে বই পড়তে আমার মন এখনো চায় বার বার, তার একটা ফর্দ্দ দিচ্ছি যথা-

ঈশপের গল্প (ইংরাজী), বিদ্যাসাগরের কথামালা, আলফোঁস দোদের তার্তারিন অব তারাস্কন, ডন কুইক্‌জোট, আরব্য উপন্যাস, কিপ্‌লিংএর কিম, জুল্‌স্ ভার্ণির চাঁদের দেশে যাত্রা প্রভৃতি কত বলবো। মোট কথা, আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত, জন্তু জানোয়ারের নানা গল্প এবং পশুপক্ষী পোকা-মাকড়দের বিষয় নিয়ে লেখা বই, ইতিকথার মধ্যে মোগল ও রাজপুতদের কাহিনী—ভাল লাগে।

কবিতার মধ্যে কবীর সাহেবের নানা দোহাঁ সর্ব্বদাই পড়ি।

আর্টের উপর বই একটুও ভাল লাগে না। খবরের কাগজও নয়।

মডার্ণ নভেল ভাল লাগে না—কি বাংলা, কি অন্য ভাষার।

বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ আর কমলাকান্ত আর কৃষ্ণকান্তের উইল এই তিন খানাই ভাল লাগে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চা এতো ভাল লেগেছে যে ওটাকে ভাল করে সবাইকে পড়াতে ইচ্ছে করে।

কবিতার বই পড়ে বুঝিনে। শুনলে ভাল লাগে। গানের বিষয়েও তাই। বটতলার অনেক বই ভাল লাগে।

৯-৯-৩৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্নসমস্যা ও বাঙালীর পরাজয়

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

কেন বলি

আমি আজ যে-সকল কথা বলিতে বসিয়াছি তাহা নূতন নয়, সুখশ্রাব্যও নয়। ১৯০৯ সালে 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' সম্বন্ধে প্রথম দুর্ভাগা বাঙালীকে মনের দুঃখে কিঞ্চিৎ রূঢ় সত্যকথা শুনাইয়াছিলাম, সেদিন হইতে প্রায় সিকি শতাব্দী অতীত হইয়াছে, আমার দুঃখ আজিও ঘুচিল না। বাঙালী আজিও সচেতন হইল না। বার বার একই কথা বলিতে বলিতে আমার জিহ্বায় জড়তা আসিল, দুঃখ-দুর্দ্দশার একই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল, আমার যৌবনের শক্তি বার্দ্ধক্যের জড়তায় বিলীন হইতে বসিল—বাঙালী কিন্তু জাগিল না। আমার মুখে একঘেয়ে নিন্দাবাক্য শুনিতে শুনিতে লোকে আমার প্রতি বীতরাগ হইয়াছে, বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া আমার অখ্যাতি রটিয়াছে, নানা জনে নানা উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি সঙ্কীর্ণমনা এমন কথাও যে দুই একজন না বলিয়াছে তাহা নয় তবু আমি দুর্ম্মুখের মত কথা বলিতে ছাড়ি নাই। সে কি বাঙালীকে ঘৃণা করি বলিয়া? আমি বাঙালী, 'সুজলা সুফলা' বাংলাদেশকে আমি ভালবাসি। বাঙালী সবল হউক, সুস্থ হউক, আপনার পায়ে আপনি নির্ভর করিয়া দাঁড়াক, ইহাই আমি নিরন্তর কামনা করি। আমার এই আন্তরিক কামনাই আমাকে কটুভাষী করিয়াছে। ১৯০৯ সালে যাহা বলিয়াছিলাম, ১৯৩৩ সালে তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি—"হয়ত আবেগের বশে দুই একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। সেই সকল কথা আমি বিদ্বেষের বশে লিখি নাই, জাতীয় দারুণ দুরবস্থাজনিত দুঃখই আমাকে ঐরূপ বলাইয়াছে।"

আমি যাহা বলি, তাহা মোটেই নূতন নয়, অত্যন্ত পুরাতন, অত্যন্ত সাধারণ কথা; বার বার শুনিতে শুনিতে যদি চৈতন্য হয়, সেই জন্যই বলি। আমি নিরাশ হই নাই, হইলে মূক হইয়া থাকিতাম। আমি জানি এই হতভাগ্য জাতিই একদিন আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে, আপনাকে জানিবে। চির অমঙ্গলভাষী আমি, সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছি। মৃত্যু উঁকি দিতেছে, তাহার শুভাগমনের পূর্ব্বে কি আমার আশা পূর্ণ হইবে না?

একটা কথা, আমি জানি বিদেশী ও স্বদেশী ডিগ্রীধারী বাঙালীরা আমার প্রতি অপ্রসন্ন, আমি ডিগ্রীবিরোধী বলিয়া। এই প্রবন্ধেও গ্রাজুয়েটদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছি। আমি ইহা সত্যসত্যই বিশ্বাস করি, বাঙালীর পক্ষে ডিগ্রীর কোনই সার্থকতা নাই। চাকুরীতেই যাহার পরিসমাপ্তি, ডিগ্রীগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে জ্ঞান-চর্চ্চা অগস্ত্যযাত্রা করে, সহজবুদ্ধিতে সে ডিগ্রীর প্রশংসা আমি করিতে পারি না। এই ডিগ্রীর মোহ বাঙালীর ক্ষতি করিয়াছে এবং সে মোহ আজিও কাটে নাই।

কুড়ের বাদশা

সে দিন আমাদের ময়দান-ক্লাবে* একজন শ্রদ্ধেয় বিচক্ষণ সভ্য বলিলেন, একটা ব্যাপার আপনারা কেউ লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না কিন্তু আমি দেখেছি—বাঙালী ছেলে যুবা প্রৌঢ় বুড়োরা যখন একত্র হয় এবং কোনও বৃদ্ধ কোনও প্রৌঢ়কে কোনও হুকুম করেন, প্রৌঢ়ব্যক্তি সে কাজ নিজে না করে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের কোনও যুবককে পাল্টে সে হুকুম দেন এবং যুবকটিও তার চাইতে কম বয়সের কোনও ছোকরাকে দিয়ে সেই হুকুম তামিল করিয়ে নেবার সুযোগ ছাড়ে না। আলাপ-আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, আমাদের সকলেরই এই অভিজ্ঞতা আছে। মনে পড়িল, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে অবস্থানকালে আমিই একবার এই কারণে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম। একটা জরুরী চিঠি ছিল, সেই দিনই তাহা ডাকে না দিলেই নয়। গ্রামের স্কুলের একজন গ্রাজুয়েট-শিক্ষককে ষ্টীমার-ঘাটের ডাক-বাক্সে চিঠিটি ছাড়িয়া দিতে বলিলাম, কিন্তু পরদিন শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম, চিঠি ডাকে যায় নাই। শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং ষ্টীমার-

* কলিকাতা ময়দানে লর্ড রবার্টস্-এর ষ্ট্যাচুর নীচে প্রত্যহ বৈকালে আমরা কয়েকজন সমবেত হইয়া নানা বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করি। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া আমাদের এই ক্লাব চলিতেছে।

ঘাট পর্য্যন্ত যাওয়ার কষ্ট স্বীকার না করিয়া একটি ছাত্রকে চিঠিটি দিয়া দায়িত্ব এড়াইয়াছেন। ফলে যাহা হইবার হইয়াছে।

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অন্য অনেক কথাও আমার মনে পড়িতে লাগিল। কাজে ফাঁকি দিবার, যতক্ষণ সম্ভব কর্ত্তব্যকে এড়াইয়া চলিবার প্রবৃত্তি যেন বাঙালীর স্বভাবগত। একটা ঘটনার কথা মনে আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি গ্রীষ্মকালে একমাস করিয়া নিজগ্রামে অতিবাহিত করিতাম। তখন আমার কাজ ছিল, খুলনা জেলায় যেখানে যেখানে স্কুল-কলেজ আছে, দুই একদিন করিয়া সেই সব জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ানো। সব স্কুলেরই তখন অবকাশ। ছেলেদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহারা দ্বিপ্রহরে সময় কাটায় কি করিয়া। বিশেষ যে সদুত্তর পাইতাম তাহা নয়। নিদ্রাদেবীই সাধারণতঃ ইহাদের অনেকের অনেক দুশ্চিন্তাই হরণ করিয়া থাকেন। এই মোহিনীর বিরুদ্ধে কি করিয়া অভিযান করা যায় তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলাম। আমাদের গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, সুতরাং দুই চার-জন গ্রাজুয়েটের অভাব ছিল না। আণ্ডার গ্রাজুয়েটও ছিল। দ্বিপ্রহরে আহারের পর বেলা একটা নাগাদ, এই সকল গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, স্কুলের ১ম ২য় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের লইয়া আমার আহ্বানে আমাদের বৈঠকখানায় সমবেত হইত। আমি বিদ্যার তারতম্য অনুসারে তাহাদিগকে কাজের ভার দিতাম: ইংরাজী সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদির চর্চ্চা করিবার ভার এক একজনের উপর পড়িত; এক একজন গ্রাজুয়েটের অধীনে একজন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের অধীনে ১ম শ্রেণীর ছাত্র, ১ম শ্রেণীর ছাত্রের অধীনে ২য় শ্রেণীর ছাত্র এই ভাবে কাজ চলিত। কার্য্যবিভাগ করিয়া দিয়া আমি অন্তরালে নিজের ঘরে চলিয়া যাইতাম। নিভৃতে অবসরযাপন নিতান্ত প্রিয় হইলেও ভাগ্যে তাহা ঘটিত না। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর অত্যন্ত সন্তর্পণে বৈঠকখানা ঘরের দরজার ছিদ্র-পথ দিয়া এই সকল শিক্ষক-ছাত্রদের পড়া-পড়া-খেলা কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখিতে আসিতে হইত। নানা মনোরম দৃশ্যে আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত হইত; প্রথমবারে, দুই একজনের মৃদু নাসিকাধ্বনি শ্রুত হইত, লক্ষ্য হইত, অন্য দুই একজন অহিফেনসেবীর মত ঝিমাইতেছে। আরো আধঘণ্টা পরে—নাসিকাধ্বনি প্রবল, যাহারা ঝিমাইতেছিল তাহারাও নীরব নহে। সেনাধ্যক্ষ, উপসেনাধ্যক্ষ এবং পদাতিক প্রায় সকলেই এক পথের পথিক হইয়াছে, ক্বচিৎ কদাচিৎ এক আধজনকে বই হাতে শ্মশান জাগিতে দেখা যাইত।

কৌতূহলী হইয়া অনুসন্ধান সুরু করিলাম। এই সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহরের অবসরযাপন গ্রামের ছেলে-বুড়া, প্রৌঢ়-যুবারা কি ভাবে করিয়া থাকে তাহার খোঁজ লইতে লাগিলাম। দুই ইতিহাস কোথায়ও শুনিতে হইল না; মাত্রা এবং প্রণালীর যা পার্থক্য—নিদ্রাদেবীর সেবা ইহারা সকলেই করিয়া থাকেন। জীবনের মহামূল্য সময়ের এক তৃতীয়াংশ, অধিকাংশ পল্লীবাসী বাঙালীই নিরুপদ্রব নিদ্রার সাধনায় কাটাইয়া দেয়। সর্ব্বত্রই এই এক ইতিহাস, শুধু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা নয়, বালকেরাও অহিফেনের মত সকলেই নিদ্রার কবলে আত্মহারা। নিদ্রাভঙ্গের পর ফোলা ফোলা চোখ মুছিতে মুছিতে সমবয়স্কদের আড্ডার খোঁজ করা, সেখানে রাজা-উজীরমারী গল্প অথবা তাসপাশা দাবার শরণাপন্ন হওয়া—ইহাই হইল পল্লীবাসী বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা এবং অন্যান্য কঠিন সমস্যা যাহার খুসী সমাধান করুক, বাঙালী হইয়া জন্মিবার সৌভাগ্য যাহারা লাভ করিয়াছে তাহারা না ঘুমাইলে চলিবে কেন?

পাড়াগাঁয়ের এইরূপ একটি ছেলেকে লইয়া পরীক্ষাকার্য্যে আমি আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি। ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছে—অবস্থা-বৈগুণ্য হেতু গ্রামে সে একপ্রকার অর্দ্ধাশনেই দিন কাটাইত। একজন আমার নিকট তাহাকে আনিয়া দিল। কলিকাতায় লইয়া আসিয়া তাহাকে একটি কারখানায় জুড়িয়া দিলাম। আশা হইল যে, প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের আহারের পর দুই তিন মাইল হাঁটিয়া বাড়ী কারখানা করিতে করিতে এবং চার পাঁচ ঘণ্টা কারখানার ফাইফরমাস খাটিতে খাটিতে দিবানিদ্রার নেশা সে পরিহার করিবে। সপ্তাহের কাজের ছয় দিন (week days) বাধ্য হইয়াই সে তাহা করিতেছে বটে কিন্তু যেই রবিবার আসিল, সাড়ে দশটা বাজিতে না বাজিতেই নাকে মুখে ভাত

ডাল গুঁজিয়া আমাদের কলেজের * চিলেকোঠায় সে অন্তর্দ্ধান করে, সেখানে সারি সারি ছাত্রদের শয্যা সজ্জিত থাকে, তাহারই একটাতে পড়িয়া ছয়দিনের মৌতাত সুদে আসলে উশুল করিয়া লয়।

এই মজ্জাগত আলস্যই বাঙালীর সর্ব্বনাশ করিতেছে—আলনাস্কারের মত কাজের ফাঁকেই সে দিবা স্বপ্নে মগ্ন হইয়া কাজ পণ্ড করিতেছে; কুড়েমির এই জড়ত্ব তাহার দেহ ও মন উভয়ই নষ্ট করিল। ইহা হইতে সে কবে মুক্ত হইবে জানি না, তবে আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিয়াছি যে, এই আলস্য পরিহার না করিলে বাঙালী জাতির মুক্তি নাই, যতদিন এই সর্ব্বনেশে নেশা তাহাকে আচ্ছন্ন রাখিবে ততদিন তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। অনেকে বলিবেন, বাংলা দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। কিঞ্চিৎ দিবা-নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানে প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের আহারের পর আধ ঘণ্টা কালের একটু মৌতাতে যে স্বাস্থ্যহানি হয় না বরঞ্চ যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাঁহাদের পক্ষে তাহা কাজের অনুকূলই হয়, ইহা আমি অস্বীকার করিব না। কিন্তু মাত্রা আধ ঘণ্টার বেশী হইলেই তাহা ক্ষতিকর এবং গ্রীষ্ম ছাড়া অন্য ঋতুতে আধ মিনিটের বিশ্রামও অনাবশ্যক। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও দিবানিদ্রা যে আয়ুক্ষয়কারী পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র আমাদের দেশের উপযোগী করিয়াই নিশ্চয়ই লিখিত। বাংলা দেশের গ্রামগুলি যে প্রাণশক্তি হারাইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই দিবা নিদ্রা। পল্লীগ্রামে যদি এই সামরিক আইন জারি করা যায় যে, কেহ অৰ্দ্ধ ঘণ্টার বেশী সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে পারিবে না, তাহা হইলে বোধ হয় ফরাসী বিপ্লবের মত একটা বিপ্লবই বাধিয়া যাইবে।

ফল কথা, এই নিদারুণ আলস্যই আবাল বৃদ্ধ-বনিতা বাঙালীর সর্ব্বনাশের মূল কারণ। কাজ না করিবার ওজুহাত ত অনেক শুনিয়া থাকি কিন্তু কাজ করিবার স্পৃহা দেখিতে পাই কই? অনেক যুবক আমার নিকট আসিয়া অনুযোগ করেন, মহাশয়, ব্যবসা করিব, মূলধন পাইব কোথায়? আমি এই সকল প্রশ্নকারীর এক একজনকে মাঝে মাঝে সঙ্গে লইয়া ময়দানে বেড়াইতে যাই, পথে বাজার বাজারের মোড় হইতে বরাবর চৌরঙ্গী লেড্‌লর বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে যতগুলি পানবিড়ির দোকান আছে তাহা গণনা করিতে বলি। তাহাকে জানাইতে বাধ্য হই, এই কলিকাতা সহরেই অন্যূন কয়েক হাজার পান চুরুট বিড়ি ও মিঠাপানির দোকান আছে কিন্তু তাহার মধ্যে বাঙালীর দোকান নাই—ভ্রমক্রমে এক আধটা বড় জোর থাকিতে পারে। যে সকল লোক এই সকল দোকান চালায় তাহারা অবশ্য বেহারা ও শ্রমজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এই কার্য্যের জন্য উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েটের আবশ্যক নাই। কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষিত আর কয়জন? পাঁচ কোটীর মধ্যে বড় জোর ৩০ লাখ। বাকীরা কি সকলেই খাইয়া-পরিয়া সুখে আছে? তাহাদের মধ্য হইতেই বা পানের দোকান করিবার লোক পাওয়া যায় না কেন? এই ব্যবসায়ে মূলধন বেশী লাগে না। যেটুকু জায়গায় ইহাদের দোকান তাহার ভাড়া মাসে সাধারণত দেড় টাকা দুই টাকার বেশী নয়, অবশ্য সদর রাস্তার মোড়ে ভাড়া বেশী। ইহারা যে কেবল পান চুরুট বিড়ি সোডা লেমনেডই বেচে তাহা নয়, গ্রীষ্মকালে সরবৎ বেচিয়াও বেশ দুপয়সা অতিরিক্ত আয় করে। লক্ষ্য করিয়াছি, ঠেলাগাড়ী করিয়া ভর্ত্তি সোডা লেমনেডের বোতল দিয়া খালি বোতল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কোম্পানীই করে, তাহার জন্যও বিশেষ মূলধনের আবশ্যক হয় না। সুতরাং মূলধনের ওজুহাতটাই বড় ওজুহাত নয়। আসলে শ্রমবিমুখতা ও আলস্যই অবাঙালী কর্ত্তৃক বাঙালীর পরাজয়ের প্রধান কারণ। আমার আত্মচরিতে 'সময়ের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার' শীর্ষক অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, নিয়মিত সময়ে নিয়মিতরূপে কাজ করিলে একজন মানুষ সাধারণত যতটুকু কাজ করে অন্যূন তাহার দশ গুণ বেশী কাজ করিতে পারে। আমার প্রাত্যহিক জীবন এই নিয়মেরই অধীন। এ বিষয়ে বলিতে গেলে সত্যই আমার ধৈর্য্য থাকে না এবং বলিতেও আমি কখনও নিবৃত্ত হইব না। ইদানীং অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকায় বারবার এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বাঙালী পাঠক সাধারণকে আমি উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি, এই বিষয়ের গুরুত্ব আমার নিকট এতই অধিক।

গদীয়ান-ভাব

কুড়েমির পরেই গদীয়ান-ভাব বাঙালীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। গদীয়ান-ভাব শুধু যে সহরগুলিতেই লক্ষ্য

* ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স

করিয়াছি তাহা নয়, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং বাঙালাদেশের অন্যান্য নানাস্থানে, সুদূর নিভৃত পল্লীতে পল্লীতে লক্ষাধিক মাইল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—সর্ব্বত্রই এই গদীয়ান-ভাবের আধিক্য দেখিয়াছি। তাহার ফলে, বাঙালী গদীয়ানদের হাত হইতে বাংলার প্রায় সমস্ত ব্যবসাই অবাঙালীদের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল বড় বড় গঞ্জে পূর্ব্বে সাহা তিলিরা কাঁচামাল অর্থাৎ পাট, সরিষা, কলাই ইত্যাদির ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল এখন মাড়োয়ারীরা সে সকল স্থানে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া এই সকল 'গদীয়ান' গন্ধবণিকদের ক্রমশঃ অপসারিত করিতেছে। এখানে 'গদীয়ান' কথাটা একটু প্রণিধানযোগ্য। জাতিভেদ-প্রথাবশতঃ বহু শত শত বৎসর ধরিয়া গন্ধবণিক তিলি তামিল সাহা কাপালিক প্রভৃতি জাতিরা বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনা করিত। পয়সার গরমে তাহারা এই সকল ব্যবসাবিষয়ক শিক্ষার ধার বড় একটা ধারিত না। ব্যবসা একচেটিয়া হওয়াতে ব্যবসা সংক্রান্ত পরিশ্রমও তাহারা বড় একটা করিত না। বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের হাতে সমস্ত ন্যস্ত করিয়া তাহারা আমারি চালে গদীয়ান হইয়া বসিত। এদিকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চবর্ণ জাতিও এই সকল 'হীন' কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে লজ্জা পাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত উপাধিধারী যুবক এই সকল সহজ ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করিয়া দ্বারে দ্বারে চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিয়াছে, উপবাসে দিন কাটাইয়া দিতেছে। কেহ কেহ বা আত্মহত্যা করিয়াও অন্ন-সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইতেছে। প্রত্যহ সংবাদপত্রে এইরূপ দুই একটি ঘটনা দেখিতে পাই।

যতদিন রেলওয়ে ষ্টীমারের বহুল বিস্তৃতিতে বাংলাদেশের পথঘাট তেমন সুগম হইয়া উঠে নাই, অর্থাৎ বাংলাদেশ এক-প্রকার স্বতন্ত্রই (isolated) ছিল ততদিন এই সকল গদীয়ান মহাজনদের রাজত্ব অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছিল, তাহারা গদীয়ানের চালেই দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু চিরদিন এরূপ থাকিতে পারে না। যেই যাতায়াতের সুবিধা হইল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের লোক কলিকাতা আসিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে দরিদ্র কৃষকদের দাদন দিয়া একটির পর একটি ব্যবসা অধিকার করিতে লাগিল তখনও এই গদীয়ানদের চক্ষু ফুটিল না; তাহারা তখনও লম্বোদর লইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া হুকুম চালাইতে লাগিল। মালপত্র অল্পবেতনভোগী ভৃত্যের মারফতে বেচাকেনা হইতে লাগিল—সে পয়সার লোভে যথেচ্ছাচার সুরু করিল। ফলে ফাঁকা গদীয়ানত্ব থাকিল কিন্তু ব্যবসা মরিল

কিন্তু মাড়োয়ারী গদীয়ানরা কখনও এরূপ করে না, পরের উপর কেনাবেচার গুরুভার ন্যস্ত করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত নয়। এবিষয়ে তাহারা এতই চৌকস যে সামান্য খুটিনাটির ব্যাপারেও লক্ষ্য স্থির রাখিতে তাহাদের কখনও ভুল হয় না। ঠিক চরকির মত তাহারা ঘোরে, এখানে ওখানে সর্ব্বত্র নিজে উপস্থিত থাকে।

আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমান নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার ফরিদপুরের অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে বলি। পাটের ব্যবসায়ে অবাঙালীদের হাতে বাঙালীদের পরাজয় কি প্রকারে সংঘটিত হইল তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে ১৮,৮৮০ জন বাঙালী পাটের মহাজন ছিল; ১৯৩১ সালের সেন্সাসে এই সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া ৩,৮৯৮ জনে দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইভাবে চলিলে দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই কয়েকজনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে।

যখনই এসকল গদীয়ান মহাজনদের সন্তানেরা কলিকাতার প্রেসিডেন্সী প্রভৃতি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ছাপ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তখনই তাহাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। কারণ শিক্ষা ও সভ্যতার ছোঁয়াচ পাইয়া এই সকল শ্রীমানেরা রাতারাতি এমনই লায়েক হইয়া উঠিতে লাগিল যে বাপপিতামহের গদীতে বসিয়া ব্যবসায়-কর্ম্ম করাটাকে তাহারা অত্যন্ত হীন কাজ বলিয়া গণ্য করিল। পুরাতন অসৎ আমলাদের উপর ব্যবসা-পরিচালনের ভার পড়িল—গদীয়ান-পুত্রেরা কলিকাতায় বাসা বাঁধিয়া বাবুগিরি করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের বুলি হইল, টাকা পাঠাও টাকা পাঠাও। টাকাও আসিতে লাগিল, জাহান্নামের পথে রীতিমত অগ্রসর হইতে তাহাদের দুই এক বৎসরের অধিক সময় লাগিল না।

একটি দৃষ্টান্ত দিই। কয়েক বৎসর হইল, ভাগ্যকুলের তিলি সম্প্রদায়ের একজন জমীদার মহাজন আমাকে জানাইলেন, যে, তাঁহার এক পুত্র বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। তাহাকে বিলাত পাঠানো উচিত কিনা সে বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, দোহাই, আর যাই করুন, ছেলের এই খেয়াল পরিতৃপ্ত হইতে দিবেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আপনাদের ব্যবসা ভাল চলিতেছে, ইহার কি আরও শ্রীবৃদ্ধি করা চলে না? বিদেশীয়দের দৃষ্টান্ত দেখুন, কলিকাতার এণ্ড্ ইউল, রেলী ব্রাদার্স, গিলাণ্ডার্স প্রভৃতি যে সকল বড় বড় ফার্ম্ম, তাহারা তো উত্তরোত্তর তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার

করিয়াই চলিয়াছে; আপনাদের ছেলেদের এই সদিচ্ছাটা হয় না কেন? ব্যারিষ্টারী পড়িয়া গোলামী করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের জাগে কেন?

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে অনেক গদীয়ান মহাজনের সন্তানেরা বিলাতফেরত হইয়া আসিয়া আর হাটখোলা অঞ্চলের সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বসবাস করিতে পারিতেছে না; চৌরঙ্গী অঞ্চলে গিয়া স্বতন্ত্র সংসার পাতিয়া সংসার-খরচ দুনো না করিলে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতেছে না। শ্রীমান নলিনীরঞ্জনও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, এইভাবে বাংলার সমস্ত অন্তর্বাণিজ্য এই সকল হাটখোলার মহাজনদের হাত হইতে সরিয়া যাইতেছে এবং বাংলার চরমতম দুর্দ্দিন ক্রমশ ঘনাইয়া আসিতেছে।

আরও বলিব

আমার কথা শেষ হয় নাই, আমার জীবিতকালে আমার কথার শেষ হইবে কিনা জানি না। এতদিকে এত আঘাত খাইয়া বাঙালীর চৈতন্য কি জাগ্রত হইবে না?

বাঙালীর অন্নসমস্যা যে কি প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে তাহাও যে আবার তাহাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। আমি এই কার্য্যকে আমার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং এ বিষয়ে বারান্তরে আরও অনেক কিছু বলিব।

প্রদর্শনী
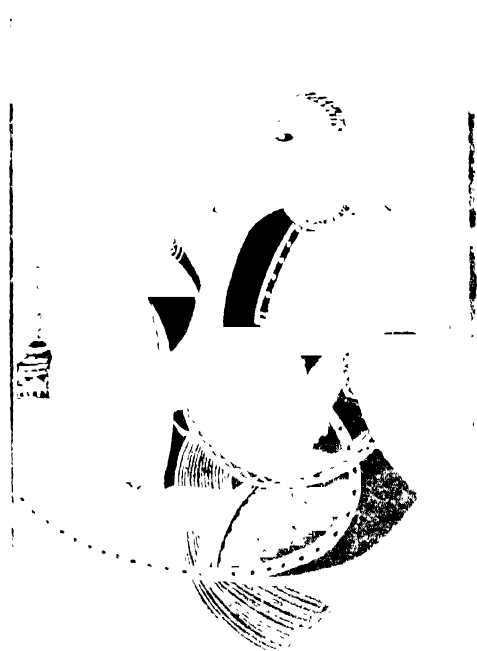
গত শ্রাবণ সংখ্যায় আমরা শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের পুত্র জীমূতবাহন রায়ের অকালমৃত্যুর সংবাদ দিয়াছি। জীমূতবাহন অতি অল্পবয়সে শিল্প চর্চ্চায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় হিসাবে এখানে তাঁহার দুইটি ছবি দেওয়া হইল। এই সংখ্যায় তাঁহার একটি ত্রিবর্ণ চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। চিত্র-শিল্প চর্চ্চার প্রচলিত রীতি হইতে এই ছবিগুলির রীতি যে একেবারে ভিন্ন, ইহা সকলেই বুঝিবেন। বহুদিন ধরিয়া বাংলার যে-পট-শিল্প অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছিল, শিল্পী যামিনী রায় তাহার পুনরুদ্ধারকল্পে স্বকীয় প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছেন। পুত্রও পিতার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি যে শিল্প-জগতে অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেন, এই ছবিগুলি দেখিয়া নিঃসন্দেহে তাহা বলা যায়।

কাশী

-শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তিন বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে গুরুকুলবাস করিয়া দেশে ফিরিয়াছি। বিদেশের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নগর দেখিয়া আসিয়াছি—এডিনবরা, অক্‌স্‌ফোর্ড, পারিস্‌, বার্লিন, ড্রেস্‌ডেন, ন্যুরন্‌বার্গ, মিউনিক, মিলান, জেনোয়া, পিসা, ভেনিস, ফ্লরেন্স, রোম, নেপল্‌স্‌, আথেন্স্‌; সৌধে দেবায়তনে চিত্রশালায় অমরাপুরীবৎ সুন্দর এক একটি নগরী; আবার ইহাদের প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও প্রকারের শিল্প কার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ফরাসীতে যাহাকে বলে Ville d'Art—কলা-নগরী বা শিল্পসুষমাময় নগরী। ইহাদের মধ্যে একটিতে—শিল্প, দুইয়ে যেন প্রতিযোগিতা করিয়া এই সব শহরকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ইউরোপে বাস ও ভ্রমণের কালে যখন এই সব নগর দেখিতাম, তখন অহরহঃ আমাদের দেশের একটি নগরের কথা মনে জাগিত, এবং আবার ভাল করিয়া সেই নগর দেখিবার জন্য ও তাহার ভাবধারায় স্নান করিবার জন্য মনে এক বিপুল আকাঙ্ক্ষাময় আবেগ আসিত। সেই নগরটী হইতেছে কাশী। বাহিরের অনেক ভাল জিনিস দেখিয়া আসিয়া, তুলনা করিয়া ঘরের কোনও জিনিস যে সত্যই সুন্দর তাহা যখন বুঝিতে পারা যায়, তখন বাস্তবিকই মনে একটা আনন্দ জাগে। সত্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর Villes d'Art গুলির মধ্যে যে কাশী অন্যতম, একথা জোর গলায় বলা যায়। আমরা বাঙ্গালীরা এই হিসাবে দুর্ভাগা—কাশী বা মথুরা, জয়পুর বা আগরার মত একটীও কলা-নগরী বাঙ্গালা-দেশে গড়িয়া উঠিল না। ঐরূপ একটীমাত্র নগরী সারা বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে দেখা যায়,—সেটী হইতেছে বিষ্ণুপুর; বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বাঙ্গালা-দেশের সমস্ত নগর-গুলির শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জন-সাধারণ চিনিল না, দেখিল না, আদর করিতে শিখিল না।

বেণীমাধব—ঔরঙ্গজেবের মস্‌জিদ (জুলিয়ান-গৃহীত আলোকচিত্র)।

পারিস্‌-এ প্রায় বৎসরকাল ধরিয়া বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, এবং এই শহরকে মনে প্রাণে ভালবাসিতেও আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই সমস্ত শহর কত প্রাচীন কীর্ত্তি, মধ্য যুগের ও কচিৎ প্রাচীন যুগের ইউরোপের কত প্রাচীন স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও এই নগরগুলি অতুলনীয়—কোথাও নদী, কোথাও বা পর্ব্বত, কোথাও বা সাগর এই সকল স্থানকে নয়নাভিরাম করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মানুষের কৃতি

এমন বাঙ্গালী কে আছে, এমন ভারতীয় হিন্দুও কে আছে, কাশী যাহার ভাল লাগে না? কোন্ কৈশোর বয়সে, সেই দূর স্বপ্নের মত ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বেকার কালে, প্রথম কাশী দেখিয়াছিলাম। তখন কাশীর প্রবহমান জীবনের দৃশ্যপটগুলিতে যে মোহন তুলিকাপাত দেখিয়াছিলাম, সে তুলির টান আমার সোনার কাশী হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। রাজঘাট ষ্টেশনে নামিয়া একখানি এক্কা করিয়া সুদীর্ঘ পথ ধরিয়া বাঙ্গালীটোলায় আসি, আমার এক পিসিমা

কাশীবাস করিতেছিলেন, তাঁহার বাসায় আসিয়া উঠি। কলিকাতার ট্রাম ও ঘোড়ার গাড়ী মুখরিত, জনাকীর্ণ ও আমার চোখে বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যহীন রাস্তার অতি সুপরিচিত একঘেয়েমির পরে—তবুও সে যুগে তখন মোটরগাড়ীর এত ছড়াছড়ি ছিল না এবং বাস্‌ও তখন হয় নাই কাশীর রাস্তাতেই আমার চিত্ত হরণ করিল। এ জিনিস যে একেবারেই অপ্রত্যাশিতরূপে সুন্দর; কলিকাতায় বসিয়া বসিয়া প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া আসিতে-ছিলাম, তাহা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এই কাশীতেই আমার নিকট ধরা দিল। কলিকাতায় কাশীর লোকের অসদ্ভাব নাই—কিন্তু কাশীর রাস্তায় তাহাদের দেখিয়া অন্য রকম লাগিল। গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে আলোকিত ও উত্তপ্ত রাস্তা; বিরাটকায় তিনটি করিয়া বলীবর্দ্দের দ্বারা বাহিত গোযান,—গোরু ও গাড়ীর আকার এবং গাড়ীর চাকা সবই আমাদের বাঙ্গালা-দেশের তুলনায় কতটা বড় এবং কতটা শক্তির ব্যঞ্জক! খোলার চালের বাড়ীর শ্রেণীর মাঝে মাঝে দুই একখানা করিয়া ইটের বা পাথরের ইমারত; সবচেয়ে চমৎকার লাগিল, পাথরের বারান্দাগুলি,—বাড়ীর ছাতের ধারে অনুচ্চ পাতলা পাতলা পাথরের আলিসাগুলি যেন রোমান্সের আকর স্বরূপ দণ্ডায়মান—সেগুলিতে আবার একটু করিয়া রেখা টানিয়া বা পদ্মপাতার নক্‌সা কাটিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। জরীর পাড় দেওয়া লাল হলদে' সবুজ বেগুনে' নানা রঙের চুপটা বা চাদর পরিয়া অত্যন্ত শালীনতার সহিত সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া কাশীর মেয়েরা—গিন্নী ঝী বৌ সকলে গঙ্গা-স্নান সারিয়া ফিরিতেছে; ইহাদের গতিভঙ্গী কেমন শুদ্ধ ও সুন্দর লাগিল! নথ-নাকে হলদে' কাপড়-পরা দুই একটী ছোট মেয়ে—কন্যা-রূপা গৌরী-মাতা হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া যেন কাশীর রাস্তায় অবতীর্ণা। একা গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ীর সামনে মেয়েরা আসিয়া পড়িলে হাঁক দিতেছে—'এ মাঈ, এ মা জী!' পুরুষ আসিলে বলিতেছে—'এ ভৈয়া, এ দাদা!'—কই, ইহারা তো কলিকাতার গাড়োয়ানদের মত পথচারী পথিকের সঙ্গে গর্ব্বদৃপ্তভাবে দুর্ব্ব্যবহার করে না! পরে যখন কাশীর ঘাটের শোভা দেখিলাম—পিসিমার সঙ্গে ঘাটের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া কেদার ঘাট হইতে বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত আসিলাম, তখন ঘাটের উদার প্রস্তরময় সোপান-রাজি ও উচ্চশীর্ষ প্রাসাদাবলী আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। 'কি সুন্দর! কি সুন্দর!'—এই এক কথার আবৃত্তি ছাড়া ভাষায় আর কথা জুয়াইল না।

ঘাটের দৃশ্য (হালিমান্-গৃহীত)।

তারপরে বহুবার কাশী গিয়াছি। কিন্তু কাশীর সেই প্রথম দিনের মোহ আর কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না। কাশীতে পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কাশীর ভিতরকার রহস্য, কাশীর কাশীত্ব—এখনও যেন যাইয়াও যায় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার কাশীখণ্ডে সমসাময়িক কাশীর যে জীবন্ত ও উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন, আধুনিক কাশীতে সেই চিত্রের অনেকটা এখনও পাওয়া যায়। ভেনিস্-এর কানাল্-গ্রান্দের খালের পাড় দিয়া-ই বেড়াই, বা মিউনিকে Isar ইজার নদীর সগর্জ্জন দ্রুত বেগ-ই দেখি, বা পারিসে বিকালে এক পশলা বৃষ্টির পরে আকাশে মেঘের গায়ে আর শহরের পুরাতন বাড়ীর দেওয়ালে আর রাস্তার

ধারের গাছপালায় অপূর্ব্ব-সুন্দর রঙের সমাবেশ-ই দেখি—কাশীর ঘাটে বসিয়া লোকেদের স্নান-আহ্নিক দেখিতে দেখিতে গঙ্গার সুশীতল বায়ুর জন্য প্রাণের ভিতরে যেন হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিত।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে আবার কাশীতে আসিলাম—এক পূজার ছুটিতে। বোধহয় পাঁচ বৎসর পরে কাশীর পুনর্দর্শন। ইহার মধ্যে অনেক কিছু দেখিয়া আসিয়াছি, জীবনে অনেক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

কাশীর ঘাটের মন্দির ও প্রাসাদ (নিউএনকাম্প রচিত খোদাই-চিত্র)।

পিসিমা বহুদিন হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন—এবার উঠিলাম অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। হালের বিলাত-ফেরত—আমার স্নানের জন্য ঘরের ভিতরে জলের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া নিজেই একটু তেল চাহিয়া লইয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া গঙ্গায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। অগত্যা আত্মীয়টীও সঙ্গে চলিলেন—কিন্তু তিনি যে অখুশী হইলেন, তাহা বলিতে পারি না। খালী পায়ে বাঙ্গালীটোলার চির-পরিচিত সেই সব সরু গলি দিয়া আসিলাম। হাতী-ফট্‌কার কাছে দেওয়ালের গায়ে কালো রঙে আঁকা হাতীটা এখনও রহিয়াছে, কিন্তু রঙটা জ্বরড়িয়া গিয়াছে, রেখাগুলি আর তেমন সুস্পষ্ট নাই। পাঁড়ে-ঘাট বাড়ীর কাছে পড়ে, পাঁড়ে-ঘাটেই আসিলাম। ছোট ঘাটটী, ঠিক যেন ঘরোয়া ব্যাপার। যাহারা নাহিতে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালীই বেশী—ঘাটটী বাঙ্গালা-দেশের কোনও স্থান বলিয়া যেন ভ্রম হয়। পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে চাতালের উপরে জন তিনেক ঘাটোয়াল ব্রাহ্মণ, বিরাট বাঁখারির ছাতার তলে বসিয়া স্নান-নিরত 'যজমান'দের কাপড় আগলাইতেছে, কোথাও বা সদ্য-স্নাত শিশুদের চন্দন পরাইয়া দিতেছে। জল অনেকটা নামিয়া গিয়াছে—ঘাটের উপরি-ভাগে সিঁড়ির ধাপের পাশে পাশে দণ্ডীদের জন্য যে কতকগুলি ঘর আছে, তাহার দুই একখানা জল চলিয়া যাওয়ায় খালি হইয়াছে। শরতের রৌদ্রে চারিদিক উদ্ভাসিত। পাশেই মুন্সী-ঘাট ও দারভাঙ্গা-ঘাটের বিরাট ও সু-উচ্চ প্রস্তরময় সৌধাবলী—কল-নাদিনী প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গার পবিত্র কূলে যেন বাস্তুশিল্পের ধ্রুপদ সঙ্গীত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছু দূরে অহল্যা-ঘাটের পরেই দশাশ্বমেধ-ঘাটের লাল পাথরের মন্দিরটী, চূড়ার উপর বট ও অশথ-গাছ গজাই-য়াছে। ঘাটের মাথায় উপরে পাথরের ফটকের পাশে দুই একটী অশথ গাছ, হাওয়ায় তাহাদের সবুজ পাতা কাঁপিতেছে। আকাশের হাসি নদীর স্বচ্ছ জলের একটানা স্রোতে যেন প্রতিফলিত হইয়াছে। বহুক্ষণ ধরিয়া মুগ্ধ নেত্রে এই শান্ত সৌন্দর্য্য দেখিলাম—নয়ন যেন তৃপ্ত হইতে চাহে না। তার পরে গঙ্গায় স্নান—সে স্নানে কি তৃপ্তি! যদিও শহরের সমস্ত ময়লা জল দুই তিনটা নহর দিয়া এই সব ঘাটের পাশ দিয়াই বহিয়া আসিয়া গঙ্গার জলকে কলুষিত করিতেছে, ইহা চোখের দেখা বলিয়া মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে অপ্রসন্নতা আসিতেছিল তাহা হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি নাই।

কাশীর আবর্জ্জনা, কাশীর পঙ্কিলতা সত্ত্বেও বাস্তবিকই কাশী অপূর্ব্ব স্থান। এই শহর আমাদের হিন্দু সভ্যতার যথার্থ পীঠস্থান। স্থান হিসাবে আধুনিক কাশী বিশেষ পুরাতন

শহর নহে। উত্তর-বাহিনী গঙ্গার তীরে অবস্থিত আধুনিক কাশীতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব্বেকার কোনও গৃহাদি নাই। কাশীর সব-চেয়ে পুরাতন বাড়ী হইতেছে প্রাচীন বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আকবরের সময়ের তৈয়ারী রাজা মানসিংহের প্রাসাদ—আধুনিক মানমন্দিরের প্রাচীন অংশ, যে অংশে ভারতীয় বস্তুশিল্পের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, মানমন্দিরের বিখ্যাত ঝরোখাটী, ঘাটের উপরেপ্র লম্বিত হইয়া আছে —মানমন্দিরের সেই অংশ আর একটী উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ইমারত। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দির অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রাণী অহল্যাবাঈ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। মুখ্যতঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকেই আধুনিক কাশী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন কাশী ছিল সারনাথের দিকে বরুণার ধারে। তাহার পরে কাশী দক্ষিণে গঙ্গা ধরিয়া বিস্তৃত হয়। উপনিষদের যুগ হইতে কাশী জাতির কথা শুনা যায়। বুদ্ধদেব যখন তাঁহার বাণী প্রথম প্রচার করিতে ইচ্ছুক হন, তখন তিনি সারনাথের নিকটে অবস্থিত কাশীতেই আগমন করেন। কাশী শিবস্থান রূপে পরিচিত হয় ইহার বহু পরে। বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া কাশী হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বিদেশের একটী মাত্র শহর আমাদের কাশীর কথা প্রতিপদে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই শহরটী হইতেছে ভেনিস্। কেবল এখানে গঙ্গার বদলে ভেনিসের বৈশিষ্ট্য খালের ছড়াছড়ি। আর হিন্দু মন্দিরের বদলে রোমান কাথলিক ধর্ম্মের গির্জ্জা। কাশীর গলিগুলিতে যেখানে সেখানে যেমন শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি, ভেনিসেও তেমনি যেখানে সেখানে লোকের বাড়ীর দেওয়ালে ছোট ছোট কুলুঙ্গীতে যীশু বা মা মেরীর মূর্ত্তি। সকালে স্নানের পরে মেয়েরা কাশীতে যেমন এই সব শিবের মাথায় এক কুশী করিয়া গঙ্গাজল এক একটী করিয়া ফুল বা বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিয়া যায়, তেমনি ভেনিসে এই সব যীশু ও মেরীর মূর্ত্তির সামনে মেয়েরা সন্ধ্যায় একটী করিয়া বাতী জ্বালাইয়া দিয়া যায়, হাত যোড় করিয়া প্রার্থনাও পড়ে। কাশীতে হিন্দু মধ্যযুগের জগতের আবহাওয়া পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ভেনিসে তেমনি মধ্যযুগের রোমান কাথলিক ভাবই প্রবল। কাশীর কাঠের খেলনা, পাথরের কাজ, পিতলের কাজ, সোনা-রূপার কাজ, রেশমের কাজ, কিংখাব, নানা প্রকার বিলাসের দ্রব্য বিখ্যাত; ভেনিসও তেমনি কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্পের কেন্দ্র—পিতলের ঢালাই কাজ, কাচের শিল্প, পাথরের কাজ, সাটিন, কিংখাব। পার্থক্য এই যে ভেনিসের লোকেরা তাহাদের প্রাচীন নগরের গৌরব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, নগরের প্রাচীন সৌন্দর্য্য সংরক্ষণ তাহারা বিশেষ ভাবে সচেষ্ট। কিন্তু কাশীর লোকেরা যেন সে বিষয়ে নিতান্তই উদাসীন।

কাশীর গৌরব—তাহার গঙ্গার তীরের ঘাট, এবং তাহার সরু গলিগুলি। ভেনিস্ এবং নেপলেস্-এ এইরূপ সরু
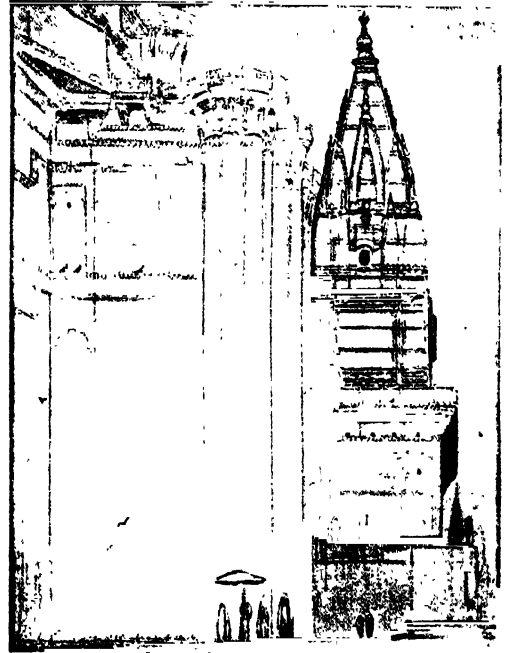
দারভাঙ্গা ঘাটের প্রাসাদ ও অহল্যাঘাটের মন্দির (নিউএনকাম্প অঙ্কিত

গলির অসদ্ভাব নাই। তবে সেখানে এগুলিকে যথাবৎ রক্ষা করা হইতেছে, গলিগুলিকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিবার জন্য উপযুক্ত অর্থব্যয়ও করা হইতেছে। কাশীর মত গলিগুলিকে অশ্রদ্ধার চোখে না দেখিয়া, বা পুরাতন প্রাসাদ ও অন্য বাড়ী ভাঙ্গিয়া সেগুলিকে দূরীভূত করিয়া, চওড়া চওড়া রাস্তা তৈয়ারী করিয়া 'আধুনিক' হইবার চেষ্টা, ইউরোপের ঐ সব শহরের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের মত উষ্ণ দেশে চওড়া রাস্তায় অন্ততঃ দিনে তিনবার করিয়া প্রচুর জল দিবার ব্যবস্থা না রাখিলে

সেগুলি ধূলায় ধূলাকীর্ণ হইয়া থাকে। রৌদ্রে ও হাওয়ায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ধূলায় কাশীর বড় রাস্তা গুলি যখন নিতান্ত অস্বস্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর হয়, তখন পাথরে-মোড়া বাঙ্গালী টোলা ও অন্য পুরাতন মহল্লার গলিগুলি পাশের বাড়ীর ছায়ায় কেমন ঠাণ্ডা থাকে, সেখানে ধূলায় উৎপাত মোটেই হয় না। সেক্‌রোলের রাস্তায় একবার হাঁটিয়া ঘুরিয়া আসিলে দস্তুর-মত ধূলিম্লান হইয়া যায়, পুনরায় ভাল করিয়া স্নান না করিলে গা ঘিণ-ঘিণ করে; পুরাতন কাশীর গলির সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। অথচ সেক্‌রোলের প্রতি যত্ন খুবই করা হয়, পুরাতন কাশীর গলিগুলিকে সাফ রাখিবার জন্যও তেমন কোনও চেষ্টা করা হয় না।

দারভাঙ্গা ঘাটের প্রাসাদ ও [illegible]

কাশীর ঘাটগুলি ভারতের মধ্য-যুগের বাস্তু-শিল্পের এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি, আধুনিক ভারতের—খালি আধুনিক ভারতের কেন, জগতের মধ্যে অন্যতম—অত্যাশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য বস্তু এই ঘাটগুলি। ইহা কেবল ভারতবাসীরই সম্পৎ নহে, ইহা বিশ্বমানবের সাধারণ ভাবে উপভোগ্য প্রাচীন জগৎ হইতে প্রাপ্ত একটি রিকথ। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান কাশীর ঘাট দেখিয়া ধন্য হইয়া যান—সহস্র সহস্র বিদেশীও কাশীর ঘাটের শোভা দেখিতে আইসে, এবং ফোটোগ্রাফের কামেরার বা তুলির আঁচড়ের সাহায্যে ঘাটের সৌন্দর্য্যের কণামাত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে এবং তাহাদের দর্শন-জনিত আনন্দকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের এখনকার হিন্দুজীবন ও হিন্দুসভ্যতা বিদ্যমান, তথাপিও এই জীবনেরই একটা বড় অংশস্বরূপ কাশীর ঘাট, সাধারণতঃ বিরুদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত বিদেশীর-ও মন হরণ করিয়া থাকে। এই ঘাটগুলি National Monument বা ভারতের জাতীয় বাস্তুসম্পৎ স্বরূপ ভারত সরকার হইতে উপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়া সংরক্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু হায়, তাহা হইবার নহে। সরকারের এ বিষয়ে মন দিবার সময় বা ইচ্ছা নাই। কাশীর লোকেরাও উদাসীন, বা এ সম্বন্ধে কিছু করিবার উপযুক্ত জ্ঞান ও অর্থবল উভয়ই তাহাদের নাই। অথচ কাশীর ঘাটের সম্বন্ধে মাঝে এক ভীতিপ্রদ কথা শুনা গিয়াছিল; ঘাটগুলি যে উন্নত ভূখণ্ডে অবস্থিত, উত্তর-বাহিনী গঙ্গার চাপে নাকি সেই ভূখণ্ড অনতিদূর ভবিষ্যতে ধ্বসিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে, কাশীর ঘাটগুলি গঙ্গা-গর্ভে বিলীন হইয়া অতীতের বস্তু হইয়া যাইবে। এই বিপৎপাত হইতে ঘাটগুলিকে যে করিয়াই হউক বাঁচানো আবশ্যক। নদীর জল অন্য পথে চালাইয়া উত্তর মুখে কাশীর অপর পারের কোল দিয়া বহাইতে পারা যায়, কিন্তু তাহা হইলে ঘাটগুলির সামনে আর জল থাকিবে না, কাশীর ঘাট কেবল সিঁড়ির কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইবে—বৃন্দাবনের ঘাট হইতে যমুনা সরিয়া-যাওয়ায় বৃন্দাবনের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে কাশীরও সেই দুর্দ্দশা হইবে। গঙ্গার জল যাহাতে এখনকার মত ঘাটের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, অথচ তাহার গতিবেগে যে ভূভাগের উপর ঘাটগুলি অবস্থিত সে ভূভাগও বিপন্ন না হয়, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কাশীর মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ে একটু চিন্তিত হইয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ পূর্ত্তবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মতও লইয়াছিলেন—কিন্তু শেষে কি ব্যবস্থা ইঁহারা করিলেন তাহা জানিতে পারি নাই। সমবেত ভাবে সমগ্র হিন্দুজাতির চিন্তা ও পরামর্শের এবং রক্ষার জন্য উপায় নির্দ্ধারণের ব্যাপার এইটা।

যাঁহারা কাশীর মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্যের কণা মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কাশীর মত নগর মানুষের চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত ও সমাহিত করিতে কতদূর পর্য্যন্ত সমর্থ হয়। বাস্তবিক, একটী নগরী মানব জীবনের পক্ষে কত বড় একটা আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রভাবের আকর-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা বার বার কাশী দেখিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বলিতে পারি। রোম, যেরুশালেম প্রভৃতি সুপ্রাচীন ধর্ম্ম-ক্ষেত্র সমগ্র জাতি-কে-জাতির জীবনে কিরূপ অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা ইউরোপের ইতিহাস হইতে, য়িহুদী জাতির ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। একটী প্রাচীন দেবক্ষেত্রে বা ধর্ম্মক্ষেত্রে মন্দিরের অবস্থানে ও ভক্তদের সমাগমে যে ভাব-প্রবাহ বিদ্যমান, মনে হয় যেন তাহার সহিত অদৃশ্য জগতেরও যোগ আছে। একটী বিরাট দেবমন্দির মানুষের চিত্তকে বিরাট অরণ্যানী, দিক্‌চক্রবালবেষ্টিত মহাসাগর অথবা আকাশ চুম্বী পর্ব্বতের ন্যায়ই অভিভূত করে। অন্য প্রকারের শিল্পের মত বাস্তু-শিল্পের বিরাট সৃষ্টির যে একটা আধ্যাত্মিক বাণী আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। মডুরার বা শ্রীরঙ্গমের সুবৃহৎ মন্দির, বা মিলানের সুবিশাল গির্জ্জা, অথবা ফ্রান্সের কোনও গথিক গির্জ্জার সহিত শিশুকাল হইতে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করাকে জীবনের একটি কাম্য সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করা যায়। এই সকল বিরাট হর্ম্ম্য, সু-উচ্চ-স্তম্ভাবলী, প্রশস্ত অলিন্দ, সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাবের ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সমস্ত মিলিয়া যেন ঈশ্বরারাধনার ঐকতান সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এগুলির মধ্যে বিচরণ করিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবহমান অমৃত ধারা পান করা বা সেই অমৃত-ধারায় স্নান করা, জীবনে অবতিশয় দুর্লভ বস্তু; বই না পড়িয়া, জীবনের সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহ দেখিয়া যে শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, এইরূপ কোনও নগরের আবহাওয়ার মধ্যে শিশুকাল হইতে পরিবর্দ্ধিত হওয়া। সমগ্র কাশী নগরী যেন একটি বিরাট মন্দির—কাশীর ঘাটগুলি, কাশীর গলিগুলি, কাশীর প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত মন্দির যেন একটী অখণ্ড দেবায়তনেরই বিভিন্ন অংশ। সর্ব্বোপরি, কাশীতে বিশ্বপিতার ও বিশ্ব-মাতার যে প্রকাশের আবাহন ও আরাধনা অহরহঃ চলিতেছে, শিব-উমাময় সেই প্রকাশ অপেক্ষা গভীরতর ও ব্যাপকতর ঐশী শক্তির কল্পনা আর কোথাও হয় নাই। হিন্দু দর্শন ও চিন্তার এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক অনুভূতির

গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যা-বন্দন। (৺ লেমান-গৃহীত আলোকচিত্র)।
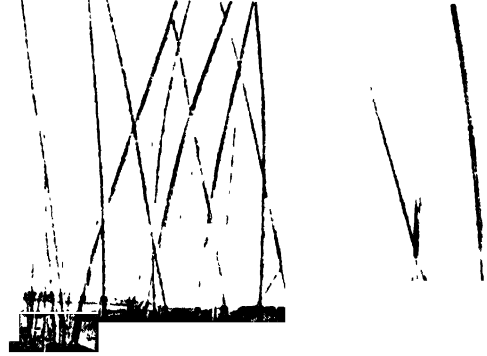
চরম প্রতীক—শিব ও উমা, এবং বিষ্ণু। জ্ঞানময় ঈশ্বর ও প্রেমময় ঈশ্বর—শিব ও বিষ্ণু—এই দুই মহনীয় মূর্ত্তির পাদ-পীঠের নিকটে আর কোন্ দেব-কল্পনা পহুছিতে পারে? সকল জাতির ও সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় এই দুই প্রতীকের মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষের প্রকৃতি ও শিক্ষা এবং রুচি ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে এই দুই ভাবের মধ্যে অন্যতর ভাবটী মানুষকে অভিভূত করে। আমাদের কাশী-নগরী এই শিবেরই মহিমা-দ্বারায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে শিবের লিঙ্গময় মূর্ত্তি বিরাজমান; পথ-ঘাট মন্দির-প্রাঙ্গণ সমস্তই

শিবের নামে মুখরিত —'হর হর বম্ বম্,' 'শিব শিব শম্ভো,' 'মহাদেব মহাদেব', এই সব দেবতার জন্য আহ্বান-বাণী কাশীতেই যেন এক বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধে শরতের সন্ধ্যা-গগন যখন ধূসর-বর্ণ, কোয়াসার মধ্যে

আরাধনা : নন্দলাল বসু অঙ্কিত

দুই একটী নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, এবং নিম্নে গঙ্গার সলিল ঘাটের পাথরের গায়ে লাগিয়া 'ছলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গে' চলিয়াছে; ঘাটের পাথরের উপরে কিংবা জলের উপরে কাঠের পাটাতনে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনায় তন্ময় বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মুখে ভক্তি ভাবের অপূর্ব্ব প্রকাশ; ওদিকে রাত্রির আর-তির নাট্টুকোটা-চেট্টিদের সত্র হইতে সন্ন্যাসীরা 'শম্ভো শিব শিব' রবে ভক্তের প্রাণে অপূর্ব্ব উন্মাদনা ও আকুলতা আনিয়া রাজমার্গ দিয়া পূজার তৈজস ও গঙ্গাজল দুগ্ধাদি উপকরণ লইয়া যাইতেছে; কেদার-ঘাটে তামিল ভক্ত বসিয়া মাণিক্কবাশগারের মধুস্রাবী স্তোত্র গাহিয়া যাইতেছে—ভাষা না বুঝিলেও সেই স্তোত্রের ধ্বনির ঝঙ্কার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রাণের মধ্যে এক আলোড়ন আনিয়া দেয়, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়; নির্জ্জন প্রাসাদের পদ-তলে গঙ্গার উপরে চবুতরায় মৃগ-চর্ম্মের উপর বসিয়া সন্ন্যাসী শ্রুতি-সুখকর স্নিগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে শিবমহিম্ন-স্তোত্রের শিখরিণী ও মালিনী-ছন্দোময় সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে: এবং শেষ—বিশ্বেশ্বর মন্দিরের শয়নারতির ঘণ্টাধ্বনি ও পুরোহিতগণের সমবেত কণ্ঠে স্তবপাঠ;—এইরূপ মানবকণ্ঠোত্থিত সমস্ত আবেদন ও অর্চ্চনা, যেন বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মানব-ভাষাতীত বাণীর সহিত মিলিত হইয়া,—অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে সমীক্ষা, কল্পনা ও অনুভূতির সাহায্যে জ্ঞাত ও পরিচিত করিয়া লইয়া, তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে। মানুষ নিজের অবস্থান-ভূমির পারিপার্শ্বিককে দেবশক্তির পদচ্ছায়াতলে আনিয়া কত সুন্দর ও শোভন করিতে পারে, জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মের পট-ভূমিকা স্বরূপ ঈশ্বরের সত্তা যে সদাবিদ্যমান ও সদাজাগ্রত—কাশীর ন্যায় ধর্ম্ম-নগরী ও কলা-নগরী অহর্নিশি তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষ করাইতেছে, সেই বাণী অহর্নিশি আমাদের কর্ণের গোচরে আনিতেছে। আমাদের এই উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট কর্ম্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে শাশ্বতের এই আবাহন একটী পরম বরণীয় বস্তু; কয়লার খনির খাদের ভিতর আমরা দিনপাত করিতেছি, কাশীর ন্যায় নগর সেখানে মাঝে-মাঝে মহাসাগরের হাওয়া বহাইয়া দেয়, সেখানে রৌদ্র-দীপ্ত আকাশ ও হরিদ্বর্ণ শষ্পের শোভা, এবং ঝরণার শব্দ ও পাখীর গান আনিয়া দেয়।

রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন

(অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে)

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ঠিক এক শত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এই এক শত বৎসরে বর্ত্তমান ভারতের পথপ্রদর্শক ও যুগগুরু বলিয়া রামমোহনের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবন ও কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে খুব বেশী প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে এ-কথা বলা যায় না। তবু, স্থায়ী ভাবে কলিকাতাবাসী হওয়ার পর হইতে (১৮১৫) রামমোহন সম্বন্ধে হয়ত আমরা কিছু কিছু সঠিক সংবাদ জানি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনে যে-সকল ঘটনা ঘটে সে-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে শুধু পরিমাণে স্বল্প তাহাই নহে, প্রামাণিকতার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও সন্তোষজনক নয়। রামমোহনের পিতৃপরিচয়, বাল্যজীবন, শিক্ষা, বিবাহ, জীবিকা, ধনসম্পত্তি, চিন্তাধারার বিকাশ, ধর্ম্মসাধনা, এক কথায় তাঁহার জীবনের বুনিয়াদ সম্বন্ধে প্রচলিত জীবনী হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহা নিতান্তই কিংবদন্তী, গল্প ও অস্পষ্ট স্মৃতিকথার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া রামমোহনের প্রথম জীবনের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের জীবনের অনুরূপ মনে হয় সত্য, কিন্তু উহাকে অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবন-যাত্রার সহিত সম্পূর্ণরূপে খাপ খাওয়ান যায় না। দেশকাল-পাত্রের সেই বাস্তব পরিবেষ্টনীর সন্ধান করিয়া রামমোহনকে উহার মধ্যে স্থাপিত না করিতে পারা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিভার সম্যক বিচার হইতে পারে না। ইতিহাস ও জীবনী-রচনার এই মূলসূত্রটি বিস্মৃত হওয়ার জন্য রামমোহনের প্রচলিত জীবনীগুলি অনেকাংশে একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। সুতরাং এই পুরাতন ভ্রমের পুনরাবৃত্তি না করিয়া রামমোহনের জীবনের বাস্তব ভিত্তি আবিষ্কারই ঐতিহাসিকের প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই অন্বেষণ সফল হইবে কিনা তাহাই বর্ত্তমানে সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে সে-যুগে জীবনী লিখিবার রেওয়াজ ছিল না, সুতরাং রামমোহনের কোন সমসাময়িক জীবনচরিত নাই। আবার এক শত বৎসরের অবহেলার ফলে তাঁহার জীবনী রচনা করিবার যে-সকল উপকরণ পূর্ব্বে মিলিতে পারিত তাহাও দুষ্প্রাপ্য এবং অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-অবস্থায় এ-যুগের লেখকের নিকট হইতে রামমোহনের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক জীবনী আশা করা অন্যায় হইবে। তবে কেহ কেহ হয়ত বহু চেষ্টার ফলে তাঁহার জীবনের কোন ঘটনা বা তাঁহার কোন বিশেষ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আমিও সরকারী দপ্তরের কাগজপত্রের সাহায্যে রামমোহনের জীবনের কতকগুলি জায়গায় আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফলে তাঁহার চাকুরি-জীবন ও অন্য কয়েকটি ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়াছে। ইদানীং আবার আমার হাতে রামমোহনের জীবন-সম্বন্ধে আরও কিছু নূতন উপাদান আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপাদান একটি মোকদ্দমার নথিপত্র।* ১৮১৭ সনে রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ-প্রসাদ রায় রামমোহনের নামে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিসনে একটি মোকদ্দমা রুজু করেন। এই মোকদ্দমায় রামমোহনের প্রথম জীবন ও বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই উঠে, এবং রামমোহনের নিজের, তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্য ও জবানবন্দি লওয়া হয়। রামমোহনের পরিবার-পরিজন, বাল্যজীবন, বিষয়সম্পত্তি ও চাকুরি ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে এই সকল জবানবন্দির ব্যবহার অপরিহার্য্য। এই প্রবন্ধে রামমোহনের প্রথম জীবনের যে বিবরণ দেওয়া হইবে তাহা প্রধানতঃ এই সকল কাগজপত্র ও বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর পত্রাবলীর সাহায্যে রচিত। এই বিবরণ সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু ইহাতে যে-সকল সংবাদ আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে রামমোহনের জীবনীকারদের জানা ছিল না।

রামমোহনের পিতৃপরিচয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পূর্ণ হইবার দু-এক বৎসর পূর্ব্বে এক সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোকের ঘরে রামমোহনের জন্ম

* এই নথিপত্র শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে দেখিবার সুবিধা হইয়াছে ; তজ্জন্য লেখক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

হয়। তিনি যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেই ধরণের পরিবার তখনকার দিনে বাংলা দেশে মোটেই বিরল ছিল না। সে-যুগে অনেক বাঙালীই অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমান রাজসরকারে, বিশেষ করিয়া মুসলমান শাসকদের রাজস্ব-বিভাগে চাকুরি লইতেন ও সেই চাকুরিলব্ধ অর্থে ভূসম্পত্তি কিনিয়া স্বগ্রামে জমিদার বা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেন। বাঙালী সমাজে এই অর্দ্ধ-রাজ-কর্ম্মচারী ও অর্দ্ধ-ভূস্বামী শ্রেণীর অভ্যুদয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘটে।

রামমোহনের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজসরকারের চাকুরি করিয়া 'রায়-রায়ান্' উপাধি পান। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহ পরবর্ত্তীকালে রামমোহনকে যে পত্র লেখেন তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলম্ যখন পূর্ব্বদেশে ছিলেন তখন ব্রজবিনোদ তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদ সরকারে কাজ করিতেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু পর-জীবনে তাঁহাকে আমরা নিজগ্রামে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত দেখিতে পাই।

রামকান্ত ছাড়া ব্রজবিনোদের আরও ছয় পুত্র ছিল। ইঁহাদের নাম—নিমানন্দ, রামকিশোর, রাধামোহন, গোপী-মোহন, রামরাম ও বিষ্ণুরাম। ভ্রাতাদের মধ্যে রামকান্ত পঞ্চম ছিলেন। ইঁহারা সকলে রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসনে একত্র বাস করিলেও পৃথগন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও স্বতন্ত্র ছিল। রামকান্ত রায়ের তিন সংসার ছিল। প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন; দ্বিতীয়া তারিণী দেবী—জগমোহন, রামমোহন ও এক কন্যার মাতা, ও তৃতীয়া রামমণি দেবী—রামলোচন রায়ের মাতা ছিলেন।

তারিণী দেবীর দুই পুত্রের মধ্যে রামমোহন কনিষ্ঠ। পিতার রাধানগরে বাসকালেই তাঁহার জন্ম হয় কিন্তু উহার সঠিক তারিখ লইয়া একটু সন্দেহ আছে। এ-পর্য্যন্ত রামমোহনের জন্মের দুইটি তারিখ চলিয়া আসিতেছে, ১৭৭২ ও ১৭৭৪ সন। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তাহা অকাট্যরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় না থাকিলেও ১৭৭৪ সনের পক্ষে কতকগুলি সমীচীন যুক্তি আছে। সেজন্য এই তারিখকেই আপাততঃ রামমোহনের জন্মের তারিখ বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে।

রামমোহনের জন্মের তারিখ যাহাই হউক, তাঁহার শৈশব যে রাধানগরের বাড়িতেই অতিবাহিত হয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বাড়িতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত সুখসাগরের নিকট পালপাড়া (মালপাড়া নহে) গ্রামের নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সহিত পরিচয় হয়। ইনিই পরজীবনে রামমোহনের গুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী বলিয়া খ্যাত হন। রামমোহনের প্রচলিত জীবনীতে আছে, রামমোহন রংপুরে থাকাকালে হরিহরানন্দ ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হন এবং রামমোহনের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রালোচনায় প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। নন্দকুমারের জবানবন্দি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রামমোহনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বহু পুরাতন এবং শুধু শাস্ত্রালোচনাসূত্রেই নয় বৈষয়িক সূত্রেও বটে। প্রথম জীবনে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার অধ্যাপক ছিলেন। সুতরাং রামমোহন তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অসম্ভব বা বিচিত্র নহে।

১৭৯১ সনে রামকান্ত রায় তিন স্ত্রী, দুই পুত্র ও দৌহিত্র সহ রাধানগরের পৈতৃক বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং নিকটেই লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে নূতন বাড়ি স্থাপন করেন। কি কারণে রামকান্ত পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করেন তাহা জানা যায় না। তবে রাধানগরের বাড়িতে জায়গার অভাব ইহার একটি কারণ হইতে পারে। এই সময়ে রামকান্তের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। তিনি ১৭৯১ সনের মে মাসে কোম্পানীর নিকট হইতে নয় বৎসরের জন্য (১১৯৮-১২০৬ সাল= ১৭৯১—১৮০০ খৃঃ) ভুরসুট পরগণা ইজারা লন। ইহার বাৎসরিক সদর জমা ১,০১,৩৮৯ টাকা ধার্য্য হয়। রামকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র জগমোহন এই ইজারার জন্য পিতার জামিন হন। * রামকান্ত সম্ভবতঃ পুত্রদিগকে অল্প বয়স হইতেই বিষয়কর্ম্মে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৪ সনে মেদিনীপুরের

* Board of Revenue Procdgs. 2 May 1791, Nos. 30, 35.

চেতোয়া পরগণায় হরিরামপুর নামে একটি বড় তালুক জগমোহন রায়ের নামে কেনা হয়। ১২০২ সালের ১২ই চৈত্র (২২ মার্চ্চ ১৭৯৬) তারিখ দেওয়া রামমোহনের লিখিত একখানি বাংলা চিঠি হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই সময়ে তিনিও পিতার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। *

রামকান্ত রায় লাঙ্গুলপাড়ায় যে বাড়ি তৈরি করেন তাহা হইতে সে-যুগের বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ির বেশ একটা ধারণা হয়। বৎসর পঁচিশেক পরে, রামকান্ত ও জগমোহন উভয়েরই মৃত্যু হইলে, বাকী খাজনার জন্য কলেক্টরী হইতে এই বাড়ি নীলামে তুলিবার প্রস্তাব হয়। সেজন্য বোর্ড-অফ-রেভেনিউয়ের কাগজপত্রে এই বাড়িটির অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি, উহা ষোল বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমির উপর অবস্থিত ছিল। তাহা ছাড়া বাড়ির পূর্ব্ব দিকে আঠার বিঘা জুড়িয়া একটি দীঘি ছিল। এই দীঘির ধারে দুই শত তালগাছ। ভিতরেও বাগান এবং আরও দুইটি পুকুর। উল্লেখযোগ্য গাছের মধ্যে এক শত আম ও সত্তরটি নারিকেল গাছ। নিজ বাড়িটি সাত শত হাত পাকা দেওয়ালের মধ্যে। ভিতরে কাঁচা ও পাকা বৈঠকখানা, খড়ে-ছাওয়া নাটমন্দির; আটচালা, রান্নাঘর, পাকা ভাণ্ডার, দোতলা ও একতলা পাকা অন্দরমহল, চাকরদের ঘর-সমেত দুইটি দেউড়ি—মোটের উপর চৌদ্দটি স্বতন্ত্র ঘর। ইহাদের মধ্যে দু-একটি বেশ বড়ই ছিল। অন্দরমহলের দোতলা কোঠা বাড়িটি পঁয়ত্রিশ হাত লম্বা ছিল; উহাতে ছয়টি কামরা। সে-যুগের সকল বাড়ির মত রামকান্তের বাড়িও অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ছড়ান ছিল।

সম্পত্তি-বিভাগ

স্ত্রীপুত্র পরিজন লইয়া রামকান্ত রায় লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়িতে দিন কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল। ১৭৯৬ সনের ১লা ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ, ১২০৩) একটি দানপত্র দ্বারা নিজের জন্য কিছু অংশ রাখিয়া, রামকান্ত বাকী সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। জগমোহন, রামমোহন ও রামলোচন তিনজনই এই দলিলে স্বীকারপত্র লিখিয়া দিলেন এবং উহা থানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাজী খদমোয়াশ্‌শিরার নিকট রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইল। কোন্ পুত্র কোন্ সম্পত্তি পাইবে তাহার তালিকা করিয়া দিয়া রামকান্ত লিখিলেন যে, তাঁহার তিন পুত্র এই ভাগ অনুযায়ী বসতবাটী ও জমিজমা ভোগ করিবে, এবং কাহারও সম্পত্তির উপর অন্য কাহারও কোন প্রকার দাবিদাওয়া থাকিবে না; তিন পুত্রের কাহাকেও নগদ টাকা দেওয়া হইল না; বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বে যাহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহারই থাকিবে এবং পরে যদি দেওয়া হয় তাহা হইলেও এইরূপ ব্যবস্থাই হইবে; তিন পুত্রের অংশ ছাড়া তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির সামান্য অংশ ও বর্দ্ধমানের বসতবাটী তাঁহার নিজের রহিল; তাঁহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দেনা বা উপার্জ্জনের সহিত তাঁহার পুত্রদের কোন সম্পর্ক নাই এবং পুত্রদের আয়ের সহিতও তাঁহার কোন সম্পর্ক রহিল না; অতঃপর তিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন তাহা তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিবেন; পৈতৃক বিগ্রহের সেবা ও পূজার ব্যয় পুত্রেরা সমভাবে দিবেন কিন্তু তাঁহার নিজের স্থাপিত বিগ্রহের জন্য তিনি নিজে দায়ী, উহার সহিত পুত্রদের কোন সংশ্রব নাই; জগমোহন রায় ও রামমোহন রায় তাঁহাদের নিজেদের মাতামহদত্ত জমিজমা পাইবেন; রামলোচন রায় তাঁহার মাতামহদত্ত জমি পাইবেন; ৺ভট্টাচার্য্যের কন্যা [তারিণী দেবী] নিজ পুত্রদের নামে যে জমি এবং পুষ্করিণী ক্রয় করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল এবং রামশঙ্কর রায়ের কন্যা [রামমণি দেবী] যে-সকল জমি ক্রয় করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল; তালুক হরিরামপুর সম্পূর্ণ জগমোহন রায়ের, উহার সহিত রামমোহন রায় বা রামলোচন রায়ের কোন সংশ্রব নাই।

রামকান্ত রায়ের তিন পুত্রই এই দলিলে নিজ নিজ অংশের নীচে, "আমি শ্রী····· রায় বসতবাটী প্রভৃতি যাহা আমাকে দেওয়া হইল তাহা গ্রহণ করিলাম ও এই বাটোয়ারা অনুযায়ী দখল ও ভোগ করিব; যদি অন্য কাহারও নামে লিখিত জমিজমাতে দাবি করি বা কেহ করে তবে তাহা মিথ্যা"—এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করিলেন।

---

* ১৩০৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'নব্যভারত' পত্রের ২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই বাটোয়ারা অনুযায়ী রামমোহন নিম্নলিখিত সম্পত্তি পাইলেন :—

শ্রীরামমোহন রায়ের অংশ

মৌজা লাঙ্গুলপাড়া :—	
বসতবাটী ও বেড়, চৌহদ্দিযুক্ত, গাছ প্রভৃতি সহ এবং খিড়কীর দরজার দিকে পুষ্করিণী ও নূতন পুষ্করিণী।	
এই সকলের অর্দ্ধেক	১ দফা
গোহালবাড়ি ও বেড়, গাছসহ ও চৌহদ্দিযুক্ত বাড়ি	৮ বিঘা
মৌজা কৃষ্ণনগর :—	
সূর্য্যদাস রায়ের বেড় ধানের জমি . .	৯ বিঘা
কোঠালিয়ারকুণ্ডে ধানের জমি	৩ বিঘা
পরগণা চন্দ্রকোণায় পুরণচক্ . .	১০ বিঘা
মৌজা কাটাদলে পৈতৃক বেড়ে আমার অংশ . .	১ দফা
মৌজা কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে রামকৃষ্ণ শেঠ ও অন্যান্য লোক হইতে ক্রীত বাড়ি ও পুষ্করিণী। চৌহদ্দিযুক্ত .	১ দফা
গোপীনাথপুরে পৈতৃক পুষ্করিণীতে নিজ অংশ .	১ দফা

অন্য ভ্রাতাদের অংশের বর্ণনা এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে একটি তালুকের কথা বাদ দিলে তিন পুত্রই সমান ভাগ পান। এই তালুকটি হরিরামপুর, উহা একমাত্র জগমোহন রায়কে দেওয়া হয়। কলেক্টরের চিঠি হইতে জানা যায় যে, জগমোহন রায় এই তালুক নিজ নামে ক্রয় করেন। জগমোহন রায়ের এই তালুকের উপর যে বিশেষ কোন একটা দাবি ছিল তাহা দানপত্র হইতে স্পষ্টই মনে হয়। বসতবাড়ির মধ্যে লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়ি সমানভাবে জগমোহন ও রামমোহনের ভাগে পড়িল। রামকান্ত রাধানগরের পৈতৃক বাড়ির স্বত্ব ত্যাগ করেন নাই। উহা দেওয়া হইল রামলোচন রায়কে। রামকান্ত রায়ের কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ি একমাত্র রামমোহনেরই ভাগে পড়িল, ইহাও উল্লেখযোগ্য। এই বাড়িটির মূল্য তখনকার দিনে আন্দাজ তিন হাজার টাকা ছিল।

পিতার জীবদ্দশায় পুত্রদের এইরূপে সম্পত্তি পাওয়া আইন অনুযায়ী অসিদ্ধ না হইলেও সচরাচর ঘটে না। সুতরাং এই ব্যবস্থা কেন হইল সে-সম্বন্ধে সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমানে উহার কারণ সম্বন্ধে অনুমান ভিন্ন নিশ্চিত কিছু জানিবার উপায় নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ-বিষয়ে দুইটি অনুমান সম্ভব বলিয়া মনে হয়। প্রথমত আমরা জানি, এই বাটোয়ারার অল্পদিন পরেই রামকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচন রায় তাঁহার মাতা রামমণি দেবীকে লইয়া লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি ছাড়িয়া রাধানগরে যান এবং রামমোহন ও জগমোহনের মাতা তারিণী দেবী দুই পুত্র, বধূগণ, দৌহিত্র এবং খুব সম্ভব কন্যাকেও লইয়া লাঙ্গুলপাড়ায় থাকেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, রামকান্তের দুই কনিষ্ঠা পত্নীর মধ্যে অসদ্ভাব ছিল, এবং উহাই সম্পত্তিভাগের অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় অনুমান এই যে, রামকান্ত রায়ের ঋণ থাকায় তিনি পাওনাদারদের হাত হইতে সম্পত্তি বাঁচাইবার জন্য উহার কিয়দংশ পূর্ব্বেই হস্তান্তরিত করিয়া ফেলেন। সম্পত্তি-ভাগের সময়ে রামকান্তের ঋণ ছিল, তাহার উল্লেখ দলিলেই আছে। অন্য কাগজপত্র হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, এই ঘটনার দুই তিন মাস পূর্ব্বে রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানের রাজার সহিত একটি কিস্তিবন্দির চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী তিনি ১২০৪ সালের ১৫ই আশ্বিনের (২৮ সেপ্টেম্বর ১৭৯৭) অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে রাজার প্রাপ্য বাকী খাজানা (৭,৫০১ টাকা) মিটাইয়া দিতে বাধ্য থাকেন। এই টাকা রামকান্ত রাজাকে আর দেন নাই এবং তাগাদা হইলেই 'দিবার ক্ষমতা নাই' এই বলিয়া রেহাই চাহিতেন। * ইহা হইতে মনে হয় তাঁহার ঋণের জন্য পাছে পুত্রদের কোন ক্ষতি হয় এই আশঙ্কায় রামকান্ত পাওনাদারদিগকে বঞ্চিত করিয়া জীবদ্দশাতেই নিজের সম্পত্তি দান করিয়া যান।

সে যাহা হউক, সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও আসিয়া পড়িল। কিছুদিন পরেই মাতাসহ রামলোচন রায় লাঙ্গুলপাড়া হইতে রাধানগরে চলিয়া গেলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত (পৌষ ১২১৬) সেইখানেই বাস করিলেন। রামকান্ত বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন এবং সেইখানে থাকিয়া নিজের ইজারা লওয়া জমিদারী ও মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এইখানে বলা প্রয়োজন যে,

* ১৮৩১ সনের আগষ্ট মাসের 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত আমার "A Chapter in the Personal History of Raja Rammohun Roy" প্রবন্ধের ১৬২-৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিনি মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মোক্তার ছিলেন।* সম্পত্তি-ভাগের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রামকান্ত সাধারণতঃ বর্দ্ধমানেই থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়া ও রাধানগরেও না-যাইতেন এমন নহে। তাঁহার পুত্রেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বর্দ্ধমান যাইতেন। দেশে থাকিলে রামমোহনও যে অন্য পুত্রদের মত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তাহার উল্লেখও আমরা একজন সাক্ষীর জবানবন্দীতে পাই। কিন্তু রামকান্তের পত্নীরা কখনও বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করেন নাই।

সম্পত্তিভাগের ফলে রামলোচন রায় ও তাঁহার মাতা লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে কোন বিশেষ ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন হইল না। তারিণী দেবী কর্ত্রী হইয়া বাড়ির ঐহিক ও পারত্রিক সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্র (গুরুদাস মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি তাঁহারই কর্তৃত্বাধীনে বাস করিতে লাগিল।

এই সময় হইতে রামমোহনের কার্য্যকলাপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা আরও একটু বেশী সংবাদ পাইতে আরম্ভ করি। এই সকল সংবাদ যথেষ্ট না হইলেও উহাদের সাহায্যে এই সময় রামমোহন কোথায় কি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। রামমোহনের জ্যেঠা নিমানন্দের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায়ের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সম্পত্তিভাগের নয় মাস পরে রামমোহন কলিকাতায় বাস করিতে যান। রামমোহন সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতার বাড়ি নিজের ভাগে ফেলেন। কিন্তু এত শীঘ্রই তিনি কলিকাতার বাসিন্দা হইয়াছিলেন কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। রামমোহনের লিখিত ২১এ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮ ও ২৮এ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯ তারিখের দুইটি পত্রে† আমরা দেখিতে পাই যে ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ সনের প্রথম দিকে তিনি ভুরসুট পরগণায় পিতার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই সকল আভাস-ইঙ্গিত হইতে মনে হয় রামমোহন এই কয় বৎসর বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, লাঙ্গুলপাড়া ও নিকটবর্ত্তী নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

যে-গুরুপ্রসাদ রায় রামমোহনের কলিকাতা যাওয়ার কথা বলিয়াছেন তাঁহার উক্তি হইতেই আমরা আরও জানিতে পারি যে কলিকাতা যাইবার সময়ে রামমোহন তাঁহার "পত্নীগণ"কে লাঙ্গুলপাড়ায় রাখিয়া যান। ইহা হইতে মনে হয় ১৭৯৭ সনের পূর্ব্বে রামমোহন একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই বৎসরে তাঁহার একাধিক পত্নী জীবিত ছিলেন। রামমোহনের বিবাহ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, অতি অল্প বয়সে তাঁহার একবার বিবাহ হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা পর পর তাঁহার দুই বিবাহ দেন। এই কাহিনী সত্য কি-না এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার তাঁহার জবানবন্দিতে বলিতেছেন, ১৭৯৯ সনে বা তাহার পূর্ব্বে রামমোহনের বিবাহ হয় কিন্তু তখন তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। ইহা হইতে মনে হয়, রামমোহনের একটি বিবাহ অন্ততঃ ১৭৯৯ সনের খুব বেশী পূর্ব্বে হয় নাই, এবং তখন তিনি নাবালক নহেন,—প্রাপ্তবয়স্ক।

১৭৯৭ সনে রামমোহন যে কলিকাতা যান তাহার কারণ খুব সম্ভব একটি বৈষয়িক ব্যাপার। ১৭৯৭ সনে তিনি অনরেবল অ্যান্ড্রু র্যামজে নামে কোম্পানীর এক সিবিলিয়ানকে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ্জ দেন। এই র্যামজে মেদিনীপুরের কলেক্টরের সহকারী ছিলেন এবং ১৭৯৭ সনের শেষে কোম্পানীর কুঠীর কমারশিয়াল রেসিডেন্টের সহকারীরূপে কাশী বদলি হন। এই টাকাটা রামমোহন তাঁহার সরকার—গোলোকনারায়ণ সরকারের হাতে এক এটর্নীর আপিসে পাঠাইয়া দেন। সেইখানে র্যামজে দলিল লিখিয়া দেন। এই ঘটনা খুব সম্ভব ১৭৯৭ সনের আগষ্ট হইতে নভেম্বরের মধ্যে ঘটে।

ইহার পর আমরা রামমোহনকে যে ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ সনে ভুরসুট পরগণায় সম্পত্তি-তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত দেখিতে পাই, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

১৭৯৯ সনে রামমোহন বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি বড় কার্য্য সমাধা করেন। এই বৎসরের ১২ই জুলাই (৩০এ

---

* Sadar Diwani Adalat Reports, vol. I, pp. 257-59: "Raja Tej Chandra vs. Jugamohun Roy."

† ১৩০৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'নব্যভারত' পত্রের ২৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আষাঢ় ১২০৬ সাল) রামমোহন বৰ্দ্ধমানে গঙ্গাধর ঘোষ ও রামতনু রায়ের নিকট হইতে ৩,১০০ ও ১,২৫০ টাকায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর নামে দুইটি বড় তালুক একই দিনে ক্রয় করেন। ইহার প্রথমটি জাহানাবাদ পরগণায় ও দ্বিতীয়টি চন্দ্রকোণা পরগণায় অবস্থিত। রামমোহনের ভূসম্পত্তির মধ্যে এ-দুইটি খুব মূল্যবান ছিল। উহা হইতে আদায়-খরচ ও সদর-জমা (বাৎসরিক ২১,৮৬৮৸১৯) দিয়া রামমোহনের পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আয় হইত।

এই তালুক ক্রয়, র‍্যামজেকে টাকা কৰ্জ্জ দেওয়া ও রামকান্ত কর্ত্তৃক পুত্রদের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেওয়া প্রসঙ্গে একটি জটিল প্রশ্ন আলোচনা করিবার আছে। আমরা দেখিতেছি যে, আইন-অনুযায়ী রামকান্ত ও তাঁহার পুত্রেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ইঁহাদের একজনের আর্থিক বন্দোবস্তের সহিত অপরের কোনও সংশ্রব নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই, রামকান্ত ও তাঁহার পুত্রেরা আইনতঃ যতটা স্বতন্ত্র, বস্তুতঃও কি ততটা স্বতন্ত্রই ছিলেন, না তাঁহাদের মধ্যে টাকা-পয়সা ও বিষয়সম্পত্তির কিছু কিছু ব্যাপার তাঁহারা মিলিত হইয়া করিতেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সম্পত্তিভাগের কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল পরে রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় তাঁহার নামে একটি মোকদ্দমা আনেন। এই মোকদ্দমার আরজিতে তিনি বলেন যে ১৭৯৬ সনের ডিসেম্বর মাসে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার এবং রামলোচন রায় ও তাঁহার মাতা লাঙ্গুলপাড়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর রামকান্ত, জগমোহন ও রামমোহন আবার একান্নভুক্ত হন, তালুক রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর রামকান্তের অর্থেই রামমোহনের নামে কেনা হয় এবং অ্যান্ড্রু র‍্যামজেকে যে-টাকা কৰ্জ্জ দেওয়া হয় তাহাও রামকান্তই দেন। রামমোহন নিজের জবাবে এই সকল কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন এবং স্বপক্ষীয় সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করিতে চান যে, সম্পত্তিভাগের পর তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি ও জগমোহন রায়ের স্ত্রীপুত্রাদি তারিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে একত্র থাকিলেও, এবং দেবসেবা ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যয় দুই ভ্রাতা সমান ভাবে এবং একত্রে বহন করিলেও তাঁহাদের হিসাবপত্র সম্পূর্ণ আলাদা ছিল; এবং তাঁহারা সংসার-খরচের টাকা একজন সরকারের হাতে দিতেন। টাকা ধার দেওয়া ও তালুক ক্রয় সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই সকল তাঁহার নিজের টাকায়, উহার সহিত তাঁহার পিতা বা ভ্রাতার কোন সংশ্রব নাই।

রামমোহনের এই উক্তি অসম্ভব তাহা বলা চলে না। কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, রামমোহন যতটুকু বলিয়াছেন রায়-পরিবার প্রকৃত প্রস্তাবেই ততটুকু স্বতন্ত্র ছিল কি-না সন্দেহ করা চলে। আমরা দেখিয়াছি, সম্পত্তিভাগের সময়ে হরিরামপুর তালুক বিশেষ করিয়া জগমোহন রায়কে দেওয়া হয়, এবং তাহার উপর অন্য কাহারও দাবিদাওয়া নাই তাহাও স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়। অথচ বোর্ড-অফ-রেভিনিউয়ের কাগজপত্রের মধ্যে ১৮০০ সনের ১১ই জুলাই তারিখের একটি চিঠিতে দেখিতে পাই বৰ্দ্ধমানের কলেক্টর লিখিতেছেন:—"হরিরামপুর তালুক জগমোহন রায়ের নামে রেজেষ্ট্রী করা হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার পিতা রামকান্তই উহার মালিক বলিয়া প্রকাশ।" তিন বৎসর পরে যখন জগমোহন রায়ের দেয় খাজনা বাকী পড়ে, তখন মেদিনীপুরের কলেক্টরকেও লিখিতে দেখি:—"রামকান্ত রায় জগমোহন রায়ের সহিত একত্রে সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহ করেন বলিয়া বলা হয়।" এহ ত গেল রামকান্ত রায় ও জগমোহন রায়ের সম্পর্কের কথা। এখন রামমোহন ও রামকান্ত রায়ের মধ্যে বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে কোন সংশ্রব ছিল কি-না তাহা দেখা যাক। রামমোহনের হস্তলিখিত ১৭৯৮ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখের যে দুইটি চিঠি মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রকাশ করিয়াছেন ('নব্যভারত', আশ্বিন ১৩০৩), তাহা হইতে দেখা যায় রামমোহন ভুরসুট হইতে কতকগুলি জমিজমা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেছেন। এই সকল জমি সম্পত্তি-ভাগের সময়ে তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির যে তালিকা আমরা পাই তাহারও অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এগুলি তাঁহার পিতার বলিয়াই মনে হয়। এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞান যতটুকু তাহা হইতে দুই-একটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে,—প্রথম এই যে, রামমোহন, জগমোহন ও তাঁহাদের পিতা রামকান্ত এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ লাঙ্গুলপাড়ার বাড়িতে একান্নবর্ত্তীভাবে থাকিলেও তিন জনেই বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে আইনের চক্ষে এবং প্রকাশ্যভাবে স্বতন্ত্র ছিলেন (একজন সাক্ষী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে রায়-পরিবার একান্নবর্ত্তী অথচ সম্পত্তিতে

বিভিন্ন ছিল) ; দ্বিতীয়তঃ, এইরূপে স্বতন্ত্র হইলেও রামকান্ত পুত্রদিগের বৈষয়িক ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন না, পক্ষান্তরে সাহায্যই করিতেন, এবং পিতা ও পুত্রদের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা বোঝাপড়া চলিত।

এই ধারণা যে সত্য হইতে পারে, তাহার অন্ততঃ একটি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্পত্তিভাগের পরই রামকান্ত যে বর্দ্ধমানে চলিয়া যান তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেখানে তিনি নিজের বিষয়কর্ম্ম ছাড়া মোক্তার হিসাবে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর সম্পত্তিরও তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সময়ে তিনি মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর টাকায় জগমোহন রায়ের বেনামীতে একটি তালুক ক্রয় করেন। এই তালুকটি মহারাণীর হইলেও তিনি পুত্রকে উহার প্রকৃত মালিক বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি মিথ্যা ইক্‌রারনামা প্রস্তুত করাইয়া রাখেন। পরে যখন এই তালুক লইয়া মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজা তেজচন্দ্রের সহিত রামকান্ত ও জগমোহন রায়ের মোকদ্দমা হয় তখন অবশ্য এই ইক্‌রারনামা টিকে নাই, এবং মহারাজা তেজচন্দ্রই এই তালুকের প্রকৃত মালিক বলিয়া সাব্যস্ত হন।

জগমোহন রায়ের মত রামমোহনকেও যে রামকান্ত সাহায্য করিতেন তাহাও বলা চলে। রামমোহন অবশ্য বলিয়াছেন, সম্পত্তি-বিভাগের পর বৎসর তিনি অ্যান্‌ড্রু র‍্যামজেকে যে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ্জ দেন ও ১৭৯৯ সনে যে তালুক রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর ক্রয় করেন, তাহার সহিত তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, সে-টাকা সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের। এই সূত্রেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, সম্পত্তিভাগের নয় দশ মাস পরেই রামমোহন এত টাকা পাইলেন কোথায়? বাটোয়ারাতে তাঁহাকে যে-সম্পত্তি দেওয়া হয় তাহার আয় এত হইবার কথা নয়, এবং তিনি যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার কলিকাতার বাড়ি বা অন্য কোন ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন তাহাও নহে। পক্ষান্তরে এই সময়ে রামকান্ত রায়ের অবস্থা খুবই সচ্ছল। তিনি তখন তিন চারটি বড় সম্পত্তির ইজারাদার ও মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মোক্তার। তাঁহার অর্থাগম যথেষ্ট হইতেছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে পুত্রদিগকে সম্পত্তি অর্জ্জনে সাহায্য করা অসম্ভব বা বিচিত্র নহে।

রামমোহনের নিজের উন্নতি এবং পিতা ও ভ্রাতাদের দুরবস্থা

১৭৯৯ ও ১৮০০ সনে হঠাৎ রায়-পরিবারের ঘোরতর দুরবস্থা উপস্থিত হইল এবং ইহার ফলে তিন বৎসরের মধ্যে উঁহারা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেন। ১৭৯৮ সনের নবেম্বর মাসে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমানে রামকান্ত রায়ের যে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল তাহার অবসান হইল। ১৭৯৯ সনের ১৩ই জুলাই মহারাজা তেজচন্দ্র মাতার বেনামী তালুক যাহা রামকান্ত রায় জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য কৌশলে দখল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—উহা দাবি করিয়া পিতা ও পুত্র উভয়ের নামেই একটি মোকদ্দমা রুজু করিলেন। ১৮০০ সনে রামকান্ত রায়ের ভুরসুটের ইজারার মিয়াদ ফুরাইয়া গেল এবং দেখা গেল তাঁহার নিকট খাজানার কিস্তি বাকী পড়িয়াছে। এই সময় বাকী খাজানা বাবদ তাঁহার নিকট বর্দ্ধমানের রাজার দাবিও প্রায় আশী হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল ঋণ শোধ করিবার সঙ্গতি রামকান্তের ছিল না। সুতরাং ১৮০০ সনের মাঝামাঝি সর্ব্বপ্রথমে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাকী খাজানার জন্য হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এই টাকাটার (সুদ ও আসলে ৩,৩৩৮৶৫) কিয়দংশ রামকান্ত নিজে শোধ করিলেন, বাকীটা তাঁহার পুত্র ও জামিন জগমোহন রায়ের সম্পত্তির অংশ-বিশেষ বিক্রয় করিয়া শোধ করা হইল; এবং রামকান্ত ১৮০১ সনের অক্টোবর মাসে মুক্তি পাইলেন।* কিন্তু বর্দ্ধমানের রাজা প্রাপ্য টাকার জন্য তখনই আবার তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এইবারে রামকান্তকে প্রথমে হুগলী ও পরে বর্দ্ধমানের জেলে রাখা হইল। ১৮০১ সনে জগমোহন রায়ও গভর্ণমেণ্টের খাজানা বাকী ফেলিলেন এবং তাঁহাকেও মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই জেল হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন ১৮০৫ সনের মার্চ্চ মাসে। ইতিমধ্যে তাঁহার তালুক হরিরামপুর বাকী খাজনার জন্য নিলাম হইয়া গেল, এবং

* Board of Revenue Procdgs. 9 October 1801, No. 57.

ইহাতেও ঋণশোধ না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট জগমোহনের আর কি কি সম্পত্তি আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অনুসন্ধানের বিশেষ কোন ফল হইল না। ১৮০৩ সনে বর্দ্ধমানের কলেক্টর লিখিলেন যে, এক সময়ে এই পরিবার সমৃদ্ধ থাকিলেও এখন অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়াই সকলে বলিতেছে।

নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টার ফলে একমাত্র রামমোহনই এই ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতে মুক্ত রহিলেন। তিনি সম্ভবতঃ পরিবারের অবস্থা পূর্ব্বাহ্ণেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ১৭৯৯ সনের শেষের দিকে তিনি "পাটনা, কাশী ও কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে" যাইবার জন্য নিজের সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে প্রথম বৎসরের বাকী খাজানার জন্য তাঁহার তালুক গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর নিলামে না চড়িয়া যায় সেইজন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি কিস্তিবন্দীর বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।* এই কিস্তিবন্দীর দলিলটি ছাড়া রামমোহনের বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত এই সময়ের আরও দুইটি দলিল পাইয়াছি। এই দলিল দুইটি পরস্পর সংযুক্ত। প্রথমটি ফার্সী ভাষায় লিখিত ৭ই পৌষ ১২০৬ সাল তারিখযুক্ত হুগলী রেজেষ্ট্রী আপিসে ১৮০০ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখে রেজেষ্ট্রী করা একটি কবালা। ইহা হইতে দেখা যায়, ১৭৯৯ সনের শেষে রামমোহন রায় তালুক গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর 'তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়' রাজীবলোচন রায়ের নিকট ৪,০০১ টাকায় বিক্রয় করিয়া দিতেছেন। আসলে ইহা বিক্রয় নয়। সাক্ষীদের সমক্ষে রামমোহন টাকা পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহা একটি বেনামী ব্যাপার মাত্র, ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন টাকা দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় দলিলটি একটি ইকরারনামা। উহার তারিখ ১২০৬ সালের ৭ই পৌষ (২০ ডিসেম্বর ১৭৯৯)। উহা রাজীবলোচন রায় কর্ত্তৃক রামমোহনের নাবালক ভাগিনেয় (১১ বৎসর বয়স্ক বালক) গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে লিখিত। উহার সাক্ষীদের মধ্যে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী) ছিলেন। দলিলটি এইরূপ :—

আপনকার অনুমতিতে ও টাকায় লাট রামেশ্বরপুর মোতালক পরগণে চন্দ্রকোণা ও লাট গোবিন্দপুর পরগণে জাহানাবাদ দুই লাটের সদর জমা ২১৮৬৸৶১৯ শ্রীরামমোহন রায়ের নিকট সন ১২০৬ সালের ৭ পৌষ মঃ ৪০০১ টাকা সিক্কা পনে আপন নামে আপনার বেনামিতে খরিদ করিলাম। এই দুই লাটের মালিক ও দান বিক্রীর অধিকারী আপনি আমার সহিত কি আমার ওয়ারিসানের সহিত কিছু এলাকা নাই।

কোন মিছা দাওয়া আমি ইহাতে করি কিম্বা কেহ করে সে বাতিল এবং মিথ্যা।

এই ইকরারনামা গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে লিখিত হইলেও, উহা রামমোহনের জিম্মায় থাকে।

এইরূপ বেনামী ক্রয়বিক্রয় আমাদের দেশে বিরল না হইলেও রামমোহন কি ভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে উহা করিলেন তাহার একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। নিজের স্বত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া প্রকাশ্যে স্বত্ব গোপন করা সকল বেনামীরই উদ্দেশ্য। রামমোহনেরও এই উদ্দেশ্যই ছিল। রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর তালুক কবালা করিয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়ায় এগুলি প্রকাশ্যে আর রামমোহনের সম্পত্তি রহিল না, অথচ টাকার লেনদেন না হওয়ায় এই সকল তালুকে রাজীবলোচন রায়েরও কোন আইনসঙ্গত দাবি রহিল না। কিন্তু বেনামদারের দুরভিসন্ধি থাকিলে অনেক সময়ে বেনামী প্রমাণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেজন্য রামমোহন রাজীবলোচন রায়ের সততার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তাঁহার দ্বারা ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি ইকরারনামা লিখাইয়া লইলেন। রামমোহনের সহিত এই দুইটি তালুকের কোন সংশ্রব নাই, প্রকাশ্যে ইহা দেখাইবার জন্য ইকরারনামাটি রামমোহনের নামে না হইয়া অন্য ব্যক্তির নামে হইল।

এখন প্রশ্ন এই, রামমোহন কর্ত্তৃক এইরূপে সম্পত্তি বেনামী করিবার মূল কারণ কি? এ-প্রসঙ্গে রামমোহন বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি তখন নিঃসন্তান থাকায়, বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হইলে যাহাতে তাঁহার ভাগিনেয় তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি তালুক দুইটি বেনামীতে বিক্রয় করেন। পক্ষান্তরে, রাজীবলোচন রায় ও গুরুদাস

* "মবলগে সত্তর হাজার নও শত উনননিব্বই ছয় আনা আঠার গণ্ডা জমা ইস্তক শ্রাবণ নাগাদী আখেরি শ্রীরামমোহন রায় সাং লাঙ্গুড়পাড়া ১২০৬।"—Mixed Persian and Bengali Records (Board of Revenue), p. 625.

মুখোপাধ্যায় উভয়েই বলিয়াছেন যে, বিদেশে অবস্থানকালে সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের সুবিধার জন্য রামমোহন এইরূপ ব্যবস্থা করেন।

এই দুইটি কারণের মধ্যে রাজীবলোচন রায় ও গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের দর্শিত কারণকেই সত্য বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত হেতু আছে। রামমোহন রাজীবলোচনের নিকট হইতে যে ইকরারনামা গ্রহণ করেন তাহার দ্বারা একটি গুরুতর কারণে তাঁহার তালুক দুইটির উপর গুরুদাসের কোন দাবি হইবার নয়। রাজীবলোচন এই ইকরারনামায় স্বীকার করিতেছেন, তিনি গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের বেনামীতে এই তালুক দুইটি ক্রয় করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠিবে, গুরুদাস তখন বালক, তিনি টাকা কোথায় পাইলেন? এ-টাকা কে তাহাকে দিল? তিনি নিজে যখন সম্পত্তিক্রয়ের টাকা দিতে পারেন নাই, তখন এই সম্পত্তি তাঁহার হইতে পারে না। ইহা ছাড়া, রামমোহন যে ভাগিনেয়কে সম্পত্তি দিবার উদ্দেশ্যে এই বেনামী করেন নাই তাহা আর দুই-তিনটি বিষয় হইতেও প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ, ১৮০০ সনে বিদেশে যাইবার সময়ে তাঁহার সন্তানসন্ততি হইবার সম্ভাবনা ছিল,—এ-কথা রামমোহন জানিতেন না ইহা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি তাঁহার বিদেশযাত্রাকে যত দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল হইতে পারে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা তত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, রাজীবলোচন রায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, এই বেনামী করিবার সময়ে রামমোহন তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের সুব্যবস্থা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

দেখাশোনার সুবিধা ভিন্ন আর একটি কারণও এই সম্পত্তি বেনামীর মূলে ছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়াছি এই সময়ে রায়-পরিবারের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ সঙ্কটাপন্ন হইতে চলিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরেই রামকান্ত রায় দেওয়ানী জেলে যান। এইরূপ কোন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা বুঝিতে পারিয়া পিতা বা ভ্রাতার ঋণের জন্য তাঁহার নিজের কোন ক্ষতি না হয় এই উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ রামমোহন তাঁহার মূল্যবান্ তালুক দুইটি বেনামী করিয়া দেন। ইহাতে তাঁহার পিতার প্রবোচনা, পরামর্শ বা সম্মতি থাকাও বিচিত্র নয়।

কারণ যাহাই হউক, আইনের ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল এবং রামমোহন ১৮০০ সনের মাঝামাঝি তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মিবার পূর্ব্বেই পশ্চিম যাত্রা করিলেন। এই যাত্রার উদ্দেশ্য খুব সম্ভব চাকুরি বা অর্থোপার্জ্জন। যে-[illegible] র‍্যামজেকে তিনি বৎসর-তিনেক পূর্ব্বে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ্জ দেন, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন। রামমোহন হয়ত চাকরির সন্ধানে বা ব্যবসায়ে সহায়তা পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহারই নিকট গিয়াছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের বিদেশ প্রবাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮০১ সনেই তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে তাঁহার তহবিলদার নিযুক্ত করেন। গোপীমোহনের জবানবন্দি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৮১৫ সন পর্য্যন্ত রামমোহন নিজে পাটনা, কাশী, রংপুর, ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি মফস্বলের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কলিকাতায় বাসা ও কর্ম্মচারী বজায় রাখিয়াছিলেন।

পশ্চিম হইতে কলিকাতা ফিরিবার পরে বৎসর-দুই রামমোহন কলিকাতা হইতে কোথাও গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর পরে (১৮০৯) বড়লাটের নিকট একটি দরখাস্তে রামমোহন লেখেন যে, তাঁহার বংশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সকল সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কর্ম্মচারিগণ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে জানা যাইবে। তাঁহাকে রংপুরের দেওয়ানীর জন্য সুপারিশ করিবার সময়ে কলেক্টর ডিগবীও লেখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান ফার্সী-মুন্সী রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিবেন। এই সকল উক্তি হইতে মনে হয় রামমোহন সদর দেওয়ানী আদালতের ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহিত কোন-না-কোনপ্রকারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের ফার্সী ও মুসলমান আইন শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য সে-যুগে কলিকাতায় মুসলমানী বিদ্যার খুব চর্চ্চা ছিল। সুতরাং রামমোহন কলিকাতার উচ্চপদস্থ মুসলমান মৌলবীদিগের সাহায্যে আর্বী-ফার্সীর ব্যুৎপত্তি গভীরতর করেন তাহাও অসম্ভব নয়। ১৮০১ সনে খুব সম্ভব কলিকাতাতেই তিনি ডিগবীর সহিতও পরিচিত হন। ডিগবী ১৮০০ সনের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন এবং অন্য সকল সিভিলিয়ানদের মত সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ডিগবী বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত রামমোহনের প্রথম পরিচয় হওয়ার সময়ে রামমোহনের বয়স সাতাইশ বৎসর ছিল। আমাদের মতে উহা ১৮০১ সনেই হয়।

কলিকাতায় রামমোহন নানা বৈষয়িক কাজকর্ম্মও করিতেন। তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনিতেন ও উহার ব্যবসা করিতেন। ১৮০২ সনে তিনি কলিকাতায় টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানীর আর একজন সিভিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দেন। রামমোহনের তহবিলদার গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জবানবন্দি হইতে জানা যায়, এই টাকাটা কর্জ্জ দিবার সময়ে রামমোহনের তহবিলে মাত্র দুই হাজার টাকা থাকায়, বাকী তিন হাজার টাকা জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহের নিকট হইতে আনা হয় এবং মোট পাঁচ হাজার

টাকা উডফোর্ডের সরকার জগন্নাথ মজুমদারের হাতে দেওয়া হয়। উডফোর্ড ইহার জন্য রামমোহনকে তমসুক লিখিয়া দেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই রামমোহন ঢাকা-জালালপুর (বর্ত্তমান ফরিদপুর) উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন (মার্চ্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই। উডফোর্ড ঢাকা-জালালপুরের কলেক্টর ছিলেন। পাওনাদার রামমোহনকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্য যে তাঁহার ছিল না, এ-কথা বলা যায় না।

সে যাহা হউক, রামমোহনের দেওয়ানী-পদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দুই মাস পরেই ১৮০৩ সনের ১৪ই মে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার কারণ অসুস্থতার জন্য উডফোর্ডের ঢাকা-জালালপুর ত্যাগ।

এই সময়ে বর্দ্ধমানে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজাকে পাঁচ শত টাকা নগদ ও বাকী টাকা এগারো বৎসরে শোধ করিবেন এই মর্ম্মে একটি কিস্তিবন্দীর দলিল লিখিয়া দিয়া দেওয়ানী জেল হইতে মুক্তি পান। কিন্তু তাঁহার জীবনে কোন সুখ অথবা শান্তি ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তখনও মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ। পাওনাদারেরা তখনও তাঁহাকে পীড়ন করিতেছিল। তিনি এই সকল ঋণ শোধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা জমার একটি জমিদারী ইজারা লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আয় হইতেছিল কি-না সে সংবাদ আমরা জানিতে পারি না।

এইরূপ দুশ্চিন্তা ও দুর্দ্দশার মধ্যে ১২১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে-জুন ১৮০৩) বর্দ্ধমানের বাড়িতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রামলোচন রায় সম্ভবতঃ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পরের দিন বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহার অপর দুই পুত্রের মধ্যে জগমোহন রায় তখন মেদিনীপুর জেলে, রামমোহন খুব সম্ভব কলিকাতায় অথবা ঢাকা-জালালপুর হইতে কলিকাতার পথে। তিনি ১৪ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) ঢাকা-জালালপুরের কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তিনি যে পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন না তাহা নিশ্চিত মনে হয়। আমরা যে-সকল কাগজপত্রের সাহায্যে এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি উহাদের মধ্যে তারিণী দেবীকে জেরা করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি প্রশ্নাবলী আছে। উহাদের একটি এইরূপ :—"উল্লিখিত রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন রায় কোথায় ছিলেন, এ-বিষয়ে কি জানেন, কি শুনিয়াছেন, কি বিশ্বাস করেন ?" ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন জগমোহন সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,— তিনিও পিতার মৃত্যুর সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। সেজন্য মনে হয়, রামমোহনও পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন না।

তাহা ছাড়া রায়-পরিবারের পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের জবানবন্দিতেও আছে :—"রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে জগমোহন রায় মেদিনীপুর জেলে ছিলেন এবং রাম-মোহন রায় বিদেশে ছিলেন, সে-দেশের নাম তাঁহার স্মরণ নাই।"

রামকান্তের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ লইয়া রামমোহন ও অন্যান্য সকলের মধ্যে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। পরিশেষে রামমোহন নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় এক শ্রাদ্ধ করিলেন, তারিণী দেবী দৌহিত্রের অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া লাঙ্গুলপাড়ায় শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধ করিলেন রামলোচন রায়, জগমোহন জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে মেদিনীপুর জেলের মধ্যেই আর একটি শ্রাদ্ধ করিলেন।

মৃত্যুকালে রামকান্তের কোন নগদ টাকা ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানে একটি বাড়ি ও পঞ্চাশ-ষাট বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ছিল। বাড়িটি বর্দ্ধমানের মহারাজা ঋণের জন্য দখল করিয়া লইলেন, ব্রহ্মোত্তর জমি রামকান্তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারিণী দেবী কর্ত্তৃক দেবসেবায় নিয়োজিত হইল। রামকান্তের মৃত্যুর বৎসর তিন পরে দেখা গেল যে, রামকান্তের প্রাপ্য কিছু টাকা আদালতে ডিক্রি হইয়া আছে। উহার পরিমাণ দুই তিন হাজার টাকার বেশী নহে। জগমোহন আদালতে দরখাস্ত করিয়া উহা আদায় করিয়া লইলেন।

রামকান্তের মৃত্যু ও জগমোহনের কারাবাসের জন্য রায় পরিবার যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত তখন রামমোহনের অবস্থা বেশ সম্পন্ন। তিনি নিজেও এই কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ সনে লাঙ্গুলপাড়ায় একটি নূতন তালুক কিনিতেও দেখি।

রামমোহন ইহার কিছুদিন পরেই সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে যান। এই সময়ে তাঁহার দুই সিভিলিয়ান পৃষ্ঠপোষক ডিগবি এবং উডফোর্ডও মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মুর্শিদাবাদে ১৮০৩ অথবা ১৮০৪ সনে রামমোহনের একেশ্বরবাদ-সম্বন্ধীয় আরবী ও ফার্সী পুস্তক 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন' প্রকাশিত হয় বলিয়া মিস্ কলেট বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ঠিক হওয়াই সম্ভব।

কিংবদন্তী আছে, রামমোহনের বয়স যখন মাত্র ষোল বৎসর তখন তিনি 'তুহ্‌ফাৎ' রচনা করেন। এই বিশ্বাস ভুল বলিয়াই মনে হয়, কারণ 'তুহ্‌ফাৎ'-এর শেষে 'পুনশ্চ' বলা হইয়াছে :—

"যাহাতে লিপিকরদের দ্বারা ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত না হয় এই উদ্দেশে রচনার অব্যবহিত পরেই এই পুস্তক মুদ্রিত করা গেল।" (অনূদিত)

সুতরাং 'তুহ্‌ফাৎ' ১৮০০ সনের পূর্ব্বে রচিত না হওয়াই সম্ভব। অন্ততঃ রামমোহনের ভ্রমণের পর যে 'তুহ্‌ফাৎ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তাহা নিঃসন্দেহ। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর ভূমিকায় আছে :—

"আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্ব্বত্য ও সমতলভূমিতে পর্যাটন করিয়াছি।"

ইহা সম্ভবতঃ রামমোহনের পশ্চিম-ভ্রমণের প্রতি ইঙ্গিত।

'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে আর একটি কথা বলিবার আছে। রামমোহন এই পুস্তকের শেষে লেখেন :—

"এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি 'মনাজিরাৎ-উল্‌-আদিয়ান্‌' বা 'নানা ধর্ম্মের বিচার' নামে আমার আর একখানি পুস্তকে করিব।"

ইহা হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, রামমোহন এই পুস্তকখানিও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রামমোহন রায় হয়ত 'তুহ্‌ফাৎ' লিখিবার সময়ে আর একটি পুস্তক লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এমন কি অংশ বিশেষ রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-পুস্তক কখনও প্রকাশিত হয় নাই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। কেহ এ-পর্য্যন্ত 'মনাজিরাৎ'-এর একখণ্ড আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া পরজীবনে রামমোহন তাঁহার দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আর্বী বা ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র পুস্তকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮২০ সনে তিনি ছদ্মনামে Appeal to the Christian Public নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; উহাতে তিনি লেখেন :—

"রামমোহন রায় ... ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও অতি অল্পবয়সে পৌত্তলিকতা বর্জন করেন এবং সেই সময়ে আর্বী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন।"

'তুহ্‌ফাৎ' ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্য কোন আর্বী ও ফার্সী পুস্তক থাকিলে তিনি একাধিক গ্রন্থের নাম করিতেন।

উপসংহার

উপরে রামমোহনের প্রথম জীবন সম্বন্ধে সমসাময়িক দলিলপত্রের সাহায্যে কয়েকটি সঠিক সংবাদ দিবার চেষ্টা করা হইল। এই সকল সংবাদ পরিমাণে খুব বেশী নয়, কিন্তু উহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সেজন্য উহাদের সাহায্যে রামমোহনের জীবনের যে কাঠামো তৈয়ারী করা হইল তাহা টিকিয়া থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। হয়ত বা ভবিষ্যতে নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে উহা দু-এক জায়গায় আরও একটু স্পষ্ট হইবে, কোন জায়গায় বা একটু পরিবর্ত্তিতও হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর উহা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এখন দেখা প্রয়োজন এই কাঠামোর সহিত রামমোহনের প্রচলিত জীবনীগুলির বিবরণ কতদূর খাপ খায়, অথবা মোটেই খাপ খায় কি-না। এরূপ তুলনার ফলে যে কয়েকটি ব্যাপার আমার নিকট বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হইয়াছে, মাত্র সেইগুলির কথাই এই উপসংহারে উত্থাপন করিব।

প্রথমেই দেখি, প্রচলিত জীবনীগুলিতে রামমোহনের বাল্যে ও যৌবনে যে-সকল দীর্ঘ ভ্রমণের—পাটনা, কাশী ও তিব্বতে হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের বিবরণ আছে তাহার সহিত দলিলপত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলির সমন্বয় হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয়ের কথা ধরা যাক। একটি জীবনীতে আছে, রামমোহন দশ বৎসরেরও অধিক কাল কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়ন তিনি কখন করেন? দলিলপত্র হইতে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১৭৯১ সন হইতে ১৮০০ সন পর্য্যন্ত রামমোহন লাঙ্গুলপাড়ায়, কলিকাতায় অথবা নিকটবর্ত্তী কোন-না-কোন জায়গাতেই রহিয়াছেন। ১৮০০ সনে অবশ্য তাঁহার পাটনা, কাশী ও কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী কোন কোন স্থানে যাওয়ার উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, রামমোহনের এই প্রবাস দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তিনি ১৮০১ সনেই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন এবং ১৮০২ ও ১৮০৩ সনেও আমরা তাঁহাকে কলিকাতাতেই দেখিতে পাই। সুতরাং রামমোহন বহু বৎসর ধরিয়া কাশীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এ-কথা মানিতে হইলে ধরিয়া লইতে হয় তিনি সাত-আট বৎসর বয়সে কাশী যান এবং সতের-আঠারো বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া লাঙ্গুলপাড়ায় ফিরিয়া আসেন। ইহাতেও তাঁহার দুই-তিন বৎসরের জন্য তিব্বতে ভ্রমণ ও পাটনায় অধ্যয়নের সময় হয় না। তবে কি রামমোহন তিব্বতে অথবা বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাটনা বা কাশীতে কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে মোটেই যান নাই? এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার উপায় আমাদের নাই। বর্ত্তমানে যে-সকল তথ্য আমাদের হাতে আছে তাহা হইতে এই সকল দীর্ঘ ভ্রমণের কাহিনী নির্ভুল নয় বলিয়াই মনে হয়। তবে ১৮০০ সনে কাশী ও পাটনা প্রবাসকালে রামমোহন সংস্কৃত বা ফার্সী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা সম্ভব হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, এই সকল দলিলপত্রের দ্বারা রামমোহন পিতার সম্পত্তি পাইয়াছিলেন কি পান নাই, এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। এতদিন পর্য্যন্ত এ-বিষয়ে নানারূপ গল্প চলিয়া আসিয়াছে। জীবনীকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য রামমোহন তাঁহার পিতার বিষয় হইতে বঞ্চিত হন এবং এই কারণে তাঁহার আত্মীয়েরা এবং দেশের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরাও তাঁহাকে নানারূপে পীড়ন করেন। তাঁহার ইংরেজ বন্ধু এবং সেক্রেটারী স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট লিখিয়া গিয়াছেন :—"সত্য ও বিবেকবুদ্ধির বেদীতে রামমোহন পৈতৃক সম্পত্তি বিসর্জ্জন দেন—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই ত্যাগস্বীকার তাঁহাকে করিতে হয় নাই।" এ সকল ধারণার উৎপত্তি কি ভাবে হইল তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায়, রামমোহনই মূলতঃ ইহার জন্য দায়ী। ১৮২৩ সনে বর্দ্ধমান-রাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা রুজু করেন তাহার জবাবে রামমোহন বলেন,—

"তাঁহার মৃত পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হওয়া দূরে থাকুক, জীবনযাত্রার রীতি ও মত-পরিবর্ত্তনের ফলে একত্রবাস সম্ভব না হওয়ায় তিনি পিতার

জীবদ্দশাতেই পিতা ও পরিজন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন। ..পিতার জীবদ্দশায় পুত্র স্বতন্ত্র হইয়া গেলে, নিজের চেষ্টায় পিতার সহিত সংস্রবহীন সম্পত্তি অর্জ্জন করিলে, এবং পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির কোন অংশের উত্তরাধিকারী না হইলে, দেশাচার ও শাস্ত্র অনুযায়ী কেহ পিতার ঋণের জন্য দায়ী হয় না।" (অনূদিত)

পিতার ঋণের জন্য আইনতঃ দায়ী না-হইবার উদ্দেশ্যে রামমোহন আদালতে এই উক্তি করিয়াছিলেন, ইতিহাস রচনা কালে উহা গ্রাহ্য নয়। রামমোহন যে পিতার সম্পত্তির "উত্তরাধিকারী" হন নাই উহা আইনতঃ সত্য, কারণ মৃত্যুকালে তাঁহার পিতার ধনসম্পত্তি বিশেষ কিছুই ছিল না, এবং মূল্যবান যাহা ছিল বর্দ্ধমানের মহারাজাই তাহা প্রাপ্য টাকার আংশিক শোধ হিসাবে দখল করিয়া লন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে যে এইরূপ উক্তি করিয়া রামমোহন পিতার প্রতি ন্যায় ব্যবহার করেন নাই। তিনি যে রামকান্তের অন্য পুত্রদের মত সমভাবে পিতার সম্পত্তির এক অংশ পাইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। রামমোহন যে-সময়ে পিতৃঋণ অস্বীকার করিতেছিলেন তখনও পিতৃদত্ত সম্পত্তি তাঁহার ভোগেই ছিল। সে-সম্পত্তি খুব মূল্যবান্ না হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য রামকান্ত রামমোহনকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন এ-কথা বলা চলে না। ইহা ছাড়া রামকান্তের সহিত রাম-মোহনের বিরোধ বা মনোমালিন্য ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ আমরা পাই না। তবে এ-কথা সত্য যে, রামকান্ত যখন দুই-তিন হাজার টাকা ঋণের জন্য হাজত-বাস করিতেছিলেন এবং অর্থাভাবে অন্য নানারূপে কষ্টভোগ করিতেছিলেন, তখন অবস্থাপন্ন ও অর্থশালী হইয়াও রামমোহন পিতাকে সাহায্য করেন নাই।

তৃতীয়তঃ, নূতন কাগজপত্র আবিষ্কার হওয়ার ফলে আমরা রামমোহনের একটি পূর্ণতর রূপ দেখিতে পাই। এতদিন পর্য্যন্ত জীবনীকারগণ রামমোহনের একটি রূপই আমাদিগকে দেখাইয়া আসিয়াছেন—সে রূপ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের, যুগগুরুর এবং 'বিশ্বমানবে'র। এখন, আমরা রামমোহনকে বিষয়ী পুরুষ হিসাবেও দেখিতে পাইতেছি। প্রচলিত জীবনীগুলি হইতে মনে হয় রামমোহনের কৈশোর ও যৌবন অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালোচনাতেই অতিবাহিত হয়। নবাবিষ্কৃত দলিলপত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় তখন তিনি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, তালুক-ক্রয় ও তালুক বেনামী করা, সিভিলিয়ান সাহেবদিগকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং সেই সিভিলিয়ানের অধীনে দেওয়ানী করা, কোম্পানীর কাগজ কেনা এবং বিক্রয় করা, এবং এইরূপ নানা ধরণের ঐহিক ব্যাপারেও উদাসীন ছিলেন না। ইহাতে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের জীবনীকার ও বন্ধুগণ তাঁহাকে শুধু ধর্ম্ম ও যুগপ্রবর্ত্তক হিসাবে দেখিতে চাওয়ায় অনেক স্থলে নিষ্প্রয়োজনে ধর্ম্মের অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ অবান্তর প্রসঙ্গের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। রামকান্ত রায়ের মৃত্যু কোথায় কি ভাবে হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর রামমোহন তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাদের মধ্যে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা লইয়া যে একটা কলহ হয় তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এই সকল ব্যাপারে রামমোহনের মধ্যে আমরা সাধারণ বিষয়ী লোকের স্বরূপই দেখিতে পাই; তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ বিদেশী বন্ধুরা কিন্তু এই ঘটনাতেও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রামমোহনকে দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদের একজন—মিঃ উইলিয়াম অ্যাডাম—লিখিতেছেন :—

রামমোহন রায় কথাপ্রসঙ্গে অত্যন্ত আবেগের সহিত আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার ... অন্তিম শ্বাসের সহিত 'রাম', 'রাম' বলিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছিলেন কুলদেবতার প্রতি কোন বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও পুত্র পিতার এই ... নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।" (অনূদিত)

সরলমতি অ্যাডাম বোধ হয় জানিতেন না যে পিতার মৃত্যুকালে রামমোহন বিদেশে ছিলেন!

রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[দাম্পত্য-কলহ সম্বন্ধে গবেষণা—আক্রমণ ও সন্দেহজনক আত্মসমর্পণ]

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে মথুর ঘোষ দুই বিবাহ বন্ধনজনিত সৌভাগ্য-সুখ অথবা দুর্ভাগ্য-পীড়ার মধ্যে, দুই পত্নীর দাসত্ব ও প্রভুত্ব অথবা দুই-ই করিয়া দিনাতিপাত করিতেছিল। জ্যেষ্ঠা তারার পরিচয় আমরা দিয়াছি; কনিষ্ঠা চম্পক, বয়সে তারা অপেক্ষা অন্ততঃ আট বছরের ছোট। কি দেহ-সৌষ্ঠবে কি বর্ণ-গৌরবে সপত্নী অপেক্ষা সে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তদুপরি স্বভাবতই চপল সৌন্দর্য্যের মায়াজাল বিস্তারে সে পটু ছিল, তাহার ফলে তাহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে এমন একটা দাম্ভিক ও কঠোর রূপ ফুটিয়া উঠিত যে, সে অঞ্চলের রূপসীরা রূপগর্ব্বে তাহার নিকট পরাজয় মানিয়াছিল; সকলে তাহাকে এজন্য হিংসা করিত। গর্ব্বিতা ও প্রভুত্ব-পরায়ণা চম্পক বাড়ির সকলকে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া শাসন করিত। বাড়ির লোক-জন তাহাকে ভয় করিত, হয়তো ভিতরে ভিতরে অপছন্দও করিত, কেননা তাহার রুক্ষ মেজাজের পরিচয় পাইয়া সকলেই বুঝিয়াছিল যে, মুখের সৌন্দর্য্যের সহিত হৃদয়ের ঔদার্য্যের বড় বেশী সম্পর্ক নাই। এবং ঠিক এই জন্যই জ্যেষ্ঠা হিসাবে সতীন তারার দাবী বেশি হওয়া উচিত হইলেও—সে-ই ছিল সংসারের সকলের কাছে আসল গৃহকর্ত্রী। মথুর ঘোষের স্বভাবে অবশ্য ভালবাসিবার বা ভালবাসা পাইবার মত কিছু ছিল না; এবং ইহাও নিশ্চয় যে প্রেম তাহার মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিও নয়, কিন্তু নারী ও তাহার সৌন্দর্য্যের মোহ সকলের উপরই প্রভাব বিস্তার করে, তাই মথুরও তাহার স্ত্রীর অনুরক্ত ছিল। মনের সুরুচি ও সুবুদ্ধি প্রণয়বৃত্তিকে আবেগময় ও স্বর্গীয় করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন ঘটায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়পরবশ মনে, ইহা কামলালসা অথবা নারী-মাধুর্য্যের অজানা রহস্যের কাছে অন্ধ আত্মসমর্পণেই শেষ হয়, কিন্তু বৃত্তির প্রবলতা দুই ক্ষেত্রেই সমান তীক্ষ্ণ হইতে পারে। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে মথুর চম্পককে ভালবাসিত, ভালবাসা যদি নাও বলা চলে, সে চম্পকের প্রতি অধীর ও অন্ধভাবে অনুরক্ত ছিল।

চারিপাশের সকলের স্বার্থকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে লাগাইয়া কঠিন মনের শক্তিতে যে সকলের প্রভু হইয়াছিল, এই ছলনাময়ীর ইচ্ছাশক্তির কাছে সে ছিল একেবারে ক্রীতদাস। তারার স্বভাবে এমন মাধুর্য্য ও ধৈর্য্য ছিল যে তাহার বিরুদ্ধে ক্রোধের কোন কারণ তাহার থাকিতে পারে না—কিন্তু তারা সম্বন্ধে মথুর উদাসীন ছিল, হয়তো সে-ঔদাসীন্য এত বেশি যে তারার প্রতি সে কোনদিন দুর্ব্ব্যবহারও করিতে পারিত না।

রাজমোহনের স্ত্রী তাহাদের বাড়িতে আশ্রয় লইবে, ইহার অনুমতি স্বামীর নিকট হইতে পাইতে তারার বেগ পাইতে হয় নাই। উত্তরে মথুর বলিয়াছিল, "দেবতা ও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমার বাড়িতে খাওয়া-পরার অসদ্ভাব নাই; আর তুমি যখন বলিতেছ, মেয়েটির স্বভাব ভাল, তখন যতদিন ইচ্ছা সে আমার এখানে থাকিতে পারে।" কিন্তু সরলমনা তারা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে ইহার প্রতিকূলাচরণ হইবে এবং তাহা তাহার এই সহৃদয়তাকে ব্যর্থ করিবে। চম্পক পছন্দ করে নাই যে তাহার বিপক্ষের আনুকূল্যে এ বাড়িতে বাহিরের কেহ আশ্রয় পায়।

মথুর ঘোষের অট্টালিকার উপর অস্তমান সূর্য্যের ম্লান কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে—মাতঙ্গিনীর ভাগ্যে যে-দিন অশুভ বিপদজালের সূচনা দেখা দিয়াছে, সে-দিনখানি সন্ধ্যার দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তেতলার এক খোলা বারান্দার উপর তির্য্যক ভাবে সূর্য্যকিরণ রহিয়া রহিয়া দেখা দিতেছে। শুধু বারান্দার উপর বসিয়া তারা তাহার মেয়ের খোঁপা বাঁধিতে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু সে বিনুনী মা কিংবা মেয়ে কাহারও পছন্দ-মাফিক হইতেছে না। মাতঙ্গিনী কাছেই বসিয়া 'হুঁ হাঁ' করিয়া কতকগুলি অশিষ্ট ও বিরক্তকর প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। প্রশ্ন-কারিণী চম্পক—মুখরা এক নাপতানীর সাহায্যে সে তাহার ছোট পা দুটিতে আলতা পরাইতে পরাইতে মাতঙ্গিনীকে অনর্গল প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিল। কেমন করিয়া ইহা সে বুঝিবে যে, তাহার স্বামী যাহাকে কৃপাপরবশ হইয়া গৃহে আশ্রয় দিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলে যে-কোন মুহূর্ত্তে সে

যাহাকে ঘরছাড়া করিতে পারে, সেই আশ্রিতা তাহার মুখের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে। মাতঙ্গিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে ও বিনীত ভাবে উত্তর দিতেছিল কিন্তু তাহাতে এই সুন্দরীর গর্ব্বে আঘাত লাগায় সে আরও চটিয়া উঠিতেছিল।

মাতঙ্গিনীকে আহ্বান করিয়া তারা বলিল—'দেখিতেছ, দুপুর বেলা হইতে চেষ্টা করিয়াও এ মেয়ের খোঁপা কিছুতে বাধিয়া উঠিতে পারিলাম না। তুমি বোধ হয় ভাল পার। যদি তুমি এই বিনুনীটা কি করিয়া বাধি দেখাইয়া দাও, তবে কাজটা শেষ করিতে পারি।' সেদিনকার জন্য খোঁপা বাধিবার অনুমতি মাতঙ্গিনী চাহিল। বলিল,—'আমিও ভাল পারি না কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখি।'

মেয়ের পিছনে বসিয়া মাতঙ্গিনী বিনুনী খুলিয়া নূতন করিয়া খোঁপা বাধিতেছিল। চম্পক বাধা দিয়া বলিল, 'আগ! দিদি বুঝি নিজেদের এই পশ্চিমী খোঁপা বাধিতেছ। যেমন ছিল তাহাই বরং ভাল।'

মাতঙ্গিনী উত্তর দিল—'এ দেশের মত খোঁপা বাঁধিয়া উঠিতে আমি যদি পারি, তবে এই সুন্দর মুখকে আরও সুন্দর দেখাইবে।'

চম্পক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, 'না বাপু না, সে খোঁপা বাঁধিতে হইবে না, নষ্টা স্ত্রীলোকেরা অমন খোঁপা বাঁধে। গেরস্থের মেয়েকে সে-খোঁপা ভাল মানাইবে না।'

তারা বাধা দিয়া বলিল, 'ছিঃ! নষ্টা মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তবে সৌন্দর্য্যকে কি কেহ অবজ্ঞা করে নাকি। তুমি যা বলিতেছ বোন্, সেদিক দিয়া হিসাব করিলে, তোমার অমন সুন্দর মুখকেও কুশ্রী করিয়া রাখা উচিত। না বাপু—নষ্টা মেয়েদের এক মাথা চুল আছে বলিয়া গেরস্থের মেয়ের তাহা থাকিবে না, এ কেমনধারা কথা। যেমন করিয়া খুসী তুমি খোঁপা বাধ দিদি।'—মাতঙ্গিনীর উদ্দেশে সে বলিল।

চম্পক উত্তর দিল না বটে, কিন্তু তাহার মুখ যে রকম অন্ধকার হইয়া উঠিল তাহাতে ইহা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তারার মুখে তাহার প্রশংসাও, সে যে নিজের ইচ্ছায় বাধা পাইয়াছে, তাহার জ্বালা ভুলাইতে পারে নাই। ঠিক এই সময়ে নীচের সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং মথুর ঘোষ বরান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চম্পক চিবুক অবধি ঘোম্‌টা টানিয়া ত্বরিতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল, দৌড়াইতে গিয়া তাহার পায়ের মল বাজিয়া উঠিল। তারাও অবশ্য মাথায় ঘোমটা টানিল কিন্তু অতখানি নয় এবং যাইবার জন্য আস্তে উঠিয়া বসিল। মাতঙ্গিনী সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মথুর ঘোষ দাঁড়াইয়া মেয়ের সহিত দুই একটি কথা কহিল। দরজার আড়াল হইতে চম্পক তাহাকে লুকাইয়া লক্ষ্য করিতেছিল—সে সন্দিগ্ধ প্রকৃতির, সুতরাং তাহার নজর এড়াইল না যে মেয়ের সহিত কথা কহিতে কহিতে নবাগতার বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্ত্তির দিকেও তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়িতেছে। মথুর ঘোষ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেলে, মেয়েরা আবার নিজেদের কাজে আসিয়া বসিল—শুধু চম্পক বাকী থাকিল। তাহার স্বামী গিয়া তাহাকে ঘরেই পাইল।

চম্পক বেশ জানিত যে তাহার স্বামী তাহার কক্ষেই আসিবেন, তাহার নিজের দেখা করিবার দরকারও ছিল। কিন্তু পাছে কেহ বোঝে যে তাহার সহিত দেখা করিতেই সে ঘরে আসিয়াছে, তাই স্বামীকে বারান্দা হইতে এদিকে আসিতে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি একটি বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে পানের সহিত চিবাইবার জন্য কয়েকটি ভাল মসল্লা বাহির করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মথুর ঘোষ ঘরে আসিয়া দেখিল যে মেঝেতে একরাশ রূপা, শিঙ ও কাঠের কৌটা এখানে-ওখানে ছড়ানো—সে ঘরে ঢুকিয়াছে, ইহা তাহার স্ত্রী লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। তখনও তাহার মুখের কিয়দংশ ঘোম্‌টায় ঢাকা ছিল, স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া সে দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফলের ছোট ছোট কৌটা মেঝের উপর ছড়াইয়াই চলিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মথুর বলিল,

—আবার কি হইল। ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া যেন মনে হয়।

চম্পক উত্তর না দিয়া কৌটার পর কৌটা মেঝের উপর সাজাইয়া চলিল।

মথুর বলিল, 'বুঝিলাম। এখন বল তো আমার কোন্ অপরাধের এই দণ্ড?'

কিন্তু তবু চাঁপা উত্তর দিল না। যেন যাহা খুঁজিতেছিল তাহা পাইয়াছে, এইভাব দেখাইয়া সে এবারে কৌটাগুলি

গুছাইয়া বাক্সে তুলিয়া চাবি বন্ধ করিয়া উঠিয়া, ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য দোরের দিকে গেল।

মথুর তাহার হাত ধরিয়া সেদিক যাইতে না দিয়া বলিল, —'তা হইবে না প্রেয়সী, এই কুশ্রী ঘোমটারই বা এখানে কি প্রয়োজন?' বলিয়া সে তাহার মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

চম্পক তাহার দিকে অত্যন্ত বিরক্তিভরা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'কেন আমার কাজে বাধা দিতেছ?'

—'বলই না, আমি কি করিয়াছি যে আমার প্রতি এই বিরূপ দৃষ্টি'। সে শুধু বলিল 'আমাকে ছাড়, যাইতে দাও।' যাইতে ইচ্ছা থাকিলে সে অবশ্য অনায়াসেই যাইতে পারিত। কেননা তাহার স্বামী অত্যন্ত সোহাগে, সন্তর্পণে তাহার হাত ধরিয়া ছিল—সে হাত ছাড়াইতে কাকুতির প্রয়োজন ছিল না—'ছাড়, আমার কাজ আছে।'

—'কমলমুখীর বুঝি কাজ আছে—কি সে কাজ?' মথুর হাসিয়া প্রশ্ন করিল।

রুক্ষ দৃষ্টি দিয়া সে উত্তরে বলিল, 'আমাকে পান সাজিতে হইবে।'

মথুর বলিল,—'এখানেই সাজ, আমাকেও দু একটি পান দিতে হইবে

সে আবার বলিল, 'ছাড়না, যাইতে দাও।'

মথুর অনুরাগভরে বলিল, 'কেন, কি হইয়াছে? কি অপরাধ করিয়াছি তাহা বল, এখনই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।'

আদর কাড়াইয়া সে তেমন করিয়াই উত্তর দিল, 'আমার কাছে অপরাধ—আমার কাছে আবার তুমি কি অপরাধ করিবে! আমি এমন কে যে তোমার অপরাধ লইতে পারি। না, তোমার যাহা খুশী তাহাই করিতে পার—কে তোমার অপরাধ লইবে! আমি আবার একটা লোক—' মথুর বলিল, 'সাবাস! এ যে ভয়ানক রাগ দেখি। এখন বলতো প্রাণেশ্বরি, আমাকে কি দুঃসাধ্য কাজ করিতে হবে—আমি এখনই তাহা করিতেছি।'

সে বলিল, 'যাও, যে বৌকে ভালবাস তাহার কাছে, সেই বলিবে তোমাকে কি অকাজ করিতে হইবে—তাহাই করিয়ো। আমি বেচারি লোক, তোমার বাড়িতে থাকা ছাড়া তোমার ঐশ্বর্য্যে আর কি ভাগ বসাইয়াছি—আমার কথা তুমি কেন শুনিবে। আর তোমার এবাড়িতে তো যে-সেই থাকিতে পারে!'

ব্যাপার কি বুঝিয়া মথুর বলিল, 'তাই নাকি'। সে বলিতে যাইতেছিল—'সতীনের কথায় ঐ গরীব মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়াছি বলিয়াই এই রাগ!' কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া সে থামিয়া গেল।

—'তোমার বাড়ি, যাহাকে খুশী আশ্রয় দিতে পার।' এখনও রাগ যেন যায় নাই এমনি ভাবে সে এই উত্তর দিল, কিন্তু তাহার বিরক্তির কারণ যে স্বামী এতক্ষণে বুঝিয়াছে, ইহাতে সে মনে মনে এবারে খুশী হইয়াছিল।

এবার মথুর গম্ভীরভাবে বলিল, 'মেয়েলি রাগ রাখিয়া সত্য করিয়া বলতো এই অনাথা স্ত্রীলোকটিকে কিছুকালের জন্য আশ্রয় দিতে তোমার কি আপত্তি!' চম্পক উত্তর দিল, 'অনাথা স্ত্রীলোক! কেন, অন্যায় করিয়াছে, বাড়ি হইতে তাড়াইয়া তো দিবেই।'

—'কিন্তু সে যে অন্যায় করিয়াছে, ইহা তুমি কি করিয়া জানিলে?'

—'কেন, তুমি কি ভাব যে মিছামিছি উহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে? নিজের স্ত্রীকে কেহ কখন খেয়ালে পড়িয়া বাড়ি হইতে তাড়ায়?'

—'হাঁ, হইতে পারে বটে সেই অন্যায় করিয়াছে—কিন্তু তাহার স্বামীও অন্যায় করিতে পারে। কিন্তু সে যাহাই হোক, বাড়িতে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া কোনও ক্রমেই অন্যায় পারে না

আবার চম্পক বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, 'যাহা খুশী, তাহা হইলে কর—আমার মত চাও কেন?'

—'আবার! ছিঃ—মেয়েমানুষের হৃদয়ে আরও বেশি দয়া থাকা উচিত।'

'যোগ্য হইলে কে না দয়া দেখায়! ভাল মন্দ সকলকেই কি দয়া করা উচিত?'··'কিন্তু কে তোমাকে বলিল যে ও সত্যই দুরবস্থায় পড়ে নাই। লোকজন তো উহার স্বভাব ভাল বলিয়াই জানে।'

—'লোকজন বলে!'—চম্পক তাহার সুন্দর সুবৃহৎ নথের এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিল,—'সুকোর মায়ের বাজে বকুনি

হইতে তুমি তো সব সংবাদ পাইয়াছ—উহার ঐ মিথ্যা প্রমাণকে তুমি লোকজনের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া মূল্য দিয়াছ !'

মথুর একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'কেন, তুমি কি উহার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আরও কোন কথা কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছ ?'

সে বলিল, 'পুরুষের চাইতে মেয়েদের কথা মেয়েরাই বেশি জানে।'

মথুর আবার প্রশ্ন করিল, 'তুমি কি শুনিয়াছ ?'

এইবার একটু বক্রোক্তি করিয়া সে উত্তর দিল, 'একটি স্ত্রীলোকের গোপন কথা শুনিবার ব্যগ্রতা দেখাইতে তোমার ভদ্রতায় বাধে না ?'

মথুর ঘোর বিরক্ত বোধ করিল। যে উদ্দেশ্যেই হউক মথুরের নিশ্চিত ইচ্ছা ছিল মাতঙ্গিনী তাহার আশ্রয়ে থাকিবে। এখন নিজের ইচ্ছা মত সকল কাজ হউক যে ভাবে—তাহার কাছ হইতে এই অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধ ব্যবহার পাইয়া সে বিরক্ত বোধ করিল।

কিছুকাল চিন্তা করিয়া সে বলিল, 'অন্ততঃ তুমি ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার কর যে আত্মীয় স্ত্রীলোককে বাড়ির বাহির করিয়া দেওয়া অত্যন্ত খারাপ দেখায়। তুমি তো জান ও আমাদের আত্মীয়া—আমাদের উপর উহার কি কোন দাবী নাই ?'

—'আর একজনের আত্মীয়তাসূত্রেই তো ও আমাদের আত্মীয়া।'—উত্তর যেন প্রস্তুতই ছিল—'বোনের বাড়িতে ও আশ্রয় লইল না কেন? নিজের বোন অপেক্ষা আমরা কি উহার বেশি আপন না প্রিয়জন? তাহারা উহাকে ভাল করিয়াই জানে বলিয়া বোধ হয় সেখানে ও আশ্রয় লইতে যায় না।'

মথুর অত্যন্ত বিরক্তমনে কহিল, 'তুমি অত্যন্ত ছোট লোক। পৃথিবীতে যে নিরাশ্রয়, তাহারও বিরুদ্ধে তোমার রাগ! আমার বাড়িতে খাওয়া-পরার অভাব আছে নাকি ?'

অভিমান করিয়া সে বলিল, 'না। সে যাই হোক্ ও যদি এ বাড়িতে আশ্রয় পায়, আমি আমার অংশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। দাও আমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া, ও থাকুক এখানে। যে বাড়িতে ঐ রকম স্ত্রীলোক বাস করে নিজের মেয়ের সেখানে থাকা পছন্দ করার মত লোক আমার বাবা নন্।'

মথুর তিক্ত হইয়া বলিল, 'এ সব আবার কি !'

—'না, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দাও' সে উত্তর দিল।

এইবারে মথুর নরম হইয়াছিল, বলিল,—'জান তো আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। এ ছেলেমানুষি রাখ।'

উত্তর হইল, 'তাহা হইলে উহাকে তাড়াও।'

—'উহাকে তাড়াও। ও আমার কে যে উহাকে তাড়াইতে বাধা হইবে।—আচ্ছা একটু ভাবিবার সময় দাও।'

এই কথা বলিয়া মথুর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মনে থাকিল, যতদিন স্ত্রীর মত না বদলায়, ততদিন তাহাকে কোনও প্রকার ভুলাইয়া-ভালাইয়া ঠকাইয়া রাখিবে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে যখন পুনরায় এই ঘরে ফিরিল তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল। ঘরের এক কোণে, তাহার শয্যা হইতে অনেক দূরে—অপর ঘর হইতে একটি সামান্য খাট আনাইয়া, তদুপরি আর একটি বিছানা পাতা হইয়াছে।

'এ কাহার জন্য ?' অতিরিক্ত শয্যার প্রতি দৃষ্টি পড়াতে মথুর জিজ্ঞাসা করিল। চম্পক কথা কহিল না, শুধু শয্যার উপর নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া কোন উত্তর না দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

স্ত্রৈণ মথুর ঘোষের সে রাত্রি কেমন কাটিল, তাহা আমাদের পাঠকবৃন্দ অনুমান করিবেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বৈঠকখানায় গিয়া সে দেখিল তাহার জন্য এক ব্যক্তি অপেক্ষা করিতেছি—রাজমোহন ঘোষ বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিল। সে মথুরকে তাহার আগমনোদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিল যে সে সংবাদ পাইয়াছে যে, তাহার স্ত্রী এখানে—সে মনোমালিন্যের অজুহাতে বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার সাহায্যার্থে অনুরোধ করিতে সে আসিয়াছে। মথুর স্বামীর কাছে স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিবার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না,—চম্পকের হাসি-মুখ দেখিবার ও সাংসারিক শান্তির ইচ্ছা থাকিলে, এবং অন্যান্য অনেক দিক বিচার করিয়া ইহা ছাড়া অপর কোন পন্থাও সে দেখিতে পাইল না।

যখন মাতঙ্গিনীকে সংবাদ দেওয়া হইল, তাহাকে যাইতে হইবে,—নিজের ভাগ্যে যাহা ঘটিবে সে কথা ভাবিয়া তাহার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। প্রায় জীবন্মৃত অবস্থায় সে সুকোর মায়ের পিছনে পিছনে চলিল—তাহাকে বাড়িতে রাখিয়া আসিবার ভার সুকোর মায়ের উপর পড়িয়াছিল। তারা খিড়কির দোর অবধি তাহাকে আগাইয়া দিল—এবং সম্ভব হইলে আরও খানিক আগাইয়া দিত। তাহাকে সে ভারী মনে বিদায় দিল এবং স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ভুলিয়া সুখে শান্তিতে থাকিবার কথা সে মাতঙ্গিনীকে বার বার করিয়া বলিল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনন্দলাল বসু

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

সঙ্ঘ সম্বন্ধে নানাবিধ নিয়মাবলী বুদ্ধের সময় হইতেই প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়, বিনয়-পিটকে ইহার সুবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে কয়েকটি মোটামুটি সাধারণ নিয়ম ছাড়া বুদ্ধ প্রথমে অন্য কিছু বলেন নাই ; এই নিয়মগুলির ব্যতিক্রম হইলে তিনি বিশেষ নিষেধের প্রবর্ত্তন করিতেন, আবার যেখানে প্রয়োজন হইত সেখানেই তিনি নিষেধ-বন্ধনের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিতেন। "বিনয়ের" এই নিয়মগুলি হইতে যেমন সঙ্ঘজীবন, ভিক্ষুদের অনেকের প্রকৃতির দোষগুণ ও সেই যুগের সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে বুদ্ধের কাছে নিয়মের চেয়ে মানুষ অনেক বড় ছিল। মানুষের জন্যই নিয়ম, নিয়মের জন্য মানুষ না— এই কথার সত্যতা বুদ্ধ "বিনয়ের" এই নিয়মগুলি সম্পর্কে যেমন দেখাইয়াছেন এমন আর কোনও শাস্ত্র বা ধর্ম্মগুরুর জীবনে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আরও একটি বিষয় "বিনয়ের" নিয়মাবলীতে প্রতীয়মান হয়, যে, বুদ্ধের মত মহামনা লোকের কাছে না হইলেও সাধারণ ভিক্ষুমণ্ডলীর কাছে মানুষের চেয়ে বিধিনিষেধের মর্য্যাদাই যেন বেশি ছিল। এমন অনেক লোক সংঘে প্রবেশ করিত যাহারা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অতি হীন ছিল। বিনয়পিটকের বিবরণ-গুলি সবই বুদ্ধের জীবদ্দশাতে ঘটিয়াছিল কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন - তাঁহারা মনে করেন, পরবর্ত্তী কালেরও কিছু ঘটনা সম্পর্কে সংঘনেতাদের আদেশ বুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনা ও বুদ্ধের আদেশ বলিয়া শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। ইহা সত্য হইলেও বুদ্ধের মতের প্রতিকূল কোন বিষয় "বিনয়ের" মধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

দীক্ষার্থীর সঙ্ঘ-প্রবেশ

কোন লোক সঙ্ঘে প্রবেশ প্রার্থনা করিলে তাহাকে প্রথমে পব্বজ্জা (পব্বজ্জা) অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত ও পরে তাহার পূর্ণদীক্ষা (উপসম্পদা) হইত। এই দুইটি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইলে তবে লোকে 'ভিক্ষু' বলিয়া পরিচিত হইত।

আন্তরিক দীক্ষার্থী ছাড়া ক্রমে অন্যরূপ লোকও সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিল। মগধের প্রত্যন্তদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় বিম্বিসার সেনানায়ক মহামাত্যদের বিদ্রোহ দমন করিতে বলিলেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। অনেক সৈন্য যুদ্ধের বিপদ ও কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভিক্ষুদের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। এদিকে যুদ্ধের ডাক পড়িলে তাহাদের পাওয়া না যাওয়ায় সেনানায়কেরা খোঁজ লইয়া জানিলেন যে তাহারা প্রব্রজ্যা লইয়াছে। সেনানায়কেরা বিম্বিসারের কাছে নালিশ করিলেন। বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে গিয়া প্রার্থনা করিলেন যে রাজভৃত্যদের যেন প্রব্রজ্যা দেওয়া না হয় ; বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডাকাইয়া রাজভৃত্যের প্রব্রজ্যা নিষেধ করিয়া দিলেন।

বিম্বিসার নগরে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন ভিক্ষুদের কোন ক্ষতি না করে। কয়েকজন বন্দী কারাগৃহ হইতে পলাইয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিল। কয়েকজন লোক তাহাদের ধরাইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু অন্যেরা বলিল তাহা হইতে পারে না, কারণ, রাজা ভিক্ষুদের ক্ষতি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। লোকের মুখে মুখে ভিক্ষুরা একথা জানিতে পারিয়া বুদ্ধকে জানাইল। বুদ্ধ পলাতক বন্দীর প্রব্রজ্যা নিষেধ করিলেন। এইরূপ আরও অনেক অপরাধী যেমন দেনাদার, ক্রীতদাস প্রভৃতি পলাইয়া আসিয়া প্রব্রজ্যা লইয়া-ছিল, ইহারাও নিষিদ্ধ হইল। মাথায় টাকওয়ালা একজন স্বর্ণকার মাতাপিতার সঙ্গে কলহ করিয়া রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া প্রব্রজ্যা লইয়া মাথা মুড়াইয়াছিল। মাতা-পিতা তাহার খোঁজে আসিয়া ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিল, টাক-মাথাওয়ালা কোন লোক প্রব্রজ্যা লইয়াছে কিনা। ভিক্ষুরা স্বর্ণকারের মাথা মুড়াইবার আগের অবস্থা দেখে নাই, তাহারা বলিল, সেরূপ কোন লোক প্রব্রজ্যা লয় নাই। মাতাপিতা পরে স্বর্ণকারকে খুঁজিয়া বাহির করিল ও ভিক্ষুদের মিথ্যাবাদী নাম রটাইয়া দিল। লোকে ভিক্ষুদের নিন্দা করিতে লাগিল। ভিক্ষুরা বুদ্ধকে একথা জানাইলে তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন

যে প্রব্রজ্যাপ্রার্থীর মাথা মুড়াইবার আগে তাহাকে সকল ভিক্ষুদের দেখাইতে হইবে।

শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা "আরামে" বাস করে, নির্ভাবনায় খায়-দায় দেখিয়া কতকগুলি লোক তাহাদের ছোট ছেলেরা ভবিষ্যতে সুখে থাকিবে ভাবিয়া তাহাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইল। এই বালকেরা শেষ রাত্রে উঠিয়া খাইবার জন্য চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। ভিক্ষুরা বুঝাইল, "সকাল হউক, খাবার থাকিলে খাইবে, না থাকিলে ভিক্ষায় বাহির হইলে খাবার পাইবে।" ছেলেগুলি ইহাতে শান্ত না হইয়া আরও গোলমাল ও উপদ্রব লাগাইয়া দিল। বুদ্ধ প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে এই গণ্ডগোল শুনিতে পাইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কুড়ি বৎসরের কমবয়স্ককে প্রব্রজ্যা দেওয়ার জন্য ভিক্ষুদের তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে অল্পবয়স্ক বালকেরা ক্ষুৎপিপাসা, শীতগ্রীষ্ম এবং অন্য শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে পারে না।

এক পরিবারের একজন লোক ও তাহার একটি বালক-পুত্র ছাড়া আর সকলেই মারীরোগে মারা পড়িল। লোকটি ছেলেটিকে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। ভিক্ষায় বাহির হইয়া বাপ কিছু পাইলে ছেলেটি অমনি 'গোঁট' ধরিত "বাবা, আমাকে একটু দাও, আমাকে একটু দাও।" লোকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা চরিত্রহীন—এ বালকটি নিশ্চয় ভিক্ষুণী-পুত্র।" ভিক্ষুরা শুনিতে পাইয়া বুদ্ধকে জানাইল। বুদ্ধ পনর বৎসরের কমবয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা-দান নিষেধ করিয়া দিলেন।

একটি পরিবার আনন্দকে বড় ভক্তি করিত। মারী-রোগে এই পরিবারের দুটি ছোট ছেলে ছাড়া আর সকলেই মারা গেল। ভিক্ষুদের দেখিলে ছেলেদুটি পূর্ব্বের অভ্যাসমত দৌড়িয়া আসিত কিন্তু ভিক্ষুরা তাহাদের তাড়াইয়া দিত, ছেলেদুটি ইহাতে কাঁদিত। ছেলেদুটির কি হইবে ভাবিয়া আনন্দের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। ছেলেদুটির বয়স পনর বৎসরের কম, কাজেই সঙ্ঘে প্রবেশ করাইয়াও ইহাদের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া আনন্দ বুদ্ধকে ইহাদের কথা জানাইলেন। পরদুঃখকাতর উদারচেতা বুদ্ধের সন্ন্যাসী হইলেও রহস্যবোধ ছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছেলে দুটি কাক তাড়াইতে পারে কি না। পারে শুনিয়া কাক তাড়াইবার জন্য ছেলেদুটিকে তিনি সংঘে প্রবেশ করাইবার অনুমতি দিলেন। সঙ্ঘের বালকদিগকে "শ্রমণের" (সামনের) বলা হইত।

এক ভিক্ষুর শিক্ষাধীন দুইটি শ্রমণের পরস্পরের সহিত দুষ্ক্রিয়া করিয়াছিল, ইহাতে নিয়ম হইয়াছিল যে একজন ভিক্ষুর কাছে একাধিক শ্রমণের থাকিতে পারিবে না। সারিপুত্রের প্রতি অনুরাগী একজন গৃহীভক্ত তাঁহার এক পুত্রকে সারিপুত্রের কাছে প্রব্রজ্যার জন্য পাঠাইলেন। বুদ্ধপুত্র রাহুল তখন সারিপুত্রের শিক্ষাধীন ছিলেন তাই উক্ত নিয়মানুসারে তিনি দ্বিতীয় কোন শ্রমণেরকে শিক্ষাধীন রাখিতে অস্বীকৃত হইলেন। বুদ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া সারিপুত্রকে দ্বিতীয় শ্রমণের গ্রহণের অনুমতি দিয়া বলিলেন, "বিদ্বান ও উপযুক্ত ভিক্ষু ইচ্ছা করিলে একাধিক বা যতগুলিকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে ও শাসনে রাখিতে পারেন ততগুলি শ্রমণেরকে শিক্ষাধীন রাখিতে পারিবেন।"

একজন শ্রমণের একজন ভিক্ষুণীর সঙ্গে দুষ্ক্রিয়া করিয়াছিল। বুদ্ধ এই শ্রমণেরকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। একজন ক্লীব প্রব্রজ্যা লইয়াছিল। সে যুবা-ভিক্ষুদের কাছে গিয়া তাহাদিগকে দুষ্ক্রিয়ায় আহ্বান করিল, ভিক্ষুরা তাহাকে "মর্ মর্" বলিয়া তাড়াইয়া দিল; তখন সে বলিষ্ঠ শ্রমণেরদের কাছে গেল, তাহারাও তাহাকে তাড়াইয়া দিল, শেষে সে হাতিশাল ঘোড়াশালের লোকদের কাছে গিয়া দুষ্ক্রিয়া করিল। ইহারা বলাবলি করিত, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা ক্লীব, তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্লীব নয় তাহারা এই ক্লীবদের সঙ্গে দুষ্ক্রিয়া করে—ইহারা চরিত্রহীন।" ভিক্ষুরা লোকমুখে এ কথা শুনিতে পাইল, বুদ্ধেরও কানে গেল; তিনি ক্লীবকে বহিষ্কৃত করিলেন।

একজন বনিয়াদি ঘরের লোকের আত্মীয়স্বজন মারা গেল। লোকটি বড় আরামে মানুষ হইয়াছিল, সে ভাবিল তাহার দ্বারা ধনার্জ্জনের পরিশ্রম পোষাইবে না, অতএব সে ভিক্ষু সাজিয়া "আরামে" গিয়া সুখে বাস করিবে। পাত্র ও চীবর সংগ্রহ করিয়া মাথা মুড়াইয়া ভদ্রলোক আরামে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কতদিন হইল উপসম্পদা পাইয়াছেন, ভদ্রলোক বুঝিতে না পারিয়া "উপসম্পদা" কথার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভিক্ষুরা বলিল, "তোমার উপাধ্যায় কে?" ভদ্রলোক ইহারও অর্থ বুঝিলেন না। তখন ভিক্ষুরা সঙ্ঘের নিয়মাবলীতে অভিজ্ঞ ভিক্ষু উপালিকে এ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে বলিল। ছদ্ম ভিক্ষু উপালির কাছে সব কথা স্বীকার করিলেন। ইঁহাকেও সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল।

একজন মাতৃহন্তা ও একজন পিতৃহন্তা প্রব্রজ্যা লইতে আসিয়াছিল। উপালি তাহাদের পরীক্ষা করিবার সময় তাহারা নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করিল। ইহাদের প্রব্রজ্যা দেওয়া হইল না। ইহার কারণ আছে; অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিলে ও স্বকৃত দোষের জন্য অনুতপ্ত হইলে তাহাকে পাপী মনে করা যদিও ধার্ম্মিকের কাজ নয় তবু এক্ষেত্রে লোকদুটি সত্যই অনুতপ্ত বোধ হয় হয় নাই, শাস্তি এড়াইবার জন্য সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিল। আরও একটি কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, এই সব প্রকৃতির কৃতাপরাধ লোক সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে সাধারণ লোকের সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাহানি হইত। বুদ্ধ লোকমত বিশেষতঃ অনুকূল পৃষ্ঠপোষকদের মত সম্বন্ধে সদা সজাগ ছিলেন। তাঁহার বহু কার্য্যে ও বাক্যে ইহা প্রমাণিত হইবে।

সাকেতনগর হইতে শ্রাবস্তীর পথে একদল ভিক্ষুর উপর ডাকাত পড়িয়া কয়েকজন ভিক্ষুকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। শ্রাবস্তী হইতে রাজসৈন্য আসিয়া কয়েকজন ডাকাতকে ধরিল, অন্যেরা পলাইয়া গিয়া প্রব্রজ্যা লইল। যাহারা ধরা পড়িল তাহাদের প্রাণদণ্ড হইল; ইহাদের যখন বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন পথে ইহাদের দেখিতে পাইয়া প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত ডাকাতরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ভাগ্যে আমরা পলাইয়াছিলাম, ধরা পড়িলে মরিতে হইত!" ভিক্ষুরা শুনিতে পাইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে ডাকাত-প্রব্রজিতেরা সব কথা স্বীকার করিল। ইহাদের সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। আর একবার সেই বনে ডাকাত পড়িয়া কয়েকজন ভিক্ষুণীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছিল। এই ডাকাতদেরও কয়েকজন পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার মত প্রব্রজ্যা লইয়া পরে সেই ভাবেই বিতাড়িত হইয়াছিল। একজন উভলিঙ্গ লোক প্রব্রজ্যা লইয়া উভয় প্রকারে দুষ্ক্রিয়া করিয়া বেড়াইত, ইহাকেও বহিষ্কার করা হইয়াছিল। বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি কোন কোন লোকও প্রব্রজ্যা লইয়াছিল। লোকে নিন্দা করিত বলিয়া এরূপ লোকের প্রব্রজ্যা নিষিদ্ধ হইল।

একজন ভিক্ষু উপসম্পদা পাইবার পর একদিন একাকী "আরামে" ফিরিতেছিল। পথে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইল, সে প্রব্রজ্যা লইয়াছে শুনিয়া স্ত্রী তাহাকে "প্রব্রজিতদের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভোগ দুর্ল্লভ," বলিয়া ভিক্ষুকে সম্ভোগে প্রবৃত্ত করাইল। ইহাতে ভিক্ষুর আরামে ফিরিতে দেরী হইয়া গেল। অন্য ভিক্ষুরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু ঘটনার কথা জানাইল। অন্যেরা তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিলে সে বলিল যে ইহা যে অকর্ত্তব্য তাহা সে জানিত না। বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া বলিয়া দিলেন যে প্রত্যেক প্রব্রজ্যাপ্রার্থীকে ভিক্ষুর পালনীয় নিয়মগুলি একটি একটি করিয়া বলিয়া দিতে হইবে। নিয়মগুলি এই—

(১) সকল প্রকারের এমন কি তির্য্যক্ যোনির সঙ্গে পর্য্যন্ত মৈথুন পরিত্যাগ করিতে হইবে;

(২) অদত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না;

(৩) ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও প্রাণীহত্যা করিতে পারা যাইবে না; এবং

(৪) লোকোত্তর কোন শক্তিসামর্থ্যের অহঙ্কার করিতে পারা যাইবে না, এমন কি "আমি নির্জ্জন স্থান ভালবাসি" এরূপও বলিতে পারা যাইবে না। বুদ্ধ অনাথপিণ্ডদকে বলিয়াছিলেন, "সুঞ্ঞাগারে খো গহপতি! তথাগতা অভিরমন্তি" এবং তাহার নির্জ্জনতাপ্রিয়তা প্রসিদ্ধ ছিল, তাঁহার দেখাদেখি ভিক্ষুরাও বোধ হয় "আমি নির্জ্জন স্থান ভালবাসি" বলিয়া বাহাদুরি লইত, এইজন্য এই নিয়মের শেষাংশটুকু যোগ করিতে হইয়াছিল।

নূতন ভিক্ষুরা আরও অনেক রকম অনাচার করিল। কেহ উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান না করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইত, কেহ লোকের আহার্য্যের উপর উচ্ছিষ্ট ভিক্ষাপাত্র ধরিয়া ভিক্ষা চাহিত, কেহ ভোজনশালায় তারস্বরে কলরব করিত। এই সব কারণে লোকে নিন্দা করিয়া বলিল, "ইহারা তো নিমন্ত্রণের সময় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ করে সেইরূপই করিতেছে।" শীলবান-সংযত ভিক্ষুরাও উচ্ছৃঙ্খল ভিক্ষুদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধকে জানাইলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডাকাইয়া তিরস্কার করিলেন ও নিয়ম করিয়া দিলেন যে নূতন ভিক্ষুদের পুরাতন

ভিক্ষুদের কাছে শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে। শিক্ষক-ভিক্ষুকে উপাধ্যায় (উপজ্‌ঝায়) ও ছাত্র-ভিক্ষুকে সাদ্ধবিহারীক (সদ্ধবিহারিক অর্থাৎ যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে) বলা হইত। গুরুশিষ্যের পরস্পরের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে বুদ্ধ এই কথা বলিয়াছিলেন, "উপাধ্যায়ের উচিত সার্দ্ধবিহারীকে পুত্রতুল্য মনে করা, সার্দ্ধবিহারীর উচিত উপাধ্যায়কে পিতৃতুল্য মনে করা—পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান, বিশ্বাসবান ও ঐক্যবান হইয়া উভয়ে এইরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।" সাদ্ধ-বিহারীকে ভৃত্যের মত উপাধ্যায়ের সেবা করিতে হইত, উপাধ্যায়কেও সার্দ্ধবিহারীর যত্ন লইতে হইত এবং সাদ্ধবিহারী অসুস্থ হইলে উপাধ্যায় সকল রকমে তাহার সেবা করিবেন এই নিয়ম ছিল। কিন্তু সুনিয়ম বা সু-ইচ্ছায় মানুষের প্রকৃতি বদলায় না, অচিরেই উপাধ্যায়-সাদ্ধবিহারীর মধ্যে গোলমাল বাধিতে লাগিল। অনেক সাদ্ধবিহারী উপাধ্যায়ের কথা শুনিল না, কাজ করিল না, তাঁহাকে মান্য করিল না। বুদ্ধ দুষ্টদের ডাকাইয়া ভর্ৎসনা করিলেন, তবু গোলমাল চলিল। তখন ব্যবস্থা হইল যে উপাধ্যায় কথায় বা ইঙ্গিতে সার্দ্ধবিহারীকে তাঁহার ছাত্রত্ব হইতে তাড়াইতে পারিবেন। কোন কোন বিতাড়িত সার্দ্ধবিহারী উপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনর্গৃহীত হইল। অনেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল না, তখন ক্ষমাপ্রার্থনা না করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে স্থির হইল। আবার কোন কোন উপাধ্যায় সার্দ্ধ-বিহারী ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও ক্ষমা করিলেন না, অনেকে দুষ্ট সার্দ্ধবিহারীকে তাড়াইলেন না, কেহ আবার নিরপরাধ সার্দ্ধবিহারীকে তাড়াইলেন। এগুলিও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে স্থির হইল।

একজন প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ব্রাহ্মণকে ভিক্ষুরা ফিরাইয়া দিল, ব্রাহ্মণ দুঃখিত চিত্তে বুদ্ধের কাছে গিয়া ইহা জানাইল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ভাল কথা কেহ কিছু বলিতে পারে কিনা। সারিপুত্র বলিলেন, ব্রাহ্মণ একবার তাঁহাকে একহাতা ভাত ভিক্ষা দিয়াছিল। বুদ্ধ বলিলেন, "সাধু সাধু! সারিপুত্র, সৎলোক কৃতজ্ঞ হয়, তুমি ব্রাহ্মণকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দাও।" এই সময় বুদ্ধ নিয়ম করিয়া দিলেন যে কাহাকেও দীক্ষা দিতে আপত্তি থাকিতে পারে মনে হইলে দীক্ষাদাতা ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে তিনবার "জ্ঞপ্তি" (ঞত্তি) বা প্রস্তাব (ইংরেজিতে যাহাকে মোশন বলে) করিবেন এবং কাহারও আপত্তি না থাকিলে দীক্ষা-প্রার্থীকে দীক্ষা দেওয়া হইবে। "জ্ঞপ্তি" উপস্থিত করিবার পদ্ধতি এইরূপ ছিল—একজন উপযুক্ত ভিক্ষু মিলিত সঙ্ঘের কাছে এইরূপ বলিবেন, "হে ভদন্তগণ, সঙ্ঘ আমার কথা শ্রবণ করুন; অমুক ব্যক্তি আয়ুষ্মান অমুকের কাছে উপসম্পদা লইতে চাহেন। যদি সঙ্ঘের সম্মতি থাকে তবে অমুক ব্যক্তিকে আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দান করুন, ইহাই জ্ঞপ্তি। হে ভদন্তগণ, সঙ্ঘ আমার কথা শ্রবণ করুন; অমুক ব্যক্তি আয়ুষ্মান অমুকের কাছে উপসম্পদা লইতে চাহেন। অমুকব্যক্তিকে আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুর উপধ্যায়ত্বে সঙ্ঘ উপসম্পদা দান করিলেন। ইহাতে যাহার সম্মতি আছে তিনি তুষ্ণী থাকুন, আর যাঁহার ইহাতে আপত্তি আছে তিনি বলুন।

"দ্বিতীয়বার আবার আমি বলিতেছি—হে ভদন্তগণ! সঙ্ঘ আমার কথা শ্রবণ করুন; অমুক ব্যক্তি······ (প্রথম বারের মত)।

"তৃতীয়বার আবার আমি বলিতেছি—হে ভদন্তগণ, সঙ্ঘ আমার কথা শ্রবণ করুন······ (পূর্ব্বের মত)

অমুকব্যক্তিকে আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে সঙ্ঘ উপসম্পদা দান করিলেন। ইহাতে সঙ্ঘের সম্মতি আছে, তাই সঙ্ঘ তুষ্ণী আছেন। আমি ইহাই বুঝিলাম।"

পার্লামেণ্টে যেমন কোন বিল পাশ করিতে হইলে তাহার "থ্রী রীডিংস্" বা "তিনবার পাঠ" প্রয়োজন হয় সেইরূপ সঙ্ঘেও তিনবার জ্ঞপ্তি উপস্থিত করিতে হইত। কাহারও আপত্তি থাকিলে বা অন্য কোনরূপ বিষয়ের আলোচনায় সঙ্ঘে মতভেদ হইলে অধিকাংশ ভিক্ষুর মত বা ভোট যাহা হইত তাহাই সঙ্ঘের মত বলিয়া পরিগণিত হইত। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এই ব্যবস্থা বুদ্ধ নিজে প্রবর্ত্তন করেন নাই, লিচ্ছবি, মল্ল প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাজ্যের শাসন-সভায় প্রচলিত রীতিই তিনি গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় যে ইংরেজ সমালোচকরা যে বলেন, গণতন্ত্র ভারতের ধাতে সহে না, কারণ ইংরেজ রাজা হইবার পূর্ব্বে গণতান্ত্রিক বোধ আমাদের ইতিহাসে বা প্রকৃতিতে ছিল না একথা অজ্ঞতা বা দুষ্টবুদ্ধি-প্রসূত। তবে

একথা এখানে উল্লেখ করা উচিত যে রাষ্ট্রব্যাপারে যাহাই থাকুক, সঙ্ঘসংক্রান্ত বিষয়ে অধিকাংশের মত যে গ্রাহ্য করিতেই হইবে একথা বুদ্ধ মানিতেন না।

বুদ্ধ মনে করিতেন যে অধিকাংশের মত ভ্রমাত্মক বা অসঙ্গতও হইতে পারে। সুবিজ্ঞ, শীলবান, পণ্ডিত ও প্রাচীন ভিক্ষুরা যদি অধিকাংশের মত অগ্রাহ্য করিতেন তবে তাহা পরিত্যক্ত হইত। দশজন কলহপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল অবিবেচক তরলমতি 'চ্যাংড়া'র মতের চেয়ে একজন সংযত, শীলবান, পণ্ডিত ও অভিজ্ঞের মতের মূল্য বুদ্ধের কাছে বেশী ছিল। সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হইত, সকলেরই মত লওয়া হইত, কিন্তু চরম নির্দ্ধারণের জন্য সংখ্যার চেয়ে জ্ঞান ও গুণের মর্য্যাদা বেশী ছিল।

উপসম্পদা লাভের পর একজন ভিক্ষু অনাচার করিল। ভিক্ষুরা আপত্তি করিলে সে বলিল, "আমি তো আপনাদের কাছে উপসম্পদা চাই নাই, আপনারা আমাকে উপসম্পদা দিলেন কেন?" ইহাতে বুদ্ধ নিয়ম করিলেন যে উপসম্পদা-প্রার্থীকে বিনীতভাবে সঙ্ঘের কাছে "সংসারমুক্তির জন্য সঙ্ঘ কৃপা করিয়া আমাকে উপসম্পদা দান করুন" এই বলিয়া আবেদন করিতে হইবে; তারপর একজন উপযুক্ত ভিক্ষু তাহার হইয়া সঙ্ঘের কাছে যথাপদ্ধতি উপসম্পদা প্রার্থনা করিয়া জ্ঞপ্তি উপস্থিত করিবেন।

রাজগৃহের কয়েকজন ধনী গৃহীভক্ত—ইহাদের "উপাসক" বলা হইত—নিয়মিতভাবে ভিক্ষুদের স্ব স্ব গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ দেখিল যে ভিক্ষুদের বেশ নিয়মিত ভোজন-শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। সে প্রব্রজ্যা লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিল ও উপসম্পদাও পাইল। কিছুদিন পরে উপাসকদের নিমন্ত্রণের পালা শেষ হইল। ভিক্ষুরা ব্রাহ্মণকে বলিল, "চল এখন ভিক্ষায় বাহির হওয়া যাক," ব্রাহ্মণ বলিল, "আমি ভিক্ষায় বাহির হওয়ার জন্য প্রব্রজ্যা লই নাই, তোমরা যদি আমাকে খাইতে দাও তবে খাইব, না দিলে গৃহে ফিরিয়া যাইব।"

"তুমি কি তবে পেটের জন্য প্রব্রজ্যা লইয়াছিলে?"

"হাঁ।" বুদ্ধকে এ কথা জানান হইলে তিনি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ সেই কথাই বলিল। বুদ্ধ তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ওহে অপদার্থ, কি করিয়া তুমি উদরের জন্য এই সু-আখ্যাত ধর্ম্ম বিনয়ে প্রব্রজ্যা লইলে? ওহে অপদার্থ ইহাতে অপ্রসন্নেরা প্রসন্ন হইবে না, প্রসন্নদেরও সংখ্যা বাড়িবে না।" বিনয়-পিটকের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই বুদ্ধ শিষ্যদের ভর্ৎসনা করিবার সময় "মোঘপুরিস" (অর্থাৎ অ-পুরুষ বা অ-মনুষ্য) শব্দটি ব্যবহার করিতেন। মূল বিবেচনা করিলে ইহা যত কড়া কথা বলিয়া মনে হয় আসলে চলিত ব্যবহারে তত কড়া ছিল না, আমরা এখন "অপদার্থ" যে অর্থে ব্যবহার করি অনেকটা সেইরূপ। "অপ্রসন্নেরা প্রসন্ন হইবে না, প্রসন্নদেরও সংখ্যা বাড়িবে না" এ কথাও বুদ্ধ প্রায়ই বলিতেন, ইহাতে বুঝা যায় জনসাধারণের যাহাতে সঙ্ঘের প্রতি আনুকূল্যভাব থাকে সে বিষয়ে তাঁহার প্রখরদৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুদের বলিলেন যে উপসম্পদা দানের সময় ভিক্ষুরা দীক্ষার্থীকে এই চারিটি অবলম্বনের (নিস্সয়, অর্থাৎ আশ্রয়) কথা বুঝাইয়া দিবেন যে,

(১) যে ভিক্ষু হইয়াছে তাহাকে যাবজ্জীবন ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, নিমন্ত্রণ প্রভৃতি অতিরিক্ত লাভ;

(২) যে ভিক্ষু হইয়াছে তাহাকে যাবজ্জীবন পথের ধূলা হইতে কুড়ান ন্যাকড়ায় প্রস্তুত (পংসুকুল) চীবরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, ক্ষৌম, কার্পাস, কৌষেয়, কম্বল, শন প্রভৃতি বস্ত্র অতিরিক্ত লাভ;

(৩) যে ভিক্ষু হইয়াছে তাহাকে যাবজ্জীবন বৃক্ষতলে বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, আরাম, বিহার, গৃহ, প্রাসাদ, গুহা প্রভৃতি অতিরিক্ত লাভ; এবং,

(৪) যে ভিক্ষু হইয়াছে তাহাকে যাবজ্জীবন পুতিমূত্র অর্থাৎ পচা গোমূত্র মাত্র ভেষজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, ঘৃত, সর্পি, নবনীত, তৈল, মধু, গুড় প্রভৃতি ঔষধ অতিরিক্ত লাভ।

একজন অল্পবয়স্ক যুবা দীক্ষার জন্য ভিক্ষুদের কাছে আসিল, ভিক্ষুরা তাহাকে নিশ্রয়গুলির কথা বলিল। যুবা বলিল, "উপসম্পদালাভের পর এগুলির কথা শুনিলে আমার আগ্রহ বাড়িত, কিন্তু এখন আমি উপসম্পদা লইব না, এগুলি আমার ভাল লাগে না ও ঘৃণ্য মনে হয়।" বুদ্ধ জানিতে

পারিয়া বলিয়া দিলেন যে আগে না বলিয়া উপসম্পদার ঠিক পরেই নিশ্রয়গুলির কথা বলিতে হইবে।

কোন কোন ভিক্ষু দুই তিন জন মাত্র ভিক্ষুকে লইয়া সঙ্ঘ করিয়া দীক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করিল। ইহাতে নিয়ম হইল যে দশ বা ততোধিক জন ভিক্ষুকে লইয়া সঙ্ঘ করিয়া তাহার কাছে উপসম্পদা দিতে হইবে।

কোন কোন ভিক্ষু নিজেদের উপসম্পদার দুই এক বৎসর পরেই নিজেদের সার্দ্ধবিহারীকে উপসম্পদা দিল। উপসেন বদন্তপুত্র নামক ভিক্ষু নিজের এক বৎসর পরেই সার্দ্ধবিহারীকে উপসম্পদা দিল। নিজের প্রব্রজ্যার পর দ্বিতীয় বর্ষাবাসান্তে সে সার্দ্ধবিহারীকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল। বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন, "হে ভিক্ষু, তোমাদের সব খবর ভাল ত'? তোমরা প্রাণধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ভিক্ষা পাইতেছ ত'? আসিতে তোমাদের বেশি কষ্ট হয় নাই ত'?"

"ভগবন্, আমাদের খবর ভালই, প্রাণধারণের পক্ষে আমরা পর্য্যাপ্ত ভিক্ষা পাইতেছি, এবং হে ভদন্ত, আসিতে আমাদের বেশি কষ্ট হয় নাই।"

"ভিক্ষু, কতদিন হইল তুমি উপসম্পদা পাইয়াছ?"

"ভগবন্, দুই বৎসর হইল আমি উপসম্পদা পাইয়াছি।"

"এই ভিক্ষুর কতদিন হইল?"

"ভগবন্, ইহার এক বৎসর হইয়াছে।"

"এই ভিক্ষু তোমার কে হয়?"

"ভগবন্, এ আমার সার্দ্ধবিহারী।"

"ওহে অপদার্থ, ইহা অন্যায়, অনুচিত, শ্রমণের অনুপযুক্ত। ওহে অপদার্থ, তোমারই উচিত অন্যের কাছে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা, তুমি কি করিয়া নিজেকে আর একজন ভিক্ষুর শিক্ষক হইবার উপযুক্ত মনে করিলে? অতি সত্বর তুমি শিষ্যসংগ্রহের বাসনায় মুগ্ধ হইয়াছ! ওহে অপদার্থ, ইহাতে অপ্রসন্নেরা প্রসন্ন হইবে না, প্রসন্নদেরও সংখ্যা বাড়িবে না।" তারপর তিনি অন্য ভিক্ষুদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, দশ বৎসরের পূর্ব্বে কেহ অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না।" এখানে বেশ বুঝা যায় যে শেষের তীব্র ভর্ৎসনার জন্যই প্রারম্ভের আপ্যায়ন, কারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুদ্ধ এক দৃষ্টিতেই আগন্তুক ভিক্ষুদ্বয়ের সম্বন্ধ বুঝিয়াছিলেন।

দশ বৎসর হইলেই যে-সে ভিক্ষু উপসম্পদা দান করিতে লাগিল, ফলে অনেক মূর্খ, নির্ব্বোধ ও অযোগ্য উপাধ্যায়ের বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও সুযোগ্য সার্দ্ধবিহারী হইল। একজন ভিক্ষু পূর্ব্বে অন্য সম্প্রদায়ের লোক ছিল, সে তাহার উপাধ্যায়কে তর্কে হারাইয়া আবার গিয়া পূর্ব্ব দলে যোগ দিল, তারপর আবার কিছু দিন পরে আসিয়া পুনরায় উপসম্পদা চাহিল। এজন্য নিয়ম হইল যে অন্য সম্প্রদায়ের লোক উপসম্পদা চাহিলে তাহাকে চার মাস "পরিবাস" পালন করিতে অর্থাৎ পরীক্ষাধীন বা নজরবন্দি হইয়া থাকিতে হইবে (যাহাকে ইংরেজিতে বলে "অন্ প্রোবেশন্" থাকা)। কিন্তু সে যদি উপসম্পদার পর আবার পূর্ব্ব সম্প্রদায়ে ফিরিয়া যায় তবে আর তাহাকে কখনও সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। পরিবাসের চার মাস অন্য সম্প্রদায়ের দীক্ষার্থী আচার ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও পরে যথাবিধি জ্ঞপ্তি করিয়া তাহাকে উপসম্পদা-দানের প্রস্তাব করিতে হইবে, একথা বুদ্ধ বলিয়া দিলেন। কিন্তু দুই শ্রেণীর লোকের জন্য বুদ্ধ পরিবাস মার্জ্জনার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। জটিলদে ও অগ্নি-উপাসকদের বিনা "পরিবাসে" উপসম্পদা দিতে পারা যাইবে কারণ তাহারা কর্ম্মফলে বিশ্বাস করে। কর্ম্মফলে বিশ্বাস বোধ হয় ইহাদের পরিবাস মার্জ্জনার ঠিক কারণ নয়, যদিও শাস্ত্র এরূপ বলিয়াছেন; জটিল ও অগ্নি উপাসক ছাড়া আরও অনেক সম্প্রদায় যেমন নির্গ্রন্থ-(জৈন)রা কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিত, ইহারা বাদ পড়িল কেন? জটিল ও অগ্নি উপাসকদের নেতারা বুদ্ধের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা স্বতঃই যখন বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল, তখন যাহাতে তাহাদের সঙ্ঘপ্রবেশে কোন বাধা না হয় সেজন্যই বোধ হয় ইহাদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, শাক্যবংশীয় কোন লোক যদি পূর্ব্বে অন্য সম্প্রদায়ে থাকিয়া পরে দীক্ষার জন্য আসিত তবে তাহাদেরও পরিবাস মার্জ্জনা করা হইত, এ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, 'আমার জ্ঞাতিদিগকে আমি এই বিশেষ সুবিধা দিলাম'।

আরও নিয়ম হইল যে শুধু দশ বৎসর সঙ্ঘে থাকিলেই যে কেহ অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না। কেবল মাত্র উপযুক্ত পণ্ডিত ভিক্ষুই দশ বৎসর পরে দীক্ষা দিতে পারিবে, অযোগ্য মূর্খ ব্যক্তি দশ বৎসর থাকিলেও পারিবে না।

কোন কোন ভিক্ষুর উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল বা তিনি অন্যত্র গেলেন বা সংসারে ফিরিয়া গেলেন বা অন্য সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। এইরূপ উপধ্যায়দের সার্দ্ধবিহারীরা যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল। ইহাদের শিক্ষাসমাপ্তির জন্য অন্য ভিক্ষু নিযুক্ত হইলেন, ইহাকে আচার্য্য (আচরিয়) বলা হইত এবং আচার্য্যের শিক্ষার্থীনকে অন্তেবাসী (অন্তেবাসীক) বলা হইত। উপাধ্যায় ও সার্দ্ধবিহারীর যে সম্বন্ধ ছিল আচার্য্য ও অন্তেবাসীরও ঠিক সেই সম্বন্ধই হইল।

একবার মগধদেশে কুষ্ঠ, গণ্ড, শোষ, অপস্মার প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের প্রকোপ হইল। লোকে চিকিৎসার জন্য জীবকের কাছে গেল, জীবক বলিলেন, "আমার অনেক কাজ আছে; আমাকে রাজা বিম্বিসারের, তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের ও বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসা করিতে হয়, আমি তোমাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।"

লোকেরা বলিল, "আচার্য্য, আমাদের যাহা কিছু আছে সব আপনাকে দিব ও আপনার দাস হইয়া থাকিব, আমাদের চিকিৎসা করুন।"

জীবক একই উত্তর দিলেন এবং তাহাদের চিকিৎসা করিলেন না। বৌদ্ধেরা জীবকের বুদ্ধভক্তি দেখাইবার জন্য সরলভাবে কথাটি বলিয়াছেন, কিন্তু এই লোকগুলির কথা হইতেই বুঝা যায় দিবার মত তাহাদের এমন বিশেষ কিছু ছিল না, থাকিলে জীবক ছাড়িতেন না। যাহা হউক, সেই সময় ভিক্ষুদের মধ্যেও অনেকের রোগ হইল এবং অন্য ভিক্ষুরাও তাহাদের জন্য লোকের কাছে খাদ্য ও ঔষধ চাহিয়া বেড়াইত। জীবক এই রুগ্ন ভিক্ষুদের চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকার জন্য নাকি ঠিকমত রাজবাড়ীর কাজও করিতে পারিতেন না। একজন ভদ্রসন্তানের রোগ হইল। তিনি দেখিলেন ভিক্ষুরা রোগ হইলে সঙ্ঘের সেবা ও জীবকের চিকিৎসা পায়, তিনি গিয়া প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন এবং ভিক্ষুদের সেবা ও জীবকের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া গেলেন। জীবক একদিন ভদ্রলোককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য, আপনি না ভিক্ষুদের কাছে প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন?"

"হাঁ, আচার্য্য।"

"এইরূপ করিলেন কেন?"

ভদ্রলোক তখন জীবককে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। জীবক শুনিয়া ভিক্ষুরা রোগগ্রস্ত লোককে দীক্ষা দিতেছে জানিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া বুদ্ধের কাছে গিয়া ইহাতে তাঁহার আপত্তি জানাইলেন। বুদ্ধ জীবকের অনুরোধে রোগগ্রস্ত লোককে প্রব্রজ্যাদান নিষেধ করিয়া দিলেন।

বুদ্ধ একবার বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত সারা বৎসরই রাজগৃহে ছিলেন। লোক বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা আর কোন জায়গা চোখে দেখিতে পায় না।"

ভিক্ষুদের মুখে এ কথা শুনিয়া বুদ্ধ আনন্দকে সব ভিক্ষুদের জানাইতে বলিলেন, যে, তিনি দক্ষিণাগিরিতে যাইবেন, যাহার ইচ্ছা তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে। আনন্দ সকলকে ইহা জানাইলেন কিন্তু তাহারা বলিল, "দশ বৎসর আমাদের উপাধ্যায় আচার্য্যের আশ্রয়ে থাকিবার কথা, এখন সেখানে গেলে আমাদের নূতন আশ্রয় (অর্থাৎ উপাধ্যায় আচার্য্য) গ্রহণ করিতে হইবে, আবার সেখান হইতে ফিরিয়া আশ্রয় বদলাইতে হইবে; আমাদের উপাধ্যায় আচার্য্যেরা যদি যান তবে আমরা যাইব, না গেলে যাইব না, নতুবা লোকে আমাদের লঘুচিত্ত বলিবে।" কাজেই অল্প ভিক্ষুই বুদ্ধের সঙ্গে দক্ষিণাগিরিতে গেল। দক্ষিণাগিরিতে কিছুদিন থাকিয়া বুদ্ধ যখন আবার রাজগৃহে ফিরিলেন তখন এত অল্প ভিক্ষু তাঁহার সঙ্গে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আনন্দের কাছে শুনিয়া নিয়ম করিলেন যে উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান ভিক্ষুর পাঁচ বৎসর উপাধ্যায় আচার্য্যের আশ্রয়ে থাকিলেই চলিবে, কিন্তু যে নির্ব্বোধ তাহাকে চিরজীবন আশ্রয়ে থাকিতে হইবে এবং উপযুক্ত লোক বিনা আশ্রয়েও থাকিতে পারিবে।

শ্রমণেরেরা উপাধ্যায়-আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিল তাহাদের কি কি বিধি-নিষেধ মানিতে হইবে। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন যে শ্রমণেরদের এই দশটি নিষেধের কথা বলিয়া দিতে হইবে, যথা (১) প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি (২) অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি (৩) মৈথুন হইতে বিরতি (৪) মিথ্যাবাদ হইতে বিরতি (৫) সুরা ও মদ্যাদি পান হইতে বিরতি (৬) অকালভোজন হইতে বিরতি (৭) নৃত্য, গীত, বাদ্য ও রঙ্গদর্শন হইতে বিরতি (৮) মালা, গন্ধ, বিলেপন, মণ্ডন, বিভূষণ হইতে বিরতি (৯) উচ্চ ও বৃহৎ শয্যা হইতে বিরতি

এবং (১০) স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ হইতে বিরতি অভ্যাস করিতে হইবে।

কোন কোন শ্রমণের ভিক্ষুদিগকে মান্য করিত না, ইহাতে নিয়ম হইল যে ভিক্ষুরা এ জন্য শ্রমণেরদিগকে দণ্ড দিতে পারিবে। দণ্ডদান সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিলেন যে কোন কোন স্থানে শ্রমণেরদের আসা বারণ করিতে পারা যাইবে। ভিক্ষুরা শ্রমণদের সমগ্র সঙ্ঘারামে প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিল, শ্রমণের বেচারীরা ইহাতে কেহ গৃহে ফিরিয়া গেল, কেহ নিরুপায় হইয়া বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ গিয়া অন্য সম্প্রদায়ে যোগ দিল। তখন নিয়ম হইল শয়নস্থান বা অন্যস্থান নিষেধ হইতে পারিবে, সমগ্র সঙ্ঘারাম নয়। ভিক্ষুরা তখন শ্রমণের দের জব্দ করিবার জন্য অন্য পথ ধরিল, এই দণ্ড দিল যে তাহারা মুখ দিয়া খাইতে পারিবে না। লোকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলে শ্রমণেরা বলিল ইহাতে তাহাদের নিষেধ আছে, লোকে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল ভিক্ষুরা কেমন করিয়া শ্রমণেরদের মুখ দিয়া খাওয়া নিষেধ করিতে পারিল। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া এরূপ নৃশংস দণ্ডদান নিষেধ করিয়া দিলেন।

সঙ্ঘে যে অনেক দুষ্ট ভিক্ষু ছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়। এই দুষ্টদের মধ্যে ছয়জন প্রধান ছিল বলিয়া ইহাদের ষড়্‌বর্গীয় (ছব্বগ্‌গিয়) বা "ছয়ভিক্ষুর দল" বলা হইত। কথিত আছে উরুবেল ও ঋষিপত্তনের সেই পঞ্চ ভিক্ষুর মধ্যে একজন এই "ছয়ভিক্ষুর দলে" ছিল। ইহারা দুষ্টামি করিত বলিয়া শেষে অনেক নষ্টামি ইহাদের ঘাড়ে চাপান হইত। "ছয়ভিক্ষুরা" কয়েকজন শ্রমণেরকে তাহাদের উপাধ্যায়কে না জানাইয়া দণ্ড দিল, স্থবির ভিক্ষুদের সার্দ্ধ-বিহারীদের ভাঙাইয়া নিজেদের সার্দ্ধবিহারী করিয়া লইল। একবার একজন উপাধ্যায়হীন লোককে ভিক্ষুরা উপসম্পদা দিল, একজনকে সমগ্র সঙ্ঘের উপাধ্যায়ত্বে, একজনকে কতকগুলি ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে, কখন বা অনুপযুক্ত লোকের উপাধ্যায়ত্বে কখন বা ভিক্ষাপাত্রহীন বা চীবরহীন লোককে, কখনও অন্যের কাছে ধার করা ভিক্ষাপাত্র বা চীবরযুক্ত লোককে উপসম্পদা দিল; কোন কোন ভিক্ষু নির্লজ্জ ভিক্ষুদের আশ্রয় হইল বা তাহাদের আশ্রয়ে থাকিল; এগুলি সবই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

আশ্রয় অর্থাৎ উপাধ্যায়-আচার্য্যের অধীনে থাকা লইয়া অনেক প্রশ্ন উঠিল। একজন ভিক্ষুর একাকী স্থানান্তরে যাইবার সময় পথ চলিতে চলিতে মনে হইল যে তাহার তখন আশ্রয় কেহ নাই, সে গিয়া বুদ্ধকে এই মহাসমস্যা জানাইল। নিয়ম করা হইল যে পথ চলিবার সময় আশ্রয় না থাকিলেও চলিবে। দুইজন ভিক্ষু পথ চলিতেছিল, একজন অসুস্থ হইয়া পড়িল; দুইজনেরই মনে হইল তাহাদের আশ্রয় নাই—নিয়ম হইল অসুস্থ অবস্থায় বা রোগীর সেবা করিবার সময় আশ্রয় না থাকিলেও চলিবে। একজন ভিক্ষু বনে ঘর বানাইয়া শান্তিতে ছিল, হঠাৎ আশ্রয় কেহ নাই খেয়াল হওয়ায় তাহার নষ্ট হইল; বুদ্ধ বলিলেন "উপযুক্ত আশ্রয় পাইবামাত্র গ্রহণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে বিনা আশ্রয়েও বনে থাকা যাইবে।"

কোন ভিক্ষু দোষ করিয়া তাহা স্বীকার না করিয়া সংসারে ফিরিয়া গিয়া আবার উপসম্পদার জন্য আসিলে প্রথমে তাহাকে দোষের কথা বলা হইত। দোষ স্বীকার করিলে প্রব্রজ্যা দেওয়া হইত, প্রব্রজ্যার পর আবার দোষের কথা বলা হইত এবং স্বীকার না করিলে বহিষ্কার করা হইত; স্বীকার করিলে উপসম্পদা দিয়া আবার দোষের কথা জিজ্ঞাসা করা হইত, অস্বীকার করিলে বহিষ্কার করা হইত এবং স্বীকার করিলে দোষের জন্য শাস্তি গ্রহণ করান হইত, শাস্তি গ্রহণে অসম্মত হইলে বহিষ্কার করা হইত।

একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। একজন লোক ভিক্ষু কাশ্যপের (ইঁহাকে "মহাকস্‌সপ" বা মহাকাশ্যপ বলা হইয়াছে) কাছে উপসম্পদার জন্য আসিল। কাশ্যপ উপসম্পদার পাঠ পড়িবার জন্য আনন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আনন্দ বলিলেন, "আমি স্থবির কাশ্যপের নাম-গ্রহণ করিতে পারিব না, স্থবির আমার অনেক বড় (উপসম্পদার পাঠের মধ্যে উপসম্পদাদাতার নাম করিতে হইত)। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন যে উপসম্পদার পাঠ পড়িবার সময় উপাধ্যায়ের নাম না করিয়া তাঁহাকে গোত্রনামেও অভিহিত করা যাইতে পারিবে।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতার ফলে নবাগত দীক্ষার্থীকে বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া তবে সঙ্ঘে প্রবেশ করান হইত। (ক্রমশঃ)

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

শান্তি-নিকেতনে যখন পৌছাইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকার তখন প্রান্তরের নীলরেখার গণ্ডীখানি নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছে—আকাশে দুই-একটি তারা মেঘের আবরণে অস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। গাছগুলি আব্ছা, দূরে শান্তি-নিকেতনের ভিতরকার আলো কুয়াশার মতো ঝাপ্সা। ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ভাবিলাম—'And is this—Yarrow?' কিন্তু কাব্যের সময় ছিল না - রাত্রের আশ্রয় প্রয়োজন। অতিথিশালার অনুসন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে কবির গৃহের নিকট গিয়া পড়িলাম। সেখানে একজন লুঙ্গিপরা ভদ্রলোক পায়চারি করিতেছিলেন। কবি কোথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি নিজেই বলিলেন, "গুরুদেব এখন ব্যস্ত আছেন, আগামী কাল সকালে সাক্ষাৎ হবে, আজ অতিথিশালায় বিশ্রাম করুন।" অতিথিশালায় আমাদের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি করিয়া দিলেন। রাত্রির মত বিশ্রাম লইবার জন্য অতিথিশালার হল-ঘরটি দখল করিলাম। আহারের পূর্ব্বে পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া সকলে বসিয়া গল্প করিতেছি, হঠাৎ বিপদের ঘণ্টা (alarm bell) বাজিয়া উঠিল। সকলে দৌড়াইয়া ঘণ্টার নিকট গেলাম। ঘণ্টার ডাকে সমস্ত শান্তি-নিকেতনের স্ত্রী-পুরুষ বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলাম কোথায় নাকি আগুন লাগিয়াছে। যাইতে প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে খবর আসিল কিছুই হয় নাই। এ রাত্রে দুইজন ফরাসী ভদ্রলোক অতিথিশালায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের একজন পাঞ্জাবী গাইড সঙ্গে ছিল। রাত্রে আহারের পর তাঁহার নিকট হইতে ইউরোপের অনেক স্থানের নানা গল্প-গুজব শোনা গেল।

কবি রবীন্দ্রনাথ ও আমরা চারজন।

২২শে।—

প্রাতে শয্যাত্যাগ করিতেই প্রথমে অতিথি-শালার ম্যানেজার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

শান্তি-নিকেতন: উত্তরায়ণ।

আমরা সেদিন থাকিব কিনা। তাঁহাকে জানাইলাম, সকালে আছি, বিকালের কথা পরে জানাইব। তিনি চলিয়া যাইবার পর আমরা চা-পান করিতেছি, এমন সময়ে কবির নিকট হইতে আমাদের ডাক আসিল। তৎক্ষণাৎ জামাকাপড়

শান্তি-নিকেতন : কবির বসিবার ঘর।

পরিয়া কবির দর্শন উদ্দেশ্যে সাইকেলে চড়িয়াই তাঁহার বাসস্থানে গেলাম। কেন না, এই সাইকেলই আমাদের একমাত্র পাস-পোর্ট কিংবা সার্টিফিকেট,—যাহাই বলুন। কবির গৃহে গাড়ীগুলি লইয়াই ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। সম্মুখে একটি ছোট বারান্দা, তাহার ভিতর একটি চতুর্দ্দিক খোলা ঘর। দেখিতে পাইলাম, সেই ঘরের মধ্যে কবি বসিয়া লিখিতেছেন। আমরা বাহিতে দক্ষিণ দিকের একটি ছোট বাংলা হইতে তাঁহার সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। কবিকে আমাদের আসার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বাহিরে আসিলে আমরা নতশির হইয়া তাঁহার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইলাম। কবি বলিলেন, "আমার সময় অল্প, শরীরও খারাপ।" তাঁহার কয়েকটি ফটো তুলিবার অনুমতি চাহিলাম, তিনি রাজি হইলেন। তাঁহার দুই চারখানি ফটো তুলিয়াছিলাম।

অমিয়বাবু আমাদের বিষয় সমস্ত তাঁহাকে বলিলেন, শুনিয়া আমাদের তিনি খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া অমিয়বাবুর সহিত গল্প-গুজব করিয়া বিদায় লইলাম। ফিরিবার পথে কবির বাসগৃহ ও বসিবার ঘরের একটি ছবি তোলা হইল। তারপর সাইকেল করিয়া সমস্ত শান্তি-নিকেতন একবার প্রদক্ষিণ করিয়া লইলাম।

স্থির ছিল সেই দিনই শান্তি নিকেতন ছাড়িব, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া স্নান সারিয়া লইলাম। একটি হলঘরে স্কুলের ক্লাসের মত ছোট, বড় দুইটি করিয়া বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে, সেইস্থানে বসিয়া আহার সাঙ্গ করিলাম। শান্তি-নিকেতনের যে কয়টি ফটো তুলিয়াছিলাম, সেগুলি দেওয়া হইল।

প্রসঙ্গত, শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন এক ছাত্রের নিকট হইতে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে চিঠি পাইয়াছিলাম তাহা উদ্ধৃত করিতেছি –

"শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং বিশ্বভারতী দেখিলাম। খুব বেশি দিন দেখিবার সুযোগ পাই নাই, অল্প দিনের দেখায় যেটুকু অভিজ্ঞতা হইল তাহাই বলিতেছি। আমার মনে হয় এই শিক্ষা নিকেতনটি একটি অদ্ভুত এবং অসম্ভব কিছু নয়- যেমন বাহির হইতে লোকে মনে করিয়া থাকে। অন্যান্য জায়গায় পড়াশুনার যেরূপ ব্যবস্থা এখানেও তেমনি তফাতের মধ্যে এই যে এখানে খোলা জায়গায় ক্লাস হয় এবং সেজন্য ছাত্র ছাত্রীগণ মুক্ত

শান্তি-নিকেতন : অতিথিশালা।

পারিপার্শ্বিকের আনন্দটুকু উপভোগ করিতে পারে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ স্বাস্থ্য

সম্বন্ধে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই যত্ন লইয়া থাকেন কিন্তু এখানে প্রচুর খোলা জায়গা থাকাতে ইহারা স্বভাবতই এবিষয়ে বেশি সুযোগ পায়।' এখানকার প্রধান আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথ। অন্যান্য সুবিখ্যাত বিদেশীয় শিক্ষক এখানে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে ইহাতে উপকারের চেয়ে অপকারই বোধ হয় বেশি হয়। যাঁহাদের সম্বন্ধে পরিণত বয়সে শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম জাগিবে—তাঁহাদের সান্নিধ্যে বাল্য-কাল হইতেই বাস করিলে ছেলেমেয়েদের সেই সম্ভ্রম-বোধ চলিয়া যায়। এমন দেখি-য়াছি, যাহারা এখানে শিশুকাল হইতে আছে, পরিণত বয়সে তাহাদের অধিকাংশই রবীন্দ্র সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদৌ পারে না। কাজেই শিক্ষাদানের এত আয়োজন সেদিক দিয়া ব্যর্থ হইতেছে। বিশ্ব-ভারতী প্রকৃত পক্ষে রিসার্চ্চ-স্কলারদের তীর্থস্থান। যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইয়া রিসার্চ্চ ওয়ার্ক করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে প্রচুর সুযোগ এখানে রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপর এবং তাঁহার কর্ম্মধারার প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান তাঁহারা চিরকাল বাহিরেই আছেন—রবীন্দ্রনাথের নৈকট্যলাভ যাঁহাদের পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে যাহারা এখানে আছে তাহারা বড় বড় লোকের সঙ্গে থাকিবার অহঙ্কারটিই শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখে—আর কিছুই রাখে না, কারণ আর কিছু পায় না—ইহা অনেক ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের ব্যাপারে লক্ষ্য করিয়াছি।"

শান্তি-নিকেতন : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমাধি-মন্দির।

শান্তি-নিকেতন : নারী বিভাগ।

ইনি যাহা লিখিয়াছেন, মোটামুটি ভাবে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মত ইহাই। রবীন্দ্র-নাথকে দেশের গৌরব হিসাবে লইলেও তাঁহার এই প্রতি-ষ্ঠানটি দেশবাসীর কাছে তেমন মর্য্যাদা পায় নাই। তাহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, এদেশ দরিদ্রের দেশ। কিন্তু শান্তি-নিকেতন দরিদ্রের পক্ষে স্বর্গের মতো স্বপ্ন-রাজ্য, ইচ্ছা থাকিলেও দরিদ্র পিতামাতা শান্তি-নিকেতনে শিক্ষার্থী সন্তানকে পাঠাইতে পারেন না,—সঙ্গতিতে কুলায় না বলিয়া। দেশের মাটিতে থাকিয়াও দেশের সহিত এ প্রতিষ্ঠানের তাই যোগ-সূত্র নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বপ্নকে এই প্রতিষ্ঠানে সফল করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের সহিত তাল রাখিবে কে? তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—"যে সব সমাজে ঐশ্বর্য্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই, আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই?"—শান্তি-

নিকেতন তাঁহার সেই সাজের ঘর। বাহিরের বিশ্বে যেখানে জীবনের উৎসব, সেই উৎসব-সভায় যোগদান করিবার জন্য তিনি নিজে যাচিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন—এবং তাঁহার

শান্তি নিকেতন : বিদ্যার্থীভবন

সহিত সেই নিমন্ত্রণে যোগ দিবার জন্য দেশবাসীকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে নিমন্ত্রণে যাইবে কে?

কিন্তু কবির কথাতেই বলি : 'তবু একথা মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা, তাহা নিশ্চয়ই এখনও তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে।' কেন না ইহা নিশ্চিত যে, আজিকার ব্যর্থ শান্তিনিকেতন অদূর ভবিষ্যতের এমনই কোন সার্থক প্রতিষ্ঠানের প্রথম সোপান গাঁথিয়া গেল। আজ রবীন্দ্রনাথ যে ভিক্ষার ঝুলি দেশে বিদেশে শান্তি-নিকেতনের জন্য নিজের স্কন্ধে বহিয়া দেশবাসীর নিকট দুঃসহ লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হইয়া গেলেন—সেই ভিক্ষার ঝুলিকেই হয়তো ভবিষ্যতে তাঁহার দেশবাসী তাঁহার মাহাত্ম্যের স্মৃতি বলিয়া পূজা করিবে। তাঁহার আজিকার কবি-খ্যাতি সেদিনকার সে-খ্যাতির কাছে হয়তো মুহূর্তে ম্লান হইয়া যাইবে।

আগেই বলিয়াছি, সেদিন আমাদের শান্তি-নিকেতন ছাড়িবার কথা ছিল. কিন্তু বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর বৃষ্টি থামিলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময়ে ফ্রী প্রেসের রিপোর্টার আসিয়া হাজির। তাঁহাকে আমাদের সমস্ত বিবরণ দিয়া দ্বিপ্রহর প্রায় আড়াইটার সময় সিউড়ী অভিমুখে দ্বিচক্রযান ছাড়িলাম। শান্তি নিকেতন হইতেই লাল কাঁকড়ের রাস্তা সুরু হইয়াছে—রাস্তাগুলি সাপের ন্যায়—আঁকিয়া বাঁকিয়া মাঠের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কি সুন্দর রাস্তা! হঠাৎ মনে হইল, 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটীর পথ'-এর কথা; সত্যই এই রাঙ্গামাটীর পথ মনকে ভুলাইয়া দেয়।

কিছু দূর গিয়া রাস্তা নামিয়া আবার উঠিয়াছে। এ পর্যন্ত রাস্তা ভাল। কতকগুলি খোড়ো ঘরের ভিতর দিয়া গিয়া "কোপাই" নদীতে যেখানে রাস্তা পড়িয়াছে, সেখান হইতেই রাস্তা খারাপ। খালি এঁটেল মাটী, তার উপর জল পড়িয়াছে; কেবল কাদা,—চাকা বসিয়া যাইতেছিল, গাড়ী চলে না, কোন প্রকারে কষ্টেসৃষ্টে নদীতে আসিয়া পড়িলাম। নদীর তিনভাগ বালি ও এক ভাগ জল—নীচে নামিতে গিয়া ধুপধাপ বালির উপর পড়িলাম। কোন রকমে জুতামোজা খুলিয়া গাড়ী ঠেলিয়া ওপারে ওঠা গেল। কাপ্তেন

শান্তি-নিকেতন : কলাভবন।

সাহেব—শ্রীযুক্ত বসু জুতামোজা পরিয়া গাড়ী চড়িয়া নদী পার হইতে গিয়া জলে পড়িলেন—প্রায় সলিল-সমাধির অবস্থা। সকলের খুব হাসি। পরপারে জুতামোজা পরিয়া গাড়ী চড়িয়া বসিলাম। কিছুদুর যাইতে না যাইতে রাস্তা

যা আরম্ভ হইল তাহা লেখা যায় না। আমরা ভ্রমবশত এই রাস্তার ছবি তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। খালি বড় বড় মাটীর ঢেলা, তার উপর গরুর গাড়ীই চলে না, সাইকেল চলিবে কি ? তার মধ্য দিয়াই গাড়ী চালাইয়াছি, মাঝে মাঝে পেড্যাল আটকাইয়া কপোকাৎও হইয়াছি। সম্মুখের ব্যক্তি পড়িলে পশ্চাতের আর চারিজনও তৎক্ষণাৎ পড়িয়াছে। সে এক হাসির ব্যাপার !

রাস্তায় জনমানব নাই, ধু-ধু মাঠ। কোন প্রকারে পাচজন গাড়ী ঠেলিয়া বেলা প্রায় চারটার সময় একটি কূয়ার কাছে পৌছাইলাম। কয়েকজন সাঁওতালী ও রাজবংশী মেয়ে সেখানে জল তুলিতেছিল। তাহাদের কাছে জল চাহিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। তাহাদের একটি ছবি তুলিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ছবিটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সামনে পাড়ু বলিয়া একটা গ্রাম আছে। সেখান হইতে রাস্তা ভাল। কিছুদূর যাইয়াই বালির বেশ ভাল রাস্তা। একটি ছোট পুল পার হইবার সময় এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে রাস্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "এদিকে আর খারাপ রাস্তা পাবেন না, সন্ধ্যার মধ্যে সিউড়ী পৌছে যাবেন।" কোপাই নদীর পর যে-রাস্তার পরিচয় পাইয়াছি, তাহার কথা ভাবিলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। ভয় হইয়াছিল, যদি খারাপ রাস্তা হয় তবে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সিউড়ী পৌছাইতে পারিব না। খুব জোরে গাড়ী চালাইতে লাগিলাম। হাঁড়ী গ্রামের ভিতর বক্রেশ্বর নামক একটি নদী—জুতা মোজা না খুলিয়াই সে নদী পার হইয়া গেলাম। বক্রেশ্বর পার হইয়া কিছুদূর আসিতে না আসিতে বেশ একটি বড় গ্রাম। গ্রামটির নাম সুলতানপুর। গ্রামে বাঙ্গালী হিন্দুই বেশী, সুলতানের বংশধর

সড়ড়ী হইতে বিদায়।

কেউ আছে বলিয়া মনে হইল না। গ্রামের একটি পানের দোকানে পান খাওয়া গেল। আর এক জায়গায় দাবা খেলা হইতেছিল, সেখানে কাপ্তেন বসু দাঁড়াইয়া গেলেন, দাবায় তাঁহার ভয়ানক ঝোঁক। তাঁহাকে জোর করিয়া টানিয়া তুলিলাম। সুলতানপুর ছাড়িবার পরই পথে সন্ধ্যা নামিল। গাড়ীগুলি ঠেলিতে ঠেলিতে অন্ধকারে টিম্‌টিমে আলোয় সুসজ্জিত সিউড়ীতে প্রবেশ করিলাম।

কোপাই।

এখানে ডাক্তার শরৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লইবার কথা আগে হইতেই ঠিক ছিল। তাঁহার ডিস্‌পেন্সারিতে খোঁজ লইয়া তাঁহার বাসায় গেলাম—তখন তিনি গৃহে ছিলেন না। ডাক্তার বাবুর দাদা তাঁহার গৃহে আশ্রয় দিলেন। কিছু পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন। আলাপে বুঝিলাম তিনি অমায়িক লোক। সন্ধ্যার সময় চা পান করিয়া রাজকীয় আলস্যে তাস খেলিতে বসিয়াছি, কখন যে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে লক্ষ্য করি নাই—আচম্বিতে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল। তাসখেলা পড়িয়া থাকিল, আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম—কি নিবিড় অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিজলীর চমক আর থাকিয়া থাকিয়া মেঘের ডাক। সমস্ত মিলিয়া সে কি অপূর্ব্ব অনুভূতি। সুরেন গান ধরিল—'গরজে গরজে বরিষণিকো'—কিন্তু প্রিয়া বিদেশে, সে প্রিয়া 'লিখত নেহি পাঁতিয়া', অথচ আকাশের এ কি দৌরাত্ম্য।

(ক্রমশঃ)

পদ্মা

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৩

হঠাৎ অনেক দাম দিয়া বিনয় এক ছিপ কিনিয়া ফেলিল। ইতিপূর্ব্বে সে কিছুদিনের জন্য মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, সম্প্রতি মৎস্য-শিকারের আগ্রহের কারণ লোকে আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই দুবেলা সে মাছ ধরিতে লাগিয়া গেল। তাহাদের বাড়ীতে একটা পুকুর ছিল—সেখানে তাহার ছিপে মাছ পড়িল না। মাছের দোষ দেওয়া যায় না—কোনো মৎস্য-অভাগ্যের নেহাৎ আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা না থাকিলে বিনয়ের ছিপে ধরা দেওয়া অসম্ভব।

তিন চার দিনের চেষ্টাতেও যখন মাছ পড়িল না, তখন বিনয় আবিষ্কার করিল, এপারের সহরের পুকুরের মাছগুলি চতুর—অতএব চরের সরল-স্বভাব মাছগুলিকে তাহার দেখা আবশ্যক।

পর দিন অতি ভোরে ছিপ লইয়া নৌকাযোগে সে ওপারের চরে গিয়া পৌঁছিল। কঙ্কণদের পাড়া হইতে কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় ছিল, মানুষের কাটা নহে, স্থানটা নীচু, বর্ষায় জল আসিয়া জমে, চৈত্র-বৈশাখেও শুকায় না। বাংলা পাঁচের আকারের সেই জলাশয়টার একদিকে একটি শিরীষ ফুলের গাছ—তাহারই তলায় বিনয় আসিয়া বসিল। জলাশয়টার চারিদিকে প্রচুর 'কাঁটাখুড়া' ও ভাটিফুলের গাছ, জল হইতে দুলিয়া দুলিয়া কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠিতেছে, জলটি এমন শান্ত ও নিশ্চল যেন এখনো তাহার ঘুম ভাঙে নাই—শিরীষ শাখা হইতে এক আধটি শুকনা পাতা জলে পড়িতেই এমন ভাবে কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঘুমন্ত মানুষকে স্পর্শ করিলে যেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। পাশেই একটা শূকরে দাঁত দিয়া খানিকটা ঘাস ও মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল সেই স্থান হইতে একটা উদ্ভিদের ও মৃত্তিকার সিক্ত স্নিগ্ধ গন্ধ বিনয়ের নাকে প্রবেশ করিতে লাগিল। শিশিরে-শাদা ঘাসের উপরে বিনয় অত্যন্ত অভিভূতের ন্যায় বসিয়া রহিল। একবারও তাহার মনে হইল না—এই অবস্থায় তাহাকে লোকে দেখিলে কি মনে করিবে। জলাশয়ের কুয়াশা ক্রমে গাঢ় হইতে লাগিল—বিনয় ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল, মাঠের চারিদিকে স্বচ্ছ কুয়াশা জমিয়া উঠিতেছে। এতক্ষণ তাহার মনে যে ক্ষীণ আশা ছিল তাহা মিলাইয়া যাইতে লাগিল। এই কুয়াশায় মাছ কি তাহার টোপ গিলিবে! ক্রমে কুয়াশা গাঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক অবলুপ্ত করিয়া ফেলিল—পুকুরের জল, পাশের আগাছা, শিরীষ গাছের কাণ্ডটি, তাহার ছিপটি, এমন কি তাহার হাত পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া উঠিল। তখন সেই সিক্ত, আর্দ্র, নিখিলপরিব্যাপ্যমান কুয়াশার অন্ধকারে হতভম্বের ন্যায় সে বসিয়া রহিল। নিজের কাছে হইতে নিজে অদৃশ্য হইয়া নিঃসঙ্কোচে সে ভাবিতে লাগিল—কি জন্য আজ এত ভোরে সে এখানে আসিয়াছে। মাছধরা! সে এত নির্ব্বোধ নয় যে একথা বিশ্বাস করিবে। প্রাতঃ-ভ্রমণ! উৎসাহের আতিশয্য তাহার এত অধিক নয়। সে তো কঙ্কণের জন্যই আসিয়াছিল—কিন্তু তাহার বাড়ীতে গেলেই তো চলিত, এখানে এই মাছ ধরিবার অভিনয় কেন! উভয়ের মধ্যে একটু সঙ্কোচের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে? এই ত! মন্দ কি—শোনা যায় ভালবাসার সূত্রপাতে এমন নাকি হইয়া থাকে। কিন্তু হায়, যে অন্ধকারে সে নিজেকে নিজে দেখিতে পাইতেছে না—সেখানে কঙ্কণ তাহাকে অতদূর হইতে দেখিবে কি করিয়া! সত্যই ত! তখন সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিপ ফেলিল বারে বারেই মাছে 'চার' খাইয়া যায়—ধরা আর দেয় না। শেষে তাহার কাজ হইয়া দাঁড়াইল; মাছগুলিকে খাদ্য দান করা। অনেকক্ষণ পরে যখন সে মাথা তুলিল—দেখিল কুয়াশা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে—মাঠের মধ্যে কে একখানা সূক্ষ্ম মসলিন ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল সেই দিকেই বটে—যেন কে আসিতেছে। না, বোধ হয় একটা গাছ নড়িতেছে—শুধু একটা অস্পষ্ট আকার, শুধু একটা গতির ভঙ্গি। এ ভঙ্গি তাহার পরিচিত—সম্মুখে ঈষৎ একটু ঝুঁকিয়া—বাঁ হাতটা বেশ একটু দোলাইয়া। বিনয়ের হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল—এই অসময়ে অস্থানে ধরা পড়িয়া গেলে আর কোনো বাধা-ই থাকিবে না। ভালই হয়, যদি অন্ধকারে না দেখিতে

পায়। কিন্তু নারীমূর্ত্তি যেন পিছাইতে লাগিল। বিনয়ের বুকটা এক হাত বসিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল—পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া যায়। নারীমূর্ত্তি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুয়াশা-অন্তে তীব্রমধুর রৌদ্রে আকাশ ভরিয়া গেল। শিরীষ পাতা হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়া শিশির-ফোঁটা জলে পড়িয়া টোপ তুলিতে লাগিল। ভাটিগাছের শাদা ফুল হইতে সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় পিছন হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"ন খলু ন খলু ছিপঃ সন্নিপাতোঽয়মস্মিন্ মৃতণি মীন-শরীরে—"

বিনয় তাকাইয়া দেখিল—মহীন্দ্র ও দীনেশ। সেই হাঁস ফেরৎ দিবার পর হইতে দীনেশ তাহাকে দুষ্মন্ত এবং কঙ্কণকে শকুন্তলা বলিয়া উপহাস করে। বলা বাহুল্য তাহার এই উপহাস হৃদয় অপেক্ষাও গভীরতর প্রদেশ হইতে উত্থিত।

—কি হে পৌষ-পার্ব্বণের নিমন্ত্রণ কি মাছ দিয়ে খাওয়াবে, তাও স্বহস্তে বধ করে!

মহীন্দ্র বলিল—ওর হাতের ধরা মাছ, ধন্যি! শেষের শব্দটা সেদিনকার তন্বীর প্রতিধ্বনি। বিনয়ের মনে পড়িল, আজ পৌষ-সংক্রান্তি, বন্ধুদ্বয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—কিন্তু মাছ-শিকারের আগ্রহে সব ভুলিয়া গিয়াছে।

বিনয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আরে এস এস—

—ওঃ, মাছ যে অনেক ধরেছ!

বিনয় বলিল—এখন কেবল অভ্যাস করছি।

মহীন্দ্র চাপাহাসির সহিত বলিল—এই নির্জ্জনে, এত ভোরে, ভাল···ভাল। কিন্তু ওহে বিনয়, জগতে যেমন মাছ আছে, তেমনি নিউমোনিয়াও আছে, অন্তত এক আধটা দাঁতাল শূওর থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে বারটার কাছাকাছি গেল।—সকলে বাড়ীর দিকে রওনা হইতেছিল—এমন সময় দেখিতে পাইল, বাদল ছুটিয়া আসিতেছে। বিনয়ের কেমন একটা ধারণা হইল, সে তাহাদিগকেই খুঁজিতেছে। বাদল কাছে আসিয়া 'দিদিমণি' বলিয়াই হাঁফাইতে লাগিল।

বিনয় উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, কি, অসুখ হয় নি তো!

—দিদিমণি তোমাদের ডাকছে!

এ আহ্বান অস্বীকার করিবার শক্তি কাহারো ছিল না। বিনয়রা ডাকমুন্সীর বাড়ীতে পৌছিতেই বিনয়ের হাতের ছিপ দেখিয়া কঙ্কণ বলিয়া উঠিল—একি, আপনি মাছধরা আরম্ভ করেছেন না কি?

—আরম্ভ নয়, অভ্যাস করছি!

মহীন্দ্র চট্ করিয়া বলিল—ওর হাতে ধরা পড়বার জন্যে মাছেরও অনেক অভ্যাস করতে হবে।

—আচ্ছা এত ঠাট্টাই যখন সকলে করছ, মনে কর না কেন—এই উপলক্ষ্যে মাছদের খাদ্য দিচ্ছি।

মহীন্দ্র বলিল—সাংঘাতিক উপলক্ষ্য। উপলক্ষ্যের বঁড়শিটা থাকে অলক্ষ্যে—খেতে এসে খাদ্যে পরিণত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়।

—দেখুন, বেলা বারটার সময় কারো বাড়ীর উঠান দিয়ে না খেয়ে চলে যাওয়া কি ভালো—আমার হাতে তো আবার ভাত খাবেন না! যাই হোক, চট্ করে স্নান করে নিন না—যা হয় কিছু জল খেয়ে নিতে আপত্তি কি!

দীনেশ তাহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া বলিল—কিছুই আপত্তি নাই।

তিনজনে একখানা অতিরিক্ত ধুতি চাহিয়া লইয়া পদ্মায় স্নান করিতে গেল।

পদ্মায় অনেকটা চর পড়িয়াছে, তাহার নীচে সামান্য একটুখানি জল—অত্যন্ত গভীর। তিনজনে আসিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিল, বালি লইয়া খেলিতে লাগিল, বালির উপরে নানা ছবি আঁকিতে লাগিল। মাছের আঁশের মত খাঁজকাটা জলের ছোট ছোট ঢেউ কাঁপিয়া কাঁপিয়া জল-তলের স্বচ্ছ সিক্ত বালিতে ছোট ছোট ছায়া ফেলিতে লাগিল। সেখানে স্রোত না থাকায় একপাশে শেওলা জমিয়া ছিল তাহারি আর্দ্র গন্ধ এবং ধানবাহী গরুর গাড়ীর চাকার আর্ত্তনাদ, রহিয়া রহিয়া আসিতে লাগিল। ওপারে বর্ষার জলে থাক্-কাটা তীরের তলে রৌদ্রমুগ্ধ নীলাভ ছায়া-খানি ছল ছল করিতে থাকিল।

তিনজনে খাইতে বসিয়া দেখে প্রচুর আয়োজন। চিঁড়া, মুড়কি, উৎকৃষ্ট দধি, গুড় এবং পাকা কলা। এতক্ষণে দীনেশের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিনয়ের কেমন অস্বস্তি

বোধ হইতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল কঙ্কণ তাহাকে কেমন অবহেলা করিতেছে, যথেষ্ট মনোযোগ তাহার প্রতি দিতেছে না। মহীন্দ্র নীরবে অভ্যস্ত চোখে বিনয়ের দুর্দ্দশা ও দীনেশের লুব্ধ ভাব দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিল। বিনয়ের বিস্ময় কত—এই এতটুকু মেয়ে, সেদিন হাঁসের শোকে অস্থির আজ কেমন সুদক্ষ গৃহিণীর মত, মাতার ন্যায় আদর ও আব্দার করিয়া খাওয়াইতে বসিয়াছে। এক হিসাবে মেয়েদের জীবনে কোনো পরিবর্ত্তন, বা পরিণতি নাই। তাহারা জন্মিয়াই মাতা—মরিবার সময়ও সেই মাতা। তাই তাহারা পুরুষের অপেক্ষা বয়সে স্বভাবতই বড়। বিশেষত এই খাওয়ানো কাজটাতেই তাহাদের মাতৃত্বের প্রধান প্রকাশ। পেটুক ছেলেটিকে মাতা বিশেষ করিয়া ভালবাসে।

—দীনেশ বাবু, আপনাকে আর একটু দই দি!

—থাক্ থাক্! পাতে অনেকটা দই পড়িল।

—তাই ত দই বেশী হয়ে গেল—আর একটু মুড়কি!

—বাঃ আপনার গাছের কলা তো বেশ! দীনেশের পাতে আর দুটা কলা পড়িল।

—দীনেশ, খাওয়ার সময় মনে রাখা দরকার খাদ্যটা অপরের হলেও পাকস্থলীটা নিজের।

—আঃ মহীন্দ্র বাবু, আপনি নিজে খেতে পাবেন না, অন্যকে ঠাট্টা করেন কেন!

—বলেন কি, ঠাট্টা! পাকস্থলী নিয়ে কি ঠাট্টা চলে।

—উনি এমনই বা কি খেয়েছেন। দীনেশ বাবু, আর একটু দই!

—থাক্ থাক্!

বিনয়ের মুখে গুড় তিক্ত এবং দধি কটু লাগিতেছিল।

—দেখুন বিনয়কে কিছু দিন! কঙ্কণ পরম গম্ভীর ও উদাসীন ভাবে বলিল—তাই তো, বিনয় বাবুকে এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, তাই উনি রাগ করেছেন, বিনয় বাবু, দই—

—থাক্ থাক্।

—আর একটু গুড়।

বিনয় যে মনোযোগ চাহিতেছিল, এখন আবার সেই মনোযোগ পাইয়া কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

আহারান্তে তিনজনে তিনটি পান পাইল। দীনেশ পরম তৃপ্তির সহিত বলিল বাঃ একেবারে 'ফিনিশিং টাচ' পর্য্যন্ত।

—দেখুন মহীন্দ্র বাবু, আজ পৌষ-পার্ব্বণের দিনে পিঠে না খাইয়ে ছেড়ে দিলে গেরস্থর অমঙ্গল হয়।

মহীন্দ্র বলিল—এর উপরে আরো খাইয়ে ছেড়ে দিলে এই হতভাগ্যদের অমঙ্গল নিশ্চিত।

দীনেশ কথাটা চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—আঃ মহীন, গেরস্থর মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। সে ভাবিতেছিল, বাড়ীতে পিঠার অংশ তো থাকিবেই—এটা উপরি পাওনা।

মহীন্দ্র বলিল—বেশ তাই হোক—আজ বিনয়ের বাড়ীতে খাবার কথা ছিল তার বদলে না হয় আপনার বাড়ীতেই হবে।

কথাটার মধ্যে কি ছিল জানি না—কঙ্কণের অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার মুখচোখ রক্তিম হইয়া উঠিল। সে এই ত্রুটি লুকাইবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলিল—আপনারা তা হ'লে একটু বিশ্রাম করুন।

মহীন্দ্র বলিল—আমরা একটু ঘুরে আসি।

৪

সেদিনের পরে বিনয় দুইচারি দিন মাত্র চরে গিয়াছিল—আর যাওয়া হইয়া ওঠে নাই। কলেজ অনেক দিন খুলিয়া গিয়াছে—পরীক্ষাও আসিয়া পড়িল। বিশেষত সংসারের একমাত্র কর্ত্রী, পিসিমাতা তাহার বিবাহের কথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর ঐ হতভাগা পরীক্ষার নামটা কেন [illegible] বি-এ হইল। অভিভাবকের দল ইহাতে অদৃষ্টের নির্দ্দেশ আছে মনে করিয়া আসন্ন পরীক্ষার্থীদের মৃতদেহের উপরে বিবাহের কথার খড়্গাঘাত সুরু করিয়া দেন।

বিনয় বিবাহের বাধা-আপত্তিগুলি একে একে তুলিল। পরীক্ষা, অস্বাস্থ্য, পাটের দর ইত্যাদি। অবশেষে স্থির হইল, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে যাহা হয় হইবে। কথাটা চাপা পড়িয়া গেল—কিন্তু বিনয়ের কল্পনার বুদ্বুদের উভয় দিকে এমন চাপ দিয়া গেল যে তাহার আকারটা অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া টি'কিয়া রহিল।

সকাল বেলায় বিনয় বারান্দায় চেয়ার টানিয়া পড়িতে ব[illegible]—মনোযোগটা বন্যপাখীর মত কখন হুস করিয়া অর্থনী[illegible]

দুরূহ অবকাশ দিয়া উড়িয়া পলায়—ওই ওপারের ঋজু উচ্চ নারিকেল গাছের দীর্ঘ পল্লব বাহিয়া প্রভাতের সূর্য্যালোক যেখানে গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। এক আধখানা ছোট নৌকা পাল তুলিয়া জলে কল কল রব তুলিয়া যায়—বিনয় চমকিয়া উঠে। বেলা বাড়িতে থাকে—নূতন-জাগা চরে গোটাকয়েক শঙ্খচিল চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা একটা আর একটার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়া কর্কশ চীৎকারে জলের ধারে-বসা মাছরাঙাটাকে চকিত করিয়া দেয়। জেল-খানার কাছের ঝাউ-শ্রেণী হইতে করুণ আর্ত্তনাদ উঠিতে থাকে। স্নানের বেলা হইলে চাকরে তাহাকে ডাক দেয়—বিনয়ের সকাল বেলাকার পাঠ এইরূপে সাঙ্গ হয়।

বাড়ীর উঠানে কয়েকটা গাঁদা ফুলের গাছ আছে—এখন গাঁদাফুলের গন্ধ পাইলেই তাহার সেই সেদিনের কথা মনে পড়ে। এক রাশি চুলের গন্ধ, আঁচলের স্পর্শ আর একখানি মুখ। কবে একদিন বিনয় কঙ্কণকে সজিনা ফুল পাড়িয়া দিয়াছিল, সজিনার ফুল দেখিলেই সেই সব কথা, ফুল দিবার সময় তাহার গোটা দুই আঙুল ছুঁইয়া লইয়াছিল—সেই স্পর্শ।

মেয়েদের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত তরল, পুরুষের মত সংহত নয়। মেয়েরা যেসব জিনিষ ব্যবহার করে, নিজেদের খানিকটা করিয়া তাহাতে যেন রাখিয়া যায়। যে-ফুলটি খোঁপায় পরে, যে-ফিতায় খোঁপাটি বাঁধে, যে-কাঁটায় খোঁপাটি আটকাইয়া রাখে, যে-শাড়িখানি, যে-জামাটি, যে-বইখানি, যে-বঁটিখানি—সব কিছুর মধ্যে নিজেদের ছড়াইতে ছড়াইতে যায়—আর হতভাগ্য পুরুষ পিছনে পিছনে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহাই সংগ্রহ করিয়া ফিরে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া নিজের মনের মত তিলোত্তমা গড়িয়া তোলে। তারপরে যখন হঠাৎ সেই তিলোত্তমার সহিত নারীর অমিল চোখে পড়ে—তখন আছড়াইয়া সেই প্রতিমা ভাঙিয়া, নারীকে অভিশপ্ত করিয়া, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া পাগলের মত ছুটিয়া যায়—হয় তো আবার নূতন তিলোত্তমার সন্ধানে।

সেদিন বিনয় বারান্দায় একখানা আরাম-চেয়ার টানিয়া বসিয়া ছিল—বেলা তখন দশটা। এমন সময় দেখিতে পাইল একটি ছেলে তাড়াতাড়ি খেয়াঘাটের দিকে যাইতেছে। সে বাদল। বিনয় উঠিয়া তাহাকে ডাকিতেই সে ফিরিয়া চাহিয়া বিনয়কে দেখিয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার হাতে একখানা চিঠি, এক শিশি ঔষধ। বিনয় তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, সে ডাকমুন্সীর জন্যে ঔষধ আনিতে ডাক্তারখানায় গিয়াছিল, অমনি ডাকঘর হইতে চিঠিও আনিয়াছে। বাদল সাধারণতঃ এত আঁটিয়া ধুতি পরে যে তাহার পেটটি ফুটবলের মত ফুলিয়া থাকে—বিশেষত কঙ্কণের যত্নে সর্ব্বদাই তাহার উদরটি পূর্ণ থাকে। সেই পেটটির স্ফীতি কিছু কম, ও তাহার মুখ শুষ্ক দেখিয়া বিনয় জেরা করিয়া বাহির করিল, দিদিমণি তাহাকে জল খাইতে চারটি পয়সা দিয়াছিল—কিন্তু সেই পয়সা দিয়া একটি কাগজের টিয়াপাখী কেনা হইয়াছে। এই ভূমিকা অন্তে সে অতি সন্তর্পণে কাপড়ের নীচে হইতে কাগজের পাখীটি বাহির করিল। পাখীটির অসাধারণত্ব এই যে—উহার বুকের সংলগ্ন একটি সুতা ধরিয়া টানিলে পাখা মেলিয়া ফর্‌ফর্ করিতে থাকে। এই উড্ডীয়মান শুকপক্ষী বালকের ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং মন হরণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন খাদ্যের আভাসমাত্রে সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

বিনয় তাহাকে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার পিসিমাতা ঠাকুর-ঘরে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন—একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া পুনরায় জপে মন দিলেন।

পাড়ার ছোট ছেলেদের সময়ে অসময়ে খাওয়ানো বিনয়ের বাতিকের মধ্যে—তাই ইহাতে কোনো নূতনত্ব কেহ দেখিল না। কোঁচড় ভরিয়া বাদলকে মুড়কি এবং দুটি পাকা কলা দিয়া বিনয় বারান্দায় আসিয়া চেয়ারে বসিল—বাদল নিকটে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগসহকারে আহারে মন দিল।

বিনয় খামের পত্রখানি তুলিয়া দেখিল, তাহাতে কঙ্কণের নাম। কঙ্কণকে চিঠি লিখিবে কে? হাতের লেখা পুরুষের, না স্ত্রীলোকের? এই দুটি প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে ভাবিত করিয়া তুলিল। শীলমোহর অস্পষ্ট। সেই অজ্ঞাত-নামা লেখকের প্রতি তাহার অত্যন্ত ঈর্ষ্যার ভাব উপস্থিত হইল।

হঠাৎ বাদলের চীৎকারে বিনয়ের ধ্যান ভাঙিল! বাদল যখন খাইতেছিল সেই সময় পাড়ার কয়েকটি ছোট ছেলে, উক্ত উড্ডীয়মান শুকপক্ষীর আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া

উপস্থিত হইয়া বাদল যখন অত্যন্ত অভিনিবেশসহকারে পক্ক কদলীর রসাস্বাদন করিতেছিল—সেই সুযোগে পক্ষীটি দেখিবার ছলে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। একা বাদলের হইয়াছিল মুস্কিল। না পারে সে চর্ব্বিত কদলীর মায়া ত্যাগ করিতে, না পারে শুকপক্ষীর দাবী ছাড়িতে—উভয় সমস্যার সমাধান করিয়া দিবার জন্য যে অব্যক্ত করুণ রব সে কণ্ঠ হইতে বাহির করিল তাহাতেই বিনয় চমকিয়া তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। যাহার নিকট হইতে সহানুভূতি আশা করা যায়—বিপদে সে সাহায্য না করিলেও সহ্য করা যায়—কিন্তু তাহার বিদ্রূপ অসহ্য! বাদল ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হায়রে মানুষের রসনেন্দ্রিয়—তবু তাহার মুখ হইতে পক্ক কদলীর এক কণাও নির্গত হইল না। বিনয় অপ্রস্তুত হইয়া পাখীটি উদ্ধার করিয়া তাহার হাতে দিল। সে-ও চোখ মুছিতে মুছিতে অর্দ্ধভুক্ত কদলীপিণ্ড গলাধঃকরণ করিতে লাগিল।

কোঁচড়ের মুড়কি নিঃশেষ করিয়া, আরো চারটি কলা ও কিছু মুড়কি সংগ্রহ করিয়া বাদলচন্দ্র চরে যাত্রা করিল। বিনয় বসিয়া দেখিতে লাগিল ক্ষুদ্র বালকটি দীর্ঘ একখানি ছায়া ফেলিয়া চরের বালু ভাঙিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে।

সে যে আধ ঘণ্টা এখানে ছিল তাহার চলিয়া যাওয়াতে বিনয়ের কেমন একটু বিষাদের মত বোধ হইতে লাগিল। যেন ঐ ছেলেটি তাহার কত প্রিয়! প্রিয়জনের চারিপার্শ্বে যাহারা থাকে—কি যাদুমন্ত্রবলে তাহারাও প্রিয় হইয়া ওঠে—প্রিয়জনের ব্যক্তিত্বের তাহারাও যেন অংশী—তাহাদের বিচ্ছেদে প্রিয়-বিরহের দুঃখই অনুভূত হইতে থাকে।

৫

এতদিন যে চাকার দাগ ধরিয়া কঙ্কণের জীবন চলিতেছিল—সহসা তাহার গতি কে পরিবর্ত্তন করিয়া দিল! সে ছিল শীতের প্রাতের কুন্দফুল, তাহার দর্শক কেহ ছিল না, সে ছিল শীতের রাতের জ্যোৎস্না—তাহাতে মুগ্ধ হইবার কেহ ছিল না। রূপ, যৌবন, যাহাতে মেয়েরা সচেতন হইয়া উঠে, সে সব থাকা সত্ত্বেও তাহার কোনো আত্মচৈতন্য ছিল না। এই সহজ আত্মবিস্মৃতিই রক্ষা-কবচের মত তাহাকে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

আজ তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! তাহার ক্ষুদ্র জীবন-স্রোতস্বিনীতে কোথা হইতে নূতন স্রোত আসিয়া পড়িল, তাই এত কলধ্বনি, তাই এত উন্মাদনা! এই নূতন জীবনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া পিছনে ফিরিয়া সে তাকাইল—সেই সুদূর শৈশব—গোবিন্দপুরে; সেই অতিদূর বাল্যকাল—চরচিলমারিতে। মাতৃহীন নিঃসঙ্গতায় একমাত্র সঙ্গী তাহার পিতা—আর কাহারও অভাব সে অনুভব করিত না। কিন্তু আজ ক্ষণে ক্ষণে তাহার একি অতৃপ্তি, একি ব্যাকুলতা, একি আশা-বিমিশ্র-প্রতীক্ষা। গৃহস্থালীর কাজ, গোহালের কাজ, পিতার সেবা সারিয়া তাহার হাতে যে প্রচুর অবকাশ থাকিত, সেই সময়ে শোলার ফুল, মুকুট গড়িত, সহরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইত। শীতের রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া কাঁথা শেলাই করিত। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কোমরে আঁচল জড়াইয়া ফুলের গাছে জল দিত—তবু যে-সময় থাকিত বসিয়া বসিয়া বাংলা বই পড়িত—ইংরেজি হাতের লেখা লিখিত। সামান্য ইংরেজি, অনেকটা বাংলা সে পিতার নিকট হইতে শিখিয়াছিল।

এতদিন যে রুদ্ধ প্রাচীরের অন্তরালে নিশ্চিন্তে সে বাস করিতেছিল হঠাৎ তাহাতে প্রকাণ্ড এক ফাটল দেখা দিয়াছে। সেই অবকাশ দিয়া বৃহৎ পৃথিবীর বিচিত্র আভাস রহিয়া রহিয়া আসে; যাহা একদিন অবজ্ঞাত ছিল আজ তাহাই অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। পিতার সেবায় তাহার অবহেলা হয় না, কারণ এই অসহায় শিশুস্বভাব পিতাটি তাহার চিত্তে যুগপৎ কন্যা ও মাতৃস্নেহের উৎস খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সব কাজেই তাহার আর সেই পূর্ব্বের মনোযোগ নাই। ধবলী ও শ্যামলী পূর্ব্বের সে যত্ন পায় না, বিবাহের ফরমাইসি টোপর গড়িতে গড়িতে হঠাৎ কোন অজ্ঞাত বাসনা নিঃশ্বসিত হইয়া ওঠে—কেবল গাঁদাফুলের গাছগুলিতে জল দিবার, যত্ন করিবার অবহেলা দেখা যায় না। সে ফুলে দেবতার পূজা হয় না—বাড়ীতে বিগ্রহ নাই—পাড়ার অধিকাংশই মুসলমান—তাহারাও ফুল তুলিতে আসে না। যে দিন বিনয় আসে, সে ফুল ভালবাসে, ফুল তোলে—তার পরে—তবে সেই জন্যই কি ফুলের গাছের এত যত্ন—কে জানে।

মাঘ মাসের শেষ। দু'তিন দিন ধরিয়া মেঘ-কুয়াশা করিয়া বৃষ্টি হইয়া সেদিনকার মেঘনির্মুক্ত প্রভাতটি একান্ত

উজ্জল হইয়া দেখা দিয়াছে। ডাকমুন্সী পাড়ার চিঠিপত্রের তদ্বির করিতে বাহির হইয়াছে, বাদল পেয়ারা গাছের তলায় সকাল বেলার ভাত খাইতেছে। কঙ্কণ ঘরের বারান্দায় নিস্তব্ধ হইয়া নদীর দিকে তাকাইয়া বসিয়া ছিল।

তাহার বয়স ষোল সতেরো, এই বয়সে হিন্দু গৃহস্থের মেয়েরা বিবাহিত হইয়া প্রায়ই মাতৃত্বলাভ করে। অথচ তাহার বিবাহের কোনই কথা নাই। ষোল বছর বয়সে বিবাহের কথা ভাবে নাই—এমন মেয়ে বাংলা দেশে বিরল। তাহার বিবাহের কথা কে তুলিবে! পিতা! ইহা শুধু অসম্ভব নয় হাস্যকর। সংসারে তাহাদের আর কেহই নাই—থাকিলেও সে জানে না।

মায়ের ইতিহাস সে জানে না—শুধু জানে তাহার শৈশবে তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। কিন্তু এই চরে হিন্দু বসতি থাকিতেও কেন যে তাহারা এই মুসলমান-পল্লীর প্রান্তে বাস করে—ইহা সে বুঝিয়া উঠিত না। আর বুঝিত না হিন্দু গৃহস্থরা তাহাদের বাড়ীতে কেন তেমন যাতায়াত করে না।

অদূরে আখ-ক্ষেতের আড়ালে একটি আগন্তুক মনুষ্য-মূর্ত্তিকে সে যখন নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে করিম প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে উঠানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

—দিদি-ঠাক্রুণ, সব গেল।

কঙ্কণ চমকিয়া উঠিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিল। অনেক প্রশ্ন করিয়া যাহা সংগ্রহ করিল তাহা এই—চরের নদীর ধারের যে অংশটাতে কঙ্কণদের জমিতে করিম বর্গাতে চৈতালি চাষ করে—তাহারি খানিকটা পদ্মায় ভাঙিতে সুরু করিয়াছে। কঙ্কণ অনেকটা আশ্বস্ত হইল—সে আরো কিছু ভয়ানক ভাবিয়াছিল। তাহার অত্যন্ত কাতর ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিল—পদ্মায় ভাঙলে আর আমি কি করব।

করিম বিরক্ত হইয়া উঠিল—সব কলাই মশুর গেল—আপনি হাসছ।

—আরে পাগল, কাঁদলেই কি নদী থামবে।

—আমি কি কাঁদতে কইছি—সব যে গেল।

—গেল তো গেল! তুই পুরুষ মানুষ যদি কিছু করতে না পারিস—আমি কি করব।

—একবার গিয়া দেখ্যা আইসেন। শেষে যে বলবেন—আমি চইতালি কম দিলাম—সে হইব না।

এতক্ষণে ব্যাপারটা কঙ্কণ বুঝিল। সে একবার ক্ষেতের মালিককে লইয়া গিয়া সাক্ষী করিয়া রাখিতে চাহে—শেষে তাহার উপরে কোনো অবিশ্বাস না হয়।

করিমের বয়স চব্বিশ, পঁচিশ। ছিপ্ছিপে গড়ন—রংটা আধফর্সা। কঙ্কণদের পাড়াতেই বাড়ী। তাহারই জমি আধিতে চাষ করিয়া বছরের ধান, কলাই কঙ্কণদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দেয়। কঙ্কণ যাহা অতিরিক্ত মনে করে তাহা সহরে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা আনিয়া তাহার হাতে দেয়। দরকার হইলে জরুরি ফরমাইসটা খাটে—এবং সমাজের ভয়ে গোপনে আসিয়া দিদিঠাকরুণের হাতের ডাল ভাত খাইয়া যায়। প্রথম প্রথম সে কঙ্কণকে মা-ঠাকরুণ ডাকিত—এখন অনেক ধমক খাইয়া দিদি-ঠাকরুণে নামিয়াছে।

কিছুতেই যখন সে ছাড়িল না—বাধ্য হইয়া কঙ্কণ উঠিল। এবং কৌতূহলী বাদলকে এক রকম জোর করিয়া বাড়ীর পাহারায় রাখিয়া দুইজনে ভাঙনের দিকে চলিতে সুরু করিল।

৬

সাধারণত বাংলা দেশে মাঘ মাসের শেষে যেমন হইয়া থাকে—তিন চারদিন বৃষ্টিবাদল, মেঘকুয়াশা অন্তে সেদিন প্রভাতটি অত্যন্ত নির্ম্মল, উজ্জ্বল। আকাশ মেঘখণ্ডহীন, বাতাস ধূলিবিমুক্ত হইয়া অত্যন্ত লঘু এবং স্বচ্ছ, এবং দূরের বনরেখা একান্ত হাতের কাছে মনে হইতেছিল। প্রকৃতি যেন শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ একখানি চিত্র—শ্বেত পাথরের শীতলতায়, উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ।

বাতাস বেশ শীতল কিন্তু ঘরে থাকিতে মন চাহে না। বিনয় অনেকক্ষণ বই লইয়া বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে এক সময় পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ম্লান ঝাউ-বীথিকার অতিউচ্চ শাখা হইতে যে চাপা আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল তাহা আকাশের প্রান্ত হইতে সুদূর দৈববাণীর মত শ্রুত হইতেছিল। পথে ধূলি নাই—পথের পাশের গোটা দুই কাঞ্চন গাছ ইতিমধ্যেই আগাগোড়া ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল; শাদা, গোলাপী, রক্তাভ ফুলগুলি এক ঝাঁক ছোট পাখীর মত ঈষৎ বাতাসে কাঁপিতেছিল।

বিনয় আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া গোটা কয়েক ভূপতিত কাঞ্চন কুড়াইয়া লইল—কিন্তু একটা নাড়া খাইতেই শিথিল বৃন্ত হইতে পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে ঝরিয়া গেল। তখন গাছ হইতে ফুল পাড়িতে সুরু করিল, একটি, দুটি অনেকগুলি। কাঞ্চনের স্বচ্ছ, লঘু, সূক্ষ্ম শিরাটানা পাপড়ি গুলিতে তখনো শিশিরের শীতলতা ছিল, তাহার আঙুলের ডগাগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল, ফুল যখন অনেকগুলি হইয়া একটা ভারে পরিণত হইল, তখন সেই পুঞ্জীকৃত স্তূপ লইয়া কি করিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

পৃথিবীতে অনেক বস্তু আছে কিন্তু তাহার অধিকাংশই আমাদের অগোচরে থাকিয়া যায়। ঘটনাক্রমে যে সামান্য-কয়টি আমাদের চৈতন্যের স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়ে—তাহাই বস্তুত পক্ষে আমাদের নিকটে সত্য। সৌভাগ্যক্রমে সেই সত্য বস্তুর মধ্য হইতে যে কয়টি আমাদের প্রেমের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, আমাদের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে স্থান পায় তাহাই বাস্তবিক ভাবে আমাদের জীবন-গঠনের উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। সামান্য ধূলিজাল হইতে বৃহত্তম নক্ষত্রগুলি পর্য্যন্ত মানুষের এই প্রেমের সংস্পর্শে আসিবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে। আর্য্যভট্ট একদিন সৌর-জগতের সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রাকৃতিক জগৎ ও মানবকে নিকটতর করিয়া দিয়াছিলেন। বিনয় আজ একমুঠি কাঞ্চনফুল কঙ্কণের হাতে দিবার ছলে এই উভয় জগৎকে খানিকটা ঘনিষ্ঠতর করিয়া দিল। ভালবাসিয়া যাহা আমরা দিই সেইটুকুই কেবল আমরা যথার্থ ভাবে পাই।

কঙ্কণের কথা মনে পড়িতেই তাহার সব সমস্যার যেন সমাধান হইয়া গেল। এতক্ষণ এই অতি সহজ কথাটা কেন মনে পড়ে নাই—ভাবিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইল।

বিনয় তৎক্ষণাৎ ঘাটে আসিয়া ডিঙি খুলিয়া দিল। স্রোতের মৃদু টানে নৌকা আপনিই ভাসিয়া চলিল। ডিঙির মুখে শান্ত জল তর্‌তর্ করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। মাঝখানে একটা চরের মুখে অনেকগুলি মাছ-ধরা জেলেডিঙি বাঁধা; উনুনে পাক্ চড়িয়াছে, খাদ্যের সুগন্ধ ও ধোঁয়া উঠিতেছিল। একস্থানে এক ঝাঁক চড়ুই উড়িতে উড়িতে হঠাৎ সাঁ করিয়া জলের সঙ্গে প্রায় বুক ঘষিয়া চলিয়া যাইতেছে—তাহাদের পাখার বাতাসে জলে কাঁপন উঠিতেছিল। বিনয়ের ডিঙি চরে আসিয়া লাগিল। দ্রুত লাফাইয়া পড়িয়া সে কঙ্কণদের পাড়ায় যাত্রা করিল। এতক্ষণ তাহার মনে যে নিশ্চিন্ত আনন্দ ছিল অভীষ্ট বস্তুর কাছে আসিয়া তাহা কেন যেন নষ্ট হইয়া গেল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা আছাড় খাইতে লাগিল—দুই পায়ের মধ্যে শির্ শির্ করিতে লাগিল। এ কেমন! বালুর জমি ছাড়াইয়া, তরমুজের ক্ষেত পার হইয়া, মটরের ক্ষেতের আল বাহিয়া, সেই জামগাছটার ছায়ার তল দিয়া, সরু আলের দুইপাশের কঞ্চির বেড়ার আক্রমণ হইতে সাবধান হইয়া কাঞ্চণদের বাড়ীর পিছনে আসিয়া পৌছিল। থমকিয়া দাড়াইল, দেখিল উঠানে ডাকমুন্সী নাই—মনটা কেমন যেন খুশী হইয়া উঠিল। খাদ্য-গ্রহণের পূর্ব্বে যেমন তাহার ঘ্রাণ-গ্রহণ—এ তেমনি। আগামী সুখটাকে মনে মনে কল্পনা করিয়া লাভের পূর্ব্বেই ফাওটুকু অনুভব করিতে লাগিল। এক পা অগ্রসর হইয়া দেখিল উঠানে কেহ নাই, বারান্দাও শূন্য। নিশ্চয়ই সে পাক-ঘরে—একেবারে পা টিপিয়া গিয়া চোখ চাপিয়া ধরিবে। উঠানে উপস্থিত হইয়া বিনয় দেখিতে পাইল—গোহালের পাশের সরু পথ দিয়া কঙ্কণ মাঠের দিকে চলিয়াছে। তাহার আগে কে একজন অপরিচিত যুবা। বিনয়ের বুকের ভিতরটায় ধক্ করিয়া উঠিল। ডাকিতে পারিল না—ইচ্ছাও হইল না। একাকী কোথায় চলিয়াছে। একাকী হইলে বিনয়ের হয়তো আশঙ্কা হইত—কিন্তু অপরিচিতের সাথে তাহাকে দেখিয়া—বুকের ভিতরকার সেই ব্যথাটা তীক্ষ্ণ শূলের মত ক্রমে কণ্ঠের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—গলা শুকাইয়া আসিল।

পলমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে ফিরিল। তাহাকে চিনিতে পারিয়া ধবলী নৈমিত্তিক তৃণগুচ্ছ-প্রত্যাশায় গ্রীবাটি অগ্রসর করিয়া দিল! কিছু না পাইয়া জিহ্বা দ্বারা একবার তাহার হাতটা লেহন করিতে চেষ্টা করিল। বিনয় ফিরিয়া চাহিতেই চোখে পড়িল কঙ্কণ রাস্তার মোড় ফিরিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইল - কিন্তু কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া আরো দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। বিনয়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল—সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। এতক্ষণ ফুলগুলার কথা তাহার মনেই ছিল না, হঠাৎ সেগুলা নজরে পড়িয়া সমস্ত ক্রোধ উহাদের উপরে পড়িল। দুই হাতে সেগুলা দলিত করিয়া, ছিন্ন করিয়া, নিষ্পেষিত করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সে যে নির্ব্বোধের মত পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া এখানে অনর্থক সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছে ইহা ভাবিয়া নিজের উপরে বিরক্ত হইয়া দ্রুত হাঁটিতে লাগিল।

হায়, কোথায় গেল প্রভাতের সেই উজ্জ্বল মধুর সুর, চিত্তের সেই নির্ম্মল জ্যোতি—সমস্ত পৃথিবীটা শ্মশানের ভস্মে ধূসর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিনয় প্রতিজ্ঞা করিল—আর কখনো এখানে আসিবে না—স্থির করিল—সে নির্ব্বোধ, মূর্খ। কঙ্কণের সাথে তাহার কি সম্বন্ধ! কয়দিনের পরিচয়!

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালা

—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

। শিশু-বোধকে দাতাকর্ণের কথা পড়িয়াছিলাম। কর্ণ ছিলেন খুব দাতা। কৃষ্ণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তিনি কর্ণের কাছে আসিয়া মাংস খাইতে চাহিলেন। কর্ণ অঙ্গীকার করিলেন, ব্রাহ্মণ যে-মাংস খাইতে চাহেন, তাহাই দিবেন। ব্রাহ্মণ কর্ণের শিশু-পুত্র বৃষকেতুর মাংস খাইতে চাহিলেন। কর্ণ ও তাঁহার রাণী পদ্মাবতী হাসিমুখে ছেলেকে করাতে কাটিবেন, তবেই ব্রাহ্মণ তাহার মাংস খাইবেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের খুশীর জন্য তাহাই করিলেন। ব্রাহ্মণ মাংস খাইতে বসিয়া মাংসের অম্বল চাহিলেন। মাংস আর নাই, কিসে অম্বল রাঁধিবেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, পদ্মাবতী ছেলের মুণ্ড লুকাইয়া রাখিয়াছেন: সেই মুণ্ড দিয়া অম্বল রাঁধিতে হইবে। কথাটি সত্যই। অবশেষে মুণ্ডের অম্বলও ব্রাহ্মণের পাতে আসিল। ব্রাহ্মণ চারিটি পাত পাড়িতে বলিলেন। এই চতুর্থ পাতে বসিবার জন্য ব্রাহ্মণ কর্ণকে শহর হইতে একটি ছেলেকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কর্ণ শহরে গিয়া দেখেন, বৃষকেতু বাজারে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতেছে। রাজা-রাণীর আনন্দ আর ধরে না। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

দ্বিজ কবিচন্দ্র এই দাতাকর্ণ-আখ্যানের কবি। ইহার ১০৬২ বাঙ্গালা সনের একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে এই মহাভারতের কথা শুনাইয়াছিলেন, বলা হইয়াছে। কিন্তু মূল মহাভারতের কোথায়ও এই গল্পটি নাই। এমন কি কাশীরাম দাসের মহাভারতেও নাই। তবে এই কাহিনীটির মূল কি?

আমরা ধর্ম্ম-মঙ্গল সমূহে রাজা হরিশ্চন্দ্র (বা হরিচন্দ্র) এবং তাঁহার পুত্র লুইচন্দ্রের (লুহিশ্চন্দ্রের বা লুহিচন্দ্রের) সম্বন্ধে একটি কাহিনী দেখিতে পাই। রাজা হরিশ্চন্দ্র আঁটকুড়া। তাই তাঁহার প্রাণে বড় খেদ। রাণী মদনাকে (মদনাবতীকে) লইয়া রাজা বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে বল্লুকা নদীর তীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখ সন্ন্যাসী ছিলেন ছদ্মবেশী ধর্ম্ম। সন্ন্যাসী বলিলেন, ধর্ম্মপূজা করিলে রাজার পুত্রসন্তান হইবে। তাহার নাম যেন লুইচন্দ্র রাখা হয়। ধর্ম্মের উদ্দেশে তাহাকে বলি দিতে হইবে। রাজা সবই অঙ্গীকার করিলেন। ক্রমে রাজার ছেলে হইল। তাহার নাম রাখিলেন, লুইচন্দ্র। একদিন সেই বল্লুকার সন্ন্যাসী রাজপুরী আসিলেন। আসিয়া তিনি উপবাসের পারণার জন্য মাংস চাহিলেন। যে-সে মাংস নয়, নরমাংস, একেবারে লুইয়ের মাংস। রাজারাণী লুইচন্দ্রকে ধর্ম্মের নিকট বলি দিলেন। রাণী লুইয়ের মুণ্ড লুকাইয়া রাখিলেন। মাংস কাটাকুটা হইলে, সন্ন্যাসী মুণ্ড আনিতে বলিলেন। অগত্যা রাণী মাথা আনিয়া দিলেন। মাথার ঘিলু বাহির করা হইল। পরে স্বয়ং রাণী পাক করিতে বসিলেন। রাঁধা শেষ হইলে সন্ন্যাসী তিন থালে মাংস বাড়িতে বলিলেন। খাইবেন সন্ন্যাসী, রাজা, রাণী। সন্ন্যাসীর কথা নাড়া যায় না। তিনজনে ভোজনে বসিলেন। রাজা রাণী মাংস মুখে তুলিবেন, এমন সময় সন্ন্যাসী হাত ধরিয়া ফেলিলেন। সন্ন্যাসী নিজের পরিচয় দিয়া বর দিতে চাহিলেন। তাঁহারা লুইয়ের জীবনদান চাহিলেন। ধর্ম্মঠাকুর বলিলেন, এ সমস্তই মায়ার খেলা। লুই মরে নাই, সে গাজনে বেত হাতে করিয়া নাচিতেছে। সত্যই তাই। রাজা রাণী লুইকে পাইয়া কতনা সুখী। সন্ন্যাসী তখন তিরোধান হইলেন।* শূণ্য পুরাণে রাজা হরিচন্দ্র ও রাণী মদনার পুত্রলাভের জন্য ধর্ম্মপূজার কথা আছে।

এই হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান হইতে দাতাকর্ণের গল্প আসিয়া থাকিবে। কিন্তু এই হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্র কে? মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রাঢ়দেশে ধর্ম্মঠাকুরের পূজায় যে লুইয়ের নামে পাঁঠা বলি দান করা হয়, তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য লুয়ীপাদেরই নামে। কিন্তু ধর্ম্মপূজার লুইচন্দ্রের আসল নাম লোহিদাস, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে লুহিশ্চন্দ্র,

---

* বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে আখ্যানের শেষে আছে যে রাণী লুকান মুণ্ড আনিয়া রাঁধিয়া দিলে সন্ন্যাসী অন্নব্যঞ্জন চারি ভাগ করিতে বলেন। চতুর্থভাগ খাইবার জন্য সন্ন্যাসী হরিশ্চন্দ্রকে নগর হইতে একটী শিশু ডাকিয়া আনিতে আদেশ করেন। তিনি সেখানে গিয়া লুহিচন্দ্রকে খেলা করিতে দেখিতে পান, ইত্যাদি।

অন্যত্র লুহিচন্দ্র বা লুইচন্দ্র। তাঁহার সহিত সিদ্ধ লুয়ীপাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

লুইচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়াছে। কাহার মতে তিনি ঢাকা জেলার সাভারের রাজা ছিলেন। নাথ-গীতিকার বিখ্যাত গোপীচাঁদ তাঁহার জামাতা ছিলেন। কিন্তু এই হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে পুত্র-বলিদান বিষয়ক কোন কাহিনী প্রচারিত নাই এবং পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মপূজারও প্রচলন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে রমাই পণ্ডিতের সমসাময়িক মনে করিয়াছেন। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৩৮ ভাগ, ৭৭ পৃষ্ঠায়) রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় শূন্যপুরাণ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার মতে বর্দ্ধমান জেলার অমরাগড়ের রাজবংশে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয় এবং প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। অমরাগড়ের রাজবংশ কুলজী মতে এইরূপ—আদি পুরুষ, তৎপুত্র রাঘবরায়, তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র শতক্রতু, তৎপুত্র মহেন্দ্র, তৎপুত্র নরেন্দ্র ইত্যাদি। এই শতক্রতুকে হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার পুত্রকে লুইচন্দ্র মনে করিবার কোন যথেষ্ট কারণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার কল্পনার সমস্ত ভিত্তি এই অমরাগড়ের উপর। মাণিক গাঙ্গুলি ও নব্য ময়ূরভট্টের মতে হরিশ্চন্দ্র অমরাগড়ের রাজা ছিলেন। কিন্তু ঘনরাম বলেন, "দ্বিতীয় অমরাবতী ভূপতির দেশ।" যখন ব্যক্তির নামেরই অভাব, তখন শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধির মত কিরূপে গৃহীত হইতে পারে?

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, (ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণের ভূমিকা, ২৮০ পৃষ্ঠা) এই হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি এবং তাঁহার পুত্র লুইচন্দ্র পৌরাণিক রোহিত বা রোহিতাশ্ব। আমি এই মতই সঙ্গত মনে করি। হরিশ্চন্দ্র প্রথমে পুত্রহীন ছিলেন। পরে বরুণদেবের কৃপায় রোহিতকে পুত্ররূপে লাভ করেন। তিনি বরুণদেবের উদ্দেশ্যে তাহাকে বলি দিবেন জানিতে পারিয়া রোহিত বনে পলাইয়া যান। পরে শুনঃশেপকে হরিশ্চন্দ্র রোহিতের পরিবর্ত্তে বলি দিতে উদ্যত হইলে বরুণদেব শুনঃশেপের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। ধর্ম্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের সহিত পুরাণের হরিশ্চন্দ্রের অনেকটা মিল দেখা যাইতেছে বটে। আমি বসন্তবাবুর মতের সপক্ষে আর একটি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য নামে একখানি বাঙ্গালা-মৈথিলী মিশ্রিত নাটক আছে। ইহা নেপালী সংবৎ ৭৭১ অব্দে (=১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে) লিখিত হয়। Dr. August Conrady ইহা ১৮৯১ সালে Leipzig হইতে প্রকাশিত করেন। কৌশিক বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্রের দান পরীক্ষা ইহার বস্তু। ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্ঞীর নাম মদনাবতী এবং পুত্রের নাম রোহিদাস আছে। রোহিদাস ধর্ম্মমঙ্গলের লুইচন্দ্র। রোহিতাশ্ব হইতে রোহিদাস, তাহা হইতে লোহিদাস, তাহা হইতে লুহিদাস, তাহা হইতে হরিশ্চন্দ্রের নাম-সাদৃশ্যে লুহিশ্চন্দ্র বা লুহিচন্দ্র, তাহা হইতে লুইচন্দ্র। লোকগাথায় শৈব্যা মদনাবতী হইয়াছেন, এবং তাহারই সংক্ষেপে মদনা। অবশ্য হরিশ্চন্দ্র-নৃত্যের গল্পভাগের সহিত ধর্ম্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালার কোন সম্পর্ক নাই। উক্ত নাটকে হরিশ্চন্দ্রের বারাণসীতে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার, রাণী মদনাবতীর পরগৃহে দাসীত্ব, রোহিদাসের সর্পাঘাতে মৃত্যু, মণিকর্ণিকার ঘাটে রোহিদাসের শবদাহের জন্য মদনাবতীর গমন, পরে পরস্পরের পরিচয় ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই হরিশ্চন্দ্র ও রোহিদাসকে লইয়াই যে ধর্ম্মমঙ্গল ও শূন্যপুরাণের আখ্যান, তাহা নিশ্চিত।

পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা, স্ফুলিঙ্গ কাঁদিছে অনশনে,
পাবকপরশে হায়, যুগান্তের জঞ্জাল-জড়তা
ক্ষণেক কাঁপিয়া উঠে, মগ্ন পুনঃ কর্দ্দম-স্বপনে ;
বসুন্ধরা নিত্যকাল বক্ষে বহে এ দুঃখ-বারতা।

আবর্জ্জনা নাহি জ্বলে, আগুনের নহে অপরাধ,
যুগধর্ম্মে অন্ধকার আলোকেরে করে উপহাস।
বিধি হয়েছেন বাম, ঊর্দ্ধে থাকি সাধিছেন বাদ—
অধিবাস দিবসেই শ্রীরামের হয় বনবাস।

শ্মশান-বৈরাগ্য

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহুলার মহিম বাঁড়ুজ্জে এ অঞ্চলে নাম-করা মহাজন।

টাকা নিজের ঘরে বাড়ে না, টাকা বাড়ে পরের ঘাড়ে—এ নীতিকথাটি বাঁড়ুজ্জে বেশ জানিত এবং মনে-প্রাণে মানিতও। ফলে দাদন বাড়িতে বাড়িতে ছড়াইয়া পড়িল দেশময়। এবং কয়েক বৎসরেই চারিপাশে দশ ক্রোশের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বাঁড়ুজ্জের কাছে ছিপে গাঁথা মাছের মত আটকাইয়া গেল। কিন্তু এত বড় মাছ টানিয়া তোলা সহজ ব্যাপার নয়। দেশ জুড়িয়া দাদন আদায় সুকঠিন হইয়া উঠিল। খাতককে তাগাদা দিলে বলে, কাল যাইব। কিন্তু নিত্য-কালের বিনাশ নাই, খাতক আসে না। স্বয়ং দেখা করিতে গেলে—লোকের কুটুম্বিতা ও কাজের হিড়িক পড়িয়া যায়। আত্মীয়বৎসল, কর্ম্মতৎপর খাতক-গুলির নাগাল পাইতে বাঁড়ুজ্জেব ব্যাধি ধরিবার উপক্রম হইল।

এদিকে কে কোথা হইতে এক বেনামী দরখাস্ত ঝাড়িয়া দিল ইন্‌কামট্যাক্স আফিসে। বাঁড়ুজ্জের খত-খাতা, সিন্দুক, মায় হাঁড়ির খবর পর্য্যন্ত তাহাতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত—খাতাপত্রসহ হাজির হইবার এক সমন বাঁড়ুজ্জের নামে আসিয়া গেল। রাজার সমনে আর সাক্ষাৎ শমনে তফাৎ বড় বেশী নয়—এ জ্ঞান বাঁড়ুজ্জেব ছিল; নির্দ্দিষ্ট দিনে হাজির সে হইল। কিন্তু সেখানে তাহার শাস্তির আর সীমা রহিল না। কোন ক্রমেই হাকিমকে সে বুঝাইতে পারিল না যে খাতার এ অঙ্কগুলা টাকা নয়, কালির আখর মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত নাচার হইয়া সে বলিল—ও সব হুজুর আপনারা আদায় ক'রে নেন গিয়ে। আমি কাগজ কলমের সুদের ওপর ট্যাক্স দিতে পারব না। ভ্রুকুটী করিয়া হাকিম কহিলেন—এখানে চালাকী জোচ্চুরী আরম্ভ করেছ নাকি? তোমাকে আমি প্রসিকিউট করব—জান! 'প্রসিকিউট' কথাটার অর্থ বাঁড়ুজ্জের অজ্ঞাত ছিল না। সে বিবর্ণ মুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া হাকিমের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনা আপত্তিতে ট্যাক্স ধার্য্য হইয়া গেল—বাৎসরিক বারশো টাকা।

বাঁড়ুজ্জে কোন কথা কহিল না—মনে মনে সে দাঁত ঘষিতেছিল খাতকগুলার উপর।

হাকিম খুসী হইয়া উঠিতেছিলেন। নথিপত্রে সহি করিয়া ফাইলটা বন্ধ করিতে করিতে কহিলেন—আপনি বন্দুক নিয়েছেন—বন্দুক!……নেন নি? আচ্ছা, দরখাস্ত করবেন গিয়েই—বন্দুক হয়ে যাবে আপনার।

না বলিতে বাঁড়ুজ্জের সাহস হইল না।

মনে মনে মারাত্মক একটা দিব্য গালিয়া বসিল—শালা আর যদি আমি মহাজনী করি তবে……

বেচারার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

কয়দিন পরই বাঁড়ুজ্জে প্রকাণ্ড একটা কাগজের দপ্তরসহ আসিয়া হাজির হইল হরিহরপুরে। হরিহরপুরেই এ অঞ্চলের সবরেজেষ্ট্রী আপিস। বাঁড়ুজ্জের প্রতিজ্ঞা, এবার যে কোনও উপায়ে হউক তাহার দাদন সে গুটাইবে। হয় টাকা, নয় জমি, এই হইল তাহার মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র লইয়া সে হরিহর-পুরে পাকা রকমের আড্ডা গাড়িতে সঙ্কল্প করিল।

হরিহরপুরে বাঁড়ুজ্জের দূরসম্পর্কীয়া এক দিদির বাড়ী। বাড়ীতে মাত্র দিদি ও তাহার বিধবা কন্যা বিভা ছাড়া কেহ নাই। বাড়ীর বাহিব হইতেই সে ডাকিতে সুরু করিয়া-ছিল—দিদি—দিদি—দিদি কৈ গো?

সঙ্গের লোকটি কাগজের প্রকাণ্ড বোঝাটা বহিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সে ধপ করিয়া বোঝাটা দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিল।

বাঁড়ুজ্জে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল, কহিল—বেতমিজ বেয়াড়া, হারামজাদ, কাগজের দাম বোঝ না বেটা চাষা! দলিলপত্র সব ফেটে যাবে যে। লোকটা পুরাতন ভৃত্য। কোন উত্তর না দিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইয়া সে তখন ঘাড়ের ব্যাথা সারিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে এদিক ওদিক দেখিয়া বিরক্তিভরেই কহিল—এরা সব গেল কোথা রে বাপু! মরেছে না কি সব? দিদি—বলি ও দিদি! নে রে বেটা নে, তামাক সাজ দেখি একবার। হুঁকোটা বেব করে জল কর।

সম্মুখের মাটীর দোতালার সিঁড়ির দরজা খুলিয়া একটি শ্রীমতী বিধবা মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। বাঁড়ুজ্জের পায়ের ধূলা লইয়া সে কহিল—মামা কখন এলে ?

এই মেয়েটিই বিভা – বাঁড়ুজ্জের দিদির মেয়ে।

বাঁড়ুজ্জে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—হাঁ মামাই. বটে। তা—রাজকন্যে ছিলেন কোথা এতক্ষণ? ডেকে ডেকে যে গলা ফেটে গেল আমার! দিদি কৈ ?

ম্লান কণ্ঠে বিভা বলিল— মায়ের বড় অসুখ মামা।

চোখদুটি তাহার ছল ছল করিয়া উঠিল।

বাঁড়ুজ্জে চমকাইয়া উঠিল ;—মনের কথা চাপিয়া রাখিতে পর্য্যন্ত সে পারিল না—বলিয়া ফেলিল—এই নাও! আচ্ছা বিপদ বটে ত! আমি এলাম কোথা—তা-না—। যাঃ, কচু খেলে—অসুখের হাঙ্গামায় পড়লাম এসে !

বিভাই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে সে বলিল—তা হোক না মামা, আমি ত রয়েছি, কোন কষ্ট হবে না তোমার।

বাঁড়ুজ্জে ধমক দিয়া উঠিল চাকরটাকে—হাঁ রে বেটা শূয়ার, হারামজাদা, ওরে উনোনে যে এখনো ধোঁয়া উঠছে। আর তুমি বেটা উল্লুক বসেছ টিকে পোড়াতে। বেরো বেটা বেরো—এখুনি বেরো তুই বাড়ী থেকে। ঋণের দায়ে সব ঘুচিয়ে এখনো নবাবী গেল না তোমার ?

চাকরটা বাঁড়ুজ্জেকে গ্রাহ্যও করিল না—সে টিকে পোড়াইয়া আগুন করিয়া হুঁকা কলিকাটা আগাইয়া ধরিল এতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিল—ও আগুনে যুৎ হবে না।

হুঁকা টানিতে টানিতে বাঁড়ুজ্জে উঠিয়া কহিল—ওরে বাইরের ঘরটায় কাগজগুলো রাখ। ঘরটা পরিষ্কার করে আমাদের তালাটা লাগিয়ে দে।

বিভা বলিল—পরিষ্কার করাই আছে মামা। তোমাদের চৌকিদার এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল যে। সব ঠিক ক'রে রেখেছি আমি।

মামা বলিলেন তা অসুখের খবরটা ত দিলেই পারতে বাপু। আমার এখন কাজ কত! টাকা কড়ি আদায় করতে আমার দু তিন মাস লেগে যাবে। তা না কোথা অসুখ বিসুখ—হুঃ সময়ও পায় না সব অসুখ করতে! চল্‌রে বাপু চল্, দেখে আসি কি হয়েছে। হাঁ, আগে ওই বেটা চাষাকে দেত এক থালা মুড়ি—গিলুক বেটা চাষা। তুই দে—আমি বরঞ্চ দেখে আসি।

হুঁকা হাতে বাঁড়ুজ্জে উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ির প্রান্ত হইতেই সে ডাকিতে সুরু করিল—দিদি, দিদি, ও-দিদি! আচ্ছা কাণ্ড তোমার বাপু!

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া একখানা থালা বাহির করিল। সেখানা আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে কহিল—হাত পা ধুয়েছ, যোগী ?

যোগী মনিবের গমনপথের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল— মা তোমার জন্মের সময় মধু মুখে দেয় নাই, দিয়েছিল বিষ !

বিভা আবার ডাকিল—যোগী !

যোগী ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল—এই যে হাতমুখ ধুয়ে আসি দিদিমণি।

ভাঁড়ার-ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বিভা কহিল— একবার জেলে-পাড়াটা ঘুরে আসবে ত যোগী। পোয়াটেক মাছ কিনে আনবে ত।

ঠোঁটের ডগায় একটা আওয়াজ করিয়া যোগী কহিল— হুঃ তোমারও যেমন দিদিমণি !

সকাল বেলা হইতেই বাঁড়ুজ্জে আসর জমাইয়া বসে। রাধু কামার, গোলাম মোড়ল, জগা নাপিত, রহিম সেখ, সুরেশ মিশ্র, হরাই মজুমদার প্রভৃতি ভিড় করিয়া বসিয়া থাকে। বাঁড়ুজ্জে আরম্ভ করে—আমি আর রাখতে পারব না রাধু। তোমাকে আমি বারবার ক'রে আজ দু-বছর ধরে ব'লে আসছি তুমি কর্ণপাতই করছ না। কেন বল দেখি? আমাকে তুমি মনে করছ কি? দাতাকর্ণ না গৌরী সেন? কিন্তু যদি আমাকে নালিশ করতে হয় তবে সূচ্যগ্র মেদিনী তোমার রাখব না আমি। তোমাকে ভাঁড় হাতে ক'রে ভিক্ষে করাব আমি সে ব'লে রাখছি।—যত বেটা বদমাস বাটপারের পাল্লায় পড়ে মাটী হলাম আমি। সেবার বল্লে তুমি—এই মাসের মধ্যে টাকা দেবে। তোমার কথায় বিশ্বাস করে···

অকস্মাৎ বাঁড়ুজ্জের গলা উগ্র হইয়া উঠে। সে বলিয়া যায়—এ সংসারে যার বাতের ঠিক নাই—তার জাতের ঠিক নাই তা জান ?·· যোগে, ওরে বেটা হারামজাদা শূয়ার—

তামাক দেরে বাপু এতগুলো ভদ্রলোক বসে আছে বেটা ডেবাডেবা চোখে দেখতে পাও না?

মজলিস গম্‌গম্‌ করিতে থাকে। যোগী হুঁকা-কলিকাটা আগাইয়া দেয়। সে তামাকই সাজিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে কহিল—কলার পেটো আন দেখি গোটা তিনেক। ভদ্রলোক কি হাতে তামাক খাবে রে বেটা চাষা?

হুঁকাটা সুরেশ মিশ্রের হাতে দিয়া আপ্যায়িত করিয়া সে কহিল—খান গো মিচ্ছি মশায়—তামাক খান।

তারপর আবার ধরিল রাধুকে—তুমি একটা মানী লোক, ভদ্রলোক। তোমার অপমান আমি করতে পারব না। নালিশ ক'রে যে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো তোমাকে, সে আমা হ'তে হবে না? কিন্তু আমারও ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে—না কি মিচ্ছি মশায়?

সুরেশ তামাক টানিতে টানিতে কহিল—তা ত' বটেই। আপনার খেয়াও ত' ঘর ঢোকাতে হবে! ন্যায্য টাকা! মিষ্টি কুলের আঁটীশুদ্ধ গিল্‌লে চলে না।

রাধু কামারকে চিন্তার অবসর দিয়া বাঁড়ুজ্জে ধরিয়া বসিল গোলাম মোড়লকে। যেন তাহার সহিত অকস্মাৎ দেখা—এমনি ভঙ্গি করিয়া কহিল—ওই—গোলাম মোড়ল যে-হে! এ্যা—একি ভাগ্যি আমার? আজ সূয্যি কোন দিক উঠেছে বল দেখি? তারপর কি মনে ক'রে আসা হ'ল মোড়ল মশাই?

গোলাম নতচক্ষে অকারণে একটা কাগজ লইয়া ভাঁজিতে-ছিল—সে চুপ করিয়া রহিল। বাঁড়ুজ্জে ঘাড় উঁচু করিয়া চশমাশুদ্ধ দৃষ্টিটা তাহার উপর নিবদ্ধ কবিয়া কহিল—কথা কও না যে হে? বলি কথা কওনা যে? কথার উত্তর দিতে হবে নাকি? না—তোমার রূপ দেখলেই আমার পেট ভরবে?

গোলাম মৃদু হাসিয়া কহিল—এসে কি করব বলুন? টাকাকড়ি যোগাড় না হ'লে আমাকে দেখে ত' আপনার পেট ভরবে না। আর আমাকে এত তাড়াতাড়িই বা কেন মশায়? আমাকে দেখে ত' আপনি টাকা দেন নি, দিয়েছিলেন আমার জমি দেখে। সে জমি ত' আপনার খতে বন্ধক দেওয়াই আছে।

বাঁড়ুজ্জে অবাক হইয়া গেল। এমন উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই। বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটিতেই সে অকস্মাৎ লাফাইয়া উঠিল—কহিল, বলি খতে থাকলেই আমি বর্ত্তে গেলাম আর কি! জমি তুমি আমাকে কবলা ক'রে দাও হে বাপু। তুমি যে দিব্যি জমি ভোগ করে যাচ্ছ—তার কি?

গোলাম কহিল—তা আজ্ঞে যদ্দিন খেয়ে নিতে পারি সেই আমার লাভ। আপনি জমি দখলে নেবার ব্যবস্থা করুন। তাতে আইনে আমি যদ্দিন সময় পাই।

বাঁড়ুজ্জে গর্জ্জিয়া উঠিল—বডি-ওয়ারেণ্ট করব তোমায় আমি—।

ততক্ষণে গোলাম রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে।

ইহার পরই একটা প্রলয় ঘটিবার কথা। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ওপাশের দরজার পাশ হইতে ডাক আসিল—মামা।

সমস্ত রাগটা তৎক্ষণাৎ বিভার উপর গিয়া পড়িল—দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বীভৎস ভঙ্গীতে বাঁড়ুজ্জে কহিল—কি? বলি—বলছ কি? মামা! মামা! শুভকর্ম্মেও পেছু থেকে মামা! মন্দেও তাই। ভালা বিপদে পড়েছি আমি।

এতগুলা লোকের সমক্ষে এমন ধারা বীভৎস অপমানে বিভাব মাথাটা হেঁট হইয়া গেল। অবরুদ্ধ কান্নায় তাহার ঠোঁটদুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। উত্তর দিতে সে পারিল না।

উপস্থিত লোকগুলিও বোধ করি এখানে উপস্থিতির জন্য মৌনভাবেই অপরাধ বোধ করিতেছিল। তাহারা যে যাহার চোখের নীচের মাটীটুকুর উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাঁড়ুজ্জে আবার খিঁচাইয়া উঠিল—বলি বলছ কি শুনি?

বিভা কোনরূপে বলিয়া ফেলিল—মা কেমন করছেন!

—কেমন করছে? বলি কি করছে! এ্যা—

—অসুক বেড়েছে মনে হচ্ছে। কথা কইতে পারছেন না।

বিভার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। বাঁড়ুজ্জে বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল—সে কিরে বাপু? কথা কইতে পারছে না—কি রে বাপু? তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ঘুমিয়েছে হয় ত। ডেকে দেখেছিস?

—ডেকে দেখেছি। উত্তর দিতে পারলেন না। ইসারা ক'রে দেখালেন বড় কষ্ট হচ্ছে।

—এ্যাঁ—সে কিরে বাপু? এ—আমি কি করি বল দেখি? যোগে—ও যোগে—যা ত' ডাক্তারের কাছে একবার। ওগো তোমরা এসো বাপু এখন। আমার বিপদ ত' দেখেছ! যোগে—গেলি রে ও যোগে!

বিভার মায়ের অসুখ সত্য সত্যই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কহিলেন—

—তাই ত' এ যে দেখছি নিউমোনিয়া ডবল সাইড নিয়ে ব'সে আছে।

বাঁড়ুজ্জে ডাক্তারের পাশে দাঁড়াইয়া মনের চাঞ্চল্যে ক্রমাগত দুলিতেছিল।

সে মৃদুস্বরে বারবার প্রশ্ন করিতেছিল—হ্যাঁ ডাক্তার—বলি—বাঁচবে ত?···ডাক্তার, বলি বাঁচবে না কি বল না হে!

ডাক্তার কহিল—বলা ত' যায় না। অবস্থা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে। এখন তাড়াতাড়ি ওষুধ আনতে লোক পাঠিয়ে দিন। বুকে দেবার জন্যে এককৌটো এ্যান্টিফ্লজেষ্টিন—

বাধা দিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল—কেন—আমাদের মসনের পুলটিস—।

ডাক্তার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—মসনের পুলটিসও ভাল জিনিস। কিন্তু এ অবস্থায় এ্যান্টিফ্লজেষ্টিন দেওয়াই ভাল।

ঘরের ভিতর হইতে ডাক আসিল—মামা!

দরজার গোড়ায় গিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল—কি?

দুইটি টাকা হাতে দিয়া বিভা বলিল—ডাক্তারের ফি।

বাঁড়ুজ্জে বাহিরে আসিয়া ডাক্তারকে বলিল—এস ডাক্তার এস। তা হ'লে ওষুধটা ভাই তাড়াতাড়ি দিয়ো যেন।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া ডাক্তারের হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল—কিছু বলতে পাবে না ভাই। বড় গরীব—আমাকে নিজে থেকে—হেঁ-হেঁ, বুঝতেই ত' পারছ।

ডাক্তার আপত্তি করিল না। নমস্কার করিয়া বলিল—ওষুধের জন্যে লোক পাঠিয়ে দিন। আর যদি দরকার হয় তবে আবার ডাকবেন আমায়, বুঝলেন।

বাঁড়ুজ্জে সবিনয়ে কহিল—মঙ্গল হবে ভাই, মঙ্গল হবে তোমার, বিভা দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, মামা বাড়ী ঢুকিতেই সে উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিল—ডাক্তার কি বল্লে মামা?

বাঁড়ুজ্জের জিভের আগায় আসিয়া পড়িয়াছিল স্বভাবসিদ্ধ একটা কটু কথা—বলবে 'আবার কি? বলছিল আমার মাথা—শিঙে ফুঁকবে আর কি।

কিন্তু বিভার মুখের দিকে চাহিয়া সে কেমন হইয়া গেল। আশঙ্কায় তাহার মুখখানি ম্লান হইয়া গেছে—বড় বড় চোখ দুটি আসন্ন অশ্রুভারে ছল ছল করিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে চেষ্টা করিল স্বাভাবিক ভাবে হুড়মুড় করিয়া একটা জবাব দিতে। কিন্তু তাও সে পারিল না। অবশেষে যাহা সে কহিল তাহা তাহার পক্ষে অতি অস্বাভাবিক।

অতি মিষ্ট ভাষায় বলিয়া উঠিল—ভয় কি রে আমি থাকতে? ভাল হ'য়ে যাবে দিদি। কেন বুকে কি সর্দ্দি বসে না কারু?

বিভা কিন্তু আকুল হইয়া উঠিল। মামার এই অস্বাভাবিক সান্ত্বনার স্বরে বুক তাহার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিল অতি বড় দুর্ভাগ্য মাথায় করিয়া পৃথিবীর বুকে সে আজ করুণার পাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই এই অযাচিত সান্ত্বনা তাহার ভাগ্যে মিলিল।

রুদ্ধ রোদন সম্বরণ করিতে করিতে সে উপরে ছুটিয়া উঠিয়া গেল। মায়ের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বারবার সে ডাকিল—মা, মা, মাগো মা!

মা তখন বিড়বিড় করিয়া আপনার কথা কহিতেছিল, সে কথার অর্থও হয় না—বোঝাও যায় না। চোখের জলে বিভার মুখ বুক ভাসিয়া গেল। কতক্ষণ পর বাঁড়ুজ্জে আসিয়া সন্তর্পণে ডাকিল—বিভা!

আঁচলে চোখ মুছিয়া বিভা মামার দিকে চাহিল।

মৃদুস্বরে মামা বলিল—ওষুধ!

একটা শিশি ও এ্যান্টিফ্লজেষ্টিনের কৌটাটা নামাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল—একদাগ ওষুধ দে, পেটে পড়ুক। আর এই কৌটোর ওষুধ কি করে লাগাতে হবে জানিস্ তুই?

বিভা ওষুধ ঢালিতে ঢালিতে কহিল—জানি। জল গরম করতে হবে। তুমি একটু এখানে বসবে মামা—আমি জলটা—

তাড়াতাড়ি বাঁড়ুজ্জে বলিল—জল গরম যোগে করবে। আমি ব'লে দিচ্ছি। বেটা হারামজাদা চাষা খাবে আর দিনরাত ব'সে থাকবে।

বিভা বলিল—তা বেশ। তুমি একবার ধরে দেবে তা হলে বাঁধবার সময় ?

সিঁড়ির মুখে পা বাড়াইয়া মামা কহিল—আমি ওই কুসুমঠাকরুণকে ডেকে দিচ্ছি সেই ধরে দেবে, বুঝলি !

তাড়াতাড়ি সে নামিয়া আসিল. হাত পা তাহার থরথর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

যোগীকে ডাকিয়া জল গরম করিতে বলিয়া অকস্মাৎ সে বলিয়া ফেলিল—কি করি বল দেখি যোগী ? আমার হাত পা থর্থর্ ক'রে কাঁপছে। আমি বাপু মানুষ মরে তাই শুনেছি—চোখে কখনও দেখি নি।

*　　*　　*

খবর পাইয়া পাড়া-প্রতিবেশীর দল ভিড় করিয়া আসিয়াছিল। জনকতক পুরুষ মানুষ বাঁড়ুজ্জেকে লইয়া বাহিরের দাওয়ার উপর ভিড় করিয়া বসিয়া ছিল।

উপরে আর একদল প্রতিবেশিনী নিঃশব্দে রোগিণীকে ঘেরিয়া বসিয়া ছিল। বিবর্ণ কঙ্কালাবশেষা নারীদেহখানি বিছানার উপর অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। অতি শীর্ণতায় সম্মুখের দাঁতগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। চোখের দৃষ্টি অস্থির—অর্থহীন।

বিভা শুধু মৃদুরবে কাঁদিতেছিল—আর মাঝে মাঝে কাতর স্বরে সংজ্ঞাহীনা মাকে প্রশ্ন করিতেছিল—মা—মা—কোথা চল্লে মা ? মা-গো ! বর্ষীয়সী মেয়েদের মধ্যে সরকার-গিন্নী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আর কোথা চল্লে মা ! মা চলেছে পথে মা। কুসুমঠাকরুণ চোখ মুছিয়া কহিলেন —আহা-হা কিযে তোর হ'ল মা।

সরকার-গিন্নী বলিলেন—উপায় কি মা ! এ এড়াবার ত পথ নাই। থাকলে কি মানুষ ছাড়ত !

নিদারুণ আক্ষেপ সহকারে শ্যামা পিসী কহিলেন—এ-ই, তা হ'লে কি মানুষ ছাড়ত ? ছাড়ত না। মানুষের বেঁচে আশ মেটে না। এই আমাকে দেখ—স্বামী গেছে পুত্তুর গেছে, কে আছে মা সংসারে আমার ? তবুত মরতে পারি না। রোগ হ'লে ওষুধ খাই। সাপ দেখে ভয় হয়।

বিভা মায়ের মুখে বড় সমাদরে হাত বুলাইতেছিল।

সহসা রোগিণীর গলার ডাকটা অন্তরূপ ধারণ করিল। নাভির প্রান্ত হইতে গোটা বুকটা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হইল। বেনেদের গিন্নী এক কোণে বসিয়াছিল—সে পার্শ্ববর্ত্তিনীর গা টিপিয়া কহিল—মহাশ্বাস আরম্ভ হ'ল।

পার্শ্ববর্ত্তিনী মনোযোগসহকারে দেখিতেছিল, সে কহিল—না।

—না কি ? দেখ ভাল ক'রে তুমি।

সরকার-গিন্নী মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন—দাও মা বিভা, মায়ের মুখে দুধ গঙ্গাজল দাও। কেঁদ না মা, কেঁদ না। এ সময়ে সন্তানের যা কাজ তাই কর। তারপর কাঁদবে বৈকি—গোটা জীবনই যে তোমার কাঁদবার জন্য রইল।

টপ্‌টপ্ করিয়া কয় ফোঁটা জল সরকার-গিন্নীর গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে বাঁড়ুজ্জে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। উপস্থিত ভদ্রলোকের একজন বলিলেন—একবার দেখে এলে না কেন মহিম ?

বাঁড়ুজ্জে চমকিয়া উঠিল—এরূপ আদেশ সে প্রত্যাশা করে নাই। কহিল—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ। তুমি বই আর কে আছে বল ?

সকাতর ব্যগ্রতায় বাঁড়ুজ্জে বলিয়া উঠিল—আপনারা আছেন। কে আছেন বলছেন কেন ?

—তা বটে—সে একশো বার। মানুষ ছাড়া মানুষের কে আছে বল। তবে তোমার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ।

বাঁড়ুজ্জেকে আর দেখিতে হইল না। বিভার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল—মা—কোথায় গেলে গো মা !

বাঁড়ুজ্জে ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল—মাঃ হয়ে গেল !

নিমেষে মৃত্যুর অনিবার্য্যতা সকলের কাছেই সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। একজন গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একান্ত আন্তরিকতার সহিত বলিয়া উঠিল—এই মানুষের জীবন !

একজন বলিল—পদ্মপত্রে জল রে ভাই। এই আছে এই নাই।

মনের চিন্তা এমন ক্ষেত্রে গোপন থাকে না—একজন বলিয়া ফেলিল—কোথায় যে যায় মানুষ !

ওই চিন্তাটাই বোধ হয় সকলকে পাইয়া বসিল, সকলেই নীরব হইয়া গেল।

অকস্মাৎ একজন কহিল—এই ক' দিনের জন্য মানুষ—মারামারি, কাটাকাটি-ঝগড়া-ঝাঁটি, আমার ঘর, আমার দোর, আমার ছেলে—কতই না করে !

সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একজন বলিয়া উঠিল—হরিবোল—হরিবোল !

বৃদ্ধ একজন বলিলেন—ওই সত্যিরে ভাই—হরিনামই সত্য। হরিবোল ! হরিবোল !

আবার কিছুক্ষণ সব নীরব। বোধহয় ওই নামকেই জড়াইয়া ধরিতে সকলে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ধরা যায় না।

একজন বলিয়া উঠিল—এদিকের যোগাড় করুন সব। বেলাও আর বেশী নাই।

বাঁড়ুজ্জে যোড় হাত করিয়া বলিল—যা করতে হয় করুন আপনারা। আমি ত বিদেশী—আর ওরা ত আপনাদের চিরকালের আশ্রিত।

—যা-যা কিনতে কাটতে হবে—সেগুলো সব—। তার পর বাঁশ—কাঠ।

বাঁড়ুজ্জে বলিয়া উঠিল—যা লাগবে বলুন। আমি টাকা দিচ্ছি। আমি ত রয়েছি—আমার দিদি !

—একশো বার। লোকে আত্মীয়-বন্ধু কামনা করে কেন তবে ? টাকাপয়সার প্রয়োজন কি ? সে কি সঙ্গে যায় ?

বাঁড়ুজ্জে আপনার মনে কত চিন্তাই করিতেছিল—অভিভূতের মত সে বলিয়া উঠিল—এই ত মানুষের জীবন। এঁ্যা ? এর জন্যে এত ? টাকা বিষয়—ধন দৌলত—আত্মীয় স্বজন—কিছুই না—কিছুই সঙ্গে যায় না ! হায় ! হায় ! হায় !

*

ওদিকে বিভা বুক ফাটাইয়া কাঁদিতেছিল—মা—মা কোথায় গেলে মা গো ! স্থিরচক্ষু, বিবর্ণ, নিস্পন্দ শবের বুকে সে বার বার আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। উপস্থিত সকলের মুখ ম্লান—চোখ জলে ছল ছল করিতেছে। এইটুকু মিথ্যা নয়—ক্ষণিকের জন্যও এ সত্য।

সরকার-গিন্নী সুগভীর আক্ষেপের স্বরে কহিলেন—মা আর উত্তর দেবে না, মা। এ জীবনে মা বলা তোর হয়ে গেল।

শ্যামাপিসী বলিলেন—নাই বল্লে আর নাই মা। বিশ্ব বেহ্মাণ্ড খুঁজে আর মিলবে না। আর মানুষ কেমন পাষাণ, দেখ—দুদিন পরে আবার খাবে, মাখবে, হাসবে—যেকে সেই।

কুসুম ঠাক্‌রুণ কহিলেন—মায়া—মায়া—মহামায়ার মায়া !

নীচে দাওয়ার উপর বসিয়া মেয়েগুলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। অনেকের চক্ষে জলও দেখা দিয়াছে। ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ায় যাহারা ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া বসিয়া-ছিল—তাহাদের মুখেও ম্লান ছায়া।

দূরের কোলাহল যেমন ভাসিয়া আসিতেছিল—তেমনি আসিতেছে। এ ঠিক যেন একখানি ভাসা মেঘের ছায়া। মেঘখানির প্রান্তসীমা বহিয়া সূর্য্যালোক চারিপাশে ঝক্‌মক্ করিতেছে।

জনকয়েক পুরুষ আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। ইহারা শব-বাহক। অপরাধীর মত তাহারা চলিয়াছিল। এ উহাকে আগাইয়া দেয়,—সে পিছাইয়া আসিতে চেষ্টা করে—অপর একজনকে সম্মুখে ঠেলিয়া দেয়।

অল্পক্ষণ পরেই বিভার আর্ত্তনাদ মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল। উপরের মেয়েরা দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল। নীচের মেয়েরা পথ পরিসর করিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

উপরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—বল হরি—হরি বোল।

বিভা বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো—মাকে আমার নিয়ে যেয়ো না গো !—ওগো—মা—গো

কে কহিল—শেকল দিয়ে দাও। দরজায় শেকল দিয়ে দাও

শিকল দেওয়ার শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শব-বাহকেরা শব লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। ঘরের মধ্যে বিভা তখন আর্ত্তনাদ করিতেছিল—ওগো—আমাকে আর একবার দেখতে দাও গো ! আর ত' দেখতে পাব না আমি মাকে !

বাঁড়ুজ্জের বুকটা কেমন করিয়া উঠিল—সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। শিকল খুলিয়া বিভাকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল, কহিল—দেখ্—দেখে নে। কি করবি বল্ ? এত' তোর নূতন নয় মা !

বিভা কাঁদিয়া কহিল—মা—আমাকে কার কাছে রেখে গেলে মা গো !

নিবিড় স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল—ভয় কি মা বিভা! আমি রইলাম—আমি তোর ছেলে—আমি তোর মা হব।

তাহারও চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতেছিল।

শব কাঁধে নিয়া বাহকেরা হরিবোল দিয়া উঠিল। সমবেত সকলেই বলিয়া উঠিল—হরিবোল—বল হরি।

একজন বাহক কহিল—বাঁড়ুজ্জে জিনিষপত্র সব নিয়ে এস।

অপর একজন মনে পড়াইয়া দিল—পাঁজির পাতা এনো—মন্তর আছে যে পাতায়।

—কাঠ নিয়েছ? খড়?

—আমাদের কাপড় আর জলখাবার।

আর একজন কহিল—শোন হে, আর একটা কথা ব'লে দি।

বাড়ুজ্জে অগ্রসর হইয়া আসিল। বক্তা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া দিল—আধ ভরি গাঁজা আর একটা বোতল—বুঝেছ! শ্মশানে না হ'লে চলে না। কথাটা শেষ করিয়াই হাঁকিয়া উঠিল—বল—হ—রি—

অপর সকলে সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল—হ—রি বোল।

শব চলিয়া গেল।

মেয়ের দল সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেলেন। শ্যামাপিসী অকস্মাৎ সরকার-গিন্নীকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—মড়ার খড় প'ড়ে রয়েছে যে!

সরকার গিন্নী কহিলেন—ছোঁয়াত পড়েছেই—

শ্যামাপিসী চমকিয়া উঠিল—বলিল—তুমি ছুঁয়েছ নাকি? তোমার বাপু সবই বাড়াবাড়ি। আমি ছুঁই নাই। এই অবেলায় চান ক'রে অসুখবিসুখ হলে কে দেখবে মা আমাকে! দেখ দেখি হাঙ্গামা!

বেনে-গিন্নী বলিল—মরণের পেহার দেখলে?

শ্যামাপিসী শিহরিয়া উঠিল—আমরা যে কি করে যাব মা তাই ভাবি!

বিভার আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছিল। কুসুম ঠাকরুণ মুখ বাকাইয়া কহিল—আবার কেন? ঢের কেঁদেছিস বাপু! আর কাঁদা আদিখ্যেতা!

অল্প বয়সী একজন অকস্মাৎ বলিল—এক কুঁড়ুলী গেল কিন্তু!

জনকতকের মুখে অল্প মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

* * *

পরদিন সকালে উঠিয়া বাঁড়ুজ্জে ভট্টাচার্য্যকে লইয়া শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করিতেছিল। ত্রিরাত্রির শ্রাদ্ধ—সময় আর মাত্র দুইটি দিন। অবসন্ন শরীরে বাঁড়ুজ্জে শুইয়া ছিল। ওদিকে বিভার মৃদু ক্রন্দনধ্বনি শোনা যাইতেছিল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—যেমন করবেন—তিলকাঞ্চনে শ্রাদ্ধ করলে অল্পেই হবে।

বাঁড়ুজ্জে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নাঃ—খরচ কমবেশীতে কি যায় আসে! বৃষোৎসর্গই হবে। একটা মানুষই গেল জন্মের মত আর ক'টা টাকা!

ভট্টাচার্য্য বাঁড়ুজ্জেকে জানিত, সে তাহার মুখের দিকে চাহিল, অবশেষে কহিল—দেখুন মেয়ে মানুষ—তার মতটা একবার—। আর সে পাবেই বা কোথায়?

মহিম চটিয়া উঠিল, সে কহিল সে খবরে আপনার দরকার কি মশাই? টাকা? টাকার ভাবনা তাকে ভাবতে হবে কেন শুনি? যে মরেছে সে ত' শুধু মেয়েটিকে রেখে মরে নাই। আমি তার ভাই, আমি দেব, আমি করব সব!

ভট্টাচার্য্য অবাক হইয়া গেল।

বাঁড়ুজ্জে কহিল—সে কি একটা বালিকা মরেছে যে তিল-পাত্র কাজ হবে? টাকা, কত টাকা লাগবে শুনি? টাকা নিয়ে করব কি? এ সময়ে যদি কাজে না লাগে সে টাকার দাম কি?

ভট্টাচার্য্য বলিল—তা ত' বটেই—।

বাঁড়ুজ্জের মনের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই—ভট্টাচার্য্যের কথায় বাধা দিয়া সে বলিয়া গেল—এইত মানুষের জীবন! এর মধ্যেও যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম—বাহির হইতে কে ডাকিল, বাঁড়ুজ্জে মশায়!

বিরক্তিভরে বাঁড়ুজ্জে কহিল—কে?

যোগী বলিল—রাধানগরের মুকুন্দ পাল।

বাঁড়ুজ্জে বলিয়া দিল—ব'লে দে আমার শরীর ভাল নাই আজ! আঃ লোকেও যে দুদিন অবসর দেবে না। সেই পঙ্কে টেনে ফেলবেই।

তবুও মুকুন্দ ঘরে আসিয়া বসিল—কহিল—আমার কাজটা—একরকম বাধা দিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল—গতকাল আমার দিদি মারা গেলেন বাপু, কথাবার্ত্তা কইবার মত মনের অবস্থা নয় আমার আজ। আজ এস তুমি। সবিনয়ে মুকুন্দ কহিল, আজ্ঞে টাকাটা আমি যোগাড় করে এনেছি—বাড়ীতে রাখলে ভেঙে যায়—কিছু হয়—।

অগত্যা বাঁড়ুজ্জে উঠিয়া কহিল—টাকা এনেছ! তা হ'লে দিয়ে যাও! মুকুন্দ কতকগুলি টাকা সতরঞ্চির উপর নামাইয়া দিল। টাকাগুলি গুণিয়া বাঁড়ুজ্জে মুকুন্দের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিল—আর?

বাড়ুজ্জের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া মুকুন্দ কহিল—পঞ্চাশটাকা আর আমি দিতে পারব না এই নিয়ে আমাকে রেহাই দিতে হবে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল—পা ছাড় মুকুন্দ, তাই হ'ল। তোমাকে দলিলখানা ফেরৎ দিই, নিয়ে যাও।

যোগী ভট্টাচার্য্যকে একান্তে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা ভট্চাজ মশাই—মরবার আগে শুনেছি নাকি মানুষের মতি গতি সব পালটিয়ে যায়—একি সত্যি?

ভট্টাচার্য্য কহিল—কত রকম হয়। কারু নাক বেঁকে যায়, কেউ অরুন্ধতী দেখতে পায় না। কেউ চোখের নীলতারা দেখতে পায় না—আরও কত লক্ষণ আছে।

*

শ্রাদ্ধশান্তি সমারোহের সহিতই হইয়া গেল। বাঁড়ুজ্জের সুযশে গ্রামখানা ভরিয়া গেল, শত্রুতেও সবিস্ময়ে কহিল—ব্যবহার না করলে মানুষ চেনা যায় না। এই ত মহিম বাঁড়ুজ্জের নাম সকালে কেউ করত না—তার কাজ দেথ।

দিন যায়।

ক্রমশ আবার বাঁড়ুজ্জের মজলিস জমিয়া উঠে।

কিন্তু কে জানে কেন অতি মাত্রায় সে রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন জগাই মজুমদার দশটি টাকা কম দিয়া কহিল—আর আমি পারব না ভাই, এতেই আমাকে মাপ দিতে হবে। ভিক্ষে চাইছি আমি···

সকাতরে সে বাঁড়ুজ্জের হাতটা জড়াইয়া ধরিল।

অতি রূঢ় ভাবে বাঁড়ুজ্জে হাতখানা টানিয়া লইল। টাকাগুলা ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। বিকৃত ভঙ্গীতে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—এতেই আমাকে মাপ দিতে হবে! মাইরী আর কি? কেন-কেন—দশ টাকা কম কেন নোব আমি শুনি? আমি কি মাগনা চাইছি, না ভিক্ষে চাইছি হে বাপু! ও সব হবে না—এক কপর্দ্দক আমি ছাড়ব না।

বলিয়া সে নিজেই আবার টাকাগুলি কুড়াইয়া লইল। অপমানে ক্ষোভে মজুমদারের চোখ ফাটিয়া মুহুর্মুহু জল আসিতেছিল - সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর বুকের দিকে চাহিয়া সে আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে খতখানা বাহির করিয়া দিয়া কহিল—উশুল দিয়ে দিন পিঠে। দশ টাকা বাকী থাকছে—টাকা দিয়ে খত নিয়ে যাবেন।

মজলিস ক্রমে ক্রমে চুকিয়া গেল। কাগজপত্র গুটাইয়া রাখিয়া বাঁড়ুজ্জে সতরঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল। অকস্মাৎ আবার উঠিল, একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া আবার দেখিতে বসিল। যোগীকে ডাকিয়া বলিল—তামাক দে ত' যোগে।

ফর্দ্দখানা বিভার মায়ের শ্রাদ্ধের।

সমস্ত অঙ্ক যোগ করিয়া পরিশেষে সর্ব্ব মোট খরচের দিকে সে চাহিয়া ছিল। সে অঙ্কটার পরিমাণ হইতেছে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা কয়েক আনা।

যোগী হুঁকা-কলিকা আগাইয়া দিল। হুঁকাটা লইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁড়ুজ্জে কহিল—ঘাড়ে ভূত চেপেছিল আমার। অনর্থক এই পাঁচ পাঁচশো টাকা! যোগী চুপ করিয়া রহিল।

বাঁড়ুজ্জে আবার কহিল—এদের খেয়েছি আর কত? জোর না হয় দশ পনের টাকা! তুই ত' আমাকে কিছু বল্লি না যোগী! কি যে তখন হ'ল আমার!

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া আবার কহিল—তুই একবার বলিস্ কেন যোগী, বিভাকে। ওদের গয়না টয়নাও ত আছে। সব আমাকে লাগানো কি···। হাঁ একবার রাধানগরের মুকুন্দকে ডাকবি ত। বেটার কাছে পঞ্চাশ টাকা পেতে হবে এখনও।

ভিতরের পাশের দরজার কাছে কিসের শব্দ শুনিয়া বাঁড়ুজ্জে চুপ করিয়া গেল।

বিভা ডাকিল—মামা, খাবে এস।

* * *

রাত্রে বাঁড়ুজ্জের আসনের সম্মুখে ভাতের থালা নামাইয়া দিয়া বিভা কহিল—মামা!

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বাঁড়ুজ্জে কহিল—কি?

কোন মতেই সে এই হতভাগা মেয়েটাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

বিভা কহিল—মা তাঁর শ্রাদ্ধের জন্যে ক'খানা গয়না রেখেছিলেন। সে ক'খানা ত' তাঁরই শ্রাদ্ধেই দিতে হয়। এ ক'খানা বেচে যা হয়…।

ছোট একটি পুঁটুলী কাপড়ের আঁচল হইতে বাহির করিয়া সে সম্মুখে নামাইয়া দিল। বাঁড়ুজ্জে তাড়াতাড়ি হাতে তুলিয়া সেটার ওজন অনুমান করিয়া খুসী না হইয়া পারিল না।

* * *

ও বারান্দায় বিভা যোগীকে ভাত দিতেছিল।

যোগী মৃদুস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—কি ছেলেমানুষী করলে দিদিমণি।

বিভা কোন উত্তর দিল না—শুধু একটা সকরুণ হাসি তাহার অধরে ফুটিয়া উঠিল।

যোগী কহিল—শোক চিরদিন থাকে না দিদিমণি!

নভোবিলাস

—শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

অলস বায়ু বহিয়া যায়, কলস ভরি জলে,
সিক্ত বাটে চরণ-রেখা রাখিয়া বধূ চলে—
দিনের আলো নিভিয়া আসে, ভিজা আঁধার নামিল ঘাসে,
মর্ম্মরিত বুকের শ্বাস থামিল নদীজলে।
একটি তারা কাঁপিয়া মরে তরুবীথির শিরে,
একটি কথা ভাবিয়া আঁখি ভরিল আঁখিনীরে।

সন্ধ্যামেঘে আমারো দিন মুদিল ক্ষীণ আঁখি,
যেথানে যত প্রদীপ ছিল তিমিরে গেল ঢাকি।
দিক্-ভোলানো আলেয়া পিছে পাগল হয়ে ঘুরিনু মিছে,
সারাটা পথ চলিয়া এনু, সারাটা পথ বাকী।
শ্রান্ত দেহ ক্লান্ত মন বসিনু দিশাহারা,
সহসা দেখি ধূসর নভে একটি তুমি তারা।

জাগিয়া বসি' তোমার লাগি সে কবে নাহি মনে,
হাওয়ার মত দীর্ঘশ্বাসে ছুটিনু বনে বনে।
দুলায়ে শাখা ছড়ায়ে ফুল, ভুলের পরে গাঁথিয়া ভুল,
নিমেষ পরে নিমেষ বাহি চাহিয়া শুভখণে—
তুমি আমার মনেই ছিলে সকল খণ জাগি,
এখানে খুঁজি ওখানে খুঁজি বিরহ-অনুরাগী।

আপন মনে চলিয়াছিনু শুধু চলাব মোহে,
ছায়ার মায়া বুঝিনি কিছু পাওয়ার আগ্রহে।
কাচেরে করি মাথার মণি কলসুখ-প্রহর গণি,
জীবন-গতি সহজ অতি ভুলের সমারোহে।

গহন বনে আলো-আঁধারে বহুর সনে দেখা,
তবুও সখি দীর্ঘ পথ চলিতে হ'ল একা।

তোমারে আজ পড়িল মনে তপ্ত দিনশেষে,
মুদিত-আলো ক্ষুধিত যত ভাঙ্গা মনের দেশে।
আকাশে তুমি জাগিয়া রহ, তিমির হ'ল বার্ত্তাবহ,
গোপন কথা কহিতে তব নামিল এলোকেশে।
তোমার আমার মাঝখানে সে রচিল ব্যবধান,
থেমেছে গতি ভেঙেছে মন গানের অবসান।

তোমারে সখি, ডাকিয়া আনি ধূলির ধরণীতে,
বরণ করি' ফুলের মালা গলায় তব দিতে—
সাধ্য নাহি নাহিক সাধ, জীবনে এল যে-অবসাদ—
দেওয়ার দাবী নাহিক তাই পারি না কিছু নিতে।
আকাশে তুমি রহিবে জাগি অ-ধরা শুকতারা,
তাদেরই সাথে ভাসিব যারা করেছে পথহারা।

ভাসিয়া চলি তবুও বুকে বহিব এই আশা,
চলাই নহে চলার শেষ, পাওয়াই ভালবাসা।
জানি আবার প্রভাত হবে, অরুণ রবি জাগিবে নভে—
যে ভাষা মূক তোমারই তরে ফুটিবে সেই ভাষা।
বুকে আমার ধ্বনিছে আজ না-বলা সেই বাণী,
ধরার ধূলি নভের তারা করিছে কানাকানি।

কামার্গের পথে

—আলফোঁস দোদে

[আলফোঁস দোদে (Alphonse Daudet) ফরাসী সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছেন। দক্ষিণ ফ্রান্সে নিমে (Nimes) ১৮৪০ সালে তাঁর জন্ম হয়। আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সুরু। দক্ষিণ ফ্রান্স বা Provence-এর ওপর তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল, তাই সেই দেশের ছবিই তিনি তাঁর বেশীর ভাগ বইয়ে এঁকেছেন। সে ছবি নিখুঁত। প্রকৃতি তাঁকে সব চেয়ে আকৃষ্ট করেছিল, তাই তাঁর লেখায় প্রভাঁসের গাছপালা, ফুলফল, মাটী ও পাথর, উত্তরে হাওয়া (mistral) ও পালিত পশুরা তাদের ছাপ রেখেছে। সে দেশের মানুষের চরিত্র অঙ্কনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তা'দের দোষগুণ, চরিত্রের সরলতা, বাইরের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা সমস্তই তিনি পাঠকের সামনে ধরে দিয়েছেন। এই প্রভাঁস যাঁরা চোখে দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পারেন সে দেশ ও তার প্রকৃতি দোদের লেখায় কি ভাবে ফুটে উঠেছে। ২৯ বৎসর বয়সে দোদে তাঁর Lettres de Mon Moulin (আমার হাওয়া-কলের চিঠি) প্রকাশ করেন, সেই বইয়ের En Camargue লেখাটির এখানে অনুবাদ দিচ্ছি। দোদের লেখার বৈশিষ্ট্য অনুবাদের ভেতর দিয়ে যতটা সম্ভব, তা' রাখবার চেষ্টা করেছি। দোদে যে সাহিত্যিক কোঠায় পড়েন তা'কে বলা হয় Naturalism; Romanticism-এর প্রতিবাদেই সাহিত্যে এই নূতন ধারার পত্তন হয়। আমার মনে হয় দোদের এই লেখায় তাঁর Naturalism এর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।—অনুবাদক]

দুর্গে বড় সোরগোল চল্‌ছে। বেয়ারা এসে এই মাত্র একখানি চিঠি দিয়ে গেল—খানিকটা ফরাসী ও খানিকটা প্রভাঁসালে লেখা—যে, এর মধ্যেই দুতিনটি গালেজেঁা ও শার্লোতিন পাখীর ঝাঁক চলে গেছে, আর তার ভেতর বাছা বাছা পাখারও অভাব নেই।

আমার সহৃদয় প্রতিবেশিরা লিখেছে, "তুমি আজ আমাদের দলে।" তাই আজ সকালে, ভোর পাঁচটায়, তাদের বড় গাড়ীখানি, বন্দুক, শিকারী কুকুর ও খাবার ভর্ত্তি হয়ে আমাকে তুলে নেবার জন্য পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়াল। আমরা আর্লের পথ বেয়ে রওনা দিলাম—পথটা ডিসেম্বর মাসের এই প্রভাতেও বেশ পোড়া ও হতশ্রী ঠেকছিল কারণ অলিভ গাছের ফিকে সবুজ রং চোখে পড়ছিল না বল্‌লেই হয়, আর শীতের হাওয়ায় দেবদারুর সবুজ রং তখনও জমাট বাঁধে নি বলে অস্বাভাবিক লাগছিল। আস্তাবলে নড়াচড়া সুরু হয়েছে। দিনের আলো দেখা দেবার আগেই অনেক ফার্মে লোক জেগেছে, শার্সির ভেতর দিয়ে তা'দের ঘরের আলো চোখে পড়ছে। মোঁমাজুর-গীর্জ্জার সংলগ্ন আশ্রমে ভাঙ্গা দেয়ালের পাথরের ফাঁকে ফাঁকে মাছরাঙা পাখীরা এখনও আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ডানার ঝাপ্টা মারছে। কিন্তু এত ভোরেও খাতের পাশে গ্রামের বুড়ীদের সঙ্গে দেখা, ছোট ছোট গাধার পিঠে চড়ে দুলকি-চালে হাটে চলেছে। তা'রা সুদূর ভিল-দো-বো' থেকে আসছে—ছ'লিগ দূরে স্যাঁ-ত্রোফিমের হাটে এক ঘণ্টার জন্য বসে পাহাড়ী গাছগাছড়ার ছোট্ট পুলিন্দাগুলি বিক্রী করবে বলে।

সামনে আর্লের প্রাচীর—আল্‌সে-তোলা দেয়াল, যেমন পুরাণো খোদাই-চিত্রে দেখা যায়। এই সুন্দর ছোট্ট শহরটি অতিক্রম করছি। ফ্রান্সের সব চেয়ে সুন্দর শহরের মধ্যেই এটি গণ্য হয়। পাথর কেটে তৈরী করা ব্যালকনিগুলি 'মুশারাবি'র মত সরু রাস্তার মাঝখান পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে। বাড়ীগুলি কালো রঙের—দরজাগুলি নীচু, হয় মুসলমানী, না হয় গথিক ঢঙ্গের—উইলিয়ম বা সারাসানদের সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে এই ভোরের বেলা এখনো কেউ বাইরে আসে নি। শুধু রোণ নদীর তীরটায় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কামার্গ পর্য্যন্ত যে ষ্টীমার যাতায়াত করে সেখানি জলার কিনারায় ধোঁয়া ছাড়ছে, রওনা দেবে বলে। বাড়ীর কর্ত্তারা লালচে রঙের সার্জ্জের ওয়েষ্টকোট পরে, ও, ফার্মে কাজ করবার জন্য লারোকেতের মেয়েরা নিজেদের ভেতর হাসিখুসীর গল্প করতে করতে আমাদের সঙ্গে ষ্টীমারের সিঁড়িতে উঠল। ভোরের জোরালো হাওয়ায় তা'দের লম্বা পোষাক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর্লেসিয়ান ঢঙের উঁচু খোঁপায় তাদের মাথাটা বেশ ছোট ও মানান-সই হয়েছে বলে তাদের লজ্জাহীনতা আর চোখে পড়ছে না। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল। আমরা চললাম।

রোণ নদী ও উত্তরে হাওয়ার দ্রুত গতি একত্র হওয়ায় মনে হ'ল যে নদীর তীর দুটি যেন ছুটে চলেছে। এক ধারে ক্রাউ, কাঁকরে ভর্ত্তি শুকনো সমতল ভূমি। অন্য ধারে কামার্গের সবুজ দৃশ্য। তার ছোট বনানী ও নলখাগড়ায় ভর্ত্তি জলাজমি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কখনো কখনো ষ্টীমার বাঁয়ে ডাইনে বাঁধানো ঘাটের কাছে থাম্‌ছে, মধ্য যুগে যখন আর্ল ছিল একটা রাজ্য তখন নদীর দুধারকে লোকে 'রাজ্য' ও 'সাম্রাজ্য' আখ্যা দিয়েছিল, রোণের পুরানো নাবিকেরা আজও নদীর দু'ধারকে সেই নামেই অভিহিত করে। প্রতি বাঁধানো ঘাটের ওপরে সাদাটে রঙের একটা ফার্‌ম আর এক গোছা গাছ। কৃষকেরা তা'দের যন্ত্রপাতি আর মেয়েরা হাতে ঝুড়ি নিয়ে সীঁড়ির ডান ধার বেয়ে নাম্‌ছে। 'সাম্রাজ্য' ও 'রাজ্য', দুধারে থাম্‌তে থাম্‌তে ষ্টীমার প্রায় খালি হয়ে গেল, তাই আমাদের নামবার স্থানে মা-দো-জিরোতে যখন পৌছনো গেল তখন ষ্টীমারে লোক ছিল না বললেই হয়।

মা'-দো-জিরো হচ্ছে বার্বেন্তানের জমিদারদের একটা পুরানো ফার্‌ম। এই ফার্‌মে আমরা ঢুকলাম, কথা ছিল গার্ড এসে এখান থেকে আমাদের খুঁজে নিয়ে যাবে। উঁচু রান্নাঘরের মাঝে ফার্‌মের সমস্ত লোক, মজুর, দ্রাক্ষার চাষী ও পশুপালকেরা শান্ত ও গম্ভীরভাবে টেবিলে বসেছে ও ধীরে ধীরে খাচ্ছে আর তাদের পরিবেশন করছে মেয়েরা, কারণ মেয়েদের খাওয়া হবে পরে। গার্ড শীঘ্রই তার হাল্‌কা গাড়ীতে এসে হাজির হ'ল। তার চেহারা খাটি ফেনিমোর (Fenimore) ধরণের, ডাঙ্গায়ও জলে ফাদ পাততেও ওস্তাদ। মাছ ও শীকারের পশুর রক্ষক। দেশের লোকেরা তাকে বলে Lou Roudeirou অর্থাৎ ভবঘুরে, কারণ সব সময়েই, ভোরের কুয়াসায় বা সন্ধ্যার আঁধারে লোকেরা তা'কে লুকিয়ে বসে থাকৃতে দেখে, হয় নল-খাগড়ার ভেতর শীকার ধরবার জন্য না হয় তার ছোট নৌকায় নিস্তব্ধভাবে জলা বা খালের ভেতর তা'র পাতা জালের দিকে তাকিয়ে থাকৃতে। বোধ হয় চিরকালের জন্য শীকারীর ব্যবসা অবলম্বন করেছে বলে তার চরিত্রে নীরবতা ও একনিষ্ঠার ছাপ পড়েছে। সে যা'হোক তা'র ছোট্ট গাড়ীখানি বন্দুক ও চুবড়ীতে ভরতি হয়ে যখন আমাদের আগে আগে চল্‌ছিল তখন সে আমাদের শীকারের নানা খবর দিচ্ছিল। পাখীর কটা ঝাঁক উড়ে গেছে, কোন দিকে গেলে পাখীদের নাগাল পাওয়া যাবে এই সব সম্বন্ধে কথা কইতে কইতে আমরা মাঠের ভিতর ঢুকে পড়লাম।

চাষের ক্ষেত আমরা অনেকক্ষণ পেরিয়ে, এখন কামার্গের সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর দিকটায় এসে পড়েছি। যতদূর দৃষ্টি চলে, পশু চরাবার মাঠ ও সমুদ্রের গাছগাছড়ার মধ্যে জলাভূমি চক্‌চক্‌ করছে। নল-খাগড়ার গোছাগুলি শান্ত সমুদ্রের ওপর ছোট ছোট দ্বীপের মত ঠেক্‌ছে। বিরাট মাঠখানির চেহারায় কোথাও চঞ্চলতা নেই। দূরে দূরে পশুদের খোঁয়াড় গুলির নীচু চালা সমতল ভূমির সঙ্গে মিশে গেছে। পশুগুলি কোথাও ছত্রভঙ্গ, কোথায়ও নোনাগাছড়ার ভেতর শুয়ে রয়েছে, কোথায়ও বা তারা তাদের রক্ষকের লালচে রঙের টুপির চারিদিকে দল বেঁধে চলেছে; এই বিরাট মাঠের অসীম

আলফোঁস দোদে

নীল দিগন্তরালে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এত ছোট দেখা যাচ্ছে যে তাদের গমনাগমনে মাঠের টানা রেখার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। ঢেউ সত্ত্বেও একটানা বিরাট সমুদ্র মনে যে নিস্তব্ধ সীমাহীনতার ছাপ এনে দেয় এই প্রান্তরও সেই ভাবই জাগিয়ে দিচ্ছে। প্রান্তর ধূ ধূ করছে, এখনো উত্তুরে হাওয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে অবাধ গতিতে বইছে, আর তা'র প্রচণ্ড বেগই যেন গাছপালাকে নুইয়ে দিয়ে দিগন্তের রেখাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সে হাওয়ার বেগে সবই নুয়ে পড়ছে। এমন কি সব চেয়ে ছোট গাছগুলির ওপরও সে তার চিহ্ন রেখে, যাচ্ছে তারা দলিত হয়ে দক্ষিণ মুখো শুয়ে পড়ছে যেন চির-পরাজিতের মত······

ক্ষাবান বা মাঠের কুঁড়ে ঘরে······

নল-খাগড়ার চালা, শুকনো ও হল্‌দে রঙের বেড়া, এমনি কুঁড়ে ঘর হচ্ছে আমাদের শীকারের আড্ডা। কামার্গের অধিবাসীদের ঘর সাধারণতঃ এই ধরণের। এ কুঁড়েগুলি এক-খানি চালা দিয়ে তৈরী, উঁচু, প্রশস্ত, জানালাহীন, রোদ ঢোকে শুধু একটা শাসির দরজা দিয়ে, আর সে দরজা রাত্রে বন্ধ করা হয় সাধারণ ছিটকিনি দিয়ে। চুনকাম করা সাদা মোটা দেওয়ালের চারিদিকে শেল্‌ফ, আর তা'তে বন্দুক, শীকারীর থলে ও জলা জমিতে ব্যবহারের জন্য বুট সাজানো। মেজেতে পাঁচ ছ'টা খাট একটা বড় খুঁটির চারিদিকে সাজানো, খুঁটিটা মাটিতে শক্ত করে পোঁতা, চালার মটকা পর্য্যন্ত উঠেছে ভার রাখবার জন্য।• রাত্রে যখন জোর উত্তরে হাওয়ায় কুঁড়েটা মড়্ মড়্ শব্দ করতে থাকে, আর সে শব্দের সঙ্গে সুদূর সমুদ্রের হাওয়ায় টেনে আনা ঢেউয়ের শব্দ মিশে যায় তখন মনে হয় জাহাজের ক্যাবিনে শুয়ে আছি।

দোদের হাওয়া-কল।

কিন্তু শুধু বিকেলের দিকেই এই কুঁড়ে ঘড়ের শোভা সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক। আমাদের দক্ষিণে শীতের সুন্দর দিনে আমার সব চেয়ে ভাল লাগে উঁচু চিম্‌নির কাছে একা বসে থাকতে। উত্তরে হাওয়ার ঝাপ্টায় দরজা ছিট্‌কে ওঠে, নলখাগড়াগুলি শব্দ করতে থাকে আর এ সব আঘাতগুলি হচ্ছে আমার চারিদিকের প্রকৃতির বিপুল আলোড়নের অতি সামান্য প্রতিধ্বনি মাত্র।

শীতের সূর্য্য যেন কখনো কখনো উত্তরে হাওয়ার প্রচণ্ড আঘাতে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ছে, কখনো সূর্য্য তার টুক্‌রো কিরণগুলি এক সঙ্গে করবার চেষ্টা করছে কিন্তু পর মুহূর্ত্তে সেগুলি আবার ছড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় ছায়া সুন্দর নীলাকাশের নীচে ছুটে চলেছে। শব্দও থেকে থেকে কানে এসে পৌছায়। পালিত পশুর গলার ঘণ্টাধ্বনি কথনো কখনো শোনা যায় আর পর মুহূর্ত্তেই সে ঘণ্টাধ্বনি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সে ঘণ্টাধ্বনির কথা ভুলতে না ভুলতে দরজার কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে সে আবার তার সঙ্গীতে ঘর মুখর করে তোলে। শীকারী-দের পৌছুবার একটু আগে যখন সন্ধ্যার আবছায়া ঘনীভূত হয়ে আসে তখনই চিত্ত আনন্দে সবচেয়ে বেশী অভিভূত হয়ে পড়ে। হাওয়া তখন শান্ত হয়ে এসেছে, আমি ক্ষণেকের জন্য বাইরে গেলাম। প্রকাণ্ড লাল সূর্য্য ধীরে অস্তে যাচ্ছে, উত্তাপ নেই। অন্য দিকে রাত্রি তার কালো ও ভিজে ডানার স্পর্শ দিয়ে নেমে আসছে। চারিদিকে ব্যাপ্ত গাঢ় আঁধারের সংস্পর্শে জীবন্ত লাল তারার আলোর মত দূরে মাঠের ঘাসের ওপর আলো ঝিলিক দিয়ে চলে গেল। দিনের সেটুকু অবশিষ্ট তার ভেতর থেকে যেন জীবন ত্বরিত গতিতে বিলীন হল। পাতিহাঁসের একটা বড় ত্রিকোণ আকারের ঝাঁক খুব নীচুতে উড়ে এসেছে, মনে হ'ল মাটীতে এসে বসবে কিন্তু কুঁড়ে ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে

প্রভাসের পথে।

দেখে তারা দূরে সরে গেল। ঝাঁকের মুখে যে হাঁসটা উড়ে চল্‌ছিল এক ঝাঁকুনি দিয়ে গলাটা খাড়া করে ওপরে উড়ে

আর তার পেছনে অন্য হাঁসগুলি অসভ্য চীৎকার করতে করতে উড়ে চলে গেল।

সহসা এক সঙ্গে বহু পায়ের শব্দ কানে এসে পৌছুল, বৃষ্টি পড়ার শব্দের মত। হাজার হাজার মেষ, মেষপালকেরা

সেঁামাজুর গীর্জ্জার সংলগ্ন আশ্রমের ধ্বংসাবশেষ।

তাদের গুছিয়ে নিয়ে আসছে, চারিদিকে কুকুরগুলি তা'দের ঘিরে চলেছে। অসংবদ্ধভাবে তাদের ছুটবার ও হাঁপানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে, তা'রা ভীত ও অশান্ত ভাবে তা'দের খোঁয়াড়ের দিকে ছুটে চলেছে। হঠাৎ তাদের দলের ভেতর পড়লাম, চারদিকে মেষের পাল আমার গা' ছুঁয়ে চলেছে মনে হ'ল, আমি তা'দের খাড়া পশমের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়েছি, চারিদিকে তা'দের চীৎকার। আর মাঝে মাঝে মেষপালকদের ছায়া এই ঢেউয়ের টানে লাফাতে লাফাতে চলেছে ··এই মেষপালের পেছনে এখন পরিচিত কণ্ঠের স্বর শোনা যাচ্ছে, কণ্ঠে আনন্দের ধ্বনি। কুঁড়ে ঘর ভর্ত্তি, সজীব ও মুখর হ'য়ে উঠল। হাসির ফোয়ারা ছুটল, কারো হাসির বিশ্রাম নেই। হাসির শব্দে যেন দিনের ক্লান্তি চাপা পড়ে গেল। বন্দুকগুলি এক কোণে খাড়া করা, বড় বুটগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো, থলীগুলি শূন্য ও তার পাশে পাখীর গালচে রঙের ডানা, তাতে সোনালি রূপালি ও সবুজ চক্‌রা আর ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। টেবিল গোছানো হ'ল, কুঁচে মাছের গরম সুপের ধোঁয়ায় নিঃশব্দতা এলো, সে নিঃশব্দতা হচ্ছে সুস্থ ক্ষুধার। কুকুরগুলি দরজার সামনে বসে তাদের খাবারের প্লেট চাট্‌ছিল আর মাঝে মাঝে তাদের গোঙানিতে নিঃস্তব্ধতা ভাঙ্‌ছিল।

বেশীক্ষণ কেউ জেগে থাকতে পারল না। ঘুমে চোখ আড়ষ্ট, তাই আগুনের শেষ ফুল্‌কি থাকা পর্য্যন্ত আমি আর গার্ড ছাড়া কেউ থাকল না। আমরা গল্প করছি অর্থাৎ থেকে থেকে পাড়াগেঁয়ে লোকদের মত পরস্পর আধখানা কথার বিনিময় করছি। সেগুলি ইণ্ডিয়ানদের বিস্ময়সূচক ধ্বনির মত শোনাচ্ছে—ছোট্ট ধরণের শুকনো দ্রাক্ষা ডালের আগুনের শেষ ফুলকির মতই তা' মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষে গার্ড উঠে দাঁড়াল, তা'র বাতিটা জ্বাল্‌ল, তারপর আমি সেই রাতের আঁধারে তার ভারি পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুন্‌লাম···

আশায়······

ঝোপের ভেতর শীকারের আশায় লুকিয়ে থাকাকে এ দেশের লোক বলে L'espere বা আশা। যে সময়ে শীকারের জন্য সকলে এমনি করে অপেক্ষা করে সেটা হচ্ছে দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থল। সকালের শীকার হয় সূর্য্য উঠার কিছু পূর্ব্বে আর সন্ধ্যার শীকার হয় গোধূলির সময়। সন্ধ্যার শীকারটাই আমার পছন্দ কারণ এই জলাজমির দেশে বিল গুলিতে অনেকক্ষণ ধরে চাঁদের আলো থাকে।

প্রভাস: আর্লেসিয়ান ঢঙের উঁচু খোঁপা।

কখনো কখনো শীকারের জন্য একরকম ছোট্ট নৌকা নেওয়া হয়, তাকে এদেশের লোকেরা নেগোশাঁ বলে, নৌকা

গুলির গলুই নেই, অল্প ঠেলাতেই তা চলে। নলখাগড়ার আড়ালে নৌকার ওপর বসে শীকারীরা খুব কাছথেকেই হাঁস মারতে পারে। কুকুরগুলি মাথা উঁচু করে হাওয়ার গন্ধ শুঁক্‌তে থাকে, কখনো কখনো মাছি কামড়ে ধরে আর তা'দের মোটা থাবা বাড়িয়ে যখন একধারে ঝুঁকে পড়ে তখন নৌকায় জল ঢুকতে থাকে। আমার জানা নেই বলে এ রকম শীকার বড় গোলমেলে ঠেকে। সেই জন্য বেশীর ভাগ সময়ে আমি শীকারে যাই পায়ে হেঁটে, তাই লম্বা ভারি বুট পায়ে দিয়ে জলা জমির মধ্যে ধীরে ধীরে যাই অনেক হিসাব করে, পাছে কাদায় পা আট্‌কে যায়। নলখাগড়ার ঝোপগুলিকে এড়িয়ে চলি, কাদার পচা গন্ধের জন্য। তার পর আবার ঝোপের কাছে গেলে ব্যাঙ্‌গুলো গায়ে লাফিয়ে পড়ে সে ভয়টাও আছে।

আর্লের একটা পুরাণো দিক্‌, প্রাচীন রোমান সমাধি।

সাম্‌নে ছোট্ট একটা সামুদ্রিক গাছের দ্বীপ, তার একটা ধার শুকনো, সেখানে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালাম। গার্ড আমাকে সম্মান দেখাবার জন্য তার কুকুরটাকে আমার কাছে রেখে গেছে, প্রকাণ্ড পীরিনিজের কুকুর, লেজটা সাদা, শীকার ও মাছধরার প্রথম নম্বরের ওস্তাদ। তা'কে কাছে দেখে আমার বরং একটু ভয়ই লাগ্‌ছিল। যখন একটা জলা মুরগি বন্দুকের রেঞ্জের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, কুকুরটা যেন একটু ঠাট্টাচ্ছলে আমার দিকে তাকিয়ে পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো, ঠিক যেন আর্টিষ্টের মত ঘাড় কাৎ করে, লম্বা ও চওড়া কান দুটি তার চোখের ওপর এসে পড়েছে, থমকে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে, যেন অসহিষ্ণু ভাবে বল্‌ছে—"গুলি ছোঁড় না"! আমি গুলি ছুঁড়লাম, শীকার এড়িয়ে গেল। তখন সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, হতাশ হয়ে অলস ও তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে হাই তুল্‌তে লাগল...হাঁ বুঝেছি, স্বীকার করছি যে আমি খারাপ শীকারী।

আমার শীকার হচ্ছে যখন সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবে যায়, আলো কমে আসে, তখন জলা কিম্বা বিলের ধারে লুকিয়ে। জল তখন চক্‌চক্‌ করতে থাকে, তার পরিষ্কার রূপালি রং, তা'তে এমন কি আকাশের জমাট ধূসর রঙও প্রতিফলিত হয়। জলের তখনকার গন্ধটা আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে নলখাগড়ার ভেতর নানা কীটপতঙ্গের গোপনে ছুটাছুটি আর শিউরে ওঠা পাতার মর্ম্মরধ্বনি। কখনো কখনো জাহাজের শাঁখের ধ্বনির মত একটা বিষাদভরা সুর আকাশে প্রতিধ্বনিত হয়। সমুদ্রের মাছরাঙা তার প্রকাণ্ড ঠোট মাছ ধরবার জন্য ছপ্‌ করে জলের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়—এ তারই শব্দ। মাথার ওপর বক উড়ে যাচ্ছে, তাদের ডানার ঝাপ্টা ও চঞ্চল হাওয়ায় তাদের ছোট লোমের ফর্‌ফর্‌ শব্দ কানে এসে পৌছায়। তারপর, তারপর সব নীরব, কারণ রাতের গভীর আঁধার ঘনিয়ে এসেছে—শুধু জলের ওপর আলোর ছাপ এখনো একটু লেগে রয়েছে।

সহসা আমার গা'টা শিউরে উঠ্‌ল। স্নায়ুর একটা চঞ্চলতা অনুভব করলাম। মনে হ'ল পেছনে যেন কে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ফিরে দাঁড়ালাম, দেখলাম সুন্দর রাতের সহচর চাঁদ—প্রকাণ্ড গোলাকার নিখুঁত সম্পূর্ণ চাঁদ—দিগন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে উঠ্‌ছে, তার ওঠার গতি প্রথমে বেশ চোখে পড়ছিল, পরে দিগন্তের ওপরে উঠে ক্রমশঃ তার গতি মন্দীভূত হয়ে এল।

চাঁদের প্রথম কিরণ আমার সাম্‌নে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, পরে তা দূরে ছড়িয়ে পড়ল, এখন সমস্ত মাঠটা সে কিরণে আলোকিত হয়ে উঠেছে। এমন কি ছোট্ট গাছটাও তার ছায়াপাত ক'রেছে। শীকার শেষ হ'ল, কারণ পাখীরা এখন আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছে। সুতরাং ফিরতে হ'ল। নীল ও হাল্‌কা চাঁদিমায় প্লাবিত মাঠের ভেতর দিয়ে চল্‌ছি। জলা জমির ভেতর পাদক্ষেপে তারার প্রতি ছায়া ও চাঁদের প্রতি কিরণ চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে।

লাল ও সাদা......

আমাদের ঘরের খুব নিকটে বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে আমাদের ঘরের মতই দেখতে আর একখানি ঘর রয়েছে—

সেখানির চেহারা আর একটু বুনো ধরণের। সেখানেই আমাদের গার্ড তার স্ত্রী ও বড় দুটি সন্তান নিয়ে বাস করে। মেয়েটা বেটাছেলেদের আহারের ব্যবস্থা দেখে আর মাছ ধরবার জালের রিপু করে; ছেলেটা মাছের জাল তুলবার ও বিলগুলির লক্-গেটের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য তার পিতাকে সাহায্য করে। ছোট ছেলেপিলে দুটি আর্লে থাকে, তাদের ঠাকুরমার কাছে। লেখাপড়া না শেখা পর্য্যন্ত ও ধর্ম্মে তা'দের প্রথম দীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তা'রা সেখানেই থাকবে, কারণ কামার্গের এ স্থানটা থেকে স্কুল ও গির্জা বড় দূরে, তারপর এখানকার হাওয়াটাও ছোট ছেলেদের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। গ্রীষ্মকালে যখন জলাজমিগুলি শুকিয়ে যায় ও বিলের নীচেটা যখন ভীষণ গ্রীষ্মে ফেটে ওঠে তখন এই দ্বীপটা সত্যই বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে।

একবার আগষ্ট মাসে আমি তা' নিজেই দেখেছি। সেবার পাখী শীকার করতে এসেছিলাম, তখনকার ভীষণভাবে পোড়া এই দেশের বিষাদভরা চেহারা কখনো ভুলব না। মাঝে মাঝে পুকুরগুলি রোদের তাপে মদ ফুটোনোর বড় বড় কড়ার মত ধুঁয়ো ছাড়ছিল, তার তলে দু'একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, ঝিঁঝি পোকা, আরসোলা, জলের মাছিরা সেই শুক্‌নো পুকুরে একটা ভিজে কোণ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সেখানে যেন একটা মড়কের আবছায়া এসে পড়েছিল। যেন একটা মরীচিকার কুয়াসা অসংখ্য মাছির ঘূর্ণী তৈরী করে ঘনীভূত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গার্ডের বাড়ীতে সবাই জ্বরে কাঁপছিল। সকলের ফ্যাকাসে রঙের মুখ, ঝুলে পড়েছে, চোখের কোণে দাগ পড়েছে। তিন মাস ধরে এই বিশ্রী দেশে সূর্য্যের কঠোর তাপের সঙ্গে তাদের মানিয়ে থাক্‌তে দেখে কষ্ট হচ্ছিল···কামার্গের শীকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে সব গার্ডের ওপর পড়ে তা'দের জীবন বড়ই কষ্টকর। তা' ছাড়া তার স্ত্রী ও ছেলেপিলেদেরও কাছে রাখ্‌তে হয়। আরও দু'লিগ দূরে জলাজমির মাঝখানে একজন অশ্বপালক সারা বছর একা বাস করে, তা'র জীবন ঠিক রবিন্সনের মত। তার নল-খাগড়ার কুঁড়ে ঘর, সে নিজে হাতে তৈরী করেছে। সেখানে এমন একখানি আসবাব নেই যা সে নিজে হাতে তৈরী না করেছে···

লোকটার প্রকৃতিও তার এই ঘরের মতই অদ্ভুত, যে সব সন্ন্যাসী বিজনে বাস করে তা'দের মতই এ একজন নীরব ফিলজফার, দেশীয় লোকের ওপর অবিশ্বাস তার চোখের পুরু ভ্রুর মধ্যে চেপে রেখেছে। যখন সে মাঠে থাকে না তখন তা'কে তার ঘরের দরজায় বসে থাক্‌তে দেখা যায়—ধীরে ছেলেদের মত একনিষ্ঠভাবে একখানি গোলাপী রঙের বইয়ের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ··

আর্লে: রোণ নদীর সেতু ও দূরে দুধারে কামার্গের প্রান্তর।

এই হতভাগ্য ডেভিলটার পড়া ছাড়া আর কোন প্রমোদ নেই—পড়বার বইও ঐ একখানি ছাড়া দ্বিতীয় নেই। প্রতিবেশী হ'লেও আমাদের গার্ডের সঙ্গে তার মুখ দেখাদেখি নেই। দেখা যা'তে না হয় সে জন্য তারা পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। একদিন তা'দের এই মনোমালিন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—ব্যক্তিগত মতামতের জন্য – সে হচ্ছে rouge (লাল) আর আমি হচ্ছি blanc (সাদা)।

বাক্কারের হ্রদের ধারে······

কামার্গের ভেতর সবচেয়ে সুন্দর স্থান হচ্ছে Vaccares অনেক সময় শীকার ছেড়ে আমি এই নোনা হ্রদের ধারে এসে বসি, একটা ছোট্ট সমুদ্র, যে বিরাট সমুদ্র মাটীর ভেতর

আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তার একটা টুক্‌রো। এই শুক্‌নো মরুর দেশে, জলার এই অনুর্ব্বর তটদেশে যেখানে মন বিষাদে অভিভূত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে এই বাক্কারের উঁচু পাড় সত্যই চিত্তাকর্ষক। পাড় নূতন ধরণের সুন্দর গাছগাছড়ায় সবুজ হয়ে উঠে ভেলভেটের মত দেখায়। হ্রদের পাড়ে এই নানা জাতীয় গাছ মাঝে মাঝে তা'দের রঙ বদলে ঋতুর পরিবর্ত্তন সূচনা করে।

সন্ধ্যা ৫টায় যখন সূর্য্য ডুবতে সুরু করে তখন তিন লিগ ব্যাপী এই জলরাশির দৃশ্য অভিনব ঠেকে। জলে একখানি নৌকা নেই, এমন একটি পাল নেই যা' সেই জলরাশির বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। এর সৌন্দর্য্য ছোট ছোট বিলের ও খালের সৌন্দর্য্য নয়, যার জল গাছগাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে কুল কুল শব্দে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ছে—আর সামান্য নীচু মাটীতে এসেও দাঁড়াচ্ছে। এর সৌন্দর্য্য হচ্ছে একটা বিরাট বিস্তৃতির। দূরে দূরে স্রোতের রেখাগুলি নানা জাতীয় জলা পাখীকে আকৃষ্ট করছে। আমি যেখানে বসে এই হ্রদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করছি সেখান থেকে জলের কুলু কুলু শব্দ আর অশ্বপালকের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘোড়াগুলিকে যে সুরে ডাক্‌ছে সে ডাক ছাড়া আর কিছু শ্রুতিগোচর হয় না। ঘোড়াগুলির নাম সবই শ্রুতিকঠোর—Cifer, L'Estello, L'Estournello. প্রত্যেক পশুটা তার নাম শুনেই হাওয়ায় ঘাড়ের চুল উড়িয়ে ছুটে আস্‌ছে রক্ষকের হাত থেকে দানা খাবে বলে…

দূরে হ্রদের একই পাড়ে এক পাল জোরালো ষাঁড় দেখা যাচ্ছে, ঘোড়াগুলির মতই স্বাধীনভাবে তারা চরছে। থেকে থেকে ঝোপের ওপর দিয়ে তা'দের ঘাড়ের বাঁক দেখা যাচ্ছে, ছোট শিঙ উঁচু হয়ে রয়েছে। এই ষাঁড়গুলি গ্রামের উৎসবের সময় খেলা দেখাবার জন্য পালিত হয়। এর ভেতর কয়েকটি এর মধ্যেই প্রভাঁস ও লাঙ্গুয়েদকের সমস্ত খেলবার জায়গায় নাম করে ফেলেছে। অল্প দূরেই আর এক পাল ষাঁড়। তার ভেতর Le Romain নামীয় একটি ষাঁড় নীম, আর্ল ও তারাস্কনের খেলার মাঠে না জানি কত মানুষ ও ঘোড়াকেই কাবু করেছে। সেই জন্য পালের অন্য গুলি তা'কে নায়ক হিসাবে গ্রহণ করেছে। কারণ এই অদ্ভুত পশুগুলি নিজেরাই একটা পালের প্রধান নায়ক নির্ব্বাচিত করে নিয়ে নিজেদের চালিত করে। যখন কামার্গে ঘূর্ণিবায়ু বয়, আর সে এমন ঘূর্ণি যার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না, তখন এই ষাঁড়গুলি গা ঘেসাঘেঁসি করে তা'দের নায়কের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায়, তখন তারা মাথা নীচু করে ও তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে, তাদের কপালটা, ঘূর্ণির দিকে ফিরিয়ে দেয়। প্রভাঁসের পশুপালকেরা এই রোখাকে বলে—*vira la bano au giscle*, ঝড়ের দিকে শিঙ ফিরিয়ে দাঁড়ানো। আর পশুর যে পালগুলি এ নিয়ম পালনে অবহেলা করে তা'দের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। বৃষ্টিতে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে ঘূর্ণি বায়ুর ঠেলায় ষাঁড়গুলি পথ হারিয়ে ফেলে ও ছত্রভঙ্গ হয়, আর ঝড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছুট্‌তে ছুট্‌তে হয় রোণের জলে না হয় বাক্কারের হ্রদে বা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

আলফোঁস দোদের ছেলে লিঁয় দোদের লেখা দোদের জীবনী হইতে একটি সামান্য কাহিনী নীচে উদ্ধৃত করা হইল—

দুজনে আমরা প্রায়ই এক সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতাম। তাঁহার গাড়ীর দরকার হইলেই তিনি সকলের চাইতে ভাঙ্গা গাড়ীটি ভাড়া করিতেন—গাড়ীটির গাড়োয়ানও ছিল একেবারে অথর্ব্ব। দোদে বেশ জানিতেন যে এই বুড়া গাড়োয়ানের গাড়ী কেহ ভাড়া করিবে না। আমার আজও মনে পড়ে, গভীর রাত্রের অন্ধকারে এই বুড়া তাহার মৃতপ্রায় ঘোড়া জুতিয়া গাড়ীর ভাঙ্গা কোচ বাক্সে বসিয়া ষ্টেশনের বাহিরে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ট্রেণ যায়, ট্রেণ আসে- সকল গাড়ীর ভাড়া জোটে—ইহার জোটে না। বাবা কোথায় গিয়াছিলেন, ট্রেণ হইতে ষ্টেশনে নামিয়া আর কোন গাড়ীর দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বরাবর আসিয়া বুড়ার গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন। যতদিন লোকটা বাঁচিয়া ছিল, ততদিন বাবা ইহার গাড়ী ছাড়া আর কোন গাড়ী চাপেন নাই। শেষ অবধি লোকটা তাহার ভাঙ্গা গাড়ীর গায়ে লাল অক্ষরে বাবার মোনোগ্রাম এ. ডি. খুদিয়া রাখিয়াছিল।

সীতা

—শ্রীসুশীলকুমার দে

জানকী-বন্ধু, জানকী তোমার কাঁদে একাকিনী নির্ব্বাসনে,
কে আছে নিঃস্ব তোমার মতন, বসিয়া রাজার সিংহাসনে ?
শৈশব হ'তে যৌবন-শেষ, গৃহে ও বনে,
চির-বন্ধন যার সাথে তব দেহে ও মনে,
যা'র তরে তব জিগীষা জাগিল, সভয়ে সাগর ছাড়িল পথ,
ছুটিল স্বর্ণপুরীর তোরণ ভাঙি' ভিখারীর বিজয়-রথ।

দেবালয়ে আজ সে-দেবতা নাই, চ'লে গেছে দূর দূরান্তরে,
সুবর্ণময়ী ব্যথার প্রতিমা প'ড়ে আছে শুধু রাজার ঘরে।
রাজ্য ছিল না, পর্ণকুটিরে ভিখারী তুমি,
সে-কুটির ছিল অনাবিল সুখস্বর্গভূমি ;
সারাদিন পরে সন্ধ্যায় যবে ফিরিতে শ্রান্ত তনু ও মন,
ছিল না শয্যা আধেক শূন্য, গৃহে ছিল তব গৃহের ধন।

সার্থক হ'ল লঙ্কা-বিজয়, বধূ ল'য়ে তুমি ফিরিলে ঘরে,
ধরণীর ভার ঘুচিল, তোমার জয়-সঙ্গীতে বিশ্ব ভরে ;
অরণ্যবাস চিরদিন তরে হয়েছে গত,
জানকীর মুখ দোহদ-খিন্ন লজ্জানত ;
সুখের পাত্র পূর্ণ করিয়া ছোঁয়ালে যখন অধরে আনি',
দারুণ দৈব একটি আঘাতে করিল চূর্ণ পাত্রখানি।

গৃহে যে লক্ষ্মী, বনে সহচরী, কোথা আজ সেই রাজার রাণী,
দেহের মনের বিশ্রাম-ভূমি, সারা-জীবনের সে কল্যাণী।
কণ্ঠের সে যে বাহুবন্ধন তৃপ্তিলীন,
অন্তরে সে যে শীতচন্দন চিরনবীন ;
আজো চোখে চোখে রয়েছে সে-রূপ, অঙ্গে অঙ্গে পরশ-রস,
ভাবের শূন্য শিখরে বসিয়া কেমনে নিজেরে করেছ বশ ?

নয়নে তোমার কেহ কোনদিন দেখেনি অশ্রু, মমতাহীন !
জানকীর সাথে সুখ চ'লে গেছে,—চ'লে যায় তবু নিশীথ-দিন।
অন্তর-দাহ বহ্নির মত দুর্ব্বিষহ
তবুও একাকী হাসি মুখে তুমি সকলি সহ ;
নিখিল-জনের কল্যাণ তরে নিজ হাতে কর বিসর্জ্জন
নিজের যা' ছিল কল্যাণ তব, যে ছিল তোমার আপন জন।

ঝড় হ'য়ে গেছে, ছিন্নকুসুম অযত্নে কোথা লুটায় বনে,—
দেবতা নহ ত, মানুষের মত কেঁদেছ কি কভু সঙ্গোপনে ?
গৃহ-মন্দিরে নাই সে, গিয়েছে অনেক দিন,
মনোমন্দিরে আছে কি লুকায়ে ভাবনা-লীন ?
কেমনে দলেছ বুভুক্ষু দেহে জীবন্ত প্রাণ, হে বলীয়ান,
শুধু মনোরথে ভাবনার পথে লভেছ গরিমা কি গরীয়ান্ ?

তব সন্তান গর্ভে ধরিয়া বন-পথে সে ত চলিতে নারে,
তোমা' ছাড়া তা'রে রক্ষা কে করে, এ বিপদে আর ডাকিবে কা'রে ?
ধরার কন্যা, সর্ব্বসহা সে ধরার মত,
আজ নিদারুণ তব নিগ্রহ-বজ্রাহত ;
একদিন যা'র বিরহে, তোমার বিফল করুণ আর্ত্তনাদ
ধ্বনিত করেছে দণ্ডক-বন,—কোথা আজ সেই প্রেমোন্মাদ ?

সে যে রাজ-ঋষি জনকের সুতা, জন্ম-যজ্ঞভূমির 'পরে,
ভাঙিয়া হেলায় হরকার্ম্মুক জিনেছিলে যা'রে স্বয়ম্বরে ;
সীঁথিতে তোমার সোহাগ-সীঁদুর আদরে ধরি'
তব রাজ্যের অশুভ কেমনে লইবে বরি' ?
তোমা ছাড়া আর জানে না ত কিছু, তাই সে এখনো তোমার লাগি'
কল্যাণ যাচে, জনমে জনমে পতিরূপে শুধু তোমারে মাগি'।

থাম থাম, তব ফিরাও দণ্ড ওগো নিষ্ঠুর দণ্ডধর,—
দোষীর লাগিয়া শাসন রাজার নির্দ্দোষী সে ত স্বতন্তর।
সোনার অঙ্গ পুড়িল না যা'র বহ্নিদাহে,
হে রাজন্, আজ কি দহনে বল পোড়াবে তাহে ?
রাজার ধর্ম্মে ঢাকিবে কেমনে মানুষের এই অগৌরব ?
যশোধন তুমি, এর চেয়ে হীন অপযশ আর কি সম্ভব ?

জীবনেরে করি' মরণ-অধিক, হৃদয়েরে করি' শ্মশান-ভূমি
যাহা সুন্দর, তা'র বুকে বুঝি সত্যের শূল হানিবে তুমি ?
কামনার তাই কালকূটে তব কণ্ঠনীল,
ভাব-তরঙ্গ মাথায় তোমার, ভাবনাশীল ;
অরূপের ধ্যানে রূপেরে তেয়াগি, পীযূষ-পিয়াস তুচ্ছ করি'
হের মৃত্যুর কি অমৃত-রূপ যোগ-নিমগ্ন নয়ন ভরি' ?

প্রাণের যজ্ঞে দেহ নাহি, শুধু সোনার প্রতিমা কেমনে তব
হরিল নয়ন, ধরিয়া মূরতি মমতাবিহীন কি অভিনব ?
তবু আপনার প্রাণের পদ্ম উপাড়ি ধরি'
চেতনারে নহে, বেদনারে নিলে বরণ করি'
সত্যের লাগি' সত্যসন্ধ, করিলে তুচ্ছ রাজ্যসুখ,
রাজ্যের লাগি' রাজার মতন বরিলে সুচির বিরহদুখ।

নবীন নৃপতি প্রবীণ রাজ্যে, রঘু-দিলীপের বংশধর,
প্রজাপালকের কঠিন ধর্ম্ম করিল তোমারে কঠিনতর ;
প্রাণসম প্রিয়া—তা'র প্রতি তুমি করুণাহীন,
আপনার প্রতি তা'র চেয়ে বুঝি আরো কঠিন ;
মনস্বী তুমি সহিবে কেমনে সবিতার কুলে কলুষ-লেখা,
ফুলের মতন শুভ্র সে-প্রেমে বিশ্বের ক্রূর নখের রেখা ?

রাজকুলবধূ, পুত্র-জননী, সহধর্ম্মিণী, রামের রাণী,
নহে তা'র তরে শুধু হাসিখেলা,—নির্ব্বাক্ হোক প্রেমের বাণী !
রাম যে অভাগা, ললাটে তাহার সুখ ত নাই,
বনে একাকিনী কাঁদে অভাগিনী জানকী তাই ;
ক্ষুণ্ণ হ'বে না প্রজার কামনা, হোক সুখী শুধু এ ধরাতল,
থাক বুকে গূঢ় বুকের বেদনা, চোখে অশ্রুত চোখের জল।

অদৃষ্ট শুধু হাসিল ! একদা শ্লথ হ'ল তব বজ্রমুঠি,
বিশ্ব-বিজয়ী রাজার অশ্ব ধরিল সাহসে কে শিশু দুটি ?
যে-মুখের ক্ষণ-দরশ হৃদয় নিত্য যাচে,
কে রচিল ওই যুগল-পদ্ম তাহারি ছাঁচে ?
তাপস-বালকে কে শিখাল কবে রামের করুণ চরিত-কথা ?
সহসা বাষ্পে ঢাকিল নয়ন,—পুরাতন ক্ষতে নূতন ব্যথা।

বক্ষের তলে এতবড় প্রাণ যা'র সে কেমনে নয়ন মুদি'
ধরণীর রূপ-সরণি ত্যজিবে দেহের নিয়তি নিয়ত রুধি ?
ধেয়াইয়া শুধু মানসের মায়া ঊর্দ্ধমুখে
ধরা নাহি পড়ে কামনার কায়া রিক্ত বুকে ;
রুদ্ধ রোদন হাহা করে কার একটু সরস পরশ লাগি',
কা'র বিগলিত অশ্রু-ললিত মুখের একটু দরশ মাগি'।

ব্যথায় বিমুখ নহ, তবু তুমি কেবল ব্যথার বিলাসভরে
চলনি কল্পলোকের আলোক নিরালোক পথে গরবভরে ;
পাথর-নিথর বুকের আড়ালে দীপ্ত-বিভা
লুকালে তরল অনল-উৎস রাত্রিদিবা ;
সেই দিতে পারে জগত-জনের লাগিয়া শ্যামল বক্ষ পাতি'
যে রাখে চাপিয়া গোপনে আপন বুকের জ্বালাটি দিবস-রাতি।

তবু সে ত আর ফিরিল না ঘরে,—একবার তুমি কাঁদায়ে যা'রে
বিদায় দিয়েছ, হে দৃঢ়-কল্প, এখন কেমনে ফিরাবে তা'রে ?
পুরাতন সুখ ফিরে না ত আর চলিয়া গেলে,
সে সুখের মত আর কোনো সুখ নাহি ত মেলে।
ওগো উপবাসী উদাসী, কঠোর মুঠিতে মলিন বুকের মালা
ঝরে পড়ে, তারে জীয়াবে কেমনে, জুড়াবে শুষ্ক চোখের জ্বালা ?

জগতের মহাযজ্ঞে জ্বালিয়া আপনি আপনা আহুতি-শিখা,
কে পারে পরিতে দীপ্ত ললাটে দাহ-অবশেষ ভস্মটীকা !
মর্ম্মবিজয়ী নির্ম্মম, ওগো মর্ম্মাহত,
বেদনারে তুমি করেছ বরণ বীরের মত ;
প্রাণ আছে যা'র সেই দিতে পারে নিঃশেষে নিজ প্রাণের হবি,
যে করেছে জয় জীবনেরে তার অমৃত গরল সমান সবি।

দেবতার মত স্থির-গৌরবে এসনি নামিয়া স্বর্গ হ'তে,
মানুষের মত ধরেছ জীবন সুখ দুখময় চেতন-স্রোতে ;
মানুষের সেই অস্থি-চর্ম্ম ক্ষুধা-আলয়,
মানুষের সেই বুদ্ধিধর্ম্ম কামনাময়,
ভেঙে' চুরে' তবু সে মর-জন্ম অমর তোমার মহিমা ঝরে ;
মানুষের রূপে আসে না দেবতা,—দেবতার রূপ মানুষ ধরে।

হে গৃহ-তাপস, স্বার্থ-বিনাশী, সুখ-দুখজয়ী শক্তিমান্,
যুগ যুগ ধরি জগৎ তোমারে দেছে পূজার অর্ঘ্যদান।
মানুষের মত রিক্ত জীবনে সহিয়া সব
দেবতার মত লভেছ মরণে কি গৌরব ?
বেদনার সেই গূঢ় ইতিহাস প্রাণ-রণ-রূঢ় বুকের তলে,
পূজার অর্ঘ্যে ঢেকেছে কি সব, মুছেছে সীতার অশ্রুজলে ?

মাষ্টার মশাই

—পলিন স্মিথ

[পলিন স্মিথ্ সম্প্রতি ইংরেজীতে গল্প লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি ইংরেজকন্যা, ছেলেবেলা হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিপালিত। সেখানকার বুয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে ইনি বিশেষভাবে পরিচিত। তারা সরল-প্রাণ ও কর্ম্মঠ, চাষবাস করিয়া জীবন যাপন করে। সভ্যতার আইনকানুন তারা জানে, অথচ সভ্যতার কালিমা তাদের মনে নাই। তাদেরই জীবনের সুখদুঃখ, ঘাত প্রতিঘাত, স্নেহ-প্রীতি লইয়া ইনি গল্প লেখেন। এঁর গল্পের ভাষাও যেমন অতি সরল, ভাবও তেমনি অতি সরল। কিছু কৃত্রিমতা নাই। লেখার ভঙ্গী স্বচ্ছ এবং অন্তলস্পর্শী, অথচ মৌলিক। যতটা সম্ভব এঁর গল্পলেখার ধরণের কিছু আভাস দিবার আশায় Schoolmaster গল্পটি তর্জ্জমা করা হইয়াছে—অনুবাদক।]

দিদিমা বলতেন, তাঁর কাছে না থাকলে আমার বুকের দোষ কিছুতেই সারবে না। তাই ছেলেবেলা থেকে বেশীর ভাগ তাঁদের কাছেই থাকতাম,—ঝাম্‌কা পাহাড়ের অধিত্যকায় লুইগেদার কুঠিবাড়ীতে। দাদামশাই আর দিদিমা সেখানে চল্লিশ বছরের ওপর বাস করছিলেন। দিদিমা ছেলেপুলে নিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। সর্ব্বদা আত্মীয়স্বজনের একপাল ছেলেমেয়ে নিজের কাছে রেখে মানুষ করতেন। ছেলেরাও তেমনি এঁদের অত্যন্ত ন্যাওটো হয়ে থাকত। আমাদের বেজি মাসী যখন মারা গেল তখন কাজেই তাঁর যতগুলি কাচ্ছাবাচ্ছা, নীনি, ফ্রিক্কি আর হান্‌সি, কুয়োশ, মার্টিন আর পিটি, সব দিদিমার ঘাড়ে এসে পড়্‌লো। দিদিমার বয়স তখন বোধ করি ষাট হবে। তাঁর চেহারাটা বেজায় স্থূল, কিন্তু তাতে তিনি অথর্ব্ব হন নি ; ঐ প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে এমন অবলীলাক্রমে চলে ফিরে বেড়াতেন, মনে হত যেন কত হাল্‌কা। একবার জাহাজ-ঘাটে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলাম একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ ঘাটে এসে লাগছে, আর কতকগুলো ডিঙ্গিনৌকা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে। দিদিমা তাঁর মস্ত ঘাঘ্‌রা পরে চলেছেন আর ছেলেমেয়ের দল আশেপাশে ছুটছে, এ দেখলেই আমার সেই কথা মনে পড়ে যেত। কিন্তু সেই বিরাট শরীরের মধ্যে যে বিশাল হৃদয় ছিল তা একেবারে মমতায় ভরা। দুনিয়ায় এমন কেউ ছিল না যাকে তিনি আন্তরিক না ভাল-বাসতেন। আর মজা এই, আমাদের যখনই যা কিছু ঘটুক, তিনি বলতেন নিশ্চয় সেটা ভগবানের ইচ্ছা।

বেজি মাসীর ছেলেরা আসবার তিন সপ্তাহ পরে একদিন রাত্রে ঝড়জলের মধ্যে কোথা থেকে এক অতিথি আমাদের বাড়ী এসে হাজির ; দিদিমা কিন্তু তখনই একদম ধরে নিলেন যে ভগবানই তাকে পাঠিয়ে দিলেন।

অতিথিকে যখন ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে যাওয়া হল, সে তার নাম বল্লে জোয়ান বোজে। দেখতে বেঁটে, রং ময়লা, ঠোঁটের নীচে ছুঁচলো একটু বেমানান দাড়ী—মনে হয় সেটা এখনও তার নিজের দখলে নয়। গালের চামড়া, হাতের চামড়া পাৎলা, ফ্যাকাসে। কথা কইবার সময় ছাড়া মুখ তুলে বড় চায় না। তার চাউনি দেখে মনে হল যেন দিদিমার কাছে বাইবেলের গল্পে শোনা সেই বিধবার ছেলে হঠাৎ মরা মানুষের দেশ থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু সেদিন রাত্রে তাকে অমন ভূতের মত দেখালেও সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল সে ক্ষুধাতুর, আগে তাকে খাবার দিতে হবে। ছুটে গিয়ে কফি তৈরী করে আনলাম।

জোয়ান বোজে খেয়ে নিলে পর দাদামশাই আর দিদিমা তার পরিচয় নিলেন। হল্যাণ্ড দেশের লোক, সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছে। এখানে তার আত্মীয় পরিচিত কেউ নেই। কোথায় আছে সোনার খনি, তারই খোঁজে পায়ে হেঁটে চলেছে।

সোনার খনির কথা শুনেই দিদিমা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটু থেমে বল্লেন—একটা কথা বলি বাপু। অনেক দেখে দেখে আমি বুড়ো হয়েছি, কিন্তু এমন দেখলাম না যে সুখে থাকতে কেউ কখনও সোনার খনির সন্ধানে বেরোয়, আর এও দেখলাম না যে সোনা পেয়ে কেউ সুখী হল। মনের মধ্যে পাপ কিংবা অশান্তি ঢুকলেই মানুষ এ সকল লোভের রাস্তায় পা দেয়, আবার সোনা হাতে পেলে তার থেকেও কত নতুনতরো পাপ, কত অশান্তি

জন্মায়। তার চেয়ে বরং আমি যা বলি শোন। এখানে আমাদের কাছেই থাক, আমার নাতি-নাৎনিদের লেখাপড়া শেখাও, তাতেই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে।

জোয়ান বল্লে—আপনার কথাই যদি ঠিক হয়, যদি কোনো পাপ কাজ করে অথবা দুঃখ পেয়ে নিজের দেশ পালিয়ে আজ আপনাদের দেশে সোনা খুঁজতে এসে থাকি, তবে কোন্ বিশ্বাসে এমন লোকের হাতে কচি ছেলেদের ভার দিতে চাইছেন?

কত করুণ স্নেহভরা সুরে দিদিমা তাকে বল্লেন—তা বাপু, পাপের কি আর ক্ষমা হয় না? দুঃখেরও কি ভাগ নেওয়া যায় না?

জোয়ান বল্লে—আমার দুঃখের অংশ অন্যকে দেওয়া যায় না। আর আমার যে পাপ তা আমি নিজেই ক্ষমা করতে পারিনি।

দিদিমা তখন বল্লেন—তা হবে। কার মনে যে কি আছে সে কথা ঈশ্বর জানেন আর সেই জানে। তা তোমার যা ভাল মনে হবে তাই অবশ্য করবে। তবে যদি আমাদের এখানে থাক তো জানব তিনিই তোমাকে পাঠিয়েছেন। কাজেই ছেলেদের পড়াবার ভার তোমার হাতেই দেওয়া হবে।

এর পর কতক্ষণ ধরে জোয়ান আমাদের সাম্‌নে চুপ করে বসেই আছে, বসেই আছে,—আর কোন কথাই কয় না। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম, তবুও মনে হতে লাগল সবাই বুঝি নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ীর মধ্যে কেবল আমি দাদামশাইদের সঙ্গে জেগে আছি। সে কি জবাব দেয় শোনবার জন্য আমরা যে কতক্ষণ উন্মুখ হয়ে রইলাম তার ঠিক নেই। শেষে যখন জোয়ান বল্লে—আচ্ছা, এখানেই থাকব—তখন আমার বোধ হল,—আমি যে একান্ত মনে কামনা করছিলাম ভগবান তাকে সুমতি দিন, সে বুঝি তা টের পেয়েছিল।

জোয়ান সেদিন থেকে ছেলেদের মাষ্টার হয়ে রইল। পুরানো আস্তাবলটা হল তাদের স্কুল-ঘর। দিদিমা আর আমি ব্যবস্থা করে সেখানে একটা টেবিল, খানকতক টুল সাজিয়ে দিলাম। আস্তাবলটার কোন জানালা ছিল না, আলো পাবার জন্য তাদের দরজার গোড়ায় এগিয়ে এসে বসতে হত। সেখান থেকে দেখা যেত সেই আমাদের কত পুরানো স্মৃতিজড়িত কমলালেবুর কুঞ্জ, তার পিছনে সারি সারি পাহাড়ের মাথায় উঁচু উঁচু চূড়া। গ্রীষ্মের দিনে সেগুলো দেখাত মেঘের মতো কালো, আর শীতের দিনে বরফ পড়ে হত দুধের মতো সাদা। যত দূরে দৃষ্টি যায়, উপত্যকাভূমির সীমা পেরিয়ে এই সব পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা গিরিপথ কতদূর পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে, কত পথিক এই পথ বেয়ে সোনার সন্ধানে পাহাড় পার হয়ে চলে গেছে। সেই পথের গা বেয়ে ঝাম্‌কা নদী পাহাড় থেকে নেমে এসে সমস্ত পাহাড়তলী উর্ব্বর করে রেখেছে। পাহাড়ের দিক থেকে সুইগেদাতে আসতে হলে খেয়াঘাটে এই নদীটা পার হতে হয়।

পুরানো আস্তাবলটি ছিল দাদামহাশয়ের গুদাম-ঘর। যত মদের পিপা, তামাকের আঁটি, গাদা-করা লাউকুমড়া, চাষের লাঙ্গল, হাল, চামড়ার যোৎ,—যা কিছু চাষের সরঞ্জাম এখানে জমা করা থাকত। কড়িকাঠে নানা আকারের বড় বড় চামড়া ঝোলানো, তাই থেকে ঘোড়ার জিনযোৎ প্রভৃতি তৈরী হত। স্কুল-ঘরটায় ঢুকলেই একটা পুরানো পুরানো অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যেত, তার মধ্যে খানিকটা মদের মিঠা গন্ধ, খানিকটা তামাকের, খানিকটা চামড়ার। ঘরের সুমুখ দিকটায় মাটির মেজেতে গোবর লেপে দেওয়া হত, সে গন্ধটাও এর সঙ্গে মিশে থাকত।

জোয়ান যখন আসে তখন আমাদের কাছে ছেলেদের পড়বার মত বিশেষ কিছু বই ছিল না। শুধু কয়েকটা বাইবেল আর পুরাকালে আমাদের মা-মাসীরা যা থেকে পড়তে শিখেছিলেন এমনি খানকতক বর্ণপরিচয়ের বই। ছেলেদের পড়া দেওয়া হত বাইবেল থেকে, আর লেখবার বোর্ড হল দাদামশাইয়ের দরুণ একখানা মস্ত বড় পেটা চামড়া। নদী থেকে কালো এঁটেল মাটি এনে তাই দিয়ে এর উপর দাগা বুলিয়ে ছোটদের অক্ষর পরিচয় হত, আর বড় ছেলেদের আঁক কষাতে হত। এ ছাড়া জোয়ান তাদের ভূগোল-বৃত্তান্ত শেখাত, তেমন অদ্ভুত ভূগোল-কথা এ অঞ্চলে কেউ জানত না। কত অদ্ভুত দেশের গল্প বলতে বলতে আস্তাবল-ঘরের মধ্যে সে যে পৃথিবী রচনা করত, এমন সব দেশের কথা আমরা কল্পনাতেও জানতাম না। আমি রোজই তার ভূগোলের গল্প শুনতে যেতাম।

কত বড় বড় সহর, কত আশ্চর্য্য দেশ সে দেখেছে তা যখন সে বলত তখন আমি মনে মনে ভাবতাম, আহা, কি পাপই সে করেছে, কত দুঃখই পেয়েছে, তাই বেচারাকে অমন সব দেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে। তাই যখন সে আমায় লক্ষ্য করে বলত,—বল তো এঞ্জেলা, কোন খানটা আজ আমাদের রিডিং পড়া হবে? তখনই আমি বাইবেলের অষ্টম অধ্যায়ে, যেখানে মঙ্গলপ্রার্থনার কথা আছে,—সেখানটার কথাই উল্লেখ করতাম।

একদিন জোয়ান আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা এঞ্জেলা, তুমি বার বার ঐ জায়গাটাই পড়তে বল কেন?

তখন কি জানতাম, তার প্রতি আমার মমতাটুকু অল্পে অল্পে কেমন করে ভালবাসার কাছাকাছি গিয়ে পৌছেচে? বল্লাম—ঐ খানটায় রাজা সোলোমন বলছে না—শোন শোন অমৃতলোকের অধিবাসী, সকলকে তুমি ক্ষমা কর; অতি দূরের যে পরদেশী অতিথি, তারও তুমি মঙ্গল কর?

সেই দিন থেকে সে ছেলেদের সঙ্গে যেমন মিষ্ট ব্যবহার করত আমার সঙ্গেও তেমনি ব্যবহার করতে লাগল। অনেক সময় দেখতে পেতাম, আমার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত। যখন আমি একমনে বসে সেলাই করতাম, তখন হয় তো ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে চুপটি করে বসে থাকত—আর আমার বুকের ভিতর থেকে থেকে আনন্দ ও ব্যাথা, দুই-ই একসঙ্গে তোলপাড় করে উঠত। নিতান্ত দরকার ভিন্ন কেবল ছেলেদের সঙ্গে ছাড়া কুঠির মধ্যে সে আর কারো সঙ্গে কথা কইত না। এখন থেকে সে আমার সঙ্গেও কথা কইতে লাগল। নীলি আর তার ছোট ভাইদের ভুলিয়ে মজার জিনিষ কুড়িয়ে দোব বলে তাদের সঙ্গে নিয়ে যখন মাঠের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতাম, তখন জোয়ানও আমাদের সঙ্গ নিত। এই সময়ে আমিই তাকে শিখিয়েছিলাম কোন্ বুনো ফুলটা খেতে মিষ্টি, কোনটা বিষাক্ত, কোন্ কোন্ গাছের পাতায় কি কি অসুখ সারে, কি গাছের শিকড় চিবোলে জলতেষ্টা দূর হয়। যা কিছু আমি জানতাম, সেই সব তুচ্ছ বিদ্যা তাকে শেখাতাম—কিন্তু পরে সে জন্য ভগবানকে কত সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়েছি। আমার স্নেহ দিয়ে আমি তার তো কিছুই করতে পারিনি—তবু এইটুকু মাত্র সান্ত্বনা পাই যে বনবাসে গিয়ে তার এই সব বিদ্যা হয় তো কাজে লেগেছিল।

জোয়ান আসার পর ছয় মাস কেটে গেল। সেদিন নীলির জন্মদিন। দিদিমা বলে দিলেন সেদিন ছেলেদের ছুটি। দুটো গাধাকে একটা ঠেলাগাড়ীতে জোতা হল—পরামর্শ হল যে আমি আর জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে গাড়ী করে পারঘাটা পার হয়ে পাহাড়ের খাদের কাছে গিয়ে তাদের নিয়ে খানিকটা আমোদ-প্রমোদ করব। দিনটা বড় পরিষ্কার ছিল, জুন মাসে এ সময় ওখানকার দিনগুলো এমনই সুন্দর হয়। গাড়ীতে যেতে যেতে নীলি আর তার ছোট ভাইরা সকলে মিলে গলা ছেড়ে এমন মিষ্টি সুরে গান করতে লাগল, মনে হল যেন দেবশিশুদের কলধ্বনি। আমার বুকের দুর্ব্বলতার জন্য আমি কখনও চেঁচিয়ে গান করতাম না, কিন্তু সেদিন জোয়ানের পাশে বসে যে গান আমার বুক ছাপিয়ে উঠেছিল, গলা ছেড়ে আমিও সে গান তাকে না শুনিয়ে পারলাম না। আমার এতই বয়স হয়ে গেল, কিন্তু সেদিন আমার সমস্ত দেহে মনে যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল, তেমন আনন্দ জীবনে আর কখনও পেলাম না।

কুঠি থেকে বেরিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা পারঘাটে পৌছে গেলাম। সে বছর পাহাড়ে বরফও তেমন পড়েনি, বৃষ্টিও বেশী হয়নি, তাই নদীতে বেশী জল ছিল না। বিস্তৃত বালুচরের মাঝ দিয়ে একটি মাত্র ক্ষীণ জলধারা বয়ে চলেছে। নদীর পাড় এখানে অনেকটা উঁচু, পাড়ের ওপারেই লাল পাথরের পাহাড়। মৌমাছিরা এইখানে মৌচাক বেঁধে মধু সঞ্চয় করে, আর সাদা সাদা বুনোহাঁসের দল এখানেই তাদের বাসা বাঁধে। সে দিন সেই পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে নীল আকাশের কোলে লাল পাথরের পাহাড় আর তার কোলে বুনোহাঁসদের সাদা সাদা ডানা কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল!

নদীটা পার করে জোয়ান গাড়ী থামালে, নীলি আর সব ছেলের দল লাফিয়ে গাড়ী থেকে নেমে কোলাহল করে হাততালি দিতে দিতে ছুটে পাড়ের উপর চলে গেল, বুনো-হাঁসের দল ভয় পেয়ে পাহাড়ের গা থেকে উড়ে পালাতে লাগল। গাড়ীতে রইলাম কেবল আমি আর জোয়ান। আরো এগিয়ে যাবার জন্য জোয়ান গাধাদের চাবুক মারলে, কিন্তু তারা সেখান থেকে আর নড়তে চায় না। জোয়ান

গাড়ীর উপর উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে চাবুক কষতে লাগল,—তাতে তারা আরও ভড়কে গিয়ে জলের দিকে পিছু হটতে লাগল। বিষম রেগে জোয়ান তখন লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে চাবুকের বাট দিয়ে তাদের চোখের উপর নির্ম্মম ভাবে মারতে লাগল। তার যে মুখ আমার কাছে এত প্রিয়,—দেখতে দেখতে সেই মুখ বদলে গিয়ে এমন ভীষণ হয়ে উঠল যে আর চেনা যায় না। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, জোয়ান! জোয়ান! কিন্তু ভয়ে গলা চেপে গেল, সে-আওয়াজ শোনাই গেল না। গাড়ী থেকে নেমে যাব মনে করে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখি জোয়ান একটা ছুরী নিয়ে তাদের চোখের ভিতর জোরে জোরে খোঁচা মেরে দিলে। ছেলেদের চেঁচামেচি আর বুনোহাঁসের ডাক ছাপিয়ে এক বিকট মর্ম্মভেদী চীৎকার উঠল,—আমি গাড়ী থেকে বালির উপর পড়ে গেলাম। যখন উঠলাম তখন দেখি গাধা দুটো গাড়ীখানা উল্টে ফেলে জলের মধ্য দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অনেক দূর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে চলেছে, আর জোয়ান তাদের পিছু পিছু ছুটেছে। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ঝোঁকের মাথায় কি কাণ্ড করে ফেললে।—তখনও ছেলেরা হাততালি দিচ্ছে, আর বুনোহাঁসগুলো মাথার উপর উড়ছে!

ঈশ্বর জানেন কেমন করে আমি তখন ছেলেদের একজোট করে বড়গুলোকে আগে দৌড়ে বাড়ী যেতে বল্লাম আর নিজে ছোটগুলোর হাত ধরে নিয়ে চল্লাম। খানিকটা গিয়ে দেখি দাদামশাই ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসছেন। আমি যতটা পারি তাঁকে বল্লাম, তিনি তাই শুনে নদীর ধার দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। কুঠিতে পৌঁছে ছেলেরা দিদিমার কাছে গেল, আমি একা আস্তাবলের দিকে গেলাম। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে জোয়ানের চেয়ারটাতে গিয়ে চুপ করে বসে পড়লাম। টেবিলের ওপর হাতে মাথা দিয়ে এমনই কতক্ষণ বসে থাকলাম। জগতে তখন আর কিছু নেই;—আছে কেবল আমার বুকভাঙ্গা ব্যথার রাশ,—আর সেই চামড়া আর তামাক আর মদের গন্ধ ভরা ঘন অন্ধকার! কতক্ষণ সেখানে বসে ছিলাম জানি না—শেষে দিদিমা এসে আমাকে খুঁজে বের করলেন। আমাকে কতই আদর করতে লাগলেন—এই যে এঞ্জেলা, আমার লক্ষ্মী! আমার মাণিক!

পরে শুনলাম অন্ধ গাধা দুটোকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, দাদামশাই তাদের গুলি করে মারলেন। গাড়ীর ভাঙ্গা টুকরোগুলো অনেক দিন পর্য্যন্ত নদীর ধারে পড়ে রইল। কিন্তু জোয়ানকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। পাহাড়ে পাহাড়ে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়ে খোঁজা হল, কেউ কোনো সন্ধান পেল না। দিন কতক পরে সবাই বল্লে বোধ হয় রাত্রের মধ্যে পাহাড় পার হয়ে অন্য দেশে সে চলে গেছে। এই সময় আমার অসুখটা এত বেড়ে উঠল যে আমার বাবাকে চাষবাস ছেড়ে আমায় দেখতে আসতে হল। তিনি আমায় নিয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু আমি কেঁদেকেটে দিদিমাকে বল্লাম যে আমি এখান থেকে কিছুতে যাব না। দিদিমার ওপর কারো কথা চলে না, কাজেই বাবা আমাকে সেখানেই রেখে গেলেন।

বাবা চলে যাবার কয়েকদিন পরে শেষে বুড়ো ফ্রাঞ্জ এল জোয়ানের খবর নিয়ে। ফ্রাঞ্জ থাকত পাহাড়পথে যাতায়াতের মুখে, টোল-আদায়ের কুঠরিতে। সেখানে গেটের ধারে একটা ভাঙ্গা হাত-গাড়ী পড়ে থাকত, জোয়ান গিয়েছিল ফ্রাঞ্জের কাছে জানতে, সেটা তাকে বেচতে পারে কি না। অত্যন্ত ভারী, নিতান্ত বাতিল একটা ঠেলা গাড়ী, রাস্তা-মেরামতের লোকেরা পাহাড়-পথের মেরামত শেষ করে যাবার সময় সেটা এখানে ফেলে গেছে। ফ্রাঞ্জ বুড়ো জিজ্ঞাসা করে, এই গাড়ী নিয়ে জোয়ান কি করবে? জোয়ান তাতে নাকি বলেছে—আমি যেমন গাধাদের হত্যা করেছি, তাদের মত গাড়ীটানার কাজ করলে তবে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। তাকে আরও বলে দিয়েছে—দুইগেদার কুঠিবাড়ীতে কর্ত্রীকে গিয়ে বলবে আমার ঘরে ছোট টিনের বাক্সতে যে টাকাকড়ি আছে, তার থেকে গাড়ীর ন্যায্য দামটা তোমাকে দিয়ে বাকী যা থাকবে তা যেন তিনি গাধা দুটোর দাম স্বরূপ গ্রহণ করেন।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন—ঠেলা গাড়ীটা নিয়ে সে করবে কি? কি খেয়ে বাঁচবে?

ফ্রাঞ্জ বল্লে—গাধার মতন গাড়ী টেনে টেনে সে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরবে, মাঠে ঘাটে যা কিছু সংগ্রহ করতে পারে তাই বেচে এক রকম করে খাবে। আমার কাছে একটা চামড়ার রসি চেয়ে নিলে,—সেটা দিয়ে নিজের গলার লাগাম তৈরী করেছে।

দিদিমা জোয়ানের ঘরে গিয়ে তার বাক্স খুলে দেখলেন, যা টাকা পয়সা আছে তাতে গাড়ীর দাম আর গাধার দাম যথেষ্ট পুষিয়ে যায়। বাক্সটা এনে ফ্রাঞ্জকে বল্লেন—এটা সব শুদ্ধই তুমি নিয়ে যাও, গাড়ীর যা দাম তা সে নিজের হাতেই দিক। গাধার দাম আমি কিছুই নেব না। সাত মাস

ধরে সে তো আমার নাতি-নাৎনিদের মাষ্টারি করেছে। ভগবান তার মঙ্গল করুন; যেখানেই থাক, যেন শান্তিতে থাকে।

ফ্রাঙ্ক কিন্তু বাক্স নিতে রাজী হয় না। বল্লে—দেখুন, আমি জোয়ানের কাছে কথা দিয়ে এসেছি যে শুধু গাড়ীর দামটা নিয়ে বাকীটা আপনার কাছেই রেখে যাব।

দিদিমা অগত্যা তাই করলেন, বাক্সটা জোয়ানের ঘরেই রেখে দিলেন। তার বদলে সে যতটা বইতে পারে, নানা রকম খাবার তার হাতে বোঝাই করে দিলেন;—রুটি, নোন্‌তা বিস্কুট, নানারকমের শুক্‌নো ফল,—অর্থাৎ দূর পথে যেতে লোকে যে রকম যেসব খোরাক সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, সেই সব। কিন্তু আমি? জোয়ানকে আমি তো সমস্ত পৃথিবীটাই দিয়ে ফেলতাম, কিন্তু সারা পৃথিবীতে কি বা আমার আছে, তাকে দিই? ফ্রাঙ্ক যখন উঠান পার হয়ে চলে যায় তখন হঠাৎ আমার ছোট বাইবেলখানা হাতে নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটলাম। চেঁচিয়ে ডেকে বল্লাম—ফ্রাঙ্ক! ফ্রাঙ্ক! জোয়ানকে ব'ল, আবার যেন সে লুইগেদায় ফিরে আসে। আমার নাম করে তাকে ব'ল যত দিন আমি বাঁচব, ততদিন আমি অপেক্ষাই করব!

আমি এই কথাই সেদিন বলেছিলাম। আমার পক্ষেই বা এ কথার মানে কি, আর জোয়ানই বা এ কথার কি মানে করে নিলে, তা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু তাকে না জানিয়ে আমি থাকতে পারছিলাম না।

সেদিন রাত্রে বিছানায় জেগে শুয়ে ছিলাম। অনেক রাত্রে দিদিমা আস্তে আস্তে এসে আমার ঘরে ঢুকলেন। কথা না বলে আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। আমি অন্ধকারের মধ্যে কেঁদে উঠে বল্লাম—দিদিমা! ভালবাসায় কি এত কষ্ট?

এখনও যেন শুনতে পাচ্ছি, তাঁর সেই মিষ্টি সুরে ধরা-গলায় আমার কানে কানে বলছেন—এতে কষ্টও হয়, সুখও হয়,—বিপদও আসে, সম্পদও আসে,—ভালবাসাকে যেমন ভাবে গড়ে তুলতে পারবে শেষ পর্য্যন্ত তেমনই দাঁড়িয়ে যাবে।

পরের দিন দিদিমা বল্লেন, জোয়ানের বদলে আমি যেন ছেলেদের পড়াই। একবার মনে করলাম, আমার যে বুকের দোষ, আমার দ্বারা এতটা হবে না। তার পরই ভাবলাম, জোয়ানের জন্য এটা আমায় করতেই হবে। ছেলেদের ডেকে নিয়ে তখনই আস্তাবল ঘরে গিয়ে তাদের পড়াতে সুরু করলাম।

সমস্ত বসন্ত কাল আর গ্রীষ্মকাল আমি পাদ্রীর কাছে বই ধার করে এনে তাদের পড়ালাম। ছেলেদের তো ভালই বাসতাম। তার ওপর জোয়ানের কাজ করছি ভেবে, জোয়ানের মত ধৈর্য্য ধরে পড়াতে আমার কষ্ট হত না। আমার বুকের ব্যথাটা ভুলেই গেলাম। আস্তাবল-ঘরে প্রত্যহ তার চেয়ারটিতে বসে ভাবতাম, জোয়ান গাড়ী টানতে টানতে কত দূরে দূরে মাঠ পার হয়ে চলেছে। আমি যে তাকে বনের ফল চিনে খেতে শিখিয়েছি, জলতেষ্টা মেটাবার উপায় শিখিয়েছি—সেজন্য কেবল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম। শুধু এইটুকুই আমার তুচ্ছ সম্বল,—আমার ব্যর্থ ভালবাসার আর কি সান্ত্বনা ছিল?

সেবার পাহাড়তলীতে তাড়াতাড়ি শীত পড়ে গেল। অনেক বরফ পড়াতে মে মাসে নদীতে বান এলো। দাদা-মশাই ছেলেদের বান দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেদিন সমস্ত দিন ধরে দরজার বাইরে যখনই চাই আর দেখি কমলালেবুর কুঞ্জের পিছনে পাহাড়ের সারি নীল আকাশের কোলে একেবারে ধব্‌ধবে সাদা হয়ে গেছে,—তখনই যেন এক ক্ষুব্ধ শান্তির ছায়া পড়ে মনটা কেমন কেমন করে ওঠে। আগুন যেন নিভে গেছে, জোয়ান বুঝি এতদিনে শান্তি পেয়েছে, তাই আমাকে বলতে আসছে! সমস্ত দিন আস্তাবল-ঘরে বসে জোয়ানের কথাই ভেবেছি। বাইরে একবার কি যেন সোর-গোল উঠল, উঠানের দিকে অনেক লোকের পায়ের শব্দ হল,—কিন্তু তাতে আমি কান দিলাম না। কিছুক্ষণ পরে গোল থেমে গেল। তার পর দিদিমা একাটি এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন, চোখদুটি তাঁর জলে ভরা, তাঁর হাতে ছোট একখানা ভিজা বই,—দেখে চিনলাম,—যে বাইবেলখানা জোয়ানকে পাঠিয়েছিলাম ··

···মৃতদেহটা ওরা পারঘাটের কাছে দেখতে পেয়েছে, বুকে তখনও তার চামড়া কষা, হাতের মুঠোয় গাড়ীর ডাণ্ডা ভাঙ্গা!···

যে ঘরে তাকে এনে রাখা হয়েছিল,—রাত্রে সেখানে একা গেলাম,—কাপড়ের ঢাকাটা খুলে দিলাম। বুকের ওপর একটা চওড়া দাগ—গাড়ীটানা চামড়া ঘষে ঘষে সেখানটা ঘানির গরুর কাঁধের মত শক্ত হয়ে গেছে। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বুকের ওপর আমার মাথা রাখলাম। বিদায় নিতে গিয়ে বুকের ভিতর থেকে শুধু কতকগুলা আদরের কথাই বেরিয়ে এল। যা বলে দিদিমা আমায় আদর করতেন, অনর্থক কেবল সেই কথাই বার বার বলতে লাগলাম,—আমার সুখের ধন,—আমার দুঃখের ধন!···আমার সর্ব্বস্ব ধন! আমার মাণিক!

অনুবাদক—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

বিচিত্র জগৎ

-শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলের তলায় নূতন জগৎ

আমরা ডাঙ্গার মানুষ, জলের খবর বিশেষ কিছু রাখি না, বিশেষ করিয়া মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশে যে অজ্ঞাত জগৎ বিরাজমান তাহার খবর তো একেবারেই আমাদের কাছে পৌঁছায় না।

সমুদ্রতলের অজ্ঞাত নশাচর মৎস্য-যূথ।

উইলিয়ম বিব্ একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডুবুরী। গভীর সমুদ্রের প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে ইঁহার মত আজকাল সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে ইনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক। ডুবুরীর পোষাক পরিয়া মিঃ বিব্ অনেক-বার প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তলদেশে নামিয়াছেন, আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রে নামিয়াছেন, পৃথিবীর সপ্তসমুদ্রে নামিয়াছেন। এই অভিযানগুলির বিবরণ অতীব কৌতূহলজনক ও বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ। মিঃ বিবের এইরূপ একটি বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল।

"ডুবুরীর পোষাক পরবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল আমি আনন্দপূর্ণ পার্থিব জীবনের চেতনাকে আর এক নতুন দিকে হাজার হাজার মাইল বাড়িয়ে নিতে চলেচি—এ যেন একটা নতুন গ্রহে ভ্রমণের আনন্দ! কারণ সমুদ্রের তলায় নেমেছেন যাঁরা তাঁরা জানেন ওখানকার জগৎ একেবারে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ডাঙার উপর-কার জগতের সঙ্গে ওখানকার কোনো মিল নেই, সত্যিই মনে হয় যেন অন্য গ্রহের মধ্যে এসে পড়েচি।

অনেকবার যাঁরা সমুদ্রের মধ্যে নেমেচেন তাঁদের মন থেকে সমুদ্রের তলার প্রাণীদের সম্বন্ধে নানা আজ-গুবি ভয় দূর হয়ে গেছে। ছেলে-বেলায় কত গল্প শুন্‌তাম—যেমন অক্টোপাসে মানুষ ধরে খায়, বিষাক্ত কাঁকড়ার দাড়ার ঘায়ে মানুষ মরে, তা ছাড়া হাঙর-মকরের তো কথাই নেই। প্রথম কয়েকবার সমুদ্রের নীচে নেমে বুঝ্‌লাম এসব গল্প কতটা ভিত্তিহীন, ভয় তো দূর হয়ে গেল্‌ই, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সাম্‌নে একটা বিচিত্র সৌন্দর্য্যভরা অজানা জগৎ ফুটে উঠ্‌ল—সে কি অদ্ভুত জগৎ ও কি তার সৌন্দর্য্য,

রহস্য, বিরাটতা! যে কখনো না দেখেচে তাকে বোঝানো যে কি মুস্কিল!

এই নতুন অজ্ঞাত জগতে যে-কেউ নাম্‌তে পারে। এতে বিশেষ কোনো শিক্ষা বা কৌশলের প্রয়োজন হয় না—চাই কেবল একটু সাহস ও ধৈর্য্য, আর অবশ্য চাই নতুন জিনিষ দেখ্‌বার চোখ, জ্ঞান-সঞ্চয়ের স্পৃহা। ডুবুরীর পোষাক পরে জলের তলা থেকে উঠে এসে যে লোক আশ্চর্য্য হয়ে যায়নি, অভি-

ত্রিশ ফিট জলের তলে ডুবুরী নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছে।

ভূত হয়ে পড়ে নি, তাকে বুঝ্‌তে হবে নিতান্ত বর্ব্বর, তার মন এখনও ঠিক মত গড়ে উঠে নি, চোখ এখনও ফোটে নি। বুঝ্‌তে হবে যে শুধু জলের তলায় কেন, ডাঙার ওপরেও সে কোন সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পায় না কখনো, এই পৃথিবীটা এতদিন তাকে কি ফাঁকিই দিয়ে এসেচে!

উদ্ভিদের মত দেখিতে সমুদ্রতলের এই প্রাণীরা অবিরাম আন্দোলিত হয়।

আমি নিউইয়র্ক জীববিদ্যা সমিতির তরফ থেকে আট দশ বার সমুদ্রের মধ্যে নেমেচি। একটা ডুবুরীর পোষাক যোগাড় করা নিতান্ত দরকার—সমুদ্রে নাম্‌তে হল এটার উপকারিতা বুঝেচি, অনেকে শুধু একটা সাঁতারের পোষাক, রবারের জুতো ও কাচবসানো তামার মুখোস পরে নামেন, কিন্তু তাতে জলের চাপে কাণের ভিতরকার পাতলা চামড়ার পাত ছিঁড়ে যেতে পারে, সে বিপদের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। ডুবুরীর পোষাক পরে নামাই সবচেয়ে নিরাপদ। ডুবুরীর পোষাকে প্রথমটা একটু অস্বস্তি মনে হয় বটে, কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেলে কোনো কষ্টই হয় না।

চল্লিশ ফুটের নীচে সাধারণ ডুবুরীর নাম্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ অগভীর জলেই প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য বেশী, এখানে রৌদ্রসম্পাতে যে অপূর্ব্ব বর্ণের সৃষ্টি হয়, গভীর জলে তা দেখা যায় না। আর একটা কথা এই যে যাঁরা প্রবাল ভালবাসেন, তাঁদের এর বেশী নাম্‌বার দরকারই হবে না। পঞ্চাশ ষাট ফুটের নীচে প্রবালকীটের উপনিবেশ নেই বল্লেই হয়, প্রবাল সাধারণতঃ অগভীর জলের প্রাণী। এমন ওস্তাদ ডুবুরী আছেন, যাঁরা হাজার ফুটও নামেন, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে সে সব নিতান্ত বিপজ্জনক। সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়-পর্ব্বত আছে, গুহা-গহ্বর আছে। বে-কায়দায় ডুবুরীর পোষাকের কোনো অংশ কিংবা বাতাসের নল যদি এ সবে আট্‌কে যায়, কি ধারালো পাথরে লেগে কেটে যায়, তবে অনভিজ্ঞ লোক প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না, অভিজ্ঞ ডুবুরী বাঁচলেও বাঁচ্‌তে পারে।

প্রথম কয়েকবার নামবার পর আমার মনে হল এই বিচিত্র প্রাণীদের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে আনা দরকার। বা ওদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার, জলের তলায় বসেই যাতে লিখ্‌তে পারি এ জন্যে ওয়াটার-প্রুফ্‌ কাগজ, দস্তার পাত নীচে নিয়ে গেলাম সঙ্গে। এতে লেখার কোনো অসুবিধা হয় না, মনে হয় যেন ঘরের টেবিলে
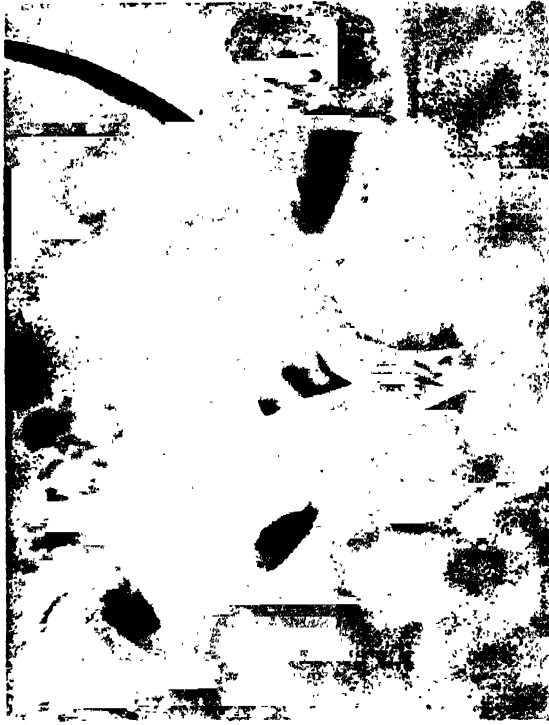
উইলিয়ম বিব্‌ সমুদ্রতলে নোট টুকিতেছেন।

বসে লিখ্‌চি। পেন্সিল দড়ি দিয়ে শক্ত করে হাতের সঙ্গে বেঁধে নিতে হয়, নৈলে জলের চাপে পেন্সিলের কাঠ আলাদা হয়ে ওপরে ভেসে ওঠে, আর সীসেটা জলে ডুবে যায়।

জলের তলায় ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে কতবার ফটো তুলেচি, শক্ত কাচবসানো আঁটাসাঁটা পেতলের বাক্সের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে যেতে হয়, বিশ ফুট পর্য্যন্ত বেশ আলো থাকে, তারও নীচে গিয়ে তুল্‌তে হলে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করা দরকার হয়। এই উপায়ে জলের তলাকার প্রাণীজগতের কত ফিল্‌ম্‌ তোলা হচ্ছে। অনেক চিত্র-শিল্পী এখানকার ছবি আঁকেন। তার জন্যে বিশেষ ধরণের ক্যান্‌ভাস, কাগজ, রং প্রভৃতি কিন্‌তে পাওয়া যায়। মাছের ঝাঁক তাড়াবার জন্যে শিল্পীর কাছে আর এক জন লোক মোতায়েন থাকা দরকার, নৈলে রংয়ের গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে বড় বিরক্ত করে, ঠুক্‌রে ক্যান্‌ভাস ফুটো করে দেয়।

সমুদ্রের তলায় প্রবালদের মধ্যে বসে এ ধরণের ছবি কতবার তুলেচি। কি অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্য সেখানকার। হাঙ্গর বা অক্টোপাসের ভয় কখনো করিনি তবে এক ধরণের ছোট সোনালী মাছে বড় ঠুক্‌রে নেয়, নতুন ধরণের জীব দেখে তাদের কৌতূহলের অবধি থাকে না, ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে পরখ করে দেখ্‌তে চায় এরা কি ধরণের জীব।

সমুদ্রের তলায় আপনার বাগান করবার সখ আছে? আমি কতবার করেচি। একটা ঢালু জায়গা ঠিক করুন, ত্রিশবত্রিশ ফুটের নীচে যাবেন না। একটা কুড়ুল কিংবা বড় ছুরির সাহায্যে পছন্দমত নানা বর্ণের প্রবালের ডালপালা কেটে এনে ওখানে বসিয়ে দিন, পাহাড়ের ফাটল হল ভাল হয়, নতুবা জলের তোড়ে ভেসে যেতে পারে। কিছু-দিন পরে ফিরে এসে দেখ্‌বেন আপনার বাগানে বিচিত্র বর্ণের প্রবাল ফুটে আছে, তাদের ডালপালার মধ্যে কত রকমের ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্চে, যেন রঙিন প্রজাপতির ঝাঁক! নানারঙের ঝিনুক খুঁজ্‌তে হলে একটা অক্টোপাসের বাসা খুঁজে বার করা দরকার। উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রে অক্টোপাস প্রায়ই অগভীর জলে বাসা বাঁধে, পাহাড়ের ফাটলে কিংবা গুহায়, শৈবালদলের অন্তরালে। অক্টোপাসের বাসার চারিধারে ঝিনুক ছড়ানো পড়ে থাকে, কারণ অক্টোপাস ঝিনুকের শাঁস খেতে খুব ভালবাসে।

সমুদ্রের তলায় যে অপূর্ব্ব দৃশ্যরাজি আছে, যে বর্ণাঢ্য প্রবাল-উপনিবেশ মহিমায় খুব সৌখীন মোরশুমী ফুলে ভরা বাগানকেও হার মানায়, তার কথা অনেকেই আজগুবি বলে মনে করে থাকেন, বিশেষতঃ যাঁরা নিজের দেশটি ছেড়ে কখনও বিদেশে যান নি, যিনি ছবিতে ছাড়া কখনও সমুদ্র দেখেন নি, এমন লোকেরা। তাঁদের অবগতির জন্যে বলি তাঁরা যেন একবার ডুবুরীর পোষাক পরে জলের তলায় নেমে দেখেন।

সমুদ্রতলের জগৎ (সমুদ্রতলে বসিয়া শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত)।

জলের তলাকার প্রাণীদের দেখ্‌তে হলে জলের তলায় গিয়েই দেখ্‌তে হয়—তাদের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে দেখার চেষ্টা করাই ভালো। এখানেই তারা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে যুদ্ধ করে মানুষ হচ্চে, বিবর্ত্তনের ছন্দে তাদের এই অগ্রগতির আসল রূপটি এখানেই ঠিক ধরা পড়ে।

জলের মধ্যে নাম্‌বার জন্যে ডুবুরী জাহাজে সাধারণতঃ ধাতুনির্ম্মিত সিঁড়ি ব্যবহৃত হয়, দড়ির মই লোনা জলে পচে যায়। সিঁড়ি বেয়ে জলে নাম্‌লেই একেবারে অন্য জগতে গিয়ে পড়তে হবে, প্রথমে বড় বড় সামুদ্রিক শেওলার রীতিমত ঘন অরণ্য, তার পর ছোটখাটো রঙীন্ মাছের রাজ্য, তারপরে ঝিনুককড়ির দেশ, সর্ব্বশেষে প্রবাল-উপনিবেশ, এই গেল ষাট ফুট পর্য্যন্ত। তারও নীচে নানা অদ্ভুতদর্শন বাইন মাছ, ঘোড়া মাছ, করাত মাছ, হাঙর প্রভৃতির রাজ্য, তারও নীচে অন্ধকার তলদেশে আরও বিচিত্র প্রাণীজগৎ, কিন্তু সাধারণ ডুবুরীরা তত্দুর নাম্‌তে বড় একটা ভরসা করে না।

উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রে দশ বার ফুট নীচে চিংড়ি মাছের ঝাঁক দেখা যায়, জাপান সমুদ্রে এই রকম জলে একধরণের রাক্ষুসে কাঁকড়া বেড়ায়, তাদের দাড়া ছ'সাত ফুট লম্বা। জেলি-মাছ, কাট্‌ল মাছ, নক্ষত্র মাছও এই রকম অগভীর জলেই দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশের সমুদ্রে প্রবাল খুব কম, একরকম নেই বলা চলে, যদিও দু এক জাতীয় প্রবাল দেখা যায়। উষ্ণ মণ্ডলের প্রবালদলের অপূর্ব্ব বর্ণসমৃদ্ধি তাদের নেই। নিউইয়র্কের নিকটে সমুদ্রে ডালপালাওয়ালা একধরণের প্রবাল

ডুবরী টোপ দেখাইয়া সমুদ্রতলের মাছাদগকে খেলাইতেছে।

আছে, চারপাঁচ বছরের মধ্যে তারা reef অর্থাৎ বাঁধ তৈরী করে—প্রবালের বাঁধের নিকট দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া
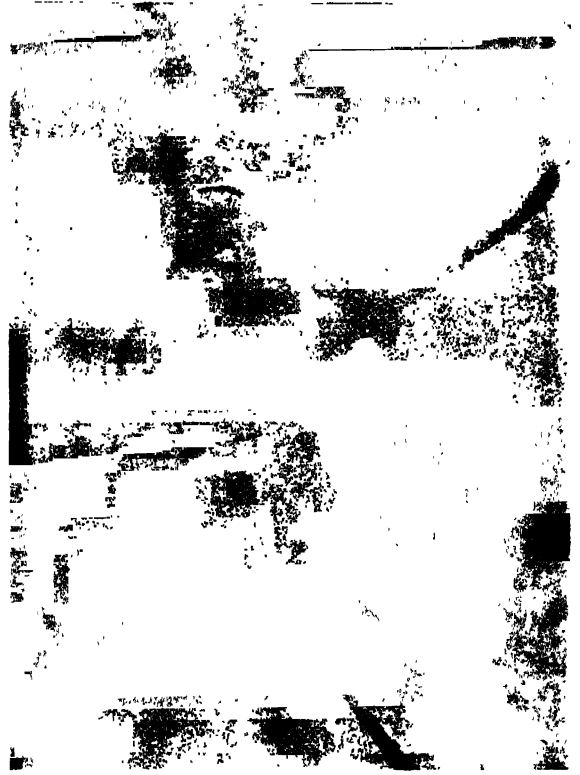
সমুদ্রতলে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হইতেছে।

অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সব প্রবাল উপনিবেশে একধরণের সুদৃশ্য সামুদ্রিক কাঠবেড়ালী দেখা যায়, তাদের চোখ বড় বড়, রং টকটকে লাল। বারমুডা দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে এক জাতীয় কাঠবেড়ালী আছে, তারা রামধনু রংয়ের।

প্রথমে প্রথমে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা ডুবুরি পোষাক পরা মানুষ দেখে ভয় পেয়ে কাছে ঘেঁসে না—কিন্তু বার কয়েক একই জায়গায় নাম্‌বার পরে ওদের ভয় কেটে যায়। তখন তারা কৌতূহলের সঙ্গে এগিয়ে দেখতে আসে। ওদের সঙ্গে তখন যেন একটা বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যায়।

যাঁরা কখনো সমুদ্রের মধ্যে নামেন নি, তাঁরা যদি প্রথম বার রাত্রে নামেন, তা হলে সামুদ্রিক জীবনের বৈচিত্র্য যে কত অদৃষ্টপূর্ব্ব তা বুঝবার সুযোগ পাবেন। সমুদ্রের তলদেশ স্বয়ম্প্রভ জীবকুলের রাজ্য—অধিকাংশ মাছ, প্রবাল,

ঝিনুক, চিংড়ি, এদের শরীর থেকে রাত্রে আলো বার হয়—সে আলো কেমন তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব, সমুদ্রগর্ভ

সমুদ্রতলের বায়োস্কোপে তোলা ছবির নমুনা

ছাড়া সে ধরণের আলো আর কোথাও জ্বলে না। তারা-খচিত অন্ধকার রাত্রে একদিন উষ্ণমণ্ডলের যে কোনোও স্থানে সমুদ্রে ডুবে দেখলে জীবনে যে কি জ্ঞান ও আনন্দ-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে যাবে! দেখ্‌বেন সমুদ্রগর্ভের অন্ধকার ভেদ করে মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ আলোর পাখার জল আলোড়িত করে চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি লক্ষ লক্ষ আনুবীক্ষণিক সামুদ্রিক জীবাণু ঢেউয়ের ভেতর জোনাকী পোকার মত জ্বলে উঠ্‌ল—দেখ্‌বেন কোনো চিংড়ি মাছের শরীর দিয়ে নীল আলো, কোনো পোকার শরীর থেকে রা-

সমুদ্রতলের অদ্ভুত উদ্যান

মশালের মত আলো, কোনো প্রবালদল থেকে চাপা ধরণের সাদা আলো বার হচ্ছে—এসব বর্ণনা করবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কখনো দেখেনি, তাকে এর সম্যক্ মহিমা বোঝানো যায় না।

জাপানী চন্দ্রমল্লিকা কি চেরী দেখে আপনারা কত তারিফ্ করেন, জাপানসমুদ্রে একবার ডুব দিয়ে দেখ্‌বেন। সমুদ্রের নীচে যা প্রাকৃতিক ফুলের বাগান আছে, তাদের বৈচিত্র্য, রং, সৌন্দর্য্যের কাছে ডাঙার ফুল লজ্জায় মুখ লুকোয়। তবে সামুদ্রিক ফুল উদ্ভিদ্ নয়—জীবন্ত প্রবাল; দু'এক স্থানে জলের মধ্যের শেওলায় পাতা এমন চমৎকার সাজানো, মনে হয় মানুষে যেন সারি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে।

জাপান-সমুদ্রে এক রকম বৃহদাকার রাক্ষুসে কাঁকড়া আছে, তার পিঠের খোলায় দৈত্যের মুখের মত নাক চোখ আঁকা—সামুরাই যুগের অনেক বিকটাকার যুদ্ধের দেবতার মুখ এই কাঁকড়া থেকে পরিকল্পিত।

মরুভূমির মধ্যে সেথিকার চাঁদ।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে অদ্ভুত ধরণের সামুদ্রিক জীব ও প্রবাল অপেক্ষাকৃত অগভীর জলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হাওয়াই দ্বীপ থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্রেলিয়ার গ্রেটবেরিয়ার রীফ, Great Barrier Reef পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটি ছোটখাটো নানা ধরণের প্রবাল-দ্বীপে ভরা। এত ধরণের, এত রংয়ের প্রবাল, ঘোড়া মাছ, ঝিনুক, সামুদ্রিক উদ্ভিদ এ অঞ্চলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, এ অঞ্চলকে ডুবুরীর স্বর্গ বলা যেতে পারে। প্রত্যেক জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের উচিত অন্ততঃ জীবনে একবারও যেন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কোন প্রবাল-দ্বীপের নিকটে স্থির জলে ডুব দিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ খুঁজে নেওয়া। খুব বড় আর্টিষ্ট এ সব অঞ্চলের সমুদ্রগর্ভের সমগ্র রূপ একটি হাজার ছবি এঁকেও বোঝাতে পারবেন না।

অষ্ট্রেলিয়ার এই অঞ্চলে সমুদ্রগর্ভে এক ধরণের বড় ঝিনুক আছে। তাদের খোলা পাঁচ ফুট লম্বা, ওজনে অনেক সময় ছ'মণ পর্য্যন্ত হয়। এরা সমুদ্রের মধ্যে গুহায় লুকিয়ে থাকে—এদের খোলার ওপরে সবুজাভ কালো ছাতলা জমে থাকে বলে পাথরের স্তূপের মত দেখায়। দৈবাৎ কোনো ডুবুরীর পা যদি তার খোলার ফাঁকে পড়ে, তবে ইঁদুর-কলের মত তখনি ওপরকার খোলাটা ঝপ্ করে বন্ধ হয়ে যায়। ডুবুরির সাধ্য থাকে না পা ছাড়িয়ে নেবার। মুক্তা তুলবার সময় কত অনভিজ্ঞ ডুবুরি এভাবে প্রাণ হারিয়েচে।"

আরিজোনার মরুভূমিতে

সম্প্রতি জনৈক মার্কিন মহিলা অশ্বপৃষ্ঠে একাকিনী আরিজোনার মরুভূমি অঞ্চলে প্রায় তিন চার হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন—মরুভূমিবাসী হোপি ও নাভাজো ইণ্ডিয়ানদের রীতি-নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য। তাঁর এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব কৌতূহলপ্রদ। রেড্ইণ্ডিয়ানদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর অনেক খুঁটিনাটি আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি।

তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে নিয়ে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করা গেল।

"অনেক দিন থেকে মনে সাধ ছিল আরিজোনার মরুভূমিতে গিয়ে নাভাজো ইণ্ডিয়ানদের দেখব। মোটরগাড়ী চেপে ওখানে যাবার ইচ্ছা আমার কোন দিনই ছিল না। চিরকালই ভাবতাম যদি কোনো দিন যাই, ঘোড়ায় চেপে

ইণ্ডিয়ান গ্রামের দৃশ্য ; পাশে জনৈক গ্রামবৃদ্ধ।

কোলো ক্যানিয়ন, মরুভূমির মধ্যে একটি পাহাড় নদখাতে।

পুরানো দিনের পথ ধরে যাব—যে পথ ধরে একদিন আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এসে দক্ষিণপশ্চিমের এই বিরাট মরুভূমি জয় করেন, এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

সভ্যতা-দুষ্ট সহরের জীবনযাত্রা-প্রণালী, সহরের আবহাওয়া আমার বিষের মত ঠেকে। তাই একদিন সত্য সত্যই ঘোড়ায় চেপে অজানার উদ্দেশে একা বেরিয়ে পড়লুম—তার পর যখন মুক্ত প্রান্তরে ঘোড়া ছুটতে লাগল, মুক্ত হাওয়ায় তার কেশর ফুলে উঠল—দূরে নীল অনাবৃত গঠিত পর্ব্বতমালা দেখা গেল—তখন আমার মনে হল, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধনীর সঙ্গেও আমি এখন ভাগ্য বিনিময় করতে রাজি নই।

বৈকালে আমি ইণ্ডিয়ানদের একটা গ্রামে পৌঁছলাম। এখানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ আছে।

কিছুক্ষণ এসব দেখে বেড়ানো গেল। হঠাৎ মনে পড়ল, সাম্নে বিস্তীর্ণ মরুভূমি, আমার সঙ্গে জল তো বেশী নেই। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একটা কূপ পাওয়া গেল। জনচারেক নাভাজো ইণ্ডিয়ান্‌ সেখানে ঘোড়াকে জল খাওয়াচ্ছিল—আমায় দেখে তারা খুব খুসি হল, দুটি বালক দড়ি-বাল্‌তি নামিয়ে দিয়ে জল তুলে আমার ঘোড়াকে জল খাওয়ালে। আমাকেও জল দিতে যাবে এমন সময় একখানা বড় মোটরগাড়ী বোঝাই হয়ে একদল টুরিষ্ট্‌ এসে পৌছুল—কর্ত্তা, গিন্নি, তিনটি ছেলে-মেয়ে। তারা এসে কোনো কিছু না বলেই বিস্মিত নাভাজো বালকটির হাত থেকে জলপূর্ণ বাল্‌তিটা কেড়ে নিয়ে নিজেরা পেট পুরে জল খেলে বা বাকী জলটুক্‌ মাটীতে ঢেলে ফেলে দিলে। এই জলহীন মরুপ্রান্তে ওইটুকু জলের মূল্য যে কি, তা এই হঠাৎ বড়লোক বর্ব্বরেরা কি জান্‌বে!

জলটল খেয়ে তারা নিকটেই একটা ইণ্ডিয়ানদের কুটীরে ঢুকল। যেন নিজেদের বাড়ী, নিজেদেরই সব। কারুর কাছে অনুমতি নেওয়ার কথাটা পর্য্যন্ত ওদের মনে পড়ল না। বড় মেয়েটা একটা আধ-বোনা কম্বল হাতে নিয়ে সুতো খুলে খুলে দেখতে লাগল, জিনিষটা কি ভাবে তৈরী হয়েচে। মা দু' একবার বারণ করলেন, কিন্তু বড়লোকের আদুরে মেয়ে সে কথায় কানও না দিয়ে কম্বলটার সুতো ছিঁড়েই চলেছে। দেখে আমার ভারী রাগ হল—আমি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ঘরের বার করে দিয়ে বল্লুম—যাও, বেরোও এখান থেকে—টাকা হয়ে থাকে অন্য জায়গায় গিয়ে বড়-মানুষি দেখাও গিয়ে, গরীবের কুঁড়েতে কেন এসেছ মেজাজ দেখাতে!

ওরা বিদেয় হল। কুটীরের কর্ত্তা আমার দিকে সকৃতজ্ঞ হাসিমুখে চেয়ে বল্লে—অথচ এরাই আমাদের অসভ্য বলে থাকে।"

রজনীগন্ধা

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

হৃদয় আমার, জাগো গো বন্ধু জাগো,
ফুটেছে গোপনে রজনীগন্ধা ফুল—
এতদিন যারে চেয়ে কভু দেখ নাই,
ঘুরিয়া বেড়েছে বক্ষের বেদনাই,
আজ চেয়ে দেখ সরস-পরশ-লোভী
রক্ত-অধর-চুম্বন-বেয়াকুল—
তিমির-বিরল নিশীথ বসনে শোভি'
ফুটেছে আমার রজনীগন্ধা ফুল!

হৃদয় আমার, ভেবেছি ক'ব না কথা
গান গাহিব না যদি বা অশ্রু ঝরে;
বুকে যত বাজে শাণিত শায়কগুলি
দৃষ্টি ফিরা'য়ে রুধির-ক্ষরণ ভুলি,
যত ঘন ঘোর খর বরষণ আসে,
প্রেতসম ঘুরি নির্জ্জন পথ 'পরে—
সুরগুলি মোর তারায় তারায় ভাসে;
গান গাহি নাক' যদি বা অশ্রু ঝরে!

হৃদয় আমার, এ জীবন শেষ হ'বে,
আমার ধরণী মিলা'বে স্বপ্নসম—
যত ছায়া আসে মনে যত বাসি ভয়,
বিরহ-ভাবনা ঘন রোমাঞ্চময়—
রূপে রূপে তা'র তত বিকশিত দেহ;
দাহন-আবেগে বক্ষ দহিছে মম।
ভাঙিবে আসর ধূলি ধূসরিবে গেহ,
ধরণী মিলা'বে সুদূর স্বপ্নসম!

হৃদয় আমার, কোনো কথা নয় আর,
মনের গহনে নয়ন পেয়েছে কূল—
শেষ ক'রে দাও যত অভিনয়-ভাণ
নিবিড় ব্যথায় কথা হোক্‌ সমাধান—
দু'হাতে সরায়ে তম-পল্লবদলে
আজ রজনীতে একবার কর়ো ভুল!
সারা ধরণীর শ্মশানের কোলাহলে
ফুটেছে আমার রজনীগন্ধা ফুল!

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : দ্বিতীয় যুগ (৪)

—শ্রীসুকুমার সেন

দ্বিতীয় প্রবন্ধে [বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগের গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। এই ক্রটি এখন সারিয়া লইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে সকলে হয়ত জানেন না যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শুধু একজন বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি বাঙ্গালা ভাষার একজন বড় লেখকও ছিলেন। ইঁহার ভাষা অবশ্য সংস্কৃতঘেঁষা ছিল। ইনি সরল বাক্য প্রয়োগ অপেক্ষা জটিল ও যুক্ত বাক্যের (complex and compound sentence) অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যও অত্যধিক ছিল। ইঁহার ভাষার সৌন্দর্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা হইতে হীন হইলেও, ইহার মধ্যে জোর ছিল, এবং তিনি যে যে বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন—প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক—সেই সেই বিষয়ের পক্ষে তাঁহার ভাষা যে যথেষ্ট উপযোগী ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তথাপি ইঁহার রচনায় ইংরেজী বাক্য-রীতির ছাপ একেবারেই নাই। বরঞ্চ সংস্কৃত বাক্য-রীতির ছাপ একেবারে দুর্ল্লভ নহে। যেমন, "উক্ত গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়"—(এখানে 'হয়' এই ক্রিয়া পদের প্রয়োগ সংস্কৃত 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদের অনুবাদ মাত্র); "কাশ্মীর জাতীয় লোকেরা আর এক বস্তু সমাহরণে আশ্চর্য্য প্রকারে প্রবর্ত্তমান হয়।"

বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ছাড়াও রাজেন্দ্রলাল বিশুদ্ধ "সাহিত্যিক" রচনায়ও যথেষ্ট গুণপনা দেখাইয়াছেন। প্রথম বর্ষের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' [কার্ত্তিক সংখ্যা ; শকাব্দ ১৭৭৩=খ্রীষ্টিয় ১৮৫১ সাল] হইতে একটি ছোট 'কৌতুককণা'[১] উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বিশেষণ শব্দের বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ লক্ষণীয়।

এক চোক্ ভাল কি দুই চোক্ ভাল

অনেক একচক্ষুহীন আপন অবশিষ্ট নয়নের প্রশংসায় কহিতেছিল যে আমি নয়ন দ্বারা অনেক দ্বিনেত্র ব্যক্তি হইতেও অধিক দেখিতে পাই। তৎসভাস্থ কোন দ্বিনেত্রবলগর্ব্বিত এতদ্বাক্যে অমর্ষান্বিত হইয়া কহিলেন, "যদি তুমি একথা সপ্রমাণ করিতে পার তবে আমি তোমাকে শত মুদ্রা দিব।" অন্ধ ঐ পণে স্বীকৃত হইয়া কহিলেক ; "আমার মুখের উপর তুমি কি দেখিতেছ"। দ্বিনেত্রবলগর্ব্বিত ব্যঙ্গ করত কহিল, "তোমার এক চক্ষু"। অন্ধ কহিলেক ; "ভালই, তবে আমি অধিক দেখিয়াছি, কারণ তোমার দুই নয়ন আমার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে, অতএব পণের একশত টাকা আমাকে দেও"।

প্রথম যুগের রচনায় যেরূপ বিভিন্ন ধরণের বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা একত্রে গ্রথিত হইত, রাজেন্দ্রলালের রচনায়ও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। যেমন, "ইতিহাস বিষয়ে এতদ্দেশে যে প্রকার অনাদর, পুরাবৃত্ত বিষয়েও তদ্রূপ ; ও কেহ কোন প্রাচীন স্থানের কিংবা ব্যক্তির আখ্যান অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইলে অনেকে তাঁহাকে উপহাসও করে।" [বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রথম বর্ষ, পৃঃ ৫১]।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সাহিত্যসৃষ্টি খ্রীষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে আরম্ভ হইলেও তাঁহার প্রধান রচনাগুলি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্যের দিক দিয়া সিংহ মহাশয়ের নাটকগুলি মূল্যহীন না হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ মহাভারতের অনুবাদ[২] ও 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা।' মহাভারতের অনুবাদে কালীপ্রসন্নের রচনা কতটুকু আছে তাহা বলা দুষ্কর, ইহা অনেক পণ্ডিতের রচনা। আদিপর্ব্বটুকু প্রায় সমস্তই বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছিলেন। তবে বিভিন্ন অনুবাদকের রচনার সামঞ্জস্য সম্পাদন বোধ হয় কালীপ্রসন্নেরই কীর্ত্তি, আর এই কীর্ত্তি নেহাত তুচ্ছ নয়।

শকাব্দ ১৭৮২ (=খ্রীষ্টিয় ১৮৬০) সালে বৈশাখ মাস হইতে কালীপ্রসন্ন 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর নবপর্য্যায় বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে তিনি যে সম্পাদকীয় ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই অংশ পাঠ করিলে বুঝা যইবে যে সাধুভাষার রচনায় সিংহ মহাশয় কতদূর সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বিবিধার্থ এতাবৎকাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পুর্ব্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—

১ বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রত্যেক সংখ্যায় রাজেন্দ্রলাল 'কৌতুককণা' এই নামে ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে হাস্যরসাত্মক ছোট ছোট "কণিকা" প্রকাশ করিতেন। 'কৌতুককণা' নামটী বেশ উপযোগী।

২ মহাভারতের অনুবাদ খ্রীষ্টিয় ১৮৬৬ সালে সমাপ্ত হয়।

যিনি বাঙ্গালি ভাষারে বিবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎপত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন, বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্যনির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। অনুবাদক সমাজ, বিবিধার্থ সহৃদয় সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি। [ইত্যাদি]।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' কেবল কালীসিংহের নহে, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্য-রসিকদিগের আদরের বস্তু। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ইংরেজী ১৮৬২, শকাব্দ ১৭৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।[১] বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'ও এই সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'হুতোম' প্রকাশ হইতেই সাহিত্য সমাজে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, কতক দল ইহার বিরুদ্ধ হইল, এবং কতক দল—যাহারা সংখ্যায় অল্প—তাহারা ইহার পক্ষপাতী হইল। বিরুদ্ধ দলের বিরূপতার দুইটী কারণ ছিল—(১) ভাষার অভিনবতা, বা তাহাদের মতে নীচতা, এবং (২) ভাবের অশ্লীলতা। আর যাহারা ইহার পক্ষপাতী হইলেন তাঁহাদেরও দুইটী যুক্তি ছিল—(১) ভাষার বৈচিত্র্য ও সরসতা এবং (২) সামাজিক দুর্নীতি প্রদর্শন। বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি দুইটীর সম্বন্ধে আমরা কিছু বিচার করিব। তাহার পূর্ব্বে হুতোমের ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' পড়িতে গেলে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে মৌখিক ক্রিয়াপদের অজস্রতা এবং ঐ ক্রিয়াপদের (ও কতক কতক তদ্ভব শব্দের) অদৃষ্টপূর্ব্ব উচ্চারণ-ঘেঁষা বানান। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এও মৌখিক ক্রিয়াপদের প্রাচুর্য্য ছিল বটে, তবে বানান এতটা পরিমাণে উচ্চারণ-ঘেঁষা ছিল না আর মৌখিক ক্রিয়াপদের সহিত লৈখিক ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হওয়াতে গুরুচণ্ডালী দোষের আধিক্য ছিল। হুতোমে এই দোষ নাই বলিলেই হয়।

'করিতে' এই ক্রিয়াপদের মৌখিক রূপ 'কর্ত্তে' ও 'কত্তে' দুইই ব্যবহার করা হইয়াছে। পদের আদি অক্ষরে একার উচ্চারণ থাকিলে তাহা য-ফলা দিয়া লেখা হইয়াছে, যেমন, 'দ্যেখে' (=দেখিয়া), 'ব্যেঁধে,' 'প্যেকে,' 'ফ্যেলে,' 'ব্যেখালেন' 'ঢ্যোলে,' 'স্যেজে,' 'হ্যাঁটু গ্যেড়ে,' 'ছ্যোলে,' 'ন্যেড়ে' চীফ,' 'স্যেক হ্যাণ্ডস্,' ইত্যাদি। ক্বচিৎ পদমধ্যস্থিত একার উচ্চারণ দেখাইতেও য-কার ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন, 'পাড়াগেঁয়ে'। মহাপ্রাণ বর্ণ প্রায়ই অল্পপ্রাণ করা হইয়াছে—অর্থাৎ ব্যঞ্জনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মৌখিক উচ্চারণ অনুযায়ী প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে রূপান্তরিত ভাবে লিখিত হইয়াছে, যেমন, 'মাতা' (=মাথা), 'মাট' (=মাঠ), 'মিচে' (=মিছে), 'কাচে' (=কাছে), 'লাপিয়ে', (=লাফিয়ে), 'পাকি', (=পাখী), 'বাগ' (=বাঘ), 'বাঁদা' (=বাঁধা), ইত্যাদি। তৎসম শব্দেও ক্বচিৎ এইরূপ হইয়াছে: যেমন, 'রতে' (=রথে) ইত্যাদি। একারের বিবৃত উচ্চারণ 'অ্যা' এইরূপে দেখান হইয়াছে। উচ্চারণের অনুকৃতিতে 'নাচ্‌তে নাচ্‌তে' 'নাস্তে নাস্তে' এই রকম লেখা হইয়াছে। অকারান্ত শব্দের ওকারান্ত উচ্চারণ হইলে তাহা ও-কার দিয়াই লেখা হইয়াছে; যেমন 'ঈশ্বর গুপ্তো।'

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বিশেষ উপভাষার ছাপও হুতোমের মধ্যে যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। নিম্নের উদাহরণগুলি হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

'কবার' (=কইবার), 'নেছেন' (=নিয়েছেন), 'বলেছেল' (=বলেছিল), 'পাধ্‌ধুলো' (পায় ধুলো=পায়ের ধূলো), 'আলো নিব্‌য়ে' (=নিবিয়ে), 'সিটি' (=সে-টি), 'ইটি' (=এ-টি), 'দ্যে গ্যাল' (=দিয়ে গেল), 'নাপাতে নাপাতে' (=লাফাতে লাফাতে), 'নড়াই' (=লড়াই), 'বাসা' (=বাসা), 'হাসবেন', 'পৌত্তুরী' (=পৌত্রী), 'ভটচাজ্জিরে' (=ভট্‌চাজ্জিরা), 'বাবুরো' (=বাবুরা), 'কারুই,' 'কারুরই' (=কাহারই), 'ডেড়মন' (=দেড় মন), 'পাইনে' (=পাই না), 'বাই কল্লেন' (=বাহির করলেন), ইত্যাদি। 'দাঁড়ালেম', 'জ্বলতেছিল' ইত্যাদি পদও

---

১ প্রথম সংস্করণে দুইটী টাইটেল পত্র ছিল, প্রথমটী ইংরেজী ও দ্বিতীয়টী বাঙ্গালা। গ্রন্থের নাম এই রকম ছিল—Sketches by Hootum | illustrative of | Every Day life and Every Day | People | Vol I হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। (প্রবন্ধ কল্পন।) প্রথম ভাগ।

আছে আবার 'পড়্‌তুম' ইত্যাদি প্রকৃত কথ্যভাষার পদেরও অসদ্ভাব নাই।

'-রে' প্রত্যয়ান্ত দ্বিতীয়া-চতুর্থীর পদের প্রয়োগ এক কালে কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষার বিশেষত্ব ছিল। হুতোমে ইহার প্রয়োগ খুবই আছে, '-কে' প্রত্যয়ও সমান ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের বহুবচনে '-এরা' প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে '-রা' প্রত্যয় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, 'মাতাল্‌রা,' 'উড়ে বামুন্‌রা' ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে এই '-রা' প্রত্যয় সাহিত্যের ভাষায় খুব জোর ভাবে চলিতেছে।

বাক্যের মধ্যে বন্ধনীস্থিত (parenthesis) বাক্যের প্রয়োগ হুতোমের ভাষার একটী বড় বিশেষত্ব। নিম্ন উদ্ধৃত উদাহরণ দুইটীতে অতীত কালের স্থলে বর্ত্তমানের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইহা তৎকালে প্রচলিত রীতি ছিল। 'সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভায়া দখল করা হয়;' 'কেবল. তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিন্‌তে পারেন নাই বলেই শুদ্ধ পায়ে আসা হয়।'

তখনকার দিনে ভদ্র সমাজে যে সকল ফারসী ও ইংরেজি কথা চলিত ছিল, কালীপ্রসন্ন তাহা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ যত আরবী ফারসী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে হুতোমে তত নাই। ইহার কারণ, হুতোমে আদালত সম্পর্কীয় কোন ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই, এবং ইতিমধ্যে আরবী ফারসী কথায় ব্যবহার কিছু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল।

হুতোমের ভাষার অন্যতম প্রধান গুণ হইতেছে 'সরসতা' (humour)। সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম না হইলেও ইহা খাঁটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রাম্যতাদোষবর্জ্জিত সরসতা ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা দেয় নাই। নাটকাদিতে যাহা দেখা যায় তাহা ভাঁড়ামির অন্তর্গত বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। এখন সরসতার কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শুভঙ্করী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো। [প্রথম সংস্করণ.

শহর শর্ম্মিতে একদিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে বেড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের এক মুহুরী বল্লে—[পৃঃ ৯৫]।

ক্রমে দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়্‌লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের যোড়হস্ত করা পাথরের গড়ুরেরও আহ্লাদের সীমে রইল না। [পৃঃ ১০১]।

নেমন্তন্নে বামুন বা সরকার রামগোছের এক ফর্দ্দ হাতে করে কাণে উড়েন্ পানসাল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তন্নো সেরে যান, ছেলেটী কেবল টিকাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে। [পৃঃ ১১৩]।

রসরাজ সম্পাদক চামর ও নপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণবাড়ি ঢুকলেন! [পৃঃ ১১৮]।

আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যামবিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে একখানা ছাবান ছেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি, তাতেই শুনলেম যে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো। [পৃঃ ১২৯]।

ইংরাজী পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্যেসাগরের উপোর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই—বিশেষত শব্দের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটীও তার জানা ছিলো, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলীও "বাপ কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"র দলে পড়্‌তে হয়। [পৃঃ ১৫৫]।

হুতোমী ভাষায় যে গম্ভীর রচনা অসম্ভব নয় তাহা 'হুতোম' হইতে উদ্ধৃত এই অংশটী হইতে পরিস্ফুট হইবে।

হায়! যাদের জন্ম গ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না! সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ একশ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এদেশে এসেচেন কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে? [পৃঃ ১২৫]।

প্রধানতঃ ব্যঙ্গ ও রস-রচনা হইলেও এবং হালকা ভাষায় লিখিত হওয়া সত্ত্বেও হুতোম প্যাচার নক্‌শার মধ্যে মৌলিক উপমা প্রভৃতির প্রয়োগ ইহার ভাষাকে মধ্যে মধ্যে গম্ভীর রচনার শান্তশ্রী প্রদান করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আবার ঈষৎ ব্যঙ্গের ভাব মিশ্রিত থাকায় ইহা পরম উপভোগ্য হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি।

ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাচাতে ভ্যাচাতে চলে গেলেন, বর্ত্তমান স্কুল মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন, আমরা ভয়ে হয়ে তটস্থ ও বিস্মিত। জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুক্‌পুক্ করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠলে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুরগুর্ করে, মড়ঞ্চে পোয়াতীর বুড় বয়সে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়্‌লেন। [পৃঃ ২০]।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হুতোমের ভাষাতে বন্ধনীস্থিত বাক্যের (parenthetical sentence) ব্যবহার খুবই বেশী দেখা যায়। এখানে তাহার একটী উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দিতেছি।

বৈংথাও 'অসৈরণ সৈন্ত নারী সিকেয় বসে ঝুলে মরি' সং—অসৈরণ সইতে নারী ১ মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে থাওয়া, পেনটুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট ২ চাপকাণ পরা (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা। রাত্তিরে থানায় পড়ে ছুচো ধরে খান। দিনের বাঙ্গালা রিফারমেসনের স্পিচ্ করেন দেখে সিকেয় ঝুল্‌চেন! [পৃঃ ৪৫]।

বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা'র উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। অথচ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন! 'আলালের ঘরের দুলাল' মৌখিক ভাষায় প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বাঙ্গালা উপন্যাসের সূত্রপাত করিয়াছে তাহা ভুলিলেও চলিবে না। এ সকল সত্ত্বেও আমরা বলিব যে আলালের ভাষায় বহু দোষ আছে, এবং ভাষা হিসাবে ও রসরচনা হিসাবে 'হুতোম', 'আলাল' হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। দুইটী কারণে বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা'কে পছন্দ করিতেন না, প্রথম কারণ ইহার অশ্লীলতা দোষ, দ্বিতীয় কারণ গ্রন্থকারের মক্ষিকাবৃত্তি ও গুণগ্রাহিতার অভাব।

হুতোম প্যাচার নক্‌শার মধ্যে যে চারিটী প্রস্তাব আছে তাহার মধ্যে 'মাহেশের রথযাত্রা' ছাড়া আর কোন প্রস্তাবে রুচিবিরুদ্ধ কিছু আছে কিনা সন্দেহ। অপর প্রস্তাব গুলির মধ্যেও দুটী একটী আধুনিক কালে অব্যবহৃত বা অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া এমন কিছুই নাই যাহা রুচিবিরুদ্ধ (indelicate) বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। যাহাকে অশ্লীলতা বলে এমন কিছু হুতোমের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বঙ্কিমবাবুর সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিবাগীশতার আধিক্য আসিয়া গিয়াছিল, আর এই রুচিবাগীশতা বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের একটী প্রধান বিশেষত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে একটী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অত্যধিক রুচিবাগীশতার দরুণই বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র প্রশংসা করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু'র যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন [বঙ্গদর্শন, ১২৮১ শাল]। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে 'কল্পতরু' হুতোম অপেক্ষা রুচিবিরুদ্ধ। তবে ইহাতে দুই একটী অধুনা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ব্যবহৃত "স্বামী" বা "স্ত্রী"-বাচক তদ্ভব শব্দের ব্যবহার নাই। এই শব্দগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি ছিল।

হুতোমের গ্রন্থকারকে কেবল দোষদর্শী বলিলে তাঁহার উপর অত্যন্ত অবিচার করা হয়। বইখানি রচনার উদ্দেশ্য তৎকালীন সমাজের দোষ ত্রুটি প্রদর্শন, সুতরাং সেজন্য গ্রন্থকারকে কিছু বলা চলে না। সমাজের তিনি এক পিঠই দেখাইয়াছেন। অপর পিঠ দেখান নাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে অনুযোগ করিতে পারি, অভিযোগ করিতে পারি না।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা'র যথাযোগ্য সমাদর না করিলেও ইহার ভাষার ও ভঙ্গীর অনুকরণ ও অনুসরণকারীর অভাব হয় নাই। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনারীতি হুতোমী প্রভাবে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে হুতোমেরই শিষ্যানুশিষ্য বলিলে বিশেষ ভুল করা হইবে না।

ভূদেব বাবুর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কোন্ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে ইহা যে খ্রীষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে রচিত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পুস্তকখানি 'Romance of History' নামক ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ইহা বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত হইলেও অধিক মাত্রায় সংস্কৃতঘেঁষা। নিম্নে উদাহরণ দিতেছি।

যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণ-ধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃতি হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষদৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমসুখের প্রধান বস্তু করিয়া দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্ত্তৃক সেই বস্তু দ্বারাই কি রকম বিপাকে পতিত হইতেছে। [ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৪ ১৫]।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' সন ১২৮২ (= খ্রীষ্ট ১৮৭৫) ৬ই কার্ত্তিক হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে 'এডুকেশন গেজেট'-এ বাহির হইতে থাকে। এই বইটির ভাষা সংস্কৃত-

১ = নারি (পারিনা)। ২ = cut.

ঘেঁষা হইলেও বেশ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়াও অভিনব। ইহার যতদূর আদর হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই, ইহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্যগগনে দেদীপ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

তিনি যে সময়ে উঠিতেছিলেন তৎকালে উত্তরদিকস্থ পটমণ্ডপ হইতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যচ্ছন্দ একজন কৃশাঙ্গ যুবাপুরুষ সুগভীর চিন্তাবনতমুখে শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে সিংহাসনাভিমুখে আসিয়া বিনা সাহায্যে তাহার সোপান অতিক্রম পূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চভাগে উপস্থিত হইলে, দুইজনেই একেবারে সিংহাসনের উপর পরস্পর সম্মুখীন! [১৩০২ সালের সংস্করণ, পৃঃ ৮]।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচনার বিশ বৎসর পরে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক প্রবন্ধসমষ্টি রচিত হয়। ইহার ভাষাও সংস্কৃতঘেঁষা, তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত নহে। পরবর্ত্তী কালে ভূদেব যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন তাহার ভাষা বেশ সরল ও ভাবপ্রকাশের উপযোগী। 'আচার-প্রবন্ধ'[১] হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদিক শাস্ত্র সমূহের বিলোপ হইয়া গেলে কোন স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে! কিন্তু সেরূপ মনে করা একটী প্রকাণ্ড ভ্রম। বেদমূল হইতেই স্মৃতির উদ্গম। শ্রুতি ছাড়া স্মৃতি নাই এবং থাকিতেও পারে না। সুতরাং স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াগুলিও বেদোক্ত ক্রিয়া হইতে উদ্গত [তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৯]।

সরল সাধুভাষার রচনায় ভূদেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার ডায়েরীর ভাষা অনবদ্য।

মধুসূদনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য গদ্য-রচনা "হেক্টরবধ"। ইহা ইংরাজী ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনাকাল ১৮৬৭-৬৮ সাল [উৎসর্গপত্র দ্রষ্টব্য]। হোমরের 'ইলিয়াড' কাব্যের মূল গ্রীকের অনুসরণে ইহা রচিত হইয়াছিল। শুধু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইচ্ছাসত্ত্বেও কবি অবশিষ্ট অংশটুকু রচনা করিতে পারিয়া উঠেন নাই।

শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দুর্গতিতে মহাকবি তখন জর্জ্জরিত। সুতরাং ইহার মধ্যে তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তি পরিস্ফুট নাই, আর তাহা আশাও করা যাইতে পারে না। তৎসত্ত্বেও বইখানি অপূর্ব্ব। প্রকাশকালে ইহা অবজ্ঞাত ও অনাদৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সাহিত্যিকেরা অনেকে ইহার নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন। বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের রসজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি আছে, অন্ততঃ প্রকৃত সাহিত্যের সমাদর দেখিয়া তাহাই মনে হয়। কিন্তু মধুসূদনের এই অপূর্ব্ব গদ্যগ্রন্থের সমাদর না করিয়া সাধারণ শিক্ষিত ও সাহিত্যিক সমাজ যথার্থ রসজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। না পারার অবশ্য কিছু কারণও আছে। প্রথমতঃ, হেক্টর-বধের ভাষার স্বাতন্ত্র্য সমসাময়িক রচনা হইতে এত পৃথক্ যে আপাতদৃষ্টিতে উৎকট বলিয়া বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, তখন উপন্যাস-সাহিত্যের সবে সৃষ্টি হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলি সকলকে মসগুল করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সে সময়ের রুচিতে গ্রীক উপাখ্যান ভাল লাগিবে কেন? তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালা সাহিত্যে বীররস নাই (এক মেঘনাদ-বধ ছাড়া), বাঙ্গালী বীররসের বিশেষ সমঝদারও নহেন। সুতরাং প্রকৃত বীররসাত্মক গদ্যকাব্য আদি ও করুণরসে মুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ ভাল লাগিবার কথা নহে।

হেক্টরবধের ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব ও একক। এক মধুসূদনই এই ভাষা লিখিতে সমর্থ ছিলেন, অন্য কেহ সে যোগ্যতা ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই। পারিলে বাঙ্গালা ভাষা পরম শক্তিলাভ করিতে পারিত। মধুসূদনের যে দূরদৃষ্টি ছিল, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন সাহিত্যিকের ছিল না বা নাই।

হেক্টরবধের ভাষায় নামধাতুর বাহুল্য আছে, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য আছে, সংস্কৃত রীতির সমাসযুক্ত পদ আছে। তবে পণ্ডিতী বাঙ্গালার মত বহু শব্দবিশিষ্ট লম্বা, কিম্ভূত-কিমাকার সমাস একেবারেই নাই। কাব্যের ধাঁচে বাক্য-রচনাও যথেষ্ট আছে। এই সকল যাহা অল্পশক্তিশালী লেখকের হস্তে দোষ হইয়া দাঁড়াইত তাহা মধুসূদনের হাতে ওজঃগুণবিশিষ্ট হইয়া পরম উপভোগ্য হইয়া দাঁড়াইল। হেক্টরবধের প্রধান গুণ—ইহার মধ্যে মূল ইলিয়াডের সুর-ঝঙ্কার দুর্লভ নহে, এবং গ্রীক মহাকাব্যের উদার অবকাশ ও বিরাটত্বের আভাস খানিকটা পাওয়া যায়। কোন প্রাদেশিক আধুনিক ভাষার শক্তিশালিত্বের প্রমাণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে?

[১] এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১৮৯৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি বহুপূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।

উৎসর্গ-পত্রে মধুসূদন লিখিয়াছেন, "বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে; কারণ, তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি ও হইব, তাহা বলিতে পারি না।" ইহার উত্তরে আমরা বলি, তিনি আশাতিরিক্ত ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং ইহার উপযুক্ত সমাদর ভবিষ্যৎ কালে অবশ্যম্ভাবী।

হেক্টরবধের ভাষার খুটিনাটি লইয়া কিছু আলোচনা করিব। প্রথমেই চোখে পড়ে নামধাতুর প্রাচুর্য্য। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরাতন কাব্য-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল, এবং কতকগুলি মধুসূদন নিজে গড়িয়া দিয়াছেন। বিশিষ্ট নাম-ধাতুগুলির উদাহরণ দিতেছি।

'এমন সময় পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি' (উৎসর্গপত্র); 'পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না' (ঐ); 'কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছে' (ঐ); 'সম্বোধিয়া কহিলেন' (প্রথম পরিচ্ছেদ); 'মহাবাহু আকিলীস্ উত্তরিলেন' (=উত্তর করিলেন (ঐ); 'মুক্তি প্রদানিবেন' (ঐ); 'এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে' (ঐ); 'স্বদলবলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ); 'মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন' (ঐ); 'তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন' (ঐ); 'এক তীক্ষ্ণতর শর তদুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন' (তৃতীয় পরিচ্ছদে); 'রণস্থলে রণিতে (=যুদ্ধ করিতে) লাগিলেন' (ঐ); 'হুহুঙ্কারিলে' 'নিবেদিলেন'; 'বন্দিতে'; 'বাহিরিলেন'; 'উত্তরিলে (=উত্তীর্ণ হইলে)'; 'উদ্ভবিতে লাগিল;' 'শোভিতেছে; 'ভাতিতে লাগিল;' 'আক্রমিয়া;' 'যুদ্ধিতে ছিলেন;' 'প্রসবিলেন;' ইত্যাদি।

স্ত্রীপ্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার আছে। নিম্নলিখিত উদাহরণ দুইটী ছাড়া তাহা কুত্রাপি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ নহে—'ত্রিপথা নদীত্রয়' (উপক্রমণিকা), 'সুধাময়ী নিশাকালে' (প্রথম পরিচ্ছেদ)। সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে; -'রা' প্রত্যয়ান্ত বহুবচনের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প। উদাহরণ—

'নারীকুল'; 'রাজাসমূহ;' 'বীরবৃন্দ'; 'শ্রোতৃনিকর;' 'দেবদেবীদল', 'শলাকামালা' 'বাজীব্রজ,' ইত্যাদি। 'দল' শব্দটাই বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশেষণ শব্দ ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ তাহা প্রথমা বিভক্তিতে অথবা অন্য বিশেষ্য শব্দ বা অসমাপিকার সহিত ব্যবহৃত হয়। হেক্টরবধে মধুসূদন এইরূপ স্থলে প্রায়ই তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাকে আঁট (condensed) করিয়াছে। যেমন, 'অতি-দ্রুতে পলায়নপর হইতেছেন'; 'দাসদলে আনয়ন করাইলেন' [পঞ্চম পরিচ্ছেদ]; 'থরথরে নড়িয়া উঠিল'; ইত্যাদি 'এ' প্রত্যয় দ্বারা করণ কারকের পদও সিদ্ধ করা হইয়াছে। যেমন 'উপাদেয় ভোজনপানসামগ্রী।'

মধুসূদন 'সু', 'কু' এই দুই উপসর্গের ভক্ত ছিলেন। যেমন, 'কুরসনা', 'সুদেশে', ইত্যাদি। কাব্যোচিত বা প্রাচীন অপর প্রয়োগের মধ্যে এইগুলি লক্ষণীয়। 'এ' প্রত্যয়ান্ত কর্ম্মকারকের পদ, যেমন, 'শলাকাবৃন্দে অবহেলা করিয়া' [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]। মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের প্রয়োগ; যেমন, 'কৃষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া'; 'কলহাগ্নি নির্ব্বাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া'; 'দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্ব্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া'; ইত্যাদি। 'ভঞ্জন', 'বিন্ধন' প্রভৃতি ব্যাকরণবিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগও প্রাচীন ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বদ্যোতক।

হেক্টর-বধের মধ্যে উপমার আতিশয্য আছে। এই উপমাগুলি প্রায় সকলই গ্রীক হইতে গৃহীত। মধুসূদন নিজেও খুব উপমা-প্রিয় ছিলেন। উৎসর্গ-পত্রের মধ্যেও তিনি উপমা ব্যবহারে ক্ষান্ত হয়েন নাই। যেমন, 'যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল যে, সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ যে, তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।' অথবা উপক্রমণিকায়—'যেমন গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্রতীর্থ ত্রিবেণীতে একত্রীভূতা হইয়া একস্রোতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি-উল্লিখিত তিনটী পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউরোপ-খণ্ডের বাল্মীকি কবিগুরু হোমরের ইলিয়াস্‌স্বরূপ সঙ্গীততরঙ্গময় সিন্ধুপানে চলিতে লাগিল।'

হেক্টর-বধের ভাষার উদাহরণ হিসাবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে মধুসূদন কিরূপ কৌশলে মূল গ্রীককে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হুহুঙ্কার শব্দে কুন্তনিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উল্কাগতিতে চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল, কিন্তু মাণিলুসের ফলক-প্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তা ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল। পরে স্কন্দপ্রিয় বীর-কুলেন্দ্র মাণিলুস স্বকুন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুল-পতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্ম্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি; তাহা হইলে হে ধর্ম্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্ম্মাচারী অতিথি কোন ধর্ম্মপ্রিয় আতিথেয় জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়ামপুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা একপার্শ্বে অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেম্বাস মাণিলুস্ সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্কন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খড়্গ শতখণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন যে, চিবুকনিম্নে সুনির্ম্মিত কিরীটবন্ধন-চর্ম্ম গলদেশ নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল।

দীনবন্ধুর নাটক ছাড়া গদ্য-রচনা দুইটি মাত্র—(১) যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, এবং (২) পোড়া মহেশ্বর। গ্রন্থকার প্রথমটীকে উপন্যাস আখ্যা দিলেও ইহা ব্যঙ্গ-কৌতুক বড় গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের "মুচিরাম গুড়" এই জাতীয় রচনা এবং ইহা প্রথম বর্ষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল [১২৭৯ সাল, কার্ত্তিক সংখ্যা]। ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা হইলেও উপযুক্ত পরিমাণে চলিত ভাষার পদ ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণ থাকাতে বিষয়বস্তুর বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে রচনাটীর ভাষা কিরূপ রোচক তাহা বেশ বুঝা যাইবে। আধুনিক পাঠক-সমাজে দীনবন্ধুর এই গল্পটীর প্রচার নাই দেখিয়া একটু বেশী অংশই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটী চৈতনক, তাহাতে দুইটী তাম্র মাদুলী: ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে দড়কারোগ সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয় রাজদণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে; ভ্রযুগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোতিহীন নহে, নাসিকাটী দীর্ঘা, অল্প মঙ্গোলিয়ান কট বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর, গুম্ফ আয়ত নিবিড় কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে একবার করিয়া ক্ষেয়ারী করা হয়। গলায় সুবর্ণ-তারজড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বীচিসদৃশ অক্ষমালা; বাহুতে ইষ্টকবচ, মধ্যভাগে রক্তচন্দনের ফোঁটা, অঙ্গুলে একটী রজত, একটী কাঞ্চন অঙ্গুরীয়; পরণে ময়ূরকণ্ঠ চেলীর যোড়; পায়ে ফুলপুকুরে চটী। সর্ব্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে আবাসস্থান সঙ্কীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধিশালী উৎকুণ-কুল গাত্রলোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। উদরটী স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদূরদর্শিতা হেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে সেই জন্য তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। কুড়রামের এবারত ভারী দোরস্ত। কুড়রাম কিছুদিন কবির দলে গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটোয়ারি-গিরী কর্ম্ম করিয়া একবার মাত্র নিকেশী দেনায় জমিদারদিগের চূণের গুদামে এবং বারত্রয় মাত্র সরকারী জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন। [প্রথম পরিচ্ছেদ]।

"পোড়ামহেশ্বর" গ্রাম্য প্রবাদ লইয়া রচিত গল্প। ইহা ব্যঙ্গ রচনা না হইলেও, হাস্যরসপ্রধান। ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা। উদাহরণ—

সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বী, কাহার সহিত বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রীবা-সঞ্চালন পর্য্যন্ত করেন না, দিবা-বিভাবরী কেবল মুকুলিত-লোচনে, রবশূন্যবদনে, অবিচলিত চিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন। ইত্যাদি।

রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "বঙ্গবিজেতা" ১২৮০ (=খ্রীষ্টিয় ১৮৭৩) সালে, এবং শেষ উপন্যাস "সমাজ" ১৩০০ (=খ্রীষ্টিয় ১৮৯৩) সালে প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস ছয়টী দুইটী শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) ঐতিহাসিক ও সম-ঐতিহাসিক এবং (২) সামাজিক। ঐতিহাসিক উপন্যাস-গুলির ভাষা একটু বেশী সংস্কৃতঘেঁষা। ইহাতে কথোপকথন-গুলি প্রায়ই সাধুভাষায় দেওয়া হইয়াছে। 'স্বামিন্', 'প্রভো' প্রভৃতি সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ত্রী-প্রত্যয়সংবলিত বিশেষণ পদের অসদ্ভাব না থাকিলেও বিশেষ বাড়াবাড়ি নাই। 'সুরূপা পুত্রবধূদ্বয়' ইত্যাদি ব্যাকরণবিরুদ্ধ স্ত্রীপ্রত্যয় ব্যবহার দুই একটী পাওয়া যায়। বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে বিশেষণের প্রয়োগ একটী বড় বিশেষত্ব। যেমন, "ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বায়ুরোগে কিঞ্চিন্মাত্র কাতর না হইয়া;" "তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কয়েক দিন হইতে যে উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন;" ইত্যাদি।

সামাজিক উপন্যাস দুইখানি মাত্র, "সংসার" ও "সমাজ"। "সংসার" ১২৮২ (=খ্রীষ্টিয় ১৮৭৫) সালে প্রকাশিত হয়। ইহা রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। এই দুইখানির ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সরল। কথোপকথন বেশীর ভাগ কথ্যভাষায়ই দেওয়া হইয়াছে। কথ্য ভাষার সহিত লেখ্য ভাষার মিশ্রণ খুবই কম দেখা যায়। 'চাষাগণ', 'তিনজন খুড়শাশুড়ীরাই গিন্নি', প্রভৃতি দুষ্ট প্রয়োগ খুব কমই আছে। ইংরেজীর প্রভাব লক্ষণীয় নহে। দুই এক স্থলে যাহা পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। যেমন, 'রূপার ঝিনুক ও গরম দুগ্ধ মুখে করিয়া কয়জন সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ?' 'প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিতা।' 'আসতেম', 'পেলেম', 'করতাম', প্রভৃতি পদেরও প্রয়োগ আছে। 'গেল' এই পদের পরিবর্ত্তে 'যাইল' এই পদের মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ লক্ষণীয়।

রমেশচন্দ্রের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য যথেষ্ট নমনীয়তা ও সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আওতায় পড়িয়াছিলেন বলিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার সময়ে—এমন কি এখনকার কালেও উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সামাজিক উপন্যাস অথবা চিত্র দুইটী বাঙ্গালা ভাষায় তৃতীয়-রহিত বলিলে বিশেষ অসঙ্গত হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে ইহার জোড়া নাই। রমেশচন্দ্রের রচনার নমুনা হিসাবে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটী সাধুভাষার উদাহরণ, দ্বিতীয়টী কথ্যভাষার।

সেই কৃষ্ণকেশমণ্ডিত, শ্যামবর্ণ, বাক্‌শূন্য মুখখানি ও আয়ত শান্তরশ্মি নয়ন দুইটি দেখিলে যথার্থ হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হয়। যথার্থই বোধ হয় যেন, সায়ংকালের শান্তি ও নিস্তব্ধতার শৈবালে আবৃত মুদিতপ্রায় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া রহিয়াছে।

এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঙ্ক্ষিণী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না, যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্র কুটীর চারিদিকে সস্নেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়াবর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনী সহচর। [মাধবীকঙ্কণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]।

তা ভাবনা কি বোন, আমাদের বাড়ীর মেয়ের বের জন্য ভাবতে হয় না, আমাদের কুল, মান, বর্দ্ধমানে ভারী চাকরী, এ কে না জানে বল, কত তপিস্যে করলে তবে লোকে এমন বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বে'র ভাবনা ? এই রসো না, তিনি পুজার সময় বাড়ী আসুন, আমি এমন সম্বন্ধ ক'রে দেব যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি করেছে, যে দিলেই এখনি মাথায় ক'রে নিয়ে যায়, তা আমি গা করিনি। ইত্যাদি। ['সংসার' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]।

সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনে প্রথমে "যাত্রা" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৮০ সাল)। "মাধবীলতা" উপন্যাস এবং "পালামৌ" প্রবন্ধও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষ, ১২৮৫—৮৮ সাল)। "কণ্ঠমালা", "জাল প্রতাপচাঁদ" এবং "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" ও "দামিনী" শীর্ষক গল্প দুইটী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ভ্রমর" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তৎসত্বেও তাঁহার দান বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। তাঁহার নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহার গ্রন্থের সকল দোষত্রুটিকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার যাবৎ গুণ সকলই আছে, তাহার উপর আছে নির্ম্মল রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিপাত। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার ভাষা মাধুর্য্যমণ্ডিত। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিয়াছেন "পালামৌ শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ"—তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ। সঞ্জীবচন্দ্রের মত গভীর রসবোধ আমরা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য বাঙ্গলী সাহিত্যিকের মধ্যে পাই নাই। বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ভাষায় তত অভিনবত্ব না থাকিতে পারে কিন্তু ভাবের ঐশ্বর্য্য তাঁহার ভাষার উপর অপূর্ব্ব রশ্মিজাল বিচ্ছুরিত করিয়াছে। "পালামৌ" প্রবন্ধেই সঞ্জীবচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্য উৎকর্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষার দুইটী ছোট উদাহরণ দিতেছি। বেশী উদ্ধৃত করা বাহুল্য, কেননা সকলেই সম্ভবতঃ তাঁহার লেখার সহিত পরিচিত। কেহ যদি না থাকেন তবে তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জাল-রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি। [জাল প্রতাপচাঁদ]।

এই সময় একটী দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল, তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল; আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। [পালামৌ]।

সরীসৃপ

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ী। জমি কিনিয়া বাড়ীটি তৈরী করিতে চারুর শ্বশুরের লাখটাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তার টন্‌টনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলি ব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোন দিন কোন দিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, আজীবন তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ, তাহার আধপাগলা স্বামী বিশ বছরের মধ্যে একদিনও প্রাণত্যাগ করিল না, অথচ এই বিশ বছরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বেশ ভাল মানুষের মতই স্ত্রীর চরিত্রে ভয়ঙ্কর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়তঃ, বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থার নামে নানা রকম মজা করিতে লাগিল। যেদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেদিকে সে তার অতি-সাবধানী দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখিল। আর যেদিকে সর্ব্বনাশের পথ খোলা রহিল সে দিকটা লাভ করিল তাহার উদাসীনতা; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্ত ভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে তাহার বাঁচানোই ছিল উচিত তাহার মত বিশ্বাসী লোক সংসারে সে আর দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রহিল তাহার নাম কিছুই না থাকা।

কোন লাভ হোক বা না হোক সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমালীর সঙ্গে সে লড়াই করিল কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতের বৎসর বয়সে। বনমালী তখন পনের বৎসরের বালক মাত্র। চারুর শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবার বারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়ীতে ফূর্ত্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোট দ্বিতল গৃহের সামনে মোটর থামাইয়া রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, 'বৌমাকে পাহারা দিস বুনো।'

হাসিয়া বলিলেও কথাটা পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বৌ বলিয়া নয়, স্ত্রী-জাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়ীতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল। চাকর-দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্য করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে তাই বাড়ীতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময়ে চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত কিন্তু কিছু বলিত না। হাসিত এবং কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ী ছাড়িয়া মার জন্য মন কেমন করায় বনমালী নিজের বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত। কিন্তু অবুঝের মত তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত না। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারাদিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা করিয়া দিয়া মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত, 'চুপ্ চুপ্! বাবার হুকুম।' এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনি যমের মত ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, সহরের ভিতরে একটা বাড়ী করিয়া উঠিয়া যাইবার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতির করিয়া কোন সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ট লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনি উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, 'ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ী তোমার কাছে বাঁধা রাখবার কথা মনে হয়েছিল, ভাই। আমার সর্ব্বস্ব গেছে, যাক, কি আর করব ;—সবই মানুষের কপাল। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের।'

বনমালী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চারুর মাথার চুলের কালিমা ফ্যাকাসে হইয়া আসিয়াছে কেবল এইটুকু লক্ষ্য করিয়া আবার সে আহারে মন দিল।

আসল ঈঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবার একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়া চারু বলিল,—'নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধ হয় ভাল লাগছে না, ভাই?'

'বেশ লাগছে।'

চারুর ছোট বোন পরী এক মাসের ছেলে-কোলে কাছে বসিয়াছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পারিয়া তার ভাল লাগিতেছিল না। এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, 'এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন, বনমালী দাদা। ডালনা নিশ্চয় ভাল হয়নি। দিদিকে কত বললাম, আমি রাঁধি দিদি, আমি রাঁধি, দিদি কি কিছুতে আমাকে রাঁধতে দিলে!'

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, 'না রেঁধেছিস বেশ করেছিস বাবু। ওইটুকু ছেলে নিয়ে রান্না করলে খেতে মানুষের ঘেন্না হ'ত না?'

পরী উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'ঘেন্না হত! আমার রান্না খেতে বনমালীদাদার ঘেন্না হ'ত, স্বয়ং বিধাতা একথা বললেও আমি বিশ্বাস করিনে দিদি!'

চারু একটু হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নে, না করিস না করিস। একটু চুপ কর। মানুষের সঙ্গে দু'টো কথা বলতে দে।'

'আমিও কথাই বলছি।'

চারু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া সে যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল এমনি রাগের সময় সে কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুর মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়ার সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেকে শোয়ানোর প্রয়োজনটা এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমার?' বলিয়া বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, 'দেখলে ভাই? শুনলে মেয়ের কথাবার্ত্তা? আমি যেন ওর ইয়ার! আর এই সেদিনও কেঁদে কেঁদে আমায় চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিও দিদি! টাকার বেলা দিদি দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়।'

বনমালী বলিল, 'ছেলেমানুষ, বোঝে না।'

'বোঝে না? হুঁঃ, কচি খুকী কি না, বোঝে না! বোঝে সব, সব বুঝে ও এমনি করে, এ আর আমি টের পাইনে! দিদির যে আর টাকা নেই, দিদি যে হুট্ বলতে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেয় নি!'

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আর অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কারণ আজ একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন মধ্যবয়সী পাটের দালাল।

খানিকপরে চারু বলিল, 'যা বলছিলাম। ভাগ্যে এই বাড়ী আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল! টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়ীটা নিয়ে নেবেনা, কিন্তু আর কারো কাছে বাঁধা রাখলে কি সর্ব্বনাশ হ'ত বলত!'

'তা বৈকি। বাগানবাড়ী পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ীতো তুমি বাঁধা রাখো নি চারুদি, বিক্রী করেছিলে।'

'ওমা, সে কি? বাড়ী আমি বিক্রী করলাম কখন?'

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, 'দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো। তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার পাঁচ

বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ী বিক্রি করেছ। বরাবার সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।'

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিল না। কি বলিবে হঠাৎ সে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বলিল, 'তুমি হাসছ, তাই বল!'

বনমালীর মুখের হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতাকে বনমালী খুব দামী মনে করিয়া থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য সহজে দুবার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, 'আমি বলি কি, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক দেনা তো তোমার আমি শুধতে পারছি না, এ বাড়ী দিয়ে তুমিই বা করবে কি; তার চেয়ে বিক্রি করে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, বাকীটা আমাকে দাও। তোমার তিরিশ হাজার কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিয়ে দেশে একটা ছোটখাট বাড়ী তুলে বাস করিগে। জমি যায়গা যা আছে দু'চার বিঘে তার খাজনা পাইনা ফসল পাইনা, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।'

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোন কিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখী হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া বলিল,'তুমি এ বাড়ী বিক্রি করতে চাও? ক্ষেপেছ!'

চারু সভয়ে বলিল, 'কেন? তোমার টাকা তো তুমি পাবে!'

'আমার টাকা চুলোয় যাক।'

চারু আরও ভয় পাইয়া বলিল, 'রাগ ক'রোনা ভাই। মেয়েমানুষ, কিছুই তো বুঝিনে!'

বনমালী বলিল, 'ভুবনের বাড়ী বিক্রি করার পরামর্শ তোমাকে দিল কে? ওসব দুর্ব্বুদ্ধি ক'রোনা। সময়টা, কি জান চারুদি, আমারও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। তোমার এই বাড়ীটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই ছাড়িয়ে নেব।'

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, 'তারপর?'

'ভুবনের বাড়ী ভুবন ফিরে পাবে।'

গলনালী প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, 'কিন্তু তোমার টাকা? তোমার তিরিশ হাজার টাকা?'

'ভুবনের কাছে জমা থাকবে!'

একথা কেহ বিশ্বাস করে! নির্ম্মূল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী বলিল, 'কেঁদোনা চারুদি।' আমি কি তোমার পর? আগে তুমি আমাকে কত ভালবাসতে।'

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্য সত্যই আর কোন আশা নাই।

'আমি যদি তোমার মনে কোন দিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো—'

বনমালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

'তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন?'

চারু চোর বনিয়া গেল—'যদির কথা বলছি।'

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ভুবন কোথায় চারুদি?'

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, 'ও ভুবন, ভুবন। একবারটি এদিকে শুনে যাও তো, বাবা।'

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপ থুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও বুঝি খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভাল বাসে, চারু তো আশ্চর্য্য মেয়েমানুষ!

মাসখানেক পরে পরী শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, 'আর আসব না দিদি।'

আরও একমাস পরে বনমালী তার বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাস দাসী ও মোট-বহর লইয়া সহরের ভিতরের বাড়ী ছাড়িয়া চারুর সহরতলীর বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই?'

বনমালী বলিল, 'অসুবিধে হলে এতদিন বাস করলাম কি করে, চারুদি? সে জন্য নয়। মনে করছি, বাড়ীটা আগাগোড়া মেরামত করব আর দু'খানা ঘর তুলবো ছাদে। মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।'

চারুকে বলিতে হইল, 'আহা আসবে বৈকি, সেকি কথা, বেশ করেছ।'

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ী মেরামত আরম্ভ হইল না, ছাদে ঘর উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ী বনমালী দুইশত দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ তৈলাক্ত অধিকার সদরের গেট হইতে পিছনের গলিতে খিড়কির দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, 'অসুবিধে হচ্ছে, চারুদি?'

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয়!

'না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।'

'কিছুদিন যদি দেশে গিয়ে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। দেশেটেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বৈকি!'

'দেশে কি বাড়ী ঘর দোর কিছু আছে ভাই, যে যাব?'

'টাকার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ী হয়। জমি জায়গা আছে, খাজনা পাওনা, ফসল পাওনা, সব লুটেপুটে নিচ্ছে; নিজে থাকলে লোকসানটা রদ হ'ত।'

'জমি! জমি কই দেশে? কিছু কি আর আছে ভাই আমার, সর্ব্বস্ব গেছে।'

বনমালী তখনকার মত চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা হেমলতা বলেন, 'হ্যাঁরে, ওরা কি যাবে না?'

'কোথায় যাবে?'

'যে চুলোয় খুসী, আমাদের তা ভাববার দরকার? ক'দিন ছাখ, তারপর নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।'

'তাড়িয়ে দিতে পারব না, মা। ওসব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে, নইলে রইল।'

কয়েক দিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, 'শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও? আমায় বলনি কেন চারুদি'? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্ম্ম কর্ম্মে আমি বাধা দেব কেন?'

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে ভুবনকে লইয়া এ বাড়ী হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্ব্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে একপরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, 'কই তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলিনি? ও, হাঁা, মনে পড়েছে। মামীকে বলছিলাম, স্বামী শ্বশুরের এই তীর্থ ছেড়ে আমার একপাও কোপাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মামীমা বুঝি মনে করেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই?'

বনমালী একটা হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তার ভাল লাগে না।

'তবু, দেশ-বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হ'ত।'

'হায়রে কপাল, ওর আবার দেশ-বেড়ানো!'

চারু কাঁদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি করিতে যায়। ভাবে, কি আর হইবে, থাক্। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদি'র ভারটা আর এমন কি গুরু!

কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দু'টি কচি সবুজ ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাই-এর মত তাদের দু'টিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত!

তারপর একদিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, 'দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো। কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে!'

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া চারু গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ায় সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম্ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না সেটা বেশ বুঝা গেল, কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, 'আমায় নাও ভগবান, এবার আমায় নাও।'

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'অমন করে কাঁদিসনে পরী; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, ককিয়ে ককিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।'

হেমলতা বনমালীর সান্ত্বনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

'ওকে এখন ওসব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কি ও একটু কাঁদতেও পেরেছে রে! এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে শেষে কি অসুখে পড়বে মেয়েটা? খানিক কেঁদে নিক।'

পরী আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, ছাখো কি নির্ম্মম; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখলে না!

ওদিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে খানিক পরে দম নিয়া পরী বলিল, 'ও মাসীমা, দিদি কি করছে দেখুন।'

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

'ধরতো দেখেই আসি একবার।'

বনমালী হাত বাড়াইল না।

'আমি দেখে আসছি।'

'তুই এখানে বোস।' পরীর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে এক রকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে নিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এসব তাঁহার ভাল লাগে না,—সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি। তা ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্ব্বদা তাহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, কোন প্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পরের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁঝে শেষে কি তাঁহার তালু জ্বলিবে!

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিয়া বলিলেন, 'দরজা খোলো মা দরজা খোলো, ওসব কি করতে আছে? মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

বলিয়া ওদিকের জানালায় সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মত চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভুবনকে আদর করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিরাজী তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, 'খোকাকে দিন, হাতটা বোধ হয় ওর ভেঙ্গেই গেল।'

খোকাকে তার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, 'তোর ছেলেটাতে বেশ হয়েছে রে!'

'থাক্, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।'

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল

এবার বনমালী উঠি যাইতে পারে, যাওয়াই সঙ্গত; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনদিন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোট বোন। আজ বনমালী লক্ষ্য করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মত দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট, স্বচ্ছ।

'তোর ঘাড়ে কি লেগে আছে রে, পরী?'

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, 'কি লেগে থাকবে? কিছু না।'

'তুই পাউডার মেখেছিস্?'

পরী জোরে নিঃশ্বাস নিয়া বলিল, 'মেখেছিইতো, একশবার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন ?'

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধ হয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তাহার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল আর পেটে হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের মধ্যে কোন্ কারণে তাহার বুক সর্ব্বদা জ্বালা করিতেছে সেটা আর সব সময় ঠিকমত বুঝিবার উপায় রহিল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিয়া বলে, 'আমার মত অবস্থা মাসীমা শত্রুরও যেন না হয়, দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনদিকে কূলকিনারা নেই মাসীমা, আমি অকূলে ডুবেছি।'

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো মা, কি করবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

মাথা চারু ঠাণ্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটা পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে নিয়া কচি বোনটাও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোনদিক সামলাইবে ?

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু রেখে গেছে ?'

'না।'

'কিছু না ? পোষ্টাপিসে, ব্যাঙ্কে, তোর নামে কিছুই রেখে যায় নি ?'

'কি রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি ? মাস গেলে হাত-খরচের টাকার জন্য বাপের কাছে হাত পাতত, রেখে যাবে !'

'আমি যা দিয়েছিলাম ?'

'শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে—খাটপালঙ্ক ছাড়া।'

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, 'তোর গয়নাও দেয়নি নাকি ? তোকে যে আমি তের চোদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে !'

'কিচ্ছুটি আমাকে দেয়নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে বাক্স খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্য্যন্ত'

'এমন চামার ! তা, আর দু'টো মাস তুই ধৈর্য্য ধরে থাকলি না কেন ? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।'

'বড় খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভাল লাগল না।'

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, 'থাকতে ভাল লাগল না ! মেয়েমানুষের অত ভাল লাগা মন্দ লাগা কিলো ? যা, কালকেই ফিরে যা তুই,—বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।'

পরী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, 'আছে, ছাই, দিয়েও যাবে ছাই। সাত ছেলের একটা রোজগার করে ? তাদের দিয়ে যেতে হবে না ? ও বাড়ী আমি আর যাচ্ছি না বাবু, হঁ্যা।'

চারু আগুন হইয়া বলিল, 'ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি ? তোকে খাওয়াবে কে শুনি ? আমি ! আমার আর সেদিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।'

'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি', বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, 'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি ! ভাবতে হবে নাতো আমার বাড়ীতে এসেছিস কেন লো হারামজাদি ?'

তিন দিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

'ছাখ পরী, এত বাড় ভাল নয়।'

'নয় তো নয়, কি হবে ?'

'খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিনি তোকে আমি ?'

'সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।'

চারু বনমালীর শরণ নিল।

'মেয়েটা নিজের সর্ব্বনাশ করছে ভাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।'

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভাণ করিয়া বলিল, 'আহা, যাবে বৈ কি চারুদি, যাবে। দু'দিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কি ?'

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন পরী মুখভার করিয়া বলিল,'লেগেছ তো পেছনে? জগতে কারো ভাল করতে নেই।'

'তুই আবার কবে আমার কি ভাল করলি লো?'

'এখানে আছ কার জন্যে? ভেবে দেখেছ একবার?'

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোর জন্যে, না? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস্!'

'তাই।'

চট্ করিয়া ঘুরিয়া দম্ দম্ পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওর জন্য আমি আর কিছু করব না। করব না, করব না, করব না; এই তিন সত্যি করলাম, নারায়ণ সাক্ষী।'

পরীর ঔদ্ধত্য তার কাছে বেশীদিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা বোঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েক দিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশী কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা অনেক আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বলে, 'খান, পেট আপনার ভরে নি। কখ্খনো ভরে নি। আমি বুঝি না! ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে?'

বলে, 'কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা রেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন বেশ রাঁধি।'

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিঞ্চিত গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহর আব্দারের ভঙ্গিমায় অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, 'হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছ দিদি? দুধটা এনে দাও! খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভাল হবে?'

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্ব্বদা আছেই। বনমালীকে কখনো চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু'চার মিনিটের জন্য কারো সঙ্গে হাল্কা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কি করছেন।'

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপি চুপি ঘরে আসে। বলে, 'কি চাই বলুন।'

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, 'পা কামড়াচ্ছে—কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না।' পরী বলে, 'কেষ্ট কেন? আমি কি পা টিপতে জানি নে?'

অবশ্য পা সে টেপে না, অত বোকা পরী নয়; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, 'যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস্ কেষ্ট।'

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝির কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।

ভাবে, কি মেয়ে বাবা! ও দেখছি সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে!

একদিন একটু বেশী রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎ-চমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল; প্রকৃতির সে এক মহামারী কাণ্ড।

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড় ভয় পাইতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজ-খবর নিলে পরী খুসী হইবে। বনমালীকে ও যেরকম বাগ মানাইয়া আনিতেছে ওকে একটু খুসী রাখা দরকার বৈ কি!

নিশুতি রাত, বাড়ীটা এক একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কি জানি, একটা বজ্র যদি তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়ে!

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দু'পা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘ-গর্জ্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোট বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর একপাটি জুতা দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায়না। কাকে সে কি বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়ন-ঘর, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দরোয়ান দিয়া এই রাত্রেও যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্য্যোগে সে যাইবে কোথায়?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনি ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনো সমানে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আকাশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চিড় খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল, একি মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্য্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া নিল যে তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারাজীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে!

হয়ত ভুবনকে না দিয়া এ বাড়ীটা সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, 'ভুবন আর বাড়ী দিয়ে করবে কি চারুদি? পরীকেই দিয়ে দিলাম।'

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়া-আসা টের পাইয়াছে। পাক্ টের। কাল তারা যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোন কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিল বলিয়া সে যাহার চোখ দু'টা উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন দুঃখে? কপাল পুড়িয়া যাওয়ার তিন-মাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে বাড়ীর ঝিএর চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠারো বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহে চুমা খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত কম্বলের শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়ীতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক্, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে।—যতদিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের গায়ে লাগিল কি? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক তাহাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

এই কথাটা বার বার ভাবিয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ নিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ীর গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণী দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে কত যত্নে তাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়ার জন্য এমন ভাবে নিজের সর্ব্বনাশ করিল এর আকস্মিকতা এর অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসংযত ক্ষুধায় অথবা নেহাৎ ছেলেমানুষী খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পারে, চারুর মনে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিন বছর স্বামীর ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ও সব পাগলামী চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারো মধ্যেই আভিজাত্যের চিহ্ন তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যে দিকে যে ভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তার আর কি আছে যে তার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্টা হইবে?

মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গম্ভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটা কি.কারণে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে,তার বড় যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনও কোন আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই!. তার নৈকট্যকে, তার নির্ব্বাক আবেদনকে, তার দু'চোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তার হিসাব হয় না।

তার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত!

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর এতটুকু পায় নাই? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, এর চেয়ে সেই যদি সেসময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভাল ছিল, এ রকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবের সঙ্গে আর গ্রামের দু'তিনটি যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই সুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। এর কোনটাই সহজ ছিলনা। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খাওয়াইতেও তাহার তেমনি অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন—এরকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলি স্থান তাই ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনিভাবে বলিল 'নে, ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।'

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়া আঙ্গুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া নিয়া বাহিরে আসিয়া চারু হাঁফ ছাড়িল।

কিন্তু তখনও আর একজন বাকী।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

একমুহূর্ত্তের জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী এক রকম জোর করিয়াই একদিন তাকে প্রায় চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত!

গাছের ডাল হইতে টপ্ টপ্ জল পড়িতেছিল। কতগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, 'কি বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল!'

বনমালী বলিল, 'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

'হ্যাঁ। কদিন গরমে প্রাণটা গেছে—আমি আজ একবার তারকেশ্বর যাব ভাই।'

বনমালী আচমকা বলিল, 'ক্ষেন্তির মা দুশো টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে?'

চারু মাথা নাড়িল।

'কাশী মাথায় থাক, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মার কি? হুট্ বলতে ও যেখানে খুসী যেতে পারে, আমরা পারিনে। আমাদের মায়া মমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে—'

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, 'ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোন, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী করার কি দরকার কে জানে! কথা কি শুনবে মেয়ে! তোমাকে মানে, ফলটল যদি খাওয়াতে পার একটু চেষ্টা দেখো ভাই।'

আগে, চারুর সরকার প্রথমে গিয়া একটা আস্ত বাড়ী ভাড়া করিয়া আসিত তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবার সে সোজাসুজি যাত্রী-নিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত করিয়া সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে তার ফিরিয়া যাওয়ার আগেই পরী যেন কলেরা হইয়া মরিয়া যায়। পরীর যে আর বাঁচিয়া থাকার দরকার নাই দেবতাকে এই কথাটা সে খুব ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিল। ··পরীর ছেলে? পরীর ছেলেকে সে মানুষ করিবে।

তৃতীয় দিন মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রীনিবাসে ফিরিয়া চারু দেখিল, একটি বৌএর কলেরা হইয়াছে। তাকে বিদায়

করিদের ষড়যন্ত্র আর পলায়নপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রী-শালা সরগরম।

সকালে বৌটির সঙ্গে চারুর পরিচয় হইয়াছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে নিয়াই মরিয়া হইয়া সে ধর্ণা দিতে আসিয়াছে। বৌটির নাম কনক, বয়স অল্প; থুপ থুপ করিয়া পা ফেলিয়া ওর চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মত!

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিয়া সকালে চারুর কাছে একটি পাথরের বাটি ধার করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বৈকি!

'হ্যাঁ মাসীমা, কদিন থাকবেন আপনি?'

চারু হিসাব করিয়া বলিল, 'আজ নিয়ে হ'ল তিনদিন, আরও পাঁচ ছ'দিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায়! কিন্তু দেখি কটা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্ন আত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। বোসো বাছা এইখেনে, পা গুটিয়েই বোসোনা, বিছানা একটু নোংরা হয়তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ ছেলেকে ওরা কি ভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কি করে জানব? এতকাল একটা জমিদারী চালিয়ে এলাম, আমার কি ওসব ভুল হয় বাছা? সে ব্যবস্থা করেই এসেছি, আমাদের পদ্ম ঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমায় সব বলবে।'

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাড়ীতে থাকিলে ভাষার একটু সংযম দরকার হয়, কে জানে কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ী মনে করিবে!

কিন্তু যে যার হৃদয়-চর্চ্চা নিয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, 'আপনি তাহ'লে আছেন ক'দিন? আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসীমা। বাবার দয়া হতে দু'দিন লাগে কি তিনদিন লাগে ঠিকতো কিছু নেই, একা কি করে থাকবে এখানে ভেবে বড় ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর—'

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'মাসীমাকে প্রণাম কর শিশু।'

কাল কনক ধর্ণা দিবে স্থির হইয়াছিল, এখন আজ তাদের এই বিপদ।

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, যে যা বলিতেছে তাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এদিকে যাত্রীনিবাসের কর্ত্তা একটা গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগতই বলিতেছে, 'যাওনা হে ছোকরা, হাঁসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে নাকি? আচ্ছা বেয়াক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোন ভয় নাই—আমি বলছি কোন ভয় নেই। রুগী হাঁসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্য্যন্ত ডিসেনফিট্ করে দিচ্ছি।...আপনাদের যদি কিছু হয় তো আমায় বলবেন তখন!'

'হলে আর তোমায় বলে কি হবে বাপু?' এই ধরণের প্রশ্ন করিলে যাত্রীনিবাসের কর্ত্তা চোখ লাল করিয়া একবার তার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কোন জবাব দিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ী আনিতে পাঠাইয়া দিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহার দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

'মাসীমা, দেখুন না এরা জোর করে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বলে দিন না?'

চারু বলিল, 'তা যাওনা বাছা, হাঁসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয়?' তারপর ভৎ'সনা করিয়া বলিল, 'এখনো একজন ডাক্তার ডাকনি, করেছ কি? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপর অন্য কথা।' বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইল গাড়ী নিয়া চাকর ফিরিয়া আসিলে।

শিশুকে ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আমার পাথরের বাটিটা?'

'বাটিটা বৌদি নোংরা করে ফেলেছে, মাসীমা।'

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কেন নোংরা করেছে? পরের জিনিষ নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাবু। আচ্ছা, যা করেছে বেশ করেছে, এবার বাটিটা এনে দাও।'

'একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি।'

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, 'দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্যে গাড়ী ফেল করব নাকি? যেমন আছে তেমনি এনে দাও।'

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তার একখানা পরণের কাপড় মাটীতে বিছাইয়া বলিল 'এইতে দাও।' অনেক পরত কাপড়ে বাটিটা সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া চারু সেটা আলগোছে তুলিয়া নিল। নিজের জিনিষ ফিরাইয়া নিয়া চোরের মত কয়েকবার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া ধূলাপায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্ম্মাল্য তুলিয়া দিল।

বলিল, 'এক হাতে নয়, দু'হাতে ধর। ছেলের মা তুই তোর ত সাহস কম নয় পরী! কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল।'

'দুটো ভাত যে দিদি।'

'ভাত নয় প্রসাদ, খা।'

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্ম্মাল্য পান চাহিয়া দেখিল। তারপর বাটিটা নিয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া সোডা দিয়া অনেকবার মাজিল। নিজে একঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোকে সকলে ভালবেসেছে ভুবন?'

ভুবন অস্বীকার করিল।

'তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমায় ধরে আনল কেন? আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে পদ্ম? সকলের ভাবসাব কি রকম দেখলি বলত!'

পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালও নয় কিন্তু। দুয়ের মাঝামাঝি। পরী তার ভাগ্নেকে ঠিক সময় মত না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মার জন্য হাউ হাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুর বেলা ভুবন চুপি চুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

'কি জান মা, মার মত কেউ কি করে?'

চারু বলিল, 'আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কি হবে? মারধর করে নিত কেউ?'

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।

'না মারধর কেউ করে নি।'

চারুর পুরানাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরাণী। এগুলি কেবল যে নাম তা নয়। মানানসই নাম।

সারাদিন পরীকে চারু আজ বিশেষ ভাবে সুন্দরী দেখিল, —অপরূপ, অভিনব। পরী যতবার তার লাল-করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল।

ভাবিল, 'না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জেলে দিত বৈ ত নয়।'

শরীরটা চারুর ভাল লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটা আশঙ্কা সে মন হইতে কোন মতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায় ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বৌটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিন ঘিন করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া আছে, বিছানাটা অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবতঃ মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল।

আর খানিক পরে সে প্রথমবার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তার শুকাইয়া গিয়াছে।

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিয়াছিল, চারু কাঁদিয়া তাকে বলিল, 'ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শীগগির।'

'কি রকম করছে ?'

'কাঁদছে আর ছটফট করছে।' অন্ধকারে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিয়া আসিল।

বনমালী বলিল, 'প্যাসেজের আলো নিভিয়েছে কে ?'

'আমি।'

বনমালী সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল, 'ত্যাখো তো কি করলে ! নিভিয়ে দাও।'

বনমালী তাহার আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।

'ঘরে যাও' বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোকে লজ্জা দিয়া আলোর নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালীর পাশের ঘরখানা হেমলতার। তিনি দিনের বেলায় বিছানায় শুইয়া থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বারান্দায় কথা শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

'কে রে ? পরী নাকি ? বনমালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কি করছিস পরী ?' বলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া যোগ দিলেন, 'মরণ তোমার, বেহায়া মেয়ে !'

পরী তখন যে কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিয়া বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিতা হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'একি কাণ্ড মা ! এঁ্যা ?'

পরদিনটা কোনরকমে চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরের দিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, 'পরীকে এবার পাঠিয়ে দে বনমালী।'

'দেব। এখন থাক্।'

পরীকে এখন সে অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল-তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

হেমলতা অত জানেন না. তিনি আবার বলিলেন, 'না বাবা, পাঠিয়েই দে। স্বামী না থাক্, স্বামীর ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস্ ?'

বনমালী হাই তুলিয়া বলিল, 'দু'টি খায়, ও আবার বোঝা কি মা ?'

হেমলতা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনীর মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা গরম না করিবার উপদেশটা পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ রহিল না।

দু'দিন পরে আবার বলিলেন, 'যে রাগী মানুষ তুই, তোকে বলতে সাহস হয় না বাবু। কিন্তু চোখ মেলে এতো আর দেখা যায় না বনমালী !'

'কি হয়েছে ?'

'রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না, বল ?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না। আমার রাগ হবেনা, বল।'

হেমলতা গলা নীচু করিয়া বলিলেন, 'পরীর স্বভাব-চরিত্র ভাল নয় বনমালী। মেয়ে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস্ ? ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ?'

'জানি। আমার চিঠি টাইপ করে।'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি, বনমালী। দুপুর বেলা সেদিন চোরের মত পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক চেয়ে ওদিক চেয়ে নীচে নেমে গেল।'

'কবে ?'

'পরশু।'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'পরশু তো ? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারী চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরো না মা। পরী সে-রকম নয়।'

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তার মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মুখোস গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরি করিতে যাওয়ার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত !

আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলের ভাণ করিতে যাওয়া কি তাহার সাজে ?

এদিকে, বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্ম্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এ রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মত জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝেনা, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, 'অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকব ? যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাব ? আর কারো দিকে একটু ঝুঁকব ? একদিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব ? পায়ে ধরে যে-দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব ?'

এর মধ্যে শেষ কল্পনাদুটিকে সে কার্য্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালবাসে।

অন্ততঃ তার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোন কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে ; ভুবনকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে নিয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

তার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মত একটা কাজ পাইয়া বনমালী ভারি সুখী।

বলে, 'ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়।'

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, 'আগে থাকতে তোমার হাতে পড়লে এ্যাদ্দিনে ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিও।'

তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, 'যেন মানুষ করবেনা, তাই বলে দিচ্ছি।'

বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত !

হেমলতার জর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের সেবা আদায় করিয়া নিতেছেন।

বনমালী বলে, 'আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।'

হেমলতা বলেন, 'আমায় চিতায় তুলে দিয়ে যাস্।'

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এদিকে ভুবন বারবার হলঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকাইয়া ওঠে। এইমাত্র সে দেখিয়া গেল, পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে ছটা বাজিতে চলিল কি করিয়া ?

ঘড়ির ডায়ালটা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটা বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর এক সময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারি কৌতুক করিয়াছে এমনিভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটাকে শাসন করিয়া বলে, 'ভেঙ্গে ফেলে দেব, পাজী কোথাকার!'

ঘড়িতে ছ'টা বাজিতে আরম্ভ করামাত্র সে বাগানে ছুটিয়া যায়। বলে, 'ছটা বাজল মামা।'

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটা নীরব হয় ঠিক বোঝা যায় না।

বনমালীর এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি হয়। ছটার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু সময়মত ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই। যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়ত কার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে ? তাহাকে একটু খুসী করার জন্য। কোন প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোন মতলব হাঁসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুসী করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য !

ভুবনকে সে যে ভাল বাসিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরও একটা গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত ; চারুর জন্য ভুবনের শোক একটি বার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত

পশুর মত ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে ; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

পরীর সামনেই একদিন সে ভুবনকে বলিল, 'একটা বাড়ী নিবি, ভুবন ?'

'নেব মামা !'

'আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ী লিখে দেব।'

এ বাড়ী অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটা ছোট বাড়ী সম্প্রতি এক প্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে। সেই বাড়ীটি দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু পরীতো তাহার মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল ভুবনকে বনমালী এই বাড়ীটিই দিয়া দিবে, একদিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে গৃহপালিতা কুক্কুরীর মত অপমান-জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুঁড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মত বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া নিয়া কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাসিতে কাসিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, 'কি করে এমন হ'ল দিদিমণি ?'

পরী ফিস ফিস করিয়া বলিল, 'বাবুর কীর্ত্তি পদ্ম। অন্ধকারে—'

পদ্ম চোখ মিট মিট করিয়া বলিল, 'সেরে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। হুঁদো বেড়ালটার হয়েছিল দেখনি ? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই ঘা পুঁজে রক্তে—!'

কয়েকদিন পরে হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাকে নিয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুরবেলা পরী চুপি চুপি ভুবনকে বলিল, 'মার কাছে যাবি, ভুবন ?'

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, 'যাব।'

'এক কাজ কর তবে। জামা গায়ে চুপি চুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ী চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।'

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

'মামাকে বলে যাই ?'

'তবেই তুমি গিয়েছ ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস্ ? ছাই দেবে !'

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নিল।

পরী বলিল, 'কাউকে কিছু বলিসনে কিন্তু, খবর্দ্দার। বললে নিয়ে যাব না। যা, রাস্তায় দাঁড়াগে।'

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে নিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ীর পিছনদিকের গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হন হন করিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। বড় রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া ষ্টেসনে।

দরাজ হাতে অনেকগুলি নোট কাউণ্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্য্যন্ত ফার্ষ্টক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ী ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্ষ্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

'যা যা বলেছি মনে আছে, ভুবন ? কাল বিকেলে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ী থামবে সেইখানে নেমে যাবি।'

ভুবন বলিল, 'আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসী।' পকেট হইতে দশ টাকা দামের ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'মামা দিয়েছে। কটা বেজেছে জানো ? তিনটে বেজেছে।'

'ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছটার সময় নেমে যাবি। গাড়ী না থামলেও লাফিয়ে নেমে যাবি। মার কাছে যাচ্ছিস্ কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।'

ভুবন বলিল, 'আচ্ছা'।

'রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস্? ওটা পাঁচ টাকার নোট জানিস তো? ভাঙ্গিয়ে কাল খাবার কিনিস।'

'মা ষ্টেসনে আসবে, মাসী?'

'আসবে।'

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

'খোকাকে দাওনা মাসী, একটা চুমু খাই।'

পরী খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

'না না, এখ্খুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে।'

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ী ঢুকিল। তাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

'ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী?'

'ভুবন? ভুবনের আমি কি জানি! বাড়ী নেই?'

বনমালী হাঁকিল, 'কেষ্ট এদিকে আয়।'

কেষ্ট ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

'তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।'

কেষ্ট কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, 'কেন বাবু?'

'রাত দুপুরে তুই দোতালায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস্ বলে। আমার ন'শো টাকা চুরি গেছে।'

ঝি চাকর আশ্রিত ও আশ্রিতারা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট? পালিয়ে গেছে?'

কেষ্টর হইয়া জবাব দিল বনমালী।

'ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।'

দোতালায় যে ঘরখানায় সে এতদিন ছিল বনমালী যে সে ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তার সমস্ত জিনিষ অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়া-মোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, 'এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নীচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।'

নীচে ভাঁড়ারের পাশে একসারিতে খানসাতেক ঘর আছে, বনমালী যাদের খাইতে দেয় ওটা তাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ বাড়ীতে যাদের স্থান ঝি চাকরেরও নীচে বনমালী অনায়াসে তাকে তাদের দলে নামাইয়া দিল? সারাদিন ধরিয়া সে যে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ রচনা করিয়াছে সেটা একবার শোনাও দরকার মনে করিল না?

সে কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আমি কি করেছি? তোমার গাঁ ছুয়ে বলছি—'

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কার? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় নিয়াছে।

পরীকে নীচেই যাইতে হইল।

ক্ষেন্তি বলিল, 'কি গো, ওপোর থেকে তাড়িয়ে দিলে? বড়লোকের মর্জ্জি দিদি, কি করবে বল!'

পরী বলিল, 'কি যে বল তার ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে? আমি যেচে এনেছি। ওপোরে যে সব ম্লেচ্ছাচার —বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষালো না।'

ক্ষেন্তি বলিল, 'ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ী তো একদিন তোমার নিজেয় দিদির ছিল! আজ যে রাণী, কাল সে দাসী। হায়রে কপাল!'

ছোট স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেন্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন? সয়ে যাবে।'

বলিয়া সে পরীর বিছানাতে বসিল।

'শোন বলি। কলকাতার সে বাড়ীতে আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম—'

পরী বাধা দিয়া বলিল, 'থাক্। তুমি যাও।'

'শোনই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ীর রাজা আমাকে বললে, নীচেটা স্যাঁতসেঁতে তুই ওপরেই থাক। তোর মাব সহ্য হয়ে গেছে কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে। আমি—'

ক্ষেন্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, ওকে শুনাইয়া বুক হাল্কা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোক গিলিয়া সে বলিল, 'ব্যাপার বুঝে আমি রাজী হলাম না। নীচে মার কাছেই রইলাম।'

পরী শুইয়া পড়িল। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বলিল, 'আমার জর আসছে তুমি যাও ভাই।'

একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁরে, ভুবনের কোন খোঁজ করলি না?

বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে, যাক।'

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।

রূপকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

মৌন বল্লে—আমি তবে যাই—সাগর, সে অনেক দূর।

এই বলে মৌন চলতে লাগলো। চলতে চলতে একদেশে পৌঁছলো। সে-দেশে লোকজন পশুপক্ষী একটিও নেই—শুধু বড় বড় শুক্‌নো পুকুর পড়ে আছে, তাদের মাঝখান থেকে পাড় পর্য্যন্ত সবদিকে ফাট ধরেছে, গাছপালা সব শুকিয়ে গেছে। ন্যাড়া গাছ, ফোঁপড়া গাছ, মাজাভাঙ্গা, পাতা-ঝরা

ওপাড়ে লাল পাথরের এক অট্টালিকা।

—অনেক গাছ। গাছের তলা শুকনো পাতায়, ভাঙ্গা ডালে মর্ মর্ করচে। মৌনর বড্ড তেষ্টা পেয়েছে আর চলতে পারে না। এমনি করে হেঁটে হেঁটে সেই দেশের সবচেয়ে যে বড়ো সরোবর তার কাছে পৌঁছলো, সেটি কিন্তু আবার সবচেয়ে শুকনো, তার মাটী সব ফেটে ফেটে চটে গেছে। মৌন সেইখানে বসে পড়ছিল, দেখতে পেলে ওপাড়ে লাল পাথরের এক অট্টালিকা। ওখানে হয়ত এক ফোঁটা জল মিলবে মনে করে মৌন সেদিকে গেলো। ফটক খোলা, প্রহরী নেই, কেউ তাকে বাধা দিলে না। সে মহলের পর মহল পেরিয়ে ঢুকে গেলো। সামনে সিঁড়ি পড়লো, তাই বেয়ে ওপরে উঠে মৌন এক প্রকাণ্ড ঘর দেখতে পেলে—খালি ঘরে শুধু একটি পালঙ্ক, তাতে বিছানা পাতা। মৌন ঘরে ঢুকে বিছানায় চোখ বুজে ধপাস্ করে শুয়ে পড়লো— অমনি শব্দ হলো ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। সঙ্গে সঙ্গে কোমর-বেঁকা, চামড়া-ঝোলা, শাদা-চুলো এক বুড়ী লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকল—ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্—অ-মৌন অ-মৌন। মৌন চোখ খুলতে, বুড়ী বল্লে—

সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী তিন ভুবনের মা,
রূপো রেখার পথ দেখালু চিনতে পারিস্ না?

মৌন বল্লে—চিনতে পারি, ঠিক চিনিচি—তেষ্টা পেয়েচে জল দাও।

বুড়ী পালঙ্কের গোড়ায় গিয়ে শ্বেতপাথরের মেঝেয় বসে বল্লে—শুকনো জলের দেশে জল কোথা পাবো?—দেখ্ লি

তো সব পুকুর। এটা হচ্ছে রাজার বাড়ী, দৈত্য এসে রাজার প্রজার সবায়ের হাড় মাংস রক্ত খেয়েচে, পুকুর কুয়োর জল শুষেচে, শুধু রাজকন্যেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল আর শুধু তার চোখের জলটুকু শুষতে পারেনি। রাজকন্যে সারারাত এই পালঙ্কের ধারটিতে শুয়ে কেঁদেচে—এক ফোঁটা করে চোখের জল মেঝেয় পড়েছে আর পাথর নরম হয়েচে। এমনি করে যখন ভোর হলো—যেখানটিতে জল পড়েচে সেখানটির পাথর নরম তুল্‌তুলে হয়ে গেলো। দৈত্য এসে এমন সময় হাঁক দিয়ে বল্লে—চলো আমার সঙ্গে। রাজকন্যে আস্তে আস্তে উঠে পালঙ্ক থেকে নাবলে। একখানি পা ঠিক্ এইখানটিতে পড়লো—অমনি তুল্‌তুলে পাথরে পা'খানির ছাপ পড়ে গেলো। ছাপখানির ধারে ধারে মোছা মোছা আলতার ছোপ ধরে গেলো। দৈত্য রাজকন্যেকে নিয়ে সাগরের দেশে চলে গেলো। তুমি সাগর যাচ্ছ—তোমায় দেখাবো বলে, পা'খানি আমি আগ্‌লে বসে আছি। মৌন শ্বেতপাথরের গায়ে সেই ছাপটির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো, তার পর পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে পড়ে বল্লে—সাগর গিয়ে রাজকন্যেকে খুঁজে আন্‌বো—আমি চল্লুম—পেথমধরা পা'খানি ঠিক্ চিন্‌বো।

বুড়ী বল্লে—জল খাবে না?

মৌন বল্লে—কৈ জল?

বুড়ী বল্লে—এই পাখানিতে খুব আস্তে আস্তে তোমার আঙ্গুলের চাপ দাও, জল বেরুবে। মৌন তাই করলে—পাখানির ওপরে জল থৈ থৈ করতে লাগলো—মৌন পান করে বল্লে—এ বুঝি চোখের জল? নোন্‌তা। বুড়ী ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ করে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লে—সাগর-জল, সাগর জল

সিঁড়ি দিয়ে নেবে মহলের পর মহল পেরিয়ে শুক্‌নো সরোবরের পাড়ে আসতেই মৌনর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে লাগলো। নিজের চোখ দু'টিতে হাত দিয়ে সে বল্লে—

ও চোখ ও চোখ,
তোর শোক কেন শোক?

হাসতে গিয়ে কান্না তার নদী এই বয়ে চলে।

জলভরা কচি তাল আকন্দমালা—
চোখ-সাগরে মিট্‌বে না তো বালিচরের জ্বালা।
বক্ষদীপা বসে থাকে অন্ধকারে একা,
পেথমধরা-পা নিয়েছে দৈত্যে দোবো ছেঁকা।
রূপোরেখা ধুইয়ে দিলে—
লাল গামছা মুছিয়ে দিলে—

মাখিয়ে দিলে রূপ,
আদরখানি বুলিয়ে দিলে
সে-চোখে কি কাঁদতে আছে?
চুপ, মৌন চুপ্।

এই বলতে বলতে মৌন চল্লো—কোন দিকে গেল, কত দূর গেলো কিছুই ঠিক রইল না—কত দিন ধরে হাঁটলে কেউ জানে না। মৌন আর কাঁদে না, চোখের জল শুকিয়ে গেছে—শুধু গালের ওপর চোখের জলের দাগ রয়েছে।

একদিন সকালবেলা রোদ উঠ্লো না—ভিজে ছাইয়ের মতন মেঘলা আকাশ—মৌন তখন একটা ভাঙ্গাভিটের উঠোনে এসে দাঁড়ালো। উঠোনটি কিন্তু তক্তকে করে গোবরমাটী দিয়ে নিকোনো—উঠোনের ধারে তিনটি চারা গাছ রয়েছে—ঝাঁপুরঝুঁপুর লঙ্কাগাছ—একটিতে ফুল ধরেছে সাদাসাদা একগাছি, একটিতে কাঁচালঙ্কা সবুজ সবুজ আর একটিতে রাঙালঙ্কা গাছভরা। মৌন সেখানে আসতেই কা'রা কচি কচি গলায় বলে উঠলো যেতে দোব-না, পথ দোব-না। মৌন কাউকে দেখতে পেলেনা, মনে হল যেন লঙ্কাগাছের ভেতর থেকেই শব্দ এলো। মৌন তাই উঁকি মেরে দেখলে, ঠিক তাই—দু'টি খুকী আর যে-গাছটিতে সাদা সাদা ফুল তার তলায় একটি খোকা উবু হয়ে লুকিয়ে বসে আছে। খুকী দু'টি দিদিদের মতন গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরে—ঝাঁপুরঝুঁপুর লঙ্কা ফলেছে—সেই চারা দু'টির তলায় ঝুমুর ঝুমুর মল বাজাচ্চে আর ধূলোমাখা ন্যাংটা খোকাটি ফুলধরা চারা গাছটি নাড়া দিচ্ছে।

মৌন তাদের বল্লে—খুকী তোমরা কারা?

খুকীরা মল বাজিয়ে বাজিয়ে বল্লে—আমরা হলুম লঙ্কাবুড়ী—ও আমাদের ভাই।

মৌন বল্লে—পথ দেবে না কেন?

তারা বল্ল—পথ তোমাকে দেবো বৈ কি। পাছে আমাদের মাড়িয়ে যাও—তাই তোমাকে সাড়া দিলুম—গালে তোমার জলের দাগ—বড্ড তুমি ভুলো ভুলো। তুমি যাও আমাদের পাশ কাটিয়ে।

মৌন হেসে হেসে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। এক জায়গায় এসে দেখ্লে বড় আশ্চর্য্য—কূলে কূলে ভরা এক নদী, যেমন জল তেমনি টান। আর সেই নদীর দু'তীরে সবুজ ঘাস—তারপর ফসলের ক্ষেত। সেই তীরে একজন মানুষ কি বল্‌চে আর খুব নাচ্‌চে।

মৌন তার কাছে গিয়ে বল্লে—ও ভাই ও ভাই একটা কথা শুনবে কি?

সে নাচতে নাচতে বল্লে—শুনবো কথা, শুনবো কথা।

মৌন বল্লে—এ নদীর নাম কি? সে তখন নদীকে ডেকে শুধলে—নদী তোমার নাম কি? নদী বল্লে—নাম ছিলো ভুলে গেছি। দু'কুল ছুঁয়ে যেতে যেতে নামটা আমার ক্ষয়ে গেলো—আমায় এখন যা-খুসী তাই বলো।

মৌন বল্লে—

দু'টো নদী হেঁটে এনু, তিন্‌বারের বার ঠেকে গেনু,
এত জল কেম্‌নে থাকে এ-নদীতে পার করে কে?
তুমি ভাই কে হও,
উত্তর কও উত্তর কও।

মানুষটি বল্লে—

বনবরফের——বা—হার্
পাথর পাথর চূড়ো করা——পা—হাড়—

সেইখানে বুড়ো বসে আছে, তার পাশে বুড়ী। কেউ কারুর পানে তাকায় না—বুড়ী বলে—ভালো বাসি, ভালো বাসি। বুড়ো বলে—ভালো বাসি, ভালো বাসি—অম্‌নি দু'জন হেসে ফেলে—

হাসতে গিয়ে কান্না
তার নদী এই বয়ে চলে।
তীরে তীরে পান্না—
সেই বুড়োটা সেই বুড়ীটা
আমি তাদের ছেলে।
নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে আসি
দেশবিদেশে ফেলে,
আমার নাম তালনন্দ,
পার হ'তে কি চাও?
এই খানেতে দাঁড়াও তবে
দাও ঝাঁপ দাও—

বলেই তালনন্দ মৌনকে একঠেলা দিয়ে জলে ফেলে দিয়ে আবার নাচতে আরম্ভ করে দিলে। মৌন টানে ভেসে চল্লো আর শুনতে পেলে, তালনন্দ নাচ্‌চে আর বলচে—

ও বুড়ো ও বুড়ী
ঘাসে ঘাসে সুড়সুড়ি।

নদীতে একটিও নৌকা নেই যে ডাকবে—অগত্যা মৌন ভেসেই গেলো।—কতোদিন যে তার হিসেব নেই—ভাস্‌তে ভাস্‌তে একদিন মৌন তীরে ঠেক্‌লো। তখন সে খুব হাঁপিয়ে গেছে, কাদার চড়ায় মরার মতন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। সেই সময় এক চাষা নাইতে আসছিলো—মড়ার মতন মৌনর নিশ্বাস প্রশ্বাস বইচে দেখে তাড়াতাড়ি তাকে দু'হাতে তুলে নিলে। চাষার ইচ্ছে হলো বুকে চেপে তাকে ঘরে নিয়ে যায়—কিন্তু সাহস হলো না। আহা কি সুন্দর ছেলেটি, নিশ্চয় কোন দেবতা – পৃথিবীতে ঘুমিয়ে পড়েছে—যদি তার ঘুম ভেঙ্গে যায়—তাই চাষা খুব সন্তর্পণে আল্‌গোছে মৌনকে দু'-হাতের উপর শুইয়ে নিলে—মৌনের ভারে চাষার শক্ত হাতের শিরাগুলো সব ফুলে ফুলে উঠ্‌লো, টান্ টান্ হয়ে গেলো—বুকটা ঝুঁকে এলো—পেটটা ঢুকে গেল—বুকে পেটে পিঠে সব খাঁজ পড়ে গেলো। ঘরে ফিরে সে মৌনকে আস্তে আস্তে মাদুরে শুইয়ে দিলে। মাদুরে গা ছোঁয়াতেই তার ঘুম ভেঙে গেলো—চাষাকে বল্লে—আমায় শুক্‌নো কাপড় দাও। চাষার মেয়ে কাপড় এনে দিলে—তারপর মৌনের জন্যে মোটা মোটা ভাত, রাঙা রাঙা রঙ কচুভাতে, লাউ-ডাঁটার ঝোল আর তেঁতুল ফুলের অম্বল বাড়তে গেলো। মৌন জিগ্যেস করলে—চাষা, সমুদ্দুর যাব কোন পথে? চাষা বল্লে—রাজধানী মাড়িয়ে পথ। আজ-কাল কিন্তু নগরে ঢুকতে বিপদ বড়। মৌন বল্লে—আমি যাবো—কি বিপদ? চাষা গলা খাটো করে চুপি চুপি বল্লে—রাজবাড়ীর গোপন কথা—গোপন কথা—ঠাকুর—আমি শুনে ফেলিচি—শুধু তোমায় বলি। যুবরাজ রোজ সকাল বেলা চম্‌কে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেন আর বলেন—ছুঁয়ে গেলো—চলে গেলো—কালো মেয়ে—কেউ এর কারণ ঠিক করতে পারে না—তাই ঠিক করেছে শত্রুর চর যুবরাজকে পাগল করেছে। নতুন লোক গেলেই আগে তাকে বন্দী করছে। তুমি এখানে কিছুদিন থাকো ঠাকুর, আমি সুবিধে বুঝে তোমায় নিয়ে যাবো। মৌন বল্লে—তাই ভালো।

দুহাতের উপর শুইয়ে নিলে।

পরদিন চাষা সহরে চলে গেলো—মৌনর আর ঘরে ভালো লাগে না। রূপোরেখার জল যদি এদ্দিনে সব শুকিয়ে গিয়ে থাকে—এই কথা মনে হতেই, তক্ষুনি সে সাগর যাবে বলে সহরপানে বেড়িয়ে পড়্‌লো। সহরে ঢুকে মৌন চুপ করে একদিকে দাঁড়িয়ে রইলো—রাস্তা লোকে ভর্ত্তি—সারি সারি দোকান—ঘোড়া-গাড়ীর বিরাম নাই।

শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে হাতীর পর হাতী সার বেঁধে চলেছে, গলায় ঠুং ঠুং করে ঘণ্টা বাজচে; কুলোর মতন কান নেড়ে নেড়ে পিঠের ওপর হাওদায় রাজার মত সব মানুষ নিয়ে তারা চলে গেলো খাটো খাটো লেজ ঝুলিয়ে। মৌন দাঁড়িয়ে

চাষার মেয়ে ছাদে নাব্‌লো।

দাঁড়িয়ে বল্লে—বেশ দেশ, বেশ দেশ। এমন সময় কোত্থেকে এক রাজ-কর্ম্মচারী এসে কিছু না বলেই মৌনকে বন্দী করে রাজবাড়ী নিয়ে গেলো—সেখানে তাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখলে।

দিন গেলো, দুপুর গেলো, বিকেল সন্ধ্যেরাত গেলো—তখন শেষ রাত্তির বেলা, মৌন জানলা দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে ছিল—এক ফোঁটা ঘুমও তার চোখে ছিল না। তার ঘরের সামনে একটা পুরণো অশথগাছ ছিলো, তার দু'তিনটে ডাল রাজবাড়ীর ছাদে গিয়ে পড়েছে—গাছের ফাঁকে তখনো বেশ অন্ধকার। মৌন সেই গাছটির দিকে চেয়ে চেয়ে একমনে শুধু ভাব্‌ছিলো—সাগর যাবে কেমন করে। সেই সময় কে একজন তাড়াতাড়ি এসে গাছে উঠ্‌লো—আস্তে আস্তে ডাল ধরে ধরে রাজবাড়ীর ছাদে নেবে গেলো। মৌন দেখতে পেলে কিন্তু বুঝতে কিছুই পারলে না—কে গেলো তাও চিনতে পারলে না। খানিক বাদে গাছ বেয়ে বেয়ে আবার যখন সে নেবে গেলো—মৌন তাকে চিন্‌লে—এ সেই চাষার মেয়ে।

সকালবেলা মৌনর ঘরের সামনে দিয়ে যুবরাজ যাচ্ছিলো—মৌন জান্‌লা দিয়ে ডাক্‌লে—যুবরাজ, আমায় সাগর পৌঁছে দাও—কালো মেয়েকে ধরে দেবো—তোমায় যে ছুঁয়ে যায়।

যুবরাজ বল্লে—দাও ধরিয়ে—তোমায় ছেড়ে দেবো—সাগর পৌঁছে দেবো—একদিনে। মৌন বল্লে—একটা কথা বলবো মনে রেখো। যুবরাজ জানলার কাছে এগিয়ে এলো—মৌন তার কানে কানে বল্লে—

শেষরাতে লুকিচোঁয়া
বুকচমকা বেটি।
চক্ষু-জুড়ন কাজলছানি
গড়ন হলো সেটি—
ভোরের আলোয় দেখবে যদি ভোরের আগে উঠো—
চোখের ঘুম ফেলে দিয়ো
খপ্‌ করে ধরে নিয়ো
ধানের শীষে ভরা দু'টি নিটোল হাতের মুঠো।

যুবরাজ মৌনকান্তির কথা মনে মনে মুখস্থ করতে করতে ফিরে গেলো। সে দিন শেষ রাত্তিরে যখন গাছ দিয়ে উঠে চাষার মেয়ে ছাদে নাব্‌লো মৌন ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বল্লে—

শেষরাতে লুকিচোঁয়া
বুকচমকা বেটি

ঠিক সেই সময় মেয়েটি জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে গোছা ধানের শীষ দিয়ে যুবরাজের গা ছুঁলে। যুবরাজ ভোরের আগে জাগতে পারেনি, কিন্তু আজ আধঘুমো আধজাগো হয়ে ছিলো—যুবরাজ ধড়মড় করে উঠে পড়লো। মেয়েটি অন্য দিনের মত দেরী করলেনা—তক্ষুনি গাছ বেয়ে নেবে কোন্ দিক দিয়ে যে মিলিয়ে গেলো—যুবরাজ তাকে ধরতে পারলে না। [ক্রমশঃ]

চতুষ্পাঠী

-শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

রেলগাড়ীর কথা

[১]

বন্ধু কাশী থেকে চিঠি লিখেছে—

"আমার বড় অসুখ। একবার আসো যদি বড় ভাল হয়। শীগ্‌গির এসো নইলে দেখা হয়তো না হতেও পারে।"

তাড়াতাড়ি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ীতে চড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাশীতে গিয়ে পৌঁছই।

কিন্তু যখন রেলগাড়ী তৈরী হয় নি – তখনকার দিনের কথা একবার ভাবো দেখি! আজকে রেলগাড়ী চড়ে চড়ে আমরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, রেলগাড়ী না থাকলে পৃথিবী চলে কি করে আমরা ভাবতেই পারি না। কিন্তু বেশী দিন আগেকার কথা নয়, একশো বছর আগেও পৃথিবীর কোনও দেশে এরকম রেলগাড়ী ছিল না। কিন্তু তবুও সেদিন পৃথিবী চলতো।

পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, নৌকো বেয়ে মানুষ সেদিন চলাফেরা করতো। চতুষ্পদ জন্তুরা মানুষের বাহন হয়ে, তার মালপত্র বয়ে বেড়িয়ে সেদিনও পর্য্যন্ত আমাদের সভ্যতাকে চালিয়ে রেখেছিল। আজকে রেলগাড়ীর দিনে, তাদের সেই ঋণের কথা আমরা যেন না ভুলি।— যেন না ভুলি, ঘণ্টায় ষাট মাইল না চল্লেও, একদিন তারাই পিঠে করে মানুষের সভ্যতাকে দেশ-দেশান্তরে নিয়ে বেড়িয়েছে।

[২]

বাষ্প এসে মানুষের অনেক পরিশ্রম দূর করেছে—তার এগিয়ে-চলাকে সে-একা অনেকখানি সাহায্য করেছে। তাতে ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে-কথা এখানে আলোচনা করে দরকার নেই। তবে একথা সত্যি যে বাষ্পকে খুঁজে পেয়ে মানুষ এই জগৎকে নতুন করে গড়ে তুলেছে। এত তাড়াতাড়ি, এত বিরাট পরিবর্ত্তন এই জগতের মধ্যে হয়ে গিয়েছে যে, আমরা তার মধ্যে বাস করছি বলে সেই পরিবর্ত্তনের বিরাটত্ব কিছুতেই বুঝতে পারি না।

অথচ বাষ্প চিরকালই মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। যেদিন আলেকজাণ্ডার বিউকাফেলায় চড়ে গ্রীস থেকে এসেছিলেন ভারতবর্ষে, সেদিনও বাষ্প ছিল; বাষ্প-শক্তি সেদিনও মানুষের অজ্ঞাতে প্রকৃতির রাজ্যে আপনার কাজ করে চলেছিল। প্রথম মাটীর হাঁড়ি তৈরী করে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে যে মানুষ তার প্রতিদিনের অন্ন তৈরী করেছিল সেও সেদিন সেই বাষ্প-শক্তির সাহায্য নিয়েছিল। এই পৃথিবী-ভরা হাজার হাজার উষ্ণ প্রস্রবণে মাটীর বুক থেকে জল টেনে ওপরে

চায়ের টেবিলে জেমস্ ওয়াট।

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে তার অস্তিত্ব জানিয়েছিল। কিন্তু মানুষ সেদিন তা লক্ষ্য নি। বোঝেনি যে, এই শক্তিকে কি করে কাজে লাগাতে পারা যায়।

[৩]

কেউ যে বোঝে নি, অবশ্য একথা বলা চলে না। আলেকজান্দ্রিয়া শহরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দার প্রাচীন আফ্রিকার উত্তর উপকূলে তাঁর নিজের নামে এই শহরটির পত্তন করেন। বহু জ্ঞানী গুণী লোক সেই শহরে এসে বসবাস স্থাপন করেন।

জুলিয়াস সীজার যখন রোমে শাসন করতেন তখন এই আলেকজান্দ্রিয়া শহরে হীরো বলে একজন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেন। কলকব্জা তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। অনেকে বলেন যে, জ্যামিতির

গোড়ার সূত্রগুলি তিনিই প্রথম বার করেন। নীল-নদের বন্যায় চাষীদের ক্ষেত প্রায়ই ডুবে যেতো। বন্যা চলে গেলে এক মহা-বিপদ ঘটতো। দেখা যেতো যে, প্রত্যেকের জমির সীমানা হারিয়ে গিয়েছে। নতুন করে জমির সীমানা মাপবার সময় প্রায়ই গণ্ডগোল ঝগড়া-বিবাদ হতো। জমি মাপবার জন্যে, জমির সীমানা ঠিক করবার জন্য হীরো জ্যামিতির সৃষ্টি করলেন।

উইলিয়াম মারডক।

এই হীরো প্রথম বাষ্প-শক্তির কথা জানতে পারেন। কিন্তু জেনেও তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাকে কাজে লাগাতে পারলেন না। তখন মিশরে মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতদের খুব আধিপত্য ছিল। অনেক রকম কায়দা করে ভক্ত যাত্রীদের তাঁরা দেবতার অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাতেন। হীরোর প্রথম বাষ্প-চালিত যন্ত্র এই মিশরীয় পুরোহিতরা তাঁদের নিজেদের কাজে লাগান।

সেকালের গ্রীকরা মন্দিরে দেবতার ভোগের জন্যে সুরা দিত। দেবতা সেই সুরা গ্রহণ ক'রে সেটা নিজেই ভক্তদের পাত্রে ঢেলে দিতেন। এই ব্যাপারটি হীরোর বাষ্পযন্ত্রে ঘটতো। ফাঁপা মূর্ত্তির তলায় আগুনের তাপে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হতো। সেই বাষ্প গিয়ে গলার কাছে সুরায় চাপ দিতে সুরা বেরিয়ে আসত। দেবতা নিজে দিলেন এই মনে করে সেই প্রসাদ ভক্তরা নিয়ে চলে যেতো। জল তোলবার জন্যে বাষ্প-চালিত আর একটি কলও হীরো তৈরী করেন। কিন্তু তারপর বাষ্পশক্তির কথা আর শোনা যায় না।

[৪]

একজন বিজ্ঞ লোক বলেছেন যে, মানুষের জ্ঞান হ'ল ধূমকেতুর মতো। ধূমকেতুর আবির্ভাবের কথা তোমরা জান বোধ হয়। হঠাৎ একদিন প্রকাশ হ'ল, তারপর বহুশত বছর আর তার কোন দেখা পাওয়া যায় না। আবার হঠাৎ একদিন দেখা গেলো। সেই যে জুলিয়াস সীজারের আমলে হীরো বাষ্প-শক্তির ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাকে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, তারপর প্রায় আঠারো শ' বছর কোন দেশে কোন মানুষ আর বাষ্প-শক্তিকে কাজে লাগাবার কথা ভাবেন নি। আঠারো শ' বছর পরে ডেনিস্ প্যাপিন বলে একজন ফরাসী আবার বাষ্প-শক্তিকে কাজে লাগালেন।

প্যাপিনের কথা বলবার আগে, বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের যে দুটি হলো বিশেষ অংশ তার সম্বন্ধে মোটামুটি দু'একটা কথা বলা দরকার। যে-কোনও বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের দুটি প্রধান অংশ হলো, সিলিণ্ডার এবং পিষ্টন। সিলিণ্ডারগুলো সাধারণতঃ গোল এবং ফাঁপা হয়। সিলিণ্ডারের সঙ্গে লম্বা দণ্ডের মত পিষ্টন আটকান থাকে। বাষ্পের চাপে পিষ্টন সিলিণ্ডারের মধ্যে যাওয়া-আসা করার ফলে যন্ত্র চলে। এই সিলিণ্ডার এবং পিষ্টনের ব্যাপার আবিষ্কার না হলে কোন বাষ্প-যন্ত্রই তৈরী হতো না। হীরো সিলিণ্ডার এবং পিষ্টনের কথা ভাবতে পারেন নি। প্যাপিন এই দুটি অপরিহার্য্য জিনিসের কথা জগৎকে জানিয়ে বাষ্প-যন্ত্র তৈরী করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। এখন প্যাপিনের কথা বলি।

[৫]

সম্ভবতঃ ১৬৪৭ থেকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্যাপিন জীবিত ছিলেন। স্বাধীন ধর্ম্ম-মত প্রকাশের জন্য তখন

য়ুরোপে নানা রকমের ঝগড়াঝাঁটী চলতো। লোকে ভীষণ ভাবে নির্য্যাতিত হতো। তাঁর ধর্ম্ম-মতের জন্যে নির্য্যাতিত হয়ে প্যাপিন স্বদেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসেন। ইংলণ্ডে এসে তিনি সিলিণ্ডার এবং পিষ্টন-ওয়ালা প্রথম বাষ্প-যন্ত্র তৈরী করলেন। অবশ্য তাঁর সিলিণ্ডার এবং পিষ্টনের গঠনের অনেক ত্রুটী ছিল কিন্তু তাঁর বাহাদুরী হল যে, যে-দুটো জিনিস না হলে বাষ্প-যন্ত্র তৈরী হত না, তিনি প্রথম সেই দুটি জিনিসের রূপ শুধু কল্পনা করলেন তা নয়, তাকে বাস্তবেও রূপ দিলেন।

প্যাপিন বাষ্প-শক্তি দিয়ে আর একটি মজার জিনিষ তৈরী করেন। Papin's Digest নামে সে-যন্ত্রটি জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে। বাষ্পের সাহায্যে তাড়াতাড়ি রান্না করবার জন্যে তিনি এই যন্ত্রটি তৈরী করেন। এই নতুন যন্ত্রে রান্না ক'রে বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সভ্যদের তিনি নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। মাংস এ রকম রান্না হয়েছিল যে হাড়গুলো পর্য্যন্ত একেবারে গলে গিয়েছিল।

জন এভেলিন বলে একজন ইংরেজের সেই সময়কার একটা ডায়েরী আছে। এই বিখ্যাত নিমন্ত্রণের তিনি একটা বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। তিনি এই নিমন্ত্রণের খাদ্যের এবং রান্নার যে-রকম বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে এই আবিষ্কারের কথা তলিয়ে গিয়েছে। প্যাপিনের নতুন যন্ত্রটির একটা বিশেষত্ব ছিল। প্যাপিন এই যন্ত্রে আর একটি নতুন অঙ্গ জুড়ে ছিলেন। বাড়তি বাষ্পকে চালিয়ে দেবার জন্যে এঞ্জিনে যে ভাল্‌বের প্রয়োজন হয়, তিনি প্রথম এই ব্যাপার উপলক্ষে তা তৈরী করেন। সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক নিমন্ত্রণের মধ্যে সমস্ত রান্নার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল, সেই ভাল্‌বের সৃষ্টি।

তা হলে, একথা বলা যেতে পারে, বর্ত্তমান বাষ্প-যন্ত্রের জনক হিসাবে এই ফরাসী নির্ব্বাসিতের নাম উল্লেখ করাই উচিত। বাষ্প-যন্ত্রের যা প্রধান-অঙ্গ, সিলিণ্ডার, পিষ্টন এবং ভাল্‌ভ্‌—এই তিনটিই প্যাপিনের দান।

[৬]

বাষ্প-যন্ত্রের ইতিহাসে প্যাপিনের নামের পর টমাস নিউকমনের নাম করতে হয়। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ডার্টমাউথে এক দরিদ্র পরিবারে নিউকমন জন্মগ্রহন করেন। যৌবনে নিউকমন তালা-চাবির কাজ করতেন। জন্ম থেকেই যন্ত্র গড়বার তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল।

সেই সময় ইংলণ্ডে কয়লার খনি খোঁড়ার কাজ খুব জোরে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল যে, এক মহাবিপত্তি ঘটছে। খনিতে এত জল জমে যে, খোঁড়ার কাজ আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। বালতি করে কত আর জল তোলা যায়?

সহজে খনি থেকে কি করে জল তোলা যায়, তখন অনেকেই এই কথা ভাবছিলেন। নিউকমনও এই ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন ধরে ভাবতে থাকেন। অবশেষে তিনি বাষ্প-

ক্যাপ্টেন ট্রেভেথিক।

চালিত একটা যন্ত্র তৈরী করলেন—তার সাহায্যে পাম্প করে খনি থেকে জল তোলা যেতো। সেই যন্ত্র তৈরী করার পর নিউকমনের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বহু খনিতে তাঁর যন্ত্র ব্যবহৃত হতে লাগলো।

পরের যুগে যাঁরা রেল-গাড়ী তৈরী করলেন তাঁরা নিউকমনের এই যন্ত্র দেখেই প্রেরণা পান।

[৭]

জেমস্ ওয়াট্ এবং তাঁর চায়ের কেট্‌লির গল্প তোমরা জান। জেমস্ ওয়াট যৌবনে একবার একটা পুরোণো নিউকমনের যন্ত্র মেরামত করবার জন্যে পান। সেই যন্ত্রটিকে

নিয়ে দিনের পর দিন তিনি তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেন এবং তার ফলে তিনি বাষ্প-চালিত এঞ্জিন এমন নিখুঁত ভাবে তৈরী করলেন যে, বাষ্প-চালিত যন্ত্রের যুগ তিনিই প্রকৃত পক্ষে নিয়ে এলেন। কিন্তু এই যে সব বাষ্প-চালিত যন্ত্র তৈরী হতে লাগল—এগুলো সবই কিন্তু স্থাণু, সচল নয়। অর্থাৎ রেল-গাড়ী তৈরী করার কথা তখনও কারুর মনে আসে নি। এইবার একটি অদ্ভুত লোকের কথা বলব—তাঁর নাম রেল

জর্জ্জ ষ্টিফেনসন।

গাড়ী তৈরীর ইতিহাসে সকলের ওপরে থাকা উচিত ছিল কিন্তু দৈব-যোগে তা ঘটে নি।

তাঁর নাম হলো উইলিয়াম মারডক্। স্কটল্যাণ্ডে আয়ার-সায়ার গ্রামে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে-বেলায় কোনও লেখাপড়া তিনি শেখেন নি। পাহাড়ে পাহাড়ে গরু চরাতেন; বিশ্রাম করবার সময় পাহাড় খুঁড়ে গর্ত্ত তৈরী করতেন। সেই গর্ত্তে কয়লা নিয়ে এসে আগুন ধরাতেন। এই ছিল তাঁর খেলা। এবং এই খেলা থেকেই কয়লার গ্যাসের খবর তিনি জগৎকে দিলেন। মানুষ একটা নতুন শক্তির সন্ধান পেল। বারমিংহাম আর মাঞ্চেষ্টার কেরোসিনের আলোর বদলে গ্যাসের আলোয় ভরে উঠল।

স্কটল্যাণ্ডে থাকতে আর তাঁর ভাল লাগছিল না। তাঁর প্রায়ই মনে হত যে, উপযুক্ত সহায় পেলে অনেক নতুন জিনিষ তিনি তৈরী করে যেতে পারেন। সকলের চেয়ে বেশী করে তাঁর মনে হ'ত যে বাষ্প দিয়ে তিনি সচল যন্ত্র তৈরী করতে পারেন। সচল রেল-এঞ্জিন-তৈরী করবার কথা প্রথম তাঁর মনে আসে।

অন্তরের বাসনাকে রূপ দেবার জন্যে পায়ে-হেঁটে তিনি বার্মিংহামে এলেন। সেখানে তখন জেম্স্ ওয়াট্ এবং তাঁর বন্ধু বোল্টনের বিখ্যাত কারখানা ছিল। এই কার-খানা থেকেই ওয়াটের সমস্ত যন্ত্র তৈরী হ'ত। মারডকের সঙ্গে দেখা হ'ল বোল্টনের।

সচল বাষ্প-যন্ত্রের কথা শুনে বোল্টন হেসে উড়িয়ে দিলেন। এতদূর পথ এসে, এরকম ভাবে অবজ্ঞাত হয়ে ক্ষোভে মার্ডক্ তাঁর মাথার টুপীটা মাটীতে ছুঁড়ে ফেললেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার, একটা খুব ভারী আর শক্ত জিনিষ মাটীতে পড়লে যেমন শব্দ হয়, টুপিটা মাটীতে পড়তেই তেমনি শব্দ হলো।

বোল্টন্ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একি টুপীটা কিসের তৈরী হে!

দুঃখিত ভাবে মারডক্ উত্তর দিল, কাঠের, স্যার! নিজের হাতে মতলব করে তৈরী করেছিলাম!

এই ব্যাপারে বোল্টন এতদুর চমৎকৃত হন যে, তিনি সেইদিনই মারডককে সপ্তাহে পনেরো শিলিং করে মাইনের একটা চাকরী দিলেন।

সেই কোম্পানীতে চাকরী করবার সময় মারডক জগতের প্রথম রেল-এঞ্জিন তৈরী করেন। এঞ্জিনটি যদিও আকারে ছোট ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাস্তা দিয়ে সেটা চলেছিল। কিন্তু মাত্র এক রাত্তিরের জন্যে। জগতের সেই প্রথম রেল-এঞ্জিন মাত্র এক রাত্তিরের জন্যে চলেছিল। কিন্তু কি বিপত্তি!

রেড্রুথ গ্রামে একদিন রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে আছে, মারডক তাঁর ছোট্ট রেল-এঞ্জিনটি নিয়ে নির্জ্জন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম এঞ্জিন, দোষ তার ছিল অসংখ্য! চোঙা দিয়ে কয়লার লাল আগুন নির্জ্জন অন্ধকারকে সশব্দে রাঙিয়ে তুললো। গৃহস্থরা ঘুমের মধ্যে হঠাৎ সেই অদ্ভুত

ধরণের শব্দ শুনে, জানালা খুলে বাইরে চেয়ে দেখে, শব্দ করে একটা আগুনের শিখা চলেছে! নিশ্চয়ই ভূতের কাণ্ড! সভয়ে তারা ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগল।

গির্জ্জের সামনে যখন এঞ্জিনটা এলো, পাদ্রীর গেল ঘুম ভেঙে। জানলার বাইরে দেখেন, শয়তান মশাল জেলে পথ দিয়ে চলেছে!

যখন তারা জানল যে মারডকও সেই সঙ্গে ছিল, তখন সবাই মিলে ঘোষণা করল যে, মারডকের ঘাড়ে শয়তান ভর করেছে!

মারডক বিব্রত হয়ে বোল্টনের শরণাপন্ন হলেন কিন্তু বোল্টন তাঁর প্রস্তাব অসম্ভব বলে প্রত্যাখান করলেন। মারডকের আর রেল-গাড়ী তৈরী করা হ'ল না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অপূর্ণ বাসনা নিয়েই পরলোক গমন করলেন।

[৮]

মারডক যে-গ্রামে তাঁর প্রথম রেল-এঞ্জিন চালিয়েছিলেন সেই গ্রামেই রিচার্ড ট্রেভিথিক বলে একটি ছেলে ছিল। ছেলেবেলা থেকেই যন্ত্র-পাতি তৈরী করার দিকে তার মন ঝোঁকে। স্কুলে পড়বার সময় সে প্রায়ই ভাবত, কি রকম করে বাষ্প-শক্তিকে কাজে লাগানো যায়। মারডকের কাহিনী সে শুনেছিল। সর্ব্বদাই ভাবত মারডকের কল্পনাকে কি করে সফল, সার্থক করা যায়। বাষ্প-শক্তি দিয়ে গাড়ী চালাতেই হবে!

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি একটি ছোট এঞ্জিন তৈরী করলেন। নিজের বাড়ীতে একটা টেবিলের ওপর সেটা চালালেন। একটা ছোট্ট খেলা-ঘরের এঞ্জিন, কিন্তু সেটা সত্যিই চল্ল!

উৎসাহিত হয়ে তিনি একটা বড় এঞ্জিন তৈরী করে সেটাকে লণ্ডনে নিয়ে এলেন। এঞ্জিনের সঙ্গে একটা ছোট্ট গাড়ী জুড়ে দিলেন। প্রথমে সে-গাড়ীতে উঠতে লোকে ভয় পেল। মাল-পত্র নিয়ে ট্রেভিথিকের রেল-গাড়ী দিব্যি চলতে লাগল। ক্রমশঃ তাতে লোকজনও উঠতে লাগল। স্যার হাম্‌ফ্রি ডেভী—সে সময়ের সব চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক—তাঁর একজন বন্ধুকে এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি এই রেল-গাড়ীটার উল্লেখ করে লেখেন, ক্যাপটেন্ ট্রেভিথিকের ড্রাগন!

পেন্-ই-ডারান্ বলে একটা জায়গায় একটা লোহার কারখানা ছিল। সেই কারখানার সঙ্গে কয়েক মাইল লম্বা একটা ট্রাম লাইন ছিল। ট্রেভিথিক সেই ট্রাম-লাইনের ওপর একটা আসল রেল-গাড়ী তৈরী করে চালালেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী, দশ টন লোহা আর সত্তর জন যাত্রী নিয়ে গাড়ী ছাড়ল। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হিসাবে গাড়ীটা চমৎকার চলতে লাগল। কিন্তু এক জায়গায় ট্রাম লাইনটা একটু খারাপ থাকায়, এঞ্জিনটা লাইন থেকে পড়ে গেল। এবং এই দুর্ঘটনার পরে সেবারকার মত রেল-লাইনে এঞ্জিন চলা বন্ধ হয়ে গেল।

জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের "রকেট"।

কিন্তু ট্রেভিথিক তাতে দমলেন না। রেল-লাইন ছাড়া বাষ্প-চালিত একটা গাড়ী তৈরী করে তিনি লণ্ডনে চালাতে লাগলেন।

তাঁর অর্থ-সঙ্গতি খুব বেশী ছিল না। তার ওপর বারবার রেল-গাড়ীর জন্যে এঞ্জিন তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়। তিনি ভাবলেন যে, এই যাত্রী-গাড়ীর ব্যবসায়ে তিনি ক্ষতি পূরণ করে নেবেন। কিন্তু ক্ষতির মাত্রা আরও বেড়ে গেল। নানা কারণে তাঁর গাড়ীতে লোকজন বিশেষ হ'ল না। এদিকে ট্রেভিথিক একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। যখন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ-রক্ষা করলেন, তখন তাঁর দেহ সমাহিত করবারও টাকা ছিল না। বন্ধুরা চাঁদা করে তাঁর দেহ যথারীতি সমাহিত করেন।

[৯]

নিউকাসেলের কাছে একটি ছোট্ট গ্রামে এক অতি দরিদ্র পরিবারে জর্জ্জ ষ্টিফেনসন বলে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। ভাই-বোনে মিলে তারা ছ'জন ছিল। একটি মাত্র ছোট ঘর, সেই ঘরে তারা সকলে কোনও মতে থাকত।

ছেলেমেয়েদের বর্ণ-পরিচয় শেখাবার মত সামর্থ্যও তাঁদের ছিল না। বাপ কারখানায় সামান্য মজুরের কাজ করত।

একটু বয়স হতেই জর্জ্জ ষ্টেফেনসনকে একটা কয়লার খনিতে মুটেগিরি করে পয়সা অর্জ্জন করতে হত।

আঠারো বছর বয়সে দিনের বেলা বার ঘণ্টা খেটে রাত্রি বেলায় একটা পাঠশালায় গিয়ে জর্জ্জ এ-বি-সি-ডি শিখতে আরম্ভ করলেন। একুশ বছর বয়সে কোনও রকমে মাত্র নাম সই করতে শিখলেন।

নানা রকম কাজ করে জর্জ্জকে পয়সা উপায় করতে হতো। জুতো সেলাই করে, মুচীর "লাস" তৈরী করে, ঘড়ি মেরামত করে, মুটেগিরি করে অর্থ উপার্জ্জন করতেন। কিন্তু তাঁর একটা বিশেষত্ব ছিল যে যে-কোনও যন্ত্র মেরামত করতে তিনি অদ্বিতীয়।

যে-লোক জগতে রেলগাড়ী আনল তিনি লেখাপড়া কিছুই শেখেন নি—বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব তিনি জানতেন না। কিন্তু যন্ত্রকে তিনি ভালবাসতেন। সে সময় যত যন্ত্র তৈরী হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকে তিনি ভাল করে জানতেন। সেইজন্যে যন্ত্র মেরামতের কাজে তিনি ওস্তাদ্ হয়ে উঠলেন।

সপ্তাহে উনিশ শিলিঙ হিসেবে তিনি একটা ভাল চাকরী পেলেন। কাজ হ'ল, ভাঙ্গা যন্ত্র মেরামত করা। এই সময় একটা কয়লার খনিতে জলতোলা কল খারাপ হয়ে যায়। কেউ আর তাকে সারাতে পারে না। শেষে খনির মালিকরা ষ্টিফেনসনকে ডেকে পাঠালেন। তখন খনির এমন দুরবস্থা যে, সেটা জলে ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছে। ষ্টিফেনসন এসে যন্ত্রটি ভালো করে দেখে, তাকে মেরামত তো করলেনই, একটা নতুন সিলিণ্ডার জুড়ে দিয়ে যন্ত্রটাকে একেবারে নতুন রকম করে গড়ে তুললেন।

যন্ত্র মেরামত করতে করতে ষ্টিফেনসন যন্ত্র তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। খনির ভেতরে ব্যবহার করবার জন্যে একটা সেফ্‌টী ল্যাম্প তৈরী করলেন। এই সেফ্‌টী ল্যাম্প তৈরী করার পর থেকে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল। বহু সম্ভ্রান্ত লোক মিলে তাঁকে অভিনন্দন দিল এবং সেই অভিনন্দনের সঙ্গে তিনি এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন।

সেই সময় ষ্টকটন থেকে ডার্লিটন পর্য্যন্ত একটা রেল লাইন খোলা হচ্ছিল। এই রেল-লাইনের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় টানা গাড়ী যাবে এই ছিল কোম্পানীর মতলব। ষ্টিফেন্‌সন এই কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হন এবং তিনি কোম্পানীর মালিক এড্‌ওয়ার্ড পীস্‌কে বোঝাতে লাগলেন যে, ঘোড়ায় টানা গাড়ীর বদলে বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের ব্যবস্থা করা উচিত। বহুকষ্টে জর্জ্জ পীসের মত করালেন এবং চার বছর ধরে কাজ করে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ষ্টকটন-ডারলিংটন রেলওয়ে খোলা হলো। এঞ্জিনের সঙ্গে ছ'খানা গাড়ী জোড়া হ'ল। পাঁচখানা গাড়ীতে মাল বোঝাই হ'ল, একটা গাড়ীতে মাত্র জন কয়েক যাত্রী উঠল। যখন সেই গাড়ী আবার ষ্টকটন থেকে ফিরে এল, তখন তার যাত্রীর সংখ্যা ছ'শো।

ষ্টিফেনসনের জীবনে সে এক অপূর্ব্ব দিন! বহু যুগের স্বপ্ন সেদিন সফল হ'ল। জগতের ইতিহাসে সীজার, নেপোলিয়ান যে পরিবর্ত্তন আনতে পারে নি, একজন সামান্য কুলীর ছেলে সেদিন জগতে সেই মহাযুগান্তর আনল। ষ্টিফেনসন ঠিক করলেন লিভারপুর থেকে মাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত রেললাইন খুলবেন।

কিন্তু দেশের লোকে যখন এই সংবাদ শুনল তখন সকলে ক্ষেপে উঠল। পার্লামেণ্টের সভ্যরা ষ্টিফেনসনের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন—লোকটা কি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার করতে চলেছে! এঞ্জিনের আগুন থেকে গ্রামে আগুন লেগে যাবে, গরু বাছুর চলতে পারবে না, দুধে বিষাক্ত জিনিস পড়বে, শীকার করবার জন্যে শেঁকশিয়াল একটিও আর থাকবে না—এ কখনই হতে পারে না! একি বিপর্য্যয় কাণ্ড! সেদিন যাতে রেল-লাইন না বসে, তারজন্যে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকেরা এই সব যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং গ্রামের লোকেরা গোপনে ষ্টিফেনসনকে হত্যা করবারও চেষ্টা করে।

পার্লামেণ্টের সভ্যদের মত করাতে ষ্টিফেনসনকে অসাধ্য সাধন করতে হয়েছিল। বহু কষ্টে তিনি পার্লামেণ্টের মত পেলেন। লিভারপুল থেকে মাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত লাইন বসল। এই লাইনে চালাবার জন্যে "রকেট" বলে একটা এঞ্জিন তৈরী করলেন। পরীক্ষার দিন রকেট ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটল।

সে-সময় রেলের এঞ্জিনের পরীক্ষা বড় ভীষণ ছিল। ঘণ্টায় দশ মাইল হিসাবে দু মাইল পথ কুড়িবার নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করলে তবে পরীক্ষায় এঞ্জিন পাশ হ'ত। "রকেট" অনায়াসে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল।

এই ব্যাপারের পর থেকে ষ্টিফেনসনের নাম য়ুরোপের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর কাছে রেলওয়ে এঞ্জিন তৈরী করে দেবার আহ্বান আসতে লাগল। এবং জর্জ্জ ষ্টিফেনসন পৃথিবীকে ঘণ্টায় ষাট মাইল হিসেবে চলতে শেখালেন। একশো বছরের মধ্যে জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের কল এতবড় এই পুরোণো পৃথিবীর চেহারা আমূল বদলে দিল। শুধু তাড়াতাড়ি যাওয়ার দিক থেকে নয়, মানুষের খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, ওঠা-বসা, ভয়-ভাবনা সকল দিক দিয়েই এই রেলগাড়ী যে কি পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে—তোমরা বড় হয়ে তা বুঝতে পারবে।

মধ্যযুগে রাজস্থান ও বাংলার মধ্যে সাধনার সম্বন্ধ

—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ভারতে আজ আধুনিক এত শিক্ষা-দীক্ষা চলিয়াছে, বিরাট ভারতীয় 'কালচার' ও সার্ব্বভৌমিকতার এত সব বাঁধাবুলি আমরা আওড়াই, তবু আমাদের কুনো প্রাদেশিকতার আর অন্ত নাই।

ভাল করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় উদারতা অর্থ: অন্যেরা উদার হইয়া আমাদের সব প্রাদেশিক বস্তু নির্ব্বিবাদে স্বীকার করুক অথচ আমাদিগকে যেন নিজ সীমা ছাড়িয়া একটুও বাহিরে না আসিতে হয়।

প্রাচীনকালে এখনকার এই সব বাঁধাবুলি হয় তো ছিল না কিন্তু জ্ঞান ধর্ম্ম ও 'কালচারে'র লেন-দেন তখন কতই স্বাভাবিক ছিল! বাহিরের পৃথিবীর সহিতও ভারতেব এই সব বিষয়ে যোগের বিশেষ কোনো বাধা তখন ছিল না। আর রেল, ষ্টীমার, তার, ডাকঘর প্রভৃতি বিনাও তখনকার দিনে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে যে যোগ ছিল তাহা বিস্ময়কর।

কোথায় গৌড় আর কোথায় রাজস্থান! আজিকার দিনে এই প্রদেশগত ভেদ হয়তো অনেকের পক্ষে ভুলিতে পারা কঠিন, কিন্তু তখনকার দিনে এই ব্যবধানে কিছুই আসিত যাইত না।

শঙ্করাচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের, অথচ ভারত জুড়িয়া তাঁহাদের স্থান। জয়দেব বাংলার, অথচ ভারতের কোথায় না তাঁর গান সাদরে গীত হয়? লীলাশুক বিল্বমঙ্গল তামিল দেশের, অথচ ঘরে ঘরে বাঙ্গালীও মনে করে সে তার আপন ঘরেরই লোক।

তখনকার দিনে সারা ভারতের মধ্যে ঐক্য-বোধের কত-গুলি বড় বড় সাধন ছিল। তীর্থ ছিল সারা ভারত জুড়িয়া; তাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের মত, ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর চিত্তও রাজস্থানের পুষ্কর দর্শনের জন্য থাকিত। রাজস্থানের জৈন সাধুরাও পরেশনাথ এবং বাংলার জৈন তীর্থ-দর্শন করিতে দল বাঁধিয়া আসিতেন।

সাধুরা সশিষ্য দল বাঁধিয়া তীর্থদর্শনে এবং আরও নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। চাতুর্মাস্য ও বর্ষাবাস প্রভৃতি উপলক্ষ্যে দীর্ঘকাল এক এক স্থানে বাসও করিতেন। তাই নানা ভাবে প্রদেশে প্রদেশে ভাবের নানা রকম লেন-দেন চলিত, তাই এক প্রদেশের 'কালচার' অন্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতে পারিত।

কোনো এক প্রদেশে যদি একটি ধর্ম্ম বা 'কালচারে'র উদয় হইত, তবে সেই ধর্ম্ম বা 'কালচারে'র সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাষাও অন্যান্য প্রদেশে সমাদৃত হইত।

'কালচারে'র ও ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও বিস্তৃতি এবং প্রচার ঘটিত। প্রদেশে প্রদেশে পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হইত। নানা-প্রদেশ-বিস্তৃত ভাষাতেও নানা স্থানের ছাপ পড়িত।

সর্ব্ব ভারত প্রচলিত সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, যে-পালি ভাষা বৌদ্ধদের এত ভক্তি-শ্রদ্ধার ধন, তাহা কি পরে আর উত্তর-মাগধী মাত্র রহিল? দিনে দিনে তাহা শৌরসেনী ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া উঠিল। জৈন মাগধীতেও কি শেষ পর্য্যন্ত মগধের স্বরূপটিই টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল?

'কালচারে'র প্রয়োজনে পরবর্ত্তী কালেও দেখা যায় অপভ্রংশ ভাষা ভারতের নানাস্থানে গেল ব্যাপ্ত হইয়া, অবশ্য প্রদেশে প্রদেশে তার কিছু রূপভেদও ঘটিল। "বৌদ্ধ গান ও দোহা"র যে অপভ্রংশ দেখা যায়, প্রায় সেই রূপ অপভ্রংশ একটু একটু প্রাদেশিক বিশিষ্টতা লইয়া কর্ণাট হইতে বাংলা পর্য্যন্ত ছিল বিস্তৃত হইয়া। বিভিন্ন প্রদেশের ভক্ত ও সাধুরা তখন পরস্পরের গান ও ভজনাদি বুঝিতে পারিতেন।

বাংলার নাথ ও যোগীদের পদ, ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গান, সমস্ত উত্তর ভারতে এমন কি সিন্ধু কচ্ছ গুজরাট মহারাষ্ট্র কর্ণাটেও গাওয়া হইত। রাজপুতানায় যোগীদের মধ্যে, এমন কি, কচ্ছ দীনোধরেও বাংলার নাথ ও যোগীদের বাণীর অনুরূপ বাণী প্রচলিত দেখিয়াছি। গোরক্ষনাথের গান, নাথ ও যোগী-পদ বাংলা রাজপুতানা সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচলিত ছিল।

জয়দেবের গানের ভাষা সংস্কৃত হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতধর্ম্মী। অথচ তাঁহার গান কাশ্মীর হইতে কুমারী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত ছিল। অবশ্য এইরূপ বিস্তৃত

হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু এখনকার এইরূপ বৈজ্ঞানিক সুযোগের দিনেও এরূপ হওয়া তেমন সহজ নয়।

দিল্লীর বাদশাহের সেনাপতি হইয়া মানসিংহ আসিলেন বাংলা দেশে, কাজেই বাংলার যশোহরের দেবী গেলেন রাজপুতনার আমেরে। সঙ্গে সঙ্গে যশোরবাসী দেবীর পূজকদেরও যাইতে হইল আমেরে। আজও সেখানে সেই দেবী ভক্তি-ভরে পূজিত, আর সেই সেবকের দল আজও সেখানে দেবীর পূজা চালাইতেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাতটি প্রধান ঠাকুর ছিলেন বৃন্দাবনে। শ্রীশ্রীগোবিন্দ ছিলেন শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত; শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত; শ্রীশ্রীরাধাদামোদর শ্রীজীব-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত, কাহারও কাহারও মতে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত; শ্রীশ্রীগোপীনাথ শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামী ও শ্রীমধু পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত; শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দর উৎকল দেশীয় ভক্ত শ্রীশ্যামানন্দের প্রতিষ্ঠিত; শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত; শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীগোপাল ভট্টের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও গোকুলানন্দ ঠাকুরের সেবা এক সঙ্গেই হয়।

উৎকলবাসী ভক্ত শ্রীশ্যামানন্দের স্থাপিত শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দরের সেবাইত উড়িয়া, তাহা ছাড়া আর ছয় ঠাকুরেরই সেবাইত বাঙ্গালী। "গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন" এই তিন ঠাকুরেরই বেশি প্রতিষ্ঠা। তার মধ্যেও গোবিন্দেরই প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি।

শেষ পর্য্যন্ত শ্রীগোপালভট্টের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহই বৃন্দাবনে টিকিয়া থাকিতে পারিলেন। দিল্লীর অত্যাচারে শ্রীশ্রীগোবিন্দ, রাধাদামোদর, গোপীনাথ, শ্যামসুন্দর, রাধাবিনোদ, গোকুলানন্দ এই কয়টি বিগ্রহকেই চলিয়া যাইতে হইল রাজস্থান জয়পুরে; আর শ্রীশ্রীমদনমোহনকে জয়পুরপতি আপন শ্বশুরের দেশে করৌলিতে পাঠাইলেন। জয়পুর-রাজার শ্যালক করৌলিরাজ গোপাল সিংহ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সেখানে মদনমোহনের একটি সুন্দর মন্দির রচনা করেন। কথিত আছে ভক্ত সুরদাস বৃন্দাবনে এই মদনমোহনের বড় ভক্ত ছিলেন।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর যে মন্দির ছিল তাহা যেমন মনোরম তেমনি বিরাট। সেই মন্দিরের গাত্রে লগ্ন একটি অস্পষ্ট শিলা-ফলক পাঠে দেখা যায় যে, অম্বরপতি রাজা মানসিংহ আকবরের ৩৪ রাজ্যাব্দে শ্রীরূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মুলতানবাসী বণিক কৃষ্ণদাসও ইহাতে যথেষ্ট সহায়তা করেন। এই মন্দির পরে মুসলমানদের হাতে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহার সৌন্দর্য্যেই অবাক হইয়া যাইতে হয়। গোপীনাথের মন্দিরও রাজপুতানা শেখাবাটীর রায়সিংহের নির্ম্মিত। ইনি সম্রাট্ আকবরের সভাসদ ছিলেন। এখন এই মন্দির জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বৃন্দাবনের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাতটি বিগ্রহের ছয়টিই গেলেন রাজপুতানায়। রাজপুতানায় গেলেও এই ছয়টি ঠাকুরের মধ্যে পাঁচটিরই সেবাইত-যাঁহারা সঙ্গে গেলেন তাঁহারা সবাই বাঙ্গালী। তাঁহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ এখনো বাঙ্গালীরই সঙ্গে চলে।

দিল্লীর অত্যাচারের অতীত হইয়া শুধু দেবতা ও দেব-বিগ্রহ নহে, নানাবিধ স্বাধীন মত ও সম্প্রদায়ের উপদেষ্টারাও আপন আপন গ্রন্থ-ভাণ্ডার সহ মধ্যযুগে রাজপুতানাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। নানাস্থানের শ্রেষ্ঠীর দলও রাজস্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সব কারণে তখনকার দিনে রাজপুতানা নানাবিধ চিন্তায়, ভাবে ও ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ছয় ছয়টি গৌড়ীয় ঠাকুর সেবাইত সহ রাজপুতানায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গৌড়ীয় মতবাদ রাজপুতানায় বিশেষভাবে সম্মানিত হইল। আজও গীজ্যগড়ের সর্দ্দার খুশহাল সিংহের মত বিদ্বান ও ভক্তলোক গৌড়ীয় গুরুর শিষ্য। এক সময় ইনি জয়পুর হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এবং দুঃসময়ে এই ছয়টি গৌড়ীয় ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়া ও তাঁহাদের সেবার সর্ব্ব ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া দিয়া রাজস্থানের বিশেষতঃ জয়পুরের রাজারা বাংলাদেশের চির-কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া আছেন।

জয়পুরের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ নানা কারণেই অতি প্রাচীন। প্রাচীন জয়পুর নগরের যে চমৎকার প্রতিষ্ঠান-ব্যবস্থা (town-planning) তাহা বাঙ্গালী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যের।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে রাজপুতানায় নানাস্থানে নানাবিধ রাজকার্য্যে ও বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা-দানের কাজে যে সব বাঙ্গালী গিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম আজ আর না-ই করিলাম। আর রাজপুতানা হইতেও কলিকাতার এবং বাংলার সর্ব্বত্র যে অগণিত রাজস্থানী মারওয়াড়ী ব্যবসায়ীর দল বসবাস করিয়া দিনে দিনে স্বদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন তাঁহাদের কথাও আজ না-ই বলিলাম। কারণ, এই সবই এই যুগের। আমার প্রধান বক্তব্য হইল সেই প্রাচীন যুগের কথা যখন নানা প্রদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনা করিতে ধর্ম্ম ও 'কালচারে'র তাগিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থূল বৈষয়িক তাগিদ ছিল না।

আজ কলিকাতার বড়বাজার দেখিলে মনে হয় রাজপুতানারই কোনো মহানগর। প্রাচীনকালেও ব্যবসাসূত্রে মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অনেক রাজস্থানী জৈন শ্রেষ্ঠী আসিয়া বসবাস করিয়াছেন।

যাহাই হউক, রাজনৈতিক ও বৈষয়িক সম্বন্ধ কোনোদিনই তেমন বিশুদ্ধ হয় না। তাই বাংলা ও রাজপুতানার মধ্যে সাধনার যে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সম্বন্ধ তাহাই আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিতে চাই।

রাজপুতানার পাশেই মথুরা ও বৃন্দাবন। শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের মতকে বলে পুষ্টিমার্গ। তাঁহাদের স্থান ছিল মথুরা-গোকুলে, বৃন্দাবনে নহে। তাঁহারাও পরে নাথদ্বারে গিয়া আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বৃন্দাবনের যাহা কিছু তাহা গৌড়ীয় ভক্তদেরই সাধনায় ও রাজপুত রাজাদের সহায়তায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সনকাদি সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইলেও বৃন্দাবনের রাধাবল্লভী সম্প্রদায় গৌড়ীয় মতের দ্বারা বিশেষতঃ নিত্যানন্দী ভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাই তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষা প্রকৃতিকেই প্রধান মনে করেন। তাঁহাদের রাধা আগে, কৃষ্ণ পরে। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ। কবি নাগরী দাস রাধাবল্লভী বলিয়া খ্যাত, কিন্তু অনেকে তাঁহাকে গৌড়ীয় মহাপ্রভুর সম্প্রদায়-ভুক্তই মনে করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বৃন্দাবনে হরিদাসী বা টাট্টি সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব হয়। ইঁহাদের মধ্যেও গৌড়ীয় ভাবের প্রভাব দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ে বিঠ্‌ঠল, বিপুল, বিহারিণীদাস, সহচরী, শরন (১৬৬৩) প্রভৃতি প্রখ্যাত লোক জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত কবি শীতলস্বামীরও এই টাট্টি সম্প্রদায়েই জন্ম (১৭২৩)। এই সব মহাপুরুষের লেখায় এবং প্রভাবেও রাজপুতানায় গৌড়ীয়ভাবের প্রভূত প্রসার ঘটিয়াছে।

ভক্ত ও সাধিকা মীরাবাই যে রাজস্থানের কন্যা, একথা কি বাংলার ভক্তগণ কখনো মনেও করেন? মীরা যে তাঁহাদেরই ঘরের লোক, তাঁর জীবনী, তাঁর গান যে তাঁহাদের সবারই অন্তরের বস্তু!

মীরার সঙ্গে গৌড়ীয় সাধকদের ভাল পরিচয় ঘটিয়াছিল, কতকটা গৌড়ীয় প্রভাবও তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। আবার মীরার গানও বাংলার ভক্তগণকে কম সরস করে নাই। তাঁহারাই তো মীরাকে নিজের মানুষ বলিয়াই জানিতেন।

তখনকার দিনেও কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে এক প্রদেশের উত্তম কাব্য ও সাহিত্য অন্য সব প্রদেশেই ছড়াইয়া পড়িতে পারিত তাহা আমরা বুঝিতে পারি—মালিক মহম্মদ জায়সী রচিত পদ্মাবতী কাব্যের প্রসার দেখিয়া। জায়সী (১৫৪০) একদিকে ছিলেন চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ের সাধক মহীউদ্দীনের শিষ্য, অন্য দিকে সাহিত্য-অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছিলেন তাঁর গুরু। আমেঠির হিন্দু রাজা ছিলেন তাঁর ভক্ত। তিনিই জায়সীর দরগাহ্ তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন।

এই পদ্মাবতী রচিত হইবার অল্প পরেই বাংলা দেশেও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

সুদূর আরাকান পর্য্যন্ত তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িলে সেখানকার মুসলমান রাজা মাগন ঠাকুরের অনুরোধে কবি আলাওল পদ্মাবতীর বাংলা অনুবাদ করেন। কোথায় জায়সীর দেশ, আর কোথায় আরাকান! এই পদ্মাবতী কাব্য হইতেই বাংলার ঘরে ঘরে চিতোরের ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর কথা সুপরিচিত হইয়া গেল। তাই পুরাতন বাংলা গল্পে পুষ্কর হইতেও চিতোরের নাম সর্ব্বজনপরিচিত। চিতোরের এই কথার সূত্রে সমস্ত রাজস্থানটা তাহাদের ঘরের বস্তু হইয়া গেল।

উদয়পুর প্রভৃতির কথা সাধারণ লোকে তখন অল্পই জানিত। ত্রিপুরা রাজ্যে এক উদয়পুর স্থাপিত হইলেও রাজা রাজড়ারা ছাড়া উদয়পুরের নাম সাধারণ লোকে বড় একটা জানিত না।

বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন ভারতের বীরত্বের প্রতি ভক্তি দেখাইতে গিয়া রাজপুতানার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যেই বোধ হয় সকলের আগে অতি মুখ্য স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু আমার বিষয় হইল মধ্যযুগের সাধনাগত পরিচয়, কাজেই আজ তাহার উল্লেখের হেতু নাই

শুধু হিন্দুর দ্বারাই যে বাংলা ও রাজপুতানার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে তাহা নহে, মুসলমান তীর্থ ও সাধকের দ্বারাও এই সম্বন্ধ দিনে দিনেই ঘনিষ্ঠ হইয়াছে।

সাধক-শিরোমণি মুইন অল দীন চিশ্‌তী (১১৪২-১২৩৬) তাঁর সাধনার পীঠ করিলেন আজমীরে। তাই বাংলার অখ্যাততম পল্লীরও দীন দরিদ্র মুসলমান মক্কার মত পবিত্র জ্ঞান করিয়া তীর্থযাত্রায় যান আজমীরে। হিন্দু সাধকদেরও অনেকে চিশ্‌তীর সাধনাস্থানে তীর্থযাত্রীর মত শ্রদ্ধাভরে যাত্রা করিয়াছেন। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি শ্রীহট্ট বিথঙ্গল মঠের স্থাপয়িতা সাধক রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য কৃপাল দাসকে লইয়া সেখানে যান ও কিছুকাল বাস করিয়া বহু সাধকজনের সঙ্গে পরিচিত হন।

বিখ্যাত ফৈজী ও আবুলফজলের পিতা মুবারক নাগোরী। ভারতের বাহির হইতে আসিলেও ইঁহারা যোধপুরের অন্তর্গত নাগোরে আসিয়া বাস করায় ইঁহাদের উপাধি হয় নাগোরী। কোরান হদিস প্রভৃতি শাস্ত্রগত অনুশাসনের প্রতি মুবারকের বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন স্বাধীন 'কালচারে'র উপাসক। তাই ইনি যুনানী অর্থাৎ গ্রীক দর্শনে ও নব-অফ্লাতুনী (Neo-Platonist) জ্ঞানে ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। ভারতের এত স্থান থাকিতেও কেন যে তিনি সুদূর রাজস্থানে আসিয়া বাস করিলেন তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। যে রাজস্থান চিরদিন তাহার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে সেই রাজস্থানই ছিল সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার সাধকদের আশ্রয়-স্থল ও স্বাধীন চিন্তার উপযুক্ত সাধনা-পীঠ। তাই মধ্য যুগে দেখিতে পাই রাজস্থানে বহু বহু স্বাধীন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে ও বাহিরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বহু বহু স্বাধীন মতবাদ এই রাজস্থানেই আশ্রয় লইয়াছে।

আকবর যখন তাঁহার উদার ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করিতে উদ্যত হইলেন তখন নাগোরী মুবারকের পুত্র বিখ্যাত ফৈজী (১৫৪৭) ও আবুল ফজল (১৫৫১) হইলেন আকবরের প্রধান সহায়। মুবারক আপন পুত্রদের ভারতীয় শাস্ত্রে, দর্শনে ও 'কালচারে' সুপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফৈজী ছিলেন বেদান্তে গভীর পণ্ডিত; তিনি ভাল ভাল বেদান্তগ্রন্থ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

যখন মধ্যযুগের উদার ধর্ম্ম-সাধকেরা সাধনাতে হিন্দু ও মুসলমান অধ্যাত্ম বিদ্যার সমন্বয় করিতে চাহিলেন, তখন ভারতীয় 'কালচারে'র বেদান্ত বিদ্যা ও মুসলমানের সমাদৃত যুনানী 'কালচারে'র নব-অফ্লাতুনী (Neo-Platonism) মত দুই দিক হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দুই দিকের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করিয়া দিল। ভারতের মধ্যযুগের অসাম্প্রদায়ী উদার সাধকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের আউল-বাউলের মধ্যে ভারতীয় এই নব-অফ্লাতুনী মতকে বলে "নাগোরী বিদ্যা"। খুব সম্ভব মুবারক নাগোরীর নামেই এই নামকরণ হইয়াছে।

দুইজন দরিয়া সাহেব, সাধনার দ্বারা এই নাগোরী মতকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত করেন। এক হইলেন দরিয়া সাহেব মারওয়াড়ী (১৬৭৬-১৭৫৮)। ইঁহার জন্ম মুসলমান মাতার উদরে ধুনকর বংশে। অনেকে মনে করেন ইনি দাদূর অবতার। দাদূর মতই তাঁহার উপদেশ, এবং তাহা ১৫টি অঙ্গে ভাগ করা। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শিষ্যই এই মতে আছে। ইঁহারা রাম পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। ইঁহাদের 'ব্রহ্ম পরিচয়'-অঙ্গে যোগের গভীর কথা আছে।

আর এক দরিয়া সাহেব হইলেন বিহারী। উজ্জয়িনী রাজবংশের এক ধারা আসিয়া বক্‌সারের কাছে জগদীশপুরে রাজত্ব করেন। সেই ক্ষত্রিয় বংশে সাধক পীরন শাহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। সুফী সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া পীরন শাহ হন সুফী। এই পীরনের পুত্রই দরিয়া সাহেব। কবীরের দ্বারাই দরিয়া সাহেব ছিলেন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি ভগবানকে বলিতেন সত্যনাম।

ইঁহারা লিখিত কোনো শাস্ত্র, ব্রত, তীর্থ, আচার, বাহ্যবিধি, ভেখ প্রভৃতি মানেন না। বিগ্রহ মূর্ত্তি ও অবতারের পূজা ইঁহারা করেন না, জাতিভেদও মানেন না। মৎস্য মাংস মদ্য ও জীবহিংসা ইঁহাদের নিষিদ্ধ। ইঁহার ৩৬ জন প্রধান শিষ্য

ছিলেন; আর চারিস্থানে ছিল ইহাঁদের প্রধান চারি আখড়া। মসুয়া চৌকী আখড়ার অলথ্ শাহ যান পূর্ব্ব দেশে। গৌড় বরেন্দ্র হইয়া ময়মনসিংহ, অষ্টগ্রাম হইয়া তিনি দক্ষিণ-শাহাবাজপুর পর্য্যন্ত যান। হিন্দু ও মুসলমান সাধনার যোগ ও মৈত্রীর উপদেশ তিনি সর্ব্বত্র করেন। তাঁর উপদেশেই বাংলাদেশে নাগোরী মত বিশেষভাবে প্রচারিত হয় ও আউল-বাউল-দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়ায়। পূর্ব্ববঙ্গে মদন প্রভৃতি পদ-রচয়িতার মধ্যে, দক্ষিণ-শাহাবাজপুরী ও অষ্টগ্রামী প্রভৃতি বাউলদের মধ্যে এবং রংপুরের পশ্চিম ভাগে সোনাউল্লা শাহের সম্প্রদায়ে এমন করিয়াই এই নাগোরী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্‌বার রাজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রসুল শাহ নামে এক ফকীর ছিলেন। বাংলাদেশের এক তান্ত্রিক সাধকের কাছে তিনি তান্ত্রিক সাধনার রহস্য লাভ করিয়া তান্ত্রিক মতের সাধনাতে প্রবৃত্ত হন ও পরে প্রখ্যাত তান্ত্রিক সাধক হইয়া তান্ত্রিক মত প্রচার করেন। এই মত পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানেও ছড়াইয়া পড়ে। ইঁহারা তান্ত্রিকদের মত চক্রে বসেন ও বীরাচারে সাধনা করেন। ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ইঁহারা সহস্রার-সুধা পান করেন। লৌকিক মন্ত্রও ইঁহারা উপেক্ষা করেন না। ইঁহারা অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন ও রসায়ণ বিদ্যায় সুপটু। কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদনেও ইঁহাদের প্রতিষ্ঠা আছে।

ইঁহাদের এক শিষ্য শাহ অলি। তিনি বাংলাদেশে আসিয়া উত্তর বঙ্গে ভোটমারীতে যান ও সহজ-সাধক রূপচাঁদ গোসাঞির সঙ্গে সাধনাতে যুক্ত হন। তখন ওখানে তিন শ্রেণীর সহজ মতের সাধক-সম্প্রদায় ছিলেন—কমলকুমারী, মাঝবাড়ী ও মধ্যমা। কমলকুমারী মতের সাধকেরা মালা-বিগ্রহাদি মানেন, কাজেই তাঁহাদের সঙ্গে শাহ অলির তেমন ঘনিষ্ঠতা হইল না। মাঝবাড়ী সম্প্রদায়ের সাধকেরা উদার ও 'অব্যক্ত-লিঙ্গাচার।' তাঁহারা মালা বিগ্রহ তুলসী গঙ্গাজল ইর বিশেষ পূজ্যতা মানেন না, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও তাঁহাদের বিশেষ কিছু নাই। তাই তাঁহাদের সঙ্গেই শাহ অলির যোগ ঘটিল। রূপচাঁদ গোসাঞির শিষ্য ক্ষেপা গোসাঞি নীলফামারীর অন্তর্গত বেলপুকুর গ্রামে ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স বোধহয় ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। ঐ প্রদেশে তাঁহাদের সহজ মতের সাধনার প্রভাব হিন্দু মুসলমান বাউলদের মধ্যে আজও লক্ষ্য করা যায়

জয়দেবের গীতগোবিন্দের নামই সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু সাধকদের মধ্যে তাঁহার সহজ পদও অনেক প্রচলিত আছে। কেবল শিখদের গ্রন্থসাহেবে নয়, রাজস্থানের দাদূপন্থী প্রভৃতি সাধকেরাও অতি সমাদরের সহিত সেই সব পদ তাঁহাদের পুরাতন পদসংগ্রহ-গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই পদগুলি আদতে ছিল বাংলাতেই লেখা। অথচ পাঞ্জাব রাজপুতানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে সে জন্য কোনই বাধা হয় নাই, যদিও সে সব দেশে গিয়া পদগুলির বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে। তখনকার দিনে রাজস্থান পঞ্চনদের সাধকেরা জয়দেবকে আপন ঘরের লোক বলিয়াই জানিতেন, ভিন্ন প্রদেশের লোক বলিয়া মনে করিতেন না।

রামানন্দের বহু শিষ্য। তাহার মধ্যে কাহারও কাহারও জন্ম রাজস্থানে। কেহ বা সাধনা প্রভৃতির সুবিধার জন্য রাজস্থানে গিয়া বাস করেন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে ধন্না ছিলেন জাতিতে জাঠ। পীপা ছিলেন রাজপুত ও একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। কুলধর্ম্ম শাক্তসাধনা ছাড়িয়া পীপা ভক্তির পথে আসিলেন ও রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পথে বাহির হইলেন। তাঁহার এক রাণীও তাঁর সঙ্গে গেলেন। দ্বারকার নিকটে পীপাবটে তিনি শেষে বহুদিন বাস করেন। সেখানে পীপার ভক্তদের এক মঠও আছে।

পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত বিথঙ্গল মঠের স্থাপয়িতা প্রখ্যাত সাধক রামকৃষ্ণ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে পীপাবটে যান ও কিছুকাল সেখানে বাস করেন। তাই রামকৃষ্ণের স্থাপিত বিথঙ্গলের মঠে ও ঢাকা ফরীদাবাদের মঠে পীপাপন্থী সাধুদের তখনকার দিনেও বিলক্ষণ যাওয়া আসা ছিল। রামকৃষ্ণ-ভক্তেরাও রাজস্থান ও দ্বারকার পীপাভক্তদের মঠে সর্ব্বদা আসা-যাওয়া করিতেন। তাঁহারা জয়পুর গলতার অনন্তানন্দের মঠেও যাতায়াত করিতেন। অনন্তানন্দ ছিলেন রামানন্দেরই এক শিষ্য। জয়পুরে খাকী সম্প্রদায়ীদের এক মঠ আছে, সেখানেও বাংলার ভক্তদের গতিবিধি ছিল।

সাধক রবিদাস ছিলেন জাতিতে মুচি। এক সময়ে রাজস্থানে তাঁহার বিলক্ষণ প্রভাব হইয়াছিল। রাজস্থানের

বহু অভিজাত ও রাজবংশেও তাঁহার ভক্তের অভাব ছিল না। বাংলা দেশেও বিস্তর রবিদাসী ছিলেন। তাঁহারা তাই রাজস্থানকে চিরদিন প্রীতির সহিতই স্মরণ করিয়াছেন।

আল্‌বারের লালদাসের জন্ম লুণ্ঠনজীবী মেওর বংশে। ভক্তদের মধ্যে কথা আছে তিনি গৌড়ীয় এক বৈষ্ণব সাধকের প্রেম-সাধনা দেখিয়া ভজন কীর্ত্তনের অনুরাগী হন।

আল্‌বারের ডেহরা গ্রামে ভক্ত চরণদাসের জন্ম। দিল্লীর কাছাকাছিই তাঁহার বহু ভক্ত, তবে বিহার ও বাংলাতেও তাঁহার ভক্ত মাঝে মাঝে দেখা যায়।

রামসনেহী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সন্তরাম বা রামচরণের জন্ম জয়পুর সুরাসেন গ্রামে। উত্তর পশ্চিম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত তাঁহাদের বহু মঠ আছে। বাংলাতেও তাঁহাদের ভক্ত কোথাও কোথাও ছিল।

দাদূ ও দাদূর শিষ্যরা নাকি দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে পূর্ব্ব ভারতে বাংলা ও জগন্নাথ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। দাদূর শিষ্য সুন্দরদাসও বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্যৌসা নগরে তাঁহার জন্ম। কবি বলিয়া সুন্দরদাসের বিলক্ষণ খ্যাতি।

ভক্ত দাদূর (১৫৪৪—১৬০৩) নাম ও সাধনা-স্থান রাজপুতানায় সুপ্রসিদ্ধ। বাংলার বাউলরাও তাঁহার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। এই বাংলার বাউলদের গানেই প্রথম সন্ধান পাইয়াছিলাম যে দাদূ প্রথমে ছিলেন মুসলমান ও তাঁর পূর্ব্বনাম ছিল দাউদ। বাউলদের গানেই শুনিয়াছিলাম —"শ্রীগুরু দাউদ বন্দি দাদূ যাঁর নাম।" পরে রাজস্থানী নানা গ্রন্থেও এই কথার সমর্থন পাইয়াছিলাম।

দাদূ নাকি দেশপরিক্রমায় বাংলা দেশে আসিয়া সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে ও সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

দাদূপন্থী পুরাতন অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থে দেখা যায়, নব-নাথের নাম ও তাঁহাদের পদ। এইরূপ একখানি বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ জয়পুরে এক বৃদ্ধ দাদূপন্থী সাধুর কাছে দেখি। তাঁহার শিষ্য শঙ্করদাসজী আমার পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থখানি ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। বাবা ঈশ্বরদাস তাঁহার শিষ্য বৈরাগী সন্তা দ্বারা ইহা লেখান। কুতব খাঁর মটীতে বাবা গোকুলদাসজীর কুটীরে বৈশাখ কৃষ্ণা একাদশীতে গ্রন্থখানির লেখন সমাপ্ত হয়। ইহা একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। তাহাতে নাথ-পদ আছে—

> "অদেখ দেখিবা, দেখি বিচারিবা,
> আক্রুষ্ট রাখিবা বা বিয়া…
> পাতাল গংগা স্বর্গে চঢ়াইবা" ইত্যাদি।

বাংলায় নাথপন্থীদের মধ্যে এই সব পদ অতি সাধারণ।

দাদূবাণীর 'মায়া'-অঙ্গে আছে—

> উডা সারং বৈঠ বিচারং, সংভারং জাগত সূতা।
> তীন লোক তত জাল বিভারণ, তঁহা পাইলা পূতা। (১৩৬)

আর পূর্ব্ব বাংলায় নাথযোগীদের পদে পাই

> উঠ্যা সারন বৈঠ্যা সারন, সামাল জাগত সূতা।
> তিন ভূবনে বিছাইলা জাল, কই যাবিরে পুতা॥

রাজস্থানের দাদূপন্থী নানা গ্রন্থে মায়া ও গোরক্ষনাথের সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায়, মায়া বলিতেছে—

> উডা মারূঁ বৈঠা মারূঁ, মারূঁ জাগত সূতা
> তীন ভবন ভগজাল পসারূ কহাঁ যায়ত পূতা॥

আর পূর্ব্ব বাংলায় নাথযোগীদের পদে দেখি—

> উঠ্যা মারুম বৈঠ্যা মারুম, মারুম জাগা সূতা।
> তিন ধামে কামজাল বিছাইমু, কই যাবিরে পুতা॥

("তিন ভবে ভগজাল বিছাইমু" পাঠও আছে)

রাজস্থানী দাদূপন্থী পুথিতে দেখি গোরখনাথ তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

> উডা খণ্ডূঁ বৈঠা খংডূঁ খংডূ জাগত সূতা।
> তীন ভবন তে ভিন হৈ খেলূঁ তৌ গোরখ অবধূতা॥

বাংলা যোগীর পদে দেখি

> উঠ্যা খণ্ডুম বৈঠ্যা খণ্ডুম, খণ্ডুম জাগত সূতা।
> তিন ভুবনে খেলুম আলগ, তয় তো অবধূতা॥

নাথযোগীদের পদে এই ভাষা পূর্ব্ব বাংলার নিতান্ত গ্রাম্য প্রচলিত ভাষা।

ইহা দেখিয়া কি মনে হয় না রাজস্থান ও পূর্ব্ব বাংলার মধ্যে সাধকদের ঘনিষ্ঠতা কিরূপ গভীর ও একান্ত ছিল!

নরাণায়, আমেরে ও সাম্ভরে দাদূজীর সাধনা-স্থান, দ্যৌসায় জগজীবনজী ও সুন্দরদাসজীর স্থান; সাঙ্গানেরে ও ফতহপুরে রজ্জবজীর স্থান; যোধপুর ওলা গ্রামে মাধোদাসজীর স্থান, ডীডবানা ফতহপুরে প্রয়াগদাসজী বিহানীর স্থান, বুশেরায় শঙ্করদাসজীর স্থান, সাঙ্গানেরে মোহনজীর স্থান, আন্ধীতে জনগোপালজীর স্থান—বাংলায় সাধকদেরও অপরিচিত নহে। এখানকার শিক্ষিত পণ্ডিতজন এই সব ঘনিষ্ঠতার কোনো খবর রাখেন না অথচ এই দুই দেশের দীন দুঃখী নিরক্ষর সাধকের দল আপন আপন সাধনার দ্বারা কত কত কাল হইতে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া আসিতেছেন।

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

নারী-নির্য্যাতন ও পাপ-ব্যবসায়

গতবারে এদেশের পাপ-ব্যবসায় প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম যে, মাত্র আইনের দ্বারা এই ঘৃণিত ব্যবসায় নিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে আমরা সাফল্য লাভ করিতে পারিব না। আমাদের সমাজে এমন কতকগুলি সঙ্কীর্ণ অনুদারতা আছে যাহার সংস্কার আবশ্যক ও যাহাতে নির্য্যাতিতা রমণীরা ভাল ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমার মনে হয় যে, আমি অযৌক্তিক কিছু লিখি নাই। কিন্তু কয়েকজন আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, আমি আইন করার বিরুদ্ধে।

আমি বলিয়াছিলাম যে, যাঁহারা আইন পাস করাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা শুধু ক্ষান্ত হইলে সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য করিবেন না। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলে ঘরে ফিরিবার সকল দ্বার যাহাদের নিকট রুদ্ধ হইয়া যায়, সমাজে তাহাদের ঠাঁই দিবার ব্যবস্থা করিবার কি আয়োজন হইবে, তাহারা কি করিবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা না করিলে পাপ-ব্যবসায় কিছুতে বন্ধ হইতে পারে না। আইনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আশ্রয় দিবার জন্য প্রতিষ্ঠান করা বিশেষ আবশ্যক। পাপ-ব্যবসায় কেন প্রসার লাভ করিতেছে তাহার কারণ সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন। অধুনা গ্রামে গ্রামে নির্য্যাতিতা নারীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে অথচ যাহারা নির্য্যাতন করে তাহাদের শাস্তি কঠোরতর করা হইতেছে না। মাস-খানেক পূর্ব্বের কথা, আমেরিকায় এই একই ব্যাপারে একটি লোকের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। বিচারপতি রায় দিবার সময় বলেন যে, "নারীধর্ষণকারীদের সম্মুখে শাস্তির কঠোরতম আদর্শ উপস্থাপিত করিবার জন্যই আমি এই গুরুতর দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিলাম।" এরূপ ক্ষেত্রে সে দেশে নারীর অপাংক্তেয় হইবার ভয়ও নাই।

এদেশে এই নির্য্যাতিতা নারীদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া কতকগুলি পুরুষ এই ব্যবসায়ের সুবিধা পায়, কারণ, তাহারা জানে, ইহাদের ভিন্ন গতি নাই—কুপথ অবলম্বন না করিলে তাহারা জীবিকা-উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। ইহাদের এমন শিক্ষা নাই যাহা দ্বারা ইহারা ভাল ভাবে থাকিতে পারে, এমন খুব কম প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে গিয়া তাহারা দাঁড়াইতে পারে।

নারী সহজে পাপ-ব্যবসায়ে নামিতে চাহে না, কারণ, ইহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অবস্থাগতিকে এ পথে তাহাকে নামিতে বাধ্য হইতে হয়। শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, স্বামীগৃহে লাঞ্ছনা, বালবৈধব্য, কু-প্রলোভন ও বলপূর্ব্বক নির্য্যাতন ইত্যাদি কারণে তাহারা বাধ্য হইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হয়। পড়িয়া মার খাইয়াও যাহারা ঘরে থাকিতে পারে, ভিখারিণী হইয়াও যাহারা ভাল ভাবে থাকিবার সুবিধা পায়, তাহারা হয়তো এ পথকে ঘৃণা করিতে পারে, তাহাদের নাম লইয়া আমাদের গর্ব্ব করিবার সুযোগ দিতে পারে কিন্তু সকলে তাহা পারে না। অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে অনেকে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই বাহিরে ছুটিয়া আসে। ইহাদের এই অসহায়ত্ব কিসে দূর হইবে তাহা লইয়া আমাদের সমাজপতিরা কয়জন চিন্তা করিয়া দেখেন বলিতে পারি না, কিন্তু মূল কারণগুলি যতদিন না দূর হইবে ততদিন আমরা এই সর্ব্বনাশকর ব্যবসায় সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে পারিব না।

নারীর সহজাত কোমলবৃত্তিকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেকে কাজে লাগাইয়া থাকে, তাহাকে বাহিরে নির্ভরতার আশ্বাস দিয়া বহু দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ পথের মাঝে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করে। আত্মরক্ষার কোনও উপায় তখন আর তাহারা খুঁজিয়া পায় না। তাহারা যখন উপলব্ধি করে ভুল করিয়াছে তখন আর শুধ্রাইবার উপায় থাকে না। সৎপথে যাইবার পথে বাধা অনেক। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে এই বাধা অপসারণ করিবার ক্ষমতা আমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে।

বহু আশ্রমের কথা শুনা যায় কিন্তু সেখানেও যে নারীরা অনেক সময় নিরাপদে থাকিতে পারে না তাহারও প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমের সংস্কার ও এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি হওয়া বিশেষ আবশ্যক। অনেক নারী, গুণ্ডা এবং দুর্ব্বৃত্তদের ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও পাপপুরী

পরিত্যাগ করিতে পারে না ; তাহারা যাহাতে অভয় পায়, সাহস সঞ্চয় করিতে পারে তাহার উপায় সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের বিশেষ কর্ত্তব্য।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী, ইহার পরিচালক-মণ্ডলীর ন্যায়নিষ্ঠা, আভ্যন্তরীণ সু-ব্যবস্থার যোগ্যতা আছে কিনা তাহা সর্ব্বাগ্রে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহা না হইলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিতে পারে। মেয়েরা যাহাতে তাহাদের মর্য্যাদা রাখিয়া থাকিতে পারে, স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ভাবে যত্ন লওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে নারী-নির্য্যাতন সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে হইলে শুধু কয়েকটি আশ্রম গড়িলেই চলিবে না, নারীরা যাহাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করা চাই। নারী যতদিন না রীতিমত শিক্ষিতা হইয়া উঠিবেন ততদিন পর্য্যন্ত অন্যায় নির্য্যাতন হইতে তাঁহার রক্ষা নাই। শিক্ষা বলিতে সূচীশিল্প, গৃহশিল্পের কথাই শুধু বলিতেছি না, ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। যাঁহারা এখনও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা জাতির ক্ষতি করিতেছেন। নারীকে জড় করিয়া তাহার ভীরুতাকে আমরা বাড়াইয়া তুলিতেছি—নারীকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমাদের লোপ পাইতে বসিয়াছে অথচ তাহাকে আত্মরক্ষারও সুযোগ দিব না, ইহার চেয়ে অন্যায় আর কি হইতে পারে ?

নারী শিক্ষিতা হইলেও চরিত্র-রক্ষায় অসমর্থ হইবেন বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু ইহা যে কত বড় ভুল তাহা এ যুগে কাহাকেও বুঝাইতে লজ্জা করে। শিক্ষার ভিতরে যে তেজঃশক্তি নিহিত থাকে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি ? আজ নারীর সেই তেজঃশক্তির প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে মূর্খতা করিব।

মানুষ কুপথে যায় তাহার কারণ শিক্ষা নয়—প্রবৃত্তি। পণ্ডিত ব্যক্তিও প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্যভিচার করিতে পারেন তাহার জন্য তাঁহার রুচিকে ধিক্কার দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাকে দায়ী করা চলে না। অনেক শিক্ষিত লোক স্ত্রীকে ধরিয়া মারেন, অশিক্ষিত থাকিলেই তাঁহারা যে মারিতেন না, এরূপ যুক্তি নিতান্ত হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয়। শিক্ষা যাঁহার চরিত্রকে বদ্‌লাইতে পারিল না অশিক্ষা তাঁহার চরিত্রকে হয়তো আরও হেয় করিয়া তুলিত।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে নারীরা শিক্ষালাভ করিয়া তেজোময়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ শাস্ত্র ঘাঁটিলে পাওয়া যায়। ইঁহারা যে সংযম, যে তিতিক্ষা, যে পতি-প্রাণতা দেখাইয়াছেন তাহা এযুগের অনেক নারীই দেখাইতে পারেন না। ইঁহারা যদি শিক্ষা পাইয়া বিগ্‌ড়াইয়া গিয়া না থাকেন, তাহা হইলে এখনকার মেয়ে মাত্রই ভিন্নরূপ ধারণ করিবেন তাহার প্রমাণ কি ? আমাদের মেয়েদের আত্ম-নির্ভরতা শিখাইতে হইলে কলেজে বা স্কুলের পড়া যে শিখাইতে হইবেই এমন কথা বলি না, তবে অবস্থা গতিকে বাধ্য হইয়া এই সকল স্থানে না পাঠাইলে যাঁহাদের চলে না তাঁহাদের পাঠানো উচিৎ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য যে-ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার ভিতর হয়তো অনেক গলদ আছে, তাহার সংস্কারের জন্য সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করুন, কিসে তাঁহারা স্বাস্থ্যবতী হইয়া, গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে সুনিপুণা হইয়াও লেখাপড়া শিখিতে পারেন, আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাহার জন্য চেষ্টা করুন, আপত্তি নাই ; কিন্তু শিক্ষার দোষ দিবেন না।

নারীর অমর্য্যাদা দূর করিবার জন্য শিক্ষার বহুল প্রসারের প্রয়োজন। সমাজের ভিতরে ভিতরে গলিত ক্ষতের মত নির্য্যাতিতা রমণীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে ; দুইটি নারীরক্ষা-সমিতি গঠন করিয়া, চাঁদা তুলিয়া এবং নারীকে লইয়া কেহ পাপ-ব্যবসায় করিতে পারিবে না বলিয়া আইন-জারি করিলেই অবস্থা ভাল হইয়া উঠিবে না, তাহার জন্য সাধনার প্রয়োজন —রোগের মূল উৎপাটন করা আবশ্যক। নারীর দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তির বিকাশের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। অবশ্য বর্ত্তমানে তাহাদের রক্ষার জন্য যাহা হইতেছে তাহা হউক—ইহা খুবই ভাল, কিন্তু ইহাই সব নয়।

নারীশিক্ষা-সমিতি

—শ্রীঅবলা বসু

বাংলাদেশে নানা দিক দিয়া নানা মঙ্গল-প্রতিষ্ঠান জাতীয় জীবনের শুষ্কপ্রায় প্রাণধারাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। একদল নিঃস্বার্থ কর্ম্মী সর্ব্বস্বপণ করিয়া এইগুলির সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদারিদ্র্য অভাব-অভিযোগ দূর করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা সফলও হইতেছেন। জাতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই।

বাংলার শিক্ষা-সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া এরূপ অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণের কাছে একথা ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, শিক্ষার উন্নতি না হইলে জাতির মুক্তি নাই। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এদেশে যেখানে যতটুকু কাজ হইতেছে, অন্যত্র অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্যও সেগুলির যথাযথ প্রচার আবশ্যক। আমি এইরূপ একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিষয় আজ উল্লেখ করিব। প্রারম্ভ হইতে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। যে অপরিসীম বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া এদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন করা সম্ভব হয়, আমি তাহা জানিয়াছি। ইহা একের বা মাত্র পাঁচের কাজ নহে। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য এই কার্য্যে একান্ত আবশ্যক।

আমি যে প্রতিষ্ঠানটির কথা বলিব, তাহার নাম নারী-শিক্ষা-সমিতি; ২৯৪।৩ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় ইহার আফিস। প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে এই সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি-গঠনের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতেছি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যদেব * জাপানে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। দেশভ্রমণের স্পৃহা আমার বরাবরই আছে; জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার ঔৎসুক্য আমার কম ছিল না কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানকার শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় জানিবার প্রবল বাসনাও মনে জাগিয়াছিল। অতি অল্পকালমধ্যে প্রাচ্য ও অবজ্ঞাত জাপান কোন্ শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল, তাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল। সেখানে গিয়া বুঝিলাম জাপানের এই আকস্মিক উন্নতির মূলে তাহার শিক্ষা। স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া অনেক বিষয়ে জ্ঞান জন্মিল। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা প্রচলিত, তাহার সহিত আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার

লেডী অবলা বসু।
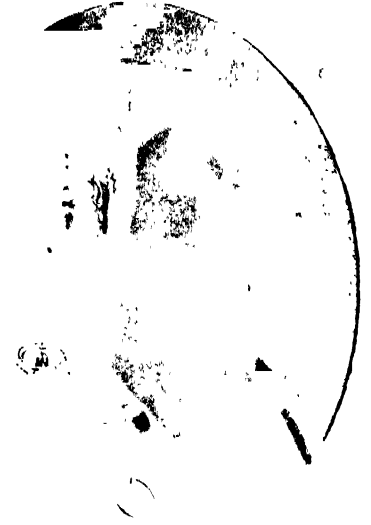
কোনই সংশ্রব নাই। জাপানে দেখিলাম, ঠিক ইহার বিপরীত। সেখানে পুঁথিগত বিদ্যার সহিত সকল প্রকার গৃহকর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম শেখানো হয়। বিদ্যালয়ে যেমন গান-বাজনার চর্চ্চা হইয়া থাকে তেমনই গোপালন ও কৃষিকর্ম্ম বিষয়েও হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তারিত সকল বিষয়ে বর্ণনা করিবার স্থান ইহা নহে; মোটের উপর, এই সকল স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভের সুফল যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। আপামর-সাধারণ সেখানে লিখন-পঠনক্ষম; দেশের সকল ব্যাপারই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরিচালিত। নূতন তথ্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগার হইতে বাহিরে প্রচারিত হওয়ার

* আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

সঙ্গে সঙ্গেই সুদূরবর্ত্তী গ্রামেও তদনুযায়ী কাজ হইতেছে। এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেশ কোথায়ও দেখি নাই। সুশিক্ষার এই সকল সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিল, যে, দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার না হইলে, বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগুলি আমাদের দৈনন্দিন কাজে না লাগাইতে পারিলে আমরা বাঁচিতে পারিব না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া আমার এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে,

নারীশিক্ষা-সমিতির ব্যবস্থাপক এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক।

বর্ত্তমানে আমার সহকারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়ের সহিত সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসের সহিত ইঁহার নাম চিরদিন যুক্ত থাকিবে। আমার সহিত পরিচয় ঘটিবার পূর্ব্বেই ইনি নানা ভাবে শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার আদর্শের সহিত আমার আদর্শ মিলিয়া গেল এবং একদা শুভক্ষণে আমাদের উভয়ের উদ্যোগে নারীশিক্ষা-সমিতি গঠিত হইল।

আজ নারীশিক্ষা-সমিতির যেটুকু সাফল্য তাহা বসাক-মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই ক্ষীণদেহ ব্যক্তিটি প্রাণশক্তির প্রাবল্যে সকল প্রতিকূল অবস্থা, সকল বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে নারীশিক্ষা-সমিতির আদর্শ প্রচার ও নারীজাতির দুঃখ-মোচনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, নিজেকে বরাবর পশ্চাতে রাখিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। বাংলার নারীসমাজের মঙ্গলকামী হিসাবে বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামের সহিত ইঁহার নামও ভবিষ্যতে শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবে।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন

নারীশিক্ষা-সমিতি গত ১৪ বৎসর ধরিয়া বাংলার গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে নারীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে। পল্লীগ্রামে যথেষ্টসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবই এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের প্রধান অন্তরায়। এই অভাব দূর করিবার জন্য সমিতি বিদ্যাসাগর-বাণীভবন নামে বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়া অসহায়া বিধবাদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সেই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।

এই বাংলাদেশে ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা সাড়ে চার লক্ষের উপর হিন্দু-বিধবা অপরের গলগ্রহ হইয়া গৃহের ও সমাজের ভারস্বরূপ দুঃখময় জীবন যাপন করেন। এই শোচনীয় অশিক্ষা, হীনতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে জাতি কখনও সুস্থ ও সবল হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। নারীশিক্ষা-সমিতি দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দৈন্য ও কলঙ্ক মোচনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। অশিক্ষিত, বিকৃত ও একান্ত সঙ্কুচিত মানব-জীবন, সমাজে যে কি গভীর ক্ষত ও বেদনা বহন করে তাহা বিধবাদের চিরবিপন্ন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধি করা যায়। সেই বিকৃত ও সঙ্কুচিত জীবনকে শিক্ষা ও আত্ম-মর্য্যাদার গৌরবে আনন্দময় করিয়া তুলিবার এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যেরূপ, জাতীয় জীবনের পক্ষেও তেমনই পরম গৌরবের বিষয়। এই সমস্ত মঙ্গল-শক্তিকে তুচ্ছ না করিয়া ইহাদের শিক্ষিত করিয়া গ্রামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছোট ছোট বিদ্যার ক্ষেত্র গড়িয়া তোলাই নারীশিক্ষা-সমিতির প্রধান কার্য্য। একদিকে যেমন সমিতি দেশের অবজ্ঞাত ও অপব্যয়িত এই প্রচুর প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা

করিতেছেন, তেমনি ইহাদের দ্বারা দেশের বিরাট অজ্ঞতা অপসরণের চেষ্টাও চলিতেছে। বিদ্যাসাগর বাণীভবনের সহিত মহিলা-শিল্প-ভবন যুক্ত। ইহা একটি অবৈতনিক শিল্প-বিদ্যালয়।

পল্লী-শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীযুক্তা সুরবালা গুপ্ত।

সমিতির তত্ত্বাবধানে ২২টি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিধবাশ্রমের ছাত্রীরা এই সব কেন্দ্রে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া থাকেন। সমিতির স্থায়ী মহিলা-পরিদর্শক এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয় স্বয়ং এই সকল স্কুলের উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছেন।

এতদ্ব্যতীত, সমিতির বিদ্যালয়ের আদর্শে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের অল্পশিক্ষিতা বিধবারা নিজ নিজ গ্রামের কয়েকটি বালিকাকে লইয়া এক একটি বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার জন্য সমিতির কাছে অর্থ-সাহায্যের প্রার্থী হইতেছেন। এইরূপে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাকার্য্যের বিস্তৃতি হইতেছে। ইহা অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়। তথাপি, আজ পর্য্যন্ত বাংলার বৃহত্তর ও ব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্রের অতি সামান্য অংশেই সমিতির এই শুভ প্রচেষ্টা ব্যাপ্ত হইয়াছে। সমিতির অধীনে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মাত্র ৪৪টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত মাত্র ৫০০০ বালিকা শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছে।

গ্রামের শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে সমিতি গ্রামবাসীদের নানারূপ সাহায্য পাইয়া থাকে, শিক্ষয়িত্রীদের বাসস্থান প্রভৃতির সুবিধা সাধ্যানুসারে গ্রামবাসীরা করিয়া দিয়া থাকেন।

নারী শিক্ষা-সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার। যাহাতে বালিকারা সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারে এবং প্রয়োজন মত শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী প্রভৃতির কাজ করিয়া এবং নানা প্রকার কুটীর-শিল্প-বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, নারী-শিক্ষাসমিতি সে বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকে। নারীজাতির জীবনের স্বাভাবিক গতির সহিত সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষার এখানে বিরোধ নাই, বরং জীবন যাত্রার স্বাভাবিক উদার বিকাশের পক্ষে এই শিক্ষাই আনুকূল্য সাধন করে। লেখা পড়া শিখিয়া আত্মার উন্নতিসাধনের সঙ্গে প্রত্যেকের একান্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতি-বিধানও সমিতির আদর্শ।

অন্তঃপুর-শিক্ষা

সমিতির মহিলা-পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অন্তঃপুরের মহিলাদের সহিত শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। একটি শিক্ষিতা মহিলাকে পাইয়া গ্রামের মহিলাগণ তাঁহাদের সকল রকম সমস্যাই তাঁহার কাছে লইয়া আসেন। এই মহিলা-পরিদর্শককে গীতাপাঠ হইতে সন্তান-পালন সমুদয় বিষয়েরই
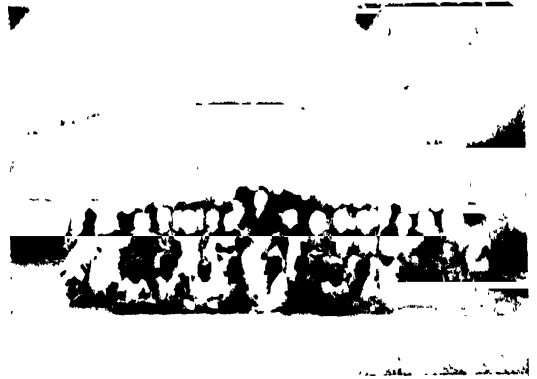
গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ (শ্রীকৃষ্ণপুর)।

পরামর্শ দিতে হয়। গ্রামের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে ইনি নূতনত্ব ও আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া থাকেন।

নারী সমবায়-ভাণ্ডার

দুই বৎসর পূর্ব্বে নারীশিক্ষা-সমিতি-সমবায়-মণ্ডলীর উদ্যোগে একটি সমবায়-ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। এখানে মেয়েদের

গ্রাম্য বিদ্যালয়ের স্কুল-গৃহ (সাঁওতা)।

ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্য ও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সকল প্রয়োজনীয় বস্তুই বিক্রয়ের জন্য থাকে। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মত জিনিষ-পত্র এখানে গিয়া ক্রয় করিতে পারেন। ভাণ্ডার-গৃহে মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করা হয়।

সমিতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বিবরণ উপরে দিলাম। বিভিন্ন ব্যক্তির যত সাধনাই থাকুক, সমিতির সমুদয় কর্ম্মই সমগ্র দেশবাসীর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। কলিকাতা কর্পোরেশনের অনুগ্রহে সমিতি স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাংলার সরকার মাসিক সাহায্য দ্বারা সহায়তা করিতেছেন। তথাপি, অর্থাভাবে সমিতি গ্রামে অধিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। দেশের ও দশের প্রতি সমিতির যথেষ্ট দাবী আছে বলিয়া আমি মনে করি। সমিতির এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে ব্যাপক ও সবল করিতে হইলে দেশবাসীর সাহায্য পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

স্বপ্ন

বহু যুগ-যুগান্তের প্রচ্ছন্ন বিস্তারে
মনের জড়তা মোর গতিবেগে লভিয়াছে স্বপ্নের সুষমা।
যত দ্বিধা, যত ভয়,
দিশাহীন তিমিরের যত দ্বন্দ্ব, যতেক সংশয়—
যত চলিয়াছি পথ—
জ্বলিয়া নিভেছে আশা, হইয়াছি ভগ্ন-মনোরথ ;
জড়পিণ্ডরূপ ক্রমে তীব্র তীক্ষ্ণ ধরেছে আকার,
দীর্ঘতর দিন মোর, ছোট হয়ে আসিয়াছে ধীরে,
আমার মানস-লোকে মোহাচ্ছন্ন নিশীথের অমা।

দীর্ঘ দেহ, কায়া সুবিপুল,
ছিল মোর সুদীর্ঘ জীবন—
অরণ্যের পশুসম অরণ্যেরে করি অনুভব।
নগ্নবক্ষে নগ্নদেহে এক হয়ে প্রকৃতিরে বোঝা—
বজ্রবৃষ্টি আলো-বাতাসেরে,
অবাধ স্পর্শের দিয়া প্রেম।

ক্ষুধিত বক্ষের মাঝে তারোপরে জেগেছে বাসনা,
নগ্ন, স্বাভাবিক।
হিংসা জাগিয়াছে মনে, নিরুদ্বেগে করেছি হনন :
ধীরে ধীরে রচি অন্তরাল
প্রকৃতির কোল হতে বিচ্ছিন্ন করেছি আপনারে।
এক যাহা দুই হয়ে পরস্পর করে হানাহানি।

তারোপরে দেহে মনে জেগেছে বিকার ;
বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি ক্ষুদ্র ক্ষুব্ধ মনের মাঝারে,
এক হ'ল বহু।

গোপন অন্তরে মোর তারোপরে জাগিয়াছে প্রেম,
কাঁদিয়াছি, বাসিয়াছি ভাল—
বহুরে করেছি এক বারম্বার ভালবাসা দিয়ে,
বারম্বার পরাজয় মানি।

তবু স্বপ্ন সত্য মোর, তবু আমি যা ছিলাম নহি,
আঁধার ভবিষ্য-গর্ভে রুদ্ধ আলো করিছে ক্রন্দন।

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীহর্ষ বিবাহ করিবে চাঁপাকে। চমৎকার!

তিনকড়ির ইচ্ছা নয় যে এমন সুন্দর এম-এ পাশ ওই প্রিয়ব্রত ছোকরাটিকে ছাড়িয়া চাঁপা এই বিগতদার প্রৌঢ় লোকটার হাতে গিয়া পড়ে। কিন্তু কি করিবে, কাকাবাবুর ইচ্ছা চাঁপার বিবাহ এই শ্রীহর্ষের সঙ্গেই হোক্, আর তাছাড়া শ্রীহর্ষ নিজেই যখন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, তখন এ বিবাহ হইবেই।

এই লইয়া তিনকড়ি সেদিন বৈকুণ্ঠের সঙ্গে খানিকটা ঝগড়াও করিল।

বলিল—'আপনি ভুল বলছেন কাকাবাবু, আপনি জানেন না, আমার বিশ্বাস লোকটার টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই।'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'আমার বিশ্বাস বললেই ত' আর সব সময় সব সত্যি হয় না তিনকড়ি! এই কলকাতা শহরে আমি এমন লোকও দেখেছি যার চেহারা হাব-ভাব দেখলে মনে হয় ব্যাটা ভিখিরী, কিন্তু আসলে সে হয়ত' লক্ষ টাকার মালিক। আর তাছাড়া ওই অতবড় বাড়ীখানা যার নিজের তার আবার টাকার ভাবনা কি বাবা!'

তিনকড়ি বলিল, 'তা থাক্ ওর বাড়ী! না হয় ধরলাম ওর বাড়ীও আছে টাকাও আছে, কিন্তু তাই বলে' চাঁপীর বিয়ে যে ওইখানে দিতেই হবে তার কি মানে! ওর চেহারা ওর বয়েস···দূর দূর, আমার ত' ভাল লাগছে না কাকাবাবু। চাপী ওই অতবড় ভাঙ্গা ভুতুড়ে বাড়ীটায় গিয়ে দু'দিনেই মরে' যাবে দেখবেন।'

বৈকুণ্ঠ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'তোর কি মনে হচ্ছে তিনকড়ি, শ্রীহর্ষর সঙ্গে চাঁপার বিয়ে না হ'লেই ভাল হয়?'

তিনকড়ি বলিল, 'ওর ওই বাড়ীতে মানুষগুলো কি রকম ধড়াধ্বড়্ মরে' গেল দেখলেন ত'? দেয়াল চাপা পড়ে' ওর বৌ যেদিন ম'লো—আহা বেচারী! সেদিনের কথাটা আমার মনে পড়লে আমার বড় কষ্ট হয় কাকাবাবু, সেই জন্যেই চাঁপীকে আমি ওখানে পাঠাতে চাই না।'

বৈকুণ্ঠ তাহার প্রতিবাদ করিল। বলিল, 'একজন মরেছে বলে' কি সবাই মরবে রে পাগল! আচ্ছা চাঁপী যে সেদিন বড়লোক বড়লোক করছিল, ওকেই জিজ্ঞেস্ কর্ না! শোন্ না কি বলে!'

ইহাদের কথাবার্ত্তা চাঁপা সবই শুনিতেছিল কাজেই তিনকড়িকে আর উঠিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। চাঁপা নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, 'শ্রীহর্ষবাবু বড়লোক ত?'

জবাব দিল বৈকুণ্ঠ। বলিল, 'হ্যাঁগো, বড়লোক বই-কি! ওই বাড়ীখানার দাম কত!'

তিনকড়ি বলিয়া উঠিল, 'সেদিন থেকে তুই শুধু বড়লোক বড়লোক কেন করছিস বল্ দেখি? আমি সেই কথাটা বলেছিলাম বলে'?'

'কি কথা দাদা? কখন বলেছিলে?'

চাঁপা এমন ভাণ করিল যেন তাহার কিছুই মনে নাই।

তিনকড়ি যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইল। বলিল, 'যাক্। ভালই হয়েছে। তাহ'লে আমার জন্যে বলছিস না ত?'

চাঁপা বলিল, 'না দাদা না, তোমার জন্যে বলতে আমার বয়ে গেছে। আমি বড়লোকের বাড়ী যাব, দিব্যি কেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে পায়ে পা দিয়ে বসে বসে খাব। গরীব লোক আমি চাই না দাদা, গরীব লোকের বড় কষ্ট।'

সুতরাং ইহার উপরে আর কথা চলে না।

চাঁপার বিবাহ শ্রীহর্ষের সঙ্গেই ঠিক হইয়া গেল।

কিন্তু সব চেয়ে মুস্কিল বাধিল সেই দিন রাত্রে।

প্রতিদিন রাত্রে শ্রীহর্ষকে ওই চাঁপার হাতের রান্নাই খাইতে হয়, অথচ সেদিন বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়া যাইবার পর চাঁপা আর লজ্জায় শ্রীহর্ষর সুমুখে বাহির হইতে চাহিল না।

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'তাতে আর কি দোষ হয়েছে মা! বিয়ের আগে অনেক বর-কনের দেখাদেখি হয়। ওই যে পাঁচু গাঙ্গুলীর জামাইটিকে দেখেছিস ত? এই এতটুকু বয়েস থেকে নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছিল। মেয়ের সঙ্গে রোজই দেখা হ'তো।'

চাঁপা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কি করিবে, নিরুপায় হইয়া সে খাবারের থালাটা হাতে লইয়া কোনো রকমে হেঁটমুখে লজ্জাজড়িত চরণে ঘরে ঢুকিয়া শ্রীহর্ষর সুমুখে ঠক্ করিয়া নামাইয়া দিয়া আসিল। কিন্তু একা শ্রীহর্ষ নয়, এক সঙ্গে তাহারা তিনজনেই খাইতে বসিয়াছে। বৈকুণ্ঠ এবং তিনকড়িকেও খাবার ধরিয়া দিতে হইবে।

সেই মাসেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

চপলা ঠাকরুণ একটুখানি আপত্তি করিতেছিল। স্ত্রী মারা যাইবার পর এত শীঘ্র বিবাহ করা উচিত নয়। কিন্তু তাহার সে আপত্তি টিঁকিল না। শ্রীহর্ষের ইচ্ছা বিবাহটা শীঘ্রই চুকিয়া যাক্।

হইলও তাহাই।

সেই মাসেরই শেষের দিকে বৈকুণ্ঠের কয়েকজন প্রতিবেশী দূর সম্পর্কের কয়েকজন পাতানো আত্মীয় আত্মীয়াদের লইয়া বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু বিবাহে যাহার সর্ব্বাগ্রে আসিবার কথা, সেই চপলা ঠাকরুণই বিবাহরাত্রে এ-দিক মাড়াইল না।

বিবাহের দুদিন আগে দুপুরে খাইতে গিয়া শ্রীহর্ষ তাহাকে এই সুসংবাদটা জানাইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি যেয়ো মাসী, তুমি না গেলে ত' কিছুই হবে না।'

চাঁপাকে শ্রীহর্ষ যে বিবাহ করিতেছে সে সংবাদ চপলা ঠাকরুণ জানিত, এতদিন প্রতিবাদও করে নাই, সমর্থনও করে নাই, হুঁ হাঁ করিয়াই চুপ করিয়া ছিল, সেদিন কিন্তু হঠাৎ তাহার কি যে হইল কে জানে, শ্রীহর্ষর মেয়ে মালতী ছিল তাহার কোলে, তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া সে বলিতে লাগিল, 'শোন্ মা শোন্, তোর বাবার কাণ্ড শোন্! মাকে তোর মারলে, মেরে আবার বিয়ে করতে চললো। আবার আমায় বলে কিনা সেই বিয়ের সব জোগাড়-যন্তর করে' দিতে! কেন, আমি ছাড়া তোর আর লোক নেই শ্রীহর্ষ? আমি কেন যাবো?'

শ্রীহর্ষ ভাবিল, মাসি উপহাস করিতেছে, কারণ তাহার মনে পড়িল, আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার উপদেশ এই মাসিই তাহাকে একদিন দিয়াছিল। শ্রীহর্ষ হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'তুমি না গেলে এখানে আমার আর আপনার লোক ত' কেউ নেই মাসি!'

চপলা ঠাকরুণ বলিল, 'দ্যাখ্ শ্রীহষ, হাসিসনে! হাসলে আমার গা জালা করে! কেন? আপনার লোক নেই কেন, ওই ত' ওঁরা রয়েছেন—ওই যাঁরা তোমার বাড়ীর লোভে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করতে রাজি করিয়েছেন! তাঁরাই সব করবেন, আমায় ডাকছিস কেন বাবা? আমি যেতে পারব না।'

শ্রীহর্ষ এখনও তাহার মনোভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'না মাসি, তোমায় যেতে হবে।'

'কি বললি? আমি যাব উনার সতীন আসবে তার জন্যে আনন্দ করতে? এই মেয়েটিকে কোলে নিয়ে, না, তা আমি পারব না বাছা!'

বলিয়া চপলা ঠাকরুণ সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সেই যে গেল আর তাহার সুমুখে আসিল না।

আহারাদি শেষ করিয়া শ্রীহর্ষ ঘরের দরজার কাছে গিয়া দেখিল, মালতীকে কোলে লইয়া ঘরের ভিতর চপলা ঠাকরুণ দাঁড়াইয়া আছে আর তাহার চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে।

রাত্রি হইলে শ্রীহর্ষ হয়ত তাহা দেখিতে পাইত না, দিনের বেলা বলিয়াই তাহার নজর পড়িল।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তাহ'লে আজ আমি চললাম। খাওয়া আমার হয়ে গেছে।'

চপলা ঠাকরুণ আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিয়া বলিল, 'যাও।'

বাস্, সেই অবধি আর তাহার দেখা নাই। বিবাহের দিনে সকলেই আশা না করুক্, শ্রীহর্ষ আশা করিয়াছিল সে আসিবেই, কিন্তু আসিল না।

যাই হোক্, চপলা ঠাকরুণ না আসিলেও বিবাহ আট-কাইল না।

শ্রীহর্ষ ভাবিল, না আসুক, চাঁপাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকরুণের কাছে গিয়া তাহাকে একটা প্রণাম করিয়া আসিলেই চলিবে।

এদিকে তিনকড়ি শুধু জানিতে চায়,—শ্রীহর্ষকে বিবাহ করিয়া বোন্ তাহার সুখী হইল কি না! তাহার ধারণা সুখী সে হইবে না। কারণ এ বিবাহ সে মোটেই সমর্থন

করে নাই। চাঁপার মত গুণবতী চাঁপার মত রূপবতী মেয়ের যে শেষে অদৃষ্টের দোষে এমনি বর হইবে তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই! প্রথমে ভাবিয়াছিল, বাড়ীখানা তাহাদের বন্ধক রাখিয়া চাঁপার বিবাহ দেওয়া হইবে, কোনও সুন্দর সুশ্রী ধনবান যুবকের সঙ্গে, যাহার কাছে গিয়া চাঁপা সুখী হইবে, জন্মদুঃখিনী তাহার ভগিনীটি গরীবের সংসারে বাল্যাবধি খাটিয়াই মরিয়াছে, বড়লোকের সংসারে গিয়া যদি তাহাকে খাটিতে না হয়, মুখে যদি তাহার হাসি ফোটে, তাহা হইলেই সে সুখী হইত বেশী, কিন্তু এ কি হইল তাহার! কি কুক্ষণেই যে ওই শ্রীহর্ষের সঙ্গে কাকাবাবুর পরিচয় হইল, কি কুক্ষণেই যে বাড়ী চাপা পড়িয়া তাহার স্ত্রী মরিল, তাহার পর কি কুক্ষণে যে মনে তাহার কাকাবাবুর উপকার করিবার স্পৃহা জাগিয়াছিল কে জানে। শেষ পর্যান্ত এমন উপকার যে করিবে সে ধারণা তিনকড়ির ছিল না।

দোষ যে চাঁপারও নাই তাহা নয়। সেও বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। মরুক্ এইবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তাহার পর সত্যই যেদিন সে মরিয়া যাইবে, ওই শ্রীহর্ষবই সেই বাড়ী-চাপা বৌটার মত তাহাকেও সেই শ্মশানে পুড়াইয়া দিয়া আসিবে। নিজের দোষে নিজের সর্ব্বনাশ কেহ যদি করে ত' তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

কিন্তু চাঁপার দুঃখের কথা ভাবিতে গিয়া যে-চোখে জল কোনোদিন আসে না, সেই তিনকড়ির চোখেও জল আসিল।

বিবাহের জন্য গত কয়েকদিন হইতে দু'জায়গায় দু'জন বাঁধুনী রাখা হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠের বাড়ীতে একজন, আর ওদিকে শ্রীহর্ষর বাড়ীতে আর-একজন। বিবাহ এমন কিছু ধুমধাম করিয়া হয় নাই। বাড়ীর ছোট্ট ছাদের উপর হোগ্‌লা বাঁধিয়া পাড়ার জনকতক ভদ্রলোককে প্রচুর খাওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবেশীদের বাড়ীর যে সব মেয়েরা দায় করিয়া আসিয়াছিলেন, দুদিন ধরিয়া খুব খানিকটা গোলমাল হট্টগোল করিয়া তাঁহারাও চলিয়া গেছেন। বাড়ী এখন আবার ঠিক আগের মতই খাঁ-খাঁ করিতেছে। বাড়ীতে তিনকড়ির একমাত্র আকর্ষণ ছিল চাঁপা। তাহাকেই বকিয়া ঝকিয়া তাহারই সঙ্গে গল্প করিয়া তাহার দিন কাটিত। সেই চাঁপাও চলিয়া গেছে শ্রীহর্ষের বাড়ী। বাড়ীর অবশ্য পাশেই, তবু তিনকড়ি অভিমান করিয়া দুদিন সেখানে যায় নাই। বিবাহের পরের দিন ক্রন্দনরতা চাঁপাকে কোনরকমে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে মাত্র।

বৈকুণ্ঠ প্রায় অধিকাংশ সময় আজকাল শ্রীহর্ষর ওই ভাঙ্গা বাড়ীতেই কাটাইতেছেন। ভাঙ্গা বাড়ীটা বিবাহ উপলক্ষে এমন করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে যে, এখন আর ছাদের দিকে না তাকাইলে ভাঙ্গা বলিয়া মনেই হয় না।

বৈকুণ্ঠ সে দিন ও-বাড়ী হইতে ফিরিয়াই বলিলেন, 'ওরে তিনু, কাছে আয়, শোন্!'

তিনকড়ি তাহার কাছে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কি?'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'এখনও তোর রাগ পড়লো না বাবা?'

তিনকড়ি ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'রাগ কিসের, কই রাগ ত' আমি করিনি।'

'করছিস বাবা, করছিস্। মানুষের মুখ দেখলেই ওটা বুঝতে পারি। কিন্তু আর এখন রাগ করেই বা কি হবে তিনু?'

তিনকড়ি বলিল, 'না, আর রাগ করে' কি হবে! বিয়ে ত' চুকিয়েই ফেলেছেন।'

বৈকুণ্ঠ একটুখানি ভাবিলেন। ভাবিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'ছাখ্ তিনু, বিয়ে আমি অনেক ভেবে-চিন্তে তোর সঙ্গে ঝগড়া করেও এইখানেই দিলাম। কেন দিলাম, সময় যদি পাই ত' তোকে একদিন বলব বাবা! সে যাই হোক্ চাঁপা তোকে একবার ডেকেছে তিনু, তুই যা। গিয়ে দেখে আয় কেমন সুখে আছে।'

তিনকড়ি বলিল, 'যাব।'

'যাব কিবে, এক্ষুণি যা না!'

তিনকড়ি বলিল, 'এখন আর যাব না কাকাবাবু, সন্ধ্যের পরেই যাব।'

সেদিন সন্ধ্যার পরেই ধীর মন্থর গতিতে তিনকড়ি শ্রীহর্ষর সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার ফটকে প্রবেশ করিয়া দেখিল—নীচের প্রায় সব ঘরেই আলো জ্বলিতেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সবই আবার সাজানো হইয়াছে, সুমুখের বাগানটি পরিষ্কার, লাল কাঁকরের রাস্তাটি আবার তেমনি নূতনের মতই দেখাইতেছে, আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, যতই সে আগাইয়া যাইতে লাগিল, কতই মনে হইল যেন বাড়ীতে বিস্তর লোকজন রহিয়াছে, কোলাহল চীৎকারে চারিদিক যেন গম্ গম্ করিতেছে। কিন্তু এত লোক এখানে আসিল কোথা হইতে? উহারা ত' মাত্র দু'জন—চাঁপা আর শ্রীহর্ষ!

তিনকড়ি তাহার চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইল।   (ক্রমশ)

স্বামী বিবেকানন্দ ও সামাজিক বৈষম্য

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

মনুষ্য-সভ্যতা নিখুঁত নহে। কোন দেশে কোন যুগে সভ্য মানুষ আদর্শ সমাজ গড়িতে পারে নাই। অতীতের বড় বড় জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস-পথ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যে-জাতি যে সময় সামাজিক বৈষম্যের প্রতি সচেতন থাকিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে—সেই জাতির সমাজই উন্নতিলাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে যখন বৈষম্য-ভেদকেই মানুষ সত্য বলিয়া জানিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে—তখনই সেই সভ্যতা ও সেই জাতির পতন হইয়াছে।

সামাজিক বৈষম্য বা মানুষে মানুষে ভেদ একেবারে দূর হইয়া আদর্শ মানব-সমাজ কোন যুগে গড়িয়া উঠিবে কিনা, তাহা নিশ্চয়ই সন্দেহের স্থল। স্বামী বিবেকানন্দ এই বৈষম্যকে পুরাতন বাতরোগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যখন যে-অঙ্গে ব্যাধির আধিক্য হয়, তখন ব্যাধিকে সেই স্থল হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা যেমন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তেমনি জাতি-দেহের কোন অঙ্গে যদি বৈষম্য আত্যন্তিক হইয়া উঠে, তবে তাহা দূর করার চেষ্টাও জাতি-দেহের জীবনের লক্ষণ। হয়তো পায়ের বাত পুনরায় হাতে দেখা দিবে, কটিদেশ হইতে বিতাড়িত বাতরোগ স্কন্ধে দেখা দিবে, কিন্তু সে কথা ভাবিয়া নিরুদ্যম হইয়া কে বসিয়া থাকে?

বর্ত্তমান জগতের সভ্যজাতিনিচয়ের মধ্যে অনেক বৈষম্য আছে। এবং তৎসম্পর্কে যে সকল জাতি সচেতন, তাহারা নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। দীন, দরিদ্র, অজ্ঞ, উৎপীড়িতের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য কত উদ্যম, কত আয়োজন!

এই বৈষম্যকে সমর্থন অথবা ক্ষাত্রবলসহায়ে পৌরহিত্য শক্তি অচলায়তন করিতে গিয়া, বহু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোমের মত একেবারে ধ্বংস হয় নাই, তাহার কারণ, ভারতের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতা, ভারতের ত্যাগ-সাধনা। বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ ভারতীয় সভ্যতাকে অদ্যাবধি জীয়াইয়া রাখিয়াছে, ইহা সত্য নহে। ভারতের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতার সহিত সমাজ-জীবন সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। সেই পতনের তামসযুগে অতি পৈশাচিক দুর্ব্বুদ্ধি পুরাণ ও স্মৃতিসমূহে ভেদ ও বৈষম্য সম্পর্কে ঘৃণিত কাহিনী সকল রচনা করিয়া অধিকাংশ মানুষকে হীন, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য পর্য্যায়ে ফেলিয়া যুগ যুগ ধরিয়া অত্যাচার করিয়াছে।

ভারতবর্ষের এই মহাপাপ সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতবাসী অচেতন থাকিলেও, ভারতের অধ্যাত্ম প্রতিভা অচেতন ছিল না। নানক, কবীর, দাদূ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের আবির্ভাব যে লক্ষ লক্ষ পতিতের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সমগ্র মুসলমান যুগে ভারতের সন্ন্যাস সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে আর ভারতের গার্হস্থ্য তাহাতে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই বিরোধ এত প্রবল হইয়াছিল যে বাঙ্গলার কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত এমন ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন যে, কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ। ক্রোধের কথা।

এই ভেদ ও বৈষম্য গত কয়েক শতাব্দীতে অতি প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। রাজশক্তিভ্রষ্ট হিন্দুর নির্বীর্য্য ক্ষাত্রবল, রাজা জমীদারাদিতে প্রকাশিত হইয়া এবং তাহাদের চাটুকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সহায়ে সমাজক্ষেত্রে প্রভু হইয়া দুর্ব্বলদিগকে জাতিচ্যুত, পতিত, অন্ত্যজ পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে। ধর্ম্ম দিয়া, বিদ্যা দিয়া, সামাজিক সদাচার দিয়া জনসাধারণকে উন্নত করিবার পরিবর্ত্তে, অধিকতর অবনত করিয়াছে।

বহু শতাব্দীর পর আর এক প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই নবশক্তিকেন্দ্র হইতে আবির্ভূত হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। একথা সত্য যে এই মহাপুরুষই এযুগে সর্ব্বপ্রথম, ভারতের এই বিশাল জনসমষ্টির উদ্ধার ও সমুন্নতির বার্ত্তা লইয়া আসিলেন। তিনি একথা বলিতে দ্বিধা করিলেন না যে, "আমাদের আভিজাত্যগর্ব্বী পূর্ব্বপুরুষগণ জনসাধারণকে পদতলে পেষণ করিয়াছেন, ক্রমে তাহারা অসহায় হইয়াছে, তাঁহাদের উৎপীড়নে তাহারা যে মানুষ একথা ভুলিয়া গিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া
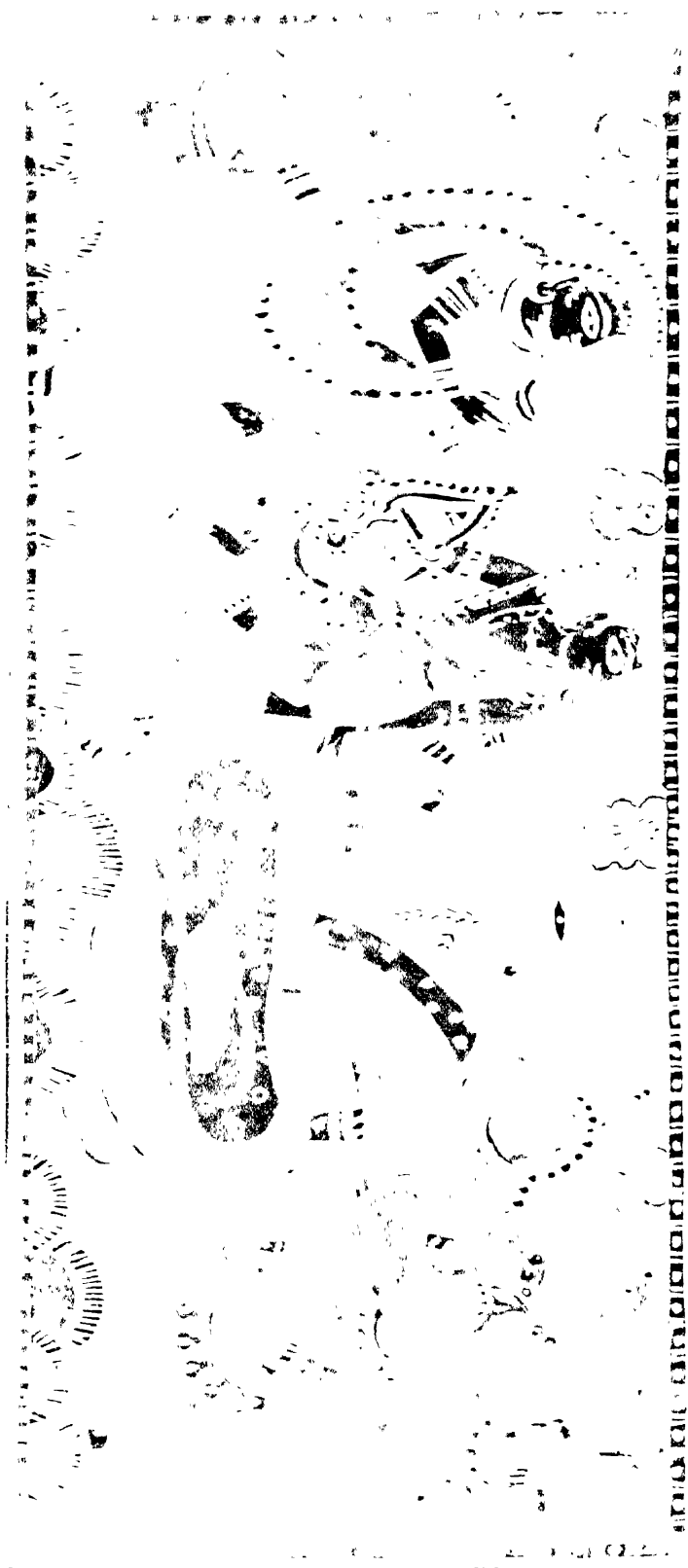
তাহারা দাসত্ব করিয়াছে, তাহাদের বুঝান হইয়াছে, তাহারা হীনবংশে গোলামী করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

"হিন্দুধর্ম্মের মত জগতের কোন ধর্ম্মই উচ্চকণ্ঠে মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করে নাই এবং কোন ধর্ম্মই গরীবের গলায় পা দিয়া এমন পৈশাচিক অত্যাচার করে নাই।"

"হা ভগবান, লক্ষ লক্ষ দীনদরিদ্র মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া এই ভারতে কয়জন কাঁদে! আমরা কি মানুষ? আমরা তাহাদের উন্নত করিবার জন্য, জীবিকার সংস্থানের জন্য কি করিয়াছি! আমরা তাহাদের স্পর্শ করি না, তাহাদের সান্নিধ্যে গেলে আমরা অপবিত্র হই। আমরা কি মানুষ!"

ভারতের জ্ঞানেবিজ্ঞানে উন্নত, মহৎ বংশে জন্মলাভের গরিমায় অন্ধ, তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দিগকে স্বামী বিবেকানন্দ "বিশ্বাসঘাতক" "কৃতঘ্ন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কি মর্ম্মান্তিক বেদনায় অহোরাত্র পীড়িত হইয়া তাঁহার মত মানব-প্রেমিকের রসনা হইতে কটূক্তি নির্গত হইয়াছে, তাহা কি আমরা আজিও ধারণা করিতে পারিলাম!

এই অশান্ত সন্ন্যাসী, হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে ভারতের দীন দরিদ্রদের জন্য সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত চেষ্টা, তাঁহার প্রাণপাত উদ্যম দায়স্বরূপ পরবর্তীয়দের উপর দিয়া গিয়াছেন।

অর্দ্ধচেতন ভারতের কর্ণে সে-বাণী প্রবেশ করে নাই। একটা জাতির সমুদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য যে চরিত্র-বল, যে শিক্ষাদীক্ষা আবশ্যক, স্বামিজী তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি বলিতেন—জাতিগঠন অপেক্ষা আমি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাই, যাহাতে মানুষ গঠন হয়।

আজ আর এক মহাপুরুষ, সমগ্র দেশকে তেমনি ভাবে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও হরিজন-সেবায় আহ্বান করিতেছেন। আমরা একটু সচকিত হইয়াছি। জাতির অধঃপতনের যে মূলীভূত কারণ স্বামিজী আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং নিরোধের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা কি আমরা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইব।

ভারতের এই দৌর্ব্বল্য যে কত সাঙ্ঘাতিক তাহা প্রমাণ করিলেন প্রথম—ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড। তিনি সাইমন কমিশনের বহু পূর্ব্বেই "ডিপ্রেষ্ট ক্লাশ" এই রাজনৈতিক সংজ্ঞা দিয়া নিপীড়িত হিন্দুদিগকে পৃথক করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সেদিনও আমাদের বিজ্ঞজনেরা বুঝিতে পারেন নাই যে, উহার পরিণতি কোথায়। বুঝিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—"ইংরাজরাজত্বে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে ঐ পথ হইতে আঘাত আসিবে।" বুঝিয়াছিলেন গান্ধীজী, যিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের অন্যতম অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

আমরা জানি কার্য্য সহজ নহে। ইহাও জানি যে, সামাজিক বৈষম্য দূর করিবার জন্য ভারতে এতকাল সচেতন চেষ্টা হয় নাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্ম, হাসপাতাল, দুর্ভিক্ষ বন্যায় এবং যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানযাত্রীদের সুখ-সুবিধার মধ্যেই আটকাইয়া রহিয়াছে। এত জাগ্রত তরুণ-তরুণী দেখি, কই কয়জন "ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সত্য, পবিত্রতা ও প্রেমের বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্য, মৈত্রী ও সামাজিক উন্নয়নের বাণী প্রচার করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?"

স্বামিজী বলিয়াছেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" সামাজিক ভয়াবহ বৈষম্যবাদের মধ্যে যে যোদ্ধৃ সন্ন্যাসী তাঁহার অদ্বৈত বেদান্তের বজ্রনির্ঘোষে আমাদিগকে একদা আহ্বান করিয়াছিল, তাঁহার কথা আমাদিগকে শুনিতেই হইবে। একদিন যীশুখৃষ্টকে অস্বীকার করিয়া, ইহুদীজাতি দেশভ্রষ্ট, মর্য্যাদাভ্রষ্ট হইয়া ইয়োরোপের দয়ার দ্বারে ভিক্ষুক হইয়াছিল, আজিও অনন্ত দুঃখ সহ্য করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে অস্বীকার করিয়া আমরাও দিনে দিনে দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতেছি। যে প্রতিকার নিজেদের হাতে, তাহা বিস্মৃত হইয়া, আজ আমরা সাহায্যের আশায়, করুণার আশায়, ন্যায়বিচারের আশায়, বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছি। "তোমরা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়োনা। কি জাতি, কি ব্যক্তিকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হয়। ইহাই প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম। যে জাতি তাহাতে অক্ষম, তাহার সময় হয় নাই, তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

ছোট গল্প

বাংলা দেশে আমাদের অবসর যে প্রচুর, আমাদের তথাকথিত ছোট গল্পগুলির বহর দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। একটি ছোট গল্প লইয়া একটি সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহর কাটাইয়া দিতে পারিলে তবে গল্পটি ভাল উৎরাইল বলা হয়। গল্প যত ভালই হউক, চট্ করিয়া শেষ হইয়া গেলেই তাহা নাকি আর গল্প থাকে না। এরূপক্ষেত্রে এদেশে সত্যকার ছোট গল্প বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সৃষ্টি সম্ভব নহে। সম্ভব হয়ও নাই।

শেকভ, মোপাসাঁ, টুর্গেনিভ, ও-হেনরী প্রভৃতির গল্পের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, ছোট গল্প কাহাকে বলে। একটা সূক্ষ্ম রসবস্তুর সন্ধান পাইলেই সেখানকার পাঠক সন্তুষ্ট; ইহার কি হইল, তাহার কি হইল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাঁহারা লেখকের নিকট দাবী করেন না। পাঠকেরও আরাম, লেখকেরও আরাম। অবশ্য বড় গল্প যে এই সকল লেখকেরা লেখেন নাই তাহাও নহে, সে লেখার তাগিদেই, প্রয়োজনের খাতিরে নয়।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় সেদিন পর্য্যন্তও তেমন পাওয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাত কুমার ছোট গল্প লিখিয়াছেন, লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যেও স্থান পায় কিন্তু গল্পগুলি প্রায়ই এক ধরণের, অধিকাংশই বর্ণনামূলক। ইয়োরোপের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সের গল্প-গুলি বদলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু সেগুলি অতি-বিশ্লেষণ-কণ্টকিত।

বাংলাদেশে সত্যকার ছোট গল্প লেখা সুরু হইয়াছে সম্প্রতি। 'ভারতীর দল' বলিতে আমরা যাঁহাদের বুঝি তাঁহারাই এক হিসাবে এই বিষয়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহারা সুরু করিয়াছেন, তেমন সাফল্য অর্জ্জন করেন নাই। কারণ, তাঁহাদের উদ্যম ছিল, প্রতিভা ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহারা খাঁটি বিদেশী গল্প, মাত্র নামধাম বদলাইয়া বেমালুম নিজেদের বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে সুফল ফলিয়াছে এই, যে, পরবর্ত্তী লেখকেরা একটা আদর্শের হদিস পাইয়া তাহা কাজে লাগাইয়াছেন।

সত্যকার গল্প-লেখক, আধুনিক বলিলে যাঁহাদের বুঝায় তাঁহাদের মধ্যেই দেখিতেছি; ছোট গল্প লেখার টেক্‌নিকও ইঁহাদের অনেকে বেশ ভাল আয়ত্ত করিয়াছেন; সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বিষয়বস্তুর অভাবে অনেক সময় ইঁহারা ভুল করিয়া বসেন বটে কিন্তু বলিবার ধরণে ইঁহারা অনেক সময় আমাদের আকর্ষণও করেন। মোটকথা বাংলাদেশ যে গল্প লেখায় উন্নতি করিয়াছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।

কিন্তু দুঃখ এই যে এই সকল আধুনিক গল্প-লেখক দেশের আবহাওয়ার দোষে ছোট গল্প লিখিতে বসিয়া ছোট উপন্যাস লিখিতে বাধ্য হইতেছেন, নইলে মাসিক পত্রিকায় চলে না; গল্প-সংগ্রহের বই যে এদেশে একেবারেই অচল তাহা পুস্তক-ব্যবসায়ী মাত্রেই অবগত আছেন। একমাত্র পরশুরামই এ বিষয়ে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী; অবশ্য একটু বাঁকা পথে গিয়া তাঁহাকে সে সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে হইয়াছে।

বাজারের অবস্থা বুঝিয়া ইতিমধ্যেই ইঁহাদের অনেকে লেখার ধারা বদলাইয়া প্রাচীনপন্থী হইয়া পড়িয়াছেন, অনেকে গল্পের মালা সাজাইয়া উপন্যাস লিখিতেছেন, ফলে গল্পও হইতেছে না, উপন্যাসও হইতেছে না। অনেক ক্ষেত্রে যে গল্প এক পাতায় শেষ হয়, ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া সেই গল্পকেই ইঁহারা দশপাতায় শেষ করিতেছেন। যথার্থ ছোট গল্পের রেওয়াজ এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে।

এই সকল টানিয়া-বাড়ানো গল্পের প্রতিবাদস্বরূপ বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যাঁহারা সত্যকার গল্প লেখেন এবং গল্প লেখক হিসাবে এখনও মরিয়া যান নাই তাঁহাদের কয়েকজনকে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম বঙ্গশ্রীর একপৃষ্ঠায় সমাপ্ত একটি করিয়া গল্প লিখিতে। সময় ও সুবিধার অভাবে দুই চারিজনকে অনুরোধ করি নাই এবং শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় 'ছোট গল্প' এই সংখ্যাতেই লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকেও লিখিতে বলি নাই। ইঁহাদের মধ্যে বারজন বারটি সত্যকার ছোট গল্প পাঠাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। দুই একজনের গল্প যে মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই তাহা নহে, গেলেও তাহা ছোট গল্পই হইয়াছে। গল্প-লেখকগণের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই যথার্থ ছোট গল্প লিখিতে পারেন, দাবীর চাপেই তাঁহাদের গল্প সচরাচর বৃহদায়তন হইয়া পড়ে। শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল এই বেনামীতে যিনি লিখিয়াছেন তিনি স্বনামে জীবন-বীমা ও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে পরিচিত ব্যক্তি। বেনামীতে তিনি অনেক ভাল ছোট গল্প লিখিয়াছেন। এতগুলি ছোট গল্পের একত্র সমাবেশ সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বাঙ্গালীর রসবোধের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আশা করি, এই গল্পগুলির রস তাঁহারা উপভোগ করিবেন।

অ *

—শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

একৃজীবিশন। সমগ্র ভারতের পণ্যসম্ভার নিজ বৈচিত্র্য-দারিদ্র্যে প্রকট হইয়া কাতারে কাতারে দেখা দিয়াছে। তেল আর সাবান, সাবান আর তেল, টু সে নাথিং অব দি ডগ পেটেণ্ট ঔষধ, মনে হইল এত সাবান কে মাখে? এবং যদি বা মাখে ত তাহার কি কিছুই ফল ফলে না! ধাক্কা ও বক্তৃতা এই দুইয়ের তাড়নায় অচিরাৎ সমস্ত একৃজীবিশনটা ঘুরিয়া লইলাম। প্রায় আড়াই সের হাণ্ডবিল হাতে লইয়া মনে মনে হিসাব করিতেছি যে প্রবেশিকা এক আনা পয়সা ইহাতে উঠিবে কিনা এমন সময় চমকিয়া, থমকিয়া এক পরকীয়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেলাম। পরনে বেগুনে শাড়ী, কপালে টিপ ও সঙ্গে (ওঃ) জঘন্য একটা স্বামী বা তজ্জাতীয় জীব! মনে হইল—

"Oh, murderous coxcomb! What should such a fool
Do with so good a wife?"

তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল; হায়! বিজলী বাতি কি নিষ্প্রভ! আর ওটাকে দেখিয়া মনে হইল—ওঃ সে যে কি মনে হইল কি বলিব! তাঁহাকে দেখিয়া কিন্তু মনটা যেন মধুতে ভরিয়া উঠিল।

"I was the hive, and Love the bee
My heart the honeycomb"

কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল প্রাণ সেই রসে। এতদিন যেন জীবন আমার জীবনই ছিল না একটা গতিবিধির সস্তা ধরণের উপায় মাত্র ছিল। মনে হইল তাঁহার উপস্থিতির ভাইটামিন-সঞ্চারে আমি যেন অঙ্গে অঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছি। গ্রোথ! এক কথায়, গ্রোথ। হায়, একে কেন আগে দেখি নাই! তাহা হইলে কি আর আমি আজ আমি হইতাম। এর প্রেমের আকাশ পাইলে আমি কি তাহে চাঁদ হইয়া উঠিতাম না? এর প্রণয়সিঞ্চনে আমার অনুর্ব্বর অন্তর অনন্ত ফলভারে ফাঁপিয়া উঠিত। পাই নাই তাই হই নাই। আজ বুঝিবা পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণ আসিল।

"Be thou glad, oh thirsting desert; let the desert be made cheerful, and bloom as the lily; and the barren places of Jordan shall run wild with wood."

কিন্তু ঐ জঘন্য স্বামীটা! ওটাকে কোন উপায়ে বেমালুম লোপাট করা যায় না কি? হায়, দেশে অরাজকতা! নচেৎ এরূপ স্ত্রীর এরূপ স্বামী; আর তাহা আইনে বাধে না! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

এমন সময় একজীবিশনের কর্ম্মকর্ত্তা রণরঞ্জণ দস্তিদার মহাশয় সেখানে লেডি-ভলাণ্টিয়র-পরিবৃত হইয়া হাজির হইলেন। আমার সহিত পরিচয় ছিল। আমি একটা প্রমাণ সাইজের নমস্কার হানিয়া বলিলাম, "রণরঞ্জন বাবু না?" তিনি বলিলেন,"আজ্ঞে হ্যাঁ আমিই; আপনি না?" আমি বলিলাম; "কি বলেন! বিলক্ষণ, আপনার কাছে কি আর কিছু অজানা থাকে।" এইরূপে আলাপটা জমাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা রণরঞ্জন বাবু, ঐ উনি! উনি কে? আর ওঁর সঙ্গে ঐ মানুষটা, ওই বা কে?"

"ওঃ, ও মিসেস পাকড়াশী। আর ও, ও মিষ্টার পাকড়াশী। আসুন আলাপ করে দি।" কথা বলিতে না বলিতে রণরঞ্জন আমায় মিসেস পাকড়াশীর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া উধাও হইয়া গেলেন—মিষ্টার পাকড়াশীও মেয়ে-ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে কোথায় যেন চলিয়া গেল। দি ওয়ে অফ ট্রু লাভ আাট লাষ্ট ডিড্ রান স্মুথ। আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম "আপনার সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হলাম।"

মিসেস পাকড়াশী আধ-আধ রকম হাসিয়া বলিলেন—হ-জ-ব-র-ল কিছুই না. কিন্তু প্রায় পোনেরো মিনিট ধরিয়া। এর মধ্যে তাঁকে আমার সকল পরিচয় দিলাম, তাঁর বাড়ী যাইব প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁর আজ্ঞা-প্রতিপালনার্থে আমি যে চিরপ্রস্তুত তাহাও জানাইলাম। তিনি আরো অনেকটা আধ-আধ হাসিলেন এবং পুরাপুরি একটা মৌরসি রকমের অধিকার আমার হৃদয়ের উপর জমাইয়া লইলেন। অনেক গল্প হইল; বিষয়হীন কিন্তু মধুর। তারপর প্রথম সে মিলনের পর বিদায়ের পালা, উঃ সে কি ব্যথা! আর ব্যাটা পাকড়াশী পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিনে-বাদাম চিবাইতে লাগিল!

বিদায়, বিদায়, বিদায়···টিল টুমরো···মিসেস পাকড়াশী বলিলেন, "কাল আসবেন নিশ্চয়···সাড়ে চারটার সময়, এসে চা খাবেন।" আরও আধ-আধ হাসিয়া, "আর, আপনার একটা ইনস্যুরেন্স আমার কাছে করতে হবে ." (মূর্চ্ছা ও পতন)

* শুনিলাম গল্পগুলি বর্ণানুক্রমে ছাপা হইবে। তাই প্রথম স্থান পাইবার জন্য এই নাম দিলাম।—লেখক।

অকস্মাৎ

-শ্রীমনোজ বসু

ফণিভূষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে ঝুপঝুপ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। মেয়েরা যে যার বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। ঘুমের ঘোরে একখানা হাত গিয়া পড়িল বধূর গায়ে। চোখ মেলিয়া দেখে, বধূ তারই দিকে চাহিয়া আছে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া বধূ মুখ ফিরাইয়া শুইল। লজ্জিত ফণিভূষণ আরও হাত দুই ফাঁক হইয়া তারপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া পাশবালিশটা মাঝখানে দিল, পরের মেয়ের গায়ে হাত যাহাতে আর না পড়িতে পারে।

তবু জাগিয়া জাগিয়া ভাবিতে লাগিল, যদি সে একটা কিছু কথা বলিয়া উঠে!...

প্রথম যে কথাটি নববধূ তোমার কানে কানে কহিয়াছিল, তাহা মনে আছে কি? মনে পড়িবে না। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করিতেছিল, দু'হাতে প্রাণপণ চেষ্টায় বুক চাপিয়া বসিয়া ছিল, কেবল অনুভব হইতেছিল, ইহা আলাপন নয়—অচেনা কিশোরী তার মর্ম্মের সকল মধু কানের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। সেদিনের কথা ভাবিয়া দেখিও।

বৈঠকখানায় বরযাত্রীর দল শুইয়া ছিল। জানলা-দরজার ছিদ্রপথে শতস্না বাণের মত রোদ আসিয়া গায়ে বিঁধিতে লাগিল। আবার বাজনদারের দল এমনি বিক্রম সুরু করিয়াছে. যে কান বাঁচাইতে হইলে বখশীস দিতেই হইবে। কেদার মুখুজ্জে মহাশয় উঠিয়া দরজা খুলিলেন। তারপর সকলে উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া ফণিভূষণ সেখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মেয়ের বাপ নাই, মামাই কন্যাকর্ত্তা। আয়োজন প্রচুর। বাটি বাটি চা শুইয়া থাকিতেই শিয়রে আসিয়া পৌছায়। চন্দ্রপুলি ক্ষীরের ছাঁচের ব্যবস্থাও আছে।

মুখুজ্জে মহাশয়ের লোভ হইল, চা জিনিষটা এই সুযোগে কিঞ্চিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। একবাটি লইয়া মাঝে মাঝে উষ্ণতা পরীক্ষা করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন. কতক্ষণ আর অপেক্ষা করিতে হইবে! এমনি সময়ে হঠাৎ অন্তঃপুরে কান্নার রোল।

ব্যাপার কি? কেদার চারিদিক তাকাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ফণি? ফণি কোথায় গেল?

মণীন্দ্র তাঁহার বড় ছেলে, ফণির প্রায় সমবয়সী। সে বলিল—আবার তাকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গেছে। মেয়েরা ঘিরে বসেছেন—।

—তবেই হয়েছে। কেদার শুষ্কমুখে গাড়ু হাতে উঠানে নামিলেন। গলা খাটো করিয়া বলিলেন—বাঁচতে চাও ত বসে থেক না, বাবারা। আমি যাচ্ছি ঐ বাঁশ-বাগানে। এমন তেমন বুঝলে ওখানে গাড়ু ফেলে গিয়ে নৌকো খুলে দেব—।

সকলেই চঞ্চল হইয়া অন্তঃপুরের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল। কন্যার মামা লাঠি লইয়া আসিয়া পড়েন বুঝি!

কেদার মুখুজ্জের অনুমান মিথ্যা নয়।

নানারূপ কথাবার্ত্তার মাঝখানে একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল—জামাই বাবু, আপনি কি কাজ করেন?

ইহার জবাব পূর্ব্বাহ্ণেই তালিম দেওয়া ছিল, বাড়ী থাকিয়া সে বিষয়-আশয় দেখে। ফণিভূষণ নির্ভুল উত্তর দিল।

—আর কিছু করেন না?

ও অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার বলিয়া ফণির খ্যাতি আছে। এমন মজলিসে সেই বাহাদুরীটুকু না লইয়া সে পারিল না। বলিল—আর ঘোড়ায় চড়ি।

—না, ঘোড়ার ঘাস কাটেন—

—তাও কাটি।

—মাইনে কত?

—মাইনে দেয় না, চড়তে দেয়।

মেয়েদের হাসি থামিয়া গেল। বেশ বোঝা গেল, ঠাট্টাতামাসার কথা ইহা নয়। জামাই সত্যই ঘোড়ায় চড়িয়া থাকেন এবং কৃষ্ণের জীবের জন্য প্রত্যহ ঘাস কাটিয়া আনেন। ঘোড়ার মালিক মণীন্দ্র মুখুজ্জে; সে বিবেচক ব্যক্তি, মাঝে মাঝে ফণিকে চড়িতে দিয়া থাকে।

জেরার মুখে আরও প্রকাশ পাইতে লাগিল, যে-দোতলা বাড়ী কন্যাপক্ষকে দেখান হইয়াছিল বাপ মরিবার সময়ে সেটা

ফণিরই ছিল বটে, কিন্তু তাহার পর দেনার দায়ে কেদার মুখুজ্জে দখল করিয়াছেন। তা বলিয়া সে নিরাশ্রয় নয়, পুকুরপাড়ের কসাড় বৈঁচির জঙ্গল কাটিয়া কেদারই নিজ খরচে এক খড়ের ঘর তুলিয়া দিয়াছেন। আবার গত বছর জমাজমি যা কিছু ছিল সমস্তই কেদারকে লিখিয়া দিয়া সে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হইয়াছে। কিন্তু বিয়ের উৎসাহ বড় প্রবল; কেদারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ভাল জায়গায় সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দিবেন।

কনের মা জানলায় কান রাখিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মামা আসিয়া পড়িলেন, আরও লোক জমিতে লাগিল। সমস্ত কথা শুনিয়া মামা ঘাড় নাড়িলেন, বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া বিয়ে-বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্বের ভিড়, এসব চুকিয়া যাক্, দশের মধ্যে মান ত বাঁচুক,—সকল কথা তারপর ভাবা যাইবে।

মেয়ের মুখ সেই হইতে অন্ধকার। কনে-বিদায়ের সময় বলির শেষে কবন্ধ-পশুর মত সে আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে লাগিল। মাও আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রাবণ মাস। দিনভোর বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু রাত্রিবেলা মেঘ কাটিয়া দিব্য জ্যোৎস্না ফুটিল। চারিদিক ভিজে ভিজে, কে যেন বড় কান্না কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া এখন চুপ করিয়াছে। প্রহরখানেক রাতে জোয়ার আসিল। পাশের নৌকায় বুড়ারা বিপুল চীৎকারে পাশায় মাতিয়াছেন। দুই নৌকা পাশাপাশি বাঁধা হইল। এ নৌকার এক কামরায় বধূ ও ঝি, আর একটিতে ফণিভূষণ ও ছোকরা বরযাত্রীর দল। নরম চকচকে বালুময় তীরভূমি। সকলে নামিয়া সেইখানে মাদুর পাতিয়া হারমোনিয়াম লইয়া বসিল। ফণিভূষণ উঠিল না, নৌকার মধ্যে চুপচাপ শুইয়া রহিল।

মাঝের দরজাটা একবার ফাঁক করিয়া সে দেখিল, ঝি নাক ডাকাইতেছে। বধূও সম্ভবতঃ ঘুমাইয়াছে, অন্যদিকে মুখ ফেরানো। মুখ তুলিয়া একটা বার যদি সে কোন রকম একটু আলাপ করিত! সে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিল, অনেক ইতস্তত করিল, অবশেষে মুখ বাড়াইয়া চুপি চুপি ডাকিল—ওগো!

চমকিয়া বধূ মুখ ফিরিয়া তাকাইল। ঘুমায় নাই, চোখে কান্নার দাগ শুকাইয়া আছে। এক নজর চাহিয়া আবার মুখ গুঁজিয়া পড়িল। সাহস করিয়া ফণি আরও একবার চেষ্টা করিল। বধূ সাড়া দিল না।

ইতিমধ্যে পাশাখেলা ভাঙিয়া কেদার মুখুজ্জেও নৌকার গলুয়ে আসিয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ ফণিকে ডাকিলেন। তটস্থ হইয়া সে বাহিরে দাঁড়াইতে কেদার সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন—যে কথা, সেই কাজ—দেখলে ত? কত সুহৃৎ তোমার কাছে বলেছিল, কেদার মুখুজ্জে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে নিচ্ছে···বিয়ে-থাওয়া কিচ্ছু দেবে না। বল এখন, কথা রেখেছি কিনা—?

বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় ফণি অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

উপর হইতে মণীন্দ্র ডাক দিল—ফণিদা, কি করছ ওদিকে? শোন—। হারমোনিয়ামের কোলাহল হইতে নিভৃতে এদিকে সরিয়া আসিয়া মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—একা একা কি করছিলে বল দিকি? বৌদির সঙ্গে ভাব জমাচ্ছিলে? কি বল্লে বউ?

নিরতিশয় ম্লান মুখে ঘাড় নাড়িয়া ফণি বলিল—কিছু না—।

—তুমি বোকা। ওরা কি আগে কথা বলে? কত সাধা-সাধি করতে হবে, তবে ত? আগে কথা বললে তুমিই হয়ত ভাববে, কি রকম বেহায়া বউ!

—আমি ত কতবার ডাকলাম, তবু কথা বলে না।

মণীন্দ্র অভয় দিয়া বলিল—বলবে, বলবে—এখনো বাকী আছে। ও অনেক খোসামোদ করতে হবে—সোজা নয়। তারপর আসল কথা পাড়িল।—খাওয়া-দাওয়ার কি হবে এবেলা? ক্ষিধে লাগছে যে।

ফণি চুপ করিয়া রহিল। বধূর অশ্রুম্লান মুখখানি বড় মনে আসিতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার কথা এ সময়ে তার ভাল লাগিল না।

মণীন্দ্র বলিল—মিছে আলসেমি করে কি হবে দাদা, দুটো ভাতে ভাত চাপিয়ে দাও চরের উপর। চাল ডাল রয়েছে··· সমস্ত রয়েছে··

কেদার মুখুজ্জে নামিয়া আসিতেছিলেন। শেষ কথাটি কানে গেল, বলিলেন—না, ওকে দিয়ে রাঁধিও না। ও হ'ল বর—আজকের দিনটে আর কেউ রাঁধুক।

মণীন্দ্র হাসিয়া বলিল - ঢেঁকির আবার স্বর্গবাস? চিরকাল করে এল, বর হয়েছে ত শিঙ বেরিয়েছে নাকি?

কিন্তু শিঙ বাহির না হইলেও ফণির কি যেন একটা হইয়াছে। ঘাড় নাড়িয়া—কোন দিন যাহা করিতে সাহস পায় না—তাহাই করিল, বলিল—আমি পারব না।

মণীন্দ্র বিস্মিত হইল, তবু মৃদু হাসিয়া বলিল— আমরা না হয় উপোষ করলাম, কিন্তু বউটি পরের মেয়ে - তার ভাবনা ভাবতে হয় একবার!

কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ফণি নৌকার মধ্যে চুপচাপ গিয়া বসিল। জোয়ার-জল কল কল করিয়া কূল ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল। চোখ বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল, বধূর শুকনা মুখখানির কথা। তারপর ভাবিল, কি হইবে আলস্য করিয়া? ভাত রান্না হইতে কতক্ষণই বা সময় লাগিবে? ওপাশের কামরায় নিঃসাড় হইয়া বধূ তেমনি পড়িয়া আছে; ওখানেই চাল, ডাল, রাঁধিবার সমস্ত মালমশলা। পা টিপিয়া টিপিয়া সেখানে গিয়া সমস্ত গোছাইল। তারপর ফিরিয়া দেখে, ইতিমধ্যে কোন সময়ে উঠিয়া বধূ দরজা চাপিয়া বসিয়া আছে—।

বধূ কথা কহিল—কিছুমাত্র সাধাসাধি করিতে হইল না, এমন লজ্জার কাণ্ড কেহ কোন দিন শুনিয়াছ কি? বেহায়া বউ নিজ হইতেই কথা বলিল, দরজায় পিঠ দিয়া পথরুদ্ধ করিয়া বলিল—আপনি যাবেন না রাঁধতে।

মণীন্দ্র ডাকিতেছে—উনুন ধরিয়েছি ফণিদা, এসো শিগগীর। বধূ বলিল—আপনি যদি যান ওখানে, আমি এই গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

তাহার গৌর গণ্ডদুটি বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অকারণ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনটা ভাল ছিল না। এক এক দিন এরকম হয়, কিছু পড়তে ভাল লাগে না, কিছু ভাব্‌তে ভাল লাগে না, কারুর সঙ্গে কথা বল্‌তেও ভাল লাগে না। মনে হয় যেন মনের চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েচে—'অয়েল' না করে নিলে চাকা আর চল্‌বে না, ক্রমে মরুচে পড়ে আস্‌বে—তারপর কবে একদিন ফুট্ করে বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলেপাড়া লেনে এক পুরোণো তাসের আড্ডায় গেলুম। সেই সব পুরোণো বন্ধুরা এসে জুটেচে—তাস কিন্তু ভাল লাগল না। তাস খেলে জিতবো, অন্যদিন এতে কত উৎসাহ, আনন্দ পাই। আজ মনে হোল, না হয় জিত্‌লামই, তাতেই বা কি?—এদের গল্পগুজব ভাল লাগ্‌ল না। অর্থহীন—অর্থহীন—এই নীচু বৈঠকখানা ঘর, চুণবালিখসা দেওয়াল, সেই সব একঘেয়ে সস্তা ওলিওগ্রাফ্ ছবি—কালীয়-দমন, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, কি একটা মাথামুণ্ড ল্যাণ্ডস্কেপ্—সেই একঘেয়ে কথাবার্ত্তা, চিরকাল যা শুনে আস্‌চি—হঠাৎ মন বিরস ও বিরূপ হয়ে উঠ্‌ল—সব বাজে, সব অর্থহীন,—পাশের একজনকে জিগ্যেস কল্লুম—আপনার বেশ ভাল লাগ্‌চে? মনে কোনোরকম—

সে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বল্লে—কেন, ভাল লাগ্‌চে না কেন? কেন বলুন তো?—

মন আরও তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল। কাজের ছুতোয় সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়লুম। বেলা চারটে বাজে। ফিরিওয়ালারা গলির মধ্যে হাঁক্‌চে—ছেলেরা বইদপ্তর নিয়ে স্কুল থেকে ফিরচে—কলে জল পড়বার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—গলির মোড়ে রোয়াকে-রোয়াকে এরই মধ্যে আড্ডা বসে গিয়েচে।

একটা নিতান্ত সরু অন্ধকার গলি, পাশেই একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গা। এই গলিটা দিয়ে যাতায়াত প্রায়ই করি—মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গাটার পাশে একটা খোলার ঘর। এই ঘরখানা ও তার অধিবাসীরা আমার কাছে বড় কৌতূহলের জিনিষ। হাত পাচেক লম্বা, চওড়াতে ওই রকমই হবে, এইতো ঘরখানা। এরই মধ্যে একটি পরিবার থাকে, স্বামী স্ত্রী ও দুটি শিশু-সন্তান। না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা শক্ত এইটুকু ঘরে কি ভাবে এতগুলি প্রাণী থাকে—তাদের জিনিষপত্র নিয়ে। কিন্তু সকলের চেয়ে অবিশ্বাসের বিষয় এই যে ওই পাঁচ বর্গ-হাত ঘরের এক কোণেই ওদের রান্নাঘর। আমি যখন

ওখান দিয়ে যাই, প্রায়ই দেখ্‌তে পাই— উনুনে কিছু না কিছু একটা চাপানো আছে। বৌটি ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে রাঁধচে না হয় দুধ জ্বাল দিচ্চে! তার বয়েস দেখ্‌লে বোঝা যায় না, তেইশও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে—চল্লিশও হতে পারে। ঘোমটার কাছে ছেঁড়া, আধময়লা সাড়ী পরণে হাতে রাঙা কড় কি রুলি। চোখ মুখ নিষ্প্রভ, নির্ব্বুদ্ধিতার ছায়া মাখানো। স্বামী বোধহয় কোনো কারখানাতে মিস্ত্রীর কাজ করে, দু'একদিন সন্ধ্যার আগে ফিরবার সময় দেখেচি লোকটা কালিঝুলি মেখে ছোট্ট বাল্‌তি হাতে পাশের নাইবার জায়গায় ঢুক্‌চে।

আজও ওদের দেখ্‌লুম। দোরের কাছে বৌটি ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে, ছেলেকে আদর করচে। নির্ব্বোধের মত আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে। সেই পায়রার খোপের মত ঘরটা, ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটীর লেপ, তার ওপরে পুরোণো খবরের কাগজ আঁটা, কাগজগুলো হল্‌দে, বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে—দড়ির আল্‌নায় ময়লা কাপড়-চোপড় ঝুল্‌চে।

মনটা আরও দমে গেল। কি ক'রে এরা এ থেকে আনন্দ পায়? কি ক'রে আছে? কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কেন আছে? আচ্ছা, ও ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে? ওই রকম মিস্ত্রী হবে তো, ওই রকমই খোলার ঘরে ছেলে বউ নিয়ে ওই ভাবেই মলিন, কুশ্রী, অন্ধকার, অর্থহীন জীবনের দিনগুলো একে একে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে চল্‌বে ততোধিক দীন, হীন মরণের দিকে। অথচ মা কত আগ্রহে খোকাকে বুকে আঁক্‌ড়ে আদর করচে, কত আশা, কত মধুর স্বপ্ন হয়তো – কিন্তু এখানেও আমার সন্দেহ এল। স্বপ্ন দেখ্‌বার মত বুদ্ধিও বৌটির আছে কি? কল্পনা আছে? নিজেকে এমন অবস্থায় ভাবতে পারে যা বর্ত্তমানে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে বলে ওর বিশ্বাস? মনের গোপন সাধ-আশাকে মনে রূপ দিতে পারে? নিজের সংকীর্ণ, অসুন্দর বর্ত্তমানকে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে হারিয়ে ফেল্‌তে পারে?

বড় রাস্তার মোড়ে বইএর দোকানগুলো দেখে বেড়ালুম। রাশি রাশি পুরোণো বই, ম্যাগাজিন। অধিকাংশই বাজে। অলস, অপরিণত মনের তৈরী জিনিষ। চটকদার মলাট-ওয়ালা অসার বিলিতি নভেল, সিনেমার ম্যাগাজিন ইত্যাদি। অন্যদিন এখানে বেছে বেছে দেখি, যদি ভালো কিছু পাওয়া যায়। আজ আর বাছবার মত ধৈর্য্য ছিল না। মনের আকাশের চেহারা আজ ঘসা পয়সার মত, নীলিমার সৌন্দর্য্য তো নেই-ই, মেঘভরা বাদল-দিনের রূপও নেই— নিতান্তই ঘসা-পয়সার মত তার চেহারা।

সিনেমা দেখ্‌তে যাবো? আউট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাবো? কোথাও বসে খুব গরম গরম চা খাবো? লেকের দিকে যাবো?—

ধর্ম্মতলার গির্জ্জার সাম্‌নে একজায়গায় লোকের ভিড় জমেচে। একটা সাহেবী পোষাক-পরা লোক ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে, ধড়টা ও মাথাটা পরস্পরের সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে, যে মনে হচ্চে লোকটা মরে গিয়েচে। দুজন সার্জ্জেণ্ট এল। লোকে বল্লে, সাম্‌নের বাড়ীর নীচের তলায় ওই বাথ্‌রুমের মধ্যে পড়েছিল এই অবস্থায়, বাড়ীর দারোয়ান ধরাধরি করে ফুটপথে এনে শুইয়ে দিয়েচে—লোকটা কে, তারা চেনে না। লোকটা মরে নি, মদে বেঁহুস্ হয়ে আছে। সার্জ্জেণ্ট দুজন ধরাধরি করে তার সংজ্ঞাহীন নিঃসাড় দেহটা একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে কোথায় গেল।

লোকটার ওপর সহানুভূতি হোল আমার। সেই নির্ব্বোধ বধূটার ওপর যা হয়নি, এই বেঁহুস্ মাতালের ওপর তা হোল। বেচারা আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছিল, পথও যা হয় একটা ধরেছিল, হয়তো ভুল পথ, হয়তো সত্যি পথ… আনন্দের সত্যতা তার মাপকাঠি—কে বলবে ওর কি অভিজ্ঞতা, কি তার মূল্য? ওই জানে। কিন্তু ও তো বেঁহুস্!

কর্জ্জন-পার্কের সামনে এলুম। অনেকগুলো চাকর ও আয়া সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বৃষ্টির ভয়ে গাড়ী-বারান্দার নীচে ফুটপথের ওপরে বসে আছে। বৃষ্টি একটু একটু বাড়চে, আমিও সেখানে দাঁড়ালুম। একটা ছোট্ট ছেলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুল, নীল চোখ, বছর দেড় কি দুই বয়েস—সে তার চাকরের টুপিটা মাটী থেকে তুলে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে উঠে অতিকষ্টে নাগাল পেয়ে চাকরের মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিচ্চে—আর যেমন পরানো

হয়ে যাচ্চে, অমনি হাত নেড়ে, নেচে, ঘাড় দুলিয়ে দন্তহীন মুখে হেসে কুটিকুটি হচ্চে। কিন্তু টুপিটা ভালো করে মাথায় বসাতে পারচে না, একটু পরেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্চে, আবার খোকা অতি কষ্টে টুপিটা মাথায় তুলে দিচ্চে···আবার সেই হাসি, সেই হাত পা নাড়া, সেই নাচ।···তাকে কেউ দেখ্‌চে না, কারুর দেখবার সে অপেক্ষাও রাখ্‌চে না, তার চাকর পার্শ্ববর্ত্তিনী আয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এমন অন্যমনস্ক, খোকা কি করচে না করচে সেদিকে তার আদৌ খেয়াল নেই, নিকটের অন্য অন্য ছেলেমেয়েরাও নিতান্ত শিশু—ওই খোকাটি আপন মনে বার বার টুপি পরানো খেলা করচে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলুম। নরম নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশভঙ্গির সজীবতা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য!···খুসির আতিশয্যে খোকা আবার সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়চে, একগাল হাসচে, ছোট ছোট মুঠি বাঁধা হাত দুটো একবার তুল্‌চে, একবার নামাচ্চে··শিশু-মনের আগ্রহভরা উল্লাসের সে কি বিচিত্র, কি সুস্পষ্ট, ভাষাহীন বার্ত্তা!···

আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যের সাম্‌নে পড়ে গিয়েছি যেন। অনেক-ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ চাকরটার হুঁস্ হোল—সে আয়ার সঙ্গে গল্প বন্ধ করে খোকার দিকে ফিরে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে 'পাশে একটা পিরাম্বুলেটারের মধ্যে রেখে দিলে। খোকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে টল্‌তে টল্‌তে পিরাম্বুলেটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু বড্ড উঁচু—তার ছোট্ট হাত দুটি সেখানে পৌঁছোয় না। সে একবার অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক চাইলে, তারপর থপ্‌ করে বসে পড়ল। চাকরটা আয়ার সঙ্গে গল্পে মত্ত।

কর্জ্জন-পার্কের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলুম। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। গঙ্গার অপর পারে আকাশ রাঙা হয়ে এসেচে।

খোকার মনের সে অর্থহীন আনন্দ আমার মনে অলক্ষিতে কখন সংক্রামিত হয়েচে দেখলুম। খোলার ঘরের মেয়েটিকে আর নির্ব্বোধ মনে হোল না।

অদ্বিতীয়া

বনফুল

বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা-ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা বাড়াইয়াছেন এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম!

প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন—মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধিসত্ত্বেও কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম।

পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই অনেককাল স্বর্গীয় হইয়াছেন কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত! বিনোদ লিখিতেছে –

"হঠাৎ 'এক্লেম্প্‌সিয়া' হইয়া দিদি ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন! আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। 'কিড্‌নি' খারাপ ছিল। সেজদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধ হয় পাইয়াছেন।"

পাইলাম ত। তিনি লিখিতেছেন–"কি করিবে বল ভাই। সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছু দিন থাকুক। আমি ত বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোন ভাবনা করিও না। ইতি ..”

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপাল-গুণে আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। ছুটি সুতরাং মঞ্জুর হইল না!

[২]

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

"প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা বলে সংসারটা ছারখার করা ত' ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে কর তুমি।...এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বলো, সম্বন্ধ করি। আমার ত' মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।"—ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম তাহা অংশতঃ এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্ব্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে ত সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তাছাড়া দেখ আমরা "মা ফলেষু কদাচন"-দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ—তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টাই করা যাক্!...দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ অপছন্দ! তোমার পছন্দ হয়েছে ত?"...

ক্রমশঃ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়-দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে যে দেখ্‌তে নেই।" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই! এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা—তাহার উপর কাঁচাপাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল!

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়া-ছিলাম - সে কোথায় চলিয়া গেল। আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার 'কিডনি' কেমন—কে জানে! নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বারবার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে?...মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে?...এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি—কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া! আচ্ছা প্রভার আত্মার যদি · গৃহ্যামি! গৃহ্যামি!

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। বাসর-ঘরেও শুনিলাম ভারি লাজুক। আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তাছাড়া এ দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে কে আর আমোদ করিতে চায়? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়ীতে মানুষ। সেজদির বাড়ীতেই বিবাহ—বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্ত্তা! সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই!

* * *

জমিল ফুলশয্যার রাত্রে!

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া! স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?

প্রভা কহিল—"ছি, ছি, সেজদিরই জিৎ হল!"

"মানে?"

"মানে আবার কি? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি মরে গেলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বল্লে—'হাতী হবে। তিনমাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে কর্বে।' আমি বল্লাম—কক্‌খনো নয়। তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদে মিলে এই ষড়যন্ত্র! আমিও শান্তিপুরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধ্যেবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিৎ। পাড়ার গাণকে ছোঁড়াকে কনে' সাজিয়ে সেজদি বাজী জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন! ছি ছি—কি তোমরা! অমন গোঁফটা কি বলে কামালে?"

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়!

* * *

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি!

অনুকম্পা

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

জন্মক্ষণ হইতেই আমার দুইজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং যাইবার সময় এমন কিছুই রাখিয়া গেলেন না যাহাতে অন্তত আমার শৈশবটাও নির্ব্বিবাদে কাটিতে পারে।

মামা এবং পিসিমা পালা করিয়া আমাকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও শক্তির একটা সীমা ছিল। আমি যখন ম্যাট্রিকুলেশান পাস করি—তখন আমার প্রতি-পালক এবং আমি উভয়েই মনে করিলাম আমরা পরস্পরকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছি। লজ্জা এবং সঙ্কোচ দুইদিক হইতেই কাটিয়া গেল। প্রতিপালক বলিলেন—হারাধন, মাণিক আমার, এইবার ত পাস করিয়াছ এখন পথ দেখ। আমি মনে মনে ভাবিলাম—আমিত ঠকাই নাই—সুতরাং যাইবার পূর্ব্বে আমার শেষ দাবীটি পেশ করিয়া যাই।

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও দুই পক্ষ হইতে আশীটি টাকার বেশি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। উহাই মাত্র সম্বল করিয়া মফঃস্বল হইতে কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। আফিসে আফিসে ঘুরিয়া আশা পূর্ণ হইল না। তিনচারি মাসে সম্বল ফুরাইয়া আসিল। মূলধন যখন আশী হইতে পাঁচে আসিয়া পৌঁছিল, তখন আকাশের আলো যেন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল—আমি হঠাৎ অনুভব করিলাম আমি মরিতে বসিয়াছি এবং চারি দিক হইতে মৃত্যুর কালো ছায়া নামিয়া আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের জোর কমিয়া গেল, হাতের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া আসিল—জোরে কথা কহিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইল।

মামা-বাড়ি থাকিতে মামার এক আত্মীয়ের সঙ্গে সেখানে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে একটা বিস্ময়ের ভাব তখন হইতে আমার মনে ছিল। লোকটির ভয়ানক একটা ক্ষমতা আমি তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাঁহার পোষাকের পারিপাট্য—চালচলনের জাঁক—কথা বলিবার ভঙ্গি—সবই যেন ইতিহাসের কোনো নবাবকে মনে করাইয়া দিতেছিল। "ওহে ছোকরা, বাজার থেকে এক টিন সিগারেট কিনে আনত"—তাঁহার নিকট হইতে এই আদেশটি পাইয়া একদা আমি ধন্য হইয়াছিলাম। এইটুকুই আমাদের পরিচয়।

পথে তাঁহার সঙ্গে এতদিন পরে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। আমাকে দেখিয়াই আমার পিঠে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, কি রে হারাধন তুই কোত্থেকে? আমি আমার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিলাম। তিনি ত হাসিয়া অস্থির।

বলিস্ কি—অভাব ব'লে কোনো জিনিসকে তোর ত্রিসীমানায় আসতে দিবিনে। অভাব ত আমাদের বাইরে নয়, অভাব মনে। মনের জোরে দুনিয়ার সব হয়-ভুলে যা ভুলে যা—ওসব ভুলে যা। তোর মত একটা জোয়ান ছেলে, তোর লজ্জা করে না? তুই কি চাস্ বল্, চাকরি? পঁচিশ ত্রিশ টাকার চাকরির জন্যে তুই তিনমাস ঘুরছিস্?

আমি ভগবানকে স্মরণ করিলাম। আমার দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া গেল। একটুখানি অনুকম্পার অভাবে শক্তি দূরের কথা—আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। আমি চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। বলিলাম—আপনি আমাকে বাঁচালেন, আমার আর কোনো দুঃখ নেই।

—চল্ স্কয়ারে একটু বসি।

দুইজন একটি বেঞ্চিতে বসিলাম। তিনি আধঘণ্টা ধরিয়া আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। আমার শিরায় শিরায় রক্ত পাগল হইয়া ছুটিতে লাগিল—মনে এমন একটা শক্তি জাগিয়া উঠিল যে-শক্তি আমি নিজের মধ্যে কোনোদিন ছিল বলিয়া জানিতে পারি নাই।

তিনি "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" কথাটি তিনবার অত্যন্ত জোর দিয়া উচ্চারণ করিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন—নিজের মনকে চালনা কর্, প্রাণকে চালনা কর্, দেহকে চালনা কর্। আমার কাছে আগে বলতে হয়—চাকরি ক' গণ্ডা চাই? চাকরি খুঁজতে হয় না—আপনি এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে। তুই আমাকে হাসালি! এইবার তবে উঠি—আর ভাল কথা, তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালই হ'য়েছে—দু আনার পয়সা দে ত।

আমি চট করিয়া পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলাম, ভাঙানি নেই—এইটেই রাখুন।

তিনি টাকা লইয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—মনে জোর নিয়ে লেগে যা, চাকরি ঠিক মিল্‌বে—পথে পথে কাঁদিস্ নে, বুঝলি?

অমনোনীত কবিতা

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

বিমলচন্দ্র কবি।

কবি হওয়া তাহার উচিত ছিল না। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে চেহারা তাহার কবিজনোচিত নয়। কিন্তু বাপ কিছু পয়সা রাখিয়া গিয়াছেন এবং কলিকাতার উপর খানকয়েক বাড়ী। তাহার আয়ে নির্ব্বিঘ্নে তাহার চলিয়া যায়। কাজ কিছুই নাই। সুতরাং সে কবিতা লেখে।

সে লেখে বলিলে ভুল হইবে। সে লেখে, আর লেখে তাহার স্ত্রী। দুজনে মিলিয়া। প্রথমে লেখে বিমলচন্দ্র। লিখিয়া তাহার স্ত্রীকে পড়িয়া শোনায়। তাহাদের ছাদটি বড় নয়, ছোটই। ধারে ধারে টবে-টবে ফুলগাছ লাগানো হইয়াছে। একটা বাঁশের আগায় বাল্‌ব্‌ বাঁধিয়া ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা আছে। তাহারই নীচে দুজনের সাহিত্য-সভা বসে। বিমলচন্দ্র পড়িয়া শোনায়, আর স্থানে-স্থানে তাহার স্ত্রী তাহা আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করে। যেমন :—

তাহার নবতম কবিতায় 'কোদণ্ড' কথা আসিয়া পড়িয়াছে,—'হরের কোদণ্ড'। অর্থাৎ রামচন্দ্র যেমন হরের কোদণ্ড ভাঙ্গিয়া জানকীকে লাভ করেন তেমনি বিমলচন্দ্র লাভ করিয়াছে তাহার স্ত্রীকে। কবিতাটি ভালো হইয়াছে। কিন্তু বিমলচন্দ্র কোদণ্ডের সঙ্গে মিল করিয়াছে 'প্রচণ্ড' দিয়া। কথাটি তাহার স্ত্রীর মনঃপূত হয় নাই। বরং মার্ত্তণ্ড দিয়া মিল করিলে ভালো হইত। কিন্তু যে লগ্নে বিবাহ হইয়াছিল সে-লগ্নে মার্ত্তণ্ডদেবকে আনা জাগতিক নিয়মে অসম্ভব। সুতরাং স্ত্রীর সহিত একমত হইলেও বিমলচন্দ্র কি করিয়া অসাধ্য সাধন করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে বলিল, 'দোর্দ্দণ্ড' করা যাক্। কিন্তু স্ত্রীর তাহাতেও ভীষণ আপত্তি। অবশেষে অনেক তর্কের পর মার্ত্তণ্ডদেবকেই আসিতে হইল।

এমনি করিয়া তাহাদের কবিতার খাতাখানির পাতা এক একটি করিয়া ভর্ত্তি হয়। কাগজে ছাপায় না, ছাপিবার কথাও কাহারও মনে হয় না। কেবল একজন পড়ে, আর একজন শোনে, আর দুজনে মিলিয়া তাহার আলোচনা হয়। নিতান্ত ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগত কবিতার মালা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট হাসি, ছোট কান্না, ছোট-খাটো মান-অভিমানের টুক্‌রা গাঁথিয়া তৈরী। কিন্তু কবিতাটি নাকি ভালো হইয়াছে। বিমলচন্দ্রের হঠাৎ মনে হইল, ছাপাইলে হয় না!

অমলা খাতাখানি ছিনাইয়া লইয়া আঁচলের আড়ালে লুকাইয়া রাখিল। বলিল,—না। তুমি শুধু আমার কবি, শুধু আমার। আমি ছাড়া তোমার সে কবিতা আর কেউ দেখতেও পাবে না। বুঝলেন মশাই!

স্বামীর গাল দুটি পরম আদরে টিপিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। ইহার পরে আর তাহার সম্পাদকের দ্বারস্থ হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু একটি মাত্র শ্রোতায় আর বুঝি তাহার মন উঠিতেছিল না। বিশেষ এই কবিতাটি···

অমলা তখনই আবার হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিল। খাতাখানি ফেরৎ দিয়া বলিল,—আচ্ছা দিয়েই এসো বাপু কাগজে, কবি-মানুষকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করা ঠিক নয়। আসছে মাসে এমনি চমৎকার রাত্রে কতলোক তাদের প্রিয়াকে এই কবিতাটি পড়ে শোনাবে। এ যেন তাদের নিজেরই কথা। সেই তো ভালো।

এতবড় একটা সম্ভাবনার আনন্দে বিমল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পরের দিনই সে মাসিক-পত্রের আফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

—একটা কবিতা এনেছি। দেখবেন?

—দিন।

সেই কোদণ্ডের কবিতাটি। সম্পাদক মহাশয় লোকটি ভালো। হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চোখে, মুখে, ঠোঁটের ফাঁকে যে ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহাই যথেষ্ট।

—দেখুন, এ কবিতাটা···অবশ্য মন্দ হয় নি···তবে কি না···।

লেখাটি ফেরৎ লইয়া বিমল যখন বাড়ী ফিরিল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই অমলার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু এবিষয়ে একটা কথাও সে কহিল না। এমন

চমৎকার কবিতা যে কেহ ফেরৎ দিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। প্রত্যাখ্যানের ধাক্কা বিমলও তখন পর্য্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সেও কোনো কথা কহিল না।

সন্ধ্যায় ছাদের উপর সে প্রথম কথাটা পাড়িল। কহিল—লেখাটা নিলে না, অমলা।

—নিলে না? কি বললে?

—বললে, মন্দ হয় নি···তবে কি না···

গাঢ় নীল আকাশে তারায় তারায় কানাকানি চলিতেছিল। বিমলের কোলে মাথা রাখিয়া অমলা অনেকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল আস্তে আস্তে বলিল—আর একবার কবিতাটি পড় তো।

বিমল পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে কবিতাটি লইয়া অমলা সস্নেহে আপনার বুকের উপর রাখিল। আনন্দে তাহার চোখে জল আসিতেছিল। অবগাঢ় কণ্ঠে কহিল,—তোমাকে যে চেনে না, এ কবিতার একটি কথাও সে বুঝবে না। তুমি দুঃখ কোরো না। তোমার কবিতা তো সকলের জন্যে নয়। আর কোনো দিন কোথাও পাঠিও না। চির দিন শুধু তুমি পড়বে, আর আমি শুনবো। কেমন?

গাঢ় নীল আকাশে তারায় তারায় তখন কানাকানি চলিতেছিল।

পুষি

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাড়ীতে ভীষণ ইঁদুরের উপদ্রব সুরু হইয়াছে।

এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া আমার উপর গৃহিণীর উপদ্রবটাও বড় কম নয়। অপরাধ যেন আমারই। সময় নাই অসময় নাই, চামুণ্ডামূর্ত্তিতে গিন্নি আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

'বলি – এর একটা কিছু প্রতিবিধান করবে, না, মরব গলায় দড়ি দিয়ে?'

বলিলাম, 'বাড়ীটা তাহ'লে ছেড়ে দিতে হয়। তাছাড়া আমি আর কি করতে পারি, বল।'

গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 'হ্যাঁ, তা ছাড়বে বই কি! পাড়াটি আমার ভাল লেগেছে কিনা, গল্প করবার দু'চারজন সঙ্গী পেয়েছি, তা তোমার সইবে কেন?'

সর্ব্বনাশ! 'তাহলে কি করতে হবে, বল!'

'কেন? কলকাতা শহর ত' দুবেলা চষে' বেড়াচ্ছ, ফেরবার পথে ইঁদুর-মারা-কল একটা হাতে ঝুলিয়ে আনতে পারো না?'

পরদিন সব কাজ ফেলিয়া ভাল দেখিয়া একটি ইঁদুর মারা-কল কিনিয়া আনিলাম। খাস্ জার্ম্মেনীর তৈরি। দোকানদার ভাল করিয়া দেখাইয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া দিল।

'মনে করুন এইটে ইঁদুর, আর এইখানে রইলো খাবার।' বলিয়া তাহার হাতের যে পেন্সিলটিকে আমি ইঁদুর মনে করিতেছিলাম সেই পেন্সিলটি কলের উপর ছোঁয়াইতে না ছোঁয়াইতে ঝপাং করিয়া স্প্রিংএর কল ডিগ্‌বাজি খাইয়া উল্‌টাইয়া পড়িল।

পেন্সিলটা কিছুতেই আর ছাড়াইতে পারি না!

দোকানদার বলিল, 'যত বড়ই ইঁদুর হোক্, বাছাধন আর টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। নিয়ে যান।'

খুশী হইয়া কল লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

মহা উৎসাহে অতি সাবধানে কলের উপর খাবার দিয়া সেই রাত্রেই রান্নাঘরে কলটি পাতিয়া রাখিলাম।

বলিলাম, 'এইবার হ'লো ত?'

স্ত্রী বলিলেন, 'কিন্তু শব্দ হ'লেই উঠো যেন। যেটা মরবে সেটাকে ফেলে দিয়ে আবার পেতে দিতে হবে। আমি ছুঁতে-টুতে পারব না। আমার ভয় করে।'

বলিলাম, 'বেশ।'

কিন্তু ইঁদুরের শব্দ শুনিতে গিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। কোথাও টুক্ করিয়া একটুখানি শব্দ হয় আর ধড়মড় করিয়া উঠি। ছুটিয়া গিয়া দেখি—কোথায় ইঁদুর! কল ঠিক যেমনটি পাতিয়া রাখিয়াছি তেমনিই আছে, ইঁদুর তখনও পড়ে নাই।

সকালে উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, ইঁদুরে জিনিসপত্র আগেকার মতই সেদিনও তচ্‌নচ্ করিয়া দিয়া গেছে, অথচ কলের ধার দিয়াও তাহারা হাঁটে নাই।

স্ত্রী বলিল, 'না তোমার ও-কলে হবে না। শহরের ইঁদুর কিনা, ভারি চালাক। আমাদের পাড়াগাঁয়ের বোকা ইঁদুর হতো ত' মরতো। তার চেয়ে এক কাজ কর। একটা বেড়াল নিয়ে এসো। বাড়ীতে পুষি।'

সেই ভাল।

সেই দিন হইতে বিড়ালের সন্ধানে ঘুরিতে থাকি। রাস্তা দিয়া পার হইয়া যাই, বিড়াল দেখি আর থমকিয়া দাঁড়াই। কিন্তু ধরিতে গেলেই ছুটিয়া পালায়। ও-সব ধাড়ি বিড়ালে চলিবে না, ছোট একটি বাচ্চা বিড়ালই পুষিতে হইবে। কিন্তু বাচ্চা পাই কোথায়?

কপাল ভাল। সুতরাং বিড়াল মিলিতেও বিলম্ব হইল না। সেদিন ট্রাম হইতে দেখিলাম, সাদা রঙের একটুকু একটি বিড়ালের বাচ্চা রাস্তার ধারে ডাষ্ট বিনের পাশে কুঁই কুঁই করিয়া বোধকরি আহারের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ট্রাম হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া এই বেওয়ারিশ্ বিড়ালের বাচ্চাটিকে কোলে তুলিয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম।

বিড়ালছানাটি আমার বাড়ীতে থাকিয়া মানুষ হইতে লাগিল। দুধ খাওয়াই, মাছ খাওয়াই, মিউ মিউ করিয়া এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করে। কাহারও সঙ্গে হয়ত' বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি—বিড়ালছানাটি কোথা হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে আমার কোলের উপর উঠিয়া বসিল, রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বিড়ালটি আমার গা ঘেঁসিয়া শুইয়া আছে।

মন্দ লাগে না। বিড়ালটিকে বোধ হয় ভাল বাসিয়া ফেলিতেছি। বাড়ীতে ছেলেপুলে নাই। পাশের বাড়ীর বৌটা সেদিন জানালায় দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে আমার স্ত্রীকে বলিতেছে শুনিলাম—'ছেলেপুলে হলো না বলে' শেষে বেড়াল পুষলেন নাকি?'

ভাবিলাম, বলুক্। আহা, বেচারা খাইতে না পাইয়া কোথায় এতদিন হয়ত রাস্তা পার হইতে গিয়া ট্রাম-বাসের নীচে চাপা পড়িয়া মরিত, তাহার চেয়ে এ বরং ভালই করিয়াছি।

কিন্তু ইঁদুর শিকার করিতে এখনও তাহার অনেক দেরি। আরসুলা দেখিলে এখনও সে ভয়ে ছুটিয়া পালাইয়া আসে, কোথাও কোনও শব্দ হইলে ত' আর কথাই নাই, ছুটিয়া একেবারে আমার কাছে আসিয়া পায়ের তলায় ঢুকিবার চেষ্টা করে।

আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলাম, পুষি।

কিন্তু পুষির উপর আমার স্ত্রী কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। প্রথম প্রথম নিতান্ত ছোট যখন ছিল, এক-একদিন দেখিতাম, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গৃহিণী আদর করিতেছেন। কিন্তু যতই সে বড় হইতে লাগিল, গৃহিণী ততই তাহার উপর বিরূপ হইতে লাগিলেন।

'না বাপু, যাও, যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেইখানেই একে আবার দিয়ে এসো ফেলে'। বেড়াল আবার মানুষে পোষে! ছি!'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? ও আবার কি করলে?'

'করলে আমার মাথা! কবে যে উনি ইঁদুর ধরবেন তার জন্যে এখন থেকে রাজকন্যের মতন মানুষ হচ্ছেন। এই দ্যাখো না কি করেছে।'

এই বলিয়া স্ত্রী তাঁহার হাতখানি আমার চোখের সুমুখে বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, গৌরবর্ণ তাঁহার সেই সুকোমল চামড়ার উপর বিড়ালের নখের আঁচড়ের দাগ লাল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।—'একি! আঁচড়ে দিয়েছে?'

স্ত্রী বলিলেন, 'থাক্ না থাক্ হাঁ হাঁ করে' সব জিনিসে মুখ দিতে যায়। বেড়ালের লোম পেটে গেলে কি হয় জানো? ওদের বৌ বলছিল, যক্ষা হয়।'

হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। বলিলাম, 'কিচ্ছু হয় না। ওকে ভালোবেসো তা হ'লে ও আর তোমায় আঁচ্ড়াবে না। কই আমায় ত' আঁচড়ায় না।'

স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন।—'হ্যাঁ, ভালবাসবে না আরও কিছু! এরই মধ্যে চুরি করে' খেতে শিখেছে। এর চেয়ে ইঁদুর আমার ছিল ভাল! ও আপদ বিদেয় কর!'

কিন্তু তাহাকে বিদায় আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না। বিদায় করিবার কথা ভাবিতেও আমার কষ্ট হইতে লাগিল।

ওদিকে স্ত্রী দেখিলাম তাহাকে প্রহার করিতে সুরু করিয়াছেন। পুষি হয় ত আমার গৃহিণীর পায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, ফুটবলের মত তিনি তাহাকে দিলেন এমন জোরে এক লাথি যে, বেচারা একেবারে ক্যাঁক্ করিয়া বহুদূরে গিয়া

ছিট্‌কাইয়া পড়িল। লাথি মারেন, ঝাঁটা মারেন, দিবা-রাত্রি গালাগালি দেন। বলেন, 'ওকে ত' তাড়ালে না, এবার আমি ওকে একদিন মেরেই ফেলব।'

তাড়াইবার চেষ্টা যে আমার স্ত্রী করেন নাই তাহা নয়। শুনিলাম, আমার অবর্ত্তমানে একদিন তিনি তাহাকে দরজার বাহিরে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া খিল্ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, ঝিকে দিয়া একদিন তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, পুষি মিউ মিউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অত্যাচার নির্য্যাতনের ত কথাই নাই! আলমারির মাথার উপর সারাদিন হয় ত' তাহাকে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। বেচারা, অত উঁচু হইতে প্রাণের ভয়ে নামিতেও পারে না, অথচ সারাদিন কিছু না খাইয়া ওখানে সে কেমন করিয়াই বা থাকে! কলিকাতা হইতে একবার আমাকে কয়েকদিনের জন্য বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম চুরি করিয়া পুষি এক টুকরা মাছ খাইয়াছিল এবং তাহার শাস্তি-স্বরূপ দু' দিন তাহাকে অনাহারে রাখা হইয়াছে।

শুনিয়া সত্যই রাগ হইল। বলিলাম, 'খেতে দাও নি? ছি!'

স্ত্রী বলিলেন, 'ক্ষেপেছ? পোড়ারমুখী না খেয়ে থাকবে? এই এতগুলি মাছ ভেজে রেখেছিলাম। চুরি করে' হতভাগী সব খেয়েছে।'

যাই হোক্ এমনি করিয়া পুষি মানুষ হইতে লাগিল।

বড় হইতে আর কতদিন!

দু'মাসের মধ্যে দেখা গেল, পুষি মস্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলে আর সেই ছোট পুষি বলিয়া মনে হয় না। এখনও সে আমার সঙ্গেই খায়, আমার কাছটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, রাত্রি হইলে তাহাকে কিন্তু আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঘের মাসি, শিকারী জন্তুর জাত, ছুটিয়া ছুটিয়া শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ইঁদুরগুলা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী তাহাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই। পুষি নাকি তাহাদের চেয়েও ক্ষতি করে যথেষ্ট বেশি, পুষি যদি এখন মরে ত' তিনি নিষ্কৃতি পান। বাড়ীতে যে আসে তাহাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁগা, বেড়ালগুলো কতদিন বাঁচে বলতে পারো?'

কেহ বলে, ছ' মাস, কেহ বলে এক বছর, আবার কেহ বলে, 'কই মা, বেড়াল মরতে ত' কখনও দেখিনি।'

এখন আবার পুষিকে মারিবারও তেমন সুবিধা হয় না, মারিতে গেলেই ছুটিয়া পালায়। ধরিতে গেলেই ফোঁস্ করিয়া গর্জ্জিয়া ওঠে। আঁচড়াইয়া দিবার ভয়ে স্ত্রী আর তাহাকে ধরিতেও যান না। দূর হইতেই গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

স্ত্রী বলেন, 'এ আপদ এলো শুধু তোমার জন্যে। জলে-পুড়ে মারা গেলাম ওর দায়ে।'

জবাব দিতে ভয় হয়। তাই চুপ করিয়াই থাকি।

গত দু'তিনদিন পুষিকে দেখিতে পাই নাই। অনেক খোঁজা-খুঁজি করিলাম! কিন্তু গেল কোথায়!

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, 'বাবাঃ। এতদিন পরে বাঁচা গেল। রাস্তায় বেরিয়েছিল হয়ত' গাড়ী চাপা পড়েছে। বেশ হয়েছে।'

আমি কিন্তু খুশী হইতে পারিলাম না। জানি আসিবে না, তবু খাইতে বসিয়া চু-চু করিয়া ডাকিয়াই আবার মন খারাপ হইয়া গেল। ভাল করিয়া খাওয়াও হইল না।

স্ত্রী তিরস্কার করিতে লাগিলেন।—'ওকি তোমার ছেলে ছিল না মেয়ে? যার জন্যে তুমি শোকে একেবারে অধীর হয়ে গেলে!'

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইলাম পুষিকে ফিরাইয়া দাও ঠাকুর!

আমার প্রার্থনার জোরেই কিনা জানি না, পরদিন সকালে গৃহিণী ঝাঁটা হাতে লইয়া ঘর পরিষ্কার করিতেছেন, দেখিলাম পুষি টলমল করিয়া টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিতেছে, শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে, মনে হইল যেন দু'তিন দিন কিছু খাইতে পায় নাই। একটুখানি দুধ দিব বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলাম। দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিতেই দেখি, স্ত্রী আমার পুষির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কানে-মুখে তাহার ফুঁ দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হলো?'

স্ত্রীকে কিছুই বলিতে হইল না। বুঝিলাম, তিনি তাহাকে তাঁহার চিরদিনের অভ্যাসমত সম্মার্জ্জনী দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে পুষি একেবারে

লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি জল আনিয়া মুখে দিলাম, কিন্তু পিছনের পা দুইটা সে বারকতক টান্ করিল, বারকতক খাপচি খাইল এবং দেখিতে দেখিতে চোখ দুইটি উল্টাইয়া দিয়া লুট্ করিয়া হাত হইতে পড়িয়া গেল।—যাঃ! সব শেষ!—'এ তুমি কী করলে বল ত?'

স্ত্রী বলিল, 'বেশ করলাম।'

দূরের মাঠে পুষিকে ফেলিয়া দিতে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখি, পুষি যেখানে মরিয়াছিল, গৃহিণী সেইখানে বসিয়া আছেন আর তাঁহার কোলের উপর পাঁচটি ছোট ছোট বিড়ালের বাচ্চা!

—'একি! এরা আবার কোত্থেকে এলো?'

স্ত্রী বলিলেন, 'তোমার পুষি এদের দিয়ে গেছে। ভাঁড়ার ঘরের ওই কোণের দিকে চৌকির তলায় কুঁই কুঁই করছিল।'

বুঝিলাম, এই জন্যই দুদিন তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

কিন্তু আর না।

স্ত্রীকে বলিলাম, 'ওদের বিলিয়ে দাও, নইলে দাও ওগুলো ফেলে দিয়ে আসি।'

হেঁট মুখে ঘাড় নাড়িয়া স্ত্রী বলিলেন, 'না।'

তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, চোখ দিয়া তাঁহার টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

মৃত্যুর পরে

—শ্রীকৃষ্ণধন দে

মণিকা বোস্‌কে মনে পড়ে?···রাধু বোসের সেই বাইশ বছরের বব্‌ড্-হেয়ার মেয়ে?···যা'র জন্যে অতুল মিটার··· ওঃ, তুমি কিছু শোন নি দেখছি! সে কথা বালিগঞ্জের কে না জানে?

···রাধু বোসের চাবুক খেয়ে অতুল মিটার বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই ঘরে ফির্‌ল। মেয়ে জাতটার ওপর তখন তা'র কী ঘৃণা!

*　　*　　*　　*

এই মণিকাই একদিন রাত দশটায় লেক-এ নারকেল গাছের তলায় বেঞ্চে বসে' তা'কে অনেক কিছুই বলেছিল··· অনেক কিছু। চাঁদের আলোয় লেক-এর জল্ গলান-রূপোর মত টলমল্,—মেঘহীন আকাশ,—ঝির্-ঝিরে মিষ্টি বাতাস,— মণিকার সর্ব্বাঙ্গ ভরে' পপির গন্ধ,—রাত্রিটা ছিল মণিকার মতই মায়াবিনী।

···বিলাত থেকে ফির্‌ল সুজিৎ ডট্। একদিন মণিকার সামনেই অতুলের সুট্ দেখে হেসেই খুন! পাইপ টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে—এ রকম ছাঁট্‌কাট্ এডেনের ওধারে একেবারেই যে অচল। তারপর সে শীসে 'বনি-ল্যাসি'র গান গাইল। তারপর, অতুলের চোখের সাম্‌নেই মণিকার হাত ধরে' মোটরে গিয়ে উঠ্‌ল। ষ্টার্ট দিয়ে দাঁতে পাইপ কাম্‌ড়ে' বল্লে—গুড্ বাই—। অতুল দেখ্‌লে মণিকা তার ডান হাতখানি সুজিতের গলায় জড়িয়েছে।

রাত দুটো পর্য্যন্ত অতুল ঘুমুতে পার্‌লে না। জানালাটা খুলে দিয়ে সার্কুলার রোডের দিকে চেয়ে রইল। এক পশলা বৃষ্টির পর গ্যাসের আলোয় পিচ্‌ঢালা রাস্তাটাকে কে জরী দিয়ে মুড়ে' দিয়েছে। ওটা যেন রাত্রির কালো সাড়ীর ঝক্‌মকে আঁচ্‌লা। মণিকাকে একদিন পার্টিতে ঐ রকম একটা সাড়ীতে কী-না মানিয়েছিল!

...এখনও টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। বেশ্ জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাশের প্রতিবেশী ডি'সুজাদের উঠানে বিলাতী পামগাছটা দুলে দুলে উঠ্‌ছে। অতুল হঠাৎ গায়ে ওভারকোটটা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

বালীগঞ্জের রাস্তার চমৎকার বাড়ীগুলো এখন সব স্তব্ধ। সেই গভীর রাত্রে বৃষ্টিধারার মাঝখানে অতুলের মনে হ'ল ও-গুলো রবিবাবুর ক্ষুধিত-পাষাণের এক একটা টুক্‌রো, এই বাদলরাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় কোথাকার এক সুস্তা নদীর ধার থেকে উড়ে' এসে এখানে ছড়িয়ে পড়েছে!

রাধু বোসের বাড়ীর কোন্ ঘরটিতে মণিকা শোয়, অতুল জানে। বকুলগাছটার ছায়ান্ধকারে দেওয়ালের গায়ে নলটির অবস্থানও ঠিক জানা আছে। শুধু দরকার একটু সাহস··· দুঃসাহস···আজ একটা বোঝাপড়া চাই।

বোধ হয় হাস্‌ছ ? . হাঁ, বোঝাপড়া কাল পর্য্যন্ত অতুল কিছুতেই অপেক্ষা কর্‌বে না।

...ভয় পেয়ে বেড্-সুইচ্ টিপে মণিকা অতুলকে ঘরের মধ্যে দেখে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে রইল। তারপর বল্‌লে,—একি !...মিঃ মিটার ?...তুমি এখানে কেন ?... এক্ষুনি বেরিয়ে যাও বল্‌চি—এক্ষুনি।

কম্পিতস্বরে অতুল বল্লে—তোমাকে একটা কথা জানাতে এসেছি মণি !

হ্যাং ইয়োর কথা ! শীগ্‌গির যাও—গেট আউট অ্যাট ওয়ান্স,...বাবা ! বাবা !

...রাধু বোস্ কিন্তু অতুলকে শুধু চাব্‌কেই ছেড়ে দিলে।

তারপর অতুলের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, ..পটাসিয়াম্ সাইনাইড্।

* * * *

কিন্তু গল্পটা বড্ড পুরানো টাইপের এবং প্লটও একেবারে মামুলি, নয় ? হোক্‌গে, তবু সত্যি ত।

...আমার কিন্তু বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে,...কষ্টও হচ্চে খুব,...আমায় এবার অব্যাহতি দাও।

কথাটা কিন্তু শেষ করে' যাই। ..আমিই অতুল মিটার, এবং...

এবং...মণিকা বোস্ এখন তোমারি স্ত্রী।...সুতরাং অজিতের সঙ্গে তা'র বিয়ে হয় নি।

শনি-কবচ

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শুধু ভূত, ভগবান, ভালবাসা নয়, আমার অনেক জিনিষেই বিশ্বাস নেই। যে সব জিনিষ আমি অবিশ্বাস করি তার মধ্যে প্রধান বলা যেতে পারে জ্যোতিষ। প্রধান বললাম এই জন্যে যে জ্যোতিষ সম্ভবতঃ এ যুগের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান। স্পেস টাইম-কন্টিনিউয়মএর সঙ্গে রিলেটিভিটি মিশিয়ে যেদিন থেকে আইনষ্টাইন ফ্যাঁসিয়ে দিয়েছেন আমাদের পুরাণো বিজ্ঞানের সবজান্তা অহঙ্কার, সেদিন থেকে জ্যোতিষ ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব্ব-গৌরবের সিংহাসন। কিছুই যখন ঠিক করে বলা যায় না, সামান্য ইলেক্‌ট্রন যখন ভেঙে দিয়েছে ডিটারমিনিজ্‌মের পাকা দর্শনের বনিয়াদ, তখন চরণামৃত-মাদুলীর সঙ্গে ভাগ্যগণনাই বা সত্য হবে না কেন।

কিন্তু তবু আমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করি না। কেন করিনা তার কারণটা বলি আগে। যে কটি গ্রহনক্ষত্র আকাশের যেখানে যেখানে থাকলে গহন অরণ্যে জন্মলাভ করেও মানুষ অনায়াসে রাজ-সিংহাসন লাভ করে, আমার জন্মকালে তার সব কটি ঠিক সেই সেই স্থানে ছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জন্মকালে তিনটি প্রধান গ্রহ ঠিক তুঙ্গী ছিল কিনা এবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে কিন্তু আমার বেলা নেই। তবু জ্যোতিষের মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ আমি সারা জীবন হোঁচট খেতে খেতে এসে মার্চ্চেন্ট-আফিসের নীচের তলার ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টেই ঠেকে রইলাম। শুধু তাই নয়, আজীবন ভাগ্য করে আসছে আমার সঙ্গে রসিকতা। রাস্তায় একটা পেরেক থাকলে হাজারো পথিকের ভেতর শুধু আমার পায়েই ফোটে, ধোপার বাড়ি থেকে আমার ভাল নতুন ধুতিটিই বদল হয়ে আসে আটহাতি খেঁটোর সঙ্গে। এসব সত্বেও জ্যোতিষে বিশ্বাস রক্তস্রোতের ভাঁটার সঙ্গে হয়ত আমার ফিরতে পারত। কিন্তু কেন ফিরলনা সেই গল্প বলব।

কিছুদিন ধরে ভাগ্যের এই সব রসিকতার একটা ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স নেবার চেষ্টা করছিলুম। হিসেব করে দেখা গেল প্রতি তিনমাস অন্তর তিনি আমায় স্মরণ করে থাকেন। তিনমাসে একবার আমার একটা কিছু ক্ষতি হবেই। হয় সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সাইকেল হারাব, নয় ট্রাম থেকে পড়ে পাটা যাবে মচকে, কিছু যদি নাও হয় তবে অকস্মাৎ একটি শ্যালিকার বিবাহের সম্বন্ধ যাবে ঠিক হয়ে। তত্ত্ব করা ব্যাপারে স্ত্রীর ফরমাজ খাটতে গিয়ে পকেটে মস্ত বড় একটা ফুটো হবে !

গতবারে এমনি একটা তত্ত্ব গিয়েছে কাঁধের ওপর দিয়ে, এবার ভাগ্যগগনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে আর কোন আসন্ন বিপদের মেঘ দেখতে পাচ্ছিলাম না। শাশুড়ী মারা গিয়েছেন শেষ কন্যার বিবাহ দিয়ে। শ্বশুর-মশাই দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করলেও শীঘ্র শ্যালিকার বিবাহের' আর সম্ভাবনা নেই। যা কিছু হারাবার সবই হারিয়েছে, আর হারাবার কিছু নেই, ...কিন্তু হায়, নতুন ছাতিটির কথা ভুলে গেছলাম।

প্রজাপতি-আফিসে গিয়েছিলাম কন্যার জন্য পাত্র সন্ধান করতে। নতুন ছাতিটি সযত্নে নিজের চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে রেখে সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। ওঠবার সময় দেখলাম ছাতিটি গেছে বদলে। আমায় না জানিয়েই বেয়াই সম্বন্ধ পাতিয়ে কে রসিকতা করে সেখানে আর একটি ছাতি রেখে গেছেন। ছাতিটির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ অবস্থায় মুড়ে নিলেও সেটি ছাতি, না ছেলেদের ছেঁড়া ঘেরাটোপ, বোঝা যায় না এই টুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে।

ছাতিটিকে নিয়ে পথে বেরোন দায়—লজ্জা করে। অথচ না হারালে নতুন ছাতি কিনতেও পারি না। শুধু গৃহিণীর ভর্ৎসনা নয়, নিজেরও কেমন একটু বাধে। এতদিন জিনিষ হারিয়েছি অনিচ্ছায়, এবার সযত্নে ছাতি হারানোর সাধনায় লাগলাম। কিন্তু হায়, এখানেও ভাগ্য সাধল বাদ। ট্রামের 'সীটে' ছাতিটি ঝুলিয়ে রেখে নির্ব্বিকার ভাবে নেমে যাচ্ছি, কণ্ট্রাক্টর ছাতিটি এগিয়ে দিয়ে বল্লে—ভুলে যাচ্ছিলেন যে! বর্ষার দিন নেমন্তন্ন বাড়ী খেতে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে ছাতিটি রেখে সটান বাড়ী চলে এলুম। ভাবলাম এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। কিন্তু তার পরদিনই নিমন্ত্রণকর্ত্তা চাকর দিয়ে সকালে ছাতিটি ফেরৎ পাঠিয়েছেন বিস্তর বিনয়-বচনের সঙ্গে—আপনি কাল ছাতিটি বোধ হয় খুঁজে পাননি। ভীড়ের ভেতর সব দিকে দৃষ্টি দিতে পারিনি বলে আমরা দুঃখিত—ইত্যাদি।

জিনিষ হারানো সহ্য হয়েছিল, কিন্তু ফিরে পাওয়া বরদাস্ত করতে পারলাম না। এতদিন বাদে গেলাম গ্রহাচার্য্যের বাড়ী। তিনি হেসে বল্লেন—হবেই ত হবেই ত, কখনো হারাবে কখনো ফিরে পাবেন, আপনার গ্রহের লেখাই যে অমনি!

—কিন্তু আমার কোষ্ঠীতে দেখেছেন ত!

—আরে ওটা কি কোষ্ঠী নাকি! বেটারা কি গুণতে জানে! বলুক দেখি ঠিক করে অয়নাংশ!

তা হলে উপায়?

উপায় আছে বৈ কি! নইলে এখানে ঘরভাড়া করে বসেছি কি জন্যে? আপনিই বা এসেছেন কেন?

উদ্গ্রীব হয়ে কান পাতলাম। তিনি বল্লেন—একটা শনি-কবচ নিতে হবে, বুঝেছেন! শাস্ত্রীয় মতে আসল শনি-কবচ! আমার কাছে ও নকল-টকল পাবেন না। খরচ পড়বে—দু'কুড়ি টাকা!

চল্লিশ টাকা!

হ্যাঁ চল্লিশ টাকা! চমকালেন যে বড়? মাণিকচাঁদ ধুধুরিয়াকে—

তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লাম—গরীব মানুষ, অল্পে হয় না!

হবে না কেন! এক পয়সায় তিনটে তামার মাদুলী ত পাওয়া যায়। বলে খানিক কি ভেবে তিনি বল্লেন—আচ্ছা সাঁইত্রিশই দেবেন—শনির তিন বাদ দিলাম।

একবার দেখাই যাক্ বলে সত্যি একটা শনি-কবচ ধারণ করে ফেল্লাম।

তারপর দিন যায়। একমাস দুমাস—দুমাস দশদিন, কুড়িদিন, পঁচিশ দিন। সত্যিই বুঝি জ্যোতিষ মিথ্যে নয়। এপর্য্যন্ত কিছু হারায় নি, কিছু ক্ষতি হয়নি অথচ আর মাসের একটি দিন বাকী। তিন মাসের অভিশাপ বুঝি কেটে গেল।

তিন মাসের শেষদিন নির্ব্বিঘ্নে গেল কেটে। মনে মনে জ্যোতিষকে নমস্কার করে বল্লাম—না ঠাকুর, আর অবিশ্বাস করব না। এই কবচ—

একি! কবচ গেল কোথায়!

তিন মাসের ধাক্কায় কবচটিই গেছে হারিয়ে। জ্যোতিষে আমি আর বিশ্বাস করি না।

সধবা

আজ সুনন্দিনীর বিয়ে। মায়ের সব ছোট কোলের মেয়ে, বাড়ীতে একে নিয়েই শেষ বিয়ের বাজনা বাজবে কিছু কালের মত।

টাকাকড়ির অভাব নেই, আত্মীয়স্বজনে ঘর ভরা, তবু উৎসবের বাঁশী এত করুণ কেন? উৎসবের আলো যেন চোরের মত লুকিয়ে পড়তে চায়, নিজের তেজে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই।

ধন মান জন, কিছুর অভাব নেই, অভাব কেবল সৌভাগ্যের। এ বাড়ীর মেয়েরা, বউরা অপয়া বলে দেশ-বিখ্যাত। রূপ আছে, শিক্ষাদীক্ষা আছে, বড় বংশের গৌরব আছে, কিন্তু সিঁথীর সিঁদুর বজায় রেখে কেউ চিতায় উঠ্‌তে পারে নি। বিধবা দুটি বড় বোন, বিধবা ভাজ, অল্প-বয়স্কা বিধবা পিসী, আজ সুনন্দিনীকে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যেখানে এরা দাঁড়াচ্ছে, শুভ্র মুখ আর শুভ্র বেশ নিয়ে মনে হচ্ছে যেন এক ঝাড় রজনীগন্ধা ফুটে উঠেছে।

মা এদের দিকে চেয়ে চোখ মুছছেন, আবার সুনন্দিনীর দিকে তাকিয়ে হাস্‌বারও চেষ্টা করেছেন। এই শেষ সন্তান তাঁর। এর বিয়ের জন্য কি কঠিন চিন্তার ফাঁসই না তাঁর গলায় জড়িয়ে ছিল। এরও কি কপাল অমনিই হবে? বিধাতা একটিকেও কি অব্যাহতি দেবেন না? কত শান্তি-স্বস্ত্যয়নই না, তিনি করেছেন, কত গণৎকার, জ্যোতিষীর পিছনেই না তিনি টাকা ঢেলেছেন। বিয়ের জন্যে কত সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ না ফিরে গিয়েছে। কারো স্বাস্থ্য ভাল নয়, কারো কোষ্ঠী ভাল নয়, কারো বংশের ইতিহাস ভাল নয়।

অবশেষে সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে সম্বন্ধ এল। এটিতে খুঁৎ নেই, অন্ততঃ যেদিকে তাঁর ভয় ছিল, সেদিকে খুঁৎ নেই। বংশের পুরুষ মানুষ কেউ সত্তর বছরের আগে কোনোদিন মরেছে বলে কেউ শোনে নি, আশী নব্বুই এমন কি এক শ' ছুঁয়ে যাওয়াও এদের ঘরে নূতন কিছু নয়। এদের ঘরে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বেশী জোটেনি কোনো বউয়েরই, কিন্তু সিঁথীর সিঁদুর অক্ষয় হয়ে থেকেছে।

কিন্তু কোথায়, কাদের ঘরে মেয়েটিকে তিনি নির্ব্বাসনে পাঠাচ্ছেন? গ্রামের নামশুদ্ধ তিনি আগে কোনোদিন শোনেন নি। এই কচি মেয়ে, বয়স পনেরো হলে কি হয়, সে মায়ের কোলের শিশুর মতই নিরীহ আর অজ্ঞ, সে কি সেই অপরিচিত অনাত্মীয়দের ঘরে মানিয়ে চল্‌তে পারবে? সে যে বড় আদরে লালিত, ফুলের মত কোমল, মনে আর দেহে!

ভ্রাতৃজায়ার চোখে জল দেখে ননদ স্নেহের ভর্ৎসনার সুরে বল্‌লেন, "ওকি বউ, তুমি আবার শুভদিনে চোখের জল ফেল্‌ছ কেন? একে ত যা কপাল আমাদের!"

সুনন্দিনীর মা চোখ মুছে' ভাঙা গলায় বল্‌লেন, "কোথায় কার হাতে দিচ্ছি কচি মেয়েটাকে, কি যে অদৃষ্টে আছে জানি না।"

ননদ বল্‌লেন, "চেনাশোনা সহুরে বড়-মানুষ দেখে ত দুই মেয়েকে দিলে, তাতেই কোন্ ভাল হল? নন্দা আমাদের মাছ-ভাত খেয়ে গরীবের ঘর আলো করে থাক, সেই ঢের।"

ভাজ বল্‌লেন, "বৎসরান্তে একবার মেয়েটাকে দেখতেও পাব না হয়ত। সে কি এ রাজ্যি?"

ননদ ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "না দেখ, নাই দেখ্‌বে। দুটোকে ত সারাক্ষণ দেখছ, অমন কপাল যেন আমাদের নন্দার না হয়।"

বিয়ে হয়ে গেল। জামাইয়ের মুখ দেখে সুনন্দিনীর মা বুক বাঁধতে চাইলেন, কিন্তু পোড়া চোখের জল কেবলি কেন ঠেলে বেরিয়ে আসে? নীরবে জামাইয়ের হাতে, মেয়ের হাত-খানি তুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দিনী বিদায় হয়ে গেল।

অনেক দূরদেশ, শীগ্‌গীর যে আর মেয়েকে দেখ্‌বেন, সে আশা ছিল না। মা কেঁদে কেটে একেবারে শয্যা নিলেন। কিন্তু সংসারের ডাক না শুনে মেয়েমানুষের উপায় নেই, আবার দুদিনের মধ্যেই বুক বেঁধে তাঁকে উঠ্‌তে হল।

দিন চলে যায়, ক্রমে সুনন্দিনীর বিচ্ছেদের ব্যথা তাঁর সয়ে এল। কালেভদ্রে চিঠি আসে, তাতে মেয়ের মনের কোনো খবরই তিনি পান না। ভাল আছে, এইমাত্র শোনেন। বাড়ীতে পুরুষমানুষের অভাব, কেউ যে গিয়ে দেখে আসবে, সে উপায় নেই।

এক শীতকালে সুনন্দিনীর বিয়ে হয়েছিল, আর এক শীতকাল ফিরে এল। মা বিকালের কাপড় কাচা সেরে বাইরে এলেন, এরি মধ্যে যেন সন্ধ্যার ঘনছায়া পৃথিবীর বুকে নেমে পড়েছে। তুলসী-তলায় দেবার জন্যে, পিতলের প্রদীপটি জ্বেলে হাতের আড়াল করে নিয়ে চললেন, পাছে শীতের নিষ্ঠুর হাওয়ায় সেটি নিভে যায়।

উঠোনের মাঝামাঝি এসেছেন, এমন সময় ঝড়ের দম্‌কা হাওয়ার মত কে তাঁর পায়ের উপর আছ্‌ড়ে পড়ল! মা চম্‌কে পিছিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, "কে রে?"

মুখ তুলে মেয়ে বল্‌লে, "আমি মা!"

মা শিউরে উঠ্‌লেন। দুই মেয়ে যেমন করে ফিরে এসেছে, এ হতভাগিনীও কি তাই এল? কোষ্ঠী, হাতের রেখা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সব কি মিছে? অকরুণ ভাগ্য এরও ললাটে কি চির-দুর্ভাগ্যের ছাপ মেরে দিয়েছে? প্রদীপ তুলে ধরে মা এগিয়ে এলেন। আঃ বাঁচা গেল! মেয়ের পরনে এখনও লাল-পেড়ে শাড়ী, সিঁথীতে সিঁদুর ডগ্‌ডগ্‌ করছে।

মেয়েকে তুলে ধরে জিগ্‌গেস করলেন, "এ কি মা, এমন করে এলি কেন?"

মেয়ে কেঁদে বল্‌লে, "ঘরে চল মা, সব বল্‌ছি।"

মা তুলসী-তলায় প্রদীপ নামিয়ে রেখে, দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ঘরে এসে ঢুকলেন। মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "এইবার বল মা।" বাড়ীর আর সকলে দরজার কাছে ভীড় করে দাঁড়াল।

সুনন্দিনীর রূপ গ্রামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। তার উপর কুলোকের নজর পড়েছিল। সে স্বামীকে শাশুড়ীকে সব কথা জানায়, কিন্তু উল্টে তাকে গাল দেওয়া ছাড়া তাঁরা আর কিছু করে উঠ্‌তে পারেন নি।

পরশুর আগের দিন, সন্ধ্যায় যখন সে ঘাটে জল আন্‌তে গেছে, তখন কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সারা রাত অশেষ লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করে, ভোরবেলা আর একটি স্ত্রীলোকের সাহায্যে মুক্তি পেয়ে সে বাড়ী পালিয়ে আসে। কিন্তু পতি-দেবতা এবং তাঁর বাড়ীর লোকে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তার জাতধর্ম্ম নেই, তাকে গ্রহণ করে তাঁরা কি নরকে যাবেন? প্রতিবেশীদের সাহায্যে সে ফিরে এসেছে।

মায়ের শরীর কাঠের মত হয়ে গেল। অন্যরা আস্তে আস্তে সরে গেল। সুনন্দিনী কেঁদে বল্‌লে, "ওমা, মাগো, কথা বল, আমার কি উপায় হবে?"

মা আর্ত্তস্বরে বলে উঠ্‌লেন, "হতভাগী, এর চেয়ে তুই মরে গেলি না কেন?"

রাত ঘনিয়ে এল। কারো খাওয়া-দাওয়া হল না, সুনন্দিনীকেও জলবিন্দু মুখে দিতে কেউ ডাকল না। সকাল হোক, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের বিচারালয়ে এই নির্য্যাতিতার বিচার ও দণ্ড আগে হয়ে যাক, তারপরে সে যে মানুষ, সে যে মায়ের কোলের মেয়ে, তা হয়ত তাঁর মনে পড়বে।

সকাল হ'ল বটে, কিন্তু সুনন্দিনীকে আর পাওয়া গেল না। পড়ে আছে একখানা চিঠি, তার মায়ের নামে!

মা,

তুমি অনেক বেছে আমাকে এমন মানুষের হাতে দিয়েছিলে যাকে যমে ছোঁবে না। সত্যি সে যমেরও অরুচি মা। মানুষ সে নয়, পশুও সে নয়। আমাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তার ছিল না, দণ্ড শুধু দিতে পারল। আমি চল্‌লাম, তার ঘরেও আমার জায়গা নেই, তোমার ঘরেও নেই। বিধবা হ'লে তোমার কোলে ঠাঁই পেতাম, কিন্তু তুমি যে বিধবা হওয়াকে সব চেয়ে ভয় করতে। সিঁথীর সিঁদুর অক্ষয় রেখে বিদায় হলাম, এই আনন্দে আমার শোক ভুলে যেও।

তোমার অভাগিনী মেয়ে।

সাপ্তাহিক

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দাম্পত্য-জীবনের প্রথম কলহের অবসানে সেই প্রথম সন্ধি,—স্বামী হাত দু'খানি দু'হাতে ধরিয়া, মুখখানা কেমন এক রকম করিয়া মার্জ্জনা চাহিল, লাগিয়াছিল বেশ, একেবারে এক নূতনতর অনুভূতি।

সুচারু সেই লোভে আবার কলহ করিয়া বসিয়াছে। সই কিরণলেখা, দাম্পত্যজীবনে তাহার সিনিয়ার, পরামর্শ দিয়াছে—"এইবার পায়ে ধরিয়ে ছাড়বি, বুঝলি ?"

উত্তর পাইয়াছে—"নিশ্চয়ই।"

কথাটা কেমন করিয়া স্বামীর কানে উঠিয়াছে। আজ তিনদিন ধরিয়া কথা বন্ধ। বাড়িতে চারিদিকেই অত্যন্ত গরমিল। পাচক বামুন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, কীই বা রাঁধে সে ?—ইনি যাহা ভালবাসেন ওঁর তাহা দু'চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সরোজের খানসামা আর সুচারুর ঝি-এ সে ভাব নেই, অষ্টপ্রহর কথাকাটাকাটি, সুচারুর পেশোয়ারী বেড়ালটা সরোজের জাপানী পুড্‌ল্‌টার সমস্ত আব্দার-অনাচার এতদিন ভাল মনেই সহিয়া আসিতেছিল, কাল তাহার ক্ষুদ্র নাসিকায় একটি কাবুলী চপেটাঘাত ঝাড়িয়া পশু-চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে। কথা নাই, সুতরাং সরোজ সুচারুকে স্পষ্ট কিছুই বলিতে পারিল না। তবে, বেড়ালের দিকে আঙুল উঠাইয়া যখন বলিল—"হাঁসপাতালের সব খরচ তোর কাছে আদায় ক'রব!" তখন কিছুই অস্পষ্ট রহিল বলিয়া বোধ হয় না।

তাসের আড্ডায় আজকাল সরোজ বিমলকে বেশ মিষ্ট মিষ্ট করিয়া শোনায়—"নতুন বিয়ে তো আমারও, তা ব'লে..." ইত্যাদি। সুচারু সইকে বলে—"বেশ আছি ভাই,—খালি কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর, কেবলই বাজে কথা..."

* * *

রবিবার পড়িতে আজ ছয় দিন হইল। সরোজের জাপানী পুড্‌ল্‌টা হাঁসপাতাল হইতে খালাস হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সকালে সুচারু ঝিকে ডাকিয়া বলিল—"বিন্দি, নিয়ে আয় তো কুকুরটাকে। আহা, অবোলা জীব!...আজ হারামজাদী বেড়ালটার খাওয়া বন্ধ; আর দেখিস্ যেন বাড়িতে না ঢোকে, আবার আঁচড়ালে-কামড়ালে আর কুকুরটা বাঁচবে না..."

বিকালে সরোজ খানসামাকে ডাকিয়া বলিল—"একবার ঝিকে ডেকে নিয়ে আয় তো...যেন ঝুঁটি ধ'রে নিয়ে আসিস্ নি...তোদের চেঁচামেচির জ্বালায় বাড়িতে টঁ্যাকা দায় হয়ে উঠেচে।"

ঝি আসিলে বলিল—"হ্যাগা বিন্দু, কি রকম আক্কেল তোমাদের ?—সমস্ত দিন বেড়ালটাকে খেতে দাও নি, বাড়িতে ঢুকতে গেলেই দেখ্-মার ক'রচ...আমার পাতে আজকাল মাছমাংস নেই, ওর কি খাওয়া হয় ?...যাও, তোমরা দুজনে ধ'রে ওটাকে বাড়িতে দিয়ে এস।"

বিন্দুকে খাটিতে হইল না, খানসামা যুগল-ই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ালটাকে ধরিয়া আনিয়া বিন্দুর কোলে দিয়া বলিল—"যা, নরম কোলের আরাম খেগে।"

বিন্দু হাসিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল—"মরণ!"

* * *

সোমবার বিকালবেলা—আজ সাত দিন। কয়েকদিন গরমের পর একটা মিঠা ঝিরঝিরে হাওয়া দিতেছে। সুচারু উপরের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া একটা নভেল পড়িতেছিল। সরোজ উপরেই আশেপাশে কোথাও আছে। সুচারু কি পড়িল সেই জানে, হঠাৎ বইটা মুড়িয়া রাখিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। পায়ের কাছে জিমি শুইয়া ছিল, তাহাকে আদর করিতে লাগিল।

জিমির অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি। চরকির মত সমস্ত ঘরটা ঘুরিয়া আসিয়া প্রভুপত্নীর পায়ে লোমশ মুখটা চাপিয়া ধরে, আবার ছুট্। একবার বুড়া আঙুলটা দাঁতে একটু চাপিয়া আদরটা আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইল। সুচারু বলিল—"আ মর! কামড়াবি নাকি ?"

কথাটা বলিয়া সুচারু একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল।... ধর,—পায়ে কুকুরে কামড়াইয়াছে—বাড়িতে ডাক্তার বৈদ্যের ভীড়...স্বামীই তো ডাক্তার!...যেন দেখা যায়—আলতাপরা রাঙা পা'টি হাতে তুলিয়া ধরিয়াছে...।

জিমি চক্র দিয়া আসিলে ডান পা'টি একটু বাড়াইয়া দিল, কিন্তু সে হাঁ করিতেই টানিয়া লইয়া বলিল—"দূর হ' ; হ্যাঁ, শেষে পাগল হ'য়ে ম'রতে যাই আর কি !"

জিমি খেলিতে লাগিল ; সুচারু ভাবিতে লাগিল।··· শেষে হাতের চুড়ি থেকে একটা সেফ্‌টিপিন্ খুলিয়া লইয়া আঙুলে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তাহার পর ধারটা পায়ের বুড়া আঙুলে দু'একবার পরীক্ষা করিল। কী-ই বা এমন বেশী লাগে ? এই তো সেদিন একটা ইন্‌জেক্‌শন্ লইল,—পিঁপড়ের কামড়।

চমৎকার বিকালটি। পাশে জুঁইফুল ফুটিয়াছে।··· স্বামীর শুক্‌ন মুখখানি মনে পড়ে···

* * *

"উঃ" - বলিয়া জোরে একটা আওয়াজ হইল।

"কি হোলো ?"— বলিয়া স্বামী ছুটিয়া আসিল।

"জিমি।"—বলিয়া পাটা টিপিয়া ধরিয়া সুচারু ঘাড়টা বাকাইয়া লইল।

স্বামী সভয়ে পা'খানি দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"কামড়ে দিলে ! ওরে যুগল, আমার বাক্সটা শিগ্‌গির নিয়ে আয় ··"

পায়ের কাছে, শাড়ীর চওড়া পাড়ের নীচে একটা সেফ্‌টি-পিন্ নজরে পড়িল। হাতে লইয়া দেখিল—মুখটিতে যেন একটু রক্তের দাগ। আর কেহ বোধ হয় টের পাইত না, কিন্তু ডাক্তার-স্বামীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইল না। মানভঞ্জনের পণের কথাটা মনে পড়িল—ডান হাতের উপর পা'টি এলাইয়া রহিয়াছে।···কুকুরের কামড় ?···সুচারু তাহাকে এতই বোকা ঠাহর করিল ?

কিন্তু তেমন অবস্থায় পড়িলে বোকা সাজাই বুদ্ধিমানের কাজ। সরোজকুমার একটু রাগ করিয়া বলিল—"দেখ ত কাণ্ড ! তুমি বুঝি এইটে দিয়ে আবার পরখ করতে গেলে কতটা দাঁত ফুটিয়েচে ?"

সুচারু সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—"দেখ, ও দুটোতে আবার মাখামাখি করচে ; রাক্কুসী দেবে বুঝি জিমিটাকে আবার আঁচড়ে !···"

স্বামী, মিনি-জিমির সন্ধি উৎসব একবার নিশ্চিন্ত মনে দেখিয়া লইয়া বধূর পাখানি বুকের কাছাকাছি তুলিয়া ধরিয়া গভীর সমবেদনায় পরীক্ষা করিতে লাগিল।

হাতে হাতে ফল

—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

মোড়ের কবিরাজি দোকান থেকেই কিন্‌লাম। টাকের অব্যর্থ প্রতিষেধ—মহাভৃঙ্গরাজ তৈল। কবিরাজ জোর গলায় বল্লেন—মশাই, রামায়ণ মহাভারত তো পড়েছেন, তাতে কারু টাকের কথা পেয়েছেন ? যুধিষ্ঠির, ভীম, দশরথ কিম্বা ভীষ্মের ? রাবণের দশটা মাথার একটাতেও কি ? তার কারণ জানেন, এই শাস্ত্রীয় ওষুধ।

—কিন্তু এক শিশির দশটাকা দাম একটু বেশি নয় কি ?

—খাঁটি জিনিষের দাম একটু বেশিই ! অন্য কোথাও হয়ত দুটাকাতেই পাবেন, কিন্তু এও বলে' দিচ্ছি তাতে টাকাই যাবে, টাক যাবে না।

—কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার মাথায় যে—

—প্রকাণ্ড। হাঁ ওটা পসারের জন্য আমাদের দরকার। প্রবীণতার বিজ্ঞাপন—বুঝলেন কিনা ? টাকা হ'লে টাক হয়, কথায় বলে ; কিন্তু কবিরাজ আর উকীলের বেলা এর উল্টোটাই খাটে মশাই। এই জন্য ভৃঙ্গরাজ মাথা দূরে থাক্, শোঁকাও আমাদের নিষেধ।

তারপর আর নিঃশঙ্কচিত্তে ও নিঃসঙ্কোচে দশটাকা খরচ করার পক্ষে বাধা রইল না।

তখনো অবশ্য আমার টাক পড়েনি, কিন্তু চুলগুলো ঠিক মহাপুরুষের মত ব্যবহার সুরু করেছিল—অর্থাৎ একেবারে ক্ষণজন্মা, যে যায় তার স্থান আর পূরণ হয়না। বিপদ এই চুল গেলে ব্যক্তিত্ব যায়, যৌবন যায়, মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত আকর্ষণ চলে যায়। কিছুদিন থেকে যেভাবে চুলক্ষয় হচ্ছিল তাতে আর কালক্ষয় করা সমীচীন বোধ করলুম না।

প্রাণপণে তৈলমর্দ্দন সুরু করলাম, কিন্তু কেশের অধঃপতন রোধ হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চুলের অলিগলির মধ্যে টাকের নিঃশব্দ সঞ্চার দেখে কেবল ক্ষেপে যাবার বাকি ছিল। সেদিন একেবারে মরীয়া হয়ে উঠ্‌লাম, রাত্রে শোবার আগে যাবতীয় চুল তেলে চুবিয়ে সারা মাথায় তেলের পটি লাগালাম—নাঃ, আজ এর চরম করে' ছাড়ব।

যে তেলের গুণে রাবণের দশটা মাথার একটাতেও টাকের দুর্ভাবনা স্পর্শ করেনি, সমস্ত রাত তারই সাহচর্য্যে নিশ্চয়ই চুলের গোড়া শক্ত হয়েছে। ঘুম ভেঙে অবধি অহেতুক উদ্দীপনা বোধ করছিলাম। অত্যন্ত উৎসাহে বুরুশটা হাতে নিয়ে ব্যাক্‌ব্রাশ করতেই মনে হ'ল ঘাড়ের পেছন দিকে

পরচুলার মত কি যেন খসে পড়ল। তাড়াতাড়ি আয়নার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালাম—আর কিছু না, সমস্ত চুল সবংশে নির্ম্মূল হয়ে চাকচিক্যময় প্রশস্ত টাক বেরিয়ে পড়েছে।

প্রথমে ভাব্‌লাম—নাঃ, আর বেঁচে সুখ নেই, আত্মহত্যা করব। কিন্তু তার আগে হতভাগা কব্‌রেজকে—। হায়, আর কি কোনো মেয়ে আমার প্রেমে পড়বে? গ্লোবের ম্যাটিনি শোয়ে গিয়ে আর লাভ কি? কিম্বা বেঙ্গল ষ্টোরে?

কিন্তু মসৃণ মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ক্রমশঃ ভালো লাগ্‌ল; ফাঁকা মাথায় খোলা হাওয়ার স্পর্শে নতুন অনুভূতির আস্বাদ পেলাম। মনে হ'ল, আত্মহত্যা বা ফাঁসি যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়, টাক নিয়েও বেশ বাঁচা যায়। কিন্তু দশ—দশটা টাকা! নাঃ, বড় ঠকান্‌টা ঠকিয়েছে। টাকের দুঃখের চেয়ে টাকার শোকে আমাকে বেশি মুহ্যমান করল।

এমনই বেদনার মুহূর্ত্তে বন্ধু ভোলানাথ এসে হাজির। অনেকদিন পরে দেখা কিন্তু আমার টাক দেখে কোন প্রশ্ন বা কৌতূহল প্রকাশ করল না। বুঝলাম, টাক আর মৃত্যু বংশানুক্রমিক ব্যাধি—ওতে কারু বিস্ময় নেই।

ভোলানাথ বল্‌ল—ভাই, পশ্চিম যাচ্ছি আজ। বড্ড বাতে ভুগ্‌লাম, দেখি একবার চেঞ্জে গিয়ে। তোমার কোনো অসুখ করেছে নাকি? বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে যেন?

—আর ভাই এক কবিরাজি তেল নিয়ে—

হ্যাঁ, কেউ কেউ বলেছেন কবিরাজি করতে। যদি কিছু থাকে ওতেই নাকি আছে। কিন্তু ভাল কবিরাজ পাওয়া –

আমার মাথায় একটা মতলব এল। বল্লাম—যা বলেছ! সৌভাগ্যক্রমে আমি একজন পেয়েছি। তাঁর দেওয়া তেলেইত আমার বাত সারল, আমিওতো কম ভুগিনি।

—বল কি তুমিও?

—আর ব'লনা! কিন্তু কি আশ্চর্য্য তেল ভাই! এই দেখ না, তিনদিনও মালিস করিনি কিন্তু কে বল্‌বে আমার পায়ে কোনোকালে বাত ছিল! এখন আমি লাফাতেও পারি। নামটা কটমট—বৃহৎ বাত গজাঙ্কুশ তৈল, কিন্তু কি বল্‌ব, বাতে একেবারে অব্যর্থ! তবে দামটা একটু বেশী —দশটাকা নেহাৎ কম নয়ত!

—দশটাকা মোটে! ভাই, এই নাও। তুমি আরেক শিশি কিনে নিও এখন। ব'লে একখানা নোট গুঁজে দিয়ে ভোলানাথ ভৃঙ্গরাজের শিশিটা আত্মসাৎ করল। যাক্, এতক্ষণে কিছু সান্ত্বনা পেলাম,—টাক গেল না বটে, কিন্তু টাকাও গেল না।

তিন মাস পরে ভোলানাথের এক চিঠি পেলাম। সে তার পরদিনই কলিকাতা পৌঁচচ্ছে এবং আমাকে দুপুর বেলা তার বাড়ী নিশ্চয় ক'রে যেতে বলেছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে আহ্লাদিত হলাম। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই, অসংখ্য ধন্যবাদ যোগে সে জানিয়েছে যে সেই তেলেই তার বাত সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

পরদিন যথাসময়ে যেতেই চাকর বৈঠকখানার দরজা খুলে দিয়ে বল্‌ল—বাবু, এইমাত্র কামাতে বস্‌লেন, ডেকে দেব কি?

—না, তাড়া কিসের? কামাতে আর কতক্ষণ লাগবে? আমি বস্‌ছি।

পনের মিনিট্ যায়, আধ ঘণ্টা যায়, এক ঘণ্টাও উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, কিন্তু ভোলানাথের আর নামা নেই। অবশেষে বিনিপয়সার ভোজের আশা ছেড়ে দিয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছি, বন্ধুবর নেমে এলেন।

বিরক্তি গোপন করলুম না। তিক্ত কণ্ঠেই বল্লুম—এতক্ষণে লাট সাহেবের খেয়াল হ'ল! তবু ভালো!

—কিছু মনে কোরো না ভাই, কামাচ্ছিলুম।

—কামাতে এতক্ষণ?

—ভাই, তোমার সেই তেলটা। বাত সেরেছে বটে কিন্তু আরেক উৎপাৎ জুটেছে। সমস্ত পায়ে চুল গজিয়েছে। চুল হে চুল, যাকে সংস্কৃতে বলে কেশকলাপ। আশ্চর্য্য হচ্ছ? রোঁয়া নয়, রোঁয়া আর চুলে তফাৎ, রোঁয়া কিছুটা বাড়ে তারপর আর বাড়ে না, চুল নিরবচ্ছিন্ন বেড়েই চলে। পায়ে দাড়ি গজিয়েছে ব'লে লোকে সন্দেহ করে, কি করি, একদিন অন্তর কামাই। যাক্, বাতের হাত থেকে বেঁচেছি, বিধাতাকে ধন্যবাদ! আর এর জন্য আমি ভাবি না, এ রোগে ত যন্ত্রণা নেই, কামালেই কমে যায়।

পুরূরবা

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আমি হতবাক্ পুরূরবা,
চির-সন্ধান-রত,
আপন গানের তানের পিছনে
হতভাগ্যের মত।

আমি হতবাক্ পুরূরবা,
ছায়া-রৌদ্রের সাথী,
ক্ষণিক সুখের পাখীর লাগিয়া
ফিরি মায়াজাল গাঁথি'।
কোন্ বিহঙ্গ নন্দনচারী,
আমার কুলায়ে গেল পাখা ঝাড়ি'—
রঙীন পালক কুড়ায়ে তাহারি
ফিরি যে দিবস-রাতি—
আমি হতবাক্ পুরূরবা
ফিরি মায়াজাল গাথি'।

আমি নির্ব্বাক্ পুরূরবা,
চির মন্দার-লোভী,
গোধূলির চর, স্বপন-দোসর,
ছায়া-আলোকের কবি।
প্রিয়ার যুগল কপোলের ধারে
যে ক্ষণ কুসুম উঁকিঝুঁকি মারে,
ওগো বল্ তোরা কেমনে তাহারে
বারেক পরশে লভি'—
নিমেষ-বৃন্তে ফোটে না কুসুম
—সেই মন্দার-লোভী।

সকাল বেলার শিশির-ফোঁটায়
উর্ণাতন্তু-হার,
মৃণাল-কোমল কণ্ঠে উঠিতে
সবুর সহে না যার।
শরৎ-প্রাতের রোদ-ভাঙ্গা মেঘে
ঝরে যে বাদল বাতাসের বেগে—
ঝড়ের আকাশে চাপা-চাঁদ লেগে
রাঙা যে মেঘের পাড়—
আমি উদ্বাহু পুরূরবা,
ফিরি সন্ধানে তার।

ওগো, পান বিনা হ'ল ঠোঁট রাঙা যার,
যুগল ভ্রমর নয়ন যাহার,
ফুলদল দলি' চরণ অরুণ
কুন্তল পড়ে খসি'—
ওরে, কোথা গেল সেই ক্ষণিক সুখের
মোর চির-উর্ব্বশী।

আমি উদ্‌গ্রীব পুরূরবা,
চির-সন্ধান-রত—
নিখিল-নারীর নয়নে নয়নে
কে যেন তাহারি মত!
সকলের ঠোঁটে তারি আভাখানি
সকল কণ্ঠে তারি সুধাবাণী—
এক ঠাঁই তারে পেতে চাই আমি
এক দেহে সংহত!
নিখিল নারীর রূপমন্থনে
তাহারে করেছি ব্রত—
আমি উদ্বেল, আমি উদ্বাহু,
চির-সন্ধান-রত।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। স্থানাভাবে এবার সমালোচনা বাহির করা সম্ভব হইল না।

মা—গোর্কীর "মাদারের" অনুবাদ—দ্বিতীয় খণ্ড; অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস ১১নং কলেজ স্কোয়ার। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড পাঁচ সিকা।

যুগগুরু—শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস। মূল্য দেড় টাকা।

কেশবার্জ্জুন—নাটক, আদিপর্ব্ব। শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য। শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য। ভাটপাড়া। মূল্য বারো আনা।

ফরাসী বিপ্লব—রেজাউল করিম। বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস। মূল্য এক টাকা।

সন্তাবশতকের কবি—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন। সেনহাটী, খুলনা। মূল্য ছয় আনা।

স্মৃতিপূজা—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন, সেনহাটী, খুলনা। মূল্য আট আনা।

রাজা গণেশ। নাটক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। বিজয়া সাহিত্যমন্দির। কাশীধাম। মূল্য এক টাকা।

মহাপ্রস্থানের পথে—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। আর্য্য পাবলিশিং হাউস। মূল্য দুই টাকা।

মোপাসাঁর গল্প—শ্রীননীমাধব চৌধুরী। মডার্ণ বুক এজেন্সী। মূল্য দেড় টাকা।

ফাঁকির নেশা—শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী। জ্ঞান পাবলিশিং হাউস। মূল্য আড়াই টাকা।

ভোরের সানাই এবং মরুসেনা—আজিজুল হাকিম। ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা এবং দশ আনা।

অভিনয়-শিক্ষা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য আড়াই টাকা।

ফুলকলি—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কামালকাছনা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। মূল্য চারি আনা।

নারী-হরণের প্রতিকার—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী। মূল্য আট আনা।

ভারত ও ইন্দোচীন—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী। ৯, রুস্তমজী ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ।

প্রেমের যুগ—মৌলভী শাহ্ আবদুল হামিদ। কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিং। মূল্য চারি আনা।

পদ্মরাগ—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। কাশিমবাজার। মূল্য এক টাকা।

গলার কাঁটা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য এক টাকা দশ আনা।

আগামীবারে সমাপ্য—মোহাম্মদ কাসেম। এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। মূল্য দুই টাকা।

বোস্তাঁ এবং গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ—শেখ হবিবর রহ্‌মন সাহিত্যরত্ন। গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী। মূল্য যথাক্রমে দেড় টাকা এবং দুই টাকা।

বিষের নেশা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল। সরোজিনী প্রতিভানিলয়। ১৬ রামচন্দ্র মৈত্র। মূল্য এক টাকা।

আমরা হিন্দুজাতি—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হিন্দু-মিশন কার্য্যালয়। মূল্য দুই পয়সা।

Kalidasa—শ্রীঅরবিন্দ। আর্য্য সাহিত্যভবন।

পরলোকের কথা—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ। ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের গলি, কলিকাতা, মূল্য দুই টাকা।

ভাষা ও সাহিত্য—মুহম্মদ শহীদুল্লা, দি ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য বার আনা।

Rishi Bunkim Chandra—শ্রীঅরবিন্দ। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস।

Rammohan Roy—শ্রীঅমল হোম, রামমোহন শতবার্ষিকী সমিতি, ২১০-৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥০।

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর। মূল্য এক টাকা।

Policy Conditions of Life Offices in India—এস্, এল, রায় ও সুনীল দত্ত। ১৯ নং ক্যানিং রোড, এলাহাবাদ। মূল্য ১৷০।

মুরগীর চাস—ওয়াশেকল হক, শঙ্করপুর পোল্‌টী ফার্ম্ম, সিউড়ি। মূল্য ।৵০।

রূপ ও যৌবন—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, নিয়োগীনিকেতন, কলিকাতা, মূল্য আট আনা।

হারজিৎ
ভাবী বিদ্যালয় } কমল মুখোপাধ্যায়, ৫নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট। মূল্য ।৵০

মিছিল—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, দেবসাহিত্য কুটীর। মূল্য এক টাকা।

উপনয়ন—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্। মূল্য ১॥০।

আরব্য উপন্যাস—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য পাঁচ টাকা।

স্বরসাধনা—পণ্ডিত কে জি ঢেকনে ৭ নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। মূল্য ॥০ আনা।

গল্পপ্রিয় এবং শ্রীমঙ্গল—পদ্মোদ্ভবনাথ মুখোপাধ্যায়। আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স। ছয় আনা।

ভ্রম-সংশোধন—৩৩৫ পৃষ্ঠার সীতা কবিতার দ্বিতীয় স্তম্ভের ১১ লাইনে 'বিফল' স্থানে 'বিকল' হইবে এবং ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভের দ্বিতীয় লাইনে 'আলোক' স্থানে 'অলোক' হইবে।

আগামী ৯ই আশ্বিন সোমবার হইতে ১৮ই আশ্বিন বুধবার পর্য্যন্ত

শারদীয় পূজা উপলক্ষে বঙ্গশ্রী কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা

কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কেশোরামের
অপূর্ব্ব
বস্ত্র সম্ভার

অম্লশূল, পিত্তশূল ও সর্ব্বপ্রকার পেট বেদনার মহৌষধ
আহমদ আলী সাহেবের
রেজিষ্টার্ড নং ১৪৭০
মূল্য বড় কৌটা ১।৵০
ছোট—৸০
রমনা,

শিশুদের জন্য

ডোঙ্গরের

বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থিসমূহ সুগঠিত করে, হজম-ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

প্রোপ্রাইটার—**কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং**—গিরগাঁও, বোম্বাই।

গিনি মেটাল গোল্ডের অলঙ্কার

কারুকার্য্য রং পালিশ চমৎকার।

আমাদের সর্ব্বজনপ্রশংসিত আদি ও অকৃত্রিম জগৎ বিখ্যাত গিনি মেটাল গোল্ডের গহনা প্রভৃতি আসল গিনি স্বর্ণের গহনার সমতুল্য, নিত্য ব্যবহার করিলেও গিনি সোনার **রং সমভাবে স্থায়ী থাকে,** তথাপি **দুই বৎসর গ্যারাণ্টি** দিয়া থাকি। উপরে অঙ্কিত ভাটীয়া ও টালি চুড়ি ৮ গাছায় ১ সেট বড় ৪৲, মাঝারি ৩।০, ছোট ৩৲। মফচেন ৩ হাতি ১ ছড়া ৫৲, ঐ ২॥০ হাতি ৪৲, ঐ ১ হাতি ২৲। বিছেহার চওড়া ছেলা ১ ছড়া ৩৲, ঐ মধ্যম ২৲, ঐ সরু ১৲ (সচিত্র ক্যাটলগ ফ্রি)

কে, স্মিথ এণ্ড কোং

৩৪৪নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

ডাকাতের ভয়?

জগৎ বিখ্যাত তালা

ও

সিন্ধুক প্রস্তুতকারক

দাস কোম্পানীর

সহিত

পরামর্শ করুন।

৬১নং বেলগাছিয়া রোড,

পোঃ বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

টেলিফোন—বড়বাজার—৪১৬

দুর্ম্মূল্য-নবরত্ন দুর্লভ-নবমূল ও
দুষ্প্রাপ্য-অষ্টধাতু-সমন্বয়ে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন
—"মঙ্গলরত্ন"—
(রেজিষ্টার্ড)
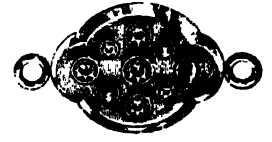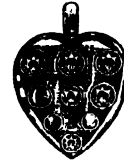
মঙ্গলরত্নের কার্য্যকরী শক্তি

১। চাকুরী সংগ্রহ।

২। পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা।

৩। মামলায় জয়লাভ।

৪। আপনার স্বপ্ন কল্পনা এবং বিবাহকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিয়া তোলা।

৫। শত্রুকে পরাজয়।

৬। কু অভ্যাস সর্ব্বদা পরিত্যাগ করাইয়া ইচ্ছাশক্তিকে সুদৃঢ় করা।

৭। ব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রকার কৃতকার্য্যতা

৮। চাকুরীর দ্রুত উন্নতি।

৯। নেতৃত্বে উন্নতি।

১০। অপরের উপর প্রভুত্ব, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, উপরিতম কর্ম্মচারীর অনুগ্রহ বা রাজদরবারে সম্মানলাভ।

১১। পুরাতন ব্যাধি আরোগ্য হইয়া সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করা।

১২। পারিবারিক জীবনের সুখ, শান্তি, প্রাচুর্য্য, বন্ধুত্ব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, দুর্ঘটনা, যাদু বা গ্রহবৈগুণ্য জনিত সকল প্রকার বিপদাদি হইতে রক্ষা পাওয়া—সমস্তই এই মঙ্গলরত্ন ধারণে সম্ভব হইয়া উঠিবে।

১৩। নারীগণ ধারণে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যশালিনী হইবেন।

—মঙ্গলরত্নের মূল্য—

১নং দুইখণ্ড প্রবালরত্ন, নয়টী দুষ্প্রাপ্য মূল ও চারিটী ধাতু (তাম্র, লৌহ, রৌপ্য ও সীসক দ্বারা আবৃত প্রায় এক বৎসর যাবৎ ফলপ্রদ কার্য্যকরী শক্তি থাকে। মূল্য ৳৵০ শোধন বাবদে ব্যয় হয় ৵০ ভিঃ পিঃ খরচ ।৵০। তিনটী একত্রে লইলে ভিঃ পিঃ খরচ দিতে হয় না।

অতীতের বিস্মৃতযুগ হইতে দেবতার নিকেতন এই পুণ্যভূমিতে ভক্তবৃন্দের সাধনার দ্বারা যে ... দ্রব্যগুণ শক্তি চিরজাগ্রত আছে—উহাই 'মঙ্গলরত্ন' জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি ও কৃতকার্য্যতায় ইহা ভগবানের দান। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে ইহাই সহস্র সহস্র গৃহ শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছে।

জীবনের গতিপথে এই মন্ত্রপূত দ্রব্যশক্তির বিদ্যুৎস্পর্শ আপনাকে সুখ ও সার্থকতার চরম শিখরে উন্নীত করিবে.

জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদলাভে সত্যই ইহা অন্যতম একটি সোপান।

জীবনের নীতিপথে ইহা প্রমাণিত সত্য।

যে ঐশ্বরিক শক্তি আধ্যাত্ম যুগের ঋষি মনীষিদিগকে পরিচালিত করিত ইহা তাহারই নামান্তর। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই শক্তি পরীক্ষায় অনন্ত দুঃখসাগর হইতে সমৃদ্ধিকূলে উপনীত হইয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছে।

ব্যক্তিগত সংস্কার সন্দেহের সমস্ত বাধা ক্ষণিকের তরে দূরে রাখিয়া এই বিবেকের বাণীই অনুসরণ করিয়া—জীবনযাত্রাকে জয়যুক্ত করুন।

২নং—ঐ ঐ রৌপ্যের লকেটে আবৃত মূল্য ৩।০ শোধনের জন্য ব্যয় হয় ৵০ ভিঃ পিঃ খরচ দিতে হয় না!

৩নং—বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন ফলপ্রদ **নবরত্ন**—(বৈদুর্য্যমণি, নীলকান্তমণি, প্রবাল, পদ্মরাগ, মুক্তা, হীরক, ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও মরকত)

নবমূল—বিল্বমূল, ক্ষীরাইমূল, অনন্তমূল, বৃদ্ধ দারকের মূল, ব্রহ্মযষ্টির মূল, সিংহপুচ্ছের মূল, শ্বেতবেড়েলার মূল, চন্দন ও অশ্বগন্ধার মূল।

অষ্টধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসক, রাং, দস্তা ও পারদ।

রৌপ্যের লকেটে বা পদকের উপরে নয়টী রত্ন সুন্দর ভাবে সেট করা এবং নয়টী মূল ও আটটী ধাতু ভিতরে আবৃত থাকে। সমস্ত ১৩টী দফায় ফল প্রদান করে এবং সমস্ত জীবনব্যাপী কার্য্যকরী থাকে। জীবন রক্ষক ও জীবনের সাথী—মূল্য ৯৸০

ঐ স্বর্ণমণ্ডিত—২৩৸০

৪নং—ঐ ঐ বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন বিশেষভাবে তৈয়ারী হয়। জাতকের জন্মসময়ে পাপ-গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে বিশেষভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। সুন্দর স্বর্ণ-লকেটে বা পদকে জন্মলীলা খোদিত সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদান করে এবং জীবনব্যাপী কার্য্যকরী শক্তি থাকে। মূল্য ৫১৸০।

(সিকি টাকা অগ্রিম দেয়।)

অর্ডার দিবার কালীন ধারণকারীর নাম, গোত্র অথবা জন্ম তারিখ ও সময় পাঠাইবেন। (নিরূপিত সময়ের জন্য উক্ত মূল্য ধার্য্য হইল।)

একমাত্র প্রচারক—

এন্ লাল এণ্ড ব্রাদার্স

১৪নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(শ্রদ্ধানন্দ পার্কের নিকট)

Oatine-Snow daily
Oatine-Cream nightly

বি. ঘোষের-

সুবাসিত

নারিকেল তৈল

স্নানে আনন্দ

প্রস্তুতকারক—

ক্যান্টি পারফিউমারি ওয়া

২৭নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

জীবনী ও উপদেশ

সংসারে থাকিয়া কিরূপে ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ভগবানের কৃপালাভ করা যায়, তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ১০০ পৃষ্ঠা, সোনালি বাঁধাই

শ্রীঅমৃতলাল সেন সম্পাদিত। মূল্য ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**দাশগুপ্ত কোম্পানী**, পুস্তক বিক্রেতা

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুখার্জ্জি দত্ত এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ কাগজ-বিক্রেতা

৩১, জ্যাক্‌সন্ লেন, কলিকাতা।

For all sorts of Paper

Ring up

B. B. 3606.

আমাদের আড়তে ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, জার্ম্মাণী, নরওয়ে, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে কাগজ প্রচুর পরিমাণে নিয়মিত রূপে আমদানী হয়, দেশী মিলের কাগজও সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

দর এবং নমুনা চাহিয়া পাঠান।

সকল প্রকার কাগজের জন্য
বড়বাজার ৩৬০৬-এ
ফোন করুন।

Mukherji Dutt & Co.,

PAPER MERCHANTS,

31, JACKSON LANE, CALCUTTA.

বিশ্বভারত গ্রন্থমালা ঃ ঃ

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক **খগেন্দ্রনাথ মিত্রের**

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মাজীর সুসম্পূর্ণ সচিত্র জীবন-কথা। মহাত্মাজীর আত্মজীবনীতে বর্ণিত সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় ও আধুনিকতম ঘটনাবলী সম্বলিত। দাম দেড় টাকা।

অধ্যাপক ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ বসুর

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

বাংলা-ভাষায় বিশ্ববরেণ্য আচার্য্য স্যর ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের একমাত্র বিস্তারিত ও প্রামাণ্য জীবনচরিত। দাম দেড় টাকা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ঋষিকল্প আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একমাত্র প্রামাণ্য বাংলা জীবনী। দাম পাঁচ সিকা।

অধ্যাপক দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের

মহারাজ নন্দকুমার

বাংলার অধঃপতিত যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণ-বীর মহারাজ নন্দকুমারের অভিনব জীবন ও "judicial murder" কাহিনী। দাম পাঁচ সিকা।

সিপাহী যুদ্ধ

বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সুলিখিত ইতিহাস। দাম দেড় টাকা।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

জাতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তি, কংগ্রেস, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ, বিপ্লববাদ, খিলাফৎ ও প্রবাসী ভারতবাসীর ইতিহাস।

'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। দাম আড়াই টাকা।

ভারত-পরিচয়

বর্ত্তমান ভারতের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা। এক কথায়, সমগ্র ভারতবর্ষকে সকল দিক হইতে জানিতে পারিবার মত সকল উপকরণই ইহাতে আছে। মিণ্টো প্রফেসার ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার ও 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ৯০০ পৃষ্ঠা—সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই—দাম পাঁচ টাকা।

অনুপম গল্প-উপন্যাস

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা ঔপন্যাসিক **নিরুপমা দেবীর**

দেবত্র

অনুপম উপন্যাস – দাম তিন টাকা

প্রতিভাশালী কথা-শিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

মাটির ঘর (উপন্যাস)	২৲	নীহারিকা (উপন্যাস	১।০
বাংলার মেয়ে ”	২৲	জোয়ার-ভাটা ”	২॥০
ষোল আনা ”	১৸০	অতসী (গল্প)	১।০
কয়লা কুঠি ”	১।০	মহাযুদ্ধের ইতিহাস	২॥০

"...আধুনিক লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।"—প্রবাসী।

প্রসিদ্ধ কবি ও কথা-সাহিত্যিক **প্রেমেন্দ্র মিত্রের**

পাঁক

বাংলা উপন্যাসে নবসৃষ্টি। দাম একটাকা বার আনা

সুপ্রসিদ্ধ লেখক সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিরচিত

চিত্রবহা

বিচিত্রা :"গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এমন একখানি সত্যকার আবেগ, গভীর ভাবনা ও অনুভূতিপূর্ণ উপন্যাস আমরা পাঠ করি নাই।" ছাপা, বাঁধাই, কাগজ উৎকৃষ্ট চারিশত পৃষ্ঠা দাম দুই টাকা বার আনা।

সুবিখ্যাত কথা-শিল্পী **হেমেন্দ্রলাল রায়ের**

ঝড়ের দোলা

অভিনব উপন্যাস। বর্ণনা বৈচিত্র্যে, মনস্তত্ত্বের নির্ভীক বিশ্লেষণে অপূর্ব্ব। দাম এক টাকা বার আনা।

..."One of the finest creations in our literature."
—Forward

ভাষার জাদুকর, মায়াবী কথা-শিল্পী হেমেন্দ্রলাল রায়ের

রক্তকমল ১৷৴০ **সোনার হরিণ** ১৷৴০

মায়াপুরী ১॥০

"মণীন্দ্রলাল বড় মিঠা হাতে কবিত্ব-সরস ভাষায় গল্প লিখেন।... গল্পগুলি ভাবের বৈচিত্র্যে ও নূতনত্বে, বর্ণনার লালিত্যে ও মোহনতায় পরম উপভোগ্য। মণীন্দ্রলাল বঙ্গ সাহিত্যে গল্প-রচনার একটি নূতন কবিত্ব-রস মধুর-ভাব-বিহ্বল রীতির প্রবর্ত্তক। সুতরাং তাঁহার গল্পগুলি একেবারে স্বতন্ত্র।"—প্রবাসী।

প্রবাসী বুকষ্টল

২১ নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহক

১। বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৸৹ টাকা। ষাণ্মাসিক ২।৶৹ আনা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য।৶৹ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী c/o মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। মাঘ হইতে বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। প্রতি বাংলা মাসের পয়লা তারিখে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ৮ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

৪। জমা-চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ করা হয়। মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনি অর্ডার কুপনে অথবা আদেশপত্রে 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ চাঁদা পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহকসংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। না লিখিলে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পত্র লিখিবার সময়ও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ কথা মনে রাখিবেন।

প্রবন্ধ

৬। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৭। লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

বিজ্ঞাপন

৮। বাংলা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার। বিজ্ঞাপনের হার নীচে দেওয়া হইল।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫৲, ৮৲, ৪॥৹।
বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,

BANGASRLE—Regd. No. C. 2064.

কার্ত্তিক, ১৩৪০

ট্রেড্‌ল মেশিনের মধ্যে

ফিনিক্স সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

Phœnix is fitted with all the latest improvements and is the strongest and most reliable machine for printing at a profitable cost every kind of plain and art printing.

ছাপাখানার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আ
তাঁহাদের সকলেই **রেকর্ড মেসি
নের** কদর জানেন। মুদ্রণ-যন্ত্র-ক্ষেত্রে
রেকর্ডই শেষ কথা। নূতন ও পুরাত
প্রেস-ব্যবসায়ীরা সকলেই রেক
কিনিয়াছেন ও কিনিতেছেন। আমা
দের শো-রুমে আসিলে ইহার কার
আপনিও বুঝিবেন।

ইণ্ডো-সুইস্ ট্রেডিং কোং

২, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।

সুরের জন্য—

"মল্লিক ফ্লুট"

হারমোনিয়মই চিরপ্রসিদ্ধ—

বহুবর্ষের অভিজ্ঞতা ও সুনাম ইহার পশ্চাতে।

গঠন-পারিপাট্যে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয়=

সকল রকম বাদ্যযন্ত্র,

গ্রামোফোন, রেডিও ও সাইকেল বিক্রেতা।

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লক্ষ্মীমার্কা গব্যঘৃত

বিশুদ্ধতায় ও পবিত্রতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

কিনিবার সময়

সূর্য্যাঙ্কিত ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহক

১। বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৸৹ টাকা। ষাণ্মাসিক ২৷৵৹ আনা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵৹ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী C/O মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। মাঘ হইতে বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। প্রতি বাংলা মাসের পয়লা তারিখে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ৮ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

৪। জমা-চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ করা হয়। মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনি অর্ডার কুপনে অথবা আদেশপত্রে 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ চাঁদা পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহকসংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। না লিখিলে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পত্র লিখিবার সময়ও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ কথা মনে রাখিবেন।

প্রবন্ধ

৬। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৭। লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

বিজ্ঞাপন

৮। বাংলা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার। বিজ্ঞাপনের হার নীচে দেওয়া হইল।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১২৲, ৮৲, ৪৷৹।
বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিত্রসূচী—কার্ত্তিক

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[কার্ত্তিক—১৩৪০

কাব্যে সত্য-শিব-সুন্দর

—শ্রীবিনায়ক সান্যাল

সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মে আজকাল আমরা প্রায়ই সত্য-শিব-সুন্দর এই তিনটি কথা একত্র শুনিতে পাই এবং মোটামুটি ঐ কথাগুলির একটি মনঃকল্পিত অর্থ করিয়া লইয়াছি। অনেকেরই বিশ্বাস উক্তিটি উপনিষদের; অবশ্য এ বিশ্বাস কেমন করিয়া আসিল বলা কঠিন। বস্তুতঃ পাণিনির পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে 'সুন্দর' শব্দই কোথায় পাওয়া যায় না এবং ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" খুব প্রাচীন পদযোজনা নহে। সম্ভবতঃ উপনিষদের 'সচ্চিদানন্দই' বর্ত্তমান কালে 'সত্যশিবসুন্দরে' রূপান্তরিত হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, মহাত্মা রামমোহন রায় ঐ শব্দাবলীর একত্র গ্রন্থন করিয়াছেন এবং তাহার পরে ব্রাহ্ম-সমাজের মারফতে কথাগুলি আমাদের দেশে লোকায়ত হইয়া পরিয়াছে। পশ্চিমে প্লেটোই প্রথম "the truth, the good, the beautiful" এই মন্ত্রের উদ্‌গাতা এবং সম্ভবতঃ রাজা উপনিষদের 'সচ্চিদানন্দের' সঙ্গে এই বাণীর ভাবসাম্য দেখিয়া পাশ্চাত্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনোহরণের জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমাজের মন্ত্ররূপে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, সত্যশিবসুন্দরের উৎপত্তি লইয়া আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের মধ্যে উহাদের স্থান কোথায়, ইহাই আমাদের বিচার্য্য।-প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে সত্য, শিব এবং সুন্দর পৃথক্ বস্তু নহে, একই ভাবের বিভিন্ন রূপ। যাহা নিত্য ও শাশ্বত অর্থাৎ যাহা চিরদিনই বর্ত্তমান থাকে তাহাই সত্য। আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানও এই সত্যকে স্বীকার করে, জড়-বিজ্ঞানের মতেও পদার্থের যদি কেবল রূপান্তরই সম্ভব হয়, তবে অধ্যাত্মসত্তার চরম বিনাশ কল্পনা করা কখনই সঙ্গত নহে। হিন্দু শাস্ত্রে অস্তিত্ব-হীনতা বুঝাইতে 'নাশ' বা 'লোপ' (অদর্শন) ব্যতীত অন্য কোন পরিভাষা নাই; কারণ আর্য্য ঋষিরা কোন পদার্থেরই আত্যন্তিক বিনাশ স্বীকার করেন নাই। যাহা চক্ষুর অগোচর তাহা হয় নাই তাহা কেমন করিয়া বলি?

বিজ্ঞানের ন্যায় কাব্যেও আমরা সেই সত্যেরই সাক্ষাৎ লাভ করি। তবে কাব্যে তাহাকে বস্তুরূপে পাই না, পাই ভাবরূপে; পরিচ্ছিন্ন সাময়িক প্রকাশরূপে নহে, পরন্তু স্থান-কালের অতীত এক অবিনশ্বর ভাবরূপে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা ও দার্শনিকের শুষ্ক জিজ্ঞাসালব্ধ সত্য হইতে কবির ধ্যানলব্ধ সত্যের কিছু পার্থক্য আছে। কবি সত্যকে দেখেন সুন্দররূপে, তাহার নগ্নরূপে তাঁহার মন ভরে না।

শুষ্ক জ্ঞানের পথ কবির নহে। জ্ঞানের দ্বারা আত্মার ভেদ-বুদ্ধিই জাগ্রত হয়,—'নেতি', 'নেতি' করিতে করিতে আসলে গিয়া পৌছান কঠিন হইয়া উঠে। তাই বেদান্ত-দর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতের কথাপ্রসঙ্গে বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমের জগতে আমরা পাই যুগপৎ এই ত্রিবিধ মিলন,—আপাত-বিভিন্ন বস্তুসমূহকে দেখি এক মহাতরুর শাখাপত্ররূপে।

সত্য হয় সুন্দর যখন সে আনন্দ দান করে। কেবল ভাব বা কেবল বস্তু আমাদের আনন্দ দিতে পারে না, কারণ বস্তু-নিরপেক্ষ ভাব আমাদের কল্পনার অতীত এবং ভাব-নিরপেক্ষ বস্তু প্রাণহীন জড়পিণ্ড মাত্র। প্রথমটি লইয়া ব্যস্ত দার্শনিক, দ্বিতীয়টির সাধনায় নিরত বিজ্ঞানবিৎ। কবি কিন্তু দুইটির কোনটিকেই ত্যাগ করেন না; তিনি ভাবকে দেখেন বস্তুরূপের মধ্য দিয়া, সত্যকে লাভ করেন রূপ-প্রতিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া। কবি সাকারের উপাসক: ভাব হইতে রূপের পথে এবং রূপ হইতে ভাবের পথে তাঁহার নিত্য অভিসার। সত্য যখন রূপের মধ্যে ধরা দেয়, ভাব যখন প্রতীকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তখনই হয় তাহা সুন্দর। সুন্দর বলিতেই আমরা বুঝি মূর্ত্তি—যাহার রূপ নাই তাহা কখনই সুন্দর হয় না। নিখিল বিশ্ব প্রকৃতি এক মহাভাবের প্রকাশ,—তাই সে সুন্দর।

এই যে বাহিরের প্রকৃতি তরুলতা, হ্রদনদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, আকাশ, বাতাস প্রভৃতি দ্বারা শোভিত, ইহারাই তো সেই

মহাভাবের বিচিত্র ভাষা—এই যে বস্তুপুঞ্জ ইহাদের পশ্চাতে আছে এক মহান্ অর্থ—এক নিগূঢ় সত্য। এই ভাবময়ী ভাষা, অনন্ত অর্থের এই সাকার প্রতীক, ইহার ব্যাখ্যাতা কবি ও শিল্পী। অদৃশ্য হস্তের এই চারুকারু, অমেয় মনের এই সুসীম ভাবনা অনুভব করেন কবি। ভাবকে প্রত্যক্ষ করিবার, সৃষ্টির এই অনাদি অক্ষরের অর্থ গ্রহণ করিবার প্রতিভা আছে একমাত্র কবির। কারণ মানুষের যে-বদ্ধ দৃষ্টি তাহার সত্য-দর্শনের অন্তরায়, কবি সেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইতে মুক্ত। স্বার্থের যবনিকা তাঁহার সম্মুখে নাই—সংস্কারের ধূলিকণায় তাঁহার মনের আকাশ আচ্ছন্ন নহে, তাই বস্তুপুঞ্জের অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁহার মনোলোকে সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়।

এই যে ভাবসত্য যাহাকে দার্শনিকেরা লাভ করেন বুদ্ধি ও বিচারের আনুকূল্যে, কবি তাহাকে পান অনাবিল প্রেমের প্রেরণায়, এবং এই ভাবকে তিনি রূপায়িত করেন কতকগুলি মূর্ত্তির (image) মধ্য দিয়া। প্রেমের স্বধর্ম্ম ভাবকে রূপের প্রতিমায় আরোপ করা, আবার রূপকে ভাবের আকাশে মুক্ত করিয়া দেওয়া। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ভাব কবির মনে রূপের আকারে ফুটিয়া না উঠে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবের সহিত প্রেম হয় না। তিনটি পদার্থের গতি ও ক্রিয়া বুঝাইতে কাগজের উপর তিনটি বিন্দুই হয়ত দার্শনিক অনুভূতির পক্ষে যথেষ্ট; কবি কিন্তু এত অল্পে তুষ্ট হন না। ঐ পদার্থনিচয় যদি জীবনের গভীর অন্ধকারে আলোকপাত না করে, উহাদের গতিবেগের তরঙ্গ যদি আমার হৃদয়ে সঙ্গীতের আনন্দে বাজিয়া না উঠে, তবে উহাদের চলা-না-চলা আমার পক্ষে সমান। এমন কি, একথাও জোর করিয়া বলা চলে না যে রূপ ভাবের অনুগামী হয়। একটা সমপ্রভাব কবির অন্তরে একেবারে আকার লইয়াই আবির্ভূত হয়, কবির হৃদয়-সমুথ এই ভাব যেন মন্থন-সঞ্জাত শশাঙ্ক, সুধালোকে নিখিল প্লাবিত করিয়া উদিত হয়—অথবা এ যেন পরাগ-পাগল পুষ্প-পরিমল বায়ুকে আকুল করিয়াই ভাসিয়া বেড়ায়। সৃষ্টির অন্তরের যে অনির্ব্বচনীয় ভাব তাহা রমণীয় রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির নব নব বৈচিত্র্যের মধ্যে। সাজাহানের প্রেম মর্ম্মর-শতদলে বিকশিত হইয়াছিল বলিয়াই না তাহা এমন অপূর্ব্ব সুন্দর!

সৃষ্টির মধ্যে যে সম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনা তাহা ধরা পড়ে কবির চোখে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবির দৃষ্টি সংস্কার-নির্ম্মুক্ত, উদার ও অবারিত। কিন্তু প্রসারই কবিদৃষ্টির একমাত্র লক্ষণ নহে; ইহা যেমন সুদূর-প্রসারী তেমনই গভীর। রাত্রি-কালীন আকাশ কবির কানে কানে কত কথাই না কহিয়া যায়—সে যেন তাঁহার ভাষা জানে, তাহার সহিত কবির যেন জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়। অন্তর্দ্দৃষ্টির গভীরতা তাঁহাকে বিশ্বরহস্যের দূরতম নেপথ্যে লইয়া যায়, ধ্যানের তন্ময়তা তাঁহাকে অকূল অতলের অতুল রত্নের সন্ধান দেয়। তাই তিনি খণ্ডকে দেখেন অখণ্ড ও সম্পূর্ণরূপে—এক মহাসত্তার প্রকাশরূপে। জগতের ভাবগত ও সৌন্দর্য্যগত ঐক্য আবিষ্কার করাই তাঁহার কাজ। বস্তুকে অবচ্ছিন্নরূপে কল্পনা করা সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়—শব্দকে গন্ধ হইতে, রূপকে রস হইতে পৃথকরূপে অনুভব করা দৃষ্টির অক্ষমতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধ্যানের লোকে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ সব একাকার হইয়া যায়। এক মহাশক্তির প্রকাশ-রূপে আমরা তাহাদের অনুভব করি; বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখি ঐক্য, অশান্তির অন্তরে দেখি 'সুমহান্ শান্তি'। তাপরশ্মি হইতে বিচ্ছিন্ন আলোকরশ্মি যেমন নানা শারীরিক ব্যাধির উপশম করে, সেইরূপ অনন্ত বিক্ষোভ হইতে বিচ্ছিন্ন এই কেন্দ্রগত শান্তি আমাদের আত্মাকে এক অননুভূতপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদে পরিতৃপ্ত করে।

চোখ দিয়া যাহা দেখিতেছি মনের দেখার সহিত তাহা যে হুবহু মিলে না ইহা আমরা স্বতঃই অনুভব করি। যেমন জড়জগতে আণবিক শক্তির আলোড়নে প্রকাশিত হয় বর্ণ, আলোক ও উত্তাপ—যাহা শক্তিমাত্র তাহা যেমন বর্ণ ও আলোকচ্ছটায় বিম্বিত হয়, তাপরূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ যাহা সত্য বা ভাবমাত্র তাহাই আমাদের নেত্রপথে রূপরসাদি বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিরূপে প্রতিভাত হয়। কবির গভীর দৃষ্টি বিষয়সমূহের অভ্যন্তরে অবগাহন করিয়া একেবারে কেন্দ্রে গিয়া উপনীত হয়। তাই তাঁহার পক্ষে চোখ দিয়া শোনা অথবা কান দিয়া দেখা কিছুই বিচিত্র নহে। এই বিশ্ব-শতদলের মধ্যদলে যে মহান্ 'এক' অধিষ্ঠিত আছেন, ছন্দে গানে তুলনা ও উপমায় কবি ক্রমাগত তাঁহারই দিকে ইঙ্গিত করেন। বিশ্বলয়ের বিরাট্ ছন্দে যেখানে তাল ভঙ্গ হয়,

কবির বীণা সেখানে নব নব সুরের সমাবেশ করিয়া সঙ্গীতকে সম্পূর্ণ করে; অসম্পূর্ণ অনুভূতিগুলি যেখানে ছিন্নমাল্যের ভ্রষ্টকুসুমের মত ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া থাকে, কবি কল্পনার স্বর্ণসূত্র যোজনা করিয়া সেইখানে তাহাদের ধ্যানের হারে গাঁথিয়া তোলেন।

শিল্পে, সাহিত্যে অনেকে আছেন বাস্তবতার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে যেমনটি দেখা যায় ঠিক তেমনটিই অঙ্কিত করা হইল শিল্পীর কাজ,—সাহিত্য সমাজের দর্পণ, শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ। কিন্তু কোন বস্তুরই হুবহু অনুকরণ করা সম্ভব নহে—প্রয়োজন অনুসারে শিল্পীকে সংযোগ বিয়োগ কিছু করিতেই হয়। বাস্তব জগৎ প্রয়োজনের জগৎ, তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রধানতঃ শরীরের। কিন্তু সাহিত্যে মানুষ সেই বাস্তব জগৎকে অবিকল সেইরূপই দেখিতে চায় না। প্রয়োজনের বাহিরে যে অবাধ অবকাশ কাজের পরপারে যে আনন্দের লীলা আমাদের মনকে উৎসবের বর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই শাশ্বত উৎসবের সঙ্গীতধ্বনি শুনিবার জন্য আমাদের মন কি কোন দিনই উৎকণ্ঠিত হয় না? প্রত্যহের জীবন সে তো শুধু দেহধারণের জন্য—সেখানে আছে নিত্য অভাব ও অসঙ্গতি, বেদনা ও হাহাকার। তাই সেখানে সৃষ্টির নবীনতা নাই, আছে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু শিল্পে আমরা প্রাত্যহিকের পুনরাবৃত্তি কামনা করি না। আমরা চাই নূতনের সাক্ষাৎ, আনন্দের সন্দেশ। পুরাতনের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া উত্তম দূতীর কাজ হইতে পারে, কবির নহে। কবি কল্পনায় নূতন ধ্যানলোকের সৃষ্টি করেন। এ যেন বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট নূতন জগৎ-সৃষ্টির দ্বিতীয় সৃষ্টি। আমাদের এই আদিম বিশ্বকে কবি নবীন করিয়া কল্পনা করেন ও রমণীয় করিয়া রচনা করেন। তাই কবির বীণায় দুঃখের রাগিণীও মধুচ্ছন্দে বাজিয়া উঠে; সেই অলৌকিক লোকে গভীরতম বিষাদ ও মধুরতম আহ্লাদ বহন করিয়া আনে। সাহিত্য দর্পণকার এই মায়ার নাম দিয়াছেন, "অলৌকিক-বিভাব"। সাহিত্যে বাস্তববাদীও, যদি তিনি প্রকৃত শিল্পী হন, তবে জীবনের সাধারণ প্রতিচ্ছবি দিয়াই ক্ষান্ত হন না। রূপের তুলিকায় যে অপরূপ আলেখ্য তিনি অঙ্কিত করেন তাহা বাস্তবের অপেক্ষা বহুগুণে পূর্ণতর, গভীরতর ও মধুরতর হইয়া উঠে।

কাব্যে বাস্তব বলিতেও বুঝিব সত্যেরই প্রকাশ, তথ্যের নহে। কারণ বস্তু এবং সেই বস্তু সম্বন্ধে অনুবোধ এক জিনিষ নহে। এই অনুবোধেরই নাম সত্য। তথ্য কাব্যের উদ্দীপক হইতে পারে, কিন্তু উপজীব্য নহে। বস্তু যেখানে বস্তুই রহিয়া যায়, অন্তর্গূঢ় ভাবের ইঙ্গিত করে না—সেখানে চিত্র হয় "পট" অথবা "আতপচিত্র," আলেখ্য হইয়া ফুটিয়া উঠে না। সাহিত্যে বাস্তবতার অর্থ বস্তু সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করা—পারম্পর্য্যবিহীন ঘটনাবলীর অনুলিখন মাত্র নহে। একটি বৃক্ষ অথবা মানুষের ছবি যদি আঁকিতে চাই তবে তাহার বাহিরের অবয়বের অবিকল নকল করিলেই যথেষ্ট হইবে না; সেই বৃক্ষ বা মানুষের পার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, যতক্ষণ না উহা একটি প্রচ্ছন্ন ভাবের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়। বাহিরের রূপকে প্রকাশ করিতে যন্ত্রই হয়তো যথেষ্ট, কিন্তু কবির মন্ত্র সেই রূপের অন্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, নির্জীব প্রতিমাকে লাবণ্যের হিল্লোলে লীলায়িত করিয়া তুলে।

শিল্পের 'সুন্দর' 'শিবে'র সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত; অর্থাৎ যে পরিমাণে যে কাব্য সুন্দর সেই পরিমাণে তাহা আমাদের অন্তঃস্থিত কল্যাণের আদর্শকে অভিব্যক্ত করে। এই কল্যাণ শিল্পে যেখানে অবিমিশ্র নীতি অথবা উপদেশের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে সেখানে তাহা দূষণীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কল্যাণ যেখানে স্বভাবের নিয়মেই সুন্দরের মধ্যে জন্মলাভ করে সেখানে রসও অব্যাহত থাকে, অথচ আমাদের মনের স্বয়ং-সিদ্ধ যে কল্যাণবৃত্তি তাহাও যথেষ্ট প্রসাদ ও প্রসার লাভ করে। বস্তুজগতে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য (coherence) অনেক স্থলেই দেখা যায় না। একটি ঘটনা কেন হইল অনেক সময়ে তাহার কোন অর্থই আমরা খুঁজিয়া পাই না—কাজেই তাহা আকস্মিক ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। কল্পনার জগতে কিন্তু আকস্মিকের স্থান নাই, সেখানে দ্রষ্টা বা কবি সমস্ত ঘটনাকে এক অব্যাহত অখণ্ড দৃষ্টিতে উপলব্ধি ও প্রকাশ করেন, সুতরাং সমগ্র ঘটনার প্রত্যেক অংশের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পাঠকের কোন সংশয় থাকে না। এই যে সংহতির সুষমা (symmetry or coherence) ইহা একাধারে সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণ। রামায়ণে রামচন্দ্রের দুঃখের কাহিনীর মধ্যে আছে পরিপূর্ণ কল্যাণের আদর্শ।

স্বেচ্ছাবৃত নির্ব্বাসনের মধ্যে, ব্যক্তিগত চরম দুঃখের মধ্যে সমষ্টির পরম কল্যাণ। তাই না ইহা এমন হৃদ্য এবং অনবদ্য। সীতা-নির্ব্বাসনকে যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনাহিসাবে কল্পনা করা যায় তবে তাহার মধ্যে পাওয়া যায় হৃদয়হীন নির্ম্মমতা। কিন্তু কাব্যগত সমগ্র ঘটনার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে আমরা পাই শিব-সুন্দরের অনির্ব্বচনীয় অনুপ্রেরণা; সেখানে আছে রাজ্য ও প্রজা-সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত রাজাধিরাজের অপূর্ব্ব স্বার্থবিসর্জ্জন—আরাধ্য দেবতার মঙ্গলের মুখ চাহিয়া স্বামি-সর্ব্বস্বা সতীর জ্বলন্ত আত্মাহুতি। কালিদাসের কাব্যে আষাঢ়াকাশের সঞ্চীয়মান ঘনঘটা যদি নিখিল-ধরণীর পিপাসা-শান্তির আশ্বাস বহন না করিয়া কেবল যক্ষেরই বিরহোপশমের কারণ হইত—কবিপ্রেরিত মেঘদূতের সান্ত্বনাবাণী বিরহান্তে যদি আমাদেরও ভাবি-মিলনের সূচনা না করিত তবে তাহা কখনই এমন হৃদয়সংবেদ্য হইত না। দুঃখ যদি কেবল দুঃখ হইয়াই থাকিত তবে তাহার জন্য আমরা কি বিন্দুমাত্রও ব্যাকুল হইতাম? অলঙ্কারশাস্ত্রে যাহাকে অলৌকিক-বিভাবত্ব বলা হইয়া থাকে তাহার অর্থ হইল দুঃখকে ক্ষেমে, বীভৎসতাকে প্রেমে পরিণত করা—সঙ্গতিহীন লৌকিক সংস্থানকে ভাবের স্বর্গে সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস করিয়া কল্পনা করা, এক কথায় জীবনের সকল ঘটনার মধ্যেই আনন্দের সুমধুর সুরটি ভরিয়া দেওয়া।

মম্মটাচার্য্য বলিয়াছেন, কাব্যের একটি গুণ 'শিবেতরে'র অর্থাৎ দুঃখের নাশ; কিন্তু সেই দুঃখনাশ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইবে কান্তাসদৃশ মধুরতাযুক্ত উপদেশ দ্বারা। শব্দ প্রধানতঃ তিন প্রকারের; প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত এবং কান্তাসম্মিত। প্রভুসম্মিত যে বাক্য তাহাকে আমরা ভয় বা শ্রদ্ধা করি, সুতরাং তাহার প্রভাব মানবজীবনে খুবই সামান্য। যেমন বেদ-বাণী, ইহাকে আমরা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করি কিন্তু ইহা আমাদের চিত্তকে সুধারসসিক্ত করিতে পারে না। সুহৃৎসম্মিত পুরাণেতিহাসের উপদেশও আমাদের জীবনে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে না; তাই আচার্য্যপাদ কাব্যের প্রসঙ্গে প্রিয়ার অনুরূপ উপদেশের কথা বলিয়াছেন। অমোঘ ইহার প্রভাব—আশ্চর্য্য ইহার ব্যাপ্তি। ললিতপদ-কদম্বসন্দীপিত কবিকথা কানের ভিতর দিয়া আমাদের মর্ম্ম-কুহরে প্রবেশ করে এবং আনন্দঘন চৈতন্যের উদ্বোধন করে। কাব্য সেই সুদুর্লভ বচন একমাত্র যাহার মধ্যে 'হিত' এবং 'মনোহারী'র অঙ্গাঙ্গি-মিলন সম্ভব হয়।

মূলতঃ অনন্তের সহিত অভিন্ন হইয়াও যে মানুষ কার্য্যতঃ ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, ইহারই মধ্যে তাহার নৈতিক জীবনের প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে। জীবনের মধ্যে এই যে একটা বিরোধ—অনন্ত হইয়াও যে মানুষ সান্ত—এই বিরোধ পরিহার করিবার অর্থাৎ ঐ আদর্শের অনন্তকে আপনার মধ্যে কার্য্যগত জীবনে পরিণত করিবার যে-চেষ্টা তাহাই তাহার নৈতিক জীবন। ব্যক্তিগত জীবনকে বিশ্বজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত করিয়া না দেখিলে তাহার ক্ষুদ্রতা ঘুচে না, ফুল যদি ফুল হইতে বিচ্ছিন্নই রহিয়া যায়, তবে তাহার মালাকারে পরিণতি কখনই সম্ভব হয় না। তাই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত একত্বকে উপলব্ধি করিতে হইলে আত্মাকে ব্যক্তিগত জীবন হইতে বিশ্বজীবনে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। বাস্তবিক ব্যক্তি ও সমাজ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ নহে—একই অখণ্ড বস্তুর দুইটি দিক। কবির বীণায় নিখিলের এই চিরন্তন মিলনের বাণীই ধ্বনিত হয়।

বিখ্যাত কবি ও সমালোচক মেথ্যু আর্নল্ড একস্থলে বলিয়াছেন, জীবনের উপর অধ্যাত্মভাবের অধ্যাসের নামই কাব্য (application of moral ideas to life), অবশ্য "moral ideas" বলিতে তিনি নীতি বুঝেন নাই অথবা নীতিমূলক কাব্যকেও তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দেন নাই। তাঁহার মতে জীব-জীবনের সহিত যে-ভাবের কোন সংযোগ নাই—যে ভাব মহাশূন্যেই নিয়ত ঝুলিতেছে সে ভাব, যত মহানই হউক না কেন, কাব্যের সম্পদবৃদ্ধি করে না; কেন না, জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন যে ভাব তাহা আমাদের কাছে নিরর্থক সুতরাং প্রকাশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ঐ যে দূরতম নীহারিকা মহাকাশে দুলিতেছে, আমার কাছে উহার কোন অর্থই থাকে না, যদি ঐ নক্ষত্রলোকের ভাষার সহিত আমার অন্তরের ভাষার কোন মিল না থাকে। বৈজ্ঞানিক উহার সংস্থান, পরিমাণ ও গতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কতকগুলি "সামান্য গ্রহের" আবিষ্কার করেন কিন্তু তাঁহার ঐ আবিষ্কারে জগতের যত উপকারই হউক, উহাকে কাব্য কিছুতেই বলা চলে না। বিজ্ঞানের স্বাভাবিক গতি সামান্য হইতে বিশেষে, কাব্য চলে বিশেষ হইতে সাধারণে; যাহা কবির একান্ত নিজস্ব তাহা কাব্যমায়ায় সহজেই সকলের হইয়া যায়।

কিন্তু যেখানে এই মঙ্গলকে কেবলমাত্র শীলোপদেশে পর্য্যবসিত করা হয় সেইখানেই কাব্য হইয়া পড়ে তত্ত্ব—সত্য হইয়া যায় তথ্য, শ্রদ্ধা আসে, সম্ভ্রম আসে; কিন্তু আনন্দ অলক্ষ্যে দূরে পলাইয়া যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত মহত্তম কবিও সময়ে সময়ে তাঁহার কাব্যে নীতিকে কল্যাণ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন এবং অজ্ঞাতসারে নীরস নীতিতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। যেখানে তিনি বলিয়াছেন "his everlasting purposes embrace all accidents converting them to good" সেখানে তাঁহার কাব্য রসহীন দর্শনে পরিণত হইয়াছে। কারণ "ভগবান আছেন এবং তিনি আমাদের সকল কর্ম্মকেই কল্যাণের পথে লইয়া যাইতেছেন" এই উক্তির মধ্যে আবেগের গাঢ়তা, কল্পনার বর্ণরাগ কই—প্রকাশরূপের মধ্যে বিষয়ের অতীত বস্তুর ধ্বনিই বা কোথায়? ইহাতো শুভসুন্দরের স্তবগান নহে—ইহার মধ্যে অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় নাই। ইহা নিতান্তই জিহ্বামূলীয়। ললিত-গীতির কলিতকল্লোল ইহা নহে। তাই শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে সুন্দরের আসন সর্ব্বাগ্রে এবং তাহার সঙ্গে থাকে মঙ্গল। তাই চারুশিল্পে প্রথম ও প্রধান কথাই প্রকাশ, সৌন্দর্য্যের দৃষ্টিকোণ হইতে সত্যমঙ্গলের একাত্মদর্শন। কান্তাসম্মিত কথাটির মধ্যে এই রসসম্পৃক্ত প্রকাশেরই ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। এই প্রকাশই সত্যবস্তুকে সুন্দর করে, ক্ষেমকে প্রেমে পরিণত করে—সংসারের মরুপ্রান্তরে সুরধুনীর সুধাধারা বহাইয়া দেয়।*

তবে একথাও ভুলিলে চলিবে না যে শিল্প-সৃষ্টির উপভোগের কালে বস্তু-অবস্তু, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নই আসে না। সে একটা পরম মুহূর্ত্ত যখন আমরা আমাদের অতীত-ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া আনন্দঘন বর্ত্তমানকে লইয়া বিভোর থাকি; কথা সেখানে অর্থকে অতিক্রম করে—অর্থ সেখানে সুরের মাঝে হারাইয়া যায়—মানুষের সমস্ত অতীত ও অনাগত সেখানে মুছিয়া লেপিয়া একাকার হইয়া যায়। মানুষের গতি এখানে বিলম্ব-ভয়ভীত, অফিসচারী কেরাণীর অসংলগ্ন পদক্ষেপ মাত্র নহে,—নির্ভীক ও নির্ম্মুক্ত জীবের জীবনানন্দে আন্দোলিত নৃত্যভঙ্গিমা। কিন্তু তবুও যতই কামনা করি ব্যবহারিক জীবনের প্রসঙ্গ হইতে একান্ত মুক্তি মানুষের নাই;—তাপ জুড়াইয়া যায়, আবেগও শান্ত হয় এবং সেই চিরন্তন প্রশ্ন বারম্বার আমাদের মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলে,—যাহা পাইলাম তাহাতে আমার বা মানব-সমাজের জীবনাদর্শ উন্নীত হইল কতটুকু? উড়িয়া চলা বন্ধ হইলে আবার পায়ে-হাঁটা আরম্ভ হয়—আবেগের সুরে প্রাণের আলাপ থামিয়া গেলে কাজের ভাষায় হয় নিত্যকার প্রয়োজনের কারবার। হৃদয়ের ছবিকে দেখি বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ হইতে—সুতরাং সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে; এবং এই বিচারের দ্বারাই চারুশিল্পের আয়ুঃ নিরূপিত হয়।

কিন্তু যখন শুনিলাম, "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্" তখন কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হয়তো ক্ষণিক জাগিল, কিন্তু প্রাণ তাহাতে সাড়া দিল না। নীরস উপদেশ মস্তিষ্ক হইতে হৃদয়ের তীর্থে যাত্রা করিয়া পথের মাঝেই পথ হারাইল! মোহমুদ্গরের মুদ্গরের আঘাত জগতে কয়জন সহ্য করিতে পারিয়াছে—আর আঘাতের পরেও যে সকল ভাগ্যবান্ বাঁচিয়া আছেন কয়জন তাঁহাদের মধ্যে তাহার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াছেন? কাব্যের অমৃত-সঙ্গীতে চিত্তবীণায় যদি সুরতরঙ্গই না উঠিল—ভাবের রসোল্লাসে জীবন-সাগরে যদি জোয়ারই না জাগিল—জনে জনে, মনে-মনে কবিচিত্তের দীপ্ত মণি যদি দুঃখের অন্ধকারে অন্তহীন আলোকের উচ্ছ্বাসই না আনিল, তবে তাহার সার্থকতা কোথায়?

দেহের সহিত দেহীর, তনুর সহিত মনের, সুন্দরের সহিত সত্যের এই যে নিত্য নিবিড় সম্বন্ধ ইহাকেই কীট্‌স্ বলিয়াছেন সৌন্দর্য্য, শেলী বলিয়াছেন প্রেম, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন আত্মা, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন জীবনদেবতা। সত্যকে যখন আমরা ভালবাসি তখন সে হয় সুন্দর অর্থাৎ সত্য তখন অনিরূপ্য ভাবের অবস্থা হইতে কবির হৃদয়ের ছাঁচে সুনির্দ্দিষ্ট রূপের আকারে প্রস্ফুটিত হয়। যেমন জলের নিজের কোন আকার নাই আধার অনুসারে তাহার রূপের পরিমাপ হয়, তেমনই ভাবময় সত্যবস্তু কবির হৃদয়াধারে রূপময় অমৃতের

* ইংরাজিতে যাহাকে Poetic Justice বলা হয় সে জিনিষটি কি? সাধারণ ব্যবহার-শাস্ত্রের বিচার অথবা বিচারের নামে স্বৈরাচার তাহা নিশ্চয়ই নহে। জীবনের পরিণতি ও পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে কবির যে অলৌকিক ধারণা, অন্তর্লীন প্রতিভাবলে তিনি তাহার অনুকূল এমন একটি অপূর্ব্ব পরিমণ্ডল রচনা করেন যে ঘটনাসমূহ স্বভাবের নিয়মেই সেই চরম আদর্শে গিয়া মিলিত হয়।

আকারে ক্ষরিত হয়। সত্য বিশ্বজনীন; সুন্দর, কবির একান্ত আপনার হইয়াও, সকলের। এই যে প্রেম বা প্রাণ, আনন্দ বা জীবন ইহার কাজই হইল সৃষ্টি অর্থাৎ আত্মাকে বহুলরূপে, বিচিত্ররূপে প্রকাশ। ভূমার আনন্দ হইতেই তো এই অনন্ত নক্ষত্রসনাথ বিশ্বের প্রকাশ, চিন্ময়-লোকে যিনি ধ্যানাসনে আসীন প্রেমলোকে তাঁহাকে রূপ প্রতিমায় অধিষ্ঠিত দেখিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। অরূপের সঙ্গে প্রেম চলে না, তাই না অপরূপের সৃষ্টি! বাস্তবিক মানুষের অৰ্দ্ধেক ভাব এবং তাহার অবশিষ্টাংশ প্রকাশ।

দেহ ও দেহীর এই মিলনের গান গাহেন কবি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও ঐক্যের ভিতরে বিচিত্রতার সুর-সাধন কবির। জগতের আদি কবিতা তো অনাদিকাল হইতেই লিখিত আছে, সেই মহাকাব্যের অন্তরালে যে গোপন অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই আবিষ্কার করেন কবি এবং তাহার ব্যঞ্জনা করেন মানুষের ভাষায়, মানুষের রূপে, শাশ্বত মানব কবি, তাঁহার বাণী যুগযুগান্তরের তমিস্রা ভেদ করিয়া আলোকের জয়গান গাহিয়া চলে—কল্পকালের আকুল আশা তাঁহার সঙ্গীতে ভাষা পাইয়া অমর হইয়া যায়।

কিন্তু কেবল ধ্বনি বা কেবল বর্ণ ই শিল্প নহে। চিন্ময় আকাশের ঈথর-স্রোতে ভাবের বিদ্যুৎ যখন শব্দ ও বর্ণে রূপান্তরিত হয় তখনই হয় শিল্প, তখনই হয় সঙ্গীত। কাব্য, ভাবের একটি তীক্ষ্ণ ও তীব্র অনুভূতি যাহা কোন জীব অথবা উদ্ভিদাত্মার মতই একটি রূপকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না এবং রূপসমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজের ঊর্ম্মিটি জুড়িয়া দেয়। বস্তুতঃ কবির দৃষ্টিতে ভাব ও রূপ, সত্য ও সুন্দর এক বস্তু, সত্যের সুন্দরে রূপান্তর, ঠিক যেন তড়িতের শব্দে রূপান্তর; সহজে এবং স্বভাবের নিয়মেই তাহা সংঘটিত হয়। বাইবেলে একটি কথা আছে—ভগবান্ মানুষকে নিজের প্রতিমায় (ছায়ায়) গড়িয়াছেন, কথাটি একটু উল্টাইয়া বলিলে বোধ হয় আরও সঙ্গত হইত; "মানুষ ভগবানকে নিজের রূপে গড়িয়াছে", অর্থাৎ যিনি অরূপ প্রেমের অধিকারে মানুষ নিজের 'ছাঁদেই' তাঁহাকে রচনা করিয়াছে। তাই মধুর রসের সাধক বৈষ্ণবকবিকুল উপাস্যকে হৃদয়াসনে পরমাত্মীয়রূপে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই প্রেমের প্রতাপ; ইহা মর্ত্ত্যকে স্বর্গে পরিণত করে, স্বর্গকে ধূলিময়ী ধরণীর ক্রোড়ে টানিয়া আনে। মহান হইতেও যিনি মহান তিনি অণু হইতেও অণু হইয়া যান।

এবারে প্রকাশের কথা (আর) একটু বলি। বস্তুসত্তার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য নিহিত আছে প্রকাশের সুষমায় তাহা মধুর ও নূতনতর সৌন্দর্য্যের আভাস লইয়া আসে। বস্তু-প্রতিমা ভাবের আধার রূপে প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহার মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য অভিনব শক্তি অনুভূত হয়; প্রয়োজনের জগতে, বংশ-নালিকা কেবল তৈলাধারের কার্য্য করে, কিন্তু তাহারই রন্ধ্রমুখে সঘন চুম্বন দিলে বিবশ বংশী অপূর্ব্ব আবেশে বাজিয়া উঠে। প্রতীকের সাহায্যে অনেক সময়ে কবি এমন নিগূঢ় ভাবসৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জনা করেন যাহা তাহার বস্তুগত সৌন্দর্য্যকে বহু গুণে অতিক্রম করিয়া যায়, যেমন শুভ্র শতদলকে যখন দেখি জ্ঞান ও পবিত্রতার মূর্ত্ত প্রকাশরূপে তখন তাহার ভাবগত সৌন্দর্য্য কি আমাদের প্রাণে অনন্তের ইঙ্গিত আনিয়া দেয় না? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই তো সেই অদৃশ্য শিল্পীর সীমাহীন আনন্দের প্রতীক; প্রতীক বলিয়াই সে সীমার মধ্যেও অসীমের ব্যঞ্জনা করে। বিশ্বরঙ্গালয়ে দর্শকের আসনে বসিয়া কবি দেখেন রহস্যময় নেপথ্য হইতে কেমন করিয়া এই সুনিপুণ অভিনেতা নানা বেশ ও নানা ভূমিকায় ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মন ভুলাইয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছেন।

ভাবুক লোক তো অনেক আছেন, নিসর্গশোভায় আবেষ্টনে বাস করেনও অনেকে; কিন্তু তাঁহাদের আমরা কবি বলি না। কারণ তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশশক্তির অভাব। এই প্রকাশের অক্ষমতা আসিয়া পড়ে অনুভূতির অসম্পূর্ণতা হইতে; ভাব যেখানে কুহেলির মত নীচের আকাশকেই আবৃত করিয়া আছে সেখানে উপর হইতে ধারাবর্ষণের আশা করা কেবল অন্যায় নয়, অসম্ভব। তাই প্রকৃতিকে নিজের চোখে দেখিয়া যে আনন্দ তাহার অপেক্ষা কবির দৃষ্টিতে দেখিয়া আনন্দ অনেক অধিক; মনে হয় যেন সেই দেখাই আমার সত্যকার দেখা, এমন করিয়া আর কখনও দেখি নাই। সমগ্র প্রকৃতি-রাজ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যাহার মধ্যে সমগ্রতার সৌন্দর্য্য নিহিত না আছে। তাই ঋষি কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গাহিয়াছেন—

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

কাননের ক্ষুদ্রতম কুসুমও আমার প্রাণে অশ্রুর অতীত ভাবের

আভাস আনিয়া দেয়। অংশের মধ্যে সমগ্রতার প্রকাশ কবি ভিন্ন আর কে দেখাইবে? সাধারণের চিত্তবৃত্তি সুপ্ত, কবি "সোনার কাঠির" 'পরশ' দিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলেন, তখন কবির ভাব আমার হইয়া যায়, একের আনন্দ নিখিল-হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় রসে উল্লসিত হইয়া উঠে।

কিন্তু যাহাকে সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়। পরিস্ফুট হইলেই সকল জিনিষ সুন্দর হয় না। যাহার আদ্যন্ত সমস্তই দেখিতে পাই যাহার সবটাই অবিকল ব্যক্ত করিতে পারি তাহার অপেক্ষা যাহা সূক্ষ্ম-সুকুমার, যাহা প্রকাশের অতীত তাহাই রহস্যের মায়ায় আমাদের মুগ্ধ করে। জগতে যে মানুষকে সহজেই বোঝা হইয়া যায় চলিত কথায় তাহাকে বলা হয় "বোকা," তাহার কোন আকর্ষণ নাই, রূপসৌষ্ঠব বর্ণবৈচিত্র্য কিছুই তাহাকে আমাদের কাছে প্রিয় করিতে পারে না; অপিচ যে-তন্বঙ্গীর শ্যামল শোভা ও নীলিম নয়ন রহস্যের অতলতায় অসীম ও অনবগাহ, সে অনায়াসেই আমাদের মনোহরণ করে। বিশ্ব-প্রকৃতির সবটাই যদি উপলব্ধ হইয়া যাইত তবে তাহাকে বুঝিবার জন্য আগ্রহ আদৌ থাকিত না, বহু অধীত পুথির মতই তাহা হইত জীর্ণ ও অনাবশ্যক। সত্যকার কবির কাব্য যত বারই পড়ি তাহা কখনও পুরান হয় না, প্রত্যেক বারই তাহা অনির্ব্বাচ্য সঙ্কেতে আমাদের নব নব আনন্দলোকে লইয়া যায়, তাহার পীযূষবর্ষণের আর বিরাম থাকে না। অনন্তের অন্তরের যে অশ্রান্ত সঙ্গীত অনাদিকাল হইতে ধ্বনিত হইতেছে তাহারই দু' একটি সুর কবি-বীণা হইতে কবে নিখিল মানবের হৃদয়ে লাগিয়া অমৃতধারায় ঝরিয়া পড়িবে আজিও জগৎ নির্ণিমেষে তাহারই প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে।

নাৎসি-কম্যুনিষ্ট সংঘর্ষে হত প্রাসিয়ান পুলিশ কর্ম্মচারীর শবাভিযান। [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

নাৎসিদের কথা

—শ্রীকরুণা মিত্র

গত যুদ্ধের পর য়ুরোপের লোকেদের মনে হয়েছিল যে আর যুদ্ধ হবে না। সে আশা যে কতটা ভিত্তিহীন তা' কয়েক মাস পূর্ব্বে নাৎসিদের জয়ের আগে বোঝা যায় নি। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই মেঘ কেটে যাবে অথবা পৃথিবীতে তা' প্রলয়ের কারণ হ'বে কিনা, বলা শক্ত, তবে তা'তে প্রলয়েরই সম্ভাবনা বেশী আছে বলে মনে হয়। জার্ম্মানীর যে উগ্র জাতীয়তা ১৯১৪ সালের

ঝটিকাবাহিনীর দুর্জ্জয় সাহস, নিষ্ঠা ও বীরত্বের প্রশংসা করিয়া হের হিট্‌লার বার্লিনের নাৎসি-জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দিতেছেন।

যুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়েছিল তাই আজকে আবার নাৎসিদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। ক্যাপ্‌টেন গোরিং এসেন সহরে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেছেন যে গত যুদ্ধে জার্ম্মানরা যে আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছে, জীবিত জার্ম্মানদের তাহা সম্পূর্ণ করা কর্ত্তব্য এবং সেই চেষ্টা যদি অন্য উপায়ে বিফল হয় তবে তা' যুদ্ধের দ্বারা সফল করতে হবে (**they must be ready to redeem with blood a pledge written in blood**)। ১৯১৮ সালে, ঠিক যুদ্ধের পর কিন্তু এই মনোভাব ছিল না ; নভেম্বর মাসের বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। য়ুরোপে সত্যকার আন্তর্জ্জাতিক মনোভাব তখনকার দিনে ছিল শুধু জার্ম্মানীতে, কিন্তু ১৯৩৩ সালে সেই দেশেই নতুন করে রণসজ্জা হচ্ছে আর একটি যুদ্ধের জন্য। এর কারণ কি? এর কারণ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি 'মিত্র-শক্তি'বর্গ জয়ের নেশায় চিন্তাশক্তি হারিয়ে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি না রেখে, জার্ম্মানীর প্রতি প্যারিসসন্ধির সর্ত্তগুলিতে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তারপর জার্ম্মানীর অক্ষমতা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে পুরোমাত্রায় ক্ষতিপূরণ আদায় ও সেই অজুহাতে তার ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করার চেষ্টা ক'রে যে অশান্তির বীজ বপন করেছিলেন, সেই বীজ আজ নাৎসিদল-রূপ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। ১৯১৮ সালের বিপ্লবের ফলে যে বিভিন্ন দল দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করে, তারা শান্তিপ্রিয় ছিল। গত কয়েক মাসের মধ্যে নাৎসিদের অত্যাচারে তারা বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণ হয়েছে।

হিট্‌লারের জয়ের কারণ বুঝতে হলে কতকগুলি ব্যাপার জানা দরকার এবং এও মনে রাখা উচিত যে নাৎসিদের বিপ্লব পাল্টা-বিপ্লব (**counter-revolution**) মাত্র। প্রথমতঃ, ১৯১৮ সালের নভেম্বরে যে বিপ্লব সাধিত হয় তা' অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিপ্লবে রাজতন্ত্রের অবসান হয় কিন্তু গণতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস-সাধন হয় নি ; বরং এবার্ট, শাইডেমান্, নস্‌কে প্রভৃতি নেতারা মজুর ও সৈনিকদের প্রতিষ্ঠিত 'শোভিয়েট'গুলি দমন করবার জন্যে কাইজারের সমর-বিভাগের নেতাদের সাহায্য নেন। ফলে সোশ্যালিষ্টদের মধ্যে মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করে এবং পাকাপাকি ভাবে দুই দলের সৃষ্টি হয়। এই কারণে গণতন্ত্রের সমর্থনকারীরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে ও পুরাতন তন্ত্রের সমর্থনকারীরা শক্তি সংগ্রহ করে। ক্রমশঃই এই শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৫ সালে প্রেসিডেন্ট এবার্টের মৃত্যুর পর ফন্ হিণ্ডেনবুর্গ তাঁর স্থানে নির্ব্বাচিত হন এবং প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের সহায়তায় গণতন্ত্রের অবসান হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের পর মার্কের মূল্য হ্রাস হওয়ায় জার্ম্মানীর যুদ্ধ-ঋণ প্রায় একেবারে পরিশোধ হয়ে যায় ; কিন্তু তার মধ্য-বিত্ত শ্রেণী ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। উপরন্তু, ১৯২৯ সাল

থেকে সমগ্র জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে পড়ে ও গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে দেশে অসন্তোষ বাড়ে।

তৃতীয়তঃ, যে সব দলপতিরা দেশের শাসন কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা নিজেদের দুর্ব্বলতার দরুণ অরাজকতা দমন করেন। যখন শান্তি স্থাপন হয় তখন তিনি হাসপাতালে। ১৯২০ সালে সৈন্যদল থেকে বরখাস্ত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে তিনি সোশ্যালিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন কিন্তু মুসোলিনির মত শীঘ্রই ঐ

হেডকোয়াটার্স ব্রাউন হাউসে চান্সেলার হিটলার সাংবাদিকগণের সহিত আলাপ করিতেছেন।

হিটলার-মন্ত্রি-সভার অর্থনীতি-বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর হুগেন-বার্গ।

বিগেড জেনারেল ভন রোয়েমের সহিত রাজনৈতিক আলোচনারত হিটলার।

বার্লিনের এই পুলিশ-বাহিনী বমেলোপ্রাৎসে কম্যুনিষ্ট দমনে প্রেরিত হইয়াছিল

করতে পারেন নি। নতুবা যে হিটলার ১৯২৩ সালে মিউনিকে ফ্যাসিষ্ট শাসন-তন্ত্র গঠন করবার চেষ্টা ক'রে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন সেই হিটলারই যে দশ বছরের মধ্যে জার্ম্মানীতে সর্ব্বশক্তিমান হবেন এরূপ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য হ'ত যদি-না সোশ্যালিষ্ট ও অন্যান্য নেতারা আশ্চর্য্যরকম দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেন।

* * * *

এখানে হিট্‌লার ও নাৎসিদের গোড়ার কথা একটু বলা দরকার। ১৯১৮ সালে ইপ্রেস, Ypresএ ব্রিটিশদের একটি আক্রমণের সময় গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে হিট্‌লার ট্রেঞ্চ ত্যাগ দল পরিত্যাগ করে মিউনিককে কেন্দ্র ক'রে একটি ফ্যাসিষ্টদল গঠন করেন। জার্ম্মানীর আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন ও যুদ্ধে হারানো আন্তর্জাতিক পদমর্য্যাদা ফিরিয়ে আনা এই দলের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর একটি উদ্দেশ্যই প্রধান বলে পরিগণিত হতে পারে। ১৯১৮ সালের বিপ্লবকে ধ্বংস করা ও তার আংশিক সাফল্যের জন্য ও যারা দায়ী সেই

সোশ্যালিষ্টদের শাস্তি দেওয়া, এই উদ্দেশ্য। অল্প কথায় নাৎসিদের পরিচয় দিতে হ'লে বল্‌তে হয় যে, তাদের লক্ষ্য, (outlook) প্রতিক্রিয়ামূলক (reactionary)। ১৯১৮ সালের বিপ্লবের ফলে জার্ম্মানজাতি যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ করে (এবং যে স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা ইতিহাস
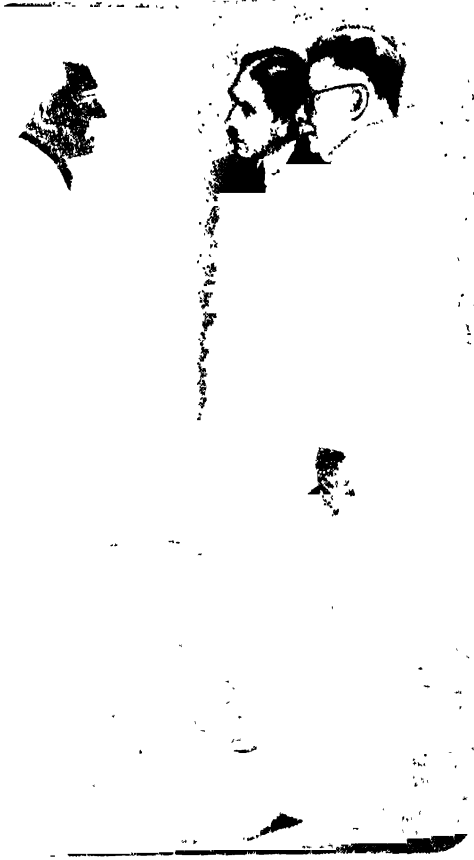
চ্যান্সেলার নিযুক্ত হওয়া হিট্‌লার পূর্ব্বতন চান্সেলার পাপেনের সহিত জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ করিতেছেন।

রচনা ক'রে নাৎসিরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে) সেই স্বাধীনতার একান্ত শত্রু নাৎসিরা। আরও দেখা যায় যে, প্রবল "ইহুদী-বিদ্বেষ জাতীয় আন্দোলনের মূলে। প্রত্যেক নাৎসি ইহুদীদের শত্রু।" * নাৎসিরা সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের বিরোধী কিন্তু এরা নিজেদের সমাজতন্ত্রবাদী ব'লে পরিচয় দেয়। "ন্যাশানাল সোশ্যালিষ্টদের প্রোগ্রাম পতাকায় প্রতিফলিত হয়েছে। লাল রঙে আমরা আন্দোলনে সমাজতন্ত্রের নীতি দেখি, সাদায় জাতীয়তার ভাব দেখি এবং স্বস্তিকে আর্য্যজাতির যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্য দেখি, আর দেখি তারই সঙ্গে সৃষ্টির কল্পনা যা' চিরদিনই ইহুদীভাব বর্জ্জিত।"†

* * * *

১৯৩৩ সালের পাল্টা-বিপ্লবের আগে নাৎসিদের অনেকেই তুচ্ছ জ্ঞানে অবজ্ঞা করেছিলেন এবং এই প্রকার মত প্রকাশ করেছিলেন যে এরকম পাগ্‌লামি স্বাভাবিক, যেহেতু জার্ম্মানরা যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পর অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে মানসিক অ-স্থিরতা (বিকার ?) লাভ করেছে। কিন্তু নাৎসিদের অভাবনীয় জয়ের পর এই অবজ্ঞা সোজা ও কঠিন বিরোধে পরিণত হয়েছে। অন্তঃসারশূন্য ন্যাশনাল সোশ্যালিজম্-এর অস্তিত্ব ও অসভ্য কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলাবার দরকার হওয়ায় নাৎসি-নেতারা মার্ক্স-পন্থার (Marxism) প্রতি তাঁদের বিরুদ্ধতাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ২রা ফেব্রুয়ারী হিট্‌লার বলেন—"এখানে (মানে জার্ম্মানীতে) মাঝামাঝি কোন পথ নেই; হয় বলশেভিজম্-এর লাল পতাকা শীঘ্রই উত্তোলিত হবে নতুবা জার্ম্মানী তার সত্তা ফিরে পাবে।" তিনি আরও বলেন, যে, চার বছরের মধ্যে জার্ম্মান কৃষকদের দুর্দ্দশা থেকে টেনে তুল্‌তে হবে এবং দেশের বেকার অবস্থার প্রতিকার করতে হবে। "মার্ক্স-এর পন্থা চোদ্দ বছরে জার্ম্মানীকে অধঃপাতে নিয়ে গেছে। বলশেভিজম্ এক বছরে তাকে ধ্বংস করবে। জার্ম্মানী কোনমতেই অরাজক, anarchical সাম্যবাদে মগ্ন হবে না এবং জাতীয় নীতি অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট চার বছরে চোদ্দ বছরের ভুল সংশোধন করতে বধ্যপরিকর।" নাৎসিদের ইতিহাস অনুধাবন করলেও দেখা যায় যে মার্ক্স-এর মতবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্যই ফ্যাসিজ্‌ম্, fascismএর জন্ম। প্রথমে হিট্‌লার যুদ্ধের ফেরত সৈনিকদের মধ্যে আন্দোলন করেন কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই সমাজের নিম্ন স্তরের লোকেরা (সাধারণত গুণ্ডামি ক'রে বেড়ান যাদের কাজ সেই জাতির লোক) হিট্‌লারের দল পুষ্টি করে। এদের কাজ ছিল কলের মজুরদের নানারকম অনিষ্ট ও উৎপীড়ন করা। বড় বড় কলকারখানার মালিকেরা

* Programme of the party of Hitler by Gottfried Feder. p. 26.

† Adolf Hitler's "Mein Kampf" p. 141.

এই আন্দোলনে নিজেদের সুবিধা বুঝতে পেরে নিয়মিত ভাবে হিট্‌লারকে অর্থসাহায্য করেন। হিট্‌লারের পৃষ্ঠপোষকের দল কেবলমাত্র জার্ম্মানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমেরিকার কয়েকজন কলকারখানাওয়ালা তাঁকে সাহায্য করেন। শীঘ্রই মুক্তিলাভ ক'রে নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সালে তাঁর দল রাইস্‌ষ্টাগের (রাষ্ট্রীয় সভার) নির্ব্বাচনে ১০৭টি সদস্য-পদ লাভ ক'রে সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতার দরুণ

বার্লিনের নব-নিযুক্ত পুলিশের কর্ত্তা কাউণ্ট হেলডর্ফ।

ফ্রান্সের নূতন মন্ত্রি-সভা : সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান মন্ত্রী দালাদিয়ের (Daladier)

দালাদিয়েরের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী আবে মুর্‍্যালিস নিজের আবিষ্কৃত ফোল্ডিং ষ্টোভের ব্যবহার-পন্থা সাংবাদিকগণকে বুঝাইতেছেন

কাইসার মন্ত্রি-সভা উচ্ছেদ উদ্দেশ্যে মিলিত পাপেন ও হিট্‌লার।

বিশেষতঃ একজন জগদ্বিখ্যাত আমেরিকান ধনকুবের একটি ইহুদী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে হিট্‌লারকে প্রভূত অর্থসাহায্য করেন। হিট্‌লার এই সব টাকা দিয়ে আন্দোলনের প্রচারকার্য্য বাড়িয়ে তোলেন ও হাজার হাজার বেকার যুবকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ক'রে নিজের দলে আকর্ষণ করেন। ১৯২৩ সালের বিফল চেষ্টা ও কারাদণ্ড তাঁর উদীয়মান শক্তিকে গ্রাস করতে পারে নি কারণ তিনি নাৎসি গুণ্ডাদলগুলির (Storm Detachments) সাহস ও শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

১৯৩০ সালে পার্লামেণ্টে ঢুকেও নাৎসিরা ১৯৩৩ সালের ৩০এ জানুয়ারীতে শাসনভার গ্রহণ করা পর্য্যন্ত যে সব কাজের পরিচয় দিয়েছে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও নির্দ্দোষ লোকেদের উপর নানাপ্রকার পাশবিক অত্যাচারই শুধু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ঘরোয়া বিরোধ বাধাবার চেষ্টা যদি আমরা

আপাততঃ বাদ দি। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও হিট্‌লার ক্রমেই ক্ষমতাশালী হ'তে থাকেন। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা থেকে জার্ম্মানী বাদ পড়েনি। এর কারণ যদিও বিবিধ এবং একা জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের হাতে এই অবস্থার প্রতিকারের ক্ষমতা ছিল না তবুও নাৎসিদের কথায় বিশ্বাস ক'রে রাজনৈতিক তত্ত্বে অশিক্ষিত (অনভিজ্ঞ) লক্ষ লক্ষ লোকের ধারণা বদ্ধমূল হয় যে তাদের গবর্ণমেণ্টই তা'দের দুর্দ্দশার জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী। হিট্‌লার ও তাঁর অনুচরবর্গ নিজেদের কথায় বার্ত্তায়

মগলা বেলার গাড়ীতে উপবিষ্ট এই ইহুদী ভদ্রলোক জার্ম্মানির চেম্‌নিজ শহরের রাস্তা ঝাঁট দিবার জন্য নাৎসি কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন্‌। সে আদেশ অগ্রাহ্য করায় এই শাস্তি।

ইহুদী-চালিত এই দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ও আচরণে এই কথাই বারবার ক'রে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে তাঁরাই একমাত্র দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আর তাঁদের ভিন্নমতাবলম্বী লোকেরা স্বদেশদ্রোহী। এই মিথ্যা প্রচার, **propaganda** যে অল্পবিস্তর সফল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু তাই নয়: হতাশায় লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান ভেবেছিল তাদের অধিক আর কি দুরবস্থা হ'তে পারে অতএব নাৎসিদের কথা কাজে পরিণত করবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

১৯৩২ সালের সভাপতিনির্ব্বাচন, **presidential election** হিট্‌লারকে আত্মপ্রচার, **advertisement**এর প্রচুর সুযোগ দিয়েছে। তারপর জুলাই মাসের রাইসষ্ট্যাগের নির্ব্বাচনে নাৎসিরা ২৩০টি সভ্যপদ অধিকার করে। কিন্তু রয়থেনের হত্যাকাণ্ড ও হিট্‌লারের হত্যাকারী-নাৎসিদের পক্ষ সমর্থন নভেম্বরে ২০ লক্ষ ভোট-ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু ফন্‌ স্লাইশার য়ুঙ্কার-স্বার্থে * আঘাত করতে গিয়ে হিণ্ডেনবুর্গ ও তাঁর বন্ধু পাপেনের দ্বারা বিতাড়িত হ'ন। জার্ম্মান সৈন্যদল (**Reichswehr**) ১৪ বৎসর যাবৎ স্লাইশারের নেতৃত্বাধীনে ছিল। পাপেন গ্রেপ্তার হ'বার ভয়ে হিট্‌লারকে ডেকে, একরকম কানে ধ'রে, চ্যান্সেলার, **Chancellor** নিযুক্ত করেন নিজে রাজত্ব করবার আশায়। স্বয়ং ভাইস্‌-চান্‌সেলার হয়ে প্রভূত অর্থশালী হুগেনবুর্গকে নিয়ে ৩০শে জানুয়ারী যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন তা'তে হিট্‌লার ছাড়া মাত্র ২'জন নাৎসি ছিলেন। সমস্ত প্রধান বিভাগগুলি পাপেন ও হুগেনবুর্গ নিজেদের দলের লোকেদের হাতে রাখেন। কিন্তু পুলিস-বিভাগটি থেকে নাৎসিদের বঞ্চিত করতে পারেন নি। তা'র পরের ঘটনাবলীকেই নাৎসিরা "জাতীয় বিপ্লব" নামে অভিহিত করে। যা' হয়েছে তা' সংক্ষেপে এই: হিট্‌লার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডল কিম্বা রাইসষ্ট্যাগ কোনটিতেই তাঁর ক্ষমতা ছিল না। মুসোলিনির পরামর্শ অনুযায়ী তিনি তাঁর সহকারী অ-নাৎসি মন্ত্রীদের ক্ষমতা ক্রমশঃই হরণ করেন এবং রাইসষ্ট্যাগের নতুন নির্ব্বাচন ঘোষণা ক'রে পুলিস, 'ঝটিকা বাহিনী' ও 'ষ্টাল্‌হেলম্‌' † দলগুলির সাহায্যে বিপক্ষ কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌ পার্টিগুলিকে দমন করেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী খবরের কাগজগুলিও দমন

* East Prussiaর জমীদারদিগের Junker বলা হয়। এই জমীদারীগুলি কয়েক বছর যাবৎ দেউলিয়া। গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে এগুলি টিঁকে আছে। Dr. Bruning ১৯৩২ সালের মার্চ্চে প্রথম প্রস্তাব করেন যে এই estate গুলিতে বেকারদের জমী দিয়ে চাষবাসের ব্যবস্থা করা হোক। হিণ্ডেনবুর্গ যে কারণে স্লাইশারকে বরখাস্ত করেন সেই কারণে Bruningকেও পদচ্যুত করেন।

† জার্ম্মানীতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ভলেণ্টিয়ার "Volunteer" বা সৈনিকদলের অনুকরণে গঠিত। নাৎসিদের জয়ের আগে নিম্নলিখিত দল ছিল, নাৎসিদের Storm Detachment, ন্যাশনালিষ্টদের "Stahlhelm অথবা "Steel Helmets" সোশ্যালিষ্টদের "Reichsbonner of the Iron front"; কম্যুনিষ্টদের "the red fighting front", ক্যাথলিকদের "the people's front" এবং বাভেরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য "Bavarian watch", নাৎসিদের নিজেদের দলগুলি ছাড়া সবগুলিই এখন বে-আইনী।

করা হয়। কিন্তু যে আশ্চর্য্য উপায়ে নাৎসিরা ৫৫ লক্ষ নতুন ভোট সংগ্রহ ক'রে রাইসষ্টাগে বেশীর ভাগ সভ্যপদ দখল করে এবং সর্ব্বপ্রকার বে আইনী কাজ আইনসঙ্গত করে নেয় তা'র সামান্য বিবরণ দেওয়া দরকার। নাৎসিরা নির্ব্বাচনের ছ'দিন আগে রাইসষ্টাগ অট্টালিকায় নিজেদের অনুচর দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সেই অনুচরকে "গ্রেপ্তার" ক'রে রাষ্ট্র করে যে, সে একজন কম্যুনিষ্ট ; যে, আসলে কম্যুনিষ্টরা ঠিক করেছিল এইদিনে জার্ম্মানীতে তাদের মতবাদ-কল্পিত বিপ্লব আনবার চেষ্টা করবে ; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই ভয়াবহ অনুষ্ঠান অঙ্কুরেই বিনাশ করেছেন। এই ব্যক্তির "স্বীকারোক্তি"র এরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যার দ্বারা সকল কম্যুনিষ্ট নেতাদের কারাবাস ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করা যায়, এমন কি নিরীহ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাও দোষী সাব্যস্ত হয়।

*　　*　　*

নির্ব্বাচনের ফলে হিট্‌লার মন্ত্রিমণ্ডলে তাঁর সহকর্ম্মীদের কাছে নিজস্ব প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং আস্তে আস্তে সকল অ-নাৎসি-মন্ত্রীদের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। হুগেনবুর্গ জার্ম্মান ধনী-সম্প্রদায়ের গৌরব এবং কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তাঁকে গবর্ণমেণ্টের একজন অপরিহার্য্য সদস্য বলে গণ্য করা হয়েছিল। গত জুন মাসে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কনফারেন্স্-এ জার্ম্মানীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যে স্মারক-লিপি পেশ করেন তা' অন্যান্য প্রতিনিধিরা ফিরিয়ে নেন এবং হুগেনবর্গকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে পদচ্যুত করা হয়। ফন্ পাপেন এখনও কোনমতে টি'কে আছেন কিন্তু নাৎসি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির গবর্ণমেণ্টে কোন শক্তি নেই। নাৎসিরা তাদের ঈপ্সিত ডিক্টেটরশিপ, dictatorship প্রতিষ্ঠা করেছে।

নির্ব্বাচনের পরেই সমস্ত ট্রেড-ইউনিয়নগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। মে মাসে সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌দের সম্পত্তিও নাৎসিরা হস্তগত করে। তারপর তা'দের যারা প্রভূত সাহায্য করেছিল সেই ষ্টালহেল্‌ম, Stahlhelm দলটিও ভেঙে ফেলা হয়। ইদানীং বাকী দলগুলিকে দমন করা হয়েছে এমন কি পাপেন ও হুগেনবুর্গের দল যার জোরে হিট্‌লার তাঁর বর্ত্তমান শক্তিলাভ করেছেন তাও বাদ পড়েনি কিন্তু হিট্‌লার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা'দের উপর অত্যাচার করা হ'বে না! সত্যই এরূপ কৃতজ্ঞতা কলিকালে বিরল। ব্রুয়েনিং, Bruning ও Stressemann স্ট্রেসেমানের দল অন্যদের দশা প্রাপ্ত হয়েছে। সকল দলের টাকাকড়ি নাৎসিরা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হিসাবে পরিপাক করতে রাজী হয়েছেন এমন কি সোশ্যালিষ্টদলের একজন নেতাকে চুরির দায়ে দায়ী করেছেন। ইহুদী সম্প্রদায়েরও অনেক টাকা নাৎসিরা চুরি করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত বা

হিট্‌লার-শাসনে জার্ম্মানীর ইহুদী-উচ্ছেদ।
পুলিশের পাল্লায় বৃদ্ধ ইহুদীর বিপদ।

সমষ্টিগত স্বাধীনতা জার্ম্মানী থেকে লোপ পেয়েছে। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হ'বার কারণ নেই। সমস্ত রাজনৈতিকদলের নেতারা "জাতীয় বিপ্লবের" (!) সময় স্বপ্নাবিষ্টের মত চেয়ে ছিলেন। নাৎসিরা যখন একটির পর একটি স্বাধীনতার চিহ্ন নষ্ট করছিল তখন তাঁরা চোখে দেখেও তা' বিশ্বাস করতে পারেন নি। নাৎসিদের সমর্থনকারীরা তাদের আনন্দের আতিশয্যে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত নাৎসিদের কথায় ও কাজে অসঙ্গতি (contradiction) দেখতে পান নি কিন্তু বর্ত্তমানে সমালোচনার ইচ্ছা থাক্‌লেও দুঃসাহস নেই। ব্যক্তিবিশেষের এবং সংবাদপত্রগুলির একই অবস্থা।

নাৎসিদের আচরণে দোষারোপ ক'রে লক্ষ লক্ষ লোকের ও বহু কাগজের দুর্দ্দশার কথা ভোলবার বিষয় নয়। অসন্তুষ্ট জার্ম্মানদের এখন চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আজকেকার অবস্থা নাৎসিদের ছাড়া অন্য জার্ম্মান নাগরিকদের পক্ষে প্রীতিকর নয়।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আজ পর্যান্ত ২৫ লক্ষ লোক কাজে ভর্ত্তি হয়েছে এবং বেকারদের সংখ্যা কমে গিয়ে ৪০ লক্ষের কিছু বেশীতে দাঁড়িয়েছে।

লণ্ডনের ইহুদীদের হিট্‌লারের বিরুদ্ধে অভিযান।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত এমন কিছু করেন নি যা'তে বলা যেতে পারে যে এই কয়েকমাসে জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি—যা' বেকারদের সংখ্যা তালিকায় প্রতিফলিত হয়েছে তা', তাঁদেরই কাজ। তবুও দু'লক্ষ লোকের কাজ তাঁদের কৃপায় হয়েছে, কারণ বহুলোক গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস্ থেকে বরখাস্ত হয়েছে হ্বাইমার শাসনতন্ত্রের প্রতি তাদের সহানুভূতি ছিল ব'লে; অনেকের কাজ গেছে তারা ইহুদী ব'লে; এবং অনেকে জেলে গিয়ে অন্যদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। তবুও নাৎসিরা যে গঠনমূলক, constructive কিছু করেন নি এমন নয়। তাদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কতকগুলি কর্ম্মকেন্দ্র, concentration camp স্থাপন। যে সব লোক কোন প্রকারে নাৎসিদের অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে পড়েছেন বিনা বিচারে তাঁদের এই কেন্দ্র, campগুলিতে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে। নাৎসি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেই কর্ম্মকেন্দ্রের concentration campsএর সৃষ্টি করে। গত ফেব্রুয়ারী মাসেই সকল কম্যুনিষ্ট নেতা ও রাইস্‌ষ্টাগের সদস্যেরা এইগুলিতে আশ্রয় লাভ করেন। কিছু দিন আগে সোশ্যালিষ্ট ও অন্যান্য সকল দলভুক্ত রাইস্‌ষ্টাগের সদস্যরা কম্যুনিষ্টদের অনুসরণ করেছেন। এই সব জায়গায় গবর্ণমেণ্ট আতিথেয়তার ব্যবস্থা ও আয়োজন পাকাপাকিভাবে করেছেন। নাৎসি মন্ত্রী ফ্রিক্, মার্চের শেষে বলেছিলেন যে কম্যুনিষ্ট ডেপুটীদের রাইস্‌ষ্টাগের (রাষ্ট্রীয় সভার) কার্য্যে যোগদান করবার কোন দরকার নেই কারণ কর্ম্মকেন্দ্র, concentration campগুলিতে তারা যে সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকবে তা' ঢের বেশী দরকারী। অন্যান্য দলের ডেপুটীদেরও যে এই কাজে আহ্বান করা হবে তা' আর আশ্চর্য্য কি? অনেকগুলি কাগজের সম্পাদক, বিস্তর ইহুদী ডাক্তার ও ব্যবহারজীবীকে এই "দরকারী" কাজে আহ্বান করা হয়েছে। 'রয়টার'এর ১২ই আগষ্টের একটি বার্লিনপত্রে প্রকাশ যে জার্ম্মান গুপ্তচর, secret policeএর হিসাবে ঐ তারিখে সকল কর্ম্মকেন্দ্রে, concentration campএ রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা আঠার হাজার! 'রয়টার' সংবাদদাতা লিখেছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই সংখ্যাই কয়েক মাস আগে এই বিভাগ প্রকাশ করেছিল। তার পরের কয়েক মাসের মধ্যে, সরকারী খবরের কাগজগুলির রিপোর্ট অনুসারে, ৭০ থেকে ৪৫০ জন লোক প্রত্যেক দিন গ্রেপ্তার হয়েছে। এই অমিলের কারণ এই হতে পারে যে আগে যে সব লোকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তা' একই দোষে (one and the same particular offence) এবং পরবর্ত্তী লোকদের অন্য পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে কারণ সাধারণের ধারণা যে বর্ত্তমানে একলক্ষের উপর লোক এই কর্ম্মকেন্দ্র, concentration campগুলিতে আবদ্ধ আছেন। এই সব লোকদের মধ্যে কারও দোষ আদালতে প্রমাণ করতে গবর্ণমেণ্ট প্রয়াসী হয়েছেন কিনা এরূপ কোনও উক্তি এই রিপোর্টে নেই।"

সম্প্রতি কতকগুলি বিখ্যাত লোকের নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়েছে—দেশের অনিষ্ট সাধন করার জন্য ("who have injured German interest by their

behaviour, which conflicts with their duty and loyalty to their nation and the Reich")।
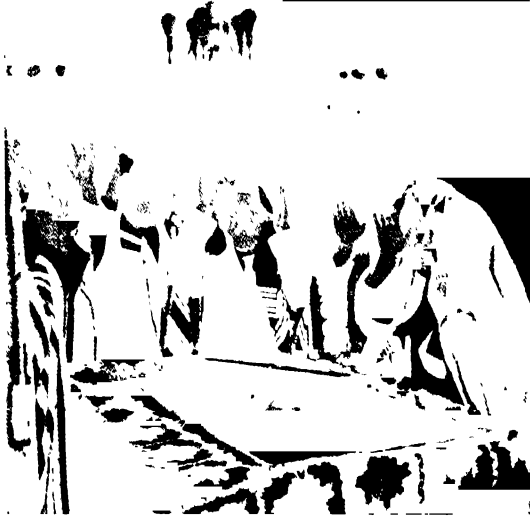
নিউইয়র্কের ইহুদী ধর্ম্মযাজকেরা জার্ম্মানীর উৎপীড়িত ইহুদীদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনা করিতেছেন।

অপমানিতদের মধ্যে আছেন জর্জ্জ বার্ণার্ড—*Vossische Zeitung*এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, ডাক্তার রুডল্‌ফ্‌ ব্রাইট্‌স্‌-চাইল্ড—রাইস্‌ষ্টাগের সোশ্যালিষ্ট নেতা, লিয়ঁ ফয়েস্‌ট্‌ হ্বাঙ্গার—বিখ্যাত লেখক, ডাক্তার আলফ্রেড কের্‌—*Berliner Tageblatt*এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, ফিলিপ্‌ জাইডেমান—বিখ্যাত সোশ্যালিষ্ট নেতা ও ভূতপূর্ব্ব চানসেলার, এবং ফ্রীড্‌রিশ্‌ ষ্টাম্‌ফের—Vorwaertsএর সম্পাদক। এই বিখ্যাত লোকেরা বিদেশী সংবাদপত্রে নাৎসিদের অযথা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখে তাদের বিরাগভাজন হয়েছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন আগেই জার্ম্মান নাগরিকের অধিকার ত্যাগ করে নিজেকে নাৎসিদের অপমান থেকে রক্ষা করেছেন। নাৎসিরা তাঁর ব্যাঙ্কের টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে।

*　　　*　　　*

নাৎসি-প্রসঙ্গে ইহুদীদের কথা বাদ দেওয়া চলে না। নাৎসিদের ইহুদীবিদ্বেষ কারও অবিদিত নেই। তথাপি, নাৎসি-নেতাদের নীচের কতকগুলি উক্তি থেকে তা' আরও স্পষ্ট হবে।

"জার্ম্মানী জার্ম্মানদের জন্য। ইহুদী, রুশ (কম্যুনিষ্ট), সোশ্যাল ডেমোক্রাট প্রভৃতি আর যাদের জার্ম্মানী পিতৃভূমি নয়……তাদের জন্য জার্ম্মানী নয়।"

"অর্থনৈতিক ভাবে ইহুদী শাসনতন্ত্রের ক্ষয় করে যতদিন পর্য্যন্ত সে ষ্টেট্‌, Stateএর সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যাপারকে পরিচালনা করতে না পায়। রাজনৈতিক ভাবে এই ইহুদীদল জার্ম্মানীর ষ্টেট্‌, Stateকে জীবনীশক্তি থেকে বঞ্চিত করে, স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার ভিত্তিগুলি নষ্ট করে, জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস আনয়ন করে, জাতির অতীত ইতিহাসকে ঘৃণার্হ ও বিদ্রূপাত্মক করে, এবং গৌরবের যা কিছু আছে তাকেই কবর দিতে চায়। কৃষ্টির ক্ষেত্রে সে সাহিত্য নাটক ও আর্টকে দুষ্ট করে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অবজ্ঞা করে; সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, সৌজন্য প্রভৃতি ধ্বংস করে। এমনি ক'রে জার্ম্মানীর মনুষ্যত্বকে তাদের জঘন্য জীবনের স্তরে নামিয়ে নিয়ে যায়। ধর্ম্মকে তারা উপহাসের বিষয় করেছে, নীতি ও শীলতাকে তারা অনাবশ্যক মনে করে। বেঁচে থাকবার জন্য জাতির শেষ শক্তি যে চরিত্রবল তাও এমনি ক'রে তারা হরণ করে।"

হিট্‌লার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশার্থে নিউ ইয়র্কে বিরাট সভা।

এইখানে বলা দরকার বর্ত্তমান জার্ম্মানীকে গৌরবান্বিত করেছেন অনেক বিখ্যাত ইহুদী বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, সঙ্গীতবিদ্, অভিনেতা ও সাহিত্যিক। এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন সকলেই কমবেশী পীড়িত হয়েছেন নাৎসিদের হাতে। অন্তত কুড়ি জনের নাম করা যেতে পাবে যাঁরা তাঁদের প্রতিভার বলে আজ জগদ্বিখ্যাত ও জগদ্বরেণ্য কিন্তু তাঁরা অনেকে বিদেশে নির্ব্বাসিত ও অনেকে

ডানজিগ পুলিশ পোল নাবিকদের [illegible] তত্ত্বাবধানে নিরত।

স্বদেশে অবাঞ্ছিত অনাত্মীয়, "undesirable alien" ভাবে বাস করছেন! সকলেই একমত যে জার্ম্মানী আজ পর্য্যন্ত যে শীর্ষস্থান অধিকার করে এসেছে ইহুদীদেব বাদ দিয়ে সেই পদমর্য্যাদা কোনমতেই রক্ষা করতে পারবে না।

"গতযুদ্ধে জার্ম্মানীর ধ্বংস মুখ্যতঃ ইহুদীদের স্বার্থের জন্যই হয়েছিল, ইংরেজের জন্য নয়।"

"যদি যুদ্ধের প্রথমে ১২ বা ১৫ হাজার ইহুদীকে বিষাক্ত গ্যাস দেওয়া হোতো যেমন লক্ষ লক্ষ শ্রেষ্ঠ জার্ম্মান শ্রমিককে যুদ্ধক্ষেত্রে সহ্য করতে হয়েছিল, তা'হলে লক্ষ লক্ষ জার্ম্মানদের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মত্যাগ বৃথা হ'ত না। পক্ষান্তরে ১২ হাজার বদমাইস ঠিক সময়ে অপসারিত হ'লে দশলক্ষ খাঁটি জার্ম্মানের প্রাণ রক্ষা হ'ত, এবং ভবিষ্যতের কাজে আসত।"

"ইহুদীরা নিশ্চয়ই মানুষ। আমাদের কেউ সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে না। কিন্তু মাছিও একটি জীব কিন্তু প্রীতিকর নয়। যেমন মাছি বিরক্তিকর জীব, এবং আমরা তার প্রতি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের কোন কর্ত্তব্য আছে বোধ করি না, এবং আমাদের কামড়াবার জন্য, কষ্ট দেবার জন্য যে একে বাঁচিয়ে রাখবার আমাদের দায়িত্ব আছে তাহাও মনে করি না, পরন্তু এর অনুপকার করবার আবশ্যকতা আছে বলেই মনে করি—সেইরূপ ইহুদীদের বিষয়ও।"

এই সব উক্তি পড়লে কেউ আশ্চর্য্য হবেন না নাৎসিরা ইহুদীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে জেনে। একজন সংবাদদাতা লিখেছেন: "বিশেষত ইহুদী বালক-বালিকারা অসুখী। রাস্তায় ও স্কুলে তাদের বিদ্রূপ করা হয় ও গায়ে থুথু দেওয়া হয় যদিও স্কুলে তাঁরা আইনত যেতে বাধ্য।"

জার্ম্মানীর কোন কোন জায়গা থেকে নাৎসিদের যে সব জঘন্য কার্য্যাবলীর সঠিক বিবরণ পাওয়া গেছে সেগুলি

যুদ্ধের সময়কার দুর্ব্বৃত্ত আচরণকেও ছাপিয়ে গেছে।* অনেক উদারনৈতিক মতাবলম্বী জার্ম্মানরা আজকাল কাইজারের শাসনতন্ত্রের জন্য আক্ষেপ করছেন—যে শাসনতন্ত্রকে ১৯১৮ সালে বিদায় দিয়ে সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে নাৎসিদের গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী হবে না কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাকে বদলাবার কিম্বা নাশ করবার শক্তি আজকেকার জার্ম্মানীতে দেখা যাচ্ছে না। তবুও যে আধিপত্য সহরের বেশীর ভাগ শ্রমজীবীদের মতের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত তা যে ফাঁপা ভিত্তির উপর গড়ে তোলা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা ধারণা করলে ভুল হবে যে আজকে জার্ম্মানীতে যে সকল নতুন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তা' ইতিহাসে সবিশেষ পরিচিত বা স্থায়ী হবে। এবং আরও ভুল হবে যদি ধারণা করা যায় যে পাণ্টা-বিপ্লবের দ্রুত প্রসারণের ও জয়ের ফলে বর্ত্তমান গোলমাল (confusion) থেকে একটি শক্তিশালী জার্ম্মানীর উদ্ভব সম্ভব হবে।

* * *

নাৎসিদের ইহুদীবিদ্বেষের প্রধান কারণ হিংসা; ইহুদীরা জাতীয় জীবনে তাদের প্রতিভার বলে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা' গায়ের জোরে নাশ করাই নাৎসিদের উদ্দেশ্য। আর একটি কারণ ইহুদীরা বেশীর ভাগ শান্তিকামী, **Pacifist** বা বিশ্বমিত্র **Internationalist** এবং অন্যান্য উদারনৈতিক মতের পৃষ্ঠপোষক। এই বিবিধ মতের মধ্যে এইগুলি ধরা যেতে পারে: **Liberalism, Communism, Socialism, Feminism, Democracy, Humanitarianism in law, Modernism in art, Rationalism in philosophy, Psycho-analysis, etc.** ক্যাথলিক দল, **Catholic party**ও এই রকম কতকগুলি মতের আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছেন বলে নাৎসিদের বিরাগভাজন হয়েছেন। কিন্তু ক্যাথলিকরা ইহুদীদের চেয়ে সংখ্যায় ঢের বেশী বলে তাদের ওপর অতটা অত্যাচার চলে না।

নাৎসিদের আসল রাগ যতটা প্যাসিফিজ্‌মের ওপর কম্যুনিজ্‌মের ওপর ততটা নয়। কারণ নাৎসিরা কম্যুনিষ্ট মতবাদ থেকে তাদের প্রোগ্রামের কতকগুলি নীতি ধার করেছে। কিন্তু যে হেতু কম্যুনিষ্টরা ইণ্টারন্যাশনালিষ্ট বা প্যাসিফিষ্ট্‌ সেইজন্য তারা নাৎসিদের শত্রু। বর্ত্তমানে স্কুল থেকে রেডিও পর্য্যন্ত সব কিছুর সাহায্যে নাৎসিরা জাতির যুযুৎসুবৃত্তি "**martial spirit**" জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে। হ্বাইমার রিপাব্‌লিক্‌ ধ্বংস করে নাৎসিরা আভ্যন্তরিক "লজ্জা" দূর করেছে; এখন বাইরের "লজ্জা" দূর করতে পারলে, গ্যোরিংএর কথায় যে আদর্শ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে জার্ম্মানরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে এবার তা সম্পূর্ণ হবে। এই আদর্শ উগ্রতমজাতীয়তার আদর্শ। যুদ্ধই একমাত্র উপায় যার দ্বারা এই আদর্শস্থলে জার্ম্মানী পৌছতে পারে। তাই হিট্‌লার সমগ্র টিউটন জাতিকে একত্র করতে মনস্থ। অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানী এক হবে এই ইচ্ছা।

আমেরিকা হইতে আইনষ্টাইনের আণ্টোয়ার্পে প্রত্যাবর্ত্তন। যতদিন জার্ম্মানীতে স্বাধীনভাবে তাহার চলা-ফেরায় বাধা থাকিবে ততদিন সে-দেশে ফিরিবেন না বলিয়াছেন।

নারাজ তাই য়ুরোপে গোলমাল আরম্ভ হয়েছে। হিট্‌লার আপাততঃ শক্তি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। এখনও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নন তাই ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইতালীর সঙ্গে এক চুক্তি হয়েছে ১০ বছর শান্তি রেখে চলবার। এখন থেকে দশ বছর পর্য্যন্ত নাৎসিরা অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে শান্তি-রক্ষা করে চল্‌তে পারবে কিনা কারও পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়।

---

* লণ্ডন 'টাইম্‌স'এর বার্লিন প্রতিনিধি এক জায়গায় লিখেছেন: "If Germany choose to treat other German citizens as vermin, it is their affair: it is only of importance to the rest of the world in estimating the new Germany.

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাহির হইতে মনে হইতেছিল লোকজন অনেক, কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই তিনকড়ি দেখিল, লোকজন অনেক নয়, সেই যে চপলা-ঠাকরুণ বলিয়া যে-মেয়েটির কাছে শ্রীহর্ষর কন্যাটি মানুষ হইতেছিল, সেই চপলা-ঠাকরুণ মালতীকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর এদিকে একটা সোফার উপর বসিয়া আছে শ্রীহর্ষ নিজে। চাঁপাকে এতক্ষণ সে দেখিতে পায় নাই। অথচ তাহাকে দেখিবার জন্যই আসা! চাঁপা দাঁড়াইয়া ছিল—ঘরের এক কোণের দিকে একটা জানালার কাছে, পরণে চওড়া লালপাড় শাড়ী, মাথায় ঘোমটা, পায়ে লাল টুক্‌টুকে আলতা, হাতে এক হাত সোণার চুড়ি!

তিনকড়িকে দেখিতে পাইবামাত্র শ্রীহর্ষ বলিল, 'এসো তিনু এসো! কাল থেকে এ-রাস্তা মাড়াওনি যে হে?'

তিনকড়ি তাহার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিল মাত্র। হাসিয়াই সে তাহার পাশে গিয়া বসিল। খালি পা, গায়ে গেঞ্জি, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, গেঞ্জিটা গায়ের সঙ্গে যেন কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেছে।

ওদিকে দেখা গেল, দাদাকে দেখিয়া চাঁপার ঘোম্‌টা তখন মাথায় উঠিয়াছে, মুখে মৃদু মৃদু হাসি!

তিনকড়ি চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল 'বা-রে! চাঁপী যে এই দুদিনেই বৌ হয়ে গেছিস!'

দাদা যেন কী! চাঁপা লজ্জায় মরিয়া গেল। চোখমুখের সে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিয়া সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইল।

চপলা-ঠাক্‌রুণ চুপ করিয়া থাকিবার মেয়ে নয়। তিনকড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'কেন বাছা, বৌ হবার জন্যে দিয়েছ ধরে-বেঁধে গছিয়ে, বৌ হবে না?'

তিনকড়ি তাহার জবাব দিতে পারিল না, হাঁ করিয়া কেমন যেন বোকার মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে শ্রীহর্ষর মুখখানি তখন শুকাইয়া গেছে। কিছু একটা বলা তাহার একান্ত প্রয়োজন, না বলিলে মানেটা অন্যরকম দাঁড়ায় ভাবিয়াই সে বলিয়া উঠিল, 'মাসি কি আজ সবার সঙ্গেই ঝগড়া করবে নাকি?'

বলিয়াই সে ব্যাপারটাকে রীতিমত লঘু করিয়া দিবার জন্য জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

চপলা-ঠাকরুণ বলিল, 'হাসচিস্ কি রে! আমার বাছা সাফ্‌রাফ্ কথা! ভাবলাম কুলীনের ছেলে, বিয়ে হ'লো, কত টাকাই না পেলি। ওমা! এসে শুনছি কিনা উল্‌টো, ও-ই খরচ করেছে।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'সে ত' বলা-কওয়া কথা মাসি! আর—ওরা পাবেই বা কোথায়! অবস্থা ত' তেমন—'

চপলা-ঠাকরুণ কথাটা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'ওরে থাম্, শ্রীহর্ষ, থাম্। আমারও মেয়ে ছিল, আমিও তার বিয়ে দিয়েছিলাম, অবস্থা আমারও ভাল ছিল না। তবু আমাকে খরচ করতে হয়েছিল।—আর তুইই বা কী এমন লাট্‌বেলাট্ শুনি, যে টাকা খরচ ক'রে বিয়ে করতে হবে, কুলীনের ছেলে! তুমি কিছু মনে কোরো না বাছা!'

বলিয়া সে তিনকড়ির কাছে আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওই দাড়ীওলা মিন্‌ষেটি তোমার কাকা হয় বুঝি?'

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ'।

চপলা-ঠাকরুণ বলিল, 'লোকটি জানে কেমন করে' কাজ বাগাতে হয়। তা বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে, খাসা সুন্দরী বৌ হয়েছে, এইবার সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর, বাস্ তাহলেই হ'লো!, ওমা! এ আবার গেল কোথায়?'

জানালার দিকে তাকাইয়া দেখে, চাঁপা নাই। সে তখন ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া পাশের ঘরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'যাবে না? যেরকম নিন্দে আরম্ভ করেছ মাসি, আর কি ও এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে!'

চপলা-ঠাক্‌রুণ বলিল, 'বেশ বাবা বেশ, আমার আর নিন্দে করে' কাজ নেই। এবার এই নাও তোমার মেয়ে, নিয়ে তোমার ওই বৌকে দাও, মানুষ করুক্।

শ্রীহর্ষ হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'সেই এক কথা এখনও তুমি ছাড়বে না মাসি?'

চপলা ঠাকরুণ বলিল, 'হাসি নয় শ্রীহর্ষ, আমি সত্যি কথাই বলছি। মেয়েটাকে তখন নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আহা, উর্মীর মেয়ে, দুটি খাবার অভাবে হাঁহাঁ করে' বেড়াবে, তার চেয়ে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখি। তাই রেখে-ছিলাম। এখন তোমার বৌ এলো,—দিব্যি ডাগর-ডোগর বৌ, এতটুকু এই মেয়েটাকে মানুষ করতে পারবে না? মেয়ে তোর কালো নয়, কুচ্ছিত নয়, আহা ছাখ্ দেখি, কেমন সুন্দর ফুটফুটে চেহারা, দিব্যি কেমন হাঁটতে শিখেছে, মুখে কথা ফুটেছে, নেহাৎ কচি খুকি ত' নয় বাছা!'

এই বলিয়া মালতীকে চপলা-ঠাকরুণ তাহার কোল হইতে নামাইতে গেল, কিন্তু নামাইতে গিয়াই বাধিল মুস্কিল! একে ওই ছোট মেয়ে, বাবাকে তাহার সে প্রত্যহ একবার করিয়া দেখে মাত্র, কোলেও যে এক-আধবার যায় না তাহা নয়, কিন্তু বাকি দু'জন তাহার অপরিচিত। চাঁপাকেও সে চেনে না, চাঁপার দাদাকেও না। কাজেই মাটিতে পা দিবার আগেই সে কান্না জুড়িয়া দিল।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'দেখলে মাসি! আমি জানি যে! এখানে ও থাকবে কার কাছে? আর, থাকতে পারবেই বা কেন?'

চপলা-ঠাকরুণ আবার তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। বলিল, 'আর আমিই বা কতদিন একে রাখতে পারব বাছা? আর কেনই-বা রাখব! বিয়ে যদি না করতিস্ ত' বলি, যে হ্যা, উর্মীকে এখনও তোর মনে আছে, কিন্তু বিয়ে যখন করেই বসলি, উর্মীকে মন থেকে যখন তুই মুছেই ফেললি বাছা, তখন আমারই বা কি এমন গরজ...'

ঠাকরুণ বোধ হয় আরও কিছু বলিত কিন্তু শ্রীহর্ষ তাহাকে বলিতে দিল না। বলিল, 'কিন্তু আমাদের কাছে মেয়েটা যদি দিবারাত্তির অমনি করে' কাঁদে মাসিমা, তাহ'লে কেমন ক'রে ওকে রাখি বল ত?'

'তা ত' দু'একদিন কাঁদবেই বাছা। তারপর দু'দিন বাদেই দেখবি আবার সব ঠিক হ'য়ে গেছে।'

ঠাকরুণের এই জিদ দেখিয়া শ্রীহর্ষ বোধ করি মনে মনে একটুখানি রাগ করিয়াই বলিল, 'তা বেশ, তাহ'লে ওকে দিয়ে যাও মাসি, সেই ভালো।'

কথাটা যে শ্রীহর্ষ রাগ করিয়া বলিতেছে চপলা-ঠাকরুণ তাহা বুঝিতে পারিল। বলিল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। পরের ছেলের ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট আমার ঘাড়ে কেন বাবা, আমি আপনার একা থাকি বেশ থাকি।'

এই বলিয়া মালতীকে বোধ করি চাঁপার কাছে দিবার জন্যই চপলা-ঠাকরুণ পাশের দরজা দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দু'হাতে দুইটি চায়ের পেয়ালা লইয়া চাঁপাকে একাকিনী ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া শ্রীহর্ষ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটাকে মাসি তোমায় না দিয়ে ছাড়লে না দেখছি। কোথায় সে?'

চাঁপা লজ্জায় কথা কহিল না। ঘোমটা যেমন টানা ছিল তেমনি টানাই রহিল। চায়ের বাটি দুইটি তাহাদের দু'জনের হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, শ্রীহর্ষ বলিল, 'এখনও তোমার লজ্জা গেল না? কেন, তিনকড়ির সুমুখে কথা ত' তুমি আমার সঙ্গে কয়েছ এককালে চাঁপা! মাসি, কি বললে কি? মালতী কাঁদে নি?'

চাঁপা এইবার ঘোম্টার ফাঁকে তাহার সেই আয়ত সুন্দর চোখ দুইটি তুলিয়া শ্রীহর্ষর দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া ইসারায় কি যে জানাইল কিছুই ভাল বুঝা গেল না।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'কি যে বলছ বুঝতে পারছি না চাঁপা, ভাল করে' বল।'

চাঁপার কি যে মনে হইল কে জানে, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সে ছুটিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'দেখলে তিনকড়ি? কি যে ওর স্বভাব, যখন-তখন অমনি খিল্ খিল্ করে' হাসচে অথচ ভাল করে' কথা কইবে না। তার বেলা লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছে।'

তিনকড়ি কি আর বলবে, একবার 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। দু'দিন মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছে, এখনও যদি তাহার লজ্জা না ভাঙ্গিয়া থাকে ত' বলিবার কিই-বা আছে!

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া তিনকড়ি মুখ তুলিয়া চাহিল বলিল, 'আপনার ওই চপলা-ঠাকরুণ ত' ভারি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে!'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, ওর ওই রকমই কথা! তুমি যেন কিছু মনে কোরো না।'

(ক্রমশঃ)

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

২৩শে—

শিউড়ী হইতে ডুমকা অভিমুখে গাড়ী ছুটাইয়াছি ; রাস্তা বৃষ্টিতে বড়ই খারাপ হইয়াছিল, চাকা বরাবর বসিয়া যাইতেছে, জোরে গাড়ী চালাইয়া ময়ূরাক্ষীর কূলে উপস্থিত হইতেই খুব বৃষ্টি নামিল। সম্মুখে একটি ছোট দোকান-ঘর দেখিয়া তাহাতেই আশ্রয় লইলাম। এই জায়গাটিকে আমজোড়া বলে। বাঙ্গলাদেশ এই খানেই শেষ হইল। বৃষ্টি থামিলে

ময়ূরাক্ষী।

নদী পার হইবার জন্য ঘাটে গিয়া খেয়ার মাঝিকে খুঁজে পাইলাম না। তখন নিজেরাই জলে নামিয়া বালির উপর গাড়ী ঠেলিতে সুরু করিলাম। এপারে ডুমকার জন্য বাস দাঁড়াইয়া ছিল, যাত্রী মাত্র দুইজন। ওপারে হেতমপুর রাজার একটি বাংলো ও পুলিশ ফাঁড়ী। ফাঁড়ী হইতে দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া আমাদের নাম-ধাম, পিতৃ-পরিচয় লইয়া গেল। আমজোড়া ও ডুমকার মধ্যে বেশ গভীর জঙ্গল, সন্ধ্যার পর এই সব রাস্তায় লোক বা গাড়ী চলাচল করে না। পথে সন্ধ্যা নামিল। কিন্তু কোথাও আশ্রয় নাই। তাই গাড়ী চালাইতেই বাধ্য হইলাম। যদি ডাকবাংলোতে থাকিতাম, তবে ভাল হইত, কিন্তু তখন ফিরিবার উপায় ছিল না, প্রায় দশবার মাইল চলিয়া গিয়াছি। রাণীবাহাল গ্রামে আসিয়া সাইকেলের আলোগুলি জ্বালিলাম। সেখানে সকলকে জঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেকের অনেক রকম কথা শুনিয়া একটু ভয় হইল। কিন্তু উপায় ছিল না, রাণীবাহালে থাকিবার মত জায়গা পাইলাম না। বাধ্য হইয়া এই দশ বার মাইল জঙ্গল পার হইয়া ডুমকা যাওয়াই স্থির করিলাম।

মসীলিপ্ত অন্ধকার, জনমানবহীন পার্ব্বত্য পথ—পাঁচটি দ্বিচক্রযান-যাত্রী দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। রাস্তার দুই ধারে ছোট ছোট পাহাড়, রাস্তায় বেশ জঙ্গল। অন্ধকারে নিকটের গাছগুলি ও দূরের পাহাড়ের মাথাগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। জঙ্গলের মধ্যে একবার প্রায় ৩০।৩৫ জন লোককে একসঙ্গে দেখিলাম। আর লোক কি কোন প্রকার যানবাহন দেখিতে পাই নাই। রাস্তায় গাড়ীর আলো নিভিয়া গেলে একবার জঙ্গলের মধ্যে জ্বালিতে নামিয়াছিলাম। সেই সময় একটা বিশ্রী ধান-পচার মত গন্ধ পাই, বোধ করি কোন বন্য জন্তুর। আমরা অবশ্য কিছু দেখিতে পাই নাই, তবে ডুমকায় আসিয়া শুনিলাম যে প্রায়ই ঐ রাস্তার উপর চিতাবাঘ দেখা যায়।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় ডুমকায় আসিয়া পৌছাই-লাম। বৃষ্টির জন্য রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ছিল, সাইকেল চালাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। ক্লান্ত অবস্থায় একটি খাবারের দোকানে আসিয়া উঠিলাম। কিছু খাবার খাইয়া ও চা পান করিয়া কাপ্তেন ও সুরেন আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। তখনও টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমরা দোকানে বসিয়া রহিলাম। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ডুমকায় একজন খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী। তাঁহার গৃহে আশ্রয় মিলিল। তিনি ও তাঁহার দুই ছেলে আমাদের পাঁচজনকে আদরের সহিত তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। গল্পগুজব করিতে করিতে জোরে বৃষ্টি নামিল। দারুণ শীত করিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি সকলেই লেপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিছু জলযোগ করিয়া বিছানার আশ্রয় লইলাম।

কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসিল না। সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল। দিনে যে-পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম, তাহার কথা মনে পড়িল··

শিউড়ী হইতে দুমকা···পথে ময়ূরাক্ষী, বালুগর্ভা, ক্ষীণকায়া। কিন্তু যখন বান আসে, তখন এপার হইতে ওপার নজরে পড়েনা। এ রূপ দেখিয়া কে সে রূপের ধারণা করিবে? খেয়ার মাঝিকে না পাইয়া নিজেরাই ধীরে-সুস্থে গাড়ী চালাইয়া নদী পার হইয়াছিলাম। কিন্তু এই নদীরই অপর রূপের কথা মনে পড়িয়া এখন লেপের মধ্যে শুইয়াও মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল—সহসা যদি বান আসে!

শুনিয়াছি, ময়ূরাক্ষীগর্ভে সতীর কোন্ অঙ্গ পড়িয়াছিল—ময়ূরাক্ষী তাই তীর্থ। পার হইয়া তখন যাহা করিতে ভুল হইয়াছিল এখন বিছানায় শুইয়া তাহাই করিলাম—বারে বারে করে মাথা ঠেকাইয়া ময়ূরাক্ষীকে প্রণাম জানাইলাম। সুপ্রসন্ন হাস্যে সে প্রণাম গৃহীত হইল।

ময়ূরাক্ষীর ঐ পারেই আমজোড়া হইতে বাংলার শ্যামল প্রকৃতি রুক্ষ ও অসম। বেশ বুঝিলাম বাংলা পার হইয়াছি। আশ্চর্য্য! অত্যন্ত অসাবধানী উদাসীন পথিকেরও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপটের এ পরিবর্ত্তন নজরে পড়িবে। চারিপাশের গাছ-পালার তো কথাই নাই, মাটি পর্য্যন্ত মূর্ত্তি বদলাইয়াছে। তাই বলিয়া এ কথা কেহ বলিবে না—বাংলার প্রকৃতি এই প্রকৃতি অপেক্ষা সুন্দর! এই কঠিন শুষ্কতার অঙ্গ বেড়িয়া সুদীর্ঘ তরুশ্রেণী। ইচ্ছা করিতে-ছিল তুলি লইয়া বসিয়া যাই।

বাংলায় বর্ত্তমানে চিত্রশিল্পে পুনর্জাগৃতি হইয়াছে, কাগজে পত্রিকায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—বাংলার নদনদী, প্রান্তরের চিত্র তাই একেবারে অপরিচিত নয়—অতি সামান্য হইলেও কোনো কোনো শিল্পীর সৃষ্টিতে বাংলার সে-রূপ বাংলার বাহিরেও ছড়াইয়াছে। সুদূর নিউইয়র্কে বসিয়া কোনো জিজ্ঞাসু ইচ্ছা করিলে বাংলার প্রকৃতির সন্ধান পাইতে পারেন, অন্ততঃ শান্তিনিকেতনের অর্থাৎ বীরভূমের প্রাকৃতিক দৃশ্য—লালমাটি, উঁচু ঢিবি, একটি নিতান্ত নির্জ্জন তালগাছ, অতিক্ষুদ্র এক জলাশয়—শান্তি-নিকেতনের চিত্রশিল্পীরা এ দৃশ্যকে অমর করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিস্ময়কর প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে এ কথা আজও বলা চলে না! তবু এখানে-ওখানে পদ্মা ও বালুচরের দুই একখানি ছবি অবশ্য দেখিয়াছি, ভবিষ্যতে আরও দেখিবার আশা রাখি।

কিন্তু ময়ূরাক্ষী পারের দৃশ্যকে কোনো শিল্পী আজও আঁকেন নাই।

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২৪শে—

পরদিন প্রাতে বেশ বৃষ্টি হইতেছিল, তথাপি আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দুমকায় আর থাকিতে ইচ্ছা ছিল না, নবীন বাবুর গৃহে চা পান করিয়া সাড়ে সাতটার সময় তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। তখন আমাদের উদরে তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল, বোধ হয় খাণ্ডবের ন্যায় একটি ছোট-খাট জঙ্গল পাইলে অগ্নিদেবের মতই উদরস্থ করিতে পারিতাম। স্কুল, মিউসিপ্যাল অফিস প্রভৃতি পার হইয়া বাজারে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। কথাবার্ত্তা দরদস্তুর করিবার শক্তি ছিল না, একটি দোকানে ঢুকিয়া পাঁচ জনে মিলিয়া কিছু খাইয়া লইলাম। তারপর বাজার ঘুরিয়া কিছু মালপত্র কিনিয়া সহরের কোর্ট, ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো প্রভৃতি দেখিয়া লইলাম। দুমকা হইতে দেওঘর রামপুরহাট প্রভৃতি যাইবার রাস্তা আছে। সহরের রাস্তার উপর একটি গুমটী, তাহাতে একজন কনষ্টেবল্ বসিয়া পাহারা দেয়। সম্মুখে দুমকা ডিভিসনের কোষাগার, দুইজন সশস্ত্র প্রহরী ফটকে পাহারা দিতেছে। দুমকার চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পাহাড় আছে এবং পাহাড়ের পরে সব জঙ্গল।

সেরাবাড়ী ও মন্দার হিল ষ্টেশনের মধ্যে ছোট গ্রাম্য হাট।

বেলা প্রায় সাড়ে নয় কি দশটার সময় ডুমকা ছাড়িয়া বাঁউশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। A. A. B. গাইড অনুসারে বাঁউশীর দূরত্ব ৩১ মাইল কিন্তু সেখানকার D. B. অনুযায়ী দূরত্বের মাপ ৪২ মাইল, একটি পথ-নির্দ্দেশক ফলকের গায়ে লেখা রহিয়াছে। প্রথম কিছুদূর বেশ, তারপর পার্ব্বত্য রাস্তা আরম্ভ হইল। দুই দিকে ছোট ছোট পাহাড়, মধ্যে রাস্তা আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। গাড়ী চালাইতে বেশ
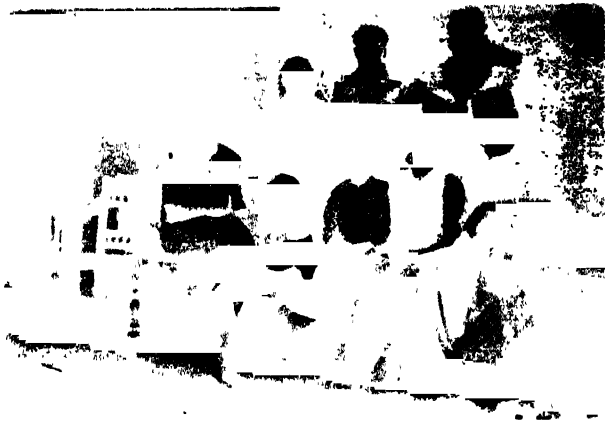
মন্দার : চন্দ্রবাবুর গৃহে।

আমোদ বোধ হইতেছিল। এদিকের সব রাস্তাই প্রায় বালির, কোথাও কোথাও মাটীর, বৃষ্টি হওয়ার দরুণ তাই রাস্তা বড় খারাপ হইয়াছিল। সাইকেলগুলির সহিত বেশ লড়াই করিতে হইতেছিল।

মাঝপথে ননীহাট নামে একটি গ্রাম। পথে একটি লোককে বাজার কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে বাম দিকের রাস্তা দেখাইয়া দিল। এই রাস্তার মোড়েই ডাকবাংলো, তারপর জমিদারের গৃহ—সকলে বলে ননীহাটের রাজবাটী। গৃহটি পাকা, একতলা, বড় বড় সাদা থাম আছে। রাজা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। উপস্থিত উত্তরাধিকারিণী তাঁহার একমাত্র কন্যা। প্রাসাদে রাণী ও তাঁহার কন্যা বাস করেন। আমাদের সেখানে ডাক পড়িয়াছিল, কিন্তু গিয়া উঠিতে পারি নাই। রাজার গ্যারেজ, ঘোড়াশালা, হাতীশালা পার হইয়া বাজারে আসিয়া পড়িলাম। একটি দোকানে বসিয়া গরম পুরী ও চা পান করা গেল। চা পাওয়া যায় না, সঙ্গেই চা, দুধ, চিনি প্রভৃতি ছিল তাই বাঁচোয়া। প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ননীহাট হইতে যাত্রা করিলাম। এইবার পথ আরও খারাপ—কেবল কাদা, চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। কর্ণবধের সময় কর্ণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আমাদের অবস্থায় সেই কথা মনে পড়িল। কোন রকমে এদিক-ওদিক করিয়া মাইল ১০।১২ যাইয়া রাস্তার ধারে কতকগুলি বড় বড় পাথরের নুড়ি পাইয়া সেগুলির উপরই বসিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় রাস্তার সহিত লড়াই করিতে বাহির হইলাম। কিছু কিছু নীচে নামিয়া আবার সমান রাস্তা। এমন ভাবে কখনও খাড়া, কখনও উৎরাই করিয়া পথ চলিয়া প্রায় বেলা আড়াইটার সময় বাঁউশী হইতে তিন মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য হাটে পৌছাইলাম। নামিয়া সেখান হইতে পেয়ারা, আতা, পানিফল প্রভৃতি কিনিয়া খাওয়া গেল। এ হাটে জিনিষপত্র এত সস্তা যে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম, ছয় পয়সায় একটি মুরগী, দুই এক পয়সায় খাঁটি গরুর দুধের সের। এই সব দেখিয়া অবাক্ হইয়া পান খাইতে গিয়া দেখি—সাজা পান এক পয়সায় দুটি। বুঝিলাম, সভ্যতার ছোঁয়াচ আসিয়া লাগিয়াছে। এখন বোধ করি সে হাটে ফিরিয়া গেলে দেখিব—দুধ দুষ্প্রাপ্য। যাক্, প্রায় বেলা চারটার সময় বাঁউশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাঁউশীতে বীরেনের ভগ্নীপতি চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উঠিয়াছিলাম। এই বাঁউশীরই অপর নাম মন্দার হিল।

গত মহাযুদ্ধের সময় ভাগলপুর হইতে রেলের এই শাখাটি খোলা হইয়াছিল। একটু অপরিসর উঁচু-নীচু জমীর মাঝে ছোট্ট ষ্টেশনটি। দূরে সন্ধ্যাকালের নীল লাল সিগ্‌নালের আলো ষ্টেশনের দুইধারে জল্‌জল্ করে। রেল লাইন পার হইয়াই ওপারে ৺মধুসূদন দেবের মন্দির প্রাঙ্গণ। সন্ধ্যায় সেখানে বেড়াইতে গেলাম, তখন আরতি আরম্ভ হইয়াছে, চারিদিক সুগন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। আরতির কাঁসরঘণ্টা রণিয়া রণিয়া দেবতার আশীষ দূরে, বহুদূরে জানাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

এই ষ্টেশন হইতে আড়াই মাইল দূরে একটি ছোট পাহাড়

আছে, তাহারই নাম সুন্দর পর্ব্বত তাহার চূড়ায় একটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরটিই কোন্ আদিকালে ৺মধুসূদন দেবের অধিকারে ছিল, কিন্তু এখন উহা জৈনদিগের দেবতার দখলে। মন্দিরটির কিছু নীচে একটি পুষ্করিণী আছে, নাম আকাশ-গঙ্গা, ইহার জল পান করিলে নাকি সকল প্রকার ব্যাধি নিরাময় হয়।

ভাগ্যক্রমে মন্দারে যে পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, পথের দুঃখ তাঁহারা আদরে-আপ্যায়নে প্রায় ভুলাইয়া দিলেন। তাঁহাদের কাণ্ড দেখিয়া মনেই রহিল না যে আমরা কয়টি লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে। মনে হইল আমরা কয়টি রাজার দুলাল, সখ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি—নদীতে ময়ূরপঙ্খী বাঁধা আছে, আমরা আসিয়াছি রাজকন্যার সন্ধানে। চির-কালের সেই রাজকন্যা, দেশে দেশে যে ঘুমাইয়া আছে, মরণকাঠি ও জীয়নকাঠি যাহার শিয়রে। কে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবে? রূপকথার রাজপুত্রের আসি-বার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—লগ্ন-ক্ষণও বুঝি পার হইল, কিন্তু মঙ্গল-শঙ্খের বাদ্য কই? হুলুধ্বনি কই? গৃহ-দ্বারে আলিম্পন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, মঙ্গল-কলসের মুখে আম্রপত্র মৃতপ্রায়—প্রতিবেশী পরিজন. আত্মীয়েরা উৎকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—কই রাজপুত্র, কখন আসিবেন?……

…স্বপ্ন ভাঙিল বীরেনের ধাক্কায়—

'সাইকেলগুলো যে সাফ করতে হবে—ওঠ'

হ্যাঁ, তাই—আমরা সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিংএ চলিয়াছি—না?

সেইদিন তিনটায় মন্দার ছাড়িলাম। মন্দার হিলের গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে ভাগলপুর রোড। দশ মাইল গিয়া বড়াহাট। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় জগদীশপুর পৌছাইলাম—লাইটিং টাইম। কিছুদূর গিয়া প্রায় দেড় মাইল পাঁকের পথ। অন্ধকার বেশ জমিয়া উঠিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়া বেপরোয়াভাবে গাড়ী ছুটাইলাম। যখন ভাগলপুর ষ্টেশনের ওভারব্রিজ ছাড়াইয়া চক-বাজারে পৌছাইলাম, তখন সাতটা।

ভাগলপুর শহরটি বিহারের মধ্যেকার সব চেয়ে বড় শহর—বিস্তৃতি প্রায় ৫০ বর্গ মাইল। গঙ্গার দক্ষিণ দিকে নাথনগর হইতে বারারি পর্য্যন্ত ভাগলপুর মিউনিসিপ্যালিটি। এখানকার জমিদার শ্রীযুত নরেশমোহন ঠাকুর অতি অল্প বয়স হইতেই জনসেবার কাজ অতি নিপুণভাবে পরিচালনা করিতেছেন—ইনি অতি সদাশয় যুবক এবং দানবীর বলিয়া খ্যাত। ইনিই

অতিথিবৎসল চন্দ্রবাবুর পরিবার।

স্থানীয় ম্যুনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। নরেশমোহনের মত নিরহঙ্কার অমায়িক ভদ্রলোক বেহারীদের মধ্যে বিরল। ইনি বাঙালীদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

বেহারে বাঙালীদের আধিপত্য কমিয়া যাইতেছে বলিয়া সকলেই বলেন। কিন্তু ভাগলপুর শহরে একথা খাটে না। এখানকার স্কুল কলেজে প্রধান অধ্যাপকগণ সকলেই প্রায় বাঙালী। প্রধান উকীল বাঙালী। ডাক্তারদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাঙালী। চাকরির বিভাগ লইয়া প্রাদেশিকতার সঙ্কোচ থাকিলেও চিন্তা করিবার কিছু আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। Meritএর আদর সর্ব্বত্র। বাঙালী যদি ভাল ডাক্তার থাকেন, তবে কোনো বেহারী মরণাপন্ন অবস্থায় কেবলমাত্র প্রাদেশিকতার মোহে কোনো অল্পশিক্ষিত বেহারী

ডাক্তারকে ডাকিবে না। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেও ভাল বাঙালী উকিলকে ফেলিয়া কেহ অন্যত্র যাইতে পারে না। বাঙালী যদি ব্যবসাক্ষেত্রে গুণী এবং চরিত্রবান হন তবে চাকরির ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া ঝগড়া করিবার কোনো হেতু

ভাগলপুর : রেলষ্টেশন।

নাই। ভাগলপুর শহরে এই কারণেই বাঙালীর আধিপত্য। এবং যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ওখানে আছেন তাঁহারা সকলেই যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া বড় বড় বাড়ি করিয়া শহরকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। নবাগত বাঙালী-ব্যবসায়ীদেরও এই শহর বঞ্চিত করে নাই—সকলেই নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে আশানুরূপ উপার্জ্জন করিতেছেন। বাংলাদেশে যেমন গুণের আদর কমিয়া আসিয়াছে বাংলার বাহিরে সেরূপ অবস্থা এখনো হয় নাই। শহরের রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত এবং প্রধান রাস্তাগুলি পীচমণ্ডিত। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি ক্লক-টাওয়ার আছে—এবং শহরের মধ্যে পর পর দুইটি বড় ময়দান। শেষেরটির নাম স্যাণ্ডিজ কম্পাউণ্ড। স্যাণ্ডিজ কম্পাউণ্ড অতি সুদৃশ্য, মাঝখানে একটি ছোট্ট পাহাড় বা স্তূপ—সিঁড়ি বাঁধানো। স্বাস্থ্যকামীদের ভ্রমণের আদর্শ স্থান। আরো পূর্ব্বদিকে রেস্-কোর্স। পূর্ব্বে রেস্ হইত, এখন হয় না—কিন্তু এরূপ বিস্তৃত সুদৃশ্য মাঠ বাংলাদেশে এক কলিকাতার ময়দান ছাড়া আর কোথাও নাই। কলিকাতার ময়দানকেও ইহা অনেক দিক দিয়া সৌন্দর্য্যে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ভাগলপুর অল্প খরচে বাস করিবার পক্ষে একটি আদর্শ স্থান। এখানকার এক সের ১০১ তোলায় হয়—এবং খাদ্য দ্রব্য আশাতিরিক্ত সুলভ। মুরগী টাকায় ৬টা হইতে ৮টা। মাছ।৶০ হইতে ৷৷০ সের। বাড়িভাড়া মাসিক ১০ টাকা। কলিকাতার লোক আমাদের পক্ষে এ যেন কল্পনাতীত ব্যাপার!

এখানকার দেখিবার জায়গা—বুড়ানাথের মন্দির। গঙ্গার ভিতরে ইহার সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে এবং এখানে আসিলে মনে হয় গঙ্গার ভিতরে জাহাজে বসিয়া আছি। রেস্‌কোর্স জ্যোৎস্না রাত্রে স্বপ্ন সৃষ্টি করে। এখানকার কলেজটি ফোর্টের ভঙ্গিতে নির্ম্মিত। আকারে খুব বড়। অঙ্গন খুব প্রশস্ত। জেলাস্কুলের কম্পাউণ্ডটিও বেশ প্রশস্ত। শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ীটিও দেখিবার মত। চড়াই-উতরাই সমন্বিত পথগুলি ভারি চমৎকার। বাঙালীদের একটি বড় লাইব্রেরি আছে—নাম সাহিত্য-পরিষদ। বাঙ্গগল্প লেখক ৺সুরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানকার বাসিন্দা ছিলেন। পরিচিত সাহিত্যিক এবং লেখক বর্ত্তমানে

ভাগলপুর : কলেজ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, "বনফুল", সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আশু দে। ইঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমরা সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। (ক্রমশঃ)

সাম্যবাদে নরনারী ও গার্হস্থ্য জীবন

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

স্ত্রী-পুরুষে কোনরূপ ভেদ কি বৈষম্য কিছু থাকিবে না, চরম এইরূপ একটা সাম্যবাদ আধুনিক ইয়োরোপে অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এদেশেও তাহার ঢেউ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার দাবীর যত কথা নব্য সাহিত্যানুরাগী সকলেই তাহার সঙ্গে কিছু না কিছু পরিচিত। এই দাবী নব্য সোসিয়ালিষ্টরাই প্রধানতঃ করিয়া থাকেন এবং বোল্‌-শেভিক রুষিয়ার সোসিয়ালিষ্ট সমাজে রাষ্ট্রবিধানবলে ইহার প্রতিষ্ঠারও সমধিক চেষ্টা একটা হইতেছে। ইহাদের মোট কথাগুলি হইতেছে এই,—বাল্যাবধি এক সঙ্গেই সমান শিক্ষায় সমান যোগ্যতা লাভ করিয়া, সমান সমান সহযোগীর ন্যায় নারী পুরুষ উভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, সমান সমান সহযোগীর ন্যায় বরাবর কাজকর্ম্ম করিয়া যাইবে। করিয়া সমান সমান জীবিকার অধিকারী সকলে হইবে। কাজের সময় কাজে আর অবসরকালে আমোদ-প্রমোদে সমান সহযোগীর ন্যায়ই মেলামেশা করিবে। নারী-স্বভাব ও পুরুষ-স্বভাবের পার্থক্য হেতু পরস্পরের সম্বন্ধে ব্যবহারিক যে সব পার্থক্য এখন আছে, তাহাও সব দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। কমনীয়তা ও কোমলতা নারীস্বভাবের প্রধান ধর্ম্ম—অন্ততঃ সাধারণতঃ এইরূপ প্রাচীন-কালাগত বর্ত্তমান এই সমাজে এখনও দেখা যায়। ইহার প্রভাবে নারী অপেক্ষাকৃত কিছু দুর্ব্বলা ও লজ্জানম্রা। নারীর একটি নামই তাই হইয়াছে, এদেশে যেমন অবলা, ইয়োরোপে তেমনই fair বা weaker sex. পুরুষরা সর্ব্বত্রই প্রায় নারীকে যত্নে রক্ষণীয়া বলিয়া মনে করেন এবং বিশেষ একটা আদর মর্য্যাদাও দিয়া থাকেন। পুরুষের সঙ্গে ব্যবহারে যে শীলতা পুরুষ মানিয়া চলে, নারীর সঙ্গে ব্যবহারে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শীলতা তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় এবং তাহার রীতিও অনেকটা ভিন্ন রকমের। কিন্তু ব্যবহারিক এই ভেদও সোসিয়ালিষ্টরা তাঁহাদের নূতন এই সমাজে কিছু রাখিতে চাহেন না। পুরুষরা যেমন সমান সমান, কম্‌রেড্ (comrade) বা সমধর্ম্মী বন্ধু বা সঙ্গীর ন্যায় মেলে মেশে, খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদ করে, নারী পুরুষও তেমনই করিবে। পরস্পর 'কম্‌রেড' পুরুষের মধ্যেও যেমন কোনও সঙ্কোচের বাধা বড় কিছুতে থাকে না, পরস্পর কম্‌রেড নারী পুরুষেও তেমন কিছু থাকিবে না। রুষিয়ায়—যেখানে এইরূপ রীতি প্রতিষ্ঠার বিপুল একটা উদ্যম হইতেছে—সমতাসূচক 'কম্‌রেড' এই বিশেষণটাও নামের আগে সকলে ব্যবহার করে, অর্থাৎ যে বিশেষণটা ব্যবহার করে তাহার ইংরেজি হইতেছে 'কম্‌রেড'; খাঁটি বাংলায় এই কথাটি হয় 'সাঙাৎ'। আমাদের এদেশেও এই 'কম্‌রেড' কথাটা তরুণ অনেকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যেমন 'কম্‌রেড বঙ্কিম', 'কম্‌রেড সুহাসিনী' ইত্যাদি। ইহাদের সভা-সমিতির চিঠিপত্রেও 'Dear Comrade' এই পাঠ অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গার্হস্থ্য জীবন এ অবস্থায় চলে না। ধনসম্পদে ব্যক্তিগত কি পরিবারগত পৃথক্ পৃথক্ স্বত্বাধিকার-লোপের সঙ্গে তাহাও সোসিয়ালিষ্টরা লোপ করিয়া ফেলিতে চান, একটিকে লোপ করিতে চাহিলে আর একটির লোপ অবশ্যম্ভাবীও হইয়া পড়ে বটে।

ধর্ম্ম বলিয়া কিছু ইঁহারা মানেন না। ধনসম্পদে ব্যক্তিগত অধিকারের লোপ এবং পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্য জীবনের লোপের সঙ্গে ধর্ম্মের লোপও (abolition of religion) কার্লমার্ক্স প্রবর্ত্তিত সোসিয়ালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদের অপরিহার্য্য একটি নীতিসূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বিবাহরূপ কোনও অনুষ্ঠান অথবা নরনারীর মধ্যে এ জাতীয় কোনও সম্বন্ধের স্থায়িত্ব—কিছুরই কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া সোসিয়ালিষ্টরা স্বীকার করেন না। যৌন সম্বন্ধে নরনারীর ইচ্ছামত মিলন এবং ইচ্ছামত ছাড়াছাড়ি হইবে, ইহাই ইঁহারা কাম্য বলিয়া মনে করেন। তবে ইচ্ছা যদি কাহারও হয়, ধর্ম্মবিধানে নয়, আইনের বিধানে, মিলনটাকে রেজেষ্ট্রী করিয়া নিয়া একনিষ্ঠ দাম্পত্যের সম্বন্ধেও একত্র বাস করিতে পারেন। বাধা তাহাতে কিছু নাই। 'বিবাহ' এই নাম ইহাকে দেওয়া যাইতে পারে, দেওয়া হইয়াও থাকে। তবে বিশিষ্ট কোনও মর্য্যাদা দিয়া আইন ইহাকে উচ্চতর একটা আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিবে না। এইরূপ 'বিবাহিত' নরনারীর সন্তান—'অবিবাহিত' নরনারীর সন্তান অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদাও বেশী কিছু পাইবে না। 'বৈধ'

কি 'জারজ' বলিয়া মানুষের সন্তানে সন্তানে কোনও পার্থক্য সোসিয়ালিজম্ মানে না। যে অবস্থায় যে ভাবেই যে জন্মগ্রহণ করুক, সামাজিক মর্য্যাদায় সকলেই সমান। কোনও-রূপ দাম্পত্যনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া বেশী লোক যে এ অবস্থায় চলিবে না, চলিতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এই 'ফ্রী লভ' (free love) অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধে নরনারীর ইচ্ছামত মিলন ও ছাড়াছাড়ি যত সহজ একটা ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে, বাস্তবিক তাহা তত সহজ নহে। মিলনে ও ছাড়াছাড়িতে দুই পক্ষেরই সমান ইচ্ছা সর্ব্বদা নাও হইতে পারে। ধরুন, যাদব চায় কমলাকে, কমলা চায় মাধবকে, মাধব চায় বিমলাকে, বিমলা চায় রমেশকে। এ অবস্থায় যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না। সুতরাং অশান্তি ঘটিবেই। চাওয়ার আগ্রহ কাহারও অতি বেশী হইলে বিবাদ-বিসম্বাদও অনিবার্য্য। তারপর, আবার ধরুন্, রতিকান্তকে বহু নারী অতি আগ্রহে কামনা করিতেছে, আবার মোহিনীকে বহু পুরুষ তেমনই আগ্রহে কামনা করিতেছে। মোহিনী বা রতিকান্ত ইহাদের কাহাকেও কামনা করুক কি না করুক, এতগুলি লোকের সাগ্রহ কামনার টানাটানিতে তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ সুখকর হইয়া উঠিবে, সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। তারপর ছাড়াছাড়ির কথা। সমান টানে দুজনের মিলন আজ হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে এক জনের সাধ মিটিল, সে ছাড়িতে চায়। আর একজনের সাধ মিটিল না, হয়ত বা বাড়িলই, সে ছাড়িতে কিছুতেই চায় না। অশান্তি এক্ষেত্রেও কম ঘটিবার কথা নয়। সুতরাং ইচ্ছামত জোড়া-ছাড়ার ব্যাপারটা উপর উপর যতই সহজ ও সরল বলিয়া মনে হউক, বাস্তবিক তাহা নয়। বেশ একটা জটিল সমস্যার বিষয়ই বটে। বৈবাহিক ধর্ম্মে মিলিত দম্পতি জানে, ছাড়াছাড়ি সহজে হইবার নহে। প্রথম হইতেই তাহাদের মন সেই ভাবে প্রস্তুত হয়, মানাইয়া থাকিবার একটা চেষ্টাও দেখা দেয়। তারপর গৃহস্থালীর বহু সমান স্বার্থ,—সন্তান-সন্ততির স্নেহ, তাহাদের পালনের দায়িত্ব, উভয়ের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ একটা যোগ ঘটায়, যে, দাম্পত্য প্রেমের অভাব বা ন্যূনতা সত্ত্বেও, মোটের উপর একটা শান্তিতেই তাহারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, করিয়াও থাকে। অন্যের প্রতি যদি একটা কামনা কখনও জন্মে, আমি বিবাহিত অথবা সে বিবাহিত, সুতরাং পাওয়া সম্ভব নয়, এই হিসাবটাও সে কামনাকে অনেক সময় সংযত করিয়া রাখে, যতই প্রবল তাহা হউক। তারপর ধর্ম্মনীতির প্রভাবও এসব বিষয়ে অনেক সাহায্য তাহাদের করে। ইহা সত্ত্বেও কত রকমের গোলমাল মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। কত দাঙ্গাহাঙ্গামা, কত খুনাখুনি পর্য্যন্ত হইয়া যায়। আর স্বাধীন প্রেমের সমাজে এসব গোলমাল যে কত বাড়িয়া উঠিবে, তাহা সহজেই আমরা অনুমান করিয়া নিতে পারি।

এই স্বাধীন প্রেমের বাহবা আজকাল অনেকেই দিয়া থাকে। কিন্তু এ প্রেম কিছু আর নিঃস্বার্থ একটা মানসিক ভাব বা Platonic Love মাত্র নয়। প্রেমিক-প্রেমিকা ভাল-বাসিয়া পরস্পরকে কেবল 'দেখিতেই আসে না, দেখা দিতেও আসে'। সম্ভোগের তৃপ্তি একটা উভয় পক্ষই চাহে। সুতরাং কেবল এক পক্ষের একতরফা ব্যাপার এটা নয়, দোতরফা একটা ব্যাপার—দুটি পক্ষই ইহাতে থাকিবে। সুতরাং জটিল রকমের বহু হাঙ্গামার সৃষ্টি অনিবার্য্য।

তারপর এসব মিলনে সন্তান-সন্ততিরও উৎপত্তি হইবে। আধুনিক জন্ম-নিরোধের সব প্রক্রিয়া, শুনিতে পাই, সর্ব্বদা সফল হয় না। আর হইলে, সকলেই যদি সেই সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তবে ত এক পুরুষেই মানব-জীবনের অস্তিত্ব এই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে। সুতরাং যেমন ইহা হয় না, হওয়াটা তেমন বাঞ্ছনীয় বলিয়াও সকলে মনে করিবেন না। প্রত্যেকটি মিলনেই ত নূতন কতকগুলি করিয়া শিশুর আবির্ভাব হইতে পারে। এক একটি মিলনের পর জনক-জননীর ইচ্ছামত আবার ছাড়াছাড়ি হইতে থাকিলে, ইহাদের ভার কে নিবে! সোসিয়ালিষ্টরা এ দায়িত্ব ব্যক্তিগত ভাবে কোনও জনকজননীর উপরে রাখিতে পারেন না, রাখিতে চানও না। ছেলেপিলে হইবে সব সরকারী ছেলেপিলে—state children. সরকার বা ষ্টেটই সরকারী সব প্রতিষ্ঠানে ইহাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। সরকারী খরচেই সব চলিবে, গোড়াতে এইরূপ একটা 'প্ল্যান' বা কল্পনাও ছিল। বোলশেভিক রুষিয়ায় সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পর এইরূপ একটা চেষ্টাও নাকি হয়। কিন্তু সুবিধা হইয়া উঠিল না। এখন নিয়ম হইয়াছে, সন্তান-

দের পালন ও শিক্ষাদানের জন্য সরকারী সব প্রতিষ্ঠান রাখা হইবে বটে, কিন্তু ব্যয়টা জনক ও জননী উভয়কে সমান ভাবে বহন করিতে হইবে। সাম্য নীতিতে সমান জনক-জননীর উপরে এ দাবী ষ্টেট্ ত করিবেই। এই সাম্যে ও যৌন-স্বাধীনতায় বিস্তর সুবিধা নারীর পক্ষে ঘটিয়াছে! সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে হইবে, প্রসব করিতে হইবে, তাহার যত কিছু ক্লেশকষ্ট, আনুষঙ্গিক রোগপীড়া—সব ভুগিতে হইবে। আবার অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের পালন ও শিক্ষাদানেরও অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে হইবে। আর পুরুষ? সন্তান-জননে ক্লেশ তাহার কিছুই নাই। অর্থোপার্জ্জনোপযোগী শ্রমকর্ম্মেও বাধা কি বিরতি তাহার কিছু হয় না। অথচ খরচের ভাগও অর্দ্ধেক মাত্র দিয়া সে খালাস; আর সেই অর্দ্ধেক দিতেও সে বাধ্য, যদি কোনও নারীর গর্ভজাত সন্তানের জনকত্ব তাহার প্রমাণসিদ্ধ হয়। নতুবা একা গর্ভধারিণীকেই ব্যয়ভার সব বহন করিতে হইবে। মিলনটা রেজেষ্ট্রী করা না থাকিলে, অথবা একত্র এক গৃহে বসবাস না করিলে, জনকত্ব যদি জনক অস্বীকার করে, এ প্রমাণসিদ্ধি—যে সহজে ঘটান যায় না, এ কথা বলাই বাহুল্য। শুনিয়াছি, রুষ-নারীরা এই কারণে মিলনটা সাধারণতঃ রেজেষ্ট্রী করিয়াই নিতে চায়।

ধনসম্পদে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত অধিকার এবং সেই অধিকারে পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক স্থিতি—দুইটিই লোপ করিয়া নরনারীনির্ব্বিশেষে সকল মানবের আর্থিক ও অন্যান্য সকল প্রকার সাম্য স্থাপনায় নূতন যে জীবন-পদ্ধতি সোসিয়ালিষ্টরা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাহাতে এরূপ একটা অবস্থা অপরিহার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবীও বটে। ইহা বুঝিয়াই তাঁহাদের নূতন সমাজে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের নীতি, সন্তান-পালনাদির ব্যবস্থা, নিঃসঙ্কোচে খোলাখুলি ভাবেই এই রূপ তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মানব-জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী ইহা কি না, সন্তান-সন্ততির জনক-জননী রূপে নরনারীর সম্বন্ধ ইহাতে সুখকর কি কল্যাণকর হইবে কি না, একথা তাঁহারা বড় ভাবেন নাই, ভাবিবার অবসরও হয় না। সকলের সমান সুখের জন্য সামাজিক ধনসাম্য স্থাপনাই একমাত্র কাম্য-সিদ্ধি বলিয়া গোড়াতেই তাঁহারা ধরিয়া নিয়াছেন। ধন-সম্পদে ব্যক্তিগত অধিকার লোপ না করিলে সামাজিক ধন-সাম্য স্থাপনা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার এবং পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক জীবন—দুইটি আবার এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সঙ্গে অনুস্যূত যে একটির লোপ চাহিলে আর একটিকেও লোপ করিতে হইবে। সুতরাং পারিবারিক জীবনের লোপও সোসিয়ালিজ্‌মে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-লোপেরই অবশ্য-অনুগামী আর একটি নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধনসাম্য স্থাপনা করিতে হইলে, পন্থামাত্র একটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত আর একটি নীতি। সুতরাং মানবজীবনকে সর্ব্বথা ইহার অনুবর্ত্তী করিয়া তুলিতেই হইবে। তারপর অন্যদিগের ভালমন্দ যাহা হয় হউক। আর সেই ভালমন্দের হিসাবও তাঁহাদের অন্যরকম দৈহিক সুখ-ভোগের উপরে এ পৃথিবীতে ভাল বলিয়া আর কিছুই ইঁহারা মানেন না, এবং স্বচ্ছন্দ ভাবে এই সুখভোগে নরনারীনির্ব্বিশেষে সকল মানবের সমান দাবী আছে বলিয়াও মনে করেন। প্রকৃতিগত কি কর্ম্মে, সেই কর্ম্মানুযায়ী কোনও ধর্ম্মে নরনারীতে কোনও প্রভেদ থাকিতে পারে, একথা কানেও তাঁহারা তুলিতে চান না। সুতরাং মানব-সমাজে নরনারী সম্বন্ধীয় এই যে জীবন-পদ্ধতি তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ন্যায়যুক্তিধারায় ইহা তাঁহাদের গৃহীত নীতির অবশ্যম্ভাবী একটা পরিণতি বলিয়াই আমাদের স্বীকার করিয়া নিতে হইবে। এই আদর্শের সোসিয়ালিজ্‌ম্ চাহিলে এ জীবন এইরূপই হইবে, অন্যরূপ কিছু হইতে পারে না।

কিন্তু ঠিক সোসিয়ালিষ্ট নহেন, গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধন যতই শিথিল করিয়া ফেলিতে চাহেন, ধনার্জ্জনে ও অর্জ্জিত সেই ধনভোগে এবং আনুষঙ্গিক অন্য কিছুতে ব্যক্তিগত অধিকার কিছুই বড় ত্যাগ করিতে যাঁহারা চাহেন না, তাঁহারাও নর-নারীতে এইরূপ একটা সাম্য, পরস্পরের সম্বন্ধেও এইরূপ একটা স্বাধীনতারও দাবী করেন। একটু তলাইয়া যদি আমরা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখি, এই সব দাবীর মূলে রহিয়াছে মাত্র একটি প্রধান কথা এবং সেটি হইতেছে যৌন-সম্ভোগে অবাধ স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার আগ্রহ, যতই যুক্তিজালের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন তাহা থাক্। স্পষ্টভাবেও এই দলের বড় বড় অনেক পণ্ডিত, শিষ্যেরা অনেকে যাঁহাদের যৌনতত্ত্বদর্শী ঋষির আখ্যাও দিয়া থাকেন—স্পষ্টভাবেই অধুনা বলিতেছেন, মানবজীবনের যত কিছু কর্ম্ম-প্রেরণা যাহা কিছু সৌহার্দ্দ্যের

আকর্ষণ সকলের একমাত্র উৎস হইতেছে যৌন-সম্ভোগ-লালসা—মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এই লালসার পরিতৃপ্তি, আর এই পরিতৃপ্তির পূর্ণতা—চরম সার্থকতা হয়, যখন 'যার সঙ্গে যার মজে মন' তাহারই সঙ্গে অবাধ মিলনে! নহিলে নাকি দেহ-মনের স্ফূর্ত্তি কিছু থাকে না, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, শক্তি পঙ্গু হইয়া যায়। পাছে এহেন সর্ব্বনাশ ঘটে, অনেকে তাই বিবাহবন্ধনের মধ্যে যাইতে চান না, চাহিলেও যখন তখন যথেচ্ছ তাহাকে তাহা ছেদের সুযোগ অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। ঋষিবৎ তরুণ সমাজের পূজ্য যশস্বী লেখক বার্ট্রাণ্ড রাসেল, Bertrand Russel, মহাশয় ইহাও বলেন, বিবাহিত নরনারী একত্র এক সংসারে বাস করিয়াও অপর প্রিয়জনের সঙ্গে ইচ্ছামত যৌনসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। বালাই যা সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা! তা, বৈজ্ঞানিক জন্মনিরোধের উপায় অবলম্বন করিলে আর ভাবনা কি? ও বালাই লইয়া কোনও সমস্যাই উপস্থিত হইবে না। দরিদ্রের গৃহে বহু সন্তানের জনন-সম্ভাবনা প্রতিরোধের বড় একটা উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিক এই সব প্রক্রিয়ার বিশেষ একটা সার্থকতা আছে বলিয়া অনেকে ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু নব তরুণ-তরুণীর অবাধ যৌনমিলনের পথে এই যে একটা অসুবিধার বালাই রহিয়াছে, সেটা দূর করিবার প্রয়োজনে সার্থকতা আরও অনেক বেশী বলিয়াও নামজাদা অনেক লেখক নিঃসঙ্কোচে ইহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নামটা ঠিক মনে নাই, কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও এক দৈনিক পত্রিকায় উদ্ধৃত এইরূপ এক লেখকের একটি উক্তি পড়িয়াছিলাম, "It will place the girls on the same footing with the boys."

বিবাহবন্ধন ব্যতীতও জননীত্বের মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠা কোনও কোনও দেশে নারী-আন্দোলনের বিশেষ একটি লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক নারীই সন্তান কামনা করে, সন্তান-লাভ জীবনের তাহার অতিবড় একটা আনন্দ। কিন্তু তাহার জন্য স্বামী বলিয়া একটা পুরুষের দাসীত্ব কেন তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে! এইরূপ কথাও এই আন্দোলনের নায়িকারা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কৌমার্য্যে মনোমত কোনও পুরুষের সহযোগে সন্তান-লাভ করিয়া সেই সিদ্ধির সংবাদ গৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্তও কয়েকটি ঘটিয়াছে!

সোসিয়লিষ্টরা যে এইরূপ একটা রীতির পক্ষপাতী, তাহার মূলে রহিয়াছে, প্রধানতঃ নূতন ধরণের বড় একটা সামাজিক সিদ্ধির প্রয়োজন। সামাজিক একটা আদর্শ তাঁহাদের আছে। সে আদর্শটা সকলের ভাল লাগুক কি না লাগুক তাঁহারা মনে করেন, ইহাই সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতেই সমাজ মঙ্গলের ভাগী হইবে। এই প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বহুদিকে মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকেও অতিমাত্রায় সঙ্কোচ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। বস্তুতঃ এই একটি দিকে ছাড়া জীবনের আর কোনও সাধনায়, কোনও সিদ্ধির লক্ষ্যে, এই স্বাধীনতার কোনও অবসর মানুষকে তাঁহারা দিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং তাঁহাদের কথাগুলার তাৎপর্য্য বরং বুঝা যায় কিন্তু ইঁহারা? সোসিয়ালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক ইঁহারা নহেন, বরং ঘোর ব্যক্তি-তান্ত্রিক। সমাজের মঙ্গল হইবে বলিয়া কোনও দিকে কোনওরূপ ত্যাগের আদর্শ লোকসমাজের সম্মুখেও ইঁহারা ধরেন নাই। দাবী করেন কেবল পূরামাত্রায় ব্যক্তিগত ভোগ, চলিতে চাহেন কেবল আপন আপন খোস-খেয়ালে। অথচ নিরঙ্কুশ এই ভোগ, অনর্গলগতি তরল চঞ্চল এই খোস-খেয়াল ফল যাহা প্রসব করিবে, তাহার দায়িত্ব কিছু নিতে চাহেন না। কে যে কি ভাবে নিবে তাহার সম্বন্ধেও স্পষ্ট কিছু বলেন না।

বর্ত্তমান এই সমাজে মানবজীবন ঠিক সমাজতান্ত্রিক (অর্থাৎ নব্য আদর্শানুযায়ী সোসিয়ালিষ্টিক্, socialistic) না হইলেও পূরাপুরি ব্যক্তিতান্ত্রিকও নহে। উভয় নীতির মধ্যে, যেরূপই হউক, একটা সামঞ্জস্য রাখিয়াই চলিতেছে। পূরাপূরি নব্য সমাজতন্ত্রতা বা সোসিয়ালিজম্ চলিতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষা এখনও হয় নাই, রুষিয়ায় একটা চেষ্টা হইতেছে মাত্র। পূরাপুরি ব্যক্তিতন্ত্রতাও যে চলিতে পারে না, এ যাবৎ কোথাও চলিতে পারে নাই, প্রত্যেকটি সমাজের স্থিতির ভিত্তিতে যে নীতি-পদ্ধতি রহিয়াছে,তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। পরস্পরের উপরে নির্ভর-শীল হইয়া, পরস্পরের সহায়তায় সুখশান্তিতে বহু লোককে একত্র থাকিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া প্রত্যেককেই

চলিতে হয়। এই নিয়ম মানিয়া চলার অর্থই কর্ম্মে কি ভোগে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা খোস-খেয়ালের সঙ্কোচ। নতুবা বহু ব্যক্তির মিলনসম্ভূত সামাজিক জীবনই সম্ভব হয় না। ধনসম্পত্তিতে ও পারিবারিক জীবনে পৃথক্ পৃথক্ একটা ব্যক্তিগত অধিকার সত্ত্বেও প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহু বিষয়ে এই সমাজে বহু প্রকার নিয়মের অধীনতা মানিয়া চলিতে হয় এই পারিবারিক জীবনও কেবল একটি মাত্র ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতার বা স্বকীয় নিরপেক্ষ প্রভুত্বের জীবন নহে। একাধিক ব্যক্তির বিশিষ্ট একটি সমবায় এবং সমবায়ের অস্তিত্ব ও মাঙ্গলিক সার্থকতা যে নীতি-ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করে, সকলকেই তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। এখন এই সমবায়ের প্রকৃতি এবং তাহার নীতিধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বুঝিতে চেষ্টা করিব, ইহার সৃষ্টি ও স্থিতির তত্ত্ব কি, কি ভাবে কি কল্যাণ সাধন মানব-জীবনে তাহা করিতেছে এবং সেই কল্যাণের জন্য ইহার নীতি-ধর্ম্মকে মানিয়া চলা অত্যাবশ্যক কিনা, আর এই সাম্য কি স্বাধীনতার দাবী কত দূর তাহার মধ্যে চলিতে পারে।

বিবাহিত দম্পতি যাঁহারা গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহারাও কেহ কেহ সাম্যবাদের ধুয়া ধরিয়া বলিয়া থাকেন, we are united on perfect equal terms, অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে সমান অধিকারে আমরা দুইটি নরনারী মিলিত হইয়াছি। এই অধিকারের দাবীর কথাও মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। কিন্তু ব্যবসায়াদি সাধারণ কোনও বৈষয়িক ব্যাপারে, দুইটি নরের, দুইটি নারীর অথবা দুইটি নর-নারীর সর্ব্বথা সকল অধিকারে একটা মিলন বা যোগস্থাপনা বস্তুটা কিরূপ হইতে পারে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সর্ব্বদা সমান অধিকারে দুইটি নরনারীর গার্হস্থ্য জীবন যে কি ভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহা ধারণ করিয়া লওয়াও বড় সহজ কথা নয়।

সাধারণতঃ সমান কোনও আর্থিক ইষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায়েই বৈষয়িক ব্যাপারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির এইরূপ একটা যোগস্থাপনা হইয়া থাকে। কাজের ভাগ ঠিক সমান সমান অথবা কিছু বেশী কম হইতে পারে, আবার অবস্থানুসারে ভিন্ন রকমও হইতে পারে। সুবিধা বুঝিয়া নিজেরাই ইঁহারা কাজ ভাগ করিয়া নেন। প্রয়োজন হইলে একের কাজ অপরেও বেশ করিতে পারেন। যতদিন ইচ্ছা, এই যোগ তাঁহারা রাখিতে পারেন; আবার যখন ইচ্ছা ভাঙ্গিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, কি অপর কাহারও সঙ্গে যোগস্থাপনা করিয়াও ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিতে পারেন ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি এমন কাহারও কিছু হয় না।

কিন্তু দুইটি নরনারীর গার্হস্থ্য মিলন ও তাহার সিদ্ধি সম্পূর্ণ পৃথক্ এক বস্তু। সৃষ্টি ও সংসারস্থিতি রক্ষাকল্পে স্বয়ং প্রকৃতি দেবী স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ অথচ একান্ত ভাবে পরস্পরসাপেক্ষ যে কর্ম্মের ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহারই সিদ্ধি স্ত্রী-পুরুষের গার্হস্থ্য মিলনের লক্ষ্য। কে বড়, কে ছোট, এ তর্ক এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রী-পুরুষ এস্থলে বিষম এবং সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ কর্ম্মে বিষম এই দুইটি জীবের ঘনিষ্ট মিলন ব্যতীত সৃষ্টি ও সংসার-স্থিতি চলে না। স্বয়ং প্রকৃতিই দুইজনকে এমন বিষম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক কর্ম্মের ভাগ (natural function) এমন ভাবে পৃথক করিয়া দিয়াছেন, যে মানুষের সাধ্য নাই তাহার এদিক ওদিক কিছু করিতে পারে। পরস্পরের সাপেক্ষতায় ও সহায়তায় যার যার কর্ম্মের ভাগ সম্পাদনে যে ভাবে গার্হস্থ্য মিলনে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহাতে সমান সমান দুই ব্যক্তির ঠিক সমান সমান অধিকারের কথা আসিতেই পারে না। তারপর এ মিলন সাধারণ বৈষয়িক বা ব্যবসায়িক মিলনের ন্যায় যখন তখন ভাঙ্গিয়া ফেলাও যায় না। যে সব গুরু দায়িত্ব উভয়ের উপরে আসিয়া পড়ে, একত্র থাকিয়াই তাহা পালন করিতে হয়। পৃথক্ হইয়া পড়িলে পালন সুসাধ্য কি সুখকর হয় না।

সকলেই জানেন, দাম্পত্যসম্বন্ধে মিলিত এক একটি নারী ও পুরুষ আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া মূল এক একটি পরিবার বা সংসার হয়। প্রকৃতির বিধানে নারীকেই সন্তান গর্ভে ধারণ ও প্রসব করিতে হয়; স্তন্যদানে তাহাকে পালন করিতে হয়। একটির পর একটি করিয়া এই ভাবে বহু সন্তান গর্ভে ধারণ ও প্রসব করিয়া স্তন্যদানে তাহাদের লালন-পালনের দায়িত্বও নারীকে নিতে হয়। আবার পশু-শাবকের চেয়ে মানব-শিশু স্তন্যত্যাগের পরেই আপনি চরিয়া খাইতে পারে না, স্বচ্ছন্দে আপনার সব প্রয়োজন আপনিই নির্ব্বাহ করিতে পারে না। বহু বৎসর তাহাদের লালন-পালন ও

রক্ষণাবেক্ষণের ভার আবার কাহাকেও নিতে হয়। নিজের মাতা অভাবে মাতৃস্থানীয়া অন্য কেহই যে এই ভার গ্রহণের যোগ্যতমা পাত্রী, একথা বলাই বাহুল্য। স্বাভাবিক স্নেহের বশে, আনন্দে মাতারা সকলে এই ভার গ্রহণ করেন এবং ইহার জন্য দৈহিক কি মানসিক কোনও ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া তাঁহারা গণনা করেন না। এই স্নেহের প্রেরণা মাতার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মেরই প্রেরণা। অসহায় মানবশিশুকে মাতার স্নেহকোমল আশ্রয় দিয়া ইহাই লোকস্থিতিকে রক্ষা করিতেছে। যত স্বস্তিতে ও শান্তিতে নিশ্চিন্তভাবে তিনি মাতৃত্বের দায়িত্ব ও ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন, সন্তানের পক্ষে—এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকস্থিতির পক্ষেও ততই তাহা কল্যাণকর হইবে। নারীর নিজের পক্ষেও তাহা সুখের বই দুঃখের কোনও অবস্থা হইতে পারে না। এই স্বস্তি, এই শান্তি, এই নিশ্চিন্ততা নারীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কর্ম্মক্ষম কোনও পুরুষ যদি তাহার ও তাহার গর্ভজাত সন্তানদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে, এবং সেই ভার গ্রহণেরও যোগ্যতম পাত্র সেই সব সন্তানদের পিতা। যেমন মাতার অন্তরে, তেমন পিতার অন্তরেও স্বাভাবিক একটা অপত্যস্নেহের প্রেরণা আছে এবং সেই প্রেরণার বশে খাওয়াইয়া পরাইয়া আপন আপন সন্তানদের সুখে রাখিবার জন্য পিতারাও বহু শ্রম ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। আপদ-বিপদ হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন। এইভাবে পিতা ও মাতা উভয়ের সমবেত স্নেহে ও যত্নে মানব-শিশু মানুষ হইয়া উঠিতেছে। পিতা সাধারণতঃ বাহিরের কাজকর্ম্মে অর্থোপার্জ্জন করেন, এবং মাতা গৃহে থাকিয়া সন্তান-পালন ও গৃহস্থালীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। সন্তান-পালন গৃহে থাকিয়াই করিতে হয় এবং গৃহস্থালীর বেশীর ভাগ কর্ম্মই এই সম্পর্কিত কর্ম্ম। স্বামী ও অন্যান্য পরিজনবর্গের আহার-বিরামাদির সুব্যবস্থা প্রভৃতি আর যাহা কিছু কাজ হইতে পারে, এক সঙ্গে সেই নারীর পক্ষে করাই সুবিধা বলিয়া গৃহকর্ম্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সব নারীর হাতেই পড়িয়াছে। দাম্পত্য সম্বন্ধে মিলিত নারী-পুরুষের মধ্যে সাংসারিক কর্ম্মের এইরূপ একটা ভাগ আপনা হইতেই ঘটিয়াছে, এবং উভয় পক্ষই বিস্তর সুবিধা তাহাতে ভোগ করিতেছে।

বৈষয়িক কার্য্যে অধিকাংশ পুরুষকেই বাহিরে এত ব্যাপৃত থাকিতে হয়, এত বেশী পরিশ্রম অনেক সময় করিতে হয় যে, তাহার পর আবার গৃহে কোনও শৃঙ্খলামত নিজেদের ও প্রতিপাল্য অপর কাহারও আহারাদির ও আরাম-বিরামের ব্যবস্থা সহজে তাহারা করিয়া উঠিতে পারে না। নারীদের হাতে এই ভার থাকায় কাজের পর গৃহে ফিরিয়া স্বচ্ছন্দ আহার-বিরাম কেবল নয়, আরও বহুবিধ তৃপ্তি ও আনন্দ তাহারা ভোগ করিতে পারে। গৃহিণীর অভাবে বেতনভোগী দাসদাসীর উপরে যেখানে নির্ভর করিতে হয়, সেখানে শৃঙ্খলামত এই সব স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বড় বড় সহরে অধুনা হোটেলাদির বহু ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে বাঁধা নিয়মে আহারাদি সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রয়োজন লোকের সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের অন্য কোনও আনন্দলাভের সম্ভাবনা কিছু নাই। তারপর 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ'। গৃহে গৃহিণীর সযত্ন ও সতর্ক তত্ত্বাবধানে যে ব্যয়ে যার যার রুচিমত যেরূপ আহারাদির ব্যবস্থা হইতে পারে, হোটেলে আদৌ তাহা সম্ভব নয়। আবার কোন দেশই কেবল বড় বড় সহরের দেশ নয়, বিরলবসতি গ্রামও অসংখ্য আছে। সেই সব গ্রামে অথবা কিছু উন্নত গ্রামবৎ ছোট ছোট সহরে এরূপ হোটেল স্থাপনাও বড় সুসাধ্য ব্যাপার হয় না। সুতরাং বৈষয়িক কর্ম্মে ধনার্জ্জনের কর্ত্তা বলিয়া পুরুষের জীবন যতই শ্লাঘ্য বলিয়া মনে হইক গৃহে এই ধনসুলভ যাবতীয় সুখের জন্য এবং ধনসাধ্য যাবতীয় ধর্ম্মপালনের সফলতার জন্য নারীর উপরে তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে।

তারপর নারীর কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গার্হস্থ্য জীবনে নারীর প্রধান দায়িত্ব, প্রধান ধর্ম্ম,—মাতৃত্বের দায়িত্ব, মাতৃত্বের ধর্ম্ম। এই দায়িত্ব, এই ধর্ম্ম, নারী যথোচিত ভাবে পালন করিতে পারে না, যদি না কোনও পুরুষ (অর্থাৎ তাহার স্বামী) তাহার ও তাহার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এক একটি সন্তান যখন তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে হয় এবং স্তন্যদানাদি কর্ম্মে সাবধানে পালন করিতে হয়, বাহিরের কোনও কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ সে করিতেই পারে না। অন্ততঃ এই সময়ের জন্যও আবার কাহারও রক্ষণাবেক্ষণের উপরে তাহাকে নির্ভর করিতেই

হইবে। যে সব বৈষয়িক কর্ম্মে মানুষ ধনার্জ্জন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-রক্ষার উপযোগী রাষ্ট্রীয়, নাগরিক ও ব্যবসায়িক (political, civic and economic) কার্য্যাদিও নির্ব্বাহ করে, অধিকাংশ স্থলেই তাহাতে যেমন কঠোর দৈহিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন হয়, তেমনই অক্ষুণ্ণ একটা ধারাবাহিকতাও রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। অন্য সময়ে পারিলেও পূর্ণগর্ভা ও নবপ্রসূতি নারীর পক্ষে এই সব কর্ম্মের সকল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। তাই সামাজিক সুব্যবস্থা (social economy) সাধারণতঃ পুরুষের উপরে এই সব কর্ম্মের ভার রাখিয়া গৃহকেই নারীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, এবং এই ক্ষেত্রে নারী যাহাতে স্বস্তিতে তাহার কর্ম্মের ভাগ নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার জন্য তাহার ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভারও পুরুষের উপরে অর্পিত হইয়াছে।

সাংসারিক ধর্ম্মের স্বাভাবিক অবস্থায় কর্ম্মের ভাগ এইরূপ বিহিত হইলেও ইহার ব্যতিক্রমও কিছু না কিছু সর্ব্বত্রই দেখা যায়। স্বামী যদি না থাকে, অথবা একা তাহার উপার্জ্জনে সংসার যদি না চলে, স্ত্রীকে অর্থোপার্জ্জন কিছু করিতেই হইবে। গৃহ-কর্ম্মের অবসরে গৃহে থাকিয়াই কোন কাজে এই উপার্জ্জন যেখানে সম্ভব হয়, নারীর মূল কাজটা অনেকটা সহজেই চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঁধা নিয়মে বাহিরে গিয়া পুরুষের ন্যায় কাজকর্ম্ম করিয়া নারীকে যেখানে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, সেখানে জননী ও গৃহিণীর কর্ম্মনির্ব্বাহ বা ধর্ম্মপালন একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাধ্য হইয়া একটির সঙ্গে আর একটিও যেখানে কতক পরিমাণে অন্ততঃ করিতে হয়, শ্রমক্লেশের অবধি থাকে না—দেহরক্ষার উপযোগী একটু বিরাম কখনও তাহার ভাগ্যে ঘটে না।

স্বামিপুত্রলাভে গৃহধর্ম্মে স্থিত হইতে না পারিয়া, তাহাদের অভাবে স্থিত থাকিতে না পারিয়া অথবা তাহাদের অক্ষমতায় অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া, যে ভাবে যে কারণেই হউক নারীদের যে বাহিরে কাজকর্ম্ম কখন কখন করিতে হয়, ইহাতে কতকটা আপদ্ধর্ম্মের প্রয়োজন বলিতে হইবে, সকল সুব্যবস্থিত সমাজেই কিছু না কিছু যাহা আছে। নারীর যেমন এরূপ কর্ম্মের অবসরও সমাজে সাধারণতঃ থাকে, যেমন ধাত্রীর কর্ম্ম, নারীরোগের চিকিৎসা, বালিকাদের শিক্ষাদান, বহু শিল্পকলা, পাচিকা, পরিচারিকার বৃত্তি ইত্যাদি।

কিন্তু আপদ্ধর্ম্মের প্রয়োজনে অবস্থা বিশেষে ও ক্ষেত্র বিশেষে বাহিরের কাজকর্ম্মে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা যতই নারীকে করিতে হউক, স্বাভাবিক ধর্ম্মে সন্তানের গর্ভধারিণী প্রসূতি ও স্তন্যদাত্রী ধাত্রী রূপে নারীর প্রধান কাজ সন্তান পালন ও গৃহরক্ষা। ভরণ পোষণের ভার স্বামী গ্রহণ করিলেই একাজ সে যত সহজে ও সুখে করিতে পারে, অন্য অবস্থায় তাহা সে পারিবে না। গার্হস্থ্য জীবনে পুরুষেরও প্রধান কাজ এই ভরণ-পোষণাদির ভার গ্রহণ এবং স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধও তাই হইয়াছে, ভর্ত্তৃ ভার্য্যার সম্বন্ধ

ভর্ত্তৃরূপে স্বামী আবার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা হইয়াও দাঁড়ায়। বহু সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য গৃহিণীর উপরে গৃহী পুরুষকে যতই নির্ভর করিতে হউক, ভর্ত্তা রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা বলিয়া তাহার একটা প্রাধান্য ও প্রভুত্ব গার্হস্থ্য জীবনে হইবেই এবং নারীকেও কোনও কোনও বিষয়ে তাহার অনুগত হইয়াও চলিতে হইবে। নারীর পক্ষে ইহা অশোভন বা অমর্য্যাদার বলিয়া মনে করিলে চলে না। নিসর্গের বিধানে নারীর ও পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ যে কর্ম্মের ভাগ বিহিত হইয়াছে, তাহা গার্হস্থ্য জীবনে ভর্ত্তার উপরে এই নির্ভরশীলতা —রক্ষাকর্ত্তার প্রতি আনুগত্য—নারীর পক্ষে অপরিহার্য্য করিয়াই তুলিয়াছে। নারীর প্রতি ইহার জন্য কোনও রূপ হীনতা আরোপ করিলে নিসর্গদেবতার বিধানকেই অবজ্ঞা করা হয়, নারী পুরুষ কেহই তাহা করিতে পারেন না। স্বস্থ অবস্থায় অবিকৃতবুদ্ধি কোনও নারীও এই নির্ভরতাকে গ্লানিজনক বলিয়া মনে করেন না। বরং যোগ্য স্বামীর উপরে এইরূপ নির্ভর করিতে পারিলে তাহা অতি গৌরবের অবস্থা বলিয়াই মনে করেন। স্বামীর আনুগত্যও তাহার চিত্তে আনন্দ বই কোনও রূপ ক্ষুণ্ণতার ভাব আনে না। নারী-পুরুষের দাম্পত্য প্রেমের রহস্য যদি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি দেখিতে পাইব, দৈহিক সামর্থ্য ও তেজোবীর্য্যের অধিকারী পুরুষের প্রতি নারী এবং কমনীয়রূপা ও কোমল-স্বভাবা নারীর প্রতি পুরুষ বেশী আকৃষ্ট হয়। যার যার কর্ম্মের ভাগ সম্পাদনের পক্ষে বিভিন্ন ধাতুর দ্বিবিধ এই গুণই নারী পুরুষের যথাযোগ্য গুণ। পুরুষে ও নারীতে সৌন্দর্য্যের আদর্শও বিভিন্ন এই গুণানুসারে বিভিন্ন রকম হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ভাবে দেখিলে, নারী-পুরুষের মধ্যে কে ছোট কে বড়

এ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। উভয়ে বিষম, কিন্তু বিষম হইলেও সংসারধর্ম্মে সমান অপরিহার্য্য। এ অবস্থায় কে ছোট, কে বড়, এ তুলনাই চলে না।

স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততির ভারণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুরুষকে গ্রহণ করিতে হয়। অপত্যস্নেহের প্রেরণায় এবং স্বাভাবিক একটা দায়িত্ববোধে সকল পুরুষই প্রায় স্বেচ্ছায় ও আনন্দে ইহা করিয়া থাকে। না করিলে সমাজশক্তি তাহাকে বাধ্য করিতে পারে, করিয়াও থাকে। কিন্তু এই সব সন্তান যে তাহারই ঔরসজাত, এ বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা না থাকিলে, অপত্যস্নেহের প্রেরণা কি দায়িত্ববোধ, কিছুই আসিতে পারে না, এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধের একনিষ্ঠতা ব্যতীত এরূপ নিশ্চয়তাও সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কোনও স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের পিতৃত্ব ও ভরণপোষণের দায়িত্বও কোনও পুরুষ গ্রহণ করিতে পারে না। সমাজ-শক্তিও ন্যায়তঃ কাহাকেও এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করিতে পারে না।

স্ত্রীর পক্ষে দাম্পত্য যৌন-সম্বন্ধের এই একনিষ্ঠতা সাধারণতঃ সতীত্বধর্ম্ম নামে পরিচিত। এবং গার্হস্থ্য জীবনে ইহা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য ধর্ম্ম বলিয়াই সর্ব্বত্র বিবেচিত হয়। এই একনিষ্ঠতার অভাব বা যৌন-ব্যাভিচার পুরুষের পক্ষে নিন্দনীয় হইলেও একেবারে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া কোথাও গণ্য হয় না। এক সঙ্গে পুরুষের একাধিক স্ত্রী-গ্রহণও বহু সমাজে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু নারীর পক্ষে একাধিক স্বামীগ্রহণের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যেখানে আছে, হয়, এক পরিবারভুক্ত একাধিক ভ্রাতা এক স্ত্রী বিবাহ করে, সন্তান সব পরিবারের সন্তান হয় এবং সকলেই সমানভাবে তাহাদের ভরণপোষণ করিতে বাধ্য থাকে। আর না হয়, পারিবারিক ব্যবস্থাই সেখানে অন্যরূপ হয়। কন্যা পিতৃগৃহেই থাকে, যথেচ্ছ ভাবে একাধিক পুরুষ-সংসর্গে সে গর্ভধারণ করে এবং পিতা ও ভ্রাতারাই তাহাদের প্রসূত শিশুদের ভার গ্রহণ করে। পিতৃকুল নহে, মাতুলকুলই এই সব সন্তানদের স্বকীয় কুল হয়। দুই একটি স্থানে এইরূপ রীতি যাহা ছিল, তাহাও লোপ পাইতেছে।

ভার্য্যাত্বে ও সতীত্বে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর যে আনুগত্য গার্হস্থ্য জীবনে অপরিহার্য্য তাহার মধ্যে সমান অধিকারের কথা আসিতেই পারে না। চরম সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টরা যে গার্হস্থ্যজীবন লোপ করিয়া স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ অন্য এক নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান ধন-সাম্য স্থাপনার প্রয়োজন ব্যতীত তাহার আর একটি কারণ ইহাও বটে।

কিন্তু এই সতীত্বের আদর্শ আবার সকল দেশে মাত্রায় ঠিক সমান নহে। হিন্দু সমাজে ইহা এরূপ চরম একমাত্রায় গিয়া উঠিয়াছে, যে, বিধবা কি পতিবর্জ্জিতা নারীরও পত্যন্তর গ্রহণ সাধারণতঃ অনুমোদিত হয় না। পুরুষসংসর্গ-দুষ্টা কুমারীকেও কেহ বড় বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয় না। প্রকাশ্যে এরূপ দোষ কাহারও জানা থাকিলে সমাজও তাহাকে বর্জ্জন করে। একমাত্র স্বামী ব্যতীত অপর কোনও পুরুষের সঙ্গে কোনও সময় কোনও অবস্থায়ই নারীর যৌন-সম্বন্ধ ঘটে না, ইহা সতীত্বের আদর্শ বলিয়া হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

বিবাহ-বন্ধনই হিন্দু সমাজে অচ্ছেদ্য বন্ধন। তবে পুরুষের পক্ষে একাধিক পত্নী গ্রহণ অধর্ম্ম বা অবিধি নয় তাই সে তাহা যখন ইচ্ছা বা প্রয়োজন করিতে পারে; কিন্তু নারীর একবার বিবাহ হইলে আর হয় না। শাস্ত্রের প্রমাণে বিধবা-বিবাহ বৈধ বলিয়া আইন পাশ হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ সমাজ এখনও এই আইন মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হয় নাই। যদি হয়, বর্ত্তমান এই আদর্শের চরম কঠোরতা অনেকটা নরম হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজের আদর্শ এই। কিন্তু অন্যান্য সমাজে বিবাহবন্ধন সাধারণতঃ দুশ্ছেদ্য হইলেও একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে। এক পক্ষের মৃত্যুতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উভয় পক্ষের জীবৎকালেও 'ডাইভোর্স' বা বিবাহ-বন্ধন খণ্ডনের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং বিধবা বা ডাইভোর্সের পর বিবাহবন্ধনমুক্তা নারী আবার বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই যখন যে স্বামীর বিবাহিতা পত্নী সে, সেই স্বামী ব্যতীত পুরুষান্তরের সঙ্গে কোনও রূপ যৌনসম্বন্ধ তাহার পক্ষে অধর্ম্ম ও অবিধি। ইহাই সতীত্ব ধর্ম্মের অপরিহার্য্য নিম্নতম মাত্রা! ইহা না মানিয়া চলিলে পুরুষের ভর্ত্তৃত্বে ও রক্ষা-কর্ত্তৃত্বে গার্হস্থ্য জীবনই কোনও নারীর চলিতে পারে না।

শিল্পী শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ননীচোরা

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
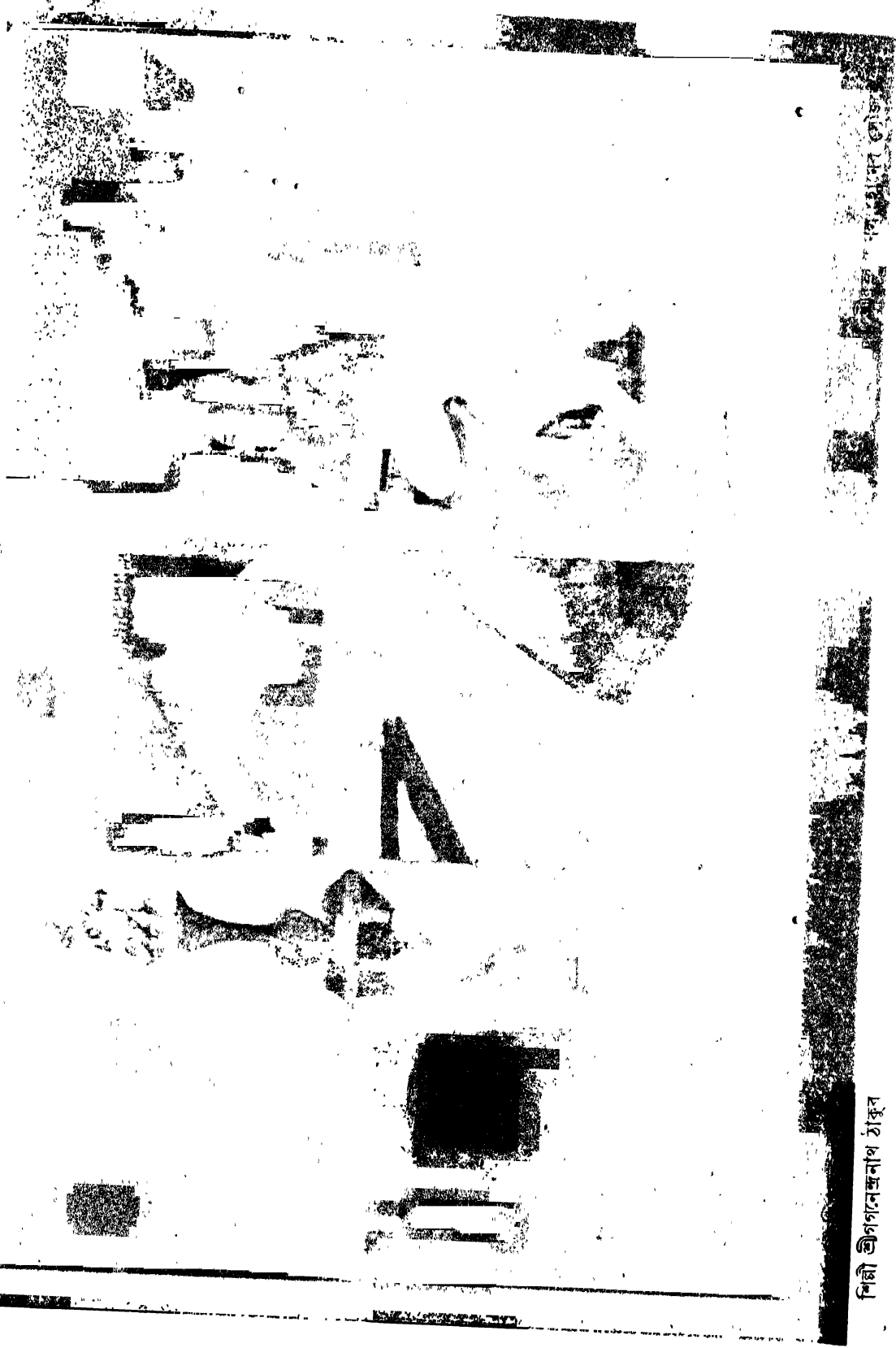
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সৃষ্টির পাট, একটু যদি নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে; তাহার উপর ঐ দজ্জাল ছেলে সামলান। ভোরে উঠিয়া বাসি কাজ সারা, তাহার পর স্নান সারিয়া পূজার বাসন মাজা, পূজার ঘর নিকান—এই দুই প্রস্থ হইয়া গিয়াছে, এখন তিন নম্বর আরম্ভ হইয়াছে এই রান্নাঘরে। স্বামীর ন'টায় গাড়ী, দেবরের দশটায় স্কুল। আমিষের ল্যাঠা চুকিলে শাশুড়ীর হবিষ্য রান্না। মাথার ঠিক থাকে না।

কাকা ভাইপোতে দাপাদাপি করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিল। কাকা কুঁজো হইয়া অত জোরে দৌড়াইয়াও ভাইপোকে কোনমতেই ছুঁইতে পারিল না; যদিও ভাইপো এরই মধ্যে তিন তিনবার আছাড় খাইয়াছে এবং প্রচণ্ড হাসিতে তাহার নিজের গতিবেগটাও নিশ্চয় ব্যাহত।

উঠানের মাঝখানে এক লাফে পলাতকের সামনে আসিয়া দুই হাতের আড়াল করিয়া বলিল—কি দৌড়ুস রে খোকা! কিন্তু এইবার!

জেতার চেয়ে হারার এই নূতনতর কৌতুকে খোকার হাসিটা আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

—আবার কাল দু'পয়সা লেট ফাইন হয়েছে, এই ছ'পয়সা হ'ল, দিও বৌদি।

বৌদির মস্তবড় তফিল র'য়েছে, নিলাম ক'রে নিও।—বলিয়া হাসিয়া কড়ায় খুন্তির একটা ঘা দিয়া বধূ ফিরিয়া বসিল।

—সে জানি না, দাদাকে বল।—বলিয়া দেবর হাসিয়া চলিয়া গেল। বধূর ননদের কথা মনে পড়ে।—সে দেবরের চেয়েও বয়সে ছোট; কিন্তু এই জায়গাটিতে ঠিক কুটুস্ করিয়া একটি কামড় দিয়া বসিত। আহা বেটাছেলে, বড্ড নিরীহ জাত।

—মা, মুনা।-বলিয়া খোকা আসিয়া পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঐ ওর রীতি।

—সর খোকা, আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই, শুনলি কাকার তাগাদা?

—উ থুনলি—বলিয়া খোকা আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া ঝাঁকড়া মাথাটা মার উরু আর বাহুর মাঝখান দিয়া বুকে গুঁজিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া গেল। মা একটু স্থির হইয়া দিল খানিকটা স্তন্য, তাহার পর তরকারি নামাইবার মত হওয়ায় খোকার মাথাটা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—হয়েচে, যা এবার, ক্রমাগত দামালপনা করবি, খিদে পাবে ছুটে আসবি—আমি কাঁহাতক ব'সে ব'সে তোকে মাই দিই খোকা? ছাড়ো, যাওতো সোনা আমার—যা, একজন এবার নাইতে যাবে, যা দিকিন, গামছা কাপড় দিগে।

ছেলে মার পিঠের ওপর লতাইয়া বাঁ হাতে মুখটা ঘুরাইয়া নিজের মুখের অত্যন্ত কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—বাবা অঙ্গা অঙ্গা মা?

এত কাজের ভিড়েও অত কাছে রাঙা ঠোঁট দু'টি পাওয়া গেলে মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলাইয়া দেয়। একটা চুম্বন দিয়া মা বলিল হ্যাঁ, গঙ্গা গঙ্গা করবে যাও।

তরকারি নামাইতে, ঢালিতে কড়া চাঁছিয়া আবার চড়াইতে একটু দেরি হইয়া যায়। কড়ায় তেল দিবার জন্য পিছন দিকে তেলের বাটি লইতে গিয়া দেখিল—সেটা ছেলের দখলে; হাত দু'টি তেলে চোবান, পেটটি তেলে চক্‌চক্ করিতেছে, নীচে একরাশ তেলের ছড়াছড়ি। মার পানে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিল—অঙ্গা অঙ্গা।

রোষে বিরক্তিতে প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া মা বলিল—ও মা গো! এ কি করেচিস খোকা? না বাপু আমি আর পারি না এই হতভাগা ছেলেকে নিয়ে, কোনদিক সামলাই বলতো?

চড় উঁচাইয়া ধমকাইয়া বলিল—দোব ঐ ওরই ওপর দু'ঘা কষিয়ে—ভিরকুটি ঘুচিয়ে?

খোকা তৈলাক্ত হাত দুটি পেটের উপর জড়সড় করিয়া অপ্রতিভ ভাবে মার কড়া চোখের উপর চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইয়াছিল, সে একটা মস্ত শ্লাঘনীয় কার্য্য করিতেছে, মা দেখিয়া তাহার বাহাদুরিতে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইবে, এ ধরণের সম্ভাষণ মোটেই আশঙ্কা করে নাই—একবার উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল

লাঞ্ছনাটা আর কাহারও নজরে পড়িল কি না, তাহার পর মার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার ঠোঁটটা একটু উল্‌টাইয়া গেল। একবার দুই গালের একটা শিরা একটু কুঁচকাইয়া সামলাইয়া গেল; ভ্রূজোড়াটি দুই তিনবার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

এ সব রংবেরংএর বিদ্যুৎস্ফুরণ বর্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ—মার জানা আছে। খোকার চোখের জল—সেটা দেখিতেও কষ্ট, সামলাইতেও কষ্ট, তা ভিন্ন শাশুড়ীর গঞ্জনা - সে তো আছেই। মা হঠাৎ মুখের ভাব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিল ওরে খোকন, না না—তোকে বলিনি; তোমায় কি বলতে পারি বাবা? আমি যে তেলকে বলছিলাম·· হতভাগা তেল! আমার যাদুর পেটে উঠে কি করেচিস বলতো!—ওরে খোকা, কি চমৎকার পাখী দেখ, তুই নিবি? ও মা—

খোকা টালটা সামলাইয়া লইয়াছে, অর্থাৎ চোখের জল ছল ছল করিতেছে বটে কিন্তু উছলিয়া পড়িতে পায় নাই। মার পাশে ঠেস দিয়া ধরাগলায় বলিল—আঙা পাখী?

শান্তিদূতের মত সামনের নিমগাছটায় একটা পাখী এই মাত্র আসিয়া বসিয়াছে। রংটা রাঙা মোটেই নয়; খানিকটা মিশ্‌কালো, খানিকটা বাসন্তী-হলদে। দু'একবার গলা ফুলাইয়া একটা হ্রস্ব, তরল আওয়াজ করিল।

বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে ছেলেকেই মর্য্যাদা দিয়া মা বলিল—হ্যাঁ, আঙা পাখী; নিবি খোকা?

উঁ, নিবি।

তাহ'লে যা তোর কাকার কাছে, যা দিকিন।· ···আর একটু তেলটা চড়িয়ে দিই। ····· হ'য়েচে, এইবার যাও।

খোকা অত্যন্ত ভাল ছেলে হইয়া গেছে। একটু কুঁজো হইয়া, ছড়ান বাসন-পত্র, বাটনা-কুটনার মধ্যে খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিয়াছে,—যেন কত বয়স, কত সাবধানী, লোকসানের কত ভয়! তাহার হঠাৎ ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া মা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কয়েক পা গেলে বলিল—ওরে খোকা, চুনো দিয়ে গেলিনি? মা যে ম'রে যাবে তা' হ'লে।

খোকা ফিরিয়া আসিল, চুমা খাওয়া হইল, খোকা আবার বুড়ার চালে গন্তব্য পথে চলিল। মা একবার দেখিয়া লইয়া ঘুরিয়া বসিল, কর্ত্তার তেল দিতে বলিল—যাও, কাকাকে বলগে। বল 'কাকা, রাঙা পাখীটা······'

পাখীটা মাঝখানের শব্দটায় একটা দীর্ঘ-টান দিয়া আওয়াজ করিয়া উঠিল—'গেরস্তর খোক্কা—হোক্।'

কি বলে পাখী সেই জানে; কিন্তু এই সূত্রে মানুষের সঙ্গে তাহার একটা গাঢ় আত্মীয়তা আছে। ঘরে ঘরে তাহার সঙ্গে উত্তরপ্রত্যুত্তর, কথা কাটাকাটি চলে। বধূ তপ্ত তৈলে একটা লঙ্কা ছিঁড়িয়া দিয়া বলিল আর খোকার প্রার্থনায় কাজ নেই বাপু, ঢের হ'য়েচে; একটিই সামলাতে মানুষের প্রাণান্ত ·····

'ওমা! অমন কথা ব'ল না বৌমা; ঐ একটিতে ঢের হ'য়েচে? পাখীর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, কোলে পিঠে জায়গা না থাক্, ঘর আমার ভরে উঠুক্ দিন দিন ."

শাশুড়ী যে ইহার মধ্যে কখন গঙ্গা-স্নান সারিয়া পূজার ঘরের রকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বধূ সেটা কাজের ভিড়ে, বিশেষ করিয়া ছেলের দৌরাত্ম্যে জানিতে পারে নাই। হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, পরণে গরদ। বধূ একটু লজ্জিতা হইয়া পড়িল; একটু থামিয়া বলিল—দেখনা এসে কাণ্ডটা মা, এক বাটি তেল ফেলে নৈবেকার ক'রেচে। অপরাধের মধ্যে বলেছিলাম—নাইতে যাচ্চে···

স্বামীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় আবার লজ্জিতা হইয়া থামিয়া গেল।

—ফেলুক, দৌরাত্মির বয়েস এখন, সইতে হবে। জীবে থির থাকলে আলো ঠিকরোয় না বৌমা; চারটে মাস ছিল না, বাড়ি যেন ও বৌমা, শীগ্‌গির দৌড়োও, খেলে আমার মাথা!···"

খোকা ঠাকুরমার গলা শুনিয়া পাখীর কথা ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে; বধূর প্রতি উপদেশ শেষ করিবার পূর্ব্বেই টলিতে টলিতে তাঁহাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিল। তাড়াতাড়ি হাত তুলিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া বিপর্য্যস্তভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন—স'রে যাও দাদু, আমায় ছুঁয়ো না···কি গেরো! ও বৌমা ..ওরে তোর গায়ে রাজ্যির অনাচার দাদা, আমায় ছুঁস্ নি, দোহাই তোর·· ও বৌমা, তুমি বুঝি তামাসা দেখচ? অ দাদু, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার···

বৌমা লজ্জার ঝাঁঝের অছিলায় মুখে কাপড় দিয়া তামাসাই দেখিতেছিল। খোকা মস্ত একটা কৌতুক পাইয়া গিয়াছে; যতই মানা, যতই এড়াইবার চেষ্টা, সে ততই দু'হাত তুলিয়া ঠাকুরমাকে ছুঁইবার জন্য ছুটিয়াছে; হাসির চোটে সারা মুখটা সিন্দুর বর্ণ। ষাট বছরের বৃদ্ধা, নাতির সমবয়সী হইয়া সমস্ত রকটা ছুটাছুটি করিতেছেন আর চেঁচাইতেছেন — অ দাদু, খাস্‌নি মাথা আমার, আবার না'ওয়াস্‌নি বুড়ীকে··· অ বৌমা, শীগ্‌গির এস বাছা সব ছেড়ে···

বৌমা গরম তেলে তরকারি ছাড়িয়া তাড়াতাড়ির ভাণ করিয়া ধীরে সুস্থে হাতদুটা ধুইয়া উঠিল। শাশুড়ী বুঝুন, উপদেশ দিলেই হয় না। ঠোঁটে কোথায় যেন একটু হাসি লাগিয়া আছে, পা চালাইয়া আসিয়া খোকাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এই রকম দাম্পাগুা দিয়ে ঘর ভ'রে উঠলেই তো—

কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই দুষ্টামির হাসি সজোরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঢাকা দিবার জন্য খোকাকে বলিল, —ঠাকুর-মাকে ছুঁতে নেই এখন।

খোকা মার মুখের কাছে মুখ আনিয়া, ঘৃণায় নাকটা একটু কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—ঠাম্মা, এ্যা ছিঃ মা?

ঠাকুরমা হাসিয়া রাগিয়া বলিলেন—হ্যা, ঠাম্মা হ'ল এ্যা ছিঃ, আর তুমি ভারী পবিত্তির, নবদ্বীপের পণ্ডিত।—আমার রীতিমত হাঁফ ধরিয়ে দিয়েছে গো! কুশাসনটা বার' ক'রে দাও তো মা, একটু ব'সে জিরিয়ে নি, আর পেরেক থেকে মালাটাও নামিয়ে দিও। ঐঃ, একা হয় না, আবার জুড়িদার এলো।—সর্ সর্, পড়ল বুঝি ঘাড়ে!"

"বা" করিয়া ছোট্ট একটি আওয়াজ করিয়া তিনচারি দিনসের একটি বাছুর সদর দরজায় প্রবেশ করিল, এবং সমস্ত উঠানটা দুড়-দুড় করিয়া ছুটিয়া সামনে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। খোকা উল্লসিত আবেগে 'গোউ, গোউ' বলিয়া করতালি দিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত পা সোজা করিয়া দিয়া মার কোল হইতে নামিয়া ছুটিল।

ঠাকুরমা কিঞ্চিত ভীত হইয়া বলিলেন—ঘাড়ে-টাড়ে পড়বে না তো বাপু? দেখো।

—না, ও নিজেই বাঁচিয়ে পালায়।···যাই, বাবাঃ—বলিয়া একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া বধূ হেঁসেলে চলিয়া গেল।

একটার পর একটা চলিতেছেই—শ্রান্তি নাই, বিরামও নাই। এবার বাছুরের সঙ্গে চলিল। হাতে একটা ছোট, শুষ্ক আমের ডাল তুলিয়া লইয়াছে, বাছুরটাকে ছোঁয় ছোঁয়—সে সমস্ত উঠানটা দু'একটা চক্র দিয়া আবার দূরে দাঁড়াইয়া পড়ে। খোকা হাসিয়া লুটাইয়া যায়, ওঠে, আবার ছোটে। সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত; কপাল, বক্ষ আর কাঁধের ধূলা ঘামের সঙ্গে কাদার কণায় কণায় জমিয়া উঠিয়াছে, হাসির চোটে মুখে লালা উঠিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, গলার হারটা কখন বুকে কখন পিঠে। মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলার দুর্দ্দশার আর পরিসীমা নাই।

দেখাও যায় না, অথচ এই অশেষবিধ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে খোকা যে কেমনভাবে কী সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, চোখ ফিরাইয়া রাখাও যায় না।

মা আড়চোখে দেখে, হাসে। তরকারি নাড়িতে গিয়া খুন্তিটা এক একবার কড়ার বাহিরে শূন্যে ওলট-পালট খায়।

ঠাকুরমার মাথা অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, জপের সঙ্গে যে তাঁহার একটা যোগ আছে এমন বোধ হয় না; কেন না, হিসাব রাখার মালিক যে মন সে উঠানে। খোকা সেখানে তাহাকে ধূলার মধ্যে, তাহার অকাজের মধ্যে, তাহার বিসদৃশ সাথীর মধ্যে, এক কথায় তাহার শতরকম বেহিসাবের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে।

এ মোহ, এরূপ ভ্রান্তি হইবারই কথা।—এই পরিবারের গৃহদেবতা গোপাল। ভগবান এখানে সম্ভ্রমের অধিকারী নয়, স্নেহের ভিখারী। তিনি বিরাট নয়, তিনি অপ্রমেয়, অজ্ঞেয় নয়; সে নন্দের দুলাল যশোদার নয়নমণি—তাহার সম্বন্ধে ওসব কথা আর আসে কোথা থেকে? সে প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের, সংসারের হাসি অশ্রু দিয়া গড়া। যশোদা তাহাকে তাড়নাও করে, আবার নধর অধরে ক্ষীর সর, ননী দেয়, চাঁদমুখ মুছাইয়া ললাটে তিলক আঁকে, মাথায় শিখীপাখা, শ্যাম দেহে পীতধড়া, হাতে পাচনি দিয়া ধেনুদলের সঙ্গে গোচারণে পাঠাইয়া দেয়। গোপাল যখন যায়, যতক্ষণ দেখা যায়, মায়ের চির অতৃপ্ত নয়ন লইয়া চাহিয়া থাকে; আবার সন্ধ্যার গোধূলিক্ষণে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়ায়—এখনি গোপাল মলিন মুখ, মলিন বেশে আসিয়া মায়ের বক্ষলগ্ন হইবে

সে সুদূর নয়, শিশুরা তাহাকে সবার ঘরে ঘরে আনিয়া দেয়—নিশ্চয়ই। খোকার মুখে কি তাহারই ছায়া পড়িয়াছে? ধূলিপটল পেলব অঙ্গে কি তাহারই বর্ণাভাস? কচি পায়ের চঞ্চলতায় কি তাহারই নৃত্যবিলাস? .

ঠাকুরমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে অশ্রু। ঝাপসা দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য এক একবার মনে হয় যেন গোপাল নিজেই—ছায়া নয়, আভাস নয়। শ্যামদেহ ঘিরিয়া পীতবাস, মাথায় মোহনচূড়া বিস্রস্ত, হাতে পাচনবাড়ি, কপালের চন্দন কাদার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমার অঙ্গ আলোড়িত করিয়া যশোদার স্নেহ নামে;· আহা অসহায় শিশু,—খেলায় অসহায়, শ্রান্তিতে অসহায়; কি যে করে, কি না করে, নিজেই জানে না। ও আবার দেবতা কবে হইল?···

যশোদা ঘরে ঘরে নিজের শিশুকে বিলাইয়া, মায়ের ব্যাকুলতা লইয়া সবার বুকে আসিয়া উঠিয়াছে।·· ঠাকুরমা বলে—ওরে অ খোকা, ঘেমে নেয়ে গেলি যে! দেখতো ছিষ্টিছাড়া খেলা ছেলের!

ওদিকে ধবলী—'হ্বা!' করিয়া আওয়াজ করে; চারিদিকে বিপদ আপদ ঢের, অবুঝ বৎস্য, সে চোখের আড়ালে কেন যে যায় ··

কিন্তু খেলা তবুও চলিতে থাকে।

অবশেষে বোধহয় শ্রান্তি একটু আসিল। খোকা অবশ্য বাহ্যত সেটা স্বীকার করিল না। উঠানে বসিয়া হাসিতে হাসিতে ঘাড় এলাইয়া—একবার মার দিকে চাহিল, একবার ঠাকুরমার দিকে চাহিল। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে হইল,—খুব সহজ ব্যাপার, অথচ খুব মজা হয় তাহা হইলে। —রকের উপর উঠিয়া গিয়া, আমের ডালটা দু'হাতে পিছনে ধরিয়া, ঘাড় দুলাইয়া প্রশ্ন করিল—ঠাম্মা, খেব্বি?

ঠাকুরমা হাসিয়া উদ্বেলিত অশ্রু মোচন করিয়া বলিল—হ্যাঁ ভাই, খেলব; ডেকে নে, আর অনেক হয়েছে।

দেরী হইয়া যাইতেছে, উঠিয়া সজল নয়নে পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সেদিন এই পরিবারের ক্ষুদ্র ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।—

ঠিক পূজা সেদিন হইল না, যেন একটি দুরন্ত, উচ্ছৃঙ্খল শিশুর পরিচর্য্যায় কাটিয়া গেল, যাহাতে তাহার চঞ্চলতা আর প্রতিকূলতার জন্য পদে পদেই বাধা। বৃদ্ধা গোপালের সাজগোজ একটি একটি করিয়া খুলিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া আবার অতি সন্তর্পণে, প্রাণের দরদ দিয়া পরাইয়া দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে নানা রকম আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ। ·· এইবার এই রকম ক'রে দাঁড়াও তো ঠাকুর—পীতধড়াটা এঁটে দিই। ··এই বাঁশী ধর।—কতদিন থেকে ইচ্ছে একটি সোনার বাঁশী গড়িয়ে দিই; সে সাধ আর গোপাল মেটাবে না?·· আর কবেই যে মেটাবে···

যেন প্রত্যক্ষ গোপালের সামনে কথাটা বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। সারাদেহে ধূলি, বদনে স্বেদবিন্দু কল্পনা করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দেন। মুখে অনুযোগ—জগতের ভাবনা ভেবেই তুমি সারা হ'লে, নিজের দিকে আর দেখবে কখন?···

হিন্দুর মন—পুতুলখেলার পাশে পাশে গীতার ধ্বনি ওঠে। অলকাতিলকা পরাইয়া শৃঙ্গার শেষ হয়। তখন আবার নিজের প্রগল্‌ভতায় হাসি পায়।—হে ঠাকুর, আমার অহমিকা নিয়ে তোমার এ খেলার মর্ম্ম তুমিই বোঝ। আমি আবার তোমায় সাজাব, মোছাব! যেমন তোমার যশোদার ছেলে হওয়া, তেমনি আমার সেবা নেওয়া;—তোমার লীলার অন্ত আমি আর কি পাব ঠাকুর?

শৃঙ্গারের সময় দেবতা বিগ্রহের মূর্ত্তিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু পূজার সময় তাঁহাকে পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। আজ খোকার খেলার পথে আসিয়া তিনি যেন অতিমাত্র চঞ্চল। চিত্তের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়াও তাঁহাকে পূজার আসনে ধরিয়া রাখা যায় না।···কখন বায়ুর মত স্পর্শাতীত—সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, অথচ আকারে ধরা যায় না। কখন তিনি নাই—একেবারেই বিলুপ্ত—সুধু শিশুতে শিশুতে সমস্ত বিশ্ব একাকার হইয়া যায়। মায়ের নতদৃষ্টির নীচে শিশুর হাসি—ছায়াশ্যাম বৃক্ষতলে খেলায় মত্ত শিশুর দল···কোথাও দরিদ্র পল্লীতে গৃহ, অবসরহীন জননী, উঠানে ছিন্নবাসপরা শিশু-ভগ্নীর কোলে রুগ্ন শিশু, অশ্রুভরা, নিষ্প্রভ তাহার চোখ - কোথাও শিশুর দুর্জ্জয় অভিমান—চাপা ঠোঁট—শান্ত, গম্ভীর ভাব—মা, খাবার, খেলনা, রাজ্যের যত জিনিস একত্র করিয়াও মন পায় না···এক এক সময় সব মুছিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ভাসিয়া

ওঠে,—নবদূর্ব্বাদলশ্যাম নবনীত-দেহ এক শিশু, মাথায় চিক্কণ কেশের চূড়া বায়ুভরে দোদুল—পীতবাসপরা বঙ্কিম কটি—যমুনাকূলের বেণুবন তাহার চঞ্চল নৃত্যপর রাঙা চরণের ঘায়ে তৃণগুচ্ছে রোমাঞ্চিত, কখন সে ধেনুর গায়ে লুটাইয়া পড়ে, কখন নাচিতে নাচিতে বংশীধ্বনি করে—তাহার বাঁশীর স্বরে আকাশ-বাতাস ভরিয়া যায়, বনপ্রান্তর পুষ্পে পুষ্পে মুঞ্জরিত হইয়া ওঠে, যমুনার কালো জলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলোর খেলা চলে···

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যশোদার গৃহ, ঘরের মেঝেয় ভাঙা ননীর পাত্র। গোপালের মুখে, হাতে, যেখানে সেখানে চুরি করা ননীর পোঁচ, শ্যাম ননীর দেহখানি স্নিগ্ধ শাদা ছোপে ছোপে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রাণী আর পারে না, নিত্যই এই চৌর্য্যবৃত্তি, এই অপচয় শাসন মানে না, এ এক বিড়ম্বনার শিশুকে লইয়া করা যায় কি? তোকে এবারে না বাঁধলে চলছে না গোপাল, রোস্ তুই, দড়ি নিয়ে আসি, গোপালের কাতর দৃষ্টি অনুনয় করিতে করিতে ক্ষুদ্র দেহখানি ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে— 'মাগো, আর হবে না, এই শেষ; তোর বাঁধন যে বড় কঠিন হয় মা'

আহা, শিশুর অদম্য লোভ,--কিই বা করে সে?

পূজার সম্ভার পড়িয়া থাকে, মন্ত্র অনুচ্চারিত। মুদিত চোখের পক্ষ ভিজাইয়া শুধু অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়ে।—হে শ্যামসুন্দর, এস; তোমার শিশু-মনের সমস্ত লোভ—তোমার সেই পরম করুণা নিয়ে এস। এখানে তোমার পায়ে সমস্ত উজাড় ক'রে দোব ব'লে ব'সে আছি, অথচ তুমি বিমুখ, হোথায় যশোদার কী পুণ্যবলে তাঁর সমস্ত লাঞ্ছনা অঙ্গের ভূষণ ব'লে মেনে নিচ্ছ ঠাকুর?

অনেকক্ষণ এইরকম যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে মনটা আচ্ছন্ন থাকে, হঠাৎ ছেলের বকাবকিতে চৈতন্য হয়—আবার আজ ভাতের দেরি ক'রে ফেললে?—না, চাকরিটি না খেয়ে আর···

বধূর চাপা গলায় উত্তর—কি করব? যা দজ্জাল ছেলে হ'য়েছে; একটিবার যে কাছে ডেকে উবগার করবে—

ও!—মনিবঠাকরুণের ছেলে না আগলালে বুঝি একমুঠো ভাত—

আরও চাপা গলায় প্রত্যুত্তর হয়—আঃ, চুপ কর, পুজোর ঘরে মা!

আবিষ্ট ভাবটা কাটিলে বৃদ্ধা নিজের মনেই বলিলেন—আজ তুমি তো ঠিক ধ্যানের রূপে দেখা দিলে না ঠাকুর,—কেন তা তুমিই জান।

পুষ্পরাশি চন্দনে মাখাইয়া বেদীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর কুশীতে জল লইয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিতে যাইতেই—এ কি হ'ল!-বলিয়া যেন চিত্রার্পিতের মত কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল হইয়া গেলেন।

চোখের জলে এখনও দৃষ্টিটা একটু ঝাপসা রহিয়াছে, অঞ্চল দিয়া মুছিলেন। না, ঠিকই তো!—রেকাবির মাঝখানের নৈবেদ্যের চূড়ার ওপর যে বড় ক্ষীরের নাড়ুটি—সব চেয়ে যেটি বড়—সেটি নাই! এইমাত্র নিজের হাতে রচনা করা নৈবেদ্য—ঐ নাড়ুটি একবার পড়িয়া গিয়াছিল, ভাল করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়—ভুলের তো কোন সম্ভাবনাই নাই!

তবুও নিজের অদৃষ্টকে বিশ্বাস হয় না, আবার ভাল করিয়া চোখ মুছিতে যান। কম্পিত হস্তে চোখে অঞ্চল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উচ্ছ্বাসে অভিভূত করিয়া ফেলে। শরীর কণ্টকিত,--মনে হয় যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙিয়া পড়িয়া সমস্ত শরীরের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে। চক্ষের জল মুছিবে কে?—কূল ছাপাইয়া বন্যা নামিয়াছে!

মুখে একটি মাত্র কথা,—আনন্দ-ব্যাকুল একটিমাত্র বিস্মিত প্রশ্ন—হে ঠাকুর, এ কি দেখালে?

৩

যখন বাহির হইয়া আসিলেন—চোখের পল্লব সিক্ত, মুখে একটি শান্ত জ্যোতি। বধূর বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল, একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল—মা, আজ তোমার এত দেরী হ'ল?

বৌমা, একবার পুজোর ঘরে এস।

ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘুরিয়া বলিলেন—রান্নাঘরের কাপড়টা ছেড়ে এস বৌমা।

বধূ কাপড় ছাড়িয়া আসিলে ভিতরে গিয়া বলিলেন—এই দেখ বৌমা, আমি নিজের হাতে বড় নাড়ুটি মাঝখানে বসিয়েছিলাম, চোখ মেলে দেখি নেই!

শাশুড়ীর মুখের আলো যেন বধূর মুখমণ্ডলে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল, সে চোখ দু'টি বিস্ফারিত করিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব,—এ বাড়ির মাটির প্রতি কণাটি পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের রসে সিক্ত, বিশ্বাস এদের কোনখানে কখন বাধা পায় না। গোপালের এ-গৃহে পদার্পণই অলৌকিকত্বের মধ্য দিয়া। তাহার পর এই পরিবারের সঙ্গে তাঁহার লীলার লুকাচুরি চলিয়া আসিতেছে,—বিশেষ করিয়া পূর্ব্বজদের আমলে। তাহার মধ্যে কত ঘটনা ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কত আজ পর্য্যন্ত সংসারের আলো-ছায়ায় চলিতেছে, কত বা একেবারেই নিঃসংশয়িত ধ্রুব সত্য। ... জীবনের চেয়েও সত্য, গোপালের বিগ্রহের মতই সত্য।

শাশুড়ী বলিলেন—এ সেই 'যাঁর-নাম-করতে-পারি-না'—গোঁসাইয়ের বংশ বৌমা, এরকম ব্যাপার তো এ-বাড়িতে নতুন নয়; তবে আজকাল আর আমাদের পুণ্যির জোর নেই এই যা।·· পূজো সেরে শ্বশুর ভাগবত প'ড়বেন—খুব তন্ময় হ'য়ে প'ড়তেন কিনা—তেমনি সুকণ্ঠও ছিল—একটি বছর তিনেকের শ্যামবর্ণ ছোট ছেলে এসে বসল—একখানি হলদে রঙে ছোবান কাপড়—কোমর থেকে খ'সে গেছে, জড়িয়ে সড়িয়ে কাঁধে পুঁটুলি ক'রে নিয়েছে। ব'সল তো ব'সল, শ্বশুর একবার দেখে আবার নিজের মনেই প'ড়ে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে আর একবার একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়ে ছেলেটির ওপর একটু নজর পড়ল,—ঠায় একভাবে ব'সে আছে। পাঠ শেষ ক'রতে আরও অনেকক্ষণ গেল। বই মুড়ে চোখ খুলে দেখেন—ছেলেটি নেই, কখন উঠে গেছে। ···আহা, ছোট্ট ছেলেটি, হুড়োহুড়ি ক'রে হাক্লান্ত হ'য়ে ব'সে ছিল, একটু নৈবিদ্যি হাতে দিই। এই ভেবে তিনি রেকাবি থেকে ক্ষীরের নাড়ুতে ফলেতে মুঠোটি ভ'রে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁগা, সে ছোট ছেলেটি আমার ঘরে গিয়ে এতক্ষণ ব'সেছিল, কোথায় গেল দেখেছ?

সকলেই ব'ললে—কৈ না, দেখিনি তো!

শ্বশুর ব'ললেন—সেকি; এই যে এতক্ষণ ব'সেছিল আমার কাছে। ন্যাংটো। কাঁধে একখানা হলদে কাপড়—ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দু'টি?

শাশুড়ী একটু খিট্‌খিটে ছিলেন, ধমক দিয়ে ব'ললেন—জ্বালিওনা বাপু; একবাড়ীর লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে—ছোট ছেলে একটা এল, রইল, বেরিয়ে গেল—কাকে-কোকিলে জানতে পারলে না।···বৌমা, ওঁর মিছরির পানাটা নিয়ে এস · রাজ্যির বেলা ক'রবেন—না নিজের মাথার ঠিক থকেবে, না অন্যের মাথা ঠিক থাকতে দেবেন।

কে আর মিছরির পানা খাবে? সেই নৈবিদ্যির ফল, নাড়ু হাতে ক'রে সমস্ত পাড়ার বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ালেন—হ্যাঁগা এই রকম একটি ছেলে, হলদে কাপড় কাঁধে—তোমাদের বাড়ীর ছেলে কি?—দেখেছ কি;···কে দেখবে? সে কি কারুর বাড়ীর ছেলে যে লোকে দেখবে তাকে?

শাশুড়ী একটু থামিলেন। দু'জনের চোখই জলে ভাসিয়া যাইতেছে। আবার বলিতে লাগিলেন—তখন এসে, সেই হাতের নৈবিদ্যি হাতে ক'রে, পুজোর ঘরে ঢুকে আসনে শুয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন গেল, সমস্ত রাত গেল—আহার নেই, নিদ্রে নেই। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা এসে স্বপ্ন হ'ল—'পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলেই কি আমায় পাবি? ওঠ, তোর নৈবিদ্যি খেয়েছি, ক্ষীরের একপাশে আমার দাঁতের চিহ্ন দেখতে পাবি। খা, আমার কষ্ট হ'চ্চে-উপোসী করে রেখেছিস্।'

অশ্রু মুছিতে মুছিতে দুইজনে বাহিরের রকে আসিয়া বসিলেন। এই ধরণের গল্প চলিতে লাগিল।—তাহার সঙ্গে গীতার, ভাগবতের তত্ত্ব-কথা—ভক্তের জন্য তিনি কি ভাবে কত লীলারূপ ধরেন, নিজের মুখে কোথায় কি আশার কথা কবে বলিয়াছেন, সেই সব।

গল্পের মধ্যে শাশুড়ী বলিলেন—এসব কথা কিন্তু কাউকেও আর এমন জানিয়ে কাজ নেই; বৌমা, অবিশ্বাসীর কাণে গেলে তিনি কষ্ট পান, কতবার স্বপ্নে ব'লেচেন—'আমার লাঞ্ছনা হয় ওতে।'

উঠানের ওদিকে সদর দরজায় খোকার আবির্ভাব, কে কাপড় পরাইয়া দিয়াছিল—শুধু কোমরের গোরোটি লাগিয়া আছে বাঁ হাতে, কাপড়ের পাড়ে-বাঁধা একটা ভাঙা, কলাই-করা সানকি, ডান হাতে সেই চিরন্তন লাঠি। সানকির উপর এক ঘা বসাইয়া, মার দিকে চাহিয়া বলিল—গোউ—ছোনা।

মা হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, নির্ব্বিবাদে মার খাচ্চে কিনা সোনা তো হবেই।

খোকা হঠাৎ শান্ত গরু আর শান্ত-করা লাঠি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার রেওয়াজ মাফিক বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিল। ঠাকুরমা তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন—কোথায় গিয়েছিলে ভাই? আজ তোর সাথী তোর সঙ্গে খেলবার জন্যে যে...”

খোকার পাঁচ-সাত টানের বেশী গ্রহণ করিবার কোন-কালেই ফুরসৎ থাকে না! খেলার নামে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। চোখ দুটো বড় করিয়া বলিল—ঠাম্মা, টুই?

এই সময় কাকা আসিয়া বলিল—বৌদি, ভাত।

খোকা বোধ হয় ঠাকুরমাকে খেলিবার জন্য উৎসাহিত করিতে যাইতেছিল, সামনে এমন জবর সঙ্গী পাইয়া মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। ছুটিয়া গিয়া চোখে মুখে প্রবল আগ্রহের দীপ্তি ভরিয়া প্রশ্ন করিল—ছেয়ে, খেব্বি?

কাকা সখ করিয়া ভাইপোকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছে। পিতাপুত্রে আবার একচোট মাতামাতি চলিল।

আশায় আশায় দিন কাটিতেছে, গোপালের আগমনের কিন্তু কোন নিদর্শনই আর পাওয়া যায় না। নৈবেদ্যের পরিবর্দ্ধিত আয়োজন—শুদ্ধাচারে তৈয়ারি করা, দু'টি অন্তরের ভক্তিরস দিয়া সিঞ্চিত—যেমনকার তেমনি পড়িয়া থাকে। বাটিতে বাটিতে সর, ক্ষীর, ননী, রেকাবীতে ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের নাড়ু কোনটারই কোনখানে প্রত্যাশিত করচিহ্নটুকু পড়ে না। বধূ উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকে, শাশুড়ী বাহির হইলে মুখে গাঢ় নিরাশার ছায়া দেখিয়া আর প্রশ্ন করিতেও সাহস করে না।

চারটি দিন কাটিয়া গেল। হাতে দুইটি নাড়ু লইয়া, রান্না-ঘরের রকে আসিয়া শ্রান্তকণ্ঠে শাশুড়ী বলিলেন—নাঃ বৌমা, কালথেকে গয়লাবৌকে ব'লে দিও, যেমন দুধ দিচ্ছিল তেমনি দেবে। মিছে আশা।—কৈ দাদু, পেসাদ খেয়ে যারে!

বধূ ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল—আমাদের কি সে রকম অদৃষ্ট মা?

খোকার কাকা ঘর থেকে চেঁচাইয়া বলিল—ওমা, ও হতভাগাকে কিচ্ছু দিও না; আমার সব নষ্ট ক'রে দিয়েচে, দেখ এসে বরং।

খোকা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল বুকে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে কালি, একটা চড়ের উপর দিয়াই ফাঁড়াটা কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া মুখে হাসি। সিঁড়ি দিয়া রকে উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—ক—ক।

মা ধমক দিয়া বলিল—খুব ক—খ হয়েছে; তোমার ঠ্যাং খোঁড়া না ক'রে দিলে আর...

ঠাকুরমা বলিলেন—থাক্, হয়েছে; আর বকে না। হাতে নাড়ু দিয়া খোকাকে আলগোছে বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন—তোর সাথী আমার পূজোর ঘরে কবে আসবে দাদু? ক্ষীর, সর নিয়ে এই রকম দৌরাত্মি ক'রতে?”

খোকা নাড়ু চিবান বন্ধ করিয়া কথাটা যেন একটু বুঝিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর পুনরায় বার কয়েক মুখ নাড়িয়া, খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া প্রশ্ন করিল—পেছা ঠাম্মা?

হ্যাঁ ভাই, পেসাদ খেতে সে আর আসবে না?

খোকা ঠাকুরমার মুখের খুব কাছে মুখটা লইয়া গিয়া, নিজের চোখ দু'টা খুব জোরে একটু বুজাইয়া রাখিয়া, আবার খুলিয়া বলিল—ঠাম্মা, এনো কনো।

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন—মিচিমিচি ওরকম ক'রতে যাবো কেন রে হনুমান?

খোকা আর একবার চোখ বুজিয়া ব্যাপারটার পুনরাভিনয় করিতে যাইতেছিল, ও বুঝেচি—বলিয়া ঠাকুরমা তাহাকে আবেগভরে বুকে চাপিয়া, গভীর বিস্ময়ে বধূর পানে চাহিয়া বলিলেন—বৌমা দেখলে? আমি বলি তোমাদের—এ আমাদের ছ'লতে এসেচে

বধূও বিস্মিত হইয়াছিল, তবে সেটা প্রধানত শাশুড়ীর আচরণে; নির্ব্বাক হইয়া সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন—'ওর বলবার ইচ্ছে, একেবারে চোখ বুজে ব'সে থেকো, তাহলেই আসবেন। ঠিকই তো বৌমা, এখন বেশ মনে প'ড়চে কিনা,—একটু দেখতে পাব আশা ক'রে এ কটা দিন ধ্যানের সময় ক্রমাগতই চোখ খুলে যাচ্চে—তাতে কি আর তিনি আসেন মা? যেদিন আসেন সেদিন কতক্ষণ যে একটা চোখ বুজে ছিলাম—এখন সেসব কথা মনে পড়চে, তাঁতে মন সুস্থির না হ'লে তো হবে না মা, তা' গাছটিকে যদি ক্রমাগতই ওপ্‌ড়াও তবে কি গোড়া বসতে

পারে ? কিন্তু ওই শিশু, নিজের খেলায়ই মত্ত, কি ক'রে জানলে ও ?

খোকাকে বুকে মিশাইয়া লইবার মত করিয়া, সজল নয়নে প্রশ্ন করিলেন—তোর মনে কি আছে দাদু ?—বড় যে ভয় করে ভাই।

অমঙ্গল আশঙ্কায় মা ও চক্ষে অঞ্চল দিল।

তাহার পরদিন রবিবার ছিল, রান্নাবান্নার তাড়া নাই। বড় ছেলেকে রোজ আটটার সময় আহার করিতে হয় বলিয়া রবিবার দিন একটার সময় আহারে বসিয়া যুগপৎ নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং চাকরির উপর আক্রোশ মিটায়। শাশুড়ী-বধূতে পরামর্শ হইল পূজার সভায় সেদিন বধূ পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকিবে না, খোকাকে লইয়া পাশের বাড়িতে বেড়াইতে যাইবে। ভিতর-বাড়িতে শুধু শাশুড়ী থাকিবেন একা—পূজার ঘরে।

সেদিন রাত্রি থাকিতেই শাশুড়ী বধূতে উঠিয়া, একান্ত শুচিতার সহিত স্নানাদি সারিয়া পূজার আয়োজন করিলেন। ক্রমে গন্ধদ্রব্যের, ফুল ও চন্দনের গন্ধে ঘরটি ভরপূর হইয়া উঠিল। একটু বেলা হইলে বড় ছেলে রবিবারের অনিশ্চিত আড্ডায় চলিয়া গেল। ছোট ছেলের ক্যারম-প্রতিযোগিতা সামনে, সে মহলা দিতে গেল। বধূও এদিক ওদিক একটু পাট সারিয়া খোকাকে লইয়া পাশের বাড়িতে চলিয়া গেল। নির্জ্জন, নিঃশব্দ বাড়িটিতে শুধু একটি ব্যাকুল ভক্ত সংসারের সহস্র প্রয়োজনে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সাধ্যমত আকৃষ্ট করিয়া, আশায় অবাধ্য নয়নদ্বয়কে প্রতীক্ষায় সংযত করিয়া পূজার আসনে বসিয়া রহিল। শিশুর কথা, দেবতারই ইঙ্গিত; খোকা চোখ বুজিতে বলিয়া চোখ খুলিয়া দিয়াছে।...অনেকক্ষণ গেল, ক্রমেই শরীর মন যেন কি একটা অপার্থিব সুষমায় ভরিয়া আসিতে লাগিল—প্রথম দিনের মতই—ক্রমে প্রথম দিনকেও অতিক্রান্ত করিয়া ..

কাকা খোকাকে ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, বিশেষ করিয়া ছুটির দিনে। খেলার মধ্যেই একবার বাড়ি আসিয়া দেখিল—আর কেহ নাই, শুধু খোকা পূজার ঘরের নীচু জানালাটায় পেটটি চাপিয়া গভীর একাগ্রতার সহিত ভিতরে উঁকি মারিতেছে। কাছে যাইতে ডান হাতের কচি, মাংসল আঙুল কয়টি জড় করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল – চুঁপ্, বাবা অবো।

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহার বাবা হওয়ার লোভ দেখাইবার ধরণ দেখিয়া কাকার বেজায় হাসি পাইল। ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর মা কোথায় ?

খোকা মুঠাটি গালের উপর বসাইয়া, ক্ষুদ্র তর্জ্জনীটি পাশের বাড়ির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া একটু কুঁজোর মত হইয়া দাঁড়াইল, কোন কথা বলিল না। তাহার ভঙ্গির নূতনত্ব আর বিচিত্রতায় কাকার হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইল, পাশের বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া বলিল—বৌদি, শীগ্‌গির এসো, একটা মজা দেখবে এসো তোমার ছেলের।

বৌদিদি নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিতেছিল, বিবর্ণমুখে বলিয়া উঠিল—ওমা, তাই তো ! কখন চ'লে গেছে সেটা ?

হন্ হন্ করিয়া ছুটিল, ছোটদের মধ্যে দু'একজন সঙ্গও লইল।

খোকা জানালার কাছে নাই। দেবরের সঙ্গে সঙ্গে রকে উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া ভিতরে নজর দিয়াই বধূ বিস্ময়ে আশঙ্কায় নির্ব্বাক হইয়া গেল।—শাশুড়ীর মুদিত নয়নযুগলে ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে, একটু দূরে কালো পাথরের বাটিতে ক্ষীরের মধ্যে হাত ডুবাইয়া খোকা সতর্ক ভাবে ঠাকরমার চোখের দিকে চাহিয়া;—পলাইবার উদ্যমে শরীরটা মাটি থেকে একটু উঠিয়া পড়িয়াছে !

জানালা দিয়া ছায়া পড়িতেই ফিরিয়া চাহিয়া, দু'টো হাত পেটে জড় করিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

'ও মাগো !'—বলিয়া বধূ ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। শাশুড়ী হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া আচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন - কি বৌমা ?—কি · সঙ্গে সঙ্গে সামনের দৃশ্যটিতে নজর পড়ায় আর কথার প্রয়োজন হইল না।

বধূ বলিতে লাগিল—তোমার এই কীর্ত্তি, হতভাগা চোর ? আমরা নাগাড়ে ক্ষীর, সর, মাখম তোয়ের ক'রে ক'রে হয়রাণ হচ্চি, আর তোমার ভেতরে ভেতরে এই মতলব ?···তুমি আমার কাছে না ছুটে যদি ধরে নিতে ঠাকুরপো···কি নৈরাকারটাই···

—আমি কি জানি? ভাবলাম এর পরে নকল ক'রবে বলে জানালা থেকে মার পুজো দেখচে; ওঁর মালাজপের নকল করে দেখ না? ওর পেটে পেটে যে এ মতলব তা' কেমন ক'রে জানব? সে বুড়ুটে ভাব যদি দেখতে!—আবার বলে—'বাবা হবো, চুপ করো।'

—হওয়াচ্ছি বাবা।...এই জন্মে ঠাকুরমাকে জো বুঝে কাল পরামর্শ দেওয়া হ'ল—চোখ বুজে থেক, চেপে। চার দিন থেকে জুত হ'চ্ছিল না, না?—বলিয়া রাগ না চাপিতে পারিয়া বধূ হাত উঠাইয়া আগাইয়া গেল।

শাশুড়ী এতক্ষণ স্মিত হাস্যে থোকার দিকে চাহিয়া এক রকম ধ্যানের ভঙ্গিতেই মৌন হইয়া বসিয়াছিলেন। বধূ অগ্রসর হইতেই বলিয়া উঠিলেন—খবরদার বৌমা। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া, খোকাকে কোলে লইয়া আসিয়া আসনে বসিলেন। ক্ষীর-মাখান হাতটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—এই তাঁর হাত বৌমা, এই তাঁর চাঁদমুখ! বৌমা, বললে বোধ হয় বিশ্বাস ক'রবে না—আজ গোপাল এসেছিলেন। ধ্যান করবার সময় মনে হ'ল যেন ঘর আলো ক'রে এলেন, ক্ষীরের বাটির মধ্যে হাত ডুবুলেন—এমন সময় তোমাদের গলা শুনে জেগে উঠলাম।

থোকার কীর্ত্তি রাষ্ট্র হইয়া গেল কত মুখে বিদ্রূপের হলাহলও উদ্গীরিত হইতে লাগিল। বধূরও ভ্রান্তি ঘুচিল বোধ হয়; কিন্তু একজনের মনে কেমন করিয়া সত্যের একটি শিখা অম্লান আলোয় জলিয়া উঠিল। বধূকে আদেশ হইল—কাল থেকে থোকার জন্যে ছোট্ট একটি নৈবিদ্যি আমার আসনের পাশে রাখা থাকবে বৌমা, যখন গোপালকে ওদিকে নিবেদন করব, খোকা তা'রটি নিয়ে খেতে ব'সবে।

প্রত্যূষ

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

খসিল রাত্রির পাখা, ছিঁড়ে যায় তিমির নিবিড়,
জ্বালাহীন রবিরশ্মি ধীরে ধীরে দূরে যায় দেখা,
আকাশের গায়ে গায়ে ভিড় করা পাখীদের নীড়
ভাঙিয়া পড়িল ভূঁয়ে, শূন্যতা ঝিমায় বসি' একা।
নীলের অঞ্জন মাখে বর্ণহীন দিক্চক্রবাল,
সে-নীলে মিশিয়া গেছে বনানীর চঞ্চল হরিৎ—
তড়াগ পল্বল নদী সাগরের রৌপ্যময় থাল,
আলোর স্বপন দেখি' চমকিয়া লভিল সম্বিৎ।
নৈঋতে ঝড়ের পাখা রাত্রিশেষে লভেছে জড়তা,
আলোক, তপস্বী রুদ্র বসে আছে ছাই মাখি' গায়ে,
বায়ু থমথম করে, ভাষাহীন বিশ্বের বারতা,
মহাকাল গতিহীন থামিয়াছে পথতরুছায়ে।

আমি একা ব'সে আছি শূন্যতার অতি কাছাকাছি,
আকাশে তারকা নাই, মেঘে মেঘে নিষ্প্রভ বিদ্যুৎ,
নীড়হারা পাখীদল, চাক-ভাঙা ব্যাকুল মৌমাছি,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ওড়ে। ছিন্ন ভিন্ন যেন পঞ্চভূত
ধূলি ধসরিত পথে উড়িতেছে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে।
আমার বাসনা লক্ষ্মী বিবসনা কাঁদিছে একাকী,
হ'ল না তাহার স্থান নিশীথের তিমির আলয়ে—
পূত শুভ্র শান্ত ঊষা আদরে নিল না তারে ডাকি'।
দিবসের খররৌদ্রে লাজ মানে বাসনা আমার,
রজনীর অন্ধকার আনিল না তৃপ্তির সন্ধান,
আলো-আঁধারের এই যবনিকা নহে লঘুভার,
দিবানিশি মাতে দ্বন্দ্বে, এ প্রত্যূষ আমার পরাণ।

পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন

—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' এবং টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালের বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তারাশঙ্কর ও তাঁহার কাদম্বরী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অসময়োচিত বলিয়া বিবেচিত না হইবারই সম্ভাবনা। তারাশঙ্করের কাদম্বরী-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইহাই প্রধান কারণ বটে, কিন্তু আরও একটি বিশেষ কারণ আছে।

বহু দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, বঙ্গসাহিত্যে তারাশঙ্করের দান ও স্থান-সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া মহামহারথীগণও পক্ষপাতিত্ব করিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন,—যেন বঙ্গসাহিত্য-সমাজ-মধ্যে তিনি একজন অতি নগণ্য, যৎসামান্য ব্যক্তি,—যেন তাঁহার দানের বিষয় আলোচনা করিতে যাওয়া এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান-নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া, উভয়ই হাস্যোদ্দীপক বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃতই এই আলোচনা হাস্যোদ্দীপক বিড়ম্বনা মাত্র কিনা তাহাই নির্দ্ধারণ ও নিরূপণ করা এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমেই সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতেছি।

তারাশঙ্কর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধি চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন। তাঁহাদের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিম পারে নবদ্বীপের নিকটে 'কাঁচকুলি' গ্রামে। সম্ভবতঃ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তারাশঙ্কর কাঁচকুলি গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেন। এইখানেই বলা ভাল যে, ১৮২০ সাল বাঙ্গালার একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই ১৮২০ সালেই, অর্থাৎ তারাশঙ্করের জন্মের ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তিন জন মনীষীরই ঋণ বঙ্গভাষা-জননী কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেন না। ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যের এক এক দিকের এক একটি দিক্‌পাল।

আর একটি এইরূপ বিচিত্র ও আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তারাশঙ্করের জন্মের ঠিক আট বৎসর পরে, একই সালে, অর্থাৎ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালার আর চার জন স্বনামধন্য পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস। দুঃখ হয়, আর ১৮২০ অথবা ১৮৩৮ সাল ফিরিয়া আসিবে না! এই অবসরে আমি বঙ্গের সপ্তর্ষিমণ্ডলীকে বারবার নমস্কার করিতেছি।

সুতরাং তারাশঙ্কর বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষা বয়সে দশ বৎসরের ছোট এবং বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা আট বৎসরের বড়।

তারাশঙ্করের পিতার সাংসারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল না,—ব্রাহ্মণ কোন গতিকে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন। তারাশঙ্কর স্বীয় গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়া কিছুদিন গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন এবং পরে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি তথায় কাব্য ও দর্শন পাঠ করিতেন। দর্শনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তর্করত্ন উপাধি লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার আর একটি উপাধি ছিল 'কবিরত্ন', কিন্তু এ বিষয়ে আমি সবিশেষ অবগত নহি। সম্ভবতঃ কাব্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি শেষোক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখনী চালনা করিতেন,—পাঠদ্দশা হইতেই বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও একান্ত নিষ্ঠা ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি বাণভট্ট-বিরচিত 'কাদম্বরী' নামক প্রসিদ্ধ গদ্যগ্রন্থ অবলম্বনে তারাশঙ্কর বাঙ্গালা গদ্যে 'কাদম্বরী' প্রণয়ন করেন। তাঁহার কাদম্বরী ১৯১১ সংবতে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৮৫১ সালে 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকা তিনি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কাদম্বরী-প্রকাশের পাঁচ বৎসর পরে ১৯১৬ সংবতে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে, তিনি ডাক্তার সামুয়েল জনসন-প্রণীত 'রাসেলাস' (**Rasselas Prince of Abissinia** উপন্যাস অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা গদ্যে 'রাসেলাস' নামক গ্রন্থ লেখেন।

এতদ্‌ভিন্ন তিনি অন্য কোন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিনা, আমরা জানি না।

শুনা যায়, তিনি দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান ছিল না, একটিমাত্র কন্যাই তাঁহার নয়নের মণি ছিল। তিনি সেই মেয়েটির নাম রাখিয়াছিলেন কাদম্বরী। ইহা হইতে অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি কাদম্বরী গ্রন্থখানিকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন। প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিতে না করিতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তারাশঙ্কর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়ঃকনিষ্ঠ—দশ বৎসরের ছোট। সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহারা দুই জনে সমসাময়িক ব্যক্তি। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে 'জীবন-চরিত' এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয়।

আমার পিতামহ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় ১২৮৬ সালে ঢাকা-কলেজ-গৃহে 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' শীর্ষক এক নাতিক্ষুদ্র নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রম ও গতি-বিষয়ক আলোচনা এই প্রবন্ধেই সর্ব্বপ্রথম অনুসৃত হইয়াছিল। ইহা প্রকাশিত হইবার পরে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশ করেন। পিতামহের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত অধিকাংশ প্রধান প্রধান লেখকের রচনাভঙ্গির পরিচয় ও সমালোচনা আছে। ইহার শেষ-ভাগে লিখিত আছে :—

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও জীবনচরিতের পর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (?) মহাশয়ের 'কাদম্বরী' সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জনসোনিয়ান ভাষা। বাঙ্গালায় গদ্যচ্ছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মদিরার মত্ততা অধিক ক্ষণ থাকে না। এই জন্য কাদম্বরীর ভাষা যদিও বঙ্গসাহিত্যের কিছু শোভা সম্পাদন করিয়াছে, কিন্তু অনুকৃত হইতে পারে নাই।"

'লুপ্ত-রত্নোদ্ধার' করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন,—

"বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

আমরা বলি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিধান-অনুযায়ী 'আদর্শ' গদ্যই তাঁহার নিজের গদ্য রচনা; তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নির্দ্দেশিত উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ তাঁহারই রচনায় অনুষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বিষয়-ভেদে—বিষয়ের গুরুত্ব-হিসাবে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা তিনিই তাঁহার বিভিন্ন রচনা মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ভাগ্য ভাল যে, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার সীমা-নির্দ্দেশক দুইটি বিভিন্ন গ্রন্থই একত্র পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এইরূপ সুব্যবস্থা ও সুপাঠ্য নিরূপণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তথা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষাভাষী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

এইবার বঙ্কিমযুগের একজন বিখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করিতেছি। আমার পিতৃদেব অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী-স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূর-চূড়া টেরি-কাটা কার্ত্তিকেয়-স্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক।

তবে অন্য পঞ্চদেবতার উপাসনা অতি শৈশবেও যেমন করিয়াছি, এখনও তেমনি করিতেছি। তারাশঙ্করের ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুর তাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম,—কিন্তু কখন নিজের জিনিস বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। ··

(পিতার) এই সান্ধ্য মজলিসে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা বিশেষরূপে হইত। ·· সেই সাহিত্যের আন্দোলনে আনন্দের ফোয়ারা উঠিত।

আমার মনে পড়ে যে দিন তারাশঙ্করের কাদম্বরীর প্রথমে পাঠ আরম্ভ হইল। শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন, পথিমধ্যে বাল্মীকি সগৌরবে পরশুরামের অবতারণা করিয়াছেন। যৌবনে তাহা পাঠ করিয়াছিলাম,—সে গৌরবও বোধ হয় ভুলিতে পারি। প্রৌঢ়ে রসিকদাস কীর্ত্তনিয়া মহাগৌরবে, মহা-আড়ম্বরে জয়দেবের 'বদসি'-গানের অবতারণা করিয়াছিল, তাহাও হয়ত ভুলিয়া যাইব, কিন্তু বাল্যে সেই যে পিতৃদেব কর্ত্তৃক কাদম্বরী পাঠ, তাহার গৌরব, তাহার মর্য্যাদা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।—সেই যে শ্রোতৃবর্গ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তামাক টানিতে ভুলিয়া গিয়া, হুকাহস্তে, বিস্ফারিত-নয়নে, একমনে, একধ্যানে পিতৃদেবের মুখপানে চাহিয়া আছেন, আর যেন সর্ব্বাঙ্গে কাণ পাতিয়া সেই কাদম্বরী সুধা পান করিতেছেন, সাহিত্য-সেবার সেরূপ জাঁক্‌-পসার, সেরূপ তন্ময়তা, সেরূপ একাগ্রতা কখন ভুলিতে পারিব না।"

প্রবীণ সমালোচকের সমালোচনা শুনিলেন, এইবার একবার একজন নবীন সমালোচকের অভিমত শুনুন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন:—

"এই জাতীয় (টেলিমেকস-রোমাবতী জাতীয়া) রচনার মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' একটি (?) উল্লেখযোগ্য পুস্তক। তৎসম শব্দের ঘনঘটা ও সমাস-বাহুল্যের মধ্য দিয়া তারাশঙ্কর মূল কাদম্বরীর শব্দঝঙ্কার ও শব্দচিত্র যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তারাশঙ্করের অন্যতম আখ্যায়িকা 'রাসেলাস।' ইহা জনসন সাহেব-রচিত তন্নামক উপন্যাস-অবলম্বনে রচিত। ইহার রচনা সংস্কৃত-ঘেঁষা ও বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।"

তারাশঙ্কর-প্রণীত মাত্র তিনখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তিকা 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা।' ইহা প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক রচনার মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় হেয়ার সাহেবের প্রাইজ ফণ্ড্ হইতে তিনি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। সেই সময়ের নারীজাতির অবস্থা—তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা,—রীতি, নীতি, আচরণ,—কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বিধবাগণের অবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের বিধান, ইংলণ্ডের বিদুষী মহিলার দৃষ্টান্ত, স্ত্রীগণের পাঠ্য-পুস্তক কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাদের পক্ষে আদর্শ বিদ্যালয় এবং কয়েকজন হিন্দু মহিলার বিবরণ প্রভৃতি স্ত্রীবিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তিকায় যোগ্যহস্তে প্রমাণ-প্রয়োগ-সহ আলোচিত হইয়াছিল। ইহার ভাষা কিঞ্চিৎ সংস্কৃতানুগ বটে, কিন্তু উৎকট সমাস-বহুল নহে।

তারাশঙ্করের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কাদম্বরী' ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট হইতে ইহার চতুর্থ সংস্করণের একখণ্ড পুস্তক পাইয়াছি। এখানি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকারকে চারি বৎসরের মধ্যে চারটি সংস্করণ প্রকাশিত করিতে হইয়াছিল। এই চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইবার সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। গ্রন্থের নাম-পরিচায়ক পৃষ্ঠায় (title-page) লিখিত আছে:—

"Kadambari translated from the original Sanskrit. By Tara Shankar Tarkaratna. Forth (?) Edition.

কাদম্বরী। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। শ্রীতারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত। চতুর্থ বার মুদ্রিত।

Calcutta: The Sanskrit Press. College Square No 1. Printed And Published by Hurish Chandra Tarkalankar. 1858.

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তারাশঙ্কর যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াই মারা যান। সম্ভবতঃ কাদম্বরীর পঞ্চম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। এই চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থকার-লিখিত দুইখানি 'বিজ্ঞাপন' মুদ্রিত আছে,—একখানি প্রথম বারের, অন্যটি দ্বিতীয় বারের। দুইখানি বিজ্ঞাপনই উদ্ধৃত হইল:—

"প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরী নামে যে মনোহর গদ্য-গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে। সংস্কৃত কাদম্বরী পাঠে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ হইয়া থাকে এবং তাহার বর্ণনা শুনিলে অথবা পাঠ করিলে সাতিশয় চমৎকৃত হইতে হয়। এই বাঙ্গালা অনুবাদ যে সেইরূপ প্রীতিদায়ক ও চমৎকারজনক হইবেক ইহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, যে সকল মহাশয়েরা বাঙ্গালা ভাষায় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকারপুর্ব্বক এক এক বার পাঠ করিলেই সমুদায় শ্রম সফল জ্ঞান করিব। শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্মা।

কলিকাতা, সস্কৃত (?) কালেজ।
৩রা আশ্বিন, সংবৎ ১৯১১।"

"দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

কাদম্বরী দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই বারে কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত ও কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল স্থান অসংলগ্ন

অথবা দুরূহ বোধ হইয়াছিল ঐ সকল স্থান সংলগ্ন ও সহজ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না।

শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্মা।

৫ই বৈশাখ।

সম্বৎ ১৯১৩।"

চতুর্থ সংস্করণে মুদ্রিত এই দুইখানি বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে মনে হয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সময়ে তিনি গ্রন্থের লিখিত বিষয়ের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন করেন নাই, নতুবা সেই পরিবর্ত্তনের বিষয় সেই সেই বারের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়া মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইত। সুতরাং এই চতুর্থ সংস্করণটিই যে গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ প্রামাণিক (authentic) ও বিশুদ্ধ সংস্করণ, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। ইহার পরের দুই-তিনখানি সংস্করণ পড়িয়াছি, সেগুলি বিভিন্ন সম্পাদক-পুঙ্গবগণের হক্-না-হক্ ওস্তাদিতে ও পণ্ডিতম্মন্যত্বে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়াছে। যাঁহার যেমন ইচ্ছা হইয়াছে তিনি সেই ভাবে প্রাণ ভরিয়া কাটিয়া, ছাঁটিয়া, বাড়াইয়া, বাদ দিয়া,—ভ্রমক্রমে কপি-ছাড় করিয়া, বিশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া অশুদ্ধ ও অপপ্রয়োগের অযথা অবতারণা করিয়া, খোদার উপর খোদ্‌কারি করিতে গিয়া পদে পদে তারাশঙ্করকে বিড়ম্বিত করিয়া, তাঁহার মুণ্ডপাত করিয়া স্ব স্ব ওস্তাদি জাহির করিয়াছেন। এইরূপ বিচিত্র ও শোচনীয় পরিণাম যে শুধু কাদম্বরীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে, তাহা নহে,—বাঙ্গালার অনেক সদ্‌গ্রন্থই গ্রন্থকারের অবর্ত্তমানে সুযোগ্য সম্পাদকের হস্তে এইভাবে বিড়ম্বিত, নির্য্যাতিত ও নিগৃহীত হইয়াছে। দুঃখ হয় না কি? বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধে কাদম্বরী-সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইবে, তাহা এই চতুর্থ সংস্করণ অবলম্বন করিয়াই।

এখন বাণভট্ট-কৃত যে মূল সংস্কৃত গদ্যগ্রন্থ-অবলম্বনে তারাশঙ্কর 'কাদম্বরী' লিখিয়াছেন, সেই মূল গ্রন্থ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

মহাকবি বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের সংস্কৃত সাহিত্যের একজন অদ্বিতীয় লেখক। তিনি ছিলেন উত্তর-ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্যের সভাপণ্ডিত। বাণভট্ট তাঁহার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের জীবন-ইতিহাস 'হর্ষচরিত' নামক গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়া আছেন। বাণভট্টের অন্যতম প্রসিদ্ধ মহাগ্রন্থ 'কাদম্বরী'। কাদম্বরী বার শত বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত গদ্যে লিখিত হইলেও ইহাকে অপূর্ব্ব ছন্দোবদ্ধ মহাকাব্য বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে—এমনি ভাষার আড়ম্বর, শব্দের ছটা, বাক্যের ঘটা, অলঙ্কারের আধিক্য, ভাবের দ্যোতনা, বর্ণনার ভঙ্গিমা আর লিপিচাতুর্য্যের মধুরিমা। মূল কাদম্বরী বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে যাওয়াও আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা, কেননা আমি সংস্কৃত সাহিত্য কিছুই পড়ি নাই। তবু সভয়ে এইটুকু মাত্র বলিতেছি যে, অনেকের ধারণা সংস্কৃত কাদম্বরী সমাস-ভারে ভারগ্রস্ত এবং দাঁতভাঙ্গা শব্দ-সম্পদের আতিশয্যে প্রপীড়িত বলিয়া অল্প-স্বল্প সংস্কৃত-জানা লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমিও একখানি অভিধানের সাহায্যে অনায়াসে—অক্লেশে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহার রস, ইহার মাধুর্য্য, ইহার সুষমা উপভোগ করিতে পারি, কেননা গ্রন্থ বিপুলায়তন হইলেও, 'সমস্ত' পদগুলি সময়ে সময়ে দুই-তিন-পঙ্‌ক্তিব্যাপী হইলেও, অধিকাংশ বাক্যগুলি পাচ-সাত পঙ্‌ক্তি জুড়িয়া বিরাজিত থাকিলেও গ্রন্থ-মধ্যে ক্রিয়াপদের সংখ্যা প্রাতিপদিকের তুলনায় অনেক কম। ক্রিয়াপদের এইরূপ সংখ্যাল্পতা হওয়াই ত স্বাভাবিক; কেননা একটি বাক্য যদি সাত পঙ্‌ক্তি ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে থাকে এবং সেই বাক্য-মধ্যে অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশটি পদ থাকে, তাহা হইলেও তাহাতে একটি বা দুইটির বেশি সমাপিকা ক্রিয়াপদ থাকিতেই পারে না। আর এই সব ক্রিয়াপদের অর্থ লইয়াই যত বিভ্রাট ও গণ্ডগোল,—এগুলিকে ত আর অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহারা মোটামুটি সংস্কৃত জানেন, তাঁহারাও একখানি মাত্র ভাল অভিধানের সাহায্যে হাসিতে হাসিতে সংস্কৃত কাদম্বরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, এবং ইহার রসাস্বাদে বিভোর হইয়া কৃতার্থ ও পুলকিত হইতে পারেন,—তবে গোড়াতেই একগজী বাক্য দেখিয়া ভড়্‌কাইলে সব মাটি হইবে, পণ্ড হইবে, ব্যর্থ হইবে।

অজ্ঞ, অকবি, অরসিক আমার কথা না হয় বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কি লিখিয়াছেন দেখুন:-

"সংস্কৃতসাহিত্যে গদ্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে, তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যেমন রমণীর তেমনি পদ্যের

অলঙ্কারের প্রতি টান বেশী - গদ্যের সাজসজ্জা স্বভাবতই কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী। তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয় এইজন্য তাহার বেশভূষা লঘু, তাহার হস্তপদ অনাবৃত। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহ্য শোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্ব্বদা চলাফেরার জন্য সে হয় নাই,—বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হোক্ কিন্তু কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মতো বিরাজ করিতে থাকে।

সেইজন্য বাণভট্ট যদিচ স্পষ্টত গল্প করিতে বসিয়াছেন, তথাপি ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া কোথাও গল্পকে দৌড় করান নাই। সংস্কৃত ভাষাকে অনুচরপরিবৃত সম্রাটের মতো অগ্রসর করিয়া দিয়া গল্পটি তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায়ভাবে ছত্র বহন করিয়া চলিয়াছে মাত্র।

কিন্তু কাদম্বরীকার মুখ্য গৌণ ছোটো বড়ো কোনো কথাকেই কিছুমাত্র বঞ্চিত করিতে চান নাই। তাহাতে যদি গল্পের ক্ষতি হয়, মূল প্রসঙ্গটি দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে তাহাতে তিনি বা তাঁহার শ্রোতারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন, তথাপি কথা কিছু বাদ দিলে চলিবে না, কারণ কথা বড়ো সুনিপুণ, বড়ো সুশ্রাব্য, কৌশলে, মাধুর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ।

কিন্তু এক কালের মধুলোভী যদি অন্য কাল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজ কালের প্রাঙ্গণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্য কালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, আপিসের বেলা হইতেছে, মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরসবিলাসী রাজোশ্বর-বিশেষ, রাজসভা-মধ্যে সমাসীন এবং 'সমানবয়োবিদ্যালঙ্কারৈঃ অখিলকলাকলাপালোচনকঠোর-মতিভিঃ অতিপ্রগল্‌ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈঃ কাব্যনাটকাখ্যানাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ বিনয়ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ।'

কিন্তু কাদম্বরীর বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ভাষা ও ভাবের বিশাল বিস্তার রক্ষা করিয়াও তাহার চিত্রগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত প্লাবিত হইয়া একাকার হইয়া যায় নাই।

এমন বর্ণসৌন্দর্য্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই। ...রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই! সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ আছে, ভাবের রঙ আছে।......

সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরীকাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে—বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন,—এজন্য তাঁহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘনসংলগ্ন-ধারাবাহিক তাহা নহে, এক একটি ছবির চারি দিকে প্রচুর কারুকার্য্যবিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া, ফ্রেমসমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য্য আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগা।"

এইবার মূল গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিব এবং আধুনিক লেখ্য ভাষায়, অর্থাৎ যে ভাষায় এখনও আমরা অধিকাংশ লেখক গম্ভীর-বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখি, সেই উদ্ধৃত অংশের শব্দগত অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিব।

"একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি রাজানমাস্থানমণ্ডপগতমঙ্গনাজনবিরুদ্ধেন বামপার্শ্বাবলম্বিনা কৌক্ষেয়কেণ সন্নিহিতবিষধরেব চন্দনলতা ভীষণরমণীয়াকৃতিঃ অবিরলচন্দনানুলেপনধবলিতস্তনতটা উন্মজ্জদৈরাবতকুম্ভমণ্ডলেব মন্দাকিনী চূড়ামণিসংক্রান্তপ্রতিবিম্বচ্ছলেন রাজাজ্ঞেব মূর্ত্তিমতী রাজভিঃ শিরোভিরুহ্যমানা শরদিব কলহংসধবলাম্বরা জামদগ্ন্যপরশুধারেব বশীকৃতসকলরাজমণ্ডলা বিন্ধ্যবনভূমিরিব বেত্রলতাবতী রাজ্যাধিদেবতেব বিগ্রহিণী প্রতীহারী সমুপসৃত্য ক্ষিতিতলনিহিতজানুকরকমলা সবিনয়মব্রবীৎ—দেব দ্বারস্থিতা সুরলোকমারোহতস্ত্রিশঙ্কোরিব কুপিতশতমখহুঙ্কারনিপাতিতা রাজলক্ষ্মীর্দক্ষিণাপথাদাগতা চণ্ডালকন্যকা পঞ্জরস্থং শুকমাদায় দেবং বিজ্ঞাপয়তি—সকলভুবনতলসর্ব্বরত্নানামুদধিরিবৈকভাজনং দেব বিহঙ্গমশ্চায়মাশ্চর্য্যভূতো নিখিলভুবনতলরত্নমিতি কৃত্বা দেবপাদমূলমেনমাদায়াগতাহমিচ্ছামি দেবদর্শনসুখমনুভবিতুম্ ইতি। এতদাকর্ণ্য দেব প্রমাণমিত্যুক্ত্বা বিররাম। উপজাতকুতূহলস্তু রাজা সমীপবর্ত্তিনাং রাজ্ঞামবলোক্য মুখানি কো দোষঃ প্রবেশ্যতাম ইত্যাদিদেশ। অথ প্রতীহারী নরপতিকথনানন্তরমুত্থায় তাং মাতঙ্গকুমারীং প্রাবেশয়ৎ।"

—একদিন ভগবান্ সূর্য্যদেব, যিনি নব নব কমল কলিকাগুলিকে প্রস্ফুটিত করেন, কিয়ৎ পরিমাণে রক্তিমবর্ণ ত্যাগ করিয়া আকাশের কিছু উপরে উঠিলে সভামণ্ডপে অবস্থিত রাজার নিকটে প্রতীহারী উপস্থিত হইল। রমণীর ব্যবহারবিরুদ্ধ তরবারি তাহার বাম পার্শ্বে ঝুলিতেছিল বলিয়া চন্দনতরুর পার্শ্বে সর্প থাকিলে যেমন রমণীয় অথচ ভীষণ আকৃতি দেখায়, তাহাকে সেইরূপ দেখাইতেছিল; চন্দনের ঘন অনুলেপনে তাহার স্তনদেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল বলিয়া ঐরাবতের মাথায় মাংসপিণ্ড মন্দাকিনীর জলে নিমগ্ন হইতে থাকিলে যেমন দেখায়, তাহাকে সেইরূপ দেখাইতেছিল; সমবেত রাজগণের মুকুটমণিতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছিল, যেন তাঁহারা মূর্ত্তিমতী রাজাজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া আছেন; কলহংসের ন্যায় শ্বেতবসনা তাহাকে শরৎকালে কলহংসতুল্য নির্ম্মল আকাশের মত দেখাইতেছিল; পরশুরামের কুঠারের ধারের ন্যায় সে সমস্ত রাজমণ্ডলীকে

বশীভূত করিয়াছিল ; বিন্ধ্যবনভূমির ন্যায় সে বেত্রহস্ত ছিল ; তাহাকে রাজ্যের মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় দেখাইতেছিল। সেই প্রতীহারী ভূতলে জানু ও করকমলযুগল সংস্থাপিত করিয়া সবিনয়ে বলিল, "দেব, ক্রুদ্ধ দেবরাজের হুঙ্কারে স্বর্গারোহণকারী অধঃপতিত ত্রিশঙ্কু রাজার রাজলক্ষ্মীর ন্যায় দক্ষিণাপথ হইতে আগত এক চণ্ডালকন্যা পিঞ্জরস্থিত একটি শুকপক্ষিহস্তে দ্বারে উপনীত হইয়া আপনাকে জানাইতেছে,—'দেব, আপনি সমুদ্রের ন্যায় সমগ্র ভূমণ্ডলতলস্থ সকল রত্নের একমাত্র আধার ; এই আশ্চর্য্য পাখীটিও নিখিল জগতের মধ্যে রত্ন-স্বরূপ ; এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহাকে লইয়া আপনার চরণতলে আসিয়াছি ; সেই জন্য আমি আপনার দর্শন সুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি।' ইহা শুনিয়া দেব যেরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিদ্দেশ করেন।"—এই কথা বলিয়া প্রতীহারী নীরব হইল। কুতূহলী রাজা সমীপবর্ত্তী অন্যান্য রাজাদের মুখের দিকে চাহিয়া "দোষ কি, প্রবেশ করিতে দাও"—এইরূপ আদেশ করিলেন। অনন্তর রাজার কথা শেষ হইলে প্রতীহারী ভূমি হইতে উঠিয়া গিয়া সেই চণ্ডালকুমারীকে তথায় প্রবেশ করাইল।

মূল গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশটুকুর ভাবানুবাদ করিয়া কি ভাবে ও কি ভাষায় তারাশঙ্কর তাঁহার কাদম্বরীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এইবার তাহাই দেখাইতেছি।

"একদা প্রাতঃকালে আপন অমাত্য কুমারপালিত ও অন্যান্য রাজকুমারের সহিত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! দক্ষিণাপথ হইতে এক চণ্ডালকন্যা আসিয়াছে। তাহার সমভিব্যাহারে এক শুকপক্ষী আছে। কহিল, মহারাজ সকল রত্নের আকর, এই নিমিত্ত এই পক্ষিরত্ন তদীয় পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। দ্বারে দণ্ডায়মান আছে অনুমতি হইলে আসিয়া পাদপদ্ম দর্শন করে।

রাজা প্রতীহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সমীপবর্ত্তী সভাসদগণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন কি হানি আছে লইয়া আইস। প্রতীহারী যে আজ্ঞা বলিয়া চণ্ডালকন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল।"

তারাশঙ্কর রাসেলাসের 'বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন,—

"ইংরেজী ভাষায় জনসন-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'রাসেলাস' গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। জনসন এক সপ্তাহে ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যিনি এত অল্প সময়ে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, ঈদৃশ অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিতে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে ; এজন্য অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনচরিত সঙ্কলিত হইয়া এই পুস্তকের প্রথমে সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে এই পুস্তক লোকসমাজে পরিগৃহীত হইলে আমার সমুদায় শ্রম সার্থক হয়।"

'জনসনের জীবনচরিত' হইতে প্রথম প্যারাগ্রাফ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"১৭০৯ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ষ্টাফোর্ড সায়ারের অন্তর্গত লিচ্‌ফিল্ড গ্রামে জনসন জন্ম গ্রহণ করেন। জনসনের পিতা পুস্তকবিক্রেতার ব্যবসায় করিতেন। প্রথম অবস্থায় কিছু সঙ্গতিও করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্চমেণ্টের ব্যবসায়ে একবারে নির্ধন হইয়া যান। যাহা হউক, বুদ্ধি বিদ্যার জন্য সকলে তাঁহার সম্মান ও সমাদর করিত। জনসনের মাতাও বুদ্ধিমতী ছিলেন। জনসন বাল্যাবধি শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগে আক্রান্ত হন। শারীরিক রোগে তাঁহার একটি চক্ষু একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তাঁহার পিতার স্বাভাবিক যে উদ্বেগ ও চিন্তারোগ ছিল, তাহারও তিনি উত্তরাধিকারী হন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তিনি পঠদ্দশায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদিগের ন্যায় শ্রমসাধ্য ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। ওলিবর নাম্নী এক বিধবার নিকট তাঁহার প্রথম শিক্ষা হয়। লিচ্‌ফিল্ডে ঐ বিধবার এক বিদ্যালয় ছিল। তিনি সর্ব্বদা কহিতেন, জনসনের মত বুদ্ধিমান ছাত্র বিদ্যালয়ে কখন আইসে নাই।"

এইবার ইংরাজী 'রাসেলাস' হইতে একটু করিতে

"From the mountains, on everyside, rivulets descended, that filled all the valley with verdure and fertility, and formed a lake in the middle, inhabited by fish of every species, and frequented by every fowl, whom nature has taught to dip the wing in water. This lake discharged its superfluities by a stream, which entered a dark cleft of the mountain, on the northern side, and fell, with dreadful noise, from precipice to precipice, till it was heard no more.

The sides of the mountains were covered with trees ; the banks of the brooks were diversified with flowers ; every blast shook spices from the rocks ; and every month dropped fruits upon the ground. All animals that bite the grass, or browse the shrub, whether wild or tame, wandered in this extensive circuit, secured from beasts of prey, by the mountains which confined them. On one part, were flocks and herds feeding in the pastures ; on another, all the beasts of chase frisking in the lawns ; the sprightly kid was bounding on the rocks, the subtle monkey frolicking in the trees, and the solemn elephant reposing in the shade. All the diversities of the world were brought together, the blessings of nature were collected and its evils extracted and excluded."

এই উদ্ধৃত অংশ ভাষান্তরিত করিয়া তারাশঙ্কর এই ভাবে তাঁহার পুস্তক-মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন :—

"পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ হইতে জল পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নদী প্রবাহিত হয়। সেই সকল নদী একত্র হইয়া গিরিগর্ভের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড এক হ্রদ হয়। তথায় নানা প্রকার মৎস্য ছিল ও নানাবিধ জলচর পক্ষী সকল সাঁতার দিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিত। পর্ব্বতের চারিদিকে ভগ্ন প্রস্তর ছিল, যখন জল ছাপাইয়া উঠিত তখন ভগ্ন প্রস্তরের মধ্য দিয়া বহির্গত হইত।

গিরিগর্ভ অতি মনোহর। উহার চতুর্দ্দিক্ নানা তরুমণ্ডলীতে আচ্ছন্ন এবং গিরি-নদীর তীর-বিকসিত কুসুমে সর্ব্বদা আলোকময়। মন্দ মন্দ গন্ধবহ নানাবিধ গন্ধলতা কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিত এবং প্রতিমাসে বৃক্ষের ফল পরিণত হইয়া ভূতলে পতিত হইত। বন্য ও পোষিত পশু মাঠের চতুর্দ্দিকে চরিয়া বেড়াইত, হিংস্র জন্তু তথায় আসিতে পারিত না। কোন দিকে গো মেষাদির পাল চরিতেছে, কোন দিকে হরিণ ও হরিণীগণ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, কোন স্থলে ছাগশাবক প্রস্তরের উপর লম্ফ-ঝম্প দিয়া বেড়াইতেছে, কোন স্থানে গম্ভীর-স্বভাব হস্তী তরুতলের ছায়ায় শয়ন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছে, কোথাও বা চঞ্চল কপিকুল এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে শাখায় লম্ফ দিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাওয়া যাইত। পৃথিবীর সমুদায় আশ্চর্য্য বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল, সংসারের সমুদায় দুঃখ-সন্তাপ তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল।"

তারাশঙ্করের লিখিত বিভিন্ন বিষয়ক ভাষা উদ্ধৃত হইল। —কাদম্বরীর দুইটি ভূমিকা, কাদম্বরীর সূচনা হইতে কিয়দংশ, জনসনের জীবনীর প্রারম্ভ, এবং রাসেলাসের গোড়া হইতে উপরি উদ্ধৃত অংশ। যদি এই সকল উদ্ধৃত অংশ অবহিত হইয়া শ্রদ্ধান্বিতভাবে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে পাঠক অনায়াসে তারাশঙ্করের ভাষার দোষ ও গুণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে পারিবেন।

প্রথমেই একটি বিশেষ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এত রকম গ্রন্থ থাকিতে তারাশঙ্কর বাণভট্টের কাদম্বরী এবং জনসনের রাসেলাস অবলম্বন করিয়াই বা কেন তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থদ্বয় রচনা করিলেন—এই প্রশ্ন সকল চিন্তাশীল পাঠকের মনেই স্বতঃ উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি কাদম্বরীকে বড় ভালবাসিতেন—এত ভালবাসিতেন বুঝি তাঁহার একমাত্র কন্যা কাদম্বরীকেও তত ভালবাসিতেন না। ভাষার গুরুগাম্ভীর্য্য—শব্দের ছটা, অলঙ্কারের ঘটা, গুরুগম্ভীর বাক্যবিন্যাস—তিনি খুবই পছন্দ করিতেন। তাই সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুইখানি গুরুগম্ভীর ও ওজ-উদ্দীপক গ্রন্থ তিনি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন বাণভট্ট ওজস্বিনী ও তেজোময়ী ভাষা লিখিতে সিদ্ধহস্ত, ইংরাজী সাহিত্যে জনসন ঠিক সেইরূপ বা তদধিক জমজমাটি ভাষা লিখিতে সুনিপুণ। জনসন একটি সামান্য বাক্যকেও অতি বিস্তারিত করিয়া লিখিতেন, কিন্তু তাহা শ্রুতিমধুর হইত, তান লয়-মাত্রা-সংবলিত হইত। ছেলেবেলায় মুখস্থ করিয়াছিলাম, এক টিপ্ নস্য লইবার জন্য নাকি জনসন বলিয়াছিলেন, —Lady, will you kindly permit me to dip down the digits of my fingers into your odoriferous concavity with a view to produce some titillation into my olfactory nerves."—মনে পড়ে, তখন দেওঘর হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম, মাইকেলের জীবনচরিতকার আদর্শ পুরুষ যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্কুলের হেডমাষ্টার; একদিন ভূগোলের ঘণ্টায় আমার একজন সহাধ্যায়ী উপরি উদ্ধৃত ইংরাজী অংশটি ক্লাসে আবৃত্তি করে, শিক্ষক শুনিতে পান। তখনই এক বিভ্রাট ঘটিল,—শিক্ষক মহাশয় আবৃত্তিকারী ছাত্রের প্রতি ভাঙ্গা শ্লেটের ফ্রেম হস্তে বেগে ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। আমরা ত সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। শেষে যখন দেখিলাম প্রহার ক্রমাগতই সমানভাবে চলিতে লাগিল তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ওকে অমনভাবে মার্‌চেন কেন? ও কি এমন দোষ ক'রেচে?" চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শিক্ষক মহাশয় উত্তর দিলেন,—"This is no place to reciting obscene and indecent passages like that!" ছুটিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে গিয়া তৎক্ষণাৎ সকল কথা নিবেদন করিলাম। তিনি আমাদের ক্লাসে আসিয়াই শিক্ষক মহাশয়কে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন এবং বালকটিকে বুকে টানিয়া লইয়া মিষ্ট মধুর বচনে কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, আর তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া বালকটিকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল! এ অপূর্ব্ব অপার্থিব দৃশ্য আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। সকল প্রকারে অমন আদর্শ পুরুষ, অমন প্রাণের মানুষ আমি খুব কমই দেখিয়াছি। আপনারা হাসিতেছেন, কিন্তু আমার চোকে জল আসিতেছে।

কি বলিতেছিলাম?—জনসনের ষ্টাইল। ইংরাজীতে গুরুগম্ভীর ষ্টাইলে কেহ কিছু লিখিলে তাহা আজও

Johnsonian (জনসোনিয়ান) বা Johnsonese (জনসোনিজ) ষ্টাইল বলিয়া অভিহিত হয়। তাই কাদম্বরীর ভাষা সম্বন্ধে পিতামহ লিখিয়াছিলেন,—'বাঙ্গালার জনসোনিয়ান ভাষা।' সত্য কথা।

তাই সন্দেহ হয়, তারাশঙ্করের কি মাথার কোন গোলমাল ছিল? তাহা না হইলে বাছিয়া বাছিয়া এই দাঁতভাঙ্গা দুইখানি বই অবলম্বন করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের চর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন কেন?

'(কাদম্বরী) বাঙ্গালায় গদ্যচ্ছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মদিরার মত্ততা অধিকক্ষণ থাকে না।' ঠিক কথা; কিন্তু এ দোষ তারাশঙ্করের নহে—এ দোষ বাণভট্টের, তাঁহার ভাষাও 'অনুকৃত হইতে পারে নাই।' মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাও অন্যে অনুকরণ করিতে পারে নাই। সেখানেও শব্দের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার ঘনঘটায় ভাবের খেই হারাইয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু কে বলিল, 'তারাশঙ্করের ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুর তাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম। স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম,—কিন্তু কখন নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না।' যিনি বলিয়াছেন, তিনি আমার সাক্ষাৎ উপাস্য দেবতা হইলেও সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে, পিতৃদেবের এই উক্তি সত্য নহে। 'পিতাপুত্রে' যখন তিনি এই কথা লিখিয়াছিলেন, তখন মেঘনাদবধের ভাষা-সম্বন্ধেও তাঁহার এইরূপ মত, বা ইহা অপেক্ষা বিকৃত মত সেই পুস্তক মধ্যেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, কবি হেমচন্দ্রের কাব্য-সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণার কবুল জবাব দিয়াছেন, নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পরিণত বয়সে পুনরায় কাদম্বরীর সমালোচনা করিবার অবসর ও সুযোগ পাইলে তিনি স্বয়ং তাঁহার ত্রুটি ও বিচ্যুতি স্বীকার করিতেন। আর এইখানেই বলিয়া রাখি, তারাশঙ্করের 'রাসেলাস' পিতৃদেব ভাল করিয়া পড়েন নাই,—বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন, ইংরাজীর তর্জ্জমা, ও আর কি পড়িব! এ কথা জোর করিয়া বলিতেছি, কেন জানেন? পিতৃদেব কেরী-মার্সম্যান, রামমোহন-বন্দ্যোর যুগের লেখকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পর্য্যন্ত সকল বিশিষ্ট লেখকের লেখার ও ভাষার আলোচনা নানা স্থানে করিয়াছেন, তাঁহাদের পুস্তকাবলির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও কোন স্থানে রাসেলাসের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, অথচ আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন এমন অপূর্ব্ব সুষমাঝরা ভাষা বঙ্গসাহিত্যে বিরল বলিলেও অতিরঞ্জন করা—বাড়াইয়া বলা ত হইবেই না,—সত্যের অপলাপ করাও হইবে না।

সুকুমারবাবু সম্প্রতি 'বঙ্গশ্রী'তে লিখিয়াছেন, 'ইহার (রাসেলাসের) রচনা সংস্কৃত-ঘেঁসা ও বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।' কাদম্বরীকার তারাশঙ্করের রচনাও 'সংস্কৃত-ঘেঁসা ও বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।' আমার মত সম্পূর্ণ অন্যরূপ, কেন, তাহাই এইবার বিশদভাবে দেখাইতেছি।

জনসনের জীবনচরিতের যে প্রারম্ভ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ভাষা আলোচনা করিতেছি। আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, তারাশঙ্করের লেখা বলিয়া না দিলে, আধুনিক এমন কোন সাহিত্য-সমালোচক নাই যিনি ঐ অংশ পড়িয়া বলিয়া দিতে পারেন যে উহা তারাশঙ্করের লেখনী-প্রসূত। এ সম্বন্ধে সুকুমারবাবু কি বলেন? ইহাও কি 'সংস্কৃত ঘেঁসা ও বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত?' 'বাল্যাবধি' ও 'অকর্ম্মণ্য', ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত-ঘেঁসা পদ এই অংশের মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। 'শারীরিক রোগে তাঁহার একটি চক্ষু একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।'—এই বাক্যটিকে আরও সহজ, সরল ও অনায়াস-বোধ্য করা যায় কি? আজকালকার ন্যাকামোর ভাষায় ইহার ভাব ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভাষার প্রসাদগুণ বা হৃদয়গ্রাহিতা বাড়ে কি? এই জীবনচরিত আগাগোড়া পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, মনে হয় যেন আধুনিক 'আনন্দবাজার' বা 'বসুমতী' পড়িতেছি। এখনকার দিনে কেবল একজন মাত্র সাহিত্যিক লেখার মধ্যে সংস্কৃতবহুল শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদ খুব বেশি বেশি ব্যবহার করেন—তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ; অথচ তাঁহার ভাষা অতিশয় মনোরম, শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু তারাশঙ্কর-প্রণীত জীবনচরিতের ভাষা হেমেন্দ্রবাবুর ভাষা অপেক্ষাও যে সহজ, সরল ও মোলায়েম—একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। পাতা উল্টাইয়া এই

অংশ পাঠককে পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি; পাঠ করিলেই আমার উক্তির যথার্থ্য অনায়াসে উপলব্ধি হইবে।

তাহার পর রাসেলাসের ভাষা। এমন বৈশিষ্ট্য-ভরা ভাষা আজিকার যুগেও অতি বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পুনরায় পঠিত হইলেই, আমি আশা করি, আমার কথা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার ভাষার বৈশিষ্ট্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এবং বুঝাইতে গেলে আর একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা দরকার। ইচ্ছা আছে, তারাশঙ্করের ভাষা-সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। আজ এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখি যে, বঙ্গভাষার উপর তারাশঙ্করের অসাধারণ দক্ষতা ছিল; তিনি ভাষাকে এতটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ভাষার উপর তাঁহার এতদূর দখল ছিল যে, যখন যে বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তখন সেই বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব-হিসাবে তিনি ভাষাকে ইচ্ছা-মত প্রয়োগ করিতে—পরিচালনা করিতে পারিতেন; আর এইরূপ পাকা মুন্সীয়ানার জন্যই না বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্য গগনের সূর্য্যচন্দ্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর সমসাময়িক ব্যক্তি। যে সময়ে তারাশঙ্করের অমূল্য গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়, তখন বিদ্যাসাগর বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহামানব। সমাজে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে তাঁহার জয়গীতি শতমুখে- সহস্রকণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছিল। একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথায় তখন বড়লাট পর্য্যন্ত উঠেন, বসেন—হিন্দু-ধর্ম্ম-নির্দ্দেশক আইন পাস করেন। এ বড় সহজ কাণ্ড নয়! আর তারাশঙ্কর সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত হইলে কি হয়, তিনি যে সংস্কৃত কলেজের একজন অখ্যাতনামা সামান্য লাইব্রেরিয়ান—যে কলেজের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা স্বয়ং বিদ্যাসাগর। তাই বিদ্যাসাগরের আওতায় তারাশঙ্কর শুকাইয়া, মুশ্‌ড়াইয়া, নির্জ্জীব—মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৈলসিক্ত শিরে তৈল দান করাই মানুষের চিরন্তন ধর্ম্ম। এ ক্ষেত্রেও সেই চিরন্তন, সনাতন, সদাতন প্রথা পূরামাত্রায় অনুষ্ঠিত করিতে আবালবৃদ্ধ কেহই অণুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। সকলেই কেবল অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—'ঐ দেখ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছেন!' কিন্তু অদূরে যে একটি ধ্রুবতারা অব্যাহতভাবে মৃদুমন্দ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া আপন হাসিতে ভাসিতেছে, গগনের উত্তরপ্রান্তে অপূর্ব্ব শোভা বিকসিত করিতেছে—সে দিকে কাহারও নজর নাই! কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, অস্তগমন আছে, উদয় আছে, কলঙ্ক আছে, কিন্তু ধ্রুবতারা অচল, অটল, অনড়—ধীর, স্থির, নির্ম্মল।

রাজনারায়ণ বসু হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সাহিত্যিকগণ পর্য্যন্ত যত লোকে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, আমার পিতামহ ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে অন্য কেহই তারাশঙ্করের বিষয়ে কিছুই বলেন নাই; আজ পর্য্যন্ত কোথাও তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হয় নাই; তাই এই অবহেলিত ও উপেক্ষিত মনীষীর জন্য দুঃখ হয়, তাঁহার গ্রন্থ-বৈগুণ্য লক্ষ্য করিয়া নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

মাইকেলের মেঘনাদবধে তন্ময় হইয়া গিয়া অথবা গলিতদন্ত হইয়া যদি আমরা তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য বিস্মৃত হই, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অবিচার এবং নিজেদের প্রতি মহাপাপ করা হইবে না কি? কিন্তু তারাশঙ্করের দুর্ভাগ্য যে, আমরা সকলে তাঁহার কাদম্বরীর সমাসবদ্ধ শব্দসম্পদ্-সমুদ্র-মধ্যে নিমজ্জমান হইয়া তাঁহার সুললিত সুমধুর রাসেলাসের কথা পূরামাত্রায় ভুলিয়া গিয়াছি।

মনে রাখুন :—

"পথের দুই ধারে উন্নত পাদপ সকল বিস্তৃত শাখা প্রশাখা দ্বারা গগন আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। বোধহয় যেন, বাহু প্রসারণপূর্ব্বক অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল পান করিবার নিমিত্ত ডাকিতেছে। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন ও লতামণ্ডপ, মধ্যে মধ্যে মসৃণ ও উজ্জ্বল শিলা পতিত রহিয়াছে। নানাবিধ রমণীয় প্রদেশ ও বিচিত্র উপবন দেখিতে দেখিতে কতক দূর হইয়া বারিশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ স্পর্শে বিগতক্লম হইলেন। বোধ হইল যেন, তুষারে অবগাহন করিতেছেন। সরোবর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে মনে মনে অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল। অনন্তর মধুপান মত্ত মধুকর ও কেলিপর কলহংসের কোলাহলে আহূত হইয়া সরোবরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ তরু মধ্যে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর দর্পণস্বরূপ, বসুন্ধরা দেবীর স্ফটিকগৃহস্বরূপ অচ্ছোদ-নামক সরোবর নেত্রে গোচর করিলেন। সরোবরের জল অতি নির্ম্মল। জলে কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়াছে। মধুকর গুন গুন ধ্বনি করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধু পান করিতেছে। কলহংস সকল কলরব করিয়া কেলি করিতেছে। কুসুমের সুরভি রেণু হরণ করিয়া শীতল সমীরণ নানাদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে।"

আর সেই সঙ্গে ভুলিলে চলিবে না :—

"১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের প্রথমে মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত এবং মাতার যে কিছু ঋণ ছিল, তাহার পরিশোধের জন্য জন্‌সন রাসেলাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে যুক্তিগর্ভ বিচার ও নীতিগর্ভ অনেক উপদেশ আছে। প্রত্যহ সায়ংকালে লিখিতে বসিতেন, যতখানি লেখা হইত, মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ এক সপ্তাহের সায়ংকালীন পরিশ্রমে রাসেলাস সমাপ্ত হয়।"

* * *

"ভদ্রে! অনেক পথ ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব কিছু দিন এইখানে বিশ্রাম কর। এই বাটীর কর্ত্রী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করিও। যুদ্ধই আমার ব্যবসায়, তন্নিমিত্ত আমি এই নিভৃত প্রদেশে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি। এখান হইতে যখন বহির্গত হই, কেহ সন্ধান পায় না। যখন এখানে ফিরিয়া আসি, কেহ অনুসরণ করিতে পারে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে এই স্থানে বিশ্রাম কর। এখানে সুখসামগ্রী অধিক নাই বটে, কিন্তু এখানে ভয় ও বিপদেরও কোন আশঙ্কা নাই।"

মনে রাখুন :—

"পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে. বিদ্যুৎঝলা সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শনশনে! ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?"

আর সেই সঙ্গে ভুলিলে চলিবে না : —

"সখি রে!
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে!
পিককুল কলকল,　　চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি মধুসূদনে।"

আলোচনা

বাংলার পরিচিত পাখী

গত আষাঢ় সংখ্যা "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়ের "বাংলার পরিচিত পাখী—বুলবুল" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে পক্ষীবিজ্ঞানের দিক হইতে আমার যাহা বক্তব্য নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম।

লেখক বুলবুলের পরিচয়ে লিখিয়াছেন, "তার গম্ভীর অচপল চালচলনে ইহা বেশ বোঝা যায় যে সে একটি বনেদি পাখী—বড়ঘরানা।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"বুলবুলের মত বৃহৎ পক্ষী সম্প্রদায় আর ভারতে নেই। বিভিন্ন প্রকারের বুলবুলের সংখ্যা হবে তিপ্পান্ন রকমের। এইটেই বোধ হয় এদের আভিজাত্যের বড় প্রমাণ।"

পক্ষিবিজ্ঞানের দিক হইতে এই উক্তির আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে। বুলবুলের মত এত বৃহৎ পক্ষিসম্প্রদায় বাস্তবিক ভারতে নাই নাকি? লেখক মহাশয় নূতন সংস্করণ Fauna of British India, Bird Volumes-এর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ ধরিয়াই বিচার করা যাক। বুলবুল বা Pycnonotidae বংশমধ্যে ১৯টা গণে বিভক্ত ৩৫ জাতির পাখী আছে। অন্তর্জাতি ধরিলে সংখ্যা মোট ৬০ হয়। লেখকের ৫৩ রকমের বুলবুল কি হিসাবে ধরা হইয়াছে? এখন অন্য কয়েকটা বংশের পাখীর সংখ্যার কথা তোলা আবশ্যক। প্রবন্ধকার একস্থানে ছাতারের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ছাতারে যে বংশের অন্তর্গত, সেই ভারতবর্ষীয় Timaliidae পাখীদের সংখ্যা গণনা করিলে দেখা যায় যে তাহাদের ৫৫টা গণ এবং ১৪০টা জাতি; অন্তর্জাতি ধরিলে মোট সংখ্যা ২৫৯ দাঁড়ায়। Turdidae বংশের হিসাব লইলে তন্মধ্যে ৩৭টা গণ, ১০৩টা জাতি এবং অন্তর্জাতি সহ মোট ১৫২ রকমের পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। শস্যভুক Fringallidae বংশে ৭১টা জাতি এবং অন্তর্জাতি সহ মোট ১০৩ রকমের পাখী দেখা যায়। Pheasant বংশ ৩২টা গণ, ৬১টা জাতি এবং অন্তর্জাতি সহ মোট ৯৭ রকমের পাখী লইয়া গঠিত। Falconidaeর ৬৬টা জাতি; অন্তর্জাতি ধরিলে মোট পাখীর সংখ্যা ১০৯। অতএব লেখকের উক্তি ভ্রমাত্মক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের ধার ধারে না। সংখ্যাধিক্যই যদি আভিজাত্যের বড় প্রমাণ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে এমন বহু পাখী আছে, যাহারা বংশহিসাবে আভিজাত্যের আরও বড় দাবী করিতে পারে। চালচলনে বড়ঘরানার কথা লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই ধরা পড়িয়াছে! পক্ষিবিজ্ঞানে ইহা স্থান পায় না। লেখক মহাশয় বুলবুলের কুলগত বিশিষ্টতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"এদের সকলেরই মস্তকের লোমগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। উত্তেজিত হ'লে সেগুলি ঝুঁটির মত খাড়া হ'য়ে ওঠে।" এই উক্তির দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের স্কন্ধে না লইয়া মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকারের শরণাপন্ন হইয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার কখনই এ কথা এরূপভাবে বলেন নাই। পূর্ব্বোক্ত Fauna গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন--"These hairs are often long, fairly numerous and conspicuous, sometimes short and inconspicuous but never entirely absent" ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে বুলবুলের মস্তকে "কিঞ্চিৎ দীর্ঘ" লোমই যে থাকিবে তাহা নহে, "short, few and inconspicuous" লোমও থাকে। মস্তকের এই

হ্রস্বদীর্ঘ লোম বিচার করিয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক মতে নানা গণে বিভক্ত করা হয়। যে Pycnonotus গণভুক্ত পাখীকে বাংলার সুপরিচিত বুলবুলের অন্যতম গণ্য করা হয় এবং মেদিনীপুরে যাহার সংখ্যাবাহুল্য দেখা যায়, সেই গণ সম্বন্ধে মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকারের গ্রন্থে তাহার মাথার লোমের বৈশিষ্ট্য এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—"Crest inconspicuous or entirely absent." আরও লিখিত আছে—"The nuchal hairs are obsolete or small." লেখক মহাশয় বাংলা আসামের সীমান্ত জেলায় বুলবুলের উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে যে শিখাহীন বুলবুলটি এত পরিচিত পাখী, সেটি কি তাঁহার নজরে পড়ে নাই? ষ্টুয়ার্ট বেকার এই Microtarsus গণের বুলবুল সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছেন—"In this genus the feathers of the head, though erectile, are exceedingly short and glossy." অতএব দেখা যাইতেছে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল রায়ের "এদের সকলেরই মস্তকের লোমগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ" এই উক্তির জন্য মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার দায়ী হইতে পারেন না, একা লেখকই দায়ী। ফলে দাড়াইতেছে এমন একটি বিচিত্র উক্তি যাহা পক্ষিবিজ্ঞান কখনই অনুমোদন করিবে না।

প্রবন্ধকার বুলবুলের কুলগত বিশিষ্টতার গবেষণা সম্পর্কে বলিয়াছেন "নিম্ন অঙ্গের, যে স্থান থেকে লেজ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ বস্তি প্রদেশের, বর্ণ এদের আর একটা বৈশিষ্ট্য। এই বর্ণ বেশীর ভাগ হয় লাল। জাতি-ভেদে হলদে বা অন্য রং দেখা যায়।" এই মন্তব্য দেখিয়া বেশ বুঝা যায় তিনি বিজ্ঞানের ধার ধারেন না। অথচ যেন মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকারের ত্রুটি ধরাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—"ষ্টুয়ার্ট বেকার সাহেব বস্তি প্রদেশের বর্ণকে কুলগত বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেন নাই।" কোন বৈজ্ঞানিকই ইহা স্বীকার করিবেন না, কারণ এই বৈশিষ্ট্য বুলবুল বংশের ১৮টি গণের মধ্যে মাত্র একটি গণে দৃষ্ট হয়। ইহা সেই গণের বৈশিষ্ট্য হইতে পারে, সমগ্র বংশের বৈশিষ্ট্য কখনই নহে।

প্রবন্ধকার বলিতেছেন "উত্তর বাংলায় কুচবেহার ও আলিপুর ডুয়ার্স অঞ্চলে যে বুলবুল দেখা যায় তাদের বস্তি প্রদেশের বর্ণ কমলালেবুর মত। এরা আসাম দেশের বাসিন্দা।" ইহাতে কি বুঝায়? উত্তর বাংলায় বুলবুল আসাম দেশের বাসিন্দা—ইহার অর্থ কি? লেখক জানাইতেছেন, "বাংলা আসামের সীমান্ত জেলায় সেইজন্য এরা নয়নগোচর হয়।" তাহা হইলে কি এই পাখী দেখিবার জন্য সীমান্ত জেলায় যাইতে হইবে? এ বুলবুল কি হিমালয় জুড়িয়া পাওয়া যায় না? উপত্যকা সমূহে এবং উত্তর বাংলার পর্ব্বত-সানুদেশে সমভূমিতে ইহাকে কি দেখা যায় না? নিশ্চয়ই দেখা যায়। তবে সে আসামের বাসিন্দা কোন্ হিসাবে?

বুলবুলের কুলগত সাদৃশ্য লইয়া গবেষণায় লেখকের ব্যুৎপত্তি বুঝা গেল। এখন তাহাদের বর্ণতারতম্য সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করা যাক। তিনি লিখিয়াছেন—"সকলেরই একটা কুলগত সাদৃশ্য আছে, দেশভেদে মাত্র বর্ণতারতম্য ঘটেছে।" পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে বুলবুলের কুলগত বিশিষ্টতা লইয়া মন্তব্যের ইহা সূত্রপাত। কুলগত সাদৃশ্য প্রত্যেক বুলবুলে আছে—ইহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু "দেশভেদে মাত্র বর্ণ-তারতম্য ঘটিয়াছে" ইহার অর্থ কি? আমাদের বুঝিতে হইবে কি যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বুলবুল বাস করে বলিয়া তাহাদের বর্ণ তারতম্যের উৎপত্তি? বস্তুতঃ পক্ষে কিন্তু এইরূপ কিছুই দেখা যায় না। ধরুন, লেখক মহাশয়ের বাংলার কালো বুলবুলের কথা। একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তাহার যে বর্ণগত বৈশিষ্ট্য আছে সে বৈশিষ্ট্য পাখীটি নানাস্থানে বাস করে বলিয়া কি দেশভেদে রূপান্তর ধারণ করিবে? পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে এই জাতির বিস্তৃতিরেখা খুব বড় অর্থাৎ এই জাতিকে ভারতবর্ষের মধ্যে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, পার্ব্বত্য অঞ্চলেও বটে, এবং সমতল ভূমিতেও বটে। জাতিহিসাবে দেশভেদে তাহার বর্ণতারতম্যের কথা আদৌ উঠিতে পারে না, কারণ এই একই জাতিকে নানা অঞ্চলে দেখা যাইতেছে এবং সর্ব্বত্রই সেই জাতির বর্ণগত বৈশিষ্ট্য বজায় রহিয়াছে। কেবল অন্তর্জাতি সম্পর্কে কোন কোন স্থলে environment-এর প্রভাব লক্ষিত হয়, ফলে দেহের পরিমাণের কিম্বা বর্ণের কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

—শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা

গত ভাদ্র মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা পাঠে মনের কৌতূহল সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। 'বিশ্বকোষে'র সুদীর্ঘ "যাত্রা" প্রবন্ধও পড়িয়াছি কিন্তু তাহাতে অথবা হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধে কালীয়দমন যাত্রার প্রবর্ত্তক শিশুরাম অধিকারী, কিংবা শ্রীদাম ও সুবলের কোন পরিচয়—এমন কি তাঁহারা ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার সঠিক নির্দ্দেশ পাওয়া গেল না। এ-সম্বন্ধে প্রাচীন সাময়িক পত্রই বোধ হয় আমাদের কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু সেদিকেও বাধা আছে, পুরাতন সাময়িক পত্রের অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য।

শিশুরাম অধিকারী এবং শ্রীদাম ও সুবল সম্বন্ধে পুরাতন সাময়িক পত্র হইতে আমি দুই-চারিটি কথা জানিতে পারিয়াছি। এখানে তাহারই উল্লেখ করিব।

১৮৫৯ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' লিখিয়াছিলেন :—

> "গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত

হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে।" ('বিবিধার্থ-সংগ্রহ', মাঘ ১৭৮০ শক, পৃ, ২৫৫)

পুরাতন সংবাদপত্রে শ্রীদামের মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২০ সনের ২১এ অক্টোবর (৬ কার্ত্তিক ১২২৭) 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

"কালিয়দমন যাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহরসময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক মরিয়াছিল এইরূপে লোক ঐ রোগগ্রস্ত হবামাত্র মরিতেছে কিছু কালবিলম্ব হয় না।"

সেকালের 'যাত্রা' সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতে চান তাঁহারা আমার সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম ও ২য় খণ্ড) এবং 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' পুস্তকগুলিতে কিছু কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবেন।

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" সংকলন করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সময় ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি যে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান সামগ্রী হইবে তাহাতে কোনও অন্যমত নাই। তবে ভূত ছাড়াইতে গিয়া মন্ত্রপূত সরিষার মধ্যে ভূত না থাকিয়া যায় অর্থাৎ উদ্ধৃত অংশে ভ্রম প্রমাদ না থাকিয়া যায় সে বিষয়ে সংকলনকারকের দৃষ্টি থাকাও কর্ত্তব্য। সেইজন্য লেখক ও বক্তা অপেক্ষা সংকলনকারকের দায়িত্ব বেশী।

পৃষ্ঠা ৬: *David Hare* by Peary Chand Mitra, 1877, p 47 হইতে উদ্ধৃত অংশ "কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার অল্পদিন পরেই কমিটির সভাগণের অনেকেই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে আন্দোলন সুরু করেন তাহার ফলে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

উল্লিখিত বিষয়টি যে ভ্রমশূন্য নহে, তাহার প্রমাণ আমি ১৮২৫ সনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারী কাগজে পাইতেছি :—"Calcutta School Society, Instituted September 1st *1814*" ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে School Society নামক প্রতিষ্ঠানটি School Book Society ("Instituted July 4, 1817") স্থাপিত হইবার পরে গঠিত হয় নাই। যদিও Calcutta School Society-র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন ১৮২০ সনের জানুয়ারি মাসে হইয়াছিল তথাপি শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র বাবুর নিজের মন্তব্য "রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আমি কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট (১৮২৬-২৮ সনের কার্য্যবিবরণী) দেখিয়াছি" প্রণিধানযোগ্য।

—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর

ভূপেন্দ্র বাবুর আলোচনাটি সম্বন্ধে 'বঙ্গশ্রী'-সম্পাদক মহাশয় আমার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। কি কৈফিয়ৎ দিব বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাচীন পুঁথিপত্র নূতন নূতন ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলে অগ্রবর্ত্তীগণের ভুল দেখাইবার ও তাহাদিগকে বাতিল করিয়া দিবার একটা আগ্রহ সকলেরই হয়, আমাদেরও যে কোন দিন না-হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার বশে কেহ যদি একটা ভুল বা কাঁচা কাজ করিয়া বসেন, তবে তাহাকে অপ্রতিভ করা সুবিবেচকের পক্ষে উচিত হয় না। ভূপেন্দ্র বাবু নিতান্তই ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া আমাকে দু একটি কথা বলিতে হইল, নহিলে এ-বিষয়ে কথা বাড়াইবার স্পৃহা আমার ছিল না।

ভূপেন্দ্র বাবুর আলোচনার উপলক্ষ্য অতি সামান্য, একটি তারিখ—কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি নামক প্রতিষ্ঠান ১৮১৮ সনে স্থাপিত হয়, না ১৮১৪ সনে। আমি লিখিয়াছি ১৮১৮, ভূপেন্দ্র বাবু বলেন ১৮১৪, কারণ "১৮২৫ সনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারী কাগজে" তিনি এই তারিখের উল্লেখ পাইয়াছেন। 'সরকারী কাগজ' অর্থে সাধারণতঃ সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র বোঝায়, তিনি কি বুঝিয়াছেন জানি না। মনে হইতেছে Annual Directory-জাতীয় কোন মুদ্রিত পুস্তক হইতেই তিনি এই তারিখটি পাইয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তক যাহাই হউক, উহার নাম ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করা তাঁহার উচিত ছিল। এই ত গেল ভূপেন্দ্র বাবুর প্রথম বক্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল "১৮১৪" পাওয়াতে তিনি ভরসা করিয়া আরও একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"স্কুল-সোসাইটি নামক প্রতিষ্ঠানটি স্কুল-বুক-সোসাইটি [১৮১৭ সনে] স্থাপিত হইবার পরে গঠিত হয় নাই"।

এখন ঠিক তারিখ কি তাহা বলিব। কলিকাতা-স্কুল-বুক-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়—১৮১৭ সনের ৪ঠা জুলাই। ইহার প্রথম বার্ষিক বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সনের ডিসেম্বর মাসে। এই বিবরণীর পরিশিষ্টে মুদ্রিত স্কুল-সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের একটি অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির প্রতিষ্ঠার তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৮১৮, অর্থাৎ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে আমি যেরূপ দিয়াছি, এবং কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা-স্কুল-বুক সোসাইটির পরেই স্থাপিত হয়—পূর্ব্বে নহে। এই অংশটি নিম্নলিখিত রূপ :—

CALCUTTA SCHOOL SOCIETY.—On the formation of the Calcutta School Book Society in 1817, it was then a question whether its designs might not conveniently be so extended as to comprise the objects of a School Society; but the general opinion was not in favour of this consolidation.

However, the importance of an Institution of the latter description continually becoming more apparent, after numerous private conferences on the subject,

several gentlemen, members of the Calcutta School Book Society, held a Meeting on the 24th July, 1818, for the purpose of considering whether the objects of that Institution would not be further promoted, with additional and important public benefits, by the establishment of a School Society. Accordingly it was agreed to request some of the gentlemen present, in concert with others whom they might desire to unite with them, to prepare the Plan of such an Association; and after making it known, to call a general Meeting of persons disposed to join in it, for the ultimate consideration and adoption of the Resolutions which might appear best calculated for carrying the design into execution. The plan was then prepared nearly the same as now adopted, and was circulated, previous to a Meeting proposed to be held at the Town Hall, on Tuesday, the 1st day of September, when all persons disposed to promote the design were invited to attend.

A general Meeting was accordingly held, very respectably attended both by the European and Native Inhabitants of Calcutta, and which proceeded to take into consideration the Institution of a School Society; when,

J. H. Harington, Esq having been requested to take the Chair on the motion of the Lord Chief Justice, and having stated the object of the Meeting, with the Rules suggested for the proposed Society, the following Rules and Regulations were unanimously adopted... (Pp. 23-24.)

আমার দেওয়া তারিখের সপক্ষে আরও একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি।

১৮২৬-২৮ সনের কার্য্যবিবরণী-সমেত কলিকাতা-স্কুল সোসাইটির পঞ্চম সাধারণ অধিবেশনের রিপোর্ট (১৮২৯ সনের ২৬এ ফেব্রুয়ারি পঠিত) আমার নিকট রহিয়াছে। ইহাতে পাইতেছি :—

CALCUTTA SCHOOL SOCIETY,
Instituted Sept. 1, 1818. *

এই রিপোর্টে আরও লিখিত আছে,--

"...they are still steadily pursuing the same objects which the Society had in view when it was formed in the year 1818;..."

* কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির ৫ম রিপোর্ট আমিও ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট দেখিয়াছি। তাহাতে এই সমাজের প্রতিষ্ঠার তারিখ ঠিক ঐরূপই দেওয়া আছে।-- 'বঙ্গশ্রী'-সম্পাদক।

আর একটি কথা। কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির প্রথম বার্ষিক সভা হয়—টাউন-হলে ১৮২০ সনের ২৯এ জানুয়ারি (*Asiatic Journal*, October 1820, pp 367-68)। এই সমাজটি "১৮১৪" সনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার প্রথম বার্ষিক সভা পাঁচ বৎসর পরে ১৮২০ সনে হওয়া সম্ভব কি?

বাহুল্যভয়ে অন্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। আশা করি ইহাতেই ভূপেন্দ্রবাবু সন্তুষ্ট হইবেন, ও দ্বিতীয় প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া একটি মুদ্রাকর-প্রমাদকে অকাট্য প্রমাণ জ্ঞান করিয়া এরূপ প্রমাদ ভবিষ্যতে আর ঘটাইবেন না।

— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈতন্য-জীবনীর উপকরণ

গত শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে মহাশয় শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে "নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞানুসারে বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন", ইহার ব্যাখ্যায় "নিত্যানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের আজ্ঞায়" এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ভাদ্রমাসের 'বঙ্গশ্রী'তে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন দেখাইয়া দিয়াছেন যে "নিত্যানন্দ স্বরূপ"—'নিত্যানন্দ ও স্বরূপ দামোদর' নহেন। নিত্যানন্দকেই নিত্যানন্দ স্বরূপ বলা হইয়াছে। ঠিক কথা। দামোদর ও নিত্যানন্দ উভয়েরই নামের পরে স্বরূপ থাকায় সুশীলবাবুর একটু গোল ঘটিয়াছে। গোল ঘটিবারই কথা। দুই জনেরই নামের শেষে স্বরূপ থাকার অর্থ টা সুকুমারবাবুও বলিয়া দেন নাই। ইহার অর্থ—দুই জনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথচ যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাইতেছি—মধ্যলীলা, দশম পরিচ্ছেদ—

"আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥

সন্ন্যাস কৈলা শিক্ষা সূত্র ত্যাগ রূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ॥

নিত্যানন্দও যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। যোগপট্ট বলিতে শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের—গিরি, পুরী, ভারতী, বন, পর্ব্বত, অরণ্য, সাগর, তীর্থ, সরস্বতী প্রভৃতি উপাধি বুঝায়।

—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পদ্মা

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

চর-চিলমারী

৭

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি একদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ বিনয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে আকাশ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ইহা তো সূর্য্যোদয়ের রঙ নয়। মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ এবং জনতার কলধ্বনি……আগুন! আগুন! বিনয় ছুটিয়া বাহির হইল। সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেলে রাত্রে দিক ঠিক করা যায় না—বিনয় প্রথমটা দিক্-নির্ণয় করিতে পারিল না—কিন্তু অধিকক্ষণ না যাইতেই বুঝিতে পারিল—আগুন চর-চিলমারীতে।

কর্ত্তব্য যেন নির্দ্ধারিত হইয়াই ছিল—তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বিনয় ডিঙিতে উঠিয়া বসিল—পরিপুষ্ট বাহুর তাড়নে ডিঙি উড়িয়া চলিল।

আজ দিন পনেরো সে যে কঠিন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া চরে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল—এমন কি আর কখনো কঙ্কণের কথা মনেও ভাবিবে না ঠিক করিয়াছিল—সে কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা আজ একবার মনেও পড়িল না। হায়রে মানুষের মনের দৃঢ়তা!

বিনয়ের ডিঙির আশপাশ দিয়া আরো অনেক নৌকা আগুন নিভাইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছিল। রাজসাহী সহর হইতে বহু লোক, বিশেষত কলেজের ছাত্রদের অনেকেই ইহার পূর্ব্বে চরে পৌঁছিয়াছিল—তখনো অনেকে যাইতেছিল—নৌকা পাইবার সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই, তাহারা অনেকে সাঁতরাইয়া নদী পার হইতেছিল।

লোকের পরোপকারের এত আগ্রহ কেন যেন বিনয়ের ভাল লাগিল না—কেমন যেন একটু ঈর্ষ্যার ভাবের উদয় হইল। প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখী হইলেও তাহাতে একটু আনন্দের ভাগ মিশান থাকে। তাহার দুঃখে আর কেহ সাহায্য না করিলেই যেন স্বস্তি। দুঃখের টানে অমিশ্র ভাবে সে নিজের হইয়া উঠে—ভালবাসার নিকষিত স্বর্ণে এই টুকু স্বার্থপরতার খাদ চিরদিন থাকিয়া যায়।

বিনয়ের ডিঙি নদীর মাঝখানে আসিতে সে দেখিতে পাইল—ক্ষুব্ধ নদী-স্রোত অগ্নির স্বর্ণাভ পীত বর্ণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অগ্নিকুণ্ডের প্রচণ্ড আলোকে সেখানটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে - গাছপালা ঘর বাড়ী সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে —কিন্তু কিছু দূরের অন্ধকার চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বিনয়ের চিন্তা ছিল—পাছে আগুন কঙ্কণদের বাড়ীতে লাগে।

নৌকা চরে লাগিতেই বিনয় লাফাইয়া ডাঙায় পড়িয়া ছুটিতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিল—আগুন কঙ্কণদের বাড়ীতে নয়—পাশে মুসলমান পাড়ায়—তবে বাতাস উল্টা দিকে বহিতেছে এই যা রক্ষা।

মুসলমানপাড়ায় ঘর চালে চালে সংলগ্ন, রৌদ্রে খড় শুকাইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক চালে আগুন ধরিলে পাড়ায় কোনো বাড়ী বাঁচিবার আশা থাকে না। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ খানা ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, এক একবার আগুন কমিয়া আসে, আবার একটা দমকা বাতাস আসে, পাশের চাল ধরিয়া ওঠে, আগুন বাড়িয়া যায়, বাঁশ ফাটিতে থাকে, কান্না ও কোলাহলে সকল শব্দ ছাপাইয়া যায়।

ঘরের কিছু কিছু জিনিষপত্র বাহির হইয়াছে, একখানা চৌকি, কিছু কাঁথা কম্বল, একটা, দুইটা জালা, কয়েকটা ধামা কাঠা—এইতো সম্বল। বাসনপত্র এখানে ওখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এক গৃহস্বামী বৃদ্ধ তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে গফুর, গফুর করিয়া ডাকিয়া পাগল। সকলেই তখন গফুর, গফুর রব করিতে লাগিল—কিন্তু গফুরের কোনো সন্ধান মিলিল না। হঠাৎ কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—আরে এই যে গফুর। দেখা গেল গফুর ঘুমের ঝোঁকে বাহির হইয়া আসিয়া যেখানে পড়িয়াছিল—সেখানেই পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘটনা-স্থানে যে পরিমাণ লোক জমিয়াছিল, তাহার সিকি হইলেই কাজ উদ্ধার হইত—ইহাতে কাজ নষ্ট হইতেছিল—সকলেই হুকুম করে, পরামর্শ দেয় এবং তাহার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা একেবারে প্রমাণ-প্রয়োগে উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করে, যাহাতে অবিশ্বাসের আর কোনো কারণ থাকে না।

মেয়েদের মধ্যে যে পরিমাণ অশ্রুবর্ষণ হইতেছিল, তাহা উত্তম রূপে সঞ্চিত হইলে একটা লঙ্কাকাণ্ড নিভিয়া যাইবার কথা।

বিনয় কঙ্কণদের বাড়ী হইয়া আসিয়াছিল—সেখানে তাহাকে দেখিতে পায় নাই—এখানে সে তাহাকেই খুঁজিতেছিল। এমন সময়ে দেখিতে পাইল—ডাকমুন্সী অদূরে দাঁড়াইয়া কাহাকে কি বলিতেছে, শুনিতে না পাইলেও তাহার হাতে চিঠির তাড়া ও মুখের নিতান্ত সুচতুর প্রসন্ন ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল—সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে সে বুঝাইতেছে এই বিপদের মধ্যেও কি অপূর্ব্ব কৌশলে এই অতি প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রগুলি সে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছে। নিশ্চয় ইহাই। তাহার প্রসন্ন ব্যগ্র মুখের প্রত্যেকটি রেখা এই কথাই প্রচার করিতেছিল। নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত অগ্নিকাণ্ডটা দেখিতেছিল—যেন কিছুই হয় নাই—যেন ছেলেদের কতকগুলি খেলাঘর পুড়িয়া যাইতেছে—যেন সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক দলিলগুলি বাঁচাইতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহার এত আত্মপ্রসাদ।

বিনয় কঙ্কণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রায় যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল অদূরে একটি অর্দ্ধ-ঝলসিত নিম গাছের তলায় একদল মেয়ে—দল হইতে একটু দূরে কঙ্কণ—প্রচণ্ড অগ্নির আলোকে তাহার মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রোম-সম্রাট নীরো কবি ছিল সন্দেহ নাই। অমরাবতী-লাঞ্ছন বিশাল রোম নগরের বিরাট হুতাশনের স্বর্ণপটে কে সেই সৌভাগ্যবতী যাহার মূর্ত্তি এক রাত্রির জন্য দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল! আবার আর একদিন বিপুল ট্রয় নগর একটি অখণ্ড শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া কাহার অমর মুখচ্ছবি ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিল! স্বর্ণলঙ্কার বিপুল স্বর্ণরাশিও যথেষ্ট হয় নাই—অমূল্য ইন্ধনে আপনার সমস্ত খাদ ভস্মীভূত করিয়া—অক্ষয় স্বর্ণপটে সীতার করুণ মুখচ্ছবি সে চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে।

কঙ্কণ একাকী দাঁড়াইয়া। অদূরে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের বিরাম নাই। সেই বিপুল সুবর্ণের পটে কঙ্কণের ভীত কাতর মুখচ্ছবি কোন্ অমর শিল্পীর একমাত্র চিত্র-সম্পদের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। গায়ে পীতাভ একখানি শাড়ি, আঁচলটা স্কন্ধ বাহিয়া পিঠের উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ডান হাতের দুটি আঙুল চিবুকে ন্যস্ত। স্রস্ত কেশপাশ কোনো রকমে একটা পাক দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে, এক গোছা বাম স্কন্ধের উপরে স্খলিত, মৃদু বাতাসে দু চারিটি চুল উড়িতেছে—অগ্নির তীব্র আলোকে তাহাও চোখে পড়ে। চোখে অর্দ্ধ ঘুমের ঘোর, ভয়ে, বিস্ময়ে, করুণায় একান্ত অসহায়। বিনয় একদৃষ্টে এই অপূর্ব্ব ছবি দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে শব্দ, স্পর্শ, দৃশ্য লুপ্ত হইয়া আসিল, আর সে জনতার আর্ত্ত কোলাহল নাই, নিশীথের অন্ধকার নাই—কেবল একখানি প্রদীপ্ত অত্যুজ্জ্বল কনকচ্ছদে একখানি অমূল্য মুখচ্ছবি। জগতে কেবল সেই একটি মাত্র দৃশ্য এবং জগতে কেবল সেই একটি মাত্র দর্শক—এমন মুহূর্ত্ত জীবনে কয়টি আসে!

ক্রমে আগুন যতই নিভিয়া আসিতে লাগিল—চারিদিক ততই পূর্ব্বতন গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এতগুলি পরিবারের যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, প্রচণ্ড আলোকে এতক্ষণ তাহা বোঝা যাইতেছিল না, এইবার অন্ধকার হইতে না হইতে সর্ব্বনাশ এবং ক্ষতি দ্বিগুণ হইয়া মনের উপর চাপিয়া বসিতে থাকিল। পাড়া-প্রতিবেশীরা যে যাহার বাড়ী ফিরিতেছিল—বিনয়ও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথ বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর আসিয়া সে পিছনে পিঠের উপরে একটি কোমল স্পর্শ পাইল—ফিরিয়া দেখে কঙ্কণ।

এতক্ষণে প্রথম তাহার সেই কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল—কিন্তু আর তাহার ফিরিবার শক্তিও ছিল না, বোধ করি ইচ্ছাও ছিল না।

কঙ্কণ প্রথমে কথা বলিল—আগুন নিভতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ!

—ভাগ্যিস আগুন লেগেছিল তাই দেখা পেলাম—নইলে বোধ হয় আর আসতেন না!

—না।

(বিনয়ের উত্তরগুলি একশাব্দিক—মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়া উভয় দিক রক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত তম উত্তর প্রয়োগ করিতেছিল)

—পড়াশুনা কেমন হচ্ছে!

—মন্দ না—এক রকম।

—পরীক্ষা কবে?

— বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি।

(প্রতিজ্ঞা যতই টলিতেছিল উত্তর ততই দীর্ঘ হইতে সুরু করিল)

—সেদিন যে হঠাৎ ফিরে গেলেন!

বিনয় নিরুত্তর!

—আপনি যা ভেবেছিলেন—তা জানি; কিন্তু একবার জিজ্ঞাসাও তো করতে পারতেন!

বিনয় নীরব।

—আপনি শুদ্ধ যখন আমাকে এই রকম অবিশ্বাস করেন, তখন এই অবস্থায় আমাদের দেখ্‌লে অন্যে কি মনে করবে! চলুন আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিন।

বিনয়ের মনে আনন্দের সুর বাজিতে লাগিল; কেবলি ধ্বনিত হইতে লাগিল 'আপনি শুদ্ধ' 'আপনি শুদ্ধ!' তাহা হইলে বিনয়ের একটু বিশেষ অধিকার আছে—সে অন্যের দলে নয়।

অপরিচিত পথের বন্ধুরতায় বিনয় দু'চারবার হুঁচোট খাইতেই—কঙ্কণ বলিল—অজানা পথে পড়বেন, তার চেয়ে আমার হাত ধরুন—এই বলিয়া বিনয়ের অপেক্ষা না করিয়াই সে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চলিতে লাগিল। বিনয়ের বুকের রক্তে তোলপাড় আরম্ভ হইল। অন্ধকার রাত্রে অনাত্মীয় যুবতী রমণীর স্পর্শ বিনয়ের স্নায়ুমণ্ডলীতে মদের মত কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

বন্ধুর পথটুকু পার হইয়া আসিয়া বিনয় বেশ একটু আবেগ ও আগ্রহের সহিত তাহার কোমল মুঠাটি চাপিয়া ধরিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অনুভব করিল, কঙ্কণের হাতটি কেমন যেন আড়ষ্টভাব ধারণ করিয়াছে। সেইটুকু অনুভব করিতেই বিনয়ের উৎসাহ ও কথাবার্ত্তার স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া আসিল, বিনয় হাতের মুঠি শিথিল করিয়া কোনোক্রমে ধরিয়া রাখিল মাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহার মুঠি শিথিল হইতেই স্পষ্ট অনুভব করিল কঙ্কণের মুঠি নিবিড়তর, অধিকতর কোমল হইয়াছে, তাহার সেই কপোতের ন্যায় মৃদু ও উত্তপ্ত ক্ষুদ্র হাতখানি কুণ্ঠিত একটি মূর্ত্তিমান্ চুম্বকের মত তাহার আঙুলগুলির ডগার ভিতর দিয়া রক্তের মধ্যে সহস্র ধারায় যুগপৎ মদ ও মধু, শিশির ও বৃষ্টি, অমৃত ও গরল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

কিন্তু তাহারা এ কোন্ পথে চলিয়াছে, বাড়ী তো এত দূরে নয়! অন্ধকারে ক্ষেতের পর ক্ষেত পার হইয়া তাহারা চলিতে লাগিল, অবশেষে অদূরে পদ্মার স্রোতের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। একটু পরেই উভয়ে আসিয়া পদ্মার ধারে দাঁড়াইল।

উভয়েই ক্লান্ত হইয়াছিল—বিনয় বসিয়া পড়িল।

—বাঃ বস্‌লেন যে!

—চল্‌তে পারছি না।

—আমি বুঝি চল্‌তে পারছি!

—চলতে কে বল্‌ছে, বসো না!

—না না, ছিঃ, তা কি হয়?

কিন্তু দেখা গেল মৌখিক গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে পর-মুহূর্ত্তেই বসিয়া পড়িল।

তখন গভীর রাত্রি, নির্জ্জন প্রান্তর, লুপ্ত দিক্‌মণ্ডল, আর পৃথিবীর সমস্ত সজীবতার প্রতিনিধির মত অদৃশ্য পদ্মার একটানা কলধ্বনি। এমন সময়ে ভাষা ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না, উভয়ে পাশাপাশি নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে বাতাসে কঙ্কণের আঁচল উড়িয়া বিনয়ের চোখে, মুখে, বুকে স্পর্শ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সেই অর্দ্ধঝলসিত নিমশাখার কচি গন্ধ ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

বিনয় পাশে হাতখানা রাখিতে গিয়া দেখে কঙ্কণের হাতের উপর তাহার হাত পড়িল, কঙ্কণ হাত টানিয়া লইল না, বিনয় হাতখানি ধরিল, মুঠা করিয়া বদ্ধ করিল, বুকের কাছে লইল এবং তাহার পরিপুষ্ট বাহুদ্বয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারা সবলে সেই কোমল মুঠিখানি নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। অন্ধকারে কঙ্কণের মুখ দেখা গেলে দেখা যাইত—মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তাহা বাথায় নহে ইহা সুনিশ্চিত।

অন্ধকার রাত্রি ও নির্জ্জন স্থান বড়ই বিশ্বাসঘাতক; সত্য-মিথ্যার প্রভেদ ঘুচাইয়া দিয়া কত কি কাণ্ড করিয়া বসে! বিনয় তাহাদেরই প্ররোচনায় হঠাৎ কি একটা কাণ্ড করিয়া বসিতেছিল, ভালো করিয়া তাহা ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইল, কঙ্কণ তাহার হাত ছাড়াইয়া

অন্ধকারের মধ্যে রওনা হইয়াছে। সমস্ত মোহ কাটিয়া গিয়া বিনয় স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। কি করিতে গিয়া সে কি করিয়া ফেলিল! সঙ্কোচ ভাঙিবার পূর্ব্বেই কাজটা বড় তাড়াতাড়ি হইয়া গিয়াছে কিন্তু রাত্রি যে অন্ধকার এবং স্থান যে নির্জ্জন!

কিন্তু বিনয়, তাহার এই অসন্তোষ, সঙ্কোচেও হইতে পারে, অভিমানেও হইতে পারে। তোমার কাছে একটি চুম্বন সে অনেক আগেই আশা করিতে পারে—কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যখন লগ্ন অতিক্রম করিয়া আসিল—তখন অভিমান কি মোটেই সম্ভব নয়!

বিনয় এত ভাবিতেছিল না—সে ভাবিতেছিল কঙ্কণ তাহার এই অভদ্রতায় রাগ করিয়াছে। হয় তো তাহার মনের ভাব ঠিক ইহার বিপরীত। পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝা দূর হইলে জগতের বারো আনা দুঃখ অশান্তি কাটিয়া যায়। কিন্তু বিনয়ের দোষ কি! যে দেশে বিবাহের পূর্ব্বে যুবকেরা আত্মীয় যুবতীর সহিত মিশিবার সুযোগ পায় না—তাহারা নারীকে হয় দেবী ভাবিয়া পূজা করে, নয় নারকী ভাবিয়া মনে মনে বিলাস করিতে থাকে! যাহারা শৈশব হইতে শুনিতে পায় নারী আগাগোড়াই কেবল জননী, তাহার অন্যান্য অবস্থাকে জানিতে অবকাশ পায় না, জীবনে তাহারা ভুল করিবেই, দুর্ভোগ ভুগিবেই—একটা ভালো করিতে গিয়া সমস্ত জীবনটাকে দুর্ব্বিষহ করিয়া তোলা হয়।

কঙ্কণ কিছু দূরে আসিয়া বুঝিতে পারিল এ কী সে করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তখন আর ফিরিবার সময় নাই। নিরুপায় হইয়া সে অগ্রসর হইতেই লাগিল—যতই অগ্রসর হইতে থাকিল ততই ফিরিবার উপায় সঙ্কীর্ণতর হইতে থাকিল—ক্রমে বিনয় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

সে তো বিনয়ের উপর রাগ করে নাই, চুম্বনটা প্রত্যাশাও করিত, বরঞ্চ এতদিন কেন সে চুমা খায় নাই, সেই জন্যই মনে মনে তাহার উপর অভিমান করিয়াছে। যখন সেই চিরবাঞ্ছিত ধন আসিল, তখন তাহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসিল মনের ভাবের যাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। আসল কথা, বহু যুগ, মন ও শরীর এক ঘরে বাস করিয়াও উভয়ে উভয়কে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। উভয়ের ভাষা ভিন্ন, আকারে ইঙ্গিতে কাজ চালাইতে হয়, এক আধটা ভুল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভুল করিতে এক মুহূর্ত্তই যথেষ্ট—সংশোধন হয় তো সারাজীবনেও আর হয় না!

এই যে একটা চুম্বন, নলের রাজহংসের মত তাহার কাছে আসিয়া ফিরিয়া গেল—তাহারই অনাস্বাদিত মাধুর্য্যে তাহার সমস্ত শরীর মন দ্বিগুণ রাঙিয়া উঠিল। অনাস্বাদিত সেই মাধুর্য্যে তাহার মন অহরহ অনুতপ্ত হইতে লাগিল এবং যে ঐশ্বর্য্য তাহারি নির্বুদ্ধিতায় ভ্রষ্ট হইল মনে মনে শত ভাবে লক্ষ ভাবে তাহারই সৃষ্টি করিয়া নানা ভাবে ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে, আশায় আভাসে ইন্ধন জোগাইয়া সত্তজ্বালিত বাসনার হুতাশন-শিখাকে সে অন্তরের মধ্যে দীপ্যমান রাখিল।

সেবার চৈত্র মাসের প্রথমে দোল। সারাদিন মহীন্দ্র ও দীনেশের সহিত মাতামাতি করিয়া বিনয় যখন বাড়ীতে ফিরিল তখন বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। স্নানাহার শেষ করিয়া পিসি-মাতার কঠিন তত্ত্বাবধানে আসন্নপ্রায় পরীক্ষার পড়ায় সে মন দিল। কিন্তু রঙের ছাপ কাপড়-জামা হইতে ধুইয়া ফেলিলেও মনটা তখনো রঙীন ছিল—তাই সে জানালার গবাদ গলিয়া রৌদ্রদীপ্ত পদ্মার শূন্য বালুচরে ঘোড়দৌড় করিয়া ফিরিতে লাগিল। এক একটা দমকা বাতাস দেয়, বালু উড়িয়া উড়িয়া উঠে; আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়। পদ্মা তাহার স্বর্ণাভ বালুকারাশি প্রকাণ্ড মুষ্টি ভরিয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে বালু ভরিয়া আকাশ তাম্রাভ হইল, বাতাস ধূসর হইল, পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল, আকাশ বাতাস পৃথিবী কিছুই দেখা গেল না—কেবল একটা অদৃশ্য শিরীষ ফুলের শাখা হইতে মৃদু গন্ধ অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বিনয়ের জানালা দিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনয় জানালা বন্ধ করিল, ক্রমে বই বন্ধ করিল, পড়িবার ইচ্ছা অনেক পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। তখন সে একাকী নির্জ্জন সেই পাঠগৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়িল কি যেন একটা কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। কান পাতিয়া শুনিল পাশের ঘরে পিসি মাতার রামায়ণ পাঠ বন্ধ। সে এক মুঠি আবির লইয়া পদ্মার চর ভাঙিয়া যাত্রা করিল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, চরের ধূলি-তাণ্ডব থামিয়া গিয়াছে। চরের খানিকটা জায়গা চাষ করিয়া ধান বোনা হইয়াছিল, সেই কচি ধানের ক্ষেত হইতে একটি মৃদু আতপ্ত সুগন্ধি শ্বাস উঠিতে লাগিল এবং অন্যমনস্ক বিনয়ের পায়ের শব্দের ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুয়ের মত এক রকম পাখী ক্ষেতের আশ্রয় ছাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল।

বিনয়ের ভয় ছিল—আজকার দিনটা ডাকমুন্সীর সম্মুখে পড়িয়া পাছে নষ্ট হয়। কিন্তু ব্যাঘ্রের ভীতি যে স্থানে সন্ধ্যা সেই স্থানেই আসন্ন হইয়া থাকে। বাড়ীর পিছন দিক দিয়া ঢুকিতে যাইতেই ডাকমুন্সীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। ডাক মুন্সী মহাখুসী—অমনি সুরু হইল—পাবনা জেলায় গোবিন্দপুর প্রকাণ্ড গ্রাম—সুবৃহৎ টিনের আটচালায় সাব পোষ্টাফিস—পাকা মেঝে—চারজন ডাক পিওন। (ডাকমুন্সীর পূর্ব্বের বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান বর্ণনার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দেখিলে ইতিহাস কেমন করিয়া গড়িয়া ওঠে—তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে)। বিনয় অত্যন্ত কাতর ভাবে সেই শত-বার শ্রুত ক্রমোন্নতিশীল কাহিনী শুনিতে লাগিল, ঘামে তাহার হাতের আবির ভিজিয়া উঠিল।

এমন সময় বিনয়ের মুক্তি কঙ্কণের মূর্ত্তিতে দেখা দিল। কঙ্কণ বিনয়ের দুরবস্থা বুঝিয়া ডাকমুন্সীকে করিমদের পাড়ায় চিঠিবিলি করিতে পাঠাইয়া দিল। ডাকমুন্সী চলিয়া গেলে কঙ্কণ হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা মুস্কিলে পড়েছিলেন—না? বিনয় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল উঠিল—

—আজ দোল জান না বুঝি!

—জানি বই কি! আঃ করেন কি, করেন কি!

বিনয় তাহার মুখে রঙ মাখাইতে আসিল, কঙ্কণ ঘোর আপত্তি করিল কিন্তু সরিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। বিনয় তাহার দুই গালে আবীর মাখাইয়া দিল—এই সামান্য কাজে সময় যতটা লাগা উচিত, তাহার চেয়ে অনেক বেশিই লাগিল। কিন্তু গালে আর রঙের প্রয়োজন ছিল না, বিনয়ের স্পর্শে তাহার শিরায় উপশিরায় রক্তের যে হোলি চলিতেছিল, দুই কপোলে তাহাই ফাটিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

—ইস্, কি বিরক্তটাই করলেন! আমিও আপনাকে বিরক্ত না ক'রে ছাড়ছি নে। চলুন পলাশ ফুল পেড়ে দিতে হবে।

কঙ্কণ একখানা গোলাপী রঙের শাড়ী পরিয়া ছিল, বাহুতে ও মণিবন্ধে রক্তকরবীর কঙ্কণ, গলায় অশোক ফুলের হার, কটিতে কল্কে ফুলের মেখলা, খোঁপায় কেবল কিছু দেওয়া হয় নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল, খোঁপায় পলাশ ফুল গুঁজিয়া নেয়। বাড়ীর কাছেই একটা পলাশ গাছ আছে, ফুলও তাহাতে অনেক, কিন্তু ডালটা একটু উঁচু, নত করিয়া না ধরিলে হাতে পাওয়া অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার লোক উপস্থিত, এই আশাই সে এতক্ষণ করিতেছিল।

বিনয় মাটিতে দাঁড়াইয়া ডালটা নীচু করিয়া ধরিল, কঙ্কণ গাছের গুঁড়ির এক হাত উপরে একটা শুষ্ক ডাল লাগিয়াছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া ফুল তুলিতে লাগিল। হাতের কাছের ফুলগুলি শেষ করিয়া যখন সে ডালের আগার দিকে হাত বাড়াইল, তাহার মুখ বিনয়ের মুখের এত কাছে আসিয়া পড়িল যে তাহার নিঃশ্বাস বিনয়ের মুখে চোখে লাগিতে লাগিল। তাহার স্রস্ত অলক বিনয়ের চোখে উড়িয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সরাইবার উপায় নাই, হাত বন্ধ। হঠাৎ এমন সময়ে কঙ্কণের পায়ের তলাকার শুষ্ক ডালটি মচ্ করিয়া ভাঙিয়া গেল এবং উভয়ে সাবধান হইবার পূর্ব্বেই কঙ্কণ আসিয়া বিনয়ের দেহের উপরে পড়িল, তাহার বুক বিনয়ের বুকে এবং তাহার ওষ্ঠ বিনয়ের মুখে গিয়া লাগিল। কোথা হইতে কি ভাবে কি ঘটিল কেহই বুঝিতে পারিল না, কেবল দুই জনেই অভিভূতের ন্যায় একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় প্রথম চেতনা পাইল, কিন্তু সে এক পা-ও নড়িল না, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া কঙ্কণের কম্পমান দেহ-যষ্টির তপ্ত, কোমল, কম্পনশীল, স্পন্দমান, বাসনাময় সেই বসন্ত-পুষ্প-মঞ্জুরীসদৃশ ভার বহন করিয়া সমগ্র দেহ মন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কঙ্কণ সত্যই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, সে আপনার অবসন্ন দেহভার বিনয়ের বুকে রাখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য অচেতন অবস্থায় ছিল। পরমুহূর্ত্তে নিজের হৃৎপিণ্ডের উপরেই বিনয়ের হৃৎপিণ্ডের আছড়ানি অনুভব করিল। তৃতীয় মুহূর্ত্তে, বিনয়ের ওষ্ঠ হইতে একটা অতি তীব্র, অতি তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত মদির স্পর্শ তাহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে গিয়া পৌঁছিল। চতুর্থ মুহূর্ত্তে সে বেশবাস সম্বৃত করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

বিনয় কিছুক্ষণ মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া কঙ্কণকে দু'একবার নাম ধরিয়া ডাকিল। কিন্তু কোনো সাড়া না পাইয়া এই নূতন লব্ধ অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে মনে মনে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিতে করিতে রওনা হইল। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না।

ভূমিকম্পে নাড়া খাইয়া পৃথিবীর অন্তর্নিহিত ধন-রত্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে, তেমনি এই কিছুক্ষণ আগেকার আকস্মিক ঘটনায় এক নিমিষে কঙ্কণের গুপ্ত নারীত্ব নিজের কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল—সুগভীর সুখ ও তীব্র বেদনা। এই মাত্র যাহা গভীর আনন্দ—তাহাকে ভালো করিয়া অনুভব করিতে গিয়া দেখা গেল তাহা পরম বেদনা। তীব্র ব্যথাকে অনুসরণ করিতে করিতে—একি অলৌকিক আনন্দ। এতদিন পর্য্যন্ত কঙ্কণের কাছে সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা দুই বিভিন্ন কোঠায় বিভক্ত ছিল, আজ প্রথম সে বুঝিতে পারিল, জীবনের এই মহামূল্য উত্তরীয়খানির এক পিঠে সুখ, এক পিঠে দুঃখ, ব্যথা ও আনন্দ তাহার দুই পিঠ। যেমন করিয়াই এই উত্তরীয়খানি গায়ে দাও না কেন—কোনো না কোনো ভাঁজে তাহার অপর পিঠ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

কঙ্কণের কপালের পার্শের শিরা দুইটি উন্মত্তের মত দপ্ দপ্ করিতেছিল, গাল দুইটি লাল হইয়া উঠিয়া কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়াছিল। সমস্ত শরীর দিয়া আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সেই ওষ্ঠের স্পর্শখানি, তাহাকে নামাইয়া দিবার সময় বিনয় যে পরিপুষ্ট বাহু দ্বারা একবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেই আবেষ্টনখানি, মনে মনে বহুবার করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না—একটু মনে আসিতেই কেমন সব ঘোলাইয়া যায়—কেবল একটা অস্পষ্ট তীব্র নিবিড়তা শরৎ কালের সন্ধ্যায় বর্ণোজ্জ্বল আতপ্ত কুয়াশার মত তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া জমিয়া জমিয়া উঠিতে থাকে।

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি আশ্চয্য হইল হঠাৎ যখন তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে পড়িতে সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! একি—এ অশ্রু কেন! আজ তো তাহার আনন্দের অবধি নাই। তবে কি সে উন্মত্ত হইল!

এই রকমই হয়। আজ সে অভীষ্ট লাভ করিয়াছে, কিন্তু নিতান্ত স্বেচ্ছাতেও কৌমার্য্য বিসর্জ্জন দিতে প্রত্যেক রমণীরই অহঙ্কারে আঘাত লাগে। যেন তার একটা পরাজয় ঘটিল। যে কৌমার্য্য তাহার কোমল হৃদয়কে এতদিন ধরিয়া শক্তির মত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আশৈশবের সেই পরম সুহৃদকে বিদায় দিতে আজ তাহার এই ক্রন্দন। কেমন অস্পষ্ট ভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল—এতদিনকার তটভূমি হইতে আজ তাহার বিদায়—যদিও সম্মুখে অভীষ্ট, ঈপ্সিত, পরম আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়—তবু যেন তাহাতে কেমন অনিশ্চয়ের ভাব। অনিশ্চয়তা আছে বলিয়াই সুখ চিরদিন আনন্দ দেয়।

১০

চরের সেই জলাশয়টাতে বিনয় মাছ ধরিতেছিল—অর্থাৎ জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া সেদিনকার কাণ্ডটার বিষয় ভাবিতেছিল। এতদিন তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে বাঁধটা ধীরে ধীরে ক্ষইয়া আসিতেছিল হঠাৎ কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল, লজ্জা সরম, সীমা, শালীনতা, সংযম, সংশয়ের অবকাশ পর্য্যন্ত রহিল না। একদিকে যখন তাহারা চিন্তা করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া একভাবে চলিতেছিল তখন কোথা হইতে আসিল সর্ব্বনাশা এই আকস্মিকতার দমকা হাওয়া, উভয়ের মধ্যেকার ক্রমঃসূক্ষ্মায়মান পর্দ্দাখানা একটানে সরাইয়া দিল। ইহার মধ্যে কোনটা বিশ্বের বিধান, মানুষের সুচিন্তিত নির্দ্দিষ্ট পথ, না বিধিবিধানরহিত খামখেয়াল। কোনটা সত্য! যোগশৃঙ্খলিত সংযত মহেশ্বর, না, নিয়ম-পাশ মুক্ত তাহার ভূতপ্রেতের দল!

যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যায়; মানুষ সেই ঘটনা শ্রেণীকে পরম্পরায় শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় বিধি-বিধান রচনা করিয়া প্রায় যখন আদর্শের এক বিশ্ব গড়িয়া তোলে, অমনি কোথা হইতে আসে এক প্রচণ্ড, অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আঘাত, সব ভাঙিয়া চুরিয়া পড়ে। অমনি সেই আদর্শবাদীর দল হয় অবিশ্বাসী, নাস্তিক, বিদ্রোহী। কিন্তু কেন! যাহাতে কোনো পারম্পর্য্য, ঔচিত্য শৃঙ্খলা মূলেই নাই তাহাকে কেন তোমার মন-গড়া শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার হাস্যকর এই প্রচেষ্টা!

এই আকস্মিকতাই বিধান। জীবনের কোন্ এক পরম মুহূর্ত্তে হাতের রুমাল খসিয়া পড়ে। মৃত্যুর পরপার হইতে প্রেতাত্মার আহ্বান আসে। কখন প্রণয়ী অজ্ঞাতসারে প্রেমাস্পদের বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়।

বিনয় মুখ তুলিয়া দেখিল, বৈশাখের দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—তবে সূর্য্য এখনো অস্ত যায় নাই—ধূলি-আচ্ছন্ন দিগ্‌মণ্ডলের ঠিক কোন স্থানটায় যে সূর্য্য তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। বাম পাশের ছোট নদীতে একখানা পালের নৌকা অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছে। ডান দিকের বড় পদ্মায় লালগোলাগামী জাহাজখানার ধূম রেখা নিষ্কম্প আকাশে সুবৃহৎ একটা রোমশ বিহঙ্গের মত নিশ্চল হইয়া আছে। পূর্ব্বতম দিগন্তের ধূসর বনরেখার শিরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিবার ক্ষীণ একটা আভাস!

হঠাৎ ছিপে টান পড়িল—বিনয় চাহিয়া দেখিল 'চার' খাইয়া একটি মৎস্যশাবক তর্ তর্ করিয়া জল কাটিয়া পলায়ন করিতেছে। আবার 'চার' দিয়া ছিপ ফেলিল। সেই নীলাভ জলাশয়ের ছোট ছোট মাছের গতিবিধি অনায়াসে লক্ষ্য হয়—কিন্তু ছিপে একটিও ওঠে না। মাছ ধরা-ই যেখানে এত কঠিন, মানুষ ধরা কি সেখানে সম্ভব! একদৃষ্টে ছিপের দিকে চাহিয়া বিনয় কতই কি ভাবিতে লাগিল। সহসা ছিপের ডগা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! ভালো করিয়া দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িতেই পিছন হইতে কে তাহার দুই চোখ টিপিয়া ধরিল—অনেক দিন পরে ছিপে মাছ পড়িয়াছে! বিনয় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিল—আঃ ছাড়ো, ছাড়ো মাছ পালালো! কেহ উত্তর দিল না, কেবল মৃদু চুড়ির শব্দমিশ্রিত চাপাহাসি তাহার কানে প্রবেশ করিল। বিনয় জোরে ছিপে টান দিতেই মাছ যথারীতি পলাইল—কঙ্কণ আসিয়া পাশে পড়িল।

—দেখলে তোমার জন্যই মাছটা পালালো।

—আমি না আসলেও পালাতো।

—ইস্ কত বড় মাছটা!

—বাস্তবিক—একটা পুঁটি।

—তা আমি কি করবো বল—তোমাদের চরে কি বড় মাছ আছে!

—তা বই কি—আমাদের চরের মাছ কি আর পছন্দ হবে! কঙ্কণের স্বরে অভিমান মিশ্রিত।

বিনয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—সে কথা আমি বলিনি।

—থাক্ থাক্ বুঝেছি।

পূর্ব্ববনান্তের শিয়রে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানুষের মনে সোনার কাঠি বুলাইয়া দিতেই সমস্ত প্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূসর পৃথিবী স্বর্ণাভ হইল, তারকা-হীন নভস্তল বিরাট দুই পাখা মেলিয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল, নিকটে, দূরের তরুশ্রেণী নানা অপ্রাকৃত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই যে বাতাসটি উঠিবে সেই তালে তালে কাঁপিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আর ক্ষুদ্র সেই জলাশয়টির চারিদিকের কিনারা আবেষ্টন করিয়া সোনালী একখানা পাড়ের মত তক্ তক্ করিয়া কাঁপিতে থাকিল।

বিনয় প্রথম কথা কহিল।

—কঙ্কণ, আমি ক'লকাতা যাচ্ছি।

—কবে?

—মাস দুয়েকের মধ্যেই।

—আবার কবে ফিরবে।

—পূজোর সময়।

কঙ্কণের বুকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। তবে এখানকার খেলা শেষ। পূজায়, তার তো অনেক দিন বাকি, একবার গেলে কি আর মানুষ ফেরে! আর ফিরলেও কি সেই পূর্ব্বের সুরটি আর বাজিয়া ওঠে!

—আচ্ছা আমি গেলে তোমার কষ্ট হবে না?

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি নেতিবাচক উত্তর!

এবারে বিনয়ের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস। মেয়েদের চোখ, কান পুরুষের অপেক্ষা সজাগ, সে নিঃশ্বাসটি তাহার কানে বাজিল। বিনয় যে তাহার উত্তরে দুঃখিত ইহা কেন যে তাহাকে অপ্রত্যাশিত আনন্দ দিল—সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একবার ইচ্ছা হইল বলে, তাহার নেতিবাচক উত্তর একান্ত মিথ্যা, বিনয় না থাকিলে তাহার সুখ কিসের! কিন্তু মনের কথা কণ্ঠে প্রকাশ যে অসম্ভব। কোন্ দারুণ বিধাতা মানুষের মনে ও ভাষায় এমন পরম অসামঞ্জস্যের বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন। মুখের কথায় যখন প্রাণটা

জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়, তখন একবার ভালো করিয়া চোখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে ভুলিয়ো না—কি জানি তাহাতে হয় তো ঠিক বিপরীত ভাব।

বিনয় কঙ্কণের হাত ধরিয়া টানিল, কঙ্কণ শক্ত হইয়া বাধা দিল। হঠাৎ দক্ষিণ হইতে ঝির ঝির করিয়া একটি বাতাস উঠিল, প্রথমে দূরের, অদূরের, নিকটের, অবশেষে ঠিক তাহাদের মাথার উপরকার শিরীষ শাখার পাতাগুলি কাঁপিয়া উঠিল। জলাশয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ লেখা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। বিনয় আবার তাহাকে কাছে টানিল। কঙ্কণ যেন অনিচ্ছায় পাশে সরিয়া বসিল। তাহার মুক্ত অলক বিনয়ের গায়ে স্পর্শ করিল, তাহার চুলের কষায়-মধুর তীব্র গন্ধ তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিল।

বিনয় তাহাকে আরো কাছে টানিল। একটা পথভ্রান্ত পাপিয়া তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে আকাশের মর্ম্মভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। কঙ্কণ নিজেকে বিনয়ের বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে একান্ত ভাবে সমর্পণ করিল। যুগল হৃৎপিণ্ডের খঞ্জনীর তালে তালে যুগল দেহের শিরা উপশিরায় রক্তধারার বিচিত্র জাল ধাবমান হইল। বিনয়ের মুখ কঙ্কণের মুখের দিকে নমিত হইল। কঙ্কণ মুখ সরাইয়া লইল। কোকিল ডাকিতে লাগিল। আবার—এবার আর সরিল না। বর্ষার প্রথম বারিসমাগমে নদীগর্ভে শরবন যেমন অকস্মাৎ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে, বিনয়ের ওষ্ঠস্পর্শে কঙ্কণের সর্ব্বদেহ তেমনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও নারীর মনে যে স্মৃতিটি অত্যুজ্জ্বল থাকে, সে তাহার প্রথম প্রণয়ের চুম্বনের।

সেই অবাতক্ষুব্ধ স্বচ্ছ সরোবরে পূর্ণিমা চাঁদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, দুইটি ছায়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, একের দেহসীমা হইতে অপরের দেহসীমা সেই পূর্ণিমার আলোকেও পৃথক লক্ষ্য করা যায় না। নীলকান্ত সেই সরোবরের শিলাখণ্ডে যুগল মূর্ত্তির মীনার কাজ! রহিয়া রহিয়া জল শিহরিয়া ওঠে, দুইটি ছায়া শিহরিত হয়, দুইটি মুখ একত্র হয়, ছায়া তদনুরূপ করে, দুইটি কপোল একত্র হয়, ছায়া তদনুরূপ, দুই জোড়া ওষ্ঠাধরের তীব্র তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী শীৎকার শব্দে দুইটি দেহ আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপে—ছায়াযুগল আপাদমস্তক কাঁপিতে থাকে!

১১

বর্ষার সন্ধ্যা। পদ্মা এপার হইতে অতি দূর পরপার পর্য্যন্ত একটানা অখণ্ড একখানি গেরুয়া জলের চাদর। কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ নদীতে স্রোত আছে বলিয়া মনে হয় না, কেবল যখন নৌকাগুলি নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া চলিয়া যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় স্রোত কি তীব্র। চরচিলমারীর অধিকাংশই ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল এক এক স্থানে পুঞ্জিত বসতির ধূসর খড়ের চাল গেরুয়া জলের উপর জাগিয়া আছে। চরের দক্ষিণ ধার দিয়া পদ্মার বৃহত্তর শাখাটা, সেদিকে প্রবল ভাঙন লাগিয়াছে। বর্ষার প্রথম হইতে ভাঙিতে সুরু করিয়াছে, এখনো অল্প অল্প করিয়া চলিতেছে।

সেখানে একদল লোক, বালক, বালিকা, যুবতী, কিশোরী, দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, রাজসাহী হইতে লালগোলা-গামী জাহাজখানা কষ্টে প্রবল স্রোতের উজান ঠেলিয়া অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। জাহাজের ধূমকল হইতে নির্গত ধূসর ধোঁয়া সেই বায়ুলেশহীন সন্ধ্যার আকাশে স্তরে স্তরে জমিয়া বৃহৎ একটা সরীসৃপের মত, কেবল পিছনে অনেকটা দূরে তাহার সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবার আভাস।

সকলে জাহাজটা দেখিতেছিল, কেহ কেহ ডেকের যাত্রীদের গুণিতে চেষ্টা করিতেছিল, দু'একটা ছেলে জাহাজের ধীরগতি দেখিয়া ছুটিয়া তাহার সহিত পাল্লা দিবার চেষ্টা করিতেছে। মাঝে মাঝে নিকটের আউশের ক্ষেতের খানিকটা করিয়া ভাঙিয়া নীরবে জলের তলে চলিয়া যাইতেছে, প্রথমে সবটা জলের তলে চলিয়া যায়, কিছুক্ষণ পরে ধান গুলা আলগা হইয়া একবার ভাসিয়া উঠিয়াই একটা পাক খাইয়াই তীরবেগে ছুটিয়া পলায়। ছেলেরা চীৎকার করিতে থাকে, ওই, ওই, ওই যাইতেছে,···বাস্, আর দেখা যায় না।

আকাশের মধ্যস্থলে মেঘ বিশেষ নাই, কিন্তু ওপারের তীরে জলের মাথার উপর দিয়া সারিবন্দী স্তরে স্তরে মেঘ, আকাশ ধূসর, জলতল গেরুয়া, পৃথিবীর শ্যামচিহ্ন প্রায় লুপ্ত, অদৃশ্য একটা বিরাট বিহঙ্গের প্রসারিত পক্ষচ্ছায়ায় সমস্ত সৃষ্টিটাকে যেন ম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

সেই দলের একান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কণ জাহাজের কাঠরার উপরে ঝুঁকিয়া পড়া একটি মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিতেছিল। বিনয়

কলিকাতা যাইতেছে। জাহাজের গতি মন্থর, লক্ষ্য করিবার অসুবিধা ছিল না, জাহাজ অনেকটা দূরে, ভালো করিয়া দেখিবার উপায় নাই, তবু ওই মূর্ত্তিটি যে তাহার ইহাতে আর সন্দেহ নাই। মূর্ত্তি একবার ঋজু হইয়া দাঁড়াইল, আবার কাঠরার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। ডেকের উপরে আর সকলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কেবল ওই মূর্ত্তিটি নিশ্চল।

কঙ্কণ কি ভাবিতেছিল কি জানি; হয়তো বিশেষ কিছু ভাবিতেছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কায়াহীন অস্পষ্টতার মত বিদায়ের প্রদোষে তাহার মনের মধ্যে বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, কেবল একটা অনির্দ্দেশ্য অনিশ্চয়তা চিরন্তন বিচ্ছেদের অমূলক আশঙ্কা! হয় তো কিছু ভাবিতে ছিল, কিন্তু সে ভাবনার মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না।

কলিকাতা সে কতদূর! সে নাকি মস্ত সহর, এই রাজসাহীর অপেক্ষাও বড়। সেখানে নাকি অনেক লোক—বিজয়াদশমীর দিন রাজসাহীতে পদ্মার ধারে যত লোক জমা হয়, তাহার চাইতেও বেশি!

বিনয়ের মুখে সে কলিকাতার বর্ণনা কিছু কিছু শুনিয়াছে, সেখানে নাকি অনেক বাড়ী ঘর, কত হাওয়াগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, অসংখ্য পথ ঘাট, অগুণতি লোক। সেখানে মেলা ইস্কুল কলেজ, উহারি একটা কলেজে বিনয় পড়িবে, সেখানে কত মাষ্টার, তাহারা অনেক জানে। এক একটা কলেজে হাজার হাজার ছাত্র। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, বিনয় বলিয়াছিল, আজকাল মেয়েরাও ছেলেদের সহিত পড়ে। মেয়েরা কলেজে পড়ে। কঙ্কণও লিখিতে পড়িতে জানে, কিন্তু কলেজে পড়া? সে যে আরেক ধরণের। সেখানকার মেয়েরা কত জানে, কত বুদ্ধি তাদের, কত বিদ্যা, তাহারা কত সুন্দর। কঙ্কণের ভাবনায় কেমন জট পড়িয়া গেল—ওই জাহাজ, এই চর, কলিকাতা সহর, কলেজের মেয়ে সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন একটা গোল পাকাইয়া গেল!

হঠাৎ পাশের লোকদের চীৎকারে তাহার চমক ভাঙিল। খানিকটা মাটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে দুটা বাবলা ও খেজুর গাছ বহুদিন হইতে পরস্পর পাক খাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিল, চরের একটা বিস্ময়ের বস্তু। সে দুটাও ধ্বসিয়া জলের তলে তলাইয়া গেল। খানিক পরেই আবার তাহারা জাগিয়া উঠিল, তখন তাহাদের বহুদিনের সেই বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, আর একবারমাত্র তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া প্রবল টানে দুইটি দুইদিকে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

কঙ্কণের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। আহা, উহারা কতদিনের সাথী! পদ্মার কি নিষ্ঠুর স্রোত! এমনি করিয়া কত বন্ধন, কত সাথী, কত কি ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

জাহাজ ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, তীরের দলও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, আকাশে মেঘ ও সন্ধ্যার দ্বিগুণিত ছায়া ক্রমেই ঘনায়িত হইয়া উঠিল। কঙ্কণ প্রায় একাকী।

মানুষ কি দূরে গেলে ফেরে! ফিরিলেও কি আর আগের মত থাকে! কি জানি। সে যে কলিকাতা সহর। কত বাড়ি ঘর, ইস্কুল কলেজ, ছাত্রছাত্রী। না, আর ফেরে না!

বিনয় জাহাজের রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চরের এই দলের মধ্যে একটি কিশোরীকে দেখিতে চেষ্টা করিতে ছিল। প্রথমে কিছুতেই সে ঠাহর করিতে পারে নাই। আগাগোড়া দৃষ্টি বুলাইয়া যাইতে অবশেষে তাহাকে দেখিতে পাইল—ঐ যে একান্তে কঙ্কণ দল হইতে একটু পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়া, নিকটে তাহার রাখাল ছেলেটি। কাল তাহাদের এই রকম পরামর্শ হইয়াছিল বটে—কঙ্কণ রাখালকে সাথে লইয়া দল হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, বিনয় কাঠরার উপরে নত হইয়া অপেক্ষা করিবে। তাহা নহিলে এতদূর হইতে চিনিতে পারিবে কি করিয়া! বিনয় ভাবিতেছিল—তাহার ভাবনা কঙ্কণের মত অসংলগ্ন না হইলেও তাহাতে আজ বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল না। বর্ত্তমানের সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলিত চিন্তা কয়জনে করিতে পারে। ওই যে জলমগ্ন চরচিলমারী নূতন দিগন্ত ও পুরাতন স্মৃতির তলে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে, ওইখানে তাহার জীবনে একটা গ্রন্থি পড়িয়া গিয়াছে। ওই যে কিশোরী বালিকাটি দল হইতে একটু পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার সাথে কেমন করিয়া অকস্মাৎ তাহার জীবনের সূত্র গ্রথিত হইয়া গেল। জীবনের গতি যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এমন আকস্মিক কাণ্ড ঘটে কেন! তবে বুঝি আকস্মিকতাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটক! তাহার ভাবনার সাথে পদ্মার অবিরাম কলধ্বনি মিশিতেছিল, চরচিলমারী অন্তর্হিতপ্রায়। বিনয় দেখিতেছিল, আলোড়িত

ধূসর স্রোতে জাহাজখানার ছায়া নিতান্ত অসংলগ্ন ভাবে পড়িতেছে জলের স্রোতে নাচিতেছে, কাঁপিতেছে দুলিতেছে ভাঙিয়া যাইতেছে, জল কোথাও বুদ্বুদের মত ফুটিয়া উঠিতেছে কোথাও কাহার হস্তবিন্যাসে যেন শয্যার মত বিস্তারিত হইতেছে আবার কোথাওবা নূতন জলধারার সংশ্রবে কল কল করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে।

সহসা জাহাজের চাকায় মথিত জলের শীতল শীকর বিনয়ের চমক ভাঙিয়া দিল। জাহাজ মোড় ফিরিয়া খাড়া পাড়ি দিয়া পদ্মা পার হইতে লাগিল। ওপার কাছে আসিয়া পড়িল, এপার মিলাইয়া গেল। উঁচু পাড় ঘেসিয়া জাহাজ চলিতেছে, পাড়ের গাছ-পালার কালো ছায়া জলে পড়িয়া সুগভীর নদীকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। ঢেউয়ের আন্দোলনে সদ্যভগ্ন শিকড়-বাহির-হওয়া কূল হইতে ঝুর ঝুর করিয়া মাটি খসিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত কুটীরের মাটির দেয়াল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, গৃহস্বামী পদ্মার ভয়ে পলাইবার সময় চাল, জানালা, দরজা যাহা সম্ভব খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনয় ফিরিয়া দেখিল চরচিলমারী আর দেখা যায় না, সেখানে কেবল একটা বাষ্প-কুহেলিকার মতন। তাহার চিন্তাস্রোত একবার একূল হইতে ওকূলে আছাড় খাইতে লাগিল। প্রথম সেই চরচিলমারীতে হাঁস কিনিতে যাওয়া, তার পরে মৎস্যশীকার! তার পরে কত হাসি, কত খেলা, হাসিতে হাসিতে আমরা যে বীজ বপন করি, একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার ফসল কাটিতে হয়!

আকাশে মেঘ নিবিড় হইয়া আসিল; পদ্মার সেই ছায়া করাল হইয়া উঠিল, চারিদিক নিস্তব্ধ স্তম্ভিত, কেবল স্রোতের একটানা ছল ছল, আর মাঝে মাঝে জাহাজের পাশ ফিরিবার গর্ঘর।

অন্ধকারে চোখ চলে না; দূরে অতিদূরে গ্রামের দু'একটা প্রদীপ, মাঝে মাঝে ধূমকল হইতে নির্গত দীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অন্ধকারে একচক্ষু জাহাজ তীব্র বিদ্যুত-আলোক নিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিল; সেই আলোকরশ্মিতে একটানা জলতল বিরাট অজগরের মসৃণ চর্ম্মের মত চক্ চক্ করিয়া উঠে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া বিনয় কামরায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; একবার সেই দিকে তাকাইল—যেখানে কিছুক্ষণ আগে চরচিলমারী ছিল। হঠাৎ আকাশের উচ্চতম স্থান হইতে বিদ্যুতের একটা অগ্নিময় শূল সবেগে নামিয়া পড়িয়া দিগন্তের সেই অনির্দ্দিষ্ট স্থানটায় আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। বিনয় নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার সেই রহস্যময়ী পদ্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

মেঘে ম্লান, শরতে স্বচ্ছ, শীতে শান্ত এই পদ্মা! কূলে শস্য, জলে নৌকা, স্থলে লোকালয় এই পদ্মা! বর্ষার প্রথম বারিসমাগমে সমাকুল; বৈশাখের মেঘ-পতাকার গূঢ় সঙ্কেতে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিস্তব্ধ; উভয় তীরের ঝাউঝাড়গ্রাসী, ঘনায়মানা, কলগর্জ্জিতা; স্নেহশীলা জননীর ন্যায় কোলের নৌকাগুলিকে দোলাইয়া নতনয়না; কখনো বা নৃত্যশীলা নটিনীর ন্যায় দ্রুত চরণ চাঞ্চল্যে কলহাস্যময়ী; কখনো বা শবর-দুহিতা শ্যামাশর্ব্বরীর মত উচ্ছ্বসিত কৌতুকে ধনুনিবদ্ধ-পাণি যুগ্মতীরতূণীরা; শ্রান্ত অঞ্চলা শরৎ শেষের ক্ষীণ শশি কলাটির প্রায় কখনো দিক্‌শয্যাপ্রান্তলগ্না! বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন বাংলার সমুদায় প্রান্তরতলশায়িনী, একাকারা, বিরাট, বিশাল, উদাস, উদার, এই পদ্মা; জগতের সবচেয়ে পুরাতন, সবচেয়ে দীর্ঘ, সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে একটানা একখানি আদি অন্তহীন কাহিনীর মত এই পদ্মা! বাংলার প্রাণ-প্রতীক এই বিরাট নাগিনী!

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

প্রথমে উরুবেল হইতে ঋষিপত্তনে যাইবার পথে বুদ্ধের সঙ্গে উপকনামক যে আজীবিকের দেখা হইয়াছিল তাহার কথা বলি। উপক এক বনে গিয়া গুহায় আশ্রয় লইয়া প্রবল তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে সেই বনের এক ব্যাধের কুটিরে ভিক্ষার জন্য যাইত। ব্যাধের চাপা-নাম্নী একটি নবযৌবনা কন্যা ছিল, তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া কিছু দিনের মধ্যে উপকের মদনবিকার উপস্থিত হইল ; উপক তপস্যা, ভিক্ষা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া গুহায় পড়িয়া রহিল। ব্যাধ কয়েক দিন উপককে না দেখিতে পাইয়া খোঁজ করিতে উপকের গুহায় গিয়া অবস্থা দেখিয়া প্রশ্ন করিলে উপক ব্যাপার খুলিয়া বলিয়া চাপাকে বিবাহ করিতে চাহিল। ব্যাধ বাড়ী ফিরিয়া কন্যাকে এ প্রস্তাব জানাইল ও কন্যা সম্মত হইলে উপকের সহিত তাহার বিবাহ দিল, উপকও তপস্যা ছাড়িয়া ব্যাধবৃত্তি আরম্ভ করিল এবং কালক্রমে তাহাদের একটি সন্তান জন্মিল। ব্যাধ-কন্যার বোধ হয় স্বামী-তৃপ্তি সন্তোষজনক হয় নাই, ছেলেটি কাঁদিলে চাপা তাহাকে "ওরে উপকের ছেলে, সন্ন্যাসীর ছেলে, ব্যাধের ছেলে, কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না!" বলিয়া সান্ত্বনা দিত! উপকের ইহাতে অপমান বোধ হওয়ায় সে বুদ্ধের কাছে গিয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিল ; চাপাও পরে বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুণী হইয়াছিল। (থেরীগাথার টীকা)

সঙ্ঘ-প্রবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প

তিষ্য নামক বুদ্ধের একজন পিসতুতো ভাই বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষু হইয়াছিলেন। ইনি স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া ভিক্ষুরা ইঁহাকে "মোটা তিষ্য" বলিত। ইনি বেশ খাওয়া-দাওয়া করিয়া সুবেশ পরিয়া ধর্ম্মসভার (বিহারের যে ঘরে বুদ্ধ উপদেশ দিতেন) ঠিক মাঝখানে বসিয়া থাকিতেন। একবার কয়েক জন ভিক্ষু স্থানান্তর হইতে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল ; তিষ্যকে দেখিয়া তাহারা ভাবিল, ইনি বোধ হয় কোন একজন বড় স্থবির হইবেন, তাহারা তাঁহার পদসেবা করিতে চাহিল কিন্তু তিষ্য তাহাদের কথার কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। আগন্তুকদের মধ্যে একজন তরুণ ভিক্ষু তিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কত বর্ষা যাপন করিয়াছেন ; তিষ্য বলিলেন, তিনি অতি সম্প্রতি সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাতে তরুণ ভিক্ষু তিষ্যকে আত্মম্ভরিতার জন্য ও তাঁহার চেয়ে গরীয়ান ভিক্ষুদের প্রতি সম্মান না দেখাইয়া তাঁহাদের সেবাগ্রহণের জন্য ভর্ৎসনা করিল। অনাচার অসহিষ্ণুতা তরুণের স্বভাব, তিষ্যকে ভর্ৎসনা করিয়া তরুণ ভিক্ষু অবজ্ঞাসূচক তুড়ি দিল। তিষ্য ইহাতে মহা খাপ্পা হইয়া বলিলেন, "জানিস্ আমি ক্ষত্রিয়, তোদের সবংশে নির্ব্বংশ করব।" রাগে অপমানে ফুলিতে ফুলিতে তিষ্য বুদ্ধের কাছে নালিশ করিতে চলিলেন, আগন্তুক ভিক্ষুরাও সঙ্গে চলিল। বুদ্ধ সব কথা শুনিয়া তিষ্যকে ভিক্ষুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তিষ্য শুনিলেন না ; বুদ্ধ বারবার তিষ্যকে বলিলেন তথাপি তিষ্য কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিলেন না। (ধ-কথা, ১।৩৮)।

পাঠিক নামক একজন আজীবিক এক গৃহস্থ-স্ত্রীর কাছে ভিক্ষা পাইত। স্ত্রীলোকটি বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে যাইবে স্থির করিল কিন্তু পাঠিক তাহাকে নিষেধ করিল। ইহাতে স্ত্রীলোকটি লোক পাঠাইয়া বুদ্ধকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিল এবং আহার প্রস্তুত হইলে বুদ্ধকে খবর দিতে তাহার ছেলেকে পাঠাইল। পথে ছেলেটির সঙ্গে নগ্নশ্রমণের দেখা হইল, নগ্নশ্রমণ এ খবর শুনিয়া ছেলেটিকে শিখাইয়া দিল যে সে যেন গিয়া বুদ্ধকে তাহাদের বাড়ীতে আসিবার ভুল পথ বলে ; সে ছেলেটিকে আরও বুঝাইল যে বুদ্ধ ঠিক মত না পৌছিতে পারিলে ভালই হইবে, তাহারা দুজনেই বেশি করিয়া খাইতে পাইবে। ছেলেটি শিখান মত বুদ্ধকে ভুল পথের কথা বলিয়া আসিল কিন্তু বুদ্ধ বাড়ী চিনিতেন, তিনি ঠিকই উপস্থিত হইলেন। নগ্নশ্রমণ আহারের লোভে পরে আসিয়া বুদ্ধকে দেখিয়া রাগিয়া স্ত্রীলোকটিকে গালাগালি দিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি ইহাতে বড় ব্যথিত হইল কিন্তু বুদ্ধ তাহাকে বুঝাইলেন যে অন্য লোকের অন্যায়ের প্রতি গ্রাহ্য না করিয়া নিজের দোষ দূর করাই আমাদের উচিত। (ধ-কথা, ১।৩৭৬)।

একজন ব্যাধ প্রভাতে মৃগমাংস লইয়া রাজগৃহে বিক্রয় করিতে আসিত। একদিন প্রভাতে এক ধনীকন্যা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া পথে বলিষ্ঠ সুগঠিত-দেহ ব্যাধকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইল। ধনীকন্যা দাস পাঠাইয়া খবর লইল যে ব্যাধ পরদিন নগর ত্যাগ করিবে, সেও গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পরদিন তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া বনে গিয়া ব্যাধের স্ত্রীরূপে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের সন্তানাদিও হইল। একদিন ব্যাধ বনে জাল পাতিয়াছিল; বুদ্ধ বনে গিয়া একটি ঝোপের নীচে বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সেদিন জালে কোন পশু না পড়ায় ব্যাধ ভাবিল, নিশ্চয় কেহ জালে পড়া প্রাণীদের ছাড়াইয়া দিতেছে। সে খুঁজিতে খুঁজিতে বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ধনুর্বাণ উঠাইল কিন্তু তাঁহার ধ্যানস্থ মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া তীর ছুঁড়িতে না পারিয়া সেখানেই স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার স্ত্রী আসিয়া উভয়কে তদবস্থ দেখিয়া বলিল, "আমার বাবাকে মারিও না।" এই সময় বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ হইল। সস্ত্রীক ব্যাধ তাঁহার ভক্ত হইয়াছিল। (ধ-কথা, ৩।২৪)।

একজন গৃহস্থ-স্ত্রী মাতার মত এক ভিক্ষুকে যত্ন করিত। স্ত্রীলোকটি একদিন বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে যাইবার ইচ্ছা করিল কিন্তু একবার বুদ্ধের উপদেশ শুনিলে আর ভিক্ষুর উপর তাহার তত ভক্তি থাকিবে না এই ভয়ে ভিক্ষু তাহাকে নিষেধ করিল। গৃহস্থ-স্ত্রী ভিক্ষুর নিষেধ না মানিয়া বুদ্ধের কাছে গেল। ভিক্ষু ইহাতে চটিয়া বুদ্ধকে বলিল যে তিনি যেন এই অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকটির উপযোগী করিয়া সাদাসিধা ভাবে তাহাকে উপদেশ দেন। বুদ্ধ ভিক্ষুর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। (ধ-কথা, ৩।১৫৫)।

অনাথপিণ্ডদের পুত্র পিতার অবাধ্য ও উন্মার্গগামী ছিল। উন্মার্গগামীর, বিশেষতঃ সে যদি বড়লোকের ছেলে হয়, অর্থের সর্ব্বদাই প্রয়োজন; অনাথপিণ্ডদ পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে সে যদি রোজ বুদ্ধের কাছে গিয়া একটি ধর্ম্ম-শ্লোক কণ্ঠস্থ করে তবে তিনি তাহাকে প্রতিশ্লোকের জন্য সহস্র মুদ্রা দিবেন (ধ-কথা, ৩।১৮৯)। ইহার পর কি হইল আখ্যানকার বলেন নাই, নিশ্চয়ই শ্লোক মুখস্থ ও বুদ্ধের কাছে যাতায়াত করিয়াও শ্রেষ্ঠীপুত্রের প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, হইলে আখ্যানে তার বিশেষ উল্লেখ থাকিত।

মাতাপিতার আপত্তিসত্ত্বেও একটি যুবা প্রব্রজ্যা লইল; তখন মাতাপিতাও পুত্রের কাছে থাকার জন্য প্রব্রজ্যা লইল। সংসার ত্যাগ করিলেও এই তিনজন সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া কথাবার্ত্তা গল্প করিয়া সারাদিন কাটাইত। ভিক্ষুরা ইহাদের সাংসারিক ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে জানাইলে বুদ্ধ তিনজনকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন। (ধ-কথা, ৩।২৭৩)।

বুদ্ধের নির্ভয়তা ও বিজিগীষার একটি বিখ্যাত কাহিনী আছে। অঙ্গুলিমাল নামক একজন দস্যু কোশল রাজ্যে বহু উপদ্রব, লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতেছিল; নিহত ব্যক্তিদের আঙ্গুল কাটিয়া মালার মত করিয়া গলায় পরিয়া থাকিত বলিয়া লোকে দস্যুর ঐ নাম দিয়াছিল। রাজ্যের লোক রাজা প্রসেনজিতের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করিল কিন্তু রাজা সৈন্য পাঠাইয়াও দস্যুদলকে ধরিতে পরিলেন না। যে বনে দস্যুর আড্ডা ছিল সেই বনের রাস্তা দিয়া বুদ্ধ যাইবেন বলিলেন। ভক্তেরা অনেক নিষেধ করিল, তিনি কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে চলিতে আরম্ভ করিলেন। গভীর বনের মধ্যে অঙ্গুলিমাল সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিল। বুদ্ধ বলিলেন, "আমি তো স্থির হইয়াই আছি, তুমি স্থির হও।" অঙ্গুলিমালের নামে লোকের হৃদ্‌কম্প হইত, তাহার কথার এরূপ উত্তরে অঙ্গুলিমালের একটু বিস্ময় বোধ হইল, সে বুদ্ধকে তাঁহার কথার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিল। বুদ্ধ বলিলেন, তিনি অহিংসাধর্ম্মে স্থির আছেন কিন্তু অঙ্গুলিমাল তাহা নাই। সন্ন্যাসীর মুখে এই নির্ভীক উক্তি শুনিয়া অঙ্গুলিমালের বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা হইল। সে তাঁহার শিষ্য হইয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গ লইল। বুদ্ধ ভিক্ষু অঙ্গুলিমালকে সঙ্গে লইয়া কয়েকস্থানে ঘুরিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন; কিরূপ লোককে জয় করিয়াছেন তাহা এবং "আক্‌কোধেন জিনে কোধন্, অসাধুম্ সাধুনা জিনে" এই বাক্যের সত্যতা লোককে দেখাইবার জন্য বোধহয় বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে সঙ্গে লইয়া কয়েক স্থানে পরিভ্রমণ করিলেন। এদিকে লোক আবার আসিয়া প্রসেনজিতের কাছে অঙ্গুলিমালের উপদ্রবশান্তির জন্য প্রার্থনা জানাইল। প্রসেনজিৎ কোন উপায় না দেখিয়া বুদ্ধের পরামর্শ লইবার জন্য জেতবনে আসিলেন। প্রসেনজিতের উদ্বিগ্ন চিন্তাকুল মূর্ত্তি দেখিয়া বুদ্ধ রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ আপনি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন?

বিম্বিসার বা লিচ্ছবিরাজগণ বা অন্য কোনও রাজা কি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-উদ্যোগ করিতেছেন ?” প্রসেনজিৎ বলিলেন যে তেমন কিছু ঘটে নাই বটে কিন্তু অঙ্গুলিমালকে কি করিয়া বশে আনিবেন তিনি ঠিক করিতে পারিতেছেন না। প্রসেনজিতের অঙ্গুলিমাল-ভীতির কথা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন, “মহারাজ অঙ্গুলিমালকে এখানে দেখিলে কি আপনি বিস্মিত হইবেন ?”

“ভদন্ত, আমি তাহাকে সম্মান দেখাইব।” বুদ্ধ তখন প্রসেনজিতের অতি সন্নিকটে উপবিষ্ট অঙ্গুলিমালকে দেখাইয়া দিলেন; ঘোরকর্ম্মা যে দস্যুর সঙ্গে তাঁহার সৈন্যেরা পারিয়া উঠে নাই তাহাকে পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রসেনজিৎ ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি অঙ্গুলিমালকে বস্ত্র, ঔষধ, আহার বাসস্থান যাহা প্রয়োজন দিতে চাহিলেন। এখন তো ভিক্ষু কিন্তু পরে আবার দস্যু হইবে কিনা কে জানে? যাহার হাতে আগে ভুগিয়াছি এবং পরেও ভুগিবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে কে না তুষ্ট করিতে চায়? যাহা হউক, রাজার ভয়ের কোন কারণ ছিল না, অঙ্গুলিমাল বলিল তাহার তিনখানি বস্ত্র আছে আর তাহার কিছুরই প্রয়োজন নাই।

ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া গর্ভবেদনায় কাতর একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া বুদ্ধকে জানাইল। বুদ্ধ তাহাকে স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়া বলিতে বলিলেন যে অঙ্গুলিমাল কখন কাহারও অনিষ্ট করে নাই এবং সে বলিতেছে যে স্ত্রীলোকটির বেদনার উপশম হউক। অঙ্গুলিমাল বলিল, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে; তখন বুদ্ধ তাহাকে বলিতে বলিলেন যে সংঘে প্রবেশ করার পর কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। এই মন্ত্রে নাকি স্ত্রীলোকের গর্ভবেদনার উপশম হইল। অঙ্গুলিমালের দীক্ষাগ্রহণ বুদ্ধের প্রায় পঞ্চান্ন বৎসরের সময় ঘটিয়াছিল (ধ-কথা, ৩।১৬৯)।

বজ্জিবংশীয় একজন রাজপুত্র ভিক্ষু হইয়াছিল। একদিন রাত্রে বৈশালী নগরীর উৎসব-বাদ্য শুনিয়া উৎসবে যোগ দিতে পারিবে না বলিয়া তাহার মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল। পরদিন প্রাতে সে বুদ্ধকে তাহার দুঃখের কথা জানাইলে বুদ্ধ তাহাকে সংসারে দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। (ধ-কথা, ৩।৪৬০)।

একজন ব্রাহ্মণ যোগবলে নাভি হইতে জ্যোতি বাহির করিতে পারিত। বুদ্ধ বা এই ব্রাহ্মণের কে বড় ইহা লইয়া ভিক্ষুদের ও ব্রাহ্মণের শিষ্যদের মধ্যে তর্ক উঠিল। মীমাংসার জন্য ঠিক হইল যে ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে গিয়া তাহার ক্ষমতা দেখাইবে। জেতবনে গিয়া গন্ধকুটির চৌকাঠ পার হইবা মাত্র নাকি তাহার নাভির জ্যোতি নিভিয়া গেল। ক্ষুণ্ণ মনে বাহির হইয়া আসিবামাত্র আবার জ্যোতি বাহির হইল, ব্রাহ্মণ আবার গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিল কিন্তু অমনি জ্যোতি নিভিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভাবিল বুদ্ধের বোধ হয় কোন বেশী শক্তিশালী মন্ত্র জানা আছে যাহার প্রভাবে জ্যোতি নিভিয়া যাইতেছে, সে বুদ্ধকে তখন ধরিয়া পড়িল যে তাহাকে মন্ত্রটি শিখাইয়া দিতে হইবে। বুদ্ধ বলিলেন, ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার শিষ্য হয় তবে তিনি মন্ত্র শিখাইবেন, ব্রাহ্মণ তাহাতে রাজি হইয়া সংঘে প্রবেশ করিল (ধ-কথা, ৪।১৮৭)। নন্দের অপ্সরীলাভের মত ব্রাহ্মণের মন্ত্রশিখা বোধ হয় আর হইয়া ওঠে নাই! আর একজন ব্রাহ্মণও মন্ত্রের লোভে বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিল। সে নাকি নরকপাল ঠুকিয়া বলিতে পারিত মৃত ব্যক্তির কি গতি হইয়াছে। পূর্ব্ব কাহিনীর মত, তর্ক মীমাংসার জন্য ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে গেল। বুদ্ধ পাঁচটি কপাল সাজাইয়া কোনটির কি গতি হইয়াছে বলিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ টোকা মারিয়া বলিল, একজন নরকে গিয়াছে, একজনের পশুজন্ম হইয়াছে, একজনের নরজন্ম হইয়াছে ও একজন স্বর্গে গিয়াছে, কিন্তু পঞ্চমটির কথা সে কিছু বলিতে পারিল না। বুদ্ধ বলিলেন, তিনি পঞ্চমটির কথাও বলিতে পারেন, সে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন এই বেশী শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার শিষ্য হইল। (ধ কথা, ৪।২২৬)।

ভিক্ষুরা নগরের পথঘাটে অনেক দৃশ্য দেখিয়া ও অনেক ঘটনার কথা শুনিয়া নিজেদের মধ্যে নানারূপ আলোচনা করিত; বুদ্ধ প্রায়ই ভিক্ষুদের কথাবার্ত্তার মধ্যে আসিয়া

ভিক্ষুদের কয়েকটি গল্প

করিতেন “ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?” ভিক্ষুরা যাহা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে তাহা তাঁহাকে জানাইলে তিনি নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেন বা অন্য গল্প করিতেন। এই উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অনেক গল্প, কথা, কাহিনী বুদ্ধের মুখ দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা বলিয়া জাতকগ্রন্থে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময় আবার তিনি ভিক্ষুদের কথা ভিন্নদৃষ্টিতে দেখিয়া উপদেশ দিতেন।

কয়েকজন ভিক্ষু একবার অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া জেতবনে আসিল। তাহারা ভ্রমণকালে যত রকমের জমি দেখিয়াছিল, সমান অসমান 'বেলে' 'আঠাল' লাল কাল প্রভৃতি, তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছিল : বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন, "এ জমি বাহিরের, তোমাদের উচিত ভিতরের হৃদয়-জমি পরিষ্কার করা। (ধ-কথা, ১।৩৩৩)।" ভিক্ষুরা একবার শ্রাবস্তীর উত্তর দ্বারের অঞ্চলে ভিক্ষা করিয়া নগরের মধ্য দিয়া ফিরিতেছিল এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামায় সামনের একটি বিচার গৃহে আশ্রয় লইল। ভিক্ষুরা দেখিল বিচারপতি মহামাত্যেরা ঘুষ লইয়া একের সম্পত্তি অন্যকে দিতেছেন, তাহারা ভাবিল, "ইহারা অধার্ম্মিক, এতদিন ভাবিতাম ইহারা যথার্থ বিচার করে।" জেতবনে ফিরিয়া ভিক্ষুরা বুদ্ধকে এ বিষয়ে জানাইলে তিনি বলিলেন, "যাহারা যথেচ্ছ নিষ্পত্তি করে তাহাদের বিচারপতি নাম দেওয়া অন্যায়। (ধ-কথা, ৩।৩৮০)।" আদালতে অর্থবলে বিচারক্রয় প্রায় সব দেশেরই ইতিহাসে দেখা যায়, অন্যত্র সে পরিমাণে ধর্ম্মাধিকরণে অর্থের প্রয়োজন কমিয়াছে, দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও সেরূপ কমে নাই।

এক ভিক্ষু আগে হাতী পোষ মানাইত; একবার একজন লোক একটি হাতীকে বশে আনিতে পারিতেছে না দেখিয়া এই ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুদের বলিল, হাতীর শরীরের অমুক অমুক জায়গায় ডাঙ্গশ মারিলে হাতীকে ইচ্ছামত চালান যাইবে। হস্তীপোষক ইহা শুনিতে পাইয়া তদনুরূপ করিয়া হাতীকে বশ করিল। ভিক্ষুরা এ কথা জানাইলে বুদ্ধ ভিক্ষুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে নিজেকে পোষ মানাইতে পারিলেই তাহার যথেষ্ট হইবে। (ধ-কথা, ৪।৫)। একটা হাতী কাদায় ডুবিয়া গিয়াছিল ও উঠিতে পারিতেছিল না; হাতীর মাহুত ইহাতে মাথায় রণসাজ পরিয়া হাতীকে দেখাইয়া হাতীর কানের কাছে রণবাদ্য বাজাইলে প্রবল বিক্রমে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কাদা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ভিক্ষুরা ইহা দেখিয়া বুদ্ধকে জানাইলে তিনি ভিক্ষুদের ইন্দ্রিয়সুখকর্দ্দম হইতে এইরূপ বিক্রমে মুক্তিলাভ করিতে বলিয়াছিলেন। (ধ-কথা, ৪।২৫)। ভিক্ষুরা একটা বন্দীশালার পাশ দিয়া যাইবার সময় দৃঢ়বদ্ধ বন্দীদের দেখিয়া বুদ্ধকে এ কথা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে তৃষ্ণাই দৃঢ়তম বন্ধন।

স্থবির কাশ্যপের দুইজন সান্ধবিহারী ছিল, একজন তাহার কর্ত্তব্য ঠিকমত করিত আর একজন কিছু না করিয়া নাম লইত। দ্বিতীয় জন একবার একজন উপাসকের কাছে স্থবিরের নাম করিয়া খাদ্য লইয়া নিজে খাইল; স্থবির এজন্য তাহাকে তিরস্কার করিলে সে তাঁহার কুটিরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল।

এক ব্যাধের সঙ্গে এক ভিক্ষুর দেখা হইল। ব্যাধ সেদিন কোন শিকার না পাইয়া ভিক্ষুর জন্যই এরূপ হইয়াছে মনে করিয়া তাহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিল। ভিক্ষু আত্মরক্ষার জন্য এক গাছে গিয়া উঠিলে ব্যাধ তাহার পায়ে তীর মারিতে লাগিল; পা বাঁচাইতে গিয়া ভিক্ষুর চীবর খসিয়া নীচে ব্যাধের উপর পড়িয়া ব্যাধকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিল এবং চীবর-ঢাকা ব্যাধকে ভিক্ষু মনে করিয়া কুকুর তাহার উপর পড়িয়া ব্যাধকে মারিয়া ফেলিল। ভিক্ষু অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধকে আসিয়া ঘটনা জানাইলে বুদ্ধ বলিলেন, ব্যাধের মৃত্যুতে ভিক্ষুর কোন দোষ হয় নাই।

এক লোভী ভিক্ষু স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া চীবর সংগ্রহ করিত। দুইটি চীবর ও একটি দামী কম্বল ভাগ করা লইয়া দুইজন শ্রমণ বিবাদ করিতেছিল, লোভী ভিক্ষু বিবাদ মিটাইয়া দিবে বলিয়া শ্রমণদ্বয়কে এক একখানি করিয়া চীবর দিয়া নিজে কম্বলখানি আত্মসাৎ করিয়াছিল! আর এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুদের রাত্রে ধ্যানাভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া নিজে সারারাত্র ঘুমাইয়া কাটাইত।

ভিক্ষু উদায়ি ভাল ধর্ম্মব্যাখ্যান করিতে পারে বলিয়া গর্ব্ব করিত কিন্তু ব্যাখ্যান করিতে দিলে কিছুই পারিত না। একবার তাহার শ্রোতারা তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করিল, উদায়ি পলাইতে গিয়া একটা খানার মধ্যে পড়িয়া গেল। এক ভিক্ষু ঔষধ দান করিয়া পরিবর্ত্তে কিছু খাদ্য পাইয়াছিল, সে একজন স্থবির ভিক্ষুকে খাদ্যের ভাগ দিল, স্থবির ভাগ লইলেন কিন্তু কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের একটা কথাও না বলিয়া চলিয়া গেলেন। ভিক্ষু একথা বুদ্ধকে জানাইলে বুদ্ধ বলিলেন, "যে কাকের মত নির্লজ্জ, বা দাম্ভিক, চক্ষুলজ্জাহীন বা নীচ তাহার পক্ষে জীবন সহজ কিন্তু যে বিনয়ী ও সদা শুদ্ধাচারী তাহার পক্ষে জীবন কঠিন।" একজন

শ্রমণের সব জিনিষের নিন্দা করিত এবং ভিক্ষায় যাহা পাইত, ঠাণ্ডাই হউক গরমই হউক, বেশীই হউক কমই হউক সবেরই দোষ ধরিত ও নিজের বাড়ীর লোকদের দানসম্পত্তির খুব বড়াই করিত। ভিক্ষুরা তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন শ্রমণেরকে তাহার গ্রামে পাঠাইয়া খবর লইয়া জানিল যে ঐ অহঙ্কারী শ্রমণেরের বাপ দ্বাররক্ষকের কাজ করে। ভিক্ষুরা তখন বুদ্ধের কাছে নালিশ করিল, বুদ্ধ শ্রমণেরকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে অহঙ্কারী ও দোষদর্শী তাহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা লাভ হয় না; কিন্তু যে নিজে কর্ত্তব্য-পরায়ণ সে যদি অন্যের ত্রুটি দেখাইয়া দেয় তবে তাহাকে দোষ ধরা বলে না।

লকুণ্টক ভদ্দিয় নামক একজন শ্রমণের বুদ্ধের কাছ হইতে চলিয়া যাইতেছিল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "একজন স্থবিরকে তোমরা যাইতে দেখিয়াছ?" ভিক্ষুরা বলিল, তাহারা একজন শ্রমণেরকে যাইতে দেখিয়াছে। বুদ্ধ বলিলেন, "সে শ্রমণের নয়, সে স্থবির।"

"ভদন্ত, তাহার বয়স খুব কম।"

"বয়স বেশী হইলেই বা স্থবিরের আসনে বসিলেই আমি লোককে স্থবির বলি না, যে সত্য বুঝে ও অন্যের প্রতি করুণা দেখায় সেই প্রকৃত স্থবির।"

কয়েকজন স্থবির ভিক্ষু কয়েকটি নবীন ভিক্ষু ও শ্রমণেরকে তাহাদের উপাধ্যায়দের চীবর রঙাইতে ও অন্য কাজ করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, "আমরা এত ভাল বাক্‌বিন্যাস করিতে পারি কিন্তু আমাদের ত' অন্যে এত কাজ করিয়া দেয় না।" বুদ্ধের কাছে গিয়া তাঁহারা বলিলেন, "ভদন্ত, আমরাও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানে সুপটু, অন্যের কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করিলেও শ্রমণেরদের ধর্ম্মবাচনা করিবার আগে আমাদের শিক্ষাধীন থাকিয়া উন্নতি লাভ করা উচিত।" যদিও এ অনুরোধে দোষের তেমন কিছু ছিল বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই তবু স্থবিররা শুধু নিজেদের স্বার্থের জন্য ইহা বলিতেছেন এই কথা বুঝিয়া বুদ্ধ বলিলেন, "তোমরা বাক্‌পটু বলিয়াই যে আমি তোমাদের দক্ষ মনে করি তাহা নয়, যাহার সকল দোষ দূর হইয়াছে সেই যথার্থ দক্ষ।" ভিক্ষু হত্থক তর্কে হারিয়া গেলেই প্রতিপক্ষকে অমুক দিন অমুক স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার আসিতে বলিয়া তাহাকে তর্কে আহ্বান করিত কিন্তু নিজে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই সেখানে উপস্থিত হইয়া লোককে ডাকিয়া বলিত যে প্রতি-পক্ষের অনুপস্থিতিতে কার্য্যতঃ তাহার পরাজয় স্বীকার প্রকাশ পাইতেছে। বুদ্ধ একথা জানিতে পারিয়া হত্থককে বলিয়া-ছিলেন যে শুধু মাথা মুড়াইলেই ভিক্ষু হয় না, ভিক্ষুকে সদা সত্যবাদী হইতে হইবে।

সঙ্ঘের প্রথম অবস্থায় ভিক্ষুদের কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিলে আহারান্তে চলিয়া আসিবার সময় ধন্যবাদজ্ঞাপনের জন্য কিছু বলার নিয়ম ছিল না। অন্য সম্প্রদায়ের শ্রমণরা ধন্যবাদ জ্ঞাপক কথা বলিত কিন্তু ভিক্ষুরা বলিত না বলিয়া লোকে অসন্তুষ্ট হইত, এজন্য বুদ্ধ ধন্যবাদজ্ঞাপনের নিয়ম করিলেন। তখন অন্য সম্প্রদায়ের শ্রমণরা বলিল, "ভিক্ষুরা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় দীর্ঘ বক্তৃতা করে কিন্তু আমরা মুনি বলিয়া মৌন থাকি।" বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন, "মৌন থাকিলেই মুনি হয় না, নিশ্চয়তার অভাব ও অন্যকে কিছু জানিতে দিতে কার্পণ্য এইগুলিও মৌনতার কারণ হইতে পারে।"

ভিক্ষু পোঠিল ধর্ম্মব্যাখ্যা করিত কিন্তু বুদ্ধ বলিলেন যে সে নিজে আত্মোন্নতির প্রয়াস মোটেই করে না। তাই তিনি তাহাকে দেখিলেই "তুচ্ছ পোঠিল এস", "তুচ্ছ পোঠিল বস", "তুচ্ছ পোঠিল নমস্কার কর" বলিতে লাগিলেন। ইহাতে পোঠিলের চৈতন্য হইল ও সে প্রয়াসী হইল।

কয়েকজন ভিক্ষু একবার প্রত্যন্তদেশের একস্থানে বর্ষাবাস করিয়াছিল। সে স্থানের অধিবাসীরা গ্রাম সুরক্ষিত করিতে এত ব্যস্ত ছিল যে ভিক্ষুদের কোন খোঁজই করিল না। ভিক্ষুরা পরে একথা বুদ্ধকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "যাক, উহাতে কিছু যায় আসে না; আরামে থাকা সব সময়ে হইয়া উঠে না; কিন্তু ঐ স্থানের লোকরা যেমন গ্রাম সুরক্ষিত করিতেছিল সেইরূপ ভিক্ষুদেরও উচিত নিজকে সুরক্ষিত করা।"

স্থবির অশ্বজিৎ ও পুনর্ব্বসুর শিষ্যেরা কিটা পাহাড়ে থাকিত। তাহারা নানারূপ পুষ্পাভরণ বানাইয়া গ্রামের তরুণীদের কাছে পাঠাইত ও তরুণীদের সঙ্গে পানাহার করিত; তাহারা গন্ধবিলেপনাদি ব্যবহার, গীতবাদ্য ও ক্রীড়ায় যোগ-দানাদিও করিত। লোকে বুদ্ধকে এ খবর দিলে তিনি সারি-পুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে পাঠাইয়া এই ভিক্ষুদের সেস্থান হইতে অন্যত্র সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভিক্ষু সুধর্ম্ম মচ্ছিকাসন্ত নামক স্থানে বাস করিত। সেখানকার চিত্ত নামক এক গৃহস্থ তাহাকে খাইতে দিত। চিত্তের একটি বাঁড়ী নির্ম্মিত হইতেছিল সুধর্ম্ম তাহার তদারক করিত। চিত্ত যখনই ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করিত তখনই বিশেষ ভাবে সুধর্ম্মের নামোল্লেখ করিত। একবার কয়েকজন স্থবির-ভিক্ষু সেখানে আসিলেন। চিত্ত গিয়া প্রথমে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিল ও পরে সুধর্ম্মের কাছে গিয়া তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিল কিন্তু সুধর্ম্ম ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া নিমন্ত্রণে যাইতে অস্বীকার করিল। পরদিন সকালে সে ভাবিল স্থবির-ভিক্ষুদের কি খাইতে দেওয়া হইয়াছে গিয়া দেখিবে। সেখানে গিয়া আহার্য্য দ্রব্যাদি দেখিয়া সে বলিল সবই ঠিক হইয়াছে তবে তিলের নাড়ু হয় নাই। ইহাতে চিত্ত বলিল, "অনেক দিন আগে দক্ষিণাপথের কয়েকজন বণিক পূর্ব্বদেশে গিয়া একটি কুক্কুটী আনিয়াছিল, এই কুক্কুটীর সহিত একটি কাকের মিলনে একটি শাবক জন্মিল; এই শাবকটি যখনই কুক্কুটের ডাক ডাকিতে যাইত তখনই "কা কা" শব্দ বাহির হইত তবং যখনই কাকের ডাক ডাকিতে যাইত তখনই কুক্কুটের শব্দ বাহির হইত। সেইরূপ বুদ্ধবচনে বহুরত্ন থাকিলেও ভিক্ষু সুধর্ম্ম মুখ খুলিলেই "তিলের নাড়ু" ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।" সুধর্ম্ম ইহাতে রাগিয়া শ্রাবস্তীতে গিয়া বুদ্ধকে জানাইল, বুদ্ধ তাহাকে তিরস্কার করিয়া চিত্তের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। (চুল্লবগ্‌গ ১।১৮।৩)

যমেলু ও তেকুল নামে দুই বিদ্বান ব্রাহ্মণ ভ্রাতা ভিক্ষু হইয়াছিল; তাহারা বুদ্ধের কাছে প্রস্তাব করিল যে তাঁহার উপদেশ তাহারা বৈদিক ছন্দে পরিণত করিবে কারণ তাহা না হইলে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বংশের যে সব লোক ভিক্ষু হইতেছে তাহাদের হাতে তাঁহার বাণী বিকৃত হইয়া পড়িবে। বুদ্ধ ইহাদের তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে তাঁহার কথা বৈদিক ছন্দে পরিণত করার কোন প্রয়োজন নাই, প্রত্যেক লোক নিজ নিজ ভাষায় উহা শিক্ষা করিবে। (চুল্ল বগ্‌গ, ৫।৩৩।১)

বুদ্ধ একবার উপদেশ দিতে দিতে হাঁচিলেন। ভিক্ষুরা অমনি সমস্বরে "ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘজীবী হউন, ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, ইহাতে উপদেশে বাধা হইল। বুদ্ধ বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেহ হাঁচিলে লোক যদি বলে 'দীর্ঘজীবী হও' তাহাতেই কি তাহার দীর্ঘ-জীবন বা মৃত্যু হয়?" তাহা যে হয় না ইহা ভিক্ষুদের স্বীকার করিতে হইল। বুদ্ধ তখন এরূপ বলা নিষেধ করিয়া দিলেন। ফলে ভিক্ষুরা হাঁচিলে লোকে যখন তাহাদের দীর্ঘ-জীবন-কামনাত্মক কথা বলিত তখন ভিক্ষুরা চুপ করিয়া থাকিত, লোকে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইত। ইহা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন যে, "গৃহীরা মাঙ্গলিকে বিশ্বাস করে, তাহারা দীর্ঘ-জীবনকামনাত্মক বাক্য বলিলে তোমাদের তাহা বলিতে অনুমতি দিলাম।" (চুল্লবগ্‌গ ৫।৩৩।৩)

ভিক্ষুরা আরামের যেখানে সেখানে—আমাদের দেশের চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিয়া স্থানটি অশুচি করিয়া রাখিত। বুদ্ধকে এজন্য পায়খানা প্রভৃতি বানাইবার ও অন্যান্য রকমের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

কয়েকজন ভিক্ষু একবার একত্র বর্ষাবাস করিয়াছিল। বর্ষাবাসের সময় যাহাতে কোনরূপ অশান্তি বা বিবাদ-বিসম্বাদ না হয় সে জন্য তাহারা আগে হইতেই কয়েকটা নিয়মপালন করা ঠিক করিয়া লইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি নিয়ম এই ছিল যে তাহারা সে কয়মাস পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিবে না। নিয়মগুলি পালনের ফলে বর্ষাবাস তাহাদের শান্তিতে কাটিল—অনেক ভিক্ষুদের মধ্যে এই সময় নানারূপ গোলযোগ দ্বন্দ্ব কলহ হইত। বর্ষান্তে তাহারা বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে বুদ্ধ তাহাদের বর্ষা কিরূপ কাটিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন ও শান্তিতে কাটিয়াছে শুনিয়া ইহা কেমন করিয়া হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষুরা কথা না বলার ও অন্য নিয়মগুলির কথা বলিলে বুদ্ধ বলিলেন, "ভিক্ষুগণ এই অপদার্থরা শান্তিতে বর্ষা কাটাইয়াছে কিন্তু আসলে অন্যায়-ভাবে কাটাইয়াছে, ইহারা গরুর পাল বা ভেড়ার পালের মত কাটাইয়াছে; তৈর্থিকদের মত ইহারা মৌনব্রত কি করিয়া গ্রহণ করে? ইহা চলিবে না; ভিক্ষুগণ, আমি নিষেধ করি তেছি যে তোমরা মৌনব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে না।"

(মহাবগ্‌গ ৪।১)

ভিক্ষু রাহুল (বুদ্ধের পুত্র) একবার রাত্রে উপস্থিত হইয়া অন্য কোথাও জায়গা না পাইয়া বুদ্ধের শৌচকুটীরে শয়ন করিয়াছিলেন; বুদ্ধ প্রত্যুষে শৌচে প্রবেশ করিবার সময় রাহুল জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। নিদ্রিত লোককে বিরক্ত না করিয়া বরং নিজে কষ্ট সহ্য করায় রাহুলের ঔদার্য্য প্রকাশ পায়। (ক্রমশঃ)

মুসলমানের রাজনৈতিক আগ্রহের অভাব

-শ্রীভবশঙ্কর দত্ত

যতই অল্প হউক না কেন ইংরেজী ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের ফলে কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশবাসীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলাদেশে উক্ত ক্ষমতা মুসলমান ও অ-মুসলমানদের (যাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জন হিন্দু) মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক কে কিরূপ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। ইংরেজী ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সালে বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ২৫৪ লক্ষ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ২৭৮ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। আর ঐ সময়ে অ-মুসলমানের সংখ্যা ২২১ লক্ষ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ২৩২ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

গত দশ বৎসরে বঙ্গীয় লাট কাউন্সিলের নির্ব্বাচকের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

	১৯২০	১৯২৩	১৯২৬	১৯২৯
অ-মুসলমান	৫৪১,১৮৯	৫৫৭,৯১৪	৬২৩,২১৭	৬২৬,১৫৩
মুসলমান	৪৬৫,১২৭	৪৬৩,৩৮৬	৫২৯,৯৯৫	৫৩০,৫৯২

১৯২৬ সালে মুসলমান ও অ-মুসলমান নির্ব্বাচকদের সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধির কারণ, ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার দেওয়া এবং স্বরাজ্যদলের চেষ্টায় ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ভোটের তালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া।

অ-মুসলমান লোকসংখ্যা দশ বৎসরে বাড়িল শতকরা ৫ আর অ-মুসলমান নির্ব্বাচকের সংখ্যা বাড়িল শতকরা ১৬ করিয়া। তদ্রূপ মুসলমানের লোকসংখ্যা বাড়িল শতকরা ৯.৫, আর মুসলমান নির্ব্বাচকের সংখ্যা বাড়িল শতকরা ১৪ করিয়া। মুসলমান নির্ব্বাচকের বৃদ্ধি মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধি হিসাবে অ-মুসলমান বা হিন্দুর বহু পশ্চাতে। সাধারণতঃ আশা করা যায় সংখ্যা-বৃদ্ধি হিসাবে ও মুসলমানের মধ্যে সরিয়াৎ অনুযায়ী সম্পত্তির বহু বিভাগ হওয়ায় এবং তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেও অংশ পাওয়ায়, নির্ব্বাচকের সংখ্যা তাঁহাদের মধ্যে দ্রুত বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এই সকল ভোটাধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তিরা, কি পুরুষ কি স্ত্রী, তাঁহাদের নাম ভোটারের তালিকায় লেখান না বা লেখাইতে কোনওরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। মুসলমান নেতাদের মধ্যেও ঐ বিষয়ে কোন রূপই আগ্রহ বা চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, যাঁহাদের নাম ভোটারের তালিকায় আছে তাঁহারাই বা ভোটের সময় কিরূপ ভোটের ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজী ১৯২০ সালে অনেক হিন্দু মহাত্মা গান্ধীর আদেশে ও কংগ্রেসী মানায় কাউন্সিলে যান নাই বা ভোটের সময় উপস্থিত হন নাই। ইংরেজী ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেও নো-চেঞ্জার, No-changer অসহযোগীরা ভোট দেন নাই এবং অনেককে ভোট দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ১৯২৬ সালে, ক্রমাগত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে, বহুতর হিন্দুসভা দলভুক্ত হিন্দু স্বরাজী কংগ্রেসীদের ভোট দেন নাই। কিন্তু গত কয়েকটি নির্ব্বাচনে মুসলমানদের মধ্যে এরূপ কোন কারণ বা ভোট দিবার অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। অপর পক্ষে কাউন্সিলে যাওয়া বা ভোট দিবার স্বপক্ষে মৌলভীদিগের ফতেহা বাহির হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এযাবৎ চারিটি সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে অ-মুসলমান ও মুসলমান, সহর ও পল্লীর নির্ব্বাচকেরা শতকরা কে কত জন ভোট দিয়াছিল, তাহা নিম্নের তালিকায় দেখান গেল :—

নির্ব্বাচকদের মধ্যে শতকরা যাহারা ভোট দিয়াছিল

অ-মুসলমান	১৯২০	১৯২৩	১৯২৬	১৯২৯
সহর	৪১.৮	৫০.১	৪৮.৪	২৫.০
পল্লী	৩৩.৮	৪২.৮	৩৯.৫	৩৩.৯
মুসলমান				
সহর	১৬.০	৪৯.৬	৪১.১	৩৮.৮
পল্লী	২২.৪	৩২.৪	৩৭.০	২০.২

উপরিউদ্ধৃত অঙ্ক হইতে, যদি সহরের অ-মুসলমান নির্ব্বাচকদের সহিত মুসলমান নির্ব্বাচকদের তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে অ-মুসলমান সহরের নির্ব্বাচকেরা সহরের মুসলমান নির্ব্বাচকদের অপেক্ষা শতকরা ৫ জন করিয়া বেশী ভোট দিতে গিয়াছিল। তদ্রূপ পল্লীর নির্ব্বাচকদের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে অ-মুসলমানরা মুসলমানদের অপেক্ষা শতকরা ১০ জন করিয়া বেশী ভোট দিতে গিয়াছিল।

যদ্যপি কেহ বলেন যে রাস্তাঘাটের দুর্গমতা, বিশেষ করিয়া নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গে ভোট দিতে যাইতে ও আসিতে অসুবিধার হেতু মুসলমানদের পক্ষে ভোটাধিকার ব্যবহারের পক্ষে বাধা জন্মাইয়াছে এবং সেই কারণেই তাঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক ভোট দিতে গিয়াছেন, সেটা ঠিক হইবে না। কারণ রাস্তাঘাটের দুর্গমতা উভয় পক্ষকেই সমানভাবে অসুবিধায় ফেলিয়াছে। তর্কের খাতিরে তাহাও স্বীকার করিয়া লইলেও, সহরে মুসলমানদের ভোট দিতে না যাইবার পক্ষে উক্ত কারণ খাটে না। যদি বলেন হিন্দু নির্ব্বাচন-প্রার্থীরা জলের মতন অর্থ ব্যয় করেন, এ কারণ অধিক সংখ্যক নির্ব্বাচককে উপস্থিত করিতে পারেন, একথা ঠিক হইবে না। সহরের নির্ব্বাচনমণ্ডলীতে (Constituencyতে) গড়ে অ-মুসলমান নির্ব্বাচকের সংখ্যা ৭,৭৮৪ ও মুসলমান নির্ব্বাচকের সংখ্যা গড়ে ২,৭৫৯। সুতরাং মুসলমান নির্ব্বাচনপ্রার্থী মুসলমান নির্ব্বাচকের সংখ্যাল্পতার হেতু প্রত্যেকের নিকট যাইতে পারেন; হিন্দু নির্ব্বাচন-প্রার্থীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। স্বর্গীয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী বারাকপুরে। তিনি বারাকপুর হইতে কলিকাতায় নিত্য যাতায়াত করিতেন এবং বহু লোকের সহিত তাঁহার অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। তথাপি তিনি প্রত্যেক ভোটারের নিকট যাইতে পারেন নাই বলিয়া অনুযোগ শুনিতে হইয়াছিল এবং একমাত্র এই কারণে অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। সহরেও যে মুসলমানেরা ভোট দিতে আইসেন না, তাহার একমাত্র সঙ্গত কারণ তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক আগ্রহের একান্ত অভাব।

কিন্তু মুসলমান নির্ব্বাচকদিগের মধ্যে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হইলেও, মুসলমানদের মধ্যে নির্ব্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা খুব বেশী। গত চারিটী সাধারণ নির্ব্বাচনে যে যে নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বিনা-দ্বন্দ্বে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

	১৯২০	১৯২৩	১৯২৬	১৯২৯	
অ-মুসলমান—	৬	৪	৯	২৭ =	৪৬
মুসলমান—	৬	৩	৪	১৬ =	২৯

গত চারিটী সাধারণ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

	১৯২০	১৯২৩	১৯২৬	১৯২৯	
অ-মুসলমান—	১৪৭	৯৫	১০২	৭০ =	৪১৪
মুসলমান—	১২৬	১০২	১০৪	৬৭ =	৩৯৯

যদি আমরা মনে রাখি যে সাধারণ অ-মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৬, আর সাধারণ মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৯, তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য মুসলমান নির্ব্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা অ-মুসলমান প্রার্থী অপেক্ষা বেশী।

খাঁ বাহাদুর আজিজল হক্ এম, এ, বি, এল্, এম, এল, সি তাঁহার প্রণীত "Plea for Separate Electorates in Bengal" নামক পুস্তিকায় একস্থানে লিখিয়াছেন যে—

হিন্দু নির্ব্বাচন-প্রার্থীরা কাউন্সিলে যাইবার জন্য অগাধ টাকা খরচ করেন। ১৯২৩ সালে একজন ৫০।৬০ হাজার টাকা ব্যয় করেন, পরের নির্ব্বাচনে অপর একজন ৬০,০০০ হইতে ১০০,০০০ টাকা খরচ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই বহু ব্যয়ের কথা বাংলার অনেক জেলা সম্বন্ধে সঠিক...... কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে নির্ব্বাচনের ব্যাপার অতি অল্প ব্যয়ে সারা হয়—২।৩ হাজার টাকা মাত্র খরচ হয়।

এই কারণে তিনি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রাখিবার পক্ষপাতী।

হিন্দু নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই যে bona fide প্রকৃত নির্ব্বাচন-প্রার্থী, একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মুসলমান নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের সম্বন্ধে একথা কি জোর করিয়া বলা যাইতে পারে?

বাংলা সরকার সাইমন কমিশনের সম্মুখে যে রিপোর্ট ও মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে লাট কাউন্সিলে নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র (nomination paper) প্রত্যাহার (withdrawal) সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে :—

"নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের মধ্যে প্রত্যাহার সম্বন্ধে কোন অঙ্ক সংগ্রহ করা হয় নাই বটে কিন্তু এটা একটা জানা কথা যে বহু প্রত্যাহার ঘটিয়া থাকে। অপর পদ-প্রার্থীদের সহিত গোপন বন্দোবস্তের ফলে কতকগুলি প্রত্যাহার হয়, অনেক স্থলে নির্ব্বাচনে জয়ের আশা দুরূহ দেখিয়া আবার কেহ কেহ প্রত্যাহার করেন।"

এইরূপ প্রত্যাহার করিলে, জমানতের টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। ইংরেজী ১৯২৩ সালে এইরূপ ৬১টী বাজেয়াপ্তি ঘটে; ১৯২৬ সালে ৫০টী এবং ১৯২৯ সালে

অন্ততঃ পক্ষে ৩৫টী বাজেয়াপ্তি ঘটে এই বাজেয়াপ্তির মধ্যে মুসলমানের বাজেয়াপ্তির সংখ্যা অত্যধিক বেশী। এক ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনে জয়ী পদপ্রার্থী, কলিকাতা কর্পোরেশনে কাউন্সিলার হইবার পাকা ব্যবস্থা করিয়া নিজ নির্ব্বাচন নাকচ করিবার পক্ষে সম্মতি দেন। . .

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলে ভারত সরকার প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে মন্তব্য তলব করেন। তদনুযায়ী বাংলা সরকার এক মন্তব্য পেশ করেন। উক্ত মন্তব্যে বাংলা সরকারের মুসলমান মন্ত্রী ও সদস্যেরা এক আলাহিদা মন্তব্য দেন। উক্ত মন্তব্যে তাঁহারা স্বীকার করেন যে, "এযাবৎ সেকালের ভদ্র ও মার্জ্জিত রুচির বা যাহাদের দেশে স্থায়িত্ব (?) অর্থাৎ stake আছে, এরূপ মুসলমান বড় একটা কাউন্সিলে আইসেন নাই, যাঁহারা কাউন্সিলে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ এমন শ্রেণীর, যে, তাঁহাদের দল বিশেষে যোগদান অর্থের দ্বারা ক্রেয়।"

যাঁহারা কাউন্সিলে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের সমধর্ম্মাবলম্বী ও তাঁহাদের ভোটের উপর নির্ভরশীল মুসলমান মন্ত্রীরা যদি এ কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে যাঁহারা সহজে কাউন্সিল নির্ব্বাচন হইতে জমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করাইয়া সরিয়া পড়েন তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক ব্যাপারই অনুমিত করা যায়। মুসলমান নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান একটী লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৩৩ সালের নির্ব্বাচনে ২১টী সংরক্ষিত আসনের জন্য ৮০ জন মুসলমান প্রার্থী হয়েন, আর ৪৮টী সাধারণ আসনের জন্য ১৫৩ জন প্রার্থী দাঁড়ান। প্রত্যেক সংরক্ষিত আসনের জন্য ৪ জন মুসলমান, প্রত্যেক সাধারণ আসনের জন্য ৩ জন অ-মুসলমান দাঁড়ান। মনোনয়ন-পত্র পরীক্ষার সময় ১৫ জন মুসলমান সরিয়া দাঁড়ান, ফলে ৩ জন মুসলমান বিনা দ্বন্দ্বে নির্ব্বাচিত হয়েন। অপর পক্ষে মাত্র ১জন হিন্দু বিনা দ্বন্দ্বে নির্ব্বাচিত হয়েন। ৬৭ জন মুসলমান, যাঁহাদের মনোনয়ন-পত্র মঞ্জুর হয়, তাঁহাদের মধ্যে আরও ২৫ জন ভোটের পূর্ব্বে সরিয়া দাঁড়ান, এবং আরও ১ জন মুসলমান বিনা দ্বন্দ্বে নির্ব্বাচিত হয়েন। যাঁহারা আইনতঃ ভোট-দ্বন্দ্বে হাজির ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই নামে মাত্র হাজির ছিলেন। একজন মাত্র ৩টী ভোট পাইয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিন্দুসভার সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে ২ জন মুসলমান ও ১ জন হিন্দু দাঁড়ান। মুসলমানদের ভোট পাইলে সুবিধা হইবে বলিয়া হিন্দু পদ অপর ২ জন মুসলমানকে সরিয়া দাঁড়াইতে রাজী করেন

আমরা দেখিতেছি যে মুসলমানেরা ভোটারের লিষ্টে নাম দেখাইতে হিন্দু বা অ-মুসলমানদের ন্যায় তৎপর নহেন। ভোটের সময় মুসলমান নির্ব্বাচকেরা হিন্দু বা অ-মুসলমানদের ন্যায় অধিক সংখ্যায় হাজির হয়েন না। যাঁহারা নির্ব্বাচন পদ-প্রার্থী হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দাঁড়ান এবং নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি হইলেই সরিয়া দাঁড়ান। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হয়েন তাঁহারাও দেশ-সেবার পরিবর্ত্তে নিজ নিজ মত "অর্থের দ্বারা ক্রেয়" করিয়া দেশের ও দশের ক্ষতি করেন।

নূতন প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে প্রধান মন্ত্রী প্রণীত Communal Award অনুসারে বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে। ৮০ জন হিন্দু যদি প্রত্যেকেই স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় যোগ্য হয়েন, তাহা হইলেও কিছু করিতে পারিবেন না। কিন্তু মুসলমান সমাজের নেতাদের দেখা উচিত ও বুঝা উচিত যে তাঁহারা উপযুক্ত ও যোগ্য লোককে কাউন্সিলে পাঠাইতেছেন কিনা? কারণ অযোগ্য লোক পাঠাইলে তাঁহারা হিন্দুর ত ক্ষতি করিবেনই (এ বিষয়ে হিন্দুদের আশা করিবার কিছুই নাই) পরন্তু মুসলমানেরও ক্ষতি করিবেন। হিন্দু হইয়া আমরা একথা কেন বলিতেছি তাহার কৈফিয়ৎ প্রয়োজন। হিন্দুর ক্ষতির জন্য বাংলার জমীদারদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হিন্দু বলিয়া তাঁহারা চিরস্থায়ী রাজস্বের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু কচুরীপানা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবনের গবেষণার জন্য, পাছে হিন্দুর হাতে টাকা যায় বলিয়া, ব্যবস্থা না করিলে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান চাষীরই ক্ষতি অধিক, সঙ্গে সঙ্গে আমরা হিন্দুরাও মারা যাইব।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ মেক্সিকো উপসাগর হইতে খাড়া পূর্ব্বদিকে প্রায় পাঁচ ছ'শো মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন চমৎকার ধরণের নূতন যে অনেক

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: আদিম অধিবাসীর কুটির।

জায়গা বেড়াইয়া যাদের চোখের ও মনের নবীনতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁরাও মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী নয়, মানুষের হাতে গড়া এমন অনেক জিনিস এই দ্বীপগুলির এদিকে ওদিকে, বন-পাহাড়ের আড়ালে লুকানো আছে—যাহা অন্য কোথাও চোখে পড়ে না। এই সকল দ্বীপে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের সভ্যতা ও আবহাওয়া আজও অটুট আছে, বিংশ শতাব্দীর কোনো আলোকরেখা এখনও সেখানে পৌছায় নাই—আরও একটা সুবিধা এই যে আমেরিকার হঠাৎ বড়মানুষ ভ্রমণকারীর দল এসব জায়গায় যাইতে ভালবাসে না—কারণ ফ্যাসানের জগতে ইহারা একেবারেই অপাংক্তেয় হইয়া আছে।

থাকুক্—কিন্তু সারা পৃথিবী খুঁজিলে জ্যামেকা বা ট্রিনিডাডের মত অপরূপ সুন্দর স্থান মেলা দুর্ঘট। নীল আটলান্টিক যেদিকে চাও সেদিকে, কূল-সমীপবর্ত্তী কোনো অনুচ্চ শৈলমালার উপর দাঁড়াইয়া চারিধারে চাহিয়া থাকো—তোমার পিছনে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি শ্যামলা ও সর্ব্বসম্পদ-ভূষিতা—তোমার সামনে, ডাইনে, বামে—নীল, নীল, নীল—অনন্ত, অপার আটলান্টিক্, দক্ষিণে দক্ষিণমেরু, উত্তরে উত্তর-মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত—দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে মধ্যযুগের পাহাড়ের দুর্গ, প্রাসাদ, জেলখানা—পুরানো ধরণের রোমান্ ক্যাথলিক গির্জ্জা, মাঝে মাঝে, পাহাড়ের নীচে আঙুরের ক্ষেত, যবের ক্ষেত।

এখানে নানা ধরণের জাতি একত্র বাস করে। নিগ্রো আছে, বর্ণসঙ্কর কারিব্ আছে, ফরাসী আছে, ইংরেজ আছে কিন্তু বেশীর ভাগ আছে স্পেন দেশের লোক। যে সকল শ্বেতকায় জাতি এখানে বহুদিন হইতে বাস করিতেছে, তাহাদের ক্রিয়োল্ বলে—বর্ত্তমানে ইহাদের একমাত্র উপ-জীবিকা চাষবাস ও পশুপালন, কিন্তু ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এদেশে আসিয়াছিল বন্দুক ও বারুদের থলি লইয়া—যুদ্ধ ও নরহত্যাই ছিল তাহাদের প্রধান কাজ, লুণ্ঠন ছিল প্রধান উপজীবিকা, তাদের অধিকাংশই ছিল জলদস্যু—অতি নিষ্ঠুর ও দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির জলদস্যু। তাহার পর জলদস্যুর ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া বিভিন্ন জাতির লোক একত্রে বা পৃথক্‌ভাবে বিভিন্ন দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া শান্তিতে বাস করিবে বলিয়া ঘরসংসার পাতিল। কিন্তু শান্তিতে বাস করা সে সকল শতাব্দীর আবহাওয়ার উপযোগী ছিল না—এ বলিতেছি

উপরে—নেভিস: চার্লসটাউনের এক প্ল্যান্টারের পুরানো ষ্টাইলের বাড়ি। নীচে—গ্রেনাডার রাস্তা।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। তখন এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত—কখনও ব্রিটিশ রণতরী ফরাসী অধিকারভুক্ত দ্বীপে হানা

দিত, কখনও ফরাসীরা চড়াও হইত ইংরেজাধিকৃত দ্বীপগুলির উপর। মাঝে মাঝে অসভ্য কারিব্ ইণ্ডিয়ান্‌রা নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলি হইতে লুণ্ঠন ও হত্যার জন্য দলবলসহ আসিত।

এ ছাড়া আরও বিপদ ছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যত অপরাধী—দস্যু, হত্যাকারী, জুয়াচোর—যত বর্ব্বর প্রকৃতির লোক দেশের আইন ভঙ্গ করিত—এই সকল দ্বীপে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করার প্রথা ছিল। বহুদিন ধরিয়া এগুলি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে কঠিন অপরাধের দণ্ডে নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদের শাস্তি-ভূমি ছিল—এবং থাকার ফলে এই সকল দ্বীপের সাধারণ অধিবাসীরা ভয়ে ভয়ে কাটাইত—কারণ ঐ বদ্‌মাইসের দল এখানে আসিয়াও প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

নিগ্রো ছোক্‌রারা টাকা তুলিতে জলে লাফাইয়া পড়িতেছে।

রাজনৈতিক অপরাধীদিগকেও এখানে নির্ব্বাসিত করা হইত। সেজমুরের যুদ্ধের পরে পরাজিত ও বিধ্বস্ত মন্‌মৌথের পক্ষের সেনানায়ক ও পরামর্শদাতাদিগকে এখানে পাঠানো হইয়াছিল, ক্রম্‌ওয়েলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী আইরিস্ ও ১৭১৫ ও ১৭৪৫ সালের জ্যাকোবাইট্ বিদ্রোহের স্কচ্ হাইল্যাণ্ডার্ নেতাদিগকেও এখানে চিরনির্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছিল।

এইসব হতভাগ্যদের কষ্টের অবধি ছিল না। এখানে নির্ব্বাসনের অপেক্ষা মৃত্যুদণ্ড তাহাদের অধিকতর কাম্য ছিল। জীবিকানির্ব্বাহের কোনো উপায়ই তখন এখানে ছিল না। কোনোরকমে মাছ ধরিয়া, শক্ত পাথুরে মাটী কোপাইয়া অল্প-সল্প ফসলের চাষ করিয়া বেচারীরা কোনোরকমে দিন গুজ্‌রাণ করিত। অকূল, অজানা মহাসাগরবেষ্টিত এই সব অরণ্য-সঙ্কুল দ্বীপ হইতে পলায়ন করা তো ছিল একেবারেই স্বপ্নাতীত। সভ্যদেশ হইতে আসিয়া আদিম বর্ব্বর জাতির মত জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়া দিনকতক পরে তাহারাও
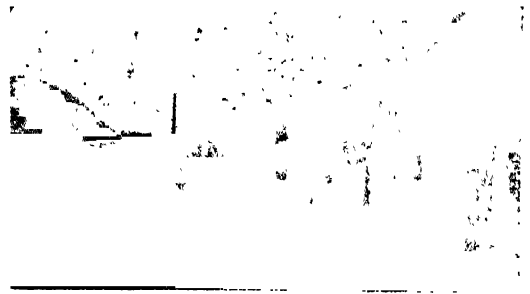
ডমিনিকা : রোসোর কয়েকটি পুরানো বাড়ি।

বর্ব্বর হইয়া পড়িত—চোর, ডাকাত, খুনীদের সঙ্গে একত্র সহবাসের ফলে দু' চারজন ভাল লোক যাহারা আসিত তাহারাও নিষ্ঠুর, হীনপ্রকৃতির হইয়া উঠিত। এদিকে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতার দরুণ তাহারা স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য হইত—নানাভাবে, নানাদিক হইতে এই সকল হতভাগ্য নির্ব্বাসিতের দল সভ্যতার স্তর হইতে ধাপে ধাপে নামিয়া এক ধরণের অদ্ভুত প্রকৃতির বর্ণসঙ্কর জাতিতে পরিণত হইতেছিল।

কালক্রমে এখানে বিস্তৃত ইক্ষুক্ষেত্র স্থাপিত হইল। বড় বড় চিনির কল গড়িয়া উঠিল এবং এই সকল আমের ক্ষেত ও চিনির কলে কাজ করিবার জন্য ইউরোপ হইতে পরিশ্রমী, দরিদ্র অথচ সৎলোকের আমদানী হইতে লাগিল—কিন্তু এ

গ্রেনাডা : হাট।

অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হইল না। আমের ক্ষেতের কুলীদের মজুরী এত সামান্য যে তাহাতে ইউরোপের অতি দরিদ্র লোকেরও কুলিগিরির স্পৃহা লোপ পাইল। স্থানীয় কৃষ্ণকায়

অধিবাসীদের সংখ্যাও খুব বেশী নহে, সুতরাং বাধ্য হইয়া এশিয়ার দেশসমূহ হইতে কুলী আমদানীর প্রয়োজন হইল। প্রথমে চীনা, পরে জাপানী, মালয় এবং সর্ব্বশেষে ভারতীয়

বার্বাডোস: নিগ্রো পল্লী।

কুলী দলে দলে আসিতে সুরু করিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বর্ত্তমানে চীনা ও জাপানী কুলীর দল এইস্থান হইতে হটিয়া গিয়াছে—এখন আছে শুধু মালয় ও ভারতীয় কুলীর দল।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের জ্যাকোবাইট্‌ বিদ্রোহের সঙ্গে যাহাদের যোগ ছিল, তাহারা এখানে নেভিস্‌ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে নির্ব্বাসিত হয়। নেভিস্‌ দ্বীপের অবস্থা এক সময় খুব ভাল ছিল—এখানে একপ্রকার খনিজ জল পাওয়া যাইত -যাহা পান করিতে সুদূর ইটালী হইতেও স্বাস্থ্যান্বেষী ধনীর দল আসিয়া ছমাস ছমাস কাটাইয়া যাইত। তখন এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতির দিন ছিল। আশপাশের দ্বীপ-গুলি হইতে অবস্থাপন্ন ইক্ষুক্ষেত্রের মালিক বা বণিকের দলও আসিত ছুটীতে আমোদপ্রমোদ করিতে—তখন এখানে ভাল ভাল পান্থনিবাস ছিল, থিয়েটার ছিল, ভাল সৌখীন জিনিসের দোকান ও মদের দোকান ছিল।

এই নেভিস্‌ দ্বীপে একটি কৌতূহলপ্রদ ঘটনা ঘটে। নেলসন একবার এখানে রণতরীবহরের অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়া মিসেস্‌ নিসবেট্‌ নামে একটি সুন্দরী বিধবার প্রেমে পড়িয়া যান—নেভিস্‌ সহরের (নেভিস্‌ দ্বীপের রাজধানী) প্রাচীন গির্জ্জাতে এখনও একখানা অতি পুরানো, কীটদষ্ট খাতা ভ্রমণকারীদিগকে দেখানো হইয়া থাকে—যাহাতে নেলসন ও মিসেস্‌ নিস্‌বেটের বিবাহের দলিল লিপিবদ্ধ আছে—এবং এ বিবাহে প্রধান বরযাত্র ছিলেন প্রিন্স উইলিয়ম হেন্‌রী—যিনি পরে চতুর্থ উইলিয়ম নামে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।

এখন নেভিস্‌ দ্বীপের পূর্ব্ব গৌরব আর নাই। খনিজ জল আছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য লোকের সে পুরাতন স্পৃহা নাই। বন্দর হতশ্রী, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িতেছে, লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। নির্ব্বাসিত বিদ্রোহীদের বর্ত্তমান বংশধরগণের অবস্থা এত খারাপ যে তাহারা এ দ্বীপ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না। কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সংখ্যা এদিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মঁপেলিয়ে—যেখানে নেলসনের সহিত মিসেস্‌ নিস্‌বেটের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এখন চূর্ণায়মান ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

মানচিত্রের জন্মকথা

যখন পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও মানুষে পৃথিবীর যতটুকু জানিত, তাহার নক্সা আঁকিত। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও মানচিত্র আঁকিবার কৌশল জানা ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীরা এখনও বাঁশের উপরে দেশের ম্যাপ আঁকিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে সমুদ্রের কড়ি বা ঝিনুক বসাইয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপের অবস্থান-স্থান জ্ঞাপন করে।

কর্টেজ্‌ যখন মেক্সিকো বিজয়ে গিয়াছিলেন সেখানকার রাজা কর্টেজ্‌কে কাপড়ের উপর লাল গিরিমাটি দিয়া আঁকা

আন্টিগুয়া: নেলসনের সময়কার কয়েকটি কামান।

একখানা মেক্সিকো উপসাগরের প্রাচীন ম্যাপ দেখান। পেরু-বিজয়ের ইতিহাসলেখক পেড্রো ডি গামবোয়া লিখিয়াছেন—পেরুর ইঙ্কাগণ ম্যাপ অঙ্কন বিষয়ে অত্যন্ত

উৎসাহ দিতেন—সে সময়ে পেরুতে উচ্চাবচভূমিপ্রদর্শক মানচিত্রও প্রস্তুত হইত।

নেভিসের গর্ব্ব ঃ একটি পর্ব্বতচূড়া।

টুরিন্ মিউজিয়মে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মানচিত্র রক্ষিত আছে। ইহা প্যাপিরাসের উপর আঁকা এবং নিউবিয়ান্ মরুভূমির মধ্যে কোথায় সোনার খনি আছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। এই ম্যাপের কথা লইয়া অনেক কাল্পনিক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী লেখা হইয়া গিয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতকে মিশরের রাজা দ্বিতীয় রামেসেস্ নিজের রাজ্যের মানচিত্র তৈরী করান। টুরিন্ মিউজিয়ামে এই মানচিত্রের ছিন্নাংশ রক্ষিত আছে। ফ্যারাও দ্বিতীয় সেটির সময়ের আর একখানা ম্যাপ এই মিউজিয়মে আছে, তাহাতে নীল নদের গতি ও হিরুপোলিস নগরের পথ দেখানো হইয়াছে।

ইরাকের মুর্জি শহরে আবিষ্কৃত বহু প্রাচীন কাদায় তৈয়ারি মানচিত্র।

মানচিত্র কোনো একটি বিশেষ জাতির দ্বারা উদ্ভূত হয় নাই—পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য জাতিরই ইহাতে কিছু কিছু হাত আছে। এরিষ্টাগোরস্ যখন স্পার্টার রাজাকে পারস্য দেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন—সে সময় তিনি রাজাকে একখানি পিতলের ফলক দেখান, ঐ ফলকের উপর সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র খোদিত ছিল। সম্প্রতি ইরাকের মরুভূমিতে ঐ জাতীয় একখানি ব্রোঞ্জ্ ফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দশ শতকের পৃথিবী অঙ্কিত আছে—উহাতে দেখানো হইয়াছে পৃথিবীর চেহারা একখানা গোলাকার চাকৃতির মত, চারিদিকে জল, কেন্দ্রস্থানে ব্যাবিলন।

ঠিকমত পৃথিবীর ম্যাপ আঁকিবার আদর্শ গ্রীক্‌জাতিই প্রথমে বাহির করে। এরাটোস্থেনিস্ ও আলেকজান্ড্রিয়া গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ এরাটোস্থেনিস্ প্রথমে কল্পনা করেন যে পৃথিবী গোলাকার এবং তাঁহাদের চেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মানচিত্র আঁকিবার উপায় বাহির হয়।

তখন নীলনদের তীরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র মাপিবার জন্য মিসর দেশীয় আমিনগণ একপ্রকার প্রণালী অনুসরণ করিত, তাহাদের যন্ত্রাদিও ছিল অসম্পূর্ণ ও নিতান্তই সেকেলে—ঐগুলির সাহায্যে তাহারা সূর্য্য ও নক্ষত্রদিগের অবস্থানস্থানের বিন্দুনির্ণয় করিত। এরাটোস্থেনিস্ ঐ প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্তন করেন—অক্ষ ও দ্রাঘিমা-রেখার কল্পনা তিনিই বোধ হয় প্রথম বরেন।
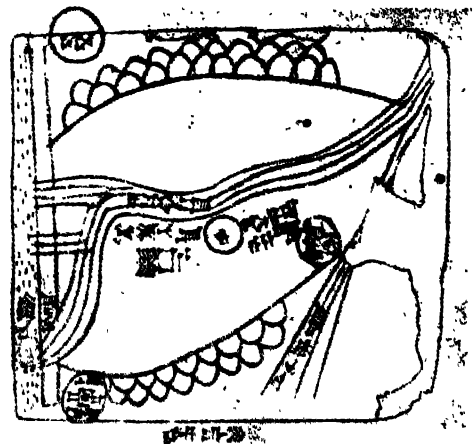
প্রাচীন কালের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ম্যাপ হইতেছে

টলেমির। ক্লডিয়স্ টলেমি আট খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিরাট ভূগোলের লেখক—এবং ঐ গ্রন্থের মধ্যে তিনি পৃথিবীর

ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্র : ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত আব্রাহাম অর্টেলিয়সের একখানি পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এখানে ওখানে সমুদ্রে ড্রাগন ইত্যাদির ছবি উঠাইয়া লইলেই বর্ত্তমানের মানচিত্রের জন্মকথা স্পষ্ট হইবে।

অনেকগুলি মানচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ম্যাপগুলি অধিকাংশই তাঁর মনগড়া—কিন্তু এরাটোস্থেনিসের প্রদর্শিত প্রণালী অনুসরণে অঙ্কিত। আনুমানিক ১৫০খৃষ্টাব্দে টলেমির ভূগোল লিখিত হয়।

মধ্যযুগে টলেমির ভূগোল হারাইয়া গিয়াছিল—বহু বৎসর ধরিয়া কোথাও আর ভূগোলের পঠন-পাঠন হইত না—কিন্তু পরে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে আবার টলেমির যুগ ফিরিয়া আসে। গ্রীসদেশে টলেমির ভূগোলের প্রাচীনতম পুঁথি আবিষ্কৃত হয়—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উহা হইতে নকল করা একখানা পুঁথি আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল—বর্ত্তমানে সেখানি ওয়াশিংটন সহরে কংগ্রেসের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। টলেমির ভূগোলে পৃথিবীর ছাব্বিশটি দেশের এবং একখানি মাত্র ভূমণ্ডলের মানচিত্র আছে।

টলেমিই ভূগোলবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থেও মানচিত্রে বহু ভুল থাকিতে পারে এবং আছেও—কিন্তু তিনি যে জনসাধারণের কৌতূহল কতকটা এ পথে ধাবিত করাইয়াছিলেন এবং তিনি যে ইউরোপে ভূগোল-বিজ্ঞানের আদি গুরু, এ বিষয়ে কোনোও ভুল নাই। তবে তাঁহার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে তিনি দূরবর্ত্তী দেশের বিষয়ে যাহার মুখে যাহা শুনিতেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ফলে নানা হাস্যকর ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছে।

গ্রীক ব্যবসায়ীদের চেষ্টার ফলে টলেমির আমলে উত্তরে শেট্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং ইংলণ্ডের আয়তন ও আকৃতি টলেমির অপরিচিত ছিল না, বিষুবরেখার নিম্নস্থ কোন দেশ ভাল জানা ছিল না। কিন্তু ভারত মহাসাগরের মানচিত্র নির্ভুলভাবে আঁকা হইত, কারণ রেশম ব্যবসায়ীদের জন্য ভারতবর্ষ গ্রীস্ ও রোমে অপরিচিত ছিল না। প্লিনি ও সেনেকার গ্রন্থে পাওয়া যায় যে রোমানদের সময়ে বিভিন্ন দেশের ম্যাপ অঙ্কিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ কোনও ম্যাপ পাওয়া যায় না। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে কল্‌মার নামে জনৈক সন্ন্যাসীর অঙ্কিত রাস্তার ম্যাপ ভিয়েনা লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। এই ম্যাপে গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থান হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত একটি কাল্পনিক সুবৃহৎ রাজপথ অঙ্কিত আছে। এখানি দৈর্ঘ্যে আঠার ফিট এবং প্রস্থে এক ফুট।
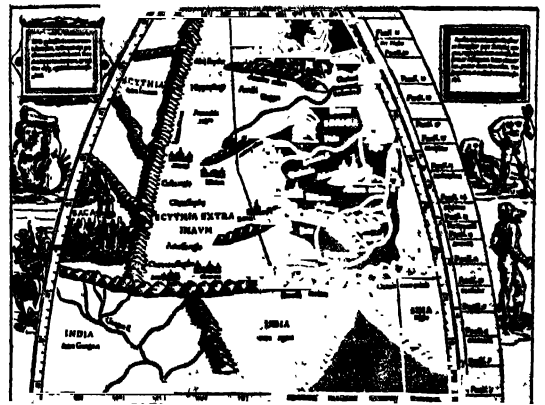
আর একখানি প্রাচীন মানচিত্র : ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে টলেমি আটলাসের সহিত প্রকাশিত। নীচের দিকে ভারতবর্ষ, INDIAও দেখা যায়। এদিকে-ওদিকে দৈত্যদানব ও নানাবিধ জন্তুজানোয়ার দ্রষ্টব্য।

এই ম্যাপটি চারভাগে বিভক্ত; বিশেষ করিয়া ইহাতে রোমান সাম্রাজ্য ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য জাতির দেশ

প্রদর্শিত হইয়াছে। রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপথগুলি লাল রঙে চিত্রিত আছে; কিন্তু বড় বড় সহর ও গ্রামগুলি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অঙ্কিত নয়। এই সব সহরের বাড়ি-ঘরদোর, গাছপালা, গির্জ্জা, মস্‌জিদ সবই আঁকিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রোম, য়্যান্টিওক্‌ ও আলেকজান্দ্রিয়া এই তিনটি সহরই খুব বড় স্কেলে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কনষ্টান্টিনোপল যে রাজধানী ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ সহরের মধ্যস্থ এক উচ্চ পর্ব্বতে একটি সিংহাসন স্থাপিত আছে। বর্ত্তমান জার্ম্মেনী তখন ঘোর অরণ্যসঙ্কুল ছিল; কারণ এই ম্যাপে ঐ সব স্থানে বহু সংখ্যক গাছের ছবি দেখা যায়।

ক্রুজেডের সময় ইয়োরোপের নানা স্থান হইতে সৈন্যদল জেরুসালেমে যাইত। ইহাদের সুবিধার জন্য ম্যাথুপ্যারিস নামে জনৈক খৃষ্টান সন্ন্যাসী ইয়োরোপ হইতে এসিয়ামাইনরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি নির্দ্দেশ করিয়া একখানি ম্যাপ অঙ্কিত করেন। বর্ত্তমানে ইহা বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই ম্যাপের এককোণে আদম, ইভ ও সর্পের ছবি অঙ্কিত দেখা যায়।

ভূগোল বিজ্ঞান আরবজাতির নিকট যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতকে সমগ্র ইউরোপ ও খ্রীষ্টান জগৎ যখন ঘোর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, আরবজাতীয় ব্যবসায়ীগণ তখন জাহাজে দূর সমুদ্রে পাড়ি দিত, তখনই তাহারা কম্পাসের ব্যবহার জানিত এবং সমুদ্রপথের কতকটা নির্ভুল ম্যাপ আঁকিতে শিখিয়াছিল।' খলিফাদের শাসনকালে বাগদাদ সহর সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, খলিফা আল্‌ মামুনের যত্নে টলেমি ও ও আরিষ্টটলের গ্রন্থ আরবীভাষায় অনূদিত হয়; উচ্চতর ভূগোল-বিজ্ঞানে টলেমিই আরবদের পথপ্রদর্শক।

খলিফা আল্‌ মামুনের সময়ে ইব্‌ন্‌ খোরদাদবে নামে একজন লেখক ও ভ্রমণকারী কয়েকখানি ভূগোলের গ্রন্থ লেখেন। ঐ সব বইয়ে তিনি আড়াইশো হাত লম্বা তিমি মাছ ও হাতী গিলিয়া খাইতে পারে এমন অতিকায় অজগর সর্পের উল্লেখ করিয়াছেন। তখনকার আমলে লোকে বিজ্ঞান ও রূপকথার তফাৎ করিতে পারিত না। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বাতিঘরে তিনি নাকি এমন একখানি বড় আয়না দেখিয়াছিলেন। যেখানির মধ্যে দেখিলে কনষ্টান্টিনোপলে কি ঘটনা ঘটিতেছে সব দেখা যাইত। এ সব অতিরঞ্জিত ব্যাপার লেখা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন বিষয়ে খোরদাদবে ও মাসুদীর দান যথেষ্ট মূল্যবান। ইঁহারাই প্রথমে বাণিজ্যপথ, জলবায়ু ও দেশের সীমানা প্রভৃতি ম্যাপে প্রদর্শন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

ভৌগলিক জগতে এই মানচিত্র যুগান্তর আনয়ন করে (১৫০৭ খৃষ্টাব্দে) এই মানচিত্রে আমেরিকা প্রথম লক্ষিত হয়। বাম পার্শ্বে তীরাঙ্কিত স্থান দ্রষ্টব্য।

ভারতের জাতীয় ঋণ

—শ্রীধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিলাতে ও ভারতের রাজনৈতিক মহলে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় শাসন-যন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তনের আলোচনা চলিয়াছে। বিলাতের পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বাধীন বর্ত্তমান স্বৈরাচারী গভর্ণমেন্টের স্থলে এদেশে জনসাধারণের প্রতিনিধি-মূলক এক দায়িত্বপূর্ণ শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়—ইহাই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দাবী। এই দাবী পূরণ হইলে আমাদের যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টি হইবে তাহার পক্ষে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান শাসক সম্প্রদায় কি কি দায় ও সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছেন, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হওয়া সমীচীন। এই কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ সরকারের আমলে এদেশের রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যাবলী এবং 'তথাকথিত' জাতীয় ঋণ সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের পর কংগ্রেস কর্ত্তৃক একটি তদন্ত-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত ঋণ সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশ পরস্পর ন্যায়ত কি কি বিষয়ে কতটা পরিমাণে দায়ী থাকিবে, তাহাও ছিল তদন্ত-সমিতির বিবেচনার বিষয়। শ্রীযুক্ত ডি. এন্. বাহাদুরজী, কুশলাল টি. সা; ভুলাভাই জে. দেশাই এবং জে. সি. কুমারাপ্পা এই চারিজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাহাদুরজী এবং দেশাই দুই জনই ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব এ্যাড্ভোকেট্ জেনারেল। আলোচ্য বিষয় যথা-বিহিত তদন্তপূর্ব্বক এই সমিতি ১৯৩১ সালে ৬ই জুলাই তারিখে একখানি সারগর্ভ প্রতিবেদন (report) প্রকাশ করেন। লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে এই প্রতিবেদনখানির প্রতি বৈঠকের সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই 'জাতীয় ঋণ' সম্পর্কে আমাদের দিক্‌কার প্রধান কথা হইতেছে এই যে, এপর্য্যন্ত ঋণভার ক্রমঃবৃদ্ধির ব্যাপারে ভারতের জনমত সরকার কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এখানকার প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্রের ক্রমঃবিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই, ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। এই সম্বন্ধে স্যর জর্জ্জ উইন্‌গেট্ সাহেব ৭০ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

> অবিসংবাদী ঘটনাপরম্পরা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, ভারত সরকারের নামে এদেশে যে শাসন পরিচালিত হইতেছে, তাহার প্রকৃত দায়িত্ব বৃটিশ জাতির। ইংরেজ সরকারের আমলে ভারতবর্ষে স্বাধীন শাসন তন্ত্র কিংবা জাতীয় গভর্ণমেণ্টের আভাষ মাত্রও কখনও ছিল না। বিলাতের বিভিন্ন গভর্ণমেন্টের ইচ্ছানুযায়ী পরাধীন দেশ হিসাবেই ভারতবর্ষ এযাবত শাসিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতের দেনা প্রকৃত পক্ষে বিলাতের সরকারই করিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি করিয়া ইংরেজ এই ভারতীয় ঋণের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে? ন্যায় ও সততার দিক দিয়া বিলাত স্বীয় গভর্ণমেন্টের ঋণের জন্য যেমন দায়ী, ভারত সরকার কৃত ঋণের জন্যও তেমনি সমভাবে দায়ী।

সে যাহা হউক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকৃত ঋণের কারণ সমূহ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বৈদেশিক যুদ্ধের ব্যয় ইহাদের অন্যতম। কোম্পানীর আমলে আফগান যুদ্ধ, দুইবার ব্রহ্মযুদ্ধ এবং নেপাল, চীন ও পারস্য প্রভৃতি দেশে সামরিক অভিযানে ব্যয় হইয়াছিল মোট ৩॥০ তিন কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৫ কোটী টাকা। কিন্তু এইরূপ বৈদেশিক যুদ্ধের ব্যয়ে ভারতীয় রাজস্ব ভারাক্রান্ত করিবার মোটেই কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। এইরূপ অসঙ্গত ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া স্যর জর্জ্জ উইন্‌গেট সাহেব পুনরায় বলেন—

> এশিয়া মহাদেশে বৈদেশিক শক্তির সহিত আমাদের প্রত্যেকটি যুদ্ধ ভারতীয় অর্থসাহায্যে পরিচালিত হইয়াছে। বিলাতের স্বার্থ সাধনই ছিল এই সকল যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষ উপলক্ষ মাত্র। * * * কাজেই ইহাতে যে দায়ভার জন্মিয়াছে তাহার জন্য ইংরেজ জাতি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী * * * প্রকৃতপক্ষে এশিয়া ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি যুদ্ধেই ভারতবর্ষের অর্থ ও সৈন্যবল নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু এই সাহায্যের প্রতিদান কোন ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং আমাদের ভারত-শাসন-নীতি কিরূপ পক্ষপাতমূলক এবং স্বার্থজড়িত, ইহাই তাহার প্রকৃত প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৭।৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করিতে যে ৪০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহাও আমাদের দেশের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে। বিদ্রোহদমনের উদ্দেশ্যে

বিলাত হইতে যে গোরাসৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল ভারত অভিমুখে রওনা হইবার ছয় মাস পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের বেতন আমাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে। অথচ বৃটিশ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বিদ্রোহদমনের উদ্দেশ্য, সুতরাং এই ব্যয়ভার সর্ব্বতোভাবে বিলাতেরই বহন করা উচিত ছিল। তাই ১৮৫৯ সালে জন ব্রাইট সাহেব এই প্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় বলেন :—

> আমার মনে হয় বিদ্রোহদমনের জন্য যে ৪ কোটী পাউণ্ড (অর্থাৎ ৪০ কোটী টাকা) খরচ হইয়াছে, ভারতের জনসাধারণের উপর উহার ভার অতি মাত্রায় দুঃসহ। সিপাহী-বিদ্রোহ বৃটিশ জাতি ও পার্লামেন্টের কুশাসনের ফলস্বরূপ। সুতরাং ন্যায়-বিচারের কোনরূপ মর্য্যাদা থাকিলে ইংরেজ জনসাধারণ প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে যে এই ৪ কোটী পাউণ্ড ব্যয় বহন করা উচিত ছিল, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

১৮৭২ সালে তদানীন্তন ভারত-সচিবও উপরোক্ত মতের পোষকতা করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

> সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজশাসিত ভারতে এক অভাবনীয় ঘটনা। প্রাচ্যে এই একটিবার মাত্র সাম্রাজ্য ধ্বংসের আশঙ্কায় উহা রক্ষাকল্পে ইংরেজ সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্য কোন অংশে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইলে, ইংরেজ সরকার নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না ; আর সেই চেষ্টার অধিকাংশ ব্যয় তাঁহাদেরই বহন করিতে হইত। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহ দমনের কোনও খরচের জন্য বিলাতের রাজকোষে হাত পড়ে নাই, ভারতীয় করদাতাগণ সেই ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করিয়াছে কিংবা করিয়া আসিতেছে।

অথচ দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ উপনিবেশে অনুরূপ অবস্থার মধ্যে ট্রান্স্‌ভাল দেশ যখন অধিকৃত হইয়াছিল, তখন তত্রত্য অধিবাসীগণকে বুয়ার যুদ্ধের ব্যয় মোটেই বহন করিতে হয় নাই, বরঞ্চ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংলণ্ড বুয়ারদিগকে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছিল। ১৮৩৮ হইতে ৪৩ সন পর্য্যন্ত কানাডাতে যে বিদ্রোহ হইয়াছিল, বিলাতের রাজস্ব হইতেই তাহা দমনের খরচ নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

অতঃপর কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারত-শাসনভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে ১৮৩৩ সালে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহাই ভারতের 'জাতীয় ঋণ'এর তৃতীয় কারণ। এই বন্দোবস্ত অনুসারে স্থির হইয়াছিল, ইতিমধ্যে কোনও বিশেষ কারণ না ঘটিলে—১৮৭৪ সনের পর যে কোনও সময় কোম্পানীর মূলধন পরিশোধ বাবদ দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করিয়া ইংরেজ সরকার কোম্পানীকে ভারত সাম্রাজ্যের মালিকানী ও শাসন-ভার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন যে পর্য্যন্ত এই অর্থ পরিশোধ না হয়, ততদিন কোম্পানীর মূলধনের উপর বার্ষিক শতকরা ১২॥০ হারে সুদ ভারতের রাজস্ব হইতে কোম্পানীকে প্রদান করিতে হইবে। এই যুক্তি অনুযায়ী শুধু মূলধনের জন্যই মোট ১'২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১২ কোটি টাকা কোম্পানীর পাওনা হয়, আর ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত পাওনা সুদের পরিমাণ হইয়াছিল ২৫'২০ কোটী টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোম্পানীর আমলে উপরোক্ত ত্রিবিধ কারণে ভারতের রাজস্ব নিম্নলিখিত ভাবে দায়গ্রস্ত হইয়াছিল :—

১। বৈদেশিক যুদ্ধ-ব্যয় :—

আফগান যুদ্ধ	১৫ কোটী টাকা	
ব্রহ্ম যুদ্ধ	১৪ " "	
চীন পারস্য প্রভৃতি দেশে সামরিক অভিযান	৬ " "	৩৫ কোটী টাকা

২। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের খরচ :—৪০ " "

৩। কোম্পানীর মূলধন ও সুদ পরিশোধ বাবদ

মূলধন পরিশোধ	১২ কোটী টাকা	
১৮৩৩ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত সুদ প্রদান বাবদ	২৫ ২০ "	৩৭.২০
মোট		১১২'২০ কোটী টাকা।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে বিগত ৭৩ বৎসর কাল ভারত সরকার কর্ত্তৃক যে পরিমাণ ঋণ স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১১১৩'০৭ কোটী টাকা। এই ঋণ বিলাত ও ভারত উভয় দেশেই সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৩০-৩১ সনে 'কণ্ট্রোলার অব কারেন্সি' কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিবরণ হইতে বর্ত্তমান ঋণের পরিমাণ নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত হইল :—

১৯৩১ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত

(ক) ভারতবর্ষে সংগৃহীত ঋণ

১। সাময়িক ও অল্পকালস্থায়ী ঋণ (Floating and Unfunded debts)

		কোটী টাকা	কোটী টাকা
(ক)	ট্রেজারী হুণ্ডি (Treasury Bills)	৬০·৬২	
(খ)	ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ (Ways and Means Advances)	১·০০	
(গ)	ক্যাস্ সার্টিফিকেট্ (Cash Certificate)	৩৭·৬০	
(ঘ)	সেভিং ব্যাঙ্ক (Savings Bank Deposit)	৩৫·৭০	
(ঙ)	প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ড ও অন্যান্য ঋণ (Provident Fund etc)	৬৭·৪৫	২·৩৭
২।	দীর্ঘ কাল স্থায়ী ঋণ (Funded Debt)		
(ক)	মেয়াদী ঋণ (Terminable Loan)	২৮৯·০৭	
(খ)	বে-মেয়াদী ঋণ (Nonterminable Loan)	১২৫·৫২	
(গ)	রেলপথের জন্য ঋণ (Railway Loan)	২·৯৭	
(ঘ)	বিনা সুদী ঋণ (Not bearing interest	·৬৮	
			৪১৮·২৪
		মোট	৬২০·৬১ কোটী

(খ) ইংলণ্ডে সংগৃহীত ঋণ মিলিয়ন পাউণ্ড

১৯৩১ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঋণের পরিমাণ	২৯২০০৭	কোটী টাকা
(অথবা টাকাপ্রতি ৬ শি. ৬ পে. হিসাবে)		৩৯০·২৬
১৯৩০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যুদ্ধে দান	১৬০১৩	
রেলপথের জন্য বাৎসরিক বৃত্তি (Railway Annuity)	৫১·৮৬	
'ইণ্ডিয়া হুণ্ডি' (India Bill)	৬·০০	
প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ড্ (Provident Fund)	২ ৬৬	
মোট …	৭৬·৬৫	
(অথবা টাকাপ্রতি ১ শিলিং ৬ পেন্স্ হিসাবে)		১০২ ২০
মোট ·		১১১৩·০৭

উপরের তালিকায় প্রকাশ যে এদেশের মোট 'জাতীয় ঋণ'-এর মধ্যে ৬২০·৬১ কোটী টাকা ভারতবর্ষে এবং ৪৯২·৪৬ কোটী টাকা বিলাতে সংগৃহীত। কিন্তু এই ঋণের অর্থ-ব্যয়ে গভর্ণমেন্টের কোনও মূল্যবান সম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়াছে কিনা, এই সূত্রে ভারতীয় ঋণ 'লাভজনক' ও 'লাভহীন' এই দুই শ্রেণীতে সাধারণতঃ বিবেচিত হইয়া থাকে। রেলপথ, সেচ্ বিভাগ (Irrigation Department) প্রভৃতিতে ঋণের যে অর্থনিয়োগ হইয়াছে, তাহা হইতে উক্ত ঋণ পরিশোধ বা উহার সুদপ্রদানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আয় প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। কাজেই এই 'জাতীয় ঋণ'কে 'লাভজনক' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সরকারের শাসন বিভাগের ব্যয়বহনের নিমিত্ত সরকার যে ঋণ করেন, তাহা নিছক ব্যয় মাত্র; কাজেই উহা সরকারের 'লাভহীন' ঋণ বলিয়া ধরা হয়। সরকারী বিবরণে প্রকাশিত 'লাভজনক' ঋণের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সুদ আদায় হয় এমন সম্পত্তির বিবরণ	৩১শে মার্চ্চ ১৯৩০ কোটী টাকা
রেলপথের মূলধনের নিমিত্ত দাদন	৭৩১·৯০
ডাক ও তার প্রভৃতি সরকারী ব্যবসায়ে দাদন	২৩·০৫
সেচ্ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য প্রাদেশিক সরকার সমূহকে দাদন	১৪২·৪৫
দেশীয় রাজাসমূহকে দাদন এবং অন্যান্য সুদি দেনা	১৭·৫৭
	মোট—৯১৪·৯৭

কিন্তু কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটির মতে নিষ্ঠার সহিত হিসাব করিলে এই ৯১৫ কোটী টাকার মধ্যে ৮৫০ কোটী টাকার বেশী ঋণ প্রকৃতপক্ষে 'লাভজনক' বলিয়া ধরা চলে না। 'লাভহীন' ঋণের উৎপত্তি প্রধানতঃ বৈদেশিক যুদ্ধ; রাজস্ব ঘাটতি; দুর্ভিক্ষ এবং মুদ্রান্তবিনিময় নীতির অব্যবস্থা, এই চতুর্ব্বিধ কারণে হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যয়ই সর্ব্ব প্রধান। নিম্নলিখিত সামরিক অভিযান সমূহে আমাদের ব্যয় হইয়াছিল ৩৭·৫ কোটী টাকা :—

১৮৬৭	আবিসিনিয়া যুদ্ধ	৬,০০,০০০ পাউণ্ড
১৮৭৫	পেরাক অভিযান	৪১,০০০ ,,
১৮৭৮	দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ	১,৭৫,০০,০০০ ,,
১৮৮২	মিশর অভিযান	১২,০০,০০০ ,,
১৮৮২-৯২	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সামরিক ব্যয়	১,৩০,০০,০০০ ,,
১৮৮৬	ব্রহ্ম যুদ্ধ	৪৭,০৫,০০০ ,,
১৮৯৭	সৌকিন সুদান অভিযান	২,০০,০০০ ,,
		মোট ৩·৭২,৪৬,০০০ ,,

(অর্থাৎ প্রায় ৩৭,৫ কোটী টাকা)

এই সকল যুদ্ধের ব্যয় এদেশের স্কন্ধে চাপান যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন্ সাহেব "আবিসিনিয়া" যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান।

আমার মতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে স্বার্থ হইতে আবিসিনিয়া যুদ্ধের উৎপত্তি, তাহার সহিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপ ও আমেরিকার যোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ * * * প্রকৃত পক্ষে ভারতবাসিগণ 'আবিসিনিয়া' সম্বন্ধে কিছুই পরিজ্ঞাত নহে। পৃথিবীর অজানা দেশসমূহের মধ্যে ইহা একটি,—'আবিসিনিয়া' সম্বন্ধে তাহাদের এরূপ ধারণা * * * যে সকল ঘটনার ফলে এই যুদ্ধ সংঘটিত

হইয়াছিল তাহার সহিত ভারতবর্ষের যেমন কোন সংশ্রব ছিল না ; যুদ্ধের ফলাফলের সহিতও তেমনি সম্বন্ধ ছিল স্বল্প * * * * *

আমরা যে ভারতের অনুরূপ এই উপনিবেশ (অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা) দুইটীর নিকট যুদ্ধের ব্যয়বহনের দাবী করি নাই তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা বিশেষ জ্ঞাত ছিলাম উপনিবেশদ্বয় আমাদের এই জাতীয় প্রস্তাব ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখ্যান করিবে। তাহারা মুহূর্ত্তের জন্যও একথা শুনিবে না, কখনও শুনিবে কি ? অথচ ন্যায়ের মর্য্যাদা সহকারে আমি বলিতে বাধ্য যে ভারতবর্ষ ও উপনিবেশদ্বয়ের মধ্যে (এ বিষয়ে) কোনও পার্থক্য ছিল না।

এইভাবে ভারতবর্ষের রাজস্ব ক্রমেই ভারাক্রান্ত হইতেছে দেখিয়া, এমন কি, ভারত সরকারও ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত-রূপ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :—

এ দেশের (ভারতের) শাসনভার আমাদের উপর ন্যস্ত ; সুতরাং নিরর্থক ব্যয়ে ভারতীয় রাজস্ব ভারাক্রান্ত করিবার বর্ত্তমান রীতির বিরুদ্ধে পুনরায় তীব্র প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। ইংলণ্ডের কার্য্যে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যের ব্যয়ভার ভারতবর্ষের বহন করার রীতি ন্যায়ানুমোদিত নহে, কারণ ইংলণ্ড যে সর্ত্তে তদ্দেশীয় সৈন্য ভারতে প্রেরণ করে, এই রীতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই রীতি অসুবিধাকরও বটে : কারণ ইহার ফলে আমাদের গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এমন সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা হইবে, যাহার প্রতিবাদে কোনও সদুত্তর থাকিবে না।

সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে বিলাত হইতে যে সৈন্যদল ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় এদেশের বহন করিতে হইয়াছিল। অথচ ইংরেজের স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধবিগ্রহে যে সকল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে চাপান ন্যায়নিষ্ঠারই পরাকাষ্ঠা বটে! এদেশের পক্ষে এইরূপ ব্যয় যে কতটা নিরর্থক, বর্ত্তমানে ব্রহ্ম-দেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার যে প্রস্তাব চলিয়াছে, তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অথচ ব্রহ্ম-যুদ্ধের খরচ ছাড়া তথাকার শাসন ও রেলপথ বিস্তার প্রভৃতি উন্নতিমূলক কার্য্যে ভারতীয় রাজস্ব হইতে এযাবৎ প্রায় ৮০ কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ব্রহ্মবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের এই জাতীয় নিরর্থক ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ কে করিবে ?

কিন্তু বৈদেশিক যুদ্ধের কারণ ভারত-শোষণের এই খানেই শেষ নহে। সাম্রাজ্যলোলুপ ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বিগত ১৯১৪ সনে যে মহাযুদ্ধ প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহারও দায় ভারতবর্ষকে বহুল পরিমাণে বহন করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ, যুদ্ধারম্ভের একমাস যাইতে না যাইতেই ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার গঙ্গাধর রাও চিৎনবিশের প্রস্তাবক্রমে এদেশ হইতে ইউরোপে প্রেরিত সৈন্য-বাহিনীর ব্যয়ভার ভারত সরকার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। এই ব্যয়ের পরিমাণ তখন হিসাব করা হইয়াছিল বার্ষিক ১৷৷০ কোটী টাকা করিয়া পড়িবে। পুনরায় ১৯১৭ সনে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ভারতবর্ষ হইতে ১৫০ কোটী টাকা দানের এক প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। এই ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত সরকারের বার্ষিক যে রাজস্ব ছিল, এই দানের অর্থ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ। কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতেই এদেশ হইতে আরও ৬২৷৷০ কোটী টাকা দান মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধের অবসান হয়। কাজেই এই মঞ্জুরীকৃত দানের মধ্যে ৩৯ কোটী টাকার বেশী ব্যয়িত হয় নাই। এই ত' গেল অর্থসাহায্যের পরিমাণ। এখন দেখা যাক্ যুদ্ধ উপলক্ষে এদেশের সৈন্যসাহায্যের বহরটা ছিল কি প্রকার ? ১৯১৯ সালে লিখিত ভারতীয় জঙ্গীলাটের এক পত্রে এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

যুদ্ধারম্ভের সময় ভারতীয় সৈন্যবিভাগে ব্যবস্থাপিত সৈন্যদল (Reservists) সমেত যুধ্যমান-(Combatants)-দের সংখ্যা ছিল ১,৯৪,০০০। অতঃপর বিভিন্ন সামরিক বিভাগে ৭,৯১,০০০ জন নূতন সৈনিক ভর্ত্তির ফলে, যুদ্ধের সময় তাহাদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৯,৮৫,০০০। ইহাদের মধ্যে ৫,৫২,০০০ জন সৈনিক বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। অযুধ্যমান (Non-combatants) দের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০ ; যুদ্ধকালে ভর্ত্তি হয় আরও ৪,২৭,০০০ জন। ইহাদের মধ্যে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল ৩,৯৭,০০০ জন। সুতরাং যুদ্ধে ভারতের সৈন্যসাহায্যের মোট সংখ্যা ছিল ১৪,৫৭,০০০ জন। ইহাদের মধ্যে বিদেশে প্রেরিতের সংখ্যা ৯,৫৩,০০০। বিভিন্ন কারণে যে ৩৬,৬৯৬ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহাদের সমেত যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে মোট হতাহতের সংখ্যা ছিল ১,০৬,৫৯৪ জন। যুদ্ধে প্রেরিত ভারবাহী পশুর সংখ্যা মোট ১,৭৫,০০০।

নূতন নূতন সৈন্য ভর্ত্তি, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জামাদি জোগাড় এবং যুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর খরচ প্রভৃতি কারণে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে ব্যয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, নিম্নের তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইল :—

বৎসর	কোটী টাকা	বৎসর	কোটী টাকা
১৯১৪-১৫	৩০·৮০	১৯১৮-১৯	৬৬·৭২
১৯১৫-১৬	৩৩·৩৯	১৯১৯-২০	৮৬·৯৭
১৯১৬-১৭	৩৭·৪৮	১৯২০-২১	৮৭·৩৮
১৯১৭-১৮	৪৩·৫৬	১৯২১-২২	৬৯·৮১

উপরোক্ত হিসাবে ১৯১৪-১৫ সালের ব্যয় যদি এদেশের গড়পড়তা বার্ষিক সামরিক ব্যয় ধরা যায়, তবে উল্লিখিত হিসাব মত পরবর্ত্তী ছয় বৎসর যুদ্ধের কারণ আমাদের অতিরিক্ত সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ অন্যূনপক্ষে (৩৫৫·৫—৩০·৮০×৬) ১৭০·৭ কোটী টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। এই ব্যয় প্রকৃত পক্ষে ইউরোপীয় যুদ্ধের দায়; আমাদের দেশের পক্ষে এরূপ ব্যয়ভার হইতে নিষ্কৃতির দাবী একান্ত সঙ্গত, সুতরাং যুদ্ধে দান এবং অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় বাবদ যে (১৮৯ কোটী+১৭০·৭ কোটী) ৩৫৯·৭ কোটী টাকা ভারতীয় রাজস্ব হইতে অযথা ব্যয়িত হইয়াছে, কংগ্রেস তদন্ত-কমিটি সেই ক্ষতিপূরণের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত রাজস্ব সুপরিচালনের অভাবেও ঋণের উৎপত্তি হইয়াছে। যুদ্ধের পর পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারত সরকারের রাজস্বে ঘাটতি পড়িয়াছিল ৯৮·৩৪ কোটী টাকা। যদিও ১৯২০ সন হইতে প্রতি বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব করিলে ভারত সরকারের এ যাবত মোট ঘাটতির পরিমাণ ৩৩ কোটী টাকার কম হইবে না, এইরূপ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে স্বতঃই ঋণের আশ্রয় লইতে হয়। বলা বাহুল্য এদেশের শাসন-বিভাগে ব্যয়বাহুল্য এই ঘাটতির কারণ। এতদ্ভিন্ন ভারতের বাহিরে বিভিন্ন স্থানের শাসন-সংক্রান্ত ও অন্যবিধ দায় এ দেশকে অনেককাল ধরিয়াই অযথা বহন করিতে হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিলাতে 'ইণ্ডিয়া অফিস', পারস্য ও চীন দেশস্থ দূতনিবাসের খরচ এবং এডেন বন্দরের শাসনবিভাগীয় ব্যয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় ব্যয়ের নিমিত্ত এযাবতকাল ভারতীয় রাজস্ব প্রায় ২২ কোটী টাকা পরিমাণ দায়গ্রস্ত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুৎপীড়িতের অন্নসংস্থানের জন্যও সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ব্যয় হইয়াছিল সোয়াদশ ১০।০ কোটী টাকা এবং ১৮৯৯ সালে ১৭·০৮ কোটী টাকা। এতদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে "ফেমিন ইন্‌সিওরেন্স ফণ্ড" Famine Insurance Fund নামে যে অর্থ-ভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও আংশিক ভাবে দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশ প্রশমনের নিমিত্ত ব্যয়িত হইয়াছিল। সে যাহা হউক দুর্ভিক্ষজনিত ঋণের এই রূপ দায় পূরামাত্রায় স্বীকার করিয়া লইতে কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটি কোনরূপ কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই।

ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-নীতির অব্যবস্থা 'লাভহীন ঋণ'-এর চতুর্থ কারণ। এদেশের স্বার্থ ও জনমত উপেক্ষা করিয়া সরকার ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-নীতি পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। তখনকার দিনে বাজারে সোনার তুলনায় রূপার দর ক্রমাগত পড়িয়া যাওয়ায় ১৮৯৩ সনে ভারত সরকার টাকার দর বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে উহার অবাধ মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন, এবং বিলাতের পাউণ্ড প্রভৃতি স্বর্ণমুদ্রার সহিত টাকার বিনিময়ের হার উচ্চস্তরে নির্দ্দিষ্টভাবে বাঁধিয়া দেন। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে উচ্চহারে টাকার বিনিময় নিয়ন্ত্রণে আমাদের দেশের সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বিদেশী স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় 'টাকা'র দর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রথমতঃ আমাদের রপ্তানীকৃত পণ্যসম্ভারের মূল্য এদেশে টাকার অঙ্কে হ্রাস পাইয়াছে। কারণ দুনিয়ার বাজারে আমাদের রপ্তানীর মূল্য টাকার দরে না হইয়া, পাউণ্ড প্রভৃতি স্বর্ণমুদ্রায় ধার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু মূল্য বাবদ আমাদের প্রাপ্য 'টাকা'র অঙ্কে আমাদিগকে তাহা চুকাইয়া লইতে হয়। সোনার হিসাবে 'টাকা'র দর অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে বলিয়াই এই রূপ বিনিময় ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে টাকায় আমাদের পাউণ্ডের দাবী মিটাইয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, সোনার হিসাবে 'টাকা'র দর ১৬ পেন্স হইতে ১৮ পেন্সে বর্দ্ধিত হওয়ায়, পূর্ব্বে ১ এক পাউণ্ডের রপ্তানী করিয়া যে ক্ষেত্রে ১৫ টাকা পাইতে পারিতাম, এখন বর্ত্তমান বর্দ্ধিত হারে মাত্র ১৩।৴৫ পাইয়া থাকি। কাজেই প্রতি পাউণ্ড ভারতীয় রপ্তানী মালের দর টাকার অঙ্কে ১৷৵১৫ হ্রাস পাইল এবং সেই পরিমাণে আমাদের চাষীকুল ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, একই কারণে বিদেশী আমদানী পণ্য টাকার দরে সস্তা হইয়াছে, ইহার ফলে বিদেশীয়ের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, টাকার অবাধ মুদ্রণ বন্ধের ফলে 'টাকা'র মুদ্রা-মূল্য উহার রৌপ্য মূল্য হইতে অধিকতর ধার্য্য হওয়ায় জনসাধারণের সঞ্চিত রৌপ্যভাণ্ডারের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং তন্নিমিত্ত তাহাদের লোকসান হইয়াছে যথেষ্ট। এই জাতীয় লোকসানের পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নহে, কাজেই কংগ্রেস

তদন্ত-কমিটি এই বাবদ কোনও ক্ষতিপূরণের দাবী করেন নাই। কিন্তু বিপরীত অবস্থার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে 'টাকা'র বিনিময়-হার উচ্চস্তরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় ১৯২০ ২১ সন হইতে 'রিভার্স বিল' (Reverse Bill) বিক্রয় বাবদ এ দেশের রাজস্বের যে প্রায় ৩৫ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে, কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটি শুধু সেই ক্ষতিপূরণের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সুদসহ কোম্পানীর মূলধন পরিশোধ, বৈদেশিক যুদ্ধ ব্যয়, সিপাহী বিদ্রোহ দমন এবং বিনিময়ের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে ভারতীয় রাজস্বে ৬৪৬'৪০ কোটী টাকা পরিমাণ অপব্যয় হইয়াছে। এইরূপ 'লাভহীন' ঋণের দায় হইতে আমাদের মুক্তির দাবী যে একান্ত সঙ্গত সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

এই জাতীয় 'লাভহীন' অংশ ছাড়িয়া দিলে 'লাভজনক' ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১৫ কোটী টাকা, ইহার মধ্যে রেল-পথ বিভাগীয় ঋণের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বর্ত্তমানে এদেশে যে প্রায় ৪০ হাজার মাইল রেলপথ রহিয়াছে, ১৯২৯-৩০ সনের বিবরণে প্রকাশ, তাহার মূলধন ৮৫৬'৭৩ কোটী টাকা। তন্মধ্যে ঋণের পরিমাণ ৭৩১'৯০ কোটী টাকা। রেলপথে নিযুক্ত মূলধনের উপর ভারত সরকার বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ প্রদান করিবেন, এই প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া এদেশে রেলপথ নির্ম্মাণের ভার বিভিন্ন বিলাতি কোম্পানীর উপর অর্পিত হইয়াছিল। 'লাভদানীয় চুক্তিবদ্ধ' (guaranteed) এইরূপ কোম্পানীর সহিত এই জাতীয় চুক্তি দেশের পক্ষে ছিল সবিশেষ ক্ষতিকর। কারণ একে ত' সাধারণতঃ ঋণ অপেক্ষা চুক্তিকৃত সুদের হার ছিল অধিকতর, তা ছাড়া সুদ বনাম লাভ প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়াতে কোম্পানীগুলি ব্যয়-সঙ্কোচের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রেলপথে ক্রমেই অধিকতর মূলধন নিয়োগ করিতে লাগিল। তাই দেখা যায়, একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রেলপথে যেখানে মাইলপ্রতি ৪, ৫ কি ৯ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, কোম্পানীর ব্যয়ের পরিমাণ সেই ক্ষেত্রে ছিল ১৮ কি ২০ হাজার পাউণ্ড। আর যত অধিক অর্থ এই কোম্পানী কর্ত্তৃক এইভাবে অযথা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার বাবদ ভারতীয় রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর অধিক পরিমাণে সুদ যোগাইতে হইত। তাছাড়া ১৯০৯ সালের মধ্যে কোম্পানীর নির্ম্মিত এই রেলপথগুলি সরকার খরিদ করিয়া লন। বিভিন্ন রেলপথ খরিদের কালে উহাদের মূলধনের দর সবিশেষ চড়িয়া যায়। ইহাতে রেল-পথের মূলধন পরিশোধ বাবদ সরকারকে অন্যূনপক্ষে ৫০ কোটী টাকা রেলকোম্পানীগুলিকে বেশী প্রদান করিতে হয়। যাহারা চুক্তি-অনুযায়ী এযাবত সরকার হইতে ক্রমাগত শতকরা ৫৲ হারে সুদ পাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে সরকার হইতে চড়া দাম (premium) আদায় করবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। এতদ্ভিন্ন সামরিক প্রয়োজনে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ও এডেন বন্দরে ৩৩ কোটী টাকা ব্যয়ে যে সামরিক 'strategic' রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা হইতে এ যাবত কিছু লাভ ত' হয় নাই, বরং লোকসানই হইয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটি ভারতীয় রেলপথ সংক্রান্ত 'জাতীয় ঋণ' সম্পর্কে নিম্নরূপ ক্ষতি-পূরণের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন :—

সরকার কর্ত্তৃক রেলপথ খরিদ কালীন শতকরা ২০৲ হারে চড়া দাম (Premium) বাবদ	৫০ কোটী টাকা
সামরিক, Strategic রেলপথ নির্ম্মাণ বাবদ	৩৩ „ „
মোট	৮৩ কোটী টাক

'লাভজনক' ঋণের ১২৩'০১ কোটী বিভিন্ন প্রদেশে সেচ্ (Irrigation) বিভাগে ব্যয়িত হইয়াছে। সেচ্ কার্য্য প্রাদেশিক সরকার সমূহের পরিচালনাধীন। এই বিভাগীয় কার্য্যের ফলে একদিকে যেমন মূল্যবান সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি কৃষিকার্য্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই বিভাগের আয় হইতে ঋণের সুদ প্রভৃতি প্রদান করিয়াও প্রাদেশিক সরকারের প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৭৲ টাকা হারে আয় হইয়া থাকে। সুতরাং এই ঋণের দায় গ্রহণে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আপত্তির কোন কারণ উঠে না। কিন্তু জনসাধারণের আপত্তি সত্ত্বেও বোম্বাই সহরের উন্নতির ব্যর্থ চেষ্টায় ঋণের যে প্রায় ১০ কোটী টাকা অযথা ব্যয়িত হইয়াছে, সেই দায় গ্রহণযোগ্য নহে। তবে নয়াদিল্লীতে রাজধানী নির্ম্মাণকল্পে যে প্রায় ১৫ কোটী টাকা ঋণ হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব শুধু রাজনৈতিক কারণেই স্বীকার্য্য। ভারত সরকারের ডাক ও তার (Post and Telegraph) বিভাগের ঋণের পরিমাণ ২৩ কোটী টাকা, এই দায়িত্বও কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটি স্বীকার করিয়া

লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভারত সরকারের ঋণের অর্থ হইতে মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে ১৯ কোটী টাকা এবং দেশীয় রাজন্যবর্গকে ১৭'৫০ কোটী টাকা দাদন করা হইয়াছে, তাহাকেও প্রকৃত পক্ষে 'লাভজনক' বলা চলে না। কারণ এই জাতীয় ঋণের অর্থে যে সম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়াছে তাহার আয় সামান্য মাত্র, আর ইহাদের সুদের অর্থ করদাতাগণের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকার ঋণের আলোচনার পর এখন দেখা যাক্ অযথাকৃত ব্যয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটি কি কি দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। নিম্নের তালিকায় বিভিন্ন দাবীর পরিমাণ নির্দ্দেশিত হইল :—

বৎসর	দাবীর পরিমাণ	কোটী টাকা	মোট পরিমাণ কোটী টাকা
১৮৩৭ সালের পূর্ব্বে	কোম্পানীর আমলে বৈদেশিক যুদ্ধ ব্যয় ...	৩৫'০০	
	১৮৩৩-৫৭ সাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর মূলধনের প্রদত্ত সুদ	১৫ ১২	৫০'১২
১৮৫৭	সিপাহী বিদ্রোহ দমনের খরচ ...		৯০'০০
১৮৭৪	১৮৫৭-৭৪ সাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর মূলধনের প্রদত্ত সুদ	১০'০৮	
	কোম্পানীর মূলধন পরিশোধ	১২'০০	২২'০৮
১৮৫৭-১৯০০	ইংরাজ রাজের আমলে বৈদেশিক যুদ্ধ ব্যয় .. .	৩৭'৫০	
১৯১৪-১৯২০	ইউরোপীয় মহাসমরে দান	১৮৯'০০	
	" " ব্যয় .	১৭০'৭০	৩৯৭'২০
১৮৫৭-১৯৩১	বিভিন্ন খরচ	২২'০০	
	ব্রহ্মদেশের জন্য ব্যয়	৮০'০০	১০২'০০
১৯১৬-২১	'রিভার্স বিল' বিক্রয়ে ক্ষতি		৩৫'০০
	রেলপথ চড়া দামে (Premium) খরিদ জনিত লোকসান		৫০ ০০
	সামরিক রেলপথ সংক্রান্ত ব্যয় .		৩১ ০০
		মোট—	৭২৯'৮০

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানের ১১১৩ কোটী টাকার তথাকথিত 'জাতীয় ঋণ'এর মধ্যে আমাদের নিষ্কৃতির দাবীর পরিমাণ মাত্র ৭২৯'৪০ কোটী টাকা। এইরূপ ঋণমুক্তির দাবী ইংরেজের ইতিহাসে বিরল নহে। ইংলণ্ডের অধীন বলিয়া ৭৭২'১০ কোটী পাউণ্ড 'ব্রিটীশ জাতীয় ঋণের' জন্য আয়র্লণ্ড দেশও বিলাতের অনুরূপ সমভাবে দায়ী ছিল। কিন্তু ১৯২২ সনে তথায় গণতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তনের সময় যখন আয়র্লণ্ডকে এই ঋণের জন্য আংশিক ভাবে দায়ী করা হয়, তখন বিলাতের বিরুদ্ধে আয়র্লণ্ড পাল্টা-দাবী উপস্থিত করে। ফলে ১৯২৫ সনে আয়র্লণ্ডকে 'বৃটিশ-ঋণে'র দায় হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। আমরা শুধু আজ আয়র্লণ্ডের অনুরূপ ব্যবস্থার দাবী করিতেছি।

উপসংহারে শুধু বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষের পক্ষে অযথাকৃত ঋণমুক্তির বর্ত্তমান দাবী আন্তর্জ্জাতিক ন্যায় ও সততার যুক্তির উপর একান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাও অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে ভারতবর্ষের উপর ঋণভার স্তূপীকৃত করিবার ফলে ভারতবর্ষের সম্মতি কি সামর্থ্য কর্ত্তৃপক্ষের মোটেই বিচারের বিষয় ছিল না। এতদ্ভিন্ন বিলাতের পক্ষে স্বীয় স্বার্থের খাতিরেও ভারতের দায়-মুক্তি সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বিলাতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা এবং ক্রমবর্দ্ধমান বেকার-সমস্যার প্রধান কারণ এই যে, বাণিজ্যক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় বিলাত আর আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সারা দুনিয়ার বাজারের মালিক ইংলণ্ডকে আজ সর্ব্বক্ষেত্রেই পাততাড়ি গুটাইতে হইতেছে। তন্নিমিত্ত দুনিয়ার বাজার ছাড়িয়া শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যকে গণ্ডী করিয়া ব্যবসায় চালাইবার সুর বিলাত ধরিয়াছে। 'অটোয়া' সম্মেলন (Ottawa Conference)এ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ ব্যবসার ক্ষেত্রে পারস্পারিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত আজ যে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা তাহারই পরিণতি। কিন্তু এই চুক্তিতে অন্যান্য দেশের লাভ লোকসান যাহাই হউক, ইংরেজের একথা ভুলিলে চলিবে না যে একমাত্র ভারতবর্ষই তাহাদের পণ্যের প্রধান খরিদ্দার। বিলাতের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি আমাদের দেশের সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করে অনেকখানি। বর্ত্তমানে ভারতের দৈন্য চরমে উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আয়র্লণ্ডের অনুরূপ ঋণভার হইতে দায়মুক্ত অবস্থায় ভারতকে শাসনভার গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে। কারণ অত্যধিক ঋণের দায়ে যদি হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হয়, তাহা হইলে ভারতের সেই দুর্দ্দশার পরিণাম বিলাতের পক্ষেও এড়ান সম্ভব হইবে না। পক্ষান্তরে ঋণের শোষণ হইতে মুক্তি পাইলে ভারতের আর্থিক উন্নতি বিধান সহজসাধ্য হইবে। আর বুভুক্ষিতের ক্ষুন্নিবৃত্তির ন্যায়, দৈন্য-বিমুক্ত ভারতের জনসাধারণের বিরাট চাহিদা সর্ব্বত্র পণ্যভাণ্ডারের মজুত মাল উজাড় করিয়া দুনিয়ার বাজারের গতি ফিরাইবে। সুতরাং সারা দুনিয়ার মন্দা বাজারের বর্ত্তমান গ্লানিমুক্তির কারণেও গত-গৌরব, হৃত-সর্ব্বস্ব ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—শ্রীশান্তিবালা রায়

যে সকল মহাপুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বদেশ-সেবার মহামন্ত্রে সুপ্ত ভারতবাসীগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম। ভারতের জাতীয় জীবন গঠনে সুরেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। বর্ত্তমান কালে যে ভারতবাসীগণের আত্মসম্মানবোধ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা যে এখন সাম্য ও স্বাধীনতালাভের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুঝিতেও কুণ্ঠিত নহে, তাহারা যে আজ সগৌরবে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত সমান আসনে বসিবার দাবী জানাইতে শিখিয়াছে তাহার জন্য তাহারা সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথের যে যুগে জন্ম হইয়াছিল, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীকে ভারতের পক্ষে, এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের পক্ষে নবজাগরণের যুগ বলা যাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ন্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন ধারায় আপনার জীবনপদ্ধতি নিয়মিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার সঙ্গে বঙ্গদেশে যে নূতন আদর্শের বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে আমরা দেখিতে পাই সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, সমাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, লালমোহন প্রমুখ দেশসেবকগণ তাঁহাদের নবলব্ধ জ্ঞানগরিমায় সারা দেশকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন।

এই নব-জাগরণের যুগে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বারাকপুরের অন্তঃপাতী মণিরামপুর নামক গ্রামে এক কুলীন ব্রাহ্মণপরিবারে সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ পরম নিষ্ঠাবান ও সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত ও উদার মতাবলম্বী ছিলেন। একই বাটীতে এই দুই প্রাচীন ও নবীন মতের সংঘর্ষের আবহাওয়ার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার প্রভাব তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে লক্ষিত হয়। তিনি উভয় মতেরই ভালমন্দ তলাইয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া উভয়ের মন্দ অংশ ত্যাগ করিয়া ভাল অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তর কালে তিনি বলিতেন যে পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া নির্ব্বিচারে নূতনকে বরণ করিয়া লওয়া তাঁহার মত নহে। তিনি চাহিতেন পুরাতনকে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত করিয়া সময়োপযোগী করিয়া লইতে।

গ্রাম্য পাঠশালাতেই সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল। পরে ইংরাজি শিক্ষার নিমিত্ত পেরেণ্টাল একাডেমিক ইনষ্টিটিউসন, Parental Academic Institution নামক বিদ্যালয়ে তিনি যাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর এবং তিনি ইংরাজির বর্ণপরিচয় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। এরূপ অবস্থায় তিনি যে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন সেখানে ইংরাজি পড়া অত্যন্ত কঠিন হইত এবং অন্যান্য কোন ছাত্রই বাংলাভাষা বুঝিতে বা বলিতে পারিত না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় অধ্যবসায়গুণে শীঘ্রই তাহাদের সমতুল্য হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রতি বৎসরই পুরস্কার বা বৃত্তি পাইতেন। ক্রমে তিনি বি-এ পাশ করিলেন এবং তাঁহার পিতার উৎসাহে ও সহায়তায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়ের সহিত সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এই বিলাত-বাসের সময়ই তাঁহার সংগ্রামময় জীবনের সূত্রপাত হয়; এবং এই সংগ্রামের ফলেই যে সকল গুণ তাঁহাকে উত্তরকালে দেশপূজ্য ও বরেণ্য করিয়াছিল, তাহার প্রথম পরিচয় আমরা পাই।

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মবহুল ও সংগ্রামময় জীবনী আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁহার চরিত্রের বহুমুখী প্রতিভার সহিত অসাধারণ অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ কর্ম্মতৎপরতার এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। সম্মুখে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন দেখিলেও তিনি বিচলিত হইতেন না, বরং বাধা যতই দুরতিক্রম্য বলিয়া বোধ হইত, তাহা লঙ্ঘন করিবার উৎসাহও যেন তাঁহার তত বেশী বৃদ্ধি পাইত। বিলাতযাত্রার এক বৎসর পরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ আই-সি-এস

পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মে নিয়োজিত হইবার পথে এক মহা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তখন সিভিল সার্ব্বিসে কর্ম্মপ্রার্থীগণের বয়স একুশ বৎসরের মধ্যে হইবার নিয়ম ছিল। ইংরাজি প্রথায় গণনা করিলে সুরেন্দ্রনাথ ঠিক একুশ বৎসর বয়সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় [illegible] নি যে বয়স দিয়াছিলেন তাহা বাংলা প্রথানুযায়ী গণনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার বয়স এক বৎসর বেশী হইয়াছিল। সুতরাং নিয়মানুযায়ী বয়স অপেক্ষা তিনি অধিক বয়সে পরীক্ষা দিয়াছেন এই অজুহাতে তাঁহার নাম কৃতী ছাত্রগণের তালিকা হইতে বাদ দিবার কথা হইল। ভুল বয়স দেওয়ার জন্য সিভিল সার্ব্বিস কমিশনরগণের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্রনাথের তলব পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে ইংরাজি ও বাংলা এই দুই প্রথায় বয়স গণনা করার তারতম্য বুঝাইয়া দিয়া প্রমাণ করিলেন যে তিনি ঠিক বয়সেই পরীক্ষা দিয়াছেন। তথাপি কমিশনের সভ্যগণ তাঁহার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার নাম তালিকা হইতে বাদ দিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সহজে দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সিভিল সার্ব্বিসে অধিকসংখ্যক ভারতবর্ষীয়গণ প্রবেশ করে ইহা ভারতের শ্বেত প্রভুগণের অভিপ্রায় নহে। এই জন্য পরীক্ষার নিয়মাবলী ভারতীয়গণের পক্ষে অত্যধিক কঠিন করা হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও যে সকল মেধাবী ছাত্র পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইত তাহাদিগের সার্ব্বিসে ঢুকিবার বিপক্ষে তিল পরিমাণও আপত্তির কারণ থাকিলে ইংরাজ সরকার সে সুযোগ ত্যাগ করিতেন না। এখনকার মত সে সময়ে ভারতবাসীগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ বা একতার ভাব জাগে নাই, এবং দেশে জনমতের প্রাধান্যও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। কাজেই ভারতবর্ষীয়গণকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করার পক্ষে সরকারের বিশেষ বাধা ছিল না। এইরূপ অবস্থায়, সুদূর প্রবাসে, বয়সে বালক হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ হতাশ হন নাই। তিনি জানিতেন যাহা সত্য ও ন্যায় পরিণামে তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তিনি অকুতোভয়ে সিভিল সার্ব্বিস কমিশনরগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব তেজ ও সাহসে মুগ্ধ হইয়া কতিপয় ইংরাজ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন ও তাঁহাদিগের স সিভিল সার্ব্বিসের কমিশনরগণের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ জয়ী হইলেন।

এইখানেই কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সুরেন্দ্রনাথের সংঘর্ষের অবসান হইল না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়া তিনি শ্রীহট্ট জিলায় গমন করেন। এই সময়ে এই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ সাদারলণ্ড। তিনি নিজে একজন ফিরিঙ্গি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার চক্ষে একজন ভারতবর্ষীয়ের (native) এইরূপ উচ্চপদে অধিষ্ঠান অসহ্য বোধ হইত। নবনিযুক্ত অনভিজ্ঞ যুবককে উপদেশ ও সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করা দূরে থাকুক তিনি সুরেন্দ্রনাথের সামান্য ত্রুটিও ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। একটি মোকর্দ্দমায় সুরেন্দ্রনাথের সামান্য ত্রুটি হইয়াছিল। সাদারলণ্ড এই সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। তিনি সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন। তাঁহার অপরাধের বিচারের নিমিত্ত তিনজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত হইল। সুরেন্দ্রনাথ যাহাতে তাঁহার বিচার কলিকাতায় হয় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদন না-মঞ্জুর হইল। বিচার শ্রীহট্টেই হইল এবং তাহাতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলেন। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে, অল্প বয়সের অনভিজ্ঞতায় যে অপরাধ সকলের পক্ষেই হওয়া সম্ভব এবং যে অপরাধে দুই একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর অতিশয় লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা হইতে দেখা গিয়াছে সেই একই অপরাধে ভারত সরকার বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচ্যুতির আদেশ করিলেন। তেজস্বী ও নির্ভীকস্বভাব সুরেন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া এ অন্যায় অবিচার মাথা পাতিয়া লইতে অসম্মত হইলেন। ভারতবর্ষে এ অবিচারের প্রতিকারের আশা নাই জানিয়া ইণ্ডিয়া অফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট সুবিচারের দাবী উপস্থিত করিবার নিমিত্ত তিনি ইংলণ্ড গমন করিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার পদচ্যুতির সংবাদ পাইলেন।

এইরূপে উন্নতির প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিতে না করিতে সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সে পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রথম যৌবনের উৎসাহের মূলে এরূপ আঘাত পাইয়াও তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। ধন ও যশ অর্জ্জনের একটি পথ বন্ধ হইতে না হইতেই তিনি তাঁহার
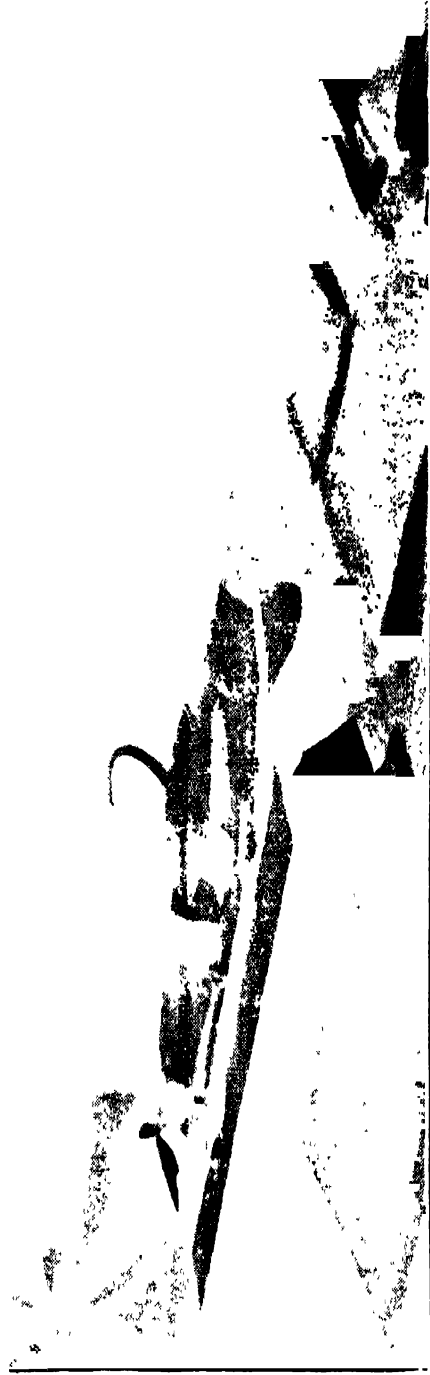
কলিকাতা মিউনিসিপাল গে টের সৌজ

জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার অন্য পথ বাছিয়া লইলেন। তাঁহার কিছুদূর অবধি ব্যারিষ্টারি পড়া ছিল। এক্ষণে সেই ব্যারিষ্টারিকে নিজের জীবিকা অর্জ্জনের ও ঈপ্সিত যশলাভের একমাত্র উপায় ধরিয়া লইয়া তিনি পূর্ণোদ্যমে ব্যারিষ্টারি পড়ায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু এপথেও বিঘ্ন উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। তিনি সরকারি চাকুরি হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন এই অজুহাতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনুমতি দিলেন না। এইরূপে আপাত-দৃষ্টিতে, সংসারের চক্ষে সুরেন্দ্রনাথের উন্নতির পথ চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই মনে করিল, এ আঘাতের পর তিনি আর মাথা তুলিতে পারিবেন না। কিন্তু অফুরন্ত জীবনীশক্তিতে সঞ্জীবিত কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ চক্ষের উপর একে একে উন্নতির প্রায় সকল পথ বন্ধ হইতে দেখিয়াও ভগ্নোদ্যম হইলেন না। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বারম্বার সংঘর্ষের ফলে তাঁহার মনে এক নূতন উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল। সরকারের অন্যায়-অবিচারের প্রতীকারের চেষ্টায় বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বুঝিলেন যতদিন পর্য্যন্ত না ভারত-বাসীগণ আপনাদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার প্রতীকারের চেষ্টায় যত্নবান হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বিদেশী প্রভুগণের হস্তে এইরূপে লাঞ্ছিত হইতেই হইবে। ভারতবাসীগণের মনে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে; তবেই তাহারা কর্ত্তৃ-পক্ষের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে একত্রে দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করিতে পারিবে, নতুবা পূর্ব্বাপর তাহাদিগকে আপনার দেশেই পরান্নভোজী প্রবাসীর ন্যায় অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইতে হইবে। সুকুমারমতি যৌবনতেজে দীপ্তশ্রী ছাত্রকুলই সকল দেশের ভবিষ্যতের আশাস্থল। তাহাদিগের সরস প্রাণে স্বদেশ-মন্ত্রের বীজ উপ্ত হইলে অচিরেই তাহা ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা। তীক্ষ্ণধী ও দূরদর্শী সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রগণের মধ্যবর্ত্তিতায় সমগ্র জাতির শিক্ষার ভারগ্রহণকেই অতঃপর নিজ জীবনের মহাব্রতরূপে বরণ করিলেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত সেই সুদূর প্রবাসেই তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। য়ুরোপের যে সকল জাতি পূর্ব্বে ভারতীয়গণের ন্যায় অন্যের পদানত ছিল ও পরে বহুদিনব্যাপী চেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃবর্গের জীবনী আলোচনা করা এক্ষণে সুরেন্দ্র-নাথের প্রধান কার্য্য হইল। তিনি গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ ও আলোচনা করিয়া আপনার কর্ত্তব্যের ধারানির্ণয়ে ব্যস্ত রহিলেন। তিনি যখন যে কাজ হাতে লইতেন সমগ্র প্রাণ মন সেই কাজের মধ্যে ঢালিয়া দিতেন, এবং তাঁহার জীবনীপাঠে জানা যায় যে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের মে মাস, এই এক বৎসর কাল অনন্যমনা হইয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় তিনি আপনার নূতন সাধনাক্ষেত্রে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সুরেন্দ্রনাথ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ইহার অনতিকাল পরে দেশপূজ্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরাজির শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে সিটি কলেজ স্থাপিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ সেখানেও ইংরাজির সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে স্বীয় অপ্রতিহত উদ্যম ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আপনার জীবনধারাপদ্ধতি স্থির করিয়া লইতে কৃতকার্য্য হইলেন।

স্বীয় মনোনীত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ আপনার জীবন দেশসেবারূপ মহাব্রতে উৎসর্গ করিলেন। ন্যূনাধিক প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল তিনি নানাপ্রকার জনহিতকর ও দেশহিতকর কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যে সকল সদনুষ্ঠানের তিনি উদ্‌যোক্তা ছিলেন এবং যে সকল সৎকার্য্যের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সবগুলির উল্লেখ করা এস্থলে সম্ভব নহে। যে দুই একটি প্রধান অনুষ্ঠানের কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থান পাইবে সেগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই তিনি যেরূপ অক্লান্তকর্ম্মী ছিলেন সেইরূপ সুন্দররূপে কার্য্য পরিচালনার শক্তিও ছিল তাঁহার অসাধারণ। শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়া তিনি শুধু আপনাকেই আপনার লক্ষ্যের একমাত্র বিষয় বলিয়া মনে করেন নাই। ছাত্রগণ যাহাতে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাদের প্রাণে যাহাতে আত্মসম্মান-বোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং যাহাতে তাহারা একত্র সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারে তাহার জন্য তিনি কোন

চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি কার্য্যে যোগদান করিবার পূর্ব্বেই স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের চেষ্টায় কলিকাতায় একটি ছাত্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ নিয়মিত-রূপে এই সঙ্ঘের কার্য্যে যোগদান করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সকল কলেজেই ছাত্রসঙ্ঘের এক একটি শাখা স্থাপিত হয় তাহার জন্য উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে আহুত হইয়া তিনি নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সহানুভূতি ও আন্তরিকতার গুণে তিনি সেইকালের যুবকবৃন্দের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে তিনি নিজে ছাত্রগণকে ভালবাসিতেন, এবং তাহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী ছিলেন বলিয়া ছাত্রগণও যৌবনসুলভ আন্তরিকতার সহিত তাঁহাকে ভালবাসিত।

ছাত্রগণকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিক্ষাদান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক মুখপাত্রস্বরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান নাই। ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় কর্ত্তৃক পরিচালিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল বটে, কিন্তু উহাতে দেশের জনসাধারণের স্থান ছিল না। উহা ধনী ভূস্বামীগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদেরই মুখপাত্রস্বরূপ ছিল। কাজেই জনসাধারণকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার এবং সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকে জনসাধারণের মতামত জ্ঞাপন করিবার যন্ত্রস্বরূপ সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ৺আনন্দ মোহন বসু, ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতের কৃতী সন্তানগণের সহায়তায় "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" স্থাপিত করিলেন।

এই সময়ের একটি ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথের গভীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও অনন্যসাধারণ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম অধিবেশন যে দিন হয়, সেই দিনই সায়াহ্ন একাদশ ঘটিকার সময় তাঁহার একটি পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে কখনও আপনার কর্ত্তব্যের পথে অন্তরায় হইতে দিতেন না। সদ্যপ্রাপ্ত পুত্রশোকের দারুণ যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া সেইদিন অপরাহ্নে তিনি এসোসিয়েশনের কার্য্যে যোগদান করিলেন এবং ধীরভাবে যথাকর্ত্তব্য সাধন করিয়া গেলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনেও দেখা গিয়াছে স্বীয় পত্নীর মৃত্যুর তিনদিন পরেই তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন ও সভাপতির নাম প্রস্তাব করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের যত্নে ও উদ্যমে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জন্মলাভ করিল। ইহার মধ্যবর্ত্তিতায় তিনি আপনার জীবনের আদর্শসকল কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইলেন। পাছে তাঁহার ন্যায় সরকারি কার্য্য হইতে বরখাস্ত ব্যক্তির সংশ্রব থাকার দরুণ এসোসিয়েশন গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হয় সেই ভয়ে তিনি প্রথমে কোনও কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন নাই। আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইহার প্রথম সম্পাদক ও অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় ইহার প্রথম সহঃ-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কর্ম্মচারীরূপে ইহার সহিত যুক্ত না থাকিলেও কার্য্যতঃ সুরেন্দ্রনাথই এসোসিয়েশনের পরিচালনার প্রধান নেতা ছিলেন এবং ইহা দ্বারা যতগুলি জনহিতকর অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাদের মূলে সুরেন্দ্রনাথের একান্ত আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা ছিল।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের দুই একটি দেশহিতকর আন্দোলনের উল্লেখ এখানে করা হইল। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে আই-সি-এস পরিক্ষার্থিগণের নির্দ্দিষ্ট বয়স একুশ বৎসর হইতে কমাইয়া উনিশ বৎসর করা হয়। ইহাতে ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে সার্ব্বিসে ঢুকিবার পথ আরও কঠিন হইল। এই ব্যাপার লইয়া ভারতে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নিমিত্ত এক বিরাট জনসঙ্ঘের অধিবেশন হইল। যাহাতে এই আন্দোলন সমগ্র দেশব্যাপী হইয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, সেইজন্য বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া দেশবাসীগণকে এই অবিচারের সম্বন্ধে সচেতন করিবার ভার পড়িল সুরেন্দ্রনাথের উপর। কর্ম্মগতপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথ একান্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত এই দুরূহ কর্ম্মভার মস্তকে লইয়া মে মাসের দারুণ গ্রীষ্মে আগ্রা, লাহোর, অমৃতসর, মীরাট, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং সর্ব্বত্রই স্বীয় সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য ও বাগ্মিতার বলে তত্তৎস্থানে

নেতৃবর্গের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করেন। এই সঙ্গে তিনি লাহোর, মীরাট, কাণপুর, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ-এ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনুকরণে এক একটি এসোসিয়েশন স্থাপনে সহায়তা করেন। উত্তর ভারত পরিভ্রমণের কার্য্য শেষ করিয়া পর বৎসর ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বোম্বাই, সুরাট, আমেদাবাদ, পুণা ও মাদ্রাজ গমন করেন। রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া এইরূপে বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতা-বন্ধন স্থাপনের চেষ্টা ভারতে এই প্রথম।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া নূতন আইন প্রচলিত হয় তখনও সুরেন্দ্রনাথ প্রাণপণে এই অবমাননাকারী আইনের বিরুদ্ধে যুঝিয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাকে প্রায় একাকী সহায়হীন অবস্থায় যুঝিতে হইয়াছিল, কারণ যাঁহারা প্রথমে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, পরে কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষুর ভয়ে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চাৎপদ্ হইয়াছিলেন। অবশেষে আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহায়তায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। তাহাতে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য জ্ঞাপন করা হইল, এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রী মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের নিকট এই আইন তুলিয়া লওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করা হইল। এইরূপে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মধ্যবর্ত্তিতায় সুরেন্দ্রনাথ দেশের জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতির ভাব উদ্দীপিত করিলেন ও ভারতে জনমতের প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

সুরেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি একই সময়ে আপনাকে বিভিন্ন প্রকারের অনেকগুলি কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিতেন, এবং প্রত্যেকটি কার্য্যই যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত যুক্ত থাকিয়া দেশের নানাবিধ আন্দোলনের সূচনা ও পরিচালনার কার্য্য করিতে করিতে সুরেন্দ্রনাথ এসোসিয়েশনের মতামত প্রচারের নিমিত্ত একটি সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। সেই সময়ে "বেঙ্গলী" নামক সংবাদপত্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বেঙ্গলীর সত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে কাগজখানির সত্ত্ব ও ছাপাখানা ক্রয় করিয়া লইলেন। তিনি কোনরূপ বিষয়বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া লাভের আশায় এ কার্য্য করেন নাই। এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে আপনাদিগের রাজনীতিসংক্রান্ত মতামত এই পত্রিকার মধ্যবর্ত্তিতায় প্রকাশ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় ও সুপরিচালনার গুণে সংবাদপত্রখানা অচিরে জনসমাজে আদৃত হইতে লাগিল ও পরে তিনি ইহাকে সাপ্তাহিক হইতে দৈনিক পত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বে বেঙ্গলী স্পষ্টবাদিতা ও সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই পত্রের সম্পাদকের কার্য্য করিবার সময় হাইকোর্টের জজ মিঃ নরিসের বিচারকার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করার ফলে সুরেন্দ্রনাথকে কারাগারে যাইতে হইয়াছিল। দেশের কার্য্যে কারাবরণের গৌরব ভারতবর্ষে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম অর্জ্জন করেন।

সুরেন্দ্রনাথের কার্য্যদক্ষতা ও সুপরিচালনার আর একটি নিদর্শন কলিকাতাস্থিত রিপণ কলেজ। তিনি মেট্রোপলিটান ও সিটি কলেজের শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তিনি অধিক দিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। আপনার মত ও আদর্শ অনুযায়ী একটি বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি প্রেসিডেন্সি ইন্‌ষ্টিটিউশন নামক একটি ছোট স্কুলের ভার লইলেন। সুরেন্দ্রনাথ যখন স্কুলটিকে হস্তে লইলেন তখন ইহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না ও ইহার ছাত্রসংখ্যা দুইশত মাত্র ছিল। কিন্তু তাঁহার সুবন্দোবস্তের গুণে স্কুলটি ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল ও বর্ত্তমানকালে ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে। ভারতের জনপ্রিয় বড়লাট লর্ড রিপণ যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নামে এই কলেজের নামকরণ করিয়াছিলেন। এই কলেজে এক্ষণে সাহিত্যকলা ও বিজ্ঞান বিভাগে বি-এ, ও বি-এস-সি পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করা হয় এবং ইহাতে একটি আইনের বিভাগও রহিয়াছে। কলিকাতার সরকারি বে-সরকারি সমুদয় কলেজের মধ্যে কেবলমাত্র রিপণ কলেজই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের বিভাগ পরিচালনা করিবার অনুমতি পাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ১,৫০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে স্কুল ও কলেজের বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

এই কলেজের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৩ খৃঃ অব্দ অবধি সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রগণকে ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। অবশেষে ১৯১৩ খৃঃ অব্দে তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিসেল্‌টিভ কাউন্সিলের Imperial Legislative Council সদস্য মনোনীত হইলেন। তখন তাঁহার পক্ষে কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করা অসম্ভব হইল। সুতরাং প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসরকাল বিভিন্ন কলেজে শিক্ষাদানের কার্য্য করিবার পর তাঁহাকে শিক্ষকতার কার্য্য হইতে অবসর লইতে হইল।

বর্ত্তমান কালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস, Indian National Congress সমগ্র ভারতের জনমতের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়াছে। কোন প্রকার রাজনৈতিক বিষয়ে ইহার মতামত বা সিদ্ধান্তকে ভারত সরকার উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন না। এই কংগ্রেসের গঠনকার্য্যে সুরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট হাত রহিয়াছে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন সমগ্র ভারতবাসী ইলবার্ট বিল Ilbert Bill সম্বন্ধীয় ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়াছিল, তখন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশন করিয়াছিলেন। ইহাতে বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল এবং যাহা বর্ত্তমানেও ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞগণের আলোচ্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে এই কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে সেই স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা প্রচার, শাসন বিভাগে ভারতীয়গণের অধিক সংখ্যায় প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ যখন কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বোম্বাই নগরে অপর কয়েকজন নেতা মিলিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ যে পদ্ধতি অনুসারে কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রদ্ধতি অনুসারে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন করিবেন স্থির করিলেন। এই নেতৃগণের অন্যতম কাশীনাথ ত্রেম্বাক তেলাং মহাশয় সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে প্রথম কনফারেন্সের কার্য্যতালিকা চাহিয়া লইয়াছিলেন। একই সময়ে বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ও কলিকাতায় কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। এইজন্য সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ইহার পর হইতে ১৯১৭ সাল অবধি কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত সকল আন্দোলন ও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য ছিলেন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কয়েকটি অত্যাবশ্যক রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যখন কয়েকজন প্রতিনিধিকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছিল তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই অভিযানের প্রত্যেক সভ্যকেই স্বীয় স্বীয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের তখনকার আর্থিক অবস্থায় এই ব্যয়ভার বহন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু দেশসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের নিমিত্ত এইরূপ ত্যাগস্বীকারে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ও দেশবাসীগণের উপর তাঁহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে পুণা কংগ্রেসে ও ১৯০২ খৃঃ অব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসে তিনি সভাপতির পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নরমপন্থী ও চরমপন্থীগণের মধ্যে মতের অনৈক্য ঘটায় ও কংগ্রেসে চরমপন্থীগণের সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রাধান্য থাকায় সুরেন্দ্রনাথ অন্যান্য নরমপন্থীদিগকে লইয়া কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেন। অতঃপর তিনি যে পথ অবলম্বন করিলেন তাহা ভাল কি মন্দ তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৭ সন পর্য্যন্ত তিনি ইহার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা ভুলিবার নহে।

আমরা দেখিয়াছি ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ভারতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল স্বদেশবাসীগণের জাতীয় জীবন গঠনের চেষ্টা। তিনি সে চেষ্টায় কতদূর সফলকাম হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিচ্ছেদ আইন উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সময়। এই বৎসর বঙ্গদেশের পক্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারত সরকার পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গের বিভাগ কয়েকটিকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন।

সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য নেতৃগণের প্রাণপণ চেষ্টায় বাঙ্গালী জাতির প্রাণে যে একতা ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গবিচ্ছেদের প্রস্তাব তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিবে এই আশঙ্কায় বঙ্গবাসীগণের প্রাণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে আন্দোলন চলিতে লাগিল। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া বঙ্গবিচ্ছেদের প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিলেন। ফলে বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে অশান্তি ও অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই দারুণ উত্তেজনার সময় বিক্ষুব্ধ জনমণ্ডলীর নেতৃস্থান অধিকার করিয়া যেরূপ ধীর শান্তভাবে অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত সুরেন্দ্রনাথ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় তিনি আপন হস্তে শিক্ষিত, আপনার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত সহস্র সহস্র বঙ্গবাসীর সহিত এই জাতীয় আন্দোলনরূপ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি একদিকে যেমন আপনার অদম্য প্রাণশক্তিতে তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছিলেন অপরদিকে তেমনি হৃদয়াবেগের আতিশয্যে তাহাদের উৎসাহ যাহাতে সংযমের সীমা লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার মূর্ত্তি ধারণ না করে সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত রাজনীতি চর্চ্চা কেবল শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের আইন শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্রাভদ্র সকল সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীর প্রাণে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিল। এই সময়ের স্বদেশী আন্দোলনেই সর্ব্বপ্রথম আপামর জনসাধারণ যোগদান করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের সুবন্দোবস্তের গুণে এই বিরাট আন্দোলন শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে আমরা দেখিতে পাই, স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণ একদিকে যেরূপ পুলিশের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া জাতীয় সঙ্গীতে রাজপথ মুখরিত করিয়া চলিতে ভীত হন নাই অপরদিকে তেমনি পুলিশ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা ত' করেনই নাই, এমন কি আঘাত প্রতিনিরোধের নিমিত্তও হস্তোত্তলন করেন নাই। তাঁহাদের চরিত্রের এই নির্ভীকতা ও সংযমের সমাবেশের মূলে ছিল সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা। যে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি বর্ত্তমানকালে দেশবাসীগণের মহামন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, জাতীয় আন্দোলনে সেই প্রাণমাতানো মন্ত্রের ব্যবহার এই সময়েই প্রথম হইয়াছিল। অধুনা যে বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশজাত শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই প্রথার প্রচলন এই সময়েই প্রথম হইয়াছিল। দেশগুরু সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে সহস্র সহস্র দেশবাসীগণকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সরকারের দলন-নীতি যতই উগ্র ভাব ধারণ করিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুচরবৃন্দের উৎসাহও যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত, নববলে বলীয়ান বাঙ্গালী জাতি যেন কোন অপূর্ব্ব শক্তির প্রভাবে ভয় ভুলিল, হিংসা ভুলিল, দ্বেষ ভুলিল, রহিল কেবল তাহাদের নবসঞ্জাত ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর মিলিত হইয়া দেশসেবার কার্য্যে অফুরন্ত উৎসাহ। এই সময়ে বরিশালে যে কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে সমাগত জনমণ্ডলী যেরূপভাবে পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করিয়াও আপনাদের আত্মসম্মান বজায় রাখিয়াছিল তাহা শুধু বাঙ্গালার ইতিহাসে কেন সমগ্র জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিচ্ছেদের আইন প্রথম কার্য্যকরী হয়। ঐ দিবস বঙ্গদেশের সকল অঞ্চলে জনসভার অধিবেশন করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হইল। ভারত সরকার বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাঙ্গালী জাতি যে মনে প্রাণে এক, তাহার নিদর্শনস্বরূপ ঐ দিবস বাঙ্গলাদেশের সকল বাটীতে রন্ধনকার্য্য বন্ধ রহিল এবং ভ্রাতৃত্বের চিহ্নস্বরূপ বাঙ্গালীগণ পরস্পর পরস্পরের হস্তে লাল সূতার রাখীবন্ধন করিয়া দিল। কলিকাতায় ঐ দিবস বিভিন্ন স্থানে তিনটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমে ফেডারেশন ষ্ট্রীটে বঙ্গদেশের দুই বিচ্ছিন্ন অংশের বাঙ্গালীগণ যাহাতে একত্রে মিলিতে পারে সেই অভিপ্রায়ে একটি গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত যে জমি ক্রয় করা হইয়াছিল তাহাতে বাটীর ভিত্তি স্থাপন করা হইল। এই স্থানে সমবেত জনসভার সভাপতি করা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে। বসু মহাশয় তখন রোগশয্যায় ছিলেন, এবং এই রোগশয্যাই ক্রমে তাঁহার মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু যে ভাবের বন্যায় তখন সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, রোগশয্যায় পড়িয়াও আনন্দ-

মোহনের ন্যায় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি তাহার প্রভাব সমুদয় অন্তর দিয়া অনুভব করিলেন। দুরন্ত ব্যাধির যন্ত্রণার মধ্যে তিনি সভাপতির অভিভাষণরূপে এক অতি মর্ম্মস্পর্শী অভিনন্দন দেশবাসীকে উপহার দিলেন। তাঁহাকে ডাক্তারের অনুমতি লইয়া শায়িত অবস্থায় সভায় আনা হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত অভিভাষণ সুরেন্দ্রনাথ পাঠ করিলেন। তাহার পর সে সভায় যে ভাব ও ভক্তির স্রোত বহিল তাহা অবর্ণনীয়। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে ঐ দিবস এক মহাক্ষণরূপে দেখা দিয়াছিল। যে মহৎ কার্য্যে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার সুফল যে আপনার জীবদ্দশাতেই দেখিতে পাইলেন ইহাতে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

বঙ্গদেশবাসীগণের এইরূপে বঙ্গবিচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে বার বার আপত্তিজ্ঞাপন সত্ত্বেও ভারতসরকার ঐ আইন উঠাইয়া দিলেন না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উদারনৈতিক মর্লে সাহেব ভারতসচিব হইলে ভারতবাসীগণের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। হাউস অফ্ কমন্সের, House of Commons এর সভ্যরূপে মিঃ মর্লে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতসচিবরূপে তিনি ভারতবর্ষের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও যে আইন একেবারে স্থির সিদ্ধান্তের, "settled fact" মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে তাহা রহিত করিবার কোনও উপায় দেখিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে কথঞ্চিত পরিমাণে মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও একেবারে হাল ছাড়িলেন না। সুযোগ উপস্থিত হইলেই তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। দেশবাসীগণ প্রতি বৎসরের ১৬ই অক্টোবর তারিখকে জাতীয় শোকের দিনের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিল এবং প্রথম বৎসরের ন্যায় প্রতি বৎসর ঐ দিবস সকল বাটীতে রন্ধনের কার্য্য বন্ধ থাকিত, যুবকবৃন্দ রাখীহস্তে জাতীয় সঙ্গীতে রাজপথ মুখরিত করিয়া শোভাযাত্রা করিতেন ও পরস্পর পরস্পরের হস্তে রাখীবন্ধন করিয়া যেন আপনাদের অন্তরের একপ্রাণতা সুদৃঢ় করিয়া লইতেন। অবশেষে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহার অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে তিনি স্বয়ং বঙ্গদেশের দুই বিচ্ছিন্ন অংশ পুনরায় একত্র করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বঙ্গভঙ্গের আইন রহিত করা যেমন সুরেন্দ্রনাথের এক কীর্ত্তি তেমনই তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি ১৯২২ সনের ম্যুনিসিপ্যাল আইন। সুরেন্দ্রনাথ বরাবরই ম্যুনিসিপ্যালিটির পরিচালনার কার্য্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থার সমর্থন করিতেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন, তখন কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিকে অনেক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন যে নূতন আইন পাশ করাইলেন তাহাতে ম্যুনিসিপ্যালিটির স্বায়ত্তশাসন বিশেষ ভাবে খর্ব্ব করা হইল। সুরেন্দ্রনাথ এই নূতন আইনের বিপক্ষে যথেষ্ট লড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই অন্যায়কারী আইন রদ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া তিনি অন্যান্য ২৭ জনের সহিত ম্যুনিসিপ্যালিটির সদস্যের পদ পরিত্যাগ করিলেন এবং স্থির করিলেন যত দিন পর্য্যন্ত না এই অন্যায় আইন তুলিয়া লওয়া হইবে তত দিন তিনি আর সদস্যের পদ গ্রহণ করিবেন না। ১৯২১ সনে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই সুরেন্দ্রনাথ এই আইন রদ করিবার নিমিত্ত নূতন একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিলেন। এই খসড়াই পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ম্যুনিসিপ্যাল আইনে পরিণত হইয়াছে। নূতন আইন অনুসারে কলিকাতার নগর সম্বন্ধীয় সকল প্রকার ব্যবস্থায় নাগরিকগণের সম্পূর্ণ হাত রহিয়াছে। নাগরিকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যগণই এই সহরের আভ্যন্তরিক সকল কার্য্য পরিচালনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে দেশে যদি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহা হইলে দেশবাসীগণকে অগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আপনাদিগের ভার লইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তবেই তাহারা পূর্ণতর স্বাধীনতার উপযুক্ত হইতে পারিবে। সেই জন্য দেশে গণতন্ত্র স্থাপনের প্রথম সোপান স্বরূপ তিনি বঙ্গদেশের বিভিন্ন সহরের ম্যুনিসিপ্যালিটিগুলি যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ যদি দেশের জন্য আর কোন কাজ নাও করিতেন তাহা হইলেও এই ম্যুনিসিপ্যালিটি আইন বাঙ্গালার গণতন্ত্রের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত।

সুরেন্দ্রনাথ যে বৎসর কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন সেই বৎসর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বাধীনে

স্বরাজপন্থীগণ কাউন্সিলে ঢুকিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। এই প্রতিযোগিতায় সুরেন্দ্রনাথ হারিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বঙ্গমাতার সুসন্তান সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসান হইল। সুরেন্দ্রনাথ একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি যখন যে কার্য্য হস্তে লইতেন তাহাই অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার এই কৃতিত্বের মূলে ছিল তাঁহার একাগ্রতা ও হস্তস্থিত কর্ম্মে মনোনিবেশের অনন্যসাধারণ শক্তি। তিনি যখন আপনার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন তখন তাঁহার মন আরব্ধ কর্ম্মে এমনই নিবিষ্ট থাকিত যে নানা প্রতিকূল অবস্থাও তাঁহার কর্ম্মে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিত না। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন যে যখন তাঁহার বয়স মাত্র একাদশ বৎসর তখন একবার তিনি তাঁহার পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও একজন আত্মীয়ের সহিত নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। তাহার পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়টি পথে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে আসিতেছিলেন। কিন্তু বালক সুরেন্দ্রনাথ নৌকার এক পার্শ্বে বসিয়া আপনার পাঠ্যবিষয় সকল আয়ত্তে নিযুক্ত রহিলেন। জ্যেষ্ঠদিগের কোলাহলে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত ঘটে নাই। আর একবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর টাউনহলে যে শোকসভা হইয়াছিল, তাহাতে বক্তাদিগের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথও একজন ছিলেন। তাঁহার সেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। যে ঘরের একপার্শ্বে বসিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় লিখিতেছিলেন তার অপর পার্শ্বে তাঁহার শিশুসন্তানগণ বালসুলভ চঞ্চলতার সহিত কোলাহল করিয়া খেলা করিতেছিল। কিন্তু সে কোলাহলে সুরেন্দ্রনাথের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে নাই, এবং আপনার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি তাহাদিগের খেলায় যোগ দিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের স্মরণশক্তিও অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি যে সকল বক্তৃতা দিতেন তাহাতে কখনও লিখিত নোট ব্যবহার করিতেন না। বাটী হইতে তিনি যে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতেন কোন প্রকার লিখিত নোটের সাহায্য ব্যতিরেকেই সেই বক্তৃতা অক্ষরে অক্ষরে বলিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যখন পুণা কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন সভাপতির অভিভাষণরূপে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা প্রস্তুত করিতে ছয় সপ্তাহ কাল সময় লাগিয়াছিল। এই ছয় সপ্তাহ প্রত্যহ তিনি দৈনন্দিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্ণে দুই ঘণ্টা সময় এই অভিভাষণ লিখিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। প্রত্যহ লেখার কার্য্য হইয়া গেলে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে মনে মনে লিখিত অংশ পুনরাবৃত্তি করিতেন এবং কোন্ কোন্ স্থানে পরিবর্ত্তনের আবশ্যক তাহা ঠিক করিয়া রাখিতেন। তাঁহার সকল কার্য্যে এইরূপ শৃঙ্খলা ছিল বলিয়া একবার যাহা করিতেন তাহা কখনও ভুলিতেন না এবং এরূপও দেখা গিয়াছে যে তিন চার ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা দিতেও নোটের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সাতাত্তর বৎসর হইয়াছিল। সেই বয়সেও তিনি সুস্থ সবল ও কার্য্যক্ষম ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে তিনি বিশ্রামের অবসর খুব কমই পাইতেন। তথাপি স্বাস্থ্যই যে সকল প্রকার সুখের মূলে এবং জীবনে কৃতকার্য্য হইবার পথে প্রধান সহায়স্বরূপ তাহা তিনি কখনও ভুলেন নাই, এবং স্বাস্থ্যরক্ষায় কখনও অমনোযোগী হন নাই। প্রতি দিন প্রাতে ও অপরাহ্ণে তিনি নিয়মিত রূপে ব্যায়াম করিতেন। তিনি ধূমপান, মদ্যপান বা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর অন্য কোন প্রকারের নেশায় আসক্ত ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট সময়মত স্নানাহার করিতেন ও নিদ্রা যাইতেন এবং সহজে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দিতেন না। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে তিনি প্রত্যহ তাঁহার বারাকপুরস্থিত বাটী হইতে কলিকাতা আসিতেন এবং সারাদিনের কাজ শেষ করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার পূর্ব্বে বারাকপুরে ফিরিয়া যাইতেন। যখন তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের বৈঠকে যোগ দিবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন তখন একদিন লর্ড ষ্ট্রাথ্কোনা (Lord Strathcona) প্রতিনিধিগণের সম্মানার্থ এক ভোজ দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ভোজের সময় যে স্থানে বসিয়াছিলেন তাহার পার্শ্বেই একটি খোলা দরজা ছিল। ভোজ শেষ হইতে না হইতেই তিনি অন্যের অগোচরে এই দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং এগারটা বাজিবার পূর্ব্বেই গিয়া শয়ন করিলেন। আর একবার যখন তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন তখন একদিন

রাউলাট বিল সম্বন্ধে আলোচনা হইতে হইতে রাত্রি হওয়াতে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড অধিবেশন তখনকার মত স্থগিত রাখিলেন। কথা হইল রাত্রির আহারের পর আবার অধিবেশনের কার্য্য হইবে। সুরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিবা মাত্র উঠিয়া লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু রাত্রি নয়টায় শুইবার সময়।" লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড হাসিয়া তাঁহাকে সে অধিবেশনে উপস্থিতি হইতে অব্যাহতি দিলেন।

ঘুমের সময় তাঁহার যেমন নির্দ্দিষ্ট ছিল তেমনই সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িতে পারিতেন। আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পথে তিনি ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয় ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিতেছিলেন। একদা তাঁহারা মার্সেলস্ নগর পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার সময় ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব আছে দেখিয়া ষ্টেসনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরিধানে তখন তাঁহাদের ভারতীয় পরিচ্ছদ। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা জনৈক পুলিশ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ (Franco-German War) সবেমাত্র শেষ হইয়াছে এবং তখনও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া ছিল। কাজেই এই সর্ব্বজ্ঞ পুলিশ মহাপ্রভু বিচিত্রবেশধারী বিদেশীত্রয়ের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ সন্দেহের চক্ষে দেখিলেন এবং স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ইঁহারা জার্ম্মানীর গুপ্তচর না হইয়াই যায় না। সুতরাং তিনি বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ না করিয়াই তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া চলিলেন। সেখানেও আর একজন পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহাদের দেখিয়া প্রথমোক্ত পুলিশটির সহিত একমত হইয়া তাঁহাদিগকে হাজতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ফরাসী ভাষা জানিতেন না এবং পুলিশদ্বয় ইংরাজি ভাষা জানিত না। সেইজন্য এই বিভ্রাট ঘটিল। যাহা হউক সেই রাত্রের মত তাঁহাদিগকে হাজতে বাস করিতে হইল। আলোকবাতাসহীন এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্বল্পপরিসর একটি বিছানায় তাঁহাদের তিনজনকে রাত্রি কাটাইতে হইল। বিদেশে এই বিপন্ন অবস্থায়, সেই অপরিসর কঠিন শয্যার এক পার্শ্বে ছারপোকাদি নানা কীটপরিবৃত হইয়াও সুরেন্দ্রনাথের ঘুম আসিতে বিলম্ব ঘটিল না। তিনি অচিরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধুদ্বয় ঘুমাইতে না পারিয়া সারারাত্রি গল্প করিয়া কাটাইলেন। পরদিন একজন ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ পুলিশ কর্ম্মচারীর সহায়তায় মুক্তি পাইয়া তাঁহারা সে দেশ ত্যাগ করিলেন।

দৈবের উপর পুরুষকারের প্রাধান্য যে কত প্রবল সুরেন্দ্রনাথের জীবন তাহার সাক্ষ্য দেয়। জীবনের আরম্ভে আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসীগণ যে সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিল, কেবলমাত্র আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখিয়া সেই সুরেন্দ্রনাথই ধন, মান ও অমর যশ অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। এক সময় যে সুরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, অবমানিত ও সরকারি চাকুরি হইতে বরখাস্ত হইয়াছিলেন স্বীয় অদম্য উৎসাহের বলে সেই সুরেন্দ্রনাথই পরে সরকারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন। যুবক সুরেন্দ্রনাথ সামান্য একটি জিলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলেন, প্রৌঢ় সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র বঙ্গদেশের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীর পদে মনোনীত হইয়াছিলেন।

ভ্রম-সংশোধন ঃ—

গত মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত 'রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন' প্রবন্ধে দুইটি মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

পৃ. ২৮১, ১ম পাটি, ৭ম পংক্তি '১৮১৫' স্থলে '১৮১৪' পড়িতে হইবে।

পৃ. ২৮২, ২য় পাটি, ২১শ পংক্তি 'দুই পুত্র' স্থলে 'তিন পুত্র' পড়িতে হইবে।

বাসর ঘর

—শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সমীরণের মতো আশ্চর্য্য প্রকৃতির ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। অন্য সকলে হয়ত তেমন লক্ষ্য করিত না, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার চেহারার মধ্যে একটি এলোমেলো খেয়ালীভাব, উজ্জ্বল অথচ উদাস স্বপ্নময় চোখের গভীর চাহনি আমাকে আবিষ্ট এবং মুগ্ধ করিয়াছিল। সমীরণের চরিত্র, কেন জানি না, আমাকে বারবার আকর্ষণ করিত। মানুষের জীবনে নীরব সহচর নাকি এই শোভাময়ী প্রকৃতি এবং সাগর মেখলা, অরণ্য-কুন্তলা পৃথিবী,—এমনই একটা কথা কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম। অসীম নির্জ্জনতার নিবিড় আনন্দে মানুষ যখন একা, তখনই প্রকৃতিদেবী তাহাকে ধরা দেয়। কিন্তু পরিপূর্ণ হৃদয়কে, কোনো প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, সমধর্ম্মী মুখর মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করিতে না পারিলে তৃপ্তি নাই। আমার কাছেই সমীরণ উৎসারিত হৃদয়ের ভার লঘু করিয়াছে। বিধাতার রচিত একটি করুণ কাহিনীর মতোই তাহার জীবনের ইতিহাস আমার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিতেছে।—একটি দুর্ল্ভ, আবেগময় মুহূর্ত্তে সমীরণ একদিন নিজেকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছিল।—

মাঝে-মাঝে তাহার নাকি মনে হয়, তাহার চোখের উপরে যেন কালো আবছায়া-কুয়াশার একটি পর্দ্দা টাঙানো আছে। রহস্যময় সেই ঘন যবনিকা শুধু আলস্যে জড়িত নয়, কেমন যেন একটি নিশ্চেতন ভাব, কিম্বা মনে মনে অনবরত কোনো কিছুই না ভাবার চেষ্টা করা। কখনো কখনো আবার সেই আবরণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া চোখের স্পষ্ট, পরিষ্কার দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে। প্রত্যেকটি মানুষের মুখের দিকে চুরি করিয়া তাকানো,—তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেছে। সেই উদাস অথচ তীব্র-মদির চাহনির সন্ধানী আলো ফেলিয়া সে প্রত্যেকটি মানুষের মুখেচোখে কি যেন বিস্ময়-রহস্যের লেখা আবিষ্কার করিতে চায়। নিস্তরঙ্গ দীঘির স্থির কালো জলে একটি ঢিল ফেলিলে, চারিদিকে যেমন ছোট ছোট ঢেউ ধীরে-ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে আবার মিলাইয়া যায়, তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ও তেমনি সামান্য আঘাতের স্পর্শেই চঞ্চল হইয়া ওঠে। একটি মোহময় মধ্যযুগের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন তা'র পরিবেশ,—নাভি-গন্ধী হরিণের মতো, আপনার সৌরভে আপনিই সে যেন বিভোর হইয়া আছে।

বি-এ-টা কোনোরকমে পাশ করিয়াই, ঘরে বসিয়া চোখ বুজিয়া সে দুই হাতে দিন ঠেলিয়া চলে; অর্থাৎ যতদিন চলে চলুক। বিদ্যাচর্চ্চার আবরণের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া, যতদিন সম্ভব, প্রতিদিনকার জীবন-সংগ্রামের কঠোর স্পর্শ হইতে নিজেকে সে বাঁচাইয়া চলিতে থাকে। এম-এ পরীক্ষার সাংঘাতিক, মোটা মোটা বইগুলির দিকে তাকাইয়াও আবার তাহার হাঁপ্ ধরে, বিশেষ করিয়া, পাঠ্য-পুস্তকের গণ্ডী ছাড়াইয়া যত অপাঠ্য কেতাবের আশে-পাশেই সমস্ত মন তাহার মধুমত্ত ভ্রমরের মতোই গুঞ্জন করিয়া ফেরে। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের ছেলে, কাজেই 'কেরাণীয়ানা'র দিকেই সদা-জাগ্রত, উন্মুখ দৃষ্টি। কিন্তু ঘরে বসিয়াই যে সে খবর পায়, আজকাল নাকি কত ভালো ভালো শিক্ষিত ছেলে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের চারিপাশে টো টো করিয়া বৃথাই ঘুরিয়া বেড়ায়। তারপর, তা'র বিশ্বাস, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' কথাটি নাকি বাঙালী ছাড়া অন্য সব জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, সুদূর-পিপাসী দুই চোখে তাহার কৈশোর-স্বপ্ন-স্মৃতির মদির ঘুমঘোর, রূপকথার অপরূপ কল্প-লোকে তাহার সমস্ত ভাবনা মগ্ন। কাজেই মাষ্টারির শ্রমসাপেক্ষ কাজটি বাদ দিয়া সে গোটা তিনেক টিউশানি করিতে সুরু করিয়াছে, এমনি সময়ে

একটি ছোটখাট একান্নবর্ত্তী পরিবার—কাজেই অনেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ ও বেদনা, শোক ও সান্ত্বনা একজনকে কেন্দ্র করিয়াই চলে। তা' ছাড়া সমীরণ শুধু শিক্ষিত নয়, তাহার সুকুমার, উদার হৃদয়ের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছে। ভবিষ্যতের ভরসা,—সংসার-ভারবাহন-সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার সেই অধিকার পাকা করিবার জন্যই বোধ করি সকলেরই একান্ত আগ্রহে, মহাসমারোহের মধ্যে, এক শুভ সুতহিবুক লগ্নে সমীরণ একদিন বেণুর পাণিগ্রহণ করিয়া ফেলিল। বেশি কথা কওয়া তাহার স্বভাব নয়, সে না দিল সম্মতি, না করিল কোনো প্রতিবাদ, যেন একটি মূর্ত্তিমান্ 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন'—ভাবের প্রতিচ্ছবি!

দেখিতে দেখিতে মাস ছয়েক পার হইয়া যায়।

প্রখর, প্রকাশ্য দিবালোকে নববধূর মুখ দেখা পর্য্যন্ত বারণ, পুরাতন পরিবারের এই সংস্কার এবং এই রীতি। শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর মতো বাড়ীতে সে একদণ্ড টি'কিতে পারে না,—চাকরির অছিলায় কোন-কোনোদিন হয়ত লেকের ধারে গিয়া একাই বসিয়া থাকে, কখনো-বা আমাদের বন্ধু-মিলনের বাধাবিহীন বৈঠকখানায় আসিয়া নিঃশব্দে চা এবং চুরুটের সৎকার করিতে থাকে।

কার্পেট-পাতা প্রকাণ্ড ফরাসে বন্ধুরা রোজকার মতো সেদিনও অমনিই যে যার ইচ্ছামতো বসিয়া গান গাহিতেছে, তাস পিটিতেছে। রথীন গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়াই বোধ-করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সুবিনয় বিমলকে প্রেমের গল্প বলিতেছে, অজয় অ্যাক্‌টিংয়ের নামে চীৎকার করিতেছে, আমি অন্যমনস্ক ভাবে খবরের কাগজের পাতা উল্‌টাইতেছি এবং পাঁচু চা খাইতেছে।

এমন সময় সমীরণ ঘরে ঢুকিতেই বিমল সোল্লাসে চীৎকার করিয়া কহিল, 'আরে এসো, এসো পবন-নন্দনের পিতৃদেব, তুমি নইলে জমে!'

অর্দ্ধস্বগতভাবে অস্ফুটকণ্ঠে পাঁচু বলিয়া উঠিল, 'হুঁ, এইবার ষোলকলা পূর্ণ হ'লো।'

ব্যস্তসমস্তভাবে সমীরণ বলিয়া উঠিল, 'এই, চা, চা শীগ্‌গির এককাপ!'

তারপর আমার কাছে বসিয়া পড়িয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, 'কদিন আসো নি যে? অনেক কথা ছিল।'

সুবিনয় কহিল, 'এই অজয় অ্যাক্‌টিং থামা, হ্যাঁ, সমীরণ একটা কবিতা আরম্ভ করে' দাও।'

পাঁচু কহিল, 'মাইণ্ড্ দ্যাট্, ওন্‌লি ওয়ান্।'

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া সমীরণ একবার সোজা হইয়া বসিল। তারপর তাহার ধীর, গম্ভীর, সুস্পষ্ট উচ্চারণ, সমস্ত বায়ুমণ্ডলে ধীরে ধীরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছড়াইয়া পড়িল।—

"তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে,
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হ'য়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায়রে বাসর ঘর,
বিরাট্ বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ঙ্কর!
তবু সে যতই ভাঙেচোরে,
মালা-বদলের হার যত দেয় ছিন্নভিন্ন করে',
তুমি আছো ক্ষয়হীন,
অনুদিন;
তোমার উৎসব,
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।"

* * * *

কবিতার বাণী-রূপ কখনো দ্রুত, কখনো ধীর-মন্থর, কখন-বা তীক্ষ্ণ, তীব্র হইয়া উঠিতেছে। সমীরণের উদাস, বিশাল চোখ দুইটি অসামান্য দীপ্তিতে বিস্ফারিত, উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! সতেজ কণ্ঠস্বর ছিন্নকণ্ঠ পাখীর ডানা ঝাপটানির মতো ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।—

"হে বাসর ঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।"

সমীরণকে দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করিতে হইল না।

পাঁচু বিরসমুখে বলিয়া উঠিল, 'এই শেষ কিন্তু।'

মৃদু হাসিয়া সমীরণ তখন সুরু করিয়া দিয়াছে—

"মনে পড়ে, কত রাতে,
দীপ জ্বলে জানালাতে,
বাতাসে চঞ্চল;
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কি বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল!
সে-রাতে তোমার মালা বলেছে মর্ম্মের কাছে আসি',
'আমি ভালোবাসি।"

কবিতা শেষ হইতেই পাঁচু চাকরটাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'এই ভালো করে' এক কাপ কোকো নিয়ে আসবি। উঃ, বাপ্‌রে!'

পাঁচুর ভঙ্গি দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

সমীরণ শুধু কহিল, 'পাঁচু ইজ্ অ্যাড্‌মিরেব্‌ল্!'

চোখ পাকাইয়া পাঁচু বলিল, 'নয় কেন শুনি?

হাসিয়া সমীরণ বলিল, 'বা-রে আমি কি তাই বললাম নাকি?'

তারপর আমার কানে-কানে কহিল, 'এই ওঠো, দরকার আছে তোমার সঙ্গে।'

এত হট্টগোলেও রথীনের ঘুম ভাঙে নাই। বলিলাম, 'এই রথীনকে দেখো।'

সকলে রথীনের দিকে তাকাইতেই, সেই অবসরে উঠিয়া পড়িলাম। পাঁচু কিন্তু দূর হইতে বলিতে লাগিল,—'হোটেলে যাচ্চ ত' মাইরি, আচ্ছা, দেখলুম।'

পেটুক বলিয়া পাঁচুর খ্যাতি আছে। হরদম্ চা খাইয়া খাইয়া পেট ঢাক হইয়া উঠিয়াছে, তবু কিছুতেই 'না' বলিবে না। বলে, 'দিয়ে যাও, আর দেখে যাও, 'গিরি-গোবর্দ্ধন'কেও ঠাঁই দিতে পারি জঠরে।'

বড় রাস্তা হইতেও বৈঠকখানার উচ্চহাসির শব্দ শুনিতে পাইলাম।

সমীরণের একখানি ডায়েরি আমার কাছে ছিল। কিছু-কিছু বাদ দিয়া এইখানে সেটি সাজাইয়া দিলাম।

'তিথিটা বোধ করি দশমী কি একাদশী হইবে। প্রত্যাসন্ন পূর্ণিমার চাঁদ তখন আকাশের প্রায় মাঝখানে দাঁড়াইয়া বহুদূর পৃথিবীর উপরে রূপালি জ্যোৎস্নার একটি চঞ্চল, করুণ রেখাপাত করিয়া চলিয়াছে। মেশিন্, কল-কারখানার ঘর্ঘর-শব্দে জর্জ্জরিত, পিচে আর ইস্পাতে মোড়া মহানগরীর নাড়ী এখন ধীরগতিতে স্পন্দিত, অপার স্তব্ধতায় যেন ঝিমাইতেছে। শরৎকালের স্ফটিকস্বচ্ছ লঘু মেঘ, ছায়াপথে আর পৃথিবীতে একটি অপরূপ ইন্দ্রজাল বুনিয়া চলিতেছে। শিয়রের জানালা খোলা, মাঝে-মাঝে এলোমেলো হাওয়া ধীরে-ধীরে বহিতেছে, স্তিমিত প্রদীপের একটি কম্পমান্, স্নিগ্ধ ছায়া ঘরের দেয়ালে পড়িয়া কাঁপিয়া যায়, শুভ্রসুকোমল বিছানায় অর্দ্ধশায়িতভাবে সমীরণ, হাতের বইখানির দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি রাখিয়া, দরজার দিকে কান পাতিয়া স্তব্ধ নিশ্বাসে জাগিয়া আছে। মনের মধ্যে তাহার অজস্র কথার ভিড়, স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডে ঐশ্বর্য্যের দীপ্ত সমারোহ, শিরা-তন্ত্রীতে মাধুর্য্যের প্রখর পিপাসা! মধ্যরাত্রির নিঝুম নীরবতাকে মুখর করিয়া এইবার বুঝি বেণুর হাতের দুটি শিথিল কাঁকণ বাজিয়া উঠিবে! কিন্তু সে যে বিরাট্ পরিবারের নববধূ, সে ত' শুধু একমাত্র তাহার নিজেরই নয়,—সকলের স্নেহ আর আদরের দাবী মিটাইয়া যখন সে সত্যই আসিল, তখন সমীরণের অধীরতা বোধ করি সীমা অতিক্রম করিতেছে! পায়ের শব্দ পাইয়াই সে তখন চুপ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

কিশোরী বেণুর চোখ দুইটি তখন গভীর ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছে। সবার অলক্ষ্যে, চুপি-চুপি যেন চোরের মতো ঘরে ঢুকিয়া সে আস্তে-আস্তে খিল বন্ধ করিল। তারপর, নিতান্ত সঙ্কোচে, সমীরণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কোলের উপর একটি পা ধীরে-ধীরে টানিয়া লইয়া তাহার সেই পেলব কোমল হাতটি বুলাইতে সুরু করিল। অজস্র সেই কথার ভিড়, কোন্‌দিক দিয়া যে হারাইয়া যায় সমীরণ বুঝিতে পারে না, বিহ্বলের মতো হঠাৎ সে উঠিয়া বসিয়া বেণুর হাতদুটি ধরিয়া ফেলে। লজ্জারুণ বাসনার একটি কোমল আবেগে, সরমকুণ্ঠিতা নববধূ বেণুর আপাদমস্তক থরথর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

সস্নেহে সমীরণ কহিল, 'তোমার খুব ঘুম পেয়েছে, না?'

একটা দম্‌কা বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া গিয়া চঞ্চল জ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে বেণু অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, 'হুঁ।' বেণুর সেই অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠস্বর সেই আমোদিত-অন্ধকার ঘরটিতে মূর্চ্ছিত হইয়া উঠিল। খোলা জানালার নীচ হইতে শিশির-সজল মাঠের একটি অজানা গন্ধ ভাসিয়া আসিল।

স্পর্শ-ভীরু, কিশোরী বেণুর, আরক্তিম মুখের, প্রদীপ্ত মধ্যমণির মতো স্ফুরিত ওষ্ঠাধর তখন অচেনা আনন্দে জ্বলিয়া উঠিতেছে,—সমীরণের মোহরঙীন্, স্বপ্নময়, একাগ্র চোখের দৃষ্টি সেখানে স্থির-নিবদ্ধ! পিঠের উপর একরাশ কালোচুল সামলাইতে না পারিয়া বোধ করি কোনোরকমে সে একটি শিথিল খোঁপা জড়াইয়া লইয়াছে। অর্দ্ধ-মুদিত চোখদু'টি তাহার ছোট হইলেও মনে হয়, যেন অতলস্পর্শ স্বচ্ছ সরোবরের উপরে বঙ্কিম ভ্রূর একটি অঞ্জন-রেখা আকর্ণপ্রসারিত!

মুগ্ধের মতো সমীরণ কহিল, 'আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ, বেণু?'

মোহময় ঘুমের রাজপুরীর পথে বেণুর তন্দ্রাতুর চোখদুটি বোধ করি তখন ধীরে-ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। কোমল কণ্ঠস্বর টানিয়া টানিয়া আবিষ্টের মতো সে বলিল, 'হুঁ...'

সমীরণের রোমাঞ্চিত দেহ ধীরে-ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে রিম্‌ঝিম্ করিয়া যেন বীণার তারের মতোই বাজিয়া উঠিল।

* * *

এমনি করিয়াই দুইটি বৎসর কাটিয়াছে। প্রত্যেকটি দিনের উদয়াস্তের গান এই একই সুরে বাঁধা; কখনো প্রাত্যহিক সংসার-সংগ্রামে, ভাঁটার স্রোতে জীবনের রঙ ধূসর হইয়া আসিয়াছে, আবার কখনো হয়ত' কোটালের বানে হৃদয়ের দুই তীর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সমীরণের ঘরে আসিয়াছে একটি নূতন অতিথি,—বেণুর কোলে ফুটফুটে একটি শিশু। বেণুর মুখে-চোখে দিব্যজ্যোতি বিকশিত করিয়া একটি অপরূপ লাবণ্যের মহিমা জাগিয়া উঠিয়াছে! চঞ্চল, কালো চক্ষুতারায় স্থির-গভীর একটি তৃপ্তি উদ্ভাসিত!

অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেদিন তাহাদের সেই বিরাট সংসারটি, উৎসবের উচ্চ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেটিকে কে যে কোথায় রাখিবে তাহার দিশা পাইতেছে না, ভোর হইতে প্রায় দুপুর গড়াইয়া আসিল, কাড়াকাড়ির আর শেষ নাই। মাসীর কোল হইতে পিসী, আবার পিসীর কোল হইতে মামী। টানা-টানা চোখদুটি তাহার ঢলঢল করিতেছে! মাখনের মতো কোমল, ছোট ছোট পা দুইটি ছুঁড়িতেছে,—আর রক্তের মতো লাল, পাত্‌লা দুটি ঠোঁটে, প্রস্ফুট গোলাপের মতো দুটি গালে, মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। নিটোল, মসৃণ গলার রেখায় সরু সোনার হারটি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, হাতে তারের বালা, পায়ে রূপার তোড়া!' ছোট একটি লাল সিল্কের কাপড় কোমরে গিট দিয়া বাঁধা। চুমায় চুমায় কচি গালদুটি একেবারে ডালিমের মতো রাঙা হইয়া গিয়াছে, তবু হাসিতে ছাড়িবে না। চুমা খাইলেই খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতে থাকিবে। কাঁদিতে একরকম জানে না বলিলেই হয়।

—'বাবা রে বাবা, কি হাত-পা ছোঁড়ার বহর দেখেছ? আবার হাসি দেখেছ খিল্‌খিল্ করে'? ও-ও-অ-রে, দেখ্‌বি? ···ওমা, তবুও হাসচে দেখো না! পেটে-পেটে কি বুদ্ধি!'

—'হবে না?···না ভাই বেনি, সমীরবাবু একেবারে সেই সক্কাল থেকেই ডুব মারলেন, নেমন্তন্ন করে' এনে,···এ আমরা সইব না বলে' দিচ্ছি।'

কোনো জবাব না দিয়া বেণু টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সকালবেলাই সমীরণ টহল দিতে বাহির হইয়াছিল। অনেক বেলায় ফিরিয়া ওদিকে নীচে সে তখন চুপি চুপি স্নান করিয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে, 'যা হয়েছে, তাই দিয়েই দাও দিকি পিসীমা, এইখানে। এখুনি আবার আমায় বেরুতে হবে।'

পিসীমা কহিলেন, 'সে কি রে, আজও তোর ঐ সব গুলো—'

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বিভার আবির্ভাব!

—'এই যে, মশায়ের কি আক্কেল বলুন ত'? একদিনের অতিথি আমরা·· নিন্,···খেয়ে নিন্, আমি পাহারা দিচ্ছি। সকাল বেলায় পালানোর শাস্তি আপনার পাওনা আছে। এবং সে-শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে।'

সমীরণ কাতরভাবে কহিল, 'আজকের দিনটা দয়া করে', নিজগুণে মার্জ্জনা করবেন না? আমার আবার এখুনি একটা এন্‌গেজমেণ্ট...'

বিভা বোধকরি মনে মনে একটু আহত হইয়াই সহসা জবাব দিতে পারিল না। তারপরই জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, 'উঁহু, কিছুতেই না, আপনার অপরাধ গুরুতর।'

দোতলা হইতে মালতীর আওয়াজ পাওয়া গেল।— 'তোমার জন্যে আমাদের গানের আসর মাটি হচ্ছে বিভাদি, শীগ্‌গির···'

বিভা বলিল, 'যাচ্চিরে, একটু সবুর কর্। আসামী হাজির। হ্যাঁ, আপনি শেষ করেই ওপরে চলে' আসুন,—তা' না হ'লে বন্ধু-বিচ্ছেদ অনিবার্য্য।'

বিভার পাহারা হইতে মুক্তি পাইয়াই সমীরণ উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়াই সে বাহির হইতেছে, সদর দরজায় পিওনের সঙ্গে দেখা। খামের চিঠি, উপরে তাহারই নাম লেখা। সুসংবাদ!—সত্তর টাকা মাহিনার সেই কাজটি তাহার হইয়াছে।

উল্লাসের আবেগে সমীরণ অধীর হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, আশ্চর্য্য, এতদিন ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়াও যা' হয় নাই, হঠাৎ আজই ··? আজ সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল? বেণুর, নিশ্চয়ই! মনে-মনে সে একবার বেণুকে স্মরণ করিল। সমস্ত শরীর তার প্রজাপতির মতো হাল্‌কা হইয়া গেছে। পনেরো মিনিটের পথ সে পাঁচ মিনিটেই পাড়ি দিয়া রথীনের দরজায় গিয়া হাঁকিল, 'কৈ হে, চলো, চলো।'

*　*　*　*

বাস্তব-সত্যের উপরে কাহারও হাত নাই, সে স্থির, নিশ্চিত এবং ধ্রুব। কল্পনাকে টানিয়া আনিয়া সত্য ঘটনার মধ্যে মিলাইয়া দিতে হইবে।

মাসখানেক পরে সমীরণ হঠাৎ একদিন দারুণ জ্বর লইয়া অফিস হইতে ফিরিল। রাত্রি তখন প্রায় আটটা, ফিরিবার পথে, সঙ্কীর্ণ গলির টিম্‌টিমে গ্যাসের আলোটা যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া হারাইয়া যাইতেছে, দৃষ্টির সুমুখে তাহার একটা ভীষণ কালো ছায়া, ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে। সামনের মুদীর দোকানে যুধিষ্ঠিরের রামায়ণ-পড়ার একটানা সুর ঠিক মতো যেন কানে আসিয়া লাগিতেছে না। 'হরলিক্‌স্‌'টি হাতে করিয়া কোনো রকমে সে সূচীবিদ্ধ শরীরটিকে বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য উত্তাপ, কপালের শিরা তাহার দারুণ যন্ত্রণায় দপ্‌দপ্‌ করিতেছে। সকলের অলক্ষ্যে সমীরণ ধীরে-ধীরে তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সমীরণের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বেণুর জানা। এবং সন্ধ্যা হইতেই সেই পরিচিত পদশব্দটির দিকে তাহার সমস্ত শ্রবণ-মন উন্মুখ হইয়া থাকে।

চুপি-চুপি ঘরে ঢুকিয়া সে সমীরণের চোখের দিকে চাহিয়াই অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিল, চোখ দুইটি তাহার অসম্ভব লাল হইয়া উঠিয়াছে, এক-রকম কাতর-শব্দে শুষ্ক ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। কপালে একটি হাত রাখিয়াই সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁগা, একি, অ্যাঁ · ইস্ গা যে একেবারে পুড়ে' যাচ্ছে।...'

এই আকস্মিক দৃশ্যের আঘাতে মুখ দিয়া আর তাহার কথা বাহির হইল না।

সমীরণ তখন জোর করিয়া ম্লান হাসিয়া ছেলেটির গালে একটি টোকা মারিয়া বলিতেছে, 'কে রে !......'

তার পরদিন হইতেই বাড়ীটি এক ভয়াবহ আতঙ্কে সারাক্ষণ থম্‌থম্ করিতে থাকে। একটি অস্বস্তিকর চাপা স্তব্ধতা,—সকলেরই বুক ভীষণ পরিণামের দিকে তাকাইয়া দুরদুর করিতে থাকে। পা টিপিয়া টিপিয়া, যেন কলের পুতুলের মতো, নিশ্বাস রোধ করিয়া কাজ করিয়া যায়।

বেণুর আলুথালু রুক্ষ কেশ,—দিশাহীন দৃষ্টি! ফুট-কমলের মতো সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখে কে যেন অমাবস্যার গাঢ় কালিমা লেপিয়া দিয়াছে। মুখে কথা নাই, লজ্জাসঙ্কোচ ভুলিয়া রুগ্ন স্বামীর মুখের দিকে সে অর্থহীন, অপলক চোখে পাগলের মতো চাহিয়া থাকে। ছেলেটি কোথায়, কেমনভাবে রহিয়াছে, তাহার খেয়াল পর্য্যন্ত নাই।

পাশের ঘর হইতে পিসীমা আর থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তারবাবু চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি রোগী ফেলিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন।—'দেখুন, আপনাদের এখন থেকেই এ রকম অধীর হ'লে কোনোদিক দিয়েই ফল হবে না। যথাসাধ্য ত' করছি, তারপর—'

ঠোঁট চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, 'আপনি ত' সবই জানেন ডাক্তার বাবু, ওই ছেলেটার ওপরেই আমাদের সব—।'

ডাক্তারবাবু মুখ ফিরাইয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, শ্বাস যতক্ষণ আছে, চেষ্টার অতিরিক্তও আমরা করবো।'

ওদিকে অনর্গল প্রলাপ চলিতেছে,—জীবনের কত অপূর্ণ সাধ ও বাসনার টুক্‌রা টুক্‌রা ইতিহাস! কাঁচা সোনার মতো সমীরণের উজ্জ্বল গায়ের রঙ, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ কদিনের মধ্যে আজ শুধু স্মৃতি হইয়া গেছে। বিবর্ণ, বিশীর্ণ, পাণ্ডুর মুখে একটি বিষাদ-করুণ ঘনায়মান কালো ছায়া; আশার সমাধি, ঐশ্বর্য্যের অবসান! কৈশোর-স্বপ্নের মোহ-মদির কল্পনার ছবি ম্লান, ধূসর হইয়া আসিয়াছে। ঘোলাটে চোখের উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া এইবার সমীরণ স্মৃতির বন্ধ দরজায় কাহাকে যেন খুঁজিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাহিরের মাঠে রাতের বাতাস তখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় যেন হঠাৎ একটা রাত-জাগা পাখী চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘরে তখন সবাই পরিশ্রমে, অবসাদে তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়িয়াছে। সমীরণের সে চাহনির অর্থ বেণু বোধ করি বুঝিল। বুকের মধ্যে তখন তাহার দারুণ শোকের আসন্ন-দারুণ ঝড় হাহাকার করিয়া জীর্ণ পাঁজরাগুলা যেন ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতেছে। তবু সে ধীরে-ধীরে স্বামীর মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অস্ফুট-বিদীর্ণ কণ্ঠে কহিল, 'এই যে আমি, ওগো, দেখতে পাচ্ছ না আমাকে, কি বলচো, বলো···বলো।'

সমীরণের বুক ঠেলিয়া একটি হতাশ, অসহায় হাসি ঠোঁটের ফাঁকে ভাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ স্মৃতির বিদ্যুৎ-চমকের মতো বেণুর চোখে জাগিয়া উঠিল, সমীরণের সেই সুদীর্ঘ-সুন্দর সুকুমার দেহ, খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া এই সেদিনও সে ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়াছে—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে !'

সেই দুর্লভ সুর-ঝঙ্কার এখনো যেন তাহার কানের কাছে অবরুদ্ধ ক্রন্দনের মতো গুমরিয়া উঠিতেছে।

সমীরণ কথা কহিল না, জোর করিয়া মুখ বুজিয়া ধীরে-ধীরে শুধু একবার মাথা নাড়িল মাত্র।

তারপর হঠাৎ একসময় কখন তাহার নিষ্প্রভ চোখের তারা দু'টি উলটাইয়া মরণ-যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর ঝাঁকাইয়া, মুখের পেশী বিকৃত করিয়া ছটফট করিতে করিতে সমীরণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। প্রাণকে দেহে ধরিয়া রাখিবার প্রবল চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইল,—সে-দৃশ্য দেখিবার আগেই বেণু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে !

* * *

বেণুর অস্পষ্ট চেতনায় বাসর-ঘরের স্মৃতি ছায়াছবির মতো ভাসিয়া উঠিতেছে ! বাসর-রাত্রির উন্মদ-গন্ধ কুসুমের অজস্রতার মধ্যে, ধূম-ধূমে শিহরিত পালঙ্কে, নববধূর নিবিড় দুটি কালো চোখে কৈশোর-স্বপ্নের মদির মোহাবেশ,—স্বপ্নের মতোই ধীরে-ধীরে আবার মিলাইয়া যাইতেছে !

শবযাত্রীর মর্ম্ম-ভাঙা কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া উঠিয়া সে প্রশান্ত দৃষ্টিতে শেষবার স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার কেমন যেন মনে হইতে লাগিল,—আশ্চর্য্য, কপালে চন্দনের দাগ, সেই অজস্র ফুলে-ফুলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, চোখ দুটি গভীর ঘুমে মুদিত · মানাইয়াছে চমৎকার !

সমব্যথিতা প্রতিবেশিনীর দল অবাক্-বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, মেয়েটা ত' কাঁদিল না, উন্মাদিনীর মতো আছাড় খাইয়া চীৎকার করিয়াও উঠিল না। ছেলেটা যেন কাহার কোলে ছিল, হাত বাড়াইয়া বুকের উপর তাহাকে টানিয়া লইয়া, নিশ্চেতন, নিষ্পলক-চোখে পাষাণ মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া শবযাত্রীদের গমন-পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর যখন আর দেখা যায় না, ধীরে-ধীরে সে একবার ছেলেটির মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল···কিন্তু ছেলেটা যে এখনো বাঁচিয়া আছে !

রূপ ও তৃষ্ণা

—শ্রীকৃষ্ণধন দে

রূপসি, তোমার কালো এলোচুলে কিসের গন্ধ ভাসে ?
রজনী গন্ধা ?·· হবে !
রূপসি, তোমার কোন্-সে বেদনা কাঁপিছে দীর্ঘশ্বাসে
বন-মর্ম্মর-রবে ?
নিশীথের বুকে হা—হা করে ঝড় উদ্বেল নদীকূলে
ভেঙ্গে পড়ে দুই পাড়,
বনের আড়ালে দশমীর চাঁদ তন্দ্রায় পড়ে ঢুলে,'
ঘনায় অন্ধকার ;
বেতের লতায়-ঘেরা দুই তীর, সাপেরা তুলেছে ফণা,
কেঁদে ওঠে শরবন,
জোনাকির সারি পাতায় পাতায় ছড়ায় আগুন-কণা,
বনতল নির্জ্জন ;

মাথার উপরে কাঁপে ছায়াপথ, আকাশ হয়েছে কালো,
ডুবে গেছে চাঁদ কবে,
রূপসি, তোমার নয়নে জ্বলিছে ও কী কামনার আলো
হাজার বছর হবে !

রূপসি, তোমার পিছনে কাঁদিছে আদিম যুগের মায়া
সীমাহীন কোন্ পথে,
কবে দিনশেষে পড়েছিল আসি' সোনার গোধূলি-ছায়া
অরণ্য-পর্ব্বতে।
সন্ধ্যার মেঘে জ্বলে' ওঠে দূরে নীল সাগরের গায়
অগ্নিগিরির শিখা,
কোন্ ঋত্বিক গগন-ললাটে নবযুগ-সূচনায়
পরাল যজ্ঞটীকা !

সেদিন তোমার সারাদেহে কাঁপে যৌবন লাজহীন,
কাঁপে দু'টী কালো চোখ,
সন্ধ্যা-তারার ইঙ্গিতে জাগে গোধূলির ছায়ালীন
অলস চন্দ্রালোক!
ঘন কুন্তলে ঝরে' পড়ে আজো অজানা রাতের ফুল
অজানা গন্ধ মাখি',
রূপসি, তোমার কণ্ঠে কুহরে আজো চির-তৃষাকুল
অজানা বনের পাখী।

রূপসি, তোমায় দেখিয়াছি কবে কোন্ পিরামিড্-তলে
চিরমরুমরীচিকা!
কোন্ ফারায়োর শবদেহ পাশে রহিয়া রহিয়া জ্বলে
জীবন্ত রূপশিখা।
নিশ্বাস তব আজো ভেসে আসে কত শতাব্দী-পারে
কবরী-গন্ধ-সাথে,
নীলনদতীরে আজো চলে "মমি" বিস্মৃত অভিসারে
স্তব্ধ গভীর রাতে!
রূপসি, তোমার অধরে আজিও ও-কী উল্লাস কাঁপে
যুগযুগান্ত ধরি'?
আজো নিখিলের তৃষ্ণা কাঁদিছে কা'র রূঢ় অভিশাপে
কত দিবা শর্ব্বরী!
বুকের উপরে কৃষ্ণ-সর্পী তুলিয়া রয়েছে ফণা
গরল-সিক্ত-মুখে,
নয়নে তোমার হাজার যুগের জ্বলিছে অগ্নিকণা
মরণের কৌতুকে!

রূপসি, তোমায় দেখিয়াছি কবে ক্ষীণতোয়া রেবাতীরে
—দেখিয়াছি নীপবনে,
কুরুবক-মালা কাঁপিছে তোমার কালো কুন্তল ঘিরে'
উন্মদ সমীরণে!

মুক্তার মালা সুরভি হয়েছে বক্ষের পরিমলে
কানে দোলে উৎপল,
কালো আঁখিদিঠি ভ্রমরের মত ক্ষণে ক্ষণে উড়ে' চলে
ভ্রূবিলাস-চঞ্চল!
রূপসি, তোমায় দেখেছি আবার রজনীর অভিসারে
কবে কোন্ নগরীতে,
পারাবতগুলি মুখে মুখ দিয়া ঘুমায় অন্ধকারে
মেঘভরা রজনীতে!
পৌরভবন-ছায়ার আড়ালে বিদ্যুৎ-আঁকা পথে
জেগে ওঠে কোন্ তৃষা,
কোন্ বিরহীর অশ্রুনদীর সীমাহারা সৈকতে
হারায়ে ফেলেছ দিশা।

রূপসি, তোমার কালো এলোচুলে কিসের গন্ধ ভাসে,
রজনী গন্ধা?···হবে!
আজি বরষার আর্দ্র বাতাসে কত কথা মনে আসে,
দেখা হয়েছিল কবে!
কত শতাব্দী ডুবে গেছে কোন্ অতীত অন্ধকারে
যুগে যুগে দেশে দেশে,
কত জনমের তৃষ্ণা কাঁদিছে অস্তমেঘের পারে
তোমারেই ভালবেসে!
আরো কাছে এস,—চেয়ে দেখ এই রাত্রি গভীর হো'ল
—আজি শেষ অনুনয়,
ঝরা-বকুলের পথটিতে আজ গুণ্ঠনখানি খোল'
—বল তব পরিচয়!
বল আজি এই অসীম তৃষ্ণা অসীম আকাশ-তলে,
কোথা পাবে তা'র পথ?
রজনীগন্ধা-সম ফুটিবে কি! ওই কালো কুন্তলে
অজানা ভবিষ্যৎ?

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কীর্ত্তি-কাহিনী

জাপানের দুটি মেয়ে

তখন জাপানে ভগবান বুদ্ধের অহিংসা-ধর্ম্মের বাণী সবে মাত্র প্রচারিত হচ্ছে। সেই সময় সে-দেশে একজন বিখ্যাত শিকারী ছিল। তার তীরের সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে, এমন কোনও প্রাণী সেই চেরী-কুসুমের দেশে ছিল না—এই ছিল তার প্রধান গর্ব্ব। অহেতুক প্রাণী-হত্যায় তার ছিল অফুরন্ত আনন্দ।

ঘরে তার আলো করে ছিল, দুটি মেয়ে। দু'বোন যেন দুটি চন্দ্রমল্লিকা। জ্যোৎস্নার সাগরে স্নান করে তারা যেন সদ্য এই পৃথিবীতে পা দিয়েছে—এমনি ছিল তাদের দেহের কান্তি।

শিকারী পিতার দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে তাদের অন্তরে এসে পৌছেছিল ভগবান বুদ্ধের অহিংসা-বাণী। পিতার সেই নিত্য প্রাণী-হত্যার ব্যাপারে তাদের অন্তর সারা রাত ধরে কাঁদতো। আকুল হয়ে ভাবতো, কি করে রোধ করা যায় এই অন্যায়ের ধারা।

একদিন শিকারীর এক বন্ধু এসে খবর দিল যে তাদের বাগানের মধ্যে বড় পুকুরটার ওপারে রোজ রাতে দুটি অদ্ভুত সাদা রঙের পাখী আসে—কিছুতেই তাদের বধ করা যাচ্ছে না। ধনুকে তীর বসাতে না বসাতেই, তারা যেন বুঝতে পারে, অম্‌নি উড়ে চলে যায়। চাঁদের আলোর জোয়ারে একজোড়া সাদা চন্দ্রমল্লিকা যেন পাপড়ি মেলে ভেসে চলে যায়।

ধনুকের উপর ভর দিয়ে শিকারী হেসে বলে, তোমাদের হাত এখনও অপটু! তোমাদের দিয়ে কি রাতে পাখী শিকার চলে? আজ পূর্ণিমা—আমি নিজে যাব, দেখি পাখী বিঁধতে পারি কি না!

আড়াল থেকে দুটি বোন সমস্ত কথা শুনলো। শুনলো পাখী দুটো চলে যায়, যেন চাঁদের আলোর জোয়ারে এক-জোড়া শাদা চন্দ্রমল্লিকা পাপড়ি মেলে ভেসে চলে যায়।

পূর্ণিমার রাত্রি। পুকুরের একপারে ধনুক হাতে শিকারী দাঁড়িয়ে—কখন আসে সেই রাতের শাদা পাখী। শিকারীর কান হঠাৎ দূরে শুনতে পেলে শুক্‌নো পাতার উপর নীরবে-চলে-আসার শব্দ। ধনুকে বিষ ভরা বাণ তুলে নিল। এমন সময় পূর্ণ চাঁদের আলোয় দেখা দিল একজোড়া শাদা পাখী—যেন জমাট বাঁধা খানিকটা চাঁদের আলো।

দেখতে দেখতে ধনুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো এক-জোড়া বিষ-ভরা বাণ। ওপারে পুকুরের ধারে আজ আর উড়ে যেতে পারলো না রাতের পাখী তার সাদা ডানা মেলে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মশাল জেলে শিকারী এগিয়ে গিয়ে দেখে, কোথায় রাতের শাদা পাখী, এ যে তারই মেয়ে দুটি, বুকে বেঁধা তারই ছোঁড়া বিষের বাণ!

শিকারীর হাত থেকে পড়ে গেল ধনুক।

জগতের প্রথম বিমান-যাত্রী

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে একদিন শীতকালে দুটি ফরাসী ছেলে রাত্রিবেলায় ঘরের ভিতর বসে এক অদ্ভুত খেলা খেলছিল। একটা কাগজের ব্যাগে ধোঁয়া পুরে তারা দেখছিল, ব্যাগটা ওপরে ওঠে কিনা! ছেলে দুটি দু'ভাই। তাদের নাম হলো জোসেফ এবং ষ্টিফেন মণ্টগল্‌ফার। তাদের এই খেলা থেকে প্রথম বেলুনের সৃষ্টি সম্ভব হয়।

জগতে যারা কিছু নতুন সৃষ্টি বা আবিষ্কার করে, তারা ছেলেবেলা থেকেই সজাগ জিজ্ঞাসু থাকে। চিমনী থেকে আকাশের দিকে ধোঁয়া উঠতে দেখে দুই ভাইএর মনে প্রশ্ন জাগে, ধোঁয়া কেন ওপরের দিকে ওঠে? পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই ওর মধ্যে এমন একটা কিছু শক্তি আছে, যা তাকে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সেই শক্তিটাকে কোন রকমে মানুষের কাজে লাগান যায় না?

কাগজের বেলুন তৈরী করে, তাই তারা দেখছিল, বেলুন ওপরে ওঠে কি না। ঘরের ভেতর এত ধোঁয়া জমা হয়েছিল যে, খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাইরে বেরুতে লাগলো। পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখেন, মণ্টগল্‌ফারদের বাড়ী থেকে ভীষণ ধোঁয়া উঠছে। আগুন লেগেছে মনে করে, বৃদ্ধ ছুটে এসে দেখেন, ঘরের মধ্যে এক রাশ ধোঁয়ার মধ্যে তারা দুই ভাই বসে বেলুন ওড়াবার চেষ্টা করছে।

বহু চেষ্টার পর তারা পরমানন্দে দেখলো যে বেলুন ঘরের ছাদে গিয়ে লাগলো। সেই ছোট্ট ব্যাপারটার মধ্যে একটা মস্ত বড় আবিষ্কারের ব্যাপার লুকিয়ে আছে আশা করে তাদের দুই ভাই-এর বুক আনন্দে দুলে উঠলো। তারা ভাবলো যে নিশ্চয়ই কোনো নতুন ধরণের গ্যাস সৃষ্ট হয়েছে, যার বলে বেলুন মাটী ছেড়ে আকাশে উঠেছে। তখন তারা জানতো না যে আগুনের তাপে বায়ু বিস্তার লাভ করে এবং এই রকম উত্তপ্ত বায়ুর স্বভাবই হচ্ছে উর্দ্ধগ হওয়া।

এই ঘটনার পর তারা দুভাই ধোঁয়ায় বেলুন ভরে প্রকাশ্য ভাবে ওড়াতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তখন বেলুন খুব বেশী দূর উঠতো না। এই সময় হেনরী ক্যাভেণ্ডিস্ হাইড্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। এই নতুন গ্যাসের গুণ হলো এ খুব হাল্কা। তখন ধোঁয়ার বদলে এই গ্যাস বেলুনে ভরে পরীক্ষা হতে লাগলো।

মণ্টগলফার দুই ভাই এই নতুন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করে কৃতকার্য্য হলেন। তাঁরা বৃহৎ একটা বেলুন তৈরী করে হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরে ছাড়লেন। বেলুনটি সাত হাজার ফিট উঁচুতে উঠলো।

এই ঘটনার পর সমস্ত ফ্রান্সে এই দুই ভাইএর নাম সকলের মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো। আজকে এই ব্যাপারটা অতি সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু সেদিন মাটী ছেড়ে সাত হাজার ফিট উঁচুতে ওঠা মানুষের পক্ষে সত্যিই শুধু কল্পনার ব্যাপার ছিল।

প্যারিসের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের দুভাইকে রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। রাজধানীর লোকের সামনে এই আশ্চর্য্য পরীক্ষা করে দেখাতে হবে।

মণ্টগল্ফার দু'ভাই প্যারিসে এসে একটি অতি সুন্দর বেলুন তৈরী করলেন। বেলুনের সঙ্গে একটা ঝুড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। সেই ঝুড়িতে একটি ছাগল, একটি মোরগ এবং একটি হাঁসকে উঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই তিনটি প্রাণী-শুদ্ধ বেলুন আকাশের দিকে উঠলো।

এই অদ্ভুত ঘটনার ফলাফল দেখবার জন্যে নানা লোকের মনে নানা রকম আশা আর আকাঙ্ক্ষার কথা উঠতে লাগলো। ফ্রান্সের রাজা থেকে আরম্ভ করে দরিদ্র চাষা পর্য্যন্ত এই ব্যাপার দেখতে সমবেত হয়েছেন। সকলেই সেই তিনটি হতভাগ্য প্রাণীর ভাগ্য সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে বেলুনটি যখন মাটীতে নামলো তখন দেখা গেলো যে, ছাগলটি নিশ্চিন্ত মনে ঘাস চিবোচ্ছে,
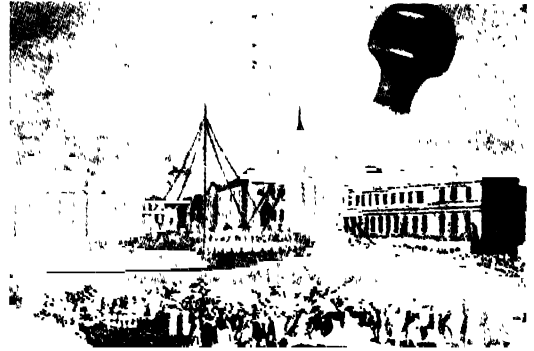
পৃথিবীর প্রথম বিমানযাত্রা (ভেস'াই, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩)।

মোরগটি বিজ্ঞ ভাবে ঘাড় তুলে দেখছে মাটীতে ফিরে এসেছে কি না, হাঁসটি পুকুরের ধারের কাদামাটীর জন্যে অস্থির হয়ে ডাকতে সুরু করে দিয়েছে।

এই তিনটি প্রাণী হলো জগতের প্রথম বিমান-যাত্রী এবং এদের আকাশ পরিভ্রমণ দেখে মানুষ বেলুনে চড়ে আকাশে উঠবার সাহস পেলো।

শেকস্পীয়ার

ইংলণ্ডে ওয়ারউইকশায়ারের অন্তর্গত আভন নদীর ধারে ষ্ট্রাটফোর্ড বলে একটা পুরোনো শহর আছে। পুরোনো জনকোলাহলহীন শহর, লোকজনের তেমন ভিড় নেই— ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র না হ'লে শহরে ভিড় হ'বে কেন? সেখানকার লোকেদের একমাত্র ব্যবসা হচ্ছে—ইট তৈরী করা। অথচ এই সামান্য নগরে প্রতি বৎসর জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৫০,০০০ হাজার করে লোক তীর্থ-যাত্রায় আসে। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়ম শেক্স্পীয়ার এই নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যে সামান্য ছোট্ট ঘরটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—ইংরাজ জাতি তার পবিত্রতম তীর্থের মত করে তাকে রক্ষা করে রেখেছে—আর সেইখানেই প্রতি বছর দেশবিদেশ থেকে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে লোক আসে—সেইখানকার হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষণিকের জন্য তাদের অন্তর ভরে উঠে, যখন ভাবে, এইখানে একদিন

একটি দুষ্টু ছেলে ঘুরে বেড়াত—এইখানে একদিন জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা কৈশোরের আনন্দময় দিন কাটিয়ে গেছেন।

বার্মিংহাম থেকে—ধর, ট্রেণে চড়ে আমরা হেন্‌লে ইন-আর্ডেন ব'লে একটা ষ্টেশনে নামলাম। এইখানেই আমাদের নামতে হবে। ষ্টেশন পেরিয়ে কয়েক শ' গজ দূরে একটা

উইলিয়ম শেক্‌সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬)।

খোলা জায়গা—শেক্‌স্‌পীয়ারের সময় এখানে গরু ঘোড়া ছাগলের হাট বসতো—এখন সেখানে একটা চমৎকার ফোয়ারা রয়েছে—একজন আমেরিকান্ শেক্‌স্‌পীয়ারের জন্মভূমির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দেখাবার জন্যে সেটা তৈরী করে দিয়েছেন—সেইটে পেরিয়ে বাঁ দিকে একটু গিয়ে একটা রাস্তার মোড়ে দেখতে পাবে লেখা রয়েছে—শেক্‌সপীয়ারের নিবাস এই দিকে, To Shakespeare House. সেই রাস্তাটির নাম হ'ল হেন্‌লে ষ্ট্রীট, Henley street. একটু গিয়েই রাস্তার উত্তর দিকে একটা ছোট্ট সেকালের ধরণের বাড়ী—বাইরের দিক থেকে তাকে রীতিমত মেরামত করা হয়েছে। এই বাড়ীতেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার আঠারো বচ্ছর বাস করেছিলেন।

দরজায় বেল টিপতেই সামনের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকবে—মেজেটা ঠিক সেই রকম ভাঙ্গা অবস্থায় আছে—বৈঠকখানার একধারে খোলা আগুন-পোয়াবার জায়গা—আগুন অবশ্য এখন আর নেই। মাথার ওপর চাও, দেখবে কড়িবরগাগুলো এখনও কালো হয়ে আছে—একদিন এই ঘরে আগুন জলতো শুধু তার সাক্ষ্য। এই ঘরটার পেছনেই ছোট্ট একটা রান্নাঘর—তার পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই যে ঘরে গিয়ে পৌঁছবে—সেই ঘরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল জন শেক্‌স্‌পীয়ারের পুত্র উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অতি সামান্য ঘর, কোনও আড়ম্বরের চিহ্ন মাত্র নেই—অথচ এই ঘরটুকু ইংলণ্ডের সব চেয়ে পবিত্রতম জায়গা। দেড়শো বছর ধরে ইংলণ্ডের সব বড় বড় লোক একবার না একবার এই ঘরে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন—একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে—ঘরের দেওয়ালে, দরজায়, চারদিকে, তাঁরা যে এসেছিলেন তাঁর প্রমাণ রেখে গিয়েছেন যে যার নিজের নাম স্বাক্ষর করে এবং সেই স্বাক্ষরগুলি যদি ভালো করে দেখো তা'হলে দেখতে পাবে এই দেড়শো বছরের ইংলণ্ডের অধিকাংশ বড়লোকের স্বাক্ষর সেখানে রয়েছে।

আজ শেক্‌স্‌পীয়ার সম্বন্ধে জগতের বিভিন্ন ভাষায়—(আমাদের বাংলা ভাষা বাদ অবশ্য)—যত বই লেখা হয়েছে তাতে একটা বড় বাড়ী ভরে যেতে পারে—শেক্‌স্‌পীয়ার কশো ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন—তার হিসেব গোণা হয়েছে—(তিনি মোট ১৫০০০ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে গেছেন) তাঁর নাটকের নায়কেরা কে কত লাইন করে কথা বলেছে তারও পর্য্যন্ত হিসেব আছে। হ্যামলেটের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই জানো—শেক্‌স্‌পীয়ারের সমস্ত নায়ক-নায়িকার মধ্যে কবি হ্যামলেটকেই সব চেয়ে বেশী কথা বলিয়েছেন—হ্যামলেটকে সব সমেত ১৫৬৯ লাইন বলতে হয়। প্রধান নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে সব চেয়ে কম কথা বলেছে কর্ডেলিয়া, Cordelia—কিং লিয়ারের, King Lear এর মেয়ে, মাত্র ১১৫ লাইন—শেক্‌স্‌পীয়ার হ্যামলেটকে সব চেয়ে বেশী কথা বলিয়েছেন, আর কর্ডেলিয়াকে সব চেয়ে কম কথা কইয়েছেন. এর মধ্যে একটা তাৎপর্য্য আছে—তোমরা দুটো গল্প পড়লেই আশা করি বুঝতে পারবে। যে-প্রেম তার আশ্রয়-নীড় খুঁজে পেলো না—নীড়হারা বিহঙ্গমের মত সেই তার অন্তরের

ব্যাকুল চীৎকারে নিশীথ অন্ধকারকে বাণী-মুখর করে তোলে— আর যে স্নেহ আত্ম-প্রতিষ্ঠ, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, কথা তার কাছে সব চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিষ। শেক্‌স্‌পীয়ারের সাহিত্য সম্বন্ধে এত-তন্ন তন্ন করে বিচার এবং আলোচনা করা হয়েছে—কিন্তু, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম—শেক্‌স্‌পীয়ারের সম্বন্ধে এত রকম গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না বল্লেও চলে। মাত্র সাড়ে তিনশো বছরের কিছু আগে শেক্‌স্‌পীয়ার জন্মগ্রহণ করে, ছিলেন তবুও তাঁর সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। এমন কি, তিনি যে এই সব নাটক লিখেছিলেন, তার সাক্ষাৎ কোনও প্রমাণ ছিল না। তাঁর হাতে লেখা একখানা নাটকের পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পর থেকে লোকে নিশ্চিন্ত হ'ল যে জন শেকস্‌পীয়ার-এর ছেলেই ডেনমার্কের যুবরাজের অপরূপ কাহিনী লিখেছেন।

তাঁর কৈশোর সম্বন্ধে এইটুকু আমরা জানতে পারি যে, মাষ্টার রোচ, Master Roche বলে একজন শিক্ষকের কাছে বালককালের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন। সে-সময় স্কুলে যে-সব বই পড়া হতো তার নমুনা একটু তোমাদের শোনাচ্ছি। ন্যাচারাল হিষ্ট্রি, Natural History বলে তখন একটা বিষয় ছিল— সেইটেই হলো তখনকার বিজ্ঞান। এই Natural Historyতে কি রকম প্রাণীতত্ত্ব শেখানো হ'ত শোন, "হাতীর রক্ত হ'ল জগতের সব চেয়ে ঠাণ্ডা জিনিষ —ড্রাগনরা তাই যখন তৃষ্ণার্ত্ত হ'ত— তারা হাতীর রক্ত খুঁজত—" এর বেশী বিদ্যা-শিক্ষার কথা শেক্‌সপীয়ার সম্বন্ধে আমাদের আজও জানা নেই—কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে এত বড় জ্ঞানী কবি জগতে আর হয়নি। শেক্‌সপীয়ারের নাটকগুলোকে যদি শিল্পসৃষ্টি—যাকে বলে artএর দিক দিয়ে দেখা না-ও যায়, একথা তবু স্বীকার করতে হবে যে এত বড় জ্ঞান-ভাণ্ডার জগতে আর নেই। যখন তাঁর তেরো বছর বয়স তখন তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হ'ল। হঠাৎ তাঁর বাবার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। তখন ছেলেকে দিয়ে কিছু রোজগারের চেষ্টায় প্রথম তিনি তাঁকে এক মাংস-ওয়ালার দোকানে মাংস বিক্রী করবার একটা কাজ জোগাড় করে দিলেন। কোন কোনও জায়গায় পাওয়া যায় যে, তিনি একজন উকীলের কেরাণীর কাজ করতেন। কিন্তু কি যে করতেন তার সঠিক কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সময় আঠারো বছর বয়সে শেক্‌সপীয়ার অ্যান্ হ্যাথাওয়ে, Ann Hathaway বলে একজন নারীর পাণিগ্রহণ করেন। হ্যাথাওয়ে, তাঁর চেয়ে আট বছরের বড় ছিল।

শেক্‌সপীয়ারের শেষ বাসস্থল : নিউপ্লেস, ষ্ট্রাটফোর্ড।

এই সময় তাঁকে ষ্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে জীবিকা উপার্জ্জনের লণ্ডনে আসতে হয়। অনেকে বলেন যে একটা দুর্ঘটনার জন্যে তাঁকে ষ্ট্রাটফোর্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। ঘটনাটা সত্যিই দুর্ঘটনা, চুরি অপবাদ! ষ্ট্রাটফোর্ডএর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন স্যর টমাস লুসি, তাঁর একটা বড় বন ছিল। সেই বনে স্যার টমাস হরিণ পুষতেন। প্রবাদ এই যে শেক্‌সপীয়ার সেখান থেকে হরিণ চুরি করতেন। একবার তিনি ধরা পড়লেন এবং স্যার লুসি, তাঁকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে আটক করে রাখলেন। ছাড়া পেয়ে শেক্‌সপীয়ার একদিন রাত্রে তাঁর বাড়ীর দরজায় তাঁকে গালাগাল দিয়ে একটা ছড়া লিখে রেখে এলেন। সকালবেলা সেই লেখা দেখে স্যার লুসি, রেগে শেক্‌সপীয়ারকে শাস্তি দেবার জন্য ধরে আনতে লোক পাঠালেন। কিন্তু তিনি তখন লণ্ডনের পথে।

লণ্ডনে এসে একটা সেই সময়ের পুরোনো থিয়েটারে তিনি চাকুরী পেলেন। লণ্ডনে তখন মাত্র দুটো থিয়েটার ছিল—একটার নাম দি থিয়েটর, The Theatre এবং আর একটার নাম দি কার্টেন্, The Curtain—দুটো থিয়েটারই ছিল নগরের বাইরে। সেই জন্যে যে-সব ভদ্রলোক থিয়েটার

দেখতে আসতেন—তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। শেক্‌স-পীয়ারের কাজ হ'ল সেই সব ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করা। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এইভাবে তাঁর নাট্য-জীবনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। তার পর কি রকম ভাবে যে তিনি সাক্ষাৎ ভাবে অভিনেতা হিসেবে রঙ্গালয়ে যোগদান করলেন তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি নিজে নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন এবং অনেকে অনুমান করেন যে, লাভস্ লেবার লষ্ট, Love's Labour Lost হ'ল তাঁর প্রথম নাটক। এই সব নাটক রচনায় তাঁর খ্যাতি এবং অর্থ প্রচুর হ'ল—তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা জানতে পারি যে, ১৬০০ সাল নাগাদ তিনি সেই সময়কার সব চেয়ে বড় যে থিয়েটার গ্লোব, Globe Theatre তাঁর অংশীদার হন। এবং ষ্ট্রাটফোর্ডের সব চেয়ে বড় বাড়ীখানা তিনি কেনেন।

তারপর রঙ্গালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি ষ্ট্রাটফোর্ডে নতুন বাড়ীতে এসে বসবাস করতে থাকেন।

তখন ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ। সেই সময়কার আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার বেন জনসন, Ben Jonson তাঁর বাড়ীতে এসে খুব আমোদ-আহ্লাদে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন। কিন্তু সেই ঘটনার পর তাঁর শরীর একদম ভেঙ্গে পড়লো এবং ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল—ঠিক তাঁর জন্ম-দিনে—তিনি এই ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন।

ষ্ট্রাটফোর্ডের গির্জ্জায় তাঁর দেহ সমাহিত আছে তাঁর কবরের ওপর একটি অদ্ভুত কবিতা লেখা আছে :—

শেকস্‌পীয়ারের জন্মস্থান, হেনলে

Good friend, for Jesus' sake forbear
To dig the dust enclosed here.
Blest be the man that spares these stones
And curst be he that removes
my bones.

যিশুর দোহাই বন্ধু, এই কবরের মধ্যে যে ধূলো পড়ে রইলো তাকে আর খুঁড়ে বার ক'র না। এই পাথরের আবরণ যে না সরাবে সে সুখী হ'ক্, আর যে এই পাথরের আবরণ সরাবে, তা জীবন যেন অভিশপ্ত হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে কবিতাটা শেক্‌স্‌পীয়ারের লেখা নয়।

তিনটি প্রশ্ন

—লিও টলষ্টয়

বহুদিনের কথা। কোন এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজের বিলাস-ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্য ও প্রজাদেরও সুখ-সুবিধার জন্য নানা রকমের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। তাহা কতক ফলবৎ হইত, আর কতক বা নিষ্ফল হইত। একদিন হঠাৎ তাঁহার মাথায় এক খেয়াল জাগিল। তিনি ভাবিলেন—কোন্ কার্য্য কোন্ সময়ে কি প্রকৃতির লোক লইয়া এবং কি প্রকৃতির লোক বর্জ্জন করিয়া আরম্ভ করিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইবে ইহা যদি পূর্ব্ব হইতে জানা যায় তবে কোন উদ্যোগই ব্যর্থ হইবার নহে। আর কোন্ সময়ে কি বা কি কি কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ইহাও জানা খুব আবশ্যক। এই ভাবনা রাজাকে রাত্রিদিন পাইয়া বসিল। অবশেষে তিনি ইহার মীমাংসা জানিবার জন্য তাঁহার রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার এই তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারিবে তাহাকে প্রচুর পুরস্কা

দেওয়া যাইবে। প্রশ্ন তিনটি এই। প্রত্যেক কার্য্যের উপযুক্ত সময় কখন কখন? সেই কার্য্যের পক্ষে উপযোগী লোক কে বা কাহারা? কোন্ সময়ে কি কার্য্য বা কি কি কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়?

প্রচুর পুরস্কারের লোভে অনেকেই প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিতে আসিল। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিল—প্রত্যেক কার্য্যের উপযুক্ত সময় জানিবার অগ্রে প্রত্যেক দিনের, প্রত্যেক মাসের, প্রত্যেক বৎসরের কার্য্যতালিকা পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়া সেই তালিকা অনুসারে দৃঢ়ভাবে চলিতে হইবে। তাহা হইলেই কেবল প্রত্যেক কার্য্য উপযুক্ত সময়ে সাধিত হইতে পারে, নতুবা কিছুতেই নহে। অপর কেহ কেহ বলিল—কোন্ কার্য্য ঠিক কোন সময়ে করা আবশ্যক ইহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট করা যায় না। তবে এই করা যায় যে তুচ্ছ আমোদপ্রমোদে সময় নষ্ট ও চিত্তবিক্ষেপ না করিয়া চোখের সম্মুখে যে সকল ব্যাপার নিয়তই ঘটিতেছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে যে সময়ে যে কার্য্য করা উচিত তাহার বোধ জন্মে। আর অনেকে বলিল—যে সকল ঘটনা নিয়ত ঘটিতেছে তাহার দিকে রাজা মহাশয় যতই লক্ষ্য রাখুন না কেন, তাঁহার কথা থাক, কোন লোকেরই সাধ্য নাই যে কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য করা উচিত, তাহা সর্ব্বদা বলিয়া দিতে পারিবে। অপর পক্ষে, রাজা মহাশয়ের উচিত, জ্ঞানী লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং সেই উপদেশ মত উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ করা। কেহ বা বলিল—এমন অনেক ব্যাপার উপস্থিত হয় যখন কাহারও পরামর্শ বা উপদেশ লইবার অবসর থাকে না, সময় সেই কার্য্যটীর উপযোগী কিনা তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঠিক করিয়া ফেলিতে হয়। আর ইহা অবধারণ করিতে গেলে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহারও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে দৈবজ্ঞ হইতে হয়। সুতরাং কোনও কার্য্যের উপযোগী সময় নির্দ্ধারণ করিতে গেলে দৈবজ্ঞের শরণ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও নানা লোক নানা রকমে দিল। কেহ বলিল—রাজার পক্ষে প্রধান সহায়ক তাঁহার অধীন শাসনকর্ত্তারা। কেহ বা বলিল—দৈবজ্ঞরাই রাজাকে বিশেষ রকমে সাহায্য করিতে পাবে। আবার কেহ বা বলিল—চিকিৎসকের সাহায্যই রাজার বেশী প্রয়োজন। অন্য লোকে বলিল—যে যাহাই বলুক, সৈন্যসামন্ত নহিলে রাজার চলিতেই পারে না।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন লোক বলিল—জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চাই জগতে প্রধান আবশ্যক কার্য্য। অপরে বলিল—না তাহা নহে, যুদ্ধবিদ্যার চর্চ্চাই পরম সাধনা। আবার কেহ বা বলিল—মানুষের চরম কর্ত্তব্য ঈশ্বরের আরাধনা।

দেখা গেল, প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তর লইয়া কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল হইল না। আর কাহারও উত্তর রাজার মনঃপূত হইল না, সুতরাং পুরস্কার কাহারও ভাগ্যে মিলিল না।

সেই রাজার রাজ্যে এক তপস্বী সাধুর প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি ছিল এবং রাজাও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন, সেই সাধুর নিকট গিয়া প্রশ্ন তিনটীর উত্তর জানিয়া আসিবেন।

সাধু একটী বনে বাস করিতেন, সেখান ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতেন না। তাঁহার নিকট গ্রাম্য লোক প্রায়ই আসিত, তিনিও অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন। ধনী বা শিক্ষিত লোক তাঁহার নিকট মোটেই আমোল পাইত না।

রাজা সাধুর দর্শনে যাত্রা করিলেন। আশ্রমের কিছু দূরে থাকিতে তিনি শরীররক্ষীদের বিদায় করিয়া দিলেন, এবং রাজপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সাধারণ বেশ ধারণ করিয়া পদব্রজে সাধুর কুটীরদ্বারে উপনীত হইলেন।

সাধু তখন তাঁহার আশ্রমের উদ্যানে মাটি খুঁড়িতেছিলেন। আগন্তুক দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও পুনরায় মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। সাধু কৃশকায়, তাঁহাকে দুর্ব্বল দেখাইতেছিল। মাটিতে কোদাল পাড়িয়া চাপ দিয়া মাটি তুলিবার সময় তিনি হাঁপাইতেছিলেন।

রাজা তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন, "আপনি জ্ঞানী তপস্বী। তিনটী প্রশ্নের যথার্থ উত্তর জানিবার জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। প্রশ্ন তিনটী এই—এমন কোন্ সময় যে-সময়কে মানুষের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে এবং যে সময় বৃথা অতীত হইলে ভবিষ্যতে অনুতাপের পরিসীমা থাকিবে না? সাহায্যকারী হিসাবে

কোন্ লোক শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যক্তির সাহায্য ও সাহচর্য্য আবশ্যক এবং কোন্ কোন্ লোকের সাহায্য ও সঙ্গ পরিত্যাজ্য? আর কি কি কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ কি কার্য্য বা কি কি কার্য্য অন্য সকল কার্য্য ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে করা উচিত?"

সাধু স্থির হইয়া রাজার কথা শুনিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। হাতের উপর থু করিয়া থুথু ফেলিয়া তিনি মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাড়াইয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন, "আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন। আপনার কোদালটী আমাকে একবার দিন, আপনার হইয়া আমি একটু কাজ করিয়া দিই।"

"আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি," ইহা বলিয়া সাধু কোদালটী রাজাকে দিলেন, এবং মাটীর উপর বসিয়া পড়িলেন। দুইটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাজা থামিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন তিনটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। এবারও কিছু না বলিয়া সাধু উঠিয়া দাড়াইলেন, তাহার পর কোদাল লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন আর বলিলেন, "আপনি বিশ্রাম করুন, আমাকে কাজ করিতে দিন।"

রাজা কিন্তু কোদালটি সাধুকে ফিরাইয়া দিলেন না। না দিয়া তিনি আবার মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, আরও এক ঘণ্টা। সূর্য্য গাছের পিছনে অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে। মাটিতে এক কোপ বসাইয়া রাজা মৌন ভঙ্গ করিলেন, "মহাশয় আপনি জ্ঞানী পুরুষ, আপনারি নিকট তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আমি আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আপনি যদি অবগত না থাকেন তবে আমাকে বলিয়া দিন, আমি ঘরে ফিরিয়া যাই।"

রাজার কথায় কোন উত্তর না দিয়া সাধু বলিলেন, "এই দিক দিয়া কে দৌড়াইয়া গেল না? আসুন তো দেখি ও কে।"

রাজা ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন সত্য সত্যই একটী দাড়িওয়ালা লোক দৌড়াইয়া আসিতেছে। লোকটী দুই হাত দিয়া পেট চাপিয়া ধরিয়াছে, আর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া রক্ত ঝরিতেছে। রাজার নিকট দৌড়াইয়া আসিয়া লোকটী পড়িয়া গেল। ভূমিতে স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিয়া সে চোখ ঘুরাইতে লাগিল, এবং অস্ফুট কাতরধ্বনি করিতে লাগিল। সাধুর সাহায্যে রাজা লোকটীর কাপড়চোপড় খুলিয়া লইলেন, তখন দেখা গেল তাহার দেহে এক প্রকাণ্ড ক্ষত রহিয়াছে। যতটা পারিলেন রাজা ক্ষতস্থানটী ভাল করিয়া ধুইয়া দিলেন, এবং নিজের রুমাল এবং সাধুর গামোছা দিয়া ক্ষতস্থান উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু রক্তক্ষরণ কিছুতেই বন্ধ হইল না। রাজা পুনঃ পুনঃ ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া লইয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন। রক্তস্রাব বন্ধ হইলে আহত ব্যক্তির চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে ক্ষীণস্বরে বলিল, "জল"। রাজা দ্রুতগতিতে গিয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছে, একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে। আহত ব্যক্তির বেশী ঠাণ্ডা লাগা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া রাজা সাধুর সাহায্যে লোকটীকে কোনরকমে সাধুর কুটিরের মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং তাহাকে সাধুর শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। বিছানায় শুইয়া আহত ব্যক্তি পরম আরামে চক্ষু মুদিল। বোধ হইল যেন সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরিশ্রম ও হাঁটাহাঁটির দরুণ রাজা অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কুটিরের দুয়ারে বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে তিনি অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই অবস্থাতেই তাঁহার এতদূর গাঢ় নিদ্রা হইল যে যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সকাল হইয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছুক্ষণ ধরিয়া তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না যে তিনি কোথায় রহিয়াছেন; আর শয্যায় শায়িত সেই দাড়িওয়ালা লোকটী কে এবং কেনই বা সে তাঁহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

রাজা জাগরিত হইয়াছেন এবং তাহার দিকে তাকাইতেছেন দেখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন মহাশয়।"

রাজা উত্তরে বলিলেন, "আমি তোমাকে চিনি না, আর তোমাকে ক্ষমা করিবারও কিছু নাই।"

তখন লোকটী বলিল, "আমাকে আপনি চেনেন না বটে কিন্তু আপনাকে আমি জানি। আমি আপনার একজন শত্রু। আমার ভ্রাতার প্রাণদণ্ড দিয়া আমার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। আ

শুনিয়াছিলাম আপনি একাকী সাধুপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। আমি ঠিক করিলাম আপনাকে হত্যা করিব। আপনি যখন আশ্রম হইতে ফিরিবেন তখন পথে আপনাকে হত্যা করিব ইহাই আমার বাসনা ছিল। কিন্তু সমস্ত দিন কাটিয়া গেল আপনি ফিরিলেন না। আমি পথের ধারে একটী ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া ছিলাম। আপনি কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য আমি যেমন ঝোপ হইতে বাহির হইয়াছি অমনি আপনার শরীর-রক্ষীদিগের সম্মুখে পড়িয়া গেলাম। তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাকে চিনিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করিল। আমি গুরুতরভাবে আহত হইয়াও কোন ক্রমে তাহাদের হস্ত হইতে পলাইতে সক্ষম হইলাম। কিন্তু আমার এত রক্তপাত হইতেছিল যে আমি অনতিবিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করিতাম যদি আপনি যত্ন করিয়া আমার ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া না দিতেন। আমি আপনাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় ছিলাম, তবু আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আমি যদি বাঁচিয়া থাকি আর আপনার যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে আমি যাবজ্জীবন আপনার অনুগত ক্রীতদাস হইয়া থাকিব এবং আমার ছেলেদেরও আজ্ঞা করিব যাহাতে তাহারাও সেইরূপ হয়। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

এত সহজে এক পরম শত্রুকে বশীভূত করিয়া মিত্ররূপে পরিণত করিতে সমর্থ হওয়াতে রাজা মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইলেন। তিনি তাহাকে ক্ষমা তো করিলেনই, উপরন্তু তাহার সমুদয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য চিকিৎসক ও ভৃত্যাদি পাঠাইয়া দিবেন তাহাও বলিলেন।

আহত ব্যক্তির নিকট বিদায় লইয়া রাজা কুটিরের বাহিরে আসিলেন এবং সাধুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি সেখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সাধুর নিকট হইতে সেই প্রশ্ন তিনটীর উত্তর জানিয়া লন। সাধু তখন বাগানে ছিলেন। পূর্ব্বদিন যে স্থানে ছোট ছোট খাল খোঁড়া হইয়াছিল, তিনি তাহার পাশে হাঁটুর উপর ভর দিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছিলেন; প্রকৃত পক্ষে তিনি শাক-সবজীর বীজ পুঁতিতেছিলেন।

তাঁহার নিকটে গিয়া রাজা বলিলেন, "মহাশয়, চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আপনাকে আমি শেষবার সেই প্রশ্ন তিনটী করিতেছি। আমার কাতর প্রার্থনা, আপনি উহার উত্তর দিয়া আমাকে বাধিত করুন।"

কর্ষিত ভূমির উপর বসিয়া পড়িয়া ও রাজার মুখের উপর তাঁহার শান্ত চোখ দুইটির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সাধু উত্তর করিলেন, "প্রশ্ন গুলির জবাব তো দেওয়া হইয়া গিয়াছে।"

রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি রকমে হইল?"

সাধু বলিলেন, "কেন উত্তর তো বেশ স্পষ্টই পাওয়া গিয়াছে। কাল আপনি আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া অনুকম্পা বশতঃ যদি এই খানাটুকু খুঁড়িয়া না দিতেন তাহা হইলে আপনাকে অনতিবিলম্বেই ফিরিতে হইত, আর ঐ লোকটী আপনাকে পথিমধ্যে একাকী পাইয়া আক্রমণ করিত। আক্রান্ত হইলে আপনার মনে এই অনুতাপ আসিত যে কেন আমি আশ্রমে সাধুর নিকট আরও একটু কাল থাকিয়া আসি নাই। সুতরাং যখন আপনি খানাও খুঁড়িতে লাগিলেন তখন সময় ঠিক তদুপযুক্তই ছিল, এবং সেই সময়ে আমিও ছিলাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। আর আমার উপকার করাই তখনকার পক্ষে আপনার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ছিল। তারপর যখন সেই আহত লোকটী দৌড়াইয়া কাছে আসিল আর আপনি তাহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন তখন সময় প্রকৃতপক্ষেই উপযোগী ছিল, কারণ যদি আপনি তাহার ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া না দিতেন, তাহা হইলে লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হইত, অথচ আপনার সহিত মৈত্রী ভাবও তাহার হইত না। অতএব তৎকালে সেই ব্যক্তিটীই সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী লোক ছিল, এবং তাহার বিষয়ে আপনি যাহা করিয়াছিলেন তাহাই তখন শ্রেষ্ঠতম কার্য্য।

"ইহা হইতে আপনি আপনার প্রশ্ন তিনটির এই উত্তর পাইলেন—সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাল একটি মাত্র—বর্ত্তমান। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত সকলের অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাল এই হেতু যে কেবল বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই আমাদের নিজেদের কার্য্যের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে, অন্য সময়ে থাকিতে পারে না সকলের চেয়ে দরকারী লোক সেই, যাহার সহিত বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কোন সংশ্রব থাকে। আর সেই মুহূর্ত্তের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইতেছে সেই ব্যক্তির হিতসাধন করা।"*

* অনুবাদক শ্রীসুকুমার সেন।

রূপকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

পরদিন, চাষার মেয়ে রোজ যেমন সময় আসে, তার চেয়ে আগে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলে— মৌন-ও-মৌন। মৌন সাড়া দিলে - ঘুম ডাকে—তুমি ডাকো—কার কথাটা শুনি ? মেয়ে বল্লে—আমার কথা, আমার কথা। আমার দেবদর্শনে বাদ সাধলে ?—ও মৌন—ও মৌন—ঘুমলে কি ? মৌন জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লে—ঘুম যে বড্ড ডাকে—তুমি কি ঘুম ? মেয়ে বল্লে—ঘুম নয় মৌন, ঘুম নয়—বকচমকা বেটী।

মৌন তখন তাড়াতাড়ি উঠে জানালার কাছে এসে বল্লে—বল বল, তোমার কথা শুনি।

মেয়ে বল্লে—তোমায় কাপড় দিলুম ভাত দিলুম—আমার দেবদর্শনে বাদ সাধলে কেন, মৌন, কেন ?

মৌন বল্লে—মেয়ে গো মেয়ে, দেবতা তোমার কে, বাদ সাধলুম কে !

মেয়ে বল্লে—যুবরাজকে দেখনি মৌন! আহা, ঠিক যেন গণেশ ঠাকুর। লুকিয়ে দেবদর্শনে যাই, তোমার তাতে কি হলো ভাই। তুমি কেন ছড়া বাধলে, যুবরাজের ঘুম ভাঙ্গালে ?

মৌন বল্লে- আচ্ছা মেয়ে যাও—আজকে আমি চুপ থাকবো।

মেয়ে বল্লে - মৌন আমি খুব খুসী, তুমি যদি চুপ করলে। আমার নামে ছড়া বাঁধলে বড় আমার লজ্জা হলো। যুবরাজের নামে একটি ছড়া বেঁধো, খুসী আমি আরো হবো।

এই বলে মেয়ে গাছ বেয়ে ছাদে গেলো। আজ যুবরাজ সারারাত জেগে ছিল যদি ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়ে—তাই ছাদে পায়চারী করেছে। ঠিক সময়টিতে বিছানায় গিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলো – মেয়ে যেমনি এসে হাত বাড়িয়েছে, যুবরাজ খপ্ করে তার দু'টি হাত ধরে ফেল্লে।

যুবরাজ জিগ্যেস করলে—তুমি কে ? মেয়ে তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লেগেছে।

যুবরাজ বল্লে—কিচ্ছু ভয় নেই, বল তুমি কে ?

মেয়ে তখন কাঁদো-কাঁদো স্বরে বল্লে—আমায় চেন না যুবরাজ—ধানের চাষী তাদের মেয়ে, বলেই ঝর্ ঝর্ করে সে কেঁদে ফেল্লে।

যুবরাজ জিগ্যেস করলে—চিনি তোমায় চিনি। এইবার বলো এখানে আসো কেন ?

মেয়ে বল্লে—আমি জানি না, মৌন জানে। যুবরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, দু'জনে গাছ বেয়ে নেবে মৌনর কাছে এসে দাঁড়ালো। মৌন তাদের আগেই দেখতে পেয়েছিল, তারা এসে দাঁড়াতেই বল্লে—

গণেশ ঠাকুর গণেশ ঠাকুর
প্রসন্ন গা,
ঢোলা ঢোলা কানদু'টি
বাতাস মাঝির না।
ঠাকুরুণ গো গড় করো
দেবতা সিঁদুরবরণ,
মুকুট মেপে কপালগড়া
সিদ্ধিদাতা হ'ন।

যুবরাজকে মেয়ে গড় করলে, যুবরাজ বল্লে - তোমায় আমার রাণী করবো। তাই শুনে চাষার মেয়ে—রাণী আমি হবো না—বলে এক ছুটে খিড়কির দিকে যে লুকোনো পথ দিয়ে সে আসতো যেতো সেই পথ দিয়ে পলক ফেলতে না ফেলতে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

যুবরাজ তক্ষুনি প্রহরীকে ডেকে মৌনকে মুক্ত করে দিয়ে বল্লে—কথা ছিল কালো মেয়েকে ধরিয়ে দিলে, সাগর পৌঁছে দেবো—এক দিনে—আজই তোমায় পৌঁছে দেবো। তক্ষুনি রথ সাজলো রথের মাথায় ধ্বজা উড়লো।

মেয়ে ধানের শীষের গুচ্ছটি ফেলে গিছ্লো, সেইটি মৌনর হাতে দিয়ে সারথিকে আদেশ দিলে—সাগরতীরে পৌঁছনো চাই—আজই। তারপর মৌনকে বল্লে—ধানের চাষী তাদের মেয়ে – তাকে আমি আন্‌তে যাবো—তুমি যাও সাগর।

সারথি মৌনকে নিয়ে রথ ছুটিয়ে দিলে, যুবরাজ চাষার মেয়েকে রাণী করে আনবার জন্যে যাত্রা করলে।

বিকালবেলা রথ এক জায়গায় এসে বালিতে আটকে গেলো – সারথি বল্লে—সাগর এখান থেকে খুব কাছে। রথ এবার ফেরাতে হবে – আর রথ চলবে না।

মৌন রথ থেকে নেবে ধানের শীষটি সারথির হাতে দিয়ে বল্লে দিলে—যুবরাজকে ফিরিয়ে দিয়ো। মৌন বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো—রথ ফিরে গেলো।

তারপর রাত্তির হলো, সেদিন অমাবস্যা, চাঁদ উঠ্‌লো না, খুব অন্ধকার, মৌনও খুব হাঁপিয়ে গেছে। সে সেই বালির ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙে দেখে সামনে শুধু ঝাউবন আর ঝাউবন, পেছনে শুধু বালি আর বালি, একেবারে আকাশের সঙ্গে কোথায় গিয়ে মিলে গেছে।

মৌন ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো—দৈত্যের দুর্গটা সে খুঁজে বার করবে। খুঁজতে খুঁজতে যে কতো সময় কেটে গেলো, বেলা আছে কি সন্ধ্যে হলো কিছুই ঠিক রইলো না—গভীর বন, দৈত্য-দুর্গের খোঁজ কোথাও পাওয়া গেলো না। মৌন তখন বনের মধ্যে যেদিকে সেদিকে ঘুরতে লাগলো আর চীৎকার করে বলতে লাগলো—দৈত্য তুমি কোথা—তোমায় আমি চিনি না—তুমি বেরিয়ে এসো আমার সাম্‌নে—তোমার সঙ্গে লড়াই করবো। অনেকক্ষণ ডেকে ডেকে অনেক ঘুরে ঘুরে তবুও দৈত্য এলো না।

মৌন তখন বল্লে—দৈত্য তুমি ভীরু, লুকিয়ে আছো কেন! পেথম ধরা পাত্‌'খানি ফিরিয়ে দাও—তাহলে লড়াই আমি করবো না।

তবুও দৈত্য সাড়া দিলে না।

মৌন এবার ভয়ঙ্কর রেগে মেঘের মতন গর্জ্জন করে বল্লে—যদি দৈত্য এই বনে থাকো—আমার কথা কানে যদি গিয়ে থাকে—তাহলে বেরিয়ে এসো আমার সামনে—দেখি তোমার কত শক্তি—নইলে……।

মৌনর কথা শেষ হলো না—বনের ভেতর থেকে বিদ্যুতের মতন চমকাতে চমকাতে দৈত্য ছুটে এলো মৌনকে খপ্‌ করে ধরে বল্লে, থামো থামো মৌন, অত রাগ কি করতে আছে, রাগের চোটে এক্ষুনি পেথম ধরা পা'ত্‌খানিই মাড়িয়ে ফেলেছিলে আর কি। বলেই দৈত্য পাথরের মতন ভারী হয়ে গেলো—চোখ নড়লো না—মুখ নড়লো না—বুক নড়লো না, সব স্থির। দৈত্যের কথায় মৌন চারদিক চেয়ে দেখলে—ঘুরতে ঘুরতে সে একেবারে বনের ধারে এসে গেছে—যে ধার থেকে ঢুকেছিল সেইধারে। কিন্তু পা তো দেখতে পেলে না।

মৌন ভাবলে, দৈত্য মিথ্যা কথা বলে তার রাগ থামিয়েছে।

যুবরাজ বল্লে—কিচ্ছু ভয় নেই, বল তুমি কে?

মৌন জিজ্ঞেস করলে, তুমি কে?

তেমনি স্থির হয়ে ঠিক যেন ঘুমতে ঘুমতে দৈত্য বল্লে—"আমি দৈত্য।"

মৌন বল্লে—তোমার আমাদের মতন মুখ, আমাদের মতন গা, আমাদের মতন হাত, আমাদের মতন পা, দৈত্য তুমি নও।"

দৈত্য উত্তর দিল না।

মৌন আবার বল্লে—বিদ্যুতের মতন চমকাতে চমকাতে এলে—কিন্তু পাথরের মতন ঠাণ্ডা হয়ে গেলে। তোমার চোখ দুটো কি মড়ার চোখ—তোমার ঠোঁট যে পাশের মতন সাদা—বুকে তোমার প্রাণ কৈ? তুমি হয়ত দৈত্যই হবে। কে তুমি বল আমায়।"

দৈত্য অল্প অল্প নড়তে লাগলো—তার ঠোঁটে রক্ত ফিরে এলো, টানাটানা চোখ দুটি জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠ্‌লো, নাকে শ্বাস এলো, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মতন চমকাতে আরম্ভ করলে।

সে বল্লে মৌন আমার কথা বলবো, কিন্তু ভীষণ ঝড় উঠ্‌বে—সহ্য করতে পারবে তো! আরো আমার কাছে সরে এসো.—শুনতে পাবে না তা না হলে।

যুবরাজকে মেয়ে গড় করলে।

মৌন কাছে সরে এসে বল্লে, ঠিক থাকবো আমি—বল তুমি।

দৈত্য বল্লে—তাহলে বলি, যতক্ষণ ঝড় থাকবে ততক্ষণ আমি থামতে পারবো না, আমায় থামতে বলো না। বলেই অগস্ত্য মুনি যেমন এক গণ্ডুষে সাগরের জল শুষে নিয়েছিলেন তেমনি করে দৈত্য এক প্রশ্বাসে বনের সমস্ত হাওয়া টানতে লাগলো, সেই হাওয়াদের বাঁচাবার জন্যে চারদিক থেকে ভাই-হাওয়ারা ছুটে এলো—সঙ্গে সঙ্গে ঝাউবনে ভীষণ ঝড় উঠ্‌লো—দৈত্য ঘন ঘন চমকাতে লাগলো—আকাশ থেকে মাটী আর মাটী থেকে আকাশ চমকে চমকে ওঠা নামা করতে করতে বলতে লাগ্‌লো—আমি তখন জন্মাইনি—তখন স্বর্গে ইন্দ্রদেবের সভায় গ্রহশুক্র ছিলেন গায়ক। তাঁকে ইন্দ্র একদিন গান গাইতে হুকুম করলেন।

গ্রহশুক্র বল্লেন—এখন আমার ঘুম পেয়েছে, গাইতে পারবো না। সেদিন ইন্দ্রসভা থেকে তাঁকে বার করে দেওয়া হলো—সেদিন থেকে আর কেউ তার গান শুনতে গেল না আমি তখন তাঁর বাড়ী যেতুম—বসে থাকতুম্, কখন তিনি গান গাইবেন শুন্‌বো। কতদিন গান তিনি গাইলেনই না—আমি বসে থেকেছি যদি গা'ন। তাই গ্রহশুক্র আমায় বর দিয়েছিলেন—'তুমি পৃথিবীতে জন্ম নেবে।' যখন জন্মালুম—যেখানে জন্মালুম, আমার চারদিকে আলোর বেড়া বাঁধা ছিলো, দেখতে পেলুম একটু দূরে বনে বাগানে ফুল ফুটেছে অনেক—ছুটে চলে গেলুম সেখানে, পেছন ফিরে দেখলুম—আলোর বেড়া ভেঙ্গে গেছে, টুক্‌রো টুক্‌রো আলোগুলো খাবি খাচ্ছে আর একে একে নিভে যাচ্ছে—সে আলো আর ফিরলো না। বনে বাগানে ফুলের গন্ধ নিচ্ছিলুম—তখন পথ থেকে ধূলপুত্তুর ডাক দিলে—খেলবি আয়, খেলবি আয়। তার সঙ্গে চলে গেলুম—পেছনে তাকিয়ে দেখলুম—ফুলের বাগান শুকিয়ে গেছে। ধূলপুত্তুরের সঙ্গে খেলা করছি—চিকনবালা পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছিলো, ছুটে গিয়ে তার হাত ধরলুম—ফিরে দেখি ধূলপুত্তুর মিলিয়ে গেছে। চিকনবালাকে নিয়ে নদীর তীরে এসে বস্‌লুম—গান গাইতে ইচ্ছে হলো, গান সুরু করলুম। যখন গাওয়া শেষ হলো পাশে তখন

সঙ্গে সঙ্গে ঝাউবনে ভীষণ ঝড় উঠ্‌লো—দৈত্য ঘন ঘন চমকাতে লাগলো।

চিকনবালা নেতিয়ে পড়ে আছে সে আর বেঁচে নেই। আমি আর কোন দিকে না তাকিয়ে বিধাতার কাছে সোজা গিয়ে প্রশ্ন—একটা ধরিতো আরটা পালায়, এমন ধারা কেন হচ্ছে।

বিধাতা বল্লেন—এ তোমার বংশাবলীর ধারা।

আমি বল্লুম—এতটুকু দেহ দিয়েছো যে।- আলোর বেড়া, ফুলের গন্ধ, ধুলপুত্তুর চিকনবালা আর আমার গান সবাইকে এর মধ্যে এক সঙ্গে রাখা যায় না—আমায় মস্ত দেহ দাও।

বিধাতা বল্লেন - ওইটুকুতেই ঢের হবে, বলে ধাক্কা দিয়ে আবার পৃথিবীতে গড়িয়ে দিলেন। আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, দশদিকে দৌড়ে, আকাশে উড়ে স্রোত উজিয়ে সাঁতার দিয়ে কত কত ধুলপুত্তুর, কত কত চিকনবালা, অনেক ফুল অনেক আলো লুট করে এনে জড় করলুম এইখানে। কিন্তু কেউ বেঁচে রইলো না, তারা মরে গিয়ে আকাশে একটি করে তারা হয়ে ফুটতে লাগলো, আর মাটীতে একটি করে ঝাউগাছ হয়ে উঠতে লাগলো, তাই হয়েছে এই ঝাউ বন। ঐ দেখ পেথম ধরা পা দুখানি ঝাউগাছের গোড়ায় বালির ওপর পাতা। বলেই দৈত্য চুপ করলো—ধপ্ করে একটা শব্দ হলো, অমনি দৈত্য পাথরের মতন ভারী আর বরফের মতন ঠাণ্ডা হয়ে মাটীতে পড়ে গেঁথে গেলো—নড়লোনা চড়লোনা কিছু না। ঝড়ও গেলো থেমে। একটি ঝাউগাছের গোড়ায় পেথম ধরা পায়ের পাতা দু'খানি বালির ওপর পাতা রয়েছে। মৌন দৈত্যকে অনেক ঠেলাঠেলি করে, যখন দেখলে সে একটুও নড়লোনা, সে একেবারে পাথর হয়ে গেছে—গা যেন হিম—তখন মৌন সরে এসে আস্তে আস্তে দু'আঙ্গুলে পা-দু'খানি ছুঁলে, অম্‌নি পা-দু'খানি শিউরে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাউগাছটি বলে উঠলো—পায়ে আমার কন্‌কনে টিপ্ কে পরালে কে পরালে!

মৌন বল্লে—পাষাণ দৈত্যের হিম গা ছুঁয়ে আমার আঙ্গুল হিম হলো, আমি এসেছি মৌনকান্তি

ঝাউগাছ বল্লে—আমায় তুমি ছুঁলে কেন? বলবে কি?

মৌন বল্লে—আস্থি কালের বস্থি বুড়ী তিন ভুবনের মা—সে বলেছে—তোমায় নিয়ে যাবো।

ঝাউগাছ বল্লে—না, না মৌন যাওয়া আমার হবে না—আমি যাবো না। তুমি যদি আসতে তখন!

মৌন বল্লে—কখন কন্যে কখন?

ঝাউগাছ বল্লে—তিন ভুবনের মা তো জানে—যখন রাজবাড়ীতে পরব সেদিন, গাছেরা নতুন পাতায় ভরে গেলো—ফাগুন মাসে, আমরা ছেলে মেয়ে দেবদারুবনে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিলুম—সেদিন আমাদের বাড়ী কত অতিথি এসেছিলেন, কুমার সৎশপ্ত ছিলেন আমার সঙ্গী।

একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, সমুদ্দুর আছড়ে পড়ে ছড়িয়ে যেতে যেতে এগিয়ে আসছিল, নাগাল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দৈত্য হঠাৎ কোত্থেকে যে এলো বিষের হাওয়া নিয়ে, কুমার সৎশপ্ত আমার সঙ্গী, দেখতে না দেখতে বিষের জ্বরে জরে গেলেন।

দৈত্য দেশের সবাইকে মারলে, দেশের সব জল শুষে নিলে, আমায় উড়িয়ে নিয়ে এলো এখানে।

মৌনকান্তি সেইদিন তুমি এলে না কেন দৈত্যকে ঠেকাতে?

এখন ঝাউবনে ঝাউগাছ হয়ে গেছি, আর যাওয়া হবেনা মৌন। কুমার সৎশপ্ত বিষিয়ে গেলেন, দৈত্য পাথর হয়ে গেছে—তুমি ফিরে যাবে—আমার কিন্তু পা'দুটো তপ্ত বালুর গায়ে পুড়ে যায়—আমায় এমনি করেই থাকতে হবে, সমুদ্দুর তো নেই, পা ধোয়াবে কে!

দেখতে পাচ্ছ না মৌন, সামনে সব সমুদ্দুরটি শুকিয়ে পায়ের তলায় আর চোখের সামনে মরুভূমি হয়ে গেছে! আমায় থাকতে হবে—তুমি মৌন ফিরে যাও—আমি তোমায় থাকতে দেবো না।

মৌন বল্লে—আচ্ছা কন্যে ফিরে যাবো—সাগর কেন শুকিয়ে গেল, শুধু এই কথাটি বল।

ঝাউগাছ বল্লে—হ্যাঁ হ্যাঁ মৌন, এই কথাটি বলবো তোমায়। যেদিন দৈত্য আমায় ধরে নিয়ে এলো, আমি নাইতে নাবলুম সমুদ্দুরে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে সমুদ্দুর বল্লে—রাজকুমারী তোমায় চাই। আমি একটু পেছিয়ে এলুম, সমুদ্দুর আমার বুকের ওপর ভেঙ্গে প[...] বল্লে—রাজকুমারী নেবো তোমায়। আমি আবার অনেকখা[...] পেছিয়ে এলুম, সমুদ্দুর আমার পায়ের ওপর আছড়ে প[...] বল্লে—রাজকুমারী, রাজকুমারী! তখন তাড়াতাড়ি তীরে[...] ওপর আমি অনেক দূরে উঠে গেলুম, যেতে যেতে একবা[...] ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, সমুদ্দুর আছড়ে পড়ে ছড়িয়ে যে[...] যেতে এগিয়ে আসছিল আমায় ছুঁতে, নাগাল না পে[...] ফিরে যাচ্ছে। আমার বড্ড মন কেমন করে উঠলো, আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকলুম।

(ক্রমশঃ)

জবাব

—শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

আমার নূতন রুম-মেটের নাম নিরুপম নন্দী। নিরুপম প্রথম যেদিন এই মেসে আসে সেদিনই সে সকলের দৃষ্টি অতি সহজেই আকর্ষণ করিয়াছিল। নিরুপম সুপুরুষ।—তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপটাই শুধু যে লোকের চোখে পড়িল, তাহা নয়, তাহার কথা বলার অনাগ্রহ দেখিয়াও সকলে বিস্মিত হইল।

মেসের আরও ঘর খালি ছিল, কিন্তু নিরুপম সব দেখিয়া শুনিয়া আমার ঘরটাই কেন জানি পছন্দ করিয়া ফেলিল। নিরুপমকে পরে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত ঘর খালি থাকিতে সে আমার ঘরটাই পছন্দ করিল কেন? নিরুপম উত্তরে বলিয়াছিল, আমি শৃঙ্খলা খুব ভালবাসি কিন্তু নিজে আমি উচ্ছৃঙ্খলের চরম,তোকে দেখেই আমার কেমন সাবধানী ব'লে ধারণা হ'ল, সেইজন্যেই তোর রুম্-মেট্ হ'লাম।

নিরুপম সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে বিস্মিত করিয়া দিল তখনই যখন দেখিলাম যে, মাস তিনেক কলেজ হইয়া যাওয়ার পরেও সে একখানিও পাঠ্যপুস্তক কিনিল না এবং একদিনের জন্যও আমার একখানি বই চাহিয়া তাহাতে কি আছে দেখিবার আগ্রহও প্রকাশ করিল না। লোকপরম্পরায় আরও জানিয়াছিলাম যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইংরাজি ও বাংলাতে নিরুপম প্রথম হইয়াছে,—অঙ্কে কোনরকমে হয়তো ৩০ পাইয়া পাশ করিয়াছে। তথাপি সে যে কেন আই-এস-সি পড়িতে আসিয়াছিল তাহা ভাবিয়া পাই না। একদিন এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইয়াছিলাম, ও দুইই এক কথা —যে পড়বে সে বিচার ক'রে আই-এ কিংবা আই-এস-সি নেবে, আর যে পড়বে না সে কেন অত মাথা ঘামাতে যাবে, তার পক্ষে দুইই সমান, একটা নিলেই হ'ল।

নিরুপমকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তবেই সে আমার কথার উত্তর দেয়, কিন্তু নিজে হইতে কখনও কিছুই বলে না। মেসের আর কাহারও সঙ্গে সে একদিনের জন্যেও কথা কহে নাই। এমনই করিয়া অল্পদিনেই সে মেসের ছাত্রদের সবার আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

অল্প কয়েক দিনেই বুঝিলাম যে, নিরুপমের যদি কিছুমাত্র আসক্তি কোন কিছুরই প্রতি থাকে তো সে চায়ের প্রতি। কিন্তু চায়ের সাজ-সরঞ্জাম তাহার নিজের কিছু ছিল না, এমন কি, কোনও রেষ্টুরেন্টে যাওয়ার বিশেষ আগ্রহও কোনদিনও তাহার দেখি নাই। চা পাইলে সে খুসি হয়, না পাইলে কাতর হয় বলিয়াও তো মনে হয় না। রোজ ভোরে উঠিয়া দুই পেয়ালা চা করিয়া নিরুপমকে ডাকিয়া তুলিতাম। নিরুপম উঠিয়া চোখে মুখে একটু জল ছিটাইয়া আসিয়া বলি[...]

কাল রাত্রে একটুও ঘুমুতে পারিনি। আঃ, চা পেয়ে বেঁচে গেলাম!

রোজই তাহার এই এক কথা।

এরূপ রোজ রাত্রে ঘুম না হওয়ার কারণ কিছু ভাবিয়া পাই না; রোজই ভাবি, তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু কোনদিনই আর তাহা হইয়া উঠে না। ভোরবেলা তাহাকে দেখিলে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাত্রে সে না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে।

দুইদিন পরেই মধ্যরাত্রে সহসা কেন জানি ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, ঘরের আলো জ্বলিতেছে, আর নিরুপম বালিশ বুকে চাপিয়া বাঁ হাতের করতলের উপর কপাল ন্যস্ত করিয়া ডান হাতে ধরা পেন্সিলটার অগ্রভাগ দাঁত দিয়া অতি উগ্রভাবে চাপিয়া ধরিয়া আছে, আর তাহার সম্মুখে বিন্যস্ত রহিয়াছে একখানি দু'পয়সা দামের এক্সারসাইজ বুক। বুঝিলাম সে কিছু লিখিতেছে। কিন্তু নিরুপম এত রাত জাগিয়া কি যে লিখিতে পারে তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, ওঃ, এই জন্যেই রাত্রে ঘুম হয় না, না? ও কি হচ্ছে শুনি?

নিরুপম চমকাইয়া উঠিয়া বসিয়া খাতাটা বন্ধ করিয়া একটু হাসিল। তারপরে বলিল, না, ও কিছু না। ঘুম পাচ্ছিল না ব'লেই—

তাহাকে কথা শেষ করিতে-না দিয়াই বলিলাম, ও, তাই বুঝি প্রেম-পত্র লেখা হচ্ছিল?

নিরুপম লজ্জিত হইয়া বলিল, দূর বোকা! এরকম বাজে কাগজে বুঝি কেউ আবার প্রেম-পত্র লেখে!

উত্তরে বলিলাম, যার ভাল কাগজ কিনে আনায় আলিস্যি থাকে সে আর করবে কি! ওতো তবু ভাল, ঠোঙার কাগজেই কত লোক কাজ চালায়।

নিরুপম বলিল, সে কথা সত্যি। উঠে আয় এখানে, তোকে দেখাই—কত প্রেম-পত্র এ-পর্য্যন্ত রাত জেগে জেগে লিখেছি।

রাত অনেক হইয়াছিল সত্য, ঘুমের ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, তথাপি নিরুপমের সে ডাক উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

নিরুপমের পাশে গিয়া বসিতে সে অতি শান্ত সমাহিতের মত তাহার রাতের পর রাত জাগিয়া লেখা কবিতাগুলি একটির পর একটি পড়িয়া চলিল। আমার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। নিরুপম কিন্তু পড়িয়াই চলিয়াছিল। আমার ভাল-লাগা না-লাগার প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি তাহার পঠন-ভঙ্গী, কণ্ঠ-লালিত্য ও দরদ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সর্ব্বোপরি তাহার কবিতার ভাব-সম্পদ ও ছন্দ-বিলাস আমাকে নির্ব্বাক করিয়া দিয়াছিল। নিরুপম যে এত বড় গুণী তাহা কোনদিনই ভাবি নাই। তাহার কবি-প্রতিভা আমাকে চমৎকৃত করিল। এতদিনে, তাহার দুনিয়ার প্রতি এই যে বিরাট বৈরাগ্য তাহার যেন একটা অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম।

বলিলাম, তুই যে এত বড় সম্পদের অধিকারী তা এতদিন জানাস্‌নি কেন? প্রেম-পত্রতো এর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিরুপম, কিন্তু কাব্য-লক্ষ্মী এত অপমান সইলে বাঁচি। একটা কলমও কি তোর জোটে না? আর খাতার তোর যা ছিরি! তুই যে কি মানুষ নিরুপম!

নিরুপম হাসিয়া বলিল, কাগজ আর কলম দিয়েই কি কাব্য-লক্ষ্মীর মান রাখা যায় রে? কাব্য-লক্ষ্মীর মান যদি কোন কবি রেখেই থাকে তো সে আমি।

নিরুপমের কথার অর্থ ঠিক ধরিতে না পারিয়াও বলিলাম, সে কথা অস্বীকার করতে পারি না। আর একথাও না ব'লে পারি না যে, কাব্য-লক্ষ্মীর যত দরদ যেন তোদের মত সব হতভাগাদের ওপরেই।

সে হাসিতে লাগিল। তারপরে বলিলাম, মাসে একশো টাকার যে ইন্‌সিওর তোর নামে আসে তা দিয়ে তুই কি করিস্ শুনি? একটা কলম আর ভাল খাতা কি তা দিয়ে কেনা যায় না? এ অমূল্য সম্পদের প্রতি তোর কি অসাধারণ অনাদর, অমন সুন্দর সব কবিতা—কোনো মাসিকে পাঠাস্ না কেন?

সহসা নিরুপম যেন একটু ব্যথিত হইয়া মুখ নামাইল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার মুখ তুলিয়া বলিল, আমার কবিতা সাধারণের জন্যে নয়—ও আমার একান্ত নিজস্ব বস্তু। ছাপার অক্ষরে আমি আমার নিজের কবিতা দেখলে হয়তো নিজেই আঁৎকে উঠবো—তাই ছাপাতে সাহস পাই না।

বলিয়া নিরুপম সহসা আমার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিল, বল্, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে কখনও কাউকে আমার কবিতার কথা ভুলেও বল্‌বি না। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, না, এমন কথা আমি কখনও দিতে পারি না। কথা হয়তো দেবো, কিন্তু রাখতে পারব ব'লে আমার নিজেরই ভরসা হয় না। এ আমি প্রকাশ না ক'রে কিছুতেই থাকতে পারবো না।

নিরুপম হঠাৎ ভীত হইয়া উঠিয়া আমার হাত আরও নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, শৈবাল, মানুষকে বিশ্বাস করা আমার স্বভাব নয়। তবু দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কেন জানি মানুষকে বিশ্বাস না ক'রেও পারি না। তোকে বিশ্বাস ক'রেচি যখন তখন যে ঠকতেই হবে সে আমি জানি। তবু আমার একমাত্র অনুরোধ—রাখতে চেষ্টা অন্ততঃ করিস্।

আমার মুখ হইতে ইহা যে সজ্ঞানে কখনও প্রকাশ পাইবে না, এমন অভয় দিয়া তাহাকে তাহার আরও কবিতা শুনাইতে বলিলাম। নিরুপম আবার পড়িয়া চলিল। রাত তখন তিনটার কাছাকাছি।

কয়েকদিন যাবৎ নিরুপমকে মেসে খুব অল্প সময়ের জন্যই দেখিতেছিলাম। ক্লাশে তাহাকে এ কয়দিন একবারও দেখি নাই। ভাবিতেছিলাম, ইহার কারণ নিরুপমকে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু যখনই তাহাকে দেখি তখনই তাহার মুখে এমন একটি বিষণ্ণতা লক্ষ্য করি যে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহস হয় না। নিরুপমকে সত্যই আমি ভাল বাসিয়া ছিলাম। তাহার অসাধারণ কবি-প্রতিভা আমাকে তাহার প্রতি আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

নিরুপমই সেদিন প্রথম বলিল, ক'দিন ক্লাশে যাই না ব'লে তুই হয়ত মনে মনে চটেছিস্ শৈবাল, নারে? কিন্তু মন যেখানে নেই সেখানে দেহটাকে মিথ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কি বলতে পারিস্? আগে ক্লাশে না গেলেও মেসে থাকতাম, কিন্তু এখন মেসেও আর ভালো লাগে না।

কেন ভালো লাগে না?—এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই অনেক কথা উঠিয়া পড়িল। সুযোগ পাইয়া তাহার আত্মীয় পরিজন কে কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করিলাম। যাহা আশা করিয়াছিলাম, উত্তরে তাহাই শুনিলাম। তাহার আত্মীয় পরিজন বলিতে কেহ কোথাও নাই। মাসের পর মাস, ঠিক একই তারিখে তবে তাহার টাকা আসে কোথা হইতে জিজ্ঞাসা করায় সে বিশেষ বিচলিত হইয়া বলিল, তার কথা নাই বা শুন্‌লি শৈবাল, তার কথা আমি কাউকে বলতে চাই না। তাহার কণ্ঠের কাতরতায় বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। কিন্তু সে রহস্য আবিষ্কারের লোভও আমার মধ্যে অতি তীব্র হইয়া উঠিল।

অনেক রাত্রেও সেদিন নিরুপম আর মেসে ফিরিয়া আসিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার কথা ভাবিলাম, পরে উঠিয়া দরজাটা ভেজাইয়া রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কত রাত্রে যে সেদিন সে মেসে ফিরিয়াছিল জানি না, কিন্তু ভোর-বেলা তাহাকে তাহার শয্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন দেখিয়া আর ডাকিয়া তুলিলাম না। আটটা নয়টার সময় তাহার ঘুম ভাঙিতে তাহাকে এক পেয়ালা চা করিয়া দিয়া বলিলাম, কাল অত রাত হ'ল কেন ফিরতে? কোথায় গেছ্‌লি শুনি?

নিরুপম প্রথমে নীরব হইয়াই রহিল, পরে বহুদিন তৈল-স্পর্শ-বর্জ্জিত রুক্ষ চুলগুলি কপালের উপর হইতে হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপিয়া লইয়া বলিল, নির্দ্দিষ্ট কোথাও যাওয়ার জায়গা আমার নেই, তাই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, বাসায় ফিরতে কেন জানি ভাল লাগছিল না।

—কিন্তু এম্‌নি রাত হ'লে লোকেই বা ভাবে কি?

নিরুপম ম্লান একটু হাসিয়া বলিল, তুই তা' ব'লে যেন কিছু ভাবিস্ না, শৈবাল। মানুষের ব্রে'ণ্ তো ভাব্‌বার জন্যই, সে তো ভাববেই—তা ভাবুক একটু।

বলিলাম, এমন পাগলও মানুষ আবার হয়! কিন্তু এটা যে মেস্ নিরুপম, নিজের বাড়ী হ'লেও কথা ছিল বরং।

নিরুপম হাসিয়া বলিল, তোর কোনও ভাবনা নাই শৈবাল, যে যা ভাবে ভাবুক না—আমি নিজেই একদিন ভাল ক'রে এসবের জবাব দিয়ে যাব।

পরদিন রাত্রেও নিরুপম আর মেসে ফিরিতেছিল না। অনেকক্ষণ তাহার জন্য ঘড়ি ধরিয়া জাগিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপরে রাত একটা বাজিতে হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ নিরুপমের ডাকে ঘুম ভাঙিল। জাগিয়া ঘড়িতে দেখি, রাত তিনটা বাজিয়াছে। নিরুপমের দিকে চাহিয়া

দেখিলাম, সে যেন কেমন ভয় পাইয়াছে। আমার একটা হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে।

বলিলাম, তোকে যেন কেমন দেখাচ্ছে নিরুপম?

নিরুপম চকিত হইয়া বলিল, হুঁ, আমাকে কেমন দেখাবারই কথা। উঃ, আজ যা ভয় পেয়েচি, এখনও গা যেন কেমন করচে!

—ভয়? ভয় আবার কিসের? বলিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, সমস্ত বিকেলটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যের পর ময়দানের দিকে বেড়াতে গিছলাম সমস্ত মন আমার হাঁপিয়ে উঠেছিল নির্জ্জনতার জন্যে। একটা মস্ত গাছের তলায় বেঞ্চে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে কাটালাম, তারপরে খেয়াল হ'ল ময়দানের ওপর দিয়ে সোজা পাড়ি দিয়ে খিদিরপুরের ব্রীজের দিকের রাস্তায় গিয়ে পড়বার। পাগলামি আর কি! রাত্রে একা ময়দানে পাড়ি দিতে ভারী আনন্দ বোধ হচ্ছিল। জীবনে এত আনন্দ খুব কমই পেয়েছি। তারপরে আবার মাঠ পার হ'য়ে চৌরঙ্গির রাস্তায় পড়বার জ যখন হাঁটতে সুরু করলাম তখন দেখি যে পা আমার যেন চলতে চায় না। কি রকম ভয় করতে লাগলো। তবু কোন রকমে পা টেনে ময়দানের মাঝে পৌছে দেখি আর এক পাও এগুতে পারি না। সর্ব্বনাশ! ভয়ে তখন আমার অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে গেছে। অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, এ আমার হ'ল কি! মরণকে তো কোন দিনই ভয় করতে শিখি নি, তবে এ আবার কোন্ নতুন অভিজ্ঞতা! কেবলই মনে হচ্ছিল, কারা যেন আমাকে সদলবলে মহাসমারোহে খুন করতে আসছে। তারা সবাই সশস্ত্র আর আমি নিরস্ত্র। মৃত্যুর এত বড় বীভৎস মূর্ত্তি কোনদিনই আমি কল্পনা করতে পারি নি। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু কণ্ঠে স্বর আছে বলে মনে হ'ল না। হয় তো চীৎকারও করেছিলাম, কিন্তু রাতের বেহুঁস্ নিরালা ময়দানে কারও কানে হয় তো সে স্বর গিয়ে পৌছয় নি। ছি, ছি, লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছিলাম! আমার মত বেপরোয়া ছেলেরও জীবনে যে এমন অবস্থা আসতে পারে এ আমি কোন দিনই ভাবতে পারি নি। তারপরে যে কি হল তার আর কিছুই আমার মনে পড়ে না। কেমন ক'রে এই ঘরে এসে যে হাজির হলাম তাও মনে নেই।

নিরুপম মুহূর্ত্তে সাবধান হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, না, আমাকে কোন অনুরোধ তোর ক'রে কাজ নেই। আমি তা কিছুতেই রাখতে পারবো না।

নিরুপম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল, কেন যে পারবো না তাই তোকে বলি শোন্। আমার জীবনের একমাত্র কামনা কি আজ জানিস্?...আমি চাই অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়েকে—এই এম্নি ক'রে আমার বাঁ হাতের ওপর কাৎ করে শুইয়ে তার বুকে ধারালো ইস্পাতের একখানা ছুরি বসিয়ে দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠতে

সে ভঙ্গী করিয়া দেখাইয়া হি-হি করিয়া সত্যই এক অদ্ভুত পাশবিক হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম। নিরুপম এসব কি প্রলাপ বকিতেছে? তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই বলিলাম, এসব পাগলের মত তুই কি বকচিস্ নিরুপম?

নিরুপম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, পাগলামিই বটে, শৈবাল! আমি একলা বসে কি ভাবি জানিস? আমি কেন জন্মালুম এই স্বাস্থ্য, এই মন নিয়ে? আমার ভাগ্যকে মেনে নিয়ে চলতে পারলুম না কেন? পৃথিবীকে ঘৃণা করতে গিয়ে এই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটির কথাই মনে হয়। একেই আমি সব চাইতে ভালবাসি—সব চাইতে ঘৃণা করি। এই সুন্দরের মধ্যে বীভৎসতা—

বলিলাম, এ তোর বিকৃত মনের চিন্তা।

নিরুপম হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বিকৃত অবিকৃত বুঝি না। ভাল কথা, ময়দানের মাঝে একা এত রাত্রে কখনও যাস্ নি আমার মত, না? গেলে পরে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা লাভ হ'ত। ময়দানের মাঝে এম্নি গভীর নির্জ্জন রাত্রে পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দরী যে নারী তাকে বাঁ' হাতের ওপর সপ্রেম সমাদরে শুইয়ে তার বুকে ধারালো একখানা ছুরি বসিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেও যে তৃপ্তি, সে তৃপ্তি দুনিয়ার আর কিছুতেই থাকতে পারে না—এই আমার বিশ্বাস।

নিরুপমকে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলাম, তোকে আজ কিসে যেন পেয়ে বসেচে, যা, শুয়ে থাকগে যা।

কাল তোর সব কথা ভাল করে শুনবো। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে।

নিরুপম যে এত সহজে থামিবে তাহা ভাবিতে পারি নাই। সে অতি শান্ত শিশুর মত আপনার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে-রাত্রে আর ঘুমাইতে পারি নাই। কেবলই থাকিয়া থাকিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়াছি—নিরুপমের নারীহত্যার কাল্পনিক অভিনয়ের ভঙ্গী স্মরণ করিয়া। নিরুপমের নিষ্ঠুর কামনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার চোখের সামনে জাগিয়া রহিল। তাই কিছুতেই আর ঘুমাইতে পারিতেছিলাম না।

নিরুপমের কথাগুলি যদিও প্রলাপের মত শুনায় তথাপি কেন জানি অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাই নিরুপমের জন্য ভাবনাগ্রস্ত হই। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, সে কবি—সত্যকারের কবি, তাহার অনুভূতির তীব্রতায় সে এসব কথা বলিয়া চলিতেছে হয় তো, আবার একটা নূতন ভাবধারা তাহার মধ্যে খেলিতে সুরু করিলেই এসব মিথ্যা অর্থহীন হইয়া যাইবে। সে নিশ্চয়ই কোথাও যেন ঘা খাইয়াছে নহিলে তাহার জীবনে এসবের কোন অর্থ হয় বলিয়া তো মনে হয় না। এ যদি শুধু কবির খেয়াল হয়, তবে অদ্ভুতই বলিতে হইবে। কিন্তু শুধু কবির খেয়াল বলিয়া কেন জানি ভাবিতে পারি না। মাঝে মাঝে নিরুপমকে দেখিয়া মনে হয়, মুখ চোখ যেন তাহার গভীর ব্যথায় থম্ থম্ করিতেছে। তবু সাহস করিয়া তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারি না।

•

দিন তিন চার পরের কথা। নিরুপম ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহার শয্যায় বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল। রাত তখন প্রায় বারটা। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মুখ চোখের স্ফীতি, কুঞ্চন ও বিক্ষোভ লক্ষ্য করিতে করিতে কখন আপনার অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙিল দরজায় আঘাত শুনিয়া। দরজা খুলিবার জন্য শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। নিরুপম তখন বেঘোরে ঘুমাইতেছে। ভাবিলাম কাল হয়তো অধিক রাত জাগিয়া কবিতা লিখিয়াছে তাই ঘুম ভাঙিতে তাহার আজ একটু বেলা হইবে। একটা খদ্দরের চাদরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত।

ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়াই অবাক হইয়া গেলাম।

আগন্তুক অপরিচিতা স্ত্রীলোক—অপরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী। একত্রে এতখানি রূপ জীবনে আর কখনও কোথাও দেখিয়াছি বলিয়াতো মনে পড়িল না।

আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—হঠাৎ মনে হইল, পটের মূর্ত্তির যেন ধ্যান ভাঙ্গিল। দু'খানি ওষ্ঠ অতি ধীরে বিচ্ছিন্ন হইল। আগন্তুক বলিল, নিরুপম বুঝি এই ঘরেই থাকে? তোমারই নাম শৈবাল?

আমারও ধ্যান ভাঙ্গিল। কোন রকমে তাহার কথার উত্তরে বলিলাম, হুঁ।

ঝড়ের বেগে সে আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার পরেই নিরুপমের শয্যার উপর গিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অল্প পরেই চকিতে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া বসিয়া চোখের জল কাপড়ে মুছিতে মুছিতে ডাকিল, লাল সিং।

লাল সিং দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, আগতার আহ্বানে সে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আগতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, লাল সিং, দাদাবাবু বিষ খেয়েচে বোধ হয়, জল্‌দি তা'কে গাড়ীতে তুলে দিতে হবে—মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাব।

আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, শৈবাল, তুমি এর বিন্দু-বিসর্গও জান না বোধ হয়? তুমিও গাড়ীতে উঠে আমার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে চল'—সব শুনতে পাবে।

তিন জনে ধরাধরি করিয়া নিরুপমকে বাহিরে যে মোটর দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে তুলিলাম। আমি কতকটা যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিয়া গেলাম।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই মেয়েটি আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিল, কাল রাত নটা দশটার সময় নিরুপম আমার ওখানে গিয়ে লালসিংকে এই চিঠি দিয়ে আসে। আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। শনিবার রাত্রে আমাকে হাস্নুবাসের জমীদারের দমদমের বাগান-বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হয়, ফিরতে সকাল হ'য়ে যায়। আমি হাস্নুবাসের জমীদারের রক্ষিতা। আর সেই ছিল নিরুপমের রাগ, নিরুপম আমার ছোট ভাই। ভোর বেলা বাড়ী ফিরেই দেখি এই চিঠি।

কৃষ্ণা

শিল্পী — শ্রীযমুনা দেবী
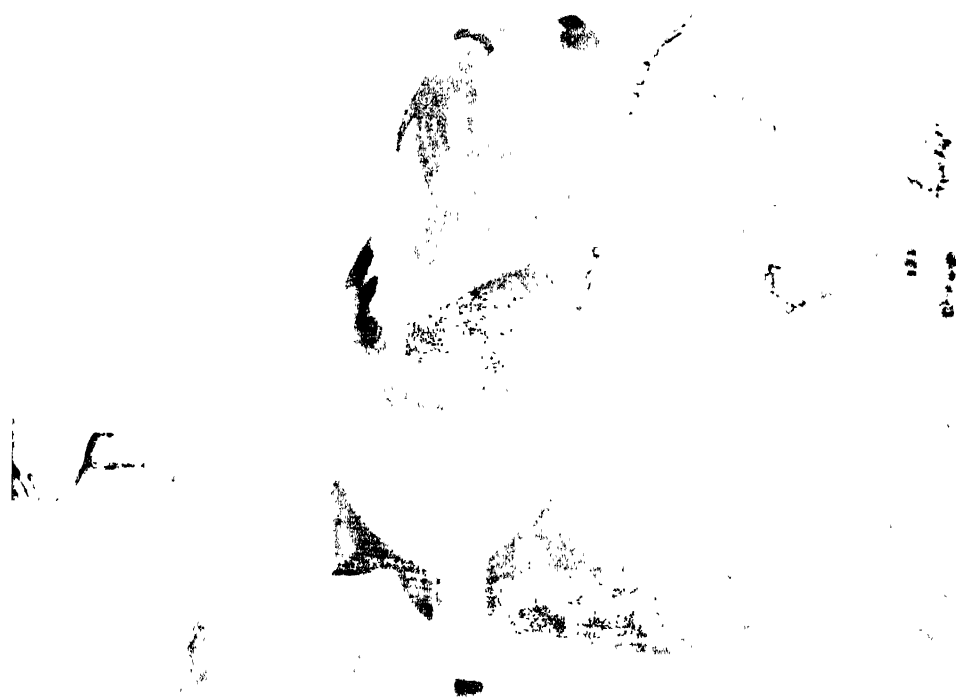
মেয়েটির কোলে নিরুপমের মাথা ছিল, সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিরুপম লিখিয়াছিল—

ছোড়দি! আমার দেহে যে বিষের জ্বালা তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ, তা' আর কিছুতেই থামতে চায় না, তাই সংকল্প ক'রেছি যে, বিষ দিয়ে বিষক্ষয় করবো। কাল ভোরে বাগান-বাড়ী থেকে ফিরে আমার মেসে গেলেই সব জানতে পারবে। হয়তো তখন আমি সমস্ত পার্থিব জ্বালার অতীত। সে যে কি তৃপ্তি—আর কাউকে আমি বোঝাতে পারবো না। আমার আত্মহত্যার পরে পুলিশের হাঙ্গামা হওয়া খুবই স্বাভাবিক; দেখো, আমার রুম-মেট্‌ শৈবাল যেন কোনও বিপদে না পড়ে। আমার মৃত্যুতে সে যে সব চেয়ে বেশী শোক পাবে তা আমি জানি, আমাকে সত্যিই সে ভালবেসেছিল তার ঋণ শোধ ক'রে যাবার মত কিছুই আমার নেই, আমার কবিতা তার ভাল লেগেছিল, সেগুলো তাকেই আমি দান ক'রে গেলাম, সে তা দিয়ে যা খুসি করতে পারবে। বন্ধুকে সে যেন ক্ষমা করে। ইতি নিরুপম।

পুঃ—কবির চোখে ভুলিয়া সুন্দর ব'লে যাদের ধারণা তাদের ভুল যেন ভাঙে।—নি।

হঠাৎ অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখে নিরুপমের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিতেই মনে পড়িল, নিরুপম একদিন বলিয়াছিল, 'আমি নিজেই একদিন ভাল ক'রে এসবের জবাব দিয়ে যাব।'

সুন্দর জবাব! কিন্তু নিরুপম যে এত নিষ্ঠুর হইতে পারে ইহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। নিরুপম ক্ষমা চাহিয়া আমাকে বিপন্ন করিয়া গেছে। তাহাকে ক্ষমা আমি কোনদিনই করিতে পারিব না।

অন্তঃপুর

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

নারীশিক্ষার ধারা

১৮৬৪ সালে রাস্কিনের পিতার মৃত্যু হয়। এই সময়টা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া রিচমণ্ড হিলে কাটাইতে হইয়াছিল। এখানে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, মা ও একটি বোন—জোয়ানা। দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় ইঁহাদের সহিত কাটানোতে স্বভাবতঃ চিন্তাশীল রাস্কিনের মাথায় স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্ন, সমস্যার বিষয় হইয়া ঢোকে। ফলে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে মাঞ্চেষ্টারের টাউন-হলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাই পরে 'Lilies of Queen's Gardens'—'রাণীর নিজ মালঞ্চের ফুল' নামে প্রকাশিত হয় (১৮৬৫)। আমরা এখানে মোটামুটি তিনি এই প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিব। প্রায় সত্তর বৎসর পরে কবর খুঁড়িয়া ইংরেজীতে লিখিত নারীশিক্ষার ধারা সম্বন্ধে এই লেখা এখানে উদ্ধৃত করার কি প্রয়োজন ছিল—আলোচনা পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে।

রাস্কিনের রচনার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, গদ্য-লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি মূলতঃ কবি, উপমার প্রাচুর্য্যে তাঁহার রচনা ঋদ্ধ। সাদামাটা ভাবে কিছু ভাবিয়া ওঠা তাঁহার আসিত না। তাই পুরুষের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পুরুষকে যেমন তিনি রাজা বলিয়াছেন, তেমনই স্ত্রীশিক্ষার উল্লেখে তিনি নারীকে রাণী অভিহিত করিয়াছেন। পুরুষের জগতকে তিনি বলিয়াছেন—Treasuries, কুবেরের ভাণ্ডার, নারীর জগৎকে বলিতেছেন—মালঞ্চ। নারী এই মালঞ্চের ফুলদলকে নিষ্ঠা ও সৌন্দর্য্যে ফুটাইয়া তুলিবে—নারীজীবনে ইহাই সবার চাইতে বড় কর্ত্তব্য।

বক্তৃতার সূচনা করিয়াছেন তিনি এই বলিয়া, কেন আমরা পড়ি? তাঁহার মতে এ পৃথিবীতে যদি রাজমুকুট বলিয়া কিছু থাকে, তবে সে-মুকুট এই শিক্ষা, জ্ঞানের মুকুট—নারীর পক্ষে ইহাই সম্রাজ্ঞীর মুকুট।

সম্রাজ্ঞী-নারীর গুণবিচারের পূর্ব্বে তিনি সাধারণ ভাবে পুরুষ নারীর কি সম্পর্ক তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নারীর স্বাধিকার, নারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—এ সকল

কথা অর্থহীন,—প্রাচীন যুগের যে ধারণা, নারী পুরুষের ছায়া ও ক্রীতদাসী মাত্র—তাহারই মত অর্থহীন। ['We are foolish and without excuse foolish in speaking of the 'superiority' of one sex to the other as if they could be compared in similar things. Each has what the other has not, each completes the other and is completed by the other : they are in nothing alike and the happiness and perfection of both depend on each asking and receiving them from the other what the other only can give.'] অর্থাৎ নারী ও পুরুষের কেহই কাহারও অপেক্ষা ছোট কি বড় নয়। ইহার যে গুণ আছে উহার তাহা নাই, উহার যে গুণ আছে ইহার তাহা নাই—দুইজন দুই জনের পরিপূরক। দুইজনের দেওয়া-নেওয়ায় দুইজনে সার্থক হইয়া উঠে।

পৃথিবীর গ্রন্থাগারে আমাদের সকল বিপদে সাহায্য করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের মতামত সঞ্চিত আছে – রাস্কিনের কথায়, এই মতামত সংগ্রহ করিবার উপায় বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানই শিক্ষা। বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তিনি পৃথিবীর এই জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন। প্রথমে শেক্‌সপীয়ার হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নাটকে মহৎ-চরিত্র পুরুষের একান্ত অভাব, অপর পক্ষে তাঁহার অধিকাংশ নায়িকাই মহৎ—কর্ডেলিয়া হইতে ভার্জিনিয়া পর্য্যন্ত। তাঁহার সকল ট্রাজেডির মূলে পুরুষের বুদ্ধিহীনতা। ওফেলিয়া ছাড়া শেক্‌সপীয়ারে দুর্ব্বল চরিত্রের নারী নাই—লেডী ম্যাকবেথ, রিগ্যান, গনেরিল নিয়মবহির্ভূত। নারীচরিত্র সম্বন্ধে শেক্‌স-পীয়ারের এই মত। এবং শেকসপীয়ারের মত নিতান্ত তাচ্ছিল্য করিবার বস্তু নয়।

ওয়াণ্টার স্কটেরও ঠিক এই মত। তাঁহার গ্রন্থে শুধু তিনটি মহৎ চরিত্রের পুরুষ আছে, পক্ষান্তরে অন্ততঃ দশটি নায়িকা আছে, যাঁহাদের বিষয়ে বলা চলে 'স্মরেন্মিত্যং'। অন্যান্য উপনায়িকাদের তো কথাই নাই। দান্তে, এস্‌কিলাস্, চসার, স্পেন্সার ও হোমার সকলেরই এই মত। সভ্যতার ইতিহাসও এই মতকে সমর্থন করে। মধ্য-যুগের নাইটদের দৃষ্টান্ত এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। রাস্কিন বলিতেছেন, সে যুগে যে মেয়েরা পুরুষদের বর্ম্ম পরাইয়া দিত, তাহাকে রোমাণ্টিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, সত্যই আত্মার যে-বর্ম্ম তাহা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেহ পরাইতে পারে না।

রাস্কিন মানিয়া লইয়াছেন, নারীর প্রতিভা জীবনযুদ্ধের সংঘর্ষে আত্মপ্রকাশ করে না, উহা সংঘর্ষের অন্তরালে শান্তিনীড় রচনার জন্য। নীড় বাঁধিবার মাল-মশলা আনয়ন করুক্ পুরুষ, নারী তাহা সাজাইয়া-গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিবে। এবং এই জন্যই নারীর শিক্ষা একেবারে নির্ভুল হওয়া দরকার। পুরুষের ত্রুটি তাহাকে ক্রমাগত সারিয়ে সারিয়া চলিতে হইবে। তাই তাহাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত হইতেই হইবে, তাহার আত্মাভিমান থাকিলে চলিবে না। পুরুষের বুদ্ধিকে নারীর বোধ ক্রমাগত মার্জ্জিত করিবে সুতরাং তাহার শিক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া চাই।

তাহা হইলে নারীকে কি শিক্ষা দেওয়া দরকার ?

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, যাঁহারা মনে করেন পুরুষে ও নারীতে পার্থক্য নাই, রাস্কিনের এ শিক্ষানীতি তাঁহাদের জন্য নয়। যে-নারীর মনে পুরুষের সহিত প্রতি-যোগিতা করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, সে-নারীর জন্য রাস্কিন তাঁহার শিক্ষার ছক প্রস্তুত করেন নাই। পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া লইয়াছেন যে পুরুষ রাজার জাত, নারী রাণীর জাত, —বিভিন্ন অথচ স্বতন্ত্র, টেনিসন যেমন বলিয়াছেন

> Not like to like, but like in difference,
> Yet in the long years liker must they grow ;
> The man be more of woman, she of man ;
> * * *
> Till at last she set herself to man,
> Like perfect music unto noble words.

—মর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের একীভূত আধার আদর্শ এই নারীর জন্য তাঁহার শিক্ষার ছক।

তাঁহার এই শিক্ষার ছকের প্রধান ও প্রথম কথা—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য। এই স্বাস্থ্যের জন্য চাই দেহের স্বাধীন সম্প্রসারণ, সৌন্দর্য্যের জন্য চাই মনের বাধাহীন বিকাশ, যেমন ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের লুসির হইয়াছিল।—তাহাকে কোথাও এতটুকু বাধা দিলে চলিবে না, সে নিজে নিজের যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবে। সামান্য মাত্র বাধা তাহার মনে দাগ ফেলিবে, তাহার নির্দ্দোষিতাকে কলঙ্কিত করিবে এবং সেই কলঙ্ক তাহার সৌন্দর্য্যহানির কারণ হইবে।

এমন করিয়া যখন তাহার দেহের কাঠামো তৈয়ারী হইবে তখন তাহার মনের শিক্ষার কথা উঠিতে পারে, তৎপূর্ব্বে নয়।

যে শিক্ষায় অনুভব-শক্তি বাড়িবে, পুরুষের মত শুধু জানিবার নয়, যে-শিক্ষায় বুঝিবার শক্তি বাড়ে, মেয়েকে সেই শিক্ষা দেওয়া দরকার। অনেকগুলি ভাষা জানি, আমি বিদুষী—এসব পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব তাহার নাই বা হইল, বরং অপরিচিত অতিথিকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়ন করার তাহার বেশী প্রয়োজন।

রাস্কিনের মত এই যে স্বাধীনভাবে মেয়েদেরকে ছাড়িয়া দিলে, তাহারা নিজেরা কি ভাল, কি মন্দ বুঝিয়া লইতে পারে, ছেলেরা ইহা পারে না। লাইব্রেরীতে কোনো মেয়েকে ইচ্ছামত বই বাছিয়া লইতে বলিলে সে ঠিক ভাল বইখানি বাছিয়া লইবে, কিন্তু কোনো ছেলেকে এ সম্বন্ধে বিশ্বাস করা যায় না। মেয়েদের স্বভাবই এই। কোনো মেয়েকে হাতুড়ী দিয়া পিটিয়া-পুটিয়া তোমার মনের মত গড়িয়া তুলিবে, এমন ব্যাপার অসম্ভব। সে নিজের কল্যাণ নিজে বেশী বোঝে। রাস্কিন বলিতেছেন, মেয়েরা সকল দিক দিয়া ফুলের মতো—প্রচুর সূর্য্যালোক ও বায়ুর অভাবে ফুল যেমন নিস্তেজ হইয়া অবশেষে ঝরিয়া পড়ে মেয়েরাও ঠিক তাই, তাহাদের সম্পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত চাই অবাধ মুক্তি।

এ যুগে অবশ্য ছেলেমেয়ে, দুজনের শিক্ষা সম্বন্ধেই প্রচলিত ধারণা,—তাহাদেরকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া। আমাদের দেশে এমন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আজও গড়িয়া উঠে নাই, যাহাতে ইহার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট চলিতে পারে। এবং পারিবারিক আব্‌হাওয়াও এমন নয় যে, ছেলে কি মেয়ে কেহ বাধাহীন স্বাধীনতায় গড়িতে পারে। বরং সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত শাসনে শাসনে কণ্টকাকীর্ণ।

রাস্কিনকে যাঁহারা সেকেলে বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে চান্‌, তাঁহাদিগকে তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এই অবাধ স্বাধীনতার ধারণা একটু ভাবিয়া দেখিতে বলি। একথাও তিনি বলিয়াছেন যে, মাত্র বাহিরের স্বাধীনতাই স্বাধীনতা নয়, মনের স্বাধীনতা হইতেছে আসল বস্তু। পাশ্চাত্যে নারীকে বাহিরের স্বাধীনতাই কেবল দেওয়া হইয়াছে, পাশ্চাত্যের কোনও অতি-আধুনিকাকে একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে যে ভিতরে তাহার ভিক্টোরিয়ার যুগের বুড়ী-গ্রাণ্ডি আজও পুরাপুরি আছে, শুধু বাহিরেই যত স্বাধীনতার সাজ। দুঃখ এই যে, তবু আমরা এই মিথ্যা স্বাধীনতার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদের দেশের নারীশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিতেছি।

নারীকে জীবন্ত ডিক্সনারি হইবার কোন দরকার নাই—কোন্‌ দেশে কয়টি নদী এবং কবে কোন্‌খানে ইতিহাসের কি যুদ্ধ হইয়াছিল এসবও তাহার বিশেষ জানিবার প্রয়োজন নাই—তদতিরিক্ত কিছু জানিবার তাহার প্রয়োজন আছে। প্রতিদিন তাহারই চারিপাশে যে-ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার বিচার-বুদ্ধি অত্যন্ত সজাগ থাকা দরকার। অতীত যে দুঃখ তাহার ইতিহাস যদি তাহাকে জানিতেই হয়, তবে সে-জ্ঞান যেন বর্ত্তমানের দুঃখ সম্বন্ধে অনুভূতিকে তীব্রতর করিতে সাহায্য করে।

রাস্কিনের এই মতের সঙ্গে প্রগতি-বিবাদী মতের মূল পার্থক্য লক্ষণীয়। তাঁহার মতে নারীকে পুরুষের সমান শিক্ষা দাও তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তদতিরিক্তও তাহার কিছু শেখা দরকার। অর্থাৎ নারীপুরুষের শিক্ষার ধারা এক হোক্‌—কিন্তু লক্ষ্য, উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হওয়া চাই। [And indeed if there were to be any difference between a girl's education and boy's I should say that of the two the girl should be earlier led to, as her intellect ripens faster, into deep and serious subjects]—অর্থাৎ মেয়ে ও ছেলের শিক্ষাতে যদি কোন বিভিন্নতা রাখিতেই হয়, তাহা হইলে সে শুধু এই যে, মেয়েকে অল্পবয়সে গভীর শাস্ত্রে হাতখড়ি দেওয়া চলিতে পারে, ছেলেকে নয়—কেননা মেয়েদের অল্পবয়সেই বুদ্ধির গভীরতা আসে।

সবদেশের মেয়েদের নবেল-পড়ার বাতিক গুরুজনের কাছে একটা মহা চিন্তার বিষয়। রাস্কিন বলিতেছেন, ক্ষমতাশালী লেখকের যে-কোন উপন্যাস, নাটক মেয়েরা পড়ুক্‌ তাহাতে ক্ষতি নাই—কেননা এ বিষয়ে রাস্কিন আধুনিক মত পোষণ করিতেন যে, উপন্যাসের নীতিমূলক কি দুর্নীতিমূলক বলিয়া দুই জাত নাই, উপন্যাস হয় সুলিখিত নয় কুলিখিত। ক্ষমতাশালী লেখকের কোনো উপন্যাসই অপাঠ্য নয়। সুতরাং মেয়েরা যদি উপন্যাস পড়িতে চায়, তাহাতে ক্ষতি নাই—কেবল তাহারা যেন অক্ষম লেখকের রচনা না পড়ে—ইহা দেখা দরকার।

এ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে, মেয়েরা ঘর সাজাইবার পুতুলের মত, কেমন করিয়া চলা-ফেরা করিতে হয়, সহবৎ শিখিতে হয়, ঠিক কতখানি কণ্ঠস্বরের সাহায্যে হাসিতে হয়—গান গাহিতে হইলে কি-পরিমাণে চোখকে আবেশ-বিহ্বল দেখাইতে হইবে—স্ত্রীশিক্ষা এ পর্য্যন্ত এই সব বিষয় লইয়াই ব্যস্ত আছে। সত্যকার জীবনে, সংসারিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের দিক্ দিয়া তাহার শিক্ষাকে কোনোদিন নিয়ন্ত্রিত করা হয় নাই। অগত্যা নারী আজ মাত্র গৃহসজ্জার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নারীশিক্ষার বিষয়ে প্রচলিত কুসংস্কার আজও একচ্ছত্র অধিপতি—লোকে কি বলিল, মেয়েটা এমন করিলে লোকে ভাল বলিবে কি মন্দ বলিবে, এই চিন্তাই মেয়েদের শিক্ষার গতি-নির্দ্দেশক। সাহস করিয়া মেয়েকে বাধা-বিপত্তির মধ্যে ছাড়িয়া দিবার কথা কোন বাপ-মা ভাবিতে পারে ?

কিন্তু এ-সাহস যদি একবার কেহ দেখাইতে পারেন, তবে তাহা নিতান্ত ব্যর্থ হইবে না। জোয়ান-অব-আর্কের জীবনী হইতে সে-প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে, ছেলে হোক্ মেয়ে হোক্—প্রকৃতির সাহায্য আমরা শিক্ষায় একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে করি। স্বভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছেলেমেয়েরা তাই অস্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠে। প্রাচীন কালে তপোবনের শিক্ষা নিতান্ত অকারণে প্রচলিত হয় নাই।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, ইহাতে মনে হইতে পারে নারীর কর্ত্তব্য কেবল গৃহের অভ্যন্তরেই নিবদ্ধ। এমন কথা মনে করা ভুল হইবে। গৃহের ভিতরে যেমন নারী ও পুরুষে কর্ত্তব্যের ভেদ আছে, গৃহের বাহিরেও ঠিক তেমনই। গৃহাভ্যন্তরে পুরুষের যে-কর্ত্তব্য, ভরণপোষণ-ব্যবস্থা, সংসারের উন্নতি করা, তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা—গৃহের বাহিরেও তাহার সেই একই কর্ত্তব্য—বহির্শক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা, শাসন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। অপর পক্ষে গৃহাভ্যন্তরে নারীর যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলার, নিয়ম ও সংহতিমূলক কাজ করিতে হয়, গৃহের বাহিরেও তাহার সেই কর্ত্তব্য।

রাস্কিনের এই মন্তব্য হইতে বোঝা যায়, তিনি মনে মনে সাফ্রেজ-অন্দোলনের বিরোধী ছিলেন না, নারীকে তিনি রাষ্ট্র হইতে বহির্ভূত করিবার পক্ষপাতী নন্। কিন্তু রাষ্ট্রেও তিনি নারী ও পুরুষের কর্ত্তব্য-স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিয়াছেন। রাস্কিনের মত যে অনেকাংশে সত্য, ইহা স্বীকার করিতে খুব বেশী চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। বক্তৃতার শেষ দিকে রাস্কিন নারীজাতির সুবুদ্ধিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন।

মোটামুটি ভাবে রাস্কিনের যাহা বক্তব্য তাহা এখানে বলা হইয়াছে। সামান্য পরিসরে একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধের সারাংশ দিতে হইয়াছে বলিয়া উপরে লিখিত অংশকে একটু খাপছাড়া বোধ হইবে—তেমন হৃদয়গ্রাহী লাগিবে না। কিন্তু কোনও মনোযোগী পাঠক ইহা পড়িলে বুঝিবেন—সত্যই রাস্কিনের চিন্তা-ধারা এ বিষয়ে, ষাট বৎসর পূর্ব্বে যে বিস্তৃত ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বহিয়াছিল—আজও কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। নারীর শিক্ষা, গৃহে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, হয়তো তাঁহার চিন্তার ধারা উঁহাদের দেশের এ যুগের চিন্তার ধারার সহিত খাপ খাইবে না—কিন্তু ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, আমাদের দেশে নারীশিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে বিতর্ক, বাদানুবাদ ছাড়িয়া আমরা অনায়াসে রাস্কিনের এই শিক্ষার ছক্‌কে মোটামুটি মডেল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। ১৮৬৫ সনে নারীশিক্ষা বিষয়ে ইংলণ্ড যে-স্থানে ছিল, আমরা এ বিষয়ে আজও সেই স্থানে আছি। সুতরাং দেশ ও পাত্রের সকল অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও—রাস্কিনের এ চিন্তা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার অনেক সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম।

কিন্তু অপরাপর সকল বিভাগের মতো আমাদের দেশের নারীশিক্ষার কর্ণধারবৃন্দ গতানুগতিকতার স্রোতে তরী ভাসাইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। দেশে এমন কোনও ব্যক্তি নাই যে ইহার বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষে অভিযোগ ও অভিযান আনয়ন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে পারেন—এ পথ ভুল, এ পথে চলিলে মৃত্যু অনিবার্য্য ; এখনও পথ পরিবর্ত্তন কর, যে-পথে গেলে স্থির লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, সে-পথের সন্ধান জানিবার প্রয়োজন আছে।

রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

(পরামর্শ ও মন্ত্রণা)

মধুমতীর বন্য অথচ সুদৃশ্য দুই তীর, নিকটে জনাকীর্ণ গ্রামের অবস্থান সত্বেও, সুদীর্ঘ দুর্ভেদ্য তৃণে আচ্ছন্ন এবং এই তৃণভূমি মনুষ্যপদলাঞ্ছিত নহে। রাধাগঞ্জের ঈষৎ দক্ষিণে এইরূপ একটি অদ্ভুত নির্জ্জনতা-হেতু প্রায় ভয়াবহ স্থান আছে। নিবিড় তৃণভূমিই শুধু স্থানটিকে সুদুর্গম করিয়া রাখে নাই, ঘনসন্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ বেতসলতা ও অন্যান্য লতাগুল্ম ইহাকে অধিকতর দুর্গম করিয়াছে। নদীতীর হইতে ভিতরে বহুদূর পর্য্যন্ত এই অরণ্য বিস্তৃত। এমন কোনও একটি স্থান যদি আবিষ্কার করা সম্ভব হইত যেখান হইতে লতাগুল্মাচ্ছাদিত সুদূরপ্রসারী এই বনভূমিকে একটি সম্পূর্ণ পরিদৃশ্যমান আলেখ্যের মত দেখিবার পথে কোনও অন্তরায় উপস্থিত না হইত—তাহা হইলে দেখা যাইত যে, ঘনসন্নিবিষ্ট এই বনভূমির কোথাও একটু ফাঁক নাই। বিষধর সর্পের এই অন্ধকার আরণ্যভূমিও যে মনুষ্যপদশব্দে চকিত হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ এক অতি সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলার-পথ আছে; কিন্তু এই পায়ে-চলার-পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে গভীর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রয়োজন। এই পথচিহ্ন ধরিয়া সামান্য অগ্রসর হইতে না হইতেই পথ হারাইয়া যায়; অরণ্যের তৃণ ও অন্ধকার নিঃশেষে পথের সকল চিহ্ন গ্রাস করে। এই পথে চলিতে অভ্যস্ত যাহারা তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; এই চিহ্নহীন আঁকাবাঁকা পথেই তাহাদের অভ্যস্ত চক্ষু তাহাদিগকে অভ্যন্তরে লইয়া যায়, বনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তৃণ-কুটিরটি পর্য্যন্ত। কুটিরের চালটি আশেপাশের ঝোপগুলি হইতে একটু উচ্চ হইলেও সন্নিহিত বৃক্ষের শাখাপত্র কৌশলে টানিয়া ও সাজাইয়া এমন ভাবে চালটিকে গোপন করা হইয়াছে যে কাহারও কৌতূহলী দৃষ্টি সেদিকে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না; সমস্তটা মিলিয়া কুটিরটিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ একটা ঝোপ বলিয়াই মনে হইত। এই ক্ষুদ্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই মনে কেমন একটা অস্বস্তিকর ভাব জাগে, নিরানন্দে মন ভরিয়া উঠে। কুটিরের মেঝে অত্যন্ত স্যাৎসেঁতে। বাঁশ এবং দরমা নির্ম্মিত দেওয়াল, ভিজা মেঝেতেও দু-তিন পুরু দরমা বিস্তৃত; এককোণে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ধূম্রকৃষ্ণ রন্ধনের কয়েকটি পাত্র জড় করা ছিল; দেখিলেই মনে হয় যে, এগুলি কচিৎ ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যুষ তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই; ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ-পত্রের অন্তরাল-পথে প্রাতঃসূর্য্যের সুদীর্ঘ রশ্মি তখনও বন-ভূমিতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

কুটিরের অধিবাসী দুইটি মাত্র ব্যক্তি, তাহাদের বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ ও দেহের অবয়ব ও গঠন এমন সুদৃঢ় এবং পেশীবহুল যে দৃষ্টিমাত্রে তাহাদের শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের কটিদেশে মাত্র একখণ্ড করিয়া সামান্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিশিষ্ট স্থূল বস্ত্র জড়ান ছিল। সুকৃষ্ণ দেহের অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লাঠি ও তরবারিগুলি দেখিলে সহজেই অনুমান হয় যে নিতান্ত শান্তিতে তাহারা জীবিকার্জ্জন করে না। তীব্রগন্ধী গঞ্জিকার ধূমে কুটিরটি পরিপূর্ণ, তাহারা পালা করিয়া গাঁজা টানিতেছিল। সেই জনমানবশূন্য বনপ্রদেশেও তাহারা অত্যন্ত সাবধানে অতি নিম্ন-কণ্ঠে কথোপকথন নিরত ছিল।

একজন প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আমাদের এতে লাভ?—কণ্ঠস্বরে পাঠক নিশ্চয়ই পূর্ব্বপরিচিত ভিখুকে চিনিতে পারি-তেছেন।

তাহার সঙ্গী উত্তর দিল, একটা মোটা টাকা।—পাঠক বুঝিতেছেন ইনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব সর্দ্দার ছাড়া কেহই নন। —পাকা পাঁচটি হাজার টাকা। এক রাত্রের রোজগার হিসেবে মন্দ নয়। কি বল? ভাগীদার তো আর কেউ জুটছে না।

ভিখু উল্লাস গোপন করিতে পারিল না, চ্যাঁচাইয়া উঠিল, তোফা।—ভাঁটার মত তাহার গোল চোখ দুইটি চক্‌ চক্‌ করিয়া উঠিল।—তাহ'লে উকীল ব্যাটাকে রাস্তায় পাবড়ে দিয়ে দলিলটা হাত করলেই তো হয়! তার সঙ্গেই তো ওটা থাকবে! অন্য জায়গা থেকে ওটা সরানো কি সুবিধা হবে?

সর্দ্দার উত্তর দিল, যত গোল বাধিয়েছে তো ওই মাগী, ওই রাজমোহনের স্ত্রী! রাজমোহনের সঙ্গে আমার পরামর্শ বেটি সব শুনেছে—আমরা যে দলিলটার সন্ধানে আছি মাধবের তা জানতে বাকী নাই। সে কি আর রীতিমত

সেপাই-শান্ত্রী না দিয়ে দলিল পাঠাবে? আমরা তো এদিকে সাকুল্যে দুজন। অন্য রাস্তায় দলিল হাতাবার চেষ্টা কেন করছি, বুঝলিতো বাঁদর!

ভিখু উত্তর দিল, সর্দ্দার, তাই বা হবে কেমন করে' শুনি। দুজন মিলে বাড়ী চড়াও করে' কোনও কাজ হবে?

সর্দ্দার বলিল, সে কাজ আমি ক'রবরে উল্লুক, গায়ের জোরে যেখানে কাজ না হয় সেখানে বুদ্ধিতে কাজ হাঁসিল করতে হয়।

ভিখু ছিলিমে একটা লম্বা টান মারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল, গাঁজার ধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উপরে উঠিতেছে।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সে বলিয়া উঠিল, না, না সর্দ্দার, আমি তো ভেবেই ঠিক করতে পারছি না, তুমি কেমন করে' কাজ হাঁসিল করবে। আর একটা কথা, যার জন্যে এই কাজ করতে হবে সেকি পাঁচ হাজারের এক হাজারও আগাম দেবে না? ফ্যাল কড়ি মাখ তেল! টাকাটা হাতে এলে তো বুঝি কিছু কাজ হ'ল। তখন এখান থেকে কেটে পড়লেই বা আমাদের ধরছে কে?

একটু গম্ভীর হইয়া সর্দ্দার উত্তর করিল, আরে বাবা, সে কি তেমন কাঁচা ছেলে! আমার সঙ্গে তার বন্দোবস্তটা কেমন হয়েছে শোন্। দলিলটা আমাদের হাতে এসেছে দেখাতে পারলে তবেই সে দেবে এক হাজার, তার হাতে সেটা দিলে আর দুহাজার, তাহলে মোট তিন হাজার হ'ল। তারপর মকোদ্দমা হ'লে যদি তার জিৎ হয় তাহলে বাকী দুহাজার আমরা পাব। তবে উইলটা নষ্ট করে দিলে জিৎ যে হবে তাতে সন্দেহ নাই।

—তা হলে উপায়? কি মতলব করছ শুনি।

—নারে না। তুই বেটা আগে থাকতে শুনলেই সব কাজ পণ্ড করবি। ধূর্ত্ত রাজমোহন তোর পেট থেকে কথা টেনে বের করবে, তাহলেই সব মাটি। ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্, যা বলি কর্- ব্যাস্, কাজ ঠিক হবেই।

ভিখু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, কি, রাজমোহন আমাকে ঠকাবে?—কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর নামাইয়া সে বলিয়া উঠিল, চুপ, পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

অদূরে বনের মধ্য হইতে প্যাঁচা যেমন শব্দ করে মনুষ্য-কণ্ঠে তাহার অনুকৃতি শোনা গেল। সর্দ্দার ঠিক অনুরূপ শব্দ করিয়া উত্তর দিয়া বলিল, রাজমোহন আসছে।

দেখিতে না দেখিতে রাজমোহন স্বশরীরে কুটিরে দর্শন দিল। সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, এই যে রাজমোহন, খবর কি?

রাজমোহন বলিল, খবর ভাল, আমার স্ত্রী ফিরে এসেছে।

সর্দ্দার খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল, বটে, বটে? কেমন করে পেলে হে? সে ছিল কোথায়?

রাজমোহন বলিল, সেও এক তাজ্জব ব্যাপার! বোনের বাড়ী সে যায় নাই, আন্দাজ করতে পার কোথায় গিয়েছিল সে?

দস্যু দুজনেই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, কোথায়? কোথায়?

—আরে আমি কিন্তু ঠিকই আঁচ করেছিলাম—তিনি গিয়েছিলেন খোদ মথুর ঘোষের বাড়ীতে।

—বটে? তা সে ফিরে এসে বল্ছে কি?

—কি আর বলবে? এখন পর্য্যন্ত তো একটা কথা বের করতে পারি নি। বাড়ীতে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, তারা কেউ কিছু জেনেছে বলে তো মনে হ'ল না।

সর্দ্দার চাপা কণ্ঠে বলিল, যা হোক, ওকে খতম করে' দাও।—তাহার রোষকষায়িত চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতেছিল বলিয়া মনোভাব গোপন করিবার জন্য সে দৃষ্টি নত করিল।

রাজমোহন বলিল, ভেবে দেখ সর্দ্দার, তার কি কোনও দরকার আছে?

—আহা—আমি আগেই বলেছিলাম তুমি—

রাজমোহন কথায় একটু জোর দিয়া বলিল, শোন সর্দ্দার, সবটা শোনই না। ওই বদমাস মাগীকে আমি তোমাদের চাইতে কম ঘৃণা করি না। সেদিন সকালে যদি ওকে পেতাম তাহলে দেখতেই পেতে, ওর ওপর আমার কত ভালবাসা! এখন, আমি স্বীকার করছি, রক্তটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ও কাজ করার মত সাহসও এখন নাই, অতটা কঠোরও হতে পারছি না। তাছাড়া আমরা যে জন্যে ভয় পেয়েছিলাম,

সে কাজ সে করেনি ; সে মাধব ঘোষের বাড়ীতেও যায় নি, কালকের রাত্রের ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈও করে নি। যদি আজ এসব ও না করে থাকে, কালই যে করবে তার মানে কি ?

সর্দ্দার একটু ভাবিল, শেষে বলিল, বেশ – আমি এমন একটা জায়গার কথা জানি যেখানে ওকে পাঠালে তোমার আমার কারও আপত্তি হবে না—বিপদের আশঙ্কাও কিছু থাকবে না।

রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

—জিনিষ-পত্তর বেঁধেছেঁদে তোমার সুন্দরী পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে মিৎগুন্টিতে বসবাস করবে।

—ডাকাত হয়ে থাকতে হবে নাকি ?

—ডাকাত তুমি নও ?

– কাজে হয়তো তাই, কিন্তু নামডাকে ডাকাত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

—তা'হলে তুমি যাবে না ?

—না, এই নচ্ছার স্ত্রী ছাড়াও আমার সংসারে অন্য লোক আছে। তাদের সবাইকে নিয়ে কি ডাকাত হওয়া সম্ভব ?

—আমাদের সংসার নাই নাকি ?

—আছে নিশ্চয়, কিন্তু আমিতো এদেরকে জানাতে পারবো না কি ভাবে আমি জীবন নির্ব্বাহ করব।

সর্দ্দার তাহাকে বাধা দিয়া প্রভুত্বের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, চোপ। আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার বোনকে ছেলেপেলে সমেত তার স্বামীর কাছে পাঠাতে পার, সে গরীব কি বড়লোক তা তোমার দেখার দরকার কি ? আর তোমার পিসী—তোমার মত অনেকেরই পিসী সে ; নিজের পথ সে নিজেই দেখে নিতে পারবে।

রাজমোহনের দ্বিধা তখনও দূর হয় নাই। অনেকক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলিল। শেষে সর্দ্দারের হুম্‌কি এবং মাধব ঘোষের জমিদারী চিরদিনের জন্য পরিত্যাগের বাসনায় সর্দ্দারের প্রস্তাবে সে রাজী হইল।

তখনও দুপুর শেষ হয় নাই—রাজমোহন স্নান সারিয়া প্রাতরাশ গ্রহণের জন্য বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমেই দেখা হইল তাহার বোন কিশোরীর সঙ্গে।

রাজমোহন বলিল,কিশোরী, সেই হতভাগীকে আমার কাছে আসতে বল্। আমার বাড়ী ছেড়ে আবার কেমন করে পালাতে হবে তাই তাকে শিখিয়ে দেব ! যা।

কিশোরী অবাক হইয়া বলিল, কার কথা বলছ দাদা ?

কিশোরীর প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া রাজমোহন দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, কার কথা বল্‌ছি ? কেন, তোর বউদির কথা ! তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি ?

কিশোরী বলিল, বৌদি তো বাড়ীতে নাই।

রাজমোহন চমকাইয়া উঠিল, বলিল, বাড়ীতে নাই, তার মানে ? সকালে কি সে ফেরে নাই ?

—তুমি বল্‌ছিলে বটে যে বড়-বাড়ী থেকে তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে – তুমি কি পাঠিয়েছিলে তাকে ?

বিরক্তি ও বিস্ময়ে রাজমোহন কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, সব জোচ্চুরি, আমি নিজে দেখেছি খুকীর মায়ের সঙ্গে সে এদিকে আসছিল।

কিশোরী বলিল, অবাক্ কাণ্ড বাপু, তবে গেল কোথায় ? সবাইকে জিজ্ঞেস কর, কেউ দেখেছে কিনা।

রাজমোহন বাঘের মত ছুটিয়া বাড়ীর আশপাশ চারিদিকটা একবার দেখিয়া আসিল ; তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু মাতঙ্গিনীকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া সে চীকার করিয়া বলিয়া উঠিল, দৌড়ে যা কিশোরী, দেখে আয়, হতভাগী নিশ্চয়ই আবার তার বোনের আশ্রয় নিয়েছে। দাঁড়া, পিসিমাকে বল্, কনকদের বাড়ীতে খোঁজ করতে। সেখানেও সে যেতে পারে। আমি এখানে পাহারায় থাকছি।

কিশোরী আর তার পিসি দুজনে দুদিকে ছুটিয়া গেল কিন্তু অনতিবিলম্বে বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। রাগে বিরক্তিতে ও বিস্ময়ে হতভাগ্য রাজমোহন গজরাইতে লাগিল। সেই দুপুরের রৌদ্রেই সে কিশোরীকে আবার মথুর ঘোষের বাড়ীতে খবর লইতে পাঠাইল। কিশোরীর পক্ষে অতদূর যাওয়াটা খুব সহজসাধ্য ছিল না, তবুও কিশোরী বিনীত ভাবে দাদার আদেশ প্রতিপালন করিল কিন্তু তাহার বৌদিদির কোনও সন্ধানই লইয়া আসিতে পারিল না। [ক্রমশঃ

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

[নিম্নলিখিত নূতন বইগুলি আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি, যথাসময়ে সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।]

হিন্দুত্বের পুনরুত্থান—শ্রীমতিলাল রায়, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, পাঁচসিকা।

কার্লমার্ক্‌স-এর মঞ্জরী ও মূলধন—শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত। শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, ১২নং মণ্ডল ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া।

উর্ব্বশী ও আর্টেমিস—শ্রীবিষ্ণু দে, গ্রন্থকার-মণ্ডলী, কলিকাতা।

অন্দরের আলো—শ্রীলালমোহন দে। পি, সি, সরকার এণ্ড কোং, ২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা।

ব্যোমকেশের ডায়েরী—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পি, সি সরকার এণ্ড কোং। ২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা।

দিল্‌রুবা—আবদুল কাদির। পি, সি, সরকার এণ্ড কোং। ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

রণডঙ্কা (২য় সংস্করণ)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এম. সি, সরকার এণ্ড কোং। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য দশ আনা।

[আশ্বিনের বঙ্গশ্রীতে যে সকল প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল তাহার সর্ব্বগুলির সমালোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হইল না : নিম্নে মাত্র কয়েকটি পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইল।]

মোপাসাঁর গল্প—অনুবাদক শ্রীননীমাধব চৌধুরী, এম-এ। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা।

খুচরো খুচরো ভাবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক মোপাসাঁর গল্প আমরা সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় মাতৃভাষাতেই পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি কিন্তু পুস্তকাকারে গ্রথিত মোপাসাঁর গল্প সম্ভবতঃ এই প্রথম। ইহাতে বাছা বাছা আটটি গল্প আছে। সুবিখ্যাত বুল দ্য-সুইফ গল্পটিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরাজী-অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের সহিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকের এই পরিচয় সাধন করাইবার চেষ্টা করিয়া ননীমাধব বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। আশাকরি তিনি ভবিষ্যতে মূল ফরাসী হইতে মোপাসাঁর আরও গল্প আমাদের শোনাইবেন।

অনুবাদের ভাষা চমৎকার ঝরঝরে, কোথাও অস্পষ্টতার চিহ্নমাত্র নাই। তৎসত্ত্বেও ভূমিকা-লেখক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জবাবে ইহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে ভাষার দিক দিয়া, যে গল্পটি তিনি সাধুভাষার আশ্রয়ে রচনা করিয়াছেন সেইটিই সব চাইতে ভাল।

কেশবার্জ্জুন—মহাভারত কাব্যাভিনয়। শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৵০।

মহাভারত আদিপর্ব্বের কুরুপাণ্ডু-ভ্রাতাদের কথা লইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্যখানি রচিত। যে বিরাট গ্রন্থের কল্পনা কবির মনে জাগিয়াছে আসলে ইহা তাহার ভূমিকা মাত্র। এই কল্পনা সফল হইলে এই জড়বিজ্ঞানের যুগে আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ ঘটিবে।

এই কাব্যখানির মধ্যে কোথাও ফাঁকি নাই, তিনি যাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন তাই লিখিয়াছেন ; ফলে তাঁহার নিজের জীবনও যেন এই মহাকাব্যের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। ভাষা প্রাচীন-পন্থী, নবীনদের নিকট স্থানে স্থানে হাস্যকর ঠেকিতে পারে, ঠেকিলেও ভাষা তেজোব্যঞ্জক।

মহাকবি শেখ্ সাদীর গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ—শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী, ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে দুই টাকা ও দেড় টাকা।

বঙ্গদেশের ভাবসাধনার ধারার সহিত পারস্যের ভাবসাধনা বহুশতাব্দী পূর্ব্বে মিলিত হইয়াছে। এমন কি, বাঙলার এক সম্প্রদায়ের 'মরমী' কবিরা পারস্যের 'মরমী' কবিদের নিকট হইতেই যে তাঁহাদের মূল প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এমন একদিন ছিল, যখন শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে হাফেজ, রুমী, জামী, নিজামী, সাদীর কবিতা অত্যন্ত সমাদরের সহিত পঠিত হইত। সে খুব বেশী দিনের কথাও নয়। পারস্য ভাষা তখন বাঙালীকে রীতিমত শিখিয়া লইতে হইত। নব্য বাঙলার তথা নব্য ভারতের যুগগুরু রামমোহনও যে পারস্যের রত্নভাণ্ডার হইতে অনেক খোরাক সংগ্রহ করিয়াছিলেন একথাও সর্ব্বজনবিদিত।

তারপর যে কারণেই হউক, বাহিরে এই দুই প্রাচীন ভাবধারার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। পারস্যভাষাচর্চ্চা ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুমুসলমান প্রায় সকল বাঙালীই হাফেজ, নিজামী, সাদীকে ভুলিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা তাঁহাদের কাব্যের রস যেটুকু পান করিতেছেন তাহা ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে। কিন্তু তাহাতে রসিকের চিত্ত তৃপ্ত হয় না ; রস পাওয়া যায় হয় মূলে, নয়, মাতৃভাষায় তাহার অনুবাদে।

শেখ হবিবর রহমান সাহেব এই অভাব দূর করিবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহারই ফল স্বরূপ এই গ্রন্থ দুইখানি আমরা পাইয়াছি। ইহাতে

আমাদের ক্ষোভ সত্যই খানিকটা মিটিবে। তিনি নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি, যতটা সম্ভব মূলের রস বজায় রাখিয়া তিনি সাদীর দুখানি কাব্যগ্রন্থ আমাদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন। বাংলাভাষায় সম্পূর্ণ এই দুইখানি কাব্যের অনুবাদ এই প্রথম। হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে এই দুইখানি গ্রন্থের আদর হউক, ইহাই কামনা করি।

অভিনয়-শিক্ষা—দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দাম আড়াই টাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাট্য-জগতে শুধু নাট্যকার হিসাবেই সুপরিচিত নহেন, তিনি নিজে সুদক্ষ অভিনেতা এবং অভিনয়-শিক্ষাদান কার্য্যে অদ্বিতীয়। সুতরাং অভিনয়-শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনায় তিনি যে যোগ্যতম পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ইহাই প্রমাণ করিতেছে। এই সংস্করণের নাম দেওয়া হইয়াছে—অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ। সত্যই ইহা অভিনব। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনয়-কার্য্যে যাঁহারা মহাকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন অভিনয়-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করাতে গ্রন্থের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের ভূমিকাটি একটি ডকুমেণ্ট। নাট্যামোদী বাঙালীর কাছে এরূপ গ্রন্থের সমাদর হওয়া উচিত। চিত্রে, গল্পে, বর্ণনায় ইতিহাসে অভিনয় সম্বন্ধে এমন চিত্তাকর্ষক বই খুব কমই দেখিয়াছি। সমগ্র গ্রন্থখানি এমন সরস ভঙ্গীতে রচিত যে পড়িতে পড়িতে মনেই হয় না যে বই পড়িতেছি। সমস্ত ছবি চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে।

নারীহরণের প্রতিকার—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রণীত (শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা-সহ)। গ্রাম ডহালিয়া, পোঃ আঃ ডুয়ারাবাজার, জিলা শ্রীহট্ট, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা।

এই বইখানি যে অত্যন্ত সময়োপযোগী বাংলার দৈনিক পত্রগুলির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। যেখানে পুরুষ ক্লীব ও পঙ্গু সেখানে নারীহরণের প্রতিকার সম্বন্ধীয় পুস্তক একখানা হাতের কাছে থাকা ভাল। বাংলার নারীরা এই সহজ বইখানি পড়িলে নিজেদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবহিত হইতে পারিবেন আশা করা যায়।

RAMMOHUN ROY, THE MAN AND HIS WORK, Centenary Publicity Booklet—No I. Compiled and Edited by Amal Home. As 8 per copy.

পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবে শ্রীযুক্ত অমল হোমের কৃতিত্ব Calcutta Municipal Gazette সম্পাদন দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে, এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থের সম্পাদনেও তাঁহার বিচক্ষণতা ও অসাধারণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় আছে। এত অল্প পরিসরের মধ্যে রামমোহন রায়ের মত কঠিন ও পরিত্যক্ত বিষয় সম্বন্ধে তিনি সাধারণকে কৌতূহলী করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। শত-বার্ষিকীই হউক আর মেমোরিয়ালই হউক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রামমোহন রায় ব্যক্তিটিকে অবতারত্বের ও ধর্ম্মগুরুর আবরণ সরাইয়া, মহৎ এবং বিরাট পুরুষ—যাহা তিনি সত্যই ছিলেন, হিসাবে সাধারণের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইতেছে না রামমোহনের যথার্থ সমাদর ততক্ষণ পর্য্যন্ত হইতে পারে না। এই পুস্তিকায় অমল হোম মহাশয় সেই কার্য্যসাধনে চেষ্টিত হইয়া সফল হইয়াছেন। অন্ধ মোহ তাঁহাকে এই কার্য্যে অনুপ্রাণিত করে নাই এইটাই সব চাইতে প্রশংসার বিষয়।

ভারত ও ইন্দোচীন—ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী। প্রকাশক : শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী, ৯ রুস্তমজী ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ। ১০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—বহু মূল্যবান চিত্র সমন্বিত।

বইখানি ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে লিখিত। লেখক ইতিহাসজ্ঞ, প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের খ্যাতি আছে। বইখানি পড়িতে পড়িতে তাই কেবলই মনে হইতেছিল, সেই বিশেষজ্ঞের জ্ঞান এমন সহজ ও সরল করিলেন তিনি কোন্ যাদুবিদ্যার স্পর্শে। বই শেষ করিয়া বুঝিলাম, যে-যাদুবিদ্যা সুদূরকে নিকট, জটিলকে প্রাঞ্জল করে—সেই ভাবৈশ্বর্য্য, লেখকের সহজ-কবচ। এই ভাবৈশ্বর্য্য দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের কাশ্মীর-রাজকুমার গুণবর্ম্মণকে ও উজ্জয়িনীর পরমার্থকে তাঁহার কাছে পরমাত্মীয় করিয়াছে এবং সে-আত্মীয়তা তিনি আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাই লেখকের সহিত আমরা এ বই পড়িতে পড়িতে ইন্দোচীনের পথে বৌদ্ধমন্দির, কম্বোজের পথে পালি বিদ্যাপীঠ, এঙ্কোর ভাট, বায়ণ-মন্দির, তৎপ্রাচীর-খোদিত সমুদ্রমন্থনের চিত্র এবং চম্পার পথে ছোট নদীর উপত্যকা ও ঘন বন দেখিয়া—অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার এবং পাণ্ডুরঙ্গের সংবাদ বহন করিয়া, চ্যামেদের পরিচয় লাভ করিয়া, পো-নগরের মন্দিরে বিশ্রাম করিয়া, টঙ্কিনের বন্দর হইতে হ্যানয়ের পুস্তক-সংগ্রহ দেখিয়া আসিলাম। এখন কেবলই মনে হইতেছে—'শত শত ভারত-সন্তান এই সমুদ্রের উপর দিয়ে পূর্ব্বদেশে গমন ক'রেছিলেন—একই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।...ভারতের নিঃস্বার্থপরতার এগুলি হ'চ্ছে জাজ্বল্যমান নিদর্শন—গরিমাময় দৃষ্টান্ত।...ভারতের ইতিহাসের পাতা তিল তিল করে খুঁজলেও এই সব গৌরবমণির নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কোথায় গুণবর্ম্মণ, কোথায় পরমার্থ, কোথায়ই বা গুণভদ্র? ভারত তার এই সব কৃতী সন্তানের নামও মনে রাখেনি—'

এ পুস্তকের বহুল প্রচার না হইলে বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য।

শারদীয় সংখ্যা বাংলা সাময়িক পত্রিকা-গুলি সম্মুখে টেবিলের উপর সাজাইয়া লইয়া বসিয়া আছি। বেশ লাগিতেছে। মনে হইতেছে মায়ের পূজা এবার জমিয়াছে ভাল। মা-দুর্গাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই যে বাৎসরিক লেখনী-কণ্ডূয়ন-বৃত্তি, যে ধরণেরই হোক, এই যে সাধনা—ইহার সিদ্ধি একদিন ঘটিবেই। যে সকল লেখক, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নহে, কুম্ভকর্ণের মত সম্বৎসরের মধ্যে একবার জাগিয়া উঠিয়া শারদীয়

সংখ্যা পত্রিকাগুলিকে খাইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়েন তাঁহারা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ঘুম দিয়াছেন, যাঁহারা আফিমখোর তাঁহারা ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া তড়কাইতেছেন।

সব চাইতে বেশী তাল ঠুকিয়াছেন শরৎচন্দ্র, 'স্বদেশে'...অবশ্য তিনি কুম্ভকর্ণ-সিরিজের নহেন, 'দেবদাসে'র পর বিচিত্রায় 'রেণুলাবলি' 'বিপ্রদাস' লিখিতেছেন এবং 'ভারতবর্ষে' 'শেষের পরিচয়'। কিন্তু সে পরিচয় 'প্রকট' হইয়া উঠিয়াছে 'স্বদেশে' 'সাহিত্যের মাত্রা'য়। মাত্রা সাহিত্যের কি না কে বলিবে? হইলেও মাত্রা বেশী স্বীকার করিতেই হইবে। একবার নরেশচন্দ্র-রূপ 'বাঘের মুখে' পড়িয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ চাট ছুঁড়িয়াছিলেন। তাহার পরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী, শরৎ-বন্দনা দুই-ই হইয়া গেল; পরস্পর-পিঠ-চুলকানি-সভার সভারূপে নরেশচন্দ্র উভয় ক্ষেত্রেই পৌরোহিত্য করিলেন। সেবার রবীন্দ্রনাথ কাহাকেও তাক না করিয়া অন্ধকারে আখড়া লক্ষ্য করিয়া গদা ছুঁড়িয়াছিলেন। এবারে তিনি নাকি রব তুলিয়া দিয়াছেন, 'অমুকে গু মাড়িয়েছেন' (পৃঃ ১৭৪)। গদাটাও শরৎচন্দ্র মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, নূতন অপবাদটাও পায়ে মাখিয়া লইতে তাঁহার লজ্জা নাই। সব্যসাচী-স্রষ্টাকে কাপুরুষ কোন মতেই বলা চলিবে না।

শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'যোগাযোগ' বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিলো এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবল পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টগ্ অফ ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি-ডাক্তার মীমাংসা করে দিলে এক মুহূর্ত্তে এসে।' শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী-সমস্যার গাঁটছড়া বাঁধিতে বাঁধিতে যিনি জটিল জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন কুমুদিনী-মধুসূদন-সমস্যার টাগ-অফ-ওয়ারে তাঁহার ভয় পাইবারই কথা। কারণ, প্রথমোক্ত সমস্যায় লেডি ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী স্বয়ং সেয়ানা।

শরৎচন্দ্রের চিঠির শেষ পংক্তি, 'বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়'—একথা শরৎ-ভক্তেরা স্মরণ রাখিলে অনেক সমস্যারই সহজ সমাধান হইতে পারে।

সব্যসাচীর পরেই বীরবল। আশ্বিনের 'উত্তরা'য় তাঁহারও একটি পত্র বাহির হইয়াছে। প্রথম পংক্তিতেই ছাপার ভুলে যে রস জমিয়া উঠিয়াছে, তিনি কেন লেখেন না তাহার দুই পাতা ব্যাপী কৈফিয়ৎও তাহা কাটাইয়া দিতে পারে নাই। ছাপাখানার শয়তান মাঝে মাঝে যে এক আধটা হিউমার করিয়া বসে এক একটা বীরবল-গোপালভাঁড়ের সমস্ত জীবনের সাধনাও তাহাতে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। চিঠিটির প্রথম লাইন এইরূপ—'আপনি (উত্তরা-সম্পাদক।) বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, যে এদানিক আমি নেশা ছেড়ে দিয়েছি।' ভুল এবং শুদ্ধ উভয় পাঠেই তিনি ভালই করিয়াছেন, কারণ আজীবন লিখিয়া সুরেশ চক্রবর্ত্তীর নিকট আমার লেখা কেহ পড়ে না বলিয়া কাঁদুনী গাওয়ার চাইতে না লেখাই সমীচীন।

তবু কিঞ্চিৎ সত্য কথা আছে বলিয়া চিঠিটি সার্থক হইয়াছে। যথা—

'—একথা বলিতে পারি যে
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

সেই জন্যই তো লিখতে ভয় পাই। কারণ, ঐ গুঁড়োটুকু ছিবলেমির গুঁড়ো।'

'কল্যাণীয়েষু মণ্টু'কে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথও পরবর্ত্তী কালের একটি কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন (উত্তরা, আশ্বিন)। তবে অনেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ভালবাসেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ঠাকুর রবীন্দ্র-ভক্ত তাঁহারা আঘাত পাইবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে রেহাই দিলে পারিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"ভূতটাকে (চিঠির জবাব দেওয়ার প্রবৃত্তি) আমার স্কন্ধ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অমিয়র (হায় রাম, হায় অযোধ্যা!) উপরে চালান ক'রে দিয়েছি; অনেকে তার হস্তাক্ষর আমারই মনে ক'রে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রাখবে। ভাবীকালের প্রত্নতত্ত্ববিদদের জন্য গবেষণার খোরাক জমা হচ্ছে। হয়ত ৩৯১০ সালে এই গৌড়দেশেই কোনো পণ্ডিত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবেন যে রবিঠাকুর ছিল Solar myth, তাঁর একচক্ররথের বঙ্গীয় নাম ছিল অমিয়চন্দ্র, এই জন্য তাঁর বাহনের প্রতি লক্ষ্য ক'রে তাকেই বলা হ'ত অমিয় চক্রবর্ত্তী। ডকুমেণ্টরি এভিডেন্স থেকে দেখানো শক্ত হবে না যে, ভারতের পূর্ব্বগগনে যেখানে রবিঠাকুরের পীঠস্থান, অমিয় চক্রবর্ত্তীর অধিষ্ঠানও ঠিক একই স্থানে।"

ইদানীং রবীন্দ্রনাথের লেখাও এমন অমিয়-চক্রবর্ত্তী-ঘেঁষা হইতেছিল যে ভবিষ্যতে ইণ্টারনাল এভিডেন্স হইতেও সঠিক কিছু ধারণা করা কঠিন হইত। 'বরাহ-নাগরিকা' শ্রীমতী রাণী মহলানবিশ চিঠিখানি রক্ষা করিয়া এক হিসাবে দেশের উপকারই করিলেন।

বীরবলের পরেই ধূর্জ্জটিপ্রসাদ। তাঁরও চিঠি—স্বদেশ-সম্পাদক কেষ্টবাবুকে একখানি এবং উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ বাবুকে একখানি—দুইয়ে মিলিয়া একজোড়া চশমা যেন—কাচ রঙীন, এই যা গোল। দুঃখের কথা আজকাল ধূর্জ্জটি বাবু 'নবেল পড়ার সময়' পান না; নবেল পড়িবার আগ্রহও তাঁহার নাই। আগ্রহ থাকিলে আরও অনেক সরস চিঠি আমরা পাইতে পারিতাম।

অথচ, তিনি অম্লান বদনে চুনোপুঁটি হইতে ইলিস কাৎলা পর্য্যন্ত যতগুলি উপন্যাস অধুনা বাঙলা ভাষায় বাহির হইয়াছে, প্রায় সবগুলি সম্বন্ধেই অত্যন্ত বিজ্ঞের মত, এটা প্রথম শ্রেণীর, ওটা দ্বিতীয় শ্রেণীর, সেটা চতুর্থ শ্রেণীর চতুর্থ পংক্তিতে বসিবার যোগ্য, মন্তব্য করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ধূর্জ্জটি বাবুর বয়স যদি আমাদের জানা না থাকিত তাহা হইলে একটি প্রচলিত বিশেষণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতাম।

ভাবিতে ইচ্ছা হয়, এই সকল পাকামি করিবার অধিকার মানুষ অর্জ্জন করে কেমন করিয়া! পাকা ফলের মত ইঁহাদের জিহ্বাগ্রে পাকা মত ঝুলিয়াই আছে, সুড়সুড়ি দিলেই তাহা টুপ্ টাপ্ করিয়া পড়িতে থাকে। কোথায়ও সন্দেহ নাই, নিক্তিতে ওজন-করা সব মত! নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়!

শ্রীলতার বৌদির 'সবুরি'রও একটা সীমা আছে, কিন্তু ধূর্জ্জটি বাবু অপরিসীম সবুর, একথা তাঁর উপর রাগ না করিয়াও বলা যায়।

কিন্তু এসকলকে ছাপাইয়া, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বীরবল, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ—সকলকে অতিক্রম করিয়া এবার পূজার বাজার সরগরম করিয়া রাখিয়াছে

সিনেমা সাহিত্য ও সিনেমা চিত্র। আ-হিমাচল-উইটিবি বাংলার সকল সাহিত্যিকই এবার নিশ্চয়ই কামনা করিয়াছেন পরজন্মে সিনেমা-ষ্টার হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার। মা-দুর্গাও এবার তারকা-অভিনেত্রীদের পিছনে পড়িয়াছেন।

দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রের পাশে কলা-বউয়ের মতো প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় যত অঘটন ঘটাইয়াছেন ভাদ্রের 'বসুমতী'র 'সেকালের স্মৃতি'তে। ইহার জের মহরম পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছাইবে কিনা বলিতে পারি না ; শান্তিপ্রিয় লোক আমরা, আমাদের বড ভয় হইতেছে। অন্ধকূপ-হত্যা সত্যই ঘটিয়াছিল কিনা আজ জোর করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ক্লাইভ ষ্ট্রীট দপ্তরে হলওয়েল মনুমেণ্টটা আজিও সত্যের নামে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জলধর দাদার 'হিমালয়'ও না হয় তেমনই দাঁড়াইয়া থাকিত !

২১শে আশ্বিনের সাপ্তাহিক 'ছোটগল্পে' শ্রীযুক্ত জলধর সেন লিখিতেছেন— "অনেক কাল আগে আমি হিমালয়ভ্রমণে গিয়েছিলাম। .. আমার গানের খাতার পিছনে যে কয়খানি সাদা পৃষ্ঠা ছিল, তাইতে সামান্য একটু আধটু পথের কথা লিখে রাথতাম।..... সেই লেখাটুকুকে অবলম্বন ক'রে স্মৃতির সাহায্যে 'হিমালয়' লিখেছিলাম

ভাদ্রের 'বসুমতী'তে শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিতেছেন, "সেই ৭০।৭৫ পৃষ্ঠা কাপি হইতে হিমালয়ের মত অত বড় কেতাব, কেবল তাঁহার (জলধরবাবুর) ডায়েরীর অস্থি-কঙ্কালের উপর, আমার ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে আসমানের কেল্লার মত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। কখন হিমালয়ে যাই নাই, হিমালয় দেখি নাই, কি লিখিতে কি লিখিব ভাবিয়া পাইতাম না।......জলধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতাম—তিনি বলিতেন, "যা মনে আসে লিখে যান......।" জলধরবাবুর হিমালয়-ভ্রমণের শুভ্র অস্থি-কঙ্কালের উপর এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল।"

যাঁহার নোট লইয়া যিনিই লিখিয়া থাকুন হিমালয় বাঁচিয়া থাক্।

কিন্তু, 'স্বদেশপ্রেমিক, খদ্দরভক্ত ও মহাত্মা গান্ধীর গুণকীর্ত্তনে অনুরক্ত' যে বাঙালী কবির একমাত্র পেশা জুয়াচুরি করিয়া অর্থসংগ্রহ, যাঁহার কৌশলে পড়িয়া কোনও 'অভাগিনী ক্ষোভেদুঃখে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন' তাঁহার কথাই ভাবিতেছি। এবার পূজার বাজারে ছোট এবং বড় সকল বার্ষিকীই তাঁহার প্রাপ্য।

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন

সম্প্রতি এণ্ড্রুজ সাহেব মহাত্মাজীকে ১৮৩৩ সনের দাসত্ব-প্রথা-রোধের সহিত অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের তুলনা করিয়া এক চিঠি দিয়াছিলেন তদুত্তরে মহাত্মাজী লিখিতেছেন—

"......অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের অর্থই বা কি এবং ১৮৩৩ সালের দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদের অর্থ ই বা কি ছিল ? আইন প্রণয়ন করিয়া দাসত্ব-প্রথাকে ধ্বংস করিতে হইয়াছিল। অন্তরের দাসত্ব-বোধ ঐ আইন দ্বারা ধ্বংস হয় নাই, এমন কি, আজ এই একশত বর্ষ অন্তেও সেই দাসত্ব-বোধ বর্ত্তমান আছে। ১৮৩৩ সালের প্রচেষ্টাকে খাটো করিবার উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইতেছে না—ইহা দ্বারা ১৮৩৩ সালের প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতার কথা বলা হইতেছে। সুতরাং ১৮৩৩ সালে যে অর্থে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছিল—সেই অর্থে ১৯৩২ সালে পণ্ডিত মালব্যজীর সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে হিন্দু প্রতিনিধিদিগের যে সভা হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই ভারতের অস্পৃশ্যতাও দূরীভূত হইয়াছে। উহা কোনও ভূয়া ব্যাপার নহে। 'নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা বোর্ড' গঠনই তাহার প্রমাণ। সেই দিন হইতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুদিগের ঐরূপ প্রতিশ্রুতি-পালন উদ্দেশ্যে একটি জীবন তাহার জামীনস্বরূপ রহিয়াছে।

"১৮৩৩ সালের প্রচেষ্টার পিছনে গবর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত আইন ছিল বলিয়া ১৯৩২ সালের প্রচেষ্টাকে কেহ যেন হীন চক্ষে না দেখেন এবং মনে না করেন যে,—যেহেতু ১৯৩২ সালের প্রচেষ্টা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মেলনের ফল, সুতরাং তাহার পিছনে কোনও অনুমোদন বা মঞ্জুরী নাই।......

"অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-সঙ্ঘসমূহের উদ্দেশ্য অতিশয় মহান। ভগবানের চরণে প্রার্থনা, ঐ সব সঙ্ঘ যেন হিন্দু-সমাজ-ধ্বংসকারী যুগাতীত কালের অন্ধ কুসংস্কারকে বিদূরিত করিয়া হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিবার মত অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি-লাভে সমর্থ হয়।"

সম্পাদকীয়

পরলোকে অ্যানী বেশাণ্ট

গত ২০শে সেপ্টেম্বর অ্যানী বেশাণ্ট পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন ১৯৩৩ সন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর। এই প্রায় ৮৬ ছিয়াশী বৎসর কাল ধরিয়া, অর্থাৎ উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর—জগতের দুইটি অতি রোমাঞ্চকর শতাব্দীর সমস্ত উত্থান-পতন, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এই মহীয়সী নারীর জীবন সাক্ষাৎভাবে বিজড়িত ছিল। অ্যানী বেশাণ্টের পরলোক-গমনের সহিত জগতের একটি অতি বিচিত্র এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব চলিয়া গেল। এক জন নারীর জীবনে এত বিভিন্ন এবং এত জটিল ভাবধারার সমাবেশ ও প্রকাশ খুব অল্প দেখা যায়।

যে-দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ইংলণ্ডে যখন প্রথম বৈজ্ঞানিক নাস্তিকা-বাদ এবং বস্তুতান্ত্রিকতা দেখা দিল—তখন প্রথম যৌবনে তিনি সেই ভাব তরঙ্গে অবগাহন করেন এবং সেই নবানীতি প্রচারের জন্য ইংলণ্ডের নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়ান: চার্লস ব্রাড্‌লর তিনি ছিলেন একমাত্র নিত্য-কর্ম্ম-সহচরী; রাজ-তন্ত্র-শাসিত ইংলণ্ডে প্রথম সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠা তিনি দেখিয়াছেন—সেই দলে থাকিয়া বার্ণার্ড শ, হেকেল প্রভৃতির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারই সম্পাদিত কাগজে (Our Corner, The Link) বার্ণার্ড শ' তাঁহার ফেবিয়ান মতামত প্রচার করিয়াছেন; নব যৌন-তন্ত্রের বন্যা যখন আসিয়াছে তাহার প্রচার-কল্পে অবিরাম লেখনী চালনা করিয়াছেন—নতুন কাগজ (National Reformer) বাহির করিয়াছেন, ইংলণ্ডে প্রথম জন্মশাসন-নিয়ন্ত্রণ লীগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহার জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছেন; বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য জগৎ-খ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড অ্যাভেবারীর শিষ্য হইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের উচ্চ ডিগ্রী লইয়াছেন, দক্ষিণ কেনসিংটন কলেজে বিজ্ঞানের আটটি ভাষায় শিক্ষকতা করিয়াছেন;

ডাঃ অ্যানী বেশাণ্ট [মিউনিসিপাল গেজেটের সৌজন্যে

ইংলণ্ড যখন নির্ব্বিবাদে তাহার উপনেবিশগুলির উপর কঠোর রাজ-তন্ত্রের নিগড় পরাইতেছিল, এবং যখন সেই সব উপনিবেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন, তখন অ্যানী বেশাণ্ট আয়ারল্যাণ্ড,

ইজিপ্ট, আফগানিস্থান এবং ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থাকে প্রতিবাদ করিয়া পুস্তকের পর পুস্তক লিখিয়াছেন (Coercion in Ireland and its Result; Our Shameful Egyption Policy; England, India and Afganisthan etc.); ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে তিনি জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন এবং ধাত্রীর মত সূতিকা-গৃহে তাহাকে লালন-পালন করিয়াছেন; পাশ্চাত্য শিক্ষায় সম্মোহিত ভারতবর্ষকে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পশ্চিমের বস্তু-তন্ত্রের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে দেখিয়া প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্ম মন্থন করিয়া নব-ধর্ম্ম-বাদ প্রচার করিয়াছেন—হিন্দু কালচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু-কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়াছেন (The Ancient Wisdom; Study in Consciousness; The Story of the Great War; Ramchandra, the Ideal King; Bhagavat Gita, Religions of India etc)—পরধর্ম্ম গ্রহণ হইতে সেই যুগের হিন্দুকে তিনি অধিকাংশে রক্ষা করিয়াছেন—মাদ্রাজের সেই সময়কার অবস্থা এবং তাঁহার প্রভাবের কথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে একথার সত্যতা স্পষ্ট বোঝা যায়; স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল একজায়গায় লিখিয়াছিলেন, অ্যানী বেশান্টের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, অসাধারণ বাগ্মিতা, এবং অনির্ব্বাণ উৎসাহ এবং কর্ম্মকুশলতা ব্যতিরেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মোহগ্রস্ত ক্ষণিক বাদবিলাসী গত যুগের ভারতীয় শিক্ষিতদের চিত্তকে দয়ানন্দ, কেশব সেন অথবা রাণাডে কেহই এমন ব্যাপকভাবে প্রতিহত করিতে পারিত না।

একথা সত্য, যে, হিন্দু-দর্শন এবং তাহার ক্রিয়াকাণ্ডের যে সমস্ত ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রে হয়ত অভ্রান্ত নয়; ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সহিত সব সময় তিনি একমত হইতে পারেন নাই—এবং ইদানীং কৃষ্ণমূর্ত্তির ব্যাপারে তাঁহার ব্যক্তিত্বের মহিমা অনেকের কাছে ম্লান হইয়াও যাইতে পারে—কিন্তু এসব সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে—এত বড় ব্যক্তিত্ব, এইরূপে অবিচ্ছিন্ন কর্ম্ম-গৌরবময় জীবন, এইরূপ বহুমুখী-প্রতিভা জগতের নারী-সমাজে খুব কমই দেখা গিয়াছে।

ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। যেদিন উটাকামণ্ডে তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়, সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া এবং নিঃশেষে মরিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া, বলপূর্ব্বক আমাকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। অন্যায়ের সহায়তা করা অপেক্ষা সে-বেদনা শ্রেয়ঃ। আজ আমি বৃদ্ধ, কিন্তু অন্তরের একমাত্র বাসনা, মরিবার পূর্ব্বে যেন আমি ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন পাইতে দেখিয়া যাইতে পারি। যদি সেই স্বপ্নকে সত্য করিবার সাধনায় কিছুমাত্র সহায়তা করিয়া থাকি—তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। ভগবান্ ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন। বন্দে মাতরম্।"

আজ মহাজ্যোতিষ্মান এই জ্যোতিষ্কের প্রয়াণ-পথের দিকে চাহিয়া সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে বলি—বন্দেমাতরম্।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের শতবার্ষিকী

প্রায় একশো বছর আগেকার ঘটনা।

একদিন মেডিক্যাল কলেজের আউট-ডোর ডিস্‌পেন্‌সারীতে ছাত্রেরা বাহিরের রোগীদের পরিচর্য্যা করিতেছেন। এমন সময় সেখানে কলেজের অধ্যাপক ডাঃ আর্চ্চার আসিয়া ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা করিবার জন্য চক্ষু এবং আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। এই রকম ভাবে অতর্কিত প্রশ্ন দ্বারা ছাত্রদের বিদ্যা-বুদ্ধি পরীক্ষা করা তাঁহার রীতি ছিল। কোন ছাত্রই সেদিন তাঁহার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

সেইখানে মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার একজন আত্মীয়কে দেখাইবার জন্য সেদিন আউট-ডোরে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। কেহই উত্তর দিতে পারিল না দেখিয়া, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রটি অগ্রসর হইয়া ডাঃ আর্চ্চারের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। উত্তর শুনিয়া ডাঃ আর্চ্চার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে, কে এ প্রশ্নের উত্তর দিল?

খবর লইয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, একজন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এই দুরূহ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিতে পারিয়াছে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ডাঃ আর্চ্চার উপর্য্যুপরি সেই তরুণ ছাত্রটিকে আলোক-তত্ত্ব এবং চক্ষু সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; যুবক সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটির উত্তর দিল এবং সে উত্তর শুনিয়া

অধ্যাপকও বিস্মিত হইলেন। ছাত্রদের অনুরোধে এবং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া সেই দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রকে সেদিন কলেজের চক্ষু-বিভাগে অধ্যাপকের স্থানে চক্ষু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয়।

সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী যুবকটির নাম ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান– বিজ্ঞান-সাধনায় বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর প্রথম পথ-প্রদর্শক গুরু ও নেতা। শিক্ষা-সাধনা-জ্ঞান-ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমুজ্জল তাঁহার পূত-জীবন-কথা আজ মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে এবং নিদারুণ লজ্জার বিষয় যে, অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া বাংলার জ্ঞান-কর্ম্ম-জীবনে যিনি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আত্মদান করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহার আত্ম দানের ফলে আজ আমরা বিজ্ঞান-সাধনায় জগৎ সভায় দাঁড়াইতে পারিয়াছি—তাঁহাকে আমরা আজ চিনি না—শুধু জন সাধারণের স্মৃতিতে এই কথা জাগরূক আছে যে, তিনি বাংলার সেই সময়ের সব চেয়ে বড় চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীজাতির অগ্রগতির সঙ্গে তাঁহার জীবনের যে কতখানি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাহার কথা আজ বাংলার আদি-যুগের ইতিহাসের মত সুদূর হইয়াছে। অথচ তিনি দেহ-রক্ষা করেন মাত্র ১৯০৪ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়ান্স, Indian Association for the Cultivation of Science হইতে স্যর রমণ জগৎ-সভায় বৈজ্ঞানিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লইয়া যেদিন ভারতে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন তিনি একবার মাত্র বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতবর্ষে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের স্থান কোথায়!

আজ হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩৩ সনে ২রা নভেম্বর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়ে যে, নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহার শত-বার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করিতেছেন—

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র মুন্সী, শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। ১নং ব্লাকোয়ার স্কোয়ার, বিডন ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস, কলিকাতা।

ইঁহাদের বিস্তৃত কার্য্যসূচী শীঘ্রই সকল সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এবং
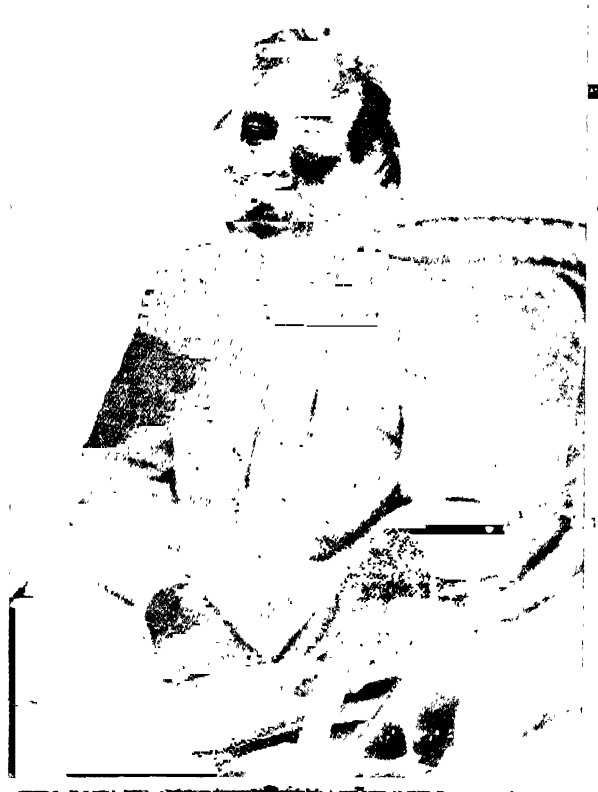
পরলোকগত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

বিজ্ঞান-সাধনায় বাঙ্গালীর প্রথম গুরুর শতবার্ষিকী উৎসবে প্রত্যেক বাঙ্গালীর যে অন্তরের উৎসাহ ও সহযোগিতা দেখা যাইবে আজ ইহা সহজেই আশা করা যাইতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষ অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সম্বন্ধে যাঁহারা যাহা জানেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন।

পরলোকে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের স্বনামধন্যা কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় পরলোক গমন

করিয়াছেন। কিন্তু "আলো ও ছায়া"র কবি বাঙালী পাঠকের মনে চিরদিন স্মৃতির পবিত্র আলোকে বিরাজ করিবেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জিলায় বাসণ্ডা গ্রামে শ্রীমতী কামিনী সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীচণ্ডীচরণ সেন। শ্রীমতী সেন তাঁহার পিতার নিকট হইতে সাহিত্যানুরাগ পাইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় 'টমকাকার কুটীর' অনুবাদ করেন এবং ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগের ঘটনা লইয়া কয়েকখানি উপন্যাস লিখেন। রাজনীতিক কারণে উপন্যাসগুলির প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীমতী সেন অতি অল্প বয়স হইতেই কবিতা রচনা করিতেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রভূত উৎসাহ পান। কন্যার কবিতা-রচনায় প্রীত হইয়া পিতা তাঁহাকে রামায়ণ ও মহাভারত উপহার দেন। এই দুইখানি মহাকাব্য তাঁহার কাব্য-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকালের জন্য বেথুন কলেজের শিক্ষকতার কাজ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রায় পরলোক গমন করেন।

কুমারী অবস্থায় তাঁহার প্রথম কাব্য-পুস্তক "আলো ও ছায়া" প্রকাশিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ভূমিকা লিখেন কিন্তু তাহাতে লেখিকার নাম ছিল না। তাহার পরবর্ত্তী অনেক পুস্তকই 'আলো ও ছায়া প্রণেত্রী প্রণীত' বলিয়া প্রকাশিত হয়। এবং আজও পর্য্যন্ত বাঙালী পাঠকের মনে তিনি 'আলো ও ছায়ার প্রণেত্রী' নামে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা কামিনী রায় যেদিন 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত করেন, সেদিন রবীন্দ্র-প্রতিভারও বিশেষ বিকাশ হয় নাই। সেই সময় 'আলো ও ছায়া'র লিরিক সুরটুকু বাঙালীর মনে বড় মধুর এক রেশ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

প্রভাতে বনতলে আলো ও ছায়ার মৃদু ভীরু কম্পনটি তাহার লিরিকগুলির মধ্যে অনাস্বাদিত আনন্দের সুমধুর প্রতীক্ষা এবং আঘাতহীন বেদনার তিক্ততাহীন বিধুরতা এক অপূর্ব্ব সুকোমল মাধুর্য্য আনিয়াছিল। সে মাধুর্য্য বাঙালীর মনকে সত্যই আনন্দ দিয়াছিল।

লোক-লোচনের সম্মুখে আসিতে তিনি সর্ব্বদাই কুণ্ঠিতা ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, তিনি বঙ্গ-নারীর কল্যাণ-আন্দোলনে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতেন এবং সেইদিক

পরলোকগতা কামিনী রায়।

হইতে বাংলার নারী-সমাজ তাঁহার তিরোধানে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার মৃত্যু-জনিত ক্ষতি পরিপূরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। 'আলো ও ছায়া'র কবি সেখানে মৃত্যু-জয়ী।

মহাত্মাজীর কর্ম্মতালিকা

ইতিমধ্যে যদি কোনও অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে মহাত্মাজী স্থির করিয়াছেন যে, ৮ই নভেম্বর হইতে সফরে বাহির হইবেন। প্রত্যেক স্থানে হরিজনদের জন্য যথারীতি অর্থ-সংগ্রহ করিবেন এবং সেই সেই যায়গার সনাতনীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহার তালিকার মধ্যে হরিজনদের বাড়ী-পরিদর্শনও আছে।

নূতন আদমসুমারীর ফলাফল

১৯২১—৩১ সালের আদম সুমারীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

এবারকার আদম সুমারী অনুসারে সমগ্র ভারতের লোক-সংখ্যা ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৭৮। ১৯২১ সালের তুলনায় অর্থাৎ দশ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৩,৮৯,৫২৯৪ বাড়িয়াছে। গত ৫০ বৎসরের হিসাব করিলে দেখা যাইবে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১০ কোটী। পূর্ব্বে চীন দেশের লোক সংখ্যাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। কিন্তু এবারকার আদম সুমারীর রিপোর্ট অনুসারে ভারতই লোকসংখ্যায় সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইল।

আদম সুমারীর হিসাবে দেখা যাইতেছে, ভারতের শতকরা ৭১ জন লোকই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে এবং শতকরা ১১ জন মাত্র শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। গত বৎসরের এমন কি গত দশ বৎসরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে যে অনুপাতে লোক বাড়িয়াছে, সেই অনুপাতে তাহার শিল্প-বাণিজ্যাদি বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং জমির উপরেই চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহার ফলে দারিদ্র্য সংক্রামক ব্যাধির মত বাড়িয়া চলিয়াছে।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও ভারতের অবস্থা যে শোচনীয়তর হইয়াছে তাহা রিপোর্টে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতের লোকের পরমায়ু গড়ে ২৬.৯১ বৎসরের বেশী নহে। বাঙ্গলা দেশের লোকের পরমায়ুর পরিমাণ অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের লোকদের চেয়ে কম, মাত্র ২৪.৯১ বৎসর।

শিক্ষার দিক দিয়া মোটামুটী ৩৫।০ কোটী লোকসংখ্যার মধ্যে সমগ্র ভারতে ২ কোটী ৮০ লক্ষ লোক কোন একটা ভাষায় লিখিতে পড়িতে জানে। অর্থাৎ অক্ষর-জ্ঞানবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা শতকরা ৮ জনের বেশী নহে। ১৯২১ সালে এই শ্রেণীর "শিক্ষিত" লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭ জন অর্থাৎ এবার কায়ক্লেশে শতকরা ১ জন বাড়িয়াছে। এবং আরও একটা ব্যাপার দেখা যাইতেছে, গত দশ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৫০ জন বাড়িয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রসংখ্যা শতকরা ২ জন হ্রাস হইয়াছে।

ব্যায়ামবীর কানাই মুখুজ্যে

শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখুজ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুল, ইটলী একাডেমি হাইস্কুল এবং ইনষ্টিটিউট অব ফিজিকাল কাল্‌চার-এর ব্যায়াম-শিক্ষক। ইনি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে নিজের দুর্ব্বল দেহকে সবল করিয়া তুলিয়াছেন। পেশী-সঙ্কুচন ও প্রসারণে (muscle control) তিনি
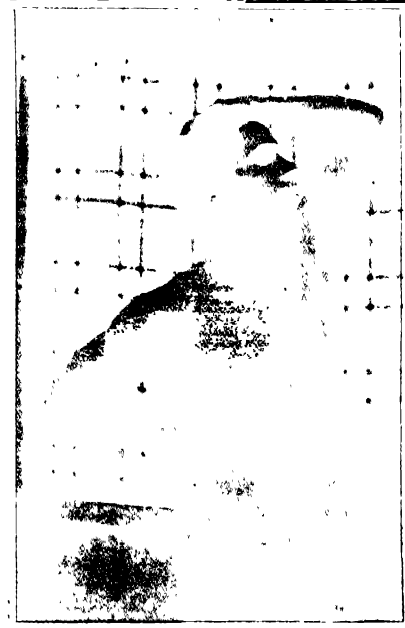
ব্যায়াম-বীর কানাই মুখুজ্যে।

অদ্বিতীয়; ভার-উত্তোলন, লৌহদণ্ড বক্রীকরণ ইত্যাদি বহুবিধ দৈহিক সামর্থ্যের পরিচয়সূচক কার্য্যেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সচরাচর দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া কথিত বাঙালী ছাত্রদের সম্প্রতি কিছুদিন হইতে শরীর সম্বন্ধীয় চর্চ্চা করিতে সুরু করিয়াছেন, ইহা খুবই আশার কথা।

ভারতে জাতীয় ঋণ

এই শীর্ষক যে প্রবন্ধটি বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মুদ্রিত হইয়া যাওয়ার পর দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম যে প্রবন্ধটি দুই কিস্তিতে ২২শে ও ২৫শে আশ্বিন তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকাতেই বাহির হয়। সম্ভবতঃ লেখক ভ্রমক্রমে বঙ্গশ্রী ও আনন্দবাজার উভয় পত্রিকাতেই প্রবন্ধটি পাঠাইয়া থাকিবেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৸০ আনা] মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, [প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা
৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা

[অমূল্যধন পালের] [স্বর্ণ পদক-

আজ দেশব্যাপী **বেঙ্গল শচীফুডের** সুখ্যাতি কেন? **বেঙ্গল শচীফুডের** সুযশ এই জন্য, ইহা যেমন **উপকারী** তেমনি **বিশুদ্ধ** এবং সম্পূর্ণ **ভারতীয় উপাদানে** ভারতবাসীর দ্বারা প্রস্তুত। আজকাল বাজারে এমন কোন শিশু-পথ্য বা খাদ্য নাই যাহা **বেঙ্গল শচীফুডের** সমকক্ষ হইতে পারে। এমন কি বিলাতি বার্লি বা এরারুট অপেক্ষা ইহা **শ্রেষ্ঠ** এবং **উপকারী**। আজকাল **বেঙ্গল শচীফুড** একমাত্র শিশু ও রোগীদের আহার্য্য ও পথ্য।

বেঙ্গল শচীফুড মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং মহামান্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

বেঙ্গল শচীফুড সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅমূল্যধন পাল

প্রসিদ্ধ মশলা-বিক্রেতা

ম্যানুফ্যাকচারার, কমিশন এজেণ্ট ও অর্ডার সাপ্লায়ার—**১১৩।১১৪, খেংরাপটী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

যদি আপনি খাঁটি বা নিখুঁত, মজবুত ও মধুর আওয়াজ-বিশিষ্ট যন্ত্র পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চান—আপনার উচিত কোন এক খ্যাতনামা বড় দোকান হইতে জিনিস লওয়া। ছোট বাজে দোকানের চেয়ে হয়ত দাম ৩৷৪ টাকা বেশী লাগিতে পারে কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিলে বড় দোকান হইতে ক্রয় করাই বিধেয়। ছোট দোকানেই প্রতারণার ভয় বেশী। শুনিতে কম দাম হইলে কি হয়?

ডোয়ার্কিনের দোকান ৬০ বৎসর সুপ্রতিষ্ঠিত ও যে-কোন দোকান অপেক্ষা ইহার খ্যাতি অনেক বেশী। আরও বিশেষ কথা এই যে, বৎসরের পর বৎসর এই দোকানের উন্নতি হইতেছে; কারণ, ইহার পরিচালকগণ সেই খ্যাতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যগ্র।

সোনরা হারমোনিয়াম, ডবল রীড—মূল্য—৩৬৲

ফ্লুটিনা বা গ্রামোলা হারমোনিয়াম, ডবল রীড—মূল্য—৪৫৲ হইতে ৬০৲

সচিত্র মূল্য-তালিকার জন্য লিখুন—ফেরৎ ডাকে পাঠাইয়া দিব।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স, ১১, এসপ্লেনেড, কলিকাতা।

ভাইটোপ্যাথিক সিস্টেম অব ট্রিটমেন্ট

সম্পূর্ণ দেশীয় সাধারণ অবিবাক্ত ভেষজ হইতে আরক আকারে তৈয়ারি। চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে অতি সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে সকল ব্যাধি আরোগ্য করা যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিনা মূল্যে ক্যাটালগ লউন।

সিদ্ধযোগ রিসার্চ্চ ল্যাবোরেটরী
১৩০ সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা

লোহার কড়ি

বরগা, বোলটু, গরাদে, গোল রড, এঙ্গেল, পাটী, করগেট টিন্, মটকা, কাঁটা তার প্রভৃতি টাটা ও কন্টিনেন্ট হইতে প্রচুর পরিমাণে আনাইয়া খুচরা ও পাইকারী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখি। সমগ্র ভারতবর্ষে লোহার কড়ির এত বড় ষ্টক কোনও দেশীয় ফার্ম্মের আছে কিনা সন্দেহ।

একই প্রকারের মাল বাজারে বহুবিধ রকমের পাওয়া যায়। বিশ্বস্ত দোকান হইতে মাল খরিদ করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মফঃস্বলের খরিদ্দারগণ তাঁহাদের আবশ্যকীয় মালের তালিকা পাঠাইলেই দর পাঠান হয় এবং অর্ডার মত মাল সযত্নে প্রেরিত হয়। আমরা সর্ব্বদাই ঠিক মাল ঠিক দরে দিয়া থাকি।

কুবের লিমিটেড
লৌহ ও ষ্টীল বিভাগ
৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—Manfred. টেলিফোন—কলিঃ ৫৯৪৫

একসেল লিমিটেডের

কাপড় কাচা সাবান

আপনার ব্যবহার করা উচিত

কারণ

১। ইহা খাঁটি ও ভেজালশূন্য।
২। অল্প সাবানে অধিক কাজ করে।
৩। ইহা শ্রমের লাঘব করে।
৪। ইহার পরিষ্কার করিবার শক্তি অত্যধিক।
৫। ইহা কাপড়ের কোন অনিষ্ট করে না।
৬। ইহা উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্দ্দোষরূপে প্রস্তুত।
৭। ইহার উৎকর্ষতার কদাচ লাঘব হয় না।

৫নং রাণী ব্রাঞ্চ রোড, কলিকাতা।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসল ইস্পাত নির্ম্মিত বি, এস, এ বাইসাইকেলই ব্যবহার করুন।

গ্যারান্টি ৫০ বৎসর।

B.S.A. CYCLE

সোল এজেন্ট—এম, এম, ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স
৫৫, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: ৪০৯৪ কলিকাতা

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহক

১। বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৸৹ টাকা। ষাণ্মাসিক ২৷৶৹ আনা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৶৹ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী c/o মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। মাঘ হইতে বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। প্রতি বাংলা মাসের পয়লা তারিখে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ৮ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

৪। জমা-চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ করা হয়। মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনি অর্ডার কুপনে অথবা আদেশপত্রে 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ চাঁদা পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহকসংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। না লিখিলে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পত্র লিখিবার সময়ও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ কথা মনে রাখিবেন।

প্রবন্ধ

৬। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৭। লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

বিজ্ঞাপন

৮। বাংলা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার। বিজ্ঞাপনের হার নীচে দেওয়া হইল।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫৲, ৮৲, ৪৷৹।

বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৫৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিত্রসূচী—অগ্রহায়ণ

মেঘমল্লার	(ত্রিবর্ণ)	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঝড়ের পরে	(দ্বিবর্ণ)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত
মন্দিরের পথে	„	শ্রীমুকুল দে

খেলার সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জাম—
স্যাণ্ডোর ডাম্বেল ও ডেভলপার
ডিস্ক লোডিং বারবেল
ক্যারম বোর্ড—রূপার কাপ ও
মেডেলের সচিত্র ক্যাটালগের

২৯ বৎসর যাবৎ
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ক্লাবে
কারনবিশের ফুটবলে খেলা হই
তেছে ইহাই আমাদের বলের
উৎকৃষ্টতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৮০৲ হইতে ৮৫০৲ টাকা মূল্যের
গ্রামোফন ও নানাবিধ রেকর্ড—

মাসিক
কিস্তিতে
ক্রয়
করিবার
ব্যবস্থা
আছে।

হিজ্ মাষ্টার ভয়েস 'পোরটেবল্'
নং ১০২ মূল্য—১২০৲

আজই পত্র লিখুন ৩ নং [illegible]

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[অগ্রহায়ণ—১৩৪০

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

(১) দীপশিখা

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

তিমির-তীর্থ।

গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া আলোর রেখা আমাকে স্পর্শ করে নাই; নিস্তরঙ্গ বায়ু আমার কানে কোনও শব্দ বহন করিয়া আনে নাই। হয় তো একা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম।

অস্পষ্ট মনে পড়িতেছিল, একদা আলোক-বন্যায় স্নান করিয়াছিলাম। আমার ললাটে ও কেশে আকাশের দীপ্তি আঘাত করিয়াছিল—সমস্ত অঙ্গে তাহার স্মৃতি যেন জড়াইয়া ছিল। কবে গান শুনিয়াছিলাম। কানে তখনও স্তোত্রের সুর অস্পষ্ট ঝঙ্কৃত হইতেছিল। মনে পড়িতেছে, সেদিন আনন্দের আবেশে কোলাহল করিয়াছিলাম।

তারপর কত যুগ চলিয়া গেল—হাসি-কান্নার, আলো-অন্ধকারের, উত্থান-পতনের সে কত ঢেউ!

আবার জ্ঞান হইল, দেখিলাম অন্ধকারে একা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছি। পথরেখা লক্ষ্য করি নাই।

সহসা অন্ধকার আলোড়িত হইল- মানুষের কলগুঞ্জন। দূরে কাহারা সম্মুখে দীপ জ্বালিয়া অগ্রসর হইতেছে।

ডাকিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বিমূঢ় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আবার অন্ধকার আলোড়িত হইল। দীপশিখার আর একটি দল ধীরে ধীরে আগাইয়া গেল।

একটি, দুটি, এমনই শত শত দীপশিখা। আমার অন্ধকার কেহ দূর করিল না।

বিস্মৃতি-তীর্থ।

সহসা আমার অন্ধকারও কাঁপিল। বাহুতে স্নেহস্পর্শ অনুভব করিলাম। আমার দীপশিখাও জ্বলিল, সম্মুখে ক্ষীণ পথরেখা।

কহিল, আমার অনুসরণ কর।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বৎসর, ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। ২৩শে অক্টোবর। পারিস।

'পরিব্রাজক' স্বামী বিবেকানন্দ লিখিতেছেন—

"এ বৎসর এ পারিস সভাজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করচেন, আজ এ পারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎ-বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর।"

এবং ইহারও তিন বৎসর পূর্ব্বে কবি রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছেন—

"বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।"

ইহার পর প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। সেদিনের সেই দীপশিখা, সেই 'বিদ্যুৎ-সঞ্চার' আমাদেরই জীর্ণ পর্ণকুটীর-প্রাঙ্গণে বাণী বীণাপাণির বেদীমূলে অনির্ব্বাণ দীপ্তিতে জ্বলিতেছে; কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল, প্রাবৃটের

অন্ধকার নামিল, বজ্রগর্জ্জনে শিহরিয়া উঠিলাম, দীপধারী অকম্পিত হস্তে প্রজ্জ্বলিত দীপখানি ধারণ করিয়া আমাদিগকে আজিও আহ্বান করিতেছেন, আমাকে অনুসরণ কর।

মোহান্ধ আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করি নাই; দীপ-শিখার কথা আমরা ভুলিয়াছি, আমাদের আবিল দৃষ্টি এখনও তাঁহার দিকে আমরা ফিরাই নাই। সাতসমুদ্রের পরপার হইতে তাঁহার জয়গান আমাদের কানে আসিয়া চকিতের জন্য আঘাত করিয়াছে; আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি; অন্ধকারের মাঝখানে দীপশিখাকে ইন্দ্রজাল কল্পনা করিয়া নিন্দাও কেহ কেহ করিয়াছি কিন্তু অনির্দ্দেশ-যাত্রায় কেহ পা বাড়াই নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে, সূক্ষ্মতত্ত্বান্বেষী সত্যসাধক বৈজ্ঞানিককে, বহুকে যিনি এক করিয়াছেন, চেতন-অচেতনের যিনি বিভেদ ভুলিয়াছেন সেই ঋষিকে, এই কল্পনাবিলাসী কবিকে, এই দেশপ্রেমিককে আমরা চিনি না। এত নিকটে থাকিয়াও তিনি আমাদের অপরিজ্ঞাত থাকিয়া গেলেন। ইহা বিচিত্র! মধ্য এসিয়ার বালুময় মরুসাগরে আমরা সহস্র শতাব্দীর মুছিয়া-যাওয়া পদচিহ্নের মালিককে খুঁজিয়া পাইবার জন্য যুগান্তরের যবনিকা ভেদ করিয়া জাল বিস্তার করি, অথচ যুগান্তরের তিমিরাবরণ ছেদ করিয়া এই অভিশপ্ত দেশে যিনি দৃপ্ততেজে প্রজ্জ্বলিত দীপহস্তে পৃথিবীর পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সম্মুখে আপন উন্নত মহিমায় দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে আমরা দেখিলাম না!

* * * *

স্কুল পরিত্যাগ করিয়া তখন সবে কলেজে ঢুকিয়াছি। ফিজিক্স-এর পাঠ্য পুস্তক এ. ডব্লিউ পয়জারের ইলেকট্রিসিটি এণ্ড ম্যাগনেটিজিম পুস্তকের একস্থলে বৈজ্ঞানিক 'স্যার চান্দার বোসের' নাম পড়িয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিলাম—খাঁটি সাহেবের লেখা আই-এস-সি ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকে বাঙালীর নাম—ইহাতেই আনন্দ! কিন্তু 'চান্দার বোস'কে জানিবার প্রয়োজন আর বোধ করি নাই; এম-এস-সি পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎ আর কোথায়ও লাভ করি নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে তাঁহাকে যেন চেষ্টা করিয়া নিশ্চিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে!

৩০শে নবেম্বর তারিখে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবসে নিতান্ত আমোদের খাতিরে আর পাঁচজনের সহিত উপস্থিত হইয়া দুটি ঘণ্টা ছবি দেখিয়া, বাগানে বেড়াইয়া অলসভাবে বাড়ী ফিরিয়া পরবৎসরের 'কার্ড' সংগ্রহের প্রতীক্ষায় থাকিতাম। 'উদ্ভিদের হৃদ্স্পন্দন' 'পাথরের প্রাণ' 'লোহার ক্লান্তি' 'ক্রেস্কোগ্রাফ' 'অ্যাসেণ্ট অব স্যাপ' ইত্যাদি বুক্‌নিও যে দুইচারিটি সংগৃহীত হয় নাই তাহা নয়—দেয়াল-গাত্রে প্রতিফলিত চলচ্চিত্রের সাহায্যে গাছের উপর বিষের ক্রিয়া এবং বিদ্যুতের মত আঁকাবাঁকা কালো রেখায় তাহার মানচিত্র যে মাঝেমাঝে দুঃস্বপ্নের মত মনে উদিত হইত না তাহাও বলিতে পারিব না, কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। সম্ভ্রম ছিল—গুজব শুনিতাম, বেতার টেলিগ্রাফি নাকি আমাদের জগদীশচন্দ্রেরই আবিষ্কার; তাঁহার লেখা পুস্তক ইউরোপে আমেরিকায় বহুমূল্যে বিক্রীত এবং পঠিত হয়—বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত শিক্ষালাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদি বহুকথা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিত। প্রবাসী পত্রিকা ও স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয়ের কল্যাণে মাতৃভাষায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কীর্ত্তি-কলাপের আভাস পাইতাম। বিপরীত কথাও অনেকে বলিত, সমস্ত ব্যাপারটা নাকি একটা ধাপ্পা, ওদেশে ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সি. ভি. রমণ সাহেব তাঁহাকে কাবু করিয়াছেন ইত্যাদি। মোটের উপর তিনি একটি বিস্ময়ই হইয়া আছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের নাই এবং দেশবাসীকে এবিষয়ে যথাযথ সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও কেহ অনুভব করেন নাই।

ভারতমাতার একনিষ্ঠ সন্তান হিসাবে তাঁহাকে জানিতাম; প্রাচীন ভারতের 'কালচারে'র প্রতি তাঁহার প্রীতি অসাধারণ, ভারতকে ভারতীয় করিবার স্বপ্ন তাঁহার মত আর কেহ দেখে নাই। জানিতাম, তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে মিলিয়া ভারতবর্ষের আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার কার্য্যকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন; জানিতাম, বর্ত্তমান ভারতীয় শিল্পকলার নব-জাগরণের মূলে তিনিও ছিলেন; আর জানিতাম, তিনি কবি। তাঁহার সকল কার্য্যকলাপের কোন ব্যাপক ধারণা ছিল না।

এই ধ্বংস ও গতির যুগে, বিজ্ঞানের ভাঙা-গড়ার যুগে এই ঋষি বৈজ্ঞানিকের পরিচয় জানার প্রয়োজন আছে। তাঁহার জীবন, তাঁহার চিন্তাধারা, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ—মোট কথা, সমগ্র মানুষটিকে দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমরা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব; তাঁহার

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

সম্বন্ধে বাহিরের জগতের অভিমত; তাঁহার নিজস্ব কল্পনা; ব্যক্তিগত জীবনে সেই কল্পনার রূপ-পরিগ্রহ; তাঁহার জীবন—তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি—থিওরী, যন্ত্র ও পুস্তক;—তাঁহার বসু বিজ্ঞান-মন্দির—তাঁহার স্বপ্ন, তাঁহার সত্য। আমাদিগকে সংক্ষেপ করিতে হইবে।

* * *

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পাশ্চাত্য জীবনীলেখক (An Indian Pioneer in Science. The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose M.A., D. Sc., Ll. D., F. R. S., C. I. E., C. S. I—Longmans Green and Co. 1920) অধ্যাপক প্যাট্রিক গেড্ডিস ভূমিকার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

I am asked whether the title of this book means especially a pioneer in science, who happens to be an Indian, or a pioneer of science in and for India. The answer is—Both. For, on one hand Bose is the first Indian of modern times who has done distinguished work in science, and his life-story is thus at once of interest to his scientific contemporaries in other countries and of encouragement and impulse to his countrymen. But it will also be seen, in the general world of science, independent of race, nationality and language, which looks only to positive results, that here is much of pioneering work, and this upon levels rarely attained, with intercrossing tracks still commonly held and treated as distinct—in physics, in physiology, both vegetable and animal, and even in psychology. Pioneering too in all these fields, not in virtue of mere variety of interests, of mental versatility, and of inventive faculty of the rarerst kind, though all these are present, but also as guided, inspired, even impassioned, by an endowment

more than usually deep and strong of that faith in cosmic order and unity which is the fundamental concept of each and all the sciences. So it has come to pass that we have in this single and long solitary worker 'a mind working in long sweeps—and attracted alike by gulfs which separate, and by borderlands which unite,' and successful to a high and rare degree in such high intellectual adventures.

অর্থাৎ শুধু ভারতবর্ষীয় হিসাবে নন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সমগ্র বিজ্ঞান-জগতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জাতি ধর্ম্ম ও ভাষানির্ব্বিশেষে পথপ্রদর্শক হিসাবে গৌরবের দাবী করিতে পারেন। ফিজিক্স, ফিজিওলজি (উদ্ভিদ ও প্রাণী), এমন কি, শাইকলজীতেও তিনি এমন উচ্চ শ্রেণীর গবেষণা করিয়াছেন যে আজিও সেগুলির বিশেষত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি অনন্যসাধারণ···

বিজ্ঞান-জগৎ এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব্ব প্রতিভাকে নমস্কার নিবেদন করিয়াছে। ইয়োরোপের যেখানে যেখানে তিনি পদার্পণ করিয়াছেন সেখানেই প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯২৬ সালের জেনেভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকুলের নিকট যে প্রশংসা পাইয়াছেন তাহা পৃথিবীর খুব কম বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে, তাঁহার তথ্যের সারবত্তা ও তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের অপূর্ব্ব সূক্ষ্মতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত এলবার্ট আইনষ্টাইন মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, "জগদীশচন্দ্র যে সকল অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়াছেন তাহার যে-কোনটির জন্য তাঁহার নামে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।"

মনস্বী রমাঁ রলাঁ বলিয়াছেন,—

I salute you, beneficent magician who have united the oriental spirit with the exact objective methods of the west. You have made us enter into the kingdon of the universe of silent life, which till yesterday was thought as dead and buried in the night.

অর্থাৎ, আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটাইয়াছে; অব্যক্ত প্রাণী-জগতে তুমি আমাদের প্রবেশাধিকার দিয়াছ—কাল পর্য্যন্ত যে জগৎ নিশীথের অন্ধকারে মৃত ও সমাহিত ছিল।

স্যর রিচার্ড গ্রেগরি, সুবিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক, বলিয়াছেন—

—he has been able to lift the veil which had previously enshrouded the analogous workings of plant and animal life...

অর্থাৎ, যে আবরণের জন্য আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পৃথক কল্পনা করিতাম, তুমি সেই আবরণ উন্মোচন করিয়াছ···

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক হ্যান্স্ মলিশ বলিয়াছেন—

The attitude of modern science of Sir Jagadis Bose is a symbol of on attitude which is not confined to him and which will shed new light over modern civilization...Who shall say that the enlightenment which of old blew over the West from the East may not be about to proceed from the East again ?

অর্থাৎ স্যর জগদীশ বসুর আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ধারণা তাহা আধুনিক সভ্যতার উপরও নূতন আলোক বিস্তার করিবে।···কে বলিতে পারে যে আবার প্রাচীন কালের মত পশ্চিমের অন্ধকার পূর্ব্বদেশের আলোকেই বিদূরিত হইবে না? হয় তো তাহারই সূচনা দেখা দিয়াছে।

আমাদের স্বদেশবাসী এক মনীষী বহুকাল পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। 'প্রাণময় জগতে'র কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক···প্রাণিদেহের অতিসূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যন্ত্রাঙ্গের মত তাঁহার আদেশ মাত্রে পরিচালিত হইতেছে। তিনি বাজিকর; বন-মানুষের হাড় ঠেকাইয়া তিনি যাহাকে যেরূপে নাচাইতেছেন, সে সেইরূপেই নাচিতেছে। তাঁহার আদেশে প্রাণ তাহার উগ্র স্বাধীনতা সংযত করিয়া জড়তার শিকলে বাঁধা পড়িতেছে, এবং আচার্য্য সেই শিকল ধরিয়া বসিয়া আছেন।"

* * *

প্রশংসাপত্রে কাজ নাই; দীপশিখা কখনও অধোমুখী হয় না। দীপশিখা স্বপ্ন দেখে—তিমির-বিদারণ স্বপ্ন। পুঞ্জীভূত অন্ধকার কাঁপিয়া সারা হয়, শিখা জ্বলিতে থাকে।

দীপশিখার স্বপ্ন! অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পঁচিশ বৎসরের এক যুবকের স্বপ্ন কালো আকাশের গায়েও রঙ ধরাইয়াছিল। সে কবি ছিল। তাহার জীবন-দেবতা তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কলকল্লোলিনী তরঙ্গিণীর তীরে তিনি

বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, হে ভক্ত, এস। আমাকে ফিরিয়া তোমার স্বপ্ন সুষমামণ্ডিত হউক। ক্ষুদ্র কবি বাঁশী হাতে পথে বাহির হইতে পারে নাই কারণ তখনও অন্ধকার ছিল, দীপ জ্বালিতে বাকী ছিল

এই যুবকই বালক-বয়সে মহাভারতের বীর কর্ণের কথা ভাবিত—বার বার পরাজয়ে, সহস্র প্রলোভনে, আঘাতের পর আঘাতেও যে কর্ণ স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নাই সেই কর্ণের কথা। এই বালকই···

"সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম।··· অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত। বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম!···নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত 'মহাদেবের জটা হইতে।'···

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্মপরিচিত, বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল?—যে যায়, সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, 'মহাদেবের পদতলে'।

এই বালক ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল. বাঁশী হাতে বাহির হইতে পারে নাই। উৎসে তাহাকে পৌঁছিতেই হইবে।

"একদিন অতীব বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-মালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল, 'এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—'

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'সম্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!'

···উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্তপ্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীল স্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র শৃঙ্গে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে এই মূর্ত্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণ পূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।"

ইহার মধ্যেই সেই বালকের সমগ্র জীবনেতিহাস নিহিত রহিয়াছে; সেই বন্ধুর পার্ব্বত্যপথ, সেই আবরণ উন্মোচন! একটির পর একটি উৎসের সন্ধান হইল; মহাদেবের জটার কলনাদিনী গঙ্গা আবার তাহাকে ডাক দিলেন। জীবনের শেষ সীমানায় আসিয়াও সেই বালক আজ ডাক শুনিতেছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের পঁচিশ বৎসর বয়স্ক কবির কথা বলিতেছিলাম। সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া এই কবি উত্তর জীবনে হয়তো বহু দুঃখেই লিখিয়াছিলেন—

"বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।"

আত্মসম্বরণ করিয়া এই কবির বৈজ্ঞানিক হওয়ার ইতিহাস বড় করুণ। আত্মসম্বরণ করিতে গিয়া জীবনব্যাপী সংঘাত তাঁহার মনকে পীড়িত করিয়াছে। এই দ্বন্দ্বে কবি এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই আহত হইয়াছেন কিন্তু কেহই পরাজয় স্বীকার করেন নাই

ভারতবর্ষের আর একটি সাধনাকে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার স্বপ্নের মধ্যেই ছিল। ভারতবর্ষের এই সাধনা—ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহতের সন্ধানে, বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য আনয়ন প্রচেষ্টায় 'জ্ঞানের অন্বেষণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, বিশ্বের অগণিত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি সূর্য্যের মধ্যে সেই একতার

সন্ধান করিয়াছে।' ভারতবর্ষের এই স্বপ্ন তাঁহার জীবনে সত্য হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনা জগতের কল্যাণই আনয়ন করিয়াছে, কাহারও পীড়ার কারণ হয় নাই।

জগৎ যতই বিচিত্র হউক না কেন, তাহার অণু-পরমাণু যে একই মহাপ্রাণে প্রাণবান হইয়া আছে ভারতের এই প্রাচীন ঋষিবাক্য প্রমাণ করিবার জন্যও তিনি সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সকল স্বপ্নই একে একে সত্য হইয়াছে—তাই তাঁহার মনের দ্বন্দ্বের ইতিহাস তাঁহার জীবনের ইতিহাসের সহিত জড়াইয়া গেছে।

১৮৯৯। আমরা করিতে চাই, কেবল পথ দেখি না। আমাদের এই ব্যর্থ উদ্যম পরবর্ত্তী সময়ের লোকেরা কি বুঝিতে পারিবে? এই জীবন ঢালিয়া দিবার ইচ্ছা, এত তিতিক্ষা সবই নিরুক্ত থাকিবে?

১৯০০।২রা মার্চ্চ। আমাদের কর্ম্মফল অনেক এবং অনেক দুরাশা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে।

কতদূর মন সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে? কতদূর কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হইবে? ইহার শেষ কোথায়? ··· আর এক সময়ে যে অনেক কাজ করিবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা আমার দ্বারা যে হইবে এমন আশা করি না। অনেকগুলি বিষয়ের সূত্র ধরিয়াছিলাম, সে-সবগুলি এখন পাক লাগিয়া গিয়াছে।

১৯০০।১৬ই মার্চ্চ। আমার কার্য্যে আরও কতকগুলি নূতন সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু the spirit is willing but the flesh is weak; পরিশ্রমে একেবারে শ্রান্ত হইয়াছি।

১৯০০।২১শে জুন। দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া অবসাদে মন আক্রান্ত।

এসময়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব চলিয়া যায়। কখনও মহীয়সী মাতৃদেবীর অনুজ্ঞা শুনিতে পাই। তাঁহার ভৃত্য পদধূলি মস্তকে লইয়া যাত্রা করিবে।

১৯০০।৩১শে আগষ্ট। লণ্ডন। পারিসে যা যা দেখিলাম তাহাতে যেমন নূতন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তেমনই দেশের কথা মনে করিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছি। এই ভয়ানক জীবনসংগ্রাম, নির্ম্মম বিরামহীন—এই সংগ্রামে যাহারা একটু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তাহারা একদিন নির্ম্মূল হইবে। এখানে কি ব্যগ্রতা! একটি নূতন আবিষ্কার হইল, আর অমনি তাহা কাজে লাগিল। যাহারা সর্ব্বপ্রথমে তাহার ব্যবহার শিখিল, তাহারা অন্য জাতিকে ব্যবসায়ে এবং manufacture এ পরাস্ত করিল। পৃথিবী ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম অহোরাত্র চলিতেছে। নির্ম্মম প্রকৃতি! আমাদের ন্যায় উদ্যমহীন, অকর্ম্মঠ জাতি আর কতকাল বাঁচিয়া থাকিবে?

১৯০০।১০ই সেপ্টেম্বর। আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না।

১৯০০। ৫ই অক্টোবর। জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষ হইতে, এক নূতন school of workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না, যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহার অদ্ধপরিস্ফুটিত প্রতিকথায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি যে ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে দিকে দেখি, সেদিকেই অনন্ত আলোকরেখা। জন্মজন্মান্তরেও আমি শেষ করিতে পারিব না।

১৯০০। ২রা নভেম্বর। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব?···

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে।

১৯০১। ৩০শে মে। কি অত্যাশ্চর্য্য নূতন জগৎ আমার সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়াছে বলিতে পারি না। কি অসীম নূতন সত্য সম্মুখে রহিয়াছে।

একদিন মনে করিয়াছিলাম যে, এমন দিন কবে আসিবে যে দেশ-দেশান্তর হইতে জ্ঞান-আহরণের জন্য ভারততীর্থে লোক সমাগম হইবে। সেই আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না। আমার সমস্ত পুঁজি এদেশে রাখিয়া রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে।

১৯০১। ১৭ই মে। দেখ, আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপরে মনে করি।

১৯০১। ২৯এ নভেম্বর। গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়।

কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্ব্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দু-সন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সুখদুঃখের অংশী সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয়লাভ করিব।

১৯০২। ফেব্রুয়ারী। আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরি, ও বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি।

মানুষ প্রস্তুত কর। জীবনে সেই পুরাকালের লক্ষ্য অঙ্কিত করিয়া দাও। আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবারে হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।

১৯০২। ৮ই এপ্রিল। তুমি মনে কর যে আমি সর্ব্বদাই কর্ম্মসাধনে উন্মুখ। তুমি যদি জানিতে যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে নিজের সহিত কত সংগ্রাম করিতে হয়। আমার মন সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতে চাহে। এই অবিরাম যুঝিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি।···আমি সম্মুখে বড় বিভীষিকা দেখিতেছি।

১৯০২।২৭এ জুন। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নয়, অন্তরে। পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে। আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ-দুঃখ আমরাই বহন করিব। * * *

এতদিন সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ ছিলাম; তুমি শুনিয়া সুখী হইবে সর্ব্বত্রই জয়-সংবাদ।

ইহার পরেই একেবারে ১৯১৬।২৫শে জুলাই।

যদি বিজ্ঞান কিছু শিখাইয়া থাকে তবে তাহা এই যে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহাই স্বরূপ নয়। সর্ব্বদা ভুল দেখি, ভুল ভাবি ও ভুল শুনি।

১৯১৬। নভেম্বর। এই জীবন একটা মহাক্রীড়া স্বরূপ। আমরা কি একটা উপলক্ষ্য করিয়া ইহাকে পাশার ন্যায় নিক্ষেপ করিতে পারি না?—হয় জয় কিম্বা পরাজয়। আপনি জীবনকে আনন্দময় দেখিতে চান। কিন্তু ঝটিকা ও অগ্ন্যুৎপাতেও এক মহা সঙ্গীত আছে।

আমরা এখানে শান্তির ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আছি। কিন্তু অদূরেই লক্ষ লক্ষ লোক নিজেকে যন্ত্রণাময় মরণে আহুতি দিতেছে। ইহাদের নিরানন্দে হয় তো ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল হইবে।

আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ, সুখ কি দুঃখ, ইহাতে কি আসে যায়?

আসল কথা—পূর্ণতা অথবা অপূর্ণতা লইয়া, ইহার মধ্যে আমরা কোনটা গ্রহণ করিব?

* * *

শেষে কবি এবং বৈজ্ঞানিকের জীবনে দার্শনিক উঁকি মারিয়াছেন। 'ইহাতে কি আসে যায়' এই তথ্যটাই সব চাইতে বড় হইয়া গেল।

কিন্তু বীর যোদ্ধা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের স্বতন্ত্র ইতিহাস। অধ্যাপনা ও গবেষণা, পরীক্ষার পর পরীক্ষা, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, আবিষ্ক্রিয়ার পর আবিষ্ক্রিয়া—গুরু জগদীশচন্দ্র, যশস্বী জগদীশচন্দ্র, বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগদীশচন্দ্র।—পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা—ইহারও ইতিহাস আছে।

* * *

কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও দীপশিখা সত্য। সত্য, কারণ—'তবে ত আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক্-শলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?

সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস, যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল, সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে।'

অধিকার

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত

শুক্তির সাথে চুক্তিতে হয় মুক্তি কি মুক্তার,
মৃণাল দেয় না কুসুম-অর্ঘ্য কুণ্ঠিত ভিখারীরে,
আঘাত না দিলে পাষাণ ভেদিয়া বহে নাক' জলধার—
নিতে যেবা জানে সেই নিতে পারে নির্ম্মম-করে ছিঁড়ে।

রামমোহন রায়

(অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে)

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত আশ্বিন মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধে রামমোহনের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা আমি ১৮০৪ সন পর্য্যন্ত দিয়াছিলাম। যে-সকল দলিলপত্র হইতে রামমোহনের প্রথম জীবনের উপর এই নূতন আলোকপাত হইয়াছে উহাদের সাহায্যে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনেরও অনেক ব্যাপার—বিশেষতঃ তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ও চাকুরি-জীবনের কথা—খুব স্পষ্টরূপে জানা যায়। এই সকল বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এতদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত স্বল্প ছিল। কিন্তু নূতন দলিলপত্র আবিষ্কারের ফলে এ-সকলই আমাদের নিকট খুব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয়ের বিবরণ দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রামমোহন ও জন্ ডিগ্‌বী

রামমোহনের উপরিতন কর্ম্মচারী, মুনিব ও বন্ধু হিসাবে জন্ ডিগ্‌বীর নাম সুপরিচিত। কিন্তু যে-সকল ইংরেজ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, ডিগবী তাঁহাদের প্রধান হইলেও প্রথম নহেন। ইহার পূর্ব্বে রামমোহন যে উডফোর্ড নামে একজন সিভিলিয়ানকে টাকা কর্জ্জ দেন ও তাঁহার অধীনে কাজ করেন তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি। ১৮০৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে উডফোর্ড মুর্শিদাবাদে বদলি হন এবং রামমোহনও সম্ভবতঃ তাঁহার সঙ্গে সেখানে যান। কিন্তু পর বৎসরই উডফোর্ড পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১৮০৫ সালের আগষ্ট মাসে সমুদ্রযাত্রা করেন। এই ঘটনার পর রামমোহন ডিগবীর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন।

১৮০৫ সনের মধ্যভাগ হইতে ১৮১৪ সনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রামমোহনের সহিত ডিগবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যুগ। এই সময়ে রামমোহন ডিগবীর সহিত প্রথমে রামগড়, পরে রামগড় হইতে যশোর, যশোর হইতে ভাগলপুর, এবং সর্ব্বশেষে ভাগলপুর হইতে রংপুর যান। যতদিন পর্য্যন্ত রামমোহনের অর্থোপার্জ্জন ও চাকুরির প্রয়োজন ছিল, ততদিন তিনি ডিগবীর পার্শ্বত্যাগ করেন নাই। এমন কি ১৮১৪ সনের পর যখন তিনি কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন তখনও তাঁহার সহিত ডিগবীর সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

রামমোহন কি ভাবে ডিগবীর সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা আমরা সরকারী কাগজপত্রে পাই। ১৮০৯ সনের জানুয়ারি মাসে যখন তিনি ভাগলপুর যান তখন পৌঁছামাত্রই রাস্তায় তাঁহার সহিত জেলার কলেক্টর স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের একটু বচসা হয়। এই কলহে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া রামমোহন বড়লাটের নিকট দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্ত পাইয়া গবর্ণমেণ্ট স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের বক্তব্য জানিতে চাহেন। জবাবে স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন লেখেন,—"গত ১লা জানুয়ারি [১৮০৯ সন] বিকালে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমার বাড়ির নিকটে অবস্থিত একটি ইটের পাঁজার নিকট আমি নামি। এই ইটের পাঁজার উপর দাঁড়াইয়া আমি দেখিলাম একটি সুসজ্জিত পাল্কী এদিকে আসিতেছে। উহার সহিত চারি জন চাপরাসী। তখন আমি আমার এক চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আসিতেছে। সে উত্তর দিল, মিঃ ডিগবীর দেওয়ান বাবু রামমোহন রায়। আমি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম তিনি তাহার চার হাত দূর দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিধানে রূপার কাজ করা নীল রেশমের মনোরম পোষাক···।" এই বচসার বিস্তারিত বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। কৌতূহলী পাঠক ১৯২৯ সনের জুন মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় উহা পাইবেন। এই ব্যাপারে একদিকে রামমোহনের আত্মসম্মানবোধের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরপ্রিয়তাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

রামমোহনের চাকুরি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এইখানেই উহা সংশোধন করা আবশ্যক। যে নয় বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, এই সময় রামমোহন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরি করিতেন ইহাই সকলের বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহন এই কয় বৎসরের মধ্যে অতি অল্পকালই

কোম্পানীর চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০৬ সনের আগষ্ট হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ডিগবী রামগড়ের অস্থায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন। রামমোহন এই সময়ে তাঁহার অধীনে ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইহার পর ডিগবী যখন রংপুরের কলেক্টর হন তখন তিনি কয়েক মাসের জন্য রামমোহনকে অস্থায়ী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন (১৮০৯ ডিসেম্বর হইতে)। ডিগবী রামমোহন সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। সেজন্য তিনি রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতার বোর্ড-অফ-রেভেনিউ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। এমন কি ডিগবীর পীড়াপীড়ির উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন—"ভবিষ্যতে ডিগবী যদি বোর্ডের প্রতি এইরূপ অসম্মানসূচক ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহার সমুচিত উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন।" ইহার পরও ডিগবী রামমোহনের জন্য লেখালেখি করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। ১৮১১ সনের মার্চ্চ মাসে অন্য লোক রংপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হইল।

রামমোহনকে স্থায়িভাবে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে বোর্ডের এইরূপ প্রবল আপত্তি হইবার কারণ কি সে-সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। এই বিষয়ে বোর্ড ডিগবীকে যে চিঠি লেখেন তাহাতে রামমোহনের নিয়োগের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথম যুক্তি এই যে, দেওয়ানের কাজ করিতে হইলে খাজনা আদায়ের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা এবং নিয়মাবলীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; রামমোহন ফৌজদারী আদালতের অস্থায়ী সেরেস্তাদারের কার্য্যে এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় আপত্তি তাঁহার জামিন সম্বন্ধে। রামমোহন রংপুরের দুইজন জমিদারকে তাঁহার জামিন হইতে স্বীকার করাইয়াছিলেন। বোর্ড বলেন, কোন দেওয়ানের জামিন যে-জেলায় তিনি কাজ করিতেছেন সেই জেলার জমিদার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এই ত গেল প্রকাশ্য আপত্তির কথা। ইহা ছাড়া, বোর্ড-অফ-রেভেনিউয়ের কাগজপত্রের মধ্যে এ-বিষয়ে উহার প্রেসিডেন্ট বুরিশ্ ক্রীম্প সাহেবের স্বহস্তলিখিত একটি মন্তব্য আমি দেখিয়াছি। উহাতে রামমোহনের নিয়োগ সম্বন্ধে আর একটি আপত্তির উল্লেখ আছে, এবং সেই আপত্তিই প্রকৃত আপত্তি বলা চলে। অন্য কথার পর বুরিশ্ ক্রীম্প লিখিতেছেন, "রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকাকালীন তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অপ্রশংসাসূচক কথা (unfavourable mention of his conduct) আমার কানে আসিয়াছে।" এই অপ্রশংসাসূচক মন্তব্য টাকা-পয়সা সম্বন্ধে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

সে যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে দেখা গেল রামমোহন দুইবার অল্পকালের জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরি করেন। বাকী সময় তিনি ডিগবীর খাস কর্ম্মচারী ছিলেন। ডিগবী যে-সময়ে যশোরে ছিলেন (জানুয়ারি—জুন ১৮০৮) তখন রামমোহন যে তাঁহার খাস ফার্সী-মুন্‌শী ছিলেন এ-কথার উল্লেখ ডিগবীর একটি চিঠিতে আছে। দেশীয় লোকদের সহিত কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য সেকালের অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখিতেন। ইঁহাদিগকে ভদ্রতার খাতিরে দেওয়ান বলা হইত। রামমোহনও ডিগবীর সহিত এইরূপেই সম্পৃক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যে সাধারণ লোকের নিকট 'ডিগবীর দেওয়ান' বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

তবে ডিগবীর অধীনে কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের পক্ষে অন্য কাজ বা ব্যবসা করাও অসম্ভব নহে, যদিও তাহার কোন উল্লেখ আমরা পাই না। ১৯৩০ সনের মে মাসে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় আমার লিখিত "Rammohun Roy in the Service of the East India Company" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে আমি বলি, রামমোহন ১৮১০ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডস্-এর অধীনে রংপুরের উদাসী পরগণার নাবালক জমিদারদের অভিভাবক রূপে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি যে-সকল তথ্যপ্রমাণ আমার হাতে আসিয়াছে তাহাতে এই বিষয়ে একটু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ১৮১০ সনের আগষ্ট মাসে ডিগবী 'রামমোহন শর্ম্মা' নামে এক ব্যক্তিকে উদাসী পরগণার নাবালক জমিদারদের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া বোর্ডকে এক পত্র লেখেন। রামমোহন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে 'শর্ম্মা' উপাধি ধারণ করা বিচিত্র নয়; এই অভিভাবক নিযুক্ত হইবার অল্প দিন পূর্ব্বেই ডিগবী রামমোহনকে দেওয়ানী পদ দিতে অসমর্থ হন; ডিগবীর নিকট

একই সময়ে একাধিক রামমোহন থাকা অসম্ভব না হইলেও অতিসাধারণ ঘটনা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; এবং রামমোহন তখন রংপুরে থাকিলেও আমরা তাঁহার কাজকর্ম্মের কোন উল্লেখ পাই না—এই সকল কারণে আমি অনুমান করিয়াছিলাম রামমোহন রায় ও রামমোহন শর্ম্মা একই ব্যক্তি এবং তিনি ১৮১০ সনের আগষ্ট মাস হইতে ১৮১৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত উদাসী পরগণার নাবালক জমিদারদের অভিভাবক ছিলেন। এখন অন্য প্রমাণের বলে দেখা যাইতেছে রামমোহন ১৮১৪ সনের মাঝামাঝি রংপুর ছাড়িয়া আসেন এবং কলিকাতায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। অথচ বোর্ড-অফ-রেভেনিউয়ের কাগজপত্রের মধ্যে ১৮১৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসেও রামমোহন শর্ম্মার লিখিত চিঠির উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামমোহনের কলিকাতা চলিয়া আসিবার পরও রামমোহন শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তি রংপুরে রহিয়াছে। যদি কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিবার পর কাজকর্ম্ম বুঝাইয়া দিবার জন্য রামমোহন আর একবার অল্পদিনের জন্য রংপুর গিয়াছিলেন বলিয়া ধরা যায়, তবেই রামমোহন রায় ও রামমোহন শর্ম্মা একই ব্যক্তি হইতে পারেন, নহিলে ইঁহাদিগকে দুই জন স্বতন্ত্র লোক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং রামমোহন রংপুরে অবস্থানকালে অন্য কোন কাজ বা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া ধরিতে হইবে।

রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতি

রংপুরে রামমোহন যে চাকুরিই করুন না কেন যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন যে করিতেছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে রংপুর ও কলিকাতা, দুই জায়গায়ই তাঁহার হিসাবনবীশ ও তহ্‌বিলদার ছিল। রংপুরে যে তাঁহার হিসাবপত্র রাখিত তাহার নাম ভবানী ঘোষ ও কলিকাতার তহ্‌বিলদারের নাম গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। এই গোপীমোহনের জবানবন্দি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই কয় বৎসর রামমোহনের কলিকাতায় একটি বাড়ি ছিল এবং তাঁহার টাকা-পয়সা সেখানেই জমা হইত। রামমোহন বাহির হইতে যাহা পাঠাইতেন তহ্‌বিলদার গোপীমোহন তাঁহার নামে উহা জমা করিয়া রাখিত।

এই কয় বৎসরের মধ্যে রামমোহন তিনটি তালুক কেনেন। উহাদের প্রথম দুইটির নাম বীরলুক ও কৃষ্ণনগর (জাহানাবাদ পরগণা); এগুলি ১৮০৮ ও ১৮০৯ (বাংলা ১২১৫ ও ১২১৬) সনে তাঁহার বন্ধু রাজীবলোচন রায় কর্ত্তৃক খরিদ হয়। তৃতীয় তালুকটির নাম শ্রীরামপুর (পরগণা ভুরসুট)। উহা রামধন চাটুর্জ্যের নিকট হইতে রামমোহনের নায়েব জগন্নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক ৭২৫ টাকায় কেনা হয়। কিন্তু উহার ক্রয়ের তারিখ জানিতে পারা যায় না।

এখন রামমোহনের বড় দুইটি তালুক রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুরের কি হইল দেখা যাক্। রামমোহন এই তালুক দুইটি যে রাজীবলোচন রায়ের নামে বেনামী করেন, এবং রাজীবলোচন যে রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের বেনামদার ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি। এই ঘটনার পর বার বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং পাছে তালুক দুইটি লইয়া আইনতঃ কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হয় এই ভয়ে ১৮১২ সনের গোড়ায় রামমোহন আবার নিজের দাবী পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে বর্দ্ধমানের কালেক্টরীতে রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুরের প্রকৃত মালিকরূপে রাজীবলোচন রায়ের পরিবর্ত্তে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম রেজেষ্ট্রী করাইয়া কলেক্টরী হইতে দেওয়ান শিবনারায়ণের স্বাক্ষরিত একটি দলিল লওয়া হইল। এই দলিলের তারিখ ৬ই জানুয়ারি ১৮১২। তখন গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের বয়স চব্বিশ বৎসর। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে (১৪ই জানুয়ারি) রংপুরে গুরুদাস তাঁহার মাতুলকে একটি দলিল লিখিয়া দিলেন। এই দলিলের দ্বারা তালুক রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর রামমোহনকে বিক্রয় করা হইল। এই দলিলের একজন সাক্ষী—পালপাড়ার নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (হরি হরানন্দনাথ তীর্থস্বামী)।* এই শেষোক্ত দলিলটি ১৮১২

* হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। ১৮৩৩ সনের জানুয়ারি মাসে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হইলে শ্রীরামপুরের সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' পরবর্ত্তী ১১ই ফেব্রুয়ারি (৩০ মাঘ ১২৩৮) লিখিয়াছিলেন :—

"নির্ব্বাণপ্রাপ্তি—সুখসাগরের সমীপবর্ত্তী পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্র...

সনের ১৪ই জানুয়ারি ডিগ্‌বীর সম্মুখে রেজেষ্ট্রী করা হইল। এই সকল লেখাপড়ার ফলে রামমোহন তালুক রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুরের প্রকৃত অধিকারী হইলেন। কিন্তু তখনই তিনি সম্পত্তি দুইটির দখল লইলেন না।

এইরূপে রামমোহনের অবস্থার যখন উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছিল তখন লাঙ্গুলপাড়ায় তাঁহার ভ্রাতারা ও পরিজনবর্গ ক্রমেই নিতান্ত দারিদ্র্যের দিকে চলিয়াছিল। ১৮০৪ সনে রামমোহন যখন মুর্শিদাবাদ যান তখন রামমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই সময়ে মাতা তারিণী দেবী তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন। গবর্ণমেণ্টকে কিছু টাকা দিয়া জেল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগমোহন অর্থশালী কনিষ্ঠের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর ১৮০৫ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে সুদ-সমেত ফিরাইয়া দিবেন এই মর্ম্মে তমসুক লিখিয়া দিবার পর রামমোহন জ্যেষ্ঠকে এক হাজার টাকা কর্জ্জ দেন। জগমোহনও এই টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিয়া এবং বাকী ৩,৩৫৮ টাকা মাসিক ১৫০ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করিয়া দিবেন এই অঙ্গীকার পত্র দিয়া মেদিনীপুর জেল হইতে মুক্তি পাইলেন (৯ই মার্চ্চ ১৮০৫)। এই অঙ্গীকার-পত্রের জামিন রহিলেন শিবচাঁদ (?) রায় নামে এক ব্যক্তি ও রামলোচন রায়।

কিন্তু জগমোহন এই টাকার একটি পয়সাও শোধ করিতে পারিলেন না। ১২১৮ সালের চৈত্র মাসে (ইং. ১৮১২ মার্চ্চ-এপ্রিল) তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা ছিল ইহাতেও সেগুলি সরকারের হাত হইতে নিস্তার পাইল না। জগমোহনের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তখন গোবিন্দপ্রসাদের বয়স ১৫ বৎসর। কয়েক বৎসর ধরিয়া চিঠিপত্র লেখালেখির পর পিতার যে-সকল জমিজমা তিনি পাইয়াছিলেন সে সকলই নীলামে চড়াইবার আদেশ হইল। জগমোহনের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ১২১৬ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৮০৯-১০) রামমোহনের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনেরও মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পর রায় পরিবারে এক রামমোহন ব্যতীত আর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কেহ রহিল না।

রামমোহনের পরিবার-পরিজনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন তিনি নিজে প্রবাসী। রামমোহনের নিজের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৮০৩ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত এগার বৎসর রামমোহন শুধু ভাই বা মা নয়, নিজের পুত্র-পরিবার হইতেও দূরে ছিলেন। ১৮০৯ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মাতুলের সহিত রংপুরে ছিলেন। জগমোহনের মৃত্যুর সংবাদ রামমোহন ও গুরুদাস গুরুদাসের পিতার একটি পত্র হইতে জানিতে পারেন, এ কথা গুরুদাসের জবানবন্দি হইতে আমরা জানিতে পারি।* ইহা ছাড়া রামমোহনের কুলপুরোহিত রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের জবানবন্দি হইতেও জানা যায় যে জগমোহনের মৃত্যুকালে রামমোহন বিদেশে ছিলেন।

জগমোহনের মৃত্যুকালে রামমোহন যে স্বগ্রামে ছিলেন না তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নাই দেখা যাইতেছে। মিস্ কলেট্ তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> ১৮১১ সনে [রামমোহনের] জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তাঁহার অনুগমন করেন। শোনা যায়, রামমোহন তাঁহাকে এই ভীষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হন নাই। পরে যখন শরীরে আগুন আসিয়া লাগিল তখন জগমোহনের পত্নী চিতা হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম

ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্লভ বিশেষতঃ তাঁহার সদ্বক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন ও শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইলেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণব-নামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশীনগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্ত মান করিতেন এবং আমরা শুনিযাছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইযাছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইঁহার মৃত্যুতে আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন।" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪)

করেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়া আত্মীয় ও পুরোহিতরা তাঁহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখে এবং তাঁহার চীৎকার ডুবাইবার জন্য চারিদিকে ঢোল কাঁসি ইত্যাদি বাজান হয়। রামমোহন তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অসীম ক্রোধ ও অনুকম্পায় অধীর হইয়া সেইখানেই প্রতিজ্ঞা করেন এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ না করিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না।

এই গল্পটি মিস্ কলেট্ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পান। তিনি আবার উহা তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসুর নিকট শোনেন। নন্দকিশোর রামমোহনের একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন।

জগমোহনের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহারা কেহ সত্যই স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন কি-না তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তবে রায়-পরিবারে অনুগমনের রেওয়াজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনের পিতা রামকান্তের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের কেহই সহমরণে যান নাই। রামমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনের পত্নীও সহগামিনী হন নাই। জগমোহনের এক পত্নীর সহগমনের গল্প প্রচলিত আছে। সুতরাং মনে হয়, অন্য দুই পত্নী বৈধব্য বরণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পত্নী সহগামিনী হইলেও রামমোহন যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না তাহা সুনিশ্চিত, কারণ তখন ও পরবর্ত্তী দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে সুদূর রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি।

রামমোহনের কলিকাতা বাস

১৮১৪ সনের ২০এ জুলাই রংপুর কলেক্টরীর ভার স্মেন্ট নামে এক সিভিলিয়ানকে বুঝাইয়া দিয়া ডিগ্‌বী দীর্ঘ ছুটি লইলেন।* সেই সঙ্গে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিলেন। এই বৎসরের মাঝামাঝি তাঁহাকে কলিকাতায় বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিতে পাই, এবং তখন হইতেই যে তিনি স্থায়িভাবে কলিকাতাবাসী হন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামমোহন তখন সম্পন্ন ব্যক্তি, জীবিকার্জ্জনের জন্য তাঁহার দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানোর বা পরিশ্রম করিবার আর দরকার ছিল না। সুতরাং প্রথমেই তিনি কলিকাতায় বাস করিবার জন্য বাড়ি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ সনে তাঁহার নামে দুইখানা বড় বাড়ি ক্রয় করা হইল। উহার প্রথমটি চৌরঙ্গীতে অবস্থিত বড় হাতা সংযুক্ত একটি দোতলা বাড়ি। উহা ২০,৩১৭৲ টাকায় এলিজাবেথ ফেনউইক নামে এক মেমের নিকট হইতে কেনা হয়। দ্বিতীয় বাড়িটি মাণিকতলায়। এই বাড়িটি এখন উত্তর-কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের আপিসে পরিণত হইয়াছে। উহা ১৩,০০০৲ টাকায় ফ্রান্সিস মেণ্ডেস নামে এক সাহেবের নিকট হইতে কেনা। এই সময়েই সম্ভবতঃ জোড়াসাঁকোতে তাঁহার যে বাড়িটি ছিল উহা বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

এই সময়ে রামমোহন রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর তালুক দুইটিরও দখল লন। বর্দ্ধমান কলেক্টরীতে তখন পর্য্যন্ত তালুকগুলি গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের নামেই ছিল। রামমোহন ও গুরুদাস দুইজনের সম্মিলিত আবেদনের ফলে ১৮১৪ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর রামমোহন তালুকগুলির দখল পাইলেন এবং বর্দ্ধমানের কলেক্টরী হইতে তাঁহাকে একটি 'পাটা' দেওয়া হয়।

বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার কালে রামমোহন গ্রামে নূতন বাড়ি করিবার কথাও ভোলেন নাই। লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ির প্রতি আর তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। এই সময়ে কিংবা কিছু পূর্ব্বে মাতা তারিণী দেবীর সহিত তাঁহার মতান্তর ও মনান্তর উপস্থিত হয় তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা পাই। এই কারণেই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক তিনি লাঙ্গুলপাড়া ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে একটি নূতন বাড়ি নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। ১৮০৯ সনে রাজীবলোচন রায় রামমোহনের জন্য কৃষ্ণনগর নামে যে তালুক ক্রয় করেন তাহারই অন্তর্ভুক্ত দশ বার বিঘা জমির উপর জগন্নাথ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে কাজ আরম্ভ হয়। ১৮১২ সনে (বাংলা ১২১৯) আরম্ভ হইয়া ১৮১৭ সনে (বাংলা ১২২৪) বাগান সম্পূর্ণ হয়; বাড়ির পত্তন হয় ১৮১৬ সনে। বাড়ি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৮১৭ সনে ২৮এ জানুয়ারি (১৭ মাঘ ১২২৩) রামমোহনের পরিবার লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি ত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরের নূতন বাড়িতে চলিয়া আসেন।

* Board Revenue Cons. 29 July 1814, Nov. 16-17.

রামমোহনের বিরুদ্ধে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মোকদ্দমা

কলিকাতা আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই রামমোহন সেখানকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন ও কলিকাতার ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সমভাবে মিশিতে লাগিলেন। তাঁহার আর তখন অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং কলিকাতায় তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির মতই থাকিতেন, দশ জনের কাজেও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির মতই মান্য হইতেন। তাঁহার মাণিকতলার বাগানবাড়িতে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইত। উহাদের মধ্যে দেশী লোক ত ছিলই, বহু বিদেশী ব্যক্তিও থাকিত। এই বাড়িতে শুধু যে শাস্ত্রচর্চ্চাই হইত তাহা নহে। একটি ইংরেজ মহিলার ভ্রমণ-কাহিনী হইতে আমরা জানিতে পারি, সেই যুগের বিখ্যাত মুসলমান বাঈজী নিকীও এখানে নাচগান করিত। এই মহিলা তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন :—

"১৮২৩, মে- সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একটি ধনী বাঙ্গালী বাবুর বাড়িতে একটি 'পার্টি'তে গিয়াছিলাম। বাড়ির বড় হাতায় বেশ ভাল রোশনাই হইয়াছিল এবং চমৎকার বাজী-পোড়ান হইয়াছিল। বাড়ির ঘরে ঘরে নাচওয়ালীরা নাচগান করিতে-ছিল……উহাদের গান গাহিবার রীতি অদ্ভুত ; সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিয়া আসিতেছিল ; কতকগুলির সুর বেশ মিষ্ট ; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকিও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের কাটালানী বলা হইত।"*

এই সকল আমোদপ্রমোদ ও বড়মানুষী ছাড়া রাম-মোহনের জীবনে ঝঞ্ঝাটও যথেষ্ট ছিল। প্রথম ঝঞ্ঝাট ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার লইয়া মসীযুদ্ধ, এবং উহার অপেক্ষাও বড় ঝঞ্ঝাট মামলা-মোকদ্দমা। বর্ত্তমান কালেও বিষয়ী ও সম্পত্তিশালী লোকের মামলা-মোকদ্দমা না করিলে চলে না। বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে রামমোহনও পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে এই সময়ে কয়েকটি মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়িতে হয়।

এই সকল মোকদ্দমার মধ্যে মাত্র একটি এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। উহা ১৮১৭ সনের ২৩এ জুন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রুজু করেন এবং উহার শুনানি হয় কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি-বিভাগে প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের সম্মুখে। এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ডাঃ কার্পেণ্টার লিখিয়া গিয়াছেন যে রামমোহন জাতি ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন এই কথা প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই মোকদ্দমা রুজু করা হয়, কিন্তু রামমোহন তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। রামমোহনের বন্ধু পাদরী অ্যাডামের বিবরণও এই মর্ম্মেরই। তিনি বলিয়াছেন, রামমোহনকে বিধর্ম্মী প্রমাণ করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার মা এই মোকদ্দমা করেন, কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই।

কার্পেণ্টার ও অ্যাডাম দুই জনই ধর্ম্মপ্রাণ পাদরী। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উক্তি করিয়া আইন-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যজনক নয়। এই মোকদ্দমার প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই মোকদ্দমা যখন রুজু হয় তখন রামমোহন কতকগুলি সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ রায় বলেন, এই সম্পত্তিগুলি এক হিন্দু একান্ন-ভুক্ত পরিবারের সম্পত্তি, উহাতে তাঁহার পিতা ও পিতামহেরও স্বত্ব ছিল, সুতরাং পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে এগুলিতে তাঁহারও অংশ আছে। রামমোহন এই দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন! তিনি বলেন, সম্পত্তিগুলি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের, কারণ ঐসকল সম্পত্তি ক্রয়কালে তিনি এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। এই ধরণের মোকদ্দমা বাংলা দেশে এখনও বহু হয়। সুতরাং সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এই মোকদ্দমার মধ্যে কোনরূপ বিশেষত্ব যে নাই তাঁহা অবিসম্বাদিত।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী কতদূর সত্য হইতে পারে তাহার আলোচনা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া এই মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ কি হইতে পারে তাহার আলোচনা করিব।

তারিণী দেবীকে জেরা করিবার জন্য রামমোহনের পক্ষ হইতে যে প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করা হয় তাহার একটিতে ইঙ্গিত করা হয় যে ধর্ম্মমত লইয়া রামমোহন ও রামমোহনের মাতার মধ্যে বিরোধই এই মোকদ্দমার মূল কারণ। প্রশ্নটি এইরূপ :—

"আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্ম্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যেভাবে

* Wanderings of a Pilgrim, etc. by Fanny Parkes, London, 1850, i. 29-30.

হিন্দুধর্ম্মের পূজা-অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মোকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি বার-বার বলেন নাই যে আপনি রামমোহনের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্ব্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্ব্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমাপূজা ও হিন্দু-আচার ত্যাগ করে তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্ম্মের প্রতিমাপূজা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই? বাদী, আপনি এবং বিবাদীর অন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই? ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে রামমোহন যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং পূর্ব্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন তাহা হইলে এই মোকদ্দমা হইত না—এ-কথা আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মত শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী প্রতিমাপূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার বিবেকবুদ্ধিতে অনুচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না? এই মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর মাণিকতলার বাগানে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্ত্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমাপূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?

তারিণী দেবীকে শেষ পর্য্যন্ত আদালতে উপস্থিত হইতে হয় নাই। সুতরাং এই সকল প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার কি বলিবার ছিল তাহা আর আমাদের জানিবার উপায় নাই।

এখন দেখা যাক্ রামমোহনের পক্ষ হইতে উপরে উদ্ধৃত প্রশ্নে যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা কতদূর সত্য হওয়া সম্ভব। রামমোহন ও তাঁহার মাতার মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া অসদ্ভাব ছিল ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এইরূপ মনোমালিন্য আরও অনেক ক্ষুদ্র ব্যাপারেও অহরহ ঘটিয়া থাকে। রামমোহনের সহিত তাঁহার মাতার প্রথম মতান্তরের পরিচয় পাই আমরা রামকান্তের শ্রাদ্ধের সময়ে (ইং ১৮০৩)। তাহার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্তও রামমোহন বাড়িতে দেবসেবার খরচ দিতেছিলেন, সে-বিষয়ে রামমোহনের নিজের উক্তি আছে, এবং তাহার পরও কয়েক বৎসর ধরিয়া এই খরচ তিনি দিয়াছেন তাহা অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে। সুতরাং শ্রাদ্ধের সময়ের ঝগড়া রামমোহনের ধর্ম্মমত লইয়া হওয়া সম্ভব নহে।* ইহার পর রামমোহন এগার বৎসর কাল বাড়ি ও পরিজন হইতে দূরে ছিলেন। এ সময়েও দেবসেবা লইয়া যে-ধরণের বচসার কথা বলা হইয়াছে তাহা ঘটে নাই ইহা প্রায় সুনিশ্চিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামমোহন ও তাঁহার মাতার মধ্যে হিন্দু আচার পালন লইয়া যদি কোন তর্কবিতর্ক বা কলহ হইয়া থাকে তবে তাহা রামমোহনের দেশে ফিরিয়া আসার অর্থাৎ ১৮১৪ সনের পর ঘটিয়াছিল।

ইহা ছাড়া এই কলহের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। রামমোহন সংস্কারক, নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সুতরাং তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাতা ও দেশবাসীরা তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন—এরূপ একটা ধারণা প্রচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু উহা সত্য না-ও হইতে পারে। রামমোহনের প্রতি তাঁহার পরিজনবর্গের ও দেশবাসীর বিরূপ হওয়ার দুইটি কারণ ছিল। উহাদের প্রথমটি তাঁহার অবিরত মুসলমান-সংসর্গ ও মুসলমানী আচার ব্যবহার গ্রহণ, দ্বিতীয়টি তাঁহার একেশ্বর মতবাদের গোঁড়ামি। প্রথম বিষয়টির উল্লেখ আমরা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের একটি পত্রে পাই। পত্রখানি ১৮১৬ সনের ১৮ই মে তারিখে লেখা। ঈষ্ট লিখিতেছেন:—

> তাহারা [হিন্দুরা] তাঁহার মুসলমান-সংসর্গ অত্যন্ত অপছন্দ করিত এবং ইহাই তাহাদের বিরাগের মূল কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। তিনি যে বন্ধুভাবে দু-একজন মুসলমানের সঙ্গে মিশিতেন তাহা নহে, অবিরত তাহাদের মধ্যে বাস করেন। এমন কি তাহাদের সঙ্গে পানভোজন করেন বলিয়াও একটা সন্দেহ আছে। আমি শুনিয়াছি তিনি সম্প্রতি হিন্দু সমাজ বর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। ইহাতে হিন্দুদের গর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, 'পরধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত,' 'জবনমাত্রে তদ্গতচিত্ত', 'জবনান্নভোক্তা', 'জবনীগমনকারী' বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আমরা তাঁহার প্রতিপক্ষের পুস্তকাদির মধ্যে পাই। এ-সম্পর্কে তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া ১৮২৩ সনে প্রকাশিত 'পাষণ্ডপীড়ন' নামক পুস্তকে লেখা হইয়াছে:—

> "নগরান্তবাসি মহাশয়কে জবনা স্পর্শ করিয়া থাক বলিয়া কোন্ ভদ্রলোকে নিন্দা করিয়া থাকেন, যদি, কেহ করেন, সেও অনুচিত, যে হেতু, অত্যল্প পাপেবিপদঃ শুচিনাং পাপাত্মনাং পাপ শতেন কিম্বা। অর্থাৎ শুচি ব্যক্তির অত্যল্প পাপেই বিপদ্ হয়। পাপাত্মার শতং পাপেও সমুদ্রের জলের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, কি

* এই ঘটনার পূর্ব্বে রামমোহনের পিতা ও ভ্রাতা দুই জনেই অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। সে-সময়ে আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও রামমোহন পিতাকে বা ভ্রাতাকে সাহায্য করেন নাই। ইহা রামমোহনের প্রতি তাঁহার মাতার বিরাগের কারণ হইতে পারে।

জানি, কে দেখিয়াছে, পরমেশ্বরই জানেন, কিন্তু, অনেকেই জবনান্ন ভোক্তা বলিয়া মহাপুরুষকে নিন্দা করিয়া থাকেন, লোকপরম্পরা শুনিতে পাই, নত্মমূলা জনশ্রুতিঃ, বহুজনের বাক্য, প্রায়ঃ অমল হয় না, সুবোধ লোকেরাই বিবেচনা করিবেন।

যে ব্যক্তি, বাল্যাবধি অহোরাত্র জবন মাত্রের সহিত আলাপ পরিচয় একাসনে সহবাস ও সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেছেন তেঁহ, সুতরাং আত্মবন্মন্যতে জগৎ ইহার ন্যায় অন্য ব্যক্তিকেও জবনজ্ঞান করিতে পারেন, সে যাহা হউক তাঁহার এই রূপ জবনজ্ঞানে পরমাপ্যায়িত হইলাম, বুজিলাম, যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানির বহুকালে বহুপরিশ্রমে এক্ষণে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানের ফল, সম্পূর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে, ভাল, ভাল, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, ক্রমে সর্ব্বত্রই জবনজ্ঞান হইবেক, যেমন, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের ফল, ব্রহ্মমাত্রে তদ্গত মানস প্রযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময় দর্শন করেন, এবং আপনিও ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তেমন, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানের ফল, জবন মাত্রে তদ্গতচিত্ততা প্রযুক্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মাণ্ড জবনময় দর্শন করেন এবং আপনিও জবন জাতি প্রাপ্ত হয়েন। (পৃ. ২৮—৩০)

ইহা হইতে বোঝা যায়, রামমোহনের মুসলমান সংসর্গের জন্য হিন্দুরা তাঁহাকে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের দ্বেষ্টা এবং দ্রোহী বলিয়া জ্ঞান করিত এবং এই কারণে তাঁহার উপর বিরূপ ছিল। রামমোহনের মাতারও এই কারণে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

রামমোহনের একেশ্বরবাদের গোঁড়ামি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও তাঁহার মুসলমান সংসর্গেরই ফল। হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বর এক স্বীকার করিতে কোনদিনই আপত্তি করে নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে নিম্নস্তরের অধিকারীর জন্য দেবদেবীর পূজাও বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু 'সেমিটিক' ধর্ম্ম মাত্রই ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত উগ্র। কি মুসলমান, কি য়িহুদী, উভয়েই ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পূজিত হইতে পারেন তাহা মানিতে প্রস্তুত নয়। কোরাণ ইত্যাদি পাঠের ফলে প্রথমজীবনে রামমোহন এই মতের দ্বারা খুব বেশী প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা অসম্ভব নহে।

রামমোহন ও তাঁহার মাতার মধ্যে যে মনোমালিন্য তাহা ধর্ম্মমত লইয়া এ-কথা মানিয়া লইলেও আর একটি কথা বলিবার থাকে। রামমোহন যে-ভাবে একটা বৈষয়িক ব্যাপারে ধর্ম্ম-মতের কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহার আর একটি উদ্দেশ্য থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়। সে উদ্দেশ্য বিচারপতিকে প্রভাবান্বিত করা। ঈষ্ট সাহেব রামমোহনের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সহিত হিন্দুদের সম্প্রীতি ছিল না তাহাও জানিতেন। সুতরাং তাঁহার এজলাসে যখন মোকদ্দমা উঠিল, তখন ধর্ম্মমতের জন্য রামমোহনকে উৎপীড়ন করিবার জন্যই পিতামহীর প্ররোচনায় গোবিন্দপ্রসাদ রায় এই মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে, এই ইঙ্গিত করিলে রামমোহনের পক্ষে একটু সুবিধা হইতে পারে ইহা মনে করা বিচিত্র নহে। আর একটি ব্যাপারেও এই ধরণের একটু আভাস পাওয়া যায়। এই মোকদ্দমায় রামমোহন যে জবাব দাখিল করেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাকে শপথ করিতে হয়। এই শপথ সম্বন্ধে ঈষ্ট লিখিতেছেন,—"বিবাদী নিজের জাতি ও অবস্থা অনুযায়ী যে শপথ করিবার সাধারণ প্রথা আছে, তাহা ছাড়া সে সময়ে বেদান্ত গ্রন্থ হাতে করিয়া ছিলেন।" রামমোহন হয়ত বেদান্ত গ্রন্থকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন সেজন্য উহা স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার একটু লোক দেখাইবার ভাবও ছিল না এ-কথাও বলা চলে না।

সে যাহাই হউক রামমোহন বিনা-যুদ্ধে ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোন সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার পক্ষে কলিকাতার একজন খ্যাতনামা এটর্নী—বেন্‌জামিন টার্ণার নিযুক্ত হইল, সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিতে লাগিল। এইরূপ অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য দরিদ্র গোবিন্দপ্রসাদের ছিল না। কিছুদিন পরে নিঃস্ব হইয়া তিনি মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিলেন ও পিতৃব্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পত্রটি লিখিলেন :—

শ্রীদুর্গা

শরণং

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রণামা পরার্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্য লোকের কথা প্রমাণ মহাশয়ের নামে হিস্যা পাইবার প্রার্থনায় সুপ্রেম কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইয়েছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্য্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকটে জাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট প্হোঁছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি।

শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।

সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কার্ত্তিক,

পরম পূজনীয়

শ্রীযুৎ রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়,

শ্রীচরণ সরজেষু

পত্র দেনা মোং কলিকাতা

রামমোহন তখন প্রসন্ন হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্ষমা করিলেন ও গৃহবিবাদের অবসান হইল। ইহার চারি বৎসর পরে তিনি ডিগবীকে ধরিয়া গোবিন্দপ্রসাদকে বর্দ্ধমানে আবকারীর দারোগা করিয়া দিলেন। তাহার জামিন হইলেন রামমোহনের বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর।

বাসবদত্তা

—শ্রীসুশীলকুমার দে

ওগো রাজা উদয়ন,
কত ফুলে ফুলে ভরিয়াছে তব প্রমোদের উপবন ?
মেলিয়াছে কত কিশোরী কলিকা আঁখি সৌরভ-নত,
প্রস্ফুট-দল কত মঞ্জরী গৌরব-উন্নত ?
যামিনীর কত কামিনী-কুসুম, প্রভাতের শেফালিকা,
দিনের দীপ্ত সূর্য্যমুখী ও সন্ধ্যার মল্লিকা ?

এনেছে তোমার তরে
ফুল-জনমের কত লঘু-লীলা নিতান্ত নির্ভরে ;
ছেয়েছে তোমার সকল অঙ্গ পরাগ-অঙ্গরাগে,
সুবাসে অধীর করেছে মদির-ফুলতনু-অনুরাগে ;
মানসের মধু নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' ধরেছে অধর-দলে,
ক্ষরেছে আকুল আঁখির শিশিরে তোমার চরণতলে।

শুধু সে-প্রমোদ-বনে
কোকিল-আলাপে, কেকা-কলরবে, কাতর কপোত-স্বনে,
ভাসিয়া বেড়ায় সুখ-গুঞ্জর ফুলদল অন্তরে
বীণা-বেণু-তানে মদ-মন্থর মদনের মন্তরে।
উছলিয়া উঠে প্রীতির প্লাবন কায়া-কূলে মর্ম্মরি,'
বক্ষ-শিলায় বাসনার ধারা পড়ে কত নির্ঝরি'।

কতবার গুঞ্জরি'
সরস পরশে তব প্রাণ-বীণা উঠিয়াছে থরথরি'।
কত নামহারা নায়িকা তোমার—কোথা আজ তা'রা গত ?
কত মাধবিকা, বকুলাবলিকা, ইন্দীবরিকা কত ;
বিবিধ লীলায় হেলায় যাহারা যৌবন-উন্মনা
আঁকিল প্রাণের ফলকে আলোক-আঁধারের আলিপনা।

প্রথম-মিলন-ভীতা
মুগ্ধা কেহ সে পুলক-আকুলা চুম্বন-সচকিতা ;
ধৃষ্ট তোমারে প্রগল্‌ভা কেহ বেঁধেছে মেখলাদামে,
লীলা-উৎপলে আঘাত করেছে যৌবন-উদ্দামে ;
আদরিণী কেহ আধ-হাসি হেসে' আধেক আঁখির ঠারে
বসনাঞ্চল লুটায়ে গিয়েছে চঞ্চল সঞ্চারে।

কোপের সোহাগে ভরা
ভুরু বাঁকায়েছে মৃগাক্ষী কেহ স্ফুরিত-বিম্বাধরা ;
বেণী বিনাইয়া বেঁধেছে কবরী কেহ কত যতনে,
পত্রলেখাটি এঁকেছে বক্ষে কস্তুরী-চন্দনে ;
কাজল-উজল আঁখির প্রসাদে, হাসিটির অনুনয়ে
করেছে স্নিগ্ধ সারা প্রাণ কেহ স্নেহরস-সঞ্চয়ে।

চেয়েছে প্রতীক্ষায়
কেহ অনিমেষে কুসুম-আসনে মণিময় বেদিকায় ;
অভিসারে কেহ চলেছে আঁধারে, তড়িত-চকিত-আঁখি,
তেয়াগি' অধির পদ-মঞ্জীর, নীলবাসে তনু ঢাকি' ;
বিরহিণী কেহ বেপথু-বিধুর বাহুতে লয়েছে টানি',
পূর্ণিমা-রাতে বিছায়ে দিয়েছে শুভ্র আঁচলখানি।

ছিল কত বারোমাস
বাপীজলকেলি, নর্ম্ম-বিনোদ, বিলাসের পরিহাস,
মধুপান সাথে ভুরুর ভঙ্গ মদকল-প্রলাপন,
শিখীর নৃত্য, কপোতের লীলা, সারিকার আলাপন,
মদনোৎসব, জ্যোৎস্না-জাগর, অটবীতে বিচরণ,
ঝুলনের মেলা, আবিরের খেলা, কদম্ব-ফুল-রণ।

কত নূপুরের ধ্বনি,
কটির প্রান্তে চপল মুখর মেখলার রণরণি,
কত সে চুলের ফুলের গন্ধ, চক্ষের অঞ্জন,
চারু-চরণের অরুণ-লাক্ষা, বক্ষের চন্দন,
ললাটের তটে তিলকের লেখা, সীমন্তে অঞ্চল,
নীল-অম্বরে নীবির বন্ধ করে তোমা' চঞ্চল।

তব কান্তারা আনে
ক্লান্ত-কান্ত মাধুরীটি শুধু পুলক-লোলুপ প্রাণে।
মানে-অভিমানে বিরহে-মিলনে মনোজের মনোরথে
নির্ঝরে ঝরে জীবন তোমার ফুল-সুকোমল পথে।
শুধু হাসি-গানে, আলাপে-প্রলাপে, উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে,
বসন্ত-বায়ে বাসনার ব্যথা সুগন্ধ নিঃশ্বাসে।

চাহি তব মুখপানে
তাহারা কেবল যৌবন-পুটে রূপের অর্ঘ্য আনে ;
বৃন্তে ফুটিয়া চেয়ে রয় শুধু বিলাইয়া সৌরভ,
তিমিরে রৌদ্রে সহে হাসিমুখে সোহাগের ঢেউ সব,
বহে বুকে শুধু বাসনার মধু ভক্ত-ভৃঙ্গ তরে,—
দিনটি ফুরালে আপন বৃন্তে নীরবে ঝরিয়া পড়ে।

মনে আছে সেই কবে
ওগো উদয়ন, নব বসন্তে মদন-মহোৎসবে,
কুসুমায়ুধের তূণ-সঙ্গিনী সহকারমঞ্জরী
ফুটিল যখন, আসিয়া জুটিল মধুকর গুঞ্জরি',
বাসবদত্তা পূজিল তোমারে বসন্তমঙ্গলে
নবমাধবীর বীথির বিতানে রক্তঅশোকতলে ?

সারা কোশাম্বীপুরী
ফাগুনের ফাগে অশোকের রাগে উঠেছিল বিচ্ছুরি' ;
নাগর-নাগরী রাজ-রথ্যায় ছুটে পীতবাস পরি'
কুঙ্কুম-করে হাসির লহরে শৃঙ্গকে জল ভরি' ;
নৃত্য-গীতের কল-উচ্ছ্বাসে যমুনার তীরে তীরে
মৃদু মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে অনঙ্গ-মন্দিরে।

সেই-সে প্রভাতকালে
কে তরুণী আসি দাঁড়ালে কখন বিটপী-অন্তরালে ;
তুমি-বসেছিলে অশোকের তলে, অধরে মধুর হাসি,
বাসবদত্তা ধরেছিল তা'র অর্ঘ্য সমুখে আসি',
কে আড়ালে থাকি' নমিল তোমারে দূর হ'তে জোড়-করে
প্রিয়দর্শন মকরকেতন ভাবিয়া ভক্তিভরে ?

ফুল-অঞ্জলি ভরি'
পূজিল তোমারে একান্তমনে দূর হ'তে সুন্দরী ;
কাঁপিল সহসা সারাটি অঙ্গ অনঙ্গ-শিহরণে,—
সকল কামনা কামদেব বুঝি পুরাল এতক্ষণে।
দেখিল তোমারে লুকায়ে লুকায়ে—তবু ভরে না ত আঁখি,
নিল নিশ্চল দু'টি আঁখি-তারা তোমারে হৃদয়ে আঁকি'।

তরণী-নিমজ্জনে
পেয়ে তা'রে কবে বাসবদত্তা রাখিল আপন সনে ;
সিংহল-নরপতির তনয়া ছিল সে ভট্টারিকা,
সাত সাগরের মন্থন ধন, নাম তা'র সাগরিকা :
পরিচয় তা'র কেহ নাহি জানে,—আসিল সাগর-স্রোতে,
বাসবদত্তা রাখিল তাহারে তোমার দৃষ্টি হ'তে।

তুমি তাই কোনো দিন
দেখ নাই তারে নিভৃতে কোথায় তব অবরোধ-লীন ;
দৈব সেদিন প্রভাতে হাসিয়া কি ঘটাল নাহি জানি—
কোন্ দ্বীপ হ'তে সাগরের স্রোতে কি রত্ন দিল আনি'।
ভুবনে ভ্রমিছে মদন-শাসন,—বিভ্রমী যৌবন,—
কে এড়াবে তা'র ললিত-মধুর নিষ্ঠুর নিপীড়ন ?

তাই বালা কত সহে,
দুর্ল্লভ-জন-কামনা তাহার মনটি নিভৃতে দহে ;
অনঙ্গ-লেখ লিখিয়া গোপনে কত সে লুকায়ে রাখে ;
প্রাণে-আঁকা তব ছবিটি যতনে চিত্রফলকে আঁকে—
যেন কামদেব মধুর মূরতি অশোক-তরুর তলে ;
সখী তা'র আঁকে তা'রি পাশে তা'রে রতিরূপে কত ছলে।

দীর্ঘ রজনী জাগি'
কে জানে কত সে নিশুতি-শয়নে কেঁদেছিল তোমা' লাগি ;
তুমি দেখিলে না, তুমি জানিলে না বুকে তা'র কত ব্যথা,
দাঁড়ায়ে আড়ালে বিটপীর তলে বহিল কি ব্যাকুলতা ;
ভাষাহীন সেই আশাহীন দুখে নিকুঞ্জবনে আসি'
মরণ শরণ করিল সে শেষে, গলে দিল লতা-ফাঁসী।

সেদিন দৈব আনি'
দিয়েছিল তব করে তা'র সেই অঙ্কিত ছবিখানি ;
তাই গোধূলিতে নিভৃতে আসিয়া তাহারি অন্বেষণে
হেরিলে তাহারে প্রথম সেদিন মরণ-আলিঙ্গনে ;
লতা-ফাঁস খুলি' বাহু-পাশ তব জড়ালে কণ্ঠে তা'র,—
তব আশ্লেষে নূতন মরণে মরিল সে আর-বার।

কখনো তোমার তরে
এত ফুল বুঝি তব উদ্যানে ফোটেনি একত্তরে ;
দেহে চম্পক, অধরে অশোক, নয়নে নীলোৎপল,
সরস উরসে যুগ্ম-পদ্ম, ভুজে কেতকের দল,—

কত অনর্ঘ পুষ্প-অর্ঘ্য অঙ্গে অঙ্গে ফুটে'
দেহের মনের গূঢ় চেতনার বেদনা-বন্ধ টুটে।

অস্তমেঘের মাঝে
কুপিতা-কামিনী-কপোলের রঙে ফুটে আলো সেই সাঁঝে;
সে-আলোকে হেরি' মুখখানি তা'র, চরাচর হ'ল ভুল—
কি সুধায় গড়া, সে-মুখের বুঝি নাহি আর সমতুল।
সহসা কখন বাসবদত্তা দাঁড়াল সেখানে আসি'—
অস্তমেঘের রঙটি তাহার কপোলে উঠিল ভাসি'।

ওগো প্রাণহীন সুখী,
ধৃষ্ট ধূর্ত্ত তুমি চিরদিন বঞ্চনা-কৌতুকী;
করি' ভ্রূভঙ্গ বাসবদত্তা চাহিল তোমার পানে,
তুমি দেখ শুধু—ফুলধনু সেথা নবধনু যেন টানে।
কুপিত তাহার কপোল-কান্তি যেন রাঙা উৎপল—
মানিনীর মান ভাঙাবার সুখে হ'লে তুমি চঞ্চল।

পড়িলে চরণতলে,
ভুলিয়াও তবু বাসবদত্তা ভুলিল না তব ছলে;
কতবার তুমি সাধিলে সেদিন, তবু চাহিল না ফিরে,
সব সুখ যেন দু'পায়ে দলিয়া চলিয়া গেল সে ধীরে।
হে সুখ-লুব্ধ, কোনোদিন কোনো দাগ নাহি ধরে প্রাণে—
কোপ-বিপাটল কপোল সেদিন তবু কেন ব্যথা আনে?

আরো একদিন কবে
দেখিলে কাহারে সরসীর তীরে কৌমুদী-উৎসবে।
রাজার কুমারী অরণ্যে কোথা ছিল সে ব্যাধের ঘরে,
সেনাপতি তা'রে লুঠিয়া সঁপিল বাসবদত্তা-করে;
বনানীর ফুল হ'ল প্রিয়া তব সেই প্রিয়দর্শিকা,—
হে লোল-চিত্ত, কোথা গেল তব সাগরের সাগরিকা।

বনফুল-যৌতুক
আনিল আবার জীবনে নবীন পুলকের কৌতুক।
হরকণ্ঠের দ্যুতিহর সেই সরসীর কালো জলে
হেরিলে তাহার নয়নের ছায়া, নব-নীল শতদলে;
লতার মতন স্তবকিনী তনু, মধুপের মনোহরা,
অধরে সরাগ কিসলয়-রাগ, বুকে কত মধু ভরা।

বাসবদত্তা তরে
প্রাসাদে তাহার প্রেক্ষা-গৃহটি কত কলরবে ভরে;
নূতন নাট্যে নামিল সেদিন হাসিগান-ফোয়ারায়
নৃত্যনিপুণা প্রিয়দর্শিকা নায়িকার ভূমিকায়;
উঠিল নূপুর-নিক্কণ সাথে বীণাতারে ঝঙ্কার,—
তুমি লুকাইয়া আসিলে সেখানে হেরিতে নৃত্য তা'র।

শরদিন্দুর মত
মুখখানি তা'র উজল সরস, অংস ঈষৎ-নত;
ক্ষীণ কটিতটে ঘন নিতম্ব, সরল পদাঙ্গুলি;
লীলায়িত ভুজে নিবিড়োন্নত বক্ষ উঠিছে দুলি';
অঙ্গটি তা'র উছসি' উছসি' লঘু-নৃত্যের ভরে
বিকশি' বিলসি' উলসি' উঠিল লাবণ্য থরে থরে।

রত্ন-অলঙ্কারে
শতদীপালোকে ঝলকে উজল তনু তা'র বারে বারে;
কবরী বেড়িয়া দোলে ফুলমালা হীরকের জ্বালা সাথে;
নূপুরের সাথে বাজে কিঙ্কিণী, কঙ্কণ দু'টি হাতে;
সেই তালে তালে উতলা তোমার মনটি সে-নর্ত্তনে
গেঁথে নিল বুঝি বক্ষে বলিত মুক্তাবলীর সনে।

তুমি নায়কের বেশে
সখীগণ সাথে মিশিয়া নামিলে রঙ্গভূমিতে এসে;
জানিল না কেহ—প্রিয়দর্শিকা আর তা'র সখী ছাড়া,—
প্রেম-অভিনয়ে তা'র সাথে তুমি হ'লে সেথা মাতোয়ারা;
চোখে হাসিরাশি, শ্রবণে কেবল গীতধারা উচ্ছলে,
রসে ভাসে দেহ দেহ-পুষ্পের পরশে ও পরিমলে।

সে রাগের রসাবেশ
সহসা ফুরাল, নিভিল প্রদীপ,—উৎসব হ'ল শেষ।
বাসবদত্তা চিনিল তোমারে,—ক্ষোভে, দুখে, অভিমানে
ভ্রূকুটির গুণ টানিয়া আবার চাহিল তোমার পানে;
আবার কপোল-পাটল-পর্ণে ফোটে রোষারুণ-রাগ,—
হে কিতব, তব প্রাণে কি তাহার পড়েছিল কোনো দাগ?

পল্লব-প্রচ্ছায়ে
আলসে বিলাসে কেটেছিল দিন চির-বসন্ত-বায়ে;

নয়নে তোমারই মায়া-মরীচিকা তৃষ্ণার বিচরণে,
হৃদয়ে তোমার কামনার শিখা স্মর-শর-অশরণে,
আজীবন তুমি ঘুরেছ, কখনো চাহনি তাহার পানে,
আহত করেছ চিরদিন তা'রে বঞ্চনা-অপমানে।

তবু ক্ষমাশীল স্নেহে
জড়ায়ে ছিল সে তব প্রাণে মনে, তব দেহে আর গেহে ;
কত সাগরিকা, প্রিয়দর্শিকা এল আর গেল চ'লে,
প্রাণহীন তুমি কতবার তা'র প্রাণটি গিয়েছ দ'লে ;
তবু বরষায় শীতে কুয়াসায় জড়ায়ে লতার মত
শ্যামল বক্ষে জীবন তোমার বাঁধিয়াছে অনাহত।

তুমি ত চাহনি ফিরে,
দেখনি তাহার স্নেহ-সৌরভ অলক্ষ্যে ছিল ঘিরে ;
আনন্দ-লঘু লীলায় চলিলে উন্মদ-যৌবনে,—
কত ফুল ফোটে, কত ফুল ঝরে বসন্ত-সমীরণে ;
সেও ত একটি এমনি কুসুম—আজ তাই সেও ঝরে ;
তা'র তরে তবে আজ কেন প্রাণ এত হাহাকার করে ?

সে কি চিরদিন তরে
গিয়েছে চলিয়া বাসবদত্তা চির-অভিমান ভরে ?
মৃত্যু আসিয়া গ্রাসিয়াছে তা'রে 'লাবাণকে' গৃহদাহে,
এতদিনে তুমি হারায়ে বুঝিলে প্রাণ তাবে কত চাহে !
যে-কমল ছিল-মানস-সরসে নিভৃতে নয়ন মেলি',
আজ নিষ্ঠুর অনল-কুণ্ডে বিধি তা'রে দিল ফেলি'।

তা'রি উত্তাপে যত
প্রমোদ-নিশির সুখরাশি তব, শুষ্ক ফুলের মত
পড়িল খসিয়া একটি নিমেষে, চোখ ভ'রে গেল জলে,
জাগিল বেদনা বেদনা-বিহীন কঠিন হৃদয়তলে ;
কণ্ঠে সহসা থেমে গেল রূঢ় বাসনা-বাঁশরী-রাগ,
লুটাল ছিন্ন লতার মতন অসহায় অনুরাগ।

ছিল গৃহকোণে হারা
যে রত্ন-দীপ, ছিল সে উজলি' জীবন-সরণি সারা ;
পেয়ে যা'রে কভু চেন নাই, তাই হারায়ে চিনিলে তা'রে-
রত্নের দীপ নিভে না, শুধু সে জ্বলিল অন্ধকারে।

দেহের দুয়ারে অনেকে এসেছে সুখের আঘাত করি,'—
আজ এ কে এল প্রাণের দুয়ারে আঁখিতে অশ্রু ভরি'।

আজ তা'রে পড়ে মনে
যে ছিল নিরভিমানিনী প্রেয়সী সেই নব-যৌবনে।
হেমন্তে আজ হিম-জোছনায় স্মৃতি-শশী বুঝি ঝরে,
আকুল সরস স্নেহের ছলটি কত আকুলিয়া ধরে ;
শিশির-ধৌত স্মৃতি-কুহেলিকা, কত আলো ছায়া মাখি'
আসে যায় শুধু ঘন-বেদনার জোৎস্না-আবেশ আঁকি'।

মনে ভেসে আসে সব
ভাবে অবগাহি' অতীতের সেই যৌবন-সৌরভ।
পিতা ছিল তা'র মহাতেজস্বী মহাসেন প্রদ্যোত,
যা'র খরতাপে লুকাইল যত রাজন্য-খদ্যোত ;
তুমি ছিলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, একদিন কৌশলে
বন্দী করিয়া আনিল তোমারে আপন প্রাসাদতলে।

ছিল রাজধানী তা'র
অবন্তীপুরী,—তব যশোগীতি আজো ঘরে ঘরে যা'র ;
রাখিল তোমারে বন্দী করিয়া সঙ্গীত শালিকায় ;
ছিল সাথী তব বীণা 'ঘোষবতী' ; গবাক্ষ-জালিকায়
বসি' আনমনে বাজাইতে তুমি,—করুণ সে সুরগুলি
কা'র কানে পশি' প্রাণের ভিতর দিল ঝঙ্কার তুলি'।

কতদিন বাতায়নে
বসিল চাহিয়া সুদূরের পানে নৃপসুতা আনমনে।
তুমি হ'লে তা'র বীণা-আচার্য্য ; তোমার বুকের বীণা
জাগিল পরম পরশে আবার তাহার অঙ্ক-লীনা ;
সেই অঙ্গুলি-প্রহৃত প্রথম উঠেছিল গুঞ্জরি'
যে সুরের ঢেউ, বুঝি আজো তাহা আছে প্রাণে মর্ম্মরি'।

গুরুদক্ষিণা তরে
ললিত কলায় প্রিয়শিষ্যা সে মর্ম্মের মধু ধরে।
অবন্তী হ'তে হরিলে তাহারে, নিজের পুরীতে আনি'
আপনার পাশে বসায়ে আদরে করিলে তাহারে রাণী ;
সেই দিন হ'তে হ'ল সে প্রাণের যূথী-বন-বিহারিণী,—
আজ সে এসেছে স্মৃতির গহনে গোপন-সঞ্চারিণী।

সেদিন কি আছে মনে
যেদিন তোমার অন্তর-গৃহে শঙ্খের নিঃস্বনে
পশিল সে আসি' শুভ কলরবে বিবাহের চেলি পরি'
হোম-ধূমারুণ নয়নে করুণ সলজ্জ হাসি ধরি'।
কেতকী-গৌর দেহখানি তা'র সুধার সুধারা-মাখা
সরমে সোহাগে চারু চাহনিটি,—আছে আজো প্রাণে আঁকা ?

তার পর কতদিন
প্রভাতে প্রদোষে কত হাসি-গান, কত সুখ সীমাহীন ;
চোখে চোখে কত চাহনি-চমক কানে কানে কত কথা,
দেহে দেহে কত শিহরণ, আর মনে মনে কত ব্যথা ;
কঙ্কণ দু'টি দু'হাতে, কেশের কিনারে কর্ণপূর,
রক্ত-চরণে অলক্ত-রাগ, সীমন্তে সিন্দুর।

যমুনার উপকূলে
সেই সব দিন তারপর তুমি একে একে গেলে ভুলে' ;
নিত্য-নূতন পুলকে বহিল প্রমোদের উত্থানে
জীবন তোমার মোহ-মন্থর কামনার কলতানে ;
আজ একি হ'ল - সে মধুর স্রোত ঠেকিল আচম্বিতে
মরণের ক্রূর পাষাণে আসিয়া থমকিয়া সচকিতে।

ভাঙি' হৃদয়ের বাঁধ
সেই স্রোত হ'ল বেদনা-জলধি উত্তাল উন্মাদ ;
হাসিল সুদূর আকাশের চাঁদ অমা-যামিনীর আড়ে—
এমন হাসি ত হাসেনি কখনো সুখপূর্ণিমা-পারে।—
হাসায়েছ তারে, কাঁদায়েছ তারে আজীবন দিয়ে ফাঁকি,
আজ সে তোমারে গেল ফাঁকি দিয়ে,—কাঁদাল আড়ালে থাকি'।

তাই সান্ত্বনাহীন
বিরহের খর-নিদাঘের দাহে হয়েছে দীর্ঘ দিন ;
আতুর হৃদয় হয়েছে বিধুর-বেদনায় উন্মুখ—
কোথা চন্দনসম নন্দন বধূর সে মধু-মুখ।
কোথা সে স্নিগ্ধ শীতল চরণ, কোথা সে সিক্ত কেশ,
কোথা আজ ঘন-ছায়া-সুকুমার শান্ত দিবস-শেষ।

স্বপ্নের মায়া-রথে
তাই সে আবার আসিল কি আজ সুপ্তির ছায়া-পথে ?
দুপুরে যখন নিকুঞ্জে আসি' শুয়ে ছিলে তুমি একা,
নূপুর-বিহীন চরণে নীরবে সে কি এসে দিল দেখা ?

অনল-দগ্ধা প্রিয়া বুঝি আজ আবার সঙ্গোপনে
জাগিল নূতন নির্ম্মল রূপে বেদনার হুতাশনে।

বুঝি নয়নের নীরে
ঝরা-জলধনু ফুল-তনু তা'র ফুটিল সুপ্তি-তীরে ;
বাতাসে তাহার কেশ-ধূপবাস এখনো উদাস করে,
এখনো দেহের সোহাগ-সুরভি বুঝি আকুলিয়া ধরে ;
মুখখানি তার ফুটিল যেন সে কোন্ সকালের চাঁদ,
কণ্ঠে তাহার দূর ভৈরবী ভাঙে ধৈর্য্যের বাঁধ।

আবার ত ফিরে পায়
যা' হারায় লোকে,—প্রাণের ভিতরে হারালে কি পাওয়া যায় ?

তাই বুঝি আজ সায়াহ্ন-রাগ স্মৃতিতটে অবগাহি,
রয়েছে হারানো পুরানো প্রভাত-স্বপনের পানে চাহি' ;
হারায়েছে যাহা, তাহা কি আঁধারে ধুয়ে মুছে অবশেষে
নূতন উদয়-অচলে আবার ফুটিয়া উঠিবে হেসে ?

প্রভাতের বন্ধুরে
আবার রবির পূরবীর তানে ডাকিল কি চেনা-সুরে ?
বুঝি অগোচর চরণে তাহার মায়া মঞ্জীর বাজে,
ফোটে সে চপল কপোলের ছায়া অস্তমেঘের মাঝে ;
তাই বিরহের গীত-শতদলে অতল মনের তলে
চকিতে আবার ফেলিল চরণ স্মরণের নব ছলে ?

আবার কি তা'র সনে
দেখা হবে নব-কলগুঞ্জিত জীবনের ছায়া-বনে ?
বেঁধেছে প্রাণের শিথিল তন্ত্রী কঠোর যত্ন ভরে,
আজ এ নিবিড় বেদনার নীড় তা'রি সঙ্গীতে ভরে,—
এ গীতের তানে আর কি কখনো বাজাবে না কিঙ্কিণী,
হবে না লীলার সঙ্গিনী আর নেপথ্য রঙ্গিণী ?

উন্মাদ-মধুমাসে
বহিবে না আর বসন্ত-বায়ু দুরন্ত উল্লাসে ?
আকুলি' তাহার কণ্ঠ-কাকলি উঠিবে না আর জেগে,
ফুটিবে না আর হাসিটি চপল-চুম্বন-রাগ লেগে' ?
আর কাটিবে না চল-চাহনিতে চঞ্চল বিভাবরী,
বেতসের মত বেপথু-উতল তনুখানি বুকে ধরি' ?

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (৫)

—শ্রীসুকুমার সেন

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে যাঁহারা নিজের পথে উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি 'চন্দ্রনাথ', 'কৃষ্ণা', 'মধুযামিনী' ইত্যাদি কতকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "স্থানে স্থানে সুমধুর ও স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বর বিশিষ্ট" [বঙ্গদর্শন ১২৮১]। ইনি গ্রন্থমধ্যে চলিত-ভাষাও মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহার লেখায় বঙ্কিমের প্রভাব যে একেবারেই পড়ে নাই তাহা বলা চলে না। ছোট ছোট বাক্যপরম্পরা বঙ্কিমের লেখার আদর্শেই গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ 'সেকাল আর একাল' ইংরেজী ১৮৭৯ কি ১৮৮০ সালের দিকে রচিত হয়। শুধু বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া নহে, ভাষার দিক দিয়াও এই রচনাটী পরম উপভোগ্য। সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের সহিত মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদ মধ্যে মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, সংস্কৃত রীতির সহিত বাঙ্গালা রীতি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলেও পড়িতে কোথাও বাধে না। কিছু উদাহরণ তুলিয়া দিতেছি।

গুরুমহাশয়ের পর আথনজীর বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আথনজী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন। মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার বদনা ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগরেদরা নিয়ত বশবর্ত্তী। চাকর-দ্বারা জল আনয়ন কার্য্য করিয়া লওয়া আথনজীর মনঃপূত হইত না। তাঁহার সাগরেদদিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের একজন প্রধান সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর রচনা সরল, প্রাঞ্জল ও বিশেষত্ব-যুক্ত। বঙ্কিমী রীতিকে ইনি কতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত উদাহরণ হইতে বোধগম্য হইবে।

চুড়, বলয়, অনন্ত—এগুলি ত নিগড় বটে। বাহুলতা বহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয় চুড়-অনন্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে শোভা বাড়ে, না কমে? তালও ত সুরের নিগড। ঐ নিগড ভাঙ্গিলেই কি ভাল? দশরূপ নিগড়েই মনুষ্যত্ব। দশরূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি শশী। ছন্দ ত নিগড়। নিগড় সৌর জগতে; নিগড় কাব্য জগতে।

সরস ও কৌতুক রচনায়ও অক্ষয়চন্দ্র দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সরসতা (humour) সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা কষ্ট-কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের সরস রচনায় ভাব ও ভাষা সর্ব্বত্র পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাও সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমী পদ্ধতির অনুযায়ী। তবে ইহাঁর লেখার মধ্যে একটা ব্যঙ্গের সুর কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও বা প্রকট ভাবে চলিয়াছে। ভাষাও ঠিক এই সুরের উপযোগী। এই কারণে ইন্দ্রনাথের ভাষা অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। এই হিসাবে ইন্দ্রনাথের রস-রচনা অক্ষয়চন্দ্রের এই জাতীয় রচনা হইতে শ্রেষ্ঠ।

ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' নামক উপন্যাস বা ব্যঙ্গ-চিত্র ১২৮১ সালের দিকে প্রকাশিত হয়। ঐ সালের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। (কল্পতরুর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র কুরুচির গন্ধ পান নাই, অথচ হুতোম প্যাঁচার নক্সা তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল!) ইন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসে কোন কোন চরিত্রের মুখে বীরভূমের কথ্যভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নাটকে এই প্রয়োগ বরাবর থাকিলেও উপন্যাসের মধ্যে রসসঞ্চার করিবার জন্য বিশুদ্ধ উপভাষার প্রয়োগ বোধ হয় এই প্রথম।

তাঁহার প্রথম রচনাতেই ইন্দ্রনাথ নিজস্ব রীতি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, এবং গোড়া হইতেই ইহাতে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টীকৃত হইবে।

উভয়ে নীরব, কিন্তু বাক্যবিষয়ে কৃপণতা মনুষ্য মাত্রেরই হয় না, বিশেষতঃ গবেশের মত মানুষের। অতএব গবেশ কিয়ংক্ষণ পরে একটা পান চাহিয়া শান্তিভঙ্গ করিলেন। মধুসূদন ভাবিবার বিষয় পাইয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। গবেশ যাইতে স্বীকার না করাতে তাঁহার চিত্ত আলকাৎরার ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই গবেশ আবার পান চাহিল, ইহাতে তাঁহার মনে যেন ঝাড়ের আলো হইল। "পান? শুধু পান? কেন জল খাবে না?" মহাব্যস্তে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন। গবেশ বাধিত হইলেন। "খেলেই হ'ল" বলিয়া মধুসূদনকে অনুগৃহীত করিলেন। এ সংসারে কতজন যে এইরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, গত লোক-সংখ্যাতে তাহার কি কোন নিদর্শন আছে? না থাকিলে, থাকা উচিত। [কল্পতরু, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৭-২৮]।

উপমাদির প্রয়োগেও ইন্দ্রনাথ যথেষ্ট মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন। যেমন—

বৃষ্টি ধরিয়াছিল, কিন্তু মেঘ পরিষ্কৃত হয় নাই। বাদলের হাওয়ায় বোধ হয় বিধাতা পুরুষের গুড়ুক খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল. সেই জন্য তিনি চকমকি ঠুকিতেছিলেন। নতুবা মধ্যে মধ্যে চমক দিয়া আকাশে আলো হইবে কেন?

ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ব্যঙ্গ-চিত্র 'ক্ষুদিরাম'এ তাঁহার ব্যঙ্গ-ভঙ্গী আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভাষা সরল, সাধুভাষা। মধ্যে মধ্যে 'খুঁটিয়ে', 'চেয়ে' ইত্যাদি কথ্যভাষার রূপ আছে। ইহাতে রচনার কোন দোষ আসে নাই। বঙ্কিমী রীতি ইহার মধ্যেও পরিস্ফুট। 'ক্ষুদিরাম' হইতে নমুনা হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বাড়ীর জন্মপত্রিকা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, সে আমোলের লোকও কেহ জীবিত নাই, সুতরাং সে বাড়ার বয়স বলা অসম্ভব। ঈষৎ ঢেউ খেলান গোছের ছাত এবং স্থানে স্থানে বালি চূণ খসিয়া পড়াতে ভিতর দিকের সেই খোলস-ছাড়া-ভাব দেখিয়া কেহ যদি বয়সের অনুমান করিতে পারেন, করুন, আমি তাহাতে অস্বীকারও করিব না, স্বীকারও করিব না। [ক্ষুদিরাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৯]।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বর্ণলতা' ১২৮১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ইহা প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে ইহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না, 'শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত' এই মাত্র লেখা ছিল। স্বর্ণলতার বিষয়-বস্তু বা উপন্যাস হিসাবে ইহার দোষ গুণ বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে খাস বঙ্কিমের যুগে তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া খাটী বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করা বড় কম কৃতিত্বের কথা নহে। ইহা দুঃখের বিষয় যে বইটী প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যথোচিত সমাদর করেন নাই। তথাপি 'স্বর্ণলতা' পরবর্ত্তী কালে যথেষ্ট পরিমাণে আদৃত হইয়াছিল। এখনও ইহার আদর কমে নাই।

ভাষা হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে স্বর্ণলতার ভাষা বঙ্কিমের ভাষা হইতে প্রাচীন-প্রকৃতির (archaic)। প্রকৃত পক্ষে ইহার রচনার মধ্যে দুইটী স্তর পাশাপাশি বিদ্যমান—একটী বঙ্কিমী পদ্ধতির, অপরটী বিদ্যাসাগরী পদ্ধতির। এই দুই পদ্ধতির রচনার উদাহরণ পরে দিতেছি। 'বল' ধাতুর অপেক্ষা 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ ইহাতে অনেক বেশী। 'হইবেক', 'আইল (=আসিল)', 'জান্তেম', 'ভাবলাম', 'বলতেছিলাম', 'বেরুয়ে (=বেরিয়ে)' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। দ্বিতীয়া-চতুর্থীর '-রে' প্রত্যয়ের প্রয়োগও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কথোপকথন মৌখিক ভাষায় দেওয়া হইয়াছে, তবে তাহার মধ্যে সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের মিশ্রণও যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন, 'তুমি শুনিলে প্রত্যয় করবে না'; 'শুনতে পাইত'; ইত্যাদি। স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ খুবই অল্প। স্বর্ণলতার রচনা-পদ্ধতির উদাহরণ দিতেছি।

বঙ্কিমী পদ্ধতি—

বর্দ্ধমান জেলায় বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক ছিল না বটে, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের সময়ে তিনি কমিসারিয়েটে কর্ম্ম করিতেন। এই কার্য্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূল। নূতন বড় মানুষ হইলে প্রায়ই কৃপণ হয়। কিন্তু বিপ্রদাসের সে দোষটী ছিল না। তাঁহার সদ্ব্যয় যথেষ্ট ছিল। দেবসেবায় ও অতিথিসেবায় তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইত। বাটীতে কোন পার্ব্বণ ফাঁক যাইত না। [প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৬০]।

বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি—

শশিভূষণ যেমন বয়সে বড় ছিলেন, তেমনি বুদ্ধিতেও তদীয় ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পাঠশালায় লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া ঐ গ্রামের জমীদারের সরকারে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম পাইয়াছিলেন, জমীদারের সরকারে কার্য্যের বেতন নাম মাত্র। বোধ হয় বেতন না থাকিলেও অনেকে জমীদারের সরকারে কার্য্য করিতে অসম্মত হন না। ফলতঃ শশিভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠিলেন। [ঐ, পৃঃ ১]।

তারকনাথের পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলির ভাষা আরও মার্জ্জিত। সেগুলির রচনা সরল ও প্রাঞ্জল, অন্যথা বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের রচনা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরী পদ্ধতির অনুযায়ী। বরঞ্চ আরও সংস্কৃতঘেঁষা এই হিসাবে যে ইহাতে তৎসম শব্দের বড়ই প্রাবল্য। ইঁহার রচনা সর্ব্বত্র বিদ্যাসাগরের মত ছন্দোময় (rhythmic) নহে, এবং ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার নমনীয়তাও প্রায় নাই। তথাপি চিন্তামূলক রচনার বাহন হিসাবে কালীপ্রসন্নের ভাষা যথেষ্ঠ পরিমাণে সার্থক হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নে কালীপ্রসন্নের রচনার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

হর্ষ, দুঃখ, ক্রোধ ও প্রীতি প্রভৃতি ভাব-নিচয়ের ভাষা চিরকালই গাঢ়তার মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যে হর্ষ, যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল, সহজেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যেমন তরল ভাব, তেমন তরল ভাষা। মনুষ্যের মন অল্প হর্ষে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অল্প আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হর্ষ অথবা আনন্দজনিত হাস্যোল্লাস তখন নিবৃত্ত হয় না। ইত্যাদি। [প্রভাত চিন্তা]।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই হইতেই তাঁহার গদ্য লেখার আরম্ভ। ইনি দার্শনিক বিষয়েই লিখিতেন। ইঁহার রচনার একটী অনন্যসুলভ বিশিষ্টতা ও নিজস্ব ভঙ্গী আছে। কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব তিনি অতি সরল ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিতেন। ভাষা সরল, সরস ও তেজস্বী। সাধুভাষার মধ্যে তদ্ভব শব্দ তিনি অতি সুন্দর ও বেমালুম ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিতেন। সংস্কৃত রীতি ও মৌখিক রীতি তাঁহার রচনায় সুন্দররূপে মিশ খাইয়া গিয়াছে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

তা ছাড়া—জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য আর এক প্রকার দুঃখ আছে- যে দুঃখে রাজপুত্র বুদ্ধদেব, মনুষ্যপুত্র ঈশা মহাপুরুষ এবং ব্রাহ্মণপুত্র চৈতন্যদেব গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এ দুঃখ মনুষ্যের আত্মার গোড়াকার দুঃখ। সহস্রের মধ্যে এক আধজন অসামান্য মহাপুরুষের মনে এ দুঃখ যখন দাবানলের ন্যায় তেজ করিয়া উঠে, তখন আর আর সকল দুঃখকে কবলিত করিয়া তাহার শিখা আকাশাভিমুখে উদ্ধত হয়। এই অতলস্পর্শ গভীর দুঃখের প্রেরণায় পৃথিবীতে কার্য্য যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর এমুড়া-হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত কম্পমান করিয়া বহুকালের সঞ্চিত স্তূপাকার আবর্জ্জনারাশি তাহার গাত্র হইতে দূরে অপসারিত করে। [গীতা-পাঠের ভূমিকা]।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাল্মীকির জয়'-এর কতক অংশ বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার পরবৎসরেই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বইটী প্রকাশিত হইবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন [বঙ্গদর্শন, ১২৮৮ সাল]। বস্তুতঃ ভাবের দিক দিয়া যেমন ভাষার দিক দিয়াও তেমনি বইখানি অপূর্ব্ব। 'বাল্মীকির জয়' প্রকাশিত হইবার পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন।

১২৯০ সালের বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদ 'কাঞ্চনমালা' নামে একটী ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত করেন। ১৩২২ সালে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদের দ্বিতীয় উপন্যাস 'বেণের মেয়ে' প্রথমে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে ১৩২৬ সালে পুস্তকাকারে বাহির হয়।

হরপ্রসাদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-শিষ্য। বঙ্কিমের রীতিকে হরপ্রসাদ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তাঁহার শেষের দিকের রচনায় এই পদ্ধতি তাঁহার নিজস্ব এক বিশিষ্ট ভঙ্গী পাইয়াছিল। 'কাঞ্চনমালা'র ভাষা প্রাঞ্জল সাধুভাষা, কখনও সংস্কৃতঘেঁষা দুর্ব্বোধ, কখনও প্রাকৃতঘেঁষা সরল; মধ্যে মধ্যে মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ভাষার গাম্ভীর্য্যহানি করিয়াছে। দুই ধরণের লেখারই উদাহরণ দিতেছি।

(১) সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদসন্ধ্যামোদিনী, ঝিল্লিরব-কৃতমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জু তারকারাজি-ব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয় কচিদুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌত বিধৌত সুরভিচর্চ্চিত বদন শাটাঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হইতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ় প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য মেধামনঃসংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, কদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল। যেন ঘোর ঝটিকা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইল। যেন দারুণ গ্রীষ্মক্লেদের পর ধীরে ধীরে শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্যময় সমীরণ বহিল। [তৃতীয় পরিচ্ছেদ]।

(২) সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল। অশোক সসৈন্যে শীঘ্র তক্ষশীলা আসিবেন শুনা গেল। কিন্তু কাঞ্চনের মনের শান্তি হইল না। স্বামীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। তিনি নানা উপায়ে, যে সকল গোপন স্থানে বন্দীভাবে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং চণ্ডালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। [ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ]।

'বেণের মেয়ে' সম্পূর্ণরূপে হরপ্রসাদের নিজস্ব রীতিতে রচিত। এই রীতির বিশেষত্ব হইতেছে—(১) মৌখিক ভাষার অনুযায়ী ছোট ছোট বাক্যপরম্পরা, (২) তদ্ভব শব্দের সহিত তৎসম শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ, (৩) বর্ণনা লঘু ও গতিশীল, (৪) লেখক ও পাঠকের মধ্যে বিশ্রব্ধভাব। এই সকলগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বিশেষত্ব হইলেও হরপ্রসাদের লেখায় ইহা পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বিষয় বস্তু অপরিচিত বা কঠিন হইলেও পাঠকের মন কোথাও বাধে না। ইহার উদাহরণ দিতেছি।

এবার ছবি। ছবি আঁকা সেকালে একটা বাতিক ছিল। সবাই ছবি আঁকিত। ছোট লোকে অন্ততঃ ঘরের দেওয়ালে দুটা ময়ূরও আঁকিয়া রাখিত। বেণেদের বাড়ীর দুপাশে দুটা টাকার থলি আঁকা থাকিত। আর

তাহার সঙ্গে এক পাশে একটা শাঁখ ও একপাশে একটা পদ্ম আঁকা থাকিত। লোককে বলিয়া দিত, এ বেণের এক শঙ্খ ও এক পদ্ম টাকা আছে। যে দুখানি ছবি রাজাকে দেখান হইল, তাহার একখানিতে নারায়ণ অনন্ত শয়নে শুইয়া আছেন। আর একখানিতে দুই শাল গাছের মধ্যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন। দুইটাই শোয়া-মূর্ত্তি। দুইটাই ডানপাশে শুইয়া আছেন, ডান হাতটা গালে। বাঁ হাতটা আজানুলম্বিত, উরুদেশের উপর অলসভাবে পড়িয়া আছে। রাজা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুইজন শিল্পীকেই সমান পুরস্কার দিলেন। দুই জনের ডাক হইল, একজনই দুইবার আসিল ও দুইটী পুরস্কার লইয়া গেল। রাজা আরও আশ্চর্য্য হইলেন। [বেণের মেয়ে, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ]।

হরপ্রসাদ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনারীতির গুণে সব প্রবন্ধগুলিই সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। অনেক সময় মনে হয় যেন প্রবন্ধ পড়িতেছি না, মুখের কথা বা বক্তৃতা শুনিতেছি। তবে ছোট ছোট বাক্য ও লঘু বর্ণনাভঙ্গীর দরুণ অনেক সময় হরপ্রসাদের প্রবন্ধ জমাট বাঁধিতে পায় নাই, খাপছাড়া খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়।

প্রবন্ধের মধ্যে সরসতা অথচ জমাটভাব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখায় যতটা পাওয়া যায় এমন আর কাহারও রচনায় নহে। ইনি ১৮৯০ সালের দিক হইতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, পরে দার্শনিক, তত্ত্বকথা, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি অনেক বিষয়েই প্রবন্ধ লেখেন। ইহাঁর রচনা, প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও ওজস্বী। ইহা ছাড়াও এমন একটা গুণ আছে তাহা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। ইহা বোধ হয় বাগ্‌ভঙ্গীর আকস্মিকতা (unexpectedness)। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় রবীন্দ্রনাথের লেখার ধরণের ঈষৎ প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও রামেন্দ্রসুন্দরের লেখায় বিষয়-বস্তু বা ভাব কখনও ভাষার দ্বারা উচ্ছ্বসিত বা উল্লম্ফিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার বলিয়া রামেন্দ্রসুন্দর চিরকাল শ্রদ্ধার্হ হইয়া থাকিবেন, ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এতদূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমায়ুঃ একেবারেই পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ধর্ম্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটী একেবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়া দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। [রচনা সংগ্রহ]।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত। [নানা কথা]।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা ভগিনীদের প্রায় সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথও বেশ প্রাঞ্জল বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো বিভিন্ন ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর সাহিত্যিক হিসাবে নাম নাই। তথাপি ইনি কিরূপ সরল বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে বোধগম্য হইবে।

একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে,—এখনকার দিনে নিতান্ত দুর্ব্বল লোকও যে পথে অনায়াসে চলিতে পারে তখনকার কালের বিশেষ শক্তিমান লোকের পক্ষেও তাহা দুর্গম ছিল। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখা চাই একবার পথ বাহির হইলে সে পথে চলা তেমন কঠিন নহে কিন্তু পথ দেখানই শক্ত। [পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী ১৩১৮]।

ইঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। শুধু প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক বলিয়াই যে ইনি সবটুকু প্রশংসার যোগ্য তাহা নহে। ইঁহার রচনাভঙ্গী সত্যসত্যই উৎকৃষ্ট। আজকালকার মহিলা ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিকদের লেখা পড়িলে কিছুতেই বোধ হইবে না যে কোন স্ত্রীলোকের লেখা পড়িতেছি। স্বর্ণকুমারীর লেখা তদ্রূপ নহে। ইঁহার রচনার মধ্যে স্ত্রীহস্তের ছাপ সুস্পষ্ট। ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ' ১৮৭৫ সালের দিকে রচিত হয়, কিন্তু প্রকাশিত হয় প্রায় বিশ বৎসর পরে। তাহার পর ইনি অনেক গল্প উপন্যাসাদি লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার

শেষের দিকের রচনা হইতে নমুনা স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

তুমি এই রকম ভাবে কথা কচ্ছ, যেন বয়সে তোমাদের দু'জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সত্যিত আর তা নয়— তোমার আর এমন কি বয়স, বাবা। তোমাদের বিয়েটা কিছুতেই অশোভন হবে না। তোমার এই অস্বীকারে স্ত্রীজাতির প্রতি মর্য্যাদা কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না. তুমি যে নিজেকে কি রকম খাট ক'রে দেখছ, তাই শুধু বোঝা যাচ্ছে। তোমার মত স্বামিলাভ কি সৌভাগ্যের বিষয় নয়. তাঁরা ত সকলেই তোমার জন্য হা-প্রত্যাশ ক'রে আছেন। [মিলন-রাত্রি, অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ]।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ঔপন্যাসিক হিসাবে দুইজন লেখকের রচনার উল্লেখ করিতে হয়। একজন শিবনাথ শাস্ত্রী, অপর ব্যক্তি শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। স্বল্প কথায় সরল ভাষায় ছবি ফুটাইয়া তুলিতে শিবনাথ দক্ষ ছিলেন। সবল ও প্রাঞ্জল গদ্যরচনা হিসাবে ইঁহার 'আত্মচরিত'ও উল্লেখ-যোগ্য রচনা। ইঁহার অনাড়ম্বর, স্বচ্ছ, হৃদয়গ্রাহী ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠা রাধারাণী তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। 'রাধে! রাজনন্দিনি! গরবিনি! শ্যামসোহাগিনি!' বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারাণী অচিরোদ্গত-দন্তাবলীশোভিত মুখচন্দ্রে একটু হাসিয়া, ঝাঁপাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাহাকে বুকে চাপিয়া বলিতেন—'রাখালের সনে প্রেম করিসনে রাই।' অমনি চক্ষে জলধারা বহিত। [যুগান্তর]।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখার একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। ইঁহার ভাষা সাধুভাষা অপেক্ষা মৌখিক ভাষার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। মৌখিক ক্রিয়াপদ ও তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দ ও সমাস প্রয়োগ করা হইয়াছে তথাপি ভাষা দুর্ব্বল বা হালকা হইয়া পড়ে নাই। বরঞ্চ ওজঃগুণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। স্বামীজীর দৃপ্ত ভাব ও অদম্য কর্ম্মক্ষমতা যেন তাঁহার ভাষার মধ্য হইতেও ফুটিয়া পড়িতেছে। ইঁহার লেখার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা-বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্ত-শস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। [পরিব্রাজক]।

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; [ইত্যাদি]।

'বঙ্গবাসী' পত্রের সহিত বাঙ্গালা ভাষার দুইজন বড় লেখক সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একজন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইঁহার লেখার পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। অপর লেখকের নাম বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকেরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন বলিয়া বোধ হয় না, তবুও ইঁহার দান বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব। এখনও আমরা ইঁহার রচনার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু কালে যে ইনি যথাযোগ্য সম্মান পাইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

ইঁহার সব চেয়ে বড় পরিচয় ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুত (grotesque) রসের স্রষ্টা। ইঁহার লেখনীতে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ, সরস, নিষ্কণ্টক ব্যঙ্গ রূপক (allegory) একত্র হইয়া রচনার মধ্যে অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র রস (humour) স্থূল চরিত্রের বাস্তব বর্ণনায়, ইন্দ্রনাথের সরসতা (humour) স্থূল কশাঘাতযুক্ত, রুচিও সর্ব্বত্র অনিন্দনীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের সরসতা (humour) যাহা 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' ও 'লোক-রহস্য'-এ পাওয়া যায় তাহা পাণ্ডিত্য-পূর্ণ (academical)। ত্রৈলোক্যনাথের সরসতা (humour) অনবদ্য। ইহাতে বিদ্রূপ থাকিলেও কশাঘাত নাই, রুচি অনিন্দনীয়, রূপকের সহিত বাস্তবের মিলনে অপূর্ব্ব। ভাষাও তেমনি ভাবের উপযোগী। মৌখিক ভাষায় সরস গল্প বলার ভঙ্গী সাধুভাষায় অপূর্ব্ব ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্য-রীতি (idiom) ভাষায় রসসঞ্চার ও চরিত্রে বাস্তবতা আনয়ন করিয়াছে। বিশুদ্ধ ভাবে সাহিত্যের দিক দিয়া সরস চরিত্র (type) সৃষ্টি ইনিই প্রথম করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। এই হিসাবে ও সকল প্রকার সামাজিক ও নৈতিক ভণ্ডামীকে সরস ব্যঙ্গে ও বিশুদ্ধ কৌতুকে কটাক্ষ করার হিসাবে বর্ত্তমান সময়ের 'পরশুরাম' ত্রৈলোক্যনাথের শিষ্য, একথা বোধ হয় বলা চলে।

ত্রৈলোক্যনাথের সরস রচনার কতিপয় উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি। ইঁহার লেখা সাধারণের খুব পরিচিত নহে বলিয়া বেশী করিয়া দিলাম।

ধর্ম্মদত্ত গিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কোনও কথা না বলিয়া বাবাজী ধর্ম্মদণ্ডকে চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন—"ধর্ম্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্ব্বোধ হইতেছিস্। শাস্ত্রে আছে 'চাচা আপনা বাঁচা।' তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? পরের জন্য প্রাণ সমর্পণ! পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ। এ সকলই কলির মাহাত্ম্য। [বীরবালা, দ্বিতীয় অধ্যায়]।

বাঁশের নলটী তাঁহার বড়ই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিষটী ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সে হিজি-বিজি গুলির বড়ই গৌরব করিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর—চীন ভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,—"চীনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং সহরের মোপিং নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটা প্রস্তুত হইয়াছে। নল নির্ম্মাণ কার্য্যে মোপিং অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাহার সুখ্যাতি। মূল্য চারি আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকরদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" যাহা হউক, আমীর যে নলটী কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্ব্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া, চীনের উত্তর সীমায় লিংটিং সহরে আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ সিকিটী ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি ধর্ম্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটা আমীরের মনোমত হইয়াছিল। [লুল্লু, প্রথম অধ্যায়]।

নয়ন বলিলেন—"আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত এখন আর হাবড়হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটি দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই চারিটী মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটী দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন। ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন।"

সকলেই বলিলেন—"ঠিক্! ঠিক! ঠিক্ কথা। হাবড় তাবড় তেত্রিশ কোটির চাল কলা যোগায় কে হে বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাক, থাক! বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টী তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু-একটী বা[illegible] লও, লইয়া বাকি স[illegible] না-মঞ্জুর করিয়া দাও।"

নয়ন বলিলেন—"আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটী দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কাটি-গঙ্গা, আর এক রইলেন ক[illegible] মনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।" [নয়নচাঁদের ব্যবসা, দ্বিতীয় পর্ব্ব]।

উপস্থিত সভাদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহ[illegible] ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া হইল ভাই? তুমি আ[illegible] পয়সার চিনির জলে গোলা ফেলিয়া, সেই গোলাটী চুষিয়া চাট করিতে। [illegible] ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্লা কি করিয়া হইল ভাই?"

নয়ন বলিলেন,—"হাঁ! এখন পথে এস। পূজা মানো তো সব ক[illegible] খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয়ন এই চুপ!"

এই কথা বলিয়া নয়ন "কপাৎ" করিয়া মুখ বুজিলেন। [ঐ]।

ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুতরসের রচনার একটু উদাহরণ দিতেছি।

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কবজখানি বাম হাতের ভিতর করিলেন, আর মন[illegible] করিলেন,—"আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব।" মনে করিতে না করিতে বীরবালা শূন্যপথে দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিলেন। নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়া সেই প্রাচীর রহিয়াছে। বীরবালা ভাবিলেন যে, তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার ওদিকে আর পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ও ধারে কি আছে? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্ব্বনাশ! প্রাচীরের ওধারে, পৃথিবীর ওপারে কোটি কোটি খর্ব্বকায় ভূ[illegible] প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে; ইচ্ছা—প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে। [বীরবালা। চতুর্থ অধ্যায়]।

করুণরসের রচনায়ও ত্রৈলোক্যনাথের দক্ষতা কম ছিল না। তাঁহার "ময়না কোথায়" নামক উপন্যাসের এখন বিশেষ প্রচার নাই বটে, এককালে ইহার খুব আদর ছিল। করুণরস-প্রধান রচনা হিসাবে বইখানি চমৎকার। হাস্যরস সমন্বিত লঘু করুণরসের রচনা হিসাবে "বাঙ্গাল নিধিরা[illegible]" গল্পটিও উল্লেখযোগ্য। এই গল্পটি ভিক্টর হিউগো[illegible] (Victor Hugo) "টয়লর্স্ অব্ দি সী" (Toilers of the Sea) উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত হইলে[illegible] ত্রৈলোক্যনাথ ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একজন লেখক মধুসূদনে[illegible] মত নামধাতু চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার [illegible]

দেবেন্দ্রনাথ দাস—ডি-এন্ দাস নামেই ইনি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলেজপাঠ্য ইংরেজি সাহিত্যের টীকাকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজের জীবনবৃত্তান্ত 'পাগলের কথা' নামক গ্রন্থে উপন্যাসচ্ছলে লিখিয়া গিয়াছেন পুস্তকখানি রচিত হইবার প্রায় ২৫ বৎসর পরে ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তখন জীবিত ছিলেন না। বইটীর ভাষা সাধারণের নিকট অদ্ভুত ঠেকে বলিয়াই বোধ হয় পাঠকসমাজে আদৃত হয় নাই। নামধাতুর প্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা (experiment) করিয়াছিলেন ইহার জন্য দেবেন্দ্রনাথ আমাদের ধন্যবাদার্হ। পুস্তকটীর ভাষা যদি কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইত, অর্থাৎ মৌখিক ও লৌকিক ক্রিয়াপদের যদৃচ্ছা-প্রয়োগ না থাকিত, তাহা হইলে ইহা পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত সন্দেহ নাই। "পাগলের কথা" হইতে নমুনা স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

> প্রকৃতির এই কমনীয় কান্তি আলোচিতে আলোচিতে আমরা গ্রামের ভিতর পৌছিলাম। দূর থেকে অতি অল্প বাড়ী দেখিতে পাইতেছিলাম, ভাবিলাম, এ কি জনশূন্য স্থানে আসিয়া পড়িলাম, কিন্তু গ্রামে প্রবেশিয়া আমার সে ভ্রম দূর হল। [নবম অধ্যায়]।

রবীন্দ্রপূর্ব্ব সাহিত্যে বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসের মোটামুটি একটা কাঠামো দেওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব। বঙ্কিমী পদ্ধতির শেষ ঔপন্যাসিক হিসাবে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম করা কর্ত্তব্য। ইনি আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র ইঁহারই লেখায় বঙ্কিমী রীতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সোনার পাখী

—শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

বল কে তোমায় সায়ক বিঁধালো আজি,
হে পাখী, সোনার পাখী!
ছিন্ন আলোর পাখার পালকরাজি
আকাশ ফেলেছে ঢাকি'।
তব বিক্ষত বুকের রক্ত-ধারে
রাঙা হ'ল মোর বন-ফুল ভারে ভারে,
তরু-বীথিকার প্রীতি আজ বারে বারে
তোমারে জানায় ডাকি'।
আমার মনের বেদনা জানাই কাবে?
হে পাখী, সোনার পাখী!

মরণ তোমার শয়ন-স্বপন সম
আসিছে নয়ন ঘিরে।
সমাধির বেদী রচিতে হবে কি মম
সুদূর সন্ধ্যা-তীরে?
নদী-জলে তব সোনালী তনুর ছায়া
ছড়ালো দু'চোখে একি অপরূপ মায়া,
দক্ষিণ বায়ে তোমার ক্লান্ত কায়া
কাঁপিছে শৈল-শিরে।
বনের কুসুমে আর্দ্র রক্ত-ছায়া
এখনো র'য়েছে ঘিরে!

কেবা সে তোমায় সায়ক বিঁধালো বুকে,
হে পাখী, সোনার পাখী!
ছিন্ন ডানার আঘাতে করুণ দুখে
কাঁদিছে তোমার আঁখি।
সন্ধ্যার তীরে যে তারাটি জ্বল জ্বল,
সেথায় এবার যাত্রা ক'রেছ বলো?
আমার যে-গান অশ্রুতে ছলছল
সে-গানে তোমারে ডাকি।
স্তব্ধ হ'ল কি আঁখি দু'টি ঢলঢল
হে পাখী, সোনার পাখী!

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এঞ্জিন্‌বিহীন এরোপ্লেন

আমাদের দেশের অনেকেই হয় তো এ খবর রাখেন না যে ইউরোপে বিশেষতঃ জার্ম্মানিতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এঞ্জিন্‌বিহীন এরোপ্লেনের যথেষ্ট ব্যবহার চলিতেছে এবং এ সম্বন্ধে নূতন নূতন পরীক্ষার অন্ত নাই। এঞ্জিন্‌বিহীন এরোপ্লেনকে গ্লাইডার, glider বলে। জার্ম্মানির অধিকাংশ স্কুলে বারো তেরো বছরের বালকদিগকে গ্লাইডার নির্ম্মাণ ও চালনা-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার মূল্যও এরোপ্লেনের অনুপাতে অবশ্য অনেক কম, তৈয়ারী করিয়া লওয়াও খুব কঠিন নয়। ১৯২৮ সালে সাড়ে তিন হাজার স্কুলের ছাত্র জার্ম্মানির বিভিন্ন স্কুল সমূহে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

এ ধরণের এরোপ্লেনে এঞ্জিন নাই, একথা সত্য, তৎসত্বেও ইহা আকাশে ওড়ে, এ কথাও ঠিক। তা ছাড়া শুধু বাতাসের গতি ও বায়ুস্রোতের অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া গ্লাইডার-চালক ছাত্র বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারে। চালানোও খুব কঠিন নয়, অনেক সময় একদিন মাত্র শিখিয়াই ছাত্রেরা আকাশে উড়িতে সমর্থ হয়।

গ্লাইডার-চালনায় বিপদ নাই একথা বলা যায় না। এরোপ্লেন্‌ চালনা অপেক্ষা ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর একাগ্রতা, ক্ষিপ্রতা ও সুবিবেচনার প্রয়োজন হয়। জার্ম্মানিতে চৌদ্দ বছরের অপেক্ষা কম বয়সের কোনো ছেলেকে গ্লাইডার-চালনা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না, কারণ অল্প বয়সের ছেলেদের কাছে অতটা বুদ্ধি বিবেচনা ও সাহস

প্রথম শিক্ষার্থীর গ্লাইডার-পরিচালনে দীক্ষা।

আশা করা যায় না। তবে প্রথম অবস্থায় গ্লাইডার চালানো খুব বিপজ্জনক নয়, একটু আধটু শিখিলে দশ বারো ফুটের বেশী গ্লাইডারকে ওঠানো যায় না, অতটুকু উপর হইতে পড়িয়া গেলে খুব বেশী আঘাত লাগিবার কথা নয়। কিন্তু

শিক্ষার্থীরা গ্লাইডারকে উচ্চ স্থানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে: অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান হইতে গ্লাইডারের প্রথম চালনা নিরাপদ।

বছর খানেক শিখিবার পরে চালক যন্ত্রকে চার পাঁচশত ফুট উঠাইতে পারে ও ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সমর্থ হয়—একাদিক্রমে আট দশ ঘণ্টা কিংবা তার বেশীও আকাশে থাকিতে পারে।
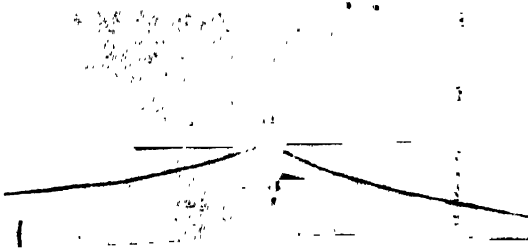
গ্লাইডার আকাশে উড়িয়াছে : দুই পাশে দড়ি যাহারা টানিয়া ধরিয়াছিল, তাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে।

গ্লাইডার-পরিচালনার ব্যাপারটি যে শুধু স্কুলের ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে তা নয়—জার্ম্মানিতে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আজকাল এ বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল দেখাইতেছে। গ্লাইডার নির্ম্মাণের নূতন নূতন কৌশল বাহির করিবার জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরীক্ষাগারে বহুসংখ্যক ছাত্র কার্য্য করিতেছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সমিতি স্থাপন করিয়াছে, সেখানে নানা ধারণের গ্লাইডারের নক্সা প্রদর্শিত হয়, ইহার কলকব্জাসংক্রান্ত খুঁটিনাটি টেক্‌নিক্যাল্ ব্যাপারের আলোচনা হয়।

মোটর-এঞ্জিন্‌বিহীন এরোপ্লেনের কথা আজকাল অনেকের কাছে আজগুবি ঠেকিলেও এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে এরোপ্লেনের আবিষ্কারক রাইট্ ভ্রাতাদ্বয় ও লিলিয়েনথেল্ যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে আকাশে উড়িয়াছিলেন তাহাতে কোনো এঞ্জিন্ ছিল না, এই গ্লাইডার শ্রেণীর এরোপ্লেনেই অর্‌ভিল্ রাইট্ প্রথম সাড়ে ছ' মাইল উড়িয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়া দেন। গ্লাইডারে এঞ্জিন্ বসানোর কথা অনেক পরে রাইট্ ভ্রাতাদ্বয়ের মাথায় আসে। কালে মোটরযুক্ত এরোপ্লেন এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল যে গ্লাইডারের কথা লোকে ভুলিয়াই গেল। কিন্তু দু'দশ জন লোকে পৃথিবীর এখানে ওখানে গ্লাইডার-চালনার রীতিটা কোনো প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়া চলিল—বিস্মৃতির গর্ভে তলাইতে দিল না। বিশ বৎসর ধরিয়া বহু তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহিয়াও তাই ইহা আজও বাঁচিয়া আছে এবং বর্ত্তমান কালে জগতের তৈলনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে ইউরোপের দৃষ্টি আবার এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপের মধ্যে জার্ম্মানি এ বিষয়ে অগ্রণী এবং গত দু' তিন বৎসরে জার্ম্মানি গ্লাইডার নির্ম্মাণের নবযুগ আনয়ন করিয়াছে বলা চলে। পাখীরা বায়ুসমুদ্রের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা জানে মানুষে যদি তাহা এতদিন শিক্ষা করিত, তবে মানুষকে পেট্রোল পুড়াইয়া মোটরযুক্ত এরোপ্লেনের ব্যবহার করিতে হইত না, মানুষে সত্য সত্যই উড়িতে পারিত। যে নদীতে নৌকায় যাইতেছে সে যেমন সাঁতার দিয়া যাইতেছে একথা বলা যায় না, তেমনি এরোপ্লেনে যে যায়, সে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে একথাও বলা চলে না। কিন্তু গ্লাইডারে মানুষে চলে বায়ুসমুদ্রে সত্যকার পাড়ি দিয়া, যন্ত্রের ডানা ও পাইলের সাহায্যে অনুকূল বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া। মাথার উপরের বিশাল বায়ুসমুদ্রের প্রকৃতি জানিবার জন্য মানুষে এখন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে বুঝিয়াছে আকাশে উড়িবার নতুন যুগ সম্মুখে আসিতেছে, যখন পেট্রোল দরকার হইবে না, দামী এঞ্জিন্-

টানা দড়ি ছাড়িতে ভুল হইলে গ্লাইডারের পক্ষে বিপদ।

বসানো যন্ত্রের দরকার হইবে না, ঘরে তৈরী পাৎলা কাঠের বা কেম্বিসের ডানালাগানো গ্লাইডারের সাহায্যে যে কেহ অতি সহজে ষাট সত্তর হইতে একশত দেড়শত মাইল উড়িতে সমর্থ হইবে।

বায়ুস্রোতের নানাবিধ গতি আছে—এ গতি কখনও ঊর্দ্ধমুখী, কখনও ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল, কখনও কোণাকুণি। গ্লাইডার-চালককে বায়ুস্রোতের প্রকৃতির সহিত পরিচিত
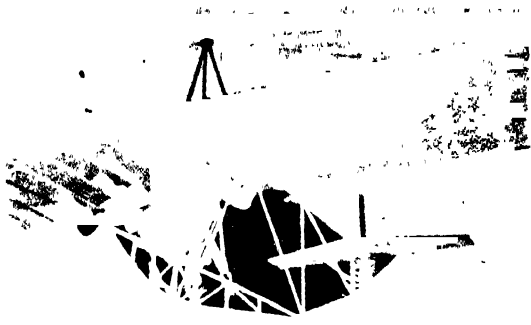
উড্ডীয়মান গ্লাইডারের নিরাপদ শিক্ষার্থী।

হইতে হয়—হইতে পারিলে যেমন সুবিধা যথেষ্ট, না জানিলে বিপদও বহু। বায়ুস্রোতের গতি ঠিকমত বুঝিতে পারার উপরই এই যন্ত্রপরিচালনের কৃতিত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে, বায়ুস্রোত বুঝিয়া যন্ত্র ছাড়িয়া দিলেই হইল যন্ত্র তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট দিকে আপনিই উড়িয়া চলিবে, চালকের কাজ তখন দড়াদড়ি টানিয়া ডানা ও পাইল ঠিক রাখা। উর্দ্ধমুখী বায়ুস্রোতে যন্ত্র আপনা-আপনি হু হু করিয়া উপরে উঠিয়া যায়, অনেক সময় দু' মাইল তিন মাইল উপরেও ওঠে, অভিজ্ঞ চালক অভ্যাস ও পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা দ্বারা বুঝিতে পারে কতদূর গিয়া স্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এইবার ভূমির সমান্তরাল কোনো স্রোত কাছাকাছি মিলিবে কিনা ইত্যাদি।

জার্ম্মান বিমানবীর ব্যারণ ক্রন্‌ফিল্ড এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছেন। তিনি একদিন বেলুনে উড়িতেছিলেন, তাঁহার বেলুনের অনেক নীচে একদল সারসপাখীও উড়িতেছিল। হঠাৎ তিনি দেখিলেন সারসের দল ডানা স্থির রাখিয়া হু-হু করিয়া খাড়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে, ডানা এতটুকু নাড়াইতেছে না, দেখিতে দেখিতে তাহারা বেলুন ছাড়াইয়াও উপরে উঠিয়া গেল। ক্রন্‌ফিল্ডের বেলুন ভূমির সহিত সমান্তরাল অবস্থায় চলিতেছিল। যে স্থান হইতে সারসের দল উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইস্থানের উপরে কিন্তু সেই একই সরল রেখায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটিও হঠাৎ ঠেলিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সারসদলের ডানা না নাড়িয়া উপরে উঠিবার ব্যাপারে ক্রন্‌ফিল্ড খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন—এখন নিজের বেলুনকে উঠিতে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন ঐস্থানে একটি ঊর্দ্ধমুখী প্রবল বায়ুস্রোত প্রবহমান—তাহারই সুযোগ লইয়া সারসদল ডানা স্থির রাখিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং সেই স্রোতের মুখে তাঁহার বেলুনও এখন উপরে উঠিতেছে। এই বায়ুস্রোতই মোটরবিহীন এরোপ্লেনের এঞ্জিনের কার্য্য করে—তবে যে বুঝিতে পারে তাহারই হাতে এ অস্ত্র ভাল খেলে, অন্যথায় বিপদ তো আছেই, মৃত্যুও বিচিত্র নয়।

এ সকল বিষয়ে পরীক্ষা ও আলোচনার জন্য বর্ত্তমানে জার্ম্মানিতে প্রায় দুইশত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ১৯২৮ সালে মধ্য জার্ম্মানিতে মোটরবিহীন এরোপ্লেনে উড়ন-প্রতিযোগিতায় ১০৫টি যন্ত্র যোগদান করিয়াছিল।
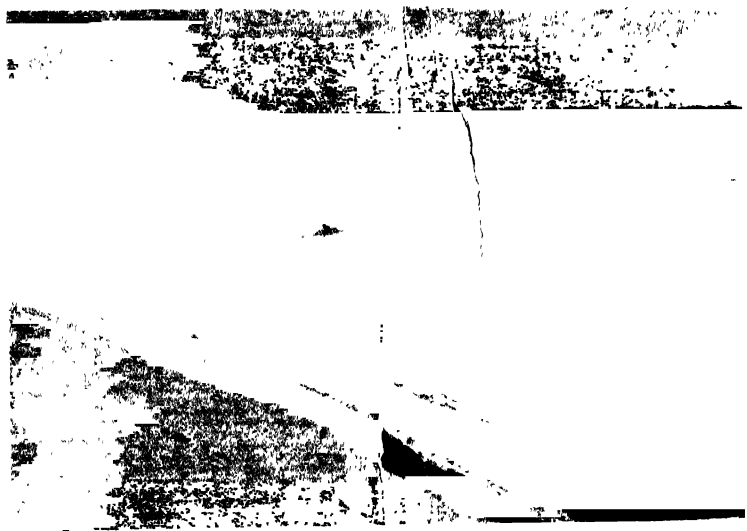
নামিবার পথে গ্লাইডারের বিপদ : সমুদ্র বক্ষে শাদা পাখীর পালকের মত গ্লাইডারকে দেখা যাইতেছে।

পরবর্ত্তী এই কয় বৎসরের মধ্যে সমিতির সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে, বিভিন্ন সমিতিসংলগ্ন কয়েকটি বড় বড় পরীক্ষাগার

স্থাপিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এ গ্লাইডারের পিছনে ডানা নাই : লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সম্মুখের ডানাও অনেকটা সাদামাটা সম্প্রতি এই গ্লাইডার লইয়া উড়িবার চেষ্টা চলিতেছে।

বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধমুখী বায়ুস্রোতের ব্যবহার ক্রনফিল্ডই প্রথমে করেন এবং গ্লাইডার পরিচালনায় যে ইহা কত মূল্যবান, তিনিই একথা সকলকে শিখাইয়া দেন। তিনিই আবিষ্কার করেন যে কোনো পর্ব্বতশ্রেণীর উভয়-পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে এই স্রোত তির্য্যগ্‌-গতিতে অবস্থান করে এবং ইহার বেগও সে সব স্থানে অত্যন্ত প্রবল। ভূমির সহিত সমান্তরালগতি বায়ু স্রোত হঠাৎ পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়া এইরূপ ঊর্দ্ধমুখী স্রোতের সৃষ্টি করে। অনেক সময় সমুদ্রের ধারের বালিয়াড়ির নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলেও ঠিক এই কারণেই ঊর্দ্ধমুখী স্রোতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনভিজ্ঞ বিমান-চালকের পক্ষে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বায়ুস্রোতের ব্যবহার সব সময় নিরাপদ নয়, বায়ুস্রোতে সমুদ্রের মধ্যে বেশী দূর গিয়া পড়িলেই মুস্কিল। এ সম্বন্ধে জনৈক তরুণ জার্ম্মান বিমানচালকের অভিজ্ঞতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সেদিন যখন উড়ি, তখন আকাশের অবস্থা বেজায় খারাপ। মেঘে আকাশ একেবারে ঢাকা। পাশেই সমুদ্র, সমুদ্রের জলে অনেকদূর পর্য্যন্ত মেঘের ঘন ছায়া। ওড়বার একটু পরেই ঊর্দ্ধগতি স্রোতের সাহায্যে আমার যন্ত্র হু হু করে' ওপরে উঠতে লাগল, মেঘের নিম্নতম স্তরে পৌছুতে সময় নিলে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মেঘে আমায় চারিদিক থেকে ঘিরে ফেল্‌লে।
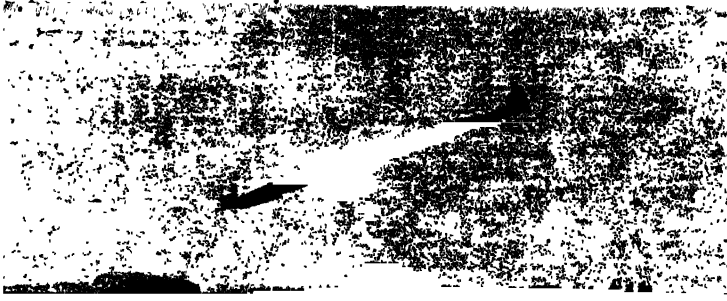
"কিছুই আর দেখতে পাইনে, কোনদিকে চালাবো? তখনও বায়ুর গতি ওপরের দিকেই। ভেবে দেখ্‌লাম মেঘের ভিতর দিয়ে যখন রোদ দেখা যাচ্চে তখন মেঘের স্তর খুব পুরু নয়। আর খানিকটা ওপরে উঠলেই নীল আকাশ পাবো।

"আমার অনুমানই ঠিক হোল। মেঘ কেটে গেল, ক্রমে মেঘের হাজার ফুট ওপর দিয়ে আমার যন্ত্র উড়লো—পৃথিবী

টানা-দড়ি হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বে নীচের ভূমি একেবারে সমতল।

তখন আমার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়েছে, আমার মাথার উপরে রৌদ্রালোকিত নীল আকাশ, নীচে সেই ঘন মেঘের পর্দা। আমার আরও ওপরে, প্রায় মাইল খানেক

ওপরে আর একটা ঘন মেঘের স্তর, সেটা ভেদ ক'রেও এখান দিয়ে ওখান দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে আমার যন্ত্রের ওপর পড়ছিল। মিটারে দেখি প্রায় ১১০০ ফুট উঠেছি।
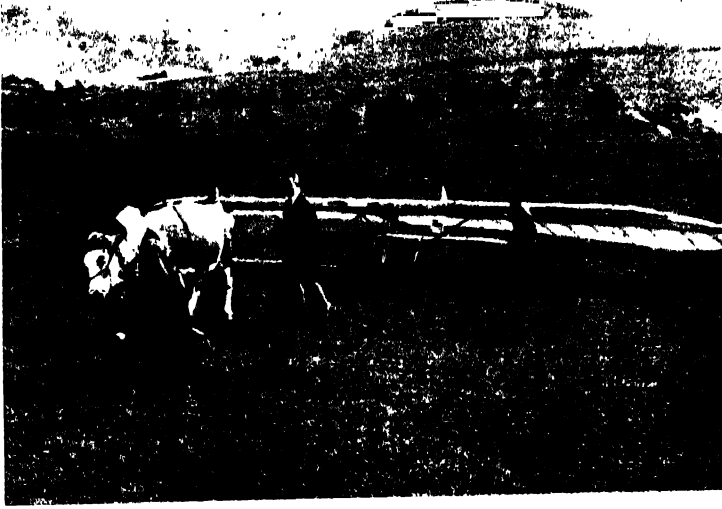
গো-চালিত ব্যোমযান নয়, গরু দ্বারা গ্লাইডারকে টানা হইতেছে মাত্র।

"হঠাৎ মেঘ সরে গেল। নীচে চেয়ে দেখি আমি সমুদ্রের ওপর উড়ছি। যন্ত্রটা চালিয়ে তীরের ওপর নিয়ে গেলাম। সেখানে কাদের একখানা ছোট কাঠের ঘর। একটি ছোট ছেলেকে তার মা খুব প্রহার দিচ্ছে। আমি 'হেলো!' বলে চীৎকার করে উঠলাম। মা চমকে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে, ছোট ছেলেটা এই অবসরে টেনে দিলে দৌড়। মা ধপ্ করে বালির ওপর বসে পড়ল—আমি তাদের ৭০ ফুট মাত্র ওপর দিয়ে উড়ে চল্লাম।

একটু পরেই দেখি একটা প্রস্তরময় অন্তরীপ—সেটা ঘুরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হোল, কারণ তখন আমার যন্ত্রটা মাটী থেকে মোটে ত্রিশ চল্লিশ ফুট ওপরে কিন্তু অন্তরীপের কাছাকাছি গিয়ে আমার যন্ত্র আরও নামতে লাগল। জলের দিকে সরে গেলাম, বাঁ দিকে আমার যন্ত্রের ডানা ঘেঁসে খাড়া পাহাড় ঠেলে উঠেছে, আমার নীচে সমুদ্র, তখন আমি জলের বারো ফুট মাত্র ওপরে, ঢেউ ছিটকে জল গায়ে লাগছে।

কোনো রকমে চোখ বুঁজে অন্তরীপ পার হয়ে গেলাম। বিপদ কেটে গেল, নীচে বালুময় সমতল সৈকতভূমি, অনেক লোকে সমুদ্রে স্নান কচ্ছে, ছেলেমেয়েরা খেলা কচ্ছে, সমুদ্র-তীরে চেয়ার পাতা, একটু দূরে গোটাকতক হোটেল।

আমি ধীরে ধীরে নামলাম। চারি ধার থেকে লোকজন ছুটে এল, আমার ওপরে চারিদিক থেকে নানা প্রশ্নবাণ বর্ষিত হ'তে লাগল। কেউ জিগ্যেস কর্ত্তে লাগল আমি আমেরিকা থেকে আসছি কিনা, কেউ বল্লে আমার এরোপ্লেনের এঞ্জিন কৈ? কাষ্টমস্‌এর একজন কর্ম্মচারী এসে আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইলে। তারপর যখন আসল ব্যাপারটা সবাই শুনলে, তখন তারা আমায় নিয়ে খুব হৈ চৈ সুরু করে দিলে, এ নাচের নিমন্ত্রণ করে, ও ডিনারের নিমন্ত্রণ করে। আমি কিন্তু মনে মনে

মোটর বিহীন বাইপ্লেন? ডাচ বৈমানিক কোকারের আবিষ্কার।

ভাবছিলাম আমার বিপদপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা। আর একটু হোলেই সমুদ্রে ডুবে যেতে বসেছিলাম।"

আফঘান-মুঘল-সংঘর্ষ

—শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু

[১]

আফঘানিস্থান, বেলুচিস্থান ও পারস্য এই দেশ তিনটি ইরাণ মালভূমির অন্তর্গত। মধ্যভাগ সুগভীর এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ব পর্ব্বতময় হওয়ায় এই উপত্যকার সাধারণ আকার একটি বাটির ন্যায়, চতুর্দ্দিকে বিশালকায় শৈলশ্রেণী পরিবেষ্টিত এই উপত্যকার মধ্যভাগ সমুদ্রতীর হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ। অত্যুন্নত পামির গিরিশ্রেণীর কয়েকটি শাখা ইরাণের এই উপত্যকায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই কয়টি পর্ব্বতশাখা হিন্দুকুশ, শ্বেতপর্ব্বত এবং এলবুর্জ নামেই সাধারণের নিকট পরিচিত। ইরাণ উপত্যকার অধিকাংশ মরুভূমি; পথঘাটও সুবিধার নহে। ভারত ও আফঘানিস্থানের মধ্যবর্ত্তী হিন্দুকুশ শৈলমালা উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র পথ খাইবার গিরি-সঙ্কট। ইরাণ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদান এই পথেই চিরকাল হইয়া আসিতেছে। এই প্রদেশে উত্তাপ যেরূপ প্রচণ্ড, শৈত্যও সেইরূপ দারুণ। উত্তরদিকস্থ উপত্যকায় অনেকগুলি নদী; এখানে গম ও নানাবিধ ফলের চাষ হয়। এই দেশের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা পশুচারণ করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইরাণ মালভূমির উত্তরাংশে পাঠান এবং দক্ষিণাংশে বেলুচি জাতির বাস।

[২]

পাঠান ও বেলুচি তুর্কো-ইরাণীয় জাতি হইতে উদ্ভূত। পূর্ব্বে ইহারা অপরিচিত অসভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইত। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তাহারা নিজেদের পুরাতন ভাষা, আচার-ব্যবহার, লুণ্ঠন প্রভৃতি করিবার প্রবৃত্তি ছাড়িতে পারে নাই। আফঘান সমাজ বলিতে কয়েকটি বিভিন্ন দল বুঝাইত। সমতল দেশবাসী অন্যান্য জাতির তুলনায় অধিকতর সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু হইলেও নিজেদের মধ্যে তাহাদের কোন সদ্ভাব ছিল না। এক পরিবারের সহিত অন্য পরিবারের সর্ব্বদাই বিরোধ। চির-বিবদমান এই বিভিন্ন দল কোন সময়ে কোন বৃহৎ বা সুদৃঢ় সাম্রাজ্য কিম্বা কোন স্থায়ী জনপদ বা জাতি গঠন করিতে পারে নাই। কথিত আছে, এক সময়ে জনৈক খ্যাতনামা ইউসুফজায়ী ফকীর নিজের দলের সম্বন্ধে এই উক্তি করেন যে, তাহারা চিরকাল স্বাধীন ভাবে বাস করিলেও, একদলের সহিত অন্যদলের কোনকালে সদ্ভাব থাকিবে না। ইউসুফজায়ী সম্বন্ধে উক্ত ফকীরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সমগ্র আফঘান জাতি সম্বন্ধেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করাই আফঘানদিগের চিরন্তন প্রথা কিন্তু কোন নিয়মের অধীন হইয়া থাকা তাঁহারা মোটেই পছন্দ করিত না। যতদিন তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ততদিন তাহারা গোষ্ঠীপতির অধীন। রাজপুত সর্দ্দার তাঁহার অনুচরদের নিকট হইতে সসম্মান ব্যবহার ও পূজা পাইতেন এবং তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে এমন লোকও তাঁহার অনেক ছিল। কিন্তু আফঘান সর্দ্দার নামেই সর্দ্দার। অনুচরদের নিকট হইতে সম্মান বা পূজা পাইবার কোন আশাই তাঁহার ছিল না। কোন অনুচর বিরূপ হইলেই সর্ব্বনাশ! সর্দ্দারের সমস্ত অধিকার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইত।

সাহস ও কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি থাকা ছাড়া, আফঘানেরা স্বভাবতঃই ধূর্ত্তের শিরোমণি। লুটপাট করাই ইহাদের জন্ম-পরম্পরাগত বৃত্তি। কিন্তু ইহারা পরবেতনভোগী হইয়াই অন্যান্য দেশ লুঠ করিয়া আসিয়াছে। কোন ব্যবস্থিত প্রণালী অনুসারে বা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহারা নিজে যে কোন অভিযানে বাহির হইবে সে সামর্থ্য তাহাদের ছিল না। আফঘান জন-সংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধনশীল, অথচ তাহাদের জমী অনুর্ব্বর। চাষের জমী হইতে উৎপন্ন ফসলে তাহাদের জীবন ধারণ করিবার আশা ছিল না। সুতরাং কৃষিকার্য্য করা অপেক্ষা ব্যবসায়েরই তাহারা অধিক পক্ষপাতী।

[৩]

আফঘানেরা ভারতবর্ষ ও কাবুল প্রদেশের মধ্যে যাতায়াত-কারী বণিকদিগের নিকট মাশুল আদায় করিত। কোন মুঘল সম্রাট তাহাদের এই অধিকার অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সুব্যবস্থা রাখিতে হইলে বা সাধারণের জন্য যাতায়াতের পথ নিরুপদ্রব করিতে হইলে

এই দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতিকে ভয় দেখানর পরিবর্ত্তে উৎকোচ দেওয়াই বিশেষ সুবিধাজনক। অথচ এইরূপ ঘুষ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আফঘানেরা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ করিতে ছাড়িত না। সাধুতার ভাণ করিয়া বা রাজবংশে জন্ম এই অছিলায়,—তাহাদের মধ্য হইতে কোন কোন সর্দ্দার সময়ে সময় বাহির হইয়া নিজের খরচে কিছুদিন সকলকে আহার দিয়া এক নূতন দল গঠন করিত, এবং পরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্যে বা মুঘল প্রদেশের উপর শিকার লোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রবল বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িত। যতদিন লুণ্ঠন-দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা ততদিন এই দল নিরাপদ। কিন্তু অর্থের অভাব হইলে বা ভাগাভাগির সময়ে ভাগ কমবেশী হওয়ার আশঙ্কা হইলে নিজেদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হইত ও দলটিও সেই সঙ্গে ভাঙ্গিয়া যাইত। যাহা হউক, এইরূপ নিয়ত গঠনশীল ভঙ্গপ্রবণ পারিবারিক দলের উপরই কিন্তু আফঘান দেশ ও জাতির সংরক্ষণ-ভার সর্ব্বদা ন্যস্ত থাকিত।

মুঘল সম্রাট ক্ষমতাশালী হইলে প্রজাদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আফঘান দমনে মনোনিবেশ করিতেন। আফঘানদিগের বিরুদ্ধে তখন সৈন্য প্রেরিত হইত: মুঘল সৈন্য আফঘানদিগের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া দিত, ফসল নষ্ট করিয়া দিত ও তাহাদের হত্যা করিত। শীত-ঋতুর সমাগমে মুঘল সৈন্য নিজেদের আড্ডায় ফিরিয়া যাইত, এবং দেশে শান্তি রক্ষার জন্য এক নূতন বন্দোবস্ত করা হইত।

শাণিত মুঘল-তরবারী আফঘান জনসংখ্যার এইরূপে যে অনিষ্ট করিত কয়েক বৎসরের মধ্যেই লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইত। তখন তাহারা আবার লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিত।

[৪]

১৫৮৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে পশ্চিম সীমান্তের রাষ্ট্রীয় গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে আফঘানেরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। আফঘান বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য রাজা বীরবল আট হাজার মুঘল সৈন্য লইয়া সীমান্ত প্রদেশে গমন করিলেন। রাজা বীরবলের সহিত তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারী জানিখাঁর বনিবনাও না হওয়ার দরুণ মুঘল বাহিনী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। সমগ্র বাহিনী সোয়াতের গিরি-সঙ্কটে সমূলে বিনষ্ট হইল। বীরবল নিহত হইলেন। প্রিয় সহচরের এই শোচনীয় মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া শোকার্ত্ত সম্রাট দুইদিন কোন আহার্য্য গ্রহণ বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। পরে, সম্রাটের বেতনভোগী রাজপুতসৈন্যের বীরত্ব ও কার্য্যদক্ষতার গুণে মুঘল বাহিনী আফঘানদিগের উপর রীতিমত প্রতিশোধ লইলেও সম্রাট একরূপ বাধ্য হইয়াই এই পার্ব্বত্য জাতির সহিত সন্ধি করিলেন। প্রত্যেক সর্দ্দারকেই বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইল।

১৬১১ খৃঃ অব্দে, কাবুলের মুঘল শাসনকর্ত্তা খাঁ ই-দৌরানের স্থানান্তরে যাওয়ার অবসরে রৌশনিয়া সর্দ্দার অহ্দাদ কাবুল আক্রমণ করিল; কিন্তু দুই নিম্নতন কর্ম্মচারী মুইইজ্-উল-মূলক এবং নাদ আলীর চেষ্টায় আক্রমণকারীরা সে যাত্রা সফলতা লাভ করিতে পারিল না। চারি বৎসর পরে অহ্দাদ পুনরায় চারিদিকে উৎপাত আরম্ভ করিল এবং এবারও মুঘলদের নিকট পরাজিত হইল। মুঘল সেনাপতি বিপক্ষের পাঁচশত অশ্ব, বহু ভারবাহী পশু এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিল। অহ্দাদের ছয়শত নিহত সৈন্যের খণ্ডিত মস্তক স্তূপাকারে সাজান হইল। অহ্দাদ কিন্তু নিরুৎসাহ হইল না, পুনরায় উপদ্রব আরম্ভ করিল। বঙ্গস্ প্রদেশে আবার নূতন করিয়া এক বিপদ দেখা দিল। কাবুলের নূতন শাসন-কর্ত্তা মহব্বৎ খাঁ তাঁহার দুই সহকারী রসিদ খাঁ ও রাজা কল্যাণকে লইয়া বঙ্গস দেশে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। আফঘান ও মুঘলের মধ্যে যুদ্ধের বিরাম ছিল না; সুবিধা ও সুযোগমত একে অন্যের উপর প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। ইতিমধ্যে সাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় মহব্বৎ সাহজাদার বিরুদ্ধে কাবুল হইতে যাত্রা করিলেন। সুবিধা পাইয়া বঙ্গসের আফঘান অধিবাসীরা এবার নির্ব্বিবাদে লুটপাট চালাইল।

সম্রাট সাহজাহানের শাসন সময়ে আফঘান সর্দ্দারদের বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাহারা মধ্যে মধ্যে মুঘল রাজ্যে হানা দিত। প্রেরিত মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারিলেও তাহারা মাঝে মাঝে উপদ্রব করিতে ছাড়িত না।

[৫]

১৬৬৭ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে ইউসুফজায়ীরা নিজেদের ক্ষমতা এবং রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা পাইল। সোয়াত ও বজওর

উপত্যকা এবং পেশোয়ারের উত্তরদিকস্থ সমতলভূমি ইহাদের আবাস-স্থান। ভাগু এই দলের সর্দ্দার। সে এই দলের এক পুরাতন সর্দ্দার বংশের জনৈক অলীক বংশধরকে সিংহাসনে বসাইয়া প্রচার করিল যে, তাহার এই কার্য্যকলাপ ন্যায়ানুমোদিত ও ন্যায়সঙ্গত। ক্রমে পাঁচ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভাগু সিন্ধু নদ পার হইল এবং পাখ্‌লি আক্রমণ করিল। এই পাখ্‌লি সহরটি কাশ্মীর যাইবার প্রধান রাজপথের উপর অবস্থিত। পাখলি দুর্গ অধিকার করিয়া আক্রমণকারীরা স্থানীয় কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিল; পরে তাহারা মুঘল সেনাবাসেরও উপর চড়াও করিল। অপরাপর ইউসুফজায়ীদল ইতিমধ্যে পেশোয়ারের পশ্চিমে এবং আটক জেলা আক্রমণ করিতে লাগিল।

সুতরাং, নিজের দেশ রক্ষা করিবার জন্য সম্রাট আওরংজীবকে এক বিরাট আয়োজন করিতে হইল। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্ম্মূল করিয়া তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন। সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বের শেষভাগে রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সাহাজাদাদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন জনিত ভ্রাতৃবিরোধে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভ্রাতৃরক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া সিংহাসন আরোহণের অপরাধে জনসমূহ তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জন করিবার জন্য প্রবীণবয়স্ক নবীন সম্রাট আওরংজীব শাসনভার গ্রহণ করিয়াই তাঁহার আদেশ-পত্র চারিদিকে প্রচার করিলেন। উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের ভাবার্থ এই যে, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্যই তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং রাজ্যে সুব্যবস্থা আনাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। এই কারণে প্রথম হইতেই রাজ্যশাসনে সম্রাটের কঠোরতা লক্ষিত হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা নিজের নিজের দেশে সম্রাটের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার চেষ্টা পাইল। তাহাদের আন্তরিক যত্নে ও প্রবল চেষ্টায় আসাম চট্টগ্রাম, পালামৌ প্রভৃতি অঞ্চলে সম্রাটের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল। কি সহর কি পল্লীগ্রাম, কি অরণ্য কি পার্ব্বত্যপ্রদেশ, সকল স্থানের অধিবাসীকেই জানান হইল যে, সম্রাটের শক্তি উপেক্ষা করার শাস্তি অতি কঠোর। এরূপ ক্ষেত্রে সেই অব্যাহতশক্তি বিরুদ্ধাচারী আফঘানদিগকে যথাযথ শিক্ষা না দিলে রাজ্যের মঙ্গল হইবে না।

কাজেই এবার তিনদল মুঘল সৈন্য আফঘানিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। মুঘল সৈন্যের আগমন-সংবাদ তাহারা পূর্ব্বেই পাইয়াছিল। শত্রুপক্ষের চেষ্টায় মুঘলবাহিনী সিন্ধুনদ পার হইতে পারিল না। আটকদেশের মুঘল ফৌজদার কামিল খাঁ এবার বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন (১ এপ্রেল, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে)। ঘোরতর যুদ্ধের পর ইউসুফজায়ী দল রণে ভঙ্গ দিল। প্রায় দুই হাজার ইউসুফজায়ী যুদ্ধে নিহত হইল; এ ছাড়া অনেকে আহত হইল এবং অনেকে নদীর জলে ভাসিয়া গেল। সেনাপতির আজ্ঞায় নিহত আফঘানদিগের স্কন্ধচ্যুত মস্তক পূর্ব্বের ন্যায় এবারও স্তূপাকার করা হইল।

উক্ত ঘটনার পর প্রায় এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। এক বিরাট মুঘল বাহিনী লইয়া সেনানী শমশির খাঁ আফঘানিস্থান হইতে রওনা হইয়া ইউসুফজায়ীদিগের দেশে পৌঁছিলেন। অনেকগুলি খণ্ড যুদ্ধের পর তিনি তাহাদের পরাজিত করিলেন এবং অহিন্দ অঞ্চলে নিজের শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পরে সেখানকার সমস্ত চাষবাস নষ্ট করিয়া, ইউসুফজায়ী সর্দ্দার ভাগুকে আক্রমণ করিবার জন্য সেনানায়ক শমশির আটক হইতে রওনা হইলেন (জুন)। যাত্রাকালে বিপক্ষের আক্রমণে তাহার অনেক সৈন্য হত হইলেও সেনাপতি অগ্রসর হইয়া তাহাদের গ্রাম অধিকার করিলেন, ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দিলেন, সম্পত্তি লুট করিলেন এবং এমন কি চাষবাসের কোন চিহ্নই রাখিলেন না। ইতিমধ্যে মুহম্মদ আমিন নামে জনৈক পদস্থ ওমরাহ মুঘল রাজধানী হইতে এক নূতন সৈন্য সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া শমশিরের নিকট হইতে যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। মুঘল সৈন্যের এই প্রকার উপর্য্যুপরি আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইউসুফজায়ীরা আপাতত সংযত হইল এবং পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর কাল তাহারা আর কোন গোলযোগ করিল না।

[৬]

১৬৭২ খৃঃ খাইবার প্রদেশস্থ আফঘান জাতির মধ্যে আবার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা দিল। হিতাহিত-জ্ঞানহীন জেলালাবাদের মুঘল ফৌজদার পার্ব্বত্য জাতির এই চিত্ত-

বিক্ষোভের মূল কারণ। বিদ্রোহী সর্দ্দার আক্মলের সহিত বহু পাঠান ও আফঘান যোগদান করিল।

আফঘানিস্থানের শাসনকর্ত্তা মুহম্মদ আমিন খাঁ বিদ্রোহী-দিগের বিরুদ্ধে পেশোয়ার হইতে কাবুল যাত্রা করিলেন। আফঘানেরা জমরুদে তাঁহার গতিরোধ করিল। অর্থবল ও ক্ষমতার গৌরবে মত্ত হইয়া তিনি হিতৈষীদের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই তিনি শত্রুমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইহাই তাঁহার ধ্বংসের কারণ হইল। আলী মসজিদে অবস্থানকালে আফ্রিদিদের প্রচণ্ড আক্রমণে বহু পদস্থ মুঘল কর্ম্মচারী ও অসংখ্য সিপাহী মারা পড়িল এবং তাহাদের সম্পত্তি লুট হইল।

আমিন খাঁ ও জনকয়েক উচ্চ কর্ম্মচারী কোনরূপে নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়া পেশোয়ার পলায়ন করিলেন। শত্রুরা প্রায় কুড়ি হাজার মুঘল পুরুষ ও স্ত্রীকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। আমিন খাঁর মাতা, স্ত্রী ও কন্যাও বন্দী হইয়াছিলেন। আমিন খাঁ তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য বিস্তর অর্থ দিলে তবে তাঁহারা সে যাত্রা উদ্ধার পাইয়াছিলেন। আমিন খাঁর অবিমৃষ্যকারিতাই মুঘল সৈন্যের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ, কিন্তু ইনি তাঁহার এক নিম্নতন কর্ম্মচারীকে কঠোর শাস্তি দিয়াই ইহার প্রতিশোধ লইলেন। এই কর্ম্মচারীটির অপরাধ সে সেনাপতিকে আফঘানদিগের সম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ দেয় নাই। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে হতভাগ্য অপরাধী পানীয় জলের প্রার্থনা করায় তাহাকে জানান হইল যে তাহারই দোষে অসংখ্য মুঘল সৈন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সুতরাং তাহারও সেই পানীয়ের অভাবেই মৃত্যু হওয়া উচিত। যাহা হউক, এই জয়লাভে আফ্রিদিরা প্রসিদ্ধিলাভ করিল। তাহারা যে প্রচুর লুণ্ঠন-দ্রব্য পাইয়াছে এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং দলে দলে অনেক লোক আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল।

আফ্রিদি বা ইউসুফজায়ীদের মত খাটকেরাও খুব সমর-কুশল। পেশোয়ারের দক্ষিণে এবং কোহাট ও বান্নুজেলায় তাহারা বাস করিত। পেশোয়ারের মাঝামাঝি ইউসুফজায়ী এবং খাটকদিগের সীমানা পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ায় খাটকেরা ইউসুফজায়ীদের বংশপরম্পরাগত শত্রু। সেই খাটকেরা এবার ইউসুফজায়ীদের পক্ষাবলম্বন করিল।

মুঘলদের বিপদ এবারও সামান্য নয়। সমস্ত পার্ব্বত্য জাতিই এখন বিদ্রোহী। ইতিপূর্ব্বে মুঘলের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করায় তাহারা অনেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। এ ছাড়া, মুঘল সৈন্য কি প্রণালীতে যুদ্ধ করে ইহা তাহারা ভাল করিয়াই জানে। মুঘলদের ন্যায় আফঘানদের বড় বড় কামান না থাকিলেও, তাহাদের অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সংখ্যায় বা গুণে মুঘলদেরই প্রায় সমতুল্য। আর, বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশেই এই যুদ্ধ, সুতরাং পার্ব্বত্য জাতিরই ইহাতে সুবিধা। দারুণ শীতে ও অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে অসমতল প্রদেশে যুদ্ধ করায় মুঘল সিপাহীর কষ্টের অন্ত ছিল না। এ দেশে যুদ্ধ করিতে তাহারা খুব ভয় পাইত।

শত্রুহস্তে মুঘল সৈন্যের দুর্গতির সংবাদ ক্রমে আওরংজীবের কানে পৌছিল। পেশোয়ার রক্ষা করিবার জন্য তিনি এক বিরাট আয়োজন করিলেন। আমিন খাঁকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে সম্রাট দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা মহব্বৎ খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। মহব্বৎ ইতিপূর্ব্বে একবার আফঘানি-স্থানের শাসনকার্য্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমিন খাঁর ন্যায় মহব্বৎ কিন্তু শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিলেন না, বরং তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। ঠিক হইল এক পক্ষ অপরকে বিরক্ত করিবে না। ফিরিবার সময় পাছে আফঘানরা তাঁহার গতিরোধ করে এই ভয়ে মহব্বৎ তাহাদের টাকাকড়ি দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করিয়া তিনি কাবুল যাত্রা করিলেন। সম্রাট কিন্তু এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। আফঘানদের রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এক বিরাট বাহিনী, অনেক যুদ্ধ-সামগ্রী ও কামান সেনানায়ক সুজায়েত খাঁর অধীনে পাঠাইলেন (নভেম্বর, ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ)। ঠিক হইল, যশোবন্ত সিংও সুজায়েতের সহযাত্রী হইবেন।

খুব সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি হইয়া সুজায়েতের আজ এই পদমর্য্যাদা। পূর্ব্বে সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সুজায়েত সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

মহব্বৎ খাঁ বা যশোবন্ত সিং উভয়েই উচ্চবংশজাত, সুতরাং তাঁহারা এই নীচকুলোদ্ভব সুজায়েতকে ঘৃণা ও ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন। সম্রাটের প্রিয়পাত্র বলিয়া সুজায়েতও অহঙ্কারে উন্মত্ত; কাহারও পরামর্শ লইয়া কাজ করিবার পাত্র তিনি ন'ন। যশোবন্তের পরামর্শ না লইয়াই সুজায়েত যুদ্ধের ব্যবস্থা ঠিক করিতে লাগিলেন। এইরূপে অসদ্ভাবাপন্ন এই দুই সেনাপতি একপরামর্শী হইয়া কার্য্য না করায় বিরাট মুঘলবাহিনী শত্রুহস্তে পুনরায় নিগৃহীত হইল।

সুজায়েত কাবুলের দিকে অগ্রসর হইলেন। গণ্ডবনদী অতিক্রম করিয়া গিরিপথে যাইবার সময় ভীষণ বৃষ্টি হইল এবং তুষারপাত হইতে লাগিল। অত্যধিক শীতে মুঘল সৈন্য ক্রমে মরণাপন্ন হইল। এই সুযোগে দুই পার্শ্বের উচ্চস্থান হইতে আফঘান সৈন্য নির্য্যাতিত মুঘল সৈন্যকে অস্ত্রবর্ষণে ও শৈলাঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার বহু সৈন্যের সহিত সুজায়েত হত হইলেন। ইতিমধ্যে যশোবন্ত এক বুদ্ধি করিলেন। সুজায়েতের অবশিষ্ট সৈন্যকে শত্রুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজের পাঁচ শ' রাঠোর সৈন্য ঘটনাস্থলে পাঠাইলেন। ইহারা আফঘান সৈন্যের পরিবেষ্টনীর মধ্য হইতে মুঘল সিপাহীদের উদ্ধার করিয়া নিজেদের শিবিরে ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু এই কার্য্যে প্রায় তিন শ' রাজপুত তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিল।

এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যে দুইবার শত্রুহস্তে মুঘল সৈন্য বিধ্বস্ত হইল। নিজের প্রতিষ্ঠা পুনর্স্থাপনের জন্য আওরংজীব স্বয়ং এইবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন (২৬ জুন, ১৬৭৪ খৃঃ অব্দ)। রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ারের মাঝামাঝি হসন আব্‌দালে প্রায় দেড় বৎসর বাস করিয়া তিনি স্বয়ং সৈন্য পরিচালন করিলেন। সম্রাটের সহিত এক বিরাট বাহিনী ও বিস্তর কামান ছিল। যথেষ্ট রসদ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম লইয়া কয়েকটি মুঘল ফৌজ শত্রুর দেশে প্রবেশ করিল। অঘর খাঁ নামে জনৈক তুর্কী ওমরাহ্ "খাইবার" অঞ্চলে সৈন্যের যাতায়াতের জন্য পথ পরিষ্কার করায় মুঘল সৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল। সুজায়েতের মৃত্যুর জন্য মহব্বৎই প্রকৃত পক্ষে দায়ী এই সন্দেহ করিয়া আওরংজীব তাঁহাকে আফঘানিস্থানের শাসক পদ হইতে অপসারিত করিলেন। এই মিথ্যা দোষারোপে বিচলিত হইয়া মহব্বৎ সম্রাটকে একখানি কড়া চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, "মহব্বৎ বা যশোবন্ত ইঁহাদের কেহই সুজায়েতের মৃত্যুর জন্য দায়ী নহেন, ইহার জন্য দায়ী সেই "পাজী" সুজায়েত নিজেই! আর, সম্রাটের এই অন্যায় অভিযোগ হইতে মনে হয় যে তিনি পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট হইয়াছেন; তিনি আজকাল নীচকুলোদ্ভব লোকেদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন!"

যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট নিজের সমরকৌশল ও কূটনীতির পরিচয় দিলেন। যুদ্ধ না করিয়া তিনি ক্রমে আফঘান সর্দ্দারদের পুরস্কার, বৃত্তি, জায়গীর ও চাকুরী দিয়া নিজের বশ্যতা স্বীকার করাইলেন। তবে, অধীনতা স্বীকার করিতে যাহারা সম্মত হইল না তাহাদের দেশে মুঘল সৈন্য প্রবেশ করিল। অল্পকালের মধ্যেই ঘোরাই, ঘিলজাই, শিরানি এবং ইউসুফজায়ী প্রভৃতি জাতি তাহাদের গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইল। আফ্রিদি সর্দ্দার সম্রাটের নিকট বিদ্রোহী সর্দ্দার আকমল খাঁর ছিন্নমুণ্ড আনিয়া দিবে স্বীকার করায় আফ্রিদিরা সে যাত্রা সম্রাটের কোপ হইতে রক্ষা পাইল।

ওদিকে, অঘর খাঁ পেশোয়ারের পশ্চিমে আফঘানদের উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। মোহমন্দ জাতির আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া, প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করিয়া তিনশ' লোক বন্দী করিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় আরও দু'হাজার লোক ও বিস্তর ধনসম্পত্তি তাহার হস্তগত হইল। পরে, খাইবার গিরিপথ যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত রাখিবার চেষ্টায় বহু যুদ্ধ করিয়াও তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। উভয় পক্ষে বহু সিপাহী মারা পড়িল, অঘর খাঁ নিজে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হইলেন। হতাশ না হইয়া পাঁচ হাজার রাজপুত ও নিজের আফগান সৈন্য লইয়া অঘর পুনরায় শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। খিলজাইরা পরাজিত ও বিতাড়িত হইল। যাহা হউক, একমাত্র অঘর খাঁই পার্ব্বত্যজাতির উপর একাদিক্রমে জয়লাভ করিয়াছিলেন; অপর কোন সেনাপতির সে সৌভাগ্য কখন হয় নাই। বঙ্গজননী যেমন জুজুর ভয় দেখাইয়া তাঁহার দুর্দ্দান্ত সন্তানকে নিদ্রিত করাইয়া থাকেন, আফঘান জননীও সেইরূপ তাঁহার দুরন্ত সন্তানকে ঘুম পাড়াইবার জন্য এই অঘর খাঁর নাম উল্লেখ করিতেন।

সেনাপতি কিদাই খাঁর অধীনে একদল মুঘল সিপাহী কাবুল হইতে পেশোয়ার ফিরিতেছিল (১৬৭৫ খৃঃ অব্দ)। জগ্‌দলক গিরিপথের নিকট শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হইল। বিপদের সংবাদ পাইয়া অম্বর খাঁ তাহাদের সাহায্যার্থ রওনা হইলেন এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া বিপক্ষকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে জগদলক গিরিপথ উন্মুক্ত হওয়ায় মুঘলেরা এই পথে অবাধে চলাফেরা করিতে লাগিল।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে, মুকরম খাঁর অধীনে এক মুঘল বাহিনী বজোওর প্রদেশে শত্রুহস্তে লাঞ্ছিত হইল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য আফঘানিস্থানে পূর্ব্বাপেক্ষা এবার মুঘল সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলে কি হইবে, মুঘল সৈন্য আরও দুইবার বিপক্ষের নিকট পরাজিত হইল। বহু পদস্থ কর্ম্মচারী ও সৈন্য নিহত হইলেও মোটের উপর মুঘলেরা সীমান্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেই দেশে নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিল। বিপদ কাটিয়া অবস্থার কতক পরিবর্ত্তন হইলে সম্রাট দিল্লী ফিরিলেন (১৬৭৫ খৃঃ অব্দ)।

[৭]

এবার সাহাজাদা মুঅজ্জম কাবুল অভিযানের নেতৃত্বে অভিষিক্ত হইলেন (১৫ অক্টোবর, ১৬৭৬ খৃঃ অব্দ)। এই উপলক্ষে সাহাজাদা 'সাহ-ই-আলম' উপাধি, এক লক্ষ মোহর, দুই লক্ষ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি সম্রাটের নিকট হইতে উপহার পাইলেন। মুঅজ্জমের সহিত বহু খ্যাতনামা সেনানায়ক, ভাল ভাল কামান ও অন্যান্য অনেক যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম চলিল।

খলিল উল্লা খাঁর পুত্র মীর খাঁ সাহজাদার সহিত চলিলেন। মীর খাঁ ইতিপূর্ব্বে ইউসুফজায়ী ও বিহারের দুই আফঘান সর্দ্দারকে দমন করার ফলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে "আমির খাঁ" উপাধি দান করেন (১৬৭৫ খৃঃ অব্দ) এবং কাবুলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন. (১৯ মার্চ্চ, ১৬৭৭ খৃঃ অব্দ)।

মীর খাঁ আফঘানিস্থানের শাসনকার্য্যে প্রায় কুড়ি বছর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সুশাসনের গুণে আফঘানেরা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিল। ক্রমে এই পার্ব্বত্যজাতি তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল, এমন কি নিজেদের সাংসারিক ব্যাপারেও তাহারা মীর খাঁর পরামর্শ না লইয়া কিছু করিত না। ইঁহার কূট শাসননীতির ফলে আফঘানেরা গৃহবিবাদে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিল। আকমলের অনুচরেরা সর্দ্দারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। টাকার লোভে একে অন্যের বিপক্ষতাচরণ করিল। যাহাহউক, এই বিরোধ নীতি অবলম্বন করায় আফঘানেরা মুঘলদের আক্রমণ করিবার আর কোন সুযোগ পাইল না।

স্বাধীনতাকামী অদম্য দেশসেবী খুশ্‌হাল খাঁ কিন্তু মুঘলদের সহিত সন্ধি করিলেন না। সমস্ত পার্ব্বত্য জাতি, এমন কি নিজেদের ঔরসজাত পুত্র পর্য্যন্ত মুঘল পক্ষ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও খুশ্‌হাল অচল, অটল। তিনি স্বাধীনতার নিশান একাই উড্ডান রাখিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, পুত্র পিতার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। জন্মভূমি হইতে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হইয়া শত্রুদুর্গে একজন সাধারণ বন্দীর ন্যায় খুশ্‌হাল তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিলেন।

ওদিকে, এই আফঘান যুদ্ধের ফলে আসন্ন রাজপুত বিরোধে মুঘল পক্ষে কোন আফঘান সিপাহী যুদ্ধ করে নাই। এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যের ভাল ভাল মুঘল সিপাহী সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত থাকায় সম্রাট-প্রতিদ্বন্দ্বী ছত্রপতি শিবাজীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই মারাঠা দেশনায়কের সাফল্যের ইহা এক কারণ।

মধু মাষ্টার

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন রবিবার। দেবীপুরের গোকুলের দোকানে হাট-যাত্রীদের ভিড় জমিয়াছে। দরিদ্র দিন-মজুরেরা হাট করিবার জন্য চাউল বেচে—গোকুল কেনে। দোকানের বারান্দায় তক্তপোষের উপর মাধব ভট্টাচার্য্য একজন চাউল খরিদ্দার মহাজনের দালালের সহিত দাবা খেলিতেছিল।

এমন সময়—ওরে গোকুল, একবার তামাক খাইবে দে তো বাবা।—বলিয়া দীর্ঘ পরিপুষ্ট-দেহ এক প্রৌঢ় আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন। ভদ্রলোকের একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুলগুলি ছোট-ছোট করিয়া ছাঁটা, সেগুলি কিন্তু একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যস্থলে পরিপুষ্ট এক টিকি।

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গোকুল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—কে, মাষ্টার মশাই!

সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সে তামাক সাজিতে বসিল

মাধব ভট্টাচার্য্য বলিলেন—কে গো—মধু মাষ্টার! এস তো এস তো ভাই। এই দেখ ইনি একজন পাকা খেলোয়াড় এসেছেন। এস তো ভাই একবাজী। আমি তো পাঁচ বাজীর একবাজীও পেলাম না।

অতি ব্যস্তভাবে মধু মাষ্টার প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—না-না-না। ও হবে না ভাই, হাটে যেতে হবে আজ। ছোট ছেলেটার জ্বর হয়েছে, হাট পড়েছে আমার ঘাড়ে। ও বড় পাজী নেশা।

গোকুল তামাক সাজিয়া আনিল। হুঁকা-কলিকা সসম্ভ্রমে তাঁহার হাতে দিয়া কহিল—অরুণ ভাল আছে মাষ্টার মশাই?

অরুণ মাষ্টারের বড় ছেলে।

মাষ্টার মশাই কহিলেন—হ্যাঁরে সে ভাল আছে, সেদিন এসেছিল যে।

গোকুল আবার কহিল—অরুণ এবার বি·এ·তেও স্কলার-শিপ পেয়েছে, নয় মাষ্টার মশাই?

—হ্যাঁ-রে—বি·এ তেও সে ফার্ষ্ট হয়েছে। তোর সঙ্গে অরুণের বড় ভাব ছিল, নয় রে?…তারপর তোর ব্যবসা কেমন চলেছে?…হাঁ হাঁ হাঁ, মাধব তোমার ঘোড়া গেল, ঘোড়া গেল। চাপা থেকে উঠে বস—বাঁয়ে বাঁয়ে উঠে বস। আচ্ছা হয়েছে।…তারপর গোকুল, তোর মনকুমারীকে মনে আছে তো রে? সে কানমলা?

গোকুল হাসিতে লাগিল।

তিনি বলিলেন—যা যা, নিজের কাজ কর গিয়ে। হাটের দিন ব্যবসার ক্ষতি করিস নে বাবা।…মাধব আবার এ কি করেছ? এ যে মন্ত্রী গেল তোমার। একচাল, দুচাল, তিন, চার পাঁচ চালে যে মাৎ হয়ে গেলে তুমি। সর দেখি, সর দেখি, দেখি একবার!…দেখি-দেখি-দেখি এ-এ-এ এ-ই।

বলিয়া একটি চাল তিনি চালিয়া দিলেন। মাধবকে চেষ্টা করিয়া সরিয়া যাইতে হইল না, মাষ্টারের বিপুল শরীরের ধাক্কায় সে আপনি কোণে সরিয়া গিয়াছিল।

মধু মাষ্টার দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে চাল ভাবিতেছিলেন। তাঁহার খেলা দেখিবার বস্তু। আশে-পাশে ক্রমশঃ লোক জমিতে লাগিল।

গোকুল ওদিকে কেনা-বেচা করিতেছিল—পাঁচ সের এক পো হ'ল গো তোমার। দাম হ'ল তোমার পাঁচ দেড়ে সাড়ে সাত আনা আর একপো'র দাম দেড় পয়সা,—সাত আনা সাড়ে তিন পয়সা। আচ্ছা আট আনাই দিলাম তোমাকে আজ—এই হাটে কেটে দিয়ো আধলাটা।

ওদিকে মাষ্টার 'বল' চালিতে চালিতে কহিতেছিলেন—চিঁ-হিঁ-হিঁ; আমার সেপাই আপনার ঘোড়ার ডান পায়ে কোপ বসালে। আর দু'কোপ বাকী।

মাষ্টার খেলার গতি ফিরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। খেলোয়াড় ভদ্রলোক একটা চাল দিয়া বলিলেন—ফসকে গেছে কোপ।

মাষ্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না, পা গিয়েছে ওর। রক্তের তেজে এখনও বুঝতে পারে নি।

তারপর আর একটি চাল দিয়া কহিলেন—এ-ই বাম পদ গেলেন। 'বাঁ পাটি লটর-পটর ডান পাটি খোঁড়া, বাবা বক্তি-নাথের ঘোড়া।'

ভদ্রলোকটি বিপদ বুঝিয়াছিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর নীরবে একটি চাল তিনি চালিলেন। মাষ্টারের হাত উদ্যত

হইয়াই ছিল, কোণের গজ তুলিয়া সশব্দে ঘোড়াটাকে বধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—শুঁড়ে ধরে আমার হাতীব পায়ে আপনার ঘোড়ার পেট ফেটে গেল—ফট্।

তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—গোকুল—তামাক একবার। আবার ছকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। অতঃপর নিঃশব্দেই কিছুক্ষণ খেলা চলিতেছিল। গোকুল তামাক আনিয়া হাতে ধরাইয়া দিয়া কহিল—মাষ্টার মশাই!

—হুঁ।

—বেলা অনেক হয়ে গেল। হাট—

মাষ্টার কহিলেন—গুড়ুম্। ছাড়লাম টর্পেডো, সামলান নৌকো।

গোকুল ডাকিল—মাষ্টার মশাই!

—দেখ গোকুলো, গোল করবি তো মার খাবি। খালি গোলমাল, খালি গোলমাল!—গেলো নৌকো—চলেছে টর্পেডো—সোঁ-সোঁ।

গোকুল আর কথা বলিতে সাহস পাইল না।

মাষ্টার কহিলেন—ভর্-ভর্-ভর্-ভর্ ভু—স্।

বিপক্ষের নৌকা তিনি বধ করিয়াছেন।

আবার খেলা চলে। বেলা অনেক হইয়াছে। দর্শকদের অনেকে চলিয়া গেল, আবার নূতন অনেকে আসিল।

হুঁকা টানিতে টানিতে মাষ্টার বলিলেন—ছাড়লাম ব্রহ্মবাণ। 'ব্রহ্মতেজে সৃষ্টি তার নাম ব্রহ্মবাণ, অমর হলেও তার নাহি পরিত্রাণ।'

ভদ্রলোক বলিলেন—আমিও ছাড়লাম অগ্নিবাণ।

হা হা করিয়া হাসিয়া মাষ্টার জবাব দিলেন—'আমার বরুণ বাণে অগ্নি নিভে যায়, এইবারে মন্ত্রী যাবে করহ উপায়।'

মন্ত্রী সত্য সত্যই গেল

ভদ্রলোক ছকের উপর বলগুলা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—মাৎ হয়েছি আমি। কিন্তু আর একবাজী।

—যুদ্ধং দেহি? আচ্ছা প্রস্তুত আমি।

আবার খেলা বসিল। খেলা যখন ভাঙিল তখন অপরাহ্ণ বেলা। মাষ্টার জয়োল্লাসে উঠিয়া কহিলেন—চলো এইবার হাট।

কিন্তু বেলার দিকে চাহিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন—একি? এ যে সন্ধ্যে হয়ে এল? হাট?

গোকুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল—হাট আমি পাঠিয়ে দিয়েছি মাষ্টার মশাই।

—দিয়েছিস? বাঁচলাম, আমি। ও ভারী পাজী নেশা। মাধবকে তাই ত বলি—ছাড় ও নেশা ছাড়। তা কাকে বলছ! দে তো বাবা একটু তেল দে তো, একেবারে স্নানটা সেরেই যাই।

গোকুল হাত জোড় করিয়া বলিল—বামুন দিয়ে রান্নাও আমি করিয়ে রেখেছি মাষ্টার মশাই, বাড়ীতেও খবর দিয়েছি—।

—বেশ করেছিস। এ সব বুদ্ধি তোর আছে—কিন্তু ইংরাজি গ্রামারেই তোর যত গোল।

মধু মাষ্টারের পুরা নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। মাষ্টার সে আমলের এফ-এ পাশ। দারিদ্র্য হেতু বি-এ পড়া তাঁহার হয় নাই। পাশের গ্রামের রায় বাবুদের এম. এল. হাই ইংলিশ স্কুলে আজ ত্রিশ বৎসর থার্ডমাষ্টারী করিতেছেন। এ অঞ্চলের চল্লিশের নিম্ন-বয়সী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার ছাত্র। রায়বাড়ীর কর্তা জ্ঞানদাবাবু মধু মাষ্টারকে বড় ভালবাসেন। তাঁহার বড় ছেলেকে তিনি প্রাইভেট পড়াইয়াছেন—আবার ছোট ছেলে সৌরীন্দ্রকে এখনও পড়ান।

সেদিন গোকুলের দোকান হইতেই মধু-মাষ্টার রায়-বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় গিয়া উঠিলেন। এই নিয়মিত কর্ম্মটিতে কেহ কখনও তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখে নাই। জল ঝড়—শত দুর্য্যোগের মধ্যেও সাদা তালি-দেওয়া বিবর্ণ ছাতাটি দীর্ঘ মানুষটির মাথার উপর বহু দূর হইতেই দেখা যাইত।

ছাত্র সৌরীন্দ্র ছেলেমানুষ, সবে সে ইংরেজী ধরিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত হইতেই সৌরীন্দ্র কহিল—আজ দুপুর বেলা পড়া করে রেখেছি মাষ্টার মশাই।

ছাতাটা কোণে রাখিয়াই মাষ্টার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—সিট্ ডাউন, ইয়ু নটি বয়।

এত বড় মানুষটির রোষ-আস্ফালনের গর্জ্জনে সৌরীন্দ্রের হইয়া গেল। সে বই খুলিয়া বলিল, আই মেট এ লেম ম্যান, মানে, আমি দেখিয়াছিলাম একটি খোঁড়া মনুষ্য।

মাষ্টার বলিলেন—ইয়েস্—আই মানে আমি, মেট মানে দেখিয়াছিলাম, এ মানে একটি, লেম মানে খোঁড়া, ম্যান মানে মনুষ্য।

মন্দিরের পথে

[শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

সৌরীন্দ্রের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। মাষ্টার তাহা দেখিয়াছিলেন কিন্তু পাথরের মত তিনি বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে সৌরীন্দ্রের মন পাঠে নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। মাষ্টার বলিলেন—বই বন্ধ কর। এদিকে এস।

ভয়ে ভয়ে সৌরীন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিল।

তাহার হাতে ঝাঁকি দিয়া তিনি কহিলেন—দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস্। খুব ক'রে ভাত ডাল খাবি—বুঝলি? হাম্‌-হাম্ ক'রে। দু বেলা উঠ-ব'স্ করবি, বুঝলি!

সৌরীন্দ্র ঘাড় নাড়িল—সে বুঝিয়াছে।

তারপর পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

—আচ্ছা বল দেখি—আমি যাই ইংরেজী কি হবে!

—আই গো—।

—গুড্, আচ্ছা—সে যায়?

—হি গোজ্।

—ভেরি গুড্, রাম যায়?

—রাম গোজ্।

—ভেরি, ভেরি, ভেরি গুড্। আচ্ছা অঙ্ক হয়েছে?

—হাঁ সার্—সব কষে রেখেছি।

—আচ্ছা একটা মণকষা কষে ফেল দেখি। একমণ মিষ্টির দাম—কি মিষ্টি খেতে ভালবাস তুমি? রসগোল্লা? পান্তোয়া? আচ্ছা এক মণ পান্তোয়ার দাম ৫৸৶৫ পাই হ'লে তিন মণ ন সের ছ ছটাকের দাম কত?

সৌরীন্দ্র কহিল—ততক্ষণ আপনি বইখানার মলাট লাগিয়ে দিন না সার। বই ও একখানা খবরের কাগজ সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। মাষ্টার কাগজখানা লইয়া ভাঁজিতে গিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সৌরীন্দ্রের অঙ্ক শেষ হইয়া গেল—সে ডাকিল—সার!

মাষ্টার নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সৌরীন আবার ডাকিল—হয়ে গেছে মাষ্টার মশাই।

টেবিলের উপরে প্রচণ্ড একটা কিল মারিয়া বিপুল গর্জ্জনে মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন—অ্যাবসার্ড, এ ভাইল এণ্ড ম্যালিসাস্ প্রোপাগাণ্ডা এজেন্‌স্টু আস্—

সৌরীন্দ্র অর্থ না বুঝিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। মাষ্টারের এরূপ ধরণের অস্বাভাবিক গর্জ্জনে কাছারী-ঘরে রায়-কর্ত্তা জ্ঞানদা বাবুর আফিংএর নিদ্রাও ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি ডাকিয়া কহিলেন—কি হ'ল—কি হ'ল মাষ্টার মশাই?

আবার টেবিলের উপর কিল মারিয়া মাষ্টার কহিলেন—এ আমি কক্ষণও ছাড়ব না। আমি এর বিরুদ্ধে লিখব—প্রমাণ ক'রব—আই শ্যাল প্রভ্ ইট।

জ্ঞানদা বাবু এবার উঠিয়া আসিলেন, কহিলেন—কি, হ'ল কি মাষ্টার মশাই? আপনি এত—

—এত? বলেন কি আপনি? পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। মাথায় আমাদের জুতো মারছে! বলে কি ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেসন্—মানে আমাদের সভ্যতার ইতিহাস সমস্ত মিথ্যা। রামায়ণ মহাভারত মিথ্যা। মিশরের সভ্যতা নাকি সবার আগে। তারই খানিকটা ভারতীয়েরা নকল করেছিল মাত্র। নইলে তারা ছিল বর্ব্বর অসভ্য। এই নিয়ে বিলেতে একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা হয়েছে মশাই। আর সেই সব বই ওদের দেশে প্রচার হচ্ছে। খবরের কাগজে কাগজে তার প্রশংসা। এই দেখুন একখানা বিলাতী কাগজে তার ওপর সমালোচনা—সমালোচনা না মাথা—সেই নিয়ে ঢাক বাজাচ্ছে। আমি লিখব—এর বিরুদ্ধে আমি লিখব জ্ঞানদাবাবু।

জ্ঞানদাবাবু বলিলেন—বেশত লিখুন না আপনি। লিখে আমাদের দেশের কাগজে পাঠিয়ে দিন।

মাষ্টার তখনও বলিতেছিলেন—ওদের র‍্যামেসিস বলে যে রাজা ছিল তারই নাম তারই কীর্ত্তি চুরি করে' আমরা রাম রাজার নাকি বড়াই করি। বেটাদের নিল-ডাউন করিয়ে দিতে হয় পৃথিবীর সামনে। কিন্তু খবরের কাগজে লিখে কি হবে মশাই? ওই বইখানার প্রতিবাদ করে' বই লেখা দরকার, আর সে বই ওদের দেশেই প্রচার করা দরকার।

জ্ঞানদা বাবু ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—লিখুন আপনি মাষ্টার মশাই, আমি আপনাকে সাহায্য ক'রব। বিদ্যে আমার নেই কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রব—যা খরচ হবে এতে সমস্ত আমার।

মাষ্টার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, ভাবপ্রকাশের ভাষা তিনি পাইতেছিলেন না। কয়ফোটা জল তাঁহার চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িল। অবশেষে কহিলেন—আমাদের ভারতবর্ষ—আর্য্যভূমি; আপনার মঙ্গল হবে জ্ঞানদাবাবু।

সৌরীন্দ্র নিজেই চুপ করিয়াছিল, এ রোষ যে তাহার উপরে নয় তাহা সে বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এতক্ষণে সে সুযোগ বুঝিয়া কহিল—সার আমার ছুটী।

মাষ্টার তখনও চিন্তা করিতেছিলেন।

জ্ঞানদাবাবু ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—মাষ্টার মশাই সৌরীন আপনার ছুটী চাচ্ছে

গম্ভীরভাবে মাষ্টার জ্ঞানদাকেই বলিলেন—যাও। না দাঁড়াও, অঙ্কটা দেখি তোমার।

অঙ্ক ঠিক হইয়াছিল। শ্লেটখানি সৌরীনের হাতে দিয়া এতক্ষণে সৌরীনের দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন—ইয়ু আর এ গুড বয়। আজ পড়া তোমার ঠিক হয়েছে।

মাষ্টারও উঠিলেন, বলিলেন—কাল তা' হ'লে বইখানা আনতে দেব, কি বলেন? একবার হেড মাষ্টারের ওখানে যেতে হবে। তাঁকেও সঙ্গে নিতে হবে।

* * *

হেড মাষ্টার শিববাবু মধু মাষ্টারের সমবয়সী লোক। তিনি শিবের মত এই সবল আত্মভোলা মানুষটকে বড় ভাল বাসিতেন। লোকটির জ্ঞান ও সামর্থ্যের উপর বিশ্বাসও ছিল তাঁহার অগাধ। শিববাবু নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু কোন প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিলে মধু মাষ্টারকে না দেখাইয়া কখনও তিনি শেষ করিতেন না। মধু মাষ্টার অম্লান বদনে তাঁহার লেখার উপরেও দুই একস্থানে কলম চালাইয়া বলিতেন—এখানটা এই করে দিলাম।

শিববাবুও তাহাই মানিয়া লইতেন।

সেই রাত্রেই মাষ্টার শিববাবুর দরজায় আসিয়া হানা দিলেন।

শিববাবু অতি মিতাচারী ব্যক্তি। নিয়মের লঙ্ঘন তিনি করেন না। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খাইয়া শুইয়া পড়া তাঁহার নিয়ম।

মাষ্টারের হাঁকে-ডাকে দরজা খুলিয়া দিয়া ভৃত্য কহিল—বাবু খেয়ে শুয়েছেন।

মাষ্টার বলিলেন—ডাক তাঁকে। জরুরী কাজ আছে। ভেরি ইম্পর্টান্ট, মোষ্ট ইম্পর্টান্ট, বুঝলে?

মধু মাষ্টারের কণ্ঠস্বর ইঁট-কাঠের বাধা মানে না, শিববাবুর কানে গিয়া আপনি পৌঁছিয়াছিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া নামিয়া আসিলেন।

—কি? কি হয়েছে মাষ্টার মশাই?

—এই প'ড়ে দেখুন।

কাগজখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

পড়া শেষ হইলে শিববাবু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন—এর বিরুদ্ধে লিখতে হবে। ও বই যে মিথ্যে তা প্রমাণ করে দিতে হবে।

শিববাবু বলিলেন—এই জন্যেই ডাকছিলেন?

—এই জন্যেই? হোয়াট ডু ইয়ু মিন্? এটা কি এত তুচ্ছ জিনিষ?

—না—না—না। কিন্তু এ তো কাল সকালে—

মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন—নাঃ, আপনাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। বই লিখতে হবে। কাল ও বইখানা আনতে দিচ্ছি। জ্ঞানদাবাবু সমস্ত খরচ দেবেন। আচ্ছা চলি আমি।

বলিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

* * *

বাড়ীর দরজায় আসিয়া মাষ্টার মৃদু স্বরে ডাকিলেন—চিনু—চিনু—চিনু মা।

চিনু—চিন্ময়ী, মাষ্টারের কন্যা—বিধবা।

দরজা খুলিয়া গেল। বেশ বোঝা গেল—প্রতীক্ষমানা কেহ এই আহ্বানটির প্রত্যাশাতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন। দ্বার-মুক্ত-কারিণী চিন্ময়ী নয়—চিন্ময়ীর জননী। তাঁহাকে দেখিয়া মাষ্টার কহিলেন—আজ—বুঝেছ কিনা—আমাদের অরুণের বন্ধু আমার ছাত্র—বুঝেছ কিনা—মানে—আমাদের দেবীপুরের গোকুল বুঝেছ—

গৃহিণী গম্ভীরভাবে কহিলেন—খুব বুঝেছি আমি।

মাষ্টার তাড়াতাড়ি বলিলেন না—না মানে, ছাত্র সে ধরলে যখন—বুঝলে কিনা—

জলের ঘটি ও গামছা নামাইয়া দিয়া স্ত্রী কহিলেন—বল্লাম ত সবই বুঝেছি।

হাতমুখ ধুইতে ধুইতে মাষ্টার কহিলেন—ওই ত—সব তাতেই তোমার রাগ। বুঝবে না কিছু—

—খুব বুঝেছি।

—কি বুঝেছ, শুনি?

—বুঝেছি—সবই আমার অদৃষ্ট।

মাষ্টার পরাজয় মানিয়া লইলেন। বলিলেন—আচ্ছা বাপু আচ্ছা তাই হ'ল। এখন ভাত দাও দেখি।

ভাতের থালা নামাইয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন—কেন দাবা খেলে পেট ভরে না?

মাষ্টার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লোকে পাগলই বলুক আর যাই বলুক—রাগ, অনুরাগ বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

* * *

বিপুল উদ্যমে বই লেখা চলিয়াছে। সে বইখানি আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনচারি শত টাকার বই কেনা হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে এই বইগুলির সাহায্য প্রয়োজন। মাষ্টার রাত্রি জাগিয়া সেই সমস্ত বই পড়েন। শিববাবুর সহিত আলোচনা হয়। মধ্যে মধ্যে জ্ঞানদাবাবুকে অনুবাদ করিয়া শোনান হয়।

কিন্তু এই পরিশ্রমে মধু মাষ্টারের পাথরের মত দেহ ভাঙিয়া পড়িল। সর্ব্বদাই যেন তিনি চিন্তাকুল। দাবাখেলা পর্য্যন্ত ছাড়িয়াছেন।

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অরুণকে পত্র লিখিলেন। অরুণ কৃতী ছেলে—এম-এ পড়ে। কোন পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় হয় নাই। অরুণ আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কহিল—বাবার ইচ্ছেয় বাধা দিয়ো না মা। উনি যে কত বড় তা তোমরা বুঝবে না।

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—বুঝব না—না?

অরুণ লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে কহিল—আমি বরং স্কলারশিপের টাকা থেকে কিছু ক'রে পাঠিয়ে দেব। বাবার জন্য ভাল খাবার-টাবারের ব্যবস্থা ক'র।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। অকস্মাৎ জ্ঞানদাবাবু মারা গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ মালিক হইয়া বসিল। সুরেন্দ্র বার তিনেক ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া শিক্ষকদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। তাহার উপর সে নবযুগের মানুষ। শিববাবু মানে-মানে বয়সের অজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়িলেন। মধু মাষ্টারকেও কহিলেন—মাষ্টার মশাই আর কেন?

হা-হা করিয়া হাসিয়া মাষ্টার বলিলেন—আপনার সব তাতেই বাড়াবাড়ি শিববাবু। আরে আমাদের সেই সুরেন। তিন চড়ে সোজা ক'রে দেব।

শিববাবু শুধু হাসিলেন, আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিলেন না। এটুকু তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি কাশী চলিয়া গেলেন।

শিববাবুর স্থলে একজন নূতন এম-এ, বি-টি, আসিলেন। সবই যেমন চলিতেছিল—চলিতে লাগিল। সেদিন আরও কতকগুলি পুস্তকের তালিকা লইয়া মধু মাষ্টার রায়-বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি—ইতিমধ্যে সৌরীন্দ্রের গৃহশিক্ষকের পদটি তাঁহার গিয়াছে। নূতন হেডমাষ্টার মহাশয় নিজে সৌরীনের ভার লইয়াছেন। তাহাতে মধু মাষ্টারের কোন আক্ষেপ ছিল না। বরং তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। বইখানা দ্রুততর গতিতে লেখা হইতেছে। বৈঠকখানার চিরমুক্ত দুয়ার আবৃত করিয়া পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। দরজার মাথার উপরে লেখা রহিয়াছে—'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ'। মাষ্টার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, বরাবর পর্দ্দা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্র সিগারেট মুখে দিয়া তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া শুইয়া ছিল। মধু মাষ্টারকে দেখিবামাত্র সিগারেটটা মুখ হইতে খসিয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া গেল। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক মধু মাষ্টার, সুরেন্দ্রের বুক হইতে তাড়াতাড়ি সেটাকে লইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—এই রাবিশগুলো খাও কি জন্যে বাপু? বাপ-ঠাকুর্দ্দার আমলের সোনারূপোর ফরসী গড়গড়া থাকতে—. ছঃ। অম্বুরী তামাক খাবে—এক মাইল তার গন্ধ যাবে। তা না।

সুরেন্দ্র এতক্ষণে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছিল—সে কহিল—কোন দরকার আছে কি?

—হাঁ, দরকার বলে দরকার! জরুরী দরকার! সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এই বইগুলো চাই।

তিনি ফর্দ্দটা সুরেন্দ্রের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

ফর্দ্দটায় চোখ বুলাইয়া সুরেন্দ্র কহিল—কি হবে এত সব বই। আর হেড মাষ্টারের সই বা কোথায়?

মাষ্টার বিরক্তিভরে কহিলেন—আঃ তোমার বুদ্ধি কি চিরকাল এক ভাবে থাকবে বাপু! এ্যালজ্যাব্রা জিয়োমিট্রি কোন কালে মাথায় ঢোকে নি তোমার। এখনও কি তাই আছে? এ বইগুলো লাগবে—আমি যে বইখানা লিখছি তার জন্যে।

—আপনি বই লিখবেন—তার জন্যে বই আমার কিনে দিতে হবে, তার মানে?

মাষ্টার সচকিত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—মানে জ্ঞানদা বাবুর অনুমতিক্রমেই বইখানা আমি লিখতে আরম্ভ করি। তিনি সমস্ত খরচ দেবেন বলেছিলেন এবং এর জন্যে অনেক টাকা খরচও হয়ে গেছে। প্রায় তিন চারশো টাকার বই কেনা হয়েছে।

—কি বই এখানা?

—সে বিশেষ বুঝবে না তুমি বাপু। তবু শোন—বিলেতে একখানা বই লেখা হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার অসারত্ব প্রতিপন্ন করে—এবং তার আদিমত্ব নাকচ করে। এখানা তারই প্রতিবাদ।

সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল—দেখুন, বাবাকে ভালমানুষ বোকা পেয়ে অনেকে অনেক রকম ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু তা আর হবে না। এসব ধাপ্পাবাজী আমি অনেক বুঝি। বিলেতের ইংরেজের বইএর প্রতিবাদ লিখবেন শাঁখপুরের মধু মুখুজ্জে। আপনার লিখতে সখ থাকে নিজে খরচ করে লিখুন গিয়ে।

মধু মাষ্টার উঠিয়া পড়িলেন। শুধু বলিলেন—দেখ সুরেন্দ্র আমাকে তুমি যা বল্লে তাই বল্লে। কিন্তু স্বর্গীয় কর্ত্তাকে বোকা বলা তোমার উচিত হয় নি। তাই বা কেন, তোমারই উপযুক্ত হয়েছে।

তিনি পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ভিতর হইতে সুরেন্দ্র কহিল—যে বইগুলো আপনার কাছে আছে—

কথা শেষ মাষ্টার নিজেই করিয়া দিলেন—বলিলেন—পাঠিয়ে দেব, আজই।

সেই দিনই একটা লোকের মাথায় এক গাদা বই ও একখানি পত্র লইয়া দেবীপুরের গোকুল আসিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে প্রণাম জানাইল। পত্রখানি মধু মাষ্টার লিখিয়াছেন—স্কুলের কার্য্যে পদত্যাগ-পত্র সেখানি।

* * *

দিন কয় পরে মধু মাষ্টার স্ত্রীকে কহিলেন—দেখ, একবার কলকাতা যাচ্ছি আমি।

স্ত্রী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন—সে কি? এই শরীর তোমার—বাধা দিয়া মাষ্টার বলিলেন—তা হোক। কাজ-কর্ম্ম একটা দেখব সেখানে। একজন ছাত্রও চিঠি লিখেছে। আর অরুণও সেখানে আছে। এই—ধর, দিন দশেক বড় জোর। কোন ভাবনা নাই। গোকুল মাস-কাবারের জিনিষ পত্র সব দিয়ে যাবে।

স্ত্রী ব্যথিত সুরে বলিলেন—আমাদের ভাবনাই আমরা শুধু ভাবি, নয়? পেটের ভাবনা ছাড়া—

অর্দ্ধ পথেই মাষ্টার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—যাঃ গেল। তুমি কিছু বোঝ না।

—না বুঝি না। সে তুমি বল, অরুণ বলে, আবার ওই ছোট খোকা সেও দশ দিন পরে তাই বলবে। বেশ, কি কি দেব বল ত? তোমার ও কাগজের বস্তা—

হাঁ হাঁ করিয়া মাষ্টার বলিলেন—না—না—না। ওতে তুমি হাত দিয়ো না। ও আমি গুছিয়ে নেব।

—কেন? মুখ্যু মানুষে হাত দিলে কি ও সব পচে যায় না কি?

—আঃ কি বিপদ? কে বলেছে তা'। কিছু বোঝ না তুমি।

মাষ্টার কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় ছোট ছেলে বরুণ আসিয়া কহিল—মা—বাবা সেই দুফসলী জমিখানা বিক্রী করেছেন হরিশ সাহাকে। আমি শুনে এলাম।

মা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই জমিটুকু খুব উৎকৃষ্ট জমি।

আখ, কলাই, গম প্রভৃতি সকল ফসলই হইয়া থাকে। এটুকু মাষ্টারের বড় সখের সামগ্রী ছিল।

বহুক্ষণ পর মা কহিলেন—বুড়ো বয়সে মতিচ্ছন্ন হয়, মানুষের, কানে শুনেছিলাম—চোখে এইবার দেখলাম। ওই কাগজেই ওর মাথা খেলে। ওতেই আমার সর্ব্বনাশ হবে সে আমি বেশ জানি।

বরুণ বলিয়া উঠিল—ছি—মা। যা বোঝ না তুমি—সে নিয়ে কিছু ব'ল না।

মা কিছু বলিলেন না।

কিন্তু টপ্ টপ্ করিয়া জল চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

* * *

কলিকাতায় আসিয়া মাষ্টার উঠিলেন কালিঘাটে—এস সি-সিন্‌হা উকীল হাইকোর্ট—তাঁহার বাড়ীতে। সতী-

সিংহ তাঁহার ছাত্র। মোট-ঘাট নামাইয়াই মাষ্টার বরাবর সতীশের ঘরে হাজির হইলেন। একঘর মক্কেল বসিয়া ছিল। সকলের সম্মুখেই তিনি কহিলেন—

—সতীশ ভাল আছিস তো?

সবিস্ময়ে সতীশ কহিল—কে মাষ্টার মশাই? কখন এলেন?

—এই আসছি বাবা। তোর এখানে উঠেছি এসে। কিছুদিন থাকব এখানে।

—অ—। তা বেশ—তা বেশ। ওই দিকে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন।

মোট কথা সতীশ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহার ছিল পান-দোষ ও আনুসঙ্গিক দোষ। অভিভাবক—বিশেষ মধু মাষ্টারের মত অভিভাবক লইয়া চলা তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর।

আহারের সময় মাষ্টার বলিলেন—বাবা সতীশ, আমাকে কিছুদিন ভাত তোমাকে দিতে হবে। আমি তোমার ছেলেকে পড়াব।

কোর্ট যাইবার পোষাকে সতীশ সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিচর্য্যার তদারক করিতেছিল, সে বলিল—দেখুন একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু না বল্লেও নয়। আপনার মত কঠোর শাসনের মধ্যে ছেলেকে রাখা আমার মত নয়। শিশুরা হার্টলেস—

একান্ত ব্যথিত ভাবে মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন—হার্টলেস—আমি হার্টলেস, সতীশ?

সতীশ তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

মাষ্টারও আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। অন্ন-ব্যঞ্জন তখন সমস্ত যেন তিক্ত হইয়া গেছে।

হাত-মুখ ধুইয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—আমি চল্লাম সতীশ। অরুণের ওখানে যাচ্ছি।

অরুণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা মেসে নীচের তলায় একখানি ঘর ভাড়া লইয়া মাষ্টার সেইখানে বাসা গাড়িলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে যান। বৈকালে অরুণ আসে। তাহার সহিত আলোচনা হয়। বড় আনন্দে তাঁহার দিন কাটে। সন্ধ্যার পর একটা প্রাইভেট টিউসন জুটিয়াছে। পনের টাকা সেখানে পাওয়া যায়। সে টাকার দশ টাকা তিনি বাড়ীতে পাঠান। অরুণ এটুকু জানে না। সে নিজে তাহার বৃত্তির টাকা হইতে দশ টাকা করিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া থাকে।

সেদিন কিসের ছুটী ছিল। অরুণ দ্বিপ্রহরে আসিয়া দেখে একরাশ রঙীন কাগজ ও কতকগুলি তার লইয়া বাবা কি করিতেছেন। সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল—এগুলো কি হবে?

অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জার সহিত মাষ্টার কহিলেন—ফুল তৈরী করছিলাম। এগুলো বেশ বিক্রী হয়। আরও এক দিন করেছিলাম, দুটাকা লাভ হয়েছিল।

অরুণের চক্ষে জল আসিল, সে কহিল—বাবা, আমি চাকরী নিই—আপনি কষ্ট করবেন না।

স্থির দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিয়া তিরস্কারের সুরে তিনি শুধু কহিলেন—অরুণ!

অরুণ মাথা নত করিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন—আমার কল্পনা তুমি অরুণ, আপন খেয়ালে আপনাকে তুমি নষ্ট ক'র না। তাতে হয়ত আমার দেহের কষ্ট দূর হতে পারে কিন্তু মনের কষ্টে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর ঈষৎ হাসিয়া আবার তিনি কহিলেন—সাধনা সামান্য বস্তু নয় অরুণ। কৃচ্ছ্র-সাধন ভিন্ন সাধনা হয় না বাবা। আমার দিকে তাকিয়ো না, এ আমার সাধনা।

দিন কাটিতেছিল। মাস দুই কাটিয়া গেল। সে দিন সন্ধ্যায় আসিয়া অরুণ দেখিল—পিতা শুইয়া আছেন। অরুণকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—বাবা অরুণ, আমায় দেশে নিয়ে চল বাবা। সামান্য কাজ বাকী আছে—দিনও বোধ হয় অল্প বাকী। তোমার মায়ের কাছে যেতে চাই আমি।

* * *

বাড়ীতে আসিয়া তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন। যে কাজটুকু বাকী ছিল সেটুকু ধীরে ধীরেই করিতেছিলেন। কিছুদিন পর সেদিন শরীর যেন সুস্থ, একান্ত গ্লানিহীন বলিয়া বোধ হইল। দিন দুই পরই আবার তিনি বিপুল পরিশ্রম আরম্ভ করিয়া দিলেন।

স্ত্রী আপত্তি করিয়া কাগজ-কলমের ঘরে চাবী দিয়া বলিলেন—আগে তুমি বিষ এনে দাও আমাকে।

মাষ্টার কহিলেন—কি যে বল তুমি। তুমি কি চিরদিনই কিছু বুঝবে না?

চাবীটা ফেলিয়া দিয়া স্ত্রী কহিলেন—এই নাও কিন্তু একবার বল সব বুঝেছি আমি।

দ্বিপ্রহর রাত্রে মাষ্টার বিকৃত স্বরে ডাকিলেন—অরুণের মা।

তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, মাষ্টার বিছানার উপর পড়িয়া আছেন। নাক-মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

ডাক্তার আসিয়া বলিল—মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

ভোর রাত্রে প্রলাপের মত মাষ্টার বলিতেছিলেন—অরুণ বই শেষ হয়েছে। ফোরওয়ার্ডটা বাকী থাকল—দেখিস, তুই দেখিস।

* * *

কাহিনীর এইখানেই শেষ—কিন্তু আরও একটু আছে। সেটুকু না বলিলে শেষ হইবে, কিন্তু সম্পূর্ণ হইবে না।

অরুণ এম-এতে ফার্ষ্ট হইয়া ষ্টেট স্কলারশিপ লইয়া বিলাত গিয়াছে।

বছর দুই পরে বরুণ একদিন ছুটিয়া আসিয়া মাকে কহিল—মা বাবার ছবি আছে?

মা কহিলেন কেন?

—বাবার বই বেরিয়েছে মা। বিলেতের কাগজে কাগজে তাঁর প্রশংসা। দাদা লিখেছেন—বইএর দাম হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। সকলে ওখানে বাবার ছবি চায়, ছাপবে।

মা কহিলেন—কি লিখেছে তারা বরুণ?

—সেত সব ইংরেজী মা। এরপর বাংলা করে শোনাব। কিন্তু বাবার ছবি।

অকস্মাৎ মা একটি আত্ম-বিস্মৃত মুহূর্ত্তে বলিয়া ফেলিলেন—আছে বাবা, সে ত' দেবার নয়।

—কেন?

প্রৌঢ় বয়সেও মায়ের মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন—না বাবা। ছবি ত নেই।

সেদিন

—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেদিনেরে আজি করিতে কি পার মনে
পরাণে দোঁহার প্রথম ফুটিল হাসি!
উন্মনা তুমি বসিয়া বিজন বনে
হেলায় তুলিয়া ফেলিছ কুসুমরাশি।
পল্লবঘন শ্যামল শাখার ফাঁকে
প্রভাত-আলোকসুধার অমল ধারা
তোমার ও-তনু ঘিরিয়া হাজার পাকে
চপল ছন্দে নাচিয়া হয়েছে সারা।

অপরূপ সেই রূপের মাধুরী হেরি'
মূঢ় বিস্ময়ে নয়ন পলক ভোলে।
খুলিল নিমেষে শতদল মর্ম্মেরি'
কিসের আবেশে রহিয়া রহিয়া দোলে।
আজিও বুঝিতে নারিনু কি কব তারে
রূপমোহ সে কি? প্রেম কহি তবে কারে?

[২]

বহু চেষ্টায় সব সঙ্কোচ ভুলি'
কহিনু সেদিন নয়নের জলে ভাসি'—
'এ জীবনে শুধু তোমারেই ভালবাসি
তুমিই দিয়েছ প্রাণের দুয়ার খুলি'।'

অধরে চাপিয়া চম্পক-অঙ্গুলি
চাহিলে নয়নে নিমেষের তরে হাসি',
মুঠিতলে চাপি' মোরি দেওয়া ফুলরাশি
শুধালে সহজে 'কি ফল সেকথা তুলি'।'

আজিকে প্রভাতে একেলা বসিয়া ভাবি
কাননে যে ফুল ঝরে সে আবার ফোটে
রঙে ও রসেতে নূতন করিয়া সাজে।
প্রাণের এ ফুল প্রেমে যা উঠেছে কাঁপি'
শোণিতে রঙীন এ শতদলের ঠোঁটে
জীবনের সুর কভু কি আবার বাজে।

বুদ্ধকথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

পূর্ব্বে বলিয়াছি সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সদ্বংশজাত ও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিলেন। উভয়েই সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং সঙ্ঘ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ও প্রচারকার্য্যে বুদ্ধের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। সারিপুত্রে সাত্ত্বিক ভাব ও মৌদ্গল্যায়নে রাজসিক ভাবের প্রাবল্য ছিল। সারিপুত্র শান্ত, ধীর, যুক্তিতর্কপটু ছিলেন; মৌদ্গল্যায়ন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছিলেন বটে, কিন্তু সব বিষয়ে একটু জোর দেখাইতেন এবং অলৌকিক শক্তি (ইদ্ধি) দেখাইতে ভালবাসিতেন। বুদ্ধ সব বিষয়ে ইঁহাদের উপর নির্ভর করিতেন ও ইঁহাদের পরামর্শে চলিতেন; কোন প্রয়োজনীয় কাজ উপস্থিত হইলে প্রায়ই তিনি ইঁহাদের একজনকে পাঠাইতেন। আনন্দ বড় ভাল মানুষ ছিলেন; কোমলতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণ তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু বুদ্ধিটা তাঁহার একটু মোটা ছিল। বুদ্ধ প্রায়ই আনন্দের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতেন আবার ত্রুটি দেখিলে তিরস্কারও করিতেন। এই প্রধান ভিক্ষুত্রয় সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প বলিব।

সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন ও আনন্দ।

বুদ্ধ একবার সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে অমৃতে শ্রদ্ধার অন্ত হয় সারিপুত্র একথা মানেন কি না। সারিপুত্র বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি বুদ্ধের মতের উপর নির্ভর করেন না। ভিক্ষুরা ইহাতে সারিপুত্রের নিন্দা করিয়া বলিল, বুদ্ধের প্রতি তাঁহার ভক্তি নাই; বুদ্ধ বলিলেন, সারিপুত্রের কথার অর্থ তাহা নয়, তিনি বলিতেছেন যে, তিনি নিজেই ইহা উপলব্ধ করিয়াছেন। (ধ-কথা, ২।১০৬)

সারিপুত্র একবার বর্ষাবাস করিতে যাইবার পূর্ব্বে শত শত ভিক্ষুর কাছে বিদায় লইতেছিলেন, একজন ভিক্ষু বাদ পড়িয়া গেল। সারিপুত্রের চীবর এই ভিক্ষুর গায়ে ঠেকিল; সারিপুত্র ইচ্ছা করিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিলেন ভাবিয়া সে বুদ্ধের কাছে অভিযোগ করিল যে, সারিপুত্র তাহার গালে এক চড় মারিয়াছেন। বুদ্ধ সারিপুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইতে বলিলেন। মৌদ্গল্যায়ন ও আনন্দ জানিতেন একথা মিথ্যা, তাঁহারা মজা দেখিবার জন্য সব ভিক্ষুদের কাছে তাহাদের সারিপুত্রের "সিংহনাদ" শুনিতে আসিতে বলিলেন। কেহ জোর দিয়া কোন কথা বলিলে পালিভাষায় তাহাকে সিংহনাদ (সীহনাদো) বলা হয়। বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে সারিপুত্র ভিক্ষুকে চড় মারার কথা অস্বীকার করিয়া নিজের গাম্ভীর্য্য ও অক্রোধের প্রশংসা করিলেন। সারিপুত্রের "সিংহনাদ" ভিক্ষুদের সকলকেই স্পর্শ করিল, অপরাধী তখন আসিয়া তাহার পায়ে পড়িল। বুদ্ধ সারিপুত্রকে ভিক্ষুকে ক্ষমা করিতে বলিলেন। সারিপুত্র তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার কাছে নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, ভিক্ষুরা সারিপুত্রের উদারতার প্রশংসা করিল। বুদ্ধ বলিলেন যে, সারিপুত্রের মত লোকের পক্ষে ক্রোধ বা বিদ্বেষ পোষণ করা অসম্ভব, সারিপুত্রের মন বিশাল পৃথিবী, বা ইন্দ্রকীলা (ইন্দখীল) বা হ্রদের মত ধীর, আঘাত করিলেও বিচলিত হয় না। (ধ-কথা, ২।১৭৮)

অতুল নামক শ্রাবস্তীর একজন গৃহী ভক্ত রেবত নামক ভিক্ষুর কাছে উপদেশ শুনিতে গেলেন। রেবত নির্জ্জনে থাকিতেন, তিনি অতুলের কথার কোন উত্তর দিলেন না। তখন অতুল সারিপুত্রের কাছে গেলেন, সারিপুত্র তাহার কাছে সবিস্তারে ধম্মব্যাখ্যা করিলেন কিন্তু অতুলের মনে হইল সারিপুত্র বড় কঠিন ও দীর্ঘ উপদেশ দেন। তারপর অতুল আনন্দের কাছে গেলেন, আনন্দ অতি সংক্ষেপে সুবোধ্য করিয়া উপদেশ দিলেন। শেষে অতুল বুদ্ধের কাছে গিয়া ভিক্ষুত্রয়ের উপদেশে তাঁহার অসন্তোষের কথা বলিলেন। বুদ্ধ বলিলেন যে, লোকে চিরদিনই যে কথা বলে না, বা বেশী কথা বলে, বা অল্প কথা বলে তাহার নিন্দা করে; অমিশ্র নিন্দা বা প্রশংসার অতীত কেহই নহে, এমন কি সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও রাজারও লোকে নিন্দা করে; মূর্খের নিন্দা-প্রশংসায় কিছু যায় আসে না কিন্তু পণ্ডিত লোকে যদি নিন্দা বা প্রশংসা করে তাহাই যথার্থ নিন্দা বা প্রশংসা। (ধ-কথা, ৩।৩২৫)

ভিক্ষুদের উপাধ্যায়ের কাছে ধ্যান শিক্ষা করিতে হইত। সারিপুত্র তাঁহার একজন সার্দ্ধবিহারীকে শরীরের বিনাশশীলতা, কাম জয় করা ও সকল জিনিসের অস্থায়িত্ব বুঝাইবার জন্য শ্মশানে গিয়া গলিত শবের ধ্যান করিতে বলিলেন কারণ তরুণদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে। তরুণ ভিক্ষু বহু চেষ্টা করিয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। সারিপুত্র তাহাকে ধ্যানের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার অকৃতকার্য্যতার কথা শুনিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে বলিলেন কিন্তু তবু কোন ফল হইল না। তখন সারিপুত্র তাহাকে বুদ্ধের কাছে লইয়া গেলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, নবীন ভিক্ষু স্বর্ণকার-পুত্র; বুদ্ধ তাহাকে পদ্মের বিষয় ধ্যান করিতে বলিলেন, কারণ সোনার লতার উপর ফুলের কাজ করিয়া করিয়া তাহার মন অপবিত্র বিষয় ধারণা করিতে পারে না। একটি সদ্যস্ফুট পদ্মকে চক্ষুর সম্মুখে বিবর্ণ, অবশ ও শুখাইয়া যাইতে দেখিয়া ভিক্ষুর সকল পদার্থের অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মিল। (ধ-কথা, ৩।৪২৫)

সারিপুত্রের ক্রোধ নাই একথা শুনিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ পিছন হইতে সারিপুত্রকে আঘাত করিলেন কিন্তু সারিপুত্র গ্রাহ্য করিলেন না। ব্রাহ্মণ সারিপুত্রকে তখন স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। সারিপুত্রকে মারিবার জন্য ভিক্ষুরা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিল কিন্তু সারিপুত্র তাহাদের ব্যাপার বুঝাইলেন। বুদ্ধ একথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে অপরকে আঘাত করে সে ব্রাহ্মণই না (ধ-কথা, ৪।১৪৫)

সারিপুত্র অশ্বজিতের দিকে ফিরিয়া মাথা নোয়াইতেন ও হাত তুলিয়া নমস্কার করিতেন কারণ অশ্বজিতের কাছেই তিনি প্রথম ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া বুদ্ধের দলে যোগ দিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল যে সারিপুত্র দিক্‌পূজা করেন, তাহারা বুদ্ধের কাছে গিয়া সারিপুত্রের কুসংস্কারের কথা জানাইল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের সারিপুত্রের মাথা নোয়াইবার ও হাত তুলিয়া নমস্কার করিবার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। (ধ-কথা, ৪।১৫০)

সারিপুত্র রাহুল ও অন্য কয়েকজন ভিক্ষুকে লইয়া নালন্দায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা সারিপুত্রের মাতা রূপসারির গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আহারে যখন বসিলেন তখন রূপসারি আসিয়া গৃহসম্পত্তি ছাড়িয়া ভিক্ষু হইবার জন্য পুত্রকে যথেষ্ট কটু কথা বলিতে লাগিলেন, "যেমন বুদ্ধি, তাই মাথা ন্যাড়া করিয়া ন্যাড়াদের সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, চিরদিন ভিক্ষা করিয়াই খাইও!" ইত্যাদি। আমাদের দেশের অনেক মাতা-পুত্র গতানুগতিক হইতে একটু বিভিন্ন হইলে এইরূপই বলিয়া থাকেন! সারিপুত্র কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে খাইয়া যাইতে লাগিলেন। নালন্দা হইতে ফিরিয়া রাহুল বুদ্ধকে একথা জানাইলে বুদ্ধ সারিপুত্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন। (ধ-কথা ৪।১৬৪)।

রূপসারি পুত্রের গৌরব বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক পরে, সারিপুত্র তখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; সে কথা পরে বলিব। সারিপুত্রের দুই ভগ্নীও ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন।

একবার বুদ্ধ বৈশালী হইতে শ্রাবস্তীতে যাইবার সময় "ছয় ভিক্ষু"র দল আগে গিয়া নিজেরা সব জায়গা অধিকার করিয়া লইল; সারিপুত্র পিছনে আসিতেছিলেন, ছয় ভিক্ষুরা কেহ সারিপুত্রের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিল না; সারিপুত্র বাহিরে বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রত্যুষে বুদ্ধ নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া কাসিলেন, সারিপুত্রও কাসিলেন।

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহিরে কে?'

"ভদন্ত আমি সারিপুত্র।"

"সারিপুত্র, তুমি এখানে বসিয়া আছ কেন?" সারিপুত্র এ ব্যাপার বলিলেন। বুদ্ধ ইহাতে পরে ভিক্ষুদের ডাকাইয়া সারিপুত্রকে জায়গা ছাড়িয়া না দিবার জন্য ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সঙ্ঘে সারিপুত্রের স্থান শুধু তাঁহারই নীচে (চুল্লবগ্‌গ, ৬।৬)। সারিপুত্রকে "ধর্ম্মসেনাপতি" আখ্যা পরে শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় সঙ্ঘে তাঁহার স্থান কত উচ্চে ছিল।

আর একবার সারিপুত্র গভীর রাত্রে আসিয়া পৌঁছিলে, তাঁহাকে দেখিয়া ভিক্ষুরা আনন্দে মহা কলরব লাগাইয়া দিল। ইহাতে বুদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল ও তিনি কুটিরের বাহিরে আসিয়া ভিক্ষুদের এবং সারিপুত্রকেও গোলমাল করার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। বুদ্ধ গোলমাল একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

সারিপুত্রের বুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্পদিন আগে সারিপুত্র বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন "ভদন্ত, আপনার প্রতি

আমার এরূপ শ্রদ্ধা যে আমার মনে হয় আপনার চেয়ে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এখন নাই এবং হইবেনও না।" বুদ্ধ বলিলেন, "সারিপুত্র,' তোমার মুখে খুব বড় কথা শুনা যাইতেছে, তুমি সব বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিয়া সিংহনাদ করিতেছ (উলারা খো তে অয়ম্ সারিপুত্ত আসভী বাচা ভাসিতা, একম্‌সো গহিতো সীহনাদো নাদিতো)! তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ অতীতের যে অর্হৎ বুদ্ধগণ তথাগতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকেই জান, তোমার মন দিয়া তাঁহাদের মন বুঝিয়াছ, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, জ্ঞান ও মত কিরূপ ছিল এবং তাঁহাদের কি গতি হইয়াছে তাহা জান ?"

"না ভদন্ত, তাহা নয়।"

"তবে তুমি নিশ্চয় সুদীর্ঘ ভবিষ্যতের যে অর্হৎ বুদ্ধগণ তথাগতত্ব প্রাপ্ত হইবেন তাঁহাদের সকলকেই জান, তোমার মন দিয়া··

"না ভদন্ত, তাহা নয়।"

"সারিপুত্র, অন্ততঃ তবে তুমি আমার মনের সব কথা

"না ভদন্ত, তাহাও নয়।"

"সারিপুত্র, তবে দেখিতেছি যে তুমি অতীত ও ভবিষ্যতের তথাগতদের জান না। তবে তুমি কিরূপে ওরূপ বড় বড় কথা বলিয়া সিংহনাদ করিতেছ?" (দীঘনিকায়, মহাপরিনিব্বাণ-সুত্ত)।

কোনরূপ বাড়াবাড়িই বুদ্ধ পছন্দ করিতেন না। একবার একজন ভিক্ষু তাঁহার প্রতি এত ভক্তিবিহ্বল হইয়াছিল যে তাহার কাছে বসিয়া সে হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত বর্ষাবাস আরম্ভ হইলে বুদ্ধ এই ভিক্ষুকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলিলেন। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,"যে ধর্ম্মকে দেখে সেই আমাকে দেখে।" (ধ-কথা, ৪।১১৮)

একজন ব্রাহ্মণী, আরামে গিয়া চারজন স্থবির ভিক্ষুকে আহার করাইবার জন্য লইয়া আসিতে ব্রাহ্মণকে বলিল। ব্রাহ্মণ গিয়া চারজন শ্রমণেরকে লইয়া আসিল, ব্রাহ্মণী ইহাদের তাড়াইয়া দিল। তখন ব্রাহ্মণ আবার গিয়া সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে লইয়া আসিল কিন্তু ইঁহারা আসিয়া যখন শ্রমণেরদের তাড়াইয়া দিবার কথা শুনিলেন তখন তাঁহারাও চলিয়া গেলেন (ধ-কথা, ৪।১৭৬)

রাজগৃহের একজন গৃহস্থ গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া বড় একখণ্ড চন্দনকাঠ পাইল। এই চন্দনকাঠে একটি ভিক্ষাপাত্র বানাইয়া পর পর কয়েকটি লম্বা বাঁশে বাঁধিয়া তাহার মাথায় পাত্রটি ঝুলাইয়া গৃহস্থ খুঁটিটি খাড়া করিয়া মাটিতে পুতিল, ইহাতে ভিক্ষাপাত্রটি মাটি হইতে অনেক উপরে বাঁশের মাথায় থাকিল। তারপর গৃহস্থ ঢোল পিটাইয়া দিল যে, যে-শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অলৌকিক বলে শূন্যে উঠিয়া পাত্রটি নামাইতে পারিবে উহা তাহারই হইবে। সেই সময়ে অনেক সম্প্রদায় অলৌকিক শক্তির দাবী করিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল, কাজেই সেখানে অনেক লোকের সমাগম হইল। সদলবলে মহাবীরও উপস্থিত হইলেন। অনেকে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। মহাবীর চাতুরী অবলম্বন করিলেন, তিনি নিজ শিষ্যদের গৃহস্থের কাছে গিয়া বলিতে শিখাইয়া দিলেন যে সামান্য একটা জিনিষের জন্য শূন্যে উঠিবার হাঙ্গামা না করিয়া গৃহস্থ যেন মহাবীরকেই পাত্রটি দিয়া দেন ; গৃহস্থ কিন্তু ছাড়িল না, সে বলিল, শূন্যে উঠিতেই হইবে। তখন মহাবীর শিষ্যদের সঙ্গে এই ফিকির করিলেন যে তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া এক হাত ও এক পা তুলিয়া ঠিক যেন শূন্যে উঠিতে যাইতেছেন এরূপ ভাণ করিবেন আর তাঁহার শিষ্যেরা "কি করিতেছেন? সামান্য একটা কাঠের পাত্রের জন্য জনসাধারণের কাছে অর্হত্বের গুপ্তশক্তি প্রকাশ করিবেন না" বলিয়া তাঁহার হাত পা ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিবে। এইরূপ ফন্দি আঁটিয়া মহাবীর সদলে গৃহস্থের কাছে গিয়া আবার অনুরোধ করিলেন যে গৃহস্থ শূন্যে উঠিবার জেদ ছাড়ুন। গৃহস্থ রাজী হইল না, তখন মহাবীর শিষ্যদের "আচ্ছা বেশ! চলিয়া এস চলিয়া এস" বলিয়া বাঁশের তলায় গিয়া বলিলেন, "এইবার আমি শূন্যে উঠিব," এই বলিয়া তিনি এক হাত এক পা তুলিয়া শূন্যে উঠিবার ভাণ করিলেন ও শিষ্যেরা পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত তাঁহাকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। মাটিতে পড়িয়া মহাবীর গৃহস্থকে বলিলেন, "গৃহস্থবর, আমার শিষ্যেরা আমাকে শূন্যে উঠিতে দিবে না, তুমি পাত্রটি আমাকেই দিয়া দাও।" কিন্তু গৃহস্থ ইহাতেও ভুলিল না। পাঠক মনে রাখিবেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দলেরা পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এ উহার বিরুদ্ধে যাহা বলে তাহাতে মিথ্যা বা অত্যুক্তি

থাকার সম্ভাবনা বেশি বলিয়া খুব সাবধানে উহা গ্রহণ করিতে হয়। বুদ্ধের কোন কোন শিক্ষার অতি অদ্ভুত ও মিথ্যা বিকৃতি জৈনদের শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে; বুদ্ধ নিজে না করিলেও তাঁহার ভক্ত শাস্ত্রকার ও গল্প-লেখকরা অপর দশজনের মতই মানুষ ছিলেন, তাহাদিগের পক্ষে মহাবীরের বিরুদ্ধে বিকৃতোক্তি করা মোটেই অসম্ভব নয়।

মৌদ্গল্যায়ন ও ভিক্ষু পিণ্ডোল-ভারদ্বাজ সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। মৌদ্গল্যায়নের প্ররোচনায় পিণ্ডোল শূন্যে উঠিয়া পাত্রটি নামাইয়া আনিলেন। বুদ্ধ অলৌকিক শক্তি দেখাইবার জন্য পিণ্ডোলকে ভৎ‍র্সনা করিয়া পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন যে, প্রয়োজন হয় তিনি নিজে "ইদ্ধি" দেখাইবেন, অন্য কোন ভিক্ষুর তাহা দেখাইবার দরকার নাই (ধ-কথা, ৩।১৯৯; চুল্লবগ্‌গ. ৫।৮)। বিম্বিসার এই বিষয়ে বুদ্ধকে এরূপ বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, রাজার আম-বাগানের ফল একা বিম্বিসারই খাইতে পারেন, অন্যে কি তাহা পারে? এই ঘটনা বুদ্ধের চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় ঘটিয়াছিল।

কথিত আছে বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে নিজ "ইদ্ধি" দেখাইবেন বলিলেন এবং এই ঘটনার চার মাস পরে শ্রাবস্তীতে বহু-লোকের সম্মুখে আকাশমার্গে উত্থান, একদিনে আঁটি হইতে আমগাছ জন্মান, স্বর্গে গমন প্রভৃতি বহু "ইদ্ধি" দেখাইয়া লোককে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সাধু সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তি দেখাইবার কথা আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ; অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধ শাস্ত্রও বুদ্ধের অলৌকিক শক্তির বর্ণনাগ্রামে পরিপূর্ণ। গোঁড়া খৃষ্টানেরা এখনও জলের উপর হাঁটা, কয়েকখানি মাত্র রুটিতে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান, শয়তানের প্রলোভন জয়, কবর হইতে পুনরুত্থান, অকৃত-পুরুষ-সহবাসে কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি বাইবেলোক্ত উপাখ্যানের ভিত্তির উপর যিশুর ঈশ্বর পুত্রত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বুদ্ধের বা অন্য কাহারও মহত্ত্ব এগুলির উপর নির্ভর করে না, এগুলি সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মানুষ হিসাবে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব কিছু মাত্র কমে না, এই জন্য এ সবের আলোচনা আমার নিরর্থক মনে হয়। আরও কথিত আছে এই সময় একবর্ষা বুদ্ধ স্বর্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতা ও তাঁহার মাতা মায়াদেবীর কাছে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহাকে এই সময় কোথাও দেখা যায় নাই এবং কিছুদিন পরে তিনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া আবার শিষ্যদের দেখা দিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, নির্জ্জনতাপ্রিয় বুদ্ধ এই বর্ষা একাকী কোথাও গোপনে কাটাইয়াছিলেন। তখনও তিনি তত বিখ্যাত হন নাই বলিয়া শিষ্যেরা বা অন্য লোকে ইহার কোন খবর রাখে নাই এবং ইহাই কালে স্বর্গবাসের আখ্যানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বাদশ বর্ষার সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছিল এবং অশ্ব-ব্যবসায়ীরা ভিক্ষুদের আহার যোগাইত। মৌদ্গল্যায়ন "ইদ্ধি"-বলে আহার সংগ্রহের কথা বলিলেন কিন্তু বুদ্ধ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় বিমলা নাম্নী একজন রূপজীবিনী মৌদ্গল্যায়নের বাসস্থানে আসিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি তাহাকে গালাগালি করিয়া মূত্র পুরীষময় শরীরের রূপের গর্ব্বের জন্য নিন্দা করিয়াছিলেন। বিমলা ইহাতে লজ্জিত হইয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিল। (থেরীগাথা, ৭২; থেরগাথা, ১১৫০-৫৭)

শ্রমণদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের জন্য কেহ কোন দান পাঠাইলে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন উহা তাঁহাদের কাছে পাঠাইতে বলিয়াছিলেন, ইহাতে ভিক্ষুরা মনে করিল তাঁহারা বুঝি দ্রব্যলোভী; বুদ্ধ ভিক্ষুদের ভুল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন (ধ কথা, ৪।১৮৪)।

বুদ্ধের জীবনের শেষভাগে আনন্দ তাঁহার সেবক, সহচর ও নিত্যসঙ্গী ছিলেন। সঙ্ঘে প্রবেশের সময় হইতেই আনন্দের এ পদ লাভ হয় নাই। প্রথম প্রথম ভিক্ষুরা সুবিধা মত

আনন্দের বুদ্ধ সেবক

পালা করিয়া বুদ্ধের পরিচর্য্যা করিত কিন্তু ইহাতে অসুবিধা হইত। পরিচারক ভিক্ষু সব সময়ে কাজ বুঝিত না ও অবাধ্যতা করিত। বুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় মেঘিয় নামক একজন ভিক্ষু তাঁহার পরিচারক ছিল। মেঘিয় একটি স্নিগ্ধ আম্রবন দেখিয়া সেখানে গিয়া ধ্যানাভ্যাস করিবার ইচ্ছা করিল। বুদ্ধ কয়েকবার নিষেধ করিয়া শেষে তাহাকে যাইতে দিলেন, কিন্তু সেই আম্রবনে কিছুক্ষণ থাকিবার পর মেঘিয়ের কামেচ্ছা উদ্দীপ্ত হইল। সে ফিরিবার পর বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়া এক... জানিয়া বলিলেন, যাহার চিত্তবিমুক্তি সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহ...

পাঁচটি জিনিষের প্রয়োজন, যথা সদ্‌বন্ধু, সংযম, সুচিন্তা, সুঅভ্যাস ও প্রজ্ঞা। আর একবার ভিক্ষু নাগসমাল বুদ্ধের পরিচারক ছিল। স্থানান্তরে যাইবার সময় এক চৌমাথায় আসিয়া নাগসমাল বলিল, "ভদন্ত, এই দিকে আসুন, আমাদের এই পথে যাইতে হইবে ;" বুদ্ধ বলিলেন, "নাগসমাল এই দিকে এস, আমাদের এই পথ দিয়া যাইতে হইবে।" বুদ্ধ কয়েকবার বলিলেন কিন্তু নাগসমাল শুনিল না, সে চৌমাথার মাঝখানে বুদ্ধের পাত্র ও চীবর নামাইয়া রাখিয়া "ভদন্ত, এই আপনার পাত্র ও চীবর থাকিল" বলিয়া নিজের ইচ্ছামত পথে চলিয়া গেল।

এই সব কারণে বৃদ্ধ বুদ্ধ হইলে একদিন ভিক্ষুদের ডাকাইয়া বলিলেন, বিভিন্ন ভিক্ষু তাঁহার পরিচর্য্যা করিলে তাঁহার নানারূপ অসুবিধা হয় ; তিনি চাহেন যে ভিক্ষুদের মধ্যে একজন তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করুক। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সোৎসাহে এই কাজের ভার লইতে চাহিলেন কিন্তু বুদ্ধ তাঁহাদের নিরস্ত করিলেন কারণ তাঁহাদের আরও গুরুতর কাজ আছে। তখন ভিক্ষুরা আনন্দকে এই ভার লইতে বলিলেন কিন্তু আনন্দ সলজ্জ-কুণ্ঠিত ভাবে এক পাশে বসিয়া থাকিলেন। শেষে আনন্দ বলিলেন, "ভগবান আমার মনের ভাব অবগত আছেন, যদি তাঁহার অনভিপ্রেত না হয় তবে আমাকে এই মহাসম্মান অর্পণ করুন।" বুদ্ধ সানন্দে আনন্দের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন ও সঙ্ঘ যথারীতি জ্ঞপ্তিদ্বারা আনন্দকে বুদ্ধ-সেবকত্বে বরণ করিলেন। আনন্দ নির্লোভ, নিরভিমান হইয়া হর্ষের সহিত বুদ্ধের সেবা করিল। বুদ্ধের জন্য ভক্তেরা বস্ত্রাদি দান করিলে আনন্দ কখনও তাহা হইতে নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করিতেন না, বুদ্ধকে প্রদত্ত ভিক্ষারও তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন না ; তিনি বুদ্ধের সঙ্গে এক কক্ষে কখনও শুইতেন না এবং বুদ্ধকে কেহ আহারের নিমন্ত্রণ করিলে নিজেকেও নিমন্ত্রিত বোধ করিতেন না। এগুলি সবই তাঁহার ভক্তি, বিনয় ও আনুগত্য-প্রসূত ছিল। তিনি বুদ্ধের সঙ্গে সর্ব্বত্র যাইতেন, বুদ্ধের সঙ্গে লোকজন দেখা করিতে আসিলে আনন্দ তাঁহাদের বসাইয়া বুদ্ধকে খবর দিতেন ও বুদ্ধের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়াই লোককে প্রবেশ করাইতেন ; যে কোন সময়ে বুদ্ধের কাছে যাইবার তাঁহার অধিকার ছিল। বুদ্ধ কোথাও কোন উপদেশ দিলে আনন্দ পুনরায় বুদ্ধের কাছে তাহার পুনরাবৃত্তি শুনিতেন। সংঘ-সংক্রান্ত ও ভিক্ষুদের খবরাখবর বুদ্ধ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন এবং তাঁহার আদেশ ব্যবস্থাদি আনন্দের মুখেই সংঘকে জানান হইত।

আনন্দের সহৃদয়তা, সরলতা ও কোমল হৃদয়ের কথা বলিয়াছি। বুদ্ধের সঙ্গে কথা বা কাজ থাকিলে লোকে আগে আনন্দকে ধরিত ; আনন্দ হাসিমুখে সকলের প্রয়োজন সমাধা করিয়া দিতেন। স্ত্রীলোকদের প্রতি আনন্দ কৃপালু ছিলেন ও স্ত্রীলোকরাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার রাণীদের ও অন্তঃপুরিকাদের কাছে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বুদ্ধ আনন্দকে এই কাজে পাঠাইয়াছিলেন (ধ-কথা, ১৩৪০)। স্ত্রীলোকদের আনন্দ-প্রিয়তার আর একটি প্রমাণ, এই যে হিউয়েন-ৎসিয়াং ভারত-ভ্রমণের সময় মাতুরাতে দেখিয়াছিলেন যে পর্ব্বদিনে বৌদ্ধরা বুদ্ধ, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের স্মৃতিস্তূপগুলির পূজা করে, বালকেরা রাহুলের স্তূপে পূজা করে এবং স্ত্রীলোকেরা আনন্দের স্তূপে পূজা দেয়। (ক্রমশঃ)

আর একদিক

১৯০০ সনে নর্থ ক্যারলিনার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এডগার টাদট্ নামীয় এক ভদ্রলোক একটি মিশন স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭ সনে উহা সংশ্লিষ্ট একটি হাসপাতাল ও অনাথ-আশ্রম সহ লীজ ম্যাকরে ইনষ্টিটুটে রূপান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে ঐ অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ মাইল স্থানের মধ্যে সকল গ্রামের লোকই ঐ হাসপাতালের চিকিৎসাধীন—অনাথ-আশ্রমে প্রায় একশত ছেলেমেয়ে মানুষ হইতেছে। ১৯২৯ সনে মিশন স্কুলটি একটি জুনিয়র কলেজে উন্নীত হয়। গ্রীষ্মকালে কলেজ বসে না, পরিবর্ত্তে কলেজের বাড়ীতে একটি গ্রীষ্মাবাস পরিচালিত হয়, পিনাক্‌ল ইন। যদি গ্রীষ্মকালে ওখানে বেড়াইতে যান, দেখিবেন, ষ্টেশনের মুটে, হোটেলের ঝি, কেরাণী, ঠাকুর, ধোবা—সব ফিট্‌ফাট, ছিমছাম—দেখিয়া আপনি আশ্চর্য্য হইবেন। এই ঝি, চাকর, ঠাকুর, সবাই যে সমস্ত শীতকাল ধরিয়া কলেজের ছাত্রছাত্রী ছিল—একথা তো আপনার জানা নাই। গ্রীষ্মকালে যিনি হোটেলের ম্যানেজার, তিনিই যে শীতকালে কলেজের প্রেসিডেণ্ট এ কথাই বা কে জানে ?—এখানকার ছাত্রছাত্রীরা বৎসরের ছ'মাস চাকরি করিয়া অপর ছ'মাসের কলেজের খরচ জোগায়।

পদ্মা

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কলিকাতা

বিনয় আজ দিন পনেরো হইল কলিকাতায় আসিয়া হ্যারিসন রোডের একটি বোর্ডিঙে আশ্রয় লইয়াছে। মফঃস্বলের ছেলে প্রথমে কলিকাতায় আসিলে যেমন হয়, তেমনই হইয়াছে। কলিকাতা তাহার নিকটে একটা বৃহৎ জনতা, একটা বাজারমাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। এটা যে বাংলাদেশের হেড-আফিসমাত্র নয়, এতগুলা লোকের বাস-স্থান, আশ্রয়, একথা তাহার মনেই হয় না। ইতিপূর্ব্বে তাহার যে জীবনটা ছিল, তাহার যেন খেই হারাইয়া গিয়াছে। নিতান্ত অভাগার মত বন্ধুবান্ধবহীন এই বিরাট জনতার মধ্যে, সে অতীতের প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিয়মিত কলেজে যায়, বিকালে বেড়াইতে যায়, কিন্তু সবই যেন কেমন তন্দ্রাবিষ্টের মত। সম্মুখেই পথের লোক-চলাচল, যেন কতদূর দিয়া!

কলেজ হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসে। পথের জনতা, ট্রাম, বাস্, মোটর। বেলা পড়িতে থাকে, রাস্তার ওপারের বড় বাড়ীটার ছায়া দীর্ঘতর হইতে থাকে। উড়ে কুলিরা 'হোসে' করিয়া জলধারায় পথ ধুইয়া যায়, তপ্ত পথ হইতে বাষ্পের ভাপ ওঠে, তারপরে মৃদু একটি সিক্ত গন্ধ! আরো বেলা পড়ে, শিয়ালদহের দিকে যাত্রীর দল ছুটিতে থাকে। বিনয় বারান্দা ছাড়িয়া উঠে না। হয়তো এক পাক ঘুরিয়া আসিল, আবার সেই বারান্দায়! সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া যায়, শিয়ালদহের যাত্রী, কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়া চলিতেছে, বিলম্বিত ট্যাক্সিগুলা উড়িয়া চলে। শিয়ালদহের যাত্রীদের কেন যেন অত্যন্ত আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেদের কাছে শিয়ালদহ ষ্টেশনটি কতই যেন আদরের বস্তু। বিনয় হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখে, ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। তবে তো ওই যাত্রীরা রাজসাহীর ট্রেনের জন্যই চলিয়াছে। তাহার ইচ্ছা করে, ওদের সঙ্গে চলিয়া যায়; অন্তত একবার উহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া আসে। কোথায় যাবেন? রাজসাহী। আমারো বাড়ী সেখানে। চরচিলমারী চেনেন? কিন্তু সে বসিয়াই থাকে!

এক একদিন রাত্রে বাদলা-বাতাসে খড়খড়ির শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যায়। ঝম্ ঝম্ রবে বৃষ্টি, জানলায়, দরজায় ভিজে হাওয়ার আছড়ানি।

সেই অদ্ধ ঘুমে জাগরণে, তাহার মনে হয়, সে রাজসাহীর বাড়ীতেই আছে। অবিরাম বৃষ্টিতে এতক্ষণে পদ্মা জাগিয়া উঠিয়াছে। জলে নৌকা নাই, তীরে লোকজন নাই, কেবল এপার হইতে ক্ষ্যাপা হাওয়া ওপারের দিকে বৃষ্টির ছাটে ভর করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

কালো পদ্মা, কালো রাত্রি! হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, প্রেতের হাসির মত পদ্মার স্রোতের দীপ্তি, আর অতি দূরে ওই ছায়া-অস্পষ্টতাটি চর-চিলমারী! কিন্তু ভাল করিয়া তাহার ঘুম ভাঙিতেই বোঝে, এ তাহার কলিকাতার মেস্। বৃষ্টি পড়িতেই থাকে, বিনয় পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

এই তো তাহার কলিকাতার জীবন। এখানে যে সহস্র সহস্র জীবনের ধারা মিলিয়াছে, তাহা পদ্মার চেয়ে কত বড়, কত গভীর। কিন্তু স্রোতে আজিও বিনয়ের জীবনধারা মিলিত হয় নাই। সে দূরে, তীরে দাঁড়াইয়া আছে, দর্শক মাত্র। মহা-ধীবর আকস্মিকতা, ঘটনাচক্রের জাল ফেলিয়া অবহেলাচ্ছলে কত লোককে একসঙ্গে টানিয়া তুলিতেছে। পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত, অপরিচিত, নানা জীবন মিলিয়া কেমন তাল পাকাইয়া যাইতেছে। সেই মহা-ধীবর এতগুলি জীবন তুলিয়া ফেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, এবং তারপর হইতে তাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অভিরুচি অনুসারে কত কি সুখদুঃখের খেলা পাতিয়া বসে। আবার হঠাৎ কখন অতর্কিতে সেই জাল আসিয়া ঘাড়ে পড়ে, সমস্ত ভাঙিয়া যায়। আবার কাহার সঙ্গে কাহাকে মিলাইয়া দেয়, কোথায় টানিয়া লইয়া যায়, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কিছু বুঝিবার উপায় থাকে না।

এই ধীবর একদিন বিনয়কে চর-চিলমারীতে টানিয়া তুলিয়াছিল ; সেই আবার আজ তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এখানকার ঘটনাচক্রের জালে এখনো সে পড়ে নাই। এই মহাজালিকের হাতে কাহারো নিষ্কৃতি নাই, তবে মাঝে মাঝে বিশ্রাম আছে বটে।

হঠাৎ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকের সহিত বিনয়ের পরিচয় ঘটিয়া গেল। অধ্যাপক রায় ইতিহাসের ধারার অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। বিনয় কেমন উসুখুসু করিতেছিল। অধ্যাপক রায় বলিলেন, চৌধুরী তোমার কি কিছু ব'লবার আছে ?

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্লাসশুদ্ধ ছেলেরা অবাক্ !

বিনয় বলিল, ইতিহাসের ধারার অবিরতি কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

—কেন বল তো ?

– শুধু ইতিহাস কেন, ক্রমবিকাশবাদ, মানবজীবন, পদার্থবিজ্ঞান কোনটা সম্বন্ধেই একথা পুরাপুরি খাটে না।

—আরো একটু স্পষ্ট করে বল !

বিনয় বলিতে লাগিল। অধ্যাপকের উৎসাহে তাহার দ্বিধা কাটিয়া গেল।

—পদার্থবিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারে এই সত্যটাকে নূতন ভাবে দেখা গিয়েছে। ক্ষুদ্রতম বস্তু-কণিকা পরস্পরকে আবর্ত্তিত করে, এই ধারণাই এতদিন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণ হয়েছে, এই আবর্ত্তনটা সম্পূর্ণ ভাবে অবিরাম নয়। মাঝে মাঝে বস্তুকণিকাগুলি অকারণে একটা করে উল্লম্ফন দিয়ে পূর্ব্বতন ধারাকে খানিকটা পরিমাণে অস্বীকার করে নেয়।

ক্লাশের ছেলেরা নিস্তব্ধ।

রায় বলিলেন, বেশ, এবার এই বিজ্ঞানের সত্যটাকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর।

—ইতিহাসের ধারাতেও মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে, যা, পূর্ব্বের সঙ্গে অপূর্ব্বের অসমন্বয় ঘটিয়ে দেয়।

—কি রকম ?

—কোনো বড়লোক বা বড় ঘটনা দুই—এ কাজ করতে পারে। যেমন নেপোলিয়ান। তাঁর কুড়ি বছরের কর্ম্মজীবন অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে এমন প্রভেদ এনে দিয়েছিল, যাকে ঘটনাস্রোতের অবিরতি কখনোই বলা যায় না। কিম্বা গত মহাযুদ্ধটা—চার বৎসরে মানব জীবনের সমস্ত পৌর্ব্বাপর্য্য একেবারে ছিন্ন করে দিয়েছে।' এই তো অনির্দ্দেশ্যতা, এর সম্ভাবনা তো সর্ব্বদাই রয়েছে।

অধ্যাপক খুসি হইয়া বিনয়ের প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, তাহার কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত।

ক্লাসের পরে বিনয়কে ডাকিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কি রকম পড়াশুনা করিয়াছে, তাহা জানিয়া লইলেন এবং বাড়ি ফিরিবার সময় বিনয়কে তাঁহার সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

বিনয় আজ কলেজে আসিবার সময় এত কাণ্ড যে ঘটিবে, স্বপ্নেও ভাবে নাই।

অধ্যাপক রায়, অর্থাৎ অবিনাশ বাবুর বৈকালিক চায়ের টেবিলে নিয়মিত অতিথিরা আসিয়া এখনো উপস্থিত হয় নাই। অবিনাশ বাবু, তাঁহার কন্যা পারুল ও বিনয়।

অবিনাশবাবু বলিলেন—মা পারুল, বিনয়কে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে দাও। পারুল চা ঢালিতে লাগিল। এই অবসরে বিনয় অবিনাশবাবু ও তাঁহার কন্যাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

অবিনাশবাবু দীর্ঘাকৃতি, কপালটা গড়াইয়া চুলের মধ্যে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মাথার চারিদিকের চুল পাকিয়া উঠিয়াছে, মধ্যভাগ সম্পূর্ণ কাঁচা। রোম-বহুল ভারি দুইটি ভ্রূ। প্রশস্ত কপালের সহিত তাল রাখিতে পারে এমন মাংসল চিবুক ; উন্নত নাসিকা, চিবুক ও কপালের মাঝে মানদণ্ডের মত। অবিনাশবাবু বোধ করি একটু তোৎলা, সব সময় বোঝা যায় না, কেবল যে শব্দটার উপরে তাঁহার জোর দিবার প্রয়োজন, সেখানে আসিয়া জিহ্বার জড়তা প্রকাশিত হয়। ইহাতে তুচ্ছ কথাটাও অকাট্য একটা যুক্তির মত শোনায়।

পিতাকে লক্ষ্য করা যেমন সহজ, কন্যা তেমন নহে। চা-প্রস্তুত-পরা পারুলের দৃষ্টি মাঝে মাঝে বিনয়ের চক্ষুকে বাধাগ্রস্ত করিতে লাগিল। মেয়েটির বয়স ষোল হইতে বিশের মধ্যে যে কোনোটা এবং কৃপণের টাকার থলির মধ্যে অর্দ্ধ-লুক্কায়িত উজ্জ্বল স্বর্ণমুদ্রাটির মত, তাহার অধরৌষ্ঠে চাপা

একটি মৃদুহাস্য। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল এবং সতর্ক ; বিনয় পাঁচ ছয় বার অপ্রস্তুত হইয়া বুঝিয়াছিল, সে-দৃষ্টি এড়াইয়া চলা তাহার সাধ্য নয়।

পারুল চায়ের পেয়ালা অগ্রসর করিয়া দিল। বিনয় তাহা টানিয়া লইতে ঢিলা পাঞ্জাবীর আস্তিনে বাধিয়া সশব্দে মাটিতে পড়িয়া পেয়ালা ভাঙ্গিয়া গেল। অবিনাশবাবু চমকিয়া উঠিলেন, বিনয় লাল হইল, পারুল উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিয়া উঠিল।

—ছিঃ মা পারুল! হাস্‌তে নেই। আর এক পেয়ালা শীগ্‌গীর করে' দাও।

পারুল অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায় চা করিতে লাগিল, বিনয় লক্ষ্য করিল, এবার তাহার অধরের স্বর্ণমুদ্রাটি অন্তর্হিত হইয়াছে, চোখ দুইটির উজ্জ্বলতা ম্লান।

এমন সময়ে রায়-গৃহিণী সর্ব্বেশ্বরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাথায় খাটো, প্রৌঢ়ত্বের স্থূলতা শরীরে দেখা দিয়াছে। মুখে সর্ব্বদা হাসি ও পান। একটি বিপুল পানের বাটা সঙ্গে বিরাজ করে। অবিনাশবাবু বিনয়ের পরিচয় দিলেন।

সর্ব্বেশ্বরী বলিলেন—তা বেশ, বেশ, তোমরা তাহ'লে জমিদার! ক'বিঘে জমি তোমাদের আছে?

এই 'বেশ, বেশ', কথাটি সর্ব্বেশ্বরীর মুদ্রা দোষের-মধ্যে, সংবাদ ভালই হউক, মন্দই হউক, বেশ, বেশ বলা চাই। অনেক সময় এমন বিপদ ঘটে, কাহারো মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অভ্যাসমত বলিয়া উঠেন, বেশ, বেশ! লোকে স্তম্ভিত হইয়া যায়।

—আমরাও জমিদার বটে, কার্ত্তিকপুরের নাম শোনা আছে? এই মুর্শিদাবাদ জেলায়। আমাদেরও অনেক জমি আছে। পৈতৃক পঁয়ত্রিশ বিঘে, আর ওঁর কেনা সতেরো বিঘে, এই হ'ল গিয়ে বাহান্ন, তাই হ'ল না গা!

বিনয় সম্মতি জানাইল।

অপরিচিত লোক আসিলেই গৃহিণীর এই বিস্তৃত জমিদারির পরিচয় দান করার হাস্যকর অভিনয় অবিনাশ বাবুর সহিয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম তিনি আপত্তি করিতেন ; তাহাতে সর্ব্বেশ্বরীর রোখ আরো চাপিয়া যাইত। তিনি বলিতেন, আহা লুকোচ্ছ কেন, এতখানি জমি একসঙ্গে কার আছে বল। বিনয় করা ভাল, তাই বলে কি সত্যি কথা বল্‌তে হবে না! তা বেশ, বেশ!

কিন্তু মাতার এই অভ্যাসটি পারুলের এখনো সহ্য হয় নাই। সে লাল হইয়া উঠিতে উঠিতে ভাবিতেছিল, এইবার বিনয়ের হাসিবার পালা।

সর্ব্বেশ্বরী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, পান খাওয়া হয়?

বিনয় তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য সম্মতি জানাইল।

—বেশ, বেশ, এই তো চাই। হাজার হোক্‌, একটা জমিদার তো বটে। বিনয়কে পান দিলেন।

—আমাদের এখানে ও কারবার নাই। উনি খাবেন না, আবার ওঁর দেখাদেখি, মেয়েও মেমসাহেব হ'য়ে উঠেছে। মেয়েমানুষ পান খায় না, আর—

পারুল অত্যন্ত কাতর ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে গৃহে দুইজন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। গৃহিণী অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবে উঠিয়া পড়িলেন।

—ওইযে, ওরা আবার আস্‌ছে। তোমরা বোস, তা বেশ, বেশ!

অপ্রসন্ন হইবার কারণ, আগন্তুক দুইজন, পানও খায় না জমিদারীর সংবাদেও উৎসুক নয়। অপ্রসন্ন সর্ব্বেশ্বরী সুবৃহৎ পানের বাটা হাতে হেলিতে দুলিতে প্রস্থান করিলেন।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন আসিয়া একেবারে একখানা আরাম-চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া আত্মগত ভাবে বলিয়া উঠিল,—চৌধুরী, চৌধুরী, তোর পা দু'খানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো! ইস্‌ কি 'সুট', মাইরি! অবিনাশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, রূপেন, কি ব্যাপার!

—ন্যাশানাল ডিফিট্‌, স্যার, একেবারে জাতীয় পরাজয়। চৌধুরী কি খেলেছিল, স্যর, কেবল বেটা 'ব্যাক'—

হঠাৎ পারুলকে চোখে পড়ায় বিশেষণটা অর্দ্ধোক্ত রহিয়া গেল। একেবারে বীর রসের নিখাদ হইতে বিপরীত রসের খাদে রূপেনের গলা নামিয়া আসিল। মৃদু হাসিয়া, মাথাটা একটু দোলাইয়া বলিল—এই যে আপনি।

অন্যজনের পোষাক-পরিচ্ছদে একটু বিশেষত্ব ছিল। হাফপ্যাণ্ট ও হাত-কাটা শার্ট, দুটারই রং লাল। মাথায় একরাশ চুল, তেল না পড়ায় ফুলিয়া ফাঁপিয়া আছে। ছবিতে কোন কোন রুষদেশীয় রাজনৈতিক নেতার যেমন দেখা যায়,

অনেকটা তেমনি। সে আসিয়া একখানা চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া পিঠ-দানের দিকটা সম্মুখে দিয়া দুই দিকে দুই পা রাখিয়া পিঠ-দানের উপরে হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া বসিল।

অবিনাশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, পরমেশ, খবর কি!

পরমেশ আরও একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—ক্লান্ত, ক্লান্ত! পরমেশ সর্ব্বদাই ক্লান্ত। সকালে, দুপুরে, বৈকালে, রাত্রে সর্ব্বদাই। কাজেই কেহ আর তাহার ক্লান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করে না। অবিনাশ বাবু পারুলকে বলিলেন, মা, চা; পুনরায় তিনি হাতের পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

চা পান করিতে করিতে রূপেন ও পরমেশের সহিত বিনয়ের আলাপ হইল। এসব স্থলে যেমন হয় তেমনি হইল—অর্থাৎ আলাপটা, গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ইকনমিক কনফারেন্সে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সাহিত্যের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিল। ইহার পরেই আধুনিক সাহিত্যের জলা-জমি, এবং চরম পরিণাম রাজনীতিক মহা-সমুদ্র।

তিনজনে তখন আধুনিক সাহিত্যের জলা-জমিতে অদ্ধ-মগ্ন ভাবে বিচরণ করিতেছিল।

রূপেন বলিল—আমার বাংলাসাহিত্য শরৎ বাবুতে এসে শেষ হ'য়ে গেছে। পরমেশ উত্তেজিত হইয়া আছে; সে বলিল—বল কি! শরৎ বাবু তো মহিলা এবং আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের লেখক। তাঁর পরের যাঁরা লেখক তাঁরাই দেশকে কতকটা বুঝেছেন। দরদ, দরদ চাই, বুঝলে রূপেন। সব লাল হো যায়গা।

রূপেন—তুমি অযথা রাসিয়ার স্বপ্ন দেখ্‌ছ ভাই। তরুণ সাহিত্যিকদের মস্ত দোষ, জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই, দেশের সঙ্গে তাদের যোগ নেই।

অতঃপর তিনজনে মিলিয়া তরুণ সাহিত্যিকদের দোষ-বিচারে নিযুক্ত হইল।

এমন সময়ে সকলের অলক্ষ্যে একটি যুবক গৃহে প্রবেশ করিল। বয়স তাহার বছর ত্রিশ, দাড়ি গোঁপ কামানো, পাঞ্জাবীর ঝুলটা আধুনিক কালের পক্ষে কিছু বেশী, পাঞ্জাবীর দুই পকেট নানা দ্রব্যে ভারী হইয়া দুইদিকে আরো খানিকটা নীচু করিয়া দিয়াছে। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া অতি সন্তর্পণে এক কোণে ছাতাটা ঠেস দিয়া রাখিয়া, সকলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন বিনয়দের মধ্যে আলোচনায় প্রায় স্থির হইয়াছে, তরুণ সাহিত্যিকদের জীবনের সহিত যোগের অভাব। নবাগত ভদ্রলোকটি একটি চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, লিভার, লিভার মশাই, লিভার খারাপ।

রূপেন ও পরমেশ চমকিয়া উঠিল—আরে রমানাথ যে!

রমানাথ সতর্কভাবে একখানা চেয়ারের ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া চাপিয়া বসিল—

—কি আলাপ হ'চ্ছিল।

—সাহিত্যিকদের দোষ।

—আর কোন দোষ নেই মশায়, লিভার খারাপ। বাংলাদেশের পৌনে ষোল আনা লোকের লিভারের দোষ, সাহিত্যিকদের মধ্যে ষোল আনা। লিভার ভালো না হলে আমাদের উদ্ধার নেই। আমাদের বড় সাহেবের—সাহেবের নাম শুনিয়া পরমেশ রাগে চীৎকার করিয়া উঠিল। রমানাথ আর একটা চাপা হাসি হাসিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা প্লেট তুলিয়া পরমেশের সম্মুখে সেটা স্থাপন করিয়া বলিল—শাট্ আপ (shut up), সঙ্গে আর একবার চাপা হাসি। রমানাথের চাপা হাসিটি ভারতীয় সভ্যতার একটি আদি ও অকৃত্রিম অবদান। যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যমকে দমাইয়া দিবার পক্ষে এমন জিনিষ আর নাই।

পরমেশ দমিয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

—রবি বাবু যে বড় কবি তার কারণ কি?

—কল্পনা শক্তি!

—তোমার মাথা! লিভার! ও রকম লিভার সেক্সপীয়রের পরে আর কারো হয়নি।

এই সব আলোচনায় পারুল বড় যোগ দিত না, চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহাকে বেকার দেখিয়া তাহার আদরের সাদা বিড়াল-ছানাটি কাছে আসিয়া তুড়ুক করিয়া পারুলের কোলে উঠিয়া একবার ওলট পালট খাইয়া শুইয়া পড়িল।

এমন সময়ে পারুলের বন্ধু বেবি গৃহে প্রবেশ করিলেন। কোন কালে তিনি বেবি ছিলেন সন্দেহ নাই, আজ তিনি যুবতী, আমরা কিন্তু নাম ও বয়সের উভয়ের মর্য্যাদা রাখিয়া তাঁহাকে কিশোরী বলিব। দীর্ঘ ছিপ্‌ছিপে পাৎলা গড়ন, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের যষ্টিখানার মত সরল। শাড়িখানা স্কন্ধ হইতে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের কাছে নামিয়া পেথমের

মত দুলিতেছে। পায়ে গোড়ালি-উঁচু জুতা ; ভয় হয় কখনও বা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যান।

বেবিকে দেখিয়াই, বিড়ালটা পারুলের নিকট হইতে টপ করিয়া নামিয়া পড়িল। একবার আপাদমস্তক ধনুকের মত বক্র ভাবে সঞ্চালন করিয়া ছুটিয়া পালাইবার উপক্রম করিল। বেবি তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন।

—ওহ্, ডিয়ারি, ডিয়ারি ! ডিয়ারি-ডিয়ারি বিড়ালটি প্রায় ধৃত হইয়াছিল, নিরুপায় দেখিয়া সে এক দুঃসাধ্য চাল দিল। বেবির উদ্যত আক্রমণ নিষ্ফল করিয়া সে তাহার জুতার গোড়ালির ফাঁক দিয়া টুক্ করিয়া গলিয়া পলায়ন করিল। সকলে হাসিয়া উঠিল। বেবি লাল হইয়া উঠিয়া বিড়ালটাকে অনুসরণ করিয়া অন্য ঘরে প্রস্থান করিলেন—তখনও শোনা যাইতেছিল—ওহ্, নটি, ডিয়ারি, ডিয়ারি !

পারুল বন্ধুকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বিনয় অবিনাশ বাবুর নিকটে বিদায় লইয়া বাহির হইল। অবিনাশ বাবু তাহাকে প্রত্যহ আসিতে বলিলেন।

রূপেন গা এলাইয়া দিয়া হতাশার স্বরে বলিল—ন্যাশান্যাল ডিফিট্। আঃ ন্যাশান্যাল ডিফিট্।

পরমেশ চেয়ারের পিঠদানের উপর অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—ক্লান্ত, ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত !

রমানাথ সেই আদি ও অকৃত্রিম চাপা হাসি দিয়া বলিল—লিভারের দোষ মশাই, লিভারের দোষ।

৩

একদিন বিকালবেলা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটি বড় বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনয় কপালের ঘাম মুছিতেছিল—মাসিকপত্রের আফিস ; ভিতরে রাশি রাশি কাগজ, দলে দলে লোক, চৌকি চেয়ার আলমারী, একেবারে রাজসূয় যজ্ঞ ! বিশাল আফিস অধিকার করিয়া দুইটি বিরাট মূর্ত্তি ; যেমন ওজনভারি পত্রিকা, তেমনি নিরেট সম্পাদকযুগল।

বিনয় আজ সাহসে ভর করিয়া একটি কবিতা ও একটি নাটক আনিয়াছে, একেবারে সশরীরে উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের হাতে দিবে। কাল রাত্রে কাজটা যত সহজ মনে করিয়াছিল, আজ কার্য্যস্থলে আসিয়া তত সহজ মনে হইল না। আফিসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাহিরে দাঁড়াইয়া সে সাহস সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল। ভিতরের কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। একজন কম্পোজিটর আসিয়া বলিল—হুজুর, দ'য়ের ফর্ম্মার শেষ পাতায় তিন ইঞ্চি ম্যাটার চাই।

—তিন ইঞ্চি ? ওরে দেখতোরে, একটা তিন ইঞ্চি কবিতা-টবিতা পাস্ কিনা ?

কবিতার এই অভিনব পরিমাপ শুনিয়া বিনয়ের কল্পনা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

একজন সহকারী ফাইল ঘাঁটিয়া বলিল—একটা খুব ভাল কবিতা আছে।

—কি রকম ?

—খুব ওরিজিন্যাল্।

—ক' ইঞ্চি ?

নিকটেই গজকাঠি ছিল, তাহা দিয়া মাপিয়া সহকারী বলিল, আজ্ঞে ইঞ্চি পাঁচেক।

—এক কাজ কর, ওর ইঞ্চি দুই ছেঁটে দাও।

সহকারী কোন্ দিক হইতে দু'ইঞ্চি ছাঁটিবে, ভাবিতে লাগিল।

—আজ্ঞে কোন্ দিক থেকে—

—আরম্ভ, শেষ, দুদিক থেকে এক ইঞ্চি করে ছেঁটে দাও ; তাহ'লে অবিচার হবে না।

এই সুবিচার স্বচক্ষে দেখিয়া বিনয় আনীত কবিতাটি আলাদা করিয়া পকেটে রাখিয়া দিল। কেবল নাটকটি লইয়া এখন সে ভাগ্য পরীক্ষা করিবে।

একবার কাসিয়া লইয়া গলা পরিষ্কার করিল ; একবার ইতস্তত তাকাইয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া দম সঞ্চয় করিল, তারপরে কম্পিত পদে সে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। পরে সম্পাদক যুগ্মের নিকটে গিয়া একটা নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। দুই বিশালবপু, যেন মিশরের যুগ্ম-পিরামিড, তবে প্রভেদ এই পিরামিডের ভিতরে ধনরত্ন আছে বলিয়া লোকের অনুমান, ইহাঁদের সম্বন্ধে সে সন্দেহ পরম বন্ধুতেও করে না।

যুগল মূর্ত্তি বিনয়ের দিকে সংক্ষেপে দৃষ্টিপাত করিয়া একতানে নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিল—হুঁ—

এই সুগভীর হুঁ শব্দটি শুনিয়া মনে হইল, ইহা একেবারে মূর্ত্তি দুটির নাভিমূল হইতে উঠিল।

—একটা নাটক...

পুনরায় সমস্বরে, সমতালে সুগভীর সেই হুঁ—

—পত্রিকার জন্য। বিনয়ের ঘাম ছুটিতে লাগিল।

—হুঁ—

বিনয়ের সাহস ভাঙিয়া পড়িল, এক লাফে সে আফিস হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িয়া, দ্রুত চলিতে লাগিল। তখনো তাহার কানে বাজিতেছিল সেই সুগভীর সুনিঃশ্বসিত হুঁ-শব্দের হুহুঙ্কার।

বিনয় চলিতে চলিতে একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল, পরিচিত কেহ তাহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া ফেলিয়াছে কিনা ! যাক্ কেহ দেখে নাই। একেবারে সে হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া থামিল।

বিনয় অনেক দিন হইতে লেখে, নিয়মিত পত্রিকায় পাঠায়, কেহ ছাপায় না। দেশে পত্রিকার অভাব, তাহা তো

নয়। এস্প্লানেডে ট্রামের যাত্রীদের জন্য যে টালির আশ্রয়টা আছে, বৃষ্টির দিনে সেখানে আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া সে বিপন্ন হইয়াছে। মেঝের সবটুকু জায়গা জুড়িয়া পত্রিকার ষ্টল। বামনরূপী তরুণ সাহিত্য মাসিকপত্রের তৃতীয় চরণ বাহির করিয়া নিরাশ্রয়ের এই আশ্রয়টুকু নিতান্ত অবলীলাচ্ছলে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের ষ্টলগুলিতে সে পত্রিকা ঘাঁটিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত মোটা মর্য্যাদাবান্ অভিজাত পত্রিকাগুলি আর দেখিল না, তাহারা বিনয়ের লেখা ছাপিবে না। নগরোপকণ্ঠের ক্ষীণকায় কাগজগুলির প্রতিই তাহার ভরসা। একখানা, দু'খানা, তিনখানা—নাই—নাই—নাই। হঠাৎ একখানাতে একি! এ যে তাহার নাম! কিন্তু দু'জনের এক নাম থাকা বিচিত্র নয়! না, সে হইতেই পারে না, এ যে তাহারই কবিতা! একবার দু'বার পড়িল, তৃপ্তি আর হয় না। দু'আনা মূল্যের কাগজ ব্যস্ততায় সে একটা সিকি দিয়া কিনিয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তা পার হইয়া পুরাতন পুঁথির দোকানগুলির কাছে দাঁড়াইয়া কবিতাটি আবার পড়িল। পথে বার বার এক লেখা পড়িতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল, পুরাতন পুঁথি দেখিবার ভাণ করিয়া, মাঝে মাঝে পাতা উল্টাইয়া পড়িয়া লয়। তাহার প্রথম লেখা, ছাপার অক্ষরে। আনন্দে তাহার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। শেষে বুঝিল, একটু নির্জ্জন স্থান না পাইলে এই জনতার মধ্যে সে কি এক কাণ্ড করিয়া বসিবে। কাগজখানা ভাঁজ করিয়া কলেজ ষ্ট্রীট ধরিয়া সে প্রায় ছুটিয়া চলিল। বোধ হয় মুখে তাহার উৎসাহের অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হাতে কাগজ, মুখে আনন্দ, গতি ত্বরিত দেখিয়া দু'জন পথচারী ক্লান্ত যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—লোকটা বোধ হয় চাকরি পেয়েছে!

কথাটা বিনয়ের কানে গেল; বুঝিতে পারিল, তাহার অবস্থাটা কেমন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। কলেজ স্কোয়ারের কাছে আসিয়া দেখিল ভিতরে ভিড়; হঠাৎ মনে পড়িল, সিনেট-হাউসটা নির্জ্জন, এখনো খোলা আছে। বিনয় সিনেট-হাউসে ঢুকিয়া একটা বিজলি বাতির তলে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে অসঙ্কোচে কাগজখানা খুলিয়া নিজের লেখা পড়িতে লাগিল।

তাহার প্রথম লেখা, ছাপার অক্ষরে। কবিতাটি বারবার পড়িল। তলে তাহার নামটি। সেটিকে কতবার কত রকমে পড়িল, একবার প্রথম হইতে, একবার শেষ হইতে, একবার মাঝ হইতে। শ্রীবিনয়কুমার চৌধুরী; চৌধুরী শ্রীবিনয় কুমার, কুমার বিনয় চৌধুরী। চোখের ক্ষুধা আর মেটে না। বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময় যদি ছাপার চলন থাকিত, তবে বলিতে পারিতাম, পদকর্ত্তা নিজের মুদ্রিত নামটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

ক্রমে বিনয়ের কর্ণ হইতে অন্য শব্দ বিলুপ্ত হইয়া গেল, গাড়ী ঘোড়া মোটরের কোনো শব্দ নাই, এমন কি সেই সম্পাদকীয় হুঁ শব্দটিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহার কবিতার ধ্বনিরূপটি—তাহার চোখ হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল, সমস্ত ঝাপসা হইয়া আসিল; দ্রোণের অস্ত্র-পরীক্ষায় অর্জ্জুনের দৃষ্টি হইতে লক্ষ্যবিদ্ধ পক্ষীটির চক্ষুব্যতীত আর সব যেমন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার দৃষ্টিতে তাহার নামের অক্ষর ক'টি ছাড়া আর সব কোথায় মিলাইয়া গেল। পত্রিকাখানি বারংবার সে স্পর্শ করিল, নূতন কাগজের গন্ধটিও যেন তাহার কত প্রিয়! শব্দস্পর্শরূপগন্ধ চতুরিন্দ্রিয়দ্বারা সে এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন অমরতার স্বাদ পাইল। এই ভাবে কতক্ষণ কাটিল সে বুঝিতে পারে নাই। যখন তন্দ্রা ভাঙিল, বিনয় দেখিল বৃহৎ কক্ষ নির্জ্জন, অন্ধকার, কেহ তাহাকে এ অবস্থায় দেখে নাই ভাবিয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। হঠাৎ সে উপরে তাকাইল, একী! একজনের দৃষ্টি সে এড়াইতে পারে নাই। যখন সে মাথা নীচু করিয়া লেখা, পড়িতেছিল, তাহার মাথার উপর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকপূর্ণ নেত্রে রহস্যময় চাপা হাসিতে তাহার এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। স্থানকালপাত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশে ব্যাপারটা হঠাৎ যেন সত্যের মত ঠেকিয়াছিল। প্রথমটা সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। ঘটনাক্রমে বিনয় বঙ্কিমচন্দ্রের তৈলচিত্রের নিম্নে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

তাহার এই লেখক-জীবনের দুর্ব্বলতা বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক দেখিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে বিনয়ের কিছু সঙ্কোচের নাই, বরং, তাহার প্রথম রচনার উপরে যে বঙ্কিমের আনত দৃষ্টির আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাহার কেমন যেন আশ্বাসপূর্ণ আনন্দ হইল। বিনয় বঙ্কিমের উদ্দেশে একটা প্রণাম নিবেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

গারো জাতি

—শ্রীজ্যোৎস্নাকান্ত বসু

পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে সমস্ত আদিম অসভ্য জাতির বাস তাহাদের সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানতে পারি। তার কারণ, প্রথমতঃ তাঁরা যে সমস্ত পাহাড়ে বাস করে সাধারণতঃ সে সমস্ত পাহাড় লোকালয় হ'তে বহু দূরে এবং দ্বিতীয়তঃ, তাদের আমরা অসভ্য জাতি মনে করে' তাদের সম্বন্ধে খোঁজ করবার দরকার মনে করি না। কিন্তু এসমস্ত অসভ্য জাতিরও যে মানবজাতির ক্রমবিকাশের মধ্যে একটা স্থান আছে আমরা আজকাল নৃতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা বেশ বুঝতে পারছি।
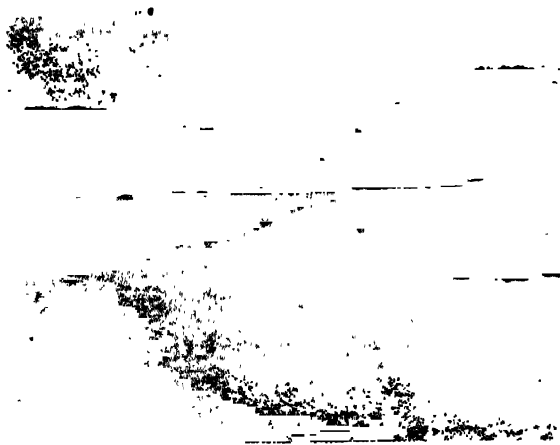
সোমেশ্বরী নদী ও গারো পাহাড়।

গারোরাও এইরূপ একটি আদিম অসভ্য জাতি এবং এদের আদিম বাসস্থান—গারোপাহাড়, যদিও ময়মনসিংহ, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায়ও কিছু কিছু গারো পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত সমতল-ভূমির গারোরা তাদের নিজেদের বিশেষত্ব রাখতে পারে নি, এমন কি, অনেক সমতল-ভূমির গারোদের নাম ও বেশভূষা থেকে তাদেরকে গারো ব'লে চিনতে পারা যায় না। ময়মনসিংহ জেলার সমতল-ভূমির গারোরা অনেক হিন্দু-উৎসবে যোগদান করে এবং হিন্দুরা অপছন্দ করেন বলে' তারা অনেকেই গরু ও শূকর পর্য্যন্ত খাওয়া ত্যাগ ক'রেছে। সুসঙ্গ থেকে একদিন একটি নিকটস্থ গারো-গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম। এই গ্রামে একটি বটগাছতলায় গারোদের গ্রাম্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি গ্রামের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ কোন্ দেবতা?' সে প্রত্যুত্তরে বলেছিল, 'এই দেবতাকে আমরা কালী বলি।' কিন্তু এই দেবতার কোন মূর্ত্তিও নাই কিংবা হিন্দুদের মত কোন পূজাও হয় না, তা সত্ত্বেও তারা তাদের দেবতার হিন্দু নাম গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত ঘটনা, তাদের নাম ও তাদের অন্যান্য আচার ও ব্যবহার থেকে বেশ স্পষ্ট রূপেই বুঝতে পারা যায় যে সমতল-ভূমির গারোরা ক্রমশঃই হিন্দু-সমাজের মধ্যে মিশে যেতে চায়। কিন্তু আমাদের সমাজ তাদের অস্পৃশ্য করে' দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তাই গারোরা মিশনারীদের সাহায্যে ক্রমশঃই খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছে।

এইবার গারোপাহাড়ের আসল গারোদের সম্বন্ধে আলোচনা ক'রব। এই গারোদের সঙ্গে সমতল-ভূমির গারোদের অনেক প্রভেদ—চেহারায়, আচারে, ব্যবহারে এবং ভাষায়। পাহাড়িয়া গারোরা একমাত্র গারো ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাই জানে না কিন্তু সমতল-ভূমির গারোরা অল্প অল্প বাঙলা ব'লতে পারে এবং তাদের ভাষা পাহাড়ের গারোদের সঙ্গে একেবারেই মেলে না।

পাহাড়িয়া গারোরা সাধারণতঃ সুস্থ ও সবল এবং তাদের রঙও সমতল-ভূমির গারোদের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। গারোরা প্রায়ই বেঁটে এবং তাদের মুখের গঠন অনেকটা গোলাকার; চোখের পাতার উপর একটি চামড়ার ভাঁজ (epicanthic fold) এবং একটু চ্যাপ্টা নাক এদের মধ্যে প্রায়ই চোখে পড়ে।

গারোরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে পাহাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম তৈরি করে। এইরূপ এক একটি গ্রামে প্রায় চল্লিশ হ'তে পঞ্চাশটি বাড়ী থাকে এবং প্রত্যেক বাড়ীতে কেবল একটি মাত্র পরিবার বাস করে। গারোদের স্বামী-স্ত্রী ও ছোট বালক-বালিকাদের নিয়ে একটি পরিবার গঠিত হয়। এই জাতির মধ্যে যৌথ পরিবার একেবারেই বিরল। সেই জন্য ছেলেদের বিবাহের পর তারা পিতামাতার সঙ্গেও একগৃহে বাস করে না, তখন তারা নিজেদের বাসোপযোগী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং এইরূপে একটি নূতন পরিবারের উৎপত্তি হয়।

গারোদের বাড়ীর মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে। এরা প্রথমে বড় বড় গাছ থেকে খুঁটি তৈরি করে; তারপর এই খুঁটি মাটিতে পোঁতে এবং মাটি থেকে তিন কিংবা পাঁচ ফুট উচুঁতে এই খুঁটির উপর বাঁশের মাচা বাঁধে; এই মাচাই তাদের ঘরের মেঝের কাজ করে। ঘরের চারপাশের দেয়ালও বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, কেবল ছাতটি ঘাস দিয়ে ছাওয়া থাকে। ঘরগুলি সাধারণতঃ পঞ্চাশ থেকে ষাট ফিট লম্বা হয়, যদিও কোন কোন গ্রামে একশত হ'তে দেড়শত ফিট লম্বা ঘর দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘরগুলি চওড়ায় প্রায় বার হ'তে ষোল ফিট এবং পনেরো হ'তে কুড়ি ফিট উঁচুও হয়। এই ঘরের মধ্যে দেওয়াল দ্বারা বিশেষ কোন ভাগ করা থাকে না এবং সর্ব্বত্রই ঘরের মাঝখানে রাঁধবার জন্য একটা জায়গা নির্দ্দিষ্ট করে' রাখা হয় এবং সেইখানেই নিয়মিত ভাবে রান্না করা হয়, তার ফলে যত ধোঁয়া ঘরের মধ্যে জমা হয় এবং ঘরটি ময়লা ও দুর্গন্ধে ভর্ত্তি হ'য়ে থাকে। আমি একটি গারো গ্রামে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তারা তাদের বাড়ীতে জানালা লাগায় না কেন। এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল যে যদি কেউ তার বাড়ীতে জানালা লাগায় তা হ'লে তাকে সেই জানালার জন্য গ্রামের লোকদেরকে তার জরিমানা দিতে হবে, সেইজন্য কেউ এই জরিমানার ভয়ে জানালা ফোটায় না। অবশ্য আজকাল এ নিয়ম সবাই মেনে চলে বিশেষতঃ সমতল-ভূমির গারোরা। এই বাসগৃহ ছাড়া গারোদের আরও দুটি বাড়ী আছে, একটি ক্ষেত পাহারা দেবার জন্য এবং অপরটি গাছের উপর তৈয়ারী বাড়ী। ক্ষেত পাহারা দেবার জন্য যে ঘর তার নাম 'জামাতাল', এই ঘর গারোরা ক্ষেতের সময় মাত্র কয়েক মাসের জন্য ব্যবহার করে এবং তারপর শস্য কাটা হ'লেই আবার নিজেদের গ্রামে ফিরে আসে। গাছের উপরের বাড়ীর নাম বোরাং, এই বাড়ীও সাধারণতঃ ক্ষেত পাহারার জন্য তৈয়ারী করে এবং অনেক সময় বছরের কয়েক মাসের জন্য এই বাড়ীতে বাস করে। কোন কোন জায়গায় শিকারের জন্য জঙ্গলের মধ্যে এই রকম বাড়ী নির্ম্মাণ করে' থাকে।

এ ছাড়া গারোদের গ্রামের মধ্যে একটি খুব বড় ঘর আছে, এই ঘরকে গারোভাষায় "নোকপান্তে" বলে—'নোক' মানে সাধারণ ঘর এবং 'পান্তি' মানে অবিবাহিত ছেলে অর্থাৎ এই বাড়ীতে গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত ছেলেরা বাস করে; ছেলেদের বয়স প্রায় সাত থেকে তিরিশ। এই সমস্ত ছেলেদের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বড় সেই দলপতি হয় এবং তাকে সকল বিষয়ে সকলেই মেনে চলে। এইখানে থাকবার সময় ছেলেদের অনেক রকম শক্ত কাজ করতে হয় এবং ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বে যখন দুই গ্রামে বিবাদ এবং যুদ্ধ হ'ত তখন এই সমস্ত অবিবাহিতের দল গ্রামকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখত। আজকাল 'নোকপান্তি'তে ছেলেদের বিশেষ কোন কাজ ক'রতে দেখা যায় না এবং সেইজন্য এই ঘরের অনেক গ্রামেই এখন আর কোনও আদর নেই। আজকাল কোন কোন গ্রামে এই সমস্ত 'পান্তি'রা সবাই মিলে গ্রামের লোকের ক্ষেতের কিংবা বাড়ী তৈরী ক'রবার কাজ গ্রহণ করে এবং এই সমস্ত কাজের জন্য তারা একটা মজুরী নেয়, তারপর বৎসরের শেষে 'ওয়ানগালা' উৎসবের সময় এই টাকা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ তৈয়ারী করে এবং বিভিন্ন গ্রামের গারোদের নিমন্ত্রণ করে' আমোদ-প্রমোদ করে।
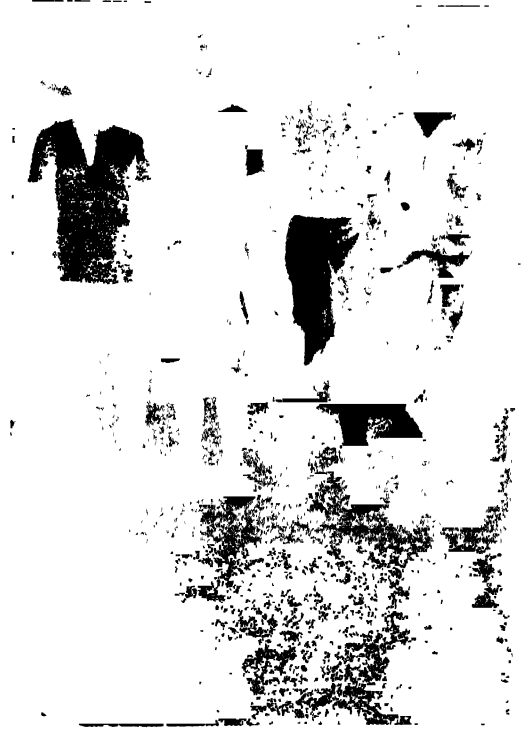
গারো পুরুষ।

সমস্ত গারোজাতি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—মারাফ, মমিন, সাংগমা। এই এক একটি সমষ্টির মধ্যে আবার অনেক ছোট ছোট ভাগ আছে, এই ভাগগুলিকে গারোভাষায় মাচং বা মাহারি বলে। প্রত্যেক মাহারির এক একটি বিভিন্ন নাম আছে, যেমন দালবৎ, দাজেল, আরুই ইত্যাদি। সমষ্টি-

গারো রমণী।

গুলির প্রত্যেকটির মধ্যে প্রায় তিরিশ চল্লিশটি মাহারি আছে এবং এই মাহারির সংখ্যা দিন দিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মাহারির উৎপত্তি সাধারণতঃ একটি পরিবার থেকে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে ক্রমে যখন তারা চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করে তখন তাদের পুরাণো নাম ত্যাগ করে না। এই মাহারির নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় না। হয় ত এই নাম কোন নদীর কিংবা পাহাড়ের কিংবা অন্য কোনও জিনিষের থেকে বহুকাল পূর্ব্বে তারা গ্রহণ করেছে।

গারোদের বিবাহ-পদ্ধতি একটু নূতন ধরণের, কারণ গারোরা মাতৃকুলজাতি এবং তাদের মধ্যে মেয়েদের প্রাধান্য প্রায় সকল বিষয়েই বেশ চোখে পড়ে। বিবাহের সময় মেয়েদের মত ছাড়া কোন বিবাহ হ'তে পারে না এবং অনেক স্থলে মেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ স্বামী নির্ব্বাচন করে। সকল জাতির মত গারোদেরও বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। কোনও গারো তার নিজের সমষ্টির কোনও একজনকে বিবাহ ক'রতে পারে না, যেমন মারাফে সমষ্টির কোনও ছেলে মারাফ সমষ্টির কোনও মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না। যদি কোন লোক এই নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহ'লে তারা তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং জাতিচ্যুত করে। এই নিয়ম পার্ব্বত্য গারোদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও সমতল-ভূমির গারোরা এই নিয়ম সব সময় মেনে চলে না, তাদের মধ্যে অনেক সময় এক সমষ্টির মধ্যে বিবাহ হয় বটে, কিন্তু তারাও এ জিনিষটাকে খুব ভাল বলে' মনে করে না। সমতল-ভূমির গারোদের মধ্যে এক সমষ্টির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকলেও এক মাহারির মধ্যে বিবাহ কখনও হয় না। যদি কেউ এই নিয়ম না মানে তাহ'লে তারা তাকে তাদের সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

সাধারণতঃ মেয়েদের বিবাহ ষোল থেকে কুড়ি বৎসরের মধ্যে এবং পুরুষের পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা থাকে এবং এই সময় তারা যে কোন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ক'রতে পারে। এই সময়েই তারা তাদের ভবিষ্যৎ স্বামী নির্ব্বাচন করে। কিন্তু যদি কোন মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে সেই পুরুষকে ঐ মেয়েকে বিবাহ করতে বাধ্য করা হয় এবং তাকে জরিমানাস্বরূপ মেয়ের পিতামাতাকে কিছু টাকা দিতে হয়। এইরূপ অবাধ মেলামেশা এদের সমাজে দোষের বলে মনে করে না।

মেয়েদের বিবাহের বয়স উপস্থিত হ'লে তারা তাদের নিজেদের পছন্দের কথা তাদের পিতামাতাকে জানায়, কিন্তু যদি কোন মেয়ের আপন মামাত ভাই থাকে তাহ'লে ঐ মেয়েকে তার মামাত ভাইকে বিবাহ করতে হয়। যদি না থাকে কিংবা মামাত ভাই যদি বয়সে ছোট হয় তাহ'লে তাকে এই নিয়ম মানতে হয় না। মেয়ের পছন্দ যদি পিতামাতার মনঃপুত হয় তাহ'লে তারপর একদিন মেয়ের পিতা কিংবা অন্যান্য আত্মীয়রা ছেলেদের গ্রামে যান। সেখানে ছেলের পিতামাতার সঙ্গে এই বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং যদি তাঁদের অমত না থাকে তাহ'লে এই খবর ছেলেকে জানান হয়। ছেলে এই বিবাহের প্রস্তাব শুনলেই গারোদের প্রথামত সে তখনি পালিয়ে যায়; তখন তার বন্ধুরা তার খোঁজ করে ধরে আনে। এইরূপ যদি কোন ছেলে তিনবার

পালিয়ে যায় তখন বুঝতে পারা যায় যে ছেলের এ বিবাহে মত নেই এবং এ বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু বিবাহের

নোকপান্তে বা অবিবাহিতদের ঘর।

প্রস্তাব শুনে দ্বিতীয়বারের পর যদি সে আর না পালায় তখন তার এ বিবাহে মত আছে বলে' ধরে নেওয়া হয়। মেয়েদেব গ্রামে ছেলের বিবাহে মত আছে এই খবর পাঠান হ'লে, সেখানে একটি বৈঠকের আয়োজন হয় এবং এই বৈঠকে ছেলে ও তার আত্মীয়রা এবং মেয়ে ও মেয়ের আত্মীয়রা ও গ্রামবৃদ্ধা উপস্থিত থাকেন। এখানে মেয়েকে ও ছেলেকে মুখোমুখি বসিয়ে গ্রামের একজন বৃদ্ধ লোক জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের এই বিবাহে মত আছে কি না? যদি দুজনেই তাদের সম্মতি জানায় তাহ'লে বিবাহের জন্য একটি দিন স্থির করা হয়। সব গারোদের মধ্যেই এইরূপে বিবাহের প্রস্তাব করা হয় না। বিশেষতঃ মাচিস্ গারোদের মধ্যে যদি কোন মেয়ের কোন ছেলেকে পছন্দ হয়, সে তখন ছেলেটির জন্য নানারকম তরকারি, মাছ, মাংস ইত্যাদি রন্ধন করে; তারপর এই সমস্ত জিনিষ একটি বড় থালায় সাজিয়ে নিজের ছোট বোন কিংবা গ্রামের কোন ছোট মেয়েকে নিয়ে সেই ছেলেটির 'নোকপান্তি'র নিকট যায়। ঐ থালাটি তখন সঙ্গের মেয়েটিকে দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে 'নোকপান্তি'র পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি পুরুষটি ঐ জিনিষ খায় তাহ'লেই তার এই বিবাহে মত আছে বলে' ধরে নেওয়া হয়।

পিতৃকুলজাতিদের মধ্যে মেয়েকে আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে' বিবাহের পর স্বামীর বাড়ী এসে বসবাস করতে হয় কিন্তু মাতৃকুলজাতিদের মধ্যে এই প্রথাটি ঠিক বিপরীত। এখানে ছেলেকে বিবাহের সময় মেয়ের বাড়ীতে যেতে হয় এবং বিবাহের পর সেখানেই নূতন ঘর করে' বসবাস করতে হয়।

বিবাহের দিন ছেলের বাড়ীতে সকাল থেকে খুব উৎসবের আয়োজন হয়; ছেলের পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা তাকে নূতন কাপড়, চাদর ও নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিষ উপহার দেন। সন্ধ্যার সময় মেয়ের গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক ছেলেকে নিতে আসেন। এই সময়ের বিদায়-দৃশ্য বড়ই করুণ, কেন না, পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলেই ছেলের চিরবিদায়ে শোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন এবং অনেকস্থলে ছেলেও এত শোকাতুর হ'য়ে পড়ে যে অবশেষে তাকে একরকম জোর ক'রেই নিয়ে যাওয়া হয়।

সাধারণতঃ বর সন্ধ্যার সময় তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সহ কনের গ্রামে যায়। কনের গ্রাম যদি খুব নিকটেই হয় তাহ'লে অনেক সময় ছেলের গ্রামের মেয়েরাও সঙ্গে যায়। কনের গ্রামে বিবাহের দিন নাচ-গান ও খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন থাকে। বরযাত্রীদল বরসহ পৌছুলে গ্রামের লোকেরা তাদের সাদর সম্ভাষণ করে' কনের বাড়ীতে নিয়ে যায়। এইখানে গ্রামের পুরোহিত কিংবা অন্য গ্রাম্য বৃদ্ধ লোকেরা দুটি মুরগীর মাথায় লাঠি মেরে কিংবা একটানে গলা ছিঁড়ে ফেলে তাদের পেটের ভিতরকার নাড়িভুঁড়ি পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাঁরা ঐগুলি বিচার করে' বলে
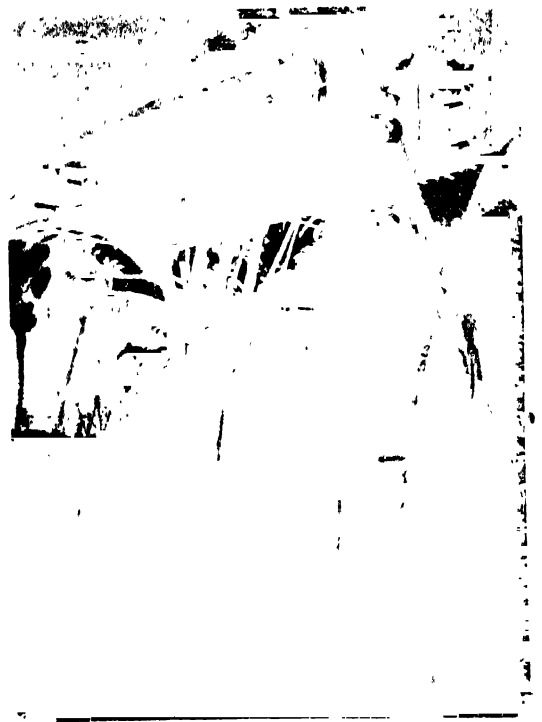
গাছের উপর বাড়ী।

দেন যে এই বিবাহ সুখের হবে কি না। যদি তাঁদের মতে এই বিবাহ সুখের না হয় তাহ'লে বিবাহের পর একটি পূজা ক'রতে হয়; ঐ পূজা দ্বারাই গারোদের মতে সমস্ত অমঙ্গল কেটে যায় এবং নব দম্পতীর বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়। এই

বিবাহকে গারো ভাষায় দোদকা বলে। এ ছাড়াও আরেক প্রকারের বিবাহ গারোদের মধ্যে প্রচলিত আছে তার নাম
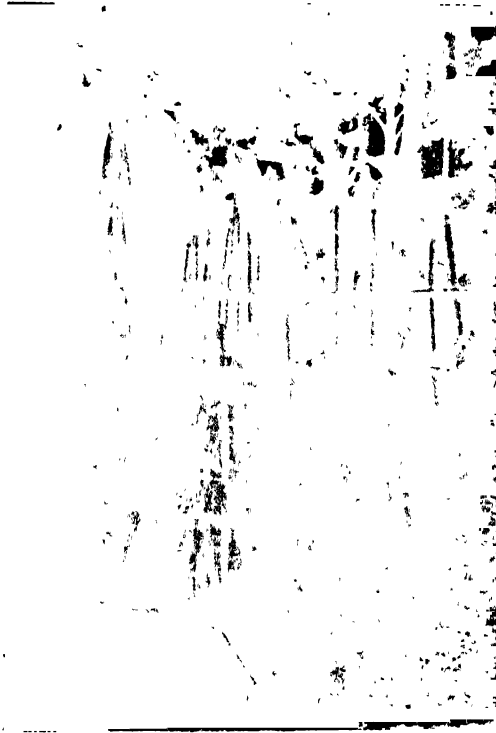
কবর।

'সেকা'। এটিকে গারোরা অনেক সময় ঠিক বিবাহের মধ্যে স্থান দিতে চায় না, তার কারণ এই বিবাহ ছেলে ও মেয়ের পিতামাতার অমতেই হয়। আসল ব্যাপারটি এই যে যদি কোনও ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মায় এবং তাদের পিতামাতার সেই মিলনে আপত্তি থাকে, তখন তারা এক-যোগ হ'য়ে অন্য কোন গ্রামে পালিয়ে যায় এবং সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মত একত্রে বাস করে। অনেক স্থলেই মেয়ের পিতামাতা তাদের ফিরিয়ে আনেন এবং সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য ছেলেটিকে কিছু জরিমানা দিতে হয়।

গারোদের মধ্যে দুরকমের জামাই করার নিয়ম প্রচলিত আছে—'নোকরোম' ও 'ছাওয়ারি'। নোকরোম অনেকটা ঘরজামাই-এর মত; বিবাহের পর নোকরোম তার শ্বশুরের সঙ্গে এক গৃহে একত্র বাস করে এবং তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়। এছাড়া নোকরোমকে তার শ্বশুরের মৃত্যুর পর তার শাশুড়ীকে বিবাহ ক'রতে হয় এবং এ নিয়ম সকলকেই মেনে চলতে হয়। যদি শাশুড়ী খুব বৃদ্ধা না হন অনেক সময় তাঁর সঙ্গে সহবাসও করতে হয় এবং পুত্রকন্যাও জন্মায়। ছাওয়ারি অনেকটা সাধারণ জামাই-এর মত কিন্তু তাকে শ্বশুরের গ্রামেই ঘর তৈরি করে' বাস ক'রতে হয় এবং শ্বশুরের সম্পত্তির উপর তার কোনও অধিকার থাকে না।

মেয়েদের নাচ।

মৃত্যুর পর গারোরা অদ্ধেক পুড়িয়ে শবটি বাড়ীর সামনেই পুঁতে ফেলে। তারপর ঐ জায়গাটি একটি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয় এবং মৃত ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় যাবতীয় ব্যবহৃত জিনিষ ঐ বেড়াটির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়, কারণ গারোরা মনে করে যে মৃত্যুর পর পরপারে তাদের আবার এসমস্ত জিনিষের দরকার লাগে।

যুদ্ধনৃত্য।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একটি মুরগীকে মৃতব্যক্তির পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।

লোকটিকে পোড়ানর সময় মুরগীটিকে মেরে ফেলা হয়। গারোদের মতে ঐ মুরগীর আত্মাই লোকটির আত্মাকে পথ দেখিয়ে "চুতমাং" পর্ব্বতে নিয়ে যায়; সেখানে সমস্ত গারোদের মৃতব্যক্তির আত্মা অবস্থান করছে।

নাচ গারোদের সমস্ত উৎসবের একটি অঙ্গ এবং নাচ ছাড়া কোন উৎসবই পূর্ণ হয় না কিন্তু তাই ব'লে যে গারোদের নাচ খুব উঁচু দরের এ কথা বলতে পারি না। দুএক রকম নাচ ব্যতীত সব নাচই প্রায় একঘেয়ে এবং মাধুর্য্যহীন, যদিও শিকার-নৃত্য ও যুদ্ধ-নৃত্যের ভাবভঙ্গির ভিতর দিয়ে শিকার ও যুদ্ধের ক্রিয়াকৌশল অনেকটা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠে।

জার্ম্মান মুসোলিনি এডল্‌ফ্‌ হিট্‌লার

—শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত

জার্ম্মানীর প্রধান রাষ্ট্রসচিব ও সর্ব্বময় কর্ত্তা, কল্পনাবিলাসী অথচ অক্লান্তকর্ম্মী এডল্‌ফ্‌ হিট্‌লারের পক্ষে ইউরোপের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ন্তা হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, যদি না ইতিমধ্যে কোন আততায়ীর হস্ত তাঁহাকে নিধন করিতে সমর্থ হয়। ইউরোপের শান্তি জার্ম্মানীর হাতে ও বর্ত্তমান জার্ম্মানী বলিতে হিট্‌লারকেই বুঝায়।

হিট্‌লারের বয়স এখন ৪৩ বৎসর। তাঁহার জন্মভূমি অষ্ট্রীয়ার নিকটবর্ত্তী ব্যাভেরিয়ার সীমান্তে। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি মাতাপিতৃহীন হন এবং তাহার পরেই কোনপ্রকার বিদ্যানুশীলনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভিয়েনাতে চলিয়া যান ও তথায় এক রাজমিস্ত্রীর সহকারীর কার্য্য করিতে থাকেন। পরিশেষে ১৯১২ সালে মিউনিক্‌ সহরে তিনি কিছুকাল স্থপতি-শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ব্যাভেরিয়ার পদাতিক সৈন্যদলে যোগদান করেন। ১৯১৬তে তিনি যুদ্ধে আহত হন ও ১৯১৮তে বিষাক্ত বাষ্পে আক্রান্ত হন। হিট্‌লারের শত্রুপক্ষীয় দল যুদ্ধে তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে অপবাদ প্রচার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ হয় নাই; কারণ নাৎসিদের নেতার অন্য যে বিষয়েই অভাব থাকুক, তাঁহার সাহস নাই এ কথা কেহই বলিতে পারে না।

শান্তিস্থাপনের সময় তিনি হাসপাতালে ছিলেন। তৎপরে ১৯২০ সালে সামরিক কার্য্য হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন হইতেই তিনি স্বমতানুযায়ী এক আদর্শ জার্ম্মানী গড়িয়া তুলিবার কার্য্যে রত হন এবং ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে অন্যান্য দলের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া মিউনিকে এক জাতীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য পরের দিনই এই বিদ্রোহ দমন করা হয়: কিন্তু বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষে জেনারেল লুডেনডর্ফ্‌ আহত হন। হিট্‌লার পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন, কিন্তু অনতিকাল পরেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করা হয়। বিচারে তাঁহাকে একটি দুর্গে পাঁচ বৎসর অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ হয়। ঘটনাচক্রে কয়েক মাস পরেই তিনি মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু শত্রুপক্ষের নিকট অনায়াস পরাজয়ে তিনি যেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিছুকাল দুর্গে কয়েদ থাকাতেও সেরূপ দুঃখিত হন নাই।

ইহার পরে ছয় বৎসর যাবৎ অসীম ধৈর্য্যসহকারে তিনি দল গঠন করিতে ও তাহার শৃঙ্খলাবিধান করিতে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার দল ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট্‌ নামে অভিহিত। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহ'তে তাঁহার পার্টী আশাতিরিক্ত সুফল লাভ করে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যে প্রকার ভয়াবহ মত প্রকাশ করেন তাহাতে ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যগুলি যথেষ্ট শঙ্কিত হইয়া উঠে। তখন হইতেই জার্ম্মান লোকমত তাঁহাকে একজন ভীতি-উৎপাদনকারী গণনেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। এবং যদিও গত জুলাই মাসের নির্ব্বাচনে তিনি আশানুযায়ী ফললাভ করেন নাই ও প্রায়ই জোরজবরদস্তির ও প্রতিহিংসার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, তবুও পরিশেষে তিনি রাষ্ট্রানুমোদিত উপায়েই জার্ম্মানীর প্রধান কর্ম্ম সচিব হইয়া অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন।

হিট্‌লারের জীবনে রাজনৈতিক সফলতার এই প্রকার আকস্মিক আবির্ভাব সত্যই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার। বস্তুত ইহার মূল কারণ তাঁহার চরিত্রগত অসীম ধৈর্য্য ও স্বাভাবিক উদ্দীপনা। এক্ষেত্রে অবশ্য ঘটনার স্রোতও তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার মনীষা খুব উচ্চস্তরের নহে এবং বক্তা হিসাবেও তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাহার সরলতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও সৎসাহসে মুগ্ধ হইয়াছেন। কোন ক্ষুদ্র সভাসমিতিতে তিনি নিজের কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন ও অপরকেও তাহা সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করাইতে পারেন। এই বিষয়ে মুসোলিনির সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

তাঁহার কার্য্যের কেন্দ্রস্থল মিউনিকে। সাদাসিধা ধরণের বৃহৎ অট্টালিকাটি সকলের নিকটেই সুপরিচিত। প্রবেশদ্বারে দুইটি অত্যুচ্চ অথচ প্রভুত্বব্যঞ্জক বর্ণাফলক অধিবাসীদের সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছে। অট্টালিকার অভ্যন্তরে এমন একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ আফিস্‌ দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, একথা স্বভাবতই মনে হয়, অদৃষ্টক্রমে হিট্‌লার একটি সুবৃহৎ ব্যাঙ্কের কর্ত্তা ও পরিচালক না হইয়া একটা রাজনৈতিক দলের অধিনায়ক হইয়াছেন।

এই প্রথিতযশা অক্লান্তকর্ম্মী বীর মন্ত্রণাগারে বসিয়া কঠোর চিত্তে তাঁহার ভীষণদর্শন ও দৃঢ়সঙ্কল্পপরায়ণ সহকর্ম্মী ও পার্শ্বচরদের সভাপতিত্ব করেন। হিট্‌লার যখন কথা বলেন তখন ঘরের মধ্যে মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করে। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা নানাপ্রকার সচল মুখভঙ্গীর সহিত উচ্চারিত হয়। অধিক সময় ধরিয়া অত্যন্ত জোরে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, সেই জন্য বক্তৃতাকালে মাঝে মাঝে তাঁহার গলার স্বর হঠাৎ নীচু হইয়া আসে।

যে সুদিন ফিরাইয়া আনিবার ভরসা হিট্‌লার জার্ম্মানীকে দিয়াছেন তাহা সত্য হইবে কিনা একমাত্র সময়ই নির্দ্দেশ করিতে পারে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস

(সূচনা)

—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র। বেদের পবিত্র বাণী এবং উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের সিদ্ধ ভূমিখণ্ডেই প্রথম উদ্‌ঘোষিত হয়। নৈমিষারণ্য ও বদরিকাশ্রমপ্রভৃতি প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্র হইতে জ্ঞান ও ভক্তির নির্ম্মল ধারা সহস্রমুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। এক দিন এই ভারতবর্ষে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও বৌদ্ধপ্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মমত সুপ্রচারিত হইয়া ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মচিন্তার যে প্রবল স্রোত আনয়ন করিয়াছিল, কালচক্রের বিপুল আবর্ত্তনও তাহার গতি এবং প্রসার একেবারে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভারতবাসীর ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ জাতি জগতে আর নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। জাতিহিসাবে ভারতীয়গণের যদি কোথাও বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তাহা দেখিতে হইবে তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ ও তত্ত্বান্বেষণতৎপরতার মধ্যে। চিন্তায় ও কল্পনায়, উৎসবে ও অনুষ্ঠানে এবং সামাজিক ও পারিবারিক সকল বিষয়েই ভারতবাসী ধর্ম্মপরায়ণ। ধর্ম্মের জন্য প্রাণপাত করিতেও যে ভারতবাসী কুণ্ঠিত হন নাই তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

এক দিকে যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং অপর দিকে অধ্যাত্মচিন্তা ইহাই ছিল ভারতের চিরাগত সাধনা। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরচিন্তাই ভারতবাসীর প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম্ম এবং পরম তত্ত্বের প্রতিপাদক বলিয়াই বেদের এত গৌরব এবং সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠা। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্যগণের সকল শাস্ত্রই গৌণ বা মুখ্য ভাবে এই তত্ত্বদ্বয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং চিন্তাপ্রণালী ও প্রস্থান বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাহাদের মধ্যে বিশেষ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না।

আর্য্যদিগের সমগ্র জীবনটাই ছিল ধর্ম্মময়। তাঁহাদের 'নিষেকাদি শ্মশানান্ত' সকল কার্য্যই ধর্ম্মানুমোদিত এবং বিধি-বোধিত। ধর্ম্ম বা সদাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা কিছুই করিতেন না। যাঁহারা সকল বিষয়েরই ঐতিহাসিক তত্ত্ব খুঁজিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে, জাতীয়তার হিসাবে এই প্রকার ধর্ম্মপরায়ণতার পরিণাম বড় ভাল হয় নাই। অতিরিক্ত ধর্ম্মপ্রাণতার ফলে ভারতবাসিগণ জাগতিক বিষয়ে কতকটা উদাসীন হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম চিন্তার গাম্ভীর্য্যে সকলকে পশ্চাৎপদ করিলেও বাস্তব জ্ঞানের নিপুণতায় তাঁহারা অন্যান্য জাতির ন্যায় উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কথাটি বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয়। তবে ইহাও সত্য যে, ভারতের আদর্শের সহিত কোনও জাতির আদর্শের তুলনা হয় না। ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ। ধর্ম্মই ভারতবাসীর জীবনের চরম লক্ষ্য। ধর্ম্মকে প্রাণের জিনিষ বলিয়া আর কোন জাতিই এমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।

নিবিষ্টভাবে ভারতের সাধনাপদ্ধতি বিচার করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, প্রগাঢ় ধর্ম্মপিপাসা এবং আত্মোৎসর্গ। ধর্ম্মজগতে ভারতবর্ষ একাগ্রতা ও ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে বস্তুতই তাহার উপমা নাই। ভারতের ধর্ম্মনিষ্ঠার কাছে সকল জাতিকেই মস্তক অবনত করিতে হয়। ভারতবাসীর ধর্ম্মানুরাগ বিশ্বজাতির অনুকরণের সামগ্রী। ইহাকে শুধু কুসংস্কার বা উন্মাদনাবিশেষ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম্মচর্চ্চা অধ্যাত্মচিন্তার প্রসূতি। ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াই ভারতীয়গণ অধ্যাত্মচিন্তার মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন। যে দার্শনিক চিন্তার জন্য ভারতীয় মনীষার এত প্রতিষ্ঠা তাহার উৎপত্তি ধর্ম্মমার্গের অনুষ্ঠানে। ধর্ম্মানুরাগের প্রবলতাই ভারতের পবিত্র হৃদয়ে শ্রদ্ধার স্ফুরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আত্মজ্ঞানের পিপাসা জাগাইয়াছিল, যাহার ফলে উপনিষদ্ ও বহুবিধ অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রচারিত হইয়া জীবের চির-সঞ্চিত বেদনার ভার লঘু করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জ্ঞান-ভূমির সমুন্নত স্তরে আরোহণ করিয়া আর্য্যগণ—যিনি 'দেবতার দেবতা' (দেবানাং দেবতমঃ) বা 'যিনি রসের মধ্যে রসতম' (রসানাং রসতমঃ)—তাঁহার সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সকল সঙ্কীর্ণতা ও আবিলতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক দিকে ঋত, সত্য ও তপশ্চর্য্যার

দ্বারা যেমন ভারতের ধর্ম্মমার্গ সমুজ্জ্বল, তেমন অন্য দিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির মধুর প্রবাহে ভারতের ধর্ম্মজীবন পবিত্র ও নির্ম্মল। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির এই প্রকার অপূর্ব্ব সমাবেশ আর কোনও ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা আজ যে ধর্ম্মের পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ভারতবর্ষের একটি অতিপ্রাচীন ধর্ম্ম। ঋগ্বেদের সংহিতাভাগেই আমরা বিষ্ণুদেবতার মাহাত্ম্য বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূচনা দেখিতে পাই। যে বিষ্ণুদেবতার উপাসনা ও মাহাত্ম্য পরবর্ত্তী যুগে পুরাণ এবং জয়াখ্য, পৌষ্কর প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র সংহিতায়[১] নানা ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অলৌকিক বিবরণ বৈদিক সাহিত্যের প্রারম্ভেই দৃষ্টিগোচর হয়। বৈদিক সন্ধ্যার আচমন-কালে যে-বেদমন্ত্রটি চিরদিন পঠিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে বিষ্ণুর পবিত্র নাম এবং তাঁহার 'পরম পদের' (যাহা অনন্ত আকাশের ন্যায় বিস্তৃত) উল্লেখ আছে[২]। সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও পরিসমাপ্তিতে হিন্দুগণ আজও বিষ্ণুদেবতার নামস্মরণ করিয়া থাকেন। বেদোক্ত অগ্নিসূর্য্যাদির ন্যায় বিষ্ণুও এক জন প্রভাবশালী দেবতা বলিয়াই বৈদিক যুগে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কখন একাকী কখনও বা অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার সহিত (আগ্নাবৈষ্ণবং চরুং নির্বপেৎ) বিষ্ণু যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। বৈদিক যাগযজ্ঞে বিষ্ণুর যথেষ্ট প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা ছিল; এমন কি, অনেক সময় ঋষিগণ যজ্ঞ বলিতে বিষ্ণুকেই বুঝিতেন (বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ)।

তন্ত্রের ন্যায় বৈষ্ণবসংহিতাও বৈষ্ণব ধর্ম্ম [বা পাঞ্চরাত্র মত] যে বেদমূলক বা বেদানুমোদিত তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, মহাভারতাদি গ্রন্থে যাহা পাঞ্চরাত্র বা একান্ত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র[৩]। মহাভারতে এই ধর্ম্ম 'মহোপনিষদ্' এবং 'চতুর্ব্বেদসমন্বিত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে :—

'ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্'।

বেদের একায়ন শাখা (কাণ্বশাখা) হইতে বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ বৈদিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

'বেদমেকায়নং নাম বেদানাং শিরসি স্থিতম্।
তদর্থকং পাঞ্চরাত্রং মোক্ষদং তৎক্রিয়াবতাম্'॥
শ্রীপ্রশ্নসংহিতা।*

ছান্দোগ্য উপনিষদে বেদাদিশাস্ত্র পরিগণনার মধ্যে একায়ন শাস্ত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামও এই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়[১]। পাঞ্চরাত্র আগমসমূহ শ্রুতি ও সংহিতা এই উভয় নামেই প্রসিদ্ধ। 'পঞ্চরাত্রশ্রুতি' এবং 'পঞ্চরাত্রোপনিষৎ' প্রভৃতি সংজ্ঞাও পঞ্চরাত্র মত যে বেদাঙ্গ বা বৈদিক যুগ হইতে প্রবর্ত্তিত তাহার প্রতি প্রমাণ।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপর বা অন্বর্থ নাম ভাগবতধর্ম্ম এবং বাসুদেবোপাসকগণ সাধারণতঃ 'ভাগবত' নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। আচার্য্যপাদ শঙ্করও পঞ্চরাত্রমতাবলম্বীদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রপ্রসিদ্ধ বাসুদেবারাধনা সুদীর্ঘকাল হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। পাণিনির সূত্রেও বাসুদেবভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়[২]।

বিষ্ণু, বাসুদেব, নারায়ণ ও কৃষ্ণ এক দেবতারই বিভিন্ন নাম। ইহাদের উপাসকগণ সাধারণতঃ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। শাস্ত্রে বহু দেবতার উল্লেখ থাকিলেও উপাসনার রাজ্যে হিন্দুগণ প্রায়ই অদ্বৈতবাদী। বেদের ঋষিগণও বলিয়াছেন,—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এক অদ্বয় ভগবানই বহুবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পরমাত্মস্বরূপ মুখ্য দেবতা এক; অগ্নিসূর্য্যাদি দেবতাগণ তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র[৩]। যিনি 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ' তিনিই বিষ্ণু, এবং তিনিই বাসুদেব, নারায়ণ ও কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা রূপে উপাসিত হইয়া থাকেন[৪]।

---

১ সাত্বতং পৌষ্করং চৈব জয়াখ্যং তন্ত্রমুত্তমম্।—জয়াখ্যসংহিতা

২ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।—ঋগ্বেদ

৩ পাঞ্চরাত্র, সাত্বত, ভাগবত, একায়ন, একান্ত, বাসুদেব ও পুরুষোত্তম একই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিভিন্ন নাম। ডাঃ এস্. কে. আয়েঙ্গার মহাশয় ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে 'সাত্বত' শব্দটি আবিষ্কার করিয়া পাঞ্চরাত্র বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাচীনতা প্রমাণ করিয়াছেন।

* জয়াখ্যসংহিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১ ছান্দোগ্য ৩।১৭।৬

২ অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।৯৮

৩ মাহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোঽন্যে দেবা প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।—নিরুক্ত (দৈবত কাণ্ড)

৪ যজ্ঞৈর্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে তং নতোঽস্ম্যহম্॥—বিষ্ণুপুরাণ

স্বয়ং নারায়ণ ভাগবত ধর্ম্মের বক্তা[1] এবং নারদ সনৎ-কুমারপ্রভৃতি ঋষিগণ ইহার প্রচারক। বহু শাস্ত্রগ্রন্থে বৈষ্ণব মত এবং বৈষ্ণবোপাসনাপদ্ধতি সমালোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নারায়ণোপনিষৎ, শাণ্ডিল্য ও নারদপ্রণীত ভক্তিসূত্র, নারদ-হয়শীর্ষপ্রভৃতি পঞ্চরাত্রাগম, জয়াখ্য-সাত্বত-পৌষ্কর-পারমেশ্বর-প্রভৃতি সংহিতা, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত, বেদান্তসূত্রের শ্রী-নিম্বার্ক ও গোবিন্দভাষ্য এবং জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণলীলার মধুর পদাবলীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের রসতত্ত্ব ও রাগানুগা ভজন-প্রণালী অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের আবির্ভাবের পর হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম একটু নূতনাকার ধারণ করিয়াছে। রূপ-সনাতন-বিশ্বনাথ-বলদেববিদ্যাভূষণপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গ্রন্থ ও ব্যাখ্যানে জ্ঞান এবং কর্ম্ম অপেক্ষা প্রীতি বা অনুরাগেরই বৈষ্ণব ধর্ম্মে সমধিক প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মতে ভগবান্ 'রসময়বিগ্রহ' এবং অহৈতুকী বা অব্যভিচারিণী ভক্তিই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে 'দ্বিভুজ মুরলীধর' উপাস্য দেবতা, শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার নিত্য নিকেতন এবং ভগবৎ-প্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ।

দেবতাবিশেষের নাম হইতেই ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের নাম-করণ হইয়াছে। যে ধর্ম্মের প্রধান দেবতা বা উপাস্য বিষ্ণু সেই ধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই ভাবে শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যপ্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের যথাক্রমে শিব, শক্তি, সূর ও গণপতি দেবতার নামানুসারেই নামকরণ হইয়াছে।

মতবাদ ও আচারাংশে সামান্য প্রভেদ পরিদৃষ্ট হইলেও ভারতের সকল ধর্ম্মেরই চরম উদ্দেশ্য এক। প্রস্থান ও পদ্ধতি বিভিন্ন, কিন্তু মূলে কোনও পার্থক্য নাই[2]।

বহু দিন হইতেই আমাদের দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ধর্ম্মজগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এক কথায় হিন্দুমাত্রই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংযম ও নিষ্ঠা হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের প্রধান আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। হিন্দুর যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যাবন্দনা, ব্রতনিয়ম এবং উপাসনাপ্রভৃতি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা বিষ্ণুপাসনা পরে পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, সাত্বত, বাসুদেব এবং পুরুষোত্তম সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

আদর্শের বিশেষ বৈলক্ষণ্য না ঘটিলেও প্রাচীন এবং পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে যে যথেষ্ট প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বেদের বিষ্ণু, উপনিষদের পুরুষ, পুরাণের নারায়ণ, পাঞ্চরাত্রের বাসুদেব, মহাভারত ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিযুগপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মধ্য দিয়া আমরা বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম্মের নানা প্রকার রূপ দেখিতে পাই। নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রভৃতি সম্প্রদায়ও নানাভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তৃতি সম্পাদন করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি মহান্ এবং সমুদ্রের মত অতি বিস্তৃত। শাখাপল্লবাদিবিশিষ্ট এই বিশাল মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় কত ত্রিতাপদগ্ধ জীব যে শান্তিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ ও প্রেম বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ।

ধর্ম্ম বলিতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি তাহা অল্প কথায় বলা কঠিন। ধর্ম্মশব্দটী বিভিন্ন যুগে পৃথক্ পৃথক্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম বলিতে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে, তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ যুগে ঠিক এক জিনিষ বুঝাইত না। বেদবিদ্‌গণ বেদকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন (বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্)। যাহা বেদপ্রতিপাদিত কর্ম্ম তাহাই ধর্ম্ম। কেহ বলিয়াছেন,—শ্রৌত বা স্মার্ত্ত বিধি অনুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম। কেহ সে কথাটীই একটু বিশদ করিয়া বলিয়াছেন,—

---

১ পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্।—জয়াখ্যসংহিতা
নারায়ণমুখোদ্গীতং নারদোঽশ্রাবয়ৎ পুনঃ।— মহাভারত

২ প্রসিদ্ধ স্তোত্রকার পুষ্পদন্ত এই কথাটি বড়ই সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন :—

'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'॥

বেদই যাহার প্রমাণ এবং যাহা অন্তিমে নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় তাহাই ধর্ম্ম[১]। সদাচার এবং আত্মতুষ্টিও ধর্ম্ম বলিয়াই পরিগণিত হয়[২]। ব্রাহ্মণাদির অনুষ্ঠেয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম-কলাপও আত্মজ্ঞানের উদ্‌বোধক বলিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক ধর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে[৩]। কেহ কেহ অহিংসাদি আচরণবিশেষকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন উল্লিখিত লক্ষণগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম কর্ম্মবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নয়—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্মশব্দবাচ্য।

ইহাও সত্য যে, শুধু প্রাণহীন অনুষ্ঠানগুলিকে (observance of rituals) প্রকৃত ধর্ম্ম বলিতে সকলে সম্মত হইবেন না। যাহা প্রাণকে উন্নত করিতে পারে না, চিত্তকে পবিত্র ও উন্মুক্ত করিতে পারে না, সেরূপ অনুষ্ঠানগুলি চিরাচরিত হইলেও সকলের নিকট যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। মনুর 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ' কথাটী বড়ই সুন্দর। ধর্ম্ম বাহিরের আচার বা শুধু নিয়মপ্রতিপালন নয়—ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তু। ধর্ম্মের প্রকৃত অনুভূতি হয় মানুষের প্রাণে। যাহা সত্য ও শুদ্ধ এবং প্রাণের অভীপ্সিত তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন—'ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ'। উপনিষদের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রও ব্রহ্মজ্ঞানকেই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে[৪]। মানুষের ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে তাহার অন্তরের যে পবিত্র প্রেরণা বর্ত্তমান আছে—যে প্রেরণা মানুষকে তাহার নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে—তাহাই পরম ধর্ম্ম। এই জন্যই মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ'।

এক কথায় বলিতে গেলে, যে কর্ম্ম আত্মজ্ঞানের সহায় হইয়া মানুষকে চরম নিবৃত্তির পথে লইয়া যায়, যে কর্ম্মের দ্বারা তাহার চিরদিনের জ্বালা নির্ব্বাপিত হয় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই উন্নত লক্ষণ ও আদর্শ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম্ম যে সর্ব্বোত্তম, অতিনির্ম্মল এবং তাপত্রয়োচ্ছেদকারী তাহা মহামুনি বেদব্যাস নিজেই সুন্দর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন[১]। ভগবান্ গোবিন্দে অহৈতুকী ভক্তিই ভাগবতে পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে[২]। যে ধর্ম্মাচরণের দ্বারা ভগবানে রতি ও প্রীতি উৎপন্ন হয় না, হৃদয় বিগলিত হয় না, প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হয় না, তাহা নিষ্ফল শ্রমমাত্র[৩]।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাইব যে, বিশ্বব্যাপক এক বিরাট্ দেবতাই ক্রমে পুরুষ, নারায়ণ, বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুশব্দের লৌকিক ব্যুৎপত্তির দিকে (বেবেষ্টি বিশ্বং ব্যাপ্নোতি) লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, যিনি সর্ব্বব্যাপক বা বিভু—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমান—তিনিই বিষ্ণু। এই সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্বভূতাশ্রয় দেবতাই বৈষ্ণবের উপাস্য। কেহ কেহ এই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু দেবতাকে সর্ব্বপ্রসবকর্ত্তা সবিতা হইতে অভিন্ন মনে করেন; কিন্তু বেদে স্বতন্ত্র ভাবে উভয় দেবতারই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

বৈদিক সংহিতায় বিষ্ণু একটী শক্তিশালী দেবতা। বিষ্ণুর প্রভূত বিক্রমের কথা ঋষিগণ শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

'বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ।
প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা' ॥
—ঋগ্বেদ, ১।১৫৪।১-২

বিষ্ণু এমন বিক্রমশালী যে তিনি একাকী ত্রিভুবনকে ধারণ করিয়া থাকেন—

১ বেদপ্রমাণকঃ শ্রেয়ঃসাধনং ধর্ম্মঃ—কুল্লূকভট্ট। শঙ্করও বলিয়াছেন—'শাস্ত্রহেতুত্বাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য' অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের প্রতি শাস্ত্রই একমাত্র কারণ।

২ আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।—মনু

৩ নিত্যনৈমিত্তিকানি তু কর্ম্মাণ্যাত্মজ্ঞানসহকারিতয়া মোক্ষায় কল্পন্তে।
—কুল্লূক

৪ ব্রহ্মজ্ঞানসমো ধর্ম্মো নান্যধর্ম্মো বিধীয়তে।—রুদ্রযামলতন্ত্র

১ ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥—ভাগবত

২ স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সংপ্রসীদতি ॥—ভাগবত

৩ ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥—ভাগবত

'য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা'।

—ঋগ্বেদ

বেদে বিষ্ণুর একাধিক নাম দেখা যায়; উরুগায়, ত্রিবিক্রম, শিপিবিষ্ট,[১] বৃষাকপি ইত্যাদি। 'উরুগায়' সংজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, বিষ্ণুর কীর্ত্তিকলাপ সকলেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত। বিষ্ণু যে তদীয় ত্রিপাদন্যাসের দ্বারা ত্রিভুবন আক্রান্ত করিয়াছিলেন তাহা একাধিকবার বিষ্ণুসূক্তে উল্লিখিত হইয়াছে[২]। তৈত্তরীয়োপনিষদেও বিষ্ণুকে বলা হইয়াছে 'উরুক্রম' (শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ)। এই পদন্যাসবৃত্তান্ত বা বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম আখ্যা হইতে পুরাণ শাস্ত্রে বামনাবতারপ্রভৃতি অনেক আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে[৩]। বিষ্ণু যে ধর্ম্মের রক্ষক এবং ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা তাহার একটু আভাস বেদেও পাওয়া যায় ('বিষ্ণুর্গোপা' এবং 'অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্')। 'বিষ্ণুর পাদন্যাসের দ্বারা পবিত্র জগৎ মধুময়' (যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদানি), 'বিষ্ণুর পরম পদে[৪] [উপনিষদের 'বিরজ ব্রহ্মলোক'] অমৃতের অনন্ত উৎস' (বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ'), 'বিষ্ণুর পরম পদ বেদবিদ্‌গণ দর্শন করিয়া থাকেন' ('তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ') ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যে বিষ্ণু যে পরম দেবতা ও অতিমহান্ তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

যাঁহার বিক্রমের কথা ঋষিগণ এমন করিয়া বলিয়াছেন, যাঁহার পরম পদ তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করিতেন (বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে) তিনি কে? বেদের বিষ্ণুসূক্ত-গুলি পড়িলে স্বভাবতই মনে হয় যে, বিষ্ণু বলিতে ঋষিগণ বিশ্বব্যাপক এক অখণ্ড মহাসত্তাকেই (All-pervading Reality) বুঝিতেন। যিনি 'একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'

১ শিপিবিষ্টো বিষ্ণুরিতি বিষ্ণোর্দ্বে নামনী ভবতঃ—নিরুক্ত

২ যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ—ঋগ্বেদ
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।—ঋগ্বেদ
ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা—ঋগ্বেদ
একো বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেভিঃ—ঋগ্বেদ

৩ বামনরূপী সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মার কথা উপনিষদেও দেখা যায়:—
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে।—কঠোপনিষৎ, ৫।৩

৪ যে-ভূমিতে মিথ্যা ও মায়ার অধিকার নাই এবং যেখানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না তাহাই 'দিব্য ব্রহ্মপুর' বা বিষ্ণুর পরম পদ।
'যদ্‌ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'।

এবং 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণু সকলের আশ্রয় (সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠা) এবং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে তাঁহার সত্তা বিরাজমান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঋষিগণ তাঁহাদের অধ্যাত্মচিন্তার প্রারম্ভেই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, এক অনির্ব্বচনীয় মহাসত্তাই সকল পদার্থের মধ্যে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। জগতের অন্যান্য জাতি শত সহস্র যুগেও যে অদ্বয় পরমার্থতত্ত্বে উপনীত হইতে পারে নাই, ভারতে মন্ত্রার্থদ্রষ্টা ঋষিগণ জ্ঞানোন্মেষের নবীন ঊষায়ই সে সত্যের সন্ধানলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে বিষ্ণুদেবতার বিশেষ প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। বেদোক্ত যজ্ঞাদিতেও বিষ্ণুদেবতার অর্চ্চনার কথা আছে। বিষ্ণুযাগ ও বিষ্ণুপূজা বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ। বেদে এক সময় যজ্ঞ বলিতে বিষ্ণুকেই বুঝাইত। পুরাণে বিষ্ণুকে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে 'যজ্ঞেশ্বর'[১]। বিষ্ণু শিবাদিপঞ্চদেবতার অন্যতম।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রাচীন যুগে বিষ্ণু ছিলেন সূর্য্যদেবতার নামান্তর মাত্র। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণু এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচরের প্রসবকর্ত্তা (আত্মা[২]) সবিতা এক। দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

'আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্'।

বেদের সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু ক্রমে ক্রমে এক সাবয়ব চতুর্ভুজ পরম প্রিয়দর্শন দেবতায় পরিণত হইলেন। উপাসনার মার্গ উন্মুক্ত করিবার জন্য বেদান্তবেদ্য নামরূপবিবর্জ্জিত চিন্ময় বস্তুই সাধকের নিকট বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হইলেন—

'প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থানমুত্তমম্॥
তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ' ॥—বিষ্ণুপুরাণ

যাঁহারা ভক্তিভাবে শঙ্খচক্রধারী আনন্দময়বিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুকে ভজনা করেন, তাঁহারা জন্মমৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অন্তিমে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন—

শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুমানন্দস্যন্দনির্ভরম্॥
যে সংশ্রয়ন্তি তং ভক্ত্যা সূক্ষ্মমধ্যাত্মচিন্তকাঃ।
তে যান্তি বৈ পদং বিষ্ণোর্জরামরণবর্জ্জিতাঃ॥—অধ্যাত্মসংহিতা

১ "যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র বিষ্ণু দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়াই পঠিত হয়।

২ সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ—ঋগ্বেদ

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে বিষ্ণুরই মূর্ত্তি তাহা ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে নানা ভাবে বলা হইয়াছে। বিষ্ণু দেবতাই অংশতঃ বা পরিপূর্ণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন[১]—

অংশাবতারো ব্রহ্মর্ষে যোঽয়ং যদুকুলোদ্ভবঃ।
বিষ্ণোস্তং বিস্তরেণাহং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।২

অত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ।—ভাগবত, ১০।১।২

বিশুদ্ধ চিত্তেই ভগবদ্ভাবের স্ফুরণ হয়। ইহাই ভগবানের জন্ম। তাহা না হইলে যিনি অজ এবং শাশ্বত তাঁহার আবার প্রাকৃত জন্ম কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে সর্ব্বান্তর্য্যামী বিষ্ণু নিল গগনে চন্দ্রের ন্যায় উদয় লাভ করিয়াছিলেন :—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥—ভাগবত

বিষ্ণু ও কৃষ্ণ যে অভিন্ন তাহাও পুরাণে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ভূভারহরণের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু প্রথমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন :—

ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্ব্বাহুমুদীক্ষ্য তং
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥

ভাগবত, ১০।৩

জয়াখ্যপ্রভৃতি বৈষ্ণবসংহিতা ও পুরাণে বিষ্ণুর মূর্ত্তি, ধাম এবং উপাসনাপ্রণালী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণপ্রসিদ্ধ দেবতাত্রয়ের (Hindu Trinity) মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম এবং প্রধান। সৃষ্ট জগতের পালনকর্ত্তা বলিয়াই তিনি সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ[১]। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠ হইল বৈষ্ণব ধাম বা বিষ্ণুর নিবাস-ভূমি[২]। বৈকুণ্ঠের পরম রমণীয় মণিমণ্ডপে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে আমরা শ্রী ও লক্ষ্মীর উল্লেখ দেখিতে পাই[৩]। লক্ষ্মী যে কখন বিষ্ণুর গৃহিণীরূপা হইলেন তাহা বলা শক্ত। কোন কোন সংহিতায় লক্ষ্মীদেবী আদিত্য-পত্নীরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। আদিত্য ও বিষ্ণু এক অর্থে অভিন্ন। এই লক্ষ্মীই পরে 'বৈষ্ণবী শক্তি' বা 'নারায়ণী' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন[৪]।

বিষ্ণুর দশাবতারপ্রসঙ্গ পুরাণের একটি অতিপ্রখ্যাত বিষয়। বিষ্ণুর অবতারসমূহের নামানুসারে বিভিন্ন পুরাণের নামকরণ হইয়াছে। মৎস্যকূর্ম্মাদি নানা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীর মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। বৈদিক মন্ত্রেও এই অবতারবাদের প্রসঙ্গ দেখা যায় :—

'উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা'।'

—নারায়ণোপনিষৎ

রামায়ণবর্ণিত রামচন্দ্রও নারায়ণের অংশবিশেষ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

১ স্থিতং পাসি স্বয়ং ভূত্বা বিষ্ণুরূপেণ কেশব।—জয়াখ্যসংহিতা, ২।১৭।

২ বৈকুণ্ঠলোকের কথা উপনিষদেও আছে। ভাগবতে দেবকীর সপ্তম গর্ভকে বলা হইয়াছে বৈষ্ণবধাম—'সপ্তমং বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে'। অনন্তশয্যাকেও 'বৈষ্ণবধাম' বলা হইয়াছে। বেদের 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' এবং উপনিষদের 'বিরজ ব্রহ্মলোকই' বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠধাম।

৩ 'শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ' এই প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্রেই লক্ষ্মীর নাম দেখিতে পাই। শ্রীসূক্তে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৪ দেবগণ মহামায়াকে স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

—দেবীমাহাত্ম্য

স্বর্গাপবর্গদে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তু তে।—দেবীমাহাত্ম্য

হের ওয়াণ্টার ফাঙ্ক জার্ম্মানীর নব-নিযুক্ত প্রেস-অফিসার। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে পৃথিবীতে আর কোনও দেশেই জার্ম্মানীর মত বেকারের সংখ্যা এত বেশী নয়। হিটলার-শাসনের পূর্ব্বে সে দেশে তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার; এছাড়া তালিকাতে যাহাদের নাম নাই, ইহাদের সংখ্যাও ন্যূনাধিক ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার বলিয়া অনুমান করা যায়। হিটলার জার্ম্মানীর শাসনভার লইয়া এ দিকে মনোযোগ দেন্। প্রুশিয়ার কোনো কোনো স্থানে বিরল-বসতি জনপদ বাসযোগ্য করিবার জন্য এখন অনেক বেকার লোককে কাজে লাগানো হইয়াছে। এমনই আরও অনেক কাজে লোক লাগাইয়া বর্ত্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ বেকারের কাজ জার্ম্মানীতে জুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাংলার আথিক সঙ্কট ঘুচিবে কিসে ?

(তৃতীয় ধারা)

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

বৈশাখের "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে বাংলার জনসংখ্যা ও চাহিদার অনুপাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও উৎপাদনে আমাদের অনেক ঘাটতি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এমন অনেক জিনিষ আমরা ব্যবহার করি যাহা বিদেশ হইতে কিম্বা অন্য কোন দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কলিকাতা ও চট্টগ্রামের বন্দরে জাহাজে যে সকল মাল আনীত হয় তাহার মধ্যে কিছু পরিমাণ রেল ও ষ্টীমারযোগে বাংলার বাহিরে চলিয়া যায়। উহা বাদ দিয়া ধরিলে মোটামুটি বাংলার ব্যবহৃত বিদেশী পণ্যের আন্দাজ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, বেঙ্গল নাগপুর, বেঙ্গল ও নর্থওয়েষ্টার্ণ এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ও আভ্যন্তরীণ এবং উপকূলবাহী ষ্টীমার-কোম্পানীগুলি বাংলার বাহির হইতে যে সকল মাল এখানে বহন করিয়া আনে তাহা হইতে কলিকাতা ও চট্টগ্রামের বন্দর হইতে রপ্তানির পরিমাণ বাদ দিলে বাংলায় নিট ব্যবহৃত অবাঙ্গালীর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে। বন্দর হইতে আমদানী ও রপ্তানির হিসাব মোটামুটি ঠিকই পাওয়া যায়। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল ভারতের আভ্যন্তরীণ মাল সরবরাহের হিসাব সংগ্রহ করা বন্ধ ছিল বলিয়া উপরোক্ত মত পরিমাণ করা এখন কঠিন। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে আবার আমাদের আন্তর্প্রাদেশিক পণ্য সরবরাহের হিসাব লওয়া আরম্ভ হইয়াছে। অতএব বৎসর খানেক পরে বাংলার নিট ব্যবহৃত ভিন্ন প্রদেশ ও বিদেশজাত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করা কঠিন হইবে না। তাহার উপর আমাদের অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনের উন্নতি বা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মোট চাহিদার পরিমাণ কিছু কিছু বাড়িয়াই যাইবে আশা করা যায়। এ কথা মনে রাখিয়া বাঙ্গালীকে তাহার শিল্পবাণিজ্যের প্রসারে উদ্যোগী হইতে হইবে।

আমাদের অর্থনৈতিক জীবন নূতন করিয়া সংগঠিত করিয়া আর্থিক কষ্ট দূর করিতে হইলে যুগপৎ তিন দিক দিয়া জাতি-গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে, যথা শ্রমিক শক্তির কর্ম্মপ্রিয়তা ও নানা শিল্পে কর্ম্মকুশলতা বাড়ান, প্রাকৃতিক শক্তিকে উপযুক্ত আয়ত্তাধীনে আনিয়া ফলপ্রসূ করা, এবং শিল্প ও বাণিজ্য-সহায়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা। বর্ত্তমান যুগে অর্থনৈতিক বৃত্তিগুলি বিষম প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। এ প্রতিযোগিতার ভাল ও মন্দ দুইটি দিক রহিয়াছে। প্রতিযোগিতার ফলে শিল্পের নানা উন্নত প্রণালীর যেমন সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে যথেষ্ট অপব্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। আমাদের জাতিগঠনের প্রথম অবস্থায়, এবং হয় তো অনেক দিন ধরিয়াই 'সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন প্রণালী' অর্থাৎ Planned Economy অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। তাহাতে বিভিন্ন দিকে সর্ব্বতোব্যাপী উন্নতি আনিবার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিয়া জাতীয় শক্তি অপচয়ের সম্ভাবনা দূর করিতে হইবে। গত কয়েক বৎসরে সোভিয়েট রুশিয়া এই উপায়ে যেরূপ অসম্ভাবিত আর্থিক উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। রুশিয়া ও আমাদের দেশের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে অনেক, এবং সেখানকার রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত প্রভাব সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-প্রণালীর সহায়তা করিয়াছে, ইহাও সত্য। সেই মহাদেশ তাহার জনশক্তিকে অতি অল্প দিনেই যে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে, আমরা অর্থনৈতিক জীবনে তাহার কিয়দংশ লাভ করিতে পারিলেও একান্ত নিরন্ন এই দেশবাসীর জীবনের ভার বিশেষ লঘু হইবে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা সামান্য কিছু পাইলেই সঙ্ঘবদ্ধ দেশবাসী অনেক কিছু করিতে পারিবেন আশা করা যায়।

জাতির প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই শক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ফলপ্রসূ শক্তি চাষোপযোগী ভূমি। তাহার উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উর্ব্বরতা বাড়াইবার চেষ্টা আমাদের অর্থনৈতিক জীবন উন্নত করিবার প্রথম সোপান হওয়া উচিত। কিন্তু এই উন্নতিসাধন প্রকৃত পক্ষে করিতে হইলে আমাদের সমাজনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন

প্রয়োজন হইবে। তাহার কিছু আভাস এই প্রবন্ধের প্রথম ধারায় দেওয়া হইয়াছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উন্নত কৃষিপ্রধান দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের চাষের ব্যবস্থা অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এখানকার কৃষির অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিলে মোটামুটি নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়, যথা :—(১) উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা ও অন্যান্য কারণে একযোগে আবাদ-করা জমির পরিমাণ ক্রমে খণ্ডখণ্ড হইয়া পড়ায় চাষীকে ভিন্ন ভিন্ন মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় ও তজ্জন্য চাষের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। (২) শিক্ষা ও উপযুক্ত বুদ্ধি পরিচালনার অভাবে চাষের পদ্ধতি নিতান্ত পুরাতন ও অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে। (৩) কোন্ জমিতে কিরূপ চাষ ও কোন্ কোন্ ফসল আবাদ করা বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে কোন চর্চা না থাকায় প্রাকৃতিক শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হইতে পারে না। ৪। জলসেচন ও জলনিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় কৃষককে মেঘবর্ষণ ও নদীর প্লাবনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হয়। এরূপ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছানুযায়ী চাষের বিস্তৃতি নিয়মিত করা সম্ভব হয় না। (৫) বহু দিন ধরিয়া একই জমি উপর্য্যুপরি একই প্রকার চাষের অধীন রাখায় জমির উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে। ব্যবস্থা ও অর্থের অভাবে সেখানে উপযুক্ত সার পড়িতেছে না। (৬) কৃষির সুফল অনেকাংশে নির্ভর করে ভাল বীজের উপর। সাধারণতঃ, আমাদের চাষীদের মধ্যে শস্যের বীজ ভাল করিবার চেষ্টা দেখা যায় না ; এবং অনেক ক্ষেত্রে অভাবের তাড়নায় যত্নে রক্ষিত বীজ নিত্য ব্যবহারে খরচ করিয়া ফেলিয়া চাষী মহাজনের নিকট হইতে ভাল-মন্দনির্ব্বিচারে প্রাপ্ত শস্যের উপর নির্ভর করিয়া চাষাবাদ করে, ইহাতে উৎপন্ন ফলের পরিমাণ ও গুণ উভয়ই কমিয়া যায়। (৭) আমাদের দেশের ভূমিকর্ষণের প্রধান শক্তি গো-মহিষাদি। ইহারা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ও উপযুক্ত খাদ্য ও যত্ন-অভাবে ভারবাহী পশুগুলির এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে যে তাহাদের দ্বারা চাষের কাজ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। (৮) সকলের উপর কৃষির অবনতির কারণ হইয়াছে আমাদের গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যহীনতা ও তাহার উপর সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রকোপে পীড়িত কৃষকদের দৈহিক ও নৈতিক বলহীনতা।

বাংলার তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক জীবন সমাজতন্ত্রমূলকই হোক বা ধনিকবৃত্তিমূলকই হোক, উপরোক্ত কারণগুলি দূর করিতে না পারিলে জাতির স্বাস্থ্য কোনদিকেই ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না ইহা সুনিশ্চিত। অতএব সর্ব্বপ্রথমে দেশের কর্ম্মীদের এদিকে মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য।

আজ অনেক দিন হইতেই পল্লীসংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু কেন এযাবৎ তাহা কার্য্যতঃ বিস্তৃতভাবে সম্ভবপর হয় নাই এখন তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পল্লীর উন্নতি যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কামনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সব দিক দিয়া ইহার গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। সেইজন্য তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কার, জলাশয়ের উন্নতি, চাষীকে উন্নত শ্রেণীতে চাষের উপায় শিক্ষা দেওয়া, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ হইতে পল্লীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা এইগুলিই যথেষ্ট হইবে। একথা তাঁহাদের মধ্যে খুব কম লোকেই ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে এই সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে তত দিন সম্ভব হইবে না যত দিন চাষীকে তাহার পরিশ্রমলব্ধ শস্যের বেশীর ভাগ অনুপার্জ্জিত-বিত্ত-ভোগী জমিদার ও মহাজনের দলকে যোগাইতে হইবে, এবং তাঁহারাই জমির মালিক রহিবেন যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সহরের বিলাসিতার মধ্যে উপস্বত্ব ভোগ করিবেন।

আর একটি কথা। আমাদের দেশের নিরক্ষর দরিদ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীকে নূতন আশা ও কর্ম্মপ্রিয়তায় শীঘ্র উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে নিরন্তর প্রেরণা দিবার জন্য একদল ব্রতী-কর্ম্মীর গ্রামের জীবনের সহিত মিশিয়া বাস করা প্রয়োজন। এই কর্ম্মীর দল কোথা হইতে আসিবে এবং কি ভাবেই বা গ্রামে অবস্থান করিয়া গঠনমূলক প্রচার-কার্য্য চালাইবে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে কতকগুলি স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসী যুবকের অবৈতনিক সেবাপরায়ণতার উপর পল্লীসংস্কারের কাজের ভার ন্যস্ত না করিলে উপায় নাই, এবং এই বিশ্বাসে তাঁহারা স্থানে স্থানে আশ্রম অথবা সেবার কেন্দ্র খুলিবার পক্ষপাতী। এই উপায়ে যে গ্রামের কাজ কোন কোন বিষয়ে বেশ ভালই হইতে পারে তাহা মানিয়া লইলেও ইহা বলিতেই হইবে যে সমস্ত দেশটিকে উপযুক্ত সংখ্যক এরূপ কর্ম্মীদের দ্বারা সংগঠিত

করিবার আশা দুরাশা মাত্র, এবং যদিও কতকগুলি স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী পাওয়া যায় তথাপি তাঁহাদের সকলকে আশ্রমী করিয়া তুলিলে আশ্রম-মনোভাবের চাপে কর্ম্মকুশলতার ব্যাঘাত ও কর্ম্ম-পদ্ধতির জড়তা জন্মিবার ভয় রহিয়াছে। গ্রাম-সংস্কার ও গ্রামবাসীকে নূতন প্রেরণায় জাগাইয়া তোলার কাজ এক দিনের নহে। কোন সাময়িক আন্দোলন গ্রাম্য জীবনের বাহিরের সাময়িক কর্ম্মী দ্বারা পরিচালন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যে ব্রত বহুদিনের ও যে কাজ করিতে হইলে কর্ম্মীকে গ্রামেরই স্থায়ী একজন অধিবাসী শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে সে কাজ অবৈতনিক সেবকমাত্র দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া বোধ হয় সম্ভব নহে। সুতরাং পল্লীসংস্কারে নিযুক্ত কর্ম্মী যতদূর সম্ভব পল্লীরই বাসিন্দার মধ্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয় এবং পল্লী-জীবনের বিভিন্ন বৃত্তি দ্বারা, বিশেষতঃ শিক্ষকতা, ডাক্তারী ও সমবায়-সমিতির কর্ম্মচারীর কাজে যাহাতে তাঁহারা গ্রামে বসিয়াই স্বীয় উপার্জ্জনে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে কৃষির উপযোগী ভূমি ছাড়া সমুদ্র ও জলাশয়, পর্ব্বত, জঙ্গল, খনি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রৌদ্রের উত্তাপ, বায়ুর বেগ প্রভৃতি আরও অনেক ফলপ্রসূ শক্তি রহিয়াছে। এগুলির বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও কার্য্যকরী করিবার প্রচেষ্টা এখনও তেমন হয় নাই। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে কত অর্থকরী প্রকৃতির জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপযুক্ত ব্যবহার না করিতে পারিলে জাতির অর্থ-সঙ্কট ঘুচিবে না। একদল বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীকে গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস এই গবেষণার ফলে শীঘ্র আমাদের বাংলা দেশেই চাষ ভিন্ন আরও অনেক অর্থকরী বৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত দেখা যাইবে। রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিক ধনোৎপাদন-সঙ্কল্পের (Five Year Plan) পশ্চাতে এইরূপ গবেষণা ও নূতন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা ছিল।

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে কেবল মাত্র কৃষির ও বিভিন্ন বৃত্তির কর্ম্মকুশলতা বাড়াইলেই দেশবাসীর আর্থিক সঙ্গতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর ধারার উন্নতি সাধন হইবে না। উৎপন্ন ধান্য ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিনিময় ও দূর দূরান্তরে সরবরাহের সুব্যবস্থা না করিতে পারিলে অর্থ সমাগম তেমন হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের গ্রাম হইতে সহরগুলি পর্য্যন্ত জিনিষপত্র-বহনের জন্য যানবাহনাদি ও তদুপযুক্ত রাস্তাঘাট, রেল লাইন ও জলপথের প্রয়োজন। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন উন্নতমনা মহাজনের এবং শিল্পবাণিজ্যের বিভিন্ন কার্য্যোপযোগী ব্যাঙ্ক ও আড়তের।

এইবারে বাংলার শিল্পগুলি কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। দেশের অধিকাংশ নরনারী এখনও বহুদিন কৃষি ও তৎসংক্রান্ত শিল্পসমূহের উপর নির্ভরশীল থাকিবে বলিয়া মনে হয়। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল করিতে হইলে একমাত্র কুটির-শিল্পগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির প্রয়োজন। একথা অবশ্য মানিতেই হইবে যে যতদূর সম্ভব গ্রামবাসীদের হাতে কৃষি ছাড়া অন্যান্য কাজ যোগাইতেই হইবে, যাহাতে তাহাদের পরিশ্রম পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার সুযোগ মিলে। কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন কুটির-শিল্প পুনরায় গ্রামে প্রচলনের চেষ্টা করিলেই জাতির উৎপাদনী-শক্তি যে সম্যক্ কাজে লাগান হইবে তাহা মনে করা ভুল। আমাদের অর্থনৈতিক জীবন এখন অনেকটা পরস্পরসাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, এবং শুধু ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কেন, অনেক ক্ষেত্রে বিদেশের সঙ্গেও আমাদের উৎপাদন-প্রণালী প্রতিযোগিতামূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ বাংলা দেশকে, এখন আর স্বয়ংতুষ্ট (self-sufficient) গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর হইবে না। সেজন্য শিল্পসমূহের বিস্তৃতি বিজ্ঞানসম্মত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পীগণ দাঁড়াইতে পারিবে না এবং অযথা জাতীয় শক্তির অপব্যয় হইবে।

ছোট বড় শিল্পগুলিকে মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যায়। যথা :—মূলগত (key or basic) শিল্প, বৃহৎ কারখানা-শিল্প, মধ্যম শ্রেণীর শিল্প ও কুটির-শিল্প। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষে কাল ও পাত্র হিসাবে সকল প্রকার শিল্পেরই প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রহিয়াছে। বাংলার নরনারীকে প্রকৃতপক্ষে আর্থিক উন্নতির পক্ষে লইয়া যাইতে হইলে তাহাদিগকে কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিলে চলিবে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং আমাদের ব্যবহার্য্য

যে সকল দ্রব্য বাংলার ও ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসে, তাহার চাহিদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, শ্রমিক শক্তিকে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করিবার ও কৃষিকর্ম্মের মধ্যে অবসর সময়ে অর্থকরী বৃত্তিতে নিয়োজিত করিবার সুযোগ দিবার জন্য যথাসম্ভব গ্রাম্য পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু যে সকল শিল্পে বাহিরের প্রতিযোগিতা খুব বেশী ও যাহাতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কারখানার প্রয়োজন হয় সেগুলির জন্য বড় বড় কারখানা-শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে। মোট কথা, আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ শিল্পগুলির বৈজ্ঞানিক বিচার হওয়া প্রয়োজন এবং যথাসম্ভব গ্রাম্য শিল্পগুলির বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয় ইহা মনে রাখিয়া অর্থনীতি হিসাবে যেখানে যেরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠা বিজ্ঞানসম্মত তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

এই সব শিল্পগুলির মালিক কিরূপ হইবে তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত, কারণ শিল্পের সংস্থান বা organisationএর উপর জাতীয় জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। এই প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে আমাদের যে সকল মূলগত বৃহৎ শিল্পের (অর্থাৎ key ও basic industries) উপর সমস্ত জাতির জীবন নির্ভর করে সেগুলির ব্যক্তিগত পরিচালনা (private ownership & control) দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। দেশের গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে আসিলে পর এই সব শিল্প রাষ্ট্রগত বা nationalised হওয়া দরকার হইবে। তাহার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হওয়া ভাল। ইহা ছাড়া সুবৃহৎ কারখানা-শিল্পের মধ্যে যেগুলি বাহিরের প্রতিযোগিতার সহিত সমান কর্ম্মকুশলতায় পরিচালনা করা এখন সম্ভব নহে সেগুলিকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হইবে এবং দেশীয় ব্যবসায়ীগণকে এরূপ শিল্পে ব্রতী করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নানা উৎসাহমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আবশ্যক হইলে এরূপ শিল্পের আংশিক দায়িত্বও রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

অপর দিকে যে সকল শিল্প কুটিরে ও গ্রামে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে পরিচালনা করা সম্ভব বলিয়া প্রতীত হইবে তাহার জন্য সমবায়-নীতিমূলক উৎপাদন-প্রণালী অবলম্বন করা ভাল হইবে। এগুলির জন্য গ্রামবাসীগণকে শিক্ষা দেওয়া ও ক্রমশঃ যাহাতে শিল্পের কুশলতা বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সতর্ক থাকার জন্য কেন্দ্রীয় ও শাখা-সমিতি সংগঠন করা প্রয়োজন হইবে। এই সমিতিগুলিতে প্রত্যেক শিল্পের বিশেষজ্ঞগণ সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে বৃহৎ কারখানা-শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটির-শিল্পীগণ ধ্বংসমুখে পতিত না হয়।

এইরূপে শিল্পসমূহের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্নস্তর সুসম্বদ্ধ হইয়া গেলে মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পগুলি পরিচালনার জন্য দেশীয় ধনিকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন শিল্প-সংস্থানের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। সমস্ত সমাজকে এইরূপে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিলেই আর্থিক দুঃখ ও দুরবস্থা দূর হইবে, নতুবা এখানে সেখানে সামান্য সংস্কার করিলেই সমগ্র দেশবাসীর স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য আসিবে না। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকে ব্যাঙ্কপরিচালনায় ও ব্যবসায়ে ক্রমশঃ অধিকতর মন দিতে হইবে। এই দুই বিষয়েই আমাদের এখন বিশেষ দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, এবং তাহারই সুযোগ লইয়া বিদেশী ও অবাঙ্গালী বণিক-শ্রেণী বাংলা দেশ হইতে প্রতি বৎসর বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে এখনও দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর যত্ন-প্রতিষ্ঠিত শিল্প হইতে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার অভাবে ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে, না হয় অবাঙ্গালী ও বিদেশীর হাতে চলিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গালী যুবককে মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীদের পন্থা অনুসরণ করিয়া বাংলার সংগ্রহমূলক ও বিতরণমূলক (collective and distributive) সমস্ত ব্যবসায় হস্তগত করিতে হইবে, এবং কলিকাতায় ও মফঃস্বলে আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্বাণিজ্যের সহায়ক বাঙ্গালীর ছোট বড় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিবেন, যে, নীতি তো অনেক শোনা গেল কিন্তু এই মত কাজ করিবার অর্থ আসিবে কোথা হইতে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে বাংলা দেশের মধ্যেই এখনও অনেক অব্যবহৃত ধন রহিয়াছে যাহা উপযুক্ত ব্যবস্থায় ধনিকের হাত হইতে শিল্প ব্যবসায়ে আসিতে পারে। জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বর্ত্তমানে উদ্বৃত্ত বিত্ত খাটাইবার প্রধান উপায় জমি-জমা ও বাড়ীঘর। জমির উপস্বত্ব ভোগ বন্ধ হইয়া গেলে অনেক টাকা দেশের শিল্পে ও ব্যবসায়ে আসিতে বাধ্য হইবে। ইহা ছাড়া দেশের ব্যাঙ্ক উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত হইলে অনেক বদ্ধ সম্পত্তির পরিবর্ত্তে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতদূর আর্থিক উন্নতি সংশোধিত করা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশক্তির সহায়তার পরিমাণের উপর। বাংলার দুঃখমোচন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা ততদিন হইতে পারিবে না, যতদিন না রাষ্ট্রশক্তি এই কার্য্যে একান্তভাবে ব্রতী হইবে।

আলোচনা

বাঙ্গালা পরিভাষা বিচার

মাতৃভাষার বিস্তারলাভের সঙ্গে কেবলমাত্র সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং এই জন্য আজ ভাষা ভিন্ন পরিভাষারও অন্বেষণ সূচিত হইতেছে। পরিভাষা সম্বন্ধে ইতোপূর্ব্বে বহুলোক আলোচনা করেন নাই। সম্প্রতি কার্ত্তিকের প্রবাসীতে (১৩৪০) শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বাঙ্গালা পরিভাষা সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্ব মূলতঃ ও সিদ্ধান্তগুলি অংশতঃ সুসঙ্গত না হইলেও তাঁহার এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়. কিন্তু এই তত্ত্বাদির অসঙ্গতির কারণ খুব সম্ভব পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তাদি অগ্রহণ। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি পংক্তিতে বিচার করা যায় না এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবুর ভুল প্রদর্শনই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে বঙ্গভাষাভাষী বলিয়া বর্ত্তমান লেখকেরও এ সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্য আছে এবং তজ্জন্যই মূলতঃ রাজশেখর বাবুর প্রবন্ধ অবলম্বনে এ প্রবন্ধটি রচিত হইল।

রাজশেখরবাবু লিখিতেছেন "অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ সীমাবিশিষ্ট বা সুনির্দ্দিষ্ট তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গবিশেষে নির্দ্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা-স্থানীয়। সাধারণতঃ 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন-বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।" এস্থলে "সংক্ষেপার্থ শব্দে"র "অর্থ" শব্দ সংক্ষেপ শব্দের সহিত অন্বিত থাকায় উহার অর্থ "নিমিত্ত". সুতরাং সংক্ষেপার্থ শব্দের অর্থ "সংক্ষেপের নিমিত্ত যে শব্দ", "অর্থ" শব্দের এই অর্থই দুর্গাদাসও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা— "গ্রন্থস্য সংক্ষেপ-নির্ব্বাহার্থ সঙ্কেত বিশেষঃ"। যথা টপোদিতেত্যাদি। ইতি মুগ্ধবোধটীকায়াং দুর্গাদাসঃ (শব্দকল্পদ্রুম পৃঃ ৫৯৬)। শব্দের অর্থ সীমাবিশিষ্ট বা সুনির্দ্দিষ্ট হইলেই উহা পরিভাষা হয় না, যথা বঙ্গদেশস্থ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ "ভাত" বুঝাইতে অনেকস্থলে "অন্ন" শব্দ ব্যবহার করেন, একপস্থলে "অন্ন" শব্দ পরিভাষা নহে। যে শব্দাবলীর অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হইয়াছে উহাও নিশ্চয়ই পরিভাষা নয় কারণ কেবলমাত্র পণ্ডিতগণই কোন শব্দের অর্থ স্থির করিবার কর্ত্তা কিনা ইহা বিবেচ্য এবং কাহারাই বা পণ্ডিত তাহাও জানা প্রয়োজন। বৈয়াকরণিকও পণ্ডিত, স্মার্ত্তও পণ্ডিত এবং নৈয়ায়িকও পণ্ডিত; কিন্তু বৈয়াকরণিকের পরিভাষা যদি স্মার্ত্ত স্থির করেন এবং স্মার্ত্তের পরিভাষা যদি নৈয়ায়িক স্থির করেন, তবে ব্যাপারটা খুব মনোরম হইবে না নিশ্চয়ই। এস্থলে বলা প্রয়োজন রাজশেখরবাবুই "চলন্তিকা"তে "পরিভাষা" শব্দের অর্থ করিতে লিখিয়াছেন, "বিশেষ অর্থবোধক শব্দ, সংজ্ঞা, terminology, technical term ('বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক—')" (পৃঃ ৩১৬) বলাবাহুল্য "পরিভাষার" উপরোক্ত এই দ্বিবিধ অর্থের পরস্পর সুসঙ্গতি নাই।

পরিভাষা ভাষা হইতে স্বতন্ত্র; কোন বিশিষ্ট বিষয় যথা, অর্থশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতির অন্তর্গত বিভাগাদি সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে ভাষা ভিন্ন সেই সেই বিষয়ের যে বিশিষ্ট শব্দাদি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় উহা পরিভাষা। ভাষা লেখকের মনোভাব ব্যক্ত করে, কিন্তু পরিভাষা কোন বিশিষ্ট বিষয়ের বিশেষত্ব প্রকাশ করে এবং এই জন্যই বিষয়ের প্রভেদ অনুসারে পরিভাষাও ভিন্ন, যথা, অর্থশাস্ত্রীয় পরিভাষা, ব্যাবসায়িক পরিভাষা, ইত্যাদি। * * * * ভবতি ঘটীনাং ষষ্ট্যাহোরাত্রং তৈস্ত্রিসঙ্গুণৈর্দশভিঃ। মাসো দ্বাদশভিস্তৈর্বর্ষং গণিতেঽত্র পরিভাষা।*

এইরূপে (১) একই শব্দ এক জাতীয় ব্যক্তির নিকট এক অর্থে পরিভাষা কিন্তু অপর জাতীয় লোকের নিকট ভিন্ন অর্থে পরিভাষা, এবং (২) একই শব্দ এক জাতীয় লোকের নিকট পরিভাষা, কিন্তু অপর জাতীয় লোকের নিকট নহে। এইরূপে (১) সাধারণের নিকট "চিত্ত" শব্দের অর্থ 'মন, অন্তঃকরণ" (চলন্তিকা, পৃঃ ১৭৭), কিন্তু বৈদান্তিকের নিকট "অনু-সন্ধানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ" (শব্দকল্পদ্রুম, পৃঃ ৩০৮), বৈষ্ণবের নিকট "যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং সান্তত্ত্বং ভগবতঃ পদম্ যদাহুর্ব্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥" (শব্দকল্পদ্রুম, পৃঃ ৩০৪), পক্ষান্তরে সাংখ্যমতাবলম্বীর নিকট, "চিত্তংহি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাত্ত্রিগুণম" ইত্যাদি।† যাহা হউক, বৌদ্ধমতে চিত্ত 'is not a permanent substance. The rise of চিত্ত is a mere expression to fix the occasion for the induction of the whole concrete psychosis and also in a variety of other senses such as mental object or presentation (*arammanam*), the process of connecting the last things arising in consciousness with that which preceded them (*sandhanam*) the property of imitative action (*pure carikam*) etc. (Yoga Philosophy p. 284 by Dr. S. N. Dasgupta, Calcutta 1930) এবং (২) ব্যবসায়ীর নিকট বস্তু বুঝাইতে "পণ্য" বা "মাল" (merchandise) একটি পরিভাষা কিন্তু অর্থ-নীতিশাস্ত্রবিদের নিকট বস্তু অর্থে ব্যবহৃত পরিভাষা "সামগ্রী" (commodity)।

পরিভাষার এই বৈচিত্র্যের কারণ, পরিভাষা "পদার্থবিবেচকাচার্য্যাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্" ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং চণ্ডীদাসঃ (শব্দকল্পদ্রুম, পৃঃ ৫৯৬), পদার্থবিবেচক [পদার্থের বিবেচক = বিবেচনকর্ত্তা, বিবেচনম — 'বিবেকঃ' "পরস্পরব্যাবৃত্ত্যা বস্তুস্বরূপনিশ্চয়ঃ" বা "বস্তুনো ভেদঃ" (শব্দকল্পদ্রুম পৃঃ ১৩৬৬)] অর্থাৎ স্বরূপনিশ্চয় দ্বারা পদার্থান্তর নির্ণায়ক আচার্য্যের‡ যুক্তিসমন্বিত [যুক্তি — ন্যায় বা লোকব্যবহার বা অনুমান (শব্দকল্পদ্রুম পৃঃ ১১০৫)] বাক্

---

* শ্রীধরাচার্য্যকৃত ত্রিশতিকা পৃঃ ২, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদি সঙ্কলিত বারাণসী ১৮৯৯।

† পাতঞ্জলযোগসূত্রাণি, পৃঃ ৪, অভ্যঙ্কর সংস্করণ বম্বে ১৯১৭।

‡ আচার্য্য শব্দের অর্থ "বঙ্গশ্রী" ২য় খণ্ডে ২য় সংখ্যায় ২০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পরিভাষা : সুতরাং কোন বিশিষ্ট বিষয়ে জন্মগত সংস্কারাদিসমন্বিত অধিকারীর শিক্ষা ও চর্চ্চা প্রভৃতি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের ক্রমবিকাশে স্বরূপনিশ্চয়ে ও পদার্থান্তর নির্ণয়ে যে যুক্তিসমন্বিত শব্দ ব্যবহৃত হয় উহা পরিভাষা, সুতরাং পরিভাষা এইরূপ ব্যক্তির আত্মবিবর্দ্ধনানুযায়ী নিশ্চিতির প্রকাশ মাত্র।

"সাধারণ লোকে কথাবার্ত্তায় চিঠিপত্রে অসংখ্য শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করে, কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চার জন্য করে না, সেজন্য আমাদের খেয়াল হয় না যে সে-সকল শব্দ পারিভাষিক। 'স্বামী, স্ত্রী, গাই, ষাঁড়, বন্ধক, তামাদি, লোহা, তামা, চৌকো, গোল' প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিক খ্যাতি নেই, কারণ এ-সকল শব্দ অতিপরিচিত।" উপরোক্ত কথাগুলির অর্থ অস্পষ্ট বোধ হইতেছে, কারণ ইহার কয়েক পংক্তি উপরেই রাজশেখর বাবু লিখিয়াছেন, "যে শব্দের অর্থ সীমাবিশিষ্ট বা সুনির্দ্দিষ্ট তা পরিভাষা", এবং বহু পারিভাষিক শব্দই বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং উপরোক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিই পরিভাষা, যদিও উহা "অতিপরিচিত", সুতরাং অতিপরিচিত হইলেই শব্দের পরিভাষা হইবার উপযুক্ততা নষ্ট হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রে এবং আইনে "স্বামী" ও "স্ত্রী" পরিভাষা, প্রাণীতত্ত্বে "গাই" ও "ষাঁড়" পরিভাষা, মহাজনী ও তেজারতিতে "বন্ধক" ও "তামাদি" পরিভাষা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, খনিজবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতিতে "লোহা" ও "তামা" পরিভাষা, এবং গণিত শাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে "চৌকো" ও "গোল" পরিভাষা।

বাস্তবিক পক্ষে শব্দের স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় উহা কোন না কোন বিশিষ্ট অর্থে, কোন না কোন বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের আত্মবিবর্দ্ধনানুযায়ী প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেক শব্দই স্থল বিশেষে পরিভাষা, কিন্তু বিষয়ান্তরে নহে। প্রাণীতত্ত্ববিদের নিকট "কান্‌কো যুক্ত হাত-পা-বিহীন মেরুদণ্ডী অণ্ডজ (এবং আরও কয়েকটি লক্ষণযুক্ত) প্রাণী" "মৎস্য," সুতরাং "চিংড়ি" "মৎস্য" নহে, কিন্তু মৎস্য-ব্যবসায়ীর পরিভাষায় "চিংড়ি" নিশ্চয়ই "মৎস্য"।

বিদ্যাচর্চ্চায় পরিভাষার প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে যথা, কাড়া, ব্যবসায় প্রভৃতিতেও নিশ্চয়ই পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। "সাধারণ কাজে" পরিভাষার তত প্রয়োজন হয় না বাক্যটি সঙ্গত নহে, যেহেতু সাধারণ কেন, কোন কাজেই ভাষা বা পরিভাষার প্রয়োজন হয় না। ভাষা "কাযাবিপর্য্যয়ঃ" (শব্দকল্পদ্রুম, পৃ ৮৮২), পরিভাষা "পদার্থবিবেচকাচাযাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্" এবং "ক্রিয়তে যৎ" ইতি কাযাম্ (শব্দকল্পদ্রুম, পৃ ১৮৩)।

লেখক বা বক্তার মনোভাব-প্রকাশক শব্দ ভাষা, কিন্তু ঐ শব্দই ভাষার তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট পরিভাষা, এইরূপে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া প্রভৃতি বৈয়াকরণিকের নিকট পরিভাষা, কিন্তু লেখক বা বক্তার নিকট মনোভাব প্রকাশক শব্দ মাত্র। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে পরিভাষায় লোক ব্যবহারেরও নিশ্চয়ই স্থান আছে; কারণ পরিভাষা "পদার্থ বিবেচকাচায্যাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্" এবং "যুক্তি"র একটা অর্থ "লোকব্যবহার"

বহুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ইংরেজী ভাষার আদর ছিল না কারণ তাঁহারা ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষায় প্রগাঢ় আস্থাবান ছিলেন। বর্ত্তমান কালে বঙ্গবাসীদিগের নিকটও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষার আদর অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার প্রমাণ এই যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গভাষায় যে উদ্বোধনের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল উহা পরে আর রক্ষিত বা বর্দ্ধিত হয় নাই। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা ভাষায় (বিশেষতঃ কথ্য ভাষায়) যেরূপ বিনা প্রয়োজনে ইংরেজী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ বিনা প্রয়োজনে উর্দ্দু শব্দের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইত। বাঙ্গালা ভাষার এই দৈন্যের জন্য ভাষার নিন্দা করা হাস্যকর কারণ ভাষা প্রকৃতিপ্রসূত নহে, বক্তার প্রয়োজনানুযায়ী ও আত্মবিবর্দ্ধনানুযায়ী শব্দ, সুতরাং বাঙ্গালাভাষাভাষীদের জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানপ্রসারের ফলেই বাঙ্গালা ভাষা ও পরিভাষা গড়িয়া উঠিবে অন্য কোন কারণে নহে। ইংলণ্ডে যে Eau-d -Cologne প্রস্তুত হয় উহা নিশ্চয়ই জার্ম্মানীর Cologne প্রদেশ হইতে আসে না, তথাপি উহার নাম Eau-de-Cologne, ইটালীর Del credere শব্দ ইংরাজীতে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহৃত হয়, ইটালীর Double-entry system সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়াছে, ইংরেজী Lloyd's জার্ম্মানীতেও Lloyd's, ইহার কারণ পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রথম আবিষ্কার বলিয়া পরবর্ত্তী দেশগুলিও পূর্ব্ববর্ত্তীর গৌরব রক্ষা করিতেছে। ইংরেজীতে ব্যবহৃত এক লক্ষ শব্দের মধ্যে দ্বিতৃতীয়াংশেরও অধিক ইংরেজী নহে*। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর মানবমণ্ডলীর পরস্পর সংযোগ সাধিত হইতেছে। যে জাতি সর্ব্বপ্রথম মানব-সভ্যতা বৃদ্ধির উপযোগী কোন কার্য্য করে সেই জাতির সেই বিশিষ্ট বিষয়ের পরিভাষা অপর জাতি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে ও এইরূপ করায় পরবর্ত্তীর জীবনী-শক্তি প্রকাশ পায় মাত্র।

সংস্কৃতচর্চ্চার যুগে দেশে কেবল মাত্র কয়েকখানা রসগ্রন্থই রচিত হয় নাই, চর্চ্চার উপযোগী অন্যান্য বিষয়েও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এ সমস্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেকেই কোন সন্ধান রাখেন না, সুতরাং তাৎকালিক ভারতীয় চর্চ্চায় ব্যবহৃত ভাষা ও পরিভাষা আজ পুনরাবিষ্কারের প্রচেষ্টা হইতেছে মাত্র। ঐ সকল পরিভাষা আজ অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত, সুতরাং বিভিন্ন লোক বিষয়প্রবেশ না করিয়াই কেবল মাত্র পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের জন্য প্রসঙ্গচ্যুত এক আধটা পরিভাষার ব্যবহার করিলে উহা নিঃসন্দেহ ভ্রমাত্মক হইবে। পক্ষান্তরে তাৎকালিক ভারতীয় চর্চ্চায় যে সকল বিষয় পরিগৃহীত হয় নাই, কিন্তু মানবসভ্যতা বিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশে পরিগৃহীত হইয়াছে, সভ্যসমাজভুক্ত থাকিতে হইলে ঐ সকল আমাদিগকে নিশ্চয়ই পরিগ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং সেই সেই দেশের পরিভাষা ব্যবহারে আমাদিগের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নাই। পৃথিবীতে সর্ব্বত্র এইরূপ হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যদি ইহাতে আমাদিগের চিত্তে ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণের একমাত্র উপায় আমাদিগেরও মানবসভ্যতা-বিবর্দ্ধনে সাহায্য করা, তাহা হইলেই বঙ্গীয় পরিভাষাও স্বতঃই প্রসার লাভ করিবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা উচিত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মানবসভ্যতা-বিবর্দ্ধনের জন্য কি কি কাজ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য দেশীয়গণও এই কল্পে

* The Art of Writing English. p 121 by Prof. J. M. D. Meiklejohn. London, 9th edition.

কি কি কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এস্থলে মনে রাখা উচিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও বিদেশী পরিভাষা প্রয়োজনানুযায়ী গ্রহণ করিতেন। গ্রীক horizon সংস্কৃতে হরিজরূপে এবং গ্রীক Kentron (centre) কেন্দ্ররূপে সুপরিচিত ; এইরূপ আরও বহু পরিভাষা বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত নহে।

যদি "সকল বিদ্যার পরিভাষাকেই মোটামুটি এই কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—বিশেষ (individual), দ্রব্য (বস্তু, substance ; অথবা সামগ্রী, article), বর্গ (class), ভাব (abstract idea) বিশেষণ (adjective) ; ক্রিয়া (verb)" তাহা হইলেই কি মানব-পরিকল্পিত সমস্ত বিষয়ের উপযুক্ত পরিভাষা স্থির হইবে ?

"দ্রব্যে" ("বস্তু" অথবা "সামগ্রীতে") কি বিশেষ ও বর্গ নিহিত নাই ? উপরোক্ত এই কয়টি বিভাগ বিবেচনা করিলেই দেখা যায় উহা ইংরেজী ব্যাকরণের যথাক্রমে Proper noun, Material noun, Common noun বা Class noun, Abstract noun, Adjective এবং Verb মাত্র ; সুতরাং যাবতীয় বিষয়ের পরিভাষা মাত্র ইহাতেই নিহিত কিনা উহা আলোচনা করাও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। পরিভাষা মানবকল্পিত প্রত্যেকটি বিষয় অনুসারে বিভিন্ন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কোন বিশিষ্ট বিষয়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পরিভাষার প্রয়োজন হয়। পরিভাষার কাজ ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু প্রদর্শন এবং ভাষার কাজ প্রকাশ করা ; সুতরাং যে কোন বিশিষ্ট বিষয়ে কতকগুলি বিশিষ্ট পরিভাষার বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। বহু দার্শনিক পরিভাষা সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু দার্শনিক অর্থে নহে।

"বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা "সঙ্কলন"(?)কালে নিম্নলিখিত উপাদানের—(ক) সংধারণ বাংলা শব্দ, (খ) হিন্দী উর্দু ফার্সী আর্বী শব্দ ; (গ) ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ (পূর্ব্ব বর্ণিত a b c d), (ঘ) প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ ; (ঙ) মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্ন-জাতীয় শব্দএর যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে" বটে কিন্তু কি উপায়ে ? এবং বিচারক হইবেন কে ? উপরোক্ত "উপাদান" গুলিও বিচারযোগ্য। এস্থলে "সঙ্কলন" শব্দটির একটু আলোচনা করা প্রয়োজন হইতেছে। "সঙ্কলন" শব্দের অর্থ "একত্রীকরণ" "যোজন" (শব্দকল্পদ্রুম, পৃ ১৬৩৩)। বাঙ্গালা পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের কার্য্য কি ইহাতেই মাত্র সীমাবদ্ধ ?

"পরিভাষা যদিও মুখ্যতঃ বাঙালীর জন্য সঙ্কলিত হবে, তথাপি অধিকাংশ শব্দ যাতে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর (বিশেষতঃ হিন্দী উড়িয়া মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষীর) গ্রহণযোগ্য বা সহজবোধ্য হয় সে চেষ্টা করা উচিত। তাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভাববিনিময়ের সুবিধা হবে।" এইরূপ করিলে যে পরিভাষা নিশ্চিত হইবে (যদিও এইরূপে কোন পরিভাষা হয় কিনা বিশেষ সন্দেহ) উহা কাহারও কোন কাজে লাগিবে কি ? ইংরেজী পরিভাষার প্রসারলাভের কারণ কি তাহাদের সমস্ত পৃথিবীর জন্য একটা পরিভাষা-নির্ম্মাণ(!) (manufacture) নাকি ? পক্ষান্তরে এদেশে ব্যবসায়িক ইংরেজী পরিভাষার মূলানুসন্ধানে দেখা যায় মধ্যযুগে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-প্রয়োজনে যে ব্যবসায়িক পরিভাষা ব্যবহার করিতেন, ব্যবসায়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা সমগ্র ভারতে সার্ব্বজনীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরসভা কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে কোম্পানির কার্য্যে ইংরেজী পরিভাষা ব্যবহারের জন্য উপদেশ দেন—"We will always observe our own old English terms, viz. Attorney General instead of Fiscal.....President and Agent instead of Commandore, Directore, or Commissaries" * কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেশপ্রচলিত Vakil (বকিল), Banyan (বাণিয়া), Shroff (সর্‌রাফ) প্রভৃতি পরিগৃহীত হইয়াছে। জাপানী বাণিজ্যে ইংরেজী পরিভাষার ব্যবহারে ইহাই প্রতীত হয় যে প্রয়োজনানুযায়ী পরিভাষা প্রসার লাভ করে।

"বহুকাল ইংরেজী প'ড়ে আমাদের জিবের জড়তা অনেকটা ঘুচেছে" কিনা এবং "সংস্কৃত শব্দেও কটমটির অভাব নেই" কিনা আমরা জানি না। তবে একথা ঠিক "বান্ হাউস" সাধারণের নিকট এবং "হিস্‌সা" ব্যবসায়ীর নিকট সুপরিচিত নহে, কারণ "বানহাউস" ব্যবসায়ে, "হিস্‌সা" জমিদারীতে প্রচলিত পরিভাষা। হিন্দীতে share অর্থাৎ divisible part of a whole অর্থে হিস্‌সা সুপরিচিত হইলেও আমরা "হিস্‌সা"কে ঠিক ঐ অর্থে জানি কি ?

গণিতে "ঘাত" শব্দের অর্থ কি "power" ? "ঘাত" শব্দে "অঙ্ক-পূরণম্"— যথা সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃ প্রদিষ্টঃ। ইতি লীলাবতী (শব্দকল্পদ্রুম পৃঃ ২৮০) বলিয়া পাওয়া যায়। সাহিত্যে হন্ ধাতুর অর্থ বধ করা হইলেও গণিতে হন্ ধাতুতে পূরণ করা বুঝায়, যথা—পঞ্চঘ্নঃ স্বত্রিভাগোনো দশভক্তঃ সমন্বিতঃ। রাশিত্র্যংশাদ্ধ পাদৈঃ স্যাৎ কোরাশির্দ্বানসপ্ততি (লীলাবতী, পৃঃ ১৮ ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণ কলিকাতা ১৯০৯)। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় power শব্দের অর্থ "সমবধ" বা "সমঘাত" লিখিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে "প্রচলিত বাঙ্গালা পাটীগণিতের পরিভাষা" বলিয়া powerএর অর্থ "শক্তি" এবং প্রাচীন "গ্রন্থের পরিভাষা" বলিয়া powerএর অর্থ "সমবধ" উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। (ভারতবর্ষ, ২১ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৯২)। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর মতই গ্রাহ্য।

ভাষা ও পরিভাষা মনোব্যাপারসম্পর্কিত এবং ভাষা ও পরিভাষার মনে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই মানসিক স্থান জাতি ও জন্মগত সংস্কারাদি সম্বন্ধযুক্ত সুতরাং এগুলিকে বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া পরিভাষার "সঙ্কলন" (?) হইতে পারে কি ? বাঙ্গালা "বক দেখানো," "ভোগা দেওয়া", "লম্বা দেওয়া", "নাক সিঁটকানো" প্রভৃতি যদি বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহাদের স্থলে সেই সেই ভাষায় কি উপরোক্ত শব্দগুলির যথোপযুক্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইতে পারে ? এগুলি যেমন ঠিক এইরূপেই অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হইতে হইবে, অন্য ভাষায়ও সেইরূপ যে ব্যক্তি আত্মবিবর্দ্ধনানুযায়ী নিশ্চিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহার সেই নিশ্চিতির প্রকাশ

* India Office Records, Letter Book No. 8, Dispatch to Fort St. George, Sept. 28, 1687

আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইলে, হয় সেই সব নিশ্চিতি যথাযথ রক্ষা করিতে হইবে অথবা তাঁহার ন্যায় আমাদিগকেও নিশ্চিতি লাভ করিয়া উহা প্রকাশ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য বা পরোপকারার্থ পরিভাষা-"সঙ্কলনে"র চেষ্টা নিশ্চয়ই বৃথা প্রয়াস মাত্র। আত্মপ্রয়োজনানুযায়ী লেখক যদি ক্রমাগত কোন অশুদ্ধ প্রয়োগও করেন (যেমন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের "কি" বুঝাইতে "কী" প্রভৃতি), ঐ ভুল ক্রমশঃ গা-সহা হইয়া পড়ে এবং কেহ ঐ সব ভুল প্রদর্শনের চেষ্টা করিলে, সাধারণ পাঠক তাহাকে সুচক্ষে দেখেন না। একটা "সঙ্কলন সমিতি যাহার প্রত্যেক সদস্যের উপযুক্ত বৈদগ্ধ্য না থাকিতে পারে কিন্তু কয়েকজনের থাকা সম্ভব" উহার কার্য্যের গুরুত্ব কি? এবং দায়িত্বই বা কতটুকু? ভাষা বা পরিভাষা কি কোন একজন বা কয়েকটি লোকের বিধিনিষেধজ্ঞাপক নিয়ন্ত্রণ বা স্বেচ্ছাচারের ফল নাকি? এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন. তবে একথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, পরিভাষা "পদার্থবিবেচকাচার্য্যাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্।"

শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

ভূদেব প্রসঙ্গ

বিগত ভাদ্র সংখ্যার "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা লিখিয়াছেন: উহা পাঠ করিয়া মনে হইল, প্রবন্ধটি তিনি বিশেষ অবধানতা সহকারে লেখেন নাই—তাই ইহাতে কতিপয় ভ্রান্তি লক্ষিত হইল, সংশোধনার্থ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

১। প্রারম্ভেই তিনি বলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বৎসরাধিককাল চন্দননগরে বাস করিয়াছিলেন, তখন আমি কলেজ ছাড়িয়া জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভূদেব বাবুর যখন মৃত্যু হয়, তখন আমি কলেজের ছাত্র।' কিন্তু বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালে স্বর্গগত হন ভূদেব বাবু ইহার প্রায় তিন বৎসর পরে (১৮৯৪ সনে) পরলোকপ্রাপ্ত হন। ইহার পর বোধহয় আর কোনও কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

২। তিনি লিখিয়াছেন, 'কিছু দিনের জন্য তিনি (ভূদেব) শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন।' অনেকেরই এরূপ ধারণা আছে বটে—কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। তিনি শিক্ষাবিভাগের (ডিরেক্টরের নীচে) সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং সেই নিমিত্ত, তদানীন্তন ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট্ সাহেব কিছু দিনের জন্য ছুটি নিবার প্রস্তাব হইলে, গবর্ণমেণ্ট ভূদেব বাবুকে ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত করিবেন, এই সংকল্প করেন। শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর, প্রিন্‌সিপ্যাল প্রভৃতি যত সাহেব ছিলেন তাঁহারা ঐটা পছন্দ করেন নাই—তাই তাঁহারা ক্রফ্‌ট্ সাহেবকে ছুটি না নিবার নিমিত্তে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন—ক্রফ্‌ট্ তাই ছুটিতে যান নাই। অতএব ভূদেব বাবুও ডিরেক্টরের পদে অভিষিক্ত হন নাই।

৩। যোগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "ভূদেব বাবুর পত্নীর নাম ছিল কালী।" আমি ৺মুকুন্দ দেব বাবু হইতে জানিয়াছিলাম, ঐ মহীয়সী মহিলার নাম ছিল "এলোকেশী"। তিনি তেমন গৌরাঙ্গী না হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং পতির চিত্তবৃত্তির সর্ব্বথা অনুসারিণী ছিলেন—"পারিবারিক প্রবন্ধে"র উৎসর্গ-পত্র পড়িলে এই দেবীস্বরূপার মাহাত্ম্য উপলব্ধ হইবে।

৪। তিনি লিখেন, 'দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ বাবু এবং কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ দেবকে রাখিয়া ভূদেব বাবু দেহত্যাগ করেন।' মুকুন্দদেবের পরে ভূদেবের আর একটি ছেলে জন্মিয়াছিল—অল্প বয়সেই মারা যায়। তাই মুকুন্দ 'কনিষ্ঠ' পুত্র ছিলেন না—'তৃতীয়' পুত্র ছিলেন।

এই সকল ভ্রান্তি নিরসনপূর্ব্বক যোগেন্দ্র বাবুর আরো দুই একটি কথার প্রতিবাদ করিতে চাই। বিদ্যাসাগর ও ভূদেবের তুলনা করিতে গিয়া যোগেন্দ্র বাবু বলেন, "উভয়েরই সনাতন হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় অবস্থা। আমার বোধ হয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথাটা না বলিলেই ভাল হইত। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় বাহ্যতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বেশধারী ছিলেন কিন্তু তদীয় আভ্যন্তর অবস্থাটা অন্যরূপ ছিল অনেকেই তাঁহাকে 'নাস্তিক' মনে করিত (শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত গ্রন্থে ১০৪ পৃষ্ঠায় তাঁহার পিতার উক্তি দ্রষ্টব্য)। ভূদেববাবু অত্যন্ত শাস্ত্রানুগত ছিলেন—প্রমাণ, "আচার প্রবন্ধ।"

যোগেন্দ্র বাবু ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে বলেন, "তাঁহার গোঁড়ামি একবারেই ছিল না"।

তিনি "গোঁড়া" দ্বারা "অন্যমত বিদ্বেষী"ই বুঝাইতে চাহেন, বোধ হয়। কিন্তু অধুনা ঈদৃশ কদর্থ দেখা গেলেও ইতঃপূর্ব্বে 'গোঁড়া' শব্দটির অর্থ এরূপ ছিল না—লোকে শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচার সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীকেই "গোঁড়া হিন্দু" বলিত—যেমন ৺গুরুদাস বাবু। সেই অর্থে ভূদেব বাবু গোঁড়াই ছিলেন। ব্রাহ্মণভক্তি, শাস্ত্রভক্তি ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি 'বিশ্বনাথ' বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত হিন্দু কেহই অন্যমতদ্বেষী হইতে পারে না। শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব অজ্ঞেরাই দেখে। খ্রীষ্টান প্রভৃতি যাহারা হিন্দুর ছেলেকে আপন ধর্ম্মে নিয়া যায়—আত্মরক্ষার জন্যেই তাহাদের মতামতের সমালোচনা করিয়া অসারতা প্রদর্শন করিতে হয়। ইহা কদাপি নিন্দনীয় হইতে পারে না। ভূদেব বাবু জ্ঞানী শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন তিনি যদি বৈষ্ণবের নিকট শাক্তের মাহাত্ম্য দেখাইয়া থাকেন—ইহাতে বৈষ্ণব বিচলিত হইবে কেন? তিনি তো বৈষ্ণবের নিন্দা করেন নাই—প্রতিপক্ষের গুণের অংশও দেখাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোনও ছাত্র যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে তজ্জন্য ভূদেব বাবু নিজেকে দোষী কেন বলিয়া-ছিলেন বুঝিলাম না।

তিনি আহারে কাঁটা-চামচ ব্যবহার করিতেন—'পারিবারিক প্রবন্ধে' (৪৫ তম প্রবন্ধ, ভোজনাদি) আছে—"ইংরেজেরা চামচ ব্যবহার করেন—হাতে করিয়া খান না। ঐ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়াই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তবে আমাদের ভোজনে কাঁটা ছুরি নিষ্প্রয়োজন।"

তবে তিনি নিয়মমত (হাতেই) গণ্ডূষ করিতেন—এই সংবাদ তদীয় পৌত্রী সুপ্রসিদ্ধা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী হইতে জানিয়াছি।

ইতি

৺ভূদেব-ভক্তস্য কস্যচিৎ

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

শিশু-পালনে ত্রুটী

যে দেশে সুচিকিৎসার অভাব নাই, জাতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যেখানকার দেশবাসী প্রাণপাত করিতেছেন সেখানকার চিকিৎসকেরা যদি সেই দেশেরই শিশুপালন সম্বন্ধে যথেষ্ট ত্রুটী প্রদর্শন করেন এবং শিশু-মৃত্যুর হার দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠেন তাহা হইলে আমাদের দেশের শিশুদের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রত্যেক দেশে শিশু পালন সম্বন্ধে কিরূপ যত্ন লওয়া হয় তাহা সর্ব্বজন-বিদিত তথাপি কেন সেদেশের শিশু মৃত্যুর হার খুব অল্প হয় না বা শিশুদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে বিলাতের জনৈক সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রবার্ট ফোরগ্যান্ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমাদের অন্তঃপুরলক্ষ্মীরা ইহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

"...শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের কোন্ সময় হইতে চেষ্টা করা উচিত তাহা আমরা অধিকাংশ লোকই ভাবিয়া দেখি না। আমাদের ভাবা উচিত যে জন্মকাল হইতেই তাহার আরম্ভ নয়—আরম্ভ জন্মের বহুপূর্ব্বে। শিশুর সহিত মাতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা জানা থাকিলেও কার্য্যতঃ শিশুর প্রথম আগমনের সূচনা যখন দেখা যায় তখন আমরা তাহার মাতার প্রতি যত্ন লইতে বিস্মৃত হই। গঠনের সময় যদি উৎকৃষ্ট উপাদান সে সংগ্রহ করিতে না পারে তাহা হইলে ভবিষ্যতে মেরামত করিয়া তাহাকে কোনরকমে চালানো যাইতে পারে বটে কিন্তু তাহার দ্বারা সংসারের ভারবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু হয় না।

যাহারা সত্যকার সবল শিশুর পিতামাতা হইতে চান তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান্ হউন, বিশেষ করিয়া শিশুর মাতার কল্যাণসাধনে চেষ্টা করুন ইহাই আমার অনুরোধ। আমি নিজে একজন চিকিৎসক এবং বহু শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া শিশুদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের পিতা মাতার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কুফল দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছি বলিয়াই আজ শিশু-পালনের ত্রুটী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলাম অধিকাংশ শিশুর দাঁত অত্যন্ত খারাপ এবং মাত্র এই কারণে তাহারা বহু-প্রকার ব্যাধিতে ভুগিতেছে। দাঁতের সহিত স্বাস্থ্যের যে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে তাহা অনেকে জানেন না। ইতর প্রাণীদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল এবং ব্যাধিতে তাহারা খুব কমই ভুগিয়া থাকে, ইহার কারণ তাহাদের দাঁত জারী পরিষ্কার। তাহা ছাড়া ইতর প্রাণীদের মধ্যে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে কিন্তু সভ্যমানুষ অল্পদিনের মধ্যে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া কৃত্রিমতাকে বরণ করিতে অভ্যস্ত হয় বলিয়া তাহাদের দেহও ব্যাধির আগারে পরিণত হয়।

বর্ত্তমানে প্রকৃতির রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমেরিকায় যে আন্দোলন হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সভ্যতার বাধাবাঁধির চাপে মানুষ যে তাহার জীবনের ক্ষতি করিতেছে ইহা সে দেশের অধিবাসীরা বুঝিয়াছেন। বিলাতে এখনও এ বিষয় লইয়া সেরূপ প্রবল আন্দোলন হয় নাই এবং সে জন্য রোগের পরিমাণ সেখানে কমিয়াও যায় নাই।

আমি দেখিয়াছি যে বিলাতে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত শিশুদের প্রতি তেমন যত্ন লওয়া হয় না, কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বাস্থ্যগঠনের জন্য অভিভাবক তথা চিকিৎসকদের আর চিন্তার অবধি থাকে না। ইহার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়, শিশুদের হিতার্থে স্কুল কর্তৃপক্ষ চাঁদা পান এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ভাল করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী হয় না। যাহার একটি দাঁত খারাপ তাহার সে দাঁত উপড়াইয়া কৃত্রিম দন্ত লাগানো, আলজিভ বৃদ্ধির জন্য আলজিভ কর্ত্তন করা প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে চিকিৎসকরা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন --শিশুরক্তে ঘর ভাসিয়া যায়, অথচ এরূপ অপ্রীতিকর কার্য্য যাহাতে না করিতে হয় তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে কেহই সাবধানতা অবলম্বন করিবেন না।

প্রাচীন কালে এদেশের রীতি ছিল, প্রসূতিকে শিশুর জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই শিশুর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিবার শিক্ষা দেওয়া। জননীদের কেহ ইন্দ্রের মত রূপবান, কেহ পবনের মত বীর সন্তান কামনা করিতেন।

পাশের ছবিগুলি আমেরিকার একখানি শিশু-স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পত্রিকা হইতে লওয়া, ইহাদের প্রত্যেকটি জননীদের [illegible] সাধ আশা ও স্বপ্নের [illegible]।

বিলাতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বিদ্যালয়ের বালকদের মধ্যে (পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসর যাহাদের বয়স) দশ হাজার ছেলের বুক খারাপ, বিশ হাজার ছেলের স্বাস্থ্য দুর্ব্বল, নব্বই হাজার ছেলের কাণের দোষ, তিন লক্ষ যাট হাজার ছেলের আলজিভ বড়, পাঁচ লক্ষ ছেলের চোখের দোষ এবং বাকি সকলেরই দাঁতের গোলযোগ আছেই। প্রত্যেক বছর চৌদ্দ হাজার স্কুলের ছেলে মারা যায় এবং পাঁচ বৎসরের অল্প বয়সী শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা বৎসরে সত্তর হাজার। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে পূর্ব্বের অপেক্ষা শিশুমৃত্যুর হার কমিয়াছে বটে কিন্তু দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত শিশুর সংখ্যা হ্রাস পায় নাই। অথচ চিকিৎসার ত্রুটী হয় না এবং শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না।

আসল কথা, শিশুদের মায়েদের দিকে প্রথম হইতে কেহই নজর দেন না এবং বুঝিতে চাহেন না যে তাঁহাদের উপর শিশুদের কতখানি নির্ভর করিতে হয়। গর্ভধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উপযুক্ত খাদ্য ও বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা না বুঝিলে আমরা শুধু তাঁহাদের উপরই অবিচার করিব না, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের উপরও নির্ম্মম অত্যাচার করিব।

শিশুর প্রাণ তাহার মাতা। মায়ের দৌর্ব্বল্য বা সবলতা শিশুর দেহকে দুর্ব্বল বা পরিপুষ্ট করে। মায়ের নিকট হইতে দেহের সকল উপাদান সে সংগ্রহ করে—মায়েদের স্বাস্থ্যহীনতাই শিশুদের দৌর্ব্বল্য ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। শিশুকে প্রাণদান করিতে হইলে, তাহাকে সংসারে মর্য্যাদা দান করিতে হইলে মাতাকে অসীম শক্তিময়ী করিয়া তোলা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

প্রকৃতির মুক্ত বাতাস, সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা, সুখাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনগুলিকে যেদিন মায়েরা স্বীকার করিবেন, উপভোগ করিবেন, সেইদিন হইতে তাঁহারা নিজেদের সন্তানের প্রতি প্রকৃত কর্ত্তব্যপালন করিবেন বলিয়া আমি মনে করি।

আমরা এখন যন্ত্রযুগে বাস করিতেছি। শিশুর জন্মদানও মনে করুন যান্ত্রিক কারখানার অন্তর্গত। কারখানা হইতে ভাল মোটর তৈয়ারী করিতে হইলে ভাল লোহা, কলকব্জা ও মিস্ত্রীর প্রয়োজন এবং মোটরকে স্থায়ীভাবে কার্য্যকরী করিতে হইলে তাহা নির্ম্মাণের উপাদানগুলিও উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, কিন্তু মূল উপাদানগুলির ভিতর ভেজাল থাকিলে সহস্র যত্ন লইলেও অতি অল্পকালের মধ্যে তাহা যেমন অব্যবহার্য্য হইয়া ওঠে তেমনি মাতার দেহে শরীরপুষ্টির উপাদান না থাকিলে শিশুও দুর্ব্বল ও শীর্ণ দেহ লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে—সংসারে তাহাকে লইয়া কোন কাজ চলে না। মূল উপাদানগুলির মধ্যে ভেজাল থাকিলে চলিবে না, পরে মেরামত করা যাইতে পারে কিন্তু নূতনের দৃঢ়তা দান করা যায় না।

খাদ্য মানুষের প্রাণদাতা, শক্তিদাতা কিন্তু সকল খাদ্যের ভিতর শক্তির উপাদান সমান ভাবে থাকে না। মাতার খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত তাহা চিকিৎসকদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেওয়া উচিত। শিশুর দেহনির্ম্মাণে মায়ের খাদ্য সহায়তা করে। গর্ভাবস্থানকালে মায়ের হাড় ও দাঁত হইতে শিশু-শক্তি আকর্ষণ করে, এ সময় মা যদি শক্তিহীনা হন কিম্বা তাঁহার দাঁত খারাপ থাকে তাহা হইলে কুফল অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময় দেখা যায় যে শিশুদের দাঁত এক প্রকারের নয়, দাঁত অত্যন্ত অপরিষ্কার, সমান ভাবে শ্রেণীবদ্ধ নয় ও নানারূপ দোষ বর্ত্তমান—ইহার কারণ মায়ের দাঁতের দোষ। গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক মাতার যেমন ভিটামিন্-যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত তেমনি দাঁত সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ফলমূল যদি তাঁহারা খান তাহা হইলে ছেলেদের হাড় এবং দাঁত খুব ভাল হয়।

ছেলেরা প্রায়ই রিকেটে ভুগিয়া থাকে—শরীর দিন দিন ক্ষীণ এবং শীর্ণ হইতে থাকে, ইহার কারণ মায়ের দেহ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর উপাদান তাহারা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক মায়ের ভিটামিন্-যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা ও প্রচুর রৌদ্র আলো বাতাস দেহে লাগানো অবশ্য কর্ত্তব্য।

ডিম, দুগ্ধ, ছানার ভিতর ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণ থাকে এবং মানুষের হাড়কে সবল করিবার ক্ষমতা ইহাদের অসাধারণ। এই সমস্ত খাদ্য ও সূর্য্যরশ্মি আমাদের দেহের ভিতর এমন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে যাহা দ্বারা দেহ-পরিপুষ্টির সহায়তা ঘটে।

প্রত্যেক মাতা যদি সূর্য্যরশ্মি দেহে লাগান তাহা হইলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন—এটুকু জানিয়া রাখিবেন, সূর্য্যরশ্মি

উৎকৃষ্ট ঔষধের অপেক্ষা উপকারী। স্বাস্থ্য লাভ করিবার এই বিধিদত্ত শক্তিকে অবজ্ঞা করার জন্য আমরা সময়ে সময়ে অত্যন্ত রোগ ভোগ করিয়া থাকি।

এইবার দাঁতের কথা বলি। যাঁহাদের দাঁত খারাপ তাঁহারা যত বার পারিবেন ভাল করিয়া বুরুশ দিয়া এবং টুথপেষ্ট (আমাদের দেশের পক্ষে নিমের দাঁতনই উৎকৃষ্ট) ব্যবহার করিয়া দাঁত পরিষ্কার রাখিবেন। প্রত্যেকবার খাইবার পর যদি তাঁহারা দাঁত পরিষ্কার রাখেন তাহা হইলে দাঁতের গোড়ায় আর কোন রকমে ময়লা জমিতে পাবে না। মাত্র মুখ ধুইলেই যে ময়লা যায় না ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবেন। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকদের দ্বারা দাঁত স্ক্রেপ্ করিয়া লইলে খুব ভাল হয়। ভিটামিন্-যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে ও সূর্য্যরশ্মির সাহায্য লইলে দাঁতের পক্ষে খুব উপকার হয়। ইহা আমরা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। মায়ের দাঁত হইতে শিশু যখন শক্তি টানিয়া লয় তখন সেই দাঁতগুলির প্রতি কতটা যত্ন লওয়া উচিত তাহা প্রত্যেক লোকের ভাবিয়া দেখা উচিত

ইহা ছাড়া গর্ভবতী মায়েরা শারীরিক পরিশ্রম করিতে ও উপযুক্ত নিদ্রার আশ্রয় লইতে যেন কখনও আলস্য করেন না পরিশ্রম ও বিশ্রাম তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজন। গর্ভকালে যাঁহারা বিশ্রাম লন না বা পরিশ্রম করেন না তাঁহারা প্রসবের সময় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে বাধ্য। এই সময় মায়েরা যতটা পবিত্র ভাবে থাকিতে পারেন, মনকে প্রফুল্লিত করিয়া রাখিতে পারেন ততই তাঁহাদের শিশুদের পক্ষে মঙ্গল।

শিশুর সূচনা হইতে আপনারা যদি আপনাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন তাহা হইলেই মাতার উপযুক্ত কর্ত্তব্য করিবেন, তাহা না হইলে পরে সহস্র চিকিৎসা করিয়া ও অর্থ ঢালিয়াও পূর্ব্বের ত্রুটীকে কোনদিনই মুছিতে পারিবেন না।"

আমেরিকা-প্রবাসীর পত্র

কল্যাণীয়া—

তুমি আমাকে এ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু জানাতে লিখেছো। তাই এদের শিশুমৃত্যু আর যক্ষ্মার বিপক্ষে অভিযান বিষয়ে নীচে কিছু লিখ্ছি।

আমরা এ যাবৎ, রোগ হ'লে রোগের চিকিৎসার কথাই ভেবে এসেছি। চিকিৎসক সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে যদি পারেন, তবে রোগীর রোগ সারাতে চেষ্টা করেন, আর যদি না পারেন, তবে হতাশ হ'য়ে যমের হাতে ছেড়ে দেন; তখন আমরা বলি "ওর সময় হ'য়েছিল তাই ম'র্‌ল।" আমরা এত বেশী অদৃষ্টবাদী হ'য়ে পড়েছি যে ঐ মরণটা যখনই আসে তখনই ভাবি সময় হ'য়েছিল। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর এত বিশ্বাস করি, যে, যদি শিশু মারা যায় তবে বলি, তার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল। বুড়া মারা গেলে পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিতে হয় না—বলি সময় হ'য়েছিল, তাই। অন্য কিছু হওয়া সম্ভব কি না, অনেক সময় তা ভাবিও না। যদি অন্য কোনও যুক্তি দেখান যায়, তবে হয়ত সে যুক্তিকে শাস্ত্রসঙ্গত নয় ব'লে গ্রাহ্যও না ক'রতে পারি।

অন্যান্য দেশেও যে সকলে আমাদের মত কর্ম্মফলে বিশ্বাস করে ও ক'রবে এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না। অন্ততঃ কতকগুলা দেশে তার উল্টোটাই দেখা গেছে। পাশ্চাত্য জগৎ, কর্ম্মফলকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে না দিলেও আমাদের মত একেবারে তার উপর নির্ভর ক'রে ব'সে নেই যখন এদের শিশুরা ম'রতে আরম্ভ ক'রল, তখন এদের মাথায় ভাবনা হ'ল, কেন শিশু মরে? কোন্ ব্যায়ারামে মরে? যখন ব্যায়ারামটি চেনা গেল, তখন প্রশ্ন হ'ল, ও ব্যায়ারাম হয় কেন? হয় কেমন ক'রে? এই রকম নানা প্রশ্ন ও তার উত্তর এনে এরা শিশুমৃত্যুর প্রতিবিধান ক'রতে আরম্ভ ক'রল। যে যে কারণে শিশুরা ম'রছিল সেই সেই কারণ-গুলোকে বিশেষ ক'রে অনুসন্ধান ক'রে তার প্রতিবিধান ক'রতে আরম্ভ ক'রল। ক্রমে শিশু-মৃত্যু ক'মে যেতে লাগ্‌ল।

অথচ আমরা এখনও সেই কর্ম্মফলের উপর অনেকটা আস্থা রেখে ব'সে আছি, স্বচ্ছন্দে বছরের উপর বছর কাটিয়ে দিচ্ছি, প্রতি হাজারে প্রায় ৫০০ শিশুকে বছর না ফিরতেই শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি। শিশু-মৃত্যু বাংলা দেশের অনেক জায়গায় বাড়ছে ছাড়া ক'মছে না। হাজারে ৫০০ বা শতকরা ৫০ অর্থাৎ ২টি শিশুর জন্ম হওয়ায় এক বছরের মধ্যেই আমরা তার একটিকে রেখে অপরটিকে বিসর্জ্জন দিই। যদি এটা একমাত্র কর্ম্মফলই হবে তবে, অন্য দেশে এর বিপরীত হ'ল কেমন ক'রে? আমেরিকায় বছরের পর বছর শিশুমৃত্যুর

সংখ্যা ক'মেই আস্‌ছে। এদের দেশে এক সময়ে প্রতি হাজারে প্রায় ৪০০ শিশু ম'রেছে। তখন এরা কর্ম্মফলে বিশ্বাস না ক'রে কারণ অনুসন্ধানে লেগেছিল। ফলে আজ এদের শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হাজারে ৬০-এরও নীচে। আমাদের সঙ্গে এ জাতের কত পার্থক্য তা আর বলা নিষ্প্রয়োজন!

বলা বাহুল্য, এতটা করা সম্ভব হ'য়েছে স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রচারে। নানা কারণে এদেশে শিশুমৃত্যু বেশী হ'ত। সেই কারণগুলোকে দূর ক'রতে এরা চেষ্টা ক'রেছিল। দুধ, জল ও অন্যান্য শিশু-খাদ্যের উন্নতি করাতে এটা সম্ভব হ'য়েছে। তাই আজ এদের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা এত কম।

এখানে একটা বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার যে সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা না প্রচার ক'রলে বা সাধারণের প্রাণে স্বাস্থ্যোন্নতির ইচ্ছা না এলে এ কখনও সম্ভব হ'ত না, আমাদের দেশেও এই ভাবে শিক্ষা বিস্তার না ক'রলে, আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি কখনও সম্ভব হবে না, এটা বোধ হয় নিশ্চিত।

সব চেয়ে আগে জানা দরকার যে, সংক্রামক ব্যায়ারামের কোনওটিই কর্ম্মফলের জন্য বা দৈব-প্রদত্ত নয়, এর প্রত্যেকটারই এক একটা কারণ আছে—আর এখন বেশ স্পষ্ট প্রমাণ হ'য়েছে যে ঐ কারণটি হচ্ছে এই যে, কোনও কোনও বিশিষ্ট জীবাণু দ্বারা ব্যায়ারামের সৃষ্টি হয়। সবগুলো ব্যায়ারামের বিষয়ে যদিও এখনও জোর গলায় একথা বলা চলে না, কেননা, এখনও সব কটার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে অধিকাংশ রোগের বিষয়ে এটা সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে আর কারও কোনও সন্দেহ নেই।

যখন একবার জানা গেল যে জীবাণু দ্বারা ব্যায়ারামের সৃষ্টি, তখন দৈব-মাদুলী ব্যবহার না ক'রে যাতে সেই জীবাণুর ধ্বংস করা হয় তার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ। একটা রোগের উল্লেখ ক'রে আমি এটা স্পষ্ট ক'রে প্রমাণ ক'রতে চাই। যক্ষ্মা রোগ ধরা যাক, এই রোগ পৃথিবীর সব দেশেই তার বিক্রম দেখাচ্ছে; প্রতি বছর বহু লক্ষ লোক—ছোট বড়, মেয়ে পুরুষ এ রোগের কবলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে। এখন আর কারও সন্দেহ নেই যে যক্ষ্মা একটি জীবাণু দ্বারা হয়। একে ইংরেজীতে বলে টিউবারকূল্ ব্যাসিলাস্ (tubercle bacillus), এই জীবাণু অতি ক্ষুদ্র, শুধু চোখে দেখা যায় না। মাইক্রোস্কোপ্ দিয়ে দেখ্‌লেও নানা কৌশলে রং ক'রলে তবে এদের চেনা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এরা শরীরে প্রবেশ ক'রতে না পারে ততক্ষণ জীবের যক্ষ্মা হ'তে পারে না। আমাদের শরীর এমন ভাবে তৈরী যে, তাতে সহজে আমাদের পরম শত্রু—অর্থাৎ বহু রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ ক'রতে না পারে, তার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া বোধ হয় আরও একটা জিনিষ আছে যার প্রমাণ না থাক্‌লেও কতকটা অনুমান করা যায়—সে হ'চ্ছে আমাদের শরীরের প্রতি রক্তকণিকার শত্রু-পরাজয়ের ক্ষমতা ও চেষ্টা। রক্তকণিকার এই ক্ষমতা আছে ব'লেই মনে হয় যে, অনেকের শরীরে রোগের জীবাণু প্রবেশ ক'রেও অনেক সময় সহজে পরাস্ত ক'রতে পারে না। যাহোক, এটা ঠিক যে, যক্ষ্মা-জীবাণু তার নিজের সুবিধা অনবরত খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেমন ক'রে জীবের শরীরে প্রবেশ ক'রবে এই তার চেষ্টা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে রক্তে বা ত্বকের সঙ্গে মিশ্‌তে না পারছে ততক্ষণ তার স্বস্তি নাই। অথচ আমাদের শরীর এমন ভাবে তৈরী যে রক্ত পেতে চামড়া কাটতে হবে, নতুবা ত্বকের অর্থাৎ শরীরে যে কোনও ভিজা জায়গাতে প্রবেশ ক'রতে হবে। যেমন মুখের ভিতর, চোখের ভিতর নাকের ভিতর, গুহ্যদ্বার বা মূত্রদ্বার ইত্যাদি। মানুষের শরীরের তাপ না পেলে যক্ষ্মা-জীবাণু সুখে বাড়্‌তে পাবে না—এবং একবার শরীরে প্রবেশ ক'রে যদি আরাম পায় তবে তার বংশ বৃদ্ধি ক'রতে আদৌ দেরী লাগেনা। ১ থেকে ২, ২ থেকে ৪, ৪ থেকে ৮, ৮ থেকে ১৬, ১৬ থেকে ৩২, ৩২ থেকে ৬৪, ৬৪ থেকে ১২৮ ইত্যাদি ক'রে বাড়্‌লে কত সময় লাগে তা বোঝা কারও কঠিন নয়। শুধু যে ঐ একটার বংশ বাড়ে তা নয়—ওর প্রত্যেকটি আবার ঐ ভাবে তার নিজের নিজের বংশ বাড়িয়ে যায়। এই হিসাবে যে কত হয় তার সংখ্যা করা অসাধ্য। কারও যদি কৌতূহল থাকে তবে কাগজকলম নিয়ে ব'সে হিসাব ক'রতে পারেন।

যক্ষ্মা-জীবাণুর পরমায়ু বড় বেশী। শুধু আগুনের কাছে ও প্রখর সূর্য্যের তাপের কাছে এর পরাজয়। খুব বেশী ঠাণ্ডাও এর বড় ভাল লাগে না, তাই চায় শরীরের উত্তাপ। কোনও যক্ষ্মা রোগী যখন থুথু ফেলে, বহু কোটী যক্ষ্মা-জীবাণু ঐ থুথুর মধ্যে থাকে। ঐ থুথু শুকিয়ে গেলেও, যক্ষ্মা-জীবাণু আশায়

ব'সে থাকে যদি কোনও রকমে কোনও জানোয়ার তাকে শরীরে জায়গা দেয়। তার খাবার ঐ থুথুর মধ্যেই থাকে। কিন্তু থুথু যত শুকোয়, এবং সূর্য্যের তাপ যত বাড়ে, যক্ষ্মার প্রাণের আশা তত কমে। সে তখন বড় জোরে অতি ক্ষুদ্র থুথুর গুঁড়াগুলিকে আঁকড়িয়ে থাকে। এই সময় হাওয়া এসে যদি থুথুর গুঁড়োগুলিকে উড়িয়েও নিয়ে যায়, তবু যক্ষ্মা তাকে ছাড়ে না, জোরে আঁকড়ে থাকে। যদি দৈবক্রমে হাওয়া তাকে উড়িয়ে অগত্যা কোনও প্রাণীর নাক, মুখ, চোখের মধ্যে একবার ফেলে তবে হয় ত সে ধন্য হবে। হয়ও অনেক সময় তাই, মোটা বা রোগা হ'লে বিশেষ কিছু এসে যায় না। যে কোনও শরীরেই যক্ষ্মা-জীবাণু বাড়তে পারে। কলিকাতায় একবার আমার একটি যক্ষ্মা রোগীর কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। রোগীটা আমার চিকিৎসাধীন থাকলেও আমার বন্ধু ব'লে তাঁর সঙ্গে ইহজন্ম পরজন্ম অনেক রকমের কথা হ'ত। তাঁর এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না যে এটা তার পূর্ব্বজন্মের "কর্ম্ম-ফল" ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি নিজে খুব হৃষ্টপুষ্ট, সবল ও চির সুস্থ ছিলেন, প্রত্যহ ব্যায়াম করা ও ভাল খাওয়া পরা তাঁর স্বভাব, ইহজন্মে তাঁর পুণ্য ব্যতীত আমরা কখনও কোনও পাপের কথা জান্‌তাম না। কিন্তু হঠাৎ তাঁর যক্ষ্মা হ'ল ও একটি বছর পার না হতেই সব শেষ হ'ল অথচ তাঁর ভাই তাঁর চেয়ে অনেক রোগা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শুনা ক'রে চশমা থেকে আরম্ভ ক'রে বদ্‌হজম প্রভৃতির কোনওটাই তার বাদ যায় নি।—তারপর আবার ওকালতী ক'রে দিনের পর দিন নানা চিন্তারও তার বাধা ছিল না, অথচ এর কখনও যক্ষ্মার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি। যতদিন আমার বন্ধু বেচে ছিলেন ততদিন আমি কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারি নি যে শুধু রোগা শরীরেই যক্ষ্মা হয় না। যক্ষ্মাকে কোনও রকমে শরীরে আসতে পথ ক'রে দিতে হবে। তিনি নিজে যে কখন কি ভাবে যক্ষ্মাকে স্থান দিয়েছিলেন তা কেউ ব'লতে পারে না। সুযোগ না পেলে যে যক্ষ্মা আস্‌তে পারে না এটা ঠিক।

এখানেই একটা স্পষ্ট প্রমাণ যে, সাবধান থাকলে ও যক্ষ্মাকে কোনও সুযোগ না দিলে, যক্ষ্মা এসে তার পায়ে হেঁটে শরীরে ঢুকতে পারে না। যত যক্ষ্মারোগী আছে, তারা যদি সবাই তাদের শরীরের ত্যক্ত সব জিনিষ নষ্ট ক'রে ফেলে, থুথু, মল, মুত্র সব ধ্বংস ক'রে ফেলে ও কোনও রকমে সুস্থ লোককে তাদের ত্যক্ত জিনিষের সংস্পর্শে আস্‌তে না দেয় তবে যক্ষ্মার নিরুপায়! থুথু যদি কেউ রাস্তায় না ফেলে, হয় পুড়িয়ে ফেলে বা রুমালে ধ'রে পরে খুব গরম জলে সিদ্ধ ক'রে ফেলে, তবে বহু নিরীহ প্রাণ যক্ষ্মা থেকে রক্ষা পাবে। আমেরিকার যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা অনেক কমে গেছে, তার প্রধান কারণ ঐ থুথু বন্ধ। আগে এ দেশের লোক যেখানে সেখানে, যখন তখন থুথু ফেল্‌ত। তখন তারা জান্‌ত না যে থুথুতে যক্ষ্মা-জীবাণু থাকে ও তার থেকে যক্ষ্মা রোগ হ'তে পারে। যখন প্রমাণ হ'ল, তখন চারি দিকে এরা প্রচার আরম্ভ করল। সাধারণের যাতায়াতের স্থানে, আদালতে, স্কুল, কলেজে, হোটেল রেষ্টরেণ্টে, ষ্টীমার ট্রেনে—সর্ব্বত্র থুথু ফেলার পাত্রের ব্যবস্থা করা হ'ল, নানা যায়গায় বড় বড় অক্ষরে লিখে এ অভ্যাস দূর ক'রতে অনুরোধ করা হ'ল। কোনও কোনও যায়গায় আইন করাও হ'য়েছিল। কিন্তু দেখা গেছে যে আইনের চাইতে অনুরোধ বেশী কাজ করে। শাস্তির চাইতে সুযুক্তি বেশী ফল দেয়। আজ আর এদেশে কাউকে ব'ল্‌তে হয় না যে, "যেখানে সেখানে থুথু ফেলো না"—এরা স্কুলে শিখেছে—চারিদিকে দেখে শিখেছে যে যক্ষ্মা বন্ধ ক'রতে হ'লে যেখানে সেখানে থুথু ফেলা বন্ধ ক'রতেই হবে। এরা শুধু "দৈব মাদুলী" ধারণ ক'রে সন্তুষ্ট হয় না।

শুধু যক্ষ্মা নয়, সংক্রামক রোগ সবগুলিই এই রকম, যদি সাবধান হওয়া যায় তবে জীবাণু অন্য শরীরে যেতে পারবে না ও ব্যায়রাম ছড়াতে পারবে না। এই শিক্ষা যত বেশী প্রচার হবে রোগ তত কমবে। তখন দৈব মাদুলীও ব্যবহার ক'রতে হবে না, এবং রোগের জন্য হতাশ প্রাণে অসময়ে "সময় হয়েছে" ব'ল্‌তেও হবে না। যক্ষ্মার চেয়ে আমাদের দেশে কলেরা বোধ হয় আরও বেশী সর্ব্বনাশ করে। অথচ কলেরা যক্ষ্মার চেয়ে অনেক বেশী সহজে বন্ধ করা যায়। আমেরিকার উত্তর ভাগে কলেরা ত নাই-ই। অনেক ডাক্তার তার জীবনে কখনও কলেরা রোগী দেখেন নাই, বইয়েতে শুধু প'ড়েছেন ও ছবি দেখেছেন। আর আমাদের দেশে ঘরে ঘরে হাহাকার কলেরার প্রকোপে।

কলেরা-জীবাণুর হাবভাব সম্পূর্ণ এক রকম না হ'লেও এর সংক্রামকতা যক্ষ্মার মত। অর্থাৎ যতক্ষণ কোনও রকমে শরীরে প্রবেশ ক'রতে না পারে ততক্ষণ এরা ক্ষমতাশূন্য।

একবার পথ পেলে আর রক্ষা নাই। এদের বংশ বৃদ্ধি করতে সময় বড় বেশী লাগে না। যক্ষ্মার মত বেশী দিন রোগীকে ভুগতে হয় না। দুই এক দিনের মধ্যেই এরা এদের চরম শক্তি প্রচার করে। আমরা কালী পূজা করি, পাঁঠা বলি দিতে চাই, মহিষ বলি দিতে চাই বা বৈষ্ণব মতে হরির লুট দিতে চাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বাংলা দেশে কোনও কোনও জায়গায় এমনও দেখেছি যে কলেরার ভয়ে হিন্দুর কালী পূজাতে মুসলমানও পাঁঠা দেয়—পূজা দেয়—হরির লুট দেয়। কিন্তু হিন্দু মুসলমান আমরা কেউ বুঝি না যে পুকুরের জলে রোগীর ময়লা কাপড় ধুয়ে জল দূষিত করায় ও পাড়ার সবাই সেই জল ব্যবহার করায় কলেরা-জীবাণু শরীরে প্রবেশ ক'রেছে, রোগীর ময়লায় ও বমিতে মাছি ব'সে তার পায়ের ও শরীরের সঙ্গে কলেরা-জীবাণু নিয়ে অন্য খাবারের উপর দিয়ে এসেছে ও সেই খাবার খেয়ে অন্য লোকের কলেরা হ'য়েছে। যত পূজা দিই না কেন যতক্ষণ জীবাণুর সংশ্রব বন্ধ না ক'রছি ততক্ষণ কলেরা বন্ধ হবে না।

এই হ'ল স্বাস্থ্য-শিক্ষার কথা। সকলকে জানাতে হবে কেমন ক'রে জীবাণু শরীরে ঢোকে—কেমন ক'রে জীবাণু প্রাণ নষ্ট করে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিষয়ে এমন অনেক পাতা লেখা যায়। সময়ে আরও লেখার ইচ্ছা রইল। সংক্রামক রোগের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার। রোগের জীবাণু শরীর পেলেই ঢোকে। তারা রূপ গুণ দেখে না, জাতি বিচার করে না, ধনী ব'লে ভয় করে না—গরীব ব'লে অবহেলা করে না, সুবিধা পেলে বিনা ওজরে সকলের শরীরেই ঢোকে। আর একটা কথা, যখন সংক্রামক রোগ নির্ম্মূল ক'রতে হবে, তখন শুধু একটি পাড়া পরিষ্কার ক'রে, অন্য পাড়া ময়লা রাখ্‌লে চল্‌বে না। গরীব লোকদের দেহ থেকে জীবাণু এসে বড়লোকদের আক্রমণ ক'রতে দেরী হয় না। সুতরাং যেখানেই হোক না কেন, গ্রামবাসী সকলের জন্য সংস্কারের কাজ ক'রতে হবে, সেই জন্য সকলের সহানুভূতি দরকার। অবশ্য যার অবস্থা স্বচ্ছল তার কাছে তার সমাজ হয়ত বেশী পয়সা আশা করবে। কিন্তু স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকেরা যেন তাতে না ভাবেন যে তাঁরা "দয়া" ক'রছেন। সাধারণ স্বাস্থ্যের কাজে প্রকৃত পক্ষে সকলের জন্য যিনি বেশী পয়সা দিতে পারেন, তাঁর বেশী দেওয়া ত' দরকারই, নইলে তাঁর স্বাস্থ্য গরীবের স্বাস্থ্যের চেয়ে কম মুস্কিলে থাক্‌বে না। পয়সা যেখান থেকে আসুক না কেন স্বাস্থ্যের কাজ হওয়া নিয়ে কথা। স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রচার হওয়া দরকার। প্রচার যত বাড়বে রোগ তত কম্‌বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

(নিউইয়র্ক) —শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুরাতনী

—শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

দ্রুপদ-লক্ষ্মী যেথানে অতুল সে সভাতলে
দেবতার লাগি না বলা কথারে নয়নে বলে;
আমি পার্থের আবির্ভাবের আশাটি বহি—
বায়ু হ'য়ে সেথা বারতা তাহার যাব গো কহি।
বৃষভানু-সুতা দয়িতের লাগি' নয়নজলে
উতলা হৃদয়ে নব যৌবন ভাসায়ে চলে!
গোকুল-প্রিয়ের অন্তরে আমি সে বারিধারা
স্বপন-পাথায় একেলা বহিব পাগলপারা!
সপ্ত-রথীরা বালক বীরের জীবন-বীণা
সঙ্গীতহারা করে যবে ক'রে ভূমিতে লীনা;
আমি উত্তরা, উত্তারয়ণে সে দিন এসে
দীর্ঘশ্বাস হইয়া মিশিব এলানো কেশে।

তারার নয়নতারায় যে দিন বালির স্মৃতি
অগ্নি-রাগেতে বাজায় ব্যাকুল বিরহ-গীতি;
আমি থর থর তার দেহপর কাঁপন হব,
রুচির তনুতে বিগত বালির পরশ লব!
অশোক-বনের অন্ধ কারায় সরমা হিয়া
বৈদেহী দুখে অজানিতে উঠে উচ্ছ্বসিয়া;
আমি সে আঁধারে বিজলী হইয়া বেড়াব ঘুরে,
হেরিব নারীর দু'চোখে কেমনে অশ্রু ঝুরে!
যোগমায়া সাথে জগদীশ্বর প্রলয়-ঘুমে
ঘুমায় যে দিন সফেণ বারিধি-শয়ন চুমে;
আমি ঘুমে তার মিশাব আমার নয়ন দুটি
আদি নরনারী হেরিব কেমনে পড়েছে লুটি!

—এস্, রাধাকৃষ্ণণ

সভ্যতার ভবিষ্যৎ

মন এবং আত্মার উচ্চতর আদর্শকে ছাড়িয়া যে-সম্প্রদায় প্রাণ এবং দেহ লইয়া প্রায় ডুবিয়া আছে, দৈহিক ও অর্থ নৈতিক সত্তা রক্ষা করাই যাহাদের ধর্ম্ম, কেবল বৈজ্ঞানিক দক্ষতাকেই যাহারা মূল্যবান মনে করে, তাহারা সত্যকার সভ্যপদবাচ্য নয়। দেহ, মন এবং আত্মা এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের এক একটা খণ্ড স্বরূপ। গোটাকে লইয়া মনুষ্য-প্রকৃতি এবং ঐ তিনের সমন্বয়ই হইল সভ্যতার সত্যকার লক্ষ্য। বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর বিবাদ এবং সংঘর্ষ নিন্দনীয় নয়, বরং একটির উপর অপরের জয়লাভজনিত যে সমন্বয় তাহাই কাম্য। খাঁটি মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য দৈহিক উৎকর্ষ এবং সুস্থতা প্রয়োজন। সুস্থ জীবনযাপনের পক্ষে সুষ্ঠু সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাই বলিয়া সেইগুলিই চরম লক্ষ্য নয়। সত্য, শিব এবং সুন্দরের যাঁহারা উপাসক, যাঁহারা নিখুঁৎ পশুত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সেই সব মানুষকে সৃষ্টি করিতে এই পৃথিবী অনেক শ্রম করিয়াছে, অনেক সংগ্রাম করিয়াছে। আত্ম-সংরক্ষণ, আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং আত্মসুখ—এগুলি পশু-প্রবৃত্তি, ইহাদের বশবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ আত্ম-সর্ব্বস্ব মানুষ আছে; আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা আত্মভোলা, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাবিয়া যাহারা সমষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে যেটুকু প্রভেদ, অদ্ধসভ্য এবং সভ্যের মধ্যে প্রভেদও সেই। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকে বিশ্বজনীন করিয়া তুলিতে পারিলে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে অনন্তের উদ্দেশ্যের সহিত গাঁথিয়া দিতে পারিলে আমরা সত্যকার মানুষ হইতে পারি। ইহার জন্য মূল্য দিতে হয় অনেকখানি, কিন্তু আমাদের গোটা প্রকৃতি যখন বিশ্বজনীন লক্ষ্যের দিকে চালিত হয় তখন কাঁধের জোয়াল সহজে বহন করা যায়-ভার লঘু হইয়া আসে। নূতন ধরণের জীবন, নূতন আত্মবোধ তখন জাগে; মানব-জীবন ও আত্মবোধ যেমন পশুর জীবন ও আত্মবোধ হইতে স্বতন্ত্র তেমনি উহাও মানুষের বর্ত্তমান জীবন ও আত্মবোধ হইতে স্বতন্ত্র।*

মনুষ্য জাতির ইতিহাসে নিছক বর্ব্বরতা বা নিছক সভ্যতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন সম্প্রদায়ই পুরাপুরি অসভ্য অথবা খাঁটি সভ্য নয়। মানুষের কোন সমষ্টিই আপন আপন দলগত বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং সামাজিক রূপের বিকাশ সাধনে ক্রটী করে নাই। ভাল-মন্দের ভেদাভেদ করে না, শিল্পকলার প্রথম পরিচয় হয় নাই, এমন জাতি ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সভ্যতাকে বর্ব্বরতারই মত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এস্কিমো, রেড ইণ্ডিয়ান, বাসুটো এবং ফিজিদ্বীপবাসীগণকে আমরা বর্ব্বর বলিয়া মনে করি কেবল এই হেতু যে, স্কুল, হাসপাতাল, আদালত, থানাসমন্বিত সভ্য সমাজের যে ধারণা আমাদের আছে, সেই ধারণা অনুযায়ী তাহারা আমাদের স্তর অবধি উঠিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও উন্নত গ্রীক এবং রোমানদের মতই অথবা আধুনিক বৃটিশ এবং জার্ম্মানদেরই মত নিজেদের জীবন-যাপন-প্রণালীতে আচারে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে নিঃসন্দেহ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের সমাজ-সংগঠন স্বতন্ত্র, প্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান সঙ্কীর্ণ এবং কার্য্য-সাধনোপায় অমার্জ্জিত ছিল বলিয়াই তাহাদিগকে আমরা অসভ্য অথবা বর্ব্বর বলিতে পারি না। এমন কি, আজ পর্য্যন্ত আমরা রাজনৈতিক সাফল্য অথবা অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি কিংবা মানুষ মারিবার কৌশলকে সভ্যতার পরিচয় রূপে ধরি বলিয়াই যে সব জাতি রাজনীতির দিক দিয়া পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য কিংবা অর্দ্ধবর্ব্বর বলিতে চাই। জাপান রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যখন পরাজিত করিল শুধু তখন হইতেই জাপান উচ্চ স্তরের সভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল। এই হিসাবে কিন্তু তাতারগণ, যাহারা সুঙ বংশকে পরাভূত করিয়াছিল এবং যে সব বর্ব্বর জাতি রোমান সাম্রাজ্যকে জয় করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সভ্য মানবের আদর্শ বলিয়া ধরিতে হয়।

এমন কি আদিমতম মানব সম্প্রদায়ের মধ্যেও যেমন সভ্যতার কাঁচা রূপ দেখা যায়, তেমনই সভ্য সমাজগুলির মধ্যে বর্ব্বরতার বহু নিদর্শন দেখি। হূন, গথ, ভাণ্ডাল, এবং তুর্কীকে আমরা বর্ব্বর মনে করি, কিন্তু এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে, ভবিষ্যতে কখনও কোন অধিকতর উন্নত মানব-সমাজ আমাদের এই আধুনিক সভ্যতার অনেক কিছুকে অপূর্ণ সভ্যসমাজের কুসংস্কার, কদাচার বলিয়া বিস্ময় ও ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। আমরা যেমন রোমানদের হিংস্র পশু ও সশস্ত্র মানবের মল্লযুদ্ধের প্রদর্শনীর নি করিয়া থাকি, তেমনি আমাদের বংশধরগণ ক্রুদ্ধ পশুর লড়াই দেখিয়া আমরা যে আনন্দ পাই তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিবে, সমর-রূপ আমাদের 'মার্জ্জিত' কসাইবৃত্তির কথা দূরে থাক, পুরস্কারের জন্য আমাদের প্রতি-যোগিতার লড়াইকেও তাহারা নিন্দা করিবে।

সভ্যতা আমাদের অন্তরের বস্তু, আমাদের নৈতিক ধারণায়, ধর্ম্মভাবে এবং সামাজিক দৃষ্টিতে উহার পরিচয়। জাহাজে এবং রেলগাড়ীতে আমরা চলিয়া থাকি, টেলিফোন এবং টাইপরাইটার ব্যবহার করি বলিয়াই আমরা নিজেদিগকে সভ্য বলিতে পারি না। সাইকেলে আরোহণ, গ্লাসে করিয়া পানীয় গ্রহণ এবং ধূমপান শিক্ষা করিয়াও বানর বানরই রহিয়া যায়। নৈতিক বিকাশের সঙ্গে শিল্প-দক্ষতার সম্পর্ক বিশেষ কিছুই নাই। প্রাচীন ভারতের অথবা গ্রীসের কিম্বা মধ্যযুগের ইটালীর যথার্থ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সংগঠন-ফল যদিও অনেকাংশে এখনকার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর, তথাপি একথা অস্বীকার করা চলে না যে, আধ্যাত্মিক মূল্য ও জীবনযাপন-কলা

* হিন্দু-শাস্ত্রের কথায় বলিতে হইলে বলা চলে, যে-সমাজ পশুবলের পূজা করে তাহা তামসিক, যে-সমাজ প্রবৃত্তির, নৈতিক, দৈহিক ও আর্থিক তৃপ্তিকেই প্রধান বলিয়া ধরে তাহা রাজসিক এবং যে সমাজ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও উন্নতিকে চরম লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাই সাত্ত্বিক।

সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল অধিকতর সত্য। সভ্যতা বুঝিতে নূতন-কিছুর জন্য জ্বরাক্রান্ত রোগীর তৃষ্ণা অথবা অর্থের জন্য পাগলের ন্যায় দৌড়ের পাল্লা যদি না মনে করি, তাহা হইলে ভারত, চীন অথবা প্রাচীন গ্রীসের নিকট হইতে আমরা জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু সুশিক্ষালাভ করিতে পারি। এমন নয় যে দোষ তাহাদিগের ছিল না। গ্রীসে নাগরিকদের অবসর এবং জ্ঞানলাভ সম্ভব হইয়াছিল এই কারণে যে, যাহারা কারিকর এবং যাহারা দাস তাহারাই সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় অথচ শ্রমসাধ্য কাজগুলি করিত, অবসর-গ্রহণ এবং জ্ঞানলাভের সুযোগ তাহাদের ছিল না। দেশীয় আচার এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি হিন্দু সভ্যতার উদার সহনশীলতা থাকার দরুণ উহা ক্রমে ক্রমে দেশের বিভিন্ন জাতিকে একটি অবাধ সমন্বয়ে বাঁধিয়া লইয়াছিল, কিন্তু উহা অন্ত্যজ জাতির শিক্ষাবিষয়ে অবহেলা করিয়াছে। হিন্দুর আদর্শ, যতই কেন না মহৎ হোক্, সর্ব্বসাধারণের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। উত্তরকালে স্বেচ্ছাচারী শাসকের অধীনে মুক্ত মনুষ্যত্বের বিকাশ খর্ব্ব হওয়ার দরুণ উচ্চ আদর্শ হইতে চ্যুতিও ঘটিয়াছিল।

আধুনিক সভ্যতা অর্থ নৈতিক বর্ব্বরতার স্তরে রহিয়াছে। আত্মা এবং আত্মার পূর্ণতা সাধনের চেয়ে পৃথিবী এবং পার্থিব শক্তির উপর ইহার ঝোঁক বেশী। হাতে যে কাজ রহিয়াছে তাহাকেই সর্ব্বোত্তমরূপে সাধন করিবার নির্দ্দেশ এই সভ্যতা দিতেছে, কারণ জীবনের আদি ও শেষ কথা কি তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। আমাদের সত্তার বাহ্যরূপগুলিকে পূর্ণতা দান করিতে, পৃথিবীর অর্থ নৈতিক সম্পদ শোষণ করিতে, স্থূল সুখ ব্যাপকভাবে ছড়াইতে এবং মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্ত করিতে এই সভ্যতার অনন্ত উদ্বিগ্ন প্রয়াস। জীবন ও জড়বস্তুকে মানুষের মন ছাড়াইয়া যাইতে পারে, এ ধারণা আমাদের আছে; কিন্তু মন, প্রাণ ও দেহের উপরেও যে-আত্মা তাহার ধারণা আমাদের এখনও হয় নাই। প্রাণ এবং দেহকে অধীন করিতে আমরা তাহাদের বিকাশধর্ম্ম ও সম্ভাবনাগুলিকে বুঝিয়া লইয়াছি। উন্নতির পথে বিজ্ঞানের জয়-যাত্রা সুরু হইলে ইহা দর্শনকে দূরে ফেলিতে এবং চিন্তাকে ঘৃণা করিতে চাহিয়াছিল এবং ধর্ম্মের বিনাশসাধনেও প্রায় সফল হইয়াছিল। আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের চেয়ে অধিকতর বিদ্বান এবং বিজ্ঞান-পন্থী হইলেও, একথা আমরা বলিতে পারিনা যে, আমাদের পশুপ্রবৃত্তি তাহাদের চেয়ে কম এবং আমরা অধিকতর সদয়। শিক্ষায় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির দাসত্ব ঘুচে নাই, মনকে ইহা প্রমত্ত করে, ইহাতে তৃপ্তি দেয় না। আমরা কবিতা পাঠ করি, উপন্যাস গিলিয়া যাই, বায়স্কোপের ছবি দেখি; আর ভাবি আমরা শিক্ষিত। আমাদের যুক্তিসিদ্ধতা (rationality) একটা ভাণ, আমরা যুক্তির ব্যবহার করি আমাদের প্রবৃত্তিকে ঠেকা দিবার জন্য, আমরা যাহা করিতে চাই তাহার জন্য অজুহাত সৃষ্টি করি এবং যাহা বিশ্বাস করিতে চাই তাহার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করি। "ভাল করিয়া বেড়ানো"-র নীতিতে আমাদের খুবই বিশ্বাস, যদিও "ভাল করা"র চেয়ে তাহার "বড়াই"টাই হইয়া থাকে বেশী। আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও এবং শৃঙ্খলার ধার না ধারিয়াও মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্বন্ধে কথার খই ফুটাইয়া এবং বাছা বাছা বুলি মুখাগ্রে রাখিয়া আমরা বাহ্যতঃ বাঁচিয়া থাকি। প্রাচীন কালের নির্ব্বোধ, ভাবাবেগ-তাড়িত সহজ বিশ্বাসী যাহারা, যাহারা সময়ে সময়ে যেমন অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইত তেমনই প্রায়ই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর আচরণ করিত, সেই সব লোক হইতে আমরা এমন কিছু স্বতন্ত্র নই। যুদ্ধপ্রিয় পশু-মানুষ এখনও পোষ মানিল না। অর্থ নৈতিক সাফল্য আমাদের উচ্চতম আদর্শ এবং আমাদের প্রায় সকল যুদ্ধের মূলে অর্থ নৈতিক কারণ বিদ্যমান। অর্থনীতিই আমাদের ধর্ম্ম। সাম্রাজ্য একটা বিরাট ব্যবসায়। ব্যবসায়বৃদ্ধির জন্য, রাজ্যের পরিসরবৃদ্ধির জন্য এবং উপনিবেশ লাভ করিবার জন্য আমরা যুদ্ধ করিয়া থাকি। ব্যবসায় এবং বাজারের খাতিরে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছি, কেন না তাহাতে সন্দেহ আসিতে পারে, ভাবের বশে সহানুভূতি দেখাইতে গেলে শ্রমিককুলের শোষণে এবং অবনতদের শাসনে আমাদের দক্ষতা নষ্ট হইতে পারে; কল্পনাও আমরা পরিহার করিয়াছি, কারণ তাহা হইলে দৃঢ়তায় বাধা জন্মিতে পারে। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে এবং জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুদ্ধের গৌরব এবং বিজয়ের আনন্দ—এই সবের মধ্যে আমাদের সভ্যতার জয়াভিযান চলিয়াছে। দ্রুত গতি এবং দুঃসাহস, সাহসিকতা এবং উত্তেজনা, কর্ম্মে ব্যস্ততা এবং উগ্র গোলমাল—এই সবের ইহা সংমিশ্রণ। ইহার বাসনা পূরণ হইবার নয়, ইহার ভাগ্যে তৃপ্তিও লেখা নাই।

আমরা গতি চাই, পরিমাণ চাই, সব কিছুকে এক ছাঁচে ঢালাই করিতে চাই এবং স্থূল বস্তুতে মগ্ন হই; এই সব বৈশিষ্ট্যহীন গুণগুলি আমাদের অধ্যাত্ম সত্তাকে কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে, অন্তরে আমরা কোথাও ঐক্যের সুর পাইতেছি না—আমাদের সর্ব্বসাধারণের মনে অরাজকতা। দৈহিক জীবনের প্রতি নির্ব্বোধ আসক্তি, ইহার স্থূল প্রয়োজন এবং প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-সুখ ও আবেগের বশবর্ত্তী নিম্ন স্তরের মানসিক জীবন এবং স্থূল প্রয়োজন-বাদীর অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং সুন্দর, প্রেমময় এবং পুণ্যময় জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচার করা হইতেছে। এমন কি কুশ্রীতর দৈহিক বর্ব্বরতাও একেবারে চলিয়া যায় নাই। দেহের প্রতি আমাদের ভাব—পবিত্র লালসা sacred lusts, ঐশ্বরিক বৃত্তি divine fire, অদৃশ্য পূজাবেদী subterranean shrine, মহৎ বর্ব্বর noble savage, আদিম প্রকৃতির বাণী voice of the elemental world প্রভৃতি বলিতে আমরা যাহা উপলব্ধি করিতেছি তাহারই মধ্যে ইহা বঞ্চনা করিয়া চলিতেছে। মনোবেগকে পবিত্র বলিয়া ধরা হইতেছে এবং অযৌক্তিকতাকে পবিত্রতার আবরণ দেওয়া হইতেছে।

জগৎটা কিছু অন্ধ অসঙ্গতির হাতে নয়। ইতিহাসে ন্যায়-যুক্তি বলিয়া একটা বস্তু আছে। লর্ড একটন (Lord Acton) বলিতেছেন, "তিন হাজার বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ বাদ দিয়া মাত্র চার শত বৎসরের পর্য্যবেক্ষণকে ভিত্তি করিয়া আমরা কোন দর্শন দাঁড় করাইতে পারি না।" (*The Study of History*) অতীতে সভ্যতার উত্থান-পতন লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আমরা

দেখিতে পাই যে, যে-সব সভ্যতা রাজনীতি, দেশপ্রেম এবং পরস্পরের উচ্ছেদ-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল সেগুলি হয় ভিতর নয় বাহির হইতে নিজেদের সর্ব্বনাশ আনিয়াছে। প্রস্তরযুগ হইতে পাশ্চাত্য ইউরোপের উত্থানের বহু পূর্ব্বে মিশর, বাবিলন, এসিরিয়া, ক্রীট্ এবং ক্যালডিয়ার সভ্যতা বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। বিগত ছয় হাজার বৎসরের ইতিহাসে আমাদের দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া যদি প্রত্যেক এক শত বৎসরকে (ডাঃ আলেকজাণ্ডার আর্ভিন যেমন কিছুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন) এক মিনিট করিয়া ধরি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে ঘড়ির উভয় কাঁটা যখন বারোটার ঘরে তখন মিশর এবং বাবিলন কেন্দ্রে অবস্থিত। বারোটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইলে ক্রীট্কে সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি; বারোটা দশ মিনিটে এসিরিয়া এবং বারোটা পনেরো মিনিটের সময় ক্যালডিয়া। চৈনিক এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ইউরোপীয় গণনা অনুযায়ী ধরিলে বারোটা কুড়ি মিনিটের সময় চীন, ভারতবর্ষ এবং মেডিয়ার দেখা মিলে। বারোটা পঁচিশ মিনিটে পারস্য অগ্রবর্ত্তী, সাড়ে বারোটার সময় আমরা গ্রীসে আসিয়া পড়িয়াছি: বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আলেকজাণ্ডার মানচিত্র হইতে কয়েকটি সাম্রাজ্য মুছিয়া ফেলিতেছেন; তারপর বারোটা চল্লিশ মিনিটে রোমের প্রভুত্ব। বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে প্রবল আধুনিক ইউরোপীয় জাতি সমূহের অভ্যুদয়। পরবর্ত্তী দশ মিনিট কালের মধ্যে প্রত্যেক এক মিনিটে একটি করিয়া সাম্রাজ্য অথবা রাজ্য মানচিত্র হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে এবং আর একটির নূতন উদ্ভব হইতেছে। একটা বাজিবার কয়েক সেকেণ্ড পূর্ব্বে আমাদের মহাযুদ্ধ হইয়া গেল। এশিয়ার সভ্যতাসমূহ বাঁচিয়া আছে, তাহাতে মানবীয় ও আধ্যাত্মিক সত্তার সঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছি। এই সব সভ্যতার যুগেও যুদ্ধ হইয়াছে, রাজারা ছিল সৈনিক, কিন্তু উন্নততর জীবনের প্রতি প্রীতিবশতঃ যুদ্ধের দুঃসাহসিকতাকে তাহারা বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিসমূহের ন্যায় বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল করিতে পারে নাই। আরো চাই, আরো চাই, পশুবলের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করিবার এই মারাত্মক কামনায় পীড়িত হইয়া এসিরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, ইহার জন্য সে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসে যুদ্ধ লাগিয়া থাকিবার দরুণ তাহার অবসান ঘটিল। রোম যখন সমস্ত তৎকালীন জ্ঞাত পৃথিবীকে জয় করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ হইতে কর আদায় করিতে লাগিল তখন তাহার সমস্ত জগৎ জয় করা হইল বটে, কিন্তু সে তাহার আত্মাকে হারাইল। বিবাহে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা পীড়াদায়ক, ইহাতেই রোমান বিলাসীর চূড়ান্ত উন্মত্ততা এবং রোমের অধঃপতনের সূচনা দেখা যায়। একটি পুরুষের ত্রয়োবিংশ পত্নী গ্রহণ এবং একটি নারীর একবিংশ স্বামীগ্রহণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। চুক্তি করিয়া বিবাহ হইল, সে বিবাহ বাতিল হইল এবং আবার বিবাহ হইল—এ যেন আসবাব-পরিবর্ত্তন। রোমের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহার এই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ঐতিহাসিক লিভি বলিলেন—"আমরা আমাদের পাপ আর সহ্য করিতে পারি না, পাপের প্রতীকারও না।" টাসিটাস সেই নৈরাশ্যময় জগতের অতি বিবর্ণ চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। জুভেনাল ইহাকে ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ সে শান্ত ক্ষীণ স্বরে কর্ণপাত করে নাই, এবং গৌরবোজ্জ্বল রোম লুপ্ত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বের উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের আশা পোষণ করার ফলে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য লুপ্ত হইল, এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যহীনতা হেতু সভ্যতার পরে সভ্যতার পতন হইল। হিন্দুর বিষ্ণুপুরাণকার আমাদিগকে চিন্তা করিয়া সেই কল্কি অবতারের যুগের প্রতীক্ষায় থাকিতে বলিতেছেন—যে যুগে একমাত্র সম্পত্তিই মর্য্যাদা দান করিবে, কেবল ঐশ্বর্য্যই হইবে সৎগুণের উৎস, স্বামী স্ত্রীর ঐক্যের বন্ধন হইবে একমাত্র লালসা, জীবনের সাফল্যের মূলে থাকিবে মিথ্যাচার, যৌন কামনার পরিতৃপ্তি হইবে আনন্দভোগের উপায় এবং বহির্ভূষণের সঙ্গে জড়াইয়া যাইবে অন্তরের ধর্ম্ম। রুচিহীন বর্ব্বর আদর্শ বেশী দিন টিঁকিলে আমাদের জীবন অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং সভ্যতা ইহার আপন ভারেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ঘটনা সব স্পষ্ট এবং ইতিহাসের নিয়ম-কানুনও নির্ম্মম—আন্দাজ করিবার কিছুই তাহারা রাখে নাই। তরবারি যাহারা গ্রহণ করে তরবারিতেই তাহাদের প্রাণ যায়। কোন সভ্যতা জয়ী হইলে জয়টা দৈহিক শক্তির চেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই বেশী হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি ও তেজের অভাব হইলেই সভ্যতার পতন হয়। তরবারির উপর যতদিন আমরা ভরসা করিয়া আছি এবং যতদিন আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা প্রভুত্ব করিতে অক্ষম ততদিন আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লোলুপ যে সমাজ প্রতিযোগিতাকে ভিত্তি করিয়া বলপ্রয়োগকে সংঘর্ষের মীমাংসক করিয়াছে, যেখানে চিন্তা কৃত্রিম, কলা যেখানে ভাববিলাস, নৈতিক চরিত্র নিকৃষ্ট, সে সমাজের সভ্যতা হইল রাজসিক সভ্যতা, সাত্ত্বিক সভ্যতা নয়, কাজেই সে সভ্যতা টিঁকিতে পারে না। জগৎটা ছুটিয়াছে বিপদের দিকে, একমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের পুনর্গঠনই উহাকে রক্ষা করিতে পারে। ঋষিবাক্য মনে পড়িতেছে—'Turn ye, Turn ye, why will ye die ?'

"মানুষ যে ইতিহাস হইতে কিছুই শিক্ষা করে না, একথা আমরা কেবল ইতিহাস হইতেই জানিতে পাই"—হেগেলের এই ভীষণ ব্যঙ্গোক্তি কি আমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিব, না, ইহাকে সমর্থন করিব? সভ্যতার ভবিষ্যৎ, না, মানুষ বিপন্ন হইয়াছে। আমাদের হাতে কিন্তু ইহা গড়িয়া উঠিতে পারে। মানব-কল্যাণের জন্য জগৎটাকে নিরাপদ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

নৈরাশ্যের প্রয়োজন নাই, মাত্র সম্প্রতি আমরা এই পৃথিবীগ্রহে আসিয়াছি। আমরা যে কেবল অর্দ্ধসভ্য তাহাতে বিস্মিত হইবারও কিছু নাই। সম্মুখে অনন্তকাল পড়িয়া রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন, এই গ্রহ বাসের অযোগ্য হইবে কিম্বা সূর্য্যদেব কোটী বৎসর পরে বিলীন হইয়া যাইবেন, এমন মনে করিবার কোন হেতু নাই। কেবল দৈহিক নয়, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যদি আমরা অগ্রসর হইতে পারি তাহা হইলে মানবের ভবিষ্য আশা অনেকখানি। আমার খুবই বিশ্বাস যে, বর্ত্তমানের অগ্রগতি পরিণামে বিশ্বের মঙ্গলই সাধন করিবে। আমাদের সভ্যতা ও ইহার উপাদানগুলির স্পষ্ট বিশ্লেষণ ও যথার্থ সমালোচনা যে-কোন উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন। অলস মমতাভিমানে বাধা, প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা এবং যাহারা বিকাশশীল মনকে অতীতের বাধানিষেধে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায় তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল বাদানুবাদ যদি হয় তবে তাহা আমাদিগকে সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ স্পষ্টভাবে ভুল স্বীকারই হইল সকল উন্নতির মূল। ভবিষ্যতের দিকে কাহারও দৃষ্টি বেশী দূর না পৌঁছিলেও, সম্মুখের প্রসারিত পথের গোড়ার কয়েক পদ, যতদূর মনে হয়, হয়তো দৃষ্টিতে পড়ে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদক শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

স্মরণ

—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

দিনমানের কলরব ও ব্যস্ততার মধ্যে যে কথাগুলি কোন দিন মনে পড়ে না, নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতায় সেইগুলিই এক একদিন এমন বিচিত্র সমারোহের সঙ্গে মনকে দখল ক'রে বসে যে বিস্ময় তখন সীমা ছাড়িয়ে যায়। ব্যাবহারিক জীবনে যা হয়ত একটি ঘটনা মাত্র—সামান্য ঘটনা, রাত্রির নিদ্রালস-মুহূর্তে তার মূল্য যেন শতগুণ বেড়ে উঠে। এই জন্যই দিনমানটা আমার কাছে ছদ্মবেশ আর রাত্রি আমার আত্ম-প্রকাশ।

আজও আমার জীবনের তেমনি একটি মুহূর্ত্ত। রাতটা গুমোট, ঘুম আসছে না কিছুতেই। খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে এল ক্লান্তি, তবু ঘুম এল না। শঙ্কিত একটু জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে আমার শয্যার পাশে সামান্য স্থান খুঁজে নেবার চেষ্টা ক'রছিল, তাকে তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে দেব না মনে ক'রে, বিছানা থেকে উঠে সুইচ্‌টা টেনে দিলাম। কৃত্রিম আলোর সামনে সে বেচারী লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল, যেন কুণ্ঠিত একটি পল্লীবধূর পাশে কোন নগর-নটীকে এনে বসিয়ে দিলাম।

মাথার শিয়রে ছোট টেব্‌লের ড্রয়ারটার মধ্যে ছিল একখানা খাতা। বছর পাঁচেক আগে পর্য্যন্ত এই খাতাটিতে নিয়মিত ভাবে লিখ্‌তাম। কি লিখ্‌তাম?—জীবনের অগ্নাংশগুলিকে এর পাতাগুলিতে জুড়ে রাখবার চেষ্টা করতাম। এখন এর অনেকস্থানে অসম্ভব ন্যাকামী ও হাস্য-রসের উপাদান আছে—যদিও যখন এর ব্যবহার ছিল, তখন রীতিমত করুণ ক'রেই সেগুলিকে লিখবার চেষ্টা ক'রেছিলাম। খাতাখানির নাম দিয়েছিলাম 'স্মরণ'।

কতকগুলি টুকরো টুকরো ঘটনার ইতিহাস ছাড়া জীবনকে কি ব'লব? তাই সেই ঘটনাগুলি যাতে আমার মনোলোকে কোনদিন অস্পষ্ট এবং বিবর্ণ হ'য়ে না যায় তারি জন্য এই দুঃসাধ্য সাধনা। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও এই ইতিহাসের অনেক ছবিই আজ ধূলো আর ধোঁয়ায় আর এক রকম দাঁড়িয়েছে—অনেকগুলি একেবারে বিস্মৃতির অতলে। জীবনে আমাদের স্মৃতির চেয়ে বিস্মৃতির স্থানই বেশী। নইলে আজ আমার সেই যৌবন-দিনের কাহিনীগুলি নিজের কাছেই এমন বিস্ময়কর মনে হ'বে কেন?

আমার ঘরে এখন দ্বিতীয় কেউ নেই। শীতের রাতে কুয়াসার গুণ্ঠনে মুখ ঢেকে রাতটি যেন বাসর-বধূর মত ঢুলছে। কোথাও একটু শব্দ নেই। মাঝে মাঝে সামান্য একটু হাওয়া আসছে। ব'সে ব'সে সেই পুরানো খাতার পাতাগুলি উল্‌টে চ'লেছি।...

তখন আকাশের চেহারা যেন আর এক রকম ছিল। যে পথ দিয়ে যেতাম তার দু'পাশে কাঁটা গাছ ছিল না, ছিল পাইন আর দেওদারের স্নেহচ্ছায়া। জীবনকে আমরা খরস্রোতের মাঝখানে দুঃসাহসী নাবিকের মত ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। আকাশে ঝড় উঠত বই কি, সে ঝড়ে নৌকা চাইত তলিয়ে যেতে—স্রোতের জল ঠেলে উঠত পায়ের কাছে, তবু নিবৃত্তি ছিল না। নিজেদের নিয়ে আমরা ক'জনে তখন এক্সপেরিমেণ্ট ক'রতাম ব'লতে পারি। জনে জনে একটি প্রমিথিউস্, বায়রণ বা ম্যাক্সিম গোর্কী। পরমায়ুর পেয়ালা ভ'রে কি কেবল সুধাই পান ক'রেছি? ঘাড় নেড়ে সায় দিলে কৃতিত্ব বাড়বে, কিন্তু সত্যের মুখরক্ষা হয়ত হ'বে না। সুতরাং সে চেষ্টাও ক'রব না। স্বীকার ক'রব যে জীবনে সুধার সন্ধানই আমাদের কাম্য ছিল না। আমরা জীবনকে নরম বিছানায় শুয়ে কেবল উপভোগ ক'রতে চাইনি, চেয়েছিলাম তার উপর দিয়ে দুরন্ত ঘোড়ার মত ছুটে বেড়াতে।

আজ সেই এক্সপেরিমেণ্টের নেশা গেছে ছুটে। তাই খাতায় বিস্মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীগুলির দিকে চেয়ে মনে হ'চ্ছে—আমি যেন লুকিয়ে আর কা'র গোপন কাহিনীগুলি প'ড়ে নিচ্ছি। নইলে জীবনের সেই বিরাট অতৃপ্তি আর চাঞ্চল্য কোথায় গেল?

হারিয়েছি নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার জন্য আজ শোক ক'রব না। আজ সেই খাতার পাতা উলটোতে উলটোতে যে ছোট্ট ঘটনাটি আমার মনে একটি বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে দেখা দিল, সেইটেই আপনাদের শোনাবার জন্যে লিখে রাখলাম।

খাতায় তারিখ দেখছি—২০শে শ্রাবণ। সেটা অবশ্য দশ বছর আগের ২০শে শ্রাবণ, অর্থাৎ তেরশ' ত্রিশের। আমাদের মধ্যে কারও বয়স তখন পঁচিশের বেশী নয়। এই আমাদের কথাটার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় ত হবে, সুতরাং সেটা ক'রে রাখা ভাল। আমরা ব'লতে তখন পাঁচটি ছেলে—প্রাণের প্রাচুর্য্যে অস্থির, দুঃসাহসিকতার নেশায় উন্মাদ, কল্পনা ও কাব্যের মোহ-অঞ্জন চোখে।

পাঁচ জনেই মিলে গিয়েছিলাম লক্ষ্ণৌয়ে। দেশ-ভ্রমণের উৎসাহ আমাদের ছিল না; আমরা গিয়েছিলাম সেখানকার যে মেয়েরা গানের ব্যবসা করে তাদের মুখে খাঁটী গজল আর ঠুংরী শুন্‌বার লোভে। সুতরাং লক্ষ্ণৌয়ের ইতিবৃত্ত, তার উদ্যান-ঐশ্বর্য্য ··এ সবের দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর আমাদের ছিল না

আমাদের মুসলমান বন্ধু আজাদ (পাঁচ জনের একজন) ছিল আমাদের এই অভিযানের অগ্রবর্ত্তী। তার বাপ-পিতামহ এই লক্ষ্ণৌয়েই তাঁদের যৌবন কাটিয়ে গেছেন এবং তাঁদের সেই যৌবন-দিনযাপনের খ্যাতি এখনও সেখানকার মহল্লায় মহল্লায় লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে আসা তাতে আজাদের চেয়ে যোগ্যতর নেতা আমরা পাব কোথায়?

আজাদের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ীটি খালি প'ড়ে ছিল, সেইটেই আমাদের আশ্রয় হ'ল। কিন্তু ভীরু আজাদ লক্ষ্ণৌয়ের সেই গান-ব্যবসায়িনীদের বাড়ীতে আনবার সাহস পেল না। সুতরাং এক অন্ধকার রাত্রিতে পাঁচজনেই মুসলমানী পোষাক প'রে আমরা যাত্রা ক'রলাম যা'রা বিশুদ্ধ উর্দ্দু গজল ও ঠুংরী শুনিয়ে আমাদের পরিতৃপ্ত ক'রতে পারে তাদের সন্ধানে।

লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধে আমরা যতখানি অজ্ঞ, আজাদও তার চেয়ে বিজ্ঞ নয়। গানের সরস্বতী মাথায় ভর ক'রবার আগেই— অর্থাৎ বার বছর বয়সে ও লক্ষ্ণৌ ছেড়ে পালিয়েছিল ক'লকাতায়। তারপর বছরে এক আধবার এখানে ফিরেছে বটে, কিন্তু আজকের মত দুঃসাহস ওর কোন দিনই হয় নি।

আমরা মনে করে এসেছিলাম—যারা আমাদের গানের সুধা পরিবেশনের ভার নেবে, তাদের চোখের কোলে টেনে-দেওয়া সুর্ম্মার রেখায় থাকবে অনির্দ্দেশ্য ইঙ্গিত, তাদের বহুমূল্য পেশোয়াজ ও শাড়ীর সুকোমল সৌন্দর্য্য মনের মধ্যে ইন্দ্রজাল রচনা ক'রবে, রূপোর গড়্‌গড়ায় সোনালী নল মুখে দিয়ে তারা যখন সঙ্গতীদের আদেশ দেবে তখন মনে হবে দৈব ক্রমে আমরা বুঝি পরলোকগত নবাব ওয়াজেদ আলি শার হারেমের মধ্যে এসে প'ড়েছি। পরন্তের গালিচার উপর রূপোর থালায় থাকবে সোনালী রং-এর পান, সুগন্ধি জর্দ্দা; আতর, গুগ্‌গুল আর লোবানের গন্ধে প্রকাণ্ড ঘরখানি থাকবে পুষ্পশয্যার রাত্রে নব বরবধূর মত মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে এবং তারই মাঝখানে আমরা পাঁচজন—গানের জন্য পাগল দুঃসাহসী পাঁচটি ছেলে ব'সে ব'সে শুনব আসল জরির কাজকরা জুতো-পরা রূপসী মেয়েদের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের কাকলী;—যে সঙ্গীতের মধ্যে উচ্চারণের এতটুকু অশুদ্ধতার স্থান নেই, যে সঙ্গীত কেবল মস্তিষ্কের দ্বারে আঘাত না ক'রে মনের অন্তঃপুরে গিয়ে ভ্রমরের মত গুঞ্জন ক'রে বেড়ায়।

কিন্তু সে ছবি কল্পনাতেই র'য়ে গেল।

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-ব্যবসায়িনীদের সন্ধান সে রাত্রে আমরা ক'রতে পারলাম না। যে দু'একটি জায়গায় সাহস ক'রে আমরা এগিয়ে গেলাম, তা'রা সেখানে অপরিচিত আমাদের দেখে আমল দিতে চাইল না। তবু অভিযান ব্যর্থ হ'তে দেব, এতদূর নিরুদ্যম আমরা ছিলাম না। শেষ পর্য্যন্ত, একস্থানে আশ্রয় নিতে হ'ল,—যদিও কল্পনার স্বর্গের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। তবে গান নাকি মেয়েটি ভালই গায়।

প্রাথমিক পরিচয়-পর্ব্বের বর্ণনা আর নাই বা দিলাম! কারণ আজকের রাত্রে যে কথাটি আমার মনকে অত্যন্ত বেশী ক'রে দোলা দিয়ে গেল তার সঙ্গে সে-সবের কোন সম্বন্ধ নেই ব'ললেই হয়। এটা শুধু উপলক্ষ্য, সুতরাং যে-টুকু না ব'ললে আপনাদের বুঝবার অসুবিধা হবে, সেটুকু ছাড়া আর সবটাই প'ড়বে বাদ।

কিছুক্ষণ পরে গান আরম্ভ হ'ল। গানটি ভাল ক'রে গাওয়া হ'য়েছিল কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আসমানী রঙের শাড়ীপরা এক মুসলমানীর মুখে তার কয়েকটি কথা আমার ভারি চমৎকার লেগেছিল। আজও তার খানিকটা আমি স্মরণ ক'রতে পারি:

তেরি গমমে রোতে রোতে
হুয়া খুন পানি পানি

* * * *

কভি বাত না কহি হঁস কর্,
মুঝে উমরি ভর্ রোলায়া,
কভি না মিলি উস্ দিল্‌সে,
মিলি থাথোমে জওয়ানী।

সিগারেটের সর্পিল ধোঁয়ার দিকে চেয়ে, সুরের কারুণ্যটুকু উপভোগ ক'রছিলাম এবং মনে মনে ভাবছিলাম, প্রতিরাত্রে আগন্তুকদের পরিতুষ্ট ক'রবার জন্য যে গানগুলি গেয়ে যায় সে-গুলির মর্ম্মোপলব্ধি এরা নিশ্চয়ই করে না। কোথায় কোন্ হতভাগিনী সারা জীবন কেঁদে কেঁদে, তার তনু ও মনকে ক'রে ফেলল ছাই সে খোঁজ রেখে এদের লাভ—?

গান থেমে যাবার পর সবাই খানিকটা চুপ ক'রে ব'সেছিলাম। সুরের জালে তখনও যেন আমাদের কণ্ঠ র'য়েছে জড়িয়ে। কথা ভুলে গিয়ে সবাই ছিলাম নিজের নিজের মন নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ নীচে থেকে উঠল করুণ কণ্ঠের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ : "আরে মোরি মাঈ······"

সুরের জাল ছিঁড়ে গেল। আমরা সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। গভীর রাত্রে চারিদিকের এই বিলাস-কলরোলের মধ্যে এমন করুণ আর্ত্তনাদ কেন? মনে হ'ল এই বাড়ীরই নীচেতলার কোন ঘর থেকে কেউ অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে। যে মেয়েটির কাছে আতিথ্যস্বীকার ক'রেছিলাম তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, অমন ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল কে?

মেয়েটি—তার নাম মনে নেই, ব'ল্‌লে—ও মুন্না।

তার কণ্ঠে কোন রকম উদ্বেগ প্রকাশ পেল না, যেন মুন্নার পক্ষে এমনি চীৎকার করা একান্ত স্বাভাবিক।

ব'ললাম, ও এমন ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল কেন?

বাইজী ব'ললে, ওর মায়ের দয়া হ'য়েছে আজ চার পাঁচ দিন, দেখবার শুনবার লোক কেউ নেই। বোধ হয় যন্ত্রণায় কেঁদে উঠে থাকবে।

কথাক'টি ব'লে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে ঘড়ির দিকে চেয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আর মাত্র একটি ঘণ্টা বাকী।

মেয়েটি কুণ্ঠাহীন; কিন্তু তার জন্যে রাগ ক'রলাম না। ঘড়ির মিনিটগুলি আমাদের কাছে কতদূর দামী তাও বোধ করি তখন স্মরণ ছিল না।

আজাদ জিজ্ঞাসা ক'রলে, এমনি ভাবে ও চার পাঁচদিন প'ড়ে আছে! তোমাদের কেউ কি ওর দেখাশুনা ক'রতে পার না?

বাইজী ম্লান একটু হেসে জানালে যে তাদের খেটে খেতে হয়, সুতরাং মা যদি তা'দের উপরেও দয়া করেন তখন কি হবে?

বাইজী হয়তো ঠিক কথাই ব'লেছিল। নিজের বিপদের আশঙ্কা যেখানে প্রবল, মানুষের কল্যাণ ক'রবার আকাঙ্ক্ষা সেখানে নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া কি?

জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মুন্না কি বরাবরই একা—?

বাইজী ব'ললে, না। একটি লোক সঙ্গে ক'রে সম্প্রতি ও এখানে এসেছে। এখনও একমাস হয় নি। মুন্নার হাতে টাকাকড়ি কিছু ছিল—সেইগুলি এই ক'দিনে ফুরিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটির জন্য মুন্না বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এল তার ভালবাসাও গেছে ফুরিয়ে। আজ সাত আট দিন তার আর কোন সন্ধানই নেই—

একটুখানি থেমে, হাসবার ভঙ্গী ক'রে বাইজী আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলে, মেয়ে-মানুষগুলো কি বোকা বলুন তো?

প্রশ্নকারিণী নিজে কোন দিন এমনি নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ ক'রেছিল কি না এবং তারপর থেকে হৃদয়কে সযত্নে আগলে রেখে ও কেবল সাবধানতার সঙ্গে ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে সময়ের হিসেব করছে কি না তা সেই ব'লতে পারে। সে সম্বন্ধে তাকে আর কোন প্রশ্ন করা হয় নি।

উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললাম, মুন্নার ঘরটা আমাদের একবার দেখিয়ে দিতে পারবে?

বাইজী ব'ললে, মাফ করবেন আমায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই ডান দিকের ছোট ঘরখানা মুন্নার। চিনে নিতে আপনাদের দেরী লাগবে না।

না, চিনে নিতে আমাদের সত্যিই দেরী হ'ল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেই মুন্নার ঘর, কিন্তু তাকে বোধ হয় ঘর না বলাই সকল দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত হবে। ঘরের মধ্যে যে দেয়ালগিরি জ্ব'লছিল তাতে ঘরের ঐশ্বর্য্য কিছু বাড়ে নি—বেড়েছিল শুধু অন্ধকার। চার জনকে বাইরে দাঁড়াতে ব'লে আমি ঢুকলাম ঘরে।

সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখলাম, ঘরের একপ্রান্তে চাদরহীন তোষকের উপর একটি মেয়ে চোখ বুঁজে প'ড়ে আছে। তার গলা পর্য্যন্ত একটি নীল-রঙের চাদর দিয়ে ঢাকা। মুন্নাই হ'বে। সম্ভবতঃ চীৎকারের পর অবসন্ন হ'য়ে ও একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'রছে। একা একা চীৎকারই বা মানুষে কতক্ষণ ক'রতে পারে?

মুন্না নিশ্চয়ই আমার উপস্থিতি টের পায়নি, যদিও বা পেয়ে থাকে তা' হ'লে বিশ্বাস ক'রবে কি ক'রে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ঘরটি ভাল ক'রে দেখে নিলাম।

ঘরের ওদিকে একটি মাত্র জানালা, সেটি এখন বন্ধ। কিন্তু জানালা হ'লেও সেটি আলো-বাতাসের পক্ষে প্রশস্ত ব'লে মনে হ'ল না। ঘরে জিনিষপত্র কিছুই নেই, মেঝের উপর ছোট্ট বিছানা পাতা। এই বিছানার উপর শুয়েই মুন্না বোধকরি তার পলাতক প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে বহু অসম্ভব সুখ-ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখেছে। লক্ষ্ণৌয়ের মত বিচিত্র শহরে এসে মালকাজেহান্ বা অচ্ছন্বাঈয়ের মত খ্যাতি-ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখা যে খুব বেশী অন্যায় একথা আজও মুন্না বোধহয় স্বীকার ক'রতে দ্বিধা বোধ ক'রবে।

ঘরের একপ্রান্তে কতকগুলি ময়লা কাপড়জামা জড় হ'য়ে র'য়েছে—আল্নাতেও কতকগুলি। এককোণে একটি ছোট টিনের তোরঙ্গ,—বোধ করি এইটি বোঝাই ক'রে মুন্না তার স্বামীর বা বাপের বাড়ী থেকে যথাসর্ব্বস্ব তার প্রণয়াস্পদের জন্য চুরী ক'রে এনেছিল এবং এখন বোধ হয় ওটার মধ্যে একটি অচল পয়সা পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঘরের আর এক দিকে একটি মাটির কুঁজো। বাণিশ-করা একজোড়া চটি, গোটা দুই তিন এনামেলের বাসন, এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু চোখে প'ড়ল না। মানুষের নিঃসহায়তার এমন উলঙ্গ রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে। তাই কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হ'য়ে মুন্নার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে-ছিলাম।

মুন্না চোখ মেলে নাই। এমন ভাবে চাইল যেন চোখ তাকাতে তার ভয় হ'চ্ছে। মাথার শিয়রে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার রোগক্লিষ্ট মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য আলো হ'য়ে উঠল, তারপর অবসন্নের মত আবার সে চোখ বন্ধ ক'রলে বুঝলাম।

কিন্তু যার সঙ্গে পরিচয় নেই, তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়াও কঠিন।

বন্ধুরা বাইরে অধৈর্য্য হ'য়ে উঠছিল, কিন্তু উপায় কি? আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রলাম। মুন্না আবার চোখ মেলে চাইল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ব'লল: বাবুজী, আপ হিঁয়া ক্যায়সে আয়েঁ?

কি ক'রে তার ঘরে এসে পৌছলাম, সে কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে দিলাম।

মিনিট কয়েক আবার চুপচাপ কাটল। মুন্নার মাথার শিয়রে ব'সে দেখলাম তার রক্তবর্ণ চোখের প্রান্ত দিয়ে ক্ষীণ অশ্রুর রেখা নেমে এসেছে। কতক্ষণ পরে সে কেবল ব'লতে পারল: বাবুজী, এয়্সা কভি হোতা হায়?

সেই রাত্রে আমরা মুন্নাকে আজাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলাম। মুন্নাও আপত্তি করে নি এবং বাড়ীর আর কেউও নয়।

দশ দিন মুন্নাকে আমি দেখেছিলাম। কারণ দশ দিন পরে আমি বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম পাই: মায়ের অসুখ সুতরাং অসুস্থ মুন্নাকে বন্ধুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সেই দিনই আমাকে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চ'লে আসতে হয়।

আমি ক'লকাতায় পৌছবার দিন কুড়ি পরে আজাদ লক্ষ্ণৌ থেকে আমাকে চিঠি লেখে:

"আমাদের সেবা-যত্নে মুন্না বেশ সেরে উঠেছিল কিন্তু একটু বল না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাকে যেতে দিই নি। কাল সন্ধ্যার পর একটি মুসলমান ছোকরা তার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসে। ছেলেটি সুশ্রী, বয়স অল্প। সম্ভবতঃ মুন্নার ভালবাসার সেই লোকটি। কিন্তু মুন্না সে কথা স্বীকার করে নি। সে বলে, লোকটি তার পরিচিত, এইমাত্র। তারা দু'জনে নিরিবিলিতে বসে' কিছুক্ষণ আলাপ করে। এতে আমাদের আপত্তি ক'রবার কথা নয়, আপত্তি হয়ও নি। কিন্তু আজ সকালে উঠে মুন্নাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। একটি কথাও সে আমাদের কাউকে জানিয়ে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে নি।... ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য্যের, নয়?......ছেলেটি নিশ্চয়ই তার প্রেমিক, কি বল?..."

* * *

এর পর আবার যখন 'স্মরণে'র পাতায় মুন্নার নাম খুঁজে পেলাম তখন তিন বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে। এই তিন বছরে আমাদের পাঁচ জনের জীবনে এসেছিল প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন মানে আমরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছিলাম। যারা একদিন দিন-রাত্রির কুড়িটি ঘণ্টা এক সঙ্গে কাটাত, তারা যখন জীবনের প্রয়োজনের খাতিরে দল ভেঙ্গে স'রে প'ড়ল, তখন খবরের কাগজে তা নিয়ে হৈ-চৈ হয় নি বটে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যে কত ভীষণ তা কেবল আমরাই জানতাম। বিচ্ছেদ কি এক রকমের! কেউ ক'রলে বিয়ে, কেউ চাকরী নিয়ে গেল পাঞ্জাবে, কেউ গেল কন্টিনেণ্ট টুর ক'রতে, কেউ গেল ম'রে! সংসারে বন্ধন ছিল যার, সে বন্ধন যখন কাটল তখন আমিও একবার ছাড়া-পাওয়া পাখীর মত সমস্ত আকাশটাকে প্রদক্ষিণ ক'রবার জন্যে পৈতৃক বাড়ীর দরজায় চাবী দিয়ে বেরিয়ে প'ড়লাম। একা বসে' বসে' আমাদের বিগত বন্ধুত্বের স্মৃতি-তর্পণ ক'রতে আমার ভাল লাগল না।

খাতায় তারিখ দেখছি—১৩৩৩র বৈশাখ। বৌবাজার ষ্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড একটা ব্যারাকবাড়ীর একটি ঘর দখল ক'রে বাস ক'রছিলাম। লিখতে গেলে বাস ক'রছিলাম ব'লতে হয়, কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক হ'ল না। কারণ সমস্ত দিন-রাত ঘুরে বেড়াতাম পথে পথে—অগণ্য পথচারী জনতার মাঝখানে, সহরের যারা আবর্জ্জনা সেই অখ্যাত দরিদ্র কুলী-মজুরদের সঙ্গে। কবিতার কল্পলোক থেকে তখন নেমে এসেছি বাস্তবের ধূলোয়। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে স্বেদ-সিক্ত সেই মানুষগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক'লকাতাকে ভাল ক'রে অনুভব ক'রতাম,—ট্রাম-বাসের ঘর্ঘর শব্দে দ্রুত ধাবমান ক'ল্‌কাতা, ড্যালহৌসী স্কোয়ারের বড় বড় ব্যাঙ্ক আর সদাগরি কুঠী-ওয়ালা ক'লকাতা, ফিরপো চাঙোয়ার হাসি আর আলোয় উদ্ভাসিত ক'লকাতা! এ সবের তুলনায় ওরা আবর্জ্জনা ছাড়া কি! তবু চেষ্টা ক'রতাম ওদের অধিকার ওদের বুঝিয়ে দিতে, ওরাও বেঁচে থাকতে পারে এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে।

কিন্তু এ গেল উচ্ছ্বাসের কথা। বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণ ক'রতে গিয়ে নিজের দুর্দ্দশা উঠ্‌ছিল বেড়ে। সাপ্তাহিক আর দৈনিকে শ্রমিক-আন্দোলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে হাতে যা পেতাম, পকেট পর্য্যন্ত তা পৌছানো ছিল দুঃসাধ্য। সভ্যতার কল্যাণে ক'লকাতায় ভাত-তরকারী পর্য্যন্ত খুচরা বিক্রী হয় তাই আচ্ছাদন না হোক গ্রাসের জন্য ভাবতে হ'ত না। অপেক্ষা ক'রছিলাম শ্রেণী-বিদ্বেষ-প্রচারের অভিযোগে শীঘ্রই একদিন সরকার থেকে ডাক আসবে, জীবনধারণের ক্রমান্বয়িক উত্তেজনা থেকে কিছুকালের জন্য নিষ্কৃতি পাব।

কিন্তু সে ডাক এল না।

মাসিক বার টাকা ভাড়া দিয়ে একখানি সম্পূর্ণ ঘর নিয়েছিলাম দোতলার উপর। ঘরের মধ্যে বাইরের কেউ থাকলে ঘুমোতে পারি না। এই অপব্যয়ের ফলে নিদ্রা অবশ্য নিবিড় ভাবেই হ'চ্ছিল, কিন্তু বাড়ীভাড়ার হিসেবটাও উঠছিল জটিল হয়ে। সে দিকে লক্ষ্য রাখবার মত আমার সময় ছিল না। কিন্তু মাসতিনেক ভাড়া বাকী প'ড়বার পর বাড়ীর মালিক দিলেন নোটীশ। জীবনে আমার বন্ধন নেই, সুতরাং এক মাসের নোটীশ আমার পক্ষে যথেষ্ট ব'লতে হবে। বাড়ীর মালিক যদি এসে ব'লতেন, আপনাকে এখুনি যেতে হবে প্রতাপ বাবু,—তা'হ'লেই বা আমি আপত্তি ক'রতাম কোন্ মুখে? তিনি একমাস সময় দিয়েছেন,—এই ক'দিনের মধ্যে চার মাসের ভাড়া বাবদ আটচল্লিশটি টাকা তাঁর হাতে গুণে দিয়ে আমাকে উঠে যেতে হবে। তাঁকে ব'লতে পারতাম, এক সঙ্গে পাঁচটি টাকার বেশী আমি বহুকাল নিজের মুঠোর মধ্যে অনুভব করিনি; সুতরাং এই ক'মাস আপনি আমাকে অনুগ্রহ ক'রে আশ্রয় দিয়েছেন মনে ক'রে আমার ধন্যবাদের পাত্র হন। কিন্তু এ কথা তিনি বিশ্বাসও ক'রবেন না এবং শুনে সুখীও হবেন না। কাজেই টাকা সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য ক'রবার আশ্বাস দিয়ে আবার পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। পথের মত উদ্বেগহারী বন্ধু আমাদের আর কে?

কিন্তু দিন কুড়ি কেটে যাবার পর বাড়ীর মালিক রাত্রি বারটার পর এসে টাকার জন্য উৎপাত ক'রতে লাগলেন। আমি রাত বারটার আগে ফিরি না, এ সংবাদটা তিনি পরিশ্রম ক'রে সংগ্রহ ক'রেছেন।

একদিন স্পষ্টই ব'ল্‌লেন, ৩১শে তারিখে যদি সমস্ত টাকা মিটিয়ে না দেন, তা'হ'লে আপনার নামে কেস্ ক'রব ব'লে রাখলাম। লোফার!

মনে মনে জানতাম, জীবিকা অর্জ্জনের সঙ্গত উপায় না থাকার অভিযোগে জেলে একদিন যেতেই হবে; তা কুলী ক্ষেপিয়েই হোক্, আর ঘরের ভাড়া না দিয়েই হোক্। সুতরাং এ বিষয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না। দশদিন পরে যখন যেতেই হবে তখন অনেক রাত পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরে পা দুটিকে ব্যথা দেওয়া মূর্খতা; এর পর থেকে সন্ধ্যা হ'তেই বাড়ী ফিরে ঘুমোতে লাগলাম।

শেষ পর্য্যন্ত ৩১শে বৈশাখ একদিন এল। তখনও বিছানা থেকে উঠিনি—সসম্মানে বিদায় নিতে পারলে কোথায় যাওয়া যেতে পারে তাই ভাবছিলাম। লালমোহন বাবু এসে হাজির। তিনিই বাড়ীর মালিক। চমৎকার সুগোল চেহারা, যাত্রার মহাদেবের মত। বিল-বই তিনি হাতে ক'রেই এসেছিলেন। ঘরের একপ্রান্তে একখানা ভাঙা টিনের চেয়ার ছিল; সেখানির উপর কোন মতে নিজের বিপুল দেহভার ন্যস্ত ক'রে লালমোহন ব'ললেন, উঠুন, বেলা যে প্রায় নটা হ'ল। বিল আমি লিখেই এনেছি। ষ্ট্যাম্প পর্য্যন্ত।

উঠবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ব'ললাম, যাক্, কাজ এগিয়ে রইল। কিন্তু টাকা আমি জোগাড় ক'রতে পারিনি, লালমোহনবাবু।

লালমোহন সেই সঙ্কীর্ণ চেয়ারের মধ্যে নিজেকে আন্দোলিত ক'রে বল্‌লেন, ও সব ছেঁদো কথায় আজ আর কাজ হ'বে না, প্রতাপবাবু। আজ রাত্তির পয্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আমি পুলিসে খবর দেব। আপনি কি ক'রে বেড়ান সে খবরও আমি পেয়েছি।

একটু দম নিয়ে প্রায় চীৎকার ক'রে ব'ললেন, গুণ্ডা, ডাকাত।

সে চীৎকার তাঁর আশেপাশের অন্য ঘরগুলিতেও গিয়ে পৌছল। সকাল বেলা একটা উত্তেজনার খোরাক পেয়ে অনেকে ছুটতে ছুটতে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল আমার (তখনও) ঘরের দরজার সামনে। তাদের মধ্যেও অনেকের ঘরভাড়া মাসাধিককাল বাকী ছিল এ কথা আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি। কিন্তু লালমোহন তখন সেসব বিস্মৃত হ'য়েছেন। তাদেরই উদ্দেশ্য ক'রে, প্রায় আর্ত্তনাদের সুরে তিনি ব'লতে লাগলেন: কাণ্ড দেখেছেন মশাই, চারটি মাসের ভাড়া বাকী, একটি পয়সা বার ক'রবার নাম নেই! আপনারা কতলোকে কত কথা ব'লেছেন—রেভ্যলিউশনারী, অ্যাবস্কণ্ডার। ভদ্রতা ক'রে সেসব আমি কানে তুলিনি। কিন্তু আজ আমি এর বিহিত ক'রবই। সন্ধ্যের পর যদি ভাড়া বুঝে না পাই, তা হ'লে পুলিস ডাকব। আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন।

দর্শকদের মধ্যে যাদের ভাড়া বাকী ছিল বোধকরি তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব'ললে: আর দুটো চারটে দিন অপেক্ষা ক'রে দেখুন। ভদ্রলোকের ছেলে টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়?

—আমিও ভদ্রলোক মশাই, আমার এক কথা। ব'লে রায় দেবার পর জজ সাহেবের মত লালমোহন চেয়ার ছেড়ে চ'লে গেলেন।

বিছানা ছেড়ে বাইরে যাবার উৎসাহ পেলাম না। একবার মনে হ'ল বন্ধু রঞ্জিতকে আজকের ঘটনা নিয়ে একখানি চিঠি লিখি। প্যারিস কিম্বা মণ্টিকার্লোর হোটেলে ব'সে আমাদের অতীত বন্ধুত্বের কথা হয়ত কিছুক্ষণের জন্য তার মনে প'ড়বে। কিন্তু তাতে আসন্ন সমস্যার মীমাংসা হ'বার সম্ভাবনা নেই। থাক্।

নীচের হোটেল থেকে ভাত দিয়ে যায়—যেদিন দুপুরে এখানে থাকি। আজও হোটেলের লোক খোঁজ নিয়ে ভাত দিয়ে গেল। কোন মতে সেগুলি গলার মধ্যে চালিয়ে দিয়ে আবার ঘুমোবার উদ্যোগ ক'রলাম।

কিন্তু সে উদ্যম সার্থক হ'ল না। মিনিটকয়েক যেতে না যেতেই একটি মুসলমান যুবক ঘরে ঢুকল। পরণে শিল্কের লুঙ্গী—গায়ে ছাই-রঙের সিল্কের জামা। হয়তো কোন কাগজের পক্ষ থেকে লেখার তাগাদা এসেছে মনে ক'রে উঠে ব'সলাম। কিন্তু ছেলেটি অপ্রতিভ ভাবে একটু হেসে ব'ললে, আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। আপনাকে একবার দয়া ক'রে আমার সঙ্গে আসতে হ'বে। ছেলেটি খাঁটি উর্দ্দুতেই কথা ব'লল। কিন্তু নিজের জামাকাপড়ের কথা কল্পনা ক'রে, মনে মনে শঙ্কিত হ'য়ে ব'ললাম, কোথায় যেতে হ'বে বলুন তো?

ছেলেটি ব'ললে, বেশীদূর নয়, এই বাড়ীরই উপরতলায়। আপনার জন্যে একখানি চিঠিও আছে।

মানে একটুক্‌রা কাগজ। কিন্তু একেবারে অকল্পিত। তলায় মুন্নার নাম এবং লেখাটা ইংরেজী ভাষায়। বোধকরি পত্রবাহকই মুন্নার জবানী লিখে থাকবে।

মুন্না এই খাড়ীর তেতলায় একুশ নম্বর ঘরে আছে। আমি যেন অবশ্য তার সঙ্গে দেখা করি।

সেদিন মুন্নার খবর পেয়ে কতখানি বিচলিত হ'য়েছিলাম তা আজও মনে ক'রতে পারি। কিন্তু তার কারণ শুধু মুন্নাই নয়, যে পাঁচজনের মাঝখানে মুন্নাকে সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলাম তাদের সকলকে আমার মনে প'ড়েছিল।

মুন্নার ঘরে গেলাম।

কিন্তু সে মুন্না নয়! এর সমস্ত অঙ্গে যৌবনের প্রাচুর্য্যে ঐশ্বর্য্যের দ্যুতি। মুখে যদি বসন্তের দাগগুলি না থাকত তা হলে মনে হ'ত আমি আর কা'রো সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

মুন্না তাদের ভাষাতেই ব'ললে, চিনতে পারেন?

ব'ললাম, না পারাই স্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু তুমি আমার খোঁজ পেলে কি ক'রে? আমাকে চিনতে পারাও তো তোমার পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ।

মুন্না আমাকে হাতে ধ'রে একটা শোফার উপর বসিয়ে দিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে সামনে ব'সে প'ড়ল। তারপর দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান সেই মুসলমান ছেলেটির দিকে চেয়ে ব'ললে, ওকে আপনি এখনও চেনেন না?

— না। কিন্তু উনি শুনলাম আমাকে জানেন।

—হ্যাঁ, আমার কাছে থেকেই শুনেছেন আপনার কথা— ছেলেটির দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মুন্না আবার ব'লল, উনিই তো আমাকে অসুখ অবস্থায় ফেলে পালিয়েছিলেন। তারপর একদিন আজাদ সাহেবের বাড়ীতে এসে হাজির। শেষকালে আমাকে ওঁর সঙ্গে পালাতে হ'য়েছিল, এ খবর নিশ্চয়ই আপনি পেয়ে থাকবেন?

—না। কিন্তু অমন ক'রে না ব'লে পালালে কেন?

নারীসুলভ লজ্জার একটি সুকোমল ছায়া মুন্নার মুখের উপর এসে প'ড়ল। মাথাটি নীচু ক'রে ব'ললে, পাছে আপনারা রাগ করেন তাই।

বুঝলাম এই ছেলেটির দাবী মুন্নার উপর কত বেশী। চেয়ে চেয়ে তার ঘরখানি দেখতে লাগলাম। লক্ষ্ণৌয়ের সেই অন্ধকার একতলাকার ঘরের সঙ্গে এর কত তফাৎ। এর একপাশে রাশীকৃত বড় বড় ছবি জড় করা, একদিকে কতকগুলি মূল্যবান গালচে ও আয়না; দরজায় ঝুলছে নানা বর্ণের পুঁতি দিয়ে গাঁথা পর্দ্দা।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে কাটবার পর মুন্নাই ব'ললে, আমার এই ঐশ্বর্য্য দেখে আপনার নিশ্চয়ই ভারি আশ্চর্য্য লাগছে বাবুসা'ব!···কিন্তু এত' আপনার দয়াতেই। আপনাদের আশ্রয়ে সেরে উঠবার পর আফজলের সঙ্গে পালালাম কাশী। সেখানে কত কষ্ট ক'রে গান-বাজনা শিখলাম, একটু একটু ক'রে নাম হ'ল, পসার হ'ল। সেখান থেকে গেলাম লক্ষ্ণৌয়ে, আপনাদের খোঁজ ক'রলাম। দেখলাম কেউ নেই। আজাদ সবে মারা গেছেন তাও শুনলাম। লক্ষ্ণৌয়ে ছিলাম এক বচ্ছর। তারপর আজ সাত আট দিন হ'ল ক'লকাতায় চ'লে এসেছি।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম, লক্ষ্ণৌ ছাড়লে কেন?

—এমনি। এক জায়গায় বেশী দিন কি আপনারই ভাল লাগে? এখন কিছুদিন ক'লকাতাতেই থাকব ঠিক ক'রেছি। সুবিধে মত ঘর না পাওয়াতে উপস্থিত এইটেতেই এসে উঠেছি।

সেই মুন্না!—ওর হাতের আংটীগুলির মত ওর চোখ দুটি আনন্দে, আশায় এবং উত্তেজনায় জলজল ক'রছে। মুন্না নিজের রূপোর ডিবে খুলে পান খেতে দিল, চাকরে আনল সরবৎ আর আফজল ধ'রল সামনে সিগারেট-কেস খুলে।

জীবনকে সময় সময় কতকগুলো অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশ ব'লে মনে হওয়া কি খুব আশ্চর্য্যের?

চ'লে আসছিলাম।

মুন্না ব'ললে, আজ রাত্রে আমার গরীবখানাতেই আপনার খানাপীনার নেমন্তন্ন রইল।

ব'ললাম: কিন্তু আজ সন্ধ্যের পর আমার এখানে থাকবার উপায় নেই।

—সে তো আমিও জানি। সকালে যখন গোলমাল হ'চ্ছিল, তখন আফজল আর আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিলাম। তাই তো জানতে পারলাম, আপনি এখানে র'য়েছেন। কিন্তু যাবার সময় তো আপনার কাল সকালে, আজ রাত্রে না হয় থেকেই গেলেন। তাতে আপনার এমন কি হরজা হ'তে পারে?

—না, না, ক্ষতি আর কি!···বিব্রতভাবে মুন্নার ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম।

সন্ধ্যা হ'ল, কিন্তু লালমোহনবাবু টাকার তাগাদা দিতে এলেন না, পরদিন সকালেও নয়।

আজাদ বেঁচে ছিল না, নইলে সেদিন তাকে চিঠি লিখতে পারতাম। লিখতে পারতাম:

মুন্নার সঙ্গে দেখা হ'ল, সেই মুন্না!-যে একদিন তোমাদের না ব'লে পালিয়েছিল, সামান্য একটা কৃতজ্ঞতার কথাও জানিয়ে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে নি।—

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

ভাগলপুরের চৌমাথার মোড়ে ট্রাফিক-পুলিশের ষ্টাণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়া কোথায় আশ্রয় লওয়া যায় কথাবার্ত্তা

ভাগলপুর : জিলা স্কুল।

হইতেছিল, কেন না এখানে আমাদের চার-পাচটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। রাস্তায় লোকজন, গাড়ীঘোড়া, চারিদিকে ইলেক্‌ট্রিক আলো। মন্দ লাগিতেছিল না। বাজার হইতে গোটাকতক জিনিষপত্র কিনিয়া লইয়া বাজার পার হইয়া কিছুদূরে বলাই বাবু ডাক্তারের (বনফুল) বাড়ীর খোঁজ লওয়া হইতেছে, এমন সময় বীরেনের কাকা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ। তিনিই আমাদিগকে সাদরে তাঁহার গৃহে তুলিয়া লইলেন। গল্প-গুজবের মধ্যে জামা-কাপড় ছাড়িয়া চা খাওয়া গেল। রামবাবুও বড় স্পোর্টস্‌ম্যান এবং সাইকেল স্পোর্টস্‌ই তাঁহার বিশেষত্ব। কথায় কথায় জানিলাম তিনি বিমল মুখুজ্জ্যেদের ওয়ার্ল্ড-টুরিষ্টের দলের সহিত দার্জ্জিলিং যাত্রার একজন সঙ্গী ছিলেন। তাঁহাদের সাইকেল-গ্রুপের একটি ফোটোও দেখাইলেন। উৎসাহিত হইয়া তাঁহার নিকট পথঘাটের অবস্থা সব জানিয়া লইলাম। তাঁহারা সকলেই রেসিং-সাইকেলে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। সঙ্গে বিশেষ কোন প্রকার লটবহর ছিল না—একটি হ্যাফপ্যান্ট, একটি করিয়া পুল-ওভার ও একটি ছোট টুল-ব্যাগ। মালপত্র সহ আমাদের ওজন দেখিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। শুনিলাম তাঁহারা শিলিগুড়ি হইতে দুইদিনে দার্জ্জিলিং উঠিয়াছিলেন। আমাদের কাশ্মীর-ভ্রমণের বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি খুশী হইলেন।

২৬শে।—

সকালে সূর্য্যের আলোয় ঘুম ভাঙ্গিল। জলযোগাদির পর রামবাবু সকাল সকাল ফিরিবেন বলিয়া দোকানে চলিয়া গেলেন। বীরেন ও সুরেন দুইখানি সাইকেল লইয়া 'ড্রাই-ম্যালায়ে' বসিল। আমরা তিনজন শহর পরিভ্রমণে গেলাম। শহর দেখা শেষ করিয়া চম্পানগরে গেলাম। চম্পানগরটি আমাদের পূর্ব্বকালের সেই চম্পা—বেহুলার জন্মভূমি। বেহুলার স্মৃতিস্বরূপ এখনও একটি মন্দির এখানে রক্ষিত আছে। চম্পানগরে একটি ছোটখাটো জমিদার আছেন। তাঁহারাই চম্পানগরের রাজবংশ এবং
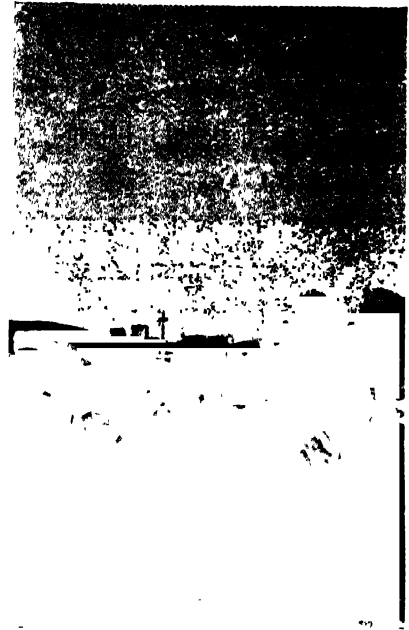
ভাগলপুর : শহরের একটি দৃশ্য।

এখনও রাজা বলিয়াই পরিচিত। চাঁদ সদাগরের সজ্জিত ডিঙ্গা, লখিন্দরের শব, বেহুলার দুঃসাহস—চোখের উপর

আসিয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে একেবারে গঙ্গার কোলে আসিয়া পড়িলাম। শশ্মানের পাশে 'চিলা-কুঠী' দেখা গেল। চিলাকুঠী পুরাকালের কোন প্রতাপশালী ঠাকুর বংশীয়ের জমিদারের প্রেক্ষাগৃহ ছিল। গঙ্গার ধারেই একটি উচ্চ ভূমি-খণ্ডের উপর ইহা নির্ম্মিত। কিছুদূরেই মুনসুবগঞ্জে বুড়ানাথ মহাদেবের মন্দির। সেখানে আসিয়া 'হরহর ব্যোম্ ব্যোম্' বলিয়া দু'জনে সাইকেলের ব্রেক্ কসিলাম।

রামবাবুর গৃহে।

বুড়ানাথ দর্শন করিয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম, বেলা তখন আড়াইটা। এত বেলা হইয়াছে জানিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলাম। আহারে বসিয়া দেখি বীরেনের কাকিমা খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। সেইদিনই অপরাহ্নে গঙ্গার ওপারে পূর্ণিয়া অভিমুখে যাইবার কথা। কিন্তু আহারাদি করার পর সে আশায় হতাশ হইলাম—গুরু ভোজনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

ফেরী-ষ্টীমার সন্ধ্যা ৬টায় বারারি ঘাট ছাড়ে। বেলা ৫টায় রামবাবুর সহিত একটি গ্রুপ তুলিয়া ধীরে ধীরে যাত্রা করা গেল। পথে ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেল, 'সুন্দরবন'—একটি মাড়োয়ারীর সজ্জিত উদ্যান, তাহার পর ওয়াটার-ওয়ার্কস—এগুলি ছাড়াইয়া বারারি ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি, হা হতোস্মি, ষ্টীমার সবেমাত্র ঘাট ছাড়াইয়া যাইতেছে। সার্চ্চ-লাইটের আলোর আস্ফালন দেখিয়া তাহাকে অভিসম্পাত দিতে ইচ্ছা করিতেছিল। অগত্যা ষ্টেসনে ফিরিতে হইল। ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট রাত্রি ১০টায় আর একখানি ফেরী পাওয়া যাইবে জানিয়া আমি ও সুরেন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া পড়িলাম। বীরেন, প্রফুল্ল ও অনিল তিন জনে ওয়াটার-ওয়ার্কসের দিকে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গেল। প্রায় রাত্রি ৯টার সময় তাহারা ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার পথে তাহারা বারারি কেভ দেখিয়া আসিয়াছে জানিয়া আপশোষ করিতে লাগিলাম। শুনা যায়, বারারি কেভ মীরকাশিমের সুড়ঙ্গ-পথের একটি প্রবেশ-দ্বার। ইহার ভিতরের পথ গোলকধাঁধাঁর মত এবং নির্ম্মাণ-কুশলতা এতই চমৎকার যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। বীরেন ভাগলপুর কলেজে পড়িবার কালে ইহার ভিতরে প্রায় দেড় মাইল পথ প্রবেশ করিয়াছিল, বলিল।

প্রায় ১০টা বাজে। বারারি ঘাট ষ্টেশন হইতে ৫ খানি টিকিট কারাগোলা রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত কেনা গেল। ঐ ষ্টেশনের ওপার হইতেই দার্জ্জিলিং রোড আরম্ভ হইয়াছে।

গঙ্গার উপর দিয়া ষ্টীমার ছুটিয়া চলিয়াছে। ওপারে দূরে ঘাটের দুই চারিটি আলো বাতাসে ধীরে ধীরে দুলিতেছিল। কাব্য করিয়া বলিলে বলা যায়, ষ্টীমারের সার্চ্চ-লাইটের আলো মাঝে মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন কাহার সন্ধান করিতেছে আর সেই আলোয় প্রতিফলিত সাদা সাদা ঢেউগুলি সে-সন্ধান বৃথা জানাইয়া দূরে দূরে মিলিয়া যাইতেছে …'তারা নাই নাই নাই'।

ঘাট ছাড়িয়া ট্রেনে উঠিয়াছি। সাইকেলগুলি ক্রু-ইন-চার্জ্জের মত লইয়া 'বুক' না করিয়া তুলিয়া লইলাম। কিছুক্ষণ পরে এক জায়গায় আসিয়া গাড়ী থামিল—থানা বিপুর জংশন ষ্টেশন। নামিলাম, আবার অন্য গাড়ী চাপিতে হইবে। ষ্টেশনে কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া উদরস্থ করা গেল, চাও দুই পেয়ালা করিয়া পান করা হইল। মনের আনন্দে সবে মাত্র পান চিবাইতে চিবাইতে ষ্টেশনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, দূরে নজর পড়িতে দেখি, সিগনালের পাশ দিয়া একটি জো

আলো ছুটিয়া আসিতেছে। অচিরেই ট্রেন আসিয়া প্লাটফর্মে দাঁড়াইল। গাড়ীতে ভয়ানক ভিড়। একখানি মাত্র ইণ্টার ক্লাশ সামনে খালি পাইয়া সাইকেলগুলি লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। ষ্টেশন-মাষ্টার ও ক্রুকে আগে হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলাম। গাড়ী ছাড়িল। দুই তিনটি ষ্টেশন পার হইয়া গেলাম। রাত্রির অন্ধকারে কুশী নদীর পুলের উপর দিয়া ট্রেন ছুটিতেছে। তখন ১টা বাজে। তন্দ্রাভাব আসিয়াছে, কেহ কেহ বেশ ঢুলিতেছে, হঠাৎ চমকাইয়া দেখি গাড়ী থামিয়া আছে একটা ষ্টেশনে। পরমুহূর্ত্তেই ক্রু মহোদয় আসিয়া 'মিষ্টার' 'মিষ্টার' করিয়া বার বার হাঁক পাড়িতে লাগিল। বড়ই বিরক্তি বোধ হইল, কি, বলে কি ও? ট্রেন তখন চলিতেছে। আগন্তুক দয়া করিয়া বলিলেন, আই কাণ্ট অ্যালাও সো মেনি রেক্স আনবুক্‌ড্‌। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, এ আবার বলে কি? মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলাম। কোন জবাবই দিলাম না। মনে মনে রাগ হইতেছিল। পরের ষ্টেশনে ক্রু নামিবার সময় বলিয়া গেলেন, প্লিজ ডিসাইড অ্যাণ্ড সী মি অ্যাট দি নেক্‌স্‌ট্‌ ষ্টেসন। বুঝিলাম, তাঁহার কিছু জলপানি খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। গাড়ী পরের ষ্টেশন পার হইল, তিনি আর আসিলেন না, মনে করিলাম, বাঁচিয়া গেলাম। এইবার কারাগোলা রোড ষ্টেশন। ষ্টেশনে নামিয়া শুনি ক্রু আমাদের নামে এক খণ্ড বিল ষ্টেশন-মাষ্টারের হাতে জমা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের চক্ষু ছানাবড়া। ক্রুকে অনেক বুঝাইতেছি, হঠাৎ চলন্ত ট্রেনে লম্ফ দিয়া উঠিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় খুব সদাশয় ব্যক্তি, খুবই দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাত্রি তখন ৩টা, বুঝিলাম আর তর্ক-বিতর্কে কোন ফল নাই। আমাদের জন্য তিনি ওয়েটিং-রুম খুলিয়া দিলেন। সেইখানেই রাত্রির মত আশ্রয় লইলাম।

২৭শে।—

সকালে ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় তাঁহার ক্ষমতার সাধ্যমত আমাদের বিলের কিছু কম্‌তি করিয়া দিলেন, তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া ৭।।০ টাকা গুণিয়া বিদায় হইলাম। ষ্টেশন হইতে নামিয়াই দুই চারিখানি খাবারের ও পানবিড়ির দোকান। জলের বোতলগুলিতে জল ভরিয়া লইয়া কিছু জলযোগ করিয়া সাইকেল ছাড়িলাম। লেভেল-ক্রসিং পার হইয়া চলিতেছি। পূর্ণিয়া এখান হইতে ২২ মাইল। মাইল ৮।৯ চলিবার পর অপার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বীরেন হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল, ওরে দাঁড়া! তাহার গাড়ীর চেন্ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর নাই জানিয়া একটি বৃক্ষের তলায় আশ্রয় লওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া গাড়ী সারাইয়া যাত্রা আরম্ভ করা গেল। বেলা বাড়িয়া উঠিতেছে। তাড়াতাড়ি চলিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু বিধি বাম,
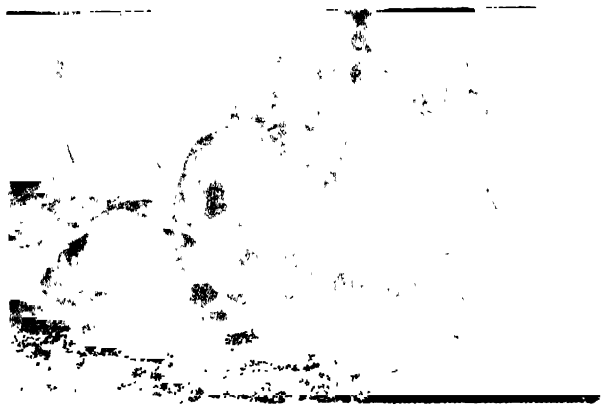
পূর্ণিয়ার পথে: গাড়ীর চেন সারা হইতেছে।

মাইল দেড়েক যাইতে না যাইতে ক্যাপ্টেন চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে আমারও যে চেন্…! আবার থামিতে হইল। বুঝিলাম, আজ আর কপালে আহারাদি নাই। গাছতলায় বসিয়া গাড়ী লইয়া অনেকক্ষণ ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া চলিতেছি। সূর্য্য ঠিক মাথার উপর উঠিয়াছে। দুপুরের ক্লান্ত আবহাওয়া সারা-জায়গাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ঘুমে চোখ মুদিয়া আসিতেছে। মাটিতেই লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল। একটি পথিক পাশ দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া তাহার সহিত বেশ খানিক আলাপ জমানো গেল। গ্রামের সাদাসিধে লোক, সরল মন। সে মনের কথা সবই খুলিয়া আমাদের নিকট বলিয়া ফেলিল। পাঁচ ছয় বৎসর পরে শ্বশুরালয়ে তাহার প্রিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল এবং একটি দিন বাস করিয়া কেবল প্রিয়তমার বিদায়-বেলার দুটি চুম্বন ঠোঁটের কোণে মাখিয়া লইয়া মনের আনন্দে আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহার কাহিনী

শুনিয়া ঘুম ছুটিয়া গেল। প্রফুল্ল আবেশবিহ্বল হইয়া গান ধরিয়া দিল—'পরদেশী বঁধুয়া এলে কি এত দিনে?'

পথিক কখন উঠিয়া গিয়াছে খেয়াল নাই। হঠাৎ বীরেনের 'প্রেসার' 'প্রেসার' শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। সে এম্-এস্-সি পড়ে, তাহার প্রেসারের অর্থ সেই বুঝিল। আমরা শুধু গাড়ীগুলি তুলিয়া আবার ছুটিলাম। ছুটিতে ছুটিতে ১৬ নম্বর মাইল-পোষ্টে একটি গ্রাম দেখিয়া থামিলাম। ক্ষুধায় তখন ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। একটি দোকান হইতে কিছু মুড়ি দই ও পেঁড়া লইয়া সকলে ফলারে বসিয়া গেলাম। বীরেন এক পেয়ালা দুধের সহিত খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল। রাস্তার ঝাঁকুনিতে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছে, আর

পূর্ণিয়া : কোর্ট।

গাড়ী চালাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। গ্রামটির নাম ঘেরাবাড়ী। গ্রামটি বেশ একটু নিরিবিলি, খান ৩০।৪০ চালাঘর রাস্তার এপার ওপার বেড়িয়া আছে। দুই তিনটা কুয়া এদিক্ ওদিক্ ছড়াইয়া আছে। একটি কুয়ার ধারেই বেশী ভিড়, বুঝিলাম ঐটির জলই পানীয়। গ্রাম-বধূরা কেহ কেহ আড় চোখে আমাদের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া লইল। জীবনের পক্ষে এইসব খুঁটিনাটিই পাথেয়। ইচ্ছা হইতেছিল, চলি ইহাদের সঙ্গে, ইহাদের সামান্য গৃহস্থালীর নিকানো-পুছানো দাওয়ায় বসিয়া দুঃখসুখের কথা শুনিব, তারপর ঘুমাইয়া পড়িব। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রহিল। এ গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই স্বাস্থ্য বেশ নিটোল ও সরল। এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে।

ঘেরাবাড়ী ছাড়িয়া ৯ মাইল একটানা খুব জোরে চলিয়া আসিয়াছি। মাত্র ৪০ মিনিট লাগিল। রাস্তা একটু ভাল পাইয়াছিলাম। পূর্ণিয়া পৌছিতে আর ৩ মাইল রাস্তা। বীরেন বলিল, 'বড় ঘুম পাচ্ছে।' বলিয়াই সে কালবিলম্ব না করিয়া গাড়ী থামাইয়া রাস্তার ধারে একটু ঘাসের বিছানা পাইয়া শুইয়া পড়িল। বাতাস বেশ ঝিরঝির করিয়া বহিতেছিল, সত্যই ঘুম আসিবার কথা। তাহার উপর আগের দিন ভাল ঘুম হয় নাই, স্নান নাই, ইত্যাদি নানা প্রকার অত্যাচার। কাপ্তেন সাহেব চটিয়া উঠিলেন, আবার মিছামিছি কেন দেরী করা, একেবারে পূর্ণিয়া গিয়া সকাল সকাল পৌছিয়া আমাদের আশ্রয়দাতার গৃহে চা-পানাদি করা যাইবে। কাহারও সমর্থন না পাইয়া কাপ্তেন মনে মনে বেশ চটিয়া উঠিলেন বুঝিয়া অগত্যা বীরেনকে উঠিতে হইল। এবং তারপর আবার পথ···পথিকের বন্ধু, কোথাও বন্ধুর, কোথাও সমতল, সীমাহীন······

পূর্ণিয়া প্রবেশ করিয়া একটি লোকের নিকট চারপাঁচটি দাঁতন ভিক্ষা পাওয়া গেল। দন্ত ধাবন (মঞ্জন নয়) করিতে করিতে ঢিমে তেতালায় পূর্ণিয়ার কোর্টের পথ বাঁয়ে রাখিয়া চলিয়াছি—কয়েকটি বাঙালি ছেলে দেখিয়া ডানদিকে এক ওয়াইন-মার্চ্চেন্টের দোকানের সম্মুখে দাঁড়ান গেল। এই রাস্তাই বরাবর ভাটাবাজার নামক পল্লীতে প্রবেশ করিয়াছে। এইটিই এখানকার বাঙালি প্রবাসীদের আস্তানা। তখন জানিতাম না, পরে শুনিয়াছি সুসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইখানে থাকেন। কাপ্তেন ও সুরেন ছুটিল কোর্টের দিকে, আশ্রয়ের সন্ধানে—কিছুক্ষণ পরে ফিরিল কোর্টের দুইটি ছবি তুলিয়া, আশ্রয় মিলে নাই। আমরা পড়িলাম অগাধ জলে। ইতিমধ্যে ওয়াইন-মার্চ্চেন্টের বাড়ীতে দুই গ্লাস জল পান করিয়া সুস্থ হইয়াছিলাম। খাতা-বহি খুঁজিয়া আশ্রয়দাতার অনুসন্ধান করা গেল। কিন্তু কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে পোষ্টাফিসে ছুটিলাম, যদি সেখানে কোন খোঁজ পাওয়া যায়।

পোষ্টাফিসের কর্ত্তারা দু'একজনের খোঁজ বলিলেন। কিছু

খাম পোষ্টকার্ড কিনিয়া লইয়া প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রাদি লিখিয়া ডাকে দিয়া আবার ভাট্টাবাজারের দিকে ছুটিলাম। সন্ধ্যা হয় হয়, এদিক ওদিকে নানা মুনির নানা মতে ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থানে কতিপয় ভদ্রলোকের সান্ধ্য আড্ডায় বিঘ্ন ঘটাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। কেহই তেমন ভরসা দিতে পারিলেন না। পাড়ায় হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। দুইচার জনে একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু কপাল মন্দ, কোন ফলই পাওয়া গেল না। মনে মনে ভাবিলাম, এতগুলি ভদ্রলোক রহিয়াছেন এবং সকলেই বাঙ্গালী, কেহ কি রাত্রের মত আশ্রয় দিতে পারেন না। ছেলেবেলায় কোন্ বইয়ে পড়িয়াছিলাম, কপর্দ্দক মাত্র সম্বল না করিয়া ভারতবর্ষের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত ঘুরিয়া বেড়ানো যায়—সে কথাও মনে পড়িল। ক্রমেই বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক বলিলেন, আপনারা আগে হাতমুখ ধুইয়া চা খান ও বিশ্রাম করুন, তাহার পর যাহা হয় হইবে। দেবদূত যেন কানে কানে বলিল, ভয় কিসের! আমরা তো ইহাই চাহিতেছিলাম। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পাঁচজন তৃপ্তিসহকারে চা পান করিলাম ও ভদ্রলোককে মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম।

ভদ্রলোকের নাম যামিনী বাবু। তাঁহার বাড়ীর সামনে ছোট সান-বাঁধান চাতালের উপর বসিয়া আছি, অনেক ছেলেমেয়ের দল আসিয়া জুটিল, অনেকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিল। প্রশ্ন-কর্ত্তাদের সাধ্যমত উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। এমন সময় বীরেন আমার গা টিপিতে লাগিল এবং কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কি বলিল। পাশেই সুরেন বসিয়াছিল। এবং তাহার পরই অমূল্য বাবুর আবির্ভাব। তিনিও এককালে সাইকেলযোগে দার্জ্জিলিং ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন শুনিলাম, তাঁহার নিকট তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কতক কতক শুনিলাম। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। একটি বাড়ীতে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় পাওয়া গেল। বাড়ীটা খালিই ছিল। আমরা বাঁচিয়া গেলাম। জলযোগ সারিয়া ভাট্টাবাজার একবার ঘুরিতে গেলাম। বাজারে ডিস্পেন্সারীতে উঠিয়া ডাক্তার বাবু ও ডিস্পেন্সারীর স্বত্বাধিকারীর সহিত আলাপ হইল। প্রয়োজনীয় গোটা-দুই ঔষধ তাঁহারা আমাদের বিনামূল্যে দিয়া ফেলিলেন। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম।

ভাট্টাবাজারে দুইটি ক্লাব আছে বাঙ্গালীদের। একটিতে খবরের কাগজের সন্ধানে গেলাম কিন্তু ফিরিয়া আসিতে হইল। অপরটিতে আসিয়া গান-বাজনার আমেজ পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোক ক্লেরিওনেট ধরিয়াছিলেন, অপর এক ব্যক্তি হারমোনিয়ামে সুর সাধনা করিতেছিলেন। আমরা পৌছিতেই তাঁহারা জিজ্ঞাসু নেত্রে অভ্যর্থনা করিলেন। আলাপ পরিচয় হওয়ার পর দুই চার খানি গান শোনা গেল। ভদ্রলোকের গলা বেশ মিষ্ট। আমাদের প্রফুল্লও দুইচারখানি গান শুনাইলেন। ক্রমে একটি দুইটি লোক আসিয়া আসর জমাইয়া তুলিতে লাগিলেন। অমূল্য বাবু, পূর্ণ বাবুও (পূর্ব্বেই ইঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল) আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের অ্যামেচার থিয়েটারের ৺কালীপূজা উপলক্ষে কিষণগঞ্জ হইতে একটি নিমন্ত্রণ থাকায় পূরাদমে 'রঘুবীর' পালার রিহার্সাল চলিতে লাগিল। খানিকটা অমৃতবাজার পত্রিকা নাড়াচাড়া করিয়া, খানিকটা রিহার্সাল শুনিয়া সময় কাটিতেছে—রঘুবীর চীৎকার করিতেছেন—'পিতা, মরে গেছে

পূর্ণিয়ার অনেক ব্যক্তির সহিত আমরা।

রঘুবীর, রঘুয়া কণ্টকতরু উঠেছে সেথায়—' এমন সময় এক কনেষ্টবল সাদাসিধা পোষাকে আসিয়া 'সাইকেল বাবু লোক, আপ্ লোগকা পাত্তা আওর নাম দিজিয়ে' বলিয়া উপস্থিত। এ আবার কি জ্বালা, রাত্রিতে কোথা হইতে কোথা খুঁজিয়া এখানে হাজির! আমাদের সহিত কলিকাতা পুলিসের হুকুমনামা থাকা সত্ত্বেও এ সব কি বিড়ম্বনা! যাহা হউক সে তাহার কাজ সারিয়া সরিয়া পড়িল। আমরাও কিছুক্ষণ পরে গাত্রোত্থান করিলাম। ফিরিয়া যামিনী বাবুকে লইয়া ২।৩ হাত ব্রিজ খেলিয়া আহার সাঙ্গ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।
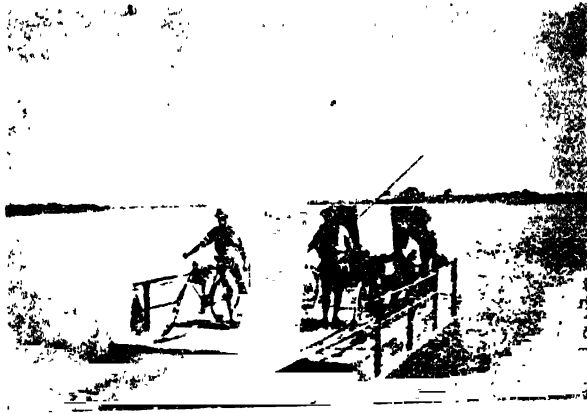
দিঙ্গাঘাট।

২৮শে।—

সুখনিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভোরে উঠিয়া আবার যাত্রার তোড়জোর। পথ যেন আর ফুরায় না। পূর্ণিয়াবাসীর জনকয়েকের সহিত দুইটি ছবি তুলিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। ভাট্টাবাজার পার হইয়া যেমন দার্জ্জিলিঙ রোডে পড়িব অমনি আওয়াজ হইল...ফটাস্! ফিরিয়া দেখি বীরেনের গাড়ির টায়ার ফাটিয়াছে। একটি প'ড়ো-বাড়ীর কম্পাউণ্ডে লিক্ সারিয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে আবার...দূর ছাই! বিরক্ত করিয়া মারিল। গাড়ী সারিয়া উঠিতে বেলা ৮॥টা বাজিয়া গেল।

রাস্তার দুইধারে সারি সারি গাছ বেশ ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া একপ্রকার সূর্য্যের আলো প্রবেশের পথ বন্ধ রাখিয়াছে। বরাবর ছায়ার তলে তলে যাওয়া সত্ত্বেও হাতে ও গায়ে জ্বালা ধরিয়াছিল আর কি বিষম ঝাঁকুনি, যেন হাত পা বাঁধিয়া কোন রকিং-মেশিনে কে ফেলিয়া দিয়াছে। এখানে রাস্তা motorable হয়ত, কিন্তু একেবারেই cyclable নয়। A.A B-র দৃষ্টি বোধ হয় এদিকে পড়ে নাই। কোথায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আর কোথায় গ্যাঞ্জেস্ দার্জ্জিলিঙ রোড! হায় শের সা!

বাঙ্গালা দেশেরই মত আবহাওয়া এখানে। মাটী স্যাঁতাসেঁতে, চারিদিকেই ডোবাখানা, তাহার সহিত মানুষগুলোও 'মিওনো', যেন কোন প্রাণই নেই। এরা আর ডালরুটি-খাওয়া বেহারী নহে, যত ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট সরু সরু হাত-পাওয়ালা স্ত্রীপুরুষ, এক একটি রঙিন লুঙ্গি পরণে। কথাবার্ত্তা আধাখিচুড়ী, বাঙ্গালা হিন্দি উর্দ্দু সব মিশান। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওরে, তোর ঘরে ভাল খাবার-জল আছে? 'নি হোবে বাবু' অর্থাৎ নেই। কথ্য বাঙ্গালার সহিত বিশেষ পার্থক্য নাই। পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহা দেখিয়াছি যে এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশ যেখানে মিশিয়াছে, সেই প্রত্যন্ত-প্রদেশের দুইটিরই কথ্য ভাষা প্রায় এক—বাংলা ও বিহার, বিহার ও উড়িষ্যা, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ—সব এমনই এক ভাষার সূত্রে গাঁথা। ভারতবর্ষ হইতে বেলুচিস্থান, বেলুচিস্থান হইতে কাবুল, তারপর পারশ্য, আরব—বরাবর চলিয়া গেলেও এমনই হয়ত লাগিবে।

কিন্তু কি যেন বলিতেছিলাম?—হ্যাঁ চলিতে চলিতে এই রকম রঙিন লুঙ্গিপরা স্ত্রীপুরুষের আর এক প্রদেশের কথা মনে পড়িল, গতবার কাশ্মীর-ভ্রমণের সময় সুদূর পাঞ্জাবের সীমানায় এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাহাদের বলিষ্ঠ লাল-টুকটুকে দেহের সহিত কর্ম্ম জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ, আর এখানে যেন নিষ্কর্ম্মার জীবন। পাটই দেখিলাম ইহাদের প্রধান ব্যবসায়, চারিদিকেই পাট-পচা জল। দেশের বাতাস দুর্গন্ধে হাঁপাইয়া উঠিতেছে। রাস্তার দুইধারে ছোট ছোট খাল-বিলে পুরুষেরা ছপ্ ছপ্ শব্দে পাটকাচার কাজে ব্যস্ত।

একটা ছোট গ্রাম ছাড়াইয়া একটুখানি গিয়া হঠাৎ চোখে পড়িল, বড় বড় অক্ষরে লেখা সাইন-বোর্ড 'caution'—

ব্রেক চাপিয়া ধরিলাম। একটি লোককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, এদিকে আর রাস্তা নাই। এবারে সত্য সত্যই দার্জ্জিলিং রোড ফুরাইয়া গেল নাকি? অনেক দিনের পুরাণো কথা মনে পড়িল, আমাদের গিরিডি-ভ্রমণকালে পাণাগড় ষ্টেশনের নিকট রাত্রে কে-যেন বলিয়া উঠিয়াছিল 'ওরে দাঁড়া, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড় ফুরাইয়া গিয়াছে, চারিদিকেই ধান-ক্ষেত।' এখানেও তাই। ডানদিকে নাবিয়া পড়িয়া ধান-ক্ষেতেই প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পরই একটি বিলের ধারে আসিতে হইল, কয়েকটি স্ত্রীলোক কাপড় কাচিতেছিল, তাহাদিগকে ডাহিনে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম। দুইদিকে ধানের ক্ষেত, মাঝে বালির রাস্তায় আমরা কয়েকজন ও একটি পথিক ছাতা মাথায়। ছোট একটি নদী, প্রায় শুখাইয়া গিয়াছে। পার হওয়া গেল। দূর হইতে দেখিলাম, ঐ নদীর উপর যে ব্রিজটি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনুমানে ঐ ছোট নদীর প্রতাপ বুঝিলাম।

রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছি, যখন দিঙ্গাঘাটে পৌছিলাম, তখন প্রায় দশটা।

(ক্রমশঃ)

ট্রেন

—শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

গাঁয়ের ষ্টেশন্—অতি ছোট আর নিরিবিলি একধারে,
গ্রাম হ'তে মোটে তিন মাইলের ফাঁক;
কেউ কোথা নাই—চুপ্‌চাপ্ সব, রাতের অন্ধকারে
মিটি মিটি জ্বলে আকাশে তারার ঝাঁক!
সাম্‌নে শূন্য ধান-ক্ষেত, তার খাঁ-খাঁ করে খালি বুক—
চোখ মেলে চাও মেলে না তাহার দিশে;
পিছনেতে ছোট বিলে সারি সারি সাপলার হাসিমুখ,
দু' পাশে গহন বনে গেছে সব মিশে।
উধাও চলেছে রেলের লাইন্—কে জানে কোথায় শেষ,
বনের মাথায় আকাশ এসেছে নেমে;
বুড়ো পাকুড়ের ডালে ও পাতায় আঁধার জমেছে বেশ,
ঝিঁঝিঁদের গান শোনা যায় থেমে থেমে।
দূরে সিগ্‌ন্যাল পাথার মাথায় জ্বলে নীল-লাল আলো,
ডাইনীর চোখ জ্বলে আকাশের গায়!
মাঝ নিশীথের ছায়ার তলায়—ছায়া সে ধূসর কালো
কা'রা যেন সব দাঁড়ায়ে র'য়েছে ঠায়!
শোনা যায় বুঝি ট্রেনের আওয়াজ—রাত্রির বুক চিরে
বর্শার মত ছুটে আসে তার বাঁশি;
রাতের প্রেতিনী নাচে পৃথিবীর মৃতদেহ ঘিরে ঘিরে
হা-হা ক'রে কাঁপে হাওয়ার অট্টহাসি!
লোহার লাইনে, পাথরে পাথরে লাগে জীবনের দোলা,
মরা শিমুলের ডালে ডালে কোলাহল!
রাত্রির ট্রেন ছোটে গন্‌গনে লাল আগুনের গোলা,
তারা খ'সে পড়ে, নাচে অদেহীর দল!

ট্রেন ছোটে আর পিছে পিছে তার ছোটে আঁধারের কোলে
রাত-প্রেতিনীর কান্নার মত হাসি;
শব্দের ঘায়ে চৌচির মাটি—সাপের ফণায় দোলে,
লক্ষ আলেয়া নেভে জ্বলে পাশাপাশি!
বিলের মাঝেতে পাক-মাখা জল চল্‌কিয়ে পড়ে যেয়ে,
ঢ'লে ঢ'লে চলে আধ-ঘুমন্ত ঢেউ;
পাশে বাজ-পোড়া নুড়ো তালগাছ থম্‌কিয়ে আছে চেয়ে,
ভয় লাগে যেন উপ্‌ড়িয়ে নেবে কেউ!
কোন্ নিশাচর পাখীর পাখ্‌না আট্‌কেছে কাঁটা গাছে,
কাঁদে একটানা বিকট তীক্ষ্ণ সুরে!
মিশ্‌মিশে কালো কয়লার ধোঁয়া ঘূর্ণী-হাওয়ায় নাচে—
আকাশের শ্বাস আট্‌কায় ঘুরে ঘুরে।
আদিম দিনের ড্রাগন্ ছুটেছে আগুনের জিভ মেলে,
দুধারি' গাছের সারি হ'ল পুড়ে ছাই;
ছুটেছে সে পিছে হাজার যুগের শ্মশান-সীমানা ফেলে—
সে-চলার তার আজিও বিরাম নাই!
লোহার বাহুতে বেঁধেছে সে কোন্ মাঠ-চারী বুনো মেয়ে,
বন্দিনী বুঝি কেঁদে কেঁদে বেয়াকুল!
কয়লার আঁচে জ্বলে কয়লার ধোঁয়া ওঠে চোঙ বেয়ে—
ধোঁয়া নয়—তা'রি উড়ন্ত এলোচুল!
রাত্রির ট্রেন থামে না কোথাও—দূরে দূরে ছুটে চলে,
পিছে পিছে তার ছোটে ছায়া চঞ্চল;
গাঁয়ের ষ্টেশন্—ছোট্ট ষ্টেশন্ ঘুমায় আকাশতলে,
রাত বাড়ে আর থেমে যায় কোলাহল!

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কীর্ত্তিকাহিনী

সকলের-সমান-না-হবার শাস্তি

বৈজ্ঞানিকদের নির্য্যাতনের অনেক গল্প বোধ হয় তোমরা জান। পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে—এর উল্টো কথা শুনলে আজ লোকে উপহাস করবে কিন্তু য়ুরোপে অনেক বৈজ্ঞানিক এই সত্য কথাটি প্রচার করবার জন্যে নানা রকমে নির্যাতিত হয়েছিলেন। গ্যালিলিও, কোপারনিকাস্, ব্রুনো, এঁদের নাম আজ বড় বড় অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে এবং এঁদের জীবনের দুঃখময় কাহিনী আমাদের সকলের পরিচিত।

কিন্তু আজ দুজনের কাহিনী বলব, তাঁদের নাম ইতিহাসের বড় বড় নামের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে মানুষের হাতে নির্য্যাতন তাঁরা কম ভোগ করেন নি। অবশ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ কিছু দান করে যেতে পারেন নি কিন্তু তাঁদের জীবন থেকেই বেশ বোঝা যায় এক সময় য়ুরোপ বিজ্ঞানকে কি চোখে দেখত!

ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীতে একটি লোক বাস করত। তার নাম-ধাম কিছুই জানা নেই। শুধু তার জীবন সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহুদিনের চেষ্টার ফলে এক রকম নতুন ধাতু দিয়ে সে এমন একটা পাত্র তৈরী ক'রল যে সেটা উঁচু থেকে সজোরে ফেলে দিলেও ভাঙত না। তার এই নতুন ধাতুটির আর একটা বিশেষ গুণ ছিল যে সেটা যেমন লোহার মত শক্ত তেমন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। বহুদিনের নিভৃত সাধনায় এইভাবে সিদ্ধিলাভ করে মনে তার খুব আনন্দ হল। সেই ধাতু দিয়ে একটা বড় পাত্র তৈরী করে সে সেই প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার কাছে নিয়ে উপস্থিত হল, উপহার দেবার জন্য।

পাত্রটির গড়ন দেখে রাজা খুব আনন্দিত হলেন কিন্তু যখন শুনলেন যে, মাটীতে ফেলে দিলেও ভাঙ্গবে না তখন বিস্মিত হয়ে উঠলেন।

আনন্দে কারিকর পরীক্ষা করে দেখালেন। সমস্ত সভা বিস্মিত। সেই স্বচ্ছ পাত্রটি খুব উঁচু যায়গা থেকে জোরে ছুঁড়ে ফেলা হল, তবুও ভাঙ্গল না! বহুদিনের সাধনার সাফল্যে চোখে-মুখে বিজয়ের হাসি নিয়ে কারিকর রাজার মুখের দিকে চাইল।

রাজা গম্ভীর হয়ে হুকুম দিলেন, যতদিন এ লোকটা বেঁচে থাকবে, এ'কে মাটীর তলায় অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রাখ। এ নিশ্চয়ই যাদু জানে। কোন্ দিন কি তৈরী করে আমার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে—কে বলতে পারে?

আর একটা ঘটনা বলি। এটা ফ্রান্সের পুরাণো ইতিহাসে লেখা আছে। লোকটির নাম ছিল এ্যালেক্স্। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের প্রোভেন্স প্রদেশে বাস করত।

সে সময়ে ডাক্তারী শাস্ত্র যতখানি জানা ছিল, লোকটি তা সমস্তই আয়ত্ত করেছিল। কেমন করে তার মাথায় ঢোকে যে, কলের মানুষ তৈরী করা যায় কি না। আজকাল কলের মানুষের কথা তোমরা সবাই শুনেছ বোধ হয়—খবরের কাগজে প্রায়ই তাদের ছবি বেরোয়। কিন্তু এ্যালেক্স্ বলে এই লোকটি প্রথম কলের মানুষ তৈরী করবার চেষ্টা করে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আপনার বাড়ীতে বসে দিবারাত্র সেই কাজে সে ডুবে থাকত। মাথার চুল সাদা হয়ে এল—যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে এসে পড়ল। তবুও সে চেষ্টায় ছিল কেমন করে তার অন্তরের বাসনাকে সফল করে তোলা যায়।

অবশেষে একদিন তার সাধনা সফল হ'ল। কলের মানুষ তৈরী হল। সে ঠিক করল যে, সমস্ত শহরকে তার এই নতুন সৃষ্টি দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবে। তার বাড়ীর একটা বড় জানালা রাস্তার ধারে ছিল। সেইখানে সে জানলা ভেঙ্গে একটা বাজনা বসাল এবং ঠিক করল যে সেই কলের মানুষকে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে সকলকে বিস্মিত করে তুলবে।

একদিন হঠাৎ রাস্তায় লোক চলতে চলতে শুনতে পেলে এ্যালেক্সের বাড়ীর দিক থেকে বিচিত্র এক শব্দ আসছে। মাথা তুলে দেখে, একটা ভূত দিবা-দ্বিপ্রহরে এ্যালেক্সের জানলায় বসে বাজনা বাজাচ্ছে। দেখতে দেখতে সারা

শহরময় হৈ-চৈ পড়ে গেল। এতদিনে লোকে একটা কারণ খুঁজে পেলে, কেন এ্যালেক্স্ রাতদিন বাড়ীর ভেতর বসে থাকে! গোপনে সে যাদুবিদ্যার সাহায্যে ভূত-প্রেতের সঙ্গে আলাপ করছিল—মানুষের সঙ্গে মিশবে কেন?

ভূত-প্রেত নিয়ে যারা সেই সময় কারবার করত, রাজার বিচারে তাদের কঠোর শাস্তি হত। প্যারিস শহরে এ্যালেক্সের বিচার হ'ল এবং বিচারে সিদ্ধান্ত হ'ল যে লোকটা যখন ভূত দিয়ে মানুষের মত কাজ করাতে পেরেছে, তখন ওর অসাধ্য কি আছে?

শাস্তিস্বরূপ এ্যালেক্স্কে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হ'ল।

এই বিচারকদের হাতে আজকালকার বায়স্কোপ-ওয়ালাদের কি শাস্তি হ'ত?

সিংহ

তোমরা লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দী সিংহ নিশ্চয়ই দেখেছ। কিন্তু যাঁরা বনে গিয়ে তার রাজত্বের মধ্যে নির্ভয়ে কেশর ফুলিয়ে সিংহকে রাজত্ব করতে দেখেছেন, তাঁরা বলেন যে সিংহের একটা অদ্ভুত রূপ আছে। এক কথায় সে রূপের বর্ণনা দেওয়া যায় না। ভয়ঙ্করের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শক্তির, শক্তির সঙ্গে বেগের, বেগের সঙ্গে তীব্রতার যোগাযোগ একমাত্র সিংহের মধ্যে দেখা যায়। এতগুলো জিনিষকে মানিয়ে নেবার জন্য সকলের উপরে রয়েছে তার অপরূপ ভঙ্গী। এই ভঙ্গী আছে তার কেশরে, তার ক্ষীণ কটিতে, তার দেহের গতিতে আর আছে তার কণ্ঠস্বরে! সে যে ভয়ঙ্কর, কণ্ঠস্বরের মধ্যে সে কথা গোপন করবার কোনও চেষ্টা নেই। যখন সে গর্জ্জন করে, তখন তার সামনে যদি কোন হতভাগ্য জীব এসে পড়ে তা হলে সেই গর্জ্জনেই সে বিকল হয়ে যায়।

তার দাঁতে এত জোর যে জ্যান্ত মোষের হাড় সে নিমেষে গুঁড়িয়ে ফেলে, একটা জেব্রার ঘাড় ছিঁড়ে ফেলে এক নিমেষে; তার থাবায় এত জোর যে দুরন্ত বন্য ঘোড়াকে এক থাবায় সে নির্জীব করে দিয়ে তার গায়ের চামড়া উপড়ে ফেলে; সে হাঁ করলে একটা পূরো মানুষের মাথা অনায়াসে তার মধ্যে চলে যায়; আর তার দেহের শক্তি এতদূর যে, একটা মোষকে মেরে কাঁধে করে ছোট ছোট নদী অনায়াসে সে লাফিয়ে চলে যায়; এবং তার সেই গতির ক্ষিপ্রতা এতদূর যে, সেই সময়ের মধ্যে মনে হয় যেন একটা জীবন্ত বজ্র চলে গেল। এমনি ভয়ঙ্কর সে!

গর্ডন কামিং বলে একজন বিখ্যাত শিকারী সিংহের গর্জ্জনের একটা বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সিংহ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয়, তার অপূর্ব্ব গর্জ্জন সম্বন্ধে। এই গর্জ্জনের নানা রকম আছে। কখনও খুব নীচু অথচ গভীর আর্ত্তনাদের মত শব্দ করে—এবং সে আর্ত্তনাদ পাঁচবার কিম্বা ছবার পর পর হয়। তার শেষে একটা গভীর শ্বাস ফেলে—একটু কাছে থাকলে মনে হয় যে বনের বুক থেকে বুঝি সেই শ্বাস আসছে। আবার কখনও সহসা গভীর উচ্চ গর্জ্জন করে ওঠে—পাঁচ-ছবার উপরি উপরি—এবং প্রত্যেক বারের গর্জ্জন থেকে তার পরের বারের গর্জ্জন গভীর থেকে গভীরতম হয়ে ওঠে। পাঁচবারের বার গর্জ্জনটা কমে আসতে থাকে—তখন মনে হয় যে দূরে কোথাও বজ্রপাত হল বুঝি। কখনও কখনও তারা দল বেঁধে আবার এক সঙ্গে গর্জ্জন করে। প্রথমে একজন আরম্ভ করে, তার পর পাঁচ ছজন মিলে সেই সুরকে তুলে নিয়ে গর্জ্জন করে উঠে, আবার তাদের গর্জ্জন মিলিয়ে যেতে না যেতে প্রথম দল ডেকে উঠে—এই ভাবে সমস্ত অরণ্যে এক ভয়াবহ শব্দের ঐক্যতান-বাদন চলতে থাকে। সাধারণত রাত্রিতেই সিংহ গর্জ্জন করে। বনে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে তখন তাদের আর্ত্তনাদ সুরু হয়। তারপর রাত্রি যত গভীর হয়, গর্জ্জন তত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে।

প্রকৃতির আশ্চর্য্য নিয়ম অনুসারে এই ভয়ঙ্কর জীব, জীব-হত্যাই যার কাজ, তার বংশ-বৃদ্ধি বেশী হয় না। সাধারণতঃ যে সমস্ত পশু ফল-মূল-তৃণ খেয়ে বাস করে, মাংসাশী প্রাণীরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী সন্তান প্রসব করে। কিন্তু তা হলে কি হবে! সেই সূতিকাগারেরই এক অলক্ষ্য নিয়মের নির্দ্দেশে তার অধিকাংশই মরে যায়। নতুবা স্বয়ং পিতা শাবকদের মেরে ফেলে! বেড়ালের বেলায় তোমরা বোধ হয় এই ব্যাপার লক্ষ্য করে থাকবে। সন্তান হলেই পিতা নিজের সন্তানকেই হত্যা করে। সেই জন্য মাতাকে সর্ব্বদাই সজাগ থাকতে হয়।

সিংহের রাজসিক শক্তিতে মানুষ এতদূর মুগ্ধ যে, মানুষের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে পুরুষ-সিংহ বলে সম্মান দেখান হয়। কিন্তু এই উপমাটি বাইরের শক্তির প্রতি মানুষের মোহেরই একটা পরিচয়। যে-প্রাণী তার সমস্ত

পশুরাজ।

শক্তিকে শুধু জীবক্ষয় আর হত্যায় ব্যয়িত করে, এবং তার ফলে প্রকৃতির নিয়মে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে—তার নামের সঙ্গে সেই মানুষের নাম জুড়ে দেওয়া খুবই অসঙ্গত - যার ক্ষয় নেই, যে বেঁচে আছে নিয়ত নব নব সৃষ্টি দ্বারা। তবুও এটা আজ প্রথা হয়ে গিয়েছে।

মানুষ প্রথমে সিংহের মধ্যে অনেক রাজ-গুণ লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী শিকারীরা দেখেছেন যে সে-গুলির অনেকই ভুল সিদ্ধান্ত। একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, সিংহ মরা-জন্তুর মাংস খায় না। কিন্তু অনেক বড় বড় শিকারী দেখেছেন যে পশুরাজ সেখানে অরণ্যের সাধারণ হিংস্র পশুদের মতই লোভী।

আফ্রিকায় ইংরেজরা যখন রাজ্যস্থাপন কার্য্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন প্রতিপদে পশুরাজের সঙ্গে লড়াই করে তাঁদের এগুতে হয়েছে এবং কত লোককে যে সেই সময় সিংহের উদরে যেতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সময়কার আফ্রিকার জঙ্গলের ইতিহাসে দুটি সিংহের অত্যাচারের কথা অক্ষয় হয়ে আছে। যখন উগাণ্ডা রেলওয়ে কোম্পানী জঙ্গল কেটে রেল লাইন বসাচ্ছিল তখন এই দুটি সিংহের উৎপাতে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কুলীদের খাবারের জন্য ছাগলভেড়া মজুত করে রাখা হ'ত। প্রথমে সেই ছাগলভেড়াদের উপর সিংহ দুটির দৃষ্টি প'ড়ল। রোজ রাত্রে এসে চারটে পাচটা করে মেরে নিয়ে যেত। তারপর তাদের দৃষ্টি মানুষের উপর প'ড়ল। ক' মাস ধরে ক্রমাগত তারা দুটিতে নিঃশব্দে প্রতিরাত্রে তাঁবুর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দুটি করে লোক নিয়ে গিয়েছে। তাদের গুলি করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে রাতের পর রাত তারা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে যারা কাজ ক'রত তাদের মানসিক অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখ! প্রতিরাত্রে কোন না কোন তাঁবুতে সেই নৈশ নীরবতার মধ্যে সহসা মানুষের শেষ ক্ষীণ আর্ত্তধ্বনি জেগে উঠত—আবার নিঃশব্দে সেই আফ্রিকার আরণ্য নির্জ্জনতার মধ্যে মিশে যে'ত। অবশেষে অবস্থা এ রকম হয়ে দাঁড়াল যে একমাস সমস্ত কাজ বন্ধ করে, শুধু সেই সিংহ দুটিকে হত্যা করবার জন্যে সকল শক্তি নিযুক্ত করা হ'ল। অবশেষে কর্ণেল প্যাটারসন তাদের বধ করেন।

হিংস্র পশুরা যখন আক্রমণ করে—ধর, কারুর হাতটা কামড়ে ধরল—কি ছিঁড়ে নিয়ে গেল—তখন নাকি কোনও বেদনা বোধ হয় না। একবার দুজন বিখ্যাত শিকারী, স্যার এডোয়ার্ড ব্র্যাডফোর্ড আর রুস্তম পাশা নিমন্ত্রিত হয়ে এক টেবিলে খেতে বসেছেন। স্যার ব্র্যাডফোর্ডের একখানা হাত নেই—রুস্তম পাশারও একখানা হাত নেই। একজনের হাত বাঘে, আর একজনের হাত ভালুকে খেয়ে ফেলেছে। তাঁরা দুজনেই সে সময়ে বলেছিলেন যে তাঁদের সে-সময় কোনও বেদনা বোধ হয় নি।

ডাঃ লিভিংষ্টোনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। এত বড় পর্য্যটক ইদানীং আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নি। আফ্রিকাকে তিনিই সভ্যজগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। তাঁর জীবনে একটা বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। একবার

তিনি একেবারে একটা সিংহের মুখে চলে গিয়েছিলেন—খুব বরাৎ জোরে একটা কাফ্রী বর্শা দিয়ে সিংহটাকে বিঁধে ফেলাতে সিংহটা লিভিংষ্টোনকে ছেড়ে কাফ্রীটাকে আক্রমণ ক'রল। পরে লিভিংষ্টোন সিংহের মুখে থাকার সময়ের অভিজ্ঞতার একটা বিবরণ দিয়েছেন্। তিনি লিখেছেন যে, সিংহটা যখন প্রথম আক্রমণ করল, তখন এমন একটা শক্, shock লাগল যে, তাঁর সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেল। বেড়ালে যখন ইঁদুরকে ধরে প্রথম ঝাঁকানি দেয়, তখন বোধ হয় ইঁদুরের এই রকম সব অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। তারপর কেমন একটা অচৈতন্য ভাব এল—সেই অচৈতন্য ভাবের মধ্যে কি ঘটছে সবই বুঝতে পারছি অথচ কোনও বেদনা বা ভয়ের চিহ্ন তখন নেই। সমস্ত ভয় যেন তখন কোথায় মিলিয়ে গেল।"

এ বড় দুমূর্ল্য অভিজ্ঞতা—কি বল?

আফ্রিকার আলজেরিয়া প্রদেশে সিংহ খুব বেশী আছে। সেখানে তিন রকমের সিংহ দেখা যায়—একেবারে কালো রঙের, মেটে রঙের আর ধূসর রঙের। এর মধ্যে কালো রঙের সিংহ কম দেখা যায় এবং তারা দেখতে অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু বলিষ্ঠ সকলের চেয়ে। সাধারণতঃ এরা শিকারের জন্যে ঘুরে বেড়ায় না। কোনও বনের মধ্যে একটা পাহাড়ের গুহায় একটা বাসা ঠিক করে সেইখানেই ত্রিশ কি চল্লিশ বছর পর্য্যন্ত বসবাস করে। এরা লোকালয়মুখী বড় একটা হয় না। সন্ধ্যা বেলায় বনের ধারেই ওৎ পেতে বসে থাকে, সামনের মাঠ থেকে, কিংবা পাহাড়ের গা থেকে সন্ধ্যা বেলায় গরু বাছুর যখন নামে তখন একেবারে গোটা পাচেক বধ করে আহার এবং তৃষ্ণা দুই নিবারণ করে। গরু বাছুরের রক্তেই এরা সাধারণত তৃষ্ণা নিবারণ করে। গ্রীষ্মকালে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার পড়তে বিলম্ব হয়, বনের পথের ধারে প্রায়ই এরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি কোনও হতভাগ্য পথিক দেরী করে সেই পথ দিয়ে ঘরে ফেরে! যাদের বরাতে সেই বনের পথে সন্ধ্যা হয়ে যায়—তাদের জীবনে আর সে দিনের মত রাত্রি আসে না। আর অন্য যে দু'রকম সিংহের কথা বল্লাম, তাদের দিন হ'ল আমাদের রাত্রি। সন্ধ্যার অন্ধকার যেই পড়ে এল অমনি তারা বেরুলো। তারা অধিকাংশ সময় আবার একা বেরোয় না। সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে চলে। স্বামী-স্ত্রীতে তখন আহারের অন্বেষণে সমস্ত অরণ্যকে কাঁপিয়ে তোলে। এবং যতক্ষণ না আহার পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তাদের গর্জ্জনের বিরাম নেই। আলজেরিয়ায় যে সমস্ত আরব থাকে—তারা রাত্রি-বেলার এই সিংহনাদকে তাদের ভাষায় বজ্রের ডাক বলে। যদি কোনও দিন কোনও কারণে দিনের বেলায় এদের চলাফেরা করতে হয়—অনেক সময় বাসা বদল করবার জন্য করতে হয়—তা হলে সে-সময় যে-প্রাণী তাদের সামনে পড়বে তার আর রক্ষে নাই। আলজিরিয়ায় এক সময় সিংহের ভয়ানক উৎপাত ছিল। মরুভূ-বাসী আরবরা এই সিংহের অত্যাচারে নিশিদিন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। অবশেষে জুলি জেরার্ড নামে বিখ্যাত ফরাসী সিংহ-শিকারী তাদের এই সিংহের আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেন। সিংহ-শিকারী হিসেবে জুলি জেরার্ডের নাম জগদ্বিখ্যাত। তাঁর মত সাহসী খুব কম লোকই ছিল। যেখানে আরবরা বন্দুক নিয়ে দলবল বেঁধে সিংহ-শিকারে যেত সেখানে জুলি জেরার্ড একা যেতেন। সিংহের পায়ের দাগ লক্ষ্য করে, তার বিবরের কাছে গিয়ে জেরার্ড সিংহ বধ করে এসেছেন।

সিংহের শেষ-জীবন বড় শোচনীয়। সমস্ত জীবন যে শুধু হত্যা করেই এসেছে—প্রকৃতি তার উপর প্রতিশোধ নিতে কার্পণ্য করে না। একজন বিখ্যাত জার্ম্মান পশু-তত্ত্ববিদ্ সিংহের শেষ-জীবন সম্বন্ধে যে সুন্দর চিত্র এঁকেছেন, এখানে তোমাদের তাই শোনাচ্ছি—

"সিংহকে পশু-রাজ বলা হয়, কিন্তু যে-মানুষ সিংহকে এই নাম দিয়েছিল, সে মস্ত বড় একটা ভুল করেছিল। যে রাজা, তার উচিত তার রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্যে শক্তি ব্যয় করা কিন্তু সিংহ শুধু অরণ্যবাসীদের হত্যা করেই তার শক্তি ব্যয় করে।

সেইজন্যে অরণ্যের আর সব প্রাণী তাকে এড়িয়ে চলে। যখনি তার গর্জ্জন শোনে—অমনি তারা তাদের গর্ত্তে কেঁপে ওঠে। * * * তারপর আসে ধীরে ধীরে প্রকৃতির প্রতিশোধ। সিংহ যখন বৃদ্ধ হয়—তার দাঁত যায় পড়ে—তাতে তখন থাকে না আর সেই জোর। থাবা হয়ে পড়ে শিথিল। সামনে দিয়ে বন্য ঘোড়া পূরো কদমে চলে যায়—সাহস হয় না আর তাকে আক্রমণ করতে। ঘোড়ার খুরকে তখন সিংহ ভয় করে, সিংহ তখন ভয় করে মোষের সিংকে! তখন তার নজর পড়ে—অরণ্যের ক্ষুদ্র নিরীহ প্রাণীদের উপর—যাদের আত্ম-

রক্ষার কোনও অস্ত্র নেই। এই সময় মানুষের উপরও তার বড় লোভ হয়। মানুষের খুরও নেই, শিংও নেই। তার-পর যখন আরও বৃদ্ধ হয় তখন ছাগল-ভেড়া ছেড়ে পশু-রাজ সিংহকে খরগোস অন্বেষণে বেরুতে হয়। এবং তারও সামর্থ্য যখন থাকে না, তখন প্রকৃতির কঠোর বিধানে সিংহকেও ঘাস খেতে হয়। তারপর একদিন পদ-চিহ্ন অনুসরণ করে, মানুষ স্বচ্ছন্দে গিয়ে তার বিবরে তাকে হত্যা করে আসে।

জীবনে সে কারুর উপকার করে নি। মৃত্যুর পরও তাকে দিয়ে কারুর কোনও উপকার হয় না। অসভ্য বন্য মানুষরা সকলের মাংস খায়—কিন্তু সিংহের মাংস তারাও খায় না। তার চামড়াও কোনও কাজে লাগে না। অসংখ্য তাতে ক্ষত-চিহ্ন। তার যৌবনের অত্যাচারের সব স্মৃতি-চিহ্ন। শুধু শিকারী মানুষ অরণ্যের ভীষণতম পশুকে হত্যা করতে পেরেছে—সেই গৌরবচিহ্ন স্বরূপ সেটাকে ঘরে টাঙিয়ে রাখে।"

হঠাৎ

১

জগতে হঠাৎ অনেক বড় জিনিষ ঘটে গিয়েছে। অনেক অসম্ভবের সন্ধান, আজীবন খুঁজেও মানুষ যা বের করতে পারে নি—হঠাৎ একদিন না খুঁজতেই তার খবর পাওয়া গিয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ সাধনা করছে, ধর, কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুঁজে বার করবার জন্যে, কিছুতেই ঠিক পথের দিশা পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ একদিন,—

এমন একটা ঘটনা ঘটল যার সঙ্গে হয়ত আসল ব্যাপারের কোনও যোগ নেই কিন্তু তারই মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এতদিন, এত যুগ-যুগান্তর ধরে যে তত্ত্বের সন্ধান আমরা পাচ্ছিলাম না, তারই খবর। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দোর-জানালা বন্ধ, বাইরেও নেই সূর্য্য, হঠাৎ ঘরের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে কে জ্বালিয়ে দিলে আলো। সেই আলোটুকুতেই হারাণো জিনিসের সন্ধান মিলে গেল!

অন্ধকার ঘরে এমনিতর হঠাৎ আলো কে জ্বালায় তার খবর আমরা জানি না কিন্তু মানুষের ইতিহাসে বারবার দেখেছি, এমনি হঠাৎ আলো জ্বলে উঠেছে এবং যেদিক দিয়ে পথ খুঁজে পাবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না—হঠাৎ সেই দিক দিয়েই পথ দিল দেখা—

এখানে সেই রকম কয়েকটা বড় বড় ঘটনা তোমাদের বলব। অবশ্য এ থেকে তোমরা মনে ক'র না যে, আমি বলছি, সেই সব বড় বড় জিনিষ দৈবের সাহায্যে ঘটেছে; মোটেই তা নয়। মানুষের শ্রম, তার প্রতিভা ষোলো-আনাই দরকার হয়েছে—তবে যে-পথে গেলে সেই শ্রম সার্থক হয়ে উঠবে তার ইঙ্গিত হঠাৎ এমন সব জায়গা থেকে এসেছে যা ভাবাই যায় না। ডাক্তার বলে গেল অসুস্থ স্ত্রীকে ব্যাঙের ঝোল খাওয়াতে। সেই ব্যাপার থেকে কে জানত, যে, বৈদ্যুতিক-তত্ত্বের খবর পাওয়া যাবে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যাকে খুঁজে পায় নি—ব্যাঙের ঝোল তৈরী করতে গিয়ে হঠাৎ সেদিন এক অদ্ভুত উপায়ে তার খবর সে পেল।

ইতালীতে লুইগী গ্যালভিনি বলে শরীরতত্ত্বের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে তিনি খুব ভালবাসতেন।

গ্যালভিনি।

একবার তাঁর স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় এবং ডাক্তার এসে পরামর্শ দিয়ে যান যে, প্রত্যহ রোগীকে যেন ব্যাঙের ঝোল খাওয়ান হয়। বাজারে একদিন ব্যাঙ পাওয়া গেল না। নিরুপায় হয়ে তাঁর ল্যাবরেটরীতে যে সব ব্যাঙ কাটা হ'ত তাই তিনি স্ত্রীর জন্যে নিয়ে যেতেন।

একদিন গ্যালভিনি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর একজন

ছাত্র সেদিন ব্যাঙ নিয়ে আসবার জন্যে ল্যাবরেটরীতে গিয়ে যেই ছুরি দিয়ে ব্যাঙটাকে ছুঁয়েছে—অমনি হঠাৎ -

দেখা গেল মরা ব্যাঙের পা-টা নড়ে সোজা হয়ে উঠল।

মরা ব্যাঙকে সেই ভাবে নড়ে উঠতে দেখে ছাত্রটির ভয়ানক কৌতূহল হল। তখনি গ্যালভিনিকে সে ডেকে পাঠাল। গ্যালভিনি এসে বহু পরীক্ষার পর দেখলেন যে, টেবিলে বিদ্যুৎ তৈরী করবার একটা যন্ত্র ছিল। (সে-সময় চাকা ঘুরিয়ে পশম ঘসে সামান্য বিদ্যুৎ তৈরী করা হ'ত মাত্র। বেশী করে বিদ্যুৎ তৈরী করে কি ভাবে তাকে মানুষের কাজে লাগানো যায়, তা তখন কারুরই জানা ছিল না।) হঠাৎ সেই ছুরির সঙ্গে সেই বিদ্যুৎ-তৈরী-করা যন্ত্রটি এবং ব্যাঙের দেহ একই সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে ব্যাঙের পা ঐ রকম ভাবে নড়ে উঠেছে।

এই ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করে গ্যালভিনি স্থির করলেন, যে, জীব-দেহে এক রকম বিদ্যুৎ আছে। এবং ইতালীর বৈজ্ঞানিকদের সামনে তিনি তাঁর এই নতুন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন।

তাঁর এই ঘোষণার পর বৈজ্ঞানিক মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। গ্যালভিনি পদার্থ-বিদ্যা ভাল রকম জানতেন না। তিনি ছিলেন শরীর-তত্ত্বের অধ্যাপক। সেই সময় একজন কবি কাব্য-চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। বহুদিন ধরে তিনি নীরবে গবেষণা করছিলেন কি করে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরী করা যায়। তাঁর নাম হ'ল আলেসান্দ্রো ভোল্টা।

গ্যালভিনির এই নতুন তত্ত্বের কথা তাঁর কানে গিয়ে পৌছল। গ্যালভিনির ভুল থেকে হঠাৎ তিনি তাঁর পথ খুঁজে পেলেন। বিদ্যুৎ ব্যাঙের দেহে ছিল না - দুটো বিভিন্ন ধাতুখণ্ডের সংস্পর্শে বিদ্যুৎ ব্যাঙের দেহে সঞ্চালিত হয়েছে—ব্যাঙের শিরা-উপশিরা শীঘ্র উত্তেজিত হয় বলে সেটা কেবল তড়িৎ-নির্দ্দেশকের কাজ করেছে।
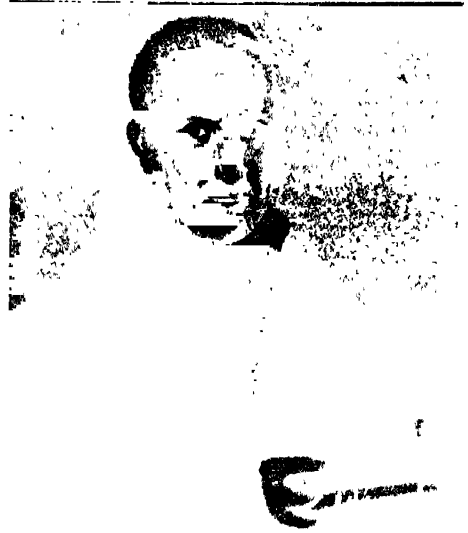
ভোল্টা। [মাসিক মোহাম্মদীর সৌজন্যে

ভোল্টা গ্যালভিনির তত্ত্ব প্রতিবাদ করলেন। সকলের সামনে তিনি তাঁর গবেষণা পরীক্ষা করে দেখালেন। ব্যাঙের দেহ বা অন্য কোনও জীবের দেহ তিনি নিলেন না। তার বদলে একটা এ্যাসিডে ভেজান ন্যাকড়া ব্যবহার করলেন। দস্তা আর তামার দুটো পাত সেই এ্যাসিডে ভেজান ন্যাকড়া দিয়ে সংযুক্ত করে দেখালেন যে, তাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেই পরীক্ষার পর গ্যালভিনির তত্ত্ব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হ'ল এবং জগতে বিদ্যুৎ-তত্ত্বের নব-যুগ সৃষ্টি হ'ল।

এতবড় একটা যুগান্তকারী আবিষ্কারের পিছনে রয়েছে ঝোল তৈরী করবার জন্যে ব্যাঙ আনতে গিয়ে হঠাৎ—

রূপকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

সমুদ্দুর ফিরে গেলো, তারপর সমুদ্দুরের মাঝখানে আকাশের মত উঁচু এক ঢেউ উঠলো—সে ঢেউ দুল্‌লো না, ভাঙলো না, আকাশে উঠে গেল, আর তার ভেতর থেকে একটি ছোট্ট বেঁটে নীলরঙের মানুষ, মাথায় ফেনার তাজপরা, গুট্ গুট্ করে বেরিয়ে এলো।

সে মেঘের মতন শব্দ করে বল্লে—জলের ছোঁয়া ভালো লাগে না, তপ্ত বালি লাগবে ভালো। তবে রাজকুমারী তোমায় আমি তাই দেবো! বলে সে এক লাফ দিয়ে মিলিয়ে গেলো।

যেখানে সমুদ্দুর ছিল সেখানে তপ্ত বালি ধূ ধূ করতে লাগলো—সেইখানে আমি ঝাউগাছ হলুম—সেই দিন থেকে পা'দুটো আমার বালির তাপে পুড়ে যায়।

মৌন তুমি ফিরে যাও - তোমায় আমি থাকতে দেবো না—এখানে আমি শুধু একলা থাকবো—আর কেউ নয়।

মৌন বল্লে—আচ্ছা কন্যে আমি ফিরে যাচ্ছি—এই চল্লুম। বলে, মৌন পেথম-ধরা পা-দুটির কাছ থেকে চলে গেলেন।

সোজা বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন মাঝরাত্তির—তখন মৌন বালির ওপর ধপ্ করে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লো।

আগে সেখানটি ছিল মাঝ-সমুদ্দুর, এখন বালির খাত।

মৌন বসে বসে মুঠো মুঠো বালি তুলে চূড়ো করে সাজাতে সাজাতে, ঝুর্ ঝুর করে ঝরাতে ঝরাতে বল্লে—সাগর হে, সাগর হে, জেগে আছ?

বালির তলায় সাততলা নীচু থেকে উত্তর এলো—জেগে আছি দিনরাত—বলতে চাও কি?

মৌন বল্লে—

রূপোরেখা প্রবালরাণী,
ভুললে কি হে নীলার পানি?

উত্তর হলো—কি বল্লে, কি বল্লে!

ঝাউয়ের মূলে পা'দুখানি
ঝাউয়ের ডালে মড়মড়ানি।

তার কথা কি বলছো, বল তো ভালো করে শুনি।

মৌন বল্লে—তার কথা কিছু বলিনি—তার পা'দুখানি তপ্ত বালুতে পুড়ে গেলো—তার কথা কিছু বলিনি—বলছি—

রূপোরেখা প্রবালরাণী,
ভুললে কি হে নীলার পানি?

উত্তর হলো—রাজকুমারী, রাজকুমারী—না, না, রূপোরেখা, প্রবালরাণী আর নীলার পানি। তারা কি সব শুকিয়ে গেছে! একটিতেও জল নেই?

মৌন বল্লে—যে নদীটি নাম হারালো, সেইটি শুধু বয় জোরালো।

উত্তর হলো—সেই নদীর তীরে তালনন্দ নাচে—নয়? তুমি আমায় অনেক কথা মনে করিয়ে দিলে, অনেকদিন সব ভুলে ছিলুম। তুমি কোন্ দিক থেকে এলে বন্ধু, কোন্ দিকেতে যাবে?

মৌন বল্লে, মাকে ছেড়ে, ধুত্তু, শ্যালের বন পেরিয়ে, আকন্দার মালা ধরে, এলুম বক্ষদীপার দোরে। সেখান থেকে নীলার বুকে মেঘমাদলে। তা'পর গেলুম শুকনো জলের দেশে—সেখানে চোখের জলে তুলতুলে শ্বেতপাথরের গায়ে পেথম-ধরা পায়ের ছাপে আল্‌তা পরার ছোপ্—তিন ভুবনের মা তাই আগলে বসে থাকেন। লঙ্কা-বুড়ীদের ভিটে মাড়িয়ে দেখলুম তালনন্দর নাচ—স্রোতে আমায় ঠেলে দিয়ে নাচের তার ধুম লাগলো, আমি ভেসে গেলুম ধানের চাষী তাদের মেয়ে, তাদের ঘরে। গণেশঠাকুর যুবরাজের বন্দী হলুম—ছাড়া পেলুম কালো মেয়েকে ধরিয়ে দিয়ে, রথে চড়ে সাগর এলুম, দৈত্য যখন পাথর হলো, রাজকুমারীর গল্প শুনে তোমার কাছে এসেছি একটা কথা বলতে।

উত্তর হলো—বল কথা।

মৌন বল্লে—তুমি আবার নীল সমুদ্দুর হও।—আকন্দার মালা যে বালির চরে নেতিয়ে পড়ে, মেঘমাদলের নৌকা চলে না, যখন থলো-থলো জাম ফলে তখন মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার পাল ফোলে না, বক্ষদীপার দুঃখু বড়। আর

রাজকুমারীর পায়ের পাতা দু'খানি যে যায়। সাগর, তুমি আবার নীল সমুদ্দুর হও, নইলে এই খানে বসে বসে আমি মরে যাবো—তোমার পাপ হবে।

উত্তর হলো—বন্ধু, তোমার মরতে হবে না, আমি আবার নীল সমুদ্দুর হবো—তুমি বসো।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোথায় যেন মেঘ ডেকে উঠলো—ফুলে ফুলে দুলে দুলে নীল জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সমস্ত বালি ডুবিয়ে দিলে। মৌন একটা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠল—সে তাকে ছুঁড়ে দিলে আর একটা ঢেউয়ের মাথায়, সে তাকে ছুঁড়ে দিলে অন্য ঢেউয়ের মাথায়। এমনি করে মৌনকে তীরে এনে ঝাউ গাছের গোড়ায় ঠেলে দিয়ে, পেখম-ধরা পা'-দুটি ধুইয়ে দিয়ে, ঢেউ ফিরে গেল। ঝাউগাছ ঘুমতে ঘুমতে স্বপ্ন দেখছিল—কুমার সংশপ্তের সঙ্গে, নতুন পাতা-ধরা দেবদারু বনের পথে বেড়াচ্ছে, দলে দলে ছেলে-মেয়েরা যে যার সাথী নিয়ে কত বেড়াচ্ছে তাদের আশে-পাশে সুমুখে পেছনে। যখন বুড়ো এলো, দুজনে তখন, দল আর কেউ নেই, শুধু সে আর বৃদ্ধ কুমার সংশপ্ত—সমুদ্রের তীরে ঝাউবনের মধ্যে নির্জ্জন রাঙা-পথে গোধূলি-বেলায় পাশাপাশি চলেছে।

আর কেউ নেই, শুধু সে আর বৃদ্ধ কুমার সংশপ্ত—সমুদ্রের তীরে ঝাউবনের মধ্যে নির্জ্জন রাঙা পথে গোধূলি-বেলায় পাশাপাশি চলেছে।

এমন সময়ে পায়ে জল লাগাতেই জেগে উঠে বল্লে—আঃ আঃ! পায়ের তলায় জলের আসন কে পেতে দিলে গো! কনকনে টিপ পরিয়েছিল—সে—মৌনকে ত তাড়িয়ে দিলুন—হিম-চাদরে পা মুড়ে দিলে কে গো তুমি—তোমার ভালো হোক্।

মৌন বল্লে—নীল সমুদ্দুর ফিরে এসেচে তোমার পা ধোয়াতে। সেই সময় সমুদ্দুর একটা ঢেউ নিয়ে এসে পড়েছিল।—সে ঝাউয়ের কথা শুনতে পেয়ে, পা ধুইয়ে দিয়ে ফিরে যেতে যেতে বল্লে—ভাল হোক্ আর মন্দ হোক্। রাজ-কুমারী—সাগর-তীরে বালির বুকে তোমার পেখম-ধরা পা'দুখানি পাতা থাকবে চিরকাল—আমার ঢেউ এসে তোমার পা ধুইয়ে যাবে—চিরকাল। ঢেউ ফিরে গেলো।

মৌন উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—এবার কন্তে, আমি তবে সত্যিই চল্লুম। বলে, মৌন অনেক দূর দৌড়ে দৌড়ে চলে গেলো। এবার তো আর রথ নেই, হাঁটতে গিয়ে কোন্ পথে যে গেলো তার ঠিকঠিকানা রইল না। যেখান দিয়ে যায় খালি বড় বড় বাড়ীর ভাঙ্গা-চোরা ভিত, গাছপালার শেকড়ে ভরে গেছে। আর দেশটাময় খালি জল আর জঙ্গল। সন্ধ্যে হয় হয় তখন মৌন একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, সুমুখ থেকে দু'টো শেয়াল আসছিল, এক কড়া দুধভর্ত্তি, মস্ত বড় এক কড়ার দুদিকের আংটা দু'জনে মুখে ধরে আনছিল।

তারা মৌনের কাছে এসে কড়া নাবিয়ে বল্লে—ওহে খানিকটা দুধ খেয়ে নাও—কড়াটা তা হলে হাল্কা হবে। আমাদের এখনো যেতে হবে।

মৌন বল্লে—শেয়াল ভায়া, এত দুধ পেলে কোথায়—কাদের দুধ খাবো আমি? শেয়ালরা বল্লে—গেরস্তর দুধ নিয়ে এলুম। তাদের ক'জনই বা লোক, এত দুধ খাবে কে! কর্ত্তা গিন্নী, আটটা ছেলে, ছটা বউ, পাচটা মেয়ে, দশটা নাতি আর নাতনি, চারটে চাকর, সাতটা ঝি, এইত মোটে তিনটে মানুষ এত দুধ খাবে কে! তাই ভাবলুম দুধটা ফেলা যাবে—নিয়ে এলুম। তুমি খানিকটা খেয়ে নাও—দেরী করো না।

হাতের কোষা করে' করে' মৌন অনেকটা দুধ খেয়ে নিলে, শেয়াল দু'জন কড়া মুখে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল—মৌনও চলতে সুরু করলো। চলে চলে আর চলতে যখন পারে না তখন মৌনর দেখা হল এক গাধার সঙ্গে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে, কান খাড়া করে, দুচক্ষু বুজে গাধাটা হাঁপাচ্ছিল—

মৌন শুধলে—ওহে গাধা, বলতে পারো এ রাস্তা কোথায় গেছে?

দু'টো শেয়াল আসছিল, এক কড়া দুধভর্ত্তি, মস্ত বড় এক কড়ার দুদিকের আংটা দু'জনে মুখে ধরে আনছিল।

গাধা বল্লে—আগে আমার কথাটা শোনো। ফুটফুটে চাঁদনী রাতে প্রাণ খুলে গান গেয়েছিলুম—বাপে-বেটায় বড্ড মারলে, বেটারা ধোপার জাত। কাজ ছেড়ে দিয়ে তাই চলে এলুম—ঠিক করিচি বনের পশু বনেই থাকবো—লোকালয়ে আর যাবো না। তা এখানে শেয়াল দুটো বলে গেলো কিনা—বেচারী গর্দ্দভ! ওহে মানুষ, কি করা যায় বলতো!

মৌন বল্লে—গাধা ভাই, রাস্তাটা বলে দাও চলে যাই। তোমার কথা তুমিই জানো—আমি কেমন করে বলবো।

গাধা বল্লে—আঃ, তাহলে জানো না। আচ্ছা চড়ো আমার পিঠে, রাস্তা কোথায় গেছে বলে আর কি হবে, একেবারে নিয়ে যাই। মৌন তার পিঠে চড়ে চল্লো। লোকালয়ের কাছে এসে গাধা বল্লে—নাবো। মৌন নাবতেই গাধা বল্লে—আর আমি যাবো না। এবার তুমি আপনি যাও। এই বলে সে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে ফিরে গেল। এদিকে বনের ধারে কুঁড়ে ঘরে মৌনর মা'র বড় দুঃখু। মৌনর মামার বাড়ীতে খোঁজ নিয়েচে, খোঁজ পায়নি। এ-গাঁ গেছে সে-গাঁ গেছে—একলা একলা হেঁটে হেঁটে সহর গেছে খোঁজ পায়নি। কতো মাস কেটে গেলো তবু মৌন ফিরলো না। বিধবা ভাবলে ছেলে আর বেঁচে নেই। তাই ঠিক করলে সে আপনিও আর বাঁচবে না। বিধবা বনে গিয়ে বিষফল জোগাড় করে ঘরে এনে শুলো। পরদিন আকন্দ-ফুলে শিব-পূজা করে বিষ খেয়ে জীবন ত্যাগ করবে এই মনস্থ করলে। কিন্তু সকাল বেলা উঠে দেখে—আকন্দ ফুল একটিও ফোটে নি। পূজোর ফুল রোজ ফোটে আজ ফুটলো না কেনো। সেদিন আর মরা হলো না, বিধবা খালি সারাদিন ধরে বলতে লাগলো—'হে শিব কি অপরাধ করিচি বলো'। এমনি করে মৌনর মা যেদিন ঠিক করে মরবো—সেদিন আর আকন্দফুল ফোটে না। বিধবার মরাও হয় না। দেখে দেখে শেষকালে মৌনর মা মরণের কথাকে মনেও আর ঠাঁই দিলে না। শুধু আশায় আশায় বেঁচে রইলো—মৌন কবে আসবে—তা জানি না—মৌন কিন্তু আসবে।

একদিন ভোরবেলা গাছেদের যখন ঘুম ভেঙ্গে গেছে, কোন-কোনটা বা স্বপ্ন দেখছে—তেঁতুল গাছটি তখন সরু সরু ডগা বাড়িয়ে পূবমুখ করে ঝিমোচ্ছিলো। নেজ দুলিয়ে দুলিয়ে ফিঙ্গে এসে সেইখানে হাজির।

ফিঙ্গে বল্লে—'তিন্তিড়ী তোর ঘুম ভাঙ্‌।'

সরু সরু ডগা নাড়িয়ে তন্দ্রার ঘোরে গাছ জবাব দিলে—না, না।

ফিঙ্গে বল্লে—তোর শির-ডগালে বসতে হবে, মৌন আসচে দেখতে হবে। বিধবা ঠিক সেই সময় দাওয়া থেকে নাবছিল ফুল তুলতে, মৌনর নাম শুনে দাঁড়িয়ে গেল। তিন্তিড়ীর তন্দ্রা ভাঙ্গচে না দেখে ফিঙ্গে আকাশে নেজটা দুলিয়ে দিলে, অমনি তেঁতুল গাছের সব ডালগুলো ধড়্‌মড়্‌ করে জেগে উঠে ফিঙ্গেকে আগ্‌ডালটি বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—

বসো। এবার তিন্তিড়ী সুয্যিঠাকুরকে নমস্কার করে পাতাগুলিতে হাসি ছিটিয়ে ছিটিয়ে ঝল্‌মল্‌ করতে লাগলো, ফিঙ্গে আগ্‌ডালটিতে বসে ঘাড় উঁচিয়ে অনেক দূরে চেয়ে রইল।

বিধবা জিজ্ঞেস করলে—ফিঙ্গেরে ফিঙ্গে, মৌনর কথা কি বলিস্? ফিঙ্গে নেজ দুলিয়ে হুস করে বাতাসে দোল খেয়ে আকাশে উঠে গেলো, তক্ষুনি দোল খেয়ে নেবে এসে ডালে বসলো, বল্লে—

ধানের চাষী তাদের মেয়ে
তাদের ঘরে খেয়ে দেয়ে রাজা চাষার মিতে,
তোর মৌন ছুটচে রথে আকন্দা নিতে।

বিধবা বল্লে—এবার ফিঙ্গে এবার? এবার মৌন কোথায়?

ফিঙ্গে বল্লে—

সারি সারি গাছের মাথায় আমমুকুলের পথ
তাইতে চলে গন্ধধ্বজ রথ,
ধূলার পথে নীচে মৌনর রথ ছোটে,
আকাশেতে ছায়াপথে ঝাপ্‌সা তারা ফোটে,
আনন্দ নাচে, মৌন এলো কাছে—
লঙ্কা-বুড়ীর ভিটে রাখলো পিছন পিঠে।

বিধবা বল্লে—এবার দেখচো কি?

ফিঙ্গে আবার দোল নিয়ে আকাশে ওঠে, ডালে নেবে এসে বল্লে—

নেই-পাতা সব গাছের ডালে
তারা ফুলের সঙ্কো,
কালো কালো শুকনো গাছে
হলদে ফুলের সঙ্কো।
সেই শুকনো জলের দেশ
তোর মৌন পেরিয়ে এলো ওই হল গো শেষ।

বিধবা শুধোলে—ফিঙ্গে কদ্দুর আর এলো?

ফিঙ্গে বল্লে—

নীলায় জল কেটে কেটে রথের চাকা ঘোরে
ওই এলো তোর মৌন দেখি বক্ষদীপার দোরে।

বিধবা বল্লে—তারপর বলরে ফিঙ্গে—থামিস্ কেন?

ফিঙ্গে বল্লে—

রূপো-রেখার আঘাটায়	মেঘ মাদলে ভিড়লো,
বক্ষদীপা পিদীম ধরে	বরকে নিয়ে ফিরলো।
তোর মৌন ডাক দিলে,	আকন্দামালা,
প্রবালরাণী সঙ্গে দিলে	জলভরা তালবালা।

সুয্যি কখন ডুবে গেছে	দেখ্‌, মৌনর মা,
এবার তবে ফিরতে হলো	ডাক্‌ছে আমার ছা।
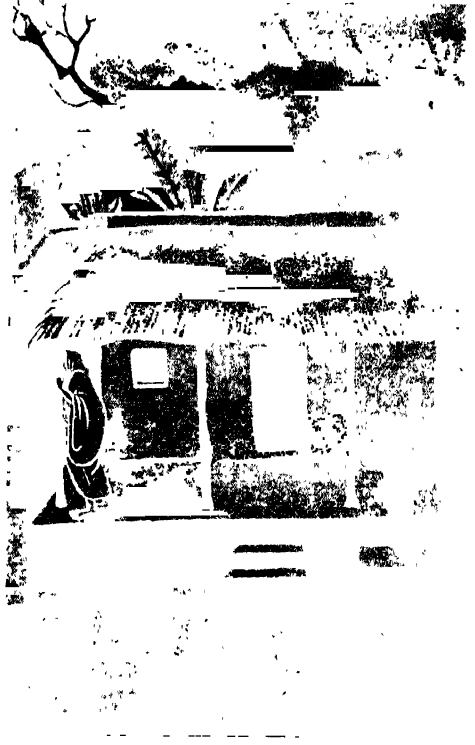
এদিকে বনের ধারে কুঁড়ে ঘরে মৌনর মা'র বড় দুঃখ।

বিধবা বল্লে—না, না, ফিঙ্গে আর একটু থাক্।

ফিঙ্গে বল্লে—ভোর থেকে বসে আছি, তোর সঙ্গে বকে বকে সন্ধে হয়ে গেলো। আমি আবার কাল আসবো। এই বলে ফিঙ্গে উড়ে গেলো। তারপর দিন ভোর ভোর ফিঙ্গে এসে ডাকলে, মৌনর মা, দুয়ার খোল্। বিধবা দোর খুললে—ফিঙ্গে চালার মাথায় গিয়ে বসলো। বিধবা উঠানে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলে, হ্যাঁরে ফিঙ্গে, কি দেখচিস্?

ফিঙ্গে বল্লে—উঠোন ভরা লাউয়ের মাচা—কচিকচি ডগা।

বিধবা বল্লে—কি দেখচিস্ ঠিক বল্ না।

ফিঙ্গে বল্লে—আঁকড়ির পাক কঞ্চির গায়।

বিধবা বল্লে—ফিঙ্গে তোর পায়ে পড়ি—কি দেখ্‌ছিস বল্।

ফিঙ্গে বল্লে—লাউফুল সাদা সাদা, আর মাচায় বোনা হিমজালতি ঠাণ্ডা রোদের বেলা।

বিধবা বল্লে—লক্ষী ফিঙ্গে, বল্ না গো।

ফিঙ্গে বল্লে—সজনে ফুল বিছিয়ে গেছে উঠোনের কোণে।

বিধবা এবার ভয়ানক রেগে গেলো—একটা বাঁশ লাঠি নিয়ে খুব জোরে ফিঙ্গের গায়ে মারলে—বল্লে- না বল্বিতো বেরো আমার চালা থেকে।

কপো-রেখার আনাটায় মেঘ মাদলে ভিড়্লো,
বঙ্গদীপা পিদীম ধরে বরকে নিয়ে ফিরলো।

বাঁশগাছা ফিঙ্গের গায়ে লাগলো না-·সে ফুরুত্ করে উড়ে পড়লো—আবার এসে বসলো।

বিধবা বল্লে—আচ্ছা ফিঙ্গে যা দেখ্লি তাই—এবার দেখিস্ কি ?

ফিঙ্গে বল্লে—কোঁচড় ভরে সজনে ফুল কুড়োয় নূতন ক'নে।

বিধবা বল্লে—ফিঙ্গে তুই বড় নিষ্ঠুর, আর একবার দেখ্।

ফিঙ্গে বল্লে—উঠোন মাড়িয়ে রথ আস্চে আকন্দা আর মৌনকান্তি।

বিধবা বল্লে—সে কদ্দুর রে—কদ্দুর ফিঙ্গে।

"পেছন ফিরে দেখ্" বলে ফিঙ্গে নেজ দুলিয়ে উড়ে গেলো।

বিধবা পিছন ফিরলে। বনের ভেতর দিয়ে মৌনর রথ পবনবেগে ছুটে আসচে। আশে পাশের গাছপালা হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে, সকাল বেলার শান্ত বনটি পাখীদের হুড়োহুড়ি, কিচিমিচিতে ভরে গেচে। হলুদ কাপড়-পরা আকন্দা মৌনর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে এককাতে সোজা হয়ে বসে কেমন একটু একটু হাসচে! মাথার ঘোমটাখানি অল্প সরে গিয়ে বাতাসে ফুলে ফুলে উঠ্চে পাশ দিয়ে আল্গা গিঁঠের বাঁধন দেওয়া একরাশ চুল কাঁধের ওপর থোওয়া। আকন্দার ঘোমটাখানির মতন রথের ঘোঁড়া দুটোও ফুলে ফুলে ছুটচে। খুঁটীর সঙ্গে যেন মিশিয়ে গিয়ে খুঁটী ধরে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বিধবা ভাবছিলো—ঘোড়ার রাশটা আকন্দার হাতে দিলে মানাতো বেশ। আকন্দার পাশে মৌন সিধে হয়ে থেবড়ি খেলে বসে আছে। আকন্দা তার আদুল গায়ে পাতলা চাদর জড়িয়ে দিয়েচে—চাদরখানা কোমর থেকে বুকে জড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে উড়চে। মজবুত শিরদাঁড়াতে পিঠখানি বেশ নরম। ঘোড়ার রাশ টেনে, হাসিমুখে, আল্গাগায়ে মৌন একবার এদিক দুলচে একবার ওদিক দুলচে। মৌনর মা মনে মনে হাস্ছিল আর বলছিল—রথে চড়েচে আকন্দা, মৌন চড়েচে চতুর্দ্দোলায়। মৌনর হাসিটি দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে পডচে।

(সমাপ্ত)

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তিনকড়ি মনে কিছুই করে নাই, তবে চাঁপার হাসিটা তাহার বড় খারাপ লাগিয়াছে। চা খাইয়া সে চাঁপার কাছে উঠিয়া গেল। দেখিল, পাশের ঘরে খোলা একটা জানালার পাশে চাঁপা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলিল—'এই! ওরকম করে' হাসছিস্ কেন? লোকে বলবে কি! ছিঃ!'

চাঁপা ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবং আবার হাসিল। বলিল,—'আমাকে বুঝি তুমি শাসন করতে এলে?'

'না, শাসন করতে আসিনি, কিন্তু ছি, নতুন বৌ হয়ে এসে অমনি পাগলের মত হাসে নাকি?'

কিন্তু শ্রীহর্ষকে দেখিলেই যে তাহার হাসি পায় সেকথা সে তাহার দাদার কাছে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। বলিল—'কাল যে তুমি এলে না দাদা? একা একা থাকতে আমার ভারি কষ্ট হয়।'

তিনকড়ি বলিল—'সে কষ্ট ত' তুই নিজেই ডেকে এনেছিস চাঁপা, আমার কি দোষ?'

চাঁপা তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'তাহলে না এলেই পারতে!'

কথাটা অভিমানের কথা। তিনকড়ি তাহা বুঝিল। তাই সে চুপ করিয়াই ছিল। এমন সময় শ্রীহর্ষ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, 'কোথায়? ঠাকৃরুণ চলে গেল? হ্যাঁগা, মালতীকে পারবে মানুষ করতে? কোথায় মালতী?'

চপলা-ঠাকৃরুণ তাহাকে রাখিয়া গিয়াছে ভাবিয়া শ্রীহর্ষ এদিক ওদিক তাকাইতেছিল, চাঁপা চোখের ইসারায় তাহার দাদাকে কাছে ডাকিয়া চুপিচুপি বলিল,—'মালতীকে নিয়ে উনি চলে গেলেন যে!'

কথাটা সে এমন ভাবে বলিল—শ্রীহর্ষ যাহাতে শুনিতে পায়।

শ্রীহর্ষ বলিল,—'তা জানি। ও অমনি বলে মাঝে-মাঝে। ওর কথায় তোমরা কেউ রাগ-টাগ কোরো না যেন।'

তিনকড়ি চাঁপার মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল,—'কেন, মেয়েটাকে তুই মানুষ করতে পারবি না চাঁপি? এনে রাখ্‌ না নিজের কাছে! ওইটুকু ত' মেয়ে!'

জবাবটা শুনিবার জন্য শ্রীহর্ষও তাহার দিকে উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

চাঁপা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'হ্যাঁ, কেন পারব না?'

কিন্তু তিনকড়ি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই শ্রীহর্ষ বলিয়া উঠিল, 'পারবে? তবে আর ও-মাগীর তোয়াক্কা কিসের! বয়ে গেল তাহ'লে! দিয়ে যাক্ না মালতীকে! না কি বল তিনকড়ি?'

কিন্তু তিনকড়ির কাছ হইতে যে-জবাব সে আশা করিয়াছিল তাহা পাইল না। তিনকড়ি বলিল,—'ঠাকৃরুণ কিন্তু আপনাকে ভালবাসে।'

শ্রীহর্ষ হাসিয়া উঠিল। বলিল,—'তুমি কি এখনও আমাকে 'আপনি' বলবে নাকি হে তিনকড়ি?'

তিনকড়ি কোনও জবাব না দিয়া ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'অভ্যেস্ করতে হবে।'

শ্রীহর্ষ কিন্তু আবার তাহার সেই পুরানো কথাটা টানিয়া আনিল। বলিল, 'চপলা-ঠাকৃরুণ—কি বলছিলে?—আমায় ভালোবাসে, না কী?'

ঘাড় নাড়িয়া তিনকড়ি বলিল, 'হ্যাঁ। সেই জোরেই আজ আপনাকে—'

শ্রীহর্ষ হাত নাড়িয়া মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল। বলিল,—'না, তুমি ভুল বুঝেছ তিনকড়ি। মাগী আমায় ভালোবাসে না। ভাল ও বাসতো ওই মালতীর মাকে।'

তিনকড়ি বলিল,—'সেই জন্যই বুঝি ওর চাঁপার ওপর এত রাগ?'

কথাটাকে শ্রীহর্ষ চাপা দিবার চেষ্টা করিল। বলিল,—'না না রাগ আবার কিসের! ওর কথাবার্ত্তাই অম্‌নি ধরণের। আর তাছাড়া ওর কাছ থেকে মালতীকে নিয়ে এলেই ত' বাস্, সব চুকে গেল। তখন ত' আর ঠাকৃরুণের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধই থাকবে না।'

সেকথা সত্য। কারণ মালতীকে লইয়াই চপলা-ঠাকরুণের সঙ্গে সম্বন্ধ। তাহা ছাড়া আর একটা সম্বন্ধ শ্রীহর্ষর ছিল। সেটা ওই ঠাকৃরুণের কাছে এক বেলা খাওয়া। কিন্তু চাঁপা

এ-বাড়ীতে আসিবার দিন হইতে রাঁধুনী বাম্‌নী একজন রাখা হইয়াছে। সে-ই রান্নাবান্না সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করে। সুতরাং শ্রীহর্ষকে আর পরের বাড়ী খাইতে হয় না।

ওদিকে কিন্তু আর একটা ভারি মুস্কিল বাধিয়াছে। চাঁপা চলিয়া আসিবার পর বুড়া বৈকুণ্ঠ ও তিনকড়ির জন্য কে যে রান্না করিয়া দিবে তাহাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটা সমস্যার বিষয়। শ্রীহর্ষ তাহা জানে। তবু সে কোন কথাই উত্থাপন করে নাই

কথায় কথায় তিনকড়ি সেদিন চাঁপাকে সেকথা বলিয়া গেছে। বলিয়াছে—'আমাকে আসতে যে বলছিস চাঁপা, কিন্তু আমি আসি কেমন করে' বল্ ত?'

চাঁপা হাসিয়া একটুখানি উপহাসের ভঙ্গীতেই বলিয়াছিল, 'হাঁ, তোমার কাজকর্ম্ম কত! দুপুরে পড়ে' পড়ে' ঘুমোতে হয়, বিকেলে এখানে-ওখানে আড্ডা মারতে হয়, সত্যি ত', তোমার সময় কোথায়?'

তিনকড়ি ভাবিয়াছিল কথাটা চাঁপাকে বলিয়া অনর্থক তাহার মনে আর কষ্ট দিবে না, কিন্তু ঘুমাইবার এবং আড্ডা দিবার কথাটা যখন সে বলিল তখন আর না বলিয়া সে থাকিতে পারিল না। বলিল, 'ঘুমোবার, আড্ডা দেবার সময় আর পাইনে চাঁপা। তুই থাকতে তাই করতাম বটে, কিন্তু এখন যে আবার হাঁড়িও ধরতে হয়।'

চাঁপা ভাবিয়াছিল, বিবাহের সময় যে রাঁধুনী রাখা হইয়াছিল সে রাঁধুনী এখনও আছে। তাই সে কথাটা শুনিয়া একটুখানি অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, 'কেন? রাঁধুনী যে রাখা হয়েছিল দাদা?'

তিনকড়ি বলিল, 'বা-রে! সে রাঁধুনী ত' বিয়ের পরের দিনই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! ওই শ্রীহর্ষ বাবুই ত' ছাড়িয়ে দিয়েছেন।'

চাঁপা গম্ভীর মুখে নীচের দিকে মুখ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্য কথা পাড়িয়া বসিল।

রাত্রে আহারাদির পর শ্রীহর্ষ দেখিল, চাঁপার মুখখানা সেদিন যেন অন্য দিনের চেয়েও গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করিল, 'মুখখানা তোমার এত গম্ভীর কেন? হ্যাঁগা?'

আপন মনেই পাগলের মত চাঁপা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

শ্রীহর্ষর মুখে এই রকম সব 'ওগো' 'হ্যাঁগা' কথা শুনিলেই সে হাসিয়া ফেলে। এই লোকটার সঙ্গে তাহার যে বিবাহ হইয়াছে, উহাকে লইয়া চিরজীবন তাহাকে ঘর সংসার করিতে হইবে, সে কথা যেন সে ভাবিতেই পারে না।

চাঁপার হাসি দেখিয়া শ্রীহর্ষ যেন একটুখানি খুশী হইল। বলিল, 'পাগলের মত কেনই বা যে হাসো, আবার কেনই বা যে মুখখানা গম্ভীর করে' থাকো কিছুই বুঝতে পারি না ছাই!'

অতি কষ্টে হাসি দমন করিয়া চাঁপা তখন মুখ বুজিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া চুপ করিয়া আছে

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আমার সঙ্গে ভাল করে' কথা কি তুমি বলবে না চাঁপা?'

চাঁপা চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীহর্ষ তখন আগাইয়া গিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'কি বলছ বল!'

চাঁপা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'কিছুই ত' বলিনি!'

'তবে হাসলে কেন?'

'ও, অম্‌নি।' বলিয়া চাঁপা মাথা হেঁট করিল। ভয়ে তখন তাহার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিতেছে।

শ্রীহর্ষ তাহার কাছে গিয়া বসিল। বলিল, 'আচ্ছা চাঁপা, কই বিয়ের আগে ত' তুমি এমন করে' হাসতে না!'

চাঁপা ধীরে ধীরে একটুখানি সরিয়া গেল। ভাবিল, একটা মনের মত জবাব না দিলে হয়ত ও সরিবে না। আবার একবার সে শ্রীহর্ষর দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল। বলিল, 'মানুষ কেন হাসে জানেন না?'

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। হাসে মানুষ কিসের জন্য শ্রীহর্ষ তাহা জানে। বলিল, 'সত্যি চাঁপা? তুমি খুশী হয়েছ? খুশী হ'লেই ত' মানুষ হাসে জানি।'

চাঁপা ধীরে ধীরে একবার ঘাড় নাড়িল।

আনন্দের আতিশয্যে এতক্ষণ শ্রীহর্ষর মনে ছিল না, এইবার আদর করিয়া হাতখানি সে চাঁপার গলায় জড়াইয়া মুখখানা তাহার মুখের কাছে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি আমায় আপনি কেন বললে চাঁপু?'

তাহার এই বলিবার ধরণ, এই দীনতা, এই কাতরতা দেখিয়া আবার চাঁপার হাসি পাইতেছিল, কিন্তু হাতটা তাহার ঠিক সাপের মতই গলায় জড়ানো রহিয়াছে, মুখখানাও তাহার মুখের নিতান্ত সন্নিকটে ; হাসি তাহার মুখের কাছে আসিয়াও হঠাৎ যেন বন্ধ হইয়া গেল। কি যে বলিবে, এক্ষেত্রে কি তাহার বলা উচিত, সব যেন তাহার মাথার ভিতর গোলমাল হইয়া গেছে।

তবু একটা কিছু না বলিলে নয়। চাঁপা জোর করিয়া তাহার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, 'আপনি বলাই অভ্যেস্ কিনা, তাই।'

শ্রীহর্ষ তাহাকে তখন আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জোর করিয়া একটি চুম্বন করিয়া বুঝাইতে লাগিল।

বুঝাইবার বিষয়বস্তু হইতেছে এই যে,—স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষই হোক্ আর তৃতীয় পক্ষই হোক্, স্বামী—স্বামী, হিন্দু-নারীর সাক্ষাৎ দেবতা। উদাহরণ স্বরূপ এই যেমন ধর সে নিজে। তাহার বয়স কম, দেখিতে সে তাহার চেয়েও ভালো, কিন্তু কি তাহাতে আসে-যায়! বিবাহ যখন তাহাদের হইয়াছে তখন ভাল করিয়া হাসিয়া খেলিয়া তাহাকে ঘর-সংসার করিতে হইবে।

এমনি-সব নানা কথা বুঝাইতে বুঝাইতে শ্রীহর্ষ হঠাৎ এক সময় লক্ষ্য করিল, চাঁপা অন্যমনস্কের মত চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া বালিসের ঝালরটা বাঁ হাত দিয়া টানিতেছে, কোনও কথা তাহার সে শুনিতেছে বলিয়া মনে হইল না।

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'শুনছ চাঁপা? আমার কথাগুলো সব মন দিয়ে শুনলে ত'?'

চাঁপা ঘাড় নাড়িল। —'শুনছি।'

'বেশ, তাহ'লে মেয়েটাকে কাল আমি নিয়ে আসি চপলা-ঠাকুরুণের কাছ থেকে, তুমিই মানুষ কর, না কি বল?'

চাঁপা বলিল, 'আমুন, কিন্তু অনেক টাকা খরচ হবে।'

'আবার আমুন বললে?'

চাঁপা একবার হাসিল।

'না, তুমি আপনি বলতে পাবে না। বল—আর আপনি বলবে না!'

এই বলিয়া শ্রীহর্ষ আবার তাহার মুখখানা আগাইয়া আনিতেছিল, চাঁপা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'বলছি, বলছি। বেশ ত', মেয়েকে আনো না! আমার কি!'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আমার কি মানে? তোমাকেই ত' মানুষ করতে হবে।'

চাঁপা বলিল, 'করব।'

'টাকা খরচ হবে, না কি বললে?'

'হ্যাঁ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক টাকা খরচ হয়।'

'তা হ'লোই-বা! করব।'

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, 'পারবে? কষ্ট হবে না?'

শ্রীহর্ষ এতক্ষণ পরে একবার হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'ও-কথা কেন বললে বল ত? আমি খরচ করতে পারব না—এই কি তোমার ধারণা?'

ঘাড় নাড়িয়া চাঁপা বলিল, 'হ্যাঁ।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'সে কি! তুমি জানো আমার কত টাকা আছে?'

চাঁপা বলিল, 'তা আমি কেমন করে' জানব? আমি শুধু জানি, আমাদের বাড়ীর রাঁধুনীটিকে আপনিই রেখেছিলেন আবার আপনিই ছাড়িয়ে—'

কথাটাকে শ্রীহর্ষ শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'আবার আপনি বললে?'

চাঁপা আবার তেমনি গম্ভীর ভাবে বললে, 'ভুলে গিয়েছিলাম।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'ভুলো না, ছি! রাঁধুনী কালই আমি রেখে দেবো।'

• •

যাক্, একটা কাজের মত কাজ সে করিল। রাঁধুনী কাল সে রাখিয়া দিবে। দাদাকে তাহা হইলে হাত পোড়াইয়া রান্না আর করিতে হইবে না।

কিন্তু যতক্ষণ না রাখে ততক্ষণ বিশ্বাস নাই।

লোকটার টাকাকড়ি আছে কি না তাই বা কে জানে! আছে নিশ্চয়ই। দাদা তিনকড়ি তাহার সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে একমাত্র কাকাবাবু—বৈকুণ্ঠ। বিবাহ এখানে এক রকম জোর করিয়া সে নিজেই করিয়াছে। কেন করিয়াছে সে কথা জানে সে নিজে আর জানেন একমাত্র তাহার অন্তর্যামী!

কিন্তু আর একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে চাঁপার মনে হইল। মনে হইল, সে কুলীনের মেয়ে, একে কুলীন, তায় গরীব। টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিবার সামর্থ্য তাহার কাকার সত্যই ছিল না। দিতে হইলে বাড়ীখানি বিক্রি করিতে হইত। এবং বাড়ী বিক্রি করা মানে, কাকাবাবু আর কতদিন, বুড়া-মানুষ, কোন্‌দিন হয়ত ফুট্‌ করিয়া মরিয়া যাইবেন, কষ্ট হইত তাহার দাদা তিনকড়ির। লেখাপড়া শিখে নাই, রোজগারও হয়ত সে করিতে পারিত না।

তাহার চেয়ে এ বরং ভালই হইয়াছে।

কিন্তু দয়া করিয়া নিজেই যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া এতগুলা সোনার গহনা দিয়া শ্রীহর্ষ যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। তাহার উপর কোথায় তাহার শালা না কে নিজে রান্না করিয়া খাইবে, কোথায় কোন্‌ বুড়া খুড়শ্বশুরের কষ্ট হইবে, তাহার জন্য, শ্বশুর-বাড়ীর জন্য কে কবে রাঁধুনী রাখিয়া দিয়াছে?

চাঁপার কেমন যেন লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু তা করুক। বোন্‌ হইয়া সে নিজে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া বসিয়া খাইবে, আর তাহার দাদা রান্না করিবে নিজের হাতে, তাহা কখনও হইতে পারে না। তা যদি হয় ত' সে বরং এখান হইতে চলিয়া যাইবে। [ক্রমশঃ

রাজমোহনের স্ত্রী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[আমাদের নায়কের ভাগ্যে কি ঘটিল]

পূর্ব্বপরিচ্ছেদবর্ণিত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধকার। মাধবের কক্ষের উজ্জ্বল কম্পমান আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইতেছিল; বাহিরের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আলোর এই প্রাচুর্য্য অসাম্যহেতু অপরূপ দেখাইতেছিল। মাধব একা ছিল, সাটিন বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি মেহগনি কৌচে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় সে বসিয়া ছিল। কক্ষে একটি মাত্র আলো সমুজ্জ্বল। কৌচের উপর দুই তিনটি ইংরেজী পুস্তক বিক্ষিপ্ত, তাহারই একটি মাধবের হস্তধৃত ছিল, কিন্তু সে তাহা পাঠ করিতেছিল এমন বোধ হইতেছিল না। উন্মুক্ত বাতায়নপথে তারকাখচিত অন্ধকার আকাশের যতটুকু দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল মাধব সেই দিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উপবিষ্ট ছিল। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিল। মোকদ্দমার ফলাফল সম্বন্ধে তাহার মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইতেছিল; তাহার ধূর্ত্ত এবং কৌশলী প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে-সকল বিবেক-বিচারশূন্য ব্যক্তিদের তাহার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহারা করিতে পারে না এমন পাপ নাই; তাহাদেরই অস্ত্রপ্রয়োগে তাহাদের সহিত যুঝিয়া উঠার ইচ্ছা ও সমর্থ্য মাধবের ছিল না। যদি তাহারা সফলকাম হয় মাধবের ভবিষ্যৎ যে কি হইবে, কে জানে? মাতঙ্গিনীর কপালেই না জানি কি আছে—তাহার ভাগ্যদেবতা যে সুগম পথে তাহাকে লইয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চিত। মথুর ঘোষের গৃহে আশ্রয় লওয়া, সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং সহসা তাহার অন্তর্দ্ধান হওয়ার সংবাদ সে পাইয়াছিল। কি কারণে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির আশ্রয় লইতে সে বাধ্য হইয়াছিল তাহা মাধব অবগত ছিল না; গুজব যে কিছু না শুনিয়াছিল তাহা নয়, তবে, মাতঙ্গিনীকে সে এত ভাল করিয়া জানিত যে, সামান্য কোনও কারণে যে, এই সাহসী যুবতী এই উপায় অবলম্বন করে নাই ইহা নিশ্চিত; মাতঙ্গিনী সহসা রমণী ও পত্নীসুলভ ধৈর্য্য হারাইয়া নিজের দুঃখ ডাকিয়া আনার পাত্রী নয়। আশ্রয় ও সাহায্যের প্রয়োজন সত্ত্বেও সে যে কেন ভগিনীর শরণাপন্ন হয় নাই মাধব তাহা ভাল রকমেই জানিত এবং মনে মনে এই কার্য্যের প্রশংসা করিত। কিন্তু তাহার গৃহত্যাগ করিবার কি হেতু ঘটিতে পারে তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই; সহসা অদ্ভুতভাবে অন্তর্দ্ধান ব্যাপারটা তাহার কাছে অধিকতর

বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল। মাতঙ্গিনী যে তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে ডাকাতদের মন্ত্রণার কথা জানিতে পারিয়া তাহারা কাজ হাঁসিল করিবার পূর্ব্বেই যথা সময়ে তাহাকে তাহা জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়াছিল—এই কথা ভাবিয়া ও মাতঙ্গিনীর ভাগ্য সম্বন্ধে সহস্র দুশ্চিন্তা তাহাকে পীড়া দিতেছিল; এক একবার সে এক একরকম ভাবে, পরক্ষণেই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব জ্ঞানে সে চিন্তাকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিল বলিয়াই এক বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হইল, যে, মাতঙ্গিনীর দুর্ভাগ্য যে রূপ লইয়াই আসুক, কোনও পাপ উদ্দেশ্য লইয়া সে পতিগৃহ ত্যাগ করে নাই। বিপদ যে তাহার একটা কিছু ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধেও তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না—তাই সে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছিল। মাতঙ্গিনী সম্বন্ধে তাহার মনে যে গভীর অথচ মধুর ভাব স্বতঃই জাগিতেছিল, বহুকষ্টে তাহা দমন করিতে হইতেছিল বলিয়া বহ্নির মত তাহা তাহার বুকে জ্বলিতে লাগিল। সেই বিদায়-দৃশ্যের স্মৃতি তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, মাতঙ্গিনীর প্রত্যেকটি কথা স্মরণে উদিত হইয়া তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সে বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। পরে আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরের স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শে দুশ্চিন্তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেখানেও দুশ্চিন্তা তাহাকে পরিহার করিল না। রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া করতলের উপর মাথা রাখিয়া সেই নক্ষত্রখচিত আকাশ এবং দূর সুনীল চন্দ্রাতপের গায়ে গাঢ় কালো ছায়ায় সজ্জিত দীর্ঘ দেবদারু গাছের সারির দিকে অপলক চক্ষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আবার সে সেই বিপদ-সাগরে ডুবিয়া গেল। নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা তাহার দৃষ্টি একটা অদ্ভুত বস্তুতে আকৃষ্ট হইল। আকাশের পটভূমিতে একটি দেবদারু কাণ্ডোত্থিত শাখা যেখানে গাঢ় কালো ছায়ার মত কিছুকাল তাহার দৃষ্টিপথে ছিল—হঠাৎ মনে হইল সেই ছায়া যেন মিলাইয়া গেল। মানুষের মনের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে, যখন সে নিজের দুশ্চিন্তায় গভীর ভাবে ডুবিয়া থাকে, এক একটা অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনাও মাঝে মাঝে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাছের গুঁড়িসংলগ্ন এই কালো ছায়ার হঠাৎ অপসরণ মাধবের কাছে বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল। তাহার যে ভুল হয় নাই ইহা স্থির, কোনও কর্ত্তিত শাখার শেষাংশ অথবা গ্রন্থিবহুল কাণ্ডের বিস্তার, যাহাই হউক, বস্তুটি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তথাপি সেই মুহূর্ত্তের জন্য ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করিয়া নিজের চিন্তায় ব্যস্ত মাধব হৃদয়ের খুব সমীপ-বর্ত্তী বস্তু লইয়াই আবার ভাবিতে বসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই মাধব আবার পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষকাণ্ডের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিল, অন্তর্হিত ছায়া পুনরায় যথাস্থানে আসিয়াছে। এইবার সামান্য কৌতূহলের উদ্রেক হওয়াতে সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অভিনিবেশ সহকারে কিছুক্ষণ ধরিয়া স্থানটি লক্ষ্য করিতে লাগিল। আবার হঠাৎ বস্তুটি সরিয়া গেল। স্পষ্ট বুঝা গেল উহা গতিশীল। সে ভাবিল, ব্যাপারখানা কি? প্রথমে মনে হইল, প্যাঁচা কিম্বা ওই জাতীয় নিশাচর পাখী হইবে; অন্ধকার এবং দূর বলিয়া শাখার উপর নিদ্রিত প্রাণীটিকে দেখা যাইতেছে না। ছায়াটি আবার দেখা গেল। মাধব এবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াও বাদুড় অথবা অন্য কোনও পাখীর আকৃতির সহিত ছায়াটির সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইল না। বরঞ্চ মানুষের মাথার সহিত উহার যেন অনেকটা মিল আছে। আকাশের গায়ে ছায়া স্পষ্ট হইল; মাধবের মনে হইল গাছের গুঁড়ির অন্তরালে যেন গলার খানিকটাও সে দেখিতে পাইল। অবশ্য এমন উচ্চে ছায়াটি পরিলক্ষিত হইল যেখানে সচরাচর মানুষ উঠে না। বারবার ছায়ার আবির্ভাব ও তিরোভাবে মাধবের কৌতূহল অথবা আশঙ্কা অথবা উভয়ই এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, সে কাছে গিয়া পরীক্ষা করিতে চাহিল। মাধব প্রথম ভাবের ধাক্কাতেই কাজে নামিয়া যায়; এক্ষেত্রেও পরীক্ষার কথাটা মনে উদিত হওয়া মাত্রই সে নিজে গিয়া গাছের আড়ালে কেহ আছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবে স্থির করিল। বৈঠকখানায় যে ক্ষুদ্র রৌপ্যমণ্ডিত তরবারি ঝুলিতেছিল তাহা লইয়া নিজেকে সশস্ত্র করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। পুনরায় সে সদর দেউড়ী হইতে গাছটির দিকে ভাল করিয়া চাহিল; দেউড়ী হইতে দেবদারু সারির দূরত্ব বেশী নয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্টস্থানে সে কিছুই দেখিতে পাইল না। এদিক ওদিক সন্ধান করিয়াও খোঁজ পাওয়া

গেল না। সুতরাং গাছের গোড়া পর্য্যন্ত তাহাকে যাইতে হইল। কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই প্যাঁচার কর্কশ চীৎকারের মত একটা শব্দ তাহাকে চমকাইয়া দিল এবং দেখিতে দেখিতে কঠিন একটা আঘাতে তাহার হাত হইতে কে যেন তরবারিটি কাড়িয়া লইল। এই হঠাৎ আক্রমণকারী কে, বা কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই একটা বলিষ্ঠ হাতের বৃহৎ এবং কর্কশ থাবা তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপুলকায় একটি লোক গাছ হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। মাধব ঘোষ তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি ভীষণদর্শন পুরুষকে দেখিতে পাইল। তাহার দেহ তেজোব্যঞ্জক এবং সে সশস্ত্র ছিল।

মাধবের অস্ত্র যে ব্যক্তি কাড়িয়া লইয়াছিল তাহাকে লক্ষ্য করিতে অপর ব্যক্তি অতি মৃদুস্বরে বলিল, বেঁধে ফেল্, বেঁধে ফেল্; মেঘ না চাইতেই দেখ্ছি জল। আগে ওর মুখ বন্ধ কর্।

অন্য ব্যক্তি ততক্ষণে একটা গামছা ও খানিকটা দড়ি তাহার কোমর হইতে বাহির করিয়া গামছা মুখে পুরিয়া মাধবের কণ্ঠরোধ করিয়া তাহার হাত পা বাঁধিতে লাগিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি মাধবকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। মাধব দেখিল, ধস্তাধস্তি করিয়া কোনও লাভ নাই, চীৎকার করিয়া কোনও লাভ নাই, চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করাও অসম্ভব; সে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করিল।

পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে পুনরায় হুকুম হইল, একে পাজাকোলা করে ধরে নিয়ে চল্।

বন্ধনকারী মাধবকে তাহার বিরাট বাহুর সাহায্যে শূন্যে তুলিল এবং প্রায় অবলীলাক্রমে সেই হতভাগ্য যুবককে লইয়া চলিল। অন্যজন তাহার অনুসরণ করিল। তাহারা এমন নিঃশব্দে ও তৎপরতার সহিত কার্য্য সমাধান করিল যে বাড়ীর কেহই এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[সতর্ক প্রেম]

আমাদের উপন্যাসের নায়কের ভাগ্যে সহসা এরূপ বিপর্য্যয় যখন ঘটিল, (পাঠক নিশ্চয়ই মাধবকেই এই উপন্যাসের নায়ক বলিয়া বুঝিয়াছেন) মথুর ঘোষ তখন বিশ্রামসুখমগ্ন, অথবা আরও যথাযথ বর্ণনা দিতে হইলে বলিতে হয়, সে তারার কক্ষে বিশ্রাম করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। তাহার অর্দ্ধশায়িত দেহের সন্নিকটে কৌচের উপরেই বসিয়া বসিয়া তারা হাতের ক্ষুদ্র সূক্ষ্মকারুকার্য্যমণ্ডিত খস্খস্ নির্ম্মিত পাখার সাহায্যে স্বামীর ক্ষুব্ধ আত্মাকে সস্নেহে ও পরম ধৈর্য্যের সহিত ঘুম পাড়াইতে চেষ্টিত ছিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতেছিল না, কারণ যদিচ মথুর ঘোষ নীরব ও মুদিতনেত্র অবস্থায় ছিল, ক্ষণে ক্ষণে তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া তাহার মনের আশঙ্কা-ব্যগ্রতার পরিচয় দিতেছিল; স্বামীর এই ব্যাকুলতার কারণ তারার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তারাই কথা কহিল।

তারা বলিল, তুমি যে ঘুমোচ্ছ না!

—ঘুম আস্ছে না—ঘুমের সময় তো আমার ঠিক এটা নয়।

—তবে ঘুমুতে এলে কেন? দেখ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, আমার আস্পর্দ্ধা ভেবে তুমি যদি রাগ না কর তো বলি!

—কিছু বলবার থাকে তো বলই না!

—তোমার মনে সুখ নেই; যে তোমাকে সত্যিই ভালবাসে তারও কাছে কি তার কারণ বলতে বাধা আছে?

মথুর চমকিয়া উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিবার জন্য হাসিবার ভঙ্গীতে জবাব দিল বটে, কিন্তু তাহার স্নেহ-দৃষ্টির কাছে তাহার এই প্রয়াস ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না। মথুর বলিল, পাগল! যত আজগুবি কথা! আমার আবার দুঃখ হবে কেন?

তারা ব্যগ্র অথচ স্নেহপূর্ণস্বরে বাধা দিয়া বলিল, প্রিয়তম, আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা ক'র না। আমি জানি তুমি আমাকে আর আমার ভালবাসাকে উপেক্ষা কর, আমরা মেয়ে মানুষ, স্বামী যে আমাদের কি—আমি জানি না, স্বামী আমাদের কি নয়! তুমি সারা সংসারকে ফাঁকি দিতে পারবে কিন্তু আমাকে পারবে না।

মথুর বলিল, তুমি পাগল না হ'লে আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতে না।—তাহার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহা তাহার নিজের কথারই প্রতিবাদ করিতেছিল।—এসব ভাবার কারণটাই খুলে বল।

তারা বলিল, এর কারণ তুমি নিজে। শোন। জানি, অনেক বিষয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হয়; তোমার তালুক, তোমার মামলা-মোকদ্দমা, তোমার খাজনা, তোমার কাছারী, তোমার বাড়ী, বাগান, দাসদাসী, তোমার সংসার—অনেক কিছু নিয়েই তোমাকে ভাবতে হয়; আমার কি আছে? আমার স্বামী আর আমার মেয়ে। আমি যদি বলি, গত তিন দিন ধ'রে আমি লক্ষ্য ক'রছি আমার স্বামীর চলার ভঙ্গীতে পূর্ব্বেকার সেই তেজ আর গর্ব্বের অভাব হয়েছে—তাতে অবাক হবার কি আছে? তোমার চোখে শূন্য দৃষ্টি, মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত ভাবে তুমি চেয়ে থাক। তুমি আগের চাইতে কথা কম বল—তোমার হাসি তোমার অন্তরের হাসি নয়। দেখ, মায়ের চোখ এটা লক্ষ্য করতে কখনও ভুল করে না যে তার সন্তানকে তার বাবা আগের মত তেমন আদরের সঙ্গে বুকে নেয় না! হাঁা, গত তিন দিন ধ'রেই আমি দেখছি, বিন্দু যখনই তোমার হাত ধরেছে কিম্বা তোমার কাছে বসে খেলা করেছে, তুমি তার সঙ্গে কথা বলনি। দিদির সঙ্গেও তো কই তোমাকে কথা বলতে দেখি না!

দিদির কথা বলিতে বলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য তারার ব্যগ্র মুখভঙ্গীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল; একটা কুটিল হাসি তাহার মুখে খেলিয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তারা বলিতে লাগিল, দিদিও দেখছি এক'দিন খুব দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে; তবু তুমি ভদ্রভাবে তার কোনও কথাই শুনছ না। আর তোমার এই দীর্ঘনিঃশ্বাস! তুমি কি এখনও বলতে চাও, তোমার কিছু হয় নি?

মথুর উত্তর দিল না।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া তারা আবার বলিতে লাগিল, তুমি কি আমাকে তোমার দুঃখের অংশভাগী হওয়ার উপযুক্ত মনে কর না? আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাস না।

তারা স্বামীর উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ চুপ করিল। মথুর তখনও নিরুত্তর। প্রেমময়ী পত্নীর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বসিয়া রহিল; তাহার বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

তারা আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, তোমার মনে কোনও সুখ নেই, তুমি আমার কাছে গোপন ক'রো না, ফাঁকি দিও না আমাকে—গভীর যন্ত্রণায় তাহার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল—আর ঠকিও না আমাকে, কিছু লুকিও না আমার কাছে, সব খুলে বল। আমার জীবন দিয়েও যদি তোমার মনের সুখ ফিরিয়ে আনতে পারি আমি তাই ক'রব—তুমি সুখী হও।

মথুর তবুও নির্ব্বাক হইয়া রহিল। উপহাস, তর্ক বা অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। একটা কঠোর গাম্ভীর্য্যের আবরণে সে বসিয়া রহিল এবং ইতিপূর্ব্বে তাহার মুখভাগে যে প্রাণহীনতা ও কপটতা আনিয়া সে তাহার পত্নীর প্রশ্নধারা এড়াইয়া চলিতেছিল, তাহা দূর হইয়া তাহার মুখে সত্যকার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল; এই ব্যাকুলতা তাহার প্রতি দর্শকের হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিলেও কোথায় যেন একটা বাধা ঘটাইতেছিল। তারার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। রমণীসুলভ হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা সে স্বামীর মুখভাবের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল।

ব্যথিত পত্নী বলিয়া উঠিল, কি কুক্ষণেই না আমি জন্মেছিলাম! এখনও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি হয় নি! তোমাকে যদি প্রাণ দিয়েও সুখী করতে পারি তাও আমি ক'রব! কি শুভক্ষণেই না জানি জন্মেছিলাম! তোমার দুঃখের কারণটাও আমি জানতে পাব না?

স্ত্রীর ক্রন্দন মথুরের হৃদয় স্পর্শ করিল। অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গীতে সে অবশেষে বলিল, আমার দুশ্চিন্তার কারণ আর তোমার কাছ থেকে গোপন রেখে লাভ নেই তারা। তোমার কাছেও আমি কিছু খুলে বলতে ভরসা করছি না—তুমি সে জন্য দুঃখ ক'রো না। তোমার শোনার উপযুক্ত কথা সে নয়।

স্বামীর এই কথা শুনিয়া তাহার ম্লান অথচ মহিমান্বিত মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্ত কালের জন্য গভীর যন্ত্রণার রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে শান্ত সহজভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, তাহ'লে আমার একটা সামান্য অনুরোধ রাখবে বল, আমাকে কথা দাও!

কিন্তু তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অদূরে প্যাঁচার চীৎকারের মত এক বিকট কর্কশ-হুঙ্কার শোনা গেল। সেই শব্দ শুনিয়া মথুর চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারা জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগো, তুমি চমকালে কেন? শব্দটা শুনে আমার বড্ড ভয় হ'ল বটে, কিন্তু ও তো প্যাঁচার ডাক।

আরও কর্কশ আরও ভীষণভাবে সেই শব্দ আবার বাতাসে ভাসিয়া আসিল। তারা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মথুর বেগে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তারা বিস্মিত হইল। শব্দটা যে প্যাঁচার চীৎকার সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল না—প্যাঁচার ডাক না হইলেও তাহা এমন কিছু ভয়াবহ নয়। অন্ততঃ তাহার মনে হইল যে, এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা ছাড়া উহাতে ভয়ের বিশেষ কিছু নাই—এই অমঙ্গল-ধ্বনি লোকে ত প্রত্যহ শোনে এবং সহ্য করে। তাহার একবার শুধু মনে হইল আওয়াজটা যেন নিশাচর পাখীর ডাকের মতনই কিন্তু ঠিক যেন প্যাঁচার ডাক নয়। তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়াতে সেও কক্ষের বাহিরে আসিল। স্বামী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছেন বুঝিয়া সে উপরের সিঁড়ি দিয়া ছাদে গিয়া উঠিল, সেখান হইতে ব্যাপারটার কিছু কিনারা হইতেও পারে। যেদিক হইতে শব্দটা আসিয়াছিল সেদিকে কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া থাকিয়াও সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। সুতরাং শব্দটা প্যাঁচারই চীৎকার হইবে এইরূপ ভাবিয়া লইয়া সে সেদিকে বেশী নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিল না। পাখীটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি ডালপালার অন্তরালে অথবা ছাদের কোণে কার্নিশের উপর কোথাও বসিয়া আছে—স্বামী এই সুযোগে হঠাৎ কক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহার মনের কোণে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছিল তাহাই সামলাইয়া লইলেন। তারা নীচে নামিতে যাইবে এমন সময় সহসা দেখিল একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি তাহাদের খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইতেছে—বাড়ীর কোনও স্ত্রীমূর্ত্তি তাহা নয়—স্পষ্ট পুরুষের মূর্ত্তি। ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া তারা বুঝিল মূর্ত্তিটি তাহার স্বামীর—মথুর দরজা পার হইয়া দ্রুতবেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। তারা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সমস্ত দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার ভয় হইল সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে। সহস্র অনিশ্চিত আশঙ্কা ও যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ তাহার মনে ঝড়ের মত বহিয়া গেল। তাহার স্বামী অপদার্থ হওয়া সত্ত্বেও সে তাহাকে ভালবাসিত, কোনও পৈশাচিক পাপকার্য্যে যে সে সহায় হইতে পারে, এরূপ ভাবা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তথাপি স্বামীর ভবিষ্যৎ নানা বিপদের আশঙ্কায় তাহার মন বিষণ্ন হইল। সে সেখানেই প্রায় স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল; নীচু আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে স্থির অথচ উদাস দৃষ্টিতে স্বামীর প্রত্যেকটি গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হঠাৎ আর সে স্বামীকে দেখিতে পাইল না। তবু সে সেদিকেই চাহিয়া রহিল—অন্ধকারের মধ্যে সবল দীর্ঘ মথুরের কোন চিহ্নই সে দেখিল না। সে এদিক ওদিক চাহিল—তাহার ভয় দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই বৃহৎ প্রাসাদের শিখরে অবিচলিত ভাষাহীন মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত শোভমানা তারা অনেক—অনেক ক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নেত্রে অরণ্যের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে হতাশ হইয়া স্বামীর সন্ধান ছাড়িয়া দিবে এমন সময়ে সহসা তাহার প্রার্থিত মূর্ত্তি তাহার চঞ্চল দৃষ্টিপথে পড়িল। মথুর তখন (পাঠকের নিকট) 'গুদাম মহল' নামে পরিচিত বাড়ীর পরিত্যক্ত অংশ হইতে বাহির হইবার ক্ষুদ্র লৌহ-দরজা দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইতেছিল।

স্বামীকে নিজ গৃহের অংশ বিশেষে দেখিতে পাইয়া তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। তথাপি তাহার ভয় তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। বাড়ীর বাহিরে স্বামীর এই নৈশ গোপন অভিসার, রাত্রির এই প্রহরে এবং বাড়ীর এই অংশে যেখানে কেহ সচরাচর পদার্পণ করে না সেখানে তাহার চলাফেরা—পূর্ব্বের আশঙ্কা ও ভীতি এবং সেই নিশাচর পক্ষীর অশুভ চীৎকার, যাহা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল—এই সব-কিছু মিলিয়া তারার মনে অজ্ঞাত কোনও বিপদের সূচনা করিতেছিল। তারা তাহার পর্য্যবেক্ষণ-স্থান পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় স্বামীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আবার কিছুকাল সে কিছুই দেখিতে পাইল না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল, তাহার স্বামী সেই গুপ্ত দরজা দিয়া আর ফিরিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল—তাহার স্বামীর ব্যক্তিগত কোনও বিপদাপদ ঘটার কোনও আশঙ্কা নাই দেখিয়া সে পুনরায় নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

হঠাৎ তাহার মনের অন্ধকারে সে যেন আলোকরেখা দেখিতে পাইল। আচ্ছা, এই ঘটনার সহিত তাহার স্বামীর গুপ্তকথার কোনও সম্বন্ধ নাই তো! তারা কি করিবে স্থির করিয়া ফেলিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মথুর সে কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহাকে আরও অস্থির, আরও চঞ্চল দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চোখের কোণে যেন একটা গর্ব্বের আনন্দ! তারা যাহা দেখিয়াছে সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। [ক্রমশঃ

ঝড়ের পরে

[শিল্পী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত
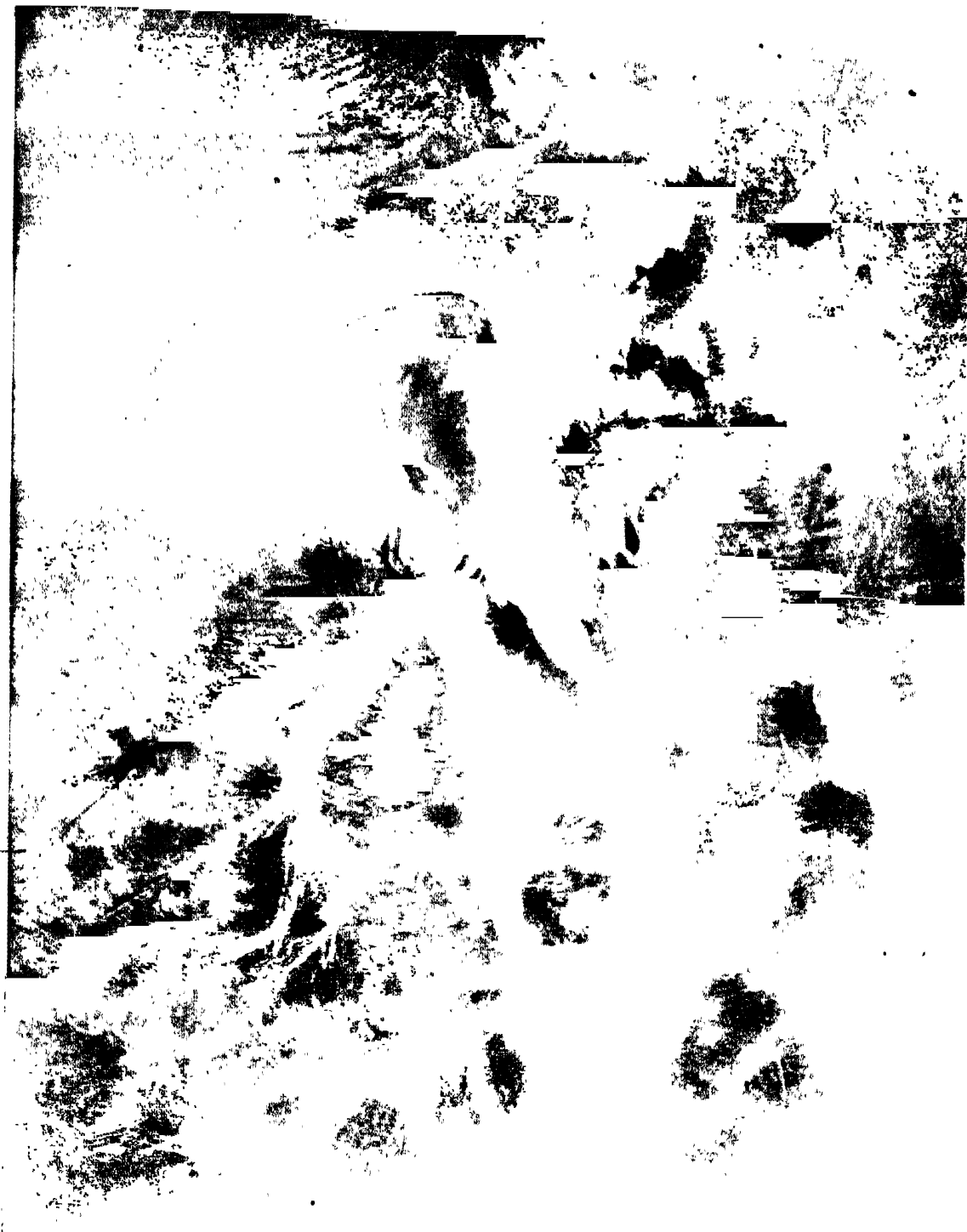
পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়

[নিম্নলিখিত নূতন পুস্তকগুলি আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। যথাসময়ে সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।]

অধিকার—শ্রীমতী যোগমায়া দেবী। সংস্কৃত পুস্তকালয়, ৫৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা।

আত্ম-জীবন স্মৃতি (১ম ভাগ)—শ্রীআশুতোষ ঘোষ। ১ ব্র্যাকোয়ার স্কোয়ার, কলিকাতা।

চাঁদের বুড়ী—শ্রীগুরুসদয় দত্ত। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ॥৵৹।

মুক্তির রূপ—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বেঙ্গল বুক সোসাইটি, ১৮৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চারি আনা।

ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত। বেঙ্গল বুক সোসাইটি। মূল্য চারি আনা।

মাধুকরী—শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল বুক সোসাইটি। মূল্য চারি আনা।

ছিন্ন পাঁপড়ি—শ্রীনবগোপাল দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দেড় টাকা।

দুইখানি একাঙ্ক নাটিকা—(হারজিৎ, ভাবী বিদ্যালয়) কমল মুখোপাধ্যায়। মূল্য ।৶৹ আনা।

স্কুলের ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী দুইখানি একাঙ্ক নাটিকা। প্রথম খানিকে (হারজিৎ) নাটিকা বলা চলেনা, সদুপদেশমূলক বক্তৃতামাত্র। দ্বিতীয়টিতে (ভাবী বিদ্যালয়) লেখকের নাট্য-রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবী বিদ্যালয়ের ৪৯-ঘকে ভোলা কঠিন।

স্বর সাধনা—পণ্ডিত কে. জি. ঢেকণে। ৭ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ॥৹ আনা।

পুস্তকখানি প্রথম শিক্ষার্থীর স্বরসাধনার সাহায্যার্থে রচিত। বর্ত্তমানে বাংলায় সস্তা হারমোনিয়ামের সাহায্যে সঙ্গীতচর্চ্চার যে কদর্য্য রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর কণ্ঠস্বরের দিকে লক্ষ্য কমিয়াছে। ফলে গানের নামে এদেশে আজ যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকে হারমোনিয়াম সাহায্যে আবৃত্তি বলা চলে মাত্র। এই ধরণের গাইয়েদের (এবং ইঁহারাই অধিক) কাছে 'সা' ও 'নি'য়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। বর্ত্তমান পুস্তিকার লেখক ওস্তাদ সাঙ্গীতিক। তিনি তাঁহার এই পুস্তিকাতে স্বরসাধনার যে ক্রমের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহার প্রচার দেশের সঙ্গীতচর্চ্চা হইতে অনেক পঙ্কিলতা দূর করিতে সক্ষম হইবে।

মুরগীর চাষ—ওয়াশেরুল হক। শঙ্করপুর পোল্ট্রি ফার্ম্ম, সিউড়ী, বীরভূম। মূল্য ।৵৹ আনা।

লেখক হাতেকলমে মুরগীর চাষ করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতাসঞ্জাত যাবতীয় তথ্য এই বইখানিতে পাওয়া যাইবে। এই বইএর সাহায্যে যে কোন বেকার যুবক অতি সামান্য মূলধনের সাহায্যে একটি লাভবান ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

মরু-সেনা—আজিজুল হাকিম। ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। দাম দশ আনা।

কয়েকটি মুসলমানী উপকথা ও একটি হিন্দু আখ্যানকে (অভিমন্যু) কবি ছন্দে স্মরণ করিয়াছেন। শেষ কবিতা 'অভিমন্যু'র কয়টি কলি নীচে উদ্ধৃত হইল—

> হিন্দু যদিগো জানিত বন্ধু কারবালা-ইতিকথা
> মুসলিম যদি জানিত কুরুক্ষেত্রেরই বারতা।
> দুই ভাই খাঁটি বীরেরই জাতি যে এই বিশ্বাস ল'য়ে
> ভ্রাতৃবিরোধ রণ ভুলে গিয়ে বাহিরিত ধরা-জয়ে।

ভোরের সানাই—আজিজুল হাকিম। ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। দাম এক টাকা। ছাপা বাঁধাই মনোরম।

প্রত্যেক কল্পনা-প্রবণ ব্যক্তিরই এমন একটি বয়স আসে, যখন তাহার ছন্দ-রচনার ইচ্ছা জাগে। হাতের কাছে অপরের রচিত কাব্য-পুস্তক যখন স্তূপীকৃত, তখন এ বয়সে কবিতা-রচনার ইচ্ছাকে সংযত করা সুকঠিন। সংযত করিবার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। নিজের ঘরে বসিয়া খাতাতে কবিতা যত খুসী লিখিলে আপত্তিরও হেতু নাই। সত্যকার সাধনা করিলে, যদি শক্তি থাকে, সাধনা সিদ্ধিযুক্ত হইতে পারে। মুস্কিল হয়, যেখানে সাধনাকে সিদ্ধি বলিয়া চালাইতে চাই। বর্ত্তমান কবিতার বইখানি পড়িয়া শুধু সেই কথাই মনে হইতেছে। কবিতাগুলি পড়িয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না, এগুলি ছাপাইবার এমন কি তাগিদ্ ছিল! দেখিলাম, 'আশীর্ব্বাণী' নাম দিয়া প্রারম্ভে কয়েকটি প্রশংসা-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'তোমার কবিতা আমার ভালো লেগেচে।' তাঁহার মতকে সমর্থন করিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম। অবশ্য, পাণ্ডুলিপি অবস্থায় এ কবিতা সম্বন্ধে আমাদের মত জানিতে চাহিলে, আমরাও হয়তো রবীন্দ্রনাথের কথাই বলিতাম, কিন্তু তাই বলিয়া বই করিয়া ছাপাইবার মত নহে, ইহাও বলিয়া দিতাম। হয় তো চেষ্টা করিলে এই পুস্তকের লেখকও একদিন পাঠ্য কবিতা লিখিতে পারিতেন, কিন্তু সে আশা আর আমাদের পোষণ করিতে ভরসা হয় না। কবি নিজে লিখিয়াছেন, তাঁহার কাব্যসাধনার দিনগুলি আঙ্গুলে গণা যায়, এত শীঘ্র কবিতার বই

বাহির করিবার দুঃসাহস তাঁহার ছিল না, শুধু বন্ধু-সঙ্গের আব্দার এড়াইতে না পারিয়াই ইহা করিতে হইয়াছে। এ পৃথিবীতে কে বন্ধু ও কে শত্রু বুঝা একটু কঠিন।

সদ্ভাবশতকের কবি—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন সম্পাদিত। মূল্য ছয় আনা। (উপস্বত্ব কবির স্মৃতিরক্ষা কল্পে ব্যয়িত হইবে।)

বইখানি ১৩৩০ সনে প্রকাশিত। ৩৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের স্বকথিত জীবন-বৃত্ত। ইঁহার অনেক কবিতা বাংলা দেশে প্রায় প্রবাদ-বাক্যের মত প্রচলিত হইয়াছে—'চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন', 'যে জন দিবসে মনের হরষে','কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ', 'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়' ইত্যাদি কবিতা আজও মুখে মুখে শোনা যায়। বর্ত্তমান বাঙলা কাব্যের মাপকাঠিতে এ কবিতাগুলি হয়তো খুব উচ্চ দরের বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই কবিতাগুলির ও ইহাদের রচয়িতার জন্য একটি স্থান নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সুতরাং এ কবির জীবনীর একটি মূল্য আছে। কবি ১২৪১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬০ কি প্রায় ঐ সময় হইতে তাঁহার সাহিত্য-জীবন আরম্ভ। প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশের এক দরিদ্র কবির দুঃখের কাহিনী এই পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একালের সাহিত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ইহাতে জ্ঞাতব্য তথ্য পাইবেন।

স্মৃতিপূজা—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন। মূল্য আট আনা। ৯৫ পৃষ্ঠা।

মফঃস্বলের প্রেস হইতে ছাপা, হলুদ কাগজের কভার সম্বলিত এই পুস্তিকাখানি সমালোচনার্থে পড়িতে বসিবার পূর্ব্ব অবধি বুঝিতে পারি নাই, ইহাতে বিশেষ পাঠ্য বস্তু কিছু থাকিতে পারে। পড়িয়া বুঝিলাম, মাত্র বাহিরের মূর্ত্তি দেখিয়া কোন কিছুর বিচার করা কি নির্ব্বুদ্ধিতা। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বই—বিষয়-বস্তু, বিগত যুগের কয়েকজন সাহিত্যিকের সহিত লেখকের পরিচয়—বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন-সম্পাদক), জজ-কবি বরদাচরণ মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের এক একটি সামান্য কাহিনী এই পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাহিনী হিসাবে এগুলি বিশেষ কিছুই নয়—কিন্তু পড়িতে পড়িতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের আবহাওয়ায় অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়া যাইতে পারিয়া সত্যকার আনন্দ লাভ করিলাম। বর্ত্তমানের প্রত্যেক সাহিত্যিকের পুস্তিকাখানি পড়িয়া দেখা উচিত।

ফরাসী বিপ্লব—রেজাউল করীম। বর্ম্মণ পাব্লিশিং হাউস, ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বাংলা ভাষায় সম্প্রতি এক প্রকার ভয়াবহ প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে—যে কোনও কঠিন বিষয় লইয়া এক প্রকার রচনা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখা যায়, সাধারণ পাঠক সে রচনা পড়িয়া লেখকের পাণ্ডিত্যের বহর দেখিয়া অবাক হইয়া যান এবং তাঁহার লিখিত বিষয়কে নির্ব্বিবাদে সে সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লন। এই ধরণের অধিকাংশ রচনাই মিথ্যা ও ভুল সংবাদে ভরা। ইহাদের জন্মদাতা ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধ কিম্বা কোনো ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকা। মূল বস্তুর সহিত কোনো প্রকার পরিচয় না রাখিয়াই তৎসম্পর্কে আলোচনাকে মাত্র ভিত্তি করিয়াই এই সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা লেখা হয়। ফল যাহা দাঁড়ায় তাহা মূল বস্তুর সম্বন্ধে যাঁহার সামান্য জ্ঞানও আছে তিনি বোঝেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানি এই শ্রেণীর। ইহার প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখিলাম,—'রিনের্স' এবং কয়েক পৃষ্ঠা পরে পড়িলাম 'ভার্সেল'। লেখক ফরাসী উচ্চারণের বিন্দু বিসর্গও জানেন না, অথচ সহজ ইংরেজী করিয়াও কথাগুলি বলিতে চান না। শুধু উচ্চারণের ভুল থাকিলেও বুঝিতাম, লেখকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। চতুর্দ্দশ লুই বিষয়ে তিনি লিখিতেছেন—"মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়া যান যে 'আমার মৃত্যুর পর এক মহাপ্লাবন আসিয়া ফ্রান্সকে ভাসাইয়া দিবে।'" ভবিষ্যদ্বাণী করিবার মত লোকই ছিলেন বটে চতুর্দ্দশ লুই! 'After me the deluge' কথাটি তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বলেন নাই, করীম সাহেবের ইহা জানা উচিত ছিল। তারপর দেখিতেছি, চতুর্দ্দশ লুইয়ের পরই তিনি ষোড়শ লুইকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন—পঞ্চদশ লুইয়ের কথা বলিবার প্রয়োজনও মনে করেন নাই। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে যাঁহার এতটুকু জ্ঞান আছে, তাঁহার পক্ষে এ পুস্তক পাঠ করা দায়। আর যদি ছেলেদের জন্য ইহা রচিত হইয়া থাকে—তাহা হইলে 'জঘন্য ফিউডাল-প্রথা'টি কি বস্তু তাহা বুঝাইয়া দেওয়া দরকার ছিল।

ফুলকলি—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কামালকাচনা, রংপুর। মূল্য ।০ আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্য পদ্যগুচ্ছ—অপাঠ্য।

রাজা গণেশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। বিজয়া সাহিত্যমন্দির, কাশীধাম। মূল্য এক টাকা।

একখানি পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটক অর্থে নাট্যকার কি বুঝিয়াছেন জানি না। নাটোল্লিখিত দুই একটি ব্যক্তি ঐতিহাসিক হইলেই নাটক কিছু ঐতিহাসিক হয় না। সমগ্র পুস্তকমধ্যে কোথাও এমন কোনো ঐতিহাসিকতার ছাপ নাই, যাহাতে ইহাকে কোনো বিশিষ্ট কালের উপর রচনা বলা চলে। চিরাচরিত প্রথায় মুসলমান বাদশা, হিন্দুরাজা, বাদশাজাদী ও হিন্দুমহিষী এবং একজন রাজগুরু নিতান্ত বর্ণহীন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কোথাও কোন ঘটনা-সংস্থান নাই—নাটকীয় রীতি অনুযায়ী যাহাকে ঘাতপ্রতিঘাত বলা হয়, তাহার কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই, কোথাও ঘটনাপারম্পর্য্যে সামান্য বিস্ময়েরও অবকাশ নাই। চরিত্রও এমন একটি নাই যাহাকে নাকি চেষ্টা করিয়াও মনে রাখা যায়। ভূমিকায় লেখা হইয়াছে' "ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নাট্যশিল্পী ক্ষীরোদপ্রসাদের তিরোভাবের পর হইতে বাংলার নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার আর পূর্ব্বের ন্যায়

উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে না। এই দুঃসময়ে উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ..."— ভূমিকা-লেখকের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিতে ইচ্ছা করে,.. দুঃসময়কে আরও ঘনীভূত করিয়াছেন।

মজুরী ও মূলধন—(মার্কস্‌বাদের আলোচনাসহ) ফণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মণ্ডল ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া। মূল্য আট আনা মাত্র

১৮১৮ সনে মার্কসের জন্ম। ১৮৪২ সনে তিনি 'রিনিশে৺ৎসাইটুং পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৮৪৯ সনে ৫ঠা এপ্রিল হইতে এই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার 'মজুরী ও মূলধন' (Wage Labour and Capital) প্রকাশ সুরু হয়—কিন্তু এসকল ইতিহাসই এই ৮১ পৃষ্ঠার বইখানিতে সন্নিবিষ্ট আছে। বইখানি আমরা আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। অনুবাদক মূল বিষয়কে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাই কোথাও তাঁহার ভাষা অস্পষ্ট হয় নাই। অর্থনীতি বিষয়ে কোনো চিন্তা বাংলাভাষায় সরল করিয়া তোলা কষ্টসাধ্য, কেননা আমাদের চিন্তা অর্থনীতিমূলক নয়। বাংলা পরিভাষা এ বিষয়ে আজও পর্যাপ্ত গড়িয়া উঠে নাই। এ সব সত্ত্বেও অনুবাদক মজুরী ও মূলধনের মূলতত্ত্বগুলি যে বাংলায় প্রাঞ্জল করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন ইহা কৃতিত্বের কথা। এ বই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে

দিল্‌রুবা—আবদুল কাদির। পি. সি সরকার এণ্ড সন্স; ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অধুনা-লুপ্ত 'জয়তী'র সম্পাদক শ্রী আবদুল কাদির বাংলা সাহিত্যে নূতন এতো নন—অনেক দিন ধরিয়া এ ক্ষেত্রে তিনি গদ্যে-পদ্যে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানির অধিকাংশই তাঁহার কিশোর বয়সের রচনা। ভূমিকায় শ্রীমোহিতচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—'অল্পবয়সের রচনার মধ্যে যে সব দোষ ত্রুটি থাকা সম্ভব, এই কবিতাগুলিতে তাহার দুই একটা হয় তো পরিলক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু কবিতাগুলির অপূর্ব্ব ছন্দ, প্রসাদগুণ ও ভাষার মাধুর্য্যে ঐ সব সামান্য ত্রুটি রসপিপাসু পাঠকের মনে কোন প্রকার উদ্বেগের সৃষ্টি করে না বলিয়াই মনে হয়।' একটি কবিতা হইতে নীচে উদ্ধৃত করা হইল—

যুগ যুগান্তরে বসি, যে যেথানে করেছে সাধনা
যে কেহ জীবন দিল মানুষের লাগি'—
জীবনে করিব মুক্ত তাহাদের সত্য আরাধনা,
যত সব তপস্যার আমি হব ভাগী।
মানব জন্মের আমি পেয়েছি সহজ অধিকার
দিকে দিকে বিকশিয়া সার্থকিব সে-জন্ম আমার!
মৃত্যুরে ভরিব দিয়া জীবনের মত্ত উন্মাদনা,
এ বিশ্বের প্রেমে র'বো চির অনুরাগী।

ব্যোমকেশের ডায়েরী—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পি. সি. সরকার এণ্ড সন্স; ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০, ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অপরিচিত লেখক নন্‌ কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার 'জাতিস্মর'-এর পরিচয় আমরা দিয়াছি। 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' পড়িবার আগে ভাবিয়াছিলাম, লেখকের লেখার ধরণ জানা আছে, সুতরাং সমগ্র বইখানি খুঁটিনাটি করিয়া না পড়িয়াও সমালোচনা লেখা চলিবে (পাঠকগণ সমালোচকের এই ত্রুটি ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন, হাতের কাছে স্তূপীকৃত পুস্তক লইয়া প্রত্যেকখানি আদ্যোপান্ত পড়া সম্ভব হয় না)। কিন্তু শরদিন্দুবাবু আমাদিগকে জব্দ করিয়াছেন। ডায়েরী পড়িতে বসিয়া দেখি, কোথায় সেই ইতিহাসসন্ধী গল্পের লেখক আর তাঁহার সাহিত্য-ঘেঁষা ভাষা, আর কোথায় এই ডায়েরীর নিপুণ শিল্পী ও তাঁহার সহজ, সাবলীল ষ্টাইল। তারপর একটির পর একটি গল্প শেষ করিয়া চলিলাম, ইচ্ছা থাকিলেও কোন গল্পের একটিমাত্র প্যারাগ্রাফও বাদ দিতে পারিলাম না। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের সহিত একাদিক্রমে দুই ঘণ্টা কাটাইয়াও বুঝিলাম না যে, এতখানি সময় তাঁহার সহিত যাপন করিয়াছি। ইংরেজীতে বলিতে ইচ্ছা করে, Hats off to Mr Banerjee. শার্লক হোম্‌স্ আর ডক্টর ওয়াটসনের কাহিনী পাঠ করিয়া বহুদিন মনে হইয়াছে এই ধরণের গল্প কেন বাংলা সাহিত্যে রচিত হয় না। কোনান ডয়লের সে-লেখা ডিটেকটিভ গল্প হইয়াও সাহিত্য। শরদিন্দুবাবুকে কোনান ডয়লের সহিত তুলনা করিতেছি না, কিন্তু তাঁহার গল্পগুলি পড়িয়া মনে হইতেছে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে শার্লক হোম্‌সের মত গল্প লিখিত হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা আশার কথা—গল্পগুলি বিদেশীর নকল নয়, গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা।

গলার কাঁটা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা দশ আনা।

একখানি উপন্যাস। চরিত্র-চিত্রণ ও চিত্র-চয়ন, উপন্যাস লিখিবার যে দুইটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, লেখকের সে দুটিতেই হাত আছে। অধিকন্তু পল্লী-জীবনের সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় বইখানিকে বর্ত্তমান নাগরিক-জীবনগ্রস্ত বাঙালী পাঠকের কাছে আদরণীয় করিবে- পড়িয়া, ধূলিমলিন, ধূম্রপঙ্কিল শহরের উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে বসিয়া অনেকখানি নীল আকাশ ও শ্যামল বৃক্ষ দেখিবার আনন্দ পাইলাম। মনে হইতেছে, লাউ গাছে লাউ 'বশ' হইতেছে, কুমড়া পাকিতেছে, কুল গাছের কুল ফুরাইবার সময় হইল, আমের গুঁটি বেশ বড় হইতে চলিল, শিবরাত্রির পরব কাটিতে চলিল—এই সব কথা। কলিকাতার এই জনতা-স্রোত আর ট্রামের ঘর্ঘর রব চোখ ও কানের সম্মুখ হইতে দূরে চলিয়া গেল—'মনে পড়িল, কার্ত্তিকের সঙ্গে কত কাল একত্র হইয়া অন্ধকারে শুপারি, নারিকেল, আম, জাম, এঁটেলি, খেজুর বৃক্ষসারির মধ্য দিয়া ছুটিয়া আসিয়া ষ্টীমার ধরিয়াছি। কিন্তু আজ কার্ত্তিক সঙ্গে নাই।' বইখানি সুলিখিত।

অন্দরের আলো—শ্রীলালমোহন দে। পি. সি. সরকার এণ্ড কোম্পানী; ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা দেড় টাকা।

মাসিক-পত্রিকা সম্পাদনের যত প্রকার দুঃখ আছে, তাহার একটি হইতেছে গল্প-নির্ব্বাচন। দিনের পর দিন রাশি রাশি গল্প আসিতেছে, একটির পর একটি পড়িয়া দেখিতেছি আর হতাশ হইতেছি। যাঁহারা গল্প লিখিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের ছাড়া কদাচিৎ কোনো নূতন লেখকের গল্প মুদ্রণযোগ্য বিবেচিত হয়। এমন কোনো নূতন লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাঁহার গল্প শুধু মুদ্রণযোগ্য নয়, গল্পপদবাচ্যও। 'বঙ্গশ্রী'তে আমরা এ পর্য্যন্ত যাঁহাদের গল্প ছাপাইয়াছি, তাঁহাদের প্রায় সকলেই যশস্বী গল্প-লেখক। এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা কেবল একজন নূতন গল্প-লেখককে আমাদের পাঠকগোষ্ঠীর সহিত পরিচিত করিতে পারিয়াছি। তিনি বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক—শ্রীলালমোহন দে। ইঁহার যে দুটি গল্প (পাণিনির পরাজয়, জঙ্গরের দুঃখ) 'বঙ্গশ্রী'তে ছাপানো হইয়াছিল, সে দুটিই এই বইয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে-কেহ গল্প দুটি পড়িবেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে শুধু মুদ্রণযোগ্য হিসাবে গল্প দুটি নির্ব্বাচিত হয় নাই, দুইটি গল্পেই লেখকের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও যে তিনটি গল্প বইখানিতে আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই সুপাঠ্য। ভূমিকায় ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন, "রসদৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত ও নিদর্শন রহিয়াছে, তাহাই এই রচনাগুলিকে পাঠকসমাজে পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য আমাকে সাহসী করিয়াছে।" আমরা ডক্টর দের সহিত একমত।

বাংলা পত্রিকা

The cry is still they come অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, বেকারসমস্যা, কিন্তু তথাপি নূতন টকি হাউস, নূতন ফিল্ম ও নূতন পত্রিকার আবির্ভাবের বিরাম নাই, পেটে অন্ন নাই তবু মানুষের জিহ্বা উদ্যত হইয়া আছে কথা কহিবার জন্য—এ এক বিচিত্র ব্যাপার। আমরাও সম্পূর্ণ নূতন, নূতনকে আমরা অভিনন্দন করিতে বাধা কিন্তু ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলির বড় ভয়!

শিক্ষাবিস্তার জাতির সৌভাগ্য সূচিত করে—পত্রিকাগুলি জনসাধারণের শিক্ষার বাহন, এই কথাই আমরা শুনিয়া থাকি। ছাপার অক্ষরের মোহ আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সুতরাং ছাপার অক্ষরে নূতন নূতন পত্রিকার প্রচার যত অধিক হইতেছে আমাদের শিক্ষা ততই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে তাহাই হইতেছে কি?

পত্রিকা-ষ্টলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঙবেরঙের নূতন নূতন পত্রিকাগুলির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনেও রঙ ধরে, ভাবিতে ইচ্ছা হয়, আমাদের উন্নতি হইতেছে। পয়সা ব্যয় করিয়া পত্রিকা ছাপা যখন হইতেছে তাহার ক্রেতাও নিশ্চয়ই আছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর অভাব নাই। পাখীর ছানার মত তাহারা হাঁ হাতে পয়সা লইয়া ঠোঁট ফাঁক করিয়া বসিয়া আছে, পক্ষীমাতা পত্রিকা-সম্পাদকেরা বহু পরিশ্রমে অরণ্যাপর্ব্বত ভাঙিয়া 'শিক্ষা' সংগ্রহ করিয়া, আনিয়া তাহাদের মুখে গুঁজিয়া দিতে কসুর করিতেছে না। গড়ে দেখিতেছি, বাঙলাদেশে প্রতিমাসে দুইটি করিয়া নূতন পত্রিকার অঙ্কুর উদ্গম হইতেছে, সুতরাং কল্পনা করা যাইতে পারে, শিক্ষিতের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে।

নূতন পত্রিকা-জন্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা ইহা নহে; পত্রিকা—জন্মনিরোধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিবার মত ডাক্তারী আমাদের জানা নাই। পাশ্চাত্যদেশ এবং প্রাচ্য জাপানের সহিত তুলনায় এ বিষয়ে আমরা এখনও স্বরে-'অ'র কোঠায় আছি। পত্রিকা বাড়ুক তাহাতে ক্ষতি নাই, আমাদের বক্তব্য পত্রিকাগুলির বিষয়বস্তু লইয়া, যে জিনিস পরিবেশন করা হইতেছে তাহার উৎকর্ষ লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকামারফৎ যাহারা এই শিক্ষা ছড়াইবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিধি লইয়া।

অনেকে বলিবেন, পত্রিকা পড়ি নেহাৎ অবসর-বিনোদনের জন্য শিক্ষা টিক্ষার কথা বাপু বুঝি না। গল্প পড়ি, সিনেমা আর্টিষ্টের ছবি দেখি, কোন রঙ্গমঞ্চে কোন্ দিন কি অভিনয় হইবে জানিয়া লই, ব্যস। অনেকের মত, চারগণ্ডা পয়সা ব্যয় করিয়া একখানি পত্রিকা খরিদ করিয়া দিলে মুখরা পত্নীর মুখ যদি ঘণ্টা চারেকের জন্য বন্ধ থাকে, তাহাই বা কম কি! অর্থাৎ নিজেদের অজ্ঞাতসারে ইহারা বিষপান করেন, না অমৃত পান করিয়া থাকেন তাহা জানিবার আবশ্যকতাও অনুভব করেন না।

কথা ইহাদের লইয়া নহে, মোটের উপর, পত্রিকাদির মারফত পাঠকের শিক্ষা বা কুশিক্ষা যাহোক একটা কিছু হয়। এদেশবাসী সকলে এমনই 'অহত্ব' লাভ করিয়া বসিয়া আছে যে শিক্ষা ও কুশিক্ষার মধ্যে যে বিশেষ কোনও তফাৎ আছে, তাহার বিচারের প্রয়োজন কেহ অনুভব করে না। কুৎসা, দুর্নীতি অথবা অশ্লীলতার কথা হইতেছে না। যাহার নামে কুৎসা করা হয় গায়ে বাজিলে মামলা করিয়া সে নিজের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, আবগারী বিভাগের পণ্যের মত অশ্লীলতা, দুর্নীতি অথবা রাজদ্রোহ প্রচারিত হইলে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট তাহার বিহিত করিতে পারেন। কিন্তু পত্রিকামারফৎ সম্পাদকেরা যে বীভৎস এবং কদর্য্য ভুল শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস সকল বিষয়েই যে ভয়াবহ অজ্ঞতার প্রচার করিয়া থাকে, কত—তাহার বিরুদ্ধে তো আইন নাই। রোমের কারাকোলা স্নানাগারের ছবির নীচে 'সাংহাইয়ের রাজপথ' লিখিয়া তাহা প্রচার করিলে তো কোনও শাস্তিই প্রচারককে পাইতে হয় না। অথচ দেশের ক্ষতি এই ভাবেই হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ইহার বিরুদ্ধে কেহ কোনও আন্দোলন করে না। যে যাহা পাইতেছে, নির্বিচারে গলাধঃকরণ করিয়া চলিয়াছে, ইহাদের অভিভাবকও এমন কেহ নাই যে বলিয়া দিবে, এটা ভাল, এটা মন্দ। খাবারের দোকানের ঘি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যও স্যানিটারি ইনস্পেক্টর আছে।

পাশ্চাত্যদেশ সমূহে দেখিতে পাই, নিতান্ত শিশুদের জন্য যাঁহারা পুস্তক রচনা করেন অথবা পত্রিকাদি প্রচার করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রত্যেকেই পাণ্ডিত্যে অসাধারণ, এক একটি বিষয়ে শেষ কথা যাঁহারা বলিতে পারেন তাঁহারাই শিশুদের জন্য কলম ধরিয়া থাকেন। বিদ্যালয় সমূহেও নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহারা কম পণ্ডিত হইলে চলে না। কারণ অত্যন্ত শিশু অবস্থায় শিক্ষকের দোষে বা পাঠ্যপুস্তকের দোষে যদি ভুল

কিছু মাথায় একবার ঢোকে সমস্ত জীবনের চেষ্টায় সে ভুল আর সংশোধিত হয় না। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের এই অভিভাবকহীন ব্যবস্থার দোষে বিপন্ন হইয়া আছি। এদেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা। শিক্ষা-জীবনে যাঁহারা সফলতা অর্জ্জন করেন নাই, তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার ভার পাইয়া থাকেন। শিক্ষার বালাই যাঁহাদের নাই শিশু-সাহিত্য পত্রিকাগুলির তাঁহারাই নিয়মিত লেখক।

ইহার বিরুদ্ধে আইন করা যদি সম্ভবও না হয়, দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের, শিশুদের অভিভাবকদের সমবেত হইয়া এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। যাঁহারা দেশের শিশুদের হিতাহিত চিন্তা করেন তাঁহাদিগকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন যে সকল পত্রিকা তাঁহাদের শিশুরা সচরাচর পড়িয়া থাকে সেগুলি উল্টাইয়া দেখেন। এই সকল ক্ষেত্রেই মাইকেলের মত বিরক্তি সহকারে বলিতে হয়, 'চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে।'

বড়দের পত্রিকাগুলি সম্বন্ধেও একই কথা; ভুল প্রচারে ইহাঁরাও কম সহায়তা করেন না। সম্পাদক মহাশয়দের পাণ্ডিত্য সর্ব্ববিষয়ে গগনস্পর্শী না হইতে পারে, তাঁহারা অপণ্ডিতও হইতে পারেন কিন্তু অসৎ যেন তাঁহারা না হন। যে বিষয়ে তাঁহারা অজ্ঞ অন্ততঃ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া সে বিষয়ে কোনও লেখা পত্রস্থ করা প্রয়োজন. ভুলক্রমে ভুল কিছু প্রকাশিত হইলে তাহার সংশোধন ও আলোচনা আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকাদি (বৃহৎ অভিধান শ্রেণীর) দ্বারাও বহু ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে। অন্ততঃ বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধাদি নির্ভুল করিয়া ছাপিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দিয়াছেন।

কোনও পত্রিকার নাম করিয়া বিরাগভাজন হইব না, সম্মুখের নূতন এবং পুরাতন অনেকগুলি পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হইল, এদেশে সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে যাহারা নিজেদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চায় তাহারা হতভাগ্য।

সম্পাদকীয়

পরলোকে বিঠলভাই প্যাটেল

গত ২২শে অক্টোবর য়ুরোপের জিনেভা শহরে ভারতের রাষ্ট্রনায়ক বিঠলভাই প্যাটেল দেহত্যাগ করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে কারাবাসজনিত নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য, চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি য়ুরোপে গমন করেন। ভারতের চরম দুর্ভাগ্য, সেখান হইতে আর তিনি জীবিত ফিরিয়া আসিলেন না।

চিকিৎসকগণ পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে থাকিয়া তাঁহার পক্ষে পূর্ণ বিশ্রাম করা সম্ভব ছিল না। যে দুই একজনের জীবন ও বাণীর দিকে ভারতের এই জাগরণ-আন্দোলন নির্ভর করিতেছিল, বিঠলভাই প্যাটেল তাঁহাদের অন্যতম। সংগ্রাম-ক্ষেত্রের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার ন্যায় যোদ্ধা এবং সেনাপতি বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারেন না।

তাই ভারতবর্ষের সমুদ্র-রেখা ত্যাগ করিয়া তিনি গিয়াছিলেন সুদূর ভিয়ানেতে। কিন্তু বিশ্রাম তিনি করিতে পারেন নাই। বিশ্রাম তিনি চাহেন নাই। বোম্বাই-এর সমুদ্র-তীর ছাড়িয়া যতদূর তিনি গিয়াছিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত সংগ্রাম-স্থলের সীমানাকেই বাড়াইয়া চলিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, আমেরিকায় পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বাণীকে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার হাতের রণ ভেরী কখনও নীরব থাকে নাই।

মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথাই ভাবিয়াছেন। তাঁহার বিদায়কালের শেষ বাণী,

"আমার স্বদেশবাসী এবং পৃথিবীর নানাদেশের বন্ধুবর্গকে আমার অন্তরের শুভ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন। জীবনের শেষ-তম ক্ষণে প্রার্থনা করিয়া যাইতেছি—অচিরে ভারতবর্ষ যেন স্বাধীনতা লাভ করে—।"

ভারতে নব-জাগরণে বিঠলভাই-এর স্থান

বিঠলভাই-এর পরলোক গমনে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে যে স্থানটি শূন্য হইল, সহজে তাহার পরিপূরণ হইতে পারে না। এমনই অসামান্য ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব, এমনই অনন্যসাধারণ ছিল তাঁহার রাষ্ট্রীয় প্রতিভা এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। এই যুগের যুদ্ধনীতিতে তিনি যে-পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব ছিল। এবং তাহার ভিত্তি ছিল, তাঁহার অপূর্ব্ব তেজস্বিতায়, ক্ষুরধার প্রতিভায়, আত্ম-প্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রজ্ঞানে এবং শাসন করিবার, পরিচালক হইবার সহজাত

অধিকারে। গান্ধী-নেহেরু দাশ-প্রভাবান্বিত ভারতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য এক মুহূর্তের জন্য রঙ বদলায় নাই। কি সরকারী পক্ষ, কি কংগ্রেস পক্ষ, তাহাদের প্রতিবাদে এবং সহযোগিতায় তিনি একই নীতি অনুসরণ করিতেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তিনি কোনও দলের ছিলেন না, অথচ প্রত্যেক দল তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তিনি একাই ছিলেন একটি স্বতন্ত্র দল। উপর্যুপরি তিনবার রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি হিসাবে তিনি যে রাষ্ট্র-প্রতিভা এবং শাসন-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে-কোনও স্বাধীন দেশের সভাপতির গৌরবের বিষয় হইতে পারিত। মিশরের নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন-প্রতিষ্ঠানে জগলুল পাশা যে-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বিঠলভাই ভারতবর্ষে ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জগলুলের পূর্ব্বে মিশরের রাষ্ট্রীয় সভা একটা উপহাসের জিনিস ছিল। সভাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, দায়িত্ববোধ তখনও গ্রাম্য অথবা স্কুল-কলেজের ডিবেটিং সোসাইটীর অনুরূপ গুরুত্বহীন ছিল। জগলুল আসিয়া সেই উদাসীন, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, বিবেকহীন রাষ্ট্রীয় সভাকে সুনিয়ন্ত্রিত, দায়িত্বপূর্ণ এবং জাতির ভাগ্য-পরিচালনের একমাত্র অনুষ্ঠানের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। পার্লামেণ্ট সভয়ে জগলুলের মন্ত্রীসভার দিকে ফিরিয়া চাহিল এবং যতদিন জগলুল জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি বৃটীশ রাজনৈতিকদের বিরুদ্ধে, মিশরের রাজা ফোয়াদের স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জাতির-সম্মতিক্রমে-গঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সভার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। বিঠলভাই প্যাটেল যতদিন রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ছিলেন তিনি ও তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সকল দলের লোককে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক কার্য্য নির্দ্ধারণে ভারতবাসী অক্ষম নয়। শক্তি কি করিয়া অর্জ্জন করিতে হয় এবং অধিকার পাইলে সে-অধিকারের মর্য্যাদা কি ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়—তাহার প্রমাণ বিঠলভাই-এর জীবনে আমরা যে-ভাবে দেখিয়াছি, ভারতের আর কোন নেতার জীবনে আমরা তাহা দেখি নাই

বিঠলভাই প্যাটেল।

কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেফতারের পর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। "দেশের মুক্তি-সংগ্রামে স্বদেশবাসীর পাশেই আমার স্থান করিয়া লইব।"—এই বলিয়া তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। পেশোয়ারের হাঙ্গামার তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তিনি একটি রিপোর্ট তৈয়ারী করেন

বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সরকারপক্ষ হইতে সে রিপোর্ট প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে দিল্লীতে ডাক্তার আনসারীর গৃহে কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভায় তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের সময় তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এতদিন সভাপতির কাজ করার পুরস্কার পাইলাম।"

কারাগার হইতে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বাহির হইলেন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি ভিয়েনা যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যে, হয়ত বিদেশ হইতে আর তিনি ফিরিবেন না।

ভবিতব্যতা সেই আশঙ্কাকেই সত্য করিয়া তুলিল।

সহরমুখো বাঙ্গালী

বাঙ্গালা দেশের সভ্যতা পল্লীপ্রাণ। বাঙ্গালীর ইহাই বিশেষত্ব। কিন্তু বাঙ্গালী বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরেজী শিক্ষার কুহকে ভুলিয়া ক্রমে ক্রমে সহরবাসী হইতেছে। কতটা পরিমাণে বাঙ্গালী সহরমুখো হইয়াছে তাহা নিম্নে সঙ্কলিত অঙ্ক হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

আদম সুমারীর বৎসর।	সহরের লোকসংখ্যা।	দুই আদম সুমারীর মধ্যে বৃদ্ধির সংখ্যা।
১৮৭২	১,৮৫৭,৫০৪	--
১৮৮১	১,৯৯১,৮৩২	১৩৪,৩২৭
১৮৯১	২,২২৩,৩৭৮	২৩১,৫৪৬
১৯০১	২,৫৯৯,১৫৮	৩৭৫,৭৮০
১৯১১	২,৯৬৮,২৪৭	৩৬৯,০৮২
১৯২১	৩,২১১,৩০৪	২৪৩,০৬৪
১৯৩১	৩,৭১১,৯০৪	৫০০,৬৩৬

উপরি উদ্ধৃত অঙ্ক সম্বন্ধে একটা আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, গত ৬০ বৎসরে বাঙ্গলা দেশের লোকসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। সে জন্য আমরা নিম্নের তালিকায় সাপেক্ষিক বৃদ্ধির স্বরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

	সহরে লোকের শতকরা বৃদ্ধি।	সমগ্র বাঙ্গলা দেশের শতকরা বৃদ্ধি।	সমগ্র বাঙ্গলার লোকের শতকরা হিসাবে সহরে লোক
১৮৭২	—	--	৫·৩৫
১৮৮১	৭·২	৬·৭	৫·৩৮
১৮৯১	১১·৬	৭·৫	৫ ৫৮
১৯০১	১৬ ১	৭·৭	৬·০৬
১৯১১	১৪ ২	৮·০	৬·৫২
১৯২১	৮·২	২·৮	৬ ৭৫
১৯৩১	১৩·৪	৭·৩	৭ ২৬

সহরমুখো হইয়া বাঙ্গালী যে সুখে পারিবারিক জীবনযাপন করিতেছে তাহা নহে। স্ত্রী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অস্বাভাবিক ভাবে মেসের বা "বাসাড়ে" জীবনযাপন করিতেছে। ইংরাজী ১৯৩১ সালে সহরে প্রত্যেক ১,০০০ একহাজার পুরুষে মাত্র ৬০১ জন স্ত্রী বাসিন্দা ছিল, আর এই স্ত্রীলোকের অনুপাত ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। কলিকাতার কথাই ধরা যাউক, গত ৬০ বৎসরে প্রত্যেক আদমসুমারীর হিসাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিয়াছে।

আদম সুমারীর বৎসর।	প্রতি ১,০০০ হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা
১৮৭২	৫৫২
১৮৮১	৫৫৬
১৮৯১	৫২৬
১৯০১	৫০৭
১৯১১	৪৭৫
১৯২১	৪৭০
১৯৩১	৪৬৮

অনেকের মনে ধারণা যে বিদেশ হইতে কলকারখানার প্রয়োজনমত কুলীমজুরের আমদানী হওয়ায় বড় বড় সহরে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর বিদেশী লোকদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশী থাকায় সহরে স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক অভাব দেখা যাইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনকে স্পর্শ করে নাই।

বাঙ্গালার বড় বড় নগরে, যেখানে কলকারখানার আবির্ভাবে বিদেশ হইতে আগত লোকের সংখ্যা অধিক হওয়া সম্ভব, সেই সব নগরে প্রত্যেক হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ৩০৬ জন বঙ্গের বাহিরে জন্মিয়াছেন। কলিকাতায় হাজার করা ৩৩২ জন বিদেশী, হাওড়ার ন্যায় কলকারখানাবহুল স্থানে হাজারকরা ৩৫৫ জন অ-বাঙ্গালী। দেখা যাইতেছে যে সহরে লোকের অনেকেই বাঙ্গালী, সুতরাং এই স্ত্রীলোকের অভাব বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে।

একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, যখন বাংলাদেশে যে কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে, স্ত্রীলোকের অনুপাত কমিয়া আসিতেছে, তখন সহরে এই স্ত্রীলোকের অনুপাত হ্রাস অস্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের পরিচায়ক নহে, আর এই হ্রাস বড় বড় সহরেই আবদ্ধ। ইহা ঠিক নহে। নিম্নের

তালিকায় আমরা গত ১৮৭২ সাল হইতে প্রত্যেক আদম সুমারিতে প্রতি হাজার পুরুষে সমগ্র বঙ্গদেশে, পল্লীগ্রামে, বড় বড় নগরে, কলিকাতায় ও কারখানাবহুল সহরে এবং সাধারণ সহরে কয়জন করিয়া স্ত্রীলোক, দেখাইব। পাঠক এই তালিকা প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালী সহরে কি অস্বাভিক পারিবারিক জীবন যাপন করিতেছে।

প্রতি হাজার পুরুষে কয়জন করিয়া স্ত্রীলোক।

আদম সুমারীর বৎসর	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
সমগ্র বঙ্গ	৯৯২	৯৯৪	৯৭১	৯৬০	৯৪৫	৯৩২	৯২৪
পল্লীগ্রামে	১০০৭	১০০৬	৯৯০	৯৮২	৯৭১	৯৬১	৯১৫
বড় বড় নগরে	৬০৭	৬১৪	৫৭২	৫৪৫	৫২০	৫১৯	৫০৯
কলিকাতা *	৪৯৩ †	৫০০	৫২৬	৫০৭	৪৭৫	৪৭০	৪৬৯
কলকারখানা বহুল সহর	৬৭১	৬৭১	৬১৯	৫২০	৫২৯	৫৩০	৫২৬
সাধারণ সহর	৯৭৭	১০৩৩	৯১০	৯৬৫	৮৬৮	৮১৬	৭৯৭

সর্ব্ব বয়সের প্রতি ১,০০০ পুরুষ প্রতি

সমগ্র বঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রী
সব বয়সের	১,০০০	৯২৪
০-১০	২৮৫	২৭৩
১০-২০	২০৭	২০৫
২০-৪০	৩৩১	৩০১
৪০ বা তদূর্দ্ধ	১৭৭	১৪৫
কলিকাতা		
সব বয়সের	১,০০০	৪৬৯
০-১০	১৩১	১১১
১০-২০	১৮০	৯৮
২০-৪০	৫০০	১৭২
৪০ বা তদূর্দ্ধ	১৮৯	৮৮
কারখানাবহুল কতিপয় সহরে		
সব বয়সের	১,০০০	৫২৫
০-১০	১৪৮	১৩০
১০-২০	১৮৪	১১০
২০-৪০	৪৮০	১৮৯
৪০ বা তদূর্দ্ধ	১৮৮	৯৬
কতিপয় সাধারণ সহর		
সব বয়সের	১,০০০	৮০১
০-১০	২১৬	২০৪
০-২০	২০২	১৬৬
	৩৮০	২৬৯
৪০ বা তদূর্দ্ধ	২০২	১৬২

এই তথ্যগুলি ভাবিবার। দেখা যাইতেছে, ২০-৪০ বয়সের পুরুষের সংখ্যা ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা অপেক্ষা সহরে ঢের বেশী। ফলে ২৪০০০ বেশ্যা তাহাদের ব্যবসা চালাইতে সক্ষম হইয়াছে। মনে হয় প্রকৃত বেশ্যার সংখ্যা আরও বেশী, নিজেকে কেহই বেশ্যা বলিয়া আদম সুমারীর খাতায় নাম লিখাইতে চাহে না।

সহরে, বিশেষ করিয়া কলিকাতার ন্যায় নগরে যাহাতে পুরুষের সংখ্যা অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অল্প ভাড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে ডেলী প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য ট্রেনের সুবিধা ও ভাড়া কমাইতে হইবে। গরীব কুলি মজুরেরা যাহাতে সহরতলী হইতে আসিয়া সহরের দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে, তজ্জন্য অতি সস্তায় বাস্ বা ট্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ নানাবিধ ব্যবস্থার ফলে হয়ত কলিকাতার পুরুষের সংখ্যা কমিতে পারে, কিম্বা অনেকে সপরিবারে সহরে বাস করিতে পারেন।

গুপ্ত-ঘাতক ও রাজসিংহাসন

আফগানিস্থানের রাজা নাদিরশাহ্ সহসা গুপ্ত-ঘাতকের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ জাহির শাহ্ সিংহাসনে বসিয়াছেন। কেন এই গুপ্ত-হত্যা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনুমানের বিষয়। প্রকাশ, একজন জার্ম্মাণি প্রত্যাগত আফগান ছাত্র এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠাতা।

আফগানিস্থান আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। এবং কিছু-দিন আগে আফগানিস্থানের সিংহাসন লইয়া যে সব নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা এখনও সকলের মনে সজাগ রহিয়াছে। ভিস্তীর ছেলের সিংহাসনে আরোহণ, আমানুল্লাহ্-এর হারুণ-অল্-রশীদী চরিত্র এবং নির্ব্বাসন, নাদির খাঁর আগমন এবং অপূর্ব্ব রাজনৈতিক এবং সামরিক নৈপুণ্যে শতধা-বিক্ষিপ্ত আফগানিস্থানকে পুনরায় শান্তি এবং শৃঙ্খ-লায় আনয়ন, একটা বড় নাটকীয় ঘটনার মত আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। নাদিরের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই নাটকের

* কলিকাতার এই দুই বৎসরের অঙ্কের সহিত পূর্ব্বে উদ্ধৃত অঙ্ক সমূহের পার্থক্য দেখা যায়, ইহা কলিকাতার সীমা হ্রাস-বৃদ্ধির ফল বলিয়া মনে হয়।

† আর এই অস্বাভাবিকতার মাত্রা যে কত বেশী তাহা স্ত্রী ও পুরুষের বয়স কত তাহা জ্ঞাত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সে তথ্যও সঙ্কলিত হইল।

নাদির শাহ্। মাসিব মোহাম্মদীর সৌজন্যে

যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অকস্মাৎ এই ঘটনা আসিয়া যেন বলিয়া দিল, কিছুকালের বিরতির পর আবার নাটকের অপরাংশের অভিনয়ের সূচনা হইল।

গত শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে-সব মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নাদির শাহ্ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। সেনাপতি এবং অসমসাহসিক যোদ্ধা হিসাবে থলের যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে তিনি আফগান উপজাতিদের হৃদয় জয় করেন। আফগান জাতির ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই সব অশিক্ষিত উপজাতিদের বিশেষ প্রভাব আছে। তাহাদের অসম্মতিতে সিংহাসনে কেহই নিরাপদে বসিতে পারে নাই। তৈমুর শাহ্‌এর মৃত্যুর (১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ) পর তাঁহার পুত্র শাহ্ জমা সিংহাসন অধিকার করিবার পর হইতে আফগানিস্থানের সিংহাসনকে ঘিরিয়া যে-ষড়যন্ত্র এবং গুপ্তহত্যার আরম্ভ হয়, তাহার বিরাম আজও হয় নাই। জগতের ইতিহাসে সিংহাসনকে ঘিরিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এত হত্যাকাণ্ড আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

নাদির শাহ্ আফগান জাতির এই মনস্তত্ত্ব জানিতেন। সেইজন্য তিনি আমানুল্লাহ্‌র মত নিজের ইচ্ছাকে জাতির উপর সবলে প্রয়োগ করেন নাই। ধীরে ধীরে উপজাতিদের মনস্তত্ত্ব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা বিভাগে সংস্কারের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহাকে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইতে হইল। আফগান উপজাতিদের মনস্তত্ত্ব বর্ত্তমান শতাব্দীর একটা রহস্য।

যখনই কোনও আফগান শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন পাঁচবার বন্দুকের আওয়াজ করিয়া তাহার আগমনবার্ত্তাকে ঘোষণা করা হয়। সেই বন্দুকের আওয়াজই তাহার পরবর্ত্তী জীবন পরিচালনা করে।

আইরিশ ফ্রী ষ্টেট ও ডি ভ্যালেরা

আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের শাসন-তন্ত্র সংশোধন করিবার জন্য ফ্রী ষ্টেটের জাতীয় পার্লামেণ্টে অর্থাৎ 'ডেইল'এ ডি ভ্যালেরা কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি "ডেইল"এ গৃহীত হইয়াছে; এখন সিনেটের অনুমোদন পাইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে। প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে এইরূপ, (১) বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে গভর্ণর জেনারেল বা ব্রিটিশ

রাজ্যের প্রতিনিধি বাজেটের কোন কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। সংশোধিত আইন দ্বারা তাঁহার সেই ক্ষমতা রদ করিয়া একজিকিউটিভ কাউন্সিলের হাতে দেওয়া হইল, (২) গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে আইরিশ ডেইলে গৃহীত কোন আইনে সম্মতি না দিতে পারিতেন, কিম্বা রাজার সম্মতির জন্য উহা স্থগিত রাখিতে পারিতেন। তাহার এই ক্ষমতাও দ্বিতীয় সংশোধিত আইনে রহিত করা হইল (৩) ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার যে অধিকার আইরিশবাসীদের ছিল, তৃতীয় সংশোধিত আইনে তাহা রহিত করা হইল।

এই তিনটি প্রস্তাবের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। এই তিনটি প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে সত্য সত্যই আইরিশ ফ্রী ষ্টেট স্বাধীন পদ-বাচ্য হইতে পারে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, এই তিনটি প্রস্তাব আইনে পরিণত করিয়া ডি ভ্যালেরা আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্‌কে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন। যে-দিন ডি ভ্যালেরা যুবক হিসাবে আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করেন, সেইদিন হইতেই ডি ভ্যালেরার ইহাই কাম্য ছিল। এবং এই দীর্ঘ জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া তিনি কোনও দিন সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

'ফায়না ফলের' অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে ডি ভ্যালেরা প্রতিনিধিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—আমরা রাজ আনুগত্যের শপথ পরিত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং উভয় দেশের আর কোন গভর্ণমেণ্টই এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত করিতে পারিবেন না। বার্ষিক সালিয়ানা বাবদ এক কপর্দ্দকও ফ্রী ষ্টেটের বাহিরে যাইবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে আর শোষণের সুযোগ পাইবেন না। একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট কাযা করিতেছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিলেও, তাঁহাদের নীতির পরিচালনা সম্বন্ধে নিজেদের হস্তে সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

প্রথম মাড়োয়ারী মহিলা সম্মিলন

এই মাসের কলিকাতা শহরের প্রধানতম কয়েকটি ঘটনার মধ্যে মাড়োয়ারী মহিলা সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে শ্রীযুক্তা জানকী দেবী বাজাজের সভানেত্রীত্বে নিখিল-ভারত-মাড়োয়ারী মহিলাদের সম্মেলন সংঘটিত হয়। সভায় পর্দ্দা-প্রথা, বাল্য-বিবাহ এবং নারীদের অশিক্ষার প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় মাড়োয়ারী সমাজের অকল্যাণকর কয়েকটি প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যথা বেশভূষায় নারীদের অলঙ্কারের আতিশয্য এবং বেশ-পরিধানে রুচিবিকার, বিদেশী বস্ত্র এবং দ্রব্য ব্যবহার, বিবাহাদিতে শুধু জাঁকজমক দেখাইবার জন্য অর্থব্যয়, বর-কন্যা বিক্রয়, বহু পত্নী গ্রহণ ইত্যাদি। সভাপতিরূপে শ্রীযুক্তা জানকী দেবী বলিয়াছেন, 'সম্মেলনীতে আমার ভগিনীদিগের মধ্যে যে উৎসাহ ও আড়ম্বর লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা আশাতীত। যদি এই আড়ম্বর ও উৎসাহ কেবল মাত্র সাময়িক উত্তেজনাতেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আমি আশা করি, এই নারী-জাগরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং পুরুষগণ এই আন্দোলনের সহায়ক হইয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।'

এই সকল প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করিবার জন্য ১১ জন নারীকে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে সভানেত্রীর সহিত আমরাও কায়মনোবাক্য প্রার্থনা করি যে, সভার প্রস্তাব যেন সমাজে কার্য্যে রূপান্তরিত হয়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তরণ-বীর প্রফুল্লকুমার

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর রেঙ্গুনে ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট কাল একাদিক্রমে সন্তরণ করিয়া প্রফুল্লকুমার সন্তরণকারী হিসাবে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। অপর দেশের সাঁতারুদের তুলনায় প্রফুল্ল ঘোষের সন্তরণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র শিশির মাথায় করিয়া এই দীর্ঘকাল জলে থাকিতে হইয়াছিল। বাথের মধ্যে সন্তরণ ও খোলা পুষ্করিণীর মধ্যে সন্তরণে অনেক প্রভেদ।

১৯০১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রফুল্লকুমারের জন্ম। ১৯১৭ সালে তিনি সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে যোগ দেন এবং সুপ্রসিদ্ধ সন্তরণ-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শান্তি পালের নিকট সাঁতার শিখিতে আরম্ভ করেন। সেই বৎসর তিন মাস পরে ১১০ গজ প্রতিযোগিতায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯২৮ সালে

কলিকাতায় বিভিন্ন সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং ওয়াটার পোলো খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। ১৯২১ সালে উক্ত ক্লাবের অধিকাংশ লম্বা সন্তরণের দৌড়ে অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম স্থান কৃতিত্বের সহিত অধিকার করিয়া প্রফুল্লকুমার সকলকে স্তম্ভিত করেন। কলিকাতার সুইমিং এসোসিয়েসানের সময় অপেক্ষা কতকগুলি দৌড়ে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সাঁতার কাটিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে ১ মাইল, অর্দ্ধ মাইল, সিকি মাইল ও ২২০ গজে ভারতের সমস্ত সন্তরণ-বীরদের পরাজিত করিয়া তিনি নূতন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেন। তাহার মধ্যে অদ্যাবধি ১১০ গজে, ৫০ গজে ও ৪৪০ গজের রেকর্ড কেহ ভাঙিতে পারে নাই। তাঁহার গঙ্গা পারের রেকর্ডও এখনও কেহ ভাঙিতে পারে নাই। উক্ত বৎসরই তিনি গঙ্গায় ১৩ মাইল সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তার পরের বৎসরও ১৩ মাইল সন্তরণে প্রথম ও ২৩ মাইল ডেড্ হিট করিয়া যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে ১৫ মাইল সন্তরণে দ্বিতীয় ব্যক্তির ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ বৎসব হেদুয়ার পুষ্করিণীতে তিনি ২৮ ঘণ্টা সাঁতার দেন। ১৯৩০ সালে ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট একাদিক্রমে সাঁতার দিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর বলিয়া গণ্য হন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য বহুস্থান হইতে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। ১৯৩১ সালে ৭২ ঘণ্টা সন্তরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ ৬৬ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সন্তরণ করিবার পর ডাক্তারের নির্দ্দেশে তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন জেলায় সন্তরণ-কৌশল দেখাইয়া তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। সমুদ্রে সাঁতার কাটিবার কৌশল দেখিয়া পুরীর সমস্ত নুলিয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ডাইভিংএ ভারতবর্ষে প্রফুল্লকুমারের জোড়া নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রফুল্লকুমারকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাইতেছি।

টেরারিষ্ট-আন্দোলনের অসারতা

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বা[illegible] শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর সকলের দৃষ্টি অজ্ঞাতকুলশীল বিপ্লবীদের কার্য্যপদ্ধতির উপর নিবিষ্ট হইয়াছে। কি য়ুরোপীয়, কি ভারতীয়, সকল শ্রেণীর লোকের এই ব্যাপার সম্বন্ধে

সন্তরণ বীর প্রফুল্লকুমার ও তাঁহার শিক্ষক শান্তি পাল।

সত্যকারের সজাগ হইবার সময় যে আসিয়াছে, এই সব মৃত্যুঘটিত ঘটনা বারবার সেই কথা বুঝাইয়া দিতেছে। এই সব টেরারিষ্টদের জন্য সেই সব স্থানের হিন্দু জনসাধারণ যে ভাবে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতেও বিশেষ উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে।

শাসন তন্ত্রের আদিম-কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে কোনও দেশে, যে-কোনও যুগে এই রকম হত্যার ব্যক্তিগত চেষ্টা দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রত্যেক ইতিহাসের অভিজ্ঞ

ছাত্র জানেন যে, এই সব ব্যক্তিগত হত্যা-চেষ্টার সঙ্গে (যাহাকে আমরা সাধারণতঃ "টেরারিষ্ট" আন্দোলন বলি) কোনও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন বা জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় যোগ নাই। এবং প্রত্যেক যুগেই দেখা যায় যে, এই সব ব্যক্তিগত উত্তেজনার ফল কোন কালেই কোন রাষ্ট্রীয় অগ্র-গতির সহায়তা করে নাই। ব্যক্তিগত উত্তেজনা ব্যতীত ইহার সহিত কোনও রাষ্ট্র-বুদ্ধির যোগ নাই। ইহা ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য। এইখানে পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার যে, সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং এই টেরারিষ্ট আন্দোলন এক নয়। সাধারণতঃ অনেকেই সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে টেরারিষ্ট আন্দোলনকে জড়াইয়া ফেলেন। টেরারিষ্টদের কার্য্যবিধি মানব-ইতিহাসের accident, এবং প্রত্যেক accidentই গতিকে প্রতিহত করিয়া থাকে। এই যুগের সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লব-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে লেনিনের নাম পরিগণিত হয়। সেই লেনিনই স্পষ্ট অক্ষরে টেরারিষ্ট-আন্দোলনের অসারতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভের ফাঁসির মঞ্চের দিকে চাহিয়া লেনিন বলিয়াছিলেন, আলেকজেণ্ডার যেন রুষিয়ার শেষ টেরারিষ্ট হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাহাতে এই সব ক্ষণিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় অগ্র-গতির বিঘ্ন না ঘটায়, তাহার দিকে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা উচিত এবং প্রত্যেকেরই উচিত, যে যেমন ভাবে পারে, কথা-বার্ত্তায়, লেখায়, সামাজিক আলাপ-আলোচনায় এই টেরারিষ্ট আন্দোলনের স্পষ্ট প্রতিবাদ করা।

প্রতিকার, প্রতিবাদ ও প্রতিহিংসা

প্রতিকার করিতে হইলেই প্রতিবাদ করিতে হয়, কিন্তু প্রতিহিংসা দ্বারা প্রতিবাদ হইতে পারে, প্রতিকার কখনও হয় না। যে বিবেকহীন উত্তেজনার বশে একজন লোক অপর একজন লোকের প্রাণনাশ করে, প্রত্যেক প্রতিবাদের উদ্দেশ্য হইল সেই বিবেকহীন উত্তেজনার বিরুদ্ধে। উত্তেজনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইলে উত্তেজিতই করা হয় এবং তখন তাহাও বিবেকহীন উত্তেজনার অপরাধ বলিয়াই গণ্য হয়। মিঃ বার্জ্জের শোচনীয় হত্যার পরে ষ্টেট্স্ম্যান সম্পাদকীয় স্তম্ভে এবং পত্র-বিভাগে যে-সব কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিবেচনাহীন উত্তেজনারই ফল এবং ষ্টেট্স্ম্যান ও অন্যান্য সংবাদ-পত্রে টেরারিষ্ট আন্দোলন দূর করিবার জন্য যে সামাজিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী!

ষ্টেট্স্ম্যানের পত্রবিভাগে এই টেরারিষ্ট আন্দোলন দমনের জন্য যে সব জঘন্য হিংসামূলক কথা প্রচারিত হইয়াছে তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) আইরিশ বিপ্লবের সময় মলকাহির হত্যার পর যে ভাবে কয়েক জনকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই ভাবে কয়েকজনকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিলে বিপ্লব আন্দোলন প্রশমিত হইবে।

(২) চট্টগ্রাম, ঢাকা, মেদিনীপুরের মত বৈপ্লবিক অনাচারবহুল স্থানের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকদের বলিয়া দেওয়া হউক, আর যদি তাহাদের এলাকায় কোন প্রকার বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে।

(৩) যাহাদের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) আবার যদি মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে জেলের মধ্যে আবদ্ধ নামজাদা বিপ্লবীদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজনকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে হইবে।

(৫) স্বয়ং ষ্টেট্স্ম্যান সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিতেছেন, "*We have good reasons to beleive* that had the military been called upon immediately after the assassination to assist the police in their search…Midnapore might have been burnt down."

"হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে খানাতাল্লাসীর সময় পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য যদি সৈন্যদের আহ্বান করা হইত, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সম্ভবতঃ সমগ্র মেদিনীপুর শহর ভস্মীভূত হইতে পারিত।" এ বিশ্বাসের মূলে ষ্টেট্স্ম্যান-পরিচালকদের তাঁহাদের স্বজাতি চরিত্রের কোন্ বিশেষ ধর্ম্মের অভিজ্ঞতা আছে, তাহা আমরা

বলিতে পারি না, কিন্তু সৈন্যদের কার্য্যবিধি সম্বন্ধে যে চিত্র ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-সম্পাদক আমাদের জানাইয়াছেন, তাহা রাষ্ট্রের শান্তি-রক্ষণশীল বিভাগের গৌরবের বিষয় নহে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নিন্দা করি, এবং মনে করি ইহা আমাদের রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির বিশেষ বাধাই সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেককে অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে, যে যেমন ভাবে পারেন, এই খণ্ড-হত্যার মধ্য দিয়া এত বড় একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের বাতুল চেষ্টার প্রতিবাদ করেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানকে আশ্রয় করিয়া একদল য়ুরোপীয়ের এই যে হিংসামূলক অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত

কলিকাতায় টাইফয়েডের বিভীষিকা

করপোরেশনের হেল্‌থ্‌ কমিটীর আমন্ত্রণে কলিকাতার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ কলিকাতায় টাইফয়েড রোগের প্রাবল্যের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সমবেত হন। কলিকাতায় অতি ব্যাপকভাবে টাইফয়েড রোগ বিস্তার লাভ করিতেছে এবং বিশেষজ্ঞেরা আশঙ্কা করেন যে, অচিরকালের মধ্যে এই মারাত্মক রোগের হেতু বিদূরিত না হইলে, কলিকাতা শহর অল্প কালের মধ্যে পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হইবে। বিশেষজ্ঞগণের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কলিকাতার ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূমিনিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা সন্তোষজনক নহে এবং তাহাই টাইফয়েড রোগ বিস্তারের প্রধান কারণ। রিপোর্টে তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, অতিরিক্ত বারিপাতের ফলে জল জমিয়া ভূমিনিম্নস্থ জল দূষিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহারা অনুমান করেন যে, ঐ দূষিত জল বিশুদ্ধ জলের কলের "মেনে" প্রবেশ করিয়া পানীয় জল দূষিত করিতেছে। অবিলম্বে এই ব্যাপারের তদন্ত এবং শহরের পয়োপ্রণালী সংস্কার না করিলে, কলিকাতার মৃত্যুহার যে-ভাবে বাড়িবে, তাহাতে কলিকাতার গৌরব আর থাকিবে না।

চিকিৎসকগণের আর একটি প্রস্তাব এই যে, শহরের খাটা :পায়খানাগুলি টাইফয়েড রোগবৃদ্ধির অন্য একটি কারণ; কেননা, এগুলির দ্বারা কলের জল দূষিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অতএব শহরের কোন কোন স্থানে এখনও যে সব খাটা পায়খানা আছে, সেইগুলি ক্রমে উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে আধুনিক ড্রেন পায়খানার প্রবর্ত্তন করা উচিত

সর্ব্বোপরি শহরের সর্ব্বত্র যাহাতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য চিকিৎসকগণ প্রস্তাব করিয়াছেন। শহরের বস্তিগুলিতে এই প্রয়োজন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা বলা বাহুল্য।

করপোরেশন এবং গভর্ণমেণ্টের মতদ্বৈধের ফলে গত কয়েক বৎসর এবিষয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয় নাই। তদানীন্তন স্পেশাল ড্রেনেজ অফিসার মিঃ বি.এন. দে এই ব্যাপার সম্পর্কে যে স্কীম গঠন করিয়াছিলেন, তাহাও আজ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন নাই। অথচ সহরবাসী সকল শ্রেণীর করদাতাদের আজ জীবন বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। আশা করি, এই ব্যাপারের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া করপোরেশন অবিলম্বে ইহার ব্যবস্থা করিবেন এবং সরকার এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

গত ২রা নভেম্বর সন্ধ্যায় ভিষক্‌-প্রবর বিজ্ঞানাচার্য্য স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের শতবার্ষিকী স্মৃতিপূজা উপলক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বহুবাজারস্থ ভারতীয় বিজ্ঞানসভা গৃহে এক মহতী জন-সভা হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

বিদ্বান বৈজ্ঞানিক এবং স্বদেশপ্রেমিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের স্মৃতির প্রতি এই সভায় সমবেত কলিকাতার পৌরবাসিগণ তাহাদের সশ্রদ্ধ ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে। তিনি একশত বৎসর পূর্ব্বে এমনই দিনে বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, স্বদেশহিতৈষণা এবং জনসেবায় অনুপ্রেরণাই ভারতীয় বিজ্ঞান-অনুশীলন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালা তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের যুবকবৃন্দ ভারতে বিজ্ঞান চর্চ্চার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিয়া ভারত-জননীকে পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানে সম্মানজনক আসনে সমাসীন করুক, ইহাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসক এবং বিশেষভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অগ্রণী, সেনেটের সভ্য, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভ্য হিসাবে এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অক্লান্ত দেশসেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁহার স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।"

ব্যায়াম-শিক্ষক রাসবিহারী ও বসন্তকুমার

বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১২৮৭ সালের কার্ত্তিক মাসে রাসপূর্ণিমার দিন আহিরীটোলায় জন্মগ্রহণ করেন।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

রাসবিহারী শৈশবে এমন শীর্ণকায় ছিলেন যে বুকের হাড়গুলি সহজে গণনা করা যাইত। তাঁহার সমবয়সীরা তাঁহাকে 'তালপাতার সেপাই' ও 'ফড়িং' বলিয়া রাগাইত।

রাসবিহারীর বয়স যখন ১৩ বৎসর সেই সময়ে পল্লীতে পল্লীতে প্রোফেসর গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের আখড়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌরবাবু তখন ব্যায়ামচর্চ্চার উন্নতিসাধনে যত্নবান। তাঁহার শিক্ষাধীনে আহিরীটোলা জিমনাষ্টিক ক্লাব তখন খুব উন্নতি করিতেছে। রাসবিহারী ঐ ক্লাবে যোগদান করিলেন। ক্লাবের অন্যান্য সভ্য তাঁহাকে দেখিয়া হাসিত।

প্রথমে 'প্যারালেল বার'এ তিনি খুব দক্ষ হইয়া উঠেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সকল বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বে দুর্গাপূজার সময় তিন দিন ধরিয়া কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবাটীতে জিম্‌নাষ্টিকের মহাধূম হইত। একবার বীরাষ্টমীর দিন গৌরবাবুর সকল আখড়ার ছাত্র মিলিয়া রাজবাটীতে এক বিরাট ব্যায়াম-উৎসবের আয়োজন করেন। রাসবিহারী সেই দলের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ক ছিলেন।

কয়েক বৎসর পরে শোভাবাজার বেনিয়াটোলায় একটি ব্যায়াম-সমিতি গঠিত হয় এবং রাসবিহারী তাহার শিক্ষা ও পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। কেবল তাঁহারই শিক্ষা-চাতুর্য্য, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম-সমিতি উন্নতির উচ্চ শিখরে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সার হরিশঙ্কর পাল তাঁহার কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছেন।

পুস্তক রচনায়ও রাসবিহারীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি দুইখানি নাটক, ('সঙ্কল্প' ও 'মুক্তিস্নান') এবং দুইখানি উপন্যাস ('জগদ্ধাত্রী' ও 'সতীর জ্যোতি') প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভাগিনেয় স্বাস্থ্যগুরু ব্যায়ামবীর ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতুলের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আজ ব্যায়াম-জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং দেশে দেশে ব্যায়াম-মন্ত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত শরীরচর্চ্চার নীতিপূর্ণ তথ্যসমূহ, বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামপ্রণালী ও দুঃসাহসিক শারীরিক কসরৎ সত্যই সম্পূর্ণ অভিনব। ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসে ব্যায়ামবীর রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর "বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম-সমিতি" বসন্তকুমার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আজও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩৪০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৷৵০ আনা

প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

-বস্ত্র! শীত-বস্ত্র!!

পাবনা শিল্প সঞ্জীবনীর

নূতন আয়োজন

❖

"পুলোভার"

"সোয়েটার"

"জাম্পার"

প্রভৃতি

❖

খাঁটি পশমে তৈয়ারী

দেখিতে সুন্দর

টেকসই ও সস্তা

❖

শিল্প-সঞ্জীবনীর

"লেডী গেঞ্জী"

"মার্থারাইজড."

নেট" ও "হানিকুম"

সুপরিচিত

ভারতের গৌরবময় জাতীয় প্রতিষ্ঠান

পাবনা শিল্প-সঞ্জীবনী কোং লিঃ

পাবনা ঃ-ঃ বেঙ্গল।

আপনি কি ভোজনে তৃপ্তি পান ?

তীব্র ক্ষুধা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ কিন্তু অজীর্ণতা রোগগ্রস্তের পক্ষে ইহা পরিহাস মাত্র।

অগ্নিমান্দ্য হইলেই বুঝিতে হইবে যে আপনার শরীরে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং তাহারই জন্য আপনি জীবনের এক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনার **পুষ্টিকারক ঔষধ** সেবন করা আবশ্যক।

উত্তমরূপে আহার করিয়া যদি পরে **অজীর্ণতায় কষ্ট পান,** অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়।

সন্তোষজনক বা অল্প আহারের পর **কোষ্ঠকাঠিন্য অনুভব করিলে,** মৃদুবিরেচক ঔষধ সেবনীয়।

ষ্টার্ণসের পরিপাচক ও পুষ্টি-কারক বটিকা এই তিনটি অভাবই পূরণ করে। **রক্ত, স্নায়ু, পরিপাক শক্তি** এবং অন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করিয়া পুরুষ ও নারী উভয়েরই **দৈহিক ক্ষমতা** ও প্রজননশক্তি আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি করে।

সকল কাজেই হ'বে সুখভোগ।
প্রমোদেও হ'বে পূর্ণ উপভোগ্য॥

STEARNS'
DIGESTIVE & TONIC TABLETS
Remedial, Restorative, Rejuvenative

উচ্চ দরের সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

ভাইটোপ্যাথিক সিস্‌টাম অব টি টমেণ্ট

সম্পূর্ণ দেশীয় সাধারণ অবিষাক্ত ভেষজ হইতে আরক আকারে তৈয়ারি। চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে অতি সহজে ও অল্প ব্যয়ে সকল ব্যাধি আরোগ্য করা যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিনা মূল্যে ক্যাটালগ লউন।

সিদ্ধযোগ রিসার্চ্চ ল্যাবোরেটরী

১৩০ সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা

একসেল লিমিটেডের

কাপড় কাচা সাবান

আপনার ব্যবহার করা উচিত

কারণ

১। ইহা খাঁটি ও ভেজালশূন্য।

২। অল্প সাবানে অধিক কাজ করে।

৩। ইহা শ্রমের লাঘব করে।

৪। ইহার পরিষ্কার করিবার শক্তি অত্যধিক।

৫। ইহা কাপড়ের কোন অনিষ্ট করে না।

৬। ইহা উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্দ্দোষরূপে প্রস্তুত।

৭। ইহার উৎকর্ষতার কদাচ লাঘব হয় না।

৫নং রাণী ব্রাঞ্চ রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি

বরগা, বোলটু, গরাদে, গোল রড, এঙ্গেল, পাটী, করগেট টিন্, মটকা, কাঁটা তার

প্রভৃতি টাটা ও কন্টিনেণ্ট হইতে প্রচুর পরিমাণে আনাইয়া খুচরা ও পাইকারী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখি। সমগ্র ভারতবর্ষে লোহার কড়ির এত বড় ষ্টক কোনও দেশীয় ফার্ম্মের আছে কিনা সন্দেহ।

একই প্রকারের মাল বাজারে বহুবিধ রকমের পাওয়া যায়। বিশ্বস্ত দোকান হইতে মাল খরিদ করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মফঃস্বলের খরিদ্দারগণ তাঁহাদের আবশ্যকীয় মালের তালিকা পাঠাইলেই দর পাঠান হয় এবং অর্ডার মত মাল সযত্নে প্রেরিত হয়। আমরা সর্ব্বদাই ঠিক মাল ঠিক দরে দিয়া থাকি।

কুবের লিমিটেড

লৌহ ও ষ্টীল বিভাগ

৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—Manfred. টেলিফোন—কলি: ৫৯৪৫

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসল ইস্পাত নির্ম্মিত বি, এস, এ বাইসাইকেলই ব্যবহার করুন।

গ্যারান্টি ৫০ বৎসর।

সোল এজেণ্ট—এম, এম, ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স

৫৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: ৪০৯৪ কলিকাতা। টেলিগ্রাম—সাইকেলষ্টাইল

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থিসমূহ সুগঠিত করে, হজম-ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরে বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

প্রোপ্রাইটার—**কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং**—গিরগাঁও, বোম্বাই।

পি, এল, দে এণ্ড কোং

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং জুয়েলার্স

১৭৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র আসল গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

— বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক সমস্যার দিনে —

আমরা সমস্ত জিনিসের মজুরী অনেক কম করিয়াছি।

যে কোন রকম চুড়ি, তাগা, মবচেন, হার, নেকলেস প্রভৃতি জিনিসের মজুরী প্রতি ভরি মাত্র ৩৲ টাকা হিসাবে।

আংটী, কানের টাপ, ইয়ারিং ও

অন্যান্য সকল জিনিসের মজুরী কম করা হইয়াছে।

আমাদের দোকানের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে পান মরা বাদ না দিয়াই গিনি সোনার মূল্যে ফেরৎ লইয়া থাকি এবং পুরাতন সোনা ও রূপার বদলে নূতন গহনা দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

চিত্রসূচী—পৌষ

প্রাচীন রাজপুত চিত্র (ত্রিবর্ণ) শ্রীসুখেন্দুনাথ চৌধুরী

দুই বোন (ত্রিবর্ণ). শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[পৌষ—১৩৪০

অর্থনীতি ও রাজনীতি

—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চিন্তা ক'রলে বোঝা যাবে যে রাজনীতি আর অর্থনীতি একটা টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। একটা টাকাকে চিৎ ক'রলেও যা উপুড় ক'রলেও তাই—এক পিঠে লেখা আছে মূল্য, অপর পিঠে আঁকা আছে রাজার বা রাণীর প্রতিকৃতি। এই রাজার মুখের সঙ্গে টাকার মূল্যের নিত্য সম্বন্ধ। আমাদের জীবনের যে-অংশটাকে রাজনীতিক অংশ বলা যায়, তার উল্টো পিঠটা হচ্ছে অর্থনীতিক অংশ। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির বা অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতিরও সেই নিত্য সম্বন্ধ।

রাজনীতির অবনতি বা বিকৃতি হ'লে, অর্থনীতিক অবস্থার অবনতি বা বিকার হ'তেই হবে। অমুক লোকটা ভাল কিন্তু মানুষটা কিছু নয় বলা যেমন অর্থহীন, দেশের রাজনীতিক অবস্থা ভাল, অর্থনীতিক অবস্থাটা খেলো—সেটাও তেমনি অর্থহীন।

এই সব কথাটি মনে রেখে ভাবলে বা কথা কইলে রাজনীতির বিচার করতে করতে অর্থনীতির মধ্যে এসে প'ড়তেই হবে, আর অর্থনীতির কথা কইতে কইতে রাজনীতিতে এসে প'ড়তেই হবে।

আমাদের দেশের লোকে খেতে পারছে না ব'ললেই বুঝতে হবে দেশের রাজনীতির অবস্থাও খারাপ। রাজনীতি ভাল হ'লেই লোকে খেতে পাবে।

উপরে যে টাকার উদাহরণ দিয়েছি—সেটা শুধু উদাহরণ মাত্র নয়, রাজনীতি ও অর্থনীতির নিত্য সম্বন্ধটা ওরই মধ্যে বর্ত্তমান রয়েছে। রাজাকে যদি সত্যি রাষ্ট্রের কর্ণধার ব'লে মেনে নেওয়া যায়, তা হ'লে আমাদের সেকালের যে কথা—রাজার পুণ্যে প্রজার সুখ, আর রাজার পাপে প্রজার মৃত্যু—একথাটাকে একটু ব'দ্‌লে নিলে আজও সত্য ব'লে ধরে নেওয়া চলে। কেবল পুণ্য অর্থে সুবিচার সঙ্গত রাষ্ট্রনীতি এবং পাপ অর্থে অবিচার, একদেশদর্শিতা, অত্যাচার ইত্যাদি ধ'রে নিলেই হ'ল। রাজার হুকুমে যখন টাকার মূল্যটা নির্ণয় হয়—দশ আনা রূপোকে এক শিলিং ছয় পেন্সের সঙ্গে তুল্য মূল্য করা হয়—তখন রাজার মুখ আর টাকা এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি এপিঠ আর ওপিঠ কি না বুঝতে বাকি থাকা উচিত নয়।

* * *

রাজনীতির ছক নিয়ে অর্থাৎ একটা কাগজে-কলমে রচিত লেখাপড়ার ভিতর নিবদ্ধ কনষ্টিটুশান, constitution নিয়ে চারিদিকে মাথা ঘামান হচ্ছে। আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ ভারতবাসীর মধ্যে একমত হ'তে না পারায়, সরকার-বাহাদুর একটা ছক তৈরী ক'রে দেশের মাথা যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কয়জনকে ডেকে বিচার করতে লেগে গেছেন। কিন্তু মোটের মাথায় চারিদিক থেকে আক্রান্ত হ'লেও গভর্ণমেণ্টের রচিত ছকখানায়, (White Paper) বড় বেশী দাগ পড়েনি। সেই আস্ত ছকখানাই পার্লিয়ামেণ্টের সমক্ষে উপস্থাপিত হ'য়ে বিচারের পর আইনে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে দেশে প্রযুক্ত হবে।

এই রকম রাজনীতির ছক প্রস্তুত ক'রতে আর একবার আর এক দেশে বড় হুড়াহুড়ি পড়ে গেছল। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর ফ্রান্সের রিপাব্লিকের কি গড়ন হবে, তাই নিয়ে দেশে কত মনীষী মাথা ঘামিয়েছিলেন। প্রথম তর্ক উঠেছিল ফ্রান্সে ফেডারেশন, federation হবে কি না। কারণ ফ্রান্সের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম অর্থাৎ চারিভিতে কত রকম ভাষা, কতরকম ঐতিহ্য, tradition, কত রকম ধর্ম্মমত ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। উত্তরের দীর্ঘাকার নর্মান, Norman বংশজাত শুভ্রবর্ণ জোয়ানের সঙ্গে দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত ময়লা রঙের খর্ব্বাকৃতি মানুষগুলোর সাদৃশ্য মোটেই ছিল না। ব্রেত্‌ঁ, বাস্ক, নর্মান, বার্গাণ্ডিয়ান ইত্যাদি সম্প্রদায় সকলের ভাষাগত, ইতিহাস-গত ব্যবহার-গত সাদৃশ্য মোটেই ছিল না—তারা নিজেদের ফরাসিই ব'লত না। কিন্তু তথাপি,

ফেডারেশন, federationএর যথেষ্ট কারণ ও উপাদান বর্ত্তমান সত্ত্বেও, ফরাসি রাজনীতিকেরা স্থির ক'রলেন, La France est une et indivisible, ফ্রান্স এক এবং অবিভাজ্য।

আমরা কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্ব হ'তে ভারতজাতির স্বপ্ন দেখে এসেছি, কিন্তু রাজনীতির যখন ছক প্রস্তুত ক'রবার সময় হ'ল, কংগ্রেসের মুখপাত্র হ'য়ে মহাত্মাজী পর্য্যন্ত ফিডারেটেড ইণ্ডিয়া, federated Indiaর প্রস্তাব এককথায় স্বীকার ক'রে নিলেন। এখন সেই প্রস্তাবের ভিতের উপর সমগ্র ইমারতটা গ'ড়ে উঠবে।

ভাষাগত পার্থক্য, ব্যবহারগত পার্থক্য এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মগত পার্থক্য—এত পার্থক্যের মধ্যে কি উপায়ে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া, United India, ভারতজাতির গড়ন গড়া যায়! ফ্রান্সের লোক-সমাজের মধ্যে ফিউডাল সিস্টেমের, feudal systemএর ভাঙ্গাচুরার মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত, ব্যবহার ও ব্যবসায়গত এমন কি ধর্ম্মগত যে বিবিধ বিভিন্নতা ছিল—সে সমস্তকে উপেক্ষা ক'রে ফ্রান্সের মনীষীরা স্থির ক'রলেন যে ফ্রান্স এক ও অখণ্ড। তাঁরা জানতেন যে রাজস্থিতির গড়নটাকে এক এবং অখণ্ড ক'রতে পারলে—সব বাঁক সোজা হ'য়ে যাবে, সব বিভিন্নতা এক হ'য়ে যাবে এবং হ'য়ে গিয়েছেও তাই—ফ্রান্সের মনীষীরা ব'লতে সুরু করেছেন, যে, যে-দেশে ফরাসি ত্রিবর্ণ-পাতাকা ওড়ে, সেই সকল দেশ নিয়ে যে বৃহত্তর ফ্রান্স, তা এক ও অখণ্ড—থাকুক সেখানে বর্ণের বৈষম্য, জাতির বৈষম্য, ধর্ম্মের বৈষম্য—এবং আমার বিশ্বাস কালে হবেও তাই।

আমাদের দেশে বৈষম্য ছিল—বৈষম্য আছে। কিন্তু তাকে যে অমোঘ উপায়ে মুছে ফেলা যেত, সেটা হ'চ্ছে এক অখণ্ড রাষ্ট্রনীতি। সে অখণ্ড রাষ্ট্রনীতির কল্পনা পরিত্যাগ ক'রে ফেডারেশন, federationএর ছক গ্রহণ করা হ'ল। এ পথে যে সকল বৈষম্য দিকে দিকে, প্রদেশে প্রদেশে বর্ত্তমান ছিল তাকে কায়েমী করা হ'ল—কেননা ভারতজাতির গঠন অসম্ভব না হ'লেও হয়ত সকলের পছন্দসই নয়। জার্ম্মানি আজ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে, জার্ম্মানিকে ফ্রান্সেরই মত এক ও অখণ্ড ক'রে তুলতে চলেছে। ফ্রান্সেরই মত এক রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ ক'রে শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট, department বা জেলায় জার্ম্মানিকে বিভক্ত ক'রে—একই আইন, একই পলিসি, policy, একই শাসনের ছক সমগ্র জার্ম্মানির উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রছেন।

কেউ কেউ ব'লবেন—যা হ'লে হ'তে পারত কিন্তু হয় নি, তা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে! যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে। তারপর ভারতবর্ষের তুলনায় ফ্রান্স একটা ক্ষুদ্র দেশ—যা সেখানে সম্ভব, এই বিশাল মহাদেশতুল্য ভূখণ্ডে কি তা সম্ভব হ'তে পারে? সর্ব্বোপরি—ফ্রান্স বা জার্ম্মানি স্বাধীন দেশ—তারা যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারে, ভারতবর্ষ ভারতবাসীর নয়—সুতরাং ফ্রান্স বা জার্ম্মানির উদাহরণ কোন কাজেরই নয়।

আমি উক্ত তিনটি কথাই মেনে নিলুম—এবং ভারতবাসীকে ঐ তিনটা কথা স্পষ্ট ক'রে মেনে নিয়ে সামঞ্জস্য রেখে চিন্তা ও কার্য্য ক'রতে অনুরোধ ক'রছি। যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে—অর্থাৎ ফেডারেশন, federation মেনে নেওয়া হ'য়েছে। এই মেনে নেওয়ার পর, দু'নৌকায় পা দিয়ে আর যেন ভারতজাতির কথা না ভাবা হয়। ফেডারেশন, federationএর ভিতর যে যে ইউনিট, unit থাকবে তারা স্ব স্ব-প্রধান—আপনার ঘরের ভিতর স্বতন্ত্র হবে, এটা যেন ভোলা না হয়। অর্থাৎ একবার ভারতজাতির কল্পনা—আবার তার ভিতর ফেডারেশন, federationএর ভাবনা ভেবে যেন মনের মধ্যে খিচুড়ী প্রস্তুত না করা হয়। যদি ফিডারেটেড ইউনিট, federated unitগুলি নিজের আর্থিক বনাম রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য গ'ড়ে তোলবার জন্য সচেষ্ট হয়, তাকে প্রাদেশিকতা, provincialism ব'লে যেন গালি না দেওয়া হয়।

বাঙ্গালার কথাই ধরা যাক্। বাঙ্গালা যদি স্বীয় আর্থিক তথা রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ ও রক্ষার জন্য, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে উন্নতি ক'রতে গিয়ে অন্য প্রদেশের লোকের ব্যবসার উপর হস্তক্ষেপ করে, সকল কর্ম্মে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে আপনার ঘরে প্রাধান্য দেয়—বেহারী বা মান্দ্রাজী বা পার্সী বা পাঞ্জাবীকে বাঙ্গলার ভিতর দাবিয়ে রাখবার বিধিব্যবস্থা করে, তা হ'লে সে ব্যবস্থাকে জাতীয়তা-বিরোধী ব'লে নিন্দা যেন না করা হয়।

ফেডারেশন ইউনিট, federation unitগুলি স্বনিয়ন্ত্রিত, autonomous হবে। অর্থনীতির সঙ্গে যে রাজনীতির নিত্য সম্বন্ধের কথা ব'লেছি তা যদি মানতে হয়—তাহ'লে টাকার সিন্দুকের চাবিকাঠিটি যদি হাতে না থাকে, তাহ'লে স্বনিয়ামনের, autonomyর কোন মানেই হয় না। অর্থনীতিক স্বাতন্ত্র্য ও রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী ভাব আছে—তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হ'চ্ছে এই, যে, আমার দেশের অর্থসঞ্চয় ও অর্থবৃদ্ধি ক'রতে যা কিছু উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন তা করার স্বাধীনতা আমার থাকবে। আমার দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে প্রথম স্থান দেবার জন্য অন্য দেশের—বেহার থেকে বোম্বাই, এমন কি বেলজিয়ম পর্য্যন্ত—সকল দেশের বাণিজ্য ও শিল্পকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। বাঙ্গালার বাজারে বাঙ্গালার পণ্য প্রাধান্য লাভ ক'রবে—এবং অন্য প্রদেশের বাজারে বাঙ্গালার পণ্য আদান-প্রদানের সমতা রক্ষা ক'রে চলাচল ক'রতে থাকবে।

ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট ক'রে ব'ল্লে এই দাঁড়ায়—বোম্বাই ধনী হ'লে—বাঙ্গালার কিছুই এসে যাবে না। সুতরাং বাঙ্গালা ও বোম্বাইএর মধ্যে পরস্পরের পণ্য আনাগোনা ক'রতে হ'লে—আজ স্বাধীন ইংরেজ ও স্বাধীন জাপানে যে বোঝাপড়া হ'ল—জাপান এত গাঁট তুলো ভারতবর্ষ থেকে কিনছে, তবে ভারতের হাটে এত লক্ষ গজ কাপড় রপ্তানি ক'রতে পারছে—অনুরূপ বোঝাপড়া বোম্বাইয়ে বাঙ্গালায় ক'রতে হবে। বোম্বাই নেটাল-কয়লার পরিবর্ত্তে রাণীগঞ্জের কয়লা এত লক্ষ টন কিনবে, তবে বাঙ্গালা বোম্বাইয়ের এত গজ কাপড় নেবে। এ বন্দোবস্ত যদি না হয়—কাষ্টম-প্রাচীর তুলে বোম্বাইএর মালকে বাঙ্গলা থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। এ ব্যবস্থাকে স্বার্থপরতা বা প্রাদেশিকতা, provincialism ব'ললে চ'লবে না। আর শুধু কাপড় আর কয়লার হাটে এই ব্যবস্থা নয়—সকল হাটে, চাকরীর হাটে, কৃষিজাত সকল দ্রব্যের হাটে, সকল শিল্পের হাটে, বাঙ্গালীর গণ্ডা গুছিয়ে গুণে নেবার জন্য হয় পরস্পর বোঝাপড়া ক'রতে হবে, নয়ত বাঁধ দিয়ে বেনো-জলকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

(২) জীবন

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

বিগত ৩০শে নবেম্বর তারিখে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ৭৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

১৮৫৮-১৮৮৫ (বাল্যজীবন ও শিক্ষা)

বিক্রমপুর পরগণায় ঢাকা সহরের ৩৫ মাইল পশ্চিমে রাঢ়ীখাল গ্রামে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ফরিদপুরের সদরালা ছিলেন। দেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি বহুবিধ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন ও বারবার পরাস্ত হন। পিতার এই পরাজয়কেই পরবর্ত্তী জীবনে পুত্র পিতার গৌরব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরাজয়ে হতবীর্য্য না হইয়া আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য পুনরায় নবীন উদ্যমে অগ্রসর হওয়াই জগদীশচন্দ্রের জীবনের মূল কথা। মহাভারত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ এবং মহাভারতের কর্ণচরিত্রই তাঁহার আদর্শ। বারম্বার পরাজয়ে তিনি অগৌরব অনুভব করেন নাই।

দুর্দ্ধর্ষ ভগবানচন্দ্রের মতামতও কিছু অদ্ভুত ছিল। নিম্নতন কর্ম্মচারীরা যখন নিজ নিজ পুত্রদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ করিতেন, তখন তিনি পুত্র জগদীশচন্দ্রকে দেশী পাঠশালায় পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই। চাষাভূষা নিম্নশ্রেণীর বালকেরাই তখন পাঠশালায় যাইত। জগদীশচন্দ্র স্বগৌরবে তাহাদের সহিত একত্রে শিক্ষালাভ করিতেন এবং সহাধ্যায়ীদের সমভিব্যাহারে পাঠশেষে মাতার নিকট দর্শন দিতেন; মাতা দ্বিধাহীন-চিত্তে পুত্রের সহিত তাহাদিগকেও আদর-আপ্যায়ন করিতেন।

এই দুর্দ্ধর্ষতা ও সর্ব্বজীবে সমান প্রীতি জগদীশচন্দ্রের জন্মগত।

১৮৮৫-১৮৯৫ (উদ্যোগ পর্ব্ব)

স্বদেশে ও বিদেশে (হেয়ার স্কুল, এণ্ট্রেন্স ; সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, এফ-এ, বি-এ ; লণ্ডন মেডিকাল কলেজ—জুয়োলজি, বোটানি, এনাটমি—অসমাপ্ত ; ক্রাইষ্টস কলেজ, কেম্ব্রিজ—বি-এস্-সি, ন্যাচারাল সায়ান্স স্কলারশিপ ; লণ্ডন—বি এস্-সি।) শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি বহু কষ্টে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এখানেই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের সাধনার সূত্রপাত। তিনি অনতিকাল মধ্যে বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন, এবং গবেষণা ও পরীক্ষায় (experiment) অদ্ভুত দক্ষতা প্রদর্শন করেন। অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ও তিনি সহজ করিয়া বুঝাইতে পারিতেন। ইয়োরোপে টেস্‌লা, হার্ট্‌জ ও রঞ্জন-রশ্মি বিষয়ক গবেষণার কথা প্রথম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার ছাত্রদের সেই সেই বিষয়ে স-এক্সপেরিমেণ্ট বক্তৃতা দিতেন ; পরীক্ষণাগারে যন্ত্রাদির বিশেষ অভাব ছিল, তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে সামান্য দ্রব্যাদির দ্বারা বহুমূল্য যন্ত্রের অভাব দূর করিয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার জীবনে ইহা বারবার দেখা গিয়াছে যে তিনি কোনও কিছুর অভাবে কখনও বিচলিত হন নাই—যেমন করিয়া হউক প্রয়োজনীয় যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।

১৮৯৫-১৯০০-১৯০৩ (ফিজিক্স হইতে ফিজিকো-ফিজিওলজি)

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে (জার্ণাল, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল) তাঁহার প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বৈদ্যুতিক তরঙ্গবিষয়ক এই সময়ের গবেষণা বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে এই জাতীয় গবেষণার মূলসূত্রস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহে এবং অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে তাঁহার এই সময়ের গবেষণাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত অথবা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সিলভ্যানাস পি. টমসন, এফ-আর-এস প্রণীত 'দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোক' (Light Visible and Invisible) নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ২২৬-২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—We are shortly to hear a discourse here by Professor J. Chunder Bose, of Calcutta, upon the polarisation of the electric wave as studied by him, with an exceedingly elegant apparatus producing still shorter waves.

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সমক্ষে জগদীশচন্দ্রের "on a self-recovering coherer and the study of the cohering action of different metals" নামক গবেষণার সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেতার-টেলিগ্রাফী সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতেন, 'কোহিয়ারার' থিওরীতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া তাঁহারা আর এই গবেষণায় অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। বেতারতরঙ্গ ধরিবার জন্য তখন পর্য্যন্ত ধারকরূপে ধাতুচূর্ণ ব্যবহার হইত—বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ছিল যে, বেতারতরঙ্গ আকর্ষণ করিয়া এই ধারকচূর্ণগুলি সমষ্টিবদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ কোহিয়ার করে ; কিন্তু জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে আসলে ইহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার এই অভাবনীয় আবিষ্কার বর্ত্তমানে বেতার-বার্ত্তা প্রসারের প্রথম এবং প্রধান কারণ। এই আবিষ্কারে 'কোহিয়ারার থিওরী' ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষিত ও স্বীকৃত হইল, গবেষকগণ ঠিক পথে চলিবার অবকাশ পাইলেন। বাংলা দেশে রেডিও সেট যাহারা ব্যবহার করেন, তাহারা আজ কেহই অবগত নহেন যে ক্রিষ্টাল-রিসিভার বাঙালী জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কার। এই বিষয়ে গবেষণায় অধিকতর অগ্রসর হইতে হইতে তিনি অনুভব করেন যে, জীবিত প্রাণীর যেমন অবসাদ আসে, জড়ধাতু বা প্রস্তরেরও সেইরূপ অবসাদ আসিয়া থাকে। এবং তখন হইতেই জড় ও জীবিতের মধ্যে ঐক্যসন্ধানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। উদ্ভিদের স্থান এই জড় ও জীবিতের মাঝামাঝি—সুতরাং তিনি উদ্ভিদের প্রাণধর্ম্ম, জীবনস্পন্দন, বৃদ্ধি ও ক্ষয় এবং মৃত্যু লইয়া গবেষণা সুরু করেন। ফিজিক্স হইতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, তথা ফিজিওলজিতে এই ভাবেই তাঁহার যাত্রা। সেই একের সন্ধান তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম—যে-এক জড় এবং ওষধিকে,

ওষধি এবং বনস্পতিকে বনস্পতি, এবং প্রাণীকে, প্রাণরূপে বিধৃত করিয়া আছেন। সেই মহাবাণীর তিনি নবীন বৈজ্ঞানিক উদ্গাতা, যে-বাণী একদা ভারতের তপোবনে ঋষি-মুখে নিঃসৃত হইয়াছিল।

"On a self-receiving coherer and the study of the cohering action of different metals" নামক গবেষণা-প্রবন্ধের শেষ কয়েকটি কথার মধ্যে যে বিরাট সম্ভবনার সূচনা ছিল, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কি তখন তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন,

It would be interesting to investigate whether the observed action of electric radiation on a potassium receiver is in any-way analogous to the photo-electric action of visible light.

এই কথাকে সূত্র ধরিয়া বিভিন্ন ধাতুর ফটো ইলেক্‌ট্রিক্ অ্যাক্‌সন সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে বর্ত্তমানের টকি-ফিল্‌মের উদ্ভব। জগদীশচন্দ্রের মনে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই সম্ভাবনার কথা জাগিয়াছিল।

"On electric touch and the molecular changes produced in matter by electric waves" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি জড়পদার্থের fatigue বা অবসাদ লক্ষ্য করেন। এবিষয়ে তাঁহার নিজের কথা উদ্ধৃত করিতেছি। "On continuity of effect of light and electric radiation on matter" নামক বক্তৃতার প্রারম্ভে (রয়্যাল সোসাইটি, জুন ২০, ১৯০১) তিনি বলেন, Though the theory of coherence gives a simple explanation of many cases of diminution of resistance in a mass of metallic particles under electric radiation, yet there are cases which are not explicable by that theory. এ বিষয়ে পটাসিয়াম, সিলভার প্রভৃতি ধাতু লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি জড়পদার্থের অবসাদ ও সুস্থ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধীয় তাঁহার বিখ্যাত ষ্ট্রেন-থিওরী (Strain theory) আবিষ্কার করেন ও জড়-জগৎ ও জীব-জগতের ঐক্য খুঁজিয়া পান। ১৯০১ সালের ১০ই মে রয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুশন অব গ্রেট ব্রিটেনে তিনি বলেন,

It was when I came upon the mute witness of these selfmade records and perceived in them one phase of a parvading unity that bears within it all things—the mote that quivers in ripples of light, the

১নং চিত্র।

teeming life upon our earth, and the radiant suns that shine above us—it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—"They who see but One, in all chang-

ing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else."

অনেকে প্রশ্ন করেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এমন কি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা মানবের উপকার সাধন করিবে? ইহার উত্তর এই যে, জড় ও জীবিতের ঐক্যবিষয়ক গবেষণা এখনও তাঁহার সমাপ্ত হয় নাই; এই বিষয়ে যেদিন তাঁহার শেষ কথা প্রচারিত হইবে সেদিন চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে একটা ওলট-পালট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই তাঁহার গবেষণা মানবের দেহতত্ত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের গবেষণা বাদ দিলেও

২নং চিত্র।

তাঁহার প্রাথমিক জীবনের বহু গবেষণার ফল আজ যে অর্থকরী হইয়াছে ক্রিষ্টাল রিসিভার তাহার প্রমাণ। বর্ত্তমান রেডিও-টেলিগ্রাফীর প্রসারের সঙ্গে যে তাঁহার যোগ আছে, ১৯৩০ সালের ১১ই জানুয়ারীর 'নেচার' পত্রিকার ৫৯ পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ আছে। স্যার হেনরী জ্যাকসন, এফ-আর-এস (অ্যাডমিরাল অব দি ফ্লীট, গ্রেটব্রিটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড) সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া 'নেচার' বলিতেছেন—

In 1891 the navy was seeking some means by which a torpedo boat could announce her approach to a friendly ship, and the idea first came to Sir Henry Jackson of employing Hertzian waves as a means of communication for this purpose. He was then at sea and was unable to put his ideas into a practical form until in 1895, when in command of the *Defiance* he read of some experiments by Dr. (Now Sir Jagadis) Bose on Coherers. Having obtained a satisfactory coherer he managed in this year to effect communication by electro-magnetic radiation from one end of his ship to the other. During the next two years he continued his experiments with increasing success. On Sept. 1, 1896 he (Sir Henry) first met Mr. Marconi......

এবং ১৮৯৭, ২৯শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁহার ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক রেডিয়েশন সম্বন্ধীয় বক্তৃতার পর সে বিষয়ে লিখিতে গিয়া সুবিখ্যাত পত্রিকা 'ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ার' যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"that no secret was at any time made as to its (Bose's Receiver) construction, so that it has been open to all the world to adopt it for practical and possibly moneymaking purposes"—

তাহাতে তাঁহার বিষয়বুদ্ধিহীনতার কথা বিষয়ী লোকে কি ভাবে না?

এই সময়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল গবেষণা করেন, এবং যে সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সাফল্যলাভ করেন, বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক স্যার জে. জে. টমসন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় তাহার বিশদ বর্ণনা

লিখিয়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁহার সম্মান করিয়াছেন। সেগুলি আজ জগতের বিজ্ঞান-মন্দিরে আসন লাভ করিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের এই সময়ের প্রবন্ধাবলী তিনিই (স্যার জে. জে. টমসন) একত্র গ্রথিত করিয়া ভূমিকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটির নাম Collected Physical Papers (Longmans, Green & Co, 1926, 10s.)। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন,—

৩নং চিত্র।

A considerable number of these were written some thirty years ago, shortly after the publication of Hertz's experiments on electric waves when the study of the properties of electric waves was being pursued with great vigour. This study was facilitated by the method introduced by Bose, of generating electrical waves of shorter wave-length than those in general use. By this nethod he obtained important results on coherence, polarization, double refraction and rotation of the plane of polarization......

জীবনের এই অংশে তিনি যে যে বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন তাহার কয়েকটির নাম এবং সেই সেই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশের স্থান ও তারিখ যথাক্রমে এইরূপ—

1. On Polarisation of Electric Rays by Double-Refracting Crystals (Asiatic Soc. Bengal—May 1895)
2. On a New Electro-Polariscope (The Electrician, Dec. 1895)
3. On Double-Refraction of the Electric Ray by a Strained Dielectric (The Electrician, Dec. 1895)
4. On the Determination of the Index of Refraction of Sulphur for the Electric Ray (Proc. Roy. Soc. Oct. 1895)
5. Index of Refraction of Glass for the Electric Ray (Proc. Roy. Soc. Nov. 1897).
6. On the Influence of Thickness of Air Space on Total Reflection of Electric Radiation (Proc. Roy. Soc. Nov. 1897)
7. A simple and accurate method of Determination of the Index of Refraction for Light (Nov. 1895)
8. On the Selective Conductivity exhibited by certain Polarising substances (Proc. Roy. Soc. Jan. 1897)
9. The production of a "Dark Cross" in the field of Electro-magnetic Radiation (Proc. Roy. Soc. March, 1898)
10. On Electric Touch and the Molecular changes produced in Matter by Electric waves (Proc. Roy. Soc. Feb. 1900)
11. On the similarities between Radiation and Mechanical Strains (Proc. Roy. Soc. June 1901)
12. On the Strain theory of Photographic Action (Proc. Roy. Soc. June 1901)
13. On the Change of Conductivity of Metallic particles under Cyclic Electromotive variation (British Association, Glasgow, 1901)
14. On the similarity of effect of Electrical stimulus on inorganic and living substances (Congress of Science, Paris, 1900)
15. The response of Inorganic matter to Mechanical and Electrical stimulus (Friday Evening discourse, Roy. Inst. 1901)

16. Electromotive wave accompanying mechanical disturbance in metals in contact with Electrolyte (Proc. Roy. Soc., 1902)

হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত তিনি গুরু ও আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার শিষ্যদের গড়িয়া তুলিতেছেন ও তাঁহাদিগকে বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া প্রাচীন ভারতের সুমহান অতীতের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। শেষের এই দুই যুগেই তাঁহার সতেরো খানি বিখ্যাত গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষায় কয়েকটির সংস্করণ হইয়াছে। এই দুই যুগেই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত রেসোনেণ্ট রেকর্ডার, ক্রেস্কোগ্রাফ ও ইলেকট্রিক প্রোব যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্ল্যাণ্ট ফিজিওলজি বিভাগে তাঁহার বহুছাত্র স্বদেশে ও বিদেশে বহু যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা তাঁহার জীবনের এই দুই যুগের পরিচয় দিব।

৪নং চিত্র। (আগামী সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

এই প্রবন্ধে আমরা চারিটি চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। চারিটি চিত্রই অধ্যাপক পেট্রিক গেড্ডিস লিখিত 'লাইফ এণ্ড ওয়ার্কস অব স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস' নামক গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত। প্রথম চিত্রটি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনে ফ্রাইডে ইভ্নিং ডিস্কোর্সে তিনি যখন 'বিদ্যুৎ-তরঙ্গ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন, এই আলোক-চিত্রটি তখন গৃহীত।

১৯০২ সালে Linnean সোসাইটির জার্নালে তাঁহার Electric Response in ordinary plants under mechanical stimulation নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে তাঁহার জীবনের তৃতীয় যুগ শেষ হয়। ওই সালেই তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক "জীবিত ও জড়ের স্পন্দন" (Response in the Living and Non-living, Longmans, 10s. 6d.) ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ফিজিক্স অপেক্ষা ফিজিওলজির আকর্ষণ এখন হইতেই অধিক হয়, বহুর মধ্যে একের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এই গ্রন্থ তিনি তাঁহার দেশবাসীকে উৎসর্গ করেন।

সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৯১৭ সালে ৩০শে নবেম্বর তারিখে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের চতুর্থ যুগ। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা-দিবস

দ্বিতীয় চিত্রটি, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আবিষ্কৃত অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে গৃহীত একটি গাছের পাতার ফটোগ্রাফি (১৯০১ সাল)। অদৃশ্য আলোর আঘাতেও বস্তুর আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটে। সেইজন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্ত্তন হয়। ফটোগ্রাফের প্লেটে যে ছবি পড়ে, তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে এবং ডেভেলপার ঢালিলে ছবি ফুটিয়া উঠে।

তৃতীয় চিত্রটি বৈদ্যুতিক স্পন্দনাহত টিনধাতুর অবসাদ-(fatigue) নির্দেশক চিত্র। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, রয়াল ইনষ্টিটুশনের ডেভি ফ্যারাডে ল্যাবরটারীতে লর্ড র‍্যালে, সার জেম্স ডেওয়ার প্রভৃতির সম্মুখে টিনের অবসাদ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত করেন।

চতুর্থ চিত্রটি রেসোনেণ্ট রেকর্ডারের।

গার্হস্থ্য-জীবন ঃ

নারীর সুখদুঃখ ও নারী-জীবনের সার্থকতা

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

গত কার্ত্তিকের সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাম্যবাদে নরনারী ও গার্হস্থ্য জীবন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, সৃষ্টিধারা-রক্ষায় নরনারীর যে কর্ম্মের ভাগ নৈসর্গিক বিধানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সুসিদ্ধির প্রয়োজনেই বৈবাহিক সম্বন্ধে মিলিত স্ত্রীপুরুষের গার্হস্থ্য জীবন উন্নত সব মানব-সমাজে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং গার্হস্থ্য-জীবনে পুরুষস্ত্রীর স্বাভাবিক সম্বন্ধই হয় ভর্ত্ত-ভার্য্যার সম্বন্ধ। ভর্ত্তৃরূপে পুরুষ আবার স্ত্রীর ও স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানসন্ততির রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা হইয়াও দাঁড়ায়। দৈহিক ও মানসিক যে সব গুণ লইয়া পুরুষের পৌরুষ, বাহিরের যে সব কাজ সাধারণতঃ পুরুষকে করিতে হয়, তাহা সেই পৌরুষেরই কাজ এবং পৌরুষেরই অনুশীলন তাহাতে হয়। ইহা হইতে চরিত্রগত যে বিশিষ্টতা গড়িয়া উঠে, তাহাই এই ভর্ত্তৃত্বের সঙ্গে রক্ষাকর্ত্তৃত্বের যোগ্যতা পুরুষকে করিয়া তুলিয়াছে, এবং ইহার দায়িত্বও সব সমাজে পুরুষের উপরে অর্পিত হইয়াছে। সুশাসিত রাষ্ট্রে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত একটা সুনীতি-শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী উন্নত সমাজে এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অবশ্য অতি কঠিন নহে এবং এরূপ সব রাষ্ট্রে ও সমাজে শিক্ষিতা ও উন্নতশীলা নারীরাও অনেক পরিমাণে আপনাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু সন্তানের গর্ভধারিণী, প্রসূতি ও ধাত্রীরূপে গৃহে যে কর্ম্মের ভাগ নারীর উপরে পড়িয়াছে, নারীস্বভাবের বিশিষ্ট সব গুণ যাহা এবং এইরূপ কর্ম্মে সেই সব গুণের অনুশীলনে নারী-চরিত্রও বিশিষ্ট যে আদর্শে গড়িয়া উঠে, তাহাতে এই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সর্ব্বদা পালন করা তাঁহাদের পক্ষে সুসাধ্য ও সুখকর হয় না। তাই যেমন ভরণপোষণের জন্য, তেমন রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও পুরুষের উপরে নির্ভরশীলতাই গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে নারীজীবনের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য এবং গার্হস্থ্য-জীবনের বহু কর্ত্তব্য পালনের জন্য গৃহস্থ পুরুষও গৃহিণীর উপরে অনেক নির্ভর করে বটে, কিন্তু গৃহস্থ না হইয়া জীবন যাপন করা পুরুষের পক্ষে এমন ক্লেশকর কিছু হয় না। সন্তানের জনকত্ব ও বাহিরের কাজে অর্থোপার্জ্জনে কোনও বাধা তাহার পক্ষে কখনও জন্মায় না। অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে একা সে তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা যেরূপই হউক, একটা করিয়া নিতে পারে। স-সন্তানা কোনও নারীর পক্ষে একেবারে আত্মনির্ভর হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে জীবন যাপন করা সহজসাধ্য একটা ব্যাপার হয় না। তাই গৃহিণীর উপরে গৃহস্থ পুরুষের যে নির্ভরশীলতা, তাহার অপেক্ষা ভর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা স্বামীর উপরে স্ত্রীর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন অনেক বড়।

গার্হস্থ্য-জীবনে পুরুষের প্রধান দায়িত্ব স্ত্রীর ও তাহার গর্ভজাত সন্তানসন্ততির ভরণ-পোষণ। ধর্ম্ম মানিয়া অথবা স্বাভাবিক প্রেমের কি স্নেহের টানে এই দায়িত্ব কেহ পালন না করিলে, সমাজশক্তি বা রাজকীয় আইন তাহাকে বাধ্য করিতেও পারে। কিন্তু স্ত্রী তাহারই মাত্র স্ত্রী, আর তাহার গর্ভজাত সন্তানসন্ততি সব তাহারই ঔরসজাত, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা একটা না থাকিলে স্বাভাবিক কোনও টান আসে না, সমাজশক্তিও ন্যায়তঃ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না। যৌনসম্বন্ধে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা ব্যতীত এ নিশ্চয়তা সম্ভব নহে। এই একনিষ্ঠতা সাধারণতঃ সতীত্ব ধর্ম্ম নামে পরিচিত। ইহা ব্যতীত ভর্ত্তৃভার্য্যার সম্বন্ধে মিলিত নরনারীর গার্হস্থ্য-জীবনই সম্ভব হয় না। পুরুষের পক্ষে এই একনিষ্ঠতা সচ্চরিত্রতার একটা আদর্শ হইলেও, গার্হস্থ্যস্থিতির প্রয়োজনে অপরিহার্য্য বলিয়া কোথাও পরিগণিত হয় না, এবং ত্রুটিবিচ্যুতিও লোকে উপেক্ষা করে। কিন্তু নারীর পক্ষে ইহা অমার্জ্জনীয় একটা অপরাধ। প্রকাশ্য ভাবে এইরূপ কোনও অপরাধ করিলে স্বামীর স্ত্রী ও সন্তানের জননী রূপে কোনও গৃহস্থকুলে সেই নারীর স্থান আর হয় না।

জনক-জননী উভয়ের হইতেই সন্তান জন্মিয়াছে। উভয়ের সঙ্গেই দেহের শোণিতগত কেবল নহে, মানসিক গুণগতও অবিচ্ছিন্ন ধারায় একটি সম্বন্ধ তাহার রহিয়াছে। সন্তানপালনে উভয়ের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমন সন্তানেরও স্নেহে পালিত হইবার একটা দাবী উভয়ের উপরে আছে। গার্হস্থ্য-

ধর্ম্মে স্থিতা সতীর গর্ভজাত ব্যতীত পিতার সঙ্গে এরূপ কোনও সম্বন্ধ দূরে থাক্, পিতৃপরিচয়ও কোনও সন্তানের পক্ষে সহজে হইতে পারে না। এই ক্ষতি সন্তানের পক্ষে কত বড় যে একটা ক্ষতি, কত বড় একটা আনন্দে ও গৌরবে যে সন্তান ইহাতে বঞ্চিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নারীর নিজের পক্ষেও ইহা বড় সুখকর হয় না। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুগত দাম্পত্য সম্বন্ধের বাহিরে কোন্ নারীর গর্ভজাত কোন্ সন্তানের জনক কোন্ পুরুষ, নিশ্চিত ভাবে তাহা নির্ণয় করা সর্ব্বদা সম্ভব হয় না; আর তাহা না হইলে কাহারও পিতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণেও তাহাকে বাধ্য করা যায় না। জনকত্ব কেহ অস্বীকার করিলে, প্রমাণে তাহা সিদ্ধ করাও বড় সহজ হয় না। কিন্তু নারীর জননীত্ব এমনই প্রত্যক্ষসিদ্ধ একটা বস্তু, যে, সহজে কেহ তাহা বড় এড়াইতে পারে না। সুতরাং পালনের সকল দায়িত্ব এ অবস্থায় জননী সেই নারীর উপরেই পড়িবে। সন্তান গর্ভে ধারণ, তাহার প্রসব ও স্তন্যদানাদি কর্ম্মে লালন-পালন ত আছেই, তাহার উপরে আবার বাহিরে কাজকর্ম্ম করিয়া ধন-আহরণও নিজের শ্রমে নারীকে করিতে হইবে। আর পুরুষ যথেচ্ছ ভাবে বহুনারীর গর্ভজাত বহু-সন্তানের জনক হইয়াও তাহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। রাজ-সরকার হইতে এইরূপ সব নারীর সাহায্যার্থে ব্যবস্থা কিছু হইতে পারে, যেমন নাকি বোলশেভিক রুষিয়ায় হইতেছে। কিন্তু সে ব্যবস্থায়ও, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে স্থিতা নারী যে সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করে, তাহা দিতে পারে নাই। রুষ-সরকার এ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিল এবং তাহা না পারিয়া শেষে যে-ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই ইহার সত্যতা সকলে বুঝিতে পারিবেন।

সন্তানের জননে ও পালনে অতি গুরু যে দায়িত্ব প্রকৃতি-দেবী নারীর উপরে অর্পণ করিয়াছেন, সেই দায়িত্বপালনে সন্তানের জনক পুরুষেরও যথাপ্রয়োজন সহায়তা সে পায়, আর পুরুষ তাহা সহজে না এড়াইতে পারে, আর সন্তানও পিতৃপরিচয়ে পিতৃস্নেহে এবং পিতার উপরে তাহার ন্যায্য দাবীতে, পিতৃকুলগত বিশিষ্ট কোনও মর্য্যাদার উত্তরাধিকারে বঞ্চিত না হয়—তাই সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য-জীবনের এবং তাহার বিশিষ্ট একটা ধর্ম্মনীতিরও অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই ধর্ম্মনীতি এক দিকে যেমন স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুরুষের উপরে ন্যস্ত করিয়াছে, অপর দিকে তেমনই ভার্য্যাত্বের সঙ্গে সতীত্বেরও একটা আদর্শ নারীর পক্ষে স্থাপনা করিয়াছে।

এখন এই ভর্ত্তৃত্ব ও রক্ষাকর্ত্তৃত্ব পুরুষকে এমন একটা প্রাধান্য দিয়াছে, এবং ভার্য্যাত্ব ও তাহার সঙ্গের সতীত্ব ধর্ম্মের একান্ত অনুবর্ত্তিতার প্রয়োজন নারীকেও স্বামীর প্রতি এমন আনুগত্যের অধীনতায় আনিয়াছে যে, গার্হস্থ্য-জীবনের পরিবারগুলি মাতৃকৌলিক (matriarchal) না হইয়া, সর্ব্বত্রই প্রায় পিতৃকৌলিক (patriarchal) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাতৃকৌলিক পরিবার ক্বচিৎ কোথাও যাহা ছিল, তাহাও উঠিয়া যাইতেছে; প্রায় পিতৃকৌলিক ধারায় আসিতেছে। বস্তুতঃ একটা মঙ্গলের ধারায় সংসার-স্থিতিরক্ষার পক্ষে এই পিতৃকৌলিক পরিবারমূলক গার্হস্থ্য-জীবন অপেক্ষা উন্নততর কি অধিকতর কল্যাণকর কোনও ব্যবস্থা কোথাও আর কেহ করিতে পারেন নাই। বোল্‌শেভিক রুষিয়ায় অনুরূপ একটা চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহা সফল ও সুফলপ্রদ হইবে কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। অন্ততঃ নূতন এই যে একটা পরীক্ষা হইতেছে, তাহার ফলাফল না দেখিয়া ভালমন্দ এ সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে পারেন না। সেই পরীক্ষার ফল কত দিনে কি ভাবে দেখা দিবে, তাহারও নিশ্চয়তা কিছু নাই। মানব-সমাজের বিগত ইতিহাসের ধারা যে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা বরং এই গার্হস্থ্য-জীবনেরই অনুকূল, সাম্যবাদী রুষিয়ার স্বতন্ত্র সব নর-নারীর জীবন যে আদর্শের দিকে যাইতেছে তাহার অনুকূল নহে। মানব-জীবন সম্বন্ধে নৈসর্গিক নীতির তত্ত্বানুসন্ধান যদি আমরা করি, দেখিতে পাইব এই ইতিহাসের ধারা তাহারই অনুসরণ করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যৌন ব্যবহারে নরনারীর মধ্যে স্বেচ্ছাচার যেখানে যাহা ছিল, ক্রমে সব লোপ পাইয়া ক্রমে গার্হস্থ্য-জীবনের সুনীতি-শৃঙ্খলার মধ্যে আসিয়াছে, কারণ এই সুনীতিশৃঙ্খলায় যেমন নরনারী নিজেরা, তেমন তাহাদের সন্তানসন্ততি, সংসার ও সমাজে, সকলপক্ষই অশেষ কল্যাণের ভাগী হয়।

গার্হস্থ্য-জীবন চাহিলে তাহা পিতৃকৌলিক ধারায়ই আসিবে

এবং নারীকে বিশিষ্ট কোনও পুরুষের একনিষ্ঠা ভার্য্যা হইয়া কেবল তাহারই সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে হইবে, তাহারই গৃহে তাহারই রক্ষণাবেক্ষণাধীনতায় আসিয়া সেই সন্তানদের লালন-পালন এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্ম সব করিতে হইবে। ইহা যে অনিবার্য্য একথা সকলেই একরূপ স্বীকার করেন। কিন্তু এই অবস্থাটা নারীর পক্ষে সুখকর বা মর্য্যাদাকর বলিয়া অনেকে আজকাল মনে করেন না। ইঁহারা বলেন, নারী যে এইভাবে অতি গ্লানিকর একটা ভাগ্য—বিশিষ্ট কোনও পুরুষের দাসীত্ব—গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সে কেবল পেটের দায়ে; তাহার আর্থিক স্বাধীনতা নাই তাই। বর্ত্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থকর কাজকর্ম্ম সব পুরুষরাই দখল করিয়া ফেলিয়াছে। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আপনাকে ভরণপোষণ করিবার সুযোগ নারী বড় পায় না। কাজেই কোনও না কোনও পুরুষের ভাগ্যাশ্রয় তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। তারপর কেবল তাহারই সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া তাহাদের প্রতিপালন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহে ভাত রাঁধা, জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি দাসীর কর্ম্ম সে করে। এখন নারী যদি নিজের কাজকর্ম্মে আর্থিক অবস্থায় স্বাধীন (economically independent) হইতে পারে, বিবাহিতা পত্নীরূপে কোনও পুরুষের আর্থিক সহায়তা লইতে এবং তাহার জন্য তাহার গৃহে এরূপ দাসীত্ব তাহাকে করিতে হইবে না। নিজের উপার্জ্জিত অর্থে স্বাধীনভাবেই সে বাস করিতে পারিবে। প্রত্যেক নারীকে আর্থিক স্বাধীনতার অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, খুব জোরেই এইরূপ একটা দাবী এখন হইতেছে। কিন্তু করিবে কে? কি উপায়েই বা করিবে? ইঁহারা বলেন, সমান সমান ভোটে নির্ব্বাচিত নারী পুরুষের প্রতিনিধিদের লইয়া নূতন যে ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রশক্তি গঠিত হইবে, সেই ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রশক্তিই ইহা করিবে। ষ্টেট্-শক্তির ধারক এ যাবৎ পুরুষরাই সব দেশে আছে, এবং নারীকে চাপিয়া রাখিয়া অর্থোপার্জ্জনের সকল পথ নিজেরাই দখল করিয়াছে। কিন্তু এই শক্তি পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে নারীর হাতে আসিলে ইহা আর সম্ভব হইবে না,—অর্থোপার্জ্জনের সকল পথ যেমন পুরুষের তেমন নারীর সম্মুখেও উন্মুক্ত হইবে। ধরিয়া লইলাম, নারীপুরুষের সমান কর্ত্তৃত্বে নূতন এইরূপ এক একটা রাষ্ট্র সকল দেশে গড়া হইল, নারীর অধিকার একেবারে নিক্তির ওজনে পুরুষের সমান সমান রাখিবারও ব্যবস্থা হইল। আইনও পাশ হইল, স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এমন আয় প্রত্যেক নারীর থাকা চাই। হাঁ, থাকা চাই, আইনে এই নির্দ্দেশটা গলা-বাজিতে আর ভোটের জোরে পাশ হইতে পারে। কিন্তু সেই গলাবাজি আর ভোট কাজেও এটা ঘটাইতে পারিবে কি? এটা কেবল নারীর পক্ষে নয়, পুরুষের পক্ষেও ঘটান চাই। কারণ সেও নারীর অন্ততঃ সমান ত বটে। সর্ব্বত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি, পুরুষ, যাহাদের কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহারাই সকলে কাজ পায়না, যাহারা পায়, তাহাদেরও সকলের আয় যথেষ্ট হয় না। এখন নারী-পুরুষ সকলেই পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ক্ষেত্রে নামিলে, সকলের পক্ষেই কাজ আর সেই কাজে স্বাধীন জীবিকার উপযোগী একটা আয় হইবে কি? পাশ্চাত্য সব দেশে নারীরা যত বেশী এই সব কর্ম্মের ক্ষেত্রে জীবিকার জন্য আসিতেছে, জীবিকা-সমস্যা—problem of unemployment—ততই যে অতি কঠিন হইয়া উঠিতেছে, অনেকেই ইহা জানেন। নব্য-সোসিয়ালিজম্ ধনার্জ্জনে ও অর্জ্জিত ধনের স্বত্বস্বামিত্বে ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করিয়া, এবং ব্যবসায়বাণিজ্য সব সরকারী দখলে আনিয়া, নরনারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি ব্যক্তির আর্থিক স্বাধীনতা কি ভাবে হইতে পারে, তাহার একটা কল্পনা করিয়াছে, বোল্‌শেভিক রুষিয়ায় এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবারও বিপুল একটা চেষ্টা হইতেছে। তবে তাহা মানবজীবনের পক্ষে সুখকর হইবে কিনা, এবং চেষ্টা আশানুরূপ ফল প্রসব করিবে কিনা, তাহা নিশ্চিত ভাবে কেহই বলিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু সুদীর্ঘ সে আলোচনার মধ্যে যাইবার অবসর এ প্রবন্ধে নাই।

ধরিয়াই না হয় লইলাম, সে-সকল চেষ্টা সফল হইল, সেচ্ছায় ও আনন্দে সকলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। কিন্তু জাতির ধারা যদি রক্ষা করিতে হয়, নারীকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবও করিতে হইবে। নারীর ভোটের জোর যতই বেশী হউক, কোনও আইনে এ দায়িত্ব পুরুষের উপরে কোনও গবর্ণমেণ্ট চাপাইতে পারে না। তবে গর্ভধারণ ও প্রসবের দায়িত্বটা নারীপুরুষে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া সম্ভব না

হইলেও, প্রসূত সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্বটা ভাগ হইতে পারে। সন্তান যতদিন স্তন্যপায়ী শিশু, ততদিন নারীকেই এ ভার বহন করিতে হইবে, কারণ প্রকৃতিদেবী যেমন তাহার গর্ভে সন্তান দিয়াছেন তেমন অতি শৈশবে সন্তানের খাদ্যও তাহার বক্ষে দিয়াছেন। তারপর পয়সা খরচ করিয়া যখন তাহাদের অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে, তখন তাহার একটা ভাগ পুরুষের কাছে আদায় করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন্ সন্তানের খরচের ভাগ কোন্ পুরুষের কাছে আদায় করা হইবে? কোন্ পুরুষ কোন্ সন্তানের জনক তাহা নির্ণয় সহজ হয় না, যদি না জননী বিশিষ্ট কোন পুরুষের কাছে যৌন-সম্বন্ধে একনিষ্ঠা থাকেন। কিন্তু সে ত প্রকারান্তরে সেই বিবাহ, সেই একনিষ্ঠ সতীত্বে পুরুষের আনুগত্যের কথাই আসিল। সেই আনুগত্যেই যদি আসিতে হয়, তবে সেই পুরুষের কাছে খোরপোষটা আদায় করিয়া লইতেই বা এমন অপমানটা বেশী কি হইবে? কার্য্যতঃ ইহাই গার্হস্থ্য-জীবনে পুরুষ-স্ত্রীতে ভর্ত্তৃভার্য্যার সম্বন্ধ। কিন্তু কোনও অপমান এ যাবৎ নারীরা ইহাতে বোধ করেন নাই। আজকাল কেহ কেহ করিতেছেন। তবে অপমানের বোধটা নারীদের চিত্তেই যে প্রথমে জাগ্রত হইয়াছে, তাহা নয়। বিকৃতবুদ্ধি কতকগুলি পুরুষই সুরটা আগে তুলিয়াছেন, কোনও কোনও নারী তাহার গোঁ ধরিয়াছেন। আর ইঁহারাও সকলেই প্রায় এমন নারী, যাঁহারা গার্হস্থ্য-জীবনে স্থিতা হন নাই, বা হইতে পারেন নাই। পত্নীত্বের, গৃহিণীত্বের ও মাতৃত্বের আনন্দ ও গৌরব যে কি বস্তু, তাহা অনুভব করিতেও পারেন নাই।

কাজ যে যাহা করে, লোকসমাজের কোনও না কোনও মঙ্গল তাহাতে ঘটে। কাজের যে আয়, সে তাহার সেই মঙ্গলদানের ন্যায্য একটা পুরস্কার। গৃহে গৃহে সব নারীরা সন্তানের মাতৃত্বে ও ধাত্রীত্বে, গৃহিণীরূপে গৃহরক্ষায়, অতি গুরু ও কল্যাণকর সামাজিক একটি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। গর্ভজাত সন্তানের পিতা গৃহস্থ পুরুষ যে তাহার ভরণ-পোষণ করে, ইহা নারীর সেই কর্ম্মের বিনিময়ে ন্যায্য পাওনা। সে পাওনা গৃহস্থ পুরুষ স্বেচ্ছায় তাহাকে না দিলে আইনের বাধ্যতায় দিতে হয়। বাহিরের কাজে পাঠাইয়া অথবা সাময়িক অর্থসাহায্যদানে সমাজশক্তি বা গবর্ণমেণ্ট সসন্তানা সব নারীর ভরণ-পোষণের ভার নিজের হাতে না রাখিয়া গৃহে গৃহে গৃহস্থ সব পুরুষের হাতে ন্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং এই যে একটা আর্থিক স্থিতি গার্হস্থ্য-জীবনে নারীর রহিয়াছে, ইহাকেও প্রকারান্তরে তাহার আর্থিক স্বাধীনতা বা economic independence বলা যাইতে পারে। ন্যায্য দাবীর উপরেই এই স্থিতি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অমর্য্যাদার কারণ ইহাতে কিছু নাই।

হাঁ, তবে আর একপ্রকার ব্যবস্থাও হইতে পারে। নারী সব স্বাধীন থাকিবে, স্বাধীন ভাবেই ইচ্ছামত সন্তান প্রসব করিবে। জনক জ্ঞাত কি অজ্ঞাত যে যাহারই হউক্, বয়স্ক সব পুরুষের উপরে বিশেষ একটা কর ধার্য্য করিয়া দেশের সব শিশু পালনের উপায় করা যাইতে পারে। সরকারী সব প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী সব সরকারী লোকেরা ইহাদের মানুষ করিয়া তুলিবে, অথবা নিজের হাতে রাখিলে সরকারী সেই তহবিল হইতে সন্তানপিছু একটা মাসহারা জননীরা পাইবে। সেই পুরুষের অর্থেই নারীর সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইবে; তখন স্ত্রীরা হইবে সব সাধারণী স্ত্রী, আর সন্তানরাও হইবে অজ্ঞাতপিতৃক সাধারণ সব সরকারী সন্তান। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে স্বামীর ভার্য্যাত্ব ও স্বামীগৃহের গৃহিণীত্ব অপেক্ষা এই অবস্থাটা কি নারীজাতির পক্ষে অধিক মর্য্যাদার অবস্থা হইবে? আর সন্তান—বাপের ছেলে কেহ নয়, সরকারী ছেলে সরকারী ভাতে সব মানুষ হইবে। বড় হইয়া উঠিলে এ অবস্থাটা তাহারাই কি বিশেষ মর্য্যাদাকর বলিয়া মনে করিবে?

এখন দেখা যাক্, গার্হস্থ্য-জীবনে পতিপত্নীর যে সম্বন্ধ, যে কাজের ভার নারীর উপরে পড়িয়াছে, নারীজীবনের সাধারণ সুখ দুঃখ ও সার্থকতা ইত্যাদির হিসাবে সেটা কিরূপ?

গৃহে থাকিয়া সন্তান-পালন এবং অন্যান্য অনেক গৃহকর্ম্ম নারীকে করিতে হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহা নারীর পক্ষে পুরুষের দাসত্ব এবং কাজগুলাও অতি একঘেয়ে রকমের কঠিন কাজ। সন্তানদের মানুষ করিয়া তুলিতেই হইবে। পিতা-মাতার সমবেত দায়িত্বে ও যত্নে কল্যাণকর একটা সুব্যবস্থায় যাহাতে তাহা হইতে পারে, তাই এইরূপ গার্হস্থ্য-জীবনের প্রথা মানবসমাজে দেখা দিয়াছে। পিতা ধন আহরণ করেন, বাহিরের আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন,

আর মাতা সুরক্ষিতা হইয়া সেই ধনে গৃহে সন্তানদের সেবাযত্ন করেন। কাজটা কঠিন বা একঘেয়ে যাহাই হউক, মাতাকেই তাহা করিতে হইবে, এবং করিবার মত যে সব গুণ তাহাও মাতৃহৃদয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই স্ফুরিত হইয়া উঠে। গৃহকর্ম্ম অনেকটা এই সম্পর্কিত, ইহারই সংযুক্ত কর্ম্ম, গৃহে থাকিয়া নারীর পক্ষে করাই সুবিধা। বাহিরের কাজকর্ম্মের অবসরে মাত্র পুরুষের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। এই গৃহকর্ম্ম যে নারী করে, দাসীরূপে নয়, গৃহের গৃহিণীরূপেই করে। উপার্জ্জিত অর্থ পুরুষ আনিয়া স্ত্রীর হাতেই সাধারণতঃ দেয়, তারপর সেই অর্থ কোন্ কাজে কি ভাবে কতটা খরচ করা হইবে স্ত্রীই প্রধানতঃ স্থির করিয়া নেয়। এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষে একটা পরামর্শ যে না হয়, তাহা নয়। কিন্তু সে পরামর্শে স্ত্রীর অভিপ্রায়কে উপেক্ষা কি অবজ্ঞা করিয়া পুরুষ সহজে কোথাও চলিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত ধনীর গৃহে বাসনমাজা, জলতোলা প্রভৃতি কঠিন কাজগুলি দাসদাসীর হাতে থাকে। গৃহিণী ব্যবস্থা করিয়া দেন, পরিদর্শনে গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। আর দরিদ্রের গৃহে কাজগুলি সবই স্ত্রীকে নিজের হাতে করিতে হয়। কিন্তু উপায় ত নাই। দাসদাসী রাখিবার মত অর্থবল না থাকিলে গৃহের সব কাজ গৃহিণীকে নিজের হাতেই করিতে হইবে। পুরুষরাও ত কেবল আরামে বসিয়া খায় না। পৈতৃক সম্পত্তির স্বচ্ছন্দ আয় নাই, এমন পুরুষ মাত্রকেই বাহিরে কাজ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই কাজ অনেকের পক্ষে অতি কঠিনও বটে। কাজে অধিক আয় যাহাদের হয়, তাহাদের স্ত্রীরা বহু আরামে ও সুখভোগেই জীবন যাপন করে। এরূপ উপার্জ্জনশালী পুরুষ কোথাও কেহ বড় দাসীর মত গৃহে স্ত্রীকে খাটাইয়া উপার্জ্জিত অর্থ সব কেবল নিজের ভোগবিলাসে ব্যয় করে না। বাহিরে যত কঠিন শ্রমই এই আয়ের জন্য করিতে হউক, স্ত্রী যাহাতে আরাম-বিরামে থাকিবে, ভাল পাঁচখানা বস্ত্র অলঙ্কার পরিবে, তাহার দিকেই দৃষ্টি তাহার বেশী থাকে। অর্থ আনিয়াও অনেকে সব স্ত্রীর হাতেই দেয়। নিজের প্রয়োজনেও কোন খরচের টাকা স্ত্রীর কাছে চাহিয়া লয়। ইচ্ছামত কোনও খরচে স্ত্রীকেও বাধা বড় কেহ দেয় না। বস্তুতঃ ধনিগৃহের গৃহিণী আরাম-বিরাম ও অর্থসাধ্য সুখ-ভোগ করিবার অবসর যতটা পান, স্বয়ং ধনী সেই পুরুষও ততটা পান না, যদি সেই ধন পৈতৃক সম্পদ না হয় এবং নিজের শ্রমে অর্জ্জন করিতে হয়। নিজের কঠোর শ্রমার্জ্জিত ধন, আর সেই ধনে স্ত্রী এত আরামবিরাম ও সুখভোগ করিতেছেন, ইহা কাহারও অসন্তোষ বা বিরক্তির কারণ হয় না। বরং স্ত্রীকে যে এত সুখে রাখিতে পারিতেছেন, এত মর্য্যাদার অধিকারিণী করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই বড় একটা কৃতার্থতা সকলে অনুভব করেন। তবে দরিদ্র এত আরাম-বিরামে ও সুখে স্ত্রীকে রাখিতে পারে না। কিন্তু স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া নিজেও ত বিশেষ আরাম-বিরামে ও সুখে থাকে না। সংসার চালাইবার উপযোগী অর্থ আহরণে অনেক পুরুষকে অতি প্রত্যূষকাল হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এত কাজ করিতে হয়, যে, তাহার তুলনায় গৃহে স্ত্রীর কাজ অনেকটা খেলার মতই হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রীর কাজ যদি একঘেয়ে রকম হয়, এই সব পুরুষের বাহিরের কাজও সমান একঘেয়ে। দিনের পর দিন সেই একঘেয়ে কেরাণীগিরি, একঘেয়ে স্কুলমাষ্টারী আর সঙ্গে ঘরোয়া মাষ্টারী, সেই একঘেয়ে দোকানদারী, কারখানার কুলীমজুরী বা তাহাদের কাজের খবরদারী,—বৈচিত্র্যই বা কোথায়, আর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবসরই বা কোথায়? দরিদ্র এ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই অসংখ্য আছে। সর্ব্বত্রই যেমন নারীদের, তেমন পুরুষদেরও একঘেয়ে রকম কঠিন কাজে দিনপাত করিতে হয়। তবে কাজের রকমটা আলাদা আলাদা, এই যা তফাৎ।

এই যে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ আহরণ দরিদ্র পুরুষ করে, সে অর্থ আনিয়াও সে স্ত্রীর হাতে দেয়, গৃহে আহারাদি প্রভৃতি দেহধারণের যে প্রয়োজনসিদ্ধি বা অতিরিক্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা তাহার ইহাতে ঘটিতে পারে, স্ত্রীর উপরেই তাহার জন্য নির্ভর করে। স্ত্রীপুত্রাদিকে ভরণ-পোষণ করিতে হইবে, তাই এত ক্লেশ স্বীকার তাহাকে করিতে হয়। নতুবা কেবল নিজের প্রয়োজনে কতই আর তাহার লাগে? অনেক অল্পায়াসে সে তাহা সংগ্রহ করিয়া নিতে পারে। গার্হস্থ্য-জীবনে স্ত্রীপুত্রাদিকে ভরণ-পোষণের যে দায়িত্ব পুরুষের উপরে পড়িয়াছে, তাহাতে পুরুষের শ্রম পুরুষের ক্লেশভার নারী অপেক্ষা বেশী বই কম হয় নাই। গার্হস্থ্য-জীবনের লোপে একটা স্বস্তির সম্ভাবনা, নারী অপেক্ষা পুরুষেরই অনেক বেশী! অথচ এই লোপ চাওয়া হইতেছে, নারীর মুক্তি

কামনা করিয়া। কিন্তু চাহিতেছে নারী অপেক্ষা তাহার হিতৈষী ভাবে পুরুষরাই বেশী। এটা কি বাস্তবিকই হিতৈষণা না নিজেদেরই কোনও গূঢ় অভিসন্ধির প্রেরণা, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

সংসার-জীবনের বাহিরে উচ্চতর যে সব সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে, আত্মবিকাশের বা উচ্চতর আনন্দভোগের যে সব সুযোগ রহিয়াছে, গৃহকর্ম্মে নিরতা নারীর পক্ষে সেই সব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার কি সেই সেই রূপ আত্মবিকাশের কি উচ্চতর আনন্দভোগের অবসর বড় হয় না! হয় না তাহা অনেকটা ঠিক। অপেক্ষাকৃত ধনিগৃহের নারীরা এরূপ অবসর অনেকটা পান, এবং সে সুযোগ ও শক্তি থাকিলে তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। দরিদ্রগৃহের নারীদের সে অবসর বড় হয় না। কিন্তু দরিদ্র পুরুষদেরই বা কয়জনের এ অবসর হইয়া থাকে? তথাকথিত যে ড্রাজারি, drudgery গৃহে গৃহে নারীদের করিতে হয়, বাহিরে জীবিকা অর্জ্জনে, কিছু ভিন্ন রকম হইলেও, সেই ড্রাজারি, drudgeryই পুরুষকে করিতে হয়। ইহার মধ্যেও অবসরকালে সেকালের কথকতা, যাত্রা, একালের থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতিতে যে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহা পুরুষেরাই কেবল ভোগ করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গৃহের নারীদেরও করায়।

প্রতিভায়, উচ্চবিদ্যালাভের যোগ্যতায় ও বিবিধ কর্ম্মকুশলতায় পুরুষ অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহেন, এমন বহু নারীর দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আছে। রাজকর্ম্ম ও যুদ্ধবিগ্রহাদি পর্য্যন্ত বহুনারী অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছেন। পুরুষোচিত অন্যান্য যে সব কাজ আছে, তাহার সম্বন্ধে ত কথাই নাই। সুযোগ পাইলে কি হাতে পড়িলে, বহুনারী বেশ নিপুণ ভাবেই সে সব সম্পাদন করিতে পারেন। এইরূপ প্রতিভা, শক্তি ও যোগ্যতা যখন তাঁহাদের আছে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার সার্থকতার অবসর না পাইয়া কেবল সন্তানপালনে ও গৃহকর্ম্মেই তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিবেন, ইহাকে ন্যায়সঙ্গত সুব্যবস্থা কি প্রকারে বলা যায়? এইরূপ প্রশ্ন কেহ কেহ করিয়া থাকেন। উত্তরে বলা যাইতে পারে, এই সন্তানপালন ও গৃহস্থালী রক্ষা যে নারীর কর্ম্মের ভাগ বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ সাংসারিক জীবনের কথা। সাধারণ এই সাংসারিক জীবনের উপরে অসাধারণ একটা সংসারাতীত জীবনও আছে, যেখানে নারীপুরুষভেদে কোনও কর্ম্মবিভাগের নিয়ম চলে না। অনন্যসাধারণ প্রতিভা, কর্ম্মশক্তি ও আধ্যাত্মিক গুণের অধিকারী হইয়া নারী কি পুরুষ যাঁহারাই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন, অসাধারণ এই সংসারাতীত জীবন তাঁহাদেরই জীবন। মহত্তর যে সব কর্ম্মসাধনের জন্য তাঁহারা আসেন, সাধারণ সংসারধর্ম্ম যদি তাহার পথে অন্তরায় হয়, ছাড়াইয়া তাহার উপরে তাঁহারা উঠিয়া যান। গৃহিনী ও জননীরূপে স্বীয় অপরিহার্য্য ধর্ম্ম পালন করিয়াও বিদ্যানুশীলনে, কবিত্বে, আধ্যাত্মিক সাধনায় কি রাজকর্ম্মাদি পরিচালনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এরূপ নারীর দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে।—যাহা হউক, অসাধারণ অবস্থা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের অবস্থা। সাধারণ অবস্থায় সাধারণ নিয়মেই মানুষকে চলিতে হয়। সাধারণ এই অবস্থায়ও প্রয়োজন হইলে অনেক নারী পুরুষোচিত অনেক কাজ করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন, আপদ্‌কালে তাহা করিতেও হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে নারীকে করিতেই হইবে, এমন কথা হইতে পারে না। দরকার হইলে নারী দারোগাগিরি করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃধর্ম্ম ও গৃহিণীধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নারীকে গিয়া দারোগাগিরি করিতেই হইবে, আর তাহা না করিতে পারিলে নারীজন্ম তাঁহার ব্যর্থ হইবে, ইহা বাতুলের কথা। পুরুষ যথেষ্ট রহিয়াছে, লোকের অভাবে এই সব কর্ম্ম যে নির্ব্বাহ হইবে না, সেরূপ আশঙ্কারও কোনও কারণ নাই। নারী কি করিবে, এই সব কর্ম্মে কতদূর কি অধিকার তাহার থাকিবে, এ সব সম্বন্ধে আইনের বাধা কি ব্যবস্থা কিছুরই আবশ্যক হয় না। ধর্ম্মে যদি সমাজ স্থির থাকে, নারী কি পুরুষ যার যার ধর্ম্মের ভাগ আপনা হইতেই সকলে নির্ব্বাহ করিবে; একে অন্যের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেই চাহিবে না। যদি কখনও করে, বন্ধুর ন্যায় কোনও অভাব পূরণের জন্যই করিবে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে কোনও অধিকারের দাবী লইয়া নহে। গৃহকর্ম্মে নারীর এইরূপ অভাবপূরণও পুরুষকে অনেক সময় করিতে হয়।

স্ত্রীর উপরে স্বামী অত্যাচার করে এবং এই অত্যাচার সহিয়া স্ত্রী স্বামিগৃহে থাকিয়া তাহার স্বকীয় ধর্ম্ম শান্তভাবে পালন করে, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। স্বামী ভর্ত্তা ও

প্রভু এবং স্ত্রী ভার্য্যা ও দাসী, এইরূপ একটা নীতির আদর্শ প্রচলিত আছে, তাই স্বামীরা এইরূপ অত্যাচার করে এবং স্ত্রীকেও নীরবে তাই সব সহ্য করিয়া থাকিতে হয়, এই কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু এটা বড় ভুল কথা। স্ত্রীর উপরে স্বামীর অত্যাচার অনেক রকম আছে। অতি স্বার্থপর এমন স্বামীও বহু আছে, স্ত্রীর দিকে ফিরিয়াও চায় না, নিজের ভোগসুখ লইয়া ব্যস্ত থাকে। মাতাল ও লম্পট অনেক স্বামী গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে প্রহার পর্য্যন্ত করে, স্ত্রী নীরবে সব সহিয়া সেই পাষণ্ডের বহু সেবাও আবার করে। একদিকে এসব যেমন আছে, অপরদিকে আবার স্বামীর উপরেও স্ত্রীর অত্যাচার অনেক আছে। অনেক উদার, শান্ত-স্বভাব, স্নেহময় স্বামীও এমন আছেন, অতি সঙ্কীর্ণচিত্তা, স্বার্থপরায়ণা, হিংসাদ্বেষদুষ্টা, অকর্ম্মণ্যা ও কলহদুর্দ্দান্তা অতি দুঃশীলা স্ত্রীকে নিয়া সংসার করেন। আত্মীয়স্বজন—এমন কি নিজের পিতামাতার সঙ্গেও প্রীতির সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না, প্রাণপণে স্ত্রীর তুষ্টিবিধানের চেষ্টা সত্ত্বেও গৃহে এক তিল শান্তি কখনও পান না। যথাসর্ব্বস্ব দিয়া স্ত্রীকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চান না। চরম দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ মাত্র করিলাম। সাধারণ ভাবে দেখিলেও দেখিতে পাইব, কেবল দুর্দ্দান্ত স্বামীর অত্যাচারই শান্তা ও সুশীলা স্ত্রীরা সহ্য করেন না, দুর্দ্দান্তা অনেক স্ত্রীর অত্যাচারও শান্ত ও সুশীল স্বামীরা সহ্য করিয়া থাকেন। তুলনা করিয়া দেখিলে কোনটা যে বেশী হয় বলা শক্ত।

লক্ষ্য করিয়া দেখিলে গার্হস্থ্য-জীবনে এইরূপ একটা অবস্থাই সাধারণতঃ দেখা যায়, যে, স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যে পক্ষ তেজে ও জিদে অথবা চরিত্রগত দুর্দ্দান্ততায় প্রবলতর, অপর পক্ষ তাহারই অনুগত হইয়া চলে। আর উভয় পক্ষ এবিষয়ে সমান হইলে অবিরত একটা সংঘর্ষ ঘটে। যে পক্ষ ভাল বেশী, নরম বেশী, অত্যাচার অবিচার সেই পক্ষই বেশী সহ্য করে। করিতেই হয়, নহিলে এক সঙ্গে থাকা যায় না। এক সঙ্গে যেখানে থাকিতে হইবে, সেখানে যে বেশী সহিয়া ও মানাইয়া চলিতে পারিবে, সেই প্রশংসনীয়।

তবে একটি বিষয়ে বড় একটা পার্থক্য দেখা যায়। যৌন ব্যবহারে স্বামীর অনাচার অনেক স্থলে স্ত্রীরা উপেক্ষা করিয়া চলে, কিন্তু স্ত্রীর অনাচার স্বামীরা উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। তাও গুপ্ত অনেক অনাচার বহু স্বামী স্নেহে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, স্ত্রীকে ত্যাগ না করিয়া সংশোধনের চেষ্টাই করেন। তবে প্রকাশ্যভাবে পুরুষান্তরের সঙ্গে এরূপ কোনও সম্পর্ক স্থাপনা করিলে, অথবা কুলত্যাগ করিলে, সে স্ত্রী সকলেরই বর্জ্জনীয়া হয়। কারণ এরূপ ব্যবহার গার্হস্থ্য-নীতির বিরুদ্ধে এমন চরম একটা বিদ্রোহ, যে, উপেক্ষা করিলে গার্হস্থ্যজীবনই চলে না। বস্তুতঃ যৌনসম্বন্ধের একনিষ্ঠতা বা সতীত্বের ধর্ম্মে স্থির যদি কোনও নারী থাকেন, অন্য অশেষ রকম দোষও স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়স্বজন সকলে সহ্য করিয়া থাকেন, ক্ষমাও করেন। এরূপ স্ত্রীকে ত্যাগও সহজে কেহ করেন না, করিতে পারেনও না। করিলেও, তাহার ভরণ-পোষণের জন্য অন্ততঃ স্বামীকে বাধ্য থাকিতে হয়।

স্বামীর প্রতি আন্তরিক একটা প্রেম ও শ্রদ্ধা ব্যতীত সতীত্বের কোনও অর্থ নাই, রীতি মানিয়া কেবল দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা অতি ক্লেশকর একটা ব্যাপার, নারীকে ইহাতে বাধ্য রাখা অসঙ্গত ইত্যাদি সব কথাও অনেকে অধুনা বলিয়া থাকেন। স্বামীর প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা যে সতীত্ব ধর্ম্মের প্রধান আশ্রয় এবং চরিত্রের বহু গুণ ব্যতীত স্ত্রীর এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাও কোনও স্বামী সহজে আকর্ষণ করিতে পারেন না, ইহা সত্য। কিন্তু এই পবিত্রতা ব্যতীত সংসার-ধর্ম্মই যখন থাকে না, সন্তান-সন্ততির মঙ্গল হয় না, তখন যে কোনও অবস্থাতেই ইহা রক্ষা করিয়া নারীকে চলিতেই হইবে। তাই মনের গতি যেরূপই হউক, অন্ততঃ দৈহিক সম্বন্ধে এই পবিত্রতা সতীত্বধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য একটি সীমা বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

দাম্পত্যপ্রেমের অভাবে পুরুষ কি নারী কাহারও সংসার-জীবন সুখের হয় না, এবং এরূপ প্রেমের অভাব বিবাহিত দম্পতীর মধ্যে অনেক স্থলে দেখাও যায়। দাম্পত্যপ্রেম মানব-জীবনের অতি বড় একটি আনন্দের উৎস এবং ইহাতে বঞ্চিত হওয়া ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যে বড় একটি দুর্ভাগ্য ইহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও আমরা বলিতে পারি না যে এই আনন্দ ব্যতীত মানব-জীবন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্ম, সকল হিতাহিত বিবেচনা, ত্যাগ করিয়া মানুষকে কেবল দাম্পত্যপ্রেমের সার্থকতাই

খুঁজিতে হইবে। জন্মগত দৈহিক ও মানসিক বহু বিকৃতি,—জন্মের পর রোগ, শোক, দারিদ্র্য, কত সাধনার ব্যর্থতা, আরও কত রকম দুঃখদুর্ভাগ্য মানুষকে বহন করিতে হয়। এসব অপরিহার্য্য দুর্ভাগ্য, প্রতিকারের উপায় নাই, কাজেই বহন করিতে হয়। কিন্তু দাম্পত্যপ্রেমের অভাবকেই কি একেবারে পরিহার্য্য বা প্রতিকারসাপেক্ষ দুর্ভাগ্য বলা যায়? বিবাহ হইল; কিন্তু দেখা গেল প্রেম হইল না কি রহিল না, আশানুরূপ সুখ ঘটিল না। অথবা মনে হইল, প্রেমের পাত্র বা পাত্রী অপর কেহ। অমনই পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন সেই পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে উভয়ে গিয়া যুক্ত হইল, অথবা নূতন পাত্র বা পাত্রীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। কিন্তু নূতন এই যোগও ঠিক প্রেমের ও সুখের যোগ ত নাও হইতে পারে; অনুসন্ধানে মনোমত পাত্র বা পাত্রীও না মিলিতে পারে। সারাটি জীবনই হয়ত বহু এইরূপ যোগে ও বিয়োগে, অথবা ব্যর্থ এই অনুসন্ধানে কাটিয়া যাইবে। অবিরত এইরূপ যোগবিয়োগ যেখানে ঘটে, প্রত্যেক যোগে সেখানে সন্তানসন্ততিও জন্মিতে পারে। ইহাদের কি হইবে? পিতামাতার যদি সংসারের কোনও স্থিরতা না থাকে, কোথায় ইহাদের একটা আশ্রয় হইতে পারে? বৈবাহিক সম্বন্ধ যে অচ্ছেদ্য বা দুশ্ছেদ্য একটা ধর্ম্মবিহিত পবিত্র সম্বন্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, ইহাকে অবিবেচক সমাজকর্ত্তাদের খামখেয়ালী একটা নিয়ম বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধিও সাধারণতঃ ইহার গুরুত্বকে মানিয়া চলে। দুঃখ যদি পাইতে হয়, উচ্চতর ধর্ম্মের অনুরোধে সেই দুঃখকেও অন্যান্য বহু অপরিহার্য্য দুর্ভাগ্যের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ সকলেই শিরে ধরিয়া নেন, নারী কি পুরুষ যাহাই তাঁহারা হউন।—সমষ্টির মঙ্গলে ব্যষ্টির কাছে এই ত্যাগের দাবী সমষ্টিধর্ম্মের আছে, এবং এই অবস্থায় এই ত্যাগেই নারী কি পুরুষ ব্যষ্টির পরম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মপালন প্রথমে যতই কঠোর বলিয়া মনে হউক, পরে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, দাম্পত্যপ্রেম, আর সেই প্রেমের সম্ভোগ তাহা কোনও মানবকে দিতে পারে না।

দাম্পত্যপ্রীতিতে যৌন আকর্ষণের বড় একটা প্রভাব আছে এবং এই সম্বন্ধটাও দাম্পত্যসম্বন্ধের বড় নিবিড় একটা সম্বন্ধ। অন্যান্য সব প্রীতি হইতে ইহাই দাম্পত্যপ্রীতিকে এবং দাম্পত্যসম্বন্ধকে তাহার বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এই আকর্ষণের অভাব বা ক্ষীণতাও অনেক সময়ে দাম্পত্যপ্রেমের অভাবটাকে সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহার প্রভাব যতই প্রবল হউক, কেবল ইহাই ধরিয়া দাম্পত্যসম্বন্ধ তাহার সকল মাধুর্য্য ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে না। সমান সাংসারিক স্বার্থের বন্ধন, সমান সব সন্তানসন্ততির স্নেহের আকর্ষণ, সমান সব স্বজনগণের সঙ্গে প্রীতির আদান-প্রদান, সমান দায়িত্বে পোষ্য-পোষণ, সামাজিক বহু ধর্ম্মপালন, এই সবই অতি নিবিড়, গাঢ় ও দুশ্ছেদ্য এক বন্ধনে দম্পতীকে ক্রমে বাঁধিয়া ফেলে। সকল কর্ম্মে পরস্পরের প্রতি সমান নির্ভরশীল, সকল সুখ-দুঃখের সমান ভাগী, সেবায় পরস্পরের ক্লেশমোচনে সমান ব্রতী, অহরহ ঘনিষ্ঠ এই সম্বন্ধে এক একটি দম্পতী যেন পূর্ণ এক একটি মানবে পরিণত হয়। এই একত্বের যে মধুরতা, তাহার তুলনা এই জগতে নাই। যৌন সম্বন্ধ কালে অতি গৌণ একটা সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়ায়, এইগুলিই মুখ্য হইয়া দম্পতীকে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। এই মর্য্যাদা আর পরস্পরের প্রতি স্নেহমধুর এই মমত্ব দাম্পত্য-জীবনকেই তাহার বিশিষ্টতা দান করে। কেবল যৌন সম্বন্ধ স্থায়ী এরূপ স্নেহমধুর মমত্বের সম্বন্ধে, এরূপ সহকর্ম্মিতার বান্ধবতায় নরনারীকে মিলিত করিতে পারে না। যে কারণেই হউক, গোড়াতে দাম্পত্যপ্রীতির একটা অভাব বা অল্পতা সত্ত্বেও, দাম্পত্যধর্ম্ম মানিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিলে এরূপ একটা মমত্বের ও বান্ধবতার যোগ অধিকাংশ দম্পতীর মধ্যেই কালে দেখা দেয়, এবং তাহা অতি সুখের বই দুঃখের একটা অবস্থা পুরুষ কি স্ত্রী কাহারও পক্ষেই হয় না।

সাহিত্যের আবহাওয়া

—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

কোন দেশের সাহিত্যকে বুঝিতে হইলে, সে-দেশকে বুঝিতে হয়, জাতিকে জানিতে হয়। পূর্ব্বাপর ইতিহাসের ধারাকে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ধারণা করিতে হয়। একটা জাতির সাহিত্য তাহার মনের আত্মবিকাশ।

সকল দেশের, সকল জাতির ইতিহাসের মূল-কথা যেমন তাহার পৌরাণিকী ঐতিহাসিক ভিত্তি, সকল জাতির ও সকল দেশের সাহিত্য-ইতিহাসের মূল-কথাও তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি।

সভ্যতা যেমন একদিনে গড়িয়া উঠে না, একদিনে লোপ পায় না, সাহিত্যও তেমনি একদিনে গড়িয়া উঠে না, একদিনে মরিয়া ভূত হয় না। কালধর্ম্মের লীলায় সকল বস্তুর একটা স্বাভাবিক বিকাশ আছে, তাহার পরিণতি আছে। ফুল ফুটিবার একটা সময় আছে, ঝরিবারও সময় আছে।

শুধু সময় নয়, নিয়মও আছে।

ভারতের দক্ষিণ-সমুদ্র হইতে মৌসুমী-বায়ুকে গড়িয়া তুলিতে ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতের সন্নিপাতে মেঘ জমাইতে সূর্য্যকে বৎসরের তাপ-সাধন করিতে হয়, দান করিতে হয়, তবে মেঘ জমে,—তবে প্রাবৃটকালে ঠিক একভাবেই বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ ধারাবর্ষণ হয়। তপ ও তাপের তারতম্যে ধারাবর্ষণেরও তারতম্য হয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।

সেই তপ ও তাপ, সেই যুগের পর যুগবাহী সাধনা, জাতির সাহিত্যকে গড়িয়া তোলে। সেই সাধনা, সেই ধারা, সেই রীতিই তাহার আবহাওয়া।

কোন সাহিত্যকে জানিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বাপর ইতিহাসের সঙ্গে তাহার সেই আবহাওয়াটি জানিতে হয়। কিন্তু তাহা জানা হইলেও যে, ফসলের অঙ্গীকার ও সাফল্য কোন চাষী করিতে পারিবেন, এমন কথা বলা শক্ত। কেননা চাষ-আবাদ শুধুই চাষীর পরিশ্রমের উপর সকল সময় নির্ভর করে না। তাহার আবার ঘোরাল আবহাওয়াও আছে। দেশভেদে, কালভেদে, শক্তির বিকাশ ও সঙ্কোচ হয়। বন্ধন ও মুক্তির সমবায়, তাহার সম্প্রসারণের উপরও নির্ভর করে। কাজেই এক দেশের সাহিত্য যে-আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠে, অন্য এক দেশের সাহিত্য যে ঠিক সেই আবহাওয়া পাইবে, অথবা সেই আবহাওয়া পাইলেই যে সে-জাতির মানস-দর্পণে ঠিক সেই মত রূপই প্রতিভাত হইবে, এমন কোন কথা নয়।

জাতির আবহাওয়ার পিছনে জাতির নিজত্ব বলিয়া একটা স্পষ্ট পদার্থ আছে। যে-আবহাওয়ায় একটা স্বাধীন জাতি আত্মবিকাশ ও তাহার সাধনার সুযোগ পায়, আর একটা জাতি, যদি পরাধীন হয়, তবে তাহার আত্মবিকাশের সুযোগ ও সাধনার ধারা সে-পথে যাইবার পথ পায় না। যে-বন্ধন স্বেচ্ছায়, তাহার প্রকাশ ভঙ্গী এক, আর যে-বন্ধন পরেচ্ছায়, তাহার প্রকাশভঙ্গী আর। এ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠ বাক্য।

জাতির নিজত্ব বিচার, অথবা বৈশিষ্ট্যকে বিচার করিতে গেলে, তাহার পিছনে যে ইতিহাস আছে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

এখানে দুইটা জিনিষ দেখিবার- একটা, জাতির নিজত্ব বা বৈশিষ্ট্য ; আর একটা জাতির আবহাওয়া।

বাঙলা সাহিত্যের জন্মকথা, অতি পুরাতন বলিয়াই খ্যাত, এবং যে যে দেশে, সত্য সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে, জাতি তাহার ভাবকে প্রকাশ করিয়া নিজের জীবনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে তাহার ভাবমূর্ত্তিকে মূর্ত্ত করিয়া দেখাইয়াছে, সেই সেই দেশেও তাহাদের জন্মকথা অতি পুরাতন বলিয়াই ঘোষিত। এই পুরাতনের দিকে যাওয়ায় জাতির আভিজাত্য বজায় থাকে। কিন্তু বনেদী হইবার জন্য যেমন মানুষের সাধ, সাহিত্যকে বনেদী করিবার জন্যও ঐতিহাসিকদেরও একটা সাধ বা সাধনা আছে। সাহিত্যের জন্মকথার সন তারিখ মিলাইয়া দেওয়া বৈজ্ঞানিক হইতে পারে বটে, কিন্তু সন তারিখ ঠিক মিলে কিনা, তাহা বলাও খুব শক্ত। কেহ বলিবেন, হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙলা ভাষায় বলিয়াছে—

"জামে কাম, না কামে জাম,"

হাজার বছর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-দোহায় যে বাঙলার জন্ম হইল, সেকি বাঙলা, না আর কিছু? তাহাতে কি বাঙলা

সাহিত্যের ভাবরূপ বীজরূপে ছিল, যে-বীজের অঙ্কুর হইতে এই বাঙলা-সাহিত্যকল্পবৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়াছে! তাহার কিছু সত্য ইতিহাস পাওয়া যায় কি? সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজিতেছি, সাহিত্যের মধ্য দিয়া, সেই জাতিকে এবং তাহার নিজস্ব, তাহার বৈশিষ্ট্যকে খুঁজিয়া পাইতেছি কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙলার ইতিহাস লিখিবার সূত্রপাত হইতে আজিকালিকার দিন পর্য্যন্ত, মাটি খুঁড়িয়া, পুঁথি হাতড়াইয়া, রূপকথা জড় করিয়া, বিজাতীয় লেখকের লেখার ভার স্কন্ধে চাপাইয়া সত্যকে, সত্যের সোনালী ছায়া ও মায়া-কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া, অনেক কিছু যে গড়িয়া উঠিল ও উঠিতেছে, তাহাই কি বাঙলার ইতিহাস?

বাঙলার ইতিহাস ত' বিদেশী আসিয়া গড়িয়া দিল, এখনও যে-সাহিত্য ও ইতিহাস সেও ত' বিদেশীর কোদালের মাটির চাপ। তাই কি সত্য বাঙালীর ইতিহাস?

ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস গড়িবার পন্থা বাহির হইয়াছে। তাহাতেই কি সত্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনা হয় বা হইতে পারে? সাহিত্যের ইতিহাস কি শুধু ভাষার উপরেই নির্ভর করে?

বাঙলা দেশের একটা সন-তারিখ হিসাবে পঞ্জিকার রীতি ছিল, এখনও তাহার চল আছে। এখন ঊনবিংশ, ষোড়শ, পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস বা সাহিত্যের ইতিহাস দেখিতেছি। বাঙলা দেশে ত' শতাব্দীর হিসাব খৃষ্টপূর্ব্ব বা খৃষ্ট-পর দিয়া চলিত ছিল না—এখন চলিয়াছে। মুসলমান প্রাধান্যের সময় হিজরা, মহরম প্রভৃতি লেখা হইত, ইংরেজী আমলে, খৃষ্টাব্দ হইয়া গেল। এই পঞ্জিকার মতে বাঙালী জাতি এখনও স্মৃতির ব্যবস্থা মানে। অনেক স্মৃতি পরধর্ম্মের আঘাতে ভাঙিয়া গেলেও, স্মৃতি এখন বিস্মৃতিতে একেবারে ডুবে নাই। অথচ গ্রহণ গণনাকালে ইংরেজী নাবিক-পঞ্জিকা হইতে গ্রহণ-ক্ষণ বসাইয়া দিই। বাঙালীর জীবন-যাত্রার স্মৃতি এখনও একেবারে অপ্রামাণ্য হয় নাই। দশবিধ সংস্কার সম্পূর্ণ না মানিলেও সে-সংস্কার একেবারে খুব ক্ষীণ নহে।

যে বাঙালী জাতির জাতীয় সাহিত্যের আবহাওয়া সম্বন্ধে আজ আমরা আলোচনা ও বিচার করিতেছি, সে জাতি পুরামাত্রায় আর্য্য না অনার্য্য? তাহারা যেখান হইতেই ভারতে আসুক, সে আর্য্যই কি বাঙালী ও তাহার ভাষাকে গড়িয়া তুলিয়াছে? তাহারাই কি তাহার স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়া, তাহাদের বনেদী বড়লোক ও বনেদী সাহিত্য রচনা করিয়া তাহাদের জীবনের কাম্য ও প্রকাশভঙ্গী দিয়াছে, না ইংরেজ আমলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, সেই আকালের দুর্ভিক্ষের কালে, এই জাতি, ইংরেজ সংস্পর্শে আসিয়া গড়িয়া উঠিতেছে? তাহারই আবহাওয়ায় আজ আমরা এই বাঙালী জাতি ও আমাদের এই বাঙলা সাহিত্য?—না, ইহার পূর্ব্বে এই বাঙালী জাতি ছিল ও তাহার জাতীয় সাহিত্য ছিল?

উত্তর আছে—জাতিও ছিল, সাহিত্যে তাহার প্রকাশও ছিল।

হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধ-গাথা, ডাকের ভাষা, খনার বচন, ইত্যাদিতে যে ভাব ও সাহিত্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, মুসলমানী আমলে চণ্ডীদাস হইতে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কাব্য ও সাহিত্য রচনায় যাহা পাই, তাহার সহিত আজিকার এই সাহিত্যের কতখানি সম্পর্ক তাহার বিশ্লেষণ করা সঙ্গত। সে হাজার বছরের সহিত এই কালের পারম্পর্য্যের ধারা সঠিক আছে কি? মুসলমানের আমলে অনেক কথা বাঙলায় মিলিয়া গেছে, ইংরেজী আমলে, ইংরেজী অনেক কথা বাঙলা হইয়া গেছে। ইংরেজী সাহিত্যের নিরিখে বাঙলা সাহিত্যের বিচার হইয়াছে, বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে অনেক সাহিত্য-রচনা পুষ্ট হইয়াছে, অথচ আজ বাঙলা-সাহিত্য ইংরেজী culture কথা পরিপাক করিতে পারিল বলিয়া মনে হয় না। এতদিন বাঙলা-সাহিত্যে কানু ছাড়া গীত ছিল না, ভিখারী এখনও 'জয় রাধে-কৃষ্ণ' বলে, কিন্তু ইংরেজী culture শব্দ অকস্মাৎ কোন এক মুহূর্ত্তে 'কৃষ্টি' হইয়া গেল কেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন আসিতেছে? না, ইংরেজের সাহিত্য-রচনার প্রতি মমত্ব-বোধ কিছু নিষ্ক্রিয় হইয়া আসিল বলিয়া নূতন শব্দসৃষ্টির ঘটা বিঘটিত হইল? ভাবিবার কথা। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার কথা।

বিশ্লেষণের পদ্ধতি দুই রকমের আছে। এক, সমগ্র জিনিষটা পূর্ণভাবে দেখা, আর, তাহাকে বিজ্ঞানের দরজা দিয়া ভাগ করিয়া দেখা। সমগ্রভাবে দেখাকে বলে দর্শন, চুল চিরিয়া দেখাকে বলে বিজ্ঞান।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারার ইতিহাস রচনার ভার একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের উপর। সাহিত্যের আবহাওয়ার কথা বলিতে গিয়া আমরা যে-আবহাওয়ার মধ্যে সম্প্রতি বাস করিতেছি তাহার কথাই বলিব। উহা আর্ট ফর আর্টস সেকের যুগ, অতি-আধুনিক যুগ। ইহারই ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁহারা তাঁহারা 'লোকহিতায়' সাহিত্য রচনা করিয়াছেন।

এই লোকহিতায়বাদ ও ইংরেজী আর্টবাদ, পরস্পর-বিরোধী ও বিদ্বেষী। কিঞ্চিৎ সহজ ভাবে প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে উভয় দলই মতের ঘোরে নিজেরাই তমসাচ্ছন্ন। কেননা জীবনের পরিপূর্ণ সত্তাকে কেহই আমল দেন না। 'লোকহিতায়'র দল শুধু লোকহিতেরই কারবার করেন; আর নবাগত বাঙলা সাহিত্যে এই আর্টবাদী 'কৃষ্টি'র দল সকল পথেই বিভ্রম রচনা করেন। একজনের অভাব কল্পনা, আর একজনের অভাব, হৃদয়—দুই দলই প্রত্যক্ষ জীবনকে ভয়ই করেন। জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার শক্তি যদি সাহিত্যে থাকে, তবে প্রত্যক্ষ জীবনকে বাদ দেওয়া অথবা সত্যকে চাপিয়া, বিভ্রম মাখাইয়া প্রকাশ করিলে হিতে-বিপরীতই সম্ভব নয় কি?

সকল কালে ও সকল অবস্থায় সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, অবিচলিত নিষ্ঠা যে তপ ও তাপের সাধনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিবার কোন হেতু সম্ভবতঃ নাই। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলে, জীবনকে কেহ হেলায় অবজ্ঞা করিতে পারে না। এই উভয় দলই তাঁহাদের বিরোধে, তাঁহাদের গতিকে পরস্পর বিপরীত দিকে চালিত করিয়াছেন। একজন দক্ষিণে, একজন বামে। তাঁহারা কোন দিনই দেখিলেন না যে, দুজনেই সমান ভ্রমকে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছেন। এই ভ্রম যে কি তাহা আমরা বিচার করিব।

এটা সর্ব্ববাদীসম্মত যে মানুষ যা করে, যা বলে, যা কিছু সৃষ্টি করে, তাহাতে সাধারণতঃ নূতন কিছুই বলেও না, নূতন কিছু করেও না। তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা ও দর্শন তাহাকে যে পথে লইয়া যায়, যাহা দেখায় তাই সে দেখে, এবং প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব দৃষ্টি-কোণ আছেই। কিন্তু কদাচিৎ সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, সত্যকে সদা-জাগ্রত চক্ষুতে দেখিয়া সাহিত্যসৃষ্টির অবকাশ পায়। সত্যকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করা, আর সত্যকে নিজের দৃষ্টি-কোণ দ্বারা ঠিক দেখিয়া তাহার সত্যরূপকে কল্পনার তুলিকায় আলিম্পনে ফুটাইয়া তোলা—অতি সহজ নয়। নিজের দৃষ্টি-কোণ অনেক সময়েই বিভ্রম আনে। দর্শন-শাস্ত্রে তাই প্রমা, মায়া, অবভাসের কথা এত বেশী।

সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাখিবার স্বতঃ-প্রযত্ন চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সেই সত্য মায়ার অবভাস দেখায়। ফলে হয় এই যে নিজের দৃষ্টির বিভ্রমকে স্বীকার, সত্যকে অস্বীকার, জীবনকে অস্বীকার করিয়া, শুধু মাত্র এই সৎ উদ্দেশ্যের ঠাট-ঠমক খাড়া হইয়া উঠে। সৎ-উদ্দেশ্যের, মনগড়া সৎ উদ্দেশ্যের ঠাট খাড়া করিয়া তাহারই ভূমিকার অভিনয় হয়; তাহাতে সাজা-মানুষের অভিনয়ের মত, সত্যকার মানুষটার নিজস্ব সত্য, সাহিত্য ও জীবনে ধরা পড়ে না। কাজেই লোকহিতায় সাহিত্য-রচনার পদ্ধতি লইয়া যাহারা মারামারি ও কথা কাটাকাটি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা, কাজ ও সাহিত্য রচনা যে খুব প্রত্যক্ষ ও বিশ্বসনীয় তাহা বলা যায় না।

কথাটা আরো একটু বিশদভাবে আলোচিত হওয়া বিধেয়। সাহিত্যকে আমরা কি ভাবে বিচার করি? সত্য, সুন্দর ও শিব। লোকহিতায় বলিবেন, যাহা সত্য তাহা সুন্দর, যাহা সুন্দর তাহাই শিব, মঙ্গলকর। আমরাও তাহাই বলি, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিতে আপাতঃদৃষ্টিতে সুন্দরের বিপরীত অসুন্দর, সত্যের বিপরীত মিথ্যা, এবং শিবের বিপরীত অশিবও আছে· অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। লোকহিতায় দলকে যে বিশ্বসনীয় নয় বলিয়াছি, তাহার আরো প্রকৃষ্ট কারণ আছে।

আমরা যখন সাহিত্যের বিচার করি, তখন তাহা চিরন্তন সত্য, সনাতন সত্যের দিক দিয়াই বিচার হয়; লেখক তাৎকালিক যে আবহাওয়ার ভিতর দিয়া সত্যের আপেক্ষিক রূপদান করেন, তাহা সনাতন হয় না। হয় না এই জন্য যে

তিনি অনেক কথা চাপিয়া যান, অনেক ছাড়িয়া দেন, অনেক বস্তু তাঁহার দৃষ্টি-কোণগত চক্ষুর বিভ্রমে মণ্ডিত হয়; আর সেই জন্যই সেই সাহিত্য-রচনাকে আমরা বিশ্বসনীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অথচ এটাও সত্য যে লেখক তাঁহার সহজ সরল মনের অভিজ্ঞতা দ্বারাই রচনা করিয়াছেন। লেখকের লেখাকে বিশ্বাস করা, আর লেখককে বিশ্বাস করার মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য থাকিয়া যায়। যাঁহারা লোকহিতায় সাহিত্যের পক্ষপাতী তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও বুদ্ধির নিরিখ দিয়াই রচনা করেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও বুদ্ধির অন্তরালে থাকে তাঁহার জাতি, তাঁহার বংশ, তাঁহার সমাজ, তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার সামাজিক ধর্ম্ম। কাজেই তাঁহার কাছে যেটা সত্য, সুন্দর, শিব, অন্যের কাছে তাহা সত্য ও সুন্দর না হইতেও পারে।

আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে, "যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা"—কথাটা অত্যন্ত সত্য। আমি যে সমাজ বা ধর্ম্মভুক্ত নই, সে সমাজ বা ধর্ম্মের মানুষের সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলেই, ওই চলন "বাঁকা" হইয়া যায়। সাহিত্যেও তাহাই হয়। সংউদ্দেশ্য যতই অহেতুকী বলিয়া গলাবাজি করি না কেন, খুঁজিয়া দেখিলে তাহার পিছনে হেতু যে বর্ত্তিয়া আছে, একথা সহজেই বুঝা যায়।

একদলের লোকের বা তাহাদের কার্য্যকলাপের পক্ষপাতী যদি না হই, তবে তাহাদের ভাব, কথা, ভঙ্গী সব জিনিষকেই অশ্রদ্ধা করিবার স্পৃহা জন্মায়, আর নিস্পৃহ হওয়া চলে না, নিস্পৃহ না হইয়া কোন কাজ করিলে সে কার্য্য সত্য লোক-হিতায় কিনা তাহাও সহজে বুঝা যায়। এই ভাবের সাহিত্যে ফল হয় এই, জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও দর্শন তাহাতে থাকে না, নূতন কোন আলো দেয় না, অপর পক্ষে হিত না হইয়া বিপরীতই হয়। লেখকের সমধর্ম্মী সম-সামাজিক লোকের কাছে তাহা যেমন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়; তাহাদের বিরুদ্ধ দলের লোককে আঘাত করার জন্য, অন্যের আনন্দরস উপচয় হয় ও তৎসামাজিক লোকের সংস্কারকে পুষ্ট করে, অন্যকে ব্যভ্রমের মধ্যে টানিয়া আনে; কিন্তু সত্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। লোকহিতায়ের দোষ এইখানে।

লোকহিতায় সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর একটা অনুযোগ আছে, যে, তাঁহারা জ্ঞানের অবাধ স্বাধীনতা দিতে নারাজ। অবাধ স্বাধীনতার অর্থ ইহা নয় যে তাহার কোন নিয়ম নাই বা নিয়মের বাঁধ তাহার নাই—তাহার রীতি আছে, নীতিও আছে। কি ভাবে যে তাঁহারা স্বাধীনতা দিতে নারাজ হন তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

জ্ঞানের স্বাধীনতার সত্য রূপ কি? ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, নিজের নিজত্ব, তাহার স্বরূপ তাহার নিজ রূপের প্রকাশ। জীবনের চলার পথে মানুষের নিজের আলোকে চলা। বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফুল-ফলের পরিণতির মত মানুষের একটা বিশেষ পরিণতি আছে। যে জ্ঞান, যে ধ্রুবকে লক্ষ্য করিয়া মানুষ অবাধে চলিতে পারে, তার সুখ-দুঃখকে নিজের করিয়া তার নিজের যাত্রার পথ কাটিয়া চলিতে পারে, সেই যাত্রা, সেই গতিকে বাধা না দেওয়াই অবাধ স্বাধীনতা দান।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, সে স্বাধীনতা অল্পবিস্তর সকল সমাজেই পাইয়া থাকে। আমি বলিব, না, তাহা পাওয়া যায় না। সকল সমাজ, সকল ধর্ম্মগত সামাজিক নিয়ম চিরদিনই সেই অবাধ স্বাধীনতাকে বাধা দিয়া আসিতেছে। বাধা দেওয়া উচিত কি অনুচিত এ কথা এখানে বিচার্য্য নয়, তবে এটা সত্য, যে, বৈষ্ণব শাক্তকে অবাধ স্বাধীনতা সাহিত্যে বা সমাজে দেন নাই—খৃশ্চান হিন্দুকে দেন না, হিন্দু মুসলমানকে দেন না হিন্দু ব্রাহ্মকেও দেন না। ধর্ম্মগত সামাজিক নিয়মের বাহিরে কার্য্যকরী শক্তিকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা, অল্পবিস্তর সকল সমাজ-ধর্ম্মেই আছে। অথচ এ কথাও সত্য যে সকল ধর্ম্মের লোকের মধ্যেই, ভাল মন্দ লোক ও ভাল মন্দ চরিত্রও আছে।

অবাধ স্বাধীনতাকে বাধা দেওয়ার প্রধান উপলক্ষ্য ধর্ম্ম। অথচ সকল সাহিত্যই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রায়শঃ জন্মিয়াছে। সে-ধর্ম্মকে তাঁহারা লোক-হিতেরই এক পর্য্যায় ধরিয়াছেন। কাজেই হিতের জন্য যে সাহিত্য লিখিত হয়, তাহাতে হিতই বা হইল কোথায়? যে-আবহাওয়া তাঁহারা সৃষ্টি করেন, যার চারদিকেই অন্যের জন্য গড়খাই কাটা, সেখানে সত্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় কি না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রামচন্দ্রের সমুদ্র-শাসন দেখাইব, অথচ বালী-বধটি লুকাইব—কৃষ্ণকে ছোট করিবার জন্য শিবকে বাড়াইব; বৈষ্ণব ধর্ম্মের সত্যকে গ্রহণ না করিলে তাহাকে বলিব—

'উলূকে না হেরে যথা সূর্য্যের কিরণ'
ইহা কি সত্যই লোকহিতায় ?

এখন Art for Art's sake—আর্টের জন্য আর্ট। অতি উচ্চাঙ্গের কথা। সত্য যদি আর্টের ভক্ত হয়, সাহিত্য যদি সত্যই জীবনের পরিস্ফুরণ হয়, তবে যে-দেশে এই 'সাহিত্য-ধর্ম্মের' সৃষ্টি, হইয়াছে, সে-দেশের সাহিত্য কি ভাবে সৃষ্টিতে রূপ লইয়াছে, তাহার বিচার করিবার স্থান এ নয়। শুধু এই প্রশ্নটুকু আমি তুলিতে চাই যে, মাইকেল মধুসূদন হইতে আধুনিক সত্যেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে কাব্য-সাহিত্য বাঙলার সাহিত্য-দরবারে দরবারী-টোড়ী হইতে ফরাসী গোলেবকাওলীর সুর বাজাইয়া তুলিল, তাহার কতখানি দরবারী আর কতখানি বিদেশীর তিনহাত ফেরতা তর্জ্জমার নকল ? ইঁহারা সকলেই কি আর্টের জন্য আর্ট করিয়াছেন ? রামমোহন হইতে রবীন্দ্রযুগের মধ্যে মাইকেল, বঙ্কিম, গিরিশ, রবি এই কয়টা বাতি। আর বাকী যারা তাঁহাদের কতখানি নিজের, কতখানি পরের ? মাইকেল, বঙ্কিম, গিরিশ, রবি যদি ঋণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের ঋণ সুদসমেতই পরিশোধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে 'আর্ট ফর আর্টস সেক' সাহিত্য-সৃষ্টি হয় নাই।

অতি-আধুনিকেরা যে আর্টের জন্য যুদ্ধবাণী ঘোষণা করিলেন, কোথায় তাঁহাদের সেই আর্ট ? যাহা পাই তাহা ফেনায়িত মাদকতার তীব্র বাস—মদিরার মত্ততাও নহে। রসের সে আনন্দ কোথায় ? সকলেই ইংরেজী smart, তরতরে হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বা করিতেছেন, একটা উদগ্র উত্তেজনা আছে, আনন্দ কোথায় ? যাহারা মনে করেন আমরা তাণ্ডবের মহড়া দিতেছি, গড়িবার আগে ভাঙ্গিব—মানিলাম, কিন্তু কোথায় সেই প্রলয়-বিষাণ, কোথায় ডমরু, কোথায় সে দীপ্ত অগ্নি ? যে লেলিহান বহ্নিশিখা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তাপ দিতেছে, সে দীপ্তবহ্নিজ্বাল-জ্যোতি কোথায় ? তাঁহারা ভুলিয়া গেছেন, অথবা দেশের সে মহাশক্তির মূর্ত্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকিলে জানিতেন, শিব—যতি। সে সংযম কোথায় ?

সৃষ্টিতে একটা বেদনা আছে। সে বেদনায় মাতার বক্ষে ক্ষীরোদ-সমুদ্রের প্লাবন আসে। সাহিত্যে কোথায় তাহার সে রূপ !

একথা সত্য যে, ইংরেজ আগমনের পর হইতে আমাদের দেশে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আসিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারা লইয়া মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহাদের সে আর্ট তাহাদের মাটির রসের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বৃক্ষরূপে দাঁড়াইয়া আছে, ফুল ও ফলে তাহা পরিশোভিত।

আমাদের দেশে কি তাহাই ? পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের রীতি যাহা ছিল, আজ তাহা ঠিক নাই। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পর হইতে আজিকার দিনের অহিংস অসহযোগ, হিংসী সহযোগ প্রভৃতি কত ঘাতপ্রতিঘাত হইল—অসূর্য্যম্পশ্যা পথে পথে বাহির হইয়া পড়িল ; রেলের ষ্টেশনে যাহারা বোঁচকা ছিল, পোটলাপুঁটলী ভাঁড়-খুরী ছিল, আজ তাহারা সবল সবল মাটির মেয়ের মত পথে ঘাটে চলিতেছে। কিন্তু তোমার আর্টে তাহার সে রূপ কোথায় ? সত্য জীবনের যে ভাষা যে দীপ্তি, যে শোণিত-প্রবাহের গতি তাহা কোথায় ? সে উন্মুক্ত জীবন, এই পরাধীনতার মধ্যেও যে উন্মুক্ত দীপ্তি, তাহা তোমার আর্টে ভাসে কোথা ? আলো দেয় কোথা, সে অগ্নিই বা কোথা ? [আগামীবারে সমাপ্য]

জেমস ম্যাক্‌নীল হুইস্‌লার চিত্রশিল্পী হিসাবে যেমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তীক্ষ্ণ বাক্‌পটুতার জন্যও সেইরূপ বিখ্যাত ছিলেন। একবার দান্তে গেব্রিয়েল রসেটির একটি ছবির আরম্ভ দেখিয়া তিনি প্রশংসা করেন। পরে ছবিটি কিরূপ অগ্রসর হইতেছে শিল্পীর নিকট জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, ভালই, ছবির জন্যে একটা চমৎকার ফ্রেমের অর্ডার দিয়েছি।

হুইস্‌লার একদিন ছবি দেখিতে গিয়া দেখিলেন সত্যই একটি চমৎকার ফ্রেমে তাহা আবদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে। বলিলেন, আমার দেখার পরে ছবিটাতে আর হাত দাওনি দেখছি।

রসেটি জবাব দিলেন, না, কিন্তু ছবিটার বিষয়ে একটা সনেট লিখেছি।

সনেটটি তিনি পড়িয়া শুনাইলেন চমৎকার।

হুইস্‌লার বলিলেন, ফ্রেম থেকে ছবিটা খুলে ফেলে সনেটটা বাঁধিয়ে রাখ।

শিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী

—শ্রীঅনাথনাথ বসু

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেল। আমাদের দেশে এই প্রদর্শনীর খবর বিশেষ আসে নাই বা ইহা আমাদের দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে নাই; ইহা কতকটা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাভাবিক। বাহিরের জগতে শিল্পবিষয়ে কি হইতেছে সে বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্য সুপরিচিত; তাহা ছাড়া আবার অটোয়াচুক্তিবদ্ধ ভারত সরকার এ প্রদর্শনীতে যোগ দেন নাই; সুতরাং যখন সরকারীভাবে ভারতবর্ষ যোগ দিল না, তখন বেসরকারীভাবে ভারতবাসী ইহাতে যোগ দেয় কি করিয়া? শিকাগো থাকিতে শুনিতেছিলাম, মহীশূরের যুবরাজ নাকি তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত কোথাও কিছু হয় নাই, ভারতবর্ষের শিল্পপণ্যের নিদর্শন এ প্রদর্শনীতে স্থান পায় নাই।

কথাটা গোড়ায় বলিয়া রাখা ভাল যে এই বিশ্ব-প্রদর্শনী হইয়াও কার্য্যতঃ ইহা অনেকখানি **commercial** অর্থাৎ ব্যবসায়মূলক হইয়া উঠিয়াছিল; এমন কি এই কারণে অনেকে এই প্রদর্শনীর সমালোচনাও করিয়াছিলেন। সে সমলোচনাকে নিতান্ত ভিত্তিহীন বলা চলে না।

প্রদর্শনীর সাধারণ দৃশ্য - উপর হইতে।

প্রদর্শনী মাত্রেরই দুই উদ্দেশ্য থাকে—এক, কৃষ্টির দিক্ দিয়া লোককে শিক্ষা দেওয়া, দুই, এই উপলক্ষে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করা। এরূপ একটা প্রদর্শনী খুব বড় রকমের বিজ্ঞাপন। শিকাগোর বিশ্ব-প্রদর্শনীতে নানা দেশের শিল্প-সম্ভার সেই সকল দেশের কৃষ্টির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—সেই সকল দেশের বাণিজ্যের একটা বড় বিজ্ঞাপন স্বরূপ হইয়া দেশের বাণিজ্য-প্রচারের সহায়তাও করিয়াছে। এরূপ একটা প্রদর্শনীতে ভারতের শিল্পসম্ভারের উপস্থিতি দ্বারা আমাদের এই দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত, তাহার কোনটাই হইল না। বাণিজ্যের জন্য না হয় আমরা অটোয়া-চুক্তিতে আবদ্ধ কিন্তু সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রসারের ব্যাপারেও কি এইরূপ আর একটা অটোয়াচুক্তিতে আমরা দাসখত লিখিয়া দিয়াছি?
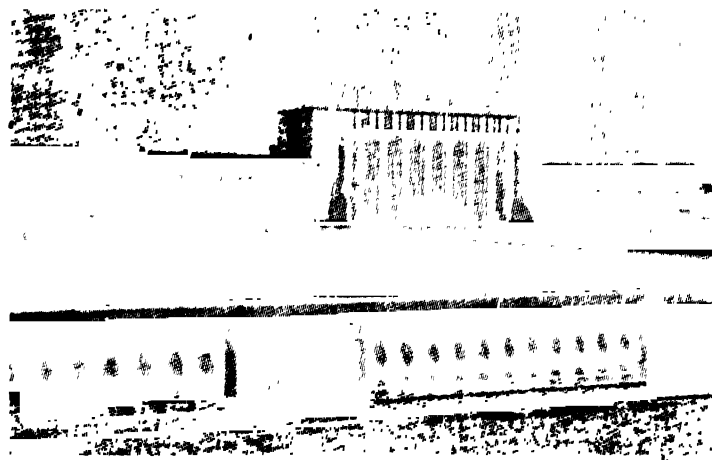
প্রদর্শনী-পরিচালন-সৌধ।

শিল্প-প্রদর্শনী ইহার প্রধান একটি উদ্দেশ্য ছিল, গত এক শতাব্দী ধরিয়া জগতে শিল্পের কিরূপ প্রসার ও উন্নতি হইয়াছে তাহাই দেখান। কিন্তু **cultural** অর্থাৎ কৃষ্টিবিষয়ক

এদিকে কিন্তু প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ব্রিটিশ শিল্পের প্রচারের জন্য সুদূর আর্জেন্টিনে গিয়া প্রদর্শনী খুলিয়া আসেন।

তাড়িৎ-গৃহ—পূর্ণালোকিত।

যাই-হোক্, অর্থনীতির সমস্যা আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে কিন্তু কথাটা প্রয়োজন মনে করিয়া বলিলাম। Oriental Bazar, প্রাচ্য-বাজার নামে প্রদর্শনীতে যে অংশ ছিল তাহাতে ত'-একজন আমেরিকাপ্রবাসী-ভারতীয় ভারতীয়-শিল্পের নিদর্শন রূপে যাহা বিক্রয় করিতেছিলেন, তাহাতে ভারতের গৌরব বাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল বিগত শতাব্দীতে শিল্পের যে প্রসার হইয়াছে তাহাই দেখান। এই জন্য প্রদর্শনীর অন্য নামকরণ হইয়াছিল, A Century of Progress Exposition অর্থাৎ উন্নতির শতবার্ষিকী প্রদর্শনী। শিকাগো সহরের জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান এবং এই বিপুল আয়োজন। ১৮১৩ সালে শিকাগো ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, সেই সালে কয়েকজন শেতাঙ্গ বণিক ফোর্ট ডিয়ারবর্ণকে কেন্দ্র করিয়া শিকাগোর ভিত্তিপত্তন করিয়াছিলেন; আজ সেই একদিনের ক্ষুদ্রগ্রাম পৃথিবীর চতুর্থ বিরাটতম নগরী; ইহার জনসংখ্যা এখন প্রায় চল্লিশ লক্ষ। শিকাগো আজ জগতের শিল্পবাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। এক শতাব্দীতে শিকাগোর এই যে উন্নতি হইয়াছে তাহাতে শিকাগোবাসী স্বভাবতই গৌরব বোধ করে। সেই গৌরববোধ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শিকাগোর অধিবাসীগণ তাহার এই জন্ম-শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শিকাগোর উন্নতির মূলে শিল্প এবং শিল্পের উন্নতির মূলে বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানের (বিশেষ করিয়া তাহার ব্যাবহারিক অংশের) ক্রমবিকাশ ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখানও প্রদর্শনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। প্রদর্শনীর দর্শক মাত্রেরই মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সে উদ্দেশ্য অনেকখানি পূর্ণ হইয়াছে। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিয়াছিলেন—

"Theme of fair is Science. Chicago's growth and the growth of Science and industry have been united during this most amazing century. Chicago's corporate birth as village and the dawn of an unprecedented era of discovery, invention and development of things to effect the comfort, con-

জেনারেল মোটর হল—নৈশ দৃশ্য।

venience, and welfare of mankind, are strikingly associated. Chicago, therefore, asked the World

কার্‌বিল্‌ন টাওয়ার—রাত্রিতে।

to join her in celebrating a century of the growth of Science and the dependence of industry on scientific research. * * Science discovers, genius invents, industry applies, and man adapts himself to, or is moulded by new things. * * Science to many of us, has been a symbol of something mysterious, difficult, intricate, removed from man's accustomed ways. So few of us realize that in virtually everything that we do we enjoy a gift of Science. A century of progress undertakes to clothe Science with its true garb of practical reality and to tell its story of humanly significant achievement."

অর্থাৎ শিকাগোর উন্নতির সহিত বিজ্ঞান ও শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। বিগত শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ; এই যুগে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের দ্বারা নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারই কল্যাণে এই সভ্যতার (অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার) এই উন্নতি। অথচ এই উন্নতির মূলে যে বিজ্ঞান একথা অতি অল্প লোকেই অনুভব করে। উন্নতির শত-বার্ষিকীর এই প্রদর্শনী বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক রূপ সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র, জন্ম ও ক্রমোন্নতির পরিচয় দিতে চাহিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—

To help the American people to understand themselves and to make clear to the coming generation the forces which have built this nation.

অর্থাৎ আমেরিকার অধিবাসীগণকে তাহাদের নিজের সভ্যতার স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া ও যে প্রভাবগুলি এই জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে সে প্রভাবগুলি পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া।

আমেরিকায় যাহা কিছুই হয় তাহাই জাঁকজমক করিয়া

বিজ্ঞান-মন্দির ও তাড়িতালয়—ঊর্দ্ধ হইতে।
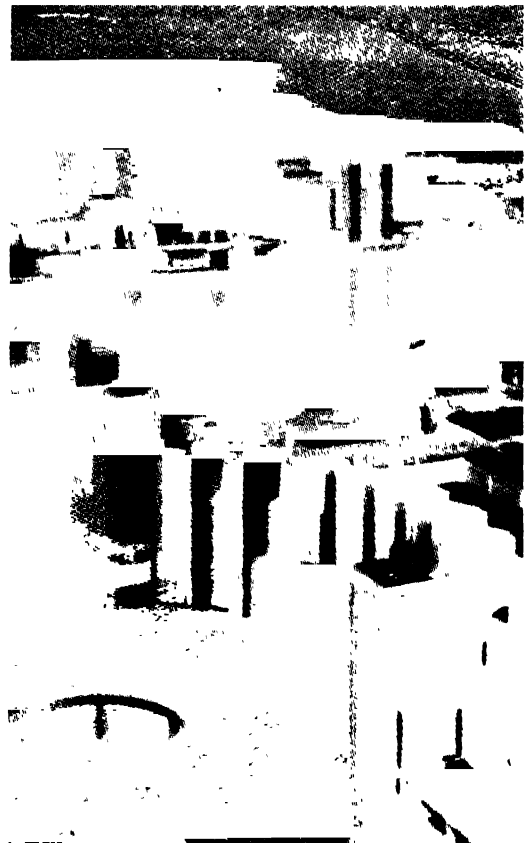
হয়। ছোটখাটো কিছু করা যেন আমেরিকানদের মনে ধরে না; তাই সেখানে একশ'তলা বাড়ি তৈয়ারী হয়, পৃথিবীর

মধ্যে বড় কারখানা, সব কিছু বড় হয়। আমেরিকানরা যেন তাহাদের বনেদিয়ানার অভাব ঘোচাইতে চায় বিরাটত্ব দিয়া,

বিজ্ঞান-মন্দির।

জগতের দৃষ্টি সেইভাবে আকর্ষণ করিয়া। বনেদিয়ানার অভাব সম্বন্ধে তাহারা অত্যন্ত সচেতন; এমন কি তাহাদের এ বিষয়ে লোলুপতা অনেক সময়ে চোখে বড় খারাপই ঠেকে। যাই হোক্, আমেরিকার জাতীয় জীবনের অন্যতম লক্ষণীয় ব্যাপার 'নূতন-কিছু-করা'র প্রবৃত্তি। জাতিটা বিজ্ঞাপনের বড় ভক্ত। প্রদর্শনীতেও জাতীয় স্বভাবের এই পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রদর্শনীর আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল—আর্কটুরাস্ তারকার আলো দিয়া। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৯০,০০০ মাইল; আর্কটুরাস্ নভোমণ্ডলের অন্যতম তারা; তাহা পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে তাহার আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে চল্লিশ বৎসর লাগে। চল্লিশ বৎসর আগে শিকাগোতে আগেকার প্রদর্শনী হইয়াছিল, (তাহারই ধর্ম্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়া জগতের নানাধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গের দৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট করেন)। বর্ত্তমান প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ তাই স্থির করিলেন, যে-আলোকরশ্মি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আর্কটুরাস্ ছাড়িয়া শূন্যপথে ছুটিয়া চলিতেছে তাহাকেই ধরিয়া উন্নতির শতবার্ষিকী এই প্রদর্শনীর আলো জ্বালাইতে হইবে। হইলও তাহাই; ইয়ার্কেস মানমন্দিরে ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেলে সেই আলো ধরা পড়িল আর তাহাই দিয়া প্রদর্শনীর আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল।

কি বিপুল ঐশ্বর্য্য সে আলোকমালার! তাহার জন্য কত ইলেক্‌ট্রিসিটি পুড়িল তাহার হিসাব করা শক্ত; নূতন নূতন রংএর আলো চোখে চমক লাগাইয়া দিল; আলোক-বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক দিকে নূতন নূতন আবিষ্কার হইল, দুর্লভ গ্যাসকে নলে পুরিয়া রংবেরংএর আলোকের সৃষ্টি হইল।

আলোকসজ্জার এই বৈচিত্র্যের পরে যে জিনিষটা দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সেটা প্রদর্শনীর অভিনব স্থাপত্য; ইহাতে যে বাড়িগুলি তৈয়ারী হইয়াছিল তাহার স্থাপত্য প্রাচীন কোন রীতিরই অনুমোদিত নহে। ছবিগুলি

বিজ্ঞান-মন্দির - ঊর্দ্ধ্ব ভাগের দৃশ্য।

দেখিলেই ইহার সত্যতা বোঝা যাইবে। আমেরিকায় গৃহ-নির্ম্মাণের নূতন নূতন রীতি দেখা দিয়াছে; উচ্চতার কথা ছাড়িয়াই দিই, আমেরিকায় পা দিতেই নিউইয়র্কে সেটা চোখে পড়ে; দশ বিশতলা ঘর তুলিয়া ইহারা আর সন্তুষ্ট নহে; পঞ্চাশ ষাট্ তলা না হইলে ইহাদের মন তুষ্ট হয় না। শুধু যে গৃহনির্ম্মাণের পদ্ধতিই নূতন হইয়াছে তাহা নহে, প্রদর্শনীর যে অংশে নূতন ধরণের ঘরবাড়ি দেখান হইয়াছিল সেখানে অভিনব উপকরণ দিয়া তৈয়ারি গৃহগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কোনটা সম্পূর্ণ কাঁচ দিয়া তৈয়ারি, কোনটা বা সমস্তটাই ষ্টীল্ দিয়া তৈয়ারি।

যখন প্রথম প্রদর্শনীর ঘর-বাড়ি উঠিতেছিল তখন সেগুলার রং চোখে বড় বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। নীল, লাল,

জেনারাল ইলেকট্রিক কোম্পানী প্রদর্শিত ম্যুরাল চিত্র।

সবুজ, হলুদ প্রভৃতি নানারংএর বাড়িগুলো—দূর হইতে মনে হইত যেন তাসের রাজ্যের ঘরবাড়ি; কিন্তু যখন সবটা শেষ হইল তখন বিভিন্ন রংগুলির মধ্যে একটি ঐক্য দেখা গেল; সে ঐক্য চোখের পক্ষে বিসদৃশ না হইয়া বরং মনোরমই হইয়া-

ব্রান্টোসরাস, ডায়োরামায় প্রদর্শিত।

ছিল। ইহা ছাড়া বাড়ীগুলির অভ্যন্তর সাজাইবারও নূতন নূতন রীতি দেখিতে পাওয়া গেল। মোটের উপর, রংএ, আলোকে, অভিনব স্থাপত্যে ও বিরাটত্বে মিলিয়া শিকাগোর এই বিশ্ব-প্রদর্শনীকে সত্যই একটা বিস্ময়কর ও দ্রষ্টব্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

প্রদর্শনীক্ষেত্রের বিস্তৃতি ছিল প্রায় ৫০০ একর, অর্থাৎ দেড় হাজার বিঘার বেশী। পূর্ব্বে এই ভূমি মিশিগান হ্রদের গর্ভে ছিল; প্রদর্শনী উপলক্ষে ভরাট করান হয়। তাহারই উপর যেন যাদুমন্ত্রের বলে এই নূতন প্রদর্শনীনগরী দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিল; যখন গড়িয়া উঠিল ঘরবাড়িগুলা দেখিয়া তখন কে বলিবে যে আর ছয়মাসের মধ্যে সব আবার ছায়ার মত মিলাইয়া যাইবে! সেগুলা স্থায়ীভাবে নির্ম্মাণ করা হয় নাই অথচ দেখিলে সে কথা মনেও পড়ে না। পূর্ব্ব হইতেই সর্ত্ত ছিল যে প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেলেই সেগুলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। বোধকরি ভাঙ্গার কাজ এতদিনে সুরু হইয়া গিয়াছে।

প্রদর্শনীকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছিল; এক, শিক্ষা-মূলক প্রদর্শনী, দুই, আমোদপ্রমোদের আয়োজনমূলক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর এই শেষের দিকটা আমাদের দেশের পোড়া-বাজারের কিং-কার্নিভালেরই বৃহৎ সংস্করণমাত্র; তাহার দ্বারা প্রদর্শনীর আয়বৃদ্ধি হইলেও সৌষ্ঠব ও গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই। এইখানেও আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে sublime ও ridiculous, তাহারই এই পাশাপাশি সংস্থাপন প্রদর্শনীকে সত্যই ছোট করিয়াছিল। কিন্তু উপায় কি? লোকের মন

ভোলাইতে হইবে; রসায়ন বা পদার্থবিজ্ঞানের রহস্য কয়জনকে আকর্ষণ করিবে? অতএব এইরূপ আয়োজন।

প্রদর্শনীর যে অংশটার উদ্দেশ্য ছিল লোককে শিক্ষা দেওয়া তাহা সত্যই সুন্দর হইয়াছিল। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে

তড়িতালয়—লাগুন হইতে।

শিকাগো ডেলী ট্রিবিউন লিখিয়াছিল যে ৫০ সেণ্ট অর্থাৎ দেড়টাকা (প্রদর্শনীর দ্বারদক্ষিণা) দিয়া এই প্রদর্শনীতে যে শিক্ষা লাভ হইবে, কলেজে সেই শিক্ষালাভ করিতে গেলে বহুশত টাকা ব্যয় হইবে। কথাটার মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকিলেও মোটের উপর অনেকটা সত্য। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য যে আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা সত্যই শিক্ষাপ্রদ।

বিজ্ঞানকে মোটামুটি এই কয়ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল; গণিতবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও তাহার ব্যবহার, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেরই প্রদর্শনী ছিল। এই প্রদর্শনী যে বিরাট বাড়িটিতে রাখা হইয়াছিল তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল Hall of Science, বিজ্ঞান-মন্দির। আমার মনে হয় সমগ্র প্রদর্শনীর এই অংশটাই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বিজ্ঞান ছলনাময়ী প্রকৃতির রহস্যশালার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; তাহারই ইতিহাস দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে ছিল। কোথাও দেখিতে পাইলাম কেমন করিয়া আকাশপথে ব্যোমযান, এরোপ্লেন চলাচল করে, ক্ষুদ্র আকারে তাহাই দেখান হইতেছে; একজন বৈজ্ঞানিক দর্শকগণকে তাহার তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন; কোথাও বা গণিতবিজ্ঞানের সাহায্যে কত প্রকার খেলার আয়োজন করা যায় তাহাই দেখান হইতেছে। কোথাও বা বেতার-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ছবি ও যন্ত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে ও অন্যান্য নানা উপায়ে বিষয়বস্তুগুলি সহজগ্রাহ্য করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া আর এক প্রকার ব্যবস্থা এই প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল; তাহার নাম ডায়োরামা, diorama, বিশেষ করিয়া ভূতত্ত্বের তথ্যগুলি ও প্রাগৈতিহাসিকযুগে জগতের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই দেখাইবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহার জন্য সাধারণতঃ ছবির ব্যবহার হইত কিন্তু ছবিতে দূরত্ব ও আপেক্ষিকতা বোঝা অসম্ভব; সেইজন্য কতকটা মডেল করিয়া কতকটা ছবির মত করিয়া এই ডায়োরামার সৃষ্টি হইয়াছে। (ছবি দ্রষ্টব্য)

পদার্থবিজ্ঞানের প্রদর্শনীগুলিও দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। জলবিন্দুর আকার গোল কেন, জলীয়বাষ্পের চাপ কি ভাবে কার্য্য করে, ইলেক্‌ট্রিসিটি দিয়া কেমন করিয়া শৈত্যের সৃষ্টি করা যায়—এই রকম আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলির উত্তর ছবি ও প্রদর্শনী দিয়া বোঝানোর আয়োজন করা হইয়াছিল। ষ্টীলের তৈয়ারি বল্ দিয়া যন্ত্রের সাহায্যে মানব-নয়নের অগ্রাহ্য অণুপরমাণুর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বোঝাইবার

সেমিনোল ইণ্ডিয়ান গ্রাম।

ব্যবস্থা ছিল। পদার্থবিজ্ঞানের এইরূপ নানা গভীর তত্ত্বের সহজ ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার এমনই কত কি আয়োজন করা হইয়াছিল।

ডিনোসর—সিনক্লেয়ার প্রদর্শিত।

তড়িৎবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক রূপ দেখাইবার আয়োজন ত এই অংশে ছিলই, তাহা ছাড়া ইহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বিজ্ঞানমন্দিরের পাশেই ইলেক্‌ট্রিকাল-বিল্ডিংএ বিশেষ করিয়া এইরূপ প্রদর্শনীগুলি রাখা হইয়াছিল। তড়িৎবিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রবলে কত রকম অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি হইতেছে তাহারই বিস্তৃত বিবরণ সেখানে দেওয়া হইয়াছিল। জেনারল ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীর ইন্দ্রজাল-গৃহ বা House of Magic সত্য সত্যই দর্শকগণের নয়নে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইলেক্‌ট্রিসিটি দিয়া শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি ও সঙ্গীতের আয়োজন, সুদূর নীহারিকামণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত ক্ষীণ আলোকরশ্মি ধরিয়া তাহারই শক্তি দিয়া বিচিত্র অনুষ্ঠান —ইন্দ্রজাল-গৃহে এইরূপ আরো কত ব্যবস্থা ছিল।

একস্থানে দেখিলাম, কাচনির্ম্মিত এক বিরাটকায় মনুষ্য-মূর্ত্তি; তাহার সাহায্যে আমাদের দেহের ভিতরে কি বিচিত্র খেলা চলিতেছে তাহা দেখান হইতেছে। তাহার পাশেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রদর্শনী রহিয়াছে।

ভূতত্ত্বের বিভাগে দেখা গেল, আমাদের চক্ষুর অন্তরালে নৈসর্গিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে কি অপরূপ পরিবর্ত্তন ও সৃষ্টি চলিতেছে।

প্রাণবিজ্ঞানের অংশে দেখিলাম গাছ কি ভাবে বাড়ে তাহা দেখাইবার আয়োজন করা হইয়াছে; এক বৎসরের বৃদ্ধি এক মিনিটে দেখাইয়া দর্শকগণকে ব্যাপারটা বোঝানর ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেহের ভিতরের সেল্ (cell) গুলির ক্রিয়া, রক্তের গতি, পেশীমাংসের বৃদ্ধি ইত্যাদি জীব-বিজ্ঞানের নানা তথ্যগুলি সহজভাবে বোঝাইবার আয়োজন রহিয়াছে।

আমেরিকার সভ্যতার ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য প্রদর্শনীক্ষেত্রে এক অংশে অধুনা-বিস্মৃত প্রাচীন ময়-সভ্যতার নিদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার যন্ত্রমূলক সভ্যতার নানা নিদর্শন রাখা হইয়াছিল। তাহার পাশে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড্-ইণ্ডিয়ানদের বসতির আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাদের ঘরবাড়ি, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহপ্রণালী সকলই দেখান হইয়াছিল। যন্ত্রমূলক সভ্যতার নিদর্শনগুলির মধ্যস্থলে তাহাদের উপস্থিতি, তাহাদের রং, চিত্র-বিচিত্রিত পরিচ্ছদ, তাহাদের জীবনধারণের সরল রীতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; (প্রদর্শনীতে উপস্থিত একদল রেড্-ইণ্ডিয়ানের ছবি দেওয়া হইল।)
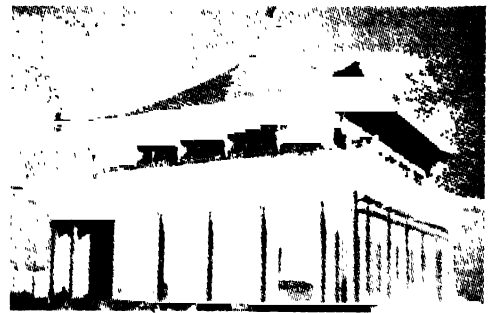
চীনা লামার মন্দির।

প্রদর্শনীর আর এক অংশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুগুলির অবিকল মডেল দেখান হইয়াছিল।

(চিত্র দ্রষ্টব্য)। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেগুলি খুবই উপভোগ করিয়াছিল। শিশুদের জন্য প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিশুদের জন্য প্রদর্শনীর যে অংশে

প্রদর্শনীর জাপানী উদ্যান ও প্যাভিলিয়ন।

বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল **Enchanted Island,** অর্থাৎ মায়া দ্বীপ; সেখানে তাহাদের চিত্তবিনোদনের নানারকম ব্যবস্থা ছিল। আর একটা মজার ব্যবস্থা ছিল; মাতা শিশু লইয়া প্রদর্শনী দেখিতে আসিলেন, কোথায় তাহাকে লইয়া ঘুরিবেন, তাহা একটা কঠিন সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের আয়োজন এখানে ছিল। শিশুকে জমা দিয়া মাতা একটি চাক্‌তি লইয়া গেলেন, তাহার উপর নম্বর রহিল; শিশুকেও সেই নম্বর দেওয়া হইল। শিশুর পরিচর্য্যা, চিত্তবিনোদনাদির ভার লইল, শুশ্রূষাকারিণী। যখন গৃহে ফিরিবার সময় হইল তখন মাতা চাক্‌তির বদলে শিশুকে লইয়া কিছু দক্ষিণা দিয়া ঘরে ফিরিলেন।

একস্থানে চীনা বৌদ্ধ-মন্দির দেখিলাম; শুনিলাম, এই মন্দিরের প্রত্যেক কাঠের টুকরা চীন হইতে আনীত; চীনা কারিগর আসিয়া সেইগুলি দিয়া মন্দির রচনা করিয়াছে; ভিতরে গিয়া নানা বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি, বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসম্ভার দেখিলাম; চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুক আছেন, যথাসাধ্য প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। কারুশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন এই চীনা মন্দির; দেখিলে সত্যই মন শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

কৃষি-প্রদর্শনীর মধ্যে বিজ্ঞান-সম্মত অভিনব পদ্ধতিতে কৃষির কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইলাম। তাহারই এক অংশে বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তু তৈয়ারি করিবার প্রণালী দেখান হইতেছিল; গম হইতে প্রস্তুত রুটি বিশুদ্ধ মধুসহ খাইয়া দেখিলাম, ভাল লাগিল। যেখানে বিক্রয় হইতেছিল সেখানে খুব ভিড়। সেই দিকেই যুক্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী ছিল। একদিন সন্ধ্যায় দেখি হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসিগণ (হাওয়াই যুক্তসাম্রাজ্যের অধীন) তাহাদের দেশের পোষাক পরিয়া সে দেশী গান ও নাচ দেখাইতেছে; পাশেই হাওয়াইএর জিনিসের প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীতে এক এক দিন এক এক জাতি বা দেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। ইহুদিদের দিনে বিরাট ইহুদি-সম্মেলন

স্কাই রাইড হইতে লাগুন ও দ্বীপ।
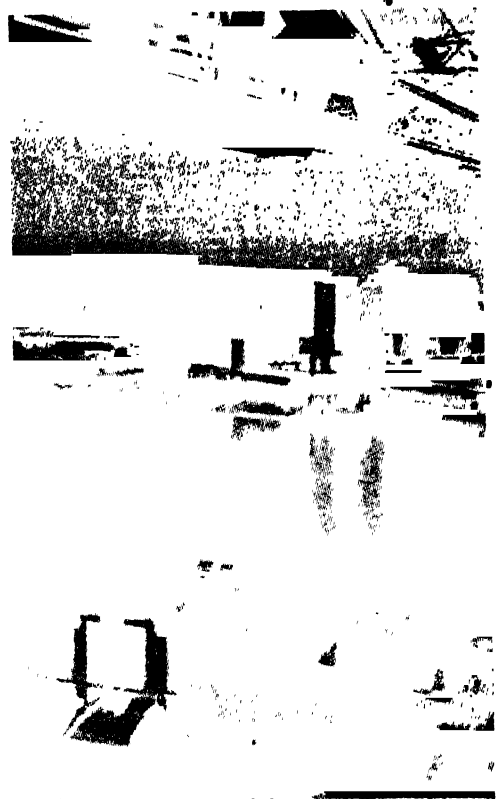
হইল; সেখানে বক্তাগণ ইহুদি সভ্যতা, তাহার ইতিহাস, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সুইডেন-দিবসে সুইডেনের প্যাভিলিয়নে (যেখানে সুইডেনের উপজাত দ্রব্য-গুলির প্রদর্শনী হইয়াছিল) আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল; সেখানে বক্তৃতা গান ইত্যাদির আয়োজনও ছিল। এমনই ভাবে বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও শিল্পের পরিচয় আমেরিকার অধিবাসী প্রদ-র্শনীর দর্শকগণ পাইলেন। জাপানের প্রদর্শনীর মধ্যে সুন্দর জাপানী-উদ্যান অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

প্রদর্শনীর অন্যতম দর্শনীয় বস্তু ছিল যানবাহন প্রদর্শনী। ট্রাভেল এণ্ড ট্রান্সপোর্ট বিল্ডিংএ সে-গুলি রাখা হইয়াছিল; অতি প্রাচীনকালের যানবাহনের ব্যবস্থা হইতে অত্যাধুনিক এরোপ্লেন, দ্রুতগামী রেলইঞ্জিন সকলই দেখানর আয়োজন ছিল। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এঞ্জিন রয়াল স্কট, Royal Scot আসিয়াছিল: মেক্সিকোর প্রেসি-ডেন্টের সুসজ্জিত সেলুনগাড়ী আনান হইয়াছিল। শীতাতপের পরিবর্ত্তনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য যে নূতন ধরণের অ্যালুমিনিয়মে প্রস্তুত পুলম্যান গাড়ী, তাহাও দেখান হইয়াছিল; ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল এমনই যে শীতগ্রীষ্মে সর্ব্বদাই তাহার আভ্যন্তরীণ তাপ সমান থাকিবে। প্রখর গ্রীষ্মে বা দারুণ শীতে যাত্রীগণ কোন কষ্টই বোধ করিবে না। এই সঙ্গে Wings of the Century অর্থাৎ শতাব্দীর পক্ষ-সংগ্রহ বলিয়া একটা ব্যাপারের আয়োজন হইয়াছিল; সেখানে কি রকম করিয়া ধীরে ধীরে মানুষের যানবাহনের রীতি সভ্যতার

নর্দালি দ্বীপ—লাগুন হইতে।

ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহারই অভিনয় দেখানো হইয়াছিল। এই অভিনয়ে ঐতিহাসিক সত্য অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। যানবাহন প্রদর্শনীর প্রকাণ্ড ডোমটাও বিস্ময়কর; সমস্ত ডোমটা উপর হইতে ঝোলান ছিল এবং বায়ুর তাপে তাহা উঠিত নামিত।

ট্রাভেল ও ট্রান্সপোর্ট বিল্ডিং।

আর একটা দেখিবার বস্তু ছিল মোটর প্রদর্শনী; সেখানে নানারকমের মোটর দেখান হইয়াছিল; জেনারেল-মোটর-কোম্পানী একটা গাড়ী ঠিক্ কি ভাবে তৈরী হয়, একটা ছোট কারখানা করিয়া একটি হলের মধ্যে তাহা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অপরিষ্কৃত রবার হইতে কিরূপে মোটরের টায়ার তৈয়ারি হয় তাহাও দেখান হইয়াছিল।

দুইটি সুউচ্চ টাওয়ার তৈয়ারি করা হইয়াছিল, তাহাদের উচ্চতা প্রায় সাতশত ফিট। তাহারই উপরে মোটা মোটা ষ্টীলের তার দিয়া দুইটি টাওয়ারের শীর্ষ যুক্ত করা হইয়াছিল; সেই তারে ঝোলান গাড়ীতে চড়িয়া অনেকেই এরোপ্লেনে চড়ার সখ মিটাইয়াছিলেন। আয়োজনের নাম করা হইয়াছিল Sky-ride অর্থাৎ আকাশে চড়া। টাওয়ারের

উপর হইতে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের চমৎকার ছবি পাওয়া গেল; কিন্তু তারের গাড়ীতে চড়িয়া ঝুলিবার স্পৃহা হইল না

সমাজ-বিজ্ঞান মন্দির ; প্রাচীন মিশরীয় রীতির প্রবেশ পথ।

বিজ্ঞান-মন্দিরের পরেই প্রদর্শনীর যে অংশটি আমার ভাল লাগিয়াছিল তাহা সমাজবিজ্ঞান মন্দির, Hall of Social Science. সেখানে সমাজের ক্রম-বিকাশ, তাহার প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা, বর্ত্তমান যুগের নানা সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি বিশদভাবে বোঝাইবার জন্য উপযুক্ত দ্রব্য সম্ভারে সমাবেশ করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এক, এই যুগের নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতা যে সকল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে,—যথা, বেকার-সমস্যা, গণসেবা ও গণশিক্ষা বিষয়ক নানা সমস্যা—সেইগুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য ছবি, ডায়োরামা, চার্ট প্রভৃতির সমাবেশ ও শিক্ষাবিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ছবি প্রভৃতির সংগ্রহ।

একস্থলে দেখিলাম আমেরিকার বিখ্যাত সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী জেন অ্যাডামসের চেষ্টায়—প্রতিমুহূর্ত্তে যুদ্ধের ব্যাপারে কত খরচ হয় তাহাই দেখান হইয়াছে। একটি কামানের মুখ দিয়া সোণার ডলার বৃষ্টি হইতেছে; এই সমস্ত টাকা এক একদিনে যুক্তরাষ্ট্র সামরিকসম্ভারের জন্য ব্যয় করিতেছে। দেখিয়া মনে জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বতঃই একটা আশঙ্কার উদয় হয়। কিন্তু তবুও এ দেশের লোকের মন এদিকে যায় না। শ্রীমতী অ্যাডামসের মুখেই শুনিয়াছিলাম এইজন্য জীবনে তাঁহাকে বহু লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে।

আব্রাহাম-লিঙ্কনের সহিত শিকাগোর বিশেষ যোগ; তিনি ইলিনয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; (ইলিনয়ের প্রধান নগরী শিকাগো) তাই তাঁহার শৈশব-আবাসস্থল,' যে কুটীরে তাঁহার জন্ম তাহারই মডেল একস্থানে রাখা হইয়াছে। সেই-খানে চরকায় উলের সূতা কাটা হইতেছে এবং সেই সূতায় প্রস্তুত বস্ত্র তৈয়ারি হইতেছে। আমার এক ভারতীয় বন্ধু এক খণ্ড কাপড় কিনিলেন গান্ধীজীকে উপহার দিবার জন্য। এই-খানে আমরা প্রাচীন আমেরিকার গ্রাম্যজীবনের একটা ছবি দেখিতে পাইলাম। এক শতাব্দীর মধ্যে সত্যই কি বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে!

আমোদপ্রমোদ বিভাগ : মধ্যপথ।

তাহারই কিছু দূরে ফোর্ট ডিয়ারবর্ণের বিরাটকায় মডেল রহিয়াছে; এক শতাব্দী পূর্ব্বে দুর্গটি ঠিক যেমন ছিল তেমনি করিয়া এই মডেলটিকে তৈয়ারি করা হইয়াছে। চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলাম; যেখানে রেড্-ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ সৈন্য আশ্রয় লইয়াছিল তাহা দেখিলাম। দুর্গের গায়ে গোলাগুলির দাগ পর্য্যন্ত নকল করা হইয়াছে।

আমোদপ্রমোদের অংশের বিস্তৃত বর্ণনা দিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহা পোড়াবাজারের কিং কার্ণিভালের বৃহৎ সংস্করণ। কোথাও প্যারিসের রাস্তার নকল, কোথাও বা কেহ দুইমাথাওয়ালা শিশু দেখাইতেছে, কেহ বা হাতের কৌশল, তাসের কৌশল দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে

একস্থানে দেখি, Infant Incubator অর্থাৎ যে-শিশু সময়ের পূর্ব্বেই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহাকে তাপ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা। কাচের ছোট ছোট ঘরে তাহাদের রাখা হইয়াছে; শুশ্রূষাকারিণীগণ তাহাদের সেবা করিতেছে। ডিমে তাপ দিয়া মুর্গীর ছানার মত চাপ দেওয়ার ব্যবস্থাই সাধারণতঃ ইন্‌ক্যুবেটর দিয়া হয় জানিতাম, এখন দেখিলাম মনুষ্যশিশুকেও এইভাবে প্রতিপালন করা অসম্ভব নহে।

আরো এইরূপ বহুকিছু দেখিবার বস্তু ছিল। সমগ্র প্রদর্শনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে বহুদিন লাগিত; একজনের পক্ষে সমস্ত দেখাও অসম্ভব মনে হইত। কিন্তু তাহারই মধ্যে অল্প কয়েকদিন প্রদর্শনীর যেটুকু দেখিয়াছিলাম তাহাতে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এরূপ প্রদর্শনী যে বাস্তবিকই গণশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপকরণ ইহা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শিকাগোর বিশ্বপ্রদর্শনীতে দোষত্রুটি হয়ত যথেষ্টই ছিল তাহাসত্ত্বেও ইহা শিকাগোর গৌরবের বিষয় হইয়াছিল

আলো-আঁধারি

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সে পথের সন্ধান দিবে কে?

*

আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে নিত্যকাল শঙ্কিত আকাশ,
সত্যাসত্য, ভালো মন্দ, ক্ষণে লুপ্ত ক্ষণে সুপ্রকাশ—
সংশয়-দোলায় চিত্ত দুলিতেছে নিত্যকাল
ছায়া-আলো বাসনা ও বিবেকে।
সে পথের সন্ধান দিবে কে?

কে ঘুমায়, কারে ডাকি, জাগ রে—

*

তিমির-মন্থন সূর্য্য, উড়িতেছে স্ফুলিঙ্গ তাহার,
কুলায়ে পাখীরা জাগে, কুলায়ে ঘুমায় অন্ধকার;
চড়ায় ঠেকেছে কেহ, দুলিতেছে তরী কারো
উত্তাল মহাকাল-সাগরে।
কে ঘুমায় কারে ডাকি জাগ রে।

মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে,—

*

মৃত-জীবিতের মাঝে হে বন্ধু, কিসের ব্যবধান,
মৃত্যুরে কে জানিয়াছে, কে পেয়েছে জীবন-সন্ধান?
মরণ-তীর্থের যাত্রী, মায়ের কোলের শিশু
একাকার নির্ম্মম বিচারে!
মোদের ভাবনা ভয় মিছা রে।

কে জেনেছে সবখানি আকাশে?

*

অনন্ত জীবনে মোর খণ্ড খণ্ড তার পরিচয়,
অসম্পূর্ণ প্রাণ-মৃত্যু, কান্না-হাসি, সম্ভব-বিলয়,
রহস্যের যবনিকা আজো উঠিল না মোর,
যাহা বুঝি, বুঝি শুধু আভাসে।
কে জেনেছে সবখানি আকাশে?

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

সকলের আগে গৃহী-স্ত্রীশিষ্যাদের মধ্যে প্রধান, দানশীলা, বুদ্ধের পরমভক্ত বিশাখার (বিসাখা) কথা বলিব। বিশাখা ভদ্দিয়-নগরের শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা ছিলেন। কোশলের রাজার অনুরোধে ধনঞ্জয় ভদ্দিয় নগর হইতে উঠিয়া আসিয়া কোশলরাজ্যের অন্তঃপাতী ও শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী সাকেত নামক নগরে বাসস্থাপন করেন। [বুদ্ধের নারীভক্তগণ]

শ্রাবস্তীতে মিগার নামে একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। মিগারের পুত্র পুণ্যবর্দ্ধন বিবাহে অনিচ্ছুক ছিল, শেষে অতি সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যা পাওয়া গেলে বিবাহ করিতে রাজি আছে বলিল। ব্রাহ্মণেরা খুঁজিয়া বিশাখাকে সর্ব্বসুলক্ষণা দেখিয়া পুণ্যবর্দ্ধনের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর পতিগৃহে যাইবার সময় বিশাখার পিতা তাহাকে দশটি উপদেশ দিয়াছিলেন, যথা, ভিতরের অগ্নি বাহিরে লইও না, বাহিরের অগ্নি ভিতরে আনিও না, যে দেয় তাহাকে দিও, যে দেয় না তাহাকে দিও না, যে দেয় তাহাকেও দিও, যে না দেয় তাহাকেও দিও, সুখে উপবেশন করিও, সুখে আহার করিও, সুখে শয়ন করিও; অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিও এবং গৃহদেবতাদের শ্রদ্ধা করিও। বিশাখার শ্বশুর পাশের ঘরে ছিলেন, তিনি সবকথা শুনিতে পাইলেন। সর্ব্বশেষে ধনঞ্জয় আটজন লোককে মধ্যস্থ নিয়োগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে বিশাখার বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় তবে এই মধ্যস্থেরা তাহার বিচার করিবেন। বহু ধনরত্ন দাসদাসী প্রভৃতি লইয়া বিশাখা পতিগৃহে গেলেন ও শ্রাবস্তীর লোকে বধূর রূপ ও ধনসম্পদে মুগ্ধ হইল।

সেই রাত্রে বিশাখার একটি ঘোটকী বৎস প্রসব করিল। বিশাখা রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া দাসীদের সঙ্গে অশ্বশালায় গিয়া বৎসকে স্নান করাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মিগার পুত্রের বিবাহ-উৎসবে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলেন না, যদিও তাঁহার বাড়ী জেতবনের বেশী দূরে ছিল না। মিগার নগ্ন-শ্রমণদের (নগ্গ-সমণক—অনেকে ইহাদের জৈন মনে করিয়াছেন; ইহারা আজীবিকও হইতে পারে, কারণ জৈন ও আজীবিক উভয়েই নগ্ন ছিল) ভক্ত ছিলেন, ইহাদের উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বহু সম্বৰ্দ্ধনা করিলেন। মিগার নবপুত্রবধূকে নগ্ন-শ্রমণদের প্রণাম করিয়া আসিতে বলিলেন; বিশাখা প্রণাম করিতে গিয়া তাহাদের নগ্নতায় ঘৃণাবোধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। নগ্নশ্রমণরা মিগারকে বিশাখাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। [দশটি উপদেশ,—বহুদান যৌতুক, নগ্ন শ্রমণদের প্রণাম, তাহাদের পরামর্শ প্রভৃতি অনাথপিণ্ডদের কন্যা ছোট-সুভদ্রা (চুল্ল সুভদ্দা) সম্বন্ধেও বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ কাহার জীবনে ইহা ঘটিয়াছিল বলা যায় না।] একদিন মিগার আহারে বসিয়াছিলেন, বিশাখা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন। বিশাখা একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতে দেখিতে পাইয়া মিগার যাহাতে ভিক্ষুকে দেখিতে পান সে জন্য সরিয়া দাঁড়াইলেন; মিগার কিন্তু ভিক্ষুর দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া খাইয়া যাইতে লাগিলেন। বিশাখা তখন ভিক্ষুকে 'আমার শ্বশুর বাসি ভাত খাইতেছেন' বলিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। মিগার ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশাখাকে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। বিশাখা বলিলেন—তাঁহার ত মাতাপিতা আছেন, চলিয়া যাইতে বলিলেই তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য নহেন, মধ্যস্থেরা তাঁহাকে বিচার করিবেন। মিগার মধ্যস্থদের ডাকাইয়া বিশাখার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মধ্যস্থদের প্রশ্নের উত্তরে বিশাখা বলিলেন যে তিনি পূর্ব্ব জন্মের সুকর্ম্মকে 'বাসি ভাত' বলিয়াছিলেন। কারণ মিগার ভিক্ষুকে ভিক্ষাদান করিয়া এই জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন না। মিগার তখন বিশাখার রাত্রে গৃহত্যাগের কথা তুলিলেন; বিশাখা ঘোটকীর বৎস-প্রসবের কথা বলিলেন। মধ্যস্থেরা বলিলেন যে, বিশাখার কোন অপরাধ হয় নাই। মিগার তখন পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় ধনঞ্জয়ের দশটি উপদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশাখা বলিলেন যে, সেই দশটি উপদেশের অর্থ যথাক্রমে এইরূপ,—শ্বশুর বা স্বামীর দোষের কথা কাহাকেও বলিও না, শ্বশুর বা স্বামীর বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে

তাঁহাদিগকে তাহা জানাইও না, যাহারা জিনিস লইয়া ফেরৎ দেয় না তাহাদের জিনিষ দিও না, দরিদ্র লোক সাহায্য চাহিলে ফিরাইয়া দিতে পারুক বা না পারুক সাহায্য করিও, শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামীর সম্মুখে বসিয়া থাকিও না, শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর আহার না হইলে আহার করিও না, তাঁহারা শয়ন না করিলে শয়ন করিও না, তাঁহাদের অগ্নির মত পূজা করিও, এবং তাঁহাদের দেবতা মনে করিও।

মিগার তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিশাখা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন কিন্তু বলিলেন যে, এখন যখন তিনি দোষমুক্ত হইয়াছেন তখন তিনি এ গৃহ ত্যাগ করিবেন। মিগার অনেক অনুনয় করিলে বিশাখা বলিলেন যে তিনি এই সর্ত্তে থাকিতে রাজি আছেন যে, তিনি বুদ্ধকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন। মিগার ইহাতে রাজি হইলেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া মিগার ও নগ্ন-শ্রমণদের ছাড়িয়া বুদ্ধের ভক্ত হইয়াছিলেন। বিশাখার চেষ্টা ও আয়োজনেই মিগার বুদ্ধভক্তি লাভ করিয়াছিলেন; শ্বশুরের এই মাতৃতুল্য উপকার করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধেরা বিশাখার নামের শেষে 'মিগার-মাতা' কথাটি যোগ করিয়াছেন। (ধ কথা, ১।৩৮৪)।

বিশাখা একবার বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে গিয়া আরামে প্রবেশ করার আগে তাঁহার বহুমূল্য শিরাভরণ খুলিয়া বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তাঁহার ভৃত্য ইহা লইতে ভুলিয়া গেল; আনন্দ এই অলঙ্কার দেখিতে পাইয়া তাহা তুলিয়া রাখিয়া দিলেন। বিবাহের সময় পিতৃদত্ত যে-যে অলঙ্কার বিশাখা যৌতুকরূপে পাইয়াছিলেন ইহা তাহাদের একটি। বিশাখা ইহা ফিরাইয়া লইতে অস্বীকার করিয়া উহা বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ সংঘের জন্য ব্যয় করিতে বলিলেন। অলঙ্কার কিন্তু এত মূল্যবান ছিল যে তাহার ক্রেতা জুটিল না; তখন বিশাখা নিজেই উহার উচিত মূল্য দিয়া কিনিলেন এবং সেই অর্থে শ্রাবস্তীতে সংঘের জন্য একটি আরাম বানাইয়া দিলেন। ইহার নাম পূর্ব্বারাম (পুব্বারাম) রাখা হইল। বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে থাকার সময় জেতবনে কিছুদিন, পূর্ব্বারামে কিছুদিন করিয়া থাকিতেন।

অনাথপিণ্ডদের মত বিশাখাও সংঘের সেবায় অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। একটি আখ্যানে তাঁহার দানের পরিমাণ বুঝা যায়। একসঙ্গে বর্ণিত হইলেও এই দানগুলি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে হইয়া থাকাই সম্ভব। বিশাখা একদিন সশিষ্য বুদ্ধদেবকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছিল, বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বৃষ্টির জলে স্নান করিতে বলিলেন। ভিক্ষুরা চীবর ছাড়িয়া বৃষ্টিতে স্নান করিতে লাগিলেন। বিশাখার গৃহে আহার্য্য প্রস্তুত হইলে বিশাখা একজন দাসীকে আরামে গিয়া সংবাদ দিয়া আসিতে বলিলেন। দাসী আরামে আসিয়া ত্যক্তচীবর ভিক্ষুদিগকে স্নান করিতে দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া বিশাখাকে বলিল, "আরামে কোন ভিক্ষু নাই, নগ্ন শ্রমণরা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে।" বিশাখা আবার দাসীকে পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে স্নিগ্ধশরীর হইয়া স্নান সারিয়া চীবর লইয়া যে যার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিল। দাসী কোন ভিক্ষুকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, "আরামে কোন ভিক্ষু নাই, আরামে লোক নাই।" বিশাখা আবার লোক পাঠাইলেন। বুদ্ধ সশিষ্য আসিয়া আহার করিবার পর বিশাখা তাঁহার কাছে আসিয়া প্রার্থনা করিলেন যে তিনি যাবজ্জীবন সংঘকে (১) বর্ষাকালের জন্য বস্ত্রদান, (২—৫) আগন্তুক, গমনোন্মুখ, রুগ্ন ও রুগ্নের শুশ্রূষাকারী ভিক্ষুদিগকে অন্নদান, (৬) রুগ্ন ভিক্ষুকে ঔষধ দান, (৭) সকল সময় ভিক্ষুদিগকে যাগু (পাতলা পায়স) দান, এবং (৮) ভিক্ষুণীদিগকে উদকশাটিক (স্নানের সময় পরিবার বস্ত্র) দান করিতে চাহেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন বিশাখা কেন এই আটটি বর প্রার্থনা করিতেছেন। বিশাখা প্রথম প্রার্থনার কারণ সম্বন্ধে দাসীর ভিক্ষুদিগকে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতে দেখিবার কথা বলিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, নগ্নতা অশুচি ও বিরক্তিকর"; দ্বিতীয় হইতে সপ্তম প্রার্থনার কারণ সম্বন্ধে বলিলেন যে ইহাতে ভিক্ষুদের যাতায়াতের সুবিধা হইবে, যাতায়াতের সময় কোথায় ঠিক ভিক্ষা মিলিবে জানা থাকিলে অনেক কষ্টের লাঘব হইবে, এবং রুগ্নের চিকিৎসার সুবিধা হইবে; অষ্টম প্রার্থনার কারণ সম্বন্ধে বিশাখা বলিলেন যে ভিক্ষুণীরা নগ্ন হইয়া বেশ্যাদের সঙ্গে অচিরবতী নদীতে এক ঘাটে স্নান করে, বেশ্যারা ভিক্ষুণীদের উপহাস করিয়া বলে, "যৌবন যতদিন আছে ততদিন তোমাদের কামভোগ ত্যাগ করিয়া লাভ কি? কামভোগ করা কি উচিত নয়? যখন বৃদ্ধ হইবে তখন কামভোগ ত্যাগ করিও,

ইহাতে তোমাদের দুই দিকই রক্ষা হইবে ;" ইহাতে ভিক্ষুণীরা অপ্রস্তুত হয়, "ভদন্ত, স্ত্রীলোকের নগ্নতা অশুচি, ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর।"

"বিশাখা, তথাগতের কাছে এই আটটি বর প্রার্থনা করায় তোমার নিজের স্বার্থ কি ছিল ?"

"ভদন্ত, ভিক্ষুরা বর্ষা-অন্তে নানা স্থান হইতে ভগবানের সঙ্গে দেখা করিতে শ্রাবস্তীতে আসিয়া যখন কোনও ভিক্ষুর মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া মৃত ভিক্ষুর ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে এবং ভগবান যখন মৃত ভিক্ষুদের স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃতাগামী ফল বা অনাগামী ফল বা অর্হত্ব ফল বিষয়ে ব্যাখ্যা করিবেন, তখন আমি ভিক্ষুদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব ঐ মৃত ভিক্ষু কখনও শ্রাবস্তীতে আসিয়া ছিলেন কি না। যদি ভিক্ষুরা বলেন যে মৃত ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন তবে আমার মনে হইবে যে তবে ঐ মৃত ভিক্ষু নিশ্চয় আমার প্রদত্ত বর্ষাবস্ত্র, ভিক্ষা বা ঔষধাদি পাইয়াছিলেন, এবং ইহাতে আমার তৃপ্তি, সন্তোষ ও আনন্দ হইবে।"

এইরূপ বর প্রার্থনার জন্য বুদ্ধ বিশাখার বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। (মহাবগ্‌গ, ৮।১৫)।

বিশাখার দৌহিত্রী দত্তার মৃত্যু হইল। বিশাখা শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রাবস্তীতে রোজ কত লোকের মৃত্যু হয় তাহা চিন্তা করিতে বলিয়াছিলেন। (ধ-কথা, ৩।২৭৮)।

একজন স্থবির (থের, অর্থাৎ বয়স্ক) ভিক্ষু একজন তরুণ ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া বিশাখার বাড়ীতে গিয়া যাগু ও পিঠা খাইলেন। তারপর তরুণ ভিক্ষুকে সেখানে রাখিয়া স্থবির ভিক্ষু অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বাড়ীর একটি বালিকা তরুণ ভিক্ষুকে বসিতে আসন দিয়া তাহার জন্য জল আনিতে গিয়া পাত্রের জলে নিজের মুখচ্ছবি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। তাহাকে হাসিতে দেখিয়া ভিক্ষুও হাসিল। বালিকা বলিল, "যে হাসে সে মাথা-কাটা।" ভিক্ষু বলিল, "তুই মাথা কাটা, তোর বাপ মাথা-কাটা, তোর মা মাথা কাটা।" বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বিশাখার কাছে গিয়া নালিশ করিল বিশাখা আসিয়া ভিক্ষুকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভিক্ষু জেদ ধরিল, কেন বালিকা তাহাকে অপমান করিয়াছিল। স্থবির ভিক্ষু এই সময় ফিরিয়া আসিলেন, তিনি ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, বালিকা ভিক্ষুকে অপমান করিবার জন্য ওরূপ বলে নাই। তরুণ ভিক্ষু তখন বিশাখার দলে যোগ দেওয়ার জন্য স্থবির ভিক্ষুকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। এই সময়ে বুদ্ধ উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে তরুণ ভিক্ষুর পক্ষ লইয়া তাহাকে বশীভূত করিলেন এবং তারপর ইন্দ্রিয়সুখের বিষয় লইয়া বিদ্রূপ করার জন্য তাহাকে দোষ দিলেন। (ধ-কথা, ৩।১৬১)।

দেবদত্ত বুদ্ধের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ভিন্ন ভিক্ষুদল গঠন করিয়াছিলেন। একটি যুবতী দেবদত্তের দলে ভিক্ষুণী হইয়াছিল। গৃহে থাকিতেই তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু যুবতী তাহা বুঝিতে পারে নাই। কিছু দিন পরে অন্য ভিক্ষুণীরা তাহার অবস্থা বুঝিয়া দেবদত্তকে জানাইল। দেবদত্ত পাপ সন্দেহ করিয়া তাহাকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বলিলেন। ভিক্ষুণী বুদ্ধের কাছে গিয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ রাজা প্রসেনজিৎ, অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা এবং আরও কয়েকজনকে মধ্যস্থ নিয়োগ করিয়া ভিক্ষুণীকে বিচার করিবার ভার দিলেন। ভিক্ষু উপালির (ইনি "বিনয়ে"র নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন) উপর বিচারকার্য পরিচালনার ভার রহিল। ভিক্ষু উপালি বিশাখাকে রাজার সামনে ডাকিয়া তাঁহাকে বিষয়টির নিষ্পত্তি করিতে বলিলেন। বিশাখা ভিক্ষুণীকে ডাকাইয়া তাহার চারিপাশে পরদা খাটাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া উপালিকে জানাইলেন যে ভিক্ষুণীর সংঘে প্রবেশ করিবার পূর্বে গৃহে থাকিতেই গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। উপালি তখন ভিক্ষুণীকে নির্দোষ ঘোষণা করিলেন। যথাসময়ে ভিক্ষুণীর একটি পুত্র প্রসব হইল, এই বালককে রাজা প্রসেনজিৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ধ-কথা, ৩।১৪৪)।

বুদ্ধ একদিন অনাথপিণ্ডদের গৃহে ভিক্ষা করিতে আসিয়া শুনিলেন যে, ভিতরে খুব চেঁচামেচি বকাবকি হইতেছে। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর লোকে এত চেঁচামেচি করিতেছে কেন ? মনে হইতেছে যেন মৎস্যজীবীদের মাছ চুরি গিয়াছে।" অনাথপিণ্ডদ বলিলেন যে তাহার গৃহে একজন বড়লোকের মেয়ে বধূ হইয়া আসিয়াছে, সে স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ী কাহারও কথা শুনিতেছে না। বুদ্ধ বধূকে তাঁহার কাছে আনিতে বলিলেন। বধূর নাম ছিল সুজাতা। সে

আসিলে বুদ্ধ বলিলেন, "এস সুজাতা।" সুজাতা অমনি তাঁহার সামনে আসিয়া দাড়াইল। বুদ্ধ বলিলেন, "দেখ সুজাতা, পুরুষের সাত প্রকারের স্ত্রী হইতে পারে। এই সাতপ্রকার কি কি? কেহ নরহন্ত্রীর মত, কেহ চোরের মত, কেহ রক্ষিতার মত, কেহ মাতার মত, কেহ স্ত্রীর মত, কেহ বন্ধুর মত, আর কেহ ভৃত্যের মত। তুমি এগুলির মধ্যে কোনটি?" সুজাতা তাহার গর্ব্ব ও জেদ ভুলিয়া গিয়া বলিল যে সে বুদ্ধের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। বুদ্ধ তখন নিকৃষ্টতম স্ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, কোনও স্ত্রী পরপুরুষাসক্ত, কেহ স্বামিদ্বেষিণী ইত্যাদি, এবং উৎকৃষ্টতম সেই, যে ভৃত্যের মত স্বামীর ইচ্ছাবর্ত্তিনী হয়, স্বামীর সকল কথা ও কাজ বিনা আপত্তিতে সহ্য করে। বুদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে সুজাতা ইহার কোনটির মত। সুজাতা তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইল যে, সেদিন হইতে সে তাহার স্বামীর ভৃত্য হইবে।

অনাথপিণ্ডদের কন্যা "ছোট-সুভদ্রা" (চুল্ল সুভদ্দা) সম্বন্ধেও বিশাখার মত গল্প আছে যে তাহার শ্বশুর তাহাকে নগ্ন-শ্রমণদের প্রণাম করিতে বলায় সে রাজি হয় নাই। শ্বশুর স্ত্রীকে জানাইলেন যে, ছোট-সুভদ্রা নগ্নশ্রমণদের লজ্জাহীন মনে করে। শাশুড়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কিরূপ শ্রমণদের শ্রদ্ধা করে। ছোট-সুভদ্রা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কথা বলিল ও শাশুড়ীর অনুরোধে বুদ্ধকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। বুদ্ধ আসিয়া তাহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন। (ধ-কথা, ৩।৪৬৫)।

কৃশা-গৌতমীর (কিসা গোতমী—শরীর রোগা ছিল বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছিল) শিশুপুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃতপুত্রকে কোলে লইয়া তাহাকে আবার বাঁচাইবার জন্য গৌতমী বাড়ী বাড়ী ঔষধ চাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। লোকে তাহাকে উন্মাদ মনে করিয়া বুদ্ধের কাছে যাইতে বলিল। বুদ্ধ তাহাকে কিছু শ্বেতসর্ষপ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন (সেকালে অনেক ক্রিয়াকর্ম্ম ও মন্ত্রতন্ত্রে শ্বেতসর্ষপ ব্যবহার করা হইত, কাজেই গৌতমী ভাবিল বুদ্ধ বোধ হয় মন্ত্রের জোরে শিশুকে বাঁচাইবেন)। বুদ্ধ তাহাকে বলিয়া দিলেন যে শ্বেতসর্ষপ এমন গৃহ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে যে গৃহে কখনও কাহারও মৃত্যু হয় নাই। গৌতমী গৃহে গৃহে ঘুরিয়া দেখিতে পাইল যে জীবিত লোকের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই বেশী, ইহাতে তাহার জ্ঞানোদয় হইল, সে বুদ্ধের কাছে ফিরিয়া আসিলে বুদ্ধ তাহাকে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। (ধ-কথা, ২।২৭৪)।

বুদ্ধ যখন আলবি নগরে যাইতেন তখন একটি তন্তুবায়-কন্যা তাহার উপদেশ শুনিতে আসিত। একবার তিনি যখন আলবিতে গিয়া উপদেশ দিতে যাইতেছিলেন তখন শ্রোতাদের মধ্যে এই বালিকাকে দেখিতে না পাইয়া উপদেশ আরম্ভ না করিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বালিকার পিতা তাহাকে মাকুতে সুতা ভরিতে দিয়াছিল বলিয়া বালিকার দেরি হইয়াছিল। পিতার কর্ম্মস্থানে যাইবার পথে বালিকা বুদ্ধের কাছে হইয়া গেল। বুদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? কোথায় যাইবে? জান না কি? জান?" বালিকা যথাক্রমে উত্তর দিল "জানি না," "জানি না," "জানি না।" শ্রোতারা তাহার এই অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল; বুদ্ধ তখন বালিকাকে তাহার কথার অর্থ বুঝাইতে বলিলেন। বালিকা বলিল, "কোথা হইতে আসিয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি জানি না; মৃত্যুর পর আবার কোথায় জন্মগ্রহণ করিব তাহাও জানি না; আমাকে যে নিশ্চয় একদিন মরিতে হইবে তাহা জানি; কিন্তু কবে মৃত্যু হইবে জানি না।" এই বলিয়া বালিকা চুপড়ি লইয়া পিতার কর্ম্মস্থানে গেল ও গিয়া দেখিল যে তাহার পিতা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। বালিকা বসিয়া পিতার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তন্তুবায় নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়াই তাঁত ধরিয়া এক টান্ দিল, তাঁতের একদিক বালিকার বক্ষদেশে আঘাত করায় তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। শোকার্ত্ত পিতা বুদ্ধের কাছে সান্ত্বনার জন্য আসিয়া বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল (ধ-কথা, ৩।১৭০)।

পুণ্যা (পুণ্‌ণা) নামক রাজগৃহের একজন দাসী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধান ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধ এই সময়ে "গৃধ্রকূট" পর্ব্বতে ছিলেন। ভিক্ষুরা সেই সময় শয়ন করিতে যাইতেছিল, একজন প্রদীপ ধরিয়া সামনে পথ দেখাইয়া চলিতেছিল। নগর হইতে পর্ব্বতগাত্রে এই প্রদীপের আলোক দেখিয়া দাসী পুণ্যা ভাবিল, "আমার অনেক পরিশ্রমের কাজ থাকে বলিয়া

আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারি না ; ভিক্ষুদের কেন ঘুম হয় না ?" কিছুক্ষণ ভাবিয়া এই দীননারী মনে মনে স্থির করিল বোধ হয় ভিক্ষুদের কাহারও অসুখ হইয়াছে, নয় কাহাকেও সাপে কাম্‌ড়াইয়াছে। পরদিন প্রাতে পুণ্যা কিছু চাউলগুঁড়াতে জল মাখিয়া আগুনে সেঁকিয়া রুটি বানাইয়া স্নানের ঘাটে যাইবার পথে খাইবে বলিয়া আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল। পথে যাইবার সময় ভিক্ষারত বুদ্ধের সঙ্গে পুণ্যার দেখা হইল। পুণ্যা ভাবিল, "আগে যখন বুদ্ধের সঙ্গে দেখা হইয়াছে তখন আমার ভিক্ষা দিবার মত কিছু থাকে নাই, তিনি যদি এই হীন জিনিষ গ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে এই রুটি আজ ভিক্ষা দিব।" এই মনে করিয়া দাসী বুদ্ধকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "ভদন্ত, এই সামান্য জিনিষ গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" বুদ্ধ নিজের ভিক্ষাপাত্রে দরিদ্রা রমণীর সামান্য দান গ্রহণ করিলেন। দাসী বলিল, "ভদন্ত, আপনি যে সত্য লাভ করিয়াছেন আমিও যেন তাহা লাভ করি।" "তথাস্তু" বলিয়া বুদ্ধ দাঁড়াইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সমাজে সকলেই তাহাকে হেয় মনে করে, তাই সেই সামান্য দাসীর বিশ্বাস হইল না—সে ভাবিল, "বুদ্ধ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন বটে কিন্তু তিনি আমার দেওয়া পোড়া রুটি নিশ্চয় নিজে খাইবেন না ; কিছুদূর পর্য্যন্ত রাখিয়া উনি নিশ্চয় উহা কাক বা কুকুরকে ফেলিয়া দিয়া রাজরাজ্‌ড়ার বাড়ী গিয়া ভাল জিনিষ খাইবেন।" দাসীর মনোভাব নিশ্চয় তাহার মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল ; অশিক্ষিত সরল লোকে আত্মগোপন করিতে জানে না। দাসীর সন্দেহ বুঝিয়া বুদ্ধ সঙ্গী আনন্দকে ইঙ্গিত করিলেন, আনন্দ পথপার্শ্বে চীবর বিছাইয়া দিলেন, তাহাতে বসিয়া বুদ্ধ দাসীর রুটি খাইলেন। পুণ্যা কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে বহু ভক্তি জানাইল। ভিক্ষুদিগকে পরে বুদ্ধের পুণ্যার দেওয়া পোড়া রুটি খাওয়ার কথা আলোচনা করিতে শুনিতে পাইয়া বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "দাতা অনুসারে দানের মূল্য হয়।" (ধ-কথা, ৩।৩২১)।

বুদ্ধ একবার বৈশালীর নিকটবর্ত্তী কোটিগ্রামে গেলেন। বৈশালীর সেই গণিকা আম্রপালী, (অম্বপালী) যাহার রূপলাবণ্য ও কর্ম্মনৈপুণ্যের কথা আগে উল্লেখ করা হইয়াছে, বিচিত্র যানে আরোহন করিয়া বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। যতদূর গাড়ী চলে ততদূর গাড়ীতে গিয়া বাকি পথ আম্রপালী হাঁটিয়া গেলেন ও বুদ্ধের কাছে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। বুদ্ধ তাহাকে উপদেশ দিলেন। উপদেশের পর আম্রপালী স্বগৃহে বুদ্ধ ও ভিক্ষু-দিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বুদ্ধের মৌন সম্মতি লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় লইলেন। বুদ্ধ কোটিগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া বৈশালীর লিচ্ছবিরা নানাবর্ণের পরিচ্ছদ ও নানাপ্রকারের আভরণ-অলঙ্কার ধারণ করিয়া বিচিত্র যানারোহণে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। পথে আম্রপালির গাড়ী লিচ্ছবিযুবকদের গাড়ীর পাশ দিয়া চাকায় চাকা ঘষিয়া চলিয়া গেল। যুবকরা জিজ্ঞাসা করিল, "আম্রপালি, তুমি আমাদের চাকায় চাকায় ঘষিয়া গেলে কেন ?"

"হে আর্য্যপুত্রগণ, আমি আজ ভিক্ষুসংঘের সহিত বুদ্ধকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

"আম্রপালি, তোমাকে লক্ষমুদ্রা দিব, তুমি এই নিমন্ত্রণটা আমাদের ছাড়িয়া দাও।"

"আর্য্যপুত্রগণ, সমগ্র বৈশালীরাজ্য দিলেও আমি এই নিমন্ত্রণ ছাড়িব না।" এই উত্তরে লিচ্ছবিরা হাতে তুড়ি দিয়া বলিল, "এই আমওয়ালী আমাদের জিতিয়া গেল। এই আমওয়ালীর কাছে আমরা হারিলাম।" আম্রপালির অনেক আম বাগান ছিল বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছিল। দূর হইতে লিচ্ছবিদের দেখিতে পাইয়া বুদ্ধ বলিলেন, "হে ভিক্ষু-গণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা দেবতাদের কখনও দেখ নাই তাহারা এই লিচ্ছবিদের দেখ, ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর, ও দেবতাদের সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য দেখ।" লিচ্ছবিদের বসন-ভূষণ-প্রসাধনের পারিপাট্য এমনই চমৎকার ছিল! লিচ্ছবিরা উপস্থিত হইয়া অভিবাদনাদির পর বলিল, "ভদন্ত, ভিক্ষুসংঘের সহিত ভগবান কাল আমাদের গৃহে অনুগ্রহ করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

"হে লিচ্ছবিগণ, আমি আমি কাল গণিকা আম্রপালীর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।"

"এই আমওয়ালীর কাছে আমরা হারিলাম। এই আম-ওয়ালী আমাদের জিতিয়া গেল।" বলিয়া লিচ্ছবিরা হাতে তুড়ি দিল।

পরদিন আম্রপালী তাঁহার বাগান-বাড়ীতে প্রচুর আয়োজন করিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুদিগকে ভোজন করাইলেন। আহারান্তে

বুদ্ধ পত্রে হাতমুখ ধুইয়া আসনে বসিলে আম্রপালী আসিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আমার এই 'আরাম' দান করিলাম।" বুদ্ধ এই দান গ্রহণ করিলেন। পরে আম্রপালী সংঘে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন।

এ কালের রুচিতে ঘৃণ্য ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করার জন্য অনেকে আম্রপালীর গুণমুগ্ধ। সেকালে রূপজীবিনীকে কেহ ঘৃণ্যা মনে না করিলেও সংঘে প্রবেশ করার জন্য বৌদ্ধেরা আম্রপালীর খুব প্রশংসা করিয়াছেন। যদিও সংঘে প্রবেশ করিয়া আম্রপালী খুব ভাল কাজই করিয়াছিলেন তবু এ ঘটনায় উচ্ছ্বসিত হইবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। একালে যাঁহারা আম্র পালীর গুণে, ত্যাগে মুগ্ধ হন তাঁহাদের মনে আম্রপালীর পূর্ব্বের ব্যবসা ও পরের ভিক্ষুণীব্রত এই দুইএর একটা তুলনা উপস্থিত হয়। কিন্তু আম্রপালী বোধ হয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া জীবনের ধারা বদলাইয়া দেন নাই। "মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তে"র বর্ণনায় দেখিতে পাই আম্রপালীর 'আরাম'-দান বুদ্ধের জীবনের শেষ ভাগে, মৃত্যুর কয়েক মাস মাত্র আগে অর্থাৎ বুদ্ধের আশী বৎসর বয়সের সময় ঘটিয়াছিল। এ সময়ে আম্রপালীর বয়স আন্দাজ কত ছিল? কথিত আছে, বিম্বিসার যৌবনে লুকাইয়া বৈশালীতে গিয়া আম্রপালীকে পরিভোগ করিয়াছিলেন। বিম্বিসার বুদ্ধের প্রায় সমবয়সী ছিলেন; যে রূপবতীকে বিদেশী রাজা লুকাইয়া ভোগ করিতে আসে সম্ভবতঃ তাহার তখন পূর্ণ যৌবন। এই সময় আম্র-পালীর কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স ছিল ধরা যাইতে পারে। বিম্বিসারের বয়সও যদি তখন ঐরূপ থাকে তবে আম্রপালী ও বিম্বিসার সমবয়স্ক, অর্থাৎ আম্রপালী ও বুদ্ধ সমবয়স্ক। যদি তখন বিম্বিসারের বয়স ত্রিশ হইতে চল্লিশ, বা চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ থাকে তবে আম্রপালীর বয়স 'আরাম'-দানের সময় যথাক্রমে ষাট বা পঞ্চাশ ছিল, কারণ এই গণনায় আম্রপালী বিম্বিসারের এবং সে জন্য বুদ্ধের চেয়ে দশ বা কুড়ি বৎসরের ছোট ছিলেন। আরও এক দিক দিয়া আম্রপালীর বয়স নির্ণয় করা যাইতে পারে। আম্রপালীর অনুকরণে রাজগৃহে শাল-বতীকে গণিকারূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আখ্যান যদি সত্য হয় তবে আম্রপালী শালবতী অপেক্ষা তখন অন্ততঃ চার পাচ বৎসরের বড় ছিলেন। স্বগর্ভজাত পুত্র বৈদ্য জীবকের চেয়ে শালবতীর বয়স যদি ষোল বৎসরও বেশী হয় তবে আম্রপালী জীবকের চেয়ে প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় ছিলেন। বুদ্ধের যখন পঞ্চান্ন বৎসর বয়স তখন জীবক তাঁহাকে চণ্ডপ্রদ্যোতের প্রেরিত মহামূল্য বস্ত্র দান করিয়া-ছিলেন। সেই সময়েই জীবক সুবিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইতেন, যদি তাঁহার বয়স তখন অন্ততঃ পঁচিশ বৎসরও হয় তবে আম্রপালীর তখন বয়স পঁয়তাল্লিশ, অন্ততঃ চল্লিশ, অর্থাৎ আম্রপালী বুদ্ধের দশ বা পনর বৎসরের ছোট। যে দিক দিয়াই দেখা যা'ক, বয়স-গণনার কিছু ভুল থাকিলেও, 'আরাম'-দানের সময় আম্রপালী অতীতযৌবনা প্রৌঢ়া, এই বচনের সার্থকতা সূচনা করে। আম্রপালীর যদি তখন কোন মূল্য থাকিত তবে বিলাসী যুবকেরা তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া 'আমওয়ালী' বলিয়া হাতে তুড়িও বোধ করি দিত না; সম্ভবতঃ আম্রপালীর তখন রূপব্যবসা আর ছিল না, পূর্ব্বের সঞ্চিত যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তাহাতে এবং বাগানের ফল বেচিয়াই তাহার চলিত। আম্রপালীর যদি পূর্ব্বের জাঁক থাকিত তবে আম্রপালী চাকায় চাকা ঘষিয়া গেলে তাহাকে 'আমওয়ালী' বলিয়া তাচ্ছিল্য না করিয়া বিলাসীরা বরং পুলকিতই হইয়া উঠিত। বার্দ্ধক্যে রূপ-যৌবন নষ্ট হওয়ায় কেহ ফিরিয়াও চাহিত না, এই দুঃখে আম্রপালী গায়ে পড়িয়া যুবকদের চাকায় চাকা ঘষিয়া বোধ হয় নিজের পূর্ব্বসম্মান আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে রূপযৌবন থাকিতে একটু কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য বহুলোকে উদ্‌গ্রীব থাকিত, তাহা চলিয়া গেলে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না উপরন্তু তুচ্ছজ্ঞান করে, এই দুঃখেই সম্ভবতঃ স্বশ্রেণীর অনেকের মত আম্রপালীও তপস্বিনী হইয়া-ছিলেন। ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির অর্থনাশ হইয়া গেলে বা ক্ষমতা-শালী চাকরিধারী পেন্‌সন্ লইলে প্রায়ই দেখা যায় যে নামা-বলীধারণ, মালাজপ, তিলককাটা প্রভৃতি দ্বারা ইঁহারা খাতির বজায় রাখিতে চাহেন। রূপ-যৌবনের কথা ভিক্ষুণী হইয়াও আম্রপালী ভুলিতে পারেন নাই; 'থেরীগাথা'তে স্বরচিত (অবশ্য যদি ইহা সত্যই তাহার নিজের রচনা হয়) গাথায় তিনি তাঁহার জরাবিশীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বের উজ্জ্বল বর্ণ, যৌবনশোভা ও বিবিধ অঙ্গসৌষ্ঠবের তুলনা করিয়াছেন, ঠিক যেমন অনেক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ কর্ম্মচারী বা বড়লোক তীর্থস্থানে বাড়ী বানাইয়াও দরজায় তিনি কোথাকার জমিদার বা পূর্ব্বে কি চাকরি করিতেন তাহা বড় অক্ষরে লিখিয়া লোককে তাঁহাদের সাবেক পদগৌরব জানাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

আম্রপালীর বয়স সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। পূর্ণযৌবনা, বহুজনপ্রার্থিতা, বহু-অর্থ-উপার্জ্জিকা সুন্দরী, গণিকাপ্রধানার সাধুসংস্পর্শে আসিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হওয়া 'রোমান্টিক্', 'ড্রামাটিক'ও বটে। ইহার মোহে অনেকে ঐতিহাসিক তথ্যের একটু ব্যত্যয় করিয়া ফেলেন, তাই এ কথার আলোচনা করিতে হইল। (ক্রমশঃ)।

ক্রিয়াকাণ্ড

—শ্রীবিমল মিত্র

টাউন-ইস্কুলের অবিনাশ মাষ্টারের নামডাক আছে। ছেলে ঠেঙাইয়া মানুষ করিতে অবিনাশ মাষ্টারের জুড়ি নাই। এতটুকু ফাঁকি দিবে না; দু'ঘণ্টা পড়াইতে গিয়া ভুল করিয়া তিন ঘণ্টা পড়াইয়া আসে। পান নয়—চা নয়—নস্যি নয়—তামাক নয়—সম্পূর্ণ খাঁটি মানুষটি; কাহারো সাতে নাই, পাঁচে নাই, মাসকাবারে ইস্কুল হইতে তিরিশটি টাকা মাহিনা লইয়া সন্তুষ্ট। মোটা চশমার ফাঁক দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছেলেদের দিকে তাকাইয়া অনবরত বকিয়াই চলিয়াছে......

এই অবিনাশ মাষ্টারই একদিন কৃষ্ণচরণের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিল।

সকালবেলা বাড়ীতে খবরের কাগজ আসে।

স্নান করিতে যাইবার আগে অবিনাশের চোখ দু'টি তাহারই পাতার উপর ঘোড়দৌড় সুরু করিয়া দেয়। কোথায় কী যুদ্ধ হইল—কে কী বক্তৃতা দিল—তাহা লইয়া অবিনাশ কোনও দিনই মাথা ঘামায় নাই—তবু নেশা! নেশা করিয়া লোকে কত পয়সা কত দিকে উড়াইয়া দেয়—ওই নেশার জন্যই অবিনাশের প্রত্যহ দু'টি পয়সা ফাঁকা খরচ হইয়া যায়।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় আসিয়া অবিনাশ থামিয়া গেল।

গ্রামের নাম মধুহাসি। নামটা অবিনাশের পরিচিত। অবিনাশ দ্রুত পড়িয়া চলিল। কোন্ বাড়ীতে কী একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারই সুদীর্ঘ বর্ণনা—; সমস্তটাই বাজে। কাজের কেবল ওই গ্রামের নামটি।

পড়িতে পড়িতে অনেক দিন আগের একটি মেয়ের কথা অবিনাশের মনে পড়িল। একটি আদুরে মেয়ে—লেখাপড়া শিখিতে চাহিত না, কেবল যত রাজ্যের খুনসুড়ী করিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিত। স্নান করিয়া আসিয়া দেখিত জামা নাই—ঘুম ভাঙিবার আগে কে সারা গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া পলাইয়া যাইত। তারপর ধরা পড়িলে কোথায় অপরাধের জন্য ত্রস্ত লজ্জিত হইবে, তা' নয়—হাসিয়া লুটাপুটি খাইত।

খবরের কাগজ রাখিয়া অবিনাশ সেই সব দিনের কথা ভাবিতে লাগিল।

অবিনাশ দূর সম্পর্কের এক রকম আত্মীয় হইত। জ্যাঠামশাই বলিয়াছিলেন—তুমিও এখানে থেকে পড়—নাৎনীকেও একটু একটু পড়াও—।

সেই দিন হইতে সুধা অবিনাশের ছাত্রী হইয়া গেল। কিন্তু ঘোড়া হইলেও তাহাকে মানুষ করা যাইত—তবু সুধা মানুষ হইবে না বলিয়া পণ করিয়া বসিল।

নেশা বৈ কি!—খবরের কাগজ কোথায় পড়িয়া রহিল—অবিনাশ ভাবিতে লাগিল। এতদিনে সুধা কেমন হইয়াছে—একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। ছেলেপুলে হইয়া ঘর ভরিয়া গিয়াছে হয় ত—একগাল পান খাইয়া গিন্নী সাজিয়া চারিদিকে তদারক করিয়া বেড়ায়—তাহার কি এখন কিছু ভাবিবার সময় আছে? বৃহৎ পরিবার—সেই চঞ্চল দুষ্ট, মেয়েটিকে গৃহিণী সাজিলে কেমন দেখাইবে, তাহাই কল্পনা করিতে গিয়া অবিনাশ মনে মনে খুব খানিকটা হাসিয়া ফেলিল।

সেই সব দিনের একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা অবিনাশের মনে পড়িল।

সকালবেলা পড়িতে বসিবার কথা।

কিন্তু বেলা হইয়া গেল—তবু সুধার আর আসিবার নাম নাই।

শেষে অবিনাশ উঠিয়া নিজেই খুঁজিয়া আনিতে গেল। বাড়ীর ভিতর অবিনাশের অবাধ গতি।

সুধা যে ঘরে শুইত, সেখানে নাই। জ্যাঠাইমা বলিলেন—সে কি আর এখন ঘুমোয় অবিনাশ, সে কোন সকালে উঠে গিয়েছে যে—।

বাড়ীর ভিতর কোথাও নাই—অবিনাশ বাড়ীর বাহিরে খুঁজিতে গেল। বাহির-বাড়ীর পিছনদিকে বাগান। জাম তখন পাকিয়াছে। সেখানেই নিশ্চয় গিয়াছে ভাবিয়া অবিনাশ গিয়া দেখে—বাগান শূন্য—কেহ নাই।

অবিনাশ বড় মুস্কিলে পড়িল। এই রকম যদি রোজ ছাত্রীকে খুঁজিয়া আনিয়া পড়াইতে হয়—তবেই হইয়াছে। পাড়ায় হয় ত কাহারও বাড়ী গিয়াছে—এই ভাবিয়া অবিনাশ পাড়াটাও ঘুরিতে যাইতেছিল—কিন্তু ভাগ্য তাহার সুপ্রসন্ন।

তাহার মনে হইল পালেদের রথের ভিতর হইতে কে যেন উঁকি মারিতেছে—ও নিশ্চয় সুধা !

প্রকাণ্ড রথ নীচের তলায় দৃষ্টি চলে না—একেবারে অন্ধকার।

অবিনাশ গিয়া ডাকিল—ও সুধা—সুধা, তোমায় পড়তে হবে না বেরিয়ে এস, এস, কিছু বোলবো না—বেরিয়ে এস—

কিন্তু সুধা কথায় ভুলিবার নয়—উচ্চবাচ্য নাই।

অবিনাশ এক উপায় বাহির করিল। জামগাছ হইতে পাকা পাকা জাম সমেত একটি ডাল বাড়াইয়া দিল।—এস এস—ও সুধা—এসব জাম দেব তোমায়—এস—।

এবার ফল ফলিল। যেমন ডালে টান পড়িয়াছে—অমনি অবিনাশ অন্ধকারের ভিতর হাত বাড়াইয়া তাহার গলা ধরিয়া ফেলিয়াছে—

ধরিতেই ব্যা ব্যা করিয়া একটি সাদা ছাগলছানা বাহির হইয়া আসিল। অবিনাশ দস্তুর মত ঠকিয়াছে। যাক—কেহ কোথাও নাই—তাই রক্ষা।

কিন্তু যাহার জন্য এত, অবিনাশ ঘরে আসিয়া দেখে—সে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পড়িতেছে—শি ক্যান্ ফ্লাই বাট দি ফক্স্ ক্যান্ নট—সে উড়িতে পারে—কিন্তু ওই খ্যাঁকশিয়াল উড়িতে পারে না—সে উড়িতে পারে—

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ অবিনাশের হুঁস হইল—তাইত ! বেলা হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির শিশি হইতে এক খাম্চা তেল লইয়া মাথায় মাখিতে মাখিতে অবিনাশ চীৎকার করিয়া বলিল—ও কেষ্টা, ভাত দিতে বল্—।

• •

পাগলা মাষ্টার বলিলে সকলেই অবিনাশকে বুঝিত। টিফিনের ঘণ্টায় নীচের ক্লাসের মাষ্টাররা সবাই আসিয়া ছোট ঘরখানিতে জড় হয়। অবিনাশ ভিতরে ঢুকিয়া কোণের দিকে একটা জায়গা করিয়া লইল। স্কুলের ছেলেরা তখন মাঠময় হৈ হৈ করিয়া দৌড়ঝাঁপ লাগাইয়া দিয়াছে।

ছোট ঘর…গরমে সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার জোগাড় ; দু'খানি পাখা, তাহাই হাত হইতে হাতে ফিরিতেছে।

হেড পণ্ডিত একটা কাগজের বাণ্ডিল দেখাইয়া বলিলেন—পূজো এখন কোথায় ঠিক নেই—এরই মধ্যে দশটি টাকা বাজে খরচ হ'য়ে গেল।

বৃদ্ধ রাইচরণবাবু বলিলেন—পরিবারের জন্যে কী কী নিলেন পণ্ডিত মশাই ? বাণ্ডিলটি খুলিতে খুলিতে পণ্ডিত মশায় বলিলেন—দশটাকায় ক'গণ্ডা জিনিস হবে আবার—ওই একখানি সাড়ী—তাও কি মনের মত হোল— ?—এই দেখুন না—

পণ্ডিতমশায় সাড়ীটি খুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া ধরিলেন। ধরিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। আশা করিতেছিলেন—সকলেই 'বেশ' কিম্বা অমনি একটা কিছু প্রসংশাবাক্য বলিবে—কিন্তু হিংসুকের দল—জাত হিংসুক ; কাপড়টা হাত দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া সকলেই দেখিল —দাম লইয়াও আলোচনা চলিল —কিন্তু ভুলিয়াও কেহ ভাল বলিল না।

হেড পণ্ডিত নিরাশ মনে বাণ্ডিলটি আবার বাঁধিতে লাগিলেন। তাঁহার গোলাই সার। কথার মোড় অন্যদিকে ফিরিল।

রাইচরণবাবু বলিলেন—ছুটি এবার পেছিয়ে গেল, শুনেছ বোধ হয়,

সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—কেন—কেন ?

রাইচরণ বলিলেন— ছেলেরা মাইনে দেয়নি—

একজন ছোকরা মাষ্টার বলিল—ওসব ভয় দেখান—সত্যি কি আর ছুটি পেছোতে পারে—ও রকম ঢের শুনে আসছি—হেড মাষ্টারের হুমকি—

হেড পণ্ডিত এতক্ষণ নিজের দুঃখে বিমর্ষ ছিলেন, এসব কথায় কান দেন নাই ; হঠাৎ ছুটি পিছাইবার কথাটা কানে যাইতেই চকিত হইয়া বসিলেন—বলিলেন—পিছিয়ে গেল ? —তাই নাকি ? কেন ? …ওদিকে যে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি—জিনিষপত্র কিনে—শেষে—

হেড পণ্ডিত তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অবিনাশের পাশে বসিয়া পরিতোষবাবু তামাক খাইতেছিলেন। —বলিলেন—দেখলে অবিনাশ, তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করে' পণ্ডিত কি রকম বৌ-পাগলা হ'য়ে গেছে—চিঠি দেখনি ? —খামে চিঠি লেখে হে—নীল খামে—।

অবিনাশ হাঁ হুঁ কিছুই করিল না দেখিয়া পরিতোষবাবু রাইচরণকে মুরুব্বি ধরিলেন। বলিলেন—বুঝলেন রাইবাবু —এঘর থেকে তামাক খাওয়া উঠিয়ে দেবে—ইনেস্পেক্টারের

হুকুম। সিঁড়ির নীচে তামাকের ঘর হবে।—এত ইস্কুলে মাষ্টারী করে এলাম মশাই—এমন আইন তো কোথাও নেই —কোথাও নেই—।

রাইবাবু বলিলেন—দিন হুঁকোটা বাড়িয়ে—আজ তামাক খেতে দেবে না—কাল বিড়ি খেতে দেবে না—শেষকালে কোন্‌দিন—

ছোক্‌রা মাষ্টার কথাটা শেষ করিলেন—শেষকালে কোন্‌দিন বলবে মাথায় টেরী কাটতে পাবে না—বললেই হোল, ছেলেরা খারাপ হ'য়ে যা'বে-বলিয়া নিজের চুলের উপর সযত্নে হাত বুলাইয়া লইলেন।

হেড পণ্ডিত আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—ব'লে এলাম মশাই—ব'ললাম পরিবারের অসুখ, ছুটি না দেন্—রিজাইন দিতে হবে—।

ছুটির পর পথের উপর অবিনাশ হেড পণ্ডিতকে ধরিল। বলিল—কোন্ দোকান থেকে কাপড়টা কিনলেন পণ্ডিত মশাই —আমার একটা ওম্‌নি দরকার ছিল কিনা—।

পণ্ডিতমশাই এই লোকটিকে খাঁটি লোক ভাবিতেন। তাহারই চোখের সম্মুখে এত মাষ্টার আসিল গেল—কিন্তু এমন নিরহঙ্কার—নির্লোভ মানুষটি আর তিনি দেখেন নাই।

বলিলেন—কাকে দেবে, পরিবারকে তো?

—আজ্ঞে, তা' ছাড়া আর—

পণ্ডিতমশাই চট্ করিয়া বলিলেন—দিও, দিও, দেবে বৈকি—আমাদের তো কত পয়সা কত দিকে ব্যয় হ'য়ে যাচ্ছে —যাচ্ছে না? এই, একটা পয়সাই কি কম?—এই যে তুমি পান খাওনা, তামাক খাওনা, ওইতেই কি কম পয়সা বাঁচে ভেবেছ? হিসেব করে দেখলে তাইতেই একটা বাড়ী তোলা যায়—তাই ভাবি, সারা জীবন কত অপব্যয়ই না করেছি, মার্ব্বেলই খেলেছি কত পয়সার, আজে-বাজে খেয়েছিই কত কি। চিরস্থায়ী কিছু নেই—তাই-ই জমালে কত পয়সা ভাবদিকিনি—ভাবদিকিনি একবার—।

অবিনাশ আপন মনে সেই কথাই ভাবিতেছিল—

সুধা তখন বড় হইয়াছে; চড়কের মেলা দেখিতে গিয়া অবিনাশ সুধাকে একটা বড় দেখিয়া বিলাতী মোমের পুতুল কিনিয়া দিয়াছিল।—দাম নিয়াছিল দু' টাকা। দু'টি টাকা! এখন ভাবিলে অবিনাশের গায়ে জ্বর আসে। ন দেবায় ন ধর্ম্মায় দু'টি টাকা একটি পুতুলের জন্য ব্যয়! লোকে বলিবে-কি?

কিন্তু তখন ওই পুতুলটা সুধাকে দিয়া অবিনাশ যে আনন্দ পাইয়াছিল, সে আনন্দ আর জীবনে পায় নাই।

জ্যাঠাইমা বলিয়াছিলেন—ও অবিনাশ, করেছ কী?— ওই আখ্‌খুটে মেয়ের হাতে ওই দিয়েছ? ওকি আর থাকবে ভেবেছ—এখুনি রাত না পোয়াতে গুড়ো করে' ফেলবে—।

কিন্তু সত্য সত্যই সে পুতুল সুধা ভাঙে নাই। সেই পুতুলের পোষাক তৈরী হইল; পাড়ারই কোন একটি মেয়ের পুতুলের সঙ্গে তাহার আবার বিবাহ হইল—অবিনাশ সে বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছে।

অবিনাশ বলিল—বুঝলেন পণ্ডিত মশাই—বয়েস তখন আমার ষোল সতেরো—আমি আমার এক জ্যাঠামশায়ের বাড়ীতে থেকে পড়তাম—সেই সময়ে—কত বোকা ছিলাম শুনুন—দু' টাকা দিয়ে একটা পুতুল কিনে দিয়েছিলাম একটা মেয়েকে···

হেড পণ্ডিত লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—দু' টাকা পুতুলের দাম—কী পুতুল হে? এই তো সেদিন আমার শালীকে একটা দিয়েছি কিনে—তা' চার আনার কমে ছাড়লে না—তা' বলে' দু' টাকা পুতুলের দাম! অবাক করলে তুমি, নিশ্চয় ঠকিয়ে নিয়েছে—ছেলে মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে দিয়েছে—।

রাত্রি বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর, অবিনাশ বিছানার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

অনেকদিন পরে আবার দেশে যাওয়া!

সত্যবালা এখন অন্ধকার রান্নাঘরের দাওয়ার উপর রাঁধিতেছে বোধ হয়। রান্নাঘর হইতে শোবার ঘরের মেঝেটা নজরে পড়ে।

টুকুটা হারিকেনের সামনে গুণ্ গুণ্ করিয়া দেহ দোলাইয়া একমনে পড়িয়া যাইতেছে।···মিনু হয়ত হারিকেনের কাছে আলোর পোকাগুলি লইয়া খেলা জুড়িয়া দিয়াছে।

সত্যবালা চীৎকার করিয়া বলিতেছে—আর পড়তে হবে না ছেলের, খুব পড়া হয়েছে, সারাদিন দস্যিপনা করে' রাত্তির বেলা তেল পুড়িয়ে পড়া—দে আলো নিবিয়ে দে—তেল বড়

সস্তা না ?… আসুক না সে—সব তোলা রইল—তখন সব দেব, বলে'—।

মিনু মায়ের বাধ্য। বলিতে না বলিতে সে আলো নিভাইয়া দিয়াছে। টুকু ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া একেবারে হাউ মাউ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িবার যোগাড়।

সত্যবালা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া টুকুকে বুকের মধ্যে পুরিয়া বলিলেন—কী হয়েছে বাবা…এই তো আমি রয়েছি…এই তো…

তারপর টুকু শান্ত হইল, কিন্তু মিনুর উপর সে কী বকুনি! মেয়ে যেন দিন দিন ধিঙ্গী হইয়া উঠিতেছে—যাবেন তো পরের বাড়ী—লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরবেন সেখানে—একটা কাজের নামে খোঁজ নাই, কেবল নষ্টামী আর খুনসুড়ীতে মেয়ের যত ওস্তাদী—।

ছোট টিনের বাড়ী; চারিদিক জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। বাঁশঝাড় আসিয়া রান্নাঘরের চালের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; বর্ষার দিনে চালের ফুটা দিয়া জল পড়ে—উই ধরিয়া বাঁশের ও সালের খুঁটিগুলি সব মাটি করিয়া দিয়াছে। তিরিশটি টাকা মাহিনার উপর সমস্ত নির্ভর। দেশে কতকগুলি দেনা পড়িয়া আছে; পূজার মাসটা যাক্।—আপাততঃ দশটা টাকা দিয়া সত্যবালার জন্য একখানি সাড়ী সে লইয়া যাইবে। এ যাবৎ কিছুই তো সে দিতে পারে নাই। আর দু'টি ছেলে মেয়ের জন্য সামান্য কিছু লইলেই চলিবে।

রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে। তক্তপোষের তলায় ইঁদুরের হড়োহুড়ি চলিয়াছে। একটু যা' ঘুম আসিতেছিল—তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল।

অবিনাশ ভাবিতে লাগিল।…

মধুহাসির সেই ছোট ঘরটিতে সে ঠিক এমনি করিয়া শুইয়া থাকিত। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কখন ভোর হইয়া যাইত—সুধা আসিয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া ঘুমকে দিত নির্ব্বাসন।—কিন্তু তবু তাহাই অবিনাশের ভাল লাগিত তখন।

একটা দিনের কথা মনে আছে—

তখন সুধার বিবাহের কথা হইতেছে। সকাল বেলা কাহারা দেখিতে আসিবে। লোকজন আসিয়া গিয়াছে, বাড়ী-শুদ্ধ হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

সিল্কের জামা পরিয়া বাহিরের ঘরে কয়েকজন লোক আসিয়া হাজির হইল।

জ্যাঠামশাই বলিলেন—অবিনাশ, দেখ তো ভেতরে কদ্দূর কী হোল—

কিন্তু অবিনাশ ভিতরে গিয়া দেখে সকলেই ভয়ে আতঙ্কে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া আছে। শুনিল—সবই প্রস্তুত—কিন্তু সুধাকে পাওয়া যাইতেছে না।

আশ্চর্য্য কাণ্ড—অমন মেয়ে এমন যে একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে, তাহা আগে হইতেই জানা উচিত ছিল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই।

অবিনাশ সারা বাড়ীর অলিগলি খোঁজাখুঁজি করিল।—ওদিকে দেরি হইয়া যাইতেছে—এমন কেলেঙ্কারীর কথা তাহাদের বলাও যায় না।

জ্যাঠামশাই বাহির হইতে তাগাদা দিতেছেন—ও অবিনাশ—দেরি কেন—?

অবিনাশ বলিয়া আসিল—আর একটু দেরি হবে জ্যাঠা-মশাই—একটু…

কিন্তু তখনও মেয়ে পাওয়া যায় নাই। রথতলা দেখা হইল—বাগান দেখা হইল—ডাকাডাকি যতটা সম্ভব হইল—কিন্তু মেয়ে যে কোথায় লুকাইল—তাহার আর পাত্তাই নাই। বাড়ীতে আর মেয়ে নাই যে তাহাকে দেখান হইবে।

কি-হইবে—কি-হইবে হইতেছে, এমন সময় অবিনাশ নিজের ঘরে আসিয়া দেখে, তাহারই খাটের উপর তাহারই লেপ চাপা দিয়া সুধারাণী চুপ করিয়া পড়িয়া আছে।

লেপ খুলিতেই সুধা কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—ও মাষ্টার মশাই, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি—কাউকে বলবেন না—দু'টি পায়ে পড়ি—দাদুভাই বকবে—।

অবিনাশ বলিল—কেন, ভয় কিসের তোমার—ওরা তোমায় খেয়েও ফেলবে না—কিছুই না, বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে, কত ধূমধাম—বাজনা বাজবে—দেখোনা তখন—।

সুধা রাগ করিয়া বলিয়াছিল—না, আমি বিয়ে কোরব না ওদের—কোরব না বিয়ে।

সুধার অনুনয় বিনয়ে সেদিন কাজ হয় নাই। অবিনাশ সেই পলায়নপরা সুধাকে ধরিয়া সাজাইয়া গুজাইয়া বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

সেদিন সুধার কী রাগ! পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া অবিনাশ দেখে—তাহার বিছানার কাছে মাথার উপর দেয়ালের গায়ে কে লিখিয়া রাখিয়াছে—'মাষ্টার মশাই ভারী দুষ্টু।'

সেই সব দিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অবিনাশ তন্ময় হইয়া গেল।

কিন্তু একদিন সত্য সত্যই সুধার বিবাহ হইয়া গেল।

সারা বাড়ী ধুমধাম—অবিনাশের সেদিন খুব কষ্ট হইয়াছিল। কোনও কারণ নাই তবু অবিনাশ নিজেই বলিতে পারে না কেন—যেদিন সুধা প্রথম শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল—ষ্টেশনের ধারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিনাশ কত কী ভাবিয়াছিল।

তারপর দেশে ফিরিয়া অবিনাশের নিজেরই একদিন বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু সেইদিন হইতে অবিনাশ আমূল বদলাইয়া গিয়াছে। স্কুলের ছেলেরা অবিনাশকে পাগল-মাষ্টার বলিয়া ডাকে—অবিনাশ তাহা জানে। কিন্তু জানিয়াও অবিনাশ আরও গম্ভীর হইয়া থাকে।

হেড্ পণ্ডিত ঠিকই বলিয়াছে—এই যে তুমি পান খাওনা—তামাক খাও না—ওইতেই কি কম পয়সা বাচে ভেবেছ?—হিসেব ক'রে দেখলে তাইতেই একটা বাড়ী তোলা যায়, তাই ভাবি—ছোটবেলায় মার্কেলই খেলেছি কত পয়সার—আজে-বাজে খেয়েছিই কত কী—চিরস্থায়ী কিছু নেই—তাই ই জমালে কত পয়সা হোত ভাব দিকিনি—ভাব দিকিনি একবার—।

অবিনাশ ভাবিতে লাগিল—

বোকামি সে অনেক করিয়াছে, কিন্তু সে যে দু'টাকা দিয়া একটা বিলাতী মোমের পুতুল সুধাকে কিনিয়া দিয়াছিল—সেরূপ বোকামীর তুলনা নাই। সেই দুটি টাকার শোকে আজ অনটনের দিনে অবিনাশের চোখে জল আসিল।

তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—দেশে তাহার স্ত্রী ছেলে মেয়ে অর্দ্ধাহারে—অনাহারে দিন কাটাইতেছে। এই যে পূজা আসিতেছে, সত্যবালা ভাবিতেছে স্বামী তাহার কত কী লইয়া আসিবে। বাড়ীর দাওয়া হইতে দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের বাঁকা সাঁকোটি দেখা যায়—সেই দিকে চাহিয়া সত্যবালা দিন গোণে হয়ত।

শীতের সকালবেলা, টুকু গায়ে দোলাই বাঁধিয়া মুড়ি খাইতে বসিয়াছে

মিনু সকালে পান্তাভাত খাইয়াছে—সুতরাং মুড়ি সে পায় নাই। টুকুর কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—ও টুকু, তোর খাওয়া হ'লে আমায় একটু দিস্ ভাই—দিবি তো?

টুকু বলিল—দেবো - বোস্ এখেনে—।

টুকু খাইতে লাগিল; তাহার হাতের ওঠা নাবার সঙ্গে সঙ্গে মিনুর চোখও উঠিতে নাবিতে লাগিল। কিন্তু সবক'টি মুড়ি শেষ করিয়া টুকু খালি বাটিটা আগাইয়া দিয়া বলিল—এই নে—খা—।

মিনুর রাগ হইবারই কথা। রাগের মাথায় মিনু চটাস্ করিয়া টুকুর গালে এক চড় কসাইয়া দিল।

আর যায় কোথায়! টুকু সশব্দে পাড়া মাতাইয়া চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। কান্না শুনিয়াই মিনু আগে হইতেই পলাইয়া গিয়াছে।

সত্যবালা আসিয়া ছেলেকে শান্ত করিলেন।

—আসুক সে মেয়ে—তা'র পিঠ আজ আর আস্ত রাখছিনে—তুমি কেঁদোনা টুকু—কেঁদনা ধন ।

টুকু অল্পে শান্ত হইল না। নূতন করিয়া মুড়ি আসিল, মুড়কি আসিল, নাড়ু আসিল।

সমস্ত দিন পলাইয়া পলাইয়া মিনুর তখন ক্ষুধা পাইয়াছে—একফাঁকে ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বেলা গড়াইয়া গেল। মিনু কোথায়—সত্যবালা ভাবিয়া অস্থির। তাঁহার খাওয়া হইল না। এ বাড়ী, ও বাড়ী খোঁজা হইল। অভিমানী মেয়ে কোথায় গেল কে জানে। সত্যবালার চোখে জল আসিল। বাড়ীতে একটা লোক নাই যে গিয়া খুঁজিয়া আনিবে। কিন্তু শেষে দেখা গেল—ঘরে লেপ চাপা দিয়া মিনু অঘোরে ঘুমাইতেছে তখন ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইয়া সাধিয়া খাওয়াইবার পালা।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনা। অন্ধকার ঘরের ভিতর অবিনাশের কল্পনা ছুটিয়া চলিতেছে…

একটা থার্ডক্লাশ কামরা দেখিয়া অবিনাশ ট্রেণে উঠিয়া পড়িল। হাতের পুঁটুলিটি একপাশে রাখিয়া অবিনাশ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দেশের ষ্টেশনে এ ট্রেণ যখন পৌছিবে, তখন রাত্রি

সেই রাত্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তবে বাড়ী

বাড়ীর বাহিরে গিয়া অবিনাশ ডাকিবে—টুকু, ও টুকু—টুকুরে—।

টুকু মিনু সবাই তখন ঘুমাইতেছে—দোর খুলিবে সত্যবালা।

হারিকেন জ্বালা হইবে···সত্যবালা ঘটি করিয়া পা ধুইবার জল আনিয়া দিবে—গামছা দিবে—তারপর পাখা আনিয়া বাতাস করিবে। জিজ্ঞাসা করিবে—কেমন ছিলে—রোগা রোগা দেখাইতেছে যে—শরীরের যত্ন না লইলে ক'দিন টি'কিবে—ইত্যাদি।

অবিনাশ গাড়ীতে বসিয়া তখনকার সমস্ত ঘটনাটি কল্পনায় আনিতে পারে···

সত্যবালা জিজ্ঞাসা করিবে—ওতে কি—ওই যে কাগজে মোড়া?

—তোমার কাপড়—।

—কেন, আমার আবার কাপড় আনতে কে বললে?—সত্যবালা খুব খানিক রাগ করিবে।

অবিনাশ বলিবে—কেউ না বলুক, আমার বুঝি দিতে ইচ্ছে করে-না?

সত্যবালা বলিবে—দিতে ইচ্ছে করলেই বা—তোমার পায়ে যে জুতো ছিঁড়ে গেছে—গায়ে জামা নেই—সেদিকে দেখেছ?

অবিনাশ বলিবে—হঁ্যা, ইস্কুল-মাষ্টারের আবার জামা-কাপড়, আমাকে সেখানে সবাই পাগলা মাষ্টার বলে—তা' জানো?

—বল্‌বেই তো—

সত্যবালা মুখে যাহাই বলুক—সাড়ীটা বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিবে। পছন্দ তাহার নিশ্চয়ই হইবে—। সাড়ীখানি পরিলে সত্যবালাকে কেমন মানাইবে, গাড়ীর এক-কোণে বসিয়া অবিনাশ তাহাই ভাবিতে লাগিল।

দেশের ছোট বাড়ীখানি ঘেরিয়া আবার কল-কোলাহল উঠিবে। সকাল সন্ধ্যা দুই শিশুকে লইয়া যত রাজ্যের গল্প—হারিকেনের আলোয় বসিয়া স্কুলের ছেলেদের গল্প—সহরের গল্প—কত গল্প অবিনাশ বলিবে। ওদিকে সত্যবালা তাড়া দিবে—হারিকেনটা কেন মিছি মিছি জ্বলছে—চাঁদের আলোয় তো বেশ দিব্বি দেখা যায়।

সংসারের স্বচ্ছলতা আনিবার সত্যবালার কী প্রয়াস!

ছেলেটার জন্য একটা পাঞ্জাবী কিনিয়াছে—মেয়েটার একটা ডুরে সাড়ী।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন চলিয়া যাইতেছে। পান নয়—চা নয়—চুপ করিয়া বসিয়া থাকা—অবিনাশের কিন্তু কোনও কষ্ট নাই। হঠাৎ কী একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল; অবিনাশ উঁকি মারিয়া দেখিল—মধুহাসি।

অকস্মাৎ কী হইল কে বলিবে—অবিনাশ পুঁটুলিটা হাতে করিয়া চলন্ত গাড়ী হইতে নাবিয়া পড়িল।

সেই পুরাতন ষ্টেশন; চিনিতে এতটুকু অসুবিধা নাই। সুধা হয় ত পূজার সময় এখানে আসিয়াছে, তাহার সহিত দেখা করিয়া গেলে হয়। পরিচিত পথ—অবিনাশ হাঁটিয়া চলিল।

দেখা হইলে প্রথম কী কথা হইবে, কে জানে!

অবিনাশের মনে হইল, লোকে যে তাহাকে পাগল বলে, তা' ঠিকই। এখন কোথায় সে দেশে যাইবে—দেশে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে তা' নয়—কবেকার পরিচিত দূর সম্পর্কের আত্মীয় কে একটি মেয়ে সুধা, তাহাকে দেখিতে সে হুট্ করিয়া নাবিয়া পড়িল।

জ্যাঠামশাইএর বাড়ীতে পূজা হয়। ধুমধামের আর সে বাড়ীতে অন্ত নাই। কত লোকজন জমা হইয়াছে সে-বাড়ীতে। একবার শুনিলে হয় যে অবিনাশ আসিয়াছে—অমনি সুধা 'মাষ্টারমশাই', 'মাষ্টার মশাই' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিবে। ঠিক আগেকার মত মাষ্টার মশাইএর হাত ধরিয়া এ-পাড়া ও-পাড়া সাতপাড়া বেড়াইতে যাইবে। সমস্তটা দিন অবিনাশকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

অবিনাশ পা চালাইয়া চলিল। তাহার একটু দুঃখ হইল—এত জিনিষ সে কিনিল, সুধার জন্য তো কিছু আনা হয় নাই। যদি ঠিক থাকিত এখানে নাবিবে তাহা হইলে যা' হোক একটা কিছু আনিত বৈকি—কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

সাম্‌নের অন্ধকারের উপর দেখিতে দেখিতে একখানি ঘর গড়িয়া উঠিল। অবিনাশ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল সর্ব্বাঙ্গ চেলী-মণ্ডিত বধূ অবিনাশের খাটের খুরো ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যে আসিতেছে তাহাকেই মারিতেছে—ঠেলিয়া দিতেছে—আবদার ধরিয়াছে—শ্বশুড়-বাড়ী সে কিছুতেই

যাইবে না। যাইবে না—যাইবে না—যাইবে না! কে কী করিতে পারে করুক!

ওদিকে পাল্কীর ভিতর বর প্রস্তুত—লোকজন হাজির। আদুরে মেয়েকে লইয়া মহা মুস্কিলেই পড়া গেল!

ভিতরে আসিয়া জ্যাঠামশাই পর্য্যন্ত বলিয়া গেলেন—সাধিয়া গেলেন, কিন্তু পাথরের শিবকে সাধনা করিলেও বর পাওয়া যাইত—সুধারাণী এতটুকু নড়িল না।

শেষে ধরিয়া বাঁধিয়া পাল্কীতে তুলিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল—কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না, অবিনাশ আসিয়া একবার অনুরোধ করিতেই সুধা রাজী হইল।

কিন্তু যাইবার আগে দেওয়ালের গায়ে যেখানে লেখা ছিল 'মাষ্টার মশাই ভারী দুষ্টু', সেই দিকে চাহিয়া রাগে গট্ গট্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

আজ এতদিন পরে সেই সব কথা সুধাকে মনে করাইয়া দিলে সুধা রাগ করিবে না হাসিবে—অবিনাশ তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সুধা যা' মেয়ে—অবিনাশ পৌছিলে—সে একাই হয় ত হুলুস্থূল বাধাইয়া দিবে। অত লোকের মধ্যে অবিনাশকে খুব লজ্জায় ফেলিবে যা' হোক। ঠাট্টাও কি কম করিবে? স্নান করিয়া আসিয়া দেখিবে হয়ত কাপড়টা কে ভিজাইয়া দিয়াছে—ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিবে জুতাজোড়া কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে বাড়ী আসিয়া গেল। সেই পরিচিত বাড়ী। ভিতরে জ্যাঠামশাই বসিয়া ছিলেন—এখন আরো বৃদ্ধ হইয়াছেন—উঠিতে বসিতে কষ্ট হয়। অবিনাশ গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

জ্যাঠামশাই বলিলেন—যাও অবিনাশ—ভেতরে দেখা করে' এস—।

অবিনাশ কম্পিত পদে ভিতরে ঢুকিল।

এখনি হয়ত কোন্ ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সুধা হৈ চৈ বাধাইয়া দিবে। অবিনাশ প্রতি মুহূর্ত্তে সুধার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বাড়ীতে কত অগণিত অপরিচিত শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে—অবিনাশ কাহাকেও চিনিতে পারিল না। নূতন লোক—নূতন মুখ—অথচ উহারাই সব পুরাতন—অবিনাশই আজ এ-বাড়ীতে নূতন। অবিনাশকে উহারা চেনে না। উহারা জানে না একদিন এ-বাড়ীর কোনও কাজ অবিনাশ না হইলে হইত না।

অবিনাশ আগন্তুকের মত চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল।

হয়ত এখনি সুধা বাহির হইয়া আসিবে—আসিয়া এতদিন দেখা না করার জন্য কত অনুযোগ অভিযোগ করিবে; তারপর ছোট বেলাকার মত 'দুষ্টু' বলিয়া তিরস্কার করিবে।—সেই মধুর তিরস্কার লাভের আশায় অবিনাশ চারিদিকে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

পূজা-বাড়ীর দালানে একদল ছেলে খেলা করিতেছে। একটি মেয়েকে ঠিক সুধার মত দেখিতে—সুধারই হয়ত মেয়ে—।

অবিনাশ কাছে গিয়া ডাকিল—ও খুকি—খুকি—শোন—শুনে যাও—।

মেয়েটি সুধারই মত দুষ্টু হইয়াছে। অবিনাশ ডাকিতেই এক দৌড়ে পলাইয়া গেল। একবার অবিনাশের মনে সন্দেহ হইল সুধা আসিয়াছে তো! হয় ত' আসে নাই! আসিলে এতক্ষণ তাহার সহিত দেখা হইত নিশ্চয়। নিশ্চয় আসে নাই—নিশ্চয়! হয়ত কাল আসিবে! সুধার সঙ্গে একটিবার দেখা না করিয়া অবিনাশ যাইতেছে না। শেষকালে সুধা আসিয়া যে বলিবে—মাষ্টার মশাই সেই আসিল—আর একটা দিন থাকিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে পারিল না!

ঘুরিয়া ফিরিয়া অবিনাশ আবার জ্যাঠামশাইএর কাছে আসিল। বলিল—সুধা এসেছে তো জ্যাঠামশাই?

জ্যাঠামশাই বলিলেন—কবে! ওপরে আছে, দেখা করগে—।

অবিনাশ আবার ভিতরে আসিল। কিন্তু উপরে যাইতে তাহার যেন কেমন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। বাড়ীতে কত নূতন বধূ আসিয়াছে, পাড়ার কত স্ত্রীলোক আসিয়াছে। সেখানে গিয়া হুট করিয়া 'সুধা' 'সুধা' করিয়া ডাকিলে—লোকেই বা বলিবে কী! অবিনাশেরও এখন সে-বয়স নাই—সুধাও এখন অনেক বড় হইয়াছে।

নীচের লোক উপরে উঠিতেছে উপরের কত লোক নীচে আসিতেছে—সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া অবিনাশ যাই-কি-না-যাই করিতে লাগিল।

হয় ত একপাল মেয়ের মধ্যে বসিয়া আছে, সেখানে তাহার হঠাৎ যাওয়াটা কেমন দেখাইবে? আর এখানে আসিবার তো কোনও ঠিক ছিল না! কাপড়টাও ফরসা নয়—কয়দিন দাড়ি কামান হয় নাই—জামাটার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে—এ পোষাকে স্কুলে যাওয়া যায়—কিন্তু মেয়েদের সম্মুখে যাইতে কেমন বাধে! নিজের দৈন্য নিজের কাছে আজ তাহার প্রথম ধরা পড়িল।

কাজ কি উপরে গিয়া! সুধা হয় ত এখনই নামিবে। তখনই একটু দেখা করিয়া বাস্ সন্ধ্যার গাড়ীতেই সে রওনা দিবে!—তবে সুধা ছাড়িলে হয়!—হয়ত ধরিয়া বসিবে পূজার কয়দিন থাকিয়া যাও—। যে আদুরে মেয়ে—বলিলেই হইল!—তাহার কথা এড়ায় কাহার সাধ্য!

উপর হইতে জ্যাঠাইমা নাবিতেছিলেন। অবিনাশ পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

জ্যাঠাইমা শুধু বলিলেন—এই যে বাবা, কখন এলে—বেশ বেশ—ভাল আছ তো··?

অবিনাশ হঠাৎ হাতের পুঁটুলিটা দেখাইয়া বলিল—এইগুলো সুধার জন্যে এনেছিলাম জ্যাঠাইমা, সুধা কোথায় তা'কে তো দেখছিনে—।

কাপড়ের মোড়কটা তিনি হাতে করিয়া লইলেন। বলিলেন—দাঁড়াও বাবা, দিচ্ছি তা'কে পাঠিয়ে- বলিয়া তিনি আবার উপরে উঠিয়া গেলেন।

অবিনাশ কম্পিত বক্ষে নীচে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। হৈ হৈ করিতে করিতে সারা বাড়ী কাঁপাইতে কাঁপাইতে সুধা এখনি আসিল বলিয়া। এখনি আসিয়া মাষ্টার মশায়ের দুইহাত ধরিয়া হয়ত উপরে লইয়া যাইবে।—তারপর কত কথা! এতদিন আসে নাই কেন সুধার কথা আর মনে পড়ে কিনা—পূজার সময় অন্ততঃ একবার করিয়া আসিলে তো হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে অবিনাশ একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িবে।

অবিনাশ একটি ছেলেকে উপরে সুধাকে খবর দিতে পাঠাইয়া দিল যে, তাহার মাষ্টার মশাই আসিয়াছে—

অবিনাশ নীচে হইতে শুনিল, ছেলেটি চীৎকার করিয়া বলিতেছে—ও সুধাদি' সুধাদি', তোমার মাষ্টার মশাই এসেছে—শোননি?

সুধার গলার আওয়াজ আসিল- এসেছে তা' কি হবে—কতবার শুনবো, নাচবো নাকি ?··

অবিনাশের সন্দেহ হইল হয়ত সে ভুল শুনিয়াছে কিম্বা সুধা হয়ত চিনিতে পারে নাই। মাষ্টার মশাই না বলিয়া নামটি বলিয়া দিলেই হইত! খুব ভুল হইয়া গেল।

কিন্তু কতক্ষণ কাটিয়া গেল, কাহারো আসিবার নাম নাই। অবিনাশের দাঁড়াইয়া থাকিতে কেমন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। এত স্ত্রীলোক যাইতেছে, এখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দাঁড়াইয়া থাকা ভাল দেখায় না।

অবিনাশ সরিয়া সেই পুরাতন ঘরখানিতে আসিল। একবার অবিনাশের মনে হইল সুধার অসুখ হয় নাই তো!—ডাক্তারে হয়ত চলাফেরা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নিশ্চয় তাই! নহিলে খবর পাইয়াছে মাষ্টার মশাই আসিয়াছে—তবু আসিল না কেন?

সন্ধ্যাবেলা বাজনা বাজিয়া উঠিল। জাঁকজমকের অন্ত নাই, সারা বাড়ী মুখরিত।

অবিনাশ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। মেয়েরা আসা-যাওয়া করিতেছে। উঠানের উপর একদল ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল। অবিনাশ সেই মেয়েটিকে গিয়া ডাকিল—ও খুকি—শোন—একটা কথা শুনে যাও—।

মেয়েটি আসিল না। পলাইয়া যাইতেছিল—অবিনাশ ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেল। মেয়েটি পেয়ারা চিবাইতেছিল - উপায় না দেখিয়া সেই চর্ব্বিত পেয়ারা থুথু সমেত অবিনাশের গায়ের উপর নিক্ষেপ করিল।

অবিনাশ তো কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। নিকট দিয়া কে একজন বাড়ীর লোক যাইতেছিল—কাণ্ড দেখিয়া বেশ করিয়া দু'টি কান তাহার মলিয়া দিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে যেন প্রলয় ঘটিয়া গেল। ছোট শিশু যে এত চীৎকার করিতে পারে তাহা অবিনাশ ধারণায়ও আনিতে পারে নাই। সারা বাড়ী কাঁপাইয়া মেয়েটি এমন চীৎকার সুরু করিল, যেন কে তাহার কান দু'টি সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে।

বাড়ীর যে যেখানে ছিল—সবাই সেই উঠানে আসিয়া জড় হইল। বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই ছুটিয়া আসিলেন। জ্যাঠাইমা

আসিলেন। সকলের মুখেই এক কথা -কি হয়েছে রে পুঁটু

পাড়ার লোকের প্রবল সহানুভূতির বর্ষণে মনে হইল—সত্যই কে যেন তাহার কান দু'টি ছিঁড়িয়া লইয়াছে।

এতক্ষণ পরে পুঁটুর মা খবর পাইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

অবিনাশ চাহিয়া দেখিল—সুধা অনেক মোটা হইয়া গিয়াছে—চেনা যায় না—গলার স্বর বদলাইয়াছে—দেহের মেদ যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। সারা শরীরে গর্ব্বের হিল্লোল। সুধা যেন অবিনাশের দিকে চাহিয়াও চাহিল না।

পুঁটুকে কোলে লইয়া সুধা বলিতে লাগিল—অমন আত্মীয়তা কে দেখাতে বলেছিল—পাঁচ টাকার সাড়ী এনে আত্মীয়তা পাতানো—আসতেও কেউ বলেনি—নেমন্তন্নও কেউ করেনি—আমার ছেলে অসভ্য—আমার মেয়ে অভদ্র, কারোর তো খাচ্ছে না তা'রা—কারোর বাড়ীও যাচ্ছে না—মাষ্টারী ফলাক্ নিজের বাড়ীতে গিয়ে—।

বলিতে বলিতে সুধা উপরে উঠিয়া গেল।

কথাগুলি আসিয়া অবিনাশের কানে যেন তীরের মত বিঁধিল। কোথা দিয়া কি হইয়া গেল—যেন ভে অবিনাশের মনে হইল—সে যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। আর এক মুহূর্ত্তও তাহার এ বাড়ীতে থাকিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এতক্ষণে তাহার জ্ঞান হইল—এবাড়ীতে সে অনিমন্ত্রিত—অযাচিত ভাবে আসিয়াছে।

অবিনাশ নিজের ঘরের কাছে গিয়া দেখিল—দেয়ালের উপর আজো লেখা রহিয়াছে—'মাষ্টার মশায় ভারী দুষ্টু'। অবিনাশের মনে হইল সুধাকে ডাকিয়া আনিয়া ওই লেখাটি দেখায়।—কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, সুধা তাহার মরিয়া গিয়াছে—সে-সুধা মরিয়া গিয়াছে। বিবাহ হইবার আগেকার সে-সুধা আজ বাঁচিয়া নাই

সবার অজ্ঞাতে অবিনাশ পথে বাহির হইয়া আসিল এ জীবনে সে আর এ-বাড়ী আসিবে না।

তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—সেই সাড়ী আর দু'টি ছেলে মেয়ের জামা-কাপড়ের কথা। সে-গুলি সবই যে ওই সুধাকে সে দিয়া আসিয়াছে। অবিনাশ জীবনে অনেক আহাম্মকী করিয়াছে—দু'টাকা দিয়া বিলাতী মোমের পুতুল কিনিয়া পরকে বিলাইয়া দিয়াছে—কিন্তু এমন বোকামীর প্রায়শ্চিত্ত সে কী দিয়া করিবে। এখন আর ফিরিয়া গিয়া চাওয়াও যায় না। সত্যবালা পূজার দিন একখানা পুরানো কাপড় পরিয়া কাটাইবে—টুকু আসিয়া বলিবে—'বাবা কি এনেছ দেখি?'—আর এ বাড়ীতে, এই ধনীর প্রাসাদে ও-সাড়ীটির হয়ত কোনও মূল্যই নাই! হয়ত কেহ তাচ্ছিল্য করিয়া পরিবে—হয়ত পরিবে না। অবিনাশের মাথাটা দুইহাতে টানিয়া ছিঁড়িয়া পিষিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। অবিনাশের মাথার ভিতর সব গোলমাল হইয়া গেল।

ষ্টেশনের প্লাটফরমের ধার হইতে দূরে ডাইনীর চোখের মত কয়েকটা নীল আলো দেখা যায়; এখনই ট্রেণ আসিবে। অবিনাশ দুই চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাথাটা রেলের চাকার তলায় গুঁড়াইয়া যাক্—পিষিয়া যাক্—তবে হয়ত শান্তি হইবে। কাল ভোরবেলা এ ট্রেণ গিয়া তাহার দেশে পৌঁছিবে—বাব্‌লা গাছ··· ইউনিয়নবোর্ডের সাঁকো···—তারপর রায়দীঘি···সত্যবালার সকালেই ঘুম ভাঙে—দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবে—আসিয়াই শুনিবে..তুলুস্থূল কাণ্ড···টুকু উঠিবে, মিনু উঠিবে,···উঠিয়া শুনিবে·তাহাদের বাবা রেলে কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে···

অবিনাশ চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল

ইটালীতে একমাস

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বোম্বাই পৌঁছিবার আগে গাড়ী যখন পশ্চিম-ঘাট পাহাড়-গুলির মধ্য দিয়া ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনের নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে যায় তখন ভোরের আলোতে সেই পার্ব্বতীয় দৃশ্য বড় চমৎকার মনে হয়। বোম্বাই কলিকাতার তুলনায় ছোট সহর; রাস্তার পুলিসের পোষাক হইতে আরম্ভ করিয়া সব জিনিসেই একটু জাঁকের অভাব। ট্রামে, রাস্তাঘাটে বাংলা দেশের তুলনায় হৈ-হৈ ও গোলমাল খুব কম। সন্ধ্যার সময় চৌপাটির সাগরকূলে অনেক লোক বেড়াইতে আসে, ভীড়ের তুলনায়

আসিসি সহরের দৃশ্য।

চেঁচামেচি নাই বলিলেই হয়। গুজরাটি ও মহারাষ্ট্রী নারীদের স্বচ্ছন্দ অবাধ গতিবিধি দেখিবার মত; তরুণীরা, কলেজের মেয়েরা অবাধে 'পথে' চৌপাটিতে বেড়াইতেছে; শুনিলাম পুরুষেরা কোন রকমে ভব্যতার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মেয়েরা নিজেরাই তাহার প্রতিবিধান করে। কয়েকটি বাঙ্গালী-ব্যবসায়ের প্রতিনিধিরূপে এখানে জনকয়েক বাঙ্গালী যুবক কাজ করিতেছেন, মাড়োয়ারী, গুজরাটি, পার্সীতে আচ্ছন্ন বাংলার পক্ষে ইহা আশাপ্রদ। গহনার কাজ নাকি বোম্বাইতে বাঙ্গালী স্যাকরাদের একচেটিয়া। একটি নূতন শিক্ষা-মন্দিরের চিত্রবিদ্যার শিক্ষক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। বোম্বাইতে সাহেব-নেটিভের সম্বন্ধ কলিকাতার চেয়ে অনেক সহজ মনে হইল। ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রধান স্থানে ব্যবসা উপলক্ষে দেশী লোকের সঙ্গে সমভাবে না মিশিলে নিজেরই স্বার্থহানি হয়, তাই সাহেব-সমাজের মূর্ত্তি এখানে একটু শান্ত। বোম্বাইতে আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ হোটেলের রেওয়াজ; বাড়ীভাড়া খুব বেশী বলিয়া সাধারণ অবস্থার লোকে সহরে পরিবার লইয়া বাস করিতে পারে না, কাজেই হোটেলে চা হইতে ভাত রুটি সবই খাইতে হয়। ভাতরুটি ছাড়া জলখাবারের সময়েও রেষ্টরাণ্ট্‌গুলিতে খুব ভীড় চপ, কাটলেট নাই, দেশ নিরামিষ, কেক-বিস্কুট-পেষ্ট্রির খুব প্রসার।

ইটালিয়ান "লয়েড ট্রিয়েস্‌টিনো" কোম্পানির 'গঙ্গা' জাহাজে (Gange : ইটালিয়ান উচ্চারণ 'গাঞ্জে') বোম্বাই ছাড়িলাম। জাহাজে উঠিবার আগে ডাক্তারের পরীক্ষা হয়, নামমাত্র, দুই তিন সেকেণ্ড নাড়ী টিপিয়া প্রশ্ন হয়, 'কবে টিকা লইয়াছ ?' সকলেই বলে, 'এই বৎসরই' ! বাস্। কিন্তু নাড়ীতে একটু জ্বরের আভাস থাকিলে রক্ষা নাই—অম্‌নি পরদার আড়ালে ঠেলিয়া পাঠায়, গা খালি করিয়া বগলে পিঠে প্লেগ ও বসন্তের সূচনা খোঁজে, নিঃসন্দেহ না হইলে খালাস নাই।

জাহাজ ডক ছাড়িয়া বাহির সমুদ্রে পড়িবার আগেই লাঞ্চ খাওয়াইয়া দিল। লাঞ্চ শেষ হয় হয়—এমন সময় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শির্ শির্ করিয়া উঠিল, অভিজ্ঞেরা ঘোষণা করিলেন জাহাজ এইবার ঠিক সমুদ্রে পড়িয়াছে, জাহাজ দুলিতেছে। লাঞ্চ সারিয়া সকলে দুড়্‌দাড়্ করিয়া ডেকে ছুটিল, না জানি কি দেখিব! ডেক-চেয়ার টানিয়া সকলে বসিয়া দোলানি খাইতে আরম্ভ করিবার দুই তিন মিনিটের মধ্যে অনেকের অস্বস্তি বোধ হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, গা বমি-বমি করিতে লাগিল। একজন বাঙ্গালী ডাক্তার যুবক 'দাদা, কোটটা একটু রাখবেন, টাকা আছে' বলিয়া অসহায় ভাবে কাতর দৃষ্টি করিলেন। ব্যাপার ঠিক না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় রাখিব ?' চোখ বুজিয়া উত্তর হইল, 'আমার বড় খারাপ লাগিতেছে', বলিতে বলিতে

ডাক্তার অর্দ্ধ-চেতনের মত সিঁড়িতে নামিতে আরম্ভ করিলেন। আশে-পাশে তাকাইয়া দেখিলাম সকলেরই মুখ গম্ভীর, প্রাণপণে কি যেন একটা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ক্রমে অনেকেই উঠিতে লাগিল। মাথার ভিতর যেন কেমন অদ্ভুত একটা গোলমাল হইয়াছে মনে হইল। জাহাজের দোলানি দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, ঝড় আরম্ভ হইল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নাবিকেরা সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের সমুদ্র নিরীক্ষণ করিয়া কঠোর স্বরে হুকুম দিল, 'সব নীচে যাও'।

তারপর চারদিন ধরিয়া সমুদ্রের তাণ্ডবে মাতিলাম। জাহাজ ভয়ানক pitch করিতেছে। জাহাজের পাশে ঢেউ লাগিয়া যে আড়াআড়ি দোলানি হয় তাকে rolling বলে। আমরা সামনে ঢেউ ভেদ করিয়া চলিয়াছি, এ দোলানির নাম pitching। পাঁচ দশ মিনিট পরে পরে দোতলার ডেকের উপর ঢেউ লাফাইয়া উঠিয়া কল কল করিয়া জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। ডাইনিং হল বার-আনা খালি, সাহেব-মেমদের অনেকেই অন্তর্ধান করিয়াছেন, ভারতীয়দের মধ্যে আমি একা দেশের নাম রক্ষা করিতেছি। ক্যাবিনের পাশ দিয়া যাইতে ক্রমাগত উদ্গার শব্দ ও নারীকণ্ঠের কাতরতা কানে আসে। ক্যাবিনে অসহ্য গরম; ঢেউয়ের প্রকোপে পোর্টহোল আঁটিয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে, দুইটি দেওয়ালফ্যান অনবরত চলিতেছে তবু খালি গায় পড়িয়া থাকিলেও ঘামের বিরাম নাই। তাহার উপর উদ্গার-গন্ধের কথা আর নাই বলিলাম। নিতান্ত অসমর্থ না হইলে মেয়েরা ছাড়া কেহ ক্যাবিনে যায় না। ডেকের কোণে, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংএ, যে যেখানে পারিয়াছে আশ্রয় লইয়া শিবনেত্র হইয়া পড়িয়া আছে। কুঁদো কুঁদো সাহেবগুলা যখন হড়্ হড়্ করিয়া উদ্গার করে, আর কেহ তাকাইলে গম্ভীর কণ্ঠে 'sorry' বলে, তখন কৃপার উদ্রেক হয়। সী-সিকনেস্ পেটের অসুখ নয়; balancing বা 'টাল'-রক্ষার বিপর্য্যয়ের দরুণ স্নায়ুমণ্ডলীর, central nervous system-এর অসুখ, ভেদ-বমি উহারই প্রতিক্রিয়া reflex action মাত্র। পেট পরিষ্কার থাকিলে কষ্টটা কম হয়, আহার লঘু করাই ভাল, অবশ্য রোগটা যাহাদের ভাল রকমে ধরে তাহাদের জলগ্রহণেও রুচি থাকে না। ইহার কোন ঔষধ বা চিকিৎসা নাই। খুব বেশী কষ্ট হইলে ডাক্তার আসিয়া বলে, 'কি করিব, যতক্ষণ ঢেউ থাকিবে ততক্ষণ ওরূপ হইবেই, বলেন তো মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন করিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখি।' লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকাই ভাল ঔষধ, মুক্ত বাতাসে কষ্ট কম হয় এবং আহার পথ্যের মধ্যে ঠাণ্ডা কমলার রস অমৃতোপম।

সাধু ফ্রান্সিসের মূর্ত্তি।

চারদিন পরে সমুদ্র শান্ত হইতে আরম্ভ করিল। তবু সিক্‌নেস কাটিতে অনেকের সময় লাগিল। ক্রমে ডেকে ডাইনিং-হলে লোক বাড়িতে লাগিল। অতঃপর এডেন বন্দরের আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হইল। জাহাজ অনেক দেরি করিয়া রাত বারটায় এডেনে পৌঁছিল। রাত্রে যখন জাহাজে জাহাজে দেখা হয় তখন উভয়ে আলোক-ভাষায় কথা বলে, 'কোন্ কোম্পানীর জাহাজ?' 'নাম কি?' 'কোথায় যাইতেছ?' 'কোথা হইতে আসিতেছ?' 'ঢেউ কেমন?' ইত্যাদি, দেখিতে বেশ লাগে। বন্দরে পৌঁছিবা মাত্র নানা রঙের সরকারি আলো জ্বালাইয়া পাইলটের মোটর-বোট দেখা দিল। জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ সেলাম করিয়া সিঁড়ি নামাইয়া

দিলেন, পাইলট লাফাইয়া জাহাজে উঠিলেন, সেলাম করিলেন, জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। ফিরিওয়ালাদের নৌকা জাহাজ আক্রমণ করিল, দড়িতে বাঁধিয়া নৌকা হইতে জাহাজে পণ্যদ্রব্য উঠাইয়া বিক্রয় করিল। এডেন free port, কোন জিনিসের উপর শুল্ক নাই, সিগারেট প্রভৃতি খুব সস্তা। সারারাত ধরিয়া ক্রেনের ঘড়ঘড়ানির সঙ্গে ডেকের উপর মালপত্র বোঝাই আর খালাস হইল। অনেক

ফ্রান্সিসের পিতৃ ভবনের উপর নির্ম্মিত গির্জ্জার মধ্যে ফ্রান্সিসের কারা কক্ষ।

উৎসাহী তরুণ রাত দেড়টায় সহরে গিয়া বেড়াইয়া আসিলেন, দোকানে পোলাও-মাংস খাইয়া আসিয়া পরে তিনদিন অসুখ করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। এডেনে অনেক ডেক-প্যাসেঞ্জার উঠিল ভোরে জাহাজ ছাড়িয়া বেড-সীতে প্রবেশ করিল।

বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেক যুবক ডাক্তারি, বিভিন্ন এঞ্জিনিয়ারিং ও অন্য নানা বিদ্যা শিখিতে ইউরোপের নানাস্থানে যাইতেছেন। কয়েকজন ব্যবসায়ীও আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ষ্টাটিস্‌টিকাল ইকনমিক্স, Statistical Economics-এর অধ্যাপক ডাঃ হরিশ্চন্দ্র সিংহ ও ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রীশৈলেশচন্দ্র বসুর সঙ্গে আলাপ হইল। ডাঃ সিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ' লইয়া যাইতেছেন, বসু মহাশয় কাপড় রং করা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞান লাভ করিতে যাইতেছেন।

বামে আফ্রিকার ও ডাহিনে আরবের তটভূমি দেখা যাইতেছে। কেবল পাহাড় ও পাথর, গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই। দুই দিকের শুষ্কভূমি হইতে সাগরের উপর দিয়া গরম হাওয়া বহিতেছে। দেখিবার বা উপভোগ করিবার কিছুই নাই, খালি জল জল, আর কদাচিৎ অতি দূরে দূবে বর্ণহীন পাহাড় আর বালুরাশি। ইতিমধ্যে ডেকের উপর কাঠের দেওয়াল খাড়া করিয়া তাহাতে সমুদ্রের জল পাম্প করিয়া স্নানার্থে বেদিং-পুল বানান হইয়াছে, সাহেব মেমরা ও একটি পার্শী যুবতী (সঙ্গে বাপ আছেন) খুব স্নান ও লুটাপুটি খাইতেছেন। ফার্ষ্ট-ক্লাসের ডেকে রোজ ডিনারের পর সিনেমা দেখান হইতেছে, সব ক্লাশের যাত্রীদেরই নিমন্ত্রণ আছে, তবে বসিতে হয় ক্লাস-মর্য্যাদা হিসাবে। ইটালিয়ান ফিল্‌ম্—দেখাও যা, না দেখাও তা। বেড্‌-সীব কয়দিন সারারাত খোলা ডেকে বিছানা বিছাইয়া ঘুমাইয়াছি।

সুয়েজ পৌঁছিলাম। এখান হইতে পোর্টসৈয়দ পর্য্যন্ত জাহাজ মন্থর গমনে সুয়েজ-কেনালের মধ্য দিয়া যাইবে। পোর্ট-সৈয়দে নামিয়া মোটর ও ট্রেণে কাইরো দেখিয়া আবার পোর্ট-সৈয়দে জাহাজ ধরা যায়। আমরা কয়েকজন দল বাঁধিয়া জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলে তাঁহারা সুয়েজ ও কায়রোতে বেতার পাঠাইয়া দিলেন, সুয়েজে পৌঁছিবা মাত্র সরকারি ডাক্তার আসিলেন, দলের লোকদের মুখের দিকে তাকাইয়া সকলকে পাশ করিলেন। তারপর পুলিস আসিয়া পাস্‌পোর্টে টিকিট আঁটিলেন, ছাপ মারিয়া 'ভিসা' মঞ্জুর করিলেন। মোটর-বোটে তীরে গিয়া দুইখানি ছয়-আসন বুইক-কার ভাড়া করিয়া আমরা সাহারার মধ্য দিয়া কায়রোতে চলিলাম। প্রায় একশ মাইল পথের প্রায় অৰ্দ্ধেকটা পিচ-বাঁধান। মরুভূমি সমতল নয়, উঁচু-নীচু, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো। বালি আল্‌গা নয়, দেখিতে পুরান ভাঙ্গাবাড়ীর ভিতের মত শক্ত, কাজেই রাস্তা বানান খুব কঠিন নয়। মোটরে প্রথমে সুয়েজ সহরের রাস্তাঘাট একটু ঘুরিয়া লওয়া গেল। সুয়েজ-কেনাল-কোম্পানীর বহু বাড়ীঘর সব আমেরিকান স্কাই-স্ক্রেপার ধরণের। অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীরও

অনেক বাড়ীঘর, ট্যাঙ্ক, লোকজন আছে। সাহারায় খুব গরম। মরুভূমি ভেদ করিয়া আসিতে ডাহিনে বামে অনেক বার খাল, বিল, গাছপালা, জলাভূমির মরীচিকা দেখিলাম। কায়রো বড় সহর। বড় বড় রাস্তা, ট্রাম, বাস প্রভৃতি বহু। নূতন সহর ঠিক ইউরোপীয় ধরণের, পুরান সহরের গলি বাজার প্রভৃতিতে সেই সনাতন ওরিয়েন্টাল ভীড়, নোংরামি ও বেবন্দোবস্তের অভাব নাই। নূতন সহরের মাঝখানে একটা বড় দেশী রেষ্টরাণ্টে খাইতে গেলাম। টেবিল চেয়ার, ঘর, বাড়ী, সব সাহেবী, আহার্য্য বহুবিধ, ফুলপাতার সজ্জাও আছে, কিন্তু সব সত্ত্বেও পাশের রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধাচ্ছন্ন হইয়া সামঞ্জস্যবোধবিহীন ওরিয়েন্টাল নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছে। নূতন কায়রোর এক অংশের নাম হেলিওপলিস; গ্রীক ভাষা, ইহার অর্থ সূর্য্য-নগর। কায়রোতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য বহুজাতির লোকের ও ভাষার সমাবেশ। ইজিপ্‌শিয়ানরা বেশ লম্বাচওড়া দেখিতে এবং 'ইন ফিরিয়রিটি-কমপ্লেকস্‌' নাই। মেডিটেরেনিয়ানের এপার ওপার বলিয়া ইউরোপের—বিশেষতঃ প্যারিসের-প্রভাব এখানে খুব বেশী। ইংরেজদের কেহ গ্রাহ্য করে না। শিক্ষিত লোক মাত্রেই ফ্রেঞ্চ জানে। ইংরেজি ও ইটালিয়ানও অনেকে জানে। মেয়েদের গালের রং হইতে পা পর্য্যন্ত সজ্জা ফরাসী ফ্যাশানের, কিন্তু চোখে সুরমা, মুখ-বিবরের উপরের ঘোমটা, ও শরীরে জড়ান কাল চাদর—এই মিশরিণীদের বাহ্য ফরাসীয়ানাকে ঢাকিয়া অন্তরের "আনচেঞ্জিং ঈষ্ট্‌"কে পরিস্ফুট করিয়াছে।

কায়রো হইতে মোটরে পিরামিড দেখিতে গেলাম। পথে নীলনদের উপর ব্রীজ, নদীতে বড়লোকদের 'হাউস্‌ বোট' অনেক আছে। পিরামিডের কাছেই স্ফিংক্স—সিংহের দেহ, পুরুষের মাথা, নারীর মুখ—চিরন্তন সমস্যার মূর্ত্ত প্রতীক, ইহার ইতিহাস বা অর্থ কেহই ঠিক করিয়া জানে না। আর্ট হিসাবে অতি সাধারণ জিনিষ মনে হইল। এই পিরামিডগুলিতে অতীতের ইতিহাসের কত স্মৃতি বিজড়িত আছে, কত প্রাচীন যুগে কি সভ্যতার বিকাশ এ দেশে হইয়াছিল! কিন্তু পিরামিড, স্ফিংক্স্‌ প্রভৃতি চোখেই দেখিলাম, গাইডের মুখে কত কাহিনীও শুনিলাম, কিন্তু কেন জানি না প্রাচীন ইজিপ্ট আমার মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল না। কায়রোতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত বাজারে কত প্রাচীন মসজিদ দেখিলাম—অন্তরে প্রবেশ করিল না; আমাদের দিল্লী, আগ্রা, লাহোরে এর চেয়ে ঢের বেশী বড় ও সুন্দর মস্‌জিদ আছে।
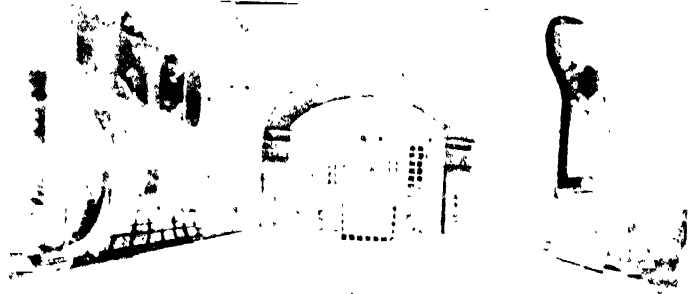
গির্জ্জার মধ্যে রক্ষিত ফ্রান্সিসের বাস-গুহা

কায়রোর একটা মস্‌জিদেও দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদের মহানতা বা আগ্রার মতি মস্‌জিদের কমনীয়তা নাই। কায়রোর মিউজিয়ম বন্ধ ছিল বলিয়া টুটেন্‌খামেনের সুন্দর জিনিষগুলি দেখা হইল না।

কায়রো হইতে ট্রেণে পোর্টসৈয়দে আসিলাম। ইজিপশিয়ান রেলওয়ের থার্ড-ক্লাসে যে শ্রেণীর লোক চলে তাহাদের বেশভূষা আচার-ব্যবহার রকম-সকম আমাদের দেশের ইণ্টার ক্লাসের যাত্রীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গাড়ীর মধ্যে সোডা-লেমনেড ডিম-রুটি প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের উৎপাত বড় বেশী। করিডর কম্পোজিশন বলিয়া ইহাদের বেশ সুবিধা হয়। গাড়ীতে মালপত্র রাখিবার জন্য বাংক্‌ নাই—কলিকাতা ট্রামের মত দুই দিকে দুইজন করিয়া বসিবার বেঞ্চ, মধ্যে পথ। 'অতজন বসিবেক', কিংবা 'অমুক কাজ করিবেক না' প্রভৃতি ধরণের কোনও লিপিও নাই। পোর্টসৈয়দে বহুজাতির বহুরকমের বদমায়েসের আড্ডা—প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ইহাই প্রবেশপথ—দুই গোলার্দ্ধের অনেক আবর্জ্জনা এখানে জড় হইয়াছে।

রাত ২টায় জাহাজ ছাড়িল। মেডিটেরেনিয়ান প্রসন্ন ছিলেন। সমুদ্রের একঘেয়েমি ছাড়া আর কোন কষ্ট হয় নাই। ইটালি ও সিসিলির মধ্য দিয়া জাহাজ যাইবার সময় দুই দিকের দৃশ্য বড় সুন্দর। জলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে কত গাছ, কত সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর, কত বাগান। এত্‌না প্রভৃতি কয়েকটা অগ্নি-গিরি দেখা যায়, মাথায় সাদা ধোঁয়া যেন জমাট মেঘের মত জমিয়া আছে, পাশ দিয়া লাভা-স্রোত বহিয়া বহিয়া চড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইটালির উপকূল সর্ব্বত্রই অতি মনোহর, প্রাকৃতিক কমনীয়তা ও মানুষের হাত পরস্পরকে সহায়তা করিয়াছে। পোর্টসৈয়দ হইতে কয়েকটি ইটালিয়ান পরিবার জাহাজে উঠিলেন। মেয়েদের গানবাজনা-হাসি-ছুটাছুটিতে ডেকে, ডাইনিং-হলে, নবজীবনের সঞ্চার হইল, ইটালিয়ান ষ্টুয়ার্ডরা ভারি খুসী, ইংরেজরা পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। বৈকালে নেপ্‌লসে জাহাজ ছাড়িয়া নামিলাম। কাষ্টম্‌সে বাক্সপত্র খুলিয়া পরীক্ষা করিল—তামাক-সিগারেটের উপর কড়া দৃষ্টি। জাহাজ ছাড়িবার আগে ষ্টুয়াডদের কিছু বক্‌শিষ দিতে হয়। ইটালিয়ান জাহাজের বন্দোবস্ত বেশ ভালই, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে কেহ কেহ একটু বাড়াবাড়ি করিলেন, ষ্টুয়াডদের বলিলেন, "তোমরা আমাদের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করিয়াছ, আমরা ক্যাপ্টেনকে জানাইব, কোম্পানীকে লিখিব," ইত্যাদি। মোটা ভাড়া দিয়া টিকিট কিনিয়াছি, চাকররা সেবা করিতে বাধ্য, কিন্তু সাদা মুখের কাছে অপমানই যেন আমাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য এরূপ একটা ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, অভদ্র ব্যবহার পাইলে কৃতার্থ বোধ করি। অথচ ব্যবহার যে খুব ভাল পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না; প্রথম প্রথম জাহাজের লোকরা সবাইকে "স্যর" বলিত, শেষে দেখিলাম সাহেবদের বলে, ভারতীয়দের বলে না; অবশ্য এজন্য অংশতঃ আমরাই দায়ী, কারণ কেহ কেহ সাদামুখ চাকরের সেবা পাইয়া, জীবন ধন্য জ্ঞান করিয়া একটু বেশী বেশী ফষ্টিনাষ্টি কুটুম্বিতা করিয়া নিজেদের মর্য্যাদাহানি করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক সিংহ মহাশয়ের সম্বন্ধ-ভ্রাতা রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীঅমিয়নাথ সরকার নেপ্‌লসে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হোটেলে উঠিয়া কয়েকদিন সহর দেখিয়া বেড়াইলাম। সহরের ইটালিয়ান নাম নাপোলি (Napoli)। পথঘাট বেশ ভাল, সমুদ্রের ধারে সুন্দর সুপ্রশস্ত রাস্তা। দেখিবার অনেক জিনিষ এখানে আছে।

হোটেল প্রভৃতি খুব পরিচ্ছন্ন নয়, বিশেষতঃ এদেশের সাধারণ গৃহস্থবাড়ীর ও পুরান হোটেলগুলির পায়খানা অতি সঙ্কীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন হয়, বাড়ী ঝাঁটাইয়া যত আবর্জ্জনা, গৃহস্থালীর অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিষ পায়খানায় গাদা করিয়া রাখে। স্নানের ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। অবশ্য বড় হোটেলে বা আপ্-টু ডেট্ অবস্থাপন্ন পরিবারে ইউরোপের মত সুন্দর বাথরুম আছে। দক্ষিণ-ইটালীর লোক এখনও প্রকৃতিতে আহার-বিহার-ব্যবহারে ওরিয়েণ্টাল। ইহারা বহু চেষ্টা করিয়াও এখনও 'সাহেব' হইতে পারে নাই। রাস্তায় গান বাজনা, দলে দলে লোক বাড়ীর সামনে ফুটপাতে বসিয়া, বহু অঙ্গভঙ্গি সহকারে বহুভাষণ, লোকের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার, কথায়, আচারব্যবহারে, সংযম, গাম্ভীর্য্য ও আত্ম-সম্মানের অভাব প্রভৃতি খুব সহজেই নজরে পড়ে। উত্তর ইটালীতে এ সবের বিপরীত ভাব দেখা যায়, অর্থাৎ বেশী ইউরোপীয়ান। দক্ষিণ-ইটালীর নোংরামি ইউরোপ-প্রসিদ্ধ। নেপ্‌লসের লোক সারা ইটালীতে জুয়াচোর অবিশ্বাসী প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত। সর্ব্বত্র দরদাম, অবিশ্বাস, কথা দিয়া কথা না রাখা, মনের ক্ষুদ্রতা। একটা উদাহরণে বোধ হয় দক্ষিণ-ইটালীর চরিত্র পরিস্ফুট হইবে—একমাস হইতে দুই তিন বৎসর এদেশে বাস করিয়াছেন এমন বাঙ্গালীদের প্রত্যেকে আমাকে বলিয়াছেন, "এরা ঠিক আমাদের মত।"

নেপল্‌স্ হইতে মোটরে পোম্পেই ও ভিসুভিয়াস্ (ইটাঃ ভেসুভিয়ো, Vesuvio) দেখিতে গেলাম। পোম্পেইতে কত বাড়ীঘর, রাস্তা, সমগ্র সহর প্রায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্যাট্রিসিয়ানের বাড়ী, এই ভেনাসের মন্দির, এই ফোরাম, এই বাথ, এই আম্‌ফিথিয়েটার, এই খাবারের দোকান, এই ওয়াইনের দোকান, এই রুটিওয়ালার দোকান, এই বাগ্মী সিসেরোর বাগান-বাড়ী—সব প্রায় অবিকৃত রহিয়াছে। পাথরের রাস্তায় গাড়ী চলিয়া চলিয়া দাগ পড়িয়াছিল, বড়-লোকের বাড়ীর সামনে উঁচু ফুটপাথের পাথর ফুটা করিয়া ঘোড়ার লাগাম বাঁধা হইত, ধনী ওয়াইন-বিক্রেতার গুদামঘর—সবই আছে। কত বড় একটা লুপ্ত অতীতের নাগরিক জীবনের ছবি এখানে প্রাণহীন-সশরীর অবস্থায় বিরাজ

করিতেছে। সংরক্ষণের কাজ খুব সুন্দর, প্রত্যেক রাস্তার নাম লেখা আছে, প্রত্যেক বাড়ীর নম্বর দেওয়া আছে। সে যুগে চৌমাথায় জল খাইবার জল ও চৌবাচ্চা ছিল, এখন ঠিক সেই জায়গায় সেইভাবে একই পুরাতন পাহাড় হইতে জল চালান করিয়া দর্শকদের খাওয়ান হয়। কয়েকটি স্ত্রীপুরুষ ও একটি কুকুরের জমাট শরীর মিউজিয়মে রাখা হইয়াছে। নিদারুণ অগ্নিবর্ষণের মধ্যে অসহায় আত্মরক্ষার কাতর চেষ্টা জমাট শরীরের প্রত্যেক রেখায় জীবিত রহিয়াছে। অনেক ঘরের মেঝের মোজেইক, দেওয়ালের ও ছাতের ফ্রেস্‌কো ও অন্য সাজসজ্জা অবিকল আছে। ধাতুময় ফ্যালাস্‌, phallusএর দ্বারা সেরেমোনিয়াল ডিফ্লোরেশন অব দি ভার্জিন্‌স্‌, ceremonial defloration of virgins-এর একটি কাল্ট cult গ্রীস হইতে এখানে আসিয়া গুপ্ত মন্দির স্থাপনা করিয়াছিল, রোমের একজন রাণী ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সেরিমনির ফ্রেস্‌কো মন্দিরের দেওয়ালে খুব সংযত ও পরিচ্ছন্ন আর্টের সঙ্গে অঙ্কিত আছে; মন্দিরের নাম এখন হাউজ অব মিষ্ট্রি, House of Mystory দেওয়ায় এবং টিকিট লইয়া ঢুকিতে হইবে (যদিও টিকিটের পয়সা লাগে না) এই ব্যবস্থা হওয়ায়, গোপন-অজ্ঞাত দেখিবার লোভে দলে দলে ইউরোপীয় নরনারী এখানে ভীড় করে। অশ্লীলাত্মক, pornography-ঘটিত অনেক জিনিষ নাকি পোম্পেইতে পাওয়া গিয়াছিল, সে সব শুনিলাম রোমে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, সাধারণকে দেখান হয় না। পোম্পেইর একটি বাড়ীতে দুইজন ধনী বিলাসী যুবকভ্রাতা থাকিত, সে বাড়ীর একটি গুপ্তকক্ষে কামকলার কিছু চিত্র ও ভাস্কর্য্য আছে, আর্ট হিসাবে নগণ্য। এই বাড়ীর প্রবেশদ্বারের পরেই দেওয়ালে একটি অশ্লীল চিত্র আছে, তাহা এখন কাঠের 'কেসে' ঢাকিয়া চাবিবদ্ধ করা হইয়াছে, রক্ষকরা চাবি খুলিয়া দলে দলে উদ্‌গ্রীব নরনারীকে দেখায়।

প্রশস্ত গির্জ্জার মধ্যে রক্ষিত সাধু ফ্রান্সিসের মৃত্যু-গুহা।

Funicular রেলের * চেয়ে মোটরে ভিসুভিয়াসের ক্রেটারের অনেক বেশী কাছে ওঠা যায়। বে-অব নেপ্‌ল্‌স্‌ হইতে ভিসুভিয়াস্‌ ছোট দেখায়, সকালে মোটরে পোম্পেই যাইতে পথে গিরিবরের স্তিমিত-ধূমায়িত মূর্ত্তি দেখিয়া প্রলয় তাণ্ডবের পরে জটাজটাচ্ছন্ন গঞ্জিকাসেবী মহাকালের উপমা মনে আসিল। উষ্ণ ভস্ম ও গলিত লাভা উদ্ধার করিয়া এই অগ্নিজঠর মহাভৈরব যুগে যুগে তাঁহার প্রলয়নাচন নাচিতেছেন, লেলিহান অগ্নি-জিহ্বা প্রসারণ করিয়া কত নগরী, কত জনপদ গ্রাস করিয়াছেন। রুদ্রভৈরবের এই কৈলাসের গায়ে মোটরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে গাইড দেখাইল পোম্পেই, হার্কিউলেনিয়াম প্রভৃতি পাঁচ-দশটা নগরের ধ্বংশাবশেষ দূরে, নীচে ধরিত্রীপৃষ্ঠে কালো হইয়া রহিয়াছে। একটা সীমার পর আর মোটরের পথ নাই, হাঁটিয়া পাহাড় ভাঙ্গিতে হয়, বিনা গাইডে যাইবার অনুমতি নাই। অতি সম্প্রতি নটরাজ একবার নৃত্যোত্থন করিয়াছিলেন, সমস্ত পাহাড়ের গায়ে সেই লাভা-বিভূতি জমাট হইয়া এখনও স্থানে স্থানে ধূমায়মান আছে। ক্রেটার আয়তনে প্রায় আটখানা গোলদীঘির সমান, তাহার এক একস্থানে এক এক সময়ে বিদীর্ণ হইয়া মেদিনীর জঠরজ্বালা প্রকাশ করে। গহ্বরের মুখে লাভা জমিয়া একটা গোল ত্রিশহাত উঁচু, ত্রিশহাত ব্যাসের দেওয়াল সৃষ্টি করিয়াছে। দেবতা গতবারে গলিত লৌহ উদ্গার

* পর্ব্বতের শিখরে উঠিবার জন্য এই রেল পাতা হয়। উপরে একটি কপিকল থাকে, তাহার দুই পাশে দুইটি গাড়ী দড়ির সাহায্যে ঝুলান থাকে। এটি যখন নামে, ওটি তখন উঠে।

করিয়াছিলেন, সমস্ত ক্রেটার গরম এবং এখনও নরম লৌহ কৰ্দমের স্রোতে প্লাবিত বহিয়াছে, এখনও উষ্ণ লৌহের বক্তিমা দেখা যায়। ভিসুভিয়াস-উদ্গীর্ণ ধাতু পাথরে নেপল্‌স সহরের অনেক রাস্তা, দেওয়াল, প্রাচীর, বাড়ী বাগান হয়।

নেপল্‌স হইতে রেলে রোমে আসিলাম (ইটাঃ রোমা, Roma)। অনেক পাহাড় ভাঙ্গিয়া টানেলের পর টানেল বানাইয়া এদেশে রেল করিতে হইয়াছে। সব গাড়ীতেই করিডর-কম্পোজিশন থাকে, বেগ আমাদের দেশেরই মত। লাইন ইউরোপে সর্ব্বত্র আমাদের চেয়ে ছোট, ভাড়া অনেক বেশী, কাজেই ব্যবস্থাও অনেক ভাল। রোম ষ্টেশনে পৌছিবার কিছু আগে প্রাচীন কালে যে উঁচু প্রাচীরের উপর দিয়া খালে দূরের পাহাড় হইতে সহরে জল সরবরাহ করা হইত সেই পয়ঃপ্রণালী, aqueduct-এর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রোমান আইন যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন এই পয়ঃপ্রণালী লইয়া প্রাচীন রোমে কত অধিকার-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। রোম খুব চুপচাপ সহর। ইটালীতে সহর অনেক আছে, প্রধান তিনটি—দক্ষিণে রোম, মধ্যে ফ্লোরেন্স, উত্তরে মিলান। রোম বিখ্যাত—প্রাচীন রোমান সভ্যতার নিদর্শনগুলি, খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস ও পোপের জন্য; ফ্লোরেন্স (ইটাঃ ফিরেনজে, Firenje) বিখ্যাত—জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্র বলিয়া ও মিলান (ইটাঃ মিলানো, Milano) বিখ্যাত কারবার কারখানার জন্য। রোম পোলিটিকাল, ফ্লোরেন্স কালচারাল এবং মিলান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সেণ্টার। মুসোলিনির দৃষ্টি রোমের উপর, তিনি রোমকে শুধু পোলিটিকাল নয়, ইটালিয়ান জাতীয় জীবনের সব বিষয়ের কেন্দ্র করিতে চেষ্টা করিতেছেন। রোমের কথা বলিয়া বোধ হয় শেষ করা যায় না—এত জিনিষ দেখিবার আছে। প্রাচীন যুগের ফোরাম, আম্‌ফিথিয়েটার, সীজারদের বাড়ী, তোরণদ্বার-প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, তারপর সেণ্টপীটার, সেণ্টপল প্রভৃতি অসংখ্য গির্জ্জা ও খৃষ্টধর্ম্মের অন্যান্য কীর্ত্তি, কত মিউজিয়াম, কত গ্যালারি, কত বাগান, কত ফোয়ারা! একা ভ্যাটিকান দেখিতেই দুই সপ্তাহ লাগে—চৌরঙ্গীর মিউজিয়মের মত পঞ্চাশ খানটা একত্র করিলেও বোধ হয় ভ্যাটিকানের সমান হয় না। কি বিরাট বাড়ী ঐ গির্জ্জাগুলির! কত ফ্রেস্‌কো, কত ছবি, কত মূর্ত্তি—উজ্জ্বল, জীবন্ত, সুন্দর। বাড়ীগুলি দেখিয়া দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়, গ্যালারীতে গ্যালারীতে রাফেল, মিকেলাঞ্জেলো, বোত্তিচেল্লি প্রভৃতি গুণীদের ভাস্কর্য্য ও চিত্র দেখিয়া দেখিয়া চোখে ধাঁধা লাগে। ইটালীর বহুস্থানে এরূপ অজস্র স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রের বিচিত্র আয়োজন। নরনারীর নগ্নদেহের যে উপাসনা এ দেশের শিল্পীরা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই; কি বীর্য্য, কি অনুপম চতুরস্রশোভী লাবণ্য, কি সজীবতা ইঁহারা পাথরে রেখায় রঙে যে ফুটাইয়াছেন তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ হয় কিছুতেই প্রতীতি হয় না। রোমের বরগেজ্ গ্যালারী, Borghese Gallery ভ্যাটিক্যানের সিসটাইন চ্যাপেল, Sistine Chapel, ফ্লোরেন্সের উফিৎসি গ্যালারী, Uffizi Gallery ও পিত্তি প্যালেস্ Pitti Palace আর্টিষ্টদের তীর্থস্থান। রোমের প্রতি ইঞ্চি জমি যেন ঐতিহাসিক—ইউরোপের বারাণসী। ঐ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, ঐ খৃষ্টান গির্জ্জা, ঐখানে শেলী কীটস্ থাকিতেন, ঐখানে দাঁড়াইয়া প্রাচীন রোমের ভিসন্, vision দেখিয়া ঐতিহাসিক গীবন তাঁহার বিরাট গ্রন্থ কল্পনা করেন, ঐ গ্যালারী-মিউজিয়াম, ঐ নূতন মেমোরিয়াল,...কত বলিব?

কিন্তু রোমে এত সব দেখিয়াও মন তৃপ্ত হয় না। ইতিহাসের সেই তোগা-পরিহিত প্রাচীন রোমানদের, সেই সীজার, সেই সেনেটার, সেই প্যাট্রিসিয়ান, প্লিবিয়ান ও গ্লাডিয়েটারদের দেখিতে ইচ্ছা করে। ভাঙ্গা ফোরামের ছাদহীন মেঝে ও থাম এবং আম্‌ফিথিয়েটারের পোড়ো দেওয়াল দেখিয়া চিত্তক্ষোভ জন্মে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা হয়, "Is this, ye Gods, the Capitolian Hill?" কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, আবার হইবেও না; বায়রণ ঠিকই বলিয়াছেন—

> Lone mother of dead empires...
> But Rome is as the desert where we steer
> Stumbling over recollections ; now we clap
> Our hands and cry 'Eureka', it is clear—
> When but some false mirage of ruins rises near...
> Alas, for Earth, for never shall we see
> That brightness in her eyes she bore when Rome was free.

মানসচক্ষে রোম দেখিতে হয়। সেই প্রাচীন জাতি যাহাদের দ্বারা "বলির্ব্বন্ধে জলধির্মথে জহ্রে'মৃতং দৈত্যকুলং

বিঙ্গিগেঁ", যাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য জ্ঞানবিজ্ঞানে জগতে সভ্যতার মহা-আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল, সমগ্র ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়া যাহার কাছে ভয়-বিস্ময়ে-শ্রদ্ধাতে মাথা নোয়াইত, সেই রোমের সবই গিয়াছে—আছে শুধু তাহাদের কাজ। আবার কবির ভাষাতেই বলি—

Where now the haughty Empire that was spread
With such fond hopes? her very speech is dead,
Yet glorious Art the power of Time defies...
Till Rome, to silent marble unconfined,
Becomes with all her years a vision of the mind.
—Wordsworth

ইটালিতে আগষ্ট মাসে প্রায় কলিকাতার চৈত্র বৈশাখ মাসের মত গরম হয়। চা এদেশে কেহ খায় না, যে চা সাধারণতঃ পাওয়া যায় তার না আছে গন্ধ না আছে রং। কফিও খুব ছোট কাপে খাওয়ার পর খায়। ঠাণ্ডা সরবতের খুব রেওয়াজ। নানা রং, গন্ধ, আস্বাদের ফলের সরবৎ পাওয়া যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাতাশুদ্ধ বড় বড় লেবুর গোছা ঝোলান সরবতের দোকান। বরফ মিশাইয়া খায় না, বরফে ডুবাইয়া বা রেফ্রিজারেটারে ঠাণ্ডা করিয়া সরবৎ খায়। এইরূপে ঠাণ্ডা করা দুধ বড়ই তৃপ্তিদায়ক। সব কাফের সামনে ফুটপাতে চেয়ার টেবিল টানিয়া লোকে সরবৎ ও ওয়াইন খায়। কায়রোতেও এইরূপ দেখিলাম, শুনিলাম প্যারিস হইতে এই ফ্যাশান আরম্ভ হইয়াছে। ওয়াইন খুব সস্তা; Vino Bianca বা সাদা ওয়াইন চৌদ্দ পয়সা সের, খাইতে বিস্বাদ; Vino Rosso বা লাল ওয়াইন আঠার আনা সের, খাইতেও মিষ্ট। পীচ, নাসপাতি, তরমুজ, খরমুজ, প্লাম প্রভৃতি অনেক ফল সস্তায় পাওয়া যায়। আঙ্গুর জলের দামে বিক্রি হয়; পোম্পেই-এর বাগানে গাছ হইতে অপূর্ব্ব কাঁচা আঙ্গুর ছিঁড়িয়া খাইয়াছিলাম, ঠিক করমচার মত বিশ্রী আস্বাদ, মাসখানেক পরে মধ্য-ইটালীতে অল্প দামে ভাল পাকা আঙ্গুর অনেক দেখিলাম। দ্রাক্ষাবন ও জলপাইগাছ এদেশে যত্র-তত্র।

রোমের বাঙ্গালীদের সঙ্গে দেখা হইল। অমিয় বাবু নেপল্‌স হইতে আমাদের সঙ্গেই ছিলেন; শ্রীপ্রমথনাথ রায় বেনারেস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজীর ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে ইটালিয়ান ভাষার অধ্যাপনা করিতেন, রোমে ইটালিয়ান সাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন; শ্রীঅমৃতশঙ্কর রায় বায়ুযানবিদ্যা (Aeronautics) শিখিতেছেন; শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস রসায়ন-চর্চ্চা করিতেছেন; ডাঃ ননীগোপাল মৈত্র বার্লিনের এম-ডি লইয়া এখানে এক্‌স্‌-রে তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। অমৃতবাবুর ল্যাণ্ডলেডির সহায়তায় একদিন সকলে হালুয়া-পোলাও খাওয়া গেল। একটি পার্শি ভদ্রলোকও ডাক্তারি পড়িতেছেন, সকলকে একদিন চা খাওয়াইলেন; দিল্লী-অঞ্চলের একটি মহিলাও অনেকদিন এদেশে আছেন। কলিকাতার ইটালিয়ান কন্‌সাল-জেনারেল স্কারপা-সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে দেখা হইল। আমার হোটেলের একটি ভদ্র যুবক ফরেন্ অফিসের এশিয়া বিভাগে কাজ করিতেন, ভাইস্-কনসাল হইয়া মধ্য ইউরোপের একটি রাজ্যে গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "একদিন নিশ্চয় আপনাকে কলিকাতার কন্‌সাল-জেনারেল রূপে দেখিতে পাইব?" তিনি বলিলেন, "সম্ভবতঃ, তবে আমার নিজের মনের ইচ্ছা যে স্বাধীন ভারতে আমব্যাস্যাডর হইয়া যাই!"

রোম হইতে মধ্য-ইটালীর উম্ব্রিয়া প্রদেশের প্রধান নগর পেরুজা, Perujiaতে আসিলাম। পাহাড়ের উপর অতি প্রাচীন নগর। প্রাক্-রোমান যুগে যে সব জাতি ইটালীতে বাস করিত তাহাদের মধ্যে এট্রাস্কান, Etruscan নামক জাতির এই অঞ্চলে বাস ছিল। এখানে বিদেশীদের ইটালিয়ান ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি শিখাইবার জন্য মুসোলিনী একটি ছোট ইউনিভার্সিটি স্থাপন করিয়াছেন। এখানে কিছুদিন ইটালিয়ান পড়িয়াছিলাম। শ্রীরাজসিংহ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমহাদেব বোস ও শ্রীকেশব ঘোষ নামক তিনটি বাঙ্গালী ছাত্র এখানে কিছুদিন ইটালিয়ান পড়িয়া কারখানায় ঢুকিবার চেষ্টায় মিলানে গেলেন। ফাশিষ্ট-বিদ্রোহের সময় যখন রোম অধিকারের আয়োজন হয় তখন মুসোলিনী নিজে মিলানে থাকিলেও তাঁহার প্রধান সহায়করা এই পেরুজা সহর হইতে বিদ্রোহ পরিচালনা করিয়াছিলেন। সহর ছোট হইলেও রেল, ট্রাম, ইলেকট্রিক ট্রেন, ইলেকট্রিক লাইট, মোটর-বাস আছে। ইটালীতে মোটরের বেগ-সীমা কিছু নাই এবং কন্টিনেন্টের অধিকাংশ দেশের মত এখানেও রাস্তার নিয়ম 'keep to the right'—যতক্ষণ অন্যের ক্ষতি না কর ততক্ষণ যত ইচ্ছা বেগে যাইতে পার। বড় ছোট বহু রাস্তায় বহু বেগগামী মোটর দেখিলাম, একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথাও কখন শুনিলাম

না। সকলেই অন্যকে বাঁচাইয়া তবে নিজের সুবিধা খোঁজে—এইখানে আমাদের দেশের সঙ্গে ইউরোপের একটা মৌলিক পার্থক্য। অ্যাক্সিডেণ্ট হইলে কিন্তু অপরাধীর অতি কঠোর শাস্তি হয়।

পেরুজার মাইল দশেক দূরে আর একটা পাহাড়ে ছোট্ট আসিজি, Assizi সহর। সাধু ফ্রান্সিসের স্মৃতিতে ইহা ক্যাথলিক খৃষ্টীয় জগতের অতি পুণ্যতীর্থ। সাধু ফ্রান্সিসের জীবনী অতি করুণ সুন্দর, দুঃখের বিষয় বাংলায় এ সম্বন্ধে কেহ লেখেন নাই। তিনি ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে ছিলেন, যৌবনে অতি উদ্দাম বিলাসী ছিলেন, সদলবলে সারাদিন ফুর্ত্তি করিয়া ও বহুরাত্রি পর্য্যন্ত নগরের রাস্তায় গান গাহিয়া বেড়াইতেন। একটা অসুখের পর তাঁহার মন যেন কেমন হইয়া যায়, তিনি স্বপ্নে যীশুর আদেশ শুনিতেন ও নানারূপ 'ভিশন' দেখিতেন। স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি বাপের পয়সায় একটা ভাঙ্গা গির্জ্জা মেরামত করিয়া দেন, বাপ জানিতে পারিয়া শাস্তিস্বরূপে তাঁহাকে একটি ছোট্ট ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন, কিছুদিন পরে বাপ ব্যবসা-উপলক্ষে বিদেশে গেলে মা তাঁহাকে কারামুক্ত করেন, বাপ ফিরিয়া স্ত্রীকে অনেক তর্জ্জন করিলেন। ফ্রান্সিস তার পর গরীবের মত থাকিতেন, পাদরীদের মঠে বা নির্জ্জনস্থানে গিয়া বাস করিতেন, একবার রোমে গিয়া সেণ্টপীটার গির্জ্জার দ্বারের এক ভিক্ষুকের সঙ্গে পরিচ্ছদ-বিনিময় করেন।' বন্ধুরা তাঁহাকে ত্যাগ করিল, রাস্তার লোকে উপহাস করিয়া পাগল বলিত। বাপ অপমানিত বোধ করিয়া বিচারকের কাছে ছেলের নামে সম্পত্তি নষ্ট করার মামলা আনিলেন। বিচারকরা ডাকিয়া পাঠাইলে ফ্রান্সিস বলিলেন, তিনি এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, বিচারকদের অধীন নহেন। বাপ-ছেলের বিবাদ হইতে বাঁচিয়া গিয়া বিচারকরা মামলা খারিজ করিলে বাপ বিশপের কাছে নালিস করিলেন। ফ্রান্সিস হাজির হইলে বাপ তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করিয়া সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে বলিলেন; বাপের পয়সায় কেনা কাপড়-চোপড় ছাড়া পিতৃ-সম্পত্তি তখন ফ্রান্সিসের কাছে আর কিছুই ছিল না, ফ্রান্সিস বিনা সঙ্কোচে সভার মধ্যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া বাপকে তাঁহার পরিচ্ছদ-বস্ত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এতদিন আপনাকে আমার পিতা বলিতাম কিন্তু এখন আমি সত্যই বলিতে পারি 'হে আমার স্বর্গস্থ পিতা!' এই ব্যাপারে সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল, বিশপ নিজের গায়ের কাপড় দিয়া ফ্রান্সিসের নগ্নতা আবৃত করিলেন। ইহার পর হইতে ফ্রান্সিস্ পূর্ণ সন্ন্যাসী হইলেন, পরে তিনি একটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদের মূলমন্ত্র দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য্য ও লোকসেবা। এখনও বহুদেশে এই সম্প্রদায়ের

সন্ন্যাসিনী ক্লারার দেহ।
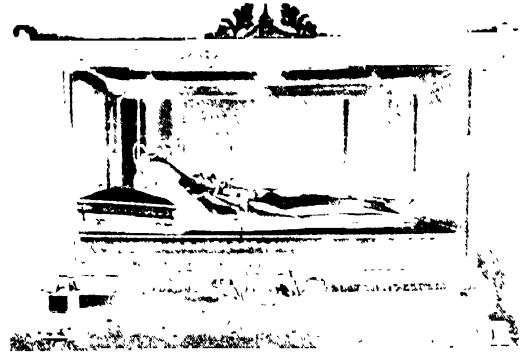
অনেক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী আছেন। পাশ্চাত্য মিস্টিসিজ্‌ম্ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ফ্রান্সিসের জীবনের ঘটনাবলীর বহু উল্লেখ থাকে। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, ফ্রান্সিসেরও প্রায়ই দিব্যোন্মাদ, নির্বিকল্প সমাধি, ঈশ্বর দর্শন প্রভৃতি হইত। "মত্তগজ-ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন। প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ, ভাবাবেশে করে সম্বোধন— ॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণিত এইরূপ ব্যাপার ফ্রান্সিসের জীবনে প্রায়ই ঘটিত। আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী', এবং 'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলী মধাই' প্রভৃতি বচনের প্রমাণস্বরূপ অনুক্ষণ যীশুধ্যান করিতে করিতে ফ্রান্সিস একবার স্বশরীরে যীশুদর্শন করেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার নিজের শরীরে যীশুদেহের পাঁচটি stigmata, অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ যীশুর দুইহাত দুইপায়ে পেরেকের চারটি গভীর ক্ষত ও বামকুক্ষিতে বর্শা-আঘাতের ক্ষত, প্রকাশিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে পোপ অভিজ্ঞদের কমিশন বসাইয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করিয়া এই ঘটনার সত্যতা ও ফ্রান্সিসকে 'সেণ্ট' ঘোষণা করেন। বস্তুত খৃষ্টীয় জগতে ফ্রান্সিসের মত যীশু-সারূপ্য

আর কোন সাধক লাভ করেন নাই। আসিজির ক্লারা নাম্নী এক ধনীকন্যা ও তাঁহার ভগিনীও ফ্রান্সিসের দলে যোগ দিয়াছিলেন ও তাঁহাদের নেতৃত্বে ফ্রান্সিস্ একটি সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ও প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রান্সিসের পিতৃভবনের উপর সুন্দর গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে, যে কুঠরিতে বাপ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা অবিকৃত রাখিয়া মধ্যে ফ্রান্সিসের উপাসনারত একটি ধাতুমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সহরের বাহিরে এক সামান্য মঠের একটি ছোট ঘরে তিনি বাস করিতেন, এবং ইহার আর একটিতে তাঁহার মৃত্যু হয়; কুঠরি দুইটি অবিকৃত রাখিয়া মঠের উপর অতি মনোহর বিরাট গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে; ক্লারার মঠের উপরও বিচিত্র গির্জ্জা বানাইয়া ক্লারার দেহ ও নূতন একটি অতি গম্ভীর-দর্শন দোতলা গির্জ্জা বানাইয়া ফ্রান্সিসের দেহ রক্ষা করা হইয়াছে। ফ্রান্সিস ও ক্লারার পরিধেয় বস্ত্রাদি অতি যত্নে অথচ দর্শকরা ভাল করিয়া দেখিতে পায় এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে। পুরীতে একটি ছয়-ইঞ্চি কাঠের নোংরা বাক্সে রক্ষিত শ্রীচৈতন্যের কাঁথার কথা ভাবিয়া আমার লজ্জা হইল। প্রত্যহ প্রায় হাজার দুই যাত্রী এখানে আসে, প্রত্যেক গির্জ্জাতে দেখিলাম ফাদাররা (ক্লারার গির্জ্জায় মুখ ঢাকা সিষ্টাররা) কত যত্নে, কত বিনয়ের সঙ্গে তিনচার ভাষাতে সকলকে দেখাইতেছেন, বুঝাইতেছেন, স্মিতবদনে বিদায় দিতেছেন। তীর্থস্থানে কোথাও পয়সার কারবার নাই, পুণ্যস্মৃতিগুলির ফটো অতি অল্প দামে বিক্রয় হয়, যাহা আদায় হয় তৎক্ষণাৎ খাতায় জমা হইয়া পরে লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় হয়। আর আমাদের পুরী-কাশী-গয়া-মথুরা বৃন্দাবন-কালিঘাট-তারকেশ্বর? খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও সমাজের প্রাণ আছে, ধর্ম্ম কলুষিত হয় নাই। আমাদের সমাজে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণকে দান দিবার ব্যবস্থা ছিল এবং ব্রাহ্মণের উপর নির্দ্দেশ ছিল তিনি প্রাপ্ত অর্থ লোকসেবায় ব্যয় করিবেন, কাজেই ব্রাহ্মণকে দত্ত দান সমাজেই ব্যাপ্ত হইত। কোথায় গিয়াছে সে ধর্ম্ম! সমাজে যদি প্রাণ থাকিত তবে পাণ্ডারা সরলপ্রাণ যাত্রীদের শোষণ করিত না। আসিজিনগরে একটা বড় সুন্দর শান্তির ভাব আছে; বুদ্ধগয়াতে যেমন দেশী-বিদেশী অনেকেই একটা প্রশান্ত ভাব দেখিতে পান সেইরূপ আসিজিতেও যেন সাধুর স্মৃতি জড়াইয়া আছে। পেরুজার পাহাড় হইতে রাত্রে উপত্যকার পরপারে দূরে আসিজিনগরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখিয়া আমার প্রায়ই মনে হইত যেন সাধুর সমাধিতে কে প্রদীপমালা জ্বালাইয়াছে।

ইটালির শিশু বালক-বালিকাগুলি বড় সুন্দর দেখিতে। ইউরোপের শিশুদের মত ভারি গড়ন নয়, নাক-মুখ সুচিক্কণ—রাফেল অঙ্কিত চেরাবদের মডেল যে ছিল এই ইটালিয়ান

সাগর-তীরে মুসসোলিনী স্নানে যাইতেছেন।

শিশুরা, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইটালীর মেয়েদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি সকলেই জানেন। মনে হইল বাঙ্গালী মেয়েদের মত দেহ-সৌন্দর্য্যের চেয়ে মুখ-সৌন্দর্য্য ইহাদের বেশী। মধ্য ইটালীতে অনেক মেয়েরই কিন্তু বেশ একটু গোঁফের আভাষ দেখা যায়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ খুব কঠোর—বাগ্‌দত্ত প্রণয়ীর সঙ্গে মেয়ে বেড়াইতে গেলে মাও সঙ্গে যায়! হিষ্ট্রি অব ইউরোপীয়ান মর‍্যালস্, History of European Morals নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রণেতা লেকি বলিয়াছেন যে, এমন সময় গিয়াছে যখন প্রাচীন রোমে একজন নারীরও সতীত্ব ছিল না। সেই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়া এখনও চলিতেছে। গৃহের কেন্দ্র এদেশে মাতা; প্রাচীন যুগের পেটার ফ্যামিলিয়াস্, pater familias ও পেট্রিয়া পোটেষ্টাস্, patria potestas নাই, যখন পিতা পুত্রের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। বাপ এখন নিজের কাজ ও স্ফূর্ত্তি লইয়া থাকে;

পুত্র কন্যা মাতার আজ্ঞাধীন ও মাতৃভক্ত অবিবাহিত কন্যা মায়ের সব কাজে সহায়তা করে।

ইটালীর চেয়ে বড় মুস্সোলিনি। রোমের অতীত গৌরবের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহার অসীম আশা। তিনি পুরুষব্যাঘ্র, কাজ ছাড়া কিছু জানেন না, অহোরাত্র ইটালীর মঙ্গল ও গৌরবের জন্য খাটিতেছেন। তরুণ ইটালী ফাশিজ্ম্-মন্ত্রে দীক্ষিত। একটি ফাশিষ্ট-সম্মিলন দেখিলাম; ফাশিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি স্তারাচে, Starace-কে দলে দলে ব্ল্যাক-শার্টরা সাইকেলে, মোটর বাইকে, ঘোড়ায়, মোটরে, পায়ে প্যারেড করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। স্তারাচের স্থান মুস্সোলিনির পরেই। মুস্সোলিনি দেশের সর্ব্বত্র সুব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও অধঃপতিত জাতির প্রকৃতি-সিদ্ধ দুষ্টামি দমন করিবার বিপুল চেষ্টা করিতেছেন। নব নব বৃহৎ কর্ম্মে জাতিকে উৎসাহিত করিয়া জগৎ-সভায় তিনি ইটালীর গৌরববর্দ্ধনে প্রয়াসী। কত নূতন রাস্তা, নূতন বাড়ী বানাইতেছেন, কত একজিবিশন খুলিতেছেন, বিদ্যা, কলা, কারখানার কত উৎসাহ দিতেছেন, রোম পোম্পেইতে নূতন খননকার্য্য excavation আরম্ভ করিয়াছেন; জেনারেল বাল্বো যখন বিমানপোতবাহিনী লইয়া আট্লান্টিক জয় করিয়া আসিলেন তখন মুস্সোলিনী তাঁহাকে সীজারদের প্রাচীন প্রাসাদে বিজয়ী বীরের রাজসম্মান দিলেন, রাজ্যে চারদিনের জন্য উৎসব ঘোষণা করা হইল। কিন্তু তাঁহার দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উজ্জ্বল স্বপ্ন সফল হইবে কিনা কে জানে! দায়িত্বজ্ঞান, কর্ম্মপ্রবণতা ও কর্ম্মকুশলতা আমাদের দেশের চেয়ে ইটালীর লোকের যদিও অনেক বেশী তবু মনে হয় এ জাতি ক্ষয়িতবীর্য্য ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে; এককালে অজস্র ফুলফল প্রসব করিয়া এ গাছের মজ্জায় যেন এখন ঘুণ ধরিয়াছে, হাজার সার দিলেও হাজার জল-আলো ঢালিলেও ইহারা নবীন-জাতিদের পিছনেই থাকিবে, ভয় হয় যে মুস্সোলিনির মত নিদারুণ পিটাইয়া-ঠিক-রাখা লোকের অভাব হইলেই ইহারা হয়ত হাজার বৎসরের পুরাতন দুষ্টামি আরম্ভ করিবে।

একদিন টাইবার (ইটা: তেভেরে, Tevere) নদীতে স্নান করিলাম। কালিঘাটের গঙ্গার মত, গভীর মোটেই নয় এবং তলায় খুব পাথর। ফ্লোরেন্স, বোলোনিয়া Bologna, প্রভৃতি সহর দেখিয়া ইটালী হইতে জার্ম্মাণীর দিকে রওনা হইলাম।

রচনা-প্রতিযোগিতা

গোলাপলাল-স্মৃতি-স্বর্ণপদক। বিষয়—বঙ্গ-সাহিত্যে মহাত্মা শিশির কুমারের দান।

নিয়মাবলী—

১। উপরোক্ত বিষয়ে বঙ্গ-ভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার লেখককে 'গোলাপলাল স্মৃতি স্বর্ণপদক' প্রদত্ত হইবে।

২। যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

৩। রচনা, কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে এবং ফুলস্ক্যাপ সাইজ কাগজের পঞ্চাশ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না।

৪। আগামী ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে 'শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুটে'র সম্পাদকের নামে ৭১।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় রচনা পাঠাইতে হইবে।

৫। মনোনয়নের অব্যবহিত পরে প্রতিযোগিতার ফলাফল স্থানীয় সংবাদ-পত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

পদ্মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কলিকাতা

৪

কি উদ্দেশ্যে বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন জানি না! পণ্ডিতেরা বলেন মানুষ নাকি স্রষ্টার সৃজনীশক্তির চরম! হয় তো তাই! কিন্তু তাহা হইলে অপরিমেয় এই সৃষ্টির মধ্যে মানুষের স্থান এমন উপেক্ষনীয় অকিঞ্চিৎকর কেন? কোটি কোটি সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারার মধ্যে কেবল, ক্ষুদ্রতম এই পৃথিবীটিতে মানুষ কেন? তাহারো আবার তিনভাগ জলময় মরু; বাকি একচতুর্থাংশের মরু মেরু নদী গিরি বন ছাড়িয়া দিয়া, যেটুকু থাকে, তাহাতে মানুষের বাস! এসব ভাবিলে মানুষকে অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু সে যে বিধাতার একটা আদরের বস্তু তা মনে করি কেমন করিয়া! হয় তো ইহা একটা বিধাতার ভুল! এই সুবৃহৎ বিশ্বগ্রন্থের কোন্ পাদটীকায় কিম্বা কোন্ শেষের দিকের পাতাখানায় হয় তো এই ভ্রম সংশোধনের উল্লেখ আছে! কিম্বা, অপরূপ রোমাঞ্চকর এই বিশ্বের মহানাট্যে মানুষের ভাগ্যে বিদূষকের ভূমিকা! তুষারাদ্র গিরিশৃঙ্গ যখন নির্ব্বাক্‌ভাবে মহাসমুদ্রের অব্যক্ত কলধ্বনি শুনিতেছে, এই বিদূষকটি তখন হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া, নিজের বৈসাদৃশ্যে একটুখানি হাসাইয়া যায়। ধ্যানস্তব্ধ ধরণী যেখানে অনন্তনভোশায়ী নক্ষত্রের পরিভাষা পাঠ করিতেছে, এই ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিটি সেখানে আসিয়া কালের অনিত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করে। বিধাতা নিজের কৃতিত্বে হাসেন! কিন্তু ইহা নিশ্চয়, সে এই মহানাট্যের নায়ক নহে, বিদূষক মাত্র। স্বতোবিরুদ্ধতা-ই তাহার জীবন রসের প্রধান উপজীব্য!

বিশ্বভাবের এই অনুবর্ত্তন ক্ষুদ্রতর আকারে প্রত্যেক সংসারে চলিতেছে! অধ্যাপক রায়ের পরিবার ইহার একটা অভ্রান্ত উদাহরণ। রায় পরিবারে চারটি প্রাণী! অবিনাশ-বাবু, গৃহিণী সর্ব্বেশ্বরী, কন্যা পারুল, আর পুত্র নিতাই। চারটি প্রাণী, দুইটি দল; ভাগে সমান পড়িয়াছে। পুত্র ও মাতা, কন্যা ও পিতা! উভয় দলের কলহ-কোলাহলে ও অব্যক্ত গঞ্জনায় বাড়ীখানিকে সর্ব্বদা কুরু-পাণ্ডবের শিবিরের মত ব্যস্তসমস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তবু তো ইহাদের টাকার অভাব নাই; সে দুঃখ থাকিলে ব্যাপারটা জটিলতর হইয়া উঠিত, এবং কুরু-পাণ্ডবের উপমাও আমাকে বদলাইতে হইত।

পিতার ইচ্ছা মেয়েটিকে একটু লেখাপড়া শিখাইবেন; মাতা গজ্জন করিয়া বলেন, কেন, মেয়ে কি হাইকোর্টের জজ হইবে! যুক্তি অভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। মাতার ইচ্ছা ছেলেটি একটু গান বাজনা শিখিয়া সামাজিক হইয়া উঠুক। পিতা অব্যক্ত রোষে তর্জ্জন করিয়া উঠেন—তুমিই ছেলেটাকে বইয়ে দিলে! পিতা যখন সর্ব্বেশ্বরীর ভয়ে গোপনে মেয়েটিকে লইয়া ইতিহাসের পাঠ দেন, সর্ব্বেশ্বরী তখন স্বামীর ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া নিতাইর জন্য থিয়েটারের পোষাক তৈয়ারী করেন। কোনো কোনো দিন সর্ব্বেশ্বরী হঠাৎ স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন—তুমিই মেয়েটাকে মদ্দা করে তুল্‌লে! অবিনাশ স্ত্রীর হাতে অদ্ধসমাপ্ত রাজার পোষাকটা (গৃহিণী তাড়াতাড়িতে সেটা সাথেই আনিয়াছেন) দেখাইয়া বলেন —ও—ও—ওটা কি! জিহ্বার জড়তার জন্য সামান্য প্রশ্নটা মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপের মত শোনায়! আহত গৃহিণী গর্জ্জন করেন —ওগো তুমিই তো মেয়েকে নাই দিয়ে কি সব সমিতিতে পাঠাও! সেখানে সব ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়ে মদ্দা! না বাপু, আমাকে কার্ত্তিকপুরে পাঠিয়ে দাও! অবিনাশ বাবু উত্তর দেন—আর তোমার ছেলে যে পাড়ার থিয়েটারের দলে 'মোশান মাষ্টার' হয়ে উঠ্‌ল! সেখানে কি হয় একবার খোঁজ নিয়ো তো! নাঃ, আগে পেন্সন-টা নি! কলহ আরো জমিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই পারুল মায়ের হাতের কাছে পানের বাটা-টি খুলিয়া ধরে; গৃহিণী গোটা দুই পান মুখে ফেলিতে ফেলিতে বলেন—তা বেশ, বেশ, একটু পড়াশুনা করা ভাল। একটা পান খা, মা! নিতাই যেদিন উপস্থিত থাকে, সে পিতার হাতের কাছে নস্যির কৌটা-টা সরাইয়া দেয়! অবিনাশ-বাবু এক টিপ নস্যি লইয়া বলেন, ওহে শুধু থিয়েটার করলেই হয় না। ওর আর্ট-টা ষ্টডি-করা দরকার। এই নাও তিনটে টাকা, অমুক বইখানা কিনে পড়োগে। নিতাই টাকা লইয়া গিয়া ভালো দেখিয়া এক জোড়া তিন নম্বরি গোঁফ কিনিয়া লয়, আর পারুল তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়া পানটি ফেলিয়া

দেয়। এই রকম করিয়া রায় পরিবার বিদূষকের অভিনয় করে! আর বিধাতা বোধকরি ছাদের কড়িকাঠের কাছে বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে অবিনাশ বাবু বেড়াইয়া ফিরিয়া দেখেন, সর্ব্বেশ্বরী কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য গিয়াছেন; পারুলের শরীর অসুখ, সে বাড়ীতেই আছে। সন্ধ্যার সময়টা অবিনাশ-বাবু পারুলকে ইতিহাসের পাঠ দেন, এবং তাহা লইয়া স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই বিবাধ বাধে। আজ সর্ব্বেশ্বরী অনুপস্থিত, অবিনাশ বাবু নিরঙ্কুশ। পারুলের শরীর অসুস্থ বলিয়া অবিনাশ-বাবু নিজের পাঠ-কক্ষে আর তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন না, সেখানেই পড়াইতে বসিলেন। সর্ব্বেশ্বরীর আসিতে বিলম্ব আছে, তাঁহার আসিবার আগে উঠিয়া পড়িলেই হইবে।

অবিনাশ বাবু অনেক দিন পরে নিশ্চিন্ত হইয়া উত্তর-ইউরোপের, শ্লেস্‌বিগ-হলষ্টিন (Chleswig-Holstein) সমস্যাটা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সমস্যাটা ইউরোপীয় অন্তর্বিবাদের একটি জটিলতম ব্যাপার, সেই জন্যই হউক বা অকস্মাৎ অতর্কিতে মাতার আগমনের আশঙ্কা করিয়াই হউক, পারুল যেন কেমন বারংবার অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল। অবিনাশ-বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কি মা, বুঝ্‌তে পারছিস্ না?—পারুল সংক্ষেপে বলিল—না।

—তা বটে! এটা হাজার বছর ধরে' ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিত ও রাজনীতিকদের মাথা ঘুলিয়ে এসেছে!

—হাঁ।

—আচ্ছা আর একবার বুঝিয়ে বলি।—অবিনাশ-বাবু অগাধ পাণ্ডিত্য সহকারে ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব সরল করিয়া বলিলেন—এবার বুঝ্‌তে পেরেছিস্? বল তো দেখি, প্রুশিয়া আর ডেনমার্কের মধ্যে যখন এই নিয়ে বিবাদ চলছিল, তখন ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া কেন প্রুশিয়ার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন?

পারুল নীরব হইয়া রহিল।

বল, বল, ভয় কিসের? না পারলে আমি বকবো না।

পারুল নীরব।

বল, ভয় কিসের?

পারুল মৃদুস্বরে বলিল—মা আসতে পারে।

অবিনাশ-বাবুও ভিতরে ভিতরে আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া, একবার ঘড়ি দেখিয়া লইয়া বলিলেন, না, না, তার বিলম্ব আছে। পুনরায় তিনি ইউরোপীয় ইতিহাসের জটিল সমস্যার সমাধানের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

—ওমা, তাই বল, এই জন্যে বুঝি নিমন্ত্রণে যাওয়া হয় নাই! আর তোমারই বা এ কি রকম ব্যাভার?

পিতা-পুত্রী তাকাইয়া দেখেন সর্ব্বেশ্বরী পানের বাটা হস্তে গৃহে প্রবেশ করিতেছেন!

পারুল এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল; অবিনাশবাবুর ইউ-রোপীয় সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিল।

—মেয়েটা আজ সারা দিন মাথা ধরে পড়ে আছে, আর তার উপরে—

পারুল ক্ষীণ স্বরে বলিল—না, মা আমার মাথা তো ধরে নি।

তবে বুঝি এই মাথা-মুণ্ড পড়বার জন্যই নিমন্ত্রণে যাওয়া হয় নি? মাথা ধরে নি—একশো বার ধরেছে!

অবিনাশবাবু এতক্ষণে প্রথম কথা কহিলেন—আহা ধরলোই বা, এটা এমন কিছু জটিল সমস্যা নয়!

—আমার মুণ্ড! মেয়েকে একটু মিশতে দেবে না, বিয়ে দেবে কি করে গো! নাঃ বাপু, তোমরা এখানে থাকো, আমাকে দাও কার্ত্তিকপুরে পাঠিয়ে!

মেয়েকে আর মিশ্‌তে দিয়ে কাজ নেই! ছেলেটি যেমন বাউণ্ডুলে হ'য়ে উঠেছে! এত রাত হ'য়েছে, কোথায় সেটা!

এইবার সর্ব্বেশ্বরীর জটিল সমস্যা! তিনি জানিতেন, নিতাই আজ পাড়ায় থিয়েটার করিতে গিয়াছে! হঠাৎ যদি সে এখন আসিয়া উপস্থিত হয়! এই তো সেদিন 'জনা' নাটকে প্রবীরের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া, সেই সাজেই "মাতঃ মাতঃ দেহ পদধূলি" বলিতে বলিতে নিতাই বাড়িতে আসিয়াছিল। ভাগ্যে তখন অবিনাশবাবু উপস্থিত ছিলেন না!

সর্ব্বেশ্বরীর মনে এই আশঙ্কা হইলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—আমার নিতাই যে দশ জনের প্রশংসা পায়, সেটাতে তোমার চোখ টাটায়! তা বেশ, বেশ, আমাকে দাও বাপু কার্ত্তিকপুরে পাঠিয়ে!

—দশ জনের প্রশংসা! পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে একটা আস্ত বাঁদর হ'য়ে উঠল! এত রাত, তবু আসে না কেন?

এমন সময়ে হাতের ছড়িখানিকে অর্দ্ধোত্থিত কুঠারের মত ধরিয়া সুপ্রচুর শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত নিতাই ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—"পিতঃ, পিতঃ দেহ আজ্ঞা, স্বহস্তে বধিব আজি জননীরে মোর।" পাড়ায় আজ সে পরশুরামের ভূমিকা করিয়াছিল—ইহা তাহারই রেশ। তাহার হাতের ছড়ি অর্দ্ধোত্থিত যেমন ছিল, তেমনি থাকিল, সম্মুখে অবিনাশবাবুকে দেখিয়া সে একেবারে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, পিছন ফিরিয়া যে পলাইবে, এমন ক্ষমতাও তাহার হইল না।

অবিনাশবাবুও কম বিস্মিত হইলেন না, কেবল বিস্ময়ের কিছু ছিল না সর্ব্বেশ্বরীর। এই তো সেদিন নিতাই প্রবীরের ভূমিকায় মাতাকে সম্ভাষণ করিয়া অতর্কিত মাতৃভক্তিতে সর্ব্বেশ্বরীকে খুসি করিয়া দিয়াছিল। পুত্রের কৃতিত্বে খুসি হইয়া মাতা অনুযোগ করিয়াছিলেন, মাতৃভক্তির অনুরূপ পিতৃভক্তি তাহার নাই। নিতাই পরশুরামের অভিনয়ান্তে আজ ঠিক করিয়াছিল, পরশুরামের ভূমিকায় মা কে দেখাইবে পিতৃভক্তিও তাহার কম নহে! কিন্তু সে ভক্তি যে স্বয়ং পিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এমন তো কল্পনা করে নাই।

নিতাই কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল! এমন অসম্ভব বীররস, হঠাৎ এমন করুণ রসে পরিণত আর কখনো হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অবিনাশবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—চা চা চাবা!

—খোল, দাড়ি, খোল গোঁফ! পিতৃভক্ত পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতাকে পর্য্যন্ত বধ করিতে পারে, নিজের দাড়ি গোঁফ ছেদন আর এমন কি কঠিন!

কিন্তু হায়, দাড়ি গোঁফ যে 'স্পিরিট গাম' দিয়া শক্ত করিয়া আঁটা! নিতাই দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, সে টানে তাহার চোখের জল বাহির হইয়া আসে কিন্তু দাড়ি গোঁফ নিশ্চল!

—খোল দাড়ি! শীগ্গীর! তাড়াতাড়ি!

নিতাই আবার সজোরে টান মারে! সর্ব্বেশ্বরী দেখিলেন পুত্রের চোখ ছল ছল করিতেছে।' কিন্তু এই বেদনা যে দৈহিক, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল, এত মূল্যের দাড়ি গোঁফ নষ্ট হইতেছে বলিয়াই নিতাইর চোখ ছলছল করিতেছে।

সর্ব্বেশ্বরী বলিলেন—একটু ধীরে, ধীরে বাবা!

—খোল, শীগ্গীর—

—একটু, ধীরে, ধীরে, বাবা! ওগো, তুমি একটু থামো না!

—খোল, শীগ্গীর,

—একটু ধীরে বাবা, দাড়ি-গোঁফের খানিকটা করিয়া তাহার হাতে ছিঁড়িয়া আসিল! হায় রে জীবনের ব্যঙ্গ! এগুলি তাহার বড় সাধের, ততোধিক মূল্যের দাড়িগোঁফ! ইহাদের মাহাত্ম্যেই সে পাড়ার থিয়েটারে পরশুরামের ভূমিকা পাইয়াছিল। আজ তাহা স্বহস্তে টানিয়া ছিঁড়িতে হইতেছে! তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সর্ব্বেশ্বরী বলিলেন, কেঁদো না, বাবা, আমি আবার কিনে দেবো! তাঁহার বিশ্বাস পয়সা নষ্ট হইল বলিয়াই নিতাইর দুঃখ। সর্ব্বেশ্বরী স্ত্রীলোক, দাড়ি-ছেদনের দুঃখ কি বুঝিবেন! নিতাই অন্য ঘরে পলায়ন করিল। পারুল সময় বুঝিয়া মায়ের কাছে পানের বাটাটি খুলিয়া ধরিল। সর্ব্বেশ্বরী গোটাদুই পান মুখে ফেলিয়া দিয়া পারুলকে একটি দিলেন।—খা, মা, মাথাধরা ছাড়বে, এখন। সর্ব্বেশ্বরী বাহির হইয়া গেলেন, পারুল বাথরুমের দিকে ছুটিল। আজ অবিনাশবাবুর কাছে নস্যির কৌটা খুলিয়া ধরিবার কেহ ছিল না, তিনি গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৫

কলিকাতায় শরতের যেমন সগৌরবে আবির্ভাব, এমন আর কোনো ঋতুর নয়। বসন্তের বিকাশ ধরাতলে—পৃথিবী এখানে ইঁট পাথরে সমাচ্ছন্ন। বর্ষা দুই তরফা, আকাশে ও পৃথিবীতে তার উত্তর প্রত্যুত্তর। কলিকাতায় সে শুধু অর্দ্ধেক। কিন্তু শরৎ কেবল দ্যুলোকের, তাই তার কোনো ঐশ্বর্য্য এখানে গোপন থাকে না।

বিনয় তাহার বারান্দায় বসিয়া দেখে দেবলোকের মধুচক্র সুধার ভারে ভাঙিয়া গিয়া আকাশের কানায় কানায় হিরণ্ময় ধারাতে পূর্ণ করিয়া দিল। আবার কখনো বা বর্ষার বারুদবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে দিগন্তের বিলীয়মান অট্টালিকাগুলির উপরে কোমল ছায়াপাত করিয়াছে, এবং সেই কালো মেঘের

পটভূমিতে পায়রার ঝাঁক শাদা শাদা ডানায় ছোট ছোট তরঙ্গ তুলিয়া একদল অদৃশ্য দেবশিশুর নির্ম্মল শুভ্র হাসির মায়া বিস্তার করিতেছে।" আবার কখনো বা গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাজপথে ক্লান্ত শকটের অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলিয়া স্বপ্নপুরীর রাজপুত্রকে কোন্ রহস্যলোকে লইয়া চলিয়াছে! এমনিভাবে বিনয়ের দিন কাটে।

প্রথম যখন সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তারপরে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একটি সূতাকে কেন্দ্র করিয়া মিছরি যেমন দানা বাঁধিয়া ওঠে, বহুআকাঙ্ক্ষিত মানবরসের একটি পরিচয়কে অবলম্বন করিয়া কলিকাতার বিপুল বিপর্য্যয় তেমনি ধীরে ধীরে সুসঙ্গত হইয়া বিনয়ের জীবনে দেখা দিতেছিল। চরচিলমারী হইতে বিদায় লইয়া জীবনের যে খেই সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, ক্রমে পুনরায় সেটি তাহার হস্তগত হইতেছিল। কিন্তু নদীর একপার যেমন কাছে আসে, আর একপার তেমনি দূরে চলিয়া যায়। চরচিলমারী ইতিমধ্যেই তাহার জীবনের সীমান্তে একটি মসীরেখামাত্রে অবসন্ন। অধিক বয়সে এমনটি হয় না—জীবনের ছাঁচ শক্ত হইয়া গেলে পরিবর্ত্তনের অবসর অল্প। কিন্তু যৌবনের ভাঙা-গড়ার সময়ে দূর নিকট হইতেছে, নিকট দূরে গিয়া পড়িতেছে! যৌবনজলতরঙ্গে প্রিয়বিচ্ছেদ গভীর দাগ কাটিয়া যায়—কিন্তু তবু সে জলের দাগ বই নয়। বার্দ্ধক্যের হিমে তুষারীভূত জীবনে যে কটি দাগ পড়ে সহজে তাহা দূর হয় না।

প্রথম প্রথম সে কঙ্কণের পত্র নিয়মিত পাইত, নিয়মিত উত্তর দিত। পত্র এখনো নিয়মিত পায়, কিন্তু উত্তরের কোঠায় বড় বড় ফাঁক পড়িয়া যাইতেছে। কোনো কোনো মুহূর্ত্তে কঙ্কণের স্মৃতি তীব্র রশ্মিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু অধিকাংশ অবসর আচ্ছন্ন করিয়া আর একজনের আভাস। কঙ্কণ তাহার চিত্তগগনের এককোণে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র; বাকি সমস্ত আকাশটা ভরিয়া ভাবী আর এক নক্ষত্রলোকের বিস্তৃত নীহারিকাপুঞ্জ।

সে দিন সে কঙ্কণের চিঠি পাইয়াছিল! বর্ষার শেষে চরচিলমারীতে জোর ভাঙন লাগিয়াছে, লোকে বলিতেছে এমন ভাবে চলিলে আগামী বছরে চরের চিহ্নও থাকিবে না। পূজা তো আসিল, বিনয় কবে আসিবে! তাহার আশা বিশেষ আবশ্যক! বাদলের কুলগাছে ফুল ধরিয়াছে, গাঁদা এখনো ফোটে নাই। বিনয় উত্তর লিখিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে রূপেন ঘরে প্রবেশ করিল।

—নাঃ শালারাই সার্‌লো দেশটাকে; বলিয়াই সে নিকটের আরাম চৌকিটাতে শুইয়া পড়িল।

—দাও তো একটা চুরুট!

রূপেনের প্রবেশ ও প্রস্থান নিখুঁৎ নাট্যোচিত! বিনয় চুরুটের পাত্র সরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন তো ফুটবল শেষ হয়েছে, তবে আবার কি!

—তুমি তো ফুটবল দেখছ, এদিকে যে বাঙালীর দফা শেষ!

—হঠাৎ এমন কি হ'ল।

—আর হল! প্রায় শেষ যে! এই বলিয়া সে উদ্বিগ্ন ভাবে উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। দীর্ঘ চুলগুলি এক একবার তাহার মুখের উপরে আসিয়া পড়ে, সে হাত দিয়া সরাইয়া দেয়।

বুঝলে বিনয়, পথের এক মোড় থেকে আর এক মোড় পর্য্যন্ত যাও, একটা বাঙালীর পান সিগেরেটের দোকান পাবে না! আমরা আছি কোথায় হে?

পায়চারি করিতে করিতে দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবির কাছে নিস্তব্ধ ভাবে খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল। তারপরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন নিজের মনেই বলিল, নাঃ—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে!'

—তারপরে, বুঝ্‌লে কিনা হে গিয়েছিলুম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে। তিনি তো দেখেই মারলেন দুই ঘুষি! তারপর বললেন, খা! চেয়ে দেখি বুনসেন বার্ণারে রাঁধা কই মাছের ঝোল! নুনটা কিছু কম হয়েছিল। যাই হোক আমার কথা শুনে বল্‌লেন, করবি দেশের কাজ! যা উড়িষ্যার বনে, বাসকপাতা চালান দে, বেঙ্গল কেমিকেলকে দিয়ে কেনাবো। শুন্‌লে হে! আমি চাই পান বিড়ির দোকান, উনি বলেন বাসক পাতা চালান দে!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইল, ভাবটা যেন আত্মশক্তি ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা নাই।

—না! হতাম যদি ডিক্টেটার! প্ল্যান আমার প্রস্তুত। —কথার শেষ অংশটায় কণ্ঠস্বর এমনি প্রত্যয়ে পূর্ণ, যে বিনয় তাহা অবিশ্বাস করিতে পারিল না!

এমন সময় ঝড়ের মত পরমেশ ঘরে ঢুকিল। তাহার কপাল বহিয়া ঝরঝর করিয়া ঘাম পড়িতেছে, মুখ-চোখ রৌদ্রে লাল। সে সবেগে বলিয়া উঠিল, বাস্ বাস্ হয়ে গিয়েছে, হিমালয় পর্ব্বত আর থাক্‌বে না! মস্কো টু দিল্লী, দিল্লী টু মস্কো!

রূপেন অকালে বাধা পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল,—দেখো পরমেশ, কাজের সময় গোল করো না!

—ওঃ, তোমার আবার কাজ! সেই পান-বিড়ির দোকান তো!

ইহাদের কার্য্য-তালিকা পরস্পরের নিকট অত্যন্ত পরিচিত! কেবল রমানাথের ভাবখানা সর্ব্বদাই অপূর্ব্ব!

অফিসের দুইটা-তিনটায় টিফিনের ফাঁকে সে একবার করিয়া দেখা দিয়া যায়। আজো সে নিয়মিত সময়ে প্রবেশ করিল! বাহির হইতেই কথোপকথনের কিছু আভাস পাইয়াছিল—কাজেই ভূমিকার প্রয়োজন তাহার ছিল না!

সে অত্যন্ত সন্তর্পণে পকেট হইতে একটুখানি সুপুরি, লবঙ্গ বাহির করিয়া মুখে পূরিয়া বলিল—ওসব এখন রাখো! কোথায় খাঁটি দুধ পাওয়া যায় বল্‌তে পারো। দাম আমি বেশী দিতে রাজি আছি কিন্তু জিনিষ খাঁটি চাই!

রূপেন-পরমেশের পরহিতৈষিতা রমানাথের আগমনেই যথেষ্ট শীতল হইয়া গিয়াছিল, তার উপরে একেবারে নির্জ্জলা দুধ! উভয়ে মন-মরা হইয়া বসিয়া রহিল। রমানাথ নিজের জয় লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধগুপ্ত একটি হাসি নিক্ষেপ করিল। রমানাথের সেই হাসি!

—বিনয় তোমার ও চিঠিখানা কার হে! মেয়েলি ছাঁদের লেখা! ওঃ এ বুঝি সেই চরচিলমারী! খুব চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যাহোক্!

এতক্ষণে রূপেন পুনরায় একটা বক্তব্যের সুযোগ পাইল! —মাইরি বিনয়, তোমার কাহিনীটা যেন রূপকথার বাজোর; মনে মনে আমিও যেন তাকে দেখ্‌ছি!

রমানাথ বলিল—সেটা মনেই যেন থাকে! পরমেশের মন এতক্ষণ দিল্লী-টু-রাশিয়া; কাজেই নিকটের কথাবার্ত্তা বুঝিতে একটু সময় লাগিবার কথা! এইবার ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—বেবি, বেবি—

—বেবি নয় হে, বল বাবা! বাপ্স! তার বাবাকে না ধরলে কিচ্ছু হবে না!

রূপেন—ধরলেও কিছু হবে কি না জানি নে!

বিনয় বলিল—পরমেশবাবু, আপনি তো একজন কম্যুনিষ্ট, আর বেবির বাপও কম্যুনিষ্ট, একবার চেষ্টা করুন না।

পরমেশ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। রমানাথ বলিল, এত শীগ্‌গীর নয় হে, বিশেষ এরকম বেশে গেলে তো বুঝতেই পারছ?

পরমেশ ততক্ষণ দরজার চৌকাট পর্য্যন্ত গিয়াছে; সহসা সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডান হাতে চৌকাঠ ধরিয়া বাঁ হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল—পৃথিবীর এত ঐশ্বর্য্য নেই যে সকলেই রাজার হালে থাক্‌তে পারে! একজন ধনী হলেই আর একজনকে দরিদ্র হ'তে হবে। সবাই মোটা খেয়ে পরে থাক্‌তে পারে, এইটুকু মাত্র সম্ভব!—কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তার অন্তর্দ্ধান। রমানাথ বলিয়া উঠিল—বাঃ বেশ বলেছে, ছাপার ভুল ছাড়া অন্য কোন ভুল নেই!

রূপেন পুনরায় চরের কাহিনী আরম্ভ করিল। রূপেনকে প্রেমের ব্যাখ্যায় উত্তেজিত হইতে দেখিয়া রমানাথ বলিল—ওহে আমার একটা টিনের টব আছে, সেটা গিয়েছে ফুটো হ'য়ে, কি করে' সারাই বল তো!

দুৎ, তোমার টব! কেবল এসেছিল একটা ইন্স্‌পিরেশন, এমন সময়ে টব্। চল্লাম হে বিনয়!—রূপেন আরশির সম্মুখে গিয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল!

এমন জম্‌কালো সভাটাকে এমন অনায়াসে ভাঙিয়া দিয়া গর্ব্বের হাসিতে রমানাথের মুখ ভরিয়া গেল! বিনয়ের ঘরে প্রায়ই এমন কাণ্ড হয়, কাজেই এসব তাহার এক রকম সহ্য হইয়া গিয়াছিল।

—আজ সন্ধ্যা বেলা যাচ্ছ তো অবিনাশবাবুর বাড়ী! সেখানে দেখা হবে আবার, কি বল!—রমানাথ প্রস্থান করিল।

বিনয় বিকালে বেড়াইয়া ফিরিতেছিল। পথটা ট্রাম বাসে বন্ধ থাকায় একপাশে সে খানিকটা দাড়াইয়াছিল। হঠাৎ নিকটে একটা গোলমালে সে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ লক্ষ্য করিল। আবর্জ্জনা ফেলিবার একটা 'ডাষ্ট বিন' এর কাছে দুইটা ভিখারীতে গোল বাধিয়াছে। দুটা লোকেরই পরিচ্ছদ অতি জীর্ণ; ময়লা ছেঁড়া কোর্ত্তা, আস্তিন দু'টা বহুধা ছিঁড়িয়া গঙ্গাসাগরে গঙ্গার মোহানার মত বহু খণ্ড

হইয়া গিয়াছে। মাথায় জটা; গলায় এক গোছা কাঠের মালা; পিঠে কাপড় চোপড়ের ঝুলি; হাতে একটা করিয়া টিনের পাত্র! লোক ছুটার মধ্যে কলহের উপক্রম। বিনয় কৌতূহলী হইয়া কাছে গেল। একজন বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—দেখুন তো বাবু, বেটার কি আস্পর্দ্ধা! এই কুণ্ডা আমার বাঁধা! ও শালা, এখানে আসে কেন!

ব্যাপার খানা প্রথমে বিনয় বুঝিতে পারে নাই, শেষে যাহা বুঝিল তাহা এই! প্রত্যেক ভিখারীর একটা করিয়া 'ডাষ্ট বিন' নিজেদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার স্বত্ব স্বামিত্ব তাহার। অন্যে তাহার ভাগ পায় না। ইহা ব্যবসায়ের সততা! আজ তাহার জমিদারীতে অন্য একজন আক্রমণ করিয়াছে। আক্রমণের কারণ, দুপুর বেলা প্রেসিডেন্সি কলেজের বার্ষিক উদ্বোধন সভা হইয়া গিয়াছে। শহরের গণ্যমান্য সমাজের চূড়ায় অধিষ্ঠিত মহোদয়গণ প্রীতি ভোজনান্তে সে সব খাদ্য পাত্রে ফেলিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পাত্রটায় নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, এই ব্যক্তির জমিদারী পার্শ্ববর্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু বিনয় ইহার কি মীমাংসা করিবে! কুণ্ডার মালিক মীমাংসার ভার নিজের হাতেই লইল। সে তাহার যষ্টিখানি উঠাইয়া আততায়ীকে তাড়িয়া গেল—তবে রে শালা—তোর—

নৈতিক শক্তি অত্যন্ত বলবান, কিন্তু তাহার সহিত লাঠি থাকিলে উহা একেবারে অব্যর্থ। আততায়ী পলায়ন করিল। বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া লোকটা গর্ব্বের হাসি হাসিল।—দেখ্‌লে বাবু, পরের জিনিষে শালার লোভ!

এই বলিয়া সে ভাঙা সরা হইতে খাদ্যদ্রব্যের ভুক্তাংশ বাছিয়া একত্র করিতে লাগিল। শিঙাড়া, মালপো, লুচি, কেক, সন্দেশ, প্রভৃতির ভগ্নাংশে পূর্ণ এক স্তূপ হইল।

—হাজার হোক বাবু, বড় লোকের ব্যাপার, অনেক ফেলেছে! বড় লোকের বড় মন। ক্ষিদেও কম, ব্যায়রাম তো লেগেই আছে! তাতেই তো আমরা বাঁচি। ওই শালাকে দিলে কি ফেল্‌ত কিছু! সরাখানা সুদ্ধ গিল্‌তো!

এমন সময় একটি শীর্ণ কুকুর আসিল। বিনয় লোকটির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কুকুরটিকে তাড়াইতে গেল। লোকটি বাধা দিয়া বলিল—

—না, না, ওটাও আমার শরীক। ওটাও এই কুণ্ডার মালিক।

খাদ্যের স্তূপ হইতে এক দিকে কুকুরটি খাইতে লাগিল, অন্যদিকে লোকটি!

—আবার মজা কি বাবু, জানো, মানুষের চেয়ে কুকুর ভালো! দেখ্‌বে সত্যি কিনা? এই বলিয়া সে এক মুঠা খাদ্য দূরে নিক্ষেপ করিল, কুকুরটা ছুটিয়া গিয়া তাহা খাইতেছে, এই অবসরে লোকটি ভালো ভালো সন্দেশ ও কেকের টুকরা মুখে ফেলিয়া দিল!

—দেখলে বাবু, কেমন ফাঁকি দিয়ে ভাল জিনিষগুলো খেলাম! মানুষ হ'লে পারতাম!

কুকুরটা বোধ হয় চালাকি বুঝিতে পারিল; লোকটির কাছে ফিরিয়া আসিয়া শুষ্ক উজ্জ্বল দাঁত বাহির করিয়া খাদ্য-স্তূপের দিকে আক্রমণ করিল। লোকটিও ততোধিক হিংস্র-দন্ত বাহির করিয়া তাহাকে মুখভঙ্গি করিল।—শালাও শিখে উঠ্‌ছে।

বিনয় আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল। জনতার কোলাহল ভেদ করিয়া তাহার কর্ণে কেবল প্রবেশ করিতে লাগিল সান্ধ্য-সংবাদ পত্র বিক্রেতাদের তারস্বর—

—প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রীতি-সম্মেলন—এক পয়সা।

—বাংলা দেশে শিক্ষার যুগান্তর—

—বাঙালী জাতির উদ্বোধন—এক পয়সা।

সমাজ, সাহিত্য-শিক্ষায় নবযুগ—

—পদদলিত, বুভুক্ষু জাতির সমস্যা সমাধান—

—কৃষ্টি, বিজ্ঞান, আর্থিক-নবযুগ—এক পয়সা।

হকার বালকদের তীব্রকণ্ঠের এক পয়সা—! এক পয়সা! বিনয়ের কেন যেন হঠাৎ মনে হইল এই এক পয়সা কিসের দাম, ওই কাগজখানার, না এই সব তালিকাবদ্ধ উন্নতির!

৬

বিনয় তিনচার মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়াছে। পূজার আগে যখন সে দেশে যাইবে বলিয়া জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত, তখন জয়পুর হইতে মহীন্দ্রের এক তার। তাহার বিশেষ অসুখ, বিনয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। আকস্মিকতার আর

এক আহ্বান! বিনয় জয়পুরে যাত্রা করিল।

অসুখ সারিতে অনেক দিন গেল, তারপর কিছুদিন সে উত্তর-ভারতের নানাস্থান দেখিয়া বেড়াইল। এমনি ভাবে তিনচার মাস অতিক্রম করিয়া বড়দিনের পর সে কলিকাতায় ফিরিল।

এই কয়মাসে সে একটা ব্যাপার বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে। যে অলক্ষ্য জ্যোতিষ্কের টানে তাহার ভাব-সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, তাহা চিরপরিচিত পৌর্ণমাসীর চন্দ্র নহে। অতি-অসীম চিত্ত-গগনের কোন্ কোণে সে আজ অদৃশ্য, কিন্তু হৃৎ-সাগরের এই দুরন্ত জোয়ার এ তো মিথ্যা নহে। একদিন যে গৃহ-দেবতা এই জোয়ারের অধিষ্ঠাত্রী ছিল, তাহার স্থান আজ যে অপরে দখল করিয়াছে, সহসা ইহা বিশ্বাস হয় না। ইহাই জীবনের অষ্টমাশ্চর্য্য! একজনের প্রতি ভালবাসা কেমন করিয়া অতি অগোচরে অতি সন্তর্পণে মিলাইয়া গিয়া আর একজন প্রিয়তমের কিরূপে উদয় হয়! এ পরিবর্ত্তন সহসা বোঝা যায় না, কারণ ভালবাসা অবিচলিত থাকে, কেবল নিঃশব্দে ভালবাসার পাত্রের বদল হইতে থাকে! প্রেমে ছেদ পড়িলে মন চঞ্চল হইয়া উঠে, কিন্তু এই অতি ধীর পরিবর্ত্তনে বিচ্ছেদ তো কোথাও নাই। তারপরে একদিন চোখে পড়ে, পুরাতন পাদপীঠে নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা! ভূতপূর্ব্ব প্রণয়ীর প্রতি অবশ্যই একটা টান থাকে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যের টান। আগুন নিভিয়া গেলে, পড়িয়া থাকে তার ভস্ম। প্রেম সেই আগুন, কর্ত্তব্য সেই ভস্মাবশেষ।

বিনয় যে কঙ্কণকে ভুলিয়াছে, একথা সত্য নহে, কিন্তু আজ তার প্রতি যে টান তাহা কর্ত্তব্যের। সে টানে আগ্রহ আছে, কিন্তু মোহ নাই। মোহহীন প্রেম যদি কোথাও থাকে থাকুক, স্বর্গে এবং তত্ত্বে; বিধাতা তুমি মানুষকে এমন অপূর্ব্ব স্বাদ হইতে বঞ্চিত করিও না।

বিনয় সেদিন দুপুর বেলা অবিনাশ বাবুর বাড়িতে গেল। রমানাথ দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া পারুলকে আগ্রহভরে ডাকিয়া লইয়া তাহার করকোষ্ঠি বিচারে বসিয়া গেল। বিনয় ঘরে ঢুকিয়া দেখিল দুইজনে নিভৃতে পরস্পর হাত ধরিয়া কি করিতেছে! তাহার মুখ গম্ভীর হইল, রমানাথ এমন সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহে। সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আর কিছু নয় বিনয়বাবু, এর হাতখানা দেখ্ ছিলুম।

—বেশ তো!

—এ বিষয়ে আপনার আগ্রহের অভাব তো আগে দেখিনি।

—হাঁ।

পারুল বলিল, বিনয়বাবু, বসুন।

—আচ্ছা, থাক্।

—দেখুন, দেখুন, বিনয়বাবু, এঁর ভিনাসের স্থানটা লক্ষ্য করবেন্। আপনাকে তো একটু শিখিয়েছিলাম।

—হাঁ দেখ্ ছি!

—আর মজা দেখেছেন, এই হার্ট-লাইনের কাটাকুটি। অনেকগুলো, তাই না!

—হ'তে পারে!

—ও! বিনয়বাবুর মন বুঝি খারাপ! আপনার সেই চরের, সেই কি চর যেন, সেখানকার সেই তিনি—

—আ! চুপ করুন!

—তা বটে, এত লোকের সম্মুখে, তা বটে। অনেক দিন পরে ফিরলেন, এতদিন বুঝি সেই চরেই বিচরণ করছিলেন!

—না।

—আচ্ছা থাক্, ওসব পরে শুনবো।—রমানাথ পারুলের হাতখানা এত জোরে টিপিয়া ধরিয়াছিল যে তাহা রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছিল। বিনয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা তা'হলে উঠি!

রমানাথ একটি চাপা হাসি গোপন করিয়া বলিল—বেশতো। একটু নিরিবিলি না হ'লে আবার হাত দেখা চলে না। কিন্তু পারুলের ধৈর্য্য আর রহিল না, সে বলিল—বসুন বিনয় বাবু, চা খেয়ে যাবেন। এই বলিয়া সে উঠিয়া প্রস্থান করিল। এইবার রমানাথের অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিবার সুযোগ!

—বিনয় বাবু—ওঁর হাত দেখাতে আপনি কিছু মনে করেছেন?

—জানি না।

—কিন্তু উনি কিছু মনে করেন নি।

—অনেকক্ষণ ধরে' হাত দেখ্ছিলেন বুঝি?

—কি আশ্চর্য্য, ঠিক ধরেছেন, কিন্তু কি করে বুঝলেন?

—হাত যে লাল হয়ে উঠেছিল!

—ও! তা-ও চোখ এড়ায়নি? আচ্ছা চোখ করে-ছিলেন বটে।

—তা'তে আর লাভ হ'ল কি!

—কিছু মনে করবেন না, বিনয় বাবু, মেয়েদের হাত দেখতে কিছু বেশি সময় লাগে।

ধীরে ধীরে বিনয়ের স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ফিরিয়া আসিতেছিল; সে বলিল—সেই লোভেই বুঝি হাত দেখা শিখেছেন?

—শিখতে আর পারলুম কই !

—দেখবেন, রমানাথ বাবু, ভাল করে' শিখে ফেলবেন না। ভাল না জানলেই সময় বেশি লাগা স্বাভাবিক।

—তাহ'লে আপনার তো আরো বেশি সময় লাগবার কথা, বিনয় বাবু।

—আমি অপরিচিত মহিলার—

—ওঃ অপরিচিতার হাত আপনি দেখেন না, কিন্তু সেই কঙ্কণের—

—চুপ করুন।

এমন সময়ে উভয়ের চাএর টেবিলে ডাক পড়িল।

* * *

সন্ধ্যা বেলা বিনয় বাড়ি ফিরিবে, এমন সময়ে পারুল তাহাকে বলিল,—বিনয় বাবু, একটু অপেক্ষা করে' যাবেন। এই বলিয়া সে বিনয়কে লইয়া গিয়া ছাদের উপর বসাইল, বলিল—একটু বসুন, আমি আসছি। বিনয় একা বসিয়া রহিল।

শীতের রাত্রি, আকাশে চাঁদ, গলিতে কোলাহল নাই, শুভ্র জ্যোৎস্না বাঁকিয়া আসিয়া ছাদের এক প্রান্তে পড়িয়াছে, আলিসার উপর সারি সারি টবে ফুলের গাছ। একা বিনয় বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পারুলের শূন্যতায় এই ফাঁকটা কল্পনার মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল। পারুল কেন তাহাকে একাকী ডাকিয়া আনিল!

এমন সময়ে পারুল ফিরিয়া আসিল।

—আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম।

—তাতে কি হয়েছে।

—আজ দুপুর বেলা রমানাথ বাবু আপনাকে বড় বিরক্ত করেছেন।

—না, না, এমন কিছু নয়। হঠাৎ রমানাথের প্রতি অদ্ভুত এক কৃতজ্ঞতায় বিনয়ের মন ভরিয়া উঠিল। সে আজ বিরক্ত করিয়াছিল, বলিয়াই তো এমন সুযোগ মিলিল।

পারুলকে রেলিঙের ধারে দাঁড়াইতে দেখিয়া বিনয় আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। দুইজনে নীরব। পারুল কি ভাবিতেছিল জানি না—বিনয় পারুলকে লক্ষ্য করিতেছিল।

সে স্নান করিয়া কাঁঠালী রঙের গরদের একখানি শাড়ি পরিয়াছে, লাল তার পাড়। ব্লাউজের গলার কাছের ফাঁক দিয়া সোনার হারটি মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। হাত-কাটা জামার ভিতর হইতে অলৌকিক-স্পর্শ কল্পনা-সর্ব্বস্ব সুগোল নিটোল স্নিগ্ধ দু'খানা বাহু নামিয়া পড়িয়া মণিবন্ধে সূক্ষ্ম খান কয়েক চুড়িতে অলঙ্কৃত হইয়া পাঁচ পাঁচটি কোমল আঙুলে ও দু'খানা তপ্ত রক্ত-করপদ্মে শেষ হইয়া গিয়াছে। কানে দুইটি দুল, মনের সংবাদ সর্ব্বাগ্রে যাহাদের কাছে পৌছিতেই নানা তালে তাহারা দুলিয়া উঠে। শ্বেতচন্দন চোখে পড়ে না এমন বর্ণ যে ললাটের, তাহার মাঝখানে একটি ছোট সিঁদুরের টিপ। স্নিগ্ধ দীর্ঘ কেশপাশ আলগোছে জড়ানো, তাহাতে একটি ঘোর রক্তবর্ণ গোলাপ ফুলের কুঁড়ি। আর সে কি কণ্ঠ, বিদ্যুতের বঙ্কিমতা, মৃণালের সরসতা, রজনীগন্ধায় শুভ্র স্বচ্ছ অ-কর স্পৃশ্যতায় মিশ্রিত।

তাহার ক্ষুদ্র পা দু'খানি দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু বিনয়ের মনে হইল, পা দু'টি বেড়িয়া নিশ্চয়ই আলতার একটি করিয়া বেষ্টন আছে; এমন পায়ে আলতা না থাকিয়া পারে না!

—আপনি তো পশ্চিমে গিয়েছিলেন, চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখেছেন!

—সে সুযোগ ঘটেনি, কিন্তু সে জন্য আর দুঃখ নেই।

—কেন?

—আজ যা দেখলাম, চাঁদের আলোয় তাজ তার চেয়ে আর কত সুন্দর হবে!

পারুল কোনো বাধা দিল না, কিন্তু বিনয় নিশ্চয় বুঝিল, এই কথায় পারুল দুঃখিত কিম্বা লজ্জিত হয় নাই।

আবার দুইজনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ মনের কথা বাক্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিল না। জীবনে মাঝে মাঝে এমন দৈব মুহূর্ত্ত আছে যখন ভাষার সাহায্য ছাড়াও মানুষ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পারুল-বিনয়ের আজ সেই রকম একটি চরম লগ্ন!

পারুল একটু সোজাভাবে দাঁড়াইয়া হাত দু'টি ললিতভাবে বাঁকাইয়া খোঁপার গোলাপ-কুঁড়িটি খুলিয়া লইল। বিনয়ের মনে হইল যুগল বাহুর সেই আন্দোলনটি একগাছা অদৃশ্য পুষ্পমালার মত আকাশে ভাসিতে ভাসিতে দেবলোকের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

বিনয় ভাবিয়াছিল পারুল ফুলটি তাহাকে দিবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটিল না।

পারুল বলিল—চলুন নীচে যাওয়া যাক, রাত অনেক হয়েছে। অকস্মাৎ স্বপ্ন-ভঙ্গের মত বিনয়ের খচ্ করিয়া একটা ব্যথা লাগিল। সে সাহস করিয়া ফুলের কুঁড়িটি চাহিতে পারিল না।

বিনয় যখন বাড়ি ফিরিতে উদ্যত, দরজায় যখন অনেক লোক, পারুল তখন সকলের চোখ এড়াইয়া অত্যন্ত কৌশলে বহুবাঞ্ছিত সেই কুঁড়িটি বিনয়ের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। উপরি-পাওনার মধ্যে সকলের চোখ এড়ানো সেই রহস্যময় সলজ্জ গোপনীয়তাটি! (ক্রমশঃ)

সেকালের পরিচ্ছদ

—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমি তখন খুব ছোট, বোধ হয় আমার বয়স আট নয় বৎসরের অধিক হইবে না—মনে আছে, আমার মামা বাজার হইতে এক জোড়া লালপাড় ধুতি আনিয়া আমার মায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখ দেখি, কাপড়ের কেমন জমি।' মা কাপড়জোড়াটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন – 'বেশ জমি ত, যেন রুটির মত। কত দাম?' মামা বলিলেন, —'দুই টাকা।' মা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—'দু টাকা! এত সস্তা। কোথাকার কাপড়?' মামা বলিলেন—'বিলাতী কাপড়, কলে বোনা হয়।' মা বলিলেন—'বিলাতী? আমি দেশী তাঁতের কাপড় মনে করিয়াছিলাম। ঠিক যেন দেশী কাপড়ের মত পাড় আর জমি করিয়াছে।'

ইহা প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

ষাট বৎসর পূর্ব্বে লোকে সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্র দেখিয়া বলিত ঠিক যেন দেশী কাপড়। আর এখন আমরা সূক্ষ্ম মিলের বস্ত্র দেখিয়া বলি—ঠিক যেন বিলাতী কাপড়! ষাট বৎসরের মধ্যে মাঞ্চেষ্টারের আর বাঙ্গালা দেশের বস্ত্র সম্বন্ধে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি—বিলাতী বস্ত্রের লাল পাড় ও কালা পাড় এই দুই বর্ণের পাড় হইত। লাল পাড়টাই লোকে অধিক পছন্দ করিত। কারণ বিলাতী লাল পাড়ের রং বেশ পাকা হইত কিন্তু কালা পাড়ের রং থাকিত না, দুই এক ধোপের পরই কালা রং ফিকে হইয়া যাইত এবং অনেক সময় কালা পাড় পুরাতন কাপড় শাদা ধুতিতে পরিণত হইত। দেশী তাঁতের কাপড়ের কালা পাড়ের রং বেশ পাকা হইত, কিন্তু লাল পাড়ের রং ভাল হইত না, ফিকে হইত।

আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি বিলাতী ধুতির পাড় এক ইঞ্চি অপেক্ষা কিছু কম চওড়া হইত, উহাকে 'ফিতাপাড়' ধুতি বলিত। এখনকার মত 'নরুণপাড়' 'চুলপাড়' ধুতি তখন ছিল না। বিলাতী শাড়ীর পাড় অপেক্ষাকৃত চওড়া—অর্থাৎ প্রায় দুই ইঞ্চি চওড়া হইত। বিলাতী ধুতি বা শাড়ীর পাড়ে কোনরূপ নক্সা বা কারুকার্য্য থাকিত না, ঢাকাই এবং শান্তিপুরের কাপড়ের পাড়েই নক্সা হইত, চন্দননগরের কাপড়ের পাড়েও কোনরূপ নক্সা হইত না।

ক্রমে ক্রমে বিলাতী কাপড়ের পাড়ের উন্নতি হইতে লাগিল। কালা পাড়ের রংও বেশ পাকা হইল। তখন হলুদ রঙ্গের, নীলরঙ্গের বা সবুজ রঙ্গের পাড় হইত না, পাড়ের রং হয় লাল, না হয় কালা হইত। কিছু দিন পরে—অর্থাৎ যখন আমাদের বয়স বোধ হয় চৌদ্দ পনের বৎসর, সেই সময়ে কলিকাতার গোষ্ঠবিহারী দে নামক একজন বস্ত্র-বিক্রেতার নামসংযুক্ত নানা প্রকার বাহারের পাড়যুক্ত বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইল। লোকে সেই কাপড়কে 'গোষ্ঠমাকা কাপড়' বলিত। গোষ্ঠমাকা কাপড়ে ফিতা পাড়ের পরিবর্ত্তে কাশী-পাড় দেখা দিল এবং গোষ্ঠমাকা কাপড়েরই প্রথম হলদে পাড় হইল। সেই হলদে রং খুব পাকা ছিল, কাপড় পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া গেলেও পাড়ের রং মলিন বা ফিকা হইত না। সেই সময় সবুজপাড় ধুতি ও শাড়ীও বাজারে আসিত, কিন্তু সে রং থাকিত না, সেই জন্য সবুজ বা নীল পাড় কাপড় কেহ একবার কিনিলে আর দ্বিতীয় বার কিনিতে চাহিত না।

সেকালে এই সকল বিলাতী কাপড়ই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নিত্যব্যবহার্য্য ছিল। ধনবান জমিদারগণ ঢাকাই, শান্তিপুরে বা ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও শাড়ী ব্যবহার করিতেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকে সেই সকল কাপড় ব্যবহার করিতে পারিতেন না, তাঁহারা 'পোষাকি কাপড়' হিসাবে দেশী ধুতি ও শাড়ী দুই একখানা ক্রয় করিতেন। বাল্যকালে প্রতি বৎসর পূজার সময় আমাদের একখানি করিয়া দেশী ধুতি হইত। পূজার সময় এবং কোন আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় আমরা সেই সযত্নে রক্ষিত পোষাকি কাপড় পরিয়া যাইতাম। ফরাসডাঙ্গার কালাপাড় ধুতি ও শাড়ী কোরা অবস্থায় নীল বর্ণের থাকে, একবার রজকালয় ঘুরিয়া আসিলে কাপড়ের নীল রং কাটিয়া যাইত। আমরা প্রতি বৎসর পূজার সময় ফরাসডাঙ্গার কোরা কাপড় পাইতাম। আমাদের ধারণা ছিল যে, পূজার সময় কোরা কাপড়ই পরিতে হয়, তাই আমরা পূজার সময় সেই নীল বর্ণের কোরা কাপড় পরিতাম। দেশী তাঁতের কাপড় ধোয়া অপেক্ষা কোরা ক্রয় করাই ভাল, কারণ ধোপারা কোরা দেশী কাপড় কাচিবার সময় যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে,

তাহাতে কাপড়ের স্থায়িত্বের হানি হয়। যেখানে ভাল কাপড় জন্মায় সেখানে সেই কাপড় কাচিবার উপযুক্ত রজকও থাকে। ফরাসডাঙ্গার কোরা কাপড় যে সকল রজক কাচিয়া থাকে, তাহারা সাধারণতঃ গৃহস্থের ব্যবহার্য্য মলিন কাপড় কাচে না। তাহারা বস্ত্রবিক্রেতাদের নিকট হইতে কোরা কাপড় লইয়া কাচিয়া থাকে। কোরা কাপড় কাচিয়া তাহারা 'ইস্ত্রি' করিবার পর একটা বড় গুরুভার মুগুর লইয়া সেই কাপড়ের উপর আঘাত করিয়া কাপড়কে একেবারে তক্তার মত করিয়া ফেলে। এই প্রক্রিয়াতে কাপড়গুলি দেখিতে বেশ সুন্দর হয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই ছিঁড়িয়া যায়। সেই জন্য দেশী তাঁতের কাপড় কোরা অবস্থায় কিছুদিন রাখিয়া পরে কাচাইয়া লওয়া উচিত। ব্যবহৃত বস্ত্র কোরা হইলেও রজকেরা তাহা নূতন বস্ত্রের মত পিটাইয়া তক্তা করে না, সেই জন্য ঐ বস্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আমাদের অভিভাবকগণ এই তথ্য জানিতেন বলিয়াই বোধ হয় পূজার সময় কখনও ধোয়া কাপড় কিনিতেন না, কোরা কাপড়ই কিনিতেন এবং পাছে আমরা নীল রঙ্গের কোরা কাপড় পরিতে আপত্তি করি, সেইজন্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে পূজার সময় কোরা কাপড়ই পরিতে হয়।

পূজার কাপড় 'কোঁচাইয়া' পরিতে হয় বলিয়া আমরা সেই নীলরঙের কাপড় কোঁচাইবার জন্য প্রতিবেশীদের দ্বারস্থ হইতাম। আমাদের প্রতিবেশী মাধব ঘোষ এক কালে কোন সৌখীন ধনীর খানসামা ছিল; সে সুন্দররূপে কাপড় কোঁচাইতে পারিত। আমরা কাপড় কোঁচাইবার জন্য তাহারই শরণ লইতাম। আজকাল বালক ও যুবকগণের মধ্যে কাপড় কোঁচাইবার শিল্পও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখনও দুই চারিজন ধনবানকে কোঁচান কাপড় পরিতে দেখা যায়, কিন্তু বোধ হয় আর কিছুদিন পরে, কাপড় কোঁচাইয়া পরিবার প্রথা সম্পূর্ণ রূপে লোপ পাইবে; কোঁচান কাপড় কার্ত্তিক এবং গণেশ ঠাকুরেরই একচেটিয়া হইয়া থাকিবে।

আমাদের পূজার কাপড় বা পোষাকি কাপড়ের কথা বলিলাম, এখন জামার কথা বলিব। আজ কাল যেমন নানাবর্ণের বিদেশী রেশমী কাপড়ের জামা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বাল্যকালে সেরূপ ছিল না। সেকালে ধনবানের পুত্রকন্যারা পূজার সময় সাটিন, মখমল বা গর্ণেটের জামা পরিত, আমরা মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ-সন্তানেরা পূজার সময় যাহা হউক একটা নূতন জামা পাইলেই আহ্লাদে আটখানা হইতাম। সাধারণতঃ আমরা পূজার সময় সাদা জমির উপর কালো, লাল বা বেগুনি ছিটের সূতির জামা পাইতাম। সেই জামার কাপড়ের মূল্য প্রতিগজ চারি আনার অধিক হইত না। মোটের উপর, আমরা বাল্যকালে পূজার সময় যে জামা পাইতাম তাহার মূল্য দশ আনা বা বার আনার অধিক নহে। পূজার জুতাও তদ্রূপ, এক টাকার মধ্যেই পূজার জুতা হইত। তখন সাধারণতঃ দুইপ্রকার চামড়ার জুতা পাওয়া যাইত, বার্নিশ ও বুরুষ। কালো রঙ্গের বার্নিশ জুতাটাই আমাদের অধিক প্রিয় ছিল, কারণ, তাহা বেশ চক্‌চকে। বুরুষ জুতা বড় পছন্দ করিতাম না। জুতাও দুইপ্রকার গঠনের ছিল—রবারের সাইড স্প্রিং এবং ফিতা বাঁধা। জুতা-বুরুষের কালি অবশ্য বিলাতী ছিল—ছোট কৌটার দাম দুই পয়সা, বড় কৌটার দাম দুই আনা। সেই কালি তরল নহে, "কোব্রা" কালির কৌটাতে যেরূপ কালি থাকে সেইরূপ মোমের মত। যখন আমরা স্কুলে উপর ক্লাসে পড়িতাম, তখন জুতার তরল কালি বাজারে বাহির হয়। সম্ভবতঃ তরল কালি তাহার অনেক পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমদানি হইয়াছিল. কিন্তু কলিকাতায় আমদানি হইলেও মফস্বলে আমদানি তাহার পরেই হইয়া থাকে। আমাদের সময়ে যে দুই প্রকার তরল কালি ছিল তাহার নাম—'সাটিন পালিস' এবং 'নিউবিয়ান ব্ল্যাকিং।' এই শেষোক্ত কালিই আমরা পছন্দ করিতাম কারণ তাহা একবার লাগাইলেই বুরুষ-জুতা বার্নিশ-জুতার মত চক্‌চকে হইত।

আমরা কৈশোরে বুট জুতাও পায়ে দিয়াছি, কিন্তু খুব অল্প। চটি জুতা এবং নাগরা জুতার প্রচলনও বেশ ছিল। এক বৎসর পূজার সময় আমি ঝিনুকের বোতাম বসান বার্নিশ জুতা পাইয়াছিলাম। কালো বার্নিশের উপর চক্‌চকে ঝিনুকের বোতাম দেখিয়া আনন্দবিহ্বল হইয়াছিলাম।

জামার কাপড় যেরূপ এখনকার মত নানাপ্রকার ছিল না, জামার গঠনও সেইরূপ রকমারি ছিল না। সাধারণতঃ কামিজ ও কোটই আমরা পরিতাম। কামিজ নানাপ্রকারের হইত। কামিজ হইলেই তাহার প্লেট ও কফ থাকে। কামিজের প্লেট বা বক্ষস্থলে পটি দেওয়া, কুঁচি দেওয়া নানা-

প্রকার কারুকার্য্য থাকিত। কফ্ অর্থাৎ হাতার শেষ অংশে কারুকার্য্য কিছু থাকিত না, তবে উল্টা কফ্ নামে একপ্রকার কফ্ হইত, সেই কফ্ পশ্চাদ্দিকে উল্টান হইত। আজ কাল বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানকে তেমন কামিজ গায়ে দিতে দেখি না, কোটের সঙ্গে কামিজ অনেকেই ব্যবহার করেন; কিন্তু আমরা বাল্যে ও যৌবনে শুধু কামিজই গায়ে দিতাম। সেকালে ইংলিশ কোট অপেক্ষা চায়না কোটের প্রচলনই অধিক ছিল, আমরা বাল্যকালে চায়না কোটই পরিয়াছি। আজকাল আমার মত দুই চারিজন বৃদ্ধ ব্যতীত কাহারও অঙ্গে চায়না কোট দেখিতে পাই না। আমাদের যৌবনকালে পাঞ্জাবী জামার আবির্ভাব হয়। কোট প্রধানতঃ জিন, সাটিনজিন, বা কটন ড্রিলের হইত। সাটিন জিনটাই আমরা বেশী পছন্দ করিতাম, কারণ উহা ধবধবে সাদা এবং একটু উজ্জ্বল হইত, জিন বা কটন ড্রিল সেরূপ হইত না। মধ্যে কিছু দিনের জন্য 'পার্শিকোট' বাঙ্গালী যুবকগণের অঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; আজকাল আর কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে পার্শিকোট পরিতে দেখি না। সেই কোট আজানুলম্বিত ছিল। এখনও কলিকাতায় পার্শিকোট দেখিতে পাই, কিন্তু বাঙ্গালীর দেহে নহে, পার্শি, গুজরাটী বা ভাটিয়ারাই ঐরূপ কোট ব্যবহার করেন।

আমাদের বাল্যকালে মোজা বোধ হয় কিনিতে পাওয়া যাইত না, অন্ততঃ মফস্বলের কোন দোকানে মোজা বিক্রয় হইতে দেখি নাই। যে বাটীর মহিলারা মোজা বুনিতে জানিতেন, সেই বাটীর পুরুষেরাই মোজা ব্যবহার করিতেন। আমার জননী মোজা বুনিতে পারিতেন, সেই জন্য আমরা শীতকালে মোজা পায়ে দিতাম, কিন্তু আমাদের বাল্য সহচরগণের মধ্যে অনেকেই মোজা পায়ে দিত না, কারণ তাহারা পাইত না।

শীতকালে আমরা শীতনিবারণের জন্য 'দোলাই' গায়ে দিতাম। এই দোলাই জিনিসটা আজকাল কলিকাতা অঞ্চল হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কি ইতর কি ভদ্র, আজকাল আর কাহাকেও দোলাই গায়ে দিতে দেখি না। দোলাই জিনিষটা কি, একালের অনেকের হয়ত সে ধারণাই নাই। বালাপোশে তুলা না থাকিলে যাহা হয়, তাহাই দোলাই। দুই পর্দ্দা কাপড় চারিদিকে সেলাই করিয়া একত্র বদ্ধ করিলেই দোলাই হয়। বালাপোশের পাড়ের মত দোলায়েরও পাড় থাকিত। উহার সদর পিঠ বা বাহিরের পর্দ্দা—লাল জমির উপর হলুদ, সবুজ ও নীল বর্ণের বড় বড় কল্কা বা ফুল কাটা, ভিতরের বা নিম্ন পর্দ্দায় কৃষ্ণ বর্ণের জমিতে ছোট ছোট সাদা গোলাকার ছাপ থাকিত। এই দোলাই বাল্যকালে আমাদের শীত নিবারণ করিত। দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমরা দোলাই গায়ে দিয়া শীত কাটাইয়া 'র‍্যাপারে' প্রমোশন পাইয়াছিলাম। র‍্যাপার বিদেশ হইতে আমদানী পশম, অথবা পাটমিশ্রিত পশমে প্রস্তুত আলোয়ান। বিলাতী কম্বলের মত র‍্যাপারে নানা বর্ণের ডোরা কাটা থাকিত। র‍্যাপারগুলি দেখিতে বড় সুন্দর ছিল, উহাতে পশম থাকিত বলিয়া দোলাই অপেক্ষা উহার শীত নিবারণের ক্ষমতা অধিক ছিল। অল্প মূল্যের র‍্যাপারগুলি নাকি জার্ম্মানি হইতে আমদানী হইত। সাধারণতঃ এক একখানা র‍্যাপারের মূল্য চারি পাঁচ টাকা হইত। শীতকালে আমরা গরম কাপড়ের কোট গায়ে দিতাম। সেই সকল কোট সাধারণতঃ বনাত, কাশ্মীয়ার বা সার্জ্জে প্রস্তুত হইত। ঐ সকল গরম কাপড়ের কোটও চায়না কোট ছিল, ইংলিশ কোট নহে। আজকাল যেরূপ মফস্বলেও ছোট ছোট ছেলেদিগকে 'অলষ্টার' গায়ে দিতে দেখি, সেকালে সেরূপ দেখিতে পাইতাম না। বলিতে পারি না, সেকালে কলিকাতায় ধনবানের সন্তানগণ অলষ্টার গায়ে দিতেন কিনা, মফস্বলে অলষ্টারের ব্যবহার অজ্ঞাতই ছিল। সেকালে জুতার ব্যবহার অপরিহার্য্য ছিল না। আমরা চৌদ্দ পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কতদিন জুতা পায়ে না দিয়াই স্কুলে গিয়াছি। গ্রীষ্মকালে, যখন পথের ইট পাথর অত্যন্ত গরম হইত, তখন নগ্ন পদে, পথিপার্শ্বস্থ ঘাসের উপর দিয়া চলিতাম।

সেকালে প্রায় সকল যুবককে এবং অনেক বালককেও চাদর বা উড়ানি ব্যবহার করিতে দেখিতাম। আজকাল চাদরের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, বিশেষতঃ কার্পাস সূত্রের উড়ানি। এখন কার্পাসের উড়ানি উঠিয়া গিয়াছে, রেশমি উড়ানির আবির্ভাব হইয়াছে। এখন অনেক প্রৌঢ় ভদ্রলোকও উড়ানি ব্যবহার করেন না, আমার মত বৃদ্ধেরাই উড়ানির মায়াতে আবদ্ধ আছেন। আমার মনে আছে ১৮৯২ কি ৯৩

খৃষ্টাব্দে সাবিত্রী লাইব্রেরীর এক সভাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথমে রেশমি উড়ানি গায়ে দিতে দেখি।

চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে এদেশে রেশমি উড়ানির প্রচলন ছিল না। গবদের জোড় বা তসরের জোড় অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, কিন্তু সূতার কাপড় ও গবদ চাদর বা এণ্ডি চাদর একযোগে ব্যবহার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে ও যৌবনে উড়ানি ব্যবহার করিতাম, এমন কি অনেক সময় স্কুলেও উড়ানি লইয়া যাইতাম। মধ্যে দিন কয়েক পাড়ওয়ালা উড়ানির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই ফ্যাশান বোধ হয় মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল, কারণ মান্দ্রাজী ভদ্রলোকেরাই পাড়ওয়ালা উড়ানি ব্যবহার করেন। এখন আর সে উড়ানি বাঙ্গালীর বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি সেকালের বালক ও যুবকগণের পরিচ্ছদের কথাই বলিলাম, বালিকা ও যুবতীদের বেশভূষা সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিলে আমার এই প্রবন্ধ অঙ্গহীন হইবে। আমাদের সেকালে বালক ও যুবকগণের পরিচ্ছদ যেরূপ আড়ম্বরহীন সাদাসিধা ছিল, বালিকা ও যুবতীদিগের পরিচ্ছদও কতকটা সেইরূপ আড়ম্বরহীন ছিল। সেকালে মফস্বলে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে শেমিজ বা শায়া ব্যবহৃত হইত না। শেমিজ ও শায়ার ব্যবহার বোধ হয় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় জামা গায়ে দিতেন, কিন্তু জুতা ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৮৯৭ কি ৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় প্লেগের প্রথম আবির্ভাব হয়, সেই সময় চিকিৎসকগণ নাকি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, যাহারা পাদুকা ব্যবহার করে না, প্রধানতঃ তাহারাই প্লেগে আক্রান্ত হয়; সেই জন্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের, ধনবান অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিদিগেরই অধিক প্লেগ হয়। চিকিৎসকগণের মতে প্লেগের বীজাণু নাকি মৃত্তিকাতে থাকে, নগ্ন পদে গমন করিলে সেই সকল বীজাণুর সংস্পর্শেই প্লেগ হয়। সংবাদপত্রে, চিকিৎসকগণের এই অভিমত পাঠ করিয়া আমার পিতা, আমার পত্নী, ভ্রাতৃবধূ এবং জননীর জন্য পাদুকা কিনিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। আমি কলিকাতা হইতে তিন জোড়া কার্পেটের জুতা লইয়া আসিলাম। বাবার আদেশে আমার স্ত্রী এবং ভ্রাতৃবধূ সেই জুতা দুই চারি দিনের জন্য পায়ে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার জননী কিছুতেই জুতা পরিতে সম্মত হইলেন না। আমি যে-জুতা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে চামড়া ছিল না। উহার সাজ কার্পেটের এবং তলা ক্যাম্বিশের, সুতরাং উহা পরিধানের কোনও যুক্তিসঙ্গত আপত্তি ছিল না, কিন্তু মা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন—'প্লেগে মরি সেও ভাল, তাই বলিয়া বুড়া বয়সে জুতা পায়ে দিতে পারিব না।' অথচ আমার মা সেকালে চন্দননগরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদুষী ও উদারমতাবলম্বিনী বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

বলা বাহুল্য যে সেকালে স্ত্রীলোকদিগের ব্লাউস ছিল না। তাঁহারা যে জামা গায়ে দিতেন, তাহা বডিস ও জ্যাকেট এই দুই প্রকারে বিভক্ত ছিল। বডিস ত আজ কাল বড় দেখিতেই পাই না, কোন কোন স্থানে এখনও জ্যাকেট দেখিতে পাই। সেকালে, বৃদ্ধা ত' দূরের কথা, প্রৌঢ়ারাও বডিস বা জ্যাকেট পরিধান করিতেন না, বালিকা ও যুবতীরাই জামা ব্যবহার করিতেন, তাহাও পরের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময়। আমার মনে হয়, একাল অপেক্ষা সেকালে বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান অধিক ছিল। একথা স্বীকার করি যে, আজকাল রাজনীতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে. এখন বাঙ্গালী, ইংরেজের মুখে দুইটা মিষ্ট কথা শুনিলেই আপ্যায়িত হয় না, শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইলে নীরবে সে লাঞ্ছনা শিরোধার্য্য করে না, কিন্তু আবার অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী শ্বেতাঙ্গের অনুকরণে কৃতকার্য্য হইলে জীবন সার্থক জ্ঞান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচ্ছদের উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমরা আজকাল যত অধিকসংখ্যক যুবাকে ইউরোপীয় বেশে সজ্জিত দেখিতে পাই, সেকালে সেরূপ দেখিতে পাইতাম না। সেকালে কেবল বিলাতফেরৎ বাঙ্গালীকেই ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিতাম। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলি কলেজে ভর্ত্তি হই। আমরা যখন স্কুলবিভাগে পড়িতাম, তখন কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক অবিনাশ দত্ত মহাশয়কে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে কলেজে আসিতে দেখিতাম। অন্য কোন ব

অধ্যাপক ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। দত্ত-সাহেব বিলাতফেরৎ ছিলেন না। সেভাবেও লালবিহারী দে আচার-ব্যবহারে পুরাদস্তুর সাহেব হইলেও কখনও সাহেব সাজেন নাই। তাঁহার সাহেব না সাজিবার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, তিনি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। অবিনাশ দত্ত গৌরবর্ণ এবং সুপুরুষ ছিলেন। তবে তাঁহার অগ্রজ রমেশচন্দ্র দত্ত সি. এস্. আই. মহাশয় বিলাতফেরৎ ছিলেন, হয়ত সেইজন্যই অবিনাশ বাবুও ইউরোপীয় পরিচ্ছদে কলেজে যাইতেন। লালবিহারী দে স্বয়ং ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান না করিলেও তাঁহার পুত্রগণ ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করিতেন। তাঁহার পত্নী পারসিক ছিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ পিতার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া মাতার ন্যায় গৌরবর্ণ ছিলেন। লালবিহারী দের তৃতীয় পুত্র হরমসজি দে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তিনি বাঙ্গালা জানিতেন না, দুই চারিটা বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা বলিতে পারিতেন। অবিনাশ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর মিঃ পি. মুখার্জ্জি হুগলি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। মুখার্জ্জি সাহেব বিলাতফেরৎ ছিলেন, বিলাতি পোষাক পরিতেন, কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁহার বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়া উঠিত। তিনি বোধ হয় কিছু অধিক পরিমাণে তৈল মাখিতেন, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে, যখন তিনি ক্লাসে অনাবৃত মস্তকে আমাদিগকে পড়াইতেন, তখন তাঁহার তৈলাক্ত কেশ চক্ চক্ করিত। আমাদের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ৺কিশোরীমোহন সেন (কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনের পিতা)। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ৺হেমচন্দ্র রায়। ইঁহারা চোগা চাপকান ব্যবহার করিতেন। আজকাল কলিকাতায় যুবক ডাক্তার, অধ্যাপক এবং হাকিম প্রভৃতির অধিকাংশকেই সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখি। কিছুদিন পূর্ব্বেও কলিকাতায় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারগণ কি ঘরে, কি বাহিরে, সর্ব্বত্রই সাহেবী পোষাক পরিতেন, কিন্তু আজকাল আর সে প্রথা নাই। হাইকোর্টে বা অন্য কোন আদালতে যাইবার সময় তাঁহারা সাহেবী পরিচ্ছদ পরেন কিন্তু নিজ বাটীতে অথবা সভা-সমিতিতে যাইবার সময় তাঁহারা বাঙ্গালী পরিচ্ছদেই গমন করেন। আমাদের সেকালে মুন্সেফ, সবজজ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হাকিমেরা চোগা চাপকান পরিয়াই আদালতে যাইতেন। এখন অনেক সব-ডেপুটিকেও সাহেবী পোষাকে আদালতে দেখিতে পাই।

গত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যে বেশের যখন এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন কেশেরও যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। সেকালে প্রায় সকলেরই মাথায় কেশ চারিদিকেই সমান থাকিত। যাঁহারা সৌখীন ও বিলাসী ছিলেন, মাথায় সিঁথা কাটিতেন, তাঁহাদের সম্মুখের কেশ পশ্চাদ্দিকের কেশ অপেক্ষা কিছু বড় থাকিত। সেকালে অনেককেই ঘাড় কামাইতে দেখিতাম, ঘাড়ের কাছে— যেখানে কেশের সীমা শেষ হইয়াছে, সেইখানটায় ক্ষৌরকার্য্য করা হইত, তাহার উপরে নহে। আজকাল যেরূপ দুই রগ এবং মাথার পশ্চাৎ ভাগ প্রায় কেশশূন্য করিয়া চুল ছাঁটা হয়, সেকালে সেরূপ ছিল না। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের সকল ফ্যাশনই সমাজের উচ্চ স্তর হইতে নিম্ন স্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কেবল দুইটি বিষয় নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজকাল এই যে বাঙ্গালী ভদ্র যুবকগণের বোধ হয় পোনর আনা রকমকে রগ ও ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটিতে দেখি, ঐ ফ্যাসান এখনকার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মুসলমান কোচম্যান ও বিড়িওয়ালা শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন দেখিতেছি উহা ক্রমশঃ সমাজের উচ্চ স্তরেও সসম্মানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়— লুঙ্গি পরিধান। লুঙ্গিটা পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান সমাজেরই একচেটিয়া ছিল। যখন আমরা হুগলী কলেজে পড়িতাম, তখন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পুত্র আমার সহপাঠী ছিলেন। অনেক সময় আমি আমার মুসলমান বন্ধুদের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের বাটীতে কাহাকেও লুঙ্গি পরিতে দেখি নাই। প্রায় সকলে কাপড় পরিতেন, কেহ কেহ ইজের পরিতেন। হুগলীতে অনেক ভদ্র মুসলমানের বাস আছে, কিন্তু আমার ছাত্রাবস্থায় কোন মুসলমান ভদ্রলোককে পথে লুঙ্গি পরিয়া বেড়াইতে দেখি নাই। লর্ড ডফরিনের সময় ব্রহ্মদেশ ইংরেজের অধীন হইলে, ব্রহ্মদেশের যুবরাজ মেইনগুনকে ভারত গভর্ণমেণ্ট বন্দী করিয়া বারাণসীতে আটক রাখেন। তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া প্রায় এক বৎসর বাস

করেন। তিনি চন্দননগরে আসিলে, কলিকাতা ও ব্রহ্মদেশ হইতে বহু বাস্মিজ চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। সেই সকল বাস্মিজকে আমি প্রথমে লুঙ্গি পরিতে দেখি, তাহার পূর্ব্বে কখনও লুঙ্গি দেখি নাই। এখন দেখিতে পাই অনেক বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তানও লুঙ্গি পরিয়া পথে বাহির হইয়া থাকেন।

সেকালের মহিলাদের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমি অতি সংক্ষেপেই দুই চারি কথা বলিলাম, কারণ, মহিলাদের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পুরুষের লেখা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের লেখাই সমধিক উপযোগী হইবে। স্ত্রীলোকদিগের বেশের কথা বলিতে হইলে ভূষণের কথাও বলা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের বেশ ও ভূষা উভয়ের বর্ণনা করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সেকালের স্ত্রীলোকদিগের সেই অসংখ্য অলঙ্কারের বর্ণনা করা সহজ নহে। মোটের উপর দেখিয়াছি যে একালে অলঙ্কারের ফ্যাশন যতই দ্রুত পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, সেকালের ধনবান ভদ্রলোকের বাটীর মহিলারা যত অধিক মূল্যের স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কার ধারণ করিতেন, একালের মহিলারা তাহার শত ভাগের একভাগ ধারণ করেন কিনা সন্দেহ। সেকালের ধনবতীরা সত্য সত্যই 'সোনায় মোড়া' হইয়া কুটুম্বগৃহে গমন করিতেন। মোটা, ভারি, নিরেট গহনাই সেকালের ধনগৌরব প্রদর্শন করিত। সুতরাং বিশ ভরির চুড়ি, ত্রিশ ভরির হার, পঞ্চাশ ভরির সুখাহার প্রভৃতি অনেক ধনবানের বাটীতেই দেখা যাইত। সেকালে কোন কোন বড় জমিদার-গৃহিণী অম্লান বদনে আড়াই সের তিন সের স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নিমন্ত্রণরক্ষায় গমন করিতেন, ইহা আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি।

ছায়া

—শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

তোমার মনের পটে ফেলে যদি থাকি কোন ছবি
শঙ্কা করিও না সখি! কালস্রোতে মুছে যাবে সবি'।
কোন রেখা, কোন বর্ণ রহিবে না দুই দিন পরে,
এ শুধু মেঘের ছায়া উর্ম্মিহীন স্বচ্ছ সরোবরে:
এ শুধু নয়নানন্দ ইন্দ্রধনু আকাশের গায়,
না চাহিতে আঁখি মেলি আকাশে মিলায় পুনরায়;
এ ছবি অক্ষয় নয়, মর্ম্মরের নহে এ মূরতি,
পর আঁখি অগোচর—তবু কেন মান এত ক্ষতি?
নিবিড় কাননতলে ক্ষীণ আয়ু কোন বনফুল
দণ্ড দুই হাসে যদি, গন্ধে করে অলিরে আকুল;
তারপর ঝরে যায় বিতরিয়া সকল সম্ভার;
বল তবে কোথা শোক? বল সে করিল ক্ষতি কা'র

বসন্ত এসেছে মনে; আসিয়াছে ফুলের মর্ম্মর;
এবার জীবন-কুঞ্জ ছেয়ে নেবে অজস্র কুসুম।
অর্পিনু মালঞ্চে তব আমার এ তুচ্ছতম দান,
হবে নাকি অবিচার তারে দিলে অধিক সম্মান?
একদিন দীপ্তরোষ বৈশাখের ভ্রূকুটি হেরিয়া
সব শোভা, সব মধু ধীরে যবে পড়িবে ঝরিয়া
তখন দুষিবে কা'রে? চাঞ্চল্যের শাস্তি দিবে কা'র?
অপরাধী এত হবে—নাম মনে রবে না সবার!
একসাথে আসিয়াছি, একসাথে লইব বিদায়—
রিক্ত হ'তে ভয় সখি! আহরিতে নব-মহিমায়।
কেন এত মায়া বল ক্ষণিকের অতিথির তরে?
নিশীথের শেফালিকা উষালোকে যায় নাকি ঝরে'?

ফুরায় প্রেমের স্বপ্ন না মিটিতে পরাণের আশা—
অনন্ত বিরহ-শেষে নিমেষের মেলে ভালবাসা।

দুই বোন্
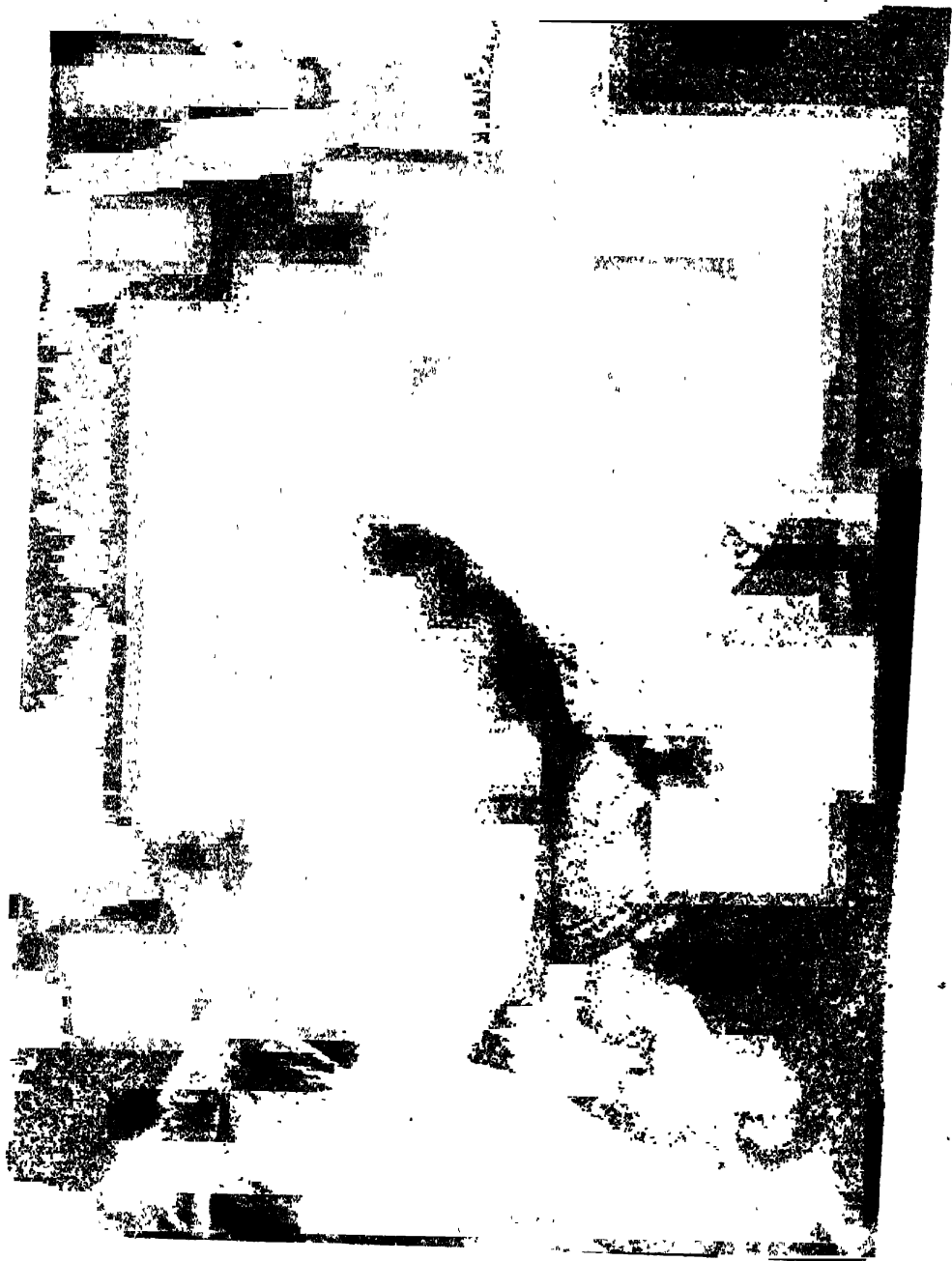
[শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

"সাধারণী"

ষাট বৎসর আগেকার সাহিত্য ও বিবিধ সংবাদ-সঙ্কলন

পরিচয়

১২৭৯ সালের (১৮৭২) ১লা বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল. তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার সেখানে ওকালতী করেন। সেই বৎসর আশ্বিন মাসে অক্ষয়চন্দ্র ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার জন্মস্থান চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। পর বৎসর ১২৮০ (১৮৭৩) সালের ১১ই কার্ত্তিক, রবিবার, অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। সাধারণী কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া কদমতলা, চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মিতভাবে ইহাতে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার স্নেহাস্পদ সুহৃদ্ অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' করিতে লাগিলেন। দুই-এক মাসের মধ্যেই লোকে বুঝিতে পারিল, দেশ-মধ্যে রাজনীতির নূতন সুর ধরিয়াছে। 'সোমপ্রকাশে' রাজনীতির আলোচনা থাকিত বটে, কিন্তু তাহার ভাষার জটিলতায় সে আলোচনা লোকের প্রাণে লাগিত না। সাধারণী সহজ, সরল, সাদাসিধা ভাষায় রাজনীতি আলোচনা করিতে লাগিল; রাজনীতির ছোট ছোট কথাগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ বিশেষ তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত জনসাধারণকে বুঝাইতে ও শিখাইতে আরম্ভ করিল। তাই প্রবীণ বয়সে কূটরাজনীতিজ্ঞ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"রাজনীতি-ক্ষেত্রে অক্ষয়চন্দ্র আমার গুরু, রাজনীতির ক-খ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ-পাঠ পর্য্যন্ত 'সাধারণী' হইতেই শিখিয়াছি।"

ক্রমে এমন হইল যে, গবর্নমেণ্টও সাধারণীর কথায় কর্ণপাত করিতে আরম্ভ করিলেন, উহার পরামর্শ-অনুসারে ছোট-খাটো দুই-চারটা কাজও করিতে লাগিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজরাজেশ্বরী হওয়া উপলক্ষে লর্ড লিটনের অধিনায়কতায় দিল্লীতে ইংরাজ গবর্নমেণ্টের যে প্রথম দরবার হয়, তাহাতে ৮জন বঙ্গদেশীয় সম্পাদকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল. হিন্দুপেট্রিয়ট, মিরর, অমৃতবাজার, সাধারণী, ভারতসংস্কারক, ঢাকাপ্রকাশ, সুলভ ও সোমপ্রকাশ।

সাধারণীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল নির্ভীক, নিষ্কম্প, নিরপেক্ষ অথচ সরস সমালোচনা।

১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে অক্ষয়চন্দ্রের পৈতৃক বাটীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র বাড়ীতে 'সাধারণী যন্ত্রালয়' স্থাপিত হইল। দশ বৎসর পরে ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত হইয়া অক্ষয়চন্দ্র সাধারণী প্রেস কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইলেন। সেই বর্ষেই শ্রাবণ মাস হইতে তাঁহার সম্পাদিত প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'নবজীবন' প্রকাশিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'নববিভাকর' পত্র সাধারণীর সহিত মিলিত হইয়া 'নববিভাকর-সাধারণী' নামে পরিচিত হইল। অক্ষয়চন্দ্রই ইহার সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ১২৯৬ সালে (১৮৮৯) 'নববিভাকর-সাধারণী' এবং 'নবজীবন'-এর প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

'সাধারণী'-সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"তখন গ্রাহকের সংখ্যা লইয়া কাগজের সম্মান হইত না। কোন খবরের কাগজের খবর যদি গবর্নমেণ্ট রাখিতেন, অভাব-অভিযোগ প্রকাশিত হইলে যদি সেই অভাব পূরণ করিতেন, অভিযোগে কর্ণপাত করিতেন, বা কখন কোন পদস্থ কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যগ্রতা দেখাইতেন, তাহা হইলে সেই সংবাদপত্রের সম্মান হইত; অর্থাৎ রাজার আদরে সর্ব্বসাধারণের কাছে সম্মান পাওয়া যাইত। আর তখন সাহিত্যের একরূপ সমাদর ছিল, এখন তাহা দেখিতে পাই না।... স্ফুটনোন্মুখ বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব সম্মান ছিল। সরস রচনার সমাদর ছিল। 'সাধারণী' সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে, সমানে সেবা করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—করিতও তাহাই। সাধারণী বলিত : ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই। সুতরাং সরল বালিকার মতন কাঁদিত, ছোট ছোট আব্দার করিত। রাজপুরুষেরা অতি ছোট ছোট আব্দারে কর্ণপাত করিতেন, বড় আব্দার করিলে এখন মুখ বাঁকান, ভর্ৎসনা করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সাধারণীর ক্ষুদ্র কথায় রাজা কর্ণপাত করিতেন বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল। আর সাহিত্যসেবাপরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালীবাবু সক্ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন, আর রাজনীতি-জড়িত সাহিত্যের সক মিটাইবার জন্য সাধারণীর জন্ম।"

এখন হইতে ষাট বৎসর পূর্ব্বে সাধারণী প্রকাশিত হইত। আমরা 'বঙ্গশ্রী'র পাঠক ও পাঠিকাগণকে প্রতিমাসে সাধারণী হইতে সঙ্কলন করিয়া ষাট বৎসর আগেকার সাহিত্য-কথা এবং বিবিধ সংবাদ ও প্রসঙ্গ উপহার দিব। আজকাল অনেকের মুখে শুনি এবং অনেকের লেখায় দেখিতে পাই,—'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি।' কিন্তু অনেকেই অবগত নহেন যে, অতি-দুঃখেই এই উক্তি স্বয়ং অক্ষয়চন্দ্রের লেখনী হইতেই সর্ব্বপ্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল। সেই আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে—যাহারা অদ্যকার ঘটনা কল্য ভুলিয়া যায়—ষাট বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা প্রতিমাসে ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

—ব° স°

[১]

সাধারণী

সাধারণী প্রকাশিত হইল। কোন বিশেষ অভাব মোচন করিবার জন্যই যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বলা যায় না।... ...

এমনই বা কে বলিতে পারে যে, বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ ও বঙ্গদেশে প্রচলিত সংবাদপত্র পরস্পরের উপযোগিতা-পক্ষে তুল্যতা লাভ করিয়াছে? কলসী যেমন জলপূর্ণ হইলে আর একবিন্দু বারিকণারও স্থান-সন্নিবেশ তাহাতে হইতে পারে না, সেইরূপ বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ সংবাদপত্রপূর্ণ হইয়াছে ?... ...

তবে কি কৃতবিদ্য সম্প্রদায় যাঁহারা আর পাঁচখানা সংবাদপত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই এই পত্রিকা পাঠ করিবেন না? এ বিষয়ে নানা সংশয় আছে। প্রথমতঃ যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা কি কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন? কই এমন লোক ত বড় অধিক দেখা যায় না। তবে আশা-ভরসার মধ্যে এই আছে যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজীনবীশ মাত্রেরই মাতৃভাষার উপর একটি বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, এখন আর তত নাই। মহাকালের অসীম ক্ষমতা। হয়ত আবার কিছুদিন পরে দেখিব যে, ইয়ংবেঙ্গলবাবু পেগ্‌টপ পেণ্ট্‌লনের পকেট হইতে বাঙ্গালীর প্রকাশিত বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির করিয়া স্বচ্ছন্দে, নাসিকাগ্রে চসমা লগ্ন করিয়া রেলওয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ির ভিতর পাঠ করিতেছেন,—তাঁহার লজ্জা হইবে না, ক্রোধ হইবে না, ঘৃণা হইবে না। কিন্তু এতদূর আশা করা দুরাশা মাত্র।

এতদূর ভরসা করা আপাততঃ দুরাশা বটে, কিন্তু তথাপি একথা বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী এখনও এত কুলাঙ্গার হয় নাই, বাঙ্গালা এখনও এত অধঃপাতে যায় নাই যে, বাঙ্গালী পাঠোপযোগী সংবাদপত্র মাতৃভাষায় দেখিলেই ঘৃণা করিয়া তাহা পদদলিত করিবে। প্রথম প্রথম বটে যখন চসর, সেক্সপিয়রের ভাষা আসিয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল, যখন শ্রীরামপুরের মিশনরিবর্গ সেই ইন্দ্রজালাচ্ছন্ন জাতির উপরি বশীকরণ-মন্ত্র ক্ষেপ করিতে লাগিল, বাঙ্গালী নানা দিকে নানা প্রলোভনে জ্ঞানশূন্য বিবেচনাশূন্য হইয়া মাতৃভাষার উপেক্ষা করাই সভ্যতার মূল বোধ করিয়া তাহাই শিক্ষা করিতেছিল, তাহার অভ্যাস করিতেছিল। কিন্তু 'তেহি নঃ দিবসা গতাঃ।' এখন বাঙ্গালী চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছে, দেশহিতৈষিতা, মাতৃভাষানুরাগ শিক্ষা করিতেছে; যাহাকে স্বদেশীয়ে ঘৃণা করে, সে অপদার্থ জীব—এ কথার সত্যতা দিন দিন উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু এখনও এমন কুলাঙ্গার বাঙ্গালী দেখিতে পাই যে, কিছু ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া সেই মদগর্ব্বে বাঙ্গালা রচনা মাত্রেই অনাদর প্রকাশ করেন। তাঁহাদের নিমিত্ত বঙ্গসমাজ নহে; তাঁহারাও বঙ্গসমাজের উপযোগী নহেন; তাঁহারা কুসন্তান। এই সাধারণী তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতেই ইচ্ছুক নহে। সাধারণী তাঁহাদের উপযোগিনী হইবে না; তাঁহারা মিষ্টর বড়াল, রেবরেণ্ড সাণ্ডেল, রায় এস্কোয়ার মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ডেলি নিউস পাঠে দিনাতিপাত করুন, বঙ্গসমাজে তাঁহাদের সংখ্যার দিন দিন হ্রাস হউক।......

বিজ্ঞের সন্তুষ্টি-সাধনের চেষ্টা করিব বটে, কিন্তু সাধারণের হিতসাধনই সাধারণীর ঐকান্তিকী বাসনা। সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই ইহার নামকরণ হইয়াছে। ইহা সাধারণের পাঠ্যপত্র; সাধারণের লেখনী, সাধারণের জিহ্বা, তাহাতেই ইহা সাধারণী।

এই স্থানে ইহা স্পষ্টই বলিয়া রাখি যে, সাধারণী সাধারণের হিতসাধনে চেষ্টা করিবে, কিন্তু সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিবে না। যদি গায়ককে সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে খেয়াল ধ্রুপদ দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়, তাঁহাকে ছেপ্‌কা, পোস্তা, খেম্‌টা লইয়া বিব্রত হইতে হয়; তাহা তিনি করেন না। সেই জন্য সাধারণীও সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিবে না। ... ...

... সকলে বলুন, সাধারণী যেন পক্ষপাতিত্ব-কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয়। তাই বলিয়া সাধারণী কি সকল মতই প্রকাশ করিবে? তাহাও নহে। এমন মতও ত কোন কোন কৃতবিদ্যের থাকিতে পারে যে, হিন্দুজাতির ক্রমেই লোপ হইয়া আসিবে, আমাদের উন্নতির চেষ্টা করা বৃথা; হিন্দুজাতির উন্নতি আর কখনই হইবে না। এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা বলেন, ইংরাজ রাজত্বের ধ্বংস না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। নানা জনের এইরূপ নানা মত আছে। এরূপ সকল মতেরই পোষকতা করা কখনই সম্ভব নহে। প্রথমোক্ত বিজ্ঞবর্গের মত আমরা নিরাশ নহি; সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ বল বুদ্ধি সাহস আছে, আর ষোল আনা ভরসা আছে। শেষোক্ত বীরগণের ন্যায়ও আমরা রাজবিপ্লবেচ্ছু নহি। সাধারণী ইংরাজ-কৃত উপকার চিরকাল স্মরণ-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে, ও কেবল কৃতজ্ঞতা-স্বীকার জন্য নহে, নিজ স্বার্থাভিলাষে, স্বদেশের স্বার্থাভিলাষে, রাজাবিপ্লবে অত্যন্ত ভীত, ও বিপ্লবকারিগণকে চিরকালই নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিবে।.....

কতকগুলি স্থির নিয়মই ইহার জীবন ও সেইগুলি ইহা অবশ্যই দৃঢ়ব্রত সংকল্পে পালন করিবে।

সেগুলি কি? পূর্ব্বেই তাহার আভাস দেওয়া গিয়াছে, এক দুই করিয়া সমস্তগুলি কখনই লেখা যাইতে পারে না। স্থূলতঃ বলা যাইতেছে—

সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালীর পক্ষপাতিনী। সাধারণী বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সাধারণের হিত কামনা করে, প্রজার মঙ্গল হয় ইহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। সাধারণী উপকার ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম জানে না, পীড়ন ব্যতীত যে অন্য কোন অধর্ম্ম আছে তাহা বোঝে না।

আর একটি কথা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমরা এই উপক্রমণিকা ভাগের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই পত্রিকা বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে,—স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা করে বটে কিন্তু রাজ্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনও ইহার বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ইংরাজে অদ্যাপি রাজা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাসন করিতেই ব্যস্ত, আইন করিতেই ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে যেমন ব্যস্ত ধনব্যয় করিতেও তেমনই ব্যস্ত, কিন্তু রাজার যে প্রধান কার্য্য প্রজারঞ্জন তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই।

আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা বিষয়ে হিন্দুপেট্রিয়ট উচিত উপদেশই প্রদান করিয়াছেন ; পেট্রিয়ট বলেন যে, এই সময়ে আমরা কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগের মহাবাক্য রাজপুরুষগণের স্মরণে আনিয়া দিতেছি :—তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, শুদ্ধ ন্যায় বিচার করিলেই হইবে না,—এরূপ ভাবে কার্য্য করিতেও হইবে যে, লোকে যেন বুঝিতে পারে যে ন্যায় বিচার হইতেছে। এই কথা ইংরাজ কর্তৃপক্ষ জপমালা করুন, তাঁহাদিগের বিচার-মন্দিরের প্রবেশ-পথে ইহা স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত করিয়া রাখুন, গবর্নমেণ্টের বিজ্ঞাপনী পত্রের, গেজেটের, সর্কুলারের শিরোদেশে ইহাই মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখুন ; ঐ মহাবাক্যই ইংরাজ রাজ-পতাকার শোভা বৃদ্ধি করিয়া অহরহঃ উড্ডীয়মান হইতে থাকুক ; এমন সারগর্ভ বাক্য আর নাই। যে রাজার উপর প্রজায় সন্দেহ করিল সে রাজা আর রাজা—রঞ্জনকর্ত্তা কই? তিনি ক্ষমতাশীল শাসনকর্ত্তা হইতে পারেন, অতিবিচিত্র নিয়ামক হইতে পারেন, দুর্দ্ধর্ষ বীর হইতে পারেন, মনীষীদিগের মাননীয় হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে রাজা বলিতে পারি না, রাজার স্বর্গীয় ভাব তাঁহাতে নাই ; রাজত্ব করিয়া যে স্বর্গীয় আনন্দ, ঐশ্বরিক সুখ তাহা তিনি পান নাই ; বোধ হয় ভারতবর্ষীয় গভর্নমেণ্ট সেই স্বর্গীয় সুখের ছায়া মাত্রও প্রাপ্ত হন নাই,—পাইলে তাহারই অনুসরণ, তাহারই উপাসনা, তাহারই ভজনা করিতেন। তাহা তাঁহারা করেন না, করিলে চারিদিক্ হইতে প্রত্যহ যে অসন্তোস-জনিত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই, তাহার দিন দিন বৃদ্ধি হইত না। সংবাদপত্র সকল রাজকার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিয়া করিয়া একরূপ জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকেও অগত্যা সেই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল। রাজপুরুষগণ একটু কর্ণপাত করিবেন।

[২]

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান বিচারক বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, এম. এ. বি. এল. কাশ্মীরে রেশমের কারবারের উন্নতি-সাধন জন্য আজি কয়বৎসর বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে মুরশিদাবাদ জেলায় রেশমের কারবার বিস্তর ; তাহাতেই তিনি বহরমপুর কালেজের পূর্ব্বতন আইন অধ্যাপক বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহরমপুরের নিকটস্থ স্থান হইতে পোলু পোষণক্ষম কতিপয় লোক ও পাকদার কাটামি প্রভৃতি জনকয়েক পাঠাইতে পত্র লেখেন, তাহারা সেখানে গিয়া কাশ্মীর মহারাজের বেতনভোগী হয় ও সেখানকার লোকদিগকে পোলু-পোষণ বিষয়ে ও রেশম-প্রস্তুত-করণ বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছে। আজ দুই তিন বৎসর পরে সেই শিক্ষার ও নীলাম্বরবাবুর সেই যত্নের যে ফল ফলিয়াছে—তাহা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া হইতে অবগত হইলাম। পূর্ব্বে আন্দাজ বার হাজার টাকার রেশম ও সেই রেশম পাঁচ ছয় টাকা করিয়া সের বিক্রয় হইত। এ বৎসর প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মন রেশম হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হইবে। .....

কাশ্মীর-রাজ ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। একটি দরবার হয়, তাহাতে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রেশম উৎপাদন করিয়াছিল বা ভালরূপে প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাদিগকে পাঁচটি সোনার, কুড়িটি রূপার মেডাল ও দুই হাজার মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। নীলাম্বরবাবুকে মহারাজ অতি মূল্যবান্ খেলাৎ প্রদান করিয়াছেন ও মহামূল্য স্বর্ণবলয় প্রদান করিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাঁহার মাসিক বেতন এক হাজার টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে তের শ ছিল এখন তেইশ শ হইল। এ সংবাদটি অতিশুভ সংবাদ বলিতে হইবে। নীলাম্বরবাবু ১৫০ টাকা বেতনে হুগলি কালেজে সংস্কৃত অধ্যাপনা করিতে আইসেন, কিছুদিন পরে প্রিন্সিপ্যালের সহিত তাঁহার একটু এদিক ওদিক হয়, তিনি অপমানিত বোধ করিয়া পদ পরিত্যাগ করেন। এখন তিনি এক রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে একটি পঞ্চাশ টাকা বেতনের কর্ম্মের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাহা পাইলেন না, অপমানিত বোধ করিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে আইন অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হইলেন ; এক্ষণে বিচারাসনে তিনিও একজন সর্ব্বেসর্ব্বা। বাঙ্গালী মধ্যে মধ্যে এইরূপ অন্তর্বিচলিত হউক, তাহা হইলে তাহাদের শান্তি-স্পৃহার হ্রাস হইবে, নানা পথ অনুসন্ধান করিবে ও কেহ কেহ কৃতকার্য্য হইবে।

[৩]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমা

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া বড় ধুমধাম, বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল। কমিসন স্থির হইয়াছে।—জজ প্রিন্সেপ অথবা বেন্‌ব্রিজ এবং আসামের ডিপুটী কমিশনর কর্ণেল ল্যাম্ব সাহেব, ইঁহারাই স্থির হইয়াছেন ও নূতন লিগাল রিমেম্ব্রান্সর ও কিনিলী সাহেব বাদীর পক্ষে তদ্বির-কারক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে অবজরবর্ যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দানের জন্য ও ধর্ম্মশীলতা প্রদর্শন জন্য সুরেন্দ্রনাথবাবুর উপর এই মকদ্দমা চালান হইতেছে। কিন্তু এত লোক থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকে লওয়া কর্ত্তব্য হয় নাই। একথা বলিবার কতকগুলি বলবৎ কারণ আছে : সুরেন্দ্রনাথ অতি কষ্ট করিয়া পবিত্র সিবিল সর্বিশে প্রবেশ করেন। যদিও রাজপুরুষগণের বক্তৃতায় ও লেখাপড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয়গণের উচ্চতর পদে নিযুক্ত হওয়া তাঁহাদের ইচ্ছা, কিন্তু পদস্থ ইংরাজেরা বাঙ্গালীর এরূপ উন্নতি মনের সহিত ঘৃণা করেন। ইংরাজেরা যে এরূপ ঘৃণা করেন, তাহা বাঙ্গালীরা অনেকে জানেন, সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে সহজেই মনে করিবেন যে, সুরেন্দ্রনাথকে যখন এই অল্প দোষের জন্য এত নিগ্রহভাজন হইতে হইতেছে—বোধ হয় দোষের দণ্ডবিধান জন্য এ উদ্যোগ নহে, কথিত দোষকারীর উপর ঘৃণাবশতঃই এত আড়ম্বর হইতেছে। সুরেন্দ্রবাবুর উপর যেরূপ দোষারোপ হইয়াছে—তিনি তাহা করিয়া থাকুন আর নাই থাকুন তাহা আমরা বলিতে চাহি না, কিন্তু এরূপ কার্য্য মধ্যে মধ্যে হইয়াই থাকে ; সাহেব শুভোতেও করিয়া থাকেন। এমন বলি না যে, দোষ নিত্য কর্ম্ম হইয়া গেল বলিয়াই তাহা দণ্ডার্হ রহিল না বরং সেই জন্য তৎপ্রতিবিধানার্থ কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করা কখন কখন কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে দৃঢ়তা সহকারে ক্রমে ক্রমে এরূপ দোষের উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া

চারিদিকের ব্যাপারে চক্ষু মুদিত করিয়া রাখিয়া হঠাৎ এক ব্যক্তির গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া আনিয়া তাহারি উপর বজ্রক্ষেপ করিলে অতি অন্যায় কার্য্য করা হয়; আবার যদি যাহার গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া আনিয়াছ তাঁহার উপর ধর্ম্মশাসকের পূর্ব্বাবধি আক্রোশ আছে বলিয়া কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে অতি অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে বলিতে হইবে। যাহাই হউক এরূপ সামান্য দোষের জন্য গবর্নমেন্টের এরূপ আড়ম্বর দেখিলে ধর্ম্ম ভান বলিয়া বোধ হয় ও সুরেন্দ্রনাথের উপর এত পীড়াপীড়ি করা বড় সুবিবেচকের কার্য্য হইতেছে না।

[৪]

নবাব নাজিম

বর্ত্তমান নবাব নাজিম সাইয়াদ মানসুর আলি গবর্নমেন্ট হইতে বাৎসরিক সাত লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়াও অনূ্যন ত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। সুদ সমেত দেনা পরিশোধ করিতে গেলে নবাবকে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইংরাজ গবর্নমেন্টের এরূপ অভিপ্রায় নহে। আজও তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন নাই যে, এই নবাব-বংশের হস্ত হইতে তাঁহারা সমুদায় বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার অধিকার প্রাপ্ত হন। দেশীয় কোন কোন সংবাদপত্র বলেন যে, পুরুষানুক্রমে নবাবকে এত টাকা বৃত্তি দিতে আমরা গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিই না, ক্রমে টাকা কমান কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা তাহা বলি না। ইংলণ্ডের একশত জনকে বৃত্তি না দিয়া ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালার নবাবকে বাৎসরিক সাত লক্ষ টাকা দিতে দেখিলে আমাদিগের মনে নানা ভাব উদয় হয়। সে যাহা হউক, গত সপ্তাহে বলা হইয়াছে যে, নবাবকে দেনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট হইতে একটি আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, গবর্নর জেনারেলের অনুমতি ব্যতিরেকে নবাব নাজিমের নামে কোন দেওয়ানি নালিশ হইতে পারিবে না। এরূপ অভিযোগ গবর্নর জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিসনরদিগের নিকট করিতে হইবে। তাঁহারা যাহাকে যত টাকা দিতে বলিবেন, গবর্নর জেনারল তাহা দিবেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ষ্টেট্ সেক্রেটারী বা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট নবাবের দেনার জন্য দায়ী নহেন। ভবিষ্যতে নবাব দেনা করিতে অপারগ হইলেন।

[৫]

মৃত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

দীনবন্ধুবাবু আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার হাসি হাসি মুখ দেখিতে পাইব না। সে কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইব না।

১৭ই কার্ত্তিক শনিবার দীনবন্ধুবাবু মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার একচল্লিশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

তিনি যে নাই তাহা আমাদের এখনও বিশ্বাস হইতেছে না। মনে হইতেছে এবার কলিকাতায় গেলেই তাঁহার সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ করিব। কোথায় যাইব? কাহার সঙ্গে দেখা করিব? দীনবন্ধুবাবু কি আর আছেন। উঃ ভাবিতে গেলে বুক বিদীর্ণ হইয়া যায়। পোড়া জীবনচরিত কি লিখিব? কিছু কি স্মরণে আসিতেছে, কিছুই মনে আসিতেছে না। সংবাদপত্র চালানর এইগুলি নিগ্রহ। যাহার জন্য বিরলে কাঁদিব, কাঁদিতেছি—তাহার কথা ছাপাইতেই হইবে। কি যন্ত্রণা! শোক কি কাগজে ধরে, না কলমে বাহির হয়।

দীনবন্ধুবাবুর জীবনের প্রতিদিনের বৃত্তান্ত লিখিলেও ত আর এক দিনও তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। যে যায় সে আর ত ফেরে না।

বেঁচে থাকি ত কত রায় বাহাদুর দেখিতে পাইব; কত ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্ট মাষ্টার দেখিব, কত বিদ্বান্ লোক দেখিতে পাইব, কত লোক কত ভাল ভাল নাটক হয় ত লিখিবেন; সকল দুঃখই মিটিবে; কিন্তু সে দীনবন্ধুকে আর দেখিতে পাইব না, সে মিষ্ট কৌতুক শুনিয়া আর ত হাসিব না। কি দুঃখ! তিনিই হাসাইতেন, তিনিই কাঁদাইয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গকে অকূলে ভাসাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আটটি পুত্র, একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের গত বৎসর বিবাহ হইয়াছে মাত্র; এখনও বালক। ইঁহাদের দশায় কি হইবে? জগদীশ্বর আছেন।

বঙ্গদেশে এমন ভদ্রলোক নাই যিনি দীনবন্ধুবাবুকে জানেন না। কাহারও মুখে কখন তাঁহার নিন্দা শুনি নাই, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তাঁহার বন্ধু-সংখ্যাও বিস্তর। সকলেই তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে।

আমাদের এমন বিদ্যা বুদ্ধি বয়োগৌরব নাই যে তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করি। তথাচ তিনি আমাদিগকে কত আদর করিতেন, কত স্নেহ করিতেন, কত ভালবাসিতেন।

নীল-দর্পণের প্রণেতার জন্য দরিদ্র প্রজারা কাঁদিতে থাকুক, লীলাবতীর জনকের জন্য কুলীন-কন্যা কাঁদিতে থাকুক, আমরা দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিতে থাকি।

যমুনার ক্রোড় শূন্য হইয়াছে। যে চৌবেড়ে গ্রাম ঘেরিয়া লইয়া যমুনা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতেন, সেই চৌবেড়ে আজ অন্ধকার। যমুনা কাঁদিতে কাঁদিতে ভগিনী সুরধুনীকে কলকল রবে সংবাদ দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে দুই সহোদরায় কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দীনবন্ধু কি কলিকাতায় আছেন? দীনবন্ধু কি বঙ্গে আছেন? দীনবন্ধু কোথাও নাই। দীনবন্ধু স্বর্গে।

[৬]

সংবাদ

কলিকাতার প্রসিদ্ধ নাখোদা মহাজন হাজি জাকেরিয়া ১৮ই অক্টোবর মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রায় দুই সহস্র মুসলমান ইঁহাকে সমাধি-শায়িত করিতে শবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল। ফৌজদারি বালাখানা মসজিদের ব্যয়-নির্ব্বাহ ইঁহার দ্বারাই হইত।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কান্তিচন্দ্রের জন্য দুঃখ হইতেছে। উলা-নিবাসী কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষণে কাথিড়াল মিসন কালেজে সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন।……, গত ২৬এ আশ্বিন তিনি দুই দিনের জ্বরে আন্দাজ ৩২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত কালেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র এবং নদে জেলার একটি অলঙ্কার ছিলেন।

লণ্ডন ইউনিবার্সীটি কালেজে বাবু প্রসন্নকুমার রায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. বি. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আগামী ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় ঘোটক-প্রদর্শন হইবে। গবর্নমেণ্ট বিশ হাজার টাকার পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

*
* *

হালিবরি কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কানন মেলবিলের পুত্র আর. জি. মেলবিল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লাহোরের একটি খানসামার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যাটির বয়স ১০ বৎসর। ইনি পঞ্জাব গবর্নমেণ্টের অধীনে সিরশর একটিং ডিঃ কমিশনার ছিলেন। কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

গত সোমবারে রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে আগ্রা হইতে ভারতপুর খুলিয়াছে ও আউড্ এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ি লাক্ষ্ণৌ হইতে বেরেলা প্রথম চলিয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব সোমবারে বিতস্তা নদীর উপরি সেতু সম্পূর্ণ হইয়াছে ও গাড়ি চলিতেছে। শতদ্রুর সেতু শীঘ্র প্রস্তুত হইবে।

*
* *

লণ্ডন নগরে সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সেখানে একটি শিবমন্দিরও নাকি সংস্থাপিত হইয়াছে। শিবমন্দির না হইয়া একটি কালীবাড়ী হইলেই ঠিক হইত।

চীন দেশীয় বিখ্যাত চ্যাং নামক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ কলিকাতায় আসিয়াছেন। এ ব্যক্তি আট ফুট লম্বা, দেখিতে সুশ্রী এবং লেখাপড়া বেশ জানেন।

*
* *

নূতন সিবিলিয়ন বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বরিশাল জেলায় কর্ম্ম করিবেন।

*
* *

এখনকার প্রধান প্রধান বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র-সম্পাদকেরা প্রায়ই মদ খান না। হিন্দুপেট্রিয়ট্, বেঙ্গলি, ন্যাশনল পেপর, অমৃতবাজার পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট ও সোমপ্রকাশের সম্পাদকগণ মদ খান না। আমেরিকার (পৃথিবীর বলিলেও হয়) প্রধান সংবাদপত্র নিউইয়র্ক ট্রাইবুনের প্রধান সম্পাদক হোরেশ গ্রিলী মদ খান না এবং মৎস্য-মাংস প্রায়ই খান না। সাধারণীর একটু ভরসা হইল।

*
* *

অদ্য পর্য্যন্ত ১৩৯খানি সমাচার-পত্র এবং সাময়িক পত্র কলিকাতা পোষ্ট আফিসে রেজিষ্টরি হইয়াছে। চুঁচুড়া হইতে পাঁচখানি পত্র প্রকাশিত হইতেছে,- (১) এডুকেশন গেজেট, (২) বেঙ্গল মেগাজিন, (৩) চিকিৎসা-দর্পণ, (৪) চন্দননগর পত্রিকা, (৫) সাধারণী। আর ওপারে কাঁটালপাড়া হইতে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইয়া থাকে। এটি আমাদের আত্মশ্লাঘার সংবাদ। *

* [১১ কার্ত্তিক (২৬ অক্টোবর) হইতে ২৫ কার্ত্তিক ১২৮০ (৯ নবেম্বর ১৮৭৩) পর্য্যন্ত তিন সংখ্যা পত্রিকা হইতে শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।]

সাময়িকী

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

কাঁদিয়া ফিরিয়া গেছে বসন্তবায়ু,
　　উষর আকাশে উড়িছে ধূসর ঝড়,-
স্তিমিত প্রদীপ, ক্ষীণ ক্রমে পরমায়ু—
　　মৃতে ও অতীতে অসহায় নির্ভর!

দিগন্ত ছায় উন্মাদ বৈশাখ,
　　বন্ধু, তাহারে বরণ করিয়া লহ,—
মাটির আঁধারে মূল সে গোপন থাক্—
　　আমরা সকলে ফুলের বার্ত্তাবহ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : রবীন্দ্রনাথ (১)

-শ্রীসুকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক মাসে, "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব" নামক পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে। প্রবন্ধটীর নাম ছিল "ভুবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখ সঙ্গিনী।" ইহার বিষয় বস্তু ছিল ঐ কবিতা বই তিনটীর সমালোচনা। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স পনেরো। তাহার পর "ভারতী" পত্রিকায় (তৃতীয় বর্ষ, ১৮০১ শক=১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) "য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র" বাহির হইতে থাকে। তাহার পর "বৌঠাকুরাণীর হাট" ও কিছু কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচনা ভারতীতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহার পর "বালক" পত্রিকায় (১২৯২ সাল) রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস "রাজর্ষি"-র কিয়দংশ প্রকাশিত হয়, এবং পর বৎসর ইহা সম্পূর্ণভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহার পর কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য বড় লেখা বা বই বাহির হয় নাই। ১২৯৮ সাল হইতে "সাধনা" পত্রিকার যুগ আরম্ভ। তখনই রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ক্ষমতা বাঙ্গালা গদ্যকে এক অপরূপ রূপ দান করে। তাহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা বাহির হইয়াছে, এবং তাহাতে নানা প্রকার গদ্য-ভঙ্গি বাঙ্গালীকে তৃপ্তি ও বিস্ময় দিয়া আসিতেছে আর বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকে বিচিত্র অলঙ্কারে ও অপরূপ ঐশ্বর্য্যে ভূষিত করিয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত অদম্য এত স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে তাঁহার হস্ত (বার্দ্ধক্য বশতঃ) ক্লান্ত হইলেও লেখনী এখনও ক্ষান্ত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘকালব্যাপী গদ্যরচনার মধ্যে, গদ্য-ভঙ্গির অভিব্যক্তি এবং রস-সৃষ্টি ও ভাববৈচিত্র্যের দিক দিয়া দেখিলে, তিন চারিটী বা ততোধিক স্তরবিভাগ পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময় রচনামালার মধ্যে বাহ্যতঃ অনেক সময় ঐক্যসূত্র মিলে না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে রচনারীতিগত একাধিক ঐক্যসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এই গুলিকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মূলগত বিশেষত্ব বলিতে হয়। রচনার কালগত ও পর্য্যায়গত স্তর-বিভাগের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির মূলগত বিশেষত্বগুলির আলোচনা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই করা যাইতেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে কালগত ও পর্য্যায়গত স্তর-বিভাগের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য মুখ্য গদ্য রচনার ভাষা ও ভঙ্গির বিশ্লেষণ করিব।

রবীন্দ্রনাথের যে কোন গদ্য রচনা একটুখানি পড়িলেই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য হয় তাঁহার বলিবার অনন্যসাধারণ, বিশিষ্ট ভঙ্গি। (এখনকার দিনে, বিশেষতঃ কতকগুলি লেখকের রচনায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষা এতদূর আত্মসাৎ করা হইয়াছে যে, হঠাৎ পড়িলে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়াই ভ্রম হয়। যেমন হাতের লেখায়, তেমনি কবিতায় এবং সেই পরিমাণে গদ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এখনকার দিনে অ-সুলভ নহে। অবশ্য এটাও ঠিক কথা যে, আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে রবীন্দ্রী ভঙ্গি একটি বিশেষ স্থান করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় আত্মসাৎকৃত রবীন্দ্রী ভঙ্গি এক জিনিষ, আর রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান অনুকরণ আর এক জিনিষ।) আর এই বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে নজরে পড়ে অলঙ্কারশালিত্ব অর্থাৎ বাক্যালঙ্কারের সমধিক ব্যবহার। এ-কথা হয়ত অনেকের কাছে নূতন ঠেকিবে যে, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যত লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অলঙ্কারপ্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথের কাছ ঘেঁষিয়া যাইতে পারেন এমন কেহই নাই। ইহাতে কেহ যেন বুঝিয়া না বসেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাহা হইলে বুঝি ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষের দলে পড়িলেন। (বাণভট্টের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক ধরণের লেখার কতকটা সাধর্ম্ম্য দেখা যায়, কিন্তু দীর্ঘ সমাস-প্রিয়তায় নহে!) ইচ্ছা করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, বাছিয়া গুছাইয়া রবীন্দ্রনাথ বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগ করেন নাই, ইহা তাঁহার লেখনীর মুখে আপনিই আসিয়া গিয়াছে, এবং সেই জন্য তাঁহার ভাষা অলঙ্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত না হইয়া অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কবি, এবং তাঁহার কবিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের সহিত ওতপ্রোত। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কবি-সুলভ অলঙ্কারের প্রয়োগ অপরিহার্য্য।

শুধু বুদ্ধির উদ্বোধ করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া, একেবারে মনের অন্তঃপুরে পৌছাইয়া হৃদয়ের অজ্ঞাত, সুপ্ত, কোমল অনুভূতিকে জাগাইয়া দেয়—ইহা রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির

প্রধানতম গুণ। এই বিষয়েই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত অন্যান্য গদ্যলেখকদিগের রচনার প্রবলতম পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কবিজনোচিত গভীর সহানুভূতি এবং কাব্যসুলভ বাক্যালঙ্কার প্রভৃতির প্রয়োগই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (এখানে গদ্যের ভাষায় বুঝিতে হইবে) প্রধানতঃ উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক (metaphor), শ্লেষ এবং বিরোধ (antithesis)—এই বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগই সব চেয়ে বেশী। অপর দুই একটী অলঙ্কারেরও অল্প স্বল্প প্রয়োগ আছে।

এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে আবার উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। ইহার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের সকল সময়ের, সকল পর্য্যায়ের ও স্তরের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ দিতেছি। (অলঙ্কারগুলির উদাহরণ কিছু বেশি পরিমাণেই দেওয়া যাইতেছে, যেহেতু সকল কালের এবং সকল স্তরের লেখা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া অলঙ্কারগুলির বিচিত্র প্রয়োগ দেখান এই আলোচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক।)

যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত১ সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলা-রাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। [ভুবন মোহিনী প্রতিভা- (জ্ঞানাঙ্কুর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩)]।

অন্ধকার এক-পা-এক-পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোল ঘেঁসিয়া অতিকাছে আসিয়া দাঁড়াইল ! [বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, দশম পরিচ্ছেদ]।

—বৃষ্টি বিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। [রাজর্ষি২, পৃঃ ১৪]।

তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝাইয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার ত তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্ত্তী পথিক আসিয়া হয়ত বুঝিতে পারিবে ; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে না পড়িল, তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মত ফুটিয়া হয়ত ঝরিয়া যাইবে কিন্তু তাই বলিয়া বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাষ্য দ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না। [কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট। (ভারতী ও বালক, ১২৯৩ সাল, পৃষ্ঠা ৭১৪)]।

বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল--[গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ]।

শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। [গল্পগুচ্ছ : প্রায়শ্চিত্ত]।

—এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে—[গল্পগুচ্ছ : বিচারক]।

—শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। [গল্পগুচ্ছ : ক্ষুধিতপাষাণ]।

একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল--[গল্পগুচ্ছ : ফেল্]।

—মনটা সহসা একটা বোঝা হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। [গল্পগুচ্ছ : একরাত্রি]।

এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তবেদনা যেন আমার সকলশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল—[গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক

কিন্তু বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশুমুখ বিনোদিনীকে সকল কর্ম্মের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। [চোখের বালি। (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৩৪১)]।

নীরব নেত্রের যেখানে অধিকার আছে, বাক্যের পক্ষে সেখানে পদার্পণ স্পর্দ্ধামাত্র। [নৌকাডুবি। (বঙ্গদর্শন, ১৩১০ সাল, পৃঃ ৩৭)]।

আজিকার এই নদীতীরের শরৎসন্ধ্যা তাহার জগদ্ব্যাপী বৃহৎ অবসান-বেদনার নিস্তব্ধতায় রমেশের সেই গতজন্মকে আচ্ছন্ন করিয়া এই শুষ্ক-কুলায় আম্রবনে, ঐ তৃণশূন্য বালুতটে, এই তরঙ্গরেখাবিহীন বিপুল জলরাশির উপরে একাকিনী অবগুণ্ঠিতমুখে ক্ষীণজ্যোৎস্ন আকাশতলে দাঁড়াইয়া আছে। [নৌকাডুবি। (ঐ, পৃঃ ৪৬৩)]।

যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। স্বদেশী সমাজ। (বঙ্গদর্শন, ১৩১১ সাল, পৃঃ ২৩৯)]।

বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে। গোরা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৮]।

পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধ ভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠ-দেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। [জীবনস্মৃতি। (প্রবাসী, ১৩১৮ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩)]।

এইসকল দুষ্প্রাপ্য সুন্দর জিনিষগুলি অন্তঃপুরের দুর্লভতাকে আরো কেমন রঙ্গীন করিয়া তুলিত। [জীবনস্মৃতি। (প্রবাসী, ১৩১৮ সাল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১২)]।

১ মূলে 'প্রস্রবন'-আছে। ২ ১৩৩১ সালের সংস্করণ।

—অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জ্জন, কেবল দুইধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছড়াইতেছে। [জীবনস্মৃতি। (ঐ, পৃঃ ৪১৮)]।

জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন বানিয়ে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়—অন্য সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে। [ঘরে বাইরে (সবুজপত্র, ১৩২২ সাল, পৃঃ ১৪৩)]।

তাঁকে না-দেখিতে-পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মত আমাদিগকে এদিক ওদিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। [চতুরঙ্গ, পৃঃ ৫৮]।

আজ মেঘলা দিনের সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপ্‌টে মরচে। [লিপিকা: মেঘলা দিনে]।

একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস ক'রেচে রাহুর মতো। [যোগাযোগ, ১৩৩৬ সাল, পৃঃ ২৪৬]। ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার একটা বিশেষ প্রয়োগ (idiom) এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রয়োগ আর কিছুই নয়, কেবল ভাববাচক বিশেষ্যের ব্যক্তি বা বস্তুবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহার এবং তদনুযায়ী বিশেষণ অথবা বিশিষ্ট প্রত্যয়াদির প্রয়োগ। এই উৎপ্রেক্ষা-মূলক বিশিষ্ট-প্রয়োগের (idiom) সহিত অনেকাংশে ইংরেজি অলঙ্কার Hypallange বা Transferred Epithet-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য বা মিল আছে। এই প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

বিজন মহত্ত্ব, হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা, একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য, সুমধুর চাঞ্চল্য, বেদনাপূর্ণ বিদারণ রেখা, নীরব উপেক্ষা, শঙ্কিত কৌতূহল, উন্মুক্ত যৌবনের প্রাচুর্য্য, শব্দহীন দীপ্ত সমারোহ, নির্জ্জন দারিদ্র্য, কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা, উদ্ধত পৌরুষ, উন্মত্ত সন্দেহ, চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ, অন্ধ ইচ্ছা, ক্ষমাহীন চিরবিদ্বেষের নীরব ক্রোধানল, উৎপাতহীন শূন্যতা, অপমানিত কবিত্বের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস, অপরাধগুলা নির্জ্জীব এবং সরল, একটা হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবাহ, একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ, বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতা, নির্লিপ্ত সুদূরতা, বিশ্রামবিরতা গ্রামশ্রী, সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে, সঙ্কীর্ণ নীরসতা, নিরর্থক আয়োজন, খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার, নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা, কাতর সঙ্কোচ, চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্য, প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণাম, নিরুপায় নৈপুণ্যহীনতা, নির্ব্বাক নিরীহতা, তারাখচিত অন্ধকার, অশ্রুসিক্ত ভালবাসা, অপক্ষপাত দ্রুততা, অশ্রুজলপ্লাবিত সুগভীর মৌন, অশ্রুপূর্ণ অভিমান, আত্মবিস্মৃত কলরব, নীরব একাগ্রতার ভাষা, অশ্রুহীন কাতরতা, দরিদ্র আয়োজন, নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায়, সন্দেহের ক্ষুদ্রতা, নিবিড় সামাজিকতা, উদ্ধত অবিনয়, সাড়ম্বর কৃত্রিমতা, সোনালি রঙের মাদকতা, সোজা লাইনের তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা, গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তি, উদার বাঁধ্যবান সহিষ্ণুতা এই সকল সকরুণতার মধ্যে, জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয়, একটা কালো ক্ষুধা, কঠোর অবাধ্যতার ইসারা, কোথাকার কোন ঔদাসীন্য, জীবনটা বিবর্ণ বিরস এবং চির অভুক্ত, কৌতূহলী কল্পনা, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, বোবা অন্ধকার, পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাত, বোবা একটা ব্যথা, নিবিড় বর্ত্তমান, বোবা গভীরতা, কাঁচা সঙ্কোচ; বৃদ্ধ অশুচিতা: ইত্যাদি।

এখন প্রকৃত Hypallange বা Transferred Epithet এর কিছু উদাহরণ দিতেছি। এইরূপ প্রয়োগও সুপ্রচুর আছে।

গৌরমসৃণ মুখের গর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতি, বিরাট বিরহীবক্ষ, বিজন বিনিদ্র শয্যা, ঋষির করুণার্দ্র কবিত্ব, কর্ম্মহীন শরৎমধ্যাহ্ন: ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষা-মূলক এই প্রয়োগের সম্পর্কযুক্ত আর একটী বিশিষ্ট প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যে দেখা যায়। সেটি হইতেছে বস্তু-বাচক বিশেষ্য অথবা বিশেষণের পরিবর্ত্তে ভাব-বাচক বিশেষ্যের প্রয়োগ (use of the abstract for the concrete or for a qualitative adjective)। যেমন,—

অরণ্যে সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না।

তাঁহার নিজগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না।

- শূন্য উঠানের শূন্যতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অপরিচিত দেশের অনাশ্রয় ও অপরিচিত লোকের অসমত্ব হইতে ছুটি লইয়া কোনো একটা নিভৃত জায়গায় আরামে স্থায়ী হইয়া বসিবার জন্য তাহার সমস্ত শরীর মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

পূজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু ভৃত্যে, ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাহাই হোক্ ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষার পরই উপমা এবং রূপকের বাহুল্য লক্ষিত হয়। পর পর উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। উপমারও নানা রকম ভেদ যেমন শ্লিষ্ট উপমা, প্রতিবস্তূপমা, মালোপমা, ইত্যাদি, এ সকলও রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় দুর্ল্লভ নহে। এই সকলের উদাহরণও নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির ভিতর মিলিবে।

উপমা—

তাঁহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ আছড়াইতে থাকে। [বৌঠাকুরাণীর হাট, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।]

সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। [কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট। (ভারতী ও বালক ১২৯৩ সাল, পৃঃ ৭১৭)]।

নদীটি বাংলা দেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মত; বহুদূর পর্য্যন্ত তার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কুল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; [গল্পগুচ্ছ : সুভা]।

সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশুপঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জ্জাইস্ অক্ষরের ছোট বড় নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। [গল্পগুচ্ছ : মুক্তির উপায়]।

গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। [গল্পগুচ্ছ : মানভঞ্জন]।

শাবকহীন মুরগী যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। [গল্পগুচ্ছ : প্রতিবেশিনী]।

কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্ত্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় দুগ্ধভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। [চোখের বালি]।

বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা সহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মত ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। [গোরা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৮]।

দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মত, লুচি কয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত। [জীবনস্মৃতি]।

প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। [জীবনস্মৃতি]।

তখনো দেখিলাম, মুখে সেই জ্যোতি— যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে। [চতুরঙ্গ]।

সমুদ্রের পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ-প্রণামের মত নত হইয়া পড়িল। [ঐ]।

—ও কোন্ ঘরের বউ গা! যেন নির্ম্মাল্যের ফুল। [লিপিকা : সুয়োরাণীর সাধ]।

রূপকের ব্যবহার উপমার তুলনায় বিশেষ কম নহে। উদাহরণ—

—এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ আষ্টে পৃষ্টে মূল বিস্তার করিয়াছে। [ভুবন মোহিনী প্রতিভা—]।

—তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। [গল্পগুচ্ছ : যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ]।

—হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া—[গল্পগুচ্ছ : মণিহারা]।

—লোকালয়ের নয়নপ্রাচীরের মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের এমন মহান সুযোগ মিলিত কোথায়? [গ্রাম্যসাহিত্য]।

—তাহা সাধ্বী-নারী-হৃদয়ের অতিনিভৃত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্ম্মল প্রেমের সঙ্গীত। [চোখের বালি]।

সেই ভাবগভীর মুখ, সেই নির্ম্মল ললাটের উপর জলভারনম্র নবনীরদের মত স্তম্ভিত কেশরাজি, সেই সুকুমার গ্রীবা, সেই তরুণ তনুদেহে কোমল শাড়ীটির তরঙ্গিত অঞ্চলরেখা, সেই স্নিগ্ধবিশ্বস্ত দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা আজ সায়াহ্নের ম্লানিমা হইয়া, সন্ধ্যাতারার সুদূরতা হইয়া, তরুপ্রচ্ছন্ন গ্রামের নিভৃত-নিস্তব্ধ বিশ্রাম হইয়া, জনশূন্য বালুতটের দিগন্তবিস্তারিত পাণ্ডুরতা হইয়া বিশাল প্রকৃতির মূক-বৃহৎ অব্যক্তভাষায় জলে-স্থলে-আকাশে,— চন্দ্রের অস্ফুটআলোকে ও বনের প্রগাঢ়চ্ছায়ায়,—নদীর স্তিমিত-গোপন গতিতে ও তটভূমির তিমিরাচ্ছন্ন গম্ভীর নিশ্চলতায় অপরূপভাবে ভাষান্তরিত হইতে লাগিল—[নৌকাড়ুবি (বঙ্গদর্শন, ১৩১০ সাল, পৃঃ ৪৬৩)]।

—নানাবিধ চৈতালি ফসলের স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিকে সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। [জীবনস্মৃতি]।

সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। [ঘরে বাইরে (সবুজপত্র, ১৩২২, পৃঃ ৩১১)]।

—অসাড়তার একটা পাৎলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। [চতুরঙ্গ]।

সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দেননি। [নামঞ্জুর গল্প (প্রবাসী, ১৩৩২ সাল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫০)]।

আজকের দিনে এই যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে। [শেষের কবিতা (প্রবাসী, ১৩৩৫ সাল, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৬৫৬)]।

উপমার ভঙ্গি (এবং কতক অংশে উৎপ্রেক্ষারও) বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। কালিদাসের পর এক বাণভট্ট ছাড়া আর কোন কবি উপমার এইরূপ মৌলিকতা ও প্রাচুর্য্য দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অল্প দুই একটী উপমার ভাব রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য হইতে লইয়াছেন। যেমন—

লাবণ্যলেখা পশ্চিমপ্রদেশের নবনীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া নির্ম্মল শরৎকালের নির্জ্জননদীকূললালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মত হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল। [গল্পগুচ্ছ : রাজটীকা]।

(ইহার সহিত তুলনা করুন কুমারসম্ভবের এই শ্লোক—

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।

নির্বৃত্তপর্জ্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ [৭।১১] ॥)

ব্যর্থ বেশবিন্যাসের আক্ষেপ বহন করিয়া একটী মৃদু সুগন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। [নৌকাডুবি]।

(এই বাক্যটি কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গের ৭৫ সংখ্যক শ্লোকটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।)

ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট শান্তি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে! [নৌকাডুবি]।

(ইহার সহিত তুলনীয়—

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।

মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ [কুমারসম্ভব ৩।৪১] ॥)

তাঁহার গাম্ভীর্য্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। [গল্পসপ্তক : হৈমন্তী]।

(ইহার মূল মেঘদূতের এই শ্লোকার্দ্ধ—

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং

রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥)

উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ ইংরেজি হইতেই পাইয়াছিলেন। উপমার ভাব ইংরেজি হইতেও কিছু কিছু লইয়াছেন। কিন্তু এ সমস্তই তিনি বেমালুমভাবে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়াছেন, বিদেশী ভঙ্গি বলিয়া এতটুকুও বুঝিবার যো নাই। তবে অল্প দুই এক স্থলে একটু বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ অনবধানতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইংরেজি হইতে গৃহীত বিসদৃশ উপমা ও উৎপ্রেক্ষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতীর মাঝখানে প্রলয়ঝঞ্জার মত পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। [গল্পগুচ্ছ : উদ্ধার]।

লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। [গল্পগুচ্ছ : একরাত্রি]।

—কোনো একটা বাড়ীর দিকে চাহিয়া কথনো এ-কথা মনে হয় না যে, হয়ত এই মুহূর্ত্তেই এই গৃহের কোনো একটা কোণে সয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে! [ডিটেক্‌টিভ্]।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। [চোখের বালি]।

আশার ঘোমটার মধ্যে তুমুল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। [ঐ]।

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। [ঐ]।

—এই প্রকারের একটা সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল। [গোরা]।

—সেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। [গল্পসপ্তক : হৈমন্তী]। ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষা ও উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রিয় অলঙ্কারবিষয়-বস্তু আছে। এই অলঙ্কার-বস্তুগুলি তিনি একাধিক স্থলে—প্রত্যেক বারেই অবশ্য কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিতভাবে - ব্যবহার করিয়াছেন। সকল কবিরই এই রকম থাকে। কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি।

(১) 'দরখাস্ত-নালিশ' সম্বন্ধীয়—

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। [কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট]।

যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি? [স্বদেশী সমাজ]।

--যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে। [চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস]।

(২) 'কালী-বই' সম্বন্ধীয়—

তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালী গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। [গল্পগুচ্ছ : জীবিত ও মৃত]।

বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল—বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালী দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বেকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল। [চোখের বালি]।

(৩) 'দিবা-দ্বিপ্রহর' সম্বন্ধীয়—

সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন। [গল্পগুচ্ছ : সুভা]।

—তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক। [গল্পগুচ্ছ : মহামায়া]।

—তাহা মধ্যাহ্নের মত সুস্পষ্ট অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে। [গল্প চারিটি : দর্পহরণ]

(৪) 'বেদনা' সম্পর্কীয়—

—যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। [গল্পগুচ্ছ : পোষ্টমাষ্টার]।

তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালবাসা উগ্র একটা বেদনার মত বিষম টন্‌টনে হইয়া উঠিল। [গল্পগুচ্ছ : শাস্তি]।

এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্ব্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল—[গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক]।

জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে। [গ্রাম্য সাহিত্য]।

(৫) 'মদ্য' সম্পর্কীয়—

—যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্ত-নয়ন মাতালের কুজ্ঝটিকাময় ঘূর্ণ্যমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া—[বৌঠাকুরাণীর হাট]।

ক্ষমতামদ মদিরার মত তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। [রাজর্ষি, পৃঃ ১২৭]।

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। [চোখের বালি]।

দুচার লাইন পড়িবামাত্র একটা সুখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মত মনকে চারিদিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। [ঐ]।

এদিকে সেই কর্ম্মহীন শরৎ মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা সহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মত আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। [জীবনস্মৃতি]।

হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল। [চতুরঙ্গ : দামিনী]।

উঠে দেখি গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। [লিপিকা : বাণী]।

(৬) 'শিশু' বিষয়ক—

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মত ঊর্দ্ধমুখে শয়ান রহিয়াছে। [নৌকাডুবি]।

একদিকের গৃহশ্রেণী সহাস্য নিদ্রিত গৌরতনু উলঙ্গ শিশুদের মত ধব্‌ ধব্‌ করিতেছে। [ঐ]।

ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল সকালবেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মত নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়াছে। [গোরা, পৃঃ ৪১]।

(৭) 'নদী-সরোবর' সম্বন্ধীয়—

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখিনি। মনে হল, নদী যেন চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েচে। [লিপিকা : বাণী]।

—ঝরণা স্পর্ধা পেয়ে যেমন সরোবর হ'য়ে দাঁড়ায়। [শেষের কবিতা]।

(৮) 'যবনিকা' সম্বন্ধীয়,—

যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দ্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। [গল্পগুচ্ছ : শুভদৃষ্টি]।

—তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ম্ময় যবনিকার মত পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল। [গোরা, পৃঃ ৫]।

পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল। [জীবনস্মৃতি (প্রবাসী, ১৩১৯, পৃঃ ১৩৭)]।

এইরকম আরও অনেক শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। দিগ্‌দর্শন হিসাবে আমি কিছু করিয়া দিলাম।

রূপকের পরই শ্লেষালঙ্কারের নাম করিতে হয়। শ্লেষ রবীন্দ্রনাথের গন্ত লেখায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাণভট্টের তুলনার কথা মনে আসে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সরসতার (humour) খাতিরে রবীন্দ্রনাথ শ্লেষের প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্লিষ্ট উপমাদির উদাহরণ কিছু কিছু পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন বিশুদ্ধ শ্লেষের কিছু উদাহরণ দিলাম।

—ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, পুরুৎ হইতে পুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, মুগ্ধবোধের সূত্র টুক্‌রা টুক্‌রা এবং বিদ্যাবাগীশের টীকা আগুন হইয়া উঠিত। [বাংলা ব্যাকরণ (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৪৫১)]।

তখনো ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ব্য-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। [জীবনস্মৃতি]।

প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এত বড় কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া? [গল্পসপ্তক : হালদার-গোষ্ঠী]

তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল। [গল্পসপ্তক : হৈমন্তী]।

মানুষের যোগ যদি সংযোগ হয় ত ভালই, নইলে সে দুর্য্যোগ। [শিক্ষার মিলন (প্রবাসী, ১৩২৮ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৮৪)]।

অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে—[নামঞ্জুর গল্প]।

ইংরেজী ছাঁদে রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হলো বৃদ্ধি। [শেষের কবিতা]।

অন্যান্য অর্থালঙ্কারের মধ্যে Synecdoche, Metonymy, Epigram, Oxymoron, (বিরোধাভাস) Zeugma (দীপক), Litotes, আক্ষেপ ইত্যাদির প্রয়োগও নিতান্ত অল্প নহে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

Synecdoche—

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। [রাজর্ষি, পৃঃ ১৬২]।

—অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটীরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হৃতাশ্বাস ভীত হৃদয়। [গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ]।

—এমন সময় দরজার বাইরে নির্জ্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। [নামঞ্জুর গল্প]।

Metonymy—

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। [চোখের বালি]।

—সে যেন সৌন্দর্য্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া—[ঘরে-বাইরে (সবুজপত্র, ১৩২২, পৃঃ ২৮৮)]।

Epigram—

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাব-সিদ্ধ বিধাতা-দত্ত সুমহৎ বর্ব্বরতা হারাইয়া—[গল্পগুচ্ছ : মণিহারা]।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কিনা জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। [চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস]।

—তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিলনা, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। [গল্পসপ্তক : হালদারগোষ্ঠী]।

—মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। [গল্পসপ্তক : হৈমন্তী]।

তাজমহলকে ভাললাগাবার জন্যই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার। [শেষের কবিতা]।

Oxymoron—

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার রকম সকম দেখিয়া—[গল্পগুচ্ছ : একটা আষাঢ়ে গল্প]।

যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চ-কলহাস্যে ছুটিয়া—[গল্পগুচ্ছ : ক্ষুধিতপাষাণ]।

Zeugma (দীপক)।

অনেক রাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল—[গল্পগুচ্ছ : মণিহারা]।

—মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ। [বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য (সাধনা, ১৩০১-০২ সাল, প্রথমভাগ, পৃঃ ৫৬১]।

আক্ষেপ (তুলনীয় Litotes)—

রমেশ ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা করিতে যাইত, কিন্তু ভগ্নীর সঙ্গেও দেখা হইয়া পড়িত—সেরূপস্থলে যোগেন্দ্র কোন কারণে উপস্থিত না থাকিলেও রমেশ অত্যন্ত হতাশ হইত না। [নৌকাডুবি]।

শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন একথা যদি কোন পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই। [জীবনস্মৃতি]।

কলিকাতার এই সহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব-শক্তি আমার নাই। কিন্তু দিন-গুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয় ছুটিয়াও নয় একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল। [চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস]।

Antithesis (আবৃত্তি)—এই অলঙ্কার রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভাষার একটা প্রধান বিশেষত্ব একথা বলা চলে। প্রথমদিককার রচনা অপেক্ষা শেষ দিককার রচনায় এই ভঙ্গি বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

উদাহরণ—

বড় বড় ব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, কিন্তু এটুকু থাকে। বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়, কিন্তু চায়ের নেশা বরাবর টিঁকে ; চোখে চোখে যে ছিল, সে চির-দিনের মত অন্তরালে পড়িয়া যায়, কিন্তু ধূমপানের হুঁকাটি কোনদিন কাছ-ছাড়া হয় না। [নৌকাডুবি]।

দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতর লুকানো। [ঐ]।

হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল। [গল্প চারিটি : পণরক্ষা]।

ইহার মধ্যে তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। [ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (প্রবাসী, ১৩১৯ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬)]।

তাদের কণ্ঠে সুরের আভাস মাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে-কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। [শিক্ষার মিলন]।

দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বরা হতে পারনি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্চ। [ঘরে-বাইরে (সবুজপত্র, ১৩২২, পৃঃ ২৯০)]।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত অথবা অর্থান্তরন্যাস দ্বারা কিংবা উপমা রূপকাদি অলঙ্কারের পুনরুক্তি দ্বারা উক্ত বিষয়ের সমর্থন বা ব্যাখ্যা করা। এই হিসাবে রবীন্দ্রী রীতিকে **explanatory style** বা ব্যাখ্যাত্মক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। এই পদ্ধতির যেমন অনেক গুণ আছে, তেমনি দোষও কিছু কিছু আছে। অনেক ভালো ভালো উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ ব্যাখ্যা বা সমর্থনের জন্য খেলো বা হালকা হইয়া গিয়াছে। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রকৃত **paradox** মিলে না। ব্যাখ্যা করিয়া দিলে **paradox**-এর বিশেষত্ব থাকে না। প্রতিবস্তূপমার উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন দৃষ্টান্ত, অর্থান্তরন্যাস এবং অন্যান্য অলঙ্কারের

প্রয়োগের দ্বারা ব্যাখ্যাত্মক পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিকে অবিশ্রাম শাণ পড়িলে ছুরি ক্রমেই অন্তর্ধান করে। একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে। [রাজর্ষি, পৃঃ ১১৮]।

সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহত্তের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, আর একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবারে তানের মধ্যে আকাশপাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়। [মেঘদূত (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ১৭৭)]।

(এখানে প্রথম বাক্যের উক্তিটি পরবর্ত্তী চারিটি বাক্যে চারিটি বিভিন্ন উক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত বা সমর্থিত হইয়াছে।)

শকুন্তলার এত দুঃখকে নিষ্ফল করিয়া শূন্যে দুলাইয়া রাখা যায় না। যজ্ঞের আয়োজনে যদি কেবল অগ্নিই জ্বলে, কিন্তু তাহাতে অন্নপাক না হয়, তবে নিমন্ত্রিতদের কি দশা ঘটে? [কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৪৩৩)]।

পূর্ব্বে যে শাসনের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে। যে লোকটা চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না; দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম। [জীবনস্মৃতি]।

দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা। [শিক্ষার মিলন]।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় humour বা সরসতার প্রধান উপকরণ হইতেছে innuendo, irony এবং sarcasm বা ব্যাজস্তুতি। শ্লেষের এবং অন্যান্য অলঙ্কারেরও এই প্রয়োজনে ব্যবহার হইয়াছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের humour অনেকটা academic বা বুদ্ধিগ্রাহ্য। যেমন—

পাশ একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরীতে ৩,২৭৫৲ টাকা খাজনা দিয়া থাকে। [গল্পগুচ্ছ : যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ]।

কলিকাতার এ বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরীর ফিতা দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। [গল্পগুচ্ছ : সুভা]।

—তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েষ্টকোট্‌পরা ফুলমোজা মণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেণ্ট," "এক্সেলেণ্ট," করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। [গল্পগুচ্ছ : মানভঞ্জন]।

তিনি কঠিনভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক তার পর বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ লইয়া যাইত। [গল্পগুচ্ছ : অনধিকারপ্রবেশ]।

শুনিয়া বাবার বৌমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এ-রকম ঠাট্টা ভালো নয়। [গল্পচারিটি : দর্পহরণ]।

কর্ম্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা সোঽহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব সমস্তই কৃষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমানভাবে গ্রহণ করেন—পরস্পরের মধ্যে যে কোনপ্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে তাহা অনুভবমাত্র করেন না। [গোরা, পৃঃ ৩৬]।

সাধারণতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য বা academic হইলেও মধ্যে মধ্যে humour (সরসতা)-এর ঔজ্জ্বল্য পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দেয়। যেমন—

এই ত আমার সেই মাখনলাল দেখ্‌চি! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদ্‌লেচে। [গল্পগুচ্ছ : মুক্তির উপায়]।

সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা কাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। [জীবনস্মৃতি]।

আজ পর্য্যন্ত কোন লেখকই রবীন্দ্রনাথের মত গদ্যে অনুপ্রাসের মধুর প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। কলমের মুখে আপনা হইতে আসিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুপ্রাস কোথাও অসঙ্গত বলিয়া কানে ঠেকে না, বরঞ্চ একটা অপূর্ব্ব লালিত্য আনিয়া দেয়। এই অনুপ্রাস অনেক সময় যমকের কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে, তখন ইহা কতক পরিমাণে ইচ্ছাকৃত বলিয়া বোধ হয়। শেষের দিকের রচনায় এই যমকঘেঁষা অনুপ্রাস যে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাকৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুপ্রাস প্রয়োগের উদাহরণ—

— সমস্ত রাজ্য নিদ্রিত নিশীথের মত নীরব হইয়া গেল [রাজর্ষি]।

সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরে বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারি মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। [গল্পগুচ্ছ : শুভদৃষ্টি]।

—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্ণিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে। [গল্পগুচ্ছ : মহামায়া]।

সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। [ছেলেভুলানো ছড়া]।

—মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ। [বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য]।

—সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্ব্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে— [চোখের বালি]।

তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক্‌সভ্যতার লাভ-লোলুপ কুশ্রী-তায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। [গোরা, পৃঃ ১৫৯]।

আসমানে আকাশ-কুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা-তানে বাঁশী বাজাবার জন্যে ধর্ম্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল না কি ? [ঘরে-বাইরে (সবুজপত্র, ১৩২২ সাল, পৃঃ ১৫১)]।

কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। [গল্প-সপ্তক : হৈমন্তী]।

সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচার-হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দেন নি। [নামঞ্জুর গল্প]।

—এমন বানান্ বানালে— [শেষের কবিতা]।

—পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতে— [ঐ]।

—তোমার মত শানিয়ে বলা কথা বানিয়ে রেখ দাও। [ঐ]।

কিন্তু রসের এই তৃপ্তি রসদের বিরলতাবশতই এটা বেশী বলা হ'ল। [শরৎচন্দ্র (প্রবাসী, ১৩৩৮ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮০৬]।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় অর্থালঙ্কারের এই যে আলোচনা করা হইল, ইহা হইতে কেহ যেন বুঝিয়া না বসেন, যে এই অলঙ্কারশালিতা শুধুই ইচ্ছাকৃত। প্রকৃত পক্ষে ইহার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের গভীর আত্মচেতনা বা আত্মদৃষ্টি (subjectivity)। পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় লেখক হইতে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এইখানে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকের কাছে বাহ্যবস্তু বাহ্যবস্তুই ; লেখক নিজেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখিয়া আগ্রহ অথবা অনাগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ বা সহযোগিতা করিতেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের নিকট বাহ্য বস্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিজের অনুভূতি বা চেতনার দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহা বর্ণনা করিতেছেন তাহা যেন নিজেরই বৃহৎ চেতনা বা ব্যাপক অস্তিত্বের অন্তর্গত। সেই কারণের বাহিরের ঘটনা বা সংস্থান অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর মনের ব্যাপার বা সংস্থান রবীন্দ্রনাথের নিকট অধিক মূল্যবান। আর বাহিরের ঘটনা বা বস্তু তখনই মূল্যবান হইয়া উঠে যখন পাত্র-পাত্রীর (অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথের) মনোব্যাপারে তাহাদের কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া কাজ করে। সুতরাং এইরূপ subjective বা আত্মদৃষ্টিমূলক রচনাভঙ্গিতে অলঙ্কারের প্রয়োগ অপরিহার্য্য ; এইটাই রবীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

প্রদোষে

—শ্রীশান্তি পাল

প্রেয়সী, তোমারে কি আজি করিব দান—
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের মম গান ?
গান আজি মোর গলিয়া গলিয়া যায়।
ছন্দে ছন্দে কূলহারা বেদনায়—
নাহি অবসাদ, নাই তার অবসান।

প্রেয়সী, আমার গানের যতেক কথা,
হয়তো জাগাবে হৃদয়ের ব্যাকুলতা !
হয়তো তোমার পাষাণ-মনের কোণে,
এক ফোঁটা জল দেখা দিবে অকারণে,
শূন্যে কাঁপিবে অমূল-আলোক-লতা।

আঁধারে প্রোথিত যে তরুর দৃঢ় মূল,
ঝড়ে ভাঙে আর করে বারবার ভুল।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোলা পথ

পৃথিবীতে এমন সব জায়গা আছে, মানুষে সেদিকে বড় যাতায়াত করে না। অথচ সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে সে সমস্ত জায়গা অতুলনীয়। পরিচিত রেলষ্টীমার লাইন থেকে দূরে, জগতের নানা নিভৃত কোণে এরকম কত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভূমি অবস্থিত। মানুষে তাহার নামও জানে না। এই রকম কয়েকটি জায়গার কথা এখানে লিখ্‌বো।

কানাডার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি অজ্ঞাত স্থান আছে, সেখানে এখনও প্রাগৈতিহাসিক অধুনালুপ্ত জীব-জন্তু বাস করে, এ বিশ্বাস মানুষের অনেকদিনের পুরাতন। চল্লিশ বছর ধরে এ সম্বন্ধে নানা ধরণের গল্প লোকের মুখে মুখে চলে আস্‌ছে কিন্তু কেউ কোনোদিন এ জায়গাটা দেখে নি। এড্‌মণ্টনের উত্তর অঞ্চল থেকে ভ্রমণকারী ও স্বর্ণান্বেষণকারীর দল ফিরে এসে এ ধরণের জায়গার গল্প করেছে কিন্তু কারোর বর্ণনার সঙ্গে কারোর বর্ণনা মেলে নি এবং যারা এই গল্প করেছে তারা কেউ বলে নি যে তারা নিজেরা চোখে দেখে এসেছে এ দেশ। সব সময়েই তারা পরের মুখে শুনেছে। কিন্তু স্বচক্ষে এই রহস্যময় ভূমি যে দেখে এসেছে, এমন কোনো পশুচর্ম্ম-সংগ্রাহক বা স্বর্ণান্বেষী লোকের (তা সে রেড্‌ইণ্ডিয়ানই হোক্‌ বা ইউরোপীয়ানই হোক্‌) সন্ধান আজও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি।

প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে একজন ক্রি ইণ্ডিয়ান একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে গল্প করেছিল যে তার বাবা অনেক কাল আগে লিয়ার্ড নদীর উত্তর পারে বহুদূরে শিকারের সন্ধানে গিয়েছিল এবং সেখানে সে একটা অদ্ভুত ধরণের ইণ্ডিয়ান্‌ জাতির দেখা পায়। সেই অসভ্য ইণ্ডিয়ানেরা তাকে বন্দী করে রাখে অনেকদিন। সেই সময় তাদের মুখে সে শুনেছিল যে লিয়ার্ড ও টোড্‌ নদীর সঙ্গমস্থান থেকেও অনেকদূরে চারিধারে পাহাড় ও ফার্‌ অরণ্যে ঘেরা একটা নিভৃত উপত্যকা আছে, সেখানে খুব বেশী শীতও নয়, খুব বেশী গরমও নয়। এই উপত্যকায় অনেক অদ্ভুত ধরুণের জীবজন্তু বাস করে—একখণ্ড হরিণের চামড়ায় তারা এই জানোয়ারের ছবি এঁকে দেয়, ডাইনোসর্‌ জাতীয় অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবের মত দেখ্‌তে ছবিটা।

এই হরিণের চাম্‌ড়াটুকু বাপের কাছ থেকে ঐ ক্রি ইণ্ডিয়ান্‌ পেয়েছিল এবং বৈজ্ঞানিকেরা তাতে আঁকা ডাইনোসরের ছবিটাও দেখেছিলেন। যদি ইণ্ডিয়ানরা সত্যি সত্যি ডাইনোসর্‌ না দেখে থাক্‌বে তবে তারা কি করে একটা ডাইনোসর্‌ আঁক্‌তে পারে? তারা কোনো বিজ্ঞানের বই পড়ে নি কিম্বা ডাইনোসরের পুনর্গঠিত কঙ্কাল কোনো মিউজিয়মে দেখে নি। আর যদি কল্পনা হয়, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এত নিখুঁত ছবি কি কল্পনার সাহায্যে আঁকা যায়?
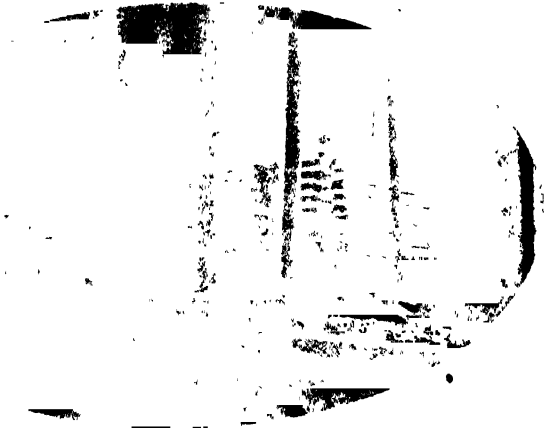
দক্ষিণ নেহানী নদীর শিকারীর আড্ডা।

এ রহস্যের এখনও পর্য্যন্ত কোনো মীমাংসা হয় নি। এই ইণ্ডিয়ান্‌ জাতির কোনো লোক কখনও সভ্য মানুষের দেখা পায় নি, হড্‌সান উপসাগরের ধারে ইউরোপীয়গণের যে কুঠী আছে সেখান থেকেও হাজার মাইল দূরে দুর্গম অরণ্যাবৃত পর্ব্বতময় দেশে এদের বাস। সুতরাং তারা যখন ডাইনোসর্‌ নিখুঁত ভাবে এঁকেছে, তখন এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অন্যায় নয়, যে তারা ডাইনোসর্‌ নিশ্চয়ই দেখে থাক্‌বে।

কানাডার এই অঞ্চল লোক-বসতিশূন্য ও অরণ্যাকীর্ণ, তাছাড়া ভয়ানক শীতের দেশ। দু'দশজন মরীয়া প্রকৃতির ইউরোপীয় বা বর্ণসঙ্কর ইণ্ডিয়ান্ এদেশের এখানে-ওখানে বনে-জঙ্গলে কাঠের ঘর বেঁধে বাস করে ও পশুচর্ম্মের জন্যে ফাঁদ পেতে লোমশ জানোয়ার ধরে, এই তাদের উপজীবিকা।

ফোর্ট ষ্টেশন।

এই বিশাল দেশের কোথায় কি আছে না আছে তা কেউ জানে না। অধিকাংশ স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত। তবে বেশীদিন বোধ হয় অনাবিষ্কৃত থাকবে না কারণ এরোপ্লেনে এখন অনেকে বহুদূর উদীচ্য বৃত্তের arctic zone-এর সীমা পর্য্যন্ত উড়ে যাচ্ছে শুধু ব্যবসার নতুন পথ খুঁজবার জন্যে।

মিঃ গড্‌সেল এই ধরণের একজন শিকারী। তিনি তেইশ বছর এই তুষারময় অরণ্যাবৃত দেশে কাটিয়েছেন, চামড়ার ও পশুলোমের ব্যবসার জন্যে। তিনি বলেন যে ১৯১২ সালে পিস্ নদীর উত্তর অঞ্চলে তাঁকে একবার যেতে হয়েছিল; তখন পিস্ নদীতে যাওয়া বড় কঠিন ছিল। ঘোড়ার পিঠে অনেকদূর গিয়ে তারপর আথাবাস্কা নদীতে ষ্টীমার পাওয়া যেত, ষ্টীমারে শ্লেভ্ হ্রদ পার হয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে কাটাতে হোত এক সপ্তাহ, তবে পৌছানো যেতো পিস্ নদীতে। এখন এই রাস্তা সহজ হয়ে গিয়েছে, এড্‌মণ্টন থেকে এখন দুদিনে ফোর্ট সিম্‌সনে পৌছানো যায়—অবশ্য এরোপ্লেনে।

এই ফোর্ট সিম্‌সনে মিঃ গড্‌সেল কিছুদিন ছিলেন, ব্যবসার খাতিরে এবং হড্‌সন বে কোম্পানীর কুঠী পরিদর্শনের জন্যে। এখানেও তিনি প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের গল্প শুনে এসেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি যখন আবার ওখানে যান তখন শুনে আসেন দক্ষিণ নেহানী নদীর ধারে, এই জায়গাটা অবস্থিত, ফোর্ট লিয়ার্ডেরও বহু উত্তরে। তখন থেকেই তাঁর জায়গাটা দেখ্‌বার আগ্রহ হোল, কিন্তু স্থান এত দুর্গম যে যাওয়ার কল্পনা করা যায় না।

তারপর ১৯২৭ সালে প্রথম এরোপ্লেন নাম্‌লো স্লেভ হ্রদের জলে, হড্‌সন বে কোম্পানীর কুঠী ফোর্ট রেজিলিউশানে। এরা আশপাশের পর্ব্বত-জঙ্গল দুর্গম অরণ্যভূমিতে এসেছে সোনার খনি খুঁজতে, নর্দার্ণ এরিয়েল মিনার্যাল্‌স্ এক্‌স্‌প্লোরেসন্ কোম্পানীর Northern Ærial Minerals Exploration Companyর পক্ষ থেকে। চার্লস ম্যাকলাউড্ এদের প্রধান পাইলট্—মিঃ ম্যাকলাউডের অন্য দুই ভাই প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই অঞ্চলে সোনার সন্ধানে এসে ইণ্ডিয়ানদের হাতে প্রাণ হারায়, অনেক দিন পরে তাদের কঙ্কাল পাওয়া যায় নেহানী নদীর পশ্চিম পারে একটা বনের মধ্যে। সে পুরোনো কথা থাক্। ১৯২৭ সালের এই এরোপ্লেন-বিহারীদের দলে মিঃ গড্‌সেলও ছিলেন, এবং তাঁরা সামনের গ্রীষ্মকালে কাজ আরম্ভ করবেন ভেবে হ্রদের তীরে তাঁবু ফেলেন, এরোপ্লেন্ ফিরে চলে যায়

ফোর্ট ভিক্টোরিয়া: বড় রাস্তা।

এবং কথা থাকে যে শীতের প্রারম্ভে আবার এরোপ্লেন্ ফিরে এসে তাঁদের নিয়ে যাবে। কিন্তু সেবার শীতের প্রারম্ভে এরোপ্লেন্ ফিরলো না, তখন তাঁরা ব্যস্ত হয়ে নিজেরাই ডাঙ্গায় চড়ে ফোর্ট সিম্‌সনের দিকে রওনা হলেন। তাঁরা পথ ভুলে

অন্য একটা অজানা নদীতে এসে পড়লেন এবং খরস্রোত নদীতে তাঁদের ডোঙ্গা উল্টে গিয়ে পাহাড়ের ধাক্কায় চূর্ণ হয়ে গেল একদল বন্য ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে সেখানে দেখা। তারা শান্ত প্রকৃতির লোক, এঁদের যত্ন করে একটা যায়গায় নিয়ে

সমুদ্র-পথে : মাহি।

গেল, সেখানটা চারিধারে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এবং সেখানে এমন সব গাছপালা, যা কেবল উষ্ণ-মণ্ডলেই দেখা যায়। তখন সকলেরই মনে হোল যে এই সেই অজানা রহস্যময় উপত্যকা যার কথা তাঁরা বহুকাল ধরে শুনে আস্‌ছেন। কিন্তু কোথায়ই বা অতিকার জানোয়ার, আর কোথায়ই বা সোনার খনি। জায়গাটায় চার পাঁচটা গন্ধকজলের প্রস্রবণ আছে এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে একটা ছোটনদী বার হয়ে নেহানী নদীর সঙ্গে বোধহয় মিলেছে। এতকাল ধরে যা শুনে আস্‌ছেন, আষাঢ়ে গল্প।

ভূস্বর্গ সেচিলিস্

ব্রিটিশ ঈষ্ট আফ্রিকা থেকে হাজার মাইলের মধ্যে ভারত মহাসাগরে সেচিলিস্ দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। সৌন্দর্য্যে এই দ্বীপপুঞ্জ ভারত-সাগরীয় দ্বীপগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ ধরণের কথা পর্য্যটকের মুখে শোনা যায়। সেচিলিস্ দ্বীপ পূর্ব্বে ফরাসীদের অধিকারে ছিল, এখানকার অধিবাসী অধিকাংই কৃষ্ণকায় নিগ্রো, কিছু ফরাসী, কিছু ক্রিয়োল; তারা সবাই ফরাসী ভাষায় কথা বলে। অনেক কাল আগে একটি ফরাসী বোম্বেটের দল দেশের আইনের শাস্তির ভয়ে পালিয়ে এখানে বাস করেছিল, তাদের ও কৃষ্ণকায় নিগ্রোর সংমিশ্রণে এক ধরণের বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়েছে, তাদের ভাষাও বর্ণসঙ্কর ফরাসী। এ ছাড়া অন্য কোনো জাতি সেচিলিস্ দ্বীপে বাস করে না। তবে আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ জন ইংরেজ মাছের ব্যবসা উপলক্ষে এখানে এসে বছরে আটদশ মাস কাটায়।

বিখ্যাত পর্য্যটক ও সংবাদিক ডেনিস্ পামার সেচিলিস্ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার কিছু এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"মোম্বাসা বন্দরে একদিন একটা মদের দোকানে বসে আছি, সন্ধ্যার সময়, হাতে কাজকর্ম্ম নেই—সেখানে একজন লোক সেচিলিস্ দ্বীপের রাজধানী মাহির সম্বন্ধে গল্প তুললে। বল্লে ও রকম সুন্দর জায়গা পৃথিবীর কোথাও নেই—কোথায় লাগে জাওয়াই আর টাহিটি।

বক্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, পরণে তার জীর্ণ পরিচ্ছদ, একমুখ দাড়িগোঁফ, কিন্তু সেচিলিস্ দ্বীপের সম্বন্ধে বল্‌তে বল্‌তে লোকটার মুখের চেহারা যেন বদ্‌লে গেল, চোখ উৎসাহে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। শুধু যে জায়গাটা দেখ্‌তে ভাল তা নয়, সেখানকার লোকের কোনো দুঃখকষ্ট নেই, জিনিষপত্র সস্তা, এক পেনিতে এক ডজন ভাল মাছ পাওয়া যায়, খাও দাও সুখে থাকো, কোনো ধরাবাঁধা

সেচিলিস্ : ক্রিয়োল কিশোরী।

প্রণালী নেই জীবনযাত্রার, সেখানকার লোকে এখনও অনেকে মোটরগাড়ী দেখেনি, রেলগাড়ী দেখেনি।

এর আগে আমি কখনো সেচিলিসের নাম শুনিনি—ঠিক করলাম অবিলম্বে একবার যেতে হবে সেখানে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মাহি একটা দ্বীপ, রাজধানীর নাম পোর্ট ভিক্টোরিয়া, দেড়মাসে সেখানে একবার একখানা জাহাজ যায়। ম্যাপে সেচিলিস্ দ্বীপ দেখে কিছু বুঝবার যো নেই—সেচিলিস্ একটা নাম মাত্র, ভারত মহাসাগরের নীল রংএর মাঝখানে, তলায় একটু লালদাগ দেওয়া, কারণ বর্ত্তমানে ওটা ইংলণ্ডের অধিকার-ভুক্ত।

চীনা জাঙ্ক।
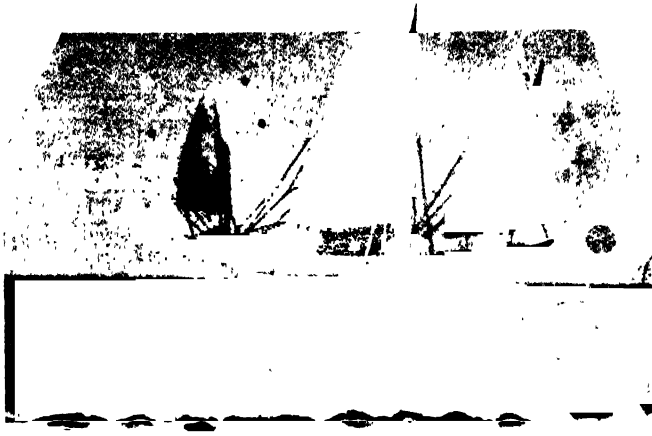
কে জান্‌তো সেচিলিস্ ও পোর্ট ভিক্টোরিয়া দেখ্‌বার আগে যে ঐ লাল কস্‌মিটানা দেশ! ফুটকিট্‌ক্ পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি অপরূপ সৌন্দর্য্যভূমি, স্বপ্নের রাজ্য, পরীর দেশ! ভারত-সমুদ্রের নীলজলে ডুবে আছে গোটাকতক নগণ্য ছোট ছোট দ্বীপ, নিকটতম বন্দর থেকেও হাজার মাইল দূর, অখ্যাত, অবজ্ঞাত, কেউ কোনোদিন নাম শোনে নি—অথচ দেখবার পর মনে হলো স্বর্গ কি আর পোর্ট ভিক্টোরিয়ার চেয়েও সুন্দর? এর চেয়ে সুন্দর কোনো জায়গা হতে পারে?

সত্যই তাই। আমেরিকান্ টুরিষ্টরা যাচ্ছে না কোথায়, কিন্তু তারা কখনো নাম শুনেছে মাহির? বড় জাহাজ যাবার রাস্তা থেকে এই দ্বীপপুঞ্জ অনেক দূরে, মোম্বাসা থেকে প্রায় হাজার বারশো মাইল হবে। বিষুবরেখার চার ডিগ্রী দক্ষিণে সেচিলিস্ অবস্থিত, সবসুদ্ধ প্রায় নব্বইটি দ্বীপ, ছোটতে বড়োতে। এর মধ্যে মাহি সব চেয়ে বড়, মাহির লোকসংখ্যাও বেশী। মাহি সতেরো মাইল লম্বা, চওড়াও প্রায় সাত মাইল। লোকসংখ্যা আন্দাজ ত্রিশ হাজার।

মোম্বাসা থেকে রওনা হওয়ার পাঁচদিনের দিন ভারত-সমুদ্রের অপার নীলজলরাশির দূর কোলে একটু সবুজাভ কালো বিন্দু ফুটে উঠ্‌লো—ওই হোল মাহি। যত জাহাজ কাছে এল, ডেকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম দ্বীপের সর্ব্বত্রই পাহাড় পর্ব্বত মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে, তালীবনরাজি, নীলা বেলা স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে দেখা গেল পোর্ট ভিক্টোরিয়ার সাদা সাদা ঘরবাড়ী, রাস্তা, দোকান, হোটেল।

যে মুহূর্ত্তে জাহাজ থেকে মোটর-বোটে উঠে চারি ধারে চাইলাম, তীরের ধূসর পর্ব্বতশিখরের দিকে চাইলাম, চারিপাশে অকূল সুনীল সমুদ্রের দিকে চাইলাম—সে মুহূর্ত্তেই বুঝলাম মনে মনে আমি এই দেশেরই কল্পনা এতদিন করে এসেছি, আমার স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণত হয়েছে!

লোকেরাও কি তেমনি সরল! যে লোকটা মোটর-বোট চালাচ্ছিল, তার চেহারাটা ফ্রান্‌জ্ হাল্‌স্‌এর লাফিং ক্যাভালিয়ার, Laughing Cavalierএর মত—মোটর চালাচ্ছে কি সিনেমা-ষ্টুডিওতে অভিনয় করছে তা বলা শক্ত। কাষ্টম্‌স্‌এর কর্ম্মচারীরা ঘিরে দাঁড়ালো নামতেই। আমি বল্লাম—একটু দাঁড়ান, ব্যাগের চাবী খুলে দি।

তারা বল্লে—থাক্ থাক্, আর কষ্ট করবেন না। আপনার কাছে কিছু নেই তো? আমি বল্লাম—না কিছু নেই।

ক্রিয়োল কর্ম্মচারীরা হেসে বল্লে—তবে চলে যান। কেন অত হাঙ্গামা কর্ত্তে যাবেন? মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হোল পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে সে এই পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে, যেখানে আইনের কড়াকড়ি নেই, নিয়মের বাঁধাবাঁধি নেই, যেখানে সবারই মুখে হাসি, সবাই ভদ্র, সবাই সরল।

তারপর একজন এসে আমাকে ওখানকার হোটেলে নিয়ে যেতে চাইলে। দুধারে কালো কালো পাহাড় যেন দৈত্য-পুরীর প্রাচীরের মত দেখাচ্ছিল অন্ধকারে। আমরা সহরের বড় সদর রাস্তা ধরলাম। একটা ছোট ক্লক্-টাওয়ার, এক-জন পুলিশম্যান দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার ধারে বড় বড় গাছের সারি।

হোটেল ছোট একটা সাদা বাড়ী, দোতালায় চারিধারে বারান্দা আছে। হোটেলের কর্ত্তা তখন সেখানে ছিল না, আমরা বারান্দাতে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম। সহরের রাস্তায় খুব বেশী লোক চলাচল করছিল না—একদল নিগ্রো হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল, দুটি সুন্দরী ক্রিয়োল মেয়ে ফুল বিক্রী করছে, কয়েকজন ফরাসী খালাসী জেটীর দিকে চলেছে। সবাই হাস্‌ছে, সবারই মনে স্ফূর্ত্তি, যেন কি একটা উৎসবের দিন সবারই। একটু পরে হোটেলের কর্ত্তা এল, সে-ও ক্রিয়োল, তবে ফরাসী বলতে পারে ভাল। সগর্ব্বে আমায় জানালে সে একবার ইউরোপ ঘুরে এসেছে—প্যারিসে

স্বগৃহে প্রবীণ সেলুঙ।

কিছুদিন ছিল, বিলেতেও গিয়েছে। এজন্য দেখ্‌লাম তার গর্ব্বের অন্ত নেই। এ দ্বীপের অধিকাংশ লোকেই বড় একটা কোথাও যায় নি, যে এত দেশ দেখে বেড়িয়েছে, গর্ব্ব তার কেনই বা না হবে!

ডিনারের টেবিলে সে সেচিলিস্ সম্বন্ধে অনেক গল্প করলে। এখানকার একটা দ্বীপে জগদ্বিখ্যাত জোড়া নারিকেল ফলে, এক একটা নারিকেল সাধারণ ফুটবলের চেয়ে তিনগুণ বড়। পৃথিবীর আর কোথাও এ নারিকেল দেখা যায় না। লা ডিগ্ দ্বীপের বড় কচ্ছপ কি আমি দেখেছি? দেখিনি? দেখ্‌বার জিনিষ, আমি যেন সে কচ্ছপ না দেখে এ-দ্বীপ না ছাড়ি। মাহি? মাহির মত এত সুন্দর জায়গা পৃথিবীর কোথায় আছে? এ জায়গা ছেড়ে সে কোথাও যেতে রাজী নয়।

আমার দিনগুলো কাট্‌তে লাগ্‌ল স্বপ্নের মত। জ্যোৎস্না উঠে, বন্দরের নীলজলে নারিকেলবনের ছায়া পড়ে। সমুদ্রের ধারে শিলাখণ্ডের ওপর বসে কর্কশ নিগ্রোকণ্ঠের গান শুনি; ক্রিয়োল মেয়েরা সাঁতার দেয়,—দিন কতক থাক্‌বার পরে মনে হোল আমি এই দ্বীপের একজন হয়ে গিয়েছি, কোথায় যাবো এমন সত্যিকার ভূস্বর্গ ছেড়ে! যে জনকয়েক ইংরেজের সাথে আমার আলাপ হয়েছে তারাও ঐকথা বলে। তারা ব্যবসা উপলক্ষে অনেকদিন এসেছে এখানে, কিন্তু এমন জালে জড়িয়ে পড়েছে' আর কোথাও যেতে রাজী নয়, এ দ্বীপ ছেড়ে। সেচিলিসের সৌন্দর্য্য তাদের বন্দী করেচে।

তার মধ্যে একজন লোক দু'বছর আগে এখানে এসেছিল একমাসের ছুটি নিয়ে মাছ ধরতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে আছে। এখানে এসে সে আর ফিরে যায় নি। তার স্ত্রী তার অপেক্ষায় এখনও আছে। সে যাই-যাই করছে আজ দু' বছর ধরে, কিন্তু যেতে পারে না।

পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে পঁচিশ শিলিংএ সপ্তাহ চলে যায়—দু পাউণ্ড যার সপ্তাহে আয়, সে রাজার মত থাক্‌তে পারে।

সেচিলিস্ দ্বীপের উপকূলে অজস্র নারিকেল-বন, এক একটা গাছ দুশো ফুটেরও বেশী উঁচু। আর কি অদ্ভুত সূর্য্যাস্ত! সূর্য্যাস্তের রঙে আর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে এই নারিকেল-বনের সারি অবাস্তব বলে মনে হয়, যেন অন্য কোনো জগতে এসে পড়েছি মনে হয়; কতদিন জ্যোৎস্নাশুভ্র সৈকতে একা বসে কাটিয়েছি—একদিকে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর পত্রমর্ম্মর, সাম্‌নে অন্তহীন ভারত-সমুদ্রের তরঙ্গসঙ্গীত!

তারপর একদিন ষ্টীমারে চেপে মাহি থেকে চলে এলাম। কয়েকবছর হয়ে গিয়েছে। পোর্ট ভিক্টোরিয়া বোধহয় স্বপ্ন। সত্যিই কি আমি সেখানে ছিলাম?"

মার্গুইএর সেলুং জাতি

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামের উপকূল থেকে কিছুদূরে মার্গুই দ্বীপপুঞ্জ। এখানে ছোট বড় অনেক দ্বীপ আছে আর মাঝে মাঝে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, পুকুরের মত নিথর। এই সব দ্বীপে সেলুং জাতির বাস। সেলুংরা শান্তিপ্রিয় জাতি, আগে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে এরা কৃষি ও পশু-পালন করতো, কিন্তু অনবরত যুদ্ধবিবাদে তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হোল। এখন এখানে নৌকাতে বাস করে ও মাছ ধরে—এই তাদের উপজীবিকা।

মার্ব্বেলের পাহাড়।

কিন্তু এখানে তারা নিরাপদ নয়। দুর্দ্ধর্ষ মালয় বোম্বেটেরা অনেক সময় অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে ছেলেমেয়েদের ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করে, যথাসর্ব্বস্ব লুঠপাট করে নিয়ে যায়। সুতরাং সেলুংদের দোষ দেওয়া যায় না, দূরে পালতোলা অপরিচিত জাহাজ দেখামাত্র নিজেদের জিনিষপত্র ও নৌকাসমেত চোখ পালটাতে না পালটাতে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেলুং জাতির লোককে দেখা এজন্য খুব সহজসাধ্য নয়।

এদের নৌকাকে কারাং বলে—একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে খোল করে এরা নৌকা বানায়। ওপরে মাদুর কিংবা বাঁশের ছই থাকে, মাদুরের পাল ওড়ায়। নৌকার মাঝখানে পাথর ও কাদার উনুন, দশ বারখানা নৌকার দশ বারোটা পরিবারের রান্না একত্র এক উনুনে হয়। এই অতি আদিম রীতিতে তৈরী নৌকায় তারা সচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপে ঘুরে বেড়ায়, ঝড় বৃষ্টি তুফান কিছুই গ্রাহ্য করে না। এক একটা দলে দশ বারোটা নৌকা থাকে, আবার ত্রিশ চল্লিশখানাও একত্র দেখা যায়।

মাছ ধরা তাদের একমাত্র উপজীবিকা। তাদের পুঁজির মধ্যে মাছ ধরার জাল, বর্শা, দড়িদড়া, সামুদ্রিক কচ্ছপ ধরার সরঞ্জাম। কচ্ছপের মাংস খুব ভালবাসে। চীনা সওদাগরী জাঙ্ক থেকে মাছ ও কচ্ছপের বদলে চাল নেয়। ভাত ও মাছ এদের প্রধান খাদ্য। সেলুংরা সাঁতারে ভারী ওস্তাদ। জলে এরা বড় বড় সামুদ্রিক হিংস্র মাছ কি হাঙ্গর কি অক্টোপাস্—সকলকে এড়িয়ে চল্‌বার কৌশল জানে।

মার্গুই দ্বীপপুঞ্জ প্রায় দুশো দ্বীপের সমষ্টি। এদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। নীল নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে ছোট বড় দ্বীপ, গভীর অরণ্যে ভরা, অধিকাংশ দ্বীপই জনমানবহীন, শুধু বুনো শূয়োর, হরিণ, ও কালো বাঁদর বনের মধ্যে থাকে আর থাকে সমুদ্রের তীরে বড় বড় কচ্ছপ। মানুষ কখনো দেখেনি বলেই হোক বা যে জন্যেই হোক্ এই সব বাঁদরের দল মানুষকে আদৌ ভয় করে না। বনে বনে নানা বিচিত্র বর্ণের পাখী দেখতে পাওয়া যায়।

কোনো কোনো দ্বীপের উপকূল ম্যান্‌গ্রোভের বনে ভর্ত্তি। ছোট ছোট ঘোলা-জলের খাল দ্বীপের মধ্যে চলে গিয়েছে—খাল বেয়ে নৌকা করে দ্বীপের মধ্যে ঢোকা যায়, কিন্তু ডাঙ্গায় নামা বিপজ্জনক, কুমীর ও বিষাক্ত সাপ সর্ব্বত্র।

সেলুংএরা জাতি হিসাবে বৈশিষ্ট্য আর বেশীদিন রাখতে পারবে না। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারা বদ্‌লে যাচ্ছে। অনেকে আফিং খেতে অভ্যাস করেছে, আফিং কিন্‌তে হলে টাকা চাই—মাছের বদলে চীনা ব্যবসাদারেরা আফিং দেয় না। তাই আজকাল অনেকে পিনাং ও সিঙ্গাপুরে কুলীগিরি ও মাঝিগিরি করে পয়সা রোজগার করে।

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

মহানন্দায় মহিষের পাল দল বাঁধিয়া নদী পার হইতেছে। বেশ লাগিতেছিল, জলে জোড়া-জোড়া শিঙ, সারি-সারি, পিছনে মহিষ-পালকের ছোট মাথা লেজ ধরিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। নদীতে বেশ স্রোত। দূরে, নদীর ধারে জেলেদের জাল শুকাইতেছে, একটি ছোট্ট খেয়াঘাটে একটি ছোট নৌকায় লোকেরা এক আনা পয়সা দিয়া খেয়া পার হইতেছে। 'যোথন মাঝি' ওপারে যখন নৌকা দাঁড় করাইল, বেলা তখন বাড়িয়াছে। তাহাকে বকশিস্ দিয়া নদীর তীরে তীরে চলিলাম। ঘাটওয়ালারা আমাদের গাড়ী ধরিল, বলিল, মাশুল দিতে হইবে; জিজ্ঞাসা করিলাম, মাশুল আবার কিসের? আমাদের বিদেশী পাইয়া ঠকাইবে নাকি? আধা-হিন্দি আধা-বাঙ্গালায় অনেক বাক-বিতণ্ডার পর D. B.-র রাব-বহি দেখিয়া দশ গণ্ডা পয়সা ফেলিয়া দিলাম। রাস্তায় নদী পার হওয়ার শেষ—শাখা-মহানন্দায় আর এক মাইল পরে চুকাইয়া দিয়া, একটি ছোট্ট বস্তিতে গিয়া উঠিলাম। দর্জ্জিলিং-রোড নদীর কূল হইতেই আরম্ভ। এখানে নদীর জলে তেমন স্রোত নাই সেইজন্য জলও ময়লা।

বালুপথ, কিষণগঞ্জের উদ্দেশ্যে।

বস্তিতেই খাবার জিনিষ পাওয়া যাইবে জানিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু গ্রামের একটি মাত্র মশলা-পাতির ও খাবারের দোকানে গিয়া শুনিলাম, কেবল মিওনো মুড়ি ছাড়া সেখানে কিছুই নাই, এমন কি দুধ-দইও পাওয়া যায় না। একটি রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত নৌকার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। প্রচণ্ড ক্ষুধায় মনে হইতেছে, জীবন-সমুদ্রে আমাদের তরণীর হাল ভাঙিয়া গিয়াছে, আমরা তাই ডাঙ্গায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। ষ্টোভ জ্বালিয়া এক ডেকচি কোকো তৈয়ারী হইল, চারি পয়সার সেই মিওনো মুড়িই কিনিয়া আনিয়া একটু সরিষার তেলের সহিত মাখিয়া সামান্য রকমে ক্ষুধা মিটান গেল।

সাইকেলে যাহারা কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং চলিতেছে, সময়ে অসময়ে সেই দুঃসাহসীদের এই ক্ষুধার পীড়া দেখিয়া অনেকে লজ্জা পাইবেন—আমরাও পাইতেছি। আসলে কিন্তু দার্জ্জিলিং-এর পথেও যাহা সত্য, জীবনের পথেও সেই একই কথা সত্য—সময়ে অসময়ে কেবল ক্ষুধা আর ক্ষুধা, আর তাহা মিটাইবার জন্য যাহা মিলে, তাহা মিওনো মুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু পথ তখনও ফুরায় নাই। কিষণগঞ্জ পৌছিতে তখনও ১৫।১৬ মাইল বাকি, সবেমাত্র ২৫ মাইল আসিয়াছি। বেলা একটা হইবে। ভাবিতেছি, সেই পথ, কাব্যে যে-পথ মধুর, চলিতে গিয়া তাহাকেই কি এত বন্ধুর লাগে? লোকের মুখে রাস্তা বেশ ভালই বরাবর শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু মনের সুখে সাইকেল আর চালান যায় না। দুই ধারে সেই একঘেয়ে গাছের সারি, পাট-কাচার শব্দ ও মাঝে মাঝে অপার নিস্তব্ধতা, একটা পাখী পর্য্যন্ত ডাকে না। ২।৪ মাইল অন্তর কখন কাদায় গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাচোঁড়-কোঁচড় আওয়াজ উদাস-বিহ্বল মনকে সজাগ করে। কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই, সব হইল কি? কেউ একটা গান গায় না, নীরব নিথর! কেবল সাইকেলের উপর বসিয়া বসিয়া যন্ত্রচালিতবৎ পেড্যাল গুলির সহিত পা ঘোরান।

সুরেন থাকিয়া থাকিয়া বলে, এই সাইকেল চালান নিয়ে তোরা আবার তড়পাস্ যে কাশ্মীর-ভ্রমণের সময়ে, ইয়া কিয়া থা, উয়া কিয়া থা? তাহার কথা শুনিয়া মনে মনে কেবল হাসি।

অনেকক্ষণ পরে রেল-লাইনের ধারে কান্‌কি ষ্টেশন চোখে পড়িল। ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের কিষণগঞ্জের আগের ষ্টেশন এইটা। একটি বড় পাড়াগাঁ বলিলেই চলে। পাটের গুদামে ভর্ত্তি। গুড়ের দুই চারিটা আড়তও আছে। এখান থেকে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। সূর্য্যিঠাকুর প্রায় ডুব মারিবার দাখিল। থাগ্‌ড়ার হাট ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে গোটা কতক লোক মাথায় হাঁড়ি কলসী, মেয়েরা ধামা লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। তাহাদের চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ জি, কিষণগঞ্জ কিতনা দূর হোগা? জবাব, এ বাবু থোড়া দূর, তিন মিল হ্যায়।

কতক্ষণ ধরিয়াই যেন এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতেছি!

বেশ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সেদিন অমাবস্যা, ৺শ্যামা পূজা। এই বিজন বিভুঁয়ে হঠাৎ মনে পড়িল, কলিকাতার দেওয়ালী উৎসবের কথা,—বাজী, আলো, গান, বাজনা—হর্‌রা। নিজেদেরকে এমন বঞ্চিত মনে হইল। অথচ প্রতি বৎসর যখন কলিকাতাতে এই উৎসব দেখি, তখন কি কুৎসিতই না লাগে। স্বর্গ হইতে বঞ্চিত করিয়াই মানুষের কাছে স্বর্গকে বুঝি কাম্য করিয়া তোলা হইয়াছে। কে জানে, দেবতারাও ধরণীর ধূলার জন্য তৃষ্ণায় রাত্রি কাটায় কি না!

আঁধারের ভিতরই গাড়ী ছুটাইয়াছি, হঠাৎ সামনে গরুর গাড়ী আসিয়া পড়ে, আমাদের বেলগুলা বাজে না, তাদেরও গাড়ীতে আলো নাই। গরুগুলা ভড়কাইয়া আচম্‌কা এদিক-সেদিক গাড়ী লইয়া ঘুরিয়া যায়। ফাঁপড়ে পড়িতে হয় আমাদের। ৫০।৬০ গজ যাই আর সামনে কাহাকে দেখিলেই জিজ্ঞাসা করি, এই, কিষণগঞ্জ কতদূর হ্যায়? আর বারেবারেই সেই একই তিন মাইল আছে জানিয়া ক্ষেপিয়া উঠি। বীরেন বলিল, তোর অত কথায় কাজ কি, যখন একটি ব্রীজ্ পার হবি, জানবি কিষণগঞ্জ এলাকা। বীরেনের শৈশব ও কৈশোর এই দিকে কাটিয়াছে, সুতরাং তাহার কথা মানিতেই হইবে। থাগ্‌ড়া আসিয়া পড়িলাম। থাগ্‌ড়া মেলা, খুব বড় মেলা। বছরে একবার করিয়া মেলা বসে। সোণপুরের হরিহরছত্রের পরই এই মেলা ভারতবর্ষের মধ্যে বড়। থাগড়ার জমিদারী এক নবাবের। নবাবের একটি প্রাসাদগোছের বাড়ীও আছে।

রম্‌জান নদীর এপারে থাগ্‌ড়া ফেলিয়া ব্রীজ্ পার হইয়া বীরেনের নির্দ্দেশমত রাস্তা দিয়া আমাদের মোহনবাগান-খেলোয়াড় কুমারের বাড়ীতে গিয়া হাজির। তাঁহার ভাইপো মথুরা কুমার বীরেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তিনি আমাদের সাদরেই অভ্যর্থনা করিলেন। লক্ষীছাড়া সাইকেলগুলা টান মারিয়া একদিকে ফেলিয়া দিয়া হাত-পা ছড়াইয়া বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলাম। চা আসিলে জামা জুতা খুলিয়া চা খাইলাম। চা না অমৃত! ইচ্ছা করিতেছিল, আজীবন শুধু এমন পেয়ালার পর পেয়ালা চা-ই খাইয়া যাই। পৃথিবীতে আর কিছু করিবার না থাক্—শুধু চা আর আমি। ক্রমান্বয়ে ইচ্ছানুসারে স্নান করিলাম, যদিও মথুরাবাবু মানা করিলেন। জলযোগ করিবার পর দেওয়ালী দেখিতে বাহির হইলাম। মথুরাবাবুর ভাই কমলাবাবুও আমাদের সঙ্গ লইলেন। আমুদে লোক। বাড়ীর বাহির হইয়াই কয়েকখানি পানের দোকান, মণিহারির দোকান, খাবারের দোকান, মোটর-বাস ষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদি। কুমারবাবুদের গোলার সামনেই বারোয়ারি রাস্তার তে-মাথার মোড়ে শ্যামাপূজা।

বারোয়ারি-তলায় বীরেনকে অনেকে দেখিয়া অবাক্ হইল, অনেকে চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারিল না। মণ্ডপে কয়েকজন ছেলে বুড়া মিশিয়া আড্ডা দিতেছে। একটি হারমোনিয়ম সংযোগে এক ভদ্রলোক সুর ভাঁজিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া তিনি চুপ করিলেন। বলিলাম, কি দাদা, আমরা কি এতই অভাগ্য, দুইটা গানই না হয় শুনাইলেন, এতদূর হইতে এই আশাতেই ত আসিয়াছি। সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন। বুঝিলাম, এই রসিকতাতেই এখানে দিব্য স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন কাটে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে রসিকতার মূল্য বাড়ে কমে! গোপালভাঁড়ের সহিত ভোল্‌টেয়ারের, বার্ণার্ড শর সহিত বীরবলের দেখা করাইয়া

দিলে একটি অসম্ভব কাণ্ড হইত নিশ্চয়ই! একজন আর একজনকে অরসিক না ভাবিয়া ছাড়িত না।

খানিকক্ষণ লাইনে বেড়ানো গেল· লাইন অর্থাৎ একটি পাড়ার নাম এবং বাঙ্গালীদেরই পাড়া। রম্‌জান্ নদী পার হইয়া যাইতে হয়, অবশ্য পুলের উপর দিয়া হাঁটিয়া। গোলায় ফিরিলাম লাইন হইতে অনেক নূতন সঙ্গী লইয়া।

২৯শে।—

ঘুম ভাঙ্গিতে শুনি, সুরেন খুব চেঁচামেচি করিতেছে, বলিতেছে, তোরা কি উঠ্‌বি না, বেলা যে নয়টা বাজে, মথুরা-বাবু দুই বার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রফুল্ল, অনিল ও বীরেন তখনও কম্বলের তলায় অসাড় ভাবে পড়িয়া আছে। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি রোদের তেজ বাড়িয়া গিয়াছে।

এই বেলাই আহারাদি করিয়া শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা। শিলিগুড়ি এখান হইতে ৬২ মাইল। একটানা ৬২ মাইল চলিতে পারিব না আশঙ্কা করিয়া আমরা আরও ১৯ মাইল আগাইয়া ইসলামপুরে থাকিতে চাই।

ইস্‌লামপুর: ব্রজবাবুর বাড়ী।

বেলা ২টায় যাত্রার কথাবার্ত্তা হইয়া রহিল। বেলা ১০টা ১০½টায় সহর-পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। জায়গায় জায়গায় ছড়াইয়া এক একটি পল্লী, তাহাদের মাঝে রম্‌জান্ নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। রেল লাইনের ডানদিকে দার্জ্জিলিং রোড্। এই রোডের পরই আদালত, মুন্সিফ্ কোর্ট, জেল, পি. ডব্লিউ. ডি আফিস, এক্সাইজ অফিস, দূরে পশুদের জন্য ছোট একটি ফাঁড়ী রম্‌জানের তীরে, এ দেশের কথায় বলে "আড়্‌গড়া", আর একটু দূরে পোষ্টাফিস। আদালত ছাড়িয়াই এস্-ডি-ওর বাড়ী। তার পরই সশস্ত্র পুলিশের লাইন। আর দুই চার পা পরে বাম হাতে কতকগুলি রেলওয়ে কোয়ার্টার্স লইয়া প্রখ্যাত কিষণগঞ্জ জংশন ষ্টেশন বিদ্যমান।

এইখান হইতে ডি. এচ্. রেলের একটি লাইন শিলিগুড়ি ছুটিয়াছে। ষ্টেশন হইতে ফিরিবার মুখে একটি গুমটীর বামে ডাকবাংলো, ডাহিনে কিষণগঞ্জ স্কুল। তাহার পর কিষণগঞ্জ-বাজার, বড় বড় কয়েকটি ডিস্‌পেন্‌সারি (সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ), কয়েকটি মণিহারির দোকান ও খানকতক বাসিন্দার বড় বড় বাড়ী রাস্তায় হাঁসপাতালও নজরে পড়িয়াছিল।
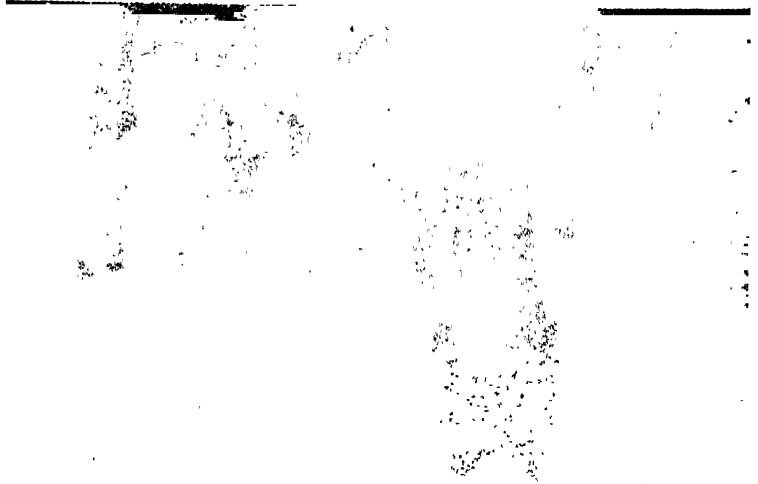
সেদিন কিষণগঞ্জে যুবকেরা থিয়েটারের ষ্টেজ নির্ম্মাণের জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিল। স্কুল-কম্পাউণ্ডে ষ্টেজ বাঁধা হইতেছিল। আমি ও বীরেন একবার উঁকি মারিতে গেলাম। গিয়া দেখি একটি বড় বটগাছের ডাল কাটিয়া আনিয়া তাহাকে লইয়া সকলে টানাহ্যাঁচড়া করিতেছে। জঙ্গলের একটি স্বাভাবিক পরিকল্পনার অভিপ্রায়ে এই বটের ডালটিকে দাঁড় করান হইতেছে। থিয়েটার-পার্টি আসিতেছে পূর্ণিয়া হইতে, আমাদেরই পরিচিত সেই ভাট্টাবাজারের দল।

কিষণগঞ্জ বৈঙ্গলি-ক্লাব হইতে আমাদের থিয়েটার দর্শন করিবার নিমন্ত্রণ আসিল। সেদিনকার মত যাওয়া স্থগিত রাখিতে হইল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া লইয়া, রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলাম। তখন রাত্রি দশটা। পালা সুরু হইয়া গিয়াছে। দুইটি অঙ্ক দেখিবার পর উঠিয়া

পড়িলাম। আগামী ভোরে যাত্রাই স্থির, আর কথার খেলাপ করিয়া কাজ নাই। কাল থাকিলে হয়ত আবার 'সাজাহান' কি 'বঙ্গে বর্গী' দেখিতে হইবে তাহার চাইতে পলায়ন ভাল।

৩০শে

ভোর ৫টায় উঠিয়া বাঁধাছাঁদা করিতে সাতটা বাজিল। বাজারের মধ্যে শ্রীপতি বাবুর ডিস্‌পেন্সারী হইতে ক্যাপ্টেনের জন্য একটি ঔষধ লইয়া দার্জ্জিলিঙ রোড ধরিলাম। ডি. এচ. রেলের কিষণগঞ্জ সিটি ষ্টেশন নিকটেই। সামনেই রাস্তার অপর পারে খোলা যায়গায় একটি পাকা দোতালা। বীরেনের শৈশব-জীবনের দুই বৎসর ঐ বাড়ীতে কাটিয়াছিল। বীরেন হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। আর দুই এক দিনের মধ্যেই শৈলরাজের আধিপত্য জয় করিব এই আশায় চলিতেছি। সুরেন বলিল, আজ কাশ্মীর-যাত্রীর দৌড় দেখ্, চল্ নন্-ষ্টপ্ শিলিগুড়ি যাই। গাড়ী ছুটিতে লাগিল, বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বীরেনই দেখি সকলের আগে হু-হু শব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে, পিছনে ফিরিয়াও তাকাইতেছেও না, সুরেনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। যেন মৃগতৃষ্ণিকার সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছি। দূরে হিমগিরি, তুষার শীর্ষ কাঞ্চনজঙ্ঘা ভোরের আলো গায়ে মাখিয়া সোনার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। হ্যাঁ, কাঞ্চনজঙ্ঘা নাম সার্থক। অতৃপ্ত নয়নে খানিক চাহিয়া রহিলাম। দিক্‌চক্রবালের সহিত মেশানো বনের রেখা দেখা যায়। চারিদিকে খোলা আকাশ—বাতাস স্নিগ্ধ। কি সুন্দর! পথের ধারে বড় বড় অশ্বত্থ, দেবদারু গাছ। ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়ার লুকোচুরির খেলা, রাস্তার একধারে কিছুদূর অন্তর অন্তর ২।৪ খানি ধানের ক্ষেত, কোনটায় ধান কাটা হইতেছে, কোথাও শস্যভার মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছে। পথ তখনও শিশিরে ভেজা। রাস্তা দিয়া গরুর পাল টুঙ্‌টাঙ ঘণ্টা বাজাইয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া রোম্যান্টিক যুগের যে কোনও বড় কবির একটি কাব্য!

এত আনন্দ অনেক দিন পাই নাই। কিষণগঞ্জের পথে আসিতে যে ক্লান্তি একদিন আগে দেহমনকে পাইয়া বসিয়াছিল, কর্পূরের মত কোথায় তাহা উবিয়া গেল! প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত জীবনে বিভিন্ন, স্বতন্ত্র, পৃথক! আদির সহিত অন্তের কোন মিল নাই।

দশ মাইল গিয়া দেখি সুরেন সাইকেল হইতে নাবিয়া, গলদঘর্ম্ম হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ওয়াটার-বটল হইতে জল খাইতেছে, দূরে বীরেন তখনও ছুটিয়া চলিয়াছে। সুরেনকে খানিকটা চাঙ্গা করিতে হইল—আবার ছুটিলাম। কি আনন্দ! কি আনন্দ! দার্জ্জিলিঙ হিমালয়ান্ রেলের লাইন আর পথ আমাদের একমাত্র সঙ্গী। অনেকগুলি ছোট ছোট ষ্টেশন ২।৩ মাইল অন্তর অন্তর পার হইলাম।

ঠিক ১৯ মাইলে ইসলামপুর। সময় লাগিয়াছিল ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। ইস্‌লামপুর ছাড়াইয়া আরও আধ মাইল দূরে গিয়া দেখি, বীরেন একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ২।৩ খানি গরুর গাড়ীর ভড়কান-গরুর ভয়ে পথ ছাড়িয়া পালাইবার চেষ্টা আর গাড়োয়ানদের বিড়ম্বনায় হাসিতেছে। টুপি খুলিয়া তাহাকে 'চিয়ারিয়ো' জানাইলাম, সে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন জানাইল।—মরিশ্ শিভেলিয়ারের ভঙ্গী। আর্টের কি জীবনের উপর এমন প্রভাব! বাংলা দেশে কলিকাতা-প্রবাসী শিক্ষিত যুবকদের ভঙ্গীতে কি আশ্চর্য্য ভাবেই না হলিউডের প্রভাব পড়িয়াছে! ইস্‌লামপুরের পুলিশ সাব-ইন্‌স্‌পেক্টারের সহিত আলাপ হইল। খুব সদাশয় ব্যক্তি। চা খাইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ইসলামপুরে অপেক্ষা করা-না-করার দোটানায় পড়িয়া সে-লোভ ছাড়িতে হইয়াছিল।

খানিক দূর গিয়া বীরেন বলিল, এখানে ভাত খেয়ে যদি যেতে চাস্ ত বল্, আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে।

—ভাত! অন্ন! এমন ভাগ্য কি হইবে? সকলে মিলিয়া নাচিয়া উঠিলাম।

বীরেনের বন্ধু ব্রজবাবুর দোকান আসিয়া উঠিয়াছি। অন্যান্য সব দোকান ষ্টেশনের ধারে একটি মেলা বসার দরুণ সেখানেই পশারের আশায় গিয়াছে। এখানে কেবল দোকান-ঘরগুলি, দোকানের আয়তন পরিমাণ লইয়া নিঝুম বসিয়া আছে। হাট বসিবার জন্য বাঁশের আটচালা খানকতক এদিক-ওদিক ছড়াইয়া আছে। ব্রজবাবুর দোকান মশলাপাতিরই, তবে তাহার সহিত কিছু কিছু মণিহারী মালপত্র আছে।

দোকানটি বেশ বড়, মাথায় সাইনবোর্ড মারা 'মণ্ডল ব্রাদার্স'।

ব্রজবাবু বীরেন ও আমাদের সকলকে হাসিমুখে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বীরেনের সহিত গল্পগুজব কিছুক্ষণ চলিল, অনেকদিন পরে তাহাদের দেখা।

চা আসিল, জলখাবার আসিল। চাদর-বিছান ফরাসের উপর গা এলাইয়া দিলাম। স্নান করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কেহ আর বাঁধা-ছাঁদার হাঙ্গামে কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য করিলাম না।

কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভ হইল। বেলা দুইটা বাজে। ব্রজবাবুর সহিত একটি ছবি লওয়ার পর তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া আবার সাইকেলে উঠিয়া পড়িলাম।

শিলিগুড়ি পৌঁছিতে এখনও ৪৩ মাইল বাকি। আজ শিলিগুড়ি না পৌঁছিলে মান থাকে না। ভাল-মন্দ রাস্তা বাচ্‌বিচার না করিয়া খুব জোরেই গাড়ী চালাইতেছি। যখন চোপ্‌রার কাছাকাছি তখন অনিলের চেন খুলিয়া গেল। সেখানে রাস্তায় আলো কিছু কম, কেননা দুই পাশে গাছগুলি খুব ঘন।

চোপ্‌রার ডাকবাঙলো ডাহিনে রাখিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি ছোট নদীর পুলের উপর কিছু বিশ্রাম লইতে চেষ্টা করিলাম। চোপরা ইসলামপুর হইতে ১৮ মাইল। এইখানে বিহারের সীমানা শেষ। আবার বাঙ্গালার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই প্রদেশ জলপাইগুড়ি জিলার মধ্যবর্ত্তী। ১৬ মাইল দূরে তেঁতুলিয়া। তাহারই উদ্দেশে দৌড় দিলাম। রাস্তায় কাহারও দিকে লক্ষ্য নাই। কেবল মনে ছিল একটি ৬।৭ মাইল ব্যাপিয়া জঙ্গল আর ঘণ্টায় ১০।১২ মাইল বেগে সাইকেল যাইতেছে।

তেঁতুলিয়া পৌঁছিলাম বেলা ৪॥০ টায়। মহানন্দা নদী কোথায় কোন দিক্ ঘুরিয়া এইখানে দার্জ্জিলিঙ রোডের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদেরকে 'ফলো' করিতেছে নাকি! একটি যায়গায় খুব লোকের ভিড়। কাছে আসিয়া দেখি একটি বাঁশে-ঘেরা আঙিনার মাঝে ঝুমুর গান চলিতেছে একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে খুব সাজিয়া বাজনদারদের মাঝে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। নাচের ভঙ্গিমা চমৎকার। কলিকাতার নিউ এম্পায়ারে আনাইয়া নাচাইলে সাড়া পড়িয়া যাইবে। ঝুমুর একপ্রকার ফোক ডান্স, folk dance। বাহিরে একটি ছোটখাট মেলা বসিয়াছে। ইহারা সব রাজবংশী। কালীপূজা উপলক্ষে আমোদ চলিতেছে। সামনেই শ্রীশ্রীকালীর মণ্ডপ।

একটি মেয়ের কাছে দুই পয়সায় গোটা দশ বার মুড়ির মোয়া কিনিয়া লইয়া বীরেন সকলকে দুইটা দুইটা হাতে দিয়া

তেঁতুলিয়া : রাজবংশীদের ঝুমুর নাচ।

গেল। মোয়া খাইতে খাইতে ঘুরিতে লাগিলাম। মেলায় মেয়েদের ভিড়ই বেশী। মেয়েদের খালি কোমরে একখানি লুঙ্গির মত ছোট কাপড় জড়ানো। পায়ে অন্য কিছুই নাই। পুরুষেরা অত্যন্ত ভীরু। প্রায় আধঘণ্টাকাল কাটাইয়া দিলাম এ দেশের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামে পূর্ণস্বাস্থ্যের লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শিলিগুড়ি এখান হইতে দশ মাইল।

রাস্তায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। অস্ত-রবির লালিমার চিহ্ন প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল। শিলিগুড়ির দুই মাইল দূর হইতে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি বৈদ্যুতিক আলো দেখা গেল। দার্জ্জিলিং রোড ছাড়িয়া ডাহিনে শিলিগুড়ি ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিলাম। ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে লেভেল-ক্রসিং এর গেটে কয়েকটি ভদ্রলোক আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারাই কি সাইকেলে দার্জ্জিলিং যাইতেছেন? বলিলেন, চাঁপাসরাই টী এষ্টেটের ম্যানেজার সতীশবাবু আপনাদের জন্য গতকল্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। আজও বোধ হয় নিশ্চয় কাহাকেও পাঠাইয়া থাকিবেন

এখান হইতে চা-বাগান তিন মাইল। (ক্রমশঃ)

সন্দেহ-দোলায়

—শ্রীলালমোহন দে

আজ যে বিষয়ে আমি লিখিব, তাহা লিখিবার সঙ্কল্প আমার বহু দিনের। এত দিন যে লিখি নাই, তাহার কারণ, এ-বিষয়ে কিছু লেখা আমার পক্ষে আদপেই উচিত হইবে কি না সে সম্বন্ধে আমার মনে প্রভূত পরিমাণে সন্দেহ ছিল। আজিও যে আমি একেবারে সন্দেহমুক্ত, তাহা নহে। কিন্তু সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টা যথাসাধ্য করিয়াও যখন কোন ফলোদয় হইল না, তখন মনের সন্দেহ মনে পোষণ করিয়াই লেখনী ধারণ করা সমীচীন বোধ করিলাম।

বন্ধু-বান্ধবেরা কিন্তু আমাকে বহু নিষেধ করিয়াছেন। বলিয়াছেন—ছিঃ, তুমিও দেখ্‌ছি মিস্ মেয়োর মত একজন ড্রেন-ইন্‌স্‌পেক্টার হয়ে দাঁড়ালে হে। এসব ব্যাপার, দেখগে যাও, ঘরে ঘরেই হচ্ছে। পরের কথা নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেই নয়, কেমন? চোখ-কান খোলা রাখ; আপনার ঘরে বসে সব দেখ শোন; কিন্তু, খবরদার,—স্পিকৃটি নট্!

আমি তাঁহাদের কথা শুনি নাই; শুনিব না। যাহা জানি, যাহা এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছি, আজ তাহা অকপটে আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিব। একটি কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিব না; আবার আধখানি কথা সেটি যতই কুৎসিত হউক না কেন, পরিত্যাগ করিব না। ঘটনাটি ঠিক যেমন ঘটিয়াছিল, আমি যোগ-বিয়োগ কিছুই না করিয়া তদনুরূপ উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

কাজটি যে ভাল হইবে না, তাহা মানি। কিন্তু এই সকল অনাচার ব্যাভিচার সমাজ হইতে দূরীভূত না হইলে, সমাজেরই ভূরি ভূরি অনিষ্টের কারণ হইবে। এ সকল কেলেঙ্কারি না ঘটিবার একমাত্র পন্থা,—দৈবাৎ একটি ঘটিয়া পড়িলে উহা ধামা-চাপা না দিয়া, তদ্দণ্ডেই জনসাধারণে প্রকাশ করিয়া দেওয়া। পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠাদের এক গণ্ডে চূণ এবং অন্য গণ্ডে কালী পড়িলে, সময় থাকিতে অনেক সাধু-ই সাবধান হইতে পারিবেন।

অযথা আমি কাহারো প্রাণে আঘাত দিতে চাহি না। যাহাদের ইতিহাস লিখিব, তাহারা কেহই কোন মাসিক-পত্রিকা পাঠ করে না। আমার এই কাহিনী কস্মিনকালেও তাহাদের নয়নপথে পতিত হইবে না। এই তিক্ত-মধুর কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশিত হইলে কাহাকেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়া, তবেই আমি লিখিতে বসিয়াছি।

কিন্তু, লিখিব বলিলেই কি আর লেখা যায়?—যন্ত্রণাও অনেক, বাধাবিঘ্নও বিস্তর। এক শ্রেণীর লোক আছেন,—বড় খুঁৎখুঁতে। সাহিত্যের পয়োভাণ্ডে পাছে কেহ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে একবিন্দু নীতিবিগর্হিত ভাব, ভাষা কিম্বা বিষয়ের অম্লরস নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া বসে, এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা শতচক্ষু উন্মীলিত করিয়া, দণ্ডপাণি হইয়া, প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত। সাহিত্যের স্বাস্থ্য কিম্বা চরিত্রের হানি ঘটিতে পারে এরূপ একটি বাক্য তাঁহারা লিখেন না, বলেন না: অপরকে বলিতে লিখিতে দেখিলে যষ্টি উত্তোলন করিয়া—'মার' 'মার' শব্দে ছুটিয়া আসেন। এই যা মুস্কিল। নচেৎ এই লজ্জাজনক ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিতে আমার আর কোনই অসুবিধা দেখিতেছি না। তবে, যত্র মুস্কিল তত্র আসান। একটি কথা প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। যাঁহাদের (আশা করি এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হইবে না) কুরুচিপূর্ণ কথাকাহিনী শ্রবণ করিতে আপত্তি আছে, তাঁহারা যদি কর্ণদ্বার অবরোধ করিয়া ইতিহাসটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তবে বোধ করি সর্পও বিনষ্ট হয়, অথচ যষ্টিও ভঙ্গ হয় না। যাহা হউক, আমি পথ প্রদর্শন করিয়া দিলাম মাত্র। যাঁহার অভিরুচি, তিনি এই প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। যিনি প্রতিজ্ঞায় ভীষ্মতুল্য, সৎ-সাহিত্য ব্যতীত অপর কিছুই যিনি জীবন থাকিতে পাঠ করিবেন না,—তিনি এই খানেই পুস্তক বন্ধ করিয়া অন্য চেষ্টা দেখিতে পারেন। আমি আরম্ভ করিলাম।

চক্রতীর্থের অনতিদূরে, একটি বালিয়াড়ির উপর একখানা দ্বিতলবাটী যাঁহারা পুরী গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যে-যুগে শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের বিহার ও উড়িষ্যার চাকুরী পাওয়া সহজসাধ্য ছিল, শুধু সহজ-সাধ্য নহে, যখন তাঁহারাই উক্ত অঞ্চলদ্বয়ের বড় বড় সরকারী চাকুরীগুলি প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সময় আমাদের এক নিকটতম আত্মীয় কটকে আবগারী

বিভাগে উচ্চ চাকুরী করিতেন। চাকুরীকাল যথাসময়ে (অর্থাৎ সরকারী হিসাবে পঞ্চান্ন আর কোষ্ঠীমতে পঁয়ষট্টি) পূর্ণ হইলে, অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পুরীতে, সমুদ্রের ধারে, এই বাটীখানা নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। সে আজ প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা।

গৃহস্বামীর মৃত্যুর পর বাটীখানার মালিকানাস্বত্ব ওয়ারিশানসূত্রে আমাদের রহিল বটে, কিন্তু উহার দখলীস্বত্ব গিয়া পড়িল আত্মীয় মহাশয়ের পুরাতন খানসামা, কটক-নিবাসী, নকুল মহাপাত্রের হস্তে। কর্ম্মোপলক্ষে আমাদের তখন বারোমাস কলিকাতায় থাকিতে হইত। কখন কদাচিৎ পুরী যাওয়া ঘটিত কিনা সন্দেহ। তথাপি, চক্রতীর্থতীরবর্ত্তী বাটীখানার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের কোনই উদ্বেগ পোহাইতে হইত না। নকুল মহাপাত্রের সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে বাড়িটির কোন শ্রী বা অঙ্গহানি যে ঘটিবে না, সে বিষয়ে আমরা একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম।

যে বৎসর ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, সেটি আমার পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বৎসর। স্বাস্থ্যহানি, বন্ধুবিচ্ছেদ, ধনক্ষয়, মনস্তাপ প্রভৃতি লক্ষণে কোপনস্বভাব হংসারূঢ় দেবতাটির সান্নিধ্য বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতেছিলাম। সন তারিখ উল্লেখ করিব না; উল্লেখ না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু দীর্ঘকালের পর একদিন আমি সত্য সত্যই পুরীর বাড়িতে সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সে দিনের কথা আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। চন্দনযাত্রার উপলক্ষে তখন পুরীতে কিছু কিছু যাত্রী-সমাগম হইতেছিল। মনে করিলাম,—যাক্ ভালই হইল। স্ত্রীর বহুকালের আকাঙ্ক্ষা, কিছু দিন এক সঙ্গে পুরীতে থাকিয়া চন্দনযাত্রা, পুষ্পযাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি যত প্রকার 'যাত্রা' পুরীধামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, উহাদের সকলগুলি দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করেন। সে সুযোগ ত এতদিন হইয়া উঠে নাই। আজ যখন শ্রীক্ষেত্রে আগমনই হইল, তখন শ্রীমতীর বহুকালপুষ্ট সাধ মিটিবে। আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। মুখে আমার হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মনোগত অভিপ্রায় তখনই প্রকাশ করিয়া দিতে আমার ইচ্ছা হইল না। ভাবিলাম, কিছুদিন এখানে থাকিব ইহা ত স্থির; তবে এখনই সে কথা ফাঁস করিয়া দিয়া কোনই লাভ নাই। করুন না উনি কয়েকদিন তোষামোদ। অনেক সাধ্য-সাধনার পর শেষে একদিন, যেন কত প্রসন্ন হইয়া একটা বরদান করিতেছি এমনি একটা 'পশ্চার' করিয়া বলা যাইবে—আচ্ছা তথাস্তু; থাকাই যাক্ তবে!

কিন্তু, সর্পের হাসি সর্পবৈদ্যের নিকট সুপরিচিত। আমার সুপ্রসন্ন হাসিটুকু লক্ষ্য করিয়া ভানুমতী, সংক্ষেপে ভানু, আমার মনোভাব স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করিল, কাজেই, আর কোথা যায়! ভানুর ডাকহাঁকে চক্রতীর্থের বেলাভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল—ওরে নকুল, ওরে ও মহাপাত্র, ছ'মাসের আগে আর এখান থেকে নড়ছি নে। ভাল লাগলে, এক বছরও থেকে যেতে পারি। উপরকার সব ঘরগুলো খুলে দে; বন্ধ থেকে থেকে দব পচে গলে গেল যে রে। তিনটে ঠিকে চাকর, দুটো ঠিকে ঝি, একটা রসুয়ে বামুন যোগাড় কর। ঘর-দোর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যাক্। অনেক দিন থাকা হচ্ছে যে, এবার। ঘর-দোরের যে ছিরি হয়ে আছে, এতে কি আর মানুষ থাকতে পারে?—মাগো, ঘেন্না করে যে ইত্যাদি ধরণের বহুকথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম পুরীর উর্ব্বর ভূমিতে এই ক্ষুদ্র পরিবারের শিকড় এ যাত্রা এতদূর প্রবিষ্ট হইবে যে উহা ছিন্ন করিয়া শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিবার আর কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না।

তখন রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। পিঙ্গলাভ বেলাভূমে বালুকারাশি সূর্য্যকিরণে চিক্‌চিক্ করিতেছে। দূরে সমুদ্র।—প্রথমে শুভ্র ফেনিল, তারপর ধূসর পঙ্কিল, তারপর—যতদূর দৃষ্টি চলে—আকাশ আর সমুদ্র, সমুদ্র আর আকাশ, নীলে নীল হইয়া পরস্পর মিলিয়া গিয়াছে। সাগর দর্শন এই আমার প্রথম নহে। তথাপি মনে হইতেছিল এই সুমহান দৃশ্য বুঝি আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই।

—বা রে এটা আবার কেত্থেকে এল?

জানালায় দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ছিলাম। ভানুমতীর যুগপৎ প্রশ্ন ও আশ্চর্য্যবোধক উক্তিটি শ্রবণ করিবামাত্র আমার চমক ভাঙ্গিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম গৃহিণী দেবদারু কাষ্ঠের একটি জবরদস্ত গোছের সিন্দুক উজাড় করিয়া নানা প্রকার গৃহস্থালী দ্রব্যসম্ভার মেঝের উপর জড়ো করিয়া বসিয়া আছেন এবং মৃদু মৃদু হাস্য

করিতেছেন। তাঁহার হাসির কোন উপযুক্ত কারণ আমি খুঁজিয়া না পাইয়া একটু বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—কি আবার কোথা থেকে এল ?

—ঐ চেয়ে দেখ, বলিয়া ভানুমতী দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

চাহিয়া দেখিলাম, অপরূপ এক দৃশ্য !

কালো কুচ্‌কুচে অল্পবয়স্কা একটি উড়িয়্যার জীব ক'নে-বউয়ের মত দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া অতি করুণ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দেহের ঐ অসিত বর্ণটি একমাত্র উড়িষ্যা এবং মান্দ্রাজেই সম্ভব। কিন্তু ঐ রঙটিই যা নিন্দনীয়; নতুবা অপর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য খুঁৎ আমার নয়নগোচর হইল না। সর্ব্বাঙ্গে নবমুকুলিত যৌবন-শ্রীর শ্যামসুষমা যেন উপছাইয়া পড়িতেছে। বক্ষ উন্নত করিয়া দাঁড়াইবার সলীল ভঙ্গিটিই বা কত মনোমুগ্ধকর। সর্ব্বোপরি, চক্ষু দুটি কি সুন্দর, কী মর্ম্মস্পর্শী। চক্ষু নয় তো যেন অবসন্ন নিশীথে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া-পড়া শুকতারা ! মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেই হইল।

অধিকাংশ স্ত্রীলোকের একটা বদ্ধমূল ধারণা এই যে, 'অধঃপাত' জিনিষটা কোন অবস্থাবিশেষের সংজ্ঞা নহে। 'অধঃপাত' একটি সুবৃহৎ গর্ত্তের নাম, এবং পুরুষাখ্য জীব-সকল সেই গর্ত্তলোক প্রাপ্ত হইয়া, আই. জি. এস. এন্. কোম্পানীর ষ্টীমারে চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্ব-দেশ হইতে আনীত, চক্রাকার বংশপিঞ্জরে আবদ্ধ, কুক্কুটসঙ্ঘের ন্যায় পরস্পর ঠোকরাঠুকরি, নথানখি করিয়া মরিতেছে; এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আপন 'পুরুষ'টির টিকি ধরিয়া বেচারাকে অধঃপাতরূপ গর্ত্ত হইতে টানিয়া তোলাই একমাত্র ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য।

ভানুমতী ছিল এই শ্রেণীর দার্শনিক। আমার রকম-সকম মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া, বাঁকাহাসি হাসিয়া সে বলিল—বেশ দেখ্‌তে, নয় ? একেবারেই অধঃপাতে গেছ দেখ্‌ছি।

ভয়ঙ্কর রাগ হইল। রূপ-যৌবনের কোন বালাই আমার নাই। রূপ কস্মিনকালেও আমার ছিল না। যৌবন ?—"বহুদিনকার, ভুলে যাওয়া যৌবন আমার" ! তথাপি, গৃহিণীর সন্দেহের আর শেষ নাই, অন্ত নাই। ফাঁক পাইলেন কি অমনি আমার অধঃপাত-লোকপ্রাপ্তির দুঃসংবাদটি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাকে সংশোধনের চেষ্টা—তথা অধঃপাত-গর্ত্ত হইতে আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পুরীতে পদার্পণ করিয়া প্রথম দিনেই যে একটি কৃষ্ণকায়া উড়িষ্যার ইতর শ্রেণীর জীব সম্পর্কে এই খোঁটা শুনিতে হইবে, ইহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। সুতরাং রাগ না হইয়া আর যায় কোথায় ?

ক্রুদ্ধ হইলে অনেকেরই মুখে কথা জোটে না। আমারও সেই দশা। কি বলিলে উপযুক্ত পাল্টা জবাবটি দেওয়া হয় ভাবিতেছি, এমন সময়, অতি ধীর পাদবিক্ষেপে, অপর একটি উড়িষ্যার বাসিন্দা পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণকায়ার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

আগন্তুককে দেখিবা মাত্র ভানুমতী সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—আরো একজন যে ! একেবার সরাসর দোতলায় ! তাড়াও দুটোকে শীগগির। এদের কাউকে বিশ্বাস নেই।

আমি গৃহিণীর কথা কানে না তুলিয়া নবাগতর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। বয়স অল্পই বোধ হইল, কিন্তু এই হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান চেহারা ! মুখখানা চমৎকার গোলগাল, মোলায়েম। তদুপরি বেশ কচিকচি সুদৃশ্য এক জোড়া গোঁফ। দেহের বর্ণ উড়িষ্যা অঞ্চলে এত যে গৌর হইতে পারে ইহা আগে জানিতাম না। চক্ষুর দৃষ্টি স্থির, মর্ম্মভেদী। মুখের ভাবটি এত গুরুগম্ভীর, যেন হাই-কোর্টের চিফ্ জাষ্টিস্ এজলাসে আসিয়া প্রবেশ করিলেন !

ভানুমতী অবাক হইয়া নবাগতকে মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল। ক্ষণ-পূর্ব্বের লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তি মস্তক উত্তোলন করিল। ভানুর তৎকালীন বঙ্কিমহাস্য অনুকরণ করিয়া, তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিলাম—বেশ দেখতে, নয় ? একেবারেই অধঃপাতে গেছ দেখ্‌ছি।

অব্যর্থ সন্ধান ! খোঁচা খাইয়া ভানুমতী একটি অগ্নিময় দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল।—কিন্তু পরক্ষণেই আপনার পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিল, এটি তাহার ন্যায্য পাওনা। সুতরাং বাগযুদ্ধে আর অধিক অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিল—তোমাদের মত আমরা অত নির্লজ্জ নই।

আমি শুধু আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম এদের সাহস দেখে, আস্পর্দ্ধা দেখে। আমি রয়েছি এখানে, তুমি রয়েছ এখানে—তবু কি সাহসে এরা দু'জন সরাসর দোতলায় উঠে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল! অনধিকার-প্রবেশের আশঙ্কা নেই, অর্দ্ধচন্দ্রের ভয় নেই এদের? দূর্, দূর্, দূর্ হ এখান থেকে। নকুল, নকুল, এদুটোকে হাঁকা এসে। সহজে না যেতে চায়, লাঠি মেরে বাড়ী থেকে বের করে দে।

গৃহিণীর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া নকুল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিল।

—কি হইল দিদিমণি?

—হইল তোর মাথা! এই জানোয়ার দুটোকে ওপরে আসতে দিয়েছে কে? কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নাই, এক্কেবারে দোতলায়? জল্‌দি হাঁকা।

—জানোয়ারদুটি কিন্তু ভানুর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইল না। যেমন তাঁহারা নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমাদের স্বামীস্ত্রী দুই-জনকে দেখিতে লাগিল।

বৃদ্ধ নকুল কহিল—আমার কোন কুলেই কেউ নেই যে কাছে এনে রাখ্‌ব। এতবড় বাড়ীতে বারমাস একলা থাকি; বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। আপনারা ত অবুরে-সবুরে পাঁচ সাত দিনের জন্য হুড়হুড় করে আসেন, আর হুড়হুড় করে চলে যান। আমার বড় একলা একলা বোধহয়। মন ভারি হয়ে থাকে। তাই এদেরকে পোষ্যপুত্র আর পোষ্যকন্যা করে কাছে রেখেছি। আপনাদের কোনই ভয় নেই। এরা দুটোই খুব ভাল। এদের ব্যবহারে আপনারা খুসী বই বেজার হবেন না।

নকুলের পোষ্য দু'জন! ভানুমতীর মন ভিজিয়া উঠিল। আমিও নরম হইয়া গেলাম। বাস্তবিক—এতবড় বাড়ি; একা একা কি থাকা যায়? নকুলই যখন এদের আশ্রয় দিয়াছে, তখন আমরা আর বেচারাদের নিরাশ্রয় করি কেন? বিশেষতঃ, যখন আমরা পুরীধামে চিরকালের জন্য থাকিতে আসি নাই।

নকুলের পোষ্যপোষ্যার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ভানুমতী প্রশ্ন করিল—ওদের নাম কি রে?

—নাম আর কি ছাই হবে ওদের? একটাকে ডাকি 'ও ছেলে' বলে, আর একটাকে ডাকি 'ও মেয়ে' বলে! যে এক একটার অপরূপ রূপ, তার আবার ঘটা করে ওদের নাম রাখতে হবে বুঝি?

ভানু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—ওমা, হবে না আবার! নাম আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কারো না থাকে? আমি এক্ষুণি ওদের একটি একটি নাম রেখে দিচ্ছি। 'ও ছেলে' 'ও মেয়ে' না তোর মাথা! বুড়ো বয়সে ভীমরতি না হলে কেউ অমন নাম রাখতে পারে? আন্ ধরে ওদের আমার সামনে।

নকুল তাহার পোষ্যপুত্র ও পোষ্যকন্যার গ্রীবা ধরিয়া এক প্রকার টানিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া তাহাদিগকে ভানুমতীর সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। শুধু দাঁড় করাইয়া দিলেই কি আর হইল? পাছে ছাড়িয়া দিলেই তাহারা পলায়ন করে এই ভয়ে বাধ্য হইয়া তাহাকে বেচারাদের স্কন্ধ চাপিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া ভানু কহিল—এদের দুজনার নাকের ওপর কি হাতীর পা পড়েছিল রে? নাক এদের আছে কি নেই সেটা বোঝাই যাচ্ছে না যে! মাগোঃ, এমন থেঁদা নাক আবার কারো হয়! মুখ দু'খানা এক্কেবারে লেপাপোঁছা! চোখ দুটো ট্যাকা ব্যাঁকা। ভেবেছিলাম, খাসা দুটো নাম রাখব এদের, কিন্তু যেমন মগের মত চেহারা, তেমন থাকল ঐ হোঁৎকার নাম চীনে, আর ঐ কালিন্দীর নাম জাপানী। তুমি কি বল? বেমানান হ'ল নাম দুটো?

বেমানান হইল কি মানানসই হইল সে চিন্তা করিবার আমার দায় পড়িয়াছে! হুট্ করিয়া বলিয়া দিলাম—বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে; এখন বিদেয় কর।

মহাপাত্র ছাড়িয়া দিবামাত্র চীনা ও জাপানী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

ইহার পর দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গিয়াছে। বিদেশে একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থার বিভীষিকা, চীনা ও জাপানীর কল্যাণে কিছুই বোধ হইতেছিল না। নকুল মহাপাত্রের কোন কুলেই কেহ নাই। বেচারা নিঃসঙ্গতার নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য চীনা ও জাপানীকে নিকটে রাখিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছে। আমাদের অবস্থাও কতকটা নকুলের অনুরূপ; তবে পার্থক্য

এই যে, আমাদের অন্যান্য সমস্ত কুলই কেহ না কেহ অলঙ্কৃত করিয়া থাকিলেও, সন্তানকুলে বিধাতা আমাদের একেবারেই ফাঁকি দিয়াছেন। সেই জন্যই চীনা ও জাপানীকে নিকটে পাইয়া পুরীর ঐ নির্জ্জন প্রবাস কতকটা অলক্ষ্যেই কাটিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু গৃহিণী কি ভাবিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। উপরে অবশ্য ভগবানেরও কিছু কিছু জানিবার কথা। আমি বুঝিলাম মাত্র সেইটুকু, যেটুকু আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলাম, এবং সেটুকু এই যে, নিঃসন্তান স্ত্রীলোকটি চীনা ও জাপানীর স্কন্ধে আপনার বহুকাল-সঞ্চিত, অব্যবহৃত অপত্যস্নেহের বোঝা চাপাইয়া দিয়া দুগ্ধের আস্বাদন ঘোলে মিটাইতে সমুৎসুক। নকুলের পোষ্য-পোষ্যাকে আপনার করিয়া লইয়া তাহাদের খাওয়ানো, ধোয়ানো, শোওয়ানো, জাগানো লইয়াই তাঁহার চব্বিশটি ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। আরো দেখিলাম, কোমল-হস্তের সেবা-যত্ন পাইয়া চীনা-জাপানীর নবীন যৌবন অতি অল্প দিবসের মধ্যেই বিচিত্র মনোমুগ্ধকর রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও তাহাদের হঠাৎ এরূপ "সরফরাজী" ধরণের হইয়া উঠিয়াছে যে দেখিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না যে ইহারাই কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের অতি কৃপার, অনুকম্পার পাত্র ছিল। তথাপি, এ সমস্ত আমি নীরবে নিরাপত্তিতে সহ্য করিয়া যাইতাম, কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন কিছু আমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, যাহাতে একদিনেই আমার চীনা জাপানী সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, দুগ্ধ এবং কদলী দ্বারা ভানুমতী এতদিন কালসর্প ই পুষিয়া আসিয়াছে। এইবার স্বহস্তে প্রতিপালিত সর্পযুগল আপনাদের স্বভাবোচিত কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে সেজন্য আপনাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও দায়ী করিলে চলিবে কেন?

কিন্তু সন্দেহ পোষণ করা এক কথা, মুখ ফুটিয়া অপরের নিকট তাহা ব্যক্ত করা আর এক কথা। বলি বলি করিয়াও কিছু দিন একটি কথাও বলা হইল না। দিন যত কাটিতে লাগিল, সন্দেহও ক্রমেই তত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, নাঃ, আর চুপ করিয়া থাকা সঙ্গত হইবে না। শেষে কি গৃহস্থ-ঘরে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটিয়া বসিবে?

থাকিতে না পারিয়া শেষে একদিন আমার ভয়ের কথা গৃহিণীকে গোপনে বলিয়া ফেলিলাম। শুনিয়া তিনি খানিকটা অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। বলিলেন—পুরুষ মানুষের মন কত আর ভাল হবে? খালি সন্দেহ, খালি সন্দেহ, খালি সন্দেহ! কেন, কি করেছে ওরা যে তোমার সুখ শান্তি নষ্ট হতে বসেছে? বুঝেছি গো, বুঝেছি, ওদের আমি একটু বেশী আদর যত্ন করি, পেট ভরে মাছ, দুধ, সর খেতে দি—এ সবই বোধ করি তোমার সহ্য হচ্ছে না? কেন বাপু, ওরা দুটো খেলে পরলে কি তোমার কুবেরের ভাণ্ডার ফুরিয়ে উজোড় হয়ে যাবে?

আমি কুবের নহি; তবে কতকটা তাঁর অনুগৃহীত বটি। চীনা ও জাপানীর ন্যায় দু' দশজন পোষ্য-পোষ্যা আজীবন পায়ের উপর পা রাখিয়া বসিয়া খাইলেও যে আমার ঐশ্বর্য্যের একটি কোণও ধ্বসিয়া পড়িবে না ইহা ভানুমতী যে প্রকার জানিত, আমিও ততোধিক জানিতাম।

কিন্তু কথা ত তাহা নহে। কথা হইতেছে চীনা জাপানীর পরস্পরের ব্যবহারের, হাবভাবের। উহার কোনটাই যে আমি বিশেষ সুবিধাজনক মনে করি না। গৃহিণী নির্ব্বোধ নহেন। তবে তাঁহার ভিতর একগুঁয়েমী জিনিষটির প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে আমি চিরকাল নিঃসংশয়। সুতরাং তিনি যে আমার কথা কানে না তুলিয়া আপনার জ্ঞান-বুদ্ধিতেই বহাল থাকিবেন, সে আশঙ্কাও যে আমার ছিল না তাহা নহে।

ভাবিলাম, যাক্, আমার বলিবার ছিল, বলিয়া আপন কর্ত্তব্য করিলাম। এখন যাহা ঘটিবার হয় ঘটুক। তখন ত আর ভানুমতী নথ ঘুরাইয়া বলিতে পারিবে না—সব বুঝেছিলে ত, আগে আমায় কেন বলনি সে কথা? আগে ভাগে আমাকে সাবধান করে দিলে ত এমনটা আর হতে পারত না। দূর দূর করে তখনই দুটোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতুম।

আমার সন্দেহে পূর্ব্বে এতটুকু শৈথিল্য থাকিলেও সে-রাত্রে এমন এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে আমাদের কাহারো আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র রহিল না—।

এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই। ভানুমতীর ব্যবস্থামতে জাপানী তাঁহার শয্যার নীচে পায়ের দিকে ভূমিতে শয়ন করিত। এই ব্যবস্থা আমার মনোমত হয় নাই, এবং

ইহার প্রতিকূলে আমি যুঝিয়াছিলামও যথেষ্ট।—কিন্তু আমার কোন প্রতিবাদ টেঁকে নাই। ভানুমতী কহিয়াছিল—আমার কাছে অষ্টপ্রহর না থাকলে পর, ওর ওপর আমি চোখ রাখব কেমন করে? জাপানী এখানেই শোবে। বুদ্ধিমতী গৃহিণী এটা বুঝিতে চাহিতেন না যে জাগিয়া থাকিলেই "চোখ রাখা" সম্ভব; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে আর উক্ত গুরুতর কার্য্যটি সম্ভবপর হয় না। এবং সেই অবসরে যাহার উপর চোখ রাখিবেন, ইচ্ছা করিলে, তিনি অনেক কার্য্যই সমাধা করিয়া ফেলিতে পারেন।

যাহা হউক, জাপানী শুইত ভানুমতীর পায়ের দিকে, মেঝের ওপর। আর চীনা ঘুমাইত একতলায় একটি ঘরে। নকুলের সহিত এক বিছানায়ও নহে, এক ঘরেও নহে। নকুল কহিত—চীনার গায় 'চীনে চীনে' গন্ধ! ওর সঙ্গে আমি থাকতে পারি না। কাজেই চীনার শয়নের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির নীচে একটি কুঠরী ছিল। বিশেষ কিছুই উহাতে থাকিত না। কতকগুলি ভাঙ্গা বাক্স পেঁটরা, কেরাসিন তৈলের গুটি কয়েক টিন, কয়েক জোড়া পরিত্যক্ত বিনামা ও একটি নাতিবৃহৎ ঠ্যাং-ভাঙা তক্তপোষে ঘরটি ভর্ত্তি ছিল। এই তক্তপোষের উপর শ্রীমান চীনা দিবাভাগে এবং প্রয়োজন হইলে রাত্রি বেলা নিদ্রা যাইত।

গুরু ভোজনের ফলস্বরূপ কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু সে রাত্রে আমার কিছুতেই আর নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল না। পড়িয়া পড়িয়া চীনা জাপানীর কথা ভাবিতেছিলাম। আর এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম। সহসা একতলার উঠান হইতে একটা মড়্ মড়্ শব্দ কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। পুরীতে চতুর্দ্দিক হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইলে উড়িয়া ও তেলেঙ্গা চোরের উপদ্রব সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। শব্দ শুনিয়া মনে করিলাম, তবে কি বাড়িতে চোর ঢুকিল?

বাহিরে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন, বাতাসের অবিরাম হুঙ্কার। উভয়ে মিলিয়া যেন দেবাসুর-যুদ্ধের রণবাদ্য বাজাইতেছে।

ধড়্মড়্ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মনে করিলাম, একটি শব্দ শুনিতে পাইয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। বাহিরে মেঘ-নির্ঘোষবৎ যে প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ চলিতেছে, তাহাতে দ্বিতীয় শব্দের প্রত্যাশা করা মূঢ়তা বই আর কিছুই নহে; ইত্যবসরে নিশীথ রাত্রির অতিথি মহাশয় হয়ত ইচ্ছা মত আপনার থলি ভর্ত্তি করিয়া প্রস্থান করিবে। কাণ্ডখানা কি দেখিতে হইল।

অতি সন্তর্পণে বিছানা ছাড়িয়া মেঝের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় উঠানে একটি অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। শব্দটা শুনিবামাত্র আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হইয়া গেল। ওঃ! ভাবিয়াছিলাম চোর, এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম এটি শ্রীমান চীনার সঙ্কেতধ্বনি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কি চায় সে? আবার কি চায়—চায় অবশ্য জাপানীকে, চায় তাহার প্রণয়িনীকে। মূর্খ আমি, কেন এতক্ষণ তাহা বুঝিতে পারি নাই?

তাড়াতাড়ি মশারির ভিতর যাইয়া আশ্রয় লইলাম। ভাবিলাম, আমাকে জাগ্রত দেখিতে পাইলে শ্রীমতীর কোন অসুবিধা বা সঙ্কোচ হইতে পারে। মশারির ভিতর বসিয়া বসিয়া দেখা যাইবে ব্যাপার কতদূর গড়ায়।

ব্যাপার কিন্তু গড়াইল বহুদূর এবং আশাও অবশ্য তাহাই করিয়াছিলাম। দ্বিতীয়বার সঙ্কেতধ্বনি হইবামাত্র জাপানী নিঃশব্দে আপনার বিছানায় উঠিয়া বসিল। রকম দেখিয়া বোধ হইল সেও জাগিয়াই ছিল। এইবার অভিসারের পালা।

পা টিপিয়া টিপিয়া জাপানী সমস্ত ঘরটা ঘুরিয়া বেড়াইল। দরজা কপাট সমস্তই বন্ধ। নিঃশব্দে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপায় নাই। বহির্গমনের প্রত্যেকটি পথ সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। একবার আমার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া সে কি দেখিতে লাগিল। আমি উন্মীলিত চক্ষে বসিয়া বসিয়া নাসিকাধ্বনি করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিলাম যে আমি ঘোর-নিদ্রামগ্ন। ফিরিয়া গিয়া সে গৃহিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। সেখানেও সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পাইল না। আমি মনে করিয়াছিলাম হয়ত দ্বারপথেই সে নিষ্ক্রান্ত হইবে। কিন্তু অভিসারিকার সাহস ও চাতুরী দেখিয়া আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

আমার শয়নকক্ষে প্রায় দরজার ন্যায় বৃহৎ দুইটি জানালা ছিল। এই দুইটি জানালাই সমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত হইত এবং ঐ বাতায়ন-পথে উর্ম্মিমালার অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করা

চলিত। দেখিলাম, জাপানী একটি জানালার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। পুরীর লবণাক্ত বায়ুতে লৌহাদি ধাতুদ্রব্য অত্যল্প সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জানালার লৌহনির্ম্মিত গরাদগুলিতে পুরু রঙ ও মসীনার তৈলের আস্তরণ থাকা সত্ত্বেও দু'টি একটি লৌহশলাকা স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। জাপানী ঐ পথে অবলীলাক্রমে বাহির হইয়া গেল। তাহার দুঃসাহস দেখিয়া ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। প্রেমের দায়ে জাপানী কি শেষে অপঘাত-মৃত্যু বরণ করিয়া লইতেছে? জানিতাম, জানালার ঠিক নীচেই অর্দ্ধহস্ত পরিমিত প্রশস্ত আলিসা। নকুলের এবং অধুনা ভানুমতীর পোষ্যটি যে এখন ঐ আলিসার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সে বিষয়ে আমার তিল মাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহার পর? আলিসায় গিয়া দাঁড়াইতে পারিলেই আর কিছু একতলার চত্বরে পৌঁছান হইল না। যেস্থানে জাপানী দাঁড়াইয়া ছিল সেইস্থান হইতে প্রাঙ্গণে অবতরণ করাটাও এক সমস্যার বিষয়। কি উপায়ে সে ঐ বিষম সমস্যার সমাধান করে জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল।

অতি সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ করিয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। একবার মনে হইল ভানুমতীকে ডাকিয়া তুলিয়া দেখাই, যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলাম, এত তাড়াতাড়ির কোনই প্রয়োজন নাই। আগে যুগল-মিলন ঘটুক, তাহার পর গৃহিণীকে ডাকিয়া তুলিয়া হাতে হাতে চোর ধরাইয়া দিব।

জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় পুনরায় চীনার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম। সে কণ্ঠস্বরে কত মিনতি, কত ব্যাকুলতা, কত প্রেম-নিবেদন! সে কণ্ঠস্বর বোধ করি প্রেমোন্মাদিনীর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রেরণ করিল। জানালার ঠিক নীচ হইতে একটা খচ্ খচ্ শব্দ শুনিতে পাইয়া আমি কারণ নির্ণয় করিবার জন্য যেমন মুখ বাড়াইয়াছি, অমনি দেখিতে পাইলাম পাইপ বাহিয়া জাপানী স্বচ্ছন্দ গতিতে একতলায় নামিয়া যাইতেছে।

ইহার পর আর কিছু দেখিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেখিবার আবশ্যকতাও ছিল না। ফিরিয়া আপনার শয্যায় আশ্রয় লইলাম। এই কেলেঙ্কারীতে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনই ক্ষতি বা অপযশের কারণ নাই। কেননা চীনা ও জাপানী আমাদের কেহই নহে। কিন্তু ভাবিলাম, ভানুমতী যখন সমস্ত শুনিতে পাইবে তখন বেচারার প্রাণে কি দারুণ আঘাতই না লাগিবে। নিঃসন্তানা স্ত্রীলোকটি ঠিক আপনার পেটের সন্তানের মতই উহাদের মানুষ করিতেছিল। কতদিন সে আমাকে সহাস্য পরিহাসে জানাইয়া দিয়াছে উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে চীনা জাপানীকে বিবাহসূত্রে গ্রথিত করিয়া চিরজীবনের মত আপনার নিকটে রাখিবে এবং কালে উহাদের ঘরে সন্তানাদি হইলে তাহাদের কত আদর যত্নই না করিবে। নকুলের নিকটও সে এ সম্বন্ধে কত কথাই না বলিয়াছে। নকুলও নিতান্ত ভালমানুষটির ন্যায় গৃহকর্ত্রীর আব্দারে চীনা জাপানীর উপর আপনার সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছে। এত কল্পনা-জল্পনা, এত আশা-আকাঙ্ক্ষার পর এই রাত্রির ঘটনাটি যখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন সেই বিষম ধাক্কা ভানুমতী কি প্রকারে সহিবে ভাবিয়া আমি নিজেই একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

চিন্তা করিতে করিতে এই স্থির করিলাম যে, যাহা ঘটিবার তাহা রাত্রি প্রভাত হইলে অবশ্যই ঘটিবে। উপস্থিত আমার প্রধান কর্ত্তব্য যাহাতে, যে-পথে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে সেই পথেই না কলঙ্কিনী আমাদের অগোচরে গৃহমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতে পারে। উন্মুক্ত জানালাটি বন্ধ করিয়া দিলেই আর সে আশঙ্কা থাকিবে না, সুতরাং পুনরায় শয্যাত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন রুদ্ধ করিতে চলিলাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে অসাবধানতার জন্য জানালা বন্ধ করিতে একটু শব্দ হইল এবং ঐ শব্দে ভানুমতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। মনে করিয়াছিলাম, বাতাসের শব্দ মনে করিয়া হয়ত সে কোন উচ্চবাচ্য করিবে না, এবং আমিও নিঃশব্দে বিছানায় ফিরিয়া আসিতে পারিব। কিন্তু আমার সেই ভুল ধারণা ভাঙ্গিবার জন্যই যেন সে হুড়মুড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল—ওখানে কে দাঁড়িয়ে; তুমি নাকি?

আমি জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম—হাঁ, আমিই বটে; তুমি ঘুমোতে পার, ভয়ের কোনই কারণ নেই।

কিন্তু ফাঁকি দেওয়া চলিল না। বারমাস যার জানালা খুলিয়া নিদ্রা যাইবার অভ্যাস, সে যে অযথা জানালা বন্ধ করিতে দুপুর রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবে ইহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য।

ভানু সরাসর বিছানা ছাড়িয়া আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শিথিল অঞ্চল ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছিল; তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে দেহ সংবৃত করিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে সে প্রশ্ন করিল—জানালা বন্ধ করলে যে?

দেখিলাম, আর গোপন করা অনাবশ্যক। যাহা আর দু'দণ্ড পরে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তাহা ক্ষণকালের জন্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কোনই লাভ নাই। বলিলাম—বন্ধ করলাম এই জন্যে যাতে শ্রীমতী জাপানী ঘরে ঢুকতে না পারে।

—মানে? জাপানী কি ঘরে নেই বলছ? সে নিশ্চয় তার বিছানায় এখন ঘুমুচ্ছে।

—ওর বিছ্‌না ত আর তিন ক্রোশ দূরে নয়; দেখে এলেই ত আছে কি নেই সে সন্দেহ মেটে। যাও দেখে এস গে।

এক মুহূর্ত্তে জাপানীর শয্যা পরীক্ষা করিয়া ভানু শুষ্কমুখে আমার নিকট ফিরিয়া আসিল।

—কোথা গেল জাপানী?

—চীনার কাছে, নীচের তলায়।

—বিশ্বাস হয় না; নিশ্চয় অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে।

—তা' হলে এই দুপুর রাতে নিশ্চয়ই মন্দিরে গেছে, ঠাকুর দেখ্‌তে! যে রকম ভক্তির জোর রাত-বিকেল জ্ঞান না থাকাই সম্ভব।

ভানু আমার আরো অধিক নিকটে সরিয়া আসিল। আপনার দু'হাতে আমার ডান হাতটি লইয়া ব্যাকুল স্বরে সে বলিল—রাগ ক'রো না; কিন্তু জাপানী যে এ স্বভাবের তা' বিশ্বাস করতে মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ছে। তুমি দেখেছ তাকে নীচে নেমে যেতে? নিজের চক্ষে? কিন্তু দরজা ত ঠিক আগের মত বন্ধই রয়েছে; নীচে গেলে দরজা খোলা থাকত না?

—আমি নিজের চক্ষে তাকে জানালার ভাঙ্গা গরাদের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। জানালার ওধারে আল্‌সেতে গিয়ে প্রথম দাঁড়িয়েছিল; তারপর সেখান থেকে খোলার নল বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল। একবার ভেবেছিলাম, পড়ে' বুঝি ঘাড়ই মট্‌কায়। কিন্তু ভয়ঙ্কর ওস্তাদ এই এদেশের এরা। কোন অনর্থ হলো না। একটু হেলে পড়া, একটু দোল খাওয়া, কি সামান্য পড়-পড় ভাব—কিছুই দেখ্‌লুম না। অতি স্বচ্ছন্দ গতিতে, সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত, সে নির্ব্বিঘ্নে নেমে চলে গেল। চীনের অস্পষ্ট গলার শব্দও শোনা গেছল। সেও ধারে কাছে কোথাও লুকিয়ে ছিল নিশ্চয়।

আমার কথা শুনিয়া গৃহিণী একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। দেহ একটু নড়িল না, চক্ষুপল্লব পড়িল না, মুখ একেবারে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, যেন একটি প্রস্তরমূর্ত্তি! কিন্তু এ-ভাব ক্ষণিকের। দেখিতে দেখিতে জড়-দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল। দেহ দুলিয়া উঠিল, পলকহীন নত চক্ষু ক্রোধে, ঘৃণায় বিস্ফারিত হইল, মুখে বাক্য ফুটিল—এস।

—কোথায়?

—নীচে, চীনার ঘরে।

—সেখানে তারা নেই, অন্য কোথাও চলে গিয়েছে নিশ্চয়।

—না, আমার মন বলছে সেইখানেই দু'টোয় আছে; আলোটা নিয়ে এস।

দরজা খুলিয়া ভানুমতী বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। লণ্ঠনহস্তে আমি বাহিরে আসিতেই সে বলিল—তুমি এখানে থাক; আমি একাই যাব। দাও, লণ্ঠন দাও।

আলোটা নিজের মুঠোয় শক্ত করিয়া ধরিয়া আমি বলিলাম—তা কি হয়?—চল দুজনায় একসঙ্গেই যাব। কিন্তু র'সো, উইনচেষ্টারটা নিয়ে আসিগে, ভবাই আছে।

—কি হবে?—মানুষ ত মানুষ, বেড়াল-কুকুরও গুলি করে এখানে মারতে পার না; আইনে বাধবে।

—কিন্তু এদের শাস্তি হওয়া আবশ্যক।

—সে ব্যবস্থা আমি করব। আগে চল দেখিগে সত্যি দুটোতে চীনের ঘরে আছে কিনা।

দুজনায় নিঃশব্দে বারান্দা অতিক্রম করিয়া সিঁড়িতে পড়িলাম। উত্তর মুখ হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে হয়; তাহার পর বাঁ দিকে ঘুরিয়া আবার দক্ষিণ মুখ হইয়া নামিয়া যাইতে হয়। সিঁড়ি যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহারই ডা'ন দিকের ছোট কুঠরী—চীনার ঘর। সেই ঘরের উদ্দেশে, গভীর নিশীথে, আমরা স্বামীস্ত্রী কম্পিতবক্ষে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। কিন্তু সমস্ত সিঁড়িটা আর অবতরণ

করিবার আবশ্যক হইল না। উত্তর মুখ হইয়া যতটা নামিতে হয় ততটা নামিয়া যেই দক্ষিণ মুখ হইবার জন্য মোড় ঘুরিয়াছি অমনি, যাহা দেখিব, আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই দেখিতে হইল। আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া প্রথমে চীনা ও তাহার পশ্চাতে জাপানী কুঠরীর ভিতর হইতে তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া বাহিরের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। হাতের কাছে কিছু না পাইয়া, ক্রোধবশতঃ পা হইতে চটি খুলিয়া আমি বদ্‌মায়েসদের পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলাম। কিন্তু ততক্ষণে একতলার বারান্দা হইতে লাফ দিয়া উঠানে পড়িয়া তাহারা বেলাভূমির দিকে ছুট দিয়াছে। চটিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বাঁধানো চত্বরে সশব্দে আছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠা যে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না।

দুজনায় নিঃশব্দে উপরের তলায় ফিরিয়া আসিলাম। ভানুকে সে রাত্রে আর কথা বলানো গেল না। চীনা জাপানীর অপরিসীম কৃতঘ্নতায় বেচারা যেন একেবারে মরমে মরিয়া গেল। পূর্ব্বে আমি যখন তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম তখন আমার কথা সে কানে তোলে নাই। পুরুষ মানুষের মন বড় কদর্য্য, সতত সন্দেহশীল ইত্যাদি কত কথাই না সে তখন আমাকে শুনাইয়াছে। ফলে এখন যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটিয়া গেল; কোন শক্তিই তাহা রোধ করিতে পারিল না। মিলনমুখী যৌবনধর্ম্মের বিপুল তাড়নায় ভানুমতী তাহাদিগকে যে শিক্ষাদীক্ষা দিয়াছিল সমস্তই খরস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

ইহার পর আরো কতকগুলি মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাড়িতে চীনা জাপানীর ছায়াও আর দেখা যায় নাই। তাহাদের কথা আমি আর বড় একটা ভাবিও না। কিন্তু প্রথম প্রথম কিছুদিন স্তব্ধ হইয়া থাকিলেও শেষে ভানু তাহাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। নকুল একদিন বলিয়াছিল চীনার কোন খোঁজ সে আর পায় নাই। কিন্তু মন্দিরের পশ্চাতে এক অন্ধকার গলিতে সে ক্ষণিকের জন্য জাপানীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে তখন পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বার সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই; যখন সে বুঝিতে পারিল যাহাকে সে দেখিয়াছে সে জাপানী, তখন গর্ভিণী বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। নকুল তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া গিয়াছে, উচ্চৈঃস্বরে 'জাপানী' 'জাপানী' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়াছে। জাপানী দাঁড়ায়ও নাই, ফিরিয়া তাকায় নাই পর্য্যন্ত। বরঞ্চ আরও অধিক দ্রুতগতিতে ভিড়ে মিশিয়া গা-ঢাকা দিয়াছে। সেদিনের পর চীনা বা জাপানী আর আমাদের কাহারো নয়নপথে পতিত হয় নাই। তাহাতে মনে হয় অকৃতজ্ঞেরা আমাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চিরজন্মের মত বিদায় হইয়া গিয়াছে।

তারপর দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের দিন সন্নিকট হইল। রওনা হইবার দিন প্রত্যূষে উঠিয়া সমুদ্রে অবগাহন করিলাম। একটু বেলা হইলে, শেষ বারের মত ভানুকে লইয়া পুরুষোত্তম দর্শন করিতে মন্দির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। দেবদর্শনে ঘণ্টা দুই ব্যয় হইল। কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যে একখানা মনুষ্য-শকট বোঝাই করিয়া যখন আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তখন বেলা প্রায় এগারোটা। আহার্য্য প্রস্তুতই ছিল। হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া অবিলম্বে আহারে বসিয়া গেলাম। অপরাহ্নে ট্রেন। আহারের পর একটু গড়াইয়া লইতে হইবে; মাল-পত্র বাঁধাছাঁদা করিবার হাঙ্গামাও কিছু কিছু আছে।

আপন মনে গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পূরিয়া চলিয়াছি। ভানুমতী নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত সঞ্চালিত করিতেছে। পুরীর মক্ষিকাবংশ ঢাকার মশকবংশের মতই বিখ্যাত ও স্বনামধন্য। গৃহিণীর তালবৃন্তের আন্দোলন অগ্রাহ্য করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে ভন্‌ভন্ শব্দে তাহারা পাতে আসিয়া বসিতেছে, পরক্ষণেই বায়ুতাড়িত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এমন সময় সহসা মুখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম, ফুটফুটে তিনটি কাচ্চাবাচ্চাসহ শ্রীমান চীনা ও শ্রীমতী জাপানী একান্ত নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভানুমতী দরজার দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিল বলিয়া উহাদের গৃহপ্রবেশ প্রথমটায় লক্ষ্য করিল না। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহার দৃষ্টি পলাতক আর পলাতকীর উপর পতিত হইল তখন সে বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল—আবার মরবার জন্যে ছেলেমেয়ের পাল নিয়ে এ বাড়ীতে ঢুকেছিস্! বেহায়া, নির্লজ্জ কোথাকার! বের হয়ে যা এখান থেকে—বলিতে

বলিতে ভানুমতী সশব্দে তিন চার ঘা পাখার বাড়ি চীনা ও জাপানীর পৃষ্ঠে বসাইয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা গৃহত্যাগ করিবার কোনই ইচ্ছা বা লক্ষণ দেখাইল না। বরং গৃহিণীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিল। মাতুলালয়ে আসিয়া চীনা জাপানীর সন্তানত্রয় এরূপ অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করে নাই। পিতামাতার "প্রহারেণ ধনঞ্জয়:" অবস্থা দেখিয়া, করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহারা অবিলম্বে যে যেখানে পারিল আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিল।

কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছি। আসিবার সময় অবোধ শিশুগুলির মুখ চাহিয়া ভানু চীনা জাপানীকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছে। ছেলেপুলে সহ তাহাদের যাহাতে সেখানে থাকার ও খাওয়ার কোনই অসুবিধা না হয়, সে জন্য নকুলকে পুনঃ পুনঃ সে বলিয়া আসিয়াছে। নকুলের মাসিক বেতন এতদিন ১৪৲ ছিল। পুরী হইতে ফিরিয়া ১৬৲ টাকা করিতে হইয়াছে। ধীবরদের নিকট সমুদ্র হইতে ধৃত হাঙ্গর-শিশু ক্রয় করিয়া চীনা ও জাপানীকে ও তাহাদের কাচ্চা-বাচ্চাগুলিকে, প্রত্যহ খাওয়াইতে হইবে এই বিশেষ কারণে নকুলচন্দ্রের বেতনবৃদ্ধির হুকুম হইয়াছে। যাহা হউক, ভানুমতী ক্ষমা করিলেও, আমি চীনা জাপানীকে কখনও ক্ষমা করিতে পারি নাই। ক্ষমা করিলে যে, পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয় ইহা আমি বেশ ভাল বুঝি। তথাপি, কেন জানি, সময় সময় মন আমার সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া উঠে। হয় ত তাহাদের ক্ষমা করাই উচিত। তা' ছাড়া, বিচারকর্ত্তা ত আমি নই। আমাদের সমাজে যাহা নিন্দনীয় চীনা জাপানীদের সমাজে তাহা সেরূপ নাও হইতে পারে। এইরূপ অনেক প্রকার চিন্তা ভাবনা করিতেছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। পূর্ব্বে যেমন দুলিত, এখনও তেমনি মন আমার সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছে। ক্ষমা করি কি না করি?

মনের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন একদিন নকুল মহাপাত্রের এক দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অনেকগুলি বাজে কথা, সুন্দর করিয়া সাজাইয়া, সাড়ে তিন পাতা ভরিয়া, সে লিখিয়াছে। যেটুকু আসল কথা, অনেক কাটাকুটি করিয়া কালী ফেলিয়া ছড়াইয়া, লেখা মুছিয়া ঘষিয়া, সে সংক্ষেপে জানাইয়াছে। সেই সংক্ষিপ্ত কথাগুলির তুতোধিক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এই যে,—চীনা ও জাপানীর অবর্ত্তমানে পুরীর বাটীতে মূষিক সম্প্রদায়ের ভীষণ উপদ্রব হইয়াছিল। অল্পের জন্য তাহারা সেই বাটীতে স্বরাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। চীনা ও জাপানীর সন্তান-সন্ততিসহ পুনরাবির্ভাবে মূষিক-আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে দমিত হইয়াছে।

পত্র পাঠ করিয়া চীনা জাপানীকে ক্ষমা করিব স্থির করিয়াছি।

আলোচনা

মহাভারতে ভারত-যুদ্ধকাল

গত আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ভারত-যুদ্ধকাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আষাঢের প্রবন্ধের শেষভাগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "যাবতীয় প্রমাণ মিলাইয়া মনে করি খ্রীঃ পূঃ ১৪৫৫ অব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল।" গণনার একটি প্রধান অবলম্বন এই যে মহাভারতে কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে (মূল প্রবন্ধ, ভারত-বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা)। প্রবন্ধকার মনে করেন যে ভারতযুদ্ধকালে "তারাপুঞ্জ কৃত্তিকা" কৃত্তিকা নক্ষত্র ছিল না; নক্ষত্র বলিলে তখনও ক্রান্তি বৃত্তের ৮০০ কলা পরিমিত স্থানই বুঝাইত এবং এই কৃত্তিকা নক্ষত্রেরই আদি বিন্দুতে ভারত-যুদ্ধকালীয় বাসন্তবিষুব অবস্থিত ছিল। এইরূপ নিরূপণের প্রক্রিয়া প্রবন্ধকার প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত আমরা এইরূপে অনুমান করিতেছি।

বর্ত্তমান কৃত্তিকার ধ্রুবক (১৯৩১ সন)	=৫৮° ৬' কলা।
কৃত্তিকার **আধুনিক** সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় আদিবিন্দু, কৃত্তিকা যোগতারা হইতে ১০° ৫০' কলা পশ্চাতে অবস্থিত বলিয়া, ঐ আদি বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট	=৪৭° ১৬' কলা।
এক্ষণে খ্রীঃ পূঃ ১৪৫৫ অব্দ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অয়ন চলনমানের বার্ষিক মধ্যমমান	=৪৯.''৮৮৭ বিকলা।
১৪৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গত বৎসর	=৩৩৮৫ বৎসর।
এই ৩৩৮৫ বৎসরে অয়ন বা বিষুব গতি	=১৬৮৮৬৭" বিকলা।
	৪৬° ৫৪'২৭" বিকলা।

সুতরাং অধ্যাপক রায় মহাশয় **আধুনিক** সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় কৃত্তিকার **আদি বিন্দুতেই** ভারতযুদ্ধকালীয় বাসন্ত বিষুব স্থাপন করিতেছেন।

(১) কৃত্তিকা আদিনক্ষত্র বলিযা মহাভারতে উল্লিখিত আছে, অতএব **আধুনিক** সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় কৃত্তিকানক্ষত্রেরই আদিবিন্দুতে পাণ্ডবকালে

বাসন্তবিষুব ছিল এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত মনে করা যায় না : বলা বাহুল্য এই কৃত্তিকানক্ষত্রেরই কোনও স্থানে সে সময়ের বাসন্তবিষুব অবস্থিত ছিল ইহাই মাত্র অনুমান করা যায়। এই কৃত্তিকারই আদি বিন্দুতে বাসন্তবিষুব ছিল এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

(২) তারপর কৃত্তিকার আদিবিন্দুতে বাসন্তবিষুব কল্পনা করিলে উত্তরায়ণান্তবিন্দু মঘানক্ষত্রে পৌঁছে কি না ? কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া মঘার আদিতে যাইতেই ৭ নক্ষত্র অর্থাৎ ৯৩° ২০' পার হইয়া যায়। বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকায় লেখা থাকে যে মঘানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ এবং কলিপ্রবৃত্তি। যুগপ্রবৃত্তি অর্থে এস্থানে অবিসংবাদিতভাবে বুঝিতে হইবে উত্তরায়ণারম্ভ। অধ্যাপক রায় মহাশয়ের নিরূপণ মতে মঘানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায় তখন উত্তরায়ণারম্ভ সম্ভব ছিল না। যাহা যুগাদি পূর্ণিমা তাহা ঠিক মঘানক্ষত্র যুক্তই ধরিতে হইবে. এই রূপই বেদাঙ্গ জ্যোতিষেও হইত। অতএব প্রবন্ধকর্ত্তার নিরূপিত ভারতযুদ্ধকালীয় বাসন্তবিষুবস্থিতি গ্রহণীয় মনে হইতেছে না।

(৩) যদি অধ্যাপক রায় মহাশয় মনে করেন যে আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বাসন্তবিষুব পাণ্ডবকালে অবস্থিত ছিল, তাহার সময় ১৪৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ হইয়া অন্ততঃ তাহার ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে চলিয়া যাইবে।

(৪) **কৃত্তিকানক্ষত্রের আদি বিন্দু কৃত্তিকা যোগতারার ৬° অংশ পশ্চাতে অবস্থিত** এমত বরাহমিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের ১৪শ অধ্যায় ৩৪ শ্লোকে লিখিত আছে যথা—

বহুলা ষষ্ঠাংশান্তে সার্দ্ধে হস্তত্রয়ে চ ভগণোদক্।

অর্থাৎ "কৃত্তিকার আরম্ভ হইতে ৬° অংশ অন্তে কৃত্তিকা যোগতারা. উহার উত্তরবিক্ষেপ ৩° ৩০' কলা"। **আধুনিক** সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় কৃত্তিকার আদিবিন্দু হইতে কৃত্তিকা যোগতারা, ১০° ৫০' কলান্তরে অবস্থিত। এইখানেই প্রভেদ পাওয়া যাইতেছে ৪° ৫০' কলা। তারপর ১ পাদ নক্ষত্রে ৩° ২০ কলা। সুতরাং মোটে পাওয়া যাইতেছে ৮° ১০' কলান্তর। এই ৮° ১০' কলা পরিমিত ক্রান্তিপাত চলন জন্য পাণ্ডবকাল প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া ১৪৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ হইতে ২০৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে যাইয়া পড়িতেছে। সুতরাং জ্যোতিষিক যুক্তিদ্বারা আমরা ১৪৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।

(৫) আমাদের অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে অধ্যাপক রায় মহাশয় বৃদ্ধগর্গ, বরাহমিহির এবং সম্ভবতঃ আর্য্যভটও যে মানিতেন "যুধিষ্ঠিরের সময় ঋষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন" তাহার কি অর্থ করিয়াছেন ? আমরা দেখাইয়াছি যে এই সকল বাক্যের অর্থ এই যে ভারতযুদ্ধকালীয় উত্তরায়ণান্তবিন্দু আধুনিক মঘানক্ষত্রের মধ্যবিন্দু দিয়াই ছিল (ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৯, ৫৮৫ পৃঃ, প্রথম স্তম্ভের প্রথমাংশ)। প্রবন্ধকর্ত্তার বাসন্তবিষুব নিরূপণ ইহার সঙ্গে ঐক্যলাভ করিতেছে না। কারণ—

বর্ত্তমানে আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় মঘার মধ্যবিন্দুর স্ফুট = ১৪৭°
বর্ত্তমানে আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় কৃত্তিকার আদিবিন্দুর স্ফুট = ৪৭° ১৬'

অন্তর প্রায় = ১০০°

এই অন্তর ৯০° হইলেই অধ্যাপক রায় মহাশয়ের নিরূপণ প্রাচীন জ্যোতিষিগণের মতানুযায়ী হইতে পারিত। সুতরাং প্রবন্ধকারের নিরূপিত সময় হইতে ভারতযুদ্ধকাল ৭২০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া খ্রীঃ পূঃ ২১৭৫ অব্দে যাইয়া পড়িতেছে।

(৬) প্রাচীন মহাভারতীয় জ্যোতিষিগণের সময়েও ক্রান্তিবৃত্তের $\frac{১}{২৭}$ অংশই নক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল কি ? সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ গর্গমতে নক্ষত্রগুলির কতকগুলি **অর্দ্ধভোগি,** কতকগুলি **অধ্যর্দ্ধভোগি** কতকগুলি **সমভোগি**। যে সকল নক্ষত্রের বিস্তার চন্দ্রের মধ্যম দিনগতির (১৩° ১০'৩৫") সমান সেগুলি ছিল **সমভোগি,** যেগুলি ছিল তাহার দেড়গুণ বিস্তৃত তাহারা ছিল **অধ্যর্দ্ধভোগি ;** আর যেগুলি ছিল চন্দ্র মধ্যমগতির অর্দ্ধবিস্তারযুক্ত সেগুলি ছিল **অর্দ্ধভোগি** (বৃহৎসংহিতা, চন্দ্রচার, ৭ম শ্লোক, ভট্টোৎপলকৃতটীকা) সুতরাং পাণ্ডবকালের নক্ষত্র ক্রান্তিবৃত্তের $\frac{১}{২৭}$ অংশক ধরিয়া নেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করিতে পারিতেছি না। নক্ষত্র অর্থে "তারা বা তারাপুঞ্জ" শতপথ ব্রাহ্মণকালে ছিল (ভারতবর্ষ, ১৩৪০, জ্যৈষ্ঠ, ৯৩৯ পৃষ্ঠা)। ব্রাহ্মণকাল ও পাণ্ডবকাল সমসাময়িক, এই বিষয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীকৃত Political History of Ancient India গ্রন্থের 3rd edition, pages 22—27, প্রমাণিত আছে। সুতরাং পাণ্ডবকালে নক্ষত্র অর্থে "তারা বা তারাপুঞ্জ" ধরাই ঠিক্ এবং ভারতযুদ্ধকালীয় বাসন্তবিষুব কৃত্তিকাতারার ক্রান্তিবৃত্তীয় স্থানেই অবস্থিত ছিল।

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণকালে "কৃত্তিকা তারাপুঞ্জে" বাসন্তবিষুব ছিল। পাণ্ডবকালেও তাহাই ছিল (ভারতবর্ষ, ১৩৪০, জ্যৈষ্ঠ ৯৪১ পৃষ্ঠা)। সুতরাং **কৃত্তিকা নক্ষত্র হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ব দেখাইয়া দেয় না, দক্ষিণ পার্শ্ব ই দেখাইয়া দেয় ;** কারণ ব্রাহ্মণকাল ও পাণ্ডবকাল সমসাময়িক প্রমাণ দিয়াছি। কৃত্তিকা তারায় বাসন্তবিষুবস্থিতির কাল হইতে সহস্র বর্ষ পরে আসিবার কোনও কারণই খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং অধ্যাপক রায় মহাশয়ের নিরূপণের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে না !

(৮) প্রথম প্রবন্ধের "সমবলোকন" অংশের প্রথমেই অধ্যাপক রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে "সাবিত্রী বাক্য, কি শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম বাক্য কি বলদেব বাক্য দ্বারা যুদ্ধকাল অবধারিত হইতে পারে না।" অধ্যাপক রায় মহাশয় মহাভারতে পূর্ণিমান্ত মাসের ব্যবহার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা হইতে এই কথা আইসে না ; কারণ তাঁহার যুক্তির, যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—

"কৃষ্ণ শুক্লাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ"

এখানে মাস শব্দের উল্লেখ তো মোটেই নাই। গয়াতীর্থে হিন্দুদের পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য অমাবস্যাতেই বিহিত কারণ অমাবস্যাই পিতৃগণের মধ্যাহ্ন এবং পূর্ণিমা অর্দ্ধরাত্রি। সুতরাং অমাবস্যাই শ্রাদ্ধকার্য্যের প্রশস্ত সময়, তাহার পূর্ব্বে ও পরে ১ পক্ষকাল গয়াতীর্থে বাস

করা উচিত ইহাই এই শ্লোকের অর্থ। শ্লোকে দুই পক্ষের কথা বলা আছে, মাসের উল্লেখ নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে কালগণনার মাস পূর্ণিমান্ত ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করা যায় না। তার পর বৈদিক কালে যে পূর্ণিমান্তমাস ছিল এবং পরে অমান্ত মাস গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ অধ্যাপক রায় মহাশয় দেওয়া উচিত মনে করেন নাই। এবিষয়ে ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত তৎপ্রণীত ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র গ্রন্থে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৈদিক কালেও দুই রকম মাসই গণনা হইত।

দীক্ষিতকৃত গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠা হইতে ৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। কিছু উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না উক্তগ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে—

"পৌর্ণমাস্যাং পূর্ব্বমহর্ভবতি।

অমাবস্যায়াং পূর্ব্বমহর্ভবতি॥" তৈঃ ব্রাঃ ১, ৮, ১০, ২।

সুতরাং যে উক্তিতে অমান্ত মাসের উল্লেখ আছে তাহা আধুনিক মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রথম প্রবন্ধের ৫ম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের শেষভাগে অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "কৌমুদ শব্দে কার্ত্তিকমাস ধরিতে হইতেছে। কারণ ইহার পর হেমন্ত আসিয়াছিল।" আমরা যতদূর বুঝি ঋতুপরিবর্ত্তন অয়ন এবং বিষুব অবস্থানের উপর নির্ভর করে। ঋতু দ্বারা মাস ধরিলে "সায়ন" মাস হয়; "নিরয়ণ মাস" বা "পূর্ণিমানক্ষত্র সূচিত চন্দ্রমাস" হয় না। এই অর্থ হইতে পারে যে "সায়ন কার্ত্তিক" ভগবদ্‌যানারম্ভের সময় প্রায় শেষ হইয়াছিল, "চান্দ্র কার্ত্তিক" শেষ হইয়া আসিয়াছিল এমত অর্থ হইতে পারে না। সুতরাং প্রবন্ধকারের কল্পনা দোষযুক্ত বলিয়াই বুঝা যায়। এইরূপ বিচারে ইহাও প্রমাণিত হয় যে পূর্ণিমান্ত মাস গণনাপদ্ধতি অমান্ত মাস গণনাপদ্ধতির পরেই আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং **যে সকল গ্রন্থে পূর্ণিমান্তমাসের গণনার উল্লেখ আছে সে সকল গ্রন্থ, অমান্তমাস গণনাযুক্ত গ্রন্থের অন্ততঃ এক সহস্র বৎসরের পরবর্ত্তী; কারণ পূর্ণিমান্তমাস অমান্তমাসের ১৫দিন অগ্রবর্ত্তী।**

শ্রীকৃষ্ণ কার্ত্তিক পূর্ণিমার ৪ দিন পূর্ব্বে রেবতীনক্ষত্রে সন্ধির অভিযান করিয়াছিলেন এবং কর্ণের সহিত অভিযানান্তে তাঁহার বাক্যালাপের দিন উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র ছিল। সেইদিন হইতে সপ্তম দিন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত অমাবস্যা এবং চান্দ্র অগ্রহায়ণারম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং মাস অমান্ত নেওয়াতে কোনও বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না।

ঐ প্রথম প্রবন্ধেরই ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের প্রথমাংশে অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ কৌরব গৃহে সাতদিন ছিলেন; অতএব মাস পূর্ণিমান্ত।" ইহাও যুক্তি নহে নিজের কল্পনার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

ভারতসাবিত্রী মতে মাস পূর্ণিমান্ত হইতে পারে; তাই বলিয়া মহাভারতেও পূর্ণিমান্ত মাস বুঝিতে হইবে তাহার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেল না। যাহার প্রমাণাভাব তাহা গ্রহণ করা যুক্তিবিরুদ্ধ। অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে—"মাসাঃ শুক্লাদয়ঃস্মৃতাঃ"।

মহাভারতের মাস অমান্ত বুঝিলে কৃষ্ণ বাক্য, বলদেব বাক্য, চতুর্দ্দশ-রাত্রি যুদ্ধে শেষ রাত্রিতে চন্দ্রোদয় ব্যাসের বাক্যের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় চন্দ্র কৃত্তিকাযোগ এই সকলগুলির কোনটির মধ্যেই অসামঞ্জস্য হয় না। তারপর "অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ" এই বাক্যাংশদ্বারা ৫৮ রাত্রিই বুঝায় বলিয়া **"শুক্লোভবিতুমর্হতি"** ভীষ্মদেবের, **অন্তিম সময়ের এই সংশয়াত্মক বাক্যের** "শুক্ল" আপনা হইতেই "কৃষ্ণ"তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া অনিবার্য্য। কারণ ২ আর ২ যোগে ৪ই হয়; অন্যকিছু সংখ্যা গণিত দ্বারা পাওয়া যায় না। আমরা এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক লিখিয়াছি (ভারতবর্ষ, ১৩৩৯, চৈত্র, ৫৮১—৫৮৩ পৃষ্ঠা এবং ভারতবর্ষ, ১৩৪০, জ্যৈষ্ঠ, ৯৪১ পৃষ্ঠা); সুতরাং এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(৯) তারপর নক্ষত্র অর্থে আধুনিক সিদ্ধান্তযুগীয় নক্ষত্র ধরিলেও যুদ্ধ কালের ঊর্দ্ধাধঃ সীমা সহজেই পাওয়া যায়। যথা জ্যেষ্ঠা যোগতারা Antaresএর ১৪০ কলা পশ্চাতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের আরম্ভ।

ঐ জ্যেষ্ঠার বর্ত্তমান (১৯৩১ সনের) স্ফুট = ২৪৮° ৪৭'৫৭"

সুতরাং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের আদি বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট = ২৪৬° ২৭'৫৭"

এখানে শ্রীকৃষ্ণোক্ত সূর্য্যচন্দ্র জ্যেষ্ঠা যোগ ধরিয়া নেওয়া যাউক। তার ৮১° ২ দিন পর সূর্য্যের উত্তরায়ণারম্ভ।

ঐ ৮১° ২ দিনে সূর্য্যের গতি = ৮০° ১'৫৩"

সুতরাং ভারতযুদ্ধকালীয় কল্পিত দক্ষিণায়নান্ত বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট = ৩২৬° ২৯'৫০"

ইহা হইতে ২৭০° অংশ বাদ দিলে অয়নচলনাংশাদি ৫৬° ২৯'৫০" হয়।

এই ফল হইতে সহজেই কালনিরূপণ হয়। এই কালকে ভারতযুদ্ধকালের নিম্নসীমা বলা চলে, ঊর্দ্ধসীমা এই নিরূপিত কাল হইতে ২০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। নিম্নসীমার কাল খ্রীঃ পূঃ ২২০০ অব্দে আসিয়া পড়ে। এইরূপে পূর্ণিমান্ত মাস ধরিয়াও গণনা চলে, তদ্দ্বারা অনেক বাক্যের সহিতই সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় না। অপর পক্ষে পূর্ণিমান্ত মাস মহাভারতে ব্যবহার নাই অতএব সেরূপ গণনা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং গণনা যে হয় না তাহা নহে, তবে কোনটি যে গ্রহণীয় তাহা বৃদ্ধগর্গ, বরাহমিহির, আর্য্যভট প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতিষিগণের উক্তির সহিত সামঞ্জস্যবিধানপূর্ব্বক স্থির করা কর্ত্তব্য। আমরা তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে করিয়াছি।

(১০) অধ্যাপক রায় মহাশয় উত্তরায়ণারম্ভ ত্যাগ করিয়া শুধু তিথি নক্ষত্র ধরিয়া ভারতযুদ্ধকাল, ভারতসাবিত্রীকাল, বলদেবের শ্রবণার সহিত ভারতসাবিত্রীর অমাবস্যা যোগ ইত্যাদি করিয়া অনেকের কাল নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই পদ্ধতি জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী নহে। কারণ তিথ্যাদির পুনরাবৃত্তি ১৯ বৎসর পর পর হয় এমত Meton নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্যোতিবী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখানে এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সৌরবৎসরমান = ৩৬৫° ২৫৬৩৬ দিন।

চন্দ্রভগণ কাল = ২৭° ৩২১৬৬ দিন।

সুতরাং, $\frac{\text{সৌরবৎসর}}{\text{চন্দ্রভগণ কাল}} =$

$$১৩+\frac{১}{২+}\frac{১}{১+}\frac{১}{২+}\frac{১}{২+}\frac{১}{৮+}\frac{১}{১২+}\frac{১}{১+}\frac{১}{৭+}\frac{১}{৯}।$$

অতএব আসন্নমান (Convergents)—

$\frac{১৩}{১}, \frac{২৭}{২}, \frac{৪০}{৩}, \frac{১০৭}{৮}, \frac{২৫৪}{১৯}, \frac{২১৩৯}{১৬০}$ ইত্যাদি।

পঞ্চম আসন্নমান হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে ১৯ সৌর বৎসরে ২৫৪ চন্দ্রভগণ হয়। ষষ্ঠ আসন্নমান হইতে জানা যায় যে ১৬০ সৌর বৎসরে ২১৩৯ চন্দ্রভগণ হয়। বলা বাহুল্য দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ১৬০ বৎসর অন্তর তিথি নক্ষত্রের পুনরাবৃত্তি শুদ্ধতর। অতএব ভারতযুদ্ধকাল অথবা ভারতসাবিত্রীকাল নিরূপণ অয়নান্তবিন্দুর অবস্থান ত্যাগ করিয়া শুধু তিথিনক্ষত্র গণনার দ্বারা সম্ভবপর নহে। ১৯ বৎসর পরপর তিথিনক্ষত্রাদির স্থূলাবৃত্তি এবং ১৬০ বৎসর পরপর সূক্ষ্মতরাবৃত্তি হইবেই হইবে। এ কারণে আমরা অধ্যাপক রায় মহাশয়ের কতকগুলি পাঁজি গণিবার শ্রমের কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলাম না।

(১১) অধ্যাপক রায় মহাশয় গত ভাদ্রমাসের ভারতবর্ষে পৌরাণিক জ্যোতিষির উক্তি হইতে ভারতযুদ্ধ কাল নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই জ্যোতিষীর কোন উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ''পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত" এই জ্যোতিষীর মতে ১০৫০ বৎসর, ১১১৫ বৎসর বা ১৫০০ বৎসর। ইহার শেষোক্তটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, অপরগুলি অকিঞ্চিৎকর। লেখকের হয়তো মনে এই ধারণা ছিল যে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত ১০০০ বৎসর, কিন্তু ইহার ধারণা যে সত্য তাহার প্রমাণ অন্য কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এই জ্যোতিষীর এই উক্তি গ্রহণীয় নহে। সপ্তর্ষিচার সম্বন্ধে ইহার যে শ্লোক দুটি আছে (ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ৩৫৮ পৃঃ) তাহাতে একটা শব্দ আছে "পূর্ব্বৌ" তাহার অর্থ প্রথমও হইতে পারে "পূর্ব্বদিক স্থিত"ও হইতে পারে। এই গেল প্রথম অনিশ্চয়তা। এক্ষণে "পূর্ব্বৌ" অর্থ "প্রথম" ধরিলে কি দোষ হয় তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে। অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিতেছেন "ক্রতু ও পুলহ তারার মধ্য বিন্দু লইয়া গণিত করিলে দেখা যায় খ্রীঃ পূঃ ১৩৯১ অব্দে সপ্তর্ষি ৯০ অংশে আসিয়াছিলেন।" এস্থলে অধ্যাপক রায় মহাশয় কল্পনা করিতেছেন যে ধ্রুব এবং পুলহ ও ক্রতু তারার মধ্যবিন্দু যোজকরেখাই ঋষিরেখা। এই ঋষিরেখা ১৩৯১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে উত্তরায়ণান্ত বৃত্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে এইরূপ কল্পিত ঋষিরেখা কি মঘানক্ষত্রে এই সময় পৌছাইয়াছিল ?

খ্রীঃ পূঃ ১৩৯১ অব্দ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

অয়ন চলনের বার্ষিক মধ্যমমান = ৪৯" ৮৯৯৫ বিকলা।

সুতরাং এই কালে অয়ন চলন = ৪৫° ৩৫'৫৩"

অতএব খ্রীঃ পূঃ ১৩৯১ অব্দের অয়নান্তের বর্ত্তমানস্ফুট = ১৩৫° ২৫'৫৩"

মঘাতারার বর্ত্তমানস্ফুট (১৯৩১) = ১৪৯° ২০' ০"

সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্তের মঘানক্ষত্রের আদিবিন্দু

মঘাযোগ তারার ৯° ডিগ্রি পশ্চাতে অবস্থিত

বলিয়া বর্ত্তমানে ঐ বিন্দুর স্ফুট = ১৪০° ২০' ০"

সুতরাং কল্পিত ঋষিরেখা মঘানক্ষত্র স্পর্শ করিল না। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে ১৪৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দের ও উত্তরায়ণান্ত বিন্দু মঘা নক্ষত্র স্পর্শ করে নাই (২)।

অধ্যাপক রায় মহাশয় ঋষিরেখার যে অর্থ কল্পনা করিতেছেন তাহা ঠিক বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। এই পৌরাণিক জ্যোতির্ষীর সপ্তর্ষিচার সম্বন্ধীয় শ্লোকদ্বয়ের কোনও অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে না। যদি অর্থ করা যায় যে আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় মঘার মধ্যবিন্দু এবং পুলহ ও ক্রতুতারার মধ্যবিন্দু-গামীসূত্রে পাণ্ডবকালীয় ধ্রুব অবস্থিত ছিল, ঐ অর্থ হইতে সময় গণনা করিলে ৪৬০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পৌছিতে হয়। আবার যদি অর্থ করা যায় যে পুলহ ও ক্রতুতারার মধ্যবিন্দু এবং আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় মঘার আদি বিন্দু-গামীসূত্রে পাণ্ডব কালীয় ধ্রুবের অবস্থিতি, তাহাতেও সময় ১৩৯১ খ্রীঃ পূঃ অব্দ হইতে অনেক পরবর্ত্তী হইয়া যায়। শ্লোকে আছে এই

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ নিশি।

তয়োর্মধ্যেতু নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং দিবি ॥

এখানে "পূর্ব্বৌ" বলিতে "প্রথমৌ" বা "পূর্ব্বদিক্‌স্থৌ"; একপক্ষে পুলহ ও ক্রতু অপর পক্ষে বশিষ্ঠ ও মরীচি। যে দুইটি তারাই হউক না কেন তাহাদের মধ্য দিয়া দুইটি উত্তর দক্ষিণ গামী রেখা করিতে হইবে। উত্তর বিন্দু বলিলে ৩টি বিন্দু বুঝায়—(ক) ক্রান্তিবৃত্তের মস্তক বা কদম্ব (খ) ধ্রুব বা Celestial pole, (গ) দ্রষ্টার ক্ষিতিজস্থিত উত্তর বিন্দু বা North point। টীকাকারগণ বলিতে চান যে ধ্রুবই অভিপ্রেত, যদি তাহাই হয় তবে ধ্রুব হইতে অভিপ্রেত দুইটি তারাগামী রেখা টানিলে, ক্রান্তিবৃত্তের যে দুই বিন্দুতে ছেদ হইবে সেই দুইবিন্দুর মধ্যে যে নক্ষত্র সমভাবে অবস্থিত হইবে, সেই নক্ষত্রেই ঋষিরা অবস্থান করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরের কালে মুনিগণ মঘা-নক্ষত্রে ছিলেন। অর্থাৎ মঘানক্ষত্রের মধ্যবিন্দুই লেখকের অভিপ্রেত ছিল। আমরা বুঝিতেছি যে ভারতযুদ্ধকালীয় উত্তরায়ণান্ত বিন্দু মঘানক্ষত্রের মধ্য বিন্দুই ছিল। শ্লোকের প্রথম পাদদ্বয়ের অর্থ বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

অপর পক্ষে বৃদ্ধগর্গ এবং বরাহমিহির মতে "যুধিষ্ঠিরের সময় মুনিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন" এই বাক্যের অর্থ আমরা বুঝিয়াছি যাহা তাহা এই :—মঘা নক্ষত্রের মধ্যতারা মঘাযোগ তারা, এবং সপ্তর্ষিগণের মধ্যতারা অত্রি, এই দুইটি তারাগামী রেখাই (Great circle) ছিল যুধিষ্ঠিরের সময়ের উত্তরায়ণান্ত রেখা। কারণ এইঃ—ইংরাজী ১৯৩১ সনে—

মঘাতারার (Regulus) এর স্ফুট = ১৪৯° ২০'

অত্রিতারার (Delta ursa Majoris) স্ফুট = ১৫০° ০'৪২"

পুলস্ত্য তারার (Gamma ursa Majoris) স্ফুট = ১৪৯° ৩০'৮"

আমাদিগকর্ত্তৃক প্রথম নিরূপিত ভারতযুদ্ধ

কালীয় উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট = ১৪৮° ১৯'৫০"

কৃত্তিকাতারা হইতে মঘাতারার স্ফুটান্তর = ৯০° ১৮'১৬"

সুতরাং বৃদ্ধগর্গের লেখা অনুসারে যুধিষ্ঠিরের সময় (১) কৃত্তিকা ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইত এবং ঠিক পশ্চিম দিকে অস্ত যাইত এমত বুঝা যাইতেছে। (২) যখন কৃত্তিকা পশ্চিমে অস্ত হইত ঠিক সেই সময় আকাশে দক্ষিণোত্তর রেখায় (Meridian) মঘাতারা, মঘার উত্তরের ১টি তারা, অত্রি, এবং পুলস্ত্যতারা এই ৪টি তারা দৃষ্ট হইত। ধ্রুব ও অত্রিগামী রেখাই ছিল ঋষিরেখা। এই ঋষিরেখা ও উত্তরায়ণান্ত বৃত্ত প্রায় ১ রেখাই ছিল এবং মঘানক্ষত্রের ৬টি তারা ও সপ্তর্ষিতারার ৭টি তারা এই রেখার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমভাবে অবস্থিত ছিল। এমতাবস্থানে কুরুক্ষেত্রে মঘাতারা পূর্ব্বদিকে উদিত হইলেই সপ্তর্ষি পংক্তি উত্তর পূর্ব্ব দিকে স্পষ্ট দৃষ্ট হইত। এই অর্থ হইতে সময় নিরূপণ করিলে ভারতযুদ্ধকাল প্রায় খ্রীঃ পূঃ ২৩৬০ অব্দে পড়ে, অপর পক্ষে বরাহমিহির মতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ সময় ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দ।

আমাদিগকর্ত্তৃক প্রথম গণনার সূক্ষ্মফল খ্রীঃ পূঃ ২৩২৪ অব্দ এবং দ্বিতীয় গণনার সূক্ষ্মফল খ্রীঃ পূঃ ২২৩৪ অব্দ। মোটের উপর ১৪৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ ভারতযুদ্ধকালের প্রকৃত সময় বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না।

[অয়ন চলন গণনায় আমরা এই নিয়মানুযায়ী হইয়াছি—General precession = 50" 2564 + 0" ° 000222 (t—1900)]

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কীর্ত্তি-কাহিনী
প্রিন্স হেনরী

প্রিন্স হেনরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পর্ত্তুগালের একজন রাজকুমার। কিন্তু জগতের ইতিহাসে তাঁর নাম পর্ত্তুগালের যুবরাজ হিসাবে বেঁচে নাই—বেঁচে আছে জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ-আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে। আফ্রিকার সঙ্গে তিনি প্রথম য়ুরোপের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরই চেষ্টা এবং সাধনার ফলে য়ুরোপীয় নাবিকদের দৃষ্টি মহাসাগরের অপর পারের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই জন্য ইতিহাসে, তাঁর আর এক নাম হেনরী দি ন্যাভিগেটর্, Henry the Navigator.

তাঁর পিতার তিনি দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। রাজ্য-শাসন করবার দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি জ্ঞান-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁর মার নাম ছিল ফিলিপা।

পর্ত্তুগালের রাজা—রাজা জন ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর-আফ্রিকার উপকূলে কেউটা শহর অধিকার করবার আয়োজন করেন। কিন্তু সমুদ্র বেয়ে সেই অজানা দেশে গিয়ে মুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কারুর সাহস হ'লনা। অবশেষে প্রিন্স হেনরী সে-ভার গ্রহণ করলেন। কথিত আছে যাত্রা করবার সময় প্রিন্স হেনরী শুনলেন যে তাঁর মা মৃত্যুশয্যায়।

মার মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে হেনরী দাঁড়ালেন। ফিলিপা ছেলে বেলা থেকেই ছেলেকে সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন—মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তে তিনি শেষ অনুপ্রেরণা দিয়ে গেলেন।

পুত্রকে পাশে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দিক থেকে এত জোরে হাওয়া এসে প্রাসাদে লাগছে?

পুত্র উত্তর দিল, উত্তর দিক থেকে!

—এই তোমার অনুকূল বাতাস—বিলম্ব ক'রো না—এখনি যাত্রা কর।

এই কথা কয়টি বলেই ফিলিপা প্রাণ-ত্যাগ করলেন।

প্রিন্স হেনরী মুরদের কাছ থেকে কেউটা দখল করায়, তাঁর নাম সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে প'ড়ল। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী তাঁকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন যে, ইংলণ্ডে এসে তিনি ইংলণ্ডের নৌ-সেনার ভার গ্রহণ করুন। কিন্তু হেনরী সে সব প্রত্যাখ্যান করে দক্ষিণ-পর্ত্তুগালের এক নির্জ্জন উপকূলে সমুদ্রের উপর একটা প্রাসাদ, একটা পাঠাগার, একটা বীক্ষণাগার নির্ম্মাণ করালেন। সেখান থেকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দিবারাত্র তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—কেমন করে সমুদ্রের বাধা উল্লঙ্ঘন করে অজানা আফ্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করা যায়। তিনি শুধু চুপ করে বসে চিন্তাই করতে লাগলেন তা নয়, দলে দলে নতুন নাবিকও তৈরী করতে লাগলেন—যাদের উৎসাহ আছে সমুদ্রের তরঙ্গকে বরণ করবার। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সময়কার সমস্ত ভৌগোলিক এবং সামুদ্রিক তত্ত্বও পড়তে লাগলেন এবং দেশের সমস্ত বড়লোককে একত্র করে পরামর্শ করতে লাগলেন।

কোনও মুরের দেখা পেলেই আফ্রিকার ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। মরক্কো, আলজিরিয়া থেকে যে-সমস্ত মুর-বণিকরা য়ুরোপের বাজারে বাটনার মশলা বিক্রি করতে আসত—(সে সময় য়ুরোপ উত্তর-আফ্রিকার উপকূলের বণিকদের কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণে মশলা কিনত নিজেদের খাবার জন্য। সে-সময়কার রান্না-ঘরের খবর যে সমস্ত ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক রেখে গেছেন তা থেকে জানা যায় যে সে সময়কার য়ুরোপীয়রা তরকারীতে খুব বেশী পরিমাণে মশলা খেতে ভাল বাসত।) সেই সব মুর-বণিকদের কাছে প্রিন্স হেনরী গল্প শুনতেন—আফ্রিকার ভিতরকার গল্প, গোল্ড-কোষ্টের কথা—অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য আছে সেখানকার মাটীর মধ্যে, সেখানকার সীমাহীন জঙ্গলে আছে অফুরন্ত সব মশলার গাছ—কোনও সাদা মানুষের পায়ের দাগ এখনও সেখানে পড়েনি। সেখানকার সেই সব সীমাহীন বনে বনে ঘুরে বেড়ায় দলে দলে অসংখ্য হাতী, অসম্ভব রকমের সব জানোয়ার! প্রিন্স হেনরী ধীর ভাবে সব শোনেন এবং মনে

মনে স্থির করেন যে, যে রকম করেই হ'ক আফ্রিকার ভিতর ঢুকতেই হবে।

প্রথমে তিনি দুজন লোকের উপর ভার দিয়ে কয়েকখানা নৌকা পাঠালেন। তারা যথাসাধ্য উপকূল ধরে যেতে যেতে হঠাৎ ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে সমুদ্রে দিশেহারা হয়ে প'ড়ল। জীবনের সকল আশা ত্যাগ করে, ভাগ্যকে ভরসা করে পাড়ি দিতে হঠাৎ তারা স্থল দেখতে পেল—একটা দ্বীপ—তারা তার নাম দিল পোর্টো সান্টো, Porto Santo, এই দ্বীপের প্রথম গভর্ণরের মেয়ের সঙ্গেই কলম্বাসের বিবাহ হয়। এই ভাবে তারা মাদিরা, Madeira দ্বীপ আবিষ্কার করে। কেপ বোজাডোর পর্য্যন্ত যেতে কেউ সাহস করত না—সকলের তখন একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে আর বেশীদূর গেলেই দৈব-অভিশাপে গায়ের শাদা রঙ কালো হয়ে যাবে। তখন এই সমস্ত কুসংস্কারকে লোকে রীতিমত মানত। কিন্তু প্রিন্স হেনরীর চেষ্টায় কেপ বোজাডোর, কেপ ব্ল্যাঙকো পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজরা আবিষ্কার করে। এমনি Sierra Leone, সিয়েরা লিওনের কাছাকাছি পর্য্যন্ত যায়। এইখান থেকে পর্ত্তুগীজ নাবিকরা একমুঠো সোনার ধূলো আর ত্রিশটি নিগ্রো নিয়ে আসে। নিগ্রোদের দেখে পর্ত্তুগালের লোকেরা তো বিস্ময়ে অবাক। মানুষ যে এত কালো হতে পারে, তাদের ধারণাই ছিল না।

এই সময় থেকে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটা অতি কলঙ্কময় ঘটনার সূত্রপাত হয়। সেটা হ'ল ক্রীতদাস ব্যবসায়। পর্ত্তুগীজ নাবিকরা লোভে অন্ধ হয়ে এই অতি ঘৃণ্য ব্যবসায় নির্ম্মমভাবে চালাতে থাকে। প্রিন্স হেনরীর সাহায্যে এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তখন দলে দলে নাবিক আফ্রিকার অজানা পথের সন্ধানে বেরিয়ে প'ড়ল। এবং এই ঘটনার পর থেকেই য়ুরোপীয় নাবিক এবং পর্য্যটকদের দৃষ্টি আফ্রিকার দিকে প'ড়ল।

অবশ্য সে-দৃষ্টির মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার চেয়ে লোভই ছিল বেশী। কিন্তু সে যাই হ'ক, এইভাবে ধীরে আফ্রিকার মানচিত্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বাড়তে লাগল।

আগে আফ্রিকাকে ব'লত ডার্ক কন্‌টিনেন্ট। অজানা অন্ধকার ঘরে কোন একটা কিছু খুঁজতে হ'লে যেমন কিছুই দেখা যায় না, পাওয়া যায় না, তেমনি এই মহাদেশ অন্ধকারে অজানা হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ-লেখক সুইফটের নাম তোমরা হয়ত শুনেছ। তিনি আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা কবিতায় লেখেন,—

> Geographers, in Afric maps
> With savage pictures filled their gaps
> And over unhabitable downs
> Placed elephants for want of towns.

অর্থাৎ, আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের এত অল্প ধারণা যে, শুধু কতক অসভ্য লোকের ছবি দিয়ে ম্যাপ ভরাতে হ'ত, হাতী বসিয়ে নগর বানাতে হ'ত। সে দিনও এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার তৃতীয় সংস্করণে লেখা হয় যে, **The Gambia and Senegal rivers are only branches of the Niger**—অথচ আসলে ও তিনটে আলাদা নদী।

হঠাৎ

[২] অজন্তার সন্ধান

গতবারে তোমাদের বলেছি, কেমন করে হঠাৎ বৈদ্যুতিক তত্ত্বের খবর মানুষ ধরতে পারল। আজকে আমাদের দেশের হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া বড় জিনিষের কথা ব'লব।

ভারতীয় চিত্র-কলা অর্থাৎ যে-ভাবে আমাদের দেশের প্রাচীনকালের বড় বড় চিত্রকররা ছবি আঁকতেন, তার বিষয় বোধ হয় তোমরা কিছু না কিছু শুনে থাকবে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত জগতের অনেক লোকের ধারণা ছিল যে, আমরা ভারতবাসী, আমাদের অতীত সম্বন্ধে যে-সব ধারণা করি, সেগুলো কাল্পনিক। কিন্তু ধীরে ধীরে অনুসন্ধানের ফলে, মাটীর ভেতর থেকে, পাহাড়ের গায়ে, গহ্বরে, হারিয়ে-যাওয়া পুঁথির পাতায় এমন সব প্রমাণ বেরুতে লাগল, যাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমরা যে-সভ্যতার উত্তরাধিকারী, জগতে তার তুলনা ছিল না। ছবি আঁকার দিক দিয়ে আমাদের দেশের একটা বিশিষ্টতা ছিল এবং খুব প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশের চিত্রকররা অতুলন সব ছবি আঁকতেন। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত সেই সব ছবির অস্তিত্বের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নি। সেইজন্য কারুর বিশেষ ধারণা ছিল না, প্রাচীন চিত্রকররা কি ভাবে ছবি আঁকতেন, তাঁদের ছবিতে তাঁরা কি ভাবে রঙ আর রেখা ব্যবহার করতেন আর কেনই বা তাঁদের আঁকা ছবি অতুলনীয় ছিল।

পশ্চিম-ভারতবর্ষে নিজাম-রাজ্যের সীমান্তে অজন্তা ব'লে একটা নগণ্য গ্রাম ছিল। সেই নগণ্য গ্রামের এক পাহাড়ে-জঙ্গলের মধ্যে জগতের বিস্ময়কর এই সব ছবি পাহাড়ের এক গুহার ভিতর লুকিয়ে ছিল। অজন্তার সেই গুহার সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যেমন একদিকে ভারতের একটি অতীত কীর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গেল, তেমনি সেই সব অপূর্ব্ব ছবি, আমাদের দেশের বড় বড় চিত্রকরদের মন মুগ্ধ ক'রল, এবং তাঁরা বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে, এক নতুন ধরণের ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। আমাদের দেশে ছবি-আঁকায় একটা যুগান্তর দেখা দিল।

কিন্তু এই অজন্তার সন্ধান মানুষ পেল—একেবারে হঠাৎ। ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর পর, তাঁর আদর্শ প্রচার করবার জন্য ভারতের চারদিকে সব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তোমরা বোধ হয় জান, যে-সব লোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন তাঁদের ভিক্ষু বলে। এই ভিক্ষুরা যেখানে বাস করেন সেটাকে বলা হয় সঙ্ঘ। যীশু খৃষ্ট জন্মাবার প্রায় দু'শ কি তিন শ বছর আগে একদল বৌদ্ধ-ভিক্ষু অজন্তার এই পাহাড়ে এসে একটা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। নির্জ্জনে আরাধনা করা আর লোকদের ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই ভিক্ষুদের কাজ। তাঁদের কোনও অর্থ ছিল না, সামান্য আহারে সামান্য পোষাকে তাঁরা দিন কাটাতেন। লোকালয়ে এঁরা থাকতেন না। পাহাড়ের মধ্যে গহ্বরে অতি কষ্টে দিনযাপন করতেন। ক্রমশঃ এই ভিক্ষুদের দলের ধর্ম্মমহিমার কথা চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ল, দেশের ধনী লোকদের নজর এদিকে প'ড়ল—তাঁরা পয়সা খরচ ক'রে, লোক লাগিয়ে, পাথর ভাঙ্গিয়ে ভিতরে আরও সব গুহা তৈরী ক'রে দিলেন। তোমরা হয়ত জান না যে, আমাদের দেশে, বা পুরাকালে সব দেশেই, এখনকার মত বৈঠকখানা সাজাবার জন্য ছবি আঁকা হ'ত—ছবি আঁকা হ'ত মন্দিরের গায়ে—যেখানে সব লোক প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া করে—আর ছবি আঁকার উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করা। যখন অজন্তার সেই পাহাড়ে অনেক গুহা তৈরী হ'ল, তখন ধনীরা প্রস্তাব করলেন যে, সেই গুহার দেওয়ালে বুদ্ধের মহিমা প্রচার ক'রবার জন্যে শিল্পীদের ডেকে সব ছবি আঁকা হোক। এইভাবে অজন্তার চিত্রশালা গ'ড়ে ওঠে।

কিন্তু তারপর নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে মানুষ অজন্তার অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়। প্রায় দু'হাজার বছর পরে আবার হঠাৎ মানুষ সেই হারিয়ে-যাওয়া জিনিষের সন্ধান পেল। ১৮১৯ সালে একজন ইংরেজ-সৈনিক একা অজন্তা গ্রামের জঙ্গলে বাঘ শীকার করতে আসেন। সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরে বাঘের সন্ধান না পেয়ে, লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়েন—তার উপর আর এক বিপদ হ'ল—জঙ্গলের ভিতরে পথ গেল হারিয়ে—সাহেবটির ধারণা হ'ল যে, তিনি ক্রমশঃ মানুষের বসবাস থেকে দূরে যেন জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকে যাচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা ছোট্ট ছেলের গলার শব্দ শুনতে পেলেন। একটা রাখাল-বালক মেষ চরাচ্ছিল—তার শব্দ। সাহেবের মনে আশ্বাস হ'ল—যে তাহ'লে, নিশ্চয়ই মানুষের ঘরবাড়ী কাছেই আছে।

রাখাল-বালকটি বন্দুক হাতে সাহেবকে দেখে বুঝল যে সাহেব শীকারের খোঁজে এসেছে। সে ইঙ্গিত ক'রে বল্লে—বাঘ খুঁজছ? আমি বাঘের বাসা দেখিয়ে দিতে পারি।

তারপর সেই সাহেবকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বল্লে,—ঐখানে—ওর ভিতরে বাঘ আছে।

সাহেব জঙ্গলের ভিতরে ঘন গাছপালার মধ্যে চেয়ে হঠাৎ দেখেন—সূর্য্যের নিভে-যাওয়া আলোয় সোনালী রঙের একটা থাম ঝিক ঝিক করছে—।

তাই দেখে হঠাৎ সাহেবটির মনে হ'ল—নিশ্চয়ই কোনও প্রাচীন-কীর্ত্তির ধ্বংস হবে। তারপর লোকজন ডেকে, মশাল নিয়ে জঙ্গল কেটে—সাহেব সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখেন—সত্যিই তো—গুহার ভিতরে অপূর্ব্ব সব ছবি—।

এইভাবে বাঘ খুঁজতে গিয়ে বেরুল—জগতের শিল্পভাণ্ডারে অদ্বিতীয় সব ছবি।

বড় হ'বার সাধনা

প্রথমেই তোমাদের একটা কথা ব'লে রাখি, বড় হ'বার কোনও কল বা যাদুমন্ত্র বা ইংরেজীতে যাকে বলে 'ফরমুলা' তা কিছুই নেই। বড় হ'বার একটা মাত্র পথ এবং সে-পথ সকলের জন্যেই খোলা আছে—সে পথ হ'ল পরিশ্রম করা, কাজ-ক'রে-যাওয়া। কাজ ক'রে যাওয়া ছাড়া বড় হ'বার আর

দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। জগতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, কোন দেবতা বা কোন ঈশ্বর এসে তাঁদের কোনও কাজ ক'রে দিয়ে যান নি—তাঁদের নিজের হাতে নিদারুণ পরিশ্রম ক'রে তাঁদের অপূর্ব্ব জীবন তাঁরা নিজেরাই গ'ড়ে তুলেছেন। দূর থেকে মনে হয় যে, তাঁদের জীবনে তাঁরা যেন দৈব সহায় লাভ করেছিলেন, তা না হ'লে, এ রকম অসাধ্য-সাধন ক'রতে পারলেন কি ক'রে? দৈব যদিও সাহায্য ক'রে থাকেন, জানবে, সেটা হ'ল সেই রকম নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করার পুরস্কার। শ্রম করলেই, সে পুরস্কার আমরা সবাই পেতে পারি।

তোমরা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁর আঁকা ছবি এবং মূর্ত্তি যদি দেখ তো আপনা থেকেই তুমি ব'লে উঠবে, এমন বিরাট এবং এমন সুন্দর জিনিষ কি মানুষের হাত গ'ড়ে তুলতে পারে! কিন্তু সেই সব ছবি এবং মূর্ত্তির পিছনে ছিল কঠোর, অতি কঠোর পরিশ্রম। তিনি কি রকম খাটতেন, শুনলে তোমরা অবাক হ'য়ে যাবে। শেষ-রাত্রে শোবার সময় তিনি পোষাক প'রেই শুতেন—ঘুম ভাঙ্গলেই যাতে তিনি কাজ আরম্ভ করতে পারেন; সেই ঘরে এক-চাঁই মার্ব্বেল এনে রেখে দিতেন—যদি কোনও কারণে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, তা হ'লে বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি না দিয়ে, পাথর নিয়ে তক্ষুনি কাজ আরম্ভ করবেন। একবার একটা গির্জ্জার গায়ে ছবি আঁকবার সময় তিনি সেই কাজে এতদূর তন্ময় হ'য়ে যান যে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তিন দিন তিনি কড়ি-কাঠের দিকে ঘাড় তুলে ছবি এঁকে গিয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর ঘাড় বেঁকে যায়।

স্যার ওয়াল্টার স্কটের নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ। তাঁর সেই সব মনোরম গল্পের পিছনে যে কি কঠোর অধ্যবসায় ছিল, তা ভাবা যায় না। যখন তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়স, তখন তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা দেখা দিল। তিনি বালান্টাইন কোম্পানী ব'লে এক প্রেসের অংশীদার ছিলেন। কালক্রমে এই প্রেসটি ভীষণ ভাবে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে এবং একলক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের ঋণ স্কটের ঘাড়ে এসে পড়ে।

লোকদের ইচ্ছে কল্লে তিনি ঠকাতে পারতেন কিন্তু তা না ক'রে তিনি স্থির করলেন যে তিনি লিখে সেই টাকা সব শোধ করবেন। মনে রেখ, তাঁর বয়স তখন পঞ্চান্ন বছর এবং ঋণের পরিমাণ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড! দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত অবিরাম তিনি লেখনী চালনা করতে লাগলেন। প্রত্যেক মাসে একখানি করে বৃহৎ উপন্যাস লিখে তিনি তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন।

সেই সঙ্গে মনে রেখ, অপরের ক্ষতিকর এবং অন্যায় কাজ ছাড়া, জগতে কোনও ধরণের কাজ করায় কোনও অসম্মান নেই। কাজের ভদ্র-অভদ্র ব'লে কোনও শ্রেণী-বিচার নেই। যারা কাজের এই ভাবে শ্রেণী-বিচার করে, তাদের সামনে বুক ফুলিয়ে তার প্রতিবাদ করবার যেন সাহস তোমাদের থাকে। শুধু কথায় নয়, কাজ ক'রে তাদের বুঝিয়ে দেবে, কাজ মাত্রেই পবিত্র, কাজ মানেই পূজা। পূজার আবার ভদ্র-অভদ্র কি? আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের গল্প বোধ হয় তোমরা জান। তবুও একবার বলি। কয়েকজন আমেরিকান সৈন্য মিলে একটা বিরাট কাঠের গুঁড়ি তুলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাদের শক্তিতে কুলোচ্ছিল না। সামনে দাঁড়িয়ে একজন কর্পোরাল মুখের কথায় তাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ঘোড়ায় চ'ড়ে একজন উচ্চ-কর্ম্মচারী সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সৈন্যদের সেই প্রাণপণ চেষ্টা দেখে তিনি নিজে ঘোড়া থেকে নেমে তক্ষুনি তাদের সঙ্গে কাঠ ঠেলতে আরম্ভ করলেন। কাজ শেষ হ'লে তিনি কর্পোরালকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ঘোড়া থেকে নেমে কেন এদের সঙ্গে হাত লাগাও নি? কর্পোরাল বিস্মিত হ'য়ে উত্তর দিল, আপনি ভুল করছেন, আমি একজন সামান্য সৈনিক নই! আমি একজন কর্পোরাল, আমি কি ক'রে এদের সঙ্গে মিলে কাঠ ঠেলি!

কর্ম্মচারীটি হেসে ঘোড়ায় চ'ড়ে বল্লেন, ঠিক বলেছ তুমি! আমিই ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি একজন কর্পোরাল! তোমার কাঠ ঠেলতে লজ্জা হয় কিন্তু জেনে রেখ, প্রয়োজন হ'লে কাঠ ঠেলতে আমার কোনও লজ্জা হয় না—আমার নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন।

মানুষের জীবন থেকে জাতির জীবনের দিকে চাও—জর্জ্জ ওয়াশিংটন, যিনি যুক্ত-রাষ্ট্রের জন্মদাতা!

রোমের ইতিহাসের দিকে চাও! দেখবে, তারা যতদিন কর্ম্মশীল পরিশ্রমী ছিল, ততদিন তাদের বিজয়-শঙ্খ দেশে দেশান্তরে বেজে উঠেছে। তারপর তারা সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ভুলে গেল পরিশ্রমের মর্য্যাদা। মানুষকে কিনে তাকে ক্রীতদাস ক'রে, তাকে খাটাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে শ্রমকে, কর্ম্মকে ঘৃণা করতে শিখল—শ্রম-করা যেন ক্রীতদাসের কাজ, ভদ্র রোমানের নয়। কিন্তু ভদ্র হ'তে গিয়ে রোমানরা তাঁদের বিরাট সাম্রাজ্য হারাল। এক নিমেষে ভেঙ্গে গেল সেই বিরাট সাম্রাজ্য। যে-সময় রোমানরা এই রকম সুখ-বিলাসে এবং আলস্যে দিন অতিবাহিত করছিল, সেই সময় এশিয়ার এক প্রান্তে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রোমানদের সেই কর্ম্ম বিমুখ অলস জীবন দেখে আতঙ্কিত হ'য়ে প্রচার করলেন, বল্লেন, তিনি ডাকছেন, হে মানব শোন, তোমাদের মধ্যে কে আছ, পরিশ্রম ক'রে শ্রান্ত হয়েছ, সে এস আমার কাছে। কিন্তু রোমানরা তখন তাঁর মুখ দিয়ে ভগবানের এই বাণী শুনল না—তাঁকে ক্রুশে করল বিদ্ধ! কিন্তু হুনদের তরবারির মুখে যে-বাণী আত্ম-বিকাশ করল, তাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি আর রোমের হ'ল না।

কি মানুষের জীবনে, কি জাতির জীবনে যেদিকে আমরা ফিরে চাই, দেখি, যেখানেই ধুলো হচ্ছে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত, যেখানেই হচ্ছে কিছু নতুন সৃষ্টি, সেইখানেই—আর সমস্ত নানা রকমের উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান সকল যায়গায় সমান ভাবে আমরা দেখতে পাই—সেটা হচ্ছে, পরিশ্রম করবার শক্তি, পরিশ্রম করবার ধৈর্য্য

উদ্ভিদের খাদ্য-সংগ্রহ

আমরা যেমন সারাদিন ছুটোছুটি ক'রে এখানে-সেখানে গিয়ে খাদ্যের যোগাড় করি, জীব-জন্তুরা যেমন মাঠে, ঘাটে, খড়ের গাদায়, যেখানে খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই খানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে—সেই রকম সবার গোপনে মাটীর আড়ালে থেকে গাছের শিকড়গুলিও দূর পথে গিয়ে গিয়ে গাছের জন্যে আহার সংগ্রহ করে। তোমরা হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে বটগাছ বা কোন বড় গাছের কাছে যদি পাতকুয়া থাকে, তাহ'লে অনেক সময় দেখা যায় যে শিকড়গুলো এসে পাতকুয়াটাকে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে—এবং অনেক সময় সেই জড়ানোর ফলে কত পাতকুয়া, কত পুকুরের পাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। গাছের শিকড়গুলো ইচ্ছে করলে অন্য দিকে যেতে পারত, কিন্তু অন্য দিকে গেলে তাদের চলবে না—যে-দিকে আছে জল—সেই দিকেই শিকড়গুলো এগিয়ে চলে। চৈত্র-বৈশাখ-মাসে গ্রামের পথে যেতে যেতে মানুষের তৃষ্ণা পেলে, সে যেমন খোঁজে কোথায় আছে পুকুর, কোথায় আছে খাবার-জল, তেমনি দেখা গিয়েছে যে চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন মাটীর রস শুকিয়ে আসে তখন গাছের শিকড়গুলিও তৃষ্ণায় অধীর হ'য়ে পাতকুয়া বা পুকুরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মানুষের নানা রকমের খাদ্য আছে—গাছের কিন্তু প্রধান খাদ্য অঙ্গার, অর্থাৎ কয়লা তবে একথা মনে ক'র না- গাছেরা কাঁচা কয়লা খায়। আমাদের চারিদিকে যে বাতাস বইছে - তাতে অঙ্গারক বাষ্প থাকে। গাছের পাতা বাতাস থেকে সেই অঙ্গারক বাষ্প চুষে নেয়। বাতাসে খাঁটি অঙ্গারের অংশ ছাড়া আর একটা বাষ্প থাকে—তাকে বলে অক্সিজেন। গাছের শুধু দরকার এই অঙ্গার টুকু—তাই তারা এই অঙ্গারটুকু নিয়ে—অক্সিজেন বাষ্পটুকু ত্যাগ ক'রে দেয় এই ভাবে গাছ তার খাদ্য সংগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে জগতের একটা মহৎ উপকার সাধন করে। অঙ্গারক বাষ্প মানুষের পক্ষে অপকারী। এই বাষ্প আমাদের দেহে প্রবেশ করলে প্রভূত ক্ষতি করে। তোমরা হয়ত শুনেছ, ঘরে আগুন জেলে দোর জানালা বন্ধ ক'রে শোবার ফলে কেউ কেউ মরে গিয়েছে।

আমাদের চারিদিকে এই যে সব কোটী কোটী গাছ রয়েছে তারা বাতাস থেকে বিষতুল্য অঙ্গারক বাষ্প চুষে নিয়ে, প্রাণদায়ী অক্সিজেন বাষ্প দিচ্ছে। এই ভাবে এই সব মূক জীবগুলি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে জগতের বায়ুকে পবিত্র ক'রে রেখে আসছে ব'লে, জগতের বাতাস বিশুদ্ধ থাকে।

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

স্ত্রী-শিক্ষার প্রশ্ন

ষাট বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'প্রাচীনা এবং নবীনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'দিনকত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবা বিবাহ দাও, স্ত্রীলোকদিগকে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহু বিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী, রাণী, মাধীকে বিলাতী মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতী মেম হইতে পারে তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওকবৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব সেগুলি চলিত হইল না, স্ত্রী-শিক্ষা সম্ভব, এজন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য। পরিবর্ত্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙালী যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক?'

আজ, ষাট বৎসর পরেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নই মোটামুটি ভাবে সত্য আছে। সুতরাং ধরা যায়, ষাট বৎসরেও আমাদের সমাজের বিশেষ কোন প্রগতি হয় নাই। অবশ্য এ যুগে ইংরেজী-শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং অনেকে আপত্তি করিবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন 'বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য', তখনকার কালের সহিত একালের তুলনা চলে না। আপাতদৃষ্টিতে ইহা গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র সামান্য শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার আলোকে দেখিলে বুঝা যাইবে যে আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি (তথা পুরুষ) আজও সামান্য শিক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সে-যুগের নবীনাদের দুইটি দোষ লক্ষ্য করেন, এক, আলস্য, দুই, ধর্ম্ম সম্বন্ধে। এই দ্বিতীয় দোষের বিচারে তিনি বলেন, 'ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখাপড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল ইহা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে, লোকে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়, অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্ত্তী হয়। তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্ত্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্ত্তী, কিন্তু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে, ধর্ম্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্যপালনীয়; এবং, পরোপকার বিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্ম্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণ মাত্র

বিদ্যার আলোচনা করে যে তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, ততদূর না যায়,' তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কোন মূল্য থাকে না। লোক-নিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্ব্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন ; এ জন্যে ধর্ম্মাংশে তাঁহারা প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। 'যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন ?'

বর্ত্তমান যুগে যুবকযুবতীনির্ব্বিশেষেও এই একই প্রশ্ন করা যায়। অনর্থক তর্ক করিবার যাঁহার ইচ্ছা নাই, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এদেশের নারীসমস্যা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, আজও সমস্যা সেই এক। তখন স্ত্রীশিক্ষা সবে সুরু হইয়াছিল, আজ তাহার প্রসার ও পরিধি বাড়িয়াছে, তখনকার অনেক মন্দ আজ ভাল হইয়াছে, অনেক ভাল আজ মন্দ হইয়াছে, কিন্তু মূলতঃ প্রশ্ন সেই একই আছে যে, শালতরু ওকবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে কিনা! বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টার ক্রটি হয় নাই, এমন কি কখনও কখনও শালবৃক্ষে ওকের পল্লবও হয় তো দেখা গিয়াছে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সমস্যা ঠিক আছে, সমাধানের কোনও বিশেষ চেষ্টা নাই।

তিনখানি কাল্পনিক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই নিজের প্রাচীনা ও নবীনার যুক্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনখানির লেখিকা যথাক্রমে, (১) শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী (২) শ্রীলক্ষ্মীমণি দাসী (৩) শ্রীরসময়ী দাসী। তিনখানি চিঠিই উল্লেখযোগ্য। প্রথমা বলিতেছেন, প্রাচীনা অপেক্ষা নবীনা নিকৃষ্ট ইহা যেমন সত্য, প্রাচীন অপেক্ষা নবীনও নিকৃষ্ট ইহাও তেমনই সত্য। দ্বিতীয়া বলিতেছেন, স্ত্রীজাতির যে-দোষ তাহা পুরুষের জন্য। তৃতীয়া যাহা বলিতেছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—'আমার মনের বড় সাধ, একবার আপনাদিগের (পুরুষদিগের) সহিত অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন্। আমরা মরিলে আপনারা একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, থেঁটে পরিবেন ; আপনারা 'স্বর্গারোহণ করিলে, আমরা 'দ্বিতীয় সংসার' করিব--জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিবেন, বাড়ীতে উপস্থিত হইলে গোঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া স্ত্রী-আচার করিবেন, বাসরঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না। আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কলেজে যাইব,—বয়সকালে ফিরিঙ্গি খোঁপার উপর পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আফিস যাইব—টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব,—চশমার ভিতর হইতে বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিব—সাধের ধর্ম্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসারগোহালে খোলবিচালি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে ? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই—তোমরা যখন মানে বসিবে—আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব—মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা-পরা হাতখানি তোমাদের পায়ে দিব—তখন ? তখন কি তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে ?

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর, তোমরা অন্তঃপুরে এস—আমরা আপিসে যাই। যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না ?'

অবস্থার বিনিময় না হইলেও, রসময়ী দাসী যাহা যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার এযুগের উত্তরাধিকারিণীরা প্রায় সব-কিছুই করিয়াছেন—কিন্তু তাহাতেই বা কি সুবিধা হইয়াছে ?

প্রশ্ন সেই একই আছে!

ষাট বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গদর্শনের প্রশ্নে আর বর্ত্তমানে বঙ্গশ্রীর প্রশ্নে কোন পার্থক্য নাই, 'যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে, আপনারা বালিকা-দিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্ম-বন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন ?"

[মা]রিয়ার মা

হলিউডের প্রথিতযশা অভিনেত্রী, মার্লেনে ডীট্রিশের প্রধান [গ]র্ব এই, যে, তিনি 'মারিয়ার মা। মারিয়া তাঁহার মেয়ের নাম—তাহার বয়স ছয় সাত হইবে। মরক্কো, ডিজ্-অনার্ড, ব্লু এঞ্জেল কি শাংহাই এক্স-প্রেসে এই প্রগল্‌ভা মৃগাক্ষীকে যাঁহারা অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কল্পনা করিতে বাধে যে, এই স্ত্রীলোকের স্বামী আছে, গৃহ আছে এবং সে-গৃহে একটি হাস্যমুখরা শিশুকন্যা আছে এবং এই বিলাসিনীর সকল ঐশ্বর্য্যের অধিক ঐশ্বর্য্য সেই কন্যা। প্রথম ছয় মাস যখন তিনি হলিউডে আসেন, তখন তাঁহার স্বামী ও মেয়ে সঙ্গে আসে নাই। ষ্টুডিয়োতে তখন তাঁহার দেখাই মিলিত না—খবর করিলেই শোনা যাইত, হয় তিনি মেয়েকে চিঠি লিখিতেছেন, নয় তাহাকে টেলিফোন করিতেছেন। এখন মারিয়া ও তাহার পিতা হলিউডে মার্লেনের সহিত বাস করেন। এখনও ষ্টুডিয়ো হইতে ছুটি পাইলেই তিনি মারিয়ার কাছে গিয়া হাজির হন।
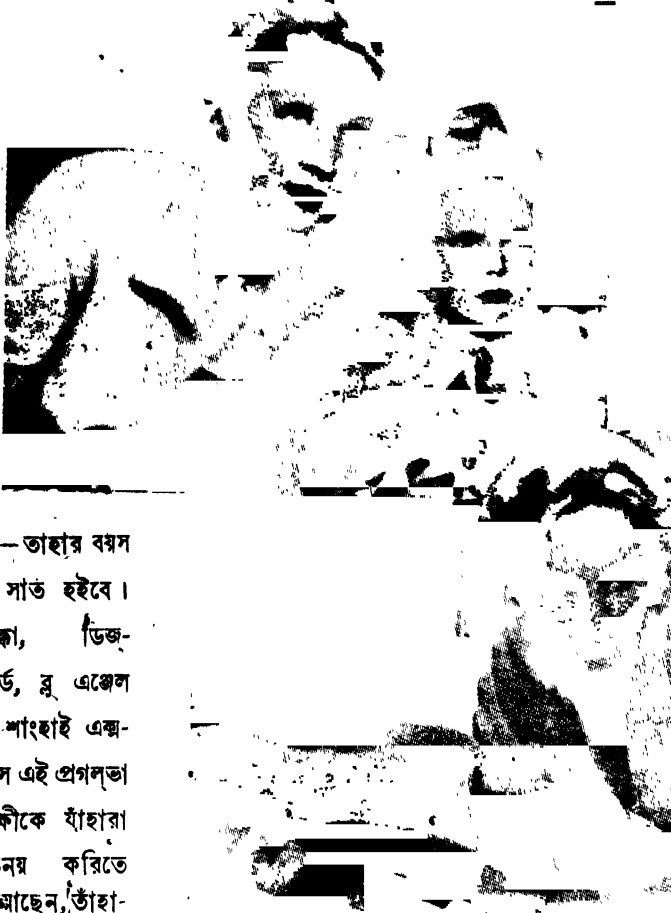
সেদিন লণ্ডনে একটি সাক্ষাৎকারিণীকে মার্লেনে বলিয়াছেন—'আজকালকার লোকের বাড়ীর উপর টান গেছে কমে,—মহাযুদ্ধের পরে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। পুরুষরা বাইরে বাইরে থাকে, মেয়েরাও তাই নকল করছে। এই জন্যই ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় না।' সংখ্যাহীন নিমন্ত্রণ, নাচ-গান, যাহা কিছু কাম্য মার্লেনের কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু কদাচিৎ কোন পার্টিতে তিনি যোগ দেন। মারিয়াকে সাজাইয়া-গুছাইয়া, তাহার সহিত হাসিয়া খেলিয়াই তাঁহার দিন কাটে। মার্লেনে ডীট্রিশ সুপটু পাচিকা, অন্ততঃ তাঁহার স্বামী রুডল্‌ফ জাইবারের কাছে ইহাই তাঁহাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

ব্লণ্ড ভেনাসে যাঁহারা মার্লেনেকে মাতার ভূমিকায় দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আসলে মারিয়ার মা-ই মার্লেনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। উপরের ঐ সাক্ষাৎকারিণীকেই মার্লেনে বলিয়াছিলেন,—"গার্হস্থ্য-জীবন ছাড়া মেয়েদের আর কি আনন্দ আছে? আমি গৃহ-জীবনের পক্ষপাতী।"

ডিকি মুর ও মার্লেনে ডীট্রিশ—ব্লণ্ড ভেনাসের ছেলে ও মার ভূমিকায়।

বিদেশে নারীপ্রগতি : ১৮৩২ সন

একশত বৎসর পূর্ব্বে ওদেশে নারীজাতির মধ্যে জীবনের ধারা কিরূপ ছিল, ও প্রগতি কতদূর হইয়াছিল ইহার হিসাব করিলে আমাদের দেশের পক্ষে শিক্ষামূলক অনেক তথ্য মিলিবে। বিলাতী কাগজে মাঝে মাঝে এমন হিসাব করা হয়। এই হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময়েই ওদেশের নারীদের মধ্যে শুধু সাহিত্যিক নয়, কিংবা সেবাময়ী শুশ্রূষা-কারিণী নয়, দুঃসাহসিকা পর্য্যটিকাও জন্মাইয়াছিলেন। গত ১৯৩২ সনে যে শতবার্ষিকী শেষ হইয়াছে, তাহার হিসাবে যে কয়েক জন মহীয়সী মহিলার কাহিনী পাওয়া গিয়াছে, নীচে তাঁহাদের দু'এক জনের বিষয়ে সামান্য কিছু লেখা হইল।

[১] লুইসা মেরী আলকট। জন্ম-তারিখ, ২৯শে নভেম্বর, ১৮৩২ সন ; স্থান, পেনসিল্‌ভেনিয়া, জার্ম্মানটাউন। পিতা আমস ব্রাসন্ আলকট, শিক্ষক। মেরীর দুই বৎসর বয়সে আলকট-পরিবার বোষ্টনে বাসা বাঁধেন ; তাঁহার আট বৎসরে ইহাঁরা কন্‌কর্ডে যান। কিছুকালের জন্য মেরী থোরোর কাছে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু নিজের পিতাকেই ইহাঁর জীবনের প্রধান শিক্ষক বলা চলে। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে ইনি লিখিতে সুরু করেন, কিন্তু এদিকে বিশেষ সুবিধা না দেখিয়া শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সিভিল-ওয়ারের সময় ওয়াশিংটনে নার্শের কাজ কয়েক মাস করিয়াছিলেন। এই হাসপাতালের অভিজ্ঞতাই শেষ অবধি তাঁহাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেয়। এই কয় মাসের অভিজ্ঞতা তিনি Hospital Sketches, হস্পিট্যাল স্কেচেস্ বলিয়া প্রকাশ করিয়া প্রথম জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু হাসপাতালের কাজে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফলে, তিনি ১৮৬৬ সনে ইউরোপে শরীর সারাইবার উদ্দেশ্যে যান। ফিরিয়া, তিনি Little Women, লিট্‌ল উইমেন বলিয়া একটি পুস্তক প্রকাশ করেন—এই পুস্তকই তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে যশের কারণ। তিন বছরে এই বই ৮৭০০০ কপি বিক্রয় হয়। ১৮৮৮ সালে ৬ই মার্চ্চ তারিখে বোষ্টন শহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি আটাশ খানি পুস্তক লেখেন।

[২] ইসাবেলা বিশপ। জন্ম-তারিখ, ১৫ই অক্টোবর, ঐ সন। পিতার নাম এডোয়ার্ড বার্ড, একজন পাদ্রী। ইনিও স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু ১৮৫৮ সনে দেশভ্রমণে বাহির হন। ক্রমে ক্রমে তিনি কানাডা, যুক্ত প্রদেশ, রকিজ, স্যাণ্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জ, পারস্য, কোরিয়া ও তিব্বত ভ্রমণ করেন। ১৮৫৮ সনে তাঁহার প্রথম পুস্তক The English Woman in America, দি ইংলিশ ওম্যান ইন অ্যামেরিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ সনে এই দুঃসাহসিকা এশিয়ার নানা বিপজ্জনক স্থান পর্য্যটন করেন এবং এই পর্য্যটিকার ডায়েরীই তাঁহাকে

লেখিকা সারা স্মিথ (ছদ্ম নাম : হেস্‌বা ষ্ট্রেটন)।

সাহিত্যে অমর যশ দান করে। ইহার পর অনেক নারীই নানা দেশ ও বনে-জঙ্গলে পর্য্যটন করিয়াছেন, কিন্তু এই পর্য্যটক-দলের অগ্রণী ইনিই। ১৮৮১ সনে ইনি এডিনবরা শহরের এক ডাক্তারকে (জন বিশপ) বিবাহ করেন। ১৯০০ সনে মরক্কো ও আটলাস পর্ব্বতের দুরধিগম্য প্রদেশ পরিভ্রমণে যান। ভারতে ও চীনে তিনি বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি মেডিক্যাল মিশনের একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। রয়াল জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটির তিনিই প্রথম মহিলা সদস্য।

[৩] ডরথি উইণ্ডলো প্যাটিসন্ (সুপ্রসিদ্ধ মার্ক প্যাটিসনের ভগ্নী)। জন্মস্থান, হক্সওয়েল, ইয়র্কস্ ; তারিখ,

১৩ই জানুয়ারী, সন ঐ। নারী-প্রতিভার চরম বিকাশ যে শুশ্রূষাধর্ম্ম, ইঁহার মধ্যে অতি অল্প বয়সেই তাহা দেখা যায়—এবং সকলেই তাঁহাকে সিষ্টার ডোরা বলিয়া ঐ বয়স হইতে ডাকিতে সুরু করে। লিটুল উলষ্টন শহরে প্রথম জীবনে ইনি শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৬৪ সনে কোটহামের সিষ্টারহুড অব দি গুড সামারিটান, Sisterhood of the Good Samaritan দলভুক্ত হন। এবং

দুঃসাহসিক পর্য্যটিকা ইসাবেলা বার্ড।

পর বৎসরে এই মিশন-পরিচালিত ওয়ালসলের হাসপাতালের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ সনে ঐ স্থানে বসন্তের মহামারী হয়। ঐ সালে তিনি স্থানীয় ম্যুনিসিপাল হস্পিট্যালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। ১৮৭৮ সনে ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

[৪] শার্লট্ ইলাইজা লসন্ রিডেল। পিতার নাম জন কাউয়ান, স্বামীর নাম জে. এচ. রিডেল। জন্ম-তারিখ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, সন ঐ। ২৫ বৎসরে বিবাহ করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এফ. জি. ট্রাফোর্ড নামে ইনি বহু উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখেন। ফার আবাভ্ রুবিজ্, Far Above Rubies, ও অষ্টিন ফ্রায়ার্স, Austin Friars ইঁহার দু'খানি নাম-করা বই। কিছুকালের জন্য ইনি সেণ্ট জেম্স্ ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা ও অংশীদার ছিলেন। ১৯০৬ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

[৫] সারা স্মিথ (হেস্‌বা ষ্ট্রেটন্, ছদ্ম-নাম)। জন্ম-তারিখ ২৭শে জুলাই, সন ঐ। স্থান, ওয়েলিংটন, শ্রপ্‌সায়ার। ডিকেন্সের সম্পাদনায় Household Words, হাউস্‌হোল্ড ওয়ার্ডস্ ও All the Year Round, অল্ দি ইয়ার রাউণ্ড, বলিয়া যে-কাগজ বাহির হইত, তাহাতে তিনি অনেক সুপাঠ্য গল্প লেখেন এবং বছর দশেকের মধ্যে এমন প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন যে, সে সময়ে সকল শিক্ষিত পরিবারেই তাঁহার পুস্তক সমারোহের সঙ্গে পঠিত হইত। তাঁহার বই, Jessica's First Paryor, জেসিকাজ্ ফার্ষ্ট প্রেয়ার সে যুগের একখানি বহু-ক্রীত পুস্তক—ইউরোপের সমস্ত ভাষায় ইহা অনূদিত হয়। ১৯১১ সনে সারে শহরে ৮ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ছেলে-মেয়ে সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্ন লওয়া অন্যায়। এমন বাপ-মা আছেন যাঁহারা ছেলে কি মেয়েকে চোখে-চোখে রাখিতে চান। তাঁহাদের বিশ্বাস ছেলেমেয়ের জন্য প্রাণপাত করিয়াই তাঁহারা তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবেন। এবং ছেলেমেয়ে একটু বিগ্‌ড়াইলেই তাঁহাদের অস্বস্তির অন্ত থাকে না। ভাবখানা এই যে, যে-ছেলেমেয়ের জন্য তাঁহারা এত করিতেছেন, তাহারা এমন অকৃতজ্ঞ কেন হইবে, কেন বাপ-মার মন বুঝিয়া চলিবে না? এজন্য তাঁহারা নিজেরাই যে দোষী এ কথা তখন ভুলিয়া যান। ছেলে বয়স হইতে আদরে-আব্দারে এবং বড় হইলে মানুষ করিবার অদম্য চেষ্টায় ছেলেমেয়ের মাথায় এ বুদ্ধি বাপমা নিজেরাই ঢুকাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাদের মাথার মধ্য-মণি এই ছেলেমেয়ে। সুতরাং ছেলেমেয়ের আত্মম্ভরিতা বাড়িতে কতক্ষণ? প্রথমে সে-আত্মম্ভরিতা সংসারের বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর দুদিন যাইতে না যাইতে নিজের বাপ-মার বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়া উঠে। তখন, তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিলে চলে কি করিয়া? আসলে, প্রথম হইতেই ছেলেমেয়েকে একটু কড়া নজরে রাখা ভাল।—শ্রীমতী গোয়েণ্ডোলেন অবিন 'উইমেন্স জার্ণাল' পত্রিকায় ছেলে মানুষ করা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন—'I feel that all wise parents would do well to pause and consider how much freedom it is wise to give to their children and where this freedom borders on laxity.' অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে, প্রত্যেক বাপমায়ের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত, কেননা স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতায় পার্থক্য বেশী নয়।

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এমনি করিয়াই তাহাদের ছুই স্বামী-স্ত্রীর দিন চলিতে লাগিল।

শ্রীহর্ষর কি যে হইল কে জানে, কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কোথায় যে তাহার ঘা পড়িল জানি না, সে শুধু তাঁহার নব-বিবাহিতা পত্নী চাঁপার কাছে জানাইতে চায় যে, সে বড়লোক এবং বিস্তর টাকার সে মালিক। আর ওদিকে চাঁপাও ঠিক তাহাই চায়। বলে, বড়লোক যদি ত' খরচ কর, আমি দেখি। এবং খরচ যদি করিবেই ত' অন্যত্রে কেন, আমার দাদা তিনকড়ির কিছুই নাই—তাহাকেই দাও।

তিনকড়িকে অবশ্য দিতে কসুর সে কিছু করে নাই। রাঁধুনী ত' সে বিবাহের পরেই রাখিয়া দিয়াছে, তাহাব উপর বৈকুণ্ঠকে বলিয়াছে—সংসারের যাবতীয় খরচ তিনি যেন এইখান হইতেই লইয়া যান।

কিন্তু খরচ করিয়াও নিস্তার নাই।

টাকা যেদিন শ্রীহর্ষকে খরচ করিতে হয় সেদিন তাহার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া থাকে, সারাদিনের মধ্যে চাঁপার সঙ্গে একটি বাক্যালাপও করে না, খাইবার সময় খায় আর নীচের বসিবার ঘরটিতে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবে।

আবার নীচের ঘরে আজকাল বসিয়া থাকাও দায় হইয়া উঠিয়াছে। যত-সব পাড়ার ছেলেগুলা তাহাকে বড়লোক ঠাওরাইয়া চাঁদার খাতা লইয়া হরদম আনাগোনা করে।

একা যখন বসিয়া থাকে, তখন যদি কেহ চাঁদা চাহিতে আসে, শ্রীহর্ষ তাহাকে এমন-সব কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দেয় যে, বেচারী খাতা লইয়া সেখান হইতে পলাইবার আর পথ পায় না। কিন্তু চাঁপার নজরে একবার পড়িয়া গেলেই মুস্কিল।

সেদিন অমনি কয়েকজন ছোকরাকে বিদায় করিয়া শ্রীহর্ষ চাঁপার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই চাঁপা বলিল, 'দু'চার আনা পয়সার জন্যে কেন যে বদনাম কেনো বাপু কে জানে।'

শ্রীহর্ষ হাসিয়া বলিল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি শুনলে বুঝি?'

'শোনবার দরকার হয় না। ছিঃ।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'শালারা সব জোচ্চোর পাজি, মিথ্যেবাদীর একশেষ! ওই ওদের ব্যবসা, ওই করেই ওদের দিন চলে, তা জানো?'

মুখ ভারি করিয়া চাঁপা চলিয়া যাইতেছিল, শ্রীহর্ষ বলিল, 'বাঃ রাগ হয়ে গেল ত? না শুনেই অমনি রাগ করে' চলে যাচ্ছ? এটা তোমার ভারি—'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া চাঁপা মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'অন্যায়, না? দ্যাখো, আমার কাছে আর তুমি 'লব্ বাফট্টাই' মেরো না বলছি! একলাখ টাকা আছে, দু'লাখ টাকা আছে, আর এদিকে চার আনা পয়সা দেবার বেলা···ছি ছি, ছি ছি, ওরা যে নিন্দা করবে গো! বলবে, লোকটা কি রকম চামার দেখেছো!'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'কিন্তু আমি ত' চামার নই চাঁপা! খরচ ত আমি করি।—এই ধর না, তোমার কথাই ধর না! তোমার পেছনে যে-খরচটা আমি করি, স্ত্রীর পেছনে এত খরচ আর কেউ—'

চাঁপা বলিল, 'হুঁ, আর কেউ কখনও করে না। না? তা আমি জানি। আর যদি কর ত' তোমার দিব্যি রইলো।'

এই বলিয়া সে সেখান হইতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে সেদিন চাঁপা আর তাহার সঙ্গে কথা কিছুতেই কয় না। অথচ শ্রীহর্ষর তরফ হইতে কাকুতি-মিনতির কামাই নাই।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আমি ত' কিছু তোমায় বলি নি চাঁপা। যদি কিছু বলতাম ত' না হয় আমার দোষ হ'তো।'

অনেকক্ষণ পরে চাঁপা এইবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। কিন্তু মুখ ফিরাইতেই দেখা গেল সে কাঁদিতেছে।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'এ আবার কি! তুমি কাঁদছ চাঁপা? কেন? কাঁদবার মত কি আমি বলেছি বল ত?'

চাঁপার দু' চোখ বাহিয়া জল গড়াইতে লাগিল এবং তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতেই সে জবাব দিল, 'বল নি? আবার কেমন

করে' বলতে হয় শুনি! আমার কাকা গরীব, আমার দাদা গরীব, তাই তাদের তুমি দাও। দিয়ে আবার আমাকে কথা শোনাও কেন? তার চেয়ে তুমি দিয়ো না বরং সেই ভালো।'

কথা শ্রীহর্ষ সত্যই বলিয়াছে। বলা কথা ফিরাইয়া লইবার নয়, তাহা না হইলে আজ সে এই মুহূর্ত্তেই তাহা ফিরাইয়া লইত। বলিল, 'তুমিই ত' আমাকে বলিয়েছ চাঁপা! আচ্ছা যাক্ আর বলব না। আর কখ্খনো বলব না।'

এই কথা বলিয়া উভয়েই চুপ করিয়া ছিল।

কিন্তু নিজে কথা না বলিলেও চাঁপাকে কথা বলাইবার জন্য শ্রীহর্ষ চেষ্টার ত্রুটি করিল না।

শেষে বলিবার মত আর কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'তিনকড়িকে একটা গোল্‌দারী দোকান করে' দেবো বলেছি! অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম—পাড়ায় একটা গোলদারী দোকান বেশ ভালই চলবে।'

চাঁপার কান্না তখনও থামে নাই। বলিল, 'না। খবরদার বলছি—আমার বা আমার সম্পর্কে কোনও লোকের পেছনে টাকা তুমি খরচ করতে পাবে না। তার জন্যে শেষে গঞ্জনা সইতে আমি পারব না—পারব না—পারব না।'

শ্রীহর্ষ ঈষৎ হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'না গো না, গঞ্জনা সইতে তোমার হবে না। দোকান করবার জন্যে হাজার খানেক টাকা কাল আমি তিনকড়িকে দেবো।'

চাঁপা গম্ভীর ভাবে বলিল, 'না, দিতে তোমার হবে না।'

'এই বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, 'চার আনা পয়সা চাঁদা দিতে যে পারে না, সে দেবে এক হাজার টাকা! তবেই হয়েছে!'

কিন্তু সব চেয়ে মজা এই যে, শেষ পর্য্যন্ত এক হাজার টাকা সে তিনকড়িকে দিয়াছে এবং সেই টাকা দিয়া তিনকড়ি তাহাদের পাড়ায় একটা গোলদারী দোকানও খুলিয়াছে।

একা মানুষের পক্ষে ওই অতবড় দোকান চালানো শক্ত, তাই আজকাল বুড়া বৈকুণ্ঠও তাহার দোকানে গিয়া এক আধবার বসে, তাহার পর শ্রীহর্ষের কাছে আসিয়া বলে, 'অশেষ ঋণে তুমি আমায় আবদ্ধ করে ফেললে বাবাজি! ভগবানের কৃপায় তোমার দেখা পেয়েছিলাম বাবা, তাই এ বুড়ো বয়েসে আর কেঁদে মরতে হ'লো না।'

শ্রীহর্ষ হাসিয়া বলে, 'ওই কথাটা দয়া করে' আপনার ভাইঝিকে একবার শুনিয়ে যান।'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'কেন বাবাজি, ও বুঝি এই নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে? কই রে, কোথায়, ও চাঁপা, চাঁপা!'

বলিয়া সেইখান হইতেই চাঁপাকে সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল।

চাঁপা ধীরে ধীরে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৈকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে, বাবাজির সঙ্গে তুই নাকি ঝগড়া করিস শুনছি?'

চাঁপা চুপ করিয়া রহিল।

বৈকুণ্ঠ আবার বলিল, 'কিরে, চুপ করে' রইলি যে?' চাঁপা বলিল, 'আর কিছু বলবে, না শুধু এই বলতেই ডেকেছ?'

চাঁপার মুখের পানে তাকাইয়া বুড়া বৈকুণ্ঠও কেমন যেন একটুখানি থতমত খাইয়া গেল। বলিল, 'বেশত, এটা কি আর কথা নয় মা? ছি! স্বামীর মনে যাতে কষ্ট হয় সেকাজ করতে নেই।'

কোনও কথা না বলিয়া চাঁপা যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

চলিয়া যাইতেই শ্রীহর্ষ মুখ তুলিয়া বলিল, 'দেখলেন মজা! পালালো।'

বৈকুণ্ঠ কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অথচ একটা কিছু না বলিলেও নয়। বলিল, 'লজ্জায় পালানো বাবাজি, তা লজ্জাই নারীর ভূষণ, লজ্জা থাকা ভালো।'

তা ইহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর রাগ-অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটি এমন প্রায় রোজই হয়। হয় আবার মিটিয়াও যায়। সুতরাং উহার মধ্যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া কথার ধারাটাকে বৈকুণ্ঠ অন্যদিকে লইয়া গিয়া ফেলিল। বলিল, 'পাড়ায় আমাদের একখানা বাড়ী বিক্রি হবে বাবাজি, খুব কম টাকায়। বাড়ীখানা কিনে ফেলে, আবার যদি চড়া দামে বিক্রি করে' ফেলতে পার ত' কিছু লাভ হয়।'

মন্দ নয়। তিনকড়িকে এক হাজার টাকা দিয়া অবধি শ্রীহর্ষের দুর্ভাবনার আর অন্ত ছিল না। ভাবিতেছিল, ব্যাঙ্ক

হইতে এই যে এতগুলা টাকা সে শুধু চাঁপার জন্য খরচ করিল, সে-টাকা সে পূরণ করিবে কেমন করিয়া। কাজেই এই বাড়ী কেনার প্রস্তাবটা তাহার মন্দ লাগিল না। বলিল, 'বাড়ীটা আবার বিক্রী করতে যদি না পারি ?'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'কেন পারবে না বাবাজি ? এই বাড়ী কেনা-বেচার কারবার কলকাতার কত লোক করে তা জানো ? বাড়ীটা একবার কিনেই ছাখো না ! কত ব্যাটা দালাল তোমার কাছে ঘোরাফেরা করবে।'

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাই। বাড়ীখানি শ্রীহর্ষ কিনিল এবং কয়েকদিন পরই বিক্রী করিবার পর দেখা গেল তিন হাজার টাকা তার-লাভ হইয়াছে।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'ঠিক বলেছেন কাকাবাবু, এইবার থেকে এই কাজটাই করা যাক।'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'দাঁড়াও বাবাজি, তাড়াতাড়ি করো না। আর একটা বাড়ী তাহ'লে আমি দেখি।'

বৈকুণ্ঠ একে বুড়ামানুষ, তার আবার ঠাকুরদেবতার পূজা-আহ্নিক করিতেই দিবসের প্রায় অধিকাংশ সময় তাহার কাটে, সস্তায় ভাল বাড়ী কোথায় বিক্রী হইতেছে সে সন্ধান রাখিবার জন্য যেরকম ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন সে-রকম অবসরও তাঁহার নাই, সামর্থ্যও নাই। অথচ এদিকে তখন অর্থ-উপার্জ্জনের আস্বাদন শ্রীহর্ষ পাইয়াছে, তাহার আর সবুর কিছুতেই সয় না।

দালালেরা প্রত্যহ কত বাড়ীর সন্ধান যে আনিয়া দেয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীহর্ষ ভাবে বুঝিবা সবেতেই লাভ হইবে। এক একবার মনে হয় সব বাড়ীগুলাই কিনিয়া ফেলে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ নিষেধ করে। বলে, 'খবরদার বাবা, এমন কাজও ক'রো না। আঁধারে ঢিল ছুঁড়েছিলাম, একটা লেগে গেছে বলেই যে সবগুলো লাগবে তার কোনও মানে নেই। খুব ভেবে চিন্তে এসব কাজ করতে হয়।'

কথাটা সত্য। কিন্তু বসিয়া বসিয়া ভাবিতে গেলে ব্যবসা করা চলে না। বৈকুণ্ঠ বাধা দিবে ভাবিয়া শ্রীহর্ষ একদিন না জানাইয়াই প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী অনেক টাকা খরচ করিয়াই কিনিয়া ফেলিল।

কথাটা বৈকুণ্ঠের কাছে গোপন অবশ্য বেশীদিন রহিল না। হাজার হোক তাহার বয়স হইয়াছে, জীবনের অভিজ্ঞতাও বড় কম নয়। বলিল, 'দালালের মার্ফৎ বাড়ীটা ত কিনলে বাবাজী, কিন্তু কাগজপত্র বেশ ভাল করে' কোন উকিলকে দিয়ে দেখিয়ে-শুনিয়ে নিয়েছ ত ?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'উকিলকে দেখাইনি, কিন্তু কাগজপত্র ঠিকই আছে।'

কিছুদিন পরে বাড়ীখানি বিক্রী করিবার জন্য দালাল নিযুক্ত করা হইল। এবং এই বিক্রী করিতে গিয়াই বাধিল গোলমাল। যে লোকটা বাড়ী বিক্রী করিয়াছে বাড়ীর মাত্র সিকি অংশ তাহার নিজের, বাকি বারো আনা অংশের মালিক যাহারা, তাহারা এখনও নাবালক। শ্রীহর্ষ মাথায় হাত দিয়া বসিল। কি যে করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ওদিকে বাড়ীখানি যিনি ফাঁকি দিয়া শ্রীহর্ষকে বিক্রী করিয়াছেন তাঁহার সন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল, নগদ টাকা হাতে পাইয়া তিনি কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এমন কি যে দালালেরা এই ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল, তাহাদেরও কোনও সন্ধান মিলিল না।

চব্বিশ হাজার টাকায় বাড়ীখানি শ্রীহর্ষ কিনিয়াছিল,—নগদ আঠারো হাজার টাকা লোকসান ! উন্মাদের মত শ্রীহর্ষ ছটফট করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন কি, বৈকুণ্ঠকেও সেদিন সে বলিতে বাকি কিছুই রাখিল না। বলিল, 'শুধু আপনার জন্যেই আমার এই টাকাটা গেল কাকাবাবু ! আপনি যদি বাড়ী কেনার লোভ আমায় না দেখিয়ে দিতেন তা'হলে যেতো না !'

এত এত টাকা হঠাৎ এমনি করিয়া লোকসান হইয়া গেলে মানুষের মাথায় কিছু গোলমাল হওয়াই স্বাভাবিক, তাই বৈকুণ্ঠ আর তাহার কথার কোনও জবাব না দিয়া মৃদু একটু-খানি হাসিল মাত্র।

লোকসানের কথাটা বলিতে শ্রীহর্ষ আর বাকি কাহাকেও রাখিল না। কথায় কথায় সেদিন সে চপলা-ঠাকরুণকেও তাহার এই সর্ব্বনাশের কথাটা জানাইয়া ফেলিল।

চপলা-ঠাকরুণ বলিল, 'এ আর কারও কাজ নয় শ্রীহর্ষ, দাড়িওলা ওই বুড়ো মিন্‌ষেরই কাজ। ও যে একদিন তোর সর্ব্বনাশ না করে' ছাড়বে না তা আমি সেই প্রথম দিনেই বলেছিলাম বাবা, একবার মনে বুঝে ছাখ ভাল করে।'

কিন্তু বৈকুণ্ঠকে সে নিজে যাহাই বলুক, চপলা-ঠাকরুণের কথা সে বিশ্বাস করে না। কারণ যেদিন হইতে তাহাকে ঠকানোর এই সংবাদ সে পাইয়াছে সেইদিন হইতে বুড়া

আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া পলাতক সেই জোচ্চোরের সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হায়রাণ হইয়া উঠিয়াছে।

একে শীতকাল, তাহার উপর শীতটা সে বৎসর খুব বেশিই পড়িয়াছিল।

শ্রীরামপুরে সেই পাজি লোকটার কে একজন আত্মীয়া নাকি বাস করে। শোনা গেল, অন্য কোথাও না পাওয়া গেলে তাহাকে নাকি সেইখানেই পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠ নিজে তাই তাহারই সন্ধান করিতে শ্রীরামপুর ছুটিয়াছিল। একদিন এক রাত্রি সেখানে বাস করিয়াও লোকটার সন্ধান সে পায় নাই। তাহার সেই আত্মীয়াটি একজন যুবতী স্ত্রীলোক, তিনি নাকি বলিয়াছেন, পরেশবাবুকে পাইতে হইলে এলাহাবাদ যাইতে হইবে। তবে সেখানে যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে তাহারও কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। এই সংবাদ লইয়া শ্রীরামপুর হইতে বুড়া বৈকুণ্ঠ যেদিন ফিরিল—সেইদিন রাত্রেই তাহার জ্বর।

ডাক্তার বলিলেন, ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছে, কোনও চিন্তার কারণ নাই। তবে বুড়া মানুষ এই যা ভয়।

এদিকে তাহার অসুখ শুনিয়া চাঁপা কাঁদিতে লাগিল।—কাকাবাবুর অসুখ, বুড়া মানুষ, সেবাশুশ্রূষা না করিলে হয়ত' আর বাঁচিবেন না, সুতরাং তাহাকে সেইখানে পাঠাইয়া দেওয়া হোক্।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তুমি চলে গেলে আমি যদি না বাঁচি?'

এত দুঃখেও চাঁপার মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, 'না, তোমার কিছু হবে না আমি জানি।'

এই বলিয়া একজন ঝিকে সঙ্গে লইয়া সে তাহার স্বামীর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। বাপের বাড়ী পাশেই। তবে যাইতে হইলে একটুখানি ঘুরিয়া যাইতে হয়। এই বাড়ীর প্রকাণ্ড লোহার ফটকটা পার হইয়া রাস্তা দিয়া সোজা দক্ষিণমুখে চলিয়া গেলে বাঁহাতি যে গলিটা পাওয়া যায়, সেই গলিরই খানকতক বাড়ীর পরেই তাহাদের সেই ছবির মত ছোট্ট বাড়ীখানি।

যাইবার আগে চাঁপা বলিয়া গেল, 'ওইখানেই খাবে। বুঝলে?'

শ্রীহর্ষ কি যেন ভাবিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, 'কেন, এখানে কি রান্নাবান্না বন্ধ নাকি?'

চাঁপা বলিল, 'না, বন্ধ নয়। এখানে খেলে তুমি খেলে না খেলে কিছুই ত' বুঝতে পারব না। তাই বলছিলাম।'

শ্রীহর্ষ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্ আমার খাবার খোঁজটা তা'হলে তুমি রাখো দেখছি!'

চাঁপা হাসিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ের আগে থেকেই সে খোঁজ আমায় রাখতে হয়েছে। তুমি নিমকহারাম, তাই সেকথা ভুলে যাও।'

শ্রীহর্ষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'বেশ তাই হবে, ওইখানেই খাব।'

কিন্তু এই আসে এই আসে করিয়া রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজিতে চলিল, শ্রীহর্ষ তবু আসিল না। একে শীতকালের রাত্রি, ইহারই মধ্যে চারিদিক সব নিঝ্‌ঝুম হইয়া গেছে, দোকানটা সেদিন সকাল সকাল বন্ধ করিয়া তিনকড়ি বাড়ী ফিরিয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, পাশের ঘরে জ্বরে বেহুঁস হইয়া বৈকুণ্ঠ শুইয়া আছে, চাঁপা একা শুধু জাগিয়া জাগিয়া ভাবিতেছে—এখনও সে আসিল না কেন?

দেখিতে দেখিতে বারোটা বাজিল। এবার আর নিশ্চিত বসিয়া থাকা চলে না। চাঁপা ধীরে-ধীরে উঠিয়া তাহার দাদার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, 'দাদা!'

তিনকড়ি ঘুমের ঘোরে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, 'কি? কি বলছিস?'

ঘরে রোগী, তাই সে ভাবিয়াছিল, কাকাবাবুর অসুখ হয়ত বাড়িয়াছে। কিন্তু চাঁপা তাহাকে অন্য কথা শুনাইল। বলিল, 'ভারি মুস্কিলে পড়েছি দাদা, এখনও সে এলো না কেন বুঝতে পারছি না। উঠে গিয়ে একবারটি তুমি দেখবে দাদা?'

তিনকড়ি তৎক্ষণাৎ জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া যে সংবাদ দিল সে সংবাদ পাইয়া চাঁপার চমকিয়া উঠিবারই কথা।

তিনকড়ি ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, 'তুইও আয় চাঁপি, আমি একা পারলাম না ওকে তুলে আনতে। মদ খেয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল দেখলাম বাইরের ওই ঘরটাতে। জামাকাপড় ছিঁড়েছে, ধুলোকাদায় মাখামাখি হয়ে - সে এক বিশ্রী কাণ্ড করে তুলেছে দেখবি চল্।'

চাঁপা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল।' (ক্রমশঃ)

রাজমোহনের স্ত্রী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[যাহারা বন্দী করিল ও যে বন্দী হইল]

আমাদিগকে দৃশ্যান্তরে যাইতে হইবে। ঘরখানি দেখিলে মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, মেঝে হইতে ছাদের দূরত্ব অতি সামান্য; একটি মাত্র প্রদীপের ক্ষীণ আলোক গম্ভীরদর্শন স্থূল প্রাচীর-গাত্রে পড়িয়া ঘরখানিকে অধিকতর ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। কক্ষটি আকারে ও আয়তনে এত ক্ষুদ্র, ইহার উচ্চতা এমন কম যে দেখিলে মনে হয়, সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্য ইহা সৃষ্ট হয় নাই, অপরাধীদিগের উপযুক্ত করিয়াই ইহা নির্ম্মিত। কক্ষটির একটি মাত্র দরজা, ক্ষুদ্র কিন্তু স্থূল লৌহ-নির্ম্মিত; দরজার আয়তনের তুলনায় ইহার হুড়কা ও খিল একটু বিরাটই বলিতে হইবে। এতদ্‌-সত্ত্বেও এই কক্ষটির দৃঢ়তায় সন্দিহান হইয়াই যেন গৃহনির্ম্মাতা অদ্ভুত সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য লৌহের পাত দিয়া সমস্ত কক্ষটি মুড়িয়া দিয়াছে। সেই অস্পষ্ট কম্পমান আলোকে কৃষ্ণবর্ণ ধাতু যেন ভ্রূকুটি করিতেছিল, মানুষকে জীবন্ত কবর দিবার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল। পূর্ব্বোক্ত লৌহদ্বার ব্যতীত যাতায়াতের আর একটি সত্য অথবা নকল পথ এই কক্ষে ছিল। আগেরটির মতন ইহারও একটি দরজা, কক্ষের এক কোণে অবস্থিত এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পার্শ্ববর্ত্তী কোনও কক্ষে এই দ্বার দিয়া গমনাগমন চলে। ইহা কিন্তু আয়তনে আরও ক্ষুদ্র, এত ক্ষুদ্র যে একটি শিশু হামা-গুড়ি দিয়া সেই দরজা পার হইতে পারে। যে ভীষণদর্শন কক্ষটির কথা হইতেছিল তাহাতে আসবাব-পত্রাদি কিছুই ছিল না—তাহা সম্পূর্ণ খালি ছিল। কক্ষের একটি মাত্র অধিবাসী, একজন পুরুষ—কক্ষস্থিত প্রদীপের অস্পষ্ট কম্পমান আলোকে প্রতীয়মান হইতেছিল যে, সে কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিতেছে। পুরুষটি আর কেহই নহে, আমাদের মাধব ঘোষ।

পাঠকের বিস্মিত হইবার কারণ নাই; মাধবকে যাহারা বন্দী করিয়াছিল তাহারা এই খানেই তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহারা কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। গভীর নিশীথের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইয়াছে। দরজার অর্গল বাহির হইতে বন্ধ ছিল এবং মাধব ঘোষ অন্ততঃ বর্ত্তমানে কিছু কালের জন্য জীবন্ত কবরে সমাহিত হইয়াছিল। তথাপি তাহার নির্ভীক চিত্ত দমিয়া যায় নাই, তাহার আশাভঙ্গ হয় নাই। একটা ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব তাহার মনকে আশ্রয় করিয়াছিল। সেই নির্জ্জন কক্ষে দীর্ঘ পদসঞ্চারে পায়চারি করিতে করিতে মাধবের মনে এই সঙ্কল্প জাগ্রত হইল যে, যে ভয়ঙ্কর চরিত্রের দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে বন্দী করিয়াছে তাহাদের কোনও অত্যাচারকেই সে গ্রাহ্য করিবে না।

অবশেষে দরজার বাহিরের তালার চাবি খোলার শব্দ হইল। তাহার পর খিল খোলার শব্দ; হুড়কো এবং শিকল খুব সাবধানে খোলা হইল; সেই বিরাট দরজার পাল্লা দুইটির কব্জা ক্যাঁচক্যাঁচ করিয়া উঠিল এবং যে দুই বর্ব্বর দস্যু তাহাকে বন্দী করিয়াছিল তাহারা নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তেমনই সাবধানতার সহিত দরজা বন্ধ করিল।

মাধব অসীম ঘৃণাভরে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কিন্তু তাহাদের আগমন যেন সে লক্ষ্যই করে নাই এমন ভাবে পূর্ব্ববৎ পদচারণা করিতে লাগিল। সর্দ্দার ও ভিখু উভয়েই প্রদীপের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। ভিখু কটিদেশপ্রলম্বিত একটি ঝুলি হইতে সামান্য পরিমাণ গাঁজা ও অতি ক্ষুদ্র মস্তক-বিহীন একটি কলিকা বাহির করিয়া গাঁজাটুকু বাঁহাতের তালুতে রাখিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল চাপ দিয়া তাহা টিপিতে লাগিল। গাঁজা কলিকায় সাজিবার পূর্ব্বে এইরূপ করিতে হয়। সর্দ্দার ততক্ষণে বাতিটা একটু উস্কাইয়া লইতে লইতে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু যে দেখছি আজ রাত্রে বড় ভালো মানুষটি!

পায়চারিরত মাধব একটু থামিয়া দুর্ব্বৃত্তের মুখের পানে চাহিল; তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হইলে যেন সে কিছু একটা জবাব দিবে। কিন্তু সে তাহা না করিয়া সহসা পিছন ফিরিয়া পূর্ব্বের মত নিঃশব্দে পায়চারি করিতে লাগিল। ততক্ষণে গাঁজা প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দস্যু দুইজন তাহা টানিতে সুরু করিয়াছে। বন্দীর

নীরব প্রায় তাহারা যেন উত্যক্ত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও অপমানসূচক কথাবার্ত্তা হইতে তাহারা বিরত ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তাহাকে অতি নীচ হিতাহিতবিবেচনাশূন্য বর্ব্বরও দূরে রাখিয়া তাহার সম্মান বজায় করিয়া চলে; তাহাদের মনে কেন জানি না, একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়া থাকে। পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন, সর্দ্দার ঠিক সে শ্রেণীর বর্ব্বর ছিল না। তথাপি বন্দীর গর্ব্বিত দৃষ্টি ও কঠোর গাম্ভীর্য্য তাহাকে রসিকতার অবকাশ দেয় নাই। কিন্তু গঞ্জিকার ধূমে তাহার সংযম টলিয়া গেল।

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া সে বলিয়া ফেলিল, বাবু, কল্কিতে দু একটা টান দিয়ে দেখবেন? শপথ করে বলছি গাঁজা যা সাজা হয়েছে তাতে লাখোপতিও দুই এক টান দিলে দোষ হবে না।

মাধব তবুও কোনও কথা বলে না। সর্দ্দার যেন একটু দমিয়া গেল। সে ঘন ঘন গাঁজায় দম দিতে দিতে তাহার সঙ্গীর সহিত কুৎসিত বাক্যালাপে রত হইল।

পরিশেষে মাধব তাহার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার মনিব আমাকে নিয়ে কি করতে চায়, বলতে পার? "আমাদের কোনও মনিব নাই" গজ গজ করিতে করিতে এই কথা বলিয়া সর্দ্দার আবার গাঁজা ও অশ্লীল কথাবার্ত্তায় রত হইল।

মাধব আবার বলিল, মনিব না হোক, একাজে তোমাদের যে ভাড়া করেছে সে—

পূর্ব্ববৎ কঠোর স্বরে সর্দ্দার জবাব দিল, ভাড়া আমাদের কেউ করে নি।—সে গাঁজা টানিয়াই চলিল।

—একাজ যার হুকুমে তোমরা করেছ—মাধব বলিল।

—কারো হুকুমে নয়।—সর্দ্দার জবাব দিল।

—কেউ নয়? তবে কি আমাকে নিয়ে খেলা করবার জন্যে আমাকে ধরে এনেছ?

সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, খেলা নয়। আমাদের টাকার দরকার, টাকা চাই।

গর্ব্বিত সর্দ্দারের বিশ্বাস ছিল যে সে ধনী এবং প্রতিপত্তি-শালী লোকদের আতঙ্কস্বরূপ, তাহাদের প্রতিপত্তি নষ্ট করাই তাহার কাজ; মাধবের শান্ত সংযত ব্যবহার ও উদ্ধত ভাষা তাহার সেই গর্ব্বে আঘাত করিল। সেও মাধবকে উত্তর-প্রত্যুত্তরে আঘাত দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

মাধব প্রশ্ন করিল, টাকা তোমাদের দেবে কে?

সর্দ্দার বলিল, ভেবে দেখ।

—সে ভাবনা আমার নয়।

একটা গভীর চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত শব্দে কথোপকথন-নিরত ব্যক্তিরা চমকিয়া উঠিল।

ভিখু বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, ও আবার কি?

সর্দ্দারও বিস্মিত হইয়াছিল, সেও বলিয়া উঠিল, তাই তো, ওটা আবার কি?—তিনজনেই কিয়ৎ কালের জন্য নীরব রহিল।

সর্দ্দার বলিল, এ ঘরে আর কেউ আছে নাকি? তাহলে ব্যাপারটা মন্দ গড়ায় না। দেখি।

তাহারা যেখানে বসিয়াছিল সেখান হইতেই সেই অস্পষ্ট আলোকেই ঘরের সমস্ত অংশ যতদূর সম্ভব দৃষ্ট হইতেছিল—সর্দ্দার তথাপি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরের সকল কোণই পরীক্ষা করিল। কিন্তু আর কিছুই সে দেখিতে পাইল না। পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে বলিল, অবাক কাণ্ড বটে! মরুকগে যাক। হুজুর আমার মনিবের কথা বলছিলেন, তিনি কে হুজুরের জানা আছে কি?

তাহার ভাষা ও কণ্ঠস্বরে মাধব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু বিরক্তি চাপিয়া সে সংক্ষেপে জবাব দিল, হাঁ জানি, মথুর ঘোষ। তার মতলবটা আমাকে জানাবে কি?

ভিখু বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ফেলিল, সর্দ্দারের কানে কানে বলিল, ব্যাপার কি, সব জেনে ফেলেছে দেখছি!

সর্দ্দার তেমনই চাপা গলায় বলিল, বোকার ডিম, এতে অবাক হবার কি আছে! রাধানগরে আর কার এমন লোহার পাতমোড়া কয়েদখানা আছে?

কিন্তু সে মাধবের প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না; মাধবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার সঙ্কল্পবশতও বটে আবার তাহাকে একটু খেলাইয়া তাহার নিজের মতলব হাঁসিল করিবার জন্যও বটে, সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু গাঁজার ধোঁয়ায় ভিখুর মেজাজ তখন চড়িতে সুরু করিয়াছিল। সে সাধারণতঃ কথা কম বলে কিন্তু গঞ্জিকা-মহিমায় তাহার সে মৌন-বাঁধ দ্রুত ভাঙিতে সুরু করিয়াছিল।

সে বলিয়া উঠিল, ভালোরে ভাল, আমরা টাকা চাই, ও রক্তমাংসের জীবটিকে নিয়ে করব কি!

সর্দ্দার বলিল, খেয়ে ফেল্, গিলে ফেল্—

সর্দ্দারের রসিকতায় ভিখু কর্কশ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার হাসি সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই ভয়ে তাহার মুখের হাসি মুখে মিলাইল; আবার সেই চাপা আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল; এবার যেন ঠিক ছাদের কাছ হইতে শব্দটা আসিতেছিল।

আতঙ্কিত সর্দ্দার চীৎকার করিয়া উঠিল, আবার!

ভিখু তখন ভয়বিমূঢ়, অপদেবতাদের কথা তাহার মনে ভিড় করিয়া আসিতেছিল। মাধবও অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল কিন্তু অন্য কারণে।

ভিখু ফিসফিস করিয়া বলিল, জায়গাটা অনেক দিন খালি পড়েছিল, কে জানে সেই সুযোগে তাঁরা সব এখানে ডেরা বেঁধেছেন কি না।

অধিকতর সাহসী সর্দ্দারের মনে যদিও অপদেবতাদের যথেষ্ট ভয় ছিল, তথাপি সে খানিকক্ষণ সে-ভয়কে আমল দিল না। এই সকল দস্যুদের উপজীবিকাই এমন যে তাহাদিগকে এমন নিঃসঙ্গ নির্জ্জন ভয়সঙ্কুল স্থানে সচরাচর চলাফেরা করিতে হয়—যেখানে গেলে সাধারণ লোকের নানাবিধ অপদেবতার ভয় জাগা স্বাভাবিক। তাহাদের অশিক্ষিত মনে ভয় যে থাকে না তাহা নয়, তবু অভ্যাসবশতঃ তাহারা নিজদিগকে অনেকটা শক্ত করিয়া রাখে।

সর্দ্দার বলিল, হয় তো আশেপাশে কেউ লুকিয়ে আছে, আমি দেখছি। ভিখু, তুই বাবুর উপর নজর রাখ।

সর্দ্দার তাহার ধুতির খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া সলিতার মত পাকাইয়া প্রদীপের তৈলে তাহা সিঞ্চিত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল এবং এই অপরূপ দীপ হস্তে সে সাবধানে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। বারান্দার সমস্ত অন্ধিসন্ধি সে খুঁজিয়া দেখিল। পাশাপাশি তিনটি ঘর, মাঝেরটিতে মাধবকে ধরিয়া রাখা হইয়াছিল; এই তিনটি ঘর সংলগ্ন বারান্দাটা। বারান্দায় কিছু দেখিতে না পাইয়া সে প্রাচীর-বেষ্টিত সামনের খোলা উঠানে নামিয়া খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু ফলোদয় হইল না। সে বিরক্ত হইয়া সন্দিগ্ধভাবে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিল। ভিখু এতক্ষণে সত্যসত্যই আতঙ্কিত হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি সেইস্থান পরিত্যাগ করিবার বাসনায় সে সর্দ্দারের কনুয়ে চিমটি কাটিয়া ইসারায় শীঘ্র কাজ সারিয়া লইতে বলিল।

সর্দ্দার বুঝিল, বলিল, দেরী হয়ে যাচ্ছে, এটা আমাদের ঘুমোবার জায়গা নয়, মাধববাবু। আমাদের সর্ত্তে যদি রাজি হও তোমাকে এখুনি ছেড়ে দি

মাধব নিজের সুবিধাটা হৃদয়ঙ্গম করিল, তাচ্ছিল্যভরে সে বলিল, কি সর্ত্ত?

—তোমার খুড়োর উইলটি আমাদের হাতে দাও।

বিশেষ না ভাবিয়া মাধব জবাব দিল, সেটাতো এখানে আমার কাছে নাই।—মাধব আবার পায়চারি সুরু করিল।

সর্দ্দারও সংক্ষেপে বলিল, তাহলে এখানেই পচে মর, আমরা চাবি নিয়ে চল্লাম।

—আচ্ছা ধর, উইলটা আমি দিতেই চাই, এখানে থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করি কি করে?

দস্যু এবারে নিজের সুযোগ বুঝিল, বলিল, সে ব্যবস্থা তুমিই করবে। একটা মতলব ঠিক করে ফেল। তোমার অবস্থায় পড়লে আমি যারা আমাকে বন্দী করেছে তাদেরই কারু হাতে বাড়ীতে চিঠি লিখে পাঠাতাম, তার হাতে উইল পাঠিয়ে দিতে বলতাম।

—যদি বাড়ীতে জিজ্ঞেস করে, আমি কোথা থেকে চিঠি দিচ্ছি, কি জবাব দেবে?

পুনরায় সেই অপার্থিব শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। একটা অত্যন্ত চাপা মৃদু আর্ত্তনাদ—মানুষে সে প্রকার শব্দ করিতে পারে না। এবারও মনে হইল ছাদ হইতে শব্দটা আসিতেছে।

দস্যু দুইজন ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল; মাধবও বিচলিত হইল।

সে প্রশ্ন করিল, দোতলায়, এর ঠিক ওপরে কি ঘর আছে?

উভয় দস্যুই সমস্বরে জবাব দিল, না, না।

সর্দ্দার বলিল, দাঁড়াও, আমি ছাদে গিয়ে দেখছি।

সর্দ্দারের মত পাকা ডাকাতের পক্ষে অনতিউচ্চ ছাদে উঠা কঠিন হইল না। লাফাইয়া প্রাচীর বাহিয়া সে ছাদে উঠিল কিন্তু সেখানে কিছুই দেখিতে পাইল না। ছাদের

আলিসায় ভর দিয়া সে বাড়িটির পিছনের দিকে নীচে চাহিয়া দেখিল। কোথায়ও কিছু নাই। বিরক্ত ও চিন্তান্বিত অবস্থায় সে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

মাধব যেন সহসা একটা কিনারা দেখিতে পাইল। সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এই ঘরের পাশে আরও দুটো ঘর আছে, না?

সর্দ্দার বলিল, হাঁ, সেই রকমই তো বোধ হয়।

—আর কাউকেও কি ওই ঘরের কোনোটাতে ধরে এনে রেখেছ?

—না।

—হয় তো, আর কেউ ধরে এনেছে। মনে হচ্ছে ওই শয়তানের কবলে পড়ে আর কোনও হতভাগ্য ভীষণ দুর্দ্দশাপন্ন হয়ে আর্ত্তনাদ করছে।—মাধব যেন আত্মগত ভাবেই কথাগুলি বলিল। যেয়ে দেখতে পার ওখানে কেউ আছে কি না।

সর্দ্দারও প্রায় নিজের মনেই বলিল, তুমি বোধ হয় ঠিক ধরেছ। দরজায় নিশ্চয়ই তালা দেওয়া আছে। তা হলেও আমি চেঁচিয়ে প্রশ্ন করব, কেউ ভেতরে থাকলে জবাব পাব নিশ্চয়ই।

সর্দ্দার পুনরায় আর একটি সলিতা পাকাইয়া তাহা লইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে দুটি ঘরের দরজাই খোলা—কেহ কোথাও নাই।

মাধব এবার সত্য সত্যই বিস্ময়বিমূঢ় হইল। সে বুঝিতে পারিল যে যেখানে যেখানে লোক থাকা সম্ভব সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করা হইয়াছে। দস্যু-সর্দ্দার এইবার অপদেবতার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রায় নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিয়াছিল। আতঙ্ক-বিহ্বল ভিখু সর্দ্দারের কাছ ঘেষিয়া দাঁড়াইল।

সর্দ্দার মাধবকে বলিল, দেখ আমরা আর এখানে থাকব না। দেবতাদের গতিবিধি দেবতারাই জানেন। তোমার কিছু বলবার থাকে বল, নইলে তোমাকে বন্ধ করে আমরা চললাম।

মাধব দেখিল, তাহাদের সর্ত্তে রাজি না হইলে আর উপায় নাই। যদি তাহারা দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, আবার যে কবে সে বন্ধ দরজা খুলিবে কেহ বলিতে পারে না। যদি সে রাজি হয় তাহা হইলে এমনও হইতে পারে যে তাহার চিঠি দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার আত্মীয়েরা কেহ তাহার সন্ধান করিতে পারে। সে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিল।

সর্দ্দারকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, তোমার দরকার টাকা, উইলটা যদি তুমি পাও তাহলে কিছু টাকাও পাবে। কত টাকা তুমি পাবে আমাকে বল, আমি তার দ্বিগুণ দিচ্ছি—উইলের বদলে টাকা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।

—না, না। অতশতে আমাদের দরকার নাই। আমরা এত বোকা নই যে বিশ্বাস করব তোমাকে! একবার ছাড়া পেলে তুমি আমাদের কলা দেখাতেও ছাড়বে না। চিঠি দাও, নইলে আমরা চললাম।

ঘরের ভিতরেই কোথায় যেন কাপড়ের খস্ খস্ আওয়াজ হইল। দস্যুরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল, আর অপেক্ষা না করিয়া পলায়ন করাটাই যেন তাহারা নিরাপদ মনে করিতেছিল। মাধব তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিল, সে কাগজ ও কলম চাহিল। কাগজ-কলম তাহাদের সঙ্গেই ছিল। মাধব কাগজ-কলম লইয়া বাড়ীতে প্রধান আমলার নামে চিঠি লিখিতে বসিল।

সর্দ্দার বলিল, আমি বলে যাই, তুমি লেখ; ফাঁকি দিয়ে যে আমাকে ধরিয়ে দেবে সেটি আমি হতে দিচ্ছি না। মনে রেখ, আমি এক সময় তোমার মত লিখতে পড়তে জানতাম।

মাধব অবাক হইয়া সর্দ্দারের দিকে চাহিল। সে সর্দ্দারের কথায় রাজি হইয়া তাহার নির্দ্দেশ মত লিখিতে বসিল। সর্দ্দার বলিতে সুরু করিল কিন্তু তখন অপদেবতার ভয় তাহার মনে নানা উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল, সে শান্ত ভাবে চিঠি লিখাইতে পারিতেছিল না। মাধব লিখিতে সুরু করিল।

সেই মুহূর্ত্তে শিকলের গভীর ঝনঝন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল দাপাদাপির আওয়াজ বজ্রনির্ঘোষের মত সেই ভীত আতঙ্কিত দলের কানে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই সেই অপার্থিব আর্ত্তনাদ—আরও উচ্চ আরও কর্কশ। ভিখু এক লাফে বারান্দায় পড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। সর্দ্দারও বিচলিত হইয়া বারান্দায় আসিল। সে সেখানে যে দৃশ্য দেখিল তাহাতেই আতঙ্ক-বিমূঢ় হইয়া দরজায় তালা বন্ধ করিবার অপেক্ষা না করিয়াই, পিছনে না চাহিয়াই দ্রুতগতিতে পলায়ন করিল। মাধব সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিল।

ওই সকল অলৌকিক শব্দ এবং দস্যু দুইজনের অতর্কিত পলায়নে মাধব স্বয়ং এতদুর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল যে নিজের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। সে কিয়ৎকালের জন্য স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল, কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া রমণীসুলভ ভয় পরিত্যাগ করিয়া বারান্দায় লাফাইয়া পড়িল। কিছুই প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইল না। খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া সে দেখিল বারান্দার একটি দরজা হইতে খোলা উঠানে একটি আলোকরেখা পতিত হইয়াছে। সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সে ধাবমান হইল, দেখিল, দরজাটি উন্মুক্ত এবং একজন রমণী সেই নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। একটি ছোট্ট লণ্ঠন মাটির উপর রক্ষিত। সেই লণ্ঠনটি হাতে তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া মাধব যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

মাধব সবিস্ময়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—তারা!

তারাও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়াছিল, সে বলিল, মাধব! কিন্তু উপর হইতে তখনও সেই ব্যথিত আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছিল। [আগামীবারে সমাপ্য]

পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়

[নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার জন্য আসিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহাদের সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।]

জীবন-রহস্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৲ টাকা।

মোহমুক্তি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১।০ টাকা।

হালিদা হানুম্—গোলাম মকসুদ্ হিলালী। ৸০ আনা।

শেকোয়া—আশরাফ আলী খাঁ। ১৲ টাকা।

ছায়াসীতা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৷৷০ টাকা।

আলোর আলেয়া—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ২৷৷০ টাকা।

পথধুলি—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ১৲ টাকা।

কবিতা-কৌমুদী (সপ্তম ভাগ—বাংলা)—শ্রীরামনরেশ ত্রিপাঠী। হিন্দি বই। ৩৲ টাকা।

অষ্টাদশী—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য। ।৴০ আনা।

একখানি মুখ—শ্রীসুধীরেন্দু রায়। ১৲ টাকা।

সুরা ও শোণিত—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। ১৲ টাকা।

নীলকণ্ঠ—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

এখানি গ্রন্থকারের তৃতীয় উপন্যাস। বর্ত্তমানে আমাদের লেখক-গোষ্ঠীর যে ক্রমবিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, অর্থাৎ প্রথম-প্রকাশিত পুস্তকের অর্জ্জিত যশকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তকের সাহায্যে হেলায় বিসর্জ্জন দেওয়া—বর্ত্তমান পুস্তকপাঠে বুঝিলাম, তারাশঙ্কর সে-রীতির ব্যতিক্রম। 'চৈতালি-ঘূর্ণী'তে তিনি আমাদের মনে যে-প্রত্যাশার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, 'পাষাণ-পুরী'তে তাহা বজায় ছিল—'নীলকণ্ঠ'তে সে-প্রত্যাশা বাড়িল। 'চৈতালি-ঘূর্ণী'র গোষ্ঠ ও দামিনীর কথা ভুলিতে পারি নাই; 'নীলকণ্ঠ'এর গিরি ও শ্রীমন্তকেও ভুলিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। বইখানির প্রথম অধ্যায়ে শ্রীমন্ত কিশোর; শেষ অধ্যায়ে সে প্রায় বিগত-যৌবন প্রৌঢ়—মাঝের কয় বৎসরে তাহার পত্নী গিরি, মাতৃহীনা ভাগিনেয়ী গৌরী, বন্ধু বিপিন ও ভগ্নীপতি হরিলাল তাহার জীবনকে দুঃখ-সুখের রং দিয়াছে।—কিন্তু কোথায় যেন প্রথম অধ্যায়ের শ্রীমন্তের সহিত শেষ অধ্যায়ের শ্রীমন্তের একটি মিল আছে। যে-স্বভাব লইয়া সে জন্মাইয়াছিল, যে-স্বভাবে সে হাসিমুখে সঙ্গীদের মার খাইয়া বলিয়াছিল, 'ওস্তাদের মন্তর আছেরে, আর জানিস দম বন্ধ ক'রে থাকলে কিছু লাগে না।'—সেই স্বভাবই জীবনে তাহার সহস্র দুঃখ-নির্যাতনের* কারণ হইয়াও কিছুতে তাহাকে ছাড়িয়া যায় নাই। তাহার নিজের চরিত্রের মধ্যেই রহিয়াছে তাহার জীবনের ট্রাজেডির মূল—যেমন 'ওথেলো'র কি 'হামলেটে'র ছিল। ইদানীং বাংলা সাহিত্যে যতগুলি বই বাহির হইয়াছে, তাহাদের কোনটারই মধ্যে শ্রীমন্তের মত একটি ট্রাজিক-ফিগার পাই নাই। সত্যকার প্রতিভার যে পরিচয়, অত্যন্ত সামান্য ঘটনা-সংস্থানকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর আদিমতম দুঃখ-দুর্দ্দশা নির্দ্দেশ করা—তারাশঙ্কর শ্রীমন্তের চরিত্রে তাহাই করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বস্তু-জীবন যে ছায়ার খেলা, আসলে মানুষের ভিতরেই তাহার মূল কায়া, ইহা দার্শনিক তত্ত্ব। কিন্তু সেই তত্ত্ব যখন রসে রূপান্তরিত হয়, তখন সহসা চোখে জল আসে, বুকের ভিতরে কি যেন মোচড় দিয়া উঠে—'নীলকণ্ঠ' পড়িয়া পাঠক মাত্রেরই এই অনুভূতি আসিবে।

*ছেলেটির নাম রাখিয়াছে নীলকণ্ঠ।

গিরির ... যত কিছু বিষ উঠিয়াছে ও-ই তাহা নিঃশেষে পান করিয়া আসিয়াছে।

* * *

"সম্মুখেই অসীম-বিস্তীর্ণ ধরণীর বুক চিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে—বহু পথিকের পদরেখা-আঁকা পথখানি।

চলিতে চলিতে নীলকণ্ঠ পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীমন্ত তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিল।"—কাব্য করিয়া বলা নয়, কিন্তু বলিতে গিয়া বইখানির ভাষা কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। কষ্ট-কল্পিত হইলে যাহাকে দোষ বলিতাম, সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ায় তাহাকেই গুণ বলিতেছি।

বাংলা-সাহিত্যের মজলিসে তারাশঙ্কর এই কয়দিন আগে আসিয়াছিলেন, মজলিস তখন সর-গরম,—কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই। আজ সে-মজলিস তাঁহাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছে—আসন তাঁহার নির্দ্দিষ্টই আছে।

আমরা হিন্দুজাতি—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মূল্য ২ পয়সা। হিন্দু-মিশন কার্য্যালয়, ৩২ বি হরিশ চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষোল পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তিকা হইলেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ।

ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বেঙ্গল বুক সোসাইটি, ২৮৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ।৶০ আনা।

চার আনা পয়সা খরচ করিয়া এ-গল্প কিনিয়া যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারা অচিন্ত্য বাবুকে না বেঙ্গল বুক সোসাইটিকে বেশী গালি দিবেন বুঝিতেছি না। যাহাকেই দিন্ আমাদের দোষ নাই।

মুক্তির রূপ—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বেঙ্গল বুক সোসাইটি। দাম চার আনা।

আজে-বাজে কথা কত ফেনাইয়া-ফুলাইয়া বলা চলে, বইখানি তাহার এক্সপেরিমেণ্ট কিনা জানি না। তাহা যদি হয়, তবে ইহা প্রকাশের কোন সার্থকতা আছে।

মাধুকরী—শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল বুক সোসাইটি। চার আনা।

পোনেরোটি কবিতা। কয়েকটি পাঠ্য কবিতা আছে—কিন্তু মাঝে-মাঝেই হার্মোনিয়ামের ভাঙা-রীডটা বাজিয়া সব মাটি করিয়া দেয়। ভাঙা-রীডটা সারাইবার বয়স এতদিনে পীযূষ বাবুর হইল বৈকি !

রূপ ও যৌবন—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। নিয়োগী নিকেতন, ১২৯-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিতার বই। কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই।

আত্ম-জীবন স্মৃতি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ। ষ্ক্যোয়ার স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

সূচনায় লেখক বলিয়াছেন—'কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছি যে, এই কাহিনীর সহিত বাহিরের কোনই সংস্রব নাই, ইহা নিছক ব্যক্তিগত—আমারই।'… 'তবে আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক বংশেরই একটি করিয়া ইতিহাস থাকা উচিত্।'

রণডঙ্কা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। মূল্য দশ আনা। ২য় সংস্করণ।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ব্রজেন্দ্রবাবুর এই সচিত্র পুস্তকখানি যে বাংলা-দেশের ছেলেমেয়েদের ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার প্রমাণ, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। ইহাতে চারিটি গল্প আছে, জান কবুল, চাঁদবিবি, মনিবের মানরক্ষা ও জালিম সিংহের মাঠ। গল্পগুলি সুখপাঠ্য প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত। এই গল্পগুলিতেও ব্রজেন্দ্রবাবুর বিশেষত্ব বজায় আছে; শিশুদের জন্য লিখিত হইলেও তিনি আজগুবি গল্পের রচনা করেন নাই; ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গল্প লিখিয়াছেন। ইহা সচরাচর লেখকেরা করেন না। চিত্রগুলি সুন্দর।

চাঁদের বুড়ী—শ্রীগুরুসদয় দত্ত। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। মূল্য দশ আনা।

দত্তমহাশয় কর্ম্মী কৃতীপুরুষ; সাহিত্য ছাড়া জীবনের বহুক্ষেত্রে তিনি স্বনামধন্য। কিন্তু এই কর্ম্মব্যাকুল পুরুষটির অন্তরালে একটি শিশু আছে; সে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। চাঁদের বুড়ী সেই শিশুর প্রকাশ।

কিন্তু ভজার বাঁশীতে যাহা কাঁচা ছিল চাঁদের বুড়ীতে তাহা পাকিয়াছে। দত্ত মহাশয়ের সাহিত্যে হাত খুলিয়াছে; চাঁদের বুড়ীর অপরূপ কবিতাগুলিতে যথার্থ সাহিত্য-রসের সন্ধান শিশুর অভিভাবকেরা পাইবেন। এবং শিশুরা চিত্রে কবিতায় সত্যকার আনন্দ লাভ করিবে। ছবি ও ছাপার তুলনায় দাম সস্তা।

পদ্মরাগ—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কাশিমবাজার; মূল্য একটাকা।

বাংলাদেশে বর্ত্তমানে যে কয়জন পুরাতনপন্থী কবি আছেন বর্ত্তমান পদ্মরাগের কবি তাঁহাদের অন্যতম। ছন্দে ও শব্দঝঙ্কার-সৃষ্টিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার; ভাবের দিক দিয়া তিনি শান্ত সমাহিত। তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ স্থির; তিনি সত্য শিব সুন্দরের উপাসক এবং এই আদর্শে স্থির থাকিতে গিয়া তিনি অনেক দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছেন ... সম্বন্ধেই আমরা দুঃখভোগও যে তাঁহার সার্থক হইয়াছে পদ্মরাগের ... জানি না যে তাহাও প্রমাণ মিলে। তিনি যাঁহার ... করিয়া সম্পাদক মহাশয় ও তাঁহার পাইয়াছেন মনে হয়। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ইহা আশার কথা। বাংলা ভাষাতেই এই পত্রিকার প্রচার হওয়া বিধেয় ছিল।

উর্ব্বশী ... সম্পাদক মহাশয় অচিরে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। শিশুদের সরকার বিষয়ে, যাঁহারা ভাবনাশীল তাঁহারা এই পত্রিকার একখণ্ড সংগ্রহ এই ...

যাঁহার ক্ষমতা আছে তাঁহাকে বেসুরা বাজাইতে দেখিলে দুঃখ হয়, সে বেসুরও আবার যাবনী! দুর্বোধ্যতা যেখানে, আর্টেমিস সেখানে উর্বশীকেও ঘাঘ্‌রা পরাইয়া ছাড়েন। হায় উর্বশী, হায় ডায়ানা!

নূতন বাংলা-পত্রিকা

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয় বিভাগে বাংলা 'মাসিক-পত্রিকা ও সাপ্তাহিক' বিষয়ে লিখিতে গিয়া আমরা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলাম, 'পঞ্জিকাকারেরা যদি যথাযথ গণনা করিতেন, তাহা হইলে ১৩৪৪ সালের পঞ্জিকাতে দেখিতে পাইতাম—এবার দেবীর কাগজে আগমন।' আমরা তখন নিতান্ত আনন্দের সহিত (১) চিরন্তনী, (২) শ্রীহর্ষ, (৩) ফাল্গুনী, (৪) অভিযান, (৫) উদয়ন, (৬) অভ্যুদয়, (৭) ক্লাইভ ষ্ট্রীট, (৮) রূপ (৯) আরতি, (১০) ব্রতী—এই দশটি নূতন পত্রিকাকে বঙ্গসাহিত্যের দরবারে সাদর আহ্বান জানাইয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরমায়ু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যেই ইহাদের কয়েকটি ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, আরও দুই একটি যে বিনষ্ট হইবেন তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তথাপি, নূতনের জন্ম কে রোধিবে!

জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের 'দেবীর কাগজে আগমন' রহস্য এমনই সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গত সংখ্যায় এই বিভাগে 'বাংলা-পত্রিকা' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমরা কিঞ্চিৎ ভয়ের কারণও দর্শাইয়াছি। আজ আমরা আরও কয়েকটি পত্রিকার জন্মবিজ্ঞপ্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং সানন্দে ইঁহাদিগকে দেশের ও দশের এবং বাংলাসাহিত্যের উত্তরোত্তর উন্নতি বিধান করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে আহ্বান করিতেছি। ইঁহারা স্থিতধী হইয়া চিরায়ু হউন।

সাপ্তাহিক বিভাগে সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী সম্পাদিত বহুদিনকার পুরাতন পত্রিকা 'নবশক্তি'র অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। পরিচালক-বৃন্দের দোষে এমন একখানি কাগজ বিনষ্ট হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। সরোজবাবু নিজে ক্যাপিটালিষ্ট নহেন, আর কোনও পত্রিকা-সম্পাদনের সুযোগ তিনি পাইবেন কি না বলিতে পারি না; সম্পাদক-সঙ্ঘ হইতে তাঁহার এই নিরুপায় নির্ব্বাসন সত্যই পরিতাপের বিষয়।

ঢাকার 'বাংলার বাণী'র প্রথিতযশা সম্পাদক শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মহাশয় 'বাংলার বাণী' ছাড়িয়া স্বয়ং 'সোনার বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক ঢাকা হইতেই বাহির করিয়াছেন। ৭ই আশ্বিন 'সোনার বাংলা'র জন্ম। জায়গায় অ'ন ও বিষয়গুণে ইহা নলিনীবাবুর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। একই কালে এক শু.,সংখ্যা আমরা নিয়মিত পাইয়াছি। আশা করি, ৯০ তোলা হইতেছে। যাহারা শৃঙ্খ'ব।
এই ব্যবস্থার ফলে বহুস্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এ দু 'ন।এক' কিছুদিন
আত্ম-
এই অবস্থার আর একটা গুরুতর অসুবিধার
করিয়া-
সে অসুবিধা হইল সামাজিক-বিজ্ঞানের দিক হইতে
এই
সম্পর্কে অধ্যাপক মহলানবিশ বলিতেছেন,—

এই বৎসরে বাংলার শ্রমিক ও কৃষক-সমাজের মুখপত্র 'গণনায়কে'র আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রমিক, মূলধন, মস্কো, কাল মার্কস্ প্রভৃতি বড় বড় কথা লইয়া ইঁহারা আলোচনা করেন। কিন্তু ইঁহাদের নিজেদের মূলধন সম্বন্ধে আমরা এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। অত্যন্ত দুস্থ মূর্ত্তি লইয়া 'নয়া মজদুর'ও বাহির হইতেছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড 'নবশক্তি'র বিরাট শূন্যতা অচিরাৎ ভরাট করিলেন। ৮ই অগ্রহায়ণ হইতে তাঁহাদের 'দেশ' খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় বাহির হইতেছে। তিন সংখ্যা 'দেশ' পোলাও-কালিয়ার ক্ষুধা না মিটাইলেও মোটা ভাত-কাপড়ের দুর্দ্দশা ঘুচাইবে এরূপ আশা দিতেছে। তবে আনন্দ-বাজার পত্রিকা লিমিটেডের কাছ হইতে আমরা আরও অনেক বেশী প্রত্যাশা করিতাম বলিয়া কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়াছি।

২১শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারের স্মরবেলায় সাপ্তাহিক 'বাঙালী' আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বাঙালীর দ্বারা বাঙলাকে রক্ষা করানোই ইঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইঁহারা বলিতেছেন, যে-সকল সমস্যা বাঙালীদের পক্ষে এখন গুরুতর তাহা লইয়াই ইঁহারা মাথা ঘামাইবেন। আমরা বলিতে চাই যে গর্দ্দানের উপর সে বস্তুটি না থাকিলে তাহাকে ঘামানো সম্ভব হয় না। আগে মাথার প্রতিষ্ঠা হউক।

দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস এবং মাসের পর ঋতু। মাসিক 'সাহিত্য-বাসর পত্রিকা', 'নবারুণ', 'আগন্তুক', 'বিজলী', 'মঞ্জির', 'ছায়াবীথি', 'আহেরী', এবং ঋতু-পত্রিকা 'তরুণ', এই বৎসর বাহির হইয়াছে। যাঁহারা বাহির হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'নিকাল' যাইবেন নিশ্চয়ই কিন্তু আমরা সেরূপ কামনা করি না। গতবারে যেরূপ বলিয়াছিলাম, আমরা তাহার পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি যে সকলেই জীবিত থাকুন কিন্তু সম্পূর্ণ দায়িত্ব-বোধ লইয়া। ছাপার অক্ষরের উপর মোহ এখনও লোকের আছে—এ কথা পত্রিকার পরিচালকগণ যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন। বার্দ্ধক্যের পর ঘুমাইয়া পড়িয়া এই হতভাগ্য জাতি আবার শিশু হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। লিখিতে জানেন বা লিখিতে পারেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস আছে—তাঁহাদিগকে কিছুকাল মাষ্টারী করিতে হইবে এবং এই মাষ্টারী-কার্য্যের দায়িত্ব যে কতখানি তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। লেখকদের অপেক্ষা সম্পাদকদের দায়িত্ব অনেক বেশী। পাপ যাহা কিছু তাঁহাদের, কারণ হাতের লেখাকে ছাপার অক্ষরে রূপায়িত তাঁহারাই করেন।

নূতন প্রকাশিত পত্রিকাগুলির প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া ভাল। আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইয়া সাধারণের নিক ন-
সেই উদ্দেশ্যের কথাই বলিব। লক্ষ্যচ্যুত হইলে জনসাধারণের নিকট তাঁহা রি,
জবাবদিহি করিবেন।
জন-
'সাহিত্য-বাসর পত্রিকা'র উদ্দেশ্য বিরাট। সাহিত্য সম্বন্ধীয় ম' করা
সমালোচনী ইঁহাদের কাজ। সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম
এ বিষয়ে যোগ্য কিনা জানি না। তিন সংখ্যা পত্রিকায় তাহার কোন

আমরা পাইতেছি না। কিন্তু তাঁহার মুখবন্ধ প্রশংসনীয়। তিনি বলিতেছেন, 'আধুনা বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে একদল সাহিত্যিক সাহিত্য-সৃষ্টির নামে যে সকল বিষয় লিখিতেছেন, তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে, কি সাহিত্যে আবর্জ্জনা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ঐ সকল সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনায় মধ্যে এমন সব বিষয় আমদানী করিতেছেন —যাহাতে অনিষ্টই বেশী হইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা। সাহিত্য সৃষ্টির অজুহাতে কতকগুলি কুরুচিপূর্ণ পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে যে বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হয় না, তাহা ঐ সকল সাহিত্যিককে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।' কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম তিন সংখ্যার কোনোটিতেই সাহিত্য বা সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক কোনই প্রবন্ধ নাই।

'নবারুণ' শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 'কচ্ছাদা' পত্রিকা—ব্যবসা বাণিজ্য, সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও সঙ্গীত সব কিছুই ইহাতে আছে। পত্রিকার তিন সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। প্রত্যেক সংখ্যায় দুই একটি করিয়া ভাল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলির জন্য সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদার্হ—দ্বিতীয় সংখ্যায়—ডক্টর সত্যানন্দ রায়ের 'ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের এক পাতা', শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনের 'বংশানুবর্ত্তন ও আবেষ্টন', শ্রীগৌরীহর মিত্রের 'প্রাচীন বঙ্গের পল্লীচিত্র'; শ্রীত্রিদিবনাথ রায়ের 'প্রাচীন ভারতের অঙ্গরাগ' এবং কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'নারিকেল'—তৃতীয় সংখায় শ্রীশচীন্দ্রকুমার মৈত্রেয়ের 'সোভিয়েট রুশিয়ার শিক্ষা', শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের 'ব্যক্তি ও সমাজ'; শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধরী মহাশয়ের 'সঙ্গীতে বঙ্গের স্থান', শ্রীমণিলাল সেন শর্ম্মার 'সঙ্গীতের উচ্চ শিক্ষা ও কলেজ' এবং চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রগতি', মৌলবী রওশন আলির 'সুফী মতবাদ' এবং শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকারের 'উত্তর বঙ্গের সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব'।

'আগন্তুক' শ্রীমতী পরিমল মিত্র সম্পাদিত বাঙালী খ্রীষ্টান-সমাজের মুখপত্র। 'আগন্তুক' এখনও আপনার স্বরূপ পায় নাই। বাঙালী খ্রীষ্টান সমাজের অনেক বলিবার কথা আছে। 'আগন্তুক'এ আমরা তাহারই প্রকাশ দেখিতে চাই।

'বিজলী' শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈদ্যুতিক-শক্তি-সংক্রান্ত বাঙ্গলা পত্রিকা। এই পত্রিকা সুসম্পাদিত হইলে আমাদের একটি সত্যকার অভাব দূর করিবে। ইলেক্‌ট্রিসিটির দিন দিন প্রসার হইতেছে সুতরাং এই পত্রিকার ভবিষ্যৎ ভাল। ছাপা কাগজ চমৎকার, কিন্তু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এখনও পাইতেছি না।

'ছায়াবীথি'র সম্পাদক নাজিরুল ইসলাম। দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমরা পাইয়াছি। মুসলমান লেখকই বেশী—ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও আছেন। সাধারণ সাহিত্য-পত্রিকা—বিশেষ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট নহে।

'সুন্দর' শ্রীঅমিয় রায় চৌধুরী সম্পাদিত। আশীর্ব্বাদে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'সত্যেরই একটা দিক সুন্দর। যা সুন্দর তা সত্য হবেই এবং যা সত্য তা কখনও অসুন্দর হতে পারে না।'

এই পত্রিকার 'সুন্দর' নামটি সুতরাং সার্থক হয় নাই।

'আহেরী' শ্রীনিখিলরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। নূতন পত্রিকাগুলির মধ্যে 'আহেরী'র একটু বৈশিষ্ট্য আছে—ইহা সংগ্রহ-পত্রিকা। নূতন রচনা সংগ্রহ ও তাহার প্রকাশে যথেষ্ট বিপত্তি আছে। ভাল লেখকের সংখ্যা কম এবং অনুপাতে পত্রিকাসংখ্যা বেশী, সুতরাং ভাল লেখা সংগ্রহ বহুভাগ্যেই হয়। আহেরীর সম্পাদকদ্বয় নূতনের দায়িত্ব না লইয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন ছাপা পত্রিকা হইতে ভাল লেখা সঙ্কলন ও সংগ্রহ করিবার দায়িত্বও সহজ নয়। এই কাজে তাঁহাদের শৈথিল্য প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। আশা করি ভবিষ্যতে এই কাজের গুরুত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন।

তাঁহারা 'বিভিন্ন পত্রিকা হইতে উৎকৃষ্ট গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা-সমালোচনার সঙ্কলন' করিবার ভার লইয়াছেন। বৈদেশিক পত্রিকাদিও বাদ যাইবে না। পাশ্চাত্য দেশে 'লিটারারি ডাইজেষ্ট', 'রীডার্স ডাইজেষ্ট' প্রভৃতি সুবিখ্যাত পত্রিকা এই কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্কলন-পদ্ধতি সম্পাদকদ্বয়কে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি।

দি ক্যালকাটা ম্যুনিসিপাল গেজেট—

নবম বাৎসরিক সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীঅমল হোম। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত অমল হোমের সুচারু হস্তাবলেপে ধাঙ্গড়, মেথর, জলকল ও রেটপেয়ারের কাগজও মনোহরণ মূর্ত্তি লইয়াছে। এখানে তাঁহার বাহাদুরী এবং এখানেই তিনি বাংলাদেশে পত্রিকা-সম্পাদনের একটি নিখুঁত আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। চিত্রে ও প্রবন্ধগৌরবে এই সংখ্যা পত্রিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; ইহার চাইতে ভাল কিছু আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব পেডিয়াট্রিক্‌স—

প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৩৩। সম্পাদক কে. সি. চৌধুরী মহাশয়। ত্রৈমাসিক। বার্ষিক সংখ্যা ৬৲, এই সংখ্যা ১॥০।

আমাদের দেশে শিশুরা জন্মে এবং বড় হয়—পৃথিবীর অনেক আশ্চর্য্যের মধ্যে ইহাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মরিয়া হাজিয়া সবকটিই যে নষ্ট হইয়া যায় না ইহার কারণ ইহারা কিছুতেই মরিবে না পণ করিয়া জন্মিয়াছে। আসলে শিশুজন্মের পূর্ব্বের এবং পরের কোনও কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই আমরা অবহিত নহি। অনেক কিছু আমরা জানি না এবং জানি না যে তাহাও জানি না। এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় ও তাঁহার মণ্ডলী এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ইহা আশার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলা ভাষাতেই এই পত্রিকার প্রচার হওয়া বিধেয় ছিল। আশা করি সম্পাদক মহাশয় অচিরে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। শিশুদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যাঁহারা ভাবনাশীল তাঁহারা এই পত্রিকার একখণ্ড সংগ্রহ করিবেন।

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্য-পদ্ধতি

নিখিলভারত কংগ্রেস-কমিটীর অধিবেশন এখন সম্ভবপর কিনা সেই সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য দিল্লীর বিরলা হাউসে কংগ্রেসের নেতাগণ সমবেত হন। গত ১৪ই ডিসেম্বর উক্ত অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আলোচনার পর স্থির হয় যে, বে-আইনী ঘোষিত হইবার পরও যদি নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটীর সভা আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে কার্য্যত ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য করা হয়। এধারে, ব্যাপক আইন-অমান্য বন্ধ রাখিবার জন্য কংগ্রেস যে নির্দ্দেশ দিয়াছিল, তাহা এখনও বলবৎ আছে। এহেন অবস্থায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটীর সভা আহ্বান করা হইলে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অমান্য করা হয়। সুতরাং উক্ত অধিবেশন এখন হইতে পারে না। এই সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেন, নিজের কাজ নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে এখন প্রত্যেকেই এক একজন নেতা। যে সমস্ত নেতা কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহারা যাহাতে এই অবস্থার গুরুত্ব আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্য এই ব্যবস্থা আরও কিছু দিন বলবৎ থাকিবে।

ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং শিশিরকুমার মিত্র মহাশয় সম্প্রতি একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের নানাজায়গায় নানাপ্রকারের মাপ এবং ওজন প্রচলিত। এক বাঙ্গালা দেশেই ওজনের তারতম্য এত বেশী আছে যে ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। কোনও জায়গায় এক সের ৮০ তোলা, আবার কোনও জায়গায় এক সের হইল ৯০ তোলা। এক দেশের মধ্যে একই কালে এক সের কখনও ৮০, কখনও ৮২, ৮৪৸৶০ বা ৯০ তোলা হইতেছে। যাহারা শস্য উৎপন্ন করে, তাহারা এই ব্যবস্থার ফলে বহুস্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তাহা ব্যতীত এই অবস্থার আর একটা গুরুতর অসুবিধার দিক আছে। সে অসুবিধা হইল সামাজিক-বিজ্ঞানের দিক হইতে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক মহলানবিশ বলিতেছেন,—

"বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য বা শস্য বা অন্য কিছুর সংবাদ সংগৃহীত হইয়া আসিলে প্রথমেই দেখিতে হয় যে, কোন্ মাপ ব্যবহার করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে মাপের ঠিক পরিমাণ কি, জানা না থাকাতে এই সব সংবাদ হইতে ঠিক তথ্য বাহির করিতে অনেক বেগ পাইতে হয়। তারপর পরিমাণ জানা গেলেও, বিভিন্ন রকমের মাপকে এক মাপে আনিবার জন্য অনর্থক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হয়, সময় সময় খুব প্রয়োজনীয় সংবাদ শুধু পরিমাণ জানার অভাবে একেবারে অকেজো হইয়া যায়। তারপর পুরাতন নথীপত্র ঘাঁটিয়া যখন আগেকার মাপ পাওয়া যায়, তখন তার ঠিক পরিমাণ না জানা থাকার দরুন সেই সব তথ্য কোনও কাজে লাগান যায় না। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এই রকম বিভিন্ন মাপ একটা মস্ত অন্তরায় হইয়া আছে!"

সেইজন্য তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যাহাতে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র এক মাপ এবং ওজন প্রচলিত হয়, তাহার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন; এই ব্যাপারে সকলের সহানুভূতি যে তাঁহারা পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, মাপ আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে, কোন্ পদ্ধতির মাপ নির্দ্ধারিত হইবে? তাঁহারা বলেন যে, মেট্রিক মাপই প্রচলন করা আবশ্যক। কারণ, গণনার দিক দিয়া এই পদ্ধতির দশমিক প্রথার ভাগ একটা মস্ত সুবিধা। ইহাতে যাঁহারা কাগজে-কলমে ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ করেন বা তাহার আলোচনা করেন, তাঁহাদের বহু সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ নিরক্ষর বিক্রেতা এবং কৃষক, যাহারা প্রথম দশটি সংখ্যা একসঙ্গে যোগ দিতে শিখে নাই, তাহাদের এই পদ্ধতি অবলম্বন করা এখন একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইবে বলিয়া মনে হয়। আগামী জানুয়ারী মাসে বোম্বাইএর বিজ্ঞান-সভায় এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইবে। আশা করি, তখন বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ব-আলোচনার সুবিধার সঙ্গে জন-সাধারণের ব্যবহারিক সুবিধার দিকটাও আলোচনা করা হইবে।

১৯৩১-৩২ সালের ভারতবর্ষের সরকারী বিবরণ

যথারীতি ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৩১-৩২ সালের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

রিপোর্টে ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার বিশদ বর্ণনা আছে। ঐ সময়কে দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম ভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে, দিল্লী-চুক্তির আমল এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে, পুনরুজ্জীবিত আইন-অমান্যের আমল। ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ্চ দিল্লীতে গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্ত্তৃক চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, আর্থিক দুর্গতি, গুজরাট, যুক্ত প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে চাঞ্চল্য, ব্রহ্মবিদ্রোহ, কাশ্মীরে অশান্তি প্রভৃতি আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিবরণীতে উক্ত বৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে অনেক সরকারী খবরাখবর প্রকাশিত হইয়াছে।

আইন-অমান্যে দণ্ডিতদের সংখ্যা

উক্ত রিপোর্টে আলোচ্য বৎসরে আইন-অমান্যে দণ্ডিতের সংখ্যা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে,

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত লোকের সংখ্যা এইরূপ :—

জানুয়ারী	...	১৪৮০৩
ফেব্রুয়ারী	...	১৭৮১৮
মার্চ্চ	...	৬৯০০
এপ্রিল	...	৫২৫৪
মে	...	৩০১৮
জুন	...	৩৫৩১
জুলাই	...	৩৫৯৫
আগষ্ট	...	৩০৪৭
সেপ্টেম্বর	...	২৭৯১
অক্টোবর	...	১৯৩৭
নবেম্বর		
ডিসেম্বর		
মোট		৬৬৯৪৬

ভারতের কলকারখানার অবস্থান

উক্ত সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৯৩২ সালে ভারতে মোট কলকারখানার সংখ্যা ছিল ৯৪৩১। ১৯৩১ সালের শেষে ভারতে ৯২৩৩টি কলকারখানা ছিল। এই বৎসর এবং ১৯৩১ সালে ভারতের কলকারখানার মধ্যে যথাক্রমে ৮২৪১ এবং ৮১৪৩টি কলকারখানাতে কাজ চলিয়াছিল। উপরোক্ত ৮২৪১টি কারখানার মধ্যে ৩৮০২টিতে সারা বৎসর ধরিয়া এবং ৪৪৩৯টিতে বৎসরের কতক সময়ে কাজ হয়। এই বৎসর আহম্মাবাদে ৫টি নূতন কাপড়ের কল এবং সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহার এবং উড়িষ্যাতে অনেক চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালের শেষে ভারতবর্ষে মোট ১১৯টি চিনির কল ছিল। ১৯৩২ সালের শেষে উহার সংখ্যা ১৬৬ দাঁড়াইয়াছে। পাঞ্জাবে এই বৎসর আরও গেঞ্জী মোজার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ে সিগারেট ও দেশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালার কতকগুলি চাউলের কল এবং পাটের বস্তা বাঁধিবার কারখানা ব্রহ্মদেশে করাত, কল এবং যে সব প্রদেশে তুলা জন্মে সেই সব প্রদেশে অনেক তুলার বস্তা বাঁধিবার কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে

এ বৎসরের নোবেল-প্রাইজ

এ বৎসর সাহিত্যের জন্য নোবেল-প্রাইজ পাইয়াছেন, রুষ সাহিত্যিক আইভান বুনিন। রুষ ভাষার লেখক হিসাবে প্রথমে বুনিন এই সম্মান পাইলেন। অনুবাদের মধ্য দিয়া বহুদিন পূর্ব্বে আমরা বুনিনের মাত্র একখানি উপন্যাসের সহিত পরিচিত হই। সে বইখানির নাম হইল—The Village. তাহার পর আসে, The Gentleman from San Francisco এবং The Wail of Days. রয়টারের মারফৎ বুনিনের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া প্রথমেই এই কথাই মনে হইয়াছিল, যে-প্রতিষ্ঠান টলস্টয়, গর্কী, আন্দ্রিভ, কুপরিনকে স্বীকার করে নাই, অবশেষে তাঁহারা রুষ-ভাষার লেখক হিসাবে সেই সম্মানের জন্য বুনিনকে নির্ব্বাচিত করিলেন। রুষ-ভাষায় বুনিনের অন্যান্য কি গ্রন্থ আছে, আমাদের তাহা জানা নাই। কিন্তু এই তিনখানি গ্রন্থের বিষয়-বস্তু এবং তাহার লেখন-ভঙ্গীর মধ্যে আমরা এমন কিছুই

নিদর্শন পাই না—যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের চিন্তাধারা বা গতি পরিপুষ্ট বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গর্কী এখনও জীবিত। রুষিয়ার পল্লীচিত্র এবং নিম্নস্তরের জীবনের মধ্য দিয়া অনাদি জীবন-ধারার নিত্য-প্রবহমান গতি যে রহস্যময় অসম-মাত্রিক ছন্দে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার রূপ তিনি যে-ভাবে ফুটাইয়াছেন এবং তাহাকে দেখিবার, বুঝিবার, অনুভব করিবার যে অপূর্ব্ব দৃষ্টি জগৎকে দিয়াছেন, বুনিনের পল্লী-চিত্রে তাহা নাই। ইহার রচনায় একটি সুন্দর লিরিক সুর আমাদের মুগ্ধ করে বটে কিন্তু আজিকার সাহিত্যে বিশেষ করিয়া তাহাকে চিহ্নিত করিবার কোনও কারণ নাই। বুনিনের এই লিরিক সুর টুর্গেনিভের অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার প্রতিধ্বনি মাত্র। বিভিন্ন য়ুরোপীয় মাসিক পত্রিকায় আজকাল নোবেল-প্রাইজ প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচন-ব্যাপার সম্বন্ধে নানাপ্রকারের সন্দেহজনক মন্তব্য প্রায়ই প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। অনেকে এমনও বলেন যে, অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মত, উহা এখন দলের প্রভাবে পরিচালিত হয়

শ্রীঅনাথনাথ বসু

বর্ত্তমান সংখ্যার শিকাগো বিশ্ব-শিল্প প্রদর্শনীর লেখক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু দীর্ঘ প্রবাসের পর সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। ১৯৩০ সালে তিনি ইংলণ্ডে যান, সেখানে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির টীচার্স ডিপ্লোমা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের শিক্ষাবিভাগের কাজ ও হ্যারো প্রভৃতি বিদ্যালয়ের কার্য্যপদ্ধতি ভাল করিয়া দেখেন। ইংলণ্ডের বাহিরের এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গুলির কাজও তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি পরে সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, সুইজার্লাণ্ড, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সে যান। সেই সব স্থানের শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া, ভারতে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটির এম্-এ ডিগ্রী পান্। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালী এ ডিগ্রী পান্ নাই।

অতঃপর তিনি ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টুডেণ্ট সার্ভিস কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া চেকোশ্লোভেকিয়ায় ভারতীয় ছাত্র-সমাজ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই সুযোগে অষ্ট্রিয়ার বিদ্যালয়গুলির কার্য্য-প্রণালী দেখেন। এই সময়েই তিনি কন্‌ফারেন্স অব নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ফ্রান্সের নীসে ভারতীয় শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এবং কিছুদিন জার্ম্মানীতে এক বিদ্যালয়ে দুই মাস অধ্যাপনা করিবার পর তিনি শিকাগোর নিকটবর্ত্তী উইনেটকার গ্র্যাজুয়েট টীচার্স কলেজের ফেলোশিপ লইয়া আমেরিকা যান্ এবং এবং সেখানকার শিক্ষা-প্রণালী আয়ত্ত করেন

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু।

তৎপরে ইউরোপে ফিরিয়া তিনি লীগ্ অব নেশন্সের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে ভারতীয় কোল্যাবরেটরের কাজ করেন। লীগ্ অব নেশন্সের কাজকর্ম্ম তিনি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন।

আগামী সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'তে তিনি লীগ্ অব নেশন্স সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

জগতের লোক-সংখ্যায় হিন্দুদের স্থান

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীর লোক-সংখ্যা ১৮৫ কোটী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম হিসাবে গণনা করিয়া দেখা

গিয়াছে যে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা জগতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এবং ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা, জগতের বিভিন্ন দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকা সত্ত্বেও, হিন্দুদের তুলনায় ২ কোটি ১১ লক্ষ কম

খৃষ্টান	৬৮ কোটি	২৪ লক্ষ
ইহুদী	১	৬১
মুসলমান	২০	৯০
বৌদ্ধ	১৫	১
হিন্দু	২৩	১
কনফিউসিয়াস মতবাদী	৩৫	৬
শিণ্টো মতবাদী	২	৫০
পার্ব্বত্য জাতি	১৩	৫৯

পরলোকে কবি মোজাম্মেল হক

গত ১০ই অগ্রহায়ণ শান্তিপুর নিবাসী প্রাচীনতম মুসলমান সাহিত্যিক মৌলবী মোজাম্মেল হক মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। অর্দ্ধশতাব্দী আগে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে যে দুই একজন লোক বাঙ্গালা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হন, তিনি তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন এবং এই দীর্ঘ ৫০ বৎসর কাল ধরিয়া একনিষ্ঠভাবে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গদ্য-রচনায় একটা মাধুর্য্য এবং শালীনতা আছে যাহা খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে এবং চরিত্রগুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ৪০ বৎসর ধরিয়া তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য ছিলেন এবং কয়েকবার ভাইস্-চেয়ারম্যানের কার্য্যও করিয়াছেন। পুরাতন বাঙ্গালার সহিত যাঁহাদের অন্তরের পরিচয় ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাদের মধ্য হইতে আর একজন চলিয়া গেল।

এবারের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক

বাঙ্গালা ভাষার লেখকদিগের পক্ষে বাঙ্গালীর নিকট হইতে এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্মান হইল—জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রাপ্তি। ১৯২১ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৩০০০ টা মূল্যের গভর্ণমেণ্ট পেপার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]ন। এই টাকার সুদ হইতে দুই বৎসর অন্তর ২০০ টাকা মূল্যের একটা স্বর্ণপদক তাঁহার জননী জগত্তারিণী দেবীর নামানুসারে বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী লেখককে দিবার জন্তই তিনি এই টাকা দান করিয়া যান। ১৯২১ সালে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ এই পদক পান। তাহার পর যথাক্রমে, শরৎচন্দ্র, অমৃতলাল, স্বর্ণকুমারী, দীনেশচন্দ্র সেন পাইয়া আসিয়াছেন। এই বৎসর এই সম্মান পাইলেন পূর্ণিয়াবাসী সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার প্রতিভার এই স্বীকারে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলনকারী প্রত্যেকেই আনন্দিত হইয়াছেন। সোক্রেটিস বৃদ্ধ বয়সে বীণা বাজাইতে শিখিয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেই যে-ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামিলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। যৌবনের প্রাণ-ধর্ম্ম প্রবীণের প্রতি ছত্রে জীবন্ত, লিখন-রীতিতে অপূর্ব্ব দুঃসাহসিকতা, এবং সেই সঙ্গে বহুপ্রকারে জীবনকে অতি অন্তরঙ্গভাবে দেখার ফলে রাগ নয়, আক্রোশ নয়, বিদ্রোহ নয়, অতৃপ্তি নয়, একটি মধুর করুণা এবং ক্ষমার দৃষ্টি দিয়া জীবনের একটি বিচ্যুতি, অতিরিক্ততা এবং পঙ্গুতাকে দেখার অনায়াস ভঙ্গী—তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার এই সময় উত্তীর্ণ করিয়া আসার অপরাধকে এমন ভাবে সংশোধন করিয়া লইয়াছে যে, আমাদের অভিযোগ করিবার কিছু নাই। অনুপ্রাস এবং দ্ব্যর্থের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের হাসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া নয়, সেই সব অনুপ্রাস এবং দ্ব্যর্থের মধ্য দিয়া জীবনকে দেখিবার যে মধুর ভঙ্গীটি তাঁহার সাহিত্য-রচনায় আমরা দেখিতে পাই, তাহার জন্য আমরা প্রাণ হইতে এই অবকাশে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে প্রেণ্টিস সাহেব

১১ই ডিসেম্বর বাঙ্গালা সরকারের মন্ত্রণা-পরিষদের রাজনীতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য অনারেবল স্যার উইলিয়াম প্রেণ্টিস্ পরলোক গমন [illegible] করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার পারলৌকিক ক্রি[illegible]র সময় বাঙ্গালা দেশের [illegible] গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম[illegible] হইয়াছিলেন। তিনি একজন [illegible] রাজকর্ম্মচা[illegible] ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র [illegible] বৎসর [illegible]ছল। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা তাঁহার [illegible] পরিবারবর্গকে অন্তরের সম-বেদনা জানাইতেছি।